ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

২য় বর্ষ ॥ ৪র্থ খণ্ড

শুক্রবার ১৮ই মাঘ ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ—শুক্রবার ১৯শে বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

শুক্রবার ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ ইং—শুক্রবার ৩রা মে ১৯৬৩ ইং

লেখক **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক — **বিষয় ও পৃষ্ঠা**

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 1st February, 1963.
40 Naya Paise.

বিগত সপ্তাহে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের দুইটি চিরস্মরণীয় দিনের বাৎসরিক স্মারক-অনুষ্ঠান এবং স্বাধীনতালাভের পর মিত্রবেশী বিশ্বাস-ঘাতক প্রতিবেশীর অতর্কিত আক্রমণের পর যে নাটকীয় পর্ব চলিতেছে তাহার দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে যবনিকা পতন, এই তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল।

সর্বপ্রথমে ছিল নেতাজী সুভাষের জন্মবার্ষিকীর সমারোহপূর্ণ উৎসব। এই বৎসর নেতাজীর স্মারক মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক বৎসরে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা, সভা ও প্রদর্শনী ইত্যাদি সমানভাবে চালিত হইয়াছিল। ঐ দিনে নানালোকে নানা-ভাবে ভারতমাতার এই অসামান্য নেতৃত্বগুণসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা ও শৌর্যবীর্যঅলংকৃত যোদ্ধা সন্তানের গুণ-কীর্তন করেন। যশোগান স্মৃতি-তর্পণের অবিচ্ছেদ্য অংগ, কিন্তু সেই উৎসব উদ্যাপনের মধ্যে যাহা কথিত ও লিখিত হয় তাহার অনেককিছুই আজিকার পরি-বেশে শুধু বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাত্র ছিল না বরঞ্চ সর্বতোভাবে অনুধাবনযোগ্য ছিল।

এই কীর্তিমান পুরুষসিংহের আদর্শবাদ ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের অতীত ছিল। কবিগুরুর ভাষায় যে বীরগণের বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ

"বিঘ্ন বিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিয়া যারা
মৃত্যুগহন পার করিল টুটিল মোহ কারা"—

তিনি সেই অমৃতের সন্তানগণের অন্যতম। যে সময় তিনি অশেষ বাধা অন্তরায় অগ্রাহ্য করিয়া ভারত-স্বাধীনতা সংকল্পে "আই-এন-এ" গঠন করেন, সেই মুহূর্তেই ভারতভূমিতে বিদেশী শাসনতন্ত্র শিথিল হইতে আরম্ভ করে, কেননা বিদেশী সরকার সেইদিনই বুঝিতে পারে যে ভারতীয় সেনাকে আর স্বদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী কার্য করাইতে পারা যাইবে না। সমরাংগণে নেতাজীর অভিযান সাফল্যলাভ করে নাই, কিন্তু যে স্বাধীনতা-যজ্ঞে তিনি সর্বস্ব আহুতি দিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। যুদ্ধে ব্রিটিশরাজ জয়লাভ করে কিন্তু সেই জয়ের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের পরাজয় নিহিত ছিল। বিদেশী শাসক বুঝিয়া-ছিল যে যেদিন নেতাজীর স্বাধীনতার ডাকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ভারতীয় সেনাদল ও সেনানীবর্গ সাড়া দিয়াছে সেইদিনই সাম্রাজ্যবাদের পতন আরম্ভ হইয়াছে। সেই কারণে যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সরকার গোপন তদন্ত করায় যে, যে বিরাট ভারতীয় সৈন্যবাহিনী (দশ লক্ষাধিক) পাশ্চাত্য যুদ্ধাস্ত্র-চালনায় শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং পশ্চিম ও পূর্ব রণাংগনে সেই শিক্ষার ও যুদ্ধ-ক্ষমতার অসীম সাহসিক পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে ভারতীয় স্বাধীনতালাভের প্রয়াসকে দমন করায় নিয়োগ করা যাইবে কিনা। তদন্তের ফলে জানা যায় যে নেতাজীর দীক্ষা বিদেশীর সেই আশা চিরদিনের মত নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' তাহার জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেমের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরাজয়কে জয়ে পরিণত করিয়া গিয়াছে। নেতাজীর পৌরুষ ও দৃঢ়-সংকল্প এইভাবে ভারতের ইতিহাসে নূতন অভ্যুদয়ের যুগারম্ভ রক্তাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় স্মারক ঘটনা ছিল সাধারণতন্ত্র দিবসের উদ্যাপন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে অনু-ষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ভারতে সাধারণতন্ত্র ঘোষণার চেষ্টা হয়। উদ্যোক্তাদিগের অন্যতম ছিলেন একজন নূতন কংগ্রেসকর্মী—সুভাষচন্দ্র বসু। বর্তমান পরিবেশে সেকথাও স্মরণ করা প্রয়োজন।

তৃতীয় ঘটনার শেষ হইয়াছে কলম্বো প্রস্তাব লোকসভায়—ও সাধারণজনের সম্মুখে প্রকাশিত করায় ও তাহার আলোচনার সঙ্গে। এই প্রস্তাবঘটিত যাবতীয় ব্যাপারই হেঁয়ালি নাট্যের ধারায় পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। আপাততঃ ঐ নাট্যে যবনিকা পতন হইয়াছে। কখন ও কিভাবে পরের অংক মঞ্চস্থ হইবে তাহা জানা নাই।

এতাবৎ যে কথা কাটাকাটি ও পাল্টাপাল্টি হইয়াছে তাহাতে আমরা ক্রমেই অধিকতরভাবে অনুভব করিতেছি এই যুগসন্ধিকালে দৃঢ়চিত্ত অটলহৃদয় ও স্থিরসংকল্প নেতৃত্বের অভাব। লোকসভা ও রাজ্যসভা প্রত্যক্ষভাবে ঐ কলম্বো প্রস্তাবকে অনুমোদন করিয়া আমাদের কর্ণ-ধারবর্গকে অবাধ ক্ষমতা দান করে নাই—ইহাতে আমরা আশ্বাস পাইতেছি। কিন্তু আমাদের যুদ্ধযাত্রা শেষ পর্যন্ত নিরুদ্দেশ যাত্রায় না পরিণত হয় সেই আশংকা আমাদের মনে রহিয়া গিয়াছে।

সারা রাত্রি সারা দিনমান
জ্বলিয়াছি যে অগ্নি-জ্বালায়,
পরবশ্যতার গ্লানি,
স্বাধিকার-প্রবঞ্চিত জীবনের
নিরুপায় নিস্ফল ক্রন্দন
যৌবনে দিয়েছে লজ্জা, আনিয়াছে জীবনে ধিক্কার,
ভুলি নাই সে যন্ত্রণা, দুঃস্বপ্নের ক্লান্তি অবসাদ;
ভুলি নাই মর্মদাহে পীড়নের আরণ্য ইন্ধন।
সে ইন্ধনে একদিন দেখিলাম অবাক বিস্ময়ে
জ্বলিতেছে রাজ-সিংহাসন
লণ্ডভণ্ড রাজ্যপাট,
জ্বলিতেছে অস্ত্রাগার ত্রাসন নাশন;
অপহৃত মুকুটের স্পর্ধিত বৈভব
বাহুবলে অপহৃত কোষাগার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
জ্বলে জ্বলে নিভে গেল,
শতাব্দীর রক্তসূর্য
ধীরে ধীরে হল অস্তমিত।

তার পরে দেখিলাম পূর্বাকাশে উদয়-ভানুর
স্বর্ণচ্ছটা দিগ্ দিগন্তরে,
নব তৃণদলশোভা দেখিলাম ধূসর প্রান্তরে।
তবুতো ভুলিনি আজও অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের বাণী,
অতীতের ক্ষোভদৃপ্ত উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
নিগ্রহের যন্ত্রণায় উপেক্ষার হাসি
উপেক্ষিত মর্যাদার ভয়শূন্য খর প্রতিবাদ
লাঞ্ছনায় অচঞ্চল স্থির লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ।
ভুলি নাই অনির্বাণ নীলাভ শিখারে
এক নহে, লক্ষ লক্ষ আদিগন্ত ঊর্ধ্বমুখী শিখা।
আবার জ্বলুক তারা
আজিকার আগ্নেয় আহবে,
অসহ্য দাহনে তার
দগ্ধ হোক স্বৈরাচারী শত্রুর শিবির,
শক্তিমদমত্ততার লোভদৃপ্ত হীন আক্রমণ
নিঃশেষ হইয়া যায়
সীমান্তের অন্তিম শয্যায়

জ্যোতির্ময়

আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, সময় খুব মূল্যবান জিনিস, অযথা সময় নষ্ট করলে নানারকম অসুবিধায় পড়তে হয়। কিন্তু যে ব্যবস্থায় আমরা বড় হ'য়ে উঠেছি তাতে সময়কে খুব যে একটা মূল্যবান বস্তু বলে মনে করা হত তার নিদর্শন দেখতে পাইনি।

একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমাদের পাশের গ্রামে একজন ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর এক ছেলে ছিল আমার বন্ধু, সেই সুবাদে মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যাতায়াত ছিল আমার। ভদ্রলোক ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বাড়িতে গৃহ-দেবতা, কিছু ভূ-সম্পত্তি এবং লক্ষ্মী-স্বরূপা একজন গৃহিণী ছিলেন তাঁর। সংসারটা মোটের ওপর বেশ সচ্ছলই ছিল বলতে হবে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে খুব সুশৃঙ্খল লাগত না।

ভদ্রলোক শয্যাত্যাগ করতেন শেষ রাত্রে। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে, বাইরের দাওয়ায় হুঁকো-হাতে ব'সে তামাক টানতেন। সেই সময় তাঁর সামনে গরু দোহানো হত, মাঝে মাঝে বর্গা-দারদের কেউ এলে তাদের সংগে জমি-জিরেতের বিষয়ে আলোচনাও চলত। তারপর বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ ব'সে ব'সে ক্লান্ত বোধ করায় উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দা এবং উঠোনের ওপর খড়ম পায়ে পায়চারী শুরু করতেন। চলতে চলতে কখনো হয়তো তিনি কোনো একটা ফুল গাছ বা অন্য কোনো চারাগাছের কাছা-কাছি এসে সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন, কখনো গুণ গুণ করে গান গাইতেন বা অদূরে কাউকে দেখতে পেলে তার সংগে বাক্যালাপ করতেন। এইভাবে সূর্য যখন মধ্য-গগন অতিক্রম করত তখন হত তাঁর স্নানের সময়। তেলবাটি নিয়ে তিনি অঙ্গমর্দন করে রওনা হতেন পুকুরের দিকে। সেখানে তখন স্নানার্থীর সংখ্যা প্রায় বিরল হ'য়ে উঠেছে, কাজেই স্নানপর্ব তাড়াতাড়িতেই শেষ হত। কিন্তু বাড়ি এসেই ঢুকতেন তিনি পুজোর ঘরে। বেলা তখন দেড়টা-দুটো। এই সময় শুরু হত তাঁর পুজো,

স্তব এবং গীতাপাঠ। একনাগাড়ে ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে ধর্মচর্চা ক'রে চারটে নাগাদ আহারের জন্যে প্রস্তুত হতেন তিনি, তারপর খাওয়া সেরে উঠতে উঠতে প্রায়ই সন্ধ্যে হ'য়ে যেত।

বাড়ির অন্য সকলে অবশ্য আগেই খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলত। কিন্তু গৃহিণী থাকতেন নিরম্বু উপবাসে। ফলে এই আপাত-শান্তিময় সংসারের তলায় একটা অশান্তির স্রোত বিপদ ঘনিয়ে তুলছিল।

একদিন গৃহিণী শয্যাগ্রহণ করলেন। জানা গেল তাঁর গ্যাস্ট্রিক আলসার হ'য়েছে, খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে নিয়মানুবর্তীতা প্রয়োজন।

কিন্তু কর্তা যে বাড়িতে চারটে নাগাদ অন্ন গ্রহণ করেন, গৃহিণী সেখানে নিয়ম মেনে চলবেন কী করে? আমার বন্ধুটি তখন কলেজের ছাত্র এবং কলকাতাবাসী। মায়ের অসুখ শুনে দেশে এসেছিল। সমস্ত ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ ক'রে সে একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ উপস্থিত হল তার পিতার সম্মুখে।

ভদ্রলোক তখন বলা বাহুল্য তাঁর দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন। ছেলেকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর পিতাপুত্রে এই ধরনের কথা-বার্তা হল।—

পিতা। কীরে, কী ব্যাপার?

পুত্র। মার তো গ্যাস্ট্রিক আলসার হ'য়েছে।

পি। তাই তো শুনলাম যোগীনের কাছে। (যোগীন বাবু গ্রামের ডাক্তার।) তা ওষুধপত্তর সব আনা হ'য়েছে তো?

পু। হ্যাঁ, কিন্তু শুধু ওষুধে তো হবে না। খাওয়া-দাওয়ার রেগুলারিটি দরকার।

পি। সে তো বটেই! বেশ একটা রুটিন করে দে দেখি, সেইভাবে চলুক সব।

পু। একা একা তো রুটিন মানা যায় না বাড়িতে। সকলেরই রুটিন মেনে চলা দরকার।

পি। বেশ তো, বেশ তো, তৈরি কর না তুই রুটিন।

পু। রুটিন আর কী করব। সবই তো জানা কথা। এক কাজ করুন না, আজ থেকেই আরম্ভ করা যায় তাহলে— আপনি স্নান করতে যান।

পি। স্নান করতে যাব?

পু। হ্যাঁ, স্নান ক'রে পুজো-টুজো শেষ করে খেয়ে নিন।

পি। খেয়ে নেব? কিন্তু তাহলে এসব... ইয়ে... মুস্কিল তো তাহলে—!

পু। কীসের মুস্কিল? কাজ আছে নাকি কিছু?

পি। না না, কাজ-টাজ নেই। কিন্তু এই এখন স্নান-খাওয়া, মানে—কোনোদিন তো করিনে এখন।... আচ্ছা যাচ্ছি একটু পরে।...... সত্যিই তো তাড়াতাড়ি সেরে নিলেই হয়!

সেদিন তিনি দুটোর মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরদিনই যে-কে সেই।

এ কাহিনীর মধ্যে শাঁস যদি কিছু থাকে তাহলে সেটা এই যে, জীবন-যাপনের পদ্ধতি এবং সময়জ্ঞান ওত-প্রোতভাবে জড়ানো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জীবন কাটাতে চাইলে ঘড়ির দিকে না তাকালেও চলে। কিন্তু যাঁরা সচেতনভাবে জীবন-যাপন করতে চান তাঁদের পক্ষে প্রতিটি মুহূর্তকে নিঙড়ে তার কাছ থেকে কিছু কাজ আদায় করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এইজন্যেই বোধহয় ব্যব-সায়ীরা বলেন, টাইম ইজ মানি। এবং অর্থ-শাসিত এ সংসারে যাঁরা সময় নিয়ে ছেলে-খেলা করেন, জীবনটাই যে তাঁদের কালক্রমে নিরর্থক হ'য়ে ওঠে এ বিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা ভারত-বাসীরা সময় সম্পর্কে এই বাস্তব-জ্ঞানটা ঠিক যেন রপ্ত করে নিতে পারিনি এখনো। বাইরের জগতের থাবা আমাদের বুকের ওপর এসে নখ বিঁধিয়ে দিলেও চির-অভ্যস্ত মধ্যযুগীয় মনোভাবটাকে যেন ঝেড়ে ফেলতে পারিনি।

সেইজন্যেই আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে অনুশাসন ঘোষণা করতে হয় —অফিসের কর্মচারীরা যেন তাঁদের লাঞ্চের ছুটিকে অযথা দীর্ঘায়িত ক'রে বাকী দিনের কাজগুলোকে শিকেয় তোলার ব্যবস্থা না করেন।

এবং সেইজন্যেই নতুন করে চিন্তা করতে হয় আমাদের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে—প্রতি বছর পরীক্ষা গ্রহণ, ফল-ঘোষণা এবং আজেবাজে ছুটির পরিমাণ কমিয়ে ছাত্রদের শিক্ষালাভের সময়টাকে আরো ত্বরান্বিত করা যায় কি না!

জানি না এসব নতুন-চিন্তা কতোদূর কার্যকর হবে আমাদের বাস্তব জীবনে। কিন্তু সময় নামক অস্তিত্বটা যে আসলে একটি বুনো ঘোড়ার মতো দ্রুতগামী, এবং তার পিঠে ব'সে ভালো ক'রে লাগাম টেনে না ধরলে যে অবিলম্বে ছিটকে পড়তে হয় পথের পাশে, সেই ভয়ঙ্কর নিয়তির কথা না মনে রাখলে কী ক'রে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাব তা ভাবতে পারি না।

মনে পড়ল

॥ স্পিরিটের গন্ধ ॥

"মা, টিকে নেবে এস।" ভোমরা ডাকল। "এ'র দেরী হয়ে যাচ্ছে।"—

উনুন থেকে কড়াইটা নামিয়ে হলুদ মাখা হাতখানা আঁচলে মুছতে মুছতে বসবার ঘরে ঢুকে অপ্রতিভ হ'লাম। একটু দেরীই হয়েছে আমার। ভদ্রমহিলা অসহিষ্ণুভাবে ঘড়ি দেখছেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—"একটু তাড়াতাড়ি করুন ভাই, আমাকে আরও পাঁচটা বাড়ীতে যেতে হবে তো।"— 'সত্যিই তো।' —হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। বাম বাহুতে স্পিরিটে-ভেজানো তুলোটো ঘষতে লাগলেন উনি। আর সেই সংগে তীব্র গন্ধে সারা ঘরটা যেন ভরে গেল। আমার নাকে স্পিরিটের তীব্র গন্ধটা ভেসে আসার সংগে সংগে আর একটা বহুদিনের পুরোনো গন্ধের স্মৃতি ক্ষণকালের জন্য আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল—আর সেই হঠাৎ জেগে-ওঠা স্মৃতির আবর্তনে আমার চোখের সামনে থেকে বর্তমান পরিবেশটা কিছুক্ষণের জন্য যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

রমা অধিকারী

সামনে কর্মরতা, নতমুখী মহিলাটিকে দেখছিলাম, কিন্তু মন আমার ভেসে চলেছিল সুদূর অতীতের জোয়ারে। উনি নীরবে চকচকে ফলার ছোট ছুরিটা দিয়ে আমার হাতে আঁচড় কাটছিলেন, আর ও'র নির্বিকার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার দৃষ্টির সামনে জেগে উঠছিল আর একখানি মুখ—তিনিও সেদিন অমনি করেই আমার হাতে ছুরির ফলা দিয়ে আঁচড় কাটছিলেন, তবে তাঁর দন্তহীন মুখে ছিল সান্ত্বনার হাসি, আর কথায় অনর্গল আনন্দের কুলধ্বনি!......

বেশ মনে পড়ে, টিকেদিদিমা যখন আসতেন আমাদের বাড়ীতে, তখন চারিদিকে একটা সোরগোল পড়ে যেত। কর্পোরেশনের লেডি ভ্যাক্সিনেটর—আমাদের টিকেদিদিমা। নাম জানবার কোনও প্রয়োজন ছিল না আমাদের। আজও জানি না। ছোট বড়, দাদাদিদি

সবকিছুতেই তিনি ছিলেন টিকেদিদিমা—এই একটি অমল ও অকৃত্রিম নামে ডাকলে, বাড়ীতে সর্বত্র তাঁর পরিচয়। কালেভদ্রে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করলেই যে তাঁর আবির্ভাব হ'ত তা নয়। টিকেদিদিমা ছিলেন বাড়ীর ... সকলের বন্ধু। বিশেষত দিদিমার সখী হিসেবে আমরা তাঁকে টিকেদিদিমা বলে ডাকতাম। এই সখীত্ব কিন্তু টিকে দেবার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল। যেদিন আমাদের বাড়ী টিকে দিতে আসতেন উনি, বড়দের কাজ সেরে আসতে আর ছোটদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে টিকে দিতে ও'র অনেকটা সময় চলে যেত, তার জন্য এতটুকুও বিরক্ত হতেন না উনি। বরং টিকে দিতে গিয়ে ছোটরা যাতে কান্নাকাটি না করে তার জন্য টফি লজেন্স ইত্যাদি লোভনীয় জিনিসে ভরিয়ে রাখতেন ও'র ছোট কাপড়ের থলিটা। শুধু কি টিকে দেওয়া, ও'র আরও কত রকম কাজ ছিল। সব বাড়ীর বৌ, মেয়ে, গিন্নীদের গল্পচ্ছলে নানারকম উপদেশ দিতেন টিকেদিদিমা। কি করে ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে হয়, অসুখে-বিসুখে কি ক'রে সেবা করতে হয়, বিপদে ধৈর্য না হারিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কি করে উপায় খুঁজতে হয়, নানারকম উদাহরণ দিয়ে মায়ের মত, বন্ধুর মত তিনি সবাইকে শেখাতেন। তাঁর রসবোধ এত সরল ও প্রাণবন্ত ছিল যে বড়দের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে আমরা ছোটরাও নিঃসঙ্কোচে উপভোগ করতাম তার রসটুকু।

তখন বর্ষাকাল। প্রবল বর্ষণে মির্জাপুর স্ট্রীট ভেসে গিয়েছে। রাস্তায় হাঁটুজল। আমি কান্না জুড়েছি স্কুলে যাব বলে। একদিনও স্কুলে অনুপস্থিত হইনি—আজকের জন্যে 'এ্যাটেন্ডেন্স প্রাইজটা' হারাব নাকি? আমার কথা সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে—'এই বৃষ্টিতে কেউ স্কুলে যায়? পাগল নাকি?' আমিও নাছোড়বান্দা। গেটের কাছে জলের ওপর বেঞ্চি ভাসছে, তার ওপর শক্ত হয়ে বসে আছি আর মাকে ভয় দেখাচ্ছি, স্কুলে না নিয়ে গেলে, জলের ওপর দিয়ে একা একা দু' মাইল রাস্তা হেঁটে চলে যাব। ঠিক এমন সময় রিক্সা চড়ে টিকেদিদিমার আবির্ভাব। মাথার ওপর চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা। সামনে পাতাকাটা কাঁচা-পাকা চুলের ওপর কোঁচানো লাল পেড়ে শাড়ী ঘোমটা পিন দিয়ে আটকানো, টিকোলো নাকের ওপর নিকেলের ফ্রেমের বাইফোকাল লেন্সের চশমা নাকের ডগায় প্রায় ঝুলে পড়েছে, সিঁথিতে সিঁদুর ছিল কিনা মনে নেই, তবে পানের রসে ঠোঁট দুটি ছিল টুকটুকে লাল আর ফোকলা মুখে, তোবড়ানো গালে সেই শিশুর সারল্যমাখা হাসি। আমার বয়স তখন বড়জোর আট, সেই বয়সেই এমন একটা ছাপ পড়ে গেল মনের মধ্যে যা আজও নানারকম অভিজ্ঞতার স্মৃতির ভিড়ে হারিয়ে যায়নি। চশমার ফাঁক দিয়ে একনজর আমার দিকে আর মার দিকে তাকিয়েই আন্দাজ ক'রে নিলেন ব্যাপারটা। মাও যেন তাঁকে দেখে অকূলে কূল পেলেন।

"দেখুন তো মাসিমা, খুকু কিছুতেই শুনবে না—এই বৃষ্টিতে স্কুলে যাবার বায়না ধরেছে—নাহ'লে নাকি প্রাইজ পাবে না, কি পাগলামি বলুন তো?"

এক মুহূর্তে আমার জেদী, গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন

> এই সংখ্যা থেকে মাঝে মাঝে পাঠক-পাঠিকাগণের রচনা প্রকাশ করা শুরু হল এই বিভাগে। তাঁরা কেউ হয়তো লেখক কেউ-বা লেখক নন, কিন্তু সকলের রচনাতেই আমরা আশা করব একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শ।
> পাঠক-পাঠিকাগণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

টিকেদিদিমা, তারপরেই স্নেহ আর সহানুভূতি ঝরে পড়ল ও'র কণ্ঠস্বরে!

"তা'তো বটেই, তোমরাই বা ওর প্রাইজটা মাটি করবে কেন বল তো? চল ভাই খুকুদিদি, আমি তোমাকে স্কুলে পৌঁছে দেব।"

বলার অপেক্ষামাত্র। তক্ষুনি লাফ দিয়ে রিক্সায় চড়ে বসলাম। যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়ে ফিরে চলল রিক্সা। অনেক ঘুরে, অনেক জল ভেঙে স্কুলে পৌঁছে শুনলাম—আজ 'রেণি ডে'।

খুব খিরক্ত হয়েছেন মনে ক'রে ভয়ে ভয়ে টিকেদিদিমার মুখের দিকে তাকালাম। সেই শান্ত মিষ্টি হাসি জেগে আছে তাঁর মুখখানিতে, মৃদুস্বরে বললেন—"আমি জানতাম খুকু যে আজ তোমাদের ছুটি, তবু ... তুমি ... পাবে বলে নিয়ে ... অবস্থা ভাল ছিল না। ... রিক্সাভাড়া তিনি ... মার কাছ থেকে ... নিয়ে গেলে বলেছিলেন—"তুমি আমার নাতনী হ'ত? তার ... হতে না আমাকে?—"

সেদিন কিরতি পথে ... আসতে আসতে মনে মনে ... আর কখনও অন্যায় জেদ ... না। কিন্তু সেদিনের সেই ... যেন টিকেদিদিমাকে আমার আরও আপনজন করে তুলেছিল। ... ঘটনার মাস কয়েক পরে ... আমাদের নিয়ে বাবার কর্মস্থল ... যাত্রা করলেন তখন সকলের চেয়ে টিকেদিদিমার বিরহই আমাকে বেশী ব্যথা দিত।

একদিন আর থাকতে পারলাম না। বাবার ড্রয়ারের নীচে একটা ভিজে ময়লা পোস্টকার্ড পড়েছিল। সেইটা রোদে শুকিয়ে নিয়ে টিকেদিদিমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। সে চিঠির ভাষা ছিল কাঁচা, অক্ষর ছিল আঁকা-বাঁকা।

লিখেছিলাম—'টিকেদিদিমা, আপনার কথা সর্বদাই মনে হয়। আমার কাছে পয়সা নেই, ময়লা, ভিজে পোস্টকার্ড বাবা ফেলে দিয়েছিলেন, তাই শুকিয়ে নিয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। কালো চিঠি দেখে যেন ঘেন্না করবেন না।'

টিকেদিদিমা সুন্দর একটি কবিতায় আমার সেই চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। কর্পোরেশনের সেই সামান্য লেডি ভ্যাকসিনেটারের প্রাণের মধ্যে যে কতখানি ছন্দ, রস আর ভাব লুকোনো ছিল—সেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর পরিচয় সেদিনের সেই ছোট্ট চিঠিখানি বহন করে এনেছিল এক অখ্যাত বালিকার কাছে—যা আজও তার স্মৃতির মণি-কোঠায় অম্লান রত্নের মতই ভাস্বর হয়ে আছে।

আজ দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতার পৌনঃপুনিকতায়, প্রবঞ্চনা আর নৈরাশ্যে যখন জীবনের প্রতি তার সাময়িক বিতৃষ্ণা আসে, তখনই হয়তো এই স্মৃতি তার মনে সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়—শৈশবের ধূলিমলিন হাতে টিকেদিদিমার সস্নেহে দেওয়া স্পিরিটের প্রলেপের মত।

শার্লক হোমস ফিরে এলেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুজনেই অন্ধকার ভেতরে। বেশ বুঝলাম বাড়ীটা একদম খালি। পায়ের তলায় কার্পেটবিহীন আলগা তক্তাগুলো মড় মড় শব্দে আর্তনাদ শুরু করে দিলো। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলতে গিয়ে হাতে ঠেকল একটা দেওয়াল। দেওয়ালের কাগজ ছিঁড়ে ফিতের মত ঝুলছিল। সরু সরু ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে আমার কব্জি ধরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একটা লম্বা হলঘরের মধ্যে আমায় টেনে নিয়ে গেল হোম্‌স্‌। দরজার ওপরের ধুলোজমা ম্যাড়মেড়ে একটা ফ্যানলাইটের আলোয় আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল চারদিক। হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে বিরাট চারকোণা একটা খালি ঘরে ঢুকল সে। ঘরের কোণগুলো ঘন আঁধারে ঢাকা, রাস্তার আলোয় মাঝখানের অন্ধকার একটু পাতলা হয়ে এসেছিল। কাছাকাছি কোন বাতি দেখতে পেলাম না, জানলার কাঁচেও প্রচুর ধুলো জমে থাকায় শুধু দুজনে দুজনকে দেখতে পাওয়া ছাড়া আর কোন দিকেই চোখ চলল না। কাঁধে হাত রেখে

খালি বাড়ী

স্যার আর্থার কোনান ডয়াল

পুরোনো ঘরটার মধ্যেই একবার ভাল করে উঁকি মেরে দেখ। দেখা যাক্‌, তিন বছর তোমার কাছ ছাড়া হয়েও তোমাকে চমকে দেবার মত ক্ষমতা এখনও আমার আছে কিনা।"

পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে তাকালাম পরিচিত জানলাটার পানে। তাকিয়েই এমন চমকে উঠলাম যে মুখ দিয়ে অজান্তে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল।

জানলার পর্দা নামানো ছিল, আর খুব জোরালো একটা আলো জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। জোর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল জানলার পর্দা, আর ঠিক মাঝখানে ফুটে উঠেছিল একটা স্পষ্ট, কালো ছায়ামূর্তি। মূর্তি একটি পুরুষের। চেয়ারে বসে ছিল লোকটি, তার মাথা হেলানোর কায়দা, চৌকো কাঁধ আর ধারালো মুখের আদরা আমার চেনা—অনেক দিনের চেনা। মুখটা অর্ধেক ঘুরিয়ে বসেছিল সে—এ রকম কালো কুচকুচে সিলুউয়েট মূর্তি আমাদের বাপঠাকুরদার চোখে পড়লে হয়ত সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতেন।

ছায়ামূর্তিটি হোম্‌সের অথবা অবিকল হোম্‌সের মত কোন পুরুষের। এমনই আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম যে হাত বাড়িয়ে হোম্‌সের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিলাম সত্যিই সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

অবরুদ্ধ হাসিতে কাঁপছিল হোম্‌স্‌। বলল—"কি হল?"

"গুড হেভেন্‌স্‌! করেছ কি?"

"যাক, তাহলে বয়েসের ভারেও আমার অসীম বিচিত্রতার বিনাশ নেই, নিত্যকারের অভ্যাসেও একঘেয়ে হয় যায় না, বাসি হয়ে বাতিল হয়ে যায় না তার সনাতন রূপ।" বহু পরিশ্রমের পর নিজের সৃষ্টির দিকে তাকালে শিল্পীর কণ্ঠে যে রকম আন্তরিক আনন্দ আর গর্ব ধ্বনিত হয়ে ওঠে, হোম্‌সের কণ্ঠেও শুনলাম সেদিন সেই সুর। "অবিকল আমার মতই দেখতে হয়েছে, তাই না ওয়াটসন?"

"আমি তো দিব্বি করে বলতে রাজী আছি যে এ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।"

"কৃতিত্বটুকু গ্রিনোব্‌ল্‌এর মঁসিয়ে অস্‌কার মনিয়ারের প্রাপ্য। ছাঁচটা তৈরী করতে বেশ কিছুদিন গেছে ভদ্রলোকের। মোমের তৈরী শার্লক হোম্‌সের আবক্ষ মূর্তি। বাকী যা দেখছ সেটুকু আজ বিকেলে বেকার স্ট্রীটে গিয়ে আমায় করে আসতে হয়েছে।

"কিন্তু কেন?"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, কারণ শুধু একটি। আমি যখন বাড়ীতে নেই, তখন কয়েকজন লোক বিশ্বাস করুক যে আমি বাড়ীতেই আছি। এবং এই অদ্ভুত বিশ্বাস তাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমিও বিশ্বাস করি।"

"অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস ঘরের ওপর চোখ রেখে কেউ বসেছিল বা এখনও আছে।"

"ছিল এবং আমি তা জানি।"

"কারা?"

"আমার পুরোনো শত্রুরা ওয়াটসন। যে কুখ্যাত সমাজের নেতা এখনও 'রাইকেনবাক্‌ ফলে' শুয়ে—তারা। তুমি তো জানই আমি যে বেঁচে আছি, তা একমাত্র তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। এবং বিশ্বাস করে যে, একদিন না একদিন, দুদিন আগে হোক, আর পরে হোক, আমার ঘরে আমি ফিরে আসবই। সমানে এই তিন বছর তারা পাহারা দিয়ে এসেছে, আজ সকালে সার্থক হয়েছে তাদের প্রতীক্ষা—স্বচক্ষে তারা দেখেছে আমায় ফিরে আসতে।"

"তুমি জানলে কি করে?"

"খুব সহজে। জানলা দিয়ে তাকাতেই ওদের চৌকীদারকে আমি চিনেছি। লোকটার নাম পার্কার, স্বভাবটি খুবই নিরীহ, পেশা হল ফাঁস দিয়ে খুন করে রাহাজানি করা, ইহুদীদের হার্প বাজানোয় জুড়ি মেলা ভার। পার্কারকে আমি ডরাই না, ডরাই তার পেছনে যে আরও ভয়ংকর লোকটা আছে তাকে। যে ছিল মরিয়ারটির হরিহর-আত্মা বন্ধু, যে 'রাইকেনবাক্‌ ফলে'র পাহাড়ের চূড়ো থেকে পাথর গড়িয়ে আমাকেও মরিয়ারটির পাশে পাঠাতে চেয়েছিল, যে এখন লণ্ডনের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, ধুরন্ধর আর পয়লা নম্বরের বদ্‌মাস—এ হচ্ছে সে-ই। ওয়াটসন, আজ রাতে আমার পিছু নিয়েছে সে নিজেই, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি তারও পিছু নিয়েছি আমরা।"

ধীরে ধীরে বন্ধুবরের মতলব স্বচ্ছ হয়ে এল আমার কাছে। এ বাড়ীতে আমরা এসেছি হোম্‌সের ডামি দেখতে নয়, ডামিকে যারা চোখে চোখে রেখেছে তাদের দেখতে, লুকোনো জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে। জানলার পর্দায় ডামির কালো ছায়াটা টোপ আর আমরা হলাম শিকারী। অন্ধকারের মাঝে, ছুঁচ পড়লে শোনা যায় এমনি স্তব্ধতার মধ্যে আমরা দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম রাস্তা দিয়ে হুন্‌ হুন্‌ করে যাওয়া মূর্তিগুলোকে। আনাগোনার তাদের যেন আর বিরাম নেই। এত লোকও যে বেকার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটে সে জ্ঞান আমার সেই দিনই হল। হোম্‌স্‌ নির্বাক এবং নিথর, কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন নয়। সে যে কতখানি সজাগ, তা শুধু আমিই বুঝলাম। তীক্ষ্ণ, সতর্ক চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সে পথচারীদের প্রবাহের পানে। রাস্তাও পড়েছে বেশ, দুর্যোগের সংকেত নিয়ে হু-হু করে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে সুদীর্ঘ রাস্তা বরাবর শুরু হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে হাওয়ার দাপট। কোটের কলার তুলে দিয়ে গলাবন্ধ জড়িয়ে অনেক লোকই যাতায়াত করছিল রাস্তায়। বারদুয়েক মনে হল বিশেষ একটা লোককে যেন এর আগেও যেতে দেখেছি সামনে দিয়ে। একবার তো দেখলাম দু'জন লোক ওভারকোটে আপাদমস্তক ঢেকে ঝড়ের ঝাপটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কিছুদূরে একটা বাড়ীর তলায় এসে দাঁড়াল। সেদিকে হোম্‌সের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এমন অসহিষ্ণুভাবে অস্ফুট শব্দ করে উঠল যে বুঝলাম এ ভাবে তাকে আর বিরক্ত না করাই মঙ্গল। একাধিকবার অধীরভাবে গোড়ালী ঠুকলে সে মেঝেতে, চঞ্চলভাবে টোকা মারলে দেওয়ালে। বেশ বুঝলাম, ধীরে ধীরে স্বচ্ছন্দতা হারিয়ে ফেলেছে হোম্‌স্‌, ফুরিয়ে আসছে তার ধৈর্য—কেননা, পরিকল্পনা মত ঠিক যে রকমটি সে আশা করেছিল, তা হচ্ছে না। অনেকক্ষণ পরে অবশেষে রাত যখন আরও গভীর হল, ফাঁকা হয়ে এল রাস্তা—উত্তেজনা আর সে চেপে রাখতে পারে না। অস্থিরভাবে ঘরের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত শুরু হল অশান্ত অবিরাম পায়চারী। ভাবলাম এই সময়ে আমার কিছু বলা দরকার। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে চোখ তুলে আলোকিত জানলার পানে তাকাতেই আবার আগের মত বিস্ময়ের ধাক্কায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সজোরে হোম্‌সের হাত আঁকড়ে ধরে আঙুল তুলে চীৎকার করে উঠলাম—

"হোম্‌স্‌, দেখেছ? ছায়াটা সরে গেছে!"

প্রথমবারে দেখেছিলাম পাশ ফিরে বসা অবস্থায় ডামির ছায়া। এবার দেখলাম পিছন ফিরে বসা অবস্থায়। তিন বছরেও যে হোম্‌সের রুক্ষ মেজাজ

মেজাজ কায়েম হয়নি—তার প্রমাণ পেলাম তখনই। তার মত বুদ্ধিমান পুরুষের পক্ষে এ রকম রসিকতায় মেজাজ খারাপ এত অল্পতেই এভাবে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা মোটেই মানায় না। আমার কথা শেষ হতে না হতেই খ্যাঁক করে উঠল সে—"মনেছে তো হয়েছে কি? তুমি কি আমাকে একদম নিরেট গাধা ভেবেছ যে একটা নিছক ডামি খাড়া করে ইউরোপের সবচেয়ে জাঁহাবাজ সবচেয়ে ধড়িবাজ কয়েকজনের চোখে ধুলো দিতে পারব? তুমি আমায় ভাব কি ওয়াটসন? ঘণ্টা দুয়েক হল এঘরে এসেছি আমরা। এই দু'ঘণ্টার মধ্যে মিসেস হাডসন ডামিটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে বসিয়েছেন সবশুদ্ধ আটবার অর্থাৎ প্রতি পনেরো মিনিটে একবার। সামনের দিকে থাকার ফলে তার ছায়া কোনমতেই জানলার পর্দায় পড়ছে না। চুপ!" হঠাৎ দারুণ উত্তেজনায় যেন দম আটকে গেল হোম্‌সের। ফিকে আলোয় দেখলাম—সামনের দিকে মাথা বাড়িয়ে দেহের প্রতিটি অংগে সজাগ প্রতীক্ষা ফুটিয়ে তুলে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সে। ওবাড়ীর সামনে সেই লোকদুটো নিশ্চয় এখনও ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে ভেবে তাকালাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না কাউকে। চারদিক নিস্তব্ধ এবং ঘন আঁধারের মাঝে দেখলাম শুধু জ্বল-জ্বলে ঝলমলে হলুদ পর্দার ওপর ফুটে রয়েছে কালো কুচকুচে ছায়াছবির দেহ-রেখা। থমথমে স্তব্ধতার মাঝে আবার শুনলাম জিব আর তালুর মধ্যেকার অতি-পরিচিত মৃদু সতর্কধ্বনি—বুঝলাম কি নিদারুণ চাপা উত্তেজনায় আচম্বিতে টানটান হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতিটি অংশ। মুহূর্তকাল পরেই এক হেঁচকা টানে আমাকে ঘরের কালির মত কালো অন্ধকারে ঢাকা একটা কোণে টেনে নিয়ে গেল হোম্‌স্‌—অনুভব করলাম আমার উৎসুক ঠোঁটের ওপর তার সাবধানী আঙুলের স্পর্শ। বুঝলাম তার অর্থ—হুঁশিয়ার! যে আঙুল দিয়ে হোম্‌স্‌ আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল স্পষ্ট অনুভব করলাম থর থর করে তা কাঁপছে। কোনদিন, জীবনে কোনদিন বন্ধুবরকে এতখানি বিচলিত হতে দেখিনি। আমি কিন্তু যতদূর পারলাম চোখ চালিয়ে নিথর নিস্তব্ধ নির্জন রাস্তায় ভয় পাওয়ার মত কোন কারণ দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আচমকা আমিও সজাগ হয়ে উঠলাম। তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে আমার আগেই হোম্‌স্‌ যার সাড়া পেয়েছে—

"হোমস দেখেছে? ছায়াটা সরে গেছে!"

এবার আমার স্থূল অনুভূতিতেও সে সাড়া জাগালে। খুব মৃদু চাপা একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। শব্দটা এল বেকার স্ট্রীটের দিক থেকে নয়, যে বাড়ীতে আমরা ঘাপটি মেরে বসে, তারই পেছন দিক থেকে। একটা দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ। পরমুহূর্তেই প্যাসেজে শুনলাম পায়ের শব্দ—কে যেন পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। অতি কষ্টে চেষ্টা করছে সে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে কিন্তু খাঁ খাঁ বাড়ীর মধ্যে ঐটুকু শব্দই হাহাকার শব্দে কর্কশ প্রতিধ্বনি তুলে যেন আসন্ন বিপদের ডমরুধ্বনি বাজিয়ে চলছে। দেওয়ালের সঙ্গে সাপটে রইল হোম্‌স্‌। আমিও রিভলভারের ওপর হাত রেখে যতটা পারলাম দেওয়ালের সঙ্গে মিশে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম খোলা দরজার ফিকে অন্ধকারের পটভূমিকায় মিশমিশে কালো একটা ছায়ামূর্তির আবছা দেহরেখা। এক মুহূর্ত দাঁড়াল ছায়ামূর্তি—তারপরেই আবার হিংস্র নিশাচর শ্বাপদের মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল ঘরের মাঝে। ঠিক তিনগজ দূরে যখন তার ক্রুর মূর্তি এসে পৌঁছালো, আমি দেহের প্রতিটি পেশী টান টান করে তৈরী হলাম লাফাবার জন্যে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম সে জানেই না যে আমরা হাজির আছি ঘরের মধ্যে। গা ঘেঁসে এগিয়ে গেল ছায়ামূর্তি। জানলার ধারে পৌঁছে খুব আলতোভাবে কিন্তু নিঃশব্দে আধ ফুট তুলে ধরলে জানলার সার্সি। খোলা জানলার ঠিক পাশটিতে সে গুঁড়ি মেরে বসে পড়তেই রাস্তার আলো সোজাসুজি এসে পড়ল তার মুখের ওপর। ধুলো-জমা কাঁচের বাধা আর নেই, কাজেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাকে। নিদারুণ উত্তেজনায় আর কোনদিকে তার মন আছে বলে মনে হল না। আলোর প্রতি-ফলনে আকাশের বুকে চিকমিকে তারার মতই জ্বলছিল তার চোখ দুটো। উত্তেজনায় থির থির ক'রে কেঁপে উঠছিল তার মুখের মাংসপেশী। বয়স হয়েছে তার, নাকটা সরু, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনের দিকে। কপালটা উঁচু, সামনের দিকে টাক প'ড়ে যাওয়ায় অনেকটা চওড়া। ধোঁয়াটে রঙের মস্ত একজোড়া গোঁফ।

আকাশ পেছন দিকে বসানো ছিল অপেরা-হ্যাট, খোলা ওভারকোটের মধ্যে দিয়ে চক চক করছিল ইভনিং ড্রেস-সার্টটা। ভারী কিন্তু মলিন মুখে অসংখ্য রুক্ষ গভীর রেখায় কলংকিত। একহাতে একটা লাঠির মত জিনিস দেখলাম, কিন্তু মেঝের ওপর তা রাখতেই কঠিন ধাতব শব্দ হওয়ায় বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক নয়। ওভারকোটের পকেট থেকে বড় আকারের একটা জিনিস বার করে তৎপর হয়ে উঠল সে, কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম জোরালো তীক্ষ্ম একটা আওয়াজ-যেন ক্লিক্ শব্দে ঘাঁটিতে আটকে গেল স্প্রিং বা ঐ জাতীয় কিছু। তখনও শেষ হয়নি তার তৎপরতা। হাঁটু গেড়ে বসে এবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেহের সমস্ত ওজন আর শক্তি দিয়ে চাপ দিতে লাগল বোধহয় কোন লিভারের ওপর—ফলে অনেকক্ষণ ধরে যাঁতা ঘোরার পর ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ শুনলাম—শেষ হল আবার একটা জোরালো ক্লিক শব্দে। এবার সে সিধে হতেই তার হাতে দেখলাম বন্দুকের মত একটা জিনিস—বাঁটটা কিন্তু বিদঘুটে রকমের। ব্রীচের দিকটা খুলে ফেলে কি একটা ঢুকিয়ে খটাস্ করে বন্ধ করে দিলে ব্রীচ-ব্লক। তারপর গুঁড়ি মেরে বসে নলচের প্রান্তটা রাখলে জানলার কিনারায়, লম্বা গোঁফ ঝুলে পড়ল কুঁদোর ওপর—মাছি বরাবর জ্বলজ্বলে চোখ রেখে টিপ ঠিক করতে লাগল সে তন্ময় হয়ে। তারপর শুনলাম স্বস্তির ছোট্ট শ্বাস ফেলার শব্দ—বন্দুকের কিম্ভূতকিমাকার বাঁটটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে তৈরী হল সে তার চরম লক্ষ্যভেদের জন্যে। মাছি বরাবর দৃষ্টি-রেখার অপর প্রান্তে জ্বলজ্বলে হলদে পটভূমিকায় কালো ছায়ামূর্তিই তার নিশানা—চোখ তুলে একবার দেখে নিলাম এই আজব টার্গেটকে। তারপর চোখ নামিয়ে আনতে দেখলাম মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে নিথর হয়ে গেল সে। পরমুহূর্তেই ঘোড়ার ওপর শক্ত হয়ে বসল তার আঙুল। অদ্ভুত একটা স্বন্ স্বন্ শব্দ শুনলাম। বাতাস কেটে কি যেন উঠে গেল তীরবেগে, সংগে সংগে জানলার কাচভাঙার মিষ্টি জলতরঙ্গের মত আওয়াজ। ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মত লাফিয়ে উঠল হোমস্—এক লাফেই বন্দুকবাজের পিঠে পড়ে চিৎ করে আছড়ে ফেলল মেঝের ওপর। পরমুহূর্তেই ছিটকে গেল লোকটা এবং পলক ফেলার আগেই সাঁড়াশীর মত আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরলে হোমসের টুঁটি। এবার আমি তৎপর হলাম, রিভলভারের বাঁট দিয়ে মাথায় এক ঘা মারতেই শিথিল হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে মেঝের ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চেপে ধরতেই হোমস্ তীব্র শব্দে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে দিলে। ফুটপাতে শুনলাম ধাবমান পায়ের খটাখট শব্দ, পরক্ষণেই ইউনিফর্ম পরা দুজন কনস্টেবল আর সাদা পোশাক পরা এক-জন ডিটেকটিভ তীর বেগে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

"লেসট্রেড তো?" শুধোলো হোমস্।

"ইয়েস, মিঃ হোমস্। আমি নিজেই এলাম। আপনাকে আবার লণ্ডনে দেখে খুবই খুশী হলাম স্যার।"

"তোমার একটু বেসরকারী সাহায্যের দরকার হয়ে পড়েছিল। এক বছরের মধ্যে তিন তিনটে খুনের কিনারা না হওয়া বড় লজ্জার ব্যাপার লেসট্রেড। তবে মোলসে মিস্ত্রি নিয়ে যে ভাবে তদন্ত করেছ, তা ঠিক তোমার মত হয়নি, অর্থাৎ মোটামুটি ভালই হয়েছে তদন্তটা।"

দুদিক থেকে জোয়ান কনস্টেবল দুজন লোকটাকে চেপে ধরায় আমরা দুজন উঠে দাঁড়ালাম। হাপরের মত হাঁপাচ্ছিল সে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। হোমস্ এগিয়ে গিয়ে সার্সিটা টেনে নামিয়ে পর্দা ফেলে দিলে। লেসট্রেড দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে ফেললে। কনস্টেবল দুজনও তাদের চোরা লণ্ঠনের ঢাকনা খুলে ফেলতে লোকটার দিকে ভাল করে তাকালাম।

মুখখানা তার পুরুষের মতই বটে। চোখেমুখে অফুরন্ত তেজের দীপ্তি, ধারালো বুদ্ধির প্রখরতা, অথচ কেমন জানি নিষ্ঠুর, নির্মম, শয়তানি মাখানো। দার্শনিকের মত চওড়া উন্নত কপাল, কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগী পুরুষের মত চোয়াল। জীবনের শুরু হয়েছিল তার অসীম কর্মক্ষমতা নিয়ে—কিন্তু কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়ে তা ভাবেনি। তার ক্রূর নীল চোখের দিকে তাকানো যায় না; ঝুলে-পড়া দুই পাতায় ফুটে উঠেছে সমস্ত মানুষজাতির প্রতি অসীম ঘৃণা। তাকানো যায় না তার ভয়ংকর রকমের বেপরোয়া নাক এবং শিহরণ-জাগানো গভীর বলি-আঁকা কপালের পানে—সেখানে অনায়াসেই পড়া যায় প্রকৃতির সহজতম ভাষায় লেখা বিপদের সংকেত। আমাদের কোন রকম আমোল দিলে না সে, [illegible] হোমসের পানে—সে [illegible] ফুটে উঠেছিল ঘৃণা [illegible] "শয়তান, ধড়িবাজ শয়তান [illegible]!" বিড়বিড় করে বলে ওঠে সে।

দুমড়ে যাওয়া কলারটা ঠিক করতে করতে হোমস্ বললে,—"কর্ণেল, পুরোনো একটা নাটকে পড়েছিলাম, সব যাত্রার শেষ হয় প্রেমিকদের মিলনে। 'রাইকেনবাক্ ফলে' পাথরের তাকটায় শুয়ে থাকার সময়ে আপনার সুনজরে পড়ে অসীম দয়ার যে একটু নমুনা পেয়েছিলাম, তা মনে করেই আবার আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা খুব সুখবর হবে বলে মনে করিনি।"

সম্মোহিতের মত কর্ণেল কটমট করে তাকিয়েছিলেন হোমসের পানে। উত্তরে দাঁতে দাঁত পিশে শুধু বললেন—"ফিচেল শয়তান কোথাকার!"

হোমস্ বলল—"ভাল কথা, এখনও আলাপ করানো হয়নি। জেন্টেলমেন, ইনিই হলেন কর্ণেল সিবাসটিয়ান মোর‍্যান। হার ম্যাজেস্টিস এর ইণ্ডিয়ান আর্মিতে এঁর সুনাম আছে এবং আজ পর্যন্ত আমাদের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যে দূরপাল্লার বন্দুকবাজ যত আছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ইনি। কর্ণেল, আপনার বাঘের ঝুলির জুড়ি আজও পাওয়া যায়নি—তাই না?"

কোন উত্তর এল না ভীষণ চেহারার বুড়ো কর্ণেলের দিক থেকে। জ্বলন্ত চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তিনি বন্ধুবর হোমসের পানে। জ্বলন্ত ক্ষুধিত চোখে ভয়ংকর চাহনি আর ঝাঁটার মত বড় বড় গোঁফ—সব মিলিয়ে তাঁকে খাঁচায় বন্দী বাঘের মতই মনে হচ্ছিল।

হোমস্ বললে—"আমার এই অতি সরল ধোঁকাবাজিতে আপনার মত এমন একজন বুড়ো শিকারী যে এত সহজে বোকা বনে যাবেন, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে। এরকম ব্যাপারের সঙ্গে এর আগেও নিশ্চয় আপনার পরিচয় ঘটেছে। গাছের গোড়ায় বাচ্চা জানোয়ার বেঁধে মাচার ওপর রাইফেল হাতে আপনিও কি বসে থাকেননি কতক্ষণে নীচের টোপ অদৃশ্য বাঘকে ভুলিয়ে আনবে তারই প্রতীক্ষায়? এই খালি বাড়ীটা হল আমার গাছ, আর আপনি হলেন আমার বাঘ। একাধিক বাঘের সম্ভাবনা থাকলে অনেকগুলি বন্দুক নিয়ে বসে থাকতেন

দরকার, এখনকার [illegible] হলেও অন্য [illegible] আপনার কাছে আসত।" চারদিকে আঙুল ঘুরিয়ে বললে হোমস্, "এরাই হল আমার অন্যান্য বন্দুক। তুলনাটা তাহলে নিখুঁত, কি বলেন?"

নিষ্ফল রাগে চাপা গর্জন করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্ণেল, কিন্তু কনস্টেবল দু'জনের হেঁচকা টানে আবার যথাস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। তাঁর চোখমুখের তখনকার সে জিঘাংসা বেশীক্ষণ দেখলেও শিউরে উঠতে হয়।

হোমস্ বললে—"আমি স্বীকার করছি আমাকেও আপনি একটু অবাক করে দিয়েছিলেন। আপনি নিজেই যে খালি বাড়ীর এমন পছন্দসই জানলার সামনে বসে তাক্ করবেন, তা আমি ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম রাস্তা থেকেই হুকুম দেবেন আপনি—তাই লেসট্রেড তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আপনার প্রতীক্ষাই করছিল বাইরে। শুধু এইটুকু ছাড়া সবটুকু আমার হিসেব মতই হয়েছে।"

লেসট্রেডের পানে এবার ঘুরে দাঁড়ালেন কর্ণেল মোর‍্যান।

বললেন, "আমাকে গ্রেপ্তার করার আপনার কোন কারণ থাকুক আর না থাকুক, এই লোকটাকে দিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করানোর কোন অধিকার কি আপনার আছে? আইনের হাতেই যদি আমি এসে থাকি, সবকিছু আইনসম্মতভাবেই হওয়া উচিত।"

লেসট্রেড বলল,—"তা অবশ্য ঠিক বলেছেন। মিঃ হোমস্, আর কিছু বলবেন কি?"

মেঝে থেকে শক্তিশালী এয়ারগানটা তুলে নিয়ে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে করতে বললে হোমস্—"তুলনা হয় না এমন অস্ত্রের, শব্দহীন কিন্তু অসাধারণ এর ক্ষমতা—বাস্তবিকই তারিফ করতে হয় এমন হাতিয়ারের। প্রফেসর মরিয়ারটির অর্ডার অনুযায়ী অন্ধ জার্মান মেকানিক ভন হার্ডার তৈরী করেছিল এটা, ভন হার্ডারকে আমি চিনি। বেশ কয়েক বছর ধরে জানতাম এই অস্ত্রের কথা, কিন্তু কোনদিন নাড়াচাড়া করার সৌভাগ্য হয়নি। লেসট্রেড, মন দিয়ে জিনিসটা দেখে রাখ এবং যে বুলেট এর মধ্যে আঁটে—সেগুলোকেও ভুলো না—এ আমার বিশেষ অনুরোধ।"

দরজার দিকে সবাইকে নিয়ে এগোতে এগোতে লেসট্রেড বললে—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিঃ হোমস্। আর কিছু বলবেন নাকি?"

"শুধু একটা প্রশ্ন। কি চার্জ আনছ কর্ণেলের বিরুদ্ধে?"

"কেন, মিঃ শার্লক হোমস্কে খুন করার চেষ্টা?"

"না, না, লেসট্রেড। এ ব্যাপারে আমি একেবারেই আসতে চাই না। আমাদের আসল গ্রেপ্তারের সবটুকু কৃতিত্ব শুধু তোমারই প্রাপ্য—আর কারোর নয়। হ্যাঁ, হে হ্যাঁ, আমার অভিনন্দন রইল। আগের মতই তুমি তোমার ফন্দি আর স্পর্ধা—এই দুই মিশিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পেরেছ তাঁকে।"
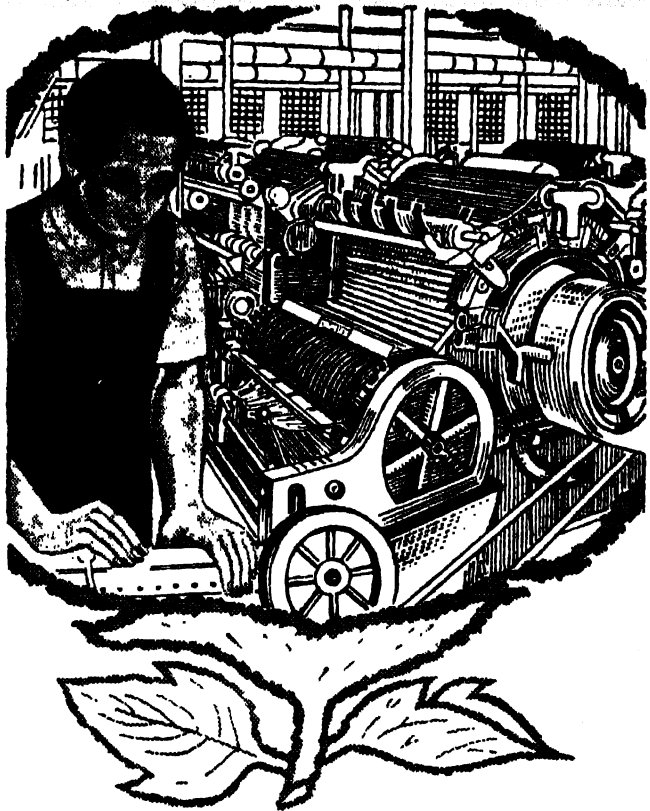
"গ্রেপ্তার করতে পেরেছি তাকে। কিন্তু কাকে মিঃ হোম্‌স্‌?"

"যাঁকে সমস্ত পুলিশ বাহিনী বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইনিই সেই কর্ণেল সিবাসটিয়াম মোর্য়ান—যিনি গত মাসের তিরিশ তারিখে ৪২৭নং পার্ক লেনের উল্টোদিকের বাড়ীর দোতলার খোলা জানলা দিয়ে এয়ার-গান থেকে বুলেট ছুঁড়ে অনারেবল্‌ রোন্যাল্ড য়্যাডেয়ারকে খুন করেছিলেন। লেসট্রেড, এই হল তোমার চার্জ। ওয়াটসন, ভাঙা জানলার ঠাণ্ডা বাতাস যদি কিছুক্ষণ সহ্য করতে পার, তাহলে সিগার টেনে আধঘণ্টা সময় আমার স্টাডিতে কাটিয়ে যাও, সময়টা যে বাজে খরচ হবে না, সে গ্যারাণ্টি আমি দিচ্ছি।"

মাইক্রফ্‌ট্‌ হোম্‌সের তত্ত্বাবধানে আর মিসেস হাডসনের নিয়মিত যত্নে আমাদের পুরোনো ঘরগুলোতে দেখলাম কোন পরিবর্তনই আসেনি। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে অবশ্য একটু অস্বস্তি লাগছিল, তবে যে জিনিসটি যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই দেখলাম আছে। কেমিক্যাল কর্ণারে আগের মতই এ্যাসিডের দাগ লাগা দেবদারু কাঠের টেবিলটাকে দেখলাম। সেলফের ওপর সারি সারি সাজানো স্ক্র্যাপ-বুক আর রেফারেন্স বুক। বইগুলোর বিকট চেহারা দেখে অবশ্য আমাদের স্বজাতি-দের মধ্যে অনেকেই সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলতে পারলেই পরম খুশী হতই রেখা-চিত্র, বেহালার বাক্স, পাইপের র‍্যাক—এমনকি তামাক ভর্তি পারস্যের চটিটাও চোখে পড়ল চারদিকে তাকাতে গিয়ে। ঘরের মধ্যে হাজির ছিল দুজন। প্রথম জন মিসেস্‌ হাডসন, আমরা ঘরে ঢুকতেই চোখেমুখে উপচে পড়া খুশী নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। দ্বিতীয় জন হোম্‌সের অদ্ভুত ডামিটা—আজ রাতের এ্যাডভেঞ্চারে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু অভিনয়ের ফলে সর্বাঙ্গীন সাফল্য এনে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয়। মডেলটা মোমের, দেহের মিলতো বটেই, রঙ্ শুদ্ধ এমনই নিখুঁত যে দেখলে পরে হোম্‌স্‌ বলেই মনে হয়। ফুলের টব রাখার সরু লম্বা মত একটা টেবিলের ওপর বসানো ছিল মূর্তিটা, গায়ে এমন কায়দায় হোম্‌সের একটা পুরোনো ড্রেসিং গাউন জড়ানো যে রাস্তা থেকে দেখলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

হোম্‌স্‌ বলল—"মিসেস্‌ হাডসন, যে রকম বলেছিলাম, ঠিক সেই রকম করেছিলেন তো?"

"ইয়েস স্যার প্রতিবারই হাঁটু দিয়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়েছে আমায়।"

"চমৎকার। বস্তুতঃপক্ষেই আপনার সাহায্য না পেলে এত নিখুঁতভাবে ধোঁকা দেওয়া যেত না ওদের। বুলেটটা কোথায় লেগেছে তা দেখেছেন তো?"

"হ্যাঁ, স্যার। আপনার অমন চমৎকার মূর্তিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। বুলেটটা মাথার ভেতর দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে পড়েছিল মেঝেতে। এই দেখুন!"

আমার হাতে বুলেটা তুলে দিয়ে বলল হোম্‌স্‌—"বুঝতেই পারছ ওয়াটসন। রিভলভারের নরম বুলেট না হলে এ অবস্থা হয় না। একেই বলে প্রতিভা—কেননা এ জিনিস যে এয়ার-গান থেকে ফয়ার করা হয়েছে—তা কারোর মাথাতেও আসবে না। ঠিক আছে, মিসেস্‌ হাডসন, সাহায্যের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। তোমার পুরোনো চেয়ারে বস, ওয়াটসন, অনেকগুলো পয়েন্ট আলোচনা করতে হবে তোমার সাথে।"

জরাজীর্ণ ফ্রক কোটটা খুলে ফেলে-ছিল সে, এবার ডামির ওপর থেকে ইঁদুর রঙের ড্রেসিং গাউনটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতেই ফিরে এল পুরোনো হোম্‌স্‌—মাঝখানে যে সুদীর্ঘ তিনটে বছরের ব্যবধান আছে, তা আর মনেই রইল না।

মূর্তিটার কপাল চুরমার হয়ে গেছিল বুলেটের ঘায়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হাসিমুখে বলল হোম্‌স্‌—"বুড়ো শিকারীর স্নায়ু দেখছি এখনও আগের মতই, ঠিক তেমনি ধীর স্থির। চোখের ধারও দেখছি এতটুকু কমেনি। বুলেটটা মাথার পেছনে ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে ঢুকে ব্রেনটা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে সামনে দিয়ে। অব্যর্থ বন্দুক চালানোয় এ'র জুড়িদার ইণ্ডিয়াতে আর ছিল না। আমার তো মনে হয়, লণ্ডনে এ'কে টেক্কা দেওয়ার মত বন্দুকবাজ অল্প কয়েক-জনই আছে। ভদ্রলোকের নাম কি এর আগে শুনেছিলে?"

"না।"

"বটে, বটে, নামযশের কি করুণ পরিণতি! অবশ্য প্রফেসর জেম্‌স্‌ মরিয়ারটির নামও তুমি কোনদিন জানতে না, অথচ তাঁকে শতাব্দীর সূর্য বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না, আগামী শতাব্দীতেও এরকম প্রতিভা আর দেখা যাবে বলে মনে হয় না। সেল্‌ফ্‌ থেকে জীবন-চরিতের স্ক্র্যাপ বইখানা নামাও একটু চোখ বুলোনো যাক।"

সিগার থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অলসভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল হোম্‌স্‌। তারপর বলল—"'M' এর সংগ্রহ দেখছি বাস্তবিকই অপূর্ব ওয়াটসন। একা মরিয়ারটিই তো পৃথিবী বিখ্যাত করে রাখতে পারে অক্ষরটাকে। তারপরে আছে মরগ্যান—বিষ দিয়ে খুন করায় যার জুড়ি নেই। মেরিডিউ—যার জঘণ্য কীর্তি কাহিনী মনে করলেও গা পাক দিয়ে ওঠে। ম্যাথুস্‌—চেয়ারিং ক্রসের ওয়েটিং রুমে যার ঘুসিতে আমার বাঁ-দিকের কুকুরে দাঁতটা জন্মের মত হারাতে হয়েছে। তারপর, সবশেষে রয়েছে আমাদের আজকের রাতের বন্ধু।"

বইটা আমার হাতে তুলে দিলে হোম্‌স্‌। মোর্য়ানের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেখলাম বেশ গুছিয়ে লিখে রেখেছে হোম্‌স্‌।

"মোর্য়ান, সিবাসটিয়ান, কর্ণেল। বেকার। ভূতপূর্ব ফার্স্ট ব্যাঙ্গালোর পাইওনীয়ারস্‌। জন্ম, লণ্ডন, ১৮৪০। স্যার আগাস্টাস্‌ মোর্য়ান, সি, বি,র পুত্র; (একসময়ে পারস্যে ব্রিটিশ মিনিস্টার ছিলেন স্যার মোর্য়ান)। শিক্ষা—ইটন এবং অক্সফোর্ড। কর্মস্থল—জোয়াকি ক্যামপেইন, আফগান ক্যাম্পেইন, চ্যারা-সিয়ার (ডিসপ্যাচেস্‌), শেরপুর এবং কাবুল। হেভি গেম অফ দি ওয়েস্টার্ণ হিমালয় (১৮৮১) এবং থ্রি মন্‌থ্‌স্‌ ইন দি জাঙ্গল (১৮৮৪)-র লেখক। ঠিকানা: কনডুট স্ট্রীট। ক্লাব : দি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, দি টান্‌কার ভাইল, দি বাগাটেলি কার্ড ক্লাব।"

মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরে হোম্‌সের হাতের লেখা : "লণ্ডনের দ্বিতীয় সবচেয়ে বিপদজনক ব্যক্তি।"

হোম্‌সের হাতে বইটা তুলে দিয়ে বললাম—"আশ্চর্য, সৈনিক জীবনে লোকটা দেখছি প্রচুর সম্মান পেয়েছেন।"

"সত্যিই তাই ওয়াটসন। সৈনিক জীবনের অনেকদূর পর্যন্ত তাঁর সুনামের অন্ত ছিল না। চিরকালই লোহার মত কঠিন ভদ্রলোকের স্নায়ু। এখনও ইণ্ডিয়াতে লোকে গল্প করে তাঁর সম্বন্ধে। কিভাবে একদিন একটা আহত মানুষ-খেকো বাঘকে ড্রেনের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছিলেন—এ কাহিনী এখনও কেউ ভুলতে পারে না সেখানকার লোকে। ওয়াটসন, জানই তো এমন কতকগুলো গাছ আছে যারা কিছুদূর বেশ সোজাসুজি উঠে যাবার পর হঠাৎ কি জানি কেন ক্যাপার মত উলটোপালটা দিকে বাড়তে শুরু করে। মানুষের মধ্যেও এরকম নজীর তুমি হামেশা দেখতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরী আছে। যে কোন ব্যক্তির সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার ঊর্ধতন সবকটি পুরুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে তার মধ্যে। কাজেই কেউ যদি হঠাৎ ভালর দিকে অথবা মন্দের দিকে মোড় নেয়, তাহলে বুঝতে হবে ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির প্রকাশের মধ্যে তার কুলপঞ্জীর বিশেষ কোন ভাবের প্রবল প্রভাব এসে পড়ায় আচমকা বিপথে যাওয়া শুরু হয়েছে তার। এ যেন বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন। বংশের পুরো ইতিহাসটার বিন্দুসার, সংক্ষিপ্তসার হয়ে দাঁড়ায় সে নিজেই।"

"কল্পনার বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"যা মনে কর তুমি। আমি অবশ্য বেশী চাপ দিতে চাই না এ থিওরীর ওপর। কারণ যাই হোক না কেন, হঠাৎ বিগড়ে গেলেন কর্ণেল মোর‍্যান, শুরু হল তাঁর বিপথে কুপথে যাওয়া। প্রকাশ্য কেলেংকারী অবশ্য কোনদিনই হয়নি, কিন্তু পাঁচ কান হওয়াও বাকী থাকেনি, ফলে তাঁর পক্ষে ইণ্ডিয়ায় বেশীদিন থাকা আর সম্ভব হল না। অবসর নিলেন কর্ণেল, এলেন লণ্ডনে, আসতে না আসতেই আবার শুরু হল তাঁর দুর্নাম কুড়োনোর পালা। এই সময়েই প্রফেসর মরিয়ারটির সুনজরে পড়লেন তিনি— মরিয়ারটি কিছুদিনের জন্যে তাঁর সাংগ-পাংগদের পাণ্ডা করে দিয়েছিলেন কর্ণেলকে। যাইহোক, কর্ণেলকে এন্তার টাকা দিতে লাগলেন মরিয়ারটি। যেসব উঁচু ধরণের কাজ সাধারণ অপরাধী-সমাজ কোনদিন ভাবতেও সাহস করত না, এই রকম দু'একটা কাজেও লাগালেন কর্ণেলকে। ১৮৮৭ সালে লডারে মিসেস্ স্টুয়ার্টের মৃত্যুর কাহিনী মনে পড়ছে তোমার? পড়ছে না? মোর‍্যান যে এর মূলে ছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রমাণ করা যায়নি কিছুই। কর্ণেলকে এমনই চালাকি করে আড়ালে রাখা হয়েছিল যে মরিয়ারটির দল ভেঙে যাওয়ার পরেও কোনমতেই মোর‍্যানকে জালে জড়ানো যায়নি। মনে পড়ে তোমার তোমাকে তোমার বাড়ীতে ডাকতে গিয়ে এয়ার-গানের ভয়ে কিভাবে জানলার খড়খড়ি টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলাম? তখনও তুমি ভেবেছিলে কল্পনার মাত্রা আমার ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানতাম আমার এত সাবধান হওয়া অকারণ নয়, কেননা এই অসাধারণ এয়ার-গানের অস্তিত্ব আমি তখনই জানতাম এবং এও জানতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বন্দুকবাজদের একজনের হাতেই থাকতে পারে হাতিয়ারটা। সুইজারল্যাণ্ডে মরিয়ারটির সাথে ইনিই আমার পেছনে ধাওয়া করেছিলেন। রাইকেনবাকের পাথরের তাকে শুয়ে থাকার সময়ে সেই ভয়ংকর পাঁচটা মিনিটের জন্যেই দায়ী ইনিই।

"হয়ত ভাবছ ফ্রান্সে অজ্ঞাতবাসের সময় মন দিয়ে কাগজ পড়তাম কবে আবার তাঁকে আমার পাছু নেওয়াতে পারব এই সুযোগের প্রতীক্ষায়। লণ্ডনে যতদিন উনি স্বাধীন জীবন যাপন করেছিলেন, ততদিন আমি এখানে সুখে শান্তিতে থাকতে পারতাম না। এর মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই ওয়াটসন। দিনে এবং রাতে চব্বিশঘণ্টার প্রতিটি মুহূর্তে ছায়ার মত আমার পেছনে লেগে থাকতেন উনি এবং একদিন না একদিন সুযোগ পেতেনই। কি করতাম আমি? দেখামাত্র তাঁকে গুলি করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে—করলে নিজেকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেটের শরণ নিয়েও লাভ নেই। উর্বর মস্তিষ্কের নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোন কিছুতে নাক-গলানো সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। কাজেই কিছুই করার ছিল না আমার। তাই অপরাধ সংক্রান্ত সমস্ত খবর নিয়মিত শুধু দেখে যেতাম। জানতাম, একদিন না একদিন তাঁকে আমি বাগে পাবই। তার পরেই মৃত্যু হল রোন্যাল্ড র‍্যাডেয়ারের। যে সুযোগের প্রতীক্ষার দীর্ঘদিন ধরে হাপিত্যেশ করে বসে থাকা, শেষ পর্যন্ত পেলাম সেই সুযোগ! একাজ কর্ণেল মোর‍্যানের সে বিষয়ে আমার আর তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। রোন্যাল্ডের সাথে তাস খেলার পর ক্লাব থেকে পাছু নিয়ে বাড়ী পর্যন্ত এসেছিলেন। তারপর গুলি চালিয়েছিলেন খোলা জানলা দিয়ে। সংগে সংগে ফিরে এলাম লণ্ডনে। পাহারাদার আমায় নজরে রেখেছে দেখলাম এবং বুঝলাম তার মনিবের কাছে যথাসময়ে পেঁৗছে যাবে আমার ধূমকেতুর মত উদয় হওয়ার খবর। রোন্যাল্ডকে খুন করার সংগে সংগে আমার ফিরে আসার উদ্দেশ্য যে কি, তাও আবিষ্কার করা কঠিন হবে না তাঁর পক্ষে। তৎক্ষণাৎ হুঁশিয়ার হয়ে গিয়ে আমাকে পথ থেকে সরানোর জন্যে তৎপর হয়ে উঠবেন কর্ণেল, সংগে আনবেন তাঁর বহু অবরাধের সংগী রক্তখেকো হাতিয়ারকে। তাঁর সুবিধার জন্যে জানলায় চমৎকার ছায়াবাজী দেখিয়ে পুলিশকে সাবধান করে দিলাম হয়ত তাদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার। ওয়াটসন, তুমি কিন্তু ওদের চিনতে একটুও ভুল করনি—ওদিককার বাড়ীর দরজায় যাদের দেখে তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে, আমিই তাদের ডাকিয়ে আনিয়েছিলাম আমাদের সাহায্যের জন্যে। যাই হোক, আমি যেখানে ঘাপটি মেরে কর্ণেলের ওপর নজর রাখব ভেবেছিলাম, কর্ণেল যে শেষ পর্যন্ত সেইখান থেকেই আক্রমণ শুরু করবে, তা ভাবিনি। তাহলে মাইডিয়ার ওয়াটসন, আর কিছু বুঝতে বাকী রইল কি?"

"আছে বইকি। অনারেবল্ রোন্যাল্ড র‍্যাডেয়ারকে খুন করার পেছনে কর্ণেলের কি মোটিভ থাকতে পারে, সে বিষয়ে কিছুই বলনি তুমি।"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, এবার তো তাহলে অনুমানের রাজ্যে সবচেয়ে যুক্তিবাদী মনেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। যা কিছু প্রমাণ আপাতত পাওয়া গেছে, সে সবের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকেই নিজের মনের মত অনুমান খাড়া করে নিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তোমারটা সঠিক হওয়ার যতখানি সম্ভাবনা ঠিক ততখানি সম্ভাবনা আছে আমারটারও।"

"অর্থাৎ এরকম একটা অনুমান খাড়া করেছ তুমি?"

"আমার তো মনে হয় সব জটিলতাই সরল হয়ে আসবে আমার অনুমান দিয়ে। সওয়ালের সময়ে জানা যায় যে কর্ণেল মোর‍্যান আর র‍্যাডেয়ার দুজনে মিলে প্রচুর টাকা জিতেছিলেন। মোর‍্যান যে শেষ পর্যন্ত ন্যায্যে খেলতে শুরু করে তা মোর‍্যান-চরিত্র যে জানে সেই বুঝতে পারবে। আমার বিশ্বাস খুনের দিনই র‍্যাডেয়ার জানতে পারেন যে মোর‍্যান তাঁকে ঠকাচ্ছেন। তখনই হয়ত আড়ালে ডেকে কর্ণেলকে তিনি ভয় দেখিয়েছিলেন যে ক্লাবের সভ্যতালিকা থেকে নিজে থেকে নাম না কাটিয়ে নিলে এবং চিরকালের মত তাস খেলা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না দিলে তিনি সব কিছু ফাঁশ করে দিতে বাধ্য হবেন। রোন্যাল্ডের বয়স অল্প। কাজেই তাঁর পক্ষে তাঁর চেয়ে অনেক বেশী বয়েসী এবং যথেষ্ট নামী কর্ণেলের মুখোশ সবার সামনে খুলে যাচ্ছে তাই কেলেংকারী সৃষ্টি করার সম্ভাবনা খুবই অল্প। সম্ভবত আমার অনুমানমত কর্ণেলকে শুধু ভয় দেখিয়েই কাজ সারতে চেয়েছিলেন রোন্যাল্ড। ক্লাব থেকে বিতাড়িত হওয়া মানেই মোর‍্যানের নিকেশ হওয়া, কেননা তাস খেলে অসাধু উপায়ে টাকা নিয়েই ইদানীং তাঁর দিন কেটেছে। কাজেই বিনা দ্বিধায় রোন্যাল্ডকে খুন করলেন তিনি। খুন হওয়ার সময়ে হিসেব করতে বসেছিলেন রোন্যাল্ড। অসৎ পার্টনারের সংগে খেলে যে টাকা তিনি জিতেছিলেন, তা হজম করার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাই হিসেব করতে বসেছিলেন কাদেরকে কত টাকা তাঁকে ফেরৎ দিতে হবে। দরজা বন্ধ করেছিলেন তিনিই। কেননা মা আর বোন এসে একসাথে অত নাম আর খুচরো টাকা পয়সা দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেই ফ্যাসাদে পড়তে হত—তাই ঐ সাবধানতা। কেমন, ঠিক আছে তো?"

"নিঃসন্দেহ। বিলকুল সত্যকেই অনুমান করে বসেছ তুমি।"

"মামলা চলার সময়ে বোঝা যাবে সত্যি কি মিথ্যে। আপাতত আমি স্বাধীন। কর্ণেল মোর‍্যান আর আসবেন না আমার দিবানিশার শান্তি কেড়ে নিতে, ভন হার্ডারের বিখ্যাত এয়ার-গানও শান্তি পাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মিউজিয়ামে, আর, আবার শুরু হবে শার্লক হোমসের পুরোনো জীবন, শুরু হবে লণ্ডনের জটিল জীবনের বিস্তর সমস্যার সমাধানে তার সর্বশক্তির বিনিয়োগ।"

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

একটি গল্প

কুমারেশ ঘোষ

দুই বুড়োর দুই বাগান;
আর মাঝখানে এক বেড়া!
ভ-বুড়ো আর চ-বুড়ো।
ভ-বুড়ো বললে, চ-বুড়ো ভাই,
তুমি আমার বন্ধু।
আমরা দু'জন পাশাপাশি
শান্তিতে বাস করবো।
চ-বুড়ো চুপ ক'রে রইলো।
পরে শুধু বললে, আচ্ছা!
ভ-বুড়ো সানন্দে চাষের দিকে মন দিলো;
কিন্তু চ-বুড়ো আড়ালে লাগলো ছুরি শানাতে।

তারপর......
একদিন চ-বুড়ো দেখলে
ভ-বুড়োর বাগানে ফল ফুটেচে নানারকম,
ফল ফলেচে অনেক
ভাবলে, ইস! বাগানটা যেন হাসচে।
হিংসায় চ-বুড়োর বুকটা উঠলো জ্বলে!
আর নিজেকে পারলো না সামলাতে—
তাই, বেড়া ভেঙে একদিন সে ভ-বুড়োর বাগানে
ঢুকিয়ে দিলো বিরাট এক ছাগলের পাল :
যা, মুড়ে খা গিয়ে ঐ বাগান।

দেখে ভ-বুড়ো হাঁ-হাঁ করে উঠলো :
এ কী বন্ধু, এ কী হ'লো?
চ-বুড়ো হেসে দেখালো বন্দুক :
ঐ তো মজা!

কিন্তু মজা টের পেলো চ-বুড়োই।
পাড়ার আর সবাই—
অ-আ-ই সকলেই বললে :
এ অন্যায়, বদমাইসি, বিশ্বাসঘাতকতা!
লাঠি নিয়ে অনেকেই
ভ-বুড়োকে সাহায্য করতে দৌড়ে এলো।
আর, ভ-বুড়োর বাগানের মালীরাও
এক জোট হ'য়ে দাঁড়ালো :
বটে! কুকুরের জন্যে মুগুরের ব্যবস্থা
আমাদের আছে-জানা।
নেবো এর প্রতিশোধ!

ব্যাপার দেখে
চ-বুড়ো গেল ঘাবড়ে।
তাড়াতাড়ি মুখ লুকোলো
তার বাগানের কাঁটা ঝোপের আড়ালে :
নাঃ! ব্যাপারটা যেন কেমনতর
হয়ে যায় ঘোরালো!

আমার গল্পও আপাতত ফুরালো।

কণ্ঠে, পারিপার্শ্বিকের মালা

করুণাসিন্ধু দে

যেখানে যা-পাই, পথে, ইতস্তত ছড়ানো ধুলোয়
স্মরণে চিহ্নিত নুড়ি, ভাঙা কাঁচে হাড়ের আগুনে,
পোড়া কাঠে দগ্ধ বুক,—দুই হাতে কাঙ্ক্ষিত কুলায়
দুবাগুণে না-জেনেই, তুলে আনি বিনষ্ট ফাল্গুনে,
সর্বনাশা তৃষ্ণা, দুঃখ; অহংকারে ভরাই হৃদয়ে
মন্থনে, মধুরে তুলে আঙুলের খাঁজে স্ফুট জ্বালা
মানুষের পীযূষের যন্ত্রণার মিলিত বিজয়ে
কন্টকে ফোটাই শোভা, কণ্ঠে, পারিপার্শ্বিকের মালা।

আপাদ-মস্তকে কাঁপে চেতনারা, রৌদ্রের রশ্মিতে
ঊর্ণনাভ মায়াজালে বারোমাস বাঁধে নিমন্ত্রণে;
মুখর অতিথি আসে মুহূর্তেরা, অঙ্গের আর্শিতে
বিম্বিত বিস্ময়ে ভালোবাসার প্রহর জাগরণে
যেন বা জ্বালাবে ধূপ ঘরে ঘরে, ইচ্ছার সংগীতে
সংসারে সংরাগে বেজে, মুহুর্মুহু প্রাণঢেলে দিতে।

ক্ষমা নেই

মঞ্জুলিকা দাশ

তূণে যত বাণ ছিল হয়েছে নিঃশেষ,
আর যাহা আছে বাকি;—
সেইটুকু করি শেষ শব্দভেদী বাণে।
অরণ্যমারীচ অন্ধ প্রলোভনে টানে,
ভুলো না তাহাতে তুমি, ছলনার কাছে কারা
পোষাকী সৌজন্য ঢাকে,—
ভয়ংকর অপমানে লজ্জারে কে মনে রাখে।

দুর্গম গিরির পথে বন্য আঁধিয়ার
নামে ঘৃণ্য সরীসৃপে, তলোয়ার ঝলসে ওঠে,
তোমরাও জ্বলে ওঠো তমিস্র তুষার,
কেন নিরর্থক পোষাকী সৌজন্য ঢাকা, খাপে যেন সমাবৃত
ধার,
তোমরাও জ্বলে ওঠো তমিস্র তুষার।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ঠিক একমাস আগে গত ১লা জানুয়ারী তারিখে জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৭০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে বিজ্ঞানের কথার পাঠকদের কাছে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও বৈজ্ঞানিক সাধনা সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থিত করতে চাই। কাজটি দুরূহ। কারণ এই মানুষটির সম্পর্কে এত অল্প লেখা হয়েছে এবং মানুষটি নিজেও নিজের সম্পর্কে এত অল্প কথা বলেছেন যে বাইরের কোনো লেখকদের পক্ষে শুধু পত্রপত্রিকা ঘেঁটে তাঁর সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি লেখা তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। যে কোনো কারণেই হোক আমাদের দেশের পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা অধ্যাপক বসুকে যোগ্য মর্যাদায় জনসমক্ষে উপস্থিত করার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি। অথচ যে বিরল সংখ্যক বিজ্ঞানীর অবদান ভারতের বৈজ্ঞানিক মনীষাকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দান করেছে তাঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুই উজ্জ্বলতম নাম।

অবশ্য গত কয়েক বছরে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম একাধিকবার খবরের কাগজের পাতায় উল্লিখিত হয়েছে। কখনো বিশ্বভারতীর সংকট উপলক্ষে কখনো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষার সপক্ষে তাঁর সুস্পষ্ট মত প্রকাশ প্রসঙ্গে। ঘটনাগুলো অন্যদিকে তাঁর একটি বিশেষ চরিত্রকেই প্রকাশ করছে। পৃথিবীর মহৎ বিজ্ঞানীদের মতো তিনিও শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ থাকেননি। ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর যে ছবিটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, তিনি তন্ময় হয়ে সেতার বাজাচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে এসে যাচ্ছে বলেই বলছি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এক্ষেত্রেও তাঁর আশ্চর্য মিল। একথা নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে যে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ভায়োলিনের হাত ছিল উঁচু দরের শিল্পীর। অধ্যাপক বসু প্রায় সমস্ত দিক থেকেই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের প্রতিরূপ হয়ে উঠেছেন।

এমনকি, আমার মনে হয়, চেহারার দিক থেকেও। মাথাভর্তি একরাশ এলোমেলো চুল, শিশুর মত সরল মুখ, অতি সাধারণ সাজপোষাক—এই তিন-

অয়স্কান্ত

টির সমন্বয় বিদেশে একমাত্র আইনস্টাইনে, স্বদেশে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে।

ঘটনার আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। ভবিষ্যতের পৃথিবীকে এই দুজন বিজ্ঞানীর নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে।

যাই হোক, বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোচনায় পরে আসছি। প্রথমে অধ্যাপক বসুর জীবনের কিছু বিবরণ উপস্থিত করা যাক।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম কলকাতার গোয়াবাগানে ১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে। বাবার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু। মায়ের নাম আমোদিনী দেবী। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের দেশে কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস আমাদের দেশের প্রথমতম প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে আমোদিনী দেবী এসেছিলেন একটি অত্যন্ত রুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার থেকে। আমোদিনীর বাবা ছিলেন বঙ্কিম-দীনবন্ধুর সমসাময়িক ও বন্ধু।

সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ীর কাছেই ছিল নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল। সেখানে পাঁচ বছর থেকে তাঁর স্কুল-জীবন শুরু। ন-বছর পড়েছিলেন এই স্কুলে। অসুখ না হলে এই স্কুল থেকেই ১৯০৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেন। কিন্তু অসুখের জন্যে একটি বছর নষ্ট হয়। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন হিন্দু স্কুল থেকে এবং যথারীতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। 'যথারীতি' বললাম এই কারণে যে সত্যেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে কোনো পরীক্ষাতেই কখনো দ্বিতীয় হননি। অথচ তিনি যে খুব বেশি পড়তেন তা তাঁর চালচলন দেখে অন্ততঃ বোঝা যেত না। দিনের মধ্যে অনেকটা সময়ই তিনি কাটাতেন বন্ধুবান্ধবের সাহচর্যে। আবার যতোটুকু পড়তেন তা শুধু পদার্থবিদ্যা বা গণিতের চর্চাতেই সীমাবদ্ধ থাকত না। তার মধ্যে অনেকখানি অংশ জুড়ে থাকত সাহিত্য ও দর্শনের বিস্তৃত অঙ্গনে কৌতূহলী পদচারণা, যেখানে সংস্কৃত ও পারশী সাহিত্যও অগম্য ছিল না। সম্ভবতঃ প্রতিভার লক্ষণই এই। কিন্তু সেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রজীবনেও, সত্যিকারের প্রতিভার নিদর্শন উপস্থিত করবার অনেক আগেই, তিনি মেধার তীক্ষ্ণতায় ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে এমন কি অধ্যাপকদেরও বিস্মিত করেছিলেন। সহপাঠীদের তো বটেই। সমস্ত দিক থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন এমন একজন মানুষ যাকে কিছুতেই ভুলতে পারা যাবে না। আমাদের দেশে পড়াশোনায় ভালো ছাত্রের অভাব নেই—কিন্তু ছাত্রজীবনেই চরিত্রলক্ষণে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত খুবই কম। এমন কি যদি শুধু পড়াশোনার কথাই ধরা যায় তাহলেও তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। তিনি যেবার এম-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেবারে তাঁর সহ-পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ পুলিনবিহারী সরকার, ডঃ যোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন, ডঃ স্নেহময় দত্ত এবং আরো অনেকে। যাঁদের নাম করা হল তাঁদের সম্পর্কে একথাটি বলা বোধহয় বাহুল্য হবে যে ছাত্রজীবনে তাঁরা সকলেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাশালী। একদল শ্রেষ্ঠ ছাত্রের এমন সমন্বয় যেমন দৃষ্টান্ত

হিসেবে বিরল, তেমনি শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে এমন অনায়াসে শ্রেষ্ঠতম হবার কৃতিত্ব অর্জন করাটাও দৃষ্টান্ত হিসেবে অসাধারণ।

ঘটনার আরো একটি আশ্চর্য যোগাযোগ, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহপাঠীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে বেরিয়ে আসা আর কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা একই সময়ে। স্যার আশুতোষ সত্যিকারের গুণীদের খুঁজে বার করতে পারতেন। সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজেই পদার্থ বিজ্ঞানের লেকচারার নিযুক্ত হলেন এবং অনতিবিলম্বেই পরিচয় দিলেন যে অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও তিনি অনন্যসাধারণ। বিজ্ঞান বিষয়ে অধিকার এবং সাহিত্য ও দর্শনে পাণ্ডিত্য—এ দুয়ের বিরল সমন্বয় তাঁকে সাহায্য করেছিল। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্যের ভাষা ও বিজ্ঞানীর তথ্যনির্ভরতা নিয়ে তিনি পদার্থবিদ্যার দুরূহ বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করতেন। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্ররা তাঁর অধ্যাপনায় মুগ্ধ হয়েছিল।

এই সময়ে জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় চলছিল। রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্তক হিসেবে আইনস্টাইনের নাম সকলেই শুনেছেন। কিন্তু সেই সময়ে—যখন তত্ত্বটি সবে প্রচারিত হয়েছিল—প্রচুর লেখালেখি ও সোরগোল সত্ত্বেও তত্ত্বটি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছেই ছিল দুর্বোধ্য। একজন সাংবাদিক রহস্য করে বলেছিলেন, পনেরো পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধের ওপরে পনেরো হাজার পৃষ্ঠা ব্যয় করার পরেও সারা পৃথিবীতে বোদ্ধার সংখ্যা ছিল বড়ো জোর পনেরো। কথাটা যদি ঠিক হয় তাহলে আমরা গর্ব করে বলতে পারি—এই পনেরো জনের মধ্যে অন্ততঃ দুজন ছিলেন বাঙালী। একজন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অপর জন মেঘনাথ সাহা। এঁরা দুজনে একদিকে জার্মাণ ভাষায় লিখিত আইনস্টাইনের প্রবন্ধাবলীর অনবদ্য ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন অন্যদিকে আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে অতি প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আরো একজন বাঙালী বিজ্ঞানীর নাম অবশ্যই করা দরকার। তিনি ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন, অতি সম্প্রতি যাঁকে আমরা হারিয়েছি। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় এই কৃতী বিজ্ঞানীর অবদান সম্পর্কে আমরা আলোচনা তুলব।

১৯২১ সালে স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হয়ে যোগ দিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তারপরেও আগের মতোই অধ্যাপনা ও গবেষণা চলতে লাগল।

অধ্যাপক বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে ধারণা করতে হলে বিশ শতকের গোড়ার দিকের পদার্থবিদ্যার গবেষণার গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে। বিষয়টির ওপরে অধ্যাপক নিজেই কয়েকটি অনবদ্য প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি পাঠকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করব 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত অধ্যাপক বসুর 'প্রোগ্রেস ইন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে।

বর্তমান শতকটি শুরু হবার আগে পর্যন্ত সাধারণ বলবিদ্যার মৌলিক নিয়মগুলির সাহায্যেই বিশ্বজগতের ক্রিয়াকান্ডকে ব্যাখ্যা করা হত। কিন্তু ১৯০০ সালে যখন ম্যাকস্ প্ল্যাংক তাঁর কোয়ানটাম থিওরি নিয়ে হাজির হলেন তখন সাধারণ বলবিদ্যার মৌলিক নিয়ম দিয়ে গড়া জগতটি ভেঙে পড়তে শুরু করে। বিষয়টি জানা গিয়েছিল বিকীরণ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে। সকলেই জানেন পদার্থ উত্তপ্ত হলে তা দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দীপ্তি প্রথমে হয় লাল, তারপরে কমলা, তারপরে হলদে, তারপরে সাদা। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও উত্তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিমান পদার্থটি থেকে তেজ কি-ভাবে পরিবর্তিত হয়—সে সম্পর্কে একটি সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক দিন থেকেই চলে আসছিল। দেখা গেল, ম্যাক্স্ প্ল্যাংক যে গাণিতিক সূত্রটি হাজির করেছেন তার সাহায্যেই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। আরো দেখা গেল, সূত্রটিকে যদি মানতে হয় তাহলে খুবই অদ্ভুত আরেকটি ব্যাপারকে অবশ্যই মানতে হবে। সূত্রটিকে অনুসরণ করতে গিয়ে ম্যাক্স্ প্ল্যাংক সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে বিকীরিত তেজ একটি অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে না, ভাগে ভাগে ছেদ টেনে টেনে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এই বিক্ষিপ্ত অংশগুলোরই তিনি নাম দিলেন 'কোয়ানটা'।

প্ল্যাংক আবিষ্কৃত এই তত্ত্বটির গুরুত্ব যে কতখানি তা উপলব্ধি করার জন্যে বিজ্ঞানীদের আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন এই কোয়ানটাম তত্ত্বকেই একটি নতুন দিগন্তে স্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে তেজ মাত্রই—তা সে আলোকই হোক বা উত্তাপ বা রঞ্জনরশ্মি—একই ভাবে ভাগে ভাগে ছেদ টেনে টেনে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। আমরা আগুনের সামনে বসে উত্তাপ অনুভব করি; তা এই কারণে যে অসংখ্য কোয়ানটা-পরিমাণ বিকীরিত তেজ আমাদের শরীরের চামড়ার ওপরে বর্ষিত

হচ্ছে। তেমনি আমাদের চোখের রেটিনার ওপরে যখন আলোকের কোয়ান্টা বর্ষিত হয় তখন আমরা রঙ দেখি।

আইনস্টাইন সিদ্ধান্ত করলেন যে, সমস্ত আলোকই তেজ-কণিকার সমষ্টি। এই কণিকার নাম তিনি দিলেন 'ফোটোন'। এতকাল ধারণা ছিল আলোক হচ্ছে তরঙ্গ, কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে ধারণা করতে হল আলোক হচ্ছে ভাগে ভাগে ছেদ টেনে টেনে বিক্ষিপ্ত কণিকাসমষ্টি।

আইনস্টাইন ঘোষণা করলেন যে বস্তুকে বিচার করতে হলেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি চাই। বস্তু হচ্ছে পরমাণুর সমষ্টি, আবার পরমাণুর মধ্যে আছে ইলেকট্রন, নিউট্রন ও প্রোটোন। এই ইলেকট্রনের গতিবিধি এবং আলোক ও ইলেকট্রনের পরস্পরের প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে হলে সাধারণ বলবিদ্যার প্রয়োগ করা চলে না। ইলেকট্রনের জগৎ যেন অন্য কোনো নিয়ম অনুসরণ করে চলছে। এই নতুন নিয়মাবলী আবিষ্কারের জন্যে সারা পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞানীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। আমাদের পক্ষে বিশেষ গর্বের কথা, পদার্থবিজ্ঞানের এই বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রেই অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান রয়েছে।

অধ্যাপক বসুর গবেষণা আলোক-কণিকার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে। তিনি উদ্ভাবন করলেন নতুন এক পরিসংখ্যান প্রণালী। আলোক-কণিকা সম্বন্ধে সাধারণ পরিসংখ্যান প্রণালীর পরিবর্তে এই নতুন উদ্ভাবিত পরিসংখ্যান-প্রণালী প্রয়োগের যৌক্তিকতাও তিনি দেখালেন। তারপরে আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে এই প্রণালীতে হিসেব করলে আলো-বিকীরণের নিয়মকানুনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকে না। এই নতুন প্রণালীর নাম দেওয়া হল 'বসু পরিসংখ্যান'। পরবর্তী কালে অধ্যাপক বসুর গবেষণাকে অনুসরণ করেই ইতালীয় বিজ্ঞানী ফার্মি ও ইংরাজ বিজ্ঞানী ডিরাক ইলেকট্রনের হিসেবের অন্য এক প্রকার পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেন। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি এই দুটি পরিসংখ্যান। তার মানে, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বললেও ভুল বলা হয় না।

অধ্যাপক বসুর এই যুগান্তকারী গবেষণার পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইউরোপে পাঠান। এই সুযোগে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই সময়েই তিনি মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরিতে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন। ইউরোপের সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত ও সম্মানিত হন। উচ্চগণিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি এমনকি ইউরোপীয় বিজ্ঞানী-দেরও শ্রদ্ধা অর্জন করে। অথচ আজও তাঁর নামের পেছনে কোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই। তাঁর কোনো প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেননি। তিনি সগর্বে ঘোষণা করে-ছেন যে, তাঁর নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই তাঁর শ্রেষ্ঠ গৌরব।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রফেসর হন, তারপরে ঢাকা হলের সর্বাধ্যক্ষ। তিনটিই বৃহৎ দায়িত্ব। তিনি একা এই তিনটি দায়িত্বই সুষ্ঠুভাবে পালন করেছিলেন। তাঁর এই কৃতিত্বেরও কোনো তুলনা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার পরে তিনি কয়েক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা প্রফেসরের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫২ সালে রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৬--৫৮ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য। ১৯৫৪ সালে তিনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত। বর্তমানে তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কৃতী জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণটি উপস্থিত করা হল তার মধ্যে তাঁর বহুমুখী জীবনের অন্যান্য কর্ম-প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়নি। এত অল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। তাঁর অতি সাধারণ বেশবাস ও চালচলন সম্পর্কেই পুরো একটি বই লেখা চলে। তাঁর ছাত্র-প্রীতি সম্পর্কে অজস্র কথা বলার আছে। তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনার রীতি এতই অনন্যসাধারণ যে তা গবেষণামূলক নিবন্ধের বিষয়-বস্তু। তাঁর অসাধারণ দেশপ্রেমের কথা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু আমার মতে, তাঁর সর্বচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্র। তাঁকে যাঁরা দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলাভাষায় বক্তৃতা দিতে শুনেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন এ-বিষয়ে তিনি অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি জোরের সঙ্গে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এমনকি উচ্চতর বিজ্ঞানের গবেষণামূলক নিবন্ধও বাংলা ভাষায় রচিত হতে পারে। এবং সম্ভবত, তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-পরিচয় এখনো পর্যন্ত তাঁর এই উক্তির সপক্ষে সার্থকতম দৃষ্টান্ত।

আজকের নেফা

"উপজাতি এলাকার সমস্যা হল, উপজাতিদের বোঝান যে, নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করবার সকল স্বাধীনতাই তাদের আছে এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও বুদ্ধি অনুসারে তারা উন্নয়নও করতে পারে। ভারত শুধু তাদের রক্ষক নয়—ভারত তাদের মুক্তির পথ, একথা তাদের বোঝাতে হবে। ভারত তাদের শাসন করছে, তারা শাসিত এবং তাদের উপর অনভ্যস্ত আচার-ব্যবহার জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের মনে এই ভাব উদয় হলেই তারা বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করবে।" উপজাতিদের কল্যাণ সম্পর্কে এই হল প্রধানমন্ত্রীর অভিমত। তাই উপজাতিদের সম্পর্কে দৃষ্টিশক্তি হবে উদার এবং মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ। উপজাতিদের গ্রহণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচিত হবে। আত্মমর্যাদাবোধে সচেতন না হলে কোন কঠোর কাজে—কোন উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে তারা সহযোগিতা করবে না। উন্নয়ন কার্যে অংশ গ্রহণের দ্বারা তাদের মধ্যে যাতে গর্ববোধ জাগে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে।

গত পনের বছর ধরে এই নীতির উপর ভিত্তি করেই ভারত সরকার নেফাঞ্চলের উন্নয়ন কাজে হাত দিয়েছিলেন বলেই অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটছে সমগ্র অঞ্চলটিতে।
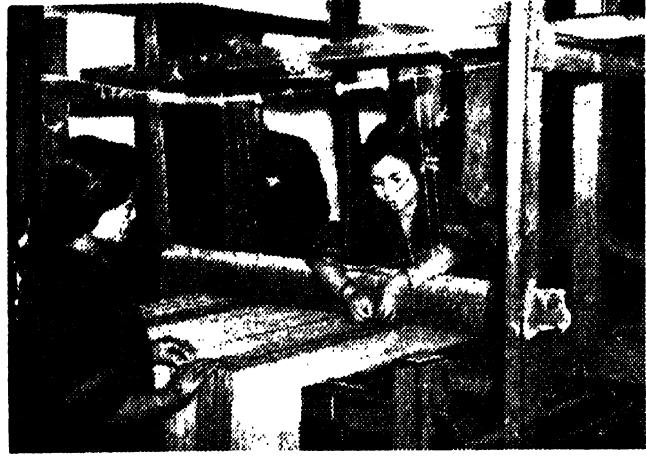
আলঙ কেন্দ্রে তাঁতের কাজ করছে নেফা যুবতীরা

নেফার ছাত্রদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরু

সাম্প্রতিক চীনা আক্রমণ সমস্ত পরিকল্পনার বুকে এক নিদারুণ আঘাত হেনেছে। কিন্তু উপজাতীয় ব্যক্তিমাত্রেই তাতে ভেঙে না পড়ে নতুন উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে নেমে এসেছে। সীমান্ত প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সরকার নতুন করে দৃষ্টি দিয়েছেন। কৃষি ও যানবাহন ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সে হিসাবেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে বর্তমান এবং আগামী বৎসরের জন্য।

নেফা অঞ্চলে বর্তমানে ৩০টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক আছে। সরকার এই
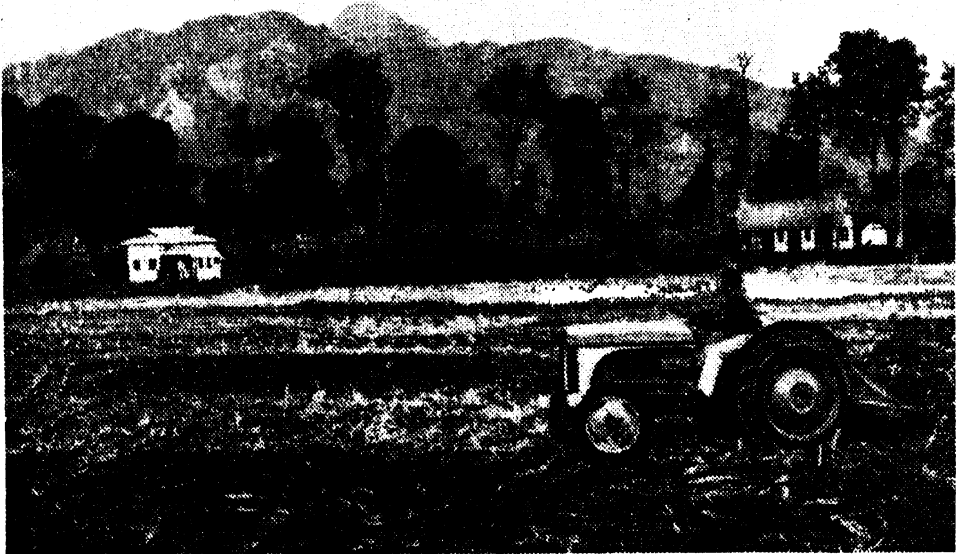
পাশিঘাট কৃষি ফার্মে নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে ট্রাকটরের সাহায্যে

ব্লক বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে আরও ৮টি ব্লক গঠন করবেন ঠিক করেছেন। ফলে সমগ্র অঞ্চলে সমবায় পরিবহন এবং যাত্রী ও মাল পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সূচিত হবে।

বর্তমানে নেফার প্রত্যেকটি জেলা ও সদর দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগকারী সড়ক আছে। জীপ চালনার উপযুক্ত এক হাজার মাইল পাথুরে পথ বর্তমান। প্রতিটি বিভাগে আছে ৫০ শয্যার একটি করে হাসপাতাল এবং সুদূরে গ্রামাঞ্চলের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট। তাছাড়া আছে ভ্রাম্যমান ম্যালেরিয়া দূরীকরণ ও বি-সি-জি টিকা ইউনিট। কেন্দ্রীয় যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং তিনটি কুষ্ঠ কলোনী আছে মার্গারিটায়।

নেফা অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমাগ্রসরমান। বর্তমানে নেফার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নয় হাজারেরও বেশী। নেফার বাইরে কলেজে ও কারিগরি শিক্ষালয়ে আছে চল্লিশজন নেফাঞ্চলের ছাত্র। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিরও সংখ্যা বাড়ছে।

নেফা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের দপ্তর, স্কুল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নেফাবাসী কর্মীদের সংখ্যাই বেশী। নেফার পলিটিক্যাল অফিসারদের মধ্যে দুজন সহকারী পলিটিক্যাল অফিসার নেফারই অধিবাসী।

নেফার কৃষি ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় আধুনিক রূপ নিচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে যাবতীয় চাষ-আবাদ

জোয়ানরা সমরাস্ত্র বহন করে নিয়ে চলেছে পার্বত্য অঞ্চলে

কাঠের কাজ করছে নেফার যুবকেরা

সম্পর্কে সরকার নেফাবাসীদের সচেতন করে তুলছেন।

এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্ম-প্রচেষ্টায় নেফাবাসীদের সহযোগিতা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তারা এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছে তাদের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎকে। তাই ভারতীয় জোয়ানদের সঙ্গে মিলিতভাবে চীনা দস্যুদের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদেরকে তারা চিনতে পেরেছে এবং জানতে পেরেছে ভারতই তাদের প্রকৃত বন্ধু।

নেফার একটি নদী পার হচ্ছে জোয়ানরা

না গ্রহন,
না বর্জ্জন
--- ইঁটের পাঁজা
তার উপরে বসলো রাজা
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা
খাচ্চে
কিন্তু গিলচে না
২৫/১/৬৩ ইং
কলম্বো প্রস্তাব
হিমালয়
বসন্তের টীকা নিন
মরিতে চাহিনা আমি
সুন্দর ভুবনে
নতুন বইয়ের লিস্ট
বিদ্যাস্থানে ভয়ে বচ
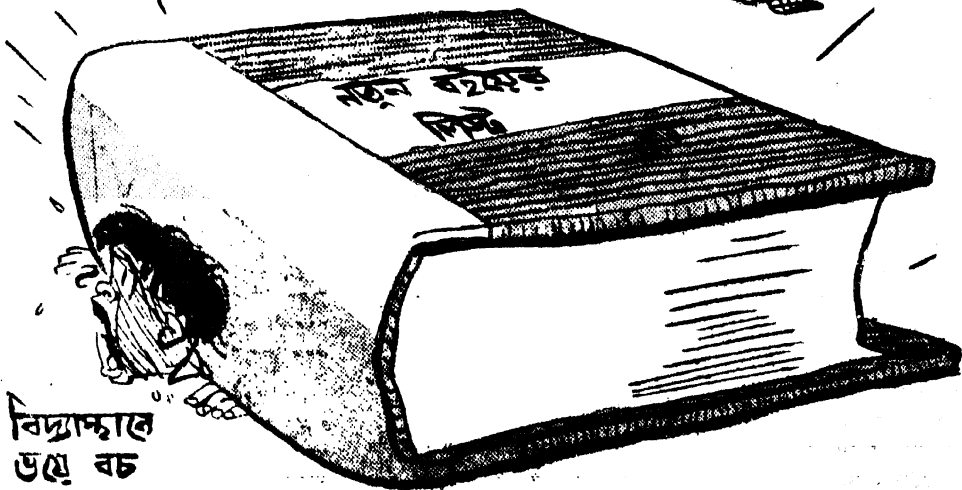
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ব্যাণ্ডেল, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি হ্রাস হতে লাগলো সেই সময় আর্মেনিয়ান ঔপনিবেশিকগণ কলকাতার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সে সময়ে আর্মেনিয়ানগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই কারণেই আর্মেনিয়ানরা হুগলী নদীর নিকটবর্তী স্থানই ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেয়। হুগলী নদীর নিকট-বর্তী স্থানে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য বহু বৎসর ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেইখানে আর্মেনিয়ানরা ঘর-বাড়ী তৈরী করে এবং ব্যবসার পত্তন করে। স্ট্র্যান্ড রোড, চিৎপুর রোড, ক্যানিং স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) সীমাবদ্ধ কলকাতার অধুনা যে অংশটি আছে সেই সময় আর্মেনিয়ানগণ তথায় ঘর-বাড়ী তৈরী করে বলে জানা যায়। উক্ত পল্লীর মধ্যস্থলে গোরস্থানের মাঝে আর্মেনিয়ানরা ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে একটি কাঠের বাড়ী তৈরী করে। এবং তার নাম দেয় সেন্ট জনস্ চার্চ।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দে আগা নজারের অক্লান্ত প্রযত্নে এবং আর্মেনিয়ান সমাজের আর্থিক আনুকূল্যে কাঠের বাড়ীটির জায়গায় একটি পাকা গির্জা-বাড়ী গড়ে ওঠে। পরিকল্পনা করেন ইরান দেশীয় এক আরমানি স্থপতিশিল্পী লেভেন ঘোভনড্ (Levon Ghovnod)।

যেহেতু চুঁচুড়ায় প্রাচীনতর আরমানি গির্জাটির নির্মাণ কাল ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ এবং যা সেন্ট জনের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল সেইহেতু নাম বিভ্রাট নিরসন করার জন্য কলকাতার আর্মেনিয়ান গির্জাটির নব নামকরণ হয়—নাজারেথের গির্জা। এইভাবে উক্ত গির্জা দানশীল হিতৈষী আগা নজারের স্মৃতি রক্ষার মানসেই নামকরণ করা হয়েছিল। সেই গির্জা আজও তার পূর্বতন অবস্থায় সুরক্ষিত আছে।

গির্জার চূড়া এবং ঘন্টাঘর ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ম্যানুয়েল হ্যাজার মালিয়ন নির্মাণ করিয়ে দেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ক্যাচিক আর-কিয়েল গির্জার অভ্যন্তরটি সুশোভিত করিয়ে দেন। এবং একটি বৃহৎ ঘড়ি দান করেন। দোতলায় যাজক-আবাস এবং চারিদিকের প্রাচীর তিনিই নির্মাণ করান। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যাজক-আবাসের

বেগম সারকিসিয়েন আর্মানিয়ান মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম (১৬২০ খৃষ্টাব্দ) কলকাতায় আসেন

তিনতলা নির্মাণ হয়। নির্মাণ ব্যয়ভার বহন করেন অরটুন গ্যাগরি আপকার।

গির্জাটি শুধুই কলকাতার প্রাচীন-তম উপাসনাস্থলই নয়, আরমানি সমাজ জীবনের একটি বিশেষ কর্মপ্রতিষ্ঠান-রূপেও উল্লেখ্য।

এইচ ই এ কটন (H. E. A. Cotton) উল্লেখ করেছেন যে, জব চার্ণক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে সুতানুটীতে কুঠি পত্তন করেন। সেই সময় চুঁচুড়ায় আরমানিরা সওদাগরী করতো। চার্ণক তাঁদের কলকাতায় বসবাস করতে আমন্ত্রণ জানান। এক দল আরমানি যে আমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজদের সংগে কয়েকটি অংগী-কারে এক দল আরমানি কলকাতায় জব চার্ণকের আমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়ান-দের জন্য একটি কাঠের ছোট গির্জা তৈরী করিয়ে দেন। দলিলের সত্ব এইরূপ ছিল :--

“আরমানী জাতির ৪০ অথবা তার অধিক ব্যক্তির জন্য যাঁরা কোম্পানীর কোন ছাউনী, সহর অথবা নগরের বাসিন্দা হবেন তাঁরা তথায় যে আপন ধর্মমত পালন করতে পারবেন তাই নয় উপরন্তু তাঁদের এক খণ্ড ভূমি দেওয়া হবে। সেখানে তাঁরা আপন ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ঈশ্বর আরাধনা করবার নিমিত্ত গির্জাঘর প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। এবং আমরা (কোম্পানী) নিজ ব্যয়ে আরমানি-দের জন্য কাঠের গির্জা তৈয়ার করাতে সাহায্য করব। আরমানিরা ঐ গির্জাঘর পরে বদলিয়ে আপন পছন্দ মত পাকা ইমারত তৈরী করতেও পারেন। স্থানীয় শাসন কর্তা এবং কোম্পানী বাহাদুর একাধিকক্রমে সাত বছর ধরে বাৎসরিক ৫০ পাউণ্ড ব্যয় করবেন যাতে পুরোহিত, ধর্মযাজক ইত্যাদির ভরণপোষণ হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে, ২২শে জুন এই দলিলের তারিখ।”

এইচ ই এ কটন লিখিত গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে যে—

‘এই গির্জা ১০০ বছর যাবৎ উপস্থিত যেখানে চার্চ অফ নাজারেথ রয়েছে তার দক্ষিণে ছিল। এবং চার্চ অফ নাজারেথ যে ভূমিতে দণ্ডায়মান সেই স্থান একদা আরমানিদের গোরস্থান ছিল। আরমানিদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরবর্তী কালে ঐ গির্জাগৃহে ভজনারত সকল আরমানিদের স্থান অকুলন হতো।’

আরমানি গির্জার চূড়ায় যে ঘড়িটি আছে সেই সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ২৮শে এপ্রিল ১৯২৫ সালের ‘দি ইংলিশম্যান’ কাগজে।

তা' ছাড়া "Bengal Past & Preasant" -এর একটি সংখ্যায় ঘড়ির কথা ছিল। উক্ত সংবাদে উল্লেখ ছিল যে, কলকাতার আরমানি গির্জাই দাবী করতে পারে যে, তার চূড়ার ঘড়িটি সহরের মধ্যে প্রাচীনতম ঘড়ি। উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, যন্ত্রপাতির কোন অংশ বদল করা হয়নি। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আগা ক্যাচিক আরাকিয়েল ইংলণ্ড হতে আনয়ন করেন। পরবর্তী বৎসরে তাঁর লোকান্তর হয়। ঘড়িটি লণ্ডন সহরের আলেকজাণ্ডার হেয়ার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তী উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ই গ্রে ঘড়িটি মেরামত করেন এবং দুটি অতিরিক্ত 'ডায়েল' তাঁর দ্বারা লাগান হয়। আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীট ও থ্যাংরাপট্টির সংযোগস্থলে বড়বাজারের প্রবেশপথে গির্জাটির চূড়ায় ঘড়িটি সবার চোখে পড়ে।

ঘড়ির কলকব্জা দেখার জন্য গির্জাঘরের ভেতর দিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ছিলাম। ছাদের উপর দিয়ে উঠেছে লোহার মই। সেই মই বয়ে উঠেছিলাম ঘড়িঘর দেখতে। বিরাট ঘড়ি। ঘড়িতে দম দেবার জন্য প্রয়োজন হয় দুইজন সুদক্ষ লোকের। চোখে পড়লো ঘড়ির কলকব্জার গায়ে উৎকীর্ণ লিপি। তা হলো—'

"Brought out from England, and fixed at the expense of the late Catchick Arakel Esqr. in the year 1792. -- Alexander Hare Maker"

আর একটি হলো—

"Repaired and two more dials added during the wardenship of Johannes Avdall in the year 1838 — by E. Gray, Calcutta."

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আর্মানি গির্জার প্রাঙ্গণে আর্মানিদের প্রাচীন গোরস্থান ছিল। ঐ ভূখণ্ডের উপর ১৭২৪ খৃীষ্টাব্দে আগা নজারের উদ্যোগে, প্রচেষ্টায় ও বদান্যতায় স্থাপিত হয় গির্জা যা কলকাতার প্রাচীনতম খৃীষ্টীয় ভজনালয়—আর্মানীয়ান চার্চ অফ নজারেথ। সেই প্রাঙ্গণে কালো পাথরের এক সমাধি-শিলা দৃশ্যমান হয়। যার নীচে মাটিতে প্রোথিত আছে এক আর্মানি মহিলার দেহাবশেষ। জব চার্ণকের নেতৃত্বে কলকাতায় ইংরাজদের আগমনের ষাট বছর আগে ১৬৩০ খৃীষ্টাব্দে এই মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। কালো পাথরের এই সমাধি-শিলায় প্রাচীন আর্মানী লিপিতে পাঁচটি পঙ্‌ক্তি উৎকীর্ণ আছে—"এই সমাধি রেজা বিবেৎ এর, মৃত দানশীল সুকিয়ার স্ত্রী। যিনি (রেজা বিবেৎ) ইহজগৎ হতে অনন্ত জীবনে মহাপ্রয়ান করেন নাথা একবিংশতি দিবসে ১৫ সনে অর্থাৎ ১৬৩০ খৃীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে।"

মেসরোভ জে-সেট লিখেছেন—"১৮৯৪ খৃীষ্টাব্দে অগাষ্ট মাসে এই প্রাচীন ও আকর্ষণীয় সমাধি বর্তমান লেখক আবিষ্কার করেন। এই সমাধি প্রস্তরের উপর দিয়া তিনটি শতাব্দীর কালস্রোত বহিয়া গিয়াছে। বাঙলার সরকার সেই সব প্রাচীন সমাধির ও স্মৃতিসৌধগুলি যাহার ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গুরুত্ব আছে তাহার তালিকা প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। কলকাতা, চুঁচুড়া, সৈদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) এবং ঢাকায় যে সব কবর ছিল এবং যাহার স্থাপনকাল প্রাক ১৮০০ খৃীষ্টাব্দ সেইগুলির উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যাহা লিখিত ছিল তাহা উদ্ধার করার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। এই কার্যে ব্যাপৃত থাকাকালে আমি কলকাতার প্রাচীনতম খৃীষ্টীয় কবরটি দেখিতে পাই। আমার এই মূল্যবান আবিষ্কার অধ্যাপক সি, আর, উইলসনের গোচরে আনি। অধ্যাপক উইলসন তৎকালে কলকাতার প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্বের পণ্ডিত ছিলেন। এবং তাঁহার উপর উক্ত তালিকা প্রণয়নের ভার সরকার কর্তৃক ন্যস্ত ছিল। অধ্যাপক প্রথমে সংশয় প্রকাশ করেন। ১৬৯০ খৃীষ্টাব্দে জব চার্ণক কর্তৃক কলকাতার পত্তনের ৬০ বৎসর পূর্বে এই কবর প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতায় তিনি সন্দিহান ছিলেন। যখন তিনি স্বয়ং আসিয়া যথাস্থানে ঐ শিলালিপি দেখিলেন তখন তিনি নিঃসংশয় হলেন যে উহাই কলকাতার প্রাচীনতম খৃীষ্টীয় কবর।"

আর্মেনিয়ান লিপিতে উৎকীর্ণ কলকাতার প্রাচীনতম (১৬৩০ খৃষ্টাব্দ) খৃষ্টীয় সমাধি-শিলার প্রতিলিপি

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

এত টাকার মুখ মহাশ্বেতা কখনও দেখেনি তার জীবনে। এক টাকায় দু আনা সুদ পাওয়া যায় তাও কখনও শোনে নি সে। তার মা টাকা ধার দেয় সে জানে—টাকায় এক পয়সা সুদ মেলে। তাও একশ কি পঞ্চাশ হ'লে শতকরা এক টাকার হিসেব। একেবারে শুধু হাতে দিলে সেইটেই বড় জোর দেড় টাকায় ওঠে। কিন্তু এক মাসে একশ টাকায় সাড়ে বারো টাকা সুদ—কখনও কখনও সুযোগ মতো পনেরোও আদায় ক'রে দেয় অভয়পদ—'এ যে গল্প কথা একেবারে। বাবা, এ যে একরাশ টাকা। একটা বাবুর মাইনে বলতে গেলে।......হ্যাঁ গা, সত্যি টাকা তো এসব—নাকি মেকী? বলি জালটাল নয়?'

অভয়পদ গম্ভীরভাবে বলে, 'বাজিয়ে দ্যাখো না, কাঁসার টাকা বলে কি মনে হচ্ছে?'

'কে জানে বাপু। সন্দ হয় যেন। মড়ারা এত টাকা পায় কোথা থেকে? এ তো কুবেরের ঐশ্বয্যি!'

সত্যিই তার বিশ্বাস হ'তে চায় না ব্যাপারটা। টাকা হাতে পেলেও না। মাঝে মাঝে অকারণেই নাড়া-চাড়া করে, বার করে গুণে দেখে। দুশো টাকা এনেছিল সে মার কাছ থেকে, পাঁচ-সাত মাসেই বেড়ে সেটা প্রায় ডবল হয়েছে। এ কী সহজ কথা!

তবে টাকাটা হাতে থাকে না বেশী দিন এটা সত্যি। মাসের শেষ ধার দেয়—দশ বারো দিন থাকতে—আবার মাস-কাবা'র ফেরৎ পায়। মাঝের কটা দিন মাত্র নাড়তে চাড়তে পায় সে। তা তার জন্যে দুঃখ নেই ওর। টাকা খাটাই তো লক্ষ্মী, বসে থাকলে আর তার দাম কি? বলি বাক্সে তুলে রাখলে ষোল বছরেও তো একটা পয়সা বাড়বে না! (এ কথা সবই অবশ্য অভয়পদর মুখে শোনা—তবে এ যে লেহ্য কথা তা সেও বোঝে।)

সব মাস-কাবারে সব টাকা ফেরৎও পায় না। তা না পাক, পরের মাস-কাবারে ডবল সুদ পাবে তা সে জানে। সেদিকে মিনসে খুব হুঁশিয়ার আছে—গলায় জোল দিয়ে আদায় করে। সুদটা ঠিকমতো পেলেই হ'ল। সুদের জন্যেই তো টাকা খাটানো। না-ই বা পেলে হাতে সব মাসে। সে তো বাড়ছে সেখানে।

আজকাল অনেক শিখেছে সে, এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান হয়েছে। সুদ পড়ে থাকলে তারও সুদ পাওয়া যায়—এ সে জানত না। এটা বলেছে মেজগিন্নী। মেজগিন্নী অনেক জানে সত্যি। কে জানে হয়ত বা মেজগিন্নী নিজেও এ কারবার করে লুকিয়ে। হয়ত মেজকর্তাই খাটিয়ে দেয় টাকাটা, ওদের কাছে সাধু সেজে থাকে। ওদের টাকা সুদে খাটলে যদি বেড়ে যায় অনেক, ফুলে-ফেঁপে যদি বড়লোক হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা—সে কি সহ্য হয়? সেই ভয়েই হয়ত দাদাকে অত সাধু-উপদেশ দিয়ে আটকাতে চেয়েছিল। সব পারে ওরা, কর্তাগিন্নীর অসাধ্য কিছু নেই। নিশ্চয়ই তাই। ভেতরে ভেতরে নিজেরা ঐ কাজই করছে—মেজগিন্নীর বুকপোঁতা করছে শুধু। নইলে এত কথা জানল কী করে?

শুধু কী তাই। আবার না কি কী চটায় আর কিস্তিতে টাকা ধার দেয় বাজারে, তাও জানে মেজবৌ। বলে, 'ও দিদি, অমন ক'রে বটঠাকুরের হাততোলায় থাকার দরকার কি, টাকা খাটাতে চাও তো বাজারে খাটাও না, মোটা লাভ।'

'সে আবার কি লো? বাজারে খাটাব কি? সে আবার কী ক'রে খাটাতে হয়?'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বেশ উৎসুকভাবেই জিজ্ঞাসা করে মহাশ্বেতা।

'সে তো খুব সোজা গো। ধরো যার কাছ থেকে মাছ কেনা হয়—তাকে দশ টাকা ধার দিলে, পরের দিন থেকে একশ' দিন পর্যন্ত রোজ সে তোমাকে দশ পয়সা ক'রে আদায় দিয়ে যাবে। মোটা সুদও পেলে, আবার সুদ ছাড়া কোন না মাঝে মাঝে কিছু মাছও আদায় হবে মাগ্না!'

'অ। তা সে কত ক'রে পোষাল তাহ'লে?'

আরও উৎসুক, আরও সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে মহাশ্বেতা। প্রাণপণে হিসাবটা মাথায় আনবার চেষ্টা করে।

'বাবা এত হিসেব বুঝছ আজকাল! বলে কত ক'রে পোষাল! দিদি আর সে মানিষ্যি নেই!'

'নে বাপু, তোর রঙ্গ রাখ। যা বলছিলি তাই বল।'

'বলি এত কারবার করছ, এ সোজা হিসেবটা বুঝতে পারলে না? একশ টাকায় তো চৌষট্টি পয়সা গো? চৌষট্টি পয়সা ধার দিয়ে সে জায়গায় পাচ্ছ একশ' পয়সা। এক টাকা ন' আনা। তাহলে এক টাকায় ন আনা পেলে। অনেক লাভ।'

'তেমনি তো 'একশ' দিন ধরে চলবে লো! সে তো তিন মাসের বেশী হয়ে গেল তা'হলে। সে আর এমন কি?'

'বাব্বা, তুমি তার চেয়েও বেশী চাও। তোমার খাঁই তো কম নয়। আরও বেশী

পাও বুঝি? তা'হলে তুমি তো টাকার কুমীর হ'য়ে পড়বে গো!'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! তা'হলে আর ভাবনা ছিল না। লাভ তো কত!...কী যে বলিস!'

অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দেবার চেষ্টা করে। আরও গোলমাল হয়ে যায়, আরও উলটো-পালটা বলে ফেলে। নিজেও বুঝতে পারে সে কথাটা। অনুতাপের সীমা থাকে না। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই মনে মনে নিজের কান মলে। কেনই যে এসব কথা তোলে সে, আর কেনই বা হাটিপাটি পেড়ে এ-সব সুদে খাটানোর কথা বলতে যায়! পেটে যে কেন কথা থাকে না তার—তা সে নিজেই বুঝতে পারে না।

এত ঠকে তবু তার লজ্জা নেই! ছি ছি!

মনে মনে বার বার নিজেকে তিরস্কার করতে থাকে মহাশ্বেতা।

যে কোন কথাই মাথায় ঢুকতে দেরি হয় মহাশ্বেতার, কিন্তু তেমনি একবার ঢুকলেও সহজে আর বেরোতে চায় না। টাকায় টাকা বাড়ে—এই কথাটা মাথায় ঢোকবার পর সে প্রাণপণে মূলধন বাড়ানোর কথাই চিন্তা করে আজকাল। মার কাছ থেকে আর এক খেপ টাকা এনেছে সে। কদিন পরে আরও একবার গিয়েছিল কিন্তু শ্যামা কিছু দেননি। হাঁকিয়ে দিয়েছেন সোজাসুজি।

'টাকা কি আমার কাছে বসে থাকে? এখন টাকা নেই, যা!'

'তা তুমি যে আমার টাকা খাটাও তা তো বলনি বাপু এতদিন!' অপ্রসন্ন মুখে বলে মহাশ্বেতা।

ঠিক এই ভয়ই করেছিলেন শ্যামা। এর পর সুদের কথা উঠবে, হিসেব চেয়ে বসবে হয়ত। তিনি প্রস্তুতও ছিলেন সে জন্যে। বললেন, 'সব সময় কি আর খাটাই। এক-আধবার তেমন লোক এসে পড়লে দিতে হয় বৈকি। আর তুমি তো কিছু বারণও ক'রে দাওনি তোমার টাকা খাটাতে। এমন হুট্ ক'রে চেয়ে বসতে পারো তাও বলনি টাকা রাখবার সময়। তা'হলে আমি তোমার টাকা রাখতুমই না।'

'না, তা নয়।' মহাশ্বেতা বেশ একটু দমে যায় মায়ের কণ্ঠস্বরে। তাড়াতাড়ি বলে, 'তা নয়—তবে টাকা খাটলে আমার একটা সুদও পাওনা হয় তো।'

'হয় বৈকি। হবেও পাওনা। আমি তো তোমার ভাগের সুদ দোব না এমন কথা কখনও বলিনি। যা দু'চার পয়সা পাওনা হয় তা নিশ্চয়ই পাবে। কিন্তু সে একটা হাতী-ঘোড়া কিছু হবে না। সে পিত্যেশ ক'রো না। কটাই বা টাকা, সব সময়ে তো খাটাইও না তোমার টাকা। তা'হলে আর চাইবা-মাত্র দিলুম কী ক'রে? দৈবে-সৈবে তেমন কেউ এলে তবেই দিই। আর তুমি তো নিয়েও গেলে বার করে চারশ' টাকা। আর কী নশ' পাঁচশ' আছেই বা?'

'তবেই তো বললে ভাল। বেশ গাইলে। তুমি তো যা সুদ দেবে তা বুঝতেই পারছি, মাঝখান থেকে আমারই লোকসান। একশ' টাকা আমার কাছে ছ মাস খাটলে দুশ' টাকা হয়ে যেত।'

'দ্যাখ—' শ্যামা বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলেন, 'অত বাড়াবাড়ি কোন জিনিসেরই ভাল নয়। যা রয়-সয় তা-ই ভাল। অত সুদ যে দেয় তার কখনও টাকা শোধ করবার মতলব নেই। সে একদিন সব সুদ্ধ ভরাডুবি করবে। তোর চেয়ে মাথা-ওলা লোক ঢের আছে সংসারে। এতই যদি সহজ হ'ত ব্যাপারটা তা হ'লে সবাই গিয়ে টাকা ঢেলে দিত। আর এত সুদ তা'হলে তারা দেবেই বা কেন? যা পিটে নিয়েছিস, নিয়েছিস—এইবার হাত গুটো। ঐ কটা টাকাই থাক, তাতেই ঢের।'

'হ্যাঁ, তা আর নয়। সব সুদ্দ এনে তোমাকে ধার দিই, কবে কে দশ টাকা ধার নিয়ে এক পয়সা সুদ দেবে সেই পিত্যেশে। তোমাদের জামাই নিজে হাতে ক'রে নে যাচ্ছে। বলি সে মানুষটা তো আর বোকা নয়। যাকে দিচ্ছে বুঝে-সুঝেই দিচ্ছে। তেমন কোন সন্দ থাকলে এক পয়সা বার করত না সে। আর এত সুদই বা কিসের। কী এমন দিচ্ছে শুনি। দারোয়ানদের কাছ থেকে নিত—তাদের সুদ কি কম? আরও ঢের বেশী। টাকায় তিন আনা চার আনা আদায় করে তারা। ওরা কি আর আমাদের মতো যে এক পয়সায় মরে-বাঁচে। ওরা হ'ল গে সায়েব বাচ্ছা—ও'দের কাছে ও দু আনা এক আনার দাম কি?'

এই বলে—যেন খুব বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলেছে, বলতে পেরেছে—এইভাবে চারিদিকে সগর্বে চেয়ে নেয় একবার। কিন্তু তার সে বিজয়গর্বের উত্তাপ বেশীক্ষণ ভোগ করা যায় না। শ্যামা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেন একেবারে।

'আছে বৈকি মা—খুবই দাম আছে। নইলে এত ছিষ্টি ক'রে তোদের মতো দীন-দুঃখীর কাছ থেকে হাত পেতে ধার নিত না—এই কটা সামান্য টাকা।'

শ্যামা বিরক্ত মুখে চুপ ক'রে যান। তাঁর আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হয় না। এর সঙ্গে তর্ক ক'রেই বা লাভ কি?

মহাশ্বেতাও বেজার মুখে বসে থাকে চুপ ক'রে। তার পছন্দ হয় না কথাটা—তা বলাই বাহুল্য। তার চেয়েও বড় কথা, স্বামীকে সে জাঁক ক'রে ব'লে এসেছে—দুশ' টাকা আজই এনে দেবে, যেমন ক'রেই হোক। অথচ সে টাকার কোন ব্যবস্থাই হ'ল না, অন্য কোথাও অন্য কোনভাবে হবে এমন আশাও নেই। এতগুলো টাকা কেউ তাকে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ওপর কিম্বা মোটা সুদের প্রতিশ্রুতির ওপর ধার দেবে না—তা সে জানে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তেমনি অন্ধকারপানা মুখ ক'রেই উঠে গিয়েছিল, যাবার সময় একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত জানায় নি।

কিন্তু তাই বলে যে এমন বাড়াবাড়ি কাণ্ড করবে সে তা শ্যামা একবারও ভাবেন নি। বিশ্বাসই করতে চান নি কথাটা—যখন চট্‌খণ্ডীদের গিন্নী এসে জানালেন যে মহাশ্বেতা গহনা বন্ধক রেখে তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করতে এসেছিল—তিনি দিতে পারেন নি বলে মল্লিকাদের কাছে গেছে তাঁর ওখান থেকে। সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে তা তিনি বলতে পারবেন না অবশ্য—তবে টাকার জন্যে যে সে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই—এবং বেশ মোটা টাকাই দরকার তার।

চট্‌খণ্ডী-গিন্নী নিজে এসেই খবরটি দিয়ে গেলেন। বড়-একটা এ'দের বাড়ি আসেন না তিনি, দরকার পড়লে শ্যামা নিজেই যান। এতকাল পরে বাড়ি বয়ে এসে তিনি কিছু আর মিছে কথা বলে যাবেন না, সে রকম লোকই নন। তিনি এসেছেন নিছক কৌতূহলবশতঃই। মহাশ্বেতাদের অবস্থা ভাল তা এ অঞ্চলের সবাই জেনেছে এতদিনে, অন্তত 'হন্যে হয়ে' টাকা ধার ক'রে বেড়াবার মতো অবস্থা তাদের নয়। তবে সে কী উদ্দেশ্যে কোন্ প্রয়োজনে টাকা ধার করতে এসেছে—সেইটেই জানতে চান তিনি। বিশেষত তার মাও যখন আজকাল বন্ধকী কারবার করেন তখন পরের কাছে যেতে হ'ল কেন? মাকে গোপন ক'রে সে কোথাও টাকা খাটাতে চায়, না মায়ের কাছ থেকে যা নেওয়া সম্ভব তা সব নেওয়া হয়ে গেছে বলেই বাইরে বেরোতে হয়েছে?

আসলে তাঁদের অজ্ঞাত বৃহত্তর কোন লাভের পথে এরা যাচ্ছে কিনা মায়ে-বেটিতে—সেটা না-জানা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি।

কিন্তু তাঁর কৌতূহল কিছুই মেটাতে পারেন না শ্যামা। কারণ সত্যিই এ খবরটা তাঁর কাছে একেবারে নূতন। অনেক জেরা ক'রেও তাঁর পেট থেকে কোন খবর বার করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ হয়েই চ'লে গেলেন চট্‌খণ্ডী-গিন্নী। শ্যামা যে একেবারেই

কোন খবর রাখেন না—এটা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন।

শ্যামা অবশ্য তাঁকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টাও করেন না বিশেষ। আসলে তখন কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না ও'র। নানা-রকম সংশয় ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে মনে। বহুরকমের দুর্ভাবনা। মেয়েটা ও'র বড়ই বোকা। এতটুকু সাংসারিক জ্ঞান নেই। এ ধরনের মানুষ যখন আবার মাথা খেলিয়ে বুদ্ধিমানের মতো কোন কাজ করতে যায় তখনই বিপদের কথা। হয় সকলের কাছে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে, নয় তো নিজের সর্বনাশ নিজেই ক'রে বসে। কী করছে সে, গহনা বন্ধক রেখে টাকা ধার করছে সে কিসের জন্যে, কার জন্যে?

যদি ঐ টাকা দিয়ে বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি কেনে তো তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই। বিষয়ের দাম কমতে পারে—একেবারে মূলে হা-ভাত হয় না। কিন্তু সুদের নেশায় পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজে ধার করে অপরকে ধার দিচ্ছে না তো? তা'হলে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। মেয়েটা না হয় চিরকালের পাগল, জামাইও কি পাগল হয়ে গেল ওর সঙ্গে সঙ্গে? না কি ও তাকে লুকিয়েই এ কাজ করছে? কিছু বিশ্বাস নেই, সব পারে ও। বুদ্ধি যে পথে যায় সে পথের ফুটপাথ মাড়ায় নি কখনও।......

অথচ বোকা-সোকা পাগল যা-ই হোক —এই একটি মেয়েই তাঁর জীবনে যা কিছু আশ্বাস বহন করে। শুধু যে ওর স্বামীর কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন শ্যামা তাই নয়—ও যে সুখী, ও যে নিশ্চিন্ত—এইটুকুই তাঁর যেন মস্ত একটা ভরসা,—এই দিক্-দিশাহীন অন্ধকার জীবনে একমাত্র আলোক-অবলম্বন। শেষে সেই সামান্য আলোকশিখাটাও নিভিয়ে দেবে না তো হতভাগা মেয়েটা? নষ্ট করবে না তো তাঁর একমাত্র আশ্রয় ও আশ্বাস-কেন্দ্রটি?

কে জানে—আবার এক সময় এমনও মনে হয়—হয়ত তেমন কোন লোকসান হবে না শেষ অবধি, কিম্বা আদৌ কোন লোকসান হবে না। বরং টাকা আসবেই উলটে—অনেক টাকা, তাঁর পক্ষে কল্পনা-তীত অঙ্ক। এটা ঠিক যে জামাই তাঁর কাড়ি-কপালে। ওর মতো অসহায় অশিক্ষিত লোক যা করেছে তা ঢের। যারা ছোটবেলায় দুঃখ পায় শেষ বয়সে অদৃষ্ট তাদের প্রতি অনেক বেশী প্রসন্ন হন নাকি। জামাইয়েরও হয়ত তাই হবে। আর যার কপাল ভাল, ভগবান যাকে দেবেন—তাকে তুচ্ছ একটা অবলম্বন ধরে, যে-কোন পথেই টাকা ঢেলে দেন। হয়ত বাধা দিলে ক্ষতিই করা হবে ওদের। তবু চুপ ক'রেই বা থাকতে পারেন কৈ? তাঁর এই দীর্ঘ-দিনের অভিজ্ঞতা যে জীবন সম্বন্ধে অন্য শিক্ষাই দিয়েছে এতকাল।......

এই নানা রকম বিপরীতমুখী চিন্তায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সেদিন আর কোন কাজে মন দিতে পারলেন না শ্যামা। রাত্রেও ভাল ঘুম হ'ল না তাঁর। শেষ পর্যন্ত সকালবেলায় সেকরাদের একটা ছেলেকে ডেকে চারটে চালতা ও গোটাদুই কাঁচকলা ঘুষ দিয়ে মহাদের বাড়ি পাঠালেন। বিশেষ দরকার, দুপুরবেলা যেন অন্তত অবশ্য সে একবার আসে।

মহা অবশ্য দুপুরের খানিকটা আগেই এসে হাজির হ'ল। কৌতূহল প্রবল—কোথায় কী অঘটন ঘটল বা মজার খবর পাওয়া গেল, এ সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য শিশুর মতোই।

'কী গো, বলি এত জরুরী তলব কিসের! যখন শুনলুম তুমি চালতে কাঁচকলা খাইয়ে তাকে পাঠিয়েছ—তখনই বুঝলুম কিছু একটা সাংঘাতিক ব্যাপার আছে। নইলে তুমি যা কিপ্পন মনিষ্যি—দরের জিনিস খরচ ক'রে সুখসোমান্দা লোক পাঠাবে—এ একটা কথাই নয়।... যেমন শোনা, আমি সব ফেলে-ঝেলে কোনমতে দুটো হাতে-ভাতে ক'রেই হুড়তে পুড়তে ছুটে এসেছি। ছোট বৌটাকে বলে এসেছি সব পড়ে রইল ভাই, তুই একটু দেখিস। ফিরে এসে আবার না মহারাণীর কাছে চাট্টি কথা শুনতে হয়! আজকাল তো আবার কাজের পালা হয়েছে, ভাগ হয়েছে—যে যার পালা সে তার করার। মোদ্দা গেরস্তর কাজ ঠিক-ঠিক ওঠা চাই, নইলেই এতটি কথা আর চিপটেন। তা ছোট বৌ দেখবে, তেমন নয় ও। মানুষের ঘরের মেয়ে যে হয় তার চালচলনই আলাদা। ও-ই বললে—তুমি যাও দিদি, মা যখন এমন ক'রে ডেকে পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই কোন জরুরী দরকার আছে।...তা ব্যাওরাটা কি বল দিকি—এত জোর তলব একেবারে!'

শ্যামা কোন বৃথা ভূমিকার মধ্যে গেলেন না—একেবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'তুই নাকি গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার ক'রে বেড়াচ্ছিস। গয়না নিয়ে নাকি এ পাড়ায় এসেছিলি?'

ঠিক এ প্রশ্নটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না মহাশ্বেতা। তার মুখখানা বেশ একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল কিছুক্ষণের জন্য। খানিকটা চুপ ক'রে বসে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে যেন কোনমতে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ!'

'কেন?' কঠিন ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন শ্যামা।

ঐ কণ্ঠস্বর সে চেনে। চিরকাল একে ভয় করতেই অভ্যস্ত মহাশ্বেতা। ভয় আজও তার কম হ'ল না। সে-ভয় দমন ক'রে বেপরোয়া হতে গিয়ে হঠাৎ রূঢ় হয়ে উঠল সে।

'কেন আবার কি? টাকার দরকার পড়েছে বলেই এইছি। আমি তো আর কচি খুকী নই—একটু কাজ যখন ক'রছি তখন তার অথ্থ আছে বৈকি!'

'সেই অথ্থটাই তো জানতে চাইছি বাছা। কথাটা বল তেই বা তোমার দোষ কি? আমি তো তোমাকে আটকাচ্ছি না, তোমারটা কেড়ে বিগড়েও নিচ্ছি না।'

'দোষ আবার কি! দেখা হয়নি তার-পর থেকে তাই বলি নি।...আর এ এমনই বা কি কথা যে, এত ছিষ্টি ব্যাখ্যানা ক'রে বলতে হবে সবাইকে? ধার-দেনা মানুষ ক'রেই থাকে, কেউ আপদে-বিপদে করে, কেউ বা কারবার করতে নেয়। আমিও না হয় ধরো কারবার করতে নিয়েছি কিছু টাকা। তাতে এমন কি মহাভারত অসুদ্ধ হয়েছে?... আর দোষের কথা কে বলেছে? কেড়ে বিগড়ে নেবার কথাই বা উঠছে কেন? আমার গয়না আমি বন্ধকে রাখব —তাতে এত কৈফিয়ৎ বা কিসের? আমার কি এটুকু এক্তার নেই?'

ভেতরের ভয়টা বাইরের 'মুখ-সাপোটে' ঢাকতে গিয়ে মহাশ্বেতার কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যায়। শেষের দিকে গলাটা কেঁপেও যায় একটু।

কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার মনে করেন না শ্যামা। তুচ্ছ কথার অর্থ ধরে মান-অভিমান প্রকাশ করা তাঁর অভ্যাসও নয়। তিনি শুধু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'অ। তুমি তা'হলে কারবার করতে টাকা ধার নিচ্ছ। টাকা ধার ক'রে ধার দিচ্ছ তুমি লোককে। বাঃ, এমন না হ'লে বুদ্ধি!......তাই তো বলি, আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে কারও সঙ্গে শলা-পরামর্শ না করেই যখন এমন কাজ করছেন তখন একটা ভাল রকমই অথ্থ আছে বৈকি!'

শ্যামা তাঁর কণ্ঠস্বরে কঠিন ব্যঙ্গটাকে যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখতেই চেষ্টা করেন তবু এর ভেতরের খোঁচাটা এতই স্থূলে যে মহাশ্বেতারও বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। এবার সে বেশ একটু তেতে উঠেই জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, অথ্থ আছেই তো। আমি কম সুদে টাকা ধার ক'রে যদি বেশী সুদে অপরকে ধার দিই তো অন্যায় অলেহ্যটা কি করা হ'ল তা তো বুঝতে পারছি না। বলি, সব কারবারেরই তো এই দস্তুর গা? কম দামে মাল কিনে বেশী দামে বেচা—না কি বল? বৌদিও তো শুনছ—বলি বল না আমি হক্ বলছি কি না বলছি! আর যদি বেহকই বলে থাকি, —টাকা গেলে আমার যাবে, এলে আমার আসবে। তোমার তো কিছু লোকসান

নেই তাতে? তবে তোমার এত জ্বালানি পোড়ানি কিসের?'

রাগ করবারই কথা। অপমানে বিরক্তিতে শ্যামার একদা-গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলও একবার—কিন্তু প্রাণ-পণ শক্তিতে সে উষ্মা দমনই করলেন তিনি। এ এমনই নির্বোধ, এমনই বুদ্ধি-হীন যে এর ওপর রাগ করা মানে নিজের শক্তিরই অপচয় করা। এর ওপর অভিমান করলে নিজেকেই অপমান করা হয়। তিনি তাই আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তা জামাই জানেন এ কথাটা?—তুই যে গহনা বন্ধক রেখে তাঁকে টাকা দিচ্ছিস?'

'ও মা, তা জানে না!' সবেগে বলতে গিয়েও কেমন যেন থতমত খেয়ে থেমে যায় মহাশ্বেতা। বুঝি কথাটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায় যে কথাটা অভয়কে জানাবার কোন কারণ ঘটে নি। সে টাকা চেয়েছে, মহাশ্বেতা বলেছে দেব। কোথায় পাবে সে—কিম্বা কোথা থেকে আনবে—সে প্রশ্ন অভয়ও করে নি, মহাশ্বেতাও বলে নি। হয়ত অভয়ের ধারণা যে তার স্ত্রীর কাছেই আরও টাকা আছে—জমিয়েছে সে। তবে সে সম্ভাবনার কথা মহার তখন মনে হয়নি, তা'হলে সে-ই ভুলটা ভেঙ্গে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠত। তখন শুধু এই কথাটাই মনে হয়েছিল যে, এইভাবে টাকাটা চাওয়া মাত্র যোগাড় ক'রে এনে দেবার মধ্যে তার একটা মস্ত বাহাদুরীই প্রকাশ পাবে—স্বামীর কাছে তার 'পোজিশ্যান' বাড়বে (এ শব্দটা সে সম্প্রতি শিখেছে ছোট দেওরের কাছ থেকে—তার ভারী পছন্দ এ শব্দটা)। তাছাড়া ধার করার কথাটা জানানো বা অনুমতি নেওয়া যে দরকার—তাও মনে হয়নি তার।

সামান্য দ্বিধায় কণ্ঠস্বর মুহূর্ত-কালের জন্য স্তিমিত হয়ে আসে, থতিয়ে থেমে যায় একটু, তার পরই আবার গলায় জোর দিয়ে বলে, 'সে আবার না জানে কি? সব যে তার নখ-দর্পণে। বলে মানুষের মুখের দিকে চাইলে সে পেটের কথা টের পায়। তার কাছে কি কোন কিছু চাপা থাকে?'

কিন্তু সেই সামান্য দ্বিধাই শ্যামার কাছে যথেষ্ট। তিনি ওর আসল প্রশ্নটা চাপা দেবার চেষ্টাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'হুঁ! তার মানে তুমি তাঁকে কিছু বলো নি, লুকিয়েই করেছ কাজটা। ......সে আমি বুঝেছি মা, জামাই জানলে কখনও এ কাণ্ড করতে দিতেন না। তোমার ভাল লাগবে না, তুমি শুনবেও না তা জানি, তবু আমার কর্তব্য বলেই বলছি—কাজটা ভাল কর নি—ভাল করছ না। অন্ততঃ জামাইকে লুকিয়ে এ কাজ করা একেবারেই উচিত নয়। যা করেছ করেছ—আজই গিয়ে তাঁকে সব খুলে বল আর এ টাকাটা ভালয় ভালয় ফিরে পেলে আগে দেনা শোধ ক'রে গহনা ছাড়িয়ে নিয়ে যাও। ছিঃ—সোনা হ'ল লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীকে বন্ধক রেখে টাকা ধার করে, নিতান্ত যাদের হা-ভাতের দশা তারা। এ কাজ করতে নেই, ক'রো না।'

শ্যামার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় কেমন যেন ভয় পেয়ে যায় মহাশ্বেতা, আস্তে আস্তে বলে, 'তা না হয় সে ফিরলে আজ খুলে বলব কথাটা, এখন যেন আর বসতে ভরসা হ'চ্ছে না। মার কাছে ধরা পড়ে যাবার লজ্জা তো আছেই—তা-ছাড়া শ্যামার বলবার ধরন-টাতে একটু ভয় ধরেও গেছে, এ অবস্থায় মার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে বসে থাকা বড় অস্বস্তিকর। তার চেয়ে বরং ভট্‌চায-বাড়ি ঢুকে একটু বসে জিরিয়ে নেবে। এক ঘটি জলও খেয়ে নেবে সেখানে। বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে যেন। এখানেও খেয়ে নেওয়া চলত কিন্তু তাতে করে আরও পাঁচটা মিনিট অন্ততঃ এখানে বসতে হয়। সেটুকুও থাকতে ইচ্ছা করছে না।

কনক অবশ্য পীড়াপীড়ি করে, হাত ধরে বসাতেও যায় কিন্তু সে আর বসে না।
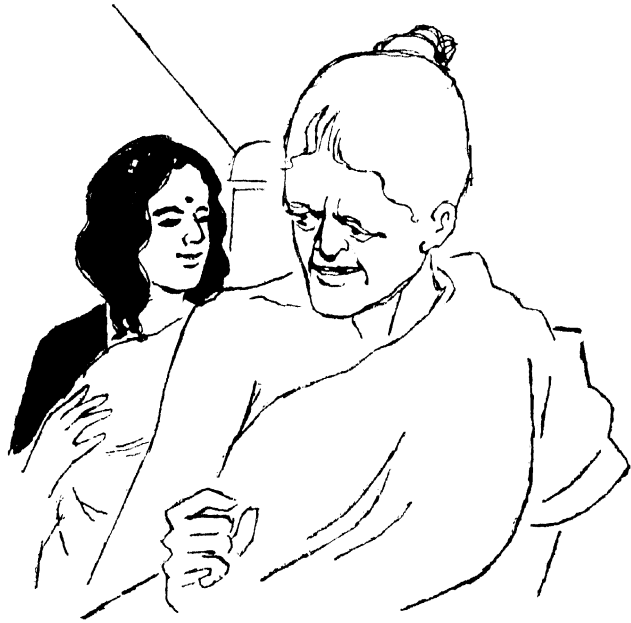
"তা জামাই জানেন এ কথাটা?"

তারপর সে যা বলে। তবে মনে তো হয় না, যে সে বারণ করবে। টাকা খোয়াবার পাত্তর সে নয়—টাকা আদায় করবেই, যেমন ক'রে হোক। এটুকু জোর আমার মনে আছে। তবু দেখি বলে—। তবে তুমি আর ঐ সব ভাল করনি, ভাল করনি বাক্যিগুলো ব'লো নি বাপু—তোমার কথা বড্ড ফলে যায়। কাল মুখের বাক্যি তোমার।'

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় সে। খেয়ে-দেয়ে এতটা পথ এসেছে, ছুটেই এসেছে বলতে গেলে—এখনও ভাল ক'রে দম নিতে পারেনি। আরও খানিকটা বসে গল্প ক'রে সেই বিকেলের দিকে ফিরবে বলে প্রস্তুত হয়েও এসেছিল—কিন্তু ঘাড় নেড়ে বলে, 'না ভাই আমি যাই। কথা তো হয়েই গেল—মিছামিছি আর দেরি ক'রে লাভ কি? ছোট বৌটার প্রেহারী শুধু। সেও তো বালপোয়াতী —তার একার ঘাড়ে অতটা চাপানো ঠিক নয়। মহারাণী যা আছেন, মানুষটে মরে গেলেও নিজের পালার বাইরে একটি কাজ করবেন না। তার চেয়ে পারি তো আমিই গিয়ে পড়ি, সে বসে থাকবে না, হয়ত এতক্ষণে কাজে লেগেই গেছে, তবু যতটা পারি। শেষের দিকে খানিকটা হাতাপিতি ক'রে সেরে নিতে পারলেও উপ্‌গার হয় কিছু!'

সত্যিই সে আর দাঁড়ায় না, হন হন্ ক'রে হাঁটতে শুরু করে দেয়।

(ক্রমশ)

বেরিল গ্রের বৈঠকে
রাখী ঘোষ

ইউরোপীয় সংস্কৃতির এক স্বপ্নময় সৃষ্টি হচ্ছে ব্যালে। যাদের জীবন-সাধনায় এ সৃষ্টির সার্থকতা, বেরিল গ্রে তাঁদেরই একজন। বেরিল গ্রে যখন নাচ শিখতে আরম্ভ করেন তখন তাঁর বয়স পাঁচ। এই সময়ই ইংল্যাণ্ডে ব্যালের পুনরুজ্জীবনের যুগ।

আজ বেরিল গ্রের স্থান ইংল্যাণ্ডের সব চাইতে বড় নৃত্যশিল্পী মার্গট ফণ্টেনের পরেই। পঁয়ত্রিশ বৎসরের জীবনে বেরিল গ্রে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তবু তাঁর সাধনা থামেনি। ব্যালে নৃত্যশিল্পীর থামলে চলে না। সাফল্যের শীর্ষমঞ্চে আরোহণ করেও তাঁকে অটুট নিষ্ঠাভরে প্রাত্যহিক অনুশীলন করে যেতে হয়। আরও পরিণতি আরও সুসমঞ্জসতার কথা চিন্তা করতে হয়। নতুবা নৃত্যজগত থেকে বিদায় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বেরিল গ্রেকে প্রথম দেখি ইণ্ডিয়া হাউসে। টেগোর ইণ্ডিয়া সেণ্টারের উদ্যোগে এক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে এসেছিলেন শ্রীজহরলাল নেহেরু। বেরিল এসেছেন যুগান্তর প্রতিনিধি শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে। তাঁরই উৎসাহে ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে বেরিলের আগ্রহ। স্বয়ং হাই-কমিশনার মিঃ কাউল তাঁকে নেহরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এই সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য বেরিল আনন্দে উচ্ছ্বসিতা--রাজ-কবি মেসফিল্ড যে নর্তকীকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, আজ তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল।

পরের সপ্তাহে বেরিল গ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া মাত্র শিল্পী বললেন 'নিশ্চয় এস।'

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে বেরিল গ্রের বাড়ীতে আমি এবং শ্রীমতী ঠাকুর হাজির হলাম। বেরিল থাকেন পার্ক লেনে—লণ্ডনের অন্যতম সম্ভ্রান্ত পাড়ায়। এর একদিকে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে সেলফ্রিজেস, পীটার রবিনসন, ইভানসের ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর আর বড় বড় হোটেল, অন্য দিকে হাইড পার্কের উদার বিস্তার।

বেরিল গ্রে তখনও প্রাত্যহিক অনুশীলন থেকে ফেরেননি। পরিচারিকা ঘরে এনে বসাল। প্রায় সাথে সাথেই এলেন বেরিল গ্রে।

বেরিল গ্রের সাথে কথা শুরু হতেই তিনি ভারতবর্ষের নৃত্যকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

শ্রীমতী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ভারতে যাননি?" "না সে সুযোগ হয়নি এখনও। তবে খুব ইচ্ছে আছে যাবার। ভাবছি শীগ্‌গীরই আমি আর আমার স্বামী প্রাচ্য ভূখণ্ডে যাব। তখনই চেষ্টা করব অন্ততঃ দু' সপ্তাহ ভারতে থাকার। আমি জাপানে গিয়েছি। তবে প্রাচ্য দেশের যে মহিমান্বিত রূপে দেখব আশা করেছিলাম তা দেখিনি। বড় বড় শহরগুলো সব আমেরিকানাইজড্। ভাল লাগলো না। তবে সত্যিকার জাপানী সংস্কৃতি দেখতে হলে জাপানীদের বাড়ী যেতে হয়। সম্পূর্ণ অন্য রকম জীবনযাত্রা—জীবনের প্রতি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি। প্রত্যেকটি বাড়ী যেন একটি উদ্যান। জাপানকে তার নিজস্ব রূপে সেখানেই দেখলাম।

"আমি ফিলিপাইন, ব্যাংকক এবং হংকঙে নাচ দেখিয়েছি। ফিলিপাইনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দশ বছরের মেয়েটির ব্যালে শেখার খুব ইচ্ছে। তার বাবা আবার এতে উৎসাহী নন। তিনি মেয়েকে ভারতীয় নৃত্য শিখিয়েছেন। তবে পরে মেয়ের আগ্রহ দেখে শেখাতে রাজী হয়েছেন।

বেরিল গ্রে

"আমি রাশিয়া গিয়েছিলাম আমার স্বামীর সঙ্গে।"

"আপনার স্বামী কি সব সময়ই আপনার সঙ্গে থাকেন?" "না না। তাঁর সে সময় কোথায়। তিনি একজন

ডাক্তার এবং তাঁর পক্ষে কাজ ছেড়ে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়।

"তবে দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার সময় তিনি সঙ্গে ছিলেন। সেই প্রথম আমি কোন দলের সাথে না গিয়ে একক নৃত্য-শিল্পী হিসেবে বিদেশে যাই। এই যাত্রায় প্রায় দশ সপ্তাহ ছিলাম সেখানে। ডাক্তার সত্যানন্দ পাঁচ সপ্তাহ পরেই ফিরে এসেছিলেন।

"সাউথ আমেরিকানরা লোক খুবই ভাল তবে বড্ড ঢিলে। ওদের যা বলতাম তাতেই শুনতাম কাল হবে। সে কাল আর হত না।"

আমরা হাসলাম। "বোধহয় ওটা শুধু প্রাচ্য দেশেরই একচেটিয়া নয়। ল্যাটিন জাতিরও বৈশিষ্ট্য।"

বেরিলও হাসলেন। "ঠিক তাই। আমি সাণ্টিয়াগো, চিলি, এ সব বড় বড় শহর ছাড়াও দঃ আমেরিকার ছোট ছোট শহরেও নাচ দেখিয়েছি। সে সব শহরে অর্কেস্ট্রাও ছিল না। শুধু পিয়ানো। তা আবার দেখা গেল বেসুরো। শুনলাম সন্ধ্যের আগে সেটা টিউন করানোর ব্যবস্থা হবে। কোথায় কি? বেসুরো পিয়ানোর সাথেই অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তখন এক পিয়ানো এসে হাজির। ইংরেজরা কিন্তু সব বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক জায়গায় ঠিক থাকা চাই।"

আমরা বললাম, "সেটা আপনাদের জাতীয় চরিত্র।"

শ্রীমতী ঠাকুর বললেন, "নিজের নাচের কথা বলুন। আপনি যে-যুগে নাচ শিখতে আরম্ভ করেন সে-যুগে ইংল্যান্ড ব্যালের সেই পুনর্জন্ম হচ্ছে। আপনি নিশ্চয় সেই তরঙ্গকে, সেই পরিবর্তনকে মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন? আমার নিজের অভিজ্ঞতা সে রকম বলেই বলছি। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব যখন আমাদের মধ্যে নাচের প্রচলন করেন তখন একটা বিরাট তোলপাড় হয়েছিল। আমি আজও সেকথা স্পষ্ট মনে করতে পারি।"

"নিশ্চয়। সে যুগে ব্যালে নিয়ে বহু মতভেদ বহু তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে। আমার শিক্ষয়িত্রী ছিলেন নিনেট দ্য ভলোয়া। তিনি নাচে সব রকম ভঙ্গিমা নিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। গোড়া ব্যাকরণ-পন্থীদের মত শুধু কাঠিন্য ও ঋজুতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

"আমি রাশিয়া থেকে ঘুরে এসে যে বই লিখেছি তাতে এসব কথা আছে। আমি ব্যালে নৃত্যে ইংরাজী ধারার দোষ-গুণ দুইই দেখিয়েছি।"

আমাদের এই বহু আলোচিত বইটি পড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঘটনা চক্রে বইটি যোগাড় করা হয়ে ওঠেনি। সে কথা শোনা মাত্র বেরিল গ্রে এক খণ্ড "রেড কার্টেন আপ" এনে শ্রীমতী শ্রীঠাকুরকে উপহার দিলেন।

আবার ইংরিজি ধারার বিশ্লেষণে ফিরে এলেন বেরিল। বললেন, "আমাদের এই ভিজে আবহাওয়া কিংবা আমাদের "মেজাজ" কোনটাই ব্যালে নাচের ঠিক উপযোগী নয়। আধুনিক নৃত্য-পরিচালকরা (কোরিয়োগ্রাফার) বলেন, নিজেদের এলিয়ে দিয়ে শিথিল অথচ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাচতে। আগের কালে তা ছিল না। ফলে বেশীর ভাগ ব্যালে নৃত্যশিল্পীর পেশীগুলো অত্যন্ত শক্ত ও সংকুচিত হত। প্রসারণ ক্ষমতা কমে যেত। অথচ নিজেকে মেলে দিলে অনেক সাবলীল ও স্বাভাবিকভাবে বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই জিনিসটা প্রাচ্য নৃত্যকলায় বিশেষ করে ভারতীয় নৃত্যে লক্ষ্য করেছি। ভারতীয় নাচে প্রতিটি আঙুল এমনকি পিঠের সামান্য ভঙ্গিতে প্রতিভাশালী নর্তক তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেন। তাছাড়া কোমরটাকে তোমরা খুব গুরুত্ব দাও। তোমাদের নাচে সংযমও লক্ষণীয়। অতীতের যা কিছু শিক্ষণীয় তা নিতে হবে। কিন্তু তা নিয়ে বসে থাকা চলে না।

"এ বিষয়ে রাশিয়ানরা আদর্শ-স্থানীয়। সেখানে প্রতিটি শিল্পীর নিজস্ব মেজাজ এবং স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা হয় এবং তাকে ঠিক তার মত করেই শেখান হয় যাতে সে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে।"

আবার ভারতীয় নৃত্যে সংযমের কথা উঠলো। শ্রীমতী ঠাকুর বললেন, "ইউরোপীয়ান ব্যালের ডিসিপ্লিন বা সংযম খুঁজে পাওয়া যায় ভারতনাট্যমে। এ নাচ খুব পুরনো নয়। কিন্তু এর প্রত্যেকটি অংশ সুবিন্যস্ত ও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এ নাচে শরীরের প্রতিটি অংশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে প্রায় সব ভারতীয় নাচেই কোমরকে শরীরের কেন্দ্র হিসাবে দেখা হয় এবং ওখান থেকে প্রতিটি ভঙ্গিমা বিন্যস্ত করা হয় (প্রোজেক্ট)।"

বেরিল বললেন, "ব্যালেতে ঘোরার সময় বা শরীরের একটি অংশের ওপর সারা শরীরের ভার বিন্যস্ত করার সময় অসম্ভব জোর লাগে। সেখানে যদি আমরা আধুনিক নাচের নমনীয়তার সাহায্য নিই তবে জিনিসটা অনেক ভাল এবং স্বাভাবিক হয়। কিন্তু আগেই বলেছি ইংরেজরা এসব ব্যাপারে রক্ষণশীল। এরা ষ্টেজের ওপর অনেক লোক দেখতে চায়। সেজন্য একক নৃত্যে আমরা বেশ অসুবিধা বোধ করি, একক নৃত্য প্রদর্শনী তো চলেই না।"

আমরা ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে ইংরেজ দর্শকদের কাছে এ ধরণের বহু অভিযোগ শুনেছি। সে কথা শোনা মাত্র বেরিল বললেন, "শুধু ভারতীয় নৃত্য কেন কিছুদিন আগেই একজন খুব ভাল আমেরিকান শিল্পী এসেছিলেন। কিন্তু একক নৃত্য প্রদর্শনীর জন্য খুব বেশী সফল হননি।

"তোমরা মার্থা গ্রাহামের কথা বলছ। কিন্তু প্রথম যখন তিনি এখানে অনুষ্ঠান করেন তখন মোটেই সাড়া জাগাতে পারেননি। আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। কারণ, সেই সময়ই আমার ছেলেটির জন্ম হয়। পরে অবশ্য খবরের কাগজওয়ালারা তাঁর দিকে নজর দেয় এবং এখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত।"

বিখ্যাত শিল্পী লাবানের কথা উঠলো। বেরিল বললেন, "উনি যুদ্ধের সময় বৃটেনে ছিলেন। তখন আমার স্বামী ছিলেন তাঁর চিকিৎসক। সুতরাং তাঁকে কয়েকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। যুদ্ধের সময় তিনি শ্রমিকরা যাতে কাজে আনন্দ পায়, তার জন্য কতগুলো বিশেষ ছন্দ বা তালের প্রচলন করেছিলেন।

"লাবানের ধারার বৈশিষ্ট্য হল সবই যেন খুব স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। মনে হয় নর্তককে চেষ্টা করে কিছু করতে হচ্ছে না। সে যা অন্তরে অনুভব করছে স্বাভাবিকভাবেই তা ছন্দে প্রকাশিত হচ্ছে। এই স্বাভাবিকতা পাভ্‌লোভার নাচেও ছিল। এজন্যই আয়নার সামনে সব সময় অভ্যাস করা উচিত নয়। তাতে সব কিছু যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।"

"কিন্তু Compose করার সময় কি আরও দরকারী নয়?"

"নিশ্চয়। অভ্যাসের পক্ষেও অনেক সময় দরকার। তবে সব সময় নয়। আত্মসমাহিত হয়ে না নাচলে দর্শকের সাথে একাত্ম হওয়া যায় না। সমস্ত অনুষ্ঠানই প্রাণহীন হয়ে পড়ে। কোন শিল্পীর নাচ দেখলেই বোঝা যায় সে যা নাচছে তা অন্তরে অনুভব করছে কিনা। ভারতীয় নৃত্যে তো এ তফাৎ আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

এর মধ্যে কফি এলো। ঘরে এলেন ডাঃ সভানশন—বেরিলের স্বামী। ভারী অমায়িক এই সুইডিস ভদ্রলোক। আমাদের সাথে পরিচয় হল। ডাক্তার বললেন, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আদান প্রদান যত হয় ততই ভাল। তোমাদের কমনীয়তা যদি আমাদের জীবনকে লাবণ্যমণ্ডিত করে এবং আমাদের যন্ত্র-সভ্যতার সাহায্যে যদি প্রাচ্যের বৈষয়িক দারিদ্র ঘোচে তবে তার চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।"

বেরিল বললেন, "সুইডিশরা আবার ভীষণ আন্তর্জাতিক। ও যখন বলে স্কুলে আমরা এ পড়েছিলাম তা শুনে-ছিলাম আমি ভাবি কই আমরা তো স্কুলে এত কথা শুনিনি।"

সভানসন বললেন, "নোবল প্রাইজ পাবার বহু আগে রবীন্দ্রনাথের কথা আমি শুনেছিলাম আমাদের অখ্যাত স্কুলে এক সাধারণ শিক্ষকের কাছে। আজ সে কথা ভাবলে আমি অবাক হয়ে যাই। কি অসাধারণ অনুসন্ধিৎসাই না তাঁর ছিল।"

ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানতে চাইলেন বেরিল। "এ নাচের উৎপত্তি কি ধর্মকে ভিত্তি করে না চাষবাস ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে?"

শ্রীমতী ঠাকুর বললেন, "মূলতঃ ধর্মকে ভিত্তি করে। তবে লোকনৃত্যের উৎপত্তি সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে।"

"কিন্তু লোকনৃত্যে মানুষের প্রেম প্রণয় অনুভূতির যা স্থান ধর্মীয় নৃত্যে তো তা নেই?" জিজ্ঞাসা করলেন বেরিল।

"না তা নেই। তবে ধর্মীয় নৃত্য বলতে যদি দেবদাসী নৃত্য ধরেন তাহলে সে নাচ দেবতার উদ্দেশ্যে হলেও লক্ষ্য ছিল দর্শকের মনোরঞ্জন করা। সেক্ষেত্রে মানবিক অনুভূতির স্থান নিশ্চয়ই ছিল।"

"ভারতীয় নৃত্য কি খুবই কঠিন?"

"কেন বলছ তো? ব্যালে শিখতে যদি দশ বছর নিরলস চর্চা করতে হয় তাহলে আমাদের নাচ কঠিন হবে কেন?"

রুথ সেণ্ট ডেনিসের কথা উঠলো। তিনি ভারতীয় নৃত্যকে পশ্চিমে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন।

বেরিল বললেন, "আজকাল নাচে একটা জিনিসের খুবই অভাব লক্ষিত হচ্ছে। তা হল সাধকের নিষ্ঠা।"

তার কারণ হল একমাত্র নৃত্যশিল্পেই শারীরিক আবেদনটা সুদক্ষ শিল্পীর পক্ষে কাজে লাগানোটা কিছু কঠিন নয়। আর সস্তা মনোরঞ্জনের জন্য হলেও এই স্থূলতাকে আপাতমধুরতার আচ্ছাদন দেওয়া সহজ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জাপানে গিয়েছিলেন বলছিলেন। জাপানী নাচ কেমন লাগলো?"

"দেখ, জাপানী নাচ আমি খুব ভাল বুঝিনি। ভারতীয় নাচ বুঝতে পারি কারণ বহুবার দেখে চোখ তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জাপানী পাখা হাতে নিয়ে নাচই ধর। ওর প্রত্যেকটি মুদ্রার বিশেষ অর্থ আছে। তা না বুঝলে নাচের রস-গ্রহণ করা যায় না। তবে একটি নাচ খুবই ভাল লেগেছিল। এক জেলে মাছ ধরতে গেছে। বাড়ীতে স্ত্রী প্রতীক্ষা করছে কখন সে ফিরবে। কিন্তু সে আর ফিরলো না। জাপানী নাচে সংযম লক্ষ্যণীয়।"

বেলা প্রায় একটা। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। এবার আমরা উঠবো। বেরিল বললেন, "আমার ছেলেটিকে গত সপ্তাহে বোর্ডিংএ পাঠালাম। কি করব! আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না এত কম বয়সে ওকে পাঠানোর। কিন্তু এ পাড়ায় ওর সমবয়সী কাউকে ও পেত না। আমিও তো বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে থাকি। আর ও নিজেই যেতে চাইলো। তবে আজ ওদের হেডমাষ্টার ফোন করে বললেন ও খুব ফুর্তিতেই আছে।"

"কিন্তু আপনার বড় একলা ঠেকছে।"'

হাসলেন বেরিল। এ ফ্ল্যাটে নতুন এসেছেন। কিছুই গোছান হয়নি। ব্যস্ত আছেন। সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলেন। এই শিল্পীর মধ্যে এক-জন সংবেদনশীল মার্জিত ইংরেজ মহিলাকে সহজেই চেনা যায়।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের বিভাগটি নিঃসন্দেহে অতীব চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক। তাই আমার একটি ছোট প্রশ্ন আপনাদের সামনে তুলিয়া ধরিতেছি।

খেলার পূর্বে টস করিবার প্রথা কোথায়, কবে এবং কোন্ খেলায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল? সন ও তারিখসহ উত্তর চাই।

শ্রীদিলীপকুমার নিয়োগী
৬১।২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা : ১৪

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতের' 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন দিলাম। পাঠক মহল থেকে উত্তর পেলে উপকৃত হব।

১। কোন কথার সঙ্গে সঙ্গে যখন টিকটিকি ডেকে উঠে, অনেকে কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য 'ঠিক ঠিক' বা সত্য সত্য বলে থাকেন। এই রীতি কি শুধু বাঙ্গালীরাই মানেন? ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তথা বিশ্বের অন্য কোন দেশে এই রীতি প্রচলিত আছে?

২। কোথাও যাত্রার মুহূর্তে যদি কেহ 'হাঁচি' দেন, তখন বয়োজ্যেষ্ঠগণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বলেন। কবে থেকে ও বিশ্বের কোথায় কোথায় এই রীতি মানা হয়?

৩। বিশ্বের কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়?

বিতান দত্ত
রেলওয়ে ইনস্টিটিউট
বদরপুর/কাছাড়।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'জানাতে পারেন' বিভাগে (২১শে ডিসেম্বর, '৬২) শ্রীরঞ্জনকুমার গুপ্ত মহাশয়ের রেডক্রশ সম্পর্কে প্রশ্নের শ্রীকুমুদরঞ্জন আচার্য মহাশয়ের দেওয়া উত্তর শুদ্ধ নয়।

Henri Dunant নামে একজন সুইজারল্যান্ডবাসী যুবক ২৪শে জুন ১৮৫৯ সালে ইতালীর Solferin নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত যুদ্ধে সৈনিকদের হতাহত ও নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সেবার জন্য এক সমিতি গঠনের আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের ফলে ৮ই—২২শে আগষ্ট (১৮৬৪) পর্যন্ত জেনেভায় ১৬টি ইউরোপীয় রাজ্য এক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ১২টি রাজ্য একটি নিরপেক্ষ সেবা-

দল গঠনে স্বীকৃত হন। Henri Dunant-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁহার (Dunant) দেশের পতাকাই এই সেবা সমিতির প্রতীক হইবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সুইজারল্যান্ডের পতাকা লাল জমির উপর সাদা ক্রশ। যাহাতে রাজনৈতিক পতাকা বলিয়া সেবা সমিতির প্রতীককে লোকে ভুল না করে তাই এই সেবা সমিতির পতাকার রং একটু অদল-বদল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই হইতে এই সেবা সমিতির প্রতীক হইল সাদা জমির উপর লাল ক্রশ। ইহাকে জেনেভা ক্রশও বলা হয়। উপরিউক্ত তথ্য যে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। আমি Encyclopedia of Britanica হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

শ্রীমতী কমলা দেবী সান্যাল
৪৬, কসবা রোড, কলিকাতা-৪২

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

২১শে অগ্রহায়ণের 'অমৃতে' (২য় বর্ষ, ৩য় খন্ড, ৩১ সংখ্যা) 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মিশ্র মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নটির যথাসাধ্য উত্তর দিতেছি। প্রথমেই প্রশ্নটির কিঞ্চিৎ সংশোধন আবশ্যক বোধ করিতেছি। ইংরাজী মাস ও বারগুলির নাম নির্বিশেষে রোমান দেবতার নাম হইতে হয় নাই। জুলাই ও আগষ্ট মাস যথাক্রমে জুলিয়াস সীজার ও অগাস্টস সীজারের নাম হইতে গৃহীত। সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর মাস রোমান বর্ষের সেপ্টু, অকটু, নভেম্ ও ডিসেম্ অর্থাৎ সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম মাস। বারের নাম এদেশে প্রচলিত নামের অনুরূপ। আকাশস্থ সপ্তগ্রহের নামাঙ্কিত (সানাম্—রবি, সোনা—চন্দ্র, টিউ বা টসিয়ুস—যুদ্ধদেবতা মঙ্গল, উড্নিস বা মার্কারি—বুধ, থরস্ বা জুপিটর—বৃহস্পতি, ফাই বা ফিট (ওডিনের স্ত্রী ভিনাস)—শুক্র, ও স্যাটার্নাস—শনি,—এই সপ্তগ্রহের নাম)।

বলা বাহুল্য, প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র মতে রবি, সোম, মঙ্গল সকল গ্রহই আপাতদৃষ্টিতে নির্দিষ্ট কক্ষে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। পৃথিবী হইতে দূরত্বের পর্যায়ক্রমে শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র, বুধ ও সোম প্রতিদিন দিবারম্ভ হইতে এক এক ঘন্টাকাল আধিপত্য করেন। চব্বিশ ঘন্টা পরে পর্যায়ক্রমে প্রথম ঘন্টার অধিপতির চতুর্থ গ্রহ (যেমন শনির চতুর্থ রবি, রবির চতুর্থ সোম ইত্যাদি) পর দিবসের প্রথম ঘন্টার অধিপতি হন ও যাহার আধিপত্যে দিবারম্ভ হয়, তাহারই নামানুসারে ঐ দিনটি চিহ্নিত হয়। স্বর্গত আচার্য মেঘনাথ সাহা মহাশয়ের মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতকে বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে দিবসের নাম চিহ্নিত হইবার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গণনা-পদ্ধতি মধ্যএশিয়া হইতে ভারতে আনীত হয় ও অচিরে সর্বত্র প্রচলিত হয়। দেখা যাইতেছে প্রধান গ্রহের চিহ্নিত দিন বা রবিবার হইতে প্রচলিত সপ্তাহ আরম্ভ, এবং ইহাই সমীচীন। অন্য কোনপ্রকার গণনা এদেশে বা অন্যত্র প্রচলিত ছিল বা আছে কিনা জানা নাই।

বাংলা বা হিন্দুমতে মাসের নাম পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রস্থিত নক্ষত্রের নাম হইতে গৃহীত। স্বর্গত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে খৃষ্টপূর্ব ১৪৫০ অব্দে পূর্বপ্রচলিত ২৮টি নক্ষত্রের পরিবর্তে ২৭টি নক্ষত্র দ্বারা চন্দ্রের গতিপথ চিহ্নিত হয় এবং এই সময় হইতে চিত্রা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত মাস চৈত্র, বিশাখায় বৈশাখ, জ্যেষ্ঠায় জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশ মাসের নাম স্থিরীকৃত হয়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পরিবর্তে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষসম্মত গণনা প্রচলিত হয় ও চান্দ্রবর্ষের পরিবর্তে সৌরবর্ষ প্রবর্তিত হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের অপর নাম 'মার্গশীর্ষ' হইবার কারণ এই—প্রাচীনকালে কোন সময়ে এই মাস হইতে বর্ষারম্ভ গণিত হইত। এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, অধুনা প্রচলিত মহাবিষুবের পরিবর্তে এক সময় জলবিষুব হইতে বর্ষারম্ভ হইত। স্বর্গত বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণনানুসারে ৪৫০০—৩২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় অর্থাৎ চন্দ্রের মৃগশিরা নক্ষত্রে অবস্থানকালে জলবিষুব হইত। ক্রমে সরিতে সরিতে বর্তমানে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারত সরকার কর্তৃক সংশোধিত পঞ্জিকানুসারে ১লা জলবিষুব হয়।

দীনেশচন্দ্র তপাদার
হাজিনগর, ২৪ পরগণা।

লিংকন ও ক্রীতদাস মুক্তির শতবর্ষ

সুখময় সেনগুপ্ত

"অন্তর্বিরোধের ফলে সর্বনাশ অনিবার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অর্ধেক দাস এবং অর্ধেক স্বাধীন নরনারী নিয়ে এই সরকার বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না।"—১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন ব'লছিলেন লিংকন। আর ১৮৬৩ সালের নববর্ষের দিন বলেন—"আমার নাম যদি ইতিহাসে কখনও স্থান পায় তবে এ জন্যই পাবে। আমার সমস্ত অন্তর রয়েছে এর পেছনে"—মুক্তি ঘোষণার চূড়ান্ত খসড়া আইনে স্বাক্ষরদান কালে বলেছিলেন একথা। পরবর্তী কালে লিংকনের এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী এব্রাহাম লিংকনের বন্দীমুক্তি ঘোষণার শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। আমেরিকার নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তির মূলে রয়েছে এই ঘোষণাটি এবং সর্বমানবের প্রগতিতে, এই ঘোষণাটি হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও লিংকনকে আজ প্রধানতঃ মহান মুক্তিদাতা বলেই সকলে স্মরণ করে থাকেন। ইনি ৪০ লক্ষ ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'আমি যেমন ক্রীতদাস হতে চাই না তেমনি আমি প্রভু হতেও চাই না। এই হলো আমার গণতন্ত্রের ধারণা।'

দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে তীব্র বিরোধিতার সূচনা হয় ১৮৩০ সাল থেকে। উত্তর অঞ্চলে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। আর দক্ষিণ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ দাস প্রথার স্বপক্ষে নিজেদের মতামত গড়ে তুলতে লাগলেন। তবুও দাসপ্রথার হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার দিক কেউই সমর্থন করতে পারবেন না। মানুষের মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করে তার ওপর প্রবলের অত্যাচার ও নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেওয়া হয়। এফ্. এল, অলমস্টেড নামে উত্তরাঞ্চলের এক ভদ্রলোক লিখেছেন—"দাসপ্রথার ফলে শ্রমিকরা তাদের কর্মনৈপুণ্য বাড়িয়ে তোলার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তাদের আত্মসম্মানবোধ নষ্ট হয়ে যায়। উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে, এবং নিজের ক্ষমতা বিকশিত করে সমাজের এবং পৃথিবীর সেবায় নিয়োজিত করার জন্য মানুষের যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে দাসপ্রথা সেই আকাঙ্ক্ষাকেই মন থেকে নির্মূল করে ফেলে।"

দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনকারীদের সহায়তায় ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে এক ওহায়ো স্টেটের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০,০০০ হাজার ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলে পালিয়ে যায়। ১৮৪০ সালের কাছাকাছি সময়ে দাসপ্রথা-বিরোধী সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ২,০০০ হাজার এবং সভ্যসংখ্যা ছিল ২,০০,০০০-এর মত। ১৮৪৫ সালে দাসপ্রথা একটি রাজনৈতিক সমস্যারূপে দেখা দেয়। ১৮৪৮ সালে রাজনৈতিক নির্বাচিত 'ফ্রি সয়েল' পার্টির বক্তব্য ছিল বিশেষ বিশেষ স্টেটেই দাসপ্রথা সীমাবদ্ধ থাকবে এবং অন্য কোথাও প্রচলনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হবে না।

লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে ১৮৬১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী 'কনফেডারেট স্টেটস অব আমেরিকা' নামে নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। এই নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন জেফারসন ডেভিস। ১৮৬২ সালের ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণকালে লিংকন ঘোষণা করেন যে, দক্ষিণাঞ্চলের এভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। লিংকনের এই অভিষেক-বাণী প্রসঙ্গে ফ্রাংকলিন এশার লিখেছেন—'তার মধ্যে ছিল এক আপোসের সুর, দক্ষিণের নিকট কার্যতঃ আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। তিনি বললেন যে, শুধুমাত্র ক্রীতদাসপ্রথা সম্প্রসারণের বিরোধীই তিনি, কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে এই প্রথা বর্তমান সেখানে তিনি এর বিরোধী নন। জাতির উত্তরাধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দক্ষিণীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন যে, নৈতিক, বাহিক এবং রাজনৈতিক বিচারে দেশের এই দুইটি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তিনি আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ না করা হলে সরকার আগ বাড়িয়ে কারো উপর জবরদস্তি করবে না।'

কিন্তু ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল সকালবেলা চার্লসটন পোতাশ্রয়ে অবস্থিত ফোর্ট সাম-টার-এর উপর কনফেডারেটদের গোলাবর্ষণের দ্বারা গৃহযুদ্ধের সূচনা হল। যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা নামিয়ে উত্তোলিত হল কনফেডারেটদের পতাকা। উভয়পক্ষ নানাভাবে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথম দিকে ইউনিয়নের সৈন্যবাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু মিসিসিপি অঞ্চল, টেনেসী অঞ্চল এবং আরো কয়েকটি মূল্যবান স্থানে কনফেডারেটদের ভীষণভাবে পরাজিত করেন ইউলিসেস এস, গ্রাণ্ট নামে এক দুর্ধর্ষ সেনানায়ক। ১৮৬৩ সালের ৪ঠা জুলাই গ্রাণ্ট অপূর্ব রণ-কৌশলের মাধ্যমে ভিকসবার্গ দখল করেন। কিন্তু ভার্জিনিয়া স্টেটে ইউনিয়ন-সৈন্যবাহিনী বারবার পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছিল। এই অঞ্চলে কনফেডারেট সৈন্যদলের নেতৃত্ব

শিল্পীর তুলিতে কংগ্রেসের সদস্যদের সঙ্গে লিংকন 'দাসমুক্তি ঘোষণা' সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

করাছিলেন রবার্ট ই. লী এবং টমাস জে, জ্যাকসন নামে দুজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী সেনানায়ক।

উত্তরের মানুষেরা এই সংঘর্ষের মাঝখানে আত্মঘাতী সংগ্রামেও বিচলিত হল না। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল : "আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি—যে সকল মানুষ জন্মসূত্রে সমান; সৃষ্টিকর্তা তাদের কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন; এই সবের মধ্যে আছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা এবং সুখানুসরণের অধিকার।"—এ সত্যকে তারা ভুলে যায়নি। প্রত্যেক মানুষের সমনাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী ও অটুট করে তোলাই ছিল যেন তাদের লক্ষ্য।

উত্তরের দাসপ্রথা বিরোধীদের মনে ক্রমেই ধারণা জন্মাতে লাগল গৃহযুদ্ধের সংগ্রাম কেবলমাত্র ইউনিয়ন রক্ষার সংগ্রাম নয়, ক্রীতদাস-মুক্তির সংগ্রামও বটে। লিংকন ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন : "একটি ক্রীতদাসকেও মুক্তি না দিয়ে আমি যদি ইউনিয়নকে রক্ষা করতে পারি তাহলে তাই করব; আর সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে যদি ইউনিয়নকে রক্ষা করা সম্ভব হয় তাহলে আমি তাও করব।"—কিন্তু এখন দেখা গেল (১৮৬২) ক্রীতদাস মুক্তি দেওয়া মঙ্গলজনক এবং সে সময় উপস্থিত। সমগ্র দেশের ঐক্য উত্তরের ঐক্য রক্ষার পক্ষে এই-ই একমাত্র অনুকূল পথ। বিশ্বের মঙ্গলকামীদের কাছে এর আবেদন নিশ্চয়ই সমর্থন পাবে। কিন্তু তবুও লিংকন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন উপযুক্ত সময়ের। দক্ষিণাঞ্চলকে আপাতত প্রতিরোধ করাই কর্তব্য বোধ করেছিলেন। তারপর ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী লিংকন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ক্রীতদাসের মুক্তি ঘোষণা করলেন। দেশের অবস্থার বিরাট পরিবর্তন এল। যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার এবং দাসপ্রথা উচ্ছেদের পূর্ণ সংগ্রাম শুরু হল এবার। নিগ্রোদের জাতীয় সেনাদলে যোগদানের আহ্বান জানালেন প্রেসিডেণ্ট।

এর পরই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। কিন্তু দু'বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। ১৮৬৩ সালের জুলাইয়ে ইউনিয়ন সৈন্যবাহিনীর প্রবল আক্রমণের ফলে কনফেডারেট সৈন্যদল পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। প্রচুর লোকক্ষয়ের জন্য গ্যেটিসবার্গের যুদ্ধক্ষেত্র যে জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে পরিণত করা হয় সে উপলক্ষে এক অবিস্মরণীয় ভাষণে লিংকন বলেছিলেন : "আমরা এখানে এই দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছি যে এদের মৃত্যু ব্যর্থ হবে না। ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট এই জাতি এক নতুন স্বাধীনতা লাভ করবে—এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জনগণের সেবাপরায়ণ, জনগণের এই সরকার বিশ্বে চিরস্থায়ী হবে।" যুদ্ধের মধ্যে লিংকনের ব্যবহারজীবী জীবনের এক অপরিসীম ঔদার্যমণ্ডিত চরিত্রের চিন্তাশীল দিকটাই বারবার প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। ১৮৬৪ সালে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়ে তিনি বলেছিলেন : "কারও প্রতি বিদ্বেষ না রেখে, প্রত্যেকের প্রতি সদিচ্ছা বহন করে, অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা নিয়ে আমাদের অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে। জাতিকে যে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে হবে। যুদ্ধের দায় বহন করেছে যারা তাদের এবং তাদের পরিবারের মঙ্গলসাধনের ভার নিতে হবে আমাদের।...... এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি যাতে স্থায়ীভাবে আমরা অন্যের সঙ্গে ভোগ করতে পারি সেজন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করলে চলবে না।"

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমদিকে টেক্সাস থেকে অরিগণ রাজ্য পর্যন্ত নতুন উন্নয়নশীল বিস্তৃত অঞ্চলে দাসত্ব-প্রথা যাতে প্রবর্তিত না হতে পারে, এই অঞ্চলকে এই প্রথা থেকে মুক্ত রাখার জন্য তিনি প্রতিনিধি সভার সদস্য হিসাবে সংগ্রাম করেছিলেন। কলম্বিয়া জেলার ক্রীতদাসদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়নের জন্যও তিনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি।

সকল ক্রীতদাসই 'মুক্তি-ঘোষণা'র কালে একই সময়ে মুক্তি পায়নি। বিদ্রোহাঞ্চলের ক্রীতদাসদের প্রথম মুক্তি দেওয়া হয়। এর ফলেই ঘরোয়া যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়।

তারপর ১৮৬৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর যুদ্ধাবসানের পর মার্কিন সংবিধানে সংযোজিত ত্রয়োদশ সংশোধনটিতে বলা হয় "কোন অপরাধের শাস্তি ব্যতীত, দাসত্ব অথবা অনিচ্ছাকৃত অধীনতার স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে না।"

দাসপ্রথা যখন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংহতি নষ্ট করবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন এই প্রথার বিরুদ্ধে মানবতার নামে কলম ধরলেন সাহিত্যিকেরা। আইনসভার সদস্য বা সংবাদপত্রের দ্বারা যা সম্ভব হল না তাই-ই সম্ভব হল মাত্র একখানি উপন্যাসের দ্বারা। হুইটিয়ার লাওয়েল, ব্রায়ান্ট, ইমারসন এবং লংফেলোর ন্যায় মানবতাবাদীরা ইতিপূর্বেই কলম ধরেছিলেন। ১৮৫১ সালে 'ন্যাশনাল এরা' নামক জনপ্রিয় সাময়িক পত্রে 'আঙ্কল টম' নামক একটি আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্পকে ভিত্তি করেই 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' উপন্যাস রচনা করেন হ্যারিয়েট বীচার স্টো। উপন্যাস রচনাকালে তাঁর সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা ছিল খুব সামান্যই। কিন্তু এই প্রথার বীভৎসতা হ্যারিয়েটকে এমনভাবে বিচলিত করে যে, সাহিত্যের ইতিহাসে এ গ্রন্থের কাহিনী এক নবযুগের সূচনা করে।

"আঙ্কল টমস্ কেবিন"কে একদেশদর্শিতার অপবাদ দেওয়া যায় না। গ্রন্থে এমন ক্রীতদাস-মালিকের কথা আছে যারা উদার এবং হৃদয়বান। সাইমন লেগ্রী নামে নির্মম এক ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর চরিত্র আঁকা হয়েছে—যার বাড়ি আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে। মিসেস্ স্টো এই এই গ্রন্থ দেখিয়েছেন দাসপ্রথার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার সম্পর্ক কিরূপ অঙ্গাঙ্গী। দাসপ্রথা

আজকের অমানুষিক নিষ্ঠুরতাও আজকের এবং দাসপ্রথার সমর্থক এবং বিরোধী-দলের মধ্যে কোনো কালে বনিবনা সম্ভব হবে না। আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে তরুণ যুবকদের মনে এইটাই গভীর রেখাপাত করল। শুধু আমেরিকায় নয়, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি নানা দেশেই 'আংকল টমস্ কেবিন' অসাধারণ জন-প্রিয়তা অর্জন করে এবং পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রধান ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র জন-মত গড়ে ওঠে। অসহায় ক্রীতদাসদের প্রতি যে অমানুষিক নির্যাতন চলতো তার প্রতি অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

মিসেস স্টো উপন্যাসের এক জায়গায় লিখছেন 'যে জাতি প্রতিবিধান না করে প্রবল কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়, অচিরাৎ সে প্রলংকর আবর্তের মুখে পড়ে।' আমেরিকার বুকে ক্রমশঃ সে সংকট এগিয়ে আসছিল। ১৮৫৮ সালের নির্বাচনে স্টিফেন ডগলাস ও লিংকনের নির্বাচনী-বক্তৃতার মধ্যে তা সুস্পষ্ট। নির্বাচিত না হতে পারলেও লিংকন জনপ্রিয় নায়ক হয়ে উঠলেন। এই জনপ্রিয়তার ফলে তিনি ১৮৬০ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তারপর আমেরিকায় এক ভয়ংকর গৃহ-যুদ্ধের শুরু হয়। লিংকনের বুদ্ধিমত্তা এবং সহকর্মীদের অকৃত্রিম সাহচর্যে তার নিবৃত্তি হয়।

আমেরিকার ইতিহাসে ১৮৬৩ সালের ঘোষণার পরে পৃথকীকরণ নীতি আইন-বিরুদ্ধ বলে সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে আদর্শের বেদীমূলে লিংকন নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন কার্যক্ষেত্রে সেই আদর্শের রূপায়ণ, তার প্রতিষ্ঠা পূর্বের তুলনায় আজ অনেকখানি নিকটতর হয়েছে। এই আদর্শ হলো সকল মানুষই সমানাধিকার নিয়ে জন্মেছে।

লিংকন এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন আজ সকলেই তা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সেদিন সকল জনসাধারণই তা মেনে নেয়নি। সুতরাং তিনি কতখানি সাহস নিয়ে যে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা আজ অনুমান করাও কঠিন। চারদিক থেকে তখন তাঁকে এজন্য ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাঁর উপর অজস্র বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হয়েছিল এবং সমগ্র দেশ জড়িয়ে পড়েছিল তিক্ত ঘরোয়া সংগ্রামে।

যদিও এই সংগ্রাম শুরু হয় এই ঘোষণার দু' বছর আগে, তাহলেও এই বন্দী-মুক্তি ঘোষণাই সংগ্রামে নতুন ইন্ধন জোগায়, তার মধ্যে নতুন বেগ সঞ্চার করে। লিংকনের বিখ্যাত জীবনীকার কার্ল স্যান্ডবার্গ এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার পূর্বে যে উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি সুবৃহৎ চিত্র এঁকেছেন। তখন কয়েকটি ইংরেজি পত্রিকায় এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল, "মুক্তি-ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে নিগ্রো ক্রীতদাসদের পক্ষে নিশ্চয়ই বিদ্রোহ দেখা দেবে, শুরু হবে হত্যা এবং জঘন্যতম নানা কার্য"—এর ফলে ওয়াশিংটনে তখন গুজব রটেছিল ১লা জানুয়ারী লিংকন এই ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেবেন।

কিন্তু যাঁরা এইসকল গুজব বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা তখন লিংকন দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে যে কী তীব্র ঘৃণা পোষণ করেন সে কথা এবং তাঁর

দাস মুক্তির অন্যতম প্রেরণাদাত্রী হ্যারিয়েট বীচার স্টো

সংকল্পের দৃঢ়তার কথা বিচার করে দেখেন নি। দাসমুক্তির কথা ঘোষিত হলো এবং কংগ্রেসে মার্কিন সংবিধানের ১৩তম সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলো। দাসত্ব প্রথাকে এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিরদিনের জন্যই নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হলে উত্তর প্রান্তীয় রাজ্য ম্যাসাচুসেটস থেকে লংফেলো লিখলেন : "যে সকল রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সেগুলিতেই প্রেসিডেন্টের বন্দী-মুক্তি-ঘোষণা কার্য-করী করা হয়েছে। এই দিনটি ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল, আর রাত্রি ছিল চন্দ্রালোকিত। এই দিনটির মতই ভবিষ্যতেও যেন আমাদের জাতির জীবন সুন্দর হয়, এই তার শুভসূচনা।"

লিংকন ক্রীতদাস প্রথাকে যে কত-খানি ঘৃণা করতেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁর যৌবনেই।

নিগ্রো ক্রীতদাসদের তিনি প্রথম দেখেছিলেন মিসিসিপি নদী দিয়ে নৌকা বয়ে নিউ অর্লিয়নসে যাওয়ার পথে। দেখলেন, ওদের হাত-পা শেকল দিয়ে বাঁধা—একটি উঁচু বেদীর উপর দাঁড় করানো। সবচেয়ে বেশী যিনি দর দিচ্ছেন তার কাছেই এদের বিক্রী করা হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি এদের জন্য প্রাণে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ গ্রহণ করলেন যে, যদি কোন দিন সুযোগ আসে তবে এই দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে যাবেন।

পরিশেষে যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি-নিধিসভার সদস্যপদে দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হলেন তখন রাজ্যসমূহের ও সমগ্র দেশের রাজনীতিতে এই দাসত্ব-প্রথার প্রশ্নটিই অন্য সব প্রশ্নের তুলনায় সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তখন লিংকন এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন যে, "দাসত্বপ্রথা যদি অন্যায় না হয় তবে পৃথিবীতে অন্যায় বলে কোন কিছুই নেই।"

দাসত্বপ্রথা যে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এই দৃঢ় ধারণা লিংকনের সারা জীবনেরই বাণী। এ সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়াদর্শে প্রণোদিত তাঁর বাণী কর্মমধ্য অভিব্যক্তিতে পরিস্ফুট। তিনি বলে-ছেন : "যে ঘরে একে অন্যের বিরোধী, সে ঘর টিকতে পারে না। আমার ধারণা কোন শাসন-ব্যবস্থা অর্ধেক ক্রীতদাস অর্ধেক স্বাধীন নাগরিক নিয়ে চিরকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে না......প্রকৃত গণতন্ত্রের সংগে গায়ের রঙ অথবা জন্ম-স্থানের কোন সম্বন্ধ নেই—যারা ক্রীতদাস তাদের মুক্তি দিয়ে আমরা স্বাধীন নাগরিকদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করছি।"

লিংকন নিঃসন্দেহে মহামানব। সংগ্রামী জীবনের প্রতিকূলে আবহাওয়ার সংগ্রাম করে গেছেন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। সমকাল তাঁকে ভুল বুঝেছিল। তাঁর পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারেনি। পৃথিবীর মানুষ হিসাবে জন্ম নিয়ে যাঁরা ঈশ্বরের স্থান লাভ করেছেন লিংকন সেই মহৎ মানব সন্তানদেরই একজন। রংগমঞ্চে অভিনয় দেখতে গিয়ে আততায়ীর হাতে প্রেসিডেন্ট লিংকন নিহত হলে কবি জেমস রাসেল লাওয়েল লিখেছিলেন : "বিস্ময়বিমূঢ় সেই এপ্রিলের প্রভাতে মনে হয়েছিল অসংখ্য মানুষ জীবনে এক পরম বন্ধুকে হারিয়েছেন যেন। চারিদিক শোকে মুহ্যমান। যার সংগে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই—তাঁর জন্যে যে সমগ্র দেশবাসী এমনভাবে অশ্রুমোচন করতে পারে কে জানতো? পরিচিত অপরিচিত নির্বি-শেষে প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের সেই যে নীরব সান্ত্বনার দৃষ্টি বিনিময়, মৃত্যুর পরে কোন প্রশস্তি-গাথাই এত বেশী আন্তরিক হতে পারে না। পরমাত্মীয় বিয়োগের বেদনা সূত্রে সেদিন প্রতিটি মানুষ পরস্পরের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।"

জনি হ্যাজার্ড
ফ্র্যাঙ্ক রবিনস

এক পাইলটকে ফুসলে প্যারিসের রাস্তায় গুণ্ডার পাল্লায় ফেলতে দেখে, জনি সেদিকে এগিয়ে যায়.....

একটু দেরী হয়ে গেল ব্রাদার, না? হুম্-ম্, একটু চোট লেগেছে দেখছি...। তবে নেশা যা করেছে তাতে ঢলে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়!

পাইলটই ত দেখছি... উইঙস্ পেয়েছে' মেক্সিক কাগজ পত্তর। কোরিয়াতে ভাল কাজ করেছে... নাম বেসো অব্রাভেজ! প্যারিসে ঠিকানা নেই... কি করি...?

ওফ্! একদম ঠিক সময়ে...!
ওই যে. দুজন হিঁয়া পর রোখ্‌কে!
(c) King Features Syndicate, Inc., 1962. World rights reserved

হ্যাঁ গুণ্ডাগুলোর দলে আরো লোক রয়েছে দেখছি... ব্যাপার কি! পাইলট ধরার হিড়িক পড়েছে না কি?...
TAXI

সরে পড়ো সুন্দরী.. তোমার ফাঁদ ফেঁসে গিয়েছে!

উঃ উঃ পালাবার আর পথ নেই ... এরা দেখছি একদম খুনে!

কিন্তু গুণ্ডাদুটো হঠাৎ দৌড় মারলে... একজোড়া হেড্‌লাইটের আলো এসে পড়ল।

ক হ্যায়.. একে
কে এসো... না কি
ব সঙ্গেই...? না:
ান লাভ নেই!
গোলমাল কোরো না! দোস্তকে উঠিয়ে নিয়ে এসো!
8-12

ড্রাইভার... অর্লি এয়ার পোর্ট.....! খুব জলদি!
ক্রমশঃ...

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের পরে বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছি বলে মনে পড়ে না। শুধু আমিই না উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে যাঁরাই জাপানী বোমার প্র-তাড়নায় কলকাতা ছাড়েন নি, তাঁরা সকলেই সেই অভূতপূর্ব ভাড়াটে বাড়ির হাটটিকে দেখেছেন। ভাড়াটের জন্যে সেদিন শহরের হাজার হাজার বাড়ির দরজা হাট করেই খোলা থাকত। ভাড়াটের অগ্নুলিহেলনে বিয়াল্লিশের বাড়িয়ালারা দেয়ালের কলি ফের'তেন: ছাদ, ছাদের ঘর বিনা আপত্তিতে ভাড়াটের হাতে সমর্পণ করতেন। সে এক স্বর্ণযুগ গেছে ভাড়া'টদের। বাড়িতে দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্য না থাকলে নাক কুঁচকোতেন তাঁরা, বাজার বাড়ি থেকে একটু দূরে হলে কর্তার মুখ ব্যাজার হত, কয়লা রাখার আলাদা ঘর না থাকলে গিন্নীর মুখ ময়লা ইত্যাদি নানা ধরণের বিলাসিতায় রাজা ছিলেন ভাড়াটেরা। কিন্তু 'হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল' এখন ভাড়াটেরা বাড়ির 'দাস' ছাড়া আর কিছু না। ভাড়াটেদের চরিত্র আজকে প্রায় জলের মতই। জল যে পাত্রে থাকে সেই পাত্রের আকার নেয়, ভাড়াটেদের আকার-প্রকারও আজকে বাড়ি এবং বাড়িয়ালাটি কেমন পাত্র তার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং আজকের বাড়াবাড়ি ভাড়াটেদের না, বাড়ি এবং বাড়িয়ালাদের। যেদিকেই তাকান না কেন দেখবেন বাড়িকে ক্রমাগতই বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। একতলা বাড়ি দোতলা হচ্ছে, দু' কাঠায় যে কখানা ঘর হত আগে দেড় কাঠার মধ্যেই সেই কটা ঘরই তোলা হচ্ছে। কোনো কোনো পাড়ায় গেলে দেখা যায় প্রায় সব বাড়িই স্বর্গের সিঁড়ি, নীচ থেকে প্রায় দূরবীন দিয়ে দেখলেও ছাদের ওপরের লোক প্রায় ভগবানের মতই অদৃশ্য। বাড়ি আজকাল মাথায় যত বাড়ে গতরে তত না। বরং উল্টোটাই সত্যি। ভাড়াটে বাড়ির তলা যত উঁচু, তলায় ঘরের প্রসার ঠিক সেই অনুপাতেই কম। আজকে যে-কোনো নতুন ফ্ল্যাটের একটা ঘরে ডবল বেডের একটা খাট আর একটা আলমারি রাখার পর আয়না টাঙানোর জায়গা খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়। তার ওপর আপনি যদি নতুন ব্যারাক-বাড়ির বাসিন্দে হন তাহলে ত কথাই নেই সব সময়েই মনে হবে তেলেসেংকি স্টেডিয়ামে বসে অলিম্পিক গেম দেখছেন। বিভিন্ন ফ্ল্যাটে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের সঙ্গীতশিক্ষার আসর, পাশের ফ্ল্যাটের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা ফোড়নের গন্ধ, ব্রীজ খেলা বুড়োদের বাঁধানো দাঁতে তর্ক ইত্যাদি নানা কৈজাং-এর হাতে আপনি অষ্টপ্রহর বন্দী। ব্যারাকবাড়িগুলোর সবচেয়ে আপত্তিকর হচ্ছে স্নানের ঘর। স্নানের সঙ্গে মুক্তির সম্পর্ককে ব্যারাকবাড়ির বাথ-রুমগুলো স্বীকার করে না। পৃথিবীর যাবতীয় আবিলতা, কোলাহল, সমাজ, সংসার ইত্যাদির হাত থেকে মুক্তিস্নান করতেই লোকে কলঘরে ঢোকে। মধ্যবিত্ত বাঙালী বাথরুমে ছাড়া আর কোথায় আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক হতে পারে? কিন্তু আধুনিক কোনো ব্যারাকবাড়ির বাথরুমে ঢুকুন, আপনার নিজেকে সেলকার্ক পরিবর্তে মনে হবে একটা সেলেই বন্দী হয়েছেন আপনি। গায়ে জল ঢাললে আপনার গায়ে যত জল লাগবে তার চেয়ে বেশী যাবে দেয়ালে। আপনার যদি নীরব বাসনা থাকে যে, বাথরুমে একটু "মুক্তহস্ত" ব্যায়াম করবেন নতুন কেতার বাথরুমে তার কোনো উপায় নেই। দুদিকে হাত মেললে দেয়ালে হাত ঠেকবে। বাথরুম-গুলো এত ছোট, দেয়ালগুলো শরীরের এত কাছে, যে বাথরুমের বদলে আপনার মনে হবে যে, আপনি একটা জুতোর বাক্সের মধ্যেই বুঝি ঢুকে পড়েছেন ভুল করে।

কিন্তু এই বাথরুম-ঘটিত বাড়ির সমস্যা শুধু আমাদের দেশেই সীমিত নেই। বরং সমস্যাটা আমাদের দেশেই হালফিল আরম্ভ হয়েছে বিদেশের দেখাদেখি। আমেরিকায় মেঘ-ছুঁলে বাড়ির সংখ্যা হাজার হাজার। কিন্তু সব বাড়িই যেন ঠিক একই ছাঁচে ঢালা। পাতলা দেয়াল, সিং সিং জেলের মতন সরু প্যাসেজ এবং বাড়ির একটেরে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের ভিড় করা বাথরুম। এ বাথরুম থেকে হঠাৎ আয়নার দিকে তাকাতে তাকাতে যদি কেউ হঠাৎ মনের আবেগে বলে ফেলে—'আয়না আয়না বলত পৃথিবীতে সেরা রূপ কার?' নির্ঘাত পাশের বাথরুম থেকে অচেনা কণ্ঠে উত্তর আসবে—তোমার! তোমার!

বিরাট উৎসব-মণ্ডপের বাইরে গাড়িগুলো যেমন পর পর ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে আমেরিকার আকাশ-লতা অট্টালিকাগুলোতে, স্নানঘরের জটলাও প্রায় একই রকম। পাতলা দেয়াল আর যন্ত্রগুলির বদান্যতার ফলে অচেনা প্রতিবেশীদের কুলকুচির শব্দটাও ঠিক চিনতে পারে লোকে। স্নানের ঘরেই শুধু প্রতিবেশীর সঙ্গে শব্দ-ভেদী পরিচয় ঘটে না। শোবার ঘর, বৈঠকখানা, খাবার ঘর সর্বত্রই 'রে অচেনা শব্দ-মুষ্টি ছাড়াবি কেমনে'। ম্যানহাটনের চৌষট্টিতলার একটা ঘরে শুয়ে জনৈক বাসিন্দা ঠিক বলে দিতে পারেন যে তার পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে এখন মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন।

তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয়, —কি করে জানলেন মশাই ওটা মাসিক পত্রিকার পাতা?

জবাবটি সংগে সংগেই পাওয়া যাবে —মাসিক পত্রিকা ছাড়া আর কি? খবরের কাগজ হলে শব্দটা আরেকটু বেশী হত!

অর্থাৎ পাশের ঘরে শুয়ে খবরের কাগজ আর মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টানোর শব্দের পার্থক্য ও পাশের ফ্ল্যাট থেকে বলে দেয়া যায়। আমেরিকার নব-বিবাহিতরা ন্যায্য কারণেই আজকাল এই ধরণের শব্দভেদী বাড়িতে থাকতে তেমন উৎসুক নন। এবং ঘুমের ঘোরে যাদের স্বীকারোক্তি করার অভ্যেস তাঁরাও এই সব বাড়ির শিকার হতে নারাজ। আমেরিকার ভাড়াটে মহলে এখন পুরোনো ধরণের ব্রাউনস্টোনের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার বাসনা ক্রমশই প্রবল হচ্ছে। অথচ ওখানকার পৌর-কর্তৃপক্ষ পুরোনো আমলের সব বাড়ি-গুলোকে ভাঙতে শুরু করেছেন। তাঁদের কাছে বাড়ির ব্যক্তিত্বের চাইতে স্থান সংকুলানের প্রশ্নই অগ্র বিবেচ্য। যে গতিতে আমেরিকায় পুরোনো আমলের বাড়ির মাথায় বাড়ি পড়ছে তার ফলে আর কয়েক বছরের মধ্যেই হয়ত হলিউডের সেটে ছাড়া পুরোনো আমলের বিশাল হলঘর এবং যেমন-খুশী-স্নান করার কলঘরযুক্ত ব্রাউন-স্টোনের বাড়ি হাজার খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

অবশ্য এত বিষয় থাকতে আমাকে এবার বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হল কেন তার কারণ এই নয় যে, বাড়িকে বাড়তে দিতে আমার আপত্তি আছে কোনো! আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাড়াটেরা প্রায় অনেকেই ব্রাউনস্টোনের বাড়িতে না হোক, দীর্ঘদিন রং না ফেরানো ব্যাকা-দেয়ালওয়ালা বাড়িতেই থাকি, উচ্চ চূড়ে বাসা বাঁধবার পাখা আমাদের না থাকারই কথা। আমার সমস্যা আমাদের একতলা বাড়ির সামনে যে বিরাট চারতলা ব্যারাক-বাড়িটা উঠছে তাকে ডিঙিয়ে কি করে চাঁদ দেখবো আমরা? হরিপদ কেরানীর ছেলেমেয়েদেরো ত মাঝে মাঝে শুয়ে চাঁদ দেখতে ইচ্ছে করে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এতোদিনের মধ্যে এই স্থানটিতে একদিনো আসেনি নীলিমা। অথচ এখানে আসার গরজ তার অনেকদিনের। নিউইয়র্কের এই প্ল্যানিটোরিয়মটির খ্যাতি আছে। অনেকের কাছে অনেক শুনেছে, কেন যে আসা হ'য়ে ওঠেনি কে জানে। চারদিকে তাকিয়ে বেশ লাগলো।

লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে এক আধো অন্ধকার প্রকান্ড হল-ঘরে এসে পৌঁছুলো তারা। সারা ঘরে একটা নীলচে আলো ছড়িয়ে আছে, ঘরের ঠিক মাঝখানে মস্ত গোল জায়গা জুড়ে আলপনা ধরনের রঙিন মোজাইকের ফুল লতাপাতা আঁকা। তার মাথার উপরের সিলিংয়ে ঠিক তেমনিই মাঝ-খানটিতে সেই মাপেরই সব বড়ো বড়ো বৃত্ত। নিচের আলপনার চারপাশ ঘিরে লাল টুকটুকে গদি আঁটা সব চেয়ার। খস খস শব্দ ক'রে বসে পড়লো সবাই। উপরে তাকালো নীলিমা, তাকিয়ে বুঝতে পারলো সিলিংয়ের বৃত্তটি হ'লো সৌরমন্ডল। আর তার মাঝখানেধ ভোঁজ, সাদা, ঝাপসা এবং অদ্ভুতভাবে ঝুলে থাকা অন্য একটি গোল আলোর বিচ্ছুরণটা হ'লো সূর্য। সেই সূর্যকে ঘিরে চারপাশে ছোটো ছোটো বৃত্তে বিভক্ত হ'য়ে গ্রহ উপগ্রহরা ঘুরছে। মৃদু মৃদু বাজনা বাজছিলো, সেই নরম গভীর গম্ভীর সমবেত যন্ত্রের তারে তারে এক অপার্থিব সুরের মোহ সৃষ্টি হ'য়ে আবহাওয়াটা ঠিক অলৌকিক ক'রে তুলছিল। লাউড স্পীকারে বলে বলে ঘটনাটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন একজন, তাঁর গলার আওয়াজটিও যন্ত্রের আওয়াজের চেয়ে কম গভীর নয়। তিনি বলছিলেন, 'দেখুন, দেখুন, পৃথিবী এবার তার চাঁদকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সূর্যের চার-পাশে প্রদক্ষিণ শুরু করেছে। বুধের উপগ্রহ দুটো চাঁদ, সূর্য থেকে তারা কাছে। বৃহস্পতি বেশ বড়ো, পৃথিবীর চেয়েও বড়ো, তার ঘোরাটা খুব মন্থর। মঙ্গলগ্রহটি পৃথিবীর চেয়েও দূরে, লাল টকটক, করছে। শূন্যে সব এক-সঙ্গে ঘুরছে, দেখে নিন দেখে নিন।'

নীলিমা হাঁ ক'রে বিহ্বল হ'য়ে তাকিয়েছিলো, ডাক্তার মৈত্র ফিসফিস করলেন, তোমার সানফ্রানসিসকের ভ্রাতা রাসেল স্মীথের মনটাও তার সব বৃত্তি নিয়ে এইভাবেই মল্লিকার চারপাশে ঘুরছে, কী বলো?'

নীলিমা তাঁর মুখের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো, 'আপনি কি এই মুহূর্তেও সে কথা ভুলতে পারলেন না?'

'একেবারেই দূর করতে পারছি না চিন্তাটা। কিন্তু সবাই উঠে পড়ছে কেন বলো' তো?

দেখা গেল হলভর্তি লোক সত্যি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে, লাইন ধ'রে, পাশের ঘরের মাঝখানে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে একে একে। দেখা-দেখি নীলিমাকে নিয়ে ডাক্তার মৈত্রও উঠলেন। অনুসরণ ক'রে দোতলায় এসে পৌঁছুলেন। মাথার উপর রাত্রিবেলাকার অনন্ত নীল আকাশের বিস্তার, সেই বিছিয়ে থাকা শান্ত আকাশের একটি জায়গা থেকে একটি লালাভ রং ছড়িয়ে যাচ্ছে চার-দিকে। বোঝা গেল চাঁদ উঠেছে, এই আলো তারই উদ্ভাস। দেখতে দেখতে একটা স্নিগ্ধ জোৎস্না ছড়িয়ে পড়লো, খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগলো চারপাশে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে লাগলো চাঁদ, নরম সবুজে আলোয় ভরে গেল জায়গাটা। এক সময় ডুবে গেল সেই চাঁদ, আকাশ নিরন্ধ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'লো। সেই ভয়ংকর অন্ধকারের কোনো তুলনা রইলো না। দেখতে দেখতে নীলিমার যেন কেমন ছমছম করতে লাগলো, কেমন এক নাম না জানা ভয়ে বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

মাইক ঘোষণা করলো, 'আজকের বিষয় হচ্ছে চাঁদ ও আমরা'।

সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার ভেদ ক'রে আবার ধীরে ধীরে তারা ফুটলো একটি দুটি ক'রে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অজস্র তারার ফুটিতে ভ'রে গেল আকাশ, অন্ধকার সহনীয় হ'লো। তারপর সরু নোখের মতো চাঁদের রেখা দেখা দিল পশ্চিম আকাশে, চোখের উপর, আস্তে

আস্তে বড়ো হ'লো সেই চাঁদ, আবার দশদিশি ভ'রে দিল তার আলোয়।

'ধরো—' শেষ হ'লে উঠে আসতে আসতে ডাক্তার মৈত্র বললেন, 'স্মীথের সংগে যদি মল্লিকার দেখা হয়, তা হ'লে তাদের মনের আকাশটিও কি এমনি করেই আলোয় ভ'রে যাবে না?'

নীলিমা অন্যমনস্ক ছিলো, অভিভূত ছিলো, জবাব দিলো না। রাস্তায় এসে সত্যিকারের আকাশের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো ঐ মেকি আকাশে আর সত্য আকাশে তফাৎটা কোথায়? সেই আকাশে রাত ছিলো, এই আকাশ এখনো বেলা চারটার রোদে ঝকঝক করছে, শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছু মনে হ'লো না তার। কিছুতেই সে মনে করতে পারলো না এতক্ষণ ধ'রে যা দেখলো, তা মিথ্যা, তা মায়া। বিজ্ঞানের দক্ষতায় সে স্তম্ভিত না হ'য়ে পারলো না। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল আমরা বেঁচে আছি তো?

এরপরে আরো খানিকটা ঘুরলো তারা। এলো আর্ট গ্যালারিতে, গেল হাল্‌মে, যেকোন রেস্তোরায় বসে বিকেলবেলার চা খেল, সন্ধ্যাবেলার ডিনার খেল, বাড়ি ফিরলো একেবারে আলো জ্বললে।

(৪)

বাড়ি ফিরে ডাক্তার মৈত্র বললেন, 'বেশ কাটলো দিনটা, না?'

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে নীলিমা বললো, 'খুব ভালো।'

'খুব পরিশ্রম হ'লো তো?'

'মোটেও না।'

'তা হ'লে এসো কফি খাওয়া যাক এক রাউণ্ড।'

তৎক্ষণাৎ গ্যাস ধরালো নীলিমা, পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এলো। সংগে টুকটাক খাবার।

ট্রেটা সেণ্টার টেবিলের উপর রেখে তাকিয়ে দেখলো, ডাক্তার মৈত্র এলিয়ে বসেছেন চেয়ারে, কোলের উপর একটি বই খোলা, সিগারটা ধরিয়ে রেখেছেন, কিন্তু টানছেন না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন গভীরভাবে কী ভাবছেন। নীলিমার উপস্থিতি টের পেয়ে হাসলেন একটু।

নীলিমা বললো, 'খুব ক্লান্ত লাগছে, না?'

'ক্লান্ত কেন? না, না।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

নড়েচড়ে বসলেন তিনি, নীলিমার দিকে মন দিয়ে বললেন, 'আমার মা-লক্ষ্মী দেখছি দারুণ কাজের হ'য়েছে, আবার কতো খাবার এনেছ সংগে, এ্যাঁ, বাঃ এটা তো বেশ, কী নাম এটার?'

নীলিমা বুঝলো তাকে সুখী করছেন কাকাবাবু। কিছু জবাব না দিয়ে কফি ঢেলে এগিয়ে দিল।

চুমুক দিয়ে সত্যি খুশি হ'লেন তিনি, 'চমৎকার হ'য়েছে। জানো, এতো ভালো কফি আমি জীবনে খাইনি।'

'বকতে পারেন না।'

'বকি না? ভীষণ বকি। কতোদিন তাড়িয়ে দি। যাবে না তো কী করবে বলো? এখন আলাদা একটা রান্নার লোক রেখে দিয়েছি। সেটি আবার দারুণ চোর। দশ টাকা বাজারে দিলে পাঁচ টাকাই পকেটে রাখে।'

'একেবারে চিড়িয়াখানা?'

'একেবারে।'

'তার চেয়ে বিয়ে করা কি সহজ ছিলো না?'

'কেউ তো পছন্দ করলো না?' হাসলেন ডাক্তার মৈত্র, প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে
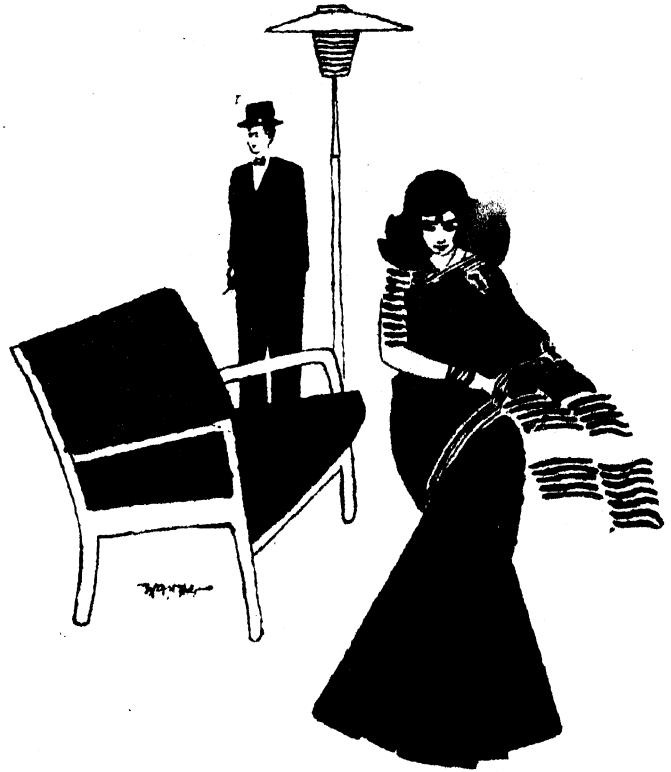
'বেশ কাটলো দিনটা, না?'

নিজেও এক কাপ ঢেলে নিল নীলিমা, হেসে বললো, 'তা বৈকি।'

'সত্যি বলছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমার একটা নেপালী ছোকরা আছে সেটা যেমনি কুঁড়ে তেমনি ফাঁকিবাজ। মাঝে মাঝে মতলব করলেও এই সব চা কফি মন্দ বানায় না। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই কী যে কতগুলো তেতো কালো জল এনে হাজির করে—'

বললেন, 'এই নিয়ে কদিন তুমি আর্ট গ্যালারিতে গেলে?'

'তিন দিন।'

'এই মুহূর্তে তোমাকে কোন ছবিটা বেশী টানছে বলে মনে হয়?'

স্মিত হাস্যে কাকাবাবুর দিকে তাকালো নীলিমা, তার চোখের তারায় ঈষৎ দুষ্টুমির আভাস খেলে গেল, বললো, 'ছবি নয় কাকাবাবু, রোঁদার ভাস্কর্য'।

'কোন মূর্তিটা বলো।'

'সেই বিশাল চিন্তিত পুরুষটা। যে পুরুষটিকে এই মুহূর্তে আমি আপনার মধ্যে জীবন্ত দেখছি।'

ডাক্তার মৈত্র জোরে জোরে হাসলেন।

নীলিমা বললো, 'কিন্তু কী এতো ভাবছেন বলুন তো?'

হাসি মুখেই ডাক্তার মৈত্র জবাব দিলেন, 'অনেক গো, অনেক। তুমি যেমন রোঁদার বিশাল চিন্তিত পুরুষ-টির কথা ভাবছো, আমি ভাবছি, তাঁর চিরন্তন প্রেমের' মূর্তিটির কথা। কী আশ্চর্য, না?' বলতে বলতে মুগ্ধ হ'য়ে উঠলেন তিনি, ছেলেমানুষের আনন্দ নিয়ে বললেন, 'সেই সঙ্গে এলগ্রেকোর সন্ধ্যাবেলার ছবিটা ভাবো, কী বিধুর, কী সুন্দর, কী বিষণ্ণ। জানো, এ হলো সেই সন্ধে, যে সন্ধ্যায় তিনি স্পেইনে পৌঁছেছিলেন, সময়টাকে এমনি ক'রেই ধ'রে রাখলেন। এ'র সম্বন্ধে একটা গল্প আছে, ইনি নাকি ছবি আঁকার সময়-টুকু ছাড়া বাকী সময় সারাক্ষণ আর কিছু না দেখে চোখে রুমাল বেঁধে রাখতেন। ভাবতে পারো কী নিষ্ঠা? কী সততা?'

উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার মৈত্র, পায়চারি করলেন, আবার বসলেন, আবার উঠলেন, সিগার ধরালেন, নিবিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, সব কিছু থেকেই ঘুরে ফিরে আমার কেবল তোমার ঐ রাসেলকেই মনে পড়ে যাচ্ছে। এ ধরনের দু'-একজন হতভাগ্য লোক থাকে সংসারে, যারা অকারণে কষ্ট পায়। যাদের জীবনে হতাশাই একমাত্র প্রাপ্য, যেখানে পুরুষকারের কোন মর্যাদা থাকে না।'

নীলিমা তার অস্থির কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে, তাঁর প্রশস্ত কপালের মাথায় যেন কী খুঁজতে চেষ্টা করলো। মনে মনে ভাবলো বাঙালীর তুলনায় এই উল্লেখযোগ্য রকমের সুপুরুষটি কি কোন মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাকে সর্বস্ব দিয়ে রাসেলের মতো ক'রেই ভালোবেসে ব্যর্থ হ'য়েছিলেন? ইনিও কি সেই দু'-একজন হতভাগ্যেরই একজন, যাদের জীবনে পুরুষকারের কোন মর্যাদা নেই?

ডাক্তার মৈত্র হঠাৎ শান্ত হ'য়ে বসলেন, বেদনাবিদ্ধ গলায় বললেন, ঐ মেয়েটিকে আমি চিনি।'

'কাকে?' প্রায় চমকে উঠলো নীলিমা।

'ঐ মল্লিকাকে। এক সময়ে মল্লিকার বাবা আর আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। বালক ছিলাম তখন, সব সময়ে এক-সঙ্গে থাকতাম, একসঙ্গে খেলতাম, একসঙ্গে ঘুরতাম, একসঙ্গে নাইতে যেতাম বুড়ি গঙ্গা নদীতে। সেখানে গামছা ভাসিয়ে মাছ ধরতাম, নৌকো চড়তাম, ডুব-সাঁতার কাটতাম, হুটো-পুটির অন্ত ছিলো না আমাদের। সেই সময়ে শৈলেশ্বরই ছিলো আমার অহরহ সঙ্গী। বয়সে সে খানিকটা বড়ো ছিলো আমার, আমি তার বুদ্ধিতেই চলতাম, আমি মনে করতাম, শৈলেশ্বরের মতো বুদ্ধিমান লোক বোধ হয় সারা পৃথিবীতেও নেই।'

ডাক্তার মৈত্র থামলেন।

নীলিমা চুপ ক'রে রইলো। সে বুঝতে পারলো নিবিড় অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে একটা মানুষ যেমন আলোতে পৌঁছুবার জন্য ব্যাকুল হয়, আজ তার কাকাবাবুও তেমনি তার সারাজীবনের সব অন্ধকার কক্ষগুলোর মরচে-পড়া দরজা-জানালা খুলে দিতে ব্যাকুল হ'য়েছেন। কারোকে বলতে চাইছেন সব, শ্রোতা তাঁর কাছে ততোটা নয় যতটা বলে ফেলে নিজের বুক হালকা করার আকুলতা। মল্লিকার খবরের জন্য আগ্রহ বোধ করলেও কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে কাকা-বাবুকে সচেতন ক'রে দিলো না, নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে তাঁকে সব কথা বলে ফেলতে সাহায্য করলো। তা-ছাড়া এই চাপা স্বভাবের মানুষটির ঈষৎ রহস্যময়
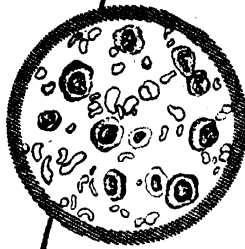
জীবনের গল্পের গন্ধে ছেলেবেলার মতো কিছুটা কৌতূহল অনুভব করলো সে।

ডাক্তার মৈত্র বললেন, 'আসলে শৈলেশ্বরের সঙ্গে আমার জীবনের একটা মস্ত মিল ছিলো। তারও মা-বাবা ছিলো না, আমারও ছিলো না। আমি আমার মাসির কাছে থাকতাম, শৈলেশ্বর তার মামার কাছে থাকতো। তার গোড়াতেই একটা মস্ত তফাৎ ছিলো এই যে, আমি আমার নিঃসন্তান বিধবা মাসীর একেবারে নয়নের মণি ছিলাম, মায়ের অভাব আমার জানা ছিলো না। আর শৈলেশ্বর তার মামা-বাড়িতে ছিলো একটা আপদের মতো। মামা-মামী দুজনেই দূর-দূর ক'রে দুটি খেতে দিতেন বাড়তি আর কিছু নয়। শৈলেশ্বর তাদের দুই চোখে দেখতে পারতো না। আর আমি আমার মাসীকে না দেখে থাকতে পারতুম না। আমার মাসী আমাকে আদর ক'রে ডাকতেন 'আমার টাট্টু ঘোড়া'। বলতেন, এই টাট্টু ঘোড়াকে বাহন ক'রেই আমি সকল দুঃখের সমুদ্র পার হ'য়ে এসেছি।

অর্থাৎ এক কথায় শৈলেশ্বরের জীবনটা ছিলো স্নেহহীন এক ধূসর মরুভূমি আর আমি আমার মাসীর মাতৃত্বের দুর্বার স্নেহধারায় সিঞ্চিত এক স্নিগ্ধ নদী।

হয়তো সেইজন্যই বড়ো হ'তে হ'তে দুজনের স্বভাব দু'দিকে মোড় নিল। দু'জন একেবারে দুই বিপরীতপন্থী হ'য়ে দাঁড়ালাম। শৈলেশ্বরের বালক বয়সেই মনের মধ্যে নানারকম হীনতা প্রবেশ করেছিলো, সে স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলো, নোংরা হ'য়ে উঠছিলো, অর্থ-গৃধ্নুতাও তার স্বভাবের একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো।

(৫)

আস্তে আস্তে স্কুলের গণ্ডী ছাড়ালাম। আমি প্রথম বিভাগে প্রথম দশজনের একজন হ'য়ে পাশ করলাম, শৈলেশ্বর পাশ করলো কান ঘেঁষে। প্রকৃতপক্ষে এই বিভেদটাই বোধহয় শৈলেশ্বরের মনে প্রথম ঈর্ষার বীজ বপন করেছিলো আমার বিরুদ্ধে।

ছেলে ভালো ক'রে পাশ করাতে মাসীর বুক ফুলে গেল, তিনি আর আমাকে মফস্বলের কলেজে ভর্তি না ক'রে ঢাকা নিয়ে এলেন বিজ্ঞান পড়াতে। সেখান থেকে দু' বছর পরে আই-এস-সিতেও যখন প্রথম বিভাগে প্রথম দশ-জনের একজন হ'য়ে পাশ করলাম তখন মাসী তাঁর আশাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরলেন। ঢাকা ছেড়ে কলকাতা এলেন। নিজের সমস্ত অলংকার বিক্রী ক'রে স্বামীর সঞ্চিত অর্থ দু'হাত খরচ ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ক'রে দিলেন আমাকে। একটি ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে অতি ক্লেশে বাস করতে লাগলাম আমরা।

মাসীর সেই আশাকেও সফল ক'রে প্রত্যেক বছর বৃত্তি পেয়ে পেয়ে আমি একদিন টাট্টু ঘোড়ার মতোই পরীক্ষার সব কটা ধাপ ডিঙিয়ে গেলাম। মাসী তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এইবার চল ফিরে যাই।'

অবাক হ'য়ে বললাম, কোথায়?'

'কোথায় আবার, যেখানে আমাদের দেশ।'

'ওখানে গিয়ে কী করবো?'

'কী আবার! ডাক্তারিই করবি।'

'এখানেই তো আমি হাঁসপাতালে কাজ পেয়ে যাচ্ছি, তাছাড়া প্র্যাকটিস জমিয়ে, ভালো কিছু করতে হ'লে তো কলকাতাই আসল জায়গা।

সমস্ত যুক্তি নসাৎ ক'রে দিয়ে মাসী বললেন, 'আহা, ডাক্তারের আবার আসল নকল কী। অসুখ কলকাতার লোকের করলেও যা, ভৈরবগঞ্জের লোকের করলেও তাই। তবু নিজের দেশের লোকেরা এক-জন উপযুক্ত ডাক্তার পেলে যদি ভালো চিকিৎসায় ভালো হ'য়ে যায়, সেটাই বেশী সার্থক। হাজার হোক তারা আমাদের চেনা।''

প্রায় কাঁদ কাঁদ হলাম আমি। যুবক বয়সের সাধের কলকাতা, এ ছেড়ে কোন মূঢ় ঐ এক অজ গঞ্জে গিয়ে বাস করতে চায়! সেখানে কী আছে, প্রতিযোগিতা আছে না নিত্য নতুন বুদ্ধির চর্চায় শান দেবার উপায় আছে।

কিন্তু মাসী অবুঝ। তিনি ফিরবেনই দেশে। আসল কথা তাঁর স্বামী ভৈরবগঞ্জ শহরে যখন তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন, মাসীর সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিলো এই ভেবে যে, উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকলে নিশ্চয়ই এতোবড়ো দুর্ভোগ ঘনিয়ে আসতো না তাঁর জীবনে। সেই থেকে সেই বেদনা লেগে রয়েছে তাঁর মনে। এতোকাল পর সেই অভাব মোচনে তিনি তৎপর হ'য়ে উঠলেন। একজনের যে কারণে— দশদিক অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিলো, আর একজন যেন সেই দুঃখ না পায়। এতো কাণ্ড ক'রে আমাকে ডাক্তারি পড়াবার চেষ্টার পিছনে সুস্পষ্ট কারণ বোধহয় এই-টাই ছিলো।

মাসীর ইচ্ছেকে অমান্য করতে পার-লাম না আমি। কলকাতা ছাড়তে কষ্ট হ'লো কিন্তু কর্তব্য কই বড়ো ক'রে দেখলাম। মাসীর জীবনে আর কী আছে আমি ছাড়া? আর এই আমার জন্য তিনি সারাজীবন কী না করেছেন! মাসীর এই সদিচ্ছাটিকে সম্মান করা অবশ্য-কর্তব্য বলেই মনে হ'লো আমার। একদিন কলকাতার মমতা ত্যাগ ক'রে, প্রায় চোখের জল মুছতে মুছতে চ'লে এলাম আবার ভৈরবগঞ্জে। পুরো ছয় বছর পরে। এসে আমার বিশ্রী লাগতে লাগলো। মাসী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দু'দিন পরে দেখবি এরাই তোর আসল আপন-জন। এদের যখন ভালো ক'রে তুলবি, দেখবি কতো আনন্দ হয় হৃদয়ে। তাছাড়া টাকা-কড়ির দিক থেকেও তুই ঠকবি না। এখানে তুই ছাড়া আর ভালো ডাক্তার আছে নাকি কেউ?'

কথাটা তিনি মিথ্যা বলেন নি, সেই সত্যতা কয়েক মাসের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। সেখানকার ডাক্তারসাহেব হ'য়ে ডাক্তারির পসার এক বছরের মধ্যে এমন জমে উঠলো যে নাওয়া-খাওয়ার সময় রইলো না। সুনাম ছড়িয়ে পড়লো চার-দিকে। সকলে সম্মান করতে লাগলো, ভালোবাসতে লাগলো, ডাক্তার-সাহেব বলতে সবাই তখন [illegible]থর। ভালো লাগলো সেই সম্মান, সেই ভালোবাসা। মন মজে গেল কাজে।

আমি যেমন ডাক্তার-সাহেব হ'য়ে খ্যাতির শিখরে উঠেছিলাম, শৈলেশ্বরও তেমনি উকিলবাবু হয়ে কম যাচ্ছিলো না। তাকে দেখে, তার কথা শুনে আমার মনে হ'লো মামা-মামীর অনাদর, অবহেলার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন সে এই শহরে এসে উকিল হ'য়ে বসেছে। প্রথমেই সে মামলা ক'রে তার বাবার গচ্ছিত সামান্য কিছু টাকাকে সুদ-সুদ্ধ দ্বিগুণ ভাবে আদায় করলো তাঁদের কাছ থেকে, তারপর ঝগড়ায় গণ্ডায় জিনিসপত্র বুঝে নিয়ে পৃথক হ'লো।

(ক্রমশঃ)

চিকিৎসা শাস্ত্র রেনেসাঁ যুগে

ডাঃ অশোক বাগচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মধ্যযুগের পরবর্তী কালে য়ুরোপের শিল্প ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের যুগকে বলা হত রেনেসাঁ যুগ। মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসান হ'য়ে, মধ্য-য়ুরোপের চিন্তানায়কগণ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। এই যুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং আলব্রেখট্ ডুরার-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, তিনি একাধারে ছিলেন শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। তিনি মৃত মানুষের শবব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন প্রবর্তিত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভুল নির্ণয় করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের ব্রাসেল্‌স শহরে বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্ আঁদ্রিয়া ভেসালিউসের জন্ম। তিনি লুভেঁ, প্যারী ও পাডুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে সমগ্র য়ুরোপের ছাত্রমণ্ডলী তাঁর নিকট সমবেত হত। পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করবার পর তিনি রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ 'নরদেহের গঠন'। গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত শিল্পী টিজিয়ানো ভেচেল্লিও বা টিটিয়ান।

পুস্তকটি প্রকাশের পর ভেসালিউসকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক ইয়াকোবুস সিলভিয়ুস এবং প্রিয় ছাত্র কলম্বুস প্রকাশ্যে তাঁকে অপমান করতেও বিরত থাকেননি। তিনি নিরুৎসাহিত হয়ে তাঁর বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দগ্ধ করে ফেলেন। ভেসালিউসের কৃতিত্ব অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডে আইনপাশের দ্বারা ক্ষৌরকার-শল্যচিকিৎসকগণকে বৎসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শবব্যবচ্ছেদ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। পাডুয়া হ'তে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ ডাঃ জন কেয়ুস ইংলণ্ডের ক্ষৌরকার শল্য-সংস্থার (Barber Surgeons' Guild) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে পাডুয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম হার্ভে।

রেনেসাঁ যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্পুস অরিয়লুস থিওফ্রাস্টুস্ বোম্বাস্টুস ফন হোহেনহাইম। সংক্ষেপে পারাসেলসুস অর্থাৎ সেলসুস নামে বিশ্ববিখ্যাত। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের আইনসিদেলেন্ শহরের বোমবাস্ট বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে অস্ট্রিয়ার কারিন্থিয়া প্রদেশের ভিলাখ্ শহরে বাস করতেন। তাঁর পিতা ছিলেন ভিলাখ্

আঁব্রয়ে পারে

শহরের চিকিৎসক। তিনি পুত্রকে প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর পারাসেলসুস্ স্পোয়াৎস্ শহরের জিগামুণ্ডফুগের-এর নিকট রসায়ন ও অপরসায়নশাস্ত্র (Alchemy) শিক্ষা করেন। ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে বিদ্যা শিক্ষা করে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গ্রহণ করেন সেলসুস। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সালৎসবুর্গ শহরে চিকিৎসা-ব্যবসায় শুরু করলেও নাগরিকগণের চক্রান্তে তাঁকে ঐ শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাজেল শহরবাসী মানবতান্ত্রিক (Humanist) পণ্ডিত ফ্রোবেন অসুস্থ হন

আঁদ্রে ভেসালিউস

এবং পারাসেলসুস কর্তৃক চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। ফ্রোবেন-এর প্রচেষ্টায় বাজেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও শহরের পৌর-চিকিৎসকের পদ লাভ করেন পারাসেলসুস। তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষা জর্মনে বক্তৃতা দিতেন। দুই বৎসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেন্টগালেন শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। পারাসেলসুস বলতেন "জ্ঞান কেবল মাত্র বই-এর পাতায় আবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিন্তা করতে হবে।"

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষৌরকারের গৃহে বিখ্যাত আঁব্রয়ে পারের জন্ম হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও খুল্লতাতের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার পরে প্যারীর বিখ্যাত ওতেল্ দীউ নামক চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য তাঁকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তিনি হিপোক্রেটেসের ন্যায় প্রকৃতিবিদ্যা-চর্চা করে রোগবিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। তিনিই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্য ধমনীবন্ধন (Ligature) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবদ্ধ শিশুকে ঘুরিয়ে প্রসব সুসাধ্য করার পথ আবিষ্কার করেন। তিনি অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গদের জন্য নানা প্রকার কৃত্রিম

অঙ্গ উদ্ভাবিত করেছিলেন। ফরাসী দেশের ক্যাথলিক ও হ্যুজেনট্‌গণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যাধ্যক্ষ মারেশাল দ্য মতেরীর অধীনে তিনি নিযুক্ত হন সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসক। সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর ধরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর প্যারে প্যারীর সেন্টকোম চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সুদীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন ধারণ করে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেন্ট আঁদ্রে দেস আর্তস গির্জার প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি আজও বিদ্যমান।

রেনেসাঁ যুগের ইংরাজ চিকিৎসকগণের মধ্যে টমাস্ লিন্‌একার (১৪৬০-১৫২৪) ও জন কেয়্‌স-এর নাম উল্লেখযোগ্য। লিন্‌একার ক্যান্‌টারবারী শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সপ্তম হেনরী কর্তৃক সভা-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অষ্টম হেনরী-এর রাজত্বকালে তাঁর উদ্যোগে লণ্ডনে রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয় বা Royal College of Physicians প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। জন কেয়্‌স পাড়ুয়া শহরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে ইংলণ্ডের নরউইচে চিকিৎসা-ব্যবসায় করতেন এবং অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথমা এলিজাবেথের অধীনেও চাকুরী করেন। লিনএকারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি হন।

রেনেসাঁ যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল যথা, ভেষজশাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষৌরকার-শল্যচিকিৎসক (Barber Surgeons) ও ভেষজ-ব্যবসায়ী (Apothecary)। ফরাসীদেশে ভেষজশাস্ত্রজ্ঞদের "গ্রাঁদ বুর্জোয়া" বা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর এবং ক্ষৌরকার শল্যচিকিৎসকগণকে "পেতি বুর্জোয়া" বা নিম্ন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ক্ষৌরকার-শল্যচিকিৎসকগণ সমাজের উচ্চস্তরে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতেন না। ষোড়শ শতকে ফরাসী ক্ষৌরকার-শল্যচিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসা-বিদ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও ইংলণ্ডে শল্যচিকিৎসা-ব্যবসায় করা যেত। সেই সকল শল্যচিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন "মাষ্টার" নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ শল্যচিকিৎসকগণ মাষ্টারের পরিবর্তে 'মিষ্টারে' পরিণত হন। ইংলণ্ডে শিক্ষিত বহু ভারতীয় শল্যচিকিৎসকও মিষ্টার বলে সম্বোধিত হতে পছন্দ করেন। ভেষজ-ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অন্য চিকিৎসকের নির্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করতেন কিন্তু সুযোগ পেলে নিজেরাও রোগী পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্লেগ মহামারীর সময় তাঁরা চিকিৎসা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরাও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সংস্থা নামে একটি সংস্থা স্থাপনা করে সমিতিবদ্ধ হন।

(ক্রমশ)

রেনেসাঁ যুগের শল্যচিকিৎসা

প্রথমে একটি গল্প। কোন্ গল্পটা সবচেয়ে লাগসই। যাতে মাত্র একটি ছবিতে চিরকালের একটা 'মাক্ষম জিনিস তুলে ধরতে পারা যায়? যাতে এ যুগের পরিষ্কার চেহারা জ্বলজ্বলে করে ওঠে? যাতে ছবিটা মানুষের দিন-রাতের সঙ্গী, বন্ধু হতে পারে? বাঙলাদেশে তো অজস্র গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছে, কিন্তু তেমন কাহিনী ভাবতে ভাবতে চিরঞ্জীবের পাক্কা সাত মাস কেটে গেল।

অবশ্য অতি আধুনিক কায়দায় ছবি করতে গেলে গল্পের দরকার হয় না। ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। সারাদিন এলোপাথাড়ি এখান সেখান থেকে চলতি, কর্মব্যস্ত মানুষের বা চিরন্তন দৃশ্যের ছবি তুলে এনে ল্যাবরেটরীতে তাদেরকে এমন-ভাবে ছেঁকে তোলা, যাতে আপসেই একটা আকর্ষণীয় খন্ডচিত্র রূপ নেয়। এমনিভাবে কয়েকদিন। তাহলেই পূর্ণ-চিত্র এসে যাবে।

না। ওভাবে হবে না। কারণ তাতে চিত্র হবে, সৃষ্টি হবে না। চিরঞ্জীবের চোখে মানুষ ও নিসর্গের বহিরঙ্গ শুধু নয় অন্তরঙ্গ পরিচয় দৃষ্ট হবে না, দর্শকরাও দেখতে পাবে না।

গল্প চাই।

শুধু গল্প? চিত্রনাট্য, অভিনেতা-অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান? আবার টেকনিশিয়ানের কত ভাগ বিভাগ। একটা ছবি করা তো নয়, একটা শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, নানান কাজ, নানান সমস্যা।

যাই হোক, চিরঞ্জীব গল্প শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, কিন্তু কিন্তু করে নয়, ইতস্তত ভাবের অহরহ খচখচানি মনের মধ্যে পুষে নয়, দরাজ দিলে মেনে নেওয়া।

চিরঞ্জীবের স্বভাবই হল এই ধরণের, ধাঁ করে যেটা ভালো লাগল, গ্রহণ করে নেবে সঙ্গে সঙ্গে। প্রথম চোখেই 'কেমন জানি' মনে হলেই ব্যাস, বাতিল সেটা।

অবশ্য একথা মনে করবার কোন যথেষ্ট কারণ নেই যে, চিরঞ্জীব সেন্টি-মেন্টাল। না, তা নয়। ভালো যেটা লাগল, সেটাকে কাছে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, খুঁত বার করবে, খুঁত বার করে ঝাড়াই পোঁছাই করে আশ্চর্যের কাছে তুলে ধরবে।

খাটের তলা ঘেঁটে অধুনালুপ্ত যার প্রথম সংখ্যাই 'অন্তিম' তেমন কাগজ 'আবেগ'এর পাতায় দিবাকর চতুর্ভূজ লিখিত 'সুখ' গল্পের আই-ডিয়াটা চিরঞ্জীবের চোখের সামনে অনন্ত দৃষ্টির রেখা বিছিয়ে দিল। অনেকটা মাটি থেকে আকাশে, সীমানা-রহিত।

চিরঞ্জীব স্থিরনিশ্চয়, ছবি করবে। এবং ছবি হবে অনন্যসাধারণ।

সরল মিত্তির চিরঞ্জীবের গ্রামো-ফোন। প্রায় তিন চার বছর থেকে। অনেক পরিচালকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, প্রযোজকের কর্মসচিব ছিল, এবং এক-কালে নিজে ছবি করার উচ্চাশাও পোষণ করত, এখন হতাশাবাদী। বাঙলা ছবির কিস্যু হচ্ছে না এবং হবে না, এই ব্যর্থতাই তার অভিজ্ঞতালব্ধ বিচার।

সেই সরল মিত্তির যেমন রোজ সন্ধ্যে হলেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি অগ্রাহ্য করে আদ্দির পাঞ্জাবি ও ফিন-ফিনে ধুতির ঝকঝকে শুভ্রতায় কায়দা করে হেঁটে নাটুকে ভঙ্গিতে ডাক ছেড়ে আসে, আজও তেমনি এল।

বৌদি চা হবে কি? কই ভাই, গেলে কোথায়? অফিসের ঝিমুনি এখনো কাটল না?

পায়রার মত দুটি লাল চোখে অবিচ্ছিন্ন হাসি মুদ্রিত, চিরঞ্জীব ডোরাকাটা পায়জামায় একটু সামনে ঝুঁকে ঘরে এসে ঢোকে। আর তারপর নানান আলোচনায় আত্মজাহির করে বসে সিনেমা, বলতে গেলে সিনেমার শ্রাদ্ধ। চিরঞ্জীবের স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত, কোন ছবির কোথায় কোন ছোট বড় ত্রুটি এমনভাবে বলে যাবে যেন শ্রোতা পর্দায় সত্যি সত্যি নতুন করে ছবি দেখছে।

কিন্তু আজ যেন তাল কেটেছে।

চিরঞ্জীব ঢুকল। প্রবেশেই স্বাচ্ছন্দ্য পলাতক। সোফায় বসল, পিকদানিতে পিক ফেলল, পানখাওয়া লাল ঠোঁটটা মুছল, পিকদানির হাঙরের মাথায় হাত বুলোল, জানলা গলিয়ে তাকিয়ে রইল

ফাঁকায়, বোধহয় আকাশে নয়, কিম্বা তারাও দেখল না। অভ্যাসবশতঃ অ্যাকোয়ারিয়ামের হাজার রঙের আস-শ্রাম শোভাযাত্রায় ছটফটে মাছগুলোর কাছে গিয়ে আদরও করল না।

তখনো সরল মিত্তির নজর দেয়নি। সে গোল্ডফ্লেকে আগুন দিয়ে আয়েস বিস্রস্ত করে দম ছাড়ছে। আর আপন মনে হাসছে মুচকি মুচকি।

আস্তে আস্তে বলল, একটা ছবি দেখলাম।

চিরঞ্জীব কয়েক মুহূর্ত নীরব।

বুঝলে, দেখে ফেললাম।

উদাসীন কন্ঠ চিরঞ্জীবের,—কী ছবি, ইতালিয়ান? বলেও কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না।

সে তো আগেই দেখে ফেলেছি। বাঙলা—বাঙলা ছবি। খুনখুনে হাসিতে যেন সরল মিত্তির তার অপরাধ স্বীকার করে ফেলল।

আচ্ছা।

আচ্ছা কী বলছ। এবার লকলকে শিখার মত সোজা হল সরল,—রাবিশ, এ ছবি যে কী করে ভেনিসে কান্স প্রাইজ পেল, আমি ভাবতেই পারছি না। দুনিয়াটার কী যে ভীমরতি হয়েছে! আরে ভাই, বড়ুয়া সাহেব বেঁচে থাকলে তো এরা প্রাইজ পাবার কল্পনাই করতে পারত না।

চিরঞ্জীব নির্বিকার। তার দৃষ্টি বাইরে থেকে ঘরে এল না, দেয়ালে টিকটিকিটাও আনতে পারল না, একটা মেনি বেড়াল টিয়াপাখির খাঁচাটার দিকে লোভার্ত নিঃশব্দ থাবায় ছাদের ধার ঘেঁষে এগোচ্ছে—এ দৃশ্যেও আকৃষ্ট করতে পারল না।

একটা কিছু ঘটেছে, কোথায় ফাঁক জমেছে, কোথায় অসঙ্গতি এসেছে—সরল মিত্তির এতক্ষণে ঠাহর করল।

রেখা চা নিয়ে ঢুকল।

কী হয়েছে বৌদি? চিরঞ্জীব আজকে অসুস্থ নাকি?

অসুস্থ নয়, বরং বেশি সুস্থ। ওকেই শুধোন না।

রেখা হাসি ছড়িয়ে চলে গেল। চার সন্তানের জননী বোঝাই যায় না। রেখার গলা শোনা গেল, ছেলেদের পড়ার ঘরে যেতে আদেশ দিচ্ছে।

চার বছর বাদে একটা বাঙলা ছবি দেখলাম, আর তুমি কিনা এটাকে কোন খবরের আমল-ই দিচ্ছ না? কী হল তোমার।—সরলের প্রবীণ অভিমান চাপা থাকল না। চল্লিশোত্তর কান্নাটা ন্যাকামির ধার ঘেঁষে গেল। বাঙলা ছবি সরল মিত্তির দেখে না। দেখে সাহেবদের ছবি। চ্যাপলিন, ডিসিকা, ফেলিনি, নিদেনপক্ষে হিচকক। যাদের ছবিতে মশলা আছে, চিন্তা করবার কিছু আছে, যাদের ছবি দেখে মনে হয় এমনটি আর দেখিনি। কী টেকনিক!

অবশ্য এ সবই চিরঞ্জীবের কাছ থেকে মনোযোগী ছাত্রের মত নেওয়া পাঠ। যদিও চিরঞ্জীব বাঙলা ছবি দেখে। বলা বাহুল্য কচিকুচি করে কাটবার জনাই দেখে। বিশেষ করে ধুরন্ধর পরিচালকের ছবিগুলো।

চিরঞ্জীব আর কিছু করে না। অর্থাৎ সে সাংবাদিক নয়, এমন কি সিনেমা প্রবন্ধকারও নয়। অনেক সাংবাদিক বন্ধু চিরঞ্জীবকে তার বক্তব্য লিখে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেছে, সমালোচনা লিখতেও আমন্ত্রণ করেছে কয়েকটা জনপ্রিয় সিনেমার কাগজ, কিন্তু কোনদিন সে কলম ধরেনি। যেমন সে সাহিত্যের একজন নিষ্ঠাবান পাঠক, তেমনি সিনেমার নির্ভীক দর্শক। দেখেই তার লাভ লোকসান, পড়েই তার সুখ-দুঃখ।

চিরঞ্জীব ভালো চাকরি করে, ওষুধ কোম্পানীর পুরোনো সেলসম্যান, ভালো মাইনে। সারা ভারতে তাকে ঘুরতে হয়। তাতে সে আনন্দই পায়। বেশ সচ্ছল তার বাঁচবার উপকরণগুলি। এবং বেশ সাবলীলভাবেই সেগুলিকে খরচ করতে সে ভালোবাসে। এতে সে সুখী। বলতে গেলে সাধারণের একজন। শুধু একটি ক্ষেত্র ছাড়া, যেখানে সে অনিদ্রা নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপায়ী। যার জন্য সর্বদাই তার মুখের তীব্র গন্ধ চাপা দেবার চেষ্টা করে পান খেয়ে। বর্তমানে সুরা চিরঞ্জীবের কাছে তরল নিঃশ্বাসের মত।

সেই লোক যদি বলে বসে, ড্রিংক করা ছেড়ে দিয়েছি, এটার চেয়েও কি তোমার খবরটা বেশি চমকাবার,—তাহলে সরল মিত্তিরের বাহাদুরি নেবার আর কোন আশাই থাকে না।

সরল মিত্তির চার বছর বাদে বাঙলা ছবি দেখছে, আর চিরঞ্জীব চৌধুরী তেইশ বছরকার অভ্যাস ছেড়েছে। স্বভাবতই সরল মিত্তির বাহাদুরি নিতে গিয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মিয়োনো গলার স্বর উপচে এমন মৃদু শব্দে বিস্ময় প্রকাশ করল যাতে তার গভীরতা অতল।

কেন! আর শরীরে সইছিল না?

তা নয়। মদ্যপান তো জল পান। সে নয়।—তোমাকে বলিনি, চেপে গিয়েছি। গত বছর কাঁথির এক ডিসপেন্সারিতে, সন্ধ্যে হব হব, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সিনেমার আলোচনা করছিলাম, ভদ্রলোক সিনেমা-পাগল আর জানেন যে আমি সিনেমা-নিন্দুক, আমি গেলেই খোঁচা মেরে ছবির আদ্যোপান্ত ইতিহাস ভালোমন্দ সব জেনে নেবেন। হ্যাঁ সেটা শীতকাল, স্যুট জড়িয়েও শীত যাচ্ছিল না, দু'চারজন চেনা-অচেনা মুখের ভিড় জমেছিল, ডাক্তারবাবু ওই লোক্যালিটিতে বেশ প্রিয়জন। আমি তো আমার ঝুলি থেকে এক একটা অস্ত্র ছেড়ে এদেশী পরিচালকদের কুপোকাৎ করছি, জোড়া জোড়া কৌতূহলী চোখ থেকে চোখে সপ্রশংস বাহবা কুড়োচ্ছি, এমন সময়, মনে হয় একজন কলেজের মেয়ে, টিপ্পনী কাটল, 'নামী লোকের নিন্দে করেও অনেকে নামী হয়ে গেছে।' আহত
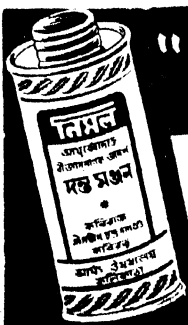
বন্দীর মত মার হজম করেও লড়াই চালিয়ে গেলাম। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তি ভিতরে ভিতরে প্রাণ ত্যাগ করে গেছে।

চিরঞ্জীব থামল। পানের ডিবে থেকে তৈরি খিলি বার করে মুখে পুরে দিল। একগাদা জর্দা চিবিয়ে নিজেকে গরম করে নিল। সরল মিত্তির বুঝল, একটা নেশার অভাব আরেকটা নেশার মাত্রাধিক্যে পুষিয়ে নিচ্ছে চিরঞ্জীব।

আবহাওয়া গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে দেখে সরল মিত্তির লঘু হল, একটা বাচ্চা মেয়ের কথায় তুমি চটে গেলে?

না ভাই সরল, আমি চটিনি। অনুতাপ হল। নিজেকে অপরাধী মনে হল। ঠিক করলাম, সেই মুহূর্তে ঠিক করলাম, আমাকে ছবি করতে হবে, তারপর থেকে—

তাই নাকি, এনকোর, চিয়ারিও—সরল মিত্তির উচ্ছ্বাসে রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল।—কতদিন তোমাকে বলেছি, ভাই চিরঞ্জীব, তুমি যদি একটা ছবি কর, তাহলে এদের একটা শিক্ষা হয়ে যায়, এরা দেখে শিখতে পারে। ব্যাঙের ছাতাগুলোর ডাঁট আর সহ্য করতে পারা যায় না, অসহ্য! বলে কিনা, ব্যাঙের ছাতায় কেমন কারুকাজ দেখে যাও, ছোঃ। আমি আছি, শালা দেখিয়ে দেব, কম পয়সায় ভালো ছবি কাকে বলে।

অপর পক্ষ কিন্তু নিষ্পলক, শান্ত। পায়ের উপর পা রাখা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, জানুটোয় রক্ত জমে ঝিনঝিন করছে, চিরঞ্জীব সরলের উত্তেজনায় কোন প্রতিধ্বনি তুলছে না। একটু নড়ল, পাটা নামাল। চিন্তার আলোড়ন চিরঞ্জীবের মনের মধ্যে সাত সাগরের মাতলামি ছুটিয়ে বয়ে যাচ্ছে, একটা খেপা শিল্পী ক্যানভাসে এলোপাথাড়ি রেখার বিদ্যুৎ বুলিয়ে যাচ্ছে, কাটাকুটি আঁকি-বুকি, নিরাকার নিরবয়ব, অর্থহীন, রূপের আদল আসছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, সুষ্ঠু চেহারায় আভাস উঠছে, তলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বাইরে চিরঞ্জীব স্টিলের মানুষ, জেল্লায় কঠোরতা নিবদ্ধ। ডাইনামোর খোলের মত, ধুকধুকর্নিটা চলছে বুকের মধ্যে, সেটার শক্তিও ছড়িয়ে পড়বে তন্তুতে তন্তুতে; অনেক দূরে—যত দূরকার আশা জ্বলছে কেন্দ্রে, কিন্তু খোলের পিন্ডটা নিরাবেগ জড়ের মত।

সরল মিত্তিরও মনে মনে দ্রুত হস্তে একটা নক্‌সা তৈরি করতে লেগে গেল। এবং তার মনে এল হঠাৎ।

বলল, কিন্তু ছবি করার সঙ্গে মদ ছাড়ার—

চিরঞ্জীব শেষ করল, কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছ না।

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

প্রাথমিক খরচটার জন্য আমি কারুর কাছে হাত পাততে রাজি নই। ধরো, মাসে আমার ড্রিংকের পেছনে খরচ চারশো, বছরে বাঁচালে চার বারো আটচল্লিশ শো। বছর দুয়েক যদি প্রস্তুতি পর্ব লাগে, তাহলে আটচল্লিশ দুগুনে ন হাজার ছশো। অন্তত এ টাকাও থাকলে কাজে নামতে পারা যায়।

তা যায়—চিন্তিতভাবে বলল সরল মিত্তির—এর মধ্যেই আমি তোমার প্রযোজক পরিবেশক জোগাড় করে দিতে পারব। কিন্তু—

কিন্তু আমি মদ ছেড়ে থাকতে পারব কিনা? পারব, আজ সারাদিন এক ফোঁটাও ছুঁইনি।

সে তো মাত্র আজ।

শুধু আজ নয়, আর কোনদিন না। দেখে নিও। আমি এদিকেও দেখাতে চাই, বউয়ের গয়না বিক্রী করা, বা ঘরের লাইব্রেরী বেচে দেওয়ার
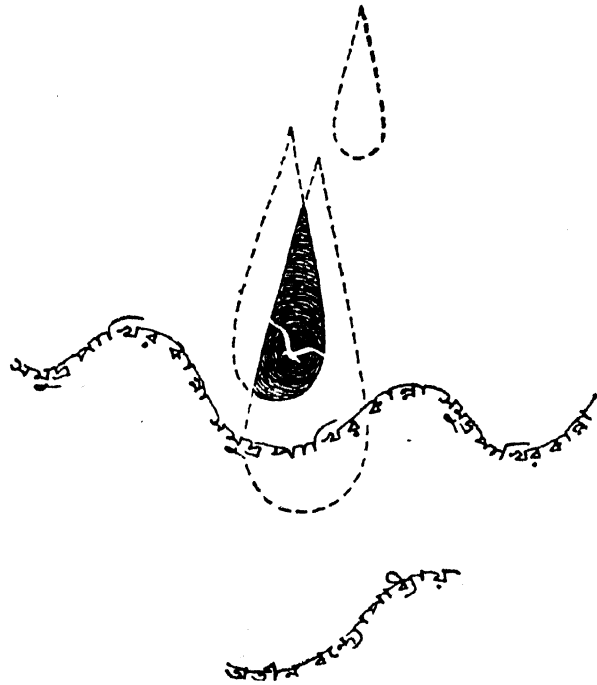
চাইতেও অনেক কঠিন সংকল্প পালন করতে আমি পারি।

অফিস থেকে চোদ্দ দিনের ছুটি নিল। সিনারিও তৈরি করতে হবে। অন্তত এই চোদ্দ দিনে খসড়াটা খাড়া করতে পারলে শেষ করতে আর ছুটি না নিলেও চলবে। সারাদিন ঘর থেকে চিরঞ্জীব বেরোয় না, দরজা বন্ধ থাকে। তিনতলার জানলা দিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের লোকজন যানবাহন দেখে, বর্ষা দেখে, নতুন বাড়ি তৈরি দেখে, আর মনে মনে একটা দীর্ঘ সেলুলয়েডের ফিতের গায়ে জীবন্ত জগত তৈরি করে চলে। যে জগত পৃথিবীতে আছে, লোকালয় অরণ্য শস্যক্ষেত্র আছে, অথচ মানুষে এক সঙ্গে একসূত্রে এক দৃশ্যকোণ থেকে দেখতে পাচ্ছে না। বাস করছে মানুষ, অথচ জীবনের গতিবিধি ধরতে পারছে না। সমাজে আছে অথচ সমাজবদ্ধ নয়; জীবনে আছে অথচ জীবন্ত নয়; এক সঙ্গে আছে অথচ ঐক্যহীন। এই যে আপাতবিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত, স্বার্থান্ধ জীবনের স্রোতকে ভয়ংকর, বেগবান, সুস্থ বলিষ্ঠ করে প্রতিবিম্বিত করবে।

বিষয়বস্তু বা গল্পটির নাম সুখ। উলঙ্গ জন্মের পর থেকে সুখের উপকরণগুলির কীভাবে প্রয়োজন এবং তার জন্য তাকে নিজেরই জাতভাই মানুষের সঙ্গে ও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে, এই হচ্ছে আইডিয়ার সার মর্ম। যদি মানুষ সচেতন হতে পারে তাহলে, সে তার শত্রু ভাববে প্রকৃতিকে, মানুষকে নয়। প্রকৃতিকে বন্দী করে তার ভাঁড়ার লুট করতে হবে।

সমাজের তিন চারটি চরিত্র, তারা জনপদে জনসংখ্যার ঘিঞ্জি এড়াতে হাজির হল সমুদ্রের ধারে, আধা জঙ্গল আধা পতিত। সেখানে তারা পত্তন করল উপনিবেশের এবং তারপর থেকেই তাদেরকে বিভিন্ন ওঠাপড়া জটিলতার ভিতর দিয়ে এগোতে হল।

তিন হাজার বছরের মানব সভ্যতার আণবিক অ্যালবাম তৈরি করিয়ে সেই কাঁথির কলেজের মেয়েটিকে কেন, বাঙলা, ভারতবর্ষ এবং গোটা দুনিয়াটাকে দেখিয়ে দেবে চিরঞ্জীব।

চিত্রনাট্য শুরু হল, ধীরে ধীরে এগোতে লাগল, স্থান, কাল, আলো, ক্যামেরার অ্যাঙ্গল, ক্লোজ-আপ, লঙ-সট সমস্তই উল্লেখ করতে করতে এগোল। অর্থাৎ চিত্র-নাট্যের সঙ্গে সঙ্গে শট-ডিভিশনও পাশের কলমে পাশাপাশি চলল। যাতে চিত্রনাট্য হাতে নিয়ে ছবি তোলবার সময় আর আটকাতে না হয়। অবশ্যই বাস্তব ক্ষেত্রে একটু-আধটু অদল বদল হবেই, কারণ সকলেই জানে—বাস্তব অসুবিধে।

এতদিন যে বইগুলো শখের তাগিদে চিরঞ্জীব পড়তে ভালোবাসত, সেগুলিই যে এমন সৎকাজে লেগে যাবে আগে কে ভেবেছিল।

কিন্তু রেখা বিরক্ত হয়ে উঠল। চিরঞ্জীব ছবি করছে এ খবর ঠোঁটে ঠোঁটে রটে গেল। লোকজনের প্রশ্নবোধক যাতায়াত বেড়ে গেল। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা অভিনয় করবার জন্যে যখন তখন হানা দিতে লাগল। এই হানা ঠেকাবার ভার রেখার ওপর। চিরঞ্জীব নতুন রক্ত আমদানি করবে, যৌবনের স্পর্শেও অতুলনীয় ছবি হয় প্রমাণ করবে—তাই সকলকেই ছ মাস এক বছর বাদে আসবার আমন্ত্রণ জানাবার ঢালাও বিজ্ঞপ্তি দিবারাত্র ঘোষণা করতে হল রেখাকেই।

রোজ সন্ধ্যেবেলা সরল মিত্তির এসে খবর নিয়ে যায়, কী রকম এগোল চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব আড্ডা মেরে সময় একেবারেই আর নষ্ট করে না। সরল মিত্তির তার সারাদিনের প্রযোজক পাকড়াবার অভিযান ফলাও করে সংক্ষেপে শুনিয়ে চলে যায়।

চিরঞ্জীবের ঘরে সারাদিন রোদের আলো আর রাত্রে ইলেকট্রিকের ঘরে আলো আর নেভে না। যেন চিরঞ্জীব নিজেই জ্বলছে। অফুরন্ত বিকিরণে সে ভাস্বর।

রাত্রে-ও কাজ করছে দেখে রেখা তাকে বকুনি দেয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

বারো দিনের দিন সারা রাত ঘরে পায়চারি করল। চিত্র-নাট্য এখন জমে উঠেছে। চরিত্রগুলিকে পুরোপুরি চিনতে পেরেছে, তাদের আনুষঙ্গিক সুকুমার বৃত্তিগুলির ওপর প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্মতাও অনুবীক্ষণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে।

অমূর্ত উল্লাসের সঙ্গে রুদ্ধ কান্নার চিরঞ্জীবের অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেলুলয়েডের গায়ে চরিত্র ও দৃশ্যগুলি বাঙময় না হয়ে ওঠা পর্যন্ত এই অস্থিরতা থামবে না। চিরঞ্জীব বুঝতে পারে, এটাই বোধহয় সৃষ্টিকর্তার মানসিকতার ঝঙ্কার।

ফার্স্ট ট্রামটা দেবদারুর ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে মেখে ছুটে গেল। জানলা দিয়ে দেখছে রেখা, গয়লারা সততা পরীক্ষা দিচ্ছে, খদ্দেরদের সামনে টকটকে সাদা দুধ দুয়ে দিয়ে। ইস্কুলে যাবার জন্য পাশের বাড়ির মেয়েটি রেডি হচ্ছে। চায়ের জোগাড় করতে বাহাদুরকে ডাকল রেখা। এমন সময়—

চিরঞ্জীব চিরঞ্জীব, বৌদি।

দরজা খুলে দিল বাহাদুর। রেখা গলা চিনেছে। বসবার ঘরে গেল। সরল মিত্তির হাঁপাচ্ছে, চালে চিরুনিও বুলোতে ভুলে গেছে। কাঁচা-পাকা লম্বা লম্বা চুলগুলো ছেঁড়া গদির ছোবড়ার মত বিক্ষুব্ধ। চোখের কোলে অনিদ্রার টিপ-ছাপ। নিঃশ্বাস সশব্দ।

এত সকালে যে! আপনিও কি পাগল হলেন। রেখা মনে মনে বিরক্ত হয়েছে।

পাগল না হলে ছবি করা যায় না বৌদি। এ বড় শক্ত কাজ। চিরঞ্জীবকে ডাকুন, এখনো ওঠেনি নাকি? সরল মিত্তির কোঁচার খুঁটে মুখ মুছল, খুঁট-টায় মুখের বাসি ঘামের সঙ্গে ময়লার ছোপ লাগল। রেখা পাখা খুলে দিল।

ঘুমোলো কখন যে উঠবে। উঠেই তো বসে আছে, পায়চারি করছে, বিড়-বিড় করে কী যে যা-তা বকছে সারারাত, আমার তো ঘুম হয় না বাপু। পাশের ঘরে থেকেও সোয়াস্তি নেই। ভোর থেকে তো কোন সাড়া-শব্দ পাইনি। যদি ইতি-মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে।

বাহাদুর চা দিয়ে গেল দু কাপ।

দুজনে চায়ে চুমুক লাগাল।

বসুন, দেখছি,—রেখা চলে গিয়ে চিরঞ্জীবকে ডাকল। দরজায় ধাক্কা দিল। সাড়া পাওয়া গেল না।

সরল মিত্তির গলা ছুঁড়ল, ছেড়ে দিন বৌদি, আমি না হয় পরে আসব। শুনুন, আপনাকেই বলে যাচ্ছি।

রেখা আসতে সরল আবার বলল, বলবেন আমি একজন জাঁদরেল মালদার প্রযোজক ঠিক করে ফেলেছি, অনেক হিন্দী ছবি করেছে, প্রেস্টিজ কেনবার জন্য আর্টের খাতিরে দিতে রাজি হয়েছে।

এবার রেখা উল্লসিত হল, বলল, থামুন থামুন। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

আবার দরজায় ধাক্কা মারল রেখা। দরজা দেয়াল কাঁপতে লাগল। ভিতর থেকে তবু কোন শব্দ নেই। রেখার ডাকে সরল মিত্তিরকে যেতে হল। সরল দরজার ফাঁকে চোখ দিয়েও কিছু দেখতে পেল না।

সরল মিত্তির শুধোল, ঘুমোচ্ছে তো। যা দিনরাত খাটা-খাটুনি চলছে, ঘুমিয়ে পড়েছে, মড়ার মত ঘুমোচ্ছে।

রেখা কিন্তু নিশ্চিন্ত হল না, ও তো এমন বেঘোরে ঘুমোয় না। ওর ঘুম খুব পাতলা। আরশোলা উড়লেও ঘুম ভেঙে যায়। এমন কি একটা মশাও গায়ে বসলেই হল।

তাহলে?

আপনি একবার ডাকুন তো।

সরল মোটা গলায় জোরে হাঁক ছাড়ল। ছেলেরা চোখ কচলাতে কচলাতে এসে ভিড় জমাল। কিন্তু চিরঞ্জীবের ঘর নিথর, চুপচাপ। ঘরের ভিতরে কোন গভীর ধ্যানমগ্ন তপস্বী রয়েছে, বাইরের কোলাহল তার কাছে তুচ্ছ। সরল ভাবল, চিরঞ্জীব হয়ত চিন্তার খনিতে অন্ধকার

হাতড়াচ্ছে। পাছে কথা বললে মন বিক্ষিপ্ত হয়, এই ভয়ে বে রাচ্ছে না। ঘুমোচ্ছে না—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হল সরল মিত্তির। ঘুমন্ত মানুষ এত গোলমালে অবশ্যই জেগে উঠত।

তবে?

এবার দরজায় এমন জোরে ধাক্কা মারল যে ভেঙে পড়ার উপক্রম। প্রাচীন আমলের কালজয়ী কপাট। নড়তে চায় না।

শেষ পর্যন্ত পরামর্শ করে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়ে তাদের ডেকে দরজা ভেঙে ফেলা হল। বাড়িতে হৈ-হৈ পড়ে গেল। পাড়ার লোকের ভিড় বাড়ল। পুলিস এল। ডাক্তার এল, হাউস ফিজিশিয়ান ডঃ দত্ত। ডাঃ দত্ত বলল, না, রুগী অচেতন হলেও এখন পর্যন্ত ভয়ের নয়। পুলিস অ্যাম্বুলেন্স স্থানত্যাগ করল।

ঘণ্টা চারেক বাদে চিরঞ্জীবের জ্ঞান হল। রেখা, ছেলেরা, সরল মিত্তির তখনো পাশে বসে। সকলে উদ্‌গ্রীব। সরল মিত্তির শিক্ষিত নার্সের মত ওষুধ খাওয়াল, দুধ খাওয়াল, মুখ মুছে দিল। মাথায় আইস-ব্যাগ দিতে লাগল।

রেখাকে বলল, আপনারা যান, চান খাওয়া সারুন। আমি ততক্ষণ আছি।

আপনিও খাবেন এখানে।—রেখা ছেলেদের নিয়ে উঠে গেল। যেন একটা বিমূঢ়তার ছায়া সরে গেল, বিষাদের ধোঁয়া উড়ে গেল।

সরল মিত্তির ভাবছে, বেশ ছিল চিরঞ্জীব। তাকে উস্কে দিয়ে কী বিপদকেই না ডেকে আনল সরল। গতানুগতিক সরলরেখায় চলে যাচ্ছিল চিরঞ্জীবের দিনাতিপাত। সমতল, বিক্ষোভবিহীন।

রাত্তির নটায় ডাঃ দত্তকে আবার ডেকে আনল বাহাদুর।

ডাঃ দত্ত সকলকে ঘর থেকে যেতে বলল ঃ থাকল একমাত্র সরল মিত্তির।

রেখা বলল, বলুন না! ভয় পেয়েই বা কী হবে। ভালোমন্দ সব সহ্য করবার শক্তি আমার আছে।

আচ্ছা থাকুন। কিন্তু তোমরা যাও বাবা।

ছেলেদের পড়াশুনো সিকেয় উঠেছে। ওরা ছাতে গিয়ে জটলা পাকাতে লাগল।

ডাঃ দত্ত জিগ্যেস করল ঃ কী অসুবিধে হচ্ছে মিঃ চৌধুরি।

সারা শরীর ঝিম-ঝিম করছে। লতাপাতা কাজ-করা হলুদ-সবুজ সুজনির প্রান্তে উল্টোনো ডিঙির মত পড়ে আছে চিরঞ্জীব, পাশেই তার নদীর ছলাৎ ছলাৎ প্রবাহ। উৎকর্ণ চিরঞ্জীব, কিন্তু তাঁরের ঘাসের কাছে উৎসর্গীকৃত। শোভাযাত্রার আকাশ-ফাটানো উল্লাস শুনেছে গুলি-[illegible] বিক্ষোভী।

[illegible] গন্ধ পাচ্ছি না? ডাঃ দত্ত হাসির সঙ্গে বলল।

ছেড়ে দিয়েছি।

বলেন কী! চমকে উঠল ডাক্তার। না না ছাড়বেন না। ওই জন্যেই নার্ভের প্রতিক্রিয়া। ও আপনার হ্যাবিট হয়ে গেছে। অভ্যাস মস্ত বড় জরুরী জিনিস মিঃ চৌধুরি। অভ্যাস মানেই রক্ত মাংস। খুব জোর বেঁচে গেছেন, মানে এখনো বিপদ কাটেনি। বাঁচতে পারবেন। হার্টফেল করলেও আশ্চর্য হতাম না। না—না।—ড্রিংক একেবারে ছাড়া কখনোই চলবে না। ছাড়লেই আপনি মরবেন।

কিন্তু ডাঃ দত্ত,—উঠে বসল চিরঞ্জীব, মুখে এসে জমল রক্ত, চিত্র-নাট্যের পাণ্ডুলিপি খুঁজল সারা ঘরে, একটা সাধারণ লোক অনন্যসাধারণ হবার ব্যগ্রতায় প্রার্থনা জানাল,—তা হলে যে ছবি ছাড়তে হয়!

ছবি কি আপনি করতে পারবেন! সেই সময় পেলে তো? ডাঃ দত্ত বুঝল চিরঞ্জীব স্থিরকল্প, হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ভেবে দেখুন, আমি চললাম।

ডাঃ দত্ত চলে যেতেই সরল মিত্তির খাটের বাজুতে বসে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ সুযোগের জন্য অপেক্ষা করল। রেখা ইসারায় বারণ করল। শুনল না। আলো নিভিয়ে দিল সরল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার চলে এল ঘরের মধ্যে। জানলা দিয়ে এল নগরের ছিটানো বাড়তি আলোক। টিয়াপাখিটা 'কে কে' বলে কর্কশভাবে চেঁচাচ্ছে, অবাঞ্ছিত কিছু দেখলেই ওটা অমন করে চেঁচাবে।

সরল মিত্তির বলল, খুব আস্তে, গলায় বিশ্বস্ততা আনল,—চিরঞ্জীব, আমি প্রডুসারের ব্যবস্থা করেছি, তোমাকে টাকার জন্য ভাবতে হবে না। ডাক্তারের কথা শুনতে পার।

সে যদি টাকা না দেয়।

দেবে না কেন।

তার কি উত্তর আছে? খারাপ দিকটাও তো ভাবা উচিত। তুমি তো পাকা লোক। সিনেমা জগৎটাকে ভালো করেই চেন। এ-ও কি হতে পারে না?

সরলের মুখে সংশয় দেখতে পেয়ে রেখাও ভাবনায় পড়ল। সরল মিত্তির খাটের বাজুতে নখের দাগ আঁকতে লাগল। রাত্রির ভারি থাবায় কলকাতা নিষ্প্রাণ হয়ে চলেছে, ট্যাক্সি-রিক্সার বিরল চলায় লোয়ার সার্কুলার রোডের ফুটপাতে লোকেরা বিছানা পাতছে। একটা একটা করে একেকটা বাড়ির জানলা দপ-দপ করে নিভেছে।

তবে কী করবে।

সরল মিত্তির ছবি করার শেষ আয়োজন সমূলে তুলে ফেলল মন থেকে। উঠল। প্রশ্নটার উত্তর না শুনলেও চলবে, এই ভঙ্গিতে দরজার কাঠামোর দিকে চাইল,—বাঙলা ছবির যা হবার তা-ই হবে, তুমি ছবি করলেও হবে, না করলেও হবে। স্বভাবসিদ্ধ হতাশায় সরলকে গ্রাস করল আচমকা।

তুমিও একথা বলছ সরল! তুমি বলতে পার। কেন না তুমি ছবি করেছ। আমি বলতে পারি না।

কিন্তু ড্রিংক ছাড়া এবং ছবি তোলা এ দুটো একসঙ্গে চললে যে তোমাকে মরতে হবে। সরল মিত্তির এবার ক্ষুব্ধ না হয়ে পারল না।—ডাক্তার কী বলল মনে নেই!

বলুক। আসুক মৃত্যু দ্বিগুণ জোরে।

বছর দেড়েক বাদে চিরঞ্জীব শেষ করল তার ছবি, সুখ। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন পরিবেশক জুটল না। ল্যাবরেটরীর স্টিলের আলমারীতে একটি বাঙময় জগত মুখ বন্ধ করে অন্ধকারে আলোময় জীবনের রহস্য দেখছে, আর মুখ টিপে হাসছে, কারণ ওরা জানে ওদেরকে একবার চলতে দেখলে সংসারের সচলতার ভান বোধহয় থমকে যেত এবং অন্তত সামান্য পরিমাণেও বদলে যেত।

পথভ্রষ্ট যোগী লরেন্স

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩০ এর পরে অনেকগুলি বছর অতিক্রান্ত; পূর্বে ও উত্তরকালে ইংরাজী সাহিত্যের সীমাহীন বিস্তার; তবুও একটা নাম স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়েও আজও স্বন্দমুখর। জীবৎকাল যাঁর নানা তিক্ত আলোড়নে উৎপীড়িত, তিরোভাবের পরেও তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন নানা মতের দ্যোতনায় অস্বচ্ছ। আইনের কঠোর আজ্ঞায় দণ্ডিত হলেন ডি এইচ লরেন্স, বাজেয়াপ্ত হল তাঁর দুখানা বই—অপরাধ নীতিহীনতা! তারপর কেটে গেল অনেকদিন—আজও মীমাংসা হ'ল না "লেডি চ্যাটারলিজ্ লাভার" লেখকের কোন দর্শনকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। হ্যাঁ, দর্শন! লরেন্স নিজেই বলেছেন—

"It seems to me that even art is utterly dependent on philosophy; or if you prefer it on a metaphysic."

. এবং একথাটা এখানে স্মর্তব্য, লরেন্সীয় জীবনদর্শনের অন্বেষায় "লেডি চ্যাটারলির প্রেম"ই একমাত্র দিশারী নয়; যদিও প্রতিভূ সন্দেহ নেই। অবশ্য "ওল্ডবেলীর" মামলার পর লরেন্স মানেই 'লেডি চ্যাটারলির লাভার'—একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

লরেন্স সম্পর্কে য়ুরোপীয় সমালোচকের দৃষ্টি বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত। সেই সব মতামতের প্রাচুর্যই অনেক সময় সাধারণ পাঠককে দিশাহারা করে ফেলে। লরেন্স সম্পর্কে ভারতীয় মনীষীর একটি অনালোচিত মন্তব্য বোধহয় একটি নতুন মননের সহায়তা করবে। অরবিন্দ একদা লরেন্সকে বলেছিলেন "পথভ্রষ্ট যোগী"—তাঁর ভাষায়—

"I suppose Lawrence was a yogi who had missed his way and came into a European body to work out his difficulties."

লরেন্সের সাহিত্যের জীবন ১৯১০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত। বলা যায় তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরুতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে এতদিনকার সমস্ত মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সভ্যতার প্রতি মোহভঙ্গ, অবিশ্বাস, হতাশ্বাস আর হতবুদ্ধি সমস্ত মানুষকে ক্লেদাক্ত করে তুলল: আর পুরাতনের প্রতি আস্থা যতই কমতে লাগল, ততই অন্য কোন নতুন মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা দিল। এই যুগের উপন্যাসের মধ্যেই যুগ-প্রতিফলন ঘটেছে সবচেয়ে বেশী, যদিও লেখকগোষ্ঠীর নব প্রয়াস ত্রিধারায় প্রবাহিত হতে লাগল।

লরেন্স প্রমুখ লেখকগণ চাইলেন ব্যক্তিগত চৈতন্যের উদ্বোধনে জীবনের উত্তরায়ণ। সভ্যতার প্রতি, যন্ত্রের প্রতি, তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি তীব্র ঘৃণা লরেন্সকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল দেশ থেকে দেশান্তরে; এই অসুস্থ, পঙ্গু, কৃত্রিম সভ্যতা মানুষকে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে—এই তাঁর বিশ্বাস হল। লরেন্স চাইলেন, বুদ্ধির কৃত্রিম, অসুস্থ আবরণ ঘুচিয়ে ফেলে হৃদয়াবেগের মুক্তি। আর তাঁর মতে এই হৃদয়াবেগের মুক্তি ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যের (unconscious) গভীরে উৎসারিত।

ইতিমধ্যে ফ্রয়েডের নতুন আবিষ্কার মানুষের মনোজগতের গহনলোকে আলো ফেলে অনেক আশ্চর্য কথা জানতে পেরেছে। আমার মধ্যে রয়েছে এক সীমাহীন জগৎ; অথচ আমি "এ বিপুলা পৃথ্বীর" বড় অল্পই জানতে পেরেছি। চেতন, অবচেতন এবং মগ্নচৈতন্য সম্বন্ধে এক নতুন জ্ঞান মানুষের জীবন সম্বন্ধে অনেক পুরাতন ধারণার পরিবর্তন ঘটাল। ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদ্ ও তাঁদের অনুসারী লেখকেরা যৌনতাকেই মানবজীবনের সামগ্রিক পরিণতির মূল বলে ধরতে চাইলেন। লরেন্সও বললেন "Call of blood"কে স্বীকার করাই হচ্ছে এই কৃত্রিম ও মৃত সভ্যতার হাত থেকে ব্যক্তি মানুষের পরিত্রাণের উপায়। প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের উন্মেষেই মানবজীবনের সার্থকতা।

লরেন্স "Call of blood"কে সত্য বলেছেন, যৌন চেতনা তাঁর লেখার মূলে সুর হলেও তিনি কিন্তু ফ্রয়েডের মত মানুষের সমস্ত ভাব ভাবনার একমাত্র উৎস যৌনবোধ—একথা স্বীকার করেন নি। কোন একটা মহত্তর বোধ কোথাও আছে—তারই অন্বেষণে যেন "Call of blood"কে সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে; এ যেন অনেকটা ভারতীয় তান্ত্রিক সাধনা—দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীতের অন্বেষণ করা; দেহই ত সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, সবচেয়ে নিকটে; তবুও কী অপারসীম রহস্য এর কোষে কোষে; এই রহস্যপুরীর চাবি যদি খোলা যায় তবেই বোধ হয় জানা যাবে আরও কোথায় মানব সত্তার কোন গভীরতর চেতনা আপনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লরেন্সও বোধ হয় এই রকম একটা অস্থিরতা আপনার মধ্যে বোধ করেছিলেন; তাই বর্তমান মৃত সভ্যতার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"Our vision, our belief, our metaphysic is wearing woefully thin, and art is absolutely threadbare; we have no future, neither for our hopes nor our aims nor our art. It has all gone grey and opaque".

তারপর তিনি বলেছেন—
"We have got to rip the old veil of a vision across, and find what the heart really believes in, after all: and what the heart really wants, for the next future. And we've got to put it down in terms of belief and of knowledge. And then go forward again, to the fulfilment of life and art. And finally; it seems to me even art is utterly dependent on philosophy—if you prefer it, on a metaphysic."

তা হলে দেখা যাচ্ছে জীবন ও শিল্পের পূর্ণতা (fulfilment of life and art) একটা গভীর দর্শন বা আধ্যাত্মিক ভিত্তি সাপেক্ষ। এখন লরেন্স যদি শুধু দেহেই দেহের চরম সমাপ্তিকে সত্য বলে বুঝে থাকেন, তবে তাঁর উপরিউক্ত কথাগুলো মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু না, লরেন্সীয় জীবনদর্শনে কোন গভীরতর মুক্তচৈতন্যের জন্য স্বন্দ্ব আছে বলেই আজও লরেন্সের আবেদন আমাদের কাছে

ফুরিয়ে যায় নি, আজও লরেন্সকে নিয়ে বিতর্ক চলে।

অবশ্য একথা ঠিক যে লরেন্স সনাতন অর্থে ধর্মকে খুঁজতে যান নি। প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্মমতকে বা প্রেমাদর্শকে তিনি অসার মনে করেছেন, শুধু তাই নয় একে তিনি আঘাত দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হয়ত সেই জন্যেই তিনি দেহকে প্রচণ্ডভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। প্রচলিত ধর্ম, মত, আদর্শ, নীতিকে বর্জন করে লরেন্স চেয়েছেন ব্যক্তিকে তার স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে। আদিম মানব এক আশ্চর্য স্বচ্ছতায় নিজের জীবনকে গ্রহণ করেছিল; প্রকৃতির বক্ষাশ্রিত শিশু আপন স্বভাবধর্মে সাবলীল ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। হৃদয়ের আবেগ তাকে প্লাবিত করেছে, বুদ্ধির প্রাধর্য তাকে সংকুচিত করে নি। লরেন্সের মতে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ আপনাকে বিকশিত করে নি, মিথ্যা আবরণে নিজেকে আবৃত করেছে। যদিও রোমান্টিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিতে লরেন্সকে প্রকৃতি-প্রেমী বলা অসম্ভব তবু তিনি যে অন্য অর্থে প্রকৃতি-পূজারী সে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মানবস্বভাবের সংগে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রথম সম্বন্ধ যেখানে, যেখানে বিচ্ছিন্নতার সামান্য আভাস মাত্র নেই—লরেন্স যেন সেখানেই যেতে চেয়েছেন। তাই নরনারীর স্বাধীন জৈব মিলনকে তিনি তখনই সার্থক বলছেন—যখন দুটি দেহ সম্পূর্ণরূপে এক হয়ে গিয়ে এক অপরূপ অনুভূতি লাভ করে। এই প্রসংগে লরেন্স আর এক জায়গায় বলেছেন, মহত্তর কোন উদ্দেশ্য সাধনেই পুরুষের সার্থকতা।

"But you have got to keep your sexual fulfilment even then subordinate, just subordinate to the great passion of purpose"

কারণ তাঁর মতে, ... "when he makes the sexual consummation, the supreme consummation, he falls into the beginnings of despair."

এই 'despair' বা হতাশা থেকেই লরেন্স দেহের গভীরে আরও কিছু অনুভব করতে, আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। আর বোধ হয় সেই জন্যই অজন্তার শৈল্পিক চেতনা তাঁকে আকর্ষণ করেছে, বত্তিচেল্লির আর্টকে বলেছেন 'Vulgur', 'Spirit' বা আত্মাকে তিনি স্বীকার করেন নি কিন্তু "Call of blood"এর মধ্য দিয়ে তিনি যেন সেই আরও কিছুকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। লরেন্স ট্র্যাজেডি কখনও পছন্দ করেন নি, কেন না তিনি মনে করতেন বিরহ জীবনের শেষ কথা নয়, কোথাও আছে একটা চিরন্তন মিলন। (এখানেও দেখি ভারতীয় দৃষ্টিভংগী!)। এই চিরন্তন মিলনের আভাস কি তাঁর কাছে আসত, যদি না তিনি দেহের মধ্য দিয়ে আরও কিছুকে ছুঁতে না চাইতেন। আর এই দ্বন্দ্ব, এই অন্বেষা, বার বার তাঁর লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই আকুল, অবোধ্য অন্বেষার কথা বুঝতে পেরেই কি অরবিন্দ তাঁকে বলেছিলেন "পথভ্রষ্ট যোগী"। অর্থাৎ যা তাঁর অন্বিষ্ট, তাঁর সাধনার ধন তাকে যতই অধরা মনে হচ্ছে, ততই বুঝি তাঁর পথ ঘোরালো হয়ে উঠছে। অন্তত একথা আংশিক স্বীকার করতেই হবে—যৌন স্বেচ্ছাচারিতার মাহাত্ম্য কীর্তন করার জন্য লরেন্স কলম ধরেন নি। গভীরতর কোন জীবনবোধ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, সেই জীবনবোধের সত্যস্বরূপ সমালোচকদের বহু বিতর্কের ধূলিজালে মলিন। গভীরতর কোন সত্যের আভাস আছে বলেই আজও লরেন্স আলোচ্য হয়ে ওঠেনি।

মার্কিনী মানস : ভারতীয় চিন্তাধারা

পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে রোমান্টিকতার যে বিরাট বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছিল আমেরিকায় তারই পরিণতি হচ্ছে এমার্সন থোরো ও অন্যান্য তুরীয়বাদীরা বা ট্রানসেনড্যানটেলিস্টরা। তাঁদের সঙ্গে ইংরাজ রোম্যান্টিকতাবাদী বিশেষ করে কোলরীজ এবং জার্মান রোম্যান্টিক দার্শনিকদের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা বলাই বাহুল্য। বহুবিস্তৃত ক্ষেত্রে নতুনের সন্ধানে নতুন চিন্তাধারার সন্ধানে বের হয়ে তাঁদের অনেকেই আবিষ্কার করেছিলেন এশিয়াকে, তার ধর্মগ্রন্থসমূহকে। ইয়োরোপের এই রোম্যান্টিক চিন্তানায়কগণের দৃষ্টান্ত আমেরিকার এই দার্শনিকগণের ভারত সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য যে দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

র‍্যালফ ওয়াল্ডো এমার্সন এবং ডেভিড থেরো প্রাচ্যভাবধারা, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য দ্বারা যে খুবই প্রভাবিত, তা অধিকাংশ ভারত ও আমেরিকাবাসীই জানেন। যে সূত্রে এই তুরীয়বাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ভারতের পরিচয় পেয়েছিলেন তা হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয় ১৭৮৭ সালে স্বাধীনতালাভের সামান্য কিছু দিন পরেই। সে সময়ে পালতোলা জাহাজেই এই দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই ব্যবসায় প্রধানত চলত আমেরিকার বস্টন ও সালেম বন্দর এবং ভারতের কলকাতা বন্দরের মধ্যে। মার্কিন জাহাজগুলি সেদিন ব্যবসায় করতে এসে ভারত থেকে শুধুমাত্র মশলা, নীল এবং কাপড়ই নিয়ে যায়নি, নিয়ে গিয়েছে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, পুঁথিপত্র আর দার্শনিক চিন্তাধারা।

নিউ ইংল্যান্ডের চিন্তানায়কদের ওপর ভারতের মহান ধর্মসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। খৃষ্টধর্মের সদ্গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন রামমোহন। হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্মের মূলে বিধানগুলির মিল ও সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিশেষ চিন্তা করতেন তিনি। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সুন্দর আলোচনার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে শুধু বলা চলে যে, হিন্দুদর্শন সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা বিগত শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে নিউ ইংল্যান্ডে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এমার্সন, থোরো প্রমুখের যোগসূত্র গবেষণাসাপেক্ষ নয়। এ হল এমার্সন-থোরোর রসজ্ঞ পাঠকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, তর্ক দিয়ে তা সপ্রমাণ হয় না। এই দুই মার্কিন লেখক, এবং সেকালের আরও অনেক স্বল্পখ্যাত লেখক-লেখিকার মনে এসেছিল পরমাত্মা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টিলাভের স্পৃহা যা দেখা যায়নি তাঁদের কঠোর পিউরিটান পূর্বপুরুষদের মধ্যে। অতীন্দ্রিয়বাদের বিস্ময় পেয়ে বসেছিল তাঁদের। মার্কিন সংস্কৃতির নানা বিষয় উদ্বেল করে তুলেছিল এই আধ্যাত্মিকতাবাদের ঢেউকে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল কোয়েকারবাদ এবং সমগোত্রীয় প্রোটেস্ট্যান্ট অতীন্দ্রিয়বাদ, একেশ্বরবাদের (ইউনিটারিয়ানিজম) অভ্যুদয়, তৎকালীন আমেরিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্য জগতের রোমান্টিক আন্দোলন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে, এমার্সন এবং থেরোর মানসিক গতিপ্রকৃতি ছিল প্রাচ্য দেশের অতীন্দ্রিয়বাদী ও আদর্শবাদী দর্শন গ্রহণের অনুকূল।

পাশ্চাত্য জগতের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে র‍্যালফ ওয়াল্ডো এমার্সনই প্রথম হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির মর্ম অনুধাবন করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, তাঁর চিন্তাধারার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে প্রাচ্য দেশের সাহিত্য ও দর্শন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এমার্সনের কয়েকটি রচনায় এই প্রভাব সম্যকরূপে প্রতিভাত। তাঁর ব্রহ্ম নামক কবিতাটিতে কঠোপনিষদ এবং গীতার মর্ম সুন্দরভাবে প্রকাশিত। আবার হামাত্রেই কবিতাটিতে হিন্দুধর্মের অনুশাসনের সন্ধান মেলে। 'দি ওভার সোল' এবং 'ইলুৎসন্স' নামক প্রবন্ধ-দুটি ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট এবং তাঁর জার্ণালে ভারতীয় সাহিত্যের উদ্ধৃতি রয়েছে সর্বত্র।

এমার্সনের সুবিস্তারী ভাবধারায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব নিঃসন্দেহে বর্তমান, তবে নির্দিষ্টরূপে সেই প্রভাব নির্ণয় করা দুরূহ। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সুসম্বদ্ধ নয়, নানা সূত্রে তিনি সেগুলি আহরণ করেছিলেন। তবে এমার্সন কিম্বা থোরোকে ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের নিয়মনিষ্ঠ ধারক মনে করাটা বিশেষ ভ্রমাত্মক হবে। তাঁরা ছিলেন আমেরিকার ট্রাডিশনে অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। এমন অবস্থায় প্রাচ্যের জীবনধারা পুরোপুরি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁদের পক্ষে।

ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে এমার্সন ও থোরোর সম্পর্ক যতটা প্রত্যক্ষ, ওয়াল্ট হুইটম্যানের ক্ষেত্রে তা নয়। তাঁর অদ্ভুত প্রাণমাতানো কবিতায় পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, তাঁর দর্শনের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈদান্তিক মতবাদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এমার্সন ছিলেন হুইটম্যানের কিছু বড়। তিনি হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা-সঙ্কলন 'লীভস অব গ্রাস' সম্পর্কে বলেছিলেন যে, গীতা ও নিউইয়র্ক হেরাল্ডের সংমিশ্রণ ঘটেছে এতে। আর থোরো বলেছিলেন যে, অদ্ভুতভাবে প্রাচ্য দেশীয় কবিতার মত এগুলি।

হুইটম্যানের সমসাময়িক ছিলেন, 'মবিডিক'-এর রচয়িতা হারম্যান মেলভিল। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চল সম্পর্কে সবিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর তবে হিন্দুপুরাণ থেকেও সাহিত্যের রসদ আহরণ করেছিলেন তিনি। 'মবিডিক' গ্রন্থে মেলভিন ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হিন্দুরা তিমিকে বিষ্ণুর অবতার, মৎস্য অবতার জ্ঞান করে।

মেলভিন, এমার্সন, থোরো ও হুইটম্যানের মত বিশিষ্ট ছিলেন না অ্যামোস ব্রনসন আলকর্ট (১৭৯৯—১৮৮৮)। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় ভারতীয় চিন্তাধারার প্রচারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশিষ্ট। আমেরিকায় এড্‌ইন আর্নল্ড লিখিত "লাইট অব এশিয়া" প্রকাশের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮৮০ সালে। উপর্যুপরি ৮০টি সংস্করণ বেরিয়েছে এই জনপ্রিয় বইটির।

মার্কটোয়েন-এর ওপর ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব ছিল এমন কথা বলা যায় না। তবে ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বেশ শিক্ষাপ্রদ। আমেরিকার এই জনপ্রিয় লেখক ১৮৯৫ সালে ভারতে এসেছিলেন। 'ফলোইং দি ইকুয়েটর' নামক গ্রন্থেই তিনি কলকাতা ও বোম্বাই উত্তরভারত ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। হিন্দুদের আচার-আচরণ ও ট্রাডিশন, বিশেষ করে বারাণসীতে যা দেখেছিলেন, মুগ্ধ করেছিল তাঁকে।

আধুনিক যুগের মার্কিন লেখকদের সাহিত্যকর্মে ভারতের প্রভাবের মূল্যায়ন অনেক গবেষণাসাপেক্ষ। যা কিছু জান গিয়েছে, তাতে বর্তমান যুগের একজন সাহিত্যিকের নাম করা যায় এ প্রসঙ্গে। তিনি হলেন টি এস এলিয়ট। জন্মসূত্রে আমেরিকান, পরে স্বেচ্ছায় বৃটিশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তিনি। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় ধারার প্রভাব ছিল না তাঁর উপর, বরং তিনি ছিলেন গোঁড়া খৃষ্টান। তবে তাঁর বিখ্যাত 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' এবং 'ফোর কোয়ার্টেটস' কবিতা দুটিতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

॥ চিত্রকলার চারটি প্রদর্শনী ॥

গত ২২শে জানুয়ারী ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে শ্রীমতী করুণা সাহার এবং পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে হিন্দী হাই-স্কুলের ছাত্রদের চিত্রকলার দুটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এ-ছাড়া ১৮ই জানুয়ারী থেকে ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলার পর শিল্পী মুরারী গুহের একটি প্রদর্শনীরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি প্রদর্শনীর কথাও কলকাতার শিল্পরসিক মানুষদের গোচরে আনার প্রয়োজনবোধ করছি। এই প্রদর্শনীটি ছিল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ইতালীর শিল্পাচার্যদের চিত্রকলার প্রতিলিপির প্রদর্শনী। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশানস-এর কর্তৃপক্ষ। এই প্রদর্শনীটিও ১৬ই জানুয়ারী থেকে ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত আর্টিস্ট্রি হাউসের প্রদর্শনী-কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতালীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার প্রতিলিপির প্রদর্শনী

ইতালীর শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের চিত্রকলার প্রতিলিপির প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে এ-বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিমধ্যে এই প্রদর্শনীটি বোম্বাই, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং কাঠমন্ডু ঘুরে এসেছে। এতকাল যে-সব শিল্পীর জগৎজোড়া খ্যাতির সঙ্গেই শুধু আমরা পরিচিত ছিলাম, তাঁদের চিত্রকলার প্রতিলিপি দেখে উপলব্ধি করতে পারলাম কী বিরাট শিল্প-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ইতালীর এই শিল্পাচার্যেরা। এই প্রদর্শনীতে বোত্তিচেল্লী কিংবা লিওনার্দোর কোন প্রতিলিপি ছিল না কিন্তু মাইকেলাঞ্জেলো, রাফায়েল, কোরিজ্জিও, কারা রোজ্জিও, জিওভান্নীর মত শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের চিত্রকলার প্রতিলিপি স্থান পেয়েছিল। প্রতিলিপিতে যেটুকু বোঝা গেল তাতেই আমরা অনুমান করতে পারি মূল চিত্রে এইসব মহান শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা এবং শিল্প-নৈপুণ্যে কী অসাধ্য সাধন করে গেছেন। প্রতিটি চিত্রের ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি অপূর্ব রঙে আর রেখায় এমন মুখর হয়ে উঠেছে যা দেখলে মুগ্ধ না হয়ে

প্রদর্শনী

কলারসিক

পারা যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তাই এই সব চিত্রের আবেদন বিশ্বমানুষকে মুগ্ধ করে আসছে। প্রদর্শনীটি আরও একটু ভালভাবে এবং একটু বেশিদিন কলকাতায় চালু থাকলে আমরা খুশি হতাম। কলকাতার পরে এই প্রদর্শনী অতঃপর দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি শহরে প্রদর্শিত হবে।

।। শ্রীমতী করুণা সাহার প্রদর্শনী ।।

শ্রীমতী সাহা কলকাতার শিল্প-রসিকদের কাছে সুপরিচিতা। ইতালীতে দীর্ঘ দুই বৎসর শিল্পচর্চা শেষ করে তিনি আবার দেশে ফিরে এসেছেন। ইতালী পরিভ্রমান্তে আরও কয়েকজন বাঙ্গালী শিল্পী এদেশে ফিরে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তাঁদের

শিল্পীঃ রাফায়েলের অঙ্কিত দুটি চিত্র

শিল্পধারার সঙ্গে শ্রীমতী সাহার শিল্পধারার একটি মৌলিক পার্থক্য এবার লক্ষ্য করা গেল। ইতালী-প্রত্যাগত অধিকাংশ শিল্পী বিমূর্ত শিল্প-চেতনাকে তাঁদের সাম্প্রতিক চিত্রকলায় প্রকাশ করতে উৎসুক কিন্তু শিল্পী সাহা বিমূর্ততার নামে এমন কিছু করেননি যা আমাদের মনকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে দেশীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি বিমুখ করে তোলে। বরং বলা যায়, আঙ্গিকের দিক থেকে শ্রীমতী সাহা কিউবিজমের অনুসারী হলেও তাঁর সামগ্রিক চিত্র-পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং রঙ ব্যবহারের কৌশল আমাদের দেশীয় শিল্প-ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইতালীতে থেকেও উগ্র আধুনিকপন্থী না হয়ে আসার অন্যতম কারণ বোধহয় শিল্পী সাহার ফ্লোরেন্স অঞ্চলে অবস্থান। ইতালীর ফ্লোরেন্স অঞ্চলেই নাকি আজও ক্লাসিক শিল্পচর্চাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। মিলান বা রোমের মত ফ্লোরেন্স বোধহয় এখনও তথাকথিত আধুনিক শিল্পচর্চায় অতবেশি মুখর হয়ে উঠতে পারেনি।

যাহোক, যে কারণেই হোক, শ্রীমতী সাহার প্রদর্শনী দেখে আমরা সহজ-সরল জীবননিষ্ঠ এবং আঙ্গিককলায় পারদর্শিনী এক শিল্পীকে খুঁজে পেয়েছি। তাঁর চিত্রের জমিনে জ্যামিতিক রেখা ভেদ করে যে নরনারীর মূর্তি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে বাঙালী-জীবনের ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে। 'ফুল হাতে নারী' (৬), 'ম্যাডোনা' 'গল্প-গুজব' (১৩) প্রভৃতি চিত্রের জ্যামিতিক রেখার মধ্যে চমৎকার রঙে বাঙালী নারীরই মুখ আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। তাঁর মোটা রেখাগুলি সমগ্র চিত্রকে শুধু প্যাটার্ণে বাঁধেনি দেহাবয়বকেও বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছে। এ-ছাড়া 'চাঁদ এবং নৌকা' (১), 'সম্মিলন' (১৫), 'তাস খেলা' (৫) প্রভৃতি চিত্রের কম্পোজিশান সত্যি সুন্দর। তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত ১৯খানি চিত্র ছাড়া জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত ৭খানি চিত্রও দর্শকদের মন আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। ইতালীর ফ্লোরেন্স অঞ্চলের নিসর্গ দৃশ্যই এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু। কিন্তু আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে শিল্পী সাহা এগুলিকে রূপায়িত করেছেন। চমৎকার চিত্র-সংস্থাপনে এবং ফিকে নীল, হলুদ ও সামান্য কালো রঙ প্রয়োগে এমনভাবে চিত্রগুলিতে আলো-ছায়ার আভাস, ঘনত্ব

শিল্পী : করুণা সাহা

ও দূরত্বকে পরিস্ফুট করা হয়েছে যে, শ্রীমতী সাহার শিল্প-নৈপুণ্যকে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। নিসর্গ দৃশ্যের মধ্যে 'কুসকানী' (২৩), 'বরফ-ঢাকা পার্ক' (২২), 'ভায়া বোলোগনা' (২৫), 'গৃহ-শীর্ষ' (২৬) নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। চারকোল ও কালি-কলমে অঙ্কিত চারখানি স্কেচও আমাদের ভাল লেগেছে। আশা করি শ্রীমতী সাহা তাঁর জীবন-নিষ্ঠ শিল্প-চেতনাকে তথাকথিত বিমূর্ত শিল্পচেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন না করে তাঁর নিজস্ব পথে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হবেন।

।। শিল্পী মুরারী গুহের প্রদর্শনী ।।

আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী মুরারী গুহের প্রদর্শনীতে ৪০টি শিল্প-নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। এর মধ্যে তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র ছিল ১৬খানি, জলরঙের মাধ্যমে ২০খানি এবং প্যাস্টেলে অঙ্কিত চিত্র ছিল ৪ খানি। শিল্পী মুরারী গুহ প্রথানুসারী শিল্পী। এই প্রথম প্রদর্শনীতেই তিনি তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তেল-রঙে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে 'বোম্বাই ডক' (১), 'বাঁক' (৪), 'ঘুম' (৬), 'সাইডিং' (১০), 'ছাদের উপর' (১২), 'মাছধরা নৌকা' (১৫) ও 'ওয়াগন' (১৬) প্রশংসনীয় কাজ। এগুলির অনুজ্জ্বল রঙ এবং চিত্র সংস্থাপনের মধ্যে শিল্পী গুহের নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। জল-রঙের কাজের মধ্যে ট্রান্সপারেন্সি রাখার চেষ্টা করলেও অধিকাংশ চিত্র সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। কয়েকটি ব্যতিক্রমের মধ্যে 'জেলেদের গ্রাম' (২০), 'দুপুর' (২২), 'মতি দরজা' (২৭), 'মধ্যাহ্ন' (৩২) ও 'পুরী' (৩৪) চিত্রেরই নাম করা যায়। প্যাস্টেলে অঙ্কিত ৪টি চিত্রই প্রতিকৃতি-চিত্র। ৩৭নং প্রতিকৃতি-চিত্রে লাল, হলুদ ও কালো রঙের ব্যবহার এবং ড্রয়িং সত্যি সুন্দর। শিল্পী মুরারী গুহ প্রথম প্রদর্শনীতে যে সাফল্য অর্জন করেছেন ভবিষ্যতে সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের আরো সুন্দরতর চিত্রসম্পদ উপহার দেবেন, এ-আশা করা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

শিল্পী : এস, কে, সিরোহিয়া

।। হিন্দী হাইস্কুলের প্রদর্শনী ।।

হিন্দী হাইস্কুলের ছাত্রদের সম্মিলিত প্রদর্শনী দেখে আমরা অন্যতর স্বাদ পেয়েছি। এই প্রদর্শনীতে শুধু চিত্রকলার নিদর্শন ছিল না, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পেরও অনেকগুলি নিদর্শন স্থান পেয়েছিল। শিশুমনের কল্পনার রঙে তাদের নিত্যদেখা ঘটনা ও জীবন চমৎকারভাবে চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। আট বৎসর বয়স থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়সের প্রায় অর্ধশতাধিক শিশু-শিল্পীর এই প্রদর্শনী ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাদের অন্য এক সহজ-সরল কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের স্কুলের জীবন, খেলা-ধুলা, জীবজন্তু সরল রেখা ও রঙে বড়দের মনকেও আকৃষ্ট করেছে। হয়তো ড্রয়িং নিখুঁত না, রঙ একটু চড়া কিন্তু সব মিলে এমন কয়েকখানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছিল যার মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায়। এইসব চিত্রের মধ্যে তেল-রঙে অঙ্কিত পি এস রামনাথনের 'নবরাত্রি উৎসব', আর কে কেজরিওয়ালের 'কাঠের সৈন্য' এবং এন ভি সাহার 'সার্কাস' আমাদের ভাল লেগেছে। জলরঙের চিত্রকলায় অজিত জৈন, ময়ূখ ঘোষ, এস পি এস ভইয়া, পার্থ ঘোষ, রাজেন্দ্র পোদ্দার, ভি কে জয়সিং প্রভৃতি শিশু-শিল্পীরা চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে।

এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে ভাল নিদর্শন হল ভাস্কর্য-শিল্প। কিশোর-শিল্পীরা যে এত নিপুণভাবে খোদাই ও ভাস্কর্যের কাজ করতে পারে এ না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর কে কেজরিওয়ালের দারুনির্মিত 'ছুটন্ত খরগোস', এস কে সিরোহিয়ার 'গোয়ালিনী' কিংবা বি কে শেধিয়ার 'কাঠবিড়ালী' সত্যি সুন্দর। এ-ছাড়া সিমেন্টের একটি ভাস্কর্য-নিদর্শন ছন্দময় গতিবেগে এবং নিপুণ ভাস্কর্যকলার নিদর্শনরূপে যে কোন প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। এটির নাম 'বাউন্ডারী' এবং স্রষ্টা তেরো বৎসরের কিশোর এস কে সিরোহিয়া। আমরা হিন্দী স্কুলের এই প্রশংসনীয় কর্মোদ্যমের জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী : মুরারী গুহ

॥ কলম্বো প্রস্তাব ॥

কমিউনিস্ট চীনের শেষ চালটা যে এভাবে ব্যর্থ হবে তা হয়ত সে ভাবতে পারেনি। তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, কলম্বো প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হতেই প্রত্যাখ্যাত হবে। একারণে এতদিন ঐ প্রস্তাবটির প্রতি "ইতিবাচক" (positive) সাড়া দিয়েই সে মুখ বন্ধ করে ছিল। কিন্তু ভারত বহু কিছু প্রতিবাদ্য বিষয় থাকা সত্ত্বেও যখন শান্তি ও সৌহার্দ্যের তাগিদে সে প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করল তখন চীনের পক্ষে তার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর রইল না। ঘানার আইন মন্ত্রী শ্রীওফরি আট্টার সম্বর্ধনা-সভাতেও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ বলেছিলেন কলম্বো প্রস্তাবকে মীমাংসা আলোচনার ভিত্তিরূপে মেনে নিতে চীন সম্মত আছে। কিন্তু ভারতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রধনমন্ত্রী নেহরু যখন প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন তখনই কলম্বো প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক পত্রযোগে জানালেন চীন কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করেনি।

গত ২৩শে জানুয়ারী সংসদে প্রধানমন্ত্রী নেহরু এ সম্পর্কে জানান যে, শ্রীমতী বন্দরনায়েককে পত্রযোগে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারত নীতিগতভাবে কলম্বো প্রস্তাব সব্যাখ্যা গ্রহণে সম্মত। কিন্তু চীন যদি সব্যাখ্য কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ না করে তবে ভারত ও চীনের প্রতিনিধিদের মধ্যে উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে আদৌ কোন বৈঠক বসবে না।

কলম্বো প্রস্তাব চীন মেনে নিলে তাদের লদাক অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার বর্গমাইল স্থান ত্যাগ করতে হ'ত। গত বছরের ৮ই সেপ্টেম্বরের পর তারা ভারতের অভ্যন্তরে যতগুলি স্থান জবরদখল করেছিল তার মধ্যে দেহ্‌রা ও গলওয়ান উপত্যকার দুটি ঘাঁটি ছাড়া আর সবই তাদের ত্যাগ করতে হ'ত। কিন্তু তাতে ভারতের উৎফুল্ল হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। কারণ তারপরেও লদাক অঞ্চলে প্রায় সাড়ে এগার হাজার বর্গমাইল স্থান চীনাদের অধিকারে থেকে যেত। পূর্বে নেফা অঞ্চলে প্রায় ম্যাকমেহন লাইন পর্যন্ত ভারতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও ঢোলা ও লংজু ভারতের অধিকারের বাইরে থাকত। কিন্তু চীন এমন সুবিধাজনক প্রস্তাবেও সম্মত হতে পারল না।

ভারতের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ খুব বেশী সম্মানজনক ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে ভারত আলোচনার পূর্বসর্তস্বরূপ ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের স্থিতাবস্থায় চীনা ফৌজ প্রত্যাহারের যে দাবী জানিয়েছিল কলম্বো প্রস্তাবে তা পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি। তবুও যে ভারত এ প্রস্তাবে সম্মত হল এবং চীন হল না তাতে আর একবার পৃথিবীর সকল দেশের কাছে চীনের আক্রমণাত্মক ভয়ংকর রূপটি প্রকাশ পেল। তবে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়ার কারণ বোধহয় এখনও ঘটেনি। কারণ ২৩শে জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ সুবান্দ্রিও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমন্ত্রণে আগামী সপ্তাহে নয়াদিল্লী আসছেন। পিকিং-এ সিংহল ও চীনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যখন আলোচনা হয় তখন ডঃ সুবান্দ্রিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং চীন ও ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান সৌহার্দ্যের সম্পর্কও সুবিদিত।

॥ ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব ॥

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচাবন গত ২১শে জানুয়ারী লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে চীনের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতির সর্বশেষ সরকারী হিসাব পেশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন: ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর চীনের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হওয়ার পর হতে ১৯৬২ সালের ২১শে নভেম্বর চীনের একতরফা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার দিন পর্যন্ত ভারতের পক্ষে নিহত, আহত ও নিখোঁজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৪৮৮। এদের মধ্যে নেফা ও লদাক রণাংগনে নিহতের সংখ্যা ৩২২ ও আহত ৬৭৬ জন। নিখোঁজ ৫,৪৯০ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩,৩৫০ জনের অবস্থা জানতে পারা গেছে। এরা সকলেই চীনা ফৌজের হাতে বন্দী হয়। তার মধ্যে ৪৫৫ জন বন্দীকে চীন সরকার ইতিমধ্যেই আহত বা সুস্থ অবস্থায় ভারত সরকারের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। ২,৯৪৫ জন ভারতীয় সৈন্য এখনও চীনাদের হাতে বন্দী আছে। অবশিষ্ট ২,১৪০ জন ভারতীয় সৈন্যের এখনও পর্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

হয়ত তাদের মধ্যে কেউ কেউ একদিন উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা অবস্থায় ফিরে আসবে। কিন্তু অধিকাংশেরই আর কোনদিন কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞায় কোন পর্বতকন্দরে বা অজ্ঞাত অরণ্যে রক্তস্নাত অবস্থায় বুকফাটা তৃষ্ণা নিয়ে তারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে, এদেশের মানুষের কাছে সে তথ্য চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে যাবে।

॥ ভারতের শান্তিনীতি ॥

মস্কোস্থ ভারতীয় দূতাবাসে এক সম্বর্ধনা সভায় সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ আঁদ্রে গ্রোমিকো বলেন, ভারতের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি ও জোটনিরপেক্ষতা সময়ের পরীক্ষায় অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, ভবিষ্যতেও ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মৈত্রীবন্ধন অটুট থাকবে এবং মিঃ ক্রুশ্চেভ ও শ্রীনেহরুর দ্বৈত উদ্যোগে বিশ্বশান্তির পথ আরও সুগম হবে।

সম্বর্ধনা সভায় মিঃ গ্রোমিকো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনোভস্কি, বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ নিকোলাই পাতোলিশেভ প্রমুখ সোভিয়েট সরকারের বিশিষ্ট সদস্যগণ। ঐ সভাতেই প্রকাশ পায় যে, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বর্তমানে বাৎসরিক বাণিজ্যিক লেনদেন হয় ৭০ কোটি হতে ৮০ কোটি টাকা। এই বছরে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ কোটি টাকা দাঁড়াতে পারে।

অপর এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলির সংগে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। গত বছরে চীনের সংগে কমিউনিস্ট দেশগুলির বাণিজ্যিক লেনদেন প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই থেকেই বোঝা যায় যে, এক সর্বনাশা নীতি অনুসরণ করে চীন কিভাবে অপরের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করছে।

॥ প্রতিশ্রুতি ॥

পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ। তিনি প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে, পশ্চিম বার্লিনকে তিনি কখনও আক্রমণ করবেন না। এবং এ ব্যাপারে কেনেডির কাছে তিনি এই মর্মে আবেদন জানিয়েছেন যে, কিউবার ব্যাপারে তিনি যেমন প্রেসিডেন্ট কেনেডির প্রতিশ্রুতিতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছেন, পশ্চিম বার্লিনের নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতিতেও প্রেসিডেন্ট কেনেডি যেন সমরূপ আস্থা রাখেন। এই প্রসংগে তিনি এই মর্মে সুপারিশ জানিয়েছেন যে, পশ্চিম বার্লিনের শাসনব্যবস্থা অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রসংঘ-পরিচালিত এক সৈন্যবাহিনীর উপর অর্পণ করা হোক। এ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট কেনেডির অভিমত এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

॥ পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ ॥

পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের কাজ হঠাৎ বেশ খানিকটা অগ্রসর

হয়েছে। ইতিপূর্বে সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ আন্তর্জাতিক সরেজমিন প্রহরার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় এ সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায় এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই নতুন করে পুর্ণোদ্যমে প্রচন্ড শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করে দেয়। কিন্তু সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে জানিয়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়নে বৎসরে অন্তত তিনবার সরেজমিন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি সম্মত আছেন। অবশ্য প্রেসিডেন্ট কেনেডি মিঃ ক্রুশ্চেভকে জানিয়েছেন যে, তাঁদের সর্বনিম্ন পর্যবেক্ষণের দাবী অন্তত আটটি। ভূগর্ভস্থ পরীক্ষা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার প্রয়োজনেই তাঁরা সারা বছরে অন্তত আটবার সোভিয়েট ইউনিয়নে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করতে চান। তবুও, মিঃ ক্রুশ্চেভ সরেজমিন তদন্তের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন বলে প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁকে অভিনন্দন জানান ও এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে, সোভিয়েট নেতার প্রস্তাব পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রয়াসে অবশ্যই সহায়ক হবে। ক্রুশ্চেভও প্রেসিডেন্ট কেনেডির পত্রের উত্তরে তাঁর দ্বিতীয় পত্রে বলেছেন, সামনা-সামনি আলোচনাকালে পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত প্রশ্নে মতৈক্য ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব নিয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যে আলোচনা হবে সে আলোচনায় ইংলন্ডও যোগ দিতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের মনোভাব এখনও অজ্ঞাত। তবে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হতে পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ আলোচনায় ফ্রান্সকে যোগ দিতে হবে বলে দাবী জানানো হয়েছে। বিশ্বের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে উভয়পক্ষ হতে বর্তমানে যে আগ্রহ দেখানো হচ্ছে তাতে মনে হয়, অনতিবিলম্বেই এই পৃথিবী হতে যুদ্ধের অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর হবে।

॥ ফ্রান্স-জার্মাণী মৈত্রী ॥

সম্প্রতি প্যারিসে জার্মানীর চ্যান্সেলর ডঃ আদেনিউর ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট দ্য গলের মধ্যে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঐ চুক্তি স্বাক্ষরান্তে বলা হয়েছে, এতদ্দ্বারা ফ্রান্স ও জার্মানীর শতাব্দীকালের বৈরিতার অবসান ঘটানো হল। ১৮৭০ সালে হয়েছিল ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ। তারপর—বিগত প্রায় শতাব্দীকালের মধ্যে আর কখনও তাদের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরকালে ৮৭ বছর বয়স্ক জার্মান চ্যান্সেলর ও ৭২ বছর বয়স্ক ফরাসী প্রেসিডেন্ট পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন ও উভয় গন্ডে পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করার পর তাঁরা ঐ ঐতিহাসিক দলিলের স্বাক্ষর-স্থান

এলেসি প্রাসাদের অপর কক্ষে প্রবেশ করেন।

প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মুখবন্ধে ঘোষিত উদ্দেশ্য অবশ্যই মহান। কিন্তু স্বাধীন ও সংযুক্ত ইউরোপ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য খুব স্বস্তিকর নয়। ফ্রান্সের বর্তমান সৈনিক প্রেসিডেন্ট দ্য গলের স্বপ্ন হৃতগৌরব ফ্রান্সকে জার্মানীর সহায়তায় পশ্চিম ইউরোপের অদম্য শক্তিতে পরিণত করা। একারণে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের যতটা বিরোধী, পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রভাব বিস্তারেও প্রায় সমরূপে বিরোধী। এই কারণেই বৃটেনকে তিনি ইউরোপের অভিন্ন বিপণিমন্ডলে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য বিরোধিতা করতেও দ্য গল দ্বিধাবোধ করেননি। তবে দ্য গল জানেন যে, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ইতালী প্রভৃতি অভিন্ন বিপণিমন্ডলীর অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধতা করে দুর্বল ফ্রান্সের নেতৃত্ব মেনে নেবেন। এ কারণেই দ্য গল তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে দুর্ধর্ষ জার্মানীকে তাঁর দোসর করতে চান। নানা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতায় জার্মানীর পক্ষে আজ শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং ফ্রান্সের সহযোগিতায় যদি সে বড় হতে পারে তার সুযোগ সে অবশ্যই নেবে। আর এইভাবে ফ্রান্স ও জার্মানী যদি মিলিত উদ্যোগে প্রচন্ড শক্তির অধিকারী হয়ে উঠতে পারে, তবে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য স্বল্প শক্তিসম্পন্ন দেশগুলি নিরুপায় হয়েই তাদের প্রভাব স্বীকার করে নেবে।

॥ কঙ্গো ॥

রাষ্ট্রসংঘের দৃঢ়তায় ও শোম্বের নীতি স্বীকারে কঙ্গো সমস্যার সমাধান হতে চলেছে বলে মনে হয়। কাতাঙ্গায় শোম্বের শেষ ঘাঁটি কলওয়েজিতে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী সম্পূর্ণ বাধাহীন অবস্থায় প্রবেশ করেছে এবং শোম্বে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করেছেন। বর্তমানে কাতাঙ্গা সম্পূর্ণরূপে কঙ্গোর কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু শোম্বে যেভাবে হঠাৎ সুবোধ বালকের মত রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এবং শোম্বের সমর্থক বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ হঠাৎ এ ব্যাপারে যে রকম নীরব হয়ে গিয়েছে তাতে অনেকেরই সন্দেহ হচ্ছে যে ঘটনাটা সাদা চোখে যতটা ভাল বলে মনে হচ্ছে আসলে হয়ত তা নয়। গোপনে নিশ্চয়ই শোম্বেকে কোন সুবিধাজনক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এবং কঙ্গোর ঐক্য যখন সম্পূর্ণ হবে তখন নিশ্চয়ই এই বিচ্ছিন্নতাকামী শ্বেতাঙ্গ-পুষ্ট নেতাটিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হবে। এ সন্দেহ যদি সত্য হয় তবে শোম্বে যে ভবিষ্যতে আবার কঙ্গোর সমস্যা হয়ে দাঁড়াবেন তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যেতে পারে। কাতাঙ্গার উপর আবার কর্তৃত্ব বিস্তারের সামান্যতম সুযোগও যদি শোম্বেকে দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে যে, কঙ্গো সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। একারণে এখন থেকেই বিভিন্ন সূত্র থেকে রাষ্ট্রসংঘের কাছে এই মর্মে দাবী জানানো হয়েছে যে, লুমুম্বা হত্যার অপরাধে অপরাধী শোম্বের বিচার করা হোক।

২৪-১-৬৩

॥ ঘরে ॥

১৭ই জানুয়ারী—৩রা মাঘ ঃ বিশ্বপথিক স্বামী বিবেকানন্দের দেশব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সাড়ম্বর উদ্বোধন—কলিকাতা ও শহরতলীতে (বেলুড় মঠ সহ) সর্বত্র জন্মলগ্নে শুভ শঙ্খধ্বনি, প্রভাতফেরি, সভা ও শোভাযাত্রার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান—কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রকে স্মারক-প্রস্তরফলক স্থাপন।

'স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সর্বকালের সর্বোত্তম রাষ্ট্রদূত'—নয়াদিল্লীর জন্মশতবার্ষিকী সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য—সংকট মুহূর্তে সমগ্র জাতিকে কর্মযোগী স্বপ্নদ্রষ্টা মহাত্মার দৃষ্টান্ত গ্রহণে আহ্বান।

কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা চেষ্টায় দিল্লীতে ভারত-পাকিস্তান মন্ত্রী ও অফিসার পর্যায়ে পুনরায় বৈঠক।

১৮ই জানুয়ারী—৪ঠা মাঘ ঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৯৬৩-৬৪ সালে ১৬৯৪ কোটি টাকা ব্যয়—জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদন—কেন্দ্রীয় খাতে ৯৪৪ কোটি টাকা ও রাজ্য খাতে ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

ভারত-পাক বৈঠকের (দিল্লী) তৃতীয় দিনেও কাশ্মীর প্রসঙ্গের আলোচনা অসমাপ্ত।

'চীনা সৈন্যাপসারণ সম্পর্কে কলম্বো প্রস্তাব ও ভারতের দাবী প্রায় এক'—মার্কিন সাংবাদিকদের নিকট শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

১৯শে জানুয়ারী—৫ই মাঘ ঃ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী ডাঃ জীবনরতন ধরের (৭৪) পরলোকগমন।

কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীর ভারত-পাকিস্তান আলোচনা অমীমাংসিত—করাচীতে ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৬৩) তৃতীয় পর্যায়ের বৈঠক আহ্বান—দিল্লী হইতে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।

২০শে জানুয়ারী—৬ই মাঘ ঃ 'কলম্বো প্রস্তাব ভারতের দাবীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে'—কংগ্রেস সংসদ দলের সভায় (দিল্লী) শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

জাতিকে স্বামীজীর অভী-মন্ত্রে ও জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান—রাষ্ট্রপতি (ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ) কর্তৃক দেশপ্রিয় পার্কে (কলিকাতা) বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উদ্বোধন—রাষ্ট্রপতির উক্তি ঃ বর্তমান সংকটে স্বামীজীর আদর্শই সকল বিপর্যয়রোধে সক্ষম।

বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ও শিক্ষাবিদ্ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের (৮৪) লোকান্তর।

২১শে জানুয়ারী—৭ই মাঘ ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (নেফা) থাগলা ও লংজু ব্যতীত ম্যাকমেহন লাইন স্বীকৃত—থাগলা ও লংজু বেওয়ারিশ থাকিবে'—কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ব্যাখ্যা — প্রধানমন্ত্রী (শ্রীনেহরু) কর্তৃক লোকসভায় ব্যাখ্যা সহ কলম্বো প্রস্তাব পেশ।

চীনাদের সহিত যুদ্ধে নেফা ও লডাক রণাঙ্গনে ৩২২ জন ভারতীয় নিহত, ৬৭৬ জন আহত ও ৫,৪৯০ জন নিখোঁজ—লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

২২শে জানুয়ারী—৮ই মাঘ ঃ ভারত সরকার কর্তৃক কলম্বো প্রস্তাব 'নীতিগতভাবে' গ্রহণের সিদ্ধান্ত—সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের (কলম্বো সম্মেলনের দূত) নিকট বার্তা প্রেরণ।

তাওয়াং-এ (নেফা) পুনরায় ভারতীয় অসামরিক প্রশাসন কায়েম—ঘরে ঘরে চীনা দৌরাত্মের চিহ্ন লক্ষিত।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান পরিষদে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলের আলোচনা আরম্ভ—বিরোধী পক্ষ কর্তৃক তীব্র সমালোচনা।

২৩শে জানুয়ারী—৯ই মাঘ ঃ 'শত্রুর বিরুদ্ধে আপোষহীন-বিরামহীন সংগ্রামই নেতাজীর মূল বাণী'—মহানায়কের ৬৭তম জন্মদিবসে জাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি—কলিকাতা সহ দেশের সর্বত্র সভা—সমাবেশ ও মিছিলের অনুষ্ঠান।

'চীন কলম্বো প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ না মানিলে আলোচনা হইবে না'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্ক শুরু।

আপৎকালীন প্রয়োজনে শিক্ষার পুনর্বিন্যাসের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা—লোকসভায় নূতন কর্মসূচী পেশ।

ভিভিয়ন কমিশনের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রিপোর্ট প্রকাশ—দশটি কোম্পানীর প্রতিটি অপকর্মের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ডালমিয়াকে দায়ীকরণ।

॥ বাইরে ॥

১৭ই জানুয়ারী—৩রা মাঘ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক কংগ্রেসে দেশের শান্তিকালীন বৃহত্তম বাজেট (৯,৮০০ কোটি ডলার) পেশ—প্রতিরক্ষা ও মহাশূন্য গবেষণা খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ।

এলিজাবেথভিলে রাষ্ট্রসংঘের প্রধানদের সহিত কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট শোম্বের আলোচনা।

১৮ই জানুয়ারী—৪ঠা মাঘ ঃ পূর্ব জার্মান কম্যুনিষ্ট কংগ্রেসে তুমুল হট্টগোল - ভারত-বিরোধী মন্তব্য করিতে যাইয়া চীনা প্রতিনিধি (মিঃ উ সিউ চুয়ান) নাজেহাল।

সীমান্ত-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নামে মার্শাল চেন-ই (চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ভারত-চীন বৈঠকের প্রস্তাব।

বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা মিঃ হিউ গেটস্কেলের (৫৬) জীবনাবসান।

সাধারণ বাজার (ইউরোপীয়) সম্পর্কিত আলোচনায় (ব্রুসেলস) অচল অবস্থা—বৃটেনের যোগদানের প্রশ্নে ফ্রান্সের অব্যাহত বিরোধী মনোভাব।

১৯শে জানুয়ারী—৫ই মাঘ ঃ লডাকে চীনা ফৌজ ২০ কিলোমিটার দূরে অপসারণের অনুরোধ—জোট-বহির্ভূত ষড়-জাতি কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাব প্রকাশ—চূড়ান্ত মীমাংসা সাপেক্ষে নিরস্ত্রীকৃত এলাকা গঠনের জন্য চীন ও ভারতের নিকট সুপারিশ।

২০শে জানুয়ারী—৬ই মাঘ ঃ 'অদূর ভবিষ্যতে চীন পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটাইবে'—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল হ্যারি ডি ফেল্টের বিবৃতি।

চীন ও নেপালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

২১শে জানুয়ারী—৭ই মাঘ ঃ পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের প্রশ্নে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মতৈক্যের আশা—বৎসরে দুই-তিনবার সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে সোভিয়েটের সম্মতি—রুশ প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির মধ্যে পত্র-বিনিময়ের সংবাদ।

রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী কর্তৃক শোম্বের (কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট) শেষ ঘাঁটি (কলওয়েজি অধিকার)—বিনা বাধায় সৈন্যদের ঘাঁটিতে প্রবেশ—রাষ্ট্রসংঘ ব্রিগেডিয়ারের সহিত শোম্বের করমর্দন।

২২শে জানুয়ারী—৮ই মাঘ ঃ ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারাদি সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন—অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও সামরিক শিক্ষার যুগ্ম ব্যবস্থা।

'রাশিয়া পশ্চিম বার্লিন অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইবে না'—মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের আশ্বাস।

২৩শে জানুয়ারী—৯ই মাঘ ঃ পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলির (৫২) ঢাকায় জীবনাবসান।

সিকিম ও ভুটানে চীনা অনুপ্রবেশের সংবাদ।

সমকালীন সাহিত্য

অভয়ংকর

॥ হাউই না তারকা ॥

কলিকাতার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতি পরিষদের সদস্যবৃন্দ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের বাড়িতে সমবেত হয়ে এই বছর শরৎকালে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভার আয়তন সুবৃহৎ না হলেও, সেই সভায় প্রবীণ ও নবীন অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকরা তাঁদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার পর প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্মৃতিকথনের ভঙ্গীতে কয়েকটি কথা বলেন, যা সাহিত্যসেবীমাত্রেরই অবশ্য-জ্ঞাতব্য। দুঃখের বিষয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এই সব সভার বিশদ বিবরণ সব সময় প্রকাশিত হয় না, যদি প্রকাশিত হত, তাহলে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ অনেক অজানা সংবাদ জানা সম্ভব হত। যাই হোক্, আজ জীবনসায়াহ্নে উপনীত এই সর্বজনমান্য সাহিত্যিককে 'জগত্তারিণী পদক' পুরস্কার দান করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এক অমার্জনীয় অপরাধের ত্রুটি স্খালনের চেষ্টা করেছেন। বিলম্বে হলেও একেবারে যে বাদ পড়েনি এই আমাদের সৌভাগ্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বোধ হয় কল্পনা করতে পারেন নি যে, শরৎচন্দ্র তাঁদের ফাঁকি দিয়ে ঘাটের কোঠায় পা দিয়েই পরপারে পাড়ি দেবেন। ডঃ নরেশচন্দ্রকেও তাঁর স্বদেশবাসীর যে সম্মান-দান কর্তব্য ছিল, সে সম্মান প্রদর্শনে তাঁরা কার্পণ্য করেছেন। তার কারণ বাংলাদেশের সাহিত্য-সমাজে দলাদলির ক্ষুদ্রতা বর্তমান।

ডঃ নরেশচন্দ্রকে বাঙালী সাহিত্য-পাঠক শরৎচন্দ্রের পরবর্তী ঔপন্যাসিক হিসাবে বরণ করেছিলেন। বাংলার সাহিত্য-আকাশে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান। শরৎকালের বিত্তবিহীন মেঘকে দেখে যদি আষাঢ়-আকাশের কথা বিস্মৃত হই, তাহলে হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। ডঃ নরেশচন্দ্রকে বিস্মৃত হলে বাঙালী পাঠক-সমাজ সেই অকৃতজ্ঞতার দায়ে অভিযুক্ত হবেন। ডঃ নরেশচন্দ্রকে উল্লেখ না করে বাংলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাসই সম্পূর্ণ হবে না, শরৎচন্দ্র ও পরবর্তীদের মধ্যে তিনি এক অবিস্মরণীয় সংযোগসেতু।

'শুভা', 'শাস্তি', 'পাপের ছাপ', 'ব্যবধান' প্রভৃতি ষাটখানা জনপ্রিয় এবং বহুল-আলোচিত গ্রন্থের লেখক ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যে
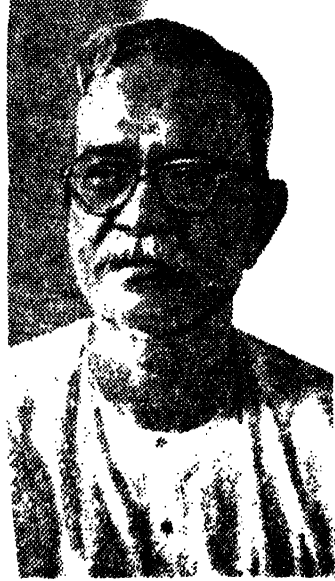
ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯১৯-এ। তারপর দীর্ঘকাল নিরলস সাধনায় তিনি বঙ্গভারতীর সেবা করেছেন। আশ্চর্য দুঃসাহস ও নির্ভীকত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর উপন্যাসে এবং সেই কারণেই তিনি চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ সেদিন নরেশচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তিকে অভিনন্দিত করেছিলেন এক বিস্ময়কর প্রতিভা আবিষ্কার করে। তারপর একদিন কখন নিঃশব্দে নরেশচন্দ্র কলম তুলে রেখেছেন, তা বাংলা সাহিত্যের পাঠক লক্ষ্য করেনি। চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। এই সেদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হয়েছেন, ধীরে ধীরে তাঁকে কি পাঠকরা বিস্মরণের কূলে বিসর্জন করছেন না? আর কিছুকাল পরে হয়ত শুধু সাহিত্য-গবেষকরাই তাঁকে স্মরণে রাখবেন।

এই রকমই হয়, এ নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। ধাবমান কাল নিত্যনূতনের জয়গানে মুখর। তাই পুরাতনকে সহজেই মন থেকে মুছে ফেলা যায়। এর জন্য খানিকটা দায়ী আমাদের প্রকাশকরা। এ-দেশে আজো ক্লাসিক সাহিত্য-প্রকাশের কোনো আয়োজন নেই।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সাহিত্য-প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসিনি। আলোচ্য বিষয় তিনি তারকা না হাউই। "মধ্যবিত্ত" নামক অধুনালুপ্ত এক সাহিত্যপত্রের সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরে নরেশচন্দ্র বলেছিলেন—"সাহিত্যাকাশের তারকা আমি হইনি, কিন্তু হাউই হয়েছিলাম। এটা আমার জীবনের একটা সাধারণ নিয়ম। আমার প্রত্যেক চেষ্টাই প্রথমে বেশ সাড়া জাগায়। কিন্তু শেষে সে-সাড়া বিলুপ্ত হয়ে যায় হাউইয়ের আগুনের মত।

"একদিন আমার লেখা নিয়ে একদিকে রব উঠেছিল—আমি যুগ-প্রবর্তক, আর একদিকে আমি একটা সমাজধ্বংসী দৈত্য বলে রাশি রাশি গালি বর্ষিত হয়েছিল। আজ সবাই নীরব। আমার হাউইয়ের আগুন নিভে গেছে।"

আগুন কোনোদিন নেভে না, রাজনীতি, সাহিত্য ও পুরাতন প্রেমের আগুন নাকি কখনো নেভে না। নরেশচন্দ্রেরও নেভে নি। তাঁর শেষতম রচনা "আমি ছিলাম" বাংলা সাহিত্যে অতি কম-পঠিত একখানি উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রমাণ করে তিনি বীতবহ্নি নন, আজো তিনি পূর্ণ-পাবকরূপে প্রজ্বলিত।

শুধু কি সফল উপন্যাস রচয়িতা হিসাবেই ডঃ সেনগুপ্ত স্মর্তব্য? বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জ্যোতিষ্ক? বোধ হয় নয়। ডঃ সেনগুপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষার এক স্মরণ-চিহ্ন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বগুড়ায় তাঁর জন্ম, ১৯০৫-এ তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের ব্যবহার-নীতি ও সমাজ-

নীতি বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টর-অব-ল উপাধি লাভ করেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সফল আইনজীবী, ১৯৫০-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক পদে সম্মানিত, ১৯৫১-তে ইউনেস্কোয় আইন-বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমন্ত্রণ লাভ আর ১৯৫৬-তে 'ভারতীয় আইন কমিশনের' সদস্য-পদ লাভ—যে-কোনও ব্যক্তির জীবনেতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনাপ্রবাহ। কর্ম-জীবনের এই সাফল্য দ্বারা নরেশচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকৃত। যদি অখণ্ডভাবে তিনি শুধু সাহিত্য-সাধনা করতেন, তাহলে হয়ত বঙ্গ-সরস্বতী অধিকতর সমৃদ্ধ হত।

ডঃ নরেশচন্দ্র বলেন—'আমি মহা-পুরুষ নই, ছক্কা-পাঞ্জার ধার ধারি না, নিতান্ত দুকুড়ি সাতের খেলোয়াড়।' এই দুকুড়ি সাতের খেলোয়াড়ই বাজীমাৎ করেছেন জীবনের বিভিন্ন দিকে। পৃথ্বীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 'Indian World' পত্রিকায় তরুণ নরেশচন্দ্র অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই প্রবন্ধাবলী বিখ্যাত সম্পাদক উইলিয়াম ষ্টেড তাঁর 'রিভিয়ু অব রিভিয়ু' নামক পত্রিকায় সারাংশ তুলে দিতেন। সেই সূত্রে নরেশচন্দ্র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ তরুণ নরেশচন্দ্রের মনে প্রেরণা জাগিয়েছিল, পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। এর পর সেই কুখ্যাত "রিজলী সার্কুলার" প্রকাশিত হয়। সেই বিজ্ঞপ্তি-অনুসারে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গড়লেন তাঁর 'এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি', সেই সোসাইটির সভাপতি হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সুরাট কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের একটা সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র রচনা করার প্রস্তাব হয়। বাংলার কমিটির পক্ষে খসড়া করলেন নরেশচন্দ্র, এলাহাবাদে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়, তা বাংলা কংগ্রেসের খসড়ার ভিত্তিতে রচিত। সেই খসড়ার পরিবর্তিত রূপ আজকের কংগ্রেসী গঠনতন্ত্র।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নরেশচন্দ্রই সর্ব-প্রথম জমিদারী প্রথা বিলোপের প্রস্তাব করেন, আজ তা সফল হয়েছে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনেও নরেশচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। ১৯২০-তে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহমেদ প্রভৃতি যে দল গঠন করেন, নরেশচন্দ্র ছিলেন তার সভাপতি, অতুলচন্দ্র গুপ্ত সহকারী সভাপতি। পেসান্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির ভূমিকা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে উপেক্ষনীয় নয়।

পরে বাংলায় রাজনীতিতে মুসলিম লীগের আবির্ভাবে যে আবিলতা সৃষ্টি হয়, নরেশচন্দ্র তা সহ্য করতে পারেন নি, তাই তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

১৯২৬-এর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অমল হোম মহাশয় 'অতি আধুনিক সাহিত্যের ধারা' সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তা নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে সাহিত্যিকদের আহ্বান করে পাঠ করলেন 'সাহিত্য ধর্ম' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ। সেদিন তরুণ দলকে যাঁরা সমর্থন করেন, শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধানতম। নরেশচন্দ্র ভাদ্র ১৩৩৪-এর 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' নামক প্রবন্ধে যুক্তি ও বিশ্লেষণসহকারে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—"হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়া ফরাসী বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব-বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি? যে হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে, তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।"

নরেশচন্দ্রের এই সাহসিক উক্তি সেদিনকার তরুণ লেখকদের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেছে, তাই তিনি বরণীয়। প্রগতির তিনি পৃষ্ঠপোষক, তিনিই ছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি।

এই বিস্ময়কর কর্ম-জীবনের অবসানে আজ নরেশচন্দ্র অবসরগ্রহণ করেছেন। তাঁর উক্তির প্রতি সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলব—তিনি সামান্য 'হাউই' ন'ন, তিনি বাংলাদেশ ও সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম তারকা। তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

রবীন্দ্রনাথ— (আলোচনা)—অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বৎসরে রবীন্দ্র-বিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে কয়েকখানি গ্রন্থেরই নাম করা যায়। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই সমস্ত অসামান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল যাঁদের গ্রন্থের অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁদেরই একজন। দীর্ঘকাল কবিগুরুর নিকট-সাহচর্যে ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথকে বুঝে নেওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বুদ্ধিবাদী চেতনা সংযোগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে ওঠে বর্তমান গ্রন্থপাঠে তা উপলব্ধি করা যাবে স্বচ্ছন্দে। শান্তিনিকেতনের ইতিহাস থেকে শুরু করে জমিদার রবীন্দ্রনাথ, মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ, যুগসন্ধির মানুষ রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বপ্রেমিক' রবীন্দ্রনাথের যে অসামান্য আলেখ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা

একমাত্র অন্নদাশঙ্করের পক্ষেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথে বহু-আলোচিত পাশ্চাত্ত্য প্রভাব সম্পর্কে এমন সংক্ষিপ্ত পূর্ণাঙ্গ রচনা চোখে পড়া দুষ্কর।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এরূপ নিবিড় ভক্তের পক্ষে রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা করা একান্তই অসম্ভব। বিশেষ করে তিনি যখন বলেন, "রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কিছু লিখতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করতে চাইনি। ভেবেছিলুম কবির রচনাবলী আদ্যোপান্ত পড়ব। সেই হবে আমার কৃত্য।" রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরাগী বহু ভক্তের কলমে বা কন্ঠে একথা শুনতে পাইনি। রবীন্দ্রনাথকে আর তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচিত হচ্ছে—রবীন্দ্র-গবেষক-বোদ্ধার বাক্যজালে নানাবিধ সংশয় আর প্রশ্নের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে সার্থকভাবে উপলব্ধি করেছেন কয়জন তা আঙুলে গুণেই বলা যায়। সেই সমস্ত অসামান্য ব্যক্তিদের প্রথম সারিতেই অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর আলোচনার কোথাও গতি হীন নয়। স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল—যা অন্নদাশঙ্করবাবুর একান্তই নিজস্ব গদ্যশৈলী। সে কারণে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনাগুলির পাঠকমাত্রেই সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথকে পাবেন—আলোচকের অস্তিত্বটাকে সহজে ধরতে পারবেন বলে মনে হয় না।

বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি একত্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য গ্রন্থকার এবং প্রকাশক প্রত্যেকেই ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত রায়ের কাছে নিবেদন তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে বাঙলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই হাতে তুলে দিয়ে বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবেন।

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস—(আলোচনা)—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল। কৃষ্ণনগর কলেজ। কৃষ্ণনগর। দাম চার টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

সাম্প্রতিক কালে বাঙলা ভাষায় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে-কোন ভাষার সমৃদ্ধির মূলে এই ধরণের উদ্যম অতি আবশ্যকীয় এবং প্রশংসনীয়। ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পালের বর্তমান গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। ইতোপূর্বে তাঁর 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করেছে।

বর্তমান গ্রন্থখানি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা-সমূহের' অন্যতম উর্দু ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এবং ভাষা-পরিচিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উর্দু সাহিত্যের আদি কবি, বাহমনী সাম্রাজ্য—মুঘল যুগ, দিহলবী উর্দুর প্রথম পর্যায় এবং প্রাচীন উর্দু গদ্য-সাহিত্যের মনোজ্ঞ ও তথ্যানির্ভর আলোচনা। উর্দু সাহিত্যের গৌরবজনক অধ্যায় দিহলবী এবং লখ্‌নোয়ী উর্দু অর্থাৎ রাজন্যপুষ্ট ভাষা হিসাবে উর্দুর জনপ্রিয়তা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায় আধুনিক উর্দু সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক আলোচনায় সমৃদ্ধ। কবিতা, জীবনী, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক ও সমালোচনা সাহিত্যে উর্দু ভাষা আধুনিক যুগের সাহিত্য-চিন্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে ভাষাকে সজীব রেখেছে। বাঙলা দেশে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে শেষ অধ্যায়ে।

বর্তমান সংকীর্ণ প্রাদেশিক চেতনার ধ্বংসকারী বিভেদ-বুদ্ধিকে বিনাশ করবার পথে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাসমূহের গ্রন্থ অবশ্য পাঠের প্রয়োজন। সেই পথে ডঃ পালের গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষাভাষীর পক্ষে প্রকৃত সহায়কের কাজ করবে। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের এমন একখানি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত আলোচনা-গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় ইতোপূর্বে রচিত হয়েছে ব[…] জানা নেই। ব্যবহৃত উদ্ধৃতিসমূহে[…] বাঙলা করে দেওয়াতে উর্দু-না-জা[…] ব্যক্তিমাত্রেই স্বচ্ছন্দে গ্রন্থখানি প[…] করতে পারবেন। গ্রন্থখানির অন্যত[…] বৈশিষ্ট্য সমগ্র আলোচনাই তথ্যানির্ভ[…] ভাষা প্রয়োগে সাবলীলতা প্রশংসনী[…] ডঃ পালের এই গ্রন্থখানি বাঙলা ভাষ[…] ভাষীদের কাছে সমাদৃত হবে। [...] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও [...] মহম্মদ শহীদুল্লাহ-র প্রশংসাবাণী আশীর্বাণী বর্তমান গ্রন্থের লেখকে[…] পাণ্ডিত্য বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ[…] করে। ডঃ পাল আরও দীর্ঘকাল বাঙ[…] ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন এই কামনাই করি।

চৈতন্য পরিকর— (আলোচনা) রবীন্দ্রনাথ মাইতি। বুকল্যা[…] প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘে[…] লেন। কলকাতা—ছয়। দাম ছে[…] টাকা।

ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব মহাজনে[…] জীবন কাহিনীর এক অসামান্য গবেষ[…] ধর্মী তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায় ডঃ রবী[…] নাথ মাইতি যথেষ্ট যোগ্যতার পরি[…] দিয়েছেন।

ষোড়শ শতকের যুগসন্ধিতে বা[…] জীবনী সাহিত্যের সমৃদ্ধি। এখা[…] সর্বপ্রথম সাহিত্যের মানবায়ন স[…] হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর [...] অসংখ্য ভক্তকবি তাঁ[…] [...] করে রেখেছেন। সেই [...] ভক্তবৃ[…] বৈচিত্র্যময় জীবন কাহিনীই বর্ত[…] গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। তাঁদের ম[…] কেন্দ্রে চৈতন্যদেব ছিলেন সুগ্রোথি[…] ফলে ভক্তবৃন্দের জীবনী আলোচ[…] সংগে সংগে চৈতন্যদেবও সে আলোচ[…] অনুপ্রবিষ্ট। কারণ মহাপ্রভুকে বাদ দি[…] তাঁর ভক্তদের কোন আলোচনা স[…] নয়। তাঁদের জীবনী বৈচিত্র্যও লক্ষণী[…] গ্রন্থকার পরমনিষ্ঠা এবং পরিশ্র[…] মাধ্যমে সেই জীবনকথা আলোচ[…] করেছেন।

সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য জীব[…] গ্রন্থে সমৃদ্ধ। বহু ঘটনার সমাবে[…] তার মধ্যে অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবে[…] ঘটেছে। ভক্তম নর তীব্র ভাবাবেগে এরূপ বিভ্রান্তিই স্বাভাবিক। আবার পারম্পর্য-হীন পরস্পর বিরোধী উক্তিতেও বহু স্থান পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার তার থেকে সত্য বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে

পেরেছেন বললে অন্যায় হবে। এক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান করে গ্রন্থকার প্রকৃত গবেষকেরই কাজ করেছেন। সাম্প্রতিককালে গবেষণা গ্রন্থ-রূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সুলভমতাদর্শপূর্ণ গ্রন্থগুলির থেকে বর্তমান গ্রন্থের পার্থক্য এখানেই। হয়ত বহু প্রশ্ন আবার দেখা দিতে পারে—কিন্তু বর্তমান গবেষক যে দুরূহ কার্য সাধন করেছেন সাম্প্রতিক কালের গবেষণা কার্যে এই ধরণের কঠোর অনুশীলন খুব কমই লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিধ্বনি (নাটক) —কালীপদ চক্রবর্তী; প্রকাশক— বিশ্ববার্তা সাহিত্যাগার। ৪৪।৪, গরচা রোড, কলিকাতা-১৯, মূল্য এক টাকা।

চীনা আক্রমণের পটভূমিতে যে কয়টি নাটক প্রকাশিত হয়েছে—কালীপদ চক্রবর্তী রচিত 'প্রতিধ্বনি' তার মধ্যে বলিষ্ঠতম। প্রতিটি চরিত্রই স্বাভাবিক এবং নাটকের গতি অত্যন্ত দ্রুত। অপেশাদার দলের পক্ষে জমানো সহজ। কি যবনিকা ও মনোরম দৃশ্যপটযুক্ত বিস্তৃত মঞ্চ, কি যবনিকাহীন মুক্ত যাত্রামঞ্চ, কি ক্ষুদ্র পরিসর বক্তৃতা-মঞ্চ—সব জায়গায়ই অতি সহজেই এর অভিনয় করা চলে। এই রকম নাটকের দরকার ছিল। আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি। যারা এখনও সুপ্ত তাদের জাগাবার জন্য হাটে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র এই বেতারে অভিনীত একাঙ্ক নাটকটির অভিনয় করা জাতীয় কর্তব্য।

সূর্য-গ্রহণ— অধ্যাপক ভ, ভ, তিয়ের —ওগানিয়েজফ্। রুশ থেকে অনুবাদ, বিনয় মজুমদার। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি।

প্রাচীন যুগে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ একটা দৈবদুর্বিপাক বলে মনে করা হ'ত। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পেরেছি গ্রহণ কেন হয়। সূর্য আমাদের জীবন ধারণের সর্বপ্রকার মূল উপকরণ যোগাবার প্রধান উৎস। তাই সূর্যের মধ্যে কি আছে, সেখানকার শক্তির উৎস কি এবং প্রতিনিয়ত সেখানে কি ঘটছে এই সব সংবাদ জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের কৌতূহল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সূর্যগ্রহণের সময়েই এই সব অনুসন্ধান চালানোর সবচেয়ে সুবিধা। আলোচ্য বইটিতে এই সব বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদের ভাষা সরল এবং ঝরঝরে। বইটি ছোট ছেলেদের জন্যে লেখা হলেও তাদের বয়স্ক অভিভাবকদের কাছে কম চিত্তাকর্ষক হবে না। ছবি, ছাপা ও বাঁধাই সন্তোষজনক।

সমুদ্র নয় মন (উপন্যাস)—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। গ্রন্থম্, ২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য একদা 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' নামক সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন, আলোচ্য উপন্যাসটি কিন্তু অতি ক্ষুদ্র উপন্যাস, পৃষ্ঠা সংখ্যা পাইকা অক্ষরেও একশ মাত্র,—কিন্তু কুশলী লেখক অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে এই ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাসে এক বৃহৎ পটভূমিকা সৃষ্টি করেছেন। নায়কের সঙ্গে সঙ্গীতরসিকা নায়িকার বিচ্ছেদ ঘটল, ফলে নায়িকা নিদারুণ মানসিক ক্লেশে তাঁর স্মৃতিশক্তি হারালেন। তারপর একদিন এক সংগীত সম্মেলনে এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে উভয়ের আবার মিলন ঘটলো। লেখক ঘটনা সংস্থাপনে এমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যে উপন্যাসটি একটানা পড়ে যেতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

ছাপা, প্রচ্ছদ ইত্যাদি সুরুচিসঙ্গত।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

চতুরঙ্গ— (শ্রাবণ-আশ্বিন) ১৩৬৯)—সম্পাদক : হুমায়ুন কবির। ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা কুড়ি নয়া পয়সা।

চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—হরপ্রসাদ মিত্র, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, অচ্যুত গোস্বামী, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

নবজীবন—সম্পাদক : সুকুমার দত্ত। ১০, ক্লাইভ রো, কলকাতা-১ থেকে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

বৎসরে একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'নবজীবনে'র। এইটি তাদের দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। প্রথম সংখ্যায় ছিল হুগলী জেলার ইতিহাস। বর্তমান সংখ্যায় দুটি উপন্যাস লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আশাপূর্ণা দেবী। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, গোকুল নাগ এবং বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প বর্তমান সংখ্যার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। কবিতা লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শান্তু চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। তাছাড়া বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি পুরোনো মূল্যবান রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ

নান্দীকর

সাম্প্রতিক কাল ও দেশাত্মবোধক নাটক :

অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট থেকে শ্রীসনৎকুমার চ্যাটার্জি প্রশ্ন তুলেছেন, "যতদিন না এইরূপ (নতুন দেশপ্রেম-মূলক) নাটক পাদপ্রদীপের সম্মুখে আনা যায়, ততদিন পুরাতন দেশাত্মবোধক নাটকগুলি মঞ্চস্থ করিতে বাধা কোথায়?"

বাধা হচ্ছেন নাট্যামোদী জনসাধারণ। প্রমাণ হাতের কাছেই রয়েছে। স্টার প্রচুর পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে খুলেছিলেন মন্মথ রায়ের দেশাত্মবোধক নাটক "কারাগার" এবং স্টারের বর্তমান শিল্পীরা এতে তাঁদের সাধ্যমত সু-অভিনয় করেছিলেন। কর্তৃপক্ষের আশা ছিল, নাট্যামোদী জনসাধারণ দলে দলে এসে এই অভিনয় দেখবেন। কিন্তু জনসাধারণ মুখ ফিরিয়ে থাকার ফলে তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। অগত্যা তাঁদের আবার সেই "শেষাগ্নি"তে ফিরে যেতে হয়েছে। যদি বলেন, অর্থ না হোক, দেশপ্রেম ত' হবে। না, তাও হবে না। জনসাধারণ যদি সাড়া না দেয়, দেখতে না আসে, তাহ'লে রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবেন কাদের? অতএব পুরাতন দেশাত্মবোধক নাটকের পুনরভিনয় প্রস্তাব সম্পূর্ণ অচল।

পূর্ণাঙ্গ নতুন নাটকের অভাবে দুটি সাধারণ রঙ্গালয় তাঁদের নিয়মিত প্রধান নাটকটি অভিনয় করবার আগে দু'টি একাঙ্কিকার প্রায় আধ ঘন্টাব্যাপী অভিনয় করছেন। এবং এই অভিনয় সমবেত দর্শকের মনে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য যে দেশপ্রীতির উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু চীনা হামলার প্রত্যক্ষ সংবাদ হিসেবে 'বমডিলার পতন'টি 'জওয়ান' নাটিকার একটি বিশেষ স্থানে নাট্যআবেগ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় নাটিকাটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ সময়ের গন্ডীতে বেঁধে ফেলা হয়েছে বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। অথচ যে কোনো নাটক বা নাটিকাই এমনভাবে লিখিত হওয়া উচিত, যাতে সমসাময়িক উত্তেজনার কাল প্রশমিত হ'লেও তার মধ্যে একটি শাশ্বত নাট্যআবেদন থেকে যায়। দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম ক'রে রসোত্তীর্ণ হ'তে পারলেই না নাটক সাহিত্য-সভায় স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দু'জন বাউন্ডুলে ছেলের মতি পরিবর্তন ও যুদ্ধে জওয়ান হিসেবে যোগদানের সংকল্প গ্রহণের মধ্যে যে শাশ্বত নাটককে প্রত্যক্ষ করা যায়, 'বমডিলার পতন' সংবাদ তাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে আজকের সচেতন দর্শকের কাছে। গেল নভেম্বরের গোড়ার দিকে দেশে যে উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া ছিল, আজ তা একেবারেই নেই। আজ যা আছে, তা' হচ্ছে ভাবীকালে চীন দ্বারা ব্যাপকতর আক্রমণের আশঙ্কা। ভারতের প্রতিটি সচেতন নাগরিক আজ চিন্তা করতে বাধ্য যে, শিয়রে দুরন্ত শমনকে দন্ডায়মান দেখেই আমরা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রাকে প্রতিপদে বিঘ্নিত করছি। কাজেই ঐ সংবাদটি আজকের দর্শকদে[র] কাছে মূল্যহীন। 'বমডিলার পত[ন]' যখন দূর অতীতের ঐতিহাসিক স[ত্যে] পরিণত হবে বহুদিন পরে, ত[খন] কিন্তু 'জওয়ান' নাটিকার শাশ্ব[ত] বস্তুটি আর আজকের মত ব্যাহ[ত] হবে না।

ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী দেশদ্রোহী[র] ক্ষমা নেই, তার অত্যন্ত নিকটত[ম] ব্যক্তিও তাকে ঘৃণার চোখে দেখেন, এ[ই] পরম সত্যটিই বিঘোষিত হয়ে[ছে] 'স্বর্ণকীট' নাটিকায় এবং ওরই সঙ্গে বিঘোষিত হয়েছে প্ল্যাস্টিক সার্জারী[র] মহিমা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, মুখ মন্ডলের রূপ পরিবর্তিত হ'লে[ও] আচার-আচরণ, কণ্ঠস্বর, চোখে[র] চাউনি প্রভৃতি কি যথেষ্ট নয়, যা[র] দ্বারা কোনো পুরুষকে তার স্ত্রী অনায়াসেই চিনতে পারে? এবং এই জন্যেই 'স্বর্ণকীট'কে যথেষ্ট প্রত্যয় উৎপাদনকারী বাস্তব চিত্র ব'লে গ্রহণ করা কঠিন। তা'ছাড়া নাটকের মুখ্য চরিত্র যদি দেশদ্রোহী ভীলেন হয়, তাহ'লে নাটকটি মনে ধরার আশা কম। দেশদ্রোহিতার পাশে দেশপ্রেমিতার ছবি বড়ো ক'রে আঁকা দরকার—ব্রুটাশের পাশে মার্ক অ্যান্টনিকে আমরা দেখতে চাই; 'ওথেলো' নাটকটি 'ইয়াগো'-সর্বস্ব নয়।

আরও খানতিনেক যুদ্ধসম্পর্কিত একাঙ্কিকা ইতিমধ্যে কয়েকটি নাট্য-সংস্থা দ্বারা অভিনীত হ'তে দেখেছি। এক, কিরণ মৈত্র রচিত 'মৃত্যুর গর্জন'; এটি একটি যুদ্ধবিরোধী নাটক যেমন, যুদ্ধবিরোধী নাটক শেরিফ [illegible] "দি জার্নিজ এন্ড"। প্রতীকধর্মী এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের নাম—শান্তি, যুদ্ধদেব, সাম্রাজ্যবাদ, অশান্তি, অস্ত্র-শক্তি প্রভৃতি। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে, বহু যুগব্যাপী যুদ্ধ চলার পর যুদ্ধদেব নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ, অস্ত্রশক্তি প্রভৃতি দ্বারা বহু প্ররোচিত হওয়া সত্ত্বেও শান্তিকেই পৃথিবীর অধিকার ছেড়ে দিয়ে নিজেকে করলেন হত্যা। কিন্তু নাট্যকারের বক্তব্য পরিস্ফুট হতে পায়নি একটি কারণে। সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রেখে যুদ্ধরাজকে মৃত্যুবরণ করানো যায় কি ক'রে, তা বুঝতে পারা কঠিন। তবুও যে নাটকে যুদ্ধরাজ শান্তিকে ভগ্নী সম্বোধন ক'রে বলে : "যত বিপদেই পড়ো না কেন, আমার

মুক্তিপ্রাপ্ত

শেষ অংক

চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত এবং অজয় কর পরিচালিত আর-ডি-বি'র "সাত পাকে বাঁধা" চিত্রের একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন ও ছায়া দেবী

অনুরোধ, তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে যেন আমার ডাক কোনদিন না পড়ে।" সে-নাটককে আমরা অভিনন্দিত করি।

আর একটি একাঙ্কিকা হচ্ছে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "সীমান্তের ডাক"। এখানে নাট্যকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সকলকে আহবান জানিয়েছেন, ব্রতভিক্ষা দেবার জন্যে; জওয়ানরা দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন, তারই জন্যে যে যা পারে ভিক্ষা দিক—কেউ অর্থ, কেউ রক্ত, কেউ পুত্র, কেউ প্রাণ। দেশপ্রেমিক পিতার একমাত্র পুত্রের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে নাম লিখিয়ে আসা পিতার মনে যে সুন্দর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা' মর্মস্পর্শী। কিন্তু এই নাটকে সর্বেশ্বর কৃপণ ও তার স্ত্রী রাধারাণীর কলহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থান জুড়ে থেকে অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে; এটিকে বহুলাংশে সংক্ষিপ্ত করবার অবসর ছিল।

তিন নম্বরটি হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতার মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক সম্প্রদায় অভিনীত "তৈরী হও"। একজন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের গৃহিনীও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কি রকম অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন, তারই একটি রেখাচিত্র আমরা এই অতি সংক্ষিপ্ত একাঙ্কিকার ভিতর দেখেছি।

এ-ছাড়াও 'ডাক', 'এগিয়ে চলার ছন্দ' প্রভৃতি কয়েকটি পথ-নাটিকা (পার্ক-নাটিকা?) প্রণব রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা রচিত হয়ে শহরের বিভিন্ন পার্কে, মাঠে-ময়দানে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু এদের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না হওয়ায় কোনো রকম আলোচনা করা সম্ভব নয়।

এবং দেখেছি অজয় বৈরাগী রচিত পূর্ণাঙ্গ দেশাত্মবোধক নাটক "সৈনিক"। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই নাটকটি সম্বন্ধে আমরা নাটকটির অভিনয় প্রসঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলুম (অমৃত, ২য় বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা)। কাজেই এখানে তার আর পুনরুক্তি করতে চাই না।

কিন্তু আজকের আপৎকালীন অবস্থায় দেশাত্মবোধক নাটক লিখতে হ'লেই যে ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা হামলাকে উপজীব্য ক'রে নাটক লিখতে হবে, এই কথাটা সকল নাট্যকারই মনে করছেন কেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে শুরু ক'রে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন পর্যন্ত বাঙলা রঙ্গালয়ে বহু দেশাত্মবোধক নাটক রচিত এবং অভিনীত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক'খানি রচিত হয়েছে? দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন", ক্ষীরোদপ্রসাদের "প্রতাপাদিত্য" "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত", গিরিশচন্দ্রের "সিরাজদৌলা", "মীরকাসেম", শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "গৈরিক পতাকা", "সিরাজদৌলা", মন্মথ রায়ের "কারাগার", "মীরকাসিম" প্রভৃতি কোনো নাটকই ত' সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত নয়; অথচ এরাই ত' রঙ্গমঞ্চ থেকে বাঙালী সমাজকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য স্বাধীনতার

পরাধীনদের আমাদেরকালের দেশাত্ম-বোধের মধ্যে আর ভারতীয় জাতির পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ায় দেশের মধ্যে আবদ্ধ নেই, আজ তার নূতন অর্থ হয়েছে। আজ রঙ্গালয় মারফং জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগাতে হ'লে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এমন উপাদান সংগ্রহ করতে হবে, যা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মানুষের চরম আত্মত্যাগের আদর্শকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে এবং এর জন্যে সম্ভবতঃ রাজপুত ইতিহাসেরই মন্থন আবশ্যক। মারাঠার শিবাজীকে নিয়েও নতুনভাবে নাটক রচনা করা যেতে পারে এবং আরও পূর্ববর্তী-কালে গিয়ে শক, হূন প্রভৃতি বহিরাগত শত্রুর আক্রমণকে ভারতীয়রা কিভাবে প্রতিহত করেছিল, সে-কাহিনী উদ্ধার করাও হয়ত আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে। অবশ্য এ-সব ভাবনা যাঁরা নাটক লিখবেন, তাঁদের; আমরা মাত্র সূত্রটুকু ধরিয়েই আমাদের কর্তব্য সমাপন করলুম।

রঙমহল "কথা কও":

আজকের দিনে বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের বয়স্থা কুমারী মেয়েরা ঘরে-বাইরে নিগৃহীতা, লাঞ্ছিতা। তারা কাউকে ভালোবাসলেও পাপ, না বাসলেও পাপ। তাদের জন্যে জলে ডুবে, আগুনে পুড়ে, বিষ খেয়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবার পথ খোলা আছে, কিন্তু তাদের মনটুকু বোঝবার কোনো ব্যবস্থা নেই।—এই বক্তব্যটিই জোরালো ভাষায় ফুটে উঠেছে বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপক সুনীলচন্দ্র সরকার রচিত এবং রঙমহল-এ অভিনীত "কথা কও" নামে তিন অঙ্কে ও ১৪টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নাটকটির মাধ্যমে।

কণার মত মেয়ে আমাদের বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে ঘরে। এবং তারা কণারই মত তাদের মা-বাপ-ভাইয়ের কাছে নিদারুণ সমস্যার রূপ নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি আপাতঃ উদারহৃদয় অথবান ছেলেকে গৃহস্থের উপকারী বন্ধু হিসেবে পেলেই মা-ভাইরা কণাকে ক্রমাগত উপদেশ দেয় সেই ছেলেটিকে খুশী করতে। ছেলেটির লোলুপ দৃষ্টির কথা কণা না পারে তার মা-বাপ-ভাইকে জানাতে, আবার না পারে মা-ভাইয়ের কথায় তাকে যথেষ্ট খাতির করতে। এরই মধ্যে তার মন যাকে চায়, তেমন মানুষ যদি তার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলে তার অবস্থা হয়ে পড়ে আরও শোচনীয়। সে যে নিজের ইচ্ছায় তাদের ধনী পারি-বারিক বন্ধুটির আপ্যায়ন করছে না, এ-কথা তার মনের মানুষকে বোঝানো অনেক সময়েই কঠিন হয়ে পড়ে এবং সময় সময় সব দিক দিয়েই ভুল বোঝা-বুঝি এমনই চরমে ওঠে যে, নিজে যথার্থই নিরপরাধ হয়েও সকলেরই চোখে অপরাধী সেজে বাধ্য হয়ে চরম পন্থা গ্রহণ করে নিজের সকল জ্বালা জুড়োবার জন্যে।

জানি না, এই সব নিরুপায় নির-পরাধ মেয়ের জন্যে বিধাতার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে কিনা; কিন্তু

গুপ্তশ্রী প্রোডাকশনের 'নিশাচর' চিত্রের একটি দৃশ্যে শম্ভু মিত্র ও ধীরাজ দাস

রাজীব পিকচার্সের 'হাইহিল' চিত্রে অনিল চ্যাটার্জী ও সন্ধ্যা রায়

আমরা ভাগ্যবিতাড়িত কণার মৃত্যুবরণে অশ্রুসংবরণ করতে পারিনি, এমনই মূর্তিমতী সে হয়ে উঠেছিল সেদিন রঙমহল রঙ্গমঞ্চে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয়ের গুণে। এমনই জীবন্ত সে-অভিনয় যে, তা' দেখে বারে বারে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছে করেছে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে, যেখানে মাত্র অর্থের অভাবে কণার মত গুণবতী সম্ভাবনাপূর্ণ মেয়েকে ব্যর্থ জীবনের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে সলিল-সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ক্রোধে জ্বলে উঠেছি, যখন পরোপকারী ধনী বন্ধু রাজীব (অসিতবরণ) অন্যায়ভাবে কণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে চেয়েছে। ব্যথিত হয়েছি, যখন কণাকে ভালোবাসা সত্ত্বেও সুধীম (সবিতাব্রত) মাত্র দুরন্ত ঈর্ষাপরবশ হয়ে কণাকে ভুল বুঝল এবং ভুল বুঝে তার সঙ্গে এমনই রূঢ় ব্যবহার করল যে, শেষ পর্যন্ত তার আফসোসের সীমা রইল না। দাদা অনাদির (ঠাকুরদাস) তাড়না, মায়ের (সরযূবালা) গঞ্জনা তার মৃত্যুকে যখন নিকটবর্তী ও অবশ্যম্ভাবী ক'রে তুলল, তখন তাদের প্রতি আমাদের মন বিরূপ হয়ে উঠেছে।

আত্মকেন্দ্রিক সুধীমের চরিত্র চিত্রণের গুরুদায়িত্ব স্বচ্ছন্দে বহন করেছেন সবিতাব্রত দত্ত; তিনি এর ওপর দর্শকদের উপহার দিয়েছেন কয়েকখানি রাগাশ্রয়ী সঙ্গীত, যার বারংবার তারিফ উঠেছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে। রাজীবের ভূমিকায় অসিতবরণ ও অনাদিরূপে ঠাকুরদাস তাঁদের গৃহীত চরিত্রগুলিকে যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন।

কণার সমস্যাসঙ্কুল জীবনের পাশে বেলা ও চিত্রা নামে যে দুটি ধনী দুহিতার চরিত্র ছায়ার পাশে আলোর কাজ করছিল, তাতে যথাক্রমে অবতীর্ণ হয়েছেন শিপ্রা মিত্র ও দীপিকা দাস। দুজনেই তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয়ের দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; অবশ্য সুযোগ বেশী থাকাতে দীপিকা দাস তাঁর নাটনৈপুণ্যের স্বাক্ষর একটু বেশী ক'রেই রাখতে পেরেছেন। এবং এ'দের সৈন্যবিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত পিতা ক্যাপ্টেন দত্তের ভূমিকায় জহর রায় আর একবার প্রমাণ করছেন, তিনি একজন বহুমুখী প্রতিভাধর অভিনেতা। লক্ষণ চাকর-রূপে অজিত চট্টোপাধ্যায়ের সর্বশেষ আর্তস্বর চিরকাল মনে রাখবার মতো। এছাড়া বরেন (হরিধন), বুলেন (মিন্টু), মেধো (সমর), ন্যাপলা (সন্দীপ) এবং চাঁপা (মমতা)—প্রত্যেকেই এক একটি টাইপ।

শব্দগ্রেক্ষণ, আলোকসম্পাত ও মঞ্চ-পরিকল্পনায় যথাক্রমে প্রভাত হাজরা, অনিল সাহা ও অমলেন্দু সেন উল্লেখ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

রূপকার অভিনীত "তিলতর্পণ" :

রসরাজ অমৃতলাল রচিত 'তিল-তর্পণ' নিঃসন্দেহে একটি ব্যঙ্গনাটিকা। প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়েটারে অভিনীত ঐতিহাসিক নাটকে কার্যকারণ সম্পর্ক-বিরহিত অসম্ভব ঘটনা সংস্থান এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ কষ্টকল্পিত কাহিনীর সমাবেশ অমৃতলালকে এই ব্যঙ্গ-নাটিকা লিখতে উৎসাহিত করেছিল। এমন কি 'তিলতর্পণে' লিখিত 'শৈলেশ্বর ঘোষ' যে নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই নামান্তর, তাও বুঝতে কারুর বাকী থাকে না। এ ছাড়া যে "কমলাকান্তের দপ্তর" 'ড্রামাটাইজ' (নাটকাকারে গ্রথিত) করা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন, তাও পরবর্তীকালে নাট্যাকারে অভিনীত হয়েছিল এবং রূপকার গোষ্ঠীও ওরই একটি দৃশ্য 'তিল-তর্পণ' নাটিকার শুরুতে সংযোজন করেছেন। এই নাটিকাখানিতে অমৃতলাল কাউকে ছেড়ে কথা কননি। নাট্যকার, থিয়েটার মালিক, নাট্য-সমালোচক, নাট্য-পরিচালক, নট-নটী—প্রত্যেকেরই

দোষত্রুটি তিনি ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন; এখানে তিনি নাট্য-জগতের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচক। জেনে রাখা ভালো, নাট্যাচার্য অমৃত-লাল ছিলেন কঠোর নিয়মানুবর্তী, যাকে ইংরাজীতে বলে 'স্ট্রীক্ট ডিসিপ্লিনেরিয়ান।'

যতদূর সম্ভব পুরাতন-ঘেঁষা অভিনয়ধারার মাধ্যমে 'তিলতর্পণ'কে মঞ্চে উপস্থাপিত ক'রে রূপকার সম্প্রদায় নাট্যরসিক দর্শক-সম্প্রদায়ের সামনে সে-যুগের একখানি ব্যঙ্গ-নাটিকার সেই যুগোপযোগী অভিনয়কে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের পুরাতন আদর্শের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে এই চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু দর্শক এই অভিনয়ের ফলশ্রুতিস্বরূপ যা পেয়েছেন, তা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন কৌতুকরস। এবং এই কৌতুকরসের অনেকখানিই উৎসারিত হয়েছে পুরাতন ভঙ্গীর অভিনয়ের বিকৃত নকল থেকে। বিশেষ হেমাঙ্গিনীরূপিণী গীতা দত্তের অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে "উপায় কর সজনী", "কে জানে সখি প্রাণ কেন কাঁদে" প্রভৃতি গান শিল্পীর অসামান্য নাট-নিপুণতার পরিচায়ক হয়েও দর্শকদের মধ্যে উপভোগ্য কৌতুকরসই উদ্রেক করেছে। এবং এইখানেই আমাদের মনে এক গুরুতর আশঙ্কার উদয় হয়েছে।

যে দেশেই নাট্যালয় জীবন্ত, সেই দেশেই নাটক রচনার ভাষা এবং প্রণালী থেকে শুরু ক'রে অভিনয়ধারা, মঞ্চরীতি প্রভৃতি পরিবর্তনশীল হ'তে বাধ্য। শেক্সপীয়র যে রীতিতে নাটক রচনা করেছেন এবং তাঁর যুগে যে-রীতিতে অভিনয় হ'ত, বার্ণাড শ' সেই সমান রীতিতে নাটক রচনা করেননি এবং তাঁর যুগের অর্থাৎ প্রায় বর্তমান যুগের অভিনয়রীতি নিশ্চয়ই তা' নয়। অথচ ইংলন্ডে আজও শেক্সপীয়রের নাটকাবলী—ট্রাজিডি এবং কমেডি, দুইই—নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে এবং তাতে অভিনয়ধারা নিশ্চয়ই বর্ত-মান কালোপযোগী। আমাদের দেশেও এই সেদিনও শিশিরকুমার বা আর্ট থিয়েটার বহু পুরাতন সামাজিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটককে পাদপ্রদীপে উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু এ'রা পুরাতন নাটকের অভিনয় করছেন ব'লে কেউই অভিনয়ের মাধ্যমে পুরাতন রীতিকে উপস্থাপিত করেননি এবং প্রয়োগরীতিতেও আধুনিকতাকেই অবলম্বন করেছিলেন। রূপকার সম্প্রদায় কিন্তু তা' করছেন না। তাঁরা মঞ্চের ওপর পুরাতন অভিনয়ধারাকে তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে উপস্থাপিত ক'রে দর্শকদের সামনে এক নূতন রঙ্গ পরিবেশনে প্রয়াসী। আশঙ্কা করি, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে দর্শকবৃন্দের চোখের সামনে যা ফুটে ওঠে, তা হচ্ছে পুরাতনের প্রতি নিদারুণ অশ্রদ্ধা। 'ব্যাপিকা-বিদায়' নাটিকাতেও এ'রা তাই-ই করেছেন। হ্যামলেট যদি আজ শেক্সপীয়ারের যুগে প্রচলিত অভিনয়ধারার মাধ্যমে দর্শক-দের সামনে অভিনীত হয় বা গিরিশ-চন্দ্রের প্রফুল্লও যদি সেইকালে প্রচলিত রীতিতে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়, তাহ'লে সেগুলিকে কি কৌতুক-নাট্য ব'লে মনে হবে না? এবং কৌতুকের রসদ কিন্তু নাটকের মধ্যে নিহিত নয়, অভিনয়ধারা থেকে উৎসারিত। তাই রূপকার সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, পুরাতন রঙ্গনাট্যকে যদি তাঁরা মঞ্চে উপস্থিত করতেই চান, তাঁরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নাট্যরীতি প্রয়োগ ক'রে তাই করুন, পুরাতনকে ব্যঙ্গ ক'রে দর্শকদের চোখে তাকে অশ্রদ্ধাভাজন করবার দায়িত্ব তাঁরা যেন গ্রহণ না করেন।

'তিলতর্পণ'-এর অভিনয়ে রূপকার গোষ্ঠীর প্রতিটি নটনটীই তাঁদের অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং এ'দের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বঙ্কিম ঘোষ, শঙ্কর মিত্র, প্রদ্যোৎ চট্টোপাধ্যায়, গীতা দত্ত এবং সবিতাব্রত দত্ত।

পূরবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাণী দে ও শ্রীমতী মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীরা সকলেই ঐ কলেজের পুরাতন ছাত্র-ছাত্রী।

স্টার থিয়েটারের পরবর্তী নাটক 'তাপসী'

স্টার থিয়েটারের পরবর্তী নাটক 'তাপসী'। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'নিশিপদ্ম' উপন্যাস অবলম্বনে উক্ত নাটকটির নাট্যরূপ দান করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। কয়েকটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত নাটকটিতে সন্নিবেশিত করা হবে বলে জানা গেল। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার। নাটকটির চরিত্র-লিপিতে এবারও দুটি জনপ্রিয় শিল্পীর নাম যুক্ত হয়েছে। এই শিল্পী দুটি হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মঞ্জু দে। এছাড়া স্থায়ী শিল্পীদের মধ্যে আছেন কমল মিত্র, অজিত ব্যানার্জি, অনুপকুমার, নবকুমার, ভানু ব্যানার্জি, শ্যাম লাহা, চন্দ্রশেখর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সুখেন দাস, প্রেমাংশু বসু, অপর্ণা দেবী, গীতা দে, বাসবী নন্দী, আশা দেবী, নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও প্রিয়া চ্যাটার্জি প্রভৃতি। নাটকটি পরিচালনা করছেন নাট্যকার স্বয়ং এবং আলোক-নিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্য-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বসু।
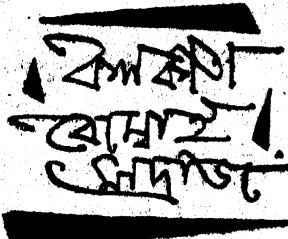
কলকাতা ঃ

গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী তাঁর নতুন ছবি সুবোধ ঘোষের জনপ্রিয় উপন্যাস ও নাটক 'শ্রেয়সী'-র কাজ আরম্ভ করেছেন। কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। ছবির বিভিন্ন অংশে অভিনয় করবেন কমল মিত্র, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চ্যাটার্জি (বোম্বে), বসন্ত চৌধুরী, পদ্মা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, দিলীপ মুখার্জি, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, বিনতা রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। সম্প্রতি টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় এছবির সঙ্গীত গ্রহণ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন কলাকুশলী বিভাগে আছেন আলোকচিত্রে বিজয় ঘোষ, সম্পাদনায় রবীন দাস ও শিল্পনির্দেশনায় সুনীল সরকার। 'কৃষ্ণা'-খ্যাত প্রযোজক কার্তিক বর্মন ছবিটি প্রযোজনা করছেন। পরিবেশনার ভার নিয়েছেন—নর্মদা চিত্র।

'বিলে নরেন' চিত্রের শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় সুসম্পন্ন হল চিলড্রেন্স ফিল্ম ফাউন্ডেশনের নতুন প্রয়াস হিসেবে। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য ও কিশোর জীবনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিমল ঘোষ (মৌমাছি)। কিশোর শিল্পী চম্পককুমারকে নিয়ে মহরৎ দৃশ্যটি গ্রহণ করেন পরিচালক রবি বসু। দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে সভাপতি খগেন দাশগুপ্ত এবং প্রধান অতিথি জি এফ অস্টিন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ যন্ত্রী আশীষ খাঁ ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য।

দীপান্বিতা প্রোডাকসনের 'বিনিময়' ছবির সঙ্গীতগ্রহণ শেষ করলেন কালীপদ সেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন দিলীপ নাগ। সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা চক্রবর্তী। এ ছবির নায়ক-নায়িকা হলেন দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুচিতা সিংহ।

শিল্প-ভারতীর 'বর্ণচোরা' এ মাসেই মুক্তি পাবে। বনফুল রচিত এ কাহিনীর চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এ ছবির চারখানি গান রচনা করেছেন গৌরীপ্রসন্ন। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। কলাকুশলী বিভাগে চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় সুদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন [illegible], সুবোধ রায় ও প্রশান্ত মিত্র। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায়, গীতা দে, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত, তুলসী, রাজলক্ষ্মী দেবী ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন সিনে ফিল্মস প্রচারসচিব শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দকান্ত)।

বোম্বাই ঃ

প্রযোজক-পরিচালক দেবেন্দ্র গোয়েল তাঁর রঙিন ছবি 'দূর কী আওয়াজ'-র কাজ প্রায় শেষ করেছেন। প্রণয়মধুর দুটি নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয় মুখার্জি ও সায়রা বানু। এ ছাড়া ছবির অন্য প্রধান শিল্পীদের মধ্যে আছেন ওমপ্রকাশ, প্রাণ, দুর্গা খোটে, মালিকা ও জনি ওয়াকর। সঙ্গীত পরিচালক রবি।

শক্তি ফিল্মস-এর 'কাশ্মির কী কলি' পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন শক্তি সামন্ত। শাম্মি কাপুর ও বাংলার জনপ্রিয় শর্মিলা ঠাকুর এ ছবির নায়ক-নায়িকা। এ মাসে ছবির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আরম্ভ হবে। কাহিনী রচনা করেছেন রঞ্জন বসু। আগামী এপ্রিল মাসে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে কাশ্মিরে।

সম্প্রতি সঙ্গীত পরিচালক শংকর-জয়কিষণ ফিল্ম যুগের একটি রঙিন ছবির (নামকরণ হয়নি) সঙ্গীতগ্রহণ করলেন কণ্ঠশিল্পী মহম্মদ রফিকে নিয়ে। ছবিটি পরিচালনা করবেন মোহন-কুমার। প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন সায়রা বানু, রাজেন্দ্রকুমার ও ধর্মেন্দ্র। গত সপ্তাহে রাজকমল স্টুডিওর এই ত্রয়ী শিল্পী সমন্বয়ে একটি জন্মদিনের দৃশ্য গৃহীত হয়। ছবির প্রযোজনার ভার নিয়েছেন জে ওমপ্রকাশ।

ফেমাস স্টুডিওর প্রযোজক-পরিচালক এইচ এস রওয়াল তাঁর রঙিন ছবি 'মেরে মেহেবুব'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ করেছেন। লক্ষ্ণৌয়ের একটি নবাব পরিবারের জীবনকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী রচিত হয়েছে। এই নবাবের চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোককুমার। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করছেন সাধনা, মমতাজ বেগম, রাজেন্দ্রকুমার, অমিতা, প্রাণ ও জনি ওয়াকর। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নৌসাদ।

মাদ্রাজ ঃ

তামিল ভাষায় মাসিক সিনেমা পত্রিকা 'সিনেমা কাদির'-এর বাৎসরিক

পুরস্কার উত্তম [illegible] শ্রেষ্ঠ [illegible] হয়েছেন [illegible] পশ্চিমবঙ্গে [illegible] দর্শন এবং [illegible] বিজয় করেন [illegible]।

বিদায়েই [illegible] অভিনয় না [illegible] কিন্তু বর্তমানে তিনি টি. আর [illegible] 'কট্টু' বোকা ছবিতে অভিনয় করছেন। বিপরীত-নায়ক চরিত্রে রয়েছেন মাতঙ্গমুকুল। —চিত্রদূত

'বৌদির মেয়েদের নামকরণটাও মেজ বৌদির অনিন্দ্য অবদান। বড়র নাম মল্লিকা, ছোটর ঘেঁটু। ফুলের নামে নাম।'

আশাপূর্ণা দেবীর সেই পদ্মপাতার নিটোল অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ এবং মহৎ ছোটগল্প 'ছায়াসূর্য'কে চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন বাংলার তরুণতম চিত্রনাট্যকার-পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। প্রযোজনা করছেন আর. ডি. বনশাল।

ঘেঁটুর জীবনোচ্ছল মুহূর্তে, যেখানে সে সবার মধ্যেও একা—তাই নিয়েই এ বৌদির প্রশ্রয়। ছেলেবেলা থেকেই তাই এই দুরন্তপনা, [illegible] চপলতা, [illegible] না জানি দেখা না পেলে [illegible] দৃষ্টিতে [illegible] ধরে [illegible]।

বড়দিন, [illegible] থেকে না [illegible] কোন [illegible] ঘেঁটুকে [illegible] পাওয়া যেত না। বড়বৌদির [illegible] বলতেন, বোঝাতেন, [illegible] ছেলেদের মতন রাস্তায় খেলে বেড়ায় কেন ঘেঁটু, [illegible] বসে খেলা করে না যা? [illegible] ঘেঁটু কিন্তু কোন আমল দিত না দিদিকে। বরং ঠোঁট উলটে বলতো 'দিদির সঙ্গে খেলা! দিদি খেলার কি জানে?'

অবশ্য স্কুলে ভর্তি হয়ে স্বেচ্ছা-বিহারটা কিছু কমেছিল ঘেঁটুর, তবে একেবারে নয়। ছুটির সময় তা পুষিয়ে নিত। মাঝে মাঝেই বাড়ীতে কমপ্লেন। ঘেঁটু ক্লাশে বসে আলুকাবলি খেয়েছে। ঘেঁটু দিদিমণির মুখের ওপর চোপা করেছে! তাছাড়া বই হারিয়ে ফেলা, পড়া তৈরী না করা, দিদিমণি বকলে কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকা। এইসব কত রকমের।

কিন্তু সবার কাছে অনাদৃতা, অব-হেলিতা হলেও একজন তাকে বুঝতো—সে তার সাহিত্যিক ছোটকাকা। এমন প্রাণের জোয়ারে স্বয়ং সম্পূর্ণা মেয়েটার মনের খবর জানতেন তিনি। কিন্তু সেই জানার সঞ্চয়ে তার অভিজ্ঞতা হলো সরল, তীব্র, দুর্বার, দুরন্ত ঘেঁটুর কটি কথা—

সেই যে ছেলেবেলায় সে বলেছিল—

ছোটকাকা—আমি তোকে একটা নাম দেবো—

ঘেঁটু—কই, দাও। কত দাম দেবে?

ঘেঁটু—ছোটকা, তুমি তো কত [illegible] দেখো, আমার দিকে একটা [illegible]?

ছোটকাকা—তোকে দিলাম।

ঘেঁটু—হ্যাঁ, আমার [illegible] নিয়ে। সে ভালোপাটে, [illegible] দেওয়ালে হাত জড়ানো রয়ে [illegible]— তাকে কিন্তু একটা ঘর জুটিয়ে দিও—দিও কেমন?

ছোটকাকা—ঘর!

ঘেঁটু—হ্যাঁ তার ভারী সাধ গো—তার নিজের একটা ঘর হবে—আর এমন কেউ থাকবে যে তাকে জানবে-বুঝবে, কক্ষোনো বকবে না— কক্খোনো না!

অপর পক্ষে বড় বোন মল্লিকা স্নিগ্ধ, শান্ত, রজনীগন্ধার মতই শিল্পিত রূপে আর গুণে। এমনকি মল্লিকার প্রত্যেকটা কাজ সুচারু ও সুছাঁদের। ওর ওই চাঁপার কলির মত আঙুলের যে ছুঁচের কাজগুলো করে, তা' সূক্ষ্মতায় কলের কাজকেও হার মানায়। ছবি আঁকাতেও সে পটু। ছবির মতই সে সুন্দর। তার গড়নে পেটনে চলনে বলনে একটা আভিজাত্যের রূপ প্রকাশ পায়।

বাংলা দেশের এক চরিত্র-বিচিত্র পরি-বারের পটভূমিকায় দুই বোনের পরিবেশ-

আর, ডি, বনশাল প্রযোজিত আশাপূর্ণা দেবীর 'ছায়াসূর্য' ছবির একটি বিশেষ দৃশ্য গ্রহণে কর্মব্যস্ত চিত্রনাট্যকার-পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং অন্যান্য কলাকুশলীরা।

পরিস্থিতি আর মানস অসাম্যে—এই গল্পের পরিণতি এক নতুন বিস্ময় আনবে তা পরিচালক শ্রীচৌধুরীর চিত্রগ্রহণ ও চিত্রনাট্যে প্রমাণ পেয়েছে। বর্তমানে এ কাহিনীর দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়।

কাহিনীর প্রধান চরিত্রে বড়দার অফিসসর্বস্ব শান্তিপ্রিয় চরিত্রটি রূপদান করছেন পাহাড়ী সান্যাল। মেজদার বিলিতী অফিসের সঙ্গে বিলিতী মেজাজটি বিকাশ রায়ের। ছোটকাকার সাহিত্যবোধ নির্মলকুমারের। বড়বৌদির কোমলে-কঠিনে জীবন্ত চরিত্রটি রূপ দিচ্ছেন মলিনা দেবী। মেজবৌদির অকারণে কথা বলা এবং উন্নাসিক ব্যক্তিত্বটি আরোপ করছেন অনুভা গুপ্তা। এছাড়া বাড়ীর চাকর বংশী—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া রবি ঘোষ, গীতা দে, অরুণ মুখোপাধ্যায়, বেবি মিত্রা, আরতি গাঙ্গুলী এ'রা আছেন। আর দুই বোনের এই দ্বন্দ্বমধুর চরিত্রে মল্লিকার ভূমিকায় কল্যাণী ঘোষ এবং অনন্যা ঘেঁটুর অনবদ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর। ঘেঁটুর চরিত্রের জন্য একটা বিশেষ মেকআপ সুন্দরী শর্মিলাকে নিতে হয়েছে। রক্তকরবীর মত অতটা সামঞ্জস্য না হলেও রঙের কালিমা একেবারে মুছে যাইনি।

এই বিশেষ রূপসজ্জার রূপকার অনন্ত দাস। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর সংগীতগ্রহণযন্ত্রে এ ছবির সঙ্গীতগ্রহণ শেষ করলেন সঙ্গীত পরিচালক ভি বালসারা। এ ছবিতে দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংযোজন চিত্রামোদীদের বিস্মিত করবে। দুটি গানের একটি কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—'এসো এসো আমার ঘরে এসো', আর একটি চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন—'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে।'

'ছায়াসূর্য' তরুণ কলাকুশলীদের একটি সার্থক প্রয়াস। তরুণতম পরিচালক পার্থপ্রতিমের সহকারীরাও তরুণ।

—চিত্রদূত

খেলাধুলা

দর্শক

॥ দলীপ সিংজী ট্রফি ॥

দক্ষিণাঞ্চল দল : ১৩২ রান (পি কে বেলিয়াপ্পা ৪৮। বাল্ গুপ্তে ৫৫ রাণে ৯ উইকেট)

ও ২৬৩ রান (আব্বাস আলী বেগ ৭৬, এম এল জয়সীমা ৬১। বাল্ গুপ্তে ৭২ রাণে ৩ উইকেট)

পশ্চিমাঞ্চল দল : ৪১৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সুধাকর অধিকারী ১০৩, পলি উমরীগড় ১০৩, অজিত ওয়াদেকার ৯৩। জয়সীমা ৭৬ রানে ৫ এবং গিলক্রিষ্ট ১৪৩ রানে ২ উইকেট)

ইডেন গার্ডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বছরের ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ২০ রাণে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দু বছর দলীপ সিংজী ট্রফি জয় করেছে। গত বছর বোম্বাইয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম বছরের ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল ১০ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করেছিল। পলি উমরীগড় পশ্চিমাঞ্চল দল এবং এম এল জয়সীমা দক্ষিণাঞ্চল দল পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন।

কৃপাল সিং এবং তাঁর ভ্রাতা মিলখা সিং পারিবারিক অসুবিধার কারণে দক্ষিণাঞ্চল দলের পক্ষে ফাইনাল খেলায় যোগদান করেন নি। কৃপাল সিং বাংগালোরে সেণ্ট্রাল জোনের বিপক্ষে দক্ষিণাঞ্চল দল পরিচালনা করেছিলেন।

দক্ষিণাঞ্চল দল টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু প্রথম দিনের ৩ ঘন্টা ১০ মিনিটের খেলাতেই দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১৩২ রাণে শেষ হয়। দলের ১৩২ রাণের মাথায় চারটে উইকেট পড়ে যায়। বাল্ গুপ্তে একাই ৫৫ রাণে ৯টা
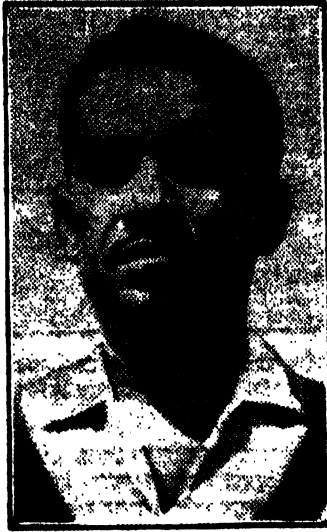
বাল্ গুপ্তে

উইকেট পান। খেলার বাকি সময়ে পশ্চিমাঞ্চল দল ২টো উইকেট খুইয়ে ৯১ রাণ তুলে দেয়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দল ৪১৫ রাণের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের পক্ষে সেঞ্চুরী করেন সুধাকর অধিকারী (১০৩) এবং পলি উমরীগড় (১০৩)। এঁদের পর অজিত ওয়াদেকারের ৯৩ রাণ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাঞ্চল দলের পক্ষে সর্বাধিক ৫টা উইকেট পান জয়সীমা। লাঞ্চের সময় পশ্চিমাঞ্চল দলের রাণ ছিল ২২৬, ৪টে উইকেট পড়ে। উইকেটে ছিলেন উমরীগড় (১৮) এবং ওয়াদেকার (৩৪)। চা-পানের সময়ে ছিল ৩৫১ রাণ, ৪টে উইকেট পড়ে। উমরীগড়ের রাণ ৮৬ এবং ওয়াদেকারের ৮৩।

পশ্চিমাঞ্চল দল ৩৬৫ মিনিট খেলে এই রাণ তুলেছিল। দলের ৫ম উইকেট পড়ে যায় ৩৭০ রাণের মাথায়। পঞ্চম উই-

সুধাকর অধিকারী
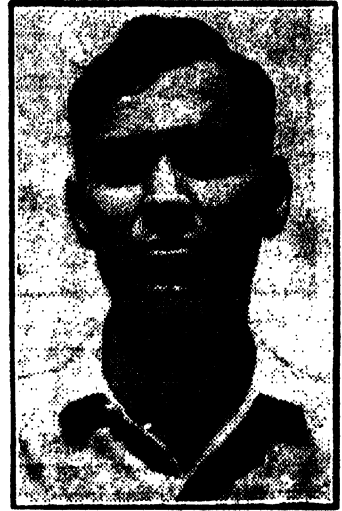
কেটের জুটিতে উমরীগড় এবং ওয়াদেকার দলের ১৮৯ রাণ তুলে দেন। দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংসের খেলার মতই পশ্চিমাঞ্চল দলেরও শেষ দিকে বিপর্যয় দেখা দেয়—৭ম ও ৮ম উইকেট একই রাণের (৪১৫) মাথায় পড়ে যায়। এই ৪১৫ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিণাঞ্চল দল কোন উইকেট না হারিয়ে ১০ রাণ করে।

তৃতীয় দিনের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭টা উইকেট পড়ে ২১৯ রাণ দাঁড়ায়। তখন ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পেতে দক্ষিণাঞ্চল দলের আরও ৬৫ রাণের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে জমা ছিল ৩টে উইকেট। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে আব্বাস আলী বেগ এবং জয়সীমা দলের ১৩০ রাণ তুলে দেন। তৃতীয় দিনে এই দুজনের খেলাই উল্লেখযোগ্য। বেগ ২২৫ মিনিটের খেলায় নিজস্ব ৭৬ রাণ ক'রে দলের ১৬৩ রাণের মাথায় আউট হ'ন। বেগের ৭৬ রাণে ছিল ১৩টা বাউণ্ডারী।

পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক পলি উমরীগড় (বাঁ দিকে) দক্ষিণাঞ্চল দলের অধিনায়ক এম এল জয়সীমার মুদ্রা নিক্ষেপ অনুষ্ঠান আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক পলি উমরীগড়কে পুরস্কার বিতরণ করছেন।

জয়সীমা নিজস্ব ৬১ রাণের মাথায় নাদকার্নীর বলে বোল্ড-আউট হ'ন। জয়সীমার বিদায়ের পরই দলের ভাঙ্গন শুরু হয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দলের রাণ দাঁড়ায় ২১৯, ৭টা উইকেট পড়ে।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে দক্ষিণাঞ্চল দল ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পাওয়ার প্রয়োজনীয় রাণ তুলতে পারেনি। চতুর্থ দিনে ৪৫ মিনিটের খেলায় দলের বাকি ৩টে উইকেট পড়ে যায়: ২৬৩ রাণে দক্ষিণাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। ফলে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ২০ রাণে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসেও বালু গুপ্তে দলের পক্ষে সর্বাধিক ৩টে উইকেট (৭২ রাণে) পান।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়া সফরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টেস্ট খেলার মাঝে একটা তিন দিনের ম্যাচ খেলেছে—নিউ সাউথ ওয়েলস কান্ট্রি একাদশ দলের বিপক্ষে। এই খেলায় এম সি সি দল ১৪৫ রাণে জয়ী হয়। তৃতীয় দিন খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে এক ঘণ্টা আগেই খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

ভিজে মাঠে এম সি সি দল প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম দিনের খেলায় ৬টা উইকেট খুইয়ে ২৪৪ রাণ করে। মাঠ ভিজে থাকার দরুণ নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয়নি। লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভ হয়। এই দিনে বেরী নাইট ৫৩ মিনিটের খেলায় ৫০ রাণ ক'রে নট-আউট থাকেন। ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ পুলার ৫৩ রাণ ক'রে রাণ-আউট হ'ন।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস ৩১৯ রাণের মাথায় শেষ হয়। এবং এই দ্বিতীয় দিনেই নিউ সাউথ ওয়েলস কান্ট্রি একাদশ দলের প্রথম ইনিংস পড়ে যায় ২০৩ রাণে। ফলে এম সি সি ১১৬ রাণে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কোন উইকেট না প'ড়ে এম সি সি দলের ৪১ রাণ ওঠে। তৃতীয় দিনে এম সি সি দল ১৯০ রাণের (৪ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অধিনায়ক টেড ডেক্সটার পিটিয়ে খেলে ৭১ রাণ তুলে নট-আউট থাকেন। হাতে ৪ ঘণ্টা সময় এবং জয়লাভের জন্যে ৩০৭ রাণের প্রয়োজন—খেলার এই অবস্থায় নিউ সাউথ ওয়েলস কান্ট্রি দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ১৬১ রানে ইনিংস শেষ করে। অফ্-স্পিন বোলার ডেভিড এ্যালেন ৩৮ রাণে ৫টা, লেগ-ব্রেক বোলার জিওফ পুলার ২৬ রাণে ৩টে এবং টম্ গ্রেভনী ২৩ রাণে ২টো উইকেট পান। খেলার এক সময়ে ডেভিড এ্যালেনের ছিল ৪টে উইকেট মাত্র ৭ রাণে।

॥ ডেভিডসন এবং হার্ভে ॥

অস্ট্রেলিয়ার এ্যালান কীথ ডেভিডসন বর্তমান সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফাষ্ট বোলার। কিন্তু তিনি টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজই তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট খেলা। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পঞ্চম টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিডসনের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের উপর যবনিকা পাত হবে, এ কথা ভাবতে গিয়ে অনেকেরই মনে দুঃখের ছায়া নেমে আসবে। ডেভিডসনের বর্তমান বয়স ৩৩ বছর। তাঁর স্ত্রী এবং দুই পুত্রের উপর তাঁর যে পবিত্র কর্তব্য রয়েছে সে সম্বন্ধে ডেভিডসন খুবই সচেতন। এবং সেই কর্তব্যের তাগিদেই তিনি তাঁর প্রিয় ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলা পর্যন্ত ফলাফল ধরে ডেভিডসনের টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের সাফল্য এই রকম দাঁড়িয়েছে: খেলা ৪২, মোট রাণ ১২৬৫, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৮০ এবং ৩৬৭৫ রাণে ১৮০টা উইকেট। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের তিনটে টেস্ট খেলায় ডেভিডসন পেয়েছেন ৩২৭ রাণে ১৮টা উইকেট (এভারেজ ১৮·১৬)। ডেভিডসন ন্যাটা খেলোয়াড়—বাঁ হাতে ব্যাট এবং বল করেন। ১৯৬০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক প্রথম টেস্ট খেলায় ডেভিডসন মোট ১২৪ রাণ (৪৪ ও ৮০) এবং ১১টা উইকেট (১[illegible] রাণে ৫ ও ৮৭ রাণে ৬) পান—টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটা খেলায় মোট ১০০ রাণ করা এবং ১০টা উইকেট পাওয়ার দৃষ্টান্ত ডেভিডসনই প্রথম স্থাপন করেন এবং এ পর্যন্ত তাঁর নাগাল কেউ পা'ননি।

অস্ট্রেলিয়ার আর এক প্রখ্যাত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—নীল হার্ভে ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। হার্ভে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের খেলোয়াড়। সম্প্রতি সাউথ অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে হার্ভে তাঁর প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়-জীবনে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বাধিক রাণ (নট-আউট ২৩১ রাণ) করার পরই অবসর গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছেন। ন্যাটা খেলোয়াড় নীল হার্ভে বিশ্বের একজন অন্যতম খ্যাতনামা খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় রাণ সংখ্যার দিক থেকে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের পরই তাঁর স্থান। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ব্র্যাডম্যানের রাণ সংখ্যা ৫২টা খেলায়

৬৯৯৬। বর্তমান সময়ে (২৪।১।৬৩) নীল হার্ভের রাণ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯৩৯। এক ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষেই হার্ভে ২২০৬ রান করেছেন। তাঁর টেস্ট সেঞ্চুরী সংখ্যা ২০।

॥ আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ॥

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পুণা ৭ উইকেটে মাদ্রাজকে পরাজিত করে রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি জয় করেছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পুণা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রথম সাফল্য লাভ করলো। হাতে দু'দিন খেলার সময় বাকি থাকতে তৃতীয় দিনের খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। তৃতীয় দিনে চা-পানের ২০ মিনিট আগে মাদ্রাজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৬ রাণে শেষ হলে জয়লাভের জন্যে পুণা দলের মাত্র ৬২ রাণের প্রয়োজন হয়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ২৫ মিনিট আগেই পুণা এই রাণ তুলে দেয়। সংক্ষিপ্ত ফলাফল : মাদ্রাজ : ১২৫ ও ১৮৬ রাণ। পুণা : ২৫০ ও ৬২ রাণ (৩ উইকেটে)।

॥ এডিলেডের টেস্ট ক্রিকেট ॥

অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের চতুর্থ টেস্ট খেলা গত ২৫শে জানুয়ারী থেকে সুরু হয়েছে। এই টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ ৩০শে জানুয়ারী। প্রেসে শেষ লেখা দেওয়ার সময় পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলা শেষ হয়নি। এই অবসরে এডিলেড মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার বিগত টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এডিলেড মাঠে টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রথম সুরু হয় ১৮৮৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর। সেই টেস্ট খেলাটি ছিল ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৮৮৪-৮৫ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা এবং এই দুই দেশের সপ্তদশ টেস্ট খেলা। এডিলেড মাঠের এই সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জয়লাভ করেছিল। সেই সময় থেকে ১৯৬৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত (অর্থাৎ বর্তমান চতুর্থ টেস্ট খেলা আরম্ভের আগের দিন পর্যন্ত) এডিলেড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ১৭টি টেস্ট খেলা হয়েছে। এডিলেডে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার এই ১৭টি টেস্টে উভয় দেশের পক্ষে যে সব রেকর্ড হয়েছে সেগুলি 'এডিলেড মাঠের টেস্ট রেকর্ড' এই শিরোনামায় এই সঙ্গে দেওয়া হল। এডিলেড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান চতুর্থ টেস্ট খেলার পটভূমিকায় এই রেকর্ড-গুলি পাঠকদের কৌতূহল যথেষ্ট চরিতার্থ করবে।

এডিলেড মাঠের টেস্ট রেকর্ড

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

মোট খেলা ১৭. অস্ট্রেলিয়ার জয় ১০. ইংল্যাণ্ডের জয় ৬ এবং খেলা ড্র ১।

এক ইনিংসে দলগত রান

(৫০০ অথবা তার বেশী)

ইংল্যাণ্ড : ৫০১ রান (১৯১১--২)

অস্ট্রেলিয়া : ৫৮২ রান (১৯২০--১); ৫৭৩ রান (১৮৯৭--৮) ও ৫০৬ রান (১৯০৭--৮)।

এক ইনিংসে সর্বনিম্ন রান

ইংল্যাণ্ড : ১২৪ রান (১৮৯৪--৫)

অস্ট্রেলিয়া : ১৩৩ রান (১৯১১—২)

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড : ১৮৭ জে বি হবস, (১৯১১—২)।

অস্ট্রেলিয়া : ২১২ ডি জি ব্র্যাডম্যান, (১৯৩৬—৭)।

টেস্ট সেঞ্চুরী

মোট ৩৪। অস্ট্রেলিয়া ২০; ইংল্যাণ্ড ১৪।

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রান

১৭৫৩ রান (৪০ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড—৪৪৭ ও ৩৭০; অস্ট্রেলিয়া—৩৫৪ ও ৫৮২। এই ১৭৫৩ রানই অস্ট্রেলিয়ার যে কোন মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক মোট রানের রেকর্ড।

উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ডব্লিউ আর হ্যামণ্ড ১১৯* ও ১৭৭ (১৯২৮—৯); ডেনিস কম্পটন ১৪৭ ও ১০৩* (১৯৪৬-৭)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : আর্থার মরিস ১২২ ও ১২৪* (১৯৪৬-৭)

একটি খেলায় ৬টি সেঞ্চুরী

১৯২০-২১ সাল

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ১৩৫* এ সি রাসেল; ১২৩ জে বি হবস।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৬২ এইচ এল কলিন্স; ১৪৭ সি কেলাওয়ে; ১২১ ডব্লিউ আর্মস্ট্রং; ১০৪ সি ই পেলিউ।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত ২০০ রান

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ২১২ ডি জি ব্র্যাডম্যান (১৯৩৬-৭); ২০৬ আর্থার মরিস (১৯৫০-১); ২০১* জে রাইডার (১৯২৪-৫)

এক ইনিংসে জয়লাভ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : এক ইনিংস ও ২৭৪ রান (১৯৫০-১); এক ইনিংস ও ১৩ রান (১৮৯৭-৮)

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : এক ইনিংস ও ২৩০ রান (১৮৯১-২)

চারটি বলে ৩ উইকেট লাভ

১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে রয় লিণ্ডওয়াল ৪টি বলে ৩টি উইকেট (বেডসার, ইভান্স এবং রাইট) পান।

সর্বাধিক রান আউট

ইংল্যাণ্ডের চারজন ১৯০১-২ সালের টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলায় রান আউট হ'ন।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ৮টি (১২৬ রানে)—জে সি হোয়াইট (১৯২৮-৯)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৮টি (৪৩ রানে)—এ ই ট্রট ১৮৯৪—৫

জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী রান

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই ৩ জন করেন : আর জে হার্টিগান (১১৬), ১৯০৭-৮; এ এ জ্যাকসন (১৬৪), ১৯২৮-৯; জে বার্ক (১০১*), ১৯৫০-১। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এ গৌরব কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যে আসেনি।

* নটআউট।

॥ অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস ॥

১৯৬৩ সালের অস্ট্রেলিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মিস মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে এবং কেন্ ফ্লেচারের সহযোগিতায় মিক্সড ডাবলস ফাইনালে জয়লাভ করেছেন। মিস স্মিথ এই নিয়ে উপর্যুপরি চারবার নিজ দেশের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন এবং এই চারবারের ফাইনালে তাঁর বিপক্ষে খেলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই জে লেহান।

অস্ট্রেলিয়ার মিস্ মার্গারেট স্মিথ ১৯৬২ সালে খুব অল্পের জন্যে একই বছরে বিশ্বের সেরা চারটি সিঙ্গলস খেতাব (অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান খেতাব) পাননি। মিস স্মিথ এই চারটি খেতাবের মধ্যে তিনটি পেয়েছিলেন—পান নি কেবল উইম্বলেডন খেতাব।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বদেশবাসী কেন ফ্লেচার। ১৯৬১ সালেও রয় এমার্সন এই প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। গত বছরের ফাইনালে তিনি স্বদেশবাসী রড লেভারের কাছে পরাজিত হন। এ বছরের সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড় রয় এমার্সন তাঁর ডাবলস খেলার সঙ্গী বব্ হিউইটকে পরাজিত করতে খুবই বেগ পেয়েছিলেন।

এই সেমি-ফাইনালে জয়লাভ করতে তাঁকে দু' ঘন্টারও বেশী সময় কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

গত বছরের অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান সিঙ্গলস বিজয়ী রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) পেশাদার খেলোয়াড়-জীবন গ্রহণ করায় রয় এমার্সন

বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর শূন্য স্থান অধিকার করেছেন। আলোচ্য বছরে অস্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস খেলায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়লাভের পর রয় এমার্সন বলেছেন, তিনি টেনিস খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে আরও দু'বছর সখের খেলোয়াড় হিসাবে টেনিস খেলবেন। বর্তমানে তাঁর লক্ষ্য, ডোনাল্ড বাজ এবং রড লেভারের মত একই বছরে বিশ্বের চারটি সেরা টেনিস খেতাব লাভ করা। তিনি এখনই পেশাদার খেলোয়াড়-জীবন গ্রহণ করবেন না। তবে মোটা টাকার প্রস্তাব পেলে বিবেচনা ক'রে দেখবেন।

॥ রড লেভার ॥

অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় রড লেভার পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি; বরং এ পর্যন্ত শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৬২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে জগতের কাছে পরিচিত। রড লেভার ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৯টি খেলায় যোগদান করেন এবং উপর্যুপরি ৮টি খেলায় পরাজয় স্বীকার করার পর ৯ম খেলায় স্বদেশবাসী কেন্ রোজওয়ালকে পরাজিত করেন। পেশাদার খেলোয়াড় জীবনে এই তাঁর সর্বপ্রথম জয়।

রড লেভার সখের খেলোয়াড় হিসাবে ১৯৬২ সালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। ১৯৬২ সাল তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের এক সাফল্যময় অধ্যায়। ১৯৬২ সালে রড লেভার বিশ্বের অন্যতম চারটি লন টেনিস প্রতিযোগিতায় (অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান) পুরুষ বিভাগের সিঙ্গলস্ খেতাব পান। তাঁর আগে একই বছরে এই চারটি খেতাব পেয়েছিলেন একমাত্র আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৮)। ১৯৬২ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলেও রড লেভার তিনটি খেলায় (দুটি সিঙ্গলস্ এবং একটি ডাবলস্) যোগদান করে অপরাজেয় সম্মান অক্ষুন্ন রাখেন।

॥ পদ্মশ্রী সৈয়দ মুস্তাক আলি ॥

ভারতবর্ষের চতুর্দশ সাধারণতন্ত্র দিবসে যে একুশ জন স্বনামধন্য ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৈয়দ মুস্তাক আলি। মুস্তাক আলির নাম শুধু ভারতীয় ক্রিকেট মহলেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে তিনি যথেষ্ট সুপরিচিত। ইতিপূর্বে প্রখ্যাত এম সি সি তাঁকে ক্লাবের আজীবন সদস্য পদ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ইন্দোরে ১৯৪১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম।

॥ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়ানুষ্ঠান

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়া অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এ্যা লেটিক প্রতিযোগিতায় পুরুষ দলগত বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব পয়েন্ট এবং মহিলাদের দলগত বিভ রেঞ্জার্স ৪২ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স লাভ করেছে। পুরুষদের ব্যক্তি চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছেন মেটাল স্পোর্টস্ ক্লাবের পি সি হাউ (পয়েন্ট) এবং মহিলা বিভাগে রেঞ্জ ক্লাবের মরীন হকিন্স (১৮ পয়ে পুরুষ বিভাগে পি সি হাউ (তিনটি অনুষ্ঠানে (৪০০ মি হার্ডলস্, ৮০০ ও ১৫০০ মি দৌড়) প্রথম স্থান লাভ করেন। মহি বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ মরীন হকিন্স (রেঞ্জার্স) এবং এ রিচসনের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্ব হয়। রিচসন প্রথম স্থান পান সট ডিসকাস্ এবং জাভেলিন অনুষ্ঠা অপর দিকে হকিন্স ১০০, ২০০ ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান প শেষ পর্যন্ত ১১০ মিটার হার্ড হকিন্স দ্বিতীয় স্থান লাভ ক ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ পান। পুরু দের দলগত চ্যাম্পিয়নসিপ নি মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লা মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোর হয়েছি এক সময়ে এই দুই দলের পয়েন্ট স ছিল। শেষে ৪ × ১০০ মিটার রি রেসে মোহনবাগান জয়লাভ করে পয়েন্টের ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গল দ পিছনে রেখে প্রথম স্থান লাভ করে

প্রতিযোগিতার এই তি অনুষ্ঠানে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপি হয়েছে : ২০০ মিটার দৌড় (মা বিভাগ) : তাপস (ইস্টবেঙ্গ সময় ২৩·৬ । ৪০০ মি হার্ডলস্ (পুরুষ বিভাগ) : পি হাউ (মেটাল বক্স এস সি), ৫৮·৩ সেঃ। ২০০ মিটার দৌড় (মহি বিভাগ) : মরীন হকিন্স (রেঞ্জা সময় ২৭ সেঃ।

আলোচ্য রাজ্য এ্যাথলেটিক প্র যোগিতার ফলাফল উন্নত ক্রীড়াম পর্যায় পড়ে না। এলাহাবাদের আগ আন্তঃ রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগি যোগদানের যোগ্যতা সম্পর্কে যে নিম্ন মান বেঁধে দেওয়া হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্রীড়ামান তুলনায় খুবই নিকৃষ্ট। তা ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনায় যোগ যথেষ্ট অভাবও ছিল। এই দুই বি আর কালবিলম্ব না করে ব্যবস্থা লম্বন করা খুবই দরকার।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০শ সংখ্যা—মূল্যে ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৫শে মাঘ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday 8th February, 1963.
40 Naya Paise.

জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজগুলির অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষকদিগকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের বার্ষিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই নিষেধাজ্ঞা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরি সমিতি ছাত্রদিগের স্বার্থের বিষয় নানাদিক দিয়া বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী অনুমোদিত হইয়াছিল।

তাহার একদিন পূর্বে. ৩১শে জানুয়ারীতে কলিকাতায় রাজ্য বিধান পরিষদে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল সম্পর্কিত আলোচনা নাটকীয় ধরণে সাঙ্গ হয়, এবং বিল গৃহীত হয়। এই আলোচনায় ছয়দিনের অধিবেশনের ২৮ ঘণ্টাকাল তর্কবিতর্কে অতিবাহিত হয়। ঐ দিন ছিল বিধান পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিন এবং পর্ষৎ বিল সম্পর্কিত আলোচনার জন্য স্থিরীকৃত ২৮ ঘণ্টার শেষ তিন ঘণ্টাও ছিল ঐ দিনের অধিবেশনকালের মধ্যে। ২৭টি ধারার আলোচনা ছিল বাকী যাহার মধ্যে ২২ হইতে ২৭ সংখ্যক ছয়টির ধারা অনুযায়ী তর্কবিতর্কে ২ ঘণ্টা চলিয়া যাইবার পর সহকারী সভাপতি প্রতাপচন্দ্র গুহরায়ের অনুরোধে বাকী ২১টি ধারা বিনা আলোচনায় ভোটে দেওয়া হয়, কেননা, সময়-সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। বিলটি গৃহীত হইবার পূর্বে নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক সমিতির (এ, বি, টি, এ) সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় রায় ক্রোধান্বিত হইয়া বলেন যে তাঁহারা বিলটিকে কাগজের টুকরা বলিয়াই মনে করেন এবং তাঁহাদের মতে উহার রচয়িতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত হইবে। ইহার উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন যে, শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ে-রা কোনদিন শাসনতন্ত্র চালনের ক্ষমতা পাইলে শিক্ষা বিষয়ক সকল ক্ষমতা শিক্ষাদপ্তরে কেন্দ্রীভূত করিবেন। ইহার পর নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পাঁচজন সদস্য প্রতিবাদ জানাইয়া পরিষদকক্ষ ত্যাগ করেন।

অন্য বিরোধী পক্ষের কোনও সদস্য ঐ শিক্ষক সদস্যাদিগের সহিত যোগ দেন নাই। তাঁহারা ঐ বিলটির বিষয়ে সেরূপ আপত্তিও জানান নাই। শুধুমাত্র নির্দলীয় সদস্য শ্রীশশাঙ্ক সান্যাল বলেন যে বিলটি সমস্ত পরিষদের পক্ষে অপমানজনক। শিক্ষকদলের আপত্তির মূল কারণ এই যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলের নূতন ব্যবস্থায় পর্ষতের সদস্যাদিগের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যাদিগের সংখ্যাধিক্য থাকিবে না, অর্থাৎ কিনা শিক্ষক সমিতির বামচক্রী মহারথীদিগের পক্ষে ঐ পর্ষৎকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজ আয়ত্তে আনা সম্ভব হইবে না। অন্ততঃপক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে।

নীতিগত তর্কের অবতারণা না করিয়া আমরা সাধারণভাবে মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি যে দেশের শাসনতন্ত্রে ও চালন-ব্যবস্থায় ব্যাপক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সাধারণতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন প্রথাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু দেশচালন ও জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনের প্রত্যেকটি ব্যবস্থার প্রতি স্তরে ও প্রতি পদে ঐ প্রথা অনুযায়ী কার্যে সুফল পাওয়ার আশা এখনও সুদূরপরাহত। কেননা দেশের জনমত কোন দেশেই এতদূর অগ্রসর হয় নাই যে ঐরূপ নির্বাচনে শুধুমাত্র কর্তব্যনিষ্ঠ সজ্জনদিগেরই সদস্যপদপ্রাপ্তি ঘটে। যদি তাহা না হয় এবং সকল কাজকর্মের প্রতি পদে যদি সকল সদস্যের মতামত লইয়া কাজ করিতে হয় তবে জনকল্যাণের পরিবর্তে কি অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান।

কলিকাতাবাসীমাত্রেই জানেন যে এই প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের কল্যাণচিন্তা অবান্তর ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিশাল নগরী এখন ঐ পৌরপ্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থা ও কর্তব্যবিমুখতার ফলে ক্রমে নরকে পরিণত হইতেছে। নগরবাসীদিগের মঙ্গল বা উন্নতির ব্যবস্থা দূরে থাক, যে সকল বাধাবিঘ্নে বা বিপত্তিজনক পরিস্থিতিতে তাহাদের জীবনযাত্রা দুর্বহ বা আশঙ্কাপূর্ণ হয় সেগুলির দূরীকরণের কোনও চেষ্টা বা সক্রীয় ব্যবস্থা ঐ পৌরপ্রতিষ্ঠান আজ দীর্ঘদিন যাবৎ করেন না। বরঞ্চ যদি কোনক্রমে ঐরূপ কাজের কোনও ব্যবস্থা ঐ প্রতিষ্ঠানের বাহিরের কোনও সংস্থা করেন তবে সেই ব্যবস্থাও নিজেদের আয়ত্তে আনিয়া পণ্ড করিবার চেষ্টাই এতদিন কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তালুকদার কমিটি কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানে কর্তব্যপালন বিষয়ে বাধা অপসারণের জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের বিশেষ ক্ষমতা দানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। অবশ্য এই সুপারিশ ব্যর্থ করার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রতিষ্ঠানে চলিতেছে।

বাংলায় শিক্ষার মান ক্রমেই নীচে নামিতেছে। এবং ইহার প্রধান কারণ যে ছাত্রদের শিক্ষার বুনিয়াদ—যাহা প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা ক্লাসে গঠিত হওয়া উচিত—তাহা কাঁচা থাকিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকারই এই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিলের প্রধান উদ্দেশ্য।

বালুকায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রের......

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বালুকায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রের ফসফরাসের আবিল নক্ষত্রপুঞ্জ—
মাছ জানে, বালুকা জানে না, দূরের দৈনিক চাঁদ চোর-পুলিশ খেলেছে কতই
ও-পাড়ার কদম্বের তল ছেড়ে, সমুদ্রে তোমার।
তোমাকে কি ভালোবাসে চাঁদ ঐ বালকের মতো?
সফেন সমুদ্রে তুমি নক্ষত্রেরও বিছানা পেতেছো,
তুমিও কি ভালোবাসো দূরত্বের প্রতি নিমন্ত্রণ?
তুমিও কি পুরুষের মতো কোনো পুরুষ দেখোনি—
রামগড় ইষ্টিশন, ফেল্ট্-টুপি উড়েছে মৌসুমে
হাজারিবাগের দিনে ট্রেণ যায় ব্যর্থ সিটি হেঁকে—
তুমিও কি ভালোবাসো, যারে ভালোবাসো বারবার!
বালুকায় ভেঙে পড়ে সমুদ্রের ফসফরাসের আবিল নক্ষত্রপুঞ্জ—
মাছ জানে, কেহই জানে না, দূরের দৈনিক চাঁদ নানাবিধ খেলার অতীত।

হিমালয়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হিমালয়, কে তোমার ধ্যানকে ভাঙালো?
সে এক বীভৎস পশু, বিশ্বাসঘাতক
কেমন কি করে বলি ঃ
সে যে নিজে নিজেরই উপমা,
সুস্থির বিশ্বাস কি তা জানে না জীবনে
মতিচ্ছন্ন উচ্ছৃংখল ঘৃণিত বর্বর।

তোমার উদাত্ত ডাক কানে শুনি আজ
অশান্ত চঞ্চল সাড়া জাগে প্রাণে প্রাণে।
কি উদ্দাম উল্লাসের ঢেউ
জীবনকে চকিত করে বলয়িত হলো!

আমার কি পরিচয়?
আমি সেই আগত ও অনাগত কালের সমীক্ষা।
আঠারো সাতান্ন সালে আমি
ঝাঁসী ও লক্ষ্ণৌয়ে পড়ে গুলিতে মরেছি।
সমুদ্রের লোনাজল দগ্ধ করে
হয়েছি স্বাধীন।
আমিই হিজলী জেলে হৃদয়ের দল মেলে
ফুটিয়েছি পদ্ম ও গোলাপ।
আবার উনিশ সাতচল্লিশের আগষ্টে
পথে পথে তে-রঙা ঝান্ডায়
জীবনকে উড়িয়েছি চিকণ ময়ূরপংখী ঘুড়ির মতন!
আমি সেই অমর অমৃতপুত্র,
তোমার অমৃতধারা আমার জীবনদাতা,
আমি তাই হাজির এখানে।
তোমারই প্রদত্ত এই জীবনের বিনিময়ে
বাঁচাবো তোমাকে, আমি, হিমালয়।

প্রতিরোধ

অনন্ত দাশ

প্রতিরোধে আমি হবো না শক্তিহীন
অমিত বীর্যে ধরি জীবনের গতি
সম্ভাবনায় ফুলে ওঠে এই বাহু
অনাহত তবু কখনো হবো না ক্ষীণ
শত আঘাতেও চাই না অব্যাহতি
তোমাকে জেনেছি আমাদের অরি-রাহু;

তীব্র সুখের দিন কেটে গেছে প্রিয়
চারিদিকে দেখি লেলিহান ঘন শিখা
এ কী আলোড়নে জেগেছে চতুর্দিক
রণসজ্জায় করো আজ রমণীয়;
আমারই রক্তে এঁকো ঋজু জয়টিকা
এই প্রতিজ্ঞায় আমি আজ নির্ভীক।

রাজপথে কার দুর্বল দেহ কাঁপে
সমবায়ী সাজে তাকেও রাখি না দূরে
বিপুল সত্তা চারিদিক ঘিরে আজ
জ্বালাক বহ্নি পশুর ঘৃণ্য পাপে—
তুঙ্গ আশার গভীর অন্তঃপুরে
খুলে রেখে দেব জয়মাল্যের সাজ।

জৈমিনি

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ করার আয়োজন শুরু হয়েছিল বছর দুয়েক আগে। প্রকৃত প্রস্তাবে এর মধ্যে আটটি খণ্ড প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু বাকী পাঁচখানা এখনো প্রকাশিত হয়নি বলে নানা লোকে নানা কথা বলতে শুরু করেছেন।

সত্যি বলতে কি, এসব সমালোচনা যে নিতান্ত অর্থহীন তা আমি এবার সরস্বতী পুজোর সময় মাইকে কান পেতেই অমায়িক ভাবে বুঝতে পেরেছি।

মাইকে গান বাজানোর বিষয়ে বোধ-হয় একটা বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু আনন্দে নিয়ম নাস্তি, অতএব সে নিয়ম দুটো দিন প্রায় শিকেয় তোলা ছিল। গান বেজেছে হরদম—বাঁদিকে, ডানদিকে, সামনে এবং পেছনে। ঠিক ছোটবেলায় যেমন পড়েছিলাম—ক্যানন টু রাইট অব দেম, ক্যানন টু লেফ্‌ট অব দেম, ক্যানন ইন ফ্রন্ট অব দেম ভলিড্‌ অ্যান্ড থাণ্ডার্ড—সেই রকম।

কিছুক্ষণ এসব গান এবং বাজনা শোনার পর মাথা ধরে উঠছিল প্রায়। এমন সময় একটা ব্রেণ ওয়েভ খেলে গেল মনে। ভাবলাম এই তো সুযোগ! এখন স্ট্যাটিসটিকসের যুগ, বাঙলা দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের রুচি আজ কোন দিকে প্রবাহিত, তার একটা জরিপ গ্রহণ করলেই তো ব্যাপারটা এত আক্রমণাত্মক মনে হবে না। মনকে আমি প্রবোধ দিয়ে বললাম, হে মন, শান্ত হও। এই যে চারদিকে সুরের অসুর-নর্তন শুরু হয়েছে একে অবাঞ্ছিত ভেবো না, ভাবো—এ তোমারই উপ-কারার্থে আত্ম-নিবেদিত। তুমি রুচির বিষয়ে গবেষণা করবে বলেই বিতরিত হচ্ছে এসব নিদর্শন। অতএব ঠাণ্ডা হয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বস।

বসা গেল নোটবই হাতে করে। তাতে যা জানতে পারলাম তা এই রকম।

কয়েকটি গান খুবই জনপ্রিয়। নানা প্যাণ্ডাল থেকে ঘুরে ঘুরে বাজানো হ'য়েছে সেগুলি। এই সব পুনরাবৃত্তি দিয়ে প্রায় দশ বারোটা প্যাণ্ডালের মাইক থেকে রেকর্ড বাজানো শুনেছি মোট ১৯২ বার। এর মধ্যে হিন্দি ফিল্মের গান বেজেছে ১৩৭ বার, বাংলা ফিল্ম ২৯ বার, আধুনিক বাংলা গান ২৩ বার, ইংরেজি বাজনা ৯ বার, ইংরেজি গান ৪ বার এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীত—একবারও নয়।

—রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রথম খন্ডটি তোমার দাদু দেখে গেছেন, আমিও কয়েক খন্ড দেখে গেলাম, বাকীগুলো তোমার ছেলেপুলেরা দেখবে।

অর্থাৎ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের দু' বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, আর কিছু না হোক, গানের ভেতর দিয়ে অন্তত তিনি থেকে যাবেন আমাদের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে, আমাদের উত্তরপুরুষের অভিমত অন্য রকম। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চেয়ে তাঁরা বাংলা ফিল্ম এবং আধুনিক গান বেশি পছন্দ করেন, এবং বাংলা গানের চেয়েও বেশি পছন্দ করেন হিন্দি ফিল্মের গান।

অবশ্য আপনারা বলতে পারেন, এটা রুচিদৈন্যের পরিচায়ক। কিন্তু রুচি বস্তুটির তো কোনো চাপ বা তাপমান যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। কী করে প্রমাণ করা যাবে যে এসব গান কুরুচির নিদর্শন? অন্যপক্ষে, যারা এগুলো শোনে তাদের যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। তারা বলে, এ গানগুলো তাদের ভালো লাগে—অপ্রতিরোধ্য রকম ভালো লাগে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এ ধরণের গান বা বাজনা তাদের কানে গেলে তারা কেবল মনের ভেতরে নয়, শারীরিক ভাবেও ভী প্রচন্ড রকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কেউ পা দিয়ে তাল ঠোকে, কেউ গেয়ে ওঠে সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে, আবার অনেকে আছে যারা নেচেও ওঠে সর্বাঙ্গ দিয়ে। ভালো লাগা একে বলতেই হবে। এবং কেন ভালো লাগে সে বিষয়ে তর্ক করা প্রায় অবাস্তব, কারণ ভালো লাগার কোনো যুক্তি থাকে না।

জানি আপনারা তবু তর্ক তুলে বলবেন খেলো জিনিস সুকুমারমতি বালক-বালিকার মনে চট করে প্রতিক্রিয়া তোলে, কিন্তু জিনিসটা যে খারাপ সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বড়দেরই; যেসব ছেলেমেয়ে এসব হালকা সুর আর কুরুচিকর গান গেয়ে আনন্দিত হয় তারাও আমাদেরই সমাজের কোনো না কোনো পরিবারের সন্তান। পরিবারের মধ্যে কোনো ভালো জিনিসের বিকল্প আদর্শ পায় না বলেই এরা হাত-পা ছেড়ে ভেসে যেতে থাকে চলতি স্রোতে। এজন্যে বড়দেরই বেশি করে সচেতন হওয়া দরকার।

মন্দ বলেননি কথাটা। কিন্তু প্রাণ রাখতেই যেখানে প্রাণান্ত সেখানে এসব উচ্চমার্গের কাব্যকথা নিয়ে মেতে থাকলেই হয়েছে আর কি! তা ছাড়া সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এসব হালকা সুরের গান, একটু রিক্রিয়েশন, দোষটাই বা কী?

এমন যুক্তি আমি স্বকর্ণে শুনেছি অনেক বাড়ির অভিভাবকদের কাছে। কাজেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার ভয়ে আলোচনার মুখ সচকিতে বন্ধ করে দিতে হ'য়েছে।

সম্ভবত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সরকারী প্রকাশকবর্গও এসব কথা ভালো ভাবেই জানেন। তাই তাঁরা উক্ত রচনাবলী প্রকাশ করতে উৎসাহ বোধ করছেন না একেবারে। কী হবে প্রকাশ ক'রে? পড়বে কে? রবীন্দ্রনাথ কী আর আমাদের জীবনে-মনে টিকে আছেন এখনো!

যদি বলেন, টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সরকারের অর্থাৎ সংস্কৃতির যে পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ টিকে থাকতে পারেন তার বাতিগুলো যাতে একে একে নিভে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং নতুন প্রদীপ জেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা—এ দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে, যদি আপনি সত্যিই এসব কথা বলেন, তাহলে বুঝব বাঙলা দেশে বাস করছেন না আপনি। সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে একখানা বই বেরোয় প্রথম শিক্ষার্থী ছাত্রদের জন্যে, নাম 'কিশলয়' সেই কিশলয়টির সবুজত্ব অক্ষুন্ন রাখতে হিমসিম খেয়ে যান তাঁরা, তিন দ সাপ্লাই শেষ করতে পারেন না, ওপর বলছেন 'সংস্কৃতি', 'পুরাণো ও' 'নতুন প্রদীপ',—আছেন ভালো! এসব উপমা দিয়ে সংসার চলে না মশাই, এ হল হার্ড রিয়্যালিটির জগৎ, ভেবেচিন্তে ধীরে সুস্থে কাজ করতে হয় এখানে।

তবে হাঁ, এমন হতে পারে যে, রবীন্দ্র রচনাবলীর যাঁরা গ্রাহক হ'য়েছিলেন তাঁরা অনেকেই হয়তো পরলোকগত হবেন শেষ খন্ডটি প্রকাশিত হবার আগে। ইতিমধ্যে গিয়েওছেন অনেকে মারা (সংবাদে প্রকাশ, ৬৬ জন!)। এসব ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দেওয়া হবে এই সম্পত্তি। কাজেই সোরগোল করার কিছু নেই, সমস্ত ব্যাপারটাই নিখুঁত আইনসম্মত উপায়ে অগ্রসর হচ্ছে!

আর, ইতিমধ্যে যদি দেশের লোক রবীন্দ্র-চর্চায় বিমুখ হ'য়ে পড়ে, অহো সে বড় দুর্ভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের গানকে হিন্দি অনুবাদে গাইলেই সে বিষয়ে কিছুটা প্রতিকার হ'তে পারবে!...

বাঙালী সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি।

।। ফকির-বাবা ।।

মনে পড়ল পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমি তখন মুঙ্গেরে ওকালতী করি। আমার বাবা জেলা কোর্টের বড় উকিল ছিলেন, তাঁর গুটি তিন চার জুনিয়র। আমি ছিলাম তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

কাজকর্ম বিশেষ করতাম না; বাবার পিছন পিছন এক এজলাস্ থেকে অন্য এজলাসে ঘুরে বেড়াতাম, কখনো বা এজলাসে সাক্ষীর এজেহার লিখতাম, এবং বেশির ভাগ সময় বার্ লাইব্রেরীতে বসে সমবয়স্ক উকিলদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম।

বার্ লাইব্রেরীর আড্ডা সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারি। অনেক চক্রে আড্ডা দিয়েছি, কিন্তু এমন চোখা বুদ্ধি ও wit-এর সংঘর্ষ আর কোথাও পাইনি। এ বিষয় আমার বিশ্বাস সব বার্ লাইব্রেরীই সমান।

আদালতের সরজমিনে নানা জাতীয় মানুষের বিচিত্র সমাবেশ। অধিকাংশই পুরুষ: বাদী প্রতিবাদী আসামী ফরিয়াদী সাক্ষী উকিল মুন্সী তদ্বির-কারী পাটোয়ারি। কেউ ছুটোছুটি করছে, কেউ মোকদ্দমা জিতে ঢোল পিটোচ্ছে, কেউ হেরে গিয়ে গাছতলায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ক্রোধ লোভ কুটিলতা হতাশা জয়োল্লাস, কত রকম মনোভাব এই আদালত নামক ভূখণ্ডের মধ্যে তাল পাকাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কোনোটাই কিন্তু উচ্চাঙ্গের মনোবৃত্তি নয়।

এই জনাবর্তের মধ্যে একটি লোককে মাঝে মাঝে দেখতে পেতাম যার সঙ্গে আদালতের বাতাবরণের কোনো মিল নেই। তাকে লোকে বলত ফকির বাবা। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, নিকষের মত গায়ের রঙ, মাথায় এক-মাথা তৈল-চিক্কণ বাব্রি চুল, অল্প দাড়ি আছে। মাংসল মুখে সামনের দুটো দাঁত ভাঙা, কিন্তু হাসিটি প্রাণখোলা; কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখ দুটিও ওই ফোঁটার মতই রক্তবর্ণ। কি শীত কি গ্রীষ্ম একটা কালো কম্বল তার চওড়া কাঁধে পাট করা থাকত। পরনে লুঙ্গি, কখনো সেই সঙ্গে একটা গেঞ্জি।

লোকটিকে দেখে আমার মনে হত সে আদৌ মুসলমান ছিল, তারপর তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেছিল। তার ফকির-বাবা নাম থেকেও তাই মনে হয়। কিন্তু এ আমার আন্দাজ মাত্র। তার গোটা পরিচয় কোনোদিন জানতে পারিনি।

ফকির বাবা আদালতে আসত টাকা রোজগার করতে। তার টাকা রোজগারের প্রক্রিয়া আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। আদালতের খোলা জায়গায় ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে হঠাৎ একটা লোকের হাত ধরে বলত—'তুই যদি আমাকে পাঁচ টাকা দিস্ তোকে মামলা জিতিয়ে দেব।' কাউকে কখনো অস্বীকার করতে দেখিনি, বরং পরম আহ্লাদিত হয়ে টাকা দিত। আশ্চর্য এই যে যারা টাকা দিত তারা কখনো মোকদ্দমায় হারত না। আবার দেখেছি কত লোক ফকির বাবাকে একশো দুশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে, বলছে—'বাবা, আমাকে মোকদ্দমা জিতিয়ে দাও।' কিন্তু ফকির বাবা টাকা নেয়নি। বলেছে—'তোর টাকা নেব না।'

আমার বিশ্বাস ফকির বাবার একটা দৈবশক্তি ছিল—খুব নিম্নস্তরের সিদ্ধাই—যার দ্বারা সে লোকের মুখ দেখে তার ভবিষ্যৎ জানতে পারত। আমাকে একবার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা এজলাসের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে বলেছিল—'তুই এখানে কি করছিস? যা ভাগ্—পালা।' তখন তার কথার মানে বুঝিনি।

দু'চার দিন আদালতে ঘুরে বেড়িয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে ফকির বাবা ডুব মারত, আবার দু'চার মাস পরে ফিরে আসত।

যে ঘটনা আজ মনে পড়ল সেটা ঘটেছিল গ্রীষ্মকালের একটি অপরাহ্ণে। তখন বোধহয় সকালে আদালত বসছে, বিকেলবেলা বাড়িতে মক্কেল আসে। মনে আছে, বিকেল আন্দাজ চারটের সময় বাবা অফিস-ঘরে এসে বসেছেন, আমিও এসেছি, আর এসেছেন বাবার প্রধান জুনিয়র শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায়। নিরাপদদাদা পরবর্তীকালে রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তখন জুনিয়র উকিল ছিলেন, আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন।

মক্কেল তখনো কেউ আসেনি; সদর দরজা ভেজানো আছে। বাবা আর নিরাপদদাদা টেবিলের দুই পাশে বসে বিশ্রাম্ভালাপ করছেন। টেবিলের ওপর নথিপত্র ভারী ভারী আইনের বই ছড়ানো রয়েছে।

হঠাৎ সদর দরজায় ঠেলা দিয়ে ঘরে ঢুকল—ফকির বাবা। সেই শা-জোয়ান চেহারা, সেই কাঁধে কম্বল, সেই গালভরা হাসি। অনেকদিন তাকে আদালতে দেখিনি, আমাদের বাড়িতে তার পদার্পণও এই প্রথম। বাবা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

ফকির বাবা তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বলল,—'বকিল সাহেব, দুটো টাকা দাও।'

বাবা বললেন,—'তুমি টাকা কি করবে?'

সে ফোগলা মুখে হেসে সপ্রতিভ-ভাবে বলল,—'মদ খাব।'

বাবা দোনা-মনা করতে লাগলেন। টাকা দিলেন না, কিন্তু 'দেব না' বলে তাকে হাঁকিয়েও দিলেন না। বাবার মনে বোধহয় সংশয় জেগেছিল, যে-ব্যক্তি মদ খাওয়ার জন্যে টাকা চায় তাকে টাকা দেওয়া উচিত কিনা।

নিরাপদদাদা এই সময় কথা বললেন। তিনি সে-সময় একটু নাস্তিক গোছের লোক ছিলেন; বললেন,—'ফকির সাহেব, তুমি তো সাধুসজ্জন ব্যক্তি, ভূত দেখাতে পারো?'

ফকির বাবা তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ফিরে বলল,—'হাঁ, পারি।'

ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বলে কি লোকটা! ভূত দেখাবে!

নিরাপদদাদা বললেন,—দেখাও ভূত। কিন্তু খাঁটি ভূত দেখাতে হবে, বুজরুকি চলবে না।'

ফকির বাবা বলল,—'এমন ভূত দেখাবো পিলে চমকে যাবে। এক তা শাদা কাগজ দাও।'

নিরাপদদাদা এক তা কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফকির বাবা কাগজ স্পর্শ করল না, কেবল কাগজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর বলল,—'হয়েছে। এবার কাগজটা চাপা দিয়ে রাখ।'

নিরাপদদাদা একটা ভারী বই-এর তলায় কাগজ চাপা দিয়ে রাখলেন। ফকির

বাবা তখন চেয়ার টেনে বসল, নিতান্ত সহজভাবে এ-কথা সে-কথা বলতে লাগল। কথাগুলো এতই সাধারণ যে আজ আর তার একটি কথাও মনে নেই।

পাঁচ মিনিট পরে ফকির বাবা গাল-গল্প থামিয়ে বলল,—'এবার কাগজটা বের করে দেখ।'

নিরাপদদাদা বই-এর তলা থেকে কাগজ বের করলেন। কাগজ দেখে সত্যিই পিলে চমকে উঠল। তার ওপর আঁকা হয়েছে এক বিকট ভয়ঙ্কর চেহারা। ছেলেমানুষদের ভয়-দেখানো রাক্কস-খোক্কসের চেহারা নয়, এমন একটা জীবন্ত হিংস্র কদর্যতা আছে ঐ চেহারায় যে বয়স্ক মানুষেরও বুক গুর-গুর করে ওঠে। আমরা মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলাম।

ফকির বাবা অট্টহাস্য করে বলল,—'দেখলে ভূত? এবার চাপা দিয়ে রাখো।'

নিরাপদদাদা যন্ত্রচালিতের মত কাগজখানা আবার বই-চাপা দিলেন। ফকির বাবা পিতৃদেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল,—'টাকা দাও।'

বাবা নিঃশব্দে দুটি টাকা দেরাজ থেকে বের করে তার হাতে দিলেন। ফকির বাবা গাল-ভরা হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমরা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলাম। তারপর নিরাপদদাদা দ্বিতীয় বার চাপা দেওয়া কাগজখানা বের করলেন। দেখা গেল কাগজে ভূতের চেহারা নেই, শাদা কাগজ আবার শাদা হয়ে গেছে।

মতামত

মহাশয়,

নিষিদ্ধ বই সম্বন্ধে আলোচনাকালে শ্রীঅভয়ঙ্কর ডি, এইচ, লরেন্সের লেখা "লেডী চ্যাটার্লীস্ লাভার" নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন (অমৃত—১৮ই জানুয়ারী) তার জন্য সাধারণ সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার লোভ সংবরণ করতে অক্ষম। যদিও এই সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বহুবার বহু পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে তবুও শ্রীঅভয়ংকরের মতো জোর দিয়ে বইটির অবদান সম্বন্ধে মন্তব্য খুব কমই পড়েছি বা শুনেছি। শ্রীঅভয়ঙ্করের প্রতিবাদ যাতে প্রতি সাহিত্যপ্রেমিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তারই প্রয়োজনে আমি মতামতের পুনরাবৃত্তি করবার প্রার্থনা করি।

আশা করি শ্রীঅভয়ঙ্করের আশা শীঘ্র সফল হ'বে—"লেডী চ্যাটার্লীস লাভার" তার যোগ্য সমাদর পাবে। কিন্তু তার জন্য দরকার পাঠকসমাজের সমবেত প্রচেষ্টা। "অমৃত" এ ব্যাপারে অগ্রণী হ'বে কি?

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা—৩১

চিঠিগুলি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে লরেন্সকে বোঝবার মতো পাঠকের অভাব ওদেশে নেই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের শিক্ষিত পাঠকসমাজে এ বিষয়ে কখনও কোনও আলোড়ন জাগেনি। লরেন্সকে আমরা কখনও ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করিনি। যদি চেষ্টা করতাম তবে দেশের সাহিত্যে এক বিরাট প্যারাডক্স-কে আমরা কখনও মেনে নিতে পারতাম না। কারণ লরেন্স অপঠিত হ'লেও এদেশে অশ্লীল সাহিত্যের ও তার পাঠকের অভাব নেই।

অশ্লীলতা ও সাহিত্যের মধ্যে এক সূক্ষ্ম সত্যের পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্য বিচারের ক্ষমতা যে পাঠকের আছে তিনিই সৎ পাঠক। সৎ পাঠকের দৃষ্টিতে *Lolita* নোংরামি ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। লরেন্স যদি নোংরামির দায়ে অপঠিত হ'তে পারেন তবে নোবোকভ্ কি করে ছাড়পত্র পান?

এক ইংরেজ লেখক বলেছিলেন, সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল নেই—আছে ভালো-খারাপ। মিলটন্ তাঁর বিখ্যাত "এ্যারিওপ্যাজিটিকা"-তে মন্তব্য করে-ছিলেন যে পাঠককে সব বই-ই পড়তে দেওয়া উচিত এবং তিনিই ভালোমন্দের বিচার করতে পারবেন। অস্কার ওয়াইল্ড আর মিলটনই বোধহয় সাহিত্যের সত্যিকারের বিচারের পথ দেখিয়েছিলেন। সে পথে যদি আমরা সাহিত্য বিচার না করি তো পাঠক হিসাবে আমরা নিজেদের সৎ বলতে পারি না।

প্রথমেই যে ব্যাপারে আমি মর্মাহত তা হ'চ্ছে লরেন্সের দার্শনিক দিকটুকু সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রে তাঁর কোনও বইয়ের আক্ষরিক মূল্য রূপায়ণের অসার্থক প্রচেষ্টা। যে কোনও মহৎ সাহিত্যিকেরই মহৎ জীবনাদর্শ থাকে; একথা বলা বাহুল্য যে জীবনাদর্শ ব্যতীত সৎ সাহিত্যিক হওয়াও অসম্ভব। লরেন্সের আদর্শ বা দর্শন—যাই বলি না কেন—সম্বন্ধে বহু মন্তব্য ইতিপূর্বেই বিদেশী সমালোচকেরা করেছেন। প্রায় সকলেই লরেন্সের বহু লেখার এক ভিন্ন ধরণের আদর্শ খুঁজে বার করতে পেরেছেন। সে আদর্শ এককথায় বলতে গেলে রক্তের জন্য ভালবাসা। "লেডী চ্যাটার্লীস লাভার"—এও এই দর্শন সামনে রেখেই লরেন্স বোদ্ধা পাঠককে সাহিত্য পাঠের নির্মল আনন্দ দানে যত্নপর ছিলেন। পাঠক তা' যে বুঝতে পেরেছেন তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এনকাউন্টার-এ অগণিত পাঠকের তরফ থেকে লেখা

মহাশয়,

আপনাদের সাপ্তাহিক 'অমৃতে'র প্রথম সংখ্যা হইতেই আমি একজন গুণ-মুগ্ধ ক্রেতা ও পাঠক। নতুন নতুন বিভাগ যেমন 'জানাতে পারেন', 'মনে পড়ল', ইত্যাদি অমৃতকে আরও আদরণীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলছে। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি বিভাগ আমি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে থাকি। জৈমিনির 'পূর্বপক্ষ' আমাকে বিশেষভাবে আনন্দ দেয়—এক কথায় 'পূর্বপক্ষ'—অনবদ্য ও অদ্বিতীয়।

বহুদিন থেকেই ভাবছিলাম আপনাদেরও সেই সঙ্গে জৈমিনিকে [illegible] অন্তরের ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু [illegible] যোগ আর হয়ে উঠছিল না। গত সংখ্যার (২য় বর্ষ, ২৮ সংখ্যা) পূর্বপক্ষ আমাকে অনু-প্রাণিত করে তুলল। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন আমারই অভিজ্ঞতার কথা জৈমিনি লিখেছেন। সত্যিই পড়তে পড়তে বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কত ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা আমার দৃষ্টি পটে জেগে উঠছিল। আমার আবেগ হয়ত আমি বড় বেশী প্রকাশ করে ফেললাম—অপরাধ হয়ত মার্জনা করবেন।

আরেকবার আপনাদের ও জৈমিনিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

অনিমেষকুমার চট্টোপাধ্যায়,
হাওড়া।

একটি বিস্মৃতপ্রায় উপন্যাস

দীপঙ্কর নন্দী

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

হিন্দু হোস্টেল। কলকাতার আদি ছাত্রাবাস।

এখানে যারা থাকে কেউ মেডিক্যাল কলেজ, কেউবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।

খাওয়া দাওয়া আর পড়াশোনা করাই তাদের প্রধান কাজ। আর ছুটির দিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ান আর আড্ডা দেওয়া।

আড্ডা বসে রবিবার। ছুটির দিন। অবসর বিনোদনের একমাত্র ছুটি। সকলে উন্মুখ হয়ে থাকে ওই দিনটির পথ চেয়ে।—দিন গোনে ওই দিনটির প্রতীক্ষায়।

আড্ডা বসে ছাত্রাবাসের খোলা ছাদে। সূর্যদেব অস্তমিত হলে, যখন ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ বাতাস বইতে থাকে তখন একটি দুটি করে আড্ডাধারী এসে উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাদ ভরে যায়। মুখরিত হয়ে উঠে কলরব আর কলহাস্যে।

সেদিন শুরু হয়েছিল সাহিত্যের আলোচনা। সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'কে কেন্দ্র করে। উপন্যাসটির প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। কেবলমাত্র একজন এর বিপক্ষে। সে বন্ধুদের কথায় সায় দিতে পাচ্ছিল না। সে বললে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র চরিত্র-চিত্র বাস্তবানুগ নয়। যা বাস্তব নয় তা চিত্রাঙ্কন করলে সুন্দর হয় না; যতই তাতে রঙ চড়িয়ে বর্ণাঢ্য করা হোক না কেন!

যুবকটির এই কথা শুনে একজন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো—তুমি যে আজ মস্ত সাহিত্যসমালোচক হয়ে উঠলে হে! সমালোচনা করতে সকলেই পারে। লেখ দেখি এমন একখানি উপন্যাস তবেই বুঝব বাহাদুর ছেলে বটে!

যুবকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় দীপ্তকণ্ঠে—তোমরা হতাশ হয়ো না, শিগগীর আমি একখানা উপন্যাস লিখব, যার প্রতিটি চরিত্র-চিত্রই হবে বাস্তব—স্বাভাবিক। যা নিত্য আমাদের সংসারে ঘটে থাকে।

যুবকটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। ভবিষ্যতে ডাক্তার হবে। দিবারাত্রি প্যাথলজি আর ফার্মাকোলজী নিয়ে মাথা ঘামায়। তার মুখে এহেন কথা শুনে সকলে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠলো। সাহিত্য যার পাঠ্যবিষয় নয়, সে বলে কিনা উপন্যাস লিখবে, ছেলেটার মাথা খারাপ হলো নাকি!

ল' কলেজের রাসবিহারী ঘোষ (পরে স্যার) তো কোনরকমে হাসি থামিয়ে বললে, দোহাই দাদা, তোমায় আর উপন্যাস লিখে কাজ নেই—নাড়ী-টেপা বিদ্যাটা ভাল করে রপ্ত কর!

ল' কলেজের আর একজন ছাত্র (পরে "সাধারণী" সম্পাদক) অক্ষয়চন্দ্র সরকার নিরাসক্ত ভাবে চুপ করে বসে ছিল। উপভোগ করছিল বন্ধুবান্ধবদের হাসিঠাট্টা আর পরিহাস। এবার সে মুখ খুললে। রাসবিহারীকে বাধা দিয়ে বললে,—থাম তো তুই; কেন ওকে অমন

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
জন্ম ১৮৪৩ : মৃত্যু ১৮৯১

নিরুৎসাহিত করছিস্‌? সাহিত্যের ছাত্র নয় বলে কি কেউ উপন্যাস লিখতে পারবে না?—

পরক্ষণে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-বন্ধুটির দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকালে। বেচারা তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণে ক্ষতবিক্ষত। ম্লান মুখে বসে ছিল চুপ করে। তাকে উৎসাহিত করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে—ওর কথায় কান দিস না ভাই! আমি বলছি তোর হবে—তুই লেখ!

বন্ধুর উৎসাহে সেদিন যুবকটি তেমন উৎসাহ বোধ করে নি। উৎসাহিত হবার মত পরিবেশও সেদিন ছিল না। হাস্যাস্পদ হয়ে চুপ করে বসে হয়তো সে সেদিন সংকল্প করেছিল এমন একখানি উপন্যাস লেখার যা সাহিত্য-ক্ষেত্রে যুগান্তরের সূচনা করবে!

হলোও তাই! এই ঘটনার কয়েক বছর পরের কথা। বাঙলা সাহিত্যে একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হ'লো। উপন্যাসটি সাহিত্যক্ষেত্রে অভূতপূর্ব আলোড়নের সূচনা করলো। উপন্যাসটি পড়ে সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

উপন্যাসটির প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। উপন্যাসটির নাম 'স্বর্ণলতা'। কিন্তু উপন্যাসটির ভাগ্যবান লেখক কে! সকলেই সাগ্রহে জানতে চায়!

উপন্যাসটির লেখক আর কেউ নয়,

হিন্দু হোস্টেলের সেই হাস্যাস্পদ যুবক,—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

তারকনাথ 'স্বর্ণলতা' রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি অনেক গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন কিন্তু কোনটিই স্বর্ণলতার মত হয়নি। একমাত্র 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের জোরেই তিনি বাঙলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। যেমন অমর হয়ে আছেন ইংরেজী সাহিত্যে কবি গ্রে একমাত্র 'এলেজী' কাব্য রচনা করে।

তারকনাথ যখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সেইসময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনী রোমান্স, বাস্তবপ্রিয় তারকনাথ 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠ করে তৃপ্তি পাননি। তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে 'দুর্গেশনন্দিনী'র অবাস্তব—অসামাজিক চরিত্র-চিত্র পাঠ করে। তাঁর তখনকার সেই বিদ্রোহী মনের পরিচয় পাওয়া যায় 'স্বর্ণলতা'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায়ঃ

"গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান ও ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় কি প্রকারে জানিতে পারিলেন, এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিমবাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। বিষ্ণুশর্মা তো একেবারে বোবা হইতেন। কিন্তু এই শক্তিটি ছিল বলিয়াই লঘুপতনক ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেছে এবং চিত্রগ্রীব অবোধ কপোতদিগকে উপদেশ দিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াই শত বৎসর পূর্বের এক যবনতনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।"

'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠ করার পরই তারকনাথের মনে একটি বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা জাগে। পরে দার্জিলিঙ প্রবাসকালে যখন সাহিত্যরসিক বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ দাস 'জ্ঞানাংকুর' মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তখন তারকনাথ তাঁর পূর্বপরিকল্পিত উপন্যাস অর্থাৎ 'স্বর্ণলতা' রচনায় হাত দেন।

তারকনাথ ছিলেন ডাক্তার। দার্জিলিঙ ছিল তাঁর কর্মস্থল। দার্জিলিঙ প্রবাসকালে তিনি স্বর্ণলতা রচনা করেন। সরকারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে তিনি স্বর্ণলতা রচনা করেন। স্বর্ণলতা রচনা তাঁর বিশ্রামসুখ ছিল। স্বর্গত সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

"সরকারী কার্যে তাঁহাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পর্যটন করিতে হইত এবং এই সময়ই 'স্বর্ণলতা' রচিত হয়। পল্লীগ্রামে ঘোড়ারগাড়ী যোটে না, সুতরাং গরুরগাড়ীই ভরসা। মধ্যাহ্নে পথিমধ্যে কোনও বৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কিয়দ্দূরে তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণ সদ্যনির্মিত ইষ্টকের চুল্লীতে হাঁড়ি চাপাইয়াছে। ডাক্তারবাবু গোরুরগাড়ীর তলায় শতরঞ্চ বিছাইয়া বসিয়া 'স্বর্ণলতা' লিখিতেছেন, স্বর্ণলতার অধিকাংশ এইরূপে গোরুরগাড়ীর তলায় রাজপথের উপর রচিত হইয়াছিল।"

পরিদর্শন-কার্যে তারকনাথ নানা শ্রেণীর ও নানা রকম চরিত্রের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ লাভ করেন। 'স্বর্ণলতা' প্রধানতঃ এই সমস্ত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। স্বর্ণলতার অধিকাংশ ঘটনাগুলির মত 'স্বর্ণলতার চরিত্রগুলিও বাস্তব জগৎ থেকে সংগৃহীত। এবিষয়ে তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন,

Some characters of my novel are from the real life. My friend Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh. 11th July, 1873.

স্বর্ণলতায় রূপায়িত শুধু রমেশই নয়—নীলকমল, গদাধর, শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি, শশিভূষণ, বিধুভূষণ, গোপাল প্রভৃতি পুরুষ-চরিত্র এবং সরলা, প্রমদা, দিগম্বর ঠাকুরাণীদি প্রভৃতি নারী-চরিত্রগুলি তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। শুধু তাই নয়, এদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এদের তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনি যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন।

সরলা চরিত্রটি তাঁর কোন প্রিয় পরিচিত ব্যক্তির স্ত্রীর চরিত্র। সরলাকে তিনি চিনতেন—জানতেন। সরলার তিল তিল করে মৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন স্বচক্ষে। অব্যক্ত এক বেদনায় মর্মাহত হয়েছেন দিনের পর দিন। তাঁর দরদী মনে চিরদিনের মত একটি স্থায়ী দাগ কেটে দিয়ে যায়। হয়তো এই কারণেই সরলার মৃত্যুদৃশ্যটি যেমন নিখুঁত, তেমনি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এই দৃশ্য রচনাকালে তিনি অঝরে অশ্রুবিসর্জন করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন,

I am very sorry and shed tears for the death of Sarala. Very sorry to part with her. I feel as if I am a murderer! What an awful thing death is

21st June, 1873.

ঠিক এইরকম অবস্থা হয়েছিল বিখ্যাত রুশ উপন্যাসকার টুর্গেনিভের। টুর্গেনিভ তাঁর Father and Children-এর নায়ক Bazarvo-কে মেরে ফেলবার সময় ঠিক এমনিভাবেই অশ্রুবিসর্জন করেন। অনুরূপ অবস্থা ঘটেছিল বালজাকের জীবনে। বালজাক একদিন তাঁর কোন এক বন্ধুকে রাস্তায় দেখে ভীষণ বিচলিত হয়ে দুঃখের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন—ওমুক। তখন তিনি যে উপন্যাস লিখছিলেন তার একটি চরিত্র মারা গিয়েছে জান? দরদী শিল্পীদের মনের অবস্থা এমনি হয়ে থাকে! তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাঁরা আপনজন মনে করেন।

সরলার মৃত্যুদৃশ্য রচনাকালে লেখক যেমন অশ্রুবিসর্জন করেন, তেমনি পাঠকরাও না কেঁদে পারেন না। সরলার মৃত্যুদৃশ্য পাঠ করে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মশায় ভীষণ ব্যথিত হন। তিনি একসময় গিয়ে তারকনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন—"বেচারা সরলাকে তিলে তিলে না মারিয়া তাহাকে বাঁচাইলেই সকল দিক রক্ষা হইত। তাহাকে তুমি বড় কষ্ট দিয়া মারিয়াছ।"

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুলাই, সোমবার অপরাহ্নে 'স্বর্ণলতা' রচনা শেষ হয়। গ্রন্থরচনা সমাপ্তির পর তারকনাথের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়। 'স্বর্ণলতা'র অধিকাংশ চরিত্রচিত্রই তাঁর প্রিয় পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের চিত্র। তাদের তিনি যেমন দেখেছেন, তেমনিভাবে স্বর্ণলতায় চিত্রিত করেছেন। 'স্বর্ণলতা'-মুকুরে প্রতিবিম্বিত নিজেদের স্বরূপচিত্র দেখে কেউ ব্যথিত, কেউ রাগান্বিত, কেউ বা চিরদিনের জন্য তাঁর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করবে, এই আশঙ্কায় তিনি দিবারাত্র বিষণ্ণ হয়ে থাকতেন, তিনি সর্বদাই এক ভীষণ মানসিক অশান্তি ভোগ করতেন। এবিষয়ে তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

"Finished my tale (Swarnalata) in the evening at 8 p.m. It was melancholy pleasure to see it completed as I was to part company with my friends forever. (Monday, 7th July, 1873).

স্বর্ণলতা রচনা শেষ হওয়ার আগেই তারকনাথ পুস্তকাকারে প্রকাশের চিন্তা করেন। Thinking of Printing my book Swarnalata on my own account. (23rd June, 1873). ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 'স্বর্ণলতা' পুস্তকাকারে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্ণলতা প্রকাশ করেন তৎকালীন বিখ্যাত ক্যানিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগেশচন্দ্র সে যুগের একজন সুলেখক ও গ্রন্থকার ছিলেন। শিক্ষকতার পবিত্র কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি পুস্তক-প্রকাশের পবিত্র ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থাবলী ও প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী "লুপ্ত রত্নোদ্ধার"-এর প্রকাশক।

প্রথম সংস্করণ স্বর্ণলতার টাইটেল পেজটি ছিল এইরকম ঃ—

স্বর্ণলতা

"Ficta Voluptatis causa sint Proxima Veris. HORACE.

Fictions to please should wear the face of Truth".

"কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং যদা সৌ তথ্যবদ্ভবেৎ" ইতি হরিবংশম।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
কলিকাতা।
আর্য্য যন্ত্রে শ্রীশেখ আতাব আলি দ্বারা মুদ্রিত।
১২৮১ সাল।

তারকনাথ স্বর্ণলতার নামপত্রে (টাইটেল পেজ) তিনটি মটো ব্যবহার করেন। প্রথম লাটিন শ্লোকটি তিনি কবি হোরেসের কাব্য থেকে, দ্বিতীয় ইংরেজী শ্লোকটি তাঁর প্রিয় উপন্যাসকার ফিল্ডিংএর 'টমজোন্স' উপন্যাস থেকে নির্বাচন করেন। আর তৃতীয় সংস্কৃত শ্লোকটি তিনি কিভাবে সংগ্রহ করেন, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন,

"ঠিক ঐরূপ (লাটিন ও ইংরেজী মটো) ভাব প্রকাশ করে এরূপ কোন শ্লোক না জানা থাকাতে নবীন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া শ্লোকটি রচনা করাইয়াছিলাম। আমি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে কিছুদিন কেমিষ্ট্রির অধ্যাপকের কার্য করি। সেই উপলক্ষে নবীন পণ্ডিত (প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক 'নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন') মহাশয়ের দ্বারা ঐ শ্লোকটি রচিত হয়। শ্লোক যদি হইল, ত কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই গ্রন্থ অথবা গ্রন্থকারের নাম দিতে হইবে। আমি বলিলাম, 'কুল্লুক ভট্ট' অথবা 'মহানির্বাণ তন্ত্র' এমন একটা কোনও বৃহৎ নাম বলিয়া দিন যাহা সাধারণ লোকে সচরাচর পড়ে না। তাহাতে নবীন পণ্ডিত মহাশয় শ্লোকটির নিম্নে 'হরিবংশম্' নামটি বসাইয়া দিয়াছিলেন।"

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণলতা অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর আগে বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের কোন উপন্যাস রচিত হয়নি। স্বর্ণলতার আগে বাংলা সাহিত্যে সাধারণতঃ ইতিহাসের বিজাতীয় ব্যক্তির চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে বাংলা উপন্যাস রচিত হয়। সেই সমস্ত রোমান্টিক পরিবেশপূর্ণ প্রণয়-কাহিনী পাঠ করে বাঙ্গালী মুগ্ধ বিস্মিত হত, তবুও এগুলিকে আপন করে গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ এগুলিতে না ছিল বাংলাদেশের ঘরের কথা, না ছিল বাঙ্গালীর মনের-প্রাণের কথা।

স্বর্ণলতায় বাঙ্গালী নিজের অন্তঃস্থলের গোপন কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের ঘর-সংসারের বাস্তব চিত্র দেখলো—অনুভব করলো প্রাণময় একাত্মতা। স্বর্ণলতা-মুকুরে নিজেদের স্বরূপ-চিত্র দেখে তারা আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। সেদিন সকলের মুখেই স্বর্ণলতার জয় জয়কার! সকলেই স্বর্ণলতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'ক্যালকাটা রিভিউ' তো স্বর্ণলতা সমালোচনা করতে বসে আত্মহারা হয়ে লিখলেন, 'স্বর্ণলতাই বাংলা ভাষার একমাত্র উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলি উপন্যাস নয়—কাব্য।' আর ক্যালকাটা গেজেটের ইংরেজ সম্পাদক স্বর্ণলতার সমালোচনায় আরো একটু এগিয়ে গেলেন ঃ—

This is perhaps the only novel (as distinguished from romance or political tale) yet written in Bengali. The incidents of every day Bengali life constitute its subject and, are described with remarkable accuracy. The phases of Bengali life touched upon various and the whole forms a panorama of great and moral and artistic interest".

একদল কিন্তু স্বর্ণলতাকে ভাল চোখে দেখেননি; এঁরা বঙ্কিমঅনুরাগীর দল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তশিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'স্বর্ণলতা' সমালোচনা পাঠ করলে তা বুঝতে পারা যায়। তাঁর সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদিত 'সাধারণী' পত্রে। সেই কৌতুহলোদ্দীপক সমালোচনাটি হল এই ঃ—

'গ্রন্থকার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তিনি নাম প্রকাশ করিলে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেন না। আখ্যায়িকাটি কৌশলময়ী, ইহাতে কিঞ্চিৎ সৃষ্টি-চাতুর্য্য আছে এবং আদ্যন্ত সহৃদয়তা পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের কোনরূপ বিশেষ রচনাভঙ্গি নাই বটে, কিন্তু ভাষা সম্পূর্ণ প্রাঞ্জল এবং গ্রন্থের সর্ব্বত্রই
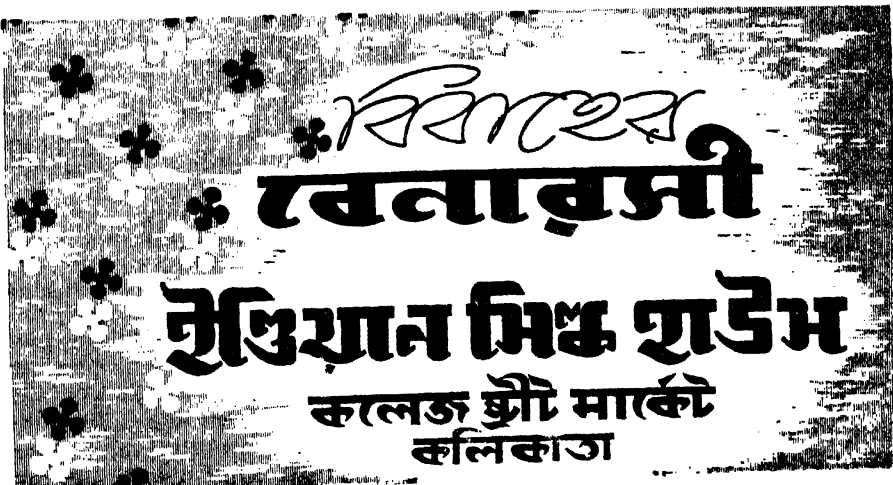
সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ শ্যামাদাসী অতি সুন্দর।

'এখন যে সকল উপন্যাস যন্ত্রমুখ হইতে উদ্গীরিত হইতেছে তৎসমস্তই বঙ্গ গ্রন্থকার-বিশেষের অনুকরণে বিন্যস্ত হয়, সুতরাং তাহার সকলগুলিই অপাঠ্য হইয়া উঠে। 'স্বর্ণলতা' আখ্যায়িকা সেইরূপ উপন্যাসের কপিন্যাস নহে। এই গ্রন্থ পাঠে কথ-কিঞ্চিৎ আশ্বাস হইয়াছি।

'কিন্তু গুপ্ত গ্রন্থকার অনুকরণের হাত একেবারে ছাড়াইতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে ইহাতেও অনুকরণ আছে, তবে অনুকরণ সর্ব্বাবয়বী বা বহুদেশ-ব্যাপী নহে, তাহাতেই গ্রন্থকারের উপর বিশ্বাস হইয়াছে ও তাহার গ্রন্থ হইতে আশ্বাস জন্মাইয়াছে। অনুকরণ ভাগ-সকল অনায়াসে পরিত্যক্ত হইতে পারিবে। সুস্বাদু রসাল তরুপরি পরগাছার মত, অনুকরণ ভাগসকল মূল কান্ড সংলগ্ন হইয়াছে। সেগুলি ছাঁটিয়া দিলে তরুর সৌন্দর্য্য ও ফলোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবে।

'দুই একটি স্থান প্রদর্শিত হইতেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভেই গ্রন্থকার ফীল্ডিঙের জ্যাঠামির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যথাঃ—

'গ্রন্থাকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানে গমনাগমন করিতে পারেন। নইলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন।' ইহা একরূপ রসিকতা বটে, কিন্তু সকল রসিকতা কিছু সকল কালেই চলে না। ফীল্ডিঙের রসিকতা এখন আর ভাল লাগে না। গ্রন্থকার সাধারণত ফীল্ডিঙের অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, ফীল্ডিং স্বীয় পূর্ব্ব-গামী উপন্যাসলেখক রিচাডসনের প্রতি যেরূপ মধ্যে মধ্যে কটাক্ষ করিয়াছেন, স্বর্ণলতাকারও সেইরূপ বঙ্কিমবাবুর প্রতি একটু-আধটু কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়াছেন। এই সকল ভাল নহে, সুতরাং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ভাগটি পরিহার্য্য। বলিতে কি, গ্রন্থারম্ভে এইরূপ রসিকতাচ্ছটা দেখিয়া আমরা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থকারের হাতযশে ও আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এরূপ রসিকতা গ্রন্থে প্রায়ই নাই, তাহাতেই বলি একটু-আধটু যা আছে তাহা উঠাইয়া দিলেই ভাল হয়।

'গ্রন্থমধ্যে আর একরূপ অনুকরণ আছে। কোন প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার ঘটনার অনুকরণ, কিম্বা নায়ক-নায়িকার বাক্যানুকরণ। প্রথমে গ্রন্থ হইতে উদাহরণ দিতেছি, স্বর্ণলতা গ্রন্থের নায়িকা। ঘটনাক্রমে স্বীয় পিতৃগুরু শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরির পিতামহির সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তখন তিনি বিবাহযোগ্যা হইয়াছেন। গুরুদেব অর্থলোভে তাহাকে অপাত্রে ন্যস্তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। বিবাহরাত্রিতে এই গুরুদেবের নিকট স্বর্ণলতা প্রথমে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, পাষণ্ড যখন তাহার হস্ত ধারণ করিতে যায়, তখন স্বর্ণ উঠিয়া দৌড়াইয়া গৃহের কোণে গিয়া আপনার অঞ্চল দ্বারা গলদেশ বন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি যেখানে আছ, ওখান থেকে যদি এক-পা অগ্রসর হও তাহা হইলে আমি ফাঁসি টানিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' ইংরেজী গদ্যকাব্য-পাঠক মাত্রেই জানেন বইসগুইলবার্চিকে রেবেকা কি বলিয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি হইতে নিবারিত করেন।

"Remain where thou art, proud, Templar, or at thy choice advance! One foot nearer and I plunge myself from precipice".

এখন দেখুন এইরূপ ঘটনানুকরণ ও বাক্যানুকরণে গ্রন্থকারকে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। যে সকল পাঠকের মনে রেবেকার বাক্য জাগরূক আছে (এবং 'আইবান হো' অনেকেই পাঠ করিয়াছেন) স্বর্ণলতার কথাগুলি তাঁহাদের কাছে 'ধার করা ধার করা' বলিয়া বোধ হয়। সত্য বটে, স্বর্ণলতা কিছু রেবেকার কাছে ঋণী নহেন, তথাপি গ্রন্থকারের ঋণের জন্য তিনি দায়িনী হয়েন, তাহাতেই তাঁহার মর্ম্ম-কথাগুলি মুখস্ত করা কথা বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং যে স্থলে কোন প্রতিভাশালী গ্রন্থকার কোন নায়ক-নায়িকার মুখ হইতে কোন সজীব বাক্য নিঃসৃত করিয়া তাহা চিরবেগে চালিত করিয়া গিয়াছেন, সে স্থলে সে রূপ বাক্যের অনুকরণ না করাই কর্ত্তব্য, করিলে বিশেষ ক্ষতি হয়।

'আর একটি ছোট কথা, নীলকমলের জন্য বড় দুঃখ হয়। একবার যাত্রার দলে বেচারী হনুমান সাজিয়া জন্মের মত নিরুদ্দেশ হইল। আর যাহারা এই ভব-যাত্রায় চিরদিন হনুমান সাজিয়া পোড়া-মুখে দিবারাত্রি কদলী ভক্ষণ করিতে করিতে মুখভঙ্গি করিতেছে তাহারা স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া চলিল। এই সকল ভাবিলে নীলকমলের জন্য বাস্তবিক দুঃখ হয়। গ্রন্থকার যদি বিধুভূষণের অঙ্গনে তাহাকে বসাইয়া একবার 'পদ্ম আঁখির' গানটি গাওয়াইতেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইতাম।

'ভরসা করি, গুপ্ত গ্রন্থকার এখন হইতে স্বনামে রবো ধন্য : বচনের সার্থকতা করিবেন। আমরা তাঁহার মাভৈ মাভৈ বলিতেছি।'

স্বর্ণলতার প্রথম তিনটি সংস্করণে তারকনাথের নাম ছিল না। বিশিষ্ট কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া 'স্বর্ণলতা'র প্রকৃত গ্রন্থকার কে কেউ জানতেন না। এই সুযোগে অনেকে স্বর্ণলতার লেখক বলে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন। অনেকে আবার মনে করতেন, স্বর্ণলতার লেখক আর কেউ নয়, 'কল্পতরু' প্রণেতা ব্যঙ্গরসিক স্বয়ং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথ ছিলেন তারকনাথের 'প্রণয়-গর্বিত' বন্ধু। তিনি তারকনাথকে এ বিষয়ে একটি পত্র লেখেন এবং পত্রটি স্বর্ণলতার প্রারম্ভে বিজ্ঞাপন স্বরূপে ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন। তারকনাথ প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধ ফেলতে পারেন নি, স্বর্ণলতার চতুর্থ সংস্করণে (১২৯০) ইন্দ্রনাথের সেই পত্রটি প্রকাশ করেন। পত্রটিতে যুগপৎ স্বর্ণলতার জনপ্রিয়তা ও সমালোচক ইন্দ্রনাথের স্বর্ণলতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশিত। পত্রটি এইরূপ—

'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারকনাথ
গঙ্গোপাধ্যায় সমীপেষু।

প্রিয়তমেষু,

নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার স্বর্ণলতা চতুর্থবার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা-ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর-ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এ সকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জ্জিত হইয়াও যে-গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী তাহার অসাধারণ কোনও গুণ আছে ইহা কে না স্বীকার করিবে. বাস্তবিক স্বর্ণলতা স্বর্ণলতাই [illegible]

'মনে করিও না যে [illegible] কাছে তোমার গ্রন্থের গুণগান ক[illegible]র জন্যই এ পত্র লিখিতেছি। যে জন্য এ পত্র লিখিতেছি, বলি, 'স্বর্ণলতা'র যশে তুমি যশস্বী হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যের পরিচয় দিবার জন্য এখন যে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে এ যশের ঘোষণা দেখিতে পাই, অথচ তুমি কে তাহা অনেকেই জানেন না। না জানাটা বড় অন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ ইহাতে পাপিষ্ঠের প্রলোভন; এই সেদিন বগুড়াতে এক ব্যক্তি স্বর্ণলতার যশোলোভে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে গ্রন্থকার পরিচয় দিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছিল। ইহা আমার অসহ্য। দ্বিতীয়তঃ আমার আত্মীয় লোকের মধ্যেও কোনও কোনও ব্যক্তি আমাকে স্বর্ণলতালেখক মনে করিয়া থাকেন। এ পরিচয়ে আমি গর্ব্বিত হইতে পারি বটে, কিন্তু যাহাতে আমার অধিকার নাই, তোমার সে গৌরব চুরি করিয়া আমি বড় হইব কেন?

যাঁহাদের এ প্রকার ভ্রম আছে, তাঁহাদের ভ্রম দূর করা উচিত। তাই বলিতেছি যে, তুমি আপন সম্পত্তি আপনার করিয়া লও।

'আমি জানি, তুমি আমার কথা রাখিবে। জানি বলিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রন্থে যোজনা করিতে তোমার মনে যদি কোনও দ্বিধা হয়, বিজ্ঞাপনস্বরূপ আমার এই পত্রখানি গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিবে। ইতি

বর্ধমান　　প্রণয়-গর্ব্বিত
জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০ সাল।
শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্ণলতা উপন্যাস হিসাবে যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে তেমনি স্বর্ণলতার নাট্যরূপ নাট্যজগতে যুগান্তরের সূচনা করে। সে যুগে রঙ্গমঞ্চে সাধারণতঃ সামাজিক নাটক অভিনয় হত না। যে দু-একটি সামাজিক নাটকের অভিনয় হয় তা সাফল্যমন্ডিত

হয়নি। আর তখন সামাজিক নাটক বলতে লোকে বুঝত ব্যঙ্গকৌতুকমূলক প্রহসন। এই কারণে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষগণের ধারণা হয় ব্যঙ্গকৌতুকমূলক মিলনান্ত নাটক ছাড়া বিয়োগান্ত সামাজিক নাটক লোকে পয়সা দিয়ে দেখতে আসবে না। কিন্তু বিখ্যাত নট ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসু এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি তারকনাথের স্বর্ণলতার প্রথমাংশের নাট্যরূপ দিলেন, নাম দিলেন 'সরলা'।

১৮৮৮ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর রসরাজ অমৃতলাল বসুর পরিচালনায় ষ্টার থিয়েটারে সরলার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীর শিল্পিবৃন্দের ভূমিকা ছিল এইরূপঃ—

সরলা — কিরণবালা
শ্যামা — গঙ্গামণি
প্রমদা — কাদম্বিনী
শশীভূষণ — নীলমাধব চক্রবর্তী
বিধুভূষণ — অমৃত মিত্র
গদাধর — অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)
নীলকমল — পরাণ শীল

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তীকালে রসরাজ অমৃতলাল বসু নিজে নীলকমলের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন।

রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত সামাজিক নাটকের অভিনয় এই প্রথম। এর আগে এই ধরনের কোন নাটক বাংলাদেশের কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি। সরলার অভিনয় যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তা তখনকার পাক্ষিক 'অনুসন্ধানের' সরলা অভিনয়ের সমালোচনাটি পাঠ করলেই বুঝতে পারা যায়। সমালোচনাটি এইরূপঃ—

'শুভক্ষণে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নাটকালোচনায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এতদিনে আমাদের আশা ফলবতী হইবার সূত্রপাত হইল। ষ্টার কোম্পানীও সময় বুঝিয়া লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণলতা উপন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত সরলা চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহারা হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মন তন্ময়ত্বভাবে বিভোর হয়, যাহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ত' অভিনয়, সেই ত' নাট্যচিত্র। উপস্থিত সরলা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা সে আশার সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহার কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব? সেই হিংস্র বিষপূর্ণা কালভুজঙ্গিনী প্রমদার—না সেই কোমলহৃদয়া, কুটিল-সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা পতিপ্রাণা সাধ্বী দেবীরূপা সরলার? আবার অন্যদিকে হাস্যরসের সপ্তসমুদ্র সেই নীলকমল, না সেই অক্ষয়-গ্রন্থের অক্ষয় সৃজিতা আদর্শ নারী—শ্যামা দাসী? এক দিকে ভ্রাতৃবৎসল বিধুভূষণ ও অন্যদিকে দানবী স্ত্রীর মন্ত্রে মুগ্ধ কাপুরুষ শশীভূষণ। ফলতঃ ভালর কোলে মন্দ ও মন্দের কোলে ভাল না থাকিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঘটনা-স্রোতের অনিবার্য্য ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়কে উদ্বেল করিতে না পারিলে নাটক হয় না, আর তাহা অভিনয় করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থে তাহা প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আমরা এই অভিনয় দেখিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। আবার সময়ে সময়ে হাসিতে হাসিতেও পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সেই "ডি ডি — ডি ডি ঐ চল্লে" গদাধরের উক্তি এখনও আমাদের কর্ণে যেন লাগিয়া রহিয়াছে। আর—সেই সরলার মর্ম্মভেদী শেষ দৃশ্য; সেই দৃশ্য অনেকদিন স্মৃতিপটে বিরাজ করিবে। কিন্তু গোপালের "মা আমার খিদে পায়নি, তুই কাঁদিস নে"—সেই মর্ম্মস্পর্শী উক্তি বড়ই স্বাভাবিক। ফলতঃ অভিনয়ে আমরা নিন্দার বড়ই কিছুই দেখিতে পাই নাই, যদি বা কিছু হইয়া থাকে, তাহা সে অপার গুণরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এ অভিনয়ে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অভিনয়ে আমরা কায়মনবাক্যে কোম্পানীর মঙ্গল প্রার্থনা করি। আরও আমরা প্রার্থনা করি, "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" যে বঙ্গবাসীর মূলমন্ত্র সেই অধঃপতিত বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে যেন এক একবার সরলার অভিনয় দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য বুঝিয়া আসেন।'

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের যুগে সরলার আবির্ভাব ও জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর। প্রথম অভিনয় রজনীর পর থেকেই অভাবনীয় জনসমাগম হতে থাকে। সরলার অভিনয় নাট্যজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করে। দর্শকগণের মনে এক নতুন ভাবের স্রোত এনে দেয়। এতকাল লোকে রাধাকৃষ্ণের মিলন-বিরহের কাহিনী দেখে চোখের জল ফেলেছে। এবার চোখের জল ফেলতে এলো সাধারণ নরনারীর তুচ্ছ সাংসারিক দুঃখ-বেদনায়। পয়সা দিয়ে লোকে কাঁদতে এলো এই প্রথম। বাংলা নাট্যজগতে এ এক অভিনব—অভূতপূর্ব ঘটনা।

ষ্টার থিয়েটারে সরলার অভিনয় হয় দীর্ঘ এক বছর। এর পরও বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচালনায় সরলার অভিনয় হয়ে গিয়েছে একাধিকবার বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার স্বর্গত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এ পর্য্যন্ত বঙ্গ রঙ্গালয়ে যত উপন্যাস নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা ভিন্ন কোন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমনিভাবে গ্রহণ করেননি যেমনভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল।"

সরলার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর বিখ্যাত নাটক 'প্রফুল্ল' এবং আরো পরে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর বিখ্যাত 'পরপারে' সামাজিক নাটক রচনা করেন।

স্বর্ণলতা কেবলমাত্র স্বদেশবাসীরই নয়, বিদেশীদেরও অসাধারণ প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করে। বাঙ্গালী ও বাংলার সমাজকে চেনবার ও জানবার পক্ষে সে যুগে বিদেশীদের কাছে স্বর্ণলতা ছিল একমাত্র অমূল্য ও অপরিহার্য গ্রন্থ। স্বর্ণলতায় বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান যেরূপ যথাযথভাবে শিল্পানুগ দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে সেরূপ সে যুগে অন্য কোন উপন্যাসে বর্ণিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণলতা বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। যে কোন বিদেশী এ গ্রন্থ পড়লে বুঝতে পারবে বাঙ্গালী জাতি কেমন, কেমন তাদের সমাজ, কেমন তাদের জীবন। এইজন্যই রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন ঃ

'উপন্যাস রচয়িতা বলিয়া স্বর্ণলতা প্রণেতা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অল্প খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোন স্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিগণ আমাদের হিন্দু জাতির রীতিনীতি অবগত হইতে চাহেন তাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ না করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারিবেন না।'

স্বর্ণলতার এই গুণের জন্যই ডক্টর জে ডি এণ্ডার্সন সাহেব স্বর্ণলতাকে বাংলাদেশের গমনোন্মুখ বিদেশী সিভিল পরীক্ষার্থীদের পাঠোপযোগী মনে করে তাঁদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণকে প্ররোচিত করেন। এই বিষয়ে তিনি স্বর্গত

সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দী মহাশয়কে লিখেছিলেন ঃ

"It was I who induced the civil service commissioners to make it a text book for the probationers going to Bengal. . . . you ask me if you can get a copy of the proceedings relative to the acceptance of Swarnalata as a text book. No, that is impossible. Some 7 or 8 years ago the senior examiner to the civil service commissioners Mr. Mair wrote privately to ask me if I could suggest suitable substitute for Nabanari (নবনারী) than the text book. There had been a complaints that Nabanari was a little old fashioned in style and gave an inadequate idea of the present state of fiction and imagination prose in Bengali on which I suggested Swarnalata".

এইচ এ ডি ফিলিপস বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব লিপিকৌশল, কবিত্বময়ী ভাষা, রোমান্টিক পরিবেশপূর্ণ প্রণয়কাহিনী পাঠ করে যেমন মুগ্ধ হন তেমনি পল্লী-বাংলার সাধারণ নরনারীর হাসিকান্নাভরা জীবন-সংগ্রামের কাহিনী 'স্বর্ণলতা' পাঠ করে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। তিনি উপন্যাসের গুণাগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে 'স্বর্ণলতা' সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একখানি উপন্যাস লিখেছেন; সেখানি 'স্বর্ণলতা'। একান্নবর্তী পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, বিবাদ-বিসম্বাদ, ষড়যন্ত্র বা পারিবারিক চক্রান্ত প্রভৃতির চিত্র গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এ ধরণের আরো উপন্যাসের চাহিদা আছে। উপন্যাসের প্রধান আগ্রহ-উদ্দীপক বিষয় হচ্ছে পরিকল্পনা, বিষয়বস্তু ও ভাবাদর্শ। তার পরে আসে ঘটনা বিন্যাসের কথা। ঘটনা বিন্যাসের উপরই উপন্যাসের কাঠামো ও প্লটের মাধুর্য নির্ভরশীল। সাধারণতঃ শিক্ষিত পাঠক ঘটনার অবাস্তবতা পছন্দ করেন না। এই অপছন্দ সুস্থ সমালোচক মনের পরিচায়ক। তবে উপন্যাস অতিমাত্রায় বাস্তবধর্মী হলে উপন্যাস না হয়ে হবে জীবনের ইতিবৃত্ত। উপন্যাসের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে আবার গ্রন্থকারের বর্ণনাশক্তির উপর। সে বর্ণনা কোন দৃশ্যের, কোন দৈনন্দিন ঘটনার কিম্বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের হতে পারে। কিন্তু উপন্যাসকারকে প্রধানতঃ বিচার করা হয় তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির দ্বারাই। এই সমস্ত গুণাগুণ বিচারে 'স্বর্ণলতা'—বাংলা সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করে।'

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর জে ডি এণ্ডার্সন বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস অনুবাদ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর মত ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যে—বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সুপরিচিত বিদেশীদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। তিনি 'স্বর্ণলতা'র অনবদ্য চরিত্রগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন,

'স্বর্ণলতার চরিত্রগুলি যেমন জীবন্ত তেমনি উজ্জ্বল। শশীভূষণ ও বিধুভূষণ, প্রমদা ও সরলার বৈষম্য অতি নিপুণ অথচ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে চিত্রিত। আর শ্যামা দাসী Sir Walter Scott কিম্বা Robert Louis Stevenson-এর মনোমত চিত্র। এই চিত্রটি এঁদের দুজনকে নিশ্চয় উল্লসিত করে তুলবে। বাঙালী গৃহস্থের বিশ্বস্ত আশ্রিতার আদর্শ সে। তার মধ্যে অনেক দোষত্রুটি রয়েছে সত্য; তবু মানবমনের ওই সমস্ত দুর্বলতাগুলিই তার চরিত্রকে আরো মধুর করে তুলেছে। আর একটি চমৎকার নারীচরিত্র ঠাকুরুন দিদি। নীলকমল চরিত্রটি চিত্তাকর্ষক বেচারা আমাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করে। গদাধর চরিত্রে দুঃখবাদ থাকলেও এটি একটি অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক চিত্র। স্বর্ণলতা, হেম, গোপাল তো আমাদের চির পরিচিত আপনজন। এছাড়া এই ক্ষুদ্র চমৎকার উপন্যাসটিতে এমন অনেক চরিত্র রয়েছে যা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে অঙ্কিত। ভয়াবহ দুর্বৃত্ত শশাঙ্কশেখর স্মৃতিগিরি তাদের অন্যতম। এই চরিত্রটি Charles Dickens-এর মত সুদক্ষ হস্তে চিত্রিত। এটি নিপুণভাবে অঙ্কিত স্বার্থপর বীভৎস চরিত্রহীনতার চিত্র হিসাবে অনন্য।'

স্যার হেনরী কটনের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। তিনি ভারত-হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখা 'নিউ ইন্ডিয়া' পুস্তকটি তার পরিচয় বহন করছে। 'স্বর্ণলতা'র গদাধর চরিত্রটি তাঁকে সব চাইতে বেশী চমৎকৃত করেছে। তিনি লিখেছেন,

'স্বর্ণলতা পল্লীবাংলার হিন্দুর পারিবারিক জীবন অবলম্বনে রচিত। স্বর্ণলতার অন্য কোন চরিত্র আমাকে তেমনভাবে বিস্মিত করেনি যেমন করেছে গদাধর চক্রবর্তী। সে একটা হতভাগ্য বেকুব ছাড়া আর কিছুই নয়। পোস্ট-অফিসের কতকগুলি রেজিস্ট্রিকৃত চিঠি ও মণিঅর্ডার চুরির অপরাধে সে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং চোদ্দ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আমরা জানি গদাধর চক্রবর্তীকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত

করা হয়। এর পর স্বভাবতই আমরা তার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নই।'

ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ চার্লস এইচ টনি সাহেব 'স্বর্ণলতা'র শ্যামাদাসীর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন, স্বর্ণলতায় পল্লীবাংলার যে মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষ বাস্তব, নিখুঁত এবং নির্ভুল। গ্রন্থকার নরনারীর দোষত্রুটিগুলিই শুধু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন নি, তাদের গুণাগুণগুলির প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। যদিও বাংলার পল্লীগ্রামে প্রমদা ও গদাধরের মত কুটিল চরিত্রের লোকের অভাব নেই তবুও একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, বাড়ীর ঝি শ্যামাদাসীর চরিত্রটি শুধুই মামুলি আত্মত্যাগের কাহিনী নয়। শ্যামাদাসীর চরিত্রটিই উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।'

তারকনাথ, স্যার ওয়ালটার স্কট, রবার্ট লুইস ষ্টিভেনসন, চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ইংরেজ উপন্যাসকারদের মতই স্বর্ণলতার চরিত্র-চিত্রণে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তারকনাথের সঙ্গে গোল্ডস্মিথের তুলনা করে ডক্টর জে ডি এণ্ডার্সন লিখেছেন, "স্বর্ণলতার মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ রয়েছে যা Goldsmith-এর Vicer of Wakefield ও ফরাসী সাহিত্যের Birnarden de Saint Pierre-এর Poul et Vergine পুস্তকে রয়েছে। শেষোক্ত অপেক্ষা প্রথমোক্ত পুস্তকের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এতে হাস্যরসাত্মক যে সমস্ত ঝগড়াটে, ধড়িবাজ, দুষ্ট, ঈর্ষাপরায়ণ প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়, তা ফরাসী সাহিত্যে বিরল। তারকনাথকে অনায়াসে বাংলা সাহিত্যের গোল্ডস্মিথ বলা যায়।'

স্বর্ণলতায় তারকনাথ শুধুই পল্লীবাংলার সামাজিক চিত্রই অঙ্কন করেননি তিনি উচ্চাঙ্গ মার্জিত হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। এ হাস্যরসের সঙ্গে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ বা কমলাকান্তের হাস্যরসের কোনরূপ সাদৃশ্য নেই। এ হাস্যরস সহজ, সরল, স্বতস্ফূর্ত। এ শুধু পল্লীবাংলার গৃহস্থের ঘরেই মেলে। এ হাস্যরসের সাহিত্যের মূল্যায়ন করে অধ্যক্ষ টনি সাহেব লিখেছেন,

"To me Swarnalata, apart from its value as a description of Bengali manners, seems to contain a fair allowance of quiet humour and good-natured satire. . . . It also possess the highest of literary merits, the power to secure general appreciation".

ডক্টর এণ্ডার্সন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তারকনাথের সাদৃশ্য খুঁজতে চাননি কিম্বা এঁদের কারুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে প্রয়াস পাননি। তিনি লিখেছেন, ' "স্বর্ণলতা" একটি সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর উপন্যাস। এর মধ্যে "বিষবৃক্ষের"র বা নৌকাডুবির মত মানব জীবনের জটিল সমস্যার ধাঁধা নেই, রোমাণ্টিক পরিবেশ নেই, নেই ঘটনার বৈচিত্র্য বা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রসারতা। তবুও এটি একটি মধুর কাহিনী; যে কোন সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রূপে স্বীকৃতি লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।" *

* প্রবন্ধ রচনায় এই বইয়ের সাহায্য নিয়েছি :

১। স্বর্ণলতা (প্রথম সংস্করণ ১২৮১)
২। ঐ (চতুর্থ ,, ১২৯০)
৩। দাস ১০ই আগষ্ট ১৯৯৬
৪। Calcutta Review 1882
৫। Calcutta Gazette 1881
৬। সাধারণী ৩০শে কার্তিক ১২৮১।
৭। Hemendranath Das Gupta Indian Stage
৮। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর
৯। অনুসন্ধান ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৮।
১০। রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।
১১। Preface to Swarnalate Translated by Dakshinacharan Roy
১২। Introductory essay on Kapalkundala, Translated H .A, D, Phillips,

একটি অবিশ্বাস্য প্রেমের কাহিনী

সুনীলকুমার ঘোষ

জানি, আপনারা আমার এ-কাহিনী বিশ্বাস করবেন না। অথচ ঘটনাটি সত্য। এবং এ-কথাও মিথ্যা নয় যে, এ-রকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। আর কোথাও ঘটেছে বলে আমিও শুনিনি। তত্রাচ, আমার জীবনে এ-কাহিনী যে মর্মান্তিক সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, প্রয়োজনবোধে, তাও আমি সাক্ষী-সাবুদ-দলিল-দস্তাবেজ হাজির করে প্রমাণ করতে পারব না। যাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে আমার সততা প্রমাণিত হওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা ছিল, সে-ও আজ আমার নাগালের বাইরে।

বিয়ের কথা চিন্তা করা তো দূরে-স্থান, এমন একটা সময় ছিল যখন মিতা সান্যালের সান্নিধ্যে আসাটাও আমার কাছে এভারেস্ট টপকানোর চেয়েও বেশী দুঃসাধ্য ছিল। তার প্রথম কারণ, মিতার কুমারীমনের প্রবেশপথের সিংহদ্বারে যিনি সজাগ প্রহরায় নিদ্রাহীন রাত্রি (বাক্যালংকারে ব্যবহৃত) যাপন করতেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং দাদু দ্বারেশ সান্যাল। কড়া ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ তিনি। কোনরকম বাঁদরাম বরদাস্ত করার পাত্র নন। নিজে তিনি প্রেম করে বিয়ে করেননি। বরং বিয়ে করে স্বামীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনমতে এককালে স্ত্রীকে প্রহার করতেন বলেই বোধ হয় পুরুষ-স্বামী আর প্রেমিক-স্বামীর মধ্যে তিনি সর্বদা একটি পার্থক্য লক্ষ্য করতেন এবং পূর্বরাগঘটিত কোন দুর্ঘটনা দেখলেই বোমার মত ফেটে ছত্রাকার হয়ে পড়তেন।

দ্বিতীয় কারণ, মিতা স্বয়ং। সুন্দরী, তন্বী, ডিম্বমুটাগ্রাইম কটিধারিণী এই তরুণীটির আশেপাশে অর্থশালীদের যে সব অপগন্ড ছাওয়ালরা রঙ-বেরঙের পোষাক প'রে বিকচ পদ্মের চারপাশে মদমত্ত হস্তিযূথের মত অনবরত ঘুরপাক খেতো, তাদের মধ্যে, ইচ্ছা থাকলেও আমার মত ছাপোষা মানুষের প্রবেশ স্বভাবতই নিষিদ্ধ ছিল।

অথচ বিশ্বাস করুন, আমিও কি মিতাদের সঙ্গে দূরপ্রবাসী একটা সম্পর্ক টেনে-হিঁচড়ে বার করতে পারতাম না? নিশ্চয়ই পারতাম। কারণ দ্বারেশ সান্যাল মশায় এককালে আমার দাদু, অধুনা স্বর্গপ্রাপ্ত দ্বারিক বটব্যাল মশায়ের সঙ্গে একোদরা পৃথক-গ্রীব ভারন্ডা পক্ষীর মতই অঙ্গাঙ্গী ছিলেন। দুজনেই সেযুগে একপাড়ার

মানুষ এবং উৎকট ধরনের দাবাড়ে ছিলেন। বাড়ীতে স্থান সংকুচিত বলে এই দুটি মৃতদার ফুটপাতের ওপর একখানি মাদুর বিছিয়ে, দু-বান্ডিল লাল সুতোর বিড়িকে একমাত্র সম্বল করে, কর্পোরেশনের লজ্জাবিধুর বাতির তলায় বসে নিরবচ্ছিন্নভাবে দাবা খেলতেন। মাঝে মাঝে দুজনের তুমুল হট্টগোলে রাস্তায় ভিড় জমতো, ট্রাফিক জ্যাম হ'ত, কখন কখন বা বিবেকানন্দ রোডের বেওয়ারিশ ষাঁড় ক্ষেপে তাড়া করত। খেলা শেষে কেউ বাকি জীবনে কারও আর মুখদর্শন করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাড়ী ফিরতেন। কিন্তু সে ঐ সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত। তারপর থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত ওঁদের পৃথক করতে পারে এমন মানুষ তামাম ভারতে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যমরাজই এ-জুটি ভেঙ্গে দিলেন। দাদু হঠাৎ দেহরক্ষা করলেন। দ্বারেশবাবু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। তার

অনেক পরে একদিন স্তম্ভিত হয়ে শুনলাম, দ্বারেশবাবু লটারীতে অনেক টাকা পেয়ে বড়লোক হয়েছেন এবং রিজেন্ট পার্কে বিরাট বাড়ী করেছেন। তাঁর বংশে বাতি দেওয়ার মত মানুষ আর নেই, একমাত্র নাতনী মিতা ছাড়া। তাকে নিয়েই তিনি রিজেন্ট পার্কে বসবাস করছেন।

মাঝখানে আমাদের বছর দশেকের বিচ্ছেদ। দ্বারেশবাবু এখন বড়লোক, সেই অনুপাতে আমরা দরিদ্র। তা ছাড়া সেই দশ বছর আগেকার রোগা, ফ্যাকাশে মিতার সঙ্গে বর্তমান মিতার কোন সাদৃশ্য নেই। তাই তার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হল, তখন তাকে চিনতে না-পারাটা আমার দিক থেকে দোষাবহ হয়নি। তবু চিনতে যখন পারলাম তখন একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম। মনে হয়, অসুরনিধন নয়, দরিদ্র ভদ্র-সন্তানদের নিধন করার জন্যেই বোধ হয় ভগবান এ-হেন তিলোত্তমা সৃষ্টি করে ময়-দানবের রাজ্য এই কলকাতায় ছেড়ে দিয়েছেন।

চোখের নেশা বড় জবর পেশা। খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত একদিন ঠিক দ্বারেশবাবুর নতুন বাড়ীর হদিশ করে ফেললাম। নতুন করে পরিচয় করতে হল। মায় মানুষটা পর্যন্ত কেমন যেন বদলিয়ে গিয়েছেন। আগেকার দশাসুর চেহারা এখন বিশাসুর হয়েছে। আর সেই লোমশ বপু নিয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জনপাঁচেক মজুরের সঙ্গে বেগুন চাষ করছেন তিনি।

অনেকভাবে পরিচয় জমানোর চেষ্টা করলাম। আমার নাম, বাবার নাম, আমাদের রাস্তার টোপোগ্রাফি, শেষ পর্যন্ত মিতার নাম। এতক্ষণ যদি বা চুপ করে ছিলেন, হঠাৎ মিতার নাম শুনেই ক্ষেপে উঠলেন তিনি। আমাকে ধমকে বললেন ঃ ভাগ্, ভাগ্ ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। নাতনীর সঙ্গে আলাপ জমাতে এয়েছো!

সেই বজ্র-নির্ঘোষে হঠাৎ আঁৎকে উঠে বললাম, না, না: সে কী কথা? মানে.....

তোমার মত অনেক ছোকরা এখানে ঘুর-ঘুর করে হে। ওঝার কাছে আর ভূতের কেত্তন দেখিয়ো না বাপু। পথ দেখ।

যদিচ আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে এতটুকু ইতর-বিশেষ ছিল না, তবু স্বারেশবাবুর এই স্পষ্ট ইঙ্গিতে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলাম।

চটে বললাম ঃ আপনি উমুকবাবুকে চেনেন না? আমার দাদু!

ব্যস। কয়েক সেকেন্ড গোল-গোল চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বিস্ময়ের স্বরে তেমনিভাবে ফেটে পড়ে বললেন ঃ চিনি নে আবার, আলবাৎ চিনি। হতভাগাটা মরে আমাকে একেবারে বেকার করে গিয়েছে। তাই না আজকাল বেগুন চাষ করি। তা এতক্ষণ আলতু-ফালতু না ব'কে ঐ একটা কথা বললেই পারতে।

তারপর সে কি আদর আর আপ্যায়নের ঘটা। আমি তো একেবারে ধন্য হয়ে গেলাম। এতক্ষণ ধরে যে দুরাশাটি গভীর লজ্জা আর হতাশায় মনের একান্ত অন্তরালে লুকিয়ে বসেছিল, সেটি হঠাৎ এবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। ড্রয়িংরুমের ওপাশে অদৃশ্য কোন তন্বীর গানের টুকরো কলির দিকে আমি কান পেতে রইলাম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কোন শরীরধারিণীর ছায়া পর্যন্ত নজরে পড়ল না।

শেষকালে বিদায় নিলাম, অথবা সত্য কথা বলতে কি বিদায় নিতে বাধ্য হলাম। ভক্তিভরে প্রণাম করলাম স্বারেশবাবুকে। আমার বিনয়ে বোধ হয় অভিভূত হয়েই স্বারেশবাবু বললেন ঃ স্বারিকের নাতি তুমি। মাঝে মাঝে এস। খুশি হব।

কৃতার্থ হয়ে গদ-গদচিত্তে উত্তর দিলাম ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়...আমি ও মানে......

এস, কিন্তু নাতনীর দিকে নজর দিয়ো না বাপু।

গলদঘর্ম হয়ে বললাম ঃ না, না; সে কি কথা? আপনি দেখে নেবেন। মেয়েদের ওপর আমার কেমন একটা এলার্জি রয়েছে।

আমি যে কলির শুকদেব তাই প্রমাণ করার জন্যে যেন বেশী করে যাতায়াত করতে লাগলাম রিজেন্ট পার্কে। মনের মধ্যে অবিরত খান্ডবদহন চললেও মিতাকে চরম অগ্রাহ্য করে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রমাণ করে দিলাম যে আর যাই হই, কিছু প্রচার পেলেই চরিত্রের দিক থেকে শুকদেব গোস্বামীকে ঘায়েল করার সামর্থ রাখি আমি।

বেশ বুঝতে পারলাম, স্বারেশবাবু খুশি হয়েছেন।

একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হ্যাঁরে, তুই দাবা খেলতে জানিস?

আমতা-আমতা করে বললাম ঃ জানি কিছু। তবু আপনার সঙ্গে......

ওতেই হবে; আয়, আয়। হাতটা যে কী নিসপিস করে তোকে কী বলব? হতভাগাটা মরে আমাকে বিপাকে ফেলে গেল।

গোবিন্দের নাম করে লেগে গেলাম।

ব্যাস, আর ছাড়ান নেই। প্রথম প্রথম, ছুটির দিন, অনতিবিলম্বে অবশ্য-কর্তব্য দৈনন্দিন ক্রিয়ায় পরিণত হ'ল। আজকাল বাসের ঝামেলায় কর্মসূচীর রদলবদল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, প্রতিদিন অফিসের দোরগোড়ায় ছুটির সময় স্বারেশবাবুর গাড়ী আসতে লাগল। একে চরিত্রবান যুবক, তার ওপর দাবাড়ে। স্বারেশবাবু তো আনন্দে একেবারে ডগমগ। মাঝে-মাঝে আমার পিঠ চাপড়ে বলতেন, সাবাস, তুই স্বারিকের নাম রাখবি।

রাজা, মন্ত্রী, গজ, নৌকো নিয়ে যখন স্বারেশবাবু প্রচন্ড বিক্রমে আমার রাজা আক্রমণ করতে উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, সেই অবসরে কাপুরুষের মত নিজের রাজা অরক্ষিত রেখেই আমি কোন অন্তরালবর্তিনীর গমনাগমনের দিকে আমার ষড় ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে বসে থাকতাম। মাঝে মাঝে মিতার সঙ্গে যে চোখাচোখি হত না, তা নয়। কিন্তু সেই চোখের তারায় যা ভেসে বেড়াত সেটি এক অসীম ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু নয়। আরও একটি জিনিস এ-সময়ে প্রায়শই লক্ষ্য করেছি। যে-কদিনই আমরা দাবার ছক নিয়ে বসতাম (এবং অধুনা সপ্তাহের কোনদিনই বাদ যেত না), সে কদিনই মিতা তার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ফুসফাস করত, কখনও দাদুর কাছে মিথ্যা অজুহাত দিয়ে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেত। স্বারেশবাবুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হলেও আমাকে ফাঁকি দেওয়া অতটা সহজ ছিল না। কিন্তু করারই বা ছিল কী? আমার অন্তরাত্মা প্রেমের এই অপমৃত্যুতে হাহাকার করে আমার সম্মুখে উপবিষ্ট দাবাড়েটির বারবার মুন্ডপাত করে ক্লান্ত হয়ে ভাবত, হায়রে, এই যবনের হাত থেকে মুক্তি হবে কবে?

হঠাৎ একদিন সুযোগ ঘটে গেল। স্বারেশবাবু দিল্লী যাবেন। ফিরতে দিন-পনের দেরি হবে।

আমাকে বললেন ঃ এই ক'টা দিন তুই এখানেই থাকবি। কোন ডেঁপো ছোকরাকে এ অঞ্চলে ঘেঁষতে দিবি নে, বুঝেছিস?

এ-হেন কর্তব্য সম্পাদনে যতটুকু প্রয়োজন তার অনেক বেশী দায়িত্বশীল হয়ে বললাম ঃ ক্ষেপেছেন?

দিল্লী যাওয়া পাছে ভেসতে যায় এই ভয়ে, নিজেই টিকিট কেটে, বার্থ রিসার্ভ করে বন্দোবস্ত পাকা করে এলাম।

যাওয়ার দিন সন্ধ্যার সময় মিতাকে ডেকে বললেন ঃ এই তোর গার্জেন এখন। ওর রিপোর্ট যদি খারাপ হয় তাহলে......

কথাটা অসমাপ্ত রেখে একটা হুঙ্কার দিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। গাড়ী ছাড়ার পর আনন্দে শিস দিতে দিতে বহাল তবিয়তে রিজেন্ট পার্কে ফিরে এলাম আমি।

ফিরে এসে দেখি, পাখি যথারীতি উড়েছে। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আমরা বেরোবার একটু পরেই একটি ছোকরার সঙ্গে মিতা বেরিয়ে গিয়েছে। প্রচন্ড ক্ষোভে সাময়িক অভিভাবকত্বের অধিকারবোধের অক্ষমতায় দুম দুম করে মেঝের ওপর কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম, তারপর যথানিয়মেই পায়ের গাঁটগুলি যখন টনটন করে উঠল তখন একটি সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

রাত্রি এগারটার কাছাকাছি, পোর্টিকোতে অনাবশ্যক কয়েকটি রূঢ় ইলেকট্রিক হর্ণ বেজে উঠল। চমকে দেখি গাড়ী থেকে নেমে মিতা গটমট করে বেপরোয়াভাবে আমারই দিকে এগিয়ে

আসছে। রুক্ষ হতে গিয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম 'তার দিকে। এতদিন পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে মিতার দিকে চেয়ে থাকার বাধা ছিল, আজ সেই বাধা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বর্ধমানের কাছা-কাছি অপসারিত হয়েছে। আজ আমি স্বরাজ্যে সম্রাট, একাধারে ' মিতার গার্জেন, আর প্রেমিক। মিতার দিকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে চেয়ে থাকাব আইনসঙ্গত অধিকার আমার রয়েছে, অন্ততঃ, আগামী পনেরটি দিন।

মিতা সোজা ড্রয়িংরুমের দিকেই এগিয়ে এল। তার শরীর আর নিখুঁৎ পোষাকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া কেবল যে অসম্ভবই ছিল তা নয়, অহেতুকও ছিল যথেষ্ট। কেবল এই-টুকু বলব যে, সেদিনের সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত মদির রজনীর একটি নির্জন গৃহকক্ষে তার উদ্ধত গতি আর চাহনির মধ্যে এমন একটি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল, যা নিঃসন্দেহে আমার পুরুষত্বের শেষ বিন্দুটিকে পর্যন্ত ক্লীব করে তুলতে পারত, যদি না সেই অদৃশ্য দ্বারেশবাবুর ক্রম-অপসারিত রক্তচক্ষু আমার দিকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে থাকত।

দাদু চলে গেলেন?

হ্যাঁ।

আপনি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লেই পারতেন।

হ্যাঁ, তা, তা তো পারতামই।

আইনসঙ্গতভাবে আমিই মিতার গার্জেন। অথচ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিতাই আমার ওপর খবরদারি করে গেল। জগতে কত আশ্চর্য ঘটনাই না ঘটে।

সেদিন রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। একটি রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ নভেল পড়ার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত জানলার ভিতর দিয়ে তারায় ভরা নীল আকাশের দিকে চেয়ে ছিলাম। মনে হল, আমি আর এ জগতে নেই। আজ থেকে চারশ বছর আগে মধ্যযুগের একটি পাষাণ-প্রাসাদের কক্ষে অন্তরীণ। আমি যেন এক চিরন্তন পুরুষাত্মার প্রতীক হিসাবে এই স্তব্ধ রাত্রির শীতল গুহায় বন্দিনী নারীকে উদ্ধার করার গুরু-দায়িত্ব মাথায় নিয়ে মনের মধ্যে অতৃপ্তির শলাকা জ্বালিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোথায় সেই নারী! ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের আয়তন বৃদ্ধি পেল, চারপাশের দেওয়াল সরে সরে আমার দৃষ্টির অন্তরালে অপ-সারিত হল। হঠাৎ মনে হল, এই বিশ্বে আমি একা, রামগিরি পাহাড়ে বিরহী যক্ষের মত চিরতরে নির্বাসিত। কোথায় সেই মেঘদূত। কাকে দূত করে সুখ-সুপ্ত প্রণয়িনীর কাছে আমার বিরহ-বার্তা পাঠাব।

খট করে একটা শব্দ হতেই বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। মনে হল, কয়েকটা ইঁদুর অকস্মাৎ ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করেছে। সেই শব্দ অনুসরণ করে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম। আমার খাট থেকে হাত ছয়েক দূরে দরজা। বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলেই খুলে রেখেছিলাম। বাইরের দালানে সারারাতই আলো জ্বলত, তারই ছিটে-ফোঁটা পড়েছিল ভিতরের দালানের ওপর। ফলে, জায়গাটার ওপর কিছুটা আবছাওয়া নেমে এসেছিল।

সেই দিকে চোখ ফেরালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত জল নয়, একেবারে বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ার জন্যে ছটফট করে উঠল। কিন্তু কী দেখলাম! দেখলাম, দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে, কপাটের ওপর হাত রেখে, আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন স্বয়ং দ্বারেশবাবু। হা হতোস্মি। তবে কি আমার চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেনের পিছনের দরজা দিয়ে সটান নেমে এসে-ছেন? তাই যদি হবে তাহলে নিজের বাড়ীতে ও-রকম ছিঁচকে চোরের মতনই বা দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? নাকি শেষ পর্যন্ত পথে কোন ট্রেন-য়্যাকসিডেন্টই ঘটলো, যার ফলে ভবের খেলা সাঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। আর আমার মনের দুর্বলতার গন্ধ পেয়ে, আমার মত অতীব পাষান্ড আর বিশ্বাসঘাতকের কবল থেকে মিতাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। সময়ের কোন জ্ঞান ছিল না আমার। হঠাৎ মনে হল, আবছাওয়া মূর্তিটির শরীরে ধীরে ধীরে গতির সঞ্চার হয়েছে।

অকারণ ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার কোন ক্ষতি করব না আমি।

কই, স্বরটা তো ঠিক দ্বারেশ-বাবুর মত বাজখাঁই নয়। বেশ করুণ, আর অসহায় বলেই মনে হল। হতে পারে, শরীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর আর শক্তিরও পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং, ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা নেই ওর, সে দ্বারেশবাবুর প্রেতাত্মা হলেও।

কে তুমি?

ভূত।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কার ভূত?

দ্বারেশ সান্যালের।

আমার বুকের ভিতরটা ঝটিতি গুরু-গুরু করে উঠলো। কিন্তু ভূতের কাছে ভয় খাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়, তাই যথাসম্ভব সাহস সংগ্রহ করে কিঁউ কিঁউ করে বললাম : ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি? জ্যান্ত মানুষের আবার ভূত কি? যত্তো সব......

ঘরের মধ্যে নিথর বাতাসের কিছুটা আলোড়ন জাগলো। মনে হল, একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল ছায়ামূর্তিটার।

সাধারণতঃ থাকার কথা নয়, এক্ষেত্রে আমিই বোধ হয় একমাত্র হতভাগ্য ব্যতি-ক্রম।

অর্থাৎ?

তোমাকে তাহলে খুলেই বলি ব্যাপারটা। দশ-বার বছর আগে দ্বারেশ-বাবুর অবস্থা তো মোটেই ভাল ছিল না। বীমা কোম্পানীর দালালি করতেন। মক্কেল পাকড়াতে পাকড়াতে একবার আমার কাছে হাজির হলেন। যদিও আমার আর্থিক অবস্থার তুলনায় সংসারটি অতীব বৃহৎ ছিল, তবুও বীমা করার নাম শুনলেই কেমন ভয় পেয়ে যেতাম। আমি বিশ্বাস করতাম, বীমা কোম্পানীর খাতায় নাম লেখালেই আমার নাম সরাসরি চিত্রগুপ্তের জাবদা খাতায় উঠে যাবে। কিন্তু দ্বারেশবাবুকে হটানো গেল না। পকেট থেকে টাকা বার করে প্রথম প্রিমিয়াম দিয়ে দিলেন তিনি।

বললাম : ভালই তো হল।

ছায়ামূর্তিটি চটে উঠল : কিন্তু আমার কি ভালটা হল। দ্বিতীয় প্রিমিয়াম আর দিতে হল না। ঠনঠনেতে গাড়ী চাপা পড়লাম। জাগতিক জ্ঞান লোপ পাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ভাবলাম, আমার এই অকালমৃত্যুর জন্যে দায়ী দ্বারেশবাবু। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, সুযোগ একবার এলে এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বো।

পুরো ন'টি বছর পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হল। দ্বারেশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মর-মর অবস্থা। বন্ধু-বান্ধবরা বলল : এই পরম সুযোগ। তুমি দ্বারেশবাবুর শরীরে অনুপ্রবেশ কর।

দ্বারেশবাবুর মাথার কাছে তিনটি দিন তীর্থের কাকের মত বসে রইলাম। অবস্থা যে-রেটে খারাপ হয়ে আসছিল তাতে অদূরভবিষ্যতে মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অহো ভাগ্যম। ঠিক যখন সব আয়োজন প্রস্তুত, তখন হঠাৎ দেখি, দ্বারেশবাবু বিকট একটি হিংস্র দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁত কিড়মিড় করছেন। অবস্থা বুঝেই আমি সেখান থেকে উঠে পাঁই পাঁই দৌড় দিলাম। পরের দিন থেকেই দ্বারেশবাবু আমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরোগ্যের পথে এগিয়ে এলেন।

তারপর?

ছায়ামূর্তিটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, তার আর পর নেই। ঘরে-বাইরে বেইজ্জত। ভূত-সমাজে আমার স্থান অভূতপূর্বভাবে খেলো হয়ে গিয়েছে। কারও কাছে মুখ দেখাতে পর্যন্ত লজ্জা করে। বিশেষ করে, দ্বারেশবাবুর ছায়া দেখলেও প্রাণটা গুরগুর করে

ওঠে। তাই তো অন্ধকারে লুকিয়ে থাকি। আজই প্রথম ফাঁকায় বেরোলাম। তুমি ঠিক জান, তিনি আজ আর ফিরছেন না?

হেসে বললাম ঃ না। এই পনেরটা দিন তুমি স্বচ্ছন্দে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াতে পার।

ছায়ামূর্তিটি যেন একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললো। একটু নড়ে-চড়ে দাঁড়ালও। হাত-পাগুলিকে টান করে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে নিলে একটু।

হ'ক ভূত, তবু ওর ঐ রকম শোচনীয় অবস্থা দেখে মায়া হল একটু।

জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কিন্তু এভাবে আর কদ্দিন ঘুরবে?

তাইতো ভাবছি।

কী?

অদূরে ভবিষতে আশা নেই জেনেও আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারছিনে। যদি কোনদিন য়্যাকসিডেন্ট ঘটে। অথচ, দ্বারেশবাবুর সাহচর্য আমাকে দিন দিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একটু বিদ্রূপ করেই বললাম ঃ মরা মানুষের আবার মরার ভয় কেন?

আত্মার যে মৃত্যু নেই তা কি তুমি জান না?

তা বটে।

ছায়ামূর্তিটি এবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল ঃ দেখ তুমি যদি আমার জন্যে একটা কাজ করতে পার তাহলে বড় উপকার হয়।

আমি! আমি আবার তোমার উপকার করবো কেমন করে?

ছায়ামূর্তিটি এবার একটু আমতা আমতা করে বলল ঃ আমার জন্যে একটি সৎ পাত্র জোগাড় করে দাও দেখি।

চারপাশে এপিডেমিকে এত লোক মরছে, তোমার আবার ভাবনা কী?

ছায়ামূর্তিটি নাক সিঁটকিয়ে বলল, রক্ষা কর। যাকে-তাকে আশ্রয় করতে আমার রুচিতে বাধে। তাছাড়া, কোন কিছুকে আশ্রয় না করে দ্বারেশবাবুকে পরিত্যাগ করাটা আমরা নীতিবিগর্হিত কাজ বলেই মনে করি।

তাহলে তো যথেষ্ট বিপদেই পড়েছ দেখছি। আচ্ছা, আমি আত্মহত্যা করলে তোমার কিছু সুরাহা হবে বলে মনে কর?

ক্ষেপেছ? তোমার মত অপদার্থকে আশ্রয় করে চিরকাল জ্বলে পুড়ে মরি আর কি? না, না বাবু, ওতে আমার কাজ নেই।

তাহলে আমি নাচার।

একটু যেন চিন্তা করে ছায়া-মূর্তিটি বলল ঃ যদি পার, তাহলে তোমাকেও কিছুটা সাহায্য করতো আমি প্রস্তুত।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি? তুমি আবার আমাকে সাহায্য করবে কেমন করে?

ছায়ামূর্তিটি এবার হেসে বলল ঃ তোমাদের ঐ একটা রোগ। জ্বলে-পুড়ে মরবে সেও ভি আচ্ছা, তবু অন্য কেউ সাহায্য করব বললেই অমনি তোমাদের আত্মসম্মানে ঘা লাগল। তুমি যে দ্বারেশবাবুর নাতনীর জন্যে আঁকুপাঁকু করছ, তা কি আমি জানি নে মনে করেছ? কিন্তু ভুলে যেয়ো না, বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা।

বই-এ পড়েছি বটে। এ-রকম মুখ-রোচক গল্পও দু'চারটে রয়েছে।

কথা বলার ধরন দেখে মনে হল, ছায়ামূর্তিটি চটেছে ঃ যাক, তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এক বছরের মধ্যে মানুষের সঙ্গে এই প্রথম কথা বলার সুযোগ পেয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। তুমি যদি আমার জন্যে কিছু করতে নাও পার, তোমার কিছুটা উপকার আমি করবই। এখন তুমি ঘুমোও, আবার যথাসময়ে সাক্ষাৎ হবে।

তাড়াতাড়ি বললাম ঃ রক্ষা কর। দয়া করে ঐ বিদকুটে মূর্তি নিয়ে আমার কাছে এস না আর। প্রেমের এই অপ-ঘাত মৃত্যু সহ্য করতে পারব না আমি।

কিন্তু ততক্ষণে ছায়ামূর্তিটি হাও-য়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

পরের দুটি দিন ছায়ামূর্তিটির কথা চিন্তা করারও সময় পাইনি আর। কারণ এই আটচল্লিশ ঘন্টায় রিজেন্ট পার্কে ঘটনা এবং অঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। আমার নাকের ডগা দিয়েই মিতা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পিকনিক করতে বেরিয়ে গিয়েছে। আমার অনুমতি নেওয়াটা প্রয়োজন বলে মনে করেনি। বাড়ীতে ফলোয়া করে পার্টি দিয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমার চোখের ওপর রজত গড়গড়ির কানে কানে ফিসফিস করে কথা বলেছে। হিমানিশ নন্দীর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়েছে। কেবল তাই নয়, আমি যে তার সামগ্রিক অভি-ভাবক, সে কথাটিও ফলোয়া করে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রচার করতে দ্বিধা করেনি। আমি লক্ষ্য করেছি, তারা আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে অপার বাঙ্গে ফিকফিক করে হেসেছে। আর অভিভাবকত্বের দুরূহ পাষাণভার কাঁধে নিয়ে সেই সব বিদ্রূপ আমাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় দিন রাত্রি ন'ঘটিকার পর ওদের পার্টি ভাঙলো। তার মধ্যে এক সময় ওদের কাছ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে, অশোককাননে নির্যাতিতা সীতার মত, লনের একান্তে দন্ডায়মান একটি পামগাছের নিচে আত্মগোপন করেছি। আর মাঝে মাঝে অর্ধনিমীলিত চক্ষে আকাশের তারা গণতে গণতে অগতির গতি রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সেরা বিরহের কবিতা স্মরণ করার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে পড়ছি। ঠিক এই রকম শারীরিক আর মানসিক অবস্থায় যে জিনিসটির ওপর মানুষের আস্থা অটুট হয়ে দেখা দেয়, আমার ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটলো না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভালবাসা তো দূরের কথা, এতটুকু কেয়ার পর্যন্ত মিতা আমাকে করে না। করলে কখনও আমারই নাকের ডগা দিয়ে ঐ হোঁৎকা রাজকিশোর মুন্সীর হাত ধরে হেলতে-দুলতে গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়?

কিন্তু কি আশ্চর্য ঘটনা। যা কোন-দিন ঘটেনি, সেই অঘটন ঘটলো। বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় দিয়ে, মিতা ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল ঃ বসতে পারি একটু?

রাগে আমার গা-টা গর-গর করে উঠলো। যেন কত অনুগত আমার।

বললাম ঃ বিলক্ষণ, স্বচ্ছন্দে।

লনে অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও, আমার কাছ থেকে মাত্র হাততিনেক দূরে বসে যেন নিজের মনে-মনেই মিতা বলল ঃ বাব্বা, কী গরম!

কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, দিলামও না।

মিতা বলল ঃ কী ভাবছেন জানি। দাদুকে সব রিপোর্ট করবেন, এই তো? বয়েই গেল আমার।

তবু চুপ করে রইলাম।

এবার ধমকে উঠলো মিতা ঃ চুপ করে রয়েছেন কেন? বোবা নাকি?

তথাপি নিরুত্তর আমি।

মেজাজটাকে একেবারে সপ্তমে চড়ালো মিতা ঃ দাদুকে আমি ভয় করি নাকি? আমি দস্তুরমত সাবালিকা। যার সঙ্গে ইচ্ছা মিশবো। দেখি, আপনারা আমার কী করতে পারেন!

আর চুপ করে থাকাটা ভদ্রোচিত হবে না বলেই বোধ হয় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, আমার পরিচিত সেই ছায়ামূর্তিটি মিতার ঠিক পিছনে হাতদশেক দূরে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে কেষ্ট ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর আমার দিকে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। বুঝুন একবার ব্যাপারটা। ঠিক যে সময়ে উৎক্ষিপ্ত ভাবসমুদ্রের অসংলগ্ন উদ্বেল তরঙ্গগুলিকে সুসংবদ্ধ করে বিপুল আয়াসে মনের না-বলা গোপন কথাটিকে সুন্দর করে বলার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ঐ কিম্ভূতকিমাকার

অশরীরীর আবির্ভাব। যুগপৎ একটি আশঙ্কা আর বিতৃষ্ণার ঝড় এসে আমাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিল।

সেই মুহ্যমান অবস্থায় আমার কর্ণবিবরে ছায়ামূর্তিটির অভয়বাণী ধ্বনিত হল, মূর্খ তুমি কি জান না, স্ব-ঢাক্কানিনাদেই আজকাল সাফল্যের জয়যাত্রা মুখরিত! কেবল বলা নয়, যত-টুকু দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়ে বল। অন্যথায়, জাহান্নামে যাও।

সে কথা আমিও জানি। কিন্তু বলব বলে ভাবলেই কি সব কথা সকলের কাছে সব সময় বলা যায়? তা ছাড়া তোমার মত বন্ধু ভূতকে সামনে রেখে কোন তরুণীকে প্রেম নিবেদন করতেও তো মানুষের রুচিতে বাধে। নাকি, প্রেমে পড়েছি বলে সেই রুচিটিকেও জলাঞ্জলি দিতে হবে? তার চেয়ে দুরম্‌পসর। বাকিটা আমি ম্যানেজ করছি।

ভূতেরা নাকি মনের কথা বুঝতে

পারে। তাই ভেবে চোখ তুলে চাইলাম অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। কিন্তু এ-ভূত আমার চেয়েও নির্বোধ। তার চেহারার মধ্যে অপসরণ করার কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। বরং আমার এই জরদ্গব অবস্থা দেখেই যেন বিপুল উৎসাহে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে আমাকে উৎসাহ দিতে লাগল। আর যতই তার শারীরিক প্রক্রিয়া বিকট থেকে বিকটতর হতে লাগল, ততই আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল থেকে শীতলতর হতে লাগল। সেই সঙ্গে মনের মধ্যে একটা চরম অস্বস্তিও জেগে উঠলো। মিতা যদি কোনরকমে বুঝতে পারে যে আমার সঙ্গে এই ধরনের একটি ভূতের আলাপ রয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা যা গড়াবে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

আর যদিই বা বলি কেন? আমার বিস্ফারিত নয়ন, বুকের দ্রুত উত্থানপতন আর রোমাঞ্চিত দেহের অস্বাভাবিক সংকোচন আর প্রসারণের ধাক্কাও তার মনে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আর ঠিক যে মুহূর্তে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে আমারই দৃষ্টিরেখা অবলম্বন করে সেই কিম্ভূত-কিমাকারের দিকে ঘুরে বসল, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল বিক্ষোভে আমি গর্জন করে উঠলাম, বেরোও বেরোও, দূর হও। পাজি, ছুঁচো, বদমাস কোথাকার।

বাস, কী ঘটতে কী ঘটে গেল। আমার দিকে বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে একবার মাত্র চেয়ে রইল মিতা। তারপর রক্তচক্ষু নিক্ষেপ করে দুরন্ত কাঙার, শিশুর মত প্রায় দৌড়ে তিন লাফে লন পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই অপসৃয়মানার দিকে হতভম্বের মত চেয়ে রইলাম আমি। তারপরেই লনের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিলাম।

মস্তকে করাঘাত করে ছায়ামূর্তিটির মুণ্ডপাত করতে করতে কখন যে ঘরে ফিরে গেলাম জানি নে। নিদ্রাহীন রাত্রির অনুশোচনায় ঘরময় পায়চারি করলাম। লজ্জায় আর নিজের অপদার্থতায় নিজেকে বারবার ধিক্কার দিলাম। মনে মনে বললাম : হে ধরণী, দ্বিধাবিভক্ত হও, আমি তোমার অতলান্ত অন্ধকারের গহ্বরে প্রবেশ করে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করি।

পরের গোটা দিনটাই ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়েছি। মিটমাট করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেই বা হবে কী? মিতা উধাও হয়েছে। রাত্রি নটার পর ফিরলো। আমারই সামনে দিয়ে গটমট করে সোজা দোতলায় উঠে গেল। আড়-চোখে চেয়ে দেখলাম। মুখ ভারি, দেহে ক্লান্তি। চলনের তীর ঘেঁষে একটি উদ্ধত বেপরোয়া ভাব উথলে উথলে পড়ছে। গভীর অবজ্ঞাভরে চলে গেল সে। এই দুনিয়ায় কাউকেই যেন সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে রাজী নয়।

এ হেন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত তাই ভাবতেই কিছুক্ষণ কাটলো। তারপরই নেহাৎ মরিয়া হয়ে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করার জন্যে সটান দোতলায় উঠে এলাম। আর একটু ভাবলাম। কম্পিত পদক্ষেপে মিতার ঘরে কাছে এসে দাঁড়ালাম। ক্ষণিকের বিরতির পর হঠাৎ সাহস সংগ্রহ করে মিতার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছিল সে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভ্রূকুটি করে আবার নিজের কাজে মন দিলে মিতা।

গোটা দুই ঢোক গিলে, বারচারেক পা ঘষে ডাকলাম : মিতা?

মিতার শরীরে কোন ক্রিয়া দেখা গেল না। যেন নির্বিকল্প পাথরের চাঁই একখানা। ইচ্ছে হল, চেহারটাকে দুম করে উলটে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকেই হার স্বীকার করতে হল।

কাল রাত্রে—মানে—

মিতার স্বর তীক্ষ্ন হয়ে উঠলো : আমাকে অপমান করেছেন আপনি।

বললাম : ভুল বুঝেছ আমাকে। মানে, কাল রাত্রে তোমাকে যা বলে-ছিলাম, তা কিন্তু মোটেই তোমাকে নয়।

এবারেও বিশেষ কোন উত্তর এল না। মিতা কেবল বিস্মিতভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল মাত্র।

তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারছিনে। মানে...

তাহলে ভূতকেই হবে।

মিতার স্বরে একটা উদাসীন নির্লিপ্ততা।

আনন্দ আর উত্তেজনায় একেবারে আত্মহারা হয়ে বললাম : ঠিক—ঠিক কথা। কিন্তু তুমি জানতে পারলে কেমন করে?

মিতার চোখের পাতায় ততক্ষণে একটি কৌতূহলের ছায়া নেমে এসেছে। সুতরাং আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলতে হল।

কাহিনী শেষ করে কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বললাম : যদিচ তোমাকে না পেলে আমার জীবন দগ্ধ সাহারার ক্ষুদ্র সংস্করণে রূপান্তরিত হবে, তথাপি তোমার যদি অনিচ্ছা থাকে—তাহলে—

ধীরে ধীরে মিতার চোখদুটি ছলছল করে উঠল, তারপর অকস্মাৎ আমার বুকের ওপর নেমে এল তার মুখটি।

এতদিন বলনি কেন?

বললাম : বাপরে! তোমার দাদুকে তো তুমি চেন না।

মিতার মুখের ওপর চটুল হাসির তির্যক একটি রেখা ফুটে বেরুলো।

কাপুরুষ কোথাকার!

একটা কিছু করা দরকার। না হলে পৌরুষ বজায় থাকে না। কিন্তু করব কী? করার সুযোগ পেলাম কোথায়? হঠাৎ দরজার দিকে নজর পড়তেই দেখি সেই বিটকেল ভূতটা আমার দিকে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে। তার সমস্ত শরীর জুড়ে একটি নিদারুণ অস্থিরতা দাপা-দাপি শুরু করে দিয়েছে। আবার না সব কিছু কেঁচিয়ে দেয়—এই ভয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ ছায়ামূর্তিটি খেঁকিয়ে উঠল : ন্যাকামো রাখ। বুনো বাইসনের মত দ্বারেশবাবু দৌড়ে আসছেন। এতটুকু বেচাল হয়েছ কি——

কথা শেষ না করেই ভূতপুঙ্গবটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দক্ষিণের খোলা জানালার ভিতর ঝটিতি অদৃশ্য হল। আর সেই সঙ্গে ঘরের নিশ্চল বাতাসের ঢেউগুলিও বেতালা হয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিল। অবশ্যম্ভাবী কোন দুর্ঘটনার ভয়ে আমি মিতার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে ধরে রইলাম। আর ওপাশ থেকে দুদুম করতে করতে দ্বারেশবাবু ওপরে উঠে এসেই আমাদের ঐ রকম সন্দেহজনক মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে থেকে গেলেন। তারপরেই একটি হুঙ্কার শুনতে পেলাম।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। হুম!!

অকস্মাৎ এই বজ্রপতনে মিতাও চমকে উঠল। দ্বারেশবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার মুখের দিকে স্মিতবদনে বারেক নেত্রপাত করে দাদুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল : ঠিক তাই। যেই রক্ষক, সেই ভক্ষক। গার্জেন করার আর লোক পেলে না তুমি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগলাম।

কয়েকটি মুহূর্ত জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। তারপরেই একটা অট্টহাসি, এক-টানা হো-হো-হো। হাসি থামলে গলা শোনা গেল দ্বারেশবাবুর : ফাঁদটা কাজে লাগল তাহলে!

প্যারিস থেকে বলছি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস. জানুয়ারী—বছরের শেষে এখানে সবার আলোচ্য বিষয় ছিল ঠাণ্ডার ঠাণ্ডা রাম ঠাণ্ডা। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ গেছে উৎসবের পর উৎসবের ঢেউ-এ ভেসে। খৃষ্টমাসের তোড়জোড় করতে না করতেই এসে গেছে নববর্ষ উৎসব। খৃষ্টমাস উৎসব অনেকে যেমন কাটিয়েছেন প্যারিসে ঘরোয়া পরিবেশে, তেমনি লাখ দুয়েক প্যারিসিয়ান গিয়েছিল এই ঠাণ্ডায় আল্পস পর্বতের শিখরে শিখরে দৌড়-ঝাঁপ দিতে। তবে এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল তরুণ-তরুণী ও বালখিল্যের দল। বয়েস যাদের একটু কম, অন্ন-বস্ত্রের যাদের চিন্তা নেই, ইস্কুলে-কলেজের ছুটি হতেই ছুটেছে পাহাড়ে দৌড়-ঝাঁপ দিতে। যাদের বয়স একটু বেশী তাঁরা যাবেন ধীরে-সুস্থে জানুয়ারী কিম্বা ফেব্রুয়ারী মাসে এই শীতের পর্বতচূড়ার নির্মল বায়ু সেবনার্থে। অবশ্য তাঁরা দৌড়-ঝাঁপ, স্কী ও স্কেটিংও করবেন বৈকি। একে বলা হয় 'স্পর্ দিভার' বা উইন্টার স্পোর্টস।

খৃষ্টমাস ও নববর্ষ উৎসবের পূর্বে ডিসেম্বর মাসটাই গেছে সাংস্কৃতিক হৈ-রৈ-এর ভেতর দিয়ে। ডিসেম্বরের গোড়ায় তো শুধু সাহিত্যের পুরস্কার বিতরণ, ফরাসী একাডেমির সভ্য নির্বাচন ইত্যাদির পালা-পর্বের অনুষ্ঠানে ভর্তি ছিল। নামকরা বাৎসরিক পুরস্কারগুলো নভেম্বরেই সাঙ্গ হয়েছে। পরের গুলো বিতরিত হয়েছে ডিসেম্বর মাসে। থেওফ্রাস্ত রনোদো পুরস্কার পেয়েছেন মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতি সিমস্ জাক্‌মার তাঁর উপন্যাস 'ল্য ভেইয়র দ্য নুই'র জন্য। মহিলা সমিতি পরিচালিত 'ফেমিনা' পুরস্কার দেওয়া হয় ম'ঃ ঈভ্ বারজের-এর উপন্যাস 'ল্য সুদ' এবং 'ল্য মোজিস' পুরস্কার দেওয়া হয় মাদাম কলেৎ আদ্রের উপন্যাস 'দেরিয়ের লা বেইনওয়ার'-এর জন্য। সাংবাদিকদের 'এ্যান্তেরাই' পুরস্কার পেয়েছেন ম'ঃ অঁরি-ফ্রাঁসোয়া রে তাঁর উপন্যাস 'লে পিয়ানো মেকানিক'-এর জন্যে। এ বছরে বড় বড় পুরস্কারের মধ্যে দুই সাহিত্যিককে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে ততটা হয়নি অন্য কাউকে নিয়ে। ম'ঃ অঁরি ফ্রাঁসোয়া রে ও ম'ঃ ঈভ্ বারজের ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত। এ'রা যুবক। এ'রা ফরাসী সাহিত্যে নতুন অধ্যায় খুলেছেন। একলা মানুষের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে এ'দের গবেষণা। এ'রা শুধু গবেষণা করেই খালাস নন। এ'রা চেয়েছেন সমস্যার একটা সমাধান করতে। কতকটা এ'রা কৃতকার্য ও হয়েছেন।

ডিসেম্বর মাসটা ধরে শুধু পুরস্কার বর্ষিত হয়েছে। তার পুরো বিবরণ দিতে গেলে কম করে পৃষ্ঠা বিশেক প্রয়োজন। তারই ছিটে-ফোঁটা দেওয়া

দা ভিঞ্চির 'মোনালিজার হাসি'

গেল। এখানকার পুলিশরা আমাদের মতন বেরসিক নন। প্যারিসের 'লাল বাজার' অর্থাৎ প্যারিস পুলিশের হেড অফিস 'কেদেজ অরফেব্র'-এর পদস্থ কর্মচারীরা প্রতি বছরে শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের ওপর একটি পুরস্কার দিয়ে থাকেন। ১৯৬২ সালের প্যারিস পুলিশের পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতি মিশলিন সান্‌প্রেল তাঁর ডিটেকটিভ উপন্যাস 'দি মিলিয়' দ্য তেমোয়া' (দশ লক্ষ সাক্ষী)-র জন্য। প্যারিসের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জেলার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো পুরস্কার বিতরণে কম যায় না। লিয়ঁ জেলার সাহিত্য একাডেমির বাৎসরিক পুরস্কার হাজার টাকা এবং দেওয়া হয় লিয়ঁ জেলার সাহিত্যিক বা ওই জেলার ওপর লেখা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারকে। এবার পেয়েছেন সেই পুরস্কার মঁঃ আঁদ্রে শানি ও মাদামোয়াজেল ম্যাগদা মারতিনি। দক্ষিণ ফ্রাঁসের তুলুজ জেলার 'আকাদেমি দে জো ফ্লোরো (ফুল নিয়ে লেখার আকাদেমি) হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সের জেলার ফুল নিয়ে লেখা কবিতার বইএর ওপর। এছাড়া দশটা পুরস্কার আরও দেওয়া হবে ফুল সম্বন্ধে যারা শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশ করবে তাদের। আকাশ-বাতাস-পুষ্প নিয়ে সাহিত্যিকেরা অনেক লিখেছেন। ওসব লেখায় তাঁরা ইন্সপিরেশন পেয়ে থাকেন। কিন্তু রান্নায় কেউ সাহিত্যের ইন্সপিরেশন পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। ভাল রান্না হলে লোভের উদ্রেক হতে পারে। রান্নার ওপর অনেক বই বছরে প্রকাশিত হয়। আবার সেই রান্নার রন্ধন সাহিত্যের ওপর একটি সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে থাকে প্যারিসের বড়বাজারের কষাইখানার কর্মচারীরা। কষাইদের এই পুরস্কারের নাম 'গ'কুর দ্য লা কুইজিন' (রান্নার গ'কুর পুরস্কার)। এবারের 'গ'কুর দ্য লা কুইজিন' পুরস্কার লাভ করেছেন মাদাম নিনেৎ লিয়ঁ তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'ভিয়াণ্দ আ তু প্রি' (মাংস যে কোনো দামে হোক)। বইটি মাংস রান্নার ওপর। বইটি মাংস রান্নার ওপর বলেই প্যারিসের বড়বাজারের কষাইরা তাদের দোকানের সামনে দাঁড়িপাল্লা খাটিয়ে গ্রথকারকে এক পাল্লায় বসিয়ে তার ওজনের দুই গুণ মাংস ওজন করে সেই মাংস গ্রন্থকারকে উপহার দিয়েছে। গ্রন্থকার বলেছেন যে, তিনি যা মাংস পেয়েছেন তা তাঁর এক বছরের খোরাক। প্রতি বছরে দেওয়া হয় রন্ধন পুরস্কার।

আকাদেমি ফ্রাঁসোয়া বা ফরাসী সাহিত্য আকাদেমিকে ফরাসী সাহিত্যের আদালত বলা চলে। ফরাসী ভাষার ব্যাকরণ, শব্দকোষের চয়ন থেকে বিধান-দান সবই এর সভ্যারা করে থাকেন। ফরাসী আকাদেমির সদস্য নির্বাচিত হওয়া মানে ফরাসী ইতিহাসে অমর হওয়া। কোন্ সাহিত্যিক না সে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ফরাসী সাহিত্যের অনেক বিশ্ববিখ্যাত দিক্‌পাল ফরাসী আকাদেমির সদস্য ছিলেন না বা এখনও নন। তাঁদের মধ্যে আছেন আঁদ্রে জিদ্, আলবেয়ার কামু এবং আঁদ্রে মালরো। অবশ্য এইসব বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকরা ফরাসী আকাদেমিকে থোড়াই কেয়ার করেন। ফরাসী আকাদেমির [illegible] সদস্য না হয়েও এঁরা বিশ্ব-সা[illegible] দরবারে অমর হয়ে থাকবেন। তবে এবার যিনি ফরাসী আকাদেমিতে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি আধা-সাংবাদিক আধা-সাহিত্যিক এবং আধা-যোদ্ধা। আকাদেমির নতুন সদস্য মঁঃ জোসেফ কেশেল খাঁটি ফরাসী নন। জন্মেছেন রাশিয়ায়। ইস্কুলের লেখা-পড়া শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনা করেন ফ্রান্সে। তারপর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের হয়ে বৈমানিক যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ফরাসী না হয়েও ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে দখল কম কথা নয়। তার সর্বশেষ উপন্যাস 'লা লিয়' (সিংহ) সবার প্রশংসা পেয়েছে। এখন তিনি একটি দৈনিক সংবাদপত্রে সাংবাদিকতা করছেন। ফরাসী আকাদেমির সদস্য হতে গেলে অনুরোধপত্র বা দরখাস্ত করতে হয়। এবং তার জন্য চাই অন্য সদস্যদের সুপারিশ। সাহিত্যিক হিসেবে
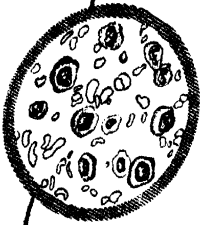
কেউ চেনে না কিন্তু তিনি মুখে মুখে কবিতা গাঁথতে পারেন এমনি এক নাম-না জানা কবি জলের কল মেরামত করার মিস্ত্রী মঃ মার্সেল গারনিয়ের ফরাসী আকাদেমিতে সদস্য পদের জন্য দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন। যদিও তিনি অন্য সদস্যদের সুপারিশ লাভ করতে পারেন নি তাহলেও মঃ গারনিয়ের দাবী করেছিলেন যে, এখন ফ্রান্সে একজনও ভাল কবি নেই। তিনি জন্ম-কবি তাঁর দাবী অগ্রগণ্য হবে। জলেরকল মিস্ত্রিরূপে তিনি অনেক আকাডেমিসিয়ানের জলের-কল মেরামত করেছেন। সেই সূত্রে তাদের সাথে তার আলাপও আছে। আকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি আকাডেমি ভবনের এটা-সেটা মেরামতির কাজও করতে পারবেন। জলের কল তো বটেই। তিনি আরও বলেছেন যে, একালের নামকরা কবিরা সবই প্রায় বালখিল্যের দল। এ'র বয়স এখন তিয়াত্তর। বাস করেন প্যারিসের কাছেই। তার শেষ একটি কবিতার নমুনা দিচ্ছি ঃ

অনেক মানা অনেক নিষেধ সত্ত্বে
ক্রোশপথ ডিঙিয়ে, দৌড়-ঝাঁপ
দিয়ে ছোটে সিনেমার পথে
ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দেখতে
সাত্যিকারের একটি নারী যেন
জলপ্রপাতের
অনেকখন সিনেমার সামনে লাইন
দিয়ে দাঁড়িয়ে।

একটি মাত্র ছবিকে নিয়ে ইদানিংকালে এত উত্তেজনা দেখা যায়নি। প্যারিসের 'ল্যুভ্‌র' প্রাসাদের মিউজিয়মের কথা কে না শুনেছেন। 'ল্যুভ্‌র' প্রসাদে রক্ষিত আছে কয়েক সহস্র ছবি ও ভাস্কর্য। তার যে কত দাম তার হিসেব আপনারা করতে পারেন শুধু একের পিঠে কয়েক কোটি শূন্য বসিয়ে। ল্যুভর মিউজিয়মে প্রদর্শিত ইতালিয়ান শিল্পী দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিজার হাসি ছবিটার দাম মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা। দা ভিঞ্চির 'মোনালিজার হাসি' ছবিটা নাকি রহস্যময়। মোনালিজার হাসি রহস্যময়। আধো হাসির দাম পঞ্চাশ কোটি টাকা। এই ছবিটা ফরাসীদের গর্ব। এহেন ছবি ধার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ কেনেডি ফরাসী রাষ্ট্রপতির কাছে। উদ্দেশ্য! মোনালিজাকে দেখান হবে মার্কিণদের। ফরাসী সরকার ছিলেন রাজী। কিন্তু একদল ফরাসী আর্ট-অনুরাগী বলেছিল যে, মোনালিজাকে যদি ল্যুভ্‌র মিউজিয়ম হতে স্থানচ্যুত করা হয় তাহলে তারা বিপ্লব না হোক একটা ছোট-খাট যুদ্ধ করবে। মোনালিজা অনুরাগী সমিতি ফরাসী সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রীকে সাবধান করে দেয়। প্রতিটি সংবাদপত্রে দেখেছি প্রতিবাদের ঝড়। শেষ পর্যন্ত দা ভিঞ্চির মোনালিজাকে ওয়াশিংটনে পাঠান হয়েছে। মোনালিজার ছবিটিকে আস্টে-পৃষ্ঠে শক্ত করে বেঁধে সশস্ত্র পুলিশি পাহারায় ফরাসী জাহাজ 'ফ্রান্স' মারফৎ পাঠান হয় নিউইয়র্ক। জাহাজের যে ঘরে মোনালিজাকে রাখা হয় সেটি ছিল দুর্গ গোছের। ঘরের মধ্যে ও ওপাশে সর্বক্ষণ সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিত। তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে তাকে যেমন রাখা হয়েছে তেমনি কত তার আইন-কানুন। এখানকার সংবাদপত্রগুলো বলেছে যে, 'ফ্রান্স' নামক নতুন জাহাজটার দাম হল ছেচল্লিশ কোটি টাকা। আর তার অন্যতম যাত্রী মোনালিজা ছবির মূল্যে পঞ্চাশ কোটি টাকা। বিমানে পাঠান হয়নি এই জন্যে যে, যদি কখনো বিমান দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে পঞ্চাশ কোটি টাকা জলে যাবে। সাবধানতা অবলম্বনেই জাহাজে পাঠান হয়েছে। মোনালিজা ছবি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানর পর তাকে বন্দী অবস্থায় এমন এক গৃহে রাখা হয়েছে যেখানে কয়েদীদের ওপরও অমন কড়া নজর দেওয়া হয় না। যাতে তার গায়ে একটি আঁচড় না লাগে তার সব রকমের ব্যবস্থা করেছে মার্কিণ সরকার। স্বয়ং মার্কিণ রাষ্ট্রপতি মিঃ কেনেডি মোনালিজার ছবির জন্য ধন্যবাদবার্তা পাঠিয়েছেন ফরাসী সরকারের কাছে। কবির কথায় 'ছবি তুমি কি শুধু পটে লিখা নয়'। ষোড়শ শতকে লিওনার্দ দা ভিঞ্চি মোনালিজা যখন আঁকেন তখন তার মূল্যে শোধ হয় ছিল কয়েক শত টাকা। কিন্তু ১৫১৬ শতকে ফরাসী সম্রাট প্রথম ফ্রাঁসোয়া ওটা কেনেন ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে। তারপর যুদ্ধ বিপ্লব কাটিয়ে সেই ছবি ল্যুভ্‌র প্রাসাদে পায় স্থান। ১৯১১ সালে যখন ওটা চুরি যায় তখন তার দাম হয় সাত কোটি টাকা। তারপর ক্রমশ তার দাম বাড়তে থাকে। এখন ওটার দাম পঞ্চাশ কোটি টাকা।

প্যারিসের বেসরকারী রেডিও প্রতিষ্ঠান 'ইউরোপ নম্বর এক' একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানে প্রচার মারফৎ বলে, তাদের নিজস্ব অনুসন্ধানে জেনেছে যে, ফ্রান্সে এখনও পনর হাজার নরনারী তুক্‌-তাক্‌, জল-পড়া, হাত-দেখা, গণনা ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত আছে। তবে এরা সবাই পেশাদার নয়। ভবিষ্যৎ গণনা, বশীকরণ কবচের ব্যবসা, রোগ সারানো বা অদ্ভুত কিছু বলার দোকান প্যারিসে কম নেই। উইচক্রাফ্‌ট্‌ বিদ্যায় পারদর্শীদের সংখ্যা ইউরোপময় ছড়ান। তবে এদের নিয়ে যত মজা করে জনসাধারণ ততটা বিশ্বাস করে বলে আমার মনে হয় না। প্যারিসে এদের সংখ্যা অনেক। তাদের দোকানপাট হবে কয়েক শত। গণনা ও তুক্‌তাকের বই-এর দোকানের সংখ্যা গোটা দশেক।
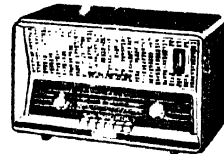
১/২/৬৩ ইং

যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা —
তোমারি ফুলবনে
যাইবনা . . .

ই. সি. এম.

কলম্বো
প্রস্তাব

স্যাবটেজ

পাঞ্জা
লড়ো
ভাই !

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

কথাটা যতই আনন্দের এবং ওর পক্ষে সুখের হোক—জিজ্ঞাসা না করলে নিজে থেকে বলা যায় না। অথচ এতদিন যেটুকু সংশয় ছিল কনকের সেটুকুও আর থাকে না। ছেলেই হবে তার—মানে ছেলে কিম্বা মেয়ে। যে-সব লক্ষণগুলোর কথা জানা বা শোনা ছিল তার—সে সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। অথচ অনেক আগেই যাঁদের চোখে পড়ার কথা তাঁরা নির্বিকার। শ্যামার সব দিকেই তীক্ষ্ন দৃষ্টি কিন্তু তিনিও—হয়ত ওর দিকে ইদানীং ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখেন নি ব'লেই, অথবা এ সম্ভাবনার কথাটা তাঁর আদৌ মনে হয় নি ব'লেই—দেখতে পান না কিছু। হেমেরও চোখে পড়ে না কারণ দিনের বেলা বৌয়ের দিকে তাকিয়ে দেখার অবসরই তার অল্প। এক রবিবারেই যা সকালের দিকে বাড়ি থাকে কিন্তু সে সময়টাও কাটে তার বাগানের তদ্বির ক'রে বা মাছ ধরে। তাছাড়া, কনকের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখার কোন কারণ আছে ব'লেও মনে হয় না তার।

অগত্যা অনেক ইতস্তত ক'রে কনক বাপের বাড়িতেই চিঠি লেখে। এসব কথা চিঠিতে লিখতেও লজ্জা করে—লিখতে বসে অনেকবারই ভাবতে হয়েছে, অনেক ইতস্তত করেছে সে কিন্তু উপায়ান্তর না পেয়েই শেষ পর্যন্ত ইসারা-ইঙ্গিতে কথাটা জানিয়েছে। আজকাল তার সুবিধাও হয়েছে একটু। কান্তি বাজারে-দোকানে যায় দরকারমতো—তাকে পয়সা দিলে খাম পোস্টকার্ড সে-ই এনে দিতে পারে। দেয়ও। এর মধ্যে দু-একবার এনে দিয়েছে। পয়সা আজকাল দুটো একটা সে সাহস ক'রে হেমের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সামান্য দুটো-একটা পয়সা চাইলে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করে না হেম, হাসিমুখেই দেয়। একবার শুধু একসঙ্গে দু আনা পয়সা চেয়ে ফেলেছিল কনক—সেই দিনই, চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে উঠেছিল হেম, কী দরকার প্রশ্নও করেছিল। সেই থেকেই সতর্ক হয়ে গেছে কনক—আর কখনও দু পয়সার বেশী চায় না। অবশ্য সে দু আনা সে হেমেরই প্রয়োজনে চেয়েছিল—ওর হাড়ের বোতামগুলো সবই প্রায় ভেঙ্গে গেছে, কান্তিকে দিয়ে কিনে আনাবে ব'লে—তাই কথাটা বলতেও কোন দ্বিধা ছিল না, হেমের মুখের গাম্ভীর্যটাও কাটতে খুব দেরি হয় নি—তবু ভাল ঘোড়ার এক চাবুকে, সেই একবারেই শিক্ষা হয়ে গেছে তার, আর ভুল করে না।

আর কীই বা দরকার তার। নিজের জন্যে কিছু কেনার উপায় নেই এ বাড়িতে, ইচ্ছা, প্রয়োজন এমন কি সঙ্গতি থাকলেও নয়। কোন কিছু দরকার হ'লে ভয়ে ভয়ে শাশুড়ির গোচরে আনতে হয় কথাটা; যদি তিনি বলেন যে, 'দেখি—এখন তো হাতে খুব টানাটানি—সামনের মাসে না হয় মরি-বাঁচি ক'রে যাহয় করব' কিম্বা যদি বলেন যে, 'হেমকে বলে দেখি একবার যদি এনে দেয়'—তো সেটা মহা সৌভাগ্য বুঝতে হবে। আর যদি সোজা ঝেড়ে জবাব দেন যে, 'ও সব এখন হবে-টবে না বাছা—অত পয়সা নেই' কিম্বা বলেন যে, 'আমার ঘরে ইচ্ছে করলেই কোন জিনিস পাওয়া যায় না মা, দরকার হ'লেও অনেক সময় চেপে রাখতে হয়।' তো ব্যস্—সেইখানেই সে প্রসঙ্গের ইতি। আবার সে কথা তুলবে এত সাহস অন্তত কনকের নেই।

আর তাঁকে না বলে কোন জিনিস কিনবে, কি কিনে আনবে এমন বুকের পাটা কার? হেমেরও সে সাহস নেই। সে চেষ্টা যে দু-একবার ক'রে দেখে নি কনক তা নয়। ইদানীং হেম তার প্রতি খুবই সদয় হয়েছে—বেশ সস্নেহ ব্যবহার করে—তবু ফরমাশের নাম শুনেই শিউরে উঠেছে। জবাব দিয়েছে, 'ও বাবা, আমি তোমাকে লুকিয়ে ক'রে কোন জিনিস এনে দেব—সে আমার দ্বারা হবে না। মা টের পেলে রক্ষে থাকবে না। মিছিমিছি একটা অশান্তি। তার চেয়ে ও মাকেই ব'লো।'

অশান্তি যে তা কনকও বোঝে। দেখতেই পাচ্ছে। এমনিতেই শ্যামা যেন তার সম্বন্ধে কেমন বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েছেন আজকাল। কেন তা অনেক ভেবেও সে বুঝতে পারে না। ছেলে যতদিন বৌ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল ততদিন তিনি কনকের প্রতি যথাসম্ভব (তাঁর স্বভাবে যতটা সম্ভব) সহানুভূতিই দেখিয়েছেন, প্রকাশ্যেই ছেলের ব্যবহারে অনুযোগ করেছেন। কিন্তু ইদানীং ছেলের মতি-গতি পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে—এমন কি ভাল ক'রে পালটাবার আগেই শ্যামার মেজাজের পরিবর্তন ঘটে গেছে যেন। স্বামীর, স্নেহ, ভালবাসা বলে আজও মনে করে না কনক, সে টের পাবার আগেই যেন শাশুড়ি টের পেয়েছেন। তা না হয় পেলেন—কিন্তু সেজন্য তিনি কেন অসন্তুষ্ট হবেন সেইটেই ভেবে পায় না সে।

চিঠি লেখারও বিপদ কম নয়। শ্যামা নিজে যদিচ মোটামুটি খানিকটা লেখা-পড়া জানেন তবু মেয়েদের বই নিয়ে বসে থাকা পছন্দ করেন না। ওটা সময়ের অপব্যয় বলেই মনে করেন। ব'লেন, 'অমন আয়না মুখে ক'রে বসে থাকা বড়লোকদের শোভা পায়। আমাদের গেরস্ত ঘরে ও-সব সাজে না। আর দরকারই বা কি, দু'পাতা বই পড়ে কি সগ্গে বাতি দেব না কোম্পানীর দপ্তরে চাকরী করতে

যাবে? ঐ সময়টা সংসারের বাড়তি কাজ করলে কিছু তবু সাশ্রয় হয়।'

পড়া যেমন পছন্দ করেন না তেমনি লেখাও না। চিঠি লিখতে দেখলেই তাঁর দৃষ্টি এবং কণ্ঠ দুই-ই তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে। বিপদ-আপদ না ঘটলে চিঠি লেখায় কী সার্থকতা তা তিনি ভেবেই পান না।

'যারা কাজ-কারবার করে তাদের না হয় ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি পাঠাতে হয়, সে চিঠিতে দু'পয়সা আ'স তাদের—তার-জন্যেই সাহেবদের আপিসে মাইনে-করা কেরানী রাখে—তোমাদের চিঠিতে তো আর একপয়সা আয় হবে না, বরং ঐ পয়সাটাই অপচ হবে। ঐ যে সব ব'লেন, ভারী তো এক পয়সা খরচ একখানা পোষ্টকার্ডের—ওটা কি আবার খরচা নাকি! আ মর—একটা পয়সাই বা আসে কোথা থেকে। বলে কড়া কড়া নাউটা, কড়াটা না ফেললে তো আর নাউটা নয়। এক পয়সার পোষ্টকার্ড না কিনে নুন কিন'লে গেরস্তর সাতদিন রান্না চলে। আর কী দরকারই বা? দুদিন আগেই হয়তো দেখা হয়েছে না হয় আর দুদিন পরে হবে। যা বলব'র আছে তখনই বলবে—পেটের থলি উজাড় করে সব কথা বলো—তাতে তো কোন ক্ষতি হবে না। এক পয়সা লোকসান নেই তাতে। অসুখ-বিসুখ করে কি কোন জরুরী দরকার থাকে—সে এক কথা, নইলে তো সেই বাঁধা গৎ, তুমি কেমন আছ—আমি ভাল আছি। সুখসোমন্দা পয়সা উড়িয়ে দেওয়া।'

সুতরাং খাম পোষ্টকার্ড আনালেই শুধু হয় না—চিঠি লেখবার মতো অবসর-টুকুর জন্যও সাধনা কত্তে হয়। সে অবসর সত্যিই দুর্লভ এ বাড়িতে। সদাজাগ্রত শাশুড়ি অহরহ কর্মব্যস্ত, কখন কোথায় এসে পড়বেন তার ঠিক নেই। দুপুরে তিনি নিজে ঘুমোন না, আর কেউ ঘুমোয় তাও পছন্দ ক'রেন না। কনক দুপুরের দিকে একটু অবসর পায় ঠিকই—কিন্তু কখন তিনি ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হতেন কিম্বা ওকে ডেকে কাছে বসাবেন তার কো'ন ঠিকই নেই। চিঠি লেখা তো অপরাধ বটেই—লুকিয়ে লেখা আরও কঠিন অপরাধ।

তবু ওরই মধ্যে সময় করে একখানা চিঠি লেখে সে। যেটা দশ মিনিটে লিখে ফেলবার কথা সেইটেই তিনদিন ধরে লিখতে হয়। রাত্রে লেখা যায় না—হেম জিজ্ঞাসা করবে হঠাৎ বাপের বাড়িতে চিঠি লেখার কী এমন দরকার পড়ল? বিশেষত ওর বাপের বাড়ির গ্রামের বন্ধু ছেলে লিলুয়ায় কাজ করে—একই গাড়িতে যাতায়াত—কে কেমন আছে তার মোটা-মুটি একটা খবর পায়ই হেম। সে জিজ্ঞাসা না করলেও তারাই সেধে দেয় সে খবর। আগে বলত না, এখন হেম ওকে দেয়ও সে খবর। কাজেই—আবার মিছিমিছি এক পয়সা খর'চের কী এমন জরুরী প্রয়োজন পড়ল—এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক!

কিন্তু চিঠি যখন লেখা হয়নি তখন কী করে লিখব—এই প্রশ্নটাই ছিল প্রধান, চিঠি লিখে গোপনে শান্তিকে ফেলতে দিয়েই অনুতপ্ত হয়ে ওঠে কনক। কেনই বা একথা ওঁদের লিখতে গেল সে! তাঁরা আর কী করবেন? এক বাড়িতে থেকে সে যা জানাতে পারল না —তাঁরা অন্য গ্রাম থেকে এসে কেমন ক'রে জানাবেন? মিছিমিছি তাঁদেরও বিব্রত করা। এঁরা যে জানেন না সে কথাটা অবশ্য লজ্জায় লিখতে পারেনি সে। তবে তাঁরা অনুমান করতে পারবেন। কারণ জানালে এঁরাই জানা'তেন সে কথাটা। তা-ই নিয়ম। দুম্ ক'রে এসে যদি কেউ কথাটা তোলে তাহ'লে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না।

এক যদি তাঁরা কোন ছুতো ক'রে দু একদিনের জন্য নিয়ে যান—তারপর সেখান থেকে লিখে জানান তো হয়। সেইটেই লিখে দেওয়া উচিত ছিল। তবে—সে মনে মনে প্রবোধ দেয় নিজেকে —সে বুদ্ধি কি আর বাবা-মার হবে না? তা না হ'লেও এলে সে টের পাবেই, কাছাকাছি এলে না হয় একটু চোখ
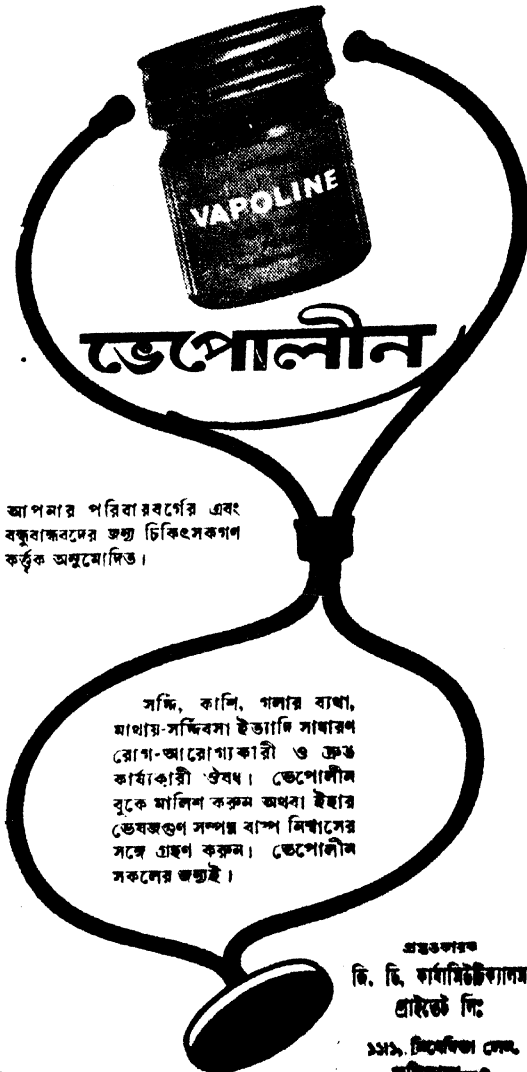
টিপে দেবেখন শাশুড়ির পিছন থেকে—যাতে চিঠির কথাটা না বলেন শাশুড়িকে।

কিন্তু এ আশ্বাসও বেশীক্ষণ টেকে না—আশঙ্কাটাই প্রবল হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, তার ভাগ্যটা যেন সৃষ্টিছাড়া একেবারে। নইলে এমন কথা কে কোথায় শুনেছে। এক বাড়িতে এক সংসারে বাস ক'রেও শাশুড়ি খবর রাখেন না—কেউ শুনলেও বিশ্বাস করবে না।... বিশেষত বিধবা শাশুড়ি—ব্রাহ্মণের বিধবা। কিন্তু শ্যামাও যে একেবারে দলছাড়া গোত্র-ছাড়া। সাধারণ অন্য বিধবাদের মতো আচারবিচারের ধরাকাঠ তাঁর আদৌ নেই। তিনি বলেন, 'অতশত মানতে গেলে আর কট্‌কেলী করতে গেলে আমার চলে না, আমার বলতে গেলে ভিখিরীর সংসার, দুঃখের পেছনে দড়ি দিয়ে চলতে হয় অষ্টপ্রহর। যে সময় ঐসব করব সে সময় আমার দু পাঁচ সের পাতা চাঁচা হয়ে যাবে।... আর ওসব মানিও না, উনি ঠিকই বলতেন—এটা করো না, এটা করলে অমুক হবে শুনলেই উনি ছড়া কাটতেন মাকড় মারলে ধোকড় হয় চালতা খেলে বাকড় হয়। সেই কথাটাই ঠিক।' ভাত অবশ্য তিনি বধূর হাতে আজও খাননি, ওর দীক্ষা হয়নি হাতের জল এখনও অশুদ্ধ বলে—তাছাড়া পাতার জ্বালে ভাত রাঁধা—তিনি ছাড়া কেউ অত ভাল পারেও না। ধৈর্যের অভাব, পাতাও অনেক বেশি খরচ ক'রে ফেলে। কিন্তু ভাত ছাড়া মোটামুটি রান্নাটা কনকই করে আজকাল; দৈবাৎ কোনদিন শ্যামার হাতে কাজ না থাকলে সে অন্য কথা। নইলে কোন নিয়ম-কানুনের ধার ধারেন না তিনি। কাজেই যে কারণে জানা যেতে পারত—সে কারণটা ওদের সংসারে নেই।

চিঠি পেয়ে ওর বাবা প্রথম শনিবারেই এসে হাজির হলেন—আর এমন সময়েই এলেন যে ওর সতর্কতার সমস্ত পরি-কল্পনা বানচাল হয়ে গেল। এ সময়টা কনকের হিসেবে ধরা ছিল না। অর্থাৎ বেলা দুটোর সময়।

ও সেদিন ঘুমোয়নি। আর একটু পরেই হেম এসে পড়বে—হেম আজকাল তিনটের মধ্যেই এসে পড়ে—এসেই গরম জল চাইবে সাবান কাচবার জন্যে; তাছাড়া স্বামী খেটেখুটে এসে দেখবে স্ত্রী আরামে ঘুমোচ্ছে—সে বড় লজ্জার কথা; তাই সে রান্নাঘরের দাওয়াতেই আঁচলটা পেতে গড়াচ্ছিল একটু। আর কতটা পরে পাতার জ্বালে গরম জলের হাঁড়ি চাপাবে—সামনের কার্নিসে-পড়া রোদটা দেখে সেইটেই হিসেব করছিল মনে মনে।

অকস্মাৎ বাবার গলা কানে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বাইরে এল কিন্তু তার আগেই অনিষ্ট যা হবার তা হয়ে গেছে। তখন আর কোনরকম সাবধান করার উপায়ও ছিল না—তিনি ওর দিকেই পিছন ফিরে রকের ওপর জেঁকে বসেছেন। আগে কি কথা হয়েছিল তা জানা গেল না, কনক যখন এল তখন ওর বাবা হাসি হাসি মুখে বলছেন, 'সুখবরটা শুনেই ছুটে এলুম বেনঠাকুরুন, বলি যাই খাড়া খাড়া গিয়ে সন্দেশ খেয়ে আসি গে।... আজ আর সহজে ছাড়ছি না কিন্তু তা আগেই বলে রাখছি, একটি হাঁড়ি মিষ্টি চাই।'

শ্যামার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল না বটে কিন্তু তাঁর মুখটা দেখার কোন অসুবিধাই ছিল না কনকের। প্রথমটা একটা প্রচণ্ড বিস্ময়, একটা হতচকিত ভাবই মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল কিন্তু সে এক লহমার বেশি নয়। তারপরই তাঁর মুখ অরুণ বর্ণ ধারণ করল, ধারালো ছুরির ফলার মতোই শাণিত হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টি। কিন্তু সেও এক মুহূর্তের বেশি নয়, বোধকরি সে উষ্ণতা ও উগ্রতার একটা ছায়ামাত্র সরে গেল তাঁর মুখের ওপর দিয়ে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যথোচিত মিষ্ট সৌজন্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন যেন। হেসেই জবাব দিলেন, 'খাওয়া তো আমারও পাওনা হয় বেইমশাই, আমি তো পথ চেয়ে বসে আছি—আপনি হাঁড়ি হাতে ক'রে ঢুকবেন। তা সে হবেই এখন—কিন্তু সুখবরটি আপনাকে এরই মধ্যে দিলে কে?'

সুখবরটা কি তা প্রশ্ন করার প্রয়োজন হ'ল না। ঐ যা প্রথমেই কয়েক মুহূর্ত সময় লেগেছিল বেহাইয়ের কথাটা ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে ধরতে। কিন্তু মনের ওপর ও মুখের ওপর যত দখলই যাক তাঁর—কণ্ঠস্বরটাকে পুরো-পুরি আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি—শেষের প্রশ্নটা করার সময় সতর্কতা সত্ত্বেও কণ্ঠ থেকে ঈষৎ তীক্ষ্ণ কঠিন সুরই বেরিয়ে এল। আর তাইতেই হুঁশিয়ার হয়ে উঠলেন পূর্ণ মুখুজ্জে মশাই। তিনিও পল্লীগ্রামেই বাস করেন—এসব বাঁকা প্রশ্নের সরল পরিণতি তাঁর একেবারে অজানা নয়। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা সামলাতে একটু সময় লাগল বটে—তবে সহজ সত্য কথার পথে আর গেলেন না তিনি। বার দুই ঢোক গিলে বললেন, 'খবর? তা মানে—তা ঠিক বলতে পারব না। মানে ঐ মেয়েমহল থেকে শোনা, বুঝলেন কিনা—ঠিক কী ক'রে খবরটা গেছে—'

অর্ধপথেই থেমে গেলেন পূর্ণবাবু।

শ্যামাও আর বেশি পীড়াপীড়ি করলেন না। অমায়িক ভাবেই হেসে বললেন, 'যাক—যে-ই দিক, খবরটা পৌঁছলেই হ'ল। আমারই দেওয়া উচিত ছিল, দোবও ভাবছিলুম কদিন থেকেই—কিন্তু জানেন তো বহুদিন মা সরস্বতীর পাট নেই, দোয়াত-কলম এখন যেন বাঘ মনে হয়!'

এর পর কোন পক্ষেই সহজ সৌজন্যের অভাব হ'ল না। বরং শ্যামার দিক থেকে একটু বাড়াবাড়িই হ'ল বলা যায়। কান্তিকে দোকানে পাঠিয়ে সত্যি-সত্যিই দুটো রসগোল্লা আনালেন তিনি—তাও এক পয়সানে ছোট রসগোল্লা নয়, দু পয়সানে বড় রসগোল্লাই আনতে বলেছিলেন তিনি—ঘরে তৈরি খুদ ভাজার নাড়ুর সঙ্গে সে দুটোই সাজিয়ে দিলেন এবং পীড়াপীড়ি ক'রে সবগুলো খাওয়ালেন। পূর্ণ মুখুজ্জেমশাইয়ের মনে যেটুকু উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল এই প্রীতিপূর্ণ হৃদ্যতায় তার আর চিহ্নমাত্র রইল না; তিনি জলযোগ শেষ ক'রে খুশী মনেই বিদায় নিলেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল বটে—কিন্তু সে শ্যামার সামনেই—আড়ালে দেখা করার কোন প্রয়োজন আছে তা তাঁরও মনে হ'ল না, শ্যামাও সে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করলেন না। সুতরাং মামুলী সাবধানে থাকার দু চারটে উপদেশ দিয়ে পূর্ণবাবু হাসিমুখে আশীর্বাদ ক'রে বেয়ানকে প্রণাম ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন। বহুদিন মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনা না হওয়ায় মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কুটিল সংশয়টা দেখা দিয়েছিল, এ সুসংবাদে সেটাও নির্মূল হয়ে গেছে। ভদ্রলোক সত্যি-সত্যিই খুশী হয়েছেন।

বেয়াইকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে তাঁর চোখের আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কানাইবাঁশীর ঝাড়টার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামা। সহজ, স্বাভাবিক মানুষ। যেতে যেতে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালেও পূর্ণবাবু কোন বৈলক্ষণ্য টের পেতেন না। কিন্তু তাঁর বগলের বিবর্ণ ছাতাটি ও'দের বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। বাইরের ঘরের রকে পাতার রাশ পড়ে ব'টিটা সেইখানেই কাৎ করা কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে সোজা বাড়ির মধ্যে এসেই ঢুকলেন।

হেম খানিকটা আগেই এসেছে কিন্তু শ্বশুরকে দেখেই বোধ হয়—তখনও পুকুরে নাবেনি কাপড় কাচতে—রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসে একটু বিশ্রাম করছিল। কনকও আছে সেখানে—সাবান কাচার জল গরম হয়ে গেছে অনেকক্ষণই, ওদিকে কাজও পড়ে বিস্তর—তবু সেখান থেকে নড়তে পারেনি। সে বহুদিন এই ঘর করছে, শাশুড়িকে সে বিলক্ষণ চেনে, তাঁর এই কিছু পূর্বের অমায়িক ব্যবহারে ভোলবার মতো নির্বোধ নয় সে। সে তাই উনুনের ধারেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় যে একটা উঠবে সে বিষয়ে তার সন্দেহমাত্র ছিল না—শুধু কখন উঠবে এবং কী পরিমাণ প্রবল হবে সেইটেই ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। আশঙ্কাটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে উদ্বেগ আরও

ষাড়ে—কনকেরও বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছিল আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনায়।

শ্যামা এসে দাওয়ার সামনেই দাঁড়ালেন। ছেলে কিংবা বৌকে অপরাধী, অথবা দুজনেই—ঠিক করতে না পেরে দুজনের মুখের ওপরই একটা কঠোর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বলি, আমাকে না জানিয়ে বেয়াইবাড়িতে চিঠিটা কে লিখলে জানতে পাই কি?'

উত্তর কারুর দেওয়ার কথা নয়, সেজন্য অপেক্ষাও করলেন না শ্যামা। শাণিতকণ্ঠ আর এক পর্দা চড়িয়ে পুনশ্চ বললেন, 'এ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার আড্ডাটি পড়ে গেল কার? আমাকে না বলে সাততাড়াতাড়ি কুটুম-বাড়িতে না জানালে চলছিল না বুঝি? মহা সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল একেবারে।... আমি কি কানা, না কিছু জানি না? যখন দরকার বুঝতুম আমিই জানাতুম। তার যদি এত মাথাব্যথাই পড়েছিল তো এমন ক'রে কুটুমবাড়িতে আমাকে বে-ইজ্জৎ না ক'রে সোজাসুজি এই দাসীবাঁদীকে হুকুম করলেই তো হ'ত যে—খবরটা জানিয়ে দাও, নইলে আমাদের চলছে না, দিন কাটছে না। না কি, মা-মাগী যে এ বাড়ির কেউ নয়—নিতান্ত ঝি-চাকরানী সেই কথাটাই জানানো দরকার ছিল!'

হেম এই আকস্মিক—এবং তার কাছে অকারণ, আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে অবাক হয়ে বললে, 'কী জানানো হয়েছে কি? আর কে-ই বা জানালে?'

'কে জানিয়েছে সেইটেই তো আমি জানতে চাইছি বাছা? কার এতবড় সাহস-বুকের পাটা হ'ল যে কুটুম-বাড়িতে মুখটা পোড়াতে গেল আমার!'

কিন্তু সুখবরটা আপনাকে এরই মধ্যে দিল কে?

ছেলের প্রশ্ন করার ধরণেই শ্যামা বুঝে নিয়েছেন—সেই সঙ্গে কনকের অমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেও যে—কাজটা কার। সেই সঙ্গে তাঁর ভাষাও গেছে বদলে।

কনকের মাথাতে যেন কিছু ঢুকছে না। তার সবটাই যেন কাঠ হয়ে গেছে—ভেতরে বাইরে। বাইরে কোথায় একটা কাঠঠোকরা ঠকাস ঠকাস আওয়াজ করছে, দুটো কাঠবেড়ালীতে ঝগড়া বাধিয়েছে—সেই দিকেই যেন প্রাণপণে কান পেতে আছে সে। আজ যে রণরঙ্গিণী মূর্তি তার শাশুড়ির আজ নিশ্চিত মার খাওয়া অদৃষ্টে আছে তার, সেই চিন্তা থেকেই মনটাকে সরাতে চাইছে সে।

হেম কিন্তু এবার বিরক্ত হয়ে উঠল। এসব কথায় প্যাঁচ সে কোনদিনই সইতে পারে না। সেও বেশ গলা চড়িয়েই বললে, 'কী মুশকিল, [illegible] জনিতা না করে আসল কথাটা কি খুলে বললেই তো হয়! কী হয়েছে সেইটেই যে বুঝতে পারছি না!'

শ্যামাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কী হয়েছে জানো না? ন্যাকা! ...তোমার ছিষ্টিধর বংশধর হবেন আমার স্বর্গে বাতি দিতে—বৌ পোয়াতী, সেই খবরটি রাতারাতি তোমার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে গেল কী ক'রে সেইটেই জানতে চাইছি।... খবর কি আমি জানতুম না—না কখন খবর দিতে হবে সেটা আমার জানা ছিল না? আমি কি ঘরসংসার করিনি কখনও? নাকি বেদের টোল থেকেই দিন কেটেছে চিরকাল? যে তোমার বৌ বিবেচনা শেখাতে গেল?...কি সাহস ওর! এত সাহস ওর আসে কোথা থেকে?...তুমিই নিশ্চয় এ আস্পর্দা যুগিয়েছ ওকে! সমঝে দিয়েছ যে [illegible] দাসীবাঁদী, ওকে থোড়াই কেয়ার—তুমি মহারানী, তুমি যা ভাল বুঝবে তার ওপর আর কথা নেই!

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত [illegible] পেলও এমন আকস্মিকভাবে যে কিছু ক্ষণ যেন হেম শব্দগুলোর অর্থই ঠিক মতো বুঝতে পারল না—বিহ্বলভাবে মায়ের দিকে চেয়ে বসে রইল শুধু।

বিহ্বল হয়ে [illegible] ছিল কনকও কিন্তু সে অন্য ক[illegible]। উনি সটান বলেছিলেন যে উনি জানতেন।...এতবড় মিথ্যা কথাটা উনি বললেন কী করে! এ সংসারে কেউই সুবিধের নয় তা সে জানে—তবু, এতখানি বয়স হ'ল ও'র, উনি মা, মা বলে ডাকে সেও—সন্তানের সামনে এই তুচ্ছ কারণে এতবড় নির্জলা মিথ্যা কথাটা বলে বসলেন!...কনক মেয়েছেলে, তার দিন রাত এ বাড়িতে বাস করছে ও'র সঙ্গে, উনি যে টের পাননি এতদিন—তা কে হলপ ক'রে বলতে পারে। শুধু শুধু—নিজের অজ্ঞতা ঔদাসীন্য ঢাকবার জন্য। তিনি সুগৃহিণী, চারিদিকে চোখ আছে তাঁর, সেইটুকু জাহির করার জন্য। তার সবচেয়ে বড় কথা, কনককে লাঞ্ছনা করবার সুযোগের জন্যই জেনেশুনে এই মিথ্যা কথাটা বলছেন উনি। উনি আর কিছু পারেন—কত যে পারেন তা এ বাড়িতে এসে অবধিই দেখছে সে কিন্তু এতটা পারেন তা ওরও জানা ছিল না।...

নূতন আবিষ্কারের অভাবনীয়তায় সে যেন নিজের আসন্ন বিপদের কথাও ভুলে গেল—বিস্ময়টাই বড় হয়ে উঠল আর সমস্ত কথা ছাপিয়ে।

কিন্তু কনকের জন্য ভগবান সেদিন আরও বিস্ময় জমিয়ে রেখেছিলেন,—অধিকতর বিহ্বলতার কারণ তোলা ছিল তার জন্য।

মার কথাগুলোর সম্যক অর্থ মাথায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত শরীরটা রিন্ ঝিন্ ক'রে উঠল ওর, মনের মধ্যে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো তারের যন্ত্র উঠল ঝন্ ঝন্ করে। একটা অব্যক্ত, অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত সুখে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তার মধ্যেই একথাটা তার মাথায় গেছে যে, এ বিহ্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। এ অনির্বচনীয় অনুভূতি উপভোগ করার অবসর সময় এটা নয়। এ মুহূর্তে কোন অশান্তি বরদাস্ত করতে রাজী নয় সে। মার যে রকম রণরঙ্গিনী মূর্তি—তিনি সব কিছুই করতে পারেন, গায়ে হাত তোলাও বিচিত্র নয়।... একবার অপাঙ্গে অপরাধিনীর দিকে চেয়ে দেখল সে। তার সেই আনত ম্লান শুষ্ক মুখ ও একান্ত দীন ভঙ্গী দেখে একটা অননুভূত মমতায়ও মনটা ভরে গেল তার। আহা বেচারী! এই কথাটাই মনে হ'ল তার সর্বাগ্রে।

সে মুখে যৎপরোনাস্তি একটা আহত ভাব টেনে এনে বললে, 'ওঃ এই! আমি ভাবছি না জানি কী একটা গুরুতর কাণ্ড হয়ে গেছে।... কথাটা তো সেভাবে বলা হয়নি—অতশত বুঝেও বলিনি। তুমি যে এই কথা নিয়ে তিল থেকে তাল করবে তাও জানতুম না।... তাছাড়া ঠিক বলব বলে বলাও হয়নি। সেদিন বড়বাবু হঠাৎ ডেকে বললেন যে, তোমার বদলীর অর্ডার এসেছে, জ.মাল-পুরে যেতে হবে।... কবে? না, এই পনেরো দিনের মধ্যে। তখনই আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলে বসলুম যে এখন দিনকতক মাপ করুন—আমার ঘরে এই ব্যাপার।... তা সে কথাটা যে এমনভাবে চাউর হবে, তাও জানি না। এখন মনে পড়ছে যে সেখানে ওদের পাড়ার পুলে চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই হয়ত গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে কথাটা।

কথাটা শ্যামার বিশ্বাস হ'ল না। বিশ্বাস হওয়ার কোন কারণ নেই। এ পৃথিবীটাকে তিনি দেখছেন বহুদিন, এই ছেলেকেও দেখছেন আজন্ম। একথাও বলেনি। সবটাই বানানো, এই মুহূর্তে যা মনে এসেছে বানিয়ে বলছে। তবু কিছু করার নেই। তাঁর এ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ নেই তাঁর হাতে। ছেলে যখন দোষটা মাথা পেতে নিচ্ছে তখন 'বলেনি' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মনের মধ্যেকার ধূমায়িত রোষ তাই প্রচণ্ডতর বেগে জ্বলে উঠলেও আত্ম-সংযমই করতে হ'ল শেষ পর্যন্ত। তিনি বিস্মিতও হলেন। ছেলে যে বৌ সম্বন্ধে আর উদাসীন নেই, এইটুকু জানতেন কিন্তু বৌ যে এতটা হাতের মুঠোয় পুরেছে ছেলেকে, কান ধরে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে—এ খবরটা জানা ছিল না তাঁর।

কিন্তু মনে যা-ই হোক, যত দাহই সঞ্চিত হয়ে উঠুক—সেটা প্রকাশ করার স্থান-কাল এটা নয়। প্রাণপণে অর্ধোদ্গত বিষ দমন করলেন শ্যামা। নিরতিশয় শীতল কণ্ঠে শুধু বললেন, 'অ। তাহ'লে তুমিই বলেছ! তা কৈ, বলনি তো সে কথাটা এতদিন। এটা যে জানতে তাও তো বলনি!'

'বাঃ রে!' হেম মাথা হেঁট ক'রে জবাব দেয়, 'একী আমার বলবার কথা। আর কেনই বা বলব।... তুমিও তো জানতে, তুমিও তো বলনি কাউকে। আমাকেও তো বলনি। তাছাড়া—'

একটু থেমে, গলাটা বোধ করি বা লজ্জাতেই একটু নামিয়ে বললে, 'তা ছাড়া আমি ঠিক জানতুমও না। বলতে হয়—একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাই বলা। আন্দাজে ঢিল মারা কতকটা—। লেগে যাবে যে ঠিক ঠিক—'

'হুঁ!' অপরাধ স্বীকারের জ্বলজ্জ্বল্যমান প্রতিমূর্তি আনতবদনা বধূর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শ্যামা আরও শীতল কণ্ঠে বললেন, 'সবই জানতে বাছা। বৌ যে লিখেছে তাও জানতে—তাই সাত তাড়াতাড়ি আগু বেড়ে এসে দোষটা ঘাড় পেতে নিলে।... তোমার যে এতটা উন্নতি হয়েছে সেইটেই শুধু আমি জানতুম না—তা জানলে কি আর একথা বলতে আসি?... তোমাদের গুষ্টির দ্বারা তো অনেক শিক্ষা, অনেক ফৈজৎ হয়েছে—এইটেই বাকী ছিল শুধু, বোয়ের কাছে অপমান হওয়া।... যাক্ ঘাট হয়েছে আমার একথা বলতে আসা, তাতে যদি রাজরাণীর কাছে অপরাধ হয়ে থাকে তো মাপ করতে ব'লো; আর কী করব তা জানি না—বলতো না হয় উঠোনে নাক খৎই দিই সাত হাত মেপে!'

এর পর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য দাঁড়ানো যায় না। তাহ'লেই সত্য মিথ্যা সাক্ষী প্রমাণের কথা উঠবে। ছেলেই বা কী মূর্তি ধারণ করবে তার ঠিক কি!

কথাটা শেষ ক'রেই শ্যামা হন্ হন্ ক'রে বাইরে চলে গেলেন।

প্রমাণ-প্রয়োগ না থাক্—মিথ্যাটা কেউ মুখের ওপর মিথ্যা বলে ছুঁড়ে মারলে কারুরই ভাল লাগে না। হেমেরও লাগল না। কিছু পূর্বেকার মনের মধ্যে রিন্‌রিনিয়ে ওঠা মিষ্টি সুরটা নষ্ট হয়ে গেল, কোথায় একটা বড় রকমের ছন্দ-পতন হ'ল যেন। মাধুর্যের বদলে মনের পাত্রে ফেনিয়ে উঠল একটু কটু-তিক্ত-স্বাদ। সে হন্‌হনিয়ে কাছে উঠে এসে চাপাগলায় বললে, 'তুমিই বা আমাকে না জানিয়ে—আমাদের না জানিয়ে চিঠি লিখতে গিছলে কেন? এ এমন একটা কি কথা যে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক পিটিয়ে না বেড়ালে হয় না। এইসব কথা নিয়ে ঘোঁট আদিখ্যেতা যার ভাল লাগে লাগে—আমার ভাল লাগে না, এইটে মনে ক'রে রেখো!'

কনক এ কথার কোন উত্তর দিতে পারে না; অন্তরভরা কৃতজ্ঞতায় এবং উচ্ছ্বসিত প্রেমে তার চোখে যে জল এসে গিয়েছিল এই কয়েক মুহূর্ত আগে—সেইটেই বেদনার অশ্রুতে পরিণত হয় শুধু। বলতে পারে না যে, ওরা অন্ধ বলেই তাকে কথাটা অন্যত্র জানাতে হয়েছিল, বলতে পারে না যে স্বামী উদাসীন তার কাছে এ কথাটা নিজে থেকে মুখ ফুটে কোন স্ত্রীই জানাতে পারে না—বলতে পারে না, তার জন্য হেমকে যে গুরুজনের কাছে মিথ্যা বলতে হয়েছে তাতে এমন কোন দোষ হয়নি কারণ সেই গুরুজনও একটু আগে তাদের কাছে মিথ্যাই ব'লে গেছেন। কিছুই বলা হয় না। একটু আগে স্বামীর মুখে মধুর মিথ্যাটা শুনতে শুনতে অভাবনীয় সৌভাগ্যের মাধুর্যরসে মন ডুবে গিয়ে যে স্বপ্ন দেখছিল, কল্পনা করছিল কেমন ক'রে সে স্বামীর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইবে, বলতে 'তুমি আমাকে মাপ করো, আমার জন্যে তোমাকে মিথ্যা বলতে হল'—আর স্বামী কেমন করে মধুর প্রশ্রয়ে ওকে পা থেকে টেনে তুলে বলবেন, 'দূর পাগল, তাতে কি হয়েছে!'—সে স্বপ্ন, সে কল্পনাও কোন্ বাস্তবের রূঢ় দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এর পর আর কোন কথাই বলবার প্রবৃত্তি রইল না ওর। হেঁট হয়ে হাঁড়ির গরম জলটা কলসিতে ঢে'ল দিতে দিতে শুধু প্রাণপণে চোখের জলটা হেমের কাছ থেকে গোপন রাখবার চেষ্টা করতে লাগল।

(ক্রমশঃ)
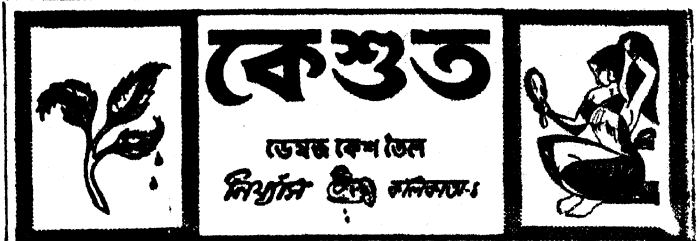
চিকিৎসা শাস্ত্র

সপ্তদশ শতকে ও অষ্টাদশ শতকে

ডাঃ অশোক কাশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন— উইলিয়ম হার্ভে, ফ্রান্সিস বেকন, যোহানেস কেপলের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে দেকার্ত, ব্লেস পাস্কাল, রবার্ট বয়েল, আইজাক নিউটন, জন লক্, বেনেডিকটুস স্পিনোজা ও গটফ্রিদ হিবলহেলম্ লাইবনিৎস এবং আরো অনেকে। গ্যালিলিও এক সরল অনুবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ভবিষ্যৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল তারই উন্নত সংস্করণ। সাংটোরিয়ুস নামক পাড়ুয়াবাসী বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর মতবাদ অনুসরণ করে সর্বপ্রথম একটি তাপমানযন্ত্র (Thermometer) আবিষ্কার করেন। রবার্ট বয়েলে-এর ছাত্র জনমেয়ো অম্লজান বাষ্প প্রস্তুতে সমর্থ হন। কালক্রমে অম্লজান বাষ্প পরিণত হয় চিকিৎসার এক অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যে। স্যর রবার্ট সিবাল্ড নামক এক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজ-শাস্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আর্চিবল্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপর এক স্কট চিকিৎসক উক্ত সংস্থার প্রধান সদস্য-পদ লাভ করেছিলেন। তাঁর ছাত্র জন মর্গ্যান আমেরিকার সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা-বিদ্যালয় পেন্সিলভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের এই সুবর্ণ যুগে ইংলণ্ডে উইলিয়ম হার্ভে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ ও পরে পাড়ুয়ায় শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লণ্ডনের সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। পাড়ুয়ার অধ্যাপক ফাব্রিসিউস-এর গবেষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শারীরস্থান-শাস্ত্রে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্ত-গতি আবিষ্কারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর উক্ত তথ্য বিশ্বজ্জন-সমক্ষে প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীগণ তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও কালক্রমে তাঁর মতবাদই সত্য বলে পরিগণিত হয়। হার্ভের সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডের অপর বিখ্যাত চিকিৎসক টমাস সাইডেনহ্যাম (১৬২৪-১৬৮৯) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করতেন। বাইশ বৎসর বয়সে চাকুরী পরিত্যাগ করে অক্সফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে রোগের প্রতিটি লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই রোগনির্ণয়-শাস্ত্র বা Clinical Diagnostic Medicine-এর প্রবর্তক। রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় লৌহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোনা বল্কল চূর্ণ প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদঘটিত লবণ প্রয়োগবিধি তাঁর অমূল্য অবদান। জীবৎকালে তিনি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে খ্যাতিলাভ করেন।

উইলিয়ম হার্ভে

গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ-যন্ত্র সরল পরকলার (lens) দ্বারা গঠিত। যৌগিক পরকলা (Compound lens) উদ্ভাবনের বহু পূর্বে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মারচেল্লো ম্যালপিঘি ও ওলন্দাজ আন্তনি ভান্ লেউভেনহোক সরল পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালপিঘি (১৬২৮-১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি জীবন্ত ব্যাঙ্-এর ফুসফুস পরকলার সাহায্যে

পরীক্ষা করে কৈশিক শিরা ও কৈশক ধমনীর (Capillaries) মধ্যে রক্ত সঞ্চালন রহস্য উদ্ঘাটন করেন। ভ্রূণাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন।

লেউভেনহোয়েক ছিলেন হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট শহরে বস্ত্র-ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে তিনি স্ফটিক হতে বিভিন্ন শক্তির পরকলা তৈয়ারী করতেন এবং প্রায় দ্বিশতাধিক অনুবীক্ষণ-যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁর একটি অনুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা অদৃশ্য বস্তুকে প্রায় ১৬০ গুণ বর্ধিত আকারে দেখা যেত। নিজের দন্তের মধ্য হতে সামান্য ময়লা নিয়ে অনুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখতে সমর্থ হন। লন্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে। তাঁর আবিষ্কার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রধান কারণ।

সপ্তদশ শতকের পূর্বে রোগ-নিদানতত্ত্ব (Pathology) সম্বন্ধে চিকিৎসকদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। জিওভান্নি বাতিস্তা মরগাগ্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন আনে। মরগাগ্নি ১৬৮২ খৃঃ অব্দে ইতালীর ফোর্লি সহরে জন্মগ্রহণ করে ম্যালপিঘির শিষ্য আলবার্টিনি ও ভাল্‌সালভার অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ-কেন্দ্র নির্ণয় করতেন। উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি নিদানতাত্ত্বিক শারীরস্থান-শাস্ত্র (Pathological anatomy) নামে অভিহিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাবাসী অধ্যাপক কার্ল ফ্রাইহের ফন্‌ রোকীটানস্কী মরগাগ্নি প্রবর্তিত শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেছিলেন।

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্ত, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ত্ব (Comparative anatomy) ও অনুবীক্ষণশাস্ত্রের (Microscopy) উত্তোরোত্তর উন্নতি ঘটে। য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হেরমান্‌ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করতে আসতেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। তিনি ছাত্রদের রোগ ও মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে। ব্যোরহাভেএর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেখট্‌ ফন হালের ও ভিয়েনার গেরহার্ড ভান্‌ সুইটেন্‌ এর নাম পৃথিবীখ্যাত।।

ব্যোরহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্য দেশের চিকিৎসকগণের সুবিধার্থে যথা সত্বর জানতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলণ্ডে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রসব-ব্যবস্থা সরল করবার জন্য উদ্ভাবন করেন প্রসব-সাঁড়াশী (Obstetrical forceps)। বংশানুক্রমে তাঁরা উক্ত যন্ত্রের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন করে রেখেছিলেন। স্বার্থপর চেম্বারলেন বংশের শেষ চিকিৎসক ডাঃ হিউ চেম্বারলেন-এর মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) য়ুরোপের চিকিৎসকমণ্ডলী সাঁড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিস্টলি প্রমাণ করেন যে, প্রশ্বাসিত দূষিত বায়ু জীবন্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাখলে পুনরায় দোষমুক্ত হয়। আঁতোয়াঁ লাভোসিয়ে নামক ফরাসী রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, বায়ুর মধ্যস্থ অম্লজান বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে দগ্ধ হয়ে পরিণত হয় অঙ্গারাম্লজান বাষ্পে। ষ্টিফেন হালেস নামক ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ হন।

(fistula) রূপান্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমন্ট নামক এক মার্কিন চিকিৎসক উক্ত ভগন্দরের মধ্যদিয়ে পাকস্থলী হতে পাচকরস সংগ্রহ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বোমন্ট প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত রসে অম্ল ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে থেয়োডোর স্বোয়ান নামক জার্মান বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, পেপ্‌সিন। বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান ইভানোভিচ্‌ পাভ্‌লভ্‌ অস্ত্রোপচার দ্বারা কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর সৃষ্টি করে পাচকরস নিঃসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার ওপর নতুন গবেষণা করেন। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে লুইজি গ্যালভানি নামক বোলোনাবাসী বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে একটি ব্যাঙের স্নায়ুরজ্জুতে প্রাণোন্মেষ করতে সমর্থ হন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে পাভিয়া শহরে বৈজ্ঞানিক আলেসান্দ্রো ভোল্টা অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে মাংসপেশী সংকুচিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে ফরাসী শারীরবৃত্তজ্ঞ দ্যু বোয়া রেমোঁ প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে স্নায়ুর ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গ দ্বারা উন্মেষিত হয়। উক্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গ লিপিবন্ধের দ্বারা আজ হৃৎবিদ্যুৎ-লেখন

শবব্যবচ্ছেদরত ডঃ উইলিয়ম হান্টার

এই যুগে মানবের পাচনপ্রক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় পাদ্রী আবে স্পালান্‌জানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সঙ্কুচন ও সম্প্রসারণের দ্বারা খাদ্য মণ্ডে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়ম প্রাউট্‌ নামক ইংরাজ পাকস্থলীর অম্লের সন্ধান পেয়েছিলেন। আলেক্স সেন্ট মার্টিন নামক একটি কানাডীয় সৈন্যের উদরে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে ভগন্দরে

(Electro cardiography) ও "মস্তিষ্ক-বিদ্যুৎ-লেখন" (Electro encephalography) করা হয়।

এই শতকে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ও জন হান্টার নামক ভ্রাতৃদ্বয় খ্যাতি লাভ করেন। জন হান্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ছিলেন। উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডে চিকিৎসক। কালক্রমে লণ্ডনে ভাগ্যান্বেষণে এসে তিনি ডঃ জেমস ডগলাস নামক বিখ্যাত

শারীরস্থানবিদ-এর সংস্পর্শে আসেন। ডগলাসের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে গিয়ে শারীরস্থানশাস্ত্র পাঠ করেন ও লণ্ডনে ফিরে একটি শারীরস্থান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জন হান্টার (১৭২৮-১৭৯৩) উইলিয়মের নিকট শারীরস্থানতত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তিনি লণ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালের ডঃ চেসেল ডেন ও সেন্ট বার্থোলামিউ হাসপাতালের ডঃ পার্সিভ্যাল পট-এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে যক্ষ্মারোগগ্রস্থ হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। উইলিয়ম ধমনী-স্ফীতি (Aneurysm) রোগের চিকিৎসার এক নতুন সীবন-পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি লণ্ডনের লিস্টার স্কোয়ারে যে বৃহৎ নিদানতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (Pathological museum) স্থাপন করেছিলেন বর্তমানে সেই সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্যচিকিৎসক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জন অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন এবং দুঃসাহসিকতার জন্যই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্য তিনি এক যৌন-ব্যাধিগ্রস্থের ক্ষত থেকে পুঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টীকা দেন এবং উপদংশ রোগাক্রান্ত হন। উপদংশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ তাঁর

ডঃ জন হান্টার

হৃৎযন্ত্রের 'মুকুট ধমনী' (Coronary artery) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেই জন্য তিনি প্রায়ই হৃদ্‌শূলে (Angina pectoris) বেদনায় কষ্ট পেতেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে সেন্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। জন হান্টারের ন্যায় চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক আজও বিরল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে পরিগণিত হন।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খৃস্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যগণ প্যালেস্টাইন হতে বসন্ত রোগ য়ুরোপে আনয়ন করেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বসন্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করত। রাণী দ্বিতীয় মেরী বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন।

স্পেন থেকে আমেরিকা অভিযাত্রিগণ কর্তৃক বসন্ত রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসন্তের কারণ বা চিকিৎসা উদ্ভাবের সম্বন্ধেই চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে তুরস্কের ইংরাজ রাজদূতের পত্নী লেডি মেরী অর্টলি মণ্টেগু তাঁর এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, তুরস্কে বসন্তের প্রতিষেধের জন্য বসন্ত রোগীর গুটিকা হতে লসিকা নিয়ে সুস্থ বালক-বালিকার দেহে সূচিকা সাহায্যে টীকা দেওয়া হয়। টীকা দেওয়ার পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জ্বরভাব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুগণ রোগমুক্ত সুস্থদেহে জীবনযাপন করে। ইংলণ্ডে উক্ত প্রতিষেধক প্রথায় প্রচলনের জন্য লেডি মণ্টেগু এককভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট সাটন নামক এক ভদ্রলোক লেডি মেরীর আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এসেক্সের ইনগেটস্টোন শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টীকা দেন। মাত্র পাঁচজন ব্যক্তি উক্ত টীকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান। অপর সকলেই ভবিষ্যতে বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন মাথের নামক ব্যক্তি মার্কিন দেশে টীকা পদ্ধতির প্রবর্তক। মনুষ্যদেহের বসন্তগুটিকা লসিকায় বিষক্রিয়ার জন্য মানুষ আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অনুসন্ধান শুরু করল।

ইংলণ্ডের গ্লস্টারশায়ারবাসী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯—১৮২৩) বাল্যকালে শুনেছিলেন যে, গো-দেহের মারী-গুটিকাক্রান্তা গোয়ালিনীদের বসন্ত

টীকাদানরত ডঃ জেনার

রোগ হয় না। তাঁর পরম সুহৃৎ ডঃ জন হান্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জেনারকে গবেষণা করতে অনুরোধ করেন। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে জেনার গো-দেহের মারী-গুটিকা লসিকা দ্বারা একটি বালকের বাহুতে টীকা দেন। প্রায় দুমাস পরে, মানুষের বসন্ত গুটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টীকা দেওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে বালকটির বসন্ত হল না। টীকার এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর জেনার টীকা ব্যবস্থায় সহজ প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের সুনামে ঈর্ষান্বিত বেঞ্জামিন জেস্টি নামক একজন কৃষক লোক-সমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন যে, জেনার কর্তৃক টীকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি গো-বসন্তের লসিকা দ্বারা তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণকে টীকা দিয়েছেন। জনমত সংগ্রহ করে তিনি তাঁর দাবী পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাঁকে অর্থ ও সম্মান প্রদর্শন করে শান্ত করা হয়। জেনার পুরস্কারস্বরূপ রাজকোষ থেকে দশ সহস্র পাউণ্ড লাভ করেন এবং রুশিয়ার জার তাঁকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আঙুলের সাহায্যে আঘাত করে বুকে শব্দ করেন ও সর্বশেষে স্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করেন। রোগ-নির্ণয় শাস্ত্রের এ দুই অত্যাবশ্যক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের অবদান। লিওপোল্ড আউয়েনব্রুগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার স্পেনীয়

সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মদ্য ব্যবসায়ীরা পিপার বাইরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মদ্যের পরিমাণ বুঝতে পারে। তাঁর মনে হয় যে, অসুস্থ মানুষের বক্ষপিঞ্জর বা উদরের উপর আঘাত করলেও হয়ত আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। অনুমান প্রকৃতই সত্য। তাঁর উক্ত 'সংঘট্টবোধ' (Percussion) আজ রোগনির্ণয়-শাস্ত্রের এক অবশ্য-করণীয় ব্যবস্থা। স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার করেন এক ফরাসী চিকিৎসক-। নাম রেনে থিয়োফিল হিয়াসিন্তে লেনেক্। উক্ত দীর্ঘ নামধারী ছিলেন অতি জীর্ণ শীর্ণ। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে তিনি ব্রিটানীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন প্যারীর একোল দ্য মেডে-সিন-এ করভিসার্ত ও বেইলে-এর অধীনে। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে তিনি জর্নাল দ্য মেডেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৮১৬ খৃঃ অব্দে প্যারীর লোপিতাল নেকার-এর পরি-দর্শক-চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত দুটি শিশু একটি কাষ্ঠখন্ডের দুই প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্যের শব্দ শুনছে। লেনেকে-এর মনে হল হয়ত অনুরূপ উপায়ে রোগীর হৃদস্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাবে। এক অতি স্থূলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল-ভাবে রোগিণীর হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। উক্ত কাগজের নল হতেই উদ্ভূত হল বর্তমান চিকিৎসকের নিত্যসংগী স্টেথোস্কোপ।

অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র ডঃ ফ্রানৎস্ আন্তোন মেস্‌মের। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কল্পনা করতেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাসমূহ মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। প্রফেসর হেহ্‌ল নামক এক যেসুইট পুরোহিত মেস্‌মেরকে দেন কয়েকখন্ড লোহ-চুম্বক। মেস্‌মের দাবী করেন যে, তিনি এক হৃদরোগীর দেহে এ চুম্বক স্পর্শ দ্বারা আশাতীত ফললাভ করেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর ধারণা হল যে, তাঁর শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এবং এর ফলে তিনি চিকিৎসায় আরোও সক্ষম হবেন। ব্যারন হারেৎসাক নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক স্নায়ুবিক দৌর্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তিকে মেস্‌মের নিরাময় করেন। মেস্‌মেরকে ঐরূপ পাগলামি থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক-সংস্থার সভাপতি ব্যারন ফন্ স্টোর্ক। সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়ার পরিচারিকা মাদ্‌মোয়াজেল্ পারাদীস নামক মহিলার চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁর সংগে ভিয়েনা চিকিৎক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ। অপরাপর চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করেন যে, পার-দীস-এর চক্ষুর স্নায়ু দুটি পক্ষঘাত-দুষ্ট হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মেস্‌মের-এর চুম্বক-চিকিৎসায় মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। মেস্‌মের-এর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত চিকিৎসকগণ তাঁকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ভাগ্যান্বেষী মেস্‌মের প্যারীর অভিজাত পল্লী প্লেস ভেন-দোমে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ কর-লেন। তার চুম্বকী-চিকিৎসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেস্‌মেরকে তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা-ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মঁশিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্থ মেস্‌মের সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানেতের নিকট আবেদন করলেন। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট ষোড়শ লুই-এর অনুগ্রহে আরও কিছুকাল মেস্‌মেরের ধাপ্পাবাজি চলল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওয়ায় ১৭৮১ খৃঃ অব্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ করেন। আজও যাদুকরগণ হাত-পা নেড়ে যে মেস্‌মেরিসম-এর খেলা দেখান, তা মেসমের-এর নামের সাক্ষ্য বহন করে। মেস্‌মেরের শিষ্য কাউন্ট দ্য পীসেগুর মেস্‌মেরের ন্যায় চিকিৎসা করতেন। জেমস্ এসক্‌ডেইল নামক ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে মেসমেরের পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন।

ডঃ মেসমের ও তাঁর রোগীনিগণ

এই শতকে ফরাসী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ফিলিপে পিনেল। চিকিৎসা-বিদ্যাশিক্ষার পূর্বে তিনি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে ধর্মচর্চা ত্যাগ করে মঁপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনান্তে তিনি নিযুক্ত হন প্যারীর বিউতর বন্দীশালার চিকিৎসক। বিউতর বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধিগণের সংগে উন্মাদগণকেও বন্দী করে রাখা হত। দু বৎসর পর তিনি সালপেত্রিয়ে বন্দীশালায় কার্য গ্রহণ করেন। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু উন্মাদ অবস্থায় উক্ত বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। ঐ ঘটনায় মর্মাহত পিনেল উন্মাদের চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নেন। ফরাসী-দেশের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্মাদগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। পিনেল ঐরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বারম্বার করুণা ভিক্ষা করেন পিনলে। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী নেতা কুথ'র নিকট উন্মাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যর্পণের দাবী করেন। কুথ প্রথমে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পিনলে-এর সহিত সালপেত্রিয়ে বন্দীশালা পরিদর্শনে যান। সালপেত্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা ও অসহায় উন্মাদগণের পশুতুল্য জীবনের মান অভিভূত করল নির্মম বিপ্লবী কুথ-এর হৃদয়। এখন তিনি হলেন পিনেল-এর সমর্থক। পিনেল উন্মাদদের শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। তাঁর সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্মাদ আবার সুস্থ মানুষে পরিণত হল। পিনল বহুকাল ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর করুণাময় হৃদয়ের কথা আজও কেউ ভোলেনি।

(ক্রমশঃ)

জনি হ্যাজার্ড
রবিনয়

প্যারিসের পথে গুন্ডার হাত থেকে এক পাইলটকে বাঁচাবার সময় আবার দুজন বন্দুকধারী এসে হাজির হওয়ায় জনি এক নতুন বিপদের মুখে পড়ল ......
দয়া করে গোলমাল কোরোনা, দোস্তকে গাড়িতে তোল।

অর্লি এয়ারপোর্টে নিয়ে যাচ্ছ কেন.. এ ত মানুষ চুরি ? আমাদের বেচলেও কিছু পাবেনা.. বরং ব্যাগ দুটো নিয়ে ছেড়ে দাও !

বড় বেশী রস খেয়েছো বাপু, ভুলে যাচ্ছো যে দরকার তোমাদের "পয়সা নয়। নইলে লীডার তোমা-দের ভাড়া করেছে কেন?

বেসো-কে ওরা নিশ্চয়ই চেনে ... ওকেই বোধ হয় খুঁজছিল। কিন্তু আমায় ধরে টানাটানি কেন? অর্লিতে গেলে হয়ত সব জানা যাবে।

অর্লিতে...
লীডার' আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

TAXI
আর্লি এয়ার পোর্ট ড্রাইভার, জলদি!

এক মেক্সিকান পাইলট, দুটো পূব দেশের লোক... আর আমি!!! একেবারে আন্তর্জাতিক হাঙ্গামা!

এদিকে প্যারিসের অন্য এক পাড়ায় ...
ছ-ছেড়ে দাও বাওয়া... আরো অ-নেক ফুর্তি বাকী রয়ে গেল যে!
MOULIN ROUGE
TRÈS JOLIE
এই শেষ কজন! ড্রাইভারদের বলো জলদি এয়ার পোর্ট যেতে! প্লেন ছাড়তে দেরী হলে লীডার ক্ষেপে লাল হয়ে যাবে!
TAXI

4-19

এই ফুর্তির আড্ডায় এই সব বখাটে লোক-গুলোকে ছেড়ে দেওয়াই ভুল হয়েছে!
কিন্তু দলের মনোবল ঠিক রাখার জন্যে একান্ত দরকার ... যে অবস্থায় পরে গিয়ে পড়বে!
২য় পর্ব ২২-২- তারিখে দেখুন
ক্রমশঃ ....

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগের আমি নিয়মিত পাঠক। উক্ত বিভাগের মারফৎ কয়েকটি প্রশ্ন পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য পাঠাইলাম।

১। P, V, C রবার বস্তুটি কি?

২। উহা সাধারণত কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

৩। উহাতে কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?

৪। তাহাদের ঠিকানা কি?

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দাশ
বি, এস, স্কুল
মাকড়দহ, হাওড়া।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। 'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমার কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমি দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি। আশা করি, প্রশ্নগুলির জবাব পাঠক-বৃন্দের মধ্যে থেকেই 'অমৃত' মারফৎ জানতে পারবো।

(ক) মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন?

(খ) অমৃত নামের সার্থকতা কি?

শ্রীরথীনকুমার বিশ্বাস
প্রতাপবাবুর বাগান
বাঁকুড়া।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করছি। সহৃদয় পাঠক মহল থেকে সাড়া পেলে উপকৃত হবো। প্রশ্নটি হচ্ছে এই—'Posthumous' এই ইংরাজী শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কি? অনেকে মরণোত্তর-জাতক বলে থাকেন—ইহা কি ঠিক?'

শ্রীগৌরপদ দাশ
লিডু রেলওয়ে স্টেশন,
আসাম।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৬ই নভেম্বর ও ৪ঠা জানুয়ারীর 'অমৃতে'র "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীকুমকুম দে ও শ্রীস্বপন বসুর লাল রং সম্পর্কে আলোচনাগুলি পড়ে দেখলাম। শ্রীস্বপন বসু শ্রীকুমকুম দের উত্তরকে 'বিতর্কমূলক' বলায় বিতর্কের ক্ষেত্রটা আরও বেড়ে উঠেছে।

যে কোন রঙের আবেদন ভিন্ন মনের ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় রক্তের উপাদান বিশ্লেষণ সম্ভব, কিন্তু মনের নিরীক্ষায় তার আবেদনটিরই মূল্য বেশী। শ্রীকুমকুম দে লালের মধ্যে যে 'ভয়ঙ্করের সূচনা' অনুভব করেছেন, তাও যেমন সত্যি, লালের মধ্যে 'রোম্যাণ্টিকতা'র অনুভবও তেমনি কোন কোন মনের পক্ষে সম্ভব। তবে এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে হয় যে, লালের দিকে মানুষের সহজাত প্রবণতার মতো বড়ো সত্য খুব কমই আছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শিশুর কাছে লালের আকর্ষণটিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। তাই দেখতে পাই, লাল ফুল, লাল খেলনা, লাল কাপড় প্রভৃতির দিকেই প্রথমে তার চোখ যায়। এই আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ভালো লাগার মাঝখান থেকেই আসে। মনে করা অসম্ভব নয় যে, লাল রঙের উদ্দীপনা, মোহ আর তীব্রতাই এই ভালো লাগার মূলে। লাল রঙের এই সামগ্রিক মোহময় তীব্র উদ্দীপনা'র মধ্যে হয়তো শ্রীকুমকুম দে ও শ্রীবসু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 'ভয়ঙ্কর' ও 'রোম্যাণ্টিকতা'কে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু লাল রংটা কেবলমাত্র 'ভয়ঙ্কর' বা শুধুমাত্র 'রোম্যাণ্টিকতা'কে নিয়ে নয়। তাই এর মধ্যে 'ভয়ঙ্কর'কে খোঁজ করে শ্রীকুমকুম দে খুব একটা ভুল করেছেন বা 'রোমান্টিকতা'কে আবিষ্কার করে শ্রীবসু সেই ভুলকে সংশোধন করতে পেরেছেন—একথা বলা যায় না। আর ঐ দুটি দিক ছাড়াও লাল রং-এর আরও অনেক দিক আছে একথা প্রমাণ দেখালেও মারাত্মক দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হবে না। দু' একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার।

"বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়েটির মুখ লাল হয়ে ওঠে", এখানে লালের মধ্যে 'ভয়ঙ্কর' বা 'রোম্যাণ্টিকতা'র চেয়ে লজ্জার আভাসটিই অধিকতর প্রকট।

"আমার সামনে এলেই তার মুখটি রাঙা হয়ে ওঠে"—এখানে ঐ তিনটি উপাদানের চেয়ে অনুরাগেরই বেশী প্রকাশ,

"এই কথায় তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো"—এখানে ক্রোধের প্রকাশটিই মুখ্য। তাহ'লে লালের আবেদন যে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—বিভিন্ন মনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুভূতি নিয়ে আসে—এ সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত—শ্রীকুমকুম দের 'রক্তের সঙ্গে লাল রঙের সাযুজ্য আছে"—এই মন্তব্যটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীবসু বলেছেন—"রক্তের লাল হবার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।" অবশ্য এই কারণটি তিনি বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু মনের ক্ষেত্রে লাল রঙের সঙ্গে রক্তের সাদৃশ্যের কথাটি উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বরং এ দুয়ের সাযুজ্যের কথাটি বিচার করতে হলে শ্রীকুমকুম দের 'ভয়ঙ্কর' বিশেষণটিকেই সমর্থন করতে হয়।

প্রচুর রক্ত দেখলে হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন মানুষ মাত্রই বলতে বাধ্য হয়—'ওঃ কী ভয়ানক!' তেমনি একটি সুন্দরী খুব ফর্সা মেয়েকে টকটকে লাল পোশাকে সাজতে দেখলেও লোকে বলতে বাধ্য হয়—'ওঃ কী সাংঘাতিক,' প্রথম ক্ষেত্রে প্রচুর লাল রক্তের দৃশ্য আমাদের মনের গ্রহণ-ক্ষমতাকে সীমার বাইরে টেনে এনে যখন এক অসহ্য পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থিত করায়, তখন মনে হয় সে ভয়ঙ্কর, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফর্সা রঙের সঙ্গে টকটকে লালের 'ম্যাচ' করা রূপক এমন প্রখর শাণিত দীপ্তি দেয় যাতে মন রোম্যাণ্টিকতার সীমা পেরিয়ে এক অসহ্য অনুভূতির সম্মুখীন হয় আর তাই সে তখন বলে 'সাংঘাতিক'। কিন্তু দুটি ক্ষেত্র আলাদা হলেও তাদের সামগ্রিক লক্ষ্য সেই 'ভয়ঙ্কর'। এই সাযুজ্যকে অস্বীকার করতে গিয়ে শ্রীবসু বলেছেন—"লাল রং পরিণামে রক্ত হয় না।" কিন্তু তার উত্তরে বলা যায়—সব রক্ত কিন্তু 'পরিণামে' লালই হয়।

তৃতীয়ত—বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে লাল রঙের ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীবসু যে যুক্তিটি দেখিয়েছেন তা' আনুমানিক। ঐভাবের আনুমানিক আর একটি যুক্তিও আমরা দেখাতে পারি। লাল রং-এর ভয়ঙ্কর আকর্ষণের মধ্য দিয়ে মনকে সচকিত করার প্রবণতাই এর বিপদ-জ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার অন্যতম কারণ।

শেষে সিঁদুরের ব্যবহার সম্পর্কে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। লালের প্রতি সহজাত আকর্ষণ, রোম্যাণ্টিক অনুরাগ ও শাণিত শপথ সবই সীমন্তিনীর এক বিন্দু সিঁদুরের মধ্যে প্রকটিত। যে রংকে মানুষ জন্ম থেকেই ভালোবাসে, মিলনের প্রতীক হিসেবে তাকে ব্যবহার করে, অনুরাগের লোহিতাভাও তার মধ্যে প্রকাশ পায় আর রক্তের অক্ষরে লেখা আজীবন সত্য পালনের ভয়ঙ্কর অনুশাসনও তার মধ্যে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সিঁদুর ব্যবহারের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতির আলোচনা গবেষণাসাপেক্ষ, কিন্তু মানসিক অনুভূতির ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় সত্য বোধহয় আর নেই।

শক্তিপ্রসাদ পাণ্ডা,
৬ষ্ঠ বর্ষ বাংলা-সাহিত্য
আশুতোষ বিল্ডিং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর্বাশ্য পৃথক সে অনেক আগেই হ'য়ে গিয়েছিলো। বি, এ, পাশ করবার পরেই আইন পড়তে ঢাকায় এসেছিলো, এবং তার নিজের খরচ সে নিজেই চালাচ্ছিলো। সে আইন পড়ুক এটা ইচ্ছে ছিলো না মামা-মামীর। তাঁরা চেয়েছিলেন সে চাকরী খুঁজুক। কিন্তু শৈলেশ্বর যখন নিজের জেদ বজায় রেখে চলে গিয়েছিলো, বেশ কড়া রকমের কথা কাটাকাটি ক'রেই গিয়েছিলো। তার বাবার লাইফ ইনসিওরেন্সের এক হাজার টাকার খবর সে ছেলেবেলা থেকেই জানতো। খরচের জন্য তখন সেই টাকাটা দাবী করেছিলো সে। মামা দেননি। মামীমা জুড়ে গাল দিয়ে বলেছিলেন, দশ বছর না পুরতেই তো বাপ-মাকে খেয়ে মামার ঘাড় ভাঙতে এসেছিস। এই যে এতোদিন লিখলি পড়লি, খেলি এর পয়সা এলো কোথা থেকে শুনি। কতো হাজার টাকা বেরিয়ে গেল আর এখন এসেছিস সেই এক হাজার টাকার দাবী জানাতে। বেইমান আর কাকে বলে। লোকে কথায়ই বলে যম, জামাই, ভাগ্না তিন নয় আপনা।

এর পরে শৈলেশ্বর আর কথা না বলে চলে গিয়েছিলো। প্রথমে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলো, তারপর এক বাড়িতে থাকা খাওয়া আর সামান্য মাইনের বদলে একটি ছেলেকে পড়াবার কাজ পেয়ে গেল। তা বাদেও টিউসানি করতো সে, প্রত্যেকটি পয়সা হিসেব ক'রে খরচ করতো। এভাবেই তিন বছর ল' পড়লো, পাশ করলো এবং বেশ কিছু সঞ্চয় হাতে নিয়ে ফিরে এলো ভৈরব-গঞ্জে। মামা তখন উকিল ভাগ্নেকে একটু খাতির যত্ন করতে লাগলেন। মামীও ভালোমানুষ সাজলেন। কিছু-দিনের মধ্যেই তাদের ভালোবাসার বিনিময়ে ঘটি বাটি নিয়ে সে আলাদা হ'লো, আলাদা হ'য়েই মামলা করলো।

টিউসানির ভেলাটা সে তখুনি ডুবিয়ে দিলো না, সেই সময়ে বি, এ, পাশের সংখ্যা ঐ গঞ্জ শহরে খুব বেশী ছিলো না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ডাক সর্বদাই আসতো। আস্তে আস্তে প্র্যাকটিসও জমে উঠলো সেই সঙ্গে।

কিন্তু ওকালতিতে বসবার খরচ অনেক, শৈলেশ্বরের সামান্য টাকা দেখতে দেখতে শেষ হ'য়ে এলো, আর তারপরেই হঠাৎ শোনা গেল সে বিয়ে করছে।

আমার মাসী বললেন, 'খবর শুনেছিস?'

আমি বললাম, 'কী।'

'শৈল তো মস্ত মুরুব্বি বাগিয়েছে।'

আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মাসী ভেঙে বললেন, কথাটা।

'ও যদি উকিল না হয়, তবে আর কে হবে বল?'

'কেন বলো তো?'

'প্রথমেই তো এক প্যাঁচ কষে অত-গুলো টাকা আদায় ক'রে নিল মামার কাছ থেকে, এখন বাগাচ্ছে শ্বশুরের কাছ থেকে।'

'তার মানে পণ নিচ্ছে?'

'সে কি যেমন তেমন পণ নাকি! নগদে সাড়ে চার হাজার টাকা, গয়না তেত্রিশ ভরি সোনার, ওদিকে ঘড়ি চেন সাইকেল, এদিকে বর ভোজনের তামা কাঁসা পিতল পাথর—'

'সে কি!'

'কোথা থেকে এক বুড়ো-বুড়ি ধ'রে এনে খুড়ো-খুড়ী সাজিয়েছে; তাদের শিখণ্ডী ক'রে এই দর দাম চলছে মেয়ের বাপের সঙ্গে।'

'হ'তে পারে না।'

'হ'য়ে গেল, আর 'হ'তে পারে না। মেয়ের বাপ বড়লোক, তার উপর মানুষটি নাকি খুব সাদাসিদে। উকিল জামায়ের উপর এমনিতেই নজর পড়েছে তাঁর, তার উপরে শৈলেশ্বরের কটা রং। শুনেছি ভদ্রলোকের মেয়েটি নাকি কালো, আর কালো বলেই তাঁর খুব ফর্সা জামাইয়ের দিকে ঝোঁক। আর সেই সুযোগও খুব নিচ্ছে শৈল।

বন্ধুর বিষয়ে এ কথা শুনে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল আমার। ভাবতে ভালো লাগলো না শৈলেশ্বর এতো ছোটো হ'য়ে গেছে, এতো ব্যবসায়ী হ'য়েছে। এ যে রীতিমতো বর্বরতা।

ছিঃ! মানুষের একটা আদর্শও তো আছে!

আমি পরের দিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে হাজির হ'লেম বন্ধুগৃহে। 'আরে এসো এসো' অভ্যর্থনায় উদ্বেল হ'য়ে উঠলো শৈলেশ্বর

'হঠাৎ? কী মনে করে?'

'শুনলাম তুমি বিয়ে করছো?'

'তা হ'লে শুনেছ? ভালো। শুন্য ঘরে আর মন টিঁকছে না, বুঝলে?'

'শূন্য ঘর ভরতেই বিয়ে করছো, না কি শূন্য পকেট পূর্ণ করবার ইচ্ছেটাই বড়ো?'

'তা, যা মনে করো।'

'মনে করাকারির কিছু নেই, মেয়ের বাপের সঙ্গে ব্যবসাটা কতদূর চালাচ্ছ সেটা জানতেই এসেছি।'

'ভালো করেছ। এসো না দুই বন্ধু এক দড়িতেই ঝুলে পড়ি? ভদ্রলোকের দুটি মেয়েই বিয়ের যোগ্য। এটি বড়ো। বল তো ছোটটি তোমার জন্য চেষ্টা করি।'
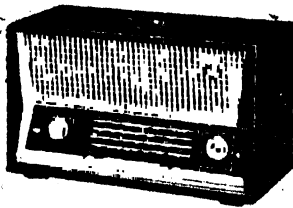
'তোমার চেষ্টার দৌড়টাই শোনা যাক আগে।'

'কী শুনতে চাও বলো।'

'ভদ্রলোকের গলায় গামছা দিয়ে কী কী আদায় করছো?'

মিটমিট ক'রে হাসলো শৈলেশ্বর, 'না হে না, গলায় গামছা দেবার দরকার হচ্ছে না, অমনিই দিচ্ছে। আর দিচ্ছে যদি নেবো না কেন?'

'কাকাটিকে ধ'রে এনেছ কোথা থেকে?'

'ধ'রে আনবো কেন, বাবা কাকা ছাড়া কোনো শিশু কখনো ধরাধামে এসেছে বলে শুনেছ নাকি?'

'এতোদিন কোথায় ছিলেন সব?'

'ছিলেন, ছিলেন। ঠিক দরকার মতো এসে হাজির হ'য়েছেন। কিন্তু ও সব কথা ছাড়ো, প্র্যাকটিস কেমন হচ্ছে বলো।'

'শেষে তুমি টাকা নিয়ে বিয়ে করবে? দরদাম ক'রে বৌ আনবে?' আমি আমার নিজের কথাতেই লেগে রইলাম। শৈলেশ্বর উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এসে বসলো, 'শোনো, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।'

'কী।'

'বিয়ের সব ঠিক, আমার সঙ্গে আমার ভাই হ'য়ে যেতে হবে।'

'ভাই কেন? বন্ধুতায় আটকাচ্ছে কোথায়?'

'একটু আটকাচ্ছে। তোমার মতো একটা মাসতুতো ভাই থাকা যে বরের একটা আলাদা কোয়ালিফিকেসন, তা তোমার মাথায় ঢুকবে না।' শৈলেশ্বর হাসলো 'বয়েস অল্প, মাসীর আদরে মানুষ, সংসারের হালচাল জান না তো কিছু? দেখ না, লক্ষ্মীছাড়া জীবনটাতে শ্রী আনবার জন্য কেমন কাকা-কাকীমাকে আনিয়ে ঘরের শ্রী ফিরিয়েছি, এখন মাসি আর মাসতুতো ভাই থাকলে পায়ে জোর বাড়ে। শ্বশুর যখন ঘটককে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'

'ও, ঘটক লাগিয়ে বিয়ে ঠিক করেছ? কোনো দিকেই ত্রুটি রাখনি?'

'তবেই বোঝো, এটুকুর জন্য আর বাকী থাকে কেন? বিদ্যাবুদ্ধির খবর তো হাতে কলমেই জানা যাবে, চেহারাটা দেখেও অপছন্দ হবার কথা নয়, কেবল তিনকুলে কেউ নেই এটাই তো একমাত্র খুঁত? তিনকুল যে মামা-মাসী-কাকা-কাকীতে ভরপুর সেটাই দেখিয়ে দিতে চাই।

'না, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তোমার কেবল ছলচাতুরী।'

'আরে, এর মধ্যে তুমি ছলচাতুরীটা দেখলে কোথায় শুনি?' কাকা কি আমার সত্যি কাকা নয়? মামা কি আমার সত্যি মামা নয়? আর তোমার মাসী যে আমারো সম্পর্কে মাসী হন তাও তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। আর তাদের ছেলেপুলেরা নিশ্চয়ই আমার ভাইবোন।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। শৈলেশ্বর আমার পিঠে হাত রাখলো। 'বলো, অস্বীকার করতে পার সে কথা? তুমি আমি বন্ধু তো বটেই কিন্তু আত্মীয়তা-সূত্রে ভাই-ও। বুঝলে?' গলার স্বরে সে ভালোবাসা ঢাললো. 'আমাকে ভুল বুঝো না টাটু, আমার মনের কথা আমি সব বলবো তোমাকে। এখন শুধু জেনে রাখ আত্মীয়স্বজন নেই শুধুমাত্র এইটুকুর জন্য এ বিয়েটা আমি ফসকাতে দিতে পারি না। অনেক কপালজোরে এমন একটা বিয়ে আমার ঠিক হ'য়েছে, শুধু কি টাকাকড়িই পাচ্ছি? গৃহলক্ষ্মী যিনি আসছেন তিনি সত্যিই লক্ষ্মী। লেখাপড়া জানে, স্বভাবের তুলনা নেই, আর দেখতে প্রকৃতই শ্রীমতী। বৌদিকে দেখে আমার পছন্দের তুমি নিন্দে করতে পারবে না।'

'মেয়েও দেখে এসেছ গিয়ে?'

'তা এসেছি।'

'তখন তো কই আমাকে জানাও নি।'

'আরে বাপু, যতো চশমখোরই হই, একটু চক্ষুলজ্জা তো আছে? তুমি যে আমার এই রাস্তা পছন্দ করবে না তা তো জানি? তাই সব ঠিক হবার আগে বলিনি কিছু। শোনো, টাকা আমার চাই, তা যে ক'রেই হোক। চারদিকে

আমার কেউ নেই, এ সংসারে কারো কাছ থেকে আমি কিছু পাইনি। নিজে নিজেই বেয়ে বেয়ে উপত্যকায় উঠতে হবে আমাকে। ওকালতিতে বসতে কতো টাকার দরকার তার কি তোমার ধারণা আছে কোনো? সংসারে কি কখনো চড়ে চড়ে বেড়িয়েছ! মাসীর বিত্ত ছিলো, পায়ে পা রেখে দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারী পাশ ক'রে এলে। কিন্তু টাকা কী জিনিস তা আমি প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করছি। ঈশ্বর আমাকে আশৈশব বঞ্চিত করেছেন, তাঁর সেই অভিশাপ আমি আমার পুরুষকারের জোরেই খণ্ডন করবো। আমি বড়োলোক হবো, আমি দশজনের একজন হ'য়ে মাথা তুলে দাঁড়াবো। আর তার জন্য—' শৈলেশ্বর থামলো। চুপ ক'রে থেকে বললো, 'এ তো আর চুরি জোচ্চুরির টাকা নয়। আমার নেই তাঁর আছে, তাই আমি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি। আর আজই না হয় তাঁর কেউ না কিন্তু তাঁর মেয়েকে বিয়ে করা মাত্রই তো একান্ত আপনজন। আমাকে দেবে না তো দেবে কাকে? এতে আমার বিবেকের উপর সত্যি কোনো আঘাত পড়ছে না টাটু। হ্যাঁ, রুচির কথাটা তুলতে পার বটে। তোমার মতো কৃতী আর ভাগ্যবান পুরুষের বেলাতেই ওসব খাটে, ওসব আমার জন্যে নয়। শোনো, যাঁর কাছ থেকে মুচড়ে নিংড়ে এখন এমন মরীয়া হ'য়ে নিচ্ছি, দুদিন পরে তাঁর মেয়েকে যত্ন দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, সুখ দিয়ে, তাঁর সব ঋণ আমি শোধ ক'রে দেবো। আমাকে খুব পছন্দ হ'য়েছে ভদ্রলোকের, বিনয়ের অবতার হ'য়ে খুব খুশী ক'রে দিয়েছি, যেটুকু খুঁতখুঁতুনি ঐ আত্মীয় নিয়ে। ঘটককে নাকি বলেছেন ছেলেটির সবই ভালো, তবে মা-বাপ-ভাই-বোন কেউ নেই সেটা একটু কেমন লাগছে। ঘটকটি তৎক্ষণাৎ উপস্থিতবুদ্ধি খাটিয়ে বলে এসেছে এটা আপনি বলছেন কি মজুমদারমশাই? এমন বিচক্ষণ ব্যক্তি হ'য়ে একথা কি আপনাকে মানায়? এই খুড়ো-খুড়ির প্রাণ এই ছেলে। ওদিকে মামা-মামীর চোখের মণি। দেশে জ্যাঠা আছে, জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা সব কলকাতাতে বড়ো বড়ো চাকরী করে। তাছাড়া ভৈরবগঞ্জের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তারই তো স্বয়ং পাত্রের মাসতুতো ভাই। এ'রা সব আপন ভাইবোনের অধিক। দায়দায়িত্ব নেই, অথচ স্নেহ-ভালোবাসা প্রচুর, সহায় হিসাবে কতো মূল্যবান।'

শৈলেশ্বর হাসলো, 'ঘটকটা আচ্ছা চালাক, বুঝলে? কিন্তু ঘটকের সে কথাগুলোকে সত্য প্রতিপন্ন না করতে পারলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় কে জানে। জান তো এসব কাজ লক্ষ কথায় পূর্ণ হয়। না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস কী? একবার যখন একটা খটকা ঢুকেইছে ভদ্রলোকের মাথায়, তখন সেটাকে উচ্ছেদ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর তার জন্য তোমাদের পাঁচজনের সাহায্য—'

'আমি যখন মনে মনে জানি এসব মিথ্যে কথা, তখন আমি কোনো রকমেই তোমাকে সাহায্য করবো না। তুমি কি প্রেমে পড়ে বিয়ে করছো? তুমি বিয়ে করছো লোভে পড়ে। স্বার্থের লোভ।'

এতদিন ছিলেন কোথায় সব?

শৈলেশ্বর হেসে বললো, 'কামিনী আর কাঞ্চন এ পিঠ ও পিঠ। যার লোভে পড়েই বিয়ে করি না কেন, লোভ লোভই।'

'না, ভালোবেসে বিয়ে করাকে লোভ বলে না।'

'কী বলে?'

'তার নাম নেই কিন্তু তার সঙ্গে লোভেরও সম্পর্ক নেই কোনো।'

'তার মানে ভালোবেসে বিয়ে করলে তুমি মিথ্যে কথা বলতে রাজী ছিলে?'

'প্রয়োজন হ'লে—অর্থাৎ যদি তোমার উপকার হ'তো, হয় তো বলতাম। কিন্তু এ জন্যে বলবো না।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে মিথ্যে বলতে বলছি না।'

'বন্ধুকে ভাই সাজানো মিথ্যে নয়? আর ঐ সব আত্মীয়স্বজন এনে ধোঁকা দেয়া—'

'দ্যাখো, টাটু, বুদ্ধি তোমার বরাবরই কম। কোনো জিনিসই তলিয়ে দেখতে শেখোনি, কেবল আদর্শবাদের বুলি চটকেই বয়েস বাড়ালে। এই কাকা কি আমার কাকা নন? দেশে কি আমার জ্যাঠতুতো জ্যাঠামশাই তাঁর সাত ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালী করছেন না? মামা-মামী কি আমার অলীক কল্পনা? বলো?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'তবে?' কাছে এগিয়ে বসলো শৈলেশ্বর, 'আর একথাটাও জেনে নাও, তোমার মাসী আমার মার দূরসম্পর্কের পিসতুতো বোন। এবার বলো তুমিও সেই সুবাদে আমার মাসতুতো ভাই কিনা। আর তার মধ্যে মিথ্যেটা তুমি কোথায় দেখলে সেটাও বল।'

ক্ষুব্ধস্বরে বললুম, 'এদের সঙ্গে কোনোদিন তোমার কোনো সম্পর্ক ছিলো না, বলতে গেলে সবাই তোমার পর, সবাই তোমার অচেনা।'

'আরে বাপু, আত্মীয় আবার কবে আপন হয় শুনি? প্রথম জীবনে মা-বাপ

ভাইবোন আর শেষ জীবনে বৌ আর ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া জগতে আর সবই পর, সবই অচেনা। ধর, তুমি তো সম্পর্কে সত্যিই আমার আত্মীয় কিন্তু তোমার সংগে কি আত্মীয় বলে এতো ভাব? বন্ধু হিসেবেই আমরা চিরদিন পরিচিত। তোমার মাসী যে আমারো মাসী সে খবর তো এই বড়ো বয়সে জেনেছি। কে জানে আগে জানলে হয় তো বন্ধুতাই হ'তো না।'

৬

শৈলেশ্বরের যুক্তিতর্কের সংগে আমি সেদিন পাল্লা দিয়ে জবাব দিতে পারিনি। অসন্তুষ্ট হৃদয়ে বাড়ি ফিরে মনটা ভার হ'য়ে ছিলো। তারপর সত্যিই যখন সে বর সেজে বিয়ে করতে গেল, সকলের কাছে অম্লান বদনে ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিল, তখনো চুপ করেই থাকতে হ'লো। বলবার ছিলোই বা কী।

কখনো বোধহয় পূর্ব বাংলায় যাওনি, জলের দেশ। শাড়ির পাড়ের মতো খাল বিল দিয়ে ঘেরা সব গ্রাম। জল আমরা ভালোবাসি, জল আমাদের প্রাণ। এখনো নদী দেখলে বুকের মধ্যে স্মৃতির বেদনা উথলে ওঠে। বিশেষত ভৈরবগঞ্জ। জল আর ডাঙা গলায় গলায়।

ভৈরবগঞ্জ থেকে শৈলেশ্বরের শ্বশুরবাড়ি লাবণ্যপুর, পুরো দেড় দিনের পথ। ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। ভরা বর্ষা ছিলো তখন। শ্রাবণ মাস, কদিন থেকে অনবরত বৃষ্টি পড়ছিলো। তারই মধ্যে রওনা হওয়া গেল। সেই থৈ থৈ বৃষ্টিতে পাছে কোনো বিঘ্ন ঘটে সেজন্য চারদিন হাতে রেখে রওনা হ'তে হ'য়েছিলো। সব মিলিয়ে আমরা পঞ্চাশ জন বরযাত্রী ছিলাম সংগে। বরের জন্য সাজানো পিনিস নৌকোয় আমরা অন্তরংগ বন্ধু এবং সমবয়সীরা সংগে ছিলাম, আর গুরু-স্থানীয়রা আলাদা আলাদা সাতখানা ঘাসি নৌকোয়। এখন ভাবি ভদ্রলোকের ঘাড় ভাঙতে এতো বরযাত্রী ও জুটিয়ে-ছিলো কেমন ক'রে। বলেছিলো যেমন আত্মীয় দেখতে চায়, দেখুক।

গ্রামের বিয়ে শহরের মতো নয় যে এলো বসলো খেলো চলে গেল। এখানে আসে বসে খায় শোয় থাকে। পঞ্চাশ জনের এই ব্যবস্থা বড়ো সহজ নয়।

বিয়ে উপলক্ষ্যে আমার মাসীকেও শৈলেশ্বর তার নিজের মাসী হিসেবে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলো। সেধে ভজে মামা-মামীকে ও নিয়ে এসেছিলো। তার উপর সেই কাকা-কাকী আর তাঁদের আধ ডজন ছেলেমেয়ে—সব মিলিয়ে শৈলেশ্বরের ছোটো বাড়িখানা বেশ কোলাহলমুখর হ'য়ে উঠেছিলো। আহ্লাদে উৎসবে, নিয়মে অনুষ্ঠানে কোথাও এতোটুকু নির্জন নিঃসংগ লাগছিলো না। কন্যাপক্ষরা বর নিতে এসে ভরাপুর সংসারের শ্রী দেখে খুশীই হয়েছিলেন। আদর যত্নের আতিশয্যও কম ছিলো না। শৈলেশ্বরের শ্বশুরের একমাত্র ছেলে মল্লিকার মামা, ভুপেন তখন মাত্র উনিশ কুড়ি বছরের সুশ্রী সুবেশ এক তরুণ যুবক মাত্র। আই, এস, সি পাশ ক'রে ডাক্তারিতে ভর্তি হ'য়েছে, হয় তো সেই কারণেই অতি দ্রুত আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'লো। আর আমারও তাকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল। যাবার পথটুকু তার সংগসুখে আমার সময় একবারের জন্যও একঘেয়ে লাগলো না।

ধলেশ্বরী উত্তাল থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা পাড়ি দিতে পারলাম এবং চারদিন হাতে রাখা সময়কে ব্যর্থ ক'রে ঠিক মতো দেড়দিনেই পৌঁছে গেলাম। তার মানে বিয়ের তিন রাত আগেই আমাদের দলবল নিয়ে নৌকোগুলো মজুমদারবাড়ির বকুল-তলার ঘাটে গিয়ে ভিড়লো।

আজো আমার সেই দিনটির কথা পরিষ্কার স্পষ্ট ক'রে মনে আছে। খুব সকালে গিয়ে পৌঁচেছিলাম। খালের ধার ভর্তি কেয়া আর গন্ধরাজের বন। বাতাস ভারি হ'য়ে ছিলো সেই বর্ষার জল পাওয়া ফুটন্ত ফুলের ঘন গন্ধে, একটু চিকচিকে রোদ উঠেছিলো, দুটো শালিখ পরস্পরের ডানা খুঁটছিলো সেই রোদে বসে বসে। আমি বলে উঠেছিলাম, 'শৈলেশ্বর দুই শালিখ।'

শৈলেশ্বর বলেছিলো 'অর্থটা কি জানো?'
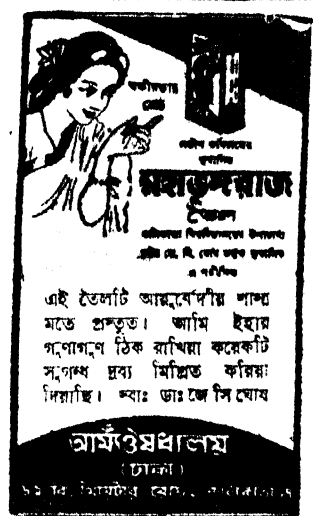
'কী।'

'রথ দেখা এবং কলা বেচা। বরযাত্রী এবং বর। আমি মনে মনে তোমার জন্যও ভাবছি কিনা? শুভ লক্ষণ তো দেখলে।'

আমি বললাম, 'ইডিয়েট।'

সেদিনের কথা মনে আছে আমার, সব মনে আছে। এই মুহূর্তে যদি কেউ তার পরীক্ষা নেয়, আমি অনুকোটি চৌষট্টি বর্ণনা এক দুই ক'রে লিখে দিতে পারি। শৈলেশ্বরের শ্বশুর, শাশুড়ি, তাঁদের ছেলেমেয়ে বাড়িঘর, সব আমার দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হ'য়ে মনে আছে। আমার যুমন্ত যৌবনের প্রথম বাতিটি সেই বাড়িতেই জ্বলে উঠেছিলো।

—ক্রমশঃ

প্রেমে, অপ্রেমে, পৃথিবীর প্রণয়ী রবার্ট ফ্রস্ট

কণাদ চৌধুরী

পৃথিবীর সেই বৃদ্ধ একনিষ্ঠ প্রণয়ী র্ট লি ফ্রস্ট গত ২৯শে জানুয়ারীতে লোকগমন করেছেন। অথচ এই রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকেই ইয়েল বিদ্যালয় বোলিংগেন পুরস্কার দিয়ে কে জীবিত আমেরিকান কবিদের মধ্যে ষ্ঠ ঘোষণা করেছিলেন। 'জীবিত' মেরিকান কবির জীবনের পাতাটি যে রস্কার ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই কারে ঝরে যাবে কবি নিজে কি নতেন? নইলে কি করে লিখলেন :

ie same leaves over and
 over again
iey fall from giving shade
 above....
efore the leaves can mount
 again
› fill the trees with another
 shade
iey must go down past things
 coming up
iey must go down dark
 decayed....

নিত্য পাতাঝরা জীবনে কখনো ন্তু থামতে চাননি কবি, বারবার জেকে শুনিয়েছেন :

nd miles to go before I sleep
nd miles to go before I sleep..

স্তবিক, ৮৮ বছরের দীর্ঘ পথই টেছেন ফ্রস্ট। এই পথশ্রমের রস্কারো পেয়েছেন অপরিমিত। লিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন চারবার, য়েট্রি সোসাইটির স্বর্ণপদক পেয়েছেন, ইব্রেরী অফ কংগ্রেসের কবিতা বিষয়ক পদেষ্টার সম্মানিত পদেও অধিষ্ঠিত হলেন, এ ছাড়াও নানা দেশের বিশ্ব-দ্যালয়গুলি প্রদত্ত উপাধির উপঢৌকন ছিলই।

রবার্ট ফ্রস্ট জন্মেছিলেন সান-ফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্ণিয়াতে। জন্ম-তারিখ ২৬শে মার্চ, ১৮৭৪ সাল। এগারো বছর বয়সেই তাঁর পিতার মৃত্যু য়। ফ্রস্টের মা ছিলেন স্কচ মহিলা। কাব্যচর্চায় তাঁর প্রবল আসক্তি ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর এক ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে ইসাবেল নিউ ইংল্যান্ডে শ্বশুরের ভিটায় চলে আসেন। ফ্রস্টরা আট পুরুষ ধরে নিউ ইংল্যান্ডেরই বাসিন্দা ছিলেন। এগারো বছর বয়সে প্রথম ফ্রস্ট নিউ ইংল্যান্ডের পিতৃভূমিতে পদার্পণ করেন। উত্তরকালে, তাঁর কবি-জীবনের সমস্ত ফুলগুলিকে ফ্রস্ট এই নিউ ইংল্যান্ডের মাটিতেই ফুটিয়েছেন। আমেরিকার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত নিউ ইংল্যান্ডের প্রকৃতি ইতিহাস, ঐতিহ্য ফ্রস্টের কাব্যধারার মৌল উৎস। পারিবারিক কুটীর, শ্যাওলা, গ্রামে প্রথম তুষারপাত, নবীন বার্চ বৃক্ষ, লাগাম ছুটে ঘোড়া, লজ্জাবতী পাহাড়ী মেয়ে প্রভৃতি নিউ ইংল্যান্ড অঞ্চলের যাবতীয় অনির্বচনীয় দৃশ্যাদি ফ্রস্টের চিত্রকল্পের প্রিয় বিষয়। নিউ ইংল্যান্ডের এমারসেন, হথর্ন, থোরো এবং ডকিনসন এরই যেন উত্তরসাধনা করেছেন ফ্রস্ট তাঁর কাব্য চর্চায়।

স্কুলের পাঠ শেষ করে ফ্রস্ট কিছু-কাল ডর্টমাউথ কলেজে ঢুকেছিলেন, কিন্তু কোনোরকম ডিগ্রী না নিয়েই কলেজ ছেড়ে দিলেন। কলেজ ছাড়ার পর নানান পেশার পথে আনাগোনা করে-ছিলেন তিনি। কাপড়ের কলে ববিন-বয়ের কাজ করেছেন, মুচীর কাজ করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন এবং সাংবাদিকও ছিলেন কিছুকাল। কলেজে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন ফ্রস্ট, কিন্তু সম্পাদকীয় অনীহার দরুণ এই সময়ে তাঁর কবিতা খুব কমই প্রকাশিত হত। ১৮৯৪ সালে তাঁর কবিতা "মাই বাটারফ্লাই" প্রথম প্রকাশিত হয় 'নিউইয়র্ক ইন্ডিপেন্ডেন্ট' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকায়। প্রথম

॥ * বিকেলের বনস্থলীতে থেমে ॥

কার এই বনভূমি
হয়ত বা জানি।
বন যার তার ঘর কিন্তু লোকালয়ে।
থেমে গিয়ে আমি যে তার তুষারে নিখোঁজ
বনের রূপ দেখছি
সে তা জানবে না কখনো।

আমার ঘোড়াটা হয়ত অবাক ভাবছে
কাছাকাছি খামার-টামার কিছু নেই
তবু থামলাম কেন!

এ পারে বন ও পারে বরফকঠিন হ্রদ
ঠিক মধ্যিখানে থেমে যাওয়া
বৎসরের বিষণ্ণতম এই দিনান্তে!

তার সাজ রেকাবের ঝুমঝুমি ঝাঁকিয়ে
সে জানতে চাইলে বুঝিবা
আমার ভুল হল নাকি?
সেই ঝুম্ ঝুম্, আর শন্ শন্ হাওয়া,
ঝর ঝর তুলো তুষারের আঁশ
এ-ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই।

এই মনোরম মলিন বনানী আমাকে টানছে
তবু কত যে কথা দেওয়া আছে—সব রাখতে হবে

যতদূরে যাবার, ততদূরে না গেলেই নয়।
মাইলের পর মাইল, মাইলের পর মাইল।
তবে ঘুম।।

* স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোয়ি ইভনিং
অনুবাদ : বিমল রায়চৌধুরী

কবিতা প্রকাশের দিনকে উদ্‌যাপিত করার জন্যে কবি নিজের খরচে দুটি কবিতার একটি পুস্তিকা ছাপেন, নাম দেন "টোআইলাইট"। প্রথম "সংস্করণে" মাত্র দুটো কপিই ছাপা হয়েছিল—প্রথমটি গ্রন্থকারের কপি এবং দ্বিতীয়টি ভাবী স্ত্রী এলিনর হোয়াইট এর জন্যে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এলিনরের সঙ্গে কবির বিবাহ হয়, এবং তাঁর জীবনের ৪৩টি বছর যাবতীয় প্রেরণার উৎস ছিলেন কবিপত্নী এলিনর। ১৯৩৮ সালে পত্নীবিয়োগ ঘটে কবির। বিয়ের দু'বছর পরে আবার হার্ভার্ড কলেজে ঢুকে-ছিলেন ফ্রস্ট, কিন্তু এবারেও পড়া শেষ হবার আগেই ছেড়ে দিলেন কলেজ। ঠাকুরদা নিউ হ্যাম্পশায়ারে একটা খামার কিনেছিলেন। সেই খামার দেখাশোনার ভার নিলেন ফ্রস্ট। লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য লাভের সৌভাগ্য কিন্তু কিছুতেই হচ্ছিল না তাঁর। ১৯০৬ সালে একবার নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুরপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন কবি। রোগের, দারিদ্র্যের এবং হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে যেতে যেতে কবিতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজলেন ফ্রস্ট। এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত জীবনটাকেই পণ রাখলেন কাব্য-চর্চার জন্যে। খামার বাড়ি বেচে দিয়ে ১৯১২ সালে সপরিবারে পাড়ি দিলেন ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে আসার পরই ফ্রস্ট সৌভাগ্যের সন্ধান পেলেন। ইংল্যান্ডে তাঁর প্রথম লিরিক কবিতার

॥ * জানালার জানালার ধারের গাছ ॥

জানালার ধারে গাছ, ও আমার গাছ
রজনীতে মোর বরোকো যদিও নামে
তোমার আমার মাঝে কোনোদিন যেন
কোনো যবনিকা আড়াল দিতে না থামে।

ফিকে স্বপ্নের মাথা তুলে মাটি থেকে
দাঁড়ালে উপরে নভতল মেঘময়
লক্ষ জিহ্বা সরবে কহিছে কথা
লকলি গভীর এ-কথা সত্য নয়।

গাছ, আমি তোর দেখেছি যাতনা জ্বালা
বিছানায় একা বেদনায় যত জর্জর
তুমি ত দেখেছো বাতনায় ঢাকা পথে
মৃত্যু মাত্র বাকী থাকে, আমি চলি।

আমদের দ্যুটি মাথা এক সাথে রেখে
জানিনা ভাগ্য দেবী কি খেলায় রত
তুমি ত রয়েছো মগ্ন বাহির নিয়ে
হিসেবে আমার পড়েছে ভিতর যত।

* ট্রি এ্যাট মাই উইনডো ॥

অনুবাদ : বিমল রায়চৌধুরী

বই 'এ বয়েজ উইল' (১৯১৩) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করল। পরের বছরই ইংল্যান্ডেই প্রকাশিত হল "নর্থ অফ বোস্টন"। এই কাব্য গ্রন্থের সাফল্যের ঢেউ আটলান্টিক পেরিয়ে আমেরিকাতে পৌঁছে প্রবল তরঙ্গ তুলেছিল। বেস্ট-সেলারের তালিকায় "নর্থ অফ বোস্টন" এর নাম উঠল। সাফল্যের জয়রথে ফিরে এলেন ফ্রস্ট আমেরিকায়। স্বদেশে ফিরে অনুরাগী জনতার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শহর থেকে দূরে নিউ হ্যাম্পশায়ারের ফ্রাংকোনিয়াতে একটা ছোট খামার কিনে লুকোতে চাইলেন নিজেকে। কিন্তু ততদিন 'নিউ পোয়েট্রি'র বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সম্মানের প্রথম সারিতে বসিয়ে ফেলেছেন এবং মার্কিনী কবিতার আসরে চল্লিশ বছরের রবার্ট ফ্রস্ট তখন নতুন প্রতিভা। প্রথম দুটো কাব্য গ্রন্থের পর ফ্রস্টের নতুন কাব্য-গ্রন্থগুলি বেশ সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হতে থাকে, 'মাউন্টেন ইন্টারভ্যাল' (১৯১৬); নিউ হ্যাম্পশায়ার (১৯২৩); 'ওয়েস্ট রানিং ব্রুক' (১৯২৮); 'কালেকটেড পোয়েমস' (১৯৩০ এবং ১৯৩৯); 'এ ফারদার রেঞ্জ' (১৯৩৬); 'এ উইটনেস ট্রি' (১৯৪২); 'এ মাস্ক অফ রিজন' (১৯৪৫); 'এ স্টিপল বুশ' (১৯৪৭); 'এ মাস্ক অফ মার্সি' (১৯৪৭); 'কমপ্লিট পোয়েমস' (১৯৪৯) এবং 'ইন দি ক্লিয়ারিং (১৯৬২)।

রবার্ট ফ্রস্ট মূলত গীতিধর্মী কবি। লিরিকের আঙ্গিকে তাঁর প্রায় অধিকাংশ কবিতাই আঞ্চলিক। কিন্তু অন্যান্য 'প্যাস্টোরাল' কবির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তাঁর কবিতায় ইতস্ততঃ ছড়ানো প্রকৃতি এবং আঞ্চলিক বিষয়গুলি তাদের বহিরঙ্গের উর্ধ্বে প্রতীকের রূপ নেয়। কিন্তু এই প্রতীকগুলি কবির একান্ত অভিজ্ঞতারই স্মারক। ফ্রস্ট ব্যক্তিমানস সমস্ত চিত্রকল্পকে দেখতেন অভিজ্ঞতার চশমায়। অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর মৌল অভিজ্ঞান। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এ বয়েজ উইল'-এর কবিতাগুলির চরিত্র লক্ষণে গীতিধর্মীতা ছিল মুখ্য বৈশিষ্ট্য; পরের সংকলন 'নর্থ অফ বোস্টন'-এর কবিতাসমূহে নাটকের আবেগ সঞ্চালিত করেছিলেন ফ্রস্ট। পরবর্তী গ্রন্থ 'মাউন্টেন ইন্টারভ্যাল'-এ দুই আঙ্গিকের কবিতারই সাযুজ্য ঘটেছিল কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরশপাথরের স্পর্শে। এই গ্রন্থে মেণ্ডিং ওয়াল' কবিতার প্রতিবেশী প্রাচীন প্রথার শেকলে আবদ্ধ হয়ে সমসাময়িক সত্যকেই স্বীকার করছে :

'Good fences make good neighbours.'

কবি নিজেও কখনো অনুভূত সত্যের বাইরে গিয়ে প্রাচীর ভাঙ্গার চেষ্টা করেননি। আঞ্চলিকতার সঙ্গে প্রতীকের আত্মীয়তার উদাহরণ ফ্রস্টের কবিতাবলীতে অজস্র। 'বার্চেস' কবিতার সেই নিঃসঙ্গ বালকের পৃথিবী থেকে ক্ষণিক পলায়ন তাকে আবার পৃথিবীর পদপ্রান্তেই এনে ফেলেছে। 'স্টপিং বাই উডস অন এ স্নোয়ি ইভনিং' অন্ধকার বনস্থলী স্তব্ধ যাত্রিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে অনেক, অনেক দূরে আরো তাকে যেতে হবে। রবার্ট ফ্রস্ট কিন্তু কখনই মিস্টিক হননি। প্রকৃতির এক প্রতীকীকরণ সত্ত্বেও মানুষ এবং প্রকৃতিকে তিনি সর্বদাই আলাদা রেখেছিলেন। 'নিউ হ্যাম্পশায়ার' এবং 'ওয়েস্ট রানিং ব্রুক' কাব্যগ্রন্থে ফ্রস্ট দর্শনের দর্পণে তাঁর সাধের নিউ ইংল্যান্ডকে দেখেছেন। তবে দর্শনের গভীরে গেলেও সাংকেতিকতা বা গীতিধর্মীতাকে ত্যাগ করেননি কবি কখনো। তাই দার্শনিক কবিতা হয়েও 'স্প্রিং পুলস'-এর সুরে কানে লেগে থাকে অনেকক্ষণ 'সোলজার' সনেটটি হৃদয়কে আপ্লুত করে। কবির দার্শনিক অভীপ্সা সময়সাময়িক কাল দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরের দিকে সমস্যামূলক হয়ে উঠেছিল। 'এ ফারদার রেঞ্জে' শ্রমিকদের কথা লিখেছেন কবি, "এ উইটনেস ট্রি' রাজনীতির হাওয়ায় আন্দোলিত, 'এ মাস্ক অফ রিজন' এবং 'এ মাস্ক অফ মার্সি'তে কবি বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেছেন।

রবার্ট ফ্রস্টকে কয়েক বছর আগে তাঁর প্রিয় বই সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি দুটি বইয়ের নাম করেছিলেন 'রবিনসন ক্রুশো' এবং থোরোর 'ওয়াল্ডেন'। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

Robinson Crusoe is never quite out of my mind. I never tire of being shown how the limited can make sung in the lifnitless. Walden has something of the same fascination. Crusoe was cast away. Thorean was self-cast away. Both found themselves sufficient. No prose writer has ever been more fortunate in subject than these two."

॥ * যে পথে হয়নি যাওয়া ॥

হলদে বনে দুদিকে দুটি পথ গিয়েছে
দুঃখ এই একা দু-পথে যেতে পারিনে
কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি।
যতদূর চোখ যায়, একটিকে পরখ করছি
পথটা কতটা বেঁকে কোথায় গেল।

তারপর দ্বিতীয় পথে চোখ।
হয় ত দ্বিতীয়টিই বেশী ভাল।
চললেই যেন জঙ্গলগুলো পরিষ্কার হবে
যেন এ পথে চললেই
এ পথও অবিকল আগেরটির মত।

যদিও প্রভাতকিরণে দুটি পথে একই আলো
পাতায় পাতায় পদচিহ্নের কোনো কলংক
নেই

প্রথম পথে না হয় অন্য দিন যাবো
কোনো অন্য দিন।
এক পথ যায় অন্য পথে
জানিনে ফেরা হবে কিনা।
কালের পর কাটবে কাল
ঠাঁই বদলাবে
অনুশোচনায় নিঃশ্বাস ফেলে
হয়ত শোনাবো কাউকে :
কোনো বনস্থলীতে একদিন দেখলাম
দুটি পথ দুদিকে বেঁকে গেছে
আমি বেছে নিয়েছিলাম একটি—
যাতে পায়ের চিহ্ন কম।
সেই থেকে কেমন জানি সব বদলে গেল।
সব।

* দি রোড নট টেকেন ॥

অনুবাদ : বিমল রায়চৌধুরী

ফ্রস্ট নিজেও তাঁর কবিতায় সীমিত মানুষের কীর্তি খুঁজে বেড়িয়েছেন অসীমের মধ্যে। কিন্তু 'অসীম' ফ্রস্টের কাছে কখনোই অমোঘ ছিল না। সাহিত্যের ব্যাপারে কখনই তিনি চিরকালের দরবারকে মানেন নি। কবিতা স্মৃতিতে থাকলেই যে সেটি মহৎ কবিতা হবে এই ধারণার বিরোধী ছিলেন ফ্রস্ট। কবিতা পাঠকালীন যদি পাঠকের মনে হয় যে, এ কবিতা ভোলা শক্ত তাহলেই কবিতার কর্তব্য শেষ। পাঠকমনে তাৎক্ষণিক "ইম্মর্টাল উন্ড" সৃষ্টি করতে পারলেই সাহিত্যের ছুটি।

মার্কিনী কাব্য জগৎ যখন রোমান্টিক ভাবালুতায় দিশাহারা, 'নিউ পোয়েট্রি'র সন্ধানে যখন তাবৎ বুদ্ধিজীবিকুল ব্যস্ত, ঠিক সেই শুভ লগ্নে আমেরিকার কাব্য জগতে নতুন হাওয়া এনেছিলেন ফ্রস্ট। সাধারণ ভাষায়, অম্লান রসবোধে আমেরিকাকে এক নতুন পৃথিবী উপহার দিয়েছিলেন। রবার্ট ফ্রস্ট নিজে ছিলেন সেই পৃথিবীর বিবাদমান প্রণয়ী :

I had a lover's quarrel with the world.

নর্তকী

জয়কুমার রায়

সের রাইন নদীর বালুকাবেলায় ন্দরী নর্তকীর রক্তরাঙা দেহ পড়্‌লো।

পতি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাইফেলটা—মুখ ইস্পাত—ক্রূর খলো মিলোয়ানি চোখ থেকে।

মাণী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সন্ধি হ'লে কী হবে—এই সন্ধিরই হঠাৎ একরাতে বিনা রক্তপাতে একেবারে জার্মাণীর পায়ের রাষ্ট্রনেতা বন্দী! এম্‌নি কায়দা।

কোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অংশটাও হবে—দিতেই হবে: না হ'লে আগুন।

চ্ছা নাও, নাও—তাই নাও।

ন্তিকামী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সায় র সংগ্রামের হাত থেকে যদি বাঁচে।

ন্তু মড়কের খিদের মতো রাষ্ট্রের তখন জার্মাণীর। চেকোশ্লোভা- কর্ণধারকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে সে ভালবেসে খাইয়েদাইয়ে সম্পূর্ণ মর্পণের দলিলটা সাম্‌নে মেলে কড়া গলায় বলা হোলো ঃ সই করো—শীগ্‌গির—না হ'লে চেকরাষ্ট্রে প্রাণের স্পন্দন থাকবে না এতটুকু।

চোখরাঙানি জবরদস্তি আর অত্যা- চারে চেকরাষ্ট্রের স্বাধীনতা তারই কর্ণ- ধারের হাত দিয়ে ইয়োরোপের মানচিত্র থেকে মুছে নেওয়া হোলো।

পোল্যান্ড ভীরু মেষবাচ্চার মতো কাঁপছে থর থর ক'রে। ফ্রান্স আর ইংলণ্ড বললে ঃ কথা দিচ্ছি বাঁচাবো তোমাকে।

পরোয়া নেই। জার্মাণী লাল চোখ আরো লাল ক'রে ব'ললে পোল্যাণ্ডকে ঃ ছেড়ে দাও ডান্‌জিগ্‌ বন্দর আর পোলিশ করিডর্‌।

ঃ দেবো না।

ঃ দেবে না? ঃ প্রথম কামানের গোলা ছুট্‌লো পোল্যাণ্ডের দিকে, উনিশ শ' ঊনচল্লিশ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর।

আর উপায় কী? তেশ্‌রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের রাজার গলা বেতারে জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এই মরণযজ্ঞের বাজ্‌না বাজিয়ে দিলে।

দিন ভালো জার্মাণীর। বিজয় কেতনে দখিণা বাতাস লেগেছে। সাতদিনে পোলিশ করিডর আর আটাশদিনে ওয়ারশ শেষ।

ব্লিৎসক্রিগ!

চল্লিশ সালের ন-অই এপ্রিল ডেনমার্ককে বললে: চুপ ক'রে শুয়ে থাকো, তোমার বুকের উপর দিয়ে বুট প'রে যাবো, ন'ড়্তে পাবে না।

রাজা মাথা নিচু ক'রে ব'ললে: জি হুজুর।

: লাগলেও ন'ড়তে পাবে না, খবরদার: সউান পেরিয়ে গিয়েও প'ড়লো একেবারে নরওয়ের ঘাড়ের উপর।

রাজা ব'ললে: মচ্‌কাবো না, ভাঙ্গ ভেঙ্‌বো—আও।

ইংলণ্ড ফ্রান্স বললে: সাবাস, মন্দ বটে!—আমরা আছি সঙ্গে।

কিন্তু বিগোড় পাশা! পয়লা মে তারিখে ব্রিটিশের ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে গেলো দস্তুরমতো নাস্তানাবুদ হ'য়ে।

গতিক সুবিধে নয় দেখে ইংলণ্ডে মন্ত্রী বদল হ'য়ে গেলো—মন্ত্রিসভা বদল হ'য়ে গেলো। শান্তিমন্ত্রীর বদলে জঙ্গীমন্ত্রী।

দশই মে মনে রাখ্‌বার মতো দিন। ঐদিন পৃথিবী দেখ্‌তে পেলে জার্মাণীর ভেল্কি খেলা।

একেবারে একসঙ্গে লুক্সেমবার্গ হল্যান্ড আর বেলজিয়ামের মাথায় সে মারলে বাড়ী।

লুক্সেমবার্গের গ্রান্ডডাচেস দে-লম্বা একদম প্যারিসে। তিনদিন ঠেক্‌না দিয়ে হল্যান্ডের রাণী দেশ ছেড়ে একদম হাওয়া—লন্ডন। আর বেলজিয়ামের রাজা দু'চারটে কামান দেগেই হাল্লাক হ'য়ে ব'ল্‌লে: বেলজিয়াম তো তোমারই।

এ যেন শুধু ছিঁড়ে-যাওয়া মালা থেকে ছড়িয়ে-পড়া পুঁতিগুলো একটা একটা কুড়িয়ে নিচ্ছে।

আর কি। এবার ফ্রান্স—যুদ্ধের আগুনের সবটা হল্কা এসে প'ড়্‌লো একেবারে ফ্রান্সের উপর।

জার্মাণী এসে ব'সেছে ওৎ পেতে ওর সদর দরজার গোড়ায়, আর খিড়কির কপাটে ধাক্কা দিতে লাগলো ইটালী।

তুচ্ছ প'রোয়া নেই। বাপমা-মরা মেয়ে তো নয় ফ্রান্স, আছে কড়া তদারকে, কে তাকে হরণ করে। হ'তে পারে সে চলানি—আমুদে—তেরছা চাউনি চোখে—চলায় চলায় নাচন বাজে পায়ে; দরকার হ'লে কালনাগিনীও 'বারিয়ে পড়ে ফোঁস ক'রে—ছোবল মেরে নীল ক'রে দেয় দেহ। তুমি আমি নয়, ইতিহাস ব'লেছে—বিশ্বজন শুনেছে।

তাছাড়া বড় রকমের তো এখনো কিছু ঘটেনি—ঘটবে কিনা সন্দেহ।

সুতরাং ইট্‌ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি মেরী। যখন হবে তখন হবে পাঞ্জা কষাকষি, এখন কী।

সীমান্ত বরাবর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ছাউনি ফেলে আছে সৈন্যরা। তৈরী হ'য়ে আছে। ফূর্তি ক'রেই আছে।

না হ'লে ফূর্তি করার সময় কোথায়? ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, হাঁট্‌তে হাঁটতে খায়, খেতে খেতে ছোটে, শ্রম ক'র্‌তে ক'র্‌তে বিশ্রাম করে। ওরা এক চোখে কাঁদে আরেক চোখে হাসে, ঘড়ির পর পর দুটো টিক্‌ টিক্‌-এর একটাতে প্রেম করে পরেরটাতে মরে। সময় কোথায়?

রাইন নদীর ধারে ছাউনি প'ড়েছে।

সারাদিনের কাজকর্ম চ'লেছে ঘড়ি ধ'রে কাঁটায় কাঁটায়। একটুকু বেচাল হবার জো নেই। নদীর ধারে আছে পাহারাওলা, দেখ্‌ছে কেউ কোথা দিয়ে পেরিয়ে আস্‌ছে যাচ্ছে কিনা। টহলদারী উড়ো-জাহাজগুলো থেকে থেকে চক্কর খাচ্ছে আকাশে, অবস্থার একটু হেরফের হ'লেই অম্‌নি জানিয়ে দেবে বেতারে। রাতের বেলা সন্ধানী আলোর মুখগুলো যেন রূপকথার খোক্কসের চোখ, ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ ক'রে ঘুর্‌ছে এদিকে ওদিকে, দেখ্‌ছে কোথাও কোনো শিকার আছে কিনা—কখনো বা অন্ধকারের গলাধাক্কা দিতে দিতে নদীর পাড় ধ'রে ধ'রে লম্বা ছুট্‌, কখনো আকাশের বুকে গেঁথে যাচ্ছে লম্বাচওড়া ঝক্‌ঝকে বল্লমের ফলার মতো।

এরই মধ্যে গানও হ'চ্ছে নাচও হ'চ্ছে, বাজনা হ'চ্ছে মদ খাওয়াও হ'চ্ছে, চোখ ঘুরিয়ে এক-এক নজর দেখে নেওয়াও হ'চ্ছে কোথাও থেকে কোনো মেয়েছেলে আস্‌ছে কিনা।

মেয়েছেলে? এমন বদ্‌খদ্‌ জায়গায়? যেখানে কিনা প্রাণ নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে লোফালুফি লেগে যেতে পারে।

হ্যাঁ, আছে বৈকি। সিষ্টার ক্যানটিনের ওয়েটাররা আছে, হাসপাতালের নার্সরা আছে, উইমেন্‌স্‌ অক্সিলিয়ারি টেরিটোরিয়াল কোর্সের সৈন্যরা আছে, সিগন্যালাররা আছে, পাচকরা আছে, সুইপাররা আছে, এয়ার সার্ভিসের কর্মীরা আছে—এমনি কত কত।

এম্‌নি নানা বিভাগে নানা ছুতোয় এদের পাঠাতে হয় রাখতে হয়। কাজের জন্যে যত নাহোক—আরো বিশেষ দরকারে—মানে, না হ'লে পুরুষ-সৈন্যরা থাকে কেমন ক'রে? ঘরবাড়ী ছেড়ে সংসার ছেড়ে কোথায় তেপান্তরের মাঠে মাসের পর মাস বছরের পর বছর প'ড়ে থাকে বেচারীরা।

এ-দিকটা উপেক্ষা কর্‌লে ওদের রুখে কার সাধ্য। আইন শৃঙ্খলা যাবে বানচাল হ'য়ে, বাহিনী যাবে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে। নীতির দোহাই দিয়ে মানুষের আদিম জৈবী ক্ষুধাকে এখানে অস্বীকার ক'রলে কী বিষম কাণ্ডকারখানাটাই না ঘটে যাবে।

এসব সরকারী ব্যবস্থা। এছাড়া দেশ থেকে লোকালয় থেকে ফলউলীরা মাঝে মাঝে আসে ফল বেচতে, ফেরীউলীরা টুকিটাকি মনিহারী জিনিষ নিয়ে আসে ফিরি ক'রতে, নাচউলীরা আসে নাচ দেখাতে, ঢঙউলীরা আসে ঢঙ্‌ দেখাতে, ম্যাজিকউলীরা আসে চুট্‌কি-চাট্‌কা ম্যাজিক দেখাতে, কখনো আবার বাজার থেকে দুষ্টু দুষ্টু ব্যবসায়ী মেয়েরা আসে তাদের কাজ গুছোতে। সৈন্যরা এদের কাউকে অল্পে ছাড়ে না। জিনিষ কেনে, নাচ দ্যাখে, ঢঙ্‌ দ্যাখে, ম্যাজিক দ্যাখে, রাতে ... আট্‌কে রেখে দেয়। এরাও অল্পে ... পেতে চায় না। না পেলেই লাভ। ... দামী দামী জিনিষ উপহার পেয়ে যায়—অনেক সময় পেয়ে যায় হঠাৎ ভাব্‌তে-না-পারা দাম। দলিত-দ্রাক্ষা সর্বাঙ্গের দাম। খুশী চিত্তের দাম।

জায়গাটা সীমান্ত থেকে অনেকখানি দূরে। যেখানে লড়াই চল্‌বে তার অনেক পিছনে। এটা সেনাপতির আস্তানা।

বাইরে কী নিয়ে যেন সৈন্যদের মধ্যে একটা হল্লা হ'চ্ছে।

সেনাপতি টেবিলের উপর ছড়ানো একটা মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলো, জিজ্ঞেস করলে: এত হল্লা কিসের?

সেপাই বাইরে থেকে ঘুরে এসে ব'ল্‌লে: একটা নাচউলী।

মুখ না তুলেই সেনাপতি ব'ল্‌লে: ভিতরে আস্‌তে বলো।

খানিক পরে সেপাই নাচউলীকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে এলো, সেনাপতি তাকাচ্ছে না দেখে সেপাই ব'ললে: নাচউলী এসেছে।

: চলে যেতে বলো: সেনাপতি মুখই তুল্‌লে না।

: চলে যাবো, নাচ দেখবেন না?

গলা শুনে সেনাপতি চোখ তুল্‌লে। সে-চোখ আর তাড়াতাড়ি নাম্‌লো না।

: তুমি নাচউলী?

: হ্যাঁ, ভারী মিষ্টি হাস্‌লো মেয়েটি: চলে যাবো? ডেকে পাঠালেন, নাচ দেখবেন না?

: সেনাপতি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর বল্‌লে: কেমন নাচতে পারো, ভালো?

: আমি ভালো ব'ল্‌লে কী ভালো হ'বে? তুমি ভালো ব'ল্‌লেই ভালো। আমি তো ব'ল্‌ছি খারাপ নাচ্‌তে পেরে

কী এতবড় ফরাসী সেনাপতির কাছে আসতে পারি?

পীতাভা ছাড়িয়েছে অথচ ঘন সবুজে পৌঁছয়নি এমন বয়সী পাতার মতো চলচল ক'রছে মেয়েটি।

: কোথা থেকে আসছ তুমি? দেখে খুব ক্লান্ত মনে হ'চ্ছে তোমায়?

: মনে হ'চ্ছে? হবে। আমাদের তো আর বিশ্রাম নেই, তোমরা যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করো শান্তির সময় বিশ্রাম করো, কিন্তু আমরা সব সময় অন্নের জন্যে যুদ্ধ ক'রছি, ক্লান্তি মুখ থেকে মুছবে কেমন ক'রে?

: ও, তুমি খুব গরীব বুঝি?

: না হ'লে কী এমনি নাচতে বেরিয়েছি সেনাপতি? তাও আবার যুদ্ধক্ষেত্রে? আমরা জানি এসব জায়গায় এলে তোমরা একটু বেশী দয়া করো। তাই।

: তোমার আর কেউ নেই বুঝি? তুমি একা?

কথা না ব'লে সামনে উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। তারপর হঠাৎ তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

: ও কিছু নয়, মাঝে মাঝে এমনি কাঁদি, ওরই মধ্যেই আবার হাসি—নাচ, আবার সুযোগ পেলেই কাঁদি। তুমি এখনি হুকুম ক'রলেই কাঁদতে কাঁদতেই ভালো নাচ দেখিয়ে দেবো।

: কেন, তোমার মনে বুঝি কোনো দুঃখ আছে?

: কোনটা দুঃখ কোনটা সুখ কী ক'রে বুঝি বলো দেখি?

: কারো জন্যে মন কেমন করে বুঝি?

নিরুত্তর। শুধু অল্প হাসলো সে। ম্লান হাসি। সে-হাসি যেন অনেক দুঃখের কয়লা বালি পেরিয়ে চুঁইয়ে আসছে।

মুখে হাসি চোখে জল। সেনাপতির চোখে ঘোর লাগলো, ব'ললেঃ তুমি এত গরীব, এত কষ্ট পাও, এত ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম ক'রে নাচ দেখিয়ে বেড়াও, তবু রূপে তো তোমার ঝাপ পড়েনি একটুও? সুন্দর দেহটি—তুমি এত সুন্দর হ'লে কী ক'রে?

লাল হ'য়ে গেলো লজ্জায় মেয়েটির মুখ, ব'ললে: ধন্যবাদ। কিন্তু চ'লে যেতে ব'ললে, সত্যিই কী আমি চ'লে যাবো?

: না। তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হ'চ্ছে, না?

: হ'চ্ছে একটু।

: ব'সবে?

: নাচ দেখাবো না?

: যখন দেখতে চাইবো দেখিও।

তোমাকে নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খাবে?

: কখন নাচ দেখবে?

: একটু ভেবে সেনাপতি ব'ললে :

: অনেক রাতে, সকলের সামনে তোমার নাচ দেখবো না।

: অনেক রাতে! আমাকে কী রাতে আটকে রেখে দেবে না কী? যেতে দেবে না?

: তুমি সুন্দরী মেয়ে, রাতে যাবে কোথায়? বিপদ হবে না?

: আমি নাচ দেখাবো, পয়সা নেবো চলে যাবো, রাতে এখানে থাকবো কোথায়? সেনাদের আড্ডা, ছিঃ।

: এটা আমার আড্ডা—সলিটারি-সেইফ্—সেনাপতির চোখে শিকারীর দৃষ্টি ফুটেছে।

নাচউলী চুপ।

চেঁচিয়ে সেপাইকে ডেকে সেনাপতি ব'ললে : একে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও—ভালো ক'রে খেতে দাও।

মেয়েদের সঙ্গে এত কথা সেনাদের সহ্যে সয় না। তাদের কাছে ওদের প্রয়োজন দু'পাঁচ মিনিটের। বর্তমানকেই ওরা বোঝে, ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করে না। বিলম্বিত লয়ের রাগিণীতে ওদের অরুচি। ওরা শুরু করায় যেমন ব্যস্ত শেষ করায় তেমনি তৎপর। রসিয়ে রসিয়ে খাবার রসিক ওরা নয়, ওরা ঢক্ ক'রে গিলে নেবার বান্দা।

কিন্তু সেনাপতির এ কেমনতর ধারা আজ! আরো কতদিন দেখেছে সেপাই, কিন্তু এমন ধারা তো দেখেনি।

সেনাপতি আজ যেন দেশঘরের চেঙে-পাওয়া লোক!

নাচউলীকে ঘরের পথটা দেখিয়ে দিলে সেপাই।

অনেক রাত।

যেখানে যেখানে পাহারা দেবার পাহারাওলারা পাহারা দিচ্ছে। সন্ধানী আলোকগুলো থেকে থেকে লম্বা দৌড় মেরে ধাঁধিয়ে আসছে মাঠের পর মাঠ, নদীর এপার ওপার—এমনকি লোকালয়ের কোল পর্যন্ত। তদারকী উড়োজাহাজগুলো মাঝে মাঝে চক্কর দিয়ে আসছে মাথার উপর মাইলের পর মাইল জুড়ে। আবহাওয়াটা শান্ত। শত্রুদের কর্মতৎপরতার সংবাদ এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। বাইরে দু'একটা তাঁবুতে মাঝে মাঝে হঠাৎ-হাসির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। হাসাবার মতো কাউকে হয়ত পেয়েছে ওরা তাঁবুতে।

: আর খানিকটা।

: না, বেশি আমার অভ্যেস নেই।

: এই শেষ চুমুক।

: না, আমি বেহুঁস হ'তে চাই না।

: লাস্ট ড্রপ্ : ব'লেই জড়িয়ে ধ'রে সেনাপতি জোর ক'রে মেয়েটির মুখে ঢেলে দিলে গ্লাসটা।

ঢোক্ গিলে মুখটা মুছে মেয়েটি ব'ললে : এত খাচ্ছো, আক্রমণ হ'লে সুস্থ মাথায় সৈন্য পরিচালনা ক'রতে হবে তো?

সেনাপতি হাসলে, ব'ললে : যতই খাই, বেহোল হবো না কোনোদিন। লিকার প্রুফ ষ্টম্যাক্। তাছাড়া আক্রমণ হবে না এখন, আমরা যে দারুণ তৈরী তা ওরা জানে। দেখছো না ম্যাপে?

: কী? : ব'লেই নাচউলী সেনাপতির বাহুর উপর দিয়ে টেবিলের উপর উপুড় হ'য়ে ঝুঁকে পড়লো।

তার উত্তপ্ত বক্ষ-যৌবন-স্পর্শে বুঁদ হ'য়ে সেনাপতি ব'লতে লাগলো : এই দ্যাখো এই যে সবুজ পতাকাওলা পিনগুলো যেখানে যেখানে আটকানো আছে, ওগুলো আমাদের ঘাঁটি। এই এখানে আছে পঁচাশি হাজার সৈন্য, ওখানে এক লক্ষ, আর ঐখানে দেড় লক্ষ, এমনি সব—আর এই দাগগুলো সব জাহাজের ঘাঁটি, ঐগুলো বিমানের—

একমনে দেখছে নাচউলী। তারপর এক সময়ে বড় বড় চোখ তুলে সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে : এত!

দেখা না গেলেও ছাতিটা ফুললো সেনাপতির, বললে : এই শেষ নয়—দেখছো ওই সুইজারল্যান্ড থেকে লুক্সেমবার্গ হ'য়ে বেলজিয়ামের সীমান্ত ধ'রে নর্থ সি পর্যন্ত সমস্ত সীমান্ত জুড়ে একটা লাল রেখা?

: কী ওটা!

: ম্যাজিনো লাইন। সমস্ত সীমান্ত জুড়ে ফ্রান্সকে বুক দিয়ে আগলাচ্ছে এই দুর্গ।

: তা না হয় হোলো, কিন্তু সে কী এমন দুর্গ যে এই এতখানি সীমান্তের কোথাও দিয়ে শত্রু আসতে পারবে না? : অবাক চোখে নাচউলী ব'ললো।

গালে তার একটা টোকা দিয়ে সেনাপতি ব'ললে : বোকা মেয়ে, তুমি কিছু জানো না। কত বড় দুর্গ শুনবে? মাটির নীচেকার এই ছ'তলা রিইনফোর্সড কংক্রীটের বাড়ীটিকে তৈরী ক'রতে পনের হাজার লোক ছ'বছর অনবরত পরিশ্রম ক'রেছে। মাটি খুঁড়তে হ'য়েছে এর জন্য কমপক্ষে সোয়া লক্ষ টন, পনের লক্ষ টন কংক্রীট আর পঞ্চাশ হাজার টন ইস্পাত লেগেছে। খরচ হয়েছে কত জানো? আটশ কোটি টাকা।

: আ-ট্-শ কোটি টাকা! : এমনি অবাক হ'য়ে গেছে নাচউলী তার চোখের পাতা প'ড়ছে না।

তার অবাক্-মুখের দিকে চেয়ে সেনাপতি হো হো ক'রে হেসে উঠলো, ব'ললে : মাটির উপরে কিছু দেখতে পাবে না, শুধু চোখে পড়বে দু'চারটে টিলা, যা-কিছু সব ভিতরে, আর টিলার মধ্যে আছে দূরবীন হাতে প্রহরীর দল।

: তা না হয় হোলো, কিন্তু এক জায়গায় ঐ একটা দুর্গ সমস্ত সীমান্ত আগলাবে কী ক'রে? আচ্ছা দাঁড়াও : ব'লে নাচউলী আস্তে আস্তে গ্লাসটাতে

আবার মদ ভর্তি ক'রে সেনাপতির সাম্‌নে তুলে ধর্‌লে।

ঃ বাঃ, দ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড্ গার্ল ঃ ব'লেই সেনাপতি তাকে প্রায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে পাত্রটা হাতে নিয়ে এক চুমুকে শেষ ক'রে ফেল্‌লে।

নাচউলী নিজেকে সরিয়ে নিলে না। তেম্‌নি আকর্ষিত অবস্থায় কোলের উপর আধশোয়া হ'য়ে গল্প শোনবার জন্যে সেনাপতির মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

সেনাপতি ব'ল্‌লে ঃ একটা দুর্গ তো নয়, ছোট ছোট অনেক দুর্গ গায়ে গায়ে হ'য়েছে। দশ ফিট্ পর্যন্ত দেয়াল আছে দুর্গে জানো?

ঃ বরাবর!

ঃ যেখানে যেখানে বেশী আক্রমণ হবার সম্ভাবনা সেখানে সেখানেই আছে। অবশ্য কমও আছে অনেক জায়গায়। সেডানের কাছে তো একেবারেই কম, কোনো রকম একটা ঠেক্‌না-প্রাচীর দিয়ে রাখা হ'য়েছে সেখানে, কেননা, আর্ডেন্‌স্‌এর জঙ্গল আছে তো সেখানে। সেটাই তো সাংঘাতিক!

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে নাচউলী ব'ল্‌লে ঃ যাক্ গে, ওসব রাখো। নাচ ব'লে আর ফূর্তি ক'রেই কাটালে, আমার নাচ দেখ্‌বে না? যে জন্যে এলাম?

ঃ দেখবো।

ঃ কখন আর দেখ্‌বে, রাত ফুরিয়ে এলো যে।

ঃ ভোর রাতে দেখ্‌বো।

ঃ ভোর রাতে তো আমি চলে যাবো।

ঃ না।

ঃ না গেলে তো দেখ্‌ছি নিস্তার নেই, সুন্দরী মেয়ে আমি, বিপদে প'ড়বো ব'লে তো রাতে যেতে দিলে না, এখানে দেখ্‌ছি আমার খুব নিরাপদে কাট্‌লো। এত বড় সেনাপতির কাছে না হ'লে কী এমন নিরাপত্তা মেলে? ঃ খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো নাচউলী।

ঃ তাই তো বলছি যেও না, যুদ্ধ তো লাগছে না, ভয় কী?

ঃ থেকে কী হবে?

ঃ মেজাজটা সরিফ্ থাক্‌বে আমার, যুদ্ধের সময় মাথা খুল্‌বে।

ঃ তার জন্যে আট্‌কাবে না, এখানে অনেকেই আছে, ডেকে নিও।

ঃ তারা তোমার মত কেউ নয়। এমন খুবসুরত চেহারা, এমন কথাবার্তা, এমন ঢঙ্— তোমাকে দেখ্‌লে জানো? আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে।

নাচউলী চমকে সেনাপতির মুখের দিকে তাকালে। তাকিয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে একসময়ে তার চোখদুটো করুণ হ'য়ে এলো, মৃদু গলায় ব'ল্‌লো ঃ কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে সেনাপতি, আমার যে না গেলে নয়।

ঃ ও, তোমার মনে যে দুঃখ আছে, সেই যে কার জন্যে যেন মন কেমন করে ব'লছিলে না?

উদাস দৃষ্টিতে সাম্‌নে তাকিয়ে নাচউলী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো, তারপর একসময়ে টপ্‌টপ্ ক'রে দু'ফোঁটা চোখের জল আবার গড়িয়ে পড়লো তার গালের উপর দিয়ে।

ঃ ও কী! আবার কাঁদছো? বলো না ব্যাপার কী, আমি হয়ত কিছু তোমার সাহায্য ক'রতে পারি।

ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো নাচউলী, ব'ললে ঃ তুমি যা ভাব্‌ছো তা নয় সেনাপতি, প্রণয়ী আমার কেউ নেই, কেবল আছে একটি প্রণয়িনী। ইচ্ছা ক'রলেই তুমি পারো সাহায্য ক'রতে, কিন্তু তুমি কী আমাকে দয়া ক'রবে?

গ্লাসটাতে আবার মদ ভর্তি করে......

বরাবর র'য়েছে দাঁড়িয়ে, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আছে যোগাযোগ রেললাইন দিয়ে টেলিফোন দিয়ে। দরকারী জিনিষ-পত্র সব নিয়ে রাখা হ'য়েছে সেখানে, এমনকি তৈরীও হ'চ্ছে।

ঃ তা না হয় হোলো, কিন্তু কামান দাগলেই তো কেল্লার প্রাচীর ফতে।

ঃ বলো কী? কত বড় কামান আছে শত্রুদের? সবচেয়ে বড় কামান যে দেয়াল ভাঙতে পারবে না সেই রকম দেয়াল দিয়ে তৈরী দুর্গ, বাইরে প্রাচীর তৈরী ক'রে আগে কামান দেগে ও বোমা মেরে দেখা দেখ্‌বে না? ওসব তোমাদের ব্যাপার তোমরাই বোঝো, আমি নাচউলী, শুধু নাচতে জানি।

ঃ আর কিছু জানো না?

ঃ আবার কী জান্‌বো? ঃ চোখে চমৎকার কটাক্ষ।

সেনাপতি হঠাৎ তাকে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ঃ এ কী!

ঃ চুপ!

ঃ সারা রাত তো কেবল বাজে কথা

: বলো, উপায় থাকলে আলবৎ ক'রবো।

: দ্যাখো, আমার আর কেউ নেই, ছিলো শুধু একটি বোন, আমার চেয়ে বয়স অল্প আর শতগুণে সুন্দরী, থাকতো ব্রুসেল্সে, অপেরায় অভিনয় ক'রতো, মাঝে মাঝে খবরাখবর পেতাম তার, তারপর জানো তো, শত্রুরা—যারা আজ এই দেশের দরজায় ঝেঁপে ব'সে আছে—একরাতে কেমন ক'রে বেলজিয়াম গিলে নিলে, তারপর থেকে তার আর কোনো খবরই পাইনি, সে কী আর আছে? সে এত সুন্দরী যে—পশুরা কী তাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে? : বেশ জোরে ফুঁপিয়ে উঠলো নাচউলী।

: তাই নাকি? তোমার চেয়ে সুন্দরী?

: ঠিক বিশ্বাস হবে না, কিন্তু যদি জানতে পারতাম সে আছে, খবর পেতাম, তাহ'লে তাকে এইখানেই নিয়ে চ'লে আসতাম।

: খবর নাও, চিঠি লেখো।

: চিঠি যেতে দেবে কেন সেনাপতি? যুদ্ধের সময়—

: দেবে- তবে বলা যায় না খোয়াও যেতে পারে।

: তাহ'লে?

: এক কাজ কর, সে ভালোবাসে এমন কিছু ছোটখাট জিনিষ পাঠিয়ে দাও, সন্দেহেরও কারণ নেই, তুচ্ছ জিনিষ খোয়া যাবারও ভয় নেই, যদি সে সই ক'রে নেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে সে আছে।

: তুমি ঠিক ব'লেছ সেনাপতি, বহুদিন আগে সে আমার কাছে একটি রুমাল চেয়েছিলো, তা আর দেওয়া হয়নি, সেটা কেনা হ'য়ে আমার কাছেই প'ড়ে আছে, সেইটা পাঠিয়ে দিই।

: খুশী।

: সেটা ঠিকই যাবে তো সেনাপতি? নিশ্চয় সে পাবে? বলো দয়া ক'রে তুমি সেটা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে? : নাচউলী পা জড়িয়ে ধরতে গেলো।

: আমি এখান থেকে বার ক'রে দেবার ব্যবস্থা ক'রবো, তারপর ওখানে পৌঁছলে যখন ওরা দেখবে একটা রুমাল ছাড়া কিছু নয় তখন তার পেতে দেরী হবে না।

: তা হ'লে কথা দিচ্ছি কাল আমি যাবো না সেনাপতি, তোমার কাছে থাকবো, রাতে নাচ দেখবো, তোমাকে খুশী করবার জন্যে তুমি যা বলবে, তাই করবো, তোমার গোলাম হ'য়ে থাকবো, যেতে হয় পরশু যাবো। দয়া ক'রে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিও সেনাপতি।

: আচ্ছা রুমালটা তুমি ঠিক করো।

সেনাপতি বেরিয়ে গেলো।

সকাল হ'য়েছিলো। সেনাপতি তখনো কাজে বসেনি। অনেকখানি দেরী হ'য়ে গেছে। নাচউলী একেবারে ছুটতে ছুটতে সেনাপতির কাছে এসে দাঁড়ালো, ছোট্ট একটা কৌটা খুলে ছোট্ট একটি রুমাল বার ক'রে তার হাতে দিয়ে ব'ললে : সেনাপতি রুমাল, এই যে রুমাল, কই পাঠিয়ে দাও।

রাতের পোষাক প'রেই ছুটে বেরিয়ে এসেছে নাচউলী, অঙ্গের খুব কম অংশ ঢাকা পড়েছে তাতে, যেন অর্ধপাগল। রাত্রির যথেচ্ছ উপভোগের গ্লানির তিলক ললাটে প'রেও এমন চক্ষুষ্মান প্রভাতের কাছে তার লজ্জা পাবার যেন অবকাশ নেই।

বাকী রাতটুকু রুমালটা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রতেই তার কেটে গেছে, বদলাবার সময় কোথায়?

অক্লান্ত লোলুপ সেনাপতির দৃষ্টি তার যৌবনের মধুচক্রগুলিকে আবার একবার লেহন ক'রে গেলো।

ছোট্ট একটি রুমাল—সাদা, মাঝখানে একটা গোল বৃত্তের ভিতর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাপার কাজে সবুজ লতাপাতার জঙ্গল।

রুমালটা ভাঁজ করে ভিতরে ঢুকিয়ে কোটের উপরটায় তাকিয়ে দেখতে দেখতে বললে সেনাপতি ঃ তোমার বোনের নাম বুঝি বার্থা, আর তোমার নাম বুঝি কোরিনা?.

ঘাড় হেলিয়ে নাচউলী ব'ললে ঃ হুঁ।

ঃ বাঃ, বেশ নাম।

ঃ তার চেয়ে তুমি বেশ ঃ মুচকি হেসে নাচউলী চলে গেলো ঘরে। উপহার চলে গেলো ফ্রান্সের সীমা পেরিয়ে।

পরের দিন কথামতো থেকে গেলো কোরিনা। দেহবুভুক্ষু সেনাপতি, লাল কামনা মদের মতো ঢল্‌ঢল্‌ ক'রছে দু'চোখে। অবাধ ভোগের উচ্ছৃংখল আবর্তে ডুবুডুবু হ'য়ে হ'য়ে এক সময়ে নিশি ভোর হ'য়ে এলো।

ঃ তুমি আমাকে চরম আনন্দ দিয়েছো কোরিন্‌, জীবনে এত আনন্দ কারো কাছ থেকে কখনো পাইনি। যদি যুদ্ধ বাধে, তাতে যদি জয়লাভ করি, সে-জয়ের নানা কারণের মধ্যে তোমার দেওয়া এ-তৃপ্তিরও মোটা অংশ থাকবে।

ঃ সেইজন্যে তোমার মনের খুসীতে কোথাও এতটুকু কোনো বাধা দিইনি। আজ যদি তোমাকে অতৃপ্ত রাখি আর এই মুহূর্তে যদি যুদ্ধ বাধে তাহ'লে তোমার অশান্ত অতৃপ্ত মেজাজের কাছ থেকে দেশ পরিপূর্ণ মঙ্গলটুকু কিছুতেই পাবে না। আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে তোমার বুকে কান পেতে শুনেছি, তুমি যুদ্ধে জয়ী হবে—হবে।

ঃ ধন্যবাদ কোরিন, তুমি শুধু সুন্দরী নও, তুমি বুঝদার মেয়ে। দেশকেও তুমি ভালোবাসো।

খানিকটা নতমুখে থেকে ব'ললে কোরিন্‌ ঃ ভোর হোলো, এবার আসি সেনাপতি, তুমি আমাকে যে-দয়া ক'রেছো তার জন্যে আমি কৃতার্থ।

ঃ কিন্তু তোমাকে যেতে দেবার আমার আদৌ ইচ্ছা নেই কোরিন, ইচ্ছা ক'রছে বরাবর তোমাকে ধরে রেখে দিই।

হাসতে হাসতে নাচউলী ব'ললে ঃ বিয়ে ক'রে না কী?

ঃ তাই যদি হয়?

গম্ভীর হোলো নাচউলী ঃ তোমার স্ত্রী আছে না?

ঃ সেও থাকবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে নাচউলী সমাপ্তি টানলো ঃ আচ্ছা সে তুমি ভেবে দ্যাখো, কিন্তু এখন যে আমাকে যেতেই হবে সেনাপতি। আর দেরী নয়।

ঃ আবার আসছো কবে?

ঃ দু'এক দিনেই, গরজেই তো আসতে হবে, যদি বোনের খবর আসে। শিবিরের বাইরে বেরিয়ে যাবার দিকে নাচউলী পা বাড়ালে।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং

টেলিফোন!

সেনাপতি রিসিভার কানে তুললো।

এক তরফা শোনা যাচ্ছে এই কথাগুলো সেনাপতির মুখ থেকে ঃ

ঃ ও, হেডকোয়ার্টার? কী খবর?

ঃ হ্যাঁ, বলুন।

হ্যাঁ, তাতো জানি, বহু ইহুদীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলো।

ঃ হ্যাঁ, তা-ও জানি বেচারীদের অনেকেই অস্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া এমনকি আমাদের দেশেও এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ঃ আঁ, বলেন কি! নিজের দেশের লোকের উপরেও নির্যাতন!

ঃ কি ব'লছেন? আসল নির্যাতন নয়, লোক-দেখানো নির্যাতন?

ঃ ও, তারাও এসে আশ্রয় নিয়েছে?

ঃ আঁ, বলেন কী! এরকম ব্যাপার!

ঃ ওদেরই মধ্যে একটি মেয়ে?...এখন কোথায়? আপনার ওখানে?

ঃ ব'সে ব'সে টফি খেতে লাগলো? বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছিলো?

ঃ বলেন কী! টফিতেই বিষ ছিলো?

ঃ তাই না কী? সে তাহ'লে কোথায়? ওর বোন ব'লে মনে হয় বলছেন?

ঃ কী ব'লছেন? নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা ক'রলে!

ঃ ও, দেহটা পাওয়া যায়নি তাহ'লে?

ঃ দেখতে খুব সুন্দরী ব'লছেন? ভর যুবতী?

ঃ কী ব'ললেন? বড় বড় চোখ? ঝুরঝুরে সোনালি চুল? পাতলা ঠোঁট? খুব সেক্সী ব'ললেন?

ঃ ব'লছেন যাদু জানে? এক মিনিটেই মন ভুলিয়ে দেবে?

ঃ ও ...হুঁ—হুঁ—আচ্ছা...আচ্ছা—যথাসাধ্য ক'রবো।

রিসিভার নামিয়ে রাখলো সেনাপতি।

সকাল হ'য়েছে। কেমন একটা ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে কুয়াশা রাইন নদীর তীরে ফ্রান্সের আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে আছে, যেন লুকিয়ে রেখেছে সূর্যকে। জোর ক'রে পাঠানো তার একটু-আধটু রঙ মেখে পূর্বাচল একটু-একটু বাদামী হ'য়ে উঠবার চেষ্টা ক'রছে।

সেই তরল বাষ্পনির্ঝরের মধ্য দিয়ে দু'রাত-জাগা ক্লান্ত দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে সামনে এগিয়ে চলেছে নর্তকী কোরিনা—সুন্দরী—সেনাপতির দু'রাত্রির প্রণয়িনী—যে কিনা তার হিডোনিস্টিক্‌ সৈন্যজীবনের চিরন্তর মরশুমী ফুলের বাগানে ষড়ঋতুর হররোজ্‌কার ফুল হবার মাটিতে হঠাৎ মকরীর মৌরুসী-পাট্টার রবাহূত ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছিলো।

তখনো একেবারে মিলোয়নি চোখ থেকে—ওই-শিবিরে খোলা দ্বারপথে তখনো দেখা যাচ্ছে—আবছায়ায় মধ্যে একটা ছায়ার মতো—ধীর বিবশ পায়ে—গুড়ুম! —

ফ্রান্সের রাইন নদীর বালুকাবেলায় সুন্দরী নর্তকীর রক্তরাঙা দেহ লুটিয়ে প'ড়লো!

সেনাপতি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলে রাইফলটা—মুখ ইস্পাত—ক্রুর দৃষ্টি তখনো মিলোয়নি চোখ থেকে!

বিভীষণ! মীরজাফর! জয়চাঁদ!

ঠিক সেই মুহূর্তে জার্মাণীর সমর দপ্তরে কোরিনার নামে দশ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হোলো।

রুমালখানার দেখা মিললো সেখানে। তখনো কেউ কেউ তার বৃত্তের মধ্যেকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সবুজ রেখার লতাপাতার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছে।

পরের দিন বিশ্ববাসী শুনলে, ফ্রান্সের পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত ভিতরের আকাশে জার্মাণীর স্বস্তিকাচিহ্ন পতাকা পত্‌ পত্‌ ক'রে উড়ছে। সেডানের কাছাকাছি ম্যাজিনো লাইনের কেউ-না-জানা লুকোনো দুর্বল অংশই নাকি ঘা খেয়ে মাথা নুইয়ে সেলাম জানিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে।

সংবাদ বিচিত্রা

॥ পথের ওজন ৪৫ টন ॥

ব্রেমেরহাভেনের কলম্বাস বন্দরে জাহাজে ওঠার জন্য যে নতুন পথ তৈরী হয়েছে তার ওজন ৪৫ টন। চলন্ত একটি ইস্পাতের খিলানের মত কাঠামোয় এই পথটি আটকানো। এই সুড়ঙ্গের মত পথ দিয়ে যাত্রীরা বন্দরের বাড়ীর ওপর-তলা থেকে সরাসরি পাশে দাঁড়ানো জাহাজে গিয়ে উঠতে পারবে। জাহাজের উচ্চতা অনুসারে এই পথও উঁচুনীচু করা যায়। জোয়ার-ভাটায় জলের কমাবাড়া বুঝে পথ দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত করতে দেওয়া হবে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধের ওপর নজর রেখেই এই অভিনব পথ তৈরী হয়েছে।

টেলিভিশনের সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

মিউনিখের পুলিশ টেলিভিশনের সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। বছর ছয়েক আগে এই ব্যবস্থাটির সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছিল, সম্প্রতি সেটি শেষ হয়েছে। এই ব্যবস্থায় এখন একজন পুলিশ ষোলটি টেলিভিশন ক্যামেরা পরিচালন করতে পারবে। 'শহরের যান-বাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিশেষত দুপুরের ভিড়ের সময় এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা খুবই কার্যকরী হবে এবং রাস্তায় প্রায় কোনরকম অচল অবস্থার সৃষ্টি হবে না। একজন পুলিশ তার চৌকিতে বসে বসেই সুইচ টিপে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং যেসব গাড়ী পথে বে-আইনী ভাবে চলবে তাদের নম্বর সঙ্গে সঙ্গে টুকে নিতে পারবে, কেননা টেলিভিশন ক্যামেরা-গুলিকে চারদিকে ঘোরানো ফেরানো যায় এবং তাদের রবার লেন্সে রাস্তার সব-কিছু ধরা পড়ে।

॥ বিদ্যুৎ সরবরাহের ভাসমান কারখানা ॥

সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দর অথবা তারই নিকটবর্তী কোন স্থানে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে মার্কিন স্থল-বাহিনী পরমাণু থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের একটি ভাসমান কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লিবার্টি নামক জাহাজে এই কারখানাটি নির্মিত হবে। এতে ১০০০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে এবং সাবমেরিন কেবল্-এর সাহায্যে সমুদ্রতীরে অবস্থিত বন্দরে বিদ্যুৎশক্তি
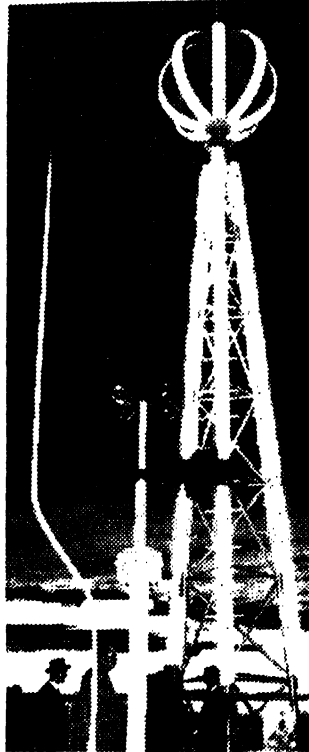
পশ্চিম জার্মাণীর আখেনে আবহাওয়ার সংকেত জানাবার জন্যে এই যন্ত্রটি এক বাড়ীর ওপর স্থাপন করা হয়েছে। ওপরের গোলকটি থেকে, আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা জানাবার জন্যে, বিভিন্ন বর্ণের আলো বিকীর্ণ হয়।

সরবরাহ করা হবে। পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের সাহায্যেই এই কারখানায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে। কেবল স্বদেশেই নয় বিদেশের বন্দরেও এটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ২০০০০ অধিবাসী-অধ্যুষিত কোন শহরের পক্ষে এই কারখানায় উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি যথেষ্ট হবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি ঘোষণায় এ প্রসঙ্গে আরও জানানো হয়েছে যে, বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় একবারের ইন্ধনে কারখানাটি দু'বছরেরও বেশী চালু থাকবে।

॥ আলোক-সংবেদনশীল বস্ত্র ॥

মিউনিখের একজন ফটোগ্রাফিক সামগ্রী ও সাজ-সরঞ্জাম নির্মাতা তৈরীর এমন একটি অভিনব প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন যার ফলে বস্ত্র আলোক-সংবেদনশীল হবে। এই অভিনব বস্ত্র-ভিত্তিক বস্তুটির গুণ অবিকল আলোক-চিত্রে ব্যবহৃত সিলভার ব্রোমাইড পেপারের মত এবং একই ভাবে ব্যবহার করা যাবে অর্থাৎ আলোকচিত্রের পদ্ধতিতে এর ওপর ছবি ফুটিয়ে তোলা যাবে। এই ধরণের বস্ত্র আসবাবপত্র, পরদা কিম্বা দেওয়াল সাজাবার পক্ষে খুব চমৎকার।

॥ নতুন শহর-মানচিত্রের সমস্যা ॥

রুশ ফেডারেশনের নির্মাণকার্যের রাষ্ট্রীয় কমিটির এক সংবাদে জানা যায় যে, রুশ ফেডারেশনে প্রতি দুই মাসে একটি করে নতুন শহর গড়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে রুশ ফেডারেশনের যেসব এলাকায় বড়ো বড়ো শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, শক্তি-শালী বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে ও খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে সেই সব এলাকায় প্রায় একশতটি নতুন শহর গড়ে উঠেছে। উক্ত কমিটির একজন মুখপাত্র বলেন, "নতুন শহরের কাজ এতো দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে যে চলতি মানচিত্রগুলিতে ওইসব শহরকে চিহ্নিত করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিটি মানচিত্রেই [illegible]গুলি-করে নবনির্মিত শহর বাদ প[illegible]।"

।। নতুন রকমের ফল ।।

আপেলের নাসপাতির সংযোগে কি নতুন রকমের কোন ফল সৃষ্টি করা যায়? ব্যবহারিক পরীক্ষায় বিশেষ কিছু প্রমাণ না হওয়ায় বিজ্ঞান ইদানীংকাল পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেনি। কিন্তু সম্প্রতি বুলগেরিয়ার ফ্রুট-গ্রোইং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বৈজ্ঞানিকরা আপেল বা নাসপাতির সংযোগে একরকম নতুন বর্ণসংকর ফল সৃষ্টি করেছেন যেগুলির আকার অনেকটা নাসপাতির মতো। এই নতুন রকমের ফলে আপেল ও নাসপাতি এই উভয় রকম ফলেরই গুণাগুণ বর্তমান। 'প্লাম' ও 'মোরেলা'-র সংযোগেও আর একরকম বর্ণসংকর ফলের সৃষ্টি হয়েছে।

কলারসিক

চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পের প্রদর্শনী

জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কলকাতার তিনটি প্রদর্শনী ভবনে তিনটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এর মধ্যে দুটি চিত্র-প্রদর্শনী এবং একটি হল স্থাপত্য-শিল্পের প্রদর্শনী।

।। শিল্পী বিজন চৌধুরীর প্রদর্শনী ।।

আলোচ্য প্রদর্শনী তিনটির মধ্যে শিল্পী বিজন চৌধুরী সঙ্গত কারণেই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্যতা রাখেন। শিল্পী চৌধুরীর পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর সঙ্গে বর্তমান প্রদর্শনী একত্র করে দেখলে অনায়াসে বলা যায়ঃ কালীঘাটের সেই সব বিখ্যাত পটুয়ারা হয়তো আর কোনদিন ফিরে আসবেন না কিন্তু আধুনিক যুগের, আধুনিক কালীঘাটের শিল্পীরূপে বিজন চৌধুরী হয়তো আরও বেশ কিছুকাল আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন। একজন তরুণ শিল্পীর পক্ষে এ নিশ্চয়ই গৌরবের কথা।

এবার যে তেরখানি তেল-রঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে তার প্রত্যেকটিতে বিধৃত হয়েছে কালীঘাটের কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রবহমান বিচিত্র জীবন-যাত্রা, উৎসব এবং লোকাচার কিংবা নিত্য দেখা সাধারণ মানুষের কোন এক বিশেষ মুহূর্তের শিল্পরূপ। শিল্পীর পর্যবেক্ষণ যদি শুধুমাত্র বাস্তবের হুবহু বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে শিল্পী চৌধুরীকে নিয়ে এত কথা বলার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সুখের কথা, শিল্পীর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্য তাঁর অঙ্কিত নর-নারীকে স্থূল বাস্তবতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছে। তিনি তাঁর নর-নারীর অবয়বকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভেঙেছেন। এই বিকৃতি হেলানো ও লম্বমান মোটা ও সূক্ষ্ম রেখায় এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছে যা সমগ্র চিত্রকে শুধু গতিময় করেনি, মনে হয়েছে ক্যানভাস অতিক্রম করেও এর গতিবেগ ধাবমান। চিত্র-বিন্যাসের এই বিশেষ কৌশলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিটি নর-নারীর ব্যঞ্জনাময় আচরণ এবং সামাজিক রীতি-নীতিকে চমৎকার বর্ণ-প্রয়োগে পরিস্ফুট করার শৈল্পিক দক্ষতা। চিত্রের জমিন সৃষ্টিতে শিল্পীর রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতিও উল্লেখ্য।

শিল্পী বিজন চৌধুরীর 'ঘুড়ি ওড়ানো' (২), 'পাখি বিক্রেতা' (৩), 'খেলনা বিক্রেতা' (৬), 'তারসানাই সহ' (৭) এবং 'বাঁশি বিক্রেতা' (৮) চিত্রে নিত্যদেখা সাধারণ মানুষ কখনো মিশ্র রঙে, কখনো বা হলুদ, নীল, কালো বা মেটে রঙের রেখা ও বর্ণপ্রয়োগে ছন্দময় গতিতে মূর্ত। এখানে যে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা শুধু দৃষ্টিসুখকর নয়, সমস্ত চিত্রপটকেও ব্যঞ্জনাময় ক'রে তুলেছে। এই প্রদর্শনীর 'একটি মেলার দৃশ্য' (১), 'গাজন-উৎসব' (৪), 'এয়োতির চিহ্ন' (১৩) চিত্র তিনটিতে বাঙালীর আত্মিক-চেতনার অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। আশা করি বিজনবাবু তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ বিকাশের পথে পরিচালিত করতে অতঃপর কুণ্ঠিত হবেন না।

।। শিল্পাঞ্জলীর সম্মিলিত প্রদর্শনী ।।

শিল্পাঞ্জলী আয়োজিত প্রদর্শনীতে ছয়জন শিল্পীর ৪০ খানি চিত্র উপস্থিত করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১১ খানি জল-রঙের ও ৪ খানি মাত্র গ্রাফিক (কাঠখোদাই ও মনোটাইপ) চিত্র আর অন্য সবগুলির মাধ্যম তেল-রঙ।

শিল্পী ঃ বিজন চৌধুরী

শিল্পী সুহাস রায় এবং শ্রীমতী ঝর্ণা চৌধুরীর ঝোঁক মূলতঃ বিমূর্ত শিল্প-চেতনার দিকে। সুহাসবাবুর 'অশ্ব' (১) চিত্রখানি সাদা ও হলুদ মেশানো জমিনে সামান্য রঙে দুইটি অশ্বের ধাবমান চেহারার আভাস এনেছে। কিন্তু অন্য অনেক চিত্রেই তিনি গাঢ় রঙ ব্যবহার করে বিমূর্ততার নামে একটি প্যাটার্ণ সৃষ্টি করেছেন মাত্র। অবশ্য তাঁর 'শহরতলী' (৫) চিত্রখানির বিন্যাসভঙ্গি চমৎকার। শ্রীমতী ঝর্ণা চৌধুরীর চিত্রে সমসাময়িক অনেক আধুনিক শিল্পীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এঁর বিমূর্ততা আঙ্গিক-প্রকরণে তেমন জটিলতার সৃষ্টি করেনি। 'ভোরের আনন্দ' (২৯) চিত্রে পায়রার পর পায়রা সাজিয়ে আলোর আভাসে বেশ সুন্দর এক পরিবেশ তৈরী করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। 'লাল মাটি'র (৩০) নিঃসর্গ দৃশ্যটি চিত্র-সংস্থাপনের গুণে মন্দ লাগেনি।

শিল্পী প্রভাংশু আইচ ভৌমিক এবং শ্রীমতী রমা ঘোষ প্রথাসিদ্ধ আঙ্গিকে মূর্ত করতে চেয়েছেন তাঁদের শিল্প-অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে প্রভাংশু আইচ ভৌমিকের 'কর্মনিরত' (১১), 'গৃহপানে' এবং জলরঙের 'একটি ফুলের স্টাডি' (১৯) মন্দ লাগেনি। শ্রীমতী রমা ঘোষের 'জলেভাসার জন্য' (৪০) ও 'শীতের নিঃসর্গ দৃশ্য' (৩৬) ব্যতীত অন্য কোন চিত্র মনকে বেশি আকর্ষণ করতে পারেনি। এঁদের দুজনের কাজের মধ্যে 'অ্যাকাডেমিক গন্ধ' এখনও যেন বর্তমান।

শিল্পী নকুল চট্টোপাধ্যায়ের একখানি চিত্রই ছিল এ প্রদর্শনীতে। শুধু চটের ক্যানভাসে মোটা রেখায় ছিন্নমূল মানুষের ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে ভালই লেগেছে।

।। আর্কিটেক্টস ক্লাবের প্রদর্শনী ।।

কলকাতার আর্কিটেক্টস ক্লাব আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্থাপত্য-শিল্পের আধুনিক রূপ ও রীতির অনেক নিদর্শন স্থান পেয়েছে। আধুনিক ভারতে স্থাপত্য-শিল্প যে বিকাশমান এই প্রদর্শনীর নানা মডেল ও চার্ট দেখে তা উপলব্ধি করা যায়। উৎসাহী দর্শকেরা এই প্রদর্শনী দেখে তৃপ্তি পেয়েছেন বলে মনে হয়। বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রদর্শনীটি শেষ হয়েছে।

॥ চীনা ধূর্ত্ততা ॥

কলম্বো প্রস্তাব ও ভারতের ন্যূনতম দাবীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকায় ভারত কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে এমন একটা ধারণা যে চীনের বদ্ধমূলে ছিল একথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম। এই কারণেই চীন ভারতের মতামত প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশে বিরত থাকে এবং ইঙ্গিতে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চায় যে, কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণে তার বিশেষ আপত্তি নেই। এর পর ভারত যদি সত্যই কলম্বো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিজের পূর্ব প্রস্তাবে দৃঢ় থাকত, তবে চীন আর এক দফা প্রচারের সুযোগ পেত যে, বিরোধের নিষ্পত্তির ইচ্ছা ভারতেরই নেই। কিন্তু ভারত সব্যাখ্যা কলম্বো প্রস্তাব চীন-ভারত আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করায় চীনের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বিরোধের নিষ্পত্তির প্রকৃত ইচ্ছা যদি চীনের থাকত তবে ত' বিরোধের সূত্রপাতই সে করত না। সুতরাং এখন যদি কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে তাকে ভারতের সঙ্গে নিষ্পত্তি আলোচনায় বসতে হয় তবে শুধু যে ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলিই তাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তাই নয়, অদূর ভবিষ্যতে নতুন ক'রে বিরোধ শুরু করার উপায়ও আর তার থাকবে না। অথচ তার বর্তমান অনুসৃত রাষ্ট্রাদর্শে 'ধনতান্ত্রিক' দুনিয়ার সঙ্গে বিরোধ অনিবার্য প্রয়োজন। তাই কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে মীমাংসার সম্ভাবনা অতি সামান্য উজ্জ্বল হওয়া মাত্র চীনকে বেঁকে বসতে হ'ল।

এখন চীনের নতুন দাবী, কোন পূর্বসর্ত আরোপ না করেই ভারতকে চীনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে হবে। কারণ আগে থেকে সর্ত আরোপ করা হলে নাকি আলোচনার গণ্ডী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি পিকিং হতে নেপালে প্রত্যাবর্তনের পথে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ তুলসী গিরী সর্বপ্রথম এই কথা বলেন যে, চীন-ভারত আলোচনায় কোন তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপ চীনের পছন্দ নয়। চীনের বিশেষ সুহৃদ ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও নাকি ঐ রকমের একটি প্রস্তাব নিয়ে নয়াদিল্লী এসেছেন। চীনের অপর মিত্র ঘানার আইনমন্ত্রীও দিল্লীতে কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কিত আলোচনায় যোগ দেওয়ার পর পিকিঙে গিয়ে একেবারে সুর পাল্টিয়ে বলেছেন, চীন-ভারত সরাসরি ও মত-নিরপেক্ষ আলোচনাই সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ। আক্রমণকারীর সঙ্গে আক্রান্তের সর্তহীন সরাসরি আলোচনা যে কি করে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানজনক পথ হতে পারে তা আমরা বুঝি না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, ইন্দোনেশিয়া ও ঘানার কূটনীতিকদের কাছে যে বিবদমান দুই পক্ষের মীমাংসার ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের মীমাংসা প্রয়াস যদি তাঁরা অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করে থাকেন তবে তাঁরা কলম্বো সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন কেন? দুটি দেশের বিরোধের মীমাংসার শ্রেষ্ঠ পথ যদি সরাসরি আলোচনাই হয় তবে রাষ্ট্রসংঘ প্রমুখ আন্তর্জাতিক শান্তি-সংস্থাগুলিরই বা অস্তিত্বের সার্থকতা কি?

সব্যাখ্যা কলম্বো প্রস্তাব আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ চীন না গ্রহণ করা পর্যন্ত চীনের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করার যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত ভারত সরকার নিয়েছেন—তা এদেশের প্রত্যেকটি যুক্তিবাদী ও শান্তিকামী মানুষের বলিষ্ঠ সমর্থন লাভ করবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশও যে এ ব্যাপারে পূর্বের মতই ভারতকে সমর্থন করবে তার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কলম্বো সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যতম রাষ্ট্র কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক বর্তমানে ভারত সফররত। ভারত কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করায় তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, ভারত সফর শেষ হলেই তিনি চীনে যাবেন এবং চীন যাতে ভারতের মতই সব্যাখ্যা কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে তার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভও ভারতের মনোভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এমনকি একথাও তিনি বলেছেন যে, চীনের আক্রমণাত্মক মনোভাবে কমিউনিজমের নামগন্ধ নেই। আসলে তা শুধু ফ্যাসীবাদের সঙ্গেই তুলনীয়। পরিশেষে, আমরা শুধু এই আশাই ব্যক্ত করব যে, ভারত সরকার তাঁর বর্তমান দৃঢ় মনোভাবে অবিচল থাকবেন। তাহলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের জনমতের চাপে চীনের শেষ পর্যন্ত নতি-স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর থাকবে না।

॥ পাঞ্জাবের দৃষ্টান্ত ॥

বক্তৃতা দেওয়া সহজ, আচরণের মধ্য দিয়ে সেই বক্তব্য বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণই সত্যিকারের কঠিন কাজ। বক্তার অভাব কোনদিনই ঘটেনি বাঙলায়, মঞ্চ হ'তে বহু আহ্বান শুনেছে এ রাজ্যের লোক রক্ত, অশ্রু ও ঐশ্বর্যদানের। কিন্তু সে আহ্বানকে তারা শুধু কথার কথা বলেই জেনেছে, 'ভাল' বক্তৃতা শুনে হাততালি দিয়েছে ভাল গান শুনে হাততালি দেওয়ার মত। কিন্তু যথাযথ কর্তব্য পালনের অনুপ্রেরণা তারা পায়নি।

আমাদের যে কত করণীয় ছিল জাতির এই চরম সঙ্কটকালে তা পাঞ্জাবের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব। দেশবিভাগের পর বাঙলার মতই সংখ্যাতীত সমস্যাভারে জর্জরিত ছিল পাঞ্জাব। তবু আমরা পেয়েছি শিল্প-নগরী কলকাতাকে, পাঞ্জাব তাও পায়নি। রাজ্যের রাজধানী লাহোর চলে গেছে পাকিস্তানের ভাগে, তাই নতুন করেই সব তাদের আবার গড়ে তুলতে হয়েছে। পাট, কয়লা, চায়ের ঐশ্বর্য নেই পাঞ্জাবের, নেই কোন স্বাভাবিক বন্দর। ভূমিবদ্ধ পাঞ্জাবের শুধু কৃষিই সম্বল, আর সম্বল তার অপরাজেয় বীর সন্তানেরা। তারই জোরে দশ বছরের মধ্যে আবার যে দেশরূপে গড়ে উঠেছে পাঞ্জাব ভারতে তার তুলনা নেই। কিন্তু পাঞ্জাবের মানুষ যে শুধু পাঞ্জাবের কথাই চিন্তা করে না, এমনকি ভারতের সুখ, দুঃখ ও সম্মানকে যে তারা পাঞ্জাবের চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে তারা জাতির এই চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থদানে পাঞ্জাবের স্থান প্রথম, রক্ত ও ঐশ্বর্য দানেও পাঞ্জাব অদ্বিতীয়, ব্যয়-সঙ্কোচনেও পাঞ্জাব অগ্রণী। আর সবচেয়ে বড় কথা, জাতির স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে বীর-জননী পাঞ্জাব যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে ভারতের অন্য সকল প্রদেশের কাছে তা অনুকরণীয় উজ্জ্বল আদর্শ।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দেয় চাঁদার লক্ষ্যরূপে পাঞ্জাব প্রথমে স্থির করেছিল, রাজ্যের দুই কোটি দুই লক্ষ লোকের হয়ে তারা মাথাপিছু এক টাকা চাঁদা দেবে। অনতিবিলম্বেই দুই কোটি টাকা সংগৃহীত হয়ে যাওয়ায় তারা পাঁচ কোটি টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে লক্ষ্যও তাদের পূর্ণ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা চাঁদা পাঞ্জাব জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করেছে। অর্থাৎ পাঞ্জাবের প্রতি লোকের গড়পরতা দান হ'ল দু টাকা সত্তর নয়া পয়সা। সে জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের দু' কোটি বত্রিশ লক্ষ মানুষ এখনও পর্যন্ত মাথাপিছু প'চাত্তর নয়া পয়সাও দিয়ে উঠতে পারেনি। আর

এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দাতা হিসাবে বাঙলার স্থান দ্বিতীয়। রক্তদানেও পাঞ্জাবের স্থান অদ্বিতীয়। এ পর্যন্ত যতদূর সম্ভব রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখনও চল্লিশ হাজার লোকের নাম রক্তদানের জন্য তালিকাভুক্ত করা আছে। পাঞ্জাবের মুখ্য-মন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজন হ'লে পাঞ্জাব প্রতিদিন পাঁচশত বোতল (২৫০ সি সি) রক্ত সরবরাহ করবে। পাঞ্জাব এ পর্যন্ত স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার দিয়েছে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার গ্রাম ও সোয়েটার, কম্বল ইত্যাদি গরম বস্ত্র সরবরাহ করেছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার। তা'ছাড়াও আহত ও মৃত জওয়ানদের জন্য সংগৃহীত হয়েছে ১৬১১ একর জমি ও দশটি বাড়ী। মন্ত্রি-সভার সদস্য সংখ্যা ৩১ থেকে কমিয়ে ৯ করার সংবাদ ইতিপূর্বে আমরা জানিয়েছি। এছাড়াও পাঞ্জাব সরকার স্থির করেছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যয় তাঁরা বছরে অন্তত ১৫ কোটি টাকা কমিয়ে ফেলবেন। পাঞ্জাবের প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের অন্তত একজন বীর সন্তান আজ ভারতের জাতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা কত গভীর হ'লে তবে এমন নিঃশেষে আত্মদান সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়।

॥ খোলা বাজারের রাজনীতি ॥

ফ্রান্সের অনমনীয় জেদে ইউরোপের খোলা বাজারে বৃটেনের যোগদা নর প্রয়াস আপাতত ব্যর্থ হ'ল। পনের মাস আগে বৃটেন খোলা বাজারে যোগদানের জন্য আবেদন জানিয়েছিল এবং স্বদেশে শ্রমিকদলের আপত্তি ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বৃটেনের বৈষয়িক স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য অবশ্যই ইউরোপের বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে বৃটেনকে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে। কমন মার্কেটে যোগ না দিয়ে তাই বৃটেনের কোন উপায় নেই। কিন্তু পনের মাস ধরে আলাপ-আলোচনা চলার পর বৃটেনকে আপাতত হার মানতে হল, কমন মার্কেটে যোগ দেওয়া তার হল না। কমন মার্কেটের বিধি অনুসারে ঐ সংগঠনের যে-কোন সিদ্ধান্তই সর্ববাদী-সম্মত হতে হ'বে। তাই কমন মার্কেটভুক্ত অপর পাঁচ রাষ্ট্র হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ, পঃ জার্মানী ও ইতালীর সম্মতি সত্ত্বেও শুধু ফ্রান্সের আপত্তিতে বৃটেনের যোগদানের আবেদন মঞ্জুর করা

সম্ভব হল না। অবশ্য কমন মার্কেটভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি ফ্রান্সের এই জেদ ক সহজভাবে গ্রহণ করেনি এবং তাদের বিরোধিতা ও প্রতিবাদে ফ্রান্স হয়ত শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য হবে আর তা না হলে হয়ত কমন মার্কেটই শেষ পর্যন্ত ভেঙে যাবে। কিন্তু বৃটেনের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান পরাজয়ের গুরুত্ব সীমাহীন। রাইন সীমান্তে বৃটেনের যে পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য আছে, অবিলম্বে হয়ত তাদের বৃটেনে ফিরিয়ে আনার দাবী উঠবে এবং সে দাবী প্রত্যাখ্যান করার মত কোন যুক্তি ম্যাকমিলান দেখাতে পারবেন না। কমন মার্কেটে বৃটেনের যোগদানের ব্যর্থতায় শ্রমিক দলের যে নৈতিক জয় হল বৃটেনের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। ইতিমধ্যেই হয়ত রক্ষণ-শীল দলকে স্বীয় দলের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মন্ত্রিসভায় কিছু বড় রকমের রদ-বদল ঘটাতে হবে। তবে বৃটেনের বড় ভরসা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সহায়। ইউরোপে আজ ফ্রান্স ও জার্মানীর মিতালীর ফলে যে দুর্জয় অশুভ শক্তি গড়ে ওঠার আশংকা প্রবল হয়ে উঠেছে এবং যার ফলে অতলান্তিক শক্তিজোটেই ভাঙ্গন ধরার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তা মুখ বুজে মেনে নেবে না। অবিলম্বেই হয়ত কেনেডি সাহেব কমন মার্কেটভুক্ত অন্য পাঁচটি দেশকে জানিয়ে দেবেন যে, ফ্রান্স বা যুক্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে যে-কোন একটি দেশকে তাদের ভবিষ্যতের মিত্ররূপে বেছে নিতে হবে। আর সেরকম পরিস্থিতির সম্মু-খীন হলে বেনেলাক্স গোষ্ঠী ত বটেই, পশ্চিম জার্মানীরও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জানানো ছাড়া উপায় থাকবে না। কারণ পঃ জার্মানী জানে যে, যুক্ত-রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া বার্লিন ও জার্মান সমস্যার সুমীমাংসা হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং অনতিবিলম্বে হয়ত ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে বা তাকে আত্ম-সমর্পণে বাধ্য করে বৃটেনের নেতৃত্বে ও যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ইউরোপে নতুন করে একটি পশ্চিমী শক্তিবর্গের অভিন্ন বাজার গড়ে তোলার ব্যবস্থা হবে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি মার্কিন কংগ্রেসে প্রেরিত তাঁর এক সাম্প্রতিক বাণীতে বলেছেন, ইউ-রোপের খোলা বাজার অর্থনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। তথাপি স্বাধীন দুনিয়ার স্বার্থে এই খোলা বাজার গড়ে ওঠা প্রয়োজন।

বৃটেনের এই ব্যর্থতায় ভারতের আপাতত লাভ হ'ল এই যে, পূর্বের মত এখনও বৃটেনে ভারতীয় পণ্য বিনা শুল্কে প্রবেশের সুযোগ পাবে। তবে বৃটেনের সর্তে যদি বৃটেন কমন মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ পেত তবে কমন মার্কেটভুক্ত দেশ-গুলিতেও ভারত এই বিশেষ বাণিজ্যিক সুযোগটুকু অর্জন করত।

॥ ঘরে ॥

২৪শে জানুয়ারী—১০ই মাঘ : কলম্বো প্রস্তাবে ভারতের কূটনৈতিক জয় (চীনের বিরুদ্ধে) সূচিত'—রাজ্যসভায় শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) মন্তব্য : ভারতের অভীষ্ট ষোল আনা সিদ্ধ হইবে বলিয়া আশা।

কলম্বো প্রস্তাব ও তাহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে লোকসভায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া—পি এস পি, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও হিন্দু মহাসভার বিরোধিতা।

প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে নিজামের স্বেচ্ছাকৃত দানে (ব্যক্তিগত তহবিলের শতকরা ১০ ভাগ) অসম্মতি—কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষোভ।

২৫শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ : লোকসভায় ব্যাখ্যাসহ কলম্বো প্রস্তাব অনুমোদন—শ্রীনেহরুর সিদ্ধান্ত বিপুলভাবে সমর্থিত—প্রধানমন্ত্রীর পুনরায় দাবী : আলোচনায় বসিবার জন্য চীনকেও পুরোপুরি প্রস্তাবটি মানিতে হইবে।

'চীনা আক্রমণের অগ্নি-পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ হইবে'—প্রজাতন্ত্র দিবস (চতুর্দশ) উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের বাণী—ভারতের মূলে নীতি বিসর্জন না দিবার সংকল্প ঘোষণা।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক (সংস্কৃত) ডাঃ পি ভি কানে 'ভারত-রত্ন' সম্মানে (রাষ্ট্রীয়) ভূষিত—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর (বিশিষ্ট অভিনেতা) যথাক্রমে 'পদ্মবিভূষণ' ও 'পদ্মশ্রী' মর্যাদা লাভ।

২৬শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ : চীনা ফৌজ বিতাড়নে চরম আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকিব'—মহানগরীতে (কলিকাতা) লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সম্মিলিত সংকল্প গ্রহণ।

অনাড়ম্বর পরিবেশে দেশের সর্বত্র নিষ্ঠার সহিত প্রজাতন্ত্র বার্ষিকী উদ্‌যাপন—দিল্লীতে শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে সংসদ সদস্যদের অভিনব শোভাযাত্রা—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ।

২৭শে জানুয়ারী—১৩ই মাঘ : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক রাজভবনের সম্মুখে (দক্ষিণ ফটক) লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের (মহারাষ্ট্র) ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন—অনুষ্ঠানের সভানেত্রী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

শত্রুর পুনরাক্রমণের সাহস চূর্ণ করিতে দ্রুত দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার আহ্বান—দিল্লীতে সমর-শিক্ষার্থী বাহিনী সমাবেশে শ্রীনেহরুর ভাষণ।

২৮শে জানুয়ারী—১৪ই মাঘ : 'তালুকদার কমিটির (রাজ্যসরকার নিযুক্ত) সুপারিশসমূহ অবাস্তব'—পৌরসভার (কলিকাতা) অধিকাংশ সদস্যের কঠোর মন্তব্য—শতকরা প্রায় ৮০টি সুপারিশই অগ্রাহ্য।

'বর্তমানে চীনের সহিত যুদ্ধের কথা উঠিতে পারে না'—ভূপালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর উক্তি।

ভারত কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করায় কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের (সফরাগত) সন্তোষ।

২৯শে জানুয়ারী—১৫ই মাঘ : সপ্তাহব্যাপী শুভেচ্ছা সফরে ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ সুবান্দ্রিও'র দিল্লী উপস্থিতি—শ্রীনেহরুর জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রীর (মিঃ চৌ) নিকট হইতে 'আশাপ্রদ' বার্তা বহনের কথা ঘোষণা।

কলিকাতা মহানগরীতে বসন্ত রোগ মহামারীরূপে ঘোষিত—অবিলম্বে টীকা লওয়ার জন্য নাগরিকদের প্রতি জরুরী দাবী।

প্রিন্স সিহানুক ও শ্রীনেহরুর যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ-মীমাংসার নীতি সমর্থন।

৩০শে জানুয়ারী—১৬ই মাঘ : দিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত ডাঃ সুবান্দ্রিও'র প্রথম দফা রাজনৈতিক আলোচনা—চীন-ভারত বিরোধ প্রসঙ্গ প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্যভাবে শহীদ দিবস ও গান্ধী-স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপন—রাজঘাটে (দিল্লী) মহাত্মার সমাধিস্থানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি—ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে ও কলিকাতায় গান্ধীজীর মূর্তির পাদদেশে ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান—মহাজাতি সদনে আরও কয়েকজন শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন।

মার্কিন-কমনওয়েলথ বিমান বাহিনী বিশেষজ্ঞ দল দিল্লীতে উপনীত।

॥ বাইরে ॥

২৪শে জানুয়ারী—১০ই মাঘ : ইরাণের শা-পন্থী জনতা কর্তৃক তেহরাণ বিশ্ববিদ্যালয় দখল—ছাত্রদের শা-বিরোধী মনোভাবের জের।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বোরগুইবাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র—১০ জনের ফাঁসি।

মিঃ জেড এ ভুট্টো পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিযুক্ত।

২৫শে জানুয়ারী—১১ই মাঘ : আলোচনার ভিত্তি হিসাবে চীন কর্তৃক কলম্বো প্রস্তাব নীতিগতভাবে স্বীকৃত—শ্রীমতী বন্দরনায়কের (সিংহলী প্রধানমন্ত্রী) নিকট মিঃ চৌ এন লাই-এর বার্তা প্রেরণের সংবাদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান—প্রেসিডেন্ট দ্য গলের (ফরাসী) উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির আবেদন।

২৬শে জানুয়ারী—১২ই মাঘ : ভূগর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডির নির্দেশ—ত্রিশক্তির (রুশিয়া - বৃটেন - আমেরিকা) স্তিমিত আলোচনায় প্রেরণা-সঞ্চারে মার্কিন উদাম।

২৭শে জানুয়ারী—১৩ই মাঘ : জাপানে ভয়ংকর তুষারঝড়—এযাবৎ অন্ততঃ ৫৮ জন নিহত।

"ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইবে"—টেলিভিশনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডীন রাস্কের ভাষণ।

২৮শে জানুয়ারী—১৪ই মাঘ : সিকিম-তিব্বত সীমান্তে চীনা সৈন্য সমাবেশ—সিকিম দরবার কর্তৃক সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

বোর্ণিও'র জঙ্গলে বৃটিশ ছত্রী বাহিনীর অবতরণ—ইন্দোনেশিয়ার দিক হইতে বিপদের আশংকায় সতর্কতা।

২৯শে জানুয়ারী—১৫ই মাঘ : আমেরিকার প্রখ্যাত কবি রবার্ট ফ্রস্টের (৮৮) জীবনদীপ নির্বাণ।

সাধারণ বাজারে (ইউরোপীয়) বৃটেনের প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ—ইউরোপীয় ঐক্যে চরম আঘাত।

৩০শে জানুয়ারী—১৬ই মাঘ : ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে বৃটেনের যোগদানের ব্যর্থতায় বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া—সকল রাষ্ট্রেরই ফ্রান্সের (বৃটেনের সাধারণ বাজারে প্রবেশ-বিরোধী) প্রতি দোষারোপ।

অভয়ংকর

॥ গুরুদেব ও গান্ধিজী ॥

রবীন্দ্রনাথের 'পরিত্রাণ' নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্র কি উত্তরকালে মহাত্মাজীর চরিত্রে রূপায়িত? বাইশ বছরের রচনা "বউঠাকুরাণীর হাট" উপন্যাসটির প্রতি কবির একটু বেশী-রকমের মমতা ছিল, যার ফলে এই কাহিনীর তিনি বারবার নতুন রূপ দিয়েছিলেন। 'বউঠাকুরাণীর হাট' গুজ-রাতি-ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন স্বর্গত মহাদেব দেশাই, এবং শোনা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্বেই গান্ধিজী সেই গ্রন্থ পাঠ করে অনুপ্রাণিত হন।

সত্য-মিথ্যা জানার আজ আর উপায় নেই, এই মহাজীবন-নাটকের পাত্র-পাত্রীরা আজ প্রায় সকলেই মহানিদ্রায় মগ্ন। তবে একথা সত্য গান্ধিজী রবীন্দ্র-নাথকে দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকেই গুরুত্বে বরণ করেন, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তখন দক্ষিণ-আফ্রিকায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁরও গুরু-দেব। 'মডার্ণ রিভিয়্যু'—পত্রিকায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধিজীর অবস্থা জেনে রবীন্দ্রনাথ কিছু অর্থসাহায্য করে-ছিলেন। প্রথমেই শান্তিনিকেতনে আসেন মাতা কস্তুরবা, গান্ধিজীর ছেলেমেয়েরা ও আশ্রমের কয়েকজন। পরে আসেন গান্ধিজী। গান্ধিজী এবং গুরুদেবের এই বোধকরি প্রথম দর্শন, এবং সেই প্রথম দর্শনেই প্রেম। গুরুদেব শিষ্যকে এই-কালেই 'মহাত্মা' এই সম্মানে অভিষিক্ত করলেন। গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক এতটুকু ম্লান হয়নি।

১৯২০-তে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মহাত্মা সম্পর্কে ঃ

"His is a liberated soul. If any one strangles me, I shall be crying for help; but if Gandhi were strangled I am sure he would not cry. He may laugh at the strangler and if he has to die he will die smiling"

গান্ধিজীর মুখ থেকে মৃত্যুকালে ধ্বনিত হয়েছিলো—হা রাম। গান্ধিজীও জানতেন যে রবীন্দ্রনাথ নির্ভীক বিবেক-রক্ষী-পুরুষ, ভারতের জনগণের মর্মবাণী তাঁর ধ্যানের ধন, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ঃ "A great Sentinel"।

ভারতের এই দুই অনন্যসাধারণ পুরুষ পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তথাপি মত-পার্থক্য ছিল অনেক, মতান্তর মনান্তর ঘটায়নি এতটুকু, এই আশ্চর্য। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গান্ধিজী যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন অসহযোগ আন্দোলনের বিপক্ষে, তাঁর মতে জনতার উচ্ছ্বাস এক অন্ধভক্তির প্লাবনে মগ্ন। অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী রবীন্দ্র-নাথের বাণী বিতর্কের সূত্রপাত করে। এই বাদানুবাদ-প্রসঙ্গে কবির বাণী সকল ক্ষেত্রে গান্ধিজী স্বীকার করে নিতে পারেন নি, তিনি যে যুক্তি এবং তর্ক করেছেন তা তাঁর মনোভঙ্গীর পরি-চায়ক, রবীন্দ্রনাথের উক্তি শিল্পীর সংস্কৃত মনের প্রতিচ্ছবি, জনসাধারণের উচ্ছ্বাস ও আবেগপ্রধান মনকে প্রভাবিত করেনি।

১৯২০-২১-এ রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে পর্যটন করেছিলেন, দেশে ফিরে দেখলেন অসহযোগ-আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে পরি-চালিত। এই পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন 'a spirit of persecution', সশস্ত্র বাহি-নীর উৎপীড়ন নয়, কিন্তু তার রূপ অধিকতর শংকাজনক, কারণ এই ভাবাবেগ অপরাজেয়। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—

"I desire that the spirit of inquiry throughout the country must be kept intact and untramelled, its mind not made timid or inactive by compulsion, open or secret".

চরকা আন্দোলনের ধর্মযুদ্ধ রবীন্দ্র-নাথকে বিক্ষুব্ধ করেছিলো। অনেক ক্ষুদ্রায়তন মানুষের বক্তৃতা এবং রচনা তাঁকে ব্যথিত করে, তাঁরা চরকার মাপ-কাঠিতে কবিকে সেদিন বিচার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ

"There is no end to the perversions of value which have weakened our minds, and it is only because we have become habituated to their facile intrusion that no one is surprised to see the charka stalk the land, with uplifted club, in the garb of Swaraj itself".

ভারতের জনগণের প্রজ্ঞা এবং মনের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও চরকার প্রতি অখণ্ড মনোনিবেশে মগ্ন ভারতের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে প্রকৃত পবিত্র আগ্রহ বর্তমান কিনা এই বিষয়ে কবির মনে সংশয় জেগেছিল। গান্ধিজী রবীন্দ্রনাথকে মহান পুরুষ হিসাবে স্বীকার করে বলেছিলেন ঃ

"When a house is on fire, all the inmates go out, and each takes up a bucket to quench the fire. When all about me are dying for want of food, the only occupation permissible to me is to feed the hungry".

যুদ্ধান্তে কবি তাঁর বীণা তুলে নিয়ে সঠিক রাগিণী ধ্বনিত করবেন, এই ছিল গান্ধিজীর যুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন ঃ

"Our present struggle to alienate our heart and mind from those of West is an attempt at spiritual suicide".

এই আত্মিক-আত্মহত্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে গান্ধিজী বললেন— Our non-cooperation is neither with the English nor with the West' ইংরাজী পদ্ধতির প্রতিই তাঁর বিরূপতা। রবীন্দ্রনাথের আশংকা হল যে অসহযোগ আন্দোলন হয়ত ভারতবর্ষকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। চারিদিকের দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে মুক্তবায়ুর প্রবেশ বন্ধ হবে। গান্ধিজী তার জবাবে বললেন ঃ "আমিও কবির মতই মুক্ত-বায়ুতে বিশ্বাসী। আমিও চাইনা চার-দিকের দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখতে। সবদেশের সংস্কৃতির হাওয়া আমাদের দেশে প্রবেশ করুক। তবে আমি আমার স্বক্ষেত্র থেকে বায়ুতাড়িত হয়ে উড়ে যেতে চাই না। অপরের ঘরে আমি অনধিকারীর মত, ভিক্ষুকের মত ক্রীত-দাসের মত থাকতে চাই না।"

রবীন্দ্রনাথের যুক্তির সঙ্গে সেদিন অনেকে একমত না হতে পারলেও, আজ

উন্মুক্ত মন নিয়ে বিচারকালে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে সুগভীর প্রজ্ঞা এবং বিচারশীলতা তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ় করে তুলেছে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। ১৯২৯এ উচ্চারিত কবির নিম্নলিখিত উক্তি ১৯৬৩তে নেহরুর উক্তি বলে সহজেই চালান যায়ঃ

"From now onward, any nation which takes an isolated view of its country will run counter to the Spirit of New Age, and know no peace . . . The war has turn away a veil from before our minds. What is harmful to the World, is harmful to each one of us".

বিহার ভূমিকম্পকে যখন গান্ধিজী অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বলেছিলেন তখন তাঁর উক্তি অতিশয় দুর্বল বিবেচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভারতের অসংখ্য চিন্তাশীল ব্যক্তির উক্তিই প্রতিধ্বনিত। তিনি বলেছিলেন ঃ

"If we associate ethical principles with cosmic phenomena, we shall have to admit that human nature is normally superior to Providence that preaches its lessons in good behaviour in orgies of the worst behaviour possible—".

গান্ধিজী বলেছিলেন এটা তাঁর বিশ্বাস, সেকথা হয়ত শুধুমাত্র তাঁর একান্ত অনুগামীদেরই সন্তুষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথের উক্তি জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ।

এই সমস্ত বাদানুবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন নবজীবন ট্রাস্ট। রবীন্দ্র-শতবর্ষে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মতবৈষম্য সম্পর্কে নানাবিধ অস্পষ্ট উক্তি ছড়িয়ে পড়েছে, কাকা কালেলকর এই গ্রন্থটির একটি সুন্দর ভূমিকা লিখেছেন। গ্রন্থটির সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন আর, কে প্রভু ও রবীন্দ্র কালেলকার। গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও বিশেষ মূল্যবান। *

* **TRUTH CALLED THEM DIFFERENTLY : TAGORE - GANDHI CONTROVERSY : Compiled by R. K. Prabhu and Ravindra Kalelkar, Navajeevan Trust, Ahmedabad-14. Price Rs. 1.50 nP.**

পরলোকে হীতেন্দ্রমোহন বোস

শ্রীহীতেন্দ্রমোহন বোস সম্প্রতি ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাংলা ক্রিকেট জগতে শ্রীযুক্ত বোসের গৌরবজনক ভূমিকা আমাদের সকলেরই সুবিদিত। খেলাধূলোর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের প্রতিও গভীর অনুরাগ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মূল পার্শিয়ান থেকে রুবাইয়াৎ অব ওমর খৈয়ামের বঙ্গানুবাদ করে বিদগ্ধ সমাজে খ্যাতিলাভ করেন হীতেন্দ্রমোহন। এই একখানি গ্রন্থের জন্য তিনি দীর্ঘকাল আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন।

গুরুদেব (স্মৃতিকথা)—**রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী। ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা। দাম পাঁচ টাকা।**

রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সাহচর্যে আসবার সুযোগ ঘটেছিল লেখিকার। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ রবীন্দ্রনাথের যে স্বাভাবিক রূপটি শ্রীমতী চন্দের চোখে ধরা পড়েছিল, ভাল ও মন্দে মিশ্রিত রবীন্দ্র-চরিত্রের যে রূপটি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বর্তমান গ্রন্থে তা সুনিপুণভাবে বর্ণিত। মানুষ রবীন্দ্রনাথের এক অজ্ঞাতপূর্ব জীবনকথা আমরা জানতে পেলাম যা ইতিপূর্বে আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই অসামান্য গ্রন্থখানিতে গুরুদেবের বিভিন্ন সময়ের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে পাওয়া যায় কৌতুকাশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। কবিগুরুর শেষ কয়েকদিনের যে বেদনাদায়ক চিত্র আঁকা হয়েছে তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা গভীরভাবে জানতে উৎসুক, যাঁরা রবীন্দ্র অনুরাগী তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

বিংশোত্তরী দশা প্রয়োগ—বিমলাকান্ত লাহিড়ী। ১৫৬, শহীদ দীনেশ গুপ্ত রোড, বেহালা, কলকাতা—৩৪। দাম তিন টাকা ত্রিশ নয়া পয়সা।

জ্যোতিষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠে উপকৃত হবেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং গবেষকসুলভ আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থকার যে নতুন ভাষ্য-সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন তা জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিনব এবং নতুন ধারার সূচনা করে। মহর্ষি পরাশর-বর্ণিত বিংশোত্তরী দশার সম্পর্কে বহু খ্যাতিবান জ্যোতিষী যে সমস্ত ভাষ্য দিয়েছেন তা অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সমস্ত অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তির মধ্যে থেকে বর্তমান গ্রন্থকার সূত্রগুলির সার্থক ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। বেঙ্কটেশ দৈবজ্ঞের 'সর্বার্থ চিন্তামণি'তে দশা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা চোখে পড়ে। বর্তমান গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থের ছয়শত শ্লোকের অনুবাদ করেছেন এবং সঙ্গে মন্তব্যও যোগ করেছেন। আরো অনেক শ্লোকের আলোচনাও রয়েছে। গ্রন্থকার কঠোর পরিশ্রমে যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাবেন আশা করি।

আলিম্পন—(সচিত্র আলোচনা)—দুর্গা মুখোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম দশ টাকা।

ভারতবর্ষের একটি অন্যতম লোক-শিল্প আলপনা। আলপনার সঙ্গে মঙ্গল-কামনার যোগ অত্যন্ত নিবিড়। এবং আলপনার প্রথম প্রচলন কোথায় তা আজও সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। আদিম অধিবাসীদের গৃহসজ্জায় অঙ্কনের যে আধিপত্য দেখা যায় তার মধ্যে অমঙ্গল-নিবারণ যেমন উদ্দেশ্য তেমনি ঐ অঙ্কনের মধ্য দিয়ে গৃহশ্রী সুন্দর করার প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। আলপনা দেওয়ার প্রথা আর্যদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। মধ্যভারত, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্যের মধ্যে রেখাঙ্কনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঐ সমস্ত অঞ্চলে আলপনার প্রচলন ছিল। বর্তমান গ্রন্থে ঐ সমস্ত অঞ্চলের কয়েকটি আলপনার প্রতিচিত্র রয়েছে। মোটকথা— আলপনা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। বাঙলা দেশে আলপনার বহুল-প্রচার লক্ষ্যণীয়। অবশ্য প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশের অঙ্কনরীতির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিশেষ করে বাঙলা দেশের অঙ্কনরীতি, রঙ ব্যবহারের দিক থেকে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বিশেষ মিল নেই। তাছাড়া বাঙলা দেশের আলপনার সঙ্গে বিবিধ ব্রতকথার মিল অত্যন্ত গভীর।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে একটি সুলিখিত বিস্তৃত ভূমিকা। ভূমিকায় ব্রতকথার সঙ্গে আলপনার গভীর যোগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বাঙলা দেশে আলপনার পতন ঘটে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে। তারপর শান্তিনিকেতনের প্রচেষ্টায় এই শিল্পের পুনরুত্থান ঘটেছে। আলপনার উপকরণ ও প্রয়োগ-বিষয়ক আলোচনাটি সুন্দর এবং আধুনিক রীতিসম্মত।

আলপনা মেয়েদের শিল্প হলেও অতিসম্প্রতি এরমধ্যে পুরুষের হাত

লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নতুনভাবে আলপনার প্রচলনকে উৎসাহদানের প্রয়োজন আছে। যাঁরা নিজেরা আলপনা শিখতে চান বর্তমান গ্রন্থটি তাঁদের উপকারে লাগবে। গ্রন্থে মোট একশ আটটি আলপনা আছে। আলপনাগুলি ছ'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম তিনভাগে আছে আদিবাসীদের দাক্ষিণাত্যের, গুজরাটের আলপনা। বাঙলা দেশের আলপনা তিনটি পৃথক ধারায় বিভক্ত।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে গ্রন্থকর্ত্রী আলপনার ওপর এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করায় সকলেরই ধন্যবাদার্হ। লোকশিল্পের যুগোপযোগী পরিমার্জিত আধুনিক আলোচনা, দামী কাগজে বহু আলপনার এমন সুমুদ্রণ এবং অংগসজ্জায় এমন পারিপাট্য খুব কমই চোখে পড়ে।

প্রবচন— (সংকলন) নির্বাণানন্দ সরস্বতী। মহেশ লাইব্রেরী। ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

বর্তমান গ্রন্থখানি শ্রীমৎস্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী মহারাজের পত্রাবলীর সার-সংকলন। কঠিন ও দুরূহ তত্ত্বসমূহ কত প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা যায় বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠে তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যাবে। নির্বাণানন্দ শিষ্য স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর কাছে লেখা মহারাজের পত্রগুলি থেকে নির্বাচিত অংশগুলি নিয়েই বর্তমান গ্রন্থখানি সংকলিত। উপনিষদ রহস্য, বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য ও বেদান্ত, বাঙলার বাউল, চণ্ডীর রহস্য, হিন্দুর উৎসব, গীতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা, বাঙালীর ভক্তিবাদ, শংকর ও মহাপ্রভু প্রভৃতি আরো অনেকগুলি আলোচনা মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়।

পূর্বরাগ— বেণুগীতি (আলোচনা)— অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। ২১এ, রাধানাথ বসু লেন, কলকাতা-৬। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত 'বেণুগীতি' আখ্যানটিতে শ্রীরাধাদি নিত্যসিদ্ধা ব্রজগোপীগণের 'পূর্বরাগ' অবস্থা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত। শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরিতে অনুপ্রাণিতা অনুরাগিণী ব্রজবধূগণের 'পূর্বরাগ' পর্যায়ে উপস্থিতির আলেক্ষ্য 'বেণুগীতা'। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ হতে গৃহীত অংশ বর্তমান গ্রন্থের মূল উপাদান। ভগবানের চিন্ময় ভুবনসুন্দরীয় মিলন মূর্তি কল্পনায় পূর্বে পূর্বরাগময় অধ্যায় এক অভাবিত পূর্ব আবেগ সঞ্চারে সক্ষম। গ্রন্থকার পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ অধ্যায় হ'তে গৃহীত অংশ টীকা অন্বয়সমেত ব্যাখ্যা করেছেন। সুলিখিত ভূমিকাটি যথেষ্ট মূল্যবান ও আকর্ষণীয়। গ্রন্থখানি ভক্ত-সমাজে সমাদৃত হবে নিঃসন্দেহে।

বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন—(জীবনী) প্রবোধচন্দ্র বসু। প্রকাশক : পূরবী প্রকাশনী। ১৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম ২-২৫ নঃ পঃ।

আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা চলেছে তার পটভূমিকায় ছোটদের জন্যে লেখা এই বইখানি পড়তে পড়তে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বিদ্যাসাগরের জীবনীর এমনই এক আকর্ষণ আছে যা বার বার আলোচনা করলেও পুরোনো হয় না। এই বইটিতে শুধুমাত্র তাঁর ছাত্র-জীবনেরই আলোচনা করা হয়েছে। আজকের ছেলে-মেয়েদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক বেশী বলে মনে হয়। অনেকগুলি প্রতিকৃতি ও তথ্যমূলক ছবি দিয়ে বইটি সুসজ্জিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় ছাপা আরেকটু ভাল হলে সুখী হতাম।

সুরের সানাই বাজুক—(উপন্যাস)— মূল রচনা : কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম। এভারেস্ট বুক হাউস। এ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

অগ্নিকন্যা— (উপন্যাস)—মূল রচনা : গুড়িপাটি ভেঙ্কটচলম্। অনুবাদ : বোম্মানা বিশ্বনাথম। নবজাতক প্রকাশন। ৬, এ্যান্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৯। দাম দু'টাকা।

দক্ষিণ ভারতের মানুষ বোম্মানা বিশ্বনাথম দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বাস করে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। অবাঙালী হয়েও কঠোর পরিশ্রম ও সাধনায় বাঙলা ভাষাকে সুন্দরভাবে নিজের মাতৃভাষার মত আয়ত্ত করেছেন বিশ্বনাথম। এবং সেইসঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে গভীর সাহিত্যবোধ। সাধারণত অন্যান্য ভাষার রচনাবলী বাঙলা ভাষায় করে থাকেন তিনি। তাঁর এই "একান্ত সাহিত্যনিষ্ঠ উদার সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই সমস্ত সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে জয়ী হবে আশা করি।"

মূল তেলুগু ভাষা থেকে 'সুরের সানাই বাজুক' অনুদিত। ঔপন্যাসিক কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও সমকালীন তেলুগু সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী। যে সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে বর্তমান উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে তার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি যে-কোন পাঠকমনকে নাড়া দেবে নিঃসন্দেহে।

'অগ্নিকন্যা' উপন্যাসের লেখক গুড়িপাটি ভেঙ্কটচলন তেলুগু কথাসাহিত্যে যুগান্তর আনয়নকারী স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল কথাশিল্পী। বহু উপন্যাস রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। বর্তমান উপন্যাসটি তেলুগু ভাষাভাষী সমাজে বিশেষ সমাদৃত। আশা করি বাঙলা দেশে গ্রন্থখানি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে।

অনুবাদক বোম্মানা বিশ্বনাথম তাঁর পূর্বঐতিহ্য এবং সুনাম অনুযায়ী বর্তমান অনুবাদের কাজে সার্থকতা লাভ করেছেন।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সপ্তপর্ণ—সম্পাদক : দীপককুমার দেব ও কান্তি গুপ্তভায়া। ৪।এ, রামানন্দ লেন, কলকাতা-৬। দাম—এক টাকা।

'সপ্তপর্ণে'র বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন—নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার ঘোষ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কণাদ গুপ্তভায়া। কবিতা ও গল্প লিখেছেন—মতি নন্দী, আশিস সান্যাল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অশোক সরকার, শঙ্কর সেনগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দিলীপ সিংহ, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

আশ্চর্য—প্রকাশক : অ্যালফা-বিটা পাব্লিকেশনস্, পোস্ট বক্স ২৫৩৯। কলকাতা-১।

বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য ও রোমাঞ্চ মাসিক পত্রিকা। প্রতি সংখ্যা এক টাকা। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নতুন পত্রিকাটি একান্তভাবেই এই ধরণের দেশী ও বিদেশী কাহিনী পরিবেশন করতে অগ্রসর হয়েছে। প্রথম সংখ্যাতেই এইচ. জি ওয়েলসের বিখ্যাত 'গল্প টাইম মেশিনের' সাবলীল অনুবাদ পড়ে তৃপ্তি-লাভ করা গেল। এছাড়া প্রথমশ্রেণীর লেখকদের কয়েকটি সুলিখিত গল্প পত্রিকাটিকে আকর্ষণীয় করেছে। আশা করি পত্রিকাটি জনপ্রিয় হবে।

সাম্রাজ্য নিয়ে গর্ব করার দিন ্যান্ডের আর নেই আজকে। নতুন র হাওয়ার দাপটে সেইসব গর্বের অধুনা অস্তমিত। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের ্জো বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সূর্য কখনো যাবে না। ইংরেজরা যদিও জাতি নবে তেমন নাটুকে না, তবু নাটকে ের অচলা ভক্তি। ইংল্যান্ডে নাট্য থার সংখ্যা কম না এবং তাদের ত নিত্য সাগর পারাপারে সক্ষম। ্নের "ওল্ড ভিক" থিয়েটারের নাম ্বর যে কোনো দেশের নাট্যামোদী ই জানেন। ক্লাসিক নাটকগুলির না সাধারণ প্রযোজনা, এবং অসাধারণ ভনয়ের মঞ্চস্থল হল এই "ওল্ড ভিক" ্গালয়। ১৯৪৬ সালে এই রঙ্গালয়ের ্ম ব্রিস্টলে একটি নাটকের দলও াপিত হয়েছে। ইংল্যান্ডের ওল্ড ভিক ন্ট দি ব্রিস্টল ওল্ড ভিক কোম্পানীর াপায়িতা। ব্রিস্টলের 'থিয়েটার রয়েল' ই সংস্থা তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ করে কেন। এই রঙ্গমঞ্চটি কিন্তু বৃটেনের ্চেয়ে পুরোনো রঙ্গালয়; স্থাপনকাল, ৭৬৬ খৃষ্টাব্দ। মাত্র ষোলো বছর হল ্থাপিত হলেও ব্রিস্টলের ওল্ড ভিক ্টা সংস্থাটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম ্জন করেছেন। লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডেও ই দলটি প্রায়ই নাটক মঞ্চস্থ করেন। ৯৫৪ সালে এ'দের প্রযোজিত ্স্যালাডডেজ" নাটকটি ও'য়েস্ট এণ্ডে ্কাদিক্রমে প্রায় পাঁচ বছর ্লেছিল। গত বছর দলটি লণ্ডনে ্লস্টয়ের "ওয়ার এ্যান্ড পীস" অবলম্বনে ্যয়বহুল জাঁকজমকপূর্ণ একটি নাটক ্মঞ্চস্থ করেন।

সম্প্রতি বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ্দ ব্রিস্টল ওল্ড ভিক নাটকের দলটি ্ভারত সফরে এসেছেন। এ'দের সফর ্আরম্ভ হবে কলকাতা থেকে। কলকাতা, ্দিল্লী, বম্বে, হায়দ্রাবাদ এবং মাদ্রাজ শহরে যথাক্রমে এই দলটি তিনটি করে নাটক মঞ্চস্থ করবেন। তিনটি নাটকের মধ্যে প্রথম দুটি হল 'হ্যামলেট' এবং শ'র 'আর্মস এ্যান্ড দি ম্যান'। তৃতীয় নাটকটি হল রবার্ট বোল্ট-এর "এ ম্যান ফর অল সিজনস"। "এ ম্যান ফর অল সিজনস"এর নায়ক হলেন ইতিহাসবর্ণিত স্যার টমাস মোর অষ্টম হেনরীর প্রধান অমাত্য। ইংল্যান্ডের রেনেশাঁকালীন স্পিলবেত মোরের ভূমিকা মুখ্য ছিল। রাজা অষ্টম হেনরীর সঙ্গে মোরের বিবাদ ঘটে পোপের অধিকার নিয়ে। ইংল্যান্ডের চার্চের ওপর পোপের সমস্ত ক্ষমতা অস্বীকার করে হেনরী নিজেই কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবাদ করতে গিয়ে জল্লাদের হাতে প্রাণ দিতে হয় স্যার টমাস মোরকে। নাট্যকার রবার্ট বোল্ট কিন্তু 'অনায়কচিত নায়ক'রূপে উপস্থিত করেছেন মোরকে। নাট্যকার বোল্ট নাটকটিকে একটি ঐতিহাসিক নাটকে মাত্র রূপায়িত করতে চাননি। নাটকের সমস্ত চরিত্রই তাদের জীবনের সমস্যাকে একেবারে খাঁটি আধুনিক রীতিতে গ্রহণ করেছে। দর্শকদের কাছেও এই সমস্যাগুলো কখনই অচেনা মনে হয় না। বিগত শতাব্দীর মঞ্চের দর্পণে দর্শকদের মুখকেই প্রতিফলিত করেছেন নাট্যকার রবার্ট বোল্ট। নাটকটি পরিচালনা করবেন ডেনিস কেরী। কেরী 'হ্যামলেট' নাটকটিরও পরিচালক। টমাস মোর-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন অলিভার নেভিল।

দি ব্রিস্টল ওল্ড ভিক দলে যে সমস্ত পরিচালক অভিনেতা অভিনেত্রী প্রভৃতি এসেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই ইতিপূর্বে পৃথিবীর অনেক দেশে অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। ডেনিস কেরী লণ্ডনের 'ওল্ড ভিক' নাটক প্রযোজনা করতেন। পিটার উস্টিনভ-এর মঞ্চসফল নাটক "রোমানফ এ্যান্ড জুলিয়েট"এর পরিচালনা করেছেন কেরী। কেরী বর্তমান পর্যায়ে 'হ্যামলেট এবং "এ ম্যান ফর অল সিজনস"এর পরিচালনা করবেন। কেরীর স্ত্রী ইভন কোলেটও এই দলে আছেন। 'স্যালাড ডেজ', 'এনটোনি এ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাভাজন হয়েছেন কোলেট। অলিভার নেভিল পরিচালনা করবেন 'আর্মস এ্যান্ড দি ম্যান'। তিনি লণ্ডনের 'ওল্ড ভিক' রঙ্গমঞ্চের পুরোনো অভিনেতা। ব্যারি ওয়ারেন 'ফাইভ ফিঙ্গার একসারসাইজ' খ্যাত অভিনেতা। কলকাতায় তাঁকে হ্যামলেটের ভূমিকায় দেখা যাবে। ওফেলিয়ার এবং রেইনার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সারা বাডেল। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা আলেন বাডেল-এর কন্যা ইনি। এছাড়াও আরো বারোজন অভিজ্ঞ অভিনেতা এই দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছেন।

দি ব্রিস্টল ওল্ড দলের পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য কলাকুশলীদের চিত্র

নান্দীকর

আজকের কথা

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তিরোধানে আমরা বাঙলা রঙ্গমঞ্চের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ এবং নাট্যলক্ষ্মীর একজন একনিষ্ঠ সেবককে হারালুম। বাঙলার নাট্যজগৎ সংশিলষ্ট প্রতিটি অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার, মঞ্চমায়াকর, স্মারক, বাদ্যকার, দ্বাররক্ষক, টিকিট-বিক্রেতা এবং অপরাপর বিভাগীয় কর্মী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহভাজন আপন জন। রঙ্গালয়কে তিনি যেমন ভালোবাসতেন, তেমনই ভালোবাসতেন নাটককে। এই নাটক ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে একেবারে সহজাত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর আপন গ্রাম, বিক্রমপুর জেলার বিদগাঁও-এর ছেলেরা ১৮৮৮ সালে অভিনয় করেছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অশ্রুমতী" নাটক। তখন হেমেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ন'বছর। কিন্তু সেই অভিনয়ই তাঁর মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত ক'রে যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেই অভিনয়ের কথা ভুলতে পারেননি। সেই বাল্য বয়েসেই যাত্রা, থিয়েটার দেখতে তাঁর উৎসাহের অবধি ছিল না। দশ এগারো বছর বয়েসে দেখা যাত্রাভিনয়ে "সিন্ধুবধ" পালা দেখে তাঁর মনে যে কারুণ্যের সঞ্চার হয়েছিল, তার স্মৃতিও তাঁর মন থেকে কোনো দিনই মুছে যায়নি। ঢাকায় স্কুলে পড়বার সময়ে তিনি সেখানকার ক্রাউন থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটক "পূর্ণচন্দ্র"-এর অভিনয় দেখেন। এই প্রথম গিরিশচন্দ্রের রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এটা ১৮৯৩ সালের কথা অর্থাৎ তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৫ বছর। ১৮৯৫

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সালে যখন স্টার থিয়েটার ঢাকায় অভিনয় করতে যায়, তখন "সীতার বনবাস", "একাকার", "নরমেধ যজ্ঞ" প্রভৃতি নাটকে তিনি অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, অক্ষয়-কালী কোঙার, গঙ্গামণি, নরীসুন্দরী, নলিনী প্রভৃতি সে যুগের প্রসিদ্ধ নট-নটীর অভিনয় দেখবার সুযোগ লাভ করেন। এইভাবে নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ ক্রমেই বাড়তে থাকে। ১৯০৭ সালে যখন আইন পরীক্ষা দেবার জন্যে তিনি কলকাতায় ছিলেন, তখন পরীক্ষা হয়ে যাবার পরেও তিনি অন্ততঃ তিন হপ্তা ধ'রে কলকাতার তখনকার প্রতিটি নাট্যাভিনয় দেখে নিজের নাট্য-পিপাসা চরিতার্থ করেন। এবং এর পরের বছরেই আবার তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র রচিত ও অভিনীত "শাস্তি কি শান্তি" দেখবার সুযোগ পান। পরবর্তী জীবনে এই "শাস্তি কি শান্তি" নাটকে তিনি গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ (দানীবাবু) অভিনীত "প্রসন্নকুমার" চরিত্রে নিজে অভিনয় ক'রে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর মনে যে স্বাদেশিকতার প্রেরণা জাগে, তার মূলেও আছে তাঁর নাট্যাভিনয় প্রীতি। তিনি নিজে স্বীকার ক'রে গেছেন, "স্বদেশী আমি বুঝিতাম না—বিশেষতঃ ইংরাজ জাতির উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল।......স্বদেশী না বুঝিলেও ছাত্রদের অনুরোধ এড়াইতে পারিতাম না। সভায় যাইতে হইত। আর যাহা বলিতাম, তাহা যন্ত্রচালিত পুতুলের মত। ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।......সকলেই উত্তেজক বক্তৃতা দিয়াছেন।......তবে এত বক্তৃতা শুনিলাম, প্রাণে কিন্তু কোন রেখা-পাত হইল না।......বোধ হয় কংগ্রেস

মুক্তি প্রতীক্ষিত
স্বর্ণচোরা
চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য

অধিবেশন শেষ হইবার দিন কি তার পরের দিন আমাদের গ্রামের সমবয়সী জ্ঞাতি খুল্লতাত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (পাঁচুবাবু) আমাকে সঙ্গে নিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে উপস্থিত হন। সেরাত্রে সিরাজদ্দৌলার অভিনয় হইতেছিল।...... যাহা দেখিলাম, জীবনে কখনও ভুলিতে পারি নাই। যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। সিরাজের দেশপ্রেম, মোহনলালের বীরত্ব ও মিরজাফরের প্রতি ভীরোক্তি, ক্লাইভের বীরোচিত বাক্যপ্রয়োগ ও আচরণ এবং পরিশেষে করিম-চাচার শ্লেষোক্তি আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। দানিবাবুর 'ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুষমন" কথা এখনও কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে।......দুই একদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের মিরকাশিম নাটকের অভিনয় দেখিয়া স্পষ্ট ধারণা হইল কিরূপে স্বার্থপর ইংরেজ বণিক আমাদের দেশজাত কাপড় প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দিয়াছে, শিল্প নষ্ট করিয়াছে, দেশপ্রেমিক মিরকাশেমের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং
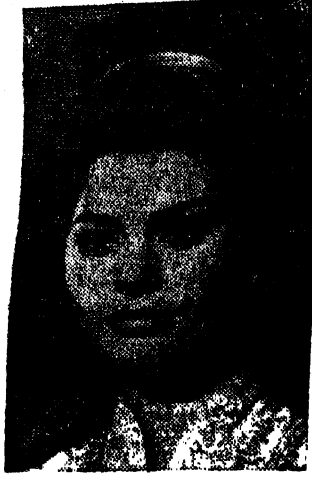
"এল সিড" চিত্রের নায়িকারূপে সোফিয়া লোরেন।

ইংরাজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করিয়াছে।...... ইহার পরেই দেশকে ভালবাসিতে লাগিলাম। এদেশে ইংরাজের অবস্থান আর মনঃপূত হইল না। এই আমার স্বদেশমন্ত্রে প্রথম দীক্ষা হইল আর তাহা হয় গুরুর সাক্ষৎ প্রত্যক্ষ দর্শনে নয়—পরোক্ষ আকর্ষণে।"

হেমেন্দ্রনাথ নিজে অভিনয় করতে ভালোবাসতেন। অভিনয় ক'রে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন এবং বলতেন, "ইহাতেই আমার জীবনের সরসতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।" ১৯০৯ সালে ময়মনসিংহে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালার সাহায্যের জন্যে যখন রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" অভিনীত হয়, তখন এই নাটকে তিনি একটি শিকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর নিজের হিন্দি জানা থাকায় সেই ছোট্ট ভূমিকাটিকে তিনি এমনভাবে তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন এবং কুমার সেনকে প্রণাম ক'রে বিদায় নেবার সময়ে এমন একটা বিষাদাচ্ছন্ন ভঙ্গী ক'রে তাঁর সংলাপটি বলে গেলেন যে, উপস্থিত সকলেই করতালি ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করে। এই হচ্ছে হেমেন্দ্রনাথের প্রথম মঞ্চাবতরণ। এর পর ১৯২২ সালে তিনি তাঁর স্বগ্রামে গিরিশচন্দ্রের "বলিদান" নাটকের প্রধান চরিত্র করুণাময়-এর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে গ্রামস্থ সকলের প্রশংসা লাভ করেন; হেমেন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু বলেন, তাঁর বাণী তখনও শুদ্ধ হয়নি এবং মাঝে মাঝে বিক্রমপুরী উচ্চারণ এসে গিয়েছিল। এর পর তিনি জয়দেব-এ 'জয়দেব', প্রফুল্ল-এ 'যোগেশ', বিল্বমঙ্গল-এ 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি ভূমিকাও তিনি তাঁর স্বগ্রামেই অভিনয় করেন। ১৯১৬ সালে কলকাতায় ৫, ল্যান্সডাউন লেনে যখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নাম দিয়ে একটি সমিতি (খেলাধুলায় প্রখ্যাত ইস্টবেঙ্গল নয়) স্থাপিত হয়, তখন তিনি সেই ক্লাবের হয়ে গৃহলক্ষ্মী নাটকে 'উপেন্দ্র'-এর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। এই অভিনয় হয় ১৯১৭ সালের ১৩ই মে। এরপর নানা উপলক্ষে নানা জায়গায় তিনি অভিনয় করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে ধৃত হয়ে জেলের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" নাটকে অভিনয়। জেলের মধ্যে অভিনয় এই প্রথম হয়; হেমেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিই এ-বিষয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। এরপর যখন ১৯৪৩ সালে গিরিশচন্দ্রের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় এবং তার স্মৃতি জাগরূক রাখবার জন্যে 'গিরিশ পরিষদ' জন্মগ্রহণ করে, তখন থেকে হেমেন্দ্রনাথ এই পরিষদের পক্ষে বহু অভিনয় করেছেন। এরপর ১৯৪৮ সালে তিনি যখন "গিরিশ সংসদ"-এর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তার হয়েও তিনি বহু নাটকে অবতীর্ণ হন। ১৯৬২ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "শাস্তি কি শান্তি"তেই তিনি শেষবারের মত অভিনয় করেন।

রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস রচনায় হেমেন্দ্রনাথকে পথিকৃত বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর "ইণ্ডিয়ান স্টেজ" ও "ভারতীয় নাট্যমঞ্চ" পরবর্তী নাট্যেতিহাস রচয়িতাগণের কাছে অমূল্য সম্পদ। গিরিশচন্দ্রের তিনি ছিলেন একলব্য শিষ্য। তাঁর "গিরিশপ্রতিভা" ও "ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র" তাঁর গিরিশভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন। রঙ্গমঞ্চ এবং বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞানের স্বীকৃতি স্বরূপেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক নিযুক্ত হন ১৯৩২ সালে। "নাটক, মঞ্চ, নাট্যশিল্পকে

বলিষ্ঠ জীবনদানের সাধনা করেছেন তিনি।" বাঙলাদেশ এবং বাঙলার রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাধনা যতদিন থাকবে, ততদিন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্বর্ণখোদিত নামও তার সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাকবে।

হেমেন্দ্রনাথের জীবন ছিল বহুমুখী। তিনি শিক্ষকতা করেছেন, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানে সংগঠক ও প্রধান বীমাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, ফৌজদারী আইন-জীবীরূপে আদালতে গেছেন, সমাজসেবা করেছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব করেছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ভীক তেজস্বিতার সঙ্গে তিনি সাফল্য অর্জন ক'রে তাঁর স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ব্যক্তি হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন অকপট, সরল, পর-হিতপ্রাণ, বন্ধু ও আশ্রিতবৎসল, এক-নিষ্ঠ, নিরলস ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। আদালতের পোশাক ছাড়া সব সময়েই তিনি ছিলেন খদ্দরধারী।

আমরা এখানে মাত্র তাঁর নাট্যজগৎ সংক্রান্ত কার্যাবলীরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি।

চিত্র সমালোচনা

শেষ অঙ্ক (বাঙলা) : কল্পনা মুভীজ (প্রাইভেট) লিমিটেডের নিবেদন. ৩৭৪৬ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য; কাহিনী : রাজকুমার মৈত্র: সংগীত-পরিচালনা : পবিত্র চট্টোপাধ্যায়: চিত্রগ্রহণ : কানাই দে; শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল; সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; সংলাপ ও গীতরচনা : শ্যামল গুপ্ত; সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী; শিল্প-নির্দেশনা : রামচন্দ্র সিন্ধে; রূপায়ণ : উত্তমকুমার, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, উৎপল দত্ত, পাহাড়ী সান্যাল, দীপক মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়; তরুণকুমার, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, জীবেন বসু, শর্মিলা ঠাকুর, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কল্পনা মুভীজ (প্রাঃ) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"শেষ অঙ্ক" একটি রহস্যপূর্ণ গোয়েন্দা কাহিনী।

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সুধাংশু গুপ্ত তাঁর প্রথমা স্ত্রী অর্ধোন্মাদ কল্পনার
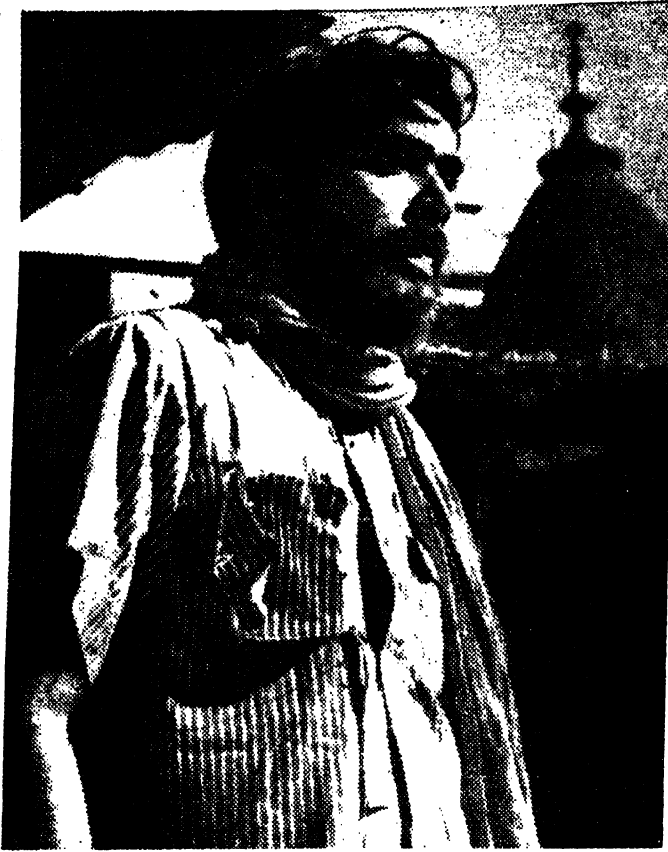
মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত জরাসন্ধের 'ন্যায়দন্ড' চিত্রে অসিতবরণ

'মৃত্যুর পর আবার ক'রে সংসার পাততে চলেছেন স্যার হরপ্রসাদের একমাত্র সুন্দরী কন্যা সোমাকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী ক'রে। সোমা জানে, সুধাংশুর প্রথমা স্ত্রী কল্পনা চলন্ত ট্রেনের তলায় প'ড়ে আত্মহত্যা করেছে: সুধাংশুই তাকে সেই কথা বলেছে। সোমা বলে, দুর্ভাগা কল্পনার, এমন স্বামী পেয়েও সে ঘর করতে পারল না।

কিন্তু সুধাংশুর সংসার পাতা হ'ল না। ঠিক বিবাহবাসরে এসে হাজির হলেন আইনজীবী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে একজন অবগুন্ঠনবতী কন্যা। সুরেন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন, সুধাংশুর প্রথমা স্ত্রী কল্পনা মৃতা নন, সশরীরে জীবিতা: কারণ তাঁর সঙ্গের ঐ অবগুন্ঠনবতী কন্যাটি আর কেউ নন, সুধাংশুর প্রথমা স্ত্রী কল্পনা এবং আইনানুসারে এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করা দন্ডনীয় অপরাধ। ঘোষণা শুনে সকলেই চমকিত হ'ল এবং সবচেয়ে বেশী চমকিত হ'ল সুধাংশু নিজে। এ কি আপদ! এ কোথাকার কে এক মেয়ে নিজেকে কল্পনা ব'লে জাহির করতে এসেছে কোন্ অভিসন্ধি নিয়ে! কিন্তু উকীল সুরেন্দ্রনাথকে সুধাংশু কিছুতেই বোঝাতে পারে না যে, ওই মেয়েটি জাল কল্পনা সেজে বিভ্রাট ঘটাতে এসেছে। আর মেয়েটি? সেই অবগুন্ঠনবতী কন্যা? সকল লজ্জা পরিহার ক'রে সে সুধাংশুর পায়েরতলায় লুটিয়ে পড়েছে—'ওগো, তুমি কেন আমায় চিনতে চাইছ না? আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলুম, কিন্তু আমি মরিনি—আমি সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এসেছি তোমারই কাছে। তুমি ওই মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে সুখী হতে চাইছ?—তাই হও; সতীন নিয়ে ঘর করতে আমার কিছু আপত্তি নেই। মাত্র আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।' ইত্যাদি বলে সে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। একি ভীষণ চক্রান্ত। ষড়যন্ত্রের রহস্য ভেদ করবার জন্যে সুধাংশু অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার শেখর চাটুজ্জের শরণাপন্ন হ'ল; তিনি ইনস্পেক্টার অনিল বসুকে সঙ্গে ক'রে সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন। বিবাহ রইল স্থগিত। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। কে বা কারা সুধাংশুর শয়নকক্ষের আলমারি থে'ক কয়েকটা প্রামাণিক জিনিস বেমালুম সরিয়ে নিয়েছে: অ্যালবাম থেকে কল্পনার ছবি সরিয়ে নিয়ে সেখানে সুন্দরভাবে এ'টে দিয়েছে জাল কল্পনার ছবি, তার ব্যবহারকরা বালা, হার, কানের দুল, আংটি নিয়ে গেছে, আর নিয়ে গেছে তার দু'খানা ডায়েরী এবং পরিবর্তে রেখে গেছে অন্য কার হাতের লেখা দু'খানা ডায়েরী। সুধাংশুর সমস্তটাই ভোজবাজী মনে হল। আদালতে মামলা উঠল; সুধাংশুর ব্যারিস্টার মিত্রকে জাল-কল্পনার উকীল সুরেন বাঁড়ুজ্জে প্রায় নাজেহাল করবার দাখিল। এমন কি রেঙ্গুনের করোনারের রিপোর্টকেও সুরেন-উকীল উড়িয়ে দিল এই ব'লে যে, ঐ রিপোর্টে লেখা থাকলেও মৃতা যে সুধাংশুর স্ত্রী কল্পনা, এটা স্বীকার করা যায় না; কারণ ঐ রিপোর্টে কে... হয়েছে মাত্র সুধাংশুর সাক্ষ্যর উপর নির্ভর ক'রেই। অতএব সুধাংশু হয়ে পড়ল নাচার। সুধাংশুর মনে হ'ল, একমাত্র মুস্কিলআসান করতে পারে, কল্পনার আপন ভাই দেবেন সেন, যে নেভীতে যোগ দিয়ে কোন্ মুলুকে রয়েছে, তা' অত্যন্ত অনুসন্ধানসাপেক্ষ। তবু তাই করতে হবে; যে-কোনো উপায়ে দেবেন সেনকে চাই-ই চাই। চারিদিকে টেলিগ্রাম চ'লে গেল এবং অনেক উৎকন্ঠার পর দেবেন সেন এসে হাজিরও হ'ল। কিন্তু সুধাংশু?—তাতেই কি সুধাংশু পরিত্রাণ পেল? যে সুধাংশু গুন্ত ট্রেনের আওয়াজে উন্মনা হয়ে ওঠে, সন্ধ্যার অন্ধকারে লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের কামরায় আলো-

। মুখের ওপর প্রতিফলিত হ'লে ক্ষণের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে প'ড়ে, পর্যন্ত তার কি হ'ল, তাই নিয়েই । শেষাংশ বা শেষ অঙ্ক। দেবেন সেন র পর থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত টিকে ছবিটির চমকপ্রদ স্টান্ট অংশ : সম্ভবতঃ অধিকতর যুক্তিসংগত।

দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে গোড়া ; শেষ পর্যন্ত "শেষ অঙ্ক"-এর নাট্যটিকে এমন সুকৌশলে রচনা হয়েছে যে, দর্শক-কৌতূহল ছবি বার সংগে সংগে উত্তরোত্তর বর্ধিতই চলে এবং একেবারে শেষের দিকে র পর চমকের সম্মুখীন হওয়ায় কে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে একেবারে ছবির চূড়ান্ত শেষ দেখবার । মূল কাহিনীতে অবশ্য অনেক ত্রুটি আছে। কোনো মৃতদেহ র্ক ময়না তদন্তের পর করোণার একটি সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর ক'রেই র্ট রচনা করেন, এমন কথা আজও ত কেউ শোনেনি। এবং এ-ক্ষেত্রে সুধাংশু ছাড়াও তার বাড়ীর দাস-দের ও আরও পরিচিত পাঁচজনের ; প্রমাণ নেবার সুযোগ ছিল। ড়া ট্রেণে চাপা প'ড়েই মৃত্যু হয়েছে, অন্য কোনো উপায়ে মৃত্যু ঘটিয়ে দেহকে চলন্ত ট্রেণের চাকার পিষ্ট হ'তে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষাও করোণার নিয়মিত-ক'রে থাকেন। এবং ময়না তের সময় কারোণার মৃতের জীবিতা-ও মৃত অবস্থা—দুইয়েরই বহু টো রাখেন সনাক্তকরণের সুবিধার । সুধাংশু যখন দেখল, তার কাছে ফোটো চুরি হয়ে গেছে, তখন সে য়াসেই কোর্টের সাহায্যে রেঙ্গুন ণার আদালত থেকে সেইসব ফোটোর আনিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ত। এর ওপর করোণারের রিপোর্টকে লতে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করা কোন্ ক্ষেত্রে সম্ভব, সে-প্রশ্নও আছে। মূল কাহিনীর এইসব ত্রুটি ও লতা অনেকাংশেই ঢেকে গেছে একটি বেন্ধ চিত্রনাট্য রচনার গুণে।

"শেষ অঙ্ক"-এর বিশেষ গুণ হচ্ছে টির আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতা। অত্যন্ত ও যত্নের সংগে এর প্রতিটি দৃশ্যের টি সট গৃহীত হয়েছে; বাস্তব দৃশ্য থাপনা বা দৃশ্যসজ্জা বা ক্যামেরা-নয়ের কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটতে য়া হয়নি। এবং এ ব্যাপারে চিত্র-শী কানাই দে পরিচালক হরিদাস চার্যের সংগে অসামান্য সহযোগিতা ছেন; ছবিটির আলোকচিত্রের কাজ ই অসাধারণের পর্যায়ে প'ড়ে। ব দৃশ্য সৃষ্টিতে রামচন্দ্র সিন্ধে ষ্ঠানের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি। টিতে দু'খানি মাত্র গান আছে; দুটিই ীত হয়েছে। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় সৃষ্ট আবহ-সংগীত রহস্যমূলক ঘটনার প্রাণ-দানে যথোচিত সাহায্য করেছে। সম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলী নিপুণহাতে কাঁচি চালিয়ে ছবির গতিকে সুষম ছন্দে চালিত করেছেন।

রহস্যমূলক ছবির নায়কের অবস্থার দাস হওয়া ছাড়া সম্ভবতঃ কোনো কর্তব্যই নেই। তবু উত্তমকুমার তাঁর গৃহীত চরিত্রে একটি ব্যক্তিত্ব আরোপে সমর্থ হয়েছেন এবং যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন, সেখানেই তাঁর নাটনৈপুণ্য দেখাবার ত্রুটি করেননি। শর্মিলা ঠাকুরের সোমা একটি স্বর্গীয় সুষমা পেয়েছে তাঁর দৈহিক শ্রী ও সংযত অভিনয়গুণে। কিন্তু এই ছবিতে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন করঞ্জাক্ষ সমাদ্দারের কুটিল ভূমিকায় বিকাশ রায়। কখনও সেলিম মিঞা, কখনও রমণী হালদার-বেশী এই করঞ্জাক্ষ সমাদ্দারই হচ্ছেন "শেষ অঙ্ক"-এর করিৎকর্মা কেন্দ্র-চরিত্র, যিনি সকল নাটের গুরু, যাঁর বুদ্ধিতে সকল ঘটনা ঘটছে। বেশে, বাসে, কথা-বার্তায়, হাসিতে, অংগ ও চলনভংগীতে ভূমিকাটিকে একটি জীবন্ত গোলকধাঁধায় পরিণত করেছেন বিকাশ রায়। করঞ্জাক্ষ সমাদ্দার-এর ভূমিকাটি তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে। মিস লতার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বিকাশ রায়কে যথাযথ সাহায্য করেছেন। অপরাপর ভূমিকার মধ্যে কমল মিত্র (সুরেন উকিল), দীপক মুখোপাধ্যায় (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শেখর চট্টোপাধ্যায়), রেণুকা রায় (মিস মেরী কমলা পাইন), তরুণকুমার (দেবেন সেন), পাহাড়ী সান্যাল (স্যার হরপ্রসাদ), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (ইনস্পেক্টর অনিল বসু), উৎপল দত্ত (ব্যারিস্টার মিঃ মিত্র) প্রভৃতি শিল্পী যথাযোগ্য নাটনিপুণতা দেখাতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেননি।

রহস্যমূলক গোয়েন্দাচিত্র হিসেবে "শেষ অঙ্ক" বাঙলার চিত্রজগতে একটি স্মরণীয় সংযোজন।

বিবিধ সংবাদ

চিত্রালয়-এর "দুই বাড়ী" :

আজ শুক্রবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে চিত্রালয় প্রযোজিত, ন্যাশনাল মুভীজ পরিবেশিত এবং অসীম পাল পরিচালিত "দুই বাড়ী" রাধা, পূর্ণ, প্রাচী এবং শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। শৈলেন দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তন্দ্রা বর্মণ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, রেণুকা রায় প্রভৃতি কৃতী শিল্পী। ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন কালিপদ সেন।

শিল্প ভারতীর "স্বর্ণচোরা" :

বনফুলের কাহিনী 'স্বর্ণচোরা' চিত্রায়িত হয়েছে পরিচালক অরবিন্দ মুখো-

পাধ্যায় দ্বারা। হেমন্তকুমারের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিখানিতে দেখতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যা রায়, গীতা দে, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতিকে। সিনে ফিল্মস-এর পরিবেশনায় ছবিটি শিগ্‌গিরই উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

স্টার থিয়েটারে "অপমানী" :

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের কাহিনী দেবনারায়ণ গুপ্ত দ্বারা নাটকাকারে গ্রথিত এবং পরিচালিত হয়ে অতি শীঘ্রই স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হচ্ছে। এই নাটকে নাট্যামোদী রসিক সুধীবৃন্দকে সর্বপ্রথম অভিবাদন জানাবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মঞ্জু দে। এই নাটকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত সমৃদ্ধ হবে এবং সে বিষয়ে সুরারোপে সাহায্য করছেন রবীন্দ্রসুরভান্ডারী অনাদি দস্তিদার।

দি 'ব্রিস্টল ওল্ডভিক' সম্বর্ধনা

আগামী শনিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপা থিয়েটার ও নাট্য উন্নয়ন পরিচালনা পরিষদ 'দি ব্রিস্টল ওল্ডভিক'এর শিল্পী ও কলাকুশলীদের অভ্যর্থনা জানাইবেন।

'সংক্রান্তি'

লিভার স্পোর্টস ক্লাবের নবম বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ২৯শে জানুয়ারী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়েছে। তিন হাজার এক টাকার একটি চেক কে, এস, রায় টি, বি হাসপাতালের জন্য অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ এন এন সেনের হাতে দেওয়া হয়। আই, পি, টি-এ-এর প্রান্তিক শাখার শ্রীসুশীল ব্যানার্জির সার্থক পরিচালনায় শ্রীবিরু মুখার্জির সামাজিক নাটক 'সংক্রান্তি' ক্লাব সদস্যগণের দ্বারা সার্থকভাবে অভিনীত হয়। পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের যে স্বাভাবিকতা ও সার্থক নাটকীয় রূপটি ফুটে ওঠে তা সচরাচর চোখে পড়ে না।

'হাই হিল' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

'মন দিল না বঁধু' চিত্রে তুলসী চক্রবর্তী

সমগ্র অভিনয়টিই ছিল নিখুঁত। বিশেষ করে রতন এবং নিস্তারিণীর ভূমিকায় জে শর্মাধিকারী এবং মানসী ব্যানার্জির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

।। "সাধক রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয় ।।

বাগবাজারের অন্যতম নাট্যসংস্থা রাজবল্লভপাড়া ব্যায়াম সমিতির কর্তৃপক্ষগণ আমোদ-প্রমোদ বিভাগের উদ্যোগে আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ নব-বৃন্দাবন ধামে "যুগসূর্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব" উপলক্ষে শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যুগ্ম-নাট্যপরিচালনায় "সাধক রামপ্রসাদ" যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করেছেন। সুরসংযোজনায় ও নাম-ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করবেন সুগায়ক শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ।

* কলকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ

কলকাতা

অঞ্জন ফিলমস পরিবেশিত হিমালয় পিকচার্স'র 'অগ্নিবন্যা' মুক্তি প্রতীক্ষিত। সম্প্রতি এ ছবির সম্পূর্ণ কাজ শেষ করলেন পরিচালক পাঁচু বসাক। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেছেন

"প্রিমেচিয়োর বেরিয়াল" ছবিতে হেজেল কোর্ট। ছবিখানি ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে লাইট হাউসে প্রদর্শিত হবে।

জেমিনির 'গৃহস্থ' চিত্রে মনোজকুমার ও রাজশ্রী

বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অসিতবরণ, তরুণকুমার, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, ধীরাজ দাস, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, ও তপতী ঘোষ অন্যতম। এ ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক।

বি এণ্ড বি প্রোডাকসন্সের 'মৌন মুখর' ছবির কাজ শুরু হয়েছে। ত্রয়ী গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করছেন। শেখর রায় রচিত এ কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্রনাট্য, তার প্রধান অংশে অভিনয় করছেন নির্মলকুমার, ভারতী রায়, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ।

ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্সের 'হাসি শুধু হাসি নয়' ছবির কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ছবিটির সম্পাদনা শেষ করছেন সম্পাদক সুবোধ রায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। নবগোষ্ঠী সংস্থা এ ছবির পরিচালক। চরিত্র চিত্রণে বহুশিল্পীর সমাবেশ এ চিত্রের প্রধান আকর্ষণ। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন জহর রায়, বিশ্বজিৎ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অজিত চ্যাটার্জি, নৃপতি চ্যাটার্জি, নীতিশ মুখার্জি, মণি শ্রীমানী, শীতল ব্যানার্জি, তুলসী চক্রবর্তী, বীরেন চ্যাটার্জি, কল্যাণী ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, গৌরী মজুমদার, জয়শ্রী সেন ও রাজলক্ষ্মী দেবী। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্যামল মিত্র।

আনন্দময়ী চিত্রপীঠের প্রথম প্রয়াস কালীঘাটের কাহিনী নিয়ে 'মহাতীর্থ কালীঘাট'। ছবিটি পরিচালনা করছেন ভূপেন রায়। ভক্তিমূলক এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সমরেশ দাস, অসিতবরণ, মিহির ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার, অজিত ব্যানার্জি, অমর মল্লিক, সিপ্রা মিত্র, রাধারাণী ও শম্পা চক্রবর্তী। সংগীতবহুল এ ছবির সংগীত পরিচালক রথীন ঘোষ। কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, মাধুরী চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় অধিকারী।

বোম্বাই

'এক রাজ' ছবির সম্প্রতি বহির্দৃশ্য গৃহীত হল পুণা অঞ্চলে। একটি গানের দৃশ্যে নায়ক কিশোরকুমারের কন্ঠে পরিচালক শক্তি সামন্ত ছবির প্রধান অংশের কাজ শেষ করে বোম্বে ফিরেছেন। এ ছবির সংগীত পরিচালক চিত্রগুপ্ত। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন যমুনা, প্রাণ, আগা, জীবনকলা, নিরঞ্জন শর্মা ও ললিতা পাওয়ার।

রঞ্জিত স্টুডিওর পরিচালক বাবুভাই মিস্ত্রী 'পরশমণি'-র কাজ আরম্ভ করেছেন। তরুণ শিল্পী সমাবেশে এ ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হচ্ছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মহিপাল, গীতাঞ্জলি, মনহর দেশাই, অরুণা ইরাণী, উমা দত্ত, নলিনী ও হেলেন। সংগীত পরিচালক চিত্রগুপ্ত।

একটি প্রণয়মধুর ছবি 'যবসে তুমহে দেখা হায়'। সম্প্রতি প্রদীপকুমার ও গীতাবালিকে নিয়ে এ ছবির মধুর দৃশ্যগুলি গৃহীত হল। কেদার কাপুর ছবিটির পরিচালক। দত্তরাম এ ছবির সংগীত পরিচালক।

নটরাজ প্রোডাকসন্সের 'গজল' চিত্রে মিনু মমতাজ অভিনয়ের জন্য সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন সুনিল দত্ত ও মীনাকুমারী। পরিচালনা ও প্রযোজনায় রয়েছেন মদন এবং ভেদ। কাহিনী ও সংগীতে সুরসৃষ্টি করছেন নিশার আক্তার ও মদনমোহন।

মাদ্রাজ

প্রযোজক-পরিচালক এস বালাচন্দর তাঁর দলবলসহ আমেরিকা সফর শেষ করে ফিরেছেন। এই সফরে তিনি 'মাদ্রাজী সংগীত' পরিবেশন করে ভারতীয় সংগীতকলার মান উন্নত করেন। এছাড়া কর্ণাটি ও হিন্দুস্থানী সংগীতও পরিবেশিত হয়।

ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ওয়েলফেয়ার সাহায্য অনুষ্ঠানে সাবিত্রী গণেশন, জেমিনী গণেশন, ভি রাজাগোপাল, নাগেশ এবং কে বালাজী এক মটর-দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সাবিত্রী দেবী তাঁর 'চেভরোলেট' গাড়ীতে একমাত্র মহিলা প্রতিযোগী ছিলেন।

—চিত্রদূত

জনপ্রিয় উপন্যাস এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সাফল্য নাটক সুবোধ ঘোষের 'শ্রেয়সী' চলচ্চিত্রে রূপ নিচ্ছে। সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় শ্যাম চক্রবর্তী এ ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন।

স্টুডিও ফ্লোরে শিল্প-নির্দেশক সুনীল সরকার কাহিনীর যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। দেখলে মনে হবে এই সেই রসিকপুরের শেষ বংশধর কমল বিশ্বাসের ...গা রাজবাড়ি। লোকের চোখে বাড়ি দুশো বছরের একটা করুণ বিদ্রূপের অবশেষ বলে মনে হয়। পুরনো নামটা আজও আছে। যদিও পুরনো রূপটা আজ আর নেই। একটা প্রাণহীন জীর্ণতার বিরাট স্তূপের মত পড়ে আছে এই পড়ো-বাড়িটা। এক একটা ফাটল-ধরা থামের মাথা থেকে ছাদের ভার খসে পড়েছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইঁটের সেই সব স্তূপের ওপর আগাছার ভিড় সবুজ হয়ে রয়েছে। এই ভাঙ্গা-বাড়ির অভিশাপে পঁয়ষট্টি বছর বয়েসের মিথ্যাচারী কমল বিশ্বাস বড় বেশি চিন্তিত। বিশ্বাস বংশের সাত-পুরুষ আগের সেই বিরাট সৌভাগ্যের কিছু সঞ্চয় আজ আর এক কণামাত্র নেই। এমন কি বিশ্বাস মশাইয়ের শেষ স্কুল মাস্টারির কাজটাও ছেড়ে দিতে হয়েছে বুকের ব্যথার জন্য। শুধু সান্ত্বনা সেই বনেদী গল্প-কথা। এ বাড়ির কোন্ একটা থামের নীচে নাকি কলসি-ভরা মোহর লুকোনো আছে। কিন্তু আজ সেই

রাধারাণী পিকচার্সের 'শ্রেয়সী' পরিচালনা করছেন শ্যাম চক্রবর্তী। কেতকী-র ভূমিকায় সাবিত্রী চ্যাটার্জিকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক শ্রীচক্রবর্তী

সোনার কিংবদন্তীর দিন ফুরিয়েছে। কমল বিশ্বাসের সামনে এখন বড় বেশি বাস্তব তার কন্যা ও পুত্রের বিবাহের শেষ কাজটুকু সুসম্পন্ন করা। অথচ সে সামর্থ নেই। কমলবাবুর স্ত্রী সুধাময়ীও ভেবে কুল পান না। তবে কমল বিশ্বাস এখনও বুদ্ধি এ'টে চলেন। হেরে যেতে তিনি রাজী নন। এর মধ্যে এলাহাবাদের ধনী পার্থবাবুর পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যা বাসনার বিবাহের সব পাকা করেছেন। শুধু যৌতুকের টাকাটাই বাকী। অবশ্য এর উপায়ও তিনি করেছেন। রামকানাইবাবুর ভাগ্নী কেতকীর সঙ্গে তাঁর পুত্র অতীনের বিয়েটা এর আগে চুকিয়ে দিতে পারলেই পুত্রের যৌতুকস্বরূপ হাতে অনেক টাকা আসবে। সেই অর্থেই কমলবাবু বাসনার বিবাহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম ফাল্গুন মাসের একটা দিনে তারপর চৈত্র পার হয়ে বৈশাখ মাসের একটা দিনে, রসিকপুরের রাজবাড়ির জীবনের সমস্যা দুটি সন্ধ্যার উৎসবে যেন সানাই-এর সুরের খেলা হয়ে আর আলোর মেলা হয়ে তারপর মিলিয়ে গেল। যাবার দিনে অনেক কেঁদেছিল বাসনা। আর কেতকী কান্নাকে সঙ্গে নিয়ে এই রসিকপুরের রাজবাড়িতে বন্দী হল। মুক্তি পেলেন কমল বিশ্বাস।

নামে রাজবাড়ি। কিন্তু রূপে এবং দারিদ্র্যে একটা রিক্ততার আড়ৎ একথা বুঝতে কেতকীর দু'দিনও সময় লাগে নি। সমাজের বিচারে কেতকীকে সব মেনে নিতে হল। শুধু কেতকীর স্বামী অতীন এ বিয়ে কিছুতেই মেনে নিতে রাজী নয়। কাজরী চৌধুরীর মত মেয়ে যাকে সে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে, সেই সুন্দর মুখের ছবি যার সারা মন জুড়ে ছড়িয়ে আছে, তার পক্ষে এ বিবাহের কোন অর্থ যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই একদিন অতীন খুব সকালে উঠেই এ বাড়ি থেকে বিদায় নিল। একটা মেস-বাড়িতে এসে উঠলো অতীন। সামান্য চাকরীতে তার দিন হেসে-খেলে ভেসে চললো কাজরীর সেই ভালবাসার গুণ টেনে। তারপর একদিন কেতকীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্পর্ক চুকিয়ে অতীন কাজরীকে বিয়ে করলো। তারা নতুন বাড়ীতে নতুন করে জীবনকে আবার রাঙিয়ে তুললো।

এর মধ্যে কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেছে। রসিকপুরের জীবনযাত্রার রূপ হঠাৎ অন্য রূপ নিয়েছে। কেতকী স্কুলের চাকরী নিয়েছে সংসার চালাতে। কেতকীর একটা ছেলে হয়েছে। অবশ্য এই সন্তান নষ্টের জন্য রামকানাইবাবু কেতকীকে বুঝিয়ে ছিলেন। তবে সে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর শেষ সাধের স্পন্দনকে রক্তাক্ত করে কোন এক হাসপাতালের ডাস্টবিনে আবর্জনার মতো ফেলে দিতে রাজী হয়নি।

অপর দিকে অতীন-কাজরীর জীবনে হঠাৎ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের একটা বাধা সৃষ্টি হল। কাজরীদের পরিবারে ধনী উপকারী বন্ধু অসিত মল্ল, জীমূত আর মিঃ গাঙ্গুলীর অবাধ মেলামেশার সুযোগে কাজরী এখন অতীনের কাছ থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছে। পাশের আর একটা নতুন ফ্ল্যাটে তাদের এই প্রত্যহ সান্ধ্য আড্ডা যখন জমে ওঠে তখন অতীন একলা অন্ধকার ঘরে শুধু ভাবে—এমন কেন হল? ভালবাসার এ বন্ধনে ঘুণ ধরলো কি করে! নতুন লাগছে কাজরীকে।

কাজরীর যে এ রকম একটা ছবিময় এগজিবিশনের জীবন আছে, সেটা এতদিন ভুলেই গিয়েছিল অতীন। অথচ কাজরীও যে একদিন তাকে নিজের মুখে বলেছিল—তোমাকে পেয়ে ও সব সাধ ভুলেই গিয়েছি, ছেড়েই দিয়েছি অতীন।

শেষ পর্যন্ত কাজরীর কাছে অতীনের ভালবাসা বিচ্ছেদ আনলো। ভালবাসার প্রতি একটা বিদ্বেষ, একটা ঘৃণা, জন্ম নিল অতীনের ভালবাসা মনের কাছে।

মন্ত্রপড়া একটি করুণ সরল মুখের ছবি অনেক দিন পর অতীনের কাছে স্পষ্ট হল। সে ছবি কেতকীর। অতীন আবার রসিকপুরে যাত্রা করলো। 'শ্রেয়সী' চলচ্চিত্র কাহিনীর এ কয়েকটি প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন কমল বিশ্বাসের ভূমিকায়—কমল মিত্র, সুধাময়ী—পদ্মা দেবী, কেতকী—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কাজরী—সবিতা চ্যাটার্জি (বোম্বে), অতীন—বসন্ত চৌধুরী ও রামকানাই—নিতীশ মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া পার্শ্ব-চরিত্রে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্যাল, রাজলক্ষ্মী দেবী, বিনতা রায়, ভারতী দেবী (অতিথি-শিল্পী), দিলীপ মুখার্জি, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, জীবেন বসু, হরিধন ও তনুশ্রী গাঙ্গুলী। কলাকুশলী বিভাগে রয়েছেন সুর, সম্পাদনা ও আলোকচিত্রে যথাক্রমে রবীন চ্যাটার্জি, রবীন দাস ও বিজয় ঘোষ। রাধারাণী পিকচার্সের কার্তিক বর্মণ এ ছবির প্রযোজক। নর্মদা চিত্র এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

—চিত্রদূত

এ প্রাইজ অব্ আর্মস্ঃ

অপরাধ কাহিনী নিয়ে বৃটেনে কম ছবি তোলা হয়নি আজ পর্যন্ত। ডাকাতির কাহিনী ত চিত্র নির্মাতাদের অতি প্রিয় বিষয়। শেষ পর্যন্ত এমন দিনও আসবে বলে অনেকে আশংকা করছেন যে নতুন বইয়ের অপরাধ কাহিনীর প্লট পাওয়াই কঠিন হবে সিনেমার জন্যে। "এ প্রাইজ অফ আর্মস" ছবিটি কিন্তু অপরাধ চিত্র হিসেবে একেবারে নতুন আবেদনে সমৃদ্ধ হয়ে সম্প্রতি লণ্ডনে মুক্তিলাভ করেছে। এই অপরাধ কাহিনীর নায়ক তিনজন। দুজন ইংরেজ, একজন পোলাণ্ডবাসী। তিনজনেই সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবক্লিষ্ট হয়ে তারা তিনজন অপরাধের পথেই পা বাড়ানোর সংকল্প করল। একটি সৈন্যাবাসে তখন সাগরপারে যুদ্ধাভিযানের মহড়া চলছিল। তারা স্থির করল ঐ সৈন্যাবাসের খাজাঞ্চীখানা থেকেই টাকা সরাবে। দলের নায়ক টারপিন-এর বদ্ধমূল ধারণা যত-বেশী সাহসী হওয়া যাবে, সাফল্যের সম্ভাবনাও ততই বেশী হবে। তিনজনে খাকি পোষাকে সজ্জিত হয়ে একটা মিলিটারী ট্রাক নিয়ে ক্যাম্পের মধ্যে ঢোকে। কিন্তু তার পরেই গোলমাল আরম্ভ হয়, টারপিনের অসাধারণ প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বের ফলে তারা কোনোরকমে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। ক্যাম্পে তখন আসন্ন যুদ্ধাভিযানের জন্যে দারুণ সোরগোল চলছে। কাতারে কাতারে সৈন্য আসছে যাচ্ছে, ফলে ওদের তিন-জনের প্রতি কারোরই দৃষ্টি পড়ছে না। টাকা নিয়ে ওরা তিনজন নির্বিঘ্নে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসে। গাড়ির বাড়তি টায়ারের মধ্যে লুণ্ঠিত টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখা হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ধর্মের কলে বাতাস লেগে গেল। পোলাণ্ডবাসী যুবকটিকে ক্যাম্পে জোর করে টিকে দেয়া হয়েছিল তার ওপর অনেক মদ খেয়ে সে পরে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এবং তার-পর থেকেই সমস্ত ঘটনার পথ গিয়ে পৌঁছল পুলিশে।

"এ প্রাইজ অফ আর্মস" চিত্রটি প্রযোজনা করেছেন জর্জ মেইনার্ড। পরি-চালনা করেছেন ক্লিফ ওয়েন। তিনজন ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করেছে স্টানলিবেকার, টমবেল এবং হেলম স্মিথ। শেষোক্তজন জার্মাণ অভিনেতা।

।। সিনেমা বনাম টেলিভিশন ।।

সিনেমা বনাম টেলিভিশন যু[illegible] সিনেমা একতরফা হেরেই চলে[illegible] বিশেষত পশ্চিমী দেশগুলিতে। সেখ[illegible] আজকাল ঘরে ঘরেই প্রায় টেলিভিশ[illegible] তাই কে আর শখ কোরে শীতে কাঁপ[illegible] কাঁপতে লাইন দিয়ে টিকিট [illegible] সিনেমা দেখতে যাবে। হিসেব দেখা[illegible] সিনেমা-দর্শকের সংখ্যা যে হ্রাস পা[illegible] তা বেশ বোঝা যায়। ১৯৫৬ [illegible] সিনেমার টিকিট বিক্রি হয়েছিল [illegible] মিলিয়ন মার্কের আর ১৯৬১ [illegible] বিক্রি হয়েছে ৬০০ মিলিয়ন মার্ক[illegible] সময়ে কাহিনী চিত্র ও প্রামাণিক [illegible] তোলা হয়েছে মোট ৪০০; অথচ [illegible] দুবছর অনেক বেশী চিত্র [illegible] হয়েছিল। একমাত্র বিজ্ঞাপন [illegible] সংখ্যা ১৯৬১ সালে বৃদ্ধি পে[illegible] দর্শকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় চিত্রগৃহ বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৬৯ বন্ধ চিত্রগৃহের সংখ্যা ২৮৪। অন[illegible] ১৯৫৭ সাল থেকে টেলিভিশনের যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ টেলিভিশনের সংখ্যা ছিল ছয় মি[illegible] এখন সেই সংখ্যা প্রায় সাত মি[illegible] কাছাকাছি। এই হিসেবে ভবিষ্যতে সিনেমার ভবিষ্যৎ [illegible] মনে হয়। ওপরের হিসেবটি পশ্চিম জার্মানীর।

দর্শক

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলা

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৩৯৩ রান (নীল হার্ভে ১৫৪, নর্মান ও'নীল ১০০ এবং এ্যালেন ডেভিডসন ৪৬। স্টাথাম ৬৬ রানে ৩, ডেক্সটার ৯৪ রানে ৩ এবং টিটমাস ৮৮ রানে ২ উইকেট পান)

ও ২৯৩ (ববি সিম্পসন ৭১, ব্রায়ান বুথ ৭৭। ট্রুম্যান ৬০ রানে ৪, স্টাথাম ৭১ রানে ৩ এবং ডেক্সটার ৬৫ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যান্ড ঃ ৩৩১ রান (কেন্ ব্যারিংটন ৬৩, টেড ডেক্সটার ৬১, ফ্রেডী টিটমাস নট আউট ৫৯। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ৮১ রানে ৫ এবং ম্যাকে ৮০ রানে ৩ উইকেট।

ও ২২৩ রান (৪ উইকেটে। কেন্ ব্যারিংটন ১৩২ নট আউট)।

প্রথম দিন (২৫শে জানুয়ারী) ঃ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেট পড়ে ৩২২ রান। উইকেটে অপরাজেয় থাকেন এ্যালেন ডেভিডসন (১৬) এবং বেরী শেফার্ড (৪)।

দ্বিতীয় দিন (২৬শে জানুয়ারী) ঃ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৯৩ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেট পড়ে ১৯২ রান। উইকেটে ছিলেন টেড ডেক্সটার (৫০) এবং ফ্রেডী টিটমাস (২)।

তৃতীয় দিন (২৮শে জানুয়ারী) ঃ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৯টা উইকেটে ৩২৮ রান দাঁড়ায়। উইকেটে অপরাজেয় থাকেন ফ্রেডী টিটমাস (৫৭) এবং স্ট্যাথাম (০)।

চতুর্থ দিন (২৯শে জানুয়ারী) ঃ ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানে সমাপ্ত। অস্ট্রেলিয়ার ৬টা উইকেট পড়ে ২২৫ রান দাঁড়ায়। উইকেটে অপরাজেয় ছিলেন নর্মান ও'নীল (২২) এবং রিচি বেনো (১৩)।

পঞ্চম দিন (৩০শে জানুয়ারী) ঃ অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৯৩ রানে সমাপ্ত। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে ২২৩ রান করে। কেন্ ব্যারিংটন (১৩২) এবং টম্ গ্রেভনী (৩৬) নট আউট থাকেন।

টসে জয়লাভ ক'রে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট ধরে। আরম্ভ ভাল হয়নি। দলের মাত্র ১৬ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট প'ড় যায়। এরপর তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বুথ এবং হার্ভে এবং চতুর্থ উইকেটের জুটিতে হার্ভে এবং ও'নীল দলের অবস্থা ভদ্রস্থ করেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বুথ এবং হার্ভে ১০৬ মিনিটের খেলায় দলের ৮৫ রান তুলে দেন। হার্ভে এবং ও'নীলের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৭১ মিনিটের খেলায় ১৯৪ রান যোগ হয়। ইংল্যান্ডের ফিল্ডিং এত খারাপ হয়েছিল যে, চোখে দেখেও তা বিশ্বাস করা যায় না। সহজ ক্যাচ হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে অথবা অন্যমনস্ক হয়ে ক্যাচ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন ঘটনা প্রথমদিনের খেলায় একাধিক ছিল। অস্ট্রেলিয়ার খুবই ভাগ্য ভাল ছিল। নচেৎ যেখানে দুটো উইকেট পড়ে ২১ রান সেখানে অনেকেরই মতে হওয়া উচিত ছিল ৬টা উইকেট পড়ে ২১ রান। হার্ভে এইদিনে কিসের কবচ ধারণ ক'রে খেলতে নেমেছিলেন জানি না। চার—চারবার তিনি আউট হওয়ায় হাত থেকে রক্ষা পান। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়ার রান

কেন ব্যারিংটন

ছিল ৮২, দুটো উইকেট পড়ে। হার্ভে (৪৫) এবং বুথ (২৭) উইকেটে খেলছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার রান তখন মাত্র ২; স্ট্যাথামের প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই স্মিথের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে সিম্পসন আউট হলেন। অস্ট্রেলিয়ার এই প্রাথমিক বিপর্যয়ে সমস্ত মাঠ হতবাক। দর্শকরা স্ট্যাথামকে অভিনন্দন জানাতে ভুলে গেলেন; খেয়াল ছিল না যে, সিম্পসনের আউট হওয়ার ফলে স্ট্যাথাম তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়জীবনে ২৩৬টি উইকেট পেয়ে ইংল্যান্ডের এ্যালেক বেডসার প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ডের সমান ভাগীদার হলেন।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এইদিনে সেঞ্চুরী করেন নীল হার্ভে (১৫৪) এবং নর্মান ও'নীল (১০০)। এঁরা দুজনেই ডেক্সটারের বলে আউট হন। নীল হার্ভে তাঁর ২৬ রান করার আগে আউট হওয়ার হাত থেকে তিনবার রক্ষা পান; তিনি যেন বেড়ালের প্রাণ নিয়ে এইদিনে খেলতে নেমেছিলেন। হার্ভে ৫½ ঘন্টা ব্যাট ক'রে তাঁর ১৫৪ রান করেন। তাঁর এই রানে ছিল ১৮টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী। হার্ভে যখন তাঁর ৬১ রানে পৌঁছান তখন সমস্ত মাঠ তাঁকে অভিনন্দন জানায়। এই ৬১ রান করার ফলে হার্ভে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৬০০০ রান পূর্ণ করেন। আলোচ্য প্রথম ইনিংসের ১৫৪ রান নিয়ে হার্ভের রান দাঁড়ায় ৬০৯৩। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে হার্ভেকে নিয়ে মাত্র চারজন খেলোয়াড় ব্যক্তিগতভাবে ৬০০০ রান করেছেন। অপর তিনজন হলেন ইংল্যান্ডের ওয়ালি হ্যামন্ড (৭২৪৯) এবং লেন হাটন (৬৯৭১) এবং অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান (৬৯৯৬ রান)।

এইদিনে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রান নর্মান ও'নীলের (১০০ রান)। তিনি ৩ ঘন্টা ব্যাট ক'রে ১৩টা বাউন্ডারী করেন।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ৩২২, ৫টা উইকেট পড়ে।

খেলার দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৯৩ রানে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে বাকি ৫টা উইকেট পড়ে গিয়ে ৭১ রান যোগ হয় পূর্বদিনের ৩২২ রানের সঙ্গে।

এইদিনে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করলেন ইংল্যান্ডের বোলার স্ট্যাথাম। অস্ট্রেলিয়ার বেরী শেফার্ড দলের ৩৩১ রানের মাথায় স্ট্যাথামের বলে ক্যাচ তুলে ট্রুম্যানের হাতে ধরা পড়ে আউট হন। ফলে স্ট্যাথাম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২৩৭টি উইকেট পেয়ে ইংল্যান্ডের এ্যালেক বেডসার প্রতিষ্ঠিত ২৩৬টি উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করলেন। শেফার্ডের আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জুটি অপর দিকের উইকেটের ব্যাটসম্যান এ্যালান ডেভিডসন হাতের দস্তানা খুলে স্ট্যাথামের করমর্দন করেন। একজন বোলার অপর বোলারের সাফল্যে আজ তাঁকে অকুণ্ঠিতচিত্তে অভিনন্দন জানালেন। যাঁর বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ হ'ল সেই এ্যালেক বেডসার সহকারী ম্যানেজার হিসাবে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে আছেন।

তিনিও খুশী হবেন—বিশেষ ক'রে যে, ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়ই তাঁর বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করেছেন।

ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। দলের ১৬৫ রানের মাথায় পঞ্চম উইকেট পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার পড়েছিল ৩০২ রানের মাথায়।

খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে ইংল্যান্ডের ১৯২ রান দাঁড়ায় ৫টা উইকেট পড়ে।

তৃতীয় দিনে উল্লেখযোগ্য খেলা বরুণ দেবের। তাঁরই কৃপায় ইংল্যান্ড খেলায় অনেক সুবিধা পেয়ে যায়। প্রথমতঃ বৃষ্টির জন্যে দু'ঘন্টার খেলা ধুয়ে যায়। তারপর আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৪৫ মিনিট আগে খেলা বন্ধ রাখতে হয়।

দলের ২২৬ রানের মাথায় ডেক্সটার (৬ষ্ঠ উইকেট) নিজস্ব ৬১ রান ক'রে আউট হ'ন। তখনও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৯৩ রানের থেকে ইংল্যান্ড ১৬৭ রানের পিছনে পড়ে আছে। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে টিটমাস এবং ডেক্সটার ৬০ মিনিটের খেলায় ৬১ রান যোগ করেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ২৬৩, ৭টা উইকেট পড়ে। এই সময়ের মধ্যে দুটো উইকেট পড়ে পূর্ব দিনের ১৯২ রানের সঙ্গে মাত্র ৭১ রান যোগ হয়। উইকেটে ছিলেন টিটমাস (৩৯) এবং এ্যালান স্মিথ (৪)। তৃতীয় দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৩২৮, ৯ উইকেটে। এইদিনে চারটে উইকেট পড়ে পূর্বদিনের ১৯২ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১৩৬ রান যোগ হয়। আজ ইংল্যান্ডের যে ভাঙ্গণ শুরু হয়েছিল ৯ম উইকেটের জুটিতে টিটমাস এবং ট্রুম্যান তা রোধ করেছিলেন। তাঁদের ৯ম উইকেটের জুটিতে দলের ৫২ রান যোগ হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৩৯৩ রানের থেকে ৬৫ রান পিছনে থেকে ইংল্যান্ড রাত্রিবাস করতে যায়।

খেলার চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড বেশীক্ষণ ব্যাট করেনি। এইদিনের দ্বিতীয় ওভারের খেলায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রানের মাথায় শেষ হয়ে যায়—পূর্বদিনের ৩২৮ রানের সঙ্গে মাত্র ৩ রান যোগ হয়। ইংল্যান্ডের চৌকস খেলোয়াড় ফ্রেডী টিটমাস ৫৯ রান করে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। টিটমাস খেলার দ্বিতীয় দিনে টেড ডেক্সটারের সঙ্গে খেলতে নেমেছিলেন। তিনি ১৯৬ মিনিট খেলে তাঁর ৫৯ রানে ৬টা বাউন্ডারী মেরেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার দরুণই ইংল্যান্ড বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

অস্ট্রেলিয়ার দুর্ভাগ্য যে, তারা ডেভিডসনকে মোটেই কাজে লাগাতে পারেনি। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনাতেই বিপর্যয় দেখা দেয়। খেলায় ডেভিডসন তাঁর চতুর্থ ওভারের চারটে বল দিয়েই যন্ত্রণার চোটে খেলা থেকে বরাবরের জন্যে অবসর নিতে বাধ্য হ'ন। ফলে সমস্ত ঝুঁকি গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জীর ঘাড়ে পড়ে। ম্যাকেঞ্জী ৩৩ ওভার বল ক'রে ৮৯টা রাণের বিনিময়ে ৫টা উইকেট পান। তৃতীয় দিনে যখন তিনি ইলিংওয়ার্থের উইকেট পেলেন তখন তাঁর বোলিংয়ের সংখ্যা—৬৮ রাণে ৫টা উইকেট। ম্যাকেঞ্জী তাঁর দক্ষতা, অসাধারণ ধৈর্য এবং কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন এই খেলায়। তাঁর পরই বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন কেন ম্যাকে, ৮০ রাণে ৩টে উইকেট। ম্যাকে তৃতীয় টেস্ট খেলায় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের

টেস্ট খেলায় ২০০ উইকেট

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ পর্যন্ত (৩।২।৬৩) মাত্র ... বোলার তাঁদের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ শত অথবা তার বেশী উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ ক'রেছেন। ইংল্যান্ডের পক্ষে আছেন বেডসার, স্ট্যাথাম এবং ট্রুম্যান। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষেও তিনজন—গ্রিমট, লিন্ডওয়াল এবং বেনো। সর্বশেষ ২০০ শত টেস্টক্যাপ পূর্ণ করেন ইংল্যান্ডের ট্রুম্যান—যখন ১৯৬২ সালে পাকিস্থানের বিপক্ষে লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনে তাঁর বলে জাভাদ বার্কি আউট হ'ন।

স্ট্যাথাম

বেডসার

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উপরের ৬ জন বোলারের উইকেট পাওয়ার সংখ্যা কি রকম দাঁড়িয়েছে, তা নীচের তালিকায় পাওয়া যাবে। হিসাবের তালিকায় বিগত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলার ফলাফল পর্যন্ত ধরা হয়েছে।

	খেলা	রান	উইকেট
স্ট্যাথাম	৬৬	৫৭৮৫	২৪১
বেডসার	৫১	৫৮৭৬	২৩৬
ট্রুম্যান	৫৩	৫১৯২	২৩৪
বেনো	৫৮	৬১১৩	২০১
লিন্ডওয়াল	৬১	৫২৫৭	২২৮
গ্রিমেট	৩৭	৫২৩১	২১৬

উপরের ছজন খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনজন—গ্রিমেট, লিন্ডওয়াল এবং বেডসার টেস্ট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন।

দলের ২৭ রাণে প্রথম এবং ৩৭ রাণে মাথায় দ্বিতীয় উইকেট পড়ে যায়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ববি সিম্পসন এবং ব্রায়ান বুথ দৃঢ়তার সঙ্গে দলের পতন রোধ করেন। এই তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ১৩৩ রাণ হয় ২¾ ঘণ্টার খেলায়। খেলায় ... করার কথা অস্ট্রেলিয়া যেন ভুলে য... ১৮৫ মিনিট খেলে শিম্পসন তাঁর রাণ পূর্ণ করেন। অপর দিকে বুথ ৫০ রাণ করতে ১২৬ মিনিট নেন্। রাণের এই বহর দেখে এডিলেড মাঠের দর্শকেরা মনের মিটিয়ে বিক্ষোভ ধ্বনি করেন ... পানের বিরতির সময় অস্ট্রেলিয়ার দাঁড়ায় ১২৮, ২টো উইকেট ... উইকেটে খেলছিলেন সিম্পসন এবং বুথ (৪৫)। দ্বিতীয় ই... দলের সর্বোচ্চ ৭৭ রাণ করেন ২¾ ঘণ্টার খেলায় বুথ ৭টা বা... করেন। সিম্পসন ৪ ঘণ্টা খেলে ৭১ রাণে মাত্র ৩টে বাউন্ডারী ... দলের ২০৫ রাণের মাথায় দলে... উইকেট পড়ে যায়। কেন্ ম্যাকে খারাপ খেলেন—৩ রাণে আউট ... ইনিংসে করেছিলেন এক রাণ। ... অভাবে পাঁচ মিনিট বাকি থাকা ... বন্ধ করতে হয়। অস্ট্রেলি... দাঁড়ায় ...৪, ৬টা উইকেট ... উইকেটে খেলছিলেন নর্মান (২২) ... রিচি বেনো (১৩ ... ও'নীল সাধারণত দ্রুতগতি ... থাকেন কিন্তু তিনি তাঁর ২২ তুলতে ৭৯ মি... নিয়েছিলেন। চতুর্থ দিনের খে... দেখা যায়, অস্ট্রেলিয়া অগ্রগামী হয়েছে। খেলায় ঝুঁকি নিতে যে অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুত নন্ তা এই দিনে খেলা থেকেই পরিষ্কার ছিল।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ ... অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনি... সমাপ্তি ঘোষণা করেনি। ... নেই—এই নীতিই অ... অক্ষরে মেনে চলেছি... ভাগের প্রধান শক্তি এ্যাল... হঠাৎ অসুস্থ হয়ে খেলা ... নেওয়াতে অস্ট্রেলিয়া ... সতর্কতা অবলম্বন করেছি...

ইংল্যান্ডের দুজন খে... শেফার্ড এবং ইলিংওয়... ছিলেন; সুতরাং তাঁরা দলে ... মত। তবুও অস্ট্রেলিয়ার অ... বেনো ইংল্যান্ডের শক্তিকে সমীহ করে চলেছিলেন তা ... নীতি থেকেই বুঝতে পারা যা... ডেভিডসনকেও তিনি ব্যা... নামিয়েছিলেন। দলের অষ্টম পড়ার পর ডেভিডসন খোঁড়াতে

মাঠে নামেন। তাঁর হয়ে দৌড়বার জন্যে তাঁর সংগে নামেন সিম্পসন। কিন্তু ডেভিডসন বেশীক্ষণ খেলতে পারেননি। মাত্র ২ রান করেছিলেন। চোদ্দ মিনিট উইকেট আঁকড়ে ছিলেন এইটাই যা অস্ট্রেলিয়ার লাভ।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চ সময়ের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৯৩ রানে শেষ হয়। পঞ্চম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৪টে উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ২২৫ রানের (৬ উইকেটে) সংগে ৬৮ রান যোগ করে। বেনো ৪৮ রানে আউট হ'ন। পঞ্চম দিনে তিনি দু'ঘণ্টা খেলে তাঁর পূর্ব দিনের ১৩ রানের সংগে ৩৫ রান যোগ করেন। মোট ১৪০ মিনিট খেলে বেনো তাঁর ৪৮ রান করেন। খেলায় তাঁর এই আত্মরক্ষামূলক নীতি থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, তিনি চতুর্থ টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার লক্ষ্যপথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ দিনেও ইংল্যাণ্ডের ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিংয়ে অস্ট্রেলিয়া লাভবান হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে তখন হাতে খেলার সময় ছিল চার ঘণ্টা এবং ইংল্যাণ্ডের পক্ষে জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল ...৬ রানের। অর্থাৎ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে জয়লাভ করতে হ'লে ঘণ্টায় অন্ততঃ ৮৯ রান ক'রে তুলতে হবে হাতে সময় এবং উইকেট থাকতে। এ অসম্ভব কাজের ...নে ইংল্যাণ্ড ছুটেনি। তবুও ...ল্যাণ্ডের খেলার সূচনায় বিপর্যয় ঘটে ...। দলের মাত্র ২ রানের মাথায় প্রথম ... ৪ রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট ... যায়। কেন্ ব্যারিংটন এবং কলিন ... তৃতীয় উইকেটে জুটি বেঁধে ... এই পতন রোধ করেন। তাঁদের ... দলের ৯৪ রান যোগ হয়। খেলা ... নির্দিষ্ট সময়ের মাথায় দেখা ...ল্যাণ্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ...ন দাঁড়িয়েছে। কেন্ ব্যারিংটন ...ন্ত ১৩২ রান ক'রে নট আউট ...ন। কেন্ ব্যারিংটন (১৩২ নট ... এবং টম্ গ্রেভনীর (৩৬ নট ... অসমাপ্ত পঞ্চম উইকেটের ...০১ রান ওঠে।

...বিহার কাপ ফাইনাল ॥

... ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতি- ... ফাইনালে পূর্বাঞ্চল দল ৮ ... পশ্চিমাঞ্চল দলকে পরাজিত ...র্যুপরি দ্বিতীয়বার কোচবিহার ...ম করেছে।

...থম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল ... প্রথম ইনিংস ১৬৪ রাণে শেষ ... পূর্বাঞ্চল দল দুটো উইকেট খুইয়ে ...১ রাণ করে। দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ... মিনিট পর পূর্বাঞ্চল দলের প্রথম ...ংস ২৩৮ রানে শেষ হলে তারা ৭৪ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিনের খেলার বাকি সময়ে পশ্চিমাঞ্চল দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দুটো উইকেট হারিয়ে ৮৭ রান করে।

তৃতীয় দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩১০ রানে শেষ হয়। দলের উল্লেখযোগ্য রান অশোক মান-কাদের সেঞ্চুরী এবং আর পার্কারের ৬৪। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৩৭ রান তুলতে পূর্বাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে একটা উইকেট হারিয়ে ৫০ রান তুলে দেয়।

খেলার শেষ দিনে পূর্বাঞ্চল দল আরও একটা উইকেট হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দিয়ে ৮ উইকেটে জয়লাভ করে। অম্বর রায় ৯১ এবং আর মুখার্জি ৫৮ রান করে নট আউট থাকেন।

শ্রেষ্ঠ স্কুল-ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে পূর্বাঞ্চল দলের দেব মুখার্জি বিশেষ পুরস্কার লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ ফিল্ডার হিসাবে আর পার্কার (পশ্চিমাঞ্চল দল) এবং শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে সোলকার (পশ্চিমাঞ্চল দল) পুরস্কার লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পশ্চিমাঞ্চল : ১৬৪ **রান** (কে তাতানি ৬৩। এ জিনি ৩৭ রানে ৪ এবং পি বসু ৩৫ রানে ৩ উইকেট) ও ৩১০ **রান।**

পূর্বাঞ্চল : ২৩৮ রান (দেব মুখার্জি ৯০, আর মুখার্জি ৭৪। সোলকার ৫০ রানে ৪, অশোক মানকাদ ৮২ রানে ৪ উইকেট) ও **২৩৭ রান** (২ উইকেটে। দে মুখার্জি ৫৪, অম্বর রায় ৯১ নট আউট এবং আর মুখার্জি ৫৮ নট আউট)।
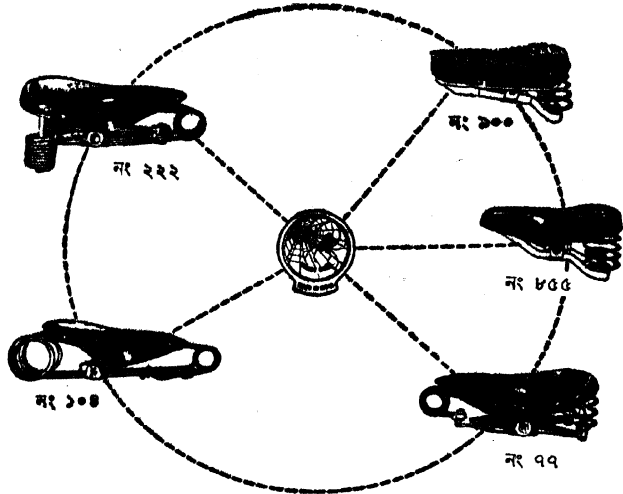
ডেভিস কাপ

॥ রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ॥

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বাংলা এক ইনিংস এবং ১৭৩ রানে উড়িষ্যাকে পরাজিত করে আঞ্চলিক খেলায় চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে মূল প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ী হায়দরাবাদের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

প্রথম দিনের খেলাতেই উড়িষ্যার প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৬ রনের মাথায় শেষ হয়। এই দিনে বাংলা দুটো উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রান করে ৩১ রানে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে বাংলা ৪৭৮ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (১৩৬ রান) করেন ভূত-পূর্ব ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়। উড়িষ্যার এই দিনের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৬৪ রান ওঠে।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে যখন উড়িষ্যা অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, তখনও তাদের ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে ২৭৮ রানের প্রয়োজন ছিল। শেষ দিনে উড়িষ্যার বাকি ৫টা উইকেট পড়ে যায় ৭৫ মিনিটের খেলায় এবং ১০৫ রান ওঠে। দ্বিতীয় ইনিংসে মোট রান দাঁড়ায় ১৬৯। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন সোমেন কুণ্ডু। ৫৯ রান দিয়ে এবারও তিনি ৫টা উইকেট পান। খেলাতে তিনি মোট ১০টা উইকেট পান ১০৩ রানে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

উড়িষ্যা : ১৩৬ রান (বি জিনা ৪৭। এস কুণ্ডু ৪৪ রানে ৫ এবং ডি এস মুখার্জি ৩৮ রানে ৪ উইকেট) ও

সোমেন কুণ্ডু

১৬৯ রান (এস সি মহাপাত্র ৫০ নট আউট। **এস কুণ্ডু ৫৯** রানে ৫ এবং কে মিত্র ২৩ রানে ৩টে উইকেট পান)।

বাংলা : ৪৭৮ রান (পি রায় ১৩৬, কে মিত্র ৭৪, বি চৌধুরী ৭৩, পি সি পোদ্দার ৫৭ নট আউট এবং এ দত্ত ৫০ নট আউট। এন এন স্বামী ৮২ রানে ৩ উইকেট)—৬ উইকেটে ডিক্লেঃ

॥ ডেভিস কাপ ও অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত ১৯ ডেভিস কাপ পেয়েছে। এই ১৯ বা মধ্যে একবার 'ওয়াকওভার' এবং অ লেশিয়া নামে ৭ বার ডেভিস কাপ প ১৯০৫ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পয অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড এ 'অস্ট্রেলেশিয়া' নামে ডেভিস কাপ প্র যোগিতায় যোগদান করেছিল। ১৯ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া পৃথক যোগদান করছে। দ্বিতীয় মহাযু দরুণ ছ' বছর (১৯৪০—৪৫) ডে কাপের খেলা বন্ধ ছিল। ১৯৪৬ থেকে পুনরায় খেলা হচ্ছে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত অস্ট্রে প্রতি বছরই ডেভিস কাপের চ্যা রাউণ্ডে খেলে মোট ১৭ বারের ১১ বার ডেভিস কাপ জয় করে বাকি ৬ বার পেয়েছে আমে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ পে ১৯৫০—১৯৫৩, ১৯৫৫—১৯৫৭ ১৯৫৯—১৯৬২। ১৯৪৬ সাল ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত (১৪ বছর) ডে কাপের চ্যালেঞ্জ রাউন্ড খে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা। পর ৩ বছর (১৯৬০—৬২) অস্ট্রে বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খে ইতালী (১৯৬০—৬১) এবং মেক্সি (১৯৬২)।

১৯৪৬ সাল থেকে ডেভিস লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যা রাউণ্ডের খেলায় বিজয়ী এবং বি দেশ :

১৯৪৬	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া
১৯৪৭	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া
১৯৪৮	আমেরিকা	৫	:	অস্ট্রেলিয়া
১৯৪৯	আমেরিকা	৪	:	অস্ট্রেলিয়া
১৯৫০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা
১৯৫২	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	আমেরিকা
১৯৫৩	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা
১৯৫৪	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া
১৯৫৫	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	আমেরিকা
১৯৫৭	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা
১৯৫৮	আমেরিকা	৩	:	অস্ট্রেলিয়া
১৯৫৯	অস্ট্রেলিয়া	৩	:	আমেরিকা
১৯৬০	অস্ট্রেলিয়া	৪	:	ইতালী
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	ইতালী
১৯৬২	অস্ট্রেলিয়া	৫	:	মেক্সিকো

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪১শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 15th February, 1963
40 Naya Paise

চীনা অভিযানের সামরিক অঙ্ক এখন স্থগিত অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু নানাক্ষেত্র হইতে যে সকল সংবাদ প্রায় প্রতিদিন আসিতেছে তাহাতে মনে হয় যে আক্রমণ প্রস্তুতির দ্বিতীয় পর্ব এখন সমানে চলিতেছে। ভারত-চীন সীমান্তে—অর্থাৎ তিব্বতের ভারতমুখী সীমান্তে—ভারী মোটর পরিবহনের ট্রাক এবং ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচল বৃহৎ কামান ইত্যাদি ভারী যুদ্ধাস্ত্র চালনের উপযোগী পথঘাট নির্মাণ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। তাহারি পশ্চাতে বহু বিমানঘাঁটি, সেনানিবাস, বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, এ সকলের কাজও পড়িয়া নাই। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে চীন সরকারের কর্তৃগণ তৎপরভাবে ভারত আক্রমণের যোগাড়যন্ত্র করিয়া চলিয়াছেন, যদিচ বর্তমানে তাঁহারা মুখে শান্তিবাক্যই উচ্চারণ করিতেছেন। সেকথা বিশ্বাস করা বা চীন সরকারকে আদৌ বিশ্বাস করা এখন অসম্ভব—এই মন্তব্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই সেদিন করিয়াছেন।

এ হেন অবস্থায় আমাদের সমগ্র দেশ ও জাতির যে অবিলম্বে শত্রুপ্রতিরোধে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন সে কথায় তর্কের বা যুক্তির অবকাশ নাই। এবং সেই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কিরূপ গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত হইবে ও তাহার জন্য কি সাজসরঞ্জামের, কিরূপ অস্ত্রশস্ত্রের, যন্ত্রপাতির ও যানবাহনাদির কতটা প্রয়োজন, সৈন্যবলেরই বা সংখ্যায় ও শিক্ষায় কি পরিমাণে বৃদ্ধি আবশ্যক, তাহাও অবিলম্বে জানা প্রয়োজন। অথচ কার্যতঃ আমরা দেখিতেছি সেই বিলম্বই ঘটিতেছে সর্বক্ষেত্রে।

অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সাক্ষাৎ সমরায়োজনের বিষয়ে আমরা কোনদিকে কতদূরে অগ্রসর হইয়াছি জানি না, কেননা সাধারণভাবে সে সকল কথা প্রকাশ করা হয় না এবং প্রকাশ করা উচিত নয় একথা আমরা বুঝি—যদিও শত্রুর গুপ্তচরেরা অনেক সংবাদ কিছুদিন পূর্বেও সংগ্রহ করিতে সক্ষম ছিল মনে হয়। তবে যেভাবে বিদেশী বন্ধুদেশের যুদ্ধবিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞের দল এখনও এদেশে আসিয়া সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আমাদের প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজন কি এবং কিভাবে তাহার কতটা তাঁহারা দিতে পারেন তাহাই নির্ণয় করিতে লাগিয়া আছেন, তাহাতে মনে হয় প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় অনেক ফাঁক এখনও রহিয়াছে। এবং কিভাবে তাহা পূর্ণ করা হইবে সে বিষয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষ এখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই, যদিও শত্রুর ব্যাপক আক্রমণের পর প্রায় চার মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও শত্রুসেনা বহু সহস্র বর্গমাইল ভারতীয় ভূমি দখল করিয়া রহিয়াছে। এরূপ "গয়ংগচ্ছ" কার্যক্রমে আমরা আশান্বিত হইতে পারিতেছি না—একথা এখন আমাদের কর্তৃপক্ষকে বলা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য আরও পরিষ্কার বুঝা যাইবে। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদ-পত্রগুলি হাতে পড়িতে দেখা গেল বড় অক্ষরে ঘোষিত হইয়াছে "কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা"। এই শীর্ষ-নামের নীচের লাইনে লিখিত রহিয়াছে "সাড়ে আট লক্ষ ছাত্রকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা" এবং "প্রতি বৎসর পুরাপুরি সামরিক শিক্ষা-প্রাপ্ত পৌনে তিন লক্ষ ছাত্র তৈরীর আশা" ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ঐ আশাবাদে আমাদের মন আশায় পুলকিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই পুলক ক্ষণিকের মাত্র। সংবাদটি সবিস্তারে পাঠ করায় বুঝা গেল যে ইহাও সরকারি প্রস্তুতি-পর্বের উপক্রমণিকা মাত্র! আসল কাজের পর্ব এখনও বহুদূরে। দেখা গেল যে "সরকারী মহল বলেন যে আগামী জুলাই হইতে এই কর্মসূচী প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতির জন্য প্রতিরক্ষাদপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।" আরও পরে দেখা গেল যে প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী এবং জাতীয় ক্যাডেট কোরের ডিরেক্টর জেনারেল ঐ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সহিত আলোচনা করিতে এতদিনে উদ্যত হইয়াছেন। এবং একথাও প্রতিরক্ষাদপ্তর মহল বলিয়াছেন যে, সমস্ত ছাত্রকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষাদান পুরাপুরিভাবে "একবার আরম্ভ হইলে এখন হইতে তিন বৎসর বাদে" প্রতি বৎসর ২ লক্ষ ৭৫ হাজার পূর্ণ সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র তৈরী হইবে। অর্থাৎ কিনা ১৯৬৬ সালের জুলাই নাগাদ এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হইতে আরম্ভ করিবে—যদি ইহা "একবার আরম্ভ" হয়! আশা করি চীনারা এ বিষয়ে প্রতিরক্ষাদপ্তরের ব্যবস্থা পণ্ড করিবার মত কোনও কিছু করিবে না—অন্ততঃ আগামী তিন বৎসরের মধ্যে।

এই আয়োজন-পর্ব আর কতদিন চলিবে? এবং আরও কতদিন এইরূপে একদিকে নেতৃবর্গ ও মুখপাত্র-দিগের কথায় দেশবাসীকে জানানো হইবে যে এই ক্রূর ও প্রবলশক্তিশালী শত্রু যে কোনও মুহূর্তে আবার ব্যাপক আক্রমণ করিতে পারে এবং প্রতিরক্ষাদপ্তর মহলের ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের আচরণে পরোক্ষ-ভাবে বুঝিতে হইবে যে কমপক্ষে তিন বৎসর সময় এখনও আছে।

সরকারি প্রচার ও সাধারণ-সংযোগ বিভাগের উচিত এই পরস্পরবিরোধী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

রৌদ্রদীপ্ত হে স্বদেশ

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

রৌদ্রদীপ্ত, হে স্বদেশ! অম্লান—
আমি যে তোমার গাজনের সন্ন্যাসী,
কোন্ সে ব্রতের উদ্যাপনের লাগি
তোমার দুয়ারে আছি জেগে, প্রত্যাশী!

যৌবন-জ্বালা ভস্মে পড়েছে ঢাকা
বিনিদ্ররাত, বিগত-নিদ্রা দিন,
আমার জীবন-মরণে বাজায় শুধু
অমোঘ তোমার নামের রুদ্রবীণ।

এই যে আমার রুদ্রাক্ষের মালা,
তোমারই মন্ত্র জপে, যে অগ্নি-জ্বালা
হৃদয় জ্বলেছে, সে আলোকে তুমি আজ
গুণ্ঠন খুলে এসেছ হৃদয়-মাঝে;
তোমার বুকেই সাত-ভাই-চম্পার
হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুক্ শুনি বাজে।

খোলা এলো চুলে ঢেকে দাও নভোনীল,
ক্রুদ্ধ-আননা তুমি কাল-বৈশাখী!
তোমার প্রেমের চরম মূল্য দিতে
আত্মাহুতির যজ্ঞ যে আজো বাকি।

আমার ব্রতের উদ্যাপন যে হবে
তোমার রুদ্র-নৃত্যের তালে, তালে,—
অন্ধকারের দোর খুলে দেবে ঊষা
সীমন্তিনীও, তরুণ-সূর্য ভালে।

মা নিষাদ

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

উচ্চকণ্ঠ বরাভয়, প্রভাত ও সমুদ্র আমার,
বিপুল সে অর্থরাশি, জলস্রোত আমার বৈভব;
কালঝঞ্ঝা, দীপমালা জেলে তোলে তার কণ্ঠস্বর;
যন্ত্রণাই আদিব্যাধি, জন্মমৃত্যু, সুদীর্ঘ শৈশব।

আমার আহ্বান আমি, রৌদ্রালোকে, কখনো ছায়ায়;
বার্তাবহ, হংসদূত, হে কঠিন তুমিই নশ্বর,
প্রস্তরের পুঞ্জীভূত শোক গলে শীতের ঊষায়;
আমি উক্তি স্মরণীয়, ইচ্ছা তাই আমার ঈশ্বর।

সে জাগিতে চায়, স্রোতে, গানে, ফুলে আপন কাননে;
শৈশবের ঘুম-চোখ, একা-একা, নিভৃত স্বপন,
আনে স্বর, উচ্চ, মিহি, বহে তারা সুদীর্ঘ জীবনে;
কেন ডাকে পাখি, সূর্য কেন, কেন জনম, হনন।

আমি যার আলো ভাবি, সেই জানে আমি তার স্বাদ:
আদিগন্ত, রৌদ্র-খেলা, শিশু হাসিতেছে মা নিষাদ!

কেননা নিভৃত তীর্থে

পরেশ মণ্ডল

নিতান্ত শিশুর মতো সমর্পিত ঘনিষ্ঠ সংরাগে
মায়ের নিবিড়ে থাকি, হৃদয়ের খুব কাছাকাছি
বন্ধনে আবদ্ধ রাখি মূল্যবান আহৃত প্রয়াগে,
কেননা নিভৃত তীর্থে মা আছে এবং আমি আছি।

কোনো শঙ্কা আতঙ্কিত করে না এখন, আলোড়ন
শক্তি আনে, দীপ্ত ঘরে একনিষ্ঠ প্রদীপে আলোক
অনির্বাণ মহিমায় অপরূপ বিভূতিপ্রবণ,
জীবনের প্রয়োজনে মুখে মুখে গ'ড়ে ওঠে শ্লোক।

নবতর উজ্জীবনে প্রেমিকের শুদ্ধ প্রেম যাচি
কেননা নিভৃত তীর্থে মা আছে এবং আমি আছি।

জেমিনি
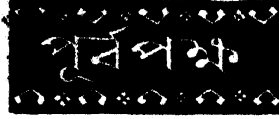
কথায় বলে, সত্যি-ঘটনা অনেক সময় রূপকথার চেয়েও আজগুবি মনে হয়। বাস্তবিকই তাই। সম্প্রতি খবরের কাগজে এমন একটি ঘটনার বিবরণ পড়লাম যা পড়ে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাওয়া কঠিন হ'য়ে উঠল।

আমেরিকার স্প্রিংফিল্ড শহরের জনৈকা বিবাহিতা তরুণী তাঁর দন্ত-চিকিৎসকের বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ টাকার খেসারৎ দাবি ক'রে আদালতে অভিযোগ পেশ ক'রেছিলেন। কিন্তু বিচারকের রায়ে চিকিৎসক অব্যাহতি পেয়ে গেছেন। অভিযোগ ছিল এই যে, ডাক্তার সাহেব ১৯৬০ সালে ভদ্রমহিলার একটি দাঁত তুলেছিলেন এবং তারই ফলে নাকি অভি-যোগকারিণীর চোয়াল, চিবুক, ঠোঁট, দাঁত এবং মাড়ি ক্রমে অসাড় হ'য়ে উঠতে থাকে। বর্তমানে তিনি এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন যে মুখমণ্ডল দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালানো তাঁর পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ করে চুম্বন, সেই 'এবিলিটি টু পারফর্ম দি এজ-ওল্ড আর্ট অব কিসিং', তাই থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছেন তিনি। অতএব ক্ষতিপূরণ চাই।

হ্যাঁ, আরো একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। দাঁতটি ছিল 'উইজডম টুথ' অর্থাৎ কিনা আক্কেল দাঁত।

ঘটনাটি পড়ে নানারকম চিন্তালহরী খেলে যেতে লাগল আমার মাথায়। প্রথমে মনে হল জায়গাটির নাম স্প্রিংফিল্ড মানে বসন্তের প্রান্তর। এরকম জায়গা ছাড়া এমন অত্যাশ্চর্য মনোবেদনায় কাতর হওয়া সম্ভব ছিল না হয়তো তরুণীটির পক্ষে। সেখানে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' বলা যায়, চিরজাগ্রত, এবং 'তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে কোরো না বিড়ম্বিত তারে' বলে সাধ্যসাধনাও চলছে, কিন্তু হায়, মুখমণ্ডল অসাড়, তাই ভদ্রমহিলার কাছে পুরোটাই হ'য়ে উঠছে এক হাস্যকর

বিড়ম্বনা। এবং অভিযোগের কারণও এইটেই।

দ্বিতীয় চিন্তা যা মাথায় এল তা হল, অভিযোগকারিণীর নাম।—মিসেস ডেভিড হাসাজেন। উচ্চারণের হেরফেরে একে যদি কেউ 'হাসাচ্ছেন' বলে পড়েন তাহলেই বুঝতে পারবেন, 'আর্ট অব কিসিং'-এ নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ্য আদালতে জাহির করে ইনি 'হাসাচ্ছেন' কেন! এই ঘটনা পূর্বনির্ধারিত। এরকম না হলে অন্য কোনোভাবে হাসাতে হত তাকে। কারণ তার নামের সঙ্গে পদবী রয়েছে 'হাসাজেন', কিংবা যা একই কথা —হাসাচ্ছেন।

চিন্তালহরীর তৃতীয় ধাক্কায় খেয়াল হল, দাঁত তোলার পর ভদ্রমহিলার মুখ-মণ্ডলে যে অংশগুলি অবশ হ'য়ে গেছে তার তালিকায় জিহ্বার নামোল্লেখ নেই। অর্থাৎ জিহ্বাটা এখনো স্ববশে আছে। থাকতেই হবে। কারণ জিহ্বা অবশ হলে ভাষা থাকত না মুখে এবং অভিযোগও হয়তো মুখর হ'য়ে উঠত না। চোয়াল চিবুক, ঠোঁট, দাঁত ও মাড়ির এই পঞ্চ-পাণ্ডবের বেদনা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন জিহ্বা-রূপী বেদব্যাস। একেই বলে পোয়েটিক জাস্টিস। সব গিয়েও এমন কিছু একটা থেকে যায় জীবনে, যার জন্যে বেঁচে থাকাটা সহনীয় হ'য়ে ওঠে। এক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে যেহেতু একজন নারীর কাছ থেকে সেজন্যে জিহ্বার সচলতা আরো বেশি অর্থময়।

কথা-বলার স্বজাতিসুলভ অনর্গলতা থেকে বঞ্চিত হননি তিনি। এবং এ পরি-স্থিতি তাঁর প্রিয়জনের পক্ষে যাই হোক তাঁর নিজের কাছে অবশ্যই স্পৃহনীয়।

চতুর্থ ঢেউয়ে মনে পড়ল, ভদ্রমহিলার বর্তমান অবস্থার কারণ আক্কেল দাঁতের অনুপস্থিতি। এখন কথা হল এই যে, বাইবেলে জানা যায় জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি খেতে আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীর বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী ঈভ-ই প্রলুব্ধ করেছিলেন তদীয় ভর্তা আদম মহো-দয়কে। তার আগে পর্যন্ত এই আদিতম মানবদম্পতি অত্যন্ত সরলভাবে জীবন-যাপন করছিলেন। সভ্যতা নামক পরি-স্থিতিতে উদ্ভূত আর্ট-সায়ান্স ইত্যাদির বিষয়ে একেবারেই কোনো কৌতূহল ছিল না তাঁদের। সম্ভবত সে সময়ে তাঁদের আক্কেল দাঁতও ছিল না। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর একদিকে এল লজ্জা এবং অন্যদিকে কৌতূহল ও সৌন্দর্যবোধ। বোধকরি সেইসঙ্গে আক্কেল দাঁতের ব্যথাও তাঁরা প্রথম অনু-ভব করলেন। যাই হোক, এই অবস্থায় নন্দনকানন থেকে বহিষ্কৃত হ'য়ে মাটির পৃথিবীতে চলে এলেন আদম-ঈভ। এবং এই রূঢ় বাস্তবকে ভুলে থাকার জন্য আবিষ্কার করলেন সেই 'এজ ওল্ড আর্ট অব কিসিং'। মনে রাখবেন, এর সঙ্গে আত্মজ্ঞান এবং আক্কেল দাঁতের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটি না হলে আরেকটি হয় না, প্রায় এইরকম কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। অতএব আক্কেল দাঁত তুলে নিলে যে চুম্বনের ক্ষমতাও চলে যেতে পারে এ ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, আক্কেল সেলামী দিয়ে যে-বস্তু আবিষ্কার করেছে মানুষ, বে-আক্কেল হ'লে তা যে হাতছাড়া হ'য়ে যেতে পারে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে পঞ্চম চিন্তা যা আমার মাথায় এল সেটা একটু গুরুতর ধরণের। চুম্বনকে অভিযোগকারিণী বলেছেন আর্ট। কেন? আমরা তো দেখলাম যেভাবে আবিষ্কৃত হ'য়েছে বস্তুটি তাতে তাকে সায়ান্স বলাই যুক্তিসঙ্গত! নাকি এক্ষেত্রে আর্ট বলতে আজকাল যাকে হিউম্যানিটিস বলা হয় সেই ভাবটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন ভদ্র-মহিলা? তাহলে অবশ্য আর ঝগড়া থাকে না। কিসিং যখন অমানুষিক কোনো ব্যাপার নয়, রীতিমত হিউম্যান এবং হিউম্যান আচরণ তখন তাকে হিউম্যানিটি বা আর্ট বলতে আমার আপত্তি নেই।

তবে সেই আর্ট বস্তুটির দাম দেড় লক্ষ টাকা ধার্য করে মামলা আনলেন কেন অভিযোগকারিণী সে একটা রহস্য বটে। মুখমণ্ডলের অসাড়তার জন্যে অনেকরকম অসুবিধেই ঘটা সম্ভব এবং ঘটেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেসব অক্ষমতা বাদ দিয়ে কেবল এই বিশেষ ক্রিয়াটি সম্পাদন করার 'এবিলিটি' না থাকাই উক্ত শ্রীমতীর কাছে মহার্ঘ ক্ষতির কারণ বলে প্রতীয়মান হ'য়েছে এটা চিন্তা করার বিষয়।

ভাবতে ভাবতে অবশেষে একটা মানে করেছি আমি এর। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিচার করে দেখতে পারেন।

আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ। হাজার রকম ক্লাব, সিনেমা, আড্ডা সত্ত্বেও তার সেই মৌল নিঃসঙ্গতার ভার কিছুতেই হাল্কা হতে চায় না। সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের ছোটবড় অজস্র ধরণের বন্ধনের মধ্যেও একটি মানুষ অন্য সকলের থেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন, এবং এই বিচ্ছিন্নতার বোধ ক্রমে ক্রমে তাকে হতাশ ও নির্জীব করে তোলে। এর মধ্যে যাঁরা উচ্চ মার্গের মানুষ তাঁরা তাঁদের এই অন্তরাশ্রয়ী শূন্যতাকে অতিক্রম ক'রে শিল্পসাহিত্য কিংবা জ্ঞানবিজ্ঞান অথবা লোকহিতৈষণার ভিতর দিয়ে বহুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই তার আত্মমুক্তির প্রধানতম সেতু হল ভালোবাসা। এর মধ্যে যেটুকু দৈহিক দিক আছে তা সর্বজীবেই প্রায় একরকম। মানুষের গৌরব হল সে এর মধ্যে দেহকে অতিক্রম ক'রে অন্য কিছুর আস্বাদ পেতে পারে। অন্য কিছু যে কী, ভাষায় তার প[illegible]। সম্ভব নয়—সে একরকম উপলব্ধি—যে পায় তার জীবন মধুময়, যে পায় না তার জীবন স্বস্তিহীন। কাজেই এ যে এক মহা-মূল্যবান বস্তু তাতে আর সন্দেহ কী?

অভিযোগকারিণী এর জন্যে দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিলেন। কিছুই না। একের পর অন্তহীনভাবে শূন্য যোগ করে যতো টাকা কল্পনা করা যায় ততো পেলেও তাঁর পাওনার ঘর শূন্যই থেকে যেত। তাঁর ক্ষতি অমূল্য।

হয়তো তিনি এবার শিল্প-সাহিত্য কিংবা জ্ঞানবিজ্ঞান অথবা লোকহিতৈষণার ভেতর দিয়ে তাঁর অন্তরাশ্রয়ী শূন্যতাকে অতিক্রম করার পথ আবিষ্কার করে নেবেন। উইজডম টুথ না থাকলেও ঈশ্বর হয়তো তাকে এই উইজডম থেকে বঞ্চিত করবেন না।

॥ গোরা জুজু ॥

মনে পড়ছে প'য়ষট্টি বছর আগেকার—অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের কথা। তখন আমার বয়স তেরো বছর—ইস্কুলে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি। তখন শাসক জাতের যেসব ইংরেজ ভারতে আসতো তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন জাতের গর্বে আমাদের অর্থাৎ এখানকার কালা আদমিকে শেয়াল-কুকুরের মত দেখতো। কালা আদমিদের দিয়ে সব কাজ করাতো, কিন্তু একটু ত্রুটি হলেই সবুট পদাঘাতে তাদের মেরে ফেলতো। মেরে ফেললেও খুনের দায়ে তাদের জাতভাই ইংরেজ হাকিমের কাছে খুনী বলে সাজা পেতো না। ওদেরি জাতভাই ডাক্তার এসে হলফ নিয়ে সাক্ষ্য দিতো যে কালা আদমি মরেছে তার পিলে খুব বড় ছিল তাই ফেটে ও মারা গেছে। অর্থাৎ লোকটা মারা গিয়েছে ও'র পিলের দোষে—সাহেবের মারের দোষে নয়। এমনি ব্যাপার নিত্য ঘটতো। তাই রসরাজ অমৃতলাল ১৮৯৭ সালে তাঁর গ্রাম্য বিভ্রাট প্রহসনে লিখেছিলেন—

সাহেবশ্চ বাঙালীশ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
সাহেবো দদাতি থাপ্পড়ং বাঙালী
হর্ষে খাদতি।।

দেশের তখন এমনি অবস্থা। মান এবং প্রাণের ভয়ে সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ এদেশী লোক ওই গোরা জাতের অধমাধম লোক-গুলোকে যথাসম্ভব পাশ কাটিয়ে চলতেন। দেশের এই অবস্থা—আমরা মার খেয়ে খবরের কাগজে সে খবর ছাপিয়ে নাকেকান্না কাঁদতুম, কিন্তু ওদের হাতে চড় খেয়ে উল্টে একটা চড় মারবো এমন মুরোদ আমাদের ছিল না। এর কারণ আমাদের দেহে বল থাকলেও আমাদের মন ছিল ভীরু। কাজেই ও জাতটাকে আমরা জুজুর মত ভয় করতুম। মনে হত, ওদের মধ্যে ভদ্র সাহেব নেই। মনে আক্রোশ জাগতো যদি ওদের এই স্পর্ধার শোধ দিতে পারতুম! কিন্তু কি করে তা হবে? ওরা রাজার জাত—যা করে তা শোভা পায়। ঘুষির বদলে যদি আমরা ঘুষি দিই তাহলে পিলে ফেটে মরবো। কাজেই ওদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকি।

এই কলকাতা শহরের চেহারা আজই বদলে গেছে! কিন্তু আপনারা কি বিশ্বাস করবেন যদি বলি, রেড রোডের দু'ধারে সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঐ যে-পথ, ও পথে ধুতিপরা আমাদের পদার্পণ ছিল নিষিদ্ধ? এবং তার অদূরে যে ইডেন গার্ডেন্‌স্‌ ও বাগানের ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের পূর্বদিকে যে শ্যাম-শষ্প-খচিত বিস্তৃত লন, সন্ধ্যার সময় ও-লনে আমাদের ধুতিপরা দেশী লোকের পা বাড়াবার জো ছিল না? দৈবাৎ ওখানে পদার্পণ ঘটলে গোরা-পুলিশের বেত আর দেশী পুলিশের রুলের গুঁতোয় দুর্গতির সীমা থাকতো না!

ট্রেনে ট্রামেও ফাঁড়া বড় কম ছিল না সেকালে। সেকেণ্ড-ক্লাসে চড়ে যত বড় পদস্থ মানী হোন, দেশী লোকের যাত্রা সব সময়ে নিরাপদ ছিল না—গোরা সাহেবদের মধ্যে যারা নিরীহ ভদ্র, তারা নাক তুলে দোশরা কামরায় যেতো; আর

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

যারা ভদ্র নয় (দুর্ভাগ্যক্রমে এঁদের ব্যবহারে আমাদের মনে ধারণা জন্মেছিল, সাহেবদের মধ্যে ভদ্র বুঝি নেই-ই!) তারা গুঁতো মেরে গালাগাল দিয়ে সে কামরা থেকে দেশী লোককে দিত তাড়িয়ে—আইনকানুনকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে। অনেক উচ্চপদস্থ ধনী মানী দেশী ভদ্র-লোক ধনে ও মর্যাদায় কীটানুকীটতুল্য গোরার হাতে কিভাবে লাঞ্ছিত হতেন, সে-সব কাহিনী জড়ো করে শোনালে আপনারা হেসে বলবেন, রূপকথা শোনাচ্ছি। কিন্তু রূপকথা নয়—সত্যই এমনি ছিল তখনকার অবস্থা।

তাঁদের দেখাদেখি ফীয়ার্স লেনের কালা-সাহেবরাও গোরার মাসতুতো ভাই বলে' সম্পর্ক টেনে দেশী ভদ্রলোকদের লাঞ্ছিত করতে আশ্চর্য স্পর্ধা দেখাতো।

আমার বয়স তখন বারো-তেরো বছর, গ্রীষ্মের ছুটিতে মামাবাড়ী যাচ্ছি শ্যামবাজারে। আমার এক মামা ছিলেন আমারি বয়সী। তাঁর খোট্টা বেয়ারা প্রত্যহ বৈকালে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যেতো। আমিও হলুম তাঁর সঙ্গী। বেয়ারার নাম ছিল কালু। খুব জোয়ান—নিত্য নিয়মিত ডন-বৈঠক করতো, আর তার হাতে থাকতো পিতলে মাথা-বাঁধানো এক মজবুত লাঠি! একদিন বৈকালে টালার পুলের উপর দিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে দমদম রোড দিয়ে আমরা বেড়াতে চললুম দমদম রেলওয়ে স্টেশনে। ওপথে মোটর-বাসের কোনো উপদ্রব ছিল না সেকালে—শুধু বড় বড় ধনীর জুড়ি যেতো বিকেলে ধনীদের নিয়ে সিঁথি, বরানগর, দমদমের বাগানে। প্রশস্ত পথ বেড়াবার পক্ষে সত্যই ছিল চমৎকার।

দমদম রোডে ঢুকে পূর্বমুখে খানিক গেলে চোখে পড়বে বাঁয়ে মস্ত কম্পাউণ্ডের মধ্যে যে লাল ইটের কখানি বাড়ী, ঐ বাড়ীগুলি তখন ছিল রেলওয়ের কালা-গোরা সাহেব কর্মচারী-দের ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স। ফটকের সামনে ঐসব রেলওয়ে-মেনের ছেলেরা—বয়সে দশ-বারো থেকে আঠারো-উনিশ—পথচারী বহু লোককে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তো—কারো পিছনে বা কুকুর লেলিয়ে দিত; এবং আহত সন্ত্রস্ত পথচারীদের পালিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াসে পাজীগুলো হেসে ফুটিফাটা হয়ে পড়তো! সেদিন আমরা সে-বাড়ীর কাছাকাছি গেছি, এমন সময় ঐ ব্যাপার। কজন নিরীহ ভদ্রলোক (বোধহয় কাশী-পুরের চটকলের কেরানী) অফিসের কাজ সেরে বুঝি বাড়ী ফিরছিলেন, তাঁদের দিকে ওরা দিলে কুকুর লেলিয়ে। ভদ্রলোকেরা ব্যতিব্যস্ত! দেখে আমার হলো ভয়। কালু বেয়ারাকে বললুম—থাক্‌গে কালু, ওদিকে যায় না। ওরা কুকুর লেলিয়ে দেবে! এ কথায় কালু গোঁয়ারের মতো মাথা নেড়ে বললে,—না দাদাবাবু, কিসের ভয়! হামার হাতে মজবুত লাঠি—লাগুক দিকিনি হামাদের সাথে—হুঁঃ!

একথায় ভয় গেল না, তবু বেয়ারার কাছে মান রাখবার জন্য ফিরতে পারলুম না। বুক ভয়ে ঢিপ-ঢিপ করছে, চললুম এগিয়ে। আমাদের দেখে তারা হিশ-হিশ করে কুকুর ডাকতে লাগলো। আমি আর আমার মাতুল কালুকে প্রায় জড়িয়ে ধরি আর কি, কালু কিন্তু ফোঁশ করে উঠলো। তার লাঠি তুলে হিন্দী ভাষায় সে বলে উঠলো—খবর্দার! চালাকি করিয়েছো কি এই লাঠি! কুকুর দোফাঁক—তুমার ভি...

কেনুই পোকার গায়ে কাঠি ছোঁয়া-মাত্র সে যেমন গুটিয়ে যায়, কালুর ভঙ্গি দেখে আর মুখের কথা শুনে কালা-সাহেব-বাচ্ছারা আর কুকুর ডাকলো না—হঠাৎ হাতের কাটাপল্ট বার করে গাছের দিকে যেন পাখি তাক্‌ করছে এমনি ভাব দেখালো!

কাল, সেদিন যে লজ্জা দিয়েছিল, তা ভুলিনি। কেবলি মনে হতো, রুখে ওদের সামনে যেদিন দাঁড়াতে পারবো!

এরপর আমরা তখন বি-এ পড়ছি—একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল এস্‌প্লানেডে খিদিরপুরগামী ট্রামে। খিদিরপুরের ট্রাম টানতো ষ্টীম-ইঞ্জিনে। একখানা এঞ্জিনের পিছনে পর পর দু'খানা ট্রেলার আঁটা থাকতো। দুখানি ট্রেলারই বেশ ভরতি থাকতো। এই ট্রামের এক কামরা একদিন অফিস-টাইমে ভরা-ভরতি,—ছাড়বার উদ্যোগ করছে এমন সময় ওদের কোন্ জর্দা রঙের কারিগর সাহেব এসে ট্রামে উঠলো। জায়গা নেই। সাহেবকে দেখে নেটিভদের মধ্যে কেউ জায়গা ছেড়ে দিলে না। সাহেব তখন এক বেচারী কেরানীকে ঠেলে উঠিয়ে তার আসন দখল করতে উদ্যত হলো। বেচারী কেরানীর নাম শরৎ চক্রবর্তী। নেহাৎ তাঁর নিয়তির ছিল লিখন—তিনি রুখে উঠে বললেন, কেন জায়গা ছাড়বো? বিনা পয়সার যাত্রী তো নই। এতো বড় স্পর্ধা! সাহেব তাঁর অঙ্গে লবুট পদাঘাত চালাতে লাগলো—লাথির পর লাথির ঘায়ে তাঁকে মেরে ফেললো! আর তখনি সেই ট্রেলার ভরতি অত যে যাত্রী, তারা দুদ্দাড় করে নেমে পালিয়ে গেল। নরাধম কাপুরুষের দল! এ-নিয়ে বাংলা বঙ্গবাসীতে (তখন ছিল দুখানি মাত্র বাংলা সাপ্তাহিক, বঙ্গবাসী আর হিতবাদী) খুব কান্নাকাটি করলো। কাছারিতে সেই রাক্ষস ফিরিঙ্গির কটা টাকা মাত্র জরিমানা হয়েছিল—এক্ষেত্রেও সাহেব-ডাক্তার বেচারী কেরানীর দেহে বর্ধিত প্লীহা আবিষ্কার করেছিলেন!

মাসিক "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার তখন সরলা দেবীর হাতে। তিনি এইসব গোরার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ জানাননি শুধু ঐ যে দুগাড়ি দেশী লোক ফিরিঙ্গির ভয়ে পালিয়ে গেল—এতগুলো লোক ঠেলা দিয়ে ফিরিঙ্গিকে চাটি মারলে সে ক্ষত-বিক্ষত হতো এবং বেচারী কেরানীর প্রাণ বাঁচতো—এই কথা বলে তিনি পলাতক-দের নিন্দাবাদে লেখনী মুক্ত করে দিয়ে-ছিলেন! এ ঘটনার পর থেকে সাহিত্য-পত্রিকা হলেও "ভারতী"তে সরলা দেবী উদাত্ত কণ্ঠে কাপুরুষতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। সুস্পষ্ট ভাষায় লিখতে লাগলেন—বিলিতী ঘুষির শোধ দিতে হবে দেশী কিলে, দেশী পদাঘাতে। তাঁর এ উৎসাহবাণী আমাদের জড়তা ভেঙে ভয় ঘুচিয়ে মনে অনেকখানি সাহস আর উন্মাদনা জাগিয়ে তুললো। তার ফলে মাঠে ফুটবলের ম্যাচে ফিরিঙ্গি ছেলেগুলোকে আর ভয় করতুম না—তারা আমাদের ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারলে আমরা প্রাণরক্ষার জন্য পালানো ছেড়ে উল্টে ইটপাটকেলে জবাব দিতে শুরু করলুম। দেহে-মনে বেশ জোর এলো।

এরপর সরলা দেবী শুধু কাগজে মন্তব্য লিখে নিশ্চিন্ত রইলেন না, কিশোরদের নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। এই অহেতুক ভয় ভাঙবার জন্য উদয়াদিত্য উৎসব, প্রতাপাদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সূচনা হলো। ভারতী অফিসের (কাশিয়াবাগান, কলিকাতা) প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মল্লক্রীড়া, অসিক্রীড়ার ব্যবস্থা হলো। মার্তুজা নামে একজন ওস্তাদ অসি-খেলোয়াড়কে আনিয়ে ছেলেদের অসিচালনা শেখাতে লাগলেন। লাঠিখেলা চলতে লাগলো। এমনি ক'রে আমাদের এফেমোনিসি ভেঙে মানুষ করে তোলবার জন্য তাঁর সে-সাধনা একালের আপনারা হয়তো তা জানেন না। পরে (তখন ভারতীতে আমি নিয়মিত লিখি, এবং ভারতীর সম্পাদকতা করি) তাঁকে বহুবার বলেছি —বাঙালী আপনার কাছে ঋণী এই একটি বিষয়ে—তাদের মনে শৌর্য জাগিয়ে তুলেছেন। আমাদের বীরাষ্টমী দলের দু-চারজন পরে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের দলেও গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। মুরারিপুকুরের বাগানে সকলে ধরা পড়েননি। যাঁরা সেদিন বাগানে যাননি, তাঁদের নাম পুলিশ জানতে পারেনি—দলের সকলের এতখানি ছিল লয়াল্টি।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রেস-কোর্সে বিপুল সমারোহে আতস-বাজী হয়, সে-বাজী দেখবার জন্য মাঠ একেবারে লোকারণ্যে পরিণত হয়েছিল। এবং বাজীর দর্শকদের দাঁড়াবার জন্য দড়ির যে-সীমানা রচিত হয়েছিল সে-সীমানার অগ্রভাগে আমাদের সরিয়ে দাঁড়াবার জন্য সাদা ও কালো সাহেবরা কি গুঁতোগুঁতি না করেছিল! তাদের সহায় ছিল বেত্রহস্ত এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেণ্ট এবং ফোর্টের গোরারা। আলি-পুরের জীরাট ব্রিজের কাছে আমরা স্থান সংগ্রহ করেছিলুম। সেখানে গুঁতোগুঁতি শুরু হবামাত্র চার-পাঁচজন নিরীহ বাঙালী দর্শককে একটা গোরা বেত মেরেছিল। এ প্রহার দেখেছিলেন দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত বীরাষ্টমী দলের হরদয়াল। দেখবামাত্র গোরার বেত কেড়ে তাকে বেশ ক'ঘা কষিয়ে দেন। বেত্রাঘাত করে গোরার বেত ভেঙে সজোরে গোরাদের জানিয়ে দেন—আমাদের কারো গায়ে যদি বেত ছোঁয়াও কিংবা ধাক্কা দাও তো গলা টিপে নিয়ে গিয়ে আদি-গঙ্গার জলে ফেলে দেবো। এ-কথায় গোরারা আমাদের উপর আর দৌরাত্ম্য করেনি।

এই যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, এ আবহাওয়ার স্পর্শে গোরাদের অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষোভ একদিকে সন্ত্রাসবাদের বিস্ফোরক সৃষ্টি করলো। ইম্পিরিয়ালিস্ট দম্ভ-দর্প দেশের যুব-সম্প্রদায়ের মনে যেন আগুন লাগিয়ে দিলে। জুজুর ভয় তখন কেটে গেছে...পথে-ঘাটে অভদ্র গোরার দল আর তেমন আস্ফালন প্রকাশ করে না। বিলিতি ঘুষি আর বিলিতি গালাগালের বুলি পাল্টা কিলঘুষির ঘা খেয়ে খানিকটা শায়েস্তা হয়েছে! ওরা বুঝলো, আমাদের চোখই শুধু খোলেনি—জড়প্রায় হাত-পাগুলোও সতেজ সক্রিয় হয়েছে। তখন আমাদের খোলা চোখ বুজিয়ে হাত-পাগুলো[illegible] দুমড়ে দেবার জন্য পুলিশের কে[illegible] ব্রাঞ্চকে ওরা আরো প্রসারিত করে [illegible]লো। সে ব্রাঞ্চে বসে আমাদেরি স্ব[illegible] গোলামের দল প্রভুর নির্দেশে অ[illegible]মড়ে উৎসাহিত হলো! কিন্তু গণচে[illegible] কি তাতে আর নিরুদ্ধ হয়? অফি[illegible]ছারীতে গোরা-মনিবের দাপট এবং [illegible]পমানের শোধ হাতে হাতে দিতে [illegible] লোক রুখে উঠলো!

একটা কথা চা[illegible] আছে—খোঁচাতে খোঁচাতে কুয়োর ব[illegible] একদিন তেড়ে ওঠে! আমরা ব্যা[illegible] মানুষ! তাই ভাবি, পঞ্চাশ বছরে [illegible]মাদের চারিদিকে যে পরিবর্তন ঘটে [illegible]—বিলিতির মোহ ভেঙে নিজেদের সত্তা আমরা ফিরে পেলুম, এ কিসের জোরে?

১৯০৫ সালে কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে জাগরণের সেই যে জোয়ার এলো, কবির অভয় বাণী মেঘ-মন্দ্রে ধ্বনিত হলো—

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দু'বেলা মরার আগে
মরবো না ভাই, মরবো না!

সেই বাণী—

নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন, হবেই হবে!

ভাগ্যে ওদিক থেকে আঘাতের পর আঘাত এসেছিল, সে-আঘাতে চেতনা জেগেছিল! জুজুর ভয়-ভাঙা কত সভা-সমিতি, কত প্রতিষ্ঠান গোপনে গড়ে উঠেছিল, সে কাহিনী সঙ্কলিত হলে রোমান্সের চেয়ে তা উপভোগ্য হবে। এ যুগের নরনারী বুঝবেন আমাদের সম্ভ্রমবোধ-জাগ্রত মন পঞ্চাশ বছরে কি দুশ্চর তপস্যা করেছে—পলাশীর প্রাঙ্গণে যে মহাপাপ একদিন সংঘটিত হয়েছিল, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে।

জোট-নিরপেক্ষতার ফলাফল

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ভারত রাষ্ট্রের অনুসৃত জোট-বহির্ভূত থাকার নীতি আর নিরপেক্ষতার নীতি ঠিক এক কথা নয়। কারণ, কোন অপশক্তির দ্বারা পৃথিবীর শান্তি যদি কখনো আক্রান্ত বা বিঘ্নিত হয় ভারত তখন নিরপেক্ষ থাকবে না—শান্তির সপক্ষে সে দাঁড়াবে এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে এই হলো ভারতের শান্তি ও সহ-অবস্থান নীতির মূলকথা এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জোট-নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি বিচার্য।

গত ২০শে অক্টোবর চীন যখন অতর্কিতে ব্যাপক আকারে ভারত আক্রমণ করে বসে, তখন ভারতের সেই জোট-নিরপেক্ষ নীতি এক বিরাট অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যে ভারত উভয় শক্তি শিবিরেরই মৈত্রীকামী এবং যুদ্ধ পরিহার ও শান্তি স্থাপনই যার পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য, ভাগ্যের পরিহাসে সেই ভারতই যখন নীতিবোধ-হীন প্রতিবেশী চীনের আক্রমণের বলি হয়, তখন পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষ থেকেই অশেষ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আক্রান্ত ভারতের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হলো। শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, ভারতের মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমা-রেখাকেই ন্যায্য ও সঙ্গত চীন-ভারত সীমান্ত বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নিয়ে এগিয়ে এল ভারতের পাশে। সেই সময় ভারতের তরফ থেকে সাহায্যের প্রার্থনা সত্ত্বেও মিত্র-দেশ সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিষ্ট শিবিরের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির নীরবতায় স্বভাবতঃই জোট-নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক দেশবাসীর মধ্যে একটা গভীর হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল। এমন কি অন্যান্য যে সব জোট-নিরপেক্ষ দেশকে ভারত সকল সময় তার সঙ্গী এবং বন্ধু বলে জেনে এসেছে তারাও বেশ কিছুদিন চুপ করে রয়েছে তাদেরই সমগোত্রীয় রাষ্ট্র ভারত অপর এক শক্তি-শালী দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও। কৌরব সভায় প্রকাশ্যে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর অসহায় আর্তনাদ ও সাহায্য লাভের ব্যাকুল প্রার্থনার সম্মুখে যেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসেছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখ মহাবীর ও মহারথী-বৃন্দ, ঠিক তেমনিভাবেই আক্রান্ত ভারতের বিপর্যস্ত অবস্থা নিতান্ত নিরুপায়ের মতই যেন নীরব দর্শক হয়ে লক্ষ্য করছিল বাম ও মধ্যপন্থী শিবিরের রাষ্ট্রগুলি। সেদিন সেই দারুণ প্রয়োজনের মুহূর্তে আমেরিকা ও বৃটেন

জওহরলাল নেহরু

যেমন করে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত যাবতীয় সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তাতে এদেশের মানুষ কৃতজ্ঞতায় অভিভূত না হয়ে পারেনি। অনেকের মনেই এ প্রশ্ন সেই থেকে জেগেছে যে, চরম সঙ্কটের দিনে আমরা যখন জানতে পেরেছি আমাদের প্রকৃত বন্ধু কে তখন তাকে প্রকাশ্যে ও স্থায়ীভাবে বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে বাধা কোথায়? যাদের মৈত্রী ও সহায়তার প্রত্যাশায় আমরা এতদিন জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে এসেছি তারা কেউই যখন আমাদের চরম বিপদে পাশে এসে দাঁড়াল না, এমন কি দুঃখের সহানুভূতি-টুকু জানাতেও যারা দ্বিধাবোধ করলো তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে বন্ধুত্ব লাভের আশায় নতুন করে আবার সেই জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের সার্থকতা কোথায়?

কিন্তু এই নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত কি সম্পূর্ণ ঠিক? ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি বিচার করতে বসে অধৈর্য হওয়া কি বাঞ্ছনীয়? দেশের ভবিষ্যৎ যে পররাষ্ট্র নীতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল তার গ্রহণ বর্জন ও পরিবর্তনে ধৈর্যশীল বিবেচনা ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত একান্ত কাম্য। তাই জোট-নিরপেক্ষ নীতির ব্যর্থতার প্রশ্ন তুলতে গেলে আরেকটি প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবেই উঠবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাহায্য অবশ্য আমরা আশাতীতরূপে লাভ করেছি এবং তার জন্যে তাদের কাছে ভারতের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, কিন্তু চীন-ভারত সংঘর্ষে বিভিন্ন জোট-নিরপেক্ষ ও কম্যুনিষ্ট শিবিরভুক্ত রাষ্ট্র-গুলির ভূমিকা কি সম্পূর্ণই গৌণ বা অনুল্লেখ্য? পরবর্তীকালের ঘটনাবলী কিন্তু একথা বলে না।

জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির কথাই প্রথমে ধরা যাক। আমরা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি মিশর তথা

কেনেডি

আরব যুক্তরাষ্ট্রের কথা। মিশর আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু। মাত্র ছয় বছর আগে সুয়েজকে কেন্দ্র করে যখন ঐ আরব দেশটি এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল তখন ভারত তাকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানাতে কোনরকম দ্বিধার পরিচয় দেয় নি। আজ ভারতের সংকটেও মিশর অনেকটা সেই ভাবেই সাড়া দিয়েছে। মিশর প্রথম থেকেই চীনকে তার সব কটি সদ্য অধিকৃত এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। তারপর সিংহল প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে কলম্বোয় এশিয়া ও আফ্রিকার যে ছয়টি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সম্মেলন বসে সেখানেও তার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কলম্বোর এই জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনের মূলে লক্ষ্যই ছিল চীন ও ভারতের বিরোধ মীমাংসায় উভয় পক্ষকে আলোচনায় বসতে রাজী করানো। এই জন্যেই অনেক বিষয়ে তাদের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। মিশরের প্রধানমন্ত্রী আলী সার্বার দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে যথার্থই বলেছিলেন, কে আক্রমণকারী, আর কে আক্রান্ত তা নির্ধারণের জন্যে তাঁরা কলম্বোয় মিলিত হন নি, তাই ও বিষয়ে কোন কথা বলাই তাঁরা সংগত বলে মনে করেন নি। এই অবাঞ্ছিত বিরোধের সম্মানজনক মীমাংসার ব্যবস্থা করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল এবং সে লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্তরিকতার সংগে সে চেষ্টা করে যাবেন।

এখন কথা হলো নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কলম্বোয় সমবেত ষড়রাষ্ট্র নেতারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় কতটা সফল হয়েছেন? এর উত্তরে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন এসে পড়ে যে, কলম্বো সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে এবং দু একটি ক্ষেত্রে ছাড়া প্রতিনিধিদের বক্তৃতা বা আচরণে আক্রান্ত ভারতের প্রতিই কি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায় নি? কলম্বো প্রস্তাবের সংগে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বেকার স্থানে চীনাদের অপসারণ সম্পর্কে ভারতের দাবীর কতটুকু পার্থক্য? প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছেন যে, কলম্বো প্রস্তাবে ভারতের অভীষ্ট ষোল আনাই সিদ্ধ হয়েছে। এ যে আমাদের জোট-নিরপেক্ষতারই ফল তা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে? এ কথা অবশ্য ঠিক, কলম্বোয় সম্মিলিত ষড়রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা হয়েছে চীনের পক্ষ থেকে। কিন্তু তা সত্বেও উভয়পক্ষে মীমাংসা আলোচনা আরম্ভের পূর্বে চীনকে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বস্থানে ফিরে যেতে হবে, কলম্বো প্রস্তাবের এই কথার মধ্যে ভারতের কূটনৈতিক জয় সূচিত হয়েছে। এ কথার অর্থই এই যে, নিরপেক্ষ ষড়রাষ্ট্র চীনকে আক্রমণকারী বলে স্বীকার করে নিয়েছে অর্থাৎ তাকে অন্যায়কারী এবং অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেছে। আরো কড়া ভাষায় ও চড়া সুরে ভারতের দাবীকে সুস্পষ্টভাবে সমর্থন জানানো সম্ভব হয়নি তা মীমাংসা প্রয়াসে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দূতসুলভ নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য। সুতরাং ভারত-চীন দ্বন্দ্বে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির সমর্থন ভারত পায় নি এমন কথা বলা ঠিক হবে না। এ সব রাষ্ট্রের সামরিক বা বৈষয়িক সামর্থ্য খুবই সীমিত, চীনের সুপরিকল্পিত ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রত্যক্ষ সাহায্যের প্রকৃত মূল্যও নিতান্ত সামান্য। এক্ষেত্রে তাদের নৈতিক সমর্থনই

ম্যাকমিলান

বড় কথা এবং আমরা নিজেরা জোট-নিরপেক্ষ বলেই অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশের সমর্থন পুরোপুরি পেয়েছি এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এই তো সেদিন দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল-

ক্রুশ্চভ

কেল্লায় সম্বর্ধনার উত্তরে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক উচ্চ কণ্ঠে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির এবং শ্রীনেহরুর কূটনৈতিক বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। রাষ্ট্রজোটের বাইরে থাকার সুফল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমাদের প্রতিবেশী দেশ-সমূহের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে যে, যদি আমরা কোন রাষ্ট্রজোটের অন্তর্ভুক্ত হতাম তা হলে আমাদের খুবই বিপদে পড়তে হতো এবং পরিণামে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা হারাতে হতো।' সিহানুকের এই কথার মধ্যে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির একটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে।

এ প্রসংগে মালয়ের কথা একটু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করতে হয়। একটি ক্ষুদ্র শান্তিকামী দেশ মালয়। চীনের অনুপ্রবেশ নীতিতে সেও কম বিব্রত নয়। তবুও যে নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহসের সংগে সে আক্রান্ত ভারতের পাশে তার পূর্ণ সমর্থন ও সম্পূর্ণ সামর্থ্য নিয়ে এসে প্রথম থেকে দাঁড়িয়েছে ভারত সে কথা কোনদিনই ভুলতে পারবে না।

এবার আসা যাক চীন-ভারত সংঘর্ষের পটভূমিকায় কম্যুনিস্ট শিবিরের কথায়। আন্তর্জাতিকতা ও কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সৌভ্রাত্রই হলো এদের রাষ্ট্র-নীতির মূল কথা। কম্যুনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণের পূর্বপর্যন্ত এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি যে একটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের কোন কাজ অপর কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-সমূহ বা দলগুলি কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। কিন্তু চীন-ভারত দ্বন্দ্ব এই শিবিরের মতাদর্শের সংঘাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দিকে প্রাভদার প্রবন্ধ ও অন্যান্য কয়েকটি সংবাদে ভারতীয়

জনমত সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেও স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা যেতে লাগল যে, ভারত ও চীনের বিরোধ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের কাছে অবাঞ্ছিত এবং চীনের পক্ষ সমর্থন করে ভারতের মৈত্রী তাঁরা হারাতে চান না। ইতালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির কম্যুনিস্ট পার্টিতো প্রকাশ্যেই চীনকে ভর্ৎসনা করেছে ভারত আক্রমণের জন্য। হাঙ্গেরীর পার্টি কংগ্রেসেও চীন নিন্দিত হয়েছে এবং অতি সম্প্রতি পূর্ব-জার্মাণ কম্যুনিস্ট কংগ্রেসে সমবেত বিশ্বের সত্তরটি দেশের প্রতিনিধি এ ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ঐ সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধি যখন ভারত আক্রমণের পক্ষে সাফাই গাইতে চেষ্টা করেন তখন সমবেত সাড়ে চার হাজার প্রতিনিধির ধিক্কার ধ্বনিতে তাঁর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণই হারিয়ে যায়। পূর্ব জার্মাণীর কম্যুনিস্ট নেতা হের উলব্রিখ্‌ট প্রকাশ্যেই সম্মেলনে বলেন, চীন-ভারত দ্বন্দ্বকে তাঁরা অহেতুক বলে মনে করেন এবং ভারতের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের দীর্ঘদিনের মধুর সম্পর্ক বজায় রাখতেই চান। এই সম্মেলনে স্বয়ং খ্রুশ্চফ যে বক্তৃতা দিয়েছেন তাও চীনা নীতি ও জঙ্গীবাদের তীব্র নিন্দায় মুখর। প্রত্যক্ষভাবে চীনের নামোল্লেখ না করলেও চীনকে লক্ষ্য করেই যে তাঁর ভর্ৎসনাবাণী উচ্চারিত হয়েছে বিশ্ববাসীর তা বুঝতে বাকি নেই। তারপর মাত্র কয়েকদিন আগে যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল টিটো লাল চীনের নেতাদের চেঙ্গিজ খানের উত্তরসাধক ও হৃদয়হীনতায় তারই সমগোত্রীয় বলে যে সমালোচনা করেছেন এখানে তাও উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষে আফ্রোশীয় সংহতি সম্মেলনে চীনা কূটকৌশলকে ব্যর্থ করে দিয়ে যেভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেও ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি এবং ভারতের শান্তিপ্রয়াসই জয়যুক্ত হয়েছে।

চীন-ভারত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট শিবিরের প্রায় সমুদয় দেশের মনোভাবের এই যে পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাতে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতির দান যে অনেকখানি তা কে অস্বীকার করবে? ভারত যদি প্রকৃত নিরপেক্ষ ও পৃথিবীর সকল দেশের অকৃত্রিম বন্ধু না হতো তবে কি চীনা আক্রমণের পর এমন করে সকল শিবিরের সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া যেতো? কোনো এক শিবিরের তল্পীবাহক হয়েও যে সমস্ত দেশবাসী গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার সমর্থনে চীৎকার করে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু দেশের শুভানুধ্যায়ী অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষই যে জোট-বহির্ভূত থাকার নীতিতে মনেপ্রাণে আস্থাশীল নিঃসংশয়েই তা' বলা যেতে পারে।

চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ মীমাংসার প্রয়াস চলেছে এবং গোটা পৃথিবীর দিক থেকেই চীনের ওপর চাপ পড়েছে তার জঙ্গী-নীতি ও শঠতাপূর্ণ আচরণ পরিবর্তনের জন্যে। কিন্তু যত-দিন পর্যন্ত তার সেই পরিবর্তনের স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যাচ্ছে এবং কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীন বিরোধ মীমাংসার আলোচনায় অগ্রসর না হচ্ছে ততদিন পূর্ণ উদ্যমেই আমাদের প্রতিরক্ষার উদ্যোগ চলবে। বর্তমান নিস্তব্ধতা এ চীনা অপসারণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেশের একদল লোক যুদ্ধের

নাসের

তবে এ কথা মানতেই হবে আক্রমণকারী চিরকালই আক্রান্ত রাষ্ট্রের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং চীনও তেমনি সুযোগের সন্ধান পেয়েই ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু আজ তো আমরা আর নির্বান্ধব নই, আমরা দুর্বলও নই—বরং জাতীয় ঐক্যে সুসংহত এবং দূরদর্শী ও শান্তিনিষ্ঠ জোট-নিরপেক্ষ নীতির ফলে গোটা পৃথিবীর নৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্য ও সমর্থনে আমরা পুষ্ট। তাই এ কথাই আবার বলব, জোট-নিরপেক্ষ নীতি অটুট রাখা ভারতের ও জগতের কল্যাণের জন্যেই অত্যাবশ্যক। অবশ্য সংগে সংগে এ কথাও আমরা মনে রাখব যে নিরপেক্ষ-

টিটো

সিহানুক

সম্ভাবনা তিরোহিত বলে প্রচার করলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশই অনুসরণীয়। মহাত্মা গান্ধীর পঞ্চদশ তিরোধান দিবসে রাজধানীতে এক বিরাট জনসভায় তিনি বলেছেন, 'চীন যে কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারছে না, বিশেষ করে সে জন্যেই দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে আরো দ্রুততর করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।' কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের টালবাহানা ও নানা ধরণের সর্ত আরোপের মনোবৃত্তি থেকেই পৃথিবীর মানুষের কাছে কে শান্তিকামী (চীন না ভারত) তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত, এ কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এ বিষয়টি যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে সমগ্র পৃথিবীর কাছে, সে সম্পর্কে আজ আর বোধহয় সন্দেহের কোন কারণ নেই। এবং সে কাজে আমাদের জোট-নিরপেক্ষ নীতি যে বহুলাংশে সহায়ক হয়েছে তাও অবশ্যই স্বীকার্য।

তার অর্থ নিশ্চেষ্টতা বা নিশ্চিন্ততা নয় —চীনের 'মধ্যযুগীয়' বর্বরতার আক্রমণ থেকে কিংবা অন্য যে কোন আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সামরিক প্রস্তুতিতে বিন্দুমাত্র শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

আজ বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কিউবা ও বার্লিন সংকটে যে ধৈর্য ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়ে চলেছেন এবং মাঝে মাঝে বাধাবিঘ্ন ও মতানৈক্য দেখা দেওয়া সত্ত্বেও নিরস্ত্রীকরণের আলোচনা বর্তমানে যেরূপ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে তাতে আশা করা যায় অচিরেই হয়তো পৃথিবী যুদ্ধের অভিশাপ হতে দীর্ঘকালের জন্যে মুক্তি পাবে এবং ভারত-প্রবর্তিত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। শান্তির শিবির যদি সত্য সত্যই এভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা হলে কম্যুনিস্ট চীনের জঙ্গী ঔদ্ধত্যের যে অচিরেই অবসান ঘটবে তাতে কি আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে

আলি সাব্রি

মিসেস বন্দরনায়ক

অজিত্রু আটা

সধবার একাদশীর মত বাইরে থেকে দিল্লীর রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশেষ সরগরম মনে না হলেও, ভিতরে ভিতরে পর্দার অন্তরালে যথেষ্ট চাঞ্চল্য। রামলীলা ময়দান থেকে সাউথ ব্লকের ক্যাবিনেট রুম পর্যন্ত সর্বত্রই প্রকাশ্যে এক ধ্বনি : নন্-এ্যালাইনমেন্ট জিন্দাবাদ। কিন্তু বাস 'দাস্ ফার, নো ফারদার'। ভিতরে ভিতরে মুখর আলোচনা। নেহরুর কি চোখ খুলবে না। কৃষ্ণ মেননের প্রভাবমুক্ত কি তিনি আজও হবেন না? নন্-এ্যালাইনমেণ্টের মোহ কি ঘুচবে না? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি......।

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকারী নীতির সমালোচনার যথাযোগ্য ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আজকের এই ইমার্জেন্সীতে প্রকাশ্যে নেহরু জিন্দাবাদ আর অপ্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধাচারণ করা কি ন্যায়সঙ্গত? লোকসভা-রাজ্যসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে গান্ধীটুপি নেড়ে নেড়ে কংগ্রেসী পাণ্ডারা যা বক্তৃতা দেন, সেটাই কি তাঁদের সত্যকার অভিব্যক্তি! বোধকরি অনেকের ক্ষেত্রেই নয়। তাই তো দেখি সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকজন বিশেষ বিশেষ কংগ্রেসী এম্ পি'র লনে, মুখর আলোচনার বৈঠক। মাঝে মাঝে এদের মধ্যে দু' এক ভিন্ন চরিত্রের লোকও দেখা যায়। এমন কি এই সমস্ত নেপথ্য-বৈঠকে অনেক সময় বেশ রোমাঞ্চকর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। শুনেছি কিছুদিন আগে এমনই এক বৈঠকে বোম্বেবাসী এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদধারী জনৈক ব্যবসাদারের ব্যবস্থাপনায় একজন তরুণ কংগ্রেসী এম্ পি'কে নেফায় নানারকম তদন্ত করতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে তা কার্যকরীও হয়। এমনি নিভৃত ভাবে রাজধানী দিল্লীতে চলছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক বিরাট দুনিয়া।

* * *

রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও দিল্লী বহু সময় মুখর হয়ে ওঠে। যেমন হয়েছে বর্তমানে বৈজয়ন্তীমালাকে নিয়ে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য তিনি বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' দেখাচ্ছেন এ-আই-আর অডিটোরিয়ামে। এই শুভ অনুষ্ঠানের উদ্যোগপতি এক বিশিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও, সরকারী অনুগ্রহে সেদিন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ গোপাল রেড্ডী এবং শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালার এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠক হলো। রাষ্ট্রপতি ভবনে বিদেশী প্রধানমন্ত্রীদের সংবাদিক সম্মেলনের যা কড়াকড়ি না করা হয়, তার দশগুণ কড়াকড়ি করা হয়েছিল এই প্রেস কন্‌ফারেন্সের জন্য। হাজার টাকার মাইনেওয়ালা তথ্য দপ্তরের অফিসারদের সেদিন কি দুর্নিবার কর্মোৎসাহ! ঘুরে-ফিরে বার বার তাঁদের ইনভিটেশন্ পরীক্ষা। আরো কত কি। চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম দু'-আড়াই হাজার টাকা মাইনেওয়ালা দু'-চারজন অফিসার করস্পন্ডেণ্টদের মাঝে ডুব মেরে বসে আছেন।

পি-আই-বি'র যে কনফারেন্স রুমে 'বর্ডার' নিয়ে 'ফরেন' ও 'ডিফেন্স' মিনিস্ট্রীর ব্রিফিং হয়, সেই ঘরেই হলো 'চণ্ডালিকা'র প্রেস কনফারেন্স। ইংরেজ এক হাতে সেক্সপিয়র-জনসন-জি, বি, এস আর এক হাতে রাইফেল নিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখেছে এতদিন ধরে। আমরাও প্রায় সেইরকম এক হাতে 'কলম্বো প্রপোজাল' আর এক হাতে বৈজয়ন্তীমালার 'চণ্ডালিকা'র টিকিট নিয়ে ইমার্জেন্সী পাড়ি দিতে চলেছি। তাই নয় কি?

* * *

ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের দরজায় বাঙ্গালী বার বার হোঁচট খেলেও, সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অনন্য কৃতিত্ব সারা ভারত সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবার রিপাব্লিক ডে'র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলার চারজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বাংলার বাইরে বাঙ্গালীর সে সম্মান মোটেই অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন নি। হেমন্ত-সতীনাথ-উৎপলা-সন্ধ্যা সম্মিলিতভাবে গাইলেন নজরুলের চিরনতুন "ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল"। কিন্তু হায়! অন্যদের কথা তো বাদই দিলাম, হাজার হাজার বাঙ্গালী দর্শকদের মধ্যে একজনও হাততালি দিলেন না। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শকের সামনে বাংলার চারজন শিল্পী যে নিদারুণ ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, তার জের বোধকরি দিল্লীর বাজারে সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তবে হ্যাঁ, সন্ধ্যার একটি গজল বেশ হয়েছিল। কিন্তু দিল্লীর দর্শক বাঙ্গালী শিল্পীদের কাছে প্রত্যাশা করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির গান। গজল নয় গীত নয়।

প্রথমা প্রলাপ বকল, 'আজ আর এলো না।'

দ্বিতীয়া স্বর উঁচিয়ে প্রতিবাদ করল, 'না আসবে কেন?'

তৃতীয়া তরঙ্গ তুলল, 'আসবেই।'

শীতের সন্ধে, একটুতেই রাত। আমগাছের ছায়াটা উঠোন কাটিয়ে সামনের রকের ওপর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। খোলামেলা আকাশ, আধো আলো আধো অন্ধকার। জোড়া নারকেলের মাথা দুটো ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে অচল।

রাস্তায় সাইকেলরিক্সার আনাগোনা। মোটর ট্যাক্সি কচিৎ কদাচিৎ। একটু দূরে বড় রাস্তায় ট্রাম, দু তিনটে রুটের বাসেরও যাতায়াত।

এই সব নিয়েই দিনরাত তর্ক করে বিমলা, যে প্রথমা ও প্রধানা। মন্ত্রী উপমন্ত্রী দেশ-বিদেশ, এমন কি মাছি-মশা নিয়েও তর্কের শেষ থাকে না। তর্ক থেমে যায় একজনকে দেখলে, যার সম্বন্ধেই তিন বোনের আলোচনা। সে আসবেই, যেমন রোজ আসে।

কমলা বলল, 'শীতশীত ভাব ভালো।'

বিমলা বিরূপ হলো। 'শীত আবার ভালো! তোর কমলা সবতাতেই মজা।'

হাত থেকে পশমের বলটা ফস্কে বেরিয়ে পড়ল। হেসে উঠল অমলা। অমলার হাসিই সব। হাসি ছাড়া যেন তার কিছুই নেই। ছোট বোন, নরম বয়েস—তাই বাড়ন্ত দেহ, ফুটন্ত যৌবন। সময় সময় রাগে দাঁতে দাঁত চেপে অমলাকে শাসন করে বিমলা। তখন আবার কমলার ভয়ানক মজা লাগে—অমলার দিক নেবে, না বিমলার।

কমলা বলল, 'শীতে শরীর সারে, হজম হয়।'

বিমলা খিঁচিয়ে উঠল, 'কিসের ইঙ্গিত হলো শুনি? মায়ের স্বভাব পেয়েছিস যে!'

কমলা লুকিয়ে হেসে আমগাছের ডালের দিকে দৃষ্টি দিল। তারপর অমলার মুখের খাঁজে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে কি-না দেখে দিদির তাড়াতাড়ি পশম বোনার ভঙ্গি দেখল।

বিমলা আবার মুখ খুলল, 'আমি না বললে তোরা হ্যাঁ বলিস, হ্যাঁ বললে তো নেচে বেড়াস। আজ জয় বাড়ী ফিরুক, তার ব্যবস্থা সে দেখে নিক। আমার হয়েছে মরণ, না পারি এদিকে যেতে না পারি ওদিকে।'

কমলা অমলা এবার সত্যিই দমে গেল। দিদির রোখ চাপলে ছাড়ছোড় নেই। মাথার ওপর নিজেদের বলতে ঐ তো একটা ভাই। কমলার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। জয়েরও বাড়ী ফেরার সময় উৎরে গেছে। তারও কি মতিগতি ভাল? ইয়ারবন্ধু নিয়ে তাস পিটে সময় নষ্ট করছে। সামান্য চাকরির পয়সায় কি আর এতবড় সংসার চলে। উপরি উপায়ের ধান্দা করতে বয়ে যায় জয়ের।

শীতটা পড়েছেই বটে। গায়ের চাদর জড়িয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিল বিমলা। হাত দুটো পশম আর কাঠির সঙ্গে যুদ্ধে মেতে আছে বলে গরম গরম ভাব আছে। এক ফালি রক, একটা দরজা। দরজা ডিঙুলেই ঘর। একখানা ঘর নিয়েই একটা আস্ত বাড়ী, মস্ত ঠিকানা।

অমলা জলের বালতি ঠুকে বসিয়ে দিয়েছে, কমলা আটায় জল ঢালতে আন্দাজ ঠিক করতে পারেনি। বিমলার উলের ডিজাইনে ভুল হয়েছে। তিনজনের চোখ তিন দিক ঘিরে দৌড় দিয়ে বেড়াচ্ছে। জয় এক্ষুনি এসেই বলবে—তাড়াতাড়ি তোরা কিছুই কোনদিন করতে পারলি না, অথচ সারাদিন শুয়ে বসে। আমাকে এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে।

বিমলা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও যেটুকু বলবে তার ধরন-ধারন নিয়ে কমলা অমলা মনে মনে সমুদ্র মন্থন করবে। জয়ের খুটিনাটি কথাগুলো শুনে কমলা

সামান্য ক্লান্ত হবে অমলা দাদাকে আরো নির্ভরযোগ্য মনে করে স্বপ্ন দেখবে।

নিয়মের কোনদিন ব্যতিক্রম হয় নি। বিমলা গৃহকর্ত্রীর রূপ ধরে যথাসম্ভব গম্ভীর হবে। জয় রাগ দেখাবে, তারপর নিঃসাড়ে চলে যাবে। বিমলা টেনে টেনে হাসবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই স্নেহাংশু আসবে। তিন বোনেই চকচকিয়ে উঠবে, অন্তরঙ্গতার সুরেলা তরঙ্গে গা ভাসিয়ে কথার পিঠে কথা ছুঁড়বে।

'খুব তাড়া কিন্তু।' জয় অবিকল এক।

'কিসের তাড়া?' বিমলা কৈফিয়ৎ চাইল।

জয় একটু চিন্তা করে বলল, 'স্নেহাংশু এখনো আসে নি? আশ্চর্য ব্যাপার! মানে, আমার দু-একজন বন্ধু আসতে চায়।'

বিমলা সহযোগিতা করে বলল, 'তা আসুক না, নিয়ে আসবি, এ এমন কি কথা।'

'না, তা হবার যো নেই। তুই আমার দিদি, তোকে খুলে বলার দরকার আছে কি?'

কমলা এতক্ষণে চোখ ফিরিয়ে দিদির মুখখানার আসল রং জানতে চেষ্টা করল। অমলা মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চেপে রাখল।

বিমলা গুম হয়ে ফুলতে লাগল। জয়ের মুখের বাড় অনেকখানি হয়েছে। সে বলতে চায় কি?

জয় আরো বলল, 'মা আজ রাস্তায় বন্ধ পাগল। কেন জানিস?'

দুখানা রুটি একসঙ্গে মুখে পুরে চায়ে চুমুক দিল জয়। পায়ের পাতা নাচিয়ে আরো কিছু বলতে গেল, বলল না।

'আমার জন্যে বলছিস?' ফুঁসে উঠল বিমলা।

'কারো জন্যে নয়, আমার জন্যে।' রুটির ডিসটা সজোরে আছাড় মেরে ফেলে দিল উঠনে।

'আরে কি ব্যাপার?' স্নেহাংশুর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর। এগিয়ে এসে বলল, 'জানেন দিদি, আশ্চর্য শুভ খবর। জয়ের প্রমোশন হয়ে যাচ্ছে, এক থোকে তিরিশ। কি হে, চুপ কেন? যার জন্যে কার চুরি সে-ই বলে চোর।'

সবার দৃষ্টি স্নেহাংশুকে আকর্ষণ করল। জয়েরও আনন্দোজ্জ্বল মুখ।

'তাহলে আজই হয়ে যাক, কি বলেন দিদি? সেরেফ মাংস। আমিই বাজারে যাচ্ছি, খরচটা না হয় আমারই। বিশেষ আপত্তি থাকলে পরে দিলেই চলবে।'

নিমিষে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বিমলার মুখখানাও খুশীতে টইটম্বুর। কমলার উচ্ছ্বাসকেও হার মানাতে চায় অমলা।

জয় বলল, 'আমার ফিরতে আরো একটু রাত হবে, তোরা ভাবিস নি।'

জয় কোনদিকে না চেয়েই বেরিয়ে গেল। জয়ের সামর্থ্যের সীমা স্নেহাংশুর চেয়ে আর কেউ জানে না। এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটাও স্নেহাংশুর দৌলতে। ভাড়াটে বাড়ী, তাতেও বাছবিচার কম নেই। স্নেহাংশুর দান কি কম? বন্ধু-হিসাবে জয়ের সঙ্গে মাথামাখি, তারপর জয়কে ছাড়িয়ে বিমলা। বয়সে বড়, মনে কিন্তু সমান সমান। স্নেহাংশুরও দিদি।

স্নেহাংশু অমলার শাড়ি গোঁজার কায়দা নিরীক্ষণ করে কমলার চোখের কাজল দেখল, তারপর সব শেষে বিমলা। পড়তি চুলের আলগা খোঁপার ওপর হাতির দাঁতের বেলকুঁড়ি, কাটা-গলার ব্লাউজ। শীতের মুখঢাকা প্রথম প্রহরের রাত। বিমলার হাতের উল কাঁটা ঝাঁপির মধ্যে আশ্রয় নিল। কমলা রান্নাঘরে, অমলার ছাতে পায়চারি।

স্নেহাংশু সত্যিই বাজারে ছুটল। বিমলা বাধা দেবার চেষ্টা করেছে মাত্র, সেই ফাঁকে স্নেহাংশুর মাফলারের সঙ্গে বিমলার আলগা খোঁপার একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়েছে। কমলা রান্নাঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়ে দীর্ঘ-শ্বাস ফেলেছে। দিদির যত বয়স বাড়ছে ততই যেন ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জেদ বাড়ছে। বাড়ুক, ঐ পর্যন্ত।

অমলা পা টিপেটিপে নিচে নামল। দিদি গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে। হিমহিম আকাশ-ছাওয়া শীর্ণ জোছনা। আমগাছের মগডালে এক ঝাঁক জোনাকি। পাশের বাড়ীর টিনের চালের ওপর বেড়ালের ডাক। জোড়া নারকেলের মাথাঘেঁষা ঘনিষ্ঠতা। স্নেহাংশুদা একবারটি ছাতে না উঠেই বাজারে ছুটল। অমলা আজ কিছুতে নেই। তার আর দরকারটা কিসে? যোগাড় তো সবই সারা। বিমলাই তো ওদের শত্রু, একটু চোখের আড়াল হলেই ডাকের ওপর ডাক। যেন অমলা ফাঁকি দিয়ে দিদির দুধের বাটিতে চুমুক দিয়েছে। কমলাও কম নয়, ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়াবার সাধ, জল করে রুমালে সাবান দেবার আগ্রহ, চা মা চাইলেও কাপের ওপর কাপ। মুখ ফুটে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে তাগিদ। বিমলা তো প্রাণ থাকতে সেটি হতে দেবে না। নিজে ঘুরবো নিজে সাজবো আর স্নেহাংশু ছাড়া চলবো না উঠবো না। অথচ কত গল্পই শ্বশুর-বাড়ীর।

সোজা ঘরের চৌকিতে ঠেসান দিয়ে বসে অমলা নিশ্বাস নিল। ধূপের সুগন্ধ এখনো ঘরে আটক হয়ে রয়েছে। নতুন ডুরে শাড়ির আঁচল ভেদ করে ব্লাউজের গলার সুচের কাজ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্নেহাংশু বারদুই চোখ বুলিয়েছে মাত্র। দিদির গলা-কাটা হলদে ব্লাউজের কাঁধের ওপর সাদা শাড়ির সবুজ পাড়। তারচেয়ে কমলার লম্বা চুলের বিনুনি খোঁপা আরো আকর্ষণীয়। অমলা চিরুনি নিয়ে সামনের চুলের গুছিটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। স্নেহাংশু প্রায়ই বলে—পরিপাটি সব সময় সুন্দর নয়, একটু এদিক ওদিক হতে দেওয়া ভালো।

বিমলার চোখ এবার সদর দরজার ফাঁক কাটিয়ে আবার ফিরে এসে রান্না-ঘরের জানালার দিকে গেল। তারপর ঘরের মধ্যে পা ফেলে ঢুকতে যেয়ে অমলাকে দেখে মুখ টিপে হাসল। বিছানার ওপর পশম আর কাঁটার ঝাঁপি ছুঁড়ে দিয়ে ছাদের সিঁড়ি-ঘরে [illegible] গলাল।

কমলা রান্নাঘর থেকে সটান ঘরে ঢুকে অমলাকে বলল, 'তুই এরই মধ্যে নামলি যে?'

'নামলুম। এমনি।'

'কি যেন বলবে আজ।' থমথমে মুখ কমলার।

'বলুক, ভালই তো। কতদিন আর আটকে থাকবি?' অমলা টেনে টেনে হাসল।

কমলা রাগ রাগ ভাব দেখাল। 'হাসির এত কি? ভেবেছিস তোরই জয়। আমি থুবড়ি হয়ে পড়েছি, এই তো?'

অমলা আর কথা বাড়াল না। শাড়ির ভাঁজ ঠিক করে কমলার মুখো-

মুখী দাঁড়াল। মাথায় দুজনেই সমান। উনিশ বিশ রং। নাকমুখ মাঝারির নীচে, তবুও জৌলুস কম নয়।

অমলা বলল, 'দিদির কথা বাদ দে, যা চাইছে কোনদিনই পাবে না।'

'আমিও তাই বলি।' সংযুক্ত হয়ে উঠল কমলা। 'আর জানিস, দাদাটা এবার একটা কিছু করবেই।' কমলা বুক খালি করতে পেরে খুব সতেজ আর সরস হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তেই স্নেহাংশু ফিরে এল। বলল, 'হাতে জল দাও অমলা।'

তাড়াতাড়ি স্নেহাংশুর হাতে জল ঢেলে দিল কমলা। কিন্তু তার আগেই বিমলা সটান রকের মাদুরে বসে পড়েছে। অমলা দরজার সমুখ থেকে আবার ঘরের মধ্যে ফিরে যাচ্ছে।

'বেশ কিন্তু লোক সব। একটা খবরের মতো খবর, কোন সাড়াই নেই। গোটা দিনের দিন যাচ্ছেতাই হয়ে যাচ্ছে।' স্নেহাংশু বিমলার পাশ ঘেঁষে বসে কমলাকে দেখতে চাইল। কমলা মাংস হাতে ধুয়ে বলল, 'একটু চা?'

'হয় হোক, আপত্তি নেই। দিদির জন্যেও কিন্তু।'

'আমার দরকার নেই।' বিমলা মুখ বাঁকাল।

'ঠিক আছে কমলা, যা বললুম।'

কমলা হাসি হাসি মুখ করে রান্না-ঘরে ঢুকল। অমলার ছায়াটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাশ কাটিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ টের না পাক স্নেহাংশুর জানতে বাকি থাকছে না।

স্নেহাংশু প্রশ্ন তুলল, 'রাগ নাকি? আমাকে কিন্তু আপনি দমাতে পারবেন না। চেনেন তো আমায়।'

বিমলার গম্ভীর মুখে হাসি এল। বলল, 'ব্যবস্থা একটা করাই উচিত। তুমি বিশ্বাস করো স্নেহাংশু, আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।'

স্নেহাংশু উৎসাহ দেখাতে পারল না।

'তোমারও যেন আজকাল মন পাওয়া দায়। কি এমন অপরাধ করেছি!' চোখ ছলছলিয়ে উঠল বিমলার।

স্নেহাংশুর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে বেরুল, বলল, 'আমিও তাই মনে করছি, কোন অপরাধই আপনি করেন নি।'

'ঠিক বলছো স্নেহাংশু?'

'ঠিক। তবে আমি বলছিলুম আপনার সম্বন্ধেই। জয় যাই করুক, যাই ভাবুক, আমি তো আছিই।'

বিমলার সারা মুখে বিদ্যুৎ খেলল। 'জানো স্নেহাংশু, তোমাকে নতুন করে বলার আমার কিছুই নেই। তোমাকে সমস্ত বলেছি, একটুও লুকুই নি। এখন তোমার ওপরই সব।'

স্নেহাংশু জড়সড় হয়ে কোটের বোতাম আটল। আমগাছের ডালের দিকে তাকিয়ে তেতলা বাড়ীর ছাদের কার্নিস দেখে অমলার ছায়াটাকে লক্ষ্য দিল। কিছু একটা বলুক। অমলার ছায়াটা উত্তর থেকে দক্ষিণে মিলিয়ে গেল।

স্নেহাংশু বলল, 'জয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন?'

'করিনি, করবো। ওদের বড্ড দাপট, মুরোদ তো কতই, অথচ আমার ওপর কটাক্ষ! কেন, আমি কি কারো কাছে দাসখত লিখে দিয়েছি না কি?'

বিমলার উত্তেজিত দেহটা আরো খানিকটা এগিয়ে গেল স্নেহাংশুর দিকে। মাফলারের প্রান্তে বিমলার আলগা চাদরের খুঁট জড়িয়ে রয়েছে।

"তোমারও যেন আজকাল মন পাওয়া দায়"

তারপর কমলার রান্নাঘরে হাতাখুন্তির শব্দ অনুভব করে বিমলার সিঁথিটা পর্যবেক্ষণ করল। মাঝে মাঝে ওখানে সিঁদুরের আঁচড় পড়তো। এখন সম্পূর্ণ অনাবৃত।

বিমলা আরো অন্তরঙ্গ হয়ে স্নেহাংশুর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'ওদের ব্যবস্থা না করলেই নয়। আর দুদিন পরে কমলাকে কেউ পছন্দ করবে না, বয়সের গাছপাথর নেই।'

অমলার কান খাড়া। তার সম্বন্ধে

কমলা ডাক দিল, 'দিদি, ও দিদি, শুনতে পাচ্ছো না বুঝি? একটু এসো, সব দায় যেন আমার?'

'চেঁচাস নি অমন করে।' বিমলা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

অমলা গলা বাড়িয়ে বলল, 'হিমহিম ভাব, ঠাণ্ডা লাগতে পারে। রাত তো হলো, আর কেন স্নেহাংশুদা? দেখুন কত শিশির পড়ে গেছে রকে।'

স্নেহাংশু নিশ্চুপ হয়ে ঘরে ঢুকল। চেয়ারে আধহেলান দিয়ে বসে বলল,

'তোমাকে কতবার বলেছি অমলা, একটু পড়াশোনা করো, শুনলে কি?'

ঠোঁট উল্টিয়ে অমলা বলল, 'কি হবে শুনি? বিয়ে আমার ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন। সংসারও ঠিক ভাল ভাবেই করে যাবো।'

স্নেহাংশু দমে গেল। বলল, 'বিয়ে তোমার দিচ্ছে কে? করতেই বা কার বয়ে যাবে।'

অমলা বাঁকা হেসে বলল, 'দাদাই ঠিক করবে।'

স্নেহাংশু ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। অমলার ডুরে শাড়ির গাঢ় রং, ব্লাউজের সূক্ষ্ম কারুকার্য আবার একবার ভাল করে দেখল। বিমলার পাশে এইমাত্র বসেছিল, হাত ধরে একান্ত হয়ে কথা বলেছে বিমলা, ভাঙা গালের ওপর সজীবতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। অমলার পাশে বসে ওর চটুল তর্ক শোনার চেয়ে সুখ কিসে। স্নেহাংশু সাড়া তোলে না, জানালার বাইরে ঝরে পড়া আলোর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলায়।

'স্নেহাংশু, এখানে এসো। মাংস একটু চাকো। কমলার আবার নুন কম দেওয়া অভ্যেস। বিয়ে হয়ে গেলে—'

এক টুকরো মাংস চিবিয়ে স্নেহাশু তিন বোনের চোখের দিকে তাকাল। সশব্দে আর একটু ঝোল চেটে বলে উঠল, 'ফার্স্ট ক্লাস। মাংস রাঁধতে কমলার জুড়ি নেই।'

অবাক চোখ মেলে কমলা স্নেহাংশুর প্রশংসা গিলতে লাগল। বিমলা ঘাড় কাৎ করে রান্নাঘরের দরজার শিকল আটকে এগিয়ে এসে বলল, 'স্নেহাংশুর ঐ এক কথা—ফাস্ট ক্লাশ। কেন, আমার রান্না কি খুব নিরেস, খুব অরুচিকর? তোমাদের যতই করে মরো, নাম নেই।'

রাগে বিমলার মুখখানা থমথম করতে লাগল। অমলা ঘরের সেই প্রান্তে দাঁড়িয়ে হেসে কুটিকুটি। কমলা আর অমলা চোখাচোখি হলো। স্নেহাংশু আবার চেয়ারে আধহেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। পাশের চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে বিমলা সায়ার ছেঁড়া লেশটাকে আবিষ্কার করল।

'কিছু বললে না?'

'বলবো একটা কিছু, তাই ভাবছি।' স্নেহাংশু সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বিমলার মুখের দিকে তাকাল। বিমলা খুব খুশীর আমেজ নিয়ে পা নাচাল। কমলা অমলা জোড় প্যাঁচ দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে কি সব বলাবলি শুরু করেছে।

'বিয়ে ওদের না হবে কেন, কিছুই অসম্ভব নয়, ভাল পাত্রও জুটতে পারে।' স্নেহাংশুর সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলি বিমলার দিকে এগিয়ে গেল।

'ভালো না হাতী! জোটে কি না জোটে দেখ। জুটলেই ভালো, আমার হাড় জুড়োয়। ভূতের বোঝা বইবার কি দরকার স্নেহাংশু?' বিমলার চোখমুখ মনোমুগ্ধ রূপ নিল। স্নেহাংশু তাকে কোনদিনই ফেলবে না, মাথায় তুলে রাখবে।

অনেক রাত্রে জয় বাড়ী ফিরল। তিনতলা বাড়ীর সমস্ত আলো নিবে গেছে কখন। অন্যদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, আজ তিন বোনেই জেগে।

জয়ের মেজাজটা ভাল। সবাইকে এক সাথে খেতে বলল। মাংস রান্নার তারিফ করে বলল, 'কে রেঁধেছে, নিশ্চয় কমলা! চমৎকার। স্নেহাংশু যা বলে গেছে মিথ্যে নয়, উন্নতি একটু হলোই তাহলে।'

'ও কি কোনদিন মিথ্যে বলেছে?' বিমলা স্নেহাংশুর দাম বাড়াল।

'তুই চুপ কর দিদি। সে আমার বন্ধু, তোর নয়।'

জয়ের কথাগুলো তীক্ষ্ম হয়ে বিমলাকে আক্রমণ করল। অল্প দুটি ভাত মুখে তুলে বলল, 'আর কিছু বলবি না?'

'এর বেশী আর বলা যায় না।' জয়ের গলাটা রুদ্ধ হয়ে এলো। কমলা অমলা কাঁটা হয়ে দাদার মুখের দিকে একঠায় তাকিয়ে রইল। বিমলা হাসবার চেষ্টা করল, পারল না। স্নেহাংশু বিমলার জন্যে মাছ এনেছে, বেশীদিন নয় মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মাছের বড় টুকরোটা থালার মাঝখানে এখনো পড়ে আছে, হাত দিতে যেয়েও দিতে পারছে না।

জয় তৃপ্তির গ্রাস মুখে তুলে বলতে লাগল, 'কমলাটার এ মাসেই মিটিয়ে দোব, যোগাযোগও করে ফেলেছি। ফাল্গুন বৈশেখে অমলার ব্যবস্থাও হবে। কেন, স্নেহাংশু ছাড়া জগৎ দুনিয়ায় কাজের লোক নেই?'

'ভালই তো, তোর দায় থেকে তুই উদ্ধার পাবি, নতুন কথা কিছু নয়।' মাছের কাঁটা বার করে মুখে তুলল বিমলা।

কমলা অমলার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে দিদির মুখটিকে যাচাই করল জয়। বলল, 'ওদের বিদেয় করতে পারলে আর আমার ভাবনা কি। মাকে তো আর ফেরানো যাবে না, অপঘাতেই যাবে।'

জয়ের মুখ মাটিতে মিশে রইল অনেকক্ষণ। 'বলছিলুম তুই কি করবি?' জয়ের মুখখানাকে ভয় পেল বিমলা।

'আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না।' বিমলা ঝগড়াটে গলা করল।

'ভাববো না ঠিকই। চেষ্টা তো করেওছি।' জয় ঘটঘট করে এক গেলাশ জল খেল।

বিমলা সতেজ হলো। 'তোর লজ্জা করে না ওদের নাম করতে?'

'লজ্জাও ছিল না, যদি তোর একটা সত্যিই কিছু হতো। দোষ তাদের না তোর?'

বিমলা কাঁদোকাঁদো হয়ে উঠল। 'আমাকে এত অপমান করতে চাস কেন বলতে পারিস জয়? আমি কি কোন কাজেই তোদের লাগি নি?' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বিমলা।

কমলা অমলারও চোখ ছলছলিয়ে উঠল। দিদির সমস্ত বিষয় তারা খুঁটিয়ে কোনদিন চিন্তা করেনি, আজ যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জয় সহজ হয়ে বলল, 'আমি কিন্তু আর এখানে নয়, ভালয় ভালয় ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিই।'

চোখ মুছে বিমলা বলল, 'আমারই বা চিন্তা করার কি আছে? সেলাই করে নিজের পেট চালাতে খুব পারবো।'

'মিথ্যে কথা না-ই বা বললি। জোর কোথায় জানি।'

যে সময়ে স্নেহাংশুকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সে সময় বিমলা তাকে কাছে পেল না। পর পর তিনদিন দেখা নেই, এমন কি একটা খোঁজও নেই। অথচ স্নেহাংশুর দিনে একবার না একবার দেখা করা চাই। বিমলার মুখ না দেখলে তার সব কাজই পণ্ড। কেন আসেনি স্নেহাংশু এ নিয়ে কমলা যেমন ভেবেছে অমলাও সে রকম। দুজনের

মুখোমুখী হয়ে তাকানোর মধ্যে স্নেহাংশুর ছায়া ভেসেছে। স্নেহাংশু ছাড়া ওদের মন দুটিও ঝরঝরে হতে পারে না।

হাসি আর সহ্য করতে পারে না বিমলা। দুজনের যেন বড় বেশী মিতালি—এতটা ভাল নয়, টিকলে রক্ষে। বিয়ে বিয়ে মন হয়েছে কমলার, একটা যেমন তেমন জুটলেই বর্তে যায়। এত হ্যাংলামি কি ভালো? বয়সের তো গাছপাথর নেই, রং ধরতে না ধরতেই ফুরিয়ে যাবে। অমলার দাপট আরো উঁচিয়ে। হবেই তো, ও বয়সে অমন হয়। স্নেহাংশুকে দেখলেই যেন অমলার চার চোখ বেরোয়। অতটা মাখামাখি ভাল নয়। পুরুষ মানুষ, তাদের মনই আলাদা। সারাদিন বিমলা সেলাই নিয়ে বসে রইল। জয়েরও মুখ দেখবে না, কমলা অমলার ছায়াও মাড়াবে না। দু তিনটে ডাক দিলে তবে সাড়া—বেজারে গলা, প্যাঁচের কথা। তাই বেশী বেশী করে হেসে ওঠে অমলা। হাসি লুকুতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়, না হয় তো সিঁড়িঘরে।

হঠাৎ 'এলুম দিদি' ডাকের সংগে স্নেহাংশুর চটকদার হাসি। মুখ তুলে দেখল না বিমলা। সেলাই-র কল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বোধ হয় কালা হয়ে গেছে। কমলা রান্নাঘরে, বিমলা বাথরুমে।

'খুব একটা কাজে, বিশ্বাস করুন। বাইরে যেতে হয়েছিল।'

'বলে যেতে পারলে না? আশ্চর্য!'

'ক্ষমা চাইছি।' স্নেহাংশুর হাসিটা আরো নম্র হলো। চেয়ারটা খুব কাছে টেনে নিয়ে বিমলার ক্লান্ত মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

'কি দেখছো অমন করে? ওরা দেখলে ভাববে কি।' গলার স্বর মিহি আর মধুর করল বিমলা। 'আমি জানতুম তুমি আজ না এসে পারো না, ঠিক মিলল না?'

স্নেহাংশু সেলাইকরা ব্লাউজের দুখানা হাতা নিয়ে নাড়া দিল। খরখরে মাজা মাজা কাপড়, মাটি মাটি রং—যেন মেঘলা দুপুরের আভাস। স্নেহাংশুর পছন্দ হয়। ব্লাউজ ছাড়িয়ে একজোড়া ফ্রকের নতুন ডিজাইনের ছাট দেখে হাসল—ঠিক অমলা কমলারই এক একটা রূপান্তর।

'মিলবেই তো, আপনি আমার জন্যে কত ভাবেন। শুনতে পেলুম ওরা পারের কড়ি পাবে, আপনার?' স্নেহাংশু মুচকি হেসে চেয়ারের হাতলে সিগারেট ঠুকে ঠোঁটে ছোঁয়াল। দেশলাইর কাঠি ঘষে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া উড়িয়ে বলল,

'আপনি আপনার, একান্ত আপনার, তাই না?'

বিমলার চোখ দুটো আরো ডাগর হলো, আরো প্রদীপ্ত হতে যেয়ে স্নেহাংশুর কথাগুলোর মানে খুঁজতে লাগল। বিমলাই সত্যিই নিজের।

'আচ্ছা স্নেহাংশু, এরপর কি দাঁড়াবে? ওরা সত্যিই যখন চলে যাবে, তখন?' চোখের পল্লবে ঈষৎ কুঞ্চন, নাসারন্ধ্র স্ফীত। বিমলার বিলোল দৃষ্টি স্নেহাংশুকে আকর্ষণ করল।

'তখন পরিচ্ছেদ বদলে যাবে। আপনাকে বলতেই এলুম, আজ সন্ধেয় একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি নাহবে যে এমন নয়, ভাববেন না কিন্তু।'

সিগারেটের ধোঁয়া জানালার বাইরে ছুটে চলেছে। শীতের সকাল, আমপাতার ছায়া-ঢাকা আবছা আলো। বিমলা উদাস হলো, বলল, 'আমারো এমনি করে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে, নিয়ে যাবে আমায়?'

'একটু অসুবিধা। এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। অফিসের কাজ, দায়িত্ব অনেক।'

'আচ্ছা বেশ, কোন সময় নিয়ে যাবে বলো?' নিবিড় হতে চাইল বিমলা।

'সুযোগ একটা করে নিলেই চলবে।'

স্নেহাংশু বাইরের রকে এসে আর দুদিকের সাড়া অনুধাবন করতে চাইল। এখনো কমলা চা দিয়ে গেল না, অমলা যেন নিরুদ্দেশ।

দূর থেকেই স্নেহাংশু বলে উঠল, 'আমি তবে চলছি দিদি, খুব তাড়া।'

বিমলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল, মুখে রা নেই।

'কিচ্ছু ভাববার নেই, জয়কে এখনো বলা হয়নি।'

দুপুরে জয় বাড়ী ফিরল। জামা-কাপড় খুলতে খুলতে বলল, 'একটা খবরের মতন খবর আছে রে দিদি।'

'কিসের খবর? খবরে আমার আর কাজ নেই।'

'স্নেহাংশু বদলি হয়ে যাচ্ছে। যাবার আগে যাতে বৌ নিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থাও পাকা।'

বিমলা কারো মুখের দিকে তাকাতে পারল না। কমলা অমলা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'বিয়ের চিঠিও ছাপা হচ্ছে। বন্ধু হিসাবে আমার নামে একটা, তোর নামে হয় তো একটা থাকতে পারে।'

বিমলার সেলাই কল অনেকক্ষণ থেমে গেছে।

শেয়ালের
গর্ত
৮/২/৫৭
মাভৈঃ
আমরা
কেল্লা ছেড়ে
চল্লাম
ভারতের শেখ
ঘাঁটী ছাড়িয়া গিয়াছে-
-এ রকম কোন সংবাদ
ভারত সরকার পান নাই
শোনো ভাই!
আমার গালিচায় বসতে দিয়েছি,
এই ঢের!
গালিচা কাটা
চলবেনা!
কাশ্মীর
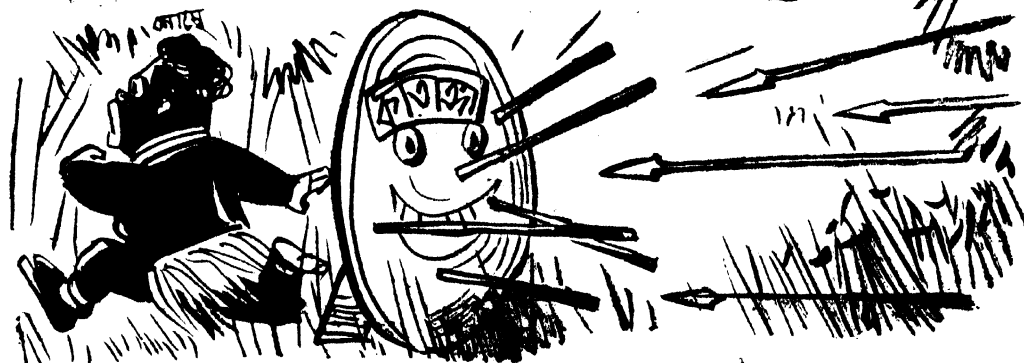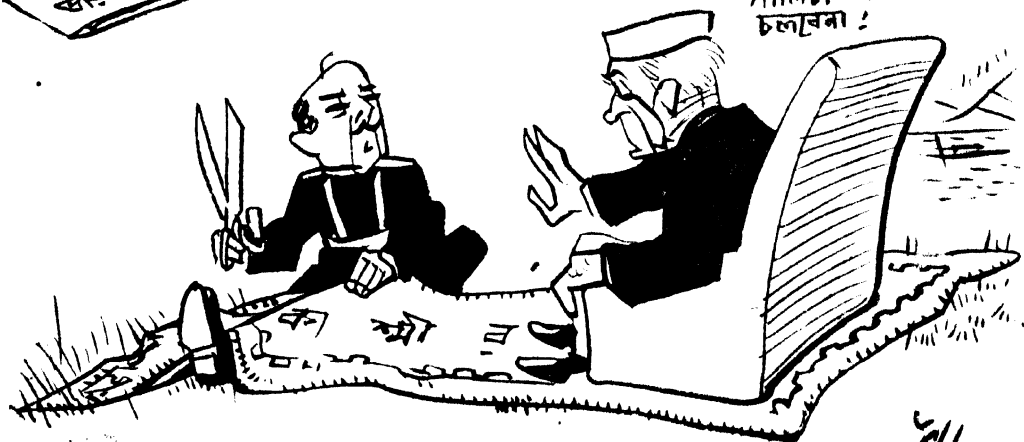
বৈদেশিক সাহায্য ও ভারতের বৈষয়িক অবস্থা

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দুটি পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ শেষ হয়েছে ভারতে। এখন চলেছে তৃতীয় যোজনার রূপায়ণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার কার্যকাল ছিল ১৯৫১ সাল হতে '৫৬ সাল। সেটি শেষ হওয়া মাত্র ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা ও তার কাজ চলে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় যোজনার কাজ তারপরেই শুরু হয়ে যায়।

সংশোধিত হিসাব মতে প্রথম যোজনায় ব্যয় হয় মোট ৩,৩৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় যোজনায় ৬,৭৫০ কোটি টাকা। তৃতীয় যোজনায় লগ্নী করার প্রস্তাব হয়েছে ১১,৬০০ কোটি টাকা, যা প্রথম দুটি যোজনার মোট ব্যয়ের চেয়েও বেশী।

তৃতীয় যোজনার হিসাব-নিকাশের সময় এখনও হয়নি। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে তা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। হয়ত এই কারণেই শেষ পর্যন্ত তৃতীয় যোজনার বহু পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবে প্রথম দুটি যোজনার শেষে সরকারী হিসাবমতে: জাতির সামগ্রিক আয়বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪২ শতাংশ। '৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,১১০ কোটি টাকা। প্রথম যোজনার শেষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০,৮০০ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় যোজনার শেষে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা। চীনা-আক্রমণের আগে পর্যন্ত পরিকল্পনাকারদের অনুমান ছিল যে, তৃতীয় যোজনার শেষে ভারতের জাতীয় আয় দাঁড়াবে ১৭,২৬০ কোটি টাকা।

তিনটি জাতীয় যোজনায় পনের বছরের ব্যবধানে মোট ২১,৭১০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের নিজের সামর্থ্যে ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অগ্রসর দেশগুলির কাছে ভারতকে এ পর্যন্ত কয়েক সহস্র কোটি টাকা সাহায্য-ঋণ অথবা দানস্বরূপ গ্রহণ করতে হয়েছে। তৃতীয় যোজনাকালেই ভারতকে ২,২০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ যোগাড় করতে হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যা লগ্নীকৃত মোট অর্থের ৩০ শতাংশ। দ্বিতীয় যোজনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করা হয়েছিল ১০৯০ কোটি টাকা, যা ছিল মোট ব্যয়ের ২১ শতাংশ।

উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক সাহায্য

বিদেশ হতে ভারত এ-পর্যন্ত যত ঋণ ও সাহায্যবাবদ অর্থসংগ্রহ করেছে, বলা বাহুল্য, তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দানই সর্বাধিক। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬২ সালের শেষ পর্যন্ত ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ হতে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট সাহায্য পেয়েছে ২,১৭৮ কোটি টাকা। সম্প্রতি ভারতে চীনাদের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র যে জরুরী সামরিক সাহায্য পাঠায় তার হিসাব এর-মধ্যে ধরা হয়নি। ১৯৬২ সালে বিদেশ হতে যত পণ্য ভারতে আসে তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র হতে। ঐ পণ্যের আর্থিক মূল্য প্রায় ২৪১ কোটি টাকা। এরমধ্যে ছিল ৯৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের রেলইঞ্জিন, রেলের অন্যান্য সরঞ্জাম, কাঁচা মাল ও আধা তৈরী মাল। এই টাকা ভারতকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আর দান হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছে ১০৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকারও বেশী মূল্যের গম, চাল, তুলা ও অন্যান্য কৃষিপণ্য। পাবলিক ল ৪৮০—১ নম্বর ধারা অনুসারে ঐ সাহায্য ভারতকে দেওয়া হয়েছে। আবার ঐ আইনেরই ২ ও ৩ নম্বর ধারা অনুসারে প্রধানত স্কুলের বালক-বালিকাদের দ্বিপ্রাহরিক খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র দান করেছে সাড়ে বাইশ কোটি টাকা মূল্যের গুঁড়া দুধ, উদ্ভিজ্জ তেল, গম, চাল, ভুট্টা প্রভৃতি। এই পরিকল্পনা অনুসারে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়ের ২৫ লক্ষেরও বেশী ছাত্রছাত্রী উপকার পাচ্ছে। ১৯৫১ সাল হতে এপর্যন্ত যত চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, নার্স, কৃষিবিজ্ঞানী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হতে ভারতে এসে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছেন তাদের মোট সংখ্যা নয় শত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতকে সর্বাধিক সাহায্য দিয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন। 'টাসে'র এক সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, গত আট বছরে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ হতে যত সাহায্য নিয়েছে তার মোট পরিমাণ প্রায় তিনশত কোটি টাকা। ১৯৫৫ সালে ভিলাই কারখানা গড়ে তোলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েটের সহায়তায় ৩০টিরও বেশী শিল্প-সংস্থা ভারতের বুকে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে আছে ভারি যন্ত্রপাতি নির্মাণের কার-

খানা, বিজলী শক্তি উৎপাদন, তৈল নিষ্কাশন ও পরিশ্রুত করার শিল্প, ইত্যাদি সংস্থা, ভারতের স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে যাদের গুরুত্ব সীমাহীন।

ভারতের বৈষয়িক উন্নতিতে সাহায্যদানের ব্যাপারে বৃটেনের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতিতে বৃটেনের সহযোগিতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। বৃটিশ সহযোগিতায় অপর উল্লেখযোগ্য শিল্প-উদ্যোগ ভূপালের ভারি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা। তৃতীয় যোজনা কালে ভারত বৃটেনের কাছে সাহায্য পাবে মোট ১২০ কোটি টাকার। ভারতে বর্তমানে যত বিদেশী মূলধন নিয়োজিত আছে তাতে বৃটেনের ভাগ সর্বাধিক। ৭৬০ কোটি টাকার মধ্যে বৃটেনের ভাগ ৪৪৬ কোটি ৪০ লক্ষ। এর কারণ অবশ্য ভারতের সঙ্গে বৃটেনের দীর্ঘ যোগসূত্র।

এই তিনটি দেশ ছাড়া ভারত আর যেসব দেশের কাছ হতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পেয়েছে তাদের মধ্যে পঃ জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, পোল্যান্ড প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের বৈষয়িক অবস্থা

কিন্তু এখন একথা ভাবার সময় এসেছে যে, পরপর তিনটি জাতীয় যোজনায় এইভাবে বিপুল পরিমাণ স্বদেশী ও বিদেশী মূলধন লগ্নী করে আমরা কতটা লাভবান হয়েছি। কতটা সফল হয়েছি আমরা আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা জয়ে। সরকারী হিসাবমতে, প্রথম যোজনার শেষে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ছিল ২৮১ টাকা। আর পরপর পাঁচটি জাতীয় পরিকল্পনার কাজ যখন শেষ হবে ১৯৭৬ সালে তখন ভারতের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৫৪৬ টাকা। মনে রাখতে হবে যে, এটা বাৎসরিক আয় ও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল গড়পড়তা আয়। অর্থাৎ পরিকল্পনাকারদের ধরে নেওয়া পরিস্থিতির যদি কোনরকম ব্যতিক্রম না হয় তবে আরও তের বছর বাদে ভারতের নরনারী নির্বিশেষে সকলের মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে জনপ্রতি সাড়ে পঁয়তাল্লিশ টাকা।

কিন্তু এটুকু ভেবেও সান্ত্বনা পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। কারণ পরিকল্পনা কমিশনের একটি সাম্প্রতিক বৈঠকে ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা এক কথায় ভয়াবহ।

কবে ভারতের সব লোক পেটভরে খেতে পারবে? তার উত্তরে পরিকল্পনা কমিশন বহু বিচার-বিবেচনা করে জানিয়েছেন, বিংশ শতাব্দী শেষ হলেও এ সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতের জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারেই বেড়ে চলে ও বৈষয়িক উন্নতিরও কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘটে তবে ২০০০ খৃষ্টাব্দেও ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের উদরপূর্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না! তবুও তখন এটাকে উন্নতি বলেই মনে করতে হবে, কারণ বর্তমানে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোকই অর্ধভুক্ত থাকে। কোন বক্তার মেঠো বক্তৃতা হলে কথাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হত সকলের; কিন্তু এ পরিকল্পনা কমিশনের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ।

পরিকল্পনা কমিশন বলছেন, এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য সর্বাধিক দায়ী ধনবণ্টনের অসাম্য। বর্তমান জাতীয় আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে ৪৪ কোটি নরনারী-অধ্যুষিত ভারতের মাত্র শতকরা দশজন। জাতির সমগ্র উৎপাদনেরও এক-চতুর্থাংশ শুধু তাদেরই ভোগ্য।

এই দেশের সর্বনীচ স্তরের শতকরা দশজন লোকের আয় মাসে সাত টাকারও কম। ঠিক তার উপরের স্তরের শতকরা দশজন লোকের মাসিক আয় দশ টাকার কম। তার পরবর্তী শতকরা দশজন লোকের আয় বারো টাকা; আর এক ধাপ উঁচু শতকরা দশজন লোকের আয় মাসে পনেরো টাকার কম; আরও এক ধাপ উঁচু শতকরা দশজন লোক মাসে উপার্জন করে আঠারো টাকা; এদের পরের ভাগ্যবান শতকরা দশজনের আয় মাসান্তে সাড়ে একুশ টাকা।

এই হিসাবের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ যতই স্ফীত হোক না কেন, বা মাথাপিছু গড় আয়ের হিসাব যাই দেখানো হোক না কেন, এই মুহূর্তের প্রকৃত অবস্থা হল এই যে, ভারতের শতকরা ৬০ জন লোক, অর্থাৎ চুয়াল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় সাতাশ কোটি লোকের মাসিক আয় ২৫ টাকার কম। অথচ, বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে ভারতের মূল্যমান অনুসারে একজন মানুষের এখন শুধু দুবেলা পেট ভরে খেতেই লাগে মাসে ৩৫ টাকা। সুতরাং ভারতের শতকরা ৬০ জন লোক বর্তমানে এক মাসে যা উপার্জন করে তাতে তাদের দুবেলা ন্যূনতম পুষ্টিকর খাদ্যসংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, প্রমোদ প্রভৃতিতে ব্যয় ত অনেক পরের কথা। বোম্বাইয়ে সম্প্রতি যে গৃহনির্মাণ দপ্তরের মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে গেল তাতে জানা গেছে যে, সমগ্র ভারতে বর্তমানে নগর অঞ্চলে গৃহের অভাব প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। গ্রামে যে কত গৃহের অভাব তার সঠিক হিসাব এখনও করা সম্ভব হয়নি। তবে অনুমান, ভারতের প্রায় পাঁচ লক্ষ আটান্ন হাজার গ্রামে যে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ গৃহ আছে তার মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটিরই জরাজীর্ণ অবস্থা। হয় তাদের বিরাট মেরামত দরকার, নয়ত সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়ে তোলা দরকার। আশা করি, এই কটি পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাবে যে বর্তমানে বৈষয়িক উন্নতির কোন পর্যায়ে আমরা অবস্থান করছি।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দশম পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

শ্যামার ইচ্ছা ছিল সাধের পর বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। সাধের পর এই জন্যে যে—নইলে সাধের তত্ত্ব করতে হয়। সাধের খরচা আইনত শ্বশুরবাড়িরই। এখানে তিনি কোন মতে একখানা মিলের শাড়ি এবং পুকুরের মাছ ধরে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিয়ে সারতে পারেন কিন্তু কুটুম-বাড়িতে তা চলবে না। দিতে গেলে একটু গুছিয়েই দিতে হয়। পাঁচজনে দেখবে, যেমন-তেমন করে দিলে নিন্দে হবে।

কিন্তু সাধের পর আর না। বাপের বাড়ির সাধ খেতে তো যেতেই হবে—অমনি ছেলে হয়ে আসবে একেবারে। প্রথম প্রসব হবার খরচাটা বাপেরই করা উচিত—এই ওর ধারণা। যদিও সে কথা প্রত্যক্ষভাবে বলেন না। সামনে অন্য ওজর দেন, 'ছেলেমানুষ—এই প্রথমবার, মা-বাপের কাছে থাকে, সেই-ই ভাল। নইলে ভয় পাবে। তাছাড়া— আমার এখানে কে-ই বা আছে বল। এত কন্না কে করবে এখানে? খেঁদিটা থাকলেও না হয় কথা ছিল!'

তবে আসল কারণটা পরোক্ষে বলেন বৈকি!

অপরকে উপলক্ষ ক'রে বলেন।

'সে কথা একশ'বার। মেয়ের বিয়ে দেবার সময় প্রথম বেন তোলার খরচটাও ধরে রাখতে হয়। শ্বশুরবাড়ির খরচা তো পড়েই রইল—বাপ মিন্‌সে প্রথম বারটাও করবে না! মেয়ে যখন হয়েছে তখন তো এসব খরচা ধরে রাখাই উচিত।'

কনক শোনে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। সে সাহস তার নেই। তবে উত্তরটা তার মুখের কাছে ঠেলাঠেলি করে। শ্যামা নিজে কোন মেয়েরই বেন তোলেন নি। 'মহাশ্বেতার প্রথম ছেলে হওয়ার সময় তার শাশুড়িও এই মতলব এঁটেছিলেন, কিন্তু শ্যামা উচ্চবাচ্য করেন নি। হয়ত তবুও বাঁচতেন না, নিহাৎ ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সাধের আগেই ছেলে হয়ে গিয়েছিল মহার। এ গল্প শ্যামাই করেছেন কতবার —হেসেছেন বলতে বলতে। কেমন জব্দ হয়েছেন মহার শাশুড়ি, সে হাসির এই অর্থ। ঐন্দ্রিলার বেলায় আনবার কোন কথাই ওঠেনি। তরুর তো এই সেদিন ছেলে হ'ল, কনকের সামনেই বলতে গেলে, কৈ, তাও তো শ্যামা তাকে আনবার নাম করেন নি। সে বেচারার শ্বশুরবাড়িতে তো তবু কেউ ছিল না। এমন কি সতীনও না—সেও সে সময় প্রসব হতে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। দাই আর পাড়ার লোকের ওপর ভরসা করেছিল তরু।

কিন্তু শ্যামার ইচ্ছা যা-ই থাক—দেখা গেল ভগবানের ইচ্ছা অন্যরকম। মহাশ্বেতা তবু সাধের খরচা করায় নি কিন্তু এ বৌ সেটিও ষোল আনা করিয়ে নিয়ে শ্যামাকে বৃহত্তর খরচার মধ্যে ফেলে দিলে।

শ্যামার তরফ থেকে চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না, হিসাবমতো ন' মাস পড়তেই প্রথম যে দিনটি পাওয়া গেল সাধের, তিনি সেইদিনই তাড়াহুড়ো ক'রে সেরে নিয়েছিলেন। যজ্ঞির ব্যাপার কিছু নয়, বাইরের এয়োও কাউকে বলেন নি—মহাদের তিন জাকেই শুধু বলেছিলেন। মহা পাঁচটা এয়োর ধুয়া তুলেছিল, তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'পাঁচটাই যে করতে হবে, কে বললে? বেজোড় হলেই হ'ল!'

মহাদের বলার সুবিধা আছে। ওরা ঘরের লোক, তাঁর হালচাল অনেকটা জানে, খুব একটা নিন্দা করবে না। কাজটা সেরেছিলেনও যতদূর সম্ভব কম খরচে। পুকুরে ছিপ ফেলিয়েছিলেন আগের দিন কান্তিকে দিয়ে, একটা মাঝারি কালবোশ আর গোটাদুই বাটা মাছ উঠেছিল। তাইতেই কাজ চলে গিয়েছিল। পায়েসের জন্যে বাজার থেকে এক পো মাত্র দুধ আনিয়েছিলেন—ইচ্ছে ছিল তাইতেই ফুটন্ত ভাত থেকে দুহাতা ফেনে-ভাতে ঢেলে দিয়ে গোটাকতক কুন্ডুবাড়ীর বাসি সন্দেশ গুঁড়িয়ে দেবেন; তার সঙ্গে খানকতক বাতাসা আর একটু কর্পূর দিলে কেউ টেরও পাবে না। সন্দেশগুলোয় একটু গন্ধ হয়ে গেছে—সেইজন্যেই কর্পূর দেওয়া।

কিন্তু অত কান্ড করতে হয়নি। মহাশ্বেতা মাকে ভাল ক'রেই চেনে, পাছে জায়েরা বাড়ি এসে টিটকিরি দেয় তাই ভোরবেলাই এক ছেলেকে দিয়ে লুকিয়ে একপোটাক দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল। একটু একটু ক'রে সকলের দুধ থেকে কেটে নিলে কেউ টেরও পায় না—অথচ

কাজ চলার মতো বেশ খানিকটা দুধ পাওয়া যায়। এ মহাশ্বেতার বহুদিনের অভ্যাস। জায়েরা যে জানে না তাও না, কারণ কোন কাজটাই সে গোপনে করতে পারে না, সে বুদ্ধিই তার নেই। আস্তে কথাই বলতে পারে না—কাজেই কোন কথা কি কাজ লুকোবার চেষ্টা করলে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে। জায়েরা তাই জেনেও, কতকটা দয়া ক'রেই কিছু বলে না আজকাল। নিতান্ত ওর গা'য়-পড়া ঝগড়া খুব অসহ্য হ'লে মেজবৌ এক-আধদিন বলে ফেলে। জোঁকের মুখে নুন দেবার মতোই চুপ করিয়ে দেয় এই খোঁটাটা দিয়ে। তারপর কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে লাফিয়ে যত প্রতিবাদই করুক মহাশ্বেতা সেদিনের মতো ঝগড়াটা চাপা পড়ে যায়, এ চেঁচামেচিও বেশীক্ষণ থাকে না। অভিযোগটা এতই সত্য যে বেশীক্ষণ প্রতিবাদ করতে বোধ হয় নিজেরই লজ্জা হয় তার।

অবশ্য অল্পস্বল্প খোঁচা দিতে কেউই ছাড়ে না। সেদিনও, কনকের সাধে খেতে বসে ভালমানুষ তরলাও বলেছিল, 'দিদি, পায়েসটা ঠিক আমাদের বাড়ির মতোই হয়েছে, না?'

তাতে প্রমীলা মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'কেন লো—আমাদের বরদা গয়লানীর দুধের বাস্ পাচ্ছিস নাকি?'

মহা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিয়ে বলেছিল, 'তোর যেমন কথা ছোট বৌ! অল্প দুধে পায়েস করা—তা আবার সেদ্ধ চালের, ও সব-বাড়িই এক রকম হয়।'......

এ পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটলেও বৌকে পাঠাতে একটু দেরি হয়ে গেল। পরের দিনই পড়ল গ্রহণ, গ্রহণের পর আট দিন যাত্রা নেই। তারপরই সংক্রান্তি মাস-পয়লা বৃহস্পতিবার—পরপর পড়ে গেল। শ্যামার ভাষায় 'আমার কপালে যেন ভগবান সার সার সাজিয়ে রেখেছিলেন দিনগুলি!' তার পর দিন পাঠাবেন সব ঠিক, বেয়াই-বাড়িও সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সেই বৃহস্পতিবারই হঠাৎ কনকের ব্যথা উঠল, আর সারা দিন রাত ব্যথা খেয়ে শুক্রবার ভোরে ছেলে হয়ে গেল তার।

অগত্যা পাড়ার দাইকে ডাকতে হ'ল, আনুষঙ্গিক যা কিছু খরচ তাও করতে হ'ল। শ্যামার ভাষায় 'কপাটে গলে গেল। ছেলে এলই আমার সঙ্গে আকচা-আকচি ক'রে—যেন মতলব এঁটে ঠাকুমার খরচ করাবে বলে। ও ছেলে যা হবে তা বুঝতেই পারছি। উঠন্তি মূলো পত্তনেই বোঝা যায়। হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করে যদি না খায় তো কী বলেছি আমি। কে জানে, সেই মিনসেই আবার আমাকে জ্বালাতে ফিরে এল কিনা। এদানতে বেটার বৌকে খুব পছন্দ হয়েছিল তো—সেই লোয়ের কোলেই ফিরে এল বোধ হয়!'

শাশুড়ি যাই বলুন, কনকের কোন ক্ষোভ হয় না। কোন কথাই আর যেন তার গায়ে লাগে না।

ছেলে সুন্দর হয়েছে। কনকের মনে হয় বাপের মতই সুন্দর হয়েছে। এক এক সময় মনে হয় আরও সুন্দর হবে। কান্তির কথা মনে পড়ে যায়, ওর বিয়ের সময় যেমন কান্তিকে দে... ছিল।... শিউরে উঠে উপমাটা মন থেকে তখনই আবার যেন দু হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বাপ্ রে, ও চেহারায় কাজ নেই তার। ঐ রকম বরাত পেলেই তো হয়েছে। ছেলের রূপ নিয়ে কি হবে, গুণটাই বড়। মূর্খ অকর্মণ্য না হয় ছেলে। সে যেমন ক'রে হোক—ভিক্ষে দুঃখ ক'রেও ছেলেকে মানুষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে।......

শ্যামারও, বধূর সম্বন্ধে মনে যতই বিদ্বেষ থাক, এই সব খরচপত্রের জন্য যত পরিতাপই হোক্—নাতি দেখে মন জুড়িয়ে যায়। তাঁর গর্ভের সন্তানরা বেশির ভাগই সুন্দর—তেমনিই হয়েছে এও। কান্তির মতো, ঐন্দ্রিলার মতো না হোক, বংশের সঙ্গে খাপ খেয়ে
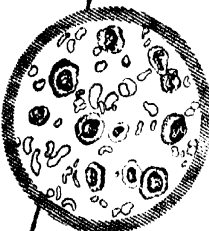
যাবে। মনে মনে বার বার বলেন, বাঁচুক, মানুষ হোক।...কপাল ভাল নিয়ে এলে থাকে তবে তো—আমার ছেলে-মেয়েদের মতো কপাল না হয়!'

কিন্তু ভাগ্য যেমনই হোক, ছেলের আয়ুপয় যে ভাল না—সেটা বোঝা গেল শীগ্‌গিরই।

ষষ্ঠীপুজো শেষ হ'তেই বৌকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন শ্যামা। বললেন, 'এখন কিছুদিন নিয়মে থাকা দরকার। এখানে থাকলে অনিয়ম হবেই। আর বিশ্রামও পাবে না, কে করবে বল? আমি না হয় রেঁধে ভাতটা জোগালুম, কাঁথাকানি তো আর কাচতে পারব না। সেখানে পাঁচটার ঘর—বোনরা আছে, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকতে পারবে। আর খাওয়া-দাওয়াই বা আমার ঘরে কী আছে, ভাত হাঁড়ির ভাত, আলাদা কিছু ক'রে দেব সে ক্ষমতা কৈ?...তার চেয়ে মা-বাপের কাছে থাক, তাদের মেয়ে তারা যেমন ক'রেই হোক একটা ব্যবস্থা করবে।...আমি তো একটা দিক টানলুম—তারা এবার করুক না!'

সেইটেই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই 'এতটি টাকা' খরচ হয়ে গেল—আবার যদি পোয়াতীকে সারিয়ে তুলতে হয় তো রক্ষে নেই। কোন না অন্তত এক পো দুধ জোগান করতে হবে—পোয়াটাক ঘিও চাই। লুচি হালুয়া না হোক, কদিন ভাত-পাতে একটু না দিলে লোকেই বা বলবে কি! তার চেয়ে ওদের ওপর দিয়েই যাক—চাই কি, মাস-দুই যদি চেপে থাকে তো তাঁর এদিকের খরচও খানিকটা উশুল হবে। হাজার হোক, একটা পেট তো বাঁচবে।

কিন্তু বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে খবর এল হারানের খুব অসুখ—এদের কারুর যাওয়া দরকার। খবরটা দিলে চিরদিনের ভগ্নদূত মহাশ্বেতাই। ছোট ছেলেটাকে পাঠিয়েছিল গাছ-কতক নাজনে-ডাঁটা দিয়ে বোনের খবর নিতে, তার মুখেই বলে পাঠিয়েছে তরু। কী অসুখ তা ছেলেটা ঠিক বলতে পারে নি—তবে দেখে এসেছে মেসোমশাই শুয়ে আছেন, অসাড় অনড় হয়ে, মাসিমা কান্নাকাটি করছে।

খবরটা এল দুপুরে, তখন হেম অফিসে। কান্তি বাড়িতেই থাকে বটে,

এখনও সে পড়াশুনোর চেষ্টা করে খানিকটা কিন্তু মার তাড়নায় কিছুই হয় না। মা তাকে সারাক্ষণই বাগানে খাটাতে পারলে বাঁচে। এদিকে বইও সব হাতে নেই, তার ওপর মাথাটাও কেমন হয়ে গেছে অসুখের পর থেকে—মাথায় যেন কিছু ঢুকতে চায় না। মুখস্থ করলেও দুদিন পরে ভুলে যায়। সে জন্যে শ্যামার যেমন দুশ্চিন্তারও অন্ত নেই, তেমনি গঞ্জনারও না। সে গঞ্জনার ভাষা কানে না গেলেও আকারে-ইঙ্গিতে তার তীব্রতা বুঝতে পারে কান্তি, ফলে আরও যেন দিশাহারা হয়ে যায়। আরও অন্যমনস্ক হয়ে ওঠে।

শ্যামা একবার ভাবলেন ওকেই পাঠাবেন, বললেনও ইশারায় কিন্তু তার-পর নিজেই আবার বারণ করলেন। কোন লাভ নেই। ও'রা দুজনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, উনি আর কনক—ওকে ঠোঁট নেড়ে কথাগুলো মোটামুটি বোঝাতে পারেন। এখনও হেমই পারে না— তরু তো পারবেই না। এই অবস্থায়—ঠিক কতটা কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না তো, যদি বাড়াবাড়িই কিছু হয়ে থাকে তো তরু লিখে জানাবে সব কথা—সে সম্ভব নয়। তাছাড়া তরু তেমন লেখাতে পটুও নয়। মিছিমিছি কান্তিকে পাঠানো মানে তাদের উদ্ব্যস্ত করা। তারচেয়ে হেমই আসুক। আজকাল 'ওপর টাইম' না থাকলে সে সকাল করেই ফেরে প্রায়। সন্ধ্যার পরই পৌঁছে যায়। ঠাকুর ঠাকুর করতে লাগলেন শ্যামা, যাতে সকাল করেই ফেরে হেম। ওপর টাইমে সামান্য কিছু পয়সা আসে বটে, তা হোক, তবু আজ তা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।...

ওভার টাইম না থাকলেও—সেদিনই হেম ফিরল সামান্য একটু রাত করে। পোস্তায় গিয়েছিল, সস্তায় এটা-ওটা বাজার করতে। অবশ্য তাতে আটকাল না—তখন সবে আটটা, সিদ্ধেশ্বরীতলায় ঘড়ি দেখে এসেছে হেম—গিয়ে খবর নিয়ে আসতে সাড়ে দশটা, এগারোটার বেশী হবে না। সে পুঁটুলিটা নামিয়েই রওনা হয়ে গেল। অন্ধকার রাত—পথটাও খারাপ। কিছুদিন আগেই সামান্য কটা পয়সার জন্যে মানুষ খুন করেছে ডাকাতরা ঐ পথেই। মন চায় না পাঠাতে। বললেনও একবার শ্যামা, এখন না হয় থাক, ভোরে তুলে দিলে—পারবি না ঘুরে আসতে?

পাগল! তিন কোয়ার্টার এক ঘন্টার পথ ভোরে গিয়ে আসব কেমন করে আপিসের আগে? কাল কামাই করাও চলবে না, কোনমতেই—বড়সাহেব আসবে আমাদের সেকশ্যানে। ও কিছু হবে না, আমি ঘুরে আসছি চট করে।

যেতে দিতেও যেমন ইচ্ছা করে না—বাধা দেবারও শক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত শ্যামা জোর করে কান্তিকেও সঙ্গে দিলেন। শুনতে না পাক—দোসর তো থাকবে অন্ততঃ।

তুমি একা থাকবে? আপত্তি করে হেম।

সে আমি বেশ থাকব'খন—আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোরা ঘুরে আয়। দুগ্‌গা-দুগ্‌গা!

তবু আওয়াজ হবে। এখনও তেমনি-ভাবে বন্ধ করে রান্নাঘর আর বাইরের ঘরে শেকল তুলে দিয়ে দালানে এসে বসলেন শ্যামা। অন্য সময় কাজ না থাকলে আলো নিভিয়েই বসেন—অকারণে তেল পোড়ান না, আজ কুপিটা জ্বালিয়েই রাখলেন। যাবার সময় হেম একটু টুকে দিয়ে গেল বলেই—নইলে তাও রাখতেন না।

না, ভয় তাঁর শরীরী অশরীরী কোন প্রাণীকেই নেই। দীর্ঘকাল একা থেকে-ছেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে। হেম যখন হয়—গুপ্তিপাড়ার অতবড় বাড়িটায়

...আমার জন্যে ভাবতে হবে না...

সদর দরজা ভাল ক'রে বন্ধ হয় না, খিলটা কোনমতে ঠেকানো থাকে শুধু। একটা লোহা না কিনলে ওর কোন উপায়ও হবে না। কাঠটাও গেছে পচে, বহুকালের দোর জলে-রোদে জীর্ণ হয়ে এসেছে। নতুন লোহা লাগবেও না হয়ত। একেবারে দরজাটা পাল্টাবেন এই মনে করেই কিছু করা হয়নি। রাত্রে খিল বন্ধ করার পরও খানদুই ইট নিচে ঠেকিয়ে রাখা হয়—কেউ ঠেলে ঢুকলে সাতাশ বিঘে বাগানের মধ্যে বলতে গেলে একাই থাকতে হ'ত। বুড়ো শাশুড়ি—সন্ধেবেলাই ঘুমিয়ে পড়তেন। বড় বড় আমগাছ আর কালোজামের গাছে বাতাস লেগে চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন সোঁ সোঁ আওয়াজ করত, উঁচু তালগাছগুলোর পাতায় আপনাআপনি কটকট শব্দ উঠত—কত কী নাম-না-জানা প্রাণীর বিচিত্র গতিবিধির আভাস পাওয়া যেত বাইরের অন্ধকারে—তখন ভয়ে বুকের

মধ্যেটা হিম হয়ে আসত এক-একদিন। প্রাণপণে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে তাকে কাঁদিয়ে দিতেন, সেই কান্নার শব্দে শাশুড়ি যদি সজাগ হন, দুটো কথা বলেন—এই আশায়।

হয়ত সব শব্দই সত্যও নয়, হয়ত অনেকখানিই কল্পনা—কিন্তু সেদিন অত বুদ্ধি হয়নি। নানারকম শব্দ পেতেন সত্যি সত্যিই। অন্ধকার জানালার সামনে বড় বড় গাছগুলো আকাশ আড়াল ক'রে যেন কী এক বিভীষিকার মতোই দাঁড়িয়ে থাকত। তার ওপর তার কন্দরে কন্দরে যখন জোনাকীগুলো দপদপ করে জ্বলত আর নিভত, যেন আরও ভয়ঙ্কর মনে হত সেগুলোকে। মনে হ'ত—এত গাছপালা কী করতে হতে দেয় মানুষ? ফল খেয়ে কাজ নেই, তার নিজের বাড়ি হ'লে সে জন ডেকে কালই গাছগুলো কাটিয়ে দিত।

তবু অন্ধকার একরকম। তার আরও ভয় করত চাঁদনী রাত হ'লে। অসংখ্য পত্রপল্লবের ছায়ায় যেটুকু আলো নামত বাগানে, তাতে সবটা পরিষ্কার দেখা যেত না, খানিকটা আবছায়ার সৃষ্টি করত শুধু। গাছের ডালপালা কাঁপার সঙ্গে তাদের ছায়াও কাঁপত, মনে হ'ত কত কী অশরীরী প্রাণী যেন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক এক সময় আলো-ছায়ার বিচিত্র যোগাযোগে সত্যিই মনে হ'ত একটা কে লোক দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু পরে কিম্বা কাছে গেলে দেখা যেত না, ভূত দেখেছেন মনে করে কতদিন দৌড়ে পালিয়ে এসে ঘরের দোর দিয়েছেন কিম্বা আলো ছুঁয়ে বসে থেকেছেন। লোহা ছুঁলেও নাকি অপ-দেবতারা কিছু করতে পারে না, আর হাতেই লোহা আছে তাঁর—একথাটা সেদিন কিছুতে মনে পড়ত না। আজ দেখে দেখে বুঝেছেন ওগুলো শুধুই আলো-আঁধারির মায়া—অশরীরী কিছু আছে কিনা তা তিনি জানেন না, থাকলেও তারা শরীর ধরে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ও বাড়িটায় আবার এমন ব্যবস্থা রাত্রে কোন প্রাকৃতিক কাজের দরকার পড়লে বাগানে বেরোনো ছাড়া উপায় থাকত না। সহজে শ্যামা বেরোতেন না, কিন্তু অসুখবিসুখ করলে বেরোতেই হ'ত। সেই সময়গুলো যেন কান্না পেত তার। শাশুড়ি দাঁড়াতেন ঠিকই—কিন্তু সেটা শুধুই দাঁড়া'না—তিনি প্রায়ই দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলতেন, 'আমি এই চেয়ে রয়েছি বৌমা, ভয় নেই, তুমি নিভ্‌ভরসায় চলে যাও!'

কিন্তু ভয়টা তো শুধু অশরীরী প্রাণীরই নয়—শরীরী প্রাণীরাও তো নেহাৎ কম যেতেন না। সাপ-খোপ তো আছেই, বাঘ বেরোনোও তখন ও অঞ্চলে খুব অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। এক-বার মনে আছে—উনি পাইখানায় গিয়ে-ছেন বাগানের মধ্যে—ফেউ ডেকে উঠল একেবারে পাশেই। শাশুড়ি চেঁচাচ্ছেন—'বৌমা পালিয়ে এস, পালিয়ে এস'—তাঁর একবারও মনে হচ্ছে না যে পালিয়ে আসতে গেলে অন্তত বিঘে দুই জমি পেরিয়ে আসতে হবে—হয়ত বা বাঘের সামনে দিয়েই। তবু যেতেই হয়েছিল তাই—ডাক ছেড়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ঐ পথটা ছুটে গিয়েছিলেন, হয়ত তাঁর চিৎকারেই বাঘ সরে গিয়ে-ছিল।

তারপর পদ্মগ্রামে এসেও কম সইতে হয়নি তাঁকে। রাতের পর রাত ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে। সেখানে দাঁড়াবারও লোক ছিল না কেউ, তাকেই দাঁড়াতে যেতে হ'ত ছেলেমেয়ের সঙ্গে। সরকারবাড়ির বাগানের মধ্যেই ছিল বটে ঘরখানা, তবু ও'দের মূল বাড়ি থেকে একেবারে আলাদা—অনেকটা দূরে। মন্দিরের গায়ে পূজুরীর ঘর—এইভাবেই করানো; ব্রাহ্মণদের দূরেই রাখতে চেয়ে-ছিলেন কর্তারা—যাঁরা ঘর তৈরী করিয়ে-ছিলেন। মঙ্গলা স্পষ্টই বলতেন, 'বাপরে, বামুন হ'ল গে জাতসাপ, ও'দের নেপ্‌টোয় কি থাকতে আছে। কত কি কথা ওঠে, কথার পিঠে কথা—কী বললুম না বললুম—অমনি হয়তো মন্যি দিয়ে বসে রইল। এক-বাড়িতে দুরন্ত ছেলেপুলে ঘরে-দোরে ঢুকবে, কী সব অত্যাচার করবে, হয়ত হুঁশ রইল না গায়ে পা-ই লাগিয়ে বসল—সে পাপের বোঝা কে বইবে বল? না, ও ঐ দূরে দূরে থাকাই ভাল।'

তারপর মুচকি হেসে কৃষ্ণযাত্রায় শোনা গানের একটা কলি গেয়ে উঠতেন হয়ত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায়—'দূরে রহু, দূরে রহু, প্রণাম হামার!'

সেই ঘরে, সেই বিজন অরণ্যের মধ্যে বলতে গেলে দীর্ঘকালই কাটাতে হয়েছে তাঁকে। এতটুকু এতটুকু বাচ্ছা নিয়ে, একদিনে ওরা বড় হয়নি, তিল-তিল সংগ্রাম করতে হয়েছে ওদের বড় করতে। দিনের পর দিন যখন অন্ন জুটত না তখন একা ঐ অন্ধকার বাগানে ঘুরে বেড়াতে হ'ত, যদি একটা পাকা তাল কি একটা

ঝরনো নারকেল কুড়িয়ে পাওয়া যায়—এই আশায়। গন্ধ শ‍ুঁকে শ‍ুঁকে আতা-পেয়ারা গাছে পেকেছে টের পেয়ে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে পেড়ে এনেছেন। অথচ কী না ছিল সে বাগানে, সাপ, গোসাপ, শিয়াল, বিছে—আরও কত কী। কিন্তু সেদিন ভয় করলে চলত না বলেই বেরোতে হয়েছে। এমন কিছু দুঃসাহসী তিনি ছিলেন না, মানুষ, বন্যপ্রাণী, সরীসৃপ—সকলকেই ভয় করতেন, ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করত, তবু যেতে হ'ত। আর সেই ভাবে যেতে যেতেই ভয়টা কমেছে তাঁর—কেমন একটা ভরসা এসেছে মনে—তাঁর কিছু হবে না।

ভয় তাঁর কাউকেই নেই আজ—অদৃষ্টকে ছাড়া। অদৃষ্ট খারাপ বলেই—বহু দুর্ভোগ কপালে লেখা আছে বলেই জেনেছেন যে, তাঁর কিছু হবে না। সহজে অন্তত মরবেন না তিনি। মানুষ, জানোয়ার, ভূত—কেউই কিছু করতে পারবে না। তাঁর ভয় তাঁর এই কপালটাকেই, কে জানে আরও কী আছে অদৃষ্টে! আরও কী দুর্দিন কী দুর্ভাগ্য তোলা আছে তাঁর জন্য।

চুপ করে বসেই রইলেন শ্যামা। দালানের দরজা বন্ধ করেন নি বটে কিন্তু সামনেই কুপির আলো, সেটা ডিঙিয়ে অন্ধকার উঠানে কিছুই ঠাওর হয় না। তা না হোক, তার জন্য ব্যস্তও নন তিনি। তিনি স্থিরভাবে চেয়ে আছেন কুপির ঐ কম্পমান শিখাটার দিকেই।

বাইরে নিশুতি হয়ে এল ক্রমে। মল্লিকবাড়ির ঝি-চাকররা এ সময়টা প্রায়ই কলহ-কোঁদল করে রান্নাঘরে বসে—ওদের পিছন দিকেই ওদের রান্নামহল—তারাও চুপ করে গেছে—বোধহয় শুয়েই পড়ল। ভূতি মল্লিকের মাতলামীর দাপাদাপি চিৎকারও স্তিমিত হয়ে এল একটু একটু করে। মহাদেবের দিদিমা ঘাটে বাসন মাজতে এসেছিল—জলের ছপছপ আওয়াজে টের পেয়েছিলেন শ্যামা—সেও সম্ভবত বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল এতক্ষণে। এ পথে পথিক কেউ হাঁটে না রাত আটটার পর—এ পাড়ায় তাঁর ছেলেই সবচেয়ে দেরি করে বাড়ি ফেরে—সুতরাং কারুর হাঁটার শব্দ পাবেন সে সম্ভাবনা নেই।

তবে মানুষের প্রাণলক্ষণ না থাক—অন্য জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের অভাব ছিল না। শব্দেরও না। মানুষ যখন নিস্তব্ধ হয় তখনই বোধহয় ওরা বেশী করে কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। এইটেই বোধহয় ওদের নিশ্চিন্ত হয়ে বিচরণ করার অবসর, জীবনটা উপভোগ করার সময়। এখনই ওরা যেন বাঁচার মতো বাঁচে।

ঝিঁঝি-পোকা সন্ধ্যে থেকেই ডাকে, অশ্রান্ত নিরবচ্ছিন্ন কিন্তু তখন কানে লাগে না, এখন মনে হচ্ছে অসহ্য। বাগানের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একাধিক গো-হাড়গেল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাপের সামান্য শব্দ এ নয়, রীতিমত ভারী কিছু যাওয়ার মড়মড় শব্দ। শিয়াল ডেকে উঠছে থেকে থেকে। অনেকের ধারণা ওরা শুধুই প্রহরে প্রহরে ডাকে, এখানে বাস করলে সে ভুল ভাঙত তাদের। প্রায়ই ডাকে ওরা, সময়ে অসময়ে। মল্লিকদের বাড়ির কার্ণিশের কোণ থেকে পেঁচা-দুটোর কর্কশ কণ্ঠস্বর উঠছে—বোধহয় এখন কী একটা ছোট পাখী ধরেছে ওরা, তার করুণ চিঁচিঁ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরে থেমে গেল আবার। মরে গেছে পাখীটা। কোথায়—দূরে কোথাও দুটো বেড়ালে ঝগড়া করছে, তারও শব্দ শুনছেন শ্যামা। মাছে ঘাই দিচ্ছে মধ্যে মধ্যে পুকুরের জলে আলোড়ন জাগিয়ে। হয়ত ভামে খাচ্ছে মাছ। কে জানে!

এ সব শব্দই অন্য দিন হয়। বেশী রাত অবধি জেগে থাকা শ্যামার কাছে নতুন নয় কিছু, কিন্তু অন্যদিন এমন-ভাবে তাঁর কানে যায় না। যে সব দিনে অন্য চিন্তা থাকে, সেই চিন্তাতেই জেগে থাকেন। আজও চিন্তা আছে—কিন্তু সেই চিন্তাটাকেই তাড়াতে চাইছেন তিনি মন থেকে, মাথা থেকে। সেই জন্যেই প্রাণপণে কান পেতে আছেন বাইরের দিকে, কোথায় কি শব্দ হচ্ছে শোনবার চেষ্টা করছেন। চিন্তার সঙ্গে তিনি যেন ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছেন তাঁর ভাগ্যকেও।

তাঁর কপালে ভাল কিছু নেই তা তিনি জানেন। খবর যা আসবে তাও আঁচ করতে পারছেন। কিন্তু সে যখন আসবে তখন আসবে—এখন থেকে সে কথা ভাবতে চান না।

হঠাৎ কী একটা দমকা বাতাস উঠল। মা বলতেন নিস্তব্ধ রাত্রিতে এমনি দমকা হাওয়া তুলে পরিচিত মানুষের আত্মা চলে যায়। যাওয়ার পথে আত্মী বন্ধুকে জানিয়ে দিয়ে যায় তাদের অস্তিত্ব। কে জানে কার আত্মা চলে গেল এ বাড়ির ওপর দিয়ে। মার? নরেনের? তার শাশুড়ির? কী বলতে চাইল সে আত্মা, কোন নতুন বিপদের আভাস দিয়ে গেল, সতর্ক থাকতে বলল!......

সে মর্মর শব্দ যেমন হঠাৎ উঠেছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। গাছপালাগুলো কিছুক্ষণ পত্রপল্লব নেড়ে স্থির হয়ে গেল আবার। শুধু বাঁশগাছের ডগাগুলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাণ্ডে কাণ্ডে কটকট শব্দ তুলে আন্দোলিত হতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

অয়স্কান্ত

॥ নক্ষত্রলোকে যাত্রা ॥

সাধারণ মানুষের কথা বাদ দেওয়া যাক, এমন কি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এখনো পর্যন্ত এমন অনেকে আছেন যাঁরা নক্ষত্রলোকে মানুষের যাত্রার কথা শুনে হেসে উঠবেন। গত পাঁচ বছরে মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে অনেক উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে কিন্তু তবুও তা এমন কিছু নয় যার ভিত্তিতে নক্ষত্রলোকে যাত্রার তোড়জোড় করা যেতে পারে। কিন্তু তবুও নভোচারণবিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে আলোচনার বাইরে রাখেননি। কারণ তাঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন, এই মুহূর্তে না হোক, অদূর ভবিষ্যতে না হোক, একদিন না একদিন এই পৃথিবীর স্বল্পায়ু মানুষই নক্ষত্রলোককেও জয় করবে।

আপাতত অবশ্য তোড়জোড় চলেছে চন্দ্রকে জয় করবার জন্যে। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের ঘোষণা শোনার পরে এখন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যে ১৯৭০ সালের আগেই চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়বে। অন্যদিকে শুক্রগ্রহ ও মঙ্গলগ্রহকে জয় করবার তোড়-জোড়ও শুরু হয়েছে। দু-নম্বর মেরিনার মারফৎ মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনেক অজানা খবর সংগ্রহ করেছেন। মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে ধাবিত হয়েছে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের এক-নম্বর মার্স। তাছাড়া, এই দুটি এবং অন্যান্য কস্মিক রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর বাইরের মহাকাশ সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রস্তুতি ও আয়োজন দেখে মনে হয়, এই শতকটি শেষ হবার আগেই পৃথিবীর মানুষের কাছে সৌরমণ্ডলের কোনো গ্রহই অগম্য থাকবে না।

তবে যতো সহজে বলা হচ্ছে ততো সহজে অবশ্যই নয়। অসুবিধে আছে বিস্তর। সমস্যারও শেষ নেই। প্রত্যেকটি অসুবিধে প্রত্যেকটি সমস্যাকে পার হয়েই তবে এই গ্রহের মানুষের গ্রহান্তরে যাত্রা শুরু হতে পারে।

একটি সমস্যা—দীর্ঘকালীন যাত্রা-পথ। একাদিক্রমে কয়েক মাস বা কয়েক বছর বা এমন কি কয়েক পুরুষের আয়ু নিয়ে মহাকাশে যাত্রা শুরু করতে হবে। যেমন, আমাদের নিতান্তই ঘরের কাছের
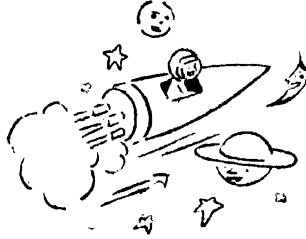
গ্রহ শুক্রের কথাই ধরা যাক। দু-নম্বর মেরিনার এই গ্রহে পৌঁছতে সময় নিয়েছে একশো সাড়ে-নয় দিন। কক্ষপথে তাকে দূরত্ব পার হতে হয়েছে আঠারো কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল। আবার, রওনা হবার দিনমানের ক্ষেত্রেও বাঁধাবাঁধি আছে, যা মহাকাশে পৃথিবী ও শুক্রের বিশেষ অবস্থানের ওপরে নির্ভর করে। যাত্রার পক্ষে এই দুই গ্রহের অবস্থানগত অনুকূল অবস্থাটি পাওয়া যায় প্রতি উনিশ মাস পরে-পরে একবার। কাজেই, কোনো মানুষকে যদি এই ঘরের কাছের শুক্রগ্রহেও যাতায়াত করতে হয় তাহলে অন্তত এই উনিশ মাস সময় হাতে নিয়ে বেরোতে হবে। এ-তুলনায়
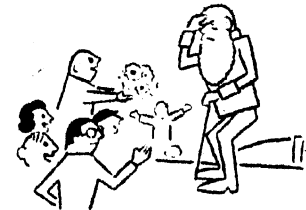
মঙ্গলগ্রহে বা সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহ প্লুটোতে যাতায়াত করতে হলে আরো কত বেশি সময় লাগবে তা অনুমান করা চলে। নিচের হিসেবটি দেখলে এ-বিষয়ে কিছুটা ধারণা হতে পারে।

গন্তব্য গ্রহ	যাত্রা-শুরুর বেগ (কি.মি।সে.)	অতিবাহিত সময় (একতরফা)
বৃহস্পতি	১৪·২	২ ব, ২৬৭ দি,
শনি	১৫·২	৬ ব, ১৮ দি,
ইউরেনাস	১৫·৯	১৬ ব, ১৪ দি,
নেপচুন	১৬·২	৩০ ব, ২২৫ দি,
প্লুটো	১৬·৩	৪৫ ব, ১৪৯ দি,

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মাত্র পনেরো কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্ব আর চল্লিশ গুণ বেশি। এই দূরত্বকেও সামান্য মনে হবে যদি বলি, সূর্য থেকে নিকটতম নক্ষত্র আলফা-সেন্টরির দূরত্ব চল্লিশ লক্ষ-কোটি মাইল বা চৌষট্টি লক্ষ-কোটি কিলোমিটার। লক্ষ-কোটি! এই মাত্রায় পৌঁছতে হলে সংখ্যার পরে বারোটি শূন্য বসাতে হবে।

এই হচ্ছে নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব। এখনো পর্যন্ত যে-ধরনের রকেট মানুষের আয়ত্তে রয়েছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে তার যাত্রা-শুরুর বেগ সেকেন্ডে প্রায় এগারো কিলোমিটার। এই বেগে যদি একটি রকেট নিকটতম নক্ষত্রের দিকে রওনা হয় তাহলে নক্ষত্র-লোকে পৌঁছতে রকেটটির সময় লাগবে আশি হাজার বছর!

আশি হাজার বছর! মানুষের আয়ু যদি ধরে নেওয়া যায় একশো বছর—তাহলে গন্তব্যে পৌঁছতে তাকে অন্তত আটশো বার নতুন করে জন্মাতে হবে। এই হিসেবটি মনে রাখলে অবশ্যই মনে হতে পারে, নক্ষত্রলোকে যাত্রার কথা বলাটা নিতান্তই একটা হাসির ব্যাপার।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই নিতান্ত হাসির ব্যাপারটা নিয়েও গুরুগম্ভীর-ভাবে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। বিজ্ঞানীদের মতে, তিনভাবে এই সমস্যাটির সমাধান হতে পারে। একটি নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধির সমাধান। বলা হয়েছে যে আশি হাজার বছরই যদি মহাকাশে কাটাতে হয় তাহলে একদল মেয়েপুরুষ একসঙ্গে যাত্রা শুরু করুক। আটশো পুরুষ ধরে মহাকাশেই তাদের জন্ম ও মৃত্যু হোক। এইভাবে বংশানু-ক্রমের বিপুল একটি ধারা পার হয়ে কেউ না কেউ শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রলোকে পৌঁছতে পারবেই। তারপরে, একই

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবার পরে কেউ না কেউ আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেই।

বলা বাহুল্য, এই সমাধানটি নিতান্তই সাধারণ বুদ্ধির, এতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনার কোনো পরিচয় নেই।

অন্য দুটি সমাধান যেমন চমকপ্রদ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

বলা হয়েছে, নক্ষত্রলোকে মানুষ যাত্রা করবে এমন একটি রকেটের যাত্রী হয়ে যার বেগ হবে আলোর বেগের প্রায় সমান। আলোর বেগ ঘন্টায় একলক্ষ ছিয়াশি-হাজার মাইল। এই দুর্ধর্ষ বেগে একটি রকেট ধাবিত হচ্ছে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। বিজ্ঞানীরা কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন এবং আলোর প্রায় সমান বেগে ধাবমান এই রকেটটির নাম দিয়েছেন ফোটোন রকেট।

তারপরে তৃতীয় যে সমাধানটির কথা বলা হয়েছে সে-সম্পর্কেই এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা তুলতে চাই।

হাইপোথার্মি বা জীবন্মৃত অবস্থা

একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, আজকের দিনের রকেটের যাত্রী হয়েই মানুষ নক্ষত্রলোকে যাত্রা করতে শুরু করতে পারে—তবে বিশেষ একটি শারীরিক অবস্থায়, যাকে বলা হয় হাইপোথার্মি বা জীবন্মৃত অবস্থা। মানুষের শরীরকে যদি ক্রমেই ঠান্ডা করা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছানো চলে যখন তার শরীরের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থারই নাম হাইপোথার্মি বা জীবন্মৃত।

কয়েক শ্রেণীর উচ্চতর জীবের হাইবারনেশন বা শীতযাপনের পদ্ধতির কথা নিশ্চয়ই সকলে জানেন। এমনি একটি উচ্চতর জীব হচ্ছে সাপ। সারা শীতকালটা সাপ এমন মরার মতো কাটায় যে মনে হতে পারে যে তার শরীরের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এও এক ধরনের হাইপোথার্মি বা জীবন্মৃত অবস্থা।

একদল সোভিয়েত ডাক্তার প্রমাণ করেছেন, হৃৎপিণ্ডে অপারেশন করবার সময়ে যদি শরীরের উত্তাপকে দশ থেকে তেরো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কমিয়ে আনা যায় তাহলে অপারেশন-পর্বটি সহজেই সাধিত হতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে প্রত্যংগটির অক্সিজেন ও রক্তের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যায়।

তবে, সম্প্রতি-কালে জীবন্মৃত অবস্থার অন্য একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে। ডঃ তারকমোহন দাসের 'আমার ঘরের আশেপাশে' বইটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এই দৃষ্টান্তটি উপস্থিত করতে চাই।

“সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্মবীজের আয়ুষ্কাল নিয়ে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে কয়েকজন জাপানী বৈজ্ঞানিক প্রথমে বলেন যে, তাঁরা দেখেছেন প্রায় দশ-বিশ হাজার বছরের পুরানো, মাটির তলায় চাপা পড়া পদ্মের বীজ আবার জল, বায়ু ও উত্তাপের স্পর্শে অংকুরিত হতে পারে। সেদিন অনেকেই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়া হ্রদের তলা থেকে ৪০-৫০ হাজার বছরের পুরানো কয়েকটি পদ্মবীজ পাওয়া গেছে, বীজের খোসাগুলি একেবারে ফসিলে পরিণত হয়েছিল। এই ফসিলের বৈশিষ্ট্য ও মাটির তলায় অবস্থানের খুঁটিনাটি বিবরণ পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা এদের প্রাক-ঐতিহাসিক বয়স সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। তারপর কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে এই বীজগুলি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল পার্কে এবং ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অংকুরিত করবার চেষ্টা করা হয়। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। প্রায় ৪০-৫০ হাজার বছরের নিদ্রাভংগ করে অবশেষে পদ্মের ভ্রূণ আবার বীজ থেকে বেরিয়ে বিকশিত কিশলয়ে সূর্যের আলো পান করছে।” (পৃঃ ২২—২৩)

এমনি দৃষ্টান্ত আরো আছে। সোভিয়েতের একটি গবেষণাগারের পঁচিশ কোটি বছরের শ্যাওলাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফেডারেল জার্মানিতেও একই ধরনের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা সফল হয়েছেন।

বিষয়টি এতই কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমহর্ষক যে সায়েন্স ফিকশনের ক্ষেত্রেও বিষয়টির রীতিমতো প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

যাই হোক, সমস্যার সমাধানটি নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে। নক্ষত্রলোকগামী রকেটের কামরায় রক্তমাংসের শরীরের যাত্রীকে রাখা হবে এমনি জীবন্মৃত অবস্থায়। তার শরীরের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে। হাজার, লক্ষ বা কোটি বছর পরে রকেটের গন্তব্যে পৌঁছবার পরে ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় আবার জাগিয়ে তোলা হবে তাকে।

মনে হতে পারে, সমস্তটাই অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু অবাস্তব কল্পনাও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তব ঘটনা হয়ে ওঠে।

কাজেই পৃথিবীতে অতি দূর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটতেও পারে যে ত্রিশ বছরের বাবা মহাকাশে একটা চক্কর দিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখছে তার নিজের বয়স সামান্যই বেড়েছে কিন্তু তার যে-ছেলেটিকে এক বছরের দেখে গিয়েছিল সে ততোদিনে থুত্থুরে বুড়ো।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রসঙ্গে

৩৯শ সংখ্যায় বিজ্ঞানের কথায় বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে যে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে সে-বিষয়ে আমরা কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। দুটি চিঠির উল্লেখ করতে চাই।

একটি লিখেছেন বীডন রো থেকে শ্রীপ্রভাতরঞ্জন ঘোষ। তাঁর চিঠি থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করছি।

“অধ্যাপক বসু যে বিষয়ে এম, এস-সি পাশ করেন, যে বিষয়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হিসাবে বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন—সে বিষয়ে আপনার লেখায় কোন উল্লেখ নেই।

ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন একসাথে অনার্স পাশ করেন এবং পরে একসাথে ফলিত গণিতে এম, এস-সি পাশ করেন—নানা কারণে ডঃ সেন সে-বৎসর পরীক্ষা না দিয়ে পরের বৎসর পাশ করেন। অধ্যাপক বসু বহুদিন কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতে শিক্ষা-দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এখনকার ফলিত গণিতের অন্যতম স্রষ্টা হলেন অধ্যাপক বসু।"

অপর চিঠির লেখক সিমলা স্ট্রীটের শ্রীকমলেশ মজুমদার। তাঁর চিঠিটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

"অমৃত পত্রিকার ৩৯শ সংখ্যায় (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩) 'বিজ্ঞানের কথা'তে 'বিজ্ঞানাচার্য' সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আলোচনা করা হয়েছে দেখে খুশি হয়েছি। এজন্য আপনার সংগে শ্রীযুক্ত অয়স্কান্তকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সবিনয়ে বলতে চাই যে প্রবন্ধটিতে কতগুলি ত্রুটি রয়ে গেছে যা এ জাতীয় রচনায় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(১) অধ্যাপক বসু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন নি, হয়েছিলেন পঞ্চম। এটি লেখার উদ্দেশ্য তাঁকে ছোট করা নয়, অন্ততঃ অধ্যাপক বসু সম্পর্কে সমস্ত তথ্য নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন।

(২) শ্রীযুক্ত অয়স্কান্ত লিখেছেন, "...পরবর্তীকালে অধ্যাপক বসুর গবেষণাকে অনুসরণ করেই ইতালীর বিজ্ঞানী ফার্মি ও ইংরাজ বিজ্ঞানী ডিরাক ইলেকট্রনের হিসেবের অন্য এক প্রকার পরিসংখ্যান আবিষ্কার করেন...।"

কথাটা সত্যি নয়। ফার্মি এবং ডিরাক উভয়েই গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে এক সংখ্যায়ন বিধির উদ্ভাবন করেন, যার নাম ফার্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন। এখানে অনুসরণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাছাড়া অধ্যাপক বোসের সংখ্যায়ন বিধিকে আরো পরিবর্ধন করেন আইনষ্টাইন। তখন সেই সংখ্যায়নকে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

(৩) "অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বললেও ভুল হয় না"—এই কথাটি বলা উচিত কিনা তা ভেবে দেখবার বিষয়। এ নিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রবন্ধ লিখতে হয়। মনে হয় অধ্যাপক বসু নিজেই এর প্রতিবাদ করবেন যদি প্রবন্ধটি তাঁর নজরে পড়ে।

(৪) আর এক জায়গায় আছে—"এই সময়েই তিনি মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরিতে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলেন।"

মনে হয় অধ্যাপক বোসের মত একজন দুর্লভ প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীর কাছে এটি "দুর্লভ সুযোগ" নয়, অন্ততঃ আমাদের পক্ষে তা বলা শোভা পায় না।
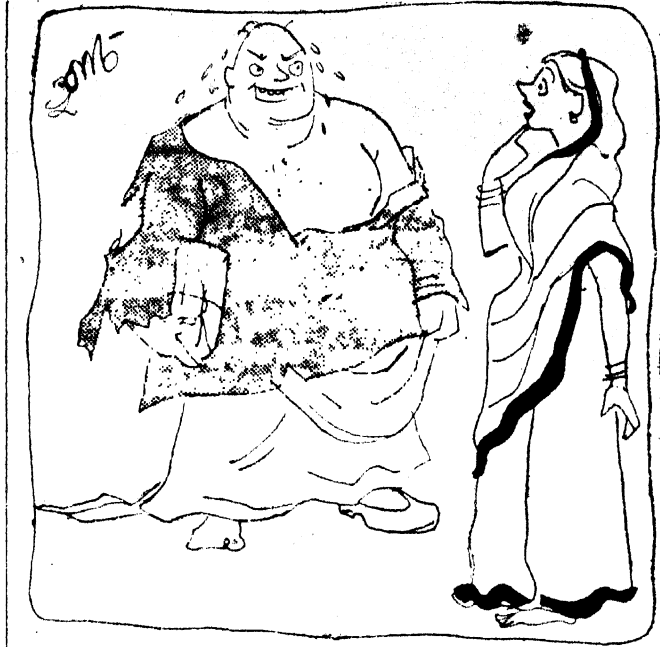
রায়েট নয় গিন্নি কলেজ স্ট্রীট থেকে ছেলেমেয়েদের স্কুলের বই কিনে আনলাম

আরো অনেক প্রসঙ্গ আছে যা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে। যেহেতু অধ্যাপক বোস সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা করা হচ্ছে, সেইহেতু তা যথেষ্ট সতর্কতার সংগে করা যুক্তিযুক্ত।"

প্রথম চিঠিতে ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে তা ঠিক। ডঃ সেন এক বছর পরে পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক বসু যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন এ তথ্যটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম একটি বাংলা বই থেকে। বইটির নাম 'বিজ্ঞানে বাঙালী'। অধ্যাপক বসুর পারিবারিক বিবরণও এই বইটি থেকেই সংগৃহীত।

'অনুসরণ' শব্দটিতে আপত্তি উঠেছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম—একই বিষয়ের অনুসরণ। ভুল বোঝার অবকাশ অবশ্যই আছে।

অধ্যাপক বসু আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কিনা তা ইতিহাসই প্রমাণ করবে। অধ্যাপক বসুর নিজের প্রতিবাদও সেক্ষেত্রে খারিজ হয়ে যেতে পারে।

"দুর্লভ সুযোগ" সম্পর্কে আমার নিজের কোনো বক্তব্য নেই। আমি অধ্যাপক বসুর লেখা থেকেই একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। ইভ কুরীর লেখা মাদাম কুরী বইটির বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় অধ্যাপক বসু লিখেছেন, "আর আমার মতো দু'চার জন বিজ্ঞানী এদেশে এখনো রয়েছেন যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছিল মাদাম কুরীকে স্বচক্ষে দেখা, তাঁর সংগে কিছুক্ষণ আলাপ করা—তাঁর বিখ্যাত লেবরেটরিতে কাজ করা বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনা! তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা' রেডিয়ম আবিষ্কারের অনেক পরে। নিদারুণ দুর্ঘটনায় পিয়েরের তিরোভাব ঘটেছে। একাই কৃতাকর্তব্য চালিয়ে দু'বার নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী মাদাম কুরী প্রায় তখন উপকথার মানুষ! দেবদুর্লভ যশের অধিকারিণী তিনি—তাঁকে দেখতে, তাঁর নির্দেশে কাজ করতে সারা বিশ্ব থেকে লোক এসে জুটেছে প্যারীর বিদ্যামন্দিরে।"

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, "যে কোনো কারণেই হোক আমাদের দেশের পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা অধ্যাপক বসুকে যোগ্য মর্যাদায় জনসমক্ষে উপস্থিত করার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি।" বলা বাহুল্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। আমি শুধু বিষয়টি সম্পর্কে যোগ্যতর ব্যক্তিদের অবহিত করতে চেয়েছিলাম। আমি আশা করব, অধ্যাপক বসুর সহযোগী অধ্যাপকরা ও ঘনিষ্ঠ ছাত্ররা এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন।

চিকিৎসা শাস্ত্র

ঊনবিংশ শতকে

ডাঃ অশোক বাগচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের প্রতি অধিকতর সচেতন। জনসাধারণ ও বৈজ্ঞানিকগণের নিকটসান্নিধ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করেছে সাধারণ মানুষকে। দেশে দেশে শিল্পের জয়যাত্রা শুরু হল। বহু অভিনব আবিষ্কারে চিকিৎসাশাস্ত্র হল সমৃদ্ধ। এই শতাব্দীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে। ঊনিশ শতকের চিকিৎসক অনুধাবন করলেন কেবলমাত্র ওষুধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না, প্রয়োজন উপযুক্ত সেবা ও যত্ন। মধ্য যুগে কোনও কোনও খৃষ্টীয় সংস্থার সন্ন্যাসিনীগণ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার অভাবে সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হত না। সেবিকারা সমাজে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিল না। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে জার্মানীর কাইজেরসূভের্থ শহরে থেয়োডোর ফ্লিদনের নামক এক লুথার-পন্থী যাজক ও তাঁর পত্নী ফ্রিদেরিকে তাঁদের গৃহে একটি রোগ-সেবিকা-শিক্ষালয় স্থাপন করেন। শিক্ষালয়টিতে শিক্ষা নিতেন সন্ন্যাসিনীগণ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ছিলেন উক্ত শিক্ষালয়েরই ছাত্রী। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলই ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ক্রীমিয়া যুদ্ধের সময় রোগজর্জরিত, আহত ও অর্ধভুক্ত ইংরাজ সৈন্যদের সেবা ও যত্ন করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। ক্রীমিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে প্রতিষ্ঠা করেন সেবিকাবিদ্যালয়।

॥ সংক্রামক রোগ-সমস্যা ॥

জীবাণুজাত সংক্রামক রোগের বিষয় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন টারেনটিউস রুসটিকুস। মধ্যযুগে ফ্রকাসটোরিউস নামক এক ব্যক্তি তাঁর 'ডে কন্টাজিওনে' বা সংক্রমণ নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। কিরুসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিম অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লেগ রোগীর রক্ত ও পুঁজের মধ্যে প্লেগ জীবাণু দেখতে পান বলে দাবী করেন ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে। জীবাণু-বিজ্ঞানের জনক ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের জন্ম এই যুগে (১৮২২—১৮৯৫)। প্রথম জীবনে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাসন (Crystallisation) বিষয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করে তাঁকে লিলে, স্ট্রাসবুর্গ ও সর্বশেষে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থা। লিলে শহরে অবস্থানকালে মদ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য তিনি গাঁজন (Fermentation) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করতেন। পাস্তুর প্রমাণ করেছিলেন যে, কয়েক প্রকার জীবাণু দ্বারা দ্রাক্ষারসে গাঁজন হয়ে দ্রাক্ষাসব (Alcohol) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে একটি বিস্ফোটক রোগগ্রস্ত গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার বৃহদাকৃতি জীবাণু দেখতে পান পাস্তুরের সহকর্মী দু'জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে উক্ত জীবাণুকে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু নামে অভিহিত করেন জার্মান জীবাণু-তত্ত্ববিদ রোবের্ট কোখ্‌। সংক্রামক রোগ-জীবাণু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুর জীবাণু-সংক্রমণ-প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কৃত টীকা-পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাস্তুরের ধারণা হয় যে, সংক্রামক রোগ-জীবাণু স্বল্প পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালে হয়ত অনুরূপ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাবে। তিনি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কর্ষিত উদরাময় জীবাণু জলে নিলম্বিত (Suspension) করে মুর্গীশাবকের দেহে সূচীবিদ্ধ করেন ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে মুর্গী-শাবকের উদরাময় রোগ নিয়ে গবেষণা-কালে। ফলে, ভবিষ্যতে মুর্গী-শাবক-গুলি উদরাময় রোগ হতে রক্ষা পায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় কৃত্রিম উপায়ে কর্ষিত (Cultivated) কৃশ (Attenuated) জীবাণু দ্বারা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব। কালক্রমে পাস্তুর ও তাঁর সহযোগী সামুবেরলাঁদ, রু ও থুলিয়ের অ্যানথ্রাক্স, শূকরের বিস্ফোটক ও জলাতঙ্ক রোগের (Rabies) প্রতিষেধক টীকা প্রস্তুতে সক্ষম হন। অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বা শিয়ালে দংশন করলে কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালের 'পাস্তুর ইনস্টিটিউট'-এ গিয়ে প্রতিষেধক টীকা নিতে হয়। পৃথিবীতে অনুরূপ বহু 'পাস্তুর ইনস্টিটিউট' পাস্তুরের স্মৃতি বহন করছে। পাস্তুরের শিষ্যদের মধ্যে রুশীয় এলি মেশনিকফ ও ফরাসী এমিলে রু-এর নাম পৃথিবী-বিখ্যাত।

ফরাসী ও জার্মান পরস্পরের জাত-শত্রু। পাস্তুরের পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীগণ যখন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তখন প্রুসিয়ার এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। তাঁর নাম রোবের্ট কোখ্‌। কোখের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল সামরিক বিভাগে চাকুরী করেন। তারপর গ্রহণ করেন এক গ্রাম্য চিকিৎসকের বৃত্তি। সে সময়ে জার্মানীতে যক্ষ্মা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। কোখ্‌ যক্ষ্মা জীবাণু অনুসন্ধানের [illegible] মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন তন্তু রঞ্জক পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। এক মৃত যক্ষ্মা রোগীর শ্বাসযন্ত্রের তন্তুর মধ্যে তিনি যক্ষ্মা জীবাণুর সন্ধান পেলেন। তিন বৎসর-ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নির্ভুল-ভাবে প্রমাণ করলেন উক্ত জীবাণুই যক্ষ্মার কারণ এবং তা প্রধানতঃ রোগীর শ্লেষ্মার সহযোগে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়ে যক্ষ্মা রোগ সৃষ্টি করে। তিনি জীবন্ত যক্ষ্মা রোগজীবাণু, শর্করা হতে প্রস্তুত এক প্রকার ক্বাথের মধ্যে কর্ষিত করে তিনি গিনিপিগের দেহে সূচিকা-বিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহে যক্ষ্মার ন্যায় ক্ষত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যক্ষ্মার জীবাণু হতে এক প্রকার নির্যাস প্রস্তুত করেন।

তার সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। উক্ত নির্যাস সাহায্যে যক্ষ্মা রোগ নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন ভিয়েনার বিখ্যাত শিশুরোগ-বিশেষজ্ঞ ডঃ ক্লেমেন্স ফ্রাইহের ফন্ পিরকে। উক্ত ডঃ পিরকে ভবিষ্যতে অধুনা সর্বজনজ্ঞাত 'এলার্জি'-মতবাদের প্রবর্তক। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ 'ভিব্রিও কোমা-ও কোখ্-এর অনুসন্ধানী দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারেনি। উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি পরিভ্রমণ করেন মিশর ও ভারত। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক গবেষণার স্মরণে স্থাপিত কোখ্-এর আবক্ষ মর্মর মূর্তি আজও বিদ্যমান। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান।

শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় জীবাণু-বিজ্ঞানের প্রভাব

প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার ক্ষত শুকোবার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু সংক্রমণ। বহু প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি ও রোগীর প্রাণনাশ করত। জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রাচীন শল্যচিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন এমন কি তাঁরা কার্যের পূর্বে হস্ত ও শল্যযন্ত্রাদি পরিষ্কার করতেন না। ডঃ চার্লস বেল নামক এডিনবরাবাসী এক চিকিৎসক মনে করতেন যে, নিশ্চয়ই বায়ুমধ্যস্থ কোনও অদৃশ্য বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দূষিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নামকরণ করেন "পূতিবাষ্প"। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে যোসেফ লিস্টার (১৮২৭—১৯১২) নামক এক চিকিৎসক গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন। গ্লাসগোর রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ টমাস এন্ডারসনের সঙ্গে লিস্টারের পরিচয় হয়। লিস্টারকে পাস্তুরের গবেষণার বিষয়ে সচেতন করেন এন্ডারসন। পাস্তুর বলতেন যে, উত্তাপ, পরিস্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়। লিস্টার সে সময়ে প্রচলিত জীবাণু নিরোধক কার্বলিক অম্লের সাহায্য নিয়ে অস্ত্রোপচারের পর অম্লাসিক্ত কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে রাখতেন, ফলে ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয় রূপে হ্রাস পায়। বায়ুর মধ্যে কার্বলিক অম্ল ছিটিয়ে দেওয়া হত শল্যগৃহের বায়ু জীবাণু মুক্ত করবার জন্য। ১৮৭৫ খৃঃ লিস্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতির পূর্ণ সমর্থন করেন মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যচিকিৎসার অধ্যাপক ডঃ ফন্ ন্যুসবাউম। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিস্টার তাঁর প্রচেষ্টা ও ফলাফল ঘোষণা করেন। লিস্টারের কৃতকার্যতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সবশেষে লর্ড উপাধি দান করেন। লিস্টারই ছিলেন ইংলন্ডের সর্বপ্রথম লর্ড পদাভিষিক্ত চিকিৎসক। লিস্টারের সমসাময়িক বার্লিনের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডঃ এরনস্ত ফন্ বের্গমান ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে বাষ্পসহযোগে জীবাণু নিধনের পন্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম হালস্টেড জীবাণুশূন্য রবারের দস্তানা পরিধান করে অস্ত্রোপচারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে প্যারীর সোরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বৃদ্ধ পাস্তুর আনন্দবিহ্বল চিত্তে লিস্টারকে চুম্বন করে অভিনন্দিত করেন। এক স্কটল্যান্ডবাসী ও অপর ফরাসীর আন্তরিক আলিঙ্গনের শুভক্ষণে সূচিত হল উন্নতশালী জীবাণুতত্ত্বের ভবিষ্যৎ।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইগনাৎস্ ফিলিপ সেমেলভাইস নামক এক হাঙ্গেরীয় যুবক ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগীণীই সূতিকাজ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কিছু দিন

লর্ড লিস্টার

পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রসূতিশালার প্রথম কামরার রোগিণীদের মধ্যেই সূতিকা জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রথম কামরার রোগিণীদের চিকিৎসা ও প্রসব করাত শিক্ষার্থী পুরুষ চিকিৎসকেরা। এবং দ্বিতীয় কামরায় প্রসব করাত ধাত্রীগণ। হাসপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শবব্যবচ্ছেদাগারে শবব্যবচ্ছেদ করে শিক্ষার্থী চিকিৎসকগণ প্রসবাগারের মধ্যে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নভাবে প্রসূতিগণের সান্নিধ্যে আসতেন। কিন্তু দ্বিতীয় কামরায় যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজ করতেন ধাত্রীরা। সেমেলভাইস উক্ত জ্বরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রফেসর কোলেট্স্কা এক রোগীর শবব্যবচ্ছেদ করবার সময় আহত হয়ে সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই রক্ত দূষিত হয়ে মারা যান। কোলেট্স্কার শবব্যবচ্ছেদের সময় সেমেলভাইস লক্ষ্য করেন যে, কোলেট্স্কার দেহের অভ্যন্তরে অবিকল সূতিকারোগিণীর মৃতদেহের ন্যায় পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই ব্যবচ্ছেদগৃহ হতে কোনও অদৃশ্য বিষাক্ত পদার্থ শিক্ষার্থীগণের দেহকে দূষিত করে ও তাঁরা প্রসূতিগণের দেহে তা সংক্রামিত করে। তিনি এক আদেশ জারী করে শবব্যবচ্ছেদগৃহ প্রত্যাগত চিকিৎসকগণকে রোগিণীগণের সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন। উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্বর সূতিকাজ্বরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে লাগল। এক প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের পর সহকর্মিগণ রুষ্ট হয়ে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। শেষ জীবনে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবিদ্যার অবদান

জার্মান পদার্থবিদ ভিল্‌হেলম্ কনরাড ফন্ রোণ্টগেন কর্তৃক রোণ্টগেন রশ্মি আবিষ্কারের পর চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি দ্রুততর হয়েছে। রোণ্টগেন ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের য়ুট্রেখ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি গবেষণা করেন ভ্যুয়ের্তস্‌বুর্গের অধ্যাপক কুন্দৎ-এর অধীনে। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে একটি ক্রুক্‌ কর্তৃক নির্মিত বায়ুশূন্য নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে গবেষণা করবার সময় তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত ও অদৃশ্য রশ্মি বা "এক্সরে" এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ রোণ্টগেন চিকিৎসা ব্যবস্থায় উক্ত রশ্মি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেননি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত ধরণের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে রোণ্টগেন রশ্মি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও গভীর প্রসারী রোণ্টগেন রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার চিকিৎসার এক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খৃঃ অব্দে রোণ্টগেন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে ফরাসী পদার্থবিদ হেন্‌রি বেকারেল্ কোনও কোনও মৌলিক পদার্থের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে মাদাম মারী কুরি ও তাঁর স্বামী মঃ পিয়ের কুরি "গামা" রশ্মিবিচ্ছুরণকারী রেডিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কর্কট রোগের চিকিৎসায় তা গভীর প্রসারী রোণ্টগেন রশ্মি অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। ১৯০৩ খৃঃ অব্দে কুরি দম্পতি লাভ করেন নোবেল পুরস্কার।

পরবর্তীকালে "সাইক্লোট্রোন" নামক যন্ত্র-সাহায্যে বহু নূতন বিচ্ছুরক মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করে কর্কট রোগ চিকিৎসার প্রচুর সুবিধা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব

ঊনবিংশ শতকে নিদানতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ভ্যুয়ের্তস্‌বুর্গের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক রুডলফ্ ফিয়েরকোভ্ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে প্রচার করেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষসমূহ অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা কর্তব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানব দেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংসের জন্য যোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু ভক্ষণ করে ফেলে। রুশীয় নিদানতাত্ত্বিক এলি মেশ্‌নিকফ্ উক্ত বিষয়ে আরও নতুন গবেষণা করে স্থির করেন যে, শ্বেত কণিকাসমূহের কিয়দংশ জীবাণুর দেহনিঃসৃত বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে।

উপদংশ রোগের সূত্র সন্ধান

প্রবাদ আছে যে, কলম্বাসের আমেরিকা প্রত্যাগত সঙ্গী নাবিকগণ ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে স্পেনদেশে উপদংশ রোগ (Syphillis) ছড়ায়। নাবিকগণের মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান রুই ডিয়াজ দে ইসলা নামক চিকিৎসক। ১৪৯৮ খৃঃ অব্দে লাস কাসাস্ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি দ্বীপে গিয়েছিলেন। ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈন্য বাহিনীর কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈন্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে ইতালীতে বিস্তৃত করে। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে ফ্রাকাসটোরিয়ুস্ নামক এক ভেরোনাবাসী পদ্যের ছন্দে সিফিলিস নামক এক যুবক পশুচারকের উপদংশ রোগযন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপদংশের নাম হল সিফিলিস্। সিফিলিস রোগ ইংলণ্ডে নিয়ে যায় সম্রাট চার্লসএর অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ। রাজা চতুর্থ জেমস্ সিফিলিস রোগীদের এডিনবরা শহরের সন্নিকটস্থ লেইথ দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন। আদেশ অমান্যকারী রোগীগণের গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা হত। ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরি উপদংশ রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্যারীর সিফিলিস রোগীগণকে সাঁ জেরমে' পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করা হয়। স্কটল্যাণ্ডবাসীগণ সর্বপ্রথম বুঝতে পারেন যে, রোগটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে প্রসারিত হয় এবং সেইজন্য এবারডিন শহরের বারবণিতাগণের গণ্ডে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল।

চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে জঁ্য আসত্রুক নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ জীবাণুসংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৯০৫ খৃঃ অব্দে জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ফ্রিৎস সাউডিন সিফিলিসের জীবাণু "স্পিরো-কিটা প্যালিডা' আবিষ্কার করেন। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে কোখ্-এর শিষ্য ডঃ আউগুস্ত ফন ভাসারমান রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে আবিষ্কার করেন সিফিলিস রোগ নির্ণয়ের পন্থা। পরীক্ষাটি "ভাসার-মান রিঅ্যাক্‌সন" বা "ডব্লিউ আর" নামে এখন সর্বজনপরিচিত। ১৯০৯ খৃঃ অব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিখ্ সিফিলিসের সর্বপ্রথম ঔষধ "স্যালভার-সান" আবিষ্কার করেন। বিংশ শতাব্দীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত মহৌষধ "পেনি-সিলিন"-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে নির্মূল করা হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আসে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডা গামার সঙ্গী নাবিকগণ।

অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপে ডিফ-থেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল এবং বহু শিশু অকালে ডিফথে-রিয়ারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হত। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ফিয়েরকোভ-এর শিষ্য ডঃ এডভিন্ ক্লেবস একটি ডিফথেরিয়া রোগীর শ্লেষ্মার মধ্যে ডিফথেরিয়া রোগ-জীবাণু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে কোখ্-এর ছাত্র ফ্রিদেরিখ্ ল্যোফ্‌লের পুষ্টিকয় ক্বাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ডিফথেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ধনুষ্টংকার রোগের টীকা আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী এমিল্ ফন্ বেহ্‌রিং ও তাঁর জাপানী সহযোগী সিবাশাবুরো কিটাসাটো। ১৯০১ খৃঃ অব্দে বেহ্‌রিংকে চিকিৎসা বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী

সপ্তদশ শতকে ইতালীয় শারীর-স্থানবিদ সর্বপ্রথম মানবদেহের নালী-বিহীন গ্রন্থিসমূহের (Ductless glands) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেও চিকিৎসকগণ উক্ত গ্রন্থিসমূহের কার্য-ক্ষমতা হীনতাজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিলেন সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী-কাল পরে। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের গাইজ হাসপাতালের চিকিৎসক টমাস এ্যাডিসন একটি রোগীর বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থির (Suprarenal glands) ক্ষরণ-ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ বা "এ্যাডিসনস ডিজিস" নির্ণয় করেছিলেন। বিখ্যাত সুইজারল্যাণ্ডবাসী শল্য চিকিৎসক থেয়োডোর কোখের পরবর্তীকালে গল-গ্রন্থি (Thyroid gland)-র কার্য-কারিতা সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর অনুগামী মরিৎস সীফ্ প্রমাণ করেন যে গল-গণ্ড রোগগ্রস্তের ব্যাধিদুষ্ট গলগ্রন্থি সম্পূর্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত "সর্দার গ্রন্থি" (Pituitary gland)-এর কার্য-প্রণালী আবিষ্কার করছিলেন হার্ভে কুশিং নামক বিখ্যাত মার্কিন স্নায়ুশল্য-চিকিৎসক।

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (Physiologist) ফ্রেডে-রিক ব্যানটিং জার্মান বিজ্ঞানী লানগের-হান্স-এর গবেষণা পুনরনুসরণ করে অগ্ন্যাশয় (Pancreas)-এর মধ্যস্থিত কোষপুঞ্জ হতে মানব শরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস ইনসুলিন আবিষ্কার করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ হয়। অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "কর্টি-জোন" নামক ঔষধ নালীবিহীন বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থি হতে ক্ষরিত হয়।

চেতনানাশকের সন্ধানে

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিকাল হতে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে জানাত তার শরীরের বেদনা নিরসন করতে। প্রাচীন চিকিৎসক সেইজন্য বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত নতুন নতুন বেদনানাশক লতা-গুল্মের অনুসন্ধানে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়ে মান্দ্রাগোরা (Mandrake) ও গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও তা জানতেন। মধ্য-যুগেও ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্দ্রাগোরা ব্যবহৃত হত রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্ব-কালে। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে য়ুনানী আমোস গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় অবহিত হন এবং হেরোডোটুস বলেছেন যে, হ্যাসিস বা গঞ্জিকার ধূম নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘ্রাণ নিলে চেতনা লুপ্ত হয়। প্রাচীন চৈনিকগণ আবিষ্কার করে অহি-ফেনের চেতনানাশক গুণ। ডিওস্কোরি-ডেস নামক য়ুনানী মান্দ্রাগোরা মূল দ্রাক্ষাসবে সিদ্ধ করে প্রস্তুত নির্যাস দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করাত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী (Carotid vessels) সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে করে অজ্ঞান করা হত। বিখ্যাত ইংরাজ শল্য-চিকিৎসক জন হাণ্টার ব্যাধি-গ্রস্ত অঙ্গচ্ছেদনের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন করতেন। অবচেতক ভেষজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য-চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্র ও পারদর্শী। বিখ্যাত ইংরাজ শল্য-চিকিৎসক উইলিয়ম চেসেল-ডেন মাত্র এক মিনিট কালের মধ্যে মূত্রাশয় হতে পাথুরী অপসারণ করতে পারতেন।

প্রকৃত অবচেতনা শাস্ত্রের (Anaes-thesiology) জন্ম হয় ইংরাজ রাসায়-নিক স্যর হার্মফ্রি ডেভী কর্তৃক "হাস্যোদ্দীপক বাষ্প" (Nitrous Oxide) আবিষ্কারের পর। উক্ত বাষ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগস নামক মার্কিন দন্তচিকিৎসক তাঁর বন্ধু ডঃ ওয়েলস-এর ওপর। ডঃ জ্যাকসন ও মর্টন নামক অপর দুই মার্কিনী চিকিৎ-সক "ইথার" (Ether) নামক জৈব রাসায়নিক দ্বারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক। ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ শল্য-চিকিৎসক ইংলণ্ডে 'ইথার' দ্বারা অব-চেতন করে অস্ত্রোপচার করতেন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে এডিনবরা শহরের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পসন ক্লোরো-ফর্ম নামক জৈব-রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় জানতে পারেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁর বন্ধু ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের আঘ্রাণ নিতে নিতে

ডঃ সিম্পসন ও তাঁর বন্ধুদ্বয়

নতুন নির্মল হাফ - বার সাবানে
কাচলে আপনার কাপড়চোপড় হবে
ধব্‌ধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর

হঠাৎ ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ করে অজ্ঞান হয়ে যান। ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন টেট্রা ক্লারএথিলিন ও ফ্লুয়োথেন প্রভৃতি রাসায়নিক।

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অস্ত্রোপচার করা যায় ঠিক সেই-ভাবেই রোগীর দেহের রোগদুষ্ট স্থান-বিশেষে 'স্থানীয় অবসাদক' (Local anaesthetic) প্রয়োগ করে বেদনাশূন্য-ভাবে অস্ত্রোপচার করা যায়। পেরু দেশীয় সুসভ্য ইনকারা 'কোকা' নামক বন্য বৃক্ষের পত্র চর্বণ করে শরীরের বেদনাগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞা-নিকগণ কোকা পত্রের রসে কোকেন নামক অবসাদক ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ভিয়েনার চক্ষু চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে একটি রোগীর চক্ষুর ওপর অস্ত্রোপচার করেন। বর্তমানে কোকেনের বিকল্পে স্থানীয় অবসাদন করা হয় প্রোকেন, জাইলোকেন প্রভৃতি ওষুধের সাহায্যে।

অবচেতনাশাস্ত্রের উন্নতি শল্য-চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিস্ময়কর পর্যায়ে উন্নত করেছে।

ঊনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে এক দরিদ্র মোরাভিয় ইহুদির গৃহে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর জন্ম। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে ফ্রয়েড ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে প্যারীর বিখ্যাত স্নায়ু-তত্ত্ববিদ জ্যঁ মার্তিন সারকো-এর কাছে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা গ্রহণ করতে যান। সারকো-র স্নায়ুতত্ত্ব-শাস্ত্রীয় জ্ঞানে মুগ্ধ ফ্রয়েড আজীবন স্নায়ুতত্ত্ব-শাস্ত্রাভ্যাস করতে মনস্থ করেন। ব্রেউয়ের নামক সারকো-র এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিৎসায় সম্মোহন প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। একটি পক্ষা-ঘাতগ্রস্তা রোগিণীকে আংশিকভাবে অব-চেতন করে ব্রেউয়ের তার সঙ্গে কথোপ-কথন শুরু করেন। ক্রমে ক্রমে রোগিণীর অবচেতন মনের বহু অব্যক্ত বাসনা প্রকাশ পায়। পূর্ণ চেতনা লাভের পর দেখা যায় যে রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষা-ঘাত মুক্ত। উক্ত সাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্রয়েড একযোগে বহু গবেষণা করে নির্ণয় করেন যে, মানুষের মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসনা থাকে। ঐ বাসনা-বৈকল্যের জন্য মানুষ হয় মানসিক রোগগ্রস্ত। ফ্রয়েড বলতেন যে, অবচেতন মন সমীক্ষার দ্বারা ঐ সকল বাসনা প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকল্য দূর হয়। ভিয়েনা মানসিক হাসপাতালে তিনি তাঁর শিষ্যদ্বয় আডলে ও ইয়ুঙ্গ-এর সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইহুদি বিতাড়নের আগে তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং সেখানে পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্যার সমাধান

খৃষ্ট জন্মের ছয় শতাব্দী আগে শুশ্রুত বলেছিলেন যে, মশক দংশন করলে জ্বর হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কলুমেল্লা নামক ব্যক্তিও অনুরূপ সন্দেহ করতেন। প্রাচীন রোমে ছিল জ্বর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। রোমকগণ মনে করত যে, অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু হতেই উক্ত রোগের জন্ম। সেইজন্য তারা উক্ত জ্বরের নামকরণ করে-ছিল 'মালারিয়া' বা দূষিত বায়ু। কালের পরিবর্তনে 'মালারিয়া' ম্যালেরিয়াতে রূপান্তরিত। গ্রীক চিকিৎসক হিপ্পোক্রতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৫ শতকের য়ুরোপীয় দক্ষিণ আমেরিকার অভিযাত্রী-গণ লক্ষ্য করেন যে, উক্ত প্রকার জ্বর নিরাময়ের জন্য পেরু দেশীয় আদি-বাসীরা এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল চূর্ণ করে ভক্ষণ করতেন। আনুমানিক ১৬৪০ খৃঃ অব্দে পেরুর স্পেনীয় শাসনকর্তা কাউন্ট সিনকোনার পত্নীর সম্মানার্থ উক্ত বৃক্ষের নামকরণ করা হয় 'সিনকোনা'। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ফরাসী জঙ্গী চিকিৎ-সক আলফোঁস ল্যাভেরাঁ আলজিরিয়ায় অবস্থান কালে এক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে এক প্রকার কীট দেখতে পান। ১৮৯৫ হতে ১৮৯৭ খৃঃ মধ্য-বর্তী কালে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তোজ্ঞামি বাতিস্তা গ্রাস্সি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া কীট-বাহক আনোফেলিস মশক আবিষ্কার করেন। ডঃ রস কলকাতায় তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান সুখলাল কারনানী স্মৃতি হাস-পাতাল) এক ক্ষুদ্র কক্ষে গবেষণা করতেন। কক্ষটি আজও অপরিবর্তিত-ভাবে বিদ্যমান। ল্যাভেরাঁ ও রস উভয়েই নোবেল পুরস্কার পান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করলেও পৃথিবীতে সিনকোনা বল্কলের অভাব ঘটে। তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সিনকোনা বল্কলজাত কুইনাইন অপেক্ষা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবি-ষ্কার করেন। ম্যুলের নামক সুইজার-ল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক 'ডি-ডি-টি' নামক মশক ধ্বংসকারী ঔষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী হতে প্রায় অবলুপ্ত।

আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় অঞ্চলে পীতজ্বর নামক এক প্রকার ভয়াবহ মশকবাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খৃঃ অব্দে ডঃ হিউজেস নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগ দেখতে পান। ১৮০০ খৃঃ অব্দে নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ত কর্তৃক হাইতি অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাসী ডঃ যোসিয়া ক্লার্ক নট্ লক্ষ্য করেন যে, মশকপ্রধান অঞ্চলে পীত-জ্বর বেশী হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে হাভানার কার্লোস ফিন্লে নামক চিকিৎসক প্রচার করেন যে, পীতজ্বরের কারণ 'এডিস্ এজিপ্তি' নামক মশকের দংশন। জেসি লাজিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 'এডিস্ এজিপ্তি' মশক কর্তৃক দংশিত হন এবং পীতজ্বরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মানুষের মধ্যে পীতজ্বর মড়ক আরম্ভ হবার আগে বানরেরা পীতজ্বরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীতজ্বর মূলতঃ বানরের রোগ এবং তার জীবাণু 'এডিস্ এজিপ্তি' কর্তৃক বানর-দেহ হতে মানব-শরীরে বাহিত হয়। ১৯২৮ খৃঃ অব্দে জাপানী জীবাণু-তত্ত্ববিদ হিদেও নোগুচি পীতজ্বরের জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতা বশতঃ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ-ত্যাগ করেন এবং মাত্র স্বল্পকাল পরে তাঁর সহকর্মী ডঃ এড্রিয়ান স্টোক্স ও ডব্লিউ ইয়ঙ্গও পীতজ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁরা আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ আরনল্ড থেইলের নামক বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, পীতজ্বর থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর রক্তমস্তু (Serum) মূষিকদের শরীরে সূচিকাবিদ্ধ করলে মূষিকের শরীরে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। বহু বৎসর অক্লান্ত গবেষণার পর পীতজ্বর নিরোধক টীকা আবিষ্কৃত হওয়ায় রোগ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

মশকবাহিত অপর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ 'গোদ'-এর কারণ নির্ণয়ও ঊনবিংশ শতকের অবদান। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন নামক নিদানতাত্ত্বিক পূর্বোক্ত দুটি রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের কীটও মশক দ্বারা মানবশরীরে প্রবেশ করে। গোদরোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে তিনি দেখতে পান যে, গোদের সূত্রানু-কৃমি (Micro filaria) সন্ধ্যার পর থেকে রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক চৈনিক গোদরোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন চৈনিককে সন্ধ্যাবেলা একটি ঘরে আবদ্ধ করে কয়েকটি 'ষ্টিগো-মাইয়া ফাটিগান্স' জাতীয় মশক ছেড়ে দেন ঘরের মধ্যে। রোগীটিকে দংশন করবার পর মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু সূত্রানুকৃমি পাওয়া যায়। সূত্রানু-কৃমিনাশক বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় ও 'ডি-ডি-টি' দ্বারা ষ্টিগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় গোদের প্রাদুর্ভাবও হ্রাসের দিকে।

(ক্রমশঃ)

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানই শৈলেশ্বর তার শ্বশুরবাড়িতে সেরে নিল। এইসব গ্রামের বিয়েতে ফুলশয্যা পর্যন্ত আসতেই হ'তো মেয়ের বাড়িতে। তাছাড়া উপায় ছিলো না। বিয়ের পরে বাসিবিয়ে সেরে তিন দিনের রাস্তা ঠেঙিয়ে নিজের দেশে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছুতে পথেই ফুলশয্যার রাত কেটে যেতো। কাজেই তিনটে অনুষ্ঠানই সেরে নিয়ে তবে রওয়ানা হ'তে হতো। নিজের বাড়ি গিয়ে তারপর বৌভাত হ'তো ঘটাপটা ক'রে।

এমনিতেই তিন দিন আগে এসে হাজির হয়েছি, আরো তিন দিন কাটলো, বলতে গেলে সপ্তাহটাই চলে গেল। যাবার জন্য তোড়জোড় চলছিলো, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন শৈলেশ্বরের স্ত্রী।

অন্যান্য বরযাত্রীরা বাসিবিয়ে দেখেই ফিরে গিয়েছিলেন। আমাকে আটকেছিলো শৈলেশ্বর। আমাকে কিছুতেই ছাড়লো না। শৈলেশ্বরের মতো মানুষও দেখলুম একটু নার্ভাস বোধ করছে একা হ'য়ে যেতে।

আমি যদি ডাক্তার না হতুম, তা হ'লে স্ত্রীর অসুখের জন্য শৈলেশ্বর ফিরতে না পারলেও আমি ফিরে আসতে পারতুম। কিন্তু রোগীর বাড়ি থেকে কি চিকিৎসক ছুটি পায়? আর আমার উপর শৈলেশ্বরের অখন্ড বিশ্বাস। ভদ্রমহিলা বেশ একটু ভুগলেন। আরো সাত দিন কাটাতে হ'লো। আমার পেশার পক্ষে এই অনুপস্থিতি যে হানিকর ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরুপায়। মোট কথা নিতান্তই দৈববশত ও বাড়িতে পুরো তেরো দিন কাটাতে হয়েছিলো আমার।

কিন্তু তাতে কি আমি দুঃখিত হয়েছিলাম? নাকি এই সুদীর্ঘ জীবনে আর কখনো সেই দিনগুলো আবার ফিরে এসেছিলো তার সমস্ত স্বাদ আর সৌরভ নিয়ে! না। আর আসেনি।

।। ৭ ।।

যেদিন প্রথম আমাদের নৌকো গিয়ে তাদের ঘাটে ভিড়েছিলো, অভ্যর্থনা জানবার জন্য অনেক স্ত্রী-পুরুষ ভিড় করেছিলো সেখানে। লাবণ্যপুরের রীতি-মতো একজন গণ্যমান্য মানুষ ছিলেন শৈলেশ্বরের শ্বশুর। বেশ কিছু তালুক-মুলুকের অধিকারী ছিলেন। এই তাঁর প্রথম সন্তান, খরচ করেছিলেন প্রচুর, বাজী-বন্দুক বাদ্য-ভান্ড কিছুরই অভাব ছিলো না। ঢাকা থেকে গোরার বাজনা এনেছিলেন, সিঁদুরপটি থেকে বিখ্যাত সানাইবাদক এনেছিলেন, হাঁসাড়া থেকে খোঁড়া ঢাকীকে নিয়ে এসেছিলেন অনেক টাকা দিয়ে, দাসপাড়া থেকে টিকারা এসেছিলো। সে এক ব্যাপার। এখন এসব তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। কী জাঁকজমক!

বর গিয়ে পৌঁছুনো মাত্র মেয়েদের শাঁখ, উলু, ইংরিজি জগঝম্প, দিশী ঢাক, সানাই, ব্যাকপাইপ সব একসঙ্গে শব্দ ক'রে উঠলো। অদ্ভুত একটা আব-হাওয়া তৈরী হ'য়ে গেল মুহূর্তে। আর সেই মুহূর্তে আমি তাকে দেখলুম। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলো তার। খয়েরী রংয়ের জরির বুটি তোলা ঢাকাই শাড়ি পড়েছিলো, লম্বা চুলের মোটা বেণীটা মালা জড়িয়ে এলিয়ে ছিলো পিঠে, কানে হীরের দুল, গলায় পাথরের হার, হাতে মোটা বালা, চোখে মুখে খুশীর দ্যুতি। গাল ফুলিয়ে শাঁখে ফুঁ দিতে গিয়েই আমার দিকে চোখ পড়লো তার। বুক চিরে দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল, এক পলকেই হয়ে গেল যা হবার। আরক্ত হয়ে মুখের কাছ থেকে শাঁখ নামিয়ে কোথায় মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

নিয়ম ছিলো যতোক্ষণ না বিয়ের জন্য নামা'না হবে, ততোক্ষণ মেয়ের বাড়ির মাটিতে পা রাখবে না বর। সুতরাং এ তিন দিন হয় সে নৌকোতেই থাকবে, নয় তো আলাদা বাড়িতে। যা তার ইচ্ছে। পাশের ঘাটেই আলাদা একটি বাড়ির বন্দোবস্ত হ'য়েছে সেজন্য। অবিশ্যি বরযাত্রীরাও সেখানেই থাকবে, খাবে এসে এখানে। বরের খাবার আলাদা যাবে।

বরযাত্রীরা আব্দার ধরলেন, আমাদের খাবারও যেন সেখানেই পাঠানো হয়,

বিয়ের আগে আমরাও কন্যার বাড়িতে বসে ভোজন করবো না। তাই সই। নৌকো ঘুরে গিয়ে সেই ঘাটেই থামলো। মহিলারা বরণ ডালা নিয়ে এসে বর তুললেন, ভদ্রলোকেরা হাতজোর ক'রে বরযাত্রীদের মন যোগাবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। ভূপেন বললো, 'আপনি কিন্তু আমার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে যাবেন।' তারপরেই ঠাট্টা করলো, 'নাকি আপনিও বিয়ের আগে পা দেবেন না।'

আমি হেসে তার কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'চলো। এখানে এতো লোকের মধ্যে থাকতে আমার দমবন্ধ হ'য়ে যাবে।'

ভূপেন খুব খুশী।

আদর-আপ্যায়নের একফোঁটাও ত্রুটি হলো না। কেটলি ভর্তি ভর্তি চা এলো, থরে থরে খাবার এলো, এটা খান ওটা খান বলবার জন্য লোক এলো, এলো পান তামাক সিগারেট, ফুলের মালা। এলাহি কাণ্ডকারখানা।

আমি ভূপেনের সঙ্গে তাদের অন্দরে এসে ঢুকলাম। সকলের সঙ্গে আলাপ হ'লো। ওর মা, বাবা, মামা, মাসী, খুড়ি, জেঠি, পিসী—সব এসে জড়ো হ'লেন।
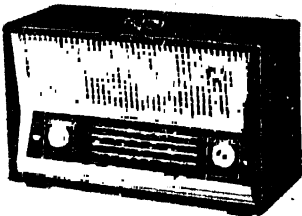
আমি তাঁদের ভাবী বরের ভাই, আমিই বা কম কী? তাঁদের মিলিত কৌতূহলী দৃষ্টির তলায় নিজেকে পেতে রাখতে রাখতে আমি ঘেমে উঠলাম।

ভূপেন তার দিদিকেও টেনে নিয়ে এলো। এক বছরের বড়ো দিদি, শৈলেশ্বরের ভাবী স্ত্রী। চমৎকার মহিলা, মুখ তুলে হাসলেন একটু, নরম গলায় আলাপ করলেন, খাবার সময় কাছে বসলেন। এতো ভালো লাগলো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

সেই সময়ের পক্ষে রীতিমতো শিক্ষিত ছিলেন তিনি, ঢাকা শহরে থেকে পড়াশুনো করতেন, সঙ্কল্প ছিলো বিয়ে করবেন না, আর সেই জেদ বেশ কিছু-দিন বজায়ও রেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত বাবা-মায়ের চাপে প'ড়ে রাজী হ'তে হ'লো। ফুটফুটে ফর্সা জামাই দেখে পাগল হ'য়ে গেলেন তাঁর বাবা। নিজে কালো বলে ফর্সার উপর তাঁর আবাল্যের আকর্ষণ। এই মেয়েটি তাঁর রং পেয়েছে, সেইজন্য আরো বেশী গৌরবর্ণ জামায়ের উপর ঝোঁক।

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভূপেনের সঙ্গে ভূপেনের ঘরে বেশ ভালোভাবেই কেটে গেল দিনটা। কিন্তু সেই ক্ষণিকার জন্য মনে মনে উদভ্রান্ত লাগছিলো, সে কে জানতে ইচ্ছে করছিলো, ইচ্ছে করছিলো আবার দেখা হোক তার সঙ্গে।

মেয়েরা এখনকার মতো সহজে কোনো ছেলের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত ছিলো না তখন। অসম্ভব লাজুক হ'তো তারা। আমি তখনো সে বাড়িতে অনাত্মীয় পুরুষ, বিশেষত যুবক, কোনো যুবতীকেই তাই দেখতে পাওয়া গেল না। আভাসে আড়ালে অল্পবয়সী অনেক মেয়ের উপস্থিতিই আমার হৃদয়ে আলোড়ন তুলছিলো, বুঝতে পেরেছিলাম, সেই দলে সে-ও আছে। তাদের কলকল কথা, অকারণ হাসির জলতরঙ্গ, সবই আমার শ্রবণকে আবিষ্ট করে রাখছিলো কিন্তু সর্বকিছু ছাপিয়ে সেই বিশেষটির জনাই উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলাম বেশী।

॥ ৮ ॥

প্রকাণ্ড চকমিলানো বাড়ি। যেমন হয় গ্রামের বড়োলোকদের। মাঝখানের বিশাল বাঁধানো উঠোনটির মাঝখানে মস্ত আলপনা আঁকা। সেই উঠোনে একসঙ্গে তিনটে বিয়ে হ'তে পারে। বারোটা গোল গোল গর্ত করা আছে, সে গর্তগুলো বাঁধানো নয়। ভূপেন বললো বিয়ে হ'লে ঐ গর্তে কলাগাছ পোতা হয়। চারটা কলাগাছ চারদিকে পুঁতে মাঝখানে বিয়ের জায়গা সাজানো হয়। এবং যাতে তিনটে বিয়ে একসঙ্গে হতে পারে সেজন্যই ঐ রকম নির্দিষ্ট জায়গায় সব মিলিয়ে বারোটা গর্ত আছে।

সেই উঠোন পেরোলে আবার আর একটা মাটির উঠোন। তার ওদিকে রান্না-ঘর, খাবারঘর, গোলাঘর, নিরামিষঘর, ঢেঁকিঘর, আঁতুড়ঘর। তুমি বোধহয় আঁতুড়ঘরটা বুঝতে পারলে না। বাড়িতে যতো মেয়ের যতো সন্তান হবে, প্রথম ভূমিষ্ট হবে সেই ঘরে। ন'দিন সেখানে থেকে, চান ক'রে বাচ্চা নিয়ে তবে ঘরে আসবে। তার আগে অশুদ্ধ, অস্পৃশ্য। গ্রামের এই আঁতুড়ঘরগুলো ছিলো নরক। মানুষের জন্মকে এরা এইভাবেই সম্মান করতো। প্রসূতি মেয়েকে ন'দিনের পর ছুঁলে স্নান করতে হ'তো। পুরো মাস তাকে কোনো শুভকাজে যোগ দিতে দেয়া হ'তো না।

অবিশ্যি ওদের আঁতুড়ঘরটা বাঁধানো ছিলো, চেহারাটা ভদ্র ছিলো। জ্ঞাতি-গুষ্টি মিলিয়ে বৃহৎ পরিবার বিয়ে উপলক্ষ্যে আরো বৃহৎ হয়েছে। আত্মীয়-পরিজনে থৈ থৈ করছে বাড়িটা। ভদ্রলোক নিজে বারোমাস সপরিবারে ঢাকায় থাকতেন, পুজো, দোল ইত্যাদি উৎসবের ছুটিছাটায় চলে আসতেন গ্রামে। এখন এসেছেন বিয়ে উপলক্ষ্যে।

পরের দিন সকালবেলা ভূপেন আমাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সব দেখাচ্ছিলো। বাড়ির পিছন দিককার বাঁধানো পুকুর-ঘাটে নিয়ে গেল সে, ঝুমকো আর মালতী ফুলের রংয়ে গন্ধে আমোদিত সেই ঘাট, হিজল গাছের ডালে ছাওয়া। একেবারে বইয়ে বর্ণিত কাব্যকুঞ্জ। রোদ তখনো চড়ে ওঠেনি, একরাশ হাঁস ভেসে বেড়া-চ্ছিলো জলে। তাকিয়ে দেখলুম কোঁচড়-ভরা ফুল নিয়ে ঘাটের তলাকার সিঁড়িতে বসে সেই আমার ক্ষণিক-দেখা মেয়েটি। মালা গাঁথছিলো, আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। ঘাটের উপর থেকে ভূপেন চিৎকার ক'রে ডাকলো 'এই বাঁদরি, কী করছিস ওখানে?'

এমন সুমধুর সম্ভাষণের জবাব আসতে একবিন্দু দেরি হ'লো না, 'এই যে লম্বকর্ণ এসো, তোমার জন্য জুতোর মালা গাঁথছি' বলতে বলতে মুখ ফেরালো সে আর তক্ষুণি আমাকে দেখে জিব কেটে থমকে গেল।

ভূপেন বললো, 'দেখলেন, দেখলেন, বড়ো ভাইকে সম্মানের নমুনাটা দেখলেন

তো? বাবা আবার আদর করে নাম রেখেছেন সান্ত্বনা। আহা রে, কী আমার সান্ত্বনা রে।'

সান্ত্বনা ভাইয়ের বাক্যবাণ সইতে না পেরে, এবং আমার উপস্থিতিতে তার কোনো প্রতিকার করতে না পেরে জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল সেখান থেকে।

শৈলেশ্বরের বিয়ের আগে পর্যন্ত, তার সঙ্গে ঐ রকমই চকিতে দেখা হ'য়ে যেতো বারে বারে। অবিশ্যি তার জন্য আমার একটু চেষ্টাও ছিলো। আমি উৎকর্ণ হ'য়ে থাকতুম, এক ফোঁটা হাসি, বা এক টুকরো কথার আভাস কানে পেলেই সেই শব্দ অনুসরণ ক'রে এমন জায়গায় এসে দাঁড়াতুম যেখান থেকে দেখা না হ'য়ে উপায় থাকতো না। সেটাই বা কম কী? বল? মুখের আলাপ নাই বা হ'লো। সেই লুকোচুরি খেলার মাধুর্য তুলনাহীন। দেখতে সে তিন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী ছিলো। তার লাবণ্যের কোনো সীমা ছিলো না, তার চোখের উজ্জ্বলতা কাচের উপর প্রতিফলিত সূর্যের মত ছিলো।

তিন দিন পরে শৈলেশ্বরের বিয়ে হয়ে গেল, আর আমি ওবাড়ির কুটুম্ব হ'লাম। আর হওয়া মাত্রই দেখলাম আমার সম্পর্কে বাড়ির লোক আর ততোটা সতর্ক নেই, তারা সহজ হ'য়ে উঠেছে। যেহেতু আত্মীয়ের পর্যায়ে পড়ে গেলাম, সেই হেতুই যুবতী মেয়েদের আর আমার কাছে বেরুতে কোনো বাধা রইলো না। সান্ত্বনা তার দিদির ছায়া, সবসময়েই সঙ্গে সঙ্গে আছে। আমারই বা শৈলেশ্বরের ছায়া হ'তে বাধা কী? আমিই বা সঙ্গ ছাড়বো কেন? অতএব চোখের দেখার তৃষ্ণা ভালোভাবেই মিটতে লাগলো। তার উপরে অবিরাম আমাকে জড়িয়ে শালির সঙ্গে শৈলেশ্বরের ঠাট্টা অতিরিক্ত উপভোগ্য মনে হ'তে লাগলো।

দুষ্টুমিতে তার জুড়ি ছিলো না কেউ। সারাদিন সে লেগে আছে এর ওর পিছনে। সারাবাড়ি তার জন্য তোলপাড়। দিদির একেবারে উল্টো। শৈলেশ্বরের স্ত্রী এতো শান্ত ছিলেন এতো চুপচাপ ছিলেন যে ও রকম মানুষ আমি আর দেখিনি। কিন্তু সান্ত্বনা দিদির সব নীরবতা একাই পূরণ ক'রে দিত। ভুপেনের সঙ্গে তার অহরহ চিৎকার চ্যাঁচামেচির সম্পর্ক। জামাইবাবুকে সে বাগে পেলেই জব্দ করে। একদিন তার সেই দুর্বুদ্ধি আরো একটু দূরে এগুলো। জামাইবাবুর ভাই পর্যন্ত পৌঁছুলো।

দিদির দেওর, সম্পর্কটি মধুর বইকি। আর তাকে নাজেহাল করার অধিকার নিশ্চয়ই তার আছে। জামাইবাবুকে শিখণ্ডি ক'রে দু'-একহাত যে হ'য়েও যায়নি তা-ও নয়। কিন্তু সেদিন একটি অপকর্ম করতে এসে একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল। দুপুরে নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিলাম, সন্তর্পণে এসে আমার মুখে সে চুনকালি মাখিয়ে দিল। নিতান্ত গ্রাম্য ঠাট্টা সন্দেহ নেই। আমার মতো একজন কলিকাতা-ফেরতা আধুনিক যুবক আর কেউ হলে নিশ্চয়ই সেটা সমর্থন করতো না, বর্বর বলে গাল দিতো। কিন্তু তখন মন যুক্তি খুঁজে বার করেছিলো। মুখোমুখি বসে আলাপ করার সঙ্কোচ না কাটাতে পারার এই সবই প্রতিষেধক। লজ্জার আস্তরণ ভেদ ক'রে এটাই সেসব দিনের আলাপ। আর এ তো যে কেউ নয়, এ একমাত্র সে-ই যার হাতের চুনকালি মণিমুক্তোর চেয়েও লোভনীয়।

কাজটি সে নিপুণভাবেই করেছিলো। একগালে চুন আর একগালে কালি মেখেই ঘুম ভাঙতো আমার, না জেনে সেই চুনকালিমাখা মুখ নিয়েই ঘরে বেড়িয়ে সারাবাড়ির হাসির খোরাক যোগাতুম, আর আড়াল থেকে সে মজা লুটতো। কিন্তু সে আশা তার পূরণ হলো না। দ্রুত পালিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই কী একটা পড়ে গেল ধাক্কা লেগে। আর সেই শব্দে আমি চোখ মেলে তাকালুম।

এতো ভাগ্য আমি আশা করিনি, হয়তো মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হ'য়ে থাকবো, কিন্তু পরক্ষণেই উদ্দেশ্যটা অনুমান করে নিতে পারলুম। তড়িৎবেগে উঠে পালাবার আগেই ধরে ফেললাম চোর। তার মুখটা লাল হয়ে উঠলো, বিন্দু বিন্দু ঘামে কপাল ভ'রে গেল, আঁচলটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় সারা-শরীর মোচড়াতে লাগলো। আমি দেখলুম তার দুই হাতের চেটোতে দুই রং মাখা, একটা চুন, একটা কালি।

'তা হ'লে এই মতলবে আসা হ'য়েছিলো?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, 'মোটেও না, আমি পাখা খুঁজতে এসেছিলাম।'

আমি বললুম, 'হাতে রং মেখে কেউ পাখা খোঁজে? চালাকি, না?'

সে ঢোক গিললো।

আমি আমার মুখের চামড়ার অস্বস্তিতে বুঝলুম ঐ দু'খানা হাত একটু আগে সেখানেই লিপ্ত ছিলো। গালে হাত বুলিয়ে সংশয় নিরসন হলো। আর তখুনি সেই রং তুলে তার গালে বুলিয়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে সে চিড়বিড় ক'রে উঠলো, 'বা রে, এসব খুব অন্যায়, খুব অসভ্যতা।'

গম্ভীর হ'য়ে বললুম, 'এই নির্জন দুপুরে, দোতলার এই একলা ঘরে, পাখা খুঁজতে আসাটাও খুব অন্যায়। আর তার আগে একদিন পানের মধ্যে বালি পুরে পান সেজে দাসীর হাতে পাঠানো হয়েছিলো, সেটাও খুব ন্যায় কর্ম বলে আমি মনে করি না।'

'ও মা, সে আবার কবে?' দুই চোখ সে কপালে তুললো। এক হ্যাঁচকা টানে

আঁচল ছাড়িয়ে নিল। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে রাস্তা বন্ধ ক'রে দাঁড়ালুম, বললুম, 'উঁহু, অত সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না।'

সে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললো, 'যা রে।'

'কী শাস্তি দেব বলুন।'

'আমি যাবো।'

'তা তো যাবেনই, কিন্তু শাস্তিটা কী?'

'ও রকম করলে আমি শৈলেশ্বর-বাবুকে গিয়ে যা তা বলবো।'

'আমি শৈলেশ্বরের শ্বশুরকে গিয়ে যা তা বলবো।'

'কী বলা হবে?' তখনো সে অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিতে কথা বলছিলো।

'বলা হবে যে তাঁর মেয়ে, মানে ছোট মেয়ে রোজ দুপুরেই নির্জন হলে চুপে চুপে আমার ঘ'রে—

'ইশ! কী মিথ্যুক।'

'কে মিথ্যুক দেখাই যাবে।'

রেগে গিয়ে বললো, 'চুনকালি মাখা মুখটা স্বভাবের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে।'

হেসে বললুম, 'আয়না দিয়ে নিজের মুখটা দেখলেও তার চেয়ে কিছু উৎকৃষ্ট বলে মনে হবে না।'

'কী!' গালে হাত দিতে গিয়ে থমকালো, শাড়ির আঁচলে মুছে তাকিয়ে বললো, 'এমা তাই তো। কী ভয়ানক লোক!'

'আসুন মুছিয়ে দি।'

'কী অসভ্য।'

'অসভ্য, কী, যার যার অপরাধ তার তারই তো খণ্ডন করা কর্তব্য। আমার গালের চুনকালির জন্য আপনি দায়ী। আমি অবশ্যই দাবী করবো যে কালি আপনাকেই মুছে দিতে হবে। কাজেই আমি ভেবেছি আপনিও নিশ্চয় সে দাবী উপস্থিত করবেন আমার কাছে। সত্যি বলছি আমি তাতে একটুও রাগ করবো না, এবং সে দাবী প্রতিপালনে আমি এই মুহূর্তে রাজী। দেব? মুছে দেব?'

এগিয়ে গিয়েছিলাম, হাত বাড়িয়ে-ছিলাম, 'য়্যাঃ' বলে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটি কোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বেরিয়ে গেল।

আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। সমস্ত শরীরে মনে সুখের আরাম ছড়িয়ে পড়তে দিলাম। যেন এক পশলা খুশীর বৃষ্টি। এক ঝলক দক্ষিণের হাওয়া।

॥ ৯ ॥

শৈলেশ্বর তার নতুন স্ত্রী নিয়ে সব সময়েই ব্যস্ত। তার অসুখ তখন সেরে গিয়েছিলো, সামান্য দুর্বলতা ছিলো মাত্র। সেই একটু অসুস্থতার ছুতোতে সারাদিন সে সেবা করতো, শোবার ঘর থেকে প্রায় বেরুতোই না। সর্বদা তার সঙ্গে তার স্ত্রীর বিছানায় বসে সময় কাটানো সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। আমি ভূপেনের সঙ্গে এদিক-ওদিক গ্রাম দেখতে যেতাম নয়তো একাই থাকতাম। বিয়েবাড়ির ভিড় ততোদিনে হালকা হয়ে গিয়েছিলো। যথেষ্ট বড়ো বাড়ি, ঘুরে

চুনকালিমাখা মুখটা স্বভাবের সঙ্গে বেশ......

বেড়াবার জায়গারও অভাব ছিলো না, আমার ভালোই লাগতো সব মিলিয়ে। শৈলেশ্বরের শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহ-যত্নের প্রাচুর্যে আমি মুগ্ধ ছিলাম। তাঁদের ছোটো মেয়ের অস্তিত্বে আমি পূর্ণ ছিলাম। আমার হৃদয়-মন ভরা নদীর মতো ছলছলে হ'য়ে উঠেছিলো তখন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই আমি ওদের তেতলার ছাদে উঠে চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে আলশের দিকে তাকি'য় ছিলাম। কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার রাতের তারাভরা বিস্তৃত আকাশ আমার কাছে এক নতুন জগৎ হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো। এই উঁচু কার্নিশ ঘেরা ছাদটিতে এই নিয়ে অনেকবার উঠেছি, ছাদটা খুব ভালো লাগতো আমার। অবিশ্যি সকলেরই পছন্দর ছিলো। বৃষ্টি না থাকলেই ও বাড়ির আড্ডা ঐ ছাদেই বসতো। শৈলেশ্বর, তার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কিত নানা বয়সের ভাইবোন মিলিয়ে পাটি পেতে জমজমাট আড্ডা বসতো। লণ্ঠন জ্বালিয়ে সারা সন্ধ্যা তাস খেলতো ওরা, হারতো, জিততো, ঝগড়া করতো, হাসতো, রাগ করতো, গানের কলি ভাঁজতো— খেলতো চারজন, দু'পক্ষের দলভুক্ত হ'য়ে চার দু'গুণে আটজন হৈ-হল্লা করতো। একমাত্র আমি হংস মধ্যে বক যথা হ'য়ে বিনা ভূমিকায় বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টোতাম। আমি তাস খেলতে জানতাম না, তাস খেলা ব্যাপারটাই আমার কাছে অতি বিশ্রি লাগতো। তবু বসে থাকতাম ঐ সান্ত্বনার জন্য। সে-ও আসতো সেখানে, কখনো খেলতো, কখনো দেখতো। বিশেষ উত্তেজনার সময় সবাই যখন একসঙ্গে কথা বলতো আমি চোখ তুলে সান্ত্বনার দিকে তাকাতাম, চোখে চোখ ফেলতে চেষ্টা করতাম, সান্ত্বনা ভুলেও তাকাতো না কিন্তু আমি দেখতাম তার নতদৃষ্টি নীরব মুখে আবিরের প্রলেপ পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

প্রথমেই আপনার 'অমৃতের' 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এর বহু প্রশ্ন-উত্তরে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক উপকৃত হয়েছি।

আমার কিছু প্রশ্ন বিভাগটির জন্য পাঠালাম, এর যথাযথ উত্তর পেলে অত্যন্ত বাধিত হব।

১। পৃথিবীতে সাংবাদিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক পদটি কি? কোন ভারতীয় এটি পেয়েছেন কিনা বা ভারতীয়দের মধ্যে সাংবাদিকতায় সবচেয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি কে পেয়েছেন?

২। সাংবাদিক ও বার্তাজীবীর মধ্যে পার্থক্য কি। (i, e, Reporter & Journalist) Calcutta-র বর্তমান ২০ জন Leading Journalist বলতে কাদের বোঝাবে?

শচীন্দ্রনারায়ণ সিংহদেও
পঞ্চকোট রাজ
কাশীপুর, পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন,

উত্তর জানার জন্য নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন দিলাম, 'অমৃতের পাঠক মহল হতে উত্তর পেলে উপকৃত হব।

১। কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর জন্যে যে কুশ-পুত্তলিকা দাহ করা হয়, কোন্ দেশে প্রথম এই প্রথার উদ্ভব হয় এবং বর্তমানে বিশ্বের কোথায় কোথায় এই-রূপে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়?

২। ব্যঙ্গ-চিত্রকররা কোন প্রখ্যাত দেশনেতার ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে যে জন্তু-বিশেষের শরীরের সংগে দেশনেতাদের মুখ জুড়ে দিয়ে আঁকেন, এর উপর কোন বিধিনিষেধ কি নেই? ব্যঙ্গচিত্র প্রথমে কোন দেশে এইরূপে আঁকা আরম্ভ হয়েছিল?

৩। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় বেশভূষা কি কি?

বিতান দত্ত
রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, বদরপুর/কাছাড়।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগে প্রকাশের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। এগুলি প্রকাশিত হলে এবং তার উত্তর পেলে বাধিত হব।

১। নিউ সেক্রেটারিয়েট, হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, মনুমেন্ট এবং হাইকোর্ট—এদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতা কার বেশী এবং প্রত্যেকের উচ্চতাই বা কি?

২। বাইসাইকেল আবিষ্কার করেন কে?

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,
৮ বৈরাগীপাড়া লেন, হাওড়া।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ২১ ডিসেম্বরের সংখ্যায় "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জ) প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—

মস্কোর ঘণ্টা সম্পর্কে যা জানা যায় তা সংক্ষিপ্তভাবে এই—এর ওজন প্রায় ২২০ টন, উচ্চতা ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং পরিধি মাত্র ২২ ফুট। আনুমানিক ১৭৩০ খৃঃ এর নির্মাণকার্য শুরু করেন বিখ্যাত রুশদেশীয় ইঞ্জিনীয়ার শ্রী "আইভ্যান মাতোরিন" এবং তাঁর মৃত্যুর পর এটি শেষ করেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র। এটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছিল মোট পাঁচ বৎসর।

মস্কোর ঘণ্টার পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম ঘণ্টাটির কথা শুনা যায় ব্রহ্ম-দেশের 'মিংগুন' নামক স্থানে, ঐ ঘণ্টার ওজন প্রায় ১২৫ টন।

মৃণাল ঘোষ।
পশ্চিম কংগ্রেসপাড়া।
জলপাইগুড়ি।

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রশ্নকারী শ্রীরণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটির উত্তর দিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন, 'সাধারণত আমরা যাহার 'মা' ও 'বাবা' জীবিত নাই তাহাকে বলি 'মাতা-পিতাহীন'। কিন্তু 'পিতৃমাতৃহীন' এবং 'মাতৃপিতৃহীন' ইহাদের অর্থ কি? এবং কি রকমভাবে ইহাদের ব্যবহার হইবে?'

যাহার 'মা' ও 'বাবা' জীবিত নাই, তাহাকে 'মাতাপিতৃহীন' বলাই উচিত। কারণ, সংস্কৃতে 'মাতাচ পিতাচ' এই পদগুলির ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস করিলে 'মাতাপিতরৌ' ও 'মাতরপিতরৌ' এই পদদ্বয় হয় এবং একশেষ করিলে 'পিতরৌ' পদ হয়। পরে 'মাতাপিতরৌ'-এর সহিত 'হীনঃ' পদের তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস করিলে, (মাতা-পিতৃভ্যাং হীনঃ—ব্যাসবাক্যের দ্বারা) 'মাতাপিতৃহীনঃ' পদসিদ্ধ হয়। অনুরূপ সমাসের দ্বারা সিদ্ধ 'মাতরপিতৃহীনঃ' পদের সংস্কৃত ভাষায় প্রয়োগ নাই এবং 'পিতরৌ' ও 'হীনঃ' হইতে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের দ্বারা (পিতৃভ্যাং হীনঃ—ব্যাসবাক্য) 'পিতৃহীনঃ' পদ সিদ্ধ হইলেও, 'পিত্রা' ('পিতৃ শব্দে তৃতীয়ার একবচন) 'হীনঃ' হইতে সিদ্ধ 'পিতৃহীনঃ' (যাহার অর্থ 'যাহার বাবা নাই') শব্দের সহিত গোলমাল হয় বলিয়া 'যাহার মা ও বাবা নাই' এই অর্থে 'পিতৃহীনঃ' পদ ব্যবহার হয় না। 'পিতৃমাতৃহীনঃ' পদটির ব্যাসবাক্য 'পিতুঃ মাত্রাহীনঃ' এবং অর্থ 'যাহার ঠাকুরমা নাই' 'মাতৃপিতৃহীনঃ' পদটির ব্যাসবাক্য 'মাতুঃপিত্রাহীনঃ' এবং অর্থ 'যাহার মাতামহ' নাই।

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য
(এম-এ, ডি, লিট্),
ভাটপাড়া
২৪ পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকার ৩১শ সংখ্যায় পুরুলিয়ার শ্রীঅহিভূষণ মিশ্রের ২নং প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি—

বাংলা মাস ও বারের নামকরণের মূলে গ্রহ ও নক্ষত্র। বারগুলির নাম গ্রহের নামে। যথা, রবি (সূর্য) সোম (চন্দ্র) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি। মাসের নাম ১২টি নক্ষত্রের নামানুসারে। যথা—বৈশাখ (বিশাখা) জ্যৈষ্ঠ (জ্যেষ্ঠা) আষাঢ় (পূর্বাষাঢ়া—উত্তরাষাঢ়া) শ্রাবণ, (শ্রবণা) ভাদ্র (পূর্ব-ভাদ্রপদ) আশ্বিন (অশ্বিনী) কার্তিক (কৃত্তিকা) অগ্রহায়ণ বা মার্গশীর্ষ (মৃগ-শিরা) পৌষ (পুষ্যা) মাঘ (মঘা) ফাল্গুন (উত্তরফল্গুনী—পূর্বফল্গুনী)। অগ্রহায়ণ মাসকে কেন 'মার্গশীর্ষ' মাস বলা হয় এই প্রশ্ন হইতেই প্রত্যেক মাসের নামের উৎসের সন্ধান মিলিবে। মার্গশীর্ষ মাসের অন্য নামের অর্থ অগ্র+অয়ণ অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। ইহা হইতে বুঝা যায় পূর্বে অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর গণনা করা হইত। মার্গের শীর্ষে অর্থাৎ রবির গমনপথের শীর্ষে এই অর্থেও অগ্রহায়ণ মাসকে মার্গশীর্ষ বলা হইতে পারে।

বম্বের মঙ্গলকুমার দত্তগুপ্তের প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি, বৈদ্যেরা বর্ণসঙ্কর—অনুলোম বিবাহজাত (ব্রাহ্মণ পিতা, অন্য বর্ণের মাতার সন্তান)। প্রাচীনকালে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা বেদ-চর্চার অধিকারী ছিলেন এই ধারণা সর্বৈব সত্য নয়। প্রাচীনকালে উপবীতের সংস্কার তথা বেদচর্চার অধিকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বৈদ্যরা যেমন আয়ুর্বেদের চর্চা করিতেন তেমনি ক্ষত্রিয়রাও ধনু-র্বেদের চর্চা করিতেন। সম্ভবতঃ বর্ণ-সঙ্কর বলিয়াই বৈদ্যমাত্রই উপবীত ধারণ করেন না। যাঁহারা উপবীত ধারণ করেন তাঁহারা বৈদ্যদের বর্ণসাঙ্কর্য স্বীকার করেন না মনে করা যাইতে পারে। বাংলাদেশের কোন কোন জিলায় (যেমন, শ্রীহট্ট ত্রিপুরা) বৈদ্যরা স্বতন্ত্র caste বলিয়াও গণ্য হন না।

বাণী দত্ত,
২৩।৪০, গড়িয়াহাট রোড, কলি-১৯

দৃশ্যকাব্য কথাকলি

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

কেরলের সম্পদ কথাকলি নৃত্য। পশ্চিমে অনন্ত গর্জনশীল চিরসংক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগর উচ্চারণ করছে গতির মহামন্ত্র, আর পূর্বে নদীমালাশোভিত শ্যামল-সুন্দর ধ্যানগম্ভীর পাহাড়বিনাস্ত স্নিগ্ধছায়া বনপ্রান্তর। কোমল-কঠোরে মধুরে-ভয়ংকরে পূর্ণ-প্রাণ মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পূর্ণবিন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকলি নৃত্যে। প্রকৃতির মুক্তলীলাভূমিতে যে সহজ সাধারণ মানুষগুলি বাস করে ছোটবড় গ্রামগুলিতে, পাহাড়তলীতে; বন-প্রান্তরের আড়ালে আড়ালে, কৃষ্ণছায়া নারিকেলকুঞ্জের মর্মরিত জীবনস্পন্দনের ছন্দে ছন্দে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী-প্রাণ সমস্ত সৌকুমার্য নিয়ে যেন লীলায়িত হয়েছে এই কথাকলি নৃত্যে।

ভারতীয় নৃত্যধারার ইতিহাসে এক প্রাচীন ঐতিহ্যবহনকারী কথাকলি নৃত্য-শিল্প সম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রভাবমুক্ত; নিজস্ব ভাবধারার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বহু প্রাচীনকাল হতেই ভারতীয় সংস্কৃতিকে করেছে উজ্জ্বল। শাস্ত্রীয় মতে নৃত্যই প্রথম আঙ্গিক যা থেকে নাটকের সৃষ্টি। নট্, নাটক, নাট্য এই সকল শব্দগুলি সংস্কৃত মূলধাতু নৃত্ হতে উৎপন্ন। আদিম যুগে মানুষ আকারে-

কেরলের লোকনৃত্যে "শিকারী"

ইঙ্গিতে ও হাতমুখের নানারূপ ভঙ্গিতে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করত। এই বিভিন্ন প্রকার প্রতীকধর্মী ভঙ্গি ও মুদ্রাগুলি নৃত্যকলার উৎপত্তির উৎস। অভিনয় দর্পণে নৃত্য সম্পর্কে শ্লোকটি এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"আস্যেনালম্বয়েদ গীতং
হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং
পাদভ্যাং তালমাদিশেৎ।" ৩৬।।
'যতো হস্ত স্ততো দৃষ্টি
র্যতো দৃষ্টি স্ততো মনঃ।
যতো মন স্ততো ভাবো
যতো ভাব স্ততো রসঃ।। ৩৭ ।।

অর্থাৎ বদনের দ্বারা গীত অবলম্বন করা কর্তব্য; হস্তের দ্বারা গীতের অর্থ প্রদর্শন করতে হয়; নেত্রদ্বয়ে ভাব দেখাতে হয়; আর পদদ্বয়ে তাল রক্ষা করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানেই নয়ন; যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি; যেখানে মন সেখানেই ভাব; আর যেখানে ভাব সেখানেই রস। অর্থাৎ এককথায় মুদ্রা-সমন্বিত তালমানরসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গ-বিক্ষেপের নাম নৃত্য। কথাকলি মূলতঃ দৃশ্যকাব্য। এই নৃত্যকলায় সম্পূর্ণভাবে উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণিত গুণগুলি পালন করতে হয়।

ভরত নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায় যে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে যখন জনসাধারণ অত্যন্ত উচ্ছৃংখল ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়ে পড়ে তখন দেবতারা লোক-গুরু ব্রহ্মাকে জনমানসের উন্নতিকল্পে সর্বসাধারণের উপযোগী নতুন বেদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা তখন ধর্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষলাভের মানসে ঋগবেদ হতে পাঠ্যম, যজুর্বেদ হতে অভিনয়ম্, সামবেদ হতে গীতম্ ও অথর্ব বেদ হতে রসম্ আহরণ করে নাট্যবেদম্ নামে এই পঞ্চবেদম সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা এই নতুন বেদ মর্তে প্রয়োগের জন্য ভরতমুনিকে নির্দেশ দিলেন। ভরতমুনি ব্রহ্মার আদেশ অনু-সারে তাঁর শতপুত্রকে "ভারতী" "সাত্বতী" ও "আরওতী" বৃত্তিতে তা শিক্ষা দেন। তারপর ব্রহ্মা "কৈশিকী" বৃত্তিতে এর প্রয়োগ করতে বলায় ভরতমুনি জানান যে

গৌতম বুদ্ধ চরিত্রের একটি দৃশ্য

নারী ব্যতীত কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারা এর প্রয়োগ অসম্ভব। তখন ব্রহ্মার ইচ্ছায় অপ্সরাগণের সৃষ্টি হয়। ভরতমুনি গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের মাধ্যমে নাট্যবেদের সাহায্যে নাট্যম, নৃত্যম্ ও নৃত্তের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগকালে দেবাদিদেব মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহেশ্বর নিজভক্ত তণ্ডুর মাধ্যমে তাণ্ডব নৃত্য ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন ও স্বয়ং পার্বতী লাস্যনৃত্যরূপ ভরতমুনিকে প্রদর্শন করেন। ভরতমুনি সেই তাণ্ডব ও লাস্য মানবসমাজে প্রচার করেন। এই নটনকলায় আঙ্গিকম্, বাচিকম্, সাত্ত্বিকম্ ও আহার্যম্ এই চারপ্রকার অভিনয় বর্তমান। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গির যে চলন তাকে আঙ্গিকম্ অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিকম্ অভিনয় বলে। এর উৎস ঋগবেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র-অলংকরণের অঙ্গসজ্জা, বসন-ভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে মুখমণ্ডলের ভাবের সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিকম্ অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী। কথাকলি নৃত্যে এই আহার্য অভিনয় একটি প্রধান ও অন্যতম অঙ্গ।

কথাকলি নৃত্য সম্পর্কে একটি প্রচলিত তথ্য হল পরম বৈষ্ণব কালিকটের

জামুরিন বংশীয় মানবদেব রাজ কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষ্ণনাটাম্ নৃত্যনাট্যের উন্নতরূপই পরবর্তী কালে কথাকলি রূপে খ্যাত। কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে অষ্টাপদী আট্যম্ নামে একপ্রকার লোকনৃত্যের ভিত্তিতে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনাটামের সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণনাটাম সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হত এবং রাজসভা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল সীমায়িত।

উত্তর চরিত্রের একটি দৃশ্য

কথিত আছে যে কোট্টারাকেরার রাজা বীর কেরালা বর্মা রাজপরিবারের বিবাহ উপলক্ষে কালিকটের জামুরিণের নিকট কৃষ্ণনাটাম্ অভিনয়ের একটি দলকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। জামুরিণ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে গভীর ভাবসম্পদপূর্ণ সাহিত্যধর্মী ও উন্নত আভিজাত্যসম্পন্ন আঙ্গিকসমৃদ্ধ এই কৃষ্ণনাটাম্ উপভোগ করবার মত সুধীজন দক্ষিণদেশে নেই। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে কোট্টারাকেরার রাজা নিজ দেশে একটি নতুন ধরণের নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন করেন। এরই নাম রামনাটাম্। তিনি কৃষ্ণনাটামের আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা বর্জন করে রামনাটামে অনাড়ম্বর প্রাগৈতিহাসিক পোশাক ব্যবহার করেন। কথিত আছে যে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে কোট্টারাকেরার গণেশমন্দির প্রাঙ্গণে রামনাটাম্ সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং পরবর্তী কালে কথাকলি শিল্পীগণের প্রথম প্রদর্শনী এই মন্দিরে গণেশদেবের আরাধনা হিসাবে অনুষ্ঠানের প্রথারূপে প্রচলিত হয়। রামনাটামকেই কথাকলি নৃত্যের উৎস ও প্রাথমিক স্তর হিসাবে মনে করা হয়। আঙ্গিক, ভাবসম্পদ, গভীরতা ও কলাসৌকর্যে রামনাটাম্ এক অনুপম সৃষ্টি। আকৃতি, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কথাকলি রামনাটামের অনুরূপ। মূলতঃ পুরাতন লোকনৃত্যের আঙ্গিকের বিস্ময়কর বৈপ্লবিক নবরূপায়ণ। কৃষ্ণনাটামের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে তা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। কোট্টারাকেরার রাজা মালয়ালী ভাষায় রামনাটাম্ রচনা করেন। তার ফলে জনজীবনের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যানভাগ রচিত হ'ত ব'লে এই নৃত্যনাট্য রামনাট্যম্ নামে অভিহিত। কোট্টারাকেরার রাজা তাঁর প্রথম আটটি নৃত্যনাট্যের কাহিনী রামচন্দ্রের জন্ম হ'তে রাবণ-বধের পর সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে রচনা করেন। কোট্টারাকেরার রাজা পরে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেও এই নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছিলেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে তিনি এই শিল্প-কলার এক গৌরবময় ভূমিকা সৃষ্টি করেন। নাট্যকার ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে তাঁর আদর্শ পরবর্তী কালের শিল্পীদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তী কালে ভেত্তাথুনাদের রাজা রামনাটাম নৃত্যনাট্যমের একজন উৎসাহী প্রযোজকরূপে খ্যাত।

কথাকলি নৃত্যের একটি দৃশ্য

কথাকলি শিল্পকলা কথাকলি সাহিত্যে অপেক্ষাও প্রাচীন। কথাকলি সাহিত্যে

চারশত বৎসরের পুরানো কিন্তু কথাকলি শিল্পকলা প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত। কথাকলিতে সাহিত্য শিল্প-শ্রয়ী। কথাকলি একটি সুপরিকল্পিত বিশেষ অঙ্গাভিনয় ও মুদ্রা সমন্বয়ে ভার-রসে উজ্জ্বল নৃত্যে। এতে বাদক ও সঙ্গীত-শিল্পীর গীতি মিলিতভাবে পরিবেশিত। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাব-ব্যঞ্জক মূকাভিনয়-সমন্বিত দৃশ্যকাব্য এই কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে একমাত্র জাভা দ্বীপের ছায়া-নাট্য ও ছায়া-নৃত্যের তুলনা চলে। এর কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বলি দ্বীপের অন্ধ রাজা ত্রিবাঙ্কুর থেকে কয়েকজন শিল্পীকে নিজদেশে বন্দী করে নিয়ে যান। পর-বর্তী কালে সেই বন্দী শিল্পীদের মাধ্যমে জাভা ও বলি দ্বীপে কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ নৃত্যের প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে এই অপরূপ দৃশ্যকাব্য কেরলের প্রাচীন লোক-নৃত্য ও পেরুমল যুগের প্রাকৃত চাক্কিয়াকুথু ও কুটি-আট্টম নৃত্যধারার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃত নৃত্যের সুসংবদ্ধ প্রকাশ-ভঙ্গি ও লোক-নৃত্যের প্রাণময় উন্মাদতা কথাকলি নৃত্য-নাট্যে স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

কথাকলি শিল্পকলার বিকাশে কেরলের কয়েকজন গুণী রাজা, কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিকদের অবদান বিশেষ স্মরণীয়। রাজন্যবর্গের মধ্যে কোট্টায়ামের রাজা কোট্টায়াত্তু-থাম্পুরান, কোট্টারা-কেয়ার রাজ বীর কেরালা বর্মা, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা রাজসুয়ম, কার্তিক থিরুমল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি উন্নায়ি ওয়ারিয়ার রচিত 'নলচরিতম্' উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। পরবর্তী কালে রবি-বর্মা থাম্পি ও আধুনিককালে মহাকবি ভাল্লাথোলা-নারায়ণ মেনন কথাকলি নাট্য-রচনায় নূতন শৈলীর প্রবর্তক। কথাকলি নৃত্যনাট্যগুলি গদ্য ও কবিতা মিশ্রছন্দে রচিত। সংলাপ অংশ সংগীত হিসাবে মালয়ালি ভাষায় রচিত হয়। শ্লোকের সাহায্যেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় অভিনেতাদের। পুরাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে সংগীত ও কাব্যরস-সমৃদ্ধ সুললিত ছন্দে রচিত কথাকলি নৃত্যনাট্যে মালাবার অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলাঘর কেরলের গ্রামে গ্রামে, মন্দিরপ্রাঙ্গণে সারারাত্রি-ব্যাপী কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে এর ধর্মপ্রবণতা, ভাব-গাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয়। সাধারণতঃ পনের থেকে পঁচিশজন শিল্পী নিয়ে কথাকলি নৃত্য-সম্প্রদায় গঠিত। কথাকলি নৃত্য-সম্প্রদায়ে কোনও মহিলা-শিল্পী অংশ-গ্রহণ করেন না, পুরুষেরাই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় করেন।

অপরাহ্নের সূর্য যখন আরব সাগরের ব্যাকুল আহ্বানে মিলন অভি-সারের আরক্তিম লজ্জায় লোহিত হয়ে মালাবারের শ্যামল পাহাড়ের নীরব গাম্ভীর্যকেও সলজ্জ রক্তিম করে তোলে তখন চতুর্যন্ত্রের মহামন্ত্র ঐকতানে ঘোষিত হয় কথাকলি নৃত্যের সুদূর-সঞ্চারী আহ্বান। চতুর্বাদ্যের এই অমোঘ আহ্বানে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ কথাকলি নৃত্য-মহামণ্ডপে সমবেত হয়। এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানটির নাম 'কেলি'।

রাত্রি আটটার পর কথাকলি নৃত্যের সূচনা এবং পরদিন সকালে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। কথাকলি মঞ্চ সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বার ফুট। চারদিকে চারটি স্তম্ভাকৃতি দণ্ডের সঙ্গে সামিয়ানা বেঁধে তৈরী হয় মঞ্চের ওপরকার আচ্ছাদন। মঞ্চের উপরের অভিনয়স্থল বস্ত্র দ্বারা আবৃত। চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা একটি বিরাট পিতলের পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। এই সময় চাণ্ডা, মাদলম, চ্যাংগালা ও কাইমনি বাজান হয়ে থাকে। একে বলা হয় 'আরঙ্গকেলি'।

'আরঙ্গকেলি' শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন শিল্পী অভিনয়-প্রাঙ্গণে একটি পর্দা ধরে দাঁড়ায়। একে বলে 'তেরেশিলা'। তেরেশিলার অন্তরালে শিল্পী একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এর নাম 'পূর্বরঙ্গম' বা 'তোড়েয়াম্'।

তোড়েয়ামের সমাপ্তিতে বন্দনা-শ্লোকম গীত হয়। তারপর 'পুরম্পাড়'। 'পুরম্পাড়' অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চ হতে ধীরে ধীরে 'তেরেশিলা' অপসারিত করা হয়। কাহিনীর প্রধান দুই চরিত্র মঞ্চে এসে 'পুরম্পাড়' নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চবন্দনা করেন। এই সময় ভাবাভিনয় ও কলাশমের ছন্দের মাধ্যমে দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। কলাশম মূলত তালাশ্রয়ী নৃত্য।

পুরম্পাড়ের পর অনুষ্ঠি[illegible] 'মঞ্জুথরারা' বা 'মালাপদম'। [illegible] হচ্ছে পুরম্পাড়ের সমাপ্তি ও মূলনাট্য কাহিনী আরম্ভের পূর্বে অনুষ্ঠিত এক সাংগীতিক বিস্কম্ভক বিশেষ। এখন মঞ্চের ওপর পূর্বোল্লিখিত চতুর্বাদ্য যন্ত্রীর একাধিপত্য। এই সময় যন্ত্র ও কণ্ঠশিল্পীগণ প্রায় প্রতিযোগিতাপূর্ণ-ভাবে তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। 'মঞ্জুথরারা'য় গীত-গোবিন্দ হতে সংস্কৃত গীতিমাল্য পরিবেশিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানের পর আরম্ভ হয় মূল কাহিনীর অভিনয়।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় চাণ্ডা, মাদলম্, চাংগালা ও এলাতালম বা কাইমনি—এই চারটি যন্ত্র। চাংগালাবাদকই যন্ত্রীদলের নেতা এবং পোন্নান নামে পরিচিত। কাইমনি-

কথাকলি নৃত্যে নবরস—

শৃঙ্গার

বীর

হর্ষ

করুণা

রৌদ্র

ভয়ানক

বীভৎস

অদ্ভুত

শান্ত

বাদককে সংকেটি বলা হয়। সংকেটি গানের প্রথম লাইন প্রধান গায়ক দ্বারা গীত হবার পর তার পুনরাবৃত্তি করেন।

কথাকলি রূপসজ্জা ও পোশাকে ভারতীয় নৃত্যকলায় এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাচীন নাট্যকলায় মুখোস বা উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ছিল অপ্রচলিত। কথাকলিতে বর্ণ-বৈচিত্র্য ও মুখোসের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। সমস্ত প্রকৃতি বিচিত্র রঙের খেলাঘর। নাট্য-শাস্ত্রে বিভিন্ন ভাব ও রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রং নির্বাচন ও ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, কথাকলি নৃত্য মূলতঃ আহার্য অভিনয়-প্রধান। কথাকলি নৃত্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিনটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে চরিত্র-গুলির রূপসজ্জার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অভিনবত্বে অতুলনীয়, পৃথিবীতে অনুরূপ কোনও মডেল নেই। কথাকলি চরিত্রগুলিকে পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি ও মিনিক্কু—এই পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। 'পাচ্চা' চরিত্রে সাদাচুট্টির বিপরীতে মুখে সবুজ এবং তাকে আরও উজ্জ্বল করবার জন্য লাল ঠোঁট ও কাল রং-এ চোখ ও ভ্রূ আঁকা হয়। কপালে আঁকা হয় চাঁপা রঙের তিলক। এই প্রসাধনে রাম, অর্জুন, কৃষ্ণ, নল প্রভৃতি বীরোচিত চরিত্র রূপায়িত। 'পাচ্চা'র মূল রস বীর ও শৃঙ্গার মিশ্র।

'কাত্তি' চরিত্রে মুখের সবুজ রঙের বদলে হয় লাল এবং আরও উজ্জ্বল করবার জন্য সাদা খড়ি দেওয়া হয়। নাকে ও কপালে দুটি সোলার বল হিংস্রতাকে প্রকট করে। এই প্রসাধন রাবণ, কীচক প্রভৃতি চরিত্রের অসাধুতা ও উগ্রতা প্রকাশক। 'কাত্তি' চরিত্রের মূল রস রৌদ্র ও বীর।

'তাড়ি' চরিত্রে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রকট প্রসাধন ব্যবহৃত। চরিত্রের গুণ অনুযায়ী লাল, কাল ও সাদা তিন প্রকার 'তাড়ি' রূপসজ্জা প্রচলিত। দুঃশাসন চরিত্রের ভয়াল শয়তান রূপ প্রকাশের জন্য 'লাল ও তাড়ি' এবং ধ্বংসাত্মক ক্রূর চরিত্র শকুনি, ব্যাধ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য 'কাল তাড়ি' ব্যবহার হয়। এদের মূলরস বীভৎস ও রৌদ্র। হনুমান চরিত্রের বীর ও হাস্য ভাব প্রকাশে প্রয়োগ করা হয় সাদা 'তাড়ি'।

'কারি' ব্যবহৃত হয় সূর্পনখা, তাড়কা প্রভৃতি হিংস্র নারীচরিত্র প্রকাশে। এতে কাল রং প্রয়োজন হয়। মূলরস বীভৎস ও রৌদ্র। 'মিনিক্কু' চরিত্রের প্রসাধনেই একমাত্র বেশী উজ্জ্বল রঙের প্রয়োগ হয় না। সাধারণ ভাবে নাটকের নায়িকা দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি ও সাধু চরিত্র রূপায়ণে এই মসৃণ ও স্বল্প উজ্জ্বল রূপসজ্জা করা হয়। মূল রস শান্ত ও শৃঙ্গার। বেগুন ফুলের ভিতরের অংশ রস করে শুকিয়ে চোখের নীচের পাতায় দিয়ে চোখের ভিতরের অংশ লাল করা হয় কারণ লাল চক্ষু ভাবপ্রকাশে অধিক সাহায্য করে ও ঐ সমস্ত বিভিন্ন রংয়ের অনিষ্টকারী গুণ হতে চোখ ও মুখের চামড়াকে সুস্থ রাখে। চারদিকের অন্ধকারের মাঝে পর্দা সরালেই প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে কথাকলি রূপসজ্জার বর্ণবৈচিত্র্য এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করে।

কথাকলি নৃত্যের দুটি ভাগ। একটি লাস্যাশ্রয়ী বা ছন্দবহুল অপরটি অভিনয়-বহুল। কথাকলি মূলতঃ দৃশ্যকাব্য বলে অভিনয়-অংশই প্রধান। "নবরস"এর মাধ্যমে কথাকলি শিল্পীগণ নাট্যের সকল অভিব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে দর্শকদের বুঝাতে সক্ষম হন। শৃঙ্গার, বীর, হর্ষ, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই নয়টি রসের সার্থক প্রয়োগ কথাকলি নৃত্যকলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

কথাকলিতে মূলতঃ পাঁচটি তাল বিদ্যমান। যথা—চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, ত্রিপাড়া ও পাঞ্চারী। কথা-কলিতে "অষ্টকলাশম" নামে একটি নৃত্যশৈলী প্রচলিত আছে যা আটটি বিভিন্ন ছন্দে রচিত কলাশমের সমষ্টি। অষ্টকলাশম প্রধানতঃ চাম্পা তালকে ভিত্তি করে রচিত।

কথাকলি নৃত্যে পোশাকও রূপ-সজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। এই পোশাকের সম্পর্কে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। যখন কালিকটের জামুরিণ বংশীয় মানব দেবরাজ কৃষ্ণনাটাম নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করেন তখন একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন সমুদ্রে এক একটি ঢেউ সরে যাচ্ছে আর কথাকলি নৃত্যের পোশাক ও প্রসাধনের অপরূপ রং প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সেইজন্য কথাকলি অনুষ্ঠানে পুর-প্পাডের সময় তেরৈশিলা ধীরে ধীরে অপসারণ করা হয় ও শিল্পীর পোশাক ও রূপসজ্জার বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুট হয়ে ওঠে। কথা-কলি ঘাঘরার নাম "উরূত্তেকেট্টু"। ঘাঘরার ওপর দিয়ে দুই পাশে যে দুটি লাল কাপড়ের ফালি ঝোলান থাকে তাকে বলে "পাটুওয়াল"। ঘাঘরার সামনের দিকে রূপোর কাজকরা কোঁচাকে বলে "মুণ্ডি"। কোমরের ওপর অর্ধবৃত্তাকারে ঝালরের মত অংশটিকে "পাড়িএরে-ঞানম" বলে। কণ্ঠ হতে ঝোলান চাদরের দু পাশে থাকে দুটি আয়না। একে 'উত্তরীয়ম' বলে। ঊর্ধাঙ্গের জামাকে বলা হয় "কুপ্পায়াম"। তাছাড়া ভালাই, হস্তকটকম, তোলপুটু, কাজু-হারম, তাড়া, চুট্টিতুনি, নারা প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়। কথাকলি শিল্পীর মস্তকাভরণ "কিরীটম্" এক অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন।

কথাকলি নৃত্য শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এগার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ছাত্ররা "কালারী"তে (গুরুর আশ্রম) গিয়ে গুরুকে অর্থ ও বস্ত্র দক্ষিণা দিয়ে ছয় হাত লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া মোটা কাপড়ের 'কাচ্চা' গ্রহণ করে। প্রত্যুষে এই 'কাচ্চা' পরে তেল মাখতে হয় সমস্ত দেহে। তারপর বিভিন্ন অঙ্গ-সঞ্চালনের

শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হবার পর গুরু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ছাত্রের দেহের গ্রন্থিসমূহ মালিশ করে দেন। এতে মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহের নমনীয়তা ও সঞ্চালন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিপ্রহরে ছন্দের তালে তালে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয় চক্ষু, অক্ষিপুট, ভ্রূ, কপাল ও ওষ্ঠ সঞ্চালন পদ্ধতি। তৃতীয় পর্যায়ে মুদ্রা, ভাবাভিনয় ও বিভিন্ন ভঙ্গি প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ পর্যায়ে চতুর্বাদ্যের সঙ্গে অনুশীলন করান হয়। এই সব শিক্ষার পর ছাত্রের অধ্যবসায় ও দক্ষতা অনুসারে তাকে উপস্থিত করা হয় কথাকলি অনুষ্ঠানের মহড়ায়। শিক্ষাকালের মোট সময় অন্যূন এগার বৎসর।

পূর্বেই বলা হয়েছে কথাকলি নৃত্যনাট্যে স্ত্রীলোকেরা অংশগ্রহণ করেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে কথাকলি নৃত্যে মহিলা শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করছেন 'সারি লাস্য নৃত্যে'। সারি নৃত্য কেবলমাত্র মহিলা চরিত্র অভিনয়ের জন্য। চান্ডা ব্যতীত অপর সকল বাদ্যযন্ত্রই এই নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকের ভূমিকার উপযোগী লোকনৃত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট সমবেত নৃত্য "কুম্মি"ও কথাকলি নৃত্যনাট্যের অন্তর্ভুক্ত। কেরলের অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্যকলা "মোহিনী আট্টম" সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। সেজন্য বর্তমান প্রবন্ধে শুধুমাত্র নামটিই উল্লেখ করলাম।

কথাকলিতে মূল চব্বিশটি হস্ত প্রচলিত। পতাকা, মুদ্রাক্ষম্, কটাকম্, মুষ্ঠি, কর্তারিমুখম্, সুখতুণ্ডম্, কপিত্থকম্, হংস্যপক্ষম্, শিখরম্, হংসাস্য, অঞ্জলি, অর্ধচন্দ্র, মুকুরম্, ভ্রমরম্, সূচীকামুখম্, পল্লবম্, ত্রিপতাকা, মৃগশির্ষম্, সর্পশির্ষম্, বর্ধমানকম্, আরালম্, উর্ণনাভম্, মুকুলম্, কটাকামুখম্, এই চব্বিশটি হস্তের মাধ্যমে সংযুক্ত, অসংযুক্ত ও মিশ্র বহু মুদ্রা কথাকলি নাট্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রাচীন লোক-নৃত্যের বিস্ময়কর বৈপ্লবিক নবরূপায়ণ কথাকলি নৃত্যে প্রতীয়মান। আড়ম্বর-বর্জিত লোকআঙ্গিকের বলিষ্ঠতা ও সারল্য শাস্ত্রীয় মুদ্রার সমন্বয়েই কথা-কলি নৃত্যে সজীব উন্মাদনার সৃষ্টি। কেরলের শিকারী চিত্রে শিল্পীর অভি-ব্যক্তি লক্ষণীয়। কেরলের বিভিন্ন অঞ্চলে "কাল্পী আট্টম্" নৃত্য প্রচলিত আছে। এই নৃত্য কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ হলেও আড়ম্বরহীন।

কথাকলি শিল্পকলায় পুনরুদ্ধার ও বিকাশের ক্ষেত্রে মহাকবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেননের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির এই লুপ্তপ্রায় মহান ধারাটিকে নবজীবন দান করেছেন। নিরলস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জীবনের দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কেরালা কলা-মণ্ডলাম্ স্থাপিত করে এই মহান কার্যে আত্মদান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মালয়, চীন, সিংহল ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কথাকলি শিল্পীদল অনুষ্ঠান পরি-বেশন করেছে।

কথাকলি নৃত্যগুরুদের মধ্যে চেঙ্গানুর রমণ পিল্লাই, কুঞ্জকুরুপ, কৃষ্ণান নায়ার, কুঞ্জ নায়ার, রামনকুট্টি নায়ার, কৃষ্ণান নাম্বুদ্রি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীউদয়শঙ্করের কথাকলি নৃত্যগুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি কথাকলি অভিনয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে স্বীকৃত। পরবর্তী কালে এই প্রাচীন নৃত্যকলার ঐতিহ্য বজায় রেখে যুগোপযোগী পরিমার্জিত নবরূপায়ণের সার্থক প্রয়োগে সাফল্য অর্জন করেছেন গুরু গোপীনাথ, কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন এবং আরো অনেকে।

॥ বৈদেশিক ঋণ ॥

অনুন্নত দেশের উন্নয়ন প্রয়াসে বৈদেশিক ঋণ অপরিহার্য। একারণে এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জনের পর হতেই বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলিও তাতে সাড়া দেয়। ১৯৬০ সালে পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিকে যে পরিমাণ সাহায্য দিয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব এখানে দেওয়া হল।

দেশ	ঋণ (কোটি পাউন্ড)	মাথাপিছু দান (পাউন্ড)
যুক্তরাষ্ট্র	১০১·০০	৫·৬
ফ্রান্স	২৯·৯০	৬·৫
বৃটেন	১৪·৫০	২·৮
পঃ জার্মানী	১১·৪০	২·১
অন্যান্য	১৮·১০	

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে মোট দানে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হলেও মাথাপিছু দানে ফ্রান্সের স্থান তার উপরে। এবার পশ্চিমী দেশগুলির সাহায্য-ঋণ কোন দেশ কত পেয়েছে তার একটা হিসাব দেওয়া হল।

দেশ	সাহায্যের পরিমাণ (কোটি পাউন্ড)	মাথাপিছু প্রাপ্তি (পাউন্ড)
ভারত	১৬·০০	০·৩৬
আফ্রিকা	১৩·৬০	১২·৩০
দঃ কোরিয়া	৯·১০	০·৭০
পাকিস্থান	৭·৪০	০·৭৮
দঃ ভিয়েৎনাম	৬·৭০	৪·৭০
ইজিপ্ট	৩·৮০	১·০০
ফর্মোসা	৩·৭০	৩·৬০

এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, পরিমাণের দিক থেকে ভারতের প্রাপ্তি সর্বাধিক হলেও তার মাথাপিছু প্রাপ্তি খুবই কম। পাকিস্থানের পাওয়া মোট সাহায্য ভারতের তুলনায় অর্ধেক হলেও তার মাথাপিছু প্রাপ্তির পরিমাণ ভারতের দ্বিগুণ।

অনুন্নত দেশগুলির বৈষয়িক উন্নয়ন প্রয়াসে পশ্চিমী দেশগুলির দান খুব কম না হলেও খুব বেশী মনে করলেও ভুল করা হবে। যেমন বৃটেন ১৯৬১ সালে বৈদেশিক ঋণ বাবদ ১৬ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড দান করেছে যা তার সারা বছরের তামাক খরচার এক-সপ্তমাংশ। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে এই প্রসঙ্গে। অনগ্রসর দেশগুলি যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করেছে গত দশ বছরে, প্রায় সমপরিমাণ অর্থই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রধান বা একমাত্র জাতীয় সম্পদ কাঁচা সম্পদগুলির মূল্যহ্রাসে।

॥ সম্পদের পার্থক্য ॥

পরপর তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতে ২১ হাজার ৭ শত কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতের বৈষয়িক সামর্থ্যের বিচারে এ টাকা এত বেশী যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতকে কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে ঋণস্বরূপ সংগ্রহ করে আনতে হচ্ছে। অপরপক্ষে এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে তাতে ব্যয়বরাদ্দের হিসাব ধরা হয়েছে ৯,৮৮০ কোটি ডলার, টাকার হিসাবে যা প্রায় ৪৯ হাজার ৪ শত কোটি টাকা। অর্থাৎ পনের বছরে ভারতের যেখানে নিজ সামর্থ্যে ২১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বছরের বাজেটে সেখানে ব্যয়বরাদ্দ করা হয় ৪৯,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ যুদ্ধ যদি না থাকত পৃথিবীতে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের এক বছরের সামরিক খরচেই ভারতের তিনটি পঞ্চবার্ষিক জাতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-সংকুলান হয়ে ৬ হাজার কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকত।

॥ মিনিটে তিনজন ॥

আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ প্রচারিত একটি সাম্প্রতিক হিসাবে। গত ডিসেম্বর মাসে পূর্ব রেলপথের বিভিন্ন শাখায় টিকিট ফাঁকি দেওয়া যাত্রী ধরা পড়েছে মোট ১,৫১,৭৭০ জন। যা আর এক হিসাবে বলা যেতে পারে যে, দিনেরাতে প্রতি মিনিটে ধরা পড়েছে তিনজন করে অসৎ যাত্রী। এটা হঠাৎ কোন ঘটনা নয়, প্রতি মাসেই প্রায় এইরকম বিপুল সংখ্যক বিনা টিকিটের যাত্রী ধরা পড়ে। নভেম্বরে তাদের সংখ্যা ছিল ১,৪২,৮২৪, অক্টোবরে ১,৫৯,৭১৪। অথচ এতবড় জাতীয় অপচয় ও অসচ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থাবলম্বনই বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই সেই "অন্যায় সরকারী জুলুমের" বিরুদ্ধে গর্জন করে উঠবে বিপ্লবী তরুণসমাজ, আর তার ফলে গরীব দেশের আরও কিছু জাতীয় সম্পত্তি তছনছ হবে তাদের হাতে!

॥ শত্রুমুক্ত নেফা ॥

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর স্পেশ্যাল অফিসার জানিয়েছেন যে, গত ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে চীনা সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে থাগলা গিরিবর্ত্মসহ সম্পূর্ণ 'নেফা' ত্যাগ করেছে। ঐ এলাকা বর্তমানে ভারতের অসামরিক ব্যবস্থার শাসনাধীন। তিনি আরও বলেন যে, ভারত, চীন ও ভূটানের সংযোগস্থলে অবস্থিত থাগলায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেননি। থাগলার সদর কার্যালয় লুমলায় পুনরায় অসামরিক শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে চীনা সৈন্যরা থাগলায় প্রথম হানা দেয়। তবে লংজু ও থাগলার উত্তরে চীনা সৈন্যদের অপসারণের কোন সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি। এ-সম্বন্ধে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলছেন যে, চীনারা যদি লংজু ও থাগলা গিরিবর্ত্মের উত্তরাংশ ত্যাগ করেও তবে সেখানে আপাতত ভারতীয় দখলদারী কায়েম করা হবে না।

কলম্বো প্রস্তাবের কোন নিষ্পত্তি এখনও পর্যন্ত হয়নি। কারণ কলম্বো প্রস্তাবের উদ্যোক্তা রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে সরকারীভাবে এখনও পর্যন্ত ভারতকে চীনের মনোভাব বা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছু জানানো হয়নি। তবে গত ১৯শে জানুয়ারী চৌ-এন-লাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আলোচনার পূর্বসর্ত-স্বরূপ যা দাবী জানিয়েছেন, এবং সিংহলের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর যে শেষ মনোভাব জানিয়েছেন তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কলম্বো প্রস্তাব অপরিবর্তিত অবস্থায় গ্রহণের কোন ইচ্ছা চীনের নেই। ১৯শে জানুয়ারীর চিঠিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিম সীমান্তে লদাক অঞ্চলের সৈন্যমুক্ত এলাকায় ভারতের কোন অসামরিক শসানব্যবস্থাই থাকতে পারবে না। আর পূর্ব সীমান্তে নেফা অঞ্চলের সৈন্যমুক্ত এলাকায় ভারতের

অসামরিক শাসন থাকলেও ভারতীয় সৈন্য সে অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারবে না। চীনের এই প্রস্তাব কলম্বো সম্মেলনের সিদ্ধান্তের বিরোধী, সুতরাং ভারতের পক্ষে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কলম্বো শক্তিবর্গের অধিকাংশই ইতিমধ্যেই চীনের মনোভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং পরবর্তী কর্ম-পন্থা স্থিরীকরণের উদ্দেশ্যে আবার তাঁরা মিলিত হচ্ছেন। কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও চীনের মনোভাব শ্রীমতী বন্দরনায়েক সরকারীভাবে কলম্বো সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী কায়রো হতে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ, চীন যাতে কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে তার জন্যে চীনকে সমবেতভাবে অনুরোধ জানানোর কথা কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোক্তারা চিন্তা করছেন। একমাত্র বর্মা ছাড়া কলম্বো সম্মেলনের আবার পাঁচটি রাষ্ট্র নাকি এব্যাপারে একমত হয়েছে এবং বর্মা সরকারকেও রাজী করানোর জন্য নাকি এখন চেষ্টা চলছে।

ওদিকে মোশিতে যে আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলন শুরু হয়েছে সেখানেও চীনাদের ব্যাপক প্রচারকার্য সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে বিপুল জনমত প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীচমনলাল যখন তাঁর ভাষণে চীনা আক্রমণের উল্লেখ করেন তখন ৬৫টি দেশ হতে সমবেত ছয়শত প্রতিনিধি তাঁকে বিপুলভাবে সমর্থন জানান। ঐ সম্মেলনেও চীন-ভারত বিরোধের সম্মানজনক নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে বলে আশা করা যায়। সম্মেলনে যদি কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে তা কলম্বো প্রস্তাবের অনুরূপেই হবে বলে মনে হয়। কিন্তু তাতেও চীনের মত ও মতি পরি-বর্তনের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কারণ, বিশ্বের জনমতের কোন মূল্যই আজ তাদের কাছে নেই।

॥ মালাওয়াই ॥

মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের অবাঞ্ছিত বন্ধন হতে নিয়াসা-ল্যান্ডের মুক্তির দিন ঘনিয়ে এসেছে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী ডঃ হেস্টিংস বান্ডা নিয়াসাল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। আপাতত নিয়াসাল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যা তার পূর্ণ রাষ্ট্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে শেষ পদক্ষেপ। স্বাধীনতা অর্জনের পর নিয়াসাল্যান্ডের নাম হবে মালাওয়াই।

প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের পর ডাঃ বান্ডা বলেন, কালো মহাদেশের কালো দেশরূপেই মালাওয়াই শাসিত হবে। অবশ্য শ্বেতসমস্যা সেদেশে সামান্যই আছে। ২৯ লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত নিয়াসাল্যান্ডে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা মাত্র ১০ হাজার ও এশীয়ের সংখ্যা ১৩ হাজার। স্বাধীনতা অর্জনের পরেই নিয়াসাল্যান্ডকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এতদিন পর্যন্ত রোডেসিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার খনি অঞ্চলে সস্তায় শ্রমিক সরবরাহই ছিল তার প্রধান জীবিকা, যা যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবার পর আর হয়ত থাকবে না। এই কারণেই ডাঃ বান্ডা শ্বেতাঙ্গ-শাসিত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পক্ষপাতী হলেও বরাবর কেনিয়া, উগান্ডা, জাঞ্জিবার, উত্তর রোডেসিয়া ও নিয়াসাল্যান্ডের সমন্বয়ে পূর্ব আফ্রিকা ফেডারেশন গঠনের কথা প্রচার করেছেন। কিন্তু সে প্রস্তাব নানা কারণে দূর ভবিষ্যতেও কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। ডঃ বান্ডা আরও বলেছেন, মালাওয়াইর স্বাধীনতা অবিলম্বে অবশিষ্ট পরাধীন আফ্রিকাকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করবে। নিয়াসাল্যান্ডেও পর্তুগীজ উপনিবেশ মোজাম্বিকের সম-সীমান্তের কথা মনে রাখলে এই উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

॥ কানাডায় রাজনৈতিক সংকট ॥

কানাডায় ডিফেনবেকার মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে। মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার সময়েই দুর্বল ছিল। কানাডা সংসদের নিম্ন কক্ষ হাউস অফ কমন্সের ২৬৩ জন সদস্যের মধ্যে ডিফেনবেকারের নেতৃত্বাধীন রক্ষণশীল দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১৫। অপর দক্ষিণপন্থী দল ক্রেডিট পার্টির সহযোগিতায় তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করে ছিলেন। সেই দলের সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হওয়াতেই ডিফেনবেকার মন্ত্রিসভার পতন হ'ল। পারমাণবিক অস্ত্রে কানাডাকে সজ্জিত করার প্রশ্ন নিয়ে মন্ত্রিসভার সমর্থক-দের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তারই ফলে মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়ল। ডিফেন-বেকার মন্ত্রিসভার পতনের পরেই কানাডা সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। এপ্রিল মাসের আট তারিখে কানাডায় আবার সাধারণ নির্বাচন হবে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৩১শে জানুয়ারী—১৭ই মাঘ: জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ—খড়্গপুর টেকনোলজি ইনষ্টিটিউটে ডাঃ এ এন খোসলার (উড়িষ্যার রাজ্যপাল) ভাষণ: স্নাতকগণকে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করার আহ্বান।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ময়ূর ভারতের জাতীয়-পক্ষী হিসাবে মনোনয়ন।

রাজ্যবিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ বিল গৃহীত—অবিলম্বে 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট' গঠনের জন্য পরিষদের দাবী।

লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন কেন্দ্রগুলির পুনরায় সীমানা নির্ধারণ ব্যবস্থা—কেন্দ্র কর্তৃক কমিশন গঠন।

শিলচরে সরস্বতী পূজা নিরঞ্জন উপলক্ষে দুইদলে হাঙ্গামা—প্রায় ৩০ জন হতাহত।

১লা ফেব্রুয়ারী—১৮ই মাঘ: '৯ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৬৩) পর আর গিনি সোনার গহনা বিক্রয় করা যাইবে না; অতঃপর ১৪ ক্যারেট স্বর্ণালঙ্কার তৈয়ারী করিতে হইবে'—কলিকাতায় স্বর্ণ বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীজি বি কোটাকের ঘোষণা। স্বর্ণশিল্পীদের পক্ষ হইতে বিকল্প কর্ম-সংস্থান বা ২০ ক্যারেট স্বর্ণের গহনা প্রস্তুত করার অনুমতি দাবী।

শ্রীনেহরুর সহিত ডাঃ সুবান্দ্রিও'র আর এক দফা বৈঠক—শীঘ্রই চীন-ভারত বিরোধ মিটিবে বলিয়া ইন্দোনেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আশা।

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯শে মাঘ: 'কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের মনোভাব এখন অবধি অপরিবর্তিত আছে—কেন্দ্রীয় (নয়াদিল্লী) পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের উক্তি: বর্তমান অবস্থায় ভারত আলোচনায় সম্মত হইতে পারে না।

শিলচরে হাঙ্গামার বিস্তৃতি—এ যাবৎ বহু লোক গ্রেপ্তার।

৩রা ফেব্রুয়ারী—২০শে মাঘ: বর্তমান সংকটে স্বামীজীর (বিবেকানন্দ) জীবনাদর্শ ও অভীঃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান—বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে দিল্লীতে আয়োজিত সভায় শ্রীনেহরুর ভাষণ।

চীনাগণ থাগলা গিরিপৃষ্ঠ সমেত নেফা হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত।

শিলচরের গ্রামাঞ্চলে হাঙ্গামা প্রসারিত—স্থানে স্থানে গৃহে অগ্নি-সংযোগ ও লুঠ-তরাজের সংবাদ।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২১শে মাঘ: গৃহ-নির্মাণ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (ছয় কোটি টাকা) হ্রাস—বোম্বাই রাজ্য গৃহ-নির্মাণ মন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ মন্ত্রী শ্রীমেহরচাঁদ খান্নার ঘোষণা।

'বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজের ফলাফল শোচনীয় ও হতাশাব্যঞ্জক'—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারীর মন্তব্য।

৫ই ফেব্রুয়ারী—২২শে মাঘ: কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের কলিকাতা উপস্থিতি ও সম্বর্ধনা লাভ।

দুই মাসের জন্য আসামে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ—শিলচর দাঙ্গার বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করায় রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ।

পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে বসন্তের প্রকোপ বৃদ্ধি—টীকা গ্রহণের ব্যাপক ব্যবস্থাকল্পে সরকারী নির্দেশ।

শিলচরের ঘটনাবলীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৩শে মাঘ: প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের কলিকাতা আগমন ও বিপুল সম্বর্ধনা।

'কলিকাতায় মহামারী রোধকল্পে জরুরী ক্ষমতা প্রয়োজন'—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের নিকট মেয়রের (শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার) পত্র—অবিলম্বে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে অনুরোধ।

॥ বাইরে ॥

৩১শে জানুয়ারী—১৭ই মাঘ: বৃটিশ পার্লামেন্টে মিঃ ম্যাকমিলানের (প্রধানমন্ত্রী) ঘোষণা: সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্সকে এককভাবে পারমাণবিক শক্তির অধিকার দেওয়া চলে না।

'সাধারণ বাজারের (ইউরোপীয়) আলোচনায় (ব্রুসেলস) ফ্রান্স বৃটেনকে প্রতারিত করিয়াছে'—বৃটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লর্ড হোমের খেদোক্তি।

১লা ফেব্রুয়ারী—১৮ই মাঘ: আংকারার উপর দুইটি বিমানের মধ্যে সংঘর্ষ—দুর্ঘটনায় অন্ততঃ ৮০ জন নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত।

দক্ষিণ ইউরোপে প্রচণ্ড হিমঝঞ্ঝায় ৪৪২ জনের মৃত্যু।

২রা ফেব্রুয়ারী—১৯শে মাঘ: হল্যাণ্ড কর্তৃক ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের বৈঠক (মার্চ মাসের) বর্জনের সিদ্ধান্ত—বৃটেনের বাজারে যোগদানে ফ্রান্সের বিরোধিতার জের।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থায় ('নাটো') ফাটল ধরায় মিঃ কেনেডির (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) দুঃখপ্রকাশ।

৩রা ফেব্রুয়ারী—২০শে মাঘ: বিশ্ব-শান্তি বাহিনী কর্তৃক দিল্লী-পিকিং মৈত্রী অভিযানের ব্যবস্থা—১লা মার্চ (১৯৬৩) অভিযান শুরু। (লণ্ডনের সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ)।

সিঙ্গাপুরে ক মু্য নি ষ্ট-বিরোধী ব্যাপক অভিযান—এ যাবৎ ১০৭ জন গ্রেপ্তার—যে কোন পরিস্থিতির জন্য বৃটিশ বাহিনী প্রস্তুত।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—২১শে মাঘ: জেনেভায় অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নে ৮৭ জাতি সম্মেলন আরম্ভ—মিঃ কেনেডি (আমেরিকা), মিঃ ক্রুশ্চেভ (রাশিয়া) ও মিঃ ম্যাকমিলানের (বৃটেন) পূর্ণ সমর্থন।

টাঙ্গানাইকার মোশিতে তৃতীয় আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলন আরম্ভ—টাংগানাইকা প্রেসিডেন্ট মিঃ জুলিয়াস নাইয়েরি কর্তৃক উদ্বোধন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—২২শে মাঘ: 'শক্তিজোটে যোগ দিয়া ভারত আপন কার্যের স্বাধীনতা বিসর্জন দিবে না: অস্ত্রসাহায্য লইলেও নিরপেক্ষতা নীতি অটুট থাকিবে'—শ্রীনেহরুর ঘোষণা। (মার্কিন সাংবাদিকের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি সিকানোতে প্রকাশ)।

পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর কানাডার ডিফেনবেকার মন্ত্রিসভার (রক্ষণশীল) পতন।

৬ই ফেব্রুয়ারী—২৩শে মাঘ: 'পশ্চিম জার্মানীর পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জা বিপজ্জনক'—ফ্রান্সের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সতর্কবাণী।

দক্ষিণ কোরিয়ায় নৌ-দুর্ঘটনায় শতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি।

অভয়ংকর

॥ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ॥

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' নামক গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে "ভাষাচার্য" বলেছেন, সুনীতিকুমারের জীবনের সেই উপাধিটাই সবশ্রেষ্ঠ মনে করি, বোধকরি স্বয়ং সুনীতিকুমারও তাই মনে করে থাকেন। আমাদের কাছে সুনীতিকুমার অধ্যাপক, সাহিত্যিক, ব্রাহ্মণ, শিল্পরসিক, পণ্ডিত, কলাবিৎ, ভোজনরসিক ইত্যাদি নানা পরিচয়ে পরিচিত। এই যুগের বাংলা বিরল-প্রতিভার বাংলা, তাই এখনও যে দুএকজন মনীষী আমাদের মধ্যে আছেন তাঁরা আমাদের কাছে বিস্ময় ও গর্বের বস্তু।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র একবার সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের সঙ্গে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আলোচনা করছিলেন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র লিখেছেন—"হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কি একটা আলোচনা করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলেন—"হাঁ। হাঁ! আমার ইউনিভার্সিটি থেকে থার্ড ডিভিসনে পাশ করে যেমন ছেলেরা বেরোয়, তেমনি আবার সুনীতি চাটুয্যেদের মত বেরিয়ে আসে—সেটা বলছ না কেন? আমি চাই বাংলাদেশে গ্রাজুয়েট পানওলারাও থাকবে আবার সুনীতি-টুনীতির মত ছেলেরাও দেশের মুখোজ্জ্বল করবে।"

স্যার আশুতোষের বাসনা পূর্ণ হয়েছে, সুনীতিকুমার বাংলাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন নানা দিক দিয়ে। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের কাছে বিস্ময়। নিরহঙ্কার, নিরলস, নিরভিমান এই মানুষটি মনে প্রাণে বাঙালী হলেও তিনি বিশ্বজগতের মানুষ। তাই প্রায় সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে স্বদেশের জন্য রত্ন আহরণ করে আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত। তিনি তাই লিখেছেন ঃ..."আমাদের আদর্শ হওয়া চাই এক মৌলিক বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী অনুসারে, বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য, ভাষা প্রভৃতির বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করে বহুরূপ হয়ে যা বিরাজ করবে আর পৃথিবীর তাবৎ মানবজাতির বা মানব সমাজকে তাদের সহজ সাধারণ মানবিকতার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত করে এক করে তুলবে।"......

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর রাস পূর্ণিমার দিনে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেই সময় শিবপুরে সুনীতিকুমারের জন্ম হয়। মধ্যবিত্ত

ঘরের ছেলে, পিতা হরিদাসবাবু সামান্য বেতনে প্রায় চল্লিশ বছর সদাগরী অফিসে কাজ করেছিলেন। শীলস ফ্রী স্কুলে বিনা বেতনে পড়াশোনা করে ১৯০৭-এ তিনি এনট্রান্স পাশ করেন। প্রথম দশজনের মধ্যে ষষ্ঠস্থান অধিকার করেছিলেন। ইংরাজী অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বি, এ পাশ করেন, এম, এ-তেও প্রথম। সুতরাং স্নেহভরে তাঁর নাম উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করার যথেষ্ট হেতু ছিল স্যর আশুতোষের। ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ১৯১৯-এ লণ্ডন যান, ১৯২১-এ ডি, লিট্ উপাধি পান। ১৯২১-২২-এ প্যারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস, জার্মাণী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে স্বদেশে ফেরেন। তারপর সেই কাল থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। ১৯২৭-এ তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দূর প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন, তার বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্বীপময় ভারতে'। এরপর তাঁকে বারবার বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে বিভিন্ন সভা ও সম্মেলনের আমন্ত্রণে। ভারতীয় সংবিধানের সংস্কৃত অনুবাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজেও সুনীতিকুমার ১৯৫১-খৃষ্টাব্দে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২-থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যবিধান পরিষদের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস।

কিন্তু—উত্তম ছাত্র এবং উত্তম অধ্যাপক হিসাবে নয়। উত্তম মানুষ হিসাবে সুনীতিকুমার সর্বজনমান্য, সকলের চিত্ত জয় করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"শ্রদ্ধেয় আচার্য সুনীতিকুমার জীবনে পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, বুদ্ধির বলে শ্রদ্ধা সম্মান, প্রণাম, তত্ত্ব, তথ্য অনেকই পেয়েছেন, তার উপর একটি আশ্চর্য প্রাপ্তি তাঁর হয়েছে, সেটি এই, জগৎ ও জীবনের মধ্যে সকল তত্ত্ব ও তথ্যের বাইরে বা উর্ধ্বলোকে একটি আনন্দময়তার পরিবেশ আছে, সেই পরিবেশের বাতাস থেকে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছেন—তার আলোক থেকে একটি প্রসন্ন প্রশান্ত দৃষ্টি পেয়েছেন, যাতে অবগাহন করে তার পুণ্যফল বাঙালী জীবনকে দিয়ে গেলেন।"

সুনীতিকুমারের জীবনের যে আনন্দময় পরিবেশ, যে প্রশান্তি সে তাঁর নিজস্ব, অনেক পাণ্ডিত্য, অনেক শিক্ষার ফল। তত্ত্ব ও তথ্যের বাইরে যে জগৎ সে জগৎ থেকে তিনি নির্বাসন গ্রহণ করেননি, তাই পেয়েছেন অপূর্ব প্রসন্নতা।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন—"আমরা বলতুম যে, সুনীতির কানে ধরা পড়েনা এমন শব্দ নেই।—এখন দেখছি, তোমার চোখে ধরা পড়েনা এমন জিনিষও কম আছে। আমাদের অধিকাংশ লোক চোখ বুজে দেশভ্রমণ করে।"

এমনকি বিধান পরিষদে মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে উঠে যখন বক্তারা অসংখ্য বিদেশী ভাষা উচ্চারণ করেন সুনীতিকুমার তা স্মরণে রাখেন ও পরে তা নিয়ে রসিকতা করে বলেন 'আমি মাষ্টার মানুষ, মনে মনে নোট নেই।' সুনীতিকুমার শুধু মাষ্টার নন, তিনি ছাত্র। যেখানে যা পেয়েছেন তা গ্রহণ করেছেন বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, আবার তা অকুণ্ঠচিত্তে দান করেছেন বিশ্বজনের কল্যাণে। এই ধারা ভারতীয়

ঐতিহ্যাশ্রয়ী। 'দ্বীপময় ভারতে'র চিঠি-গুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে বলেছিলেন—"সুনীতির নিরন্ধ্র চিঠি-গুলি তোমরা যথাসময়ে পড়বে, দেখবে এ-গুলি বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম, বর্ণনা-সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোট বড় কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত, লিপি বনস্পতি, কিংবা লিপি-সার্বভৌম, কিংবা লিপি চক্রবর্তী।"

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথনাথ দুজনেই প্রায় এক ধরনের কথা বলেছেন। সুনীতিকুমার তাঁর সকল অভিজ্ঞতা এখনও লিখে উঠতে পারেননি, যেদিন তা প্রকাশিত হবে নিঃসন্দেহে তা এক অপূর্ব সাহিত্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

নানা কর্মের মধ্যেও সুনীতিকুমার 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য', 'ইওরোপ' 'চরিত্র সংগ্রহ', বৈদেশিকা', 'ভারত-সংস্কৃতি', 'পথ-চলতি', 'সাংস্কৃতিকা' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন বাংলা ভাষায়, গবেষণা-পুস্তকাবলী বা রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত "Languages and Litaratures of modern India" তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ, এ-ছাড়া আর একটি বিশিষ্ট রচনার নাম 'Africanism'। এদেশে আফ্রিকা সম্পর্কীয় জ্ঞান অনেক কম, সুনীতি-কুমারের এই গ্রন্থটি বহুবিধ তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ।

এ সব ছাড়িয়ে সুনীতিকুমারের আর এক পরিচয় আছে। এই প্রবন্ধের এক জায়গার তার ব্রাহ্মণত্বের উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে সামান্য কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সুনীতিকুমার যে ব্রাহ্মণ তার পরিচয় তাঁর আদর্শ নিষ্ঠা।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৪ অনুচ্ছেদ মতে যে সরকারী কমিশন বসে সুনীতিকুমার তার সদস্য ছিলেন। সেই কমিশনের সদস্য হিসাবে সুনীতিকুমার ও ডঃ সুব্বরায়ণ দুজনে সকল সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে না পেরে তাঁদের বিরুদ্ধ মত পেশ করেন। সুনীতিকুমার তাঁর মতানৈক্য সম্পর্কিত মন্তব্যটির নাম দিয়েছেন 'Minority Report'।

প্রকাশ্যভাবে হিন্দীর বিপক্ষে যে কথা তিনি বলেছেন তা তাঁর স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁর ভাষা সংক্রান্ত চিন্তা বিশেষভাবে সংস্কার-মুক্ত ও বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সাহসিক। নাগরী লিপির বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন—

"এ পরিকল্পনায়, কল্পনার অভাব সূচিত করেছে। একে বলা চলে যারা জন্মাবধি নাগরীর সঙ্গে পরিচিত নয়, সেই সব হতভাগ্যদের প্রতি স্থূল নিষ্ঠুরতা প্রকাশ।" তাঁর মতে ভারতীয় ভাষার জন্য রোমক লিপির বিস্তার ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতি। ভারতীয় কোনও লিপি এই ভাবে পরিপূর্ণ নয়।

সংস্কৃত সম্পর্কে সুনীতিকুমারের সুগভীর অনুরাগ সর্বজনবিদিত। তিনি বলেন—"সংস্কৃত ভাষার জগৎ ও পরিবেশ থেকে যে ভারতীয় বিচ্যুত সে ব্যক্তি ভারতীয়রূপে জীবনের যে সব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া দরকার, তা থেকে ভ্রষ্ট হয়।"

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারকে প্রজাতন্ত্র দিবসে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে সম্বর্ধিত করা হয়েছে। সুনীতিকুমার দেশবাসীর কাছে সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ পেয়েছেন অজস্র। আজ তাঁর এই নবতম সম্মানে আমরা আনন্দিত।

বহুভাষী ভট্টারক, প্রিয়দর্শী সুনীতিকুমার দীর্ঘজীবী হোন, তাঁর কীর্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

নতুন বই

আধুনিক শারীর শিক্ষা পদ্ধতি— (মেয়েদের জন্য)— অমিতাভা মৈত্র প্রণীত। প্রকাশক—বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—৬। দাম ২-৫০

শ্রীমতী অমিতাভা মৈত্র মহিলা শিক্ষাব্রতীদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রসম্মত শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কিত এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। শারীরিক শিক্ষার তত্ত্ব, তথ্য ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে লেখিকার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই ধরণের গ্রন্থের সংখ্যা কম, সেই হিসাবে গ্রন্থটি প্রয়োজনীয়। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

দেশবিদেশের শিক্ষা— (শিক্ষাব্রতীদের জন্য)—জ্ঞানান্বেষী প্রণীত। প্রকাশক—দাশগুপ্ত এন্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ—কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

শ্রীজ্ঞানান্বেষী চমৎকার ভাষায় সরল ভঙ্গীতে বিভিন্ন দেশের ছাত্র ও শিক্ষকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রীস, ইতালী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স সিরিয়া, হল্যান্ড, ব্রিটেন, পেরু, নিকারগুয়া, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি বিশেষ কৌতূহলজনক। জ্ঞানান্বেষীর গ্রন্থ সকল জ্ঞানান্বেষীর পক্ষেই অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ। ছাপা, আকার ইত্যাদি অনুপাতে দাম অবশ্য কিঞ্চিৎ অধিক মনে হয়।

লোক-সাহিত্যের ত্রিধারা— (প্রবন্ধ) যোগীলাল হালদার প্রণীত। পরিবেশক—ঘোষ এন্ড কোং, ১২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট—কলিকাতা-৯। দাম—৩-৫০ নঃ পঃ।

এই গ্রন্থে লেখক রামেশ্বরের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণের সমালোচনা করেছেন। লেখকের এই গ্রন্থটিতে বাংলা ভাষার তিনখানি মহাগ্রন্থের আলোচনা থাকায় গ্রন্থটি বিশেষ আকর্ষণীয়। এই জাতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। লেখক অতিশয় সরলভাবে যে আলোচনা করেছেন তা কিন্তু নিতান্ত প্রাথমিক ধরণের, বিষয়ের গুরুত্ব অনুপাতে আলোচনা বিশদ এবং বিশ্লেষক নয়। স্থানে স্থানে অনেক উল্লেখ আছে যার সমর্থনে কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়নি। যেমন মুকুন্দরামের জন্মকাল সম্পর্কে তিনি ৯১ পৃষ্ঠায় দীনেশচন্দ্র সেন ও হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের অনুমান উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোন গ্রন্থে সেই কথা আছে তা বলেন নি। ৮৩ পৃষ্ঠায় প্রথম ধারার সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাদির বিবরণ আছে, দ্বিতীয় ধারায় সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থের উল্লেখ নেই। এ ছাড়া অজস্র ছাপা এবং বানানভুল চোখে লাগে। গ্রন্থটি অন্যদিক থেকে প্রশংসনীয়। সংক্ষেপে এমন সুন্দরভাবে এই আলোচনা করা সম্ভব হত না।

অলংকার-জিজ্ঞাসা— (প্রবন্ধ)—শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রণীত। সুপ্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—৬। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থটিতে বিশিষ্ট লেখক অলংকারের প্রয়োগ, অলংকার সৃষ্টির সম্ভাবনা, শব্দালংকার ও তার প্রকার

ভেদ, অনুপ্রাস, শব্দ-সাম্য এবং শব্দ সাদৃশ্য, ক্রমসাদৃশ্য প্রভৃতি, অর্থালংকার ও তার শ্রেণীভেদ, উৎপ্রেক্ষা, বাচ্য ও প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতি-শয়োক্তি, প্রতিবস্তূপমা, বিরোধমূলে অলংকার, ন্যায়মূলে অলংকার, গৌণ অলংকার ইত্যাদি অলঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে সহজ ভংগীতে আলোচনা করেছেন। অলংকার সম্পর্কিত প্রশ্নের অনেক উত্তর এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। পরিশিষ্ট অংশে উধৃতি-সংখ্যা নির্দেশিকা এবং বিশিষ্ট ইংরাজী অলংকারের বাংলা উদাহরণ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মূল্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লেখক স্বয়ং একজন খ্যাতিমান কবি, তাই এই গ্রন্থে নবীন ও প্রবীণ বহু বংগদেশীয় কবির কবিতার উদাহরণ উধৃত করে তিনি সংস্কার মুক্ত সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের রস-লোকে অতি সহজে প্রবেশের সুবিধা করে দিয়েছেন লেখক, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ— (প্রবন্ধ) —সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা—৬। দাম সাড়ে চার টাকা।

হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে এই আলোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে মূলতঃ প্রবন্ধ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রচনা-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ও গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। তিনি গদ্যের ব্যাকরণগত আকৃতি ও প্রকৃতি, সংজ্ঞা ও প্রকরণ, শৈলী ও শিল্পী, ছন্দ ও শৈলী বিষয়ে এই প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যে এবং প্রতিপাদ্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ছাত্রদের পক্ষে গ্রন্থটি যথেষ্ট উপযোগী।

বন্ধনহীন গ্রন্থি— (উপন্যাস)—সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—পুঁথিঘর। ২২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা মাত্র।

আসামের এক বাঙালী অধ্যুষিত রেল কলোনীর পট-ভূমিকায় রচিত কাহিনী। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি বলে মনে হয়। এ অঞ্চলের সবচেয়ে জোয়ান আর সব চেয়ে কীর্তিমান নেপাল, সে কারো বিপদে স্থির থাকে না। সেই নেপালের জীবনের বিচিত্র কথা এই উপন্যাসে বিধৃত। শেষ পর্যায় আসামের বাঙালী বিতাড়নী দাঙ্গার পরিবেশে এর মিলনান্তক পরিসমাপ্তি। নূতন লেখকের প্রথম উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থটি প্রশংসার দাবী রাখে। ভাষা সুন্দর ও সংযত। প্রচ্ছদ মনোরম।

নানারঙ— (গল্প)—ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। প্রকাশক—এডুকেশনয়াল এন্টার প্রাইজার্স। ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম আড়াই টাকা।

ডাঃ বিশ্বনাথ রায় তরুণ লেখক, এবং অল্পকাল মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। 'নানা রঙ' গল্প গ্রন্থটিতে তিনি চিকিৎসক হিসাবে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা সরস ভংগীতে কাহিনীর আঙ্গিকে লিপিবন্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত : 'শৈশব', 'যৌবন' ও 'শেষ জীবন'। শৈশব বিভাগের গল্পে শিশু সন্তান পালনে জননীর দায়িত্ব, 'যৌবনে'র রোমান্টিক আবেগে জীবনের জলপ্রপাতের গল্প লিখেছেন—তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে এতটুকু অনাচার ঘটলে ব্যাধি দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারে, তেমনই 'শেষ জীবনে' সতর্কতা প্রয়োজন সামান্য কারণেই দেহে ব্যাধির আবির্ভাব হয়। বলাবাহুল্য গল্পগুলি শিক্ষামূলক। লেখক স্বয়ং সাহিত্যিক এবং চিকিৎসক, তাই তাঁর কাহিনীগুলি রসোত্তীর্ণ এবং শিল্প সম্মত হয়েছে। নবীন ভারতে এই জাতীয় গল্পের প্রয়োজন অনেক বেশী তাই ডাঃ বিশ্বনাথ রায়কে অভিনন্দন জানাই। ছাপা এবং বাঁধাই সুন্দর।

সুভাষচন্দ্র— (জীবনী)—দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল। মণিকোঠা। ১২, অনাথ দেব লেন। কলকাতা-৬। দাম দু'টাকা।

ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম সংগ্রামী নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-সম্পর্কিত সুনিপুণ আলেখ্য। বাঙলা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থ ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। সুভাষচন্দ্রের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা আজকের নতুন ভারতের নাগরিকদের জানবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বর্তমান গ্রন্থখানি সেই প্রয়োজন মেটাবে বলে মনে হয়।

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

দুই বাড়ী : (বাংলা) চিত্রালয়-এর নিবেদন; ১১,৯৯৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা বিষ্ণু সরকার ও অনিল দত্ত; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অসীম পাল; কাহিনী ও সংলাপ—শৈলেশ দে; সঙ্গীত পরিচালনা : কালিপদ সেন; গীত-রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ : কানাই দে ও মনীষ দাশগুপ্ত; শব্দানুলেখন : সুনীল ঘোষ; বহির্দৃশ্য শব্দানুলেখন : অবনী চট্টোপাধ্যায়; শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও প্রতুল রায়চৌধুরী; শিল্পনির্দেশনা : গৌর পোদ্দার; রূপায়ণ : জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, জীবেন বসু, 'তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মণ, গীতা দে, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, বলীন সোম প্রভৃতি। আলোকচিত্র: বিলিজ হিসাবে ন্যাশনাল মুভীজ প্রাঃ লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে রাধা, প্রাচী, পূর্ণ ও অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

সাধারণ দর্শকের জন্যে লেখা সাধারণ ঘরোয়া গল্প হচ্ছে এই "দুই বাড়ী"। কোনো রকমে উন্নাসিক নয়, তথাকথিত প্রগতিমূলক নয়, 'ইজম্'-এর ভারে নুয়ে পড়া নয়! সোজাসুজি গল্প, যা দেখতে দেখতে মানুষ হাসবে, কাঁদবে এবং যা দেখে যে-কোনো মানুষের মোটের ওপর ভালোই লাগবে। গল্পের শিক্ষণীয় কিছু আছে কি? নিশ্চয়ই আছে; তবে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে শিক্ষা দেব বলে শিক্ষা দেওয়া নয়। গল্পের ফলশ্রুতি হিসেবে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা; ছবি দেখবার পর ছবির গল্প সম্বন্ধে ভাবলে যে শিক্ষার কথা মনে হয়, সেই শিক্ষা আছে এই "দুই বাড়ী" ছবিতে।

সুন্দর আরম্ভ ছবিটির। প্রথম ঘটনাটি একেবারে ছবির গল্পের মধ্যে এনে হাজির করে দর্শকদের। তিন পুরুষ ধরে যারা এক পাঁচিলে বসবাস করছে এবং সুখেদুঃখে হাসিকান্নায়, ভালোবেসে ঝগড়া করে কাটিয়েছে, সেই 'ভট্টাচার্য' ও 'চক্রবর্তী'-দের বাড়ীর বর্তমান পুরুষের দুই কর্তা—মহাদেব ও কালিদাস বাজারে একটা মাছ কেনার ব্যাপার নিয়ে বচসা শুরু করল এবং ক্রমে এমন ঝগড়া পাকিয়ে তুলল যে, সেই ঝগড়া আদালত পর্যন্ত গিয়ে হাজির হল। তবে মামলা করবার এক্তিয়ার দেখা গেল মহাদেবেরই; কারণ কালিদাস ধন্বন্তরী কবিরাজ হয়েও বিশেষ কিছু উপার্জন করতে পারে না এবং জ্যোতিষ-শিরোমণি হয়ে মহাদেব করেছে টাকার আণ্ডিল। সেই টাকার জোরেই কালিদাস দর-করা মাছ সে এক কথায় কিনে নেয় এবং সেই টাকার

'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রের একটি দৃশ্যে মিহির ভট্টাচার্য ও সুনীল দাশগুপ্ত

জোরেই কথায় কথায় সে তার ছোট ভাইয়ের তুল্য কালিদাসের নামে মামলা রুজু করে। অথচ ঐ কালিদাসের একমাত্র ছেলে শংকরকে সে নিজের খরচায় কলকাতায় ডাক্তারী পড়াচ্ছে এবং ঐ কালিদাসই আবার মহাদেবের একমাত্র মেয়ে দীপুকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। দুজনের ভালোবাসার কথা গাঁয়ের লোক ত' জানেই, পুলিশ-অফিসার, এমন কি ফৌজদারী আদালতের হাকিম পর্যন্ত জানেন। তাই তিনি প্রতিবারই দু'পক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মামলা খারিজ করে দেন। নীলমণি উকিল আর ভৈরব আচার্যের কারসাজি ও ফান্দকে ভেস্তে দিয়ে। কিন্তু শংকরের এম-বি, বি-এস; গোল্ড মেডালিস্ট হয়ে পাশ করার দরুণ মহাদেব দু'বাড়ীর মধ্যে যে-ভুরিভোজের আয়োজন করেন, একসঙ্গে খেতে খেতে তাতেই বাধল গোল এবং সেই কলহ এমনই উত্তাল হয়ে উঠল যে, দু'বাড়ীর মাঝের ভাঙা পাঁচিলটা বেশ উঁচু করে গাঁথা হয়ে গেল এবং এবার কালিদাসের নামে মহাদেব যে-টাকা ধারের মামলা রুজু করল, সেটিকে আর হাকিম খারিজ করতে পারলেন না। মোকদ্দমায় কালিদাসের হার হ'ল, কেননা কালিদাস নিজের মুখে ঋণ কবুল করল হাকিমের সামনে। ফলে কালিদাস বাড়ী বিক্রি করে টাকা পরিশোধ করবার উপায় খুঁজতে লাগল। এদিকে মহাদেব হঠাৎ হয়ে পড়ল ভীষণ অসুস্থ। কালিদাসের মন চায় ছুটে গিয়ে মহাদেবের অসুখ সারিয়ে দিতে তার কবিরাজী ওষুধ প্রয়োগ করে; কিন্তু তার পরিবর্তে সে ঠাকুরের সামনে মাথা খোঁড়ে মহাদেবদাদাকে সারিয়ে দেবার জন্যে। এমন কি যে শংকর মহাদেবের চোখের মণি, সেও তার ডাক্তারী বিদ্যের পরীক্ষা করতে পারছে না মহাদেব জ্যাঠার অসুখে এবং শেষে নাচার হয়ে বন্ধুকে পাঠিয়ে দেয় ইনজেকশান দিতে। অবস্থা যখন চরমে উঠেছে, কালিদাস-বাড়ী বিক্রির অঙ্গীকারপত্রে সই দিয়ে টাকা আগাম নিতে যাবে, তখন তিন পুরুষের সম্পর্ক শেষ হবার আশঙ্কায় অকুস্থলে দেখা দিলেন সদ্য রোগমুক্ত মহাদেব এবং সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হয়ে গেল দুই দাদা-ভাইয়ের চোখের জলের মধ্যে শংকর-দীপুর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সূচনায়। আশা করেছিলুম, গল্পটি প্রথমার্ধে যেমন হাসিকৌতুকে ভরা, শেষার্ধে ও মাঝটা কিছু ব্যথা-বেদনা প্রকাশের পর শেষ পর্যন্ত হাসি-কৌতুক দিয়েই শেষ হবে। এবং সেইটেই হ'ত এই কাহিনীর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয়নি। শেষের দিকে কাহিনীটি হঠাৎ ভারাক্রান্ত গুরুগম্ভীর ও বিষাদপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং প্রায় একেবারে শেষ পর্যন্ত সেই খাতেই

অসীম পাল পরিচালিত "দুই বাড়ী" চিত্রে তন্দ্রা বর্মণ

চলতে থাকে। ফলে শেষাংশ কিছুটা একঘেয়ে বলে বোধ হয়।

কথায় আছে, পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে। 'দুই বাড়ী'র অভিনয়াংশে তাই দেখতে পাওয়া গেল। মহাদেব ও কালিদাস রূপী পাহাড়ী সান্যাল ও জহর গাঙ্গুলীর জুটি তাঁদের অভিনয়ের সুযোগের এমন চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করেছেন যে, তাঁদের পাশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় বেশ নিষ্প্রভ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। জহর রায় অবশ্য তাঁর বহুরূপী-বাচন ও চলনভঙ্গী দিয়ে দর্শক-দৃষ্টিকে তাঁর ওপর নিবদ্ধ রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পাহাড়ী-জহর গাঙ্গুলীর দিক থেকে দর্শকরা চোখ ফেরাবার অবকাশ পাননি কোথাও, বিশেষ করে গোড়ার হাল্কা অংশে। যেখানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায়কে সাউন্ড এফেক্ট সমেত পেটের ধাক্কায় পরাস্ত করেন, সেইটেই হচ্ছে ভানু ও জহর রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মরণীয় দৃশ্য। দুই কর্তার স্ত্রীর ভূমিকায় গীতা দে ও রেণুকা রায় তাঁদের গৃহীত চরিত্র দুটির দাবি পরিপূর্ণভাবে মিটিয়েছেন। শঙ্কর এবং দীপুর রোমান্টিক চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও তন্দ্রা বর্মণের নদীর ধারে বা পুকুর ঘাটে হাত ধরাধরি করে বসে থাকা, বেড়ানো এবং হেমন্ত-সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের সঙ্গে ঠোঁট মিলোনো ছাড়া পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা জানাবার অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যবস্থা নেই ছবিটিতে; বরং যেখানে তাঁরা জেঠা ও কাকার সান্নিধ্যে, সেখানে তাঁরা ঢের বেশী সহজ। ছবির অপরাপর ভূমিকায় উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন জীবেন বসু (পুলিশ অফিসার), অনুপকুমার (শঙ্করের বন্ধু বাদল), মিতা চট্টোপাধ্যায় (দীপুর বান্ধবী সরযূ), শৈলেন মুখোপাধ্যায় (হাকিম) এবং বলীন সোম (উকিল)।

ছবিতে গান আছে ছ'খানি এবং এর মধ্যে দু'খানিতে সুর যোজনা করেছেন অমল মুখোপাধ্যায় ও নীতা সেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বহু বাংলা ছবিতেই গান লেখেন এবং তাঁর রচিত বহু গান জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে। কিন্তু আলোচ্য ছবিতে তাঁর রচনা অনেক স্থানেই দুর্বল ও কণ্টকিত এবং সহজ সুরের ধারা বেয়ে গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে ওঠেনি। আবহ-সঙ্গীতে বাঁশি ও বেহালার প্রাধান্য ও নিরলসতা কানে লেগেছে। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ মোটামুটি ভাল।

পাহাড়ী-জহর গাঙ্গুলী অভিনয়-সমৃদ্ধ "দুই বাড়ী"-তে জনচিত্ত হরণের বহু উপাদান আছে।

এল সিড (ইংরাজী) : ৫৪৬২ মিটার দীর্ঘ এবং ১৭ রীলে সম্পূর্ণ এই বিরাট ছবিটি ৭০ মিলিমিটার সুপার টেকনিরামা ও টেকনিকলারে তোলা। তার ওপর ৬-ট্র্যাক স্টিরিয়োফোনিক সাউন্ড সমৃদ্ধ হয়ে দর্শকের চোখ ও কানকে ছবিটি প্রতি মুহূর্তে সচকিত করে। একাদশ শতাব্দীর স্পেনে রড্রিগো ডায়াজ্ দা বিভার নামে যে অসমসাহসী যোদ্ধা তার দেশের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসার জন্যে এল-সিড আখ্যায় ভূষিত হয়ে হাজার বছর ধরে বহু কবির গাঁথা ও কাব্যে কীর্তিত হয়ে আসছেন, তাঁরই জীবননাট্যটি আলোচ্য চিত্রে অপরূপভাবে বিধৃত হয়েছে। নিজের প্রেমিকা, ক্যাপ্টেনের সিমেনের পিতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করায় এল সিড সিমেনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু এল-সিড এই বিরূপমনা নারীকেই স্ত্রী-রূপে বরণ করেছিল এই আশায় যে একদিন সে এই নারীর মনকে আবার জয় করতে পারবে। একদিকে নিজের শৌর্যের দ্বারা সেই ভালোবাসাকে পুনরুদ্ধার করা এবং অন্যদিকে নিজের জন্মভূমি স্পেনের মর্যাদাকে কোনোক্রমেই শত্রুর কাছে বিনষ্ট হতে না দেওয়ার দুরূহ তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছিল এল সিড। শেষ পর্যন্ত সে তার শৌর্যবীর্য ও চরিত্রবলে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল এবং দেশের প্রতি নিজের মমত্ব ও ভালোবাসার উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ নিজের মৃতপ্রায় দেহকে মমতাময়ী স্ত্রীর সাহায্যে অশ্বারূঢ় করে যুদ্ধযাত্রায় নেতৃত্ব করতে বেরিয়েছিল স্পেনরাজের পাশে থেকে।

স্যামুয়েল ব্রনস্টন প্রযোজিত এই দ্রুত ঘটনাবহুল চিত্রটি তোলা হয়েছে স্পেনে। যে-ভূভাগে এল সিড একদা তাঁর শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন যে-দুর্গগুলি এল সিডের কীর্তিকাহিনীর অকুস্থল, সেইসব স্থান এই চিত্রটির বহুলাংশ জুড়ে রয়েছে। অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধা এই চিত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। এবং শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন "বেন হার"-খ্যাত চার্লটন হেস্টন এবং মধুময়ী সোফিয়া লোরেন। প্রণয়সমৃদ্ধ নাটক ও দ্রুত-প্রবাহী ঘটনার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে এই ছবিখানিতে। এবং তা হবে নাই-বা কেন, যখন অ্যান্থনি

আসলী
নকলী

'এল সিড' চিত্রে চার্লটন হেসটন ও সোফিয়া লোরেন

ম্যান-এর মত একজন বিশিষ্ট পরিচালক এর সৃষ্টির মূলে রয়েছেন।

গেল বুধবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮-৪৫ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মহামান্যা পদ্মজা নাইডুর উপস্থিতিতে কলম্বিয়া পিকচার্স পরিবেশিত এই ছবিখানির সর্বভারতীয় উদ্বোধন সম্পন্ন হয়।

হুসার ব্যালাড (সোভিয়েত) : গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার "সোভিয়েত দেশ" অফিসের প্রাঙ্গণে রুশিয়ার বিরুদ্ধে নেপোলিয়'র যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত এই রঙ্গীন কমেডি চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। যখন ফ্রান্সের দুর্ধর্ষ অধীশ্বর ১৮১২ সালে রুশিয়া আক্রমণ করেন, তখন তাঁকে প্রতিহত করবার জন্যে শুধু যে রুশ সৈন্যরাই জীবনপণ করেছিল, তা নয়; রুশীয় কৃষকরাও ও জনসাধারণও দেশরক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং নিজেরা দেশরক্ষা বাহিনী, গেরিলা বাহিনী এবং লঘুভার অশ্বারোহী বাহিনী (হুসার) সৃষ্টি করেছিল। নাডেজ্‌ডা ডুরোভা নামে একটি সপ্তদশী তরুণী শৈশব থেকে পুরুষের মত বীরত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেমন করে পুরুষের বেশে হুসার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল এবং কি অসম্ভব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল, অত্যন্ত উপভোগ্য লঘুভঙ্গীতে তারই উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে এই ছবিখানিতে। এতে যেসব বিচিত্র সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলি দর্শকের চোখকে অনায়াসেই খুশী করে।

এলজার রিয়াজানভ পরিচালিত এই ছবিখানিতে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন গোলুবকিনা। এ ছবিতে এই তাঁর প্রথম অভিনয়; কিন্তু এমনই অবলীলাক্রমে তিনি তাঁর ভূমিকাটিকে রূপায়িত করেছেন যে, মনে হয় তিনি একজন সুদক্ষ শিল্পী। তাঁর সঙ্গে আছেন য়ুরী ইয়াকোভলেভ এবং আই-গর ইলিনস্কি। ছবিটিকে আশ্চর্যভাবে সুরসমৃদ্ধ করেছেন টিখন খেন্নিকভ।

বিবিধ সংবাদ

"বর্ণচোরা"র শুভমুক্তি :

আজ শুক্রবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অপরাপর চিত্রগৃহে শিল্পভারতীর নবতম নিবেদন, সিনে ফিল্মস পরিবেশিত ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "বর্ণচোরা"র শুভ উদ্বোধন হবে। বনফুল রচিত কাহিনীর চিত্ররূপটিতে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যা রায়, গীতা দে, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি সুখ্যাত শিল্পীকে। হেমন্তকুমারের সুরসৃষ্টি ছবিখানির অন্যতম আকর্ষণ।

প্রসাদ প্রোডাকসন্স (মাদ্রাজ)-এর হামরাহী :

আসছে শুক্রবার, ২২এ ফেব্রুয়ারী মুক্তি পাচ্ছে প্রসাদ প্রোডাকসন্স (মাদ্রাজ)-এর নবতম হিন্দী চিত্রার্ঘ "হামরাহী"। টি প্রকাশরাও পরিচালিত ও শঙ্কর জয়কিষণ সুরসমৃদ্ধ এই ছবিখানির প্রধান ভূমিকায় আছেন রাজেন্দ্রকুমার, যমুনা ও মেহমুদ। রাজশ্রী পিকচার্স ছবিখানির পরিবেশক।

বিশ্বরূপার "সেতু"র জয়যাত্রা :

গেল শনিবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী "সেতু" নাটকের ৮০০তম অভিনয় সুসম্পন্ন হয়েছে। বাংলার নাট্যেতিহাসে যুগান্তরসৃষ্টিকারী এই নাটকটির ৮০০তম স্মারক উৎসব খুব শিগ্‌গিরই অনুষ্ঠিত হবে।

স্টারে "তাপসী" :

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত কাহিনী অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকারে গৃহীত ও পরিচালিত "তাপসী"র শুভ উদ্বোধন ঘটেছে গেল বৃহস্পতিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী স্টার রঙ্গমঞ্চে। প্রতিষ্ঠানের কুশলী শিল্পিবৃন্দের সঙ্গে এই নাটকখানিতে দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং মঞ্জু দে এবং নাট্যান্তর্গত রবীন্দ্রসংগীতগুলির পরিচালন ভার গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্র সুরভাণ্ডারী অনাদি দস্তিদার, এ খবর পাঠকদের আগেই জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক বিমল রায় :

গেল শনিবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী গ্রাণ্ড হোটেলের প্রিন্সেস গৃহে পরিচালক বিমল রায় স্থানীয় চিত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। শ্রীরায় সম্প্রতি তাঁর আধুনিকতম ছবি "বন্দিনী"র চিত্রগ্রহণের জন্যে

স্যুটিংয়ে অশোককুমার, নূতন সমর্থ এবং অপরাপর শিল্পীদের নিয়ে সাহেবগঞ্জ গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে জানান এবং আশা করছেন, আসচে এপ্রিল মাসের মধ্যেই ছবিখানি মুক্তির জন্য প্রস্তুত হবে। চা-চক্রে তাঁর ছবির ছ'খানি গান রেকর্ডযোগে সাংবাদিকদের শোনান হল। গানগুলি গেয়েছেন লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, মান্না দে এবং সংগীত-পরিচালক শচীন দেববর্মণ স্বয়ং।

"তোমার হল শুরু" ঃ

আজ শুক্রবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় রচিত নতুন নাটক "তোমার হল শুরু" স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ দ্বারা রঙমহল রংগমঞ্চে অভিনীত হবে।

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর নবতম চিত্র "বাদসা"-র শুভ মহরৎ ঃ

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত কাহিনী অবলম্বনে "বাদসা" ছবিটির পরিচালনা করবেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। এবং সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গেল সোমবার রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে ছবিখানির শুভ মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মহরৎ-দৃশ্যের শিল্পী ছিলেন সন্ধ্যারাণী। নাম-ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অপরাপর ভূমিকায় থাকবেন অসিতবরণ, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, শিবশঙ্কর এবং আর দেখতে পাওয়া যাবে একটি কুকুর, একটি ছাগল এবং একটি বানরকে। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স ছবিখানির প্রযোজনা ও পরিবেশনা করছেন।

।। কম্বোডিয়ার নৃত্যানুষ্ঠান ।।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ছটায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে রাজকুমারী বোপা দেবীর অধিনায়কত্বে কম্বোডিয়ার রাজকীয় ব্যালেগোষ্ঠীর একটি নৃত্যের আয়োজন হয়। কম্বোডিয়ার নৃত্য প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরানো। তবে ৮ম শতাব্দীতে রাজা যশোবর্মণ ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্যকে সংযুক্ত করেন। কম্বোডিয়ার প্রাচীন কিংবদন্তীতে বলে পিতামহ ব্রহ্মা একবার মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্যে দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। তখন এক নর্তকী ছাড়া আর কেউ তাঁকে আশ্রয় দেয়নি। ফলে ব্রহ্মা রাজাকে নৃত্যশিল্পের সংরক্ষণের আদেশ দেন। আজকে কম্বোডিয়ার রাণীই দেশের নৃত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

কম্বোডিয়ার ধ্রুপদী নৃত্য জনপ্রিয়। সাধারণতঃ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের ঘটনাবলী ও বুদ্ধের জীবনীর ওপর ভিত্তি করেই এইসব নৃত্যের কাহিনী রচিত হয়। অতি অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজকুমারী বোপা দেবী স্বয়ং নৃত্য শিক্ষা শুরু করেন মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে। আমাদের চোখে কম্বোডিয়ার নৃত্য খুব মৃদুতাল, ধীর এবং সুছন্দময় গতিভঙ্গীতে রূপায়িত বলে মনে হল। সাজপোষাকের বিচিত্র এবং উজ্জ্বল বর্ণ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক একজন নৃত্যশিল্পীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আঙ্কোরের ভাস্কর্যগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তবে ভারতীয় নৃত্যের দ্রুত ছন্দ এবং লাস্যের কিছু অভাব দেখা গেল। যন্ত্রসংগীতে চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ছাপই স্পষ্ট তবে সংগীতে মাঝে মাঝে কর্ণাটিক সংগীতের আমেজ আসে। কিন্তু এই সাদৃশ্য খুব গভীর নয়।

"সাধক রামপ্রসাদ যাত্রাভিনয়"

বাগবাজারের অন্যতম নাট্য-সংস্থা রাজবল্লভ পাড়া ব্যায়াম সমিতি তাদের প্রমোদ বিভাগের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় রামকান্ত বোস স্ট্রীটস্থ নব-বৃন্দাবন মন্দিরে শ্রীগোকুল মুখার্জি ও শ্রীসতীশ দত্তের যুগ্ম-নাট্য পরিচালনায় "সাধক রামপ্রসাদ" যাত্রাভিনয়ের শুভ উদ্বোধন হয়। সুর-সংযোজনায় ও নাম-ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংগীতজ্ঞ সুগায়ক শ্রীপ্রভাত ঘোষ। ভক্ত দর্শকবৃন্দ আকুল আগ্রহভরে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকটি শ্রবণ করেন। অভি-

কম্বোডিয়ার রাজকীয় ব্যালেগোষ্ঠীর একটি নৃত্যানুষ্ঠানের দৃশ্য

ময়ের প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনেতাই প্রশংসার দাবী রাখিতে পারেন, কারণ তাঁদের সুঅভিনয়ে দর্শকমণ্ডলীর হৃদয় জয় করেন। বিশেষ করে চতুর্থ ও সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা কুমারী সুনীতি ও কৃষ্ণা দাসের দেবী ও জগদীশ্বরীর ভূমিকা। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী গৌরাঙ্গ দাস, প্রভাত ঘোষ, শশী বাড়ুরী, গোকুল মুখার্জি, হরিপদ দাস, শিবনাথ ভট্টাচার্য, তারক ঘোষ, মুরারী বোস, অনিল ঘোষ, কানাই ঘোষ, কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী, ঋষি রায়চৌধুরী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, বলাই ঘোষ, দুলাল ঘোষ, ফণী দাস ও সুনীতি দাস, বনমালি দাঁ, গোপাল মিত্র, কৃষ্ণা দাস প্রভৃতি।

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যায় রহড়া রামকৃষ্ণ বালকাশ্রমে উক্ত নাটকটির দ্বিতীয় রজনী অভিনীত হবে।

।। বঙ্গে বর্গী ।।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য অধিকর্তাকের অন্তর্গত এণ্টি-প্লেগ রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভ্যগণ কর্তৃক নিশিকান্ত বসুরায়ের "বঙ্গে বর্গী" নাটকটি অভিনীত হয়। চিত্তরঞ্জন হোমরায় (আলিবর্দী), গৌরীশংকর কুণ্ডু (সিরাজ), শান্তিরঞ্জন ব্রহ্ম (ভাস্কর পণ্ডিত), চিত্তরঞ্জন ব্রহ্ম (মোহনলাল), মনীষা রায় (মাধুরী) ও চন্দনা দে (নর্তকী)-র ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। রমেশ চট্টোপাধ্যায়ের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য নাটকটি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

।। মৈত্রী-সংসদের নাটকাভিনয় ।।

আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় ন-পাড়া, সতীন সেন পল্লীতে মৈত্রী-সংসদের সভ্যসভ্যাগণ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের "জনক-জননী" ও "নামে কি যায় আসে" এবং পরশুরামের গল্প অবলম্বনে "কে থাকে কে যায়" একাংক নাটক তিনটির অভিনয় করবেন। দীপক ঘোষ, অঞ্জুরাণী ঘোষ (ছোট), দীপালি কর্মকার, অরুণ চ্যাটার্জি, মণীন্দ্র ঘটক, বিনয় ঘোষ, ননী চন্দ্র, নান্টু, রতন, বাচ্চু, অশোক, অলোক, স্বপন, গদাই ও আরো অনেকে রয়েছেন চরিত্রচিত্রণে। নাটক তিনটি পরিচালনা করেছেন অনিলকুমার ঘোষ।

✶ কলকাতা ✶ বোম্বাই ✶ মাদ্রাজ

কলকাতা

শিল্প-ভারতী প্রো ডা ক স ন্সে র 'বর্ণচোরা' এ সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। বনফুল রচিত এ কাহিনীর চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতবহুল ছবির সুর-সৃষ্টিকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, তন্দ্রা বর্মণ, জহর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, রেণুকা রায়, গীতা দে, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী। সিনে ফিল্মস পরিবেশিত শিল্প-ভারতীর এ ছবি প্রযোজনা করেছেন গৌর দে, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিমা মুখোপাধ্যায়।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম চিত্র 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর চিত্রগ্রহণ দ্রুত গতিতে সুসম্পন্ন হতে চলেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত এই রসাল কাহিনীর দ্বৈত নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনায় মানু সেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সবিতা বসু, তরুণকুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, তমাল লাহিড়ী, লীলাবতী করালি, জয়নারায়ণ ও গৌর শী এ ছবির অন্যতম চরিত্র-শিল্পী। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনায় নিযুক্ত আছেন অনিল গুপ্ত, জ্যোতি লাহা, সুনীল সরকার ও হরিদাস মহলানবিশ। সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। ছায়াবাণী এ ছবির পরিবেশক।

রূপছায়া চিত্রের প্রথম প্রয়াস 'দেয়া নেয়া।' সম্প্রতি প্রযোজক ও সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র এ ছবির নায়িকা বোম্বাইয়ের তনুজাকে মনোনীত করেছেন। নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। এ মাসের শেষে তনুজাকে নিয়ে ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করবেন পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়।

এ ছবির অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন কমল মিত্র, ছায়াদেবী, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, লিলি চক্রবর্তী, সুস্মিতা সান্যাল ও জয়নারায়ণ মুখার্জী। আলোকচিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কানাই দে ও শ্যামল মিত্র।

প্রযোজক, পরিচালক ও কাহিনীকার সলিল দত্ত তাঁর ছবি 'সূর্যশিখা'-র চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করেছেন টেক্‌নিসিয়ান স্টুডিওয়। সম্পাদনার কাজ চলেছে। ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। কলাকুশলী বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সত্যেন রায়চৌধুরী। এ ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও তরুণকুমার। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

বোম্বাই

সম্প্রতি প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় বিহার অঞ্চলে 'বন্দিনী' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন। জরাসন্ধের তামসী কাহিনী অবলম্বনে বিকাশ ও কল্যাণীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোককুমার ও নূতন। গত জানুয়ারী মাসে এই সংস্থার কলাকুশলীসহ পরিচালক শ্রীরায় বিহারের সাহেবগঞ্জ ঘাট, ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেল ও বীরভূমের কয়েকটি অঞ্চলে এ ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ করেছেন।

এ সপ্তাহে উদয়পুরে ইন্দো-আমেরিকান কো-প্রোডাকসন্সের ছবি 'দি গাইড' ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ শুরু হল। পার্ল বাক ও পরিচালক ডেনিয়েলউস্কি সহ নায়ক-নায়িকা দেবানন্দ ও ওয়াহিদা রেহমান এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। বারো সপ্তাহের মধ্যে এ ছবি সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। তারপর হিন্দী ভাষায় এটির চিত্ররূপ

দেবেন চেতনানন্দ। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শচীনদেব বর্মণ।

কিরণ প্রোডাকসন্সের নতুন ছবিতে নায়ক-নায়িকার জন্য মনোনীত হয়েছেন মনোজকুমার ও মালা সিনহা। প্রযোজক রাজেন্দ্র ভাটিয়া এ ছবিটি পরিচালনা করবেন। সঙ্গীত পরিচালক মদনমোহন। আগামী মাস থেকে ছবির কাজ শুরু হবে।

মাদ্রাজ

সম্প্রতি বিজয়া স্টুডিওর প্রযোজক-পরিচালক বি, আর, পান্থালু ধর্মমূলক ছবি 'কর্ণম'-এর শুভমহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। মহাভারতের কাহিনী-চরিত্র কর্ণের জীবন নিয়ে এ ছবির মূল চিত্রনাট্য রচনা করেছেন টি, কে, কৃষ্ণস্বামী। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন বিশ্বনাথন ও রামামূর্তি। কর্ণের ভূমিকায় ও অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শিবাজী গণেশন, এম, ভি, রাজাম্মা, রুক্মিণী ও নটরাজন।

গত সপ্তাহে অভিনেত্রী কুমারীর শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হল। মালায়ম ও তামিল ছবিতে এ'র অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

বাঙলা সাল বারোশ উনসত্তর। ইংরেজি আঠারোশ তেষট্টি। তারিখ বারোই জানুয়ারী। কলকাতার গৌর মুখার্জি লেনের বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। পৌষ মাসের শেষ দিনে। মকর সংক্রান্তিতে। সোমবার। সূর্যোদয়ের ছ'মিনিট আগে।

এর মধ্যেই একশো বছর কেটে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আজ পৃথিবীব্যাপী পালিত হচ্ছে। উনিশ'শো তেষট্টি—জন্ম-শত-বর্ষের পূর্তি বছর। আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রেও এ উৎসবের পালা শেষ হয়নি। বছরটিকে স্মরণীয় করতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকে কেন্দ্র করে যশস্বী পরিচালক মধু বসু 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রটি পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন।

ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় সম্প্রতি এ ছবির চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে একদিন খবর নিতে স্টুডিওতে হাজির হয়েছিলাম। তখন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার ছুটি ছিল। বাইরের সবুজ মাঠের এক পাশে একটা চালা-ঘরের বেঞ্চিতে বসে রয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। পাশে বসে বিবেকানন্দ। হঠাৎ এমন যুগল দৃশ্য দেখে কি যেন মনের ভেতর আঁকু পাঁকু করে উঠলো। পরমুহূর্তেই মনে পড়লো এটা ছবি তৈরীর কারখানা। কিন্তু কি আশ্চর্য!! এমনও চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায় চলচ্চিত্র জগতে। বিবেকানন্দ ও শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভূমিকায় এ ছবিতে অভিনয় করছেন অমরেশ দাস ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপশ্রেয়-সংলাপ—আবার শুরু হয় স্টুডিও ফ্লোরে। কাঠ আর দরমার ঘর-বাড়ি। বড় বড় আলো আর যন্ত্র। তার
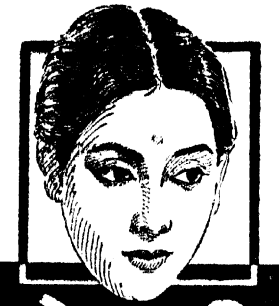
'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রে বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অমরেশ দাস ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণের পূর্বে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক মধু বসু। সহকারী বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়

মধ্যে অভিনেতৃরা সংলাপ বলেন। পরিচালক চিত্রগ্রহণ শুরু করেন।

এ ছবির চিত্রগ্রহণ করছেন আলোকচিত্রশিল্পী অজয় মিত্র। শব্দ-গ্রহণ এবং শিল্পনির্দেশনায় আছেন বাণী দত্ত ও বটু সেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নরেন এসেছে পরীক্ষা করতে। ঠাকুরের বাড়ির দৃশ্যটি সেদিন গৃহীত হল।

পরিচালক মধু বসু এ কাহিনীর কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করার পর এ ছবি সম্পর্কে কিছু বললেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন নিয়ে। তিনি ছবি করছেন। কিন্তু স্বামীজীর সম্পূর্ণ জীবনের সমস্ত ঘটনা একটা ছবিতে দেখানো সম্ভব নয়। তাই তিনি নরেনের বাল্য জীবন থেকে আমেরিকা সফরের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাকে চিত্রনাট্যে স্থান দিয়েছেন। বিশেষ করে নরেনের সংসার-অনটন ও অধ্যয়ন শেষে পরমাত্মার সান্নিধ্য-মুহূর্তের ঘটনাগুলোর প্রতি শ্রীবসু আলোকপাত করেছেন।

প্রাণে ভক্তি নিয়ে অন্তরের সঙ্গে এক হয়ে কিছুটা তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম অভিনীত ঠাকুরের সংলাপে—'আমরা হচ্ছি নর, ও নরের মধ্যে ইন্দ্র। পাতাল ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। যেন খাপখোলা তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশি আসে না, সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই।'

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন মধু বসু। ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন—'কে মানুষ? যে মান-হুঁস সেই। অর্থাৎ নিজের মান সম্বন্ধে যে সচেতন সেই মানুষনামবাচ্য। আর মান অর্থ যেমন সম্মান তেমনি আবার পরিমাণ। অর্থাৎ দুই অর্থেই যে সজ্ঞান সেই মানুষ। অর্থাৎ যে জানে সে কে, সে কতটা। সে যে ছোট নয়, তুচ্ছ নয় সে যে অমৃত, সে যে অনন্ত এই বোধে উদ্ভাবিত। সে যে শুধু বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নয়, সে যে স্বয়ং বিশ্বনাথ এই সংজ্ঞায় যে চৈতন্যময়।'

কিন্তু ঈশ্বর বলে সত্যি কি কেউ আছেন? চোখ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে ধরা যায় না, কান দিয়ে শোনা যায় না এমন কি থাকতে পারে? থাকতে পারে তো কোথায়?

সাধু-সন্ন্যাসীর কাছেও নরেন সঠিক জবাব পায় নি। একদিন ঠাকুরকেই সে জিজ্ঞেস করলো—'এত যে মা-মা করো, মাকে দেখতে পাও তুমি?'

পরলোকে চিত্রপ্রযোজক শ্রীবিমল ঘোষ

চিত্র-প্রযোজক শ্রীবিমল ঘোষ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি 'বধূ' ছবির প্রযোজক। এবং 'বিজিতা' নামক নির্মীয়মান চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালকও ছিলেন। তিনি উত্তর কলকাতার একটি সিনেমাগৃহে টাকা গোনার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং ডাক্তার এসে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

—'দেখতে পাই কি রে! তার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, মার পাশটিতে ছোট্টটি হয়ে ঘুমুই।'

অনেক পরীক্ষার পর ঠাকুরের কাছে নরেন দীক্ষা নেয়—'পরোপকারই ধর্ম'।' সেই থেকে স্বামীজীও বলেন—'আমি এক ধর্ম মানি, তার নাম পরোপকার।' তা না হলে এতবড় কথা কে বললে—'আমি বৃষ্টিবিন্দু হতে চাই। বৃষ্টি-বিন্দু হয়ে সমুদ্রে ঝরে পড়ব না। ঝরে পড়ব মাটিতে। ঝরে পড়ে ধুয়ে দিয়ে যাবো এক কণা ধূলি। মুছে দিয়ে যাবো এক কণা পিপাসা।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—'পড়েছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব। দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর এরাই তোমার দেবতা হোক। যে ধর্ম গরিবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তাকি আবার ধর্ম?'

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রে প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন ভুবনেশ্বরী—মলিনা দেবী, গিরিশ ঘোষ—জহর গাঙ্গুলী, সুরেন মিত্র—বীরেন চ্যাটার্জি ও রাম দত্ত—মিহির ভট্টাচার্য। সেবক চিত্র প্রোডাকসন্সের তরফ থেকে ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়।

—চিত্রদূত

।। বৃটিশ ছবির টুকরো খবর ।।

লন্ডনের কাছে এলস্ট্রি স্টুডিওতে "দি ভি-আই-পি" ছবির স্যুটিং চলছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন এলিজাবেথ টেইলার এবং রিচার্ড বার্টন।

• • •

স্টানলি কুবরিকের রহস্যচিত্র "ডক্টর স্ট্রেঞ্জ লাভ, অর হাউ আই লারনড টু স্টপ ওরিং এ্যান্ড লাভ বম্" চিত্রে পিটার সেলার্স নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। সহভূমিকায় আছেন জর্জ স্কট। কুবরিকই এই চিত্রের পরিচালক। ছবির কাজ শুরু হয়েছে শেপারটন স্টুডিওতে।

* * *

হ্যামার চিত্র প্রতিষ্ঠান একটি রোমহর্ষক ছবি তুলছেন "হেয়ার ইজ দি নাইফ—নাউ ইউজ ইট' নামে। জেমস স্যাংকস্টার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এবং প্রযোজনাও। ফ্রেডী ফ্রান্সিস চিত্রের পরিচালক। জনৈকা তরুণী সবসময়ে, কি স্বপ্নে, কি জাগরণে অবগুণ্ঠনবতী এক রহস্যময়ী মহিলাকে দেখেন। কখনো মহিলাটি জীবন্ত, কখনও বা ছুরিবিদ্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় তরুণীর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

ডেভিড নাইট, প্রিসিলা মেডমণ্ড, রেন্ডা ব্রুস, জর্জ এ কুপার, আইরিন রীচমণ্ড এই চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ।

* * *

'স্যাটার ডে নাইট এ্যান্ড সানডে মরনিং'-এর পরিচালক কারেল রেইজ অল্পদিনেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর নবতম ছবির নাম ঘোষিত হয়েছে। এবার তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অস্ট্রেলিয়ার পটভূমিকায় একটি ছবি তুলবেন। ছবিটির নাম 'নেড কেলি'। আগামী বছরের গোড়াতে অস্ট্রেলিয়াতেই বর্তমান ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হবে।

—চিত্রকূট
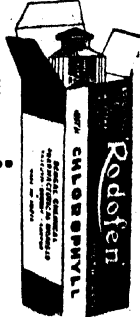
দর্শক

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

এম সি সি দল বনাম ভিক্টোরিয়া দলের চার দিনের খেলাটি (১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী) অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই দুই দলের প্রথম খেলায় (১৪ই—১৮ই ডিসেম্বর) এম সি সি দল ৫ উইকেটে জয়লাভ করেছিল। দ্বিতীয় খেলাটিও এম সি সি'র হাতের মধ্যে ছিল। অল্পের জন্যে তারা খেলায় জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভিক্টোরিয়া দল তখনও এম সি সি দলের থেকে ৯৮ রানের পিছনে পড়ে আছে এবং ভিক্টোরিয়া দলের দশম অর্থাৎ শেষ উইকেটের জুটি খেলছে। এই শেষ জুটিকে এম সি সি দল মাত্র ১৬ মিনিট হাতে পেয়েছিল।

এম সি সি দল প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পায়। তাদের খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—দলের ১ রানে ১ম, ৬ রানে ২য়, ৬২ রানে ৩য়, ৭৮ রানে ৪র্থ এবং ৯৬ রানে ৫ম উইকেট পড়ে যায়। অর্থাৎ দলের অর্ধেক আউট হয় মাত্র ৯৬ রান ক'রে। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে টম্ গ্রেভনী এবং ফ্রেড টিটমাস ১২৩ মিনিটের খেলায় দলের ১০৬ রান যোগ করেন। টিটমাস ২৮ রান ক'রে আউট হ'ন। কিন্তু গ্রেভনী ১০১ রান ক'রে এইদিন নট আউট থাকেন। প্রথম দিনে এম সি সি দলের ৬টা উইকেট পড়ে ২১৬ রান দাঁড়ায়। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে গ্রেভনী এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সেঞ্চুরী করলেন।

দ্বিতীয় দিনে এম সি সি দলের প্রথম ইনিংস ৩৭৫ রানে শেষ হয়। গ্রেভনী নিজস্ব ১৮৫ রানে আউট হ'ন। তিনি মোট ৫ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ব্যাট করে ২৩টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। ১৯৫৭ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে নটিংহামের টেস্ট খেলায় তাঁর ২৫৮ রানের পর এই ১৮৫ রানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য রান। সপ্তম উইকেটের জুটিতে গ্রেভনী এবং এ্যালান স্মিথ (৪৮ রান) দলের ১০৭ রান তুলে দেন। গ্রেভনী দলের নবম খেলোয়াড় হিসাবে দলের ৩৭২ রানের মাথায় আউট হন। এম সি সি দলের শেষ পাঁচটা উইকেটে ২৭৯ রান উঠেছিল—প্রথম দিকের পাঁচটা উইকেট পড়ে উঠেছিল মাত্র ৯৬ রান। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বাকি ৪টে উইকেটে পূর্ব দিনের ২১৬ রানের (৬ উইকেটে) সঙ্গে ১৫৯ রান যোগ হয়।

ভিক্টোরিয়া দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় এইদিনে ৩টে উইকেট পড়ে গিয়ে ১৫৮ রান ওঠে।

তৃতীয় দিনে ভিক্টোরিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৩০৭ রানে শেষ হলে এম সি সি দল ৬৮ রানে অগ্রগামী হয়। ভিক্টোরিয়া দলের জন পোটার সেঞ্চুরী (১০৬) করেন। সাড়ে চার ঘণ্টা ব্যাট করে পোটার তাঁর ১০৬ রানে ১১টা বাউণ্ডারী করেন। তৃতীয় দিনে এম সি সি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতে দুটো উইকেট খুইয়ে ১১২ রান করে।

এই দিনে এম সি সি ১৮০ রানে এগিয়ে যায়।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে এম সি সি দল ২১৮ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১২৭ মিনিট খেলে দলের ১১৬ রান যোগ করেন। এম সি সি দলের খেলার সমাপ্তি ঘোষণার পর দেখা যায় খেলা ভাঙ্গতে আর ২৫০ মিনিট সময় বাকি আছে; এদিকে ভিক্টোরিয়া দলের জয়লাভের জন্যে ২৮৭ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়া দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৮৮ রানের বেশী তুলতে পারেনি। এই রান তুলতে তাদের ৯টা উইকেট পড়ে যায়। সুতরাং জয়লাভ দূরের কথা, তারা পরাজয়ের মুখ থেকে খুব জোর উদ্ধার পায়। দলের পরিত্রাতা হিসাবে খেলেছিলেন আর কুপার; ১৩৯ মিনিট খেলে তিনি ৫১ রান করেন।

এম সি সি : ৩৭৫ (গ্রেভনী ১৮৫। মেকিফ ৯৩ রাণে ৫ উইকেট)
ও ২১৮ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডেক্সটার ৭০ এবং ব্যারিংটন ৬৬। মেকিফ ৪৭ রাণে ২ উইকেট)

ভিক্টোরিয়া : ৩০৭ **রাণ** (জন পোটার ১০৬। লার্টার ১০৫ রাণে ৪ এবং এ্যালেন ৪৩ রাণে ৫ উইকেট)
ও ১৮৮ **রাণ** (৯ উইকেটে। আর কাউপার ৫১। লার্টার ৪৫ রাণে ৩, এ্যালেন ২৪ রাণে ৩ এবং ব্যারিংটন ৬০ রাণে ২ উইকেট)

এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতার আকর্ষণ কম নয়। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশনের রহস্যময় আচরণ এবং অব্যবস্থার দরুণ এবারের ৬ষ্ঠ এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতা তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি। উক্ত নিয়ন্ত্রণ সংস্থার এক অদ্ভুত আচরণের ফলেই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা বাংলার লন টেনিস এসোসিয়েশনকে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রথমতঃ এই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ করতে তারা হাতে খুব অল্প সময় পেয়েছিল। দেনা-পাওনা নিয়ে অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ দিন ধরে দর কষা-কষি চলেছিল। শেষে ১৯শে জানুয়ারী তারিখে অর্থাৎ প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাত্র কয়েক দিন আগে অল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশনের সর্ত স্বীকার করে নিলে বেঙ্গল টেনিস এসোসিয়েশনের পক্ষে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের কোর্টে এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। নাটকের পর্ব এইখানেই শেষ হ'ল না। অল ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশনের পূর্ব ঘোষণা মত এই প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া এবং হাঙ্গেরীর টেনিস খেলোয়াড়দের যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়, এ ব্যাপারে বাংলার টেনিস এসোসিয়েশনকে এক কথায় সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে রাখা হয়েছিল। মাত্র ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্থাৎ ক্রীড়া-সূচী প্রস্তুত করার দিনে তাদের এইটুকু জানানো হয়, অস্ট্রেলিয়ার টেনিস খেলোয়াড়রা যোগদান করবেন না। কিন্তু হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়দের সম্পর্কে কোন খবর ছিল না। অল্ ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশন বিদেশ থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহের ভার নিয়েছিলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রতিযোগিতা আরম্ভের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁরা যেভাবে সে দায় সারলেন, তার দৃষ্টান্ত আধুনিক কালের সভ্য দেশের খেলাধুলার ইতিহাসে বিরল। বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'রয়টার' মারফৎ আমরা একই দিনে ভিতরের খবর জানতে পারলাম। খবরে প্রকাশ, এশিয়ান লন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যে অস্ট্রেলিয়ান দল তৈরী হয়েছিল সেই দলে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয়

জয়দীপ মুখার্জী

রমানাথন কৃষ্ণান

শ্রেণীর টেনিস খেলোয়াড়—বব্ হাউ, বিল বাউরে, জে লেহান এবং রবীন এবার্ণ। অল ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস এসোসিয়েশন নির্বাচিত পুরুষ খেলোয়াড়দের সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির খেলোয়াড়—রয় এমারসন, বব্ হিউইট, কেন ফ্লেচার, ফ্রেড স্টোলী এবং মার্টিন মালিগান এই পাঁচজনের যে কোন দু'জন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার টেনিস এসোসিয়েশনের পক্ষে এই পাঁচজনের একজনকেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তখন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচিত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর টেনিস দলের জন্যে অল্ ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশন যাতায়াতের মাত্র অর্ধেক খরচ বহন করতে রাজী হয়। দুঃখের সঙ্গেই অস্ট্রেলিয়ার লন্ টেনিস এসোসিয়েশন এই সর্ত প্রত্যাখ্যান করে। ফলে অস্ট্রেলিয়া থেকে টেনিস দল এলো না। হাঙ্গেরীয়ান টেনিস খেলোয়াড়দের না আসার খবর এখনও জানা যায়নি। মাত্র জাপান এবং ইস্রায়েলের যোগদানের ফলে এবারের এশিয়ান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার আন্তর্জাতিক কুলমর্যাদা কোন রকমে অক্ষুন্ন ছিল।

পুরুষদের বাছাই তালিকায় প্রথম আটজন খেলোয়াড়ের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন ভারতীয় এবং তিনজন বিদেশী খেলোয়াড়। প্রথম স্থান পান রমানাথন কৃষ্ণান। জাপানের ইশিগুরো, ইস্রায়েলের ডেভিডসন এবং জাপানের ফুজি পুরুষদের বাছাই তালিকায় যথাক্রমে ২য়, ৫ম এবং ৮ম স্থান পান। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে আখতার আলি (৬নং) জাপানের এক নম্বর খেলোয়াড় এবং এই প্রতিযোগিতার দু'নম্বর খেলোয়াড় ওসামু ইশিগুরোকে পরাজিত করেন। ইস্রায়েলের ডেভিডসন (৫নং) তৃতীয় রাউণ্ডের খেলায় মহারাস্ট্রের সতের বছর বয়সের তরুণ খেলোয়াড় শ্যাম মিনোত্রার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করেন। মিনোত্রা বাছাই তালিকায় স্থান পাননি। চার নম্বর বাছাই খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লাল কোয়ার্টার ফাইনালে মিনোত্রাকে পরাজিত করেন। এক নম্বর খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণানের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজিত হ'ন আট নম্বর খেলোয়াড় এম ফুজি (জাপান)। বাইরের তিনজন খেলোয়াড়ের মধ্যে জাপানের ইশিগুরো (২নং বাছাই) এবং ফুজি (৮নং বাছাই) কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। ইস্রায়েলের ডেভিডসন (৫নং বাছাই) খেলেছিলেন তৃতীয় রাউণ্ড পর্যন্ত। ফলে সেমিফাইনালের খেলা ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেমিফাইনালে কৃষ্ণান (১নং বাছাই) পরাজিত করেন প্রেমজিৎ লালকে (৪নং বাছাই) এবং জয়দীপ মুখার্জি (৩নং বাছাই) পরাজিত করেন আখতার আলিকে (৬নং বাছাই)।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। এই জয়লাভের ফলে কৃষ্ণান দ্বিতীয়বার সিঙ্গলসের খেলায় এশিয়ান খেতাব লাভ করলেন। প্রথম পান ১৯৬১ সালে, আমেরিকার বেরী ম্যাকেকে পরাজিত করে। কৃষ্ণানের এই জয়লাভে ভারতীয় টেনিসে এক বিরাট দুর্বলতা পুনরায় ধরা পড়ে গেল। কৃষ্ণান ১৯৫৩ সালে জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করেন এবং সেই সময় থেকে কখনও ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের হাতে তিনি হার স্বীকার করেন নি। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর থেকে শক্তিশালী ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের আবির্ভাব সম্ভব হয়নি। ভারতীয় টেনিস খেলায় এই অবস্থাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। ডাবলসের ফাইনালে কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার জয়লাভ করেছেন। এই জুটিও দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় জুটির উপর আধিপত্য অক্ষুন্ন রেখেছে। ১৯৫৫ সালে এই জুটি প্রথম খেলা সুরু করে। সেই থেকে মাত্র একবার এই জুটি ভারতীয় জুটির কাছে হার স্বীকার করেছে। ১৯৬০-৬১ সালের জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতার ডাবলসের ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালের জুটি কৃষ্ণান এবং নরেশ কুমারকে পরাজিত করেছিলেন। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণান এবং কুমারের জুটিকে গত দুটো মরসুমে সরকারীভাবে ভারতবর্ষের হয়ে খেলতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আজ তাঁরা সামনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রেমজিৎ লাল এবং জয়দীপ মুখার্জির জুটি তিন বছর প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এই জুটি গত তিন বছর জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতায় ডাবলসের খেতাব পান।

মহিলাদের সিঙ্গলস খেলায় মহীশূরের চেরী চিত্তায়ানা প্রতিযোগিতার ১, ২ ও ৩ নম্বর বাছাই খেলোয়াড়কে পরাজিত করে খেতাব লাভ করেন। সেমিফাইনালে তিনি পরাজিত করেন ২নং বাছাই খেলোয়াড় লীলা পাঞ্জাবীকে

(মহারাষ্ট্র) এবং ফাইনালে এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় রতন থাডানিকে (দিল্লী)।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : রমানাথন কৃষ্ণান (১নং বাছাই) ৬-৪, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে (৩নং) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কুমারী চেরী চিত্তায়ানা (মহীশূর) ৬-১, ১-৬ ও ৬-৩ গেমে কুমারী রতন থাডানিকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশ কুমার ৭-৫, ৬-১, ৩-৬, ৩-৬ ও ৬-১ গেমে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : মিস রিতা সুম্রাইয়া এবং আখতার আলী (কলকাতা) ১০-৮ ও ৮-৬ গেমে ই ডেভিডসন (ইসরাইল) এবং মিসেস স্লাম-বার্জারকে পরাজিত করেন।

জাতীয় বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার ফাইনালে উইলসন জোন্স ৪৯৫২—২০১১ পয়েন্টে এম ফেরীরাকে পরাজিত করেছেন। উভয়েই মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড়।

জাতীয় স্নুকার প্রতিযোগিতার ফাইনালে এম জে এম লফির (সিংহল) ৬-২ ফ্রেমে টনি মন্টিরোকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

বিলিয়ার্ডস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উইলসন জোন্স ২,৩৩৮—৯৯৪ পয়েন্টে এম জে এম লফিরকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন। অপরদিকে লফির এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন স্নুকার প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ৬-৩ ফ্রেমে উইলসন জোন্সকে পরাজিত করে।

জাকার্তার এশিয়ান গেমস প্রসঙ্গ

গত বছর জাকার্তায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ এশিয়ান ক্রীড়ানুষ্ঠানে ইস্রায়েল এবং ফরমোজাকে অন্যায়ভাবে যোগদান করতে না দেওয়ার জন্যে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি সম্প্রতি এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন যে, আগামী ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়াকে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের একমাত্র সর্ত, ইন্দোনেশিয়াকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া হাতে-নাতে পাওয়া গেছে। খবরে প্রকাশ, জাপানের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন, ইন্দোনেশিয়া আগামী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারলে জাপানের পক্ষে তা খুবই দুঃখের কারণ হবে। জাপান নাকি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্যে অন্যান্য দেশের সহযোগিতা কামনা করবে। জাপানের প্রিন্স তাকেদা এই নিষেধাজ্ঞায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। ইন্দোনেশিয়ার ক্রীড়া-মন্ত্রী ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির এই প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে হুমকিও দিয়েছেন যে, ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়াকে যোগদান করতে না দিলে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত থাকবে।

পরলোকে স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার

বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার পেলহাম ওয়ার্ণার (ইংল্যাণ্ড) ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তিনি পরিণত বয়সেই দেহরক্ষা করেছেন এবং ক্রিকেট খেলায় তাঁর সঞ্চয় বলতে আর কিছু ছিল না—এই কঠিন সত্যকে ক্রিকেট অনুরাগীদের পক্ষে সহজভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনে শোকের ছায়া নেমে আসবে এবং তাঁর অবর্তমানে এক মহাশূন্যতা অনুভব করবেন তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মহলের সঙ্গে স্যার পেলহাম ওয়ার্ণারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—সে সম্পর্ক ক্রিকেট খেলায় ব্যাট-বলের মত। ক্রিকেট খেলোয়াড়, সমালোচক, গ্রন্থকার, অধিনায়ক এবং সংগঠক এই বিবিধ ভূমিকায় তিনি সাফল্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় রান এবং সেঞ্চুরী সংখ্যার তালিকায় তাঁর বিশেষ কোন অবদান ছিল না—১৫টা টেস্ট খেলায় মোট ৬২২ রান (গড় ২৩·৯২) এবং মাত্র একটা টেস্ট সেঞ্চুরী। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর মোট রান ২৮৭৫৬ (গড় ৩৬·৪৯) এবং সেঞ্চুরী ৬০। খেলায় সাফল্যের এইসব সামান্য পরিসংখ্যান দিয়ে তাঁকে তুলাদণ্ডে বিচার করা হয়নি। তাঁর জীবনই ছিল ক্রিকেট খেলা এবং তিনি ছিলেন "মিঃ ক্রিকেট"।

।। পরলোকে হিতেন বসু ।।

বাংলার প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীহিতেন বসু ৬৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাংলার ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে 'রায় এবং বসু'—এই দুই পরিবারের অবদান অসাধারণ। রায় পরিবারের স্বর্গীয় অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় বাংলার ক্রিকেট খেলার জনক হিসাবে চিরস্মরণীয়। আবার এই দুই পরিবার ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ। বসু পরিবারে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিন ভ্রাতা—হিতেন বসু, গণেশ বসু এবং কার্তিক বসু। সারদারঞ্জন রায় হলেন এ'দের মাতুল। হিতেন বাবু নিজে বড় খেলোয়াড় হওয়ার থেকে নিজের হাতে ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরী করার প্রতি বেশী উৎসাহী ছিলেন। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ।
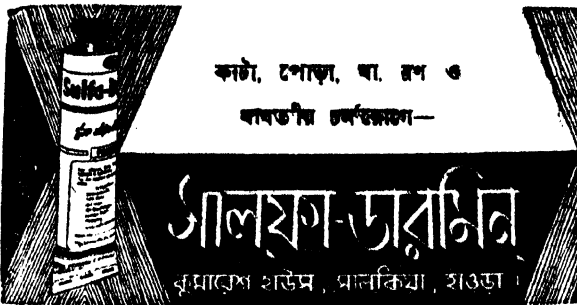
অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বৎ
৪র্থ খণ্ড

৪২শ সংখ্যা
মূল্য—
৪০ নঃ পঃ

শুক্রবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
Friday, 22nd February 1963. 40 Naya Paise.

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বিগত সপ্তাহে শিল্প পরিসংখ্যান ব্যুরোর বার্ষিক সভায় বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন যে, পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ চলা সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। ইহার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, দেশের জনসাধারণের সহিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাজের সমন্বয় হয় নাই।

এই সঙ্গে তিনি গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কৃষিউন্নয়নের সহিত একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিস্তার প্রয়োজন নহিলে গ্রামবাসীর সমস্যা পূরণ করা সম্ভব হইবে না। সেই কারণে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ক্ষুদ্র শিল্প গড়িবার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ও কারিগর ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহা গড়িয়া তোলাই তাঁহাদের লক্ষ্য। বৃহৎ শিল্পকে তাঁহারা গ্রামে লইয়া যাইতে চাহেন না কেননা তাঁহাদের মতে তাহাতে গ্রামবাসীদের লাভ হইবে না, বরঞ্চ ক্ষতিই হইবে।

নীতিগত বিচারে শ্রীনন্দের বক্তৃতার এবং তৎপরে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু এদেশে কথা ও কাজের তফাৎ এতই বেশী—বিশেষ উচ্চ অধিকারীবর্গের ক্ষেত্রে—যে কার্যতঃ আমাদের মনে হয় উহা একটি গোলকধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নহে। এরূপ মন্তব্য কেন করিতেছি তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য আমরা ঐ একই দিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত—অর্থাৎ যে দিনে ঐ ভাষণের সংবাদ প্রকাশিত হয়—দুই বিষয়ক তিনটি সংবাদ কলিকাতার সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম দুইটি স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিষয়েঃ—

"বোম্বাই, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—আজ বোম্বাইয়ের প্রধান গহনা ও সোনার বাজার (জাভেরী বাজার) বন্ধ থাকে। প্রায় দশ সহস্র স্বর্ণকার, জুয়েলার ডিলার, কমিশন এজেন্ট এবং স্বর্ণশিল্পের সহিত সংশিলষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিরা স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশের ফলে উদ্ভূত স্বর্ণকারদের সমস্যাসমূহের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মানসে হরতাল পালন করেন।

'শ্রীমালী' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর স্বর্ণকার (সংখ্যায় প্রায় এক হাজার) তাহাদের হাজার বৎসরের পুরাতন বৃত্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপের প্রতিবাদে আজ অনশনে থাকেন। নিঃ ভাঃ শ্রীমালী সোনি মহামণ্ডলের উদ্যোগে এই হরতাল ও অনশন পালন করা হয়।"

'গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে জাভেরী বাজারে কাজকারবার কার্যতঃ বন্ধ। জুয়েলাররা ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা তৈরী না করায় কোন দোকানেই ঐ গহনা নাই। সোনি মণ্ডলের প্রতিনিধিরা বলেন যে, জুয়েলাররা ১৪ ক্যারেটের গহনা তৈরী না করায় স্বর্ণকারেরা বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বাজারে সোনা না পাওয়ায় তাহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়াও ১৪ ক্যারেটের গহনা তৈরী করিতে পারিতেছে না। এমন কি যাহারা লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিয়াছে, মজুত সোনা বাজারে না থাকায় তাহারাও সোনা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।'

'আজ সন্ধ্যায় সোনি মণ্ডলের সদস্যরা এক সভায় মিলিত হইয়া সরকারের নিকট বেকার স্বর্ণকারদের মাথাপিছু এক হাজার টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তাঁহারা জুয়েলারদের নিকটেও আবেদন করেন যে, তাঁহারা যেন স্বর্ণকারদের বেকার না করেন। ইহাদের শ্রমেই তাঁহারা (জুয়েলাররা) প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, গত এক মাসে মজুত গহনা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে স্বর্ণকারদের সাহায্যে তাঁহাদের আগাইয়া আসা উচিত।'

এই তো গেল বোম্বাইয়ের স্বর্ণকারদিগের কথা। এখানে দ্রষ্টব্য যে, যাহারা স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য, অর্থাৎ বৃহৎ স্বর্ণসঞ্চয়কারী ও ব্যবসায়ীগণ, তাঁহারা এই নিয়ন্ত্রণের ফলে 'প্রভূত' অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন—মরিতেছে দরিদ্র স্বর্ণশিল্পী!

কলিকাতার অবস্থা আরও নিদারুণঃ—

"কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী—মহানগরীর সোনাপাড়াগুলির হাহাকার বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজ নাই, আয়ও নাই। ভাগ্যে কি লেখা আছে কেহ জানেন না।'

'সরকার দেশের দিকে চাহিয়া স্বর্ণবোর্ড গঠন করিয়াছেন, উহার ফলে দেশের হয়ত অনেক কল্যাণ হইবে—কিন্তু অসহায় স্বর্ণশিল্পীরা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। না খাইয়া তাঁহাদের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, এখন অন্য কিছু চোখে পড়িতেছে না।'

'আজ যেখানেই গিয়াছি, স্বর্ণশিল্পীদের মধ্যে এই অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তা দেখিতে পাইয়াছি।'

আর বিশেষ লেখা প্রয়োজন আছে কি? স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা "দরিদ্র ক্ষুদ্রশিল্পী" বিষয়ে কার্যতঃ কতটুকু চিন্তা করিয়াছেন জানি না। যদি বলেন যে, এক্ষেত্রে 'জরুরী অবস্থার' দরুণ সরকারের চিন্তার সামর্থ ছিল না তবে নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদ দেখুনঃ—

'আটাশে ফেব্রুয়ারীর দেরী আছে। কিন্তু একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর তর সহিতেছে না। ইতিমধ্যেই বাজারে বিশেষ বিশেষ ব্র্যান্ডের সিগারেট, বৈদ্যুতিক বালব, দাড়ি কামানোর ব্লেড, দাঁতের মাজন, সৌখিন দ্রব্যাদির দাম বাড়ান হইয়াছে।

'প্রতি বৎসরই ফেব্রুয়ারীর শেষে সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে এমন হয়। তবে এইবার একটু আগেভাগে হইতেছে এই যা। সাময়িকভাবে দ্রব্যমূল্যে বাড়াইয়া কিছু রোজগারের এই রেওয়াজের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে তেমন কিছু করা হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর এখন দেশের জরুরী অবস্থাতেও নয়।'

যতদিন আমাদের দেশে শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গ এই সকল দুর্নীতির পরোক্ষ প্রশ্রয় দিবেন ততদিন এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নীচেই নামিবে। পরিসংখ্যানের ভুয়া তথ্য তাহার প্রতিকার করিতে পারে না।

স্বাধীন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কাঠের উদ্ধার কাঠে
পাথরের উদ্ধার পাথরে।
অন্তঃসার যে অনল সুপ্ত আছে
গুহাহিত প্রাণের কোটরে,
ঘর্ষণে-ঘর্ষণে তারে উচ্চারিত করে দাও
উদ্দামে দারুণে,
কাঠের নির্বাধ মুক্তি নির্মল আগুনে।

তেমনি আমার মুক্তি আমারি এ মুষ্টিবদ্ধ হাতে,
পাষাণ বক্ষের দ্বারে প্রত্যয়কঠিন করাঘাতে
সঘন সবল,
গুণ্ঠিতেরে অপাবৃত, নিরুদ্ধেরে করি নিরর্গল।
প্রকম্পিয়া অন্ধ গিরিদরী
জাগুক গর্জনদৃপ্ত বিক্রান্ত কেশরী—
অমিত সে ভামতী ব্যঞ্জনা।
জাগুক জীবনভরা বৃহৎ মহৎ সম্ভাবনা।
তুষারসঙ্ঘাত থেকে জন্ম নিক নির্ঝর উৎসুক,
জড়ত্বের পশুনিদ্রা ভেঙে দিক চেতনাচাবুক।
শুধু পাশমুক্তি নয়
শাপমুক্তি আমার সাধন,
মৃত কাষ্ঠে মঞ্জরীরঞ্জন।

এ আমি কোথায় আছি—
একদিকে কতগুলি চীনী,
অন্যদিকে ভাসা-ভাসা ছিমছাম কজন মার্কিনী।
কোথা সেই সুপ্রিয় আত্মীয়
স্থানীয়, দেশীয়,
সত্য ভারতীয়॥

আপনার মেরুদণ্ডে সমুদ্ধত শুদ্ধ বলে বলী
দাঁড়াও হে তমোহর, দশদিক গৌরবে উজ্জ্বলি,
নিজের শক্তিতে দৃঢ়, সুসম্পূর্ণ, স্বাবলম্বে বাস,
নিজেতে নির্ভর করো নিজেতে বিশ্বাস।
নয় নয় দরিদ্রের শীর্ণ হাত পাতা
খুলে ধরা কীটদষ্ট মিনতির খাতা—
আমিই আমার পরিত্রাতা॥

স্ববলে পর্যাপ্ত আমি স্বধামে আসীন,
শুধুই স্বাধীন নই, স্বদেশে স্বাধীন॥

জৌর্মান

আহা, কী মনোরম বসন্তকাল। শীত প্রায় নেই বললেই চলে, গরমও ঠিক জেঁকে বসেনি এখনো. এরই মধ্যে ক্ষণিক বিরতির মতো এই বসন্ত। ভালো লাগবার কথা বইকি!

কবিরা বলেন, বসন্ত নাকি তারুণ্যের প্রতীক। শীত যেন জরার মতো জবুথবু ক'রে রাখে প্রকৃতিকে। বসন্ত এলে চারদিকে কেমন একটা আড়মোড়া ভাঙার আভাস। ধুলোপড়া শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে গাছ থেকে, সতেজ কচিপাতা দেখা দেয় ডালে ডালে। উত্তুরে হাওয়ার যে আক্রমণে বাড়ির উত্তরের দিকের জানলা-গুলো শীলমোহর ক'রে রাখার মতো অবস্থা হ'য়েছিল, হঠাৎ করে যেন তার মোড় ঘুরে গেছে। আজ আর সে আক্রমণ নয়, আমন্ত্রণ। দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে হঠাৎ-হঠাৎ ঢুকে পড়ে তার উচ্ছ্বাস.আর চঞ্চল ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো সশব্দে নেড়ে চেড়ে জানিয়ে দেয় তার উপস্থিতি। এদিকে মেঝের ওপর আড় হ'য়ে পড়ে রয়েছে একফালি রোদ্দুর. একটা চড়ুই সেখানে পায়ে পায়ে হেঁটে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার আপন খেয়ালে—জানলার পাশে আরেকটির আবির্ভাব ঘটতেই চলে গেল সে সরব উল্লাসে।

সমস্ত কিছু মিলে মিশে বেশ একটা রসঘন ভাব, তা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু, হায়, এ অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে না। সমস্ত দিনের হালকা আনন্দের ওপর কালো পর্দা টেনে সূর্য-দেব এক সময়ে অস্তাচলে গমন করেন, এবং তখনই শুরু হয় আমাদের দুঃখের পালা।

—মশা। চমকে ওঠবার কিছু নেই, ছন্দপতন ঘটলে আমি দুঃখিত, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, বসন্তকালের এই রাত্রিগুলো আমার কাছে বিভীষিকাময় হ'য়ে উঠেছে। মশা, হাজারে-হাজারে লাখে- লাখে মশা, ছোট-বড়-মাঝারী নানা সাইজের, সশব্দ কিংবা নীরব নানা-প্রকৃতির কোটি-কোটি মশা আমাকে আক্রান্ত-বিভ্রান্ত-দিশেহারা করে তোলে। তখন আমি কী করব, কোন কথা ভাবব, কোথায় যাব খেয়াল থাকে না একেবারে—সমস্ত চিত্ত মশার চিন্তায় ভরপুর—নিজের নামটা জিগ্যেস করলেও সঠিক উত্তর দেওয়া তখন হ'য়ে ওঠে অসম্ভব। তখন শিশুর কাকলী বিস্বাদ, রেডিওর স্বরলহরী বিরক্তিকর, বইয়ের পাতা নীরস এবং বন্ধুর সাহচর্য হাস্যকর। তখন কেবল হাত ওঠে হাত পড়ে, পা ওঠে পা পড়ে, সমস্ত শরীর ক্ষণে-ক্ষণে

পার্শ্ব পরিবর্তন করে—মনে হয় যেন ব্যায়াম করছি। ঘড়ির কাঁটা একটু ভদ্র-স্থানে এলে মশারীর মধ্যে আশ্রয় পাওয়া ছাড়া তখন আর দ্বিতীয় কিছু কাম্য থাকে না।

শরীরমনের যখন এইরকম অবস্থা, হঠাৎ মনে পড়ল শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি ছড়া। সমব্যথী পেয়ে উল্লসিত হ'য়ে উঠলাম, কবি লিখেছেন—

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!
বাঘ নয়, ভালুক নয়
নয়কো জাপানি
বোমা নয়, কামান নয়
পিলে কাঁপানি।
মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।...ইত্যাদি

এতদিনে বুঝলাম কোনো কবিতার অর্থবোধের জন্যে আমাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় কেন! এবারে মশক-বাহিনীর এই চর্মভেদী আক্রমণের মর্ম-ভেদী অভিজ্ঞতা না পেলে এ ছড়া কি আর কোনোদিনই তেমন করে উপভোগ্য হ'য়ে উঠত?

কবিতার কথায় আরো একটি কবিতা মনে পড়ে গেল আমার হঠাৎ, সেটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। ঠিক মশার ওপর লেখা না হলেও মশার ওপর কেউ যদি পাঠ্যপুস্তক-সুলভ 'এসে' লিখতে চান তবে তাতে 'সি, এফ' দিয়ে এ কবিতার অংশ বিশেষ বেমালুম উদ্ধার করে দেওয়া সম্ভব বলে আমার মনে হ'য়েছে। মশা যে কেমন নাছোড়বান্দা উৎপীড়ক তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেইভাবে একটু ভূমিকা রচনা করে নিয়ে 'সি, এফ' দিতে হবে এই অংশটুকু—(মশা যেন বলছে:)

নিত্যকালের সঙ্গী আমি যে
আমি যে রে তোমার ছায়া,
কিবা সে রোদনে কিবা সে হাসিতে
দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে
কভু সম্মুখে কভু পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে একাকী যখন
বসিয়া মলিন প্রাণে
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে,
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে
চেয়ে তোর মুখপানে।...

... ...

রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
দারুণ আলিঙ্গনে,
মোর যাতনায় হইবি অধীর
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে॥
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি
কেবল দেখিবি মোরে—
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধারঘোরে
কোথা হ'তে এক ঘোর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধরে॥...
(রাহুর প্রেম)

বলাবাহুল্য এই 'ঘোর উন্মাদ' ঠিক 'এক' নয়, অনেক—অনন্ত। এই সংখ্যা-তীত উন্মাদের উন্মাদনায় নিজেকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হ'তে দেওয়া ছাড়া আর যে কী করণীয় আছে ভেবে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু হঠাৎ—

হঠাৎ আমার দৃষ্টি (কড়িকাঠ গোনার অভ্যাসেই বোধহয়) গিয়ে পড়ল সিলিঙে, এবং তৎক্ষণাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, আছে—এ মর্মস্পর্শী হিংস্র আক্রমণ থেকেও আত্মরক্ষার কিছু উপায় আছে।

না, ডি ডি টি নয়, ওসব কাগুজে প্রস্তাব নিয়ে মাথা ঘামাইনে আমি; ডি ডি টি ছড়ানো এবং না-ছড়ানোর অনেক কেরামতী দেখেছি আমি গত কয়েক বছর; ওতে আর আস্থা নেই আমার। সিলিঙে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম আমি ফ্যান, মানে পাখা—যা ইলেকট্রিকে চলে। চুলোয় যাক বসন্ত, আর কটা দিন যাক, প্রাণপণে খুলে দেব আমার এই পাখা। বিষে বিষক্ষয়ের মতো পাখা দিয়েই ঐ পাখাওয়ালা প্রাণী মশাকে ঠেকিয়ে রাখব আমি দেহসীমান্তের বাইরে।

গরম পড়লে বাঁচি!

॥ নিশির ডাক ॥

খবরটা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মুখেমুখে সারা শান্তি-নিকেতনে ছড়িয়ে পড়তে মোটেই দেরী হ'ল না। আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো যে, গোঁসাইজীকে আর পাওয়া যাচ্ছে না......।

হ্যাঁ, আমি গুরুদেবের আমলের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তি নিতাইবিনোদ গোস্বামীর কথাই এখানে বলছি। এ ঘটনাটি তাঁরই জীবনে ঘটেছিল।

সময়টা ঠিক আমার মনে না থাকলেও কালটা যে ছিল গরম কাল তা আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে। শান্তি-নিকেতনে যাঁরা পড়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো গরমকালের রাত্রে ছেলেদের কান্ডকীর্তি সম্বন্ধে বেশ ভালোভাবেই বিদিত আছেন।

শান্তিনিকেতনের অসহ্য গরমের কথা হয়তো অনেকেই শুনে থাকবেন। কি প্রকারের দুঃসহ গরম সেখানকার

নন্দকুমার চক্রবর্তী

ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে নির্বিবাদে সহ্য করতে হয় তা বলা যায় না। অবশ্য এই গরমের জন্য কলকাতার তুলনায় সেখানকার গরমের ছুটিও দীর্ঘতর।

যাক্ ও-সব কথা।

এই প্রচন্ড গরমের জন্যে সেখানকার অনেক ছেলেই মাঠের মধ্যে চৌকী নিয়ে গিয়ে তার ওপরে বিছানা পেতে শুতো। এর ফলে ঘুমও যে তাদের নেহাৎ খারাপ হ'ত না একথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সব ছেলেই বিদ্যাসাগর বর্ণিত "গোপাল"-এর ন্যায় সুবোধ বালক ছিল না। বর্ণপরিচয় কন্ঠস্থ করা সত্ত্বেও তার মধ্যে দু'চার জন ছেলেও যে "রাখাল" বালকের ন্যায় ছিল না একথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। আর তা যদি নাই থাকতো, তবে বোধ হয় এমন কান্ড কখনোই হতে পারতো না।

গরমের জন্যেই হোক বা অন্য যে কোন কারণের জন্যই হোক "রাখাল" সম্প্রদায়ের যেসব ছেলে ছিল তাদের ঘাড়ে রাত্রিবেলাতে নিদ্রাদেবী মোটেই ভর করতেন না। ফলে সারা রাত তাদের জেগেই কাটাতে হ'ত। অবশ্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশে চাঁদ দেখে বা তারা গুনে নয়। জেগে থেকে হয় তারা মেকী ভূতের উৎপাত আরম্ভ করে দিত। নয়তো অন্যান্য ছেলেদের যেনো-তেনো প্রকারে ভয় দেখিয়ে রাত্রিটাকে রোমাঞ্চকর এবং উপভোগ্য করে তুলত। তাদের ভয় দেখানোর প্রধান পদ্ধতি ছিল—নিশির ডাক। অর্থাৎ কোন ছেলেকে তার খাটশুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে হয়তো একশো গজ দূরে আম বা শালবীথির মাঝখানে রেখে আসা এবং পরে তাকে আচমকা শিস, বন্দুকের আওয়াজ বা অন্য কোনরকম বিদঘুটে বন্য জন্তুর ডাকের সাহায্যে জাগিয়ে দিয়ে ভয় পেতে সাহায্য করা ও নিজেদের কৃতিত্বটাকে ষোল আনায় উপভোগ করা।

এই ছিল তাদের আনন্দ।

এই ছিল তাদের কাজ।

এমনিভাবে তাদের যখন দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়েই এক-দিন সকাল বেলায় গোঁসাইজীকে তাঁর গুরুপল্লীর বাড়ীতে পাওয়া গেল না। শুধু তাঁর বাড়ীতেই যে তাঁকে পাওয়া গেল না তাই নয়, তাঁকে সারা শান্তি-নিকেতনের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি যেন এক রহস্যের মধ্যে দিয়েই কোথায় উধাও হয়ে গেলেন। কেউ জানলো না......কেউ জানতে পারলই না......।

কিন্তু এ কাজ কার?

বোর্ডিংএর ছেলেদের?

না। তারা হয়তো বিদ্যাসাগর বর্ণিত রাখালের চেয়েও অধম হতে পারে, কিন্তু তাদের যে এ প্রকারের দুঃসাহস মরে গেলেও হবে না, হতে পারে না......একথা একবাক্যে প্রত্যেকেই মেনে নিলেন।

তবে? ..... তবে এ কাজ কার দ্বারা সম্ভব?

আর এখন তিনি আছেনই বা কোথায়?

এই দুটি মাত্র প্রশ্নই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের হৃদয়পটে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছিল। কিন্তু কে দেবে এর প্রকৃত সদুত্তর?

কোন জায়গাই যখন আর খুঁজতে বাকী নেই, তখন খেয়াল হ'ল সিংহ-সদনের কথা। যদিও সিংহ সদনের দরজায় সব সময়েই তালা লাগানো

> মাঝে মাঝে পাঠক-পাঠিকাগণের রচনা প্রকাশ করা শুরু হল এই বিভাগে। তাঁরা কেউ হয়তো লেখক কেউ-বা লেখক নন, কিন্তু সকলের রচনাতেই আমরা আশা করব একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্পর্শ।
>
> পাঠক-পাঠিকাগণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

থাকতো এবং সেই তালার চাবি একমাত্র কর্তৃপক্ষের কাছেই থাকতো, তবু সেখানে একবার দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কেননা, একাজ আর যারই হোক না কেন এ যে কোন মানুষের কাজ নয় একথা এক রকম প্রায় সকলেই বুঝে নিয়েছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে অসম্ভবই সম্ভব হওয়ার সম্ভাবনাতে সিংহ সদনে খোঁজার কথা সবার মনে হ'ল।

আশ্চর্য! পাওয়া গেল সেখানেই। তবে সে এক আরও আশ্চর্য অবি-শ্বাস্য ঘটনা। গোঁসাইজীকে পাওয়া গেল বটে, তবে সিংহ সদনের ভেতরে নয়, সিংহ সদনের ছাদের ওপর থেকে সংজ্ঞাহীন ভূলুন্ঠিত অবস্থায়।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সিংহ সদনের বাইরের দিক দিয়ে ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি আছে বটে কিন্তু সিঁড়িটি এতই অপ্রশস্ত যে সাধারণ লোকের পক্ষেই ঐ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা দায়; তা আবার গোঁসাইজীর মতন বিরাট স্বাস্থ্যবান সুদীর্ঘ পুরুষের ওঠা তো একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু অসম্ভব হলেও তা সম্ভব হয়েছিল এবং তা এক গুরুতর কারণে।

গোঁসাইজীর মুখ থেকেই পরে শুনেছিলাম, সেই রাত্রে তিনি নাকি মাষ্টারমশাই-এর (নন্দলাল বসু) ডাক শুনেছিলেন। মাষ্টারমশাই গোঁসাইজীকে নাকি তাঁর নাম ধরে বার দুয়েক ডেকে-ছিলেন। আর সেই ডাকেই সাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর ওই দশা হয়েছিল......।

বলা বাহুল্য, পরে মাষ্টারমশাই-এর কাছ থেকে শোনা গিয়েছিল যে, তিনি নাকি সেদিন গোঁসাইজীর বাড়ী গুরু-পল্লীর দিকেই যাননি।

তবে? তবে এই কি সেই নিশির ডাক যে ডাকের মজার মজার লোমহর্ষক রোমাঞ্চকর গল্প ছেলেবেলাতে ঠাকুরমার কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে শুনতাম আর ভয় পেলে পর ভয়ার্ত ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠতাম—

"ঠাকুমা বড্ড ভয় করছে......"

শান্তিনিকেতনের ছেলেদের কাছে এ বিষয়ে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

অগ্নিদ্রুম

উমা দেবী

তোমরা প্রস্তুত হও—আসন্ন আগামী দিন।
দিনান্তের সূর্য দেখ মেঘে অন্তর্লীন।
শীতল পার্বত্য রাত্রি অন্ধকারে ক্রমশ ঘনায়
প্রভাত-প্রত্যাশা যেন অন্তর্হিত-প্রায়।

তবুও প্রস্তুত হও—আগামী দিনের
স্বপ্নাঞ্জন চক্ষে নিয়ে। প্রীতি নবীনের
শক্তিকে হৃদয়ে গাঁথ। জীবনের যন্ত্রণা যদিও
অসহ্য হয়েই ওঠে, তবু রেখে দিও
জয়লিপ্সু সহিষ্ণুতা। কারণ এ বিশাল ভারত—
মূল এর সুপ্রোথিত। এর জয়রথ
উড়িয়েছে স্বর্ণধ্বজা সভ্যতার প্রথম প্রত্যূষে।
জ্বলাগ্নি সূর্যসম মুহূর্তে গণ্ডূষে
শুষে নিতে পারে এও যন্ত্রণার সমুদ্রকে নিশ্চিত আবার—
এ দেশ প্রাচীন আর শক্তিমান দুঃখেও দুর্বার।

তবুও প্রস্তুত হও—আত্মার সৌরভময় জীবনের
রাজটীকা নিতে,
গাঁথ অভিনব মাল্য রক্ত-ঝরা পেশীতে পেশীতে।
—অন্ধকারে দেখ অগ্নিদ্রুম
ছড়ায় চৌদিকে তার রক্তাক্ত কুসুম।

তৃষ্ণা

ভাস্কর দাশগুপ্ত

সাগর শুষেও মেটে কি কখনও তৃষা?
ডুব দিয়ে আছি বাসনার কালীদহে
কাছে পেলে তবু অনন্ত ভালবাসা—
বাড়িয়েছি হাত, ভুলেছি মিথ্যামোহে।

দিন চলে যায় রাতের শরীর কাঁপে
মায়াবী নিশীথে তনুমন বিহ্বল।
জ্বলেছি বৃথাই বাসনার উত্তাপে,
অশ্রু নদীর স্রোতটুকু সম্বল।

জলের সাগরে পিপাসু চাতকাসু
রাত্রির স্বরে জীবনের আশ্বাস—
শুনি চিরদিন। সময়ের স্রোতে ম্লান
হয় নাকো কভু সৃষ্টির সম্মান ॥

উপহার

কমলেশ চক্রবর্তী

তাকে বললাম, ভালোবাসি ব'লে
সিন্দুকে রাখি গন্ধের উপহার,
মান্দাসে যদি স্থানাভাব হয়
না হয় অন্য কোনোদিন আর

যাবো তোমাদের গ্রামের আকাশে
ছিটোতে ছিটোতে কিছু কলকাতা
কিছু গ্রীষ্মের বিবর্ণ ধুলো
উপহার নিয়ে অনন্য ব্যথা।

তাকে বললাম, বেহালা বাজাবে,
মরকত মণি লাঞ্ছিত বিভা
দীপ্র নয়নে উত্তাল বেগ
সান্দ্র সারণি তার সন্নিভা।

শেষ কথা বলি, ভালোবাসি ব'লে
একদিন যাবো ক্লান্ত চরণে
কলকাতা ছেড়ে তোমার অখিল
কৃত্তিকাময় মন স্মরণে॥

চলো এক সাথে

একাঙ্কিকা — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথম দৃশ্য—বন প্রান্ত

ভূশণ্ডি কাক ও ভূশণ্ডিনী

স্ত্রী—গেলাম গেলাম!—তেষ্টায় গলা থেকে পেট পর্যন্ত শুকিয়ে গেল—এমন ক'রে কতদিন আর বাঁচবো।

পুং—মাগীর ঠাট দেখ। এই একটা আস্ত কেঁদো মোষের রক্ত ঘাঁটিয়ে এলি, এখনই এত তেষ্টা।

স্ত্রী—ওই ছিঁটে-ফোঁটা—ওতে পেটও ভেজে না। ওতে তেষ্টা মিটবে? ধর্মত বল তুই, তুইও তো খেয়েছিস একটা মোষের রক্ত, তোর তেষ্টা মিটে গেছে? ভুলে গেছিস কি সেকালের কথা—সেই শুম্ভ-নিশুম্ভের কথা, গজ-কচ্ছপের লড়াইয়ের কথা। তেমন কি এমনি এক ফোঁটা রক্ত পেয়েছিস? তারপর কুরুক্ষেত্র! সেও ছিল বিরাট রক্তগঙ্গা—তাতে তোর পেট ভরুক না ভরুক—গলা শুকোতো না।

পুং—ও সব স্বর্ণযুগের কথা ভুলে মন খারাপ ক'রে কি হবে? সে সুখের দিন কি আর আসবে? এখন লোক-গুলো হ'য়ে উঠেছে দারুণ রক্ত-কৃপণ। কি নিজের কি পরের রক্ত ছাড়তে চায় না। তখন মানুষে রক্ত খরচ করতো দরাজ হাতে। একটা কথার জন্য ছেলে কেটে দিতে দ্বিধা ক'রতো না! আর এখন? এখন ছেলে কোন ছার—একটা পাঁঠা কেটে দিতে দশ দিন ব'সে হিসেব করে—তাতে লাভ দাঁড়াবে কি না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরও কিছুদিন ছিল বেশ। ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হ'য়ে ছোট ছোট রাজ্য হয়ে গেল, সহদেবের বংশীয়েরা মগধে এক রাজ্য বসাল। সে রাজ্য বড় হোল, সেখানে একটার পর একটা নূতন বংশ রাজা হ'ল। তারমধ্যে শিশুনাগ বংশে বিম্বিসার বেশ চালাল। ছোট-খাট হলেও যুদ্ধ-টুদ্ধ করলো, রক্তের ছিটে-ফোঁটা পেলাম আমরা। বিপদ করলো তার কাছে শাক্য গৌতম এসে। সেদিনও কেটে গেল; অজাতশত্রু রাজা হয়ে নেড়া বৌদ্ধদের তাড়ালে। তখন যুদ্ধের ছিঁটে-ফোঁটা রইল। তার কিছুদিন পরে এল চন্দ্রগুপ্ত। তার পৌত্র অশোক খাসা ছেলে! রাজা হয়েই রক্তের নদী বইয়ে দিলে কলিঙ্গে। মনে আছে তো কী আনন্দ হল আমাদের? কিন্তু কলিঙ্গ জয় করেই তার যুদ্ধ-ফুদ্ধ শুকিয়ে গেল; শাক্য গৌতমের চেলা হ'য়ে সে রক্তপাত বন্ধ করল—কেবল নিজের রাজ্যে নয়—দেশে বিদেশে নেড়া ভিক্ষুদের পাঠিয়ে সে সব দেশে অহিংসার বাণী প্রচার ক'রলো। সেই থেকে—সেই থেকে তোর আমার এই দুর্দশা—রক্তের তৃষ্ণায় মারা যেতে হয় বুঝি আমাদের।

স্ত্রী—এমন ক'রে আর বাঁচা যায় না। চল আমরা দুজনে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরি।

পুং—উহুঁ সে হবার নয়। ব্রহ্মার বরে আমরা যে অমর। আগুনে ঝলসে পুড়ে তবুও বেঁচে থাকতেই হবে। কী বুদ্ধি ঠাকুরের! অমন ক'রে কী উপকার ক'রলেন আমাদের!

স্ত্রী—তবে? তবে কী উপায়?

পুং—উপায়? দাঁড়া (দূরের দিকে চাহিয়া) মনে হ'চ্ছে হবে বুঝি উপায়—বিধাতা করুণাময়—হ্যাঁ— আশার আলো দেখছি একটু।—ঐ দেখছিস—উই—বিশ্বামিত্র আশ্রম। মধুচ্ছন্দা ঋষি ব'সে আছেন ধ্যানে। দলে দলে দেশ-বিদেশের লোক—রাজা, অমাত্য পরিষদ ভিড় ক'রে চলেছে ওখানে।

স্ত্রী—কী করবে ওরা?

পুং—ওরা গেছে যুদ্ধের থেকে, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার পরামর্শ নিতে।

স্ত্রী—এই তোমার আশার আলো! যুদ্ধ যদি থেমে যায় ওদের, তাতে আমাদের কী?—না খেতে পেয়ে মরবো—না, না, না মরতেও তো পার না। এমন পোড়া কপাল!

পুং—আ—হা—এতদিন দেখে এই শিখলি? দেখিস না, দেখিস নি বার-বার? যখন রাজারা ঘটা করে সভায় ব'সে যুদ্ধ বন্ধ ক'রতে—তখনি যুদ্ধ লাগে! মনে আছে কুরুক্ষেত্রের আগে শ্রীকৃষ্ণ গিয়েছিলেন হস্তিনাপুরে, যুদ্ধ থামাতে—শুধু পাঁচখানা গ্রাম ভিক্ষা নিয়ে। চটপট লেগে গেল যুদ্ধ, দুর্যোধন তো তখনই বধ করতে যায় কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ তাঁর বিভূতি দেখিয়ে—ভেল্কী ক'রে দেখালেন বিশ্বরূপ! তাতে ভড়কে গেল দুর্যোধন—কৃষ্ণ হঠাৎ হাওয়া হ'য়ে গেলেন। তারপর আর কী? লেগে গেল মহারণ। এমনি বরাবর হয়। এখানে এতগুলো রাজা-গজার মেলা—এতে যুদ্ধ না হ'য়ে যায় না। চলু একটু কাছে গিয়ে দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান ও পশ্চাতে বৃক্ষশাখায় উপবেশন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিশ্বামিত্রের আশ্রম—

(অন্ধকারের শেষ প্রান্তে spot-light-এ ক্রমশঃ ফুটে উঠলো ধ্যান-মগ্ন মধুচ্ছন্দা ঋষি। স্টেজের সম্মুখ-ভাগে ধ্যান-ভঙ্গের প্রতীক্ষায় বসে আছেন শিষ্য অন্তেবাসীগণ, বহু রাজা, অমাত্য, বহুলোক। ঋষি চোখ মেলে চারদিকে চাইলেন, তারপর শিষ্যদের দিকে চেয়ে বল্লেন)

"শোন বৎসগণ, শোন। ধ্যানে দিব্য-নেত্রে দেখছি ভারতবর্ষের যে মাতৃ-রূপ; তোমরাও দিব্যনেত্র খুলে দেখতে চেষ্টা কর। অপরূপ সে রূপ। শীর্ষে হিমাচলের ধূসর রেখা ধ'রে চলেছে মেঘের রূপে ঘনকৃষ্ণ কুন্তল—বায়ুতাড়িত হয়ে তার অগ্র-ভাগ পূর্ব ও পশ্চিমের সাগর স্পর্শ করে নাচছে। কণ্ঠে জ্বলজ্বল করছে মুক্তার মত সাতলহরে পশ্চিমের সপ্তসিন্ধু। মধ্যভাগে শোভা পাচ্ছে বিন্ধ্যগিরি, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা মেখলার মত। বক্ষে মণিহার—গঙ্গা, যমুনা, গণ্ডকী, কুশী, গোমতী, ঘর্ঘরা—অগণিত স্রোতস্বিনী। সুদূরে দক্ষিণে কন্যাকুমারী রূপে তিনি আলস্যে চরণ আন্দোলিত করেছেন, তার দক্ষিণ ও বাম হ'তে দুই মহা-সিন্ধু তাঁর চরণ মৃদুমন্দ আন্দো-লিত ক'রছে।—আহা কী দেখলাম! নমো মাতা ভারত! নমো নমোঽস্তুতে!

১ম শিষ্য—দেব, আপনার মুখে শুনতে চাই এ'র ইতিহাস। যদি দয়া করেন।

মধু—শোন, এককালে ভারত ছিল না। আজ যা ঐশ্বর্যময়ী ভূমি, সেকালে সে ছিল দুর্ভেদ্য গহন বন। ছিল না ভারত রাষ্ট্র—ছিল শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যের অধি-কারে। তারা ছিল একদিকে শ্বাপদের অত্যাচারে পীড়িত আর একদিকে দস্যু, অনার্য ও দাস-জাতিদের দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আক্রান্ত।

শেষে আর্য রাজন্যগণ রাজা ভরতের নেতৃত্বে সমবেত হ'য়ে বিপুল বিক্রমে লড়লেন মহাসংগ্রাম। সুবিনীত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল—ভরত হলেন তার

সার্বভৌম সম্রাট—সমস্ত দেশের নাম হল ভারতবর্ষ।

তারপর যুগের পর যুগ চ'লে গেল। ভরতের বংশধরগণ করলে ভারতবর্ষের গৌরব ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই বংশের যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের সহায়তায় করলেন বিশাল ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তারপর এলেন পরাক্রান্ত পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়—তাদের হাতে ভারতের গৌরব আরও বেড়ে গেলো; দেশের পর নূতন দেশ ভারতবর্ষে যুক্ত হ'ল বা ভরত-বংশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রলো। সেই বিশাল ভারতের মাতৃমূর্তি আমার ধ্যাননেত্রে ফুটে উঠেছে—

জয় ভারতের জয়!

সকলে—জয় ভারতের জয়।

কৌশাম্বীপতি—দেব, আমি সেই ভরতের বংশধর। গঙ্গা-যমুনার প্রবল প্রভাবে একদিন হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ যখন ধ্বংস পেল, তখন আমার পূর্বপুরুষেরা সেখান থেকে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের কাছে রাজধানী নিয়ে এসে রাজ্য শাসন ক'রতে লাগলেন। কিন্তু আমার রাষ্ট্র আজ চারিদিক থেকে শত্রুবেষ্টিত। পশ্চিমে প্রতীপ-নন্দন বাহ্লীকের রাজ্য চ'লে গেছে সুদূর পশ্চিমের যবনের হাতে। যবন সম্রাট সেকেন্দর তাঁর রাজ্য বিস্তার ক'রে বাহ্লীকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলেন ক্ষত্রপ সিলিউকাসকে। তার জীবনান্তে সে রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লো,—সেগুলি ভ'রে গেল যবন, শক ও হূণ প্রভৃতি জাতীয় লোকে। সেই সব রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে ভরত বংশীয়ের—পরীক্ষিৎ ও জনমেজয়ের রাজ্যকে, মূষিকের দল যেমন দন্তাঘাত ক'রে পুপ বা পিষ্টককে গ্রাসে গ্রাসে ছেদন করে, তেমনি আমাদের রাষ্ট্র গ্রাস ক'রতে থাকলো!—ভরতের প্রতিষ্ঠিত যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়ের বিপুল রাষ্ট্রকে ক্ষয় করে দিল। পূর্বদিক হতে হ'ল মগধের সহদেব বংশ উৎখাত করে নূতন নূতন বংশের অভ্যুদয়—চন্দ্রগুপ্ত, অশোকবর্ধনাদি বিরাট সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রে ভারতবর্ষকে গ্রাস করলো। তাই এখন আমার পরিচয় শুধু কৌশাম্বীপতি! ভারতবর্ষের অধীশ্বর নয়। এমনি ক'রে দক্ষিণ ও পশ্চিম হ'তে শবর গুর্জর মলয় প্রভৃতি জাতি আক্রমণ চালাল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে লিচ্ছবি হূণাদি জাতি ক্রমে ক্রমে বিরাট ভূখন্ড জয় করে নিল। আজ ভারতরাষ্ট্র নামে মাত্র পর্যবসিত—অন্তর্দ্বন্দ্বে এ আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আদি ভারতবর্ষ এখন ক্ষুদ্র কৌশাম্বীতে তার ছায়াপাত মাত্র বহন ক'রছে। এখনো পশ্চিম হ'তে যবন-রাজ প্রবল বিক্রমে আক্রমণ ক'রছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ দুর্বল কৌশাম্বী এর প্রতিরোধ করবার উপায় খুঁজছে—তাই উপদেশ নিতে এসেছি বিশ্বামিত্র-বংশধরের কাছে।

(আর্য-সৈন্য সহ অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।)

আশ্রম পুরুষ—কে আপনি মহাভাগ?

অগ্নিমিত্র—আমি মহারাজ পুষ্যমিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র—শ্রীঅগ্নিমিত্র।

আঃ পুঃ—মালবাধিপতি?—

অগ্নি—এ অকিঞ্চনের সে পরিচয়ও আছে; কিন্তু আমার প্রধান পরিচয় আমি পুষ্যমিত্রের বংশধর।

আঃ পুঃ—স্বাগত রাজন, পাদ্য ও অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। (পাদ্য ও অর্ঘদান) আপনার শুভাগমনের প্রয়োজন?

অগ্নি—মহাতাপস ঋষি মধুচ্ছন্দাকে আমার ও আমার পিতার শেষ সন্দেশ বিজ্ঞাপন ও প্রণাম নিবেদন ক'রতে এসেছি।

আঃ পুঃ—আপনি ক্ষণেক বিশ্রাম করুন। ঋষিবর এখন ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান-ভঙ্গে আপনার সংবাদ জানাব। আপনি কি এখন মগধ থেকে আসছেন?

অগ্নি—না কাশ্মীর ও সিন্ধুর রাজগণ আমার পিতাকে আহ্বান করেছিলেন তাদের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার সহায়তা করতে, তাই পিতার আদেশে আমি মালব থেকে গিয়েছিলাম।

কো—আপনি নিশ্চয় কৌশাম্বীর পথে গিয়েছিলেন। আমি কৌশম্বী-রাজ—আমি কোনও সংবাদ পাই নি তো।

অগ্নি—না, আপনার রাজ্যে আমি যাইনি। সংবাদ পেয়েছিলাম আপনি কাশ্মীর ও সিন্ধুর অনুকূলে নন, তাই আপনার রাষ্ট্রে আমার বাধা পাওয়ার আশঙ্কায়, সে পথে না গিয়ে উত্তরের গিরিসংকুল পথে গিয়েছিলাম।

কো—শত্রুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন? যুদ্ধ হয়েছে কি?

অগ্নি—শত্রুদের মধ্যে চীন ও হূণদের সাক্ষাৎ পাইনি, তারা আমার আসবার বার্তা পেয়েই পর্বত-বন লঙ্ঘন ক'রে এমন দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে পলায়ন ক'রে গেছে যে তাদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষার অবসর পাই নি, কিন্তু পশ্চিমের পর্বত ভেদ ক'রে গিয়ে দেখা পেয়েছিলাম বাহ্লীকের ক্ষত্রপের যবন বাহিনীর। তাদের একেবারে স্বদেশে পার ক'রে রেখে এসেছি।

কো—ধন্য ধন্য রাজন্, আপনি আমার প্রতি বিশেষ সহৃদয়তা না দেখালেও আমার প্রভূত উপকার ক'রেছেন। আমার ও কৌশাম্বীবাসীদের অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।—আমিও এই শত্রুদের অগ্রগতিতে বিচলিত হ'য়েই এখানে এসেছি; বিশ্বামিত্র-নন্দনের আদেশ ও আশীর্বাদ লাভের আশায়।

অগ্নি—(উচ্চহাস্য) হা হা, মহারাজ, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার শঙ্কায় আপনি এসেছেন ঋষির আশ্রমে অধ্যাত্ম শক্তি ভিক্ষা ক'রতে। কিন্তু মহারাজ, সে দিন কখনো ছিল কিনা জানি না, তবে আজ নেই; অধ্যাত্ম বলে রাজ্য রক্ষা বা শত্রু বিনাশ আর হয় না। হয় বাহুবলে (কৃপাণ আস্ফালন করিয়া) এই তরবারির বলে। এরই বলে আমার পিতা চারিদিকে শত্রু জয় ক'রে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। তাঁর ও দেবগণের আশীর্বাদে আমিও এই কৃপাণের বলেই রাজ্য রক্ষা করবো আশা করি।

কো—হুম্—এখনও যুবক আপনি তাই বাহুবলের উপর, শক্তির উপর এই চরম আস্থা। কিন্তু যখন বয়স হবে তখন বুঝবেন এই শেষ নয়; আত্মার শক্তি ও দেবতার আশীর্বাদ পশ্চাতে না থাকলে শুধু বাহুবলে কিছুই হয় না।

অগ্নি—কিন্তু বাহুবলেই আপনার পূর্বপুরুষ পান্ডবগণ ও পরীক্ষিৎ জনমেজয়াদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, আধ্যাত্মিক বলে নয়।

কো—কিন্তু অতুলনীয় বাহুবল ও শক্তিসম্ভার নিয়েও রাক্ষসরাজ রাবণ পরাভূত হ'য়েছিলেন অজিনধারী রাম-লক্ষ্মণ ও বানর সেনার কাছে।

অগ্নি—রাম-লক্ষ্মণ অজিনবাস ছিলেন, কিন্তু দুর্বল ছিলেন না। বানর সেনার অপূর্ব পরাক্রম ও অমিত শক্তির বহু পরিচয় আছে। মহারাজ, এ ভ্রান্তি পরিত্যাগ করুন। শক্তির সাধনা করে পরাক্রম দেখিয়ে রাজ্য রক্ষা করুন; যাগযজ্ঞ ও মন্ত্রশক্তির বলে নয়। দৈবশক্তি চিরদিনই পরাক্রমের সহায়, দুর্বলের নয়।

আঃ পুঃ—কিন্তু মালবরাজ, ভাল ক'রে ভেবে দেখেছেন কি? শস্ত্রের বলে যুদ্ধ জয় করেও প্রতি যুদ্ধেই জেতা ও বিজেতা উভয়েরই কেমন সর্বনাশ হয়েছে? স্মরণ করেছেন কি, কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধ অন্তে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ; কৌরবের পুরুষ

সব নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে রইলো শুধু বিধবাদের হাহাকার; ধার্তরাষ্ট্রগণ পরাজিত, কিন্তু বিজয়ী পাণ্ডবদেরই বা কে রইল? শুধু উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিৎ! বংশ রক্ষা হ'ল, কিন্তু যথাসর্বস্ব নাশও হল। রাজ্যের বিশাল ভূমি রইল, কিন্তু শুধু ভূমিই রইল। তাতে না রইলো লোক না রইল শ্রী। অশ্বমেধ যজ্ঞ হ'ল, চারিদিকে বহুরাজ্য জয় হলো পাণ্ডবদের শক্তিবলে, কিন্তু তারপর পাণ্ডবেরা রাজ্যের দিকে চেয়ে দেখলেন বিরাট শূন্য। বৈরাগ্যে অন্তর পূর্ণ হ'ল, তাই তাঁরা যাত্রা ক'রলেন মহাপ্রস্থানের পথে। পাণ্ডবেরা পাঁচখানা গ্রাম চেয়েছিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন সেই প্রার্থনা নিয়ে। দুর্যোধন তাতে কার্মুকে টঙ্কার দিয়ে ব'লেছিলেন, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী! আপনারই মত কৃপাণ আস্ফালন ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে অপমান, চাই কি, হত্যা করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন। হ'ল যুদ্ধ—সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল, জয়ী ও বিজিত সবাই নিঃশেষ হ'য়ে গেল, রইল শুধু একটি গর্ভস্থ ভ্রূণ।

এমনি হয়েছে চিরদিন। রাবণের স্পর্ধিত বাক্য স্মরণ করুন। কালনেমীর উপদেশও অগ্রাহ্য ক'রে জানকীকে মুক্ত না করে রামকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কী হল? নির্মূল হ'য়ে গেল রাক্ষসকুল। তারপর যুদ্ধ-জয়ী রাঘবের হল কী? সীতা নির্বাসিত—লক্ষ্মণ পরিত্যক্ত। অযোধ্যাপুরী শূন্য। ভূশণ্ডী কাকের যে উপাখ্যান, তাতেও কি এই উপদেশ নেই? শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে যতগুলি মহাযুদ্ধ হয়েছে তাতে উল্লসিত হয়েছে শুধু ভূশণ্ডী, অপর্যাপ্ত রক্তপানের আশায়। এত রক্ত পান ক'রেছে তবু তৃপ্তি হয় নি ভূশণ্ডীর। জানবেন রাজন্, যেখানে যে যুদ্ধ হয়েছে তার পশ্চাতে আড়ালে র'য়েছে এই ভূশণ্ডীর রক্ততৃষ্ণা। আপনারা কি রাজ্য কি গৌরব কি দেশজয় যে উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে অগ্রসর হন, শেষে তৃপ্তি আপনাদের হবে না, হবে ভূশণ্ডীদের।

ন—এ এক নূতন বেদ প্রবর্তন করেছেন আপনি—তবে ক্ষাত্রধর্মটা কিছুই নয়। (হাস্য)

কৌ—আপনাদের মত যুবকের মস্তিষ্কে যেটা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে সেটা শুধু হিংসার আগুন—সেটা ক্ষাত্রধর্ম নয়। ক্ষাত্র-ধর্ম রক্ষার ধর্ম, হিংসার নয়—আততায়ীর বাহুবলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, দুর্বলকে রক্ষা করা, পীড়িত প্রজাকে রক্ষা করাই ক্ষাত্র-ধর্ম, নির্বিরোধীকে অযথা আক্রমণ করা নয়। আপনি যে আক্রান্ত দুর্বল রাজ্যকে রক্ষা করতে সমগ্র আর্যাবর্ত অতিক্রম ক'রে কাশ্মীর ও সিন্ধুকে হিংস্র চীন ও হূন ও যবনকে নিবৃত্ত ক'রে আতঙ্কিত রাজগণকে সহায়তা ক'রতে গিয়েছিলেন, তখন সার্থক কৃপাণ ধারণ ক'রেছিলেন, প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম পালন ক'রতে গিয়েছিলেন, ক্ষত্রিয়ের গৌরব, বিজয় পতাকা নিয়ে আপনার পিতৃকুলকে ধন্য ক'রেছিলেন—আমাকে এই সভায় আক্রমণ ক'রলে সে গৌরব ধূলায় লুটিয়ে যাবে।

শাস্ত্রে বলে হিংসা করো না, কিন্তু যে আততায়ী—অগ্নিদ, গরদ, কিম্বা শস্ত্রপাণি কি ধনাপাহারী যে, সে আততায়ী—আর সে আততায়ীকে গ্রহণ করবার বিধি হ'চ্ছে—হন্যাদেব অবিচারয়ণ্—বিনা বিচারে তাকে হত্যা ক'রবে। যে তোমাকে বা তোমার দেশকে আক্রমণ করে, তাকে হত্যা ক'রবে, তা হ'ক না সে গুরু কি পূর্ব মিত্র। —এটা সবার ধর্ম—ক্ষত্রিয়েরও ধর্ম—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিশেষতঃ আর্তত্রাণ, প্রজা রক্ষা ও শরণাগতের রক্ষায়ও এই ধর্ম।

অগ্নি—এই তবে আপনার বক্তব্য। পাষণ্ডী আপনি। জানেন? আমার পিতার সংকল্প এই পাষণ্ডীদের নির্মূলে ক'রে উচ্ছেদ করতে হবে। তাঁর এই সংকল্প সিদ্ধ করবার জন্য আমি সারা জীবন উৎসর্গ করবো।

কৌ—এ সংকল্প আপনারই প্রথম নয় মালবরাজ। দেবদত্ত এই ব্রত নিয়ে মুক্ত কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হয়েছিলেন, বৌদ্ধ বিনাশ করতে। তারপর বহু রাজা ধর্মের ধ্বজা নিয়ে এসেছিলেন এই ধর্ম ধ্বংস করতে। রক্তস্রোত বয়ে গেছে তাতে, শুধু আর্যাবর্তে নয়—শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বের বহু রাজ্যে বহু দেশে। কিন্তু সদ্ধর্ম ধ্বংস হ'য়েছে কি?

অ—এখনো হয়তো হয় নি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস এখনও শেষ হয় নি। মহারাজা পুষ্যমিত্র বৌদ্ধ নিধনে সবে ব্রতী হ'য়েছেন! তাঁর বংশধর আছি আমি! (হাসিয়া) দেখেই নিন না আমরা কী ক'রতে পারি!

কৌ—কিন্তু ধর্মধ্বজিদের বংশের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। সদ্ধর্ম মরেও বেঁচে উঠেছে। পুরাণে, তন্ত্রে রক্তবীজের কাহিনী শুনেছেন, জীবের অন্তরে যে সত্যের প্রাণ আছে, সে এই রক্তবীজের মত। শীতের চাপে, প্রখর রৌদ্রের তাপে মরে যায়, পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় গাছের পাতা, সবুজ ঘাসের লজ্জাবরণ পৃথিবীর—কিন্তু তার ভিতরকার যে জীবন, যে প্রাণপদার্থ, সে বেঁচে থাকে। ফাল্গুনের প্রথম অনুকূল বায়ুর নিঃশ্বাসে সে আবার অংকুররূপে উঁকি মারে; দগ্ধ-তৃণের ফাঁকে ফাঁকে বেড়ে উঠে আবার পৃথিবীকে আবৃত করে। এই কি নিত্য ঘটছে না? এমনি ক'রে বারে বার মৃত্যুর পায় পায় ছুটে আসে সত্যের জীবন, অংকুর ক্রমে হয়ে ওঠে বিশাল মহীরুহ। অতীতের বিম্ব প্রসারিত করে বর্তমানে। এই কি সত্য নয়? এই সত্যই কি জগতে বারংবার যুগে যুগে কল্পে কল্পে আত্মপ্রচার করে না? পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ক্ষত্রিয়কে নির্মূলে করবেন। বারংবার ক্ষত্রিয়রক্তের বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত করেছিলেন। ক্ষত্রিয় মরে নি—মরেও সে বারবার বেঁচে উঠেছে—তার বংশ কেবলই বেড়ে গেছে! আর পরশুরাম?........ তাঁর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের আশায় তিনি দেশে-বিদেশে যে শত শত তীর্থ-সলিলে স্নান করেছিলেন, সেইগুলি শুধু বেঁচে আছে তাঁর পাপের সাক্ষী হয়ে—

পরশুরাম নাই—নাই তাঁর কুঠার বহন করবার কেউ—এসেছে মাঝে মাঝে নব নব অনুকারী ধ্বংসাবতার ধ্বংসের ব্রত নিয়ে—আর, তাঁরই মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয় আজও বেঁচে আছে।—প্রকৃত ক্ষাত্র-ধর্মের সার সত্য যা তা আজও বেঁচে আছে,—লোকরক্ষার আতত্রাণের শত লক্ষ আয়োজনের মধ্যে। তেমনি রাবণের রাজ্যে আজ প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম, যেখানে মঠে মঠে ধ্বনিত হচ্ছে মন্ত্র—ওম্ মণি পদ্মে হুম্—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘম শরণং গচ্ছামি।

অগ্নি—(তরবারি আস্ফালন)— পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী এখানে এসেছে পাষণ্ডীধর্ম প্রচার করতে। নিষ্ক্রান্ত হও, নইলে এই মুহূর্তে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করবো।

ভূষণ্ডী—লাগ্ লাগ্ লাগ্—দেখছিস বুড়ী? কী বলেছি?...নারদ! নারদ! (কৌশাম্বীপতির অংগরক্ষীরা বর্শা তুলিয়া অগ্নিমিত্রের দিকে অগ্রসর হইল। সংগে সংগে অগ্নিমিত্রের সশস্ত্র অনুচরেরা অগ্রসর হইয়া আসিল।। ধ্যান হইতে জাগিয়া মধুচ্ছন্দা)—ক্ষান্ত হও।

আশ্রম পুরুষ—ক্ষান্ত হউন রাজগণ—এটা ঋষির আশ্রম, শান্ত হয়ে না থাকতে পারেন নিষ্ক্রান্ত হ'ন।

মধু—শোন সবাই শান্ত হ'য়ে, দীর্ঘ তপস্যান্তে আমি যে মন্ত্র লাভ ক'রেছি তা শোন। তোমরা যে-সব সমস্যার সমাধান চাও তার উত্তর এই মন্ত্রে পাবে—ভারতবর্ষের মুক্তি, শান্তি ও ঋদ্ধি তোমরা চাও, তার উত্তর এই মন্ত্রে। এ ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়! হে রাজন্যগণ, এই মন্ত্র একটা সাধারণ নির্দেশ দিচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবন ও রাজ্যপালন যজ্ঞের সুষ্ঠু সাধনের। শুধু তোমাদের নয়, সমস্ত জগতের সকল প্রকার অভ্যুদয় সাধনের এই মন্ত্র—এতেই জগতের মুক্তি, জগতের লক্ষ্য লাভ। তোমরা প্রস্তুত হয়ে শোন।

সঙ্গচ্ছধ্বং সম্বদধ্বং সম্বো মনাংসি
জানতাম
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ
সমাসং মন্দ্রমভিমন্দ্রয়েবঃ সহচিত্ত
মেষাং।
সমানং বো হবিষা জহোমি
সমানী বঃ আকূতিঃ সমানা
হৃদয়ানি বঃ
সজ্ঞানন্তু বো মনো যথাবো
সুসহানতি।

মীমাংসক—(অগ্রসর হইয়া) হে মহাভাগ, আমি কিছু নিবেদন ক'রতে পারি কি?

মধু—বল।

মীমাংসক—এ নির্দেশ বেদ দিচ্ছেন কাকে? শ্রৌত-যজ্ঞের বহু ঋত্বিককেই কি এর দ্বারা একবাক্য একমন্ত্র হবার নির্দেশ নয়? অন্যত্র এর প্রয়োগ আছে কি?

মধু—যজ্ঞের জন্য এ নির্দেশ, সত্য। কিন্তু সমগ্র জীবনটাই যে যজ্ঞ। বিশেষ, রাজার রাজ্য পালন একটা যজ্ঞ। সে যজ্ঞেও এই বিধি প্রয়োগ হবে। সকলে এক মন এক বাক্য হ'লেই এই যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে পালন করা হবে।

মী—তাহলে এটা কি কেবল রাগপ্রাপ্তের নির্দেশ নয়—অর্থবাদ নয়?

মধু—না, এটা বেদের বিধি—অর্থবাদ নয়।

অগ্নি—হে দেব, আপনার কাছে যে মহামন্ত্র আমরা লাভ করলাম, তাতে আমরা ধন্য! আমি নিবেদন করি, আমার পিতৃদেবের জীবনও এই মন্ত্রেই নিয়মিত। সমগ্র ভারতে আজ খণ্ড খণ্ড রাজ্য, তাদের এক পথে গতি, এক বাণী কি এক চিত্ত। আমার পিতার জীবনের এক লক্ষ্য—ভারতবর্ষকে এক করা। বাহুবলে তিনি বহু রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন—তবু এখনও সেই লক্ষ্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সকলে তাঁর অধিরাজ্য স্বীকার ক'রে না। তাঁর জীবনের এই লক্ষ্য পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সংকল্প ক'রেছেন পূর্ববর্তী মহাজনগণের পদাংক অনুসরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। সেই যজ্ঞে সমস্ত ভারতের একীকরণ সম্পূর্ণ হবে, সকল প্রদেশ সকল রাষ্ট্র তাঁর অধিরাজ্য স্বীকার করলেই এক গতি, এক বাণী, এক চিত্ত, এক মতি প্রতিষ্ঠিত হবে। ঠিক বেদে যেমন বলেছেন।—যারা ভিন্নপন্থী তাদেরকে উৎসন্ন করবার অবিসম্বাদী শক্তি তাঁর আছে। তাই এ আদর্শ তাঁর আয়ত্ত করা

সম্ভব। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনি হবেন পুরোধা ও প্রথম ঋত্বিক এই তাঁর প্রার্থনা, সেই প্রার্থনা জানিয়ে আপনাকে উপদেশ দেবার জন্য মগধে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতে আমি এসেছি।

মধুচ্ছন্দা—অশ্বমেধ যজ্ঞ! আমি হব তাতে ঋত্বিক! না বৎস, এ আমার কার্য নয়! দেশের একত্ব প্রতিষ্ঠা হবে, দেশে দেশে সৈন্যদল নিয়ে সকলকে একচ্ছত্র নায়কের অধীনে এনে? ব'লের দ্বারা যে একতা প্রতিষ্ঠা হবে তাতে আমার আস্থা নেই। অসি দিয়ে দেহকে জয় করা যেতে পারে চিত্তকে নয়। চিত্তের একতা প্রতিষ্ঠা না হলে একতার, এক-চিত্ততার স্বপ্ন নিষ্ফল। বলের দ্বারা নিষ্পেষণ করে সহস্র গোধুমকে চূর্ণ ক'রে একাকার করতে পার, কিন্তু প্রাণকে পারা যায় না– ঐ যে পিপীলিকার সারি চ'লেছে, ওদের চিত্তের এক রকম একতা এমনি আছে কিন্তু ওগুলিকে এক করবার জন্য যাঁতায় পিষলে, একটা পিন্ড হতে পারে কিন্তু তাতে প্রাণের মিলন হবে না।

অগ্নি—কিন্তু দেব, এই শতধা বিচ্ছিন্ন লোকের ভিতর এক মন, এক ব্রত প্রতিষ্ঠা—শক্তি ভিন্ন হবে কী? শাস্ত্র-সমূহ বিধি প্রচার করে, সমস্ত প্রকৃতি-জন তা স্বেচ্ছায় পালন করে না। পালন করাবার শক্তি শাসন। এই শাসনই বিধির আশ্রয়—রাজার শাসনের ভয়েই সবাই শাস্ত্র মানে। শাস্ত্রের নির্দেশ পালনের অপরিহার্য উপায়—শস্ত্রবল।

মধু—এ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিধি ও নিয়ম থাকলে তাকে মেনে চলাই সাধারণ লোকের স্বভাব ও অভ্যাস, যারা তা লঙ্ঘন ক'রতে উদ্যোগী হয় তারা সর্বদাই মুষ্টিমেয়। তাদের শাসন ক'রে, রাজার শস্ত্র নয়—সাধারণের একমতের শক্তি। সে শক্তির তুলনা নেই। তার তুলনায় সব বিদ্রোহীর শক্তিই তুচ্ছ, তার বেগে বিরুদ্ধতা ভেসে যায় স্রোতের মুখে কুটোর মত। তাই শাস্ত্রই স্বয়ং শাসন করে এই স্বভাবজাত নিয়মানু-বর্তিতার বলে। রাজার কতটুকু শক্তি আছে বাধা করবার যদি সব প্রজা বিরোধী হয়? শাস্ত্রের দ্বারাই লোক শাসিত হয় বলেই রাজার ক্ষুদ্র শক্তি বিদ্রোহীকে দমন করতে পারে।

দেখ না ক্ষুদ্র পিপীলিকা—দুর্বল, শক্তিহীন—একটা আঙ্গুলের ভর সে সয় না। তারা এক হ'য়ে যখন কাজ করে পর্বতের মত বাধাকে অনায়াসে লঙ্ঘন করে যায়। বিরাট খাদ্যের স্তূপ দেখতে দেখতে অপসারণ করে নিঃশেষ করে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতকে শক্তি প্রয়োগ করে অনেক কিছু করতে পারবে, গায়ের জোরে এক-প্রাণ ক'রতে পারবে না। পৃথিবীর অপর দিকে এমন দেশ আছে, যেখানে বনের পিপীলিকা যখন দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা করে, কোনও বাধা তারা মানে না। প্রকান্ড প্রকান্ড গাছ, মানুষ জীব জন্তু প্রভৃতি যা তাদের পথে পড়ে সে-সব আচ্ছন্ন করে তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি সমবায়ে দেখতে দেখতে তাদের নিশ্চিহ্ন করে খেয়ে ফেলে। তাদের নেই বাহুবল, নেই কোন শস্ত্র—শুধু একতার বলে তারা সব বড় বড় শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়—অস্ত্রের বা বাহুবলের প্রয়োজন হয় না। সব শক্তির বড় শক্তি সম্পূর্ণ একপ্রাণতার শক্তি, তাই বেদ উপদেশ দিচ্ছেন—একপ্রাণ হও, এক মন্ত্র ধর, একসঙ্গে চল, এক বাণী বল। বল, এক ভারত, ভারতের জয়।

অগ্নি—কিন্তু প্রভু আপনি আমাদের প্রত্যাখ্যান করলে কোথায় যাব আমরা?

মধু—অশ্বমেধ করবেই যদি তার উপদেশ আমার কাছে পাবে না—যাও পতঞ্জলি মুনির কাছে, তার আশ্রমে, আমাকে মার্জনা করে।

অগ্নি—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করে চল্লাম আমি, এখন পতঞ্জলি মুনির আশ্রমে। সেখান থেকে মগধে ফিরে আমি আপনার আজ্ঞা পিতাকে যথাযথ নিবেদন করবো। আপনি আমার শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভুশণ্ডী ও ভুশণ্ডিণী

ভুশণ্ডিণী—কই কী হল? সব তো ফুসফাস। যে যার বাড়ী চলে যাচ্ছে। কোথায় যুদ্ধ? কোথায় রক্তপাত? থুঃ—

ভুশণ্ডী—তোদের মেয়েদের ঐ তো বিপদ—তোরা রয়ে-সয়ে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারিস না! যে যার বাড়ী চলে গেল! গেলেই হল? ওই দেখ চেয়ে, অগ্নিমিত্র চলেছে ওই দিকে—পতঞ্জলি মুনির কাছে। সেখানে ওর কাজ না হয় আবার

অন্য জায়গায় যাবে। আর কোথাও না পেলে শেষে কাশীর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে একটা মোটা গোছের বামন ধরে নিয়ে যাবে। ওই দেখ না, আগে আগে ঘোড়া যাচ্ছে। অশ্বমেধের ঘোড়া তৈয়ারী আছে, অগ্নিমিত্রও তৈয়ারী। দুটো মন্ত্র পড়াবার একটা বামন পেলেই হয়। তারপর হবে অশ্বমেধ। ঘোড়া নিয়ে সেনাবল নিয়ে সেনাপতিরা ছুটবেন সারা ভারতে। যুদ্ধ হবেই, একটা দুটো নয়, একেবারে পাইকারী। তারপর —কত রক্ত? খাবি? চল, আমরা ওদের সাথে সাথেই যাই।—আরে ঐ দেখ, ঐখানে পণ্ডিতেরা বসেছেন ঐ বেদবাক্যের বিচার করতে। শুনলি না, মীমাংসক বলতে চান এটা বিধি নয়—অর্থবাদ। তার মানে এটা মানতে হবে না। হাঃ হাঃ।

(নেপথ্যে হট্টগোল ও সমবেত সঙ্গীত। সঙ্গীতের তালে তালে ষ্টেজের পশ্চাৎ ও দুই পাশ দিয়া দলে দলে নৃত্য করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন অনার্য জাতির পুরুষ ও নারীর প্রবেশ। অগ্নিমিত্র ও তার রক্ষীগণ তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিল।)

সম্মিলিত সঙ্গীত

হাজার হাজার বছর মোরা
করছি যেথায় বাস,
সেই ভূমি আজ মোদের নয়,
তোদের বলতে চাস!
দস্যু মোরা দৈত্য মোরা
তোদের জন্মদাস,
এই কথা দিন-রাত মোদের
শিখাতে চাস!
সে তো মানবো না মানবো না
মানবো নাকো আজ।

তোরা ধ্বংস হবি,
নিপাত নির্বংশ হবি, ।
এদিন তোদের থাকবে নাকো
থাকবে না আর
আমরা তোদের কথা
মানবো না রে মানবো নাকো আর।

আঃ পুঃ—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সকলে। মনে রেখো এটা ঋষির আশ্রম।

মধু—শান্ত হও, শান্ত হও মালবরাজ।

অগ্নি—অনুমতি করুন প্রভু, আমি এই দুর্বৃত্ত দলকে দূর করে দিয়ে আসি।

মধু—না না, ওদের প্রতি তুমি অস্ত্রাঘাত কোরো না। দেখছ না ওরা সবাই নিরস্ত্র?

অগ্নি—কিন্তু মহাত্মন্! ওরা সংখ্যাবলে বলীয়ান, শস্ত্রের শাসন ছাড়া এদের শান্ত করা যাবে না।

মধু—যাবে। আজই না হোক, ক্রমে যাবে। সেজন্য সহিষ্ণু হ'য়ে অপেক্ষা ক'রবে। এরা অজ্ঞান। এদের শিক্ষা দিতে হবে, দীক্ষা দিতে হবে শান্তির মন্ত্রে, অজ্ঞানতা দূর করে এই ব্রাত্যদের শুদ্ধি করে শান্ত করবে। এদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা চেষ্টা করে দূর করবে। এই ব্রাত্যদের অধিকারী বিচার ক'রে জ্ঞান ও শাস্ত্র দীক্ষা দেবার যে পদ্ধতি শাস্ত্রে আছে আবশ্যক হলে সেই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা এদের ক্রমে উন্নত করলেই এরা বশীভূত হবে, শস্ত্রের শাসনে হবে না। এদের জ্ঞান নেই, শিক্ষা নেই, তাই নেই উন্নত জীবনের মন্ত্র ও সুত্রের পরিচয় বা অভ্যাস। এদের শিক্ষা দেও, দীক্ষা দাও শ্রেয়ো জীবনের মন্ত্রে। তবেই ক্রমে এরা সে জীবনের যোগ্য হ'য়ে উঠবে। এমনি শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে ব্রাত্যস্তোমের মাধ্যমে বহু ব্রাত্য ও অনার্য চিরকাল আর্য পদবীতে আরোহণ করেছেন। তপস্যা ও সাধনায় আমার কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মেও হয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষি, গৃৎসমদ ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হয়েছিলেন। ভুলো না রাজন্, তোমার পূর্বপুরুষেরাও শূদ্র কুলে জন্মে ক্ষত্রিয়ের রাজপদ লাভ করেছিলেন। এবং আজ তোমার পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ করবার অধিকারী হয়েছেন। — এরাও মানুষ। এই ভারতের সংস্কৃতিতে কতক সমৃদ্ধ। এদের দেহে শক্তি আছে, শুধু অন্তরে এদের নেই সে উৎসাহ যাতে ক'রে এরা পূর্ণভাবে সে সংস্কৃতিতে অধিকারী হয়। তাই পরপদানত হ'য়ে তারা দ্বিজাতির দাস মাত্র হয়ে রয়েছে। এদের এ পঙ্ক থেকে উদ্ধার ক'রে নেও হাত বাড়িয়ে, প্রীতি দিয়ে টেনে নেও, উন্নত কর। তুমি রাজা, তোমারই এ ব্রত হ'ক, এদের যে শক্তি, এখন কেবল দাসকর্মে সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে, সেই সীমার বন্ধন ভেঙ্গে তাদের মুক্ত কর, উন্নত জীবনের অধিকার দেও। শস্ত্রের শাসনে হবে না সে কাজ; হবে যদি প্রীতি দিয়ে শিক্ষা দিয়ে তোমরা এদের হাত বাড়িয়ে দেও, স্নেহ দিয়ে তাদের শিক্ষা দেও দীক্ষা দেও।

আঃ পুঃ—(অনার্যদের প্রতি) তোমরা নিবৃত্ত হও। তোমাদের যা কিছু অভিযোগ এবং যা কিছু প্রার্থনা তা নিবেদন করো এই ঋষির কাছে। ইনি তার প্রতিকার করবেন।

(অনার্যরা শান্ত হইল)
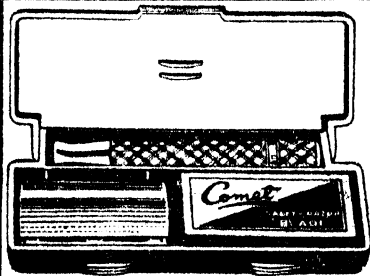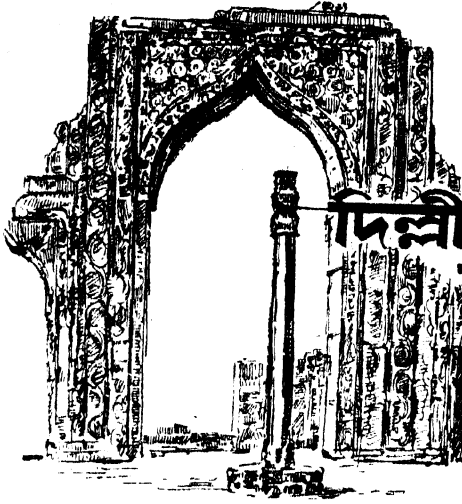
পত্রোকাঙ্ক্ষী বন্ধুপত্নী সন্দর্শনে গিয়েছিলাম উইলিংডন নার্সিং হোমে। সচরাচর এখানে আমি মাড়াই না; কারণ এলেই ফিরোজের (গান্ধী) কথা বার বার মনে আসে। ......দিল্লীর আঁধি আর 'লু' অগ্রাহ্য করে তখন ঘুরে বেড়াতাম সারা দিল্লী চরণযুগল সম্বল করে। এমনি এক খরা মধ্যাহ্নে ফিরোজ নিজের হাতে এয়ার কণ্ডিসনার চালিয়ে বেয়ারাকে চা-কফি নিত্য দেবার ফতোয়া জারী করে আমাকে তাঁর লাইব্রেরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই উইলিংডন নার্সিং হোমে এলেই এমনি বহু স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। তাইতো ওকে পারত-পক্ষে সতীনের মত এড়িয়েই চলি।

বহুদিন পর আবার উইলিংডন নার্সিং হোমে পা দিয়েছি। তাই কে কোথায় আছেন দেখবার জন্য রিজার্ভেশন বোর্ড দেখছি। হঠাৎ দেখলাম রুম নম্বর সিক্সটিন ঃ মিসেস উমা নেহরু, এম-পি। বর্ষীয়সী মাতৃ-কল্পা মহিলার নাম দেখতেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ছুটে গিয়ে দেখি শুয়ে আছেন। দু'পাশে দু'জন বিশিষ্টা মহিলা দর্শনার্থিনী। পাশে গিয়ে হাতটা চেপে ধরে বল্লাম ঃ মাতাজি, কিয়া খবর। এনি থিং রঙ? আশির ঘরে পা দিলে কি হয়! বুড়ীর মুখের দীপ্তি এখনও কমেনি। তবে আজ যেন অনেকটা নিষ্প্রভ। এক গাল হাসি নিয়ে শ্রীমতী নেহরু আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন ঃ নাথিং সিরিয়াস। ব্যস্ত হবার কিছু নেই......চেয়ারটা টেনে নিয়ে আগে তো বসো।

বিন্দুমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করে শ্রীমতী নেহরু বল্লেন.....এই কদিন আগে শরীর ভালো না লাগায় ব্রেক ফাষ্ট খেলাম না। দুপুরেও কিছু খাব না ঠিক করলাম। একটু জল খাব ভেবে জলের গেলাসটা ধরতে গেছি......ব্যস ঐ পর্যন্তই। আর মনে নেই। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখি আমি নীচে মেঝেতে শুয়ে আছি। আরও দু-চার মিনিট কাটবার পর আস্তে আস্তে খাটের উপরে শুয়ে পড়লাম। বেয়ারা ডেকে টেলিফোন নাম্বর জেনে নিজেই উইলিংডনে ফোন করলাম—এ্যাম্বুলেন্স পাঠাও। তারপর সাড়ে চারটে নাগাদ এখানে এসে যে শুয়েছি, ব্যস আর এখনও উঠিনি।

পরে শুনলাম খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন শ্রীমতী নেহরুর আত্মীয়-পরিজনের দল। জওহরলালও ছুটতে ছুটতে এসেছিলেন উইলিংডন নার্সিং হোমের কেবিন নম্বর সিক্সটিনে। উমা নেহরু যে শয্যা নিতে পারেন একথা বহুজনের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন। তাইতো জওহরলাল অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন, একি হলো তোমার! তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে কাজে লেগে পড়ো। এখন কি তোমার বিছানা নেবার সময়!

খবরের কাগজ পড়ে যারা দেশসেবার হিসেব রাখেন, তাঁদের উমা নেহরুকে না জানার জন্য অপরাধ দেওয়া যায় না। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগেক কথা। উমা গিয়েছিলেন পুণা কং তাঁর বাবার সঙ্গে। তিলক-গোখলে বক্তৃতা আজও তাঁর মনে পড়ে। তারপর ষোল বছর বয়সে নেহরু পরিবারে বধূ-রূপে যখন এসেছিলেন, তখন জওহর-লাল এগার বছরের শিশু। দুজনে তখন কত খেলেছেন। পরে রাজনৈতিক জীবনেও শ্রীমতী নেহরু জওহরলালের সঙ্গে বহু খেলা একসাথে খেলেছেন। সাইমন কমিশন বর্জনের সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে লক্ষ্মৌ-এর রাস্তায় পুলিশ যখন জওহরলালকে বেদম প্রহার করে, তখন তার ভাগ উমা নেহরুরও জুটে-ছিল। পন্থজীও ছিলেন পাশে। সেদিনের মত আজও ইনি নিভৃতেই থাকেন। লাটসাহেব-মন্ত্রীদের থেকে শত হস্ত দূরে থেকেই ইনি নীরবে-নিভৃতে রিফিউজি হোম করেন, চিলড্রেন্স হোম চালান, পঞ্চায়েৎ তদারক করেন। বিশ্বাস করতে পারেন, নেহরু পরিবারের বধূ হয়েও, উমা নেহরু পারতপক্ষে প্রাইম্ মিনিষ্টার্স হাউস মাড়ান না। শুধু তাই নয়, সাধারণ বহুজনের মত কনষ্টিটিউ-শন হাউসের একখানি ঘরে নিজে নিঃসঙ্গভাবে দিন কাটান। ক্যান্টিনে খেয়ে আর বাসে চড়ে পার্লামেন্ট যান। ট্যাক্সি চড়ার পয়সা নেই তাঁর। কারণ ষ্টেট ব্যাঙ্কের পার্লামেন্ট হাউস ব্রাঞ্চে যা জমা হয়, তা চাঁদা দিতেই ফতুর হয়ে যায়। তাইতো রাজস্থান টুর শেষ করে দিল্লী পৌঁছতেই খবর পেয়ে ছুটে এসে-ছিল 'ইন্দু' (ইন্দিরা)। বেশী কথা বলতে পারেননি; কিন্তু দু' ফোঁটা চোখের জল কেন জানি না গড়িয়ে পড়েছিল শুধু।

একটী আরব্য রজনীর নতুন সংস্করণ
(কাসেম - মর্জিনা - আরেফ্ আলিবাবা)
কর্নেল আরেফ
ইরাক
তেল
কাসেম
মিশর
সিরিয়া
জর্ডান
সাউদী আরব
ইরান
ওরে শোন, আমাদের তো তবু অ্যাটম বোমা আছে! তোর কী আছে? লড়াই করবি কী দিয়ে?
চেঙ্গিস খাঁ
কেন, আমাদের রাজা এই আছে!
এক ছিলিম ববম বম্, দুই ছিলিম গাঁজা! তিন ছিলিম মহাদেব চার ছিলিম রাজা!

যুগ হতে যুগান্তরে

চিকিৎসা শাস্ত্র বিংশ শতকে

ডাঃ অশোক কাঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৯ খৃঃ অব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পলএরলিখ্ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু-বিধ্বংসী স্যালভারসান নামক রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞগণ নতুন নতুন ঔষধ প্রস্তুতে সচেষ্ট। ডঃ গেলমো নামক এক অখ্যাত ভিয়েনাবাসী ফলিত রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোনঅ্যামাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাণু-বিধ্বংসী গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন না। পদার্থটি পশম বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্য ব্যবহৃত হত। ১৯৩২ খৃঃ অব্দে জার্মান নিদান-তত্ত্ববিদ ডঃ গেরহার্ড ডোমাগ উপরোক্ত পদার্থের অনুরূপ "প্রন্টসিল" নামক এক পদার্থের অসাধারণ জীবাণুনিধন ক্ষমতার বিষয়ও আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে কয়েকজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে, "প্রন্টসিল" মানব শরীরের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গেলমো কর্তৃক সৃষ্ট প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইডে রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংস করে। ঔষধটি নিয়ে বহু গবেষণার পর সালফাথিয়াজল, সালফা-ডায়াজিন, সালফামেজাথিন, সালফা-গুয়ানিডিন প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণু-বিধ্বংসী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে ডোমাগকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইহুদীবিদ্বেষী হিটলার ইহুদীবংশোদ্ভব আলফ্রেড নোবেল প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগকে বাধা দেন। মাত্র স্বল্পকাল পূর্বে ডোমাগ সুইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন।

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাঁউরুটির উপর এক প্রকার সূক্ষ্ম ছত্রাক জন্মায়। বহু সহস্র বৎসর ধরে অনাবৃত খাদ্যের উপর উক্ত ছত্রাক দেখা সত্ত্বেও মানুষ তার জীবাণু-জন্মনিরোধক (Antibiotic) গুণের বিষয় কল্পনাও করতে পারে নি। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম "পেনিসেলিউম নোটাটুম"। ১৯২৯ খৃঃ অব্দে লন্ডনের সেন্ট মেরী হাসপাতালের জীবাণু-তত্ত্ববিদ ডঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে, অসাবধানতা-বশতঃ একটি কৃত্রিম জীবাণুকর্ষণ ক্ষেত্রের এক কোণে একটি পেনি-সেলিউম ছত্রাকের বসতি জন্মেছে। ক্ষেত্রটিতে স্টাফাইলোকক্কাস নামক এক প্রকার জীবাণু কর্ষিত করা হয়েছিল। দু-তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে, ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে স্টাফাইলোকক্কাস বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে পেনিসেলিউম ছত্রাকের বসতির পরিধি থেকে স্টাফাইলোকক্কাস অদৃশ্য হয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি পূর্ণোদ্যমে অন্যান্য জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, কয়েক প্রকার জীবাণু পেনিসেলিউম ছত্রাকের সান্নিধ্যে আসলে তাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনের অধ্যাপক রাইস্ট্রিক উক্ত ছত্রাক কর্ষণের উপযোগী এক তরল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। উক্ত তরল ক্ষেত্রে ছত্রাকটি কর্ষিত করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণু-জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান মেলে। পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির নামকরণ করা হল "পেনি-সিলিন"। পেনিসিলিন সহজলভ্য করবার জন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোর্ডের প্রঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও তাঁর সহকারী ডঃ চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনি-সিলিনের গাঢ় দ্রাবণ প্রস্তুত করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিনী ঔষধ ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের পুরস্কারস্বরূপ ফ্লেমিং ও ফ্লোরি 'নাইট' উপাধি ভূষিত হলেন, এবং ১৯৪৫ খৃঃ অব্দে ডঃ চেইনসহ তাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ফ্লেমিং-এর সাফল্যে উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছত্রাক-বিজ্ঞানী (Mycologist) নানাপ্রকার ছত্রাকের জীবাণু-জন্মনিরোধক ক্ষমতা নিরূপণের জন্য গবেষণা শুরু করেন। মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ সেলমান ভাক্সমান 'অ্যাকটিনোমাইকোসিস গ্রাইসিউস" নামক ছত্রাক থেকে যক্ষ্মা জীবাণু-রোধক ঔষধ 'স্ট্রেপটোমাইসিন" প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ খৃঃ অব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে অরিওমাইসিন, টেরা-মাইসিন, ওলিয়াণ্ডোমাইসিন, ভায়ো-মাইসিন প্রভৃতি আরও অনেক ছত্রাক-জাত ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অরিও-মাইসিন উৎপাদন-প্রচেষ্টায় আমেরিকা-বাসী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়াল্লাপ্রাগাডা সুব্বারাও-এর অবদান সর্বজনবিদিত।

বিংশশতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা

মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ঔষধ ইনসুলিন ও মস্তকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা আক্ষেপ উৎপাদিত করে মানসিক রোগের চিকিৎসা বিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়-কর অবদান। ডঃ মানফ্রেড ফন সাকল্ নামক এক ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খৃঃ অব্দে মানসিক রোগীদের দেহে "ইনসুলিন" সূচী বিদ্ধ করে রোগীর শরীরে মৃগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (Schizophrenia) এর চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাটি এখনও সুপ্রচলিত। ১৯৩৪ খৃঃ অব্দে বুদাপেস্তবাসী ডঃ ফন মেডুনা "লেপ্টাজোল" নামক ঔষধ প্রয়োগে অনুরূপ আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানকালে রোগীর মস্তকে শক্তিশালী বিদ্যুৎতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরালেত্তি ও বেনি ১৯৩৭ খৃঃ অব্দে উক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পর্তুগালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ-মোনিজ ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ আল-মেহডা লিমা মানসিক রোগীর মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ অপরাংশ হতে অস্ত্রোপচার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম "প্রিফ্রন্টাল লিউকোটমী"।

বিগত দশ বৎসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বহু নতুন নতুন রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা সহজতর হয়েছে।

॥ বিংশ শতকের শল্যচিকিৎসা ॥

অবচেতনা শাস্ত্রের উন্নতি ও জীবাণু-নিরোধক ঔষধ আবিষ্কারের পরবর্তীকাল হতে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। মস্তিষ্কের শল্য-চিকিৎসা এ যুগে সহজসাধ্য। কৃত্রিম

হৃদযন্ত্র ও ফুসফুস নির্মাণের পর থেকে হৃৎপিণ্ডের কার্য সাময়িকভাবে বন্ধ করে তার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দুরূহ অস্ত্রোপচার করা হয়। 'কৃত্রিম বৃক্ক' নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় এক মানুষের দেহ হতে অন্যের দেহে সুস্থ বৃক্ক সংযোজিত করা সম্ভব। সাম্প্রতিক-কালে আমেরিকায় একটি বালকের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনঃসংযোজিত করে আশাতীত ফল লাভ করা গেছে। শল্যচিকিৎসার আরও কত উন্নতি হবে তা অনুমান করা এখন সত্যই দুঃসাধ্য।

পরিশিষ্ট

১৪৯৮ খৃঃ অব্দের ১৭ই মে ভাস্কো ডা গামা নামক পর্তুগীজ নাবিক ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলের কোহিকোডে (কালিকট) বন্দরে অবতরণ করেন। তার পরবর্তীকালে রাণী প্রথমা এলিজাবেথ ও প্রথম জেমস-এর সনদ-প্রাপ্ত ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ জাহাজযোগে ভারতে আসবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের প্রতি জাহাজে থাকতেন এক বা একাধিক চিকিৎসক।

সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন ভারতীয় নৃপতিদের সভায় ছিলেন বহু য়ুরোপীয় চিকিৎসক। তাঁদের মধ্যে ফরাসী ঐতিহাসিক ও চিকিৎসক ফাঁসোয়া বেনিয়ের এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি মঁপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করেন এবং ১৬৫৮ বা ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে সুরাটে পৌঁছান। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে তিনি শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকো-এর অধীনে শল্য-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আউরঙ্গজেব কর্তৃক দারা নিহত হওয়ার পর তিনি তাভেরনিয়ের সঙ্গে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন (১৬৬৫ খৃঃ)। নিকোলাস মানুচ্চি বা ডঃ মানুচ নামক ভেনিসীয় যুবক ১৬৫৪ খৃঃ সুরাটে এসেছিলেন লর্ড বেলামণ্ট নামক ইংরাজের সঙ্গে। ১৬৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি দারা শিকো-এর অধীনে চাকুরি নেন। পূর্বে কোনও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করলেও দারার মৃত্যুর পর আগ্রা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

১৬৭১—১৬৭৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি লাহোরে চিকিৎসা ব্যবসায় করেন এবং ১৬৭৮—১৬৮২ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি আউরঙ্গজেবের অধীনে চিকিৎ-সকের চাকুরী করেছিলেন। ১৭০১ খৃঃ অব্দে নিযুক্ত হন মাদ্রাজ-এর পৌর-চিকিৎসক। তাঁর রচিত "স্টোরিয়া দো মোগোর" বা মুঘল কাহিনী নামক পুস্তকে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর সম-সাময়িক কালে সিকান্দার বেগ নামক এক আর্মেনীয় দারার পুত্র সুলেমান শিকো-এর চিকিৎসক ছিলেন। সম্রাট শাহজাহানের চিকিৎসা করতেন মুকারাম খান নামক এক পারসিক। তা ছাড়া দিনেমার যাকব মিনুস ও গেলমের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইসো, দ্যস্ত্রেম ও কাতেমু এবং ভেনিসীয় আঞ্জেল্লো লেগ্রেঞ্জি প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিভিন্ন ভারতীয় রাজন্যবর্গের সভা-চিকিৎসকের কাজ করতেন।

তাভেরনিয়ের লিখেছেন যে, মঃ ফ্রাঁসোয়া দ্য লা পালিস্ মুঘল দরবারে

ও মঃ ক্লডিয়াস মার্লে এলাহাবাদের শাসনকর্তার অধীনে চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৫—১৭১৭ খৃঃ পর্যন্ত সম্রাট ফারুখ শিয়ারের চিকিৎসক ছিলেন মঃ মার্তিন নামক চিকিৎসক। পরবর্তীকালে তিনি বাহাদুর শাহ্ ও মুহম্মদ শাহ-এর অধীনেও চাকরি করেন। মহীশূররাজ হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন জাঁ মার্তিন নামক এক ফরাসী।

১৮২৪ খৃঃ অব্দে ডঃ জেমিসন, ডঃ ব্রিটন ও ডঃ টেলর নামক ইংরাজ চিকিৎসকগণ ভারতীয়গণকে প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রথমতঃ হিন্দুগণকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষায় ও মুসলমানগণকে কলকাতা মাদ্রাসায় ফার্সী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

কলকাতায় সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ চার বৎসর চিকিৎসাবিদ্যা পাঠ করলে ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হত। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত নামক বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ছাত্র সর্বপ্রথম মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্যক্রমের অনুকরণে চিকিৎসাশিক্ষার কাল বর্ধিত করে পাঁচ বৎসর করা হয়। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বর্তমান কলকাতা মেডিকেল কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর নামক বাঙালী চিকিৎসক ভারতে যে প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তা বৃটিশ রাজত্বকালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ নামে

ডঃ রাধাগোবিন্দ কর

পরিচিত হয়। ১৯৪৮ সালে ডঃ কর-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার নামকরণ করা হয় আর জি কর মেডিকেল কলেজ।

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে শ্রীভোলানাথ বসু, শ্রীগোপালচন্দ্র শীল, শ্রীদ্বারকানাথ বসু ও শ্রীসূর্যকুমার চক্রবর্তী নামক ছাত্র চতুষ্টয় লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে যান। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেব প্রমুখ ধনী ব্যক্তিগণ তাঁদের শিক্ষার ব্যয় বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিনজন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক উপাধি লাভ করেন এবং শ্রীচক্রবর্তী ডক্টর অব্ মেডিসিন উপাধি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সর্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্রে ডক্টরেট পান ডঃ চন্দ্রকুমার দে। পরবর্তীকালে সর্বপ্রথম শল্যচিকিৎসাশাস্ত্র ও ধাত্রীবিদ্যায় স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন যথাক্রমে ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সতীনাথ বাগচী।

ডঃ লিওনার্ড রজার্স

ধনী রকিফেলার-এর বদান্যতায় কলকাতায় ইনস্টিটিউট্ অব হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ স্থাপিত হয়।

কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার পরবর্তীকালে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাঙলার সুসন্তান ও বিখ্যাত চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই প্রচেষ্টার মূলস্তম্ভ।

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যর কৈলাসনাথ বসু, স্যর কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম পৃথিবী বিখ্যাত। স্যর উপেন্দ্রনাথ পৃথিবীর সর্বপ্রথম কালাজ্বর চিকিৎসার ঔষধ "ইউরিয়া ষ্টিবামাইন" আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হন। বর্তমান কলকাতার বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক অজিতকুমার বসু ১৯৬০ খৃঃ নিযুক্ত হন

বাম হইতে দক্ষিণে : ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী।

১৯১০ খৃঃ অব্দে প্রখ্যাত নিদানতাত্ত্বিক ডঃ লিওনার্ড রজার্স কলকাতা স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্থাপনা করেন এবং ১৯৩২ খৃঃ অব্দে মার্কিন লণ্ডনের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থার পরীক্ষক। তাঁর পূর্বে কোনও অয়ুরোপীয় উক্ত সম্মান লাভ করেননি।

— সমাপ্ত —

পার্বতী ঃ অহিচ্ছত্রপুর

ওলিম্পাস থেকে হিন্দুকুশ

অনিন্দ্যকুমার সেন

আফ্রোদিতে ঃ ক্লিডস

ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের সম্পর্ক আজকের নয়। খৃষ্ট জন্মের ৩২৬ বছর আগে সারা পশ্চিম এশিয়ায় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে যেদিন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উপস্থিত হলেন সেই দিন থেকে। সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ অবশ্য পরোক্ষভাবে আরো আগে কিছু কিছু ছিল। পন্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে সংস্কৃত যবন শব্দ আইয়োনিয়ান শব্দের অপভ্রংশ। হিরোডোটাসের ইতিহাসেও ভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। পারসিকেরা যখন গ্রীস আক্রমণ করে তখন তাদের সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় তীরন্দাজ সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রীসের সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয় সেই পঞ্চনদীর তীরে।

সমগ্র পৃথিবীকে এক সংস্কৃতির বন্ধনে বেঁধে সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে একতা স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন আলেকজান্দার। তখনকার পৃথিবীর সব জাতের মানুষ নিয়েই তিনি তাঁর সেনাবাহিনী গঠিত করেছিলেন এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতেও তিনি উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজেও বিভিন্ন দেশীয় রমণী বিবাহ করেন। যে দেশেই তিনি যান সে দেশেই তিনি স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহারকে অসম্মান না করেও গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে তাঁর স্বপ্ন সফল হতে পারে নি।

তাঁর মৃত্যুর পর সেলুকাসের সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ভারতের মৌর্য রাজারা গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখেন। এর নিদর্শন পাই চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনে, বিন্দুসারের পাশ্চাত্য ডুমুর আর সুমিষ্ট মদ্য প্রীতিতে এবং অশোকের দূরদেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণে, অশোকের এক শিলালিপিতে সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিওকাস, ম্যাসিডনের রাজা অ্যান্টিগোনাস গোনাটাস, এপিরাসের রাজা আলেকজান্দার, মিশরের রাজা টলেমী এবং সাইরেণের রাজা মেগাস-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের সঙ্গে তাঁর দৌত্য বিনিময় হয়েছিল। মৌর্য যুগে মেগাস্থিনিস এবং ডাইমেকাস পাটলীপুত্রে রাজদূতরূপে বাস করে গিয়েছেন। সে যুগের ভারতবর্ষের অনেক কথা এঁদের বিবরণ থেকেই জানা যায়। বিদেশীদের তত্ত্বাবধানের জন্যে পাটলীপুত্রে একটি আলাদা

বিজয়লক্ষ্মী ঃ স্যামোথ্রেস

বিভাগই ছিল। সুতরাং সে যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ নেহাৎ অল্প ছিল না।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেলুকাসবংশীয়দের হাত থেকে রাজশক্তি ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকদের হাতে চলে যায়। এই বংশের বিখ্যাত রাজা হলেন মিনান্ডার—বৌদ্ধ সাহিত্যে যিনি মিলিন্দ নামে পরিচিত। পূর্ব ভারতে তখন মৌর্য শক্তির অবসান ঘটেছে। পুষ্যমিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। মিনান্ডার উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হলে মথুরায় পুষ্যমিত্রের সঙ্গে তাঁর অস্ত্রপরীক্ষা হয়। এই যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। এরপর আসেন কুষাণ রাজারা। তাঁদের রাজত্বে অনেক গ্রীক এবং ইন্দো-গ্রীকের বসবাস ছিল। এঁরা ক্রমে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গেলেন। নাসিকের কাছে কার্লি গুহার অনেক মূর্তি এই ভারতীয় যবনরা উৎকীর্ণ করান। কিন্তু তাঁদের তখন আর চেনবার উপায় নেই। আচার ব্যবহার ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে তাঁরা প্রায় পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিদিশার গরুড়স্তম্ভের স্থাপক পরম ভাগবত হেলিওডোরস-এর কথাও মনে পড়ে—যিনি গ্রীক হয়েও বিষ্ণুর উপাসক হয়ে পড়েন।

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গ্রীসের প্রভাব কতখানি তা আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তন্ন তন্ন করে আজও দেখা হয়েছে কিনা জানি না। তবে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে যা জানা যায় তার পরিমাণ এবং গুরুত্ব নেহাৎ অল্প নয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু তথ্য আমরা মেগাস্থিনিস, হিরোডোটাস, ডায়োডোরাস, আরিয়ান প্রভৃতির লেখা এবং পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী'র লেখক ও নিয়ারকাসের সমুদ্রযাত্রার বিবরণী প্রভৃতি থেকে জানতে পারি। সংস্কৃত নাটকে গ্রীক প্রভাব কতখানি তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবসান বোধ হয় আজও হয় নি। অশ্বঘোষের লুপ্ত নাটকগুলি পাওয়া গেলে হয়ত এর কিছুটা মীমাংসা হতে পারত। তবে মুদ্রা প্রস্তুতের উন্নত রীতি গ্রীকদের কাছ থেকেই পাওয়া। মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠে সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করার রীতি এর আগে ভারতে বোধ হয় দেখা যায় নি।

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যের ওপর গ্রীক শিল্পের প্রভাব আরো পরিস্ফুট।

ভারতে গ্রীক সংস্পর্শের অল্পকালের মধ্যেই গ্রীক এবং রোমান শিল্পরীতি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনুসৃত হতে থাকে। আফগানিস্থান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নানা স্থানেই (এমন কি বিকানীর পর্যন্ত) এর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। এসব ভাস্কর্যের পোষাক-পরিচ্ছদও গ্রীকো-রোমান প্রভাব-মুক্ত নয়। কুষাণ রাজারা এশিয়া মাইনর থেকে বৌদ্ধবিহার নির্মাণের জন্য বহু গ্রীক শিল্পী নিয়ে আসেন। পেশোয়ার অঞ্চলের বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারগুলিই এর সাক্ষী। এই শিল্পীরা সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। এঁরা এবং এঁদের প্রথায় শিক্ষিত ভারতীয় শিল্পীরা ভারত-শিল্পে গান্ধার শৈলী প্রবর্তন করেন। ভারত-শিল্পের ওপর হেলেনীয় শিল্পের এইটিই সবচেয়ে বড় প্রভাব। এই গান্ধার রীতির প্রভাব মধ্য এশিয়ার খোটান হয়ে জাপান পর্যন্ত গিয়ে পেঁছেছিল। বৌদ্ধ মূর্তি-শিল্পের সূচনায় গান্ধার শৈলীর ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা ভারত-শিল্পের ইতিহাসের সন্ধান যাঁরা রাখেন তাঁরাই জানেন। বাস্তুশিল্পে গ্রীক প্রভাব বোধ হয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তক্ষশীলার বিহার এবং কাশ্মীরের মার্তন্ড মন্দিরে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে মূর্তিশিল্পে গান্ধার শৈলী পরবর্তী যুগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পশৈলীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্য এর প্রভাবে নবজীবন লাভ করেছিল।

আরেকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর গ্রীসের প্রভাব পরিস্ফুট দেখা যায়। সেটি হল জ্যোতির্বিদ্যা। গার্গী সংহিতার লেখক স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন যে, যবনেরা ম্লেচ্ছ হলেও তাঁরাই হলেন জ্যোতির্বিদ্যার জনক এবং সেইজন্য তাঁরা দেবগণের ন্যায় মাননীয়। জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত বহু ভারতীয় শব্দ গ্রীক থেকে নেওয়া।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা পাইথাগোরীয় দর্শনের সঙ্গে সাংখ্যের সাদৃশ্য দেখতে পাই এবং প্লেটোর রচনায় কোথাও কোথাও কর্মবাদের আভাস মেলে। আলেকজান্দ্রিয়ার নিওপ্লেটোনিকবাদ এবং পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য ধর্মে কৃচ্ছ্র-সাধনের রীতির মধ্যে অনেকে হিন্দু দর্শনের প্রভাব দেখতে পান। আলেক-জান্দ্রিয়া পরবর্তী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সক্রেটিসের সঙ্গে নাকি এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়েছিল আর একথাও প্রচলিতই আছে যে, পাইথাগোরাস কিছু-কাল ভারতে বসবাস করেছিলেন। এ ছাড়া পারস্যের আকিমিনিদ সাম্রাজ্যও ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তাধারার আদান-প্রদানের এক ক্ষেত্র ছিল।

বুদ্ধ ঃ গান্ধার
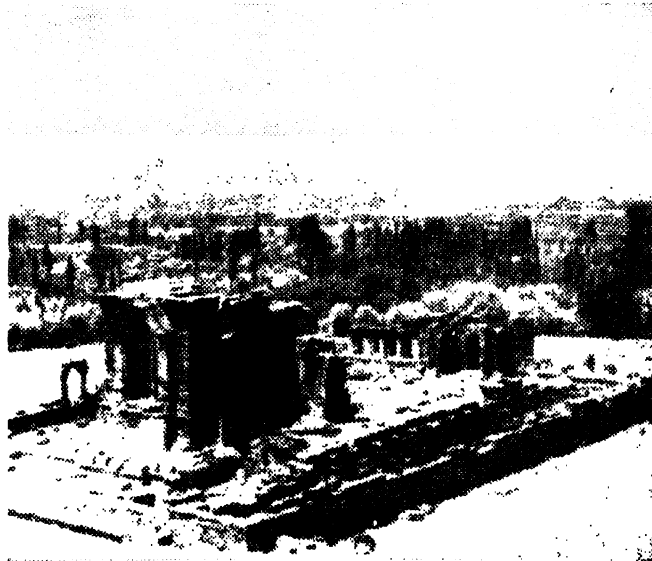
মার্তণ্ড মন্দির ঃ কাশ্মীর

এই প্রসঙ্গে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জগতে কতদূর প্রবেশ করেছিলেন সে আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র ছিল। সুতরাং সেই পথে পশ্চিমে ভারতীয় চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক। আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমন্ট ত বলেন "গ্রীকরা বর্বরদের কাছ থেকে দর্শনবিদ্যা নিয়েছে।" শোনা যায় ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কিছু আগে কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জেনোব বলেন, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ইউফ্রেটিস অঞ্চলে একটি ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। ভারতীয়রা সেখানে দুটি দেবমন্দিরও নির্মাণ করে। ৩০৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেগরী মন্দির দুটি ধ্বংস করতে উদ্যত হলে তারা প্রবলভাবে বাধা দেয়। এই অঞ্চলে খৃষ্ট ধর্মের প্রচলন হলে তার মধ্যে অনেক বৌদ্ধ আচারও প্রবেশ করে। সোভিয়েত পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যের ফলে আরো

বুদ্ধের তপস্যা : গান্ধার

উত্তরে, সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় কয়েকটি ভারতীয় উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

অনেক ভারতীয় রূপকথা প্রাচীন যুগেই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত ব্যবসায়-বাণিজ্য সূত্রে ইন্দো-গ্রীকরা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি ইউরোপে নিয়ে যায়। গ্রীকরা হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র এবং গণিতের সন্ধান রাখতেন।

দক্ষিণ ভারতে গ্রীক ও পরবর্তী যুগে রোমানরা দীর্ঘকাল বাণিজ্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে। বিদেশ থেকে তারা নিয়ে আসত মদ্য এবং এ দেশ থেকে নিয়ে যেত বিভিন্নপ্রকার মশলা ও কার্পাস বস্ত্র। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে লেখা একটি গ্রীক প্রহসনে দেখান হয়েছে যে, একটি মহিলা জাহাজডুবি হয়ে কানাড়া উপকূলে উপস্থিত হয়েছেন এবং সেখানকার অধিবাসীরা কানাড়ী ভাষায় আলাপ করছে। সুতরাং কিছুসংখ্যক গ্রীক কানাড়ী ভাষাও জানতেন বলে মনে হয়। চোল রাজাদের রাজধানীতে যবন বসতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন তামিল সময়জ্ঞাপক শব্দ 'ওরাই' নাকি গ্রীক 'হোরা' শব্দ থেকেই এসেছে। এ ছাড়া তামিল জ্যোতির্বিজ্ঞানেও অনেক গ্রীক শব্দ পাওয়া যায়।

জিউস : পারগামাম্

আজকের শিক্ষিত ভারতীয়েরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমেই গ্রীসকে নতুন করে জেনেছেন। আজ গ্রীসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হওয়ার সম্ভাবনা আগের চেয়ে আরো বেশী হয়েছে। এই যোগাযোগ যতই ঘনিষ্ঠ হবে ততই আমরা আমাদের অতীত এবং বর্তমানকে ভালভাবে জানতে পারব। *

* গ্রীসের রাজা পল, রাণী ফ্রেডেরিকা এবং রাজকুমারী আইরিণ সম্প্রতি ভারত-ভ্রমণে আসেন। তাঁদের আগমন-উপলক্ষে এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হল।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

ছেলেরা ফিরল রাত বারোটারও পর।

বিপদ একটা নয়—অনেকগুলো।

হারানের অসুখটাও বাঁকা। হঠাৎ পাঁচ-ছ দিন আগে খেয়ে উঠে কী একটা ব্যাপার নিয়ে বড়বৌয়ের সঙ্গে চেঁচামেচি করতে গিয়ে মাথায় খুব যন্ত্রণা টের পায়। দু'হাতে মাথাটা ধরে বসে পড়ে উঠোনেই। সেদিন নাকি অফিস থেকে ফিরেও রাগারাগি করেছিল। কিছু না খেয়েই ক্লাবে গিয়েছিল রিহার্স্যাল দিতে। সেখানেও চেঁচাতে হয়েছে অনেকক্ষণ, ফিরে এসে ভাত খাওয়ার পর হঠাৎ চেঁচাতে গিয়েই এই বিপত্তি। কিন্তু শুধু মাথার যন্ত্রণাই নয়। ওকে বসে পড়তে দেখে ছুটে এসে দুই বৌ ধরতে গিয়ে দেখে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। খুব বেশী নয়—তবে নাকি নিতান্ত দু-এক ফোঁটাও নয়। তখন আর কিছুই করা যায় নি, ঘরে এনে শুইয়ে মাথায় জল দেওয়া ও বাতাস করা ছাড়া। অত রাত্রে কে-ই বা ডাক্তার ডাকতে যাবে। নিবড়ের তেমন ডাক্তারও নেই। এখানকার কোন ডাক্তারকে খবর দিলেও যেত না রাত্রে।

যাই হোক—সে রাত্রে হারান আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি, একটু অস্ফুট গোঙানি ছাড়া। ওরা প্রশ্ন করে উত্তর পায় নি, ভেবেছে মাথার যন্ত্রণার জন্যই উত্তর দিচ্ছে না। সকালে বুঝেছে যে তা নয় অজ্ঞানের মতো হয়ে আছে। তখন বড় বৌ কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ি গেছে খবর দিতে, তবু পাড়ার লোক ডেকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছে।

ডাক্তার আর শ্বশুর একসঙ্গেই এসেছেন। শ্বশুর দেখেশুনে মুখের ওপরই বলেছেন, সন্ন্যাস রোগ—ও আর বাঁচবে না। ডাক্তার অতটা হতাশ করেন নি, তবে তাঁরও মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। কী সব ওষুধ দিয়ে কতকটা জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন কিন্তু দেখা গেছে যে হাত-পা আর কিছু নাড়তে পারছে না, কথাও কইতে পারছে না। কথা কারও বুঝতেও পারছে কিনা সন্দেহ। পক্ষাঘাতের মতোই সব লক্ষণ। ডাক্তার বলেছেন যে, সন্ধ্যা থেকে রাগারাগি করে আর চেঁচিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে ছিল, তার ওপর আবার চেঁচাতে গিয়ে এই বিপত্তি। মাথার কোন শির ছিঁড়ে গেছে, এই তাঁর বিশ্বাস। বলেছেন, প্রাণের ভয় এখনও যায় নি। তবে হয়ত বাঁচিয়ে দিতে পারবেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু আগের মতো সহজভাবে আর চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বিপদের ওপর বিপদ—শ্বশুর এসে জামাইবাড়িতে জেঁকে বসে আছেন, সুতরাং তিনিই এখন অভিভাবক। খরচ-পত্র সব তাঁর হাতে, তিনিই সব করছেন। তরুর বিশ্বাস বুড়ির সিন্দুকে আর হারানের আলমারীতে নগদ টাকা ঢের ছিল, বুড়ির দরুণ কিছু গয়না তো ছিলই—সেই জন্যেই হারান কোনদিন বাড়িতে চাবি রেখে যেত না। বুড়ি মরার পর থেকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরত। শ্বশুর এসে প্রথম দিনই চাবির গোছা হস্তগত করেছেন এবং প্রকাশ্যে মেয়ের গহনা সব নিজের বাড়িতে রেখে এসেছেন বাক্স শুদ্ধ। কিন্তু তরু বলে যে, তার মধ্যে ওর সতী...র গহনা ছাড়াও অনেক জিনিস তিনি বই করেছেন। বুড়ির দরুণ যা কিছু ছিল সবই। এ-ছাড়াও অফিস থেকে ওর বন্ধুদের সাহায্যে টাকাকড়ি নিয়ে এসেছেন খানিকটা, অসুখের অজু-হাতে। সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করেছে। তবু একেই ভীতু আর লাজুক, তবু সর্বনাশ হয় দেখে একটু মৃদু প্রতিবাদ করতে গিছল। তিনি চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বলেছেন, "অফিসের টাকা না পেলে তো চিকিচ্ছেই চলত না, ঘরে তো কিছুই ছিল না। সিন্দুক আর আলমারী নামেই—ভেতরে তো ঢু-ঢু অণ্টরম্ভা। বিশ্বাস না হয় খুলে দ্যাখো না।'

মরীয়া হয়ে তবু বলতে গিছল তরু যে, সে নিজে দেখেছে সিন্দুকে নগদ টাকা আর গিনি ছিল, আলমারীতেও কিছু কিছু টাকা রাখত হারান। এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে যাবার কথা নয়—কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ওর সতীন তেড়ে এসেছে, তবে কি তার বাবা মিছে কথা বলছেন? তবু কি বলতে চায় তিনি চুরি করেছেন সে টাকা?

তেড়ে এসেছেন সতীনের বাবাও। তাঁর সে সময়কার ভয়ঙ্কর চোখমুখের চেহারা দেখে তরুর মনে হয়েছে যে তিনি হয়ত ওকে মার-ধোর করবেন।

শুধু তাতেই ক্ষান্ত হননি, আজই নাকি বিকেলে ওকে শুনিয়েছেন, 'যে রকম ঘটার চিকিৎসা হচ্ছে, টাকা যা পেয়েছি, তাতে আর কদিন? এরপর তো তোমার গয়না বেচতে হবে। তোমার ছেলে হয়েছে, বিষয়-সম্পত্তি তো সবই সে পাবে। ওর তো মেয়ে—আশাভরসা বলতে তো ওর কিছুই নেই, ঐ গয়না কখানা ছাড়া। সেও-তো আমারই দেওয়া। ওতে তো আর হাত দিতে বলতে পারি না! ওরও তো সারা জীবন পড়ে রইল। মেয়েটা যদি বাঁচে তার বিয়েও দিতে হবে। ......না, ওর কাছ থেকে কিছু পিত্যেশ ক'রো না। সোয়ামীকে যদি বাঁচাতে চাও তোমাকেই টাকা বার করতে হবে!'

এ ও-সব নয়, ছেলেটাও নাকি গত দুদিন একজ্বরী হয়ে আছে। জ্বর

বাড়ছেও না কমছেও না—ছাড়বারও কোন লক্ষণ নেই। তার কোন ওষুধের কথা তো কেউ চিন্তাই করছে না—এখন আরও কিছু খারাপ না হলে হয়। তবু ঠিক মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি—কিন্তু হেমের মনে হল সে একটা কিছু ভয় করছে। তার মনে হচ্ছে হয়ত যে সতীনের দিক থেকে ছেলেটাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করাও বিচিত্র নয়।

দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে হেম চুপ করল। তার বলার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে যে, শরীরের চেয়েও মনই বেশী অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কান্তিরও দুই চোখ ছলছল করছে, সামান্য আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কিন্তু তাঁর মনে হল চোখ দুটো অস্বাভাবিক লালও হয়ে উঠেছে। হয়ত পথে আসতে আসতে কেঁদেছে কিম্বা প্রাণপণে কান্না চাপার ফলেই অত লাল। এসে পর্যন্ত আলোটার দিকে চেয়ে বসে আছে চুপ করে। আরও ওকে যেটা

যদি বাঁচতে চাও তোমাকেই টাকা বার করতে হবে

সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভোর ছটায় খেয়ে গেছে, এখনও পেটে কিছু পড়েনি। অফিসে সে কোনদিনই কিছু খায় না, জলখাবারের বিলাসিতা এখনও অভ্যাস হয়নি তার। দুবেলা দুমুঠো ভাত ছাড়া নিজে থেকে কিছু খায় না। বড় মাসীমার বাড়ি গেলে তিনি হয়ত কিছু খেতে দেন। আজ তাও যায় নি, উলটে বাজারে বাজারে ঘুরেছে। তার ওপর এই দীর্ঘ পথ হাঁটা। কিন্তু শুধু শারীরিক ক্লান্তিই নয়—মনে মনেও আজ যেন বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সেটা ওর মুখের চেহারা দেখেই টের পাচ্ছেন শ্যামা। মনের জোর আর কিছুমাত্র নেই। পীড়ন করছে সেটা ওর বেকারত্বের লজ্জা—এবং গ্লানি। ওর মনের মধ্যেটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন শ্যামা। ... কিছুই করতে পারছে না সে, কিছুই করবার নেই। কোন কাজেই লাগতে পারছে না এদের। আর হয়ত পারবেও না কোন দিন ......

এরা সকলেই মুহ্যমান, এরা সকলেই বিচলিত কিন্তু শ্যামা সে রকম কিছু বোধ করছেন না কেন? বরং যে একটা দুশ্চিন্তা, একটা দুঃখ-বোধ, তেমন যেন হচ্ছে না। বরং বেশ কৌতূহলের সঙ্গেই দেখছেন ওদের, লক্ষ্য করছেন। মনে হল এদের অলক্ষ্যে একবার বুকটা টিপে দেখেন—ভেতরের মতো বাইরেটাও পাথর হয়ে গেছে কিনা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা বলে ফেললেন শ্যামা, 'অনেক রাত হয়ে গেল তো, বোধহয় বারোটা একটা হবে—মুখ হাত ধুয়ে নে, তোদের ভাত দিই।'

হেম চমকে উঠল ওর কথা শুনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখল মার মুখের দিকে।

এতক্ষণ কি এসব কথা কিছুই শোনেন নি? না, বহু আঘাতে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল? অমন নির্বিকারভাবে বসেই বা আছেন কী করে? যেন অপর কারও কথা হচ্ছে! ওঁর নিজের মেয়ে নয়—পরস্যাপি পর কেউ।

শ্যামা কিন্তু প্রস্তাব করেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর কথা শোনেনি কান্তি—হঠাৎ ওঁকে সহজভাবে উঠে দাঁড়াতে দেখে সেও চমকে উঠল। অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইল সেও।

শ্যামা হাতটা মুখে তোলার ভঙ্গি করে ইশারায় ওকেও বললেন, 'হাত-পা ধুয়ে নে—ভাত দিই।'

হেম যেন একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বললে, 'তোমার তো সেই সকালের ভাত-বাড়া, সে কি এখনও আছে? সে-তো পচে গন্ধ উঠেছে এতক্ষণে। আর পারলেও এত রাত্রে খেতে পারব না। এক গ্লাস জল দাও, তাহলেই হবে।'

কনক চলে যাওয়ার পর থেকে ওবেলা আর রাঁধেন না শ্যামা—বেলায় যা রাঁধেন তাই এই দুভায়ের জন্য রেখে দেন। সন্ধ্যাবেলা এসে হেমকে প্রত্যহই কড়কড়া ভাত খেতে হয়। আজ সে-ভাতের কী অবস্থা হয়েছে তা বুঝতে পারছে সে।

শ্যামাও তা বুঝলেন। তিনি আর পীড়াপীড়ি করলেন না। আগের দিন দাদাকরা কী উপলক্ষে হরিরলুঠ দিয়েছিল, তারই কখানা বাতাসা দিয়ে গেছে। সেই বাতাসা কখানা বার করে দিয়ে দুঘটি জল গড়িয়ে দিলেন ঘড়া থেকে। একবারেই সব কাজ সারতে হয় বলে ঘুঁটেপাতার আড়াও করতে পারেননি, তাঁর পরে যাবার মতো আর কিছুই নেই।

হেম মুখ-হাত না ধুয়ে সেই অবস্থাতেই দুখানা বাতাসা মুখে দিয়ে ছোট ঘটির পুরো একটি ঘটি জল খেল। এত যে তেষ্টা পেয়েছে তা সে নিজেও এতক্ষণ বোঝেনি।

জল দিয়ে শ্যামা দাঁড়িয়েই আছেন। অর্থাৎ শুয়ে পড়তে চান এবার। হেম চলে গেল দোর দিয়ে শুয়েই পড়বেন হয়ত।

সে আবারও মার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। সত্যিই মার মাথার গোলমাল হয়ে গেল?

একটু ইতস্তত করে আবার সে নিজেই কথাটা পাড়ল, 'কান্তি একটা কথা বলছিল আসতে আসতে—বলছিল এখানে এ রোগের যে ঠিক ঠিক চিকিৎসা হচ্ছে তা তো মনে হয় না। তার চেয়ে, খরচ তো হচ্ছেই, পাল্কী করে এনে ট্রেণে তুলে কোন মতে ধরাধরি করে কলেজে নিয়ে গিয়ে ফেললে কি হয়?'

এবার শ্যামা কথা কইলেন। মনে

হ'ল যেন একটা অন্ধ আক্রোশে দুই চোখ জ্বলে উঠল তাঁর। সে আক্রোশ তাঁর ভাগ্যবিধাতার ওপর। সামনে পেলে বাঘিনীর মতোই নখে-দন্তে টুকরো-টুকরো করে ফেলতেন হয়ত—

তীক্ষ্ন কণ্ঠে বললেন, 'এসব করবে কে? তুমি তো আপিস নিয়ে আছ, আর ও তো ঐ না মানিষ্যি না জানোয়ার। যা পার কর—আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। ঢের মাথা ঘামিয়েছি, ঢের ভেবেছি। আর না। আর আমি ভাবতে পারি না। ভেবেই বা কি হবে? ......যতই যা কর—ও যা হবে তা তো আমি জানিই। আমার ভাল কিছু হয় না কোন দিন। এও হবে না। কেউ থাকবে না আমার, কেউ না—। শুধু আমি রাক্ষুসী চারযুগ বসে থাকব সবাইকে খেতে, সকলের সর্বনাশ দেখতে—'

বলতে-বলতেই এতক্ষণ পরে দুই চোখ ছাপিয়ে হু-হু করে জল নামে তাঁর। ললাটে করাঘাত করতে থাকেন সজোরে। হাহাকার করে কেঁদে ওঠেন।

হেম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

পরের দিন ভোরবেলা অফিস যাবার পথে হেম ডাক্তারের বাড়ি হয়ে গেল। এ পাড়ারই ডাক্তার—বড় ডাক্তারের ছেলে, ভাল প্র্যাকটিস। এত ভোরে দেখা পাবার কথা নয়—তবে সে শুনেছিল ডাক্তারের পুজোপাঠের অভ্যাস আছে, হয়ত ভোরেই ওঠেন। দেখা পেয়েও গেল সে। অত সকালেই ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলেন ডাক্তার—দেখা হয়ে গেল। তিনি প্রস্তাবটা শুনে মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমার তো মনে হয় না এ ঝুঁকি আপনাদের নেওয়া উচিত। হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয় এখনও—অত টানা-হেঁচড়া কি সইবে? এখান থেকে একেবারে গাড়িতে নিয়ে যেতে পারতেন কিম্বা পাল্‌কীতে—সে আলাদা কথা। তাও রাস্তা যা, গাড়িতেও নিয়ে যেতে বলি না। ঝাঁকানিতেই দফা রফা। পাল্‌কীও বোধহয় কলকাতা পর্যন্ত যেতে রাজী হবে না। তাছাড়া সেও, পালকীতে তোলা নামানো কম কাণ্ড নয়—ও-তো হাত-পা কিছুই নাড়তে পারছে না। কলকাতা হলে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে পারতেন। এখানে তো সে ব্যবস্থা নেই!'

তবু হেম বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলা অনেক ঘুরে দেখল। কোন পাল্‌কী-ওলাই রাজী হল না যেতে। কলকাতায় গেলে নাকি পুলিশে বড় দিক্ করে, সে হাঙ্গামে ওরা যেতে রাজী নয়। তাছাড়া রুগী নিয়ে যাওয়া—যদি পালকীতেই মরে যায়? তাহলে ওদের পালকীতে কেউ চড়বে না।

খুব পীড়াপীড়ি করতে একজন পঞ্চাশ টাকা হেঁকে বসল।

অর্থাৎ না যাওয়ারই মতলব।

সুতরাং কিছুই করা গেল না।

রাত্রে হেম গিয়ে কান্তিকে রেখে এল তরুর কাছে। তবু একটা দোসর। আর কিছু না হোক, ছুটে এসে খবরটাও দিতে পারবে। ওকে কাগজে লিখে ওখানের ব্যাপারটাও বুঝিয়ে দিলে একটু, যাতে একটু নজর রাখতে পারে হারানের শ্বশুরের ওপর। ছেলেটাকে একটু দেখতে পারবে কান্তি।

খানিকটা ইতস্তত করে শ্যামার কাছেও কথাটা পাড়ল, 'তুমি একবার গেলে বোধহয় ভাল হত। অতটা পারত না ওরা। ......বিপদের সময় জামাইবাড়ি বলে সংকোচ করতে গেলে চলে না।'

কিন্তু শ্যামা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন, 'না। আর পারাপারির কিছু নেইও। যারা জামাইয়ের মরণ টেঁকে আগেই টাকা-পয়সার কথা চিন্তা করে, তারা এত বোকা নয় যে বয়েবসে নেবে। যা করবার তা করেই ফেলেছে। হরিনাথের বেলা নিজের মা-ভাইই ঠকিয়ে নিলে—এ তো শ্বশুর।... মিছিমিছি আমি গিয়ে নিমিত্তের ভাগী হতে চাই না, ওরা মজা পেয়ে যাবে, বলবে ও মাগীও সরিয়েছে।'

অগত্যা হেমকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

অভয়পদকে বলতে হবে কথাটা। তার একটা পরামর্শ নেওয়া দরকার।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র-চিত্রের রূপ

সোমেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথের যে ছবিগুলিকে 'ছড়া' জাতীয় বলেছি', সেগুলিকে যদি বলা যায় ভঙ্গিপ্রধান, তবে দ্বিতীয় দলের ছবিগুলিকে বলা যেতে পারে ভাবপ্রধান।

এ দুটি দলের যে পার্থক্য নিছক চোখের দেখায় ধরা পড়ে, তাহ'লে এই যে, প্রথম দলের ছবিতে রেখার যে ভূমিকা, দ্বিতীয় দলে সেই ভূমিকা রঙের। এইদিক থেকে রেখাপ্রধান ও বর্ণপ্রধান এইভাবেও ছবিগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে মোটামুটিভাবে। 'মোটামুটিভাবে' বলবার কারণ বর্ণে আঁকা ভঙ্গিপ্রধান এবং রেখায় আঁকা ভাবপ্রধান ছবি যে নেই এমন নয়।

রেখাপ্রধান ছবিতে রেখার ব্যবহার দুরকম। কোথাও রেখার বেষ্টনীতে একটি রূপ সীমায়িত, আবার কোথাও রেখা রূপের সীমানির্দেশক বা আউট-লাইন নয়, তার অজস্র আঁচড়ে একটি রূপ পরিস্ফুট। সীমানির্দেশক রেখায় আছে একটা ছন্দিত রূপ, আঁচড়ের রেখায় সেই ছন্দ নেই। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই চিত্রের ভাষাটা প্রধানত হ'ল রেখার ভাষা।

কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিতে রেখা অনুপস্থিত, বা প্রায় অনুপস্থিত। সেখানে মূর্তিগুলি প্রায় রেখাবন্ধনে বাঁধা পড়েনি। সীমারেখার বন্ধনহীন বর্ণরঞ্জিত মূর্তিগুলি একটা রহস্যঘন অস্পষ্টতা নিয়ে উপস্থিত। আমরা জানি য়ুরোপীয় চিত্রকলায় রেখার ভূমিকা গুরুত্বহীন; সেখানে বর্ণের বৈচিত্র্য ও মাত্রাগত তারতম্য রেখার অভাব মোচন করে ও তার দায়িত্বও গ্রহণ করে। আলোছায়ার দ্বন্দ্ব সে চিত্রের প্রধান উপকরণ। বর্ণ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে ও শক্তিতে রূপটিকে নির্দিষ্ট ও পরিস্ফুট করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলিতে কিন্তু রেখাহীনতা থাকলেও বর্ণ-প্রয়োগের য়ুরোপীয় ট্র্যাডিশনাল কৌশল অর্থাৎ আলোছায়ার দ্বন্দ্বে ও ক্রমানুযায়ী বর্ণের মাত্রার তারতম্যে বস্তুর রূপবিন্যাস চেষ্টা নেই। রবীন্দ্রনাথের বর্ণপ্রয়োগ প্রথাবহির্ভূত নিজস্ব রীতিতে। সে বর্ণ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বর্ণের অনুকরণ নয়, অন্যদিকে তেমনি আলোছায়ার মাত্রা বা দূর নৈকট্যের ক্রমজ্ঞাপক নয়। এবং এইখানেই এ প্রচলিত রীতি-বহির্ভূত।

চোখের দেখাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে গেলে ভঙ্গিপ্রধান ও ভাব-প্রধান ছবির রূপগত আরও কয়েকটি পার্থক্য ধরা পড়বে। প্রথম দলের ছবিতে যে একটা ছন্দোস্পন্দের অথবা রেখার চাঞ্চল্য আছে, দ্বিতীয় দলের ছবিতে তা অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, এগুলি যেন অচঞ্চল, স্থির। প্রথম দলের ছবি-গুলিকে যদি বলি 'ডাইনামিক্', এগুলিকে বলব 'স্ট্যাটিক্'। কিন্তু স্থির হলেও নিছক বেগবিহীন বা নিঃশেষিত বেগ স্থিরত্ব নয়। মনে হয় ছবিগুলিতে একটা প্রচণ্ড বেগ সংহত হয়ে আশ্চর্য সংযম রক্ষার দ্বারা অটুট স্থিরত্বের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। যেন গতিময় জীবননাট্যের কোনো দৃশ্যে হঠাৎ কে অদৃশ্য সঙ্কেতে 'তিষ্ঠ' এই শব্দটি উচ্চারণ ক'রে ঘটমানতার মধ্যে এক আকস্মিক বিরতি এনে দিয়েছে।

শুধু আকারের স্থিরত্ব নয়, চিত্রের মধ্যে অনেকগুলিতেই একটা জমাট নীরবতার ভাব আছে, যাকে নাম দিতে ইচ্ছে হয় 'নাটকীয় নৈঃশব্দ্য'। কিন্তু একথা বললেও অনুভূতিটিকে ঠিক ভাষা দেওয়া যায় না। কেন না নীরবতা শব্দটা নেতিবাচক, সে মাত্র শব্দের অভাবকে সূচিত করে, আরও অধিক অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনে হয় যে একটা নৈঃশব্দ্যের তরঙ্গ ছবিগুলির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তরঙ্গিত। যেন তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক মহা নীরবতা নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে।

ভঙ্গিপ্রধান ছবিতে মাত্র দুটি 'ডাইমেনশন' দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় দলের ছবির মধ্যে পাই তিনটি 'ডাইমেনশন'। এর মধ্যে একটা ঘনতা ও গভীরতা আছে। এক হিসাবে উভয়

ছবির গতি ভিন্নমুখী। প্রথম পর্যায়ের ছবি কাগজের ভূমি থেকে দর্শকের চোখের দিকে এগিয়ে আসে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবি দৃষ্টিকে ভূমির দিকে আকর্ষণ করে ও ভূমি ভেদ করে আরও গভীরে টেনে নিয়ে যায়।

শেষোক্ত দলের অধিকাংশের মধ্যেই প্রায় দেখা যায় পটভূমিকা বা ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ডের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ভঙ্গিপ্রধান ছবির মতো শুধু মূর্তি বা ফিগার চিত্রের বিষয় নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রধান হলেও পটভূমিকারও মূল্য আছে। আবার কোথাও দুইই তুল্যমূল্য। কোথাও বা কোনো মূর্তি নেই, শুধু নিসর্গ দৃশ্যকে উপজীব্য করা হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো এই যে, এই পটভূমিকা শুধু দৃশ্যভাবেই থাকে না। যেন প্রতিটি ছবির মধ্যেই আর একটা অদৃশ্য পটভূমিকা আছে, যার অশরীরী উপস্থিতি লক্ষ্য নয়, অনুভব করা যায়। যেন আসল ছবিটা অনেক বড়, তার অনেকখানি বাদ দিয়ে একটু অংশে আলোকপাত করা হয়েছে। বাকিটা অদৃশ্য। ছবি সেই অদেখা অব্যক্তের মধ্যে একটুখানি দ্বীপের মতো জেগে থাকে বৃহতের দ্যোতনা নিয়ে। চতুর্দিকে পুঞ্জিত নীরবতা ছবির স্বল্পোচ্চার বক্তব্যটিকে ঘিরে থাকে বলে ছবিগুলি অদৃশ্য ইশারায় রহস্যময়। কবির ভাষায় বলা যায়—

'তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভীড়'

রেখা বা ভঙ্গিপ্রধান ছবিগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে সেগুলি ভাব-ভাবনার ভারবিহীন। 'ভঙ্গি'টাই সব। কলমের আঁচড়ে তা আকস্মিক ও অভাবিতভাবে রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে নিজেই জানিয়েছেন—'আমি কোনো বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে একটা অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব।'

কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিগুলি ঠিক এ জাতীয় নয়। এদের ভঙ্গি নেই আছে ভাব। সুস্পষ্ট না হতে পারে, কিন্তু একটা অশরীরী ভাবকে শরীর-দানের আকুলতা এখানে আছে। কবির 'আলেখ্য' নামে একটি কবিতায় এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা থেকে একটু অংশ উদ্ধার করি—

'অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্র রূপ চলেছিল নানা
কলরবে
নানা ছন্দে নেয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়াছিলি শূন্যে শূন্যে
কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিকের মহা অন্তরাল
পরশিল মোর ভাল চুপে চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার
আলেখ্য-লোকে
আনিয়াছি তোকে।'

প্রথম দলের মতো এগুলি অর্থছুট্ নয়, অর্থময়। অবশ্য অর্থময় মানে অর্থ-সর্বস্ব নয়। কোনো শিল্পই অর্থসর্বস্ব নয়। অর্থকে ছাড়িয়ে যাওয়াই তার ধর্ম, অর্থবান হয়েও সে অর্থাতীত। ভঙ্গি-প্রধান ছবিগুলিকে যদি বলি অর্থছুট্, ভাবপ্রধানকে বলব অর্থাতীত। প্রথম দলের ছবিগুলি অতীত ভবিষ্যতের বন্ধনমুক্ত, লঘুভার, বর্তমানসর্বস্ব। ভাবের অশ্রু-বাষ্পে ঝাপসা নয়। ভাবের ছবিগুলি কিন্তু বিপরীতধর্মী। এগুলি অতীত-কবলিত। ছবির ভাষায় যাকে বলেছি 'বৃহত্তর পটভূমিকা', সাহিত্যের ভাষায় তাকে বলব 'অতীত'। প্রায় প্রতিটি ছবির
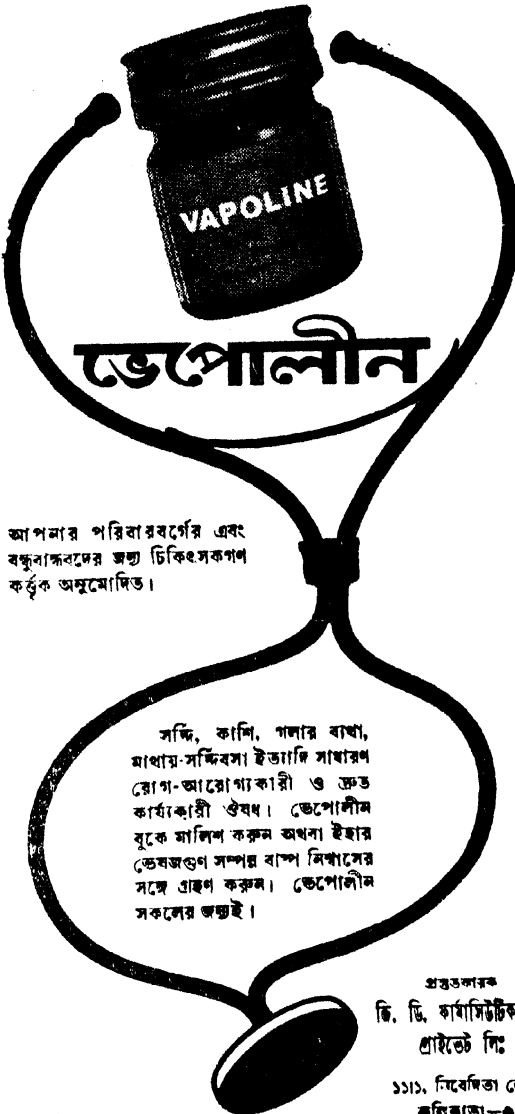
যেন এক অতীত ইতিহাস আছে। যেন জীবন-নাট্যের কোন এক সংঘাতপূর্ণ অথবা আবেগপূর্ণ দৃশ্যকে হঠাৎ এখানে সমুপস্থিত করা হয়েছে। এইদিক থেকে দেখলে এগুলিকে নাটকীয়তাপূর্ণ বলা চলে। নাটকের মতোই এখানে একটা রসের তীব্রতা আছে। নরনারীর মুখে চোখে, অথবা চোখমুখহীন কালিমালিপ্ত দেহাবয়বে, এমন কি মনুষ্যেতর জীব এবং নিছক নিসর্গ চিত্রের মধ্যেও এই রসের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এ রস করুণ কি মধুর সেটা সব সময় খুব স্পষ্ট নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিমিশ্র। একাধিক রসের মিশ্রণে এক কুহেলিকাচ্ছন্ন অস্পষ্টতার সৃষ্টি। তবে এটুকু বলা চলে যে লঘু কৌতুকরস, যা প্রথম পর্যায়ের ভঙ্গি-প্রধান ছবিতে প্রধান বা অনেক সময় একমাত্র, এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে কৌতুকের স্থান নেই। কেননা ও রসটি ভাবাবেগের সম্পূর্ণ বিরোধী। কৌতুকের ছটায় ভাবের ঘন বাষ্পাচ্ছন্ন পরিমন্ডলটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাই ও রস ভাবের ছবিতে অশোভনতার সৃষ্টি করে।

॥ ২ ॥

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমালোচকেরা দুটো শব্দ ব্যবহার করেন—'পদ্যের কলম' আর 'গদ্যের কলম'। ছবির জগতেও যদি তেমনি দুটি শব্দ সৃষ্টি করা যায়, তবে বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য 'পদ্যের তুলি' আর 'গদ্যের তুলি' আশা

করে চলতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গিপ্রধান ছবিগুলিকে যদি বলি পদ্যের তুলিতে আঁকা, তবে ভাব-প্রধান চিত্রগুলিকে বলব গদ্যের তুলিতে সৃষ্টি। এখানে চিত্রী রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী নন; তাঁর সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথের। ঘনত্বযুক্ত, গুরুভার এই ছবিগুলির মধ্যে ক্ষীণপ্রাণতা অতি অল্পই দেখা যায়। বহুস্থানেই শিল্পী যে শুধু পেলবতা ও লালিত্যকে পরিহার করেছেন, তা নয়, ছন্দোহীন, ভারগ্রস্ত স্থূলতাকেই প্রকাশ করেছেন। একেই বলতে চাই গদ্যাত্মকতা। ছবিগুলি গদ্যের তুলিতে আঁকা। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এগুলিতে নাটকীয়তা আছে। এখানে 'নাটকীয়তা' বলতে বোঝাতে চেয়েছি 'নাট্যরস'। অর্থাৎ মিলটা নাটকের যা ভিতরের বস্তু, তার সঙ্গে, তার বহিরঙ্গের সঙ্গে নয়। কিন্তু ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য অনুভব করা যায় উপন্যাসের সঙ্গে। কাব্যের মতোই নাটকের গঠনভঙ্গির একটি নির্দিষ্ট সুবিন্যস্ততা বা দৃঢ়পিনদ্ধ পরিপাট্য আছে। উপন্যাস অনেকটা অবিন্যস্ত, শিথিলগ্রথিত, ভারগ্রস্ত। তার সামঞ্জস্য একটু জটিল, বৃহৎ সামঞ্জস্য, তার গতি মন্থর। আমার তো রবীন্দ্রনাথের ভাব-প্রধান ছবিগুলিকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যযুক্ত বলে মনে হয়। বলা বাহুল্য উপন্যাসের বিপুল সামগ্রিকতা ছবিতে নেই; এগুলি উপন্যাস-জীবনের এক একটি দৃশ্য। অথচ ছবি হিসেবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নরনারীর জীবনের যে হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা, অনুরাগ, আক্ষেপ অথবা তীব্র মর্মবেদনা ও অন্তর্দাহ উপন্যাসে ভাষাসংস্পর্শে সুবোধ্য স্পষ্টতা লাভ করে পাঠকের মর্মগম হয়, এখানে তাই যেন ভাষাহীন মূকাভিনয়ে পর্যবসিত। ছবিগুলির মধ্যে জীবনের সেই গভীর রূপের, নিবিড় রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। সে রস শুধু যে শান্ত জীবনের রস, তা নয়। অনেক সময় বিক্ষুব্ধ, মথিত জীবনেরও রস। অথচ ছবিতে সে রসের প্রকাশটি শান্ত, স্তব্ধ। সে শুধু বিক্ষুব্ধ অতীত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। চাঞ্চল্যের ইঙ্গিত দিলেও সে স্বয়ং অচঞ্চল।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রের সমালোচকদের একটি মন্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন বলে মনে করি। এ ছবিগুলির মধ্যে অনেকেই শুধু বিষাদের ছায়া দেখেছেন এবং আনন্দবাদী কবির স্বভাববিরুদ্ধ বিপরীত মনো-ভঙ্গির প্রকাশ বলে ঐগুলিকে কবির ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি নামে অভিহিত করেছেন। কেউ বা এর মধ্যে কবি-মনের অবচেতনার সন্ধানে রত হয়েছেন। প্রথমেই বলা প্রয়োজন চিত্রগুলি নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের প্রকাশ, এ উক্তি সমগ্র রবীন্দ্র-চিত্রের সঙ্গে অপরিচয়কেই সূচিত করে। কয়েকটি মাত্র প্রকাশিত অথবা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ছবিকে ভিত্তি ক'রে এই ত্বরিত সিদ্ধান্ত অযথার্থ। শুধু সমালোচক নয়, কবি নিজেও এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—'আমার সব ছবিরই ভাব কেমন বিষাদমাখা।' কিন্তু বস্তুত কবির অজস্র ছবির মধ্যে বহু ছবিতে বিষাদের ছায়া দেখা গেলেও, সব ছবিতেই তা নেই। এমন কি অধিকাংশ ছবিতেও নেই, একথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি ভাবের ছবিগুলিতে কৌতুকরস নেই, তেমনি নেই আনন্দের উল্লাস। প্রায়ই দেখা যায় অপ্রশস্ত গভীর ভাবের প্রকাশ। করুণ, মধুর, বিস্ময় যে-কোনো রস অপ্রমত্ত গভীরতার স্তরে পৌঁছলে তা নাইরে অনেকটা ঐক্য বা নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু সেই গভীরতা বা স্তব্ধতাকে বিষাদের অভিব্যক্তি বলে মনে করলে ভুল হবে। একটু সজাগ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে এগুলিতে প্রণয়, বাৎসল্য, শোক, হতাশা, পুলক, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি বহুবিচিত্র মনোভাবের পরিচয় পাওয়া কঠিন হবে না। নিসর্গ-চিত্রে হৈমন্তিক কুহেলিকা যেমন আছে, তেমনি আছে বাসন্তী বর্ণালী। সূর্য-চন্দ্রহীন চিররাত্রির দেশের ছবি যদি পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যাবে সূর্যকরোজ্জ্বল উদয়দিগঙ্গনের প্রভাস্বরতা। তুলির টানে গোলাপের রক্তাক্ত হৃদয়ের চিত্রটি যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি রূপায়িত হয়েছে বর্ষা-নিশীথের শুভ্রতনু রজনীগন্ধার সুকুমার রূপসৌন্দর্য। সাহিত্যের মতো চিত্রজগৎও বহুবৈচিত্র্যময়।

আর শুধু যদি করুণরসাত্মক ছবিগুলিই নেওয়া যায়, অথবা এমন ছবি নেওয়া যায়, যা 'রবীন্দ্র-মানসিকতা' বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন, তবে তাতে বিস্মিত হবার বা অবচেতনার অন্ধকারে গবেষণা শুরু করবার কোনো কারণ নেই। এই সহজসত্যটি মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, ছবি আত্মভাব-প্রকাশক গীতিকাব্যের মতো স্রষ্টা-চিত্তেরই অভিব্যক্তি নয়। ছবির রাজ্যে কেন, সাহিত্যের রাজ্যেও আমরা এমন অসংখ্য ছবি পাই যেখানে কবির আশাবাদ বা আনন্দবাদের প্রকাশ আদৌ নেই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে আশাহীন, করুণ জীবনচিত্র অনেক আছে। তেমনি আছে রুচিহীন স্থূল মনের পরিচয় কথাসাহিত্যের বহু পাত্র-পাত্রীর মধ্যে। কিন্তু সেগুলি সৃষ্টি মাত্র। সৃষ্টি স্রষ্টা-মনেরই প্রতিরূপ হবে, এমন আশা বা কল্পনা করা শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। নাটকে কথাসাহিত্যে এমন কত চরিত্র আছে যা রবীন্দ্র-মানসিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। রক্তকরবীর রাজা, গোঁসাই, শারদোৎসবের লুব্ধকেশ্বর, গোরার পানুবাবু, ঘরে বাইরের সন্দীপ, যোগাযোগের মধুসূদন, শ্যামা, তিন সঙ্গীর সোহিনী—আরও কত মুখ মনে পড়বে।

এককালে সাহিত্যসমালোচনায় এক শ্রেণীর জাতমানা, শুচিতাগ্রস্ত, রক্ষণশীল সমালোচক এ সব চরিত্র নিয়ে সাহিত্যকে খোঁটা দিয়েছিলেন। নিরুপায় কবিকে সেই অরসিক মন্তব্যের বিরুদ্ধেও কলম ধরতে হয়েছিল কৈফিয়ৎ লিখতে। সেখানে তাঁর বক্তব্য এই যে, এগুলি সৃষ্টি, সৃষ্টিকে সৃষ্টি হিসেবেই দেখো। সৃষ্টিরাজ্যের জীবগুলো সব নীতিধর্মের ক্ষুরধার পথের ঠিক উপর দিয়েই চলে না। সেটা শিল্পীর অকীর্তি নয়। সাহিত্যে মধ্যযুগীয় সমালোচনা আজ অবসিত ও সর্বজন-ধিকৃত। কিন্তু চিত্র সমালোচনায় আবার সেই মনোভাবের ঈষৎ রূপান্তরিত পুনরাগমন ঘটছে এবং ঘটছে আধুনিক মনেও এ বড় আশ্চর্য। এটি লক্ষ্য করেই এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমার ছবি এদেশকে দেখাই নি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না, প্রথমেই দেখে এর চেহারাটা ভালো দেখতে কিনা। দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কিনা। সে দেখা কেমন করে দেখা, তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। একটা নিরত অভ্যাস আর ইন্‌স্টিংক্‌টিভ্‌ দৃষ্টি থাকা চাই। ছবি দেখা সকলের কাজ নয়।'

চিত্রী রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টা ও স্রষ্টামাত্র। চিত্র তাঁর রূপ-সৃষ্টির ক্ষেত্র। সেখানে ভালো-মন্দ, স্থূল-সূক্ষ্ম সবই এসেছে ভিড় ক'রে। সেখানে সন্দীপকে পাবো, শ্যামাকেও। কিন্তু চিত্রীর অবচেতনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা হাস্যকর। 'খোঁচাওয়ালা, কোণ-ওয়ালা' ছবি, 'তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, নুরালজিয়ার ব্যথার মতো' ছবি যদি থাকেও তবে শান্ত-দৃষ্টি ঋষি রবীন্দ্রনাথের ভাবান্তর দেখে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ ঐ খোঁচাওয়ালা ছবিটা ছবিই। ওটা যে অতি অবশ্যই কবি-মনের বা অন্ততপক্ষে তাঁর অবদমিত অবরুদ্ধ অবচেতন মনের ছবি, চিত্র সমালোচকের অদ্ভুত ধারণার এমনতর জবরদস্তিটা হাস্যকর। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই 'খোঁচা ও ক্ষুরের, কড়া লাইনের খাড়া লাইনের' ছবি আদৌ বিরল নয়। আত্মভাব-প্রকাশক বিশুদ্ধ গীতিকাব্য ও গানের বাইরে যে বিচিত্র রূপসৃষ্টির জগৎ আছে, সেখানে জীবনের বহুবিচিত্র স্তরের ভালো-মন্দ অজস্র রূপের লীলা দৃশ্যমান। সেই কারণেই রবীন্দ্র-চিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে যোগহীন কোনো কোনো সমালোচকের এই মনগড়া কল্পনাটার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই শুধু কোমল, পেলব, সুকুমার, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যই রূপায়িত এবং দুঃখ-

সম্বন্ধহীন বিশুদ্ধতম আনন্দময়তারই প্রকাশ; বেদনা ও হতাশার অথবা পার্থিব জীবনের অতি সাধারণ নীচু পর্দার কামনা-বাসনা ও স্থূলতার প্রকাশ সেখানে অনুপস্থিত, এই অদ্ভুত ধারণা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচয় সূচিত করে। শুধু গল্প-উপন্যাস-নাটকই বা বলি কেন, গীতি-কাব্য ও গানেও কবির তীব্র অন্তর্বেদনার প্রকাশ রবীন্দ্র-পাঠকের অলক্ষ্য থাকে না। যৌবনের কড়ি ও কোমল, মানসী থেকে শুরু করে জীবনের উপান্তবর্তী কাব্য-গুলিতে এর পরিচয় ছড়িয়ে আছে। 'প্রশ্ন' কবিতাটি তো একটি অতি পরিচিত রচনা। এ ছাড়া 'দুর্ভাগা দেশ', 'আফ্রিকা' প্রভৃতি কত কবিতা আছে। জীবনের প্রতিকূল অবাঞ্ছিত পারিপার্শ্বিক কবি-মনকে উত্যক্ত করেছে যখনই, কাব্যে তার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু অশান্তি স্থায়ী হয় নি। আপন আন্তরশক্তিতে কবি তাকে কাটিয়ে উঠে আবার আত্মসংস্থ সহজাবস্থা ফিরে পেয়েছেন। অশান্তিকে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

যাই হোক, ছবি-রাজ্যের পাত্রপাত্রী-গুলি রবীন্দ্র-চিত্তেরই রূপপরিগ্রহণ নয়, তাঁর চোখে অথবা কল্পনার চোখে দেখা জীবনেরই রূপায়ণ। এতে তাঁর চিত্তের পরিচয় মেলে, কিন্তু সে দ্রষ্টাচিত্তের। এ সম্পর্কে কবি নিজে কিছু মন্তব্য করে চিত্রদর্শকের পথসন্ধানের সহায়তা করেছেন। শিল্পী যামিনী রায়কে একটি পত্রে লিখেছেন—

'যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্ব-দৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আনত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় মন টানল, তখন দৃষ্টির মহা-যাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টা-রূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ; এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী।...চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অয়ম্ অহম্ ভো—এই যে আমি আছি।'

ছবির জগৎ দৃষ্টির জগৎ। কিন্তু কবির দেখার আরও একটু বিশেষত্ব আছে এবং সে বিশেষত্বটি আমাদের কাছে খুবই কৌতূহলজনক। নিজের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যত্র লিখেছেন—

'আমার ছবি যখন বেশ সুন্দর হয়, মানে সবাই যখন বলে, 'বেশ সুন্দর হয়েছে,' তখনি আমি তা নষ্ট করে দিই। যখন ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন তাকে আবার উদ্ধার করি। এমনি করে তার একটা রূপ বের হয়।'

এই সঙ্গেই লিখেছেন—

'আমি মানুষের জীবনটাকেও এমনি করেই দেখি। মানুষ যখন একবার ঘা খায়, বা পড়ে যায়, একটা কিছু সাংঘা-তিক ঘটে, তারপর মানুষ যখন নিজেকে ফিরে তৈরি করে, তখনি তার একটা রূপ বের হয়।' (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ: রাণী চন্দ)।

এই যে রূপের কথা বলা হল, এ রেখার বা রংএর রূপ নয়, ভাবের রূপ, অর্থাৎ ব্যক্তিরূপ। এখানে রবীন্দ্র-চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটা গভীর যোগ পাওয়া যায়। সাহিত্যেও তিনি অনেক সময় এমনি করেই মানুষকে দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। পতন ও পুনরুদ্ধার, রাহুগ্রাস ও গ্রাসমুক্তি রবীন্দ্র-সাহিত্যে, রবীন্দ্র-নাটকে তো বিশেষ করে, সুপরিচিত চরিত্রলক্ষণ। বিসর্জনের রঘুপতি, তপতীর বিক্রম, রাজার সুদর্শনা, রক্তকরবীর রাজা এর উদাহরণ। এখানে চিত্রী ও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি এক।

॥৩॥

ভঙ্গি-প্রধান ছবিগুলির মতো ভাব-প্রধান ছবিতেও রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মন সৃষ্টিক্ষেত্রে আপন স্বৈরগতিতে অগ্রসর। আধুনিক ইয়োরোপীয় আর্ট আন্দোলনের সঙ্গে এর প্রভাবগত কোনো সম্বন্ধ নেই, এই কথাটি বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যেমন অজন্তা, মোগল, রাজপুত আর্টের পদাঙ্ক ধরে 'ওরিয়েন্টাল আর্ট'এর সৃষ্টি করেন নি, তেমনি অনাধুনিক অথবা আধুনিক ইয়োরোপীয় আর্টেরও দাগা বুলিয়ে শিল্পী হতে চান নি। পরের চেহারা ধার করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলার ভঙ্গি নিয়ে আপন সৃষ্টিকে যুগধর্মের তিলক-লাঞ্ছিত করার প্রয়াসও তাঁর ছিল না।

বস্তুত ইয়োরোপীয় আধুনিক আর্টের সঙ্গে এ ছবিগুলির যদি কোনো বাহ্য সাদৃশ্য থাকেও তবে তা আকস্মিক এবং প্রভাব বা অনুকরণগত সম্পর্ক-শূন্য।

ইয়োরোপের আধুনিক আর্টের সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রের দুটি পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথমটি রূপগত এবং দ্বিতীয়টি ইতিহাসগত। ম্যানে-মনে, সেজান্, পিসারো, গগাঁ, মাতিস, পিকাসো প্রমুখ শিল্পীর যে শিল্প-চেষ্টা আজ শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় ইয়োরোপে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে একটা অস্থির পরীক্ষা-প্রবণতার ভাব আছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা প্রবল, প্রচণ্ড পরীক্ষাজ্বালা। পরীক্ষা বস্তুটি এক অদ্ভুত বিমিশ্রতার আধার। সেখানে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের দৃঢ়তার সঙ্গে অনিশ্চিত সিদ্ধির সংশয় ও শৈথিল্য পাশাপাশি বাস করে। দুর্বলতার কথা ছেড়ে দিলেও পরীক্ষার মধ্যে রং, রেখা, ভঙ্গি, আঙ্গিক নিয়ে অবিরাম অনিশ্চিত নড়াচাড়া আছে। পথসন্ধানের মানসসংগ্রাম ছবিতে প্রায়ই প্রত্যক্ষ। অনেকক্ষেত্রে শুধু সংগ্রাম নয়, সাম্প্রতের অস্থির, সংশয়-পীড়িত জীবনদর্শন, বিশিষ্ট পরিভাষায় 'জীবনযন্ত্রণা' আধুনিক শিল্পে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের অশান্ত আক্ষেপকে প্রকট করে তুলেছে।

রবীন্দ্র-চিত্রে সে লক্ষণ অনুপস্থিত। এ ছবিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোথাও
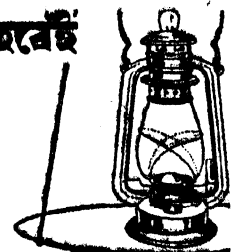
নেই, একথা বলি না। কিন্তু সর্বোপরি একটা স্নিগ্ধ শান্তি আছে। হাত-পা ছোঁড়ার ভাব নয়, একটি অনায়াস ভঙ্গি আছে। পথসন্ধানের আত্যন্তিক আকুলতা নেই; শিল্পী যেন আপনার সহজপ্রাপ্ত পথেই প্রাগ্রসর। সে পথের শিল্পগত সার্থকতা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু পথিকের নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত পদক্ষেপ তর্কাতীত। বোধ হয় এই বস্তুটি লক্ষ্য করেই ফ্রান্সে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী দেখে ওদেশের শিল্পী একটু উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়েই বলে উঠেছিলেন—'অনেকদিন ধরে আমরা যে চেষ্টা করছি, তুমি সেটা পেয়েছ।' পল্ ভেলেরি ও আঁদ্রে জিদ্-এর মুখে মন্তব্য শুনি—'আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এই সব আন্দোলনের তলায় তলায় যে নূতনকে পাবার চেষ্টা লুকানো রয়েছে, আপনি কী করে এত সহজে সেই জিনিসটিকে চোখের সামনে এনে ধরলেন?' (প্রতিমা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে)। রবীন্দ্রনাথের অনায়াস সিদ্ধিই ইয়োরোপীয় শিল্পী-গোষ্ঠীকে বিস্মিত করেছিল।

এই হ'ল রূপগত ব্যবধান। এ ছাড়া ঐতিহাসগত পার্থক্যও আছে। ইয়োরোপের মডার্ন আর্ট যুগ যুগ অনুশীলিত অনুকৃতিমূলক আর্টের প্রবল প্রতিক্রিয়াজাত। ইয়োরোপের শিল্প-বোধের অবদমিত, উপেক্ষিত কল্পনা আজ সেজান্, পিকাসো, মাতিসে বিদ্রোহের কালাপাহাড়ি মূর্তি নিয়ে উপস্থিত। তাই এককালে যে শিল্প প্রাকৃতিক বস্তুর পার্সপেকটিভ্ অ্যানাটমির দাসত্ব করেছে রিয়ালিস্টিক্ হবার সাধনায়, আজ সে উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় ইম্প্রেশনিষ্ট্, সুর রিয়ালিস্ট প্রভৃতি রূপে অভিব্যক্ত। ইয়োরোপের শিল্পে অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথেই এটি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের দেশে সে পটভূমিকা নয়। এ আন্দোলনও স্বাভাবিক নয়। এ দেশীয় মানস-রাজ্যে এ জিনিস স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত হতে পারে না। রিয়ালিজম্-এর নাগপাশে এ দেশ কখনো শিল্পী-মনের কল্পনাকে বাঁধে নি। চিত্রে, ভাস্কর্যে সর্বত্র অবাধ কল্পনার যথেচ্ছ বিহার। বস্তুরূপকে সে গ্রহণ করেছে যতটুকু গ্রহণ করা যায়, স্বাধীন শিল্পসৃষ্টি দ্বারা তাকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। রবীন্দ্র-মন এই শিল্প-বোধের ভাবপরিমন্ডলেই পুষ্ট। কিন্তু শুধু দেশীয় বা জাতীয় ঐতিহ্যই নয়, কবির ব্যক্তিক প্রবণতাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ জন্ম-রোমান্টিক। 'আপন মনের মাধুরী' দিয়েই তিনি জগৎকে দেখেছেন, কোনোদিন তথাকথিত 'রিয়ালিস্ট' হবার সাধনা করেন নি। স্বভাবতই আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পীর দ্রোহ বুদ্ধির আবেগ ও বেগ তাঁর মনে সঞ্চিত হবার কোনো কারণ ঘটে নি। চিত্রী রবীন্দ্রনাথের মন এ যুগের ইয়োরোপীয় চিত্রীগোষ্ঠীর মনের প্রতিরূপ নয়, এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। এই জন্য যে, আজকাল একটা অতি-উচ্চারিত, জনপ্রিয় মন্তব্য শুনতে পাওয়া যায় যে একালের ছোট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে 'আধুনিক মন' নামে একটা বস্তু এ যুগের কারখানা ঘরে সর্বত্রই এক ছাঁচে তৈরি হচ্ছে। এ সম্বন্ধে বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। কারণ তাতে ফল নেই। কিন্তু শুধু এইটুকু বলি যে আধুনিক সংকুচিত পৃথিবীতেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর দৈশিক অথবা ব্যক্তিক সুদূর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। একথা বলি না যে আধুনিক বিশ্ব বা বিশ্বমন তাঁর চিত্রে ও সাহিত্যে আদৌ ক্রিয়াশীল নয়। চিরদিন চিত্তের প্রচন্ড শোষণ-শক্তিতে বিশ্ব-জীবন থেকে অনেক কিছু তিনি আত্মসাৎ করেছেন। তথাপি ব্যক্তিক বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্য হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা সীমায়িত। আগে তিনি রবীন্দ্রনাথ, তারপর বিশ্ব-কবি।

চিত্রেও তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য আছে। রবীন্দ্র-চিত্র সংকুচিত বিশ্বের আধুনিক মনোজাত সাধারণীকৃত আর্টের বৈশিষ্ট্যহীন নমুনা মাত্র নয়। তাঁর সৃষ্টি ইয়োরোপীয় মডার্ন আর্টের অংশও নয়, প্রতিনিধিও নয়। এ প্রসঙ্গে একটি আপাত-অবান্তর কথা বলে রাখি। আধুনিক মনের ব্যক্তিত্বহীন চেহারা যদি শিল্পে একইভাবে সর্বত্র সত্যই কাজ করতে থাকে, তবে বিশ্ব-শিল্পের পক্ষে বড় দুর্দিন উপস্থিত বলতে হবে। ফ্রান্স, জার্মানী, ইংলন্ড, রাশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান সব দেশের শিল্পী যদি বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্যহীন মডার্ন আর্টের একমেবাদ্বিতীয়ম্ রূপ পরিগ্রহ করে ব্যক্তিগত বা দেশগত রূপ-স্বাতন্ত্র্যকে নস্যাৎ করে, তবে শিল্পের সেই কৈবল্যপ্রাপ্তি বড়ই দুঃখের। কোনো দেশেই প্রকৃত শিল্পী ও শিল্প সেই আত্মসত্তাহীন সাযুজ্যমুক্তি চায় না। শিল্পরসিকেরও তা কাম্য নয়। দেশে দেশে বিশ্ব-শিল্পে পরস্পর যোগটা শিল্পগত, পরস্পর ভেদটা শিল্পীগত। আমরা ঐক্যও চাই, ভেদও চাই। রবীন্দ্রনাথের শিল্পে, আমার বিশ্বাস, আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পের সঙ্গে যদি কোথাও ঐক্য থাকেও, ভেদও আছে।

ইয়োরোপীয় আধুনিক আর্ট ও রবীন্দ্র-চিত্রের রূপগত ও ঐতিহাসিক প্রেরণাগত পার্থক্যকে সংক্ষেপে আর একবার স্পষ্টীকৃত করে নেওয়া যাক।—

(১) ইয়োরোপীয় আধুনিক চিত্র এক মহা পরীক্ষাশালা, নিয়ত পরীক্ষণের তাড়নায় অস্থির। রবীন্দ্র-চিত্র অনুরূপ পরীক্ষামূলক নয়।

(২) ইয়োরোপের আধুনিক আর্ট দীর্ঘদিনের অনুকৃতিমূলক শিল্প-সাধনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহজাত এবং এই হিসেবে ইয়োরোপীয় শিল্প-বিবর্তনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। রবীন্দ্র-চিত্র কোনো প্রতিক্রিয়াজাত নয়।

তথাপি যে উভয়ের সম্বন্ধের কথা বলা হয়, তার মূলে আছে বাইরের চেহারায় কিছু কিছু আপাত সাম্য। প্রথমত উভয় ক্ষেত্রেই শিল্প প্রাকৃতিক বস্তুরূপের বিস্তর ওলটপালট ঘটিয়েছে। দ্বিতীয়ত উভয় চিত্রেই রং রেখায় প্রচলিত প্রয়োগরীতির অনুবর্তন নেই। এ মিল অনেকটাই আকস্মিক। ড্রইং প্রভৃতি ব্যাপারে উপযুক্ত পূর্ব-শিক্ষার অভাব থাকায় রবীন্দ্রনাথকে কতকগুলি অনিবার্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই অসুবিধাকে তিনি কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন নিজের এমন একটা পথ আবিষ্কার করে, যেখানে ট্র্যাডিশনাল সাধনার অভাব-জনিত দুর্বলতা বাধা সৃষ্টি না করে। এ পথেই ড্রইং-এর জটিলতা পরিহার করা হয়েছে এবং এইখানেই যেমন আদিম গুহা-মানবের ছবির সঙ্গে তাঁর ছবির একটা মিল এসে গেছে, তেমনি মিল ঘটেছে আধুনিক ইয়োরোপীয় আর্টের সঙ্গে। তাঁর ছবিতে গতানুগতিক ড্রইং-এর অভাব

শিক্ষার অভাবজনিত; সুতরাং অনিবার্য। অশিল্ট ভাষায় 'বাধ্যতামূলক'। কিন্তু আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পে সর্বত্র তা নয়। এমন শিল্পী অবশ্য আছেন (যেমন ভ্যানগগ্, সেজান্) যাঁরা ট্র্যাডিশনাল একাডেমিক ড্রইং শেখেন নি ভালো করে; কিন্তু এমন বহু ড্রইংসিদ্ধ শিল্পী আছেন যাঁদের ছবির ড্রইংহীনতা নিছক ঐচ্ছিক। (যেমন পিকাসো কিংবা মাতিস্)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওই ছবির ঐক্য ধাতুগত ঐক্য নয়, তাই একে বলেছি আকস্মিক।

রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে ইয়োরোপীয় অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট আন্দোলনের কোনো মিল নেই, একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। আত্যন্তিক মননজাত, বুদ্ধি-সর্বস্ব, একান্ত অবচ্ছিন্ন এই শিল্পরূপ রবীন্দ্রনাথ খুব পছন্দ করতেন না। সাহিত্যে তিনি যেখানে মননধর্মী অবচ্ছিন্নতার (abstraction) সাহায্য নিয়েছেন; সেখানেও তার মধ্যে হৃদয়ঙ্গম ও জীবনের রূপময়তার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রাণস্পন্দনকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সাহিত্যকে নিছক বুদ্ধিগ্রাহ্যতার শুষ্কতা থেকে রক্ষা ক'রে তার ভারসাম্যকে অটুট ও রসরূপকে সুসম্পূর্ণ রেখেছেন। মুক্তধারা, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি সাংকেতিক নাটকগুলি লক্ষ্য করলেই এটা স্পষ্ট হবে। সেখানে চরিত্র ও ঘটনা একদিকে যেমন অবচ্ছিন্ন, অশরীরী সত্য, অন্যদিকে তেমনি মানসিক ও প্রাকৃতিকরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সহজ জীবনধর্মের প্রকাশক। পাত্র-পাত্রীগুলি নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্ব হয়েও ব্যক্তিক সত্তাময়। একদিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য, অন্যদিকে হৃদয়-বেদ্য। দুই-ই একসঙ্গে, একাধারে। সাহিত্যের মতো ছবিতেও এই ভারসাম্য উপস্থিত। তাই রবীন্দ্র-চিত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট নয়। সে প্রকৃতির নকল যেমন নয়, প্রকৃতি থেকে খুব দূরবর্তীও নয়। অবনীন্দ্রনাথ এটি লক্ষ্য করেই বলেছেন, 'রবিকার ছবিতে যা আছে, তা বহু আগে থেকেই হয়ে আসছে, নেচারে সে সব আছে।' অর্থাৎ জীবনের বা প্রকৃতির সহজরূপেই এর প্রেরণা ও আদর্শ। প্রকৃতি থেকেই এ নেওয়া, শুধু 'মনের মাধুরী' মিশিয়ে তার নবরূপায়ণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে ইয়োরোপীয় ইম্প্রেসনিস্ট আর্টিস্টদের মিল বরং খুঁজে পাওয়া যায়। এই শিল্পীগোষ্ঠীর রচনার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিত্রের বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে। যদিও, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পার্থক্যও নেই এমন নয়।

॥৪॥

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই শিল্পীর কৌতূহলজনক আপাত-বিরোধী দুটি মন্তব্যের উল্লেখ ক'রে আমাদের কথা শেষ করি। উইলিয়াম আর্চার ওদেশে রবীন্দ্র-চিত্র প্রদর্শনী দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'এ চিত্র সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ অভিনব।' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এগুলি দেখে বলেছেন, 'রবিকা যা আঁকলেন, তা নতুন নয়। যখন সবাই বললে, এ একটা নতুন জিনিস, আমি বললুম নতুন নয়, এ নতুন হতে পারে না।'

মন্তব্য দুটি যে বিরোধী নয় অবনীন্দ্রনাথের উক্তির শেষ বাক্যটি তার ইঙ্গিত দেয়। তিনি বলেছেন, 'রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন। আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)

স্বভাবে অভিনবই হোক, আর সনাতনীই হোক, রবীন্দ্র-চিত্রের প্রধান গুণ তার অভিব্যক্তিতে সুস্পষ্ট আত্মতা। সে বলে, 'অয়ম অহম্ ভো'। এই আত্ম-ঘোষণার জোরেই দর্শকের দৃষ্টিকে সে মুগ্ধ করে। এই চারিত্রশক্তি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'ক্যারেক্টার', এর পিছনে আছে একটি সহজ বলিষ্ঠতা। কিন্তু সহজ হলেও এর অনুকরণ সহজ নয়, বরং একে বলা যায় অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—'যাহা সর্বাপেক্ষা সহজ, তাহাই সর্বাপেক্ষা কঠিন, সহজের প্রধান লক্ষণই এই।' তাই যতই অদ্ভুত, উদ্ভট, সরল, সহজ মনে হোক, অনুকরণের পথে তখনো গিয়ে পৌঁছনো অসম্ভব। ঐ অনায়াস সারল্য আয়াসসাধ্য নয়। 'যে পারে সে আপনি পারে' এই হ'ল আসল কথা।

বস্তুত আর্টিস্টের তথাকথিত সাধনা না থাকলেও রুচি, দৃষ্টি, রং ও রেখার ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের গভীর বোধ, এক কথায় শিল্প-সৌন্দর্যের রীতিমতো ধারণা যে রবীন্দ্রনাথের ছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায় সেখানে, যেখানে রেখার বিন্যাসে, বিশেষ বর্ণের প্রয়োগে অত্যন্ত দুঃসাহসিক স্বাধীনতার স্বৈরগতিও কোথাও শিল্পের মৌলিক নীতিকে আঘাত না ক'রে কঠিন সংযম রক্ষা করেছে। ছবিগুলি অশিল্পীর যেমন-তেমন রেখা বা যা-খুশি তাই রং-এর সমষ্টি কদাপি নয়। পরন্তু প্রতিটি চিত্রের মধ্যেই একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে পরিণত ওজনজ্ঞান ও পরিমাণবোধ, অন্যদিকে তেমনি দেখা দিয়েছে অনায়াস বলিষ্ঠতা। কবির দৃষ্টিও কাঁচা নয়, হাতও কাঁচা নয়। 'পাকা হাত' বললে 'ট্র্যাডিশনাল ড্রইং-এ ওস্তাদ' এই প্রচলিত অর্থ ধরে আমার কথা ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। তাই ওই শব্দটি ব্যবহার না ক'রে বলব কবি 'সিদ্ধহস্ত'। আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে সে হাত দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথের ছবি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ছবি। তিনি কোনো ধারার অনুসারক নন, কোনো ধারার প্রবর্তক নন। তাঁর অনুগামিতা অসম্ভব। অননুকরণীয় চারিত্র-শক্তির প্রবল আত্মতাই রবীন্দ্র-চিত্রের প্রথম ও প্রধান সম্পদ।

দ্রষ্টব্য—পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ—রবীন্দ্র-চিত্রের রূপ' প্রথম পর্যায় (অমৃত, ৪ঠা মে, ১৯৬২)

।। অপরাধী সনাক্তকরণের নতুন পদ্ধতি ।।

অপরাধীকে ধরবার কাজে নানা রকম বৈজ্ঞানিক উপায় এবং উপকরণের প্রয়োগ আজকাল পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত। সম্প্রতি পরমাণু বিজ্ঞানকেও এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অচিরেই আরম্ভ হবে মনে হচ্ছে।

পরমাণু বিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাধীকে ধরবার, অর্থাৎ তার অপরাধ প্রমাণিত করবার এমন সব সূক্ষ্ম প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারা যাবে, যা অন্য কোনও উপায়ে সম্ভবপর নয়।

'জেনারেল ডিনামিকস কর্পোরেশনের বিজ্ঞানী ডাঃ ভিনসেন্ট পি, গিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পরমাণু শক্তি কমিশনের' তরফে এই বিষয়টি নিয়ে যে সব গবেষণা করেছেন, তার ফলাফল ওয়াশিংটনের 'আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটির' এক অধিবেশনে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

অপরাধনির্ণয়-সহায়ক এই পারমাণবিক পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'নিউট্রন এ্যাকটিভেশন' বিশ্লেষণ।

ডাঃ গিন ঐ বৈঠকে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে বলেছেন, কোনও লোক কিছুক্ষণ আগে বন্দুক বা পিস্তল থেকে গুলী ছুঁড়েছে কিনা, তাঁর আবিষ্কৃত পন্থায় সেটা ধরতে পারা যাবে। এই প্রমাণ এত সূক্ষ্ম যে, অন্য কোনও উপায়েই তার কণামাত্রও ধরা-ছোঁওয়া যায় না।

বন্দুক বা পিস্তলের গুলীতে যে বারুদ থাকে, তার কোনও রকম অস্তিত্ব অপরাধীর শরীরে সাধারণতঃ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এক গ্রাম পরিমাণ বারুদের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অতি সূক্ষ্ম কণাও এই পারমাণবিক পদ্ধতিতে ধরে ফেলা যায়।

প্রায় সব রকম পিস্তলে ব্যবহার্য গুলীতে যে বারুদ থাকে, তার মধ্যে এণ্টিমণি মিশ্রণ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার সংগে বেরিয়াম মিশ্রণও থাকে। যে লোকটি বন্দুক বা পিস্তল ছুঁড়েছে তার হাতে ঐ মিশ্র ধাতুর অতি সূক্ষ্ম অংশ লেগে থাকে। ডাঃ গিনের আবিষ্কৃত নিউট্রন এ্যাকটিভেশন পদ্ধতির সাহায্যে ধরতে পারা যাবে, সন্দেহভাজন কোনও লোক কিছুক্ষণ আগে বন্দুক বা পিস্তলের গুলী ছুঁড়েছিল কিনা।

প্রচলিত 'প্যারাফিন টেস্ট' এখন আর ততটা নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিভিন্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের গবেষণাকেন্দ্রে ডাঃ গিনের এই নতুন পদ্ধতিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

মুরগী-চোর শেয়ালের স্বভাব পরিবর্তন

মানুষ কত রকম পশুপাখীকে পোষ মানায় এবং পোষ মানিয়ে তাদের কত কিছু শেখায়। কিন্তু শুনেছেন কখন যে মানুষ শেয়ালকে পোষ মানিয়েছে? শোনেননি। অথচ পশ্চিম জার্মানীতে ব্রেমেন শহরে এই অসাধ্য-সাধন করেছেন এক ভদ্রলোক যাঁর নাম কুট উইলকে। ইনি যে জন্তুটিকে

কুট উইলকে ও শেয়াল মাক

পোষ মানিয়েছেন, সেটি হচ্ছে একটি সিলভার ফক্স অর্থাৎ ঐ দেশের এক-রকম লোমওয়ালা শেয়াল, ভারি ধূর্ত, ভীষণ লোভী, পাখী কিম্বা ছোট জানোয়ার দেখলেই এদের জিব দিয়ে জল ঝরে। শিয়ালটির নাম মাক।

মাত্র চার সপ্তাহ আগে ছ'মাসের এই মদ্দা মাক ভীষণ ঝগড়াটে ও বদমায়েশ ছিল। অথচ কুট উইলকে তার স্বভাব বিলকুল পালটে দিয়েছেন, এবং তা করেছেন মাত্র ঘণ্টা কয়েকের শিক্ষায়। তাঁর মতে এটা নাকি খুবই সহজ; মানুষের প্রতি পশুর বিশ্বাস জন্মাতে হবে এবং শিক্ষককেও পশুর জন্যে চিন্তা করতে হবে। তাকে অবশ্য লোকে যখন জিজ্ঞেস করলে যে এই মুরগীচোরকে কি করে তিনি শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বানালেন, তখন কিন্তু তিনি ব্যাপারটা ভাঙেননি। ভগবান জানেন তিনি শেয়ালটিকে কি গুণ করলেন; তবে তাঁর বন্ধুরা বলেন গুরু উইলকে ভোর না হওয়া পর্যন্ত সারা রাত শেয়াল শিষ্যকে শিক্ষা দিয়ে একেবারে তার ভোল পালটে দিয়েছেন। এখন সে হাঁস-মুরগী, পায়রা ছেড়ে কেবল আইসক্রীম খেতে ভালোবাসে। পথে আইসক্রীমের দোকান দেখলে সে আর নড়তে চায় না।

কুট উইলকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন মাককে। শীগ্গির মাক নামক এক ভ্যারাইটিশোর দলের সঙ্গে রোম, প্যারিস, মাদ্রিদ যাত্রা করবে। উইলকে সেজন্যে খুবই খুশী। আর মাক দেশ-বিদেশে যাবে, কত নাম কিনবে, কত খেলা দেখাবে যেমন মুখে করে জ্যান্ত হাঁস ধরে আনবে, কিন্তু তাকে মারবে না কিম্বা খাবে না। বলা-বাহুল্য কিছুদিন আগে এই ভদ্রলোক একটি লাল শেয়াল বা রেড ফক্সকেও পোষ মানিয়ে খেলা শিখিয়েছিলেন।

।। স্তম্ভের ওপর উপনগর ।।

লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল কতক-গুলি 'স্তম্ভের' উপর কংক্রিটের বড় বড় প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ করে তার উপর ২৫০০ লোকের বাসোপযোগী এক উপনগর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছেন। এই প্রস্তাবিত উপনগরটি নির্মিত হবে কেণ্টের অন্তর্গত এরিথ-এর জলাভূমির উপর। এবং পরিকল্পনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কেবল বৃটেনে নয়, বিশ্বের যে-কোন অংশে নিম্নভূমির উপর এই ধরণের শহর গড়ে তোলা সম্ভব।

লণ্ডনে বাসস্থানের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এই ধরণের উপনগর নির্মাণ করে সমস্যা কি পর্যন্ত মেটানো সম্ভব হতে পারে, তা নিয়ে পরীক্ষা চালাবার একটা প্রস্তাব হয়। অন্যান্য উপনগরে সমাজ-উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মের অভিজ্ঞতা এবং প্রি-ফ্যাব গৃহনির্মাণের নতুনতর পদ্ধতি এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে সাহায্য করে।

উপনগরের জন্য সংগৃহীত ৫০০ (আনুমানিক) একর পরিমাণ জমির প্রায়

সমস্তটাই টেমস নদীর জলপৃষ্ঠের কিছুটা নিচে, যার ফলে জোয়ারের সময় অনেকখানি অঞ্চল প্লাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তা ছাড়া এখানকার মাটি এতই নরম যে ঘরবাড়ির জন্য উপযুক্ত ভিত্তি নির্মাণ প্রায় অসম্ভব।

আর একটা বড় অসুবিধা হল এই যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কখনও সাধারণভাবে এখানে বাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিতে পারেন না, তাঁদের নিয়ম অনুযায়ী বাসকক্ষ নির্মাণ করতে হবে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অন্ততঃ আট ফুট উপরে। প্রতি বাড়ির জন্য একটা গাড়ির মাপের জায়গা ছাড়তে হবে এবং প্রতি ১০০০ লোকের জন্য ছাড়তে হবে সাত একর পরিমাণ খোলা জায়গা।

চূড়ান্ত ডিজাইনে সেই জন্য সমস্ত ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে, ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১২ ফুট উপরে প্লাটফর্ম নির্মাণ করে, এতে 'গ্যারাজিং'এর ব্যবস্থা অতি সহজেই করতে পেরেছেন উপনগরের পরিকল্পকগণ। প্ল্যাটফর্মের নিচের জায়গাটি নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে গাড়ি রাখার জন্য বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের জন্য, মেণ্টেনান্স ওয়ার্কশপ, ইনসিনারেটিং প্ল্যাণ্ট, পাম্পিং স্টেশন, টেনাণ্টস্ ওয়ার্কশপ ও খেলার মাঠের জন্য।

প্রতিটি প্লাটফর্মে থাকবে তার নিজস্ব "গ্রামীন" সম্প্রদায়। এই গ্রাম স্থাপিত হবে ৪৫০'×৫৫০' জায়গা জুড়ে। স্তম্ভের উপর নির্মিত এই সব প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা হবে ২০টি, এগুলি সংযুক্ত হবে ২০টি পায়েচলা সেতুর সাহায্যে এবং বাইরের মাটির সঙ্গে এই সব প্ল্যাটফর্মের যোগ থাকবে সিঁড়ির সাহায্যে।

প্ল্যাটফর্মগুলির ফাঁকে ফাঁকে ৩১তলার কতকগুলি টাওয়ার থাকবে সেগুলিকে সংযুক্ত ক'রে। এই সব টাওয়ারে থাকবে দুটি এবং তিনটি কক্ষের বাস ব্যবস্থা; প্ল্যাটফর্মের উপর যে সব বাসস্থান নির্মিত হবে, তা হবে নানা আকারের এক থেকে চার তলার।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, বিপনি কেন্দ্র, যুব ক্লাব সব কিছুরই ব্যবস্থা এই উপনগরটিতে থাকবে।

অনুমান করা হয় কাজ শুরু করার পর সমগ্র পরিকল্পনা কার্যকর করতে কাউন্সিলের প্রায় ১৮ বৎসর সময় লাগবে এবং এর জন্য ব্যয় হবে আনুমানিক ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড।

জনি হ্যাজার্ড
৪
ম্যাক রবিন্স

এই হাঁড়ি-মুখোদের জিগেস করে কিছুই জানা যাবেনা দেখছি। বেসো আর আমায় কেন যে অর্লি এয়ারফিল্ডে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে কথা একমাত্র ////

অর্লি এয়ারফিল্ড
লীডার, এই প্যারিসে আমাদের দলকে ছুটি দেওয়া তাদের মনোবলের পক্ষে ভাল হবে বলছেন!
নিশ্চয় /// যেখানে যাচ্ছি, সেখানে এই পুরুষ নামক জন্তুদের ফুর্তির ব্যবস্থার একান্ত অভাব! দীর্ঘকাল হয়ত তাদের শুধু স্মৃতিটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে!

এইযে, ট্যাক্সি করে সব পাকড়ে নিয়ে এসেছে!

সবাই হাজির? কেউ বাকি থাকলে বল! নইলে এমন শাস্তি পাবে যে বাপের নাম ভুলে যেতে হবে!
শেষবার ফুর্তি করতে আঠার জন প্যারিসে গিয়েছিল //// আঠার জনই ফিরেছে লীডার!

তাহলে রোল-কল করে সবাইকে জলদি উঠিয়ে নাও!

ওরা যাকে লীডার বলল সেই বলতে পারে!

সবাই নেমে পড়!! লীডারের দিকে মুখ করে লাইন দাও!!!
বটে! এই তবে এদের লীডার?!

ক আছে, বাওয়া! বেসো এখনো কাই চলতে পারে! সবে তো ন-বৈ থুকু!!! কো-কোথায় যেতে হবে?
থাম, আমি মেয়েছেলে নই! আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এক ঝামেলা থেকে তোমায় উদ্ধার করলাম আর শেষে আরেকটা ফ্যাসাদে আমায় জড়ালে!
ব্যাপার কি বল দেখি!!! এখানে হচ্ছেটা কি?
এর পর দেখুন ১.৩.৬৩
ক্রমশঃ
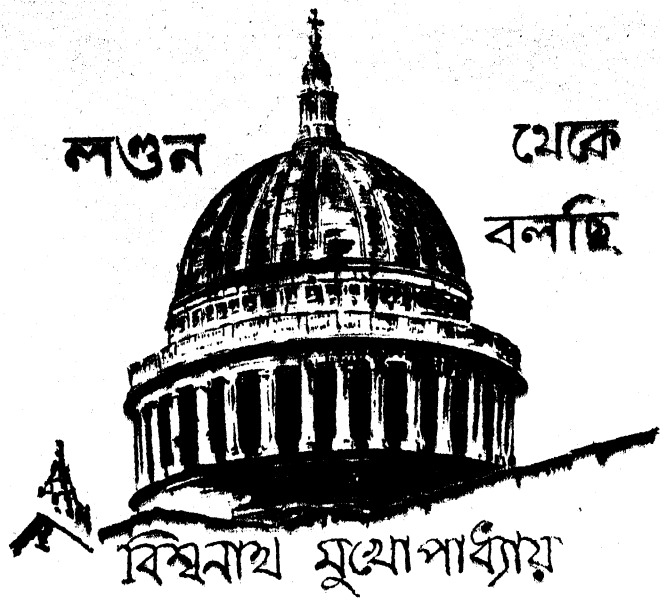
অবসরকালে পাখির পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো আমার আবাল্যপোষিত নেশা। ধ্রুপদী সঙ্গীত কিংবা অমর চিত্রকলার মতই, রূপ-রঙ ও সুরে বিচিত্র রহস্যময় এই প্রাণীর অবাধ, মুক্ত,—চিরতুষারময় মেরু থেকে আরম্ভ করে রৌদ্রদগ্ধ মরু ও চিরচঞ্চল সমুদ্রবক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত,—জগতের সঙ্গে পরিচয় যতই ঘনিষ্ঠ হয় নিবিড়তর হয় অনুরাগ।

পাখিদের তাদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জীবনে পর্যবেক্ষণ না করে শুধু বই পড়ে কিংবা চিড়িয়াখানার ও যাদুঘরে বন্দী ও মৃত পাখিদের দেখে তাদের সম্পর্কে জানার চেষ্টা হচ্ছে ছবির কার্ডে তাজমহলের ছবি দেখে তাজ দেখার বিকল্প তৃপ্তির মত।

কারণ পাখিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি অংশ, তাদের আচার-ব্যবহার সামাজিকতা, পদচারণা, সাঁতার, গগন-বিহার, নীড় নির্মাণ, প্রণয় ও সন্তান পালন জাতিতে-জাতিতে এবং গোষ্ঠিতে-গোষ্ঠিতে স্বতন্ত্র ও নিজস্ব। যেন দুনিয়ার জৈবিক প্রয়োজনের উপযোগী করে বিবর্তনের ধাপে-ধাপে তৈরি।

যেমন, যে পাখি শস্যাহারী তার ঠোঁট ছোট, তে-কোণা, শক্ত ও দুটিই আকারে সমান। অন্য কোন হাতিয়ার দিয়ে শস্য খুঁটে খেতে, কিংবা ক্ষেত্র-বিশেষে বাদাম প্রভৃতির খোলা ভেঙে খেতে সুবিধা হতো না। পতঙ্গভুকদের ঠোঁট সরু, সুচালো ও তীক্ষ্ণ, কীটপতঙ্গ পাকড়াবার মোক্ষম চিমটে। আমিষা-হারীদের ওপরের ঠোঁট দীর্ঘ বাঁকানো ও শানিত, নীচের ঠোঁট ছোট কিন্তু শক্ত।

তেমনি হচ্ছে পাখিদের পা। শাখাচারী দোয়েল, কোকিল, ময়না প্রভৃতির পা ছোট। সাধারণত আঙ্গুলের সংখ্যা তিনটি, সামনে দুটি, পেছনে একটি। গাছের সরু ডাল তা দিয়ে এমনভাবে আঁকড়ে ধরা যায় যে ঝড়ের দাপটেও সে মুঠো খোলে না।

বক, হেরণ, সারস, ফ্লেমিঙ্গ প্রভৃতি পাখিদের জলকাদা থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে হয় বলে তাদের পাগুলো লম্বা লম্বা, আঙ্গুলগুলো ফাঁক-ফাঁক। জল-চারীদের বেশিরভাগেরই আঙ্গুল চারটি এবং সাঁতারের উপযোগী করে পাৎলা চামড়া দিয়ে জোড়া। এমন অনেক সামুদ্রিক পাখি আছে যারা প্রসবের সময় ছাড়া সারা জীবনটাই জলে কাটায়। অব্যবহারের ফলে তাই পা দুটি ভূমির ওপর হাঁটার পক্ষে একেবারেই অনুপ-যুক্ত। ডাঙ্গায় ওপর তারা কোন রকমে পা দিয়ে লগি ঠেলে-ঠেলে চলে। মরুবাসী এমু ও অস্ট্রিচের পা লম্বা, শক্ত, সেকালের ডাকাতদের রণ-পায়ের মত দীর্ঘপথ দৌড়বার পক্ষে উপযুক্ত। প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে নিরীক্ষণ না করলে কি করে এই পদবৈচিত্র্যের তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে?

তারপর ধরুন, মানুষের কাছে পাখির অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ, তাদের পালকের রঙ। বয়স ও ঋতু অনুযায়ী একই জাতের পাখিদের পালকের বর্ণ-বিন্যাসের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে। যেমন রাজহাঁস, গাল ও চিকা গোষ্ঠির, চন্দনা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখিদের বয়সের পালক, কিংবা গলার কণ্ঠি ও ল্যাজের বাহারের খোলতাই হতে কয়েক বছর লেগে যায়। পালক দেখেই তাদের বয়স আন্দাজ করা যায়। আবার কোন কোন জাতের পাখিদের শীতের আট-পৌরে পোষাক ও বসন্তের প্রেমোৎসবের পালকসজ্জার মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি যে অনভিজ্ঞ চোখে তাদের দুটি গোষ্ঠির, এমনকি দুটি জাতির পাখি বলে ভ্রম হতে পারে। চিড়িয়াখানার বন্দী, কিংবা যাদুঘরের মৃত পাখি অথবা বইয়ের পাতায় ছবি দেখে এসব তথ্যের সম্যক উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব।

পালকের বর্ণবৈচিত্র্যের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মরক্ষা কিংবা আক্রমণের সুবিধা। পরিবেশের রঙে রঙ মিলি তারা গাছের পাতার আড়ালে, ব পটভূমিতে, অথবা নদীর উপল-উপকূলে আত্মগোপন করে। প্রকৃতির নিগূ রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের জন্যে প্রাকৃতি পরিবেশে পাখিদের দেখা চাই।

পাখিদের স্বচ্ছন্দ গগন-বিহা ক্ষমতা হচ্ছে আদিকাল থেকে মানুষে আকাশ জয়ের প্রেরণা। সেই গ বিহারেরই বা কত না বৈচিত্র্য! যে শ আগারে-ভাগারে মুদ্দফরাস নোংরা ও কদাকার তারাই যখন নি নীল আকাশে মুক্তপক্ষ হয়ে ভেসে চ তখন তা কতই না নয়নাভিরাম। হাঁ চাঁচার যেমনি কণ্ঠস্বর, তেমনি ছি স্বভাব। কিন্তু তার দীর্ঘ পুচ্ছে ঢেউ চূড়া এঁকে-এঁকে ওড়ান কি তুলনা আ আর বিশাল আকাশের পটভূমি উড়তে উড়তে হঠাৎ যখন স্কাইলার্করা সুরের ঝর্ণা ঢালে? কবি তার ছবি আঁকতে পারেন? শিল্পী তাকে করে তুলতে পা জীবন্ত? পশ্চিম ইংল্যাণ্ডে অতলা মহাসমুদ্র পারে অনেক নির্মেঘ দি অনাদ্য-অনন্ত আকাশের নীল-চ তপের তলে প্রকৃতির সেই নির সঙ্গীত-শিল্পীদের আমি দে শুনেছি।

আর দেখেছি, বসন্ত সমা পাখিদের মনে যখন জেগেছে স সুখের উল্লাস! প্রকৃতির আঙিনা ম হয়ে উঠেছে, দোয়েল-কোয়েল-কা

স্কাইলার্কের গানে-গানে। কোথাও 'চোখ গেল,' 'চোখ গেল' করে পাপিয়ার করুণ মিনতি ভেসে ফিরছে। কোথাও বা কোন গোমড়ামুখী বধূর মত লাজুক আরেক বিহঙ্গ 'বৌ কথা কও', 'বৌ কথা কও' করে কাননকোণা আকুল করে তুলছে!

ওদিকে বন-টার্কী রঙিন পেখম তুলে নাচছে, ল্যাপ উইং ঘনবাদামী রঙের ডানার-ঝাড়নীর বাহার দেখাচ্ছে! ঘুঘু ও পারাবতেরা অবিশ্রান্ত প্রলাপ বকে বকে গলা ফুলিয়ে মরছে! ঘোর বাস্তববাদী জে, গাল ও টার্ণেরা মুখ-রোচক খাদ্য সংগ্রহ করে কোন পছন্দসই বিহঙ্গীকে উপহার দিয়ে তার মন-ভুলনোর চেষ্টা করছে।

প্রেমের পালা শেষ হলে পড়বে ঘর বাঁধার ধুম! কত না বিচিত্র তার আয়োজন, কত না অদ্ভুত তার উপাদান। একের রীতি-প্রকৃতি-শৈলী ও স্থাপত্যের সঙ্গে অপরের কতই পার্থক্য। দীর্ঘ-পুচ্ছ কিন্তু ক্ষুদ্রবপু টিটের তার জন্যে চাই ২০০০ পালক, নাইট্যাঙ্গেল ৬৫০০ কাঠি-কুটো, বাবুইয়ের অবাক নৈপুণ্য। সোয়ালো-মার্টিন ও গাঙ-শালিকেরা মাটির কুটিরবাসী, কেউ বেছে নেয় গাছের কোটর কিংবা ফোকর। আর সমুদ্রচারী গাল, টার্ণ, প্লভার, গিলমট, কমোরান্ট, পানকৌড়ি, পাফিন, গ্যানেট প্রভৃতিরা সাগরসৈকতের পাহাড়ের কন্দরে, পাথরের খাঁজে ও ধাপে স্থাপন করে বিশাল ও ঘিঞ্জি উপনিবেশ!

নীড়ের আকৃতি প্রকৃতির ওপর আবার ডিমের আকৃতি-প্রকৃতি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। কোটর ও গর্তে যারা ডিম পাড়ে তাদের ডিম সাধারণত গোল ও সাদা। কারণ তা গড়িয়ে যাবার ভয় নেই ও অন্ধকারে দেখতে সুবিধে। কিন্তু মাটিতে বা খোলা জায়গায় যারা ডিম পাড়ে তাদের ডিম লম্বাটে, পেয়ারার মত একদিক সরু। সুতরাং গড়িয়ে চলে যায় না। নদীর উপল উপকূলে যারা ডিম পাড়ে তাদের ডিম উপলখণ্ডের মতই বিচিত্রিত।

পাখি দেখার সরঞ্জাম

পাখি দেখতে হলে একেবারে অত্যাবশ্যকীয় হচ্ছে দূরবীণ। পাখিদের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তি দুই খুব তীক্ষ্ণ ও সদাসতর্ক। তাই দূর থেকে সাবধানে তাদের দেখতে হয়। তা ছাড়া চাই ক্যামেরা, দূর থেকে তোলা যায় এমন 'লেনস্' হলেই ভালো। নয়তো এমন অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা চোখে পড়বে যা স্থায়ীভাবে ধরে না রাখবার জন্যে পরে আফসোস করতে হবে। আর চাই নোটবই ও সম্ভব হলে স্কেচবই।

ছুটির দিনে শিকারের শেষে

বড় রকম অভিযান হলে আরো চাই তাঁবু, স্টোভ, টিনের খাদ্য ও পানীয়। আত্মগোপন করে পাখি দেখার কিম্বা ছবি তোলার জন্যে অনেক ব্যয়বহুল আয়োজন, যেমন ছোট-খাটো জাহাজ-ভাড়া করে দূর সমুদ্রে কোন দ্বীপে যাওয়া, কিম্বা কোন দেওদার গাছের চূড়ায় কোন দুর্লভ কোন দুর্লভ ঈগল দম্পতীর ঘরকন্নার নিখুঁত কাহিনীকে ছায়াচিত্রে তোলার জন্যে রাতের বেলায় কাজ করে ৬০ ফিট উঁচু লোহার ভারা বেঁধে পালাক্রমে দিনের পর দিন কাটাতে, আমি দেখেছি এবং শুনেছি।

তাছাড়া জলাভূমি, খেত-খামার ও পাহাড় পর্বতে বিচরণের জন্যে চাই প্রয়োজন মত জামা-জুতো-লাঠি-থলে। আমার অবশ্য ওসব ধরাচূড়ার কিছু নেই। যে স্যুটে পরে আমি অফিস করি, সেই পরেই আমি টেমসের মোহনায় ও স্কটল্যাণ্ডের পাহাড়ে ঘুরেছি।

পাখি দেখতে গিয়ে কত রাত যে আমরা তাঁবুতে, কিম্বা খোয়ারবাড়ীর খড়ের গাদায় কাটিয়েছি তার ঠিক নেই। খাবার মধ্যে জুটেছে পিঠের থলেয় যে যা কিছু সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, স্যাণ্ডউইচ, সেদ্ধ ডিম, লেবু, কলা, আপেল, বিস্কুট, ফ্লাস্কে কিম্বা বোতলে চা, কফি, কমলা-রস। লক্ষ্য করেছি পাহাড়, প্রান্তর, সমুদ্রতীর যেখানেই হোক না কেন খাওয়া শেষ হলে লেবুর খোসা, বোতল, ঠোঙ্গা যা কিছু পরিত্যজ্য সবই কুড়িয়ে ফের থলেয় ভরে নিয়েছে। শুধু ময়লা ফেলবার জায়গাতেই তা ফেলা চলে, অন্যত্র ফেললে প্রকৃতির শ্রী ও মর্যাদার হানি হয়।

উপরি পাওনা

ইউরোপের দেশে পাখির রাজ্যে ঘুরতে গিয়েই তার পরিবেশের বিচিত্র প্রকৃতির ঋতুচক্রে যে রূপান্তর দেখেছি তাওকি কোন দিন ভুলবো?

—এই পাখি দেখতে গিয়েই সুইজারল্যাণ্ডে দেখেছি, শীতের ধূম্র আকাশের পটভূমিতে বল্কলহীন বৃক্ষ-শাখা ও কাণ্ডের ফিকে হলুদ ও রক্তাভ-পীত রঙের অবাক সমন্বয়! উপলব্ধি করেছি একটি নিষ্পত্র বনভূমির নিঃসীম, নিঃশব্দ রিক্ততা। বরফ-ঝরা রাত্রিশেষে সূর্যালোক বিচ্ছুরিত সেই বনভূমিকেই মনে হয়েছে যেন বিচিত্র-ভঙ্গিতে অকস্মাৎ স্তব্ধ-হয়ে-যাওয়া অরণ্য ঝর্ণা ও ফোয়ারা!

দেখেছি নিদাঘ দিনে স্কটল্যাণ্ডের সবুজ পাহাড়ের উত্তাল ঢেউ। তার পাদ-দেশে কোথাও বা বনরাজিনীলা আর কোথাও উদ্বেলিত হ্রদ কিম্বা বাত্যাহত হরিৎ ক্ষেত! কোথাও বাঁকের কাঁকালে রজত মেখলার মত স্রোতধারার বুকে বুনো হাঁসের মেলা। দূরদ্বীপের কাছে ভেসে উঠেছে তাদের পাখার রঙের

কারুকাজ। শীতের দিনে তারা ছিল কোথায়? কাশ্মীরে না সাইবেরীয়ায়?

হঠাৎ কোথাও বনফুলের চলা পথ রোধ করে দেয়। কোথাও পাহাড়ের বুকে অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী দৈত্য সেনানীর মত দাঁড়িয়ে আছে ঝাউ-পপলারের অরণ্য। যেন উপত্যকার সমভূমির আহ্বানে এসে আচম্বিতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে! এখন শুধু মাঝে মাঝে ঝড়ের রাতে তাদের কুচ-কাওয়াজ হয়। তখন বজ্রের গর্জনে তাদের অশরীরী নায়ক হুকুম জারী করে। বিদ্যুতের কশার ঝলক দিয়ে ওঠে ত্রাস!

কোথাও 'চুপ্! চুপ! চুপ!' সাবধানে ছুটে আসেন দলের কোন সঙ্গিণী। পাহাড়তলীর ঘাসের গালিচায় একপাল শিশুর মত খেলা করছে এক ঝাঁক খরগোস, কিম্বা অবাক নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে লাল হরিণের দল।

কোথাও দলের সবাই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে চাপা আক্রোশে গর্জন করে উঠলো। পায়ে ভারী বুট, কাঁধে বন্দুক, পিঠে মৃত, আহত ও রক্তাক্ত পাখির বোঝা নিয়ে চলেছে শিকারীর দল। আমরা ভিন্ন প্রকৃতির লোক। আমরা ওদের দেখে রেগে উঠি, ওরাও নিশ্চয় আমাদের নিয়ে পরিহাস করে।

তারপর এক সময় উত্তর ইউ-রোপের দীর্ঘজীবী দিনান্তও দিগন্তে লুটিয়ে পড়ে। জাফ্রীকাটা মেঘের মিনারে কনেদেখা আলোর বর্ণবহুল দীপালী নিবু-নিবু হয়। আমরা বিশ্রাম-স্থলের দিকে যাত্রা করি। সেই বিজন বনভূমি এবং বিরল ও নিস্পন্দ গ্রামের পাশ কাটিয়ে, ঘনবিন্যাস তরু-বীথিকার পল্লবঘন দীর্ঘ বিসর্পিল পাহাড়ী পথে চলি আর সেই অবাক স্তব্ধতার মধ্যে নিজেদের ক্লান্ত পদ-শব্দের প্রতিধ্বনি শুনি। ওদিকে দূরে ওক-পাইন ও বার্চের বনে অন্ধকার জমাট বাঁধে। আরেকটু পরেই মহাকাশ থেকে জ্যোতির্ময় সূর্যের শেষ রশ্মি-রেশটুকুও মুছে যায়। শুধু অম্লান হয়ে থাকে স্মৃতির মণিকোঠায় আনন্দে-আলোকে-সৌন্দর্যে-সৌহার্দ্যে উজ্জ্বল একটি দিন।

দুটি স্মরণীয় অভিযান

আমার পাখি দেখার দিনপঞ্জীতে দুটি অভিযান বিশিষ্ট হয়ে আছে। প্রথমটি ঘটে ইন্‌ভারনেস্ সায়ারের গার্টেন হ্রদের তীরে, এক অস্‌প্রে দম্পতীকে ঘিরে।

অস্‌প্রেরা এক গোষ্ঠির মৎস্যাশী ঈগল। প্রায় ষাট বছর আগে মহিলাদের টুপি তৈরীর পালকসংগ্রহকারীদের তস্করবৃত্তিতে এই সুন্দর পক্ষী গোষ্ঠি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর সরকারী আইনে তারা সংরক্ষিত, অর্থাৎ তাদের হত্যা দণ্ডণীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। তবুও ষাটটি বছর কেটে যায় কিন্তু এই দ্বীপপুঞ্জে অস্‌প্রের দেখা পাওয়া যায় না।

অকস্মাৎ ১৯৫৬ সালের বসন্তা-রম্ভে বৃটিশ বিহঙ্গবিকেরা সহর্ষে ঘোষণা করেন যে, পূর্বোক্ত গার্টেন হ্রদের তীরে এক অস্‌প্রে দম্পতীকে নীড় বাঁধতে দেখা গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেবার তারা ডিম প্রসব করেও তাতে তা দিল না। বিহঙ্গবিদরা তাতে ক্ষুণ্ণ হলেও নিরাশ হলেন না। কারণ, পাখিরা এক বছর যদি কোনখানে তার বাসা বাঁধে, তবে পরের বছর সেখানেই বাসা বাঁধতে ফিরে আসে। পরের বছর দেখা গেল, সেই অস্‌প্রে দম্পতী সত্যিই ফিরে এসেছে। কিন্তু সেবার কোন এক তস্কর তাদের বাসা থেকে ডিম দুটি চুরি করে নিয়ে গেল। আপাত শান্তি-প্রিয়, স্বল্পভাষ ও প্রকৃতি-প্রেমিক বিহঙ্গবিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রোধের ঘূর্ণী জাগলো।

পরের বছর তাঁরা সাবধান হলেন। অস্‌প্রে দম্পতীর গ্রীষ্মাবাস অষ্টপ্রহর পাহারা দেবার জন্যে সারা দেশ থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হলো। সেই স্থানটিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হলো। বৃটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান তাঁদের এক অতি স্পর্শকাতর মাইক্রোফোন সর-বরাহ করলো। তার একটি মুখ এমন-ভাবে অস্‌প্রে দম্পতীর বাসার কাছে রাখা হলো, যাতে সেখানে কোন অস্বাভাবিক শব্দ হলেই তা স্বেচ্ছা-সেবকদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছায়।

সেই সব কাণ্ডকারখানা দেখতে সেখানে দলে-দলে সাধারণ লোক, ফটোগ্রাফার ও সাংবাদিকরা ছুটলো। আমরাও গেলাম। আগন্তুকদের কাছ থেকে বহু টাকাও সেই আয়োজনের ব্যয়বাবদ সংগৃহীত হলো। অস্‌প্রেদের প্রসবাগারের সংবাদ জানতে দেশ জুড়ে বিহঙ্গপ্রেমীরা প্রতীক্ষা করতে লাগলো। তারপর একদিন সেই অতিপ্রত্যাশিত প্রভাত এলো। তিনটি তরুণ অস্‌প্রে তাদের পিতামাতার সঙ্গে আকাশে পাখা মেললো। রয়াল সোসাইটি ফর প্রটেক্-শান অব বার্ডসের জয়বার্তা ঘোষণা করে সংবাদপত্রসমূহের শিরোনামায় বড় বড় হরফের পতাকা উড়লো। সম্প্রতি 'অস্‌প্রেদের প্রত্যাবর্তন' কাহিনী নিয়ে একুশ শিলিং দামের মোটা বই বেরিয়েছে।

উল্লেখিত দ্বিতীয় অভিযানটি ঘটে ইংলণ্ডের সারে জেলায়। সেখানে ক্ষুদ্রাকৃতি ষ্টার্লিং পাখিদের এক বিরা[ট] এজমালী শয়নক্ষেত্র দেখবার জন্যে কয়েক বছর আগে বৃটিশ অর্ণিথলজি ইউনিয়নের আমরা কয়েকজন সদ[স্য] ডিসেম্বরের শীতকে উপেক্ষা ক[রে] তাঁবুতে রাত কাটিয়েছিলাম। ষ্টার্লিং হাজারে-হাজারে, এমন কি কয়েক লা[খ] জোট বেঁধে রাত কাটায়।

সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তখন আ[মি] লিখেছিলুম, "...শীতের আশু সন্ধ[্যা] ধূসর আকাশে সেই অগণিত পাখি হঠাৎ ধাবমান কালো মেঘের মত [দে]খা দিলো। তারপর উঁচু-নীচু স্তরে বি[ভক্ত] হয়ে আধ মাইল ঘন, তীর গতিশ[ীল] চাপের আকারে সেই বিজন প্রান্ত[রের] ওপর ঘুরে বেড়ালো। ক্রমে ক্রমে, আ[রো] আরো নীচু হতে হতে মিশে গে[ল]। অজস্র বৃষ্টিধারার মত নেমে এসে [তা] হাজারে হাজারে ঝোপে-ঝাড়ে মি[লিয়ে] গেল। ঠিক যেন অগণিত অসংখ্য শ[ব্দে] মূর্তিমান কালো-কালো টুকরোর এ[ক] বিপুল ঘূর্ণী কোন ইন্দ্রজালে নির্জন ঝোপঝাড়বহুল প্রান্তরে থুবড়ে এসে পড়লো।—তারপর চুপচাপ!

আবার পরের দিন বিলম্বিত ধ[ূসর] প্রভাত এলো। সেই হতচৈতন্য ঘূর্ণী প্রান্তরশয্যা ছেড়ে জেগে উঠ[লো।] কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুলে উঠ[ে] ভেসে উঠলো, আকাশ ছেয়ে দিল। [তার]পর ঝড়ের ঢেউয়ে ভেসে-যাওয়া [মেঘের] মত, দূরে, আরো দূরে দিক-চক্রবা[লের] ওপারে মিলিয়ে গেল!"

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দিন অন্যরকম ছিলো নীলা। আমরা কো-এডুকেশনাল স্কুল-কলেজে পড়ে অভ্যস্ত ছিলাম না। মেয়েদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের সঙ্কেত আমাদের সত্যি অন্যরকম ছিলো। এই গোপন প্রণয়ের আনন্দ মাত্র দুটি মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো বলে জমাট বাঁধতো খুব। এক ফোঁটা উছলে পড়ে অপচয়ের ভয় থাকতো না। সেই সীমাহীন উপভোগ্যতায় আমি অভিভূত হ'য়ে থাকতুম। আমি যেখানে আছি সেও যে সেখানেই আছে সেই অনুভূতিতেই মন তৃপ্ত থেকেছে।

নির্জন অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে আমি তার কথাই ভাবছিলাম। মনে মনে ব্যাকুল বাসনা হচ্ছিলো যদি কোনো দৈব প্রক্রিয়ায় তাকে একবার এখানে দেখতে পাই! আসলে তাকে ভীষণ একা পেতে ইচ্ছে করছিলো আমার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ পায়ের শব্দে চোখ ফিরিয়ে সিঁড়ির দরজায় তাকিয়ে বুকটা ধক ধক করতে লাগলো। আমি দেখলাম সান্ত্বনা উঠে এসে অন্যকোণে কার্ণিশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। সে আমাকে দেখতে পায়নি, সে ভেবেছিলো সে একা। মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আমি কাঁপছিলাম। সান্ত্বনার একা গলায় গানের গুণগুণানি ছিলো।

সাহসে বুক বাঁধলাম আমি। প্রায় নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ঈশ্বর অকৃপণ।'

'কাকে।' ভীষণ রকম চমকে উঠলো সে। মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারে চোখে চোখে তাকিয়ে চুপ ক'রে গেল!

আমি একটু হাসলাম, 'কী হ'লো, আমাকে দেখে কি সুর পালিয়ে গেল।'

বললো, 'হ্যাঁ।'

'সঙ্গী হিসেবে পছন্দ হচ্ছে না?'

'না।'

'কেন?'

'আমি সঙ্গী খুঁজতে ছাদে আসিনি।'

'আমার মনের তলায় কিন্তু সেই প্রতীক্ষাই ছিলো।'

'আর কারো মনের সঙ্গে আমার মনের কিছু মিল নেই।'

'নেই?'

'না।'

'একটুও না?'

'একটুও না?'

'আর কারো বলতে আপনি কাকে ভাবছেন?'

'জানি না।'

'তা হ'লে কি আমি চলে যাবো?'

'জানি না।'

'বারে, কিছুই না জানলে চলবে কী ক'রে?'

'চালাবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।'

'ঠিক আছে।' সরে আসছিলাম। বললো, 'একটা কথা।'

'কী।'

'বলছিলাম ছাদটা আমার একার নয়, যার খুশি সে থাকতে পারে।'

'হাসলাম।'

চুপ ক'রে থেকে বললো, 'শৈলেশ্বরবাবুকে ওসব বলে দেননি তো আবার?'

'কী সব?'

'ঐ যে—'

'খুলে না বললে বুঝতে পারবো না।'

'আহা, যেন মনে নেই।'

'সত্যি মনে নেই।'

'সেই যে দুপুরে—মানে—'

'ও, আপনি যে নিরিবিলিতে ঘুম ভাঙিয়ে গল্প করতে এসেছিলেন সেই কথা?'

'ঘুম ভাঙিয়ে! নিরিবিলিতে গল্প! আপনার সঙ্গে? কক্ষনো না।'

'তবে কেন এসেছিলেন?'

'যাকে যা মানায় তাই ক'রে দিচ্ছিলুম।'

'মানে আমার মুখে চুনকালিই মানায়, না?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে আপনি দয়া ক'রে রোজ দুপুরে যদি ঐ কর্মটি করতে আসেন আমি বড়ো বাধিত হবো।'

'কেবল বাজে কথা। আমি চললাম।'

আমি গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'আপনি কি জানেন না আমি আপনার দিদির দেওর, কুটুম্ব, চলে গেলে অপমাণিত হতে পারি?'

'হোনগে।'

'বেশ। তা হ'লে আর আপনার যাবার দরকার কী। আমি আছি।'

'আমি আপনাকে যেতে বলিনি।'

'তা হ'লে থাকবো?'

'সে যার যার ইচ্ছে।'

'আজকের রাতটা খুব সুন্দর, না?'

'বিশ্রী।'

'ধরুন আকাশটা আপনার কালো চুলের খোঁপা, তারাগুলো আপনার সোনার কাঁটা—'

'জঘন্য উপমা—'

'আচ্ছা, তা হ'লে আকাশটা আপনার শাড়ি, তারাগুলো শাড়ির বুটি—'

'পচা—'

'তা হ'লে—তা হ'লে—'

'তা হ'লে এই, আকাশটা এক হাতুড়ে ডাক্তারের অন্ধকার হৃদয় আর তারাগুলো সেই অন্ধকারের পোকা মাকড় দুর্বুদ্ধি।'

'কী।'

'হ্যাঁ।'

'এসব আনপার্লামেন্টারি কথার জন্য আমি মানহানি আনতে পারি জানেন?'

'মামলা টি'কবে না।'

'টি'কবে কি টি'কবে না দেখা যাবে। প্রথম নম্বর আমাকে হাতুড়ে ডাক্তার বলা, আর দ্বিতীয় নম্বর আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপরে এক আকাশ কালিমা-লেপন। সাংঘাতিক। ক্রিমিনেল। আপনার জেল হওয়া উচিত। আপনার মা আমাকে সোনার টুকরো ছেলে বলেন।'

'তা হ'লে আর কি, গয়না হ'য়ে কারো অঙ্গে শোভা পেলেই হয় এবার।'

'কে সেই ভাগ্যবতী বলুন তো?'

'আমি জ্যোতিষশাস্ত্র পড়িনি।'

'আমি পড়িয়ে দিতে পারি।'

'খুব বাজে শিক্ষক।'

'ছাত্রীটির প্রেরণা পেলে কী ভয়ানক কাজের হ'য়ে উঠতে পারি, দেখিয়ে দেব নাকি?'

সে বাঁকা চোখে তাকালো।

আমি বললাম, 'মানে এই আপনার মা-বাবাকে বলতে পারি কথাটা।'

'কী কথা?'

'মাস্টার হবো, মাইনে নেবো না, শুধু ছাত্রীটিকে ছাড়া এক পয়সা দক্ষিণা দিতে হবে না আমাকে। রাজী?'

'হেট্'।

এরপরে সান্ত্বনা সত্যি পালালো। আমি বুকের মধ্যে আগুনের তাপ নিয়ে খেলা করতে লাগলাম।

(১০)

কয়েক দিন পরেই চলে আসতে হ'য়েছিল আমাদের। বলাই বাহুল্য নতুন প্রেমের বিচ্ছেদের কষ্টে আমি অত্যন্ত কাতর বোধ করেছিলুম। বিদায়ের সময় যখন তাকে কোথাও দেখতে পেলুম না, সব ভুলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সারা বাড়ি খুঁজে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করলুম। হাঁটুতে মুখ গুঁজে সে ফুলে ফুলে কাঁদছিল।

এই কান্না তার অস্বাভাবিক নয়। তার আবাল্যের সংগী তার দিদি চির-দিনের জন্য অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। এর বেদনা মর্মন্তুদ। কিন্তু আমার মনে হলো সব ছাপিয়ে সে আজ এই মুহূর্তে আমার জন্যই কাঁদছে।

আমার বিবাহ্যতা নিয়ে সেদিন যে ঠাট্টা করেছিলো আমাকে, আমি সে ঠাট্টা মেনে নিয়েছিলুম। আর তারপর ফিরে এসে জগৎ-সংসার আমার কাছে শূন্য মনে হ'য়েছিলো। কাজ, কর্ম, জীবনধারণ,
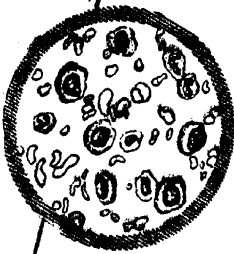
সব কিছু ব্যর্থ লেগেছিলো। আমি অন্য কিছুতেই মন দিতে পারছিলুম না, একমাত্র তার ভাবনা ছাড়া। শেষে কোনো এক নির্ঘুম রাত্রে একটা চিঠি লিখলাম তাকে।

তখনকার দিনে নিষেধ-শাসনের গণ্ডি অতিরিক্ত কড়া ছিলো। দিদির দেওর হবার দৌলতে দু'টো চারটে ঠাট্টা মস্করার অধিকার পেয়েছি বলেই যে মাথা কিনে নিয়েছি তা নয়। তা ছাড়া পরিচয়ই বা কতোটুকু। লজ্জার বেড়া ডিঙিয়ে কতোটুকু কাছে এসেছিলো আমার! পরস্পরকে কতোটুকু বুঝতে পেরেছিলাম। সুতরাং সেইটুকুতেই চোদ্দোপাতার প্রেমপত্র পাঠানো যায় না। মনের আবেগে লিখে গিয়েছি, পরিণতি ভাববার শক্তি ছিলো না। দিনের আলোয় ঠাণ্ডা মাথায় এতো কথা মনে হ'লো। এই চিঠি পেয়ে তার নিজের কী মনে হবে, এই স্পর্ধায় সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠবে কিনা, সে সব ছাড়াও তো ভাববার কথা আছে? চিঠি যদি তার মা-বাবার হাতে পড়ে? যদি তারা সে চিঠি খোলেন? কে জানে কী ঘোলাটে ব্যাপার হ'য়ে উঠবে ঐ এক চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে। শেষে শৈলেশ্বর পর্যন্ত গড়াবে। তার ভাইয়ের হঠকারিতার দাম তাকে দিতে হবে হয় তো।

ছিঁড়ে ফেললাম। কিন্তু সদ্য প্রেমে-পড়া যুবক-হৃদয় বড়ো অবুঝ; তার বিচার-বিবেচনার তুলনায় অসংযম বেশী। এতো কিছু ভাববার পরেও আবার লিখলাম। আবার ছিঁড়লাম। তারপর একদিন রঙিন বিলিতি প্যাডের মস্ত কাগজের ঠিক মাঝখানটিতে লিখলাম 'ভুলে গেছ?' তলায় নাম সই থাকলো না, উপরে ঠিকানা থাকলো না। চোখ বুজে পাঠিয়ে দিলাম। পাঠিয়ে দিয়েই আমার বুক কাঁপতে লাগলো। মনে হ'লো কাজটা ভালো করলাম না। কিন্তু হাতের তীর ফস্‌কে গেছে, আর উপায় নেই ফিরিয়ে আনার।

মাত্র দু'দিনের উদ্বেগ। তৃতীয় দিনেই খামের উপরে সুশ্রী হস্তাক্ষরে নিজের নামের চিঠিটা দেখে রুদ্ধনিঃশ্বাস হলুম। ভিতরে মাত্র একটি বর্ণ ছিলো 'হ্যাঁ।'

ঐ একটি বর্ণেরই যে কতো শক্তি সে কথা আমি ছাড়া আর কে জেনেছিলো সেদিন। ও তো একটি বর্ণ নয়, একটি গোটা জগতের দরজা। সেই দরজা দিয়ে সেদিন সান্ত্বনা আমাকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলো। তার মানে বেনামী চিঠিটা কার হ'তে পারে এটা সে বুঝেছে, সে 'ভুলে গেছে' কিনা এই প্রশ্ন যে তাকে শুধু আমিই করতে পারি এটাও সে সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে আমাকে। প্রকারান্তরে আমাকে সে শক্তি পাঠিয়েছে, সাহস পাঠিয়েছে, প্রশ্রয় পাঠিয়েছে। মিথ্যে ক'রে 'হ্যাঁ' লেখা কাগজটা দেখে দেখে বেলা পড়ে গেল।

আমি জবাব লিখেছিলুম, 'স্মরণ-শক্তিটা দেখছি বড্ডই দুর্বল।'

সে লিখলো, 'ওটা দুশ্চিকিৎস।'

আমি লিখলুম, 'ডাক্তারের সাহায্য দরকার?'

জবাব এলো 'কি ফল হতো?'

লিখলুম 'রোগীর সঙ্গে অবিরাম দেখা হওয়া।'

সে লিখলো, 'আপাতত পরীক্ষা কাছে, ওটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক।'

এইসব সাঙ্কেতিক ভাষার ছেলে-মানুষী আমাদের অনেক দূর গড়ালো। আমাদের অনেক দূর নিয়ে গেল। আমি লিখলুম 'সান্ত্বনা, আর আমি পারছি না।' সে লিখলো, 'জামাইবাবুকে বলো।'

প্রায় একটা বছর কেটে গেছে ততো-দিনে। শুধু চিঠিতে চিঠিতেই আমরা পরস্পরকে এতো কাছে পেয়েছি, এতো ভালোবেসেছি যে আমাদের পৃথিবীতে আমরা ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

বললুম শৈলেশ্বরকে। শৈলেশ্বর মুচকি হাসলো। চা-বিস্কুটে আপ্যায়িত ক'রে বললো, 'সবই জানি।'

'কী জানো?'

'তোমরা যে চিঠি লিখে প্রেম ক'রছ।'

'কী ক'রে জানলে?'

'ওকালতি ক'রে খাই, মগজে তো কিছু আছে? রোজ রোজ নীল খাম কি অমনি অমনিই যায়?'

'মানে?'

'দিব্যি সাহেব-মেমের মতো কোর্ট-সীপ চালাচ্ছো কিন্তু। মেয়েটাকে আর ফাস্ট ডিভিসন পেতে দিলে না। চিঠি পড়বে না বই পড়বে?'

'শৈলেশ্বর!' আমার আবেগকম্পিত গলা।
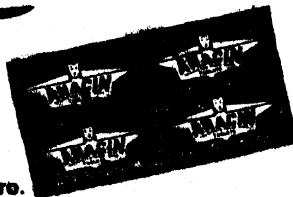
মাথা নাড়লো শৈলেশ্বর, 'তা বেশ তো, কী তোমার দেনা-পাওনা বলো, আমি শ্বশুরমশায়ের কাছে প্রস্তাবটা করে ফেলি।'

আমি হাত চেপে ধরলাম, 'কিছু চাই না, কিছু চাই না। একটা ফুটো পয়সাও না, শুধু উনি যদি দয়া ক'রে ও'র মেয়েকে—'

'আচ্ছা প্রশান্ত, এতোদিন তুমি আমার কাছে কিছু বলোনি কেন বলো তো?'

'লজ্জা করেছে।'

'আমার শ্বশুর ভদ্রলোকটি নিতান্তই ভালো। শাশুড়ি মহিলা বারোমাস বিছানায়, ভূপেন কলকাতায় থাকে, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক কোথায়? সান্ত্বনাকে কতো বন্ধু কতো চিঠি লিখে, ও'রা লক্ষ্যই করেন না কিছু।'

'তুমি গিয়েই বুঝে ফেললে না?'

'তা ফেললুম বইকি। হাতের লেখাটা তো অচেনা নয়।'

'তবে তুমি এটা করে দাও।'

'আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি তোমার মাসীমার সঙ্গে কথা বলবো।'

তোমরা যে চিঠি লিখে প্রেম...

'চিঠি লিখতে তোমার লজ্জা করলো না, আর আমার কাছে বলতেই লজ্জা?'

'চিঠির কথা তুমি কী ক'রে জানলে?'

'বা, তুমি লিখবে, আর আমি জানবো না?, আমি কি এক বছরের মধ্যে একবারো যাইনি বলে তোমার ধারণা?'

'এ সব নিয়ে কি ওদের বাড়িতে কোনো কথাবার্তা হ'য়েছে?'

'না, না, মাসীমাকে তুমি এখুনি কিছু বোলো না, সময়মতো আমি নিজেই বলবো।'

কিন্তু দেনা-পাওনার কথাটা তো তাঁর সঙ্গেই ঠিক করতে হবে?'

'বললাম তো তোমাকে, দেনা-পাওনার কোনো প্রশ্নই উঠছে না এখানে। ও সব আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি।'

একটু চুপ ক'রে গেল শৈলেশ্বর, ঠাট্টা ক'রে বললো, 'বড়ো জামায়ের তুলনায় ছোটো জামাই যে কতো মহানুভব সেটাই প্রমাণ করতে চাও বুঝি?'

'ছি, এসব কী বলছো? আমার মতামত তুমি বরাবরই জানো।'

শৈলেশ্বর পিঠ চাপড়ে বললো, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করো গে যাও।'

পাখায় ভর ক'রে বাড়ি এলাম। মাসীকে বললাম, 'মাসী, আমার বয়েস কতো বলো তো?'

মাসী বললেন, 'হরি হরি, মা-মাসীর কাছে বয়স জানতে এসেছিস? বছরের হিসেবে ছাব্বিশ বছর তিন মাস সতেরো দিন, আর স্মৃতিতে ছ' বছরের বালক। তোকে আমি ঐ বয়সেই পেয়েছিলুম।'

'আমার জন্য তো তুমি মনে মনে কতো পাত্রী ঠিক করেছ, সেই পাত্রীদের গুণাবলী শোনাও তো?'

'তা হ'লে বিয়েতে কি আমাদের টাটুবাবুর মতি হ'য়েছে?'

'হ'য়েছে, কিন্তু সর্ত আছে কিছু।'

'যেমন।'

'মেয়েটিকে ছাড়া তৃণও নিতে পারবে না।'

'তা নে না। এখন তোর কেমন মেয়ে পছন্দ তাই বল।'

'তোমার কেমন মেয়ে পছন্দ?'

'সে আমি খুঁজে নেবো, তোরটাই জানা দরকার।'

'একা একাই খুঁজবে?'

'সাহায্যকারী পাবো কোথায়?'

'কেন, আমিই তো তোমার সব কাজের সারথি।'

'তা বলে নিজের বৌ নিজে খুঁজবি?'

'সেটাই তো সবচেয়ে ভালো। ভালো না।'

মাসী তাকিয়ে রইলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মনোমত আছে বুঝি কেউ?'

'শুধু আমার মনোমত হ'লেই তো হবে না, আমার মাসীমণি রাজী হবে তবে তো।'

'বল দেখি কার মেয়েকে তোর মনে ধরেছে? নিশ্চয়ই শশি মুন্সেফের মেজ মেয়েটা।'

'হ'লো না।'

'আরতি?'

'উঁহু।'

'বিমল ডিপ্‌টির ভাগ্নি?'

'না।'

'তবে আবার কে রে? এই গপ্পে তো ঐ ক'টাই একটু ধুক্‌পুক্‌ করছে।'

'গপ্পেই যে সে আছে তা তোমাকে কে বল্‌লো? তুমি কী রকম চাও বলো না, দেখবে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে তরবারি হাতে আমি তৎক্ষণাৎ দেশ-দেশান্তরে ছুটে নিয়ে আসবো তাকে।'

ডালের বড়ি দিতে দিতে মাসী হেসে বললেন, 'শোন টাট্টু, তার রং হবে দুধে আলতার, চুল হবে মেঘ, দাঁত হবে মুক্তোর দানা, আর চরিত্র হবে খাঁটি সোনা।'

'পেয়েছি, পেয়েছি।' আমি আমার ঐটুকু ছোট্টখাট্ট মাসীকে দু'হাতে শূন্যে তুলে ধরলুম। মাসী চ্যাঁচাতে লাগলেন।

এরপরে দিনগুলো যেন হালকা হাওয়ায় ভাসতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সম্পাদিত "অমৃতে" নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি "জানাতে পারেন" বিভাগে কোন পাঠক-বন্ধু জবাব দিলে চিরবাধিত থাকিব।

এককালে পৃথিবী-বিখ্যাত এবং বর্তমানে লুপ্ত ঢাকাই "মসলিন" কাপড় যে ঢাকায় তৈয়ারী হইত ও তাহা অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর ছিল এ প্রমাণ কি ইতিহাসে পাওয়া যায়? না সংরক্ষিত "মসলিন" কাপড় থেকে জানা যায়? যদি ইতিহাস থেকে জানা যায় তবে তাহা কোন বই থেকে? তার লেখক কে? যদি সংরক্ষিত কাপড় থেকে জানা যায় তবে কোথায় সংরক্ষিত আছে?

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস।
পোঃ বহরমপুর,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

(উত্তর)

বিগত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে অমৃতে প্রকাশিত শ্রীঅহিভূষণ মিশ্র মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর ঃ—

(১) বিখ্যাত লোকের নামে দেশের রাস্তাঘাটের নামকরণের প্রথা বা রেওয়াজ মানবসভ্যতার আদি যুগ হইতেই প্রচলিত আছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোন দেশ এ বিষয়ে অগ্রণীর সম্মান পাইবার অধিকারী, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তবে যতদূর মনে হয়, মানব সভ্যতার আদি নিকেতন, এবং জগতে প্রচারিত ও প্রচলিত তাবৎ ধর্মমতের আদি ধাত্রী হিসাবে, এই এশিয়া ভূখণ্ডেরই কোন দেশে ইহার প্রথম প্রবর্তন হইয়াছিল।

পূর্বে রাজা-রাজড়া এবং বিত্তবান লোকেরা তাহাদের স্ব স্ব এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া স্ব স্ব নামে বা পিতৃ-পিতামহের নামে তাহাদের নামকরণ করিতেন। তবে যে সমস্ত নগরে পৌর-শাসন ব্যবস্থা বলবৎ থাকিত, তথায় বর্তমানকালের মতই হয়ত নগর-প্রধানগণের নামানুসারেই রাস্তাঘাটের নামকরণ হইত। বাল্মীকি রামায়ণ, সংহিতা গ্রন্থ, এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পৌরশাসনের উল্লেখ দেখা যায়। বৌদ্ধ-সাহিত্যেও তাহার অভাব নাই। এমন কি, আজ হইতে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে হারাপ্পা-মহেঞ্জোদারোতেও নগর-শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।

(২) এই একটি প্রশ্নের সঙ্গে পর পর ৫টি প্রশ্ন জড়িত। প্রশ্নকর্তা আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্নগুলি করিয়া পাঠাইলে

বিশদভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত। Encyclopaedia Britannica মতে ইংরেজি পঞ্জী রোমান পঞ্জীর অনুকরণে রচিত হইলেও তাহার সপ্তাহের বারের নামগুলি রোমান দেবদেবীর নামানুসারে রাখা হয় নাই, হইয়াছে প্রাচীন স্যাক্সন (Saxon) দেবদেবীর নামানুসারে। আবার সপ্তাহের ৭টি দিনও কোন প্রাচ্য দেশ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। বৎসরের ১২ মাসের সব কয়টি নামও রোমান দেবদেবীর নামানুসারে হয় নাই, যেমন জুলাই ও আগস্ট। জুলাই মাসের নামকরণ হইয়াছে প্রখ্যাত যোদ্ধা ও শাসনকর্তা জুলিয়াস্ সীজারের নামে, আর তদীয় ভাগিনেয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী অগাস্টাস্ সীজারের নামে হইয়াছে আগস্ট মাসের নাম। সুতরাং বার ও মাসের নামকরণ সম্পর্কে প্রশ্নকর্তার ধারণা ভুল।

'জানাতে পারেন' বিভাগটি পাঠক-মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে আমরা কৃতজ্ঞ। সকল প্রশ্ন প্রকাশ করা এখন আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। সহজ প্রশ্ন অথবা যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কোন স্থানীয় ও সহজপ্রাপ্য বিশ্বকোষ অথবা ইয়ার-বুকে পাওয়া যাবে তাহা প্রকাশের জন্য না পাঠালে ভাল হয়। তাছাড়া প্রশ্ন ও উত্তর যতদূর সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া উচিত। কি জানতে চাই, আর কি বলতে চাই সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলেই প্রশ্ন ও উত্তর যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত হয়।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি ১২ মাসের নাম ১২টি নক্ষত্রের নামানুসারে রাখা হইয়াছে, যেমন বৈশাখ মাস—বিশাখা নক্ষত্র, জ্যৈষ্ঠ মাস—জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ইত্যাদি। ৭টি বারের নামকরণ হইয়াছে ৭টি গ্রহ হইতে,—যেমন রবিবার—সূর্য বা রবি, সোমবার—চন্দ্র, মঙ্গলবার—মঙ্গলগ্রহ, বুধবার—বুধগ্রহ ইত্যাদি। হিন্দু জ্যোতিষে নবগ্রহের অবশিষ্ট রাহু ও কেতু গ্রহরূপে স্বীকৃত হইলেও প্রকৃত গ্রহ হিসাবে তাহাদের অবস্থানের স্বীকৃতি নাই, আছে মাত্র বিন্দুরূপে অবস্থানের স্বীকৃতি।

মৃগশিরা নক্ষত্র হইতেই অগ্রহায়ণ মাসের মার্গশীর্ষ নাম হইয়াছে। এই মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে বলিয়াই এই মার্গশীর্ষ নাম। বৈদিক যুগে এই অগ্রহায়ণ মাস হইতেই বৎসর গণনা করা হইত। হায়ণ অর্থে বৎসর বুঝায়। সেই হেতু অগ্রহায়ণের অর্থ হইল বৎসরের অগ্র বা প্রথম মাস।

সৌর মাস ধরিয়া যাঁহারা বৎসর গণনা করেন (পৃথিবীর তাবৎ আর্য জাতি), তাঁহারাই গ্রহরাজ সূর্যের নামানুসারে রবিবার হইতে সপ্তাহ গণনা করিয়া থাকেন। আর চান্দ্র মাস ধরিয়া যাঁহারা বৎসর গণনা করেন (সেমেটিক বা আরব জাতি), তাঁহারা সোমবার (চন্দ্রের আর এক নাম সোম) হইতে সপ্তাহ আরম্ভ করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে চান্দ্র মাস হিসাবে বৎসর গণনার সূত্রপাত করেন সম্ভবতঃ সুমেরীয়গণ (আনুমানিক ৩০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে) ও তৎপরে বেবিলোনীয়গণ (আনুমানিক ২৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে)। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ও মিশর দেশে সেই যুগ হইতেই চান্দ্র মাস হিসাবে বৎসর গণিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র ইরান ও আফগানিস্তানে ইস্লাম ধর্ম প্রবর্তনের পর হইতেই চান্দ্রমাসেরও প্রবর্তন হইয়াছে।

(৩) কাকের চক্ষু একটি নয় দুইটিই, এবং তাহাতে তারাও দুইটিই আছে। এদিক-ওদিক দেখিবার জন্য কেবল কাকই মাথা নাড়া-চাড়া করে না, লম্বা মাথা ও ঠোঁটযুক্ত প্রায় সব পাখীই কমবেশী এরূপ করিয়া থাকে। কথায় আছে "পক্ষিণাং বায়সো ধূর্তঃ", অর্থাৎ পক্ষীজাতির মধ্যে কাক সর্বাপেক্ষা ধূর্ত ও হুঁশিয়ার। এজন্যই সব সময় চারিদিকে নজর রাখিবার সুবিধা হিসাবেই কাক অনবরত এদিকে ওদিকে মাথা ঘুরাইয়া থাকে। লম্বাটে মাথা, তাহাতে লোম, আর লম্বা ঠোঁট থাকায় মাথা না ঘুরাইলে দুই চক্ষুতে একদিকে বিস্তৃত এলাকার উপর নজর রাখা সম্ভবপর হয় না।

আমাদের দেশে কাক প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এক চক্ষুবিশিষ্ট কাক কোথাও নাই, আর কোন কালে কোথায়ও যে ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ কোন পুঁথিপত্রে দেখা যায় না। তবে অন্যান্য পাখীর মত কাকের দুইটি চক্ষু থাকিলেও মণি কেবল একটিই, এরূপ একটা গুজব শোনা যায়। প্রশ্নকর্তা হয়ত মণি বা তারাকেই চক্ষু বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

কাকের চক্ষুর ডিম স্বচ্ছ নীলবর্ণের। নির্মল জলপূর্ণ গভীর জলাশয়ের রংও নীলাভ দেখায়। এজন্যই নির্মল জলের সঙ্গে কাকচক্ষুর তুলনা করা হইয়া থাকে।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী,
কলিকাতা-৯।

।। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা ।।

রবীন্দ্র-ভারতীর উদ্যোগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন কলকাতার শিল্পরসিক মানুষের কাছে এ-সপ্তাহের সবচেয়ে বড় সংবাদ। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে এই প্রদর্শনীটি আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা থাকবে।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের ৮৬ খানি চিত্রকলার নিদর্শন স্থান পেয়েছে। অধিকাংশই জল-রঙের মাধ্যমে অংকিত। কিছু প্যাস্টেলে আর কয়েকখানি ক্রেয়নে এবং যতদূর মনে পড়ছে একখানি মাত্র আছে তেল-রঙের মাধ্যমে অংকিত।

এই প্রদর্শনীতে এসে শিল্পাচার্যের শিল্পী-জীবনের প্রথম দিকের কাজ যেমন দেখতে পাওয়া যাবে তেমনি দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর পরিণত শিল্পী-জীবনের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের নব-জাগরণের স্রোত-ধারায় ভারতীয় শিল্পকলার যে পুনরুজ্জীবন ঘটে হ্যাভেলের নেতৃত্বে, অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই আন্দোলনের অগ্রপথিক। কিন্তু যেহেতু সেই আন্দোলনকে তৎকালীন শাসক-সমাজ খুব সুনজরে দেখেন নি সেইহেতু লর্ড কার্জন প্রমুখ শাসনকর্তারা সেই শিল্প-আন্দোলনকে অজন্তা, রাজপুত, মুঘল, পারসিক তথা দরবারী রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে আমাদের লোকচিত্র, লৌকিক আচার, রীতি-নীতি, ধর্ম এবং ব্রত-পূজোর মধ্যে দিয়ে এমনভাবে নতুন পথ প্রশস্ত করে দিল যে এর ফলেই সত্যিকার এক দেশজ চিত্র-রীতি গড়ে উঠল। আর, ঠিক এই কারণেই অবনীন্দ্রনাথকে আমরা দিয়েছি শিল্পগুরুর মর্যাদা।

শিল্প-শিক্ষার সেই প্রথম যুগে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজ শিক্ষক পামারের কাছ থেকে ড্রয়িং সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেন, চিত্রের পারস্পেকটিভ অর্থাৎ—দূরে-কাছে, পারস্পরিক অনুপাত ও সম্বন্ধ সম্পর্কে যে চেতনা লাভ করেন, তিনি তাঁর চিত্রকলায় তা যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন — এই প্রদর্শনীর চিত্রগুলি দেখলে তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্যাস্টেলের কাজেও যে তেলরঙের বর্ণবিভঙ্গ বা রঙের টোন আনা যায়, ভারতীয় চিত্রকলায় এর

কলারসিক

সার্থক এবং প্রথম প্রয়োগকর্তা বোধহয় অবনীন্দ্রনাথ। এই টোনালিটির গূঢ়তত্ত্ব তিনি শিক্ষা করেছিলেন তাঁর ইতালীয় শিক্ষক গিলার্দি'র কাছ থেকে। আলোচ্য প্রদর্শনীর 'খে'কশিয়াল' (৩৩), 'বাঁদর নাচিয়ে' (৩৮), 'কালপে'চা' (৩৯), 'রাস-নৃত্য' (৪০) কিম্বা 'পুতনা বধ' (৪১) চিত্রগুলি দেখলে এতকাল পরেও সেই রঙের বর্ণবিভঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে। অবনীন্দ্র বুঝেছিলেন কী করে ধূসর আর ব্রাউন রঙ অন্য উজ্জ্বল রঙের গৌণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উঠিয়ে দিতে হয় এবং কী করে সেই উজ্জ্বলের মধ্য দিয়ে ছাই ও ব্রাউন রঙের জৌলুস তুলে দ্যুতি, টোন তথা বিচিত্র বর্ণালী

অবনীন্দ্রনাথের একটি ছবি

বিভঙ্গের মধ্যদিয়ে চিত্রে হীরা-জহরতের ছটা আনা যায়। মোটকথা, এ তাঁর ইংরেজি ড্রয়িং ও ভিনিশান রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতি আয়ত্ত করার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

জলরঙের কাজে অবনীন্দ্রনাথ যে 'ওয়াশ'-পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদের বিস্মিত করেছেন, সেই 'ওয়াশ'-পদ্ধতি তিনি শিক্ষা করেছিলেন প্রখ্যাত জাপানী শিল্পী ওকাকুরা, তাইকোন, হিশিদা প্রভৃতি শিল্পীদের কাছ থেকে। এই-ভাবে অবনীন্দ্রনাথ বিদেশী চিত্র-রীতিকে আত্মস্থ করে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে তা তাঁর চিত্রকলায় প্রয়োগ করে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ইতিহাসকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে বিংশ শতাব্দীর আলোকে নিয়ে আসেন।

প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে যে কয়খানি নিসর্গ চিত্র ছিল তার রঙ প্রয়োগ-পদ্ধতি ইওরোপীয় হলেও 'মুড' কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দেশীয়। এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে হ্যাভেল কথিত : 'ভারতীয় চিত্র-ঐতিহ্যের ছিন্নসূত্রকে তিনি সত্যিই জোড়া দিতে এসেছিলেন।' কারণ তাঁর হাতে ছিল 'প্রাচ্য কাব্য-জগৎ ও কল্পলোকের চাবিকাঠি।'

আমরা আশা করি দর্শকেরা এই আলোচনার সূত্র ধরে এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত অবনীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের চিত্রসহ 'কৃষ্ণ-লীলা', 'ওমর খৈয়াম', 'আরব্য রজনী', 'কবিকংকন চন্ডী' ও 'কৃষ্ণমঙ্গল'—বিষয়ক চিত্রগুলি এবং সেই সঙ্গে নিসর্গ চিত্র, পাখি ও জীবজন্তুর স্টাডি, মুখোস ও অন্যান্য চিত্রগুলিও দেখে আসতে ভুলবেন না।

এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আমরা রবীন্দ্র-ভারতীকে অভিনন্দিত করি। সম্ভব হলে প্রদর্শনীর সময় আরও কিছুদিন বর্ধিত করতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।

।। শিল্পী রঞ্জন রুদ্রের প্রদর্শনী ।।

পার্ক স্ট্রীটের আর্টস এন্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে শিল্পী রঞ্জন রুদ্রের যে প্রদর্শনী শুরু হয়েছে (৮ই ফেব্রুয়ারী) সম্ভবতঃ কলকাতায় সেটিই বিশুদ্ধ

বিমূর্ত চিত্রকলার প্রথম একক প্রদর্শনী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত শিল্পী রুদ্র ইওরোপীয় বিমূর্ত চিত্রকলার রীতি-নীতিকে আত্মস্থ করে ১৯৬২ সালে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর এই তাঁর প্রথম প্রদর্শনী।

এই প্রদর্শনীতে এসে সাধারণ দর্শক যে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খাবেন, সে-কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, শিল্পী কোনো আকৃতি বা রেখায়িত ভঙ্গীমায় তাঁর চিত্র-বক্তব্য উপস্থিত না করে শুধু চ্যাপ্টা রঙ এবং দু'-একটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাঁর 'মনের নিস্বর্গ চিত্র' আঁকতে চেয়েছেন। হয়তো এর মধ্যে শিল্পী-কথিত 'জন্ম-মৃত্যু, যৌবন-জরা, আনন্দ-বেদনায় জড়ানো জীবন' প্রশ্নের সম্মুখীন; কিন্তু প্রশ্নেভরা শিল্পী-মনের এই চিত্রাবলী যদি দর্শক-মনেও অনুরূপ ভাবনা-চিন্তার জন্ম না দেয়, কিম্বা চিত্র-বক্তব্য যদি দর্শক-মনের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু রচনা করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে-দোষ কি শুধু দর্শকদের? বিমূর্ত চিত্র-রচনার সঙ্গে কি অবজেকটিভ চেতনার কোন সম্পর্ক নেই? ইওরোপীয় বিমূর্তবাদীরা কি এইভাবেই ভাবিত? শিল্পী রঞ্জন রুদ্রের প্রদর্শনী দেখার পর যে কোন দর্শক এই প্রশ্নের বাণ ছুড়ে দিতে পারেন।

শিল্পী রঞ্জন রুদ্রের আঁকা ছবি
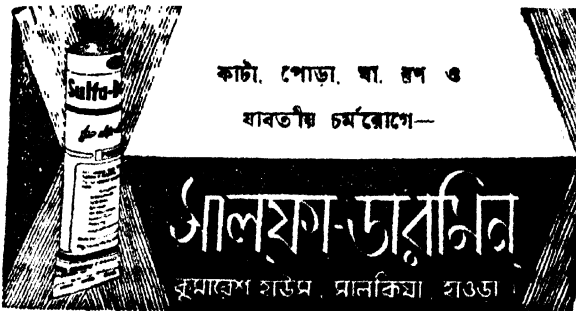
আমার বক্তব্য : রঞ্জন রুদ্র যে-দেশের জল-মাটি, আলো-হাওয়ায় তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন তাকে ভুলে না যেয়ে যদি তাঁর শিক্ষিত চেতনার সঙ্গে এর সমন্বয়সাধনে উদ্যোগী হন তবে তাঁর কাছে আমরা অন্যতর শিল্প-সম্পদ পাওয়ার আশা রাখতে পারি। অন্যথায় তিনি এ-দেশের মন জয় করতে পারবেন বলে আমার অন্ততঃ বিশ্বাস নেই। আশা করবো শিল্পী তাঁর 'যন্ত্রণা' চিত্রে রঙ প্রয়োগের মধ্যে যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছেন কিম্বা অন্যান্য চিত্রের জমিন-সৃষ্টিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তা ভবিষ্যতে আরও বাস্তবগ্রাহী শিল্প বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে না। আমরা রঞ্জন রুদ্রের ভবিষ্যৎ চিত্র-প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় রইলাম।

আহ্বান

রমানাথ রায়

যে ঘরগুলোর দরজা এতক্ষণ হাট করে খোলা ছিল, দশটা বাজতেই সেগুলো শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল এবং প্রতি ঘরে যে আলোগুলো জ্বলছিল, সেগুলো নিভে গেল একে একে। তারপর কোন কোন ঘরে গোপন আলাপের মত যে ফিসফাস শব্দ শোনা যাচ্ছিল, তাও আর শোনা গেল না। রাত্রি আরও গভীর হল, চারদিক থমথম করতে লাগল, এক শ্বাসরোধকারী নিঃস্তব্ধতা। গোটা বাড়িটা এই সঘন অন্ধকারের মধ্যে বোবার মত একাকী দাঁড়িয়ে রইল।

নিখিলবাবু, যিনি এই বাড়ির অধিকর্তা, তাঁর বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশটি, মাথার চুল তাঁর সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে এবং যিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও আটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, তিনি তাঁর নিজের ঘরের দামী পালঙ্কে অন্যান্য দিনের মত সেদিনও ঘুমিয়ে পড়তে দেরী করেননি, খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

নিখিলবাবু এখন বিপত্নীক; দু বছর হল তাঁর স্ত্রী বিগত হয়েছেন; কিন্তু এই মৃত্যু তাঁর কাছে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি; কেননা, বহু দীর্ঘ বছর ধরে তিনি তাঁর সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রীর সাহচর্য পেয়েছেন। স্ত্রীর কাছে মানুষের যে সব অমূল্য প্রত্যাশা থাকে, সে সব থেকে তিনি বঞ্চিত হননি; এবং এজন্য তিনি গর্বিত ছিলেন। অবশ্য স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও তাঁর পক্ষে গর্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। অর্থ, মানুষের অন্যতম কাম্যবস্তু, তা তিনি প্রচুর অর্জন করেছেন, হয়ত বা প্রয়োজন তার থেকে বেশী করেছেন। কিন্তু শুধু অর্থই মানুষকে সুখী করে না, যশের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে প্রবল ও অপ্রতিহত, এবং এদিক থেকেও তিনি

সৌভাগ্যের অধিকারী। কলকাতা শহরে ডাক্তার নিখিল বসুর নাম জানে না, এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। তবে, অর্থ এবং যশ বড় বেশী চঞ্চল; তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদাই একটা সন্দেহ থেকে যায়। তাই মানুষ বুঝি রক্তের মধ্যে অমরতা চায়; আর সেই একান্ত গোপন কারণেই মানুষ সন্তান কামনা করে। নিখিলবাবু এদিক থেকেও বঞ্চিত নন। তাঁর দুই পুত্র এবং একটি কন্যা বর্তমান; এবং দুই পুত্র তাঁর মত অর্থ ও খ্যাতির অধিকারী মানুষের উপযুক্ত সন্তান। কেননা, এই দুই পুত্র ইতিমধ্যেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছে। প্রায় চার-পাঁচ বছর হল বড়টির বিবাহ হয়েছে; এবং তার দুটি সন্তানও হয়েছে। ছোটটির বিবাহ এখনও হয়নি; তবে ধনী, শিক্ষিত কন্যার সন্ধান পেলেই বিবাহ দেবেন, এ রকম আশা মনে মনে পোষণ করছেন নিখিলবাবু। আর কন্যাটিকে এম-এ পর্যন্ত পড়িয়ে এক প্রতিষ্ঠিত বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ারের হাতে সমর্পণ করেছেন।

এহেন শ্রদ্ধেয় নিখিল বসু, যাঁর পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে কোন অসন্তোষ ছিল না; ক্ষোভ, দুঃখ, যন্ত্রণা—এই সব অস্থির শব্দগুলো যাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে গেল চিরকাল, তাঁর যে ঘুমের কোনদিন ক্ষেদ

মুহূর্তের জন্যেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে না, এই ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

কিন্তু সেদিন প্রায় রাত দুটোর সময় যখন গোটা বাড়িটা অন্ধকারে ঝিমুচ্ছিল, ঠিক সেই সময় নিখিলবাবুর চওড়া কপালে কয়েকটা স্পর্শ রেখা ফুটে উঠল। ঘুমের মধ্যে তিনি যেন অকস্মাৎ কলিং বেলের তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলেন; এবং কি আশ্চর্যের ব্যাপার, বেলটা মুহূর্তের জন্যে আর্তনাদ করে কিছুতেই থেমে গেল না, নিখিলবাবুর ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত বেলটা বেজে চলল। এক তীব্র অসন্তোষে নিখিল-বাবুর গোটা শরীর ভরে গেল। অন্ধকারে চোখের পাতা দুটো খুললেন; আর খুলতেই; কলিং বেলের কোন শব্দ তিনি শুনতে পেলেন না। না পেয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইলেন; কিন্তু কলিং বেল দ্বিতীয়বার বেজে উঠল না। নিখিলবাবু একটু অবাক হলেন; শেষে ভাবলেন, হয়ত স্বপ্ন। তারপর আরাম করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন সময় পুনরায় ঠিক আগের মত ঘুমের মধ্যে কলিং বেলের তীব্র শব্দ যেন নিখিলবাবু শুনতে পেলেন। তাঁর অসন্তোষ দ্বিগুণ হয়ে উঠল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঘুম ভাঙতেই কলিং বেলের শব্দ এবারেও যেন অকস্মাৎ থেমে গেল। কিছু বুঝতে না পেরে তিনি উৎকর্ণ হয়ে জেগে রইলেম। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে অতিক্রান্ত হল। কিন্তু কলিং বেল আর কিছুতেই বেজে উঠল না।

নিখিলবাবুর মধ্যে প্রথমে যে বিস্ময় দেখা দিয়েছিল, তা আর রইল না। তাঁর শরীর এবং মন স্পর্শ করল এক অদ্ভুত অপরিচিত ঠাণ্ডা ভয়। ঘটনাটা তাঁর কাছে অলৌকিক বলে মনে হল। কেননা,

কিছু বুঝতে না পেরে তিনি উৎকর্ণ হয়ে জেগে রইলেন

এ রকম আশ্চর্য ঘটনার মুখোমুখি তাঁকে কোনদিন হতে হয়নি। মাঝরাতে কোনদিন এ রকম আকস্মিকভাবে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়নি; না, দুঃস্বপ্নেও না। কেননা, দুঃস্বপ্ন দেখার মত চরিত্র তাঁর ছিল না। প্রতিদিন ঠিক রাত দশটায় তিনি ঘুমোতে গিয়েছেন; এর এক মিনিট এপাশ-ওপাশ কোনদিন হয় নি, হতে দেন নি; এবং প্রতিদিন নির্ভুল-ভাবে সকাল আটটায় তাঁর ঘুম ভেঙেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্যেও ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। আজ জীবনে এই প্রথম তাঁকে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হল।

নিখিলবাবু পুনরায় ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চোখের পাতা বন্ধ করলেও কিছুতেই তাঁর ঘুম এলো না। এক ভয়ংকর অস্বস্তি তাঁকে পেয়ে বসল। শেষে তিনি নিরুপায় হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। খুলে দিলেন রাস্তার ধারের বন্ধ জানলা। সেখান দিয়ে মুখ বাড়ালেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না; না পেয়ে, 'কে, কে' বলে চিৎকার করে উঠলেন কয়েকবার। কিন্তু কোন উত্তর ভেসে এল না।

নিখিলবাবু শেষে খুব ভীত হয়ে জানলা বন্ধ করে, দরজা খুলে বড় ছেলের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেশ শব্দ করে দরজায় ধাক্কা দিলেন কয়েকবার।

বড় ছেলে দরজা খুলে চোখে ঘুম নিয়ে জড়িত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করল, কি হল?

নিখিলবাবু ধরা গলায় বললেন, কলিং বেলের শব্দ শুনেছিস?

—কই, না ত!

নিখিলবাবু একটু অবাক হলেন; বললেন, শুনিস নি?

—না।

—আমি ত দু'বার শুনলাম।

—কে ডাকছে?

—জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম, অথচ কাউকে দেখতে পেলাম না।

তাহলে, ও তোমার মনের ভুল। যাও, ঘুমিয়ে পড়গে। ও নিয়ে বেশী চিন্তা

করো না, বলে খুব বিরক্ত ভঙ্গিতে পুনরায় ঘরে ঢুকে বড় ছেলে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

নিখিলবাবু খুব আহত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। বড় ছেলের কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার তিনি প্রত্যাশা করেন নি। খুব ক্ষুব্ধ হয়ে অন্ধকারে একাকী দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে ভাবলেন, হয়ত ওর কথাই ঠিক। হয়ত, এ তাঁর মনের ভুল। কিন্তু নিখিলবাবু এটাকে কিছুতেই যেন মনের ভুল বলে ভাবতে পারলেন না।

এরপর প্রায় যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন, অন্ততঃ যখন আর জেগে নেই, সেই সময় নিখিলবাবু আবার যেন কলিং বেলের ভয়ংকর আর্তনাদ শুনতে পেলেন।

নিখিলবাবুর পক্ষে আর ঘুমোনো সম্ভব হল না। এই নিয়ে তিনবার তাঁর কলিং বেল্লের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল; এবং আগের মতই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে এবারেও কোন শব্দ আর শুনতে পেলেন না।

জীবনে এই প্রথম নিজেকে বড় বেশী অসহায় বলে মনে হল নিখিলবাবুর। এখন কি করবেন আর কি করবেন না, তা যেন ভেবে পেলেন না। না পেয়ে, নরম বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইলেন।

কিন্তু এইভাবে চুপচাপ কতক্ষণই বা শুয়ে থাকা যায়! আর ঘুমোনো তাঁর পক্ষে এখন একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পেরেছেন, ঘুমোলেই পুনরায় তাঁকে সেই অলৌকিক শব্দের আহ্বান শুনতে হবে! তাই শেষ পর্যন্ত, প্রবল পরাক্রমের মত এই আহ্বানকে তিনি আর কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারলেন না।

শেষে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নিখিলবাবু। অন্ধকারে তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর একবার যেন টলে উঠল। অতি-কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। একবার তাকালেন বড় ছেলের ঘরের দিকে। না, ওকে তিনি দ্বিতীয়বার আর বিরক্ত করবেন না। বড় ছেলের পাশেই ছোট ছেলের ঘর। সে ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর মনে হল, ছোট ছেলেকে যদি ডাকেন এবং বিবৃত করেন গোটা ঘটনাটা, তাহলে ও হয়ত তাঁকে এই রাত্রিবেলা ভীষণ ঠাট্টা করতে শুরু করবে। আর সেটা নিখিলবাবুর মত বৃদ্ধ লোকের পক্ষে সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

এই সময়ে মধ্যরাতে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে নিখিলবাবু বুঝতে পারলেন, আসলে তিনি কত একা, আর কত অসহায়। তাই শেষে নিখিলবাবু আস্তে আস্তে সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। কেননা, এই সিঁড়িগুলো অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে সেই কঠিন দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে, যে দরজাটা খোলা তাঁর এখন একান্ত প্রয়োজন।

তারপর মধ্যরাত্রির নীরব অন্ধকারে পঁয়ষট্টি বছরের অতিবৃদ্ধ নিখিলবাবু ঐ অলৌকিক অমোঘ আমন্ত্রণের মুখোমুখি হবার জন্যে, যেন প্রায় অনাদিকাল ধরে সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে ভাঙতে লাগলেন। আর সেই সময় তাঁর চেতনা থেকে অর্থ, খ্যাতি, সংসার এই সব অতিপ্রিয় শব্দগুলোর অস্তিত্ব নষ্ট নগরীর মত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল।

॥ চৈনিক শঠতা ॥

কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে চীনের সরকারী বক্তব্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। শুধু তাঁরা এইটুকু জানিয়েছিলেন আলোচনার প্রথম পর্বে যে, "নীতিগতভাবে" কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে তাঁরা রাজী কিনা এসম্পর্কে একটি কথাও চীনের ধূর্ত নেতারা আজ পর্যন্ত কলম্বো প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদের জানাননি। কলম্বো সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক সম্প্রতি ভারত-সফর শেষ করে চীনে যান। সেখানে তাঁর সম্বর্ধনায় যে সভা হয়, তাতে চীনের প্রেসিডেণ্ট লিউ শাওচি বলেন, কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোগী ছয় রাষ্ট্র যেন প্রাথমিক বাধাবিপত্তিতে নিরাশ না হন এবং চীন-ভারত বৈঠক যাতে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়, তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যান। প্রাথমিক বাধাবিপত্তি যে কি তা চীনা প্রেসিডেণ্ট ব্যাখ্যা করে বলেননি, বা কলম্বো শক্তিবর্গের নতুন উদ্যম কোন পথে চালিত হবে, সে সম্পর্কেও তিনি নীরব। এর দ্বারা স্পষ্ট করে তিনি এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ভারত যদি কোন মীমাংসা চায়, তবে তাকে বিনাসর্তে চীনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে এবং এ ব্যাপারে কলম্বো শক্তিবর্গের কাজ হবে, চীনের সর্তে চীনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে ভারতকে বাধ্য করা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, চীনের এই সুস্পষ্ট দম্ভের সমুচিত জবাব দেওয়ার মত সাহস বা সদিচ্ছা কলম্বো শক্তিবর্গের অনেকেরই নেই। তাই চীন কলম্বো প্রস্তাব তুচ্ছ করা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কারও পক্ষেই চীনকে ভর্ৎসনা করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী মিঃ আলি সাবরি এই নিবীর্যতার বলিষ্ঠ ব্যতিক্রম। তিনিই শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পিকিঙ আলোচনার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। চীনা আক্রমণের প্রথম দিন থেকেই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রকাশ্যে ভারতকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে এবং একথাও আজ সকলে জানে যে, কলম্বো সম্মেলনে যদি সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত না থাকতেন, তবে কলম্বো প্রস্তাবে ভারতের প্রতি যেটুকু সমর্থন জানানো হয়েছে, সেটুকুও হয়ত শেষ পর্যন্ত সম্ভব হ'ত না। কোন বিষয়ে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস যে রাষ্ট্রের নেই, সে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিরোধে মধ্যস্থতা করার সাধ যে কেন জাগে, তা আমরা বুঝি না। এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলি পরিশেষে নিজেদের মুখরক্ষার্থে হয়ত ভারতের কাছে এমন কতকগুলি প্রস্তাব করে বসবে, যাতে ভারতের পক্ষে অবস্থাটা আরও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

সম্প্রতি টাঙ্গানিকায় মোসি শহরে যে আফ্রো-এশীয় সংহতি-সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল তাতে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাকে শুধু নিন্দনীয় বললেই যথেষ্ট বলা হবে না। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনীতিতে বর্তমানে যে ঘটনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই চীন-ভারত বিরোধ প্রসঙ্গকেই সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আলোচনা সূচী থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত তার প্রতিবাদে সম্মেলন স্থানত্যাগ করায় সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ভারতকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় সম্মেলনে ফিরিয়ে আনেন যে, কলম্বো প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ও চীনকে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ করে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হবে। সেই আশ্বাস বাক্যে ভারতের প্রতিনিধিরা আবার ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁরা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, কলম্বো প্রস্তাবের সমর্থনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র যে প্রস্তাব রচনা করেছিল ভারতের অজ্ঞাতে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে তাই সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে। ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতা সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের এই আচরণকে 'প্রবঞ্চনা' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা আমাদের স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে যে, যতদিন না আমরা নিজেদের শক্তিতে শক্তিশালী হচ্ছি ততদিন আমাদের এ জাতীয় প্রবঞ্চনার অপমান বার বার সইতে হবে। নিজেদের সম্মান ও স্বার্থরক্ষার কাজে যতদিন আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকব ততদিন আমাদের সম্মান ও স্বার্থ আজকের মতই বিপন্ন থাকবে।

॥ পাক-ভারত আলোচনা ॥

চীনা আক্রমণের ফলে একটা অন্তত বড় লাভ হবে বলে দেশবাসীর আশা হয়েছিল। মনে হয়েছিল যে, শিয়রে শত্রুর কথা চিন্তা করে পাকিস্তান ও ভারত এবার তাদের দীর্ঘদিনের বিরোধগুলি মিটিয়ে ফেলবে। কিন্তু করাচীতে পাক-ভারত মন্ত্রিপর্যায়ের তৃতীয় দফার আলোচনাও নিষ্ফল হওয়ায় সে আশা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। অবশ্য কোনপক্ষই এখনো হাল ছাড়েননি এবং করাচী বৈঠকেই স্থির হয়েছে যে, মার্চ মাসে আবার উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা কলকাতায় মিলিত হবেন।

স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার পর হতেই কাশ্মীর-সমস্যা উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ককে তিক্ত করে রেখেছে। কাশ্মীর সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতভাবে ভারতে যোগদান করে এবং ভারতকে প্রধানমন্ত্রী যদি সেদিন সেই যোগদানকেই কাশ্মীর সম্পর্কে শেষ কথা বলে মনে করতেন ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী হানাদারদের বলপূর্বক বিতাড়ন করতেন তবে বোধহয় কোনদিনই কাশ্মীর সমস্যা বলে কিছুর সৃষ্টি হত না। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী হানাদারদের বিতাড়নের পূর্বেই তাদের সঙ্গে আপোষ করেন ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ গণভোটের মাধ্যমে স্থির করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই একটি মাত্র প্রতিশ্রুতিই কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবীকে জোরালো করে তোলে এবং গত পনের বছর ধরে সেই গণভোটের দাবীকে জিইয়ে রেখে পাকিস্তান কাশ্মীর-সমস্যার মীমাংসা অসম্ভব করে রাখে। গোটা পাকিস্তানে কোথাও আজ নির্বাচনের নাম-গন্ধ নেই, রাজনৈতিক প্রশ্নে জনগণের মতামত দেবার সামান্যতমও অধিকার আছে বলে স্বীকার করেন না পাকিস্তানের বর্তমান শাসকরা, কিন্তু কাশ্মীরের জনগণের অভিমত জানার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহের অন্ত নেই। এমন কি কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান গত পনের বছর ধরে দখল করে বসে আছে সেখানেও আজ পর্যন্ত কোন নির্বাচন হয়নি। সেখানেও সাধারণ মানুষের কাছে এ প্রশ্ন করা হয়নি যে, পাকিস্তানে তারা থাকতে চায় কিনা। অথচ ভারতের অন্তর্গত কাশ্মীরে এ পর্যন্ত তিনটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে, হাজারে হাজারে কাশ্মীরবাসীরা সে সব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হতে বিচার করলেই বোঝা যায় যে, কাশ্মীর-সমস্যার মীমাংসায় পাকিস্তানের গণভোটের দাবী কত অন্যায়।

পাক কর্তৃপক্ষও এতদিনে তা কিছুটা উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয়। তাই এবার তাঁরা গণভোটের

বদলে কাশ্মীর-বিভাগের প্রশ্নে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু বিভাগের ব্যাপারেও তাঁরা যে নীতির ভিত্তিতে তাঁদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা ভারতের পক্ষে কোনমতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখাকে বিভাগের মূল সীমান্তরূপে ধরে নিয়ে তার ওপর কিছু অদল-বদল করতে ভারতের অবশ্যই আপত্তি হবে না। কিন্তু পাকিস্তান তাতে সম্মত নয়, তার দাবী ধর্মের ভিত্তিতে বিভাগ, যা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত কখনও মেনে নিতে পারে না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগের পরিণতি যে কি বিষময় তা গত পনের বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতের উপলব্ধি হয়েছে। আজ যদি আবার সেই ধর্মের জিগিরকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা হলে এই উপমহাদেশের উভয় খণ্ডেই সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়বে। এতবড় বিপদের ঝুঁকি কখনও আমরা নিতে পারি না। কলকাতায় পাক-ভারত আলোচনার সফল পরিণতি আমরা অবশ্যই কামনা করি কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ কাশ্মীর উপত্যকা পাকিস্তানকে উপঢৌকন দেওয়ার প্রস্তাব আমরা কোনমতেই মেনে নিতে পারি না।

॥ রবীন্দ্রস্মৃতি ॥

পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে ধন্যবাদ, কবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত শিলাই-দহের কুঠিবাড়ীটিকে তাঁরা রবীন্দ্রস্মৃতি ভবনরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। জীর্ণ ভবনটির সংস্কারের জন্য পূর্ব পাক সরকার ইতিমধ্যে পনের হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং প্রয়োজন হলে আরও টাকা তাঁরা দেবেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-স্মৃতিপূত বিভিন্ন সামগ্রীর সংগ্রহশালারূপে ভবনটি যাতে কবির অনুরাগীদের আকৃষ্ট করতে পারে তার জন্যে পূর্ব পাক সরকার যাবতীয় ব্যবস্থাবলম্বন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এইজন্য কুঠিবাড়ী যাওয়ার আট মাইল পথটিও বাঁধানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার পাক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষের হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শুভেচ্ছাস্বরূপ এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলী উপহার দিয়েছেন।

আর এক সংবাদে প্রকাশ, যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে কবি শ্রীমধু-সূদনের পৈতৃক বাসভবনটিও অনুরূপ-ভাবে সংস্কার ও সংরক্ষণের পরিকল্পনা পূর্ববঙ্গ সরকার নিয়েছেন। তাঁদের এই সাধু পরিকল্পনাগুলিকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। রাজ-নীতি আমাদের বিভক্ত করলেও সংস্কৃতির বন্ধন যেন দিনের পর দিন আমাদের চিরন্তন সম্পর্ককে এমনি করে নিবিড় করে তোলে।
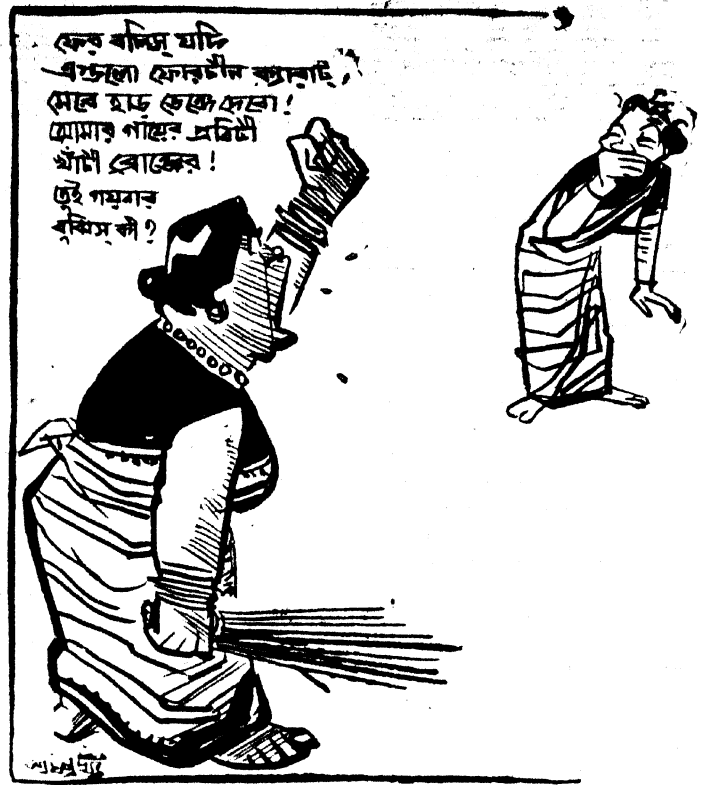
॥ ইরাক ॥

পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে আবার এক বিরাট চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল। ১৯৫৮ সালের ১৪ই জুলাই অতর্কিতে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জেনারেল কাশেম নামক এক অখ্যাত সৈনিক ইরাকের শাসনক্ষমতা দখল করেন এবং ইরাকের রাজা ও তাঁর বংশের প্রত্যেকটি মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে ইরাকে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেন। ইরাকের সেই অভ্যুত্থানে নাসেরসহ আরবের প্রায় সকল রাজ্যের নেতাই অভিনন্দন জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তবুও কাশেমের সঙ্গে তাঁদের কোন হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। তার কারণ, কাশেম আরব-ঐক্যের ব্যাপারে খুব বেশী আগ্রহী ছিলেন না, বা ক্ষমতাদখলের ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সঙ্গে তিনি যতটা আপোষ করেছিলেন সেটাও আরব নেতাদের বিশেষ পছন্দ ছিল না। ইরাকের বাথ সোস্যালিস্ট দল কাশেমকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল, কিন্তু তাদের আরব-ঐক্যের ধ্বনি কাশেমের পছন্দ ছিল না বলে কাশেম শেষ পর্যন্ত তাদের উপর উৎপীড়ন করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বাথ সোস্যালিস্টদের প্রতি বিরূপ মনো-ভাব দেখিয়ে কাশেম তাঁর বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বড় ও শক্তিশালী শত্রুদলের সৃষ্টি করেন। তারপর উত্তর ইরাকের প্রায় পাঁচ লক্ষ কুর্দ উপজাতীয়র উপর অকথ্য নির্যাতন করেও তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা হারান। সবশেষে কুয়াইতের উপর দখল-দারির দাবী জানিয়ে তিনি সমগ্র আরব রাজ্যকে তাঁর শত্রু করেন। এ সকল কারণে ক্ষমতাদখলের কিছুকাল পর হতেই কাশেমকে হত্যার চেষ্টা আরম্ভ হয়। আততায়ীর আঘাতে ইতিপূর্বে বহুবারই তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। এমন কি একবার আহত অবস্থায় যখন তিনি হাসপাতালে ছিলেন তখন সেই অবস্থাতেই আর একবার তাঁর উপর গুলী বর্ষণ করা হয়।

শেষ পর্যন্ত আততায়ীদের হাতেই প্রাণ হারালেন তিনি এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর একবার ইরাকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সূচনা হল। কাশেম-বিরোধী অভ্যুত্থানে বাথ সোস্যালিস্টদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই মনে হয়, এর ফলে ইরাকে আরব-ঐক্যের আন্দোলন আবার জোরদার হয়ে উঠবে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪শে মাঘ : পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ (জুলাই, ১৯৬৩) হইতে ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার (এন সি সি ট্রেণিং) ব্যবস্থা—কেন্দ্রীয় উদ্যম।

'দুশমন (চীন) আবার রুখিয়া দাঁড়াইতে পারে, তজ্জন্য প্রস্তুতি অক্ষুন্ন রাখা চাই'—কলিকাতা সফরাগত কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সতর্কবাণী—প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার কাজে ব্যবসায়ী সমাজের গুরু দায়িত্বের উল্লেখ।

বনহুগলীতে (কলিকাতার সন্নিহিত) পঙ্গু শিশুদের জন্য নির্মিত হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্বোধন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে মাঘ : ভারতে গিনি সোনার অলঙ্কার বেচাকেনার শেষদিনে সর্বত্র গহনার দোকানগুলিতে অসম্ভব ভিড়—অলঙ্কার ভিন্ন অন্য সোনার হিসাব দাখিলের মেয়াদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬৩) পর্যন্ত বর্ধিত।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (কলিকাতা) বাংলার সাহিত্যসেবীদের সম্মেলনে চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশাত্মবোধের নূতন পটভূমি রচনার শপথ গ্রহণ— সভাপতি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৬শে মাঘ : শিলং-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠক আরম্ভ—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রিগণের যোগদান।

প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের তিন বৎসরব্যাপী বাধ্যতামূলক এন সি সি ট্রেণিং—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের বোম্বাই বৈঠকের প্রস্তাব।

ময়দানে (কলিকাতা) স্বর্ণশিল্পী সমাবেশে (সারা বাংলা) কর্মচ্যুত স্বর্ণশিল্পীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দাবী।

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৭শে মাঘ : 'কলম্বো প্রস্তাবের রদবদলের প্রশ্ন অবান্তর'—পূর্বাঞ্চল পরিষদের বৈঠকে (শিলং) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর ঘোষণা—শিলচরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য আগামী তিন বৎসরে ৭০ হাজার (দরিদ্র ও মেধাবী) ছাত্রের উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ—কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঋণভিত্তিক বৃত্তিদানের পরিকল্পনা।

১১ই ফেব্রুয়ারী—২৮শে মাঘ : 'কাশ্মীর প্রশ্নে উভয় প্রতিনিধি দলের (ভারত-পাক) গুরুতর মতভেদ'—করাচী বৈঠকান্তে দিল্লী ফিরিয়া সর্দার শরণ সিং-এর মন্তব্য।

সোভিয়েট 'মিগ' জঙ্গীবিমানের প্রথম কিস্তি (১২খানি বিমানের মধ্যে ৪টি) চালান বোম্বাই-এ উপনীত।

কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ কর্তৃক সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ

১২ই ফেব্রুয়ারী—২৯শে মাঘ : 'যুগান্তরের' আসাম প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত—সমগ্র রাজ্যে 'যুগান্তরের' চাহিদা বৃদ্ধি।

চীনাদের হাতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দী : মোট ৪০৫৭ জনের মধ্যে এখনও ৩৩১৯ জন আটক।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—৩০শে মাঘ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বি এন দাতারের (৬৮) দিল্লীতে পরলোকগমন।

ভারত-সফররত গ্রীক রাজদম্পতির কলিকাতা উপস্থিতি— বিমানঘাঁটিতে সম্বর্ধনা।

আলোচ্য বর্ষেই (১৯৬৩) পাঁচিশ লক্ষ ছাত্রের এন সি সি ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা—এন সি সি ডিরেক্টার জেনারেল মেজর জেনারেল বীরেন্দ্র সিং-এর ঘোষণা।

॥ বাইরে ॥

৭ই ফেব্রুয়ারী—২৪শে মাঘ : আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে (মোসি, টাঙ্গানাইকা) পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের প্রতিবাদ—সম্মেলনের কর্মসূচীতে চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত না করায় প্রতিবাদস্বরূপ ভারতের সম্মেলন ত্যাগ।

অলিম্পিক ক্রীড়া হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্দোনেশিয়া সাসপেণ্ড—খেলাধুলায় রাজনীতির প্রশ্রয় দিবার

৮ই ফেব্রুয়ারী—২৫শে মাঘ : ইরাকে পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান—কর্ণেল আব্দুল করিম মোস্তফার নেতৃত্বে নূতন বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতাদখল।

আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে ভারতের পুনরায় যোগদান—নেতৃবৃন্দের দরবারের ফলে সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত বাতিল।

সিংহলকে আমেরিকার অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাহায্যদান বাতিল—তৈল কোম্পানীর (মার্কিন) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার জের

কাশ্মীর-বিরোধ মীমাংসা-চেষ্টা করাচীতে তৃতীয় দফা ভারত-পাক বৈঠক শুরু—ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা সর্দার শরণ সিং ও পাক দলের নেতা মিঃ ভুট্টো।

৯ই ফেব্রুয়ারী—২৬শে মাঘ : ইরাকের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী আবদুল করিম কাসেমকে (দুইজন স... কারী সমেত) গুলী করিয়া হত্যা... নূতন ইরাকী সরকারের প্রেসিডেন্ট কর্ণেল আরিফ।

ভারত-পাক বৈঠকে (করাচী) স... সমিট—গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ... কিংবা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ... বিভাগে ভারতের আপত্তি জ্ঞাপ... সংবাদ

১০ই ফেব্রুয়ারী—২৭শে মাঘ : তৃতীয় পর্যায়ে ভারত-পাক বৈ... (করাচী) ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম... পর্যন্ত কলিকাতায় চতুর্থ দফা বৈ... (৯ই মার্চ—১২ই মার্চ '৬৩) সিদ্ধা...

আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে (টা... নাইকা) ভারতের প্রয়াস জয়যুক্ত ও ... চক্রান্ত ব্যর্থ—কলম্বো প্রস্তাব গ্র... (ভারত ও চীন উভয় রাষ্ট্র কর্তৃক) আহ্বান অনুমোদিত।

১১ই ফেব্রুয়ারী—২৮শে মাঘ : উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান—... আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলন ... সাধারণ ঘোষণা প্রচার।

১২ই ফেব্রুয়ারী—২৯শে মাঘ : আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দল প্রতারিত—মূল প্রস্তাব পুনর্লিখিত হইয়াছে বলিয়া নাইরোবি... দেওয়ান চমনলালের (ভারতীয় দলের নেতা) অভিযোগ।

আণবিক পরীক্ষা বন্ধের ... সম্পাদন সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির আশা—জেনেভায় অস্ত্র ... সন পুনরারম্ভের মুহূর্তে বিবৃতি

১৩ই ফেব্রুয়ারী—৩০শে মাঘ : কেন্দ্রীয় কঙ্গো সরকারের বি... দক্ষিণ কসাই-এ বিদ্রোহ—শহর ও গ্রাম পরিত্যক্ত।

অভয়ঙ্কর

॥ শ্লীল ও অশ্লীল ॥

গ্রীসের রাজা ও রাণী সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন। ঠিক এই সময়েই তাঁর দেশের সাহিত্য-বিচারবুদ্ধি-প্রসঙ্গে ধন্যবাদদানের প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করি। এথেন্সের ন্যায়াধীশবৃন্দের এজলাসে একটা জবর মামলা চলছিল, সম্প্রতি তার নিষ্পত্তি হয়েছে। এইবার কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল জাঁ-পল সার্ত্রেকে, তাঁর 'LE MUR' নামক গ্রন্থটি pornography প্রকৃতির, এই অপরাধ। আমাদের দেশে পর্ণোগ্রাফির প্রতিশব্দ না থাকায় আমরা 'অশ্লীল' কথাটি ব্যবহার করে থাকি, 'ভালগারে'র বাংলাও তাই। যাই হোক, গ্রীক দেশের লেখকবৃন্দ অতিশয় জোরালো কণ্ঠে বলেন যে, সার্ত্রে-রচিত "লে ম্যুর" যদি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয় তাহলে ভেনাস ডি মেলোর মূর্তিটিও অশ্লীল, সেই নগ্নতার অশ্লীলতা নিবারণার্থে প্রয়োজন একটি আঁট-সাঁট বেদিং-স্যুট। গ্রীক লেখকরা রাগের মাথায় আর কিছু হয়ত ভাবতে পারেন নি, সমগ্র গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীগুলি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারতেন। ভেনাস ডি মেলোর নগ্নতা হয়ত দীর্ঘকালের পরিচয়ে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই কোনও বাতিকগ্রস্ত এখনও সেই মূর্তিটা ভাঙবার জন্য এগিয়ে আসেন নি। যিনি হাতটা ভেঙেছিলেন, তাঁর হয়ত ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল। আমাদের যুগ শ্লীল ও অশ্লীল বিচারে এখনও একটা নির্দিষ্ট গজকাঠি স্থির করতে পারেন নি। ১৯৫৯-এ বিলাতে যে Obscene Publications Act বিধিবদ্ধ হয়েছে তার একটি ধারায় আছে—

"A Book that may otherwise be thought obscene will escape the ban if it can be shown that it is in the interests of Science, art, literature or any other matter of general concern — in short, if it is for the public good."

এখন পাবলিক গুডের জন্য কি ভালো এবং কি মন্দ তার বিচার করার ভার যাঁর ওপর তাঁর সাহিত্যবোধ এবং বিচার-বুদ্ধির ওপর সবকিছু নির্ভর করে। অসকার ওয়াইলড বলেছিলেন—

"Art is rarely intelligible to criminal classes".

"লে-ম্যুর" গ্রন্থের লেখক জাঁ-পল সার্ত্রের নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবীতে তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। ফরাসী নাট্যকার, উপন্যাস-রচয়িতা, সাংবাদিক এবং দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রের দানে সমসাময়িক সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। অস্তিত্ববাদ সম্পর্কিত তাঁর দর্শন সম্পূর্ণরূপে পরিণত চিন্তার পরিচায়ক এবং সার্থকতা লাভ করেছে। ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়েকের্গার্দ এই চিন্তাধারার জনক। হেগেলীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই নব্য-তন্ত্রের উৎপত্তি, বিশেষতঃ এর বিমূর্তন নীতি। আচরণবাদ, লজিক এবং বিজ্ঞানের বিরোধী এই তত্ত্ব। সুতরাং সেই মনীষী যে সহসা পর্ণোগ্রাফীতে হাত পাকাবার চেষ্টা করবেন এই ধারণা মূর্খতার পরিচায়ক। সাহিত্যকে জীবনের বা প্রকৃতির শিল্পীত রূপায়ণ হিসাবে যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের সাহিত্য-কর্মে অতি স্বাভাবিক কারণেই জীবন-মৃত্যুর চিরন্তন লীলা প্রকাশিত হবে। জাঁ-পল সার্ত্রের লে ম্যুরকে অব্যাহতি দিয়ে এথেন্সের বিচারকগণ তাই শিল্প-রুচির পরিচয় দান করেছেন।

কিছুকাল আগে কালিফোর্ণিয়ার লস এঞ্জেলেসের একটি আদালত এমনই বিচারে বসেছিলেন হেনরী মিলারের বিখ্যাত উপন্যাস Tropic of Cancer আইনের চক্ষে অশ্লীল কিনা স্থির করার উদ্দেশ্যে। ১৯৩১-এ এই উপন্যাসটি ফ্রান্সে রচিত হয়। মিলারের উপন্যাসে অনেকগুলি ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে, বাহ্যতঃ মনে হবে একের সঙ্গে অপরের সংযোগ নেই, কিন্তু এই আপাতঃ অসম্পৃক্ত কাহিনী আশ্চর্য রকমের সংশ্লিষ্ট। বক্তব্যের ফুলঝুরি, এবং বাক্য-প্রয়োগের অদ্ভুত কুশলতা বিস্ময়কর, ফলে পাঠকের এতটুকু ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। বিচার হয়েছিল সেই Lady Chatterley' Lover-এর মত চার অক্ষরবিশিষ্ট আপত্তিকর শব্দের অজস্র সমাবেশের জন্য। কিন্তু এ ছাড়া এই গ্রন্থ অশ্লীলতার এবং অশ্লীল-চিন্তনের এক নির্লজ্জ নির্ঘণ্ট। সাংস্কৃতিক জগতে শ্লীল ও অশ্লীলের মধ্যে একটা সংযোগসেতু রচনা করা আজো সম্ভব

হয়নি। তার ফলে কোনো শিল্পকর্মে চূড়ান্ত রায় দেওয়া সম্ভব নয়। আদালত সঙ্কীর্ণ আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে পারেন, রায় দিতে পারেন, কি শ্লীল এবং কি অশ্লীল তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতেও পারেন। কিন্তু তার মূল্য কতটুকু।

যাঁরা হেনরী মিলারের উপন্যাসের বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন তাঁরা উপন্যাসটিকে 'Diort', 'filth', 'muck' ইত্যাদি বলেছেন আর যাঁরা স্বপক্ষে তাঁরা বলেছেন এ কাহিনী বুভুক্ষা, দুর্ভোগ ও দারিদ্র্যের কাহিনী, তথাপি 'Joyous' বা আনন্দদায়ক গ্রন্থ। আর আশ্চর্য কান্ড যে, অনেক যাজকশ্রেণীর মানুষ গ্রন্থটির স্বপক্ষে লড়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন একথা বলেছেন যে মিলার গভীরভাবে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি— "Whose tormented soul-searching in the book might be compared with Christ's retreat into the wilderness."

গ্রন্থ-বিচার সম্পর্কে এই ধরনের বিভিন্ন মন্তব্য আদালতের সিদ্ধান্তকে নিরর্থক করে তোলে, কারণ বিচারে রায় যাই হোক গ্রন্থটির সমাদর বৃদ্ধি পাবে, এবং অনেকেই গ্রন্থটি পাঠ করতে আগ্রহান্বিত হবেন। দীর্ঘকাল প্যারীতে গ্রন্থটি বিক্রী হচ্ছে, এবং এই বিচারের পূর্বে য়ুনাইটেড স্টেটস্ ফেডারেল কোর্ট য়ুনাইটেড স্টেটস্ পোস্টঅফিস এবং কাস্টমসে এই গ্রন্থ সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করেছেন। এখন লস্ এঞ্জেলসের বিচারপতিবৃন্দ গ্রন্থটি যে স্বেচ্ছাকৃত পর্নোগ্রাফিক নয়, তা স্বীকার করে, গ্রন্থটির অবাধ প্রচারে অনুমতিদান করেছেন।

প্রায় তিন যুগ আগে এই যুক্তরাষ্ট্রে জেমস জয়েস কৃত 'Ulysses' নামক উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়েছিল মলি ব্লুমের সুদীর্ঘ আত্মকথনের মধ্যে কয়েকটি আপত্তিকর কথা ছিল বলে। উপন্যাসের শেষাংশে এই অনুচ্ছেদটি আছে। সমগ্র উপন্যাসটি পাঠ না করেও এই অংশটাও পাঠ করা যায়, তরুণ পাঠকদের চিত্তে নাকি তাতে বিষময় ক্রিয়া হতে পারে, এই ছিল অভিযোগ।

বিচারকগণ পরে স্থির করেন এই গ্রন্থে অশ্লীলতা নেই। এমন কোনও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি নেই যে জেমস্ জয়েসের সুবৃহৎ 'ইউলিসিসের' পৃষ্ঠা সন্ধান করে অশ্লীল অংশবিশেষ পাঠ করবে। পরবর্তী কালে এই গ্রন্থের যে সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই অংশটুকু বাদ দেওয়া আছে।

হেনরী মিলারের Tropic of Cancer-এর কিন্তু এমন সহজে শুদ্ধিকরণ সম্ভব নয়। এর সারা অঙ্গে ব্যারাক-রুমে ব্যবহৃত কথার ছড়াছড়ি আছে, মূল উপন্যাস থেকে তা বাদ দেওয়া যায় না। এই উপন্যাসের বিরোধীরা বলেন, এর ফলে তরুণ চিত্তে বিষময় প্রতিক্রিয়া ঘটবে।

আমাদের মনে হয় উন্নত চিত্ত ও অনুন্নত চিত্ত মানুষদের জন্য 'A' ফিল্ম ও 'U' ফিল্মের মত A এবং U চিহ্নিত গল্প-উপন্যাস চালু করলে হয়ত সুকুমারমতিদের চিত্ত-চাঞ্চল্য রোধ করা সম্ভব। মিলার স্বয়ং অবশ্য বলেছেন যে, যাঁদের মতামত আমার কাছে মূল্যবান তাঁরা এই গ্রন্থ পড়েছেন। লেখকের পক্ষে এই কথাই সবচেয়ে বড়ো কথা।'

এথেন্সের আদালত সার্ত্রেকে ও লস এঞ্জেলসের আদালত হেনরী মিলারকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এখন কিন্তু অনেকেই সার্ত্রের 'লে-মুর' গ্রন্থটি পাঠে আগ্রহান্বিত হবেন। এখনকার কালে রীতি হয়েছে যা খুশী ছেপে যাও, কারণ তার ফলে পাঠকের ভালো ও মন্দ সূক্ষ্ম বিচারের অত সময় হবে না। শ্লীল কি অশ্লীল অপরের মুখে শুনে বোঝা যাবে। হেনরী মিলার ত' সাম্প্রতিক কালে বিচারালয় থেকে ত্রাণ পাওয়ার পর প্রায় দেবত্বে উন্নীত হয়েছেন। আজ জেমস জয়েসের অবস্থা ভাতি করুণ, অথচ ত্রিশের দশকে নিষিদ্ধ 'ইউলিসিসে'র সন্ধানে ছেলে-বুড়ো ঘুরে বেড়াত। হেনরী মিলার, সার্ত্রে প্রভৃতি আবার একদিন এমনই হয়ত ম্লান হবেন, তাঁদের লেখা লোকে শ্লীল বলে বিবেচনা করবে।

মাইকেল আর্টজিবাসেভের 'স্যানিন', র‍্যাডক্লিফ হলের 'দি ওয়েল অব লোনলিনেস' প্রভৃতি বিখ্যাত ও কুখ্যাত উপন্যাসের কথা ক'জন পাঠকের স্মরণে আছে?

কুসংস্কার ও গোঁড়ামি ত্যাগ করে যা শিল্পকর্ম তাকে গ্রহণ করাটাই চিত্ত ও চরিত্রের ঔদার্যের লক্ষণ, আর অশ্লীল বলে পাড়া মাৎ করার পিছনে অনেক সময় আবার অন্য ব্যাধি প্রচ্ছন্ন থাকে, সে কথাও চিন্তা করা কর্তব্য।

নতুন বই

টুনু— শিউলি গুপ্ত : আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—২·৫০।

শিউলি গুপ্তের 'টুনু' বইখানি শিশু-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আজকাল শিশু-সাহিত্য তার পূর্বেকার ছককাটা গণ্ডী থেকে একটা স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্রে বেরোবার উপক্রম করেছে। পূর্বেকার সাহিত্য-শিশুরা অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ, উদ্ভট-মানসিকতা প্রধান রূপে দেখা দিয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথের শিশু ও শিশু ভোলানাথ; সময় সময় সাংসারিক জ্ঞানের আতিশয্য তাদের অকালপক্ক করে তুলেছে এমন সংশয়ও করা যেতে পারে। কিন্তু অতি-আধুনিক যুগের শিশুরা, জীবনের চারিদিকে যে কল্পনাসঙ্কোচের পালা চলেছে তার দ্বারা কম-বেশী প্রভাবিত। বিজ্ঞান যুগের হাওয়া শিশুচেতনায় প্রবেশ করে তাকে কতটুকু বাস্তবধর্মী করে তুলেছে—রূপকথার রাক্ষস-খোক্কস তার স্মৃতির সীমান্তলগ্ন থাকলেও তার মনে বিশেষ ছায়াপাত করে না। আধুনিক জীবনের চিন্তাশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা শিশু-মনের অবাধ কল্পনা-বিহারণে অনেকটা সঙ্কুচিত করে তাকে কতকটা বস্তুছন্দে বেঁধেছে।

শিউলি গুপ্তের 'টুনু' এই বাস্তব জীবনে পোষমানা মানবিকা। সে পুতুল খেলে, ঘটা করে পুতুলের বিয়েও দেয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের চাপে তার নেশা নিবিড়তা হারিয়েছে। আজকাল আর কল্পলোকবিহারিণী পিতামহীরা নেই—এখন মা-বাপ ভাই-এর বাস্তব চেতনা ও কর্মধারাবদ্ধ জীবনবোধ টুনুর স্বপ্ন-রাজ্য-বিচরণকে সংক্ষিপ্ত করেছে। পুতুলের স্থান স্কুলের প্রাইজ অধিকার করেছে। স্কুলে সহপাঠিনীদের সঙ্গসুখ ও রুটিন-বাঁধা নিয়ম তার নির্জন স্বপ্ন-চারিতাকে কুণ্ঠিত করেছে। চিড়িয়াখানার সত্যিকার জীবজন্তু তার কৌতূহলকে অপ্রাকৃত থেকে প্রকৃতি-রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছে। বনভোজনে রসনার আস্বাদন-স্পৃহা ও ছুটির মুক্তিবোধ তার চিন্তাকল্পনাকে অবাস্তবতার ধোঁয়া থেকে উদ্ধার করেছে। আজকাল স্কুলজীবনের কৃত্রিম তাপঘরে তার মানসবৃত্তিগুলো বড় শীঘ্রই পেকে যাচ্ছে। কাজেই অপুর মত শিশু এ-যুগে বিরল ব্যতিক্রম রূপেই প্রতিভাত হচ্ছে। শৈশবকালটাই যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে অতিদ্রুত কৈশোরে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

বইখানিতে টুনুর শৈশব থেকে কৈশোরের ছবিই বেশী স্থান অধিকার করেছে। এই অপেক্ষাকৃত পরিণত মনের উপর জীবন-অভিজ্ঞতা গাঢ়তর রং-এ মুদ্রিত হচ্ছে। ভ্রমণে তার জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে—তেপান্তরের মাঠ বোম্বাই শহরের হৃদয় বিদীর্ণ করে অগ্রসর হয়েছে। রাজপুত্রের পরিবর্তে এক খেয়ালী ভদ্রলোকের অদ্ভুত আচরণ করুণ রসের সঞ্চার করেছে। আজকের খেলার সাথীর সঙ্গে বিদায়-বিচ্ছেদ গভীরতার বিষণ্ণতার উদ্বোধন ঘটিয়েছে। বাস্তবের চাপে মর্মগ্রন্থিগুলো নিবিড় বেদনায় টন টন করে উঠেছে। এক বন্ধুর অকালমৃত্যু টুনুর কিশোর স্বপ্নরঞ্জিত চোখে মরণের করুণাশ্রুবিন্দু ঝরিয়েছে। আজকাল যদি কোন ভূত দেখা যায় সে নিতান্ত মেকী ভূত; ফাঁকি ধরা পড়লেই ভৌতিক ভীতি অবিশ্বাসের উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। তার মনে তৃপ্তি আসে প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষ্যে তোলা ফটোতে ও পরীক্ষা পাশের সন্দেশের উপহারে। এই পরিবেশের মধ্যেই ক্ষুদ্র মানবক-মানবিকা

বয়স্কদের জগতে প্রবেশলাভ করে সেখানে তাদের স্থির আসন গ্রহণ করে।

শিউলি গুপ্তের বইখানি এই শৈশব রূপান্তরের একটি চমৎকার রূপায়ণ। টুনুর জীবনের পরিবর্তন ছন্দটি এখানে আশ্চর্য সঙ্গতি ও সংযমের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে। আধুনিক যুগের শিশুমনের ইতিহাস আজকাল আয়তনে ক্ষুদ্র ও বৈচিত্র্যে বর্ণরিক্ত। এই ধূসর ইতিহাসের পাতাগুলিতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। শিউলি গুপ্তের বইটি শিশু-চিত্তের মনোবিজ্ঞানসম্মত রূপায়ণে ভবিষ্যৎ শিশু-সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করেছে—এই তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলে থেকে বিবেকানন্দ— (নাটক)

মূল্য ২-২৫।

অঙ্কুরে বিবেকানন্দ—(নাটক)

মূল্য ১-২৫।

রচনা : কালীপদ চক্রবর্তী, বাক্ সাহিত্য—৩৩, কলেজ রো, কলি-৯; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি-৯; গ্রন্থালয়, ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-১।

কালীপদ চক্রবর্তী রচিত 'বিলে থেকে বিবেকানন্দ' – মহাপুরুষ কিংবা বিখ্যাত মনীষীদের জীবন-কাহিনী নিয়ে যত নাটক রচিত হয়েছে এ নাটকটি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, এমন কি যে কোন সামাজিক নাটকের সঙ্গে তুলনা করতে গেলেও এ নাটকটিকে উচ্চাসনে স্থান দিতে হয়। সাধারণতঃ আমরা মনীষীদের জীবন-কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক অভিনয় করতে ভীত হই; কিন্তু আলোচ্য নাটকটি এত সহজভাবে লিখিত যে, যে কোন অপেশাদার নাট্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে অভিনয় করা অত্যন্ত সহজ। নানা সমস্যার চাপে আমাদের জীবন থেকে তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, ব্যক্তিত্ব, পরোপকারিতা, ত্যাগ, স্নেহমায়া প্রভৃতি লোপ পেতে বসেছে। এগুলিকে আবার জাগিয়ে তোলা আমাদের প্রধান কর্তব্য। বিবেকানন্দের জীবনের অংশ নিয়ে রচিত একটি মাত্র স্ত্রী-ভূমিকাযুক্ত এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি ভারতের পল্লীতে পল্লীতে অভিনীত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অপেশাদার নাট্য সম্প্রদায় ও অফিস-নাট্য সংস্থার যুবকদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।

কালীপদ চক্রবর্তী রচিত আর একটি উচ্চস্তরের নাটক 'অঙ্কুরে বিবেকানন্দ'। বিবেকানন্দের বাল্যজীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। স্কুলের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য এতে স্ত্রী-ভূমিকা বর্জন করা হয়েছে। এ নাটক স্কুলে-স্কুলে, পল্লীতে-পল্লীতে অভিনয় করান শিক্ষকদের কর্তব্য। বিবেকানন্দের বাল্যের তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, বন্ধু-প্রীতি—এগুলি কিশোর মনে উপলব্ধি করাবার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নাই।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

এই দশক (তরুণ লেখক সংস্থার মুখপত্র) : সম্পাদক—রমানাথ রায়। ৭১, পটুয়াটোলা লেন থেকে প্রকাশিত। দাম প্রতি সংখ্যা দশ নয়া পয়সা।

"আমরা আধুনিক। স্বভাবতই অনাধুনিকদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান নিশ্চিত ও বিপুল। ঐতিহ্য আমরা স্বীকার করি; কিন্তু ঐতিহ্য-অনুসৃতির নামে কোন গতপ্রাণ রীতিচর্চাকে আঁকড়ে থাকতে আমরা রাজি নই"—তরুণ লেখক সংস্থার মুখপত্র 'এই দশক'-এর প্রথম সংখ্যায় ঘোষিত এই প্রস্তাবের মধ্য থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ পরিচয় সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট। তাছাড়া এ পর্যন্ত প্রকাশিত ছয়টি সংকলনে অত্যন্ত সুস্থতা এবং চিন্তাশীলতার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের শিল্পসত্তাকে সকলের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। "আমরা এক ভয়ংকর দুঃসময়ের মুখোমুখি। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রচলিত নীতিবোধ, ধ্যান-ধারণার কতই তফাৎ! পায়ের তলে দাঁড়াবার মাটি নেই। লক্ষ্য নেই জীবনের। নেই বলেই অসংলক্ষ্য অসংযমী। লক্ষ্যহীন বলেই অস্থির।" এমন অকপটে নিজেদের জীবনের প্রতিটি সত্য পরিচয় প্রকাশ করা শক্তি ও সদিচ্ছারই পরিচায়ক।

এই দশকের লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে 'অমৃতে'র পাঠকবর্গ অপরিচিত নন। আমরা তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের লেখক-জীবনের উন্নত ও মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ কামনা করি।

শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী নাটকের ভক্তের সংখ্যা সামান্য নয়। তার ওপর ইংরেজী নাটক বলতে বাঙালী প্রথমে বুঝত একমাত্র শেক্সপীয়রকে; এখন কিছু দিন হ'ল বুঝতে শুরু করছে ওঁর সঙ্গে বার্ণার্ড শ'কে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ-র ইংরেজী নাটকের পাঠ্যতালিকার দিকে নজর দিলে ঐ একই কথা বলতে হয়। কয়েক বছর যাবৎ আবার স্নাতক-শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্যের মধ্যে রয়েছে শ'-এর "আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান"। কাজেই ইংরেজী শিক্ষিত কলকাতা-বাসীর যেমনই কানে এল যে, ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ইংলন্ডের বিখ্যাত আঞ্চলিক স্থায়ী নাটকে দল (প্রভিন্সিয়াস রেপার্টারি কোম্পানী) "দি ব্রিস্টল ওল্ড ভিক" স্থানীয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে ২রা থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অভিনয়ের আসর বসাবেন, অমনই টিকিট-বিক্রির প্রথম দিন ৭ই জানুয়ারী সকাল ৯টা থেকে ইংরেজী নাট্যরসিকরা 'কিউ' দিতে শুরু করেছিলেন টিকিটঘরের সামনে। বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, ব্রিস্টল ওল্ড ভিক কোম্পানী দুটি ম্যাটিনী সমেত যে ১২টি অভিনয়-আসর বসাবেন, তাতে তাঁরা শেক্সপীয়রের "হ্যামলেট" অভিনয় করবেন ৪ বার (১টি ম্যাটিনী), বার্ণার্ড শ'-এর "আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান" অভিনয় করবেন ৫ বার (১টি ম্যাটিনী) এবং বাঙালী নাট্যরসিকদের কাছে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত, নবীন নাট্যকার রবার্ট বোল্ট প্রণীত "এ ম্যান ফর অল সিজনস" ৩ বার। স্বাভাবিকভাবেই "হ্যামলেট" এবং "আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান"-এর টিকিট আগে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত নাট্যাভিনয়ের আসর তিনটির আসনগুলিও অভিনয়-দিনের আগেই পূর্ণ হয়ে যায়। যাঁরা টিকিট সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সেই ভাগ্যবানেদের চেয়ে টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে-যাওয়া লোকের সংখ্যা ঢের বেশী। টিকিটকে নিরাপদ জায়গায় রেখে ইংরেজী নাট্যরসিকরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কবে সেই বাঞ্ছিত দিনগুলি আসবে চক্ষুকর্ণের চিরদিনের বিবাদভঞ্জন করবার জন্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে-কটি সাধারণ নাট্যশালা বোমাধর্ষিত হয়ে টিঁকে আছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম হ'ল ব্রিস্টলের "থিয়েটার রয়্যাল"। ১৭৬৬ সালের ৩০-এ মে তারিখে এই নাট্যশালাটির উদ্বোধন হয়। ডেভিড গ্যারিকের স্মৃতিপূত এই প্রাচীন নাট্যশালাটির বর্তমান অধিকারী হচ্ছে "ব্রিস্টল ওল্ড ভিক কোম্পানী"। নামে "ওল্ড ভিক" হ'লেও নাট্যসম্প্রদায়টি কিন্তু আদৌ পুরাতন নয়। এর জন্ম হয়েছে যুদ্ধোত্তর ১৯৪৬ সালে। গ্রেট ব্রিটেনের আর্ট কাউন্সিল "থিয়েটার রয়্যাল"এর তত্ত্বাবধান করবার জন্যে এবং সেখানে নিয়মিত অভিনয় করবার জন্যে "ওল্ড ভিক ট্রাস্ট"কে একটি স্থায়ী নাট্যসম্প্রদায় গঠনের জন্যে অনুরোধ করলে লন্ডন ওল্ড ভিক থিয়েটারের আদর্শে ও অনুকরণে এই নাট্যসম্প্রদায়টি জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু মাত্র ষোল বছরের মধ্যেই অভিনয় ও নাট্যপ্রযোজনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ব্রিস্টল ওল্ড ভিক কোম্পানী একটি প্রথম শ্রেণীর নাট্যসংস্থা রূপে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এ'রা প্রায়ই লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ড-এ এদের অভিনয় আসর

বসিয়ে থাকেন। ১৯৫৪ সালে এই সংস্থা "স্যালাড ডেজ" নামে যে সঙ্গীতসমৃদ্ধ কমেডি মঞ্চস্থ করে, তা জনপ্রিয়তার দরুণ ওয়েস্ট এণ্ড-এ পাঁচ বছর ধ'রে অভিনীত হয়। মাত্র গেল বছরে এঁরা বহু অর্থ ব্যয়ে বিরাট আড়ম্বরপূর্ণভাবে টলস্টয়ের "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস"-এর নাট্যরূপটিকে ওয়েস্ট এণ্ড-এ মঞ্চস্থ করেছিলেন।

ভারত-সফরে ব্রিস্টল ওল্ড ভিক দলকে কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজে অভিনয়-আসর বসাতে হচ্ছে। সাত-সমুদ্দুর তের-নদী পেরিয়ে আসার দরুণ রীতিমত দৃশ্যপট নিয়ে পূর্ণ আঙ্গিকে কোন নাটকই মঞ্চস্থ করা এঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি এবং হবে না। দর্শকের কল্পনা-শক্তির ওপর নির্ভর ক'রে অনেকটা ইঙ্গিতধর্মী হাল্কা দৃশ্যসজ্জার সাহায্যেই এঁরা এঁদের নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করেছেন। মঞ্চের পিছনের অর্ধাংশে নির্মিত একটি সোপানশ্রেণীর সাহায্যে বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ চরিত্রের উত্তরণ-অবতরণের মাধ্যমে "হ্যামলেট" এবং "এ ম্যান ফর অল সিজনস"-এর নাটকীয় গতিকে ছন্দোবদ্ধ করবার একটি নবতর রীতি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাওয়া গেছে এঁদের মঞ্চস্থাপনায়। প্রসঙ্গক্রমে বিখ্যাত পরিচালক আর্নস্ট লুবিজ-এর চিত্রগুলিতে অনেকটা এই একই উদ্দেশ্যে সিঁড়ির ব্যবহারের কথা মনে পড়ে। 'আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান'"-এ একটি সম্পূর্ণ ঘর না দেখিয়ে নাটকের প্রয়োজন মেটাতে মাত্র অল্প দেওয়ালের অংশ-সমেত জানলা এবং দরজা দেখানোর মধ্যেও একটি রুচিসম্মত দৃশ্যসজ্জা সংক্ষেপের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। কে, এ, থিয়েটার সোসাইটির মিঃ ফজল রহিমের তত্ত্বাবধানে মিঃ মহম্মদ আসরফ এই সংক্ষিপ্ত দৃশ্যসজ্জা নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু দৃশ্যসজ্জার এই সংক্ষিপ্ত রূপ নাট্যাভিনয়ের পরিপূর্ণ রস-গ্রহণে অবিসংবাদীভাবে বাধার সৃষ্টি করেছিল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যেভাবে নাটককে মঞ্চস্থ করা হ'ত, ঠিক সেইভাবেই নাটকগুলিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। অবশ্য সংস্থাটির শিল্প-সম্মত পরিচালনার ভার যাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে, সেই ডেনিস কেরী পরে আমাদের জানিয়েছেন যে, "দি ম্যান ফর অল সিজনস"-এর নাট্যকার তাঁর নাটকখানির মানবিক আবেদনকে মূর্ত ক'রে তোলবার জন্যে দৃশ্যপটবর্জিতভাবেই নাটকখানির অভিনয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং লণ্ডন বা আমেরিকাতেও এই নিউ এম্পায়ারে যেভাবে অভিনীত হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই নাটকখানি অভিনীত হয়ে থাকে।

"হ্যামলেট"-এর প্রয়োজনায় মূল নাটকের কিছু কিছু অংশ বাদ পড়েছে এবং কোথাও কোথাও কিছুটা ওলট-পালটও হয়েছে। কিন্তু নাট্যকারের বক্তব্য কোথাও চাপা পড়েনি। অবশ্য দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণে হ্যামলেটের অকৃতকার্যতা যে বিরাট ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করেছিল, তাকে পরিপূর্ণভাবে উত্তাল ক'রে মেলোড্রামার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে না দিয়ে কিছুটা স্তিমিত ও স্বাভাবিকভাবে দেখাবার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। ডেনমার্কের যুবরাজের চরিত্রে ব্যারী ওয়ারেন চরিত্রগত আন্তরিক বিক্ষোভকে কোন কোন ক্ষেত্রে মেলোড্রামাটিকভাবে প্রকাশ করলেও মোটের ওপর একটি সংযত স্বাভাবিক রূপকেই মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। শেক্সপীরিয়ান অ্যাক্টিং-এর একটি অভিনব ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল তাঁর অভিনয়ে। একটি বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক সারা ব্যাডেলা-এর ওফেলিয়ার প্রশংসা করতে পারেন নি। আমরা কিন্তু উন্মত্ত ওফেলিয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও চাউনির সঙ্গে কথার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর গান গেয়ে ওঠার দৃশ্য অবিস্মরণীয় নাট্যনিপুণতার পরিচায়ক। বিখ্যাত মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা অ্যালান ব্যাডেল-এর কন্যা নিঃসন্দেহে একটি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। দুষ্ট খুল্লতাত ক্লডিয়াস-এর ভূমিকায় লণ্ডন ওল্ড ভিক-এর খ্যাতিমান অভিনেতা অলিভার নেভিল স্পষ্ট বাচনের মাধ্যমে চরিত্রটিকে জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন।

কিন্তু নেভিল তাঁর সার্থকতর নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন "এ ম্যান ফর অল সিজনস"-এর মুখ্য ভূমিকা সার টমাস মোর-এর চরিত্রে। মানুষ যে তার বিবেক-পরিচালিত হয়ে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার জন্যে হাসিমুখে প্রাণ

রবার্ট বোল্ট

পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে, এই চিরন্তন সত্যটি একটি অসামান্য নাটকের সৃষ্টি করেছে "এ ম্যান ফর অল সিজনস"-এ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজা অষ্টম হেনরীর প্রথমা স্ত্রী ক্যাথারিণকে ত্যাগ ক'রে পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে না পারার জন্যে মিথ্যা অভিযোগে মোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেই ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে একদা শিক্ষক রবার্ট বোল্ট এমন একটি দেশকালোত্তীর্ণ নাটক রচনা করেছেন, যা তাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকারের সম্মানে ভূষিত করেছে। এই মানবিক আবেদনপূর্ণ নাটকে অলিভার নেভিলের আশ্চর্য সার্থক অভিনয়ের সঙ্গে আরও যাঁরা দর্শক-দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ক্রিস্টোফার বার্গেস (কমনম্যান), ব্যারী ওয়ারেন (রিচার্ড রিক), জন মরিস (অ্যামব্যাসাডার) এবং জন রিংহাম (টমাস ক্রমওয়েল)।

"হ্যামলেট" এবং "এ ম্যান ফর অল সিজনস" যেমন দুটিই ট্রাজিডি, তেমনই বার্ণার্ড শ'য়ের "আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান" হচ্ছে পুরোপুরি কমেডি। যুদ্ধকে নিন্দা ক'রে এবং সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বকে অবিষ্কার ক'রে শ' যে হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে পাঠক ও দর্শককে মানবতাবোধ শিক্ষা দিয়েছেন, ব্রিস্টল ওল্ড ভিকের অভিনয় তাকে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করেছে। সেবাস্টিয়ান ব্রেকস্ সার্গিয়াস-এর কঠিন ভূমিকাটিকে স্বচ্ছন্দভাবে রূপায়িত করেছেন তাঁর অসামান্য বাচনভঙ্গী দ্বারা। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লুন্টস্‌লি রূপে জন রিংহ্যম নাট্যকারের সৃষ্টিকে সার্থক ক'রে দর্শক-সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। হিউম্যানিং-এর পেটকফ, প্যাট হেউড-এর লোকা এবং লিওনার্ড ফেন্টন-এর নিকোলা পরম উপভোগ্য।

সারা ব্যাডেল অবতীর্ণা হয়েছিলেন রাইনার ভূমিকায়। তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ অভিনয় ক'রে রাইনার অন্তরের আদর্শ পরিবর্তনকে দর্শকদের সামনে রূপায়িত করেছেন অবলীলাক্রমে। সময়ে সময়ে অভিনয়কে কিছুটা আতিশয্যপূর্ণ মনে হ'লেও পরমুহূর্তেই স্মরণ করতে হয়েছে, আমরা বার্ণার্ড শ'-এর কমেডি দেখছি এবং এতে আতিশয্যের স্থান অবধারিতভাবেই আছে।

ওল্ড ভিক দলে শিল্পী আছেন অন্ততঃ জনকুড়ি। তাঁরা সকলেই কিছু জাঁদরেল অভিনয়দক্ষ নন। এবং আশ্চর্য অভিনয়-ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাধর অভিনেতা বা অভিনেত্রী এ দলে একজনও নেই। তবু এই সংস্থাটির সমষ্টিগত অভিনয়ের বা টীম-ওয়ার্কের প্রশংসাই করতে হয়। এবং ব্যারী ওয়ারেন, অলিভার নেভিল ও সারা ব্যাডেল স্মরণীয় অভিনয় করবার ক্ষমতা রাখেন। দলের শিল্পসম্মত নাট্য-পরিচালক ডেনিস কেরী ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত অন্ততঃ চল্লিশখানি নাটকের সার্থক পরিচালকরূপে যশোলাভ করেছেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র মাত্র ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ নয়; তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বেলজিয়ম এবং হল্যাণ্ডেও বহু নাট্য-প্রযোজনা করেছেন।

ডেনিস কেরী

ব্রিস্টল ওল্ড ভিক নাট্য-সংস্থায় অভিনয়-ব্যবস্থা করবার জন্যে ব্রিটিশ কাউন্সিল কলকাতার ইংরাজী নাট্যামোদীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অলিভার নেভীল　　সারা ব্যাডেল　　ব্যারী ওয়ারেন

নান্দীকর

আজকের কথা

নাট্যযশঃপ্রার্থীদের প্রতি

ইংরেজীতে একটি বহুব্যবহৃত াদ আছে, যার বাঙলা অনুবাদ হচ্ছে, বনুতেরা যেখানে পা বাড়াতে ভয় পায়, খেরা সেখানে ভিড় করে ঢোকে। অপ-পর দেশ সম্পর্কে কথাটা উচ্চারণ করব কিন্তু আমাদের এই বাঙলা দেশে ক এই অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি নাটক নার ক্ষেত্রে। এক বা দু দিস্তে কাগজ, কটি দু আউন্স কালীর দোয়াত এবং কটি ঝর্ণা কলম থাকলেই যে-কোনো াক, বাঙলা ভাষা কিছুটা লিখতে ড়তে জানলেই, আজকাল কবি, গল্প উপন্যাসলেখক কিংবা নাট্যকার বনে চ্ছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা বার কারুরই অধিকার নেই; কাজেই গজ-কালী-কলম এবং শ্রম ও সময় য় করে যাঁরা নিজেদের খেয়াল রতার্থ করবার জন্যে নাটক-নভেল-গল্প কবিতা লেখেন, তাঁদের সম্বন্ধে বা কি বলবার থাকতে পারে? কিন্তু শক্তি ওঠে তখনি, যখন ঐসব রচনা াপনার আমার গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ন, দৈনিক কাগজের রবিবাসরীয় ভাগ খুলে একটি ছোটগল্প পড়তে ইলেন, কিংবা কোনো মাসিক বা পত্রিকে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসটির সিক কিস্তিগুলি বা দুপাঁচটা গদ্য বিতা পড়বার বাসনা চরিতার্থ করবার ষ্টা করলেন; এ ব্যাপারে আপনার মার অভিজ্ঞতা কি বলে? মনে হয় কি অধিকাংশই অখাদ্য? পড়ার রিশ্রমটাই শুধু বাজে গেল না, সঙ্গে গে মনটা অনর্থক বিরক্তিতে ভরে ঠল! কিন্তু ভাবুন তো, একটি সাধারণ গালয় ভাড়া নিয়ে আপনার-আমার ল্লীর বা কর্মস্থলের কোনো সাংস্কৃতিক তিষ্ঠান বা নাট্যকে দল খুব ঘটা করে গালয়ের প্রধান প্রবেশপথে সাদা, পোলী বা সোনালীতে নাম লেখা শালু ঙিয়ে এবং মঞ্চের দু পাশে চাঁদমালা গাঁদর বাহার দিয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কের সামনে একটি নবলিখিত নাটক ভিনয় করলেন পুরো তিন ঘন্টা ধরে বং অভিনয়শেষে নিজের মোটরযোগে বাড়ী ফেরবার সময়ে অপনার পার্শ্ব-বর্তিনী গৃহিণী সখেদে বললেন, দূর! দূর! একেবারে যাচ্ছেতাই! মাথা নেই, মুন্ডু নেই! এতক্ষণ ধরে বসে দেখলুম কি? এর চেয়ে বাড়ীতে খেয়ে দেয়ে দুদন্ড জিরোলে কাজ দেখত।। তখন আপনার মনের অবস্থাটা কি হয়? মনে হয় না কি, ঐ মনের অবস্থায় নাট্যযশ-প্রার্থী লোকটিকে সামনে পেলে নিতেন তার ওপর বেশ দু হাত বা দিতেন তাকে খুব কষে দু কথা শুনিয়ে? বলতে ইচ্ছে করে না কি, নিজের অবসর সময় কাটাবার জন্যে আরও বেশী কোনো অসৎ কাজ না করে ছাই-পাশ যা খুশি তাই লিখেছিলে, তাতে ক্ষতি নেই; কিন্তু তোমার (নাট্যকার) চেয়েও কতকগুলো গোলা লোককে ক্ষেপিয়ে বহু সময়, অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে ঐ ছাইপাঁশকে এক-বাড়ী লোকের সামনে অভিনয় করে লোক হাসানো কেন?

বাঙালী নাটক তো আর এই নতুন দেখছে না। কলকাতার সাধারণ রঙ্গা-লয়ের বয়েসও নব্বই পেরিয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের নাটকের কথা না হয় বাদই দিলুম, কিন্তু গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, দ্বিজেন্দ্র-লাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, অপরেশ-চন্দ্র, শচীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র, মন্মথ রায় প্রভৃতির নাটকগুলো তো ছাপার হরফে দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলোও কি আজকের নাট্যযশঃপ্রার্থীরা ভালো করে পড়ে দেখবার সময়ও সুযোগ পান না? এ'রা সামাজিক বা গার্হস্থ্য নাটকও তো কম লেখেন নি। সেগুলোকে মন দিয় ধীরভাবে পড়লে নাটক কি ভাবে আরম্ভ করা উচিত, একটি দৃশ্য বা অঙ্ক কি ভাবে শেষ করা উচিত, নাট্যবর্ণিত কাহিনীর প্রতি দর্শক-কৌতূহলকে কিভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হয়, চরিত্রসৃষ্টি কাকে বলে, নাটককে উপভোগ্য করবার জন্যে বিভিন্ন রসের অবতারণা কিভাবে করতে হয়, নাটককে বক্তৃতামঞ্চ না করে তুলেও সামাজিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রিক দুর্নীতির প্রতি কিভাবে কশাঘাত করতে হয়, এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা মোটামুটি ধারণা জাগা সম্ভব বলে মনে হয় না কি? এ ছাড়া সংস্কৃত, বাঙলা এবং ইংরাজিতে নাট্যরচনা পদ্ধতির ওপর প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বইয়ের অভাব নেই। সেগুলিকেও সাধ্যমত পড়ে নেওয়া যেতে পারে। এর পর যদি শক্তি থাকে, তাহলে নাটক লিখে সেই নাটকখানিকে পান্ডু-লিপি অবস্থাতেই দুপাঁচজন জ্ঞানী-গুণীকে পড়ে শোনাতে দোষ কি? এবং তাঁরা যে মতামত দেবেন, সেগুলি নিয়ে স্থিরমস্তিষ্কে আলোচনা করতেই বা বাধা কোথায়? অবশ্য মাত্র নাটক বা নাট্য-শাস্ত্র সম্পর্কিত বই পড়লেই কত বোর শেষ হবে না। মনে রাখা উচিত, এ জগতে কোনো বিদ্যাই আপনা হতে শেখা যায় না। প্রতিটি বিদ্যাই, গুরুমুখী। রবীন্দ্রনাথকেও কবি বিহারীলাল চক্র-বর্তীর কাছে শিষ্যত্ব করতে হয়েছিল। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও প্রথম প্রথম গুরুর প্রয়োজন আছে। এবং নাটক রচনার পর শোনাবার জন্যে এমন কয়েকজন গুণীকে আহ্বান করা প্রয়ো-জন, যাঁরা শিল্পিতা বজায় রাখবার জন্যে
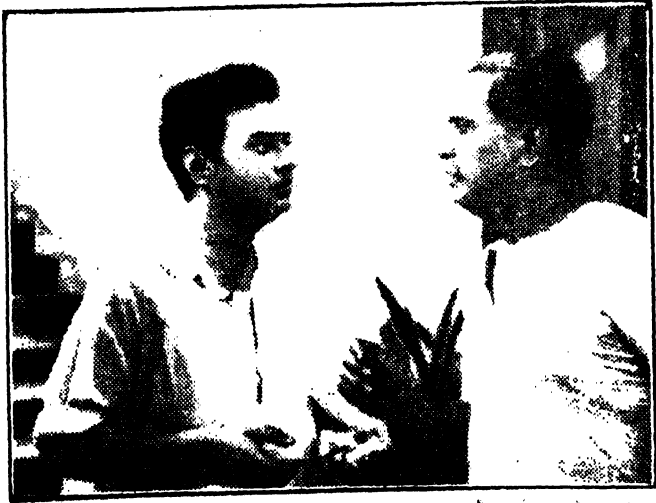
শিল্প-ভারতীর 'বর্ণচোরা' চিত্রে পিতাপুত্র রূপে জহর গাঙ্গুলী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

'বাঃ, বেশ হয়েছে' না বলে যথাযোগ্য দোষত্রুটি দেখাবার সৎসাহস রাখেন। অবশ্য উচিত সমালোচনা সহ্য করবার মত মনোবৃত্তি সকলের থাকে না এবং যাঁদের থাকে না, তাঁদের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন কোনোদিন নাটক লেখবার চেষ্টা না করেন। শুনেছি, 'মরা', 'মরা' করতে করতেই একদিন বাল্মিকী 'রাম' নাম করতে শুরু করেছিলেন; আজকালকার তথাকথিত নাট্যকারেরা সেই দুরূহ পথেই সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করছেন কিনা, তা জানি না। কিন্তু এইটা জানি, প্রতি হপ্তাতেই একটি-দুটি-তিনটি করে নাটক নামধারী বস্তু গলাধঃকরণের ফলে কোনো নতুন লেখা নাটকের অভিনয় দেখবার আমন্ত্রণ পেলে আমার গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু তবুও আমি নাটক ও তার অভিনয় দেখি। কারণ এইটাই আমার পেশা, এবং পেশার চেয়েও বড়—আমার নেশা।

চিত্র সমালোচনা

স্বর্ণচোরা (বাঙলা) ঃ শিল্পভারতীর নিবেদন; ৩৪১৭ মিটার দীর্ঘ ও ১২ রীলে সম্পূর্ণ: প্রযোজনা ঃ গৌর দে; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়; কাহিনী ঃ বনফুল; সঙ্গীত পরিচালনা ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; গীত-রচনা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার; চিত্রগ্রহণ ঃ বিজয় ঘোষ; শব্দানুলেখন ঃ নৃপেন পাল ও শ্যামসুন্দর ঘোষ; অবনী চট্টোপাধ্যায় (বহির্দৃশ্য); সম্পাদনা ঃ

'আসলী নকলী' চিত্রের একটি দৃশ্য

সুবোধ রায় ও নিমাই রায়; শিল্প-নির্দেশনা ঃ প্রসাদ মিত্র; রূপায়ণে ঃ অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সন্ধ্যা রায়, রেণুকা রায়, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী, সুরুচি সেনগুপ্তা প্রভৃতি। সিনে ফিল্মস (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

বনফুল রচিত রসোজ্জ্বল নাটিকা 'কাঁণি' বিভিন্ন নাট্যসংস্থা দ্বারা একাধিকবার মঞ্চস্থ হতে দেখেছি এ অভিনয়ের তারতম্য অনুসারে কমবে উপভোগও করেছি। বর্তমান 'বর্ণচোর ছবিটি সেই 'কণ্ঠি'রই চিত্ররূপ।

বয়সে প্রবীণ হলেও মনের দিক দি বনফুল চিরনবীন; মন তাঁর উদা ধর্ম বা সমাজের গোঁড়ামি তাঁর ম নেই। তাই কণ্ঠি ওরফে সুলতা চট্ট পাধ্যায়ের সঙ্গে ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত শুভ পরিণয় ঘটিয়ে তিনি প্রাচীনপন্থ পুরন্দরের মুখ দিয়ে সোল্লাসে বলা পেরেছেন—'বাই জাভ, আই অ্যাম গ্ল্যাড আজ যুগসন্ধিক্ষণে প্রাচীন রক্ষণশী শক্তির সঙ্গে পরিবর্তনকামী নবীন শক্তি যে দ্বন্দ্ব চলছে, তাতে প্রাচীনেরই পরাজ অনিবার্য, 'কণ্ঠি' নাটকের এই হচ্ছে প্রতি পাদ্য বিষয়। নায়িকার নাম কা দেওয়ার মধ্যেও কিছু তাৎপর্য নিহি আছে। সুলতা আধুনিক, শিক্ষি সংস্কারমুক্তা; কণ্ঠির মতই ঋজু উদ্ধত। প্রাচীন বংশদন্ড নত হ পারে, কিন্তু কণ্ঠি 'ভাঙে তো মচক না'। 'কণ্ঠি' নামের মধ্যে দিয়ে নাট্যক সেই ইঙ্গিতই করতে চেয়েছেন।

'বর্ণচোরা' ছবিটি 'কণ্ঠি' নাটিকারই চিত্ররূপ বটে, কিন্তু মূল নাটকের সুরটিও যেমন ছবিতে হুবহু বজায় থাকে নি, তেমনই মূল চরিত্রটিরও বেশ অদল-বদল করা হয়েছে। মূলে কণ্ঠি হচ্ছে উচ্চশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী। কিন্তু ছবির সুলতা একজন কলেজের ছাত্রী মাত্র এবং তার 'কণ্ঠিত্ব'ও বিশেষ পরিস্ফুট নয়। ছবির সুলতা উদ্ধত, ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী নয়, ছবির আরও পাঁচটা নায়িকার মত প্রেমিকা এবং তার বাকপটুত্ব মাত্র তার প্রেমিকেরই কাছে। এমন কি তাকে তালাবন্ধ করতে তার বাবা গোবর্ধন বিন্দুমাত্রও পরিশ্রান্ত হননি এবং তালাবন্ধ অবস্থাতেও সে অত্যন্ত সুশীলা, শান্ত বালিকা। পুলিসকে টেলিফোন করে সে জীবনে একবার যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল, সেই বুদ্ধির দীপ্তি ছবির আর কোথাও কোনো উপলক্ষেই প্রকাশ পায় নি। 'বর্ণচোরা' নামটি যেমন নায়ক-ঘেঁসা হয়েছে, উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় তেমনই নায়কই দিয়েছেন একাধিক জায়গায়। বস্তুতঃ ছবিটিতে নায়িকা থেকে নায়কই কিছুটা বেশী প্রাধান্য পেয়েছেন। ছবির কণ্ঠি শিক্ষয়িত্রী নয় বলে মূল নাটকের মিস্ দত্ত ছবিতে অনুপস্থিত এবং তার পরিবর্তে সুলতাকে উত্যক্ত করবার জন্যে কেশব নামে একজন দ্বিতীয় প্রেমিক ছবিতে স্থান পেয়েছেন।

এককালে চিত্রনাট্য রচনা সম্পর্কে একটি বিশেষ কৌশল প্রচলিত ছিল— 'ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু কর' (স্টার্ট ফ্রম দি রং অ্যাঙ্গল)। 'বর্ণচোরা'র চিত্রনাট্যে দেখছি সেই কৌশলটিই অবলম্বিত হয়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে। নইলে ছবির প্রথম দৃশ্যে নায়কের পিতা পুরন্দর দাশগুপ্তমশাই হাত পুড়িয়ে মাংস রাঁধতে বসবেন কেন? এই ঘটনার সঙ্গে বাকী সমস্ত ছবিটার সম্পর্ক কি? পুরন্দরের রাণাঘাটের বাড়ীর নীচের তলার ভাড়াটেরা—শিখ ট্যাক্সি-ড্রাইভার থেকে শুরু ক'রে বেকার উদ্বাস্তু গণেশ পর্যন্ত সবাই ক্ষিতীশের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঝগড়া-মারামারি, বচসা, সহানুভূতি প্রভৃতির মধ্যে যতই বাস্তব সত্য নিহিত থাকুক না কেন, ও ঘটনাগুলি যতই মানবিক অবদানে পূর্ণ হোক না কেন, মূল কাহিনীর সঙ্গে তাদের কতটুকু সম্পর্ক? গুরুজনদের প্রচণ্ড গোঁড়ামি, অসম্মতি ও সক্রিয় বাধা সত্ত্বেও সুলতা-ক্ষিতীশ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'ল এবং সেই মিলনে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করলেন স্বয়ং জেলা-হাকিম—এই একমুখী গল্পকে চিত্রায়িত করতে গিয়ে চিত্রনাট্যে এমন সব চরিত্র ও ঘটনা স্থান পেয়েছে, যা না-প্রত্যক্ষ, না-পরোক্ষ—কোনোভাবেই মূল কাহিনীর সঙ্গে জড়িত নয়। মনে হয়, ছোট্ট কাহিনী থেকে একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ ছবি তৈরী করতে গিয়ে এই সব অবান্তরকে স্থান দিতে হয়েছে, যেমন আনতে হয়েছে কতকগুলি অকারণ গানকে। "বর্ণচোরা"র আসলে হওয়া উচিত ছিল দ্রুত লয়ে গাঁথা একটি কৌতুকচিত্র; কিন্তু তা না হ'য়ে ছবিটি হয়েছে কিছুটা প্রেমের, কিছুটা কৌতুকের, কিছুটা বাস্তব এবং কিছুটা কৌতূহলোদ্দীপক অর্থাৎ সাসপেন্স-ধর্মী।

অভিনয়াংশে প্রথমেই নজর পড়বে সুলতার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায়কে। চিত্রনাট্যকারের দাবিকে তিনি নিশ্চয়ই নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ণ করেছেন। ক্ষিতীশের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় সবচেয়ে সু-অভিনয় করেছেন, যেখানে তিনি বর্ণচোরা, ভৃত্য কেষ্টরূপে ছদ্ম-বেশধারী। হেমন্তকুমারের গাওয়া কয়েকখানি গান তাঁর মুখে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু গান তাঁকে স্পর্শ করেনি, নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে। পুরন্দরের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী এবং গোবর্ধনের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী পিতৃ-যুগলের চরিত্রচিত্রণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গঙ্গাপদ বসুর বাচনে বাঁকুড়ার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কেশব-রূপী অনুপকুমার এবং তার পিতার ভূমিকায় হরিধন উপভোগ্য অভিনয় করেছেন। পিঁপড়ের কামড় খাওয়ার পর অনুপকুমারের ছটফটানির কসরৎ রীতিমত দুরূহ সাধনার পরিচয় বহন করে। অপরাপর ভূমিকায় জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, গীতা দে প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি সাধারণ মান বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু ছবির প্রারম্ভ ভাগের পরিচয়পত্রগুলি (ক্রেডিট টাইটল) অত্যন্ত সুপরিকল্পিত, সুলিখিত ও শিল্পিমনের পরিচায়ক। গানগুলি সুপ্রযুক্ত না হ'লেও সুন্দরভাবে সুরসমৃদ্ধ ও সুগীত। আবহ-সঙ্গীত যথাযথ।

বিবিধ সংবাদ

হিন্দী ছবির মুক্তি ঃ

আজ শুক্রবার, ২২এ ফেব্রুয়ারি দু'খানি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এল, বি, ফিল্মস-এর "আসলী নকলী" দুই, প্রসাদ প্রডাকসন্স (মাদ্রাজ)-এর "হামরাহী"। এল, বি, লছমন প্রযো

জিত, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত, শঙ্কর জয়কিষণের সুরসমৃদ্ধ এবং দেব আনন্দ, সাধনা, সন্ধ্যা রায়, লীলা চিটনীস, নাজির হোসেন, মুখরী প্রভৃতি অভিনীত 'আসলী নকলী' বিলিমোরিয়া লালজীর পরিবেশনায় প্যারাডাইস, কৃষ্ণা, চিত্রা, রূপালী, ছায়া, মেনকা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হবে।

আর টি, প্রকাশ রাও পরিচালিত, শঙ্কর জয়কিষণের সুরসমৃদ্ধ এবং রাজেন্দ্রকুমার, মেহমুদ, যমুনা, শোভা খোটে, শশীকলা প্রভৃতি অভিনীত "হামরাহী" রাজশ্রী পিকচার্স-এর পরিবেশনায় হিন্দ, দর্পণা, প্রিয়া, গণেশ, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে।

পরলোকে সত্যসাধন সরকার :

আমরা জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে, বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ সরকার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স (প্রপার্টিস) প্রাইভেট লিমিটেডের বোর্ড অব ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান সত্যসাধন সরকার গেল মঙ্গলবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করছি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৯ বৎসর। শেষ কুড়ি বছর ধরে সম্পূর্ণরূপে সংসার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থেকে ধর্মজীবন যাপন করতেন।

রবার্ট জোফ্রে ব্যালে :

ইন্ডো-আমেরিকান সোসাইটি এবং ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে আসছে ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥টায় নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 'রবার্ট জোফ্রে ব্যালে' প্রদর্শিত হবে। ওয়াশিংটনের সিয়াটেলের অধিবাসী সুদক্ষ নৃত্যকুশলী রবার্ট জোফ্রে ১৯৫৬ সালে ২২ জন সুশিক্ষিত নৃত্যশিল্পীর সমন্বয়ে এই নৃত্যসংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ব্যালের বিশেষত্ব এই যে, এতে কোনো 'তারকা', নর্তক বা নর্তকী নেই। প্রতিটি শিল্পীই সমানভাবে পারদর্শী এবং প্রত্যেকেই একক নৃত্যসক্ষম। প্রাচীন ক্লাসিক নৃত্য থেকে শুরু ক'রে বর্তমানের দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে সজীব, ছন্দোময় লোকনৃত্য পর্যন্ত সকল রকম নৃত্যধারায় এই শিল্পীরা সমান দক্ষ। বারোই ১২ জন যন্ত্রীর বাদ্যের সহযোগিতায় এঁরা যে-নৃত্য পরিবেশন করবেন, তা উপভোগ্যতার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হবে, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

বলাকা সাংস্কৃতিক চক্র

বলাকা সাংস্কৃতিক চক্র বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণের জন্য "সংস্কৃতি" এই পর্যায়ে এক বৈচিত্র্য-

ময় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। বিনা প্রবেশমূল্যে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার ফর্ম ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮-৩০ মিঃ ও ছুটির দিন বেলা ৯টা থেকে ১১টা চক্রের কার্যালয় ১৩৩।২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিঃ-৬ এই ঠিকানায় বিতরণ করা হবে।

বিশ্বরূপায় "ব্রিস্টল ওল্ড ভিক্স্"-এর সংবর্ধনা :

গেল সোমবার, ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপা থিয়েটার ও বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ "ব্রিস্টল ওল্ড ভিক্স্" সম্প্রদায়কে একটি সংবর্ধনায় আপ্যায়িত করেন। এই উপলক্ষে বিশ্ব-

রঙমহলে
নতুন
নাটক
কথা
কও

রূপার শিল্পীরা সংক্ষিপ্ত আকারে "সেতু" নাটকটি অভিনয় করেন। অভিনয়-শেষে অভ্যাগত সম্প্রদায়ের সভ্যবৃন্দকে সংবর্ধনাপত্র দেওয়া হয়। উত্তরে সম্প্রদায়ের পরিচালক ডেনিস কেরী ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "কোনো ভ্রাম্যমাণ নাট্যকে দলকে এইভাবে সংবর্ধিত করায় আমরা অভিভূত হয়ে গেছি; কারণ আমাদের দেশে এ-জিনিস ঘটে না। আপনাদের অভিনয়ধারা অনেকটা ইতালীয় প্রথার অনুগামী; আমাদের সঙ্গে এ-অভিনয়ের বিশেষ মিল নেই। অভিনয় দেখে আমরা নিশ্চয়ই খুশী হয়েছি। ট্রেনের দৃশ্যটি বিস্ময়করভাবে সুপরিকল্পিত।" পরে সম্প্রদায়ের সভ্যরা উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে একটি চা-চক্রে মিলিত হন।

ঢাকুরিয়া ক্লাব কর্তৃক 'মুক্তধারা' অভিনয়

গত শনিবার, ৯ই ফেব্রুয়ারী ঢাকুরিয়া ক্লাবের সভ্যগণ তাঁদের ৩৮তম পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষ্যে ক্লাবসংলগ্ন প্রাঙ্গণে কবিগুরুর 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন শ্রীবিমলভূষণ। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন—সর্বশ্রী প্রভাতভূষণ (রেডিও), নন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বসু, হৃষীকেশ ঘোষ, বিকাশ ঘোষ দস্তিদার, মঞ্জু দেবী, এনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। মঞ্চ-পরিকল্পনা ও আলোক-সম্পাতে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সর্বশ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায়, অজিত গুপ্ত ও সুনীল দাস।

* কলকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ

কলকাতা

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর নবতম প্রয়াস ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বাদশা।' গত সপ্তাহে রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় অগ্রদূত-গোষ্ঠী এ ছবির মহরৎ শেষে চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেছেন। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন বিভূতি লাহা ও হেমন্ত মুখোপধ্যায়। শব্দ গ্রহণে যতীন দত্ত। নির্মীয়মান ছবির মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন নাম ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া প্রধান চরিত্রে রয়েছেন অসিতবরণ, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, প্রেমাংশু বসু, রথীন ঘোষ ও মাস্টার শিবশঙ্কর।

কলাকুশলী বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা ও রূপনে যথাক্রমে সত্যেন রায়চৌধুরী, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বসির আমেদ। এ ছবির প্রচার পরিকল্পনায় আছেন প্রচার-সচিব বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার চতুর্থ ছবির নামকরণ হয়েছে 'বিপত্তি।' যদিও পরিচালকদ্বয়ের এ নাম পছন্দ নয়। ছবিটির কাজ সমাপ্তপ্রায়। পরিচালনা করছেন শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। নায়ক-নায়িকা অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার। অন্যান্য প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, সুমিতা সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, অমর গাঙ্গুলী, শান্তি দাস, কুমার রায়, নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরাজ

মুক্তিপ্রাপ্ত

হমরাহী

দাস। চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিচালক হয়ে কাজ করছেন দেওজিভাই ও ভি বালসারা।

বোম্বাই

প্রযোজক মোহন সেহগল প্রোডাকসন্সের পঞ্চম ছবিটির কাজ গত সপ্তাহে মোহন স্টুডিওয় আরম্ভ হয়েছে। এ ছবি পরিচালনা করছেন নরেন্দ্র সুরি। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন রাজেন্দ্রনাথ, লোলিতা পাওয়ার, নাজ, সবিতা চ্যাটার্জি ও জগদেব।

ভাসু ফিল্মসের 'ভরসা' সমাপ্তপ্রায়। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের কোচিন, ত্রিবান্দ্রাম এবং মহাবালিপুরম অঞ্চলে এ ছবির বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ হল। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত, আশা পারেখ, কানহাইলাল, পালসিকর, লোলিতা পাওয়ার, ওমপ্রকাশ, শিবরাজ, সুলোচনা চ্যাটার্জি ও নীনা। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন ভাসু মেনন এবং কে শঙ্কর। সঙ্গীত পরিচালক রবি।

মাদ্রাজ

বিজয়া স্টুডিওয় মীনা প্রোডাকসন্সের নতুন হিন্দী ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। বাংলা 'স্বয়ংসিদ্ধা' অবলম্বনে এ কাহিনী রচিত হয়েছে। টি প্রকাশ রাও এ ছবির পরিচালক। অভিনয় করছেন গুরু দত্ত, মালা সিনহা, প্রতিমা দেবী, নাজির হুসেন ও লোলিতা পাওয়ার। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সি রামচন্দ্র।

স্টুডিও থেকে বলছি

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা শেষ করে ফিরেছেন চিত্রযুগের শিল্পী ও কলাকুশলী দল। সম্প্রতি রমাপদ চৌধুরীর 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'-র শেষ দৃশ্য গ্রহণ সমাপ্ত হতে চলেছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক গুরু বাগচী।

মাদ্রাজের ভিজগাপটুম, বিমলিপটুম ও চিন্তাপল্লির গহন অরণ্যে একমাসকালীন এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, দীপা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিত দে, শিপ্রা সেন ও বনানী চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ-পরিচালক ও চিত্রগ্রহণ করেছেন অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা।

এ ছবির সঙ্গীত বিশেষ আকর্ষণীয় হবে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বহির্দৃশ্যে দুটি গানের দৃশ্যে সাগর উপকূলে সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য ও দীপা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গৃহীত হয়েছে। গান দুটি গেয়েছেন শ্যামল মিত্র ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান রচনা করেছেন প্রণব রায়। সুর শুনে ভাল লাগলো। তামসীর মুখে যে গান আপনারা ছবিতে শুনবেন তার প্রথম কয়েকটি বাণী হল—

'ওগো সাগর আমি বাহির হলাম
এ কোন অভিসারে
কে যেন তোমার মতন মোহনরূপে
ভোলায় আমায় বারে বারে।'

রমাপদ চৌধুরীর এ কাহিনী আপনারা অনেকেই জানেন তাই বিস্তারিত কাহিনী আর বলছি না।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে টিয়ারঙ দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন নিয়ে এ কাহিনীর চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। স্টিফেন্স সাহেবের স্টীমার এসে এখানকার কাঠ চালান দেবার জন্য টিয়ারঙে প্রথম নোঙর ফেলে। মাত্র পাঁচিশ-তিরিশ ঘর বাসিন্দে তখন বাস করতো। গায়ের রঙ তাদের হলুদ-লালে মেশানো। চমৎকার দেহ এখানকার মেয়েপুরুষদের। এই দ্বীপের মেয়ে ফিরুজা আর আকাঙ্গী। এদের ভালবাসার লোক মদনা আর আলুভা। কোম্পানীর খাতায়

এরা কর্মচারী। সারাদিন জঙ্গলে কাঠ কেটে বেড়ায়। শুধু আলভো ছাড়া। ওর যেন সংসারে বাধন নেই। গান গায় আর ধনদৌলতের স্বপন দেখে। আর মদনা স্বপন দেখে ফিরজোর চোখে। তারা ঘর বাঁধবে। ঘর অবশ্য আকাশীও বাঁধতে চেয়েছিল আলভোকে নিয়ে। কিন্তু সরল আলভোকে হয়তো ভুল বুঝেছিল আকাশী। অন্যদিকে কোম্পানীর চাকরী নিয়ে যারা সহর থেকে উচ্চপদে বহাল হয়ে এ দ্বীপে এসেছিলেন তাদের মধ্যে সমীরণ, সৌমেন, মিঃ চ্যাটার্জি, তামসী ও তাপসী এ কাহিনীর পার্শ্বচরিত্র। সৌমেন-তামসীও ভালবাসা চেয়েছিল। সহর আর দ্বীপের ভালবাসা নিয়ে এ কাহিনীর সব চরিত্র টিয়ারঙে মিশেছে। তাই ছবির নাম—দ্বীপের নাম টিয়ারঙ।

'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' চিত্রের একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে পরিচালক গুরু বাগচী নির্দেশ দিচ্ছেন নবাগতা দীপা চট্টোপাধ্যায়কে।

কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফিরজো—সন্ধ্যা রায়, মদনা—নিরঞ্জন রায়, আকাশী—শিপ্রা সেন, আলভো—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সৌমেন—অমিত দে, তামসী—দীপা চট্টোপাধ্যায়, সমীরণ—দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জের্মান—দিলীপ রায়, মাধো সর্দার—শিশির মি..., বুড়ো—গৌর শী, তাপসী— ... চৌধুরী, অমিয়—বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ চ্যাটার্জি—দিলীপ রায়চৌধুরী। বহুল জনপ্রিয় এ উপন্যাসের চিত্র-নাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক।

—চিত্রদ...

ভিন দেশী ছবি

বৃটিশ ছবির টুকরো খবর

ভিনদেশে একটি ছবির স্যুটিং চলছে। 'সামার হলি ডে', 'মিঃ মা... গোজ টু স্কুল' এবং 'রিটার্ণ টু লাইফ' তথ্যচিত্র দুটির পরিচালক জন ক্রি... এই সঙ্গীতমুখর ছবিটি পরিচালনা করছেন। গ্রীস এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বহির্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ চলছে।

• • •

ওল্ড ভিক থিয়েটারের অভিনেতা টম কোর্টিনে এবারে ছায়াছবিতে অভিনয় করবেন। ছবির নাম 'প্রাইভেট পটার'। ছবিটির পরিচালনাও করবেন ওল্ড ভিক থিয়েটারের নাট্য-পরিচালক ক্যাসপার রেড। ইংল্যাণ্ডের এম-জি-এম চিত্র প্রতিষ্ঠানের পতাকায় ছবিটি নির্মিত হচ্ছে। রোনাল্ড হারউডের টেলিভিসন-নাটক অবলম্বনে 'প্রাইভেট পটার' চিত্রায়িত হচ্ছে। —চিত্রক

অলিম্পিকের আঙ্গিনায় মেয়েরা

শিবানী চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলো শুধু নেশা নয়। শুধু [শ]রীর সুস্থ রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের [জ]ন্যও খেলার আসরে মেয়েদের আগমন [এ]কমাত্র কাম্য নয়; সুস্থ ও সবল [স]ন্তানের জন্যও হয়ত সুদূর অতীতে [এ]টি রাষ্ট্রীয় আইনেও বিধিবন্ধ হয়ে[ছি]ল।

ইতিহাস অন্ততঃ তাই বলে। [প্রা]গৈতিহাসিক যুগ থেকে মেয়েরা যে [খে]লাধুলোয় অংশ নিচ্ছেন এ তথ্য [ক্রী]ড়ামোদীদের অজানা নিশ্চয়ই নয়। [প্রা]য় ৪০০০ বছর আগে ক্রীটের [নো]সাসের রাজা মাইনোসের রাজ[প্রা]সাদের দেওয়ালে মহিলাদের যে [দুঃ]সাহসিক ক্রীড়াচিত্র অঙ্কিত ছিল, [তা] নিঃসংশয়ে এ যুগের মানুষেরও [বি]স্ময়ের উদ্রেক করবে। গ্রীস দেশের [পৌ]রাণিক কাহিনীতে যে সব মহিলা [খে]লোয়াড়দের নাম পাওয়া যায়, তার [ম]ধ্যে রাজকুমারী আটলান্টা ছিলেন সে [স]ময়ের শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ। সেই সময়ে তাঁর [দৌ]ড়-ক্ষমতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

আরও পরবর্তী যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, স্পার্টার 'জিমনোপেডিয়া' উৎসবে পুরুষদের মত মহিলারাও অংশ নিতেন। কোরিন্থের আফ্রোডাইতি দেবীর মন্দিরের পূজারিণীরা আফ্রোডাইসিয়া উৎসবে এবং 'ডেলফি'তে পারসিক বাহিনী বিজয়ের স্মারক হিসাবে এ্যাপোলোদেবকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য যে বিজয়োৎসবের আয়োজন করা হত, সেখানেও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করতেন।

এযুগে খেলাধুলোর আন্তর্জাতিক মান অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বহু পুরাকাল থেকে চলে আসছে এবং এ সম্পর্কে বহু কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে। সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। ঠিক কবে থেকে অলিম্পিকের সূচনা হয়েছিল তা সঠিক জানা না গেলেও বন্ধ হয়েছিল রাজা থিয়োডোসাসের আমলে ৩৯৩ খৃষ্টাব্দে। অলিম্পিকের গোড়ার দিকে অলিম্পিকের দুয়ার মেয়েদের কাছে বন্ধ ছিল। যদিও তারও আগে থাকতে

১৯৪৮ সালের অলিম্পিকের ৮০ মিটার হার্ডলস অনুষ্ঠান : ১ম ফ্যানি ব্লাংকার্স কোয়েন (হল্যাণ্ড), ২য় এম গার্ডনার (ইংল্যাণ্ড) এবং ৩য় এস বি স্ট্রিকল্যাণ্ড (অস্ট্রেলিয়া)।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকের ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক বিজয়িনী। ছবির বাঁদিক থেকে : অস্ট্রেলিয়ার বি জোন্স (রৌপ্যপদক), রাশিয়ার এল শেভকোভা (স্বর্ণপদক) এবং জার্মাণীর ইউ ডোনাথ (ব্রোঞ্জপদক)। স্বর্ণপদক বিজয়িনী এল শেভকোভা ৮০০ মিটার দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড (২ মিঃ ৪·৩ সেঃ) স্থাপন করেন।

এই সেই পবিত্র অলিম্পিক মশাল। ১৯৫৬ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণের পথে যাত্রা সুরু হওয়ার দৃশ্য। গ্রীসের এথেন্স সহর থেকে ২০০ মাইল দূরে অলিম্পিয়া উপত্যকা। তারই কোলে চিরনিদ্রিত প্রাচীন আলটিস মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। সেই সুমহান প্রাচীন মন্দির প্রাঙ্গণেই গ্রীক জাতির প্রাচীন অলিম্পিকের ধর্মীয় প্রথানুসারে সূর্য রশ্মির সাহায্যে উৎপাদিত অগ্নি শিখায় অলিম্পিক মশালটি প্রজ্জ্বলিত ক'রে প্রথম মশালধারীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মেয়েরা।

মহিলারা খেলাধূলায় নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু অলিম্পিকে অংশগ্রহণ ত দূরের কথা, দর্শক হিসাবে তাঁদের প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিল ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে।

অলিম্পিক উৎসবের সংগে জড়িত কিম্বদন্তীর নায়ক রাজা 'পেলোপসে'র সহধর্মিণী হিপ্পোডোমিয়া (এঁকে নিয়েই রূপকথা) কিন্তু অলিম্পিক উৎসবে মেয়েদের যোগদানের স্বপক্ষে ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত অনুশাসন উচ্ছেদ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই মেয়েদের জন্য তিনি একটি নতুন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর বিবাহোৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে জীউসদেবের পত্নী 'হেরদেবী'র সম্মানে 'হেরেরা' নামে মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক অথচ এক অভিনব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বছর, কিম্বা তারও আগে এই 'হেরেরা' তৎকালীন পুরুষদের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের মতই প্রতি চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত হত। অলিম্পিক বিজয়ী এ্যাথলীটদের মত হেরেরা বিজয়িনীরাও ক্যালিষ্টো-ফানাস গাছ থেকে সংগৃহীত অলিভ-মাল্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের পুরস্কার হিসাবে লাভ করতেন। তা ছাড়া হেরাদেবীর প্রসাদের অংশও তাঁদের প্রাপ্য ছিল। দুই এবং আড়াই ষ্টেডের দৌড় প্রতিযোগিতাই তখন খেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য কি ধরণের খেলা হত, সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি। প্রতিযোগিণীরা কোমর পর্যন্ত অঙ্গাবরণ, খাটো জাঙিয়া পরে এলোচুলে খালি পায়ে প্রতিযোগিতায় নামতেন। রোমের ভ্যাটিকান শহরে খৃঃ পূঃ ৫০০ বছর আগের তৈরী এই সাজে সজ্জিতা হেরেরা-এ্যাথলীটের মূর্তি আছে। হেরেরার প্রতিযোগিণীরা হেরাদেবীর সামনে শপথ নিতেন এবং নিয়মিত অনুশীলন করতেন। বিজয়িণীদের মূর্তি দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে মাটি অথবা ব্রোঞ্জে নির্মাণ করে স্থাপন করা হত। প্রথমে শুধু এলিয়ান কুমারী, পরে হেল্লাস (এক সময়ে গ্রীসকে হেল্লাস বলা হত) বংশীয় যে কোন কুমারীর জন্য হেরেরা প্রতিযোগিতা উন্মুক্ত ছিল। এই প্রতিযোগিতাটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এটি ছিল সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত। ঘোষক, তূর্যবাদক, জিমন্যাষ্ট, বিচারক প্রভৃতি সবাই ছিলেন শিক্ষিতা মহিলা। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও মহিলারা পুরুষদের অলিম্পিক-অঙ্গনে প্রবেশের জন্য উৎসুক থাকতেন। কিন্তু ধর্মীয় শাসনের কড়া প্রহরায় মেয়েরা তখন বন্দিনী। এই ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করলে তখন পেতে হত চরম শাস্তি। অলিম্পিক দর্শনের শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। পর্বতের উপর থেকে ফেলে দিয়ে এ শাস্তি দেওয়া হত। বাধানিষেধের এই অতিরিক্ত কড়াকড়ির জন্য অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের আগ্রহটা মেয়েদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠতে থাকে।

অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও যিনি প্রবেশ করে মহিলাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করলেন-- তাঁর নাম ফেরোনিস। পুত্র দৌড়বীর

পসিডোরাসের খেলা দেখতে জননী ফেরোনিস পুরুষের ছদ্মবেশে অলিম্পিক-অঙ্গনে প্রবেশ করেন। পুত্রের বিজয়ে মাতা সংযম হারিয়ে ফেলেন। অপ্রত্যাশিত আনন্দে পুত্রকে তিনি জড়িয়ে ধরেন। এই সময়ে তিনি দর্শকদের কাছে ধরা পড়ে যান। উপস্থিত দর্শকসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন—তিনি ধর্মীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে জীউসদেবের মন্দির অপবিত্র করেছেন। ফেরোনিস অভিযোগ স্বীকার করে বলেন—যদি ধর্মীয় অনুশাসনে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই অপরাধিনী এবং এর জন্য যে কোন দণ্ড নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি ত [illegible] নন, তিনি মা। মা বলেই তিনি [illegible] অপত্যস্নেহের [illegible] ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে ঢুকেছেন। [illegible] বুকে সেই অপত্যস্নেহ ত [illegible] যান—তবে তাঁর অপরাধ [illegible]

[illegible] শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি [illegible] অলিম্পিকের উদ্যোক্তা জীউস-[illegible] পুরোহিত ও ভবিষ্যৎবক্তার মাধ্যমে [illegible] কাছে মহিলাদের প্রবেশ সম্পর্কে [illegible] প্রার্থনা করেন। জীউসদেবের [illegible] কয়েকটি অলিম্পিয়াডের [illegible] মহিলারা প্রবেশ করেন ও সর্ব-[illegible] রথ প্রতিযোগিতায় যোগদান [illegible] রথ প্রতিযোগিতায় প্রথমে [illegible] 'ডিমিটার দেবী'র পূজারিণী-[illegible] যোগদানের অধিকার ছিল। পরে [illegible] প্রবেশাধিকার পান। দুই অশ্ব-[illegible] চালিত রথ প্রতিযোগিতায় ১২৮-[illegible] অলিম্পিকে ম্যাসিডোনীয়ান মহিলা [illegible] জয়লাভ করেছিলেন। [illegible] ক্রীড়ানুষ্ঠান অলিম্পিকের [illegible] পাশাপাশি অব্যাহতগতিতে চলে ৩৯৩ [illegible] বন্ধ হয়ে যায়।

[illegible] অধীনতাপাশ থেকে গ্রীসের [illegible] স্বাধীনতালাভের পঞ্চসপ্ততিতম দিবসে, ১৮৯৬ সালের ৬ই এপ্রিল পুনরায় [illegible] অলিম্পিকের সূচনা হয়।

প্রথম অলিম্পিকে মহিলারা যোগ [illegible] নি। দ্বিতীয় অলিম্পিকে মাত্র ছ' জন মহিলা যোগ দিয়েছিলেন কেবল টেনিস খেলায়। লেডিস সিঙ্গলস ও ডাবলস প্রথাও প্রবর্তিত হয়। আধুনিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় লেডিস সিঙ্গলসে গ্রেট ব্রিটেনের সি কুপার ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিনী এইচ প্রেভোঁকে পরাজিত করে প্রথম মহিলা প্রতিযোগিণী হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেন। দ্বিতীয় অলিম্পিকের ছ' জন মহিলা, পঞ্চদশ অলিম্পিকে দাঁড়ায় ৩৭১ জনে।

ত্রয়োদশ অলিম্পিকে ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েন বিশ্ব রেকর্ড ও ফাইভ ক্যাম্পে (পেন্টাথলনের মহিলা সংস্করণ। ১০০ মিটার দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, লৌহগোলক নিক্ষেপ ও বর্শা নিক্ষেপ সমন্বয়ে গঠিত। ডাচ রেকর্ড স্থাপন করেন। চারটি স্বর্ণপদকের অধিকারিণী ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েনের নামে ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক বছরটিকে 'ফ্যানি ব্লাঙ্কার্স কোয়েনের বছর' বলা হয়—যেমন ১৯৬০ সালকে বলা হয় এল, ল্যাটিনিনার বছর। ১৯৪৯ সালের ২৯শে জুন হল্যাণ্ডের রাণী জুলিয়ানা ব্লাঙ্কার্স কোয়েনকে নাইট অব দি অর্ডার অব অরাঞ্জ নাসাউ' উপাধিতে ভূষিতা করেন। ডাচ মহিলাদের ক্রীড়ার জন্য এই সম্মান আগে কেউ পাননি।

আধুনিক কালের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এথেন্সে। সেই সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৫টি। পরবর্তী অনুষ্ঠান

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে সর্বাধিক স্বর্ণপদক বিজয়িনী রাশিয়ার লারিসা ল্যাটিনিনা।
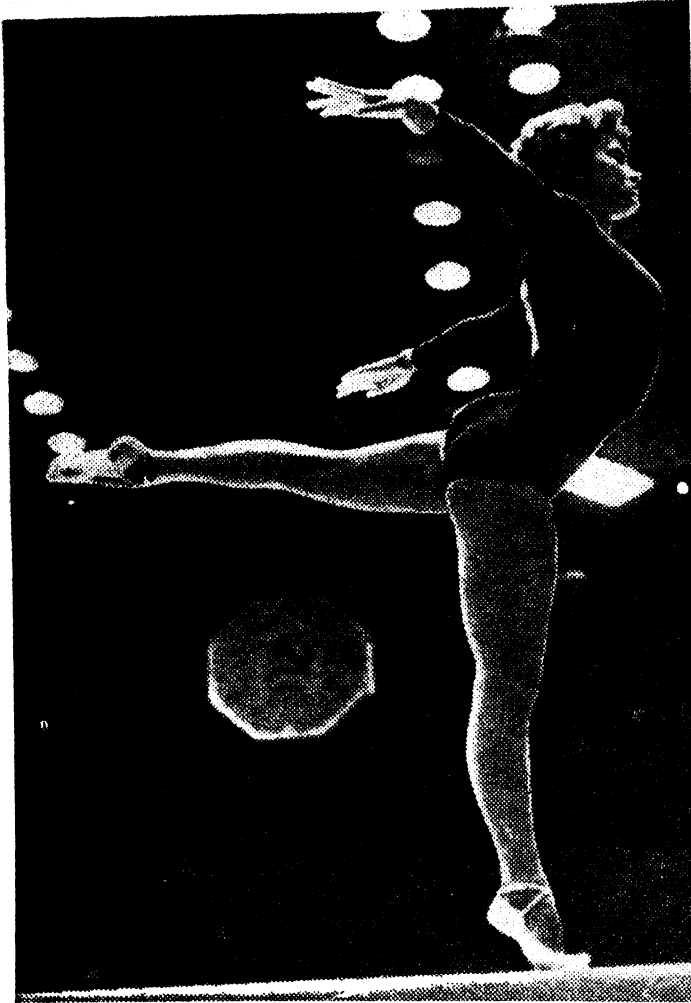
হবে জাপানের টোকিও শহরে ১৯৬৪ সালে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট বছরে (১৯১৬, ১৯৪০ ও ১৯৪৪) অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়নি। গত পনের বারের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে আমেরিকা ১২ বার, রাশিয়া ২ বার (১৯৫৬ ও ১৯৬০) এবং জার্মানী ১ বার (১৯৩৬) সর্বাধিক পদক এবং পয়েন্ট লাভ ক'রে বেসরকারীভাবে চ্যাম্পিয়নশীপ পায়। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহিলা বিভাগে স্বর্ণপদক প্রাপ্তির তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান আছে নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং রাশিয়ার। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে মহিলাদের এ্যাথলেটিক বিভাগে মোট ১০টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৭টি অনুষ্ঠানে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হয়। সাঁতারে মোট ৭টি অনুষ্ঠানের মধ্যে ৬টি অনুষ্ঠানে পূর্ব-রেকর্ড ভঙ্গ হয়।

অলিম্পিকের জিমন্যাস্টিক অনুষ্ঠানে রাশিয়ার 'মাস্টার অব্ স্পোর্টস' তা . লিউথিনা

অলিম্পিক রেকর্ড—মহিলা বিভাগ

এ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান	রেকর্ড	রেকর্ডধারিণী	দেশ	বৎসর
১০০ মিটার দৌড়	১১·৩ সেঃ	উইলমা রুডলফ	আমেরিকা	১৯৬০
২০০ "	২৩·৪ সেঃ	বেটি কাথবার্ট	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬
৮০০ "	২ মিঃ ৪·৩ সেঃ	এল শেভকোভা	রাশিয়া	১৯৬০
৮০ মিটার হার্ডলস	১০·৭ সেঃ	শার্লি হার্স্টি	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬
হাইজাম্প	৬ ফিঃ ¾ ইঃ	বালাস	রুমানিয়া	১৯৬০
ব্রডজাম্প	২০ ফিঃ ১০¾ ইঃ	ভি ক্রেপিংকা	রাশিয়া	১৯৬০
ডিসকাস	১৮০ ফিঃ ৮¼ ইঃ	এন পোনোমারেভা	রাশিয়া	১৯৬০
জ্যাভেলিন	১৮৩ ফিঃ ৮ ইঃ	ই ওজোলিনা	রাশিয়া	১৯৬০
সটপুট	৫৬ ফিঃ ৯¾ ইঃ	তামারা প্রেস	রাশিয়া	১৯৬০
সাঁতার				
ফ্রি স্টাইল :				
১০০ মিটার	১ মিঃ ১·২ সেঃ	ডন্ ফ্রেজার	অস্ট্রেলিয়া	১৯৬০
৩০০ মিটার	৪ মিঃ ৩৪ সেঃ	ই ব্লাইবাট্রি	আমেরিকা	১৯২০
৪০০ মিটার	৪ মিঃ ৫০·৬ সেঃ	সি ভি সল্টজা	আমেরিকা	১৯৬০
ব্যাকস্ট্রোক :				
১০০ মিটার	১ মিঃ ৯·৩ সেঃ	লিন বার্ক	আমেরিকা	১৯৬০
ব্রেস্টস্ট্রোক :				
২০০ মিটার	২ মিঃ ৪৯·৫ সেঃ	অনিটা লন্সবরো	ইংল্যান্ড	১৯৬০
বাটারফ্লাই :				
১০০ মিটার	১ মিঃ ৯·৫ সেঃ	সি স্কুলার	আমেরিকা	১৯৬০

দর্শক

॥ এশিয়ান টেবল টেনিস ॥

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ এশিয়ান ল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান ুষ এবং মহিলা বিভাগে অপরাজেয় স্থায় দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ছে। গত ১৯৬০ সালে বোম্বাইয়ে ্ঠিত ৫ম এশিয়ান টেবল টেনিস যোগিতায় জাপান উভয় বিভাগেই স্থান লাভ ক'রে চ্যাম্পিয়ান ছিল।

আলোচ্য ৬ষ্ঠ এশিয়ান টেবল টেনিস যোগিতার ব্যক্তিগত বিভাগের সমস্ত ষ্ঠানেই জাপান চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। প্রতিযোগিতার মোট সাতটি অনু-নের খেতাব জাপানের ঘরে গেছে। পুরুষদের দলগত বিভাগে মোট টি দেশ যোগদান করে। লীগ প্রথায় হয়। জাপান অপরাজেয় অবস্থায় বিভাগের পুরস্কার বরোদা কাপ।

বাছাই তালিকায় জাপান প্রথম স্থান, ণ কোরিয়া দ্বিতীয় স্থান এবং মোজা তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। জাপান ফরমোজার খেলাটি খুবই গুরুত্ব-ছিল—উভয় দলেরই ছ'টা খেলায় লীগের এই শেষ খেলায় ফরমোজা ত্যাশিতভাবে ভাল খেলে ২—৫ য় জাপানের কাছে পরাজিত হ'য়ে ীয় স্থান লাভ করে। তৃতীয় স্থান দক্ষিণ কোরিয়া।

মহিলাদের দলগত বিভাগেও জাপান রাজেয় অবস্থায় কমলা রামানুজন জয় করে। এই বিভাগে জাপানের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণ রিয়া। উভয় দলেরই চারটে খেলায় এই অবস্থায় তারা মিলিত হয়। ান ৩—০ খেলায় দক্ষিণ কোরিয়াকে জিত করে।

লীগ খেলার চূড়ান্ত ফলাফল

পুরুষ বিভাগ—বরোদা কাপ

	খেলা	জয়	হার
জাপান	৭	৭	০
তাইওয়ান	৭	৬	১
দঃ কোরিয়া	৭	৫	২
দঃ ভিয়েৎনাম	৭	৪	৩
ফিলিপাইন	৭	৩	৪
সিঙ্গাপুর	৭	২	৫
মালয়	৭	১	৬
থাইল্যান্ড	৭	০	৭

মহিলা বিভাগ—কমলা কাপ

	খেলা	জয়	হার
জাপান	৫	৫	০
দঃ কোরিয়া	৫	৪	১
তাইল্যান্ড	৫	৩	২
দঃ ভিয়েৎনাম	৫	২	৩
ফিলিপাইন	৫	১	৪
তাইল্যান্ড	৫	০	৫

ব্যক্তিগত বিভাগ

ব্যক্তিগত বিভাগে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, খেলার তৃতীয় রাউন্ডে ১নং বাছাই খেলোয়াড় ইচিরো ওগিমুরার (জাপান) পরাজয়। ওগিমুরা গতবারের প্রতি-যোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পেয়ে-ছিলেন; তাছাড়া তিনি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দু'বার সিঙ্গলস খেতাব পান। দক্ষিণ কোরিয়ার তরুণ খেলোয়াড় পার্ক জাং-কিল ২১-১০, ১৭-২১, ১৩-২১, ২১-১৯ ও ২৭-২৫ পয়েন্টে ওগিমুরাকে পরাজিত করেন। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা, দু' নম্বর বাছাই খেলোয়াড় লি দাই জুনের (দক্ষিণ কোরিয়া) পরাজয়। জুন গতবার সিঙ্গলসের ফাইনালে ওগিমুরার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতিটি অনুষ্ঠানের ফাইনাল খেলা কেবল জাপানের খেলোয়াড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাপানের ২১ বছরের খেলোয়াড় হিরোসি তাকাহাসি দুটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে (পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস) জয়লাভ করেন এবং মিক্সড ডাবলসে রাণার্স-আপ হ'ন। অপর দিকে মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস ফাইনালে জয়লাভ করেন কুমারী কিমিয়ো মাৎসুজাকি। কুমারী মাৎসুজাকি ১৯৫৯ সালের বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন।

ফাইনালের ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : হিরোসি তাকাহাসি ১৭-২১, ২১-১৯, ১২-২১, ২৩-২১ ও ২১-১৫ পয়েন্টে কিইচি মিকিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : তাকাহাসি এবং মানজি ফুকুসিমা ২১-১৭, ২১-১৬ ও ২১-১৬ পয়েন্টে মিকি ও ওগিমুরাকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : কিমিয়ো মাৎসুজাকি ১২-২১, ২১-১৯, ২১-১৩, ১৪-২১ ও ২১-১৩ পয়েন্টে কাজুকো ইতোকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কিমিয়ো মাৎসুজাকি এবং মাসাকো সেকী ২০-২২, ২১-১৯, ১১-২১, ২১-১৬ ও ২১-১৮ পয়েন্টে কাজুকো ইতো এবং নোরিকো ইয়ামানাকাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ফুকুসিমা এবং ইতো ২১-৭, ১২-২১, ২১-১৫, ২১-১৯ পয়েন্টে তাকাহাসি এবং নোরিকি ইয়ামানাকে পরাজিত করেন।

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

রাষ্ট্রপতির একাদশ : ৩৭৫ রান (১০ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এম এল আপ্তে ৬০, বি কুন্দরাম ৫৩, এস দুরানী ৬২, প্রেম ভাটিয়া ৬৯ নট আউট। নাদকার্ণী ৮৭ রানে ৪ এবং জয়সীমা ১৪ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৪৫ রান (৯ উইকেটে ডিক্লে-য়ার্ড। বিজয় মেহরা ১০৯, দুরানী ৭৫, বেগ ৫৭। বোরদে ১৩০ রানে ৬ উইকেট)।

প্রধানমন্ত্রীর একাদশ : ৩৬৮ রান (এম এল জয়সীমা ৬৬ এবং চান্দু বোরদে ১৪২। দুরানী ১১৩ রানে ৩ এবং গোকুল ইন্দর দেব ১১৭ রানে ৫)

ও ২৮৭ রান (৯ উইকেটে। এম সুদ ১০৮। দুরানী ৭৬ রানে ৪ এবং মেহরা ২৮ রানে ২ উইকেট)।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে আয়োজিত রাষ্ট্রপতির একাদশ দল বনাম প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের চারদিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই প্রদর্শনী খেলায় প্রতি দলে ১২ জন ক'রে খেলোয়াড় ছিলেন।

রাষ্ট্রপতির একাদশ দল প্রথম ব্যাট ধরে। প্রথমদিনের খেলায় তাদের ৯টা উইকেট পড়ে ৩২৩ রান ওঠে। প্রথম উইকেটের জুটিতে বিজয় মেহরা (৪০) এবং মাধব আপ্তে (৬০) ৮৫ মিনিটের খেলায় দলের ১০৩ রান তুলে দেন। সেলিম দুরানী ৮০ মিনিটে তাঁর ৬২ রান করেন—তাঁর এই রানে ছিল ৮টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার বাউন্ডারী। তাঁর খেলা দর্শক-সাধারণকে যথেষ্ট আনন্দ দেয়।

খেলার দ্বিতীয় দিনে রাষ্ট্রপতির একাদশ দলের ৩৭৫ রানের মাথায় (১০ উইকেটে) অধিনায়ক পলি উমরীগড় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এইদিনে প্রধানমন্ত্রী একাদশ দলের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনায় বিপর্যয় দেখা দেয়। দলের ১০ রানের মাথায় ১ম, ৩৫ রানের মাথায় ২য়, ৭৩ রানের মাথায় ৩য়, ১২০ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ১২৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে চাঁদু বোরদে এবং মনোমোহন সুদ (৩৩) দলের ৯৭ রান যোগ করেন। ওপনিং ব্যাটসম্যান জয়সীমার ৬৬ রান উল্লেখযোগ্য। ১০০ মিনিটের খেলায় তিনি ১১টা বাউন্ডারী করেন। চাঁদু বোরদে তাঁর ১৩০ রান ক'রে এইদিন নট আউট থাকেন। এইদিনে প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের ৬টা উইকেট পড়ে ২৯১ রান ওঠে। উইকেটে নট আউট থাকেন বোরদে (১৩০) এবং আকাশ লাল (২২)।

তৃতীয়দিনের খেলায় প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৮ রানে শেষ হ'লে রাষ্ট্রপতির একাদশ দল মাত্র ৭ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের চাঁদু বোরদে তাঁর ১৪২ রানের মাথায় আউট হ'ন। বোরদে এবং আকাশলালের ৭ম উইকেটের জুটিতে দলের ৮৮ রান যোগ হয়। তৃতীয় দিনে রাষ্ট্রপতি একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট পড়ে ২১৩ রান ওঠে। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে বিজয় মেহরা এবং সেলিম দুরানী ১৬২ রান যোগ করেন। বিজয় মেহরার ১০৯ রাণ এবং সেলিম দুরানীর ৭৫ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেহরা ১৭টা বাউন্ডারী করেন। দুরানী ১৩৫ মিনিট খেলে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিমায় যে ৭৫ রান করেন তার মধ্যে ছিল ৮টা বাউন্ডারী এবং ২টো ওভার বাউন্ডারী। মঞ্জরেকারের বলে তিনি যে ওভার বাউন্ডারী করেন সে রকম উঁচু ধরণের মার নাকি ফিরোজ শা কোটলা মাঠে কেউ ইতিপূর্বে দেখেননি। এইদিনে বোরদে ৫৯ রানে ৩টে উইকেট পান।

চতুর্থদিনে অর্থাৎ শেষদিনের খেলায় রাষ্ট্রপতির একাদশ দলের ৩৪৫ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বোরদে দলের পক্ষে সর্বাধিক ৬টা উইকেট পান ১৩০ রান দিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দল যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে তখন আর ২২৫ মিনিট খেলার সময় হাতে ছিল এবং তাদের খেলায় জয়-লাভের জন্যে ৩৫৩ রানের প্রয়োজন ছিল। এই সময়ের মধ্যে এই রান করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের খেলার সূচনায় বিপর্যয় দেখা দেয়। দলের মাত্র ৮৪ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট পড়ে যায়। দলের এই বিপর্যয়ের মুখে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট ধরে খেলে যান মনমোহন সুদ।

পঞ্চম উইকেটের জুটিতে রমেশ সাক্সেনার সঙ্গে দলের ৭১ রাণ এবং ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে বিজয় মঞ্জরেকারের সঙ্গে দলের ৮০ রান তিনি যোগ করেন। সুদ ১১৫ মিনিট উইকেটে খেলে তাঁর ১০৮ রান করেন বাউন্ডারী ছিল ১৫টা। নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের ৯টা উইকেট পড়ে ২৮৭ রান দাঁড়িয়েছে, এবং তখনও তাঁরা রাষ্ট্রপতির একাদশ দলের থেকে ৬৫ রানের পিছনে আছে।

রাষ্ট্রপতির একাদশ দলের অধিনায়ক ছিলেন পলি উমরীগড় এবং প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের বিজয় মঞ্জরেকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চারজন ফাস্টবোলার এই প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির একাদশ দলে ছিলেন লিস্টার কিং এবং রয় গিলক্রিস্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর দলে ছিলেন চেণ্টার ওয়াটসন এবং চার্লস স্টেয়ার্স।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি দল

এম সি সি দলের অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ হ'তে চলেছে। সফরের শেষ খেলা (সিডনির পঞ্চম টেস্ট) আরম্ভ হয়েছে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে। ছাপাখানায় শেষ লেখা দেওয়ার সময় পর্যন্ত পঞ্চম টেস্ট খেলা শেষ হয়নি। ১৯৬২-৬৩ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের তালিকায় এম সি সি দলের খেলা ছিল ২৭টা। অনুষ্ঠিত ২৬টা খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : এম সি সি'র জয় ১২, পরাজয় ৩ এবং ড্র ১১। চারটে টেস্ট খেলার ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের জয় ১, অস্ট্রেলিয়ার জয় ১ এবং খেলা ড্র ২। এই অবস্থায় পঞ্চম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেলে, অস্ট্রেলিয়ার হাতেই কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' সম্মান থেকে যাবে।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এম সি সি দল বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর একাদশ দলের এক দিনের খেলাটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মহলে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মাত্র দু'জন খেলোয়াড়ের উপর—প্রধানম[ন্ত্রীর] একাদশ দলের অধিনায়ক স্যার ডো[ন] ব্র্যাডম্যান এবং এম সি সি [দলের] এ্যালেক বেডসার। এ'রা ক্রিকেট [খেলা] থেকে অনেক দিন আগে অবসর [গ্রহণ] করেছেন। তবুও তাঁদের খেলা স[ম্পর্কে] ক্রিকেট অনুরাগীদের আগ্রহ এ[তটুকু] হ্রাস পায়নি।

দীর্ঘ পনের বছর পর ব্র্যা[ডম্যান] বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাঠে [খেলতে] নামেন। কিন্তু ব্র্যাডম্যান দর্শ[কদের] নিরাশ করেন। তিনি বেশীক্ষণ উ[ইকেটে] ছিলেন না; মাত্র পাঁচটা বল [খেলে] পাঁচ রাণ করেছিলেন। প্রথম [বলে] বাউন্ডারী, তারপর এক [...] ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার স্ট্যাথামের দ্বিতীয় বলেই তিনি আউট হ'ন। এ্যালেক বেডসারে[র সঙ্গে] ব্র্যাডম্যানের খেলা দেখাই ছিল দ[র্শকদের] উদ্দেশ্য। কিন্তু সে আশা পূরণ [হয়নি]। এই খেলাতে এ্যালেক বেডসার [পেয়ে]ছিলেন মাত্র একটা উইকেট [...] দামী উইকেট—অস্ট্রেলিয়ার [...] রিচি বেনো তাঁর বলে আউট ছিলেন।

এম সি সি প্রথম ব্যাট ক[রে ...] মিনিটের খেলায় ২৫৩ রাণ [...] কেটে) তুলে প্রথম ইনিংসের [সমাপ্তি] ঘোষণা করে। দলের সর্বোচ্চ [রাণ] করেন ডেভিড শেফার্ড। ৭৫ [...] তিনি এই ৭২ রাণ করেছিলেন [...] মন্ত্রীর একাদশ দলের প্রথম [ইনিংস] ২৫০ রাণে শেষ হ'লে এম [সি সি] ৩ রাণে জয়লাভ করে। প্রধ[ানমন্ত্রীর] একাদশ দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রা[ণ করে] ছিলেন রিচি বেনো (৬৮ রাণ)।

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় [...] বেশীদিন বেডসারের বিপক্ষে [...] নি—মাত্র দুটো টেস্ট সিরিজ [...] ৪৭ ও ১৯৪৮)। বেডসার টেস্ট [...] খেলায় ইংল্যাণ্ড দলে প্রথম [...] ১৯৪৬ সালে। এদিকে ১৯[...] ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরি[জ ...] ব্র্যাডম্যানের শেষ টেস্ট খেলা। [...] সালের প্রথম ও দ্বিতীয় টে[স্টের] প্রতি ইনিংসে বেডসারের বলে আউট হয়ে তাঁর নামের সঙ্গে [...] নামটাও সারা দুনিয়ার ক্রিকে[ট ...] ছড়িয়ে দেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৩শ সংখ্যা, মূল্য—৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 1st March, 1963
40 Naya Paise.

বিগত সপ্তাহের আরম্ভে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর ও জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এবং কলিকাতায় রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইড়ু যথাক্রমে জাতীয় সংসদের ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর যৌথ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ আরম্ভ হইলে সামান্য কয়েকজন লোহিয়া সমর্থক সমাজতন্ত্রী জিদ ধরেন যে, ভাষণ হিন্দীতে দিতে হইবে। সেই দাবী রক্ষিত না হওয়ায় ঐ দলের চারিজন সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া যান। রাষ্ট্রপতির আবেদনও তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। এরূপ উদ্ধত ও অসৌজন্যপূর্ণ আচরণ ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে নাই। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন সদস্যদের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতির নিকট দুঃখ প্রকাশের জন্য এবং ইহাও জানাইতে বলেন যে, এই আচরণ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে।

এ-বিষয়ে বিশেষ মন্তব্যের প্রয়োজন নাই, তবে এই মহাশয় ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের সমর্থক বুদ্ধিমানগণকে সহজ ভাষায় বুঝান প্রয়োজন যে, যে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন তাঁহারা দেখিতেছেন তাহা কোনদিনও বাস্তবে পরিণত হইবে না যদি এইরূপ উদ্ধত ব্যবহারে তাঁহারা অহিন্দীভাষীদিগের মনে হিন্দীবিমুখতা জাগ্রত করেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে হিন্দীর একমাত্র গুণ ইহার আপেক্ষিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অর্থাৎ অন্য বারটি ভাষার কোনটিই এত লোকের মাতৃভাষা নয়। কিন্তু সারা ভারতের বিয়াল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে অধিকাংশের ভিন্ন মাতৃভাষা। যতদিননা তাঁহাদের সকলে বুঝিবেন যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে অগ্রাধিকার দিলে তাঁহাদের সন্তানদিগের উপর কোনও অন্যায্য ভার পড়িবে না এবং যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাঁহাদের সন্তানগণের অন্যায়ভাবে—শুধু মাতৃভাষার দরুণ—অধিকারপ্রাপ্তি ঘটিবে না ততদিন রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর অগ্রাধিকার ও একাধিপত্যের চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। বর্তমানে যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তাঁহাদের অধিকাংশই মনে করেন যে এইরূপ জিদ ও জিগীরের পিছনে যে উদ্দেশ্য তাহা শুধু অসৎ নহে উপরন্তু তাহার সাফল্যে অহিন্দীভাষীর ব্যাপক অমঙ্গলের সম্ভাবনা যথেষ্ট। অন্যদিকে হিন্দী এখনও ইংরাজীর তুলনায় অপরিণত ও অনুন্নত রহিয়াছে সেদিকে এই উগ্রপন্থীদিগের চিন্তা নাই। তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিচারে হিন্দীর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই—শুধু জিগীরের জোরেই জয়লাভ নিশ্চিত!

রাষ্ট্রপতি বলেন যে, জাতির প্রধান ও প্রথম কর্তব্য তাহার স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা। কোনও দেশ বা জাতি এই মহান কর্তব্য পালনে যদি অসমর্থ বা পরাঙ্মুখ হয় তবে সেই জাতির জীবনে সবকিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এবং সেই কারণে বর্তমানে আমাদের প্রথম কর্তব্য চীনের এই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণকে সবলে প্রতিহত করা। আমরা শান্তির পথে ভারত-চীন বিরোধের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত কিন্তু ভারত কথনই অপরের বলদৃপ্ত সামরিক হুঙ্কারের সম্মুখে মাথা নত করিবে না এবং করিতে পারে না।

তিনি বলেন যে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতিতে ভারত রাষ্ট্রের ও ভারতীয় জাতির সকল প্রয়াস সমস্ত সামর্থ নিয়োজিত করিতে হইবে। ভারতের এই দুঃসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যে দ্রুতগতিতে আগাইয়া সাহায্য দান করিয়াছেন সেই জন্য রাষ্ট্রপতি ঐ দুই রাষ্ট্রের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলির সম্প্রসারণের উপর তিনি জোর দেন। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধের প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, আমাদের সরকারের বিবেচনায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতির জন্য তৃতীয় যোজনার অনেকাংশই অপরিহার্য। উহা প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতির বিষয়েও অত্যাবশ্যক একথাও রাষ্ট্রপতি জানান। সবশেষে উপনিষদের মহান বাণী "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত" নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া তিনি ভাষণ শেষ করেন। ভাষণ তাঁহার স্থির প্রজ্ঞার অনুযায়ী ও ব্যক্তিত্বের উপযুক্তই হইয়াছিল।

রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইড়ু বলেন, চীন অধিকৃত অঞ্চলগুলির পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই। এই যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থায় দেশবাসীকে বিলাস ও আলস্যপূর্ণ আরাম ত্যাগ করিতে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন যে, প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অর্থসংস্থানের জন্য দেশবাসীকে অতিরিক্ত করভার বহন করিতে হইবে। তিনি তাঁহার বিশ্বাস জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সকল কঠোর ভার ও দুঃখ স্বেচ্ছায় ও সাহসের সহিত বহন করিবেন।

রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ভাষণ সময়োচিত ও যথাযথ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের জনগণের উপর যে ভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে ও হইবে তাহা সর্বত্র সমতার সহিত অর্পিত হইতেছে কি? যদি এই জরুরী অবস্থা দীর্ঘদিন থাকে তবে সাধারণের সহ্যশক্তি ও মনের বল যাহাতে অটুট থাকে সে বিষয়ে সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

ধুলো পড়ে

বিষ্ণু দে

এখানে সমুদ্র নেই. পশ্চিমের ধূসর শহরে,
জল নয়, ধুলো পড়ে. সকালে. বিকালে.
সারা রাত। ধুলো পড়ে. দুপুরের ঝড়ে
ঘরে ও বাইরে. পথে ছাতে জানলায় সার্শিতে
ধুলো ওড়ে. ধুলো পড়ে. পাতা নড়ে বটে. পড়ে ওড়ে
সারাদিন। রাত্রে শুধু ধুলো পড়ে, পাতাও নড়ে না।

তারই মধ্যে প্রাণের প্রতীক সুন্দরীরা. মধ্যে ক্ষামা
না হলেও কাঁধ-ছাঁটা পেট-কাটা জামার আশ্রয়ে
ঝক্ঝকে টকটকে মুখ দেখে প্রবল আলোতে,
ক্ষয়িষ্ণু মাটির দেশে পুরুর প্রাসাদে যত প্রাণের প্রতিমা
ধুলায় প্রাচীন পাণ্ডু আঁধিয়ার ধূসর আর্শিতে,
যায় যত বণিকের কত রাজনীতিকের বড় বড় কেরাণির
চর্বচোষ্য খানাতে বা নিরামিষ ফল-ঘাঁটা পানাতে পিনাতে।

ধুলো পড়ে ব্যবসায় কাজে কর্মে আয়ের খাতায়.
ধুলো পড়ে মগজে হৃদয়ে ধূর্তে, এমন কি সদ্য সদ্য বইয়ের পাতায়
এখানে সমুদ্র নেই জরিষ্ণুর জনপদে, ঊষর শহরে।
অথচ যখনই দিবা দ্বিপ্রহরে কয়েক মুহূর্তে
চুপচাপ চেয়ে থাকি টিফিনের আগে কিংবা পরে,
চোখে ভাসে নীল জল, শান্ত স্নিগ্ধ তরল চঞ্চল
ঊর্মিল আবেগে আসে চৈতন্যের পাড়ে পাড়ে
শীতল বিস্তারে ধুয়ে দিয়ে যায়, আসে পুনরালিঙ্গনে,

মনে মনে ভিজে যাই মুক্তিস্নানে, শুচি নগ্নতায়।
এমন কি গরম হাওয়ায় নিশ্বাসে নিশ্বাসে
সজল আশ্বাস পাই, যেন তাল-তমালের বনরাজি নীলা
ছায়া দেয়, এখানেও, দেহে মনে, এখানেই দেয়, আজই।
হয়তো বা প্রাচীন কালের সেই সমুদ্রের গণ্ডোয়ানা স্মৃতি
জাগে এই দগ্ধ দেশে, হয়তো বা আসে ধূলিমগ্ন দেশে
সমুদ্রের পরাক্রান্ত দূর ভবিষ্যৎ. দূরে সজল আকাশ,
ভূগোলের বন্যা রূপান্তরে আনে অন্য ইতিহাস।
আর, আমার চৈতন্য জেগে ওঠে সমুদ্র-শীকরে,
যেমনটি জাগে মহাবলী পঞ্চপাণ্ডবের রথ শতকে শতকে,
অথবা যেমন ব্যাপ্ত কোণে কোণে উষ্ণ স্নিগ্ধ
প্রাণময় সূর্যের মন্দির বাংলার সমুদ্রের দক্ষিণা বাতাসে।
রোমে রোমে সমুদ্রের হাওয়া পাই কালদগ্ধ ধূসর শহরে॥

জৈর্মিন

গত সংখ্যার 'অমৃতে' শেয়াল পোষ-মানানোর খবর প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ-বিচিত্রা বিভাগে। সঙ্গে ছবিও আছে। কাজেই ব্যাপারটা প্রতীক কিংবা ফিগার অব স্পীচ বলে গ্রহণ করার উপায় নেই। রীতিমত জ্যান্ত শেয়াল। এবং সংসারের অন্যান্য শেয়ালের মতো ইনিও গৃহস্থের হাঁস-চুরিতে পারঙ্গম ছিলেন একদা, তাও জানা যাচ্ছে।

কোনো ঘটনাই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার বাইরে নয়। যেমন, আমাদের পা ফসকায় বলে আমরা পড়ে যাই, পড়ে যাই বলে আমাদের ব্যথা লাগে, ব্যথা লাগে বলে আমরা চ্যাঁচাই, চ্যাঁচাই বলে ডাক্তার ডাকা হয়, ইত্যাদি। সেই রকমই মনে করা যায় - আমাদের বাড়িতে হাঁস থাকে বলেই শেয়াল আসে, শেয়াল আসে বলেই তাকে আমরা ধরি, ধরা হয় বলেই তাকে পোষ-মানানো সম্ভব হয়, এবং পোষ-মানানো সম্ভব বলেই তার ছবি ছাপানো চলে।

পাঠক! আমার এ ধরণের যুক্তিকে আপনি ভাঁড়ামি মনে করবেন না। সাহিত্য-গুরু ভলতেয়ার তাঁর একটি চরিত্র ডাক্তার প্যাংগ্লস-এর মুখ দিয়ে এধরণের কার্য-কারণের কথা অবতারণা করেছিলেন একদা। তাতে, যতোদূর মনে পড়ে, এই রকম কয়েকটি উক্তি ছিল—পাথরের সৃষ্টি হয়েছে বাড়ি তৈরি করার জন্যে, কাজেই আমরা পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরি করি, ছাগবৎসের সৃষ্টি হয়েছে আমাদের আহারের জন্যে, কাজেই আমরা পাঁঠা ইত্যাদির মাংস আহার করি; আমাদের পায়ের সৃষ্টি হয়েছে মোজাপরার জন্যে, কাজেই আমরা মোজা পরি!......ইত্যাদি। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কথাগুলোর মধ্যে যুক্তি আছে বই কি!

সে যুক্তিটা হল, মানুষের প্রয়োজন-বোধ। মানুষের যা দরকারে লাগে, অবলীলাক্রমে তা সে করতে পারে। এবং নিজের দরকারে মানুষ যা করে তাই যুক্তিসঙ্গত।

শেয়ালের কথা থাক, আরো যেসব জন্তু-জানোয়ার পোষ মানিয়েছে মানুষ, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই দেখবেন
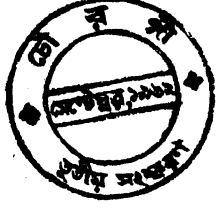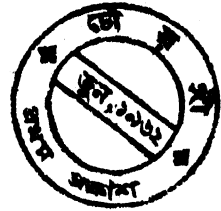
তার দরকারটা যেমন বিস্ময়কর রকম জটিল তেমনি বিচিত্র।

গরু-ঘোড়া-কুকুর-হাতি এসব জন্তুর কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কিছু-না-কিছু কাজ মানুষ তাদের কাছে আদায় করে নেয়ই। ঠিক সেইভাবেই দেখা যায়, ভালুক-বাঁদর-বাঘ-সিংহও মানুষ বৈষয়িক প্রয়োজনেই পোষমানায়। কিন্তু কাঠবিড়ালী বা কুমির কি সীল মাছ এগুলো পোষার খুব স্পষ্ট কোনো মানে নজরে পড়ে না চট করে।

এক্ষেত্রে বুঝতে হবে, পোষাটাই হল প্রধান দরকার। অর্থাৎ অন্যকে স্ববশে আনা, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা—এইটেই হল প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো কোনো মানুষের এই প্রেরণাটা একটু বেশি রকমের প্রবল হয়। তখন তাঁরা পোষানোর ফাঁদে পড়ে যান। অর্থাৎ তখন তাঁদের এমন অবস্থা ঘটে যে দেখে মনে হয়, তাঁরা কাউকে পোষ-মানাচ্ছেন না, জীবজন্তুগুলোই যেন তাঁদের পোষ-মানাচ্ছে।

আর শুধু কি অন্য প্রাণীর হাতেই মানুষের এই দুর্দশা? মানুষকে পোষ-মানাতে গিয়েও কি মানুষ কম নাজেহাল হয়? আর্য রক্তের দেমাকে সারা ইউ-রোপকে পোষ মানাতে গিয়ে হিটলার কী রকম লড়াই-ক্ষ্যাপা হয়ে উঠেছিল সে তো আজ ইতিহাসের বিষয়। ছোটো-খাটো এমন ঘটনা আমাদের চারপাশেও কম ঘটছে না।

ধরুন না এই হিন্দীর ব্যাপারটা।

সকলেই জানেন, হিন্দীভাষাকে একচ্ছত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে একদল মানুষ দিশেহারা হ'য়ে উঠেছেন সম্প্রতি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এঁরাও এক ধরণের পোষ-মানানোর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভুগছেন। তাবৎ ভারতবর্ষকে স্ববশে আনতে হবে, ভারতের সমস্ত ভাষার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এই হল এঁদের সুখস্বপ্ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁরা জানেন না যে হিন্দীকে যতো অবলা-সরলা ভাষা মনে ক'রে এঁরা শিভালরী দেখাচ্ছেন, হিন্দী ঠিক ততো নিরীহ বস্তু নয়। এক্ষেত্রে এঁরা যা মনে করছেন, ব্যাপার ঘটছে ঠিক তার বিপরীত। এঁদের ধারণা, হিন্দীকে পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে এঁরা খেল দেখাচ্ছেন, অথচ আসলে কিন্তু হিন্দীই এঁদের নাকে দড়ি দিয়ে খেল দেখাচ্ছে।

ঠিক যেন আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যটা, ফরমাজ না করতে পারলে স্বয়ং প্রভুরই যে ঘাড় মটকাতো।

অতএব, ভারত-সীমান্তে চীনা সৈন্য এখনো যদি ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে তো থাকুক, ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় সংহতি যদি ভিতশুদ্ধ টলে ওঠে তো উঠুক, হিন্দীর মনস্তুষ্টির জন্যে যতোরকম সার্কাসের খেলা জানা আছে কোনোটাতেই হিন্দীভক্তরা পিছ-পা নন আজ। কারণ—

কারণ আর কী? হিন্দী তাঁদের কাঁধে-চড়া ভূত, বহু ভাষা-ভাষী এই ভারতবর্ষে একটা দক্ষযজ্ঞ না বাধানো পর্যন্ত তাঁদের অব্যাহতি নেই যেন! আর সেই নাটকেরই ড্রেস রিহার্সেল হ'য়ে গেল লোক-সভাতেও।

তবে লোকসভায় যা ঘটেছে সকলেই তার জন্যে বিচলিত, একটা ব্যবস্থা হয়তো হবেই। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে বোধহয় অন্যত্র। কিছুকাল আগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের রাষ্ট্রনেতাদের কাছে হিন্দীকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রমের অন্যতম শিক্ষণীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে যে অনুরোধ জানানো হয়েছে, চরম প্রহসন লুকিয়ে রয়েছে তারই মধ্যে। ভাবখানা যেন এইরকম যে, রাতারাতি ইংরেজির বদলে হিন্দী চাপানোর জন্যে জুলুম করছি না তো ভাই, শুধু ইংরেজি আর তোমাদের মাতৃভাষার পাশে একটু বসবার ঠাঁই চাইছি, তার বেশি নয়। কেন? না, ভারত যে বহু ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও একজাতি হিসেবে সংহত, তার প্রমাণ দিতে হবে না? এক রাজ্যের মানুষে যদি অন্য রাজ্যের ভাষা না শেখে সংহতির রঙটা তাহলে টেকসই হবে কী করে? বেশ কথা। কিন্তু হে হিন্দী প্রেমিক, তোমরাও কি কেউ বাংলা-ওড়িয়া-অসমীয়া শিখবে?...নৈব নৈব চ. ওসব শিখে তাঁরা সময় নষ্ট করতে রাজি নন। হিন্দীর গদা ঘুরিয়েই তাঁরা সম্মুখ-যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে যাবেন অনায়াসে, আমাদের মতো হিন্দী-বাংলা-ইংরেজি-সংস্কৃতের চতুরঙ্গ বাহিনী সাজিয়ে বলসঞ্চয় করতে হবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, পিছনের দরজা দিয়ে এই হিন্দী কায়েম করার অপচেষ্টাতে কি আমরা সায় দিয়ে বসব সহজেই? জীবনের প্রথম পনের বছরের মধ্যেই চারটি ভাষায় পারংগম হওয়ার চতুরালি আর যারই থাক বাঙালী ছাত্রের নেই। এবং নেই ব'লে তাদের লজ্জিত হওয়ারও কারণ নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হত হরবোলা পাখির মতো ভাষা কপচানো, তাহলে চারটে কেন, দশ টাকার নোটের মতো চৌদ্দটা ভাষার ছাপ কপালে আটলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বিপদ এই যে, ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করতে করতে অন্য সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় যদি আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়তে থাকে তাহলে সেই শূন্যস্থানে সরস্বতী তো বটেই লক্ষ্মী-দেবীও তাঁর করুণাকণা বর্ষণ করবেন না।

জানিনে, আমরা মূর্খ হ'য়ে থাকি এইটেই আমাদের নব-চতুষ্পাটির প্রধান উদ্দেশ্য কিনা। মূর্খ, এবং সেই সঙ্গে পোষ-মানা।

কিন্তু আমরা তো কারো হাঁস মারতে যাইনি, আমাদের সঙ্গে এভাবে শেয়ালের মতো ব্যবহার করা কেন?

নাকি ও'রা আয়নায় মুখ দেখছেন!

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এ বছর বাঙলা সাহিত্যে
আকাদমি পুরস্কার পেয়েছেন
প্রখ্যাত সাহিত্যিক
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
তাঁর রচিত
'জাপানে'
গ্রন্থখানির জন্য

"অন্নদাশঙ্কর একজন বিরল সাহিত্যিক যার সান্নিধ্যে গিয়ে বসলে আধ্যাত্মিকতার একটা সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। একটি মৌন মহত্ত্ব যে তার চিন্তায় তা যেন স্পষ্ট স্পর্শ করি। কোনো কথা না বলে তাঁর কাছে চুপ করে বসে থাকাটাও অনেক কথা-ভরা। আত্মার সঙ্গে আত্মার যখন কথা হয় তখনই মহৎ আর্ট জন্ম নেয়। অন্নদাশঙ্কর সেই মহৎ আর্টের অন্বেষক। সাহিত্যের আদর্শ তার এত উঁচু, যা তার আয়ত্ত, অধিকৃত তাতে সে আপ্তকাম নয়। জীবনে সে স্বচ্ছ ও শান্ত হতে পারে, কিন্তু সৃজনে সে অপরিতৃপ্ত। এমনিতে সহজ গৃহস্থ মানুষ, কিন্তু আসলে সে বন্দী প্রমিথিউস।"—এই কথা কটিতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটা রেখাচিত্র এঁকেছেন তাঁর "কল্লোল যুগে"। যাঁরা অন্নদাশঙ্করের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর জীবন ও কর্মের সঙ্গে সুপরিচিত, অচিন্ত্যকুমারের উক্তি তাঁদের কাছে অত্যুক্তি মনে হবে না। পরিচিত ব্যক্তির সুনিপুণ রেখাচিত্র হিসাবেই স্বীকৃত হবে।

এই অন্নদাশঙ্কর। ক্ষীণদেহ কিন্তু প্রচুর প্রাণশক্তির অফুরন্ত আধার। স্থির, স্থিতধী অথচ অশান্ত এবং চঞ্চল। নম্র, ভদ্র অথচ তেজস্বী ও কঠোর। স্পষ্টবাক, শুদ্ধ-বিবেক, সাহিত্যিকের যা স্বধর্ম, পূর্বসূরীরা যে পথে চলেছেন সেই পথ অন্নদাশঙ্করের। মতলবহীন, স্বার্থহীন কর্মেই তাঁর আসক্তি, প্রচার ও প্রসারে তিনি নিশ্চেষ্ট।

অন্নদাশঙ্কর যখন আই. সি. এস-এ সাফল্য লাভ করে স্বদেশে এলেন, তখন ইংরাজ আমলের জমাট হাট। পুরোপুরি সাহেব হয়ে যাওয়ার কোনো বাধা ছিল না অন্নদাশঙ্করের। মনের দিক থেকে তিনি অবশ্য যুরোপীয়, তিনি যুরোপীয় এই অর্থে যে যুরোপের অগ্রগতি, শিক্ষা, সংস্কারহীন সমাজজীবন তিনি পছন্দ করেন। স্বদেশবাসীর নানাবিধ সংকীর্ণতা তাঁর অন্তরকে পীড়িত করে তোলে। তাই অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদে প্রখর হয়ে ওঠেন। যাঁরা তাঁকে জানেন, অন্নদাশঙ্করের বক্তব্য তাঁদের কাছে গভীর অর্থপূর্ণ। এক হিসাবে এক নিমজ্জমান যুগধর্মের প্রতি হংসস্বারী এটা বোঝা যায়। আর যাঁরা জীবনের স্থূলে দিকটাই ভালো বোঝেন, যা নগদ পাওয়া যায় তার দিকেই যাঁদের আগ্রহ প্রচন্ড, তাঁদের পক্ষে অন্নদাশঙ্করকে বোঝা কঠিন; তাঁরা ক্ষেপে ওঠেন। এমন হয়েছে বার বার, কিন্তু যেটা অন্যায়, যেটা তাঁর সত্য বলে মনে হয়েছে, তিনি সেই দিকে। তার ফল ভালোই হোক আর মন্দ হোক। একখানি ব্যক্তিগত পত্রে তিনি লিখেছেন—

"দীর্ঘকাল উজানে সাঁতার কেটেছি, চলতি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিইনি। আমার অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি আমি সংরক্ষণ করতে চাই সেই শক্তিসাধ্য কাজের জন্য, যে কাজের জন্য আমি জন্মেছি। যে কাজ করে না যেতে পারলে আমার জন্ম বৃথা।" (দর্পণ—১৫-২-১৯৬৩)।

অন্নদাশঙ্করের চরিত্র এই পত্রাংশে পরিস্ফুট। পরিমিত এবং পরিচ্ছন্ন তাঁর ভাষা অথচ সেই ভাষার মধ্যে তীক্ষ্ণতার অভাব নেই। পুরুষোচিত বলিষ্ঠতার সঙ্গে একটা ভদ্র সংযত বিনয়ী বৈদগ্ধ্য অন্নদাশঙ্করের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

তিনি উচ্চ রাজকর্মচারী হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। সাহিত্যে তিনি প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকেই প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি অহংকারকে অলংকার হিসাবে ব্যবহার করলে নেহাৎ বে-মানান হত না হয়ত,

আসনে উপবিষ্ট : (দক্ষিণ থেকে বামে) শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়।
পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁদের কনিষ্ঠা কন্যা

কিন্তু অন্নদাশঙ্কর অন্য জাতের মানুষ। মানুষই তাঁর কাছে বড়, তার খ্যাতি প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাকে তিনি বিচার করেন না। তাই, ক্ষমতাশালী আর অক্ষম, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকও তাঁর কাছে সম্মানভাজন। বহু ব্যক্তি প্রতিদিন তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে পত্রাঘাত করেন, নানা উদ্দেশ্য সেই সব চিঠির। নানা রকমের প্রশ্ন আর সমস্যায় কণ্টকিত। অন্নদাশঙ্কর পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে পরিচিত অপরিচিত সব পত্রলেখককেই জবাব দিচ্ছেন, আর সেই জবাব রবীন্দ্রনাথের মতো অতিশয় তৎপরতার সঙ্গেই পত্রদাতার হাতে এসে পড়ছে। ঠিক জানি না, স্বয়ং অন্নদাশঙ্করও বলতে পারবেন না, এ যাবৎ কত লিখেছেন এবং সেই সব চিঠিতে কি কি বিষয় আলোচিত।

চট্টগ্রামে থাকার সময় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের পরিচয় ঘটে। এঁদের অবস্থা অতিশয় সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে দেশবিভাগের পর। অন্নদাশঙ্করের মনে উদ্বেগের সীমা নেই, তিনি ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে লিখছেন—

"তোমাদের জন্য আমি উদ্বেগ বোধ করছিলুম। আমার স্ত্রী তো অনুতাপ করছিলেন, তোমাকে ওখানে থেকে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে। তোমার চিঠি পেয়ে আমি দুর্ভাবনা থেকে ও অনুতাপ থেকে মুক্ত। তোমাদের প্রতিবেশীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ভালোলোক, সব জায়গায়, সব সম্প্রদায়ে আছেন, তাঁদের ওপর নির্ভর করতে হবে—তোমরা পাকিস্তানে থাকবে বলে মনস্থির করো। আর সব ছেড়ে দাও মঙ্গলময়ের উপরে। তিনি যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। মাকে আমার শ্রদ্ধা নমস্কার, ভাইবোনকে আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ো। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে তোমাদের কুশলবার্তা দিয়ো। রবীন্দ্রনাথের সাধনা, গান্ধিজীর সাধনা ব্যর্থ হবার নয়।" (পত্রাংশ... বৈতানিক—বৈশাখ, ১৩৬৯)।

এই চিঠিখানি সুদীর্ঘ। সমস্ত চিঠিখানির মধ্যে ব্যক্তি অন্নদাশঙ্করের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এই পত্রাধিকারীর জন্য, সব মানুষের জন্যই অন্নদাশঙ্করের মনে সেই উদ্বেগ ও আকুলতা। মহৎ শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার অন্তরালে যে ব্যক্তিসত্তা তা জীবনের জয়গানে মুখর। সেখানে হতাশা নেই, আছে গভীর প্রশান্তি। তাঁর সাহিত্যে জীবনের গভীরতর দিকটাই তাই স্পষ্ট। অসাধারণ প্রজ্ঞা-দৃষ্টির অধিকারী হয়েও অন্নদাশঙ্কর তাঁর গল্প বা উপন্যাসকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি। 'আপন হতে বাহির হয়ে' বাইরে দাঁড়িয়ে জীবনদর্শন তাঁর ব্রত নয়, তাই তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম। অচিন্ত্যকুমারের কথায় "যা তার আয়ত্ত, অধিকৃত তাতে সে আপ্তকাম নয়।" জীবন ও মনোজগতের গভীরতর রহস্য সন্ধানে তিনি অভিযাত্রী। অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকর্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য, কিন্তু নীরস দার্শনিক তত্ত্ব নয়। হৃদয় সেখানে নির্বাসিত নয়, অন্তর্নিবেশের ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ, সাহিত্যে তা পরিপূর্ণরূপে তাই রূপায়িত করেছেন তিনি। দুঃখ-বেদনা-মৃত্যুরহিত এক অপূর্ব আনন্দলোকের বার্তা এনেছেন অন্নদাশংকর, সে তাঁর নিজস্ব জগৎ, তাই তার অনির্বচনীয় মাধুর্যে পাঠকচিত্তকে তিনি জয় করতে পেরেছেন। শূন্যে প্রাসাদ রচনায় প্রয়াসী তিনি নন, চটকদার উচ্ছ্বাস ও মাদকতায় তিনি বিশ্বাসী নন, গতানুগতিকতার পথ তাঁর নয়, এইখানেই তিনি অনন্যসাধারণ হয়ে আছেন।

এই প্রবন্ধ তাঁর সাহিত্য-বিচারের প্রয়াস নয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম বিরাট, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা ও ছড়া সবদিকেই তিনি বৈচিত্র্য এনেছেন। এবং একটা সুস্পষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। সংস্কারমুক্ত চিন্তার সঙ্গে অপরিসীম বৈদগ্ধ্যের সংমিশ্রণে এখনও দীর্ঘকাল তাঁর সারস্বতকর্ম অব্যাহত থাকবে। বিশশতকের এই বিশিষ্ট বঙ্গ-সন্তানকে আমরা শ্রদ্ধা করি। আগামী ১৫ই মার্চ তাঁর জন্মদিন, প্রার্থনা করি তিনি শতায়ু হোন, বিরামবিহীন সাহিত্য-সাধনায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন।
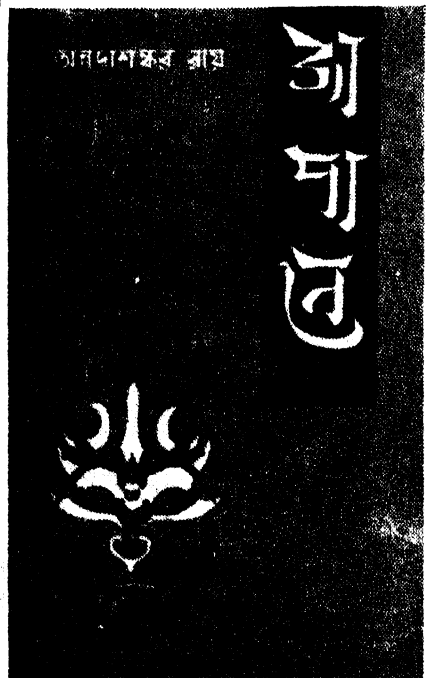
॥ প্রধান অতিথি ॥

সভা-সমিতিতে যাই না, আর প্রতি-দিনের করণীয় কর্মসূচীও লিখে রাখি না। প্রথমটার ফলে অনেক দায় বাঁচে, দ্বিতীয়টার ফলে কাজে অনেক ভন্ডুল হয়।

একবার এই দুইয়ের বেশ একটা যোগাযোগ ঘটেছিল।

বছর ছয়-সাত আগের কথা। অফিসের কাজের এক ফাঁকে দক্ষিণাদার ঘরে গিয়েছিলাম। দক্ষিণারঞ্জন বসু—কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক। মাঝে-সাজে যাই, চা খাই, গাল-গল্প করি। তিনি অনুজের মত স্নেহ করেন, বন্ধুর মত ভালও বাসেন।

ঘরে ঢুকেই দেখি তিনি আক্রান্ত। জনা চার-পাঁচ ভদ্রলোক তাঁকে ছেঁকে ধরেছেন। এক মুহূর্তে ব্যাপার বোঝা গেল। কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করার বা প্রধান অতিথি হবার আমন্ত্রণ। ভদ্রলোকদের অবুঝ আবেদন, আর সেই নির্দিষ্ট দিনে অন্যত্র আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ফলে দাদার নিরুপায় আত্ম-রক্ষার চেষ্টার মাঝখানে আমি গিয়ে পড়েছি। ঠিক দু'মিনিটের মধ্যে একটা সন্তোষজনক নাটকীয় ফয়সালা হয়ে গেল। শুধু আমিই বিমূঢ়।

দক্ষিণাদা বরাভয়ের মত করে হাত তুলে বললেন, যাক, হয়ে গেছে—ইনি যাবেন। ইনি গেলে আমিই গেছি ধরে নিতে পারেন।

নাম বলে পরিচয় দিলেন। দু'কথায় আমার গুণাবলীর অতিশয়োক্তি করলেন। আমাকে বললেন, এঁদের মস্ত ফাংশান, আর সেইজন্যেই মস্ত বিপদ। তোমার না গেলেই নয়। আমার চকিত-বিভ্রান্ত দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁদের বললেন, খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেল—আপনারা সময়মত এঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবেন আর পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

সেটা সভাপতি আর প্রধান-অতিথি শিকারেরই কোনো মৌসুম হবে। ভদ্র-লোকদের অবস্থা দেখে মনে হল, সাহিত্যিক ছেড়ে ভবিষ্যতে সাহিত্য করবেন এমন লোক পেলেও তাঁরা ধরে নিয়ে যান। আমার অনুমোদনের আর অপেক্ষা না রেখে দিন তারিখ জানিয়ে এবং দক্ষিণাদার কাছ থেকেই আমার বাড়ির ঠিকানা-পত্র লিখে নিয়ে তাঁরা হাসি মুখে প্রস্থান করলেন। দিন দশেক পরের এক রবিবারে অনুষ্ঠান। রবি-

বারটাই মাটি বলে মন আরো বেশি অপ্রসন্ন হয়েছিল মনে আছে।

মাঝে কতগুলো ব্যাপার ঘটল।

প্রথম ব্যাপার, দিন তিনেকের মধ্যেই নানা কাজের ভিড়ে অনুষ্ঠানের কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে আমার নাম ছাপা সুন্দর কার্ডখানা বাড়ির ঠিকানায় যথাসময়েই এসেছিল হয়ত কিন্তু সেটা আমার তিন বছরের মেয়ের আজব-সংগ্রহের বাক্স থেকে বেরিয়েছে মাস-খানেক বাদে। নির্দিষ্ট রবিবারের দুদিন আগে চিত্র-সম্পাদক মহেন্দ্র সরকার জানালেন, 'অমুক লাইব্রেরি থেকে আপনাকে দু'বার ফোন করেছিল—বলল, শুধু এই বললেই আপনি বুঝবেন।' বলা বাহুল্য কিছুই বুঝিনি, আর, কোনো লাইব্রেরি আমার তখন মাথায় নেই। নতুন লাইব্রেরি থেকে কখনো-সখনো বইপত্রের জন্য চিঠি বা ফোন আসে। ভাবলুম, দু'বার যারা ফোন করেছে, গরজ থাকলে তিনবারও করবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নির্দিষ্ট রবিবারে কাউকে কিছু না বলে আড়াইটের শোয়ে একটা ছবি দেখতে গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য, ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, কি যেন একটা করার ছিল, কি যেন করিনি। ঘুরে-ফিরে বার বার একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি। ছবি জমে উঠতে সে অস্বস্তি কাটল। বেরিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে তাঁদের তাসের আড্ডায় গিয়ে বসলাম। সেখানেও বার কয়েক অজ্ঞাত অস্বস্তিটা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। বাড়ি ফিরলাম রাত প্রায় সাড়ে ন'টায়।

বাইরের ঘরে পা দিতেই এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু। ঘরে বসে তিনটি বিশেষ পরিচিত মূর্তি, আর বাড়ির লোকেরা, আর আমার স্ত্রীও। সকলেরই মুখ শুকনো। সকলেই এক-সঙ্গে সচকিত। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে ওই পরিচিত জনেরা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন, কি ব্যাপার? কোথায় ছিলেন? কি হয়েছিল?

আমি হতভম্ব। স্ত্রী দুই এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝে নিলেন তিনিই জানেন। কাউকে আর একটিও কথা বলার অবকাশ না দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, এখন কথা বলে কাজ নেই, আগে ভিতরে এসো।

হাত ধরে পরদা ঠেলে একেবারে ভিতরের ঘরে নিয়ে এলেন। তারপরেই ভিন্ন মূর্তি। চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আজ তোমার কোনো সভার প্রধান অতিথি হবার কথা ছিল?

কানের কাছে যেন বোমা ফাটল একটা।

পরের সমাচার সংক্ষিপ্ত। সভার লোকেরা বিকেলে গাড়ি নিয়ে এসে-ছিলেন। নেই শুনে তাঁরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছেন। ওদিকে স্বাভাবিকভাবেই সভা আরম্ভ হতে দেরি। শেষে মাইকে কর্মকর্তারা ঘোষণা করলেন এই মাত্র তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন প্রধান অতিথি মহাশয় হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি প্রধান অতিথি জেনে স্থানীয় ওই সুপরিচিত ভদ্রলোক তিনজন ভাষণ শুনতে এসে-ছিলেন। অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁরা বাড়িতে খোঁজ নিতে এসেছেন। তাঁদের মুখে সেখানকার সেই ঘোষণার কথা শুনে বাড়ির লোকও চিন্তিত।

পরদিন অফিসে ওপরতলা থেকে দক্ষিণাদার টেলিফোন, কি ব্যাপার? তোমাকে না পেয়ে তাঁরা আমাকে বাড়িতে টেলিফোন করেছিল—আমি অবশ্য বলে দিয়েছি নিশ্চয় কোথাও গিয়ে অসুখে পড়েছে। কি হয়েছিল?

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, আর বলেন কেন।

লো-প্রেসার নিশ্চয়? কতদিন বলেছি, মাঝে মাঝে প্রেসার চেক কোরো। বউমাকে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলো।

নিজে তিনি লো প্রেসারের রোগী, ফলে কারো লো প্রেসারের সম্ভাবনাতেই ক্ষমাশীল। সভায় অসুস্থতা ঘোষণার কারণ বোঝা গেল। তবু পরদিন আবার টেলিফোন। আমন্ত্রণকারীদের একজন। গলার স্বর ঈষৎ চড়া।—আপনি তো এলেন না?

ঢোক গিলে বললাম, শুনেছেন তো......।

এবারে স্বর একটু নরম। বললেন, হ্যাঁ......আমরা বড় মুশকিলে পড়ে গিয়ে-ছিলাম। এখন কেমন আছেন?

যথাসম্ভব করুণ গলায় বললাম, একটু ভালো।
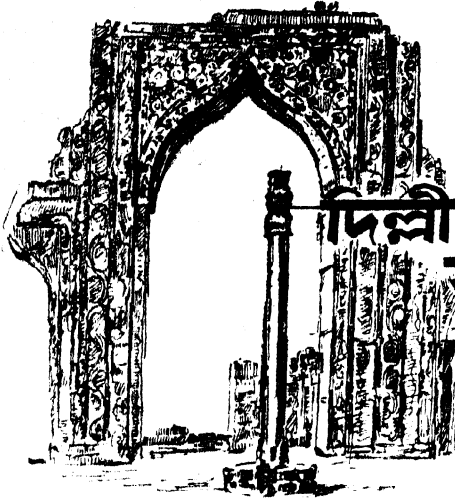
সতী-সাবিত্রী-খনা-লীলাবতী-সীতা-অরুন্ধতীর দেশ ভারতবর্ষে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে স্বামী-বন্দনার কাহিনী বিধবা ঠাকুমা-পিসিমার দৌলতে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে পিতৃ-বন্দনা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে আশে-পাশে স্বামীর কল্যাণ কামনার পুজো-পার্বন-ব্রতপালন কম দেখিনি। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বহু রীতি-নীতির মত স্বামী-কল্যাণ যজ্ঞেরও পরিবর্তন হয়। তাইতো রাজধানী দিল্লীতেও স্বামী-কল্যাণ যজ্ঞের এক নতুন রূপ আছে।

ড্রইংরুমের সোফায় বসে আনন্দ পাবার লোক আমি নই। আমি রান্না-ঘরের ভাতের হাঁড়ির ঢাকনা হয়েই আনন্দ পাই। তাইতো বহু মন্ত্রী-পত্নীদের স্বামী-উপাসনার এক দুর্লভ ও অনন্য দৃশ্য বহু সময় দেখার বা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। চুড়িদার পায়-জামা, সেরোয়ানী ও ধবধবে আনকোরা গান্ধী-টুপি চড়িয়ে মন্ত্রীরা বক্তৃতা করেন, হাততালি পান, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় নাম ছাপান। মধুকুঞ্জের মত তাঁর চারপাশে ঘুরেফিরে বেড়ায় হাজার জন। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! এই এত বড় একটা কর্মকাণ্ডের পিছনে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী—সেই মন্ত্রী-পত্নীর খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না।

হঠাৎ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না করলেও এ-কথা সত্যি যে, পত্নীর পুণ্যে বহু স্বামী রাজনৈতিক জীবনের মোক্ষ-লাভ করে মন্ত্রিত্ব পান। থার্ড জেনারেল ইলেক্‌শন শেষ হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নতুন মন্ত্রিসভা হবে হবে—ঠিক এমনি সময়র কথা বলছি। দুঃসংবাদ হাওয়ায় ভেসে আসে বলে একটা চলতি কথা আছে। এমনিভাবে হাওয়ায় ভেসে এক মহা দুঃসংবাদ এলো বিদায়ী মন্ত্রি-সভার একজনের কাছে। বাতাস যেন তাঁর কানে কানে বলে গেল, এবার আর চান্স নেই। স্বর্গ থেকে আসন্ন বিদায়ের সম্ভাবনায় সারা বাড়ীতে যেন শোকচ্ছায়া পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর রংটাই বোধ করি পাল্টে গেল। দুঃসংবাদ কি আর মিথ্যে হয়! শুনেছি, ক'দিনের মধ্যে স্বয়ং লালবাহাদুর সে বাড়িতে হাজির হয়ে গুজবের সত্যতা জানিয়ে-ছিলেন। তিনি নাকি অনেক করে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন দুঃখ না করার জন্য। শোকাতুর অবোধ মন কি যুক্তি মানে! মন্ত্রী-পত্নী হাউ হাউ করে কেঁদেই ফেলেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি হাল ছাড়লেন না। কাচ্ছা-আঁটা বারো হাত শাড়ী পরে পরের দিন হাজির হলেন এক নম্বর ইয়র্ক প্লেসে। আবেদন-নিবেদন দাবী জানিয়ে ফিরে এলেন মন্ত্রী-পত্নী। কিছুদিন পরে রাষ্ট্রপতি ভবন সার্কুলারে তাঁর স্বামীর নাম অপ্রত্যাশিতভাবে আবার দেখা গেল! কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, দিল্লীর রাজনৈতিক জগতের এমন বেহুলার কাহিনী কেউ জানল না!

এ আর এক বীরাঙ্গনার কাহিনী। ঠিক একই সময়ের কথা। হঠাৎ দিল্লীর বাজারে জোর গুজব চালু হয়ে গেল, উনি আর মন্ত্রী হচ্ছেন না। তবে মন্ত্রিত্বের রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিট হিসেবে গভর্ণর হবেন। ভদ্রলোক ভালভাবেই জানতেন গভর্ণর হওয়া মানেই 'পলিটি-ক্যাল কেরিয়ার'-এর বারোটা বেজে যাবে। তাই যেভাবেই হোক মন্ত্রী থাকতেই হবে। কিন্তু থাকতে হবে বললেই কি আর থাকা যায়? আর তা-ছাড়া 'হু উইল বেল দি ক্যাট'—নেহরুকে বলা যায় কিভাবে! লোকে বলে পত্নীর দৌলতে ইনিও সেবার রক্ষা পেয়েছিলেন।

কড়া মন্ত্রী-পত্নী হিসেবে আলোচ্য মহিলার অশেষ সুনাম। বাজারে মাছের দাম কোনদিন তিন টাকা, কোনদিন বা সাড়ে তিন টাকা। কিন্তু সে-কথা বলার সাহস চাপরাশী-বেয়ারাদের নেই। নিজের গাঁট থেকে পয়সা দিয়ে মন্ত্রী-পত্নীকে হিসেব দিতে হবে, দশ আনা পোওয়া। স্বামী নেহরুর সুনজরে আছেন। কিন্তু তাই বলে কি ইলেক্‌শনের পর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায়! তাঁর সেই চির-পরিচিত অপ্রয়োজনীয় কালচারাল ইনস্টিটিউশনের ধুয়া ধরে নাকি রাধা-কৃষ্ণনের কাছে বার বার যাতায়াত শুরু করলেন।

কলেরা-বসন্ত যে সবারই হবে, তার কোন মানে নেই, তবে টিকা-ইনজেক্‌-শন নেওয়া থাকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। দুষ্টু লোকে বলে মন্ত্রী-পত্নীর ঘোরাঘুরিও টিকা-ইনজেক্‌শনের মত অপ্রত্যাশিত বিপদ এড়াবার প্রচেষ্টা নই আর কিছু ছিল না।

এমনি বহু কাহিনী রাজধানীতে ঘটে থাকে। এইত ক'দিন আগেকার কথা বলছি। আমাদের ধোলা-থাগলা-দৌলত বেগ ওল্ডির পতন ঘটেছে। বিশে-বাইশে অক্টোবরের কথা বলছি। কৃষ্ণ মেননের অবস্থা তখন বিশেষ উৎকণ্ঠাজনক। এদিকে মোরারজী নেশন-ওয়াইড ব্রডকাস্ট করে সোনা চাইলেন জনে-জনের কাছে।

এরই দু'একদিনের মধ্যে এক নম্বর উইলিংডন ক্রীসেন্টে গেছি মোরারজী সন্দর্শনে। জীবনে সোনা প্রায় দেখিনি বললেই চলে, তাই এখানে এসে সোনা দানের হিড়িক দেখে আমার চোখ তো ছানাবড়া। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে আমার এক পাতা-কাটা বৌদিকে দেখে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। দেখলাম, আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন, দুটি মোটা মোটা কঙ্কন খুলে দিলেন। আমার দাদাটি কৃষ্ণ মেননের কৃপায় দিল্লীর মসনদে ঠাঁই পেয়েছিলেন, এ-কথা সবাই জানেন। কথায় বলে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। তাইতো দাদা যেই দেখেছেন, কৃষ্ণ মেনন পড়ো পড়ো, অমনি কঙ্কন দিতে বৌদিকে পাঠিয়েছেন উইলিংডন ক্রীসেন্টে।
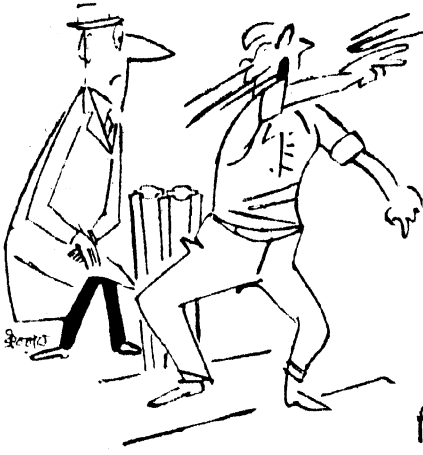
শয়তানী টেষ্টম্যাচ

বিমল রায় চৌধুরী

বজবজের অফিসারস ক্লাবের বিলি-য়ার্ড ঘরে বসে সভ্যরা গল্পগাছা করছিলেন। এমন সময় জোরকেন্স কোণের আরাম-কেদারাটায় বসে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল,—

—হামবাগস!

জোরকেন্স সমীরণ লাহিড়ীর অতিথি। কাল সবে একটা বৃটিশ অয়েল ট্যাংকার থেকে নেমেছে, কাজেই জোর-কেন্সের হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠায় আমরা সকলে চমকালুম এবং সমীর বিব্রত হল।

—কি হল? সমীর সাহেবের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে।

—হবে আর কি! দোজ হামবাগ অস্ট্রেলিয়ান নিউজমেন! 'সিডনি ম্যান', 'মেলবোর্ণ হেরাল্ড', 'মেলবোর্ণ এজ' এরা বলেছে ফিফথ টেষ্টে ইংল্যান্ড নাকি হারবেই।

—হারবেই? কেন? সমীর লাহিড়ী ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে।

—হেডেন নোজ হোয়াই! পসেবলি দে গট ইট ডিরেক্ট ফ্রম ক্যাঙ্গারুজ মাউথ! এ ছাড়া আর কি বলা যায়!

বিনয় মল্লিকের দূর-সম্পর্কের এক কাকা কোন এককালে নাকি স্বদেশী করে জেল খেটেছিলেন, সেই থেকে বিনয় ইংরেজ-বিরোধী। ইংরেজ কোম্পানীতে চাকরী করতে করতে সেই বিরোধিতা আরো তীব্র হয়েছে, ফলে সুযোগ পেলেই সে ইংরেজ-বিরোধী কথা-বার্তা বলে। এবারো বলল:

তা সাহেব, কি করবে বলো! টেষ্ট ত ব্যাটসমেনরা জেতে না, জেতে বোলাররা। তোমরা বড় আশায় ছিলে ডেভিডসন খেলতে পারবে না শেষ টেষ্টে, কিন্তু ডেভিডসন খেলছে। আর ডেভিডসন খেললে যে কি হয় তা তো জানোই। ওর নাম ডেভিডসন বটে কিন্তু ও আসলে 'ডেভিলসন'। ওর বলে শয়তান লুকিয়ে থাকে!

শয়তান কথাটা উচ্চারিত হতেই লক্ষ্য করলুম জোরকেন্স কেমন যেন চমকে যায়। বিনয়ের দিকে চেয়ারটাকে ফিরিয়ে প্রশ্ন করে—কি বললে? শয়তান? ইস্, পোরলিকের ঠিকানাটা যদি জানতাম, শয়তানকে দিয়েই শয়তানীর কাঁটা তোলা যেত। পোরলিকের হাতে এখনো পর পর সাতটা উইকেট নেওয়ার বল আছে। পোরলিককে পাওয়া গেলে নীল হার্ভের জীবনের শেষ টেষ্ট শূন্য রানে শেষ হত।

—কিন্তু পোরলিক কে? সমীর অধীর হয়ে প্রশ্ন করে।

—পোরলিক হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বোলার, যে যে-কোনো টেষ্ট ম্যাচে পর পর দুটো হ্যাটট্রিক এখনো করতে পারে।

ইংরেজ-বিরোধী বিনয় মুখ টিপে হাসল।

—টেষ্টে পর পর দুটো হ্যাটট্রিক? সত্যি তোমাকে দেখে এতদিনে আমার বিশ্বাস হল যে ইংরেজদের সেন্স অফ হিউমার আছে। তা তাকে টেষ্টে নিচ্ছ না কেন তোমরা?

—মিঃ মল্লিক, তুমি ভাবছ আমি রসিকতা করছি? ঘটনাটি যদি শোনো, তোমারো বিশ্বাস না করে উপায় থাকবে না। গল্পটা আমাকে অবশ্য পোরলিকই বলেছে। একদিন একটা বারে বসে ঘটনাটা শুনেছিলাম।

—বেশ ত, আমাদের বলই না গল্পটা। বিনয় পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে তাই সোজাসুজি জোরকেন্সকে গল্পে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে সমীর।

—তোমরা যদি শুনতে চাও বলতে আমার আপত্তি নেই। পোরলিকের কাছে যা শুনেছি হুবহু বলে যাচ্ছি।

ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে গল্পটা আরম্ভ করে জোরকেন্স:

পান-দোষের সঙ্গে আনুষঙ্গিক দোষ একটু ছিল পোরলিকের কম বয়সে। অবশ্য কথাটা স্বীকারই করে সে। লুকোবার চেষ্টা করে না। একদিন এক রাত্রে একটা ইয়ে—মানে খারাপ বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় শয়তানের।

—শয়তান? বিনয় স্ববশে গল্পটা আনবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে, প্রশ্নটা করে ফেলল।

—ইয়েস, হি ওয়াজ দি স্যাটান হিম-সেলফ!

বিনয় আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল সমীরের পদ-পীড়নে চুপ করে গেল। জোরকেন্স বলতে আরম্ভ করে আবার:

সদর দরজাটা তাকে শয়তান নিজেই খুলে দিয়েছিল। তার পরনে ছিল সান্ধ্য পোষাক। সাদা ওয়েস্ট-কোট, নিখুঁত-

ভাবে বাঁধা সাদা টাই। বুক-খোলা কালো একটা ক্লোক তার কাঁধ থেকে ঝুলোছিল। ওকে দরজা খুলতে দেখেই আমার বন্ধুটি প্রথমে কেমন হকচাকিয়ে গিয়েছিল। ক্ষমাপ্রার্থনার মত বিড় বিড় করে কিছু বলেও থাকবে হয়ত। শয়তানের কিন্তু একেবারে দারুণ মাই-ডিয়ার ভাব।

—আরে আসুন, আসুন, এ বাড়িতে এসেছেন তাতে লজ্জার কি আছে মশাই! অভিবাদনের ভঙ্গিতে একটু মাথা নুইয়ে দরজা থেকে সরে বন্ধুটিকে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করল সে। তার ব্যবহারে এমন একটা সম্মোহনী ভদ্রতা ছিল যে, অনুরোধ অগ্রাহ্য করা প্রায় অসম্ভবই। ঘরের ভেতরে ঢোকার পর পোরলিকের দিকে ফিরে সবিনয়ে প্রশ্ন করে সে ঃ

—বলুন আপনার কোন কাজে লাগতে পারি আমি?

শয়তানকে কাজে লাগাবার ইচ্ছে পুরোপুরি ছিল আমার বন্ধুটির। প্রথমে শয়তানের কাছে যা চাইবে ভেবেছিল পোর-লিক, তা অবশ্য আমার কাছে ভেঙে বলতে চায় নি সে। আমিও আর জিজ্ঞেস করি নি তার প্রথম ইচ্ছার কথা। কিন্তু শয়তানের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেন জানি না মতি-গতি পাল্টাল তার। সেই ঘুণ-ধরা বাড়িটা ছাড়িয়ে সবুজ মাঠের মধ্যে চলে গেল তার মনটা। একেবারে হঠাৎ। এবং হঠাৎই সে তার অদ্ভুত একটা ইচ্ছা পূরণের হাত পাতল শয়-তানের সামনে।

—নিশ্চয়ই—আপনি আমার কাজে লাগতে পারেন! আপনি যদি দয়া করে আমাকে মাত্র কুড়িটি বলে কুড়ি উইকেট দখল করার ক্ষমতা দেন, বড়ই বাধিত হই।

—কুড়ি বলে কুড়ি উইকেট? বেশ তাই হোক!

—কিন্তু তার জন্যে বিনিময়ে আমাকে কি দিতে হবে?

পোরলিক যেন একটু ব্যস্ত হয়েই প্রশ্ন করল শয়তানকে। কারণ কোনো কিছুর বিনিময়েই তার আত্মাকে সে কিছুতেই শয়তানের হাতে সমর্পণ করতে রাজী নয়। শয়তান আমার বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েই ওর মনের কথাটা বোধ হয় ধরে ফেলেছিল। আত্মার কথা তুললই না সে, শুধু পোরলিকের গুণাবলীর একটি মাত্র গুণ সে বিনিময়ে চেয়েছিল। অকাতরেই রাজী হল পোরলিক। শয়তান হাওয়ায় কুড়িবার তর্জনী নাচিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাস, তারপর থেকেই পোর-লিক ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলার মাঠে মাঠে। যেখানেই ভালো খেলা হত, দাঁড়িয়ে পড়ত সে। দলের সেরা ব্যাটস-ম্যানটিকে লক্ষ্য করত, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে শয়তানদত্ত ক্ষমতাটির পরীক্ষা করা তার সাহসে কুলোচ্ছিল না। অচেনা অজানা একটা যুবকের পাগলামিতে কে ব্যাট বাড়াবে! অবশেষে অনেক জোগাড়-যন্ত্র করে একটা সুপারিশ নিয়ে একজন খুব ভালো ব্যাটসম্যান-এর সঙ্গে আলাপ করল। প্রথমে অনেকক্ষণ একথা সেকথা বলতে বলতে ব্যাটসম্যানটিকে বিরক্তির শেষ সীমায় এনে পোরলিক তার প্রস্তাবটি পাড়ল। যে ভদ্রলোক তার সঙ্গে ব্যাটসম্যানটির আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ভাগ্যিস তিনি চলে গিয়েছিলেন, পোরলিক নির্ভয়ে নিজেকে একজন উঠতি বোলার বলে চালিয়ে দিল। ব্যাটসম্যানটিকে জানালো যে সে একজন ভালো বোলার, অনেক উইকেট পেয়েছে সে ইতিমধ্যে, তবে তার বাসনা যে একটা ভালো টীমের হয়ে সে খেলবে। ব্যাটসম্যানটি বেশ দিলখোলা লোক, একজন তরুণ বোলারকে উৎসাহ দেবার জন্যে প্যাড পরে পোরলিককে নিয়ে নেট প্র্যাকটিশে নেমে গেলেন। পোরলিকের প্রথম বলেই তিন দিকে ছিটকে গেল স্টাম্প তিনটে। ব্যাটসম্যান ভদ্রলোক সত্যিই অবাক। ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর নাম ছিল, কাউণ্টির হয়েও তিনি অনেক ম্যাচ খেলেছেন। তিনিই কিনা প্রথম বলেই বোল্ড! ভদ্রলোক আবার বল করতে বললেন পোরলিককে! পোরলিক কিন্তু আর দাঁড়ায়নি। সোজা মাঠের বাইরে চলে এল। কুড়িটা উইকেটের একটা উই-কেট গেল। শয়তান তার সঙ্গে ছলনা করেনি তাহলে! পরদিন আমার বন্ধুটি সোজা চলে এল লণ্ডনে। সেবার ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার মরশুম! অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা তখন লণ্ডনে। উনিশ বছরের পোরলিকের মনে তখন দুর্দমনীয় আশা যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সে টেস্ট খেলবে। আর কেনই বা খেলবে না সে। সে এখন ক্রিকেটের অধীশ্বর। একেক বলে সে একটা করে উইকেটের বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে পারে। উনিশটা উইকেটের স্টাম্পগুলোকে সে যেন তার পায়ের তলায় লুটোতে দেখল। যে-কোনো টেস্ট ম্যাচের রাজা হতে পারে সে ইচ্ছা করলেই। পোরলিকের কাছে সামান্যই টাকা ছিল, তাই দিয়ে কোনো-রকমে সে লণ্ডনে বাসা ভাড়া করলো আর ইংল্যাণ্ডের টীমের ক্যাপ্টেন-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য সুপারিশ জোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগল অবিরাম। অবশেষে একজনকে পাওয়া গেল যার সঙ্গে ইংরেজ টীমের একজন খেলোয়াড়ের পরি-চয় আছে। লোকটাকে যথারীতি নিজের গুণপনার কথা বলে ভেজাবার চেষ্টা করেছিল প্রথমে পোরলিক। কিন্তু ট্রেন্‌লে অবিচল। নিজের কাহিনী শত-কাহন করে অমন সকলেই গায়। পোরলিক ভাবল লোকটাকে বিশ্বাস করাতে হলে তাকে আরেকবার বল খরচ করতে হবে। তার পুঁজির অর্ধেক খরচ করে সে ট্রেন্‌লেকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করল। খাওয়ার টেবিলেই ট্রেনলেকে বলল,—

বেশ আমি যদি প্রথম বলেই আপনাকে বোল্ড করতে পারি তাহলে বিশ্বাস করবেন আমার কথা?

—প্রথম বলেই বোল্ড? বেশ তুমি যদি তা পারো আমি কালকেই তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে লর্ডসে যাবো খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে। আমার বন্ধু এম-সি-সি'র হয়ে টেস্ট খেলছে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো তোমার!

ট্রেন্‌লে এম-সি-সি'র সভ্য এবং একদা সে নিজেও ভালো ক্রিকেট খেলত। দুজনে মিলে স্থির করল যে পরদিন টেস্ট খেলা আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে তারা লর্ডসে যাবে। সেখানে নেট প্রাকটিসে পোরলিক যদি আউট করতে পারে ট্রেন্‌লেকে, তাহলে ওর বন্ধু হ্যাথওয়ের সঙ্গে পোরলিকের আলাপ করিয়ে দেবে সে। পরদিন যথা-রীতি পোরলিক প্রথম বলেই আউট করল ট্রেনলেকে এবং সেও কথা রাখলে যথারীতি। পোরলিককে উদীয়মান বোলার হিসেবে আলাপ করিয়ে দিলে ইংল্যাণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় হ্যাথওয়ের সঙ্গে। হ্যাথওয়ে প্রথমটা বিশেষ আমল দিতে চান নি। কিন্তু নায়েগ্রা জলপ্রপাত, হিমালয় পাহাড় এবং পোরলিকের সদম্ভ ঘোষণাকে উপেক্ষা করা একে-বারেই অসম্ভব। হ্যাথওয়েকে চমকে দিয়ে বল্লে পোরলিক,—

অস্ট্রেলিয়ার সবকটা ব্যাটসম্যানকে আমি ঠিক দু ওভারেই খতম করতে পারি। ক্যাপ্টেন যদি ব্যাট নিয়ে দাঁড়ান তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন আমি কি পারি!

—আমার মনে হয় তোমাকে পরীক্ষা করার সময় এখন ক্যাপ্টেনের নেই। হ্যাথওয়ে তবুও কাটাবার চেষ্টা করেন।

—বেশ, ধরুন আপনাকেই যদি আমি প্রথম বলে আউট করি, আপনি আলাপ করিয়ে দেবেন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে?

—প্রথম বলেই আউট? বেশ আমি রাজী। বেশ খানিকটা যেন আশার আলো দেখলেন হ্যাথওয়ে।

কিন্তু প্রথম বলেই আলোটি নিভে গেল। আউট হলেন হ্যাথওয়ে!

—আমার মনে হয় আমি প্রস্তুত হবার আগেই তুমি বল ছুঁড়েছ, আরেক-বার দেবে বল? নিজেকে হ্যাথওয়ে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। লোকে বলবে কি? তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলছেন অথচ তাঁকেই

প্রথম বলে আউট করল ছোকরা! পৌরলিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও বল নিয়ে ক্রিজের দিকে রওনা হল। এর মধ্যেই তিন বলে তিন উইকেট হয়ে গেছে, আরেক-বার উইকেট নেয়া মানেই আর মাত্র ষোলটা উইকেট সে নিতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, টেস্ট খেলতে হলে হ্যাথ-ওয়েকে সন্তুষ্ট করতেই হবে। দ্বিতীয়-বার আউট হবার পর সংশয় কাটল হ্যাথওয়ের।

—বেশ চল, তোমার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

প্যাভেলিয়নের দিকে তাঁরা তিনজন হাঁটতে আরম্ভ করলেন। টেস্ট খেলা আরম্ভ হতে তখন আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকী। বাইরের লোকের পক্ষে সে সময়ে প্যাভেলিয়নে ঢোকা বেশ মুস্কিল! আমার বন্ধুটিকে গেটে দাঁড় করিয়ে ব্রেনলে এবং হ্যাথওয়ে দুজনে ভেতরে ঢুকে ক্যাপ্টেনকেই বাইরে সঙ্গে করে নিয়ে

এলেন। পোরলিকের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বল্লেন ক্যাপ্টেন—
তুমি বোলিং দেখাতে চাও আমাকে?

পোরলিককে দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি যে, ছেলেটি আদপেই বল ধরতে পারে।

পোরলিক বিনয়ে গলে যেতে যেতে বলে,—

আজ্ঞে যদি আপনি দয়া করে একটিবার মাত্র দ্যাখেন!

নেহাৎ দয়া করেই যেন রাজী হলেন ক্যাপ্টেন! নেটে ব্যাট নিয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে। পোরলিক বল দিল। উইকেটের স্টাম্প, যেন তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়ল।

—হুঁ! আরেকটা বল দাও দেখি। যেন বল না, ফুসফুস থেকে একেক ফোঁটা রক্তই যেন চাইছেন মনে হল পোরলিকের। শয়তানের বর বোধ হয় এভাবে পরীক্ষা দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাবে!

ক্যাপ্টেনকে বোঝানোর চেষ্টা করে পোরলিক,—

আরেকবার দিলেও ফল অন্য রকম হবে না। আপনি আউট হবেনই।

কিন্তু ক্যাপ্টেনও দ্বিতীয়বার বলের দাবী ছাড়লেন না। ফলে আবার বোল্ড হলেন।

নিজের ওপরেই যেন বিরক্ত হয়ে এবার বল্লেন ক্যাপ্টেন,

—কি যে হল! আমার ফর্মটাই বোধ হয় পড়ে গেছে আজকে! আচ্ছা তুমি আরেকবার বল কর ত!

হতাশায় নিজের গলাটিই চেপে ধরল পোরলিক। শেষ পর্যন্ত কি নেট প্র্যাকটিশের কুড়িটা উইকেট পাওয়ার বর দিল শয়তানটা? ক্যাপ্টেন বল দেবার জন্যে আরেকবার ইঙ্গিত করতেই পোরলিক বেপরোয়া হয়ে বলে উঠল,—
—দিতে পারি যদি আপনি আমাকে আগামী টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে খেলতে নেন। পোরলিকের অর্বাচীন প্রস্তাবে ক্যাপ্টেন যেন বিস্ময়ে থ হয়ে যান। পর পর দু'বলে আউট করার মধ্যে কৃতিত্ব কম নেই সত্যি, কিন্তু তাই বলে রাতারাতি টেস্ট ম্যাচে খেলার দুঃসাহস! একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবক হঠাৎ এভাবে টেস্ট ম্যাচে খেলার প্রস্তাব করতে পারে ভাবতে গিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেন না ক্যাপ্টেন। অনেক চেষ্টায় বাক্‌শক্তি ফেরে তাঁর।

—ইয়ে......না তা বোধ হয় আমাদের পক্ষে সম্ভব না।

—কিন্তু স্যার, তৃতীয় বলেও যদি আপনি আউট হন তাহলে হ্যাট্-ট্রিক'এর সম্মান লাভ করবো আমি।

—না, আমার মনে হয় না, তুমি তৃতীয়বার আউট করতে পারবে আমাকে!

—কিন্তু যদি পারি?

—তাহলে......অবশ্য তোমার প্রস্তাব নিয়ে ভাবা যাবে!

—শুনুন তাহলে, শুধু এইখানেই না, আমাকে যদি টেস্টে নেয়া হয় তাহলে আমি কথা দিচ্ছি অস্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধেও আমি তিনটে হ্যাট্-ট্রিক করবো!

—তিনটে...কি...কি বললে? নিজের কানকেও যেন আর বিশ্বাস করা সম্ভব হচ্ছে না ক্যাপ্টেনের পক্ষে।

পোরলিক তার কথার পুনরুক্তি করল।

—আচ্ছা, আচ্ছা তুমি এবার দাও ত বল তারপর দেখা যাবে।

—কিন্তু এবারে আউট হলে আমাকে টেস্টে নেবেন ত?

আবার পোরলিকের দুঃসাহসিক দাবীটা শুনলেন ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন। অর্বাচীন যুবকের উন্মাদোচিত প্রস্তাবকে তাড়াতাড়ি এড়াতে গিয়ে বলে ফেল্লেন—

—ঠিক আছে এবার আউট করতে পারলে নেবো তোমাকে!

হ্যাথওয়ে আর ট্রেনলে নেটের কাছেই দাঁড়িয়ে দুজনের অমানুষিক সংলাপ এবং কার্যকলাপ শুনছিলেন এবং দেখছিলেন। পোরলিককে কথা দেয়ার পর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ব্যাট ধরে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যেই দাঁড়ালেন উইকেটের সামনে। দলের শোচনীয় অবস্থার পরাজয় এড়াতে খেলার শেষ বল যেভাবে ঠেকায় ব্যাটসম্যানরা, অনেকটা সেই মনোবৃত্তি নিয়ে উইকেট রক্ষার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেদিন ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন। ব্যাটসম্যান হিসেবে তাঁর নাম ভুবনবিদিত। সাধারণতঃ তিনি মেরেই খেলেন। কিন্তু তিনি যদি মাটি কামড়ে উইকেট রক্ষার জন্যে আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলেন, ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার কোনো বোলারের সাধ্য নেই তাঁকে আউট করে! এমনকি বাম্পার দিয়েও তাঁকে টলানো যায় না। সুতরাং তিনি যখন আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ব্যাট নিয়ে দাঁড়ালেন ট্রেনলে হ্যাথওয়ে স্থির ধরে নিলেন যে হ্যাট্-ট্রিকের দরজা দিয়ে টেস্ট ম্যাচে ঢোকার একটি উচ্চাশায় যতি পড়ল। কিন্তু সতর্কতার, ব্যাটিং নৈপুণ্যের, কোনো বেড়া দিয়ে মিডল স্টাম্পকে রক্ষা করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন।

—ধন্যবাদ স্যার, আশা করি প্রস্তাবটা মনে আছে আপনার! আর একটাও কথা না বলে পোরলিক সোজা মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। পোরলিক মাঠ থেকে যাবার পর ট্রেনলে, হ্যাথওয়ে আর পোরলিকের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল আমি জানি না, কারণ পোরলিক এ বিষয়ে নিজেই কিছু জানে না। তখনকার ইংল্যান্ড টীমের বোলার সমস্যাও ছিল কিনা বলতে পারবো না। বোলিং ছাড়া, পোরলিকের ব্যাটিং বা ফিল্ডিং সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন কিছুই জানতেন না। তবে একথা পোরলিক ভেবেছে যে, ফিল্ডিং বা ব্যাটিং না জানলেও তার কিছু এসে যাবে না। অনেক ভালো বোলারই ত ব্যাট ধরতে জানে না। আর ফিল্ডিং? ক্যাপ্টেন যদি তাকে প্রথমে বল করতে দ্যান তাহলে মাত্র এক ওভারই তাকে ফিল্ডিং দিতে হবে। কারণ তার দ্বিতীয় ওভারের পর ত ব্যাটিং করতে আর কেউ থাকছে না। পোরলিক ক্যাপ্টেনকে কিছুদিন পরে টেস্ট ম্যাচে তার অন্তর্ভুক্তির কথা মনে করিয়ে একটা চিঠি লিখল। কিছু বাড়তি টাকা ছিল তার, তাই দিয়ে খেলার জামা-কাপড় বানিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। উত্তর সত্যিই এল। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নয়। খোদ সিলেকশন কমিটির কাছ থেকে। তাকে জানান হল যে তাকে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে নেয়া হয়েছে। খেলার তারিখ, স্থান সবই লেখা ছিল চিঠিতে। পোরলিকের মনে হচ্ছিল খেলার দিনটা বোধহয় আর আসবেই না তার জীবনে। উত্তর ইংল্যান্ডে হনবির মাঠে টেস্ট খেলতে জমায়েত হলেন খেলোয়াড়রা। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন টসে হারতেই পোরলিক সোজা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—আপনার অনুমোদন নিয়েই আমাকে দলে নেয়া হয়েছে। আপনার যদি মনে হয়, আপনি আমাকে নিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন, তাহলে সে ভুলটা যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে ততই ইংল্যান্ডের পক্ষে মঙ্গল। আমি এই প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি যদি হ্যাট্-ট্রিক দিয়ে শুরু না করি, তাহলে পেশীতে টান বা ঐ জাতীয় কোনো ছুতোয় 'রিটায়ার্ড হার্ট' হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাবো। আর আমি যা বলেছি তাই যদি হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি ওরা আউট হয় ততই ভাল। কাজেই যেদিক দিয়ে বিচার করুন না স্যার, আমাকে দিয়ে বোলিং আরম্ভ করালে আপনি ঠকবেন না।

পোরলিকের কথার তোড়ে ক্যাপ্টেন যেন ভেসে গেলেন। ক্যাপ্টেন খেলোয়াড়

মানুষ, নিজে কথা কম বলেন, এমনকি অন্য কোনো খেলোয়াড়ও যে বাক্যবাগীশ হতে পারে ভাবতেও পারেন না। ক্যাপ্টেনকে খানিকক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত রেখে পোরলিক সবিনয়ে স্বীকারোক্তি করে ঃ

—ফিল্ডিং আমার ঠিক আসে না তেমন। তবে বোলিংএ যদি আমাকে পাঠান, তাহলে একটা খেলাই দেখবেন!

হ্যাঁ, খেলা সেদিন দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন। শুধু ক্যাপ্টেনই বা কেন মাঠে উপস্থিত হাজার হাজার দর্শকরাও সেই অলৌকিক খেলা দেখেছিল।

ক্যাপ্টেন পোরলিকের কথামত তাকেই প্রথম ওভার বল করতে দিয়েছিলেন। মূর এন্ড থেকে বোলিং শুরু করল পোরলিক। পোরলিক আমাকে বলেছিল যে, প্রথম মিনিট তার ভীষণ নার্ভাস লাগছিল। কিন্তু যখন বল হাতে নিয়ে উইকেট থেকে হাঁটতে আরম্ভ করল শয়তানের অদৃশ্য শক্তিকে অনুভব করতে করতে সমস্ত ভয় কেটে গেল তার। বোলিং-ক্রিজ পর্যন্ত অবহেলাভরে দৌড়ে গিয়ে, বলের প্যাঁচ নিয়ে একদম মাথা না ঘামিয়ে, বলটা ছুঁড়লো যেমন তেমন করে। এছাড়া অবশ্য আর কিভাবেই বা বল দিতে পারত সে। টেস্ট ম্যাচে বা প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলার মান অনুযায়ী বল দেয়ার অভিজ্ঞতাও তার জানা নেই। অতএব ভেবেচিন্তে বল দিয়ে কিই বা লাভ হত! যেমন তেমন ভাবে বলটা ছুঁড়েছিল সে, এবং তার বোলিং দেখে বড় জোর মনে হতে পারত যে বোলার অমনোযোগী এবং অনভিজ্ঞ। কিন্তু বলের বিচিত্র গতি দেখে মাঠের উপস্থিত সকলে ত বটেই, পোরলিক নিজেই কম অবাক হয়নি। নেটে যেভাবে এতদিন ফাস্ট বোলিং করে এসেছিল পোরলিক এ বলটা ঠিক সে ধরণের না। বলটা তার হাত থেকে বেরিয়ে প্রায় ফানুসের মত আকাশে উঠতে লাগল ধীর গতিতে এবং খানিক পরে ঠিক সেই গতিতেই নামতে আরম্ভ করল উইকেটের দিকে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যান ব্যাট হাতে অবাক হয়ে ওপরে বলটার দিকে তাকিয়ে রইল। দর্শকরা পেটে হাত দিয়ে হাসতে আরম্ভ করে। বলটা নীচে নাগালের মধ্যে আসতেই অফের দিকে ব্যাট চালিয়ে দেন ব্যাটসম্যান। বলটা ফার্স্ট স্লিপের ফিল্ডিংরত খেলোয়াড়ের জুতোর ডগায় লেগে সটান সেকেণ্ড স্লিপের ফিল্ডসম্যান-এর হাতের মুঠোয় উঠে এল। আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আউট দিলেন। দর্শকরা কিন্তু ভেবেছিল বলটা মাটিতে বাম্প করেছিল, ক্যাচ কোনরকমেই হয় না ওতে। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকরা রেগে আগুন। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান যা তা লোকের যা তা বলে

ফানুসের মত আকাশে উঠতে লাগল ধীর গতিতে

আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাচ্ছে এ দৃশ্য শান্ত চোখে দেখা অসম্ভব। অস্ট্রেলিয়ান দর্শকরা গ্যালারি থেকে গজরাতে থাকে। ইংলিশ টীমের খেলোয়াড়রাও কেমন যেন করুণার চোখে তাকাতে থাকে আমার বন্ধুটির দিকে। ক্যাপ্টেন পোরলিককে অভয় বাণী দেবার চেষ্টা করলেন।

—ঘাবড়াচ্ছো কেন? খেলে যাও। নতুন বল অনেক সময় স্লিপ করতে পারে। যাও ভালো করে ওভারটা শেষ করো। আমাকে যেভাবে বল করেছিলে ঠিক সেইভাবেই বল দাও না।

পোরলিক এবার স্থির করলো যথাশক্তি নিখুঁত বল করবার চেষ্টা করবে। শয়তানের শক্তি ত আছেই, তার সঙ্গে নিজের শক্তিও যোগ করে টেস্ট ম্যাচের উপযুক্ত বোলিং করবে। কিন্তু এবারেও কি যেন হল। পোরলিক এবং শয়তানের দুই শক্তির যুগ্ম চেষ্টা সত্ত্বেও বলটা সমস্ত পাঁচটাই পেরোতে পারলো না। পাঁচের মাঝখানে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে সামান্য কয়েক হাত গড়িয়ে থেমে গেল। দর্শকদের আসনে এবারো তুমুল হাস্যধ্বনি। ব্যাটসম্যান যখন দেখলেন বলটা তার কয়েক হাত দূরে থেমে গেছে এগিয়ে এসে পা দিয়ে বলটাকে যেন ঘৃণাভরেই ঠেলে দিলেন পোরলিকের দিকে। পোরলিক সঙ্গে সঙ্গে আউটের আবেদন করে আম্পায়ারের কাছে। বলটা যদিও পাঁচের মাঝখানে থেমে গিয়ে 'ডেড' ছিল, কিন্তু অতদূরে থেকে আম্পায়ার স্থির করতে পারলেন না, ব্যাটসম্যান বলটা পা দিয়ে ঠেলবার সময় বলটা সত্যি সত্যি একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছিল কিনা। ফলে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যানও আউট হলেন। পোরলিক আমাকে বলেছিল সে নিজে কিন্তু আউটের আবেদন জানাতে চায়নি, কিন্তু তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভেতর থেকে কে যেন তাকে আবেদন জানাতে প্ররোচিত করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরা ব্যারাকিংএর ঝড় তুলল। ক্যাপ্টেনের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লো কেউ কেউ ঃ

—এমন খাসা মালটিকে কোত্থেকে জোগাড় করলেন ক্যাপ্টেন সাহেব? এর আগে ছোঁড়াটা বলটল ছুঁড়েছে কখনো?

পোরলিকের সন্দেহ হল শয়তান তাকে নিয়ে মজা করবার জন্যেই এইভাবে বল দেওয়াচ্ছে। নিজেও হয়ত শয়তানটা পোরলিকের অবস্থা দেখে পেটে হাত

দিয়ে হাসছে। কিন্তু দোষ দেবার উপায় নেই তাকে। প্রতিজ্ঞার খেলাপ করেনি সে। প্রতি বলেই পোরলিক একটা করে উইকেট ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ব্যাটসম্যান নামলেন ব্যাট করতে। ভিড় থেকে সাবধান বাণী ভেসে এল

—খুব সাবধান, ফুটবল খেলতে যেও না ক্রিকেটের বল নিয়ে! মারা পড়বে!

যথাসাধ্য প্রাণপণ ভালো বল দেয়া ছাড়া পোরলিকের করণীয় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু তার সাধ্য শয়তানের বাদ সাধার কাছে কিছুই না। পরের বলেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এবারের বলটির বিতিকিচ্ছিরি পীচ পড়ল, স্টম্পের অনেক দূরে দিয়ে ওয়াইড হয়ে বেরিয়ে গেল অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন লেগের দিকে ফিল্ডিং করছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটস-ম্যান দারুন বিরক্তিতে তাঁর দিকে ব্যাট উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন

—আমরা কি ক্রিকেট খেলছি?

ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে প্রশ্নটা করতে গিয়ে ডান পাটা ক্রিজ থেকে তুলে ফেলেছিলেন ব্যাটসম্যানটি এবং ব্যাটটিও যখন তুলে ফেললেন মাটি থেকে, উইকেট কিপার সংগে সংগে বলটা কুড়িয়ে স্টাম্প করলেন। টেস্ট ম্যাচে দুর্লভ হ্যাট-ট্রিক হলে যেমন গ্যালারি থেকে সোরগোল শুরু হয় ঠিক তেমনি হোল তৃতীয় ব্যাটসম্যান আউট হবার পর। তবে এই সোরগোলে উল্লাসের চেয়ে গর্জনের শব্দই ছিল বেশি। ক্যাপ্টেন অন্যান্য দুজন খেলোয়াড়ের সংগে পরামর্শ করতে লাগলেন, কিন্তু পোরলিককে কেউ বলল না কিছু। অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ ব্যাটসম্যান যেন সার্কাসের তাঁবুতে ঢুকছেন এইভাবে এসে দাঁড়ালেন উইকেটে। ভীষণ নার্ভাস হয়ে ঘন ঘন মাটিতে ব্যাট ঠুকতে লাগলেন। আবার বল করল পোরলিক। একেবারে সোজা ওপরে উঠে গেল বল, প্রথম বলের চেয়েও খাড়া ওপরে, তারপরে উইকেট পেরিয়ে ব্যাটস-ম্যানকে ডিঙিয়ে উইকেটকীপারের কাছে নামতে আরম্ভ করল। ব্যাটসম্যানকে পেরিয়ে গেলেও পিছন দিকে তাঁর নাগালের মধ্যেই ছিল বলটা। ব্যাটসম্যান পেছনে একপা হটে প্রাণপণে বল লক্ষ্য করে ব্যাট চালালেন। একদম মাটি না ছুঁয়ে সোজা ওপর দিয়ে বল চলে গেল বাউন্ডারীতে। ওভারবাউন্ডারীর হাত-তালি দিতে দিতে দর্শকরা দাঁড়িয়ে পড়ল গ্যালারিতে। কিন্তু পিছু হটতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে অস্ট্রে-লিয়ার ব্যাটসম্যান ততক্ষণে উইকেটের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন এবং যথারীতি আউট হয়েছেন। শূন্যে রানে

উইকেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন

পরপর চার উইকেট পড়ে গেল অস্ট্রে-লিয়ার! অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন উত্তেজিত হয়ে অপরপক্ষের ক্যাপ্টেনকে কি যেন একটা বলতে বেরিয়ে এসেছিলেন প্যাভেলিয়ন থেকে কিন্তু কি ভেবে কিছু না বলে আবার ফিরে গেলেন। সত্যি, কিই বা বলতে পারতেন তিনি। ইংল্যান্ড টীমের খেলোয়াড়রা তাঁদের ক্যাপটেনকে ঘিরে জটলা করতে লাগলেন। পঞ্চম ব্যাটসম্যান নামলেন ব্যাট করতে। আবার সেই আকাশ-ঘুড়ি বল! ঘুড়ির মতই উড়ে গিয়ে গোত্তা খেলো উইকেট কিপারের কাছে। ব্যাটসম্যান এমনিতেই ব্যাপার-স্যাপার দেখে চটে ছিলেন, উইকেট কীপারের দিকেই বল লক্ষ্য করে ব্যাট চালালেন। ব্যাট লাগল উইকেট-কিপারের মাথায়। উইকেট-কিপার মাটিতে প ড়ে গেলেন। বল স্ক্রিনের দিকে গড়াতে আরম্ভ করল, ব্যাটসম্যানরা বাইরাণ নিলেন এবং সংগে সংগেই আম্পায়ারের কাছে আউটের আবেদন জানায় পোরলিক। উইকেট-কীপারকে মেরে শুইয়ে দিয়ে রাণ নিচ্ছে ব্যাটসম্যানরা। 'ইন্টারফিয়ারিং উইথ দি ফিল্ড'-এর অভিযোগে ব্যাটস-ম্যানকে আউট দিতে বাধ্য আম্পায়ার। পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটল অস্ট্রেলিয়া দলের।

—বাঃ বেশ কাজ হচ্ছে ত! পোরলিক প্রায় চেঁচিয়েই শোনায় নিজেকে।

—কিসের কাজ হচ্ছে? মিড-অফ প্রশ্ন করে।

—নাঃ কিচ্ছু না! জবাব দেয় পোরলিক।

এদিকে গ্যালারীতে তখন সাংঘাতিক অবস্থা। চারদিকে চীৎকার হৈ-হৈ। যারা খেলার নিয়মকানুন ঠিক জানে না তারা পোরলিকের ওভার শেষ না হতেই চেঁচাতে থাকে

—সরিয়ে নাও, ঐ মালটিকে মাঠ থেকে হটাও!

উইকেট-কীপার ততক্ষণে কোনো-রকমে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁদের ক্যাপটেনের দিকে তাকাচ্ছেন।

—আর ওভারের মাত্র একটা বলই বাকী আছে, শেষ হোক ওভারটা—ক্যাপটেনকে বলতে শোনা গেল।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন নামলেন ষষ্ঠ উইকেটে। পোরলিককে খানিকক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে উইকেটে ব্যাট ধরে দাঁড়ালেন তিনি। এবারে বলটা পীচের মাঝখান অবধি বাম্প করে এসে

হঠাৎ সুড়ুত করে গড়িয়ে গড়িয়ে উইকেট থেকে অনেক দূরে ভীষণ আস্তে আস্তে এসে প্রায় থেমে যাওয়ার মতন হল। ক্যাপটেন ক্রিজ থেকে বেরিয়ে বলটা হাতে তুলে নিয়ে বোলারের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বললেন—

—আমরা সার্কাসের খেলা দেখাতে আসিনি, সম্ভবতঃ ক্রিকেট খেলতে এসেছি।

ক্যাপটেনের কথা শেষ না হতে হতেই আম্পায়ার আবার পোরলিকের কাছ থেকে আউটের আবেদন শোনেন। বল হাতে নেয়ার জন্যে আউট হলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন। যা হচ্ছিল তখন মাঠে, তখন সবকিছুই সম্ভব, নইলে খামোখা ক্যাপটেনই বা কেন বলটা হাতে করে তুলতে যাবেন। পোরলিকের ওভার শেষ হল। ইংল্যাণ্ডের ক্যাপটেনের বেশ ঘাম দিয়ে জ্বর নামলো। তিনি অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেনের পাশে পাশে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে করতে প্যাভেলিয়ন পর্যন্ত গেলেন। এরপর থেকে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হল মাঠে। টেস্ট ম্যাচে যেভাবে বল হয় সেভাবে বল হল, রাণ হয় রাণ হল, ব্যাটসম্যানরা যেভাবে খেলতে হয় খেললেন। পোরলিককে একেবারে বাউ-ণ্ডারী সীমায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রথম যে বলটা এলো ওর কাছে ইচ্ছে করেই সেটাকে ছেড়ে দিল পোরলিক, এবং বলের পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে মাঠ পেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে একেবারে হারিয়ে গেল। তাকে আর খুঁজে বার করা যায়নি। দেখেনি কেউ। তার কাছে খুব বেশী টাকা পয়সাও ছিল না। একরকম হেঁটেই বাড়ি ফিরেছিল। যে কোনো টেস্টে পর পর আরো সাতটা উইকেট নিতে পারত পোরলিক। কিন্তু জীবনে বোধ হয় আর বল ছোঁয়নি সে।

অনেকক্ষণ একটানা গল্প বলবার পর একটু থামল জোরকেন্স। আর সেই ফাঁকে আমরা বিনয়ের গলা শুনলুম—

—তা সেই ম্যাচের কি হল?

—না, প্রথমদিকের বিপর্যয় সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া হারেনি সেবার, ম্যাচ ড্র হয়েছিল। আসলে আমরা ইচ্ছে করেই আর মন দিয়ে খেলিনি।

বিনয়ের ইংরেজ-বিরোধীতা শেষ হবার নয়, আবার প্রশ্ন করলে—

কোন তারিখে খেলাটা হয়েছিল?

—পোরলিক ঠিক তারিখটা আমাকে বলেনি। তবে একথা বলেছিল যে দেশ-বিদেশের সমস্ত কাগজগুলো ব্যাপারটা একদম চেপে গিয়েছিল। ক্রিকেট ইংরেজদের পবিত্র খেলা, কাজেই খবরটা বেরোলে ইংল্যাণ্ডেরই বদনাম হত, তাই ইংলিশ প্রেস এই নিয়ে একটা কথাও লেখেনি এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে অস্ট্রেলিয়ার কাগজগুলোও একলাইন লেখেনি পোরলিক সম্বন্ধে। হাজার হোক ক্রিকেট হচ্ছে রাজার খেলা, তাকে ভাঁড়ের খেলা কেই বা করতে চায়।

—কিন্তু খেলাটা ত হনবিতে হয়েছিল না? আবার বিনয়ের অবিনয়োচিত জেরা।

—নিশ্চয়ই। তবে সেখানে আর কখনো ক্রিকেট খেলা হয়নি। সমস্ত মাঠটা এখন জঙ্গলে ভরে গেছে। এমনকি প্যাভেলিয়ানটাও ভেঙ্গে গেছে। কতক-গুলো বুনো শুয়োর এখন সেই জঙ্গলে চরে বেড়ায়।

—কিন্তু সাহেব, একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। গল্পটা পোরলিক তোমাকে একটা বারে বসে বলেছে, অর্থাৎ পোরলিক মদ খায়, আর খারাপ বাড়িতে যে যায় সে ত তুমিই বললে। ছেলেটি যে চরিত্রবান না বোঝাই যাচ্ছে। তাহলে শয়তানকে তার ইচ্ছা পূরণের বিনিময়ে সে তার চরিত্রের কোন গুণটা দিয়েছিল?

বিনয়ের প্রশ্নটা শুনে জোরকেন্স কেমন যেন খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তারপর চেয়ার থেকে হঠাৎ উঠে টুপি মাথায় দিয়ে সমীরের দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলল,

—সত্যি কুড়ি বলে কুড়ি উইকেটের তুলনায় গুণটা শয়তানকে সমর্পণ করে ভালো করেনি পোরলিক!

—কিন্তু গুণটা কি বল না সাহেব!

—গুণটা হল, সত্যি কথা বলার অভ্যেস!

কথাটা শেষ করে জোরকেন্স আর দাঁড়াল না, আমাদের অবাক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

---

* গল্পটি, নাম-মনে-নেই এমন একটি ভিনদেশী গল্পের আলোয় আলোকিত।

পেটের ভেতরেই রোগ !

২১·২·৬৩ ইং

দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সাম্রাজ্য

বিজয়নগর ও হাম্পি

গোপী রায়

অক্টোবর মাসের এক অপরাহ্ণে মাসুলিপত্তন-হুবলি মিটার গেজ লাইনের প্যাসেঞ্জার ট্রেণে চলেছি হসপেটের পথে। সংগে রয়েছেন ডঃ ঘোষ ও আমার প্রতিটি ভ্রমণের সঙ্গিনী শ্রীমতী রায়। আমাদের লক্ষ্য—বিজয়নগরের রাজধানী—হাম্পি।

দক্ষিণ ভারতের অন্য অংশের তুলনায় এই অঞ্চলে হিন্দি বেশ বোঝে ও ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলতেও পারে। টাংগাওয়ালা হাতজোড় করে যা নিবেদন করলে, তার মর্মার্থ হচ্ছে—সাহেব লোগ যেন তার কসুর মাফ করেন। যাতে কোনো তকলিফ না হয়, যাতে আরামসে থাকতে পারি, তারজন্যে সে আমাদের প্রবাসী মন্দিরে অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল রেস্ট হাউসে নিয়ে যেতে চায়। সেখানে যদি ঘর পাওয়া যায়, সাহেব লোগ খুশী হবেন। সেই ঘর যদি পছন্দ না হয়, সে আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবে।

বিদেশে টাংগাওয়ালা অনেক সময়েই অসুবিধে ঘটায়। তাদের কথা কখনো শুনিনে বা বিশ্বাসও করিনে। কিন্তু, এবার কী যে হলো জানিনে, তার কথাতেই রাজি হয়ে গেলুম এবং দশ মিনিটের মধ্যে সে আমাদের নিয়ে প্রবাসী মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে উপস্থিত হলো।

ভাগ্যগুণে দুখানা ঘরই পাওয়া গেলো। বিজলী বাতি, পাখা, খাট, নেটের মশারি (বিছানা ছিলো না), ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, টুল ও কক্ষসংলগ্ন আধুনিক বাথরুম। এবং শুনলে অবাক হবেন, ভাড়া ঘর প্রতি মাত্র ১·৬৫ নয়া পয়সা। রেস্ট হাউসটি শহরের কেন্দ্র-স্থলে। বাজার, দোকান পশরা, হোটেল—সবকিছুই তার কাছে। বাস স্ট্যান্ডও দূরে নয়। তুংগভদ্রা বাঁধ মাত্র চার মাইল দূরে। সুতরাং, সেইরাত্রের মতো প্রবাসী মন্দিরেই আস্তানা ঠিক হলো।

রাত্রে বিছানায় গা ঢেলে দিতেই মনে হলো হসপেটের পূর্বনাম নাগালাপুর। জননী নাগালা দেবীর সম্মানার্থে রাজা কৃষ্ণ দেবরায় ১৫০৯ থেকে ১৫২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই শহরটি নির্মাণ করেন এবং মায়ের নামানুসারে এর নামকরণ করেন নাগালাপুর। শহরটি রাজার অতি প্রিয় ছিলো,—তিনি এখানে থাকতে খুব পছন্দ করতেন। গোয়া এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের পর্যটকরা হসপেটের ভিতর দিয়েই সেকালে রাজধানী হাম্পিতে প্রবেশ করতেন। হসপেটের গুরুত্ব তখন যথেষ্ট ছিলো। আজ যে হসপেটে আমরা এসেছি, সেখানে কয়েকটি ভেঙে-পড়া-ইমারৎ ও ধ্বংসস্তূপ ছাড়া সেদিনের আর-কিছুই খুঁজে পাওয়া গেলো না। ছোটোখাটো শহর হলে হবে কি, বর্তমান হসপেট আধুনিক শহরের সব-কিছু সুখ-সুবিধে ও বিলাস-উপকরণ নিয়ে সাধারণের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হয়ে আছে। এখানে কী নেই? থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলো, দূরভাষ (টেলিফোন), পিচের চমৎকার সড়ক, বিজলী বাতি ও ফ্লুওরেসেন্ট আলোয় ঝলমলে তার চেহারা; পথের দুধারে অজস্র দোকান পশরা, কাফি ক্লাব, আমিষ ও নিরামিষ হোটেল। এ ছাড়াও রয়েছে তুংগভদ্রা বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং একটি ইস্পাতের কারখানা। বাঁধের বুকে অবসর বিনোদনের জন্যে মহীশূরের বৃন্দাবন উদ্যানের মতো একটি উদ্যানও রচনা করা হয়েছে—যদিও, বৃন্দাবনের সঙ্গে তার তুলনাটাই হাস্যকর।

সেইরাত্রে আমরা তিনজন বিস্মৃতির কালো পর্দা সরিয়ে বিজয়নগরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছিলুম। কিন্তু, একে কি ইতিহাস বলবো? ইতালির নিকালো কন্তি (১৪২০ খৃষ্টাব্দ), সমরখন্দের আবদুল রেজ্জাক (১৪৪০), পর্তুগীজ ডোমিংগো পাএস (১৫২০) ও ফার্নাও নুনিজ এবং ইতালির সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৭) রাজধানীতে এসে তাঁদের বিবরণ যদি না লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, তা হলে সব-কিছুই বিস্মৃতির অতল গর্ভে চিরকালের মতো তলিয়ে যেতো। বিজয়নগরের ইতিহাসের জন্যে আমরা চিরকাল এই বিদেশী বণিক ও পর্যটক-দের স্মরণ করবো।

হাম্পি সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা হচ্ছে এই যে, হাম্পি একটি ছোট গ্রাম। মহীশূর রাজ্যের বেলারি জেলায় তুংগ-ভদ্রা নদীর দক্ষিণ তটে পম্পাপতি স্বামী মন্দির। তাকে কেন্দ্র করে এই ছোট্ট গ্রাম ধীরে-ধীরে একদিন বিজয়নগরের রাজধানীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নরসিংহ মূর্তি

এখানে শিল্পকলা, ভাস্কর্য ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। হাম্পির ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের সীমা ছিলো না। কিন্তু, আমরা কী দেখলুম? দিগন্ত-প্রসারী গ্র্যানাইট পাহাড়ের শ্রেণী, তার মধ্যে জনশূন্য পরিত্যক্ত এক বিরাট প্রান্তর,—সেই প্রান্তর জুড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিপুল পাথরের স্তূপ, বিধ্বস্ত সৌধ ও প্রাসাদ এবং মরুভূমির অপার শূন্যতা নিয়ে সেদিনের ঐশ্বর্য-গরবিনী হাম্পি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, হাহাকার করে উঠছে। এখনো তার বিগতকালের সাক্ষী রয়েছে ওই কলনাদিনী তুংগভদ্রা,—সে আজো তার উত্তর প্রান্ত ছুঁয়ে বয়ে চলেছে।

হাম্পির ধ্বংসস্তূপ নয় বর্গমাইল-স্থান জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না যে আরো বিশাল এলাকা নিয়ে তার পরিধি বিস্তৃত ছিলো। ধূসর রঙের দুর্ভেদ্য নগরপ্রাকার আজ অবশ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেছে,—কিন্তু নয় মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে যে-তোরণটি রয়েছে, সেটিই সুনিশ্চিতরূপে হাম্পির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবেশপথ ছিল। আর উত্তর ও পূর্ব সীমা ছিলো যথাক্রমে আনাগুন্ডি ও কাম্পলি।

হাম্পির বুকের উপর ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধের যে-কাঠামোগুলি আজো দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে তাকালে সেই বিস্মৃত কালের অবলুপ্ত সৌন্দর্য ও গঠন-সৌকর্যের কিছু আভাস বা আন্দাজ আজো পাওয়া যায়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিটি পাথরেই লেখা রয়েছে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাওয়া হিন্দু-সাম্রাজ্য বিজয়নগরের উত্থান ও পতনের কাহিনী, প্রতিটি পাথরের সঙ্গে প্রতিটি পাথরের রয়েছে অপার আত্মীয়তা ও উত্থান-পতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা এই স্বাধীন সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সাক্ষী হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবলুপ্তির হাত থেকে কোনো রকমে রক্ষা পেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। যে-সব শিল্পী, স্থপতি ও কারিগর এই রাজ্যের বৃহদাকার সৌধ ও ইমারৎসমূহের পরিকল্পনা এবং নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছিলো, তাদের কাজের বিশালতা, সুষ্ঠু বিন্যাস এবং শিল্পকর্ম দেখলে বিস্ময়ে মাথা নত হয়ে যাবে। নন্দনতত্ত্বে তাদের জ্ঞান ছিলো প্রখর। তারা বিরাট বিরাট পাথর কেটে, ভেঙে, ছেনি দিয়ে খোদাই করে বিশাল স্তম্ভ, হল, মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও সৌধগুলি নিজস্ব রীতি ও পদ্ধতিতে নির্মাণ করে নগরীর পরম শিল্পময় রূপ ও যে-সুষমা ফুটিয়ে তুলেছিলো, তা সত্যিই পরম বিস্ময়ের। জনসাধারণেরও শিল্পে ছিলো প্রগাঢ় নিষ্ঠা। প্রাণপ্রাচুর্যেভরা এই নগরীতে তারা তাদের স্বাভাবিক রীতিতে ভাস্কর্য, কাব্য, সংগীত ও নৃত্যকলার চর্চা করতো।

হাম্পির সৌধসমূহের একটি চমৎকার বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছি। মন্দির গঠনে ও প্রাসাদের নিচের অংশ নির্মাণে যে-পাথর ব্যবহৃত হয়েছিলো, সেগুলির আকার এরূপ বৃহৎ ছিলো যে গাঁথুনির সময় সিমেন্টজাতিয় কোনো পদার্থ ব্যবহার করার আদৌ আবশ্যক হয়নি।

কিন্তু, হাম্পির কথা এখন থাক্। তার আগেই ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করার আছে। তারো আগে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক চেহারার একটু পরিচয় নিতে হবে।

জালালুদ্দিন খিলজি তখন দিল্লীর সুলতান। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খিলজি তাঁর অনুমতি না নিয়ে মহারাষ্ট্রের যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী দেবগিরি (বর্তমান দৌলতাবাদ) আক্রমণ করলেন এবং রাজা সেই আক্রমণের মোকাবিলা করতে না পেরে ইলিচপুর নামের প্রদেশ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে প্রচুর ধনদৌলত উপঢৌকন দিয়ে দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করলেন। তারপর ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দিনকে হত্যা করে আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করলেন। এইবার তাঁর সাধ হলো—আলেকজান্দারের মতো পৃথিবী জয় করবেন। কিন্তু পৃথিবী বস্তুটি তো নিহাৎ ছোটো নয়,—ভারতবর্ষের অনধিকৃত অঞ্চলে হাত পাকিয়ে তবেই পৃথিবীর অন্য অংশ কুক্ষিগত করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সে কারণ, তিনি সবার আগে ভারতবর্ষের হিন্দু রাজ্য অধিকারে মন দিলেন। প্রথমে গুজরাট, পরে চিতোর (বুদ্ধিমান পাঠক এইখানে পদ্মিনীর ইতিহাস স্মরণ করবেন।) অধিকার করে তিনি মধ্য ভারতের ধারা, মান্ডু, উজ্জয়িনী চান্দেরী প্রভৃতি জায়গাগুলো দখল করে নিলেন এবং পরিশেষে দাক্ষিণাত্যের দিকে মুখ ফেরালেন।

ইতিহাস বলে—তিনি চারবার দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন। এই চারটি অভিযানে নেতৃত্ব করেন তাঁর প্রিয়পাত্র ও সেনাপতি মালিক কাফুর। যাদবরাজ রামচন্দ্রের পুত্র বিদ্রোহী হয়ে কর দেওয়া বন্ধ করলে মালিক কাফুর তাঁকে হত্যা করে যাদব বংশ ধ্বংস করেন। তাঁর পরবর্তী অভিযান অন্ধ্র দেশের কাকতিয় রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী বরংগল বা ওয়ারাংগলের ওপর। মালিক কাফুরের দুর্ধর্ষ বাহিনীর হাতে পরাজিত হয় রাজা দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন। এইভাবে তুংগভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যেকার বিশাল ভূভাগ দিল্লীর অধীনে চলে আসে। ১৩১০ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর দোরসমুদ্রের হয়সালা (বর্তমান মহীশূর) রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা তৃতীয় বল্লাল কাফুরের অজেয় বাহিনীর বিরুদ্ধে টিকতে না পেরে পরাজিত হন এবং অগাধ ধনরত্ন দিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। মাদুরার পান্ড্য রাজাকে পরাস্ত করে মালিক কাফুর রামেশ্বরম্ পর্যন্ত এগিয়ে যান এবং সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করান। এর তিন বছর পর ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে কাফুর আবার দোরসমুদ্র লুন্ঠন করে হয়সলাদের ধ্বংস করেন।

এরপর ক্ষমতার লালসায় শ্রেষ্ঠত্ব-লাভের জন্যে স্থানীয় মুসলমান শাসকরা নিজেদের মধ্যে কোঁদল শুরু করে দেয়। তাদের এই দ্বন্দ্বের ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তারই পটভূমিকায় ১৩১০ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের ইতিহাস শুরু হয়। অবশ্য, সাম্রাজ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করতে তার কয়েক দশক সময় লেগে যায়।
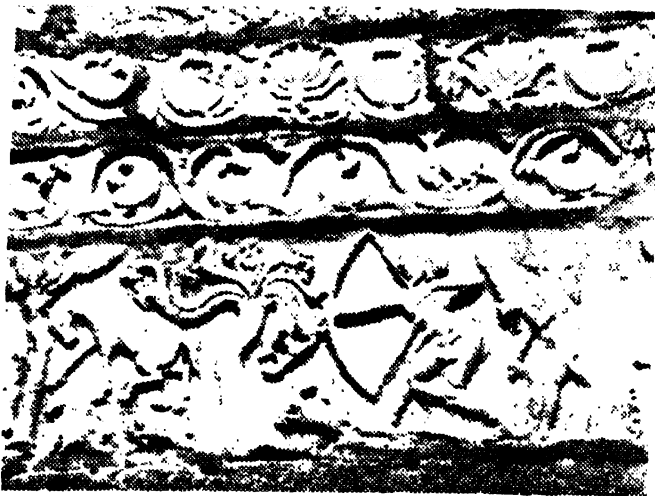
দশেরা ডিববার বাইরের দেয়াল

কেউ-কেউ বলেন, দোরসমুদ্রের হয়সলারাজ তৃতীয় বীরবল্লাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তুংগভদ্রা নদীর দক্ষিণে আনাগুন্ডিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। পরে এই দুর্গকে কেন্দ্র করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের আবির্ভাব ঘটে।

অপর মতে, গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের রাজত্বকালে তাঁর ছেলে জুনা খাঁ কাকতিয় রাজধানী বরংগল আক্রমণ করে ধ্বংস করলে সংগম নামের এক ব্যক্তির পাঁচ পুত্র—তার মধ্যে হরিহর ও বুক্কার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়—সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তুংগভদ্রা নদীর তটে এই নতুন রাজ্য স্থাপন করেন।

দুটি মতে পার্থক্য থাকলেও সংগমের পুত্রগণই যে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাতে কোনো ভুল নেই। আবার কোনো-কোনো বিবরণে তাদের সংগে হয়সলাদের সম্পর্কের কথাও স্বীকার করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংগমের দুই পুত্র প্রথম হরিহর ও বুক্কা ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই মহৎ উদ্যমে তাঁদের সহায়তা করেন বেদের ভাষ্যকার সায়ন ও তাঁর ভাই শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীংগেরি মঠের প্রধান পুরোহিত মাধব বা বিদ্যারণ্য। রাজগুরু মাধবই এই নতুন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন।

ইতিহাসে পাচ্ছি—বিজয়নগরে চারটি বংশ রাজত্ব করে গেছে। প্রথম রাজবংশ, অর্থাৎ সংগম বংশীয় ন'জন নৃপতির রাজত্বকাল ১৩৩৬—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ। গৃহবিবাদের ফলে সংগম বংশের পতন হলে নরসিংহ সালুবা নামে একজন সেনাপতি জোর করে সিংহাসন দখল করে নিয়ে সালুবা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নরসিংহ ও তাঁর ছেলের রাজত্বকাল ১৪৮৬—১৫০৮ খৃষ্টাব্দ। এরপর পরমনায়ক ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুলুবা রাজবংশ স্থাপন করেন। এই বংশের ছ'জন নৃপতির রাজত্বকাল ১৫০৮—১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ। পরমনায়েকের ছেলে কৃষ্ণ দেবরায় (১৫০৯—১৫২৯ খৃষ্টাব্দ) বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। তিনি শুধু রাজনীতিজ্ঞ, কূটনীতিক ও সমরকুশলীই ছিলেন না সংগীত সাহিত্য ও শিল্পকলায় তাঁর অগাধ অনুরাগ ছিলো। চতুর্থ বা শেষ রাজ বংশ রামরাজা বা আরাবিদু বংশীয় ছজন নরপতি ১৫৬৯—১৬৪৪ খৃঃ পর্যন্ত বিজয়নগরে রাজত্ব করেন। রামরাজার ভাই তিরুমল পেনুগোণ্ডায় এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের প্রসিদ্ধ রাজার নাম বেংকাট। তিনি বৈষ্ণব ও তেলগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পরে তিনি রাজধানী চন্দ্রগিরিতে সরিয়ে নিয়ে যান। তারপরে
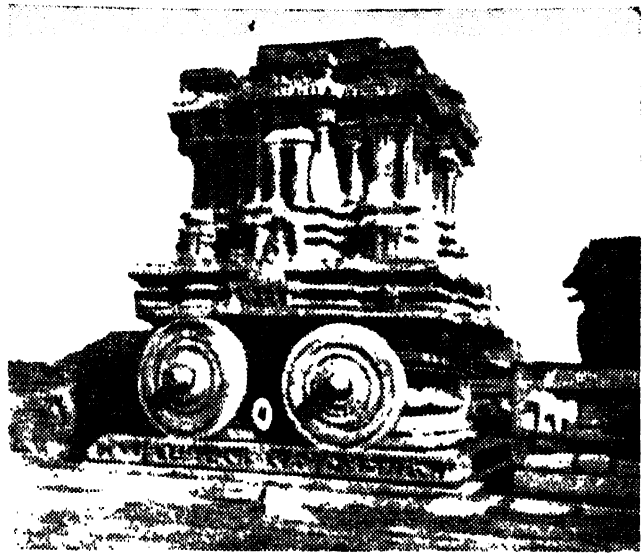
বিঠল মন্দিরের পাথরের রথ

ধীরে-ধীরে এই রাজ্য তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নিঃশেষে মুছে যায়।

প্রথম হরিহরের রাজত্বকাল থেকেই বিজয়নগর পরাক্রমশালী ও অজেয় হয়ে উঠতে থাকে। মুর পরিব্রাজক ইবন বতুতা ১৩৩৪—১৩৪২ খৃঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বলেন, মুসলমান প্রধানগণ পর্যন্ত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতেন।

হরিহরের ভাই বুক্কা রায় বিজয়নগরের পরবর্তী নৃপতি। ইতিহাসে তাঁর প্রসিদ্ধিও বড়ো কম নয়। শত্রুর কাছ থেকে দোরসমুদ্র থেকে শুরু করে একশোটি নগর তিনি মুক্ত করেন। তাঁর তেত্রিশ বছরের রাজত্বকালে তিনি তুংগভদ্রা থেকে শুরু করে সম্ভবত ত্রিচিনপল্লী পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্য দখল করেন এবং পূর্বদিকে উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। শোনা যায়, চীন দেশেও তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন।

বুক্কা রায়ের ছেলে দ্বিতীয় হরিহর সিংহাসনে আরোহণ করে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর ছেলে প্রথম দেবরায়ের রাজত্বকালেই গুলবর্গার বাহমণি সুলতানদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ শুরু হয়। ঐতিহাসিক ফিরিস্তার বিবরণে এই সংঘাতের উল্লেখ দেখা যায় এবং জানা যায় যে, সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে দেবরায় বাহমণি সুলতান ফিরোজ শাহকে নিজের কন্যা সম্প্রদান করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষভাগে রাজা দেবরায় সুলতানকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন এবং মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে বিজাপুরকে ধ্বংস করেন। ফিরোজ শাহ্ এই বিপর্যয়কে রোধ করতে পারেননি।

কিন্তু, তাঁর উত্তরাধিকারী আহমেদ শাহ্ এই আঘাতকে সামাল দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানেন হিন্দুদের ওপর। ফলে, হিন্দুরা বিতাড়িত হয়,—আহমেদ শাহ চরম আক্রোশে বিজয়নগর আক্রমণ করে শিশু ও নারীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন এবং পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এর ফলে সমস্ত রাজ্য জুড়ে অকল্পনীয় রক্তপাত ও অভাবনীয় ত্রাসের সঞ্চার হয়। শেষে দু পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়, আহমেদ শাহ্ তাঁর রাজ্যে ফিরে যান এবং কিছুকাল পরে একশো মাইল উত্তরে বিদরে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান।

এর পরেও কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বিন্দুমাত্র কমেনি,—ছোটো খাটো সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকে। এই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে বিজয়নগরের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি কৃষ্ণ দেবরায়ের সিংহাসনে আরোহণের পরেই। তাঁর রাজত্বকাল অর্থাৎ ১৫০৯—১৫২৯ খৃষ্টাব্দ হচ্ছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও গৌরবের কাল। তিনিই বিজয়নগরকে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যান। তাঁর মহৎ ও আপ্রাণ প্রচেষ্টায় এবং অসমসাহসিক কার্যের ফলে বিজয়নগর ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। তিনি দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে কটক এবং পশ্চিমে সালসেট পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজ্যকে সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ, সুন্দর ও সুরক্ষিত করবার জন্যে বহু মন্দির, সৌধ, সড়ক, তোরণ, জলাশয় ও সেচ খাল প্রভৃতি

নির্মাণ ও খনন করান। নিজের রাজ্যকে দক্ষিণ দিকে সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য করে তুলে রাজা কৃষ্ণ দেবরায় বিজাপুরের সুলতান ইসমাইল আদিল শাহ্-এর বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করেন। রায়চুর দুর্গ নিয়ে দীর্ঘ দু' শতাব্দীকাল সুলতান ও বিজয়নগর রাজাদের মধ্যে বিরোধ ছিলো। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণ দেবরায় রায়চুর অবরোধ করে দুর্গটি পুনরুদ্ধার করেন, বিজাপুর লুণ্ঠন করেন এবং গুলবর্গাকে ধ্বংস করেন। এই বিজয়ের ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পর্তুগীজ পর্যটক পাএস রাজা কৃষ্ণ দেবরায়কে কয়েকবার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তাঁর মতে, রাজা ছিলেন অমিত শক্তিশালী ও সদাশয়, আচার ও আচরণে আকর্ষণশালী; প্রবল তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব; তিনি সশরীরে সৈন্য পরিচালনা করতেন, বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; রাজনীতির জ্ঞান ছিলো প্রখর, সাহস ছিলো দুর্জয়,—অথচ তিনি ছিলেন দয়ালু, কোমল এবং অন্যায়ের কাছে মহানুভব। রাজোচিত সদ্গুণের তিনি অধিকারী ছিলেন, সকলেই তাঁকে সমীহ ও ভয় করে চলতো। এই মহান শাসক ছিলেন ন্যায়ানুরাগী,—শিল্পী, কবি এবং সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। যে আটজন কবি তাঁর সভা অলংকৃত করতেন তাঁদের মধ্যে আল্লাসানি পেদ্দানার নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। লক্ষাধিক বাসগৃহ সমন্বিত বিজয়নগরকে পাএস পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী শহর বলে উল্লেখ করেছেন।

ইতালিয় বণিক নিকলো কান্তির মতে, বিজয়নগরের রাজধানীর পরিধি ৬০ মাইল। পর্তুগীজ পর্যটক নুনিজ বলেন, রাজপ্রাসাদে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া অন্য কোনো ধাতব পাত্রের ব্যবহার ছিলো না। শুধু সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের দিক থেকে নয়, বিজয়নগরে শাস্ত্রচর্চা, সাহিত্য ও সংগীতের রীতিমতো মর্যাদা ছিলো এবং স্ত্রী-শিক্ষারও প্রচলন ছিলো।

কৃষ্ণ দেবরায়ের শাসনকালে বিজয়নগরকে শাসনকার্যের সুবিধের জন্যে অনেকগুলি প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রতি প্রদেশ একজন শাসনকর্তা বা গভর্ণরের নিয়ন্ত্রণে ছিলো—তিনিই সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এই প্রাদেশিক শাসকরা সরকারি রাজকোষে বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিতেন এবং রাজার জন্যে এক বিরাট সৈন্যদল পোষণ করতেন। এই সৈন্যদল ও অর্থ রাজা যথাক্রমে ওড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারত অভিযানে এবং রাজধানীকে সুসজ্জিত করার জন্যে বিপুল ব্যয়বহুল সৌধসমূহ নির্মাণে ব্যয় করেন।

পাএসের বিজয়নগর পরিদর্শনের প্রায় আশি বছর আগে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে সমরখন্দের রাজদূতের সঙ্গে আবদুর রেজ্জাক বিজয়নগরে পদার্পণ করেন। তিনি বলেন ঃ "বিজয়নগর নগরী এমনি সুন্দর যে মানুষের চোখের মণি কখনো এমন স্থান দেখেনি এবং এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন কিছু যে এ-পৃথিবীতে আছে শ্রবণেন্দ্রিয় তা কখনো শোনেনি!"

ডিউরেট বারবোসা পর্তুগিজ সরকারের পক্ষ থেকে ১৫০০—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁর লেখায় বিজয়নগরের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, রাজধানী খুব বিশাল ও বিপুল জনসমৃদ্ধ। দেশীয় হীরক, পেগুর চুনি, চীন, আলেকজান্দ্রিয়া ও কুইনাবারের রেশম এবং মালাবারের কর্পূর, মৃগনাভি, গোলমরিচ ও চন্দনের প্রধান কর্মব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র। তাঁর বিবরণে জানা যায়—রাজা ও মন্দিরের প্রাসাদগুলি পাথরের তৈরী জমকালো সৌধ—যদিও রাজ্যের বেশির ভাগ লোক খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি নিকৃষ্ট ধরনের কুঁড়েঘরে বাস করে।

তালিকোটা বা রাক্ষস তরংগীর যুদ্ধে লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হবার পরেও বিজয়নগরের পূর্ব সৌন্দর্যের বেশ কিছু অবশিষ্ট ছিলো। লুণ্ঠনের দু' বছর পর সিজার ফ্রেডারিক বিজয়নগর দেখে লেখেন ঃ "আমি অনেক রাজদরবার দেখেছি, কিন্তু, নগরটি যেরূপ বিশিষ্ট বিজয়নগর (Bijianuggur) রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এমন কিছু আমার নজরে পড়েনি।"

কৃষ্ণ দেবরায়ের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর সৎ-ভাই অচ্যুত রায়। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই বিজয়নগরের সৌভাগ্য-সূর্য অস্তাচলে নামতে শুরু করে। অচ্যুত রায়ের পর সিংহাসনে উপবেশন করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সিংহাসনে বসান কর্ণাটকের শাসনকর্তা রামরাজা। রামরাজার হাতেই রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা ছিলো। সরগিরি অর্থাৎ পেনুগোণ্ডার সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন এবং দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের সংগে মুসলমান রাজ্যগুলিকে বারংবার অপদস্থ করেন। তাঁর দুর্ব্যবহারে এই মুসলমান রাজ্যগুলির শাসকরা ক্রোধে ও উত্তেজনায় আগুনের মতো জ্বলতে থাকেন। অবশেষে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহমেদনগর ও বিদর রাজ্য পরস্পরের বিবাদ বিসংবাদ ভুলে গিয়ে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে একযোগে সকলের সাধারণ শত্রু বিজয়নগরকে আক্রমণ করা স্থির করেন।

দীর্ঘদিন মুসলমানদের আক্রমণ কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করার ফলে বিজয়নগরের সেনাপতিদের নিজেদের ওপর অহেতুক আস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। তাঁরা বিশ্বাস করতেন—শত্রুর যে কোনো আক্রমণের মুখোমুখি হবার এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ও সামর্থ তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। এই ঠুনকো আত্মবিশ্বাসই তাঁদের পতনের মুখ্য কারণ হয়ে উঠলো। মুসলমান আক্রমণ যখন সত্যি-সত্যি শুরু হলো, দেখা গেলো, বিজয়নগরের সৈন্যরা তার মোকাবিলা করার পক্ষে একেবারেই অপ্রস্তুত।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনে সম্মিলিত মুসলমান শক্তি দক্ষিণ দিকে তাদের সৈন্যচালনা শুরু করলো। তারা সরাসরি এসে উপস্থিত হলো কৃষ্ণা নদীর উত্তরে তালিকোটা দুর্গের কাছাকাছি। তাদের মৎলব ও পরিকল্পনা ব্যর্থ করবার জন্যে রামরাজা নদীপথ অবরোধ করবার উদ্দেশ্যে গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সমবায়ে গঠিত এক দুর্ধর্ষ বাহিনী প্রেরণ করলেন। তার পর আরেকটি বিপুল সৈন্যবাহিনীর সংগে তাঁর ভাইকে পাঠালেন,—সবার শেষে তিনি বিজয়নগরের অবশিষ্ট সৈন্য-সমভিব্যাহারে সশরীরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তালিকোটায় যে স্মরণীয় সংগ্রাম শুরু হলো, তা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলে। এই যুদ্ধই তালিকোটা বা রাক্ষস তরংগীর যুদ্ধ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

সংগ্রামী দুই পক্ষই দু-তরফে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে। ৬০০ কামান নিয়ে যে মুসলমান গোলন্দাজবাহিনী গঠন করা হয়েছিলো সেগুলিকে তিন ভাগে সন্নিবিষ্ট করা হলো। প্রথম শ্রেণীতে রইলো ভারি কামানের বাহিনী, তারপর মাঝারি কামান শ্রেণী এবং পশ্চাদ্দিকে মুখ ঘোরানো যায় এমন কামান শ্রেণী। কামানগুলি এমন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছিলো যাতে হিন্দুরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গও জানতে পারেনি।

নব্বুই বছরের বৃদ্ধ রামরাজা কেন্দ্রস্থলের সৈন্য পরিচালনা করছেন। তাঁর দুই ভাইকে বাম ও দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করবার নির্দেশ দিলেন। আর সেই মুহূর্তেই প্রচ্ছন্ন অবস্থায় গোলন্দাজবাহিনী আক্রমণ-মুখী বিজয়নগর সৈন্যদলের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করলো। সেই অতর্কিত ও অভাবনীয় অগ্নিবর্ষণে বিজয়নগর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দারুণ ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো, তারা পিছু হটে এলো। আর

তার ফলে যে ফাটলের সৃষ্টি হলো, তার মধ্য দিয়ে মুসলমান অশ্বারোহী-বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাঘাত করে সামনের দিকে বিপুল বেগে অগ্রসর হতে লাগলো এবং সোজাসুজি হাজির হলো তত্ত্বাবধান ও সৈন্য পরিচালনায় রত বৃদ্ধ রামরাজার সুসজ্জিত শিবিকার কাছে। কথিত আছে, সৈন্যদলকে উৎসাহিত করার মানসে তিনি "মুক্তোর ঝালরে সজ্জিত ও সোনার কাজ-করা-গাঢ় রক্তবর্ণের মখমলের চন্দ্রাতপের নিচে মণিরত্ন খচিত সিংহাসনে" উপবেশন করে যারা ভালোভাবে লড়াই করেছে তাদের অর্থ বিতরণ করছিলেন। হিন্দু সৈন্যরা যখন পিছিয়ে আসছে সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে বিপক্ষের একটি হাতি সবেগে রামরাজার দিকে ছুটে এলো। রামরাজা ঘোড়ায় উঠে পালাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন, তাঁকে বন্দী করে তাঁর গলা কেটে ফেলা হলো।

এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে যে ত্রাসের সৃষ্টি হলো, তার জন্যে হিন্দু সৈন্যরা নতুন ও সুবিধাজনক স্থানে নিজেদের পুনরায় সমবেত করে' যুদ্ধ করার কোনো চেষ্টাই করলো না। চারিদিকে শুধু বিভীষিকা, আতঙ্ক আর দারুণ বিশৃঙ্খলা। এই তো গেলো সৈন্যদলের কথা। কিন্তু, রাজধানীর অবস্থা কী? রামরাজা সমস্ত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে গেছেন, ফলে অরক্ষিত রাজধানীতে লুঠেরাদের তখন পোয়াবারো। যুদ্ধের পরদিন রাজধানী যাযাবর বেদুইন ও লুঠেরাদের দ্বারা লুণ্ঠিত হলো। তার পরের দিন বিজয়ী মুসলমান বাহিনী আগুন তরবারি, শাবল ও কুঠার নিয়ে রাজধানী হাম্পিতে প্রবেশ করে পৈশাচিক ও অমানুষিক ধ্বংসের লীলায় মেতে উঠলো। সেই বন্য তাণ্ডবে বিজয়নগর বিধ্বস্ত হয়ে গেলো।

হাম্পির লুণ্ঠনের দু-বছর পর সিজার ফ্রেডারিক বিজয়নগরে আসেন। তিনি বলেন : জনমানবশূন্য অবস্থায় গৃহগুলি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং তাতে বাস করছে বাঘ এবং অন্যান্য আরণ্যক জন্তুর দল।'

এইভাবে একটি জনবহুল ঐশ্বর্যময় পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেলো, পড়ে রইলো জনশূন্য বিরাট এক নিস্তব্ধ প্রান্তর আর তার মধ্যে কতোগুলি নিষ্প্রাণ পাষাণের স্তূপ!

শ্রীমতী রায় বল্লেন : তার পর?

বল্লুম : 'অতীত ঘেঁটে আর লাভ নেই, ইতিহাসের এইখানেই শেষ। কিন্তু, রাত যে অনেক হ'লো। এবার শুয়ে পড়া যাক্—কাল আবার ভোরে উঠ্তে হবে!'

ডঃ ঘোষের আহার ও নিদ্রার উৎসাহ বরাবরই বেশি। আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখি, তিনি তাঁর কক্ষে অন্তর্হিত হচ্ছেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আমি আপনার সাপ্তাহিক 'অমৃতের' নিয়মিত পাঠক, বিশেষ আগ্রহশীল 'জানাতে পারেন' বিভাগটির জন্য। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে নিম্ন প্রশ্নটি পাঠালাম। সঠিক উত্তরের আশা করি।

(১) সরস্বতী উপাধির বিশেষত্ব কি?

(২) পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় শহর কোনটি?

অরুণ দেব
লংকা, নওগাঁ,
আসাম।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'অমৃতে' 'জানাতে পারেন' বিভাগটি পাঠকদের নিকট সত্যিই একটি চিত্তাকর্ষক বিষয়। এটি পাঠকদের নানা জিজ্ঞাসার একটি চাবি-পথ। আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় এই বিভাগে পাঠালাম, আশা করি সদুত্তর পাব।

(১) বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী নাটক-সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ও লেখকের নাম কি?

(২) আমেরিকার জীবিত কবি ও নাট্যকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলা যেতে পারে?

(৩) (ক) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে বর্তমান বইয়ের সংখ্যা কত? লাইব্রেরীয়ানদের নাম কি?

(খ) ভারতে যেমন ব্রিটিশদের পরিচালিত বা আমেরিকানদের পরিচালিত লাইব্রেরী আছে, তেমনি বিদেশে ভারতীয়দের পরিচালিত কোন লাইব্রেরী আছে কি? যদি থাকে তো কোথায় এবং নাম কি?

(৪) W. B. Yeats; T. S. Eliot; G. B. Shaw এবং Haldor K. Laxness যথাক্রমে কোন্ বই লিখে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?

শ্রীবিমান দত্ত
সারদাসদন
৮৬ পল্লীশ্রী
কলিকাতা-৪০।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

১লা ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত শ্রীদিলীপকুমার নিয়োগী মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, টস করিবার প্রথা ইংলণ্ডেই প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে সন, তারিখ বলা কঠিন। কারণ টসের গুরুত্ব সম্বন্ধে কেউ মাথা ঘামিয়েছেন কিনা আমি ঠিক জানি না। এ সম্বন্ধে অন্য কেউ আলোকপাত করলে খুশী হবো।

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী,
৬১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা—৫।

সবিনয় নিবেদন

১৬ই নভেম্বর '৬২ তারিখে আমি যে জবাব দিয়েছিলাম 'জানাতে পারেন' বিভাগে, ৪ঠা জানুয়ারী '৬৩-র সংখ্যায় স্বপন বসু সে সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই সে জন্য।

প্রশ্নটি ছিল—বিপদজ্ঞাপক চিহ্ন হিসেবে লাল রঙের ব্যবহার হয় কেন এবং কতদিন থেকে তা শুরু হয়েছে? এর জবাব প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম যে, 'লালের মধ্যে আছে ভয়ংকরের সূচনা।' স্বপন বসু বলছেন—'কিন্তু লালে যে রোমান্টিকতার চরমতম প্রকাশ তা তো সকলেরই জানা।' আমার জানা ছিল না—সবিনয়ে সে কথা স্বীকার করছি। অনুরাগে 'রাঙা হওয়ার কথাটা অবশ্য মানি— কিন্তু অনুরাগই কি জীবনের একমাত্র রোমান্টিকতা? আমার মতে, নীল রঙই (আকাশ নীল, নাবিক নীল নয়) রোমান্টিক স্বপ্নিলতার রঙ। স্বপন বসু আমার সঙ্গে একমত নন—এ জন্য দুঃখিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রক্তের লাল হবার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন জানি, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে রক্তের রঙকে লাল মনে হয় না? খুনো-খুনি, রক্তারক্তি কাণ্ড যদি ঘটে—তাহলে ঘটনাটা যে ভয়ানক ঠেকে—তার অন্যতম কারণ হল ওই 'লাল' রক্ত।

এছাড়া, আগুন যদি লাগে, তবে তা-ও ভীতির সঞ্চার করেই। আর আগুনের রঙও তো লালই ঠেকে।

সাধারণভাবে ধরুন না কেন—মানুষে যদি রাগ করে, তাহলেও সে লালই হয়। এবং কারোর কারোর ক্ষেত্রে তাও ভীতিকারক বটে।

আর লাল রঙ যে সত্যিই ভয়ংকরের সূচনা করে একথা স্বয়ং কবিগুরুই বলে গেছেন তাঁর 'রক্তকরবী'তে। উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধার করছি। অধ্যাপক নন্দিনীকে বলছেন—'তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।.....ওই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে।' রাজা বলে, 'ওই ফুলের গুচ্ছে দেখি আর মনে হয় ও যেন আমারই রক্ত-আলোর শনিগ্রহ, ফুলের রূপ ধরে এসেছে।'

গোকুল বলে, 'সর্বনাশী তুমি।... দেখি দেখি সিঁথিতে তোমার ওই কী ঝুলেছে।' নন্দিনী—রক্তকরবীর মঞ্জরী। গোকুল—আমি কিছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা কিছু বিপদ ঘটাবে। ভয়ংকরী! ওয়ে ভয়ংকরী। সে আরও বলে, 'দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই নির্বোধদের বুঝিয়ে বলি গে সাবধান, সাবধান, সাবধান।

শেষতঃ জানাই — বিশ্বাসঘাতক 'লাল'-চীনের আক্রমণে ভারতের বর্তমান যে পরিস্থিতি—তাতেও কি 'লাল' ভয়ংকরের সূচনা করছে না?

দ্বিতীয়ত, 'সাযুজ্য' শব্দটির ব্যবহার বেমানান ঠেকেছে তাঁর কাছে—উপযুক্ত প্রতিশব্দ বাংলো দিলে বাধিত হতাম। তিনি আরও বলেছেন—'এছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি শুভকাজে প্রাচীনকাল থেকেই লাল রঙকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একথা বলার মানে বুঝলাম না ঠিক। কারণ আমি তো লাল রঙ অশুভ এমন কথা কোথাও লিখিনি। মূলে আমার বক্তব্যই তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি—তাই তাঁর কাছে তা ঠেকেছে বিতর্কমূলক। তিনি আরও লিখেছেন—'তাঁর (আমার) দ্বিতীয় উক্তি — স্বেচ্ছাচার যেমন কলঙ্কিত করেছে প্রতিটি নারীকে—তিনি বলছেন—'ভারত ইতিহাসে ঠিক এরকম অবস্থার নিদর্শন আমরা পাই না।' পাবেন কি করে? আদতে ইতিহাসই যে তখন তৈরী হয়নি। অর্থাৎ আমি বলেছি—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। 'সমাজের বিধান যখন সুশৃংখলিত হয়নি—' (স্বপন বসুকে আমার এই উক্তিটিও স্মরণ করতে অনুরোধ জানাই) সেই যুগের কথা।

বিপদসূচক চিহ্ন হিসেবে লাল রঙের ব্যবহার কেন—এর কারণ নির্দেশ করে তিনি যা লিখেছেন সেই পয়েন্টটি আমার উত্তরেও আছে। আর আমি বলেছি—এর ব্যবহার শুরু হয়েছে বহু দিন থেকেই। এর মধ্যে বিতর্কের অবকাশ কি খুবই আছে? বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে দাঁড়িয়ে কি মনে হয় না—উনিশ শতক থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি— উনিশ শতককে পিছনে ফেলে এসেছি বহুদিন?

শ্রীকুমকুম দে,
৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কোলকাতা—৯।

একাঙ্কিকা

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

চরিত্র-লিপি

অনুভা
রবি
শচীন
কেতকী
হরিচরণ

[অরণ্য নয় জনারণ্য। অন্ধকার—অপার, কিন্তু রাত্রির মত গভীর। সমগ্র অরণ্য নয়, বিচ্ছিন্ন এক অংশ। জোনাকির আলো নয়, দু-একটি জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন।]

অনুভা। অনেকক্ষণ কিন্তু হ'ল।

রবি । হ'ক না। ক্ষতি কি?

শচীন । ক্ষতি? কিছু না। সামনে থেকে ইঁট ছুঁড়তে পারে—এই যা।

কেতকী। ইট ছুঁড়বে? কারা?

শচীন । কেন? যারা টিকিট কেটেছে—তারা।

অনুভা। টিকিট তা হ'লে কিছু বিক্রী হয়েছে?

শচীন । সাড়ে পাঁচটা অবধি তিনখানা।

রবি । ক টাকার?

শচীন । দুখানা এক টাকার, আর একখানা দেড় টাকার।

কেতকী। ও! আমরা তো এখন থিয়েটারে? তাই না?

শচীন । কেন? তুমি কি ভেবেছিলে অন্য কোথাও?

কেতকী। আমি? আমি তো কিছু ভাবিনি।

রবি । কেন? ভাবনি কেন? কেউ কি মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

কেতকী। হ্যাঁ—জয়ন্ত।

অনুভা। জয়ন্ত এসেছিল বুঝি?

কেতকী। বাঃ—তা হ'লে বলছি কি! কাল রাত্তির দশটা অবধি বসে বসে গল্প করলুম।

অনুভা। আমার কথা কিছু বললে?

কেতকী। না। খালি যাবার সময় আমাকে ভাবতে বারণ ক'রে গেল। বললে, ভেব না—ভাবলে ব্লাড-প্রেসার লো হ'য়ে যাবে।

শচীন । তাই বুঝি ভাবার পাঠ বন্ধ?

কেতকী। একেবারে। কাল রাত্তির দশটা থেকে। তাই তো সময় আর এগোয়নি। এখনো যেন জয়ন্তর সামনেই আছি।

হরিচরণ। আচ্ছা...সিঙ্গাড়ার ফুড-ভ্যালু কত?

রবি । তুমি কিন্তু তা হ'লে না এলেই পারতে কেতকী।

কেতকী। বাঃ—আমি না হ'লে আমার পার্টটা করবে কে?

রবি । কিন্তু জয়ন্ত সামনে থাকবে না। পারবে তো?

কেতকী। কেন পারব না। তোমাকে জয়ন্ত ভেবে নেব। আমি তো যখন তখন যাকে তাকে জয়ন্ত ভেবে নিতে পারি। সে বুঝি জান না? গেল হপ্তায় জয়ন্ত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এল এক কয়লাওয়ালা—

হরিচরণ। আচ্ছা, সিঙ্গাড়ার ফুড-ভ্যালু কত?

(একটু যেন আলো এসে পড়ে। সেই আবছা আলোয় সকলকেই ঝাপসাভাবে দেখা যায়।)

কেতকী। কিন্তু আমার কাছে তো আর কয়লাওয়ালা নয়। আমার কাছে সে তখন জয়ন্ত। ঝপ ক'রে কয়লা নামিয়ে যেই না পেছন ফিরেছে, আমিও ফস করে বলে ফেললুম—

হরিচরণ। (হাসি চাপিতে না পারিয়া) কাকে বললে? কয়লাওয়ালাকে?

কেতকী। হ্যাঁ। বললুম— কয়লাওয়ালা, কেউ তোমায় মনে করিয়ে দেয়নি—তুমি রূপকথার রাজ-পুত্র? আরবা-উপন্যাসের পাতা থেকে তুমি উঠে এসেছ?

হরিচরণ। (জোরে হাসিয়া উঠিয়া) এই যাঃ! হেসে ফেললুম।

রবি । তাতে হ'য়েছেটা কি?

হরিচরণ। বাঃ! ডাক্তারের বারণ! ডাক্তার যে সময় বেঁধে দিয়েছেন! এই সময় থেকে এই সময় অবধি প্রফুল্ল হ'য়ে থাকতে হবে। তার আগে নয়, পরেও নয়।

অনুভা। কেন?

হরিচরণ। আমি যে ক্রণিক ডিস্‌পেপ্‌-সিয়ায় ভুগছি।

শচীন । ডাক্তার আর কিছু বেঁধে দেন নি?

হরিচরণ। নিশ্চয়। ফুড-ভ্যালু ধরে খেতে বলেছেন। তাই তো জিজ্ঞেস করছিলুম— সিঙ্গাড়ার ফুড-ভ্যালু কত।

রবি । কেন? তুমি কি সিঙ্গাড়া খাচ্ছ নাকি?

হরিচরণ। হ্যাঁ। দেখছ না—সামনে রয়েছে দুটো সিঙ্গাড়া আর এক কাপ চা।

শচীন । এ সময় কত ক্যালরি খেতে হবে?

হরিচরণ। আট।

শচীন । তা হ'লে খেয়ে ফেল। দুটো সিঙ্গাড়ায় তিন তিন ছয়, আর এক কাপ চায়ে দুই—এই হল গিয়ে আট।

কেতকী। সবশুদ্ধ কত ক্যালরি খেতে বলেছে হরিচরণ?

হরিচরণ। বলব না। ট্রেড-সিক্রেট্।

শচীন । বাঁচাটাও তোমার ট্রেড্ নাকি হরিচরণ?

হরিচরণ। নিশ্চয়। একেবারে একচেটে ব্যবসা। মনোপলি।

(আবছা আলো স'রে যায়। আবার অন্ধকার, আবার দু-একটি জ্বলন্ত সিগারেটের আগুন।)

রবি । তুমি কি বলতে চাও হরিচরণ? আমরা কি কেউ বাঁচছি না?

হরিচরণ। আমার বাঁচাটা আমিই বাঁচছি—তোমরা নও।

শচীন । কিন্তু এখন তো তোমাকে অন্যের ভূমিকায় বাঁচতে হবে।

হরিচরণ। কে বললে। আমি হরিচরণ। হরিচরণের ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যাব।

অনুভা। কিন্তু নাটকে যদি হরিচরণের ভূমিকা না থাকে?

হরিচরণ। সে কথা নাটক বুঝবে। (শুধু হরিচরণের ওপর আলো এসে পড়ে।) আমি আজ চল্লিশ বছর ধ'রে হরিচরণ হবার চেষ্টা ক'রে আসছি। আজ যখন হতে পেরেছি, তখন আমার পক্ষে অন্য কোন ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব নয়।

রবি । কিন্তু তুমি কি সত্যিই হরিচরণ হতে পেরেছ হরিচরণ?

হরিচরণ। নিশ্চয়। মা নাম রাখলেন হরিচরণ। দলের অধিকারী ছিলেন বাবা। উনিশ বছর বয়েসে প্রথম রোল পেলাম। কেরানীর রোল। সেই থেকে অভিনয় শুরু। ছোটো কেরানী করলাম, মেজো কেরানী করলাম, বড়ো কেরানী করলাম। কিন্তু আদর্শ কেরাণী ছিলেন বাবা—তাঁর মত হ'তে পারলাম না।

কেতকী। কেন?

হরিচরণ। চল্লিশের পর তাঁর ঠোঁটটা একটু বেঁকে গিয়েছিল। অসুখ কিনা জিজ্ঞেস করলে বলতেন— ক্রণিক ডিস্‌পেপ্‌-সিয়া। এতদিন চেষ্টা করেও সেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটা তয়ে হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আজ

হয়েছে। আমাকেও আজ ডাক্তার বলেছে—আমার ক্রণিক ডিসপেপ্‌সিয়া। আজ আমি সত্যিই হরিচরণ। তাই আমার পক্ষে আজ আর অন্য কোন ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব নয়।

(হরিচরণের ওপর থেকে আলো সরে যায়। আবার অন্ধকার।)

অনুভা। কিন্তু ব্যাপার যা দেখছি—আমাদের পক্ষেও তো কোন ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব নয়।

কেতকী। সত্যি। এখনো পর্যন্ত আলোই ঠিক হ'ল না।

রবি। সত্যি! অভিনয় আরম্ভই হল না—খালি মনে হচ্ছে—অভিনয় যেন শেষ হয়ে গেছে।

শচীন। কিছু নয়, কিছু নয়। স্টেজ-ম্যানেজারটা হাঁদা। উল্টো-পাল্টা সুইচ জ্বালাচ্ছে—তাই একবার আলো, একবার অন্ধকার।

অনুভা। আমার কিন্তু মনে হয়—আমাদের নির্দেশকের মতলব খারাপ।

কেতকী। কিন্তু সে তো লোক খারাপ নয়। এই সেদিন আমাকে একটা কোটির সেট কিনে দিয়েছে।

শচীন। আমি একবার বাইরে গিয়ে বরং দেখে আসি।

রবি। কিন্তু বাইরে তুমি যাবে কি ক'রে?

শচীন। কেন?

অনুভা। নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টেজ ছেড়ে যাওয়া বারণ।

শচীন। আরে ও-সব বড় বড় কথা দু-একটা বলতে হয়। নির্দেশক ব'লে ব্যাপার!

রবি। ওর ধারণা—ওই যেন সব!

হরিচরণ। সেইজন্যেই তো ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—আমরা না থাকলে ও কিছুই নয়।

অনুভা। হ্যাঁ—তাই একবার বোঝাতে গিয়ে দেখ না—

হরিচরণ। কি রকম?

অনুভা। সেদিন বলছিল—জান? তোমা-দের কাউকে আমার দরকার নেই! আমি একটা জলোচ্ছ্বাস, একটা ঘূর্ণি, একটা আগুন দেখিয়ে দর্শকদের মাত ক'রে দিতে পারি।

হরিচরণ। কিন্তু এই অন্ধকারে আমি ব'সে থাকতে পারছি না। ডাক্তার বলেছে—আলো আর হাওয়া— দুটোই আমার দরকার।

কেতকী। আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে—

অনুভা। কি বল তো?

কেতকী। আমরা আমাদের যতটা দরকারী ব'লে মনে করছি, ততটা দরকারী আমরা হয়তো নই।

রবি। নই-ই তো। সেদিন বলছিল—আমরা নাকি সব স্ক্রু আর বোল্টু। যখন যেটাকে ইচ্ছে বাদ দিয়ে, যেটা ইচ্ছে বসিয়ে নেবে।

কেতকী। আমার কিন্তু মনে হয়—এই ধরনের কথাবার্তা না বলে চুপচাপ অপেক্ষা করাই ভাল।

হরিচরণ। আচ্ছা, দেখবার লোক হয়েছে তো?

শচীন। ঐ যে বললুম সাড়ে পাঁচটা অবধি তিনজন।

হরিচরণ। তারপর আর হয় নি?

রবি। হয়েছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

অনুভা। কি ক'রে বুঝলে?

রবি। নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যে।

কেতকী। আচ্ছা— দর্শকদের নিঃশ্বাসের শব্দ কি রকম?

অনুভা। অনেকটা ঘুমন্ত লোকের নিঃশ্বাসের আওয়াজের মত।

রবি। আমার নিজেরও কিন্তু কি রকম ঘুম পাচ্ছে।

হরিচরণ। বেশ তো ঘুমিয়ে পড়ো। ইচ্ছেয় কক্ষণো বাধা দিতে নেই। ডিসপেপ্‌সিয়া ধরতে পারে।

রবি। ঘুম ঘুম চোখে আমার ছোট-বেলার কথা মনে আসছে।

(রবির ওপর আবছা একটু আলো এসে পড়ে) সেই ছোটবেলায়—আমার নিজের মা যখন বেঁচে ছিলেন—এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে মেয়েরা বেড়াতে আসত......মা বলতেন—খোকন নাচো তো...আর আমিও এক-পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচতুম......মা তালি দিতে দিতে ছড়া কাটতেন......

অনুভা। (তালি দিতে দিতে ছড়া কাটে। অনুভার ওপরও একটু যেন আলো এসে পড়ে।)

নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলোচাল খেতে দেব কোঁচড় ভরিয়ে।

রবি। (ঘুম ঘুম স্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এই রকম। নাচো তো সীতা-রাম (দুজনের ওপর থেকে আলো স'রে যায়।)।

হরিচরণ। (ব্যাকুল স্বরে) কিন্তু এ অন্ধকার আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না। আমার যে ক্রণিক ডিসপেপ্‌সিয়া... আলো ... অন্ধজনে দেহ আলো...আলো ...এতটুকু আলো...

[সমস্ত মঞ্চের উপর আলো এসে পড়ে।]

কেতকী। আঃ! এতক্ষণে আলো এল।

অনুভা। কিন্তু কি রকম কাঁপছে দেখেছ?

রবি। ঠিক বলেছ। কি রকম ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাচ্ছে...কি রকম যেন অস্থির!

শচীন। ওটা নির্দেশকের নির্দেশ। আরম্ভ করার আদেশ। আমা-দের অস্থির হ'তে বলছে—শুরু ক'রে দিতে বলছে।

রবি। বেশ তো। তা হ'লে আমরা আরম্ভ করে দিই। কই, এস কেতকী—

অনুভা। কিন্তু তার আগে দর্শকদের একটু ব'লে নিলে হয় না?

শচীন। ঠিক বলেছ। কিন্তু কে বলবে?

অনুভা। কেন—আমরা প্রত্যেকেই। তুমি আরম্ভ কর।

কেতকী। আমার কিন্তু মনে হয়—আগে থাকতে কিছু বলাটা ঠিক উচিত হবে না।

রবি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল—

হরিচরণ। জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নেই রবি। ওতে দুশ্চিন্তা বাড়বে বই কমবে না।

কেতকী। আর মিছিমিছি প্রশ্ন তুলে দেরি করা। সামনে ওঁরা ব'সে রয়েছেন।

শচীন। আমার কিন্তু মনে হয়—রবি প্রশ্নটা তুললেই ভাল করত। হয়তো ওর প্রশ্নের মধ্যে আমরা আরম্ভ করার একটা খেই পেয়ে যেতে পারি। তা হ'লে রবি......

রবি। না—মানে—ঠিক প্রশ্ন নয়...... একটা কথা......

অনুভা। কি কথা শুনি—

রবি। ওঁদের সামনে আমাদের সব খুলে বলাই উচিত।

অনুভা। বেশ তো বল—

শচীন। আমি বললে কিন্তু বেশ গুছিয়ে বলতে পারতাম।

অনুভা। সেইজন্যেই তো ওকে বলতে বলছি। কই রবি—ওঠ।

রবি। কে উঠবে? আমি?

অনুভা। নিশ্চয়।

রবি। আমাকে নিয়ে মজা করছ অনুভা। তুমি জান—কিছু বলতে গেলে আমার তোৎলামো এসে পড়ে।

অনুভা। একটু সুর ক'রে আরম্ভ কর—তা হ'লে আর তোৎলামো আসবে না। নাও নাও ওঠ—দেরি হয়ে যাচ্ছে—

রবি। (উঠিয়া দর্শকদের সামনে আসে) দেখুন...আজ... মানে আজ আমরা এখানে এসেছি... মানে প্রত্যেক অভিনেতার স্বপ্ন

থাকে...মানে আমারও ছিল... চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ হবার ......তা হ'লে কিন্তু খুব ভাল হ'ত... মানে মনের মত একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারতাম... এই ধরুন আমাদের কেতকীর মত...আর খুব বেশী কিছু নিতাম না......মানে একটা রোলেক্স ঘড়ির খুব শখ ছিল, যদি সেইটে...কিন্তু এসব কী কথা বলছি...না...মানে......

আমরা এখানে এসেছি.. কিন্তু আমাদের কাউকে কোন পার্ট এখনো দেওয়া হয় নি...মানে নিজের নিজের পার্ট আমাদের নিজেদের তৈরী ক'রে নিতে হবে...মানে আমরা নিজেরাই জানি না কিসের জন্যে আমরা এখানে এসেছি...কে আমরা... কি আমরা......মানে... আমি অন্তত জানি না......মানে...... হয়তো সত্যিই আমরা এখানে নেই...হয়তো এসব স্বপ্ন......

অনুভা । ঠিক আছে। তুমি যে কিছু জান না—তা বোঝা গেল। এখন এদিকে এস। (রবি ফিরিয়া আসে।) আচ্ছা রবি, শচীনের মত হতে পার না? শচীন কেমন সব কিছু জানে।

শচীন । আরে ছেড়ে দাও। সবাই কি সব হয় না হ'তে পারে! ঠিক আছে রবি—তুমি বস, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। (দর্শকদের সামনে আসিয়া) দেখুন, আজ আমরা সোজা স্টেজে চ'লে এসেছি। আমাদের নাটক কিছু তৈরি করা নেই। নির্দেশকের হুকুম—হাতাহাতি নাটক তৈরি ক'রে আপনাদের দেখাতে হবে। দেখলে রবি—কত সহজ ক'রে বলা যায়।

রবি । যা হ'য়ে গেছে, তা তো সহজ ক'রে বলা যাবেই। কিন্তু যা হয় নি? কে আমরা? কি আমরা? কেন আমরা? কই সে-সব তো কিছু বললে না?

কেতকী। আমার কিন্তু মনে হয়, আমাদের নামগুলো ব'লে দেওয়া উচিত।

শচীন । ঠিক বলেছ। (দর্শকদের দিকে ফিরিয়া) দেখুন আমাদের কোন স্মরণিকা—মানে প্রোগ্রাম নেই। তাই আমাদের নামগুলো ব'লে দিচ্ছি। আমার নাম শচীন। থিয়েটারে খুব নাম হওয়ার পর ফিল্মে চ'লে গিয়েছিলাম। এখন ফিল্মে খুব নাম হওয়ায় থিয়েটারে চ'লে এসেছি। আমার মা বাবা দুজনেই থিয়েটার করতেন।

কাজেই বুঝতে পারছেন—মানুষ হয়েছি গ্রীণরুমে গ্রীণরুমে—

অনুভা। এটা কি বলার মত বলা হচ্ছে শচীন—

শচীন । বাঃ—আমি যা তাই তো বলব।

রবি । কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি বলছ।

অনুভা। সত্যি শচীন—এত কথা বলার দরকার কি?

শচীন । বাঃ—আমার যে সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

অনুভা। তোমার মত একজন অভিনেতা। লোকে তো তোমায় দু কথায় বুঝে নেবে। তুমি বস শচীন।

শচীন । কিন্তু.........

অনুভা। কোন কিন্তু নয়। বসে যাও।

কেতকী। এবার তা হলে তোমার পালা অনুভা।

অনুভা। বেশ। (দর্শকদের সামনে আসিয়া) আমার নাম অনুভা। আমাকে আপনারা এ-থিয়েটারে ও-থিয়েটারে দেখবেন—বিধবা দিদির পার্টে, বিধবা পিসির পার্টে। কিন্তু মনে রাখতে পারবেন না। থিয়েটার করি, কিন্তু ভাল লাগে না—

রবি । সে কি অনুভা—

অনুভা। (রবির দিকে ফিরে) হ্যাঁ—ঠিক তাই। (ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে) কিন্তু কেন জান? থিয়েটার থিয়েটারই থেকে যায়, সত্যি হয়ে ওঠে না! (কেতকীকে) নাও কেতকী এবার তোমার পালা।

কেতকী। (দর্শকদের সামনে আসিয়া) আমার আসল নাম কেতকীবালা। ছোট করে নিয়ে কেতকী করেছি, তাতে কোন সুবিধে হয় নি। আরও ছোট করে নিয়ে কেটি করব ঠিক করেছি, তাতেও বোধহয় কোন সুবিধে হবে না। সুবিধে বোধহয় কোনদিনই হবে না। ঠিক অভিনেত্রী যাকে বলে, আমি বোধহয় তা নই। আমার আর কিছু বলার নেই।

অনুভা। নাও রবি—ওঠ।

রবি । আমি! না না আমি নয়—

অনুভা। তাই কি হয়। আমরা সবাই বলছি। তুমিও কিছু বল।

রবি । বেশ। (দর্শকদের সামনে আসিয়া) কিন্তু...আমি...মানে আমার সত্যিই কিছু বলার নেই। ইচ্ছে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হব। কিন্তু ছোটবেলায় মা মারা গেলেন। থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করার পর লেখাপড়া আর এগুলো না। ইচ্ছে ছিল কেতকীর মত একটি মেয়েকে বিয়ে করি। কিন্তু বাবা দুবারের বার বিয়ে করলেন। আমাকেও থিয়েটারে চলে আসতে হ'ল। এখানে আসতে আমি চাই নি! এখানে আসতে আমি চাই নি! (অল্পক্ষণের নীরবতা)

অনুভা। এবার তোমার পালা হরিচরণ—

হরিচরণ। (না উঠিয়া) আমি তো গোড়াতেই আমার চরিত্রকে এস্ট্যাবলিস করে দিয়েছি। এখন তো আমার মর্ণিং-ওয়াকের সময়।

শচীন । কিসের সময়?

হরিচরণ। মর্ণিংওয়াকের।

কেতকী। কিন্তু এখন তো সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্তির।

হরিচরণ। তাতে কি হয়েছে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন—সকাল - সন্ধ্যে দু-বেলাই মর্ণিংওয়াক। আচ্ছা—তোমরা এদিকটায় প্লে কর, আমি ওদিকটা পার্ক করে নিয়ে মর্ণিংওয়াক করছি। (মঞ্চের অপর প্রান্তে গিয়া মর্ণিংওয়াক শুরু করে। মাঝে মাঝে পার্কের ফুলগাছ কল্পনা করিয়া লইয়া দাঁড়ায়, ফুলের গন্ধ শোঁকে, আবার মর্ণিংওয়াক শুরু করে। কখনো বা পার্কের রেলিং কল্পনা করিয়া লইয়া ভর দিয়া দাঁড়ায়, পার্কের বেঞ্চি কল্পনা করিয়া লইয়া বসে, আবার মর্ণিংওয়াক শুরু করে। এদিকে যতক্ষণ অভিনয়, ওদিকে ততক্ষণ হরিচরণের মর্ণিংওয়াক।)

অনুভা। শচীন—আমরা তা হলে আরম্ভ করি—

শচীন । আর একটু—(দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) আমাদের নির্দেশকের নির্দেশটি এঁদের জানিয়ে দিই।

অনুভা। নির্দেশ না দেয়ালের লিখন?

শচীন । ও দুটোই বলতে পার।

অনুভা। নির্দেশটি কি শুনি—

শচীন । যতক্ষণ না তাঁর মনের মত হচ্ছে, ততক্ষণ যবনিকা উঠেই থাকবে, পড়বে না।

অনুভা। (দর্শকদের দেখাইয়া) ওঁদের তো বেশ আনন্দ দিলে দেখছি!

শচীন । কেন বল তো?

অনুভা। তোমার নির্দেশকের তো হাড়ে টক। আমাদের করা কোন কিছুই আজ পর্যন্ত তাঁর পছন্দ হয় নি।

কেতকী। দেয়ালেরও কান আছে অনুভা।

অনুভা। থাকলে ব'য়ে গেল। আমি কি গ্রাহ্য করি নাকি।

কেতকী। আমার কিন্তু ওঁর ওপর খুব বিশ্বাস।

অনুভা। তোমার এখন আরম্ভ করার কথা কেতকী। তুমি আরম্ভ কর।

শচীন । একটু দাঁড়াও—আমি শেষ কথাটা বলে নিই। (দর্শকদের দিকে ফিরিয়া) নির্দেশকের নির্দেশ—আজকের নাটক যেন জীবনের অনুকরণ হয়।

রবি । না না—ও-কথা তিনি বলেন নি।

কেতকী। তুমি ঠিক শুনেছ তো রবি—

রবি । আমি ঠিক শুনেছি। তিনি বললেন—আজকের নাটক যেন জীবনের মত হয়। বললেন—জীবনটাই নাটক।

শচীন । কি করে হবে? নাটক জীবনের বিরুদ্ধে হয়, জীবনের পক্ষে হয়, জীবনের অনুকরণ হয়, জীবন সম্পর্কে হয়, কিন্তু জীবন কখনো নাটক হয় না।

রবি । তিনি কিন্তু ঐ কথাই বলেছিলেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে।

কেতকী। আমারও মনে আছে—তিনি বললেন, জীবনটাই নাটক.

অনুভা। তা হলে শচীন—জীবনে একবার অন্তত তোমারও ভুল হ'ল।

শচীন । ভুল! কে বললে? একটু যাচাই করে দেখছিলাম—তোমাদের মনে আছে কিনা।

অনুভা। মনে আমাদের ঠিকই ছিল।

শচীন । যাক গে—এবার আমরা আরম্ভ করি।

কেতকী। কি দিয়ে আরম্ভ করব?

শচীন । কেন? নাটক যা দিয়ে আরম্ভ হয়। পাত্রপাত্রী কতকগুলো ভাল ভাল কথাবার্তা দিয়ে।

রবি । শেষ করব কোথায়?

শচীন । ক্যাথারসিস্ এলেই শেষ।

অনুভা। বেশ তা হলে—

শচীন । (একপাক ঘুরিয়া আসিয়া, যেন দেখা করিতে আসিয়াছে এই ভাবে অনুভাকে) ভাল আছেন?

অনুভা। আরে আপনি!

শচীন । এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলুম একটু খবর নিয়ে যাই।

অনুভা। আপনি রোজই এদিক দিয়ে যান নাকি?

শচীন । না...মানে...কিন্তু কেন বলুন তো?

অনুভা। রোজই একবার করে খবর নিয়ে যান কিনা—তাই।

শচীন। না...মানে...রোজ একবার করে খবর না নিলে কি রকম যেন মন কেমন করে।

অনুভা। সত্যি—আপনার মত লোক হয় না।

শচীন। (বিগলিত ভাবে) আপনার মত মেয়েও কিন্তু হয় না।

অনুভা। যাঃ—এটা আপনি বাড়িয়ে বলছেন। (ইতিমধ্যে রবি ও কেতকী একসঙ্গে একপাক ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। তাহারাও যেন দেখা করিতে আসিয়াছে।)

শচীন। (রবি ও কেতকীকে দেখাইয়া) বিশ্বাস না হয়—এ'দের জিজ্ঞেস করে দেখুন।

রবি ও কেতকী। (একসঙ্গে) কি হয়েছে ......কি হয়েছে?

শচীন। (অনুভাকে দেখাইয়া) আমি বলেছি—এ'র মত মেয়ে হয় না।

রবি ও কেতকী। (একসঙ্গে) নিশ্চয়—সে কথা আর বলতে।

অনুভা। (বিগলিত ভাবে) আপনারাও তাই বলছেন।

রবি ও কেতকী। (একসঙ্গে, গম্ভীর-ভাবে) নিশ্চয়—এ কথা তো কারো বলার অপেক্ষা রাখে না।

অনুভা। তা হলে?

শচীন। তা হলে আর কি। সমস্যার সমাধান। নাটক শেষ।

অনুভা। মানে?

শচীন। সমস্যা ছিল—আপনার মত মেয়ে হয় কি না।

কেতকী। প্রমাণ হ'ল—হয় না।

রবি। কাজেই নাটক শেষ।

অনুভা। কিন্তু কই—আলো তো নিভল না? যবনিকা তো নামে নি?

কেতকী। তা হলে? মানে......?

অনুভা। মানে আর কি। মানে—নাটক শেষ হয় নি।

রবি। ও-রকম যেখান-সেখান থেকে আরম্ভ করলে কি নাটক হয় না—না সে নাটকের শেষ থাকে?

শচীন। সেটটা ভাল করে দেখলে কিন্তু একটা নাটক বেরিয়ে আসতে পারে।

অনুভা। সেট? সেট বলতে তো দেখছি একখানা ঘর।

শচীন। বেশ তো। ঘর যখন—তখন তুমি তার ঘরণী হয়ে যাও।

অনুভা। হতে পারি। কিন্তু আমার বিয়ে হয় নি, প্রেম করার স্কোপ্ আছে।

শচীন। নিশ্চয় আছে। তুমি দিদি, আর কেতকী তোমার ছোট বোন। দুজনের কারোরই বিয়ে হয় নি। দুজনেই মিস।

অনুভা। না—আমি টাইপ করব না। কেতকী দিদি, আর আমি ছোট বোন।

কেতকী। আমার কিন্তু অনেক দিনের ইচ্ছে—আমি একটা টাইপ করি।

শচীন। তা বললে তো আর হয় না। যাকে যেমন মানায় তাকে তেমন করতে হবে। কেতকী তোমার ছোট বোন, আর রবি তাকে ভালবাসে। কেতকীও রবিকে ভালবাসে।

কেতকী। কিন্তু আমি তো জয়ন্তকে ......(কি যেন ভাবে) ঠিক আছে—আমি জয়ন্তকে—মানে রবিকে ভালবাসি।

অনুভা। আর আমার ভালবাসাটা কার সঙ্গে?

শচীন। আমার সঙ্গে।

অনুভা। তোমাকে ভালবাসতে আমার ইচ্ছে করে না।

শচীন। অভিনয় করতে করতে অভ্যেস হ'য়ে যাবে।

কেতকী। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—সামনের ও'রা বোধ হয় অধৈর্য হ'য়ে পড়েছেন।

শচীন। না না—অধৈর্য হবার কি আছে? আমরা তো আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। তুমি বাড়ি নেই। রবি এসেছে তোমাদের বাড়িতে। তোমার দিদি তার সঙ্গে কথা কইছেন। সে তোমাকে ভালবাসে, তুমিও তাকে ভালবাস। তবু সে কেমন যেন বিষণ্ণ।

অনুভা। এর মধ্যে তুমি আসছ কি ক'রে?

শচীন। আমি? আমি তোমাদের পরিবারের একজন বন্ধু। এদের চারহাত এক ক'রে দিয়ে নিজের দু-হাত তোমার দু-হাতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব।

অনুভা। ও-রকম বেসুরো মিল আমার পছন্দ নয়।

শচীন। আমি কি এতই অসহ্য অনুভা?

অনুভা। তুমি অসহ্য কিনা ভেবে দেখিনি, কিন্তু তোমার 'আমি' সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

কেতকী। আমরা কিন্তু নাটক থেকে স'রে যাচ্ছি। সামনের ও'রা আবার অধৈর্য হয়ে পড়ছেন।

শচীন। না না—অধৈর্য হবার কি আছে। আমরা তো আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। কই রবি এস এস—কেতকীর দিদি একা—তোমার প্রবেশ।

(রবি এক পাক ঘুরিয়া অনুভার সামনে আসে।)

অনুভা। এই যে রবি—এস—

রবি। কেতকী আছে? (কেতকী ও শচীন পিছনে সরিয়া গিয়াছে।)

অনুভা। না—কেতকী তো নেই। কোথায় যেন গেল।

রবি। আচ্ছা—তা হ'লে আমি এখন আসি।

শচীন। (পিছন হইতে) মাথায় কিচ্ছু নেই—একেবারে গোবর! আরে তুই চ'লে গেলে নাটকটা এগোবে কি ক'রে? অনুভা—প্লিজ্—তুমি ওই গাধাটাকে হেল্প কর!

অনুভা। এখনি চ'লে যাবে রবি? একটু বস।

রবি। না মানে—কেতকী নেই...

অনুভা। নাই বা থাকল কেতকী—আমি তো আছি—

রবি। আপনি...মানে তুমি...অনুভা...

অনুভা। হ্যাঁ আমি রবি...কতদিন ধ'রে তোমার অপেক্ষায়......

রবি। আমার অপেক্ষায়?...আপনি? মানে......

অনুভা। না না, আমি নই—কেতকী।

রবি। কিন্তু কেতকী তো নেই। তাই তো ফিরে যাচ্ছি।

অনুভা। একটু অপেক্ষা কর। ফিরে এলেও তো আসতে পারে।

রবি। ফিরে সে আসবে না। সে জয়ন্তর কাছে চ'লে গেছে। জয়ন্তকে সে ভালবাসে।

অনুভা। আয়নার সামনে কি কোনদিন দাঁড়িয়েছ রবি?

রবি। হঠাৎ এ-কথা কেন?

অনুভা। দেখেছ কি—তোমার ও-মুখ সব সময় কেমন যেন বিষণ্ণ।

শচীন। দেখো অনুভা, নাটকের বাইরে যেন চ'লে যেও না।

অনুভা। (ব্যঙ্গের সুরে শচীনকে) তুমি থাকতে সেটা সম্ভব নয়। (সমস্ত আবেগ নিয়ে রবিকে) তোমার ওই বিষণ্ণতাকে কি কেউ ভালবাসতে পারে?

কেতকী। এ-কথা তো তোমার বলার নয় অনুভা—এ তো আমি বলব—দ্বিতীয় দৃশ্যে—যখন রবির সঙ্গে দেখা হবে—

অনুভা। (কেতকীকে) আমার ভুল হ'য়ে গেছে কেতকী—আমি বদলে নিচ্ছি। (রবিকে) কেতকীর কথা ভেবে দেখেছ রবি? তার পক্ষে তোমার ওই বিষণ্ণতাকে ভালবাসা সম্ভব কিনা?

রবি। কিন্তু প্রসন্ন হই কি ক'রে? প্রসন্ন হবার মত সুখ তো আমি কোনদিন পাই নি।

অনুভা। কোনদিন নয়?

রবি। না কোনদিন নয়।......হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছিলাম ... একদিন ... অনেকদিন আগে একদিন... বাবা আর সৎমার সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলাম... পথে হারিয়ে গেলাম...ইচ্ছে ক'রে হারিয়ে গেলাম...বাবা আর সৎমা এগিয়ে গেলেন... ফিরেও দেখলেন না...বড় আনন্দ হয়েছিল সেদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলে...

শচীন। কি সব আবোল-তাবোল বকছ রবি—

রবি। আবোল-তাবোল কিছু বলিনি। যা ঘটেছিল তাই বলছি।

অনুভা। কিন্তু রবি...তারপর? ...অন্য কোনদিন? ... আজ? একটু আগের কোন এক মুহূর্তে...?

রবি। আমি থিয়েটার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি অনুভা। আসবে তুমি আমার সঙ্গে?

শচীন। থিয়েটার ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ? এখন?

রবি। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে।

শচীন। কিন্তু সামনে দর্শকেরা রয়েছেন। ও'দের কাছে কি কৈফিয়ত দেবে?

রবি। ও'দের কাছে দেবার মত কোন কৈফিয়তই আমার নেই। দিতে পারতাম একমাত্র নিজেকে। কিন্তু নিতে ও'রা রাজি হবেন না। আসবে অনুভা—আমার সঙ্গে?

অনুভা। কিন্তু আমি তো কেতকী নই রবি।

রবি। একবার না হয় চেষ্টা ক'রে দেখতাম। তুমি আর আমি—আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করা যায় কিনা।

কেতকী। কিন্তু তারই বা দরকার কি রবি? মাঝে মাঝে আমি না হয় তোমাকে জয়ন্ত ব'লে ভেবে নিতাম।

রবি। কিন্তু আমার পক্ষে জয়ন্তের ভূমিকায় অভিনয় করা আর সম্ভব নয় কেতকী। আসবে অনুভা আমার সঙ্গে?

অনুভা। কি ক'রে যাই রবি! (দর্শকদের দেখাইয়া) তোমার যা দেবার ছিল তা তুমি ও'দের দিয়েছ। কিন্তু আমার যা দেবার আছে তার সবটুকু তো আমি এখনো দিতে পারি নি।

রবি। আচ্ছা—তা হ'লে আমি চলি— (প্রস্থানপথে অগ্রসর হইয়া যায়।)

অনুভা। (অস্ফুট স্বরে) রবি! (রবি এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করে। তারপর অন্তরালে চলিয়া যায়।)

কেতকী। রবি বোধ হয় আর ফিরে আসবে না শচীন।

শচীন। ফিরে এসে লাভ কি? অভিনেতা ও কোনদিনই হ'তে পারত না।

অনুভা। তুমি বোধহয় হয়েছ—না শচীন?

শচীন। তার মানে? তুমি বেশ ভাল ক'রেই জান অনুভা......

অনুভা। আমার জানার তো দরকার নেই শচীন। তুমি নিজে জান তো? তা হ'লেই হবে। গম্ভীরভাবে বলা হ'ল—অভিনেতা ও কোনদিনই হ'তে পারত না। কিন্তু আজকের নাটকের যেটুকু অভিনয়, সেটুকু তো ওই ক'রে গেল।

শচীন। তার মানে? আমার চরিত্র তখনো আসেনি তাই! দ্বিতীয় দৃশ্য এলে আমি দেখিয়ে দিতাম না!

অনুভা। থাক শচীন।

শচীন। মানে? তুমি কি বলতে চাও কি?

অনুভা। আমি যা বলতে চাই তা সহ্য করতে পারবে শচীন?

শচীন। (অন্যদিকে মুখ করিয়া) সহ্য করা-করির তো কিছু নেই। নিজের ক্ষমতার আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। বাইরে আমি তারকা ব'লে বিখ্যাত। এ-পর্যন্ত রোল যা পেয়েছি সাধ্যমত অভিনয় করেছি। দর্শকেরা আমায় যথেষ্ট তারিফ করেছেন। (কণ্ঠস্বর কেমন যেন ক্ষীণ হইয়া আসে) তোমার মতামতে আমার কি যায় আসে অনুভা—

অনুভা। ঠিক! আমার মতামতে কি-ই বা যায় আসে। ও'দের তারিফ পেলেই হ'ল। এই আমাদের নাটক! আমাদের স্বরূপ কেউ যেন জানতে না পারে—আমরা যা নই, তাই সেজে আমরা অভিনয় করব! যাকগে, এস কেতকী—নাটকটা শেষ করি।

কেতকী। কিন্তু...

অনুভা। আবার কিন্তু কিসের? কই শচীন—এস এস।

শচীন। (তখনও নিজেকে আয়ত্তে আনিতে পারে নাই) না... মানে...

অনুভা। আবার না-মানে! এস এস—আমি তোমায় পার্ট ধরিয়ে দিচ্ছি।

কেতকী। কিন্তু রবি...?

অনুভা। আরে—রবির সম্পর্কে একটা কিছু ভেবে নিলেই হবে। কি ভাবা যায় বল তো শচীন?

শচীন। ভাবা যায় ... মানে ... (আবার পূর্বের মত হইয়া যায়) দাঁড়াও—এক মিনিট। মনে পড়েছে। ব'লে দিলেই হবে, রবি কি একটা কাজে বম্বে চ'লে গেছে।

কেতকী। ঠিক। রবি কি একটা কাজে বম্বে চ'লে গেছে। (আলো কমিয়া আসে।)

শচীন। এ কি! আলো কেন ক'মে আসছে? (প্রায় অন্ধকার হইয়া আসে।)

কেতকী। এ কি! এ যে অন্ধকার হ'য়ে এল!

অনুভা। নাটক শেষ শচীন।

শচীন। কিন্তু আমরা যে এখনও আরম্ভই করিনি!

অনুভা। আমাদের যেটুকু করার ছিল, সেটুকু নিশ্চয়ই করেছি। নইলে নাটক শেষ হ'ত না শচীন।

শচীন। কিন্তু আমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। দর্শকেরা রয়েছেন.....

অনুভা। এখনি যবনিকা নেমে আসবে। ও'রা বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজেদের নাটক আরম্ভ করবেন। (সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া যায়। শুধু একটু ঝাপসা আলো থাকে হরিচরণের উপর।)

হরিচরণ। কিন্তু আমার যে সবে মর্ণিং ওয়াকের শেষ। ডাক্তারের—থুড়ি—নির্দেশকের নির্দেশ—আমার যে এখন একটু প্রফুল্ল হ'তে হবে। কই রে—তোরা কিছু বল না!—একি! কেউ নেই নাকি? তা হ'লে? ও... হয়েছে...হয়েছে...ঐটে মনে করি......তা হ'লেই প্রফুল্ল হওয়া যাবে...ঐ যে...ঝপ ক'রে কয়লা নামিয়ে যেই না পেছন ফিরেছে, আমিও ফস ক'রে ব'লে ফেললুম—কয়লাওয়ালা, কেউ তোমায় মনে করিয়ে দেয় নি—তুমি রূপকথার রাজপুত্র? ... কয়লাওয়ালা ... কেউ কি তোমায় মনে করিয়ে দেয় নি...এ কি? হাসি আসছে না কেন?... কয়লাওয়ালা ... কেউ কি তোমায় ... কিন্তু কই? প্রফুল্ল হচ্ছি না তো ... কিন্তু ... (ব্যাকুল স্বরে) আমার যে প্রফুল্ল হ'তেই হবে...ডাক্তারের নির্দেশ...। শোন...কে কোথায় আছ ... দোহাই তোমাদের ... আমাকে বাঁচতে হবে...তোমরা আমাকে প্রফুল্ল ক'রে দাও! ...তোমরা আমাকে প্রফুল্ল ক'রে দাও!

—যবনিকা—

[এই নাটিকার অভিনয় নাট্যকারের অনুমতি সাপেক্ষ]

ক্লিওপেট্রা
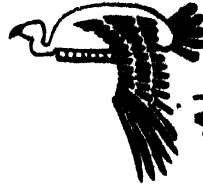
রাখী ঘোষ

টেলিভিশন চালু হবার পর থেকেই হলিউড চিত্রসাম্রাজ্যে তোলপাড় পড়ে গেল —কি করতে পারলে দর্শককে প্রেক্ষাগৃহে আকর্ষণ করা যায়? শুরু হল স্টিরিও-ফোনীক শব্দের ভেলকিবাজী, পর্দার আয়তন বৃদ্ধি, ত্রিমাত্রিক ও সিনেরামা চিত্রগ্রহণ, ব্যয়বহুল, জমকালো দৃশ্যপট এবং সর্বোপরি খরচের মোটা অংকের বিজ্ঞাপন। এক কথায় দর্শককে অভিভূত করবার সম্ভব-অসম্ভব প্রচেষ্টা।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে সব নতুনত্বই একদিন পুরোনো হয়ে যায়। আর এদিক দিয়ে সংখ্যাতত্ত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও বিশ্বাসঘাতক।

কারণ অভিনেতাদের নাম ও অর্থের অংক যত বড় সংখ্যাই হাজির করা যাক না কেন, এ বিরাটত্ব সব সময়েই আপেক্ষিক। ফিল্মজগৎ তাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারে না। তবু হলিউডে এই চোখধাঁধানো বিরাট বিরাট গাণিতিক হিসাব-নিকাশ দেখিয়ে দর্শককে ছবি সম্পর্কে উৎসুক করবার ছেলেমানুষী প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরেই চলে আসছে।

"এ ছবিতে সবসুদ্ধ দশ হাজার লোককে দেখতে পাবেন।" সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ভাবে দশ হাজার লোক আর এমন কি? এক লক্ষ হলেও নাহয় কথা ছিল! খরচের অংকেও তাই। ছবিতে দশ লক্ষ ডলার খরচা হওয়া তো অতিসাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিক থেকে অন্যান্য জমকালো ছবির সঙ্গে ক্লিওপেট্রার পার্থক্য হল এই যে, এ ছবির প্রচারকার্যে অন্য সবকিছুর চাইতে নায়িকা বা মুখ্য চরিত্রের ওপরই বেশী নজর দেওয়া হয়েছে।

দৃশ্যবহুল জমকালো ছবিগুলির মধ্যে ক্লিওপেট্রা চিত্রজগতের অতি প্রিয়-পাত্রী। ফিল্মজগৎ এই রহস্যময়ীর আকর্ষণকে কোনদিন ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তাই প্রতি দশ বছরে একবার করে তার ওপর নতুন আলোকপাত হয়েছে।

১৯১৭ সালে ক্লিওপেট্রা হয়েছিলেন থেডা বারা। তাঁর অভিনয়ে ধরা দিল প্রথম এক লাস্যময়ী নারী যার কটাক্ষে অকস্মাৎ "পুরুষের বক্ষো মাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা", যার বাহুবন্ধনে মৃত্যুও মধুর।

তারপর তিরিশ দশকে এলেন সিসিল, বি, ডি মিলি। তিনি খুঁজে বের করলেন ক্লডেট কোলবার্টকে। ক্লডেট তুলে ধরলেন সেই মোহময়ী ক্লিওপেট্রাকে, সযত্ন প্রসাধনে যার সৌন্দর্য চিরকালের কাহিনী হয়ে আছে।

এর কয়েক বছর পরে আবার সেই

১৯১৭ : ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় থেডা বারা

১৯৩৪ : ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় ক্লডেট কোলবার্ট

এ'যুগের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখাবেন তিনি তীক্ষ্মবুদ্ধি-সম্পন্না অথচ বাস্তব জগতে অসহায়, আবেগপরায়ণা হয়েও তিনি নির্লিপ্ত। তিনি উচ্চাশাময়ী কিন্তু অসতর্ক।

এবারকার ক্লিওপেট্রা চিত্রজগতে নিজস্ব ইতিহাস রচনা করলো বলা চলে। ১৯৬০ সালের শীতকালে এর স্যুটিং শুরু হয়েছে। এরমধ্যে নায়িকা এলিজাবেথ টেলরের দীর্ঘ রোগভোগ গেছে একাধিকবার। পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়েছে। প্রথম পরিচালক রুবেন চিত্রজগতের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল বারটি মিনিট ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। বীমা কম্পানীরা অভিযোগ এনেছে। ছবিটির পুরো দলবল এসেছেন ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল ধরে স্যুটিং করতে। ব্যয়ের অঙ্কের কোন
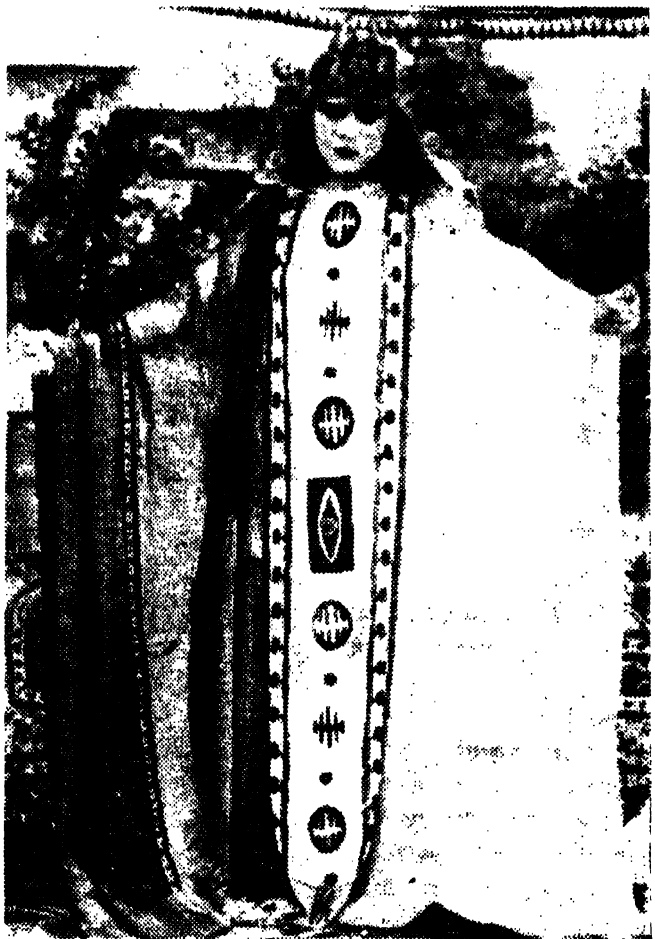
কবেকার মিশরে ফিরে গেলেন আলেকজান্ডার কোরডা। নির্মাণ করলেন শ'এর কাহিনী অবলম্বনে সীজার এন্ড ক্লিওপেট্রা। এবার ক্লিওপেট্রা হলেন যশস্বিনী অভিনেত্রী ভিভিয়েন লে।

এবারের ক্লিওপেট্রা হবেন আরও পরিণত, আরও পূর্ণাঙ্গ। এবার আমরা রাজত্ব নয়, রাণীকেই দেখব। এবারকার ক্লিওপেট্রায় আর সব কিছুই চাইতে এই অসাধারণ নারীর মনস্তত্ত্বই যে প্রাধান্য পাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় শেষ মুহূর্তে জোসেফ ম্যানকউইজকে পরিচালক নির্বাচনে। কারণ স্বাভাবিকতার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম,-এরকম মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। তার প্রমাণ "সাডেনলি লাস্ট সামার", "অল এবাউট ইভ" ইত্যাদি।

পরিচালক ম্যানকউইজের মতে ক্লিউপেট্রা শুধু অসামান্য সুন্দরীই ছিলেন না, তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নাও ছিলেন। নতুবা শুধু সৌন্দর্য দিয়ে তিনি সেযুগের দুটি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে অভিভূত করতে পারতেন না। সীজার ও এন্টনি দুটিই সে যুগের প্রবল ব্যক্তিত্ব। শুধু সৌন্দর্যের মোহ তাঁদের রোম থেকে বহু দূরে মিশরের এক বিদেশিনীকে কাছে টেনে এনেছিল এ'কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

১৯৪৫ : ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় ভিভিয়েন লে

সপ্তম ক্লিওপেট্রা এলিজাবেথ টেলর

১৯৬২ সাল : ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় এলিজাবেথ টেলর

হিসাব নেই। ডানদিকে শূন্যের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

ক্লিওপেট্রা ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিল বলতে হবে। অন্তত এ ভাগ্যের ছোঁয়া এলিজাবেথ টেলরকে ভাগ্যবতী করেছে। আমেরিকার সিনেমা জগতে তিনি আর শুধু সেই "মিষ্টি মেয়েটি" নন, এখন তিনি চিত্রব্যবসার দুর্মূল্য সম্পদ। ক্লিওপেট্রার স্যুটিং চলার সময় তাঁর ব্যক্তি-গত রোমান্স আর অভিনেত্রী-জীবনের নানা কাহিনী দেশে-বিদেশে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কবে তাঁকে কার সাথে দেখা গেছে, কোন নায়কের প্রতি তিনি প্রসন্ন এবং কোন নায়কের সাথে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত, কবে তাঁর পরিচালকের সাথে মত-ভেদ হয়েছে, কোনদিন তাঁর বেশভূষা মনোনীত হয়নি, রোমের কোন কোন জায়গায় তিনি সময় কাটান এবং ফটোগ্রাফারদের আটকানোর জন্যে কি করা হয়েছে, তাঁর গাড়ী, হোটেল এবং অন্যান্য খরচ বাবদ কর্তৃপক্ষের মিনিটে কত করে খরচ হচ্ছে ইত্যাদির কল্পনার কোন শেষ ছিল না। ক্লিওপেট্রার সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাস ইউরোপ আমেরিকার ফ্যাশন-জগৎকে এতই প্রভাবান্বিত করেছিল যে আজ সেগুলো অত্যন্ত প্রচলিত ও সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকার চিত্রামোদী জন-সাধারণের কাছে হলিউডের আজ আর তেমন কোন আকর্ষণ নেই। এই দুর্দিনে ক্লিওপেট্রা হলিউডের অনমনীয় দৃঢ়তা ও সর্বস্ব-পণের একটি নজীর সৃষ্টি করে রাখল। হলিউড যদি হেরেও যায়, বাঁচার জন্য তার এই উদগ্র সংগ্রাম আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণ করবে।

অয়স্কান্ত

মার্কিন দেশের চলচ্চিত্রে বিজ্ঞান

আমাদের দেশে নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিক্ষাদান ও প্রচারের যে কী ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টা রয়েছে তার কিছুটা নমুনা এ-মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল আমেরিকান সায়েন্স ফিল্‌ম্‌ ফোরাম। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিন দেশের বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র সংঘ এবং কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংঘ ও ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ সংঘ। অনুষ্ঠানটি একদিকে যেমন দুই দেশের সহযোগিতার নিদর্শন, তেমনি অন্যদিকে গবেষণা ও শিক্ষামূলক ভূমিকায় চলচ্চিত্রের অবদান যে কতখানি ফলপ্রদ হতে পারে তার একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রত্যেকটি উন্নত দেশে চলচ্চিত্রের এই বিশেষ অবদান স্বীকৃত এবং সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত। আমাদের দেশে চলচ্চিত্র যদিও শিল্প হিসেবে আন্তর্জাতিক মানে উত্তীর্ণ কিন্তু তবুও গবেষণা ও শিক্ষার উদ্দেশে আমরা এখনো চলচ্চিত্রকে তেমনভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। সম্প্রতি অবশ্য কিছু কিছু প্রথম তথ্যচিত্র তোলা হয়েছে; কিন্তু স্কুল কলেজ ও গবেষণাগারের প্রয়োজন তাতে সিদ্ধ হয়নি। খুব সম্ভবত যতোদিন আমরা কাঁচা ফিল্‌ম্‌-এর জন্যে বিদেশের ওপরে নির্ভর করতে থাকব ততোদিন এই অপূর্ণতাও থেকে যাবে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত দেশে শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে টেলিভিশনকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। আমাদের দেশে আমরা এখনো পর্যন্ত টেলিভিশনের কথা ভাবতেই পারি না। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের সাধ্যের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামগ্রিক পরিকল্পনা যদি থাকে তাহলে আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে থেকেই চলচ্চিত্রের সার্থকতর প্রয়োগ সম্ভব। এক্ষেত্রে বিদেশের বিশেষজ্ঞদের সাগ্রহ সহযোগিতাও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

মার্কিন দেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের এই অনুষ্ঠানটি প্রথমে হয়েছিল দিল্লীতে, তারপরে মাদ্রাজে ও বোম্বাইয়ে, সবশেষে কলকাতায়। এই উপলক্ষে পাঁচজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী ভারতে এসেছিলেন।

কলকাতার অনুষ্ঠানটি চারটি পর্বে বিভক্ত ছিল। একটি পর্বের নাম 'বিজ্ঞানের দিগন্ত' (ফ্রন্টিয়ার্স অফ সায়েন্স)। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের উদ্যোগে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়র ফিজিক্স-এর ভবনে এই পর্বে দেখানো হয়েছিল তেরোটি চলচ্চিত্র। প্রত্যেকটি চলচ্চিত্রই বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোলা, সাধারণ দর্শকের জন্যে কোনোটিই নয়। তা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো। কয়েকটি চলচ্চিত্রের নাম বলে গেলেই এ-বিষয়ে খানিকটা ধারণা হতে পারে: কস্‌মিক রশ্মি, সমুদ্রের ডাক, রাণী প্রজাপতির কোর্টশিপ, চৌম্বক শক্তি, ইত্যাদি।

আরেকটি পর্বের নাম বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংঘ। এই পর্বে বোস ইনস্টিটিউট ভবনে বারোটি চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল। কয়েকটি চলচ্চিত্রের নাম: ক্রিস্টাল, জীবকোষ কী? মহাকাশ অভিযান, বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার, ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্বে ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র। ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে এই পর্বে দেখানো হয়েছিল উনিশটি চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রগুলোতে আগুনে পুড়ে যাওয়া রোগীর চিকিৎসা-পদ্ধতি থেকে শুরু করে ক্যানসার রোগের নির্ধারণ পর্যন্ত নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

শেষ পর্বটি অবশ্যই পপুলার সায়েন্স বা লোক-বিজ্ঞান। উদ্যোক্তা ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান সংবাদ সংঘ। এই পর্বে জনতা চিত্রগৃহে চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছিল দশটি। বিষয়বৈচিত্র্যে এই পর্বটিই ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। টেলস্টার, ডারউইনের অভিযান, আলবার্ট

মার্কিন তথ্যচিত্র 'আলবার্ট শোয়াইৎসার'-এর একটি দৃশ্য

শোয়াইৎসার-এর জীবনী, অ্যাটলাস রকেটের নির্মাণকার্যে ব্রতী কর্মীদল, ইস্পাত উৎপাদন ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে লোকবিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্রের প্রযোজকরা পদচারণা করেছেন। কল্পনাশক্তির মৌলিকতায় ও কারিগরী কুশলতায় প্রত্যেকটি চলচ্চিত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

এই সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কলকাতার ইউ-এস-আই-এস। তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বিদ্যালয়ের জন্য ইলেকট্রনিক "শিক্ষক"

চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষাদান সম্পর্কে অনেক দিন থেকেই নানা খবর শোনা যাচ্ছে। বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি সোভিয়েত বুলেটিনে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যে লেনিনগ্রাদে একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটরের সাহায্যে ভাষা-শিক্ষার ক্লাশ নেওয়া হচ্ছে। সংবাদটি সত্যিই অভিনব। মাস্টারমশাইয়ের বদলে একটি যন্ত্র এসে পড়া জিজ্ঞেস করছে ও নতুন পড়া বুঝিয়ে দিচ্ছে—এ দৃশ্য ভাবতেও অদ্ভুত লাগে।

সোভিয়েত বুলেটিন থেকে পুরো সংবাদটি আমি উদ্ধৃত করছি।

"লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটিং বিভাগের একদল বিজ্ঞানী ক্লাশঘরে শিক্ষাদানের কাজে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন। এঁদের নির্দেশে, একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র জার্মান ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে অতি সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে এবং তাদের প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর দেয়। শুধু তাই নয় : এই 'উরাল—১' শ্রেণীর ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটরটি ভাষা-তত্ত্বের ছাত্রদের সঙ্গে রীতিমত আলাপ-আলোচনা চালায়, তাদের জ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দেয়।

কিয়েভ এবং লেনিনগ্রাদের দুটি ভাষা শিক্ষার ক্লাসে এই 'যান্ত্রিক শিক্ষক' যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দান করে, তার একটু নমুনা এখানে দেওয়া যাচ্ছে :

সাধারণভাবে ভূমিকা দেবার পর, যন্ত্রটি একটি জার্মান বিশেষ্য ও বিশেষণ উচ্চারণ করে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে, 'এই দুটি শব্দের রুশ প্রতিশব্দ কি?'

'জানি না', জবাব দেয় একজন ছাত্র।

যন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে তার রুশ প্রতিশব্দ দিয়ে বলে, 'এবার বলো দেখি, প্রথম শব্দটি কি পদ?'

একজন ছাত্রী : 'ক্রিয়া পদ'।

উরাল—১. : 'ভুল হল!' তারপর অনেকক্ষণ ধরে বিশদভাবে জার্মান ক্রিয়া-পদগুলির লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে এবং ওই শব্দটি যে বিশেষ্য তা বুঝিয়ে, সে বলল : 'আচ্ছা, এবার দ্বিতীয় শব্দটির পদ বল তো?'

প্রথমোক্ত ছাত্র : 'ক্রিয়া-বিশেষণ।'

উরাল—১ : 'আবার ভুল বললে!' এবং আর একবার সে বিশদভাবে জার্মান বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা করল।

ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছে করে এমন সব ভুল উত্তর দিচ্ছিল যার ফলে যে কোনো মানুষ-শিক্ষক ধৈর্য হারাতেন। কিন্তু উরাল—১ প্রত্যেকবার বিশদ ব্যাখ্যা করে সঠিক উত্তরের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গেছে। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষা শিক্ষণ-বিভাগের অন্যতম অধ্যাপিকা আনা বেলোপোলস্কাইয়া দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভুলগুলির তালিকা তৈরি করে সেগুলির যেসব বিশ্লেষণাত্মক শ্রেণীবদ্ধ সারণী তৈরি করেন, সেই-গুলিকে এই 'ভাষা-শিক্ষক কম্পিউটর' তৈরি করার সময়ে কাজে লাগানো হয়।

আপাততঃ এই যন্ত্রকে শিক্ষার্থীদের দলগত শিক্ষাদানের বা 'গ্রুপ টিচিং'-এর কাজে ব্যবহার করা হবে। পরে, এর আরও উন্নতি ঘটিয়ে একে লাগানো হবে ছাত্রদের ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের বা 'ইন্ডিভিজুয়াল টিচিং'-এর কাজে।

কোমোরো দ্বীপের জীবন্ত ফসিল

কোমোরো দ্বীপের জীবন্ত ফসিল

একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইন্দোনেশিয়ার কোমোরো দ্বীপ থেকে অদ্ভুত-দর্শন একটি জীবের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। জীবটি গিরগিটি জাতীয় কিন্তু সাধারণ গিরগিটির মতো ক্ষুদে আকারের নয়। লম্বায় তিন মিটার, ওজনে ১৫০ কিলোগ্রাম। হরিণ, ছাগল, শুয়োর ও মুরগী হচ্ছে এদের খাদ্য। রঙ প্রায় কালো, চোয়াল খুবই শক্ত, জিভের রঙ হলদে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ভরান্'। মধ্যযুগীয় জীবের এই সরীসৃপটির জ্ঞাতিগোষ্ঠী বহু আগেই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে—এই হিসেবে এই জীবটিকে জীবন্ত ফসিল বললেও ভুল বলা হয় না। ১৯১২ সালের এই জীবটির অস্তিত্ব প্রাণী-বিজ্ঞানীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ইন্দোনেশিয়ার কোমোরো দ্বীপে ও আর মাত্র দু-একটি জায়গায় এ-জাতীয় সরীসৃপ এখনো টিকে আছে।

সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা যায়, কোমোরো দ্বীপের জঙ্গলে পূর্ণবয়স্ক ভরান্-এর সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। ছোট একটি দ্বীপের পক্ষে সংখ্যাটি নিতান্ত কম নয়। সংখ্যা দেখে মনে হয়, কয়েক কোটি বছরের প্রাচীন এই সরীসৃপ-বংশটি আরো কিছুকাল টিকে থাকতে পারবে।

জনি হ্যাজার্ড
৫
ফ্র্যাঙ্ক রবিন্সন

টেনেছ ত খুব, তাছাড়া মাথার পেছনটাও তোমার ফুলে রয়েছে। আমি না থাকলে ত সাবাড় হয়ে যেতে!
নেশা হয়েছিল! ষণ্ডা গুণ্ডা একটা লোক, একটা... কে যেন হাঁক

অ্যান্টন মুভেরনিক... বেনে মোজেস... নীলস স্ভেনসন...
ডা!
উই!
ইয়া!
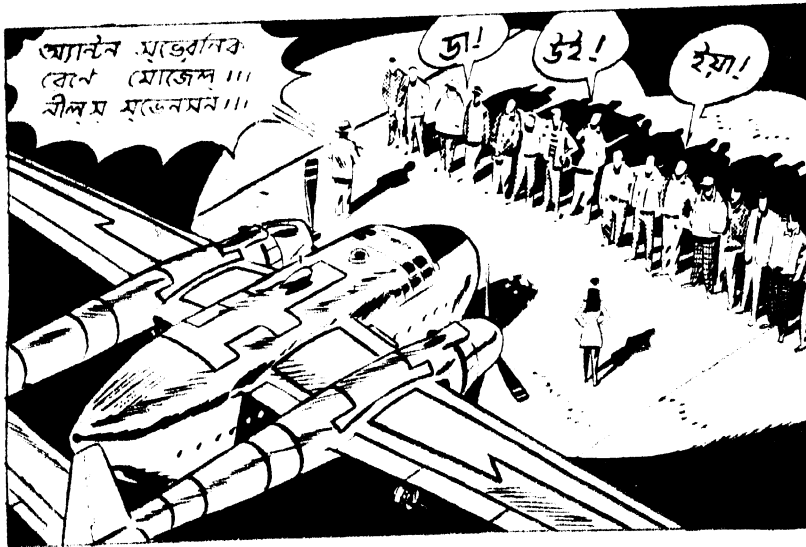
বেস্তো! এ যে দেখছি পাইলটদের নিয়ে এক ফরেন লিজিয়ন!

আর তারই ফলে আমায় এখানে পাকড়ে আনা হল! কিন্তু ব্যাপারটা কি?
ওস্তাদ ম্যাক্সো! টেকোটা আমায় নিয়েই সটকেছে, এ্যাঁ? তার কাজটা তুমি নিতে চাও, কি ভায়া... কিছু বলবার আছে?

পয়সা করতে আপত্তি নেই, যদি খেটে রোজগার হয়। তাছাড়া আমার কোন খারাপ রেকর্ডও নেই। কিন্তু কাজটা কি? কার জন্যে?

হ্যাঁ, আমি। আমি হাজির হলাম, বেটাদের বদমাইসি বার করে দিয়েছি!

আমি হ্যাজার্ড... আমিও পাইলট। ম্যাক্স যেই হোক, মনেহয় "শা নোয়ার" কাফেতে এখনো ফুর্তি মারছে ...!
লুইগি ডেরো... জোশ্‌—
সি!
?

যেখান থেকে তুমি সেই খুবসুরত টোপাটিকে নিয়ে বেরোচ্ছিলে — যার দোস্ত- -দের হাত থেকে তোমায় বাঁচালাম!

বহুত আচ্ছা, সুন্দরী নিজেই তোমাকে সব খুলে বলুন ...!
৭২

ওগো পূব গগনের আলো ... ম্যাক্সি হাওয়া। মেনর হ্যাজার্ড বদলী হিসেবে কাজ করতে রাজী ...
তাই নাকি? তা রাজপুত্তুর কি জানেন যে যেদেশে যাচ্ছি সেখানে বার্ধক্যের সৌম্যমূর্তি বড় একটা দেখা যায়না।
ক্রমশঃ

আঙুলের সাহায্যে দেখা

গত ডিসেম্বর মাসে রোজা কুলেশোভা নামে নিজ্‌নি-তাগিল শহরের এক তরুণী হঠাৎ নামজাদা হয়ে ওঠে। তার একটা অদ্ভুত ক্ষমতার কথা সমস্ত সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। মেয়েটি চোখ বাঁধা অবস্থায় কিংবা অন্যদিকে তাকিয়ে সাধারণ ছাপা বইয়ের বা খবরের কাগজের লাইনের ওপরে শুধু আঙুল চালিয়ে পড়ে যেতে পারে; ছাপা ছবির ওপরে আঙুল চালিয়ে সেই ছবির হুবহু বর্ণনা দিয়ে থাকে; এমনকি, শুধু স্পর্শ করেই সে বিভিন্ন জিনিসের রঙ পর্যন্ত বলে দিতে পারে।

রোজাকে মস্কোয় এনে খুঁটিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা চালানো হয়। তাকে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরে রেখে, চোখ বাঁধা অবস্থায়, পেছনে বই রেখে ইত্যাদি নানা অবস্থায় সাধারণ বই পড়তে দেওয়া হয়, ছবির ওপর হাত চালাতে দেওয়া হয়, নানারকম রঙীন জিনিস স্পর্শ করতে দেওয়া হয়। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখন শুরু হয় তার শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণা। এরই ফলে আবিষ্কৃত হয় এক অবিশ্বাস্য তথ্য : রোজা কুলেশোভার আঙুলে রয়েছে আলোকতরঙ্গকে অনুভব করার জৈব ব্যবস্থা—ঠিক যে-ভাবে লোকে চোখ দিয়ে দেখে, রোজাও সেইভাবেই "দেখে" তার আঙুলের সাহায্যে স্পর্শ ক'রে। অর্থাৎ রোজার আঙুলগুলি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

খুব সূক্ষ্ম স্পর্শপ্রবণ আঙুলের সাহায্যে কাগজের ওপরে ছাপা অক্ষরের বা ছবির সাদা-কালো অংশের উচ্চাবচতা বা রিলিফ অনুভব করে রোজা পড়তে পারে কিনা, পরীক্ষা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা একটি আধা-স্বচ্ছ ঘষা কাচের ওপরে একটা রঙীন ছবির আলোকচিত্র প্রক্ষেপ (প্রোজেক্ট) করেন এবং সেই কাচের সম্পূর্ণ মসৃণ উল্টো-দিকে আঙুল চালিয়ে রোজা সেই ছবিটির হুবহু বর্ণনা দিয়ে যায়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে রোজা কুলেশোভা আলোকরেখার উচ্চতা অনুভব করেই যে এই ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে তা নয়।

তখন প্রশ্ন উঠল : রোজার আঙুলগুলি হয়তো এতো স্পর্শপ্রবণ যে সে আলোকিত অংশের তাপাঙ্কের তারতম্যটুকু ধরতে পারে—যদিও সেই তাপাঙ্ক এক ডিগ্রির শত ভাগের এক ভাগেরও কম। এটারও পরীক্ষা হল প্রক্ষেপক যন্ত্রের লেন্স-এর সামনে আলোকরশ্মির ছাঁকনি বা ফিল্টার লাগিয়ে, কাচের পর্দা বা স্ক্রীনটাকে আলোকরশ্মির সমান তাপাঙ্কে গরম রেখে এবং অবলোহিত বা ইনফ্রা রেড রশ্মির ছবি ফেলে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয় যে তাপাঙ্কের তারতম্যের সঙ্গে রোজার এই আশ্চর্য ক্ষমতার কোনো সম্পর্ক নেই। তখন বাকি রইল শুধু এই প্রকল্প যে রোজার আঙুলগুলিই দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

এবার মানুষের চোখকে নিয়ে যেসব পরীক্ষা বিশেষজ্ঞরা করে থাকেন, রোজার আঙুলগুলিকে নিয়ে শুরু হল সেই সব পরীক্ষা। বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলেন—মানুষের চোখের ওপর আলোকতরঙ্গ যে সব বিক্রিয়া সৃষ্টি করে, ঠিক সেই রকম বিক্রিয়া হয় রোজার আঙুলে। চোখের জৈব-ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে কয়েক লক্ষ আলোক-স্পর্শপ্রবণ আদিভূত বা এলিমেণ্ট। আর রোজার আঙুলগুলির ডগায় রয়েছে প্রতি বর্গ-মিলিমিটারে ১০টি করে ওই এলিমেণ্ট। অর্থাৎ, তার আঙুলগুলি প্রায় চোখের মতই সমান আলোক-স্পর্শপ্রবণ।

প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে ডাক্তাররা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, রোজা কুলেশোভার আঙুলগুলিতে রয়েছে তিনটি আলোকগ্রাহী জৈব ব্যবস্থা যার সাহায্যে লাল, নীল ও সবুজ আলোকতরঙ্গ সে খুব সহজে "স্পর্শ" করতে পারে; তার আঙুলের এই তিনটি রঙের বর্ণগত স্পর্শপ্রবণতা ঠিক মানুষের চোখের অনুরূপ। যেমন, লাল আলোকে বদলে দিয়ে যদি খুব আকস্মিকভাবে (০'০৬২৫ সেকেণ্ডের কম সময়ের মধ্যে) সেই জায়গায় ধূসর আলো ফেলা যায়, তাহলে আমরা সেই জায়গাটুকুকে নীল রঙের দেখবো। দ্বিতীয়ত, দৃষ্টির স্থায়িত্ব (ইনারশিয়া অফ ভিশন) বলে একটা ব্যাপার আছে যার ফলে পটের ওপরে খুব দ্রুত হারে ফুটে ওঠা অনেকগুলি স্থির দৃশ্যের পরম্পরাকে আমরা দেখি নিরবচ্ছিন্ন-রূপে চলমান একটা দৃশ্য হিসেবে—সিনেমা বা চলচ্চিত্র হল তাই। রোজা কুলেশোভার আঙুলগুলির ক্ষেত্রেও হুবহু এই ব্যাপার হয়ে থাকে।

রোজা কুলেশোভার এই অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি-ভাবে কার্যকরী হতে পারে? প্রথমত, প্রাণীর ক্ষেত্রে আলো আর রঙ অনুভব করার জৈব ব্যবস্থার উৎপত্তি হল কি-ভাবে, আদিতে এই দর্শনেন্দ্রিয়ের রূপটি ছিল কি ধরণের এবং চোখের জৈব-প্রকৃতির বিকাশ-বিবর্তন ঘটেছে কি-ভাবে—এসব প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে কুলেশোভার এই "দ্বিতীয় দর্শনেন্দ্রিয়ের" অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত, আলোকতরঙ্গগ্রাহী আদিভূত বা এলিমেণ্টগুলির গঠনপ্রকৃতি কিরূপ—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে কুলেশোভা হয়তো সাহায্য করতে পারেন। তৃতীয়ত, আলোকসংকেত আর চিত্রকল্পগুলি (ভিস্যুয়াল ইমেজ) কিভাবে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় আর সেই সংকেত "পাঠে" আমরা কিভাবে অভ্যস্ত হই—জৈবক্রিয়ার এই অমীমাংসিত সমস্যাটির সমাধান হয়তো এর ফলে হতে পারে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

শরৎ খবরটা পেলেন গোবিন্দর কাছ থেকে। ওদের বাড়িও আসতে পারে নি কেন, কাকে দিয়ে যেন খবর দিয়েছে। গোবিন্দ আপিস থেকে ফেরার পথে বলে গেল।

তখন উমা ছিলেন না। ফিরে এসে স্বামীর মুখে শুনলেন সব। আগে বলেন নি শরৎ, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বললেন।

উমা শুনে চুপ করে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'যা শুনছি তাতে তো আশা-ভরসা বিশেষ আছে বলে মনে হচ্ছে না! যদি বা অন্য লোকের ক্ষেত্রে বাঁচত, ছোড়দির যা বরাত—!...ঐ মেয়েটাও না আবার ঘাড়ে চাপে!...কেউ তো নেই শুনেছি জামাইয়ের তিন কুলে, আর কে-ই বা দেখবে?...যদি অমনি অনড় হয়ে পড়ে থাকে সে তো আরও বিপদ। তখন ওকে সুদ্দ টেনে এনে তুলাতে হবে। যা পিশাচ শ্বশুর প্রথম পক্ষের—সে খোঁজ নেবে না।.. তাই তো!'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আহা, বড় ভালমানুষ মেয়েটা. সাত চড়ে রা করে না। ওর কপালেই কি এত দুর্ভোগ!...একে তো ঘাড়ে একটা সতীন চাপল, আগেকার কালে ওটা গা-সওয়া ছিল. এখন তো সতীন নিয়ে ঘর করা শোনাই যায় না, ওর কপালে তাও হ'ল। তার ওপর—'

তার ওপর কি সেটা আর বলতে পারেন না উমা, মধ্যপথেই থেমে যান। কন্যাস্থানীয়া সম্বন্ধে সে দারুণ সম্ভাবনার কথাটা মুখে উচ্চারণ করতে পারেন না।

শরৎ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করেন, 'যাবে নাকি?'

'না, না। আর না।'

প্রবলবেগে মাথা নাড়েন উমা। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ লাল হয়ে ওঠেন। সে অকারণ লজ্জা ঢাকতেই বোধ হয় মুখটা ফিরিয়ে বসেন একটু।

আগের সে উজ্জ্বল কান্তি আর নেই. রোদে রোদে ঘুরে মুখখানা তো রীতিমতো তামাটে হয়ে উঠেছে. তবু সে বর্ণান্তর শরৎ টের পান। এ লজ্জার কারণটাও মনে পড়ে যায় তাঁর। তিনিও মাথাটা নামান একটু।

অনেকদিনের কথা হ'ল। তবু মনে আছে। স্পষ্ট সব দেখতে পাচ্ছেন যেন।

হরিনাথের অসুখের খবর পেয়ে উমা পাগলের মতো হয়ে উঠেছিলেন। ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছেই মানুষ বলতে গেলে. তাই তার আসন্ন বৈধব্যের সম্ভাবনায় দিশাহারা হয়ে গিয়েছিলেন। অন্য কোন লোক না পেয়ে শরতের প্রেসে ছুটে এসেছিলেন সঙ্গে যাবার জন্যে। তখন কোন সম্পর্কই ছিল না. যেটুকু ছিল সেটুকু অভিমানেরই. তার আগে কোন দিন নিজে থেকে এসে কিছু চান নি উমা, বোধহয় সুদূর কল্পনাতেও ভাবতে পারেন নি যে কোনদিন কোন সাহায্য চাইতে হবে এই স্বামীর কাছে—যে স্বামী একদিনও গ্রহণ করেনিন তাঁকে, যে স্বামী পরের প্রেমে উন্মত্ত। তবু এসেছিলেন, প্রেস কোন্ দিকে তা ধারণা ছিল না—গোবিন্দ এসে দেখিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত লাজলজ্জার মাথা খেয়ে স্বামীকে ডেকে বাইরে এনে মিনতি করেছিলেন—কোনমতে একটু সঙ্গে যাবার কি সুবিধা হবে? হরিনাথ মরণাপন্ন ঐন্দ্রিলা একা অসহায়—তিনি এখনই একবার ওদের দেখতে যেতে চান।

খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন শরৎ। অনুরোধটা অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বলেই শুধু নয়, বিব্রত হবার আরও কারণ ছিল। তাঁর রক্ষিতা গোলাপীর কাছে তিনি আমরণ বিশ্বস্ত ছিলেন. কিন্তু সে তাঁকে সম্পূর্ণ পেয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না, তার সংশয় কখনও যায়নি। সে টের পেলে কী পরিমাণ অশান্তি করবে তা তিনি জানতেন—আর ক্ষরেও ছিল তা—তবু সেদিন শরৎ তাঁর কর্তব্যই পালন করে-ছিলেন, একমুহূর্তের বেশী ইতস্তত করেননি।

সেদিনের কথা মনে আছে বৈকি। ট্রেনের পথটুকু একরকম, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে যাওয়া যায়, স্টেশনে নেমে অপরিসর পালকীতে ঘেঁষাঘেঁষি বসে যাওয়া—অন্ধকার নির্জন পথ দিয়ে—সেই বয়সেও একটু মোহ, খানিকটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। তারপর সেখানে নেমেও, হরিনাথের মার তীক্ষ্ণ

দৃষ্টি ও সন্দিগ্ধ প্রশ্নে দুজনেই যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছিলেন।

'আর না।' কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বোধকরি সচেতন হয়ে উঠেছেন উমা। সেদিনের স্মৃতিটাই মনে পড়ে গেছে তাঁর।

তাই এ সুগভীর লজ্জা।...

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন শরৎ।

উমাও বোধকরি সেই বিশেষ দিনটার স্মৃতিতেই ডুবে গিয়েছিলেন—উমার নিঃশ্বাসের শব্দে সম্বিৎ ফিরল তাঁর। তিনিও একটা নিঃশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন উমাও।

কিন্তু শোওয়া আর ঘুমনো এক কথা নয়। উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে চাইলেই তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। উমাও পেলেন না। বহুরাত্রি পর্যন্ত এপাশ ওপাশ করলেন, মধ্যে একবার উঠে গিয়ে মাথায় জল দিয়েও এলেন, তবু তাঁর চোখে তন্দ্রা নামল না।

দুটো বিছানার মধ্যে ব্যবধান সামান্যই। একজন জেগে থাকলে আর একজনের সেটা অগোচর থাকা কঠিন। শরতেরও তা অজানা রইল না।

কিন্তু সেদিন শরৎ ঘুমোন নি। বহু রাত্রিই অনিদ্রায় কাটাতে হয় বলে স্থির হয়ে থাকাটা অভ্যাস হয়ে গেছে। স্থির হয়েই শুয়েছিলেন বলে উমা তাঁর জেগে থাকাটা টের পাননি। নইলে তন্দ্রা নামেনি তাঁর চোখের পাতাতেও।

তিনিও ভাবছেন আকাশ-পাতাল। ভাবছেন উমার কথাই।

অনেকদিন ধরেই ভাবছেন।

উমা মিছে বলেন নি, কথার কথা নয়। সত্যিই উমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শরৎ কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছেন সেটা। সুগভীর ক্লান্তি ফুটে উঠেছে মুখেচোখে।

হয়ত সবটাই তার কায়িক দুর্বলতা নয়—দীর্ঘদিন ধরে একঘেয়ে পরিশ্রমে হয়ত মানসিক অবসাদও এসেছে একটা। কিন্তু সেটাও তো কম কথা নয়; মানসিক ক্লান্তি যখন মুখের ভাবে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তখন সেটা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন বুঝতে হবে।

আর শারীরিক ক্লান্তিরই বা অপরাধ কি। হলও তো বহুদিন—প্রায় ত্রিশ বৎসর হতে চলল। এই একই কর্মসূচী। বেলা বারোটা না বাজতে বাজতে বেরিয়ে যাওয়া—রাত আটটা নটায় বাড়ি ফেরা। এক টাকা দু টাকা—বড় জোর চার টাকার টিউশানী বহু বাড়িতে অনেক মেয়েকে না পড়ালে একজনের খরচ চলে না। টাকা যা-ই দিক, সকলেই ঘাড়ে মিলিয়ে নেয়। দেড়ঘণ্টার আগে উঠলে মুখ ভার হয় মেয়ের মায়েদের। এখন ইংরেজী পড়ার রেওয়াজ হয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে-ইস্কুল, সেখানকার মাস্টারনীরাও টিউশানী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। প্রতিযোগিতা খুব বেশী। উমার মতো শুধু ফার্স্ট বুক পড়া শিক্ষয়িত্রীর টিউশানী জোটাও আজকাল কঠিন। সেজন্যে ভয়ে ভয়েই থাকেন উমা।...এসব কোনদিন খুলে না বললেও কথায় বার্তায় বেরিয়ে আসে। কতকটা শুনলে বাকীটা অনুমান করে নেওয়া চলে।

শুধু অবিশ্রাম বকাই নয়—হাঁটতেও হয় অনেক। শ্যামবাজার, আহিরীটোলা, বিডন স্ট্রীট,—এক এক জায়গায় এক একজন। পুরনো বাড়ি খুব বেশী নেই। বছর দুই পড়লেই ও'র বিদ্যা শেষ হয়ে যায় শুধু প্রাথমিক পাঠ ছাড়া ও'কে দিয়ে পড়াবে কে? যে বাড়িতে অনেক-

শরৎ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ও'র মুখের দিকে চেয়ে......

বসলেন। বললেন, 'আমার দ্বারা আর ওসব খবরদারী করা সম্ভব নয়। আমার শরীরে আর বয় না। তার ওপর একটু উদ্বেগ দুশ্চিন্তা হ'লেই যেন মাথার মধ্যে কেমন করে—শরীর আরও দুর্বল বোধ হয়।...আর কেনই বা, ভগবান যখন দিলেনই না—তখন পরের ঝঞ্ঝাট বইতে যাই কেন শুধু শুধু।'...

তার কারণ তিনিও জেগেই ছিলেন। ইদানীং হাঁপানীটা কম ছিল, রাত্রে ঘুমও হচ্ছিল কদিন। তাঁর অনেক সাধনার ঘুম বলেই উমারও সতর্কতার অন্ত ছিল না। পাছে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় বলে অতি সন্তর্পণে পাশ ফিরছিলেন—যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বাইরে যাচ্ছিলেন।

গুলি বোন পর পর সাজানো থাকে, সেই বাড়িতেই টি'কে থাকেন উমাও। কিন্তু সে রকম বাড়ি এখন একটিই আছে বিডন স্ট্রীটে। ইদানীং—অনেক মেয়ে হাতছাড়া হওয়ায়, জানাশুনোর মধ্যে ভাল কাজ না পেয়ে উমা ভদ্র গৃহস্থ বাড়ি থেকে একটু নামতেও বাধ্য হয়েছেন। খারাপ পাড়ায় নয়, ভদ্র পাড়ায় ভদ্রলোকের মতোই বাস করে, অথচ পরিচয়টা গোলমেলে, বিবাহিত দম্পতি নয় জেনে শুনেই এমন বাড়িতে পড়ানো ধরতে হয়েছে তাঁকে। এরা মাইনে ভাল দেয়, টাকা ছাড়াও অন্য জিনিস দেয়—যত্ন করে সম্মান করে—তবু, উমার অপমান বোধ হয় বৈকি। প্রথম যেদিন এইরকম বাড়িতে কাজ নিতে হয়েছে—সেদিনের কথা নয়—শরৎ আসার পরের কথাই—সেদিন বাড়ি ফিরে অবসন্নভাবে বসে পড়াটা শরৎ কোন দিনই ভুলবেন না। কী সুগভীর লজ্জা আর অবসাদই না ফুটে উঠেছে মুখে—যেন কাঁচের বোতল ভরা কালিকে ঢেলে দিয়েছে।

গোপন করেন নি—সবই বলেছিলেন উমা। গত তিন চার মাস ধরেই আয় কমছে কিছুতেই কোন ভদ্রবাড়িতে আর কাজ যোগাড় করতে না পেরেই এ কাজ নিতে হয়েছে তাঁকে। বাজারে দেনা হয়ে গেছে—মুদির দোকানে এমন কি সব্জি বাজারেও বাকী পড়েছে আর অপেক্ষা করবার সাহস নেই তাঁর।

সেইদিনই কথাটা বলেছিলেন শরৎ।

অনেক ইতস্তত ক'রে কোন মতে বলে ফেলেছিলেন।

বহুদিন ধরেই বলবেন ভাবছিলেন—কিন্তু সাহস হয়নি। সেদিন বোধ করি উমার ঐ প্রায়-ভেঙে-পড়া মূর্তি দেখেই মরীয়া হয়ে পড়েছিলেন।

গোলাপী মরার পর যখন নিজের সংসারও ভেঙে পড়ল তখন প্রেস লীজ দিয়েছিলেন। সেই লীজই আছে এখনও, সব মাসে টাকা আদায়ও হয় না। তিন চারদিন ঘুরে বকাঝকা করে আদায় করতে হয়। যে মাসে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন সে মাসে আদৌ কিছু পাওয়া যায় না। তবে সে-ই সব নয়, তাঁর হাতেও কিছু আছে। যত কমই হোক, কষ্ট ক'রে চলে যায়। আর কদিনই বা বাঁচবেন তাঁর।

সেই কথাই বলেছিলেন, 'কিন্তু কেন এত কষ্ট করছই বা তুমি—আমার যা আছে তাতে কোনমতে শাকভাত আমাদের দুজনের চলেই যাবে। কিছু ছিল হাতে, এই কবছরে কিছু জমেওছে, তুমি তো আমার খোরাকীর বেশী এক পয়সাও নাও না—যা নাও তাতে আমার খোরাকীও বোধহয় চলে না বরো—কাজেই আয় যত কমই হোক, কিছু কিছু তো জমছেই।...আর না হয় ছাপাখানাটা বেচে হাতে নগদ টাকা নিয়ে চল কোন তীর্থস্থানে চলে যাই। কাশীতে শুনেছি খুব সস্তা-গন্ডা—বহু বুড়ী মাসে দুটাকা তিন টাকা আয়ে চালায় সেখানে—কাশীতে গিয়েও থাকতে পারি। কদিনই বা আর বাঁচব আমরা, যা আছে দুটো পেট চলেই যাবে!'

'না!'

কথাটার গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে প্রথম থেকেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলেন উমা—প্রতিবাদ করার জন্য কথার ফাঁক খুঁজছিলেন শুধু—এবার একেবারে যেন ফেটে পড়লেন।

'না। এ যত দুঃখই পাই না কেন, যত নীচু দোরেই ঢুকতে হোক না কেন—এতে আমার লজ্জার কোন কারণ নেই। নিজের কাছে নিজের মাথা উঁচু আছে। তোমার ভাতের চেয়ে এ ঢের ভাল। এতকাল যদি তোমার ভাত না খেয়ে কেটে থাকে তো বাকী কটা দিনও কাটবে।...মা সতীরানীর কাছে এই প্রার্থনাই করি অহরহ—অনেক দুঃখ অনেক অপমান জীবনে দিয়েছ—এই অপমানটা আর দিও না। তোমার ভাত যেন না খেতে হয়। তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয় অন্তত!'

বলতে বলতে যেন হাঁপাতে থাকেন উমা। উত্তেজনায় মুখচোখ আরক্ত হয়ে ওঠে তাঁর।

এর উত্তর দেবার শক্তি নেই শরতের, এরপর আর কথা বলার সাহস নেই।

তিনি মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন।

এ উমার আর এক মূর্তি। আর কোন কারণে কোন প্রসঙ্গেই এত উত্তেজিত হন না উমা। এত কঠিন কথাও অন্য সময় তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ব্যথা পান শরৎ, ব্যথা পান এই দুর্বাক্যের জন্য নয়, ভর্ৎসনার জন্যও নয়—ব্যথা পান উমার জন্যই।

প্রথম জীবনে যেন অন্ধ হ'য়েই ছিলেন। অত্যন্ত স্বার্থপর ও আত্ম-সর্বস্ব মায়ের কাছে মানুষ হয়েছিলেন বলে বাপের কাছ থেকে পাওয়া স্বাভাবিক ভদ্রতা নিয়ে জন্মেও অপর মানুষের দিকটা ঠিক দেখতে শেখেননি। ও'র বাবার অকালমৃত্যু হয়েছিল—কিন্তু তাকে আত্মহত্যা বলাই উচিত। প্রবল জ্বরের ওপরও বারবার স্নান করে নিমোনিয়া ডেকে এনেছিলেন তিনি—আজ শরৎ বুঝতে পারেন—সে ঐ স্ত্রীর জন্যেই।

শরতের বহু গুণ ছিল কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীকে গ্রহণ না করলে তার জীবনে কী হ'তে পারে, সে-কথাটা ভাববার মতো মানসিক গঠনই তাঁর ছিল না। লেখাপড়া শেখেন নি, ভদ্রসমাজে

মেশেন নি—তাই কোন কথা গুছিয়ে ভাবতেও পারতেন না সেদিন।

প্রথম যৌবনের সুতীব্র আবেগে গোলাপীকে ভালবেসেছিলেন—তার কাছে শপথ করেছিলেন যে, সে জীবিত থাকতে অন্য স্ত্রীলোককে কামভাবে স্পর্শ করবেন না। মার কথায় তিনি বিবাহে সম্মত হয়েছেন শুনেই সে শপথ করিয়ে নিয়েছিল—অন্যথায় আত্মহত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। পতিতার কাছে করা শপথ রাখতেই তিনি উন্মুখযৌবনা বিকশিত পদ্মের মতো স্ত্রীকে গ্রহণ করেন নি সেদিন। আজ সে-কথা মনে হলে হাসি পায়। দুঃখের হাসি। সে-শপথ এমনভাবে রক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ বুঝতে শিখেছেন যে, এ-শপথ রক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তর শপথ ভঙ্গ করেছেন তিনি—অগ্নি ও নারায়ণের কাছে করা শপথ!

আশ্চর্য। এসব দিকে চোখ খুলে দিয়েছে কিন্তু সে-ই। সে-ই বলতে গেলে ওকে মানুষ করেছে। গোলাপী ছোট জাতের মেয়ে, তায় অতি নিচু দরের পতিতা কিন্তু অসামান্য রূপলাবণ্যের আকর্ষণে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক তাঁর ঘরে এসেছেন। শরতের সংস্পর্শে আসার আগে তো বটেই, পরেও। শরৎকে জেনে-শুনেই সে প্রস্তাবে রাজী হতে হয়েছে—সময়ে সময়ে তার জন্য ঈর্ষার জ্বালাও ভোগ করতে হয়েছে কিছু কিছু। তার কারণ ঈশ্বর-দত্ত রূপ ছাড়া তার আর কিছুই ছিল না, এক পয়সাও দেবার সঙ্গতি ছিল না তাঁর। বরং গোলাপীই তাঁকে দিয়েছে ঢের। ছাপাখানা করেছিলেন, সে-ও ওরই পয়সায়। অর্থাৎ গোলাপী তাঁর রক্ষিতা ছিল বলা ভুল—তিনিই ওর রক্ষিত ছিলেন।
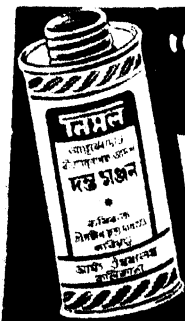
হয়ত সেই জন্যেই গোলাপীর কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই ছিল। তার সংস্পর্শে এসেই শরৎ অনেক ভদ্র হয়েছিলেন। অবশ্য ব্যবসার কল্যাণেও বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে—জেনেছেন-শিখেছেন ঢের। নইলে তাঁর বাল্যের পরিবেশ ও শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেবার মতো নয়।

ভুল বুঝতে পেরেও তা সংশোধনের চেষ্টা করেন নি কেন? শুধুই কি গোলাপীর প্রতি প্রেম, কৃতজ্ঞতা, সেই ছেলেমানুষী শপথের ভয়—নাকি আরও ছেলেমানুষী সংকোচ একটা, বৃথা চক্ষু-লজ্জা? কে জানে—আজও ঠিক মনের এ-খবরটা পান নি শরৎ—আজও প্রশ্নের কোন উত্তর নিশ্চিত করে দিতে পারেন না।

কে জানে—যখন সামান্য একটু পরিচয় হয়েছিল ওঁদের—যখন কিছুটা কাছাকাছি এসেছিলেন, তখন ও পক্ষ থেকে যদি একটু জোর দেওয়া হত—ওদিক থেকে যদি সংকোচ ভাঙবার চেষ্টা করা হত, তাহলে কী করতেন উনি। আজ সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। কে জানে তখনও শপথের ভয় থাকত কিনা।

কিন্তু সে কিছুই হয়ে ওঠেনি। কিছুই করা হয়নি। শুধু দুহাতে এই জীবনটা উড়িয়ে দিয়েছেন নষ্ট করেছেন। নিজেরই শুধু নয়—এরও। দুটি দুর্লভ জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আজ তার জন্য অনুতাপ হয় বৈকি। আজ মনে হয় তিনিও ঠকেছেন। সে যতই ভালবাসুক, তার কাছ থেকে যতই পান—দাম্পত্য-সুখ সেখানে পান নি তিনি। এ আলাদা জিনিস। ঘরসংসার করেছেন, সন্তানও হয়েছে—তবু গৃহ-সুখে বঞ্চিতই থেকে গেছেন চিরকাল। ছোট একটি নিজস্ব সংসারে সর্বময় কর্তা, একেশ্বর হয়ে থাকার যে তৃপ্তি, তা অনাস্বাদিতই রয়ে গেল এ-জীবনে। ভদ্রসমাজে সাধারণ গৃহস্থ হয়ে বাস করার মধ্যে যে সম্মান, তারও কি মূল্য কম?

না, অনেক কিছুই হারিয়েছেন তিনি। অনেকখানি। আজ মনে হয়, কোনমতে যদি জীবনের এই কটা বছর ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করা যেত! অন্তত কিছুটা সময় যদি পিছিয়ে যাওয়া যেত—যখন স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি এতটা কঠিন হতে পারতেন না, সে-ক্ষমা পাওয়া যেত।

এখন এই স্ত্রীর সামান্য কিছু প্রয়োজনে লাগতে পারলেও ধন্য হয়ে যান তিনি, কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু আজ বুঝি কোথাও কোন পথ খোলা নেই তার।

স্ত্রীর প্রিয় সাধনের জন্যই তিনি খোকাকে এনে রেখেছেন, কান্তিকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে আর কতটুকু!

বরং মনে হয় এখানে এসে এই চোখের সামনে থাকাটাই উমার পক্ষে আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। কোন দিন সামান্য কোন যত্ন করলে, কোন মিষ্টি কথা বললে কি ওর কাজে কোন সাহায্য করতে গেলে উমার চোখে জল এসে পড়ে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন বহুদিন। সেদিন ঐ কাজ ছেড়ে দেবার কথা তোলেন, সেদিন শেষ রাত্রে ঘরের বাইরে উঠোনের দিক থেকে চাপা কান্নার আওয়াজে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল—খুবই সামান্য শব্দ—কিন্তু তাঁর হাঁপানির টানের মধ্যে বসে বসে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়নি। অন্ধকারেই উঠে এসে দেখেছেন রকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছেন উমা। মুখে কাপড় গোঁজা—তবু সে কান্নার শব্দ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, এমনই আকুল সে-কান্না!

এক একবার মনে হয় এর চেয়ে তিনি দূরে কোথাও চলে যাবেন—সেখানে তাঁর অদৃষ্টে যাহয় হবে, উমাকে মুক্তি দেওয়া যাবে। কিন্তু তা-ও পারেন না, বড় বেশী মায়া পড়ে গেছে। লোভ হয়—যদি কোনদিন কোন কাজে লাগতে পারেন, যদি কোন একটি সামান্য বেদনার কাঁটাও তুলে দিতে পারেন এই বিড়ম্বিত জীবন থেকে। সেই পরম লাভ। সে সম্ভাবনাটুকু নষ্ট করতে মন চায় না।

(ক্রমশ

শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(৪)

যে নিমাই পণ্ডিত পরম উদ্ধত ছিলেন, তাঁহার বিনয় ও আর্তিতে পাষাণ গলিয়া যায়। নিমাই পণ্ডিত এখন গঙ্গার ঘাটে গিয়া নানারূপে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের সেবা করেন। কাহারো ফুলের সাজি বহিয়া দেন, কাহারো স্নানের পর ভিজা কাপড় নিঙড়াইয়া ধুতিবস্ত্র তুলিয়া দেন, কাহারো কুশ গঙ্গামৃত্তিকা হাতে যোগাইয়া দেন। এইরূপে তিনি সকলেরই আশীর্বাদ লাভ করিলেন। প্রেম মূর্তি পরিগ্রহ করিল। মহাভাবের উদয়ে প্রভু অধীর হইয়া উঠিলেন। লোকে বলেন বায়ুরোগ, এ-তো উন্মাদের লক্ষণ। শ্রীরাম পণ্ডিত আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন,—বলিলেন, এ-যে মহা-ভক্তিযোগ। শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ ভিন্ন কি মানুষের এমন ভাগ্যোদয় ঘটে। ইতিমধ্যে একদিন অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ পূজা করিয়াছেন। ভাবাবেশে তাঁহার পূজা লইয়া পরে আচার্যের চরণবন্দনা-পূর্বক তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তি হউক এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। নিজগৃহে নিশিদিশি কীর্তন করিয়া পরে শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তন-যুগধর্ম প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহার পরে পর পর বহু ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি পুস্তকাকারে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধের মধ্যে তিন চারিটি বিষয়ের মাত্র স্থান হইবে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচনাকালাবধি আজ চারিশত বৎসর মধ্যে এ বিষয়ে কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ মধ্যখণ্ড পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের—

প্রভু বোলে বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন হেন দেখি জ্যেঠা বলরাম ।।

এই দুইছত্র পয়ারের উল্লেখ করিতে পারি। পয়ার পংক্তিদ্বয়ের অর্থ বুঝিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি। কত আচার্য সন্তানের দ্বারস্থ হইয়াছি। কত স্থানে গিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না। আমি সাধ্যমত এইরূপ কয়েকটি জটিল বিষয়ের সংগত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে মহাপ্রভু আপন জীবনে সাধনার কোন্ ক্রমপর্যায় দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই বলিব।

ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই অনেকরূপে দিব্যদর্শনের ভাগ্য লাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভু নানা অবতারের আবেশে ভক্তগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আচার্য অদ্বৈতের মস্তকে শ্রীচরণ দান করিয়াছেন। সাত প্রহরিয়া ভাবে মহা-প্রকাশের দিনে অমায়ায় সকলকে অভীষ্ট বর দান করিয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। জগাই মাধাই-এর উদ্ধার সাধন হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভাবাবেশে মহালক্ষ্মীরূপে নৃত্য করিয়াছেন। জননী শচীদেবীর বৈষ্ণবা-পরাধের মার্জনার জন্য তাঁহাকে অদ্বৈত আচার্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া-ছেন। কাজী দলন হইয়াছে। আচার্য অদ্বৈত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু আপন সাধনপথ হইতে ভ্রমেও কোনদিন পদস্খলিত হন নাই। তিনি যে গৃহত্যাগ করিবেন, মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে অক্রূরযানের শ্লোক পড়িয়া তাহার আভাস দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও কৃষ্ণ আর বাপ বলিয়া কান্দিয়াছেন। তাহার পর গৃহত্যাগের যখন আর বিলম্ব নাই সাধনার শেষ অবস্থায়—

একদিন গোপীভাবে জগৎ ঈশ্বর
বৃন্দাবন গোপী গোপী বোলে নিরন্তর ।।

গোপীভাবে না ভজনা করিলে যে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না, আপনার জীবনে সাধনা করিয়া মহাপ্রভু তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইহার পূর্বেই আমরা এইভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছি। কিন্তু তখনো দাস্য-ভাব যায় নাই। তথাপি মাঝে মাঝে তিনি গোপী শরণাগতি গ্রহণে প্রয়াস পাইতেছেন। মধ্যখণ্ড চতুর্বিংশ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ আছে।

ক্ষণে বোলে মুঞি সেই মদন গোপাল।
ক্ষণে বোলে মুঞি কৃষ্ণদাস সর্বকাল ।।
গোপী গোপী গোপী মাত্র কোনদিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহা কোপে ।।

শেষ যেদিন বৃন্দাবন এবং গোপী গোপী জপ করিতেছিলেন—সেদিন এক পড়ুয়া এইভাবের মর্ম না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিল। বলিয়াছিল গোপী গোপী

নাম ত্যাগ করিয়া কেন কৃষ্ণনাম জপ কর না। গোপীনাথ জপ করিলে তোমার কি পুণ্যলাভ হইবে। মহাপ্রভু লাঠী লইয়া তাহাকে মারিতে গিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বর্ণনা করিয়াছেন মহাপ্রভু গোপী গোপী জপ করিতেছেন। আর কৃষ্ণকে মহাদস্যু বলিয়া গালাগালি দিতেছেন। এইভাবের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। এ যেন সেই মাথুর বিরহের ভাবাবেশ। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ গোপী আনুগত্য ভিন্ন কৃষ্ণলাভের দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। আপন জীবনের সাধনায় মহাপ্রভু এই পথই দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীপাদ রূপ প্রভৃতি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণ মহাপ্রভুকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাহার ধারে পাশেও যান নাই। তিনি বৈকুন্ঠনাথ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণের কথাই বলিয়াছেন, এবং তিনি যে যুগধর্ম নামসংকীর্তন প্রচারের জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন, বারবার এই একই কথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরণে কোটী নমস্কার যে তিনি মহাপ্রভুর স্বরূপে পূর্বাধ্যায় গান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী যাঁহাকে—"বিনির্যাসে প্রেমো নিখিল পশুপালাম্বুজ দৃশাম্" বলিয়াছেন ও শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাঁহারই শ্রীমুখে গোপী-নামাবলী জপ করাইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে গোপীভাবেও কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহার বর্ণনা আছে। এই গোপী গোপী রূপেই যে গৃহত্যাগের সূচনা—শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সম্বরে সংশয় মানি পঢ়ুয়া পালায় ।।
ভিন্ন ভাবে ধায় প্রভু না জানে পঢ়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা ত্রাসে যায় পলাইয়া ।।
আথে ব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ।।
সভে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পঢ়ুয়া পালাঞা গেল দূরে ।।
সম্বরে চলিলা যথা পঢ়ুয়ার গণ।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সভে ভয়ের কারণ ।।

পঢ়ুয়া বলিল, আর ভাই কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, নিমাই পন্ডিতের বাড়ী গিয়া দেখিলাম, তিনি বসিয়া গোপী গোপী জপ করিতেছেন। আমি তাই বলিলাম শাস্ত্রসম্মত কৃষ্ণনাম জপ না করিয়া কেন বৃথা গোপী গোপী জপিতেছ। এই আর যায় কোথায়, মহা-ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া ঠেঙ্গা হাতে আমাকে খেদাড়িয়া মারিতে আসিলেন। আর কৃষ্ণকে যে গালাগালি দিলেন কি আর বলিব। পরমায়ু গুণে আজি রক্ষা পাইলাম। তখন অন্যান্য ছাত্রগণ সব বলিতে লাগিল বেশতো বৈষ্ণব হইয়াছে নিমাই পণ্ডিত। কেহ বলিল তাহাকেই বা এত সম্ভ্রম কেন? আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ ধারণ করি না? কেহ বলিল ব্রাহ্মণের মর্যাদা রাখে না, বৈষ্ণব হইয়া গোপী নাম জপ করে এই বা কেমন? কেহ বলিল তিনি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, আমরাও তো যে সে লোকের ছেলে নহি। সকলে মিলিয়া এক জোট হও, এবার যদি মারিতে আসেন আমরাও আর সহ্য করিব না। কালি যার সঙ্গে একত্রে লেখাপড়া করিয়াছি, আজি সে হঠাৎ গোসাঞী হইল কেমন করিয়া? পাপিণ্ঠগণের এইরূপ পরামর্শ শুনিয়াই মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

করিল পিপ্পলীখন্ড কফনিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে ।।
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্বলোকনাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভাত ।।
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ।।

নবদ্বীপলীলায় শ্রীঅদ্বৈত আচার্যও কোনদিন প্রকাশ করেন নাই যে তিনি যাঁহাকে আনিয়াছেন, যুগধর্ম প্রবর্তন ভিন্ন তাঁহার নিজেরও কিছু প্রয়োজন আছে। কিন্তু তিনি না চিনাইয়া দিলে সর্বসাধারণে জানিবে কেমন করিয়া, মানিবেই বা কেন? তাই তিনি নিজেই সে ভার গ্রহণ করিলেন। কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক মহাপ্রভু তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তাহাকে শান্তিপুরে লইয়া আসেন। নিজগৃহে এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বৃদ্ধ শান্তিপুরনাথ আনন্দে গাহিয়াছিলেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ।।

মাথুর বিরহের অবসানে প্রিয়দয়িত ব্রজধামে পুনরাগমন করিয়াছেন। মথুরা ও দ্বারকার ঐশ্বর্যলীলার পর এইবার মাধুর্যলীলার শুভারম্ভ হইল।
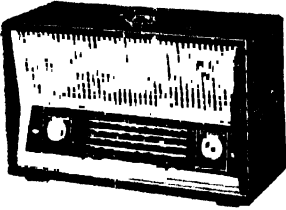
[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ১১ ॥

পনেরো দিনের মধ্যেই শৈলেশ্বর ডেকে পাঠালো আমাকে। শৈলেশ্বর অনেকটাই দূরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলো। একটা মস্ত খাল পেরিয়ে সাঁকোর উপর দিয়ে যেতে হ'তো। তার লোক এসে খবর দেয়ামাত্রই আমি সব ফেলে ছুটলাম।

সেই সময়ে তার সঙ্গে আমার বড়ো একটা দেখাশুনো হ'তো না। আমরা দুজনেই যার যার কাজে এতো ব্যস্ত থাকতুম যে যোগাযোগ করার সময়-সুযোগও বড় একটা মিলতো না, তা ছাড়া মনের আগ্রহেও ভাঁটা পড়ে এসেছিলো। সত্যি বলতে আমি আর তখন শৈলেশ্বরকে একটুও পছন্দ করতুম না. ও দিন দিনই কেমন বদলে যাচ্ছিলো. কমন ফন্দিবাজ হয়ে উঠছিলো. স্বার্থ-সিদ্ধি ছাড়া আর কোনো কিছুরই যেন অস্তিত্ব ছিলো না ওর হৃদয়ে। তার সঙ্গে আমার জীবনযাপনের পদ্ধতিতে কোনো মিলই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

কিন্তু তার স্ত্রীর স্বভাব ছিলো মলিনতাহীন। এতো ভালো ছিলেন ভদ্রমহিলা! শিক্ষায়-দীক্ষায় সেবায় যত্নে একেবারে অদ্বিতীয়া। আমাকে পছন্দ করতেন তিনি। গেলে খুশি হয়ে উঠতেন। তক্ষুনি ধোঁয়াওঠা চায়ের কাপ হাতে কাছে এসে দাঁড়াতেন, অনুযোগ করতেন যাই না বলে।

সেদিনও তেমনি অভ্যর্থনায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন, চা দিলেন, খাবার দিলেন। শৈলেশ্বর স্ত্রীর এই আতিশয্য নিয়ে রসিকতা করলো। তারপর সে সব পাট চুকলে আমাকে নিয়ে সে বাইরের ঘরে এলো। নিভৃত হয়ে গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললো, 'শোনো, আমি শ্বশুরমশায়কে লিখেছিলাম।'

অস্থির হয়ে বললাম, 'কী! কী জবাব দিয়েছেন।'

'ও'র মত নেই।'

'নেই!' আমি চুপসে এতোটুকু হয়ে গেলুম।

'না।'

'কেন'?

'বোসো, বলছি সব। তোমার এই চিঠিপত্র লেখাটা বন্ধ করতে হবে।'

'ও।'

'ঐ চিঠি লেখালেখিটই তোমার কাল হয়েছে।'

'চিঠি!'

'আমি ভেবেছিলুম তিনি বুঝি কিছুই লক্ষ্য করেন নি, তা নয়। এবং সেটা তিনি সুনজরে দেখেন নি।'

আমার গলা শুকিয়ে গেল। যেন ফাঁসির হুকুম শুনছি এমন এক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলাম শৈলেশ্বরের দিকে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে শৈলেশ্বর বললো, 'আসলে কি জান, এমনিতেই ডাক্তারদের চরিত্র বিষয়ে আমাদের দেশের লোকেদের মনে ততো বিশ্বাস নেই, তার উপরে দু'দিন দেখা একটা মেয়ের সঙ্গে ও রকম তরল পত্র চালাচালি—'

শৈলেশ্বরের মুখের ঐ তরল পত্র চালাচালি কথাটা আমার খুব খারাপ লাগলো। আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি তো জানো, সে বিষয়ে একটা সর্ষে পরিমাণ কালিও আমি চালিনি আমার স্বভাবে। সান্ত্বনাকে ছাড়া আমি কিছু জানি না, সান্ত্বনাকে ভালোবাসার আগে অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমি তাকাইনি পর্যন্ত। বরং একটু অস্বাভাবিকই ছিলাম আমি এ বিষয়ে। কিছুই তো তোমার অজানা নেই।'

'কিন্তু কী করবো বল; মেয়ে তো আর আমার নয়।'

'যাঁর মেয়ে তাকে তুমি বলবে সে কথা।'

'বললেই কি তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারবো? হাজার হোক তাঁদের কাছে তুমি আমার ভাই, ভাইয়ের হয়ে আমি যে মিথ্যে সাফাই গাইবো না তার ঠিক কী?'

'কী আশ্চর্য! সান্ত্বনাও তো তোমার কম স্নেহের নয়, তোমার

বোনেরই মতো, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক কি কখনো মিথ্যে বলে ও রকম একটা সর্বনাশ করতে পারে? হলোই বা ভাই।'

'এ সব যুক্তি আমাকে বলে লাভ কী। ভদ্রলোক একগুঁয়ে।'

'তবে কি হবে শৈলেশ্বর?'

'দেখি কতদূর করতে পারি।'

'বৌদিকে বলেছ?'

'না।'

'তা হলে আমি তাঁকে বলি, তিনি নিশ্চয়ই একটা উপায় করে দিতে পারবেন। তাঁকে তো আর তাঁর বাবা অবিশ্বাস করবেন না।'

'খবরদার। তাকে এসব কিছু বলতে যেয়ো না। আমি যা বলি ঠিক তাই করে যাও, হয়তো তাতেই তোমার আশা পূরণ হবে।'

'কেন বৌদিকে বলতে বাধা কী।'

'নিশ্চয়ই আছে, নইলে আমিই বা বলিনি কেন?'

এরপরে আর আমি কী বলবো। হতাশ হৃদয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। চুপচাপ বসে রইলাম নিজের ঘরে। মাসী বললেন 'কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'মাথা ধরেছে।'

এরপরে ভয়ে ভয়ে আর আমি সান্ত্বনার চিঠির কোনো জবাব দিলাম না। একাধিক চিঠি লিখলো সে আমাকে। প্রথমে অভিমান করে লিখলো, তারপরে উদ্বিগ্ন হয়ে, তারপরে রাগ অভিযোগ আর চোখের জলের শেষে একদিন থেমে গেল। আমি সব সহ্য করে তার চেয়েও বড়ো কিছুর আশায় চাতকের মতো তাকিয়ে রইলাম শৈলেশ্বরের দিকে। আসলে আমি বোকা ছিলাম, মানুষকে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্ন ছিলো না আমার সরল হৃদয়ে আর সেইজনাই আশা দিয়ে দিয়ে ছমাস ঘোরালো আমাকে শৈলেশ্বর। আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলাম। আমার নাওয়া গেল, খাওয়া গেল, ঘুম গেল, ডাক্তারি গেল, সব গেল। মরীয়া হয়ে ভাবলাম এবার আমি নিজে গিয়ে একবার ভদ্রলোকের কাছে দাঁড়াবো, ভিক্ষা চাইবো তাঁর মেয়েকে, তাঁর মেয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে বলবো অন্তত সে আমাকে বিশ্বাস করে কিনা। আর তার আগে শৈলেশ্বর যতোই গোপন করুক, আমি তার স্ত্রীকে বলবোই সব কথা, আমার ইচ্ছেটা আমি তাঁকে নিবেদন করবোই। হাজার হোক, ছোটোবোনের হয়ে তাঁরও তো বলবার কিছু অধিকার আছে? মনে হতেই সব ফেলে ছুটলাম শৈলেশ্বরের বাড়ি। গিয়ে দেখলাম, শৈলেশ্বর একা বাড়িতে খেতে বসেছে। অস্থির হয়ে বললাম বৌদি কই?'

'বাপের বাড়ি।'

'বাপের বাড়ি? কবে গেলেন?'

'কাল।'

'হঠাৎ।'

'খুব হঠাৎ নয়, যাবার দরকার হয়েছিলো।'

'কারো অসুখ?'

'নিজেরি অসুখ।'

'বৌদির অসুখ? কই আমাকে তো খবর দাওনি। কী অসুখ?'

'বোকামী করিস না, বোস। মেয়েদের এমন অনেক অসুখ আছে, যাতে ডাক্তার না ডেকেও তার হদিস পাওয়া যায়। প্রায় দু'বছর হতে চললো বিয়ে করেছি, এ অসুখ তার অনেক আগেই হতে পারতো।'

চুপ করে থেকে বললাম, 'ক মাস?'

'দু'তিন মাসের বেশী না। কিন্তু সে কথা যাক। সান্ত্বনা কি তোকে কোনো খবর জানিয়েছে?'

'সান্ত্বনা তো আমায় চিঠি লেখে না।'

'লেখে না?'

'তুই লিখিস না?'

'না।'

'কদ্দিন?'

'যেদিন থেকে তুমি বারণ করেছ।'

শৈলেশ্বর হাসলো, 'যাই বলিস, প্রশান্ত, মেয়েদের মন, যে পারে যেমন। এই এতো প্রেম, এতো ভালোবাসা আর দিব্যি সব ভুলে চুপটি করে গেল?'

'তার দোষ নেই, আমি জবাব দিই না বলেই সে আর লেখে না।'

'বাজে কথা রেখে দে, তার মন এখন নতুন রসে ডগমগ।'

'কী বলছো কী তুমি?'

'তার যে বিয়ে।'

'ক-কী।'

'পৃথিবীটা এ বয়সেও তুমি চিনতে শিখলে না, ও সব রং ঢং মেয়েরা বোকা পেলেই করে, ওরা যে কতো ছলনাময়ী, তা তো আর জান না।' আমি বসে পড়লাম, আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ-সংসার দুলতে লাগলো। কী যে করবো, কী যে ভাববো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

শৈলেশ্বর সান্ত্বনা দিল, পুরুষমানুষ হয়ে এতো দুর্বল কেন হে। ঐ তো সামান্য একটা মেয়ে, তার জন্য এতো? তুমি না হয়ে যদি আমি হতাম, ঘেন্নায় স্ত্রীজাতির আর মুখ দেখতাম না। শুনেছি আমার শ্যালিকাটির ফূর্তি নাকি আর ধরে না। তা-ও তো ঐ এক মরা পোড়া বর। আরে, ঐ আমার মক্কেল, রমেশ তালুকদার, তার একটা থার্ডক্লাশ ছেলে।'

'আমি আজ উঠি শৈলেশ্বর—'।

'আসলে শাশুড়ি ভীষণ অসুস্থ, শ্বশুরের ব্লাডপ্রেসার অস্বাভাবিক বেড়েছে, আর ফুটুনি করে করে টাকাকড়ি তো রাখেন নি কিছু, এখন ভাবনা হয়েছে মরে গেলে মেয়েটার কী হবে—'

'আমি যাচ্ছি—'

'আরে বোসো না বাপু, তোমার বৌদি গিয়ে বাড়ি তো খাঁ খাঁ, এসেছ যখন একটু থাক না।'

'আমার কাজ আছে।'

'কাজ কি আমারি নেই? এই তো সব ফেলে ছুটতে হবে শ্বশুরবাড়ি, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলে না বলে যতো রাগই করি না কেন, স্ত্রীর মুখ চেয়ে সে রাগ আমার চেপে থাকতেই হবে। আর বিশেষ করে মেয়েদের এই সময়টায় একটু, ইয়ে মানে সাবধানে রাখাই উচিত।'

'তাই তো।'

'চা খাবি?'

'না।'

'মন খারাপ করিস না।'

'না।'

'কী না মেয়ে, এর চেয়ে কতো ভালো বৌ পাবি তুই।'

'আজ উঠি শৈলেশ্বর।'

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম তার বাড়ি থেকে। আমার পায়ের জোর কমে গিয়েছিলো, দেহে বল ছিলো না, ফুসফুসে হাওয়া ছিলো না, আমি সেই সময়ে মরে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর কঠিন আঁধার চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরেছিলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একা ঘরের অন্ধকারে বালকের মতো কেঁদেছিলাম।

॥ ১২ ॥

শুধু সেদিনই নয়, তারপরের দিনও নয়, তারপরের দিনও নয়, অনেকদিন, অনেকদিন ধরে সেই কান্না আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে জমে রইলো। অনেকদিন ধরে সান্ত্বনার স্মৃতি আমাকে পাগল করে রাখলো। অস্থি-মজ্জায় জড়ানো যে মেয়েটিকে আমি মাত্র তেরোদিনের জন্য চোখে দেখেছিলাম, তাকে কতোটুকু ভালোবেসেছিলাম আমি জানি না, চিঠির ভাঁজে ভাঁজে যে অদেখা মানুষটির মন আমি এক বছর ধরে ধীরে ধীরে ছুঁতে পেরেছিলাম সেই অশরীরীর মমতাতেই আমি ডুবে রইলাম।

কিন্তু কোনো তীব্রতাই চিরস্থায়ী নয়। আমার দুঃখের ধারাও প্রকৃতির নিয়মেই একদিন ভোঁতা হয়ে গেল

একটা জায়গায় পর্দা পড়ে গেল। আমি আবার শান্ত মনে কাজেকর্মে যোগ দিলাম। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আমার অদ্ভুত নেশা জন্মালো, আমি ডুবে গেলাম সেখানে। আমার হৃদয়ের ক্ষত শুকিয়ে এলো, মানুষের রাজত্বে আবার মানুষের মতো সুখে-দুঃখে আনন্দে উৎসবে বাঁচতে লাগলাম।

আরো একটা বছর কেটে গেল কোথা দিয়ে। এর মধ্যে আর কখনো আমি শৈলেশ্বরের সঙ্গে দেখা করিনি। সে-ও আসেনি।

হঠাৎ তার স্ত্রী একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। শৈলেশ্বরের স্ত্রী। সান্ত্বনার বোন। বুকের ভিতরে মোচড় দিয়ে উঠছিলো! শক্ত হয়ে সেটা সামলে নিলাম।

ডাকটা জরুরী ছিলো। দু'লাইন চিঠি লিখে লোক দিয়ে পাঠিয়েছিলেন তিনি। সান্ত্বনার সঙ্গে স্বভাবের মিল

না থাকুক, হাতের লেখা একেবারে এক। তাকিয়ে দেখতে দেখতে অনেকটা সময় গেল। তারপর লোকটিকে বসতে বলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। বৌদিকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছিলো।

গিয়ে খবর পেলাম দিন সাতেক আগে কী কাজে শৈলেশ্বর ঢাকা গেছে। বৌদি একা আছেন। মেয়ের জ্বর। এই মেয়ে, এই মল্লিকা।

'মল্লিকা! স্মৃতির মল্লিকা?'

'স্মৃতির মল্লিকা। তার তখন এগারো মাস বয়েস। কী সুন্দর মেয়ে, কালো কালো ঘন চুলে ছোট্ট মাথাটা ঠাসা, বড়ো বড়ো চোখ, সুস্থ, সবল, জ্বরটা একটু প্রবলই, মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে।

আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন বৌদি। গাঢ় অভিমানে বললেন, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি একটা খোঁজও নেন না।'

ব্যস্ত হয়ে আমি মল্লিকার কপালে হাত রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করলাম, জবাব দিলাম না। বৌদিকে দেখে আমি দুর্বল বোধ করছিলাম।

বৌদি বললেন, 'আজ তিনদিন হয়ে গেল এই জ্বর চলছে।'

বললুম, 'তিনদিন আগেই খবরটা পাঠানো উচিত ছিলো।'

'আমি আজ নিতান্ত বিপন্ন হয়েই ডেকে পাঠিয়েছি। আপনার দাদা এখানে নেই, একা এই বাচ্চা নিয়ে আমার মনের অবস্থাটা বোধহয় আপনি বুঝতে পারছেন।'

'আমি জানি আমি আপনাদের প্রীতি-ভাজন নই কিন্তু এতো পর হয়ে গেছি তা-ও জানতাম না।'

ভালো করে বুক পিঠ দেখলুম, জ্বর দেখলুম। সাধারণ জ্বর। ভাববার কিছু ছিলো না। নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালুম একটা। বৌদির সান্নিধ্য আমার মনটাকে আবার বিধুর করে তুলেছিলো।

ভীতু গলায় বৌদি বললেন, 'ওর কঠিন কিছু হয়নি তো?'

'নাঃ, নতুন মায়েদের নিয়ে আর পারা যায় না।'

হাসলুম আমি, 'কিছু হয়নি, আজ না হয় কালই দেখবেন জ্বর ছেড়ে গেছে। শুইয়ে দিন, উঠুন, চা খাবো না?'

এতোক্ষণে বৌদির মুখের চিরাচরিত নরম মিষ্টি হাসিটুকু ছড়িয়ে পড়তে দেখলুম।

তাড়াতাড়ি গিয়ে চা করে নিয়ে এলেন, প্লেটে ঘরে-তৈরী খাবার সাজিয়ে আনলেন। আমি সাগ্রহে সেই যত্নের স্বাদ গ্রহণ করলুম। বললুম 'উপলক্ষ্য যাই হোক, তবু যে অভাজনকে ডাক দিয়েছেন তার জন্যই কৃতজ্ঞ।'

বৌদির সহাস্য মুখে আবার মেঘ ঘনিয়ে এলো, 'প্রত্যক্ষভাবেই যে মানুষ এড়িয়ে গেছে তাকে ডাকবো কোন ভরসায়?'

'এড়িয়ে গিয়েছি?'

'আপনি পুরো দেড় বছর পরে এলেন।'

আমি জানতাম আমার আসাটা আপনাদের প্রতীক্ষার মধ্যে ছিলো না। হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন বৌদি, একটু চুপ করে হেসে বললেন, 'জানেন, আপনাকে আমরা এতো ভালোবেসে ফেলেছিলাম যে প্রথমটায় প্রায় বিশ্বাস করতে পারিনি, কিন্তু—' থেমে গেলেন বলতে বলতে, তারপর কেমন অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন।

আমি তাঁর কথার অর্থটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলাম না। বললুম, 'কী বিশ্বাস করতে পারেন নি?'

'থাক সে কথা।'

'না, আপনি কী বলতে চাইছেন বলুন।' আমার মনে এবার খটকা লাগলো একটু।

'বলে আর কী লাভ।'

'না বলেই বা কী লাভ।'

'তা ঠিক, লাভ-লোকসানের হিসেবটা খুব ভালোভাবেই চুকেছে। ওর অত-বড়ো ক্ষতিটা আপনি না করলেও পারতেন।'

'বৌদি, আমি আপনার অভিযোগের কারণটা এখনো ধরতে পারছি না।'

'অথচ দেখলে তো আপনাকে কক্ষনো অত নিষ্ঠুর মনে হয় না।'

'কী নিষ্ঠুরতার পরিচয় পেয়েছেন, বলুন তো।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

...একটা কথা জিজ্ঞেস করবো......

'নিশ্চয়ই।'

একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কেন আপনি ও রকম করলেন বলুন তো?'

'কী রকম?'

'যেটা আপনার খেলা সেটা যে অন্য কারো প্রাণান্ত হতে পারে অন্ততঃ সেটুকু বোঝার অনুভূতি আপনার থাকা উচিত ছিলো। প্রশান্তবাবু, সান্ত্বনা বড়ো ভালো মেয়ে, বড়ো সরল, আমার বোন বলে বলছি না—' উদ্গত চোখের জল সামলে তিনি চুপ করলেন। আর বৌদির কথা শুনে আমার হাত পা শক্ত হলো। আমি বললাম 'যদি প্রাণান্ত কারো হয়ে থাকে তা আমারই হয়েছে।'

'আপনার কী?'

সান্ত্বনা বিয়ে করেছে, স্বামী পেয়ে পুরোনো স্মৃতি মুছে ফেলতে দেরি হয়নি তার, কিন্তু আমি এই মুহূর্তেও তাকে ভুলে নেই, ছেড়ে নেই।'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৌদি। যেন বুঝতে পারলেন না কী বলছি। আস্তে বললেন, 'যদি তাই হবে তবে কেন বিয়ে করলেন না তাকে?'

'আমি বিয়ে করলাম না?'

'আপনি যেদিন আপনার দাদার কাছে আপনার অসম্মতি জানিয়েছিলেন আমরা প্রত্যেকে অবাক হয়েছিলাম, আহত হয়েছিলাম। কিন্তু সান্ত্বনার বেদনা ছাপিয়ে অপমানের আঘাতটাই বেশী লেগেছিলো। বিশেষত আপনি তার সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন—'

বৌদির কথা শুনে আমার কান পুড়ে গেল। আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। বুঝতে পারলাম না কাকে বিশ্বাস করবো। শৈলেশ্বরকে না তার স্ত্রীকে। শৈলেশ্বর এতো বিশ্বাস-ঘাতক? এতো মিথ্যেবাদী! এতো নির্মম! রাগে দুঃখে বেদনায় আমার সারা অন্তর আগুন হয়ে জ্বলে উঠলো। আমার ইচ্ছে করলো বৌদিকে তার স্বামীর স্বভাবের খোলসটা ছাড়িয়ে

দেখিয়ে দি। কিন্তু সমস্ত অপরাধ মাথায় নিয়ে অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলাম। মনে মনে ভাবলাম স্বামীর উপর কোনো কারণেই কোনো মেয়ের অশ্রদ্ধার উদ্রেক করা কারো উচিত নয়। আমার ক্ষতি শৈলেশ্বর করেছে, তার স্ত্রী নয়। তাঁকে আমি দুঃখ দিতে পারি না। এই থেকেই হয়তো তাদের পারিবারিক জীবনে ফাটল ধরবে। তা ছাড়া আমার কথা বৌদি বিশ্বাসই বা করবেন কেন। আমাকে তাঁর স্বামী কী ছবিতে এঁকেছে তা তো বুঝতে পেরেছি। তারপরেও যে তাঁর স্ত্রী, সান্ত্বনার দিদি, এখনো আমাকে মমতা-ময়ীর মতো যত্ন করছেন, বেদনা জানাচ্ছেন, সেটাই তো আশ্চর্য। আমার অপরাধ তো তাঁর কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়?

বৌদি বললেন, 'মুখ যদি মানুষের মনের আয়না হ'তো তাহলে এই মুহূর্তে আমার বোনকে যে আপনি সত্যি ঠকাতে চাননি, তার উপর আপনার দুর্বলতা যে আপনাকে এখনো পীড়িত করে এটা বিশ্বাস করতে আমার আটকাতো না। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে গড়িয়েছে—জানেন, বিয়ের দিন সকালে ও আত্ম-হত্যার চেষ্টা করেছিলো?'

আমি এবার অসহ্য হয়ে উঠলাম, হাত তুলে বললাম, 'আর শুনতে চাই না, আর শুনতে চাই না। আমি এতো-দিনে বুঝেছি আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে এক মস্ত কৌতুক করেছে। আপনাকে আমি আর কিছুই বলতে চাই না, শুধু জেনে রাখুন আপনার বোনকে পাওয়ার চাইতে বড়ো প্রার্থনা আমার জীবনে আর কিছু ছিলো না। আর কিছু নেই।' আমি উঠে দাঁড়ালাম, অধীরভাবে পায়চারি করতে করতে আবার বসলাম, বললাম 'আপনি বিশ্বাস করুন, আমার মুখের আয়না আমার ছদ্মবেশ নয়, আমি তা পারি না, আমি তা জানি না, আমি যা জানি তা আমি একান্ত মনে শুধু তাকেই চেয়েছিলাম।' দু হাতে মুখ ঢাকলাম আমি।

কেমন এক রকম সুদৃঢ় স্বরে বৌদি বললেন, 'তবে কি কোনো ভুল বোঝা-বুঝি হয়েছিলো আপনার দাদার সঙ্গে?'

আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম, এবার যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বললাম, 'যা হবার হয়ে গেছে, সে আগুন খুঁচিয়ে লাভ নেই।'

'আপনি কি তা হলে বিয়েতে অসম্মতি জানাননি বলতে চান?'

'যা অসম্ভব তা কী করে করবো।'

'ও'র সব কথা মিথ্যে? বানানো?'

'সে সব থাক।'
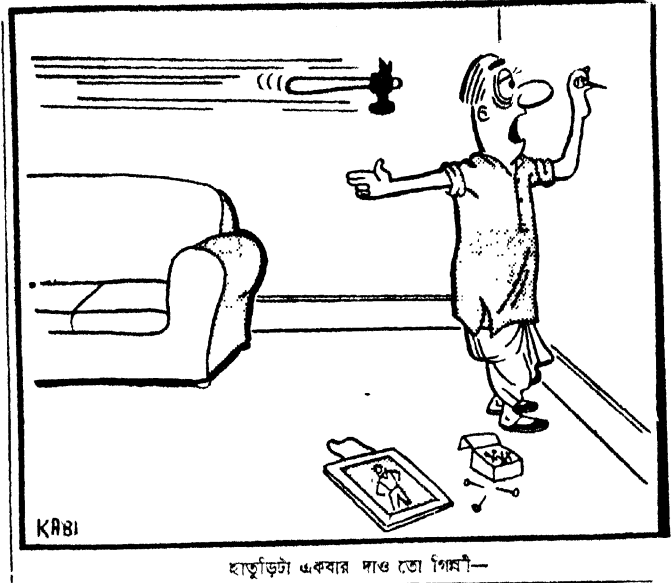
হাতুড়িটা একবার দাও তো গিন্নী—

'আমি বুঝেছিলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন বৌদি।

আমি বললাম, 'এবার যাই। কাল একটা খবর দেবেন জ্বর ছাড়লো কিনা। লোকটিকে সঙ্গে দিন ওসুধ পাঠিয়ে দেব।' ঝুঁকে পড়ে বাচ্চার ঘুমন্ত কপালে একটি চুমু খেলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম, মায়ের চেয়ে তার মাসীর সঙ্গেই মিল বেশী।

দরজার কাছে এসে বৌদি বললেন, 'কিন্তু আপনি পুরুষমানুষ, তার উপরে নিজের অভিভাবক নিজে। যদি আপত্তিই না থাকবে তা হলে কই আপনি তো কখনো আমার বাবাকে চিঠি লেখেন নি, আমাকেও তো বলেননি।'

'বৌদি, ওসব থাক।'

বৌদির চোখে আমি বিদ্রোহের আগুন দেখলাম। দৃঢ় হয়ে বললেন, 'সবই ক্ষমা করা যেতো, যদি সান্ত্বনা সুখী হতো। সান্ত্বনাকে জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। প্রশান্তবাবু, আমি আপনার কাছে খোলাখুলি সব শুনতে চাই।'

বললাম, 'আমার কথাই যে প্রামাণ্য তার বিশ্বাস কী?'

দূরের দিকে তাকিয়ে বৌদি বললেন, 'তা ঠিক, বিশ্বাস আর কাউকেই করা উচিত না এই জগৎ-সংসারে।'

একটু দাঁড়ালাম আমি। আমার বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো।

জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'এমন হঠাৎ করে তার বিয়েই বা দিলেন কেন?'

'আপনার দাদার ইচ্ছেতে। তার পীড়াপীড়িতেও বলতে পারেন।'

'শৈলেশ্বরের পীড়াপীড়িতে?'

'তিনিই এই সম্বন্ধ ঠিক করে-ছিলেন। ছেলের বাপ এ'র মক্কেল, ছেলেটি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু টাকা আছে।'

'শৈলেশ্বর নিশ্চয়ই সেটা জানতো না।'

'হয়তো নয়, জানলে আর এ শত্রুতা করবেন কেন?'

'তাই তো।'

'ছেলেটি দেখতে ভালো। সেটা বাইরের। সেটা বাবা দেখে পছন্দ করে-ছিলেন। বাদবাকী খবরের জন্য জামায়ের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলেন তিনি। ভুপেন নাবালক কাজেই ইনিই আমাদের কর্ণধার।'

আমি আমার চুলের মধ্যে ঘন ঘন আঙুল চালিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করছিলুম। স্বামী সম্পর্কে বৌদির মনের ভাবটাও আঁচ করতে চেষ্টা করলুম। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে আমার অজান্তেই 'স্কাউন্ড্রেল' শব্দটা খসে পড়লো।

চমকে উঠে বৌদি বললেন, 'কী।'

সচকিত হয়ে বললাম, 'কিছু না এবার যাই। বাচ্চার খবর পাঠাতে ভুলবেন না। জ্বর কাল সকালেই ছেড়ে যাবে।'

(ক্রমশঃ)

শীতের অঞ্জলি

ফটো : সুকুমার রায়]

প্রদর্শনী

কলারসিক

শিল্পী নিখিলেশ রায়ের একক প্রদর্শনী

পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী নিখিলেশ রায়ের চিত্র প্রদর্শনী গত ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলার পর শেষ হয়েছে। শীতের মরশুমে চিত্র প্রদর্শনীর যে জোয়ার এসেছিল এই সপ্তাহ থেকে তাতে ভাঁটার টান ধরেছে। এক সঙ্গে অনেকগুলি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন অন্ততঃ গত সপ্তাহে শুরু হয়নি।

যা হোক নিখিলেশ রায় তরুণ শিল্পী। এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রায়ই দেখা যায়, প্রতিটি প্রদর্শনীতে নানা মাধ্যমে অংকিত চিত্র পাশাপাশি ভীড় করে থাকে। জল-রঙের পাশে তেল-রঙ —তেল-রঙের পাশে প্যাস্টেল কিংবা ভাস্কর্যকলার উপস্থিতি একরকম স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু নিখিলেশ রায়ের এই প্রদর্শনী তার ব্যতিক্রম ছিল। তিনি জল-রঙের একক মাধ্যমে অঙ্কিত চল্লিশখানি চিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন দর্শকদের সম্মুখে। আমরাও একটি মাধ্যমে শিল্পী কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছেন তা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি।

প্রথমেই বলা যায় শিল্পী নিখিলেশ রায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। যদিও তিনি কি চিত্র-বক্তব্য এবং কি আঙ্গিকে প্রচলিত পথের পথিক এবং নতুন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার দুঃসাহসও দেখাননি তবু সেই প্রথাসিদ্ধ কাজের মধ্যেও কোন কোন চিত্রে তিনি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। প্রধানতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য দেখা ঘটনা, তাই নিঃসর্গ এবং প্রতিকৃতির মধ্যেই তাঁর চিত্র-বক্তব্য আবদ্ধ। কিন্তু সেই নিত্য দেখা ঘটনাকেও তিনি তাঁর ড্রয়িং দক্ষতায় বর্ণপ্রয়োগের স্নিগ্ধতায় এবং চিত্র-সংস্থাপনের কৌশলে বহু ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি শিল্পমানে উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। দু'একটিতে সত্যি তিনি সার্থক।

শিল্পী : নিখিলেশ রায়

'দার্জিলিং'-এর নিঃসর্গ দৃশ্য (১), 'বস্তি' (২), 'সিনেমা কিউ' (৯), 'নদী-তীর' (১৪), 'ভোর' (১৯), 'জানালার মধ্য দিয়ে' (২২), 'সিঁড়ির উপরে' (৩৬) কিংবা 'নরম আলো' (৩৮)— অন্ততঃ চমৎকার কম্পোজিশান, জল-রঙের মৃদু প্রয়োগ এবং আলো-ছায়া সৃষ্টির দক্ষতায় দর্শক মনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তেমনি কিছু কিছু চিত্রে কল্পনা এবং রঙ প্রয়োগে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এবং যদি পারতেন তবে 'ব্যস্ত পথ' 'কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর', 'বৃষ্টি' ও 'দুপুর' আরও ব্যঞ্জনাময় হতে পারত। প্রথম প্রদর্শনীর এই ত্রুটি-বিচ্যুতি শিল্পী কাটিয়ে উঠবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। আমরা তাঁকে অভি-নন্দিত করি।

এই সপ্তাহের নতুন প্রদর্শনী

এই সপ্তাহে দুটি নতুন প্রদর্শনী শুরু হবে। একটি থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারীতে। এখানে বোম্বের প্রখ্যাত শিল্পী জেহাংগীর সাবাওয়ালার প্রদর্শনী ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ চলু থাকবে। অন্যটি শুরু হবে ক্যাথেড্রাল রোডের অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে। শিল্পীর নাম প্রদীপ বসু। আমরা আগামী সংখ্যায় এ দুটি প্রদর্শনী সম্বন্ধে আলোচনা করব।

২৩-২-৬৩

এখন প্রেরণা

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আমার প্রেমের ফুল বৃক্ষনিম্নে জানি আছে পড়ে।

সকালের আলো তাকে দেখেছিল, গোধূলির ঘরে
তার সেই ক্ষীণতনু, ভালবেসেছিল আরও কয়েকটি তারকা।
যখন প্রেরণা আসে, তখনই তো কিছু বলে, কিছু করে
কেউ; অন্ধ অতীতের প্রান্ত থেকে ক্ষণদীপ্তি ছায়া প্রগাঢ়তা,
দিব্যচক্ষু দীর্ঘপথে সেই ফুল বৃক্ষনিম্নে—জানা আছে, জান কি, কারও তা?
সূর্য যত আলো দেবে, ক্ষণদীপ্তি নক্ষত্রের যতো আলো আছে,
ততোধিক প্রেম ঢেলে দেবে জেন, এই ফুল শিয়রের কাছে।
সময়ের সেতু পার হবে যোদ্ধা, পাশে অতিকায়া অনীকিনী—
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা পৃথিবীর ধূলোর প্রান্তর ঘর ছারখার
অন্ধ অতীতই বল, দিব্যচক্ষু দীর্ঘপথ তোমার আমার—
বৃক্ষনিম্নে তবু ফুল। আমি তাকে চিনি, ফুল কিনি।

এখন প্রেরণা আসে, সেই ফুল তুলে নেব করে॥

উত্তর সীমান্ত-যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তখন কি জ্যোৎস্না ছিল পর্বতের তুষার শিখরে?
অথবা কি অন্ধকার মেলে মহামৃত্যুর শীতল
সাম্রাজ্য জাগিয়াছিল? তখনো কি নির্জনতা ছিল
নিষ্ঠুর ঘাতক সম সম্মুখে পশ্চাতে, তোমরা কি
জানিতে, হয়তো আর ফিরিবে না, কোনোদিন আর?
অযুত স্নেহার্ত হাত পশ্চাতে প্রবল ডেকেছিল
যেতে নাহি দিব, কোটি জননীর অশ্রুসিক্ত পথে—
তবু যেতে দিতে হয়, কর্তব্য যখন ডাকে ভীষণ সে ডাক।

তখন ছিল না কেহ তৃষ্ণায় হৃদয় তুলে ধরে।
সন্ধ্যায় বা ঊষালগ্নে অথবা মধ্যাহ্নে নীরবতা
বড় বেশী আততায়ী, কেননা দূরের এই কর্মকোলাহল
ব্যাকুল হৃদয় আর্ত নয়নের কথা বহে আনে...
ফিরিতে চাহনি তবু? জানি, তোমাদের প্রতীক্ষায়
এরকম দুর্বলতা অসম্ভব, শক্তি বহে আনে।

তখন কি জ্যোৎস্না ছিল অন্ধকার ঊষা বা গোধূলি
হিংস্রতার মুখোমুখী যখন বুদ্ধের জন্মভূমি?
(শয়তানের অভিধানে প্রেম নেই, কৃতজ্ঞতা নেই।)
শয়তানের অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত প্রেমিক আমার
লয়ে ছিলে ঠাণ্ডা হিম শয্যার আশ্রয়, তখনো কি
দুচোখ জ্বলন্ত অগ্নি প্রেতাত্মার দিকে চেয়েছিল?

বিপ্রতীপ

তৃপ্তি বসু

একটি প্রতিভা মরে—
ভালবেসে না-পাওয়ার পুরনো প্রতায়ে,
ধুঁকে ধুঁকে খাবি খাওয়া মাছের মতন।

একটি মুখশ্রী গড়ে,
শুধু প্রেম-প্রবঞ্চনা-পাউডার-স্নোয়ে;
—শত শত প্রতিভার হোক না পতন!

রূপকথার সেই ময়দানব

অনীতা গুপ্ত

—"তারপর ?"

—"ময়দানবটা তখনো মরেনি। রাজপুত্র সমানে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। এই তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে তাকে পৌঁছতেই হবে রাজপুরীতে, সেখানে সোনার পালঙ্কে রাজকুমারী রাক্ষসের মায়ায় ঘুমিয়ে আছে, শিয়রে তার সোনা-রুপোর কাঠি।"

ঠাকুরমা থামলেন। কিন্তু তাঁর কোলের কাছে বসে-থাকা ছোট্ট শিশুটির মন থামতে চাইছে না। চারদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। লণ্ঠনের আলো জ্বলছে মিটমিটি। ওর বুকের মধ্যে মোটা কালো চেহারার ভয় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। অধীর হয়ে আবার সে প্রশ্ন করল—"ময়দানবটাকে মারতে পারবে রাজপুত্র ?"

ঠাকুরমা স্থির শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ পারবে। ওর হাতে যে মন্ত্রসিদ্ধ তলোয়ার রয়েছে।"

শিশু এবার নিশ্চিন্ত হ'ল।

স্মৃতিমন্থন করছিল স্নেহাংশু। উনিশ শ' বাষট্টি সালের নভেম্বরের এক সকাল। বারন্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল সে। কাগজটা কিছুটা পড়ে বন্ধ করে রাখল। স্নেহাংশু যুদ্ধের ঐ সংবাদগুলো সহ্য করতে পারে না। প্রতিদিন সংবাদপত্রটা খোলার পর তার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। স্নেহাংশু বুঝতে পারে ওর বিশ্বাসগুলো ভেঙে যাচ্ছে। জীবনের কাছে তার পরাজয় শুরু হয়েছে বহুদিন ধরে। মনের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানি অনুভব করতে করতে তার মনে পড়ছিল ঠাকুরমার সেই স্থির বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর। ছোটবেলায় সেও এইভাবে বিশ্বাস করতে শিখেছিল। অন্ধকার রাতে ছায়া-ছায়া ভয় যখনই তাকে আক্রমণ করতে এসেছে স্নেহাংশু নিজেকে ভেবেছে সেই রাজপুত্র। তখন থেকেই সে খুঁজতে শুরু করেছে ময়দানবটা কোথায় ? ময়দানবটা কে ?

একটা উড়োজাহাজ শব্দ করে উড়ে চলে গেল। সূর্যের আলো ইস্পাতের ডানায় ঝলসে উঠছে। স্নেহাংশু এতদিন মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখেছে। আজ মনে হ'ল তার সমস্ত পৃথিবীর উপর ইস্পাতের ঐ আকাশযান তীক্ষ্ণচঞ্চু বাজপাখীর মত পাক খেয়ে ঘুরছে। গৃহ-কপোতের মত শান্ত, নিরীহ এই

পৃথিবীর কোমল মাংসের জন্য তার লোভ ইস্পাতের ঠোঁটে ঝলসে উঠছে।

স্নেহাংশুর মনে পড়ল প্রথম যেদিন সে তাদের মফঃস্বল শহরের আকাশে উড়োজাহাজ দেখে বিস্ময়ে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে জানিয়েছিল, ওর বাবা তখন বলেছিলেন—"ওরা নতুন সভ্যতার দূত, সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে ওরা এক করবে।"

আজ স্নেহাংশু সে কথা স্মরণ করে মনে মনে হাসল।

খবরের কাগজটা টেবলের উপর রেখে স্নেহাংশু উঠে চলে গেল স্নান করতে। কলেজে তাকে পড়াতে যেতে হবে। মাথায় জল ঢালতে ঢালতে স্নেহাংশু ভাবতে লাগল। ওর ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়। ওর বাবা ছিলেন মফঃস্বলের এক স্কুলমাস্টার। ভূগোল পড়তে বসলে পৃথিবীর মানচিত্রটি খুলে ওর বাবা সাগর পারের নানা দেশের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতেন। স্নেহাংশু একবিন্দু কালো অক্ষরের মধ্যে যেন এক বিরাট মহাদেশ আবিষ্কার করত। শান্ত, স্থির সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে স্নেহাংশু ভাবত বড় হলে সে নাবিক হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটবে। তারপর আর একটু বড় হলে তার সেই ইচ্ছেটা বদলে যায়। বাবাকে সে একদিন জানায়—"আমি বড় হ'লে সৈনিক হবো।"

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন—'সৈনিক তো তুমি সব সময়ে। তোমাকে শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে।'

সচকিত হয়ে সে প্রশ্ন করেছিল—'শয়তানটা কোথায়, বাবা ?'

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন—'শয়তানকে তুমি চিনে নেবে। তোমার চারপাশেই রয়েছে।'

সে আবার প্রশ্ন করেছিল—'শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধে আমি জিততে পারবো ?'

এক মুহূর্তের জন্য ওর বাবা চুপ করেছিলেন। তারপর ছেলের চোখের দিকে না তাকিয়ে সুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শান্ত, অবিচলিত কণ্ঠে ব'লেছিলেন—'হ্যাঁ, সাহস আর শক্তি থাকলে মানুষ জীবনে জয়লাভ করে। সত্য যদি তোমার অবলম্বন হয়, তবে তুমি তাই দিয়ে শয়তানকে হারিয়ে দিতে পারবে।'

স্নান শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে তার মনে হল, পনের বছরে পা দেবার পর থেকেই তার মনে হয়েছে বাবা মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন তাকে সেইদিন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য বাবার স্কুলের চাকরীটি চলে যায়। এর আগে স্নেহাংশু মনে করতো শয়তান বুঝি চাটুজ্জেদের ঐ কর্তা, যার দাপটে পাড়ার লোক অস্থির, কিংবা তার জ্যাঠামশাই, বাবাকে যিনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। ছোট মামাকেও সে শয়তান বলে মনে করত, কারণ স্নেহাংশুকে তিনি প্রায়ই তিরস্কার করতেন দুষ্টুমির জন্য। ছোট মামীকে একলা কাঁদতে দেখেছে সে অনেকদিন। তার মনে হোত ছোট মামাই তাকে ইচ্ছে করে কাঁদায়। স্কুলের অঙ্কের মাষ্টারকেও তার মনে হতো শয়তান।

কিন্তু পনের বছর বয়সে শয়তানের আর এক রূপ দেখল স্নেহাংশু। সে হল দারিদ্র্য। রোগশয্যায় সে যখন বাবার পাশে গিয়ে বসতো, স্নেহাশুর বারে বারে মনে হয়েছে বাবাকে সে জিজ্ঞেস করবে শয়তানকে তিনি পরাজিত করতে পেরেছেন কিনা? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারেনি। বাবার প্রতি গভীর সহানুভূতিবোধ তাকে বাধা দিয়েছিল।

ভাত খেতে ব'সও স্নেহাংশুর মন থেকে এই চিন্তা দূর হল না। খেতে খেতে সে বাবার কথাই ভাবতে থাকল। বাবার রোগপান্ডুর মুখে স্নেহাংশু ব্যর্থতার কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। স্নেহাংশু তার শৈশবে বাবাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত, কৈশোরে তাঁর উপরে নির্ভর করেছে, যৌবনের প্রারম্ভে তাঁকে আদর্শরূপে সামনে রেখে জীবনযুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু জীবনযুদ্ধের প্রতি মুহূর্তে মৃত পিতার প্রতি এক অক্ষম অভিমানে সে দিনের পর দিন বিক্ষত হয়েছে। তার মনে হয়েছে তিনি পরাজিত, নিঃস্ব এক মানুষ। বিত্তহীন পুত্রের হাতে তিনি কেবল মিথ্যা স্বপ্নের শূন্য ঝাঁপি তুলে দিয়ে গেছেন। কৈশোরে সেই ঝাঁপি হাতে নিয়ে দীর্ঘ পথ সে অতিক্রম করে এসেছে। যৌবনে সেটা খুলে দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছে, স্নেহাংশু! মনে হয়েছে বাবা তাকে বঞ্চনা করেছেন। স্নেহাংশুর মনে দিনের পর দিন জমে উঠেছে অক্ষম অভিমান।

বাসে উঠেও স্নেহাংশুর মস্তিষ্কে সেই চিন্তাটাই ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে চলল। ডারুইনের থিয়োরী তার মনে পড়ছে। যোগ্যতম প্রাণীই জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতার বিচার হবে কি দিয়ে? সাহস, শক্তি আর সততা? তার মন যেন অস্বীকার করে বলতে চাইছে—দানবীয় শক্তিতে যোগ্যতম ব্যক্তি ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার কারুর নেই, স্নেহাংশুরও না। সে ভাবল, আমরা যারা জীবনযুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ছি, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব এই পৃথিবী থেকে। আমাদের বংশধরেরা লোপ পাবে। আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে অযোগ্য বিবেচিত হয়েছি। যোগ্যতমদের বংশধরেরাই পৃথিবীতে বাঁচবে, পৃথিবী ভোগ করবে। স্নেহাংশু রাস্তার চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তারপর স্নেহাংশু কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। ওর স্ত্রী প্রমীলা গা ধুয়ে সামান্য প্রাত্যহিক প্রসাধনে নিজেকে নতুন করে নিয়েছে। স্নেহাংশুর জন্য তৈরী করেছে চা, নিমকি, হালুয়া। স্নেহাংশু হাতমুখ ধুয়ে সারাদিনের গ্লানি আর ক্লেদ শরীর থেকে ধুয়ে ফেলে প্রমীলার হাত থেকে সেই পরম যত্নের সেবাটুকু নিয়েছে। বারন্দায় আরাম-কেদারায় ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে স্নেহাংশু দেখেছে প্রমীলা আকাশ-নীল শাড়িটি সারা গায়ে জড়িয়ে এঘর, ওঘর করছে। তারপর অন্ধকার নামতে তাদের পাঁচ বছরের ছেলে সংগীদের সংগে খেলা করে বাড়ি ফিরেছে। স্নেহাংশু তখন তাকে কাছে ডেকে নিয়ে পড়াতে বসেছে। রাত্রে রান্না হলে প্রমীলা ওদের দুজনকে খেতে ডেকেছে। স্নেহাংশু আর মিন্টু পাশাপাশি বসেছে, প্রমীলা সামনে। প্রমীলা তার সামান্য উপাদান দিয়ে প্রতিদিনের মত সুস্বাদু রেঁধেছে। চিংড়ি দিয়ে রান্না করা লাউঘন্ট বারে বারে তুলে দিয়েছে স্নেহাংশুর পাতে। স্নেহাংশু ওটা ভালবাসে। তারপর ছেলেকে পাশে নিয়ে শুতে গিয়েছে স্নেহাংশু। প্রমীলা তখন ঘরকন্নার শেষ কাজটুকু নিয়ে ব্যস্ত। মাথার কাছে জানলাটা খোলা। রাত্রির নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে স্নেহাংশু তখন আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। তখন সে বুঝতে পারল এতক্ষণে সে সকালের বিষাক্ত চিন্তাটার হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে একটু একটু করে তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কখন তলিয়ে গেছে বুঝতে পারেনি।

এই ছোট্ট ঘরের স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে তার ভাল লাগে। এখন তার মনে হচ্ছে, হিংসা এবং লোভে যারা রাত্রি-দিন নখ শাণিত করছে তারা কি সত্যিই বাঁচে? সকালবেলার জটিল প্রশ্নের উত্তরটা যেন এখন সে খুঁজে পাচ্ছে। আশা এবং বিশ্বাস মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। মনে পড়ল বাবার মৃত্যুর পর স্বাধীনতা দিবসের দিন তার প্রথম মনে হয়েছিল তিনি পরাজিত হননি।

মিন্টু এগিয়ে এল বাবার কাছে, শোবার আগে রোজ তার বাবার সঙ্গে গল্প করা চাই। স্নেহাংশু তাকে কাছে টেনে নিয়ে গল্প শুরু করল। রাজপুত্র এগিয়ে চলেছে মন্ত্রসিদ্ধ তলোয়ার হাতে। ধু-ধু করছে তেপান্তরের মাঠ।

সেখানে বাস করে ময়দানব। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছে মিণ্টু। সেই শিশু-স্নেহাংশুর মতই আতঙ্কিত কণ্ঠে স্নেহাংশুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে মিণ্টু জিজ্ঞেস করল—'বাবা, ময়দানবটাকে রাজপুত্র মারতে পারবে তো?

স্নেহাংশু তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আকুল আগ্রহে বার বার বলতে লাগল—'পারবে, পারবে, পারবে। রাজপুত্র নিশ্চয়ই ময়দানবটাকে হারিয়ে দেবে। তা না হ'লে তুই, তোরা বাঁচবি কেমন করে?'

মিণ্টু ...র এই আকস্মিক স্নেহে দিশেহারা। আর স্নেহাংশু ভাবতে লাগল মিণ্টুও তার ছেলেকে এই কথা বলবে এবং তার পরের বংশধরও।

॥ বাজেট ॥
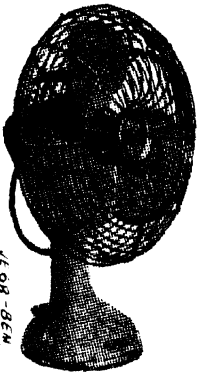
সারা দেশ জুড়ে বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংসদের যুক্ত অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি যা বলেছেন, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনে রাজ্যপালদের উদ্বোধনী ভাষণে প্রায় সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেছে। সকলেই বলেছেন, জাতির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রত্যেককে আরও ত্যাগ ও দুঃখবরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই মুহূর্তে এই কটি কথাই যেন জাতির কাছে জাতির নেতাদের একমাত্র বাণী। যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ ইতিমধ্যেই করভারে ন্যুব্জ এবং যার তিন-চতুর্থাংশ মানুষ শুধু দুটি ক্ষুধার অন্নের অন্বেষণেই দিশেহারা তাদের কর্ণে এ বাণী যে মধুবর্ষণ করবে না তা সহজেই অনুমেয়। তাদের প্রত্যেকের মনে আজ তাই এই শঙ্কিত প্রশ্ন যে, আরও কত অগ্নিমূল্যে ও আয়ত্তাতীত হবে প্রতিদিনের ভোগ্য-পণ্য, সংসারের অতিরিক্ত প্রয়োজন পূরণ কেমন করে সম্ভব হবে এই সীমিত আয়ে? দৈবাচার্য যাঁরা, তাঁরা বোধহয় এবার কোন গবেষণা-করেই সপ্তাহের কররাশিতে বলতে পারবেন, আর্থিক দুশ্চিন্তায় সব গৃহস্থের মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে।

এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাজেটের যেটুকু জানা গেছে, তাতে বলা হয়েছে এবার রেলে যাত্রী-ভাড়া বাড়ানো হবে না কিন্তু বাড়বে পণ্যবহনের মাশুল। ঐ মাশুল বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বত্রিশ কোটি টাকা আয় বাড়বে। পণ্যের কারবারীরা নিশ্চয়ই সে বর্ধিত মাশুল নিজেদের পকেট হতে দেবেন না, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করে তা পণ্যক্রেতাদের কাছ হতেই আদায় করে নেবেন। সুতরাং বত্রিশ কোটী টাকা দ্বিগুণিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতাদের কাঁধেই বোঝা হয়ে চাপবে। যাত্রী-ভাড়া বাড়লে শুধু যাত্রীদের তা দিতে হ'ত, মালের ভাড়া বাড়তে যারা কখনও রেলে চাপেনি বা চাপে না তাদেরও নতুন কর দেওয়ার দায়ে পড়তে হ'ল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট যখন এর পর বিস্তৃতভাবে জানা যাবে তখন ঠিকমত বোঝা যাবে যে, ভবিষ্যতের রঙিন আশায় বর্তমানকে আরও কত কঠিন করে কোমরের কাপড় বাঁধতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তাতে এই রাজ্যের করদাতাদের কাছ থেকে আরও সাড়ে তিন কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী সে ঘোষণা সবিনয়ে নিবেদন করেননি, করেছেন জোর গলায়। বলেছেন, এ রাজ্যে অতিরিক্ত কর নির্ধারণের ন্যায়সঙ্গত অবকাশ এখনও আছে। এ রাজ্য বলতে তিনি কাদের বুঝিয়েছেন তা আমরা জানি না, তবে তারা যে গাঁয়ের চাষী বা কলের মজুর বা শহরের মসিজীবী মধ্যবিত্তরা নয় তা অর্থমন্ত্রী নিজের ঘরে বসেই সরকারী পরিসংখ্যানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করতে পারেন। সার-চার্জ, সুপারট্যাক্স ইত্যাদি যাঁরা দেন তাঁদের সংখ্যা হয়ত অল্প। কিন্তু নিংড়ালে রস শুধু ঐখানেই পাওয়া যাবে। এর বাইরে সারা পশ্চিমবঙ্গ আজ পশ্চিম এশিয়ার মরুপ্রান্তরের মতই শুষ্ক। অতি কঠিন পেষণেও আর তাতে রসের সন্ধান পাওয়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে বিহার রাজ্যের একটি ঘটনা স্মরণীয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার দ্বিতীয় বর্ষে অতিরিক্ত ৪১ কোটি টাকা নতুন করের মাধ্যমে আদায় করার কথা ছিল বিহার রাজ্য সরকারের। কিন্তু বিহারের সাধারণ মানুষের চরম দুর্গতি প্রত্যক্ষ করে' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা সে কর আদায় স্থগিত রাখেন। জাতিগঠনের জন্য সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ব্যক্তির সুখ-দুঃখ বা সীমাবদ্ধতার কথা তার জন্য অবশ্যই ভোলা চলে না। দৃঢ়তা আর আমলাতান্ত্রিক হৃদয়হীনতা নিশ্চয়ই এক কথা নয়।

অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এক নীতিবোধহীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্যায় আচরণে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ সর্বাধিক জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিগঠনের জন্য যে অর্থব্যয় হতে পারত তা আজ গোলাগুলী নির্মাণে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু তবুও একথা মনে রাখা দরকার যে, নতুন কর যেন সাধারণ মানুষকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে না দেয়।

॥ নিষ্ফল আলোচনা ॥

পাক-ভারত মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা তিন দফা শেষ হ'ল। আবার তাঁরা মিলিত হবেন মার্চ মাসের বারো তারিখে, কলিকাতায়। তিন দফা আলোচনাতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দফা আলোচনাও যে ফলপ্রসূ হবে তার কোন শুভ ইঙ্গিত এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পাকিস্তানের পক্ষ হতে ক'দিন আগে একটু আশার কথা শুনিয়েছেন পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পাক প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব ভুট্টো। এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, কাশ্মীর বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা যদি পাকিস্তানের কাম্য হয় তবে ভারতের বক্তব্য বিষয় অবশ্যই তাদের সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে হবে। আর এক আশার কথা এই যে, গণভোটই কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ নয়—একথা স্বীকার করেছেন পাক কর্তৃপক্ষ। কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী মীমাংসাকল্পে কাশ্মীর বিভাগে সম্মত হয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু আলোচনায় দুর্লঙ্ঘ্য সংকট সৃষ্টি করেছে বিভাগের নীতি সম্পর্কিত মত-বৈষম্য। পাকিস্তানের দাবী ধর্মের ভিত্তিতে বিভাগ, যা ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতের পক্ষে মানা অসম্ভব। পাকিস্তান চায় জম্মু ভারতকে দিয়ে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার উপর পূর্ণ অধিকার, কারণ কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ নরনারী মুশ্লিম। কিন্তু সে প্রস্তাবে ভারতের পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ধর্মকে বিভাগের নীতিরূপে মানতে হলে ভারতকে তার প্রায় পাঁচ-ছয় কোটি মুশ্লিম নাগরিকের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। আর ধর্ম-ভিত্তিক বিভাগের কুফল যে কি সাংঘাতিক তা ভারত '৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পর কঠিন মূল্য দিয়ে বুঝেছে। ভারতের পক্ষ হতে তাই জানানো হয়েছে যে, শুধু যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার ভিত্তিতে কাশ্মীর বিভাগের প্রস্তাবে ভারত সম্মত হতে পারে। এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হলেও কাশ্মীরের

তেত্রিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দু' পক্ষের অনমনীয় মনোভাবে তৃতীয় পর্যায়ের বৈঠকেই আলোচনা ভেঙে যেতে পারত। কিন্তু তা যখন যায়নি তখন অবশ্যই আশা করা যেতে পারে যে, ক'লকাতার চতুর্থ বৈঠক হয়ত সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে না। পররাজ্য-লোলুপ চীন আজ ভারত-পাকিস্তান উভয়েরই শিয়রে শমন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিপদের প্রকৃত গুরুত্ব যদি এই উপ-মহাদেশের দুটি ভগ্নী-প্রতিম দেশ যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে তবে কাশ্মীর বিরোধের নিষ্পত্তি না করে তারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে না।

॥ অর্থহীন উক্তি ॥

কলম্বো প্রস্তাবের অন্যতম উদ্যোক্তা কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক কদিন আগে যখন ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছিলেন তখন তাঁর অধিকাংশ ভাষণ ভারতের শান্তি-নীতির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ভারত সঠিক কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করায় তিনি সানন্দে প্রকাশ করে বলেছিলেন, চীনও যাতে ভারতের মত কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ গ্রহণ করে তার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন।

এরপর ভারত সফর শেষ করে তিনি যান চীনে। সেখানে চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আট দিন ধরে আলোচনা চলে তাঁর। সে আলোচনা কি নিয়ে হয়েছিল তা আমরা জানি না। প্রিন্স সিহানুকও পিকিঙ ত্যাগের প্রাক্কালে তা প্রকাশ করেন নি। তবে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণে যে চীনকে তিনি সম্মত করাতে পারেন নি বা তার জন্যে তিনি বিশেষ চেষ্টাও করেননি সেটা তাঁর অন্যান্য কথা হতে বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পিকিঙ বিমানবন্দরে তিনি যে বিদায়-ভাষণ দেন তাতে চীনের "শান্তি-নীতি"র প্রশংসায় তিনি প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়েন। চীন যে অতি সম্প্রতি একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কয়েকশত মানুষকে হত ও নিহত করেছে এবং কয়েক হাজার সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে স্বদেশে আটক করে রেখেছে তা তাঁর কোন কথা হ'তে এতটুকুও বোঝা যায়নি। চীনকে তিনি কম্বোডিয়ার অকৃত্রিম বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কম্বোডিয়া বরাবর চেষ্টা করে যাবে।

ভারতে যে-সব কথা বলে গেছেন প্রিন্স নরোদম তার সঙ্গে তাঁর চীন সফরকালের উক্তিগুলির যদি তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তাঁর প্রায় সব কথাই তাৎপর্য-বর্জিত নিছক কথার কথা। তাতে গুরুত্ব আরোপ করার মত ভুল খুব কমই আছে। চীন যদি সত্যই কোনদিন কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয় তবে অবশ্যই কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রমুখ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির দুর্বল নেতাদের অনুরোধে বা চাপে সে সম্মত হবে না।

(হায় সুকেতু নাথ, তোমার কপালে এই ছিল!)

॥ সীমান্তের সংবাদ ॥

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচাবন জানিয়েছেন যে, চীন তার এক-তরফা ঘোষণামত নেফা অঞ্চল সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে ম্যাকমোহন লাইনের উত্তরে চলে গেছে এবং লাদাকেও তারা তাদের দাবীমত ১৯৫৯ সালের ৭ই নভেম্বর 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রণাধীন' এলাকার ওপারে চলে গেছে। ভারতের অসামরিক প্রশাসন ঐ সকল এলাকায় পুনঃস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু চীন আপত্তি জানিয়েছে বলে আমাদের সৈন্যবাহিনী ঐ মুক্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। চীন তার প্রস্তাবমত কাজ করেছে এবং আমরা তাকে তার ইচ্ছা বা দাবীমত অনুসরণ করেছি। সুতরাং চীনের প্রস্তাব আমরা মানি না বা মানব না, একথা বলার মত অবস্থায় আর আমরা আছি কিনা সেটা অবশ্যই নতুন করে ভেবে দেখা দরকার।

॥ মালয়েশিয়া ॥

দুবছর আগে বৃটিশ সরকার যখন তার প্রাক্তন উপনিবেশ মালয়ের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবশিষ্ট কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ উঃ বোর্ণিও, সারওয়াক ও ব্রুনেই সংযুক্ত করে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব করে তখন তাতে কোন রাষ্ট্র হতেই বিশেষ কোন আপত্তি ওঠেনি। একমাত্র ফিলিপাইনস ঐ ক্ষুদ্র উপনিবেশ কটির উপর উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী জানায়। কিন্তু বৃটিশ সরকারের আপত্তিতে ফিলিপাইনস প্রায় সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায় এবং মালয়, সিঙ্গাপুর ও বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরভাগে উপস্থিত বৃটিশ উপনিবেশ তিনটির সমন্বয়ে মালয়েশিয়া গঠন প্রায় সুনিশ্চিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মাত্র আশী হাজার নরনারী অধ্যুষিত ক্ষুদ্র সুলতানশাহী ব্রুণেইতে হঠাৎ একটি অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ার পর হতেই ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। ব্রুণেই অভ্যুত্থানের পেছনে কার প্ররোচনা ছিল তা স্পষ্ট ধরা না পড়লেও ইন্দোনেশিয়ার জোরালো সমর্থনে বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে তার ভূমিকা খুব নিষ্ক্রিয় ছিল না। ক্ষুদ্র ব্রুণেইকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি অবশ্যই হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মালয়ের সঙ্গে তার সংযুক্তিতে ইন্দোনেশিয়ার আপত্তির অর্থ শেষ পর্যন্ত তাকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে বাধ্য করা। শুধু দাবী জানিয়েই পশ্চিম ইরিয়ানকে পেয়েছে ইন্দোনেশিয়া, সুতরাং এখন হতে দাবী জানাতে থাকলে ঘটনা পরম্পরায় উত্তর বোর্ণিওর বৃটিশ উপনিবেশগুলিও তার হয়ে যাবে একদিন, এমন আশা অবশ্যই ইন্দোনেশিয়া করতে পারে। বিশেষ করে আজ যখন তার সবচেয়ে বড় সহায় কমিউনিস্ট চীন।

॥ ঘরে ॥

১৪ই ফেব্রুয়ারী—১লা ফাল্গুন : চোরা-কারবার দমন ও আমদানী-রপ্তানী ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও কড়া-কড়ি ব্যবস্থা—ভারত রক্ষা আইন অনুসারে নূতন বিধি প্রবর্তন।

কলিকাতার বিভিন্ন অংশে শহরতলীতে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ।

কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক দিংবা ঘাটে (পূর্ণিয়ার নিকট) মহানন্দা নদীর উপর ২০১৭ ফুট দীর্ঘ সেতুর উদ্বোধন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—২রা ফাল্গুন : কলিকাতায় টীকাদান অভিযানে রাজ্যপাল (শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু) মুখ্যমন্ত্রী (শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন) ও মেয়রের (শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার) যোগদান—বড়বাজার ও কলাবাগান বস্তী অঞ্চলে উদ্দীপনা।

বোম্বাই-এ স্বর্ণকারদের অনশন ও হরতাল পালন।

পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজলি কাউলের পদত্যাগ।

পাকিস্তানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের পর সশস্ত্র নাগাদলের নাগাভূমিতে বিদ্রোহের চেষ্টা—অবস্থা নিয়ন্ত্রণে মণিপুরের সীমান্ত অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ—মণিপুরের দুইটি মহকুমা উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষিত।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : 'ভারতে বিমানছত্র রচনার কথাই ওঠে নাই—প্রস্তাবটি কাল্পনিক'—কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণার পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া মন্তব্য।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক ডিহরী-অন-শোনে এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর (দুই মাইল) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

এটর্ণী জেনারেল ও কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রীর পদ দুইটি একীকরণের প্রস্তাব আপাততঃ পরিত্যক্ত। বৃটিশ সামরিক অধিনায়ক জেঃ হালের পুনরায় দিল্লী আগমন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ফাল্গুন : দিল্লীতে সংবাদপত্র বিষয়ক সেমিনারে শ্রীনেহরুর মন্তব্য—একচেটিয়া মালিকানা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে।

সরকারী কার্যে ইংরাজীর ব্যবস্থা ১৯৬৫ সালের পরেও চালু রাখার ব্যবস্থা—বাজেট অধিবেশনেই পার্লামেন্টে ভাষা বিল পেশ হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) উক্তি।

স্থগিত উপনির্বাচনসমূহ (ছয়টি পার্লামেণ্ট ও ২৮টি বিধানসভা আসনে) আশু অনুষ্ঠানের উদ্যোগ—কেন্দ্রের সহিত পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত।

'চীন কলম্বো প্রস্তাব হুবহু মানিয়া লইতে রাজী নহে'—কলম্বো সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক ভারতকে সংবাদ জ্ঞাপন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—৫ই ফাল্গুন : 'সামরিক হুমকীতে ভারত মাথা নত করিবে না—চীনা আক্রমণ চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা'—সংসদের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির (ডাঃ রাধাকৃষ্ণন) উদ্বোধনী ভাষণ।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর-ভার গ্রহণের আহ্বান—বিধানমন্ডলীর (পশ্চিমবঙ্গ) যুক্ত অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ।

পার্লামেন্টে সোস্যালিষ্ট সদস্যদের (হিন্দীর সমর্থক) অশোভন আচরণ—রাষ্ট্রপতির ইংরাজী ভাষণে আপত্তি করিয়া সভাকক্ষ ত্যাগ।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলের ৬০ সহস্রাধিক কর্মহীন স্বর্ণশিল্পীর দুর্গতি—দিল্লীতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই'র সহিত পঃ বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের সাক্ষাৎকার।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—৬ই ফাল্গুন : রেলওয়ে মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং কর্তৃক লোকসভায় ১৯৬৩-৬৪ সালের রেল বাজেট পেশ—যাত্রী ভাড়া অপরিবর্তিত : মালের মাশুল কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি।

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও ব্যাংক ব্যবসায়ী শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখার্জি'র (৬৪) কলিকাতায় পরলোকগমন।

২০শে ফেব্রুয়ারী—৭ই ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জি কর্তৃক রাজ্যের ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট পেশ—প্রায় ১০ কোটি টাকা ঘাটতি প্রদর্শন—সাড়ে তিন কোটি টাকা নূতন কর ধার্য—বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে (দিল্লী) সরকারের সীমান্ত নীতি পূর্ণ সমর্থন—দলীয় নীতির বিরোধিতা করার অভিযোগে কয়েকজন কংগ্রেসী নেতাকে শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত।

॥ বাইরে ॥

১৪ই ফেব্রুয়ারী—১লা ফাল্গুন : রকেট থেকে মহাশূন্যে আমেরিকার 'স্থির' উপগ্রহ (দৃশ্যতঃ পৃথিবীর গতির সমান গতিবিশিষ্ট) উৎক্ষিপ্ত—বিশ্বব্যাপী সুলভে সংবাদ আদান-প্রদানের নূতন সম্ভাবনা। ইরাক-সিরিয়া ফেডারেশন গঠনে সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর (ডাঃ মহসেন) প্রস্তাব।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—২রা ফাল্গুন : প্রেসিডেন্ট দ্য গলকে (ফ্রান্স) হত্যার নূতন ব্যর্থ ষড়যন্ত্র—ছয়জন পদস্থ অফিসার ও আরও অনেকে গ্রেপ্তার।

'আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে আমেরিকাকে আগ্রহ দেখাইতে হইবে'—জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সোভিয়েট প্রতিনিধির মন্তব্য।

আণবিক পরীক্ষা বন্ধের জন্যে জেনেভায় শতাধিক বিজ্ঞানীর আবেদন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—৩রা ফাল্গুন : সংযুক্ত আরবতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরের নিকট প্রধানমন্ত্রী নেহরুর বার্তা প্রেরণ—বার্তাসহ চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য শ্রীআর কে নেহরুর (দিল্লীস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী জেনারেল) কায়রোয় উপনীত—নাসেরের সহিত দীর্ঘ আলোচনা।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা ফাল্গুন : দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারী বর্ণ-বৈষম্য নীতির ভয়াবহতা—সাড়ে চার লক্ষ ভারতীয় বাসিন্দার উপর নিষ্ঠুর আঘাত—ভারতীয় অধ্যুষিত বহু মহল্লা 'একমাত্র শ্বেতাঙ্গদের' বলিয়া ঘোষণা।

ছয়জন মন্ত্রীর পদত্যাগের পর সিরিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—৫ই ফাল্গুন : ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের শান্তি-মীমাংসার 'নূতন আশা' সঞ্চার—পিকিং-এ কম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের উক্তি।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—৬ই ফাল্গুন : পাকিস্তানস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ ও পি ম্যাকনটির পাকিস্তানের বিভিন্ন মহলে জেহাদ—পূর্ববঙ্গের সহিত স্বতন্ত্র ভাবে ঘনিষ্ঠতার প্রস্তাবে ক্ষোভ।

২০শে ফেব্রুয়ারী—৭ই ফাল্গুন : 'নাটো' জঙ্গী পোর্ট ও ওয়ারশ পোর্টের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য নূতন সোভিয়েট প্রস্তাব—জেনেভায় ১৭-জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে পেশ।

ফ্লোরিদার দরিয়ায় মার্কিন মাছধরা জাহাজের উপর কিউবাস্থ মিগ বিমানের (রুশ নির্মিত) রকেট বর্ষণের সংবাদ—আমেরিকা কর্তৃক সামরিক বাহিনীর প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ।

অভয়ংকর

॥ সাহিত্যিক প্রসঙ্গ ॥

সম্প্রতি বুলগেরিয়া থেকে ডঃ কুরোনভ এবং মাদাম কুরোনভ কলকাতায় এসেছিলেন। একটি বাঙালী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আসরে তাঁদের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মাদাম কুরোনভ 'ইসাকা পানোভা' এই নামে পরিচিত। তিনি 'বুলগেরীয় সাহিত্যের সমস্যা' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন। বর্তমান বুলগেরিয়ায় কিভাবে সাহিত্য-চর্চার অগ্রগতি ঘটছে তার বিশদ বিবরণ দান করলেন। বুলগেরিয়া ক্ষুদ্র দেশ, কলকাতার সামগ্রিক জনসংখ্যা বুলগেরিয়ার সমান। তাঁদের দেশে শিক্ষা বিস্তার হয়েছে অতিশয় সাফল্যজনকভাবে তার ফলে সাহিত্যকর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বুলগেরিয়ায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে যেসব লেখক অনেকদিন অনাদৃত ছিলেন তাঁরা এখন খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে আসীন। বুলগেরিয়ার ছোট গল্পে গ্রামজীবনের চেয়ে নগরজীবনের ছবিই অধিকতর প্রতিফলিত একথাও মাদাম কুরোনভ বললেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ কিভাবে তাঁর বাল্যজীবনকে প্রভাবিত করেছেন 'গীতাঞ্জলী'র মাধ্যমে সেকথাও তিনি উল্লেখ করলেন এবং বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে বুলগেরিয়ার মানুষ আবার নতুন করে আবিষ্কার করছেন একথা বললেন। মাদাম কুরোনভের প্রবন্ধ শেষ হওয়ার পর গোপাল হালদার, মৈত্রেয়ীদেবী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ ও চিন্মোহন সেহানবীশ প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটির সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসে বার্তা বিভাগের দপ্তরে প্রখ্যাত সোবিয়েত ভারতবিদ অধ্যাপক এ এম দিয়াকফ একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণদান করেন। অধ্যাপক দিয়াকফের বর্তমান বয়স ৬৭ বছর। তিনি ইংরাজী অভিজ্ঞ এবং উর্দুও জানেন। ভারতবিদ্যানুশীলনে অধ্যাপক দিয়াকফের বিশেষ জ্ঞান ভারত ইতিহাসের ১৯১৮-উত্তর কাল। তিনি তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে ভারত-রুশ সম্পর্কে বলেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত-রুশ সম্পর্কের উপর একটি গ্রন্থ লিখিত হয়। প্রথমে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়েই অধিক আগ্রহ ছিল, পরে ভারতীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ বিস্তারলাভ করে। রাশিয়ায় প্রাচীন কাগজপত্রে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ভারতীয় সিপাহী-বিদ্রোহের উল্লেখ আছে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় অক্টোবর বিপ্লবের পর। রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করেন। রাশিয়ার গবেষকগণ ভারতের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর অনুশীলন করছেন এবং সেইসঙ্গে নাগার্জুনের ন্যায় প্রাচীন ও শ্রীঅরবিন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকদের রচনাবলী অনুশীলন করছেন। তিলক ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁদের দেশে গভীর শ্রদ্ধা একথাও অধ্যাপক দিয়াকফ উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গতঃ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠায় অধ্যাপক দিয়াকফ বলেন—সুভাষচন্দ্র যখন বার্লিন থেকে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করতেন তখন কখনও রাশিয়াবিরোধী কথা উচ্চারণ করেননি। সোভিয়েট সরকার যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন, তখন ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রের নাম ঐ তালিকায় যুক্ত করার অনুরোধ করেন কিন্তু সোভিয়েট সরকার তা গ্রাহ্য করেন নি। সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে অবস্থানকালে বলেন যে, নাৎসীবাদের সঙ্গে রাশিয়াকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এর জন্য তিনি দুঃখিত। রুশ সরকার জানতেন যে ভারতীয় জনসাধারণ ফ্যাসীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ উভয়বিধ পদ্ধতির বিরোধী। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় এই বিষয়ে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'India's Struggle for Freedom' নামক গ্রন্থের নূতন সংস্করণের ২৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইংরাজ লেখক হিউ-টয় রচিত The Leaping Tiger নামক গ্রন্থেও সুভাষচন্দ্রের জার্মানবাসকালীন কিছু নূতন তথ্য আছে।)

অধ্যাপক দিয়াকফ বলেন যে সোভিয়েত ভারতবিদ্‌রা বর্তমানে কানাড়া ছাড়া ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষা অনুশীলন করছেন এবং ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী ও উপজাতির ভাষার অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করছেন। মুণ্ডাদের ভাষা তাঁর মতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁরা প্রাচীনতম ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

ভারত-তত্ত্ববিদ অধ্যাপক এ এম দিয়াকফ সোভিয়েত-ভারত সাংস্কৃতিক

সমিতির উপ-সভাপতি। মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদের তিনি অন্যতম কর্মকর্তা।

য়ুনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে ২২শে থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'অনুবাদের সমস্যা' বিষয়ে একটি আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্টের কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে এই সভার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায় এই সভার উদ্বোধন করেন। ইউ এস আই এসের মিঃ গিলবার্ট অষ্টিন এবং মিঃ ষ্টারলিন প্টীল এই আলোচনা সভাটি সার্থক করার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন। সভায় বঙ্গ, আসাম ও উড়িষ্যা এই তিন প্রান্তের সাহিত্যিকবৃন্দ উপস্থিত হয়ে 'অনুবাদের সমস্যা' ও তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারার বিশদ আলোচনা করেন, অনুবাদ কিভাবে অধিকতর উন্নত এবং জনপ্রিয় করা যায় সেই বিষয়েও আলোচনা হয়। আমরা যতদূর জানি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্র এই প্রথম; এই কারণে উদ্যোক্তরা ধন্যবাদার্হ।

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ইনফর্মেশন সেন্টারে কলিকাতাস্থ অন্ধ্র সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপাল রেড্ডি সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'আঞ্চলিক ভাষা প্রচারের জন্য বিশেষ দৃষ্টিদান করা প্রয়োজন, হিন্দি আজ সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত, তাই তার প্রচারের তেমন প্রয়োজন নেই। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না, কারণ আঞ্চলিক ভাষাই ভাবগত সংহতির প্রধান বাহন।

এই অনুষ্ঠানে অন্ধ্র সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তেলেগু ভাষার বর্তমান শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীবিশ্বনাথ সত্যনারায়ণকে "কবি সম্রাট" হিসাবে অভিষিক্ত করা হয় এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনকে "রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশারদ" এই উপাধি দান করা হয়। শ্রীসেনকে 'সুবর্ণপদক' ও কবি বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণকে পুষ্পমুকুট দ্বারা শোভিত করা হয়। শ্রীযুক্ত গোপাল রেড্ডি কবি বিশ্বনাথের এবং শ্রীযুক্ত পুলিন-বিহারী সেনের পান্ডিত্যের উল্লেখ করেন। বাঙ্গালী ও তেলেগুভাষীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর সাদৃশ্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কবি বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন এই অভিনন্দনের উত্তরে সংক্ষিপ্ত প্রতিভাষণ জ্ঞাপন করেন।

আমরা এই দুজন সাহিত্যিককে সম্মানিত করার জন্য অন্ধ্র সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্প্রতি একজন সাহিত্যিকের মৃত্যু হয়েছে যা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হয়নি, অথচ দীর্ঘকাল তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। শান্তিনিকেতনে বাল্যে শিক্ষালাভ করেছেন, যৌবনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মসূত্রে জীবন কাটিয়েছেন এবং বঙ্গ সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারকল্পে নিরলস সংগ্রাম করছেন। 'সবুজ পত্র,' 'প্রবাসী', 'কল্লোল' প্রভৃতি পত্রে তাঁর সাহিত্য বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বর্তমান-কাল এমনই অকৃতজ্ঞ যে তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ কোথাও নেই। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে অবনীনাথ রায়ের মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। অবনীনাথ রায় পরোপকারী, সাহিত্য-প্রাণ এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁর গল্পের বই 'অনুচ্চারিত' (এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না) একদা প্রথম চৌধুরী মহাশয়ের প্রশংসা লাভ করেছিল। 'প্রবাসী বাঙালী' নামক তাঁর গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান গ্রন্থ, প্রবাসী বাঙালীদের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের ইতিহাস। মীরাটের অবনীনাথ দিল্লীতেও সমান জনপ্রিয় ছিলেন। দিল্লীর সাংস্কৃতিক সমাজে যখন সারদা উকীল ভাতৃত্রয়, অধ্যক্ষ ডঃ সুরেন্দ্রকুমার সেন ও তৎসভ্রাতা ডাঃ সুধীন্দ্রকুমার সেন, যামিনীকান্ত সোম প্রভৃতি নেতৃত্ব করছেন, সেইকালে অবনীনাথ রায়ও এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখিত।

রক্তের হাওয়া—(উপন্যাস) অসীম রায় কথাশিল্প প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।
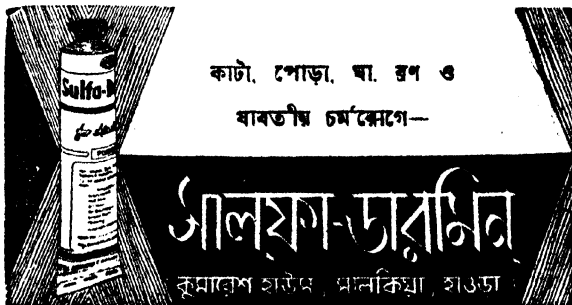
'রক্তের হাওয়া' সীরিয়স উপন্যাস। অসীম রায় আধুনিক জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে বুদ্ধির কোষ্ঠি পাথরে যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকের অথবা সমালোচকের অমিল হতে পারে, তবু লেখক অনায়াসেই তাঁর পাঠককে একটি প্রাচীন সমস্যা নিয়ে নতুন করে ভাবাতে সক্ষম হবেন এতে সন্দেহ মাত্র নেই।

উপন্যাসের নায়ক অমর, ব্যাংকে ... দিয়ে চাকরী করে। বিধবা রমার সঙ্গে তার পাঁচ বছরের প্রেমের সম্পর্ক। অমর তার আর রমার প্রেমকে বিষয়-বস্তু করে একটি (বোধ হয় ছদ্মনামে) উপন্যাস লেখে। এই উপন্যাসটি লেখার পরই তাদের জীবনে আলোড়ন উপস্থিত হয়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ধিক্কারে রমা এবং অমর দুজনেই পীড়িত হতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের ধিক্কারের চেয়ে অবশ্য অমরের আত্মধিক্কারই রক্তের হাওয়ার মৌল উপজীব্য!

কিন্তু অমরের আত্মধিক্কারের যুক্তিগ্রাহ্য সদুত্তর উপন্যাসে লভ্য নয়। কিছু কিছু পরস্পরবিরোধী বিষয়ও পাঠককে বিভ্রান্ত করে। যেমন অমর একবার ভাবছে "শিল্পের জন্যে তার লোভ নেই। তার লোভ এই জীবনের জন্যে। সেই লালসাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।" আবার অন্য জায়গায় অমরেরই উপলব্ধি "তাকে শিল্পী হতে হবে।" নায়িকা রমার ভয় জন্মেছে অমরের বই থেকে "তার ভয় হয়েছে কারণ অমর প্রশ্ন করেছে তাদের সম্বন্ধকে।" অথচ অমরের মা প্রসন্নময়ী অমরের বই পড়ে ভাবছেন "অমর কি সত্যিই বিশ্বাস করে যেসব কথা বইয়ে লিখেছে? রমাকে না হলে কি তার একেবারেই চলবে না? যে আজব কথা লিখেছে সে—নিজেকে চিনতে পারা—তা কি রমা না হলে সম্ভব না?"

তাহলে রমা ভয় পাচ্ছে কেন অমরকে? বিশেষ করে সে যখন নিজেই বলেছে "সে (অমর) যেমন আসত তেমনি এলেই আমি খুসী। আর আমি কিছু চাই না।"

উপন্যাসে 'রক্তের হাওয়া পাল্টানোর ব্যাপারটি অনেকের কাছেই খুব একটা

...জীর সমস্যার সামগ্রী হিসেবে উপস্থিত নাও হতে পারে। বহুগামীতার স্বপক্ষে নায়ক যেভাবে মহাভারতের অর্জুনের স্মরণাপন্ন হয়েছে সেটা তার অপবোধের নামান্তর ছাড়া সমালোচক আর কিছু ভাবতে অক্ষম। উপন্যাসে সুমিতার অংশটুকু অন্তরাশ্রয়ী নায়ককে যেন খানিকটা লঘুই করেছে। সুমিতার সঙ্গে মাত্র কয়েকদিনের হাল্কা আলাপেই নায়ক ভাবতে পারছে : "এত তাড়াতাড়ি কি কোরে সে রমার মালা দেবে সুমিতার গলায়?" কয়েকদিনের আলাপেই যে চরিত্র 'পূর্বের বন্ধন শিথিল' করে দ্বিতীয় বন্ধনে আসক্ত হয় তাকে মননশীল চরিত্র ভাবা পাঠকের পক্ষে রীতিমত কষ্টকর—বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার ভূমিকাটি গ্রন্থে যখন একান্তই লঘু।

অসীম রায়ের গদ্য-ভঙ্গী অনন্য। সাম্প্রতিককালের মননশীল গদ্য ভঙ্গীকে শ্রীযুক্ত রায় আরো নির্ভর করেছেন ফলে মননধর্মী হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসের গতি কখনও মন্থর হয়নি।

নিরভিমান প্রচ্ছদ প্রকাশকের সুরুচির পরিচয় বহন করে।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা— (উপন্যাস)— বাণী রায়। রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

আত্মহত্যার পর অশরীরী নায়িকা বিহারের এক অখ্যাত শহরের প্রধান শিক্ষক পিতার প্রথম সন্তান আত্মকথনের ভঙ্গীতে তার জীবনের ইতিহাস বলে গেছে। বুক জোড়া তৃষ্ণা নিয়ে সে আত্মহত্যা করেছিল তাই স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডলীতে নিরলম্ব বায়ুভুক হয়েও সে যৌবন-জ্বালা ভুলতে পারে না। পুরুষজাত সম্বন্ধে তার ঘৃণা জেগেছিল অসংযমী পিতার আচরণে। এক প্রৌঢ় রাজনীতির পাণ্ডাকে মেয়েটি বিয়ে করেছিল—লালসার বহ্নি তাকে আজীবন পুড়িয়েছে, মৃত্যুর পরও তার দহন শেষ হয়নি। গৃহস্বামী রাজনৈতিক নেতার তরুণ ভাগ্নে নিরঞ্জনকে শীকার করার জন্য ফাঁদ রচনা করে ব্যাহত হয়ে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা'র নায়িকা অনঙ্গপীড়ার আতিশয্যে জীবনে এবং মরণে যন্ত্রণা ভোগ করছে। কামনার আগুন চরম সর্বনাশ আনে মানুষের জীবনে, সেই কথাটাই লেখিকা অনন্যসাধরণ লিপিকুশলতায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। দেহ ভোগবতীর প্রলয়ংকর প্লাবনে সব কিছুই ভেসে যায় এই কথাই বাণী রায়ের দুঃসাহসিক লেখনীতে রূপায়িত। ছাপা, বাঁধাই এবং খালেদ চৌধুরীকৃত প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়।

বিষের বাঁশী— কাজী নজরুল ইসলাম। একমাত্র পরিবেশক বুকস এণ্ড বুকস, ৪০।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। দাম—দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে প্রকাশক নজরুলের 'বিষের বাঁশী' প্রকাশ করে পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বাংলা কবিতায় নজরুল একটি অবিস্মরণীয় নাম। 'ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব!' শাসিত ও জর্জরিত বাঙালীর জীবনে মহাজীবনের বাণীই তিনি জাগিয়েছেন। তিনি শুনিয়েছেন 'দুর্জয় মহা আহ্বান।' মহৎ কবিতার সত্য কোন দিন বিবর্ণ হয় না। বিষের বাঁশীর আবেদন আজও ব্যর্থ হয় নি। এই আহ্বান ব্যর্থ হবার নয়। আজও বিষের বাঁশী পড়তে পড়তে পাঠকেরা এই সত্য উপলব্ধি করবেন যে, দেশের মাটির প্রতি কবিতার টান কত গভীর, কত নিবিড় এই কবিতার আবেদন দেশের সকল মানুষের কাছে।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

চিত্ত : মনোবিদ্যা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা: কার্তিক-পৌষ সংখ্যা : সম্পাদক : তরুণচন্দ্র সিংহ, ১১৫, ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু রোড, কলকাতা-৩৯। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

বাংলা ভাষায় সম্প্রতি বিশেষিত বিষয়কে অবলম্বন করে নানাবিধ সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে বাঙালী বিদ্বানদের নিকটে ইংরেজী-ভাষাই প্রায় একমাত্র ভাবপ্রকাশের মাধ্যম বলে মনে করা হত। নব্যবুদ্ধিবাদীদের এই বিশেষিত বিষয় আলোচনায় মাতৃভাষা চর্চা একাধারে বাংলাভাষা ও বাংলা সংস্কৃতির পুষ্টি সাধন করবে।

'চিত্ত' অনুরূপ একটি বিশেষিত বিভাগের বুদ্ধিবাদী মুখপত্র। ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক। মনঃসমীক্ষার জগতে ফ্রয়েডীয় ও পাভলভিয় মতাদর্শের মধ্যে, ফ্রয়েডীয় পন্থাই কার্তিক-পৌষ সংখ্যাটিতে প্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে লক্ষণীয়। এ সংখ্যায় সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের 'টোটেম এ্যান্ড ট্যাবু'র ধারাবাহিক অনুবাদের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছে, স্বচ্ছ অনুবাদ করেছেন শ্রীধনপতি বাগ। তা ছাড়া মানসিক রোগীদের রচনা এবং লুম্বিনী মানসিক চিকিৎসালয়ের বিবরণাদি এ সংখ্যায় আছে। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মনঃ সমীক্ষণের দৃষ্টিতে শিখণ্ডি ও কৈলাস চরিত্র' প্রবন্ধটি এবং ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহের 'স্বকাম' আলোচনাটি সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ। এ সংখ্যায় শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশী, শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ, শ্রীউদয়চাঁদ পাঠক প্রভৃতির রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

নান্দীকর

আজকের কথা

নাটক এবং অনুবাদ ঃ

একটি চমৎকার কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার অবতারণা হয়েছিল সেদিন। বিষয় ছিল—বিদেশী নাটকের বাঙলা অনুবাদ। প্রথম চিন্তার কথা হ'ল, নাটকের পাঠক ক'জন! নাটকের সার্থকতা হচ্ছে অভিনয়ে। নাট্যকার নাটক লেখেন, সেটি মঞ্চস্থ হবার আশায়। বহু নাট্যকার ত' রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থেকে নাটক লিখেছেন কোনো বিশেষ দলের দ্বারা অভিনীত হবার জন্যে; তাঁরা বিশেষ বিশেষ শিল্পীর অভিনয়ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের নাটকের বিশেষ বিশেষ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এই যখন অবস্থা, তখন মুদ্রিত নাটক মাত্র তাঁরাই কেনেন, যাঁরা সেই নাটকখানিকে অভিনয় করতে চান, এমন ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এবং বহুকাল ধ'রেই বাঙলাদেশের পুস্তক প্রকাশকেরা এই ধারণার বশবর্তী হয়েই নাটক প্রকাশ করাকে একটা রীতিমত লোকসানের কারবার জ্ঞান ক'রে এসেছেন। আজও তাঁদের মনোবৃত্তির যে একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, এমন কথা বলতে পারি না।

কিন্তু নাটক কি শুধু অভিনয়ের মাধ্যমেই উপভোগ করবার বস্তু? নাটক পাঠ ক'রে কি আনন্দ পাওয়া যায় না? কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম', শেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো', ইবসেনের 'ডলস্ হাউস', বার্নার্ড শ'-এর 'আর্মস্ অ্যান্ড দি ম্যান', 'পিগম্যালিয়ন', 'ক্যান্ডিডা', 'ব্যাক টু মেথুশেলা', গলস্‌ওয়ার্দি'র 'জাস্টিস', 'স্ট্রাইক', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'রাজারাণী', 'তপতী', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি পাঠ ক'রে আমরা কি রসের সাগরে ভাসমান হই না? নাটকের যদি সাহিত্য-মূল্যই না থাকবে, তা হ'লে কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে পৃথিবীর এত নাটক বেঁচে আছে কিসের জোরে? রঙ্গমঞ্চ অভিনয়ের স্থান স্বীকার করি; কিন্তু তার চেয়েও বড়ো রঙ্গমঞ্চ কি আমাদের মনের মধ্যে নেই? একজন নাট্যরসিক যখন 'শকুন্তলা', 'হ্যামলেট' বা 'বিসর্জন' পাঠ করেন, তখন তিনি কি তাঁর মানস রঙ্গমঞ্চে ঐ নাটকগুলির বিভিন্ন চরিত্রকে জীবন্ত চলাফেরা করতে দেখেন না?

আমাদের দেশে নাটককে পঞ্চম বেদ বলা হয়েছে। গ্রীক সাহিত্যেও নাটকের স্থান সর্বোচ্চে নির্দিষ্ট হয়েছে। আরিস্তোতোল যখন বলেছেন, 'আর্ট ইজ্ অ্যান ইমিটেশন', তখন তিনি নাটককে লক্ষ্য ক'রেই তাঁর মতামত প্রকাশ করতে চেয়েছেন। নাটক রচনা চ'লে আসছে সেই মান্ধাতার আমল থেকেই। নাটকের তুলনায় উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতির বয়স অত্যন্ত অল্প। তবু পৃথিবীতে সাফল্যমণ্ডিত নাট্য-কারের সংখ্যা উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ লেখকের তুলনায় অতি সামান্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। নাটক যেমন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, তেমনই নাটক রচনাও শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যশক্তির পরিচায়ক। তাই ইচ্ছা করলেই নাট্যকার হওয়া যায় না। আরও সোজাসুজি বলা যেতে পারে, একজন নাট্যকার যদি চেষ্টা করেন, তাহ'লে তিনি উপন্যাসও রচনা করতে পারেন; কিন্তু ঔপন্যাসিক মনে করলেই নাট্যকার হ'তে পারেন না।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নাটককে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে প্লট সৃষ্টি, চরিত্র সৃষ্টি, জটিলতা সৃষ্টি, দৃশ্যসংস্থাপন প্রভৃতি নাট্যরচনার স্বীকৃত সূত্রগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংস্কৃত ও গ্রীক নাটক থেকে শুরু ক'রে আজকের পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় যে-সব রসোত্তীর্ণ নাটক লেখা হয়েছে, তাদের সংখ্যার চেয়ে এই নাটকগুলির ওপরে যে-সব সমালোচনামূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী। এক শেক্সপীয়র সম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থগুলির দিকে তাকালেই আমাদের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কাজেই নাটক যে পাঠ্যও করা হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে আর দ্বিরুক্তি না করাই উচিত।

এখন আমরা গোড়ার প্রশ্নে ফিরে যেতে পারি—বিদেশী নাটকের বাঙলা অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে কিনা। এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার আগে বর্তমান জগতের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন মনে করি। বিমান পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমার বহুল প্রচার এবং প্রসারের ফলে আজ জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে বললেও চলে। এ হেন অবস্থায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ এবং সদিচ্ছাও স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং কোনো দেশের জাতিকে জানবার জন্যে সে দেশের সাহিত্য যে বিশেষ কার্যকরী, একথা না বললেও চলে। সে-দেশের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, নৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও শিল্পসংক্রান্ত চিন্তা-ধারা—সমস্তই সেই দেশের সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। আবার অপরপক্ষে কোনো জাতি তার মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয় যেমন সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, বিদেশী ভাষার সাহায্যে ঠিক তেমন ক'রে পারে না। এটা তো সত্য যে, কম ক'রে দু'শো বছর ধ'রে ইংরেজী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে প'ড়েও আমাদের জাতির শতকরা ১০ জনও ভালোরকম ইংরেজী জানে না। কাজেই বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় ঘটাতে হয়, তাহ'লে সেই সাহিত্যকে আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তর্জমার মাধ্যমে। এবিষয়ে ইংরেজ জাতির প্রশংসনীয় উদ্যমের অনুসরণ করলে আমাদের উপকার ছাড়া অপকার হবে না। সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস, ভাস, বাঙলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ, গ্রীক সাহিত্যের ইস্‌কাইলাস, ইউরিপিডিস, নরউইজানের ইবসেন, ফ্রান্সের মেটারলিঙ্ক, রুশিয়ার গোর্কী, শেকভ্, স্পেনের হ্যাথেন্তো বেনাভেন্তে, জার্মানীর গার্হার্ট হাউপ্টমান প্রভৃতি কোনো দেশেরই কোনো বড় নাট্যকারকেই ইংরেজ তার নিজের ভাষার মাধ্যমে নিজের দেশের লোকেদের সঙ্গে পরিচয় না ঘটিয়ে ছাড়েনি। আমাদের মধ্যে যাঁদের কিছুটা ইংরেজী পড়বার সুযোগ হয়েছে, তাঁদেরও যে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান হয়েছে, সেও তো ঐ ইংরেজীরই মাধ্যমে। কিন্তু যদি বাঙলা ভাষায় পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিকে সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে পড়তে পাওয়া যায়, তাহ'লে বাঙালী মাত্রই তার দ্বারা উপকৃত হবেন না কি? তাছাড়া ভাষাকে জীবন্ত ও সমৃদ্ধ করবার একটি বিশেষ উপায় হচ্ছে বৈদেশিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজিকে অনুবাদের সাহায্যে আত্মস্থ করা। কাজেই বিভিন্ন জাতির চিন্তার সুফলস্বরূপ পুস্তকগুলিকে তর্জমার সাহায্যে আমাদের বাঙলা ভাষায় এনে

মুক্তিপ্রাপ্ত
গৃহস্থী
চিত্রের কয়েকটি দৃশ্য

ক্ষেত্রে ভাষা এবং জাতির কল্যাণই হবে।

সেদিনের আলোচনা-চক্রে এর পর যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো বিদেশী নাটকের অনুবাদ আক্ষরিকভাবে সম্পূর্ণ মূলানুসারী হবে, না মূলের চরিত্র, স্থান প্রভৃতির নাম পরিবর্তিত ক'রে নাটকটিকে বাঙলা ছাঁচে ঢেলে নেওয়া হবে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গিরিশ-চন্দ্র যেমন ম্যাকবেথকে ম্যাকবেথই রেখেছিলেন, তেমন ক'রে অনুবাদ করা হবে, না, অমরেন্দ্রনাথের মত 'হ্যামলেট'কে হরিরাজ বা উমানাথ ভট্টাচার্যের মত গোর্কির লোওয়ার ডেপ্থ্-কে 'নীচের মহল' করা হবে? এখানেও ইংরাজী অনুবাদকেরা কি করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার। মূল রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও অনুবাদের ভূমিকা বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলের চরিত্র বা স্থানের নাম, তার ভিতরকার স্থানীয় পরিবেশ (লোক্যাল কলার) প্রভৃতিকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে অনুবাদকে মূলানুসারী করবার চেষ্টাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অথচ এশিয়া, জার্মানী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশের আচার-ব্যবহার, চিন্তা-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় না। কাজেই আমরাই বা অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ না ক'রে বাঙলা ছাঁচে ফেলবার জন্যে এত ব্যগ্র হব কেন? এমন কি কোনো বিদেশী নাটকের বাঙলা অনুবাদকে যদি মঞ্চস্থ করবারই আয়োজন করি, তাহ'লে পোশাকে, দৃশ্যপটে, আসবাবপত্রে, আদব-কায়দায় সেই নাট্যোল্লিখিত দেশকে যতদূর সম্ভব রূপ দিতে চেষ্টা করা বৈচিত্র্যের দিক দিয়েও যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই মূল নাটকের প্রতি যথার্থ সুবিচার করার জন্যেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। চৈনিক নাট্যকার স্যু সুন্-এর 'নববর্ষ' গল্পটি থেকে তুলসী লাহিড়ী যে একাঙ্কিকাটি রচনা করেছিলেন, তার মঞ্চাভিনয়ে চৈনিক জীবনকে প্রতিফলিত করবার প্রচেষ্টা আশ্চর্য সাফল্যলাভ ক'রে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল। উৎপল দত্ত পরিচালিত 'লিটল থিয়েটার'-এর 'ম্যাকবেথ' এবং 'টুয়েল্‌ভ্ নাইট'-এও অনুরূপ সাফল্য লক্ষ্য করা গেছে। কাজেই বিদেশী নাটকের বিদেশীত্ব বজায় রেখে অনুবাদ করাই যেমন উচিত ও প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়, তেমনই ঐ বিদেশী আবহাওয়ার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাবার জন্যে, বিদেশী নাট্যকারের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবার জন্যে এবং সবশেষে অভিনবত্বের জন্যে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

চিত্র সমালোচনা

হামরাহী (হিন্দী) **:** প্রসাদ প্রোডাকসন্স (মাদ্রাজ)-এর নিবেদন; ৪১৮১ মিটার দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা **:** এল, ভি, প্রসাদ; **পরিচালনা :** টি, প্রকাশরাও; **চিত্রনাট্য ও সংলাপ :** ইন্দ্ররাজ আনন্দ; **সঙ্গীত-পরিচালনা :** শঙ্কর জয়কিষণ; **সঙ্গীত-রচনা :** শৈলেন্দ্র ও হসরৎ জয়পুরী; **চিত্রগ্রহণ :** দ্বারকা দিবেচা; **শব্দানুলেখন :** যশোবন্ত মিৎকার ও নাসির; **সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা :** মিনু কাত্রাক; **শিল্প-নির্দেশনা :** শান্তি দাস; **সম্পাদনা :** শিবাজী অবদূত; **নৃত্যপরিচালনা :** সত্যনারায়ণ, হীরালাল ও সুরেশ; **রূপায়ণ :** রাজেন্দ্রকুমার, যমুনা, মেহমুদ, নাজির হোসেন, ললিতা পাওয়ার, শুভা খোটে, আগা, ধুমল, শশিকলা, ইন্দিরা প্রভৃতি। রাজশ্রী পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ২২এ ফেব্রুয়ারী থেকে হিন্দ, দর্পণা, প্রিয়া, গণেশ, ভবানী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

"হামরাহী" ছবিখানির প্রযোজনায় একটি বিশেষত্বঃ লক্ষ্য করবার মত। প্রযোজক এল্, ভি, প্রসাদ এবং পরিচালক টি, প্রকাশরাও—দুজনেই মাদ্রাজের লোক হ'লেও ছবিখানি তোলা হয়েছে বোম্বেতে এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে নায়িকা যমুনা ছাড়া প্রায় সকলেই বোম্বের চিত্রজগতের সঙ্গে জড়িত। অতএব ছবিখানিকে বোম্বের ছবি বললে অত্যুক্তি হবে না।

আজকের দিনে শেখরের মত ছেলে নজরে পড়ে বৈকি! তরুণী মেয়েদের সঙ্গে হেসে খেলে, মস্করা ক'রে জীবনটাকে বেপরোয়া বোহেমিয়ানভাবে কাটিয়ে দিতেই ভালোবাসে এরা। কিন্তু সময়ে সময়ে সারদার মত মেয়ে এদের জীবনের গতি পরিবর্তন ক'রে দেয়। সারদার সম্মুখীন হয়ে শেখরের মনে হয়, মেয়েদের সে এতদিন যত সহজলভ্য ব'লে মনে ক'রে এসেছে, সব মেয়েই তেমন সহজলভ্য নয়। সারদার মত কেউ কেউ আছে, যারা পুরুষকে নিরাপদ ব্যবধানে রেখে নিজেদের আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে জানে। এবং অর্থের জোরে যদি কোনো উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ তাকে বিবাহও করতে সক্ষম হয়, তাহ'লে সেই মেয়ে সারদারই মত স্বামীকে জানিয়ে দিতে পারে, 'টাকার জোরে দেহটাকে পেয়েছ, কিন্তু প্রেম? সে অনেক দূরে।' শুনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নায়ক মদ্যপানে নিজেকে ভুলিয়ে রেখে দেয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেখরের মত আত্মস্থ হয়ে প্রেম জয়ের সুকঠিন সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে। বাস্তবের সংঘাতে সাধনা বিপর্যস্ত হ'লেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধি যে অনিবার্য, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

কাজেই কাহিনীর মূল বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে সমাজসচেতনতা। কিন্তু এই বক্তব্যকে ছবির মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়েছে দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রতি অতিরিক্ত মনোনিবেশ ক'রে। ফলে ছবিতে নাচ, গান, কৌতুক এবং হৈ-হুল্লোড়ের ছড়াছড়ি; চমকও নেহাৎ কম নেই। প্রেমাভিনয়পটু, ছলাকলায় সিদ্ধহস্ত হেমার হত্যার ফলে শেখর অভিযুক্ত হ'লে যে নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত হয়, তার ওপর যতক্ষণ না যবনিকা পড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মোহিত দর্শকের মনের উদগ্র কৌতূহলের অবসান ঘটে না। শেষাংশের এই নাটকীয়তাটি 'হামরাহী' ছবিটিকে একটি অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছে।

অভিনয়ে শেখরের ভূমিকায় রাজেন্দ্রকুমার হাল্কা এবং গুরুগম্ভীর, দুরকম অভিনয়েই নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন অনায়াসভঙ্গিতে। নায়িকা সারদারূপে যমুনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন; তাঁর মুখাবয়ব ও অভিনয়ধারা ক্ষণে ক্ষণে মালা সিংহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। পিতা ধর্মদাসের চরিত্রে নাজির হোসেন দৃঢ়চেতা কর্তব্যনিষ্ঠ আইনজীবীকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন। অপরাপর চরিত্রে
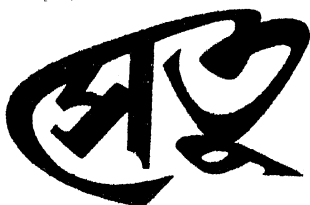
ললিতা পাওয়ার, মেহমুদ, শুভা খোটে, আগা, ধুমল, শশিকলা প্রভৃতি শিল্পীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

শঙ্কর জয়কিষণের সুরসমৃদ্ধ গীতগুলি "হামরাহী"র অন্যতম আকর্ষণ। কলাকৌশলের অপরাপর দিকে একটি উচ্চ মান বজায় আছে।

বিবিধ সংবাদ

"সেতু"র ৮০০তম স্মারক উৎসব :

গেল ১০ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বরূপার বিজয়বৈজয়ন্তী "সেতু"র ৮০০তম অভিনয়-রজনী অতিক্রান্ত হয়েছে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই গৌরবময় সংযোজনের স্মারক উৎসব পালিত হবে আজ শুক্রবার, ১লা মার্চ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সানুগ্রহ উপস্থিতিতে এই নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শিল্পী ও কর্মী ঐ উৎসবে যোগ্যভাবে সম্মানিত হবেন। উৎসব আরম্ভ হবে সন্ধ্যা ৬টায় এবং উৎসবান্তে "সেতু"র ৮১২তম অভিনয় শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টায়।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে "স্টারস্" :

গেল মঙ্গলবার, ২৬এ ফেব্রুয়ারী সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে জনতা সিনেমায় বিশ্ববিখ্যাত চিত্র, কনরাড উলফ্-এর "স্টারস্" ছবিখানি দেখানো হয়। আসছেবারে আমরা ছবিখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব।

গীতবিতান শিক্ষায়তনের বার্ষিক উৎসব :

গেল মঙ্গলবার, ২৬এ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় ভবানীপুর আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ গীতবিতান শিক্ষায়তনের প্রধান কেন্দ্র ও বালিগঞ্জ শাখার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর বাঙলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন সেন-জায়া রুচিরা সেন।

"সাজ ও আওয়াজ"-এর বিশেষ অনুষ্ঠান :

আসছে ৬ই মার্চ, বুধবার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্ গৃহে "সাজ ও আওয়াজ" নামক সংগীত-সংস্থাটির একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালিত হবে। সংস্থাটি তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় যন্ত্র-সংগীতের ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রসর হ'তে পেরেছেন, তারই পরিচয় সুধীজনসমক্ষে উপস্থাপিত করবার প্রয়াসে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন।

রাধারাণী পিকচার্স-এর "প্রেয়সী" :

শ্যাম চক্রবর্তীর পরিচালনায় "প্রেয়সী"র চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় অর্ধ-পথে এগিয়ে গেছে। যে দ্রুতগতিতে কাজ চলেছে, তাতে আশা করা যাচ্ছে, আসছে এপ্রিলের মধ্যেই স্যুটিংয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কার্তিক বর্মণের প্রযোজনায় নির্মিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, অনুপকুমার, মঞ্জু দে, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই) প্রভৃতি শিল্পীকে দেখতে পাওয়া যাবে। নর্মদা চিত্র ছবিখানির পরিবেশক।

বৈতানিকের 'তপতী' :

আসছে ৯ই মার্চ, শনিবার সন্ধ্যা ৬।।টায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বৈতানিক সম্প্রদায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' মঞ্চস্থ হবে। পরিচালনা ও

গুরু বাগচী পরিচালিত 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' চিত্রে দিলীপ রায় ও শিপ্রা সেন

সংগীত তত্ত্বাবধানে আছেন যথাক্রমে প্রফুল্ল বোস ও জয়দেব বেজ।

ডাচ ফিল্ম প্রদর্শনী :

গেল সোমবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার উদ্যোগে রয়্যাল নেদারল্যাণ্ডস্ এম্বাসির সহযোগিতায় ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেণ্টারে ৫ খানি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ডাচ তথ্য-চিত্র প্রদর্শিত হয়। এর মধ্যে ছিল বার্ট হ্যানাস্টার "জু", ডেল্টা ফেজ, অ্যান আর্মি অব হিউন স্টোন, প্রমিস অব হেভেন এবং হোল্ড ব্যাক দি সী।

"সব পেয়েছির আসর"-এর বার্ষিক উৎসবে "পাশাপাশি" :

'সব পেয়েছির আসর'-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে গেল ২রা ও ৪ঠা জানুয়ারী মহাজাতি সদনে বাঙলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা অখিল নিয়োগী বিরচিত "পাশাপাশি" কৌতুক-নাটিকাটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত করেন। এই অভিনয়ে সবচেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন নাটিকার প্রধান চরিত্র তিন্তিড়ি তরফদারের ভূমিকায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এমন আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছিলেন যে, তিনি যদি সাহিত্যিক জীবন গ্রহণ না ক'রে 'নোটো'-বৃত্তি করতেন, তা'হলেও তিনি বাঙলাদেশে চিরস্মরণীয় হ'তে পারতেন। নাট্যকার অখিল নিয়োগী নিজেও কম যান না। মোহম্মদ'গর মজুমদারের ভূমিকায় তিনি যে সাবলীল অভিনয় করেন, তা দর্শকরা রীতিমত উপভোগ করেছিলেন। অপরাপর ভূমিকায় উমা দে শীল (ফুলঝুরি), সুধাময়ী দাশগুপ্তা (দামিনী), পুষ্প দেবী (মনোমোহিনী), নটবর (কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়), বিমল রায় (দুঃখবরণ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

অরুণাভ মজুমদারের "মূকাভিনয়"

গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর ব্যবস্থাপনায় তরুণ মূকাভিনেতা অরুণাভ মজুমদারের দশটি বিষয়ের একক মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে। প্রতিটি অনুষ্ঠান দর্শকদের অভিবাদন লাভ করে। অনুষ্ঠানে দশটি বিষয়ের মধ্যে ছিল ঘুড়ি ওড়ান, কেরাণী, সাইকেল চালক (বাইসাইকেল থিফ-এর কাহিনী), দাঁড় টানাটানি, বেকার যুবক, আধুনিকা মেয়ে, আধুনিক ছেলে, শ্রমিক, হনুমান (রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ ও রাবণ বধ) ও মাতৃগর্ভ থেকে সমাধি। সবগুলিই দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করেছে।

উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলন

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার উত্তর কলিকাতা সংগীত সম্মেলনের ৬৫তম মাসিক উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুষ্ঠান বিশিষ্ট সংগীতরসিক ও সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

এ মাসের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল শিল্পী উদীয়মান ও তরুণ হওয়ায় সম্মিলিত আসরটি হয়ে ওঠে বেশ চিত্তাকর্ষক।

এইদিনকার আসরের প্রথম শিল্পী ছিলেন ভারতবিখ্যাত শিল্পী ওস্তাদ আল্লা আকবর খাঁর মধ্যম পুত্র শ্রীধ্যানেশ খাঁ। এটি তার জনসম্মুখে প্রথম সংগীত পরিবেশন। তিনি সরোদে "হেমন্ত" ও পরে "মাঝ খাম্বাজ" রাগ পরিবেশন করেন।

সম্মেলনের সভ্য শ্রীরামপুরের বিখ্যাত সংগীতশিল্পী স্বর্গত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রী আশ্চর্যলাল চট্টোপাধ্যায় প্রথমে 'পুরিয়া' ও পরে একটি 'মিশ্র পাহাড়ী' ঠুংরী পরিবেশন করেন। তাঁর কণ্ঠে দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী ছিলেন বিখ্যাত সুরকার শ্রীতিমিরবরণের পুত্র

শ্রীইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য প্রথমে 'মালকোষ' ও পরে 'পঞ্চম সে গারা' রাগ পরিবেশন করেন। বিশেষ করে তাঁর 'পঞ্চম সে গারা' অপূর্ব শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

এদের সকলের সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন উদীয়মান শিল্পী শ্রীশংকর ঘোষ।

কলকাতায় 'মার দি গ্রা'

এ দেশের বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহের জন্যে ২৬শে ফেব্রুয়ারী আমেরিকান উইমেন্স ক্লাব গ্র্যান্ড হোটেলে নিউ অর্লিয়্যান্সের এই প্রাচীন উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেন। মার্কিণ সরকারের কর্মচারীদের স্ত্রী এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এতে অংশ গ্রহণ করেন।

এই উৎসবে যে অর্থ সংগৃহীত হবে তার সমস্তই এদেশের ২৩টি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্যে দান করা হবে। এইসব সংস্থার মধ্যে আছে অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন, চিলড্রেন্স ওয়েলফেয়ার হোম, দি অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশান অব ব্লাইন্ডনেস, দি গভর্ণরস টী আফটার কেয়ার কলোনী ফাণ্ড, মাদার টেরেসাজ মিশনারীজ অব চ্যারিটিজ এবং ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেণ্টার কারেকরিয়া।

ক্যাথলিকদের লেণ্ট-এর উপবাসের আগের দিনকে বলে শ্রোভ টুইসডে। সে দিনটি নানারকম আমোদ উৎসবে অতিবাহিত করা হয়। এই প্রথা ফ্রান্স থেকে নিউ অর্লিয়্যান্সে আসে। কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল স্থূল মঙ্গলবার। সেকালের দিনে শ্রোভ টিউসডেতে প্যারিসের রাস্তায় একটি বৃহদাকার ষাঁড়কে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হত।

১৭৬৬-তে ফরাসী ঔপনিবেশিকরা আমেরিকায় 'মারদি গ্রা' উৎসব প্রচলন করেন। এই প্রথা নিউ অর্লিয়্যান্স এবং অন্য সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেকগুলি রাজ্যে সেদিন অফিস আদালত ইত্যাদি ছুটি দেওয়া হয়। নিউ অর্লিয়্যান্সের উৎসবই সবচেয়ে বিখ্যাত।

নিউ অর্লিয়্যান্সে এই উৎসব প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পালন করা হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক ট্যুরিস্ট এই সময়ই এখানে এসে থাকে। শনিবার থেকে প্রত্যেকদিনই শোভাযাত্রা ও নৃত্যের ব্যবস্থা থাকে। কতকগুলি গোপন সংস্থা এই আমোদ-প্রমোদের আয়োজন আর ব্যয় বহন করে থাকে। এদের কোন কোনটি প্রায় একশ বছরের পুরোনো!

কার্নিভালের সময় ক্রিউয়েস বল নাচ ও পার্টির আয়োজন করে। এই সংস্থার সদস্যরা মুখোশ পরে ছদ্মবেশ ধারণ করে রাস্তায় শোভাযাত্রা বার করেন। মঙ্গলবার, 'মার-দি গ্রা'র দিনে

'মার দি গ্রা' সম্প্রতি কলকাতায় প্রদর্শিত হয়।

নানা সুন্দর সুন্দর সাজান গাড়ি এবং বিচিত্র ব্যান্ড পার্টি দিয়ে শোভাযাত্রা বার হয়। জনসাধারণও বিভিন্ন সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এই শোভাযাত্রার অনুগমন করে বা রাস্তায় নাচগান আমোদ-প্রমোদ করে। প্রতি বছর এই উৎসবে কোন না কোন উপকথা বা কিম্বদন্তীর বিষয় বস্তু দেখান হয়।

কলকাতার উৎসবে "কার্ণিভালের রাণী" নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র-সংস্থার "তোমার হোলো শুরু":

গেল শুক্রবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চে স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র-সংস্থার সভাবৃন্দ অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় প্রণীত নতুন নাটক 'তোমার হোলো শুরু' মঞ্চস্থ করেন। আজ মানুষের নৈতিক চরিত্র কত নীচে নেমে গেছে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অর্থের দ্বারা প্রলুব্ধ ক'রে চাকরীর নামে কিভাবে পদস্খলনে বাধ্য করা হয়, তারই একটি বাস্তবচিত্র উদ্ঘাটনের প্রয়াস
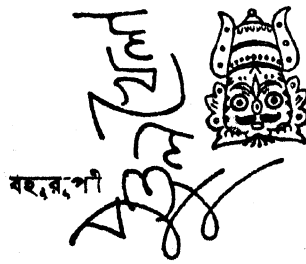
সলিল দত্ত পরিচালিত 'সূর্যশিখা' চিত্রে গঙ্গাপদ বসু, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

দেখা যায় এই নাটকের মাধ্যমে। বিভিন্ন ভূমিকায় নাট্যকার সুশীল মুখোপাধ্যায় (হরকান্ত), রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায় (অমল রায়), অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (চিন্ময় মিত্র), পূরবী মুখোপাধ্যায় (ডলি রায়), বাণী দে (মিনতি), মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রণতি) এবং পূরবী চক্রবর্তী (রীতা চৌধুরী) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। ফিল্ম-পরিবেশকের প্রচার-শিল্পী এবং সিনেমা-পত্রিকার স্টুডিও রিপোর্টাররূপে প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় ও বিমান গুপ্ত সুন্দর চরিত্রাভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

শিল্পীচক্র-এর "বেহালা" :

শিল্পীচক্র (গাঙ্গুলী বাগান) গত ২৫।১।৬৩ তারিখে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে শ্রীজগদিন্দ্র বসুর আদর্শমূলক মর্ম-স্পর্শী নাটক "বেহালা" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাটকখানা পরিচালনা করেন শ্রীসন্তোষ ঘোষাল। প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয়-নৈপুণ্যে বাস্তবধর্মী এ নাটকখানা দর্শকবৃন্দের মনে বিশেষ-ভাবে রেখাপাত করে। সাবলীল অভিনয় করে সকলের প্রশংসা পান—রমেন ঘোষ (মানব), প্রমথনাথ দত্ত (রাজমোহন), শঙ্করসেবক মুখার্জি (দেবীপ্রসাদ), প্রদ্যোৎ বসু (রঞ্জন), নারায়ণ ঘটক (ষষ্ঠীলোচন)। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ভুজংগর চরিত্রে বিমল দে এবং মমতার ভূমিকায় শুভ্রা দাস। আবহ-সঙ্গীতে জিতেন চ্যাটার্জি ও মৃণাল-কান্তি রায় নাটকের মূল সুর ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে মৃণালকান্তি রায়ের একক-বাঁশী স্মরণ করে রাখবার মত।

* কলকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ

কলকাতা

রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় গল্প 'নিশীথে'। সুখ্যাত অগ্রগামী গোষ্ঠীর পরিচালনায় এই দুরূহ গল্পের চিত্ররূপ বাংলা চিত্রজগতে এক নতুন সংযোজন। বহু পরিশ্রম ও পরীক্ষার পর ছবিটি এবারে মুক্তি পেতে চলেছে। প্রভূত নিষ্ঠার প্রসাদ গুণে ছবিটি যে জনবন্দিত হবে তা আমাদের একান্ত বিশ্বাস। প্রতিটি চরিত্রে যথার্থ রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নন্দিতা বসু, রাধামোহন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, শিশির বটব্যাল,

'নিশীথে'র নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'সুবর্ণরেখা' চিত্রের একটি দৃশ্যে মাধবী মুখার্জি।

সঞ্জীব দে ও ছায়াদেবী। বিভিন্ন কলা-কুশলী কাজে আপন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় সুধীন দাশগুপ্ত, চিত্রগ্রহণে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও সম্পাদনায় কালী রাহা।

বি কে প্রোডাকসন্স প্রযোজিত 'কালস্রোত' সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দু নম্বরে পরিচালক সুশীল মজুমদারের তত্ত্বাবধানে চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এ ছবির নায়িকা নবাগতা লোলিতা চট্টোপাধ্যায়। নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অসিতবরণ, সুমিত্রা সান্যাল, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, রবীন মজুমদার, দ্বিজু ভাওয়াল, অশোক মুখোপাধ্যায় ও রথীন ঘোষ। সম্পাদনা, সঙ্গীত ও চিত্রগ্রহণ করছেন দুলাল দত্ত, নবেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সন্তোষ গুহ-রায়। শিল্পনির্দেশক সুনীতি মিত্র।

'লুকোচুরি' ছবির পর কিশোর-কুমারকে নিয়ে দ্বিতীয় বাংলা ছবি 'ছদ্মবেশী' পরিচালনা করবেন কমল মজুমদার। সম্প্রতি প্রযোজক-পরিবেশক রূপচাঁদ কাংকোরিয়া ছবিটির পরিবেশনা-স্বত্ব ক্রয় করেছেন। প্রধান চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন অশোককুমার, সুমিত্রা দেবী, কিশোরকুমার ও মালা সিনহা। ছবির কাজ শীঘ্র শুরু হবে বলে জানা গেল।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর রূপ-নিকেতনের প্রথম ছবি 'শেষপ্রহর'এর চিত্রগ্রহণ নিয়মিতভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রান্তিক গোষ্ঠী। সুবোধ ঘোষের এ কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে তার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়াদেবী, অপর্ণাদেবী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সুব্রতা সেন, খগেশ চক্রবর্তী ও সবিতা সিনহা। চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা, ও সম্পাদনায় দায়িত্ব নিয়েছেন সৌমেন্দু রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও দুলাল দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রান্তিক গোষ্ঠীর পরিচালনায় রয়েছেন তরুণ কলাকুশলী নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ ও নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়।

এস এম পিকচার্সের প্রথম প্রয়াস 'মুক্তবিহঙ্গ'। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ রায় ছবির চিত্রনাট্যকার ও কাহিনীকার। এক মধুর প্রণয় কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রের জন্য মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর। এ মাসেই ছবির কাজ শুরু করবেন পরিচালক অজয় কর। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এস এম পিকচার্সের পক্ষ থেকে ছবিটি প্রযোজনা করছেন হেমেন মিত্র।

বোম্বাই

প্রযোজক রাজেন্দ্র ভাটিয়া তাঁর পরবর্তী ছবির জন্য নায়ক-নায়িকা মনোনীত করেছেন মনোজকুমার ও মালা সিনহাকে। ছবিটির নামকরণ এখনও ঠিক হয়নি। এই মাসের মাঝামাঝি ছবি গ্রহণের কাজ শুরু হবে। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মদনমোহন।

'হামরাহী' চিত্রে যমুনা

শ্রীসাউন্ড স্টুডিওয় গঙ্গা চিত্রের 'চাঁদ অর সুরয'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। তনুজা এ ছবির নায়িকা। পরিচালনা করছেন দুলাল গুহ। সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন অশোককুমার, নিরুপা রায়, ধর্মেন্দ্র, অসিত সেন ও সজ্জন।

প্রযোজক-পরিচালক জগন্নাথ ধর যে ছবিটি বর্তমানে করছেন তার নাম 'এক বানওয়ারা দো ফুল'। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন ভারতভূষণ ও কল্পনা। এ ছাড়া রয়েছেন ললিতা পাওয়ার, নিরুপা রায়, নাজির হসেন, জীবন, নিরঞ্জন শর্মা, রাজা ও নবাগত রাজদীপ। এন দত্ত এ ছবির সুরসৃষ্টি করবেন।

মাদ্রাজ

কাহিনীকার, প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীধর বর্তমানে যে ছবিটি শেষ করেছেন তার নাম 'দিল এক মন্দির'। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন রাজকুমার, মীনাকুমারী ও রাজেন্দ্রকুমার।

জেমিনী প্রোডাকসন্সের 'গৃহস্থী' এ সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন কিশোর সাহু। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন অশোককুমার, নিরুপা রায়, মনোজকুমার, মেহমুদ, শুভো খোটে, ললিতা পাওয়ার ও রাজশ্রী। —চিত্রদূত

জন্মক্ষণে কেমন শঙ্খ বেজেছিল, বিভাস জানে না। জীবনের বিশেষ বিশেষ লগ্নগুলিই পরম। তা সুন্দর কিংবা নির্মম, তার বিচার আলাদা। জীবনের সেই লগ্ন অদৃশ্য স্তব্ধ পথের বাঁকে। তারা আবিষ্কৃত হয়। মানুষ হিসেবে তার জন্ম কোন আবিষ্কার নয়। বিভাসের বিশ্বাস, কোন মানুষেরই নয়। জন্ম ই একমাত্র প্রকাশ্য। মানুষের স্বভাব থেকে নিয়ত উদ্ভূত।

বাইশ বছরের বিভাস আই, এ পাশ করে বেকার ঘুরছে চাকরির চেষ্টায়। কলকাতায় গিয়ে সে চাকরির চেষ্টা করে। কিন্তু নিরাশ হয়ে বরবারই ফিরতে হয়েছে। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন দাদা-বৌদিদের কাছে একটু ঠাঁই ছিল। এখন তাও গেছে। প্রথম প্রথম বন্ধুরা দেখতো। এখনত কেউ ফিরেও দেখে না।

সে মরছে। আস্তে আস্তে মরবে। এই একটি কথাই তার অনুভূতির মধ্যে বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে। বেশ কয়েকদিন খাওয়া জোটে নি। পথে-পথে। বাজার থেকে ষ্টেশনে। তারপর এক অচেনা গ্রামে। ষ্টেশনের পাশে ডাক্তারখানা। বিভাস এগিয়ে যায়। বড় বড় করে লেখা—'আঁচিন ফার্মেসী', ডাক্তার তারকেশ্বর রায় এল, এম, এফ। গ্রাম—আঁচনা, পোঃ—আঁচনা। ডাক্তারবাবুর কি যেন দয়া হল। বিভাসকে সেইদিন থেকে নিজের সহকর্মী করে নিলেন। বিভাসের নতুন নাম হল—কমপনডরবাবু।

বিভাস বেঁচেছে। পরাধীন থেকে স্বাধীন হবার বাসনায়। এখন সকলেই তাকে চেনে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের লোক সে। শুধু তাই নয়, বিভাসও অনুভব করে, তাকে না হলে কোন কাজেই তারকেশ্বরের আর চলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের চিঠিপত্র লেখা, জগত ও জীবন সম্পর্কে তার বক্তৃতা শোনা। তবু বিভাসের একটি বিস্ময়! তারকেশ্বরকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। নামের সঙ্গে চেহারার ব্যক্তিত্ব। দেখলে মনে হবে, রীতিমত গোঁড়া এবং শক্ত। ডাক্তারি, রাজনীতি আর শিকারে যাওয়া তাঁর জীবনের ব্যস্ততা।

তারকেশ্বরের বাড়ীতেই বিভাস থাকে। পুরনো ভাঙ্গা বাড়ির মধ্যে প্রাণী বলতে তারকেশ্বরের বউ, মেয়ে পদ্ম, ছেলে তাপস ও তার বউ বিদ্যুত। বিদ্যুতকে দেখে বিভাসের ছোটবৌদির কথা মনে পড়ে যায়। বেশ নম্র-শান্ত। স্নেহ আছে। আর পদ্ম একটু চঞ্চল। বাঁকা চোখে হাসে। অকারণে উঁকিঝুঁকি দেয়। বিভাসের ভাল লাগে। পদ্মও খুশি। এ যেন বিভাসের ওপর তার রাগ করে অধিকার জন্মেছে। রাগ করেও খুশি যেদিন কাঁদবার অধিকার জন্মাবে সেদিন পদ্ম বুঝি কেঁদেই খুশি হবে। এমন যে খুশি-খুশি।

কোন-কোন দিন দুপুরের নিঝুম বাগানে পদ্ম এসে উঁকি মারে বাগানে বিভাসের ঘরে, বলে—শুয়ে আছেন কেন বিভাস তখন আপন করে বলে—কি করবো? পদ্ম বলে—নাচুন। নাচো বললেই সত্যি আর নাচা যায় না। বিভাস তখন হাসি-হাসি মুখে বলে তুমি দুপুরে খেয়ে একটু শুলেই তো পারো

—কেন শোব?

—শুলে কি হয়?

—টো-টো কোম্পানী হয় না।

ভাললাগার-সংলাপ কাজের মাঝে মাঝে বিভাসকে মনে করিয়ে দেয়। পদ্ম সে ভালবাসে।

"আঁচনার ইউনিয়ন বোর্ডে রাজনীতি ঝড় উঠে। সাঁকো ভাঙার সংবাদ, রাস্তা ধ্বসে যাবার খবর আর সরকারী খয়রাতি ধান-চাল নিয়ে রোজই অভিযান আসে। খয়রাতি ছাড়াও ঋণ আছে। আর ঋণ মেটাতে পারলে শেষে ভিটে নিয়ে টানাটানি। এসবের বিচারক তারকেশ্বর প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে, লো বিভাসকেই যেন একমাত্র প্রতিনিধি ধরে নেয়। যত জিজ্ঞাসাবাদ তাকে কিন্তু জবাব দেবার অধিকার বিভাসের নেই। সে ছুটি নিতে চায়। এ জীবন ভাল লাগছে না। এক এক সময় মনে

যে চলে যাবে। কিন্তু ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে সে রাজী নয়। মৃত্যুভয় তার নেই। লোভ নেই, স্বার্থ নেই, তবু তার শঙ্কিত লালসা-স্তূপের হিসেব রাখতে হয়। মনে হয় সে কত পরাধীন।

তারকেশ্বর বিভাসের জন্য ভাবেন। ঋণী জনকের জমি বাঁধা পড়লে জোর করে সে জমি বিভাসের নামে দলিল-দস্তাবেজ করিয়ে দেন তারকেশ্বর। কিন্তু এমনভাবে জমির দখল নিতে চায় না বিভাস। তারকেশ্বর কঠিন হলেন। এর-মধ্যেও ইউনিয়ন বোর্ডের রাজনীতি। বিপক্ষদলকে জব্দ করতে তারকেশ্বরের এ প্রচেষ্টা। কিন্তু বিভাস এমন দখল কিছুতেই নেবে না। তারকেশ্বর জীবনে হার স্বীকার করেননি। তিনি বিভাসের ওপরেও কঠোর হলেন। কথা বন্ধ হল। জনককে বাঁচাতে তারকেশ্বরের ফাঁদে বিভাস পড়লো আটকে। একদিন তারকেশ্বর শিকারে সঙ্গে নিলেন বিভাসকে। অবশ্য এ বিপদের কথা চম্পা বিভাসকে সাবধান করে দিয়েছে। একটা কিছু বিপদের আশঙ্কায় চম্পার হৃদয় ভেঙে পড়েছিল। সে ছাড়তে চায়নি বিভাসকে। কিন্তু বিভাস জোর করেই তারকেশ্বরের সঙ্গে গেছে। এ যাত্রায় ভয় পেলে সারাজীবন তারকেশ্বরকে ভয় করে চলতে হবে। তাই সে শিকারে গিয়ে তারকেশ্বরের বন্দুকের গুলিতে আহত হল।

বিভাস পঙ্গু হয়নি। তবে ডান পা-টা জখম হয়েছে। হাসপাতালে রয়েছে সে। তারকেশ্বর একদিন দেখা করতে এসে-ছিলেন। পদ্ম বা বিদ্যুৎকে তিনি আসতে দেননি।

এদিকে ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে বিভাস জয়লাভ করলো। তারকেশ্বরের জুলুম যেন শেষ হল। পদ্ম এলো অসুস্থ হয়ে বিভাসের কাছে। এতদিনপর পদ্ম চুপি চুপি বলে,—

—রাগ করনি তো?

বিভাস নুয়ে পড়ে পদ্মর কপালে ঠোঁট স্পর্শ করলো।

সমরেশ বসু রচিত 'অচিনপুরের কথকতা' অবলম্বনে 'বিভাস' চিত্রকাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক বিনু বর্ধন। চিত্রগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। কলাকুশলীর বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রগ্রহণে বিজয় ঘোষ, সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশনা কার্তিক বসু, রূপসজ্জায় শক্তি সেন এবং ব্যবস্থাপনায় সুধীর রায়। সহকারী পরিচালনায় বিশু ব্রহ্ম, কনক মুখোপাধ্যায়, গোপাল চট্টোপাধ্যায় ও পঙ্কজ দাস। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নির্মল এন্ড কোং। —চিত্রদূত

'বিভাস' চিত্রের নামভূমিকায় উত্তমকুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক বিনু বর্ধন ও সহকারী বিশু ব্রহ্ম

কাহিনীর নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। তারকেশ্বরের চরিত্রে কমল মিত্র এবং পদ্ম-এর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্যাল বিকাশ রায়, তরুণকুমার ও নবাগত রুনু বোস।

জেনিথ পিকচার্স প্রযোজিত এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন আর ডি বনশল এন্ড কোং। —চিত্রদূত

ভিন দেশী ছবি

।। ১৯৬২ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি ।।

বিখ্যাত বৃটিশ চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা 'ফিল্ম এ্যান্ড ফিল্মিং' ১৯৬২ সালে বৃটেনে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন আন্তো-নিয়নির 'লা নোত' ছবিকে। এই পত্রিকার বিচারে শ্রেষ্ঠ বৃটিশ ছবি হল পিটার উস্টিনভের 'বিলিবাড'। শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন আলায়ে' রেজনে 'লানে দেবানিয়ের আ মারিয়েনবাদ' ছবিটি পরিচালনার জন্যে। শ্রেষ্ঠ পুরুষ-অভি-নেতার সম্মান লাভ করেছেন বার্ট ল্যাংকাস্টার, 'বার্ড ম্যান অফ আলকাট্রাজ' ছবিতে অভিনয়ের জন্যে এবং স্ত্রী-অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয়েছেন 'লা নোত' এবং 'জুল এ জিম' চিত্র দুটির অভিনেত্রী শ্রীমতী জাঁস মোরো।

১৯৬২ সালে বৃটেনের ২৪০০ চিত্র-গৃহে প্রদর্শিত দশটি জনপ্রিয় ছবির মধ্যে সাতটি ছবিই বৃটেনে নির্মিত। জন-প্রিয়তার মান অনুযায়ী সেই দশটি ছবি হল :

১। দি গানস অফ নেভারোন (বৃটেনে নির্মিত)
২। ডঃ নো "
৩। দি ইয়ং ওয়ানস "
৪। ওনলি টু ক্যাম প্লে "
৫। দি রোড টু হংকং "
৬। স্পার্টাকাস (আমেরিকায় নির্মিত)
৭। দি কম্যানচেরোস "
৮। রু হাওয়াই "
৯। এইচ, এম, এস ডিফায়েন্ট (বৃটেনে নির্মিত)
১০। পাইরেটস অব ব্লাড রিভার "

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা

ইংল্যাণ্ড : ৩২১ রাণ (কেন ব্যারিংটন ১০১ এবং টেড ডেক্সটার ৪৭ রাণ। ডেভিডসন ৪৩ রাণে ৩, হক ৫১ রাণে ২ এবং বেনো ৭১ রাণে ২ উইকেট পান।

ও ২৬৮ রাণ (ব্যারিংটন ৯৪, শেফার্ড ৬৮ এবং কাউড্রে ৫৩ রাণ। ডেভিডসন ৮০ রাণে ৩ এবং বেনো ৭১ রাণে ৪ উইকেট—৮ উইঃ ডিক্লেঃ।

অস্ট্রেলিয়া : ৩৪৯ (পিটার বার্জ ১০৩, নর্ম্যান ওনীল ৭৩ এবং রিচি বেনো ৫৭ রাণ। টিটমাস ১০৩ রাণে ৫ উইকেট পান।

ও ১৫২ রাণ (৪ উইকেটে। বার্জ ৫২ নট-আউট এবং লরী ৪৫ নট-আউট। এ্যালেন ২৬ রাণে ৩ উইকেট পান)

প্রথম দিন (১৫ই ফেব্রুয়ারী) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট পড়ে ১৯৫ রাণ ওঠে। রয় ইলিংওয়ার্থ (১০) এবং ফ্রেডী টিটমাস (০) নট-আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩২১ রাণে সমাপ্ত। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩টে উইকেট পড়ে ৭৪ রাণ ওঠে।

তৃতীয় দিন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) : অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৮৫ রাণ (৬ উইকেটে) দাঁড়ায়। পিটার বার্জ (৯৮ রাণ) এবং রিচি বেনো (১৩ রাণ) নট-আউট থাকেন।

চতুর্থ দিন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) : অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৪৯ রাণে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১৬৫ রাণ ওঠে, ৩টে উইকেট পড়ে। ব্যারিংটন (৫৭ রাণ) এবং কাউড্রে (১২) নট-আউট থাকেন।

পঞ্চম দিন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : ইংল্যাণ্ড ২৬৮ রাণের মাথায় (৮ উইকেটে) দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৪টে উইকেট পড়ে ১৫২ রাণ দাঁড়ায়।

সিডনিতে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়াতে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজই অমীমাংসিত থেকে গেল। এই সিরিজের মোট পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে মাত্র দু'টো খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে—মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয় ৭ উইকেটে এবং সিডনির তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮ উইকেটে। বাকি প্রথম, চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্ট খেলা ড্র যায়। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই নিয়ে ৪৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা (টেস্ট খেলার সংখ্যা ১৮৮) হ'ল; এবং এই ৪৬টি টেস্ট সিরিজের মধ্যে টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থাকার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৮টি (১৮৭৬-৭, ১৮৮২-৩, ১৯৩৮ ও ১৯৬২-৬৩ মরসুম)।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার এই ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ অমীমাংসিত যাওয়ার ফলে প্রচলিত প্রথানুসারে অস্ট্রেলিয়ার হাতেই কাল্পনিক এ্যাসেজ সম্মান থেকে গেল। অস্ট্রেলিয়া রিচি বেনোর নেতৃত্বে ১৯৫৮-৯ সালের টেস্ট সিরিজে ৪—০ খেলায় (একটা খেলা ড্র) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে এই 'এ্যাসেজ' সম্মান পুনরুদ্ধার করে। পরবর্তী টেস্ট সিরিজেও (১৯৬১ সাল) অস্ট্রেলিয়া ২—১ খেলায় (ড্র ২) ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করলে অস্ট্রেলিয়ার হাতেই 'এ্যাসেজ' সম্মান থেকে যায়। তার পরই এই ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজ খেলা।

সিডনির আলোচ্য পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট ধরে। খেলার সূচনা মোটেই ভাল হয়নি। পুলার শারীরিক অক্ষমতার কারণে দলভুক্ত হননি। অপরদিকে পিটার পারফিটকে দলে একাদশ খেলোয়াড়ের স্থান দেওয়া হয়। ফলে

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বোলার নীল হক (ছবির ডানদিকের উপরে) ইংল্যাণ্ডের কেন ব্যারিংটনের বিপক্ষে 'এল-বি-ডব্লিউ'-এর আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। পঞ্চম টেস্টের এই প্রথম ইনিংসে ব্যারিংটন ১০১ রাণ করেন।
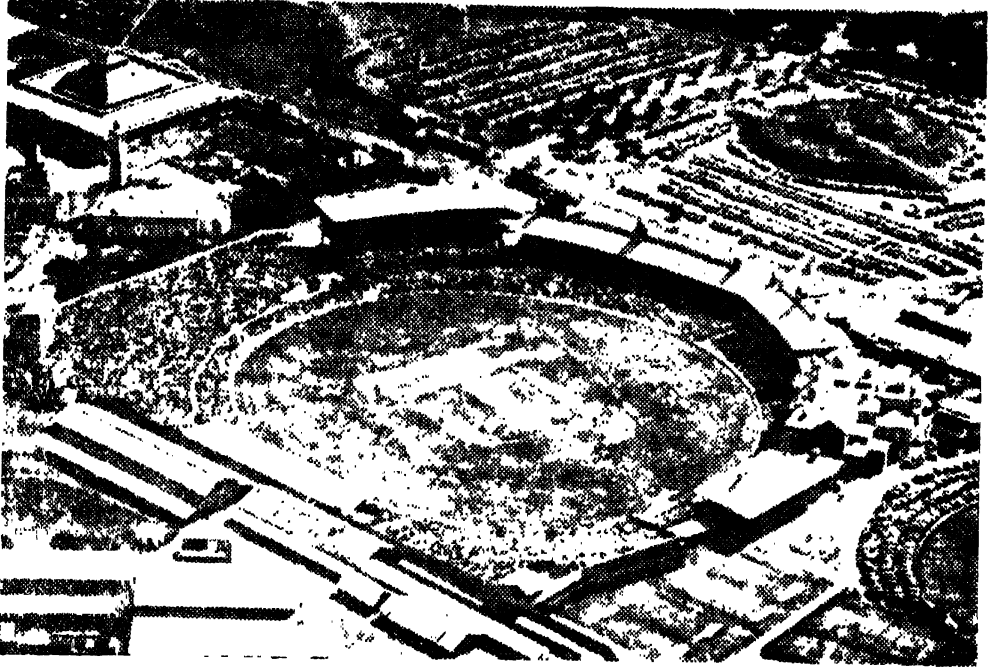
অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত সিডনি ওভাল মাঠের দৃশ্যঃ এখানে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের ৩য় এবং ৫ম টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়লাভ করে এবং ৫ম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

শেফার্ডের সঙ্গে প্রথম উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন কাউড্রে। কাউড্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রথম উইকেটের জুটিতে খেলতে পাঠানো যে কত ভুল ইংল্যান্ড তার ফল হাতে-নাতে পেয়েছে। কাউড্রে মাত্র ২ রান করে দলের মাত্র ৫ রানের মাথায় আউট হন। লাঞ্চে ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৪৯ (২ উইকেটে)। শম্বুক গতিতে রান উঠতে থাকে। চা-পানের সময় দেখা গেল ইংল্যান্ডের রান ১২৭ (২ উইকেট পড়ে)। উইকেটে তখন ছিলেন ব্যারিংটন এবং ডেক্সটার। সারা মাঠের ধিক্কার ধ্বনির মধ্যে ডুবে গেলেন ব্যারিংটন এবং ডেক্সটার। এ'দের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে দলের ৯০ রান ওঠে। প্রথম দিনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য খেলা কেন্ ব্যারিংটনের। তিনি সেঞ্চুরী (১০১) করেন—টেস্ট ক্রিকেটে এই নিয়ে তাঁর ৮টা সেঞ্চুরী এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর উপর্যুপরি টেস্ট সেঞ্চুরী। আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলায় ব্যারিংটন মাত্র একবার (৯৩ রানের মাথায়) বুথের হাত থেকে ফস্কে গিয়ে আউট হওয়া থেকে রক্ষা পান। এই দিনের খেলায় কোন উত্তেজনা ছিল না—সারা মাঠের লোকের মুখ ছিল বিরক্তিমাখা। খেলা ভাঙ্গার অনেক আগেই অর্ধেক লোক মাঠ ছেড়ে চলে যান। টিকিট কেটে পয়সা তো জলে পড়েছে—সেটা উসুল করতে মাঠে বসে খেলা দেখার মত ধৈর্য লোকের ছিল না।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের ৫টা উইকেট পড়ে ১৯৫ রান দাঁড়ায়।

প্রথম দিনে মাঠে দর্শক সংখ্যা ছিল ২৫,০০০ হাজার। দ্বিতীয় দিনে ৩৮,৩১০। দ্বিতীয় দিনে চা-পানের আধ ঘণ্টা আগে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল ৩২১ রানের মাথায়। ইংল্যান্ডের শেষ দিকের খেলোয়াড়রা তবু দলের মান রক্ষা করেন; পূর্ব দিনের নট আউট খেলোয়াড় ইলিংওয়ার্থ দলের ২২৪ রানের মাথায় নিজস্ব ২৭ রান করে আউট হন। কিন্তু সেঞ্চুরী করে ব্যারিংটন দর্শকদের কাছ থেকে যে খাতির পেয়েছিলেন তার থেকে অনেক-গুণ বেশী পেলেন ইলিংওয়ার্থ—দ্রুত গতিতে রান করার জন্যে। ব্যারিংটন তাঁর ১০১ রান করতে সময় নিয়েছিলেন ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট। ইলিংওয়ার্থ এবং টিটমাসের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে দলের ৩৫ রান যোগ হয়। ইলিংওয়ার্থের বিদায়ের পর খেলা আবার ঝিমিয়ে পড়ে। উইকেটে তখন টিটমাস এবং ট্রুম্যান। তাঁদের দুজনকেই দর্শকরা ধিক্কার ধ্বনিতে অপদস্থ করেন। [illegible] মন্থর গতিতে এ'দের রান উঠেছিল তার উদাহরণ : ট্রুম্যান ১১০ মিনিটের খেলায় তাঁর ৩০ রান করেন। টিটমাস তাঁর ৩৪ রান তুলতে ১৪১ মিনিট সময় নিয়েছিলেন। সপ্তম উইকেটের জুটিতে এ'রা ৯০ মিনিটের খেলায় ৫২ রান করেন। অস্ট্রেলিয়াও তেমন জোর দিয়ে খেলেনি। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড তার বাকি ৫টা উইকেট হারিয়ে পূর্ব দিনের ১৯৫ রানের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১২৬ রান যোগ করে। প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ডের প্রথম পাঁচটা উইকেটে ১৮৯ রান এবং শেষের পাঁচটা উইকেটে ১৩২ রান ওঠে।

এইদিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ড ৩টে উইকেট পেয়ে খেলায় বেশ খানিকটা প্রাধান্য লাভ করে; আলোর অভাবে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে ২২ মিনিট আগেই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়ায় ৭৪, ৩ উইকেট পড়ে।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ইংল্যান্ডের 'এ্যাসেজ' পুনরুদ্ধারের যে সম্ভাবনা দ্বিতীয় দিনে দেখা দিয়েছিল তৃতীয় দিনের খেলায় তা চাপা পড়ে যায়। প্রথমতঃ বৃষ্টি এবং আলোর অভাবে খেলার ৭০ মিনিট নষ্ট হয়। ও'নীলকে স্মিথের আউট করা খুবই উচিত ছিল। বার্জের ১২ রানের মাথায় গ্রেভনী তাঁর ক্যাচ ধরতে পারেননি এবং এই বার্জ শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। ও'নীল এবং বার্জ চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৩৮ মিনিট খেলে দলের ১০৯ রান যোগ করেন। এই জুটিই ইংল্যান্ডের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়। ও'নীলের খেলাই ছিল এই দিনের দর্শনীয় খেলা। ১১৪ মিনিট পিটিয়ে খেলে তিনি তাঁর ৭৩

রান করেন—বাউণ্ডারী করেন ৭টা। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে বার্জ এবং হার্ভে ৬২ মিনিটের খেলায় দলের ৫১ রান যোগ করেন। এই দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৬টা উইকেটে ২৮৫ রান দাঁড়ায়। অর্থাৎ তারা এই দিনের খেলায় আরও ৩টে উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ৭৪ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে ২১১ রান যোগ করে। উইকেটে এই দিনের মত অপরাজেয় থাকেন বার্জ (৯৮ রান) এবং বেনো (১৩ রান)।

খেলার চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৩৪৯ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিনে অস্ট্রেলিয়া ১১০ মিনিট খেলে পূর্ব দিনের ২৮৫ রানের (৬ উইকেটে) সঙ্গে ৪টে উইকেট খুইয়ে ৬৪ রান যোগ করে। এই ৬৪ রানের মধ্যে বেনো একাই করেছিলেন ৪৪ রান ৫১ মিনিটে। পিটার বার্জ সেঞ্চুরী (১০৩ রান) করেন। টেস্ট খেলায় এই তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। তিনি ৩৮১ মিনিট খেলে ৯টা বাউণ্ডারী মারেন। বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন টিটমাস, ১০৩ রানে ৫টা উইকেট পেয়ে।

ইংল্যান্ড ২৮ রানের পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং ৩টে উইকেট খুইয়ে এইদিনে ১৬৫ রান করে। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা করেন এবার শেফার্ড এবং ইলিংওয়ার্থ। দলের ৪০ রানের মাথায় ১ম উইকেট (ইলিংওয়ার্থ) পড়ে যায়। ২য় উইকেটের জুটিতে শেফার্ড (৬৮ রান) এবং ব্যারিংটন দলের ৯৭ রান যোগ করেন ১১২ মিনিট খেলে। ব্যারিংটন (৫৭ রান) এবং কাউড্রে (১২ রান) এই দিনে নটআউট থাকেন। ইংল্যান্ড ১৩৭ রানে অগ্রগামী হয় এবং তাদের হাতে জমা থাকে ৭টা উইকেট।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনের লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ড তাদের ২৬৮ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। কেন ব্যারিংটন এবারও দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৯৪) করেন। আর মাত্র ৬ করলে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার দুর্লভ সম্মান লাভ করতেন। ব্যারিংটনের দ্বিতীয় ইনিংসের ৯৪ রানের মধ্যে মাত্র ২টো বাউণ্ডারী ছিল। খেলেছিলেন ২৬৩ মিনিট।

অস্ট্রেলিয়া যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা হাতে পায় তখন খেলা শেষ হ'তে ২৪০ মিনিট বাকি ছিল এবং অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্যে ২৪১ রানের প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ জয়লাভের জন্যে তাদের মিনিটে কমপক্ষে একটা ক'রে রান তুলতেই হবে। পঞ্চম দিনের খেলায় এইভাবে রান করা মুখের কথা নয়, খুবই ঝুঁকির কাজ। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার আরম্ভেই দুর্যোগ নেমে আসে। দলের রান সংখ্যার ভাঁড়ার শূন্যে, এদিকে সিম্পসন বোল্ড আউট হ'লেন ট্রুম্যানের প্রথম ওভারের পঞ্চম বলে। খেলা বেশ জমে উঠল চল্লিশ মিনিট পরে যখন এ্যালেন এবং টিটমাস বল দিতে আরম্ভ করলেন। হার্ভে তাঁর ১৭ রানের মাথায় টিটমাসের দ্বিতীয় বলে ক্যাচ তুলেন। তাঁর বরাত ভাল যে, কাউড্রে বলটা লুফতে পারেননি। দলের ৩৯ রানের মাথায় হার্ভে তাঁর ২৮ রান ক'রে এ্যালেনের বলে বোল্ড হ'ন। খেলার এক সময় স্কোর বোর্ডে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়ার ৭০ রান দাঁড়িয়েছে দুটো উইকেট পড়ে। অনেকেরই ধারণা হ'ল, অস্ট্রেলিয়া তার প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু আবার ভাঙ্গন আরম্ভ হ'ল ৭০ রানের মাথায় ৩য় উইকেট (ও'নীল) এবং ৪র্থ উইকেট (বুথ) পড়ে গেল। এ দুটো উইকেট পেলেন এ্যালেন। তখন তাঁর বোলিংয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ রানে ৩টে উইকেট। ডেভিড এ্যালেন এক ওভারে ২টো উইকেট পান। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে উভয় ইনিংসের খেলায় তিনি মোট ৫টা উইকেট পান ১১৩ রানে। ইংল্যান্ডের চোখের সামনে একটা ক্ষীণ আশার আলো ভেসে উঠল। সমস্ত মাঠ স্তব্ধ। ওপনিং ব্যাটসম্যান লরীর সঙ্গে খেলতে নামলেন পিটার বার্জ। প্রথম ইনিংসে পিটার বার্জ সেঞ্চুরী ক'রে দলের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু দর্শকদের মনের অবস্থা তখন অন্য রকম। চা-পানের সময় রান দাঁড়াল ৭৫, ৪টে উইকেট পড়ে। শেষ পর্যন্ত এই পঞ্চম উইকেটের জুটি লরী (৮৫ রান) এবং বার্জ (৫২ রান) অপরাজেয় থেকে গেলেন। খেলা ভাঙ্গার সময় রান দাঁড়াল ১৫২ (৪ উইকেটে)। প্রাথমিক বিপর্যয়ের ফলে অস্ট্রেলিয়া খেলায় জয়লাভের চেষ্টা ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষায় মন দেয়। অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই খেলায় জয়লাভের বিশেষ কোন তাগিদ ছিল না। তাগিদ ছিল ইংল্যান্ডের; কিন্তু তারাই মন্থর গতিতে খেলে প্রথম ইনিংসের খেলা ৯½ ঘণ্টায় শেষ করে। ফলে খেলার গতি জয়-পরাজয়ের পথ ছেড়ে যায়। ইংল্যান্ডের ভাবগতিক দেখে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো জয়লাভের জন্যে খুব বেশী মাথা ঘামাননি। খেলা ড্র হ'লেও অস্ট্রেলিয়ার হাতেই যখন 'এ্যাসেজ' সম্মান থেকে যাচ্ছে তখন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ঝুঁকি নেওয়ার কোন গরজ ছিল না।

ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজ এক চরম ব্যর্থতার কাহিনী হিসাবে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। এই সদ্য সমাপ্ত টেস্ট সিরিজ উপলক্ষ্য ক'রে ক্রিকেট অনুরাগী মহলে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁরা সজাগ এবং যাঁরা প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলার একান্ত সমর্থক তাঁরা এ ধরনের টেস্ট খেলার বিরুদ্ধে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। খবরে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট সাপোর্টার্স এসোসিয়েশন ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা বর্জন আন্দোলনের প্রস্তাব সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রাক্কালে এম সি সি তথা ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ক্রিকেট খেলার স্বার্থে তিনি কখনও দলীয় মান-সম্মানকে প্রাধান্য দিবেন না, এর জন্যে দলের পরাজয়কে তিনি হাসিমুখেই বরণ করবেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো এ বিষয়ে একমত ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কথা রাখতে পারেন নি। ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলায় উভয় দলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দলের পরাজয় পরিহার করা এবং তার জন্যে খেলার শুরু থেকেই অতি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। খেলায় জয়লাভের উদ্দেশ্য ছিল গৌণ। এই নীতির ফলেই বেশীর ভাগ টেস্ট খেলা অমীমাংসিত থেকে যায় এবং সেই সঙ্গে ক্রিকেট খেলার মনোহারিত্ব লোপ পায়। ১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করেও অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের কাছ থেকে যে রাজকীয় আদর-অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন ডেক্সটারের নেতৃত্বে ইংলিশ ক্রিকেট দল তার এক কণা অংশেরও ভাগ নিতে পারেন নি। ইংলিশ ক্রিকেটের চরম ব্যর্থতা এইখানেই। অস্ট্রেলিয়াও তাদের সুনাম যথেষ্ট নষ্ট করেছে। রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত চারটি দেশের বিপক্ষে (ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান) মোট ছ'টি টেস্ট সিরিজ খেলে উপর্যুপরি পাঁচটি টেস্ট সিরিজে 'রাবার' পেয়েছে এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে। খেলার এ ফলাফল এক দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মস্ত কৃতিত্বের পরিচয়। কিন্তু ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা ক'রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া যে আদর্শ নীতি গ্রহণ ক'রে

নব-যুগের সূচনা করেছিল, সদ্য সমাপ্ত টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া সেই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি।

ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের গড়পড়তা

অস্ট্রেলিয়া—ব্যাটিং : ১ম পিটার বার্জ (মোট রাণ ২৪৫ এবং গড় ৬১·২৫) ২য় ব্রায়ান বুথ (মোট রাণ ৪০৪ এবং গড় ৫০·৫০)। দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রাণ করেন বুথ (৪০৪)।

অস্ট্রেলিয়া—বোলিং : ১ম এ্যালেন ডেভিডসন (৪৮০ রাণে ২৪ উইকেট এবং গড় ২০·০০)

ইংল্যান্ড—ব্যাটিং : ১ম কেন ব্যারিংটন (মোট রাণ ৫৮২ এবং গড় ৭২·৭৫); ২য় স্থান টেড ডেক্সটার (মোট রাণ ৪৮১ এবং গড় ৪৮·১০)

ইংল্যান্ড—বোলিং : ১ম ফ্রেডী ট্রুম্যান (৫২১ রাণে ২০ উইকেট; গড় ২৬·০৫); ২য় ফ্রেডী টিটমাস (৬১৬ রাণে ২১ উইকেট; গড় ২৯·৩৩।)

টেস্ট সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া (৫) : ব্রায়ান বুথ ১১২ (১ম টেস্ট) এবং ১০৩ (২য় টেস্ট); নর্ম্যান ও'নীল ১০০ এবং নীল হার্ভে ১৫৪ (৪র্থ টেস্ট); পিটার বার্জ ১০৩ (৫ম টেস্ট)।

ইংল্যান্ড (৪) : কেন ব্যারিংটন ১৩২ নট-আউট (৪র্থ টেস্ট) এবং ১০১ (৫ম টেস্ট); শেফার্ড ১১৩ এবং কলিন কাউড্রে ১১৩ (২য় টেস্ট)

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড

(১৮৭৭ থেকে ১৯৬৩)

স্থান	খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ড	৮৬	২৫	২৩	৩৮
অস্ট্রেলিয়া	১০২	৩৯	৫৪	৯
মোট :	১৮৮	৬৪	৭৭	৪৭

টেস্ট সিরিজ

এ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৪৬টি টেস্ট সিরিজ খেলা হয়েছে। এই ৪৬টি টেস্ট সিরিজে টেস্ট ম্যাচের সংখ্যা ১৮৮। উভয় দেশই সমান সংখ্যক (২১টি) টেস্ট সিরিজ জয় করেছে। ৩টি টেস্ট সিরিজ অমীমাংসিত থেকে গেছে।

স্থান	সিরিজ সংখ্যা	ইংল্যান্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	সিরিজ ড্র
ইংল্যান্ড	২২	১২	৯	১
অস্ট্রেলিয়া	২৪	৯	১২	৩
মোট	৪৬	২১	২১	৪

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রাণ

(দুই দলের রাণ নিয়ে)

১৭৫৩ রাণ (ইংল্যান্ড—৪৪৭ ও ৩৭০; অস্ট্রেলিয়া ৩৫৪ ও ৫৮২), এডিলেড, ১৯২০-২১।

একটি খেলায় সর্বনিম্ন রাণ

(দুই দলের ৪০ উইকেটের পতনে)

২৯১ রাণ (৪০ উইকেটে। ইংল্যান্ড—৫৩ ও ৬২; অস্ট্রেলিয়া—১১৬ ও ৬০), লর্ডস, ১৮৮৮।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রাণ

ইংল্যান্ড : ৯০৩ রাণ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ রাণ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ), লর্ডস, ১৯৩০

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ইংল্যান্ড : ৪৫ রাণ, সিডনি, ১৮৮৬-৭

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬ রাণ, বার্মিংহাম, ১৯০২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রাণ

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ৩৬৪ রাণ—লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৩৩৪ রাণ—ডন্ ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে

১৭৬ ও ১২৭ হার্বার্ট সাটক্লিফ, মেলবোর্ণ, ১৯২৪-৫; ১১৯* ও ১৭৭ ডব্লিউ আর হ্যামন্ড, এডিলেড, ১৯২৮-৯; ১৪৭ ও ১০৩* ডেনিস কম্পটন, এডিলেড, ১৯৪৬-৭

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে

১৩৬ ও ১৩০ ডব্লিউ বার্ডসলে, ওভাল, ১৯০৯; ১২২ ও১২৪* এ আর মরিস, এডিলেড, ১৯৪৬-৭

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রাণ

(ব্যক্তিগত রাণ)

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ৯০৫ রাণ (গড় ১১৩·১২) ডব্লিউ হ্যামন্ড, ১৯২৮-৯

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৯৭৪ রাণ (গড় ১৩৯·১৪)—ডন্ ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০

সর্বাধিক ব্যক্তিগত রাণ

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে :

৫০২৮ রাণ—ডন্ ব্র্যাডম্যান (খেলা ৩৭, ইনিংস ৬৩, নট-আউট ৭ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ৩৩৪ এবং গড় ৮৯·৭৮)

ইংল্যান্ডের পক্ষে :

৩৬৩৬ রাণ—জ্যাক হবস (খেলা ৪১, ইনিংস ৭১, নট-আউট ৪ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১৮৭ এবং গড় ৫৪·২৬)

২০০০ অথবা তার বেশী রাণ

ইংল্যান্ডের পক্ষে : (৪ জন) : ৩৬৩৬ রাণ (গড় ৫৪·২৬)—জ্যাক হবস; ২৮৫২ রাণ (গড় ৫১·৮৫)—ডব্লিউ আর হ্যামন্ড; ২৭৪১ রাণ (গড় ৬৬·৮৫)—হার্বার্ট সাটক্লিফ এবং ২৪২৮ রাণ (গড় ৫৬·৪৬)—লেন হাটন।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : (৬ জন) : ৫০২৮ রাণ (গড় ৮৯·৭৮)—ডন্ ব্র্যাডম্যান; ২৬৬০ রাণ (গড় ৩৫·৪৬)—সি হিল; ২২৬৩ রাণ (গড় ৩২·৭৯)—ভি টি ট্রাম্পার; ২১৯৩ রাণ (গড় ২৫·৮০)—এস ই গ্রেগোরী; ২১৭২ রাণ (গড় ৩৫·০৩)—ডব্লিউ আর্মস্ট্রং এবং ২০৮০ রাণ (গড় ৫০·৭৩)—এ আর মরিস।

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১২টি—জ্যাক হবস্

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৯টি—ডি জি ব্র্যাডম্যান

দলগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৪১টি

ইংল্যান্ড : ১৩০টি

সর্বাধিক ব্যক্তিগত উইকেট

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১০৯টি—ডব্লিউ রোডেস (ওভার ৯৮৮·৩, মেডেন ২৩৭, রাণ ২৬১৬ এবং গড় ২৪·০০)

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৪১টি—এইচ ট্রাম্বল (ওভার ১৩৯৬·৩, মেডেন ৪৪৮, রাণ ২৯৪৫ এবং গড় ২০·৮৮)

১০০ অথবা তার বেশী উইকেট

ইংল্যান্ডের পক্ষে (৪ জন) : ১০৯ (গড় ২৪·০০)—ডব্লিউ রোডেস; ১০৬ (গড় ২১·৫৮)—এস এফ বার্নেস; ১০৪ (গড় ২৭·৪৯)—এ্যালেক বেডসার এবং ১০২ (১৬·৮১) আর পীল।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৭ জন) : ১৪১ (গড় ২০·৮৮)—এইচ ট্রাম্বল; ১১৫ (গড় ২৪·৭৮)—এম এ নোবেল; ১১৪ (গড় ২২·৪৪)—আর আর লিন্ডওয়াল; ১০৬ (গড় ৩২·৪৪)—সি ভি গ্রিমেট; ১০৩ (গড় ২৭·০৯)—জি গিফেন; ১০২ (গড় ২৫·৬৮)— ডব্লিউ জে ও'রীলী এবং ১০১ (গড় ১৬·৫৩)—সি টি বি টার্নার।

ব্যক্তিগত সর্বাধিক উইকেট

এক সিরিজে

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ৪৬টি (গড় ৯·৬০)—জিম লেকার, ১৯৫৬

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৩৬টি (গড় ২৬·২৭)—এ এ মেলী, ১৯২০-১

এক ইনিংসে

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৫৬

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ৯টি (১২১ রাণে)—এ এ মেলী, মেলবোর্ণ, ১৯২০-১

একটি খেলায়

ইংল্যান্ডের পক্ষে : ১৯টি (৩৭ রাণে ৯ ও ৫৩ রাণে ১০)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেষ্টার, ১৯৫৬

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে : ১৪টি (৯০ রাণে)—এফ আর স্পোফোর্থ, ওভাল, ১৮৮২

অমীমাংসিত টেস্ট সিরিজ

মরসুম	মোট খেলা	ইংঃ জয়ী	অস্ট্রেঃ জয়ী	খেলা ড্র
১৮৭৬-৭	২	১	১	০
১৮৮২-৩	৪	২	২	০
১৯৩৮	৪	১	১	২
১৯৬২-৩	৫	১	১	৩

॥ বিভিন্ন দেশের টেস্ট ক্রিকেট ॥

(খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

	খেলা	জয়	হার	ড্র
ইংল্যান্ড	৩৯১	১৫৬	১০৮	১২৭
অস্ট্রেলিয়া	২৬৫*	১২৮	৭২	৬৪
দঃ আফ্রিকা	১৪২	২৭	৭২	৪৩
ওঃ ইণ্ডিজ	৯৪*	৩১	৩২	৩০
ভারতবর্ষ	৮২	৮	৩৪	৪০
নিউজিল্যান্ড	৫২	১	২৭	২৪
পাকিস্তান	৪২	৮	১৪	২০

* অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় উভয় দলের রাণ সংখ্যা সমান দাঁড়ায়। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই খেলাটিই প্রথম 'টাই ম্যাচ'।

॥ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

এলাহাবাদের নবনির্মিত আলফ্রেড স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত চার দিনের আন্তঃ-রাজ্য এ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ১৪টি রাজ্য যোগদান করেছিল। সার্ভিসেস দল যোগদান না করলেও তাদের প্রতিনিধিরা পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের পক্ষ নিয়ে যোগদান করেছিলেন। পুরুষ বিভাগে পাঞ্জাব, মহিলা ও বালিকা বিভাগে মহীশূর এবং বালক বিভাগে উত্তর প্রদেশের প্রতিনিধিরা সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতার সাতটি অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয় এবং একটি অনুষ্ঠানের সময় ভারতীয় রেকর্ড স্পর্শ করে। প্রতিযোগিতায় মহীশূরের শীলা পল বালিকা বিভাগে মোট ছ'টি স্বর্ণ-পদক লাভ করে অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি ৫০ মিটার দৌড় (৭-২ সেঃ), ১০০ মিটার দৌড় (১৩-৪ সেঃ), ২০০ মিটার দৌড় (২৮-২ সেঃ), ৮০ মিটার হার্ডলস (১৪-৭ সেঃ) এবং লংজাম্পে (১৫ফিঃ ৪½ইঃ) প্রথম স্থান লাভ করেন এবং ৪×১০০ মিটার রীলে রেসে মহীশূরে দলকে প্রথম স্থান পেতে সাহায্য করেন। তাছাড়া তিনি মহিলা বিভাগের ১০০ মিটার দৌড়ে তৃতীয় স্থান পান। গত বছর তাঁরই মত বালিকা বিভাগে ৬টি স্বর্ণ-পদক পেয়েছিলেন ক্রিশ্চন ফোরেজ (মহারাষ্ট্র)—সটপুট, ডিসকাস, জাভেলিন, হাইজাম্প, ৮০ মিটার হার্ডলস এবং ৪×১০০ মিটার রীলে অনুষ্ঠানে।

মহারাষ্ট্রের স্টিফি ডি'সুজা মহিলা বিভাগের ২০০ মিটার দৌড়ে এবার নিয়ে উপর্যুপরি সাতবার প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব লাভ করেছেন। তাছাড়া তিনি এবার ১০০ মিটার দৌড়েও প্রথম স্থান পান। এই অনুষ্ঠানে এবার নিয়ে গত সাত বছরে তিনি ছ'বার প্রথম স্থান অধিকার করলেন। পুরুষ বিভাগের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান লাভ করেছেন মহীশূরের কে এল পাওয়েল। বালকদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে দিল্লীর ই ওবানেয়ী প্রথম স্থান লাভ করেন।

বাংলার পক্ষে এই তিনজন স্বর্ণ-পদক লাভ করেন; পুরুষ বিভাগের কুড়ি হাজার কিলোমিটার ভ্রমণে বিবেকানন্দ সেন, বালক বিভাগের পোল-ভল্টে সুনীল ঘোষ এবং জাভেলিনে সাধন গাঙ্গুলী।

নতুন জাতীয় রেকর্ড

পুরুষ বিভাগ

সটপুট : দিনশ ইরাণী (মহারাষ্ট্র)
দূরত্ব—৫২ ফিঃ ৩½ ইঃ।

মহিলা বিভাগ

৮০০ **মিটার দৌড় :** পি জোসেফ (কেরালা)
সময়—২ মিঃ ৩৭-৯ সেঃ

সটপুট : কমলেশ ছাতোয়াল (মধ্যপ্রদেশ)
দূরত্ব—৩৫ফিঃ ৭½ইঃ

বালক বিভাগ

৪০০ **মিটার দৌড় :** নিওল তিরকি (বিহার)
সময়—৫১-২ সেঃ (হিট)

৮০০ **মিটার দৌড় :** মুনিয়েপ্পা (মহীশূর)
সময়—২মিঃ ১-৭ সেঃ

৪×১০০ **মিটার রীলে :** দিল্লী
সময়—৪৫-১ সেঃ

হপ-স্টেপ-জাম্প : যোগেন্দ্র সিং (উত্তর-প্রদেশ)
দূরত্ব—৪৭ফিঃ ১ইঃ

বালিকাদের নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পূর্বের ভারতীয় রেকর্ড স্পর্শ করেছে।

২০০ **মিটার দৌড় (হিট) :** শীলা পল (মহীশূর)
সময়—২৮-১ সেঃ

॥ এক নজরে ॥

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪৬তম টেস্ট সিরিজে (১৯৬২-৬৩) যে সব খ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগদান করেছিলেন, বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলার পর বর্তমানে তাঁদের খেলার ফলাফল কি রকম দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। নীচের পরিসংখ্যান তালিকাটি পাঠকদের সে কৌতূহল চরিতার্থ করবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে এবং এ্যালেন ডেভিডসন টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নীল হার্ভে ৭৯টা টেস্ট খেলায় মোট ৬,১৪৯ রান করেছেন। তিনি ছাড়া টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৬০০০ অথবা তার বেশী রান করেছেন মাত্র এই তিনজন—ওয়াল্টার হ্যামন্ড (৭,২৪৯), স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (৬,৯৯৬ রান) এবং স্যার লিওনার্ড হাটন (৬,৯৭১ রান)। সুতরাং এই তালিকায় নীল হার্ভে পেয়েছেন চতুর্থ স্থান। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনোর টেস্ট ক্রিকেটে ২০০০ রান পূর্ণ করতে আর মাত্র ৩০ রানের প্রয়োজন। এই ৩০ রান করতে পারলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ২০০০ রান এবং ২০০ উইকেট লাভের রেকর্ড তিনিই সর্বপ্রথম স্থাপন করবেন।

ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার ব্রায়ান স্ট্যাথাম ২৪২টি উইকেট পেয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ্যালেক বেডসারের সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার পূর্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। বর্তমানে স্ট্যাথামের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো (২৩৬ উইকেট) এবং ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যান (২৩৬ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া

	মোট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান*	সেঞ্চুরী সংখ্যা
নীল হার্ভে	৭৯	৬,১৪৯	২০৫	২১
রিচি বেনো	৫৯	১,৯৭০	১২২	৩
ডেভিডসন	৪৪	১,৩২৮	৮০	[illegible]
ও'নীল	২৮	২,০৩২	১৮১	[illegible]
বব্ সিম্পসন	২২	১,১৭৩	৯২	[illegible]
কেন ম্যাককে	৩৭	১,৫০৭	৮৯	[illegible]

বোলিং

	রান	উইকেট
ডেভিডসন	৩৮২৮	[illegible]
রিচি বেনো	৬২৫৫	[illegible]
ম্যাকে	১৭২১	[illegible]

ইংল্যান্ড

	মোট খেলা	মোট রান	সর্বোচ্চ রান*	সেঞ্চুরী সংখ্যা
কাউড্রে	৬২	৪,২১৪	১৮২	[illegible]
ডেক্সটার	৪০	৩,০৫৪	২০৫	[illegible]
শেফার্ড	১৯	১,০৮৭	১১৯	[illegible]
ব্যারিংটন	৩৭	২,৮৮৫	১৭২	[illegible]
পুলার	২৮	১,৯৭৪	১৭৫	[illegible]

বোলিং

	রান	উইকেট
স্ট্যাথাম	৫৮৬৯	[illegible]
ট্রুম্যান	৫২৩১	[illegible]
ডেক্সটার	১৬৮৭	[illegible]

* এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রা[ন]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 8th March, 1963.
40 Neya Paise.

॥ পরলোকে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ॥

উচ্চ আসনের অধিকারিদের মধ্যে একটা মানসিক দৌর্বল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অধিকারীর নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার উপর বিশ্বাস উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায় এবং সেইসঙ্গে অন্যের বুদ্ধি-বিচারকে হেয় করার স্পৃহাও বাড়িতে থাকে। নিজের মানমর্যাদা সম্পর্কে চেতনা ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু অন্যের বেলায় ঐ মর্যাদাজ্ঞান বিপরীত অনুপাতে চলে। যাহা কিছু নিজের প্রাপ্য সে বিষয়ে জ্ঞান ক্রমেই টনটনে হয়। কিন্তু অন্যের সম্পর্কে সে জ্ঞান বা বিচার ক্রমেই কমিতে থাকে। শেষে এই অহমিকা এতই প্রখর হয় যে কোনও সাধারণ লোক সহজ ও সরল পথে ঐ অধিকারী মহাশয়ের কাছে পৌঁছাইতে পারে না, পারে শুধু সেই তোষামোদকারী চাটুকারের দল, যাহাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে লাজ-শরমের কোনও বাধা নাই এবং যাহারা জানে যে অধিকারী মহাশয়ের আত্মম্ভরিতাকে তোয়াজ করিতে পারিলে তাহাদের নীচস্বার্থসিদ্ধির পথ খুলিয়া যায়। বলা বাহুল্য এ জাতীয় ব্যক্তি চাটুকারদিগের স্বাভাবিক শিকার এবং তাহাদের চক্রান্তের বিষময় ফল অনেক নিরীহ লোককে ভোগ করিতে হয়। এইসব কিছুই যে আমাদের জাতীয় জীবনের নিত্য অভিজ্ঞতার কথা—অবশ্য বিদেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

এই ধারার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল রাজেন্দ্রবাবুর জীবনে। একথা যাঁহারা মনে করেন যে যেহেতু রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তাহার প্রয়োগও কচিৎ কদাচিত হয়, সেই কারণে উঁহার ক্ষেত্রে ঐরূপ আত্মশ্লাঘার স্ফীতি দেখা যায় নাই, তাঁহারা বোধহয় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অধিকার কতটা ছিল তাহা অবগত নহেন।

মনে পড়ে মেশানজোড় বাঁধের ভিত্তিস্থাপনের কথা। এই বাঁধের কাজ আটকাইবার জন্য বহু চেষ্টা উহার পূর্বে হইয়া গিয়াছে। ঐ বাঁধ বাঁধিলে বিরাট তামার খনি জলতলে যাইবে এই ছুতায় একবার সমস্ত কাজ স্থগিত রাখিয়া জিওলজিক্যাল সার্ভেকে দিয়া সমস্ত অঞ্চলটি পরীক্ষা করানো হয়। তাঁহারা দীর্ঘদিনের পরীক্ষার পর ওখানে তামা থাকার সম্ভাবনা নাই বলায় বলা হয় যে যে কর্মচারী ঐখানে পরীক্ষা করিয়াছেন তিনি নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা "প্রভাবিত"। সুতরাং আর একজন ভূতত্ত্ববিদকে দিয়া পরীক্ষা করানো প্রয়োজন যাহাতে বাঙালীর চক্রান্তে বিহারীর সর্বনাশ না হয়। আবার দীর্ঘদিন গেল উপযুক্ত ভূতত্ত্ববিদ জোগাড় করিতে এবং তাঁহার দ্বারা ঐ বাঁধের অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা শেষ করিতে। এবারের পরীক্ষাতেও কিছু পাওয়া গেল না—অবশ্য পাইবার কথাও ছিল না কেননা ওখানের ভূগর্ভে কোনও মূল্যবান খনিজ ছিল না।

ছিল কতিপয় মহাশয় ব্যক্তির আক্রোশ। তাঁহারা মনে মনে আঁটিয়াছিলেন যে ঐ বাঁধের এলাকায় কিছু জমি জলের দরে ক্রয় করিয়া সোনার দরে বেচিবেন। তাঁহারা এইভাবে এক চাল চালিয়া নিশ্চিতে বিলক্ষণ মোটা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী মহল একেবারে পূর্বাহ্নেই জমির প্রকৃত দর নির্ণয় করিয়া আইনানুসারে দখল নেওয়ায় শিকার ফসকাইয়া যায়। তখন তাঁহারা স্থির করেন যে যেকোন প্রকারে কাজটা পণ্ড করিতে হইবে। ঐ কারণে একটি পরীক্ষা হইলেও বিভিন্ন লোককে দিয়া করানো হয়—অবশ্য খরচ দিল দুইবারই পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় কিছু না পাওয়াতে স্থির হয় যে যথেষ্ট দেরী হইয়া গিয়াছে এখন এখন কাজটা ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর করিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসানসোলে আসিলেন। সেখান হইতে স্পেশাল ট্রেনে মেশানজোড় যাইয়া ভিত্তিস্থাপন করিবেন পরের দিন। ভিত্তিস্থাপন হইয়া গেলে বাঁধের কাজ রোখে কে? কিন্তু চক্রান্তকারীরা ছাড়েন নাই। শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত টেলিগ্রাম ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতে লাগিল রাজেন্দ্রবাবুকে জানাইয়া যে কাজটা স্থগিত রাখা নিতান্তই প্রয়োজন নহিলে স্থানীয় লোকদের উপর অবিচার করা হইবে। এই খবরটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ণগোচর হওয়ায় তাঁহারা একজন সাংবাদিকের মারফৎ সব কিছুই রাজেন্দ্রবাবুকে জানাইলেন। তিনি সবকিছু শুনিয়া ঐ চক্রান্তকারীদের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করিয়া যথাসময়ে ভিত্তি-স্থাপনের কাজ শেষ করেন। শুধু তাই নয়, ঐ চক্রান্তকারীদের দলের কয়েকজন ক্ষমতাশালী লোক শেষ চেষ্টায় মেশানজোড়ে দল নিয়া বাধা দিতে যাওয়ায় রাজেন্দ্রবাবু তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ভর্ৎসনা করায় সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

এই নির্লোভ নিষ্কাম সজ্জনের মৃত্যুতে দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ১৯১৭ সাল হইতে গান্ধীজীর পরম অনুগত শিষ্য ছিলেন এবং জ্ঞানতঃ গান্ধীবাদ-বিরোধী কোনও কাজ তিনি করেন নাই।

ভারতরত্ন রাজেন্দ্রপ্রসাদ :: জীবনীপঞ্জী

জন্ম—৩১শে ডিসেম্বর ১৮৮৪

শিক্ষা—পাটনা টি কে ঘোষ স্কুল, এণ্ট্রান্সে প্রথম স্থান অধিকার ও বৃত্তিলাভ। প্রেসিডেন্সী কলেজ, বি-এতে প্রথম; এম-এ, এম-এল এবং ডক্টরেট লাভ। ডন সোসাইটি ও স্বদেশী আন্দোলন।

কর্মজীবন ও রাজনীতি—কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ার—১৯০৬। প্রথমে কলিকাতা ও পরে পাটনা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯১৪র বন্যায় আর্তত্রাণ। ১৯১১তে কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ১৯১৬তে গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ। চম্পারণ সত্যাগ্রহ ১৯১৭। অসহযোগ আন্দোলন ১৯২০ এবং ১৯২২এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-পদ লাভ। ১৯৩০এ কারাবরণ। ১৯৩৪ ও ১৯৩৯এ বোম্বাই এবং কলিকাতায় কংগ্রেসের সভাপতি। ১৯৪২—৪৫এ আগস্ট আন্দোলনে কারাবরণ। ১৯৪৭এ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী, ১৯৪৬—৪৯এ ভারতের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সভাপতিরূপে ভারত-সংবিধান রচনায় সহায়তা; ১৯৫০—৬২এ ভারতের রাষ্ট্রপতি; লিখিত গ্রন্থ "ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড" এবং "অটোবায়োগ্রাফি"। পরলোকগমন—২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩।

জৈমিনি

বাঙালীর সব থেকে বড় গর্ব তার সংস্কৃতি। সে জানে ব্যবসাতে তার স্থান নগণ্য, চাকরীতে অগণ্য হলেও তুচ্ছ, কিন্তু সংস্কৃতিতে সে সুধন্য, সাংস্কৃতিক জগতে তার আসন সু-উচ্চে স্থাপিত।

এই জানাটা বাস্তবের দ্বারা কতোখানি সমর্থিত হচ্ছে, সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ পুরোটাই একটা অভ্যাসের ব্যাপার। আর অভ্যাস এমন ভয়ানক জিনিস যে যাকে নিয়ে অভ্যাস সে বস্তু না থাকলেও কোনো অসুবিধে ঘটে না; অভ্যাসটা চলতে থাকে বেমালুম গতিতে।

সেই যেমন বলেছিলেন জনৈক চা-বিলাসী ভদ্রলোক।

"সকালে উঠেই এক কাপ চা খাওয়া আমার অভ্যাস। তা থাকলেও খাই, না থাকলেও খাই।"

"না থাকলে খাও কী করে?" বিস্মিত বন্ধুর তথ্যানুসন্ধানী প্রশ্ন।

"অভ্যাস যে!" ততোধিক বিস্ময়ের সঙ্গে পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের উত্তর।

একথার আর কোনো উত্তর হয় না। আমাদের সংস্কৃতি-প্রেমও অনেকটা এই ধরনের ব্যাপার।

না হলে এই অজস্র সমস্যা-ভারাক্রান্ত কলকাতা শহরে সংস্কৃতি নিয়ে এত উল্লাস আমাদের জাগে কী ক'রে? নাগরিক জীবনের নাভিশ্বাস শুনে কর্পোরেশন যখন দিশেহারা, সি. এম. পি. ও. স্তম্ভিত এবং সাধারণ মানুষ অবসন্ন; যখন বাজারের থলিতে ডেফিসিট বাজেট, মনের মধ্যে প্রতিরক্ষার দুশ্চিন্তা এবং জলে-স্থলে কলেরা-বসন্তের চিরস্থায়ী আক্রমণ,—তখন, তখনো আমরা ঝড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চাই সংস্কৃতির বালুতে মুখ গুঁজে। পৃথিবীর এ এক অষ্টম আশ্চর্য বটে!

কিন্তু, কী সেই সংস্কৃতি যা নিয়ে আমাদের এত উত্তেজনা? সে কি রামমোহন-বিদ্যাসাগরের চারিত্র? না। সে কি জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা? না, ঠিক তা নয়। সেকি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্র-

নাথের অবদান? কিছুটা তাই বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, তাও ঠিক নয়। এসব জিনিস আমাদের আছে, আমরা তার জন্যে গৌরবান্বিত। কিন্তু কথা কী জানেন, আমরা চলে গেছি একেবারে উৎসে মানে, গাঁয়ের দিকে। গ্রামজীবনের পরিবেশ থেকে আমরা আহরণ করেছি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আনন্দের ভেতর দিয়ে দেশের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে ধন্য হতে চাই আমরা।

অতএব আমরা বাংলার নানা অঞ্চলে জাল বিছিয়ে দিয়েছি। মাঝেমাঝে নাচ-গানের দল এনে করেছি শহরের আসর গুলজার। আর কিছু নয়, নাচ গান এবং সেই রকম অন্য কয়েকটি ব্যাপার। সিনেমা থিয়েটার-জগৎ থেকে বেশ আমাদের লাগে, শহরের প্রান্তে সংস্কৃতি আর টিকিট কিন্তু বাবুরা সাগ্রহে টিকিট কিনে ভিড় জমান উৎসাহী হন, এমনি আমাদের সব প্রোগ্রাম দিয়ে আসর সাজিয়ে পরিবেশন করেছি আমরা। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে। বাংলার লোক-সংস্কৃতির ভগীরথ বলে গৌরবটিও লাভ করেছি।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, আমাদের এই সুযোগ সম্বন্ধে বেয়াড়া প্রশ্ন তুলে বসেন কেউ কেউ। তাঁরা বলেন

শহরের নিরাপদ দূরত্বে ইলেকট্রিক শোভিত মঞ্চের সামনে বসে পান চিবোতে-চিবোতে এভাবে বাংলার সংস্কৃতিকে পকেটস্থ করার বাসনা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। শহরের বাবুরা ছুটি-ছাটায় বাইরে বেড়াতে গিয়ে যে উৎসাহের প্রাবল্যে চার আনা দামের কপিকে চৌদ্দ পয়সায় কিনেতে দেখলে বলেন 'জাপ্তি', সেই মনোভাব নিয়ে সংস্কৃতির পসরা ঘরে তোলা যায় না। দেশের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা দীর্ঘদিনের সাধনা এবং পরিশ্রমের ব্যাপার। এবং তার জন্যে সংস্কৃতির উৎসের সঙ্গে বাস্তবিক যোগা-যোগের যেমন দরকার তেমনি দরকার নাচ-গান ছাড়াও লোকায়তের সুবিস্তীর্ণ এবং বহুমুখী ব্যাপারেও অভিনিবেশ প্রয়োজন। এসব বাদ দিয়ে সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে গেলে কিংবদন্তী সংগ্রহের মতো একটা যেনতেন চমকপ্রদ হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে সংস্কৃতিরও যেমন কিছু এসে যায় না, লোকেরও তেমনি কিছু আয়ত্ত হয় না।

আপত্তিকারীদের দ্বিতীয় যুক্তি হল, এই যে সব নাচ-গান এনে হাজির করা হয় শহরের মঞ্চে, প্রোগ্রামে তাদের নামে কোনো কোনো অঞ্চলের ছাপ আঁকা থাকলেও, অনেক সময়েই দেখা যায় সেই-সব অঞ্চলে ঐ ধরনের আনন্দ-উৎসবের শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত উবাও হ'য়ে গেছে অনেক আগেই। এখন যা উপস্থিত করা হয়, তা মোটামুটি একটা জনশ্রুতি, এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির রুজি-রোজগারের উপায় মাত্র। তাছাড়া এই সব সংস্কৃতি-বাহক যেহেতু সংস্কৃতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী নন, বড় জোর সেলসম্যান বা ক্যানভাসার, সেইজন্যে বেসাতির উপর কড়া জৌলুশ লাগানোর উৎসাহে তাঁরা অনেক সময় আসল জিনিসের সঙ্গে নকলের খাদ মেশাতেও পিছ-পা হন না। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সিনেমা-থিয়েটার দেখা চোখকে টানতে হবে তো! যথাসাধ্য গেঁয়ো-গেঁয়ো ভাবটা বজায় রেখে একই সংগে একটু পাউডার-অলংকার ছোপ ধরাতে হয় সেই জন্যে। অর্থাৎ যাকে বলে, 'অশিক্ষিত পটুত্ব' তা নয়, সুশিক্ষিত অপটুত্বের সুচিন্তিত প্রয়োগ। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্যাশ-কাউন্টারের সাফল্য এ পথে সুনিশ্চিত।...

এঁদের এ-সব বাঁকা কথায় আমরা অবশ্য ভড়কে যাই নি একটুও। এঁরা যে-সব বড় বড় কথা বলেন, সেগুলো শুনতে যতোই ভালো লাগুক, বোকা বা পাগল ছাড়া সে পথে পা বাড়াতে সাহস পাবেন কম লোকই। সংস্কৃতির ক্ষেতটুকু জমি-তৈরি করার ব্যাপার তা তো আমরা পঞ্চাশ বছর আগেই শেষ করে ফেলেছি। এখন ফসল তোলার সময়, ফসল তুলব না? যদি বলেন, এ জমি বারবার ক'রে তৈরি করতে হয়, বারবার ছড়িয়ে দিতে হয় এতে বীজধান, আর তবেই এর ফসলের ভাঁড়ার কখনো শূন্য হয় না—তাহলে বলব, আপনারা বড় প্রাচীনপন্থী, আধুনিক জগতের আসল কায়দাটাই অজানা রয়ে গেছে আপনাদের। এখন কাজের চেয়ে বড় হল সাজ; নিচের ফাঁক যতো বিরাটই হোক, ওপরের জাঁকটা ঠিকঠাক থাকলেই সেলাম জুটে যাবে খোশমেজাজে। আজকের দিনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কোপাতে পাওয়া পণ্ডশ্রমের নামান্তর। ওতে হাততালি পাওয়া যায়, কিন্তু হাত ভরে না।

আর, হাঁ, টাকা-পয়সার ব্যাপারটা? দেখুন, মানে টাকার কথা যারা তোলে তারা নেহাত পরশ্রীকাতর মানুষ। কিন্তু ধরুন, আসেই যদি কিছু এতে, ক্ষতি কী? ফাঁকি দিয়ে তো নিচ্ছি নে! কিছু দিচ্ছি, কিছু নিচ্ছি, লজ্জা কী এতে?

যদি বলেন ব্যবসার মতো হ'য়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা চোরের মায়ের চেয়েও বড় গলায় বলব: কখনো না, একেবারেই না। কিন্তু, ইয়ে মানে ধরুন যদি ব্যবসাই হয়, দোষ কী তাতে? ডিম্যান্ড না থাকলে সাপ্লাই টেকে না। লোকে যদি চায় তো জোগান দিতে আমাদের দোষটা কী? তবে হাঁ, যদি বলেন, বহুদিন ধরে চেষ্টা ক'রে বেশ আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছি আমরা, চারদিকে প্রচারের ঢাক পিটে লোককে আগ্রহী করে তুলেছি—মানে বেশ একটা লার্জস্কেল বিজনেস্-এর মতো পার্ফেক-শানে নিয়ে এসেছি ব্যাপারটাকে, তাহলে লজ্জিত নয় বরং গর্বিতই বোধ করব আমরা। বাঙালী তেজস্বীন্দী না চিনুক, ডেবিটে-ক্রেডিটে অসহায় বোধ করুক, নাচ-গানের মধ্যেই সোনার মতো দামী শাঁস আবিষ্কার করেছে সে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই তার অদ্বিতীয় আবিষ্কার। দেখবেন, সারা ভারতবর্ষেই এর অনুকরণ হ'তে থাকবে অচিরে।

তাড়াতাড়ি একটা পেটেণ্ট নিয়ে নিলে কেমন হয়?

শ্রীগৌরাঙ্গ ও সাহিত্যের নতুন পথ

রাজীব কুমার চক্রবর্তী

প্রেমবিগ্রহস্বরূপ বঙ্গ সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত ধর্মমতে ভক্তমনই প্রধান—জ্ঞান ও কর্ম মুখ্য নয়—গৌণ। জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ প্রেমধর্মের অপরূপ মাহাত্ম্যে হল নিশঙ্ক স্থিতধী এবং মুক্ত মানসের অধিকারী নবভাবোদ্ভুত এক বলিষ্ঠ জাতি। মহাপ্রভুর দ্বিধামুক্ত পদক্ষেপে কাব্যলক্ষ্মী হল নতুনভাবে অনুপ্রাণিত। বাঙলা সাহিত্যের সেই মহোৎসবে একমাত্র নায়ক তিনি। তাঁর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কনককান্তি ভক্তকবির মনকে অপরূপ রূপমাধুর্যে করল অভিষিক্ত। কৃষ্ণপ্রেমতনু চৈতন্যদেব গয়া হতে প্রত্যাবর্তনকালে কৃষ্ণদর্শন লাভ করেন। সে সময় থেকে কৃষ্ণভজনাই ছিল তাঁর একমাত্র আদর্শ। এবং ভক্তবৃন্দকে ঐ আদর্শ অনুসরণে উপদেশ দিতেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর ন্যায় বিগ্রহের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, যা মহাপ্রভুর জীবনে ও আদর্শে সম্পূর্ণ একীভূত হয়ে যায়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখেছেন—"তাঁহার অলোকসামান্য সমুন্নত আকৃতি ও অসাধারণ সৌন্দর্য... তাঁহার প্রকৃতির দুর্দমনীয়তা...তাঁহার যে মধুর মূর্তি ও অনিরত মধুর ব্যবহার, তাহা নদীয়ার সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছিল তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।...তাঁহার সেই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত সুবিশাল সমুন্নত ও সুগঠিত কনককান্তি গৌরদেহে যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাহা দীন দুর্গত, অজ্ঞ অসহায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর ব্যথিত হৃদয়ে সাংসারিক সকল জ্বালা মিটাইয়া দিবার জন্যই যে অলোকসামান্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।"

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যজীবন ভক্তকবিবৃন্দকে নতুন শিল্পসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করল।

আজি আর কোন অবতার গাওনা নাঞি।
সর্ব অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি।।

চৈতন্য-কীর্তন স্বতঃস্ফূর্ত রূপ লাভ করে। নবপ্রাণশক্তিতে উদ্বেলিত ভক্তমনে জন্ম নিল মহৎ শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকরা। চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাস্বর আলোকে মধ্যযুগের বাঙালী মনে যে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হল তার মধ্য দিয়ে শিল্পী ও কবিকুলের কণ্ঠে নতুন বাণী শোনা গেল। "মানুষী-প্রেমের সুড়ঙ্গ-পথে তাঁহাদের হৃদয়গুহাগহ্বরে তখন তরঙ্গোচ্ছ্বাস আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারই প্রচণ্ড অভিঘাতে ধর্মানুশাসন অধ্যাত্মবিশ্লেষণ ও পূর্বাচরিত বিধিবন্ধনের অনড় প্রস্তরস্তূপও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ভাসিয়া গেলে, শিল্পী ও কবির বন্ধনমুক্তি ঘটিল এবং মুক্তির প্রথম আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহারা যে কাব্যকল্লোলের সৃষ্টি করিলেন তাহাই যেন নানাভাবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া বঙ্গভারতীর সুপ্রতিষ্ঠাকে ঘোষণা করিয়া দিলে আধুনিক সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইয়া গেল।"

চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্ত অবলম্বনে কাব্য রচনা তাঁর জীবৎকালে এবং তিরোভাবের পর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দের জীবনীগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। "...ইহাতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, তাঁহার সর্বত্যাগী পার্ষদগণের পূতজীবনকথা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণব সমাজের বাহিরে বৃহত্তর বাঙালী হিন্দু সমাজ, হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই জীবনীকাব্যগুলি শুধু জীবনী মাত্র হয় নাই,—ইহাতে গৌড়, বিশেষতঃ নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, নীলাচল ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের যে-প্রকার বাহুল্য দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলির সাহায্য অপরিহার্য।"

প্রাকচৈতন্য যুগে বাংলা ভাষায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার, শাস্ত্রের অনুবাদ ও টীকা নির্ণয় এই ছিল সাহিত্যসৃষ্টির মূল বিষয়। জীবনচরিত রচনার কোন প্রচলন ছিল না। দেশের সংকটজনক পরিস্থিতি জীবনচরিত রচনার অনুকূল ছিল না। নবদ্বীপের সংস্কৃতি তখন চলেছে এক ভাঙনের মধ্যদিয়ে। এই বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনে 'আত্মবোধের ঋষি শ্রীচৈতন্য জাতির নবজন্ম-পত্রিকা উন্মুক্ত করেন'।

চৈতন্য আবির্ভাবে সমাজজীবনে সুস্থতা আসবার সংগে সংগে সাহিত্য ক্ষেত্রেও এল যুগান্তর। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যেও নবভাব প্লাবন নিয়ে এল মহৎ পুরুষদের জীবনকাহিনী সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য হয়ে দেখা দিল। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যে জীবন-চরিতের অভাব নেই—তবুও একথা সত্য চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে সর্বপ্রথম আধুনিক-যুগলক্ষণাক্রান্ত জীবন-চরিত রচনার সূত্রপাত হয় বাঙলা সাহিত্যে। চরিতকারগণের সকলেই ভক্ত বৈষ্ণব হওয়ায় চরিতাখ্যান ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের নিখুঁত বিবরণ না হয়ে দর্শন ও ভক্তিরসাশ্রিত এক অভূতপূর্ব রূপালেখ্যরূপে বিধৃত হয়েছে।

মুরারি গুপ্ত রচিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীচৈতন্যের প্রথম-জীবনী-গ্রন্থ। মুরারি গুপ্ত ছিলেন মহাপ্রভুর লীলাসহচর। চৈতন্যদেবের জীবনী-কাব্যগুলির মধ্যে কয়েকখানি হল—গোবিন্দদাসের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত।

'গোবিন্দদাসের কড়চা' গ্রন্থখানি নিয়ে নানাবিধ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে গ্রন্থখানিকে জাল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।

গুরু নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল নিত্যানন্দপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু এবং অন্যান্য চৈতন্যদেবের সহচরগণের কাছ থেকে। বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থখানি আদৃত। 'চৈতন্যভাগবতে'র অন্যতম আকর্ষণ আবেগ ও কবিত্বের মনোরম সম্মিলন। নরসিংহ সরকার ঠাকুরের আদেশে লোচনদাস রচনা করেন 'চৈতন্যমঙ্গল'। দীর্ঘকাল যাবৎ এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হয়েছে। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' একটি আকর্ষণীয় জীবনীকাব্য। কবি বৈষ্ণব নেতৃবর্গের নির্দেশিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই জীবনচরিতে বহু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। অসাধারণ পণ্ডিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্যচরিতামৃত' সর্বাপেক্ষা সমাদৃত গ্রন্থ। জীবনকথা—ভক্তি ও দার্শনিক চিন্তার অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে গ্রন্থখানিতে। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য সমাকীর্ণ চরিতাখ্যান শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যে অনন্য।
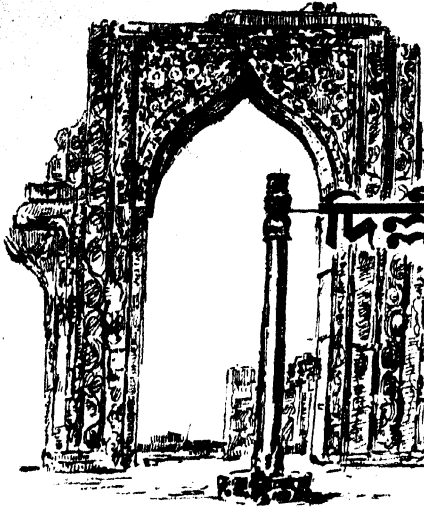
দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য

কদিন আগে জওহরলালের বাড়ীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। মিটিং শেষ হবার পর অধিকাংশ করস্পনডেন্টই ছুটলেন আট নম্বর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোড। কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারীর ব্রিফিং। যাঁরা আরো একটু উৎসাহী, তাঁরা পরিচিত দু'একজন ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বরদের বাড়ী। কিন্তু শীতের শেষের সেই সন্ধ্যায় ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং শেষে ক'জন নেতা যে তিন নম্বর ইয়র্ক প্লেসে (অধুনা মতিলাল নেহরু প্লেস) ঢুকলেন, সে কথা বোধকরি অধিকাংশ সাংবাদিকই জানতেন না বা জানার তাগিদ বোধ করেননি। আমারও যে ঠিক মনে ছিল, তা নয়। অতুল্যদার বাড়ী থেকে সি-টি-ও ঘুরে বাড়ী ফেরার পথে নিতান্তই হঠাৎ মনে পড়ায় গাড়ী ঘোরালাম টি, টি, কে'র বাড়ী। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বেরিয়ে এলেন শাস্ত্রী-মোরারজী-টি, টি, কে। পিছন পিছন এলেন কৃষ্ণচন্দ্র—স্বর্গতঃ পন্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের ছেলে।

স্বর্গতঃ পন্থজীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নেহরু, টি টি কে, শাস্ত্রী, মোরারজী প্রভৃতিকে নিয়ে একটা ছোট্ট কমিটি হলো এই মিটিং'এ। কে সি পন্থ হলেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী।

......টি টি কে'র বাড়ীর বারান্দায় বসে বসে অনেক কথাই মনে পড়ছিল। ভাবছিলাম, এই ত সেদিন পর্যন্ত এই বিরাট মানুষটি বেঁচেছিলেন; আর কত অগণিত মানুষই না আসত তাঁর কাছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসতেন নানান রকমের পরামর্শ নিতে; কিন্তু হাজার হাজার লোক আসত নিছক তাঁবেদারী করতে, শ্রদ্ধা জানাতে অথবা শুধু দেখতে। আজ তাঁরা সব কোথায়! পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান বা তাঁদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের বিধি আছে আমাদের শাস্ত্রে। ভাটপাড়ার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমি নই; পিতৃপুরুষ এই পিণ্ড খেতে আসেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে মনে হয় এইসব ক্রিয়াকর্মের মূল উদ্দেশ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অধুনাকালে আমরা আধুনিক হবার পর পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করাই শুধু বন্ধ করিনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলে গেছি।

দিল্লীর নেতাদের সম্পর্কে বাংলাদেশে খুব সুন্দর মনোভাব নেই, একথা সর্বজনবিদিত। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধাচরণই আপাততঃ এর প্রধান কারন। রাজনীতির কথা বাদ দিন; রাজনীতিই তো আর সমগ্র জীবন নয়। দরদী মানুষ হিসেবে তাই পন্থজীর কথা ভোলার নয়।......জানকীকে বলে বেলা সাড়ে পাঁচটায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো। নভেম্বরের গোড়ার দিকে; দিনের বেলায় বিশেষ গরম জামা না পরেই বেরিয়েছিলাম। মতলব ছিল সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরব। পন্থজীর বাড়ী গিয়ে দেখি ড্রইংরুম ভর্তি লোক। লোক বললে ঠিক বলা হয় না; কারণ তাঁর বারো আনাই ভি-আই-পি। চোখের সামনে দেখলাম, ইনি আসছেন, উনি যাচ্ছেন এবং এমনিভাবে আমার যখন ডাক পড়ল তখন ঘড়িতে দেখি ন'টা চল্লিশ। আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন; কারণ সাড়ে পাঁচটায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তার প্রায় আড়াই শ' মিনিট পরে দেখা হলো! পন্থজীকে যাঁরা জানতেন তাঁরা কিন্তু আশ্চর্য হবেন না। (তখন উনি উত্তর প্রদেশের চীফ্ মিনিষ্টার। কোন একটা বিশেষ কারণে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন থেকে তাঁর ট্রেন ছাড়ার কথা সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ। পন্থজী যখন হাজির হলেন তখন রাত্রি নটা। তারপর থেকে পন্থজীর সব বক্তৃতা আগে থেকে রেকর্ড করে রাখার নিয়ম হয়ে গেল।) যাইহোক পন্থজীর ঘরে ঢুকতেই বল্লেন, কি, গরম জামা নেই কেন? আমি উত্তর দেবার আগেই ঘণ্টা বাজিয়ে জানকীকে ডাক দিলেন। একটা গরম চাদর এনে দিতে বল্লেন। চাদর এলো; কিন্তু চাদর নিতে আমি কুণ্ঠা প্রকাশ করলাম। তিনি সোজা জানিয়ে দিলেন, চাদর গায় না দিলে কথা বলবেন না। চাদর নিলাম, কথা হলো।

রায়পুর কংগ্রেস থেকে ফিরছি। আমারই কম্পার্টমেণ্টে ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের একজন পরিচিত মন্ত্রী; ইনি ইতিপূর্বে এক বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার চীফ্ মিনিষ্টার ছিলেন। এই রাজ্যের নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর গদী দখল নিয়ে দুই কন্যার মধ্যে লড়াই চলছিল। এর এক কন্যা ছিলেন এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে। এই নবাববাড়ীর চক্রান্তে ভারতের বহু সম্পদ দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল বা যাচ্ছিল। বহু মন্ত্রীর কাছে শুনেলাম, পন্থজী কিভাবে তা রোধ করেছেন। দিল্লী ফিরে এক লম্বা-চওড়া রিপোর্ট টাইপ করে সোজা পন্থজীর বাড়ী হাজির। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করতেই টাইপ-করা কাগজ কটি এগিয়ে দিয়ে বল্লাম: কণ্ট্রাডিক্ট অর কনফার্ম। রিপোর্টটি পড়ে শুনে ছাপতে মানা করলেন। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটিতে পন্থজী তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সে কাহিনীই তিনি ছাপতে মানা করে দেশের লোকের কাছে নিজের এক মস্ত পরিচয় গোপন রাখলেন। বিনা কৃতিত্বেই খবরের কাগজের পাতায় নাম ছাপান আমাদের অধিকাংশ পলিটিসিয়ানদের চিরাচরিত নীতি; কিন্তু পন্থজী ছিলেন এর একটি জ্বলন্ত ব্যতিক্রম।

বহুদিন পর পন্থজী এলেন ভবনগর কংগ্রেসে। ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং'এ যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা। 'কিয়া সব ঠিক-ঠাক্ হ্যায়'—জিজ্ঞেস করলেন পন্থজী। কোথায় ঠিকঠাক, খেতেই পাচ্ছি না।

বিকেলবেলায় প্রেস রুমে বসে কি যেন টাইপ করছি। পন্থজীর খাস চাপরাশী ছুটতে ছুটতে এসে বল্লো, 'সাহাব আপকো ঢুড়তা হ্যায়। দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি লাঠি ভর দিয়ে গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পন্থজী। 'তোমারা খানা গাড়ীকা অন্দর হ্যায়, খা লেও।' পন্থজী ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং'এ চলে গেলেন; আর আমি ভবনগরের মহারাজার গোলাপ বাগানে' ঢুকে মহানন্দে খেতে বসলাম।

॥ জ্যান্তো কালী ॥

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ খুলে বসেছিলুম। প্রথমেই চোখে পড়ল এই দুটি লাইন—

"আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছে গুচ্ছে ধরিয়াছে ফল।"

সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন আগেকার কথা মনে পড়ল। কতদিন আগেকার? তা পঁইষট্টি কি ছেষট্টি বৎসরের কম হবে না। আমি তখন বালক।

বাড়ীর ছাদের উপরে আমারও অধিকার ছিল দ্রাক্ষাকুঞ্জবন এবং তাতেও ধরত গুচ্ছে গুচ্ছে ফল।

ছাদের উপরে দ্রাক্ষাকুঞ্জবন? শুনে অবাক হচ্ছেন?

বাবা আর মা আমাকে ও আমার দুটি বোনকে নিয়ে বদলি হয়ে এক বৎসরকাল রাওলপিণ্ডি সহরে বাস করেছিলেন।

রাওলপিণ্ডিতে যেমন উৎকট শীত, তেমনি ভয়াবহ গরম। কতকটা আরামে থাকবে বলে বাসিন্দারা সেখানে পাকা বাড়ীর ছাদের উপরেও তক্তা পেতে প্রায় একফুট পুরু মাটি বিছিয়ে রাখত। এবং সেই মাটির ছাদের উপরে দেখা যেত অযত্নবর্দ্ধিত আগাছার মতই দ্রাক্ষাকুঞ্জের পর দ্রাক্ষাকুঞ্জ।

আমাদের বাসাবাড়ীর ছাদের উপরে ছিল দুটি দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং তাদের মধ্যে ফলত থোলো থোলো আঙুর। যখন খুসি আঙুর খেতুম এবং অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতুম দূরে— বহুদূরে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত চিরতুষারধবলিত গিরিমালার পিছনে হারিয়ে গিয়েছে দিকচক্রবাল রেখা। দেখে দেখে সাধ আর মিটত না, মনে মনে রচনা করতুম কত সব বিচিত্র দিবা স্বপ্ন! গ্রীষ্মকালেও সেই গিরিমালার সাদা বরফের পোষাক খসে পড়ত না। সে বৃহৎ গিরিমালার নাম আজও আমি জানি না।

দ্রাক্ষাকুঞ্জের কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপথে দেখা দিলে আর এক অদ্ভুত দৃশ্য—একেবারে জলজ্যান্তো কালী!

আমার বাবা-মার গুরুদেব ছিলেন জাতে রাঠোর, নাম পণ্ডিত বিদ্যাধর। শুনেছি তিনি রাজপুতানার কোন্ রাজবংশের সন্তান— অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করেন। নানা দেশে ঘুরে অবশেষে বাংলাদেশে এসে স্থায়ী হন। আমাকে তিনি অতিশয় ভালোবাসতেন এবং আমি তাঁকে 'দাদামশাই' বলে ডাকতুম।

একদিন পণ্ডিতজী আমাকে ডেকে বললেন, "জ্যান্তো কালী দেখবি বেটা?"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'জ্যান্তো কালী?"

তিনি বললেন, "হাঁ বেটা। আজ নাকি তিনি পিণ্ডি সহরে আসবেন। আমার সঙ্গে আয়।"

আমি সাগ্রহে তাঁর সঙ্গ নিলুম। ভাবতে ভাবতে চললুম সত্যসত্যই কি জ্যান্তো কালী দেখা যায়?

তখন রাওলপিণ্ডি সহরে অসংখ্য হিন্দু বাস করত এবং বলা বাহুল্য, তার অধিকাংশই পাঞ্জাবী।

সারা সহরে সে কী উত্তেজনা— সকলেরই মুখে জীবন্ত কালীর কথা। রাস্তায় রাস্তায় ভীড় আর ধরে না— সকলেই দলে দলে ছুটে চলেছে জীবন্ত কালীর দর্শন পাবার আগ্রহে।

খানিক পরেই অসংখ্য কণ্ঠে শোনা গেল—"জয় কালীমায়ী-কি জয়, জয় কালীমায়ী কি জয়, জয় কালীমায়ী-কি জয়"!

হেমেন্দ্রকুমার রায়

তারপর সে কি হৈ-হৈ, কি হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, ঠেলা ঠেলি! দীর্ঘদেহ সব পাঞ্জাবী যেন একেবারে পাগল হয়ে গেল! আমি কিছুই দেখতে পেলুম না, উল্টে সেই জনতারণ্যের মাঝে প'ড়ে আমার ক্ষুদ্র দেহ প্রায় পিষ্ট হবার উপক্রম! দাদামশাই তাড়াতাড়ি আমাকে কাঁধের উপরে তুলে নিলেন।

তাঁর স্কন্ধদেশে আসীন হয়ে সবিস্ময়ে দেখলুম, একটি প্রায় আমারই বয়সী সুন্দরী মেয়ে বিরাজ করছে বেগে ধাবমান জনতার মাথার উপরে! সে কিসের উপরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা বুঝতে পারলুম না—কিন্তু এইটুকু দেখলুম সে উলঙ্গিনী, তার হাতে খাঁড়া না থাকলেও তার এক হাত উপরদিকে তোলা আর এক হাত নামানো এবং জিভ বার ক'রে সকলকে সে যেন ভেংচি কাটছে!

আমাকে নামিয়ে দিয়ে দাদামশাই হাসতে হাসতে বললেন, "দেখ্‌লি বেটা?"

আমি অতৃপ্ত কণ্ঠে বললুম, "এ কি রকম কালী? রং কালো নয়, হাতে খাঁড়া নেই—"

দাদামশাই আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, "চল, এইবারে ফেরা যাক্।" তাঁর মুখে-চোখে জেগে আছে কৌতুকের আভাস। বোধহয় কালীঠাকুরকে তাঁরও পছন্দ হয়নি।

* * *

তারপর সপ্তাহকাল ধ'রে শোনা যেতে লাগল কতরকম জনরব—তার কোন কোনটা একেবারেই আজব!—কালীমায়ের সামনে নাকি কাঁড়ি কাঁড়ি দর্শনীর টাকা পড়ছে—কয়েকজন ধনপতি নাকি ঢেলে দিয়েছেন কয়েক হাজার টাকা! দুই ব্যক্তি নাকি নিজেদের জিভ কেটে উপহার দিয়েছে এই আশায়, মায়ের বরে তাদের অর্থ ও পরমার্থ লাভ তো হবেই এবং সেইসঙ্গে তাদের কাটা জিভও আবার নতুন ক'রে গজিয়ে উঠবে!

দাদামশাই বললেন, "চল্ বেটা, আর একবার কালীমায়ের খেল্ দেখে আসি।"

সেদিন গিয়ে দেখলুম অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা! জ্যান্তো কালী মৌনমুখে বসে আছেন, আজ আর মা ভেংচি কাটছেন না এবং বিবস্ত্রাও নন। সামনেই ধুনী জেলে হোম হচ্ছে। ধুনীর এপাশে একখানা বারকোশের মত মস্ত থালা—তার উপরে জমে আছে রাশীকৃত টাকা, নোট ও সোনার গহনা প্রভৃতি! আর একদিকে কাতর মুখে দুই হতভাগ্য মূর্তি উপবিষ্ট—জ্যান্তো কালীর চরণে জিহ্বা উপহার দিয়ে এখন বোধকরি মজাটা টের পাচ্ছেন—কারণ তাদের ব্যাদিত মুখ দিয়ে কর্তিত রসনা থেকে ক্রমাগত ঝরে পড়ছে রক্তমিশ্রিত রসধারা!

কী জনতা! দম বন্ধ হয়ে আসে! কালীমায়ের নামে অশ্রান্ত জয়নাদে কানে তালা ধরে যায়। প্রকাণ্ড ঘর, কিন্তু তিলধারণের ঠাঁই নেই।

দাদামশাই অধীর স্বরে বললেন, "চল্ চল্, এ-নরক নরক থেকে চল্!"

লোকের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আমি বললুম, "দাদামশাই, তোমার জ্যান্তো কালীর পায়ে নমস্কার।"

দাদামশাই বললেন, "আমার কালী কি রে বেটা! আমার কালীর দেখা এত সহজে পাওয়া যায় না।"

আরো হপ্তাখানেক গেল। আরো আজব আজব গুজব শুনলুম।

তারপর একদিন দাদামশাই এসে বললেন, "শুনেছিস্ বেটা, টাকাকড়ি আর দলবল নিয়ে জ্যান্তো কালী কোথায় বেমালুম অদৃশ্য হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আর যারা জিভ কেটে ফেলেছিল তারা?"

—"তারা কাঁদতে কাঁদতে থানায় নালিস করতে গিয়েছে।"

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা বাজেট

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

একাধারে উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার বিপুল ব্যয়ভার বহনের উদ্দেশ্যে সমগ্র জাতিকে যে এবার বিরাট ত্যাগ-স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হতে হবে তা একরকম জানাই ছিল সকলের। তাই বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতির ভাষণে যখন বহু নূতন কর-ধার্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয় তখন দেশবাসী তাতে খুব বেশী বিচলিত হয়নি।

কিন্তু গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বজ্রসম ভয়ংকর যে বাজেটটি উপহার দিয়েছেন দেশকে তাতে অতিবড় দেশপ্রেমিকের সহানুভূতিশীল হৃদয়ও আতংকে প্রায় স্পন্দনহীন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী আর্থিক বছরে পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হবে ১৮৫২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। অথচ বর্তমান করহারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ১৫৮৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং প্রস্তাব করা হয়েছে যে, ঘাটতি

পূরণের জন্য নূতন কর ধার্য করে ২৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা হবে এবং তারপরেও যে ১৫১ কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে তা পূরণ করা হবে ফালতু নোট বাজারে ছেড়ে।

কেন্দ্রীয় সরকার-পরিকল্পিত এই বিপুল ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক বরাদ্দ করা হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে। খুবই দুঃখের বিষয় যে, এই গরিব দেশের কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থ হতে ৮৬৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করে ব্যয় করা হবে শুধু কামান, গোলাগুলী নির্মাণে। কিন্তু উপায়ই বা কি আছে এ ছাড়া? নীতিজ্ঞানহীন দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র শান্তিকামী ভারতের জীবনকে এমনই দুর্বিষহ করে তুলেছে যে, আজ লাঙ্গলের ফলার সঙ্গে মারণাস্ত্রও শাণিত করা ছাড়া উপায় নেই তার। তাই চলতি আর্থিক বছরের জন্য যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে প্রারম্ভিক ব্যয় ধার্য হয়েছিল ৩৭৬ কোটি টাকা, আগামী আর্থিক বছরে সে জায়গায় প্রারম্ভিক ব্যয় ধার্য হল ৮৬৭ কোটি টাকা। অবশ্য চলতি বছরেই চীনের অতর্কিত আক্রমণে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার পূর্ব পরিকল্পনা প্রায় সম্পূর্ণই বানচাল হয়ে যায় এবং অতি দ্রুত আরও ১২৯ কোটি টাকা ব্যয় করে ধাবমান চীনা সৈন্যবাহিনীর গতিরোধের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই সাময়িক, প্রয়োজন পূরণের আশু ব্যবস্থা। এবার তু আর সেভাবে চললে চলবে না। তাই ৮৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করে একেবারে গোড়া থেকে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতি মিত্রদেশগুলির যে সব সমর-বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি এসেছিলেন এদেশে, তাঁরা এক-বাক্যে বলে গেছেন, একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে। আমাদের বীর সৈনিকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁরা, কিন্তু সেই সঙ্গেই বলেছেন, আধুনিক সমর-বিদ্যায় পারদর্শী চীনের বিপুল সেনা-বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে ভারতের প্রত্যেকটি সৈন্যবাহিনীকে। আধুনিক স্বয়ংচালিত সমরাস্ত্রও বিপুল পরিমাণে নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে আর কোনমতেই দ্বিধা বা কার্পণ্য করা চলবে না।

প্রতিরক্ষার এই গুরুদায়িত্বের সঙ্গে আছে রাষ্ট্রের বৈষয়িক উন্নয়নের গুরুতর দায়িত্ব। একথা আজ সর্ববিদিত যে, জাতির শক্তির বিস্তার শুধু সমরাস্ত্র দিয়ে হয় না। উপবাসক্লিষ্ট অনগ্রসর জাতির প্রতিরোধ-শক্তি শুধু অস্ত্রের জোরে দুর্জয় করে তোলা যায় না। তাই বলা হয়, আধুনিক যুদ্ধের প্রথম সাফল্য কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে, তার-পর সমরাঙ্গনে। সমরাস্ত্রের প্রতিরোধও ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও ব্যর্থ হয়নি শক্তিশালী জাতির স্বাধীনতারক্ষার শপথ। এই কারণে অন্য কোন প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে সদ্যস্বাধীন ও উন্নয়নকামী জাতি তার গঠনমূলক কর্মসূচী স্থগিত রাখতে পারে না। তাই তৃতীয় জাতীয় যোজনার কোনই পরিবর্তন করা হয়নি এবং ঐ বাবদ আগামী আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করবেন ১৬৫১ কোটি টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় পরি-কল্পনা বাবদ ব্যয় হবে ৯০১ কোটি টাকা ও রাজ্য পরিকল্পনা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা। তৃতীয় জাতীয় যোজনায় যে ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তার ২২ শতাংশ আগামী আর্থিক বছরে ব্যয় করা হবে।
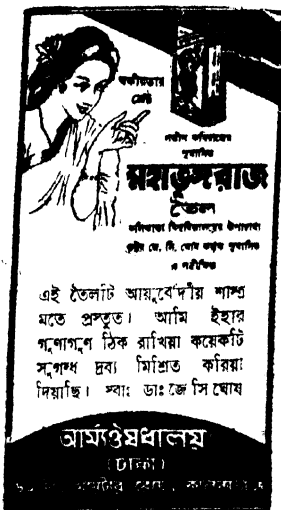
পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আগামী আর্থিক বছরে যে ১৬৫১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে তার মধ্যে ৪৬২ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য বাবদ। ৪০০ কোটি টাকা ভারতের অভ্যন্তর হতেই ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করা হবে। এই বছর যে বাধ্যতা-মূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল সেই ব্যবস্থানুসারে পাওয়া যাবে ৬৫ হতে ৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১৬৫১ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ, আভ্যন্তরীণ ঋণ ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বাবদ পাওয়া যাবে ৯৩০ কোটি টাকা মত। এরপরেও যে ৭২০ কোটি টাকার প্রয়োজন অপূর্ণ থাকবে তা পূরণ করা হবে নূতন কর ধার্য করে ও ফালতু নোট বাজারে ছেড়ে, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আমাদের প্রয়োজন এত বেশী যে সমাজের দরিদ্রতম মানুষগুলিরও সহায়তা ছাড়া তা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। এই উক্তিকে তিনি শুধু কথার কথা করেই রাখেননি, বাস্তবে এমন সব ব্যবস্থাবলম্বন করেছেন, যা থেকে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিটির পক্ষেও দূরে সরে থাকা সম্ভব নয়। বাড়তি রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে পরোক্ষ কর, সারচার্জ, আমদানী শুল্ক ও আবগারী শুল্ক বৃদ্ধি করে। এই ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাব দেশের ধনী-দরিদ্র সকল মানুষকেই পীড়িত করবে। বিশেষ করে সারচার্জ ও আয়কর বৃদ্ধির ফলে নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের অসুবিধা হবে সবচেয়ে বেশী। অবশ্য আয়কর চাপ যে ধনীদের উপরেও

কিছু কম পড়েনি, তা নিম্নলিখিত তালিকা হতেই বুঝতে পারা যাবে।

বাৎসরিক আয়	আয়কর '৬২-'৬৩	'৬৩-'৬৪
৫,০০০	৪২	২৪১
১০,০০০	৪৭৯	৯৩০
১৫,০০০	১,১৭১	১,৮৮১
২০,০০০	২,২৭২	৩,২৭০
৪০,০০০	১১,০৬৫	১২,৯৭৯
৭০,০০০	৩০,৭৪৫	৩৩,৫৮৫
এক লক্ষ	৫৩,০৩৯	৫৬,৬২৫
দুই লক্ষ	১,৩৪,৬০১	১,৪০,০৩১

উপরের হিসাব হতে বোঝা যাবে যে মাসে যার আয় ৪১৭ টাকা মত তাকে আয়কর দিতে হবে মাসে ২০ টাকা কয়েক নয়া পয়সা। আগে সে জায়গায় তাকে দিতে হত মাসে সাড়ে ৩ টাকা। তার মানে দাঁড়ালো এই যে, পরের ইনক্রিমেন্টের পুরো টাকাটাই চলে যাবে আয়করের গর্ভে। এর ওপরেও আছে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, যার কথা পরে বলা হবে।

চারশত টাকা বাঁধা আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর এই অর্থনৈতিক চাপ যে কত গুরুতর তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পরিসংখ্যানটির নিচের দিকে তাকালে হয়ত তার জন্যে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে। দুই লক্ষ টাকা যার বাৎসরিক আয় তাকে আয়করই দিয়ে দিতে হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। এটাও প্রায় অভাবিতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু একথা প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, দু লাখ টাকা আয়ের ক্ষমতা যে রাখে তা কেমন করে পকেটস্থ করে রাখতে হয় সে বিদ্যাও তার জানা আছে। আজকের দিনে আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি বোধহয় এইটিই। বড়লোকেরা কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, কিন্তু তার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় না। ট্যাক্সটা তখনই একজনের কাছে বেশী অবিচার বলে মনে হয় যখন সে দেখে যে তাকেই শুধু কড়ায় গন্ডায় সরকারী পাওনা চুকিয়ে দিতে হচ্ছে অথচ তারই জানা অন্য একজন শুধু টাকার জোরে সরকারকে কত সহজে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বর্তমান পরিস্থিতির কথা স্মরণ রেখে দেশের লোক যেন হাসিমুখে এই করভার বহন করেন। হাসিমুখে না হলেও কর্তব্য মনে করে স্বল্পায়ী লোকেরা প্রত্যেকেই এই করের বোঝা মাথা পেতে নিতে পারে যদি দেখে যে, যার যেরকম বোঝা বওয়ার ক্ষমতা সে সেরকমই বোঝা বইছে, এবং যে অসৎ ব্যক্তি আত্মস্বার্থে বোঝা বইতে চাইছে না, সরকারের ন্যায়দণ্ড তাকে তা বহনে বাধ্য করছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা অনুসারে আয়ের একটি অংশ প্রত্যেক উপার্জনকারী ব্যক্তিকে সরকারের ঘরে সঞ্চিত রাখতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের খুঁটিনাটি এখনও জানতে পারা যায়নি। শুধু একটি উদাহরণ তার জন্য এখানে দেওয়া হল। যে ব্যক্তির বাৎসরিক আয় পাঁচ হাজার টাকা তার আয়ের চার শতাংশ অর্থাৎ বছরে দুইশত টাকা অফিস থেকেই কেটে নিয়ে সরকারী তহবিলে জমা দেওয়া হবে। এইভাবে পাঁচ বছরে কাটা হবে মোট হাজার টাকা, ও তার জন্যে সুদ দেওয়া হবে শতকরা চার টাকা। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও আয়কর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার

করলে অবশ্যই আর একটি অবাঞ্ছিত বোঝা বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু পাঁচ বছর বাদে সরকারের কাছ থেকে সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে এগারশ' টাকা ফেরত পাওয়া যাবে একথা ভেবে অবশ্যই এই অতিরিক্ত বোঝা বহন করা যেতে পারে।

আমদানি আরও হ্রাস করে যেমন বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের ব্যবস্থা করেছেন সরকার, রপ্তানি বৃদ্ধি করেও তেমনি একই উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা হয়েছে। যেমন চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চায়ের উপর রপ্তানিশুল্ক সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উপর কর যতদূর সম্ভব না ধার্য করাই সঙ্গত। কিন্তু এইবারের 'রেকর্ড' কর ধার্য পরিকল্পনায় সে নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রথমে ডাকতারের কথাই বলা যাক। সরকার লোকাল পোস্টকার্ড ব'লে কিছুই রাখেননি। আর অন্য পোস্টকার্ডের দাম পাঁচ থেকে ছয় নয়া পয়সা করেছেন। যার ফল দাঁড়াল এই যে, কলকাতার মানুষকে এখন কলকাতারই কাউকে কিছু ডাকযোগে জানাতে হ'লে অন্তত ছয় নয়া পয়সা খরচ করতে হবে, যেটা আগে তিন নয়াতেই সম্ভব হ'ত।

এছাড়া অন্যান্য প্রায় সবকটি পোস্টাল ব্যবস্থারই মাশুলে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়া যেসব নিত্যব্যবহার্য বস্তু নূতন করের বলি হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তামাক, কেরোসিন, বনস্পতি, সাবান ইত্যাদি। সিগারেটের দাম বেড়েছে প্যাকেটপিছু প্রায় দশ নয়া পয়সা। সিগারেট ভদ্রসন্তানদের সেব্য। সুতরাং দু চার পয়সা দাম বাড়ার জন্যে যাঁরা বিশেষ কিছু 'মাইণ্ড' করেন না, তাঁরা এরপরেও সিগারেট খাবেন, যাঁরা ব্যাপারটাকে অসম্ভব ব'লে মনে করবেন তাঁরা ধূমপান ত্যাগ করবেন। কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের কাছে তামাকের প্রয়োজনীয়তা ব'লে বোঝানোর দরকার করে না। সারা বর্ষায় জলে ভিজে যে কৃষককে মাঠে কাজ করতে হয় তার কাছে এক ছিলিম তামাকের যে কি মূল্য তা অর্থমন্ত্রীরও অজানা নেই। কিন্তু জেনে-শুনেও তিনি এবার ঐ 'ছিলিম'-এর কর্থাঞ্চত ভাগ বসানোর লোভ সংবরণ করতে পারেননি। আর কেরোসিনের দাম বাড়ালেন তিনি বোতল পিছু দশ নয়া। গ্রামজীবনে এ আঘাত যে কত গুরুতর তা আগামী আর্থিক বছরে গ্রামের অন্ধকার কুটিরগুলির দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যাবে। কেরোসিন ও তামাকের উপর এই 'আক্রমণ' হ'তে অর্থমন্ত্রীকে নিবৃত্ত হতেই আমরা অনুরোধ জানাব। আর মধ্যবিত্ত জীবনের পরিচ্ছন্নতারক্ষার একমাত্র সহজলভ্য বস্তু সাবানকে যে বিলাসদ্রব্য অপবাদে বারংবার করাঘাত করা হচ্ছে তাকেও আমরা অনুচিত বলেই অভিমত ব্যক্ত করব।

দেশের লোকের করভার বহনের শক্তি যে অনেক বেড়েছে তা এই দেশেরই এক যুগ আগের বাজেটের সঙ্গে আজকের বাজেটের তুলনা করলে বুঝতে পারি। ১৯৪৮-৪৯ সালে যেখানে রাজস্বখাতে আয় ছিল ২৩০ কোটি টাকা ও ব্যয় ২৫৭ কোটি টাকা, ১৯৬২-৬৩ সালে সেখানে আয় হয়েছে ১৩২০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও ব্যয় হয়েছে ১৩৮৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। বারো-তেরো' বছরে এইভাবে প্রায় ছয়গুণ করভার বৃদ্ধি এই দেশের মানুষই বহন করেছে, সুতরাং এবারের অতিরিক্ত ভারও হয়ত তাদের অসহনীয় হবে না। বিশেষ করে জাতির প্রয়োজন যেখানে শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি যাতে যথাসম্ভব করমুক্ত রাখা যায় তার জন্য সচেষ্ট হ'তে এবং করভার বহনের সামর্থ্য যাদের আছে তারা যাতে অতি সহজে কর ফাঁকি না দিতে পারে তার জন্য সতর্ক হতে আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভ্রান্ত

বনফুল

একাঙ্ক-নাটক

[প্রান্তর। চারিদিক স্বল্পালোকিত অন্ধকারে ঢাকা। একটু দূরে আবছাভাবে একটা মন্দির আভাসিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে বুঝি এই মন্দিরের বিষণ্ণ ছায়াই বাইরে অন্ধকারের রূপ ধরেছে। সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে পাঁচটি শিক্ষক বেরিয়ে এলেন। সকলেরই চেহারা জরাজীর্ণ কঙ্কালসার, বেশবাসে দারিদ্র্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট, মুখে হতাশার ছাপ। বাইরে থেকে মনে হয় সকলেই দরিদ্র, কিন্তু তাঁরা যখন কথা বললেন বোঝা গেল তাঁদের অন্তরে ঐশ্বর্য আছে।]

প্রথম শিক্ষক। এই অন্ধকারের ভাষা কি আমাদের মর্মে প্রবেশ করেছে? এর অন্তর্নিহিত বাণী আমরা শুনেছি কি? তার অর্থ কি বুঝেছি?

দ্বিতীয় শিক্ষক। শুনেও শুনিনি,
বুঝেও বুঝিনি।
একটা কবন্ধ অস্পষ্টতা
আমাদের বুদ্ধির সামনে দাঁড়িয়ে
আছে দু'হাত বাড়িয়ে।
আমাদের যুক্তিকে গিলে খাচ্ছে,
স্তব্ধ করে' দিচ্ছে আমাদের প্রয়াসকে
ছায়াপাত করছে আমাদের বিবেকের
উপর।
অসহায় হয়ে পড়েছি আমরা,
লজ্জিত বিমর্ষ হয়ে পড়েছি।

তৃতীয় শিক্ষক। নিজের অস্তিত্বের অর্থ
হারিয়ে ফেলছি যেন।
আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
অবিশ্বাস্য প্রহেলিকার মতো মনে
হচ্ছে।
টলমল করছে সব বিশ্বাসের ভিত্তি
প্রতারণা করছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

চতুর্থ শিক্ষক। অথচ আমরা শিক্ষক।
আমরা সেই ভগীরথের দল
যাদের শঙ্খধ্বনি শুনে
জ্ঞান-গঙ্গার পবিত্র ধারা
অবতীর্ণ হন মর্ত্যলোকে,
দুর্গম গিরিশিখর লঙ্ঘন করে'
হিম-কন্দর ভেদ করে'
অবতরণ করেন সমতলে,
শ্যামল করেন ঊষর মরুভূমিকে
শস্য সম্পদে,
অরণ্যকে রূপান্তরিত করেন জনপদে,
বহন ক'রে আনেন
ইহলোকের সুখ
পরলোকের শান্তি।
কিন্তু আমরা কি আর
সে শঙ্খধ্বনি করতে পারছি?

দ্বিতীয় শিক্ষক। অসহায় হয়ে পড়েছি
আমরা,
লজ্জিত, বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছি

প্রথম শিক্ষক। অন্ধকারের ভাষা আমাদের
মর্মে প্রবেশ করেনি।
আমরা শুনতে পাইনি
এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বাণী,
দেখতে পাইনি এর রহস্যময় ইঙ্গিত।

তৃতীয় শিক্ষক। অথচ আমরা অন্ধ নই
বধির নই
মূক নই।
তবু আমরা দেখতে পাই না
শুনতে পাই না
বলতে পারি না

দ্বিতীয় শিক্ষক। একটা কবন্ধ অস্পষ্টতা
দাঁড়িয়ে আছে দু'হাত বাড়িয়ে।
প্রাচীরের মতো, অথচ প্রাচীর নয়,
প্রেতের মতো অথচ প্রেত নয়,
গ্রাস করছে আমাদের আত্মার
প্রকাশকে।
ঘন মেঘ যেন
ঢেকে রেখেছে সূর্যকে,
সংশয়-কুজ্ঝটিকার অন্তরালে
আচ্ছন্ন হয়ে আছে সব।
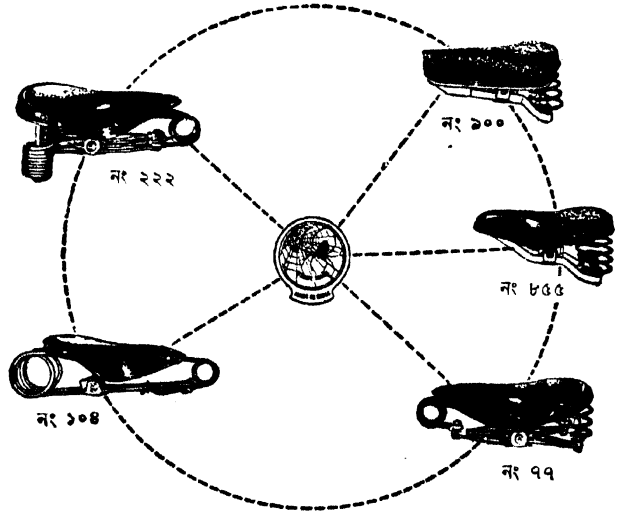
চতুর্থ শিক্ষক। অথচ আমরা শিক্ষক;
অন্ধকার মোচন করাই আমাদের কাজ
কিন্তু আমাদের ঘিরেই অন্ধকার নামছে।
[পঞ্চম শিক্ষক এতক্ষণ কিছু বলেননি। নির্ণিমেষে চেয়ে ছিলেন শুধু। তিনি এবার কথা বললেন]
পঞ্চম শিক্ষক। আমরাই মূর্তিমান অন্ধকার।
আমাদের দীপ নিবে গেছে।
আমাদের আলো আমরা বন্ধক রেখেছি
বিক্রি করেছি
বণিকের কাছে
শয়তানের কাছে
ধূর্তের কাছে।
আলো তারা নিবিয়ে দিয়েছে।
তারা শিখিয়েছে প্রদীপটকেই আলো বলতে,
শিখাহীন প্রদীপকেই আলো বলছি আমরা।
[হঠাৎ খাপ-ছাড়া রকম হেসে]
শিখাহীন প্রদীপকেই আলো বলতে শিখেছি।
[বাকী চারজন চাইলেন তাঁর দিকে]
প্রথম শিক্ষক। দুর্দশার ওইখানেই শেষ নয়।
আমরাও ওই শিখাহীন প্রদীপটাকে
বিশ্বাস করছি আলো বলে।
মনে করছি ডিগ্রিটাই বিদ্যা
তৃতীয় শিক্ষক। তাই অন্ধকার নামছে,
পাখী গান গাইছে না,
সূর্য মেঘের আড়ালে,
ফুলেরা ফুটছে না
হাসছে না শিশুরা।
দ্বিতীয় শিক্ষক। তাই যুবতীরা পা বাড়িয়েছে বিপথে।
লোলুপ বাঘিনীর মতো
অদৃশ্য বিদ্যুতের মতো
সঞ্চরণ করছে অন্ধকারে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিকারের উপর।
জননী নেই
ভগিনী নেই
কন্যা নেই
সব স্বৈরিণী।
অন্ধকার নামছে।
চতুর্থ শিক্ষক। হ্যাঁ অন্ধকার নামছে।
নিষ্ঠুর বৃষ্টিধারার মতো
নিস্নশব্দ প্রস্রবনের মতো,
নামছে, নামছে, ক্রমাগত নামছে।
প্রথম শিক্ষক। আলোর মৃত্যু হয়েছে।
এখন অন্ধকারই আমাদের আলো,
শত্রুই আমাদের মিত্র,
ষড়রিপুই আমাদের সহচর।
তৃতীয় শিক্ষক। সহচর নয়, প্রভু।
উঠছি বসছি তাদের কথায়
নাচছি, ডিগবাজি খাচ্ছি!
অথচ আমরা শিক্ষক,
মানুষ তৈরি করবার দায়িত্ব আমাদের।
পঞ্চম শিক্ষক। মানুষ নেই
যুবকরা অসুস্থ, মত্ত, বাক্‌সর্বস্ব।
রাস্তায় দিশাহারা হয়ে ঘুরছে সবাই
কুকুরের মতো, কীটের মতো।
গুণ্ডা অভিনয় করছে ক্ষত্রিয়ের!
তামসিকতা পরেছে আধ্যাত্মিকতার মুখোশ,
চণ্ডাল সেজেছে ব্রাহ্মণ।
চতুর্থ শিক্ষক। অন্ধকার ভেদ করে সূর্য ওঠে
পংক ভেদ ক'রে ফোটে কমল।
কিন্তু আর সূর্য উঠছে না,
কমল ফুটছে না।
তৃতীয় শিক্ষক। পাখী গাইছে না,
হাওয়া বইছে না।
মায়ের বুকে দুধ নেই
ভায়ের বুকে স্নেহ নেই
[হঠাৎ] ও কে— ও কে—ও কে—
[অন্ধকারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর সভয়ে আস্তে আস্তে বললেন—ও কে—ও কে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে একটি মেয়ে চলেছে। যুবতী, সুন্দরী, মোহিনী। তার লীলায়িত গতি-ভঙ্গীতে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে, একাগ্র চোখের দৃষ্টিতে, শিকারী শ্বাপদের ছবি প্রতিভাত হচ্ছে। সে এত একাগ্র যে সমবেত শিক্ষকদের দেখতে পেল না। নিঃশব্দ গতিতে এল এবং চলে গেল]
তৃতীয় শিক্ষক। ও কে!
দ্বিতীয় শিক্ষক। প্রেতিনী
প্রথম শিক্ষক। কিন্তু কি অপরূপ
চতুর্থ শিক্ষক। মূর্তিমতী শিখা। মনে হচ্ছে যেন চেনা-চেনা।
তৃতীয় শিক্ষক। কে বলুন তো?
পঞ্চম শিক্ষক। ও, আমার মেয়ে।
প্রথম শিক্ষক। সে কি! তোমার মেয়ে?
কোথা যাচ্ছে এখন!
পঞ্চম শিক্ষক। সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে।
সমাজের শবদেহকে
চড়ানো হয়েছে চিতায়
তাতেই ও আগুন দেবে।
সেই আগুনে অন্ধকার আলোকিত হবে হয়তো!
[এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সবাই]
প্রথম শিক্ষক। এ অন্ধকার বাইরের নয় ভিতরের,
মূর্চ্ছিত চেতনার।
পাপের আলো কি উজ্জ্বল করতে পারবে তাকে?
দ্বিতীয় শিক্ষক। না।
পাপের দাহ আছে, দীপ্তি নেই।
তৃতীয় শিক্ষক। তাই পাখীরা গান গাইছে না
সূর্য মেঘের আড়ালে
ফুলেরা ফুটছে না
নদী বুজে আসছে
সমীরণ স্নিগ্ধ নয়
হাসি নিবে গেছে
অশ্রু জমে গেছে
সুস্থ ক্ষুধা রূপান্তরিত হয়েছে
দুষ্ট ক্ষুধায়।
যা দেখছি
তা সূর্যের আলো নয়
আলেয়ার মায়া
চতুর্থ শিক্ষক। আমাদের হিমশীতল অসাড় অস্তিত্বে
ও আলো সাড়া জাগাতে পারবে না।
প্রথম শিক্ষক। (পঞ্চম শিক্ষককে) তুমি শিক্ষক না?
প্রায়-উলঙ্গিনী মেয়েকে
লালসার প্রতীক ক'রে
অন্ধকারে একা ছেড়ে দিয়েছ।
দ্বিতীয় শিক্ষক। কিসের আশায়?
তৃতীয় শিক্ষক। তোমার উদ্দেশ্য কি!
চতুর্থ শিক্ষক। সর্বনাশ! ওই মেয়েকেই তো তুমি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছিলে।
প্রথম শিক্ষক। উদ্দেশ্য কি তোমার?
খোলসা ক'রে বল।
[পঞ্চম শিক্ষক ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে তারপর যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন]
পঞ্চম শিক্ষক। আমি খেতে পাই না,
খেতে পাই না, খেতে পাই না!
ওই মেয়েই আমাকে খাওয়াচ্ছে।
কেমন ক'রে খাওয়াচ্ছে সে প্রশ্ন আমি করি না,
সে প্রশ্ন করতে ভয় হয়।
তোমাদেরও হয়।
[প্রত্যেকের দিকে তর্জনী আস্ফালন ক'রে]
তোমার ছেলে ঘুস-খোর,
তোমার ছেলে কালোবাজারি,
তোমার ছেলে চুরি করে
তোমার ছেলে চরিত্রহীন মাতাল।
সবাই রোজগেরে ছেলে কিন্তু।
তোমরা কি প্রশ্ন কর
কি ক'রে রোজগার করছে তারা?
তোমরা সব জান,
সব বোঝ
কিন্তু প্রশ্ন কর না।
প্রশ্ন করতে তোমাদেরও ভয় হয়,
পাছে প্রশ্নের খোঁচায়
ফেটে যায় আপাত-রঙীন বেলুনটা।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি
আমাদের কারো নেই।
সবাই আমরা এক নৌকোয়
পাড়ি জমাতে চাইছি উত্তাল পংক-সমুদ্রে,

প্রাণপণে ধরে আছি একটি মাত্র হাল
যার নাম স্বার্থপরতা
যার নাম পশুত্ব
যার নাম হীনতা।
হা—হা—হা—হা—

[বিকট হাসিটা অদ্ভুত শোনালো, হাসি থামতে না থামতেই কয়েকজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তর্ক করতে করতে প্রবেশ করল কয়েকটি যুবক। সকলেরই পরিধানে কোট, প্যাণ্ট, হাওয়াই শার্ট ইত্যাদি বিদেশী পোশাক। তারা সবাই তর্কে নিমগ্ন, শিক্ষকদের দেখতে পেল না]

প্রথম যুবক। আরে রেখে দাও তোমার নিরঞ্জনবাবু। উনি আমাদের পার্টিতে আসবেন না, আর না এলে আমরা ওঁকে ভোট দেব না। রঘুবাবুকে দেব।

দ্বিতীয় যুবক। [সবিস্ময়ে] রঘুবাবুকে! নিরঞ্জনবাবুর মতো অমন সচ্চরিত্র বিদ্বান লোককে না দিয়ে ওই চরিত্রহীন মাতালটাকে দেবে? নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে রঘুবাবুর তুলনা হয়?

তৃতীয় যুবক। হয় না। রঘুবাবু এই ইলেকশনে নিজের পকেট থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করছেন। নিরঞ্জনবাবু বলেছেন একটি পয়সা খরচ করব না

দ্বিতীয় যুবক। [চতুর্থ যুবককে] তুমি কার জন্যে চেষ্টা করছ?

চতুর্থ যুবক। রঘুবাবুর জন্যে। রঘুবাবু বলেছেন তিনি আমার ভাইপোর চাকরি জোগাড় ক'রে দেবেন।

দ্বিতীয় যুবক। কিন্তু দেখ নিরঞ্জনবাবু—

চতুর্থ যুবক। আমি কিছু দেখব না, কিছু শুনব না। কানে তুলো গুঁজে চোখ বুজে আমি রঘুবাবুর জন্যেই চেষ্টা ক'রে যাব খালি। আমার বখাটে ভাইপোটার তিনি যদি গতি ক'রে দেন একটা—

পঞ্চম যুবক। আমি কিন্তু ব'লে দিচ্ছি রঘুবাবুও হবেন না, নিরঞ্জনবাবুও হবেন না। হবেন পৃথ্বীচাঁদ সিঙাড়াবালা। তিনি মস্ত লোক। আমাদের গ্রামে একটা হাইস্কুল করিয়ে দেবেন বলেছেন, তাছাড়া আমাদের প্রত্যেককে চাকরি দেবেন।

প্রথম যুবক। আশ্চর্য! তোমরা সচ্চরিত্র বিদ্বান লোককে না নির্বাচন করে' কে চাকরি দেবে, কে স্কুল করে, দেবে এই সব অলীক প্রতিশ্রুতির পিছনে ধাওয়া করবে না কি। নিরঞ্জনবাবুর মতো লোককে ছেড়ে—

তৃতীয় যুবক। আমাদের জীবন অভাবে অনাহারে শুকিয়ে খট্-খট্ করছে। তেল দিয়ে যিনি তাকে একটু মোলায়েম করবেন তাকেই আমরা ভোট দেব

[দূরে শোনা গেল—'জয় জগদীশবাবুর জয়'। আর একদল যুবক এল। তাদের হাতে প্রকাণ্ড একটা পোস্টার। তার উপর লেখা—'জেল-ফেরত জগদীশ দাঁকে ভোট দিয়া কৃতার্থ করুন'।]

পঞ্চম যুবক। জগদীশবাবু কি পৃথ্বীচাঁদ সিঙাড়াবালার সঙ্গে পারবে? সিঙাড়াবালার কত টাকা!

আগন্তুক দলের একজন। জগদীশ দাঁও টাকার ঘড়া উপুড় করে' দিয়েছে। শুধু টাকার নয়, মধুরও। জগদীশ দা আত্মত্যাগী দধীচি, তার হাড় থেকে বজ্র তৈরি করব আমরা। চল হে, চল চল, মীটিংয়ের দেরি হয়ে যাচ্ছে। জগদীশবাবু ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় আসবেন মীটিংয়ে। জয় জগদীশবাবুর জয়। ওহে রাম শ্যামকেও আমাদের দলে টানতে হবে, ওরা এলে কাজের খুব সুবিধে হবে। দুজনেই খুব কাজের। চল—

[আগন্তুক দল চলে' গেল। যারা আগে এসেছিল তারা নির্বাক হ'য়ে সব দেখছিল, শুনছিল। তারা চলে' গেলে এদের মুখে কথা ফুটল]

দ্বিতীয় যুবক। যাই বল তোমরা, এখনও দেশে আদর্শবাদী লোক আছে। অনে—ক আছে। তাদেরই মোবিলাইজ করতে হবে। যাই লেগে পড়ি—

[দ্বিতীয় যুবক চলে' গেল]

প্রথম যুবক। [তার প্রস্থান পথের দিকে চেয়ে, দু'হাতে বুড়ো আঙুল নাড়তে নাড়তে] কিস্সু হল না, কিস্সু হবে না।

তৃতীয় যুবক। চল হে, রঘুবাবুর জন্যে আমরাও একটা মীটিংয়ের ব্যবস্থা করি গে। মীটিং একটা করা দরকার। একটা বুলেটিনও ছাপাতে হবে। চল, চল।

[প্রথম যুবক ও তৃতীয় যুবক চলে' গেল]

পঞ্চম যুবক। [বাকি ক'জনকে উদ্দেশ্য করে'] এ'রা পৃথ্বীচাঁদ সিঙাড়াবালাকে চেনে নি এখনও। আমার হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন তিনি (পাঁচটা আঙুল বিস্তারিত ক'রে' দেখালেন)—তাঁর বিরুদ্ধে একটি মীটিং হতে দেব না আমি। গুণ্ডা লাগিয়ে ভেঙে দেব সব। ট্রাক ভাড়া করেছি আমরা, বড় বড় ট্রাক, তার উপরেই মীটিং হবে আমাদের, চলন্ত মীটিং। বারোটা লাউড স্পীকার আমাদের হাতে।

অনেক রিক্‌শা ভাড়া করেছি।
বারোটা রিক্‌শায় বারোটা লাউড
স্পীকার থাক্‌, গাঁক করে' বলবে,
ভোট কর সিঙাড়াবালা। তোমাদের
বলছি তোমরাও এই দলে এস। তা
না হলে শেষ পস্তাবে। চল, দেরি
হয়ে যাচ্ছে—

[যুবকরা সবাই চলে' গেল]

প্রথম শিক্ষক। আজকাল রাজনীতিই
জীবন-নীতি।

ধর্মকে ধরে' নেই কেউ আজকাল
রাজনীতিকে ধরে' আছে।

দ্বিতীয় শিক্ষক। রাজনীতি এক নয়,
অনেক।

ধর্ম কিন্তু এক।

তৃতীয় শিক্ষক। ধর্মও এক নয়।
নানা ধর্মের ছিটে
মানব-সমাজ সাজিয়েছে নিজেকে
যুগে যুগে।
আজ রাজনীতি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে
ধর্ম নিয়েও অনেক যুদ্ধ হয়েছে
অতীতে।
অনেক রক্ত প্লাবিত করেছে
পৃথিবীকে
ঝরেছে অনেক অশ্রু;
আকাশের নীলকে আরও নীল করেছে
আর্তের হাহাকার।
সে সব কাহিনী দগদগে ঘায়ের মতো
দগদগ করছে ইতিহাসের পাতায়।

দ্বিতীয় শিক্ষক। রাজনীতিই এককালে
ধর্মের মুখোশ পরেছিল।
মুখোশের মতোই তাই তার—
নানা রং, নানা ঢং, নানা বৈচিত্র্য।
মুখোশের তলায় ছিল
রাজনীতি
স্বার্থ-নীতি
পীড়ন-নীতি
জয়-নীতি
অহংকারের আস্ফালন-নীতি।
ধর্ম কিন্তু এক
শুদ্ধ, শান্ত, নিরঞ্জন।

পঞ্চম শিক্ষক। সূর্য নেই
তাই আলো নেই

চতুর্থ শিক্ষক। [সহসা দূরের দিকে
চেয়ে] ওই দেখ, ওই দেখ, আর এক-
দল আসছে। ও বাবা, সঙ্গে পুলিশ
যে। চল একটু আড়ালে যাই

পঞ্চম শিক্ষক। আড়ালে যাওয়ার দরকার
নেই।
আমরা সবাই অন্ধকারের বোরখা পরে'
আছি,
আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

[তিনটি যুবককে নিয়ে দুটি
পুলিশ কনস্টেবল এল। যুবক
তিনটির হাতে হাত-কড়ি, কোমরে
দড়ি। তারা এল এবং চলে গেল]

প্রথম শিক্ষক। এ কি আমার ছেলে যে!
বিনুকে পুলিশে ধরেছে,—সে কি!

দ্বিতীয় শিক্ষক। আঁ, আমার ছেলে
যোগেনকেও ধরেছে দেখছি, কি
সর্বনাশ!

তৃতীয় শিক্ষক। ঘাবড়ো না, ঘাবড়ো না,
তৃতীয় ব্যক্তিটি আমারই সুপুত্র
শকুল। মামা সাধ করে' নাম রেখে-
ছিল শক্রকুমার। হয়েছেন কৃষ্ণকুমার।
কালোবাজারি। আরও দু'বার ওকে
পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে
এনেছি। এবারও আনব। না আনলে
চলবে না। কারণ ওই একমাত্র বংশ-
প্রদীপ

প্রথম শিক্ষক। কি করে' আনবে!

দ্বিতীয় শিক্ষক। যোগেনকেও ছাড়িয়ে
আনতে হবে, উপায় কি বল তো?

তৃতীয় শিক্ষক। [স্মিতমুখে] আজকাল
একটি মাত্র উপায়ই উপায়।
এ অন্ধকারে একটিমাত্র আলোই
আলো,
একটি মাত্র পাখীই গান করে,
একটি মাত্র ফুলেই সুন্দর,
একটি মাত্র চাবিই সব তালা খোলে,
একটি মাত্র শাস্ত্রই শাসন করে,
একটি মাত্র তলোয়ারই সর্ব-বাধা-
ছিন্নকারী—
টাকা—টাকা—টাকা

[টাকা বাজাবার মুদ্রা দেখিয়ে]

টাকা যোগাড় করতে হবে!

দ্বিতীয় শিক্ষক। ঠিক বলেছ, টাকা চাই।
কোথায় পাওয়া যায় বল তো।

তৃতীয় শিক্ষক। অগাধ ঐশ্বর্যের অধীশ্বর
টংকনাথ বাবুই আমাদের ভরসা।
তিনিই আমাদের প্রভু। চল তাঁর কাছে
যাই

প্রথম শিক্ষক। ঠিক বলেছ। শুনেছি
পুলিশও তাঁকে খাতির করে।

তৃতীয় শিক্ষক। সবাই তাঁকে খাতির করে,
তাঁর টাকা আছে যে! চল, আর দেরি
করে' কি হবে।

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক
চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই
টলতে টলতে প্রবেশ করল এক
মাতাল। কারো দিকে না চেয়ে
টলতে টলতে এল এবং টলতে
টলতে চলে গেল]

চতুর্থ শিক্ষক। উনিই আমার কুল-তিলক।
সমস্ত দিন মোষের মতো খাটে। সন্ধে
থেকে মদ খায়। ওকে দোষও দিতে
পারি না। সমস্ত দিন এতো খাটুনির
পর একটু নেশা না করলে—

পঞ্চম শিক্ষক। দিন আর রাতের তফাত
করতে পার না কি তুমি!
আমি তো দেখি সব সময়ে অন্ধকার।
আকাশে সূর্য চন্দ্র তারা কিছু নেই,
থাকলেও দেখতে পাই না;
হয় নেই,
না হয় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছি।

তুমি দেখতে পাও?
সূর্যোদয় দেখেছ ইদানিং?

চতুর্থ শিক্ষক। দেখবার সময় পাই নি।

পঞ্চম শিক্ষক। [সাগ্রহে] সূর্য ওঠে কি?

চতুর্থ শিক্ষক। হয়তো ওঠে। অত খেয়াল
করিনি

[দূরে কলরব শোনা গেল। দিব্য-
কান্তি কিশোর বালক আলোক
ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করল
ঊর্ধ্বশ্বাসে। তারপর সে ঘাড়
তুলে ঘুরে ঘুরে অস্পষ্ট
মন্দিরের আভাসটাকে দেখতে
লাগল। তার ভাব-ভঙ্গি থেকে
মনে হল সে যা দেখছে তা যেন
অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্য। তারপর
দূরের দিকে চেয়ে সে চীৎকার
করে' উঠল]

আলোক। স্বপ্ন সফল হয়েছে, মেঘ নয়,
ছায়া নয়, মন্দির [সহসা উচ্ছ্বসিত
হয়ে] মন্দির, মন্দির, মন্দির।
আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে

চতুর্থ শিক্ষক। [সবিস্ময়ে] মন্দির!

আলোক। এই যে আপনার সামনে!
দেখতে পাচ্ছেন না? ভারতবর্ষের
চিরন্তন মন্দির, এতকাল অন্ধকারে
ঢাকা ছিল, ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করছে।
আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যেন
করেছে। সফল হয়েছে আমার স্বপ্ন।
সবাইকে ডেকে আনি।

[সোৎসাহে চলে গেল]

চতুর্থ শিক্ষক। [কপালের উপর হাত
রেখে অস্পষ্ট মন্দিরটাকে দেখবার
চেষ্টা করতে লাগলেন] হ্যাঁ মন্দিরের
মতোই কি একটা মনে হচ্ছে যেন।
ওই তো চুড়ো—

পঞ্চম শিক্ষক নির্নিমেষে চুপ করে চেয়ে-
ছিলেন।

চতুর্থ শিক্ষক। [পঞ্চম শিক্ষককে] তুমি
দেখতে পাচ্ছ কিছু! মন্দিরের মতোই
তো দেখতে। কিন্তু এখানে মন্দির
আসবে কোথা থেকে!

[পঞ্চম শিক্ষক নীরব হয়ে
রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে
ধীরে কথা বললেন]

পঞ্চম শিক্ষক। তাঁর ইচ্ছা হলে শুষ্ক তরু
মঞ্জরিত হয়,
অশুচি ভেদ করে' দেখা দেয় মন্দির
মূক হয় বাচাল
গিরি-লঙ্ঘন করে পঙ্গু।
আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কিছু,
মন্দির দেখার চোখ অনেক কাল
হারিয়েছি!

চতুর্থ শিক্ষক। ও কিসের শব্দ—

[অন্ধকারের ভিতর থেকে মৃদু
গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ শোনা
গেল। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে,

তারপর ক্রমশ স্পষ্টতর হল সেটা। মনে হল মন্দিরের ভিতর থেকে কে যেন উদাত্ত কণ্ঠে বার বার বলছে—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে নিনাদিত হতে লাগল এই মন্ত্র। পরিপূর্ণ হয়ে উঠল চতুর্দিক। স্পষ্টতর হল মন্দির, অন্ধকার হ'ল আর একটু আলোকিত। তারপর হঠাৎ নীরব হয়ে গেল সব]

পঞ্চম শিক্ষক। এযে উপনিষদের বাণী! অনেক দিন আগে শুনেছি। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কে বলছে—

চতুর্থ শিক্ষক। কে তা জানি না। মনে হচ্ছে মন্দিরের ভিতরে মন্ত্র পড়ছে কেউ।

পঞ্চম শিক্ষক। মন্দির কই? এখনও দেখতে পাই নি। পুরাতন সূর্য
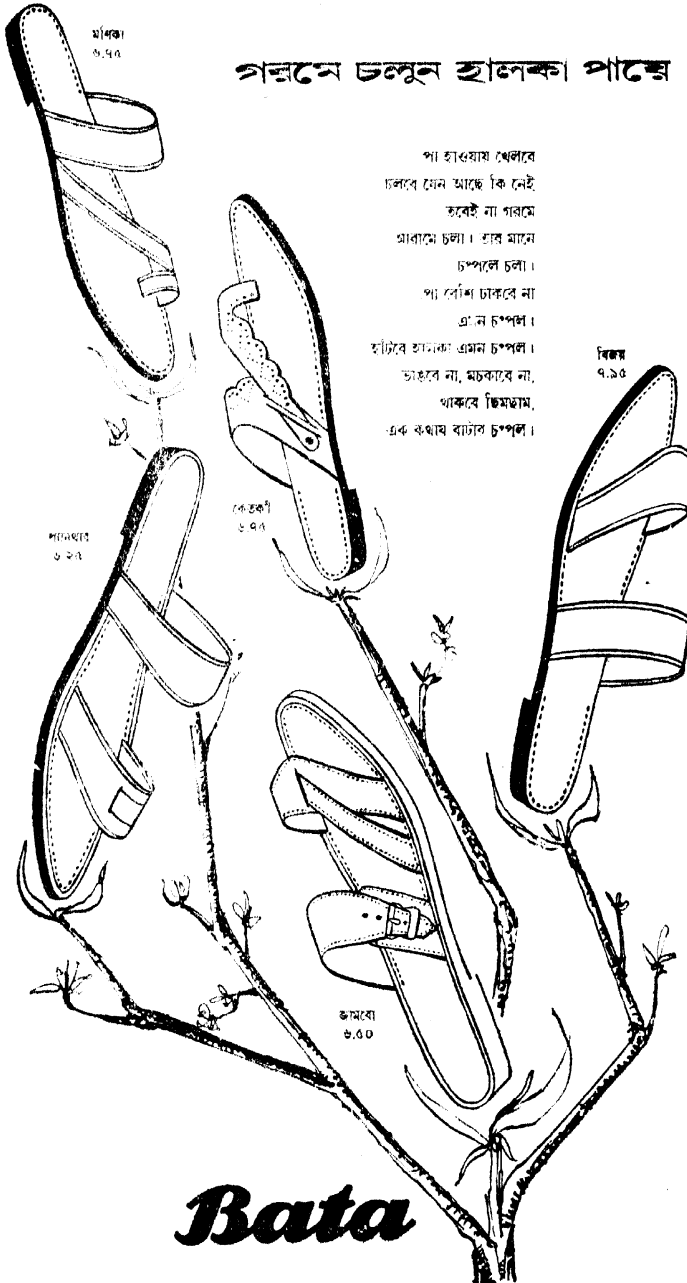
কতদিন আগে অস্ত গেছে। সে সূর্য না উঠলে আর মন্দির দেখতে পাব না

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার সেই উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হল। অন্ধকারে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হল যেন]

উদাত্ত কণ্ঠ। ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্,
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।
ভক্তি নত-চিত্তে সূর্যকে প্রণাম কর। আকুল কণ্ঠে তাঁকে ডাক। তিনি দেখা দেবেন। পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠবার আর বিলম্ব নেই।

[অন্ধকার আরও স্তব্ধ হল। আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠল]

পঞ্চম শিক্ষক। কার কণ্ঠস্বর

চতুর্থ শিক্ষক। কণ্ঠস্বর কার তা জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে কথাগুলি বিবেকানন্দের। ছেলেবেলায় পড়েছি মনে হচ্ছে।

পঞ্চম শিক্ষক। তাহলে কি বিবেকানন্দই এলেন আবার। তাঁর মতো লোকের কি মুক্তি হয় নি এখনও

[মন্দিরের ভিতর উদাত্ত কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হ'ল]

উদাত্ত কণ্ঠ। আমি মুক্তি চাই না। আমি চাই তোরা মানুষ হ। একটা মানুষ তৈরি করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হয় আমি তাতেও প্রস্তুত। আমি দিবাচক্ষে দেখছি তোদের ভিতর অনন্ত শক্তি রয়েছে। সেই শক্তি জাগা। ওঠ, ওঠ, লেগে পড়, কোমর বাঁধ। দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আমি আর স্থির থাকতে পারি না। তোদের মঙ্গলকামনাই আমার জীবনের ব্রত। তোরা সব পচে' গলে' মরবি আর আমি মুক্ত হ'য়ে যাব, সে মুক্তি আমি চাই না

[অন্ধকারের পটভূমিকায় মন্দির আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ক্রমশ তাতে ফুটে উঠল একটা উজ্জ্বল গৈরিক দীপ্তি]

পঞ্চম শিক্ষক। (সোল্লাসে) দেখেছি, দেখেছি, এইবার দেখতে পেয়েছি, আর ভয় নেই

চতুর্থ শিক্ষক। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার

পঞ্চম শিক্ষক। প্রণাম কর, প্রণাম কর, তিনি এসেছেন আর ভয় নেই

[উভয়ে প্রণত হল। তারপর উঠে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরের ভিতর থেকে আবার ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে লাগল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত, বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায় চ। আলোকের সঙ্গে রাম শ্যাম হরি যদু প্রভৃতি একদল লোক প্রবেশ করল। কেউ উৎসুক, কেউ উত্তেজিত]

আলোক। [উদ্ভাসিত মুখে] ওই দেখ রাম। আশ্চর্য তো!

হরি। শুধু আশ্চর্য নয়, ভয়াবহ। কোথাও কিছু ছিল না, মন্দির এল কোথা থেকে!

আলোক। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমি যাই, সকলকে ডেকে ডেকে দেখাই

[আলোক চলে' গেল]

(ক্রমশঃ)

শারীরবিদ্যা ও লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

অমিয়কুমার মজুমদার

মহাকবি গোটে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছবির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কথা কয়। কে না জানে তাঁর আঁকা 'ম্যাডোনা অব দি গ্রোটো' ছবির কথা। ম্যাডোনার শিশুর দেহ থেকে স্বর্গীয় জ্যোতি তাঁর মুখে পড়েছে এবং তিনি নিবিড় দৃষ্টিতে ঐ শিশুর দিকে তাকিয়ে আছেন—অথচ মনে হয় যেন বহু যোজন দূর থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের সুর তাকে আপ্লুত করে রেখেছে। এবারে লক্ষ্য করুন আর একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রের দিকে 'দি লাস্ট সাপার'। এর গঠনরীতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করবার মতো। জ্যামিতির সমবাহু ত্রিভুজের মতো তিনটি মূর্তিকে এক সঙ্গে বেঁধে তাকে আলো-আঁধারির কাছে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিত্রে স্থাপত্যের 'থ্রি ডাইমেনসন' প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। লিওনার্দো দু'চোখ ভরে সৃষ্টির অপার রহস্যলীলা উপভোগ করেছেন আর নব নব আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়েছেন রেখার টানে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী—এই তাঁর পরিচয়। 'মোনালিসা'র হাসির আড়ালে চাপা পড়ে আছে শিল্পীর অপরাপর সত্তা। প্রাণতরঙ্গের অফুরন্ত উচ্ছলতায় ভরা মোনালিসার অঙ্গে হীরকখণ্ডের দ্যুতি, ওষ্ঠাধরে মিষ্টিক হাসির কম্পন। আমরা প্রথম দর্শনেই বিমোহিত হই। যাঁরা আর্ট বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখেন মোনালিসাতে মানবিক দেহের গঠনবৈচিত্র্য পরিস্ফুটনে শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতা। এর মূলে লিওনার্দোর শিল্পী সত্তা যত দায়ী, তার চেয়ে কোন অংশে কম প্রভাব বিস্তার করেনি তাঁর বৈজ্ঞানিক সাধনা। তাঁর আঁকা ছবির অঙ্গে স্পষ্ট ছাপ আছে অ্যানাটমির জ্ঞানের। এ শুধু আবছা ধারণার বা সীমিত জ্ঞানের ফলশ্রুতি নয়, এর পেছনে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনা, কঠোর শ্রম আর একনিষ্ঠতার ত্রিবেণী সংগম।

নরদেহতত্ত্ব এবং শারীরবিদ্যা (অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি) তিনি যে বেশ ভালভাবে জানতেন একথা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। শবব্যবচ্ছেদের পর মানুষ ও পশুর দেহের বিভিন্ন ছবি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এঁকেছিলেন। শারীরবিদ্যা এবং ভেষজবিদ্যা (মেডিসিন) নিয়ে তাঁর রচিত বহু নিবন্ধ এবং টীকা আজ গবেষকদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে।

লিওনার্দোর মৃত্যুর কয়েকবছর পরে অর্থাৎ ১৫৪৩ সালে "ভেসালিয়াস" নরদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সব চিত্র অংকন করেন তার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে দা ভিঞ্চি রচিত অ্যানাটমির স্কেচের। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার ক্লাসে পাঠ নিয়েছিলেন কোনকালে, তাহলে ভুল করা হবে। কারো কাছে তিনি এই বিদ্যা শিক্ষা করতে যান নি, সম্পূর্ণ নিজের গরজে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করে এ সম্বন্ধে তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন। লিওনার্দোর জীবনের পরিক্রমণকাল ১৪৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত। আজকের দিনে কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা কানিংহাম সাহেবের লেখা শব-ব্যবচ্ছেদের গ্রন্থের চিত্রাদি দেখে মুগ্ধ হন, কিন্তু

এ কথা সজোরে বলা যেতে পারে যে, তাঁরা এই শিল্পীর 'ব্যবচ্ছেদ-পদ্ধতি' এবং সংশ্লিষ্ট চিত্রাদি দেখে অবশ্যই বিস্মিত হবেন। ও' ম্যালি এবং সন্ডার লিখিত 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অন দি হিউম্যান বডি' এবং আর্ণল্ড বেল্টের 'লিওনার্দো দি অ্যানাটমিস্ট' এই গ্রন্থ দুটির মধ্যে এ সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

শারীরবিদ্যাবিশারদ হার্ভে থেকেও এক শতক পূর্বে তিনি মিলান শহরে শিল্পী জীবনের শুরু করেন, অথচ সে যুগেই তিনি রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া, নাড়ীর গতিবেগ ইত্যাদি সম্বন্ধে মননশীল নিবন্ধ রচনা করে গেছেন।

মধ্য যুগের সায়াহ্নকালে এক যুগসন্ধিক্ষণে লিওনার্দোর জন্ম। পরিবর্তনশীল যুগের সমস্ত প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। লিওনার্দো যদি কেবলমাত্র শিল্প নিয়েই থাকতেন তাহলে হয়তো আরো বড়ো হতে পারতেন, তাঁর কৌতূহল বিজ্ঞানের নানা শাখার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে—চিকিৎসাবিদ্যায়, স্থপতির রেখাঙ্কনে, নগর গঠনের পরিকল্পনায়, গৃহ নির্মাণের কারিগরী বিদ্যায়, হাইড্রলিকসে, সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ, এরোডায়নামিক্সে, উদ্ভিদবিদ্যায়, ক্রিপ্টোগ্রাফিতে তাঁর আগ্রহ ছিল অসীম। আনন্দের উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি বিজ্ঞানের মণিকোঠায়। পনের বছর বয়সে ফ্লোরেন্সের ভেরোসিওর কাছে শিখলেন জ্যামিতি, ফ্রা লিউকা পাক্সিওলির কাছে অধ্যয়ন করলেন গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক তত্ত্বগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ত্রিশ বছর বয়সে মিলান শহরে এলেন সিভিল এবং মিলিটারী ইঞ্জিনিয়র হয়ে।
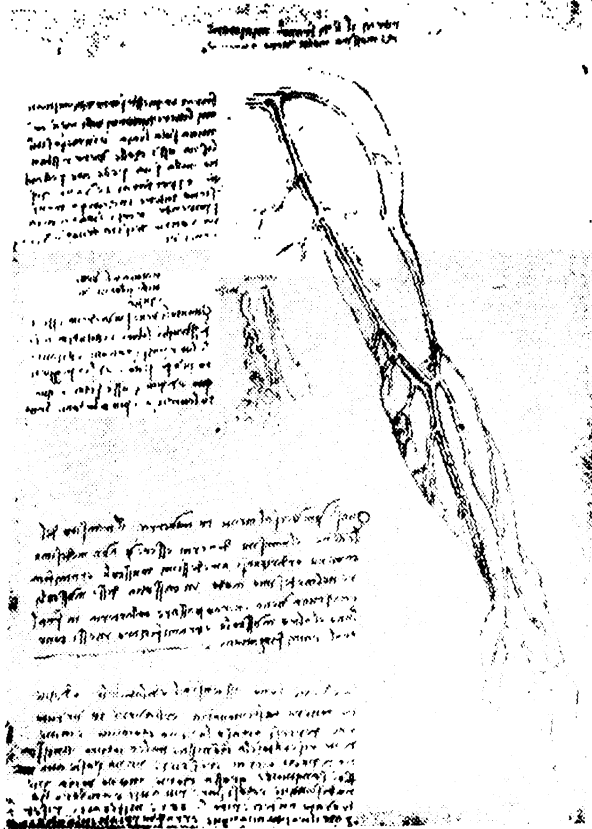
দা ভিঞ্চির আঁকা হাতের রক্তশিরা

অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং মেডিসিন—এই তিন শাখায় তাঁর জ্ঞান ছিল বেশ প্রবল। বিজ্ঞানীর মতো অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের এই তিন এলাকায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন এবং দক্ষতারও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল মানুষের যকৃতের পাঁচটি অংশ আছে এবং এ'কেছেনও সেইভাবে। পেটের মধ্যেকার স্থান পরিমাপণের জন্য তিনি গলিত মোম ইনজেকশান করে হিসেব নিতেন। মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত আরক না থাকাতে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে শব-ব্যবচ্ছেদের কাজ শেষ করতে হতো। এক একটি অঙ্গ এক বৈঠকেই সম্পূর্ণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই দ্রুত পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর সমীক্ষা সর্বত্র সঠিক হয়নি। 'দি নোট বুকস্ অব লিওনার্দো দা ভিঞ্চি' গ্রন্থে আছে, লিওনার্দো বলেছেন যে কোন অঙ্গের

ছবি কোন লোকের কাছে তুলে ধরতে হলে তার চারদিক দেখানো উচিত চারটি চিত্রে এবং অস্থির চিত্র অংকনে চারদিক এবং কেটে ভেতরের অংশ প্রদর্শন করানো প্রয়োজন। তা না হলে সাধারণ মানুষের মনে এদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয় না। এমনি নানা তথ্যে পরিপূর্ণ তাঁর স্বলিখিত 'টিকা গ্রন্থ'।

দেহ প্রৌঢ়ত্বের সীমানা অতিক্রম করলে রক্তবাহী ধমনীর দেয়ালগুলি ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে যেতে থাকে। তারা হারিয়ে ফেলে তাদের স্থিতি-স্থাপকতা। ফলে দেখা দেয় রক্তরোগ। তেমনি রক্তবাহী শিরার দেয়ালগুলিও বয়সের ক্রমাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে পুরু হতে আরম্ভ করে এবং নানা ধরণের রোগাক্রমণের সূত্রপাত হয়। আশ্চর্যের কথা শিল্পী লিওনার্দো এই তত্ত্ব বহু-কাল পূর্বে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর স্বরচিত পান্ডুলিপিতে এ ধরণের বহু রোগের বিবরণ পাওয়া যায়।

মাংসপেশী ও স্নায়ুর মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি কয়েক শতক পূর্বে যা লিখে গেছেন তা অতীব সত্য। তিনি লিখছেন ঃ 'মাংসপেশী যেমন বহু, স্নায়ুর সংখ্যাও তেমন অনেক। কম বা বেশী হবার যো নেই। কারণ বিশেষ স্নায়ু নির্দিষ্ট মাংসপেশীকে অনুভূতি যোগায়, এই স্নায়ুর প্রভাবেই মাংসপেশী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। বৃদ্ধবয়সে দেহস্থ রক্তবাহী শিরার দেয়াল পুরু হতে থাকলে রক্তচলাচলে বিঘ্ন হয়, হৃদপিন্ডে যথোচিত রক্তসরবরাহের অভাবে তা হয়ে পড়ে দুর্বল এবং এভাবে চলতে থাকলে মানুষ ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়।'

হৃদপিন্ড এবং রক্তবাহী ধমনীর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে শিল্পী লিওনার্দো ১৫১০ সালে যা বলে গেছেন তার অনেকদিন পরে ১৬২৮ সালে বিজ্ঞানী হার্ভেও তাঁর গবেষণাপত্রে একই কথা বর্ণনা করেছেন। হৃদপিন্ডের রক্তচলা-চল এবং তার মাংসপেশীগুলির বিচিত্র কার্যকলাপ বিষয়ে তিনি যে বর্ণনা করে গেছেন ও চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তা আধুনিককালের মনীষীরাও যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন।

উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পুং হর্মোনের কথাও তাঁর অজানা ছিল না। মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এবং দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণার

দা ভিঞ্চির আঁকা মানুষের করোটির ছবি

দা ভিঞ্চির করা শবব্যবচ্ছেদ
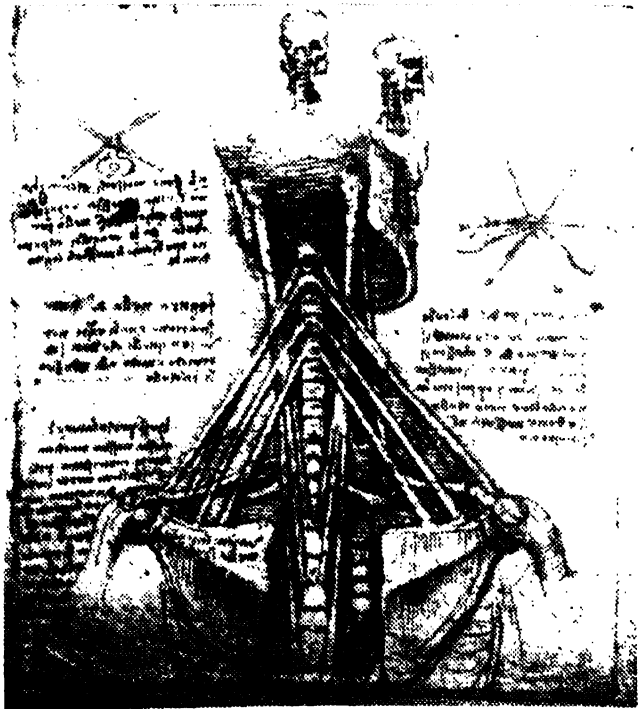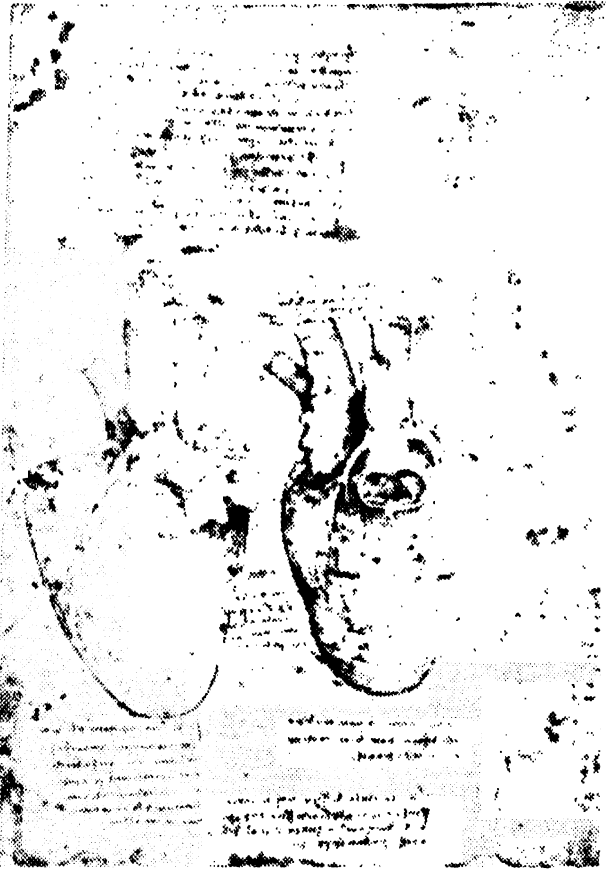
দা ভিঞ্চির আঁকা হৃৎপিণ্ডের দুটি ছবি

দ্বারা তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছিলেন। দৃষ্টিশক্তি নিয়েও তিনি পড়াশোনা করেছিলেন, চোখের অ্যানাটমি ভালভাবেই জানতেন। এমন কি মধ্য-কর্ণে (মিডল্ ইয়ার) ম্যালিয়া এবং ইনকাস্ নামে যে দুটি ছোট হাড় আছে সে খবরও তিনি রাখতেন। জিভের মাংসপেশী, হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা এবং জরায়ুতে শিশুর অবস্থিতি ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। তাঁর সময়ে সকলের ধারণা ছিল যে তলপেটের ব্লাডারে মূত্র তৈরী হয়, একথা যে ভুল তা তিনিই বোধহয় সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তিনি বলেন কিডনী বা বৃক্কের কাজ হচ্ছে মূত্র উৎপাদন করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞরা বলেন যে ইউরেটরী ডাক্ট মূত্র বহন করে ব্লাডারে প্রবেশ করে না। এ কথা খাঁটি নয়। ...আমরা বলতে পারি যে, লম্বা এবং ঈষৎ বাঁকানো পথ বেয়ে (ইউরেটর) মূত্র ব্লাডারে স্থানান্তরিত হয় কিডনী থেকে।'

লিওনার্দোর মৃত্যুর পর তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি তাঁর তরুণ শিষ্য মেলজির কাছে গচ্ছিত ছিল। প্রায় একশ কুড়ি বছর ধরে সেগুলি ছিল অবজ্ঞাত অবস্থায়। এলমার বেল্ট নামে ভিনসিয়ানার একজন খ্যাতনামা সংগ্রাহক লিওনার্দোর প্রায় সাত হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। তাঁর আঁকা অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির বহু চিত্র অবহেলিত হয়েছিল। বৃটিশ মিউজিয়ম, সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ম, তুরিনের রয়াল লাইব্রেরী, উইন্ডসর ক্যাসল, ইনস্টিটিউট দ্য ফ্রান্স ইত্যাদি বড়ো বড়ো সংগ্রহশালায় তাঁর অমূল্য পাণ্ডুলিপি ও অপূর্ব চিত্রকলা প্রদর্শিত হয়েছে বহুবার। আর একালের মানুষ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলসহ কাগজের রত্নরাজি অবলোকন করে ধন্য হয়েছে।

তাঁর সমগ্র জীবন বাস্তবজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জ্ঞানের রাসায়নিক সংমিশ্রণ। তাঁর প্রতিটি কর্ম বাস্তবতার প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত। স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কল্পনায় তিনি যেমন আইডিয়ালিস্ট, বাস্তব ঘটনার প্রকৃত রূপায়ণে তিনি তেমনই রিয়ালিস্ট। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে তিনি মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় তার মুখের রঙ, দেহভঙ্গি, দেহের কম্পন তিনি অত্যন্ত মনোনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন বলে শোনা যায়, তেমনি গ্রামের হাস্যোচ্ছল চাষীদের প্রাণতরঙ্গে কম্পিত দেহের সঞ্চালন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন; তিনি নাকি খাঁচায় আবদ্ধ পাখীদের ছেড়ে দিয়ে সেই মুক্ত বিহঙ্গের স্বাধীনতার উল্লাসে শিহরিত পক্ষের আন্দোলন গভীর আগ্রহ সহকারে দেখতেন। এই পর্যবেক্ষণা বিজ্ঞানী-সুলভ। কারণ সংকীর্ণ অর্থে বিজ্ঞান মানেই পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান। দেহের তুচ্ছ অংগ সঞ্চালনের মধ্যেও বিমূর্ত হয় এক ছন্দায়িত মূর্ছনা। সাধক শিল্পীর চোখে এই ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সর্বপ্রথম এই ছন্দোবদ্ধ গতি এবং তার মূর্ছনার সুর অনুভব করেন। কৈশোরে তিনি যে জ্যামিতি অধ্যয়ন করেছিলেন তার প্রভাব তাঁর শিল্পীজীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনের বীক্ষণযন্ত্রে এই গতি-ভঙ্গিমার মধ্যে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক পরিমাপে আবিষ্কৃত হয়। দা ভিঞ্চি বলেন যে, নির্ভুল গাণিতিক হিসাবের পরে নির্ভর করে শিল্পের চারুতা এবং কারুতা। তাঁর এ কথার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন প্রতিটি চিত্রে। তাঁর 'দি আঞ্জেল ফ্রম দি অ্যানানসিয়েশন', 'জিনেভার দি বেনসী', এবং 'ভারজিন অব দি রকস্' ছবি সম্বন্ধে এক লেখক যথার্থই বলেছেন, 'জ্যামিতিক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিমাপ সংস্থাপনা, পোষাকের ভাঁজ এবং ছবির পারস্পেকটিভ্ গঠনের বিস্ময় এখানে এক উচ্চচূড় সার্থকতা লাভ করেছে।'

কি গণিতে, ফলিত বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে, চিত্রশিল্পে—জ্ঞানের প্রায় প্রতি শাখায় সিদ্ধ সাধকের মতো বিচরণ করেছেন ইটালীর রেনেসাঁয় যুগের যুগন্ধর পুরুষ লিনার্দো দা ভিঞ্চি। অন্তরে শিল্পী-দার্শনিকের সত্তা, নয়নে বিজ্ঞানীর অসীম কৌতূহল—এই দ্বৈত চেতনার সার্থক সমন্বয় তাঁর জীবনে। চিত্রশিল্পে অ্যানাটমির নিখুঁত প্রয়োগ এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য সূক্ষ্মতর ভাবকে শিল্পের ব্যঞ্জনায় প্রতিমূর্ত করা সম্ভব একমাত্র বিজ্ঞান-শিল্পীর পক্ষে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তার পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি কালজয়ী শিল্পী।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন পাঠক। পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগ আমার কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। আমি কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছা করি। আশা করি প্রশ্নগুলির জবাব 'অমৃত' মারফৎ জানতে পারবো।

(ক) শুনেছি মানুষের আয়ু ২০ বৎসর। মানুষ জীবিত থাকে বর্তমান অনুযায়ী ৫০ বৎসর। ২০ বৎসর পর থেকে মানুষ কার থেকে আয়ু পেল?

(খ) বিড়াল কি করে আয়ু বাড়ায়?

(গ) ছবি কেটে যে প্লাষ্টার করে ফটো হয় তা কি প্রকারে করলে ফটো উঠে আসবে না।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
৭৮নং ফিডার রোড
পোঃ বেলঘরিয়া
২৪ পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

'জানাতে পারেন' বিভাগের মাধ্যমে উত্তর পাবার আশায় কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম।

১। পদ্য ও কবিতায় এবং Poetry ও Verse-এ পার্থক্য কি?

২। নকল নাম নিয়ে সর্বপ্রথম কোন্ লেখক কি বই লেখেন?

৩। 'College'-এর (মহাবিদ্যালয় ছাড়া) এবং 'Yours ever'-এর শ্রুতি-মধুর বাংলা প্রতিশব্দ কি?

৪। বাংলা ও হিন্দী গানের রেকর্ড কবে কোথায় সর্বপ্রথম তৈরী হয়। ও গান দু'টি কি কি?

৫। ভারতের সমুদ্রে যাতায়াত উপযোগী কয়টি জাহাজ আছে? তাদের নাম কি?

৬। বাংলায় যে ব-ফলার প্রচলন তার উচ্চারণের পার্থক্য লক্ষ্য করি। কোথাও এই ব-ফলা উহ্য রাখা হয়। যেমন—স্বীকৃতি, স্বর্গ ইত্যাদি। কোথাও বিশ্ব (বিশ্শ), অশ্ব (অশ্শ), বিহ্বল (বিউহল) ইত্যাদি। আবার কোথাও ব-ফলার ঠিক উচ্চারণ করা হয়। যেমন—উদ্বোধন, সম্বন্ধ, অম্বর, উদ্বাস্তু ইত্যাদি। এর ব্যাকরণগত কারণ কি?

৭। খুব সাহসী, নির্ভীক, দুষ্ট ছেলেকে 'ডার্নাপটে' ছেলে বলা হয়। এইরূপে বলবার কারণ কি? এবং স্ত্রীলিঙ্গে এর ব্যবহারের রূপ কি?

৮। সভাপতি নির্বাচন করে সভার কাজ আরম্ভ করবার রীতি কবে থেকে চালু হয়?

৯। রাশিয়া বা অ্যামেরিকার কোন উপগ্রহ এখনও কি মহাকাশে বিচরণ করছে?

(১০) ৯ (-নয়) দিয়ে গুণ মেলাবার পদ্ধতিটি সকলেই জানেন। এই পদ্ধতিটির আবিষ্কর্তা কে? এবং এই ৯ ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে হয় না কেন?

শ্রীমদনচন্দ্র মান্না
সুগন্ধ্যা,
হুগলী।

উত্তর

গত ১৮।১।৬৩ তারিখের 'অমৃত' পত্রিকায় 'জানাতে পারেন' বিভাগে নদীয়া থেকে শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী POULTRY সম্বন্ধে যে তিনটি প্রশ্ন জানতে চেয়েছিলেন তারই উত্তরে জানাচ্ছি......।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমিও একজন ভুক্তভোগী এই POULTRY'র ব্যাপারে। সুতরাং যেটুকু লিখলাম এ আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার পুঁজি থেকেই লিখলাম। এ অভিজ্ঞতা আমার পুঁথিগত বিদ্যায় শেখা নয়।

(ক) POULTRY (মুরগী সংক্রান্ত ব্যাপারে) সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বই বেরোয়নি। যার থেকে আমাদের মতন লোকেরা উপকৃত হ'তে পারেন।

(খ) মুরগীরা যে গরমের সময়ে মারা যায় এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। কেননা মুরগীরা মোটেই গরম সহ্য করতে পারে না, (আমি বিলিতি মুরগী অর্থাৎ লেগহর্ন ও রোডাইল বা উভয়ের ক্রশ মুরগীর কথাই এক্ষেত্রে বিশেষ করে বলছি। তবে এই অসুখ দিশী মুরগীদেরও হয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য) ফলে তাদের অসুখ করে। যে অসুখে মৃত্যু অবধারিত; সেই অসুখই তখন তাদের হয়। অনেকটা কলেরা টাইপের। আর অসুখটি অত্যন্ত সংক্রামক। যার ফলে, এই রোগে আক্রান্ত মুরগীকে সঙ্গে সঙ্গে তার ঝাঁক থেকে অন্ততঃ বিশ-ত্রিশ গজ দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। রোগটি এত বেশী সংক্রামক যে, যদি ঠিক সময়মত আক্রান্ত মুরগীকে সরানো না হয় তবে এক ঘণ্টার মধ্যে একটি মুরগী থেকে একশোটি সুস্থ মুরগী পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এক্ষেত্রে মুরগীর মৃত্যুই নিশ্চিত ভেবে নিতে হবে। কেননা, এই অবস্থায় মুরগীদের খাওয়ানোর মতন তেমন কোন ফলপ্রদ ওষুধ বেরোয়নি।

অবশ্য মুরগীর মৃত্যু অনিবার্য জেনেও কিন্তু চুপ করে বসে থাকবেন না। কপাল ঠুকে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে খাওয়াবেন তাদের দিশী ওষুধ। যে ওষুধ খেয়ে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকেও অনেক সময়ে ফিরে আসে মুরগী সশরীরে। ওষুধটি হ'ল, রসুনের কোয়াকে থেঁতো নিয়ে আর পুদিনা পাতাকে (যদি কাছে-পিঠে কোথাও পেয়ে যান) বেটে নিয়ে তার সঙ্গে কাঁচা সরষের তেল মাখিয়ে বেশ বেশী পরিমাণ করে দিনে পাঁচ থেকে ছ'বার পর্যন্ত তাদেরকে খাইয়ে দিন। আর এই রোগে আক্রান্ত কোন মুরগীকে কিছু খেতে দেবেন না, এমনকি জল পর্যন্ত না।

এবারে অপেক্ষা করুন আপনার ভাগ্য কি চরম রায় দেয়......।

অসুখের লক্ষণ : অবিরাম পায়খানা করা। যে পায়খানাতে চুনের ভাগ অত্যন্ত বেশী। আর ঝিমিয়ে পড়া। এছাড়া খাওয়াতেও তখন তাদের রুচি থাকে না। তবে জল খেতে চায় খুব বেশী পরিমাণে।

পূর্ব হ'তে সাবধানতা : মুরগীর যখন দিন পনেরো বয়স হবে (মুরগীর সংখ্যা যদি অন্ততঃ পঞ্চাশটির উর্ধ্বে হয়) তখনই আপনি নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এ POULTRY'র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সেখান থেকেই লোক গিয়ে আপনার মুরগীদের ভ্যাক্সিন দিয়ে আসবে।

এ ছাড়া ঘরে সব সময়ে SULPHAMEZATHINE 16% ওষুধটি মজুত রাখবেন। বাচ্চা অবস্থায় মুরগীর পায়খানার সঙ্গে যদি রক্ত পড়ে তখন এই ওষুধটি ফোঁটা দশেক ফেলে দেবেন এক আউন্স তিনেক জলের মধ্যে, এবং এই জলই তখন তাদের খেতে দেবেন। তখন কাঁচা জল খেতে দেবেন না।

এ ছাড়া মাঝে মাঝে প্রত্যেক মুরগীদেরই পিঁয়াজ ও রসুন কুঁচিয়ে খেতে দেবেন।

(গ) বিলিতি মুরগীর খাদ্য : গম, ভুট্টা, কাঁচা চিনেবাদাম, কুঁচো শুঁটকী মাছ, শামুক প্রভৃতি। জিনিসগুলিকে ভালো করে গুঁড়িয়ে নিয়ে তার সঙ্গে অল্প পরিমাণে হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। খেতে দেবার সময়ে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে কাদা কাদা করে মেখে মুরগীদের খেতে দিন।

শ্রীনন্দকুমার চক্রবর্তী
৬৩, রায়বাহাদুর রোড,
কলিকাতা—৩৪।

গ্রীষ্মের এক মধ্যাহ্নে দক্ষিণের ছোট্ট স্টেশনটিতে পৌঁছলাম।

দু'দিকে বিস্তৃত মাঠের মাঝ বরাবর পায়ে চলা সরু পথ লোকালয়ের দিকে গেছে। আমার জন্য স্টেশনে কারও আসার কথা ছিলো না। পাশের কুঁজো মতো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলেশ্বরটা কোনদিকে হবে, বলতে পারেন?

টাঁক থেকে বার করা তার খুচরো পয়সা গুণতে সে এতো ব্যস্ত ছিলো, মুখ না তুলেই হাত দিয়ে একদিকে দেখিয়ে দিলো। আমি আর দেরী না করে অন্য দু'একজনের পেছনে পেছনে হাঁটতে সুরু করলাম। আকাশে উত্তপ্ত মেঘের নীচে একটুও বাতাস ছিলো না। দূরে দিগন্তের দিকে তাকালে চোখে ঝাপসা লাগে। এবং মাঠ পেরিয়ে লোকালয়ের গাছ, গাছগুলির পাতা যেন ভেতর ভেতরে পুড়ে কালো হয়ে উঠেছিলো।

কিছুক্ষণের পর কাদামাটির একটি দোতলা বাড়ী চোখে পড়লো। একপাশে বাজপড়া একটি দগ্ধ তালগাছ, ঝোপের আড়ালে কয়েকটি অদৃশ্য পাখির ডানা-ঝাড়ার শব্দ ছাড়া স্তব্ধপ্রায় মধ্যাহ্নে নিঃসঙ্গ প্রাচীন বাড়ীটি যেন এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলো। উঠোনের পাশে জীর্ণ খামারের গায়ে একটি নেড়িকুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলো। অচেনা পায়ের শব্দে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে সুরু করলো। পথের একজন আমায় বাড়ীটি দেখিয়ে দিতে এসেছিলো। সেও চলে গেলো। আমি একা বাড়ীর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এর আগে মমতার শ্বশুর এবং তাদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে অনেক শুনেছি। এতদিনে, এখন তার কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। কিছুদিন আগে মমতার চিঠি পেয়েছি। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই মমতা বিধবা হয়েছে। যেহেতু তার স্বামীকুলের কেউ জীবিত ছিলো না, তার অভিভাবকত্বের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে বর্তিয়েছে। আমাদের দূর-সম্পর্কের কিন্তু নিকট এই বোনের দুর্ভাগ্যে আমরা সত্যি বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই তার শ্বশুরপরিবারের এই বাড়ী ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। অগত্যা কিছুদিনের ছুটিতে আমি ফুলেশ্বরে এসেছি। আহা, সে আমার কতো স্নেহের।

মমতাদের বাড়ীটা অনেকদিনের পুরনো। চারপাশে বিরাট বিরাট গাছ বাড়ীটিকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র করে রেখেছে। বাড়ীর পিছনে ইতস্ততঃ কতকগুলি ঢিবি আছে। সেখানে ধ্বসেপড়া একটি তুলসীমঞ্চ, ভাঙ্গা পরিত্যক্ত সামগ্রী আর অবিন্যস্ত বুনোগাছের জঙ্গল। কোনো ফাটলে, কি ঢিবির গর্তে সাপ থাকাও আশ্চর্য নয়। ঐ তুলসীমঞ্চে আলো জ্বলে না। এবং বহুদিন। গা-ছম-ছম অন্ধকারে তাকালে শুধু ক্ষুব্ধ বাতাসে পাতা থেকে জোনাকি খসে পড়ছে, দেখা যেতো।

মমতার কিছু হাঁস ছিলো। সন্ধ্যার মাথায় চাঁদতোলা বাছুর আর হাঁসগুলো ফিরে না এলে তার দুশ্চিন্তার সীমা থাকতো না। লুকিয়ে কান্নার শব্দ বড় শুনতে পেতাম না। কিছু জিজ্ঞেস করলে সে বলতো, সে খুব ভালো আছে। আহা, ভালো থাকুক তাকে আমি কি সান্ত্বনা দেবো ভেবে পেতাম না।

একদিন রাতে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম।

অন্ধকারে মধ্যে তাকালাম। চোখের পাতাগুলো তখন আড়ষ্ট। বুঝতে পারলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আবার শব্দ কানে এলো। এবং খুব কাছে। আমার ঘাড়ের কাছে তপ্ত নিশ্বাস পড়লো। আমার শরীরের খুব কাছে তার শরীর-চুল-ঘ্রাণ অনুভব করলাম। এত কাছে—। আমি জেগে আছি। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় ও সম্পর্কশূন্য হয়ে বিছানার ওপর পড়ে আছে। না, জেগে ওঠার ক্ষমতা আমার ছিলো না। প্রায় নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছিলাম।

পরের দিন আলোহীন নিস্তব্ধ ঘরে আবার শুতে গেলাম। ঘুমালাম না। নিঃশব্দে চোখ বুজে থাকলাম। ধীরে ধীরে নিশীথের নিদ্রাকে আমি হত্যা করছিলাম। এ সমস্তই আমার কাছে খুব আকস্মিক ছিলো। প্রবল অস্থিরতায় দিন কাটতে লাগলো। আমি যেন কিছু না ভেবে প্রায় অভ্যাসবশে চলা ফেরা করেছিলাম। আমার এই জাগরণের কাহিনী আমি ছাড়া কেউ জানতো না।

চতুর্থ রাতে (যখন ক্ষীণতম শব্দের জন্য কান উদগ্রীব হয়ে থাকে) অস্ফুট ফোঁপানির শব্দ শুনলাম। তখন গভীর রাতে অনুভূতি অত্যন্ত ভোঁতা লাগে আর যাবতীয় আশঙ্কায় রাত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। পাশের ঘরে স্তিমিত আলোয় মমতা বুকে মুখ গুঁজে বসে

ছিলো। সহসা কে-কে চীৎকারে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। দেখলাম, দেয়ালের বিরাটাকার ভয়াবহ একটি ছায়ার দিকে সে তাকিয়ে আছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দেখো, তুমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছো। এ ছায়া আমার আবছা আলোতে এতো বড় দেখাচ্ছে। সে আমার দিকে তাকালো। তার চোখে চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম। বলতে চাইলাম, মমতা অমন করছো কেনো, তোমার কি হয়েছে?

দিনে দিনে নিজেকে অপরাধী বোধ হতে লাগলো। মাঝে মাঝে টের পেতাম, তার খুব কষ্ট হচ্ছে। যদি তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারতাম।...কোথায় একটা পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। কিন্তু এতো ধীরে ও অপ্রকাশ্যে যে মনে হলো, এরা অনিবার্য ছিলো। আমি কি করতে পারতাম। সন্ধ্যার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীটা যেন ছম ছম করতে থাকতো। পলেস্তারাহীন দেওয়াল, অব্যবহৃত ঘর নির্বোধ অন্ধকারে শরীরী হয়ে উঠতো।

একদিন দুপুরে দেখলাম, মমতা আমার দিকে তাকিয়ে দরজার আড়ালে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার রুক্ষ চুল ইতস্ততঃ উড়ছিলো। ঐ দৃষ্টি আমি চিনি না। হঠাৎ ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কিছু বলার আগেই সে ছুটে পালিয়ে গেলো। আমি কিছু বুঝতে পারলাম না।

মমতা দিনে দিনে অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগলো। চুলে তেল দিতো না। প্রায়ই স্নান করতো না। আমার কিছু করা দরকার। শেষে গ্রামের ভেতরে তে-মাথায় হঠাৎ হোমিওপ্যাথের সাইনবোর্ড দেখে থামলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলাম না। দু'তিনবার আশেপাশে ঘোরাফেরা করলাম। ভেতরে তারের চশমা চোখে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। ঘরে দু'-তিনটে কাচ ভাঙ্গা আলমারী। তিনপায়া টেবিলে, সর্বত্র ধুলো জমেছে! প্রথমে তিনি আমায় দেখতে পাননি। দেয়ালে স্ত্রীরোগ বিষয়ক কতকগুলি ছবি টাঙ্গানো ছিলো। তার প্রায় কানের কাছে মুখ এনে বললাম, দেখুন?

তিনি প্রায় চমকে উঠে বসলেন। আমার পা থেকে মাথা অব্দি দেখে নিলেন। মনে হলো সমস্তই তিনি বুঝে ফেলেছেন। ভরসা পেয়ে বললাম, দেখুন, মমতা, আমার বোন, তার সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু—

ডাক্তারবাবু চোখ বুজে তার গালের আঁচিলের ওপর হাত রেখে শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, অসুবিধেগুলো কি?

আজ্ঞে, আমি প্রায় ঢোক গিলে ফেললাম। মমতার অসুবিধেগুলো তা কি আমার জানা আছে? মূর্খের মতো বলতে লাগলাম,

আজ্ঞে রাতে.........

ঘুম হয় না? ডাক্তারবাবু আমায় সাহস দিতে লাগলেন, বুক ধড়ফড় করে?

বোধ হয় করে।

মাথা ধরে, গলা জ্বালা...?

অ্যাঁ, আমি তখন তোতলাতে সুরু করেছি। কিন্তু ডাক্তারবাবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তাকে খুশি আর বিজ্ঞ বিজ্ঞ দেখাচ্ছিলো। তার ছোট্ট কালো বাক্স খুলতে খুলতে তার বহুতর অভিজ্ঞতা, অন্যান্য শাস্ত্রের তুলনায় হোমিওপ্যাথের শ্রেষ্ঠতা আমায় বোঝাতে লাগলেন। বলার সময় প্রতিবার তিনি চোখ বুজতেন। হাত থামিয়ে যেনো চিবিয়ে গলধঃকরণ করার ভঙ্গীতে তিনি কথা বলছিলেন। তারপর আমার কাছে প্রায় লুকিয়ে ছোট একটা শিশি বার করলেন। এবার অন্য বড় একটি শিশি থেকে সুগার অব মিল্ক ঢাললেন। তারপর যত্নের সঙ্গে মিশিয়ে পুরিয়াগুলো আমার হাতে তুলে দিলেন।

যেন একটা কাজ করা গেছে, ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। দেখলাম মমতা বাইরের দিকের ঘরে উবু হয়ে শুয়ে আছে। পায়ের শব্দ শুনে সে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। প্রসন্নতায় আমি বললাম, দ্যাখো, তোমার জন্য ওষুধ এনেছি।

কিন্তু সমস্ত সংশয় ও সন্দেহের চোখে সে আমার হাতের পুরিয়াগুলোর দিকে তাকাতে লাগলো।

আবার বললাম, ওকি অমনভাবে কি দেখছো? আমি তোমার জন্য—

সে এবার পায়ে পায়ে পেছন দিকে হাঁটতে লাগলো। তার ভঙ্গীতে, তার পালানোর ব্যস্ততায় মনে হচ্ছিলো, আমি যেন হাতে করে বিষ এনেছি। তাকে বলেছি, এই নাও।

মমতার ব্যবহার ক্রমেই অদ্ভুততর হতে লাগলো। শেষে ভাবলাম অন্যান্য আত্মীয়দের খবর দেই। কলকাতায় আমাদের এক পিসিমা থাকেন। তাঁকে একবার আসতে লিখব ভাবলাম। এখানে কিছু দূরে বাড়ী একমাত্র অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। গঞ্জে তার সাজান দোকান আছে। মাঝে মাঝে তিনি আসতেন। কিন্তু তার কাছে কিছু বলিনি। সেদিন দেখা হতে বললেন, কি মশায়, কাল রাতে আপনাদের বাগানে আলো দেখছিলাম, কি ব্যাপার?

অম্বিকাবাবুকে কোনরকম ভুল বোঝাবার চেষ্টা করে পালিয়ে এলাম। পুরনো তুলসীমঞ্চে মমতা আবার প্রদীপ দিতে সুরু করেছে তাকে বললাম না।

কিন্তু ক্রমে লুকিয়ে রাখাও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। দিনের বেলা মমতা অনেকটা শান্ত হয়ে থাকতো। কথা প্রায় বলতো না। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। শুয়ে না হয় চুপ করে বসে থাকতো। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাইতাম। তাকে সহজ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমাকে দেখলেই তার মুখ যেন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যেতো। ...তারপর দেখতাম সে যেন ভয় কাটাতে চাইছে। ভরসা পেয়ে তার পাশে বসে পড়তাম। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। তার ঠোঁটদুটো শুধু কাঁপতো। বিড়বিড় করে কি বলতো আমি বুঝতে পারতাম না।

ভাবলাম, রাতদিন ঘরে বন্ধ থাকে। বাইরে একটু ঘুরে এলে তার মন ভাল লাগতে পারে।

সন্ধ্যায় বললাম, মমতা, চল আমরা জীবন-মা'র মন্দিরে আরতি দেখে আসি?

মমতা রাজী হলো।

আকাশে বিচ্ছিন্ন মেঘ ছিলো। পথে বেশী লোক ছিল না। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছে দেখলাম অনেক মেয়ে এবং পুরুষ জমেছে। অম্বিকাবাবুর সঙ্গে আর একবার এখানে এসছিলাম। সমস্ত দিন বিশাল বিশাল গাছের নীচে মন্দির প্রাঙ্গণ থম থম করে। আবার সন্ধ্যায় মুখরিত হয়ে ওঠে।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মন্দিরে প্রতিমার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তুমুল ধ্বনি, ঢক্কানিনাদ ইত্যাদির মধ্যে আবছা আলোয় কারও মুখ স্পষ্ট নয়। কেউ কারও কথা শুনতে পাচ্ছিল না। শুধু আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিত হচ্ছিল।

অসহ্য ভীড়ের চাপ—ধোঁয়া ও শব্দে মুহূর্তের জন্য সমস্ত চিন্তারহিত অপূর্ব আচ্ছন্নতা আমাকে অধিকার করেছিলো। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনলাম।

চকিতে দেখলাম, মমতা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

ম-মতা? আমি চীৎকার করে উঠতে চাইলাম। মানুষগুলি ঠেলতে ঠেলতে দু'ভাগ হয়ে গেল। কে চীৎকার করে উঠলো, ভর হয়েছেন, ভর হয়েছেন।

অমনি ঝনঝন করে আবার ঢাককাঁসি বেজে উঠলো।

ধ্বনি দাও, ধ্বনি দাও হে—এ-এ।

তারা আমায় মমতার কাছে যেতে দিল না। সমস্ত হট্টগোলে প্রায় কোন কথাই শোনা যাচ্ছিল না। শেষে এক সময় বাজনা থামল।

লোকগুলোর মুখ অস্পষ্ট আলোয় রহস্যময় দেখাচ্ছিলো। এই সময় মমতা একটু নড়ে উঠলো। দেখলাম, থান-পরা একজন বৃদ্ধা হাত জোড় করে কাঁপছেন।

মমতা যেন সাড়া দিল। মনে হল বুকে ভর দিয়ে সে উঠতে চাইছে। ... একটা নেড়িকুকুর জিভ দিয়ে আমার পা চাটছিল। লোকগুলি আবার ধ্বনি দিয়ে উঠলো। দেখলাম, মমতা উঠে বসেছে। মানুষগুলি যেন ভয়ে ভয়ে আরও দূরে দাঁড়াতে লাগলো। মমতা

কি অদ্ভুত চোখে চারদিকে তাকাচ্ছিলো। তার ঠোঁট কাঁপছিলো। বিড় বিড় করে সে কি বলছিলো দূরে থেকে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না।

কিছুক্ষণ পর খোঁজ করে আমাকে একজন জীবন-মা'র কাছে নিয়ে গেল। লোকগুলো আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। আমি বড় বিব্রত বোধ করছিলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকে বিস্মিত হলাম। তাঁর চওড়াপেড়ে-শাড়ী, এলান চুল, চন্দনের ফোঁটায় মা বলতে বড় সাধ হয়। সহসা আমার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হরিমতী কে?

আমি চমকে উঠলাম। কোথায় যেন এ নাম শুনেছি। কিন্তু মনে করতে পারছি না। বুঝতে পারছিলাম জীবন-মা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি আবার কথা বললেন, বাছা, যেদিকে মানুষের পায়ের ছাপ নেই সেদিকে যেতে নেই।

আজ্ঞে?

তাঁর কথাগুলো আমার এতো দুর্বোধ্য ঠেকছিলো। তিনি তখনও বলছিলেন, মানুষের সাধ্যের সীমা আছে। তার বাড় বাড়তে নেই। আসলে সৃষ্টি বিলয় সবই অদৃশ্য শক্তির খেলা বাবা। আমাদের এই দেহ যেন একটা তানপুরো, মাথাটা তার অলাবু। আর তিনগুণ তিনটি তার। বাইরে থেকে একজন বাজাচ্ছেন।

থাকতে না পেরে আমি বললাম, আজ্ঞে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে হরিমতির কথা আমার মনে পড়ছে।

জীবন-মা মৃদু হেসে বললেন, বল?

আমি বললাম, আমি তাকে কখনও চোখে দেখিনি। মমতা, আমার বোনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল। শুনেছি বিয়ের রাতে আমাদের এ বাড়ীতে আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন, আমি জানি না।

আমি থামলাম। যেন বড় পরিশ্রম করেছি। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত ঘর অসহ্য স্তব্ধতায় থমথম করতে লাগলো। তারপর জীবন-মা বলতে লাগলেন, মমতার ওপর ভর হয়েছে, হয়তো হরিমতী, হয়তো—

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে জানলেন?

জীবন-মা বললেন, এখনও সঠিক জানি না। তবে জানতে পারবো। এখানে তুলে আনার সময় সে হরিমতীর নাম উচ্চারণ করেছিলো। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। জলদর্পণ ধরলে জানা যাবে কে এসেছে। শোন, তখন যা বলছিলাম। মানুষের সাধ্যের বাইরে যেতে নেই। কুপিত গ্রহপুঞ্জ আছেন। প্রেতাত্মা-পিশাচের যে কেউ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। সে জন্য সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মেয়েটির ওপর যে ভর করেছে হরিমতী না-ও হতে পারে। অন্য যে কেউ হতে পারে। এমন কি জীবিত লোকেরও ক্ষতি করার ক্ষমতা কম নয়। এর সঙ্গে আর কে কে থাকে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলাম না। তারপর বড় অপরাধীর মতো বললাম, আজ্ঞে আমি। আর এক রাঁধুনী। সে সন্ধ্যার আগেই কাজ সেরে চলে যায়।

জীবন-মা কিছুক্ষণ স্থির থেকে কি চিন্তা করলেন। তারপর জলদর্পণ সম্পর্কে খুঁটিনাটি উপদেশ দিয়ে জানালেন, কাল সকালে তার লোক আমাদের বাড়ীতে যাবে।

আমি রাজী হলাম।

কিন্তু মমতাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে খুব খেলো মনে হতে লাগলো। আমি কি প্রেতাত্মা, ঝাড়-ফুঁক এ-সব বিশ্বাস করি? আবার বিশ্বাস করি না, এ-কথা জোর করে বলার সাহস ও যুক্তি তো আমার ছিল না। ফলে, হ্যাঁ, বা না কোন দলেই নিজেকে নিঃসংকোচে ফেলতে পারলাম না। সারাক্ষণ বিছানায় ছটফট করে কাটলো। শেষ রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে দেখলাম, ভোর হচ্ছে, মমতা ঘরে নেই। হাতের পিঠে পিচুটি মুছতে মুছতে তাকে খুঁজতে লাগলাম। তারপর দেখলাম, বাড়ীর পেছনে পেয়ারা গাছের সারির মধ্যে সে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এলো চুল পিঠে ছড়ানো। আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে।

নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করলাম। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। মমতা ধীরে ধীরে প্রায় মজা দীঘির বাঁধান ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। এদিকে পায়ে চলা পথ নেই বললে চলে। দু'দিকে ঢিবি আর বুনো-গাছের ঝোঁপ। মাঝে মাঝে পুরনো আমলকী, মাদার আর সজনে গাছ দেখা যায়।

মমতা দীঘির ঘাটের ভাঙ্গা সিঁড়ির ওপর জলের কাছে বসল। আমাকে সে দেখতে পায়নি। হঠাৎ একটি কাক শ্রান্ত পাখার ঝাপটায় আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। প্রায় সঙ্গশূন্য নিঃশব্দ এই স্থানে এমনিতেই ভয়ের সঞ্চার হয়।

আমি মমতার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দীঘির সামনে সে বসেছিলো। সহসা কৌতূহলে আমি জলের দিকে মুখ বাড়াতে অসাবধানতায় এবং প্রায় নিয়তির মতো আমার পায়ের আঘাতে এক খণ্ড পাথর জলে ছিটকে পড়ল। চূড়ান্ত বিপ্লবে জলের মসৃণতা চৌচির হয়ে গেল। সেখানে অসংখ্য মুখ কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে লাগলো। সে মুখ মমতার, না হরিমতীর—হরিমতীর অথবা মমতার বুঝতে পারলাম না।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মমতা চকিতে উঠে দাঁড়ালো। যেন পালাবার পথ খুঁজছিলো? কিন্তু আমি চমকে দেখতে লাগলাম, মমতার রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। অসম্বৃত আঁচল ধূলিলুণ্ঠিত। আমি যেন প্রথম আজ এখন তার রক্ত-মাংসের শরীরের দিকে তাকালাম।

এই সময় বাড়ীর দিক থেকে একাধিক মানুষের গলার স্বর আমাদের কানে পৌঁছল। বুঝলাম, জীবন-মার লোক এসেছে। কোথায় একটা তক্ষক ডেকে উঠলো। ধুলো-জমা পাতায়, ঝোপে গুল্মে, বাতাসে ও স্বল্প আলোকে আবার একটি অশরীরী অস্তিত্ব বিরাজ করতে লাগলো।

তফাং যাও!
নে উইন
বৈদেশিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণ
কাঠের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ব করণ

ভুট্টোর পরিণতি

পাকিস্তানের ভুট্টো
চি কি
তুই ভারতকে অস্ত্রসাহায্য দিয়ে আমাদের দোস্তির খেলাপ করলি যে ?
আর, তুই ছুঁচোর মত তোর বন্ধু ভারতের পিঠে ছুরি মারলি যে ?
২৮।২।৬৩ ইং

দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সাম্রাজ্য
বিজয়নগর ও হাম্পি

গোপী রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন সকাল ছ'টায় আমরা তিনজনে বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে হাজির হলুম। গত-কাল সন্ধ্যে ছটা থেকে ন'টা অবধি নিরবিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি নেমেছিলো হসপেটে। দীর্ঘ তিনঘণ্টাস্থায়ী সেই বিরামহীন বর্ষণ দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম এই ভেবে যে হাম্পি দেখা বোধ হয় ভাগ্যে নেই। কেন না, আজ হাম্পি দেখে বিকেলের গাড়িতেই আমরা হসপেট ত্যাগ করবো এবং গাড়োক হয়ে বাদামী গুহা পর্যবেক্ষণ করে কাল হায়দ্রাবাদ রওনা হবো। উৎকণ্ঠার কারণ অপার। আকাশ সকালেই মেঘমুক্ত,—বাতাসে একটু মিঠে ঠাণ্ডার আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। বাস আসবে সাড়ে ছটায়। ধীরে-সুস্থে চা পান করে বাস-স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছি। স্কাউটের পোষাক পরা ১০।১২ জন বাঙালী ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তারাও চলেছে হাম্পির উদ্দেশ্যে। এই সময় এক স্টেশনওয়াগন-ওয়ালা তার গাড়ি নিয়ে হাজির হলো, বাস-ভাড়া অর্থাৎ ৫০ নয়া পয়সায় সে আমাদের হাম্পি পৌঁছে দেবে। আর কালবিলম্ব না করে আমরা সবাই হৈ-হৈ করে গাড়িতে উঠে পড়তেই গাড়ি ছেড়ে দিল। পিচের রাস্তা মাড়িয়ে আমাদের গাড়ি সকালের সেই মধুর আবহাওয়ার মধ্যে গ্রামের ভিতর দিয়ে হাম্পির দিকে ছুটে চললো। পথের দুধারে ধান ও আখের ক্ষেত,—পথ জনবিরল, যানবাহনশূন্য। স্পিডোমিটারের কাঁটা ৪০।৪৫।৫০ মাইলের ঘর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

আকাশের নীলের রঙটুকু বেশ নরম, তার মধ্যে সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরোহীরা কেউ কথা বলছে না,—সকলের চোখ বাইরের দিকে। সাত মাইল পথ পেরিয়ে আমরা হাম্পি বাজারে পম্পাপতি স্বামী মন্দিরের গোপুরমের সামনে যখন পৌঁছলুম তখন সাতটা বাজতে কিছু বাকি আছে। মন্দিরের কাছেই হোটেল, চা-এর দোকান ছাড়াও কয়েকটি দোকান রয়েছে। তারই একটিতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় নগ্ন পা, নগ্ন দেহ একটি দক্ষিণ ভারতীয় যুবক আমাদের সামনে উপস্থিত হলো। সে আমাদের গাইড হতে চায়, পারিশ্রমিক মাত্র দু টাকা। আমরা এক টাকা বলতেই সে তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলো। হিন্দি জানে না, ইংরেজি বেশ বলতে ও বুঝতে পারে। বাড়ি অন্ধ্র দেশে। শংকরাচার্য মঠের লোক। কেউ নেই। অধুনা দেশ ছেড়ে মহীশূরে রাজ্যে এসেছে, পেশা এই গাইডগিরি।

পম্পাপতি স্বামী মন্দিরের গোপুরমটি বিরাট। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র যে-ধরনের গোপুরম দেখা যায়, তারই মতো, বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই। ভিতরে প্রশস্ত চত্বর, তার বাঁ দিকে লম্বা বারান্দা। মন্দিরটি বেশ উঁচু, তার মধ্যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন বিজয়নগর রাজাদের গৃহদেবতা বিরূপাক্ষ। মন্দিরবেষ্টনীর আশে-পাশে অনেকগুলি কক্ষ,—কোনোটা মণ্ডপ, কোনোটা বা পুরোহিতদের বাসস্থান। মন্দিরের পাশ দিয়ে কুলু কুলু ছন্দে তুংগভদ্রা বয়ে চলেছে। নদীতটে গাছের সারি ও ঢেউ-খেলানো গ্র্যানাইট পাহাড়ের শ্রেণী। পরিবেশটি ভারি মনোরম।

মন্দির পরিক্রমা করে কখন বাইরে বেরিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিলো না, চমক ভেঙে দেখলুম আমরা হাম্পি বাজারের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। পথ বেশ প্রশস্ত ; দুধারে সেকালের কতোগুলি বিপণি, তার অনেকগুলিই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেগুলি বাসোপযোগী তাতে এখনো মানুষ বাস করছে। গথিক ধাঁচের থামওয়ালা অট্টালিকাও চোখে পড়লো। পথটি শান-বাঁধানো ও চওড়া হলে কি হবে, অত্যন্ত নোংরা—কাদা ও গোময়ে তার অনেকখানিই কদর্য হয়ে রয়েছে। পথটি বেশি লম্বা নয়, তার প্রায় প্রান্তে বাঁ দিকে পাথরের ধ্বজ-স্তম্ভ। এর কাছেই পাথরের তৈরি বৃহদাকার এক নন্দীমূর্তি। দক্ষিণ ভারতে সর্বত্র শিব-মন্দিরের সামনে নন্দী বা ষণ্ডের মূর্তি স্থাপন করা প্রচলিত রীতি।

কতোগুলি পাহাড় দেখিয়ে গাইড গড়-গড় করে তাদের নাম বলে যেতে লাগলো। যথা—মাতংগ পর্বতম্, রত্নগিরি, হেমকূটম্, ঋষ্যমূখ ও বালি পর্বত। সে এইখানেই রামায়ণের একটি কাহিনী শোনালে, যার সারাংশ হচ্ছে হাম্পির কাছেই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য ছিলো। দুই ভাই বালি ও সুগ্রীব সেখানে রাজত্ব করতেন। বালি সুগ্রীবকে বিতাড়িত করলে সুগ্রীব হনুমানকে নিয়ে পম্পা নদীর কাছে ঋষ্যমূখ পাহাড়ের জংগলে পালিয়ে যান এবং মাতংগ ঋষির বাসস্থান মাতংগ পর্বতে লুকিয়ে থাকেন।

রাবণ সীতা দেবীকে হরণ করার পর তাঁর সন্ধানে শ্রীরামচন্দ্র যখন কিষ্কিন্ধ্যায় পদার্পণ করেন, সুগ্রীব তখন তাঁকে রাবণ কর্তৃক সীতা দেবীর অপহরণের বিষয় জানান এবং সীতা দেবীর নিক্ষিপ্ত কাপড়ের টুকরো ও অলংকার যা তিনি গুহায় রক্ষা করেছিলেন তা শ্রীরামচন্দ্রকে দেখান। খুশি হয়ে রামচন্দ্র বালিকে বধ
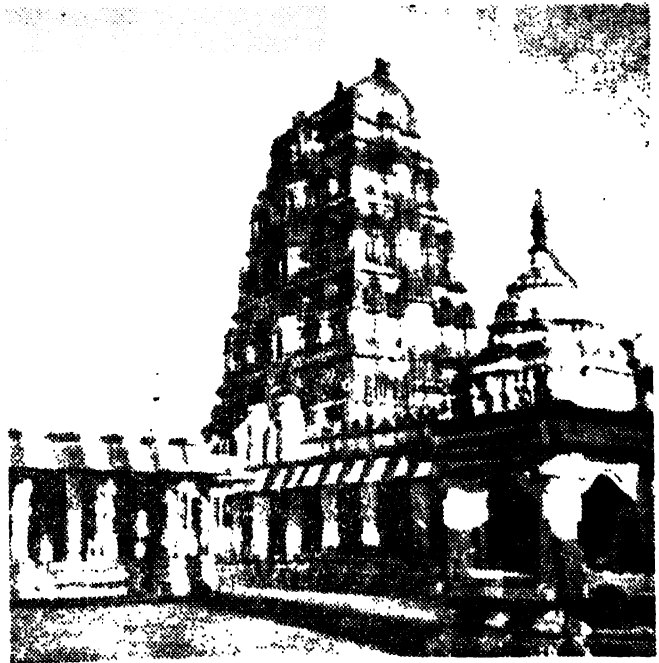
পম্পাপতি স্বামী মন্দির

করে তার দেহ চিতায় দাহ করেন। এবার হনুমান সীতার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং রামচন্দ্র মন্যেবন্ত পাহাড়ের একটি অংশ প্রস্রবনে তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। লঙ্কায় সীতার সন্ধান পেয়ে হনুমান বানর-সেনার সাহায্য রামেশ্বরম্ থেকে লঙ্কা পর্যন্ত একটি সেতু নির্মাণ করেন। রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়ে রাবণকে বধ করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করেন।

রামায়ণের এই অংশের কাহিনী হিন্দুমাত্রেই জানেন। এটি উল্লেখ করা হলো এই জন্যে যে, হাম্পির আশে-পাশে এমন কয়েকটি স্থান আছে যাদের নাম রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আনাগুন্ডির কাছে একটি সরোবর আছে, তার নাম পম্পাসার বা পম্পা-তীর্থম্। তুঙ্গভদ্রার পুরোনো নাম পম্পা নদী—যার জন্যে বিরূপাক্ষ মন্দিরকে পম্পাপতি মন্দির বলা হয়। সামনের ঋষ্যমুখ মন্যেবন্ত ও মাতংগ পর্বতের নাম-ও রামায়ণের নামের সঙ্গে অভিন্ন। নদীর ধারে সুগ্রীবের গুহা রয়েছে : ওখানে নাকি সীতাদেবীর অলংকার রাখা হয়েছিলো। গাইড আরো জানালে—পাশের নিম্বপুরম্ গ্রামে বালির চিতার অংগার এখনো দেখা যায়। এবং এই সমস্ত পাহাড়ে ও জঙ্গলে যে-সব বানরের দল আজো ঘুরে বেড়ায় তারাই নাকি বালি-সুগ্রীবের বংশধর। হাম্পির প্রান্তরে যে-সমস্ত পাথরের খন্ড ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে ওইগুলি নাকি সেতুবন্ধনের অব-শিষ্ট পাথরের টুকরো। এমন বিশ্বাস করা বা না করার ভার আপনাদের ওপর রইলো। আমি এতোদিনের অভিজ্ঞতায় এই বুঝেছি যে, গাইডেরা যা বলে তা বিশ্বাস করি বা না করি, অন্তত বিশ্বাস করার ভান করতে দোষ কি? এতে গাইড মনের মতো শ্রোতা পেয়ে রীতিমতো খুশি হয়। নিঃখরচায় মানুষকে খুশি করার মতো অপার আনন্দ আর কিসে আছে?

এবার পাহাড়ে চড়াই। পাহাড় মাঝামাঝি হলে হবে কি, উঠতে রীতি-মতো কষ্টকর। খানিক পরেই অবশ্য উৎরাই পাওয়া গেলো। নিচে নেমে গেছে। অচ্যুত রায়ের মন্দিরে হাজির হলুম। পাথরের তৈরি সাদাসিধে মন্দির, —বিগ্রহ নেই। অনেক অংশ ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। দেয়ালে কিছু কিছু শিল্প-কর্মের চিহ্ন নজরে পড়লো। মন্দির ছাড়িয়েই সুলাই বাজার; তার মধ্যস্থলে সাবেক আমলের পাথুরে পথ। পথের ওপরে এক জায়গায় নিচু পাথরের ছাদ রয়েছে,—সেটা অতীতকালের কোনো দোকান-ঘরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাজার পেরিয়েই আবার রাস্তা,—তার বাঁ দিকে ভগ্ন বরাহ মন্দির। দেয়াল-গাত্রে কিছু ভাস্কর্যের নমুনা রয়েছে। এক জায়গায় খোদিত রয়েছে বিজয়নগর রাজাদের প্রতীক চিহ্ন—সূর্য চন্দ্র বরাহ ও তরবারি। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুদিকে দুটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি : তাদের দেহের, বিশেষ করে মুখের কমনীয়তা ও লাবণ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বরাহ মন্দিরের প্রায় সামনেই বিষ্ণু মন্দির —এখানে রয়েছেন অনন্তশয়নে শায়িত শ্রীবিষ্ণু,—তাঁর চরণের কাছে দুটি স্ত্রী-মূর্তি, শিয়রে ব্রহ্মা। মন্দির থেকে বেরিয়েই আবার তুঙ্গভদ্রার সঙ্গে চোখাচোখি হ'লো। তার টলটলে জলে পাহাড়ের প্রতিচ্ছায়া। নদীর অপর পারে পাহাড়ের গায়ে সুগ্রীবের গুহা।

পথ এবার সামনের দিকে ঢালু হয়ে নেমে চলেছে। একটু একটু করে নিচে নামছি, চোখে পড়লো রাজার তুলা দণ্ড (King's Balance)। এটি একটি পাথরে তৈরি অনেকটা গোল পোস্টের মতো কিন্তু বেশ উঁচু তুলা-দণ্ড : মাথার দুদিকে পাল্লা লাগাবার আঁকশির মতো খাঁজ কাটা রয়েছে। "তুলা পুরুষ দানা" উৎসবের সময় রাজা কৃষ্ণ-দেব রায়কে এইখানে তৌল করা হ'তো। রাজা বসতেন পাল্লার একদিকে, অপর দিকে সোনা-রুপো টাকা কড়ি দিয়ে তাঁকে ওজন করা হতো। সেই অর্থ গরিব ও নিঃস্বদের রাজা বিলিয়ে দিতেন। তুলা-দণ্ডের অনতিদূরে একটি অসমাপ্ত তোরণ। এর দুদিকে দুটি নারী-মূর্তি লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডান দিকের অংশে বিষ্ণু, তাঁর পাশে গড়ুর; অপর দিকে দুটি রমণী-মূর্তি—একটি মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীর, —অপরটি যমুনা দেবীর?

তোরণের একটু দূরে বিঠল রায় মন্দিরের গোপুরম নজরে পড়লো। মন্দিরটি শ্রীবিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছে;—বিষ্ণুর অপর নাম বিঠল। রাজা কৃষ্ণ দেবরায় ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। কেউ-কেউ বলেন : রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে অথবা তারো আগে এটির নির্মাণ শুরু হয় এবং রাজা অচ্যুত রায়ের রাজত্বকাল পর্যন্ত এর নির্মাণকার্য চলে—যদিও, মন্দিরটি কখনোই সমাপ্ত হয়নি। আবার অপর মতে—১৫০৯-১৫২৯ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণ দেবরায় এটি তৈরি করান।

গোপুরমের নিচের তলা পাথরের তৈরি, উপরের অংশ ইঁটের। এর দুদিকেও দুটি নারীমূর্তি খোদিত রয়েছে। গোপুরম্ পেরিয়েই বিশাল প্রাঙ্গণ। সামনে বিঠল রায়ের মন্দির। ডানদিকে একটি চমৎকার মণ্ডপ,—এখানে বিশেষ দিনে বিঠল রায় ও লক্ষ্মী দেবীর বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হতো। মণ্ডপটি এখনো চমৎকার অবস্থায় রয়েছে। মণ্ডপের ভিতরে অজস্র স্তম্ভ : যে-দিকে তাকাই সেদিকেই স্তম্ভ। আর প্রতিটি স্তম্ভের কী বাহার, কী অপূর্ব শিল্প-সুষমা! স্তম্ভগুলিতে প্রচুর মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে—আর সেগুলি নেওয়া হয়েছে পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্র থেকে। গরুড় মৎস্য কূর্ম বরাহ বামন নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারদের খোদিত মূর্তিগুলি শিল্পীর ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে। মণ্ডপের বিরাট সিলিংটির কাজ অতি মনোরম। তাতে পাথরের ওপর লতাপাতা অনেক পরিশ্রমে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। চার কোণে এক জোড়া করে টিয়া পাখি,—সেগুলি অতি জীবন্ত। সিলিঙের একটি অংশে সূর্য গরুড় ও সুগ্রীবের মূর্তি রয়েছে। হাম্পির এই মণ্ডপটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মণ্ডপের সামনেই পাথরের তৈরি একটি অপূর্ব কারুকার্যময় রথ রয়েছে। এটি এখনো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

রথের পাশেই নৃত্যশালা বা নাচ-মন্দির। সিঁড়ির মাথায় দুটো হাতির মূর্তি—ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। নৃত্যশালার ভিতরেও নানা রকমের মূর্তি খোদাই করা প্রচুর স্তম্ভ। শিল্পী তাঁর কল্পনাকে মনের আনন্দে পাথরের গায়ে রূপ দিয়ে গেছেন। নৃত্যশালার ভিতরে প্রবেশ করে আমার মন কয়েক শতাব্দী পিছনে এক অদ্ভুত স্বপ্নলোকে ফিরে গেলো। কল্পনায় দেখছি—ধূপের ধোঁয়া ও সুগন্ধে চারদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। বীণার ঝংকার উঠছে বাঁশির সঙ্গে, পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গের বোল উঠছে, সুরের স্রোত নেমে আসছে কণ্ঠ-শিল্পীর গলা থেকে। নৃত্যের নিক্কণ তুলে আবির্ভূত হয়েছেন দেবদাসী—নাচের তালে-তালে তিনি নিজেকে নিবেদন করছেন দেবতার চরণে। কিন্তু, আজ কোথায় কি! ভগ্ন নৃত্যশালা হতাদরে অবহেলায় এক পাশে পড়ে র'য়েছে।

নৃত্যশালার পাশেই বিঠল রায়ের মন্দির। মন্দিরের কার্ণিশ পদ্মের পাপড়ির মতো ঢেউ-খেলানো। ভঙ্গিটি মনোরম। বেশ বোঝা যায়—বর্ষার জল যাতে না বারান্দায় প্রবেশ করতে পারে তারই জন্যে কার্ণিশের এই পরিকল্পনা। মন্দিরের বহির্দেশে ভিত্তিমূলের উপরের অংশ খাঁজ কাটা কাটা—তার সবটুকুতেই অলংকরণ রয়েছে। নিচের অংশে অশ্ব-বাহিনী লম্বা সারিতে চক্রাকারে মন্দিরের সবটুকু বেষ্টন করে র'য়েছে। তার ওপরের অংশে এইভাবে চলেছে লতা-পাতার সারি। সিঁড়ির মুখে বাঁ-দিকে একটি সিংহমূর্তি, ডান দিকেরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রবেশদ্বারের দুপাশে দুটি অতিকায় হাতির মুখ। ভিতরে অজস্র স্তম্ভ—স্তম্ভে-স্তম্ভে ছয়লাপ! স্তম্ভগুলির বিন্যাস ও গঠন-শৈলী অতি রমণীয়। একেকটি স্তম্ভের ভিতরে ছোটো ছোটো অনেকগুলি থাম। স্তম্ভের নিচের অংশ মোটা চৌকো এবং চমৎকারভাবে চিত্রিত, উপরের অংশটিও মোটা—তার কার্ণিশে আর গা কেটে সুন্দর সুন্দর মূর্তি খোদিত। মধ্যখানে ছোটো-ছোটো থামের শ্রেণী জ্যামিতিক নিয়মে তৈরি করা হয়েছে। আগে এই স্তম্ভগুলি মন্দিরের বিশাল ছাদকে ধরে

রাখতো। কয়েকটি স্তম্ভে আঘাত করলে নানা রকম ধ্বনি শোনা যায়। গত বছর এই রকম ধ্বনিময় স্তম্ভ মাদুরার মীনাক্ষী মন্দিরে দেখেছিলাম। এই স্তম্ভগুলির কোনোটিতে হিরণ্যকশিপু, কোনোটিতে নৃসিংহ ও লক্ষ্মী দেবীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। একেকটি বিশাল পাথরে স্তম্ভগুলি তৈরি, কোনো জোড় নেই। প্রতিটি স্তম্ভেই রয়েছে শিল্পীর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। এবং এগুলির বিরাট আকার ও উচ্চতা দেখলে অবাক হতে হয়।

৫০০×৩০০ ফুট চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে বিঠল রায়ের দেউলটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রবেশপথ তিনটি। তিনটি স্তম্ভ সমন্বয়ে গঠিত স্তম্ভশ্রেণীর বিন্যাস লক্ষ করবার মতো। আর ভিতরে আলো-হাওয়া প্রবেশের পরিকল্পনাটিও সুচিন্তিত। বিঠল রায়ের মূল মন্দির, নৃত্যশালা এবং মণ্ডপ—এই তিনটিতেই স্তম্ভের ছড়াছড়ি। এইগুলি দেখলে সহজেই মনে হয়—শিল্পীরা কাঠের মতো পাথরের ওপরেও কতো অনায়াসভঙ্গিতে তাঁদের শিল্প-নৈপুণ্য পরিস্ফুট করতে সক্ষম হয়েছেন।

তারপর পাহাড় ডিঙিয়ে যখন হাম্পি বাজারে পৌঁছুলুম, তখন সাড়ে নটা বাজে। বাজার থেকে খানিকটা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। আর পরিশ্রান্ত শরীরে আবার চড়াই ভাঙা যে কী আয়াসসাধ্য তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কোনো রকমে বাজারের ওপরে উঠে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা কাদালাই কাল্লু গণেশ মন্দিরের চত্বরে বসে পড়লুম।

গাইড একটু দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালে—ওইখানে শাশিভি কাল্লু গণেশ মূর্তি আছে। আমরা আদেশ করলে সে নিয়ে যাবে। মনে মনে বললুম: চুলোয় যাক্ তোমার গণেশ মূর্তি। এখন একটু জিরিয়ে নিতে দাও।

একটু পরে আবার আমাদের পথচলা শুরু হলো কমলাপুরমের দিকে। পায়ের নিচে পিচঢালা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা—সোজা ঢালু হ'য়ে নামছে। ডান দিকে দেখা যাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষ্ণ-মন্দির। শুনলাম—এই মন্দিরের অনেক শিল্প-নিদর্শন মাদ্রাজের মিউজিয়মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; সেইজন্যে আর ওই দিক মাড়ালুম না।

রাণীর স্নানাগার

রোদ চড়ছে। ঘামে শরীর ইতিমধ্যেই ভিজে উঠেছে; সেটা পরিশ্রমে না রোদের তাপে, বোঝা গেলো না। নীল আকাশে উড়ে-যাওয়া মেঘ মাঝে-মাঝে সূর্যকে না ঢেকে দিলে সেই তীব্র গরমে হাম্পি পরিক্রমা করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিলো। একে উদরে কিছু নেই তারও পরে এই গরম,—শরীরের সহ্য-শক্তি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

পথ ঢালু। সহজভাবেই নামছি, কোনো কষ্ট নেই। ডানদিকে দেখা গেলো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নীল ফলক গ্রেট লিংগম্ ও নরসিংহ মূর্তির নির্দেশনা দিচ্ছে। কয়েক পা এগিয়েই ডান দিকে বৃহৎ লিংগ—যার উচ্চতা ১২ ফুট। ভারতবর্ষের বহু স্থান আমি ঘুরেছি। কিন্তু এই রকম বৃহদাকার শিবলিংগ আমার চোখে পড়েনি। যে-কক্ষটিতে (নাকি মন্দির বলা যুক্তিসংগত ?) লিংগটি প্রতিষ্ঠিত, তার দরোজা অতো বড়ো লিংগের পক্ষে অত্যন্ত ছোটো মাপের। মনে হলো লিংগটি প্রতিষ্ঠা করে পরে এই কক্ষটি তৈরি করা হয়েছে। লিংগসহ কক্ষটি অর্ধেক জলে পূর্ণ। একদিন এখানে কতো পূজার্থীর সমাবেশ হতো; আজ আর কেউ কোথাও নেই।

বৃহৎ লিংগের অনতিদূরেই পাথরের তৈরি এক আশ্চর্য সুন্দর অতিকায় যোগ নরসিংহ মূর্তি—উচ্চতা যার ২২

বাঁদিকে বিঠল মন্দির, ডানদিকে মণ্ডপ ও পিছনে রথ

ফুট। একটা গোটা বিরাট পাথরকে কুঁদে এই মূর্তিটির রূপদান করা হয়েছে। বেদীটি একটি বৃহৎ সাপের কুণ্ডলীকৃত দেহ—দেবতা তাতে উপবেশন করে আছেন। সাপের এই দেহটি মূর্তির পিছন দিক থেকে ক্রমশ উপরে উঠে দেবতার মাথায় ফণা বিস্তার করে ছত্রের আকার নিয়েছে। সাপটি সপ্তমুখী। দু'ধারে দুটি অলংকৃত থাম। দুদিকে সিংহের মূর্তি, তার উপরে হাতি। নরসিংহ মূর্তির হাত দুটি অর্ধেক, আর দুটি পা ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। রাজা কৃষ্ণ দেবরায় কর্তৃক ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। শোনা যায়, নরসিংহের পদতলে লক্ষ্মীদেবীর একটি মূর্তি ছিলো, ৩০।৩২ বছর আগে সেটি অকস্মাৎ অন্তর্ধান করে।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোদের বিক্রম বাড়ছে। পায়ের তলায় পিচের রাস্তা তেতে উঠ্‌ছে। বাতাস বেশ গরম। এগিয়ে চলেছি। পথে বীরভদ্রের মন্দির দেখা গেলো। ডঃ ঘোষ ও শ্রীমতী রায়ের দেববিগ্রহে ভক্তি বেশ প্রগাঢ়। দুজনে দেব সন্দর্শনে গেলেন। আর এই অধম একটি বৃক্ষতলে বাঁধানো বেদীতে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো। কয়েক মিনিট পর আবার যাত্রা শুরু। মাঝে-মাঝে ফ্লাস্ক থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছি। দু'চারটে খুচরো আলাপ চলছে। শ্রীমতী রায়ের পরিহাস ভালোই লাগল। আমরা এগিয়ে চলেছি।

এতোক্ষণ পথ বেশ ভালোই ছিলো। পথের দু'পাশে গাছের শ্রেণী : দুধারে আখ ও ধানের ক্ষেত। তার সবুজ শ্যামশ্রী দেখে চোখ ও মন প্রকৃতির গভীরে ডুব দিয়েছিলো। সে-মগ্নতা আর রইল না,—পথ ক্রমশ রুক্ষ ও ঊষর হয়ে উঠতে লাগলো। সামনে ও এক পাশে পাহাড়, অপর পাশে শিলীভূত প্রান্তর। বাবলা গাছের বনাতা ছাড়া কোনোখানেই এতোটুকু শ্যামলের স্পর্শ নেই। মরুভূমির অপার শূন্যতা। বাতাস হাহা করে ছুটে আসছে, চোখ-মুখ পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা চলেছি। পথ মনে হচ্ছে অফুরন্ত। আর তা রীতিমতো খাড়াই। ডান দিকে পাহাড়ে দেখা গেলো সেই Natural Archway অর্থাৎ প্রকৃতির তৈরি একটি পাহাড়ি খিলান—যার মধ্য দিয়ে যাবার রাস্তা রয়েছে।

আরো খানিকটা গিয়ে আমরা কমলাপুরমের পিচ-ঢালা সড়ক ছেড়ে দিলুম। বাঁ-দিকে বেঁকে পায়ে চলা পথ ধরে এগোতে লাগলুম। এই পথের ডান দিকে —মাটির তলায় একটি ভগ্ন দেউল চোখে পড়লো। এ-মন্দিরটিও আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পায়নি।

এবার যেখানে এলুম, সেটি রাজধানীর একটি বিশিষ্ট অঞ্চল ছিলো (সংরক্ষিত অঞ্চল বল্লেই যথার্থ বলা হয়।) প্রথমেই চোখে পড়লো বাদকদের আস্তানা বা ব্যাণ্ড টাওয়ার; সেনানায়কদের আবাসস্থল; দুর্গের দেয়ালের খানিকটা অংশ; আবার একটি ব্যাণ্ড-টাওয়ার—এটি দোতলা। এর সামনে টাঁকশাল বা মিণ্ট তারপর সৈন্যাধ্যক্ষের বাসস্থান,—এটিকে পরে মসজিদে পরিণত করা হয়। এর পরেই পেঁাছলুম হাজারা রাম মন্দিরের সামনে। মন্দিরের বহির্দেয়ালে চমৎকার শিল্পকর্ম রয়েছে। নিচের সারিতে হস্তিযূথ; তার উপরে ঘোড়ার সারি—লাগাম ধরে সৈন্যরা টেনে নিয়ে চলেছে; তার উপরে পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহীদের মিছিল, সবার উপরে নৃত্যরতা নর্তকীর দল। তাদের পায়ের ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা—সব যেন জীবন্ত। কোথাও বা কমনীয় রমণীমূর্তি, ঘোড়-সওয়ার ও পদাতিক সৈন্যদল। হাতিগুলির কতো ভঙ্গি। শুঁড় দিয়ে গাছ ভাঙ্গছে, তালে তালে পা ফেলে চলেছে। পাথরের গায়ে খোদাই করা এই চিত্রগুলি অপূর্ব সুন্দর।

পাথরের তৈরি গোপুরম্ পেরিয়েই মূল মন্দির; তার ছাদের বাইরের অংশে কার্ণিশের কাছে অজস্র মূর্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরে রামায়ণের কাহিনী পরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই জন্যেই মন্দিরের নাম হাজারা রাম। এখানেও দেবতা নেই। মন্দিরের ছাদটিকে রক্ষা করছে বার্ণিশ করা চকচকে কালো পাথরের চারটি বৃহৎ স্তম্ভ। এতে যে মূর্তিগুলি খোদাই করা আছে তাদের শিল্প-সুষমা দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। অত্যাচারীর নিষ্ঠুর আঘাত যদিও এই স্তম্ভগুলির গায়ে পড়েছে, তবু, যা অবশিষ্ট আছে, তাদের মধ্যে গণপতি গণেশ, বিষ্ণু ও কল্কি অবতারের মূর্তিগুলির শিল্প-মাধুর্য তো সহজে ভুলে যাবার নয়!

বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে মন্দিরের মেঝে তৈরি করা হয়েছিলো। তার নিচে সোনা-দানা, মণি-রত্ন লুকোনো আছে মনে করে লুঠেরারা মেঝে খুঁড়ে পাথর ভেঙে-চুরে তছনছ করে দেয়। অনুমান, রাজা দ্বিতীয় বিরূপাক্ষ (১৪৬৫-৮৫ খৃষ্টাব্দ) মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

দুর্গ প্রাকারটি দেখে মনে হলো সেটি বহিশত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে তৈরি হয়নি, তার আসল উদ্দেশ্য ছিলো জানানা মহলকে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখা। ছোটো দরোজা দিয়ে আমরা যেখানে প্রবেশ করলুম সেটি একটি বিরাট প্রাঙ্গণ—নাম জানানা মহল। এখানে দেখা গেলো রক্ষি-নিবাস, বীক্ষণ-চূড়া (ওয়াচ টাওয়ার) প্রভৃতি। দু পাশে দুই রানীর মহল—যার ভিত্তিমূলে ছাড়া সব কিছুই নিশ্চিহ্ন। একটু এগিয়েই সামনে পদ্ম-মহল (লোটাস মহল)। সৌধটির গঠন অনেকটা পদ্মের মতো। চারিদিক খোলামেলা, দরোজার পল-তোলা খিলেনগুলির নির্মাণ-রীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরে কার্ণিশ, তার মাথায় ছোটো-ছোটো গবাক্ষ, মনে হবে যেন দোতলা সৌধ। গবাক্ষগুলির উপরে কার্ণিশ। মাথার ছাদ উড়িষ্যার মন্দিরের চূড়োর মতো ক্রমশ-সরু-হয়ে-যাওয়া অনেকগুলি চূড়ো। অবাধ ও প্রচুর আলো-হাওয়ার প্রবেশ আর নিষ্ক্রমণের উদ্দেশ্যে সৌধটিতে প্রচুর দরোজা ও জানালার সমাবেশ করা হয়েছে। সৌধটির গঠন-রীতিতে হিন্দু ও মুসলমানি স্থাপত্য-কলার সংমিশ্রণ ঘটেছে। রাজা কৃষ্ণ দেবরায় তাঁর রাজধানী হাম্পির সৌধসমূহ নির্মাণে মুসলমান কারিগর নিযুক্ত করেন, তার ফলেই এই সংমিশ্রণ ঘটে। শোনা যায়—রাজ-সন্দর্শনে যাবার আগে সখি সমভিব্যাহারে রানীরা এইখানে জমায়েত হয়ে আলাপ-চারি করতেন।

একটি ছোট্টো পাঁচিল পেরিয়ে যেখানে এলুম সেটি হচ্ছে রাজার হাতিশালা। এটিতেও মুসলমানি স্থাপত্য-রীতির ছাপ পড়েছে। হাতিশালাটি বেশ লম্বা—তাতে সারি সারি বৃহদাকার ঘর। তার ছাদ মুসলমানি গম্বুজের মতো। দুদিকে পাঁচটি পাঁচটি গম্বুজ, কেন্দ্রের ছাদটি চৌকো আর দ্বিতল। গম্বুজগুলি আবার তিন রকমের। প্রথমটি গোল—তার মাথাটি ছাতির মতো; দ্বিতীয়টি তিনটি স্তবকে মন্দিরের চূড়োর মতো আকৃতি নিয়েছে, তৃতীয়টি প্রথমটিরই অনুরূপ কিন্তু লম্বা খাঁজ-কাটা; চতুর্থটি দ্বিতীয়টির মতো; পঞ্চমটি প্রথমটির অনুরূপ। অপর দিকে ঠিক এই ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি ঘরের দরোজা বিশালাকার, তার দু-দিকে একটি করে দুটি বৃহদাকার কুলুংগি; তার উপর দু'দিকে তিনটি করে ছটি ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গি। হাতিশালাটি সম্প্রতি মিউজিয়মরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, বাম প্রান্তের দুটি ঘরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্যালয় খোলা হয়েছে। সামনের বিরাট প্রাঙ্গণে হাম্পি ও বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা অজস্র মূর্তি ও শিল্প-নিদর্শন সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফোটো তোলায় নিষেধ থাকায় ছবি নিতে পারলুম না।

হাতিশালার কাছেই রক্ষিনিবাস। তার পর শুরু হলো রাজকীয় প্রাসাদসমূহ। প্রথমে যেটি নজরে পড়লো সেটি দরবার গৃহ। পাথরের তৈরি বিরাট ভিত্তিমূল ও মেঝে ছাড়া সব-কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রশস্ত এই দরবার-গৃহে প্রায় একশোটি স্তম্ভ ছিলো,—স্তম্ভের অবস্থানের চিহ্নস্বরূপ এখনো তার গোলাকার গর্তগুলি বর্তমান রয়েছে। দরবার-গৃহের সন্নিকটেই মাটির নিচে মন্ত্রণালয়। লোক-চক্ষের অন্তরালে একান্ত গোপনে জটিল বিষয়ের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কক্ষটির এই ভূগর্ভস্থ পরিকল্পনা। মন্ত্রণা-কক্ষের কাছেই রাজপ্রাসাদ—

সিঁড়ির মুখে দুটি হাতি ও প্রশস্ত ভিত্তিমূলই শুধু বর্তমান রয়েছে।

প্রাসাদের কাছেই দশেরা ডিব্বা বা Throne Platform —যেটি রাজা কৃষ্ণ দেবরায় তাঁর উড়িষ্যা-বিজয়ের স্মারক হিসাবে নির্মাণ করেন। বিজয়-নগরের প্রতিটি উৎসব মহা-সমারোহে আর আড়ম্বরে এখানে অনুষ্ঠিত হতো। পর্তুগীজ পর্যটক পা এস (১৫২০-২২ খৃঃ) মহা-নবমী উৎসবের সময় বিজয়-নগরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লেখায় সেই উৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমানে মহীশূরে দশেরা উৎসবে যে-সিংহাসনটি ব্যবহৃত হয়, গাইডের মতে, সেটি এখান থেকেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দশেরা ডিব্বার ভিত্তিটি বেশ উঁচু। বিরাট প্ল্যাটফর্ম ছাড়া অবশ্য তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে তবে উপরে উঠতে হয়। প্ল্যাট-ফর্মের বহির্দেশটি নিপুণভাবে চিত্রায়িত করা হ'য়েছে। প্যানেলে-প্যানেলে কতো অসংখ্য রকমের চিত্র। বিভিন্ন রকমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও চিত্রণে শিল্পীরা যে নিপুণ শিল্প-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তার বুঝি তুলনা নেই। মানুষ পশু পাখি গাছ পাতা ফুল প্রভৃতির সমাবেশে প্ল্যাটফর্মটি ব্যাপকভাবে অলংকৃত। কোথাও বিভিন্ন ভঙ্গিতে হাতির সারি, কোথাও বা বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ময়ূরের দল : কেউ গলা বাঁকিয়ে আছে, কেউ মাথা নিচু করে আছে, কেউ বা বিশ্রামের ভঙ্গিতে গায়ে ঠোঁট রেখে ঘুমোচ্ছে। আর কেউ বা ওড়বার চেষ্টা করছে। গাছের তলায় দুই বানর; প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে হরিণেরা আর তাদের পিছনে ধনুর্যোজনা করছে শিকারী রমণী; ঘোড়-সওয়ার, পদাতিক সৈন্যের দল, নৃত্যরতা নর্তকী—কোথাও একক, কোথাও দ্বৈত; কতো বিভিন্ন ধরনের নৃত্য-ভঙ্গিমা, কতো রকমের নাচের মুদ্রা, কোনো প্যানেলে বা বাদিকার দল। মাথা নিচু করে যে অশ্বটি দাঁড়িয়ে আছে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি কতো দৃপ্ত। আর ওই হাতিটি, —শুঁড় দিয়ে গাছ ভেঙেছে আর তাকে লাঠি দিয়ে মারছে একটি মেয়ে। এই প্যানেলগুলি বিশেষ করে নর্তকী ও বাদিকার প্যানেলগুলি যেন চলচ্চিত্র। আমি শিল্পী নই, নন্দন-কলার কিছুই প্রায় বুঝিনে; কিন্তু এই চিত্রগুলির সরলতা ও পেলব-ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। এ যেন বিরাট এক ক্যান-ভাস—তার ওপর তুলি দিয়ে যেন পট আঁকা হয়েছে।

দশেরা ডিব্বা থেকে আবার পথে নেমে পড়েছি। চলেছি কমলাপুরমের দিকে। চলতে চলতে পথের এক পাশে কতোগুলি পাথরের নালি দেখতে পেলুম। দূরের চতুষ্কোণ জলাশয় থেকে এই নালির মাধ্যমে প্রাসাদসমূহে জল-সরবরাহ করা হতো। নালিগুলি বেশ দীর্ঘ ও গভীর। কয়েক জায়গায় সেগুলি এখনো দেয়ালে সাঁটা রয়েছে।

এইবার আমরা প্রবেশ করলুম রানীর স্নানাগারে। এই একতলা সৌধটিও হিন্দু-মুসলমান স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত হয়েছে। ছাদের আলসে ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গির সারি দিয়ে তৈরি; তলায় চৌবাচ্চার মতো বিরাট চতুষ্কোণ স্নানা-গার। চারধারে অজস্র দরোজা। চারপাশে ঝুল বারান্দার মতো বারান্দা রয়েছে। তার দুটিতে গবাক্ষর সারি, অপর দুটিতে থামের সারি। বারান্দাগুলির নিচে পাথরের নালি-মুখ রয়েছে যা দিয়ে জলা-শয় থেকে জল-প্রবাহ এনে স্নানাগারটি পূর্ণ করা হতো।

স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলুম। সামনেই কমলাপুরমের আঁকাবাঁকা পিচ-ঢালা পথ। বিদায়ের সময় আসন্ন হ'য়ে এসেছে, তাই শেষবারের মতো হাম্পির দিকে ঘুরে দাঁড়ালুম। আর চোখের সামনে শেষবারের মতো ভেসে উঠলো—বহুদূর ছড়ানো বিশাল প্রান্তরে কতো-গুলি সৌধের জীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদা ঐশ্বর্যশালিনী বিজয়-নগরের গরবিনী রাজধানী হাম্পি। তার অবয়বে কী অপার নিঃস্বতা! অস্ফুট কান্নার আওয়াজ যেন শুনতে পেলুম। হাম্পির আর্তি কি কান্নার মতো করুণ হ'য়ে কানের কাছে বাজছে? একদিন তার সব ছিলো,—ধনজন ঐশ্বর্য জাঁকজমক সমারোহ—কিছুরই অভাব ছিলো না। তার বুকে রাজার পর রাজা রাজত্ব করে গেছে, পথে-পথে উৎসুক-মুখর নরনারী জমকালো পোষাকে সজ্জিত হয়ে হেঁটে চলে গেছে। গৃহে-গৃহে অলিন্দে-অলিন্দে জনপদবধূর হাস্য-পরিহাস, শিশুর কলতান, মানুষ-মানুষীর প্রেমালাপ—সে সব শুনেছে। রাজা রানী মন্ত্রী সদাগর সিপাই সান্ত্রী—তার সব ছিলো; ছিলো পথের দুধারে ছায়া দানের জন্যে রাজার আদেশে রোপণ করা প্রচুর বৃক্ষশ্রেণী, অজস্র বিপণি; প্রাণোচ্ছল নর আর নারী, নৃত্য-গীত শিল্প আর সাহিত্য। সে দেখেছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর দস্যুর হিংস্র হানাহানি; নিরীহ নরনারী আর শিশুর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে তার রাজপথ। সে লুণ্ঠিত হয়েছে, ধর্ষিত হয়েছে। তার এই দীন-হীন সর্বস্বান্ত চেহারা দেখে একটু চোখের জল ফেলি যদি, সেন্টিমেন্টাল বলে আমায় দোষ দেবেন না। হাম্পির এই মহা-শ্মশানে যে দীর্ঘশ্বাস শুনে এলুম, তাকে আমি ভুলবো কেমন ক'রে? কেমন করে ভুলবো—দক্ষিণ ভারতের স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরের শেষ পরি-নামকে?

গাইড শিবরাম তাড়া দিচ্ছে। আর দেরি নয়। কমলাপুরমের বাস ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। চন্দ্রশেখর মন্দির দেখা মাথায় উঠলো। দ্রুতপায়ে চলেছি কমলাপুরমের বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে। কানের কাছে শুনছি ঐতিহাসিক সিওয়েলের বিলাপ : 'পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম চমৎকার নগরীর উপর এই ধরনের সর্বাত্মক ধ্বংসলীলা সম্ভবত আর দেখা যায়নি'!।

বাসের হর্ণ শোনা যাচ্ছে। শিবরাম তাঁর হোঁচট-খাওয়া থেঁৎলান পা নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে দৌড় লাগিয়েছে। আমরা তিনজনেই পথশ্রমে ক্লান্ত ও শ্রান্ত;—কোনো রকমে পা টেনে টেনে চলেছি। আশ্চর্য, শিবরাম বাস ঠিক থামিয়ে রেখেছে।

বাসে উঠে তার হাতে দুটি টাকা গুঁজে দিয়ে তার হাত চেপে ধরে বল্লুম : 'বন্ধু, তোমায় ভুলবো না! বিজয়নগরের ইতিহাসের সঙ্গে তুমিও আমাদের মনে অক্ষয় হ'য়ে রইলে'!

কমলাপুরম্ থেকে আমাদের বাস চলেছে হসপেটের দিকে। শিবরাম হাত তুলে নাড়াচ্ছে। তাকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। বাস মোড় ঘুরতেই শূন্য পা নগ্ন দেহ ছোট্টো মানুষ শিবরাম আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলো। *

---

* এই প্রবন্ধ রচনায় 'গাইড টু হাম্পি' বই-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে; প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।

ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলা

তরুণ মৈত্র

কলকাতা থেকে তিরিশ মাইলের রেলপথের যাত্রা। কাঁচড়াপাড়া রেল-স্টেশন থেকে বাসে পাঁচ মাইলের পথ। নবনির্মিত কল্যাণী সহরের কোল-ঘেঁসে, ঘোষপাড়া নর্থ রোড ধরে এগিয়ে যেতে হবে মেলার নির্দিষ্ট স্থানে। প্রতি বৎসর এ সময় স্থানীয় 'বাস সিণ্ডিকেট' অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করেন তীর্থযাত্রীদের জন্যে। বাসের যাত্রা শেষ হয় মেলার কাছাকাছি এক মাঠের মধ্যে। সেখান থেকে দল বেঁধে স্ত্রীপুরুষেরা ছুটে চলে সতীমার মেলায়। দোলোৎসব শুরু হয় নির্দিষ্ট দিনটির পূর্বদিনের বিকেলবেলা থেকে। সন্ধ্যায় চাঁদিনী রাতে বাস থেকে নেমে বিভিন্ন যাত্রীরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় মেলার কল-কল্লোল শব্দের টানে। মেলার যতই কাছে এসে পড়ে ততই যেন এদের পায়ে ওঠে নৃত্যের ছাঁদ। দোলা খায় প্রাণপাখী। নামকীর্তনের আওয়াজ কানে আসতেই দোলোৎসবে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে তারা। তারা নাম সাগরে ডুব দিতে আঁকুপাঁকু ক'রে ওঠে। সতীমার 'হিমসাগরে' ডুব দিয়ে অরূপরতন লাভের আশায় যাত্রীরা তখন উন্মাদ। ঘোষপাড়ার সতীমা মন্দিরের 'ডালিম গাছের' মাটি ছুঁয়ে ধন্য হাত, অঙ্গ জুড়োতে চায়। এমনি আকাঙ্খা নিয়ে প্রতি বছর তিনটি দিন, তিনটি রাত দোলোৎসবে সতীমা মন্দিরের প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে থাকে।

প্রতি বৎসর যেমন আসে হাজারে হাজারে তীর্থযাত্রী আর আউল-বাউলের দল, তেমনি আসে মেলায় দোকান পাট নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী। আসে বেতের ধামা কাঠা নিয়ে, আসে বাঁশের ঝুড়ি পাখা নিয়ে আশ-পাশের গ্রামীন লোকেরা। শহর থেকে আসে কাঁসার বাসন নিয়ে, শঙ্খ শাঁখা নিয়ে কাঁচের চুড়ি নিয়ে ছোটছোট দোকানদার। ফটো তোলার 'মবাইল স্টুডিও' এসে আসর জমায়। আরও কত দোকান। মেলার আদি ও অকৃত্রিম জিনিস নাগরদোলার আমদানি হতেও এখানে বাধা নেই। প্রতি বছর নাগর দোলা জমিয়ে দেয় আসর। সংগে থাকে ছোট ছোট সার্কাসের তাঁবু। ক'বছর হ'ল মেলার মুখেই 'ওয়েল অব ডেথ' সার্কাসের গোল কাঠের কূপটি যাত্রীদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

যাত্রীরা আসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে। তারা এসে কিন্তু এসব দোকানপাটের কাছে ঠাঁই নেয় না। মস্তবড় 'আম্রকুঞ্জে'র হাটে এসে ছিটিয়ে বসে। সতীমার মন্দিরের নাট্যমঞ্চ পেরিয়ে যাত্রীরা চলে যায় সোজা বাগানের বিভিন্ন কোণে। বাগানের এক একটা আম গাছের নীচে বসেছে এক এক দলের আস্তানা। এখানে এলেই প্রতি বৎসরই যে কোন লোকের চোখে পড়বে 'মহারাজা'কে। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। বৈষ্ণব পদাবলী মুখে। শাস্ত্রজ্ঞ তিনি। গ্রামে গ্রামে সারা বছর পরিক্রমা করে বেড়ান। বছর শেষে এই ঘোষপাড়া সতীমার আম্রকুঞ্জে এসে তিনি উপস্থিত হ'ন শিষ্যশিষ্যাদের মধ্যে মধ্যমনি হয়ে। হয়তো দেখতে পাবেন, দক্ষিণের কোণ-টার এ গাছতলা থেকে ও গাছতলাতে কাদের যেন তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হাতে একটি মোটা বেতের লাঠি। পায়ে খড়ম। গায়ে রক্তবস্ত্র। গলায় গুণ গুণ ভাবগানের সুর। কিন্তু নজর তার সর্বদিকে। হাসনাবাদের মঙ্গল তার দলটিকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে। অল্প বয়সী স্ত্রী মালতী গাছতলায় পড়ে থাকতে চায় না। মেলার বিভিন্ন দোকানের কাঁচের চুড়িগুলি তাকে পাগল ক'রে ফেলেছে। সমবয়সী ননদিনী সন্ধ্যাকে নিয়ে তাই একবার ঘুরে আসতে চায়। মঙ্গলের এতে আপত্তি আছে। মঙ্গল ধমকে ওঠে। ওদের মন এতে মোটেই দমে না। চলকে ওঠে জনতার উত্তাপে। ঠিক সময় মত 'মহারাজা' ওদের মধ্যে গিয়ে হাজির। পরিবেশটা হাল্কা ক'রে দেবার জন্যে. গুনগুনিয়ে ওঠে,—মানুষ পাঁচ পাকা পাঁচের ঘরে চাঁদোয়া ধ'রে রয়। এই রূপের হাটে —সবার মাঝে গুরুভক্তি বয় ৮

সন্ধ্যা হয়তো প্রশ্ন করে বসলো মহারাজাকে,—সতীমা কে ছিলেন গো?

মঙ্গল তখন ব্যস্ত হয়ে উঠবে পুচকে মেয়েটার ধৃষ্টতা দেখে। শাস্ত্রজ্ঞ বাবা ইনি। এমন কথার প্রশ্ন করতে আছে?

মহারাজা তাঁর মাথার পাগড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে হয়তো বলবেন, সতীমা সত্যের প্রতীক। সত্যমেব জয়তে—তাঁর মন্ত্র। সত্য ধর্ম সকল বস্তুর সার। আর এই সতীমা হলেন চিরসত্য সদগুরু, সচ্চিদানন্দময়ী। এর পরিচয় কে দেবে মা?—ভক্তের কাছে তত্ত্বমূলক যুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তবুও সন্ধ্যার মতো ভক্তরা সন্তুষ্ট থাকবে। সারারাত নামকীর্তন করবে। ভাবের গীত গাইবে সন্ধ্যা তার মনটা উজার ক'রে। এমনি ভাবগানের বন্যায় সতীমার আম্রকুঞ্জে তখন গুঞ্জন উঠেছে। শ্যামনাম, গুরুনামে মুখরিত আকাশ বাতাস।

আম্রকুঞ্জের প্রতিটি গাছের তলায় বসেছে আউল-বাউলের আখড়া। সমবেত স্ত্রী-পুরুষ আউল, বাউল, সাঁইয়ের কণ্ঠের নামগানে ঘোষপাড়া মাতাল। গাইহাটা-পানাপুকুরের বাউল হাজারী গোস্বামীর কন্ঠে। টাকীর সতীমা আশ্রমের গোষ্ঠবিহারী আর আশুবালার কন্ঠে প্রতি বছর কর্তাভজা গীতের বিভিন্ন ভাবগানে ঘোষপাড়া ভেসে যায়। চতুর্দশী রাতের চাঁদের আলোয় সতীমা মেলায় আগত ভক্তদের বিভিন্ন কন্ঠে বিভিন্ন সুরের গুরুপুজোর বিভিন্ন পদ্ধতির কথা, গুরুপুজোর মহিমামৃত রসকথা শুরু হয়, তিনটি দিনরাত্রির জন্যে। মোহনবাবাজী প্রতি বছর আসবে তার দলবল নিয়ে ঘোষপাড়ার এই নাম-সাগরে। তার একতারাটা মাথায় তুলে নৃত্যের সাথে সমবেত গান ধরবে,—

গুরুভজে কি না হ'ল
কত বাদশালোকের বাদশায়ী গেল,
কত কুলবধুর কুল গেল
ওই নারে—কালারে ভজে।
সামান্যে কে সে ধন পাবে।।...

এদিকে নাট্যমঞ্চে নামসাগরের ভাব বন্যায় ভক্তের দল ডুব দিয়ে চলেছেন। এঁরা গ্রামের আউল-বাউল নয়। শহরের শানানো বুদ্ধিতে বাঁধানো সংস্কৃতি এঁদের মজ্জায় মজ্জায়। মূল গায়ক কাশীনাথ দাস। কন্ঠ দরাজ, গম্ভীর, মধুর। কথকথা পাঠ করছেন কৃষ্ণধন

ভট্টাচার্য। ভট্টাচার্য মহাশয় প্রতি বছর আসবেন কলকাতা থেকে। সারারাত পাঠ করবেন আউল-চাঁদ আর সতীমার কথা। নদীয়া জেলার উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের পানের বরজে পাওয়া যায় পরিত্যক্ত এক সুন্দর শিশু। বারুইজায়া সে শিশুটিকে সাগ্রহে লালনপালন করতে থাকে। ক্রমে শিশু বড় হ'লো। কিন্তু মহাদেব এই বালকটিকে ভৃত্যের চাইতে বেশী কিছু ভাবতে পারে না। মনিবসুলভ অত্যাচার চললো বালকটির ওপর। বারো বৎসর বয়সে বালক পূর্ণচাঁদ মহাদেবের অত্যাচারে একদিন উলাগ্রাম ত্যাগ করে। বর্তমান বীরনগর এই উলাগ্রাম। গৃহত্যাগী পূর্ণচাঁদকে আশ্রয় দিলেন বিষ্ণুভক্ত হরিহর। মহাপন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ তিনি। তাঁর কাছে পূর্ণচাঁদ সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করে হলেন সুপন্ডিত। তারুণ্যের সীমায় পূর্ণচাঁদ তখন নটবরকান্তি, সুঠাম। সুন্দর। সুন্দর কণ্ঠে সুললিত সঙ্গীত। প্রশস্ত বক্ষে ভক্তির পূর্ণকুম্ভ। দুটি চোখে তার অনুরাগরঞ্জিত প্রীতির দীপ্তি। হরিহর তাকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধবার ব্যবস্থা করেন। যুবক পূর্ণচাঁদ আবার ঘর ছাড়ে। এবার বজুয়া গ্রামে এসে কাতরকণ্ঠে নাম ভিক্ষা চাইলেন শান্ত, সৌম্য, সাধক, বলরাম দাসের কাছে। বলরামও শিষ্যের মহিমায় পূর্ণ হলেন। পূর্ণচাঁদের মহিমায় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের মিলন ঘটলো। জাতির সঙ্গে জাতির আলিঙ্গন। ভাষায় ভাষায় সংমিশ্রনে মুসলমান বললো—'আউল' অর্থাৎ মহাজ্ঞানী। হিন্দু বৈষ্ণব সম্প্রদায় বললো, 'চাঁদ'। সবাই জানলো সহজ পথের পথ প্রদর্শক হলেন আউল সম্প্রদায়ের কর্তা 'আউল চাঁদ'। হটু ঘোষ ইত্যাদি অনুগতদের নিয়ে সাধক আউলচাঁদ চললেন ধর্মের অভিনব বাণী প্রচারে। নিত্যধাম ঘোষপাড়ায় উপস্থিত হ'লে রামশরণ পাল ফকির তাঁর অন্যতম অনুগত শিষ্য হলেন। তাঁর স্ত্রী সরস্বতীদেবীকে সত্যধর্মে দীক্ষা দিয়ে সত্যধর্ম প্রচারের ভার অর্পণ করলেন। সরস্বতীদেবী সত্যাশ্রয়ী শ্রীশ্রীসতীমাতা বলে পরিচিত হলেন পরবর্তীকালে। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউল চাঁদ ও সতীমাতা যে সত্যধর্ম প্রচার করলেন তা ধর্মীয় জগতে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। নিত্যধাম ঘোষপাড়ায় শ্রীশ্রীআউলচাঁদ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীশ্রীসতীমাতা তিনে এক, একে তিন হলেন। এতে বৃন্দাবনলীলার, নবদ্বীপলীলার ও নীলাচললীলার কোন অন্তরায় রইলো না। সত্যধর্মের সার কথা,—সত্যাশ্রয়ী বা সত্যধর্মাবলম্বী মাত্রেরই একই বোধ ঃ মানুষ সত্য, সদগুরু, সচ্চিদানন্দ, মহামানব, ভক্ত ছাড়া কিছু নয়। কেউই পর নয়; সারা বিশ্ব তাঁর, আমিও তাঁর। এ বস্তু ভাবা, মনের ও ভাবের অতীত মহাভাবের ও ভাবোন্মাদের বস্তু। এই সত্যধর্মাবলম্বী ভক্তবৃন্দকে সাধারণ কথায় 'কর্তাভজা' সম্প্রদায় বলা হয়। কর্তাভজা অর্থে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অধিকর্তা যিনি তার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিকে গুরু বলে গ্রহণ ক'রে সত্যসনাতন নিরঞ্জনের উপাসনা করা। গুরুপূজাই হ'ল সার। এই সারকথা সাধারণ আউল-বাউলের গানের প্রতিছত্রে।

গত আড়াই শত বছর ধরে প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমার সুপ্রভাতেই ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলা দোলোৎসবের রঙে রাঙা হয়ে উঠবে। চারদিকে খোল করতাল আর হরিনাম সংকীর্তন। 'হিম সাগরে' ভক্তরা প্রথমেই স্নান সেরে নেবে। আবির আর বাতাস ছিটিয়ে হিমসাগর রাঙা ক'রে তুলবে যাত্রীরা। যাত্রীরা হিমসাগরে ডুব দিয়ে ঘোল আনায় সিন্নি হাতে দণ্ডী কেটে চলবে ডালিমগাছের মাটি ছুঁতে। হয়তো কেউ ডালিমগাছতলায় ধর্ণা দেবে বিশেষ প্রার্থনায়। বন্ধ্যা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব নাকি ঘুচে যায় সতীমার কৃপায় ডালিমগাছের মাটি স্পর্শে।

'সত্যধর্মসেবক সংঘে'র উৎসাহে এই ঐতিহাসিক স্থানটির সংস্কার হয়েছে। প্রতি বছর দোলোৎসবের মেলায় এই প্রতিষ্ঠান ঘাট, মন্দির ও রাস্তার সংস্কার করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ মেলায় আগত যাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। অথচ সতীমার সম্পত্তির মালিক মহান্তরা কোন রকম সংস্কারের দিকে নজর দেন না। উৎসব সময়ে তাঁদের কাজ হ'ল,—গদিতে বসে ভক্তদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা মাত্র। 'সরস্বতী ট্রাস্ট স্টেট' নামক সংস্থানটিও তথৈবচ।

জনি হ্যাজার্ড
৬
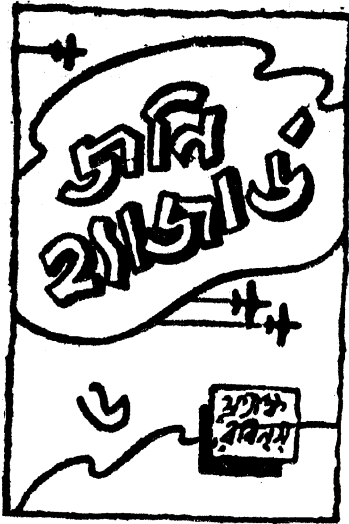
আঃ বন্ধু হে দলের অন্য সব পাইলট হয়ত বেশী পয়সা কিম্বা অ্যাডভেঞ্চারের লোভে এসে থাকবে, কিন্তু সে লোক এই ঘাটি নয়!
মানে.. এই, স্ত্রীলোক দেখলে.. আমার কেমন যেন মাথার ঠিক থাকেনা। আর ওই সুন্দরী মাদাম সোম-ফনের ত কথাই নেই!

ভোর বেলা, প্যারিস... তাড়াহুড়ো করে জোগাড় করা হেলিকপ্টার পাইলটদের দল সুদূর প্রাচ্যে যাত্রা করল...
ORLY
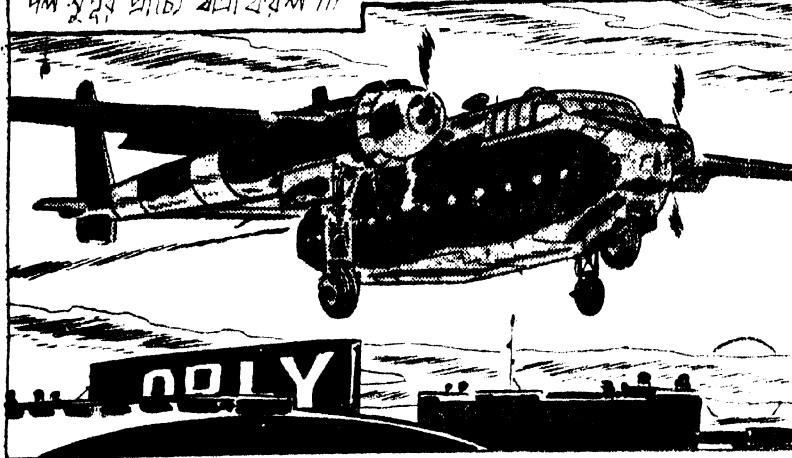
নিকট প্রাচ্যের ওপর দি
এক ভাবে ওরা পূর্ব দিকে
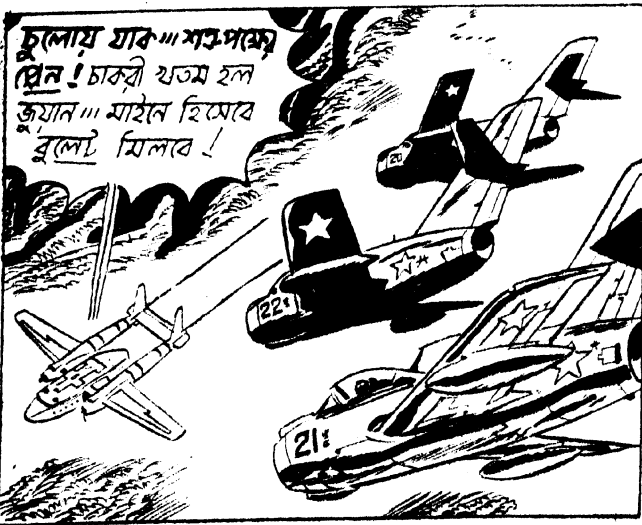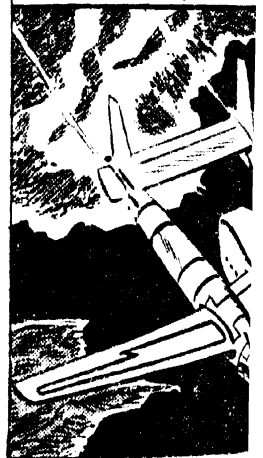
চুলোয় যাক... শত্রুপক্ষের প্লেন! চাকরী খতম হল জুয়ান... মাইনে হিসেবে বুলেট মিলবে!

কিন্তু ওরা গুলি ছুঁড়ছেনা কেন? আমরা নিরস্ত্র... একেবারে মনের মত শিকার!

এই কাজ খতম হবার আগেই ও ভীষন ভাবে আমার প্রেমে পড়ে যাবে, ... দেখে নিও!

পরে ...
ভদ্রমহোদয়গন, আপনাদের ধৈর্যের জন্যে ধন্যবাদ... দয়াকরে সীটবেল্ট গুলো আটকে নিন —

...পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা নামব!
আর তার পরেই খেলা সুরু হবে অ্যাঁ, বেমো! হুমম্, একটু ওপরে ওটা কি?

যদিনা মাদাম সোম-ফন রেডিওতে আত্ম-সমর্পন জানায়! তাহলে আবার যতদিন লড়াই চলবে ততদিন বন্দী হয়ে থাকতে হবে!
আর জেনেভা চুক্তির কোন সুযোগই মিলবেনা বন্ধু ... তার মানে অ-নেক দিনের জন্যে!
21
22
ক্রমশঃ ...

সাহিত্য আকাদমী ১৯৬২ সালের জন্য আটজন ভারতীয় সাহিত্যিককে পুরস্কৃত করেছেন। বাংলা ভাষায় এই সম্মান লাভ করেছেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। এবং তামিল, তেলগু, কানাড়া, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী ভাষায় অপর সাতজন সাহিত্যিকও সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রকাশিত বিশেষ সাহিত্য-গুণান্বিত গ্রন্থগুলিকে আকাদমীর কার্যকরী বোর্ড পুরস্কার দিয়েছেন। ঐ বোর্ডের সভার সভাপতিত্ব করেন আকাদমীর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু।

পুরস্কৃত প্রত্যেক সাহিত্যিকের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে একটি মাত্র গ্রন্থে একজন সাহিত্যিককে বিচার করা যায় কিনা? দ্বিতীয়ত তাঁর অপর কোন গ্রন্থ পুরস্কৃত গ্রন্থ থেকে অধিক শিল্পগুণসম্পন্ন কিনা? তা যদি থেকে থাকে তাহলে বিচারের মান পাল্টাবার প্রশ্ন উঠতে পারে। বিশেষ করে আকাদমী পুরস্কারের ক্ষেত্রে কোন একজন সাহিত্যসেবীর একখানি গ্রন্থই যথেষ্ট নয়।

১৯৬১ সালে ভারতীয় ভাষাসমূহের মোট তেরখানি গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলি ছিল অসমীয়া, গুজরাটী, বাংলা, হিন্দী, কানাড়ী, কাশ্মিরী, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু ও উর্দু ভাষায় রচিত। ১৯৬২ সালের পুরস্কৃত গ্রন্থগুলি বাংলা, গুজরাটী, কানাড়ী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, তামিল, তেলেগু ও উর্দুতে রচিত। অর্থাৎ এই বছরে অসমীয়া, হিন্দী কাশ্মিরী, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষার কোন সাহিত্যিক পুরস্কার পাননি।

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের পুরস্কার-প্রাপ্তি আকাদমী কর্তৃক ইতিপূর্বে পুরস্কৃত বাঙালী সাহিত্যসেবীদের ঐতিহ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম বিশেষ। এই মননশীল সাহিত্যিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমকালীন বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টাদের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় তিনি যে অসাধারণ শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন কোন একখানি গ্রন্থের সাহায্যে তার বিচার করা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত রায়ের অসামান্য ভ্রমণকাহিনী 'জাপানে' গ্রন্থখানি পুরস্কারলাভের যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় আমরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত ও গর্বিত। কিন্তু তাঁর বৃহৎ শিল্পসাধনায় যে গভীর জীবনদর্শন প্রতিভাত তা কোন একখানি গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে না। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর রায় এমনই প্রতিভার অধিকারী যা সমকালীন বাংলা সাহিত্যস্রষ্টাদের আর একজনের মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বিশেষ করে তাঁর শিল্পীসত্তার দৃঢ়তার যে সাম্প্রতিকতম পরিচয় আমরা পেয়েছি তা আমাদের বিস্মিত করেছে। যাই হোক, এই সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। সাহিত্যকে তিনি একাগ্র নিষ্ঠায় জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিনের সাধনায় শিল্পীর নির্লিপ্ততা তিনি অর্জন করেছেন। এই কারণেই তাঁর সম্মাননায় সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত।

আটটি ভাষায় পুরস্কৃত সাহিত্যিক ও তাঁদের গ্রন্থের নাম দেওয়া হল :— শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় : 'জাপানে' বাংলা; অধ্যাপক ভি আর ত্রিবেদী : 'উপায়ণ গ্রন্থ' - গুজরাটী (সমালোচনা-সংগ্রহ); শ্রীদেবুদু নরসিমা শাস্ত্রী 'মহাক্ষত্রিয়' - কানাড়ী (উপন্যাস); শ্রী ওয়াই দেশপাণ্ডে : 'অনাচকাচি চিন নিকা' - মারাঠী (দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ শ্রীবলবন্ত গার্গী : 'রঙ্গমঞ্চ' - পাঞ্জাব শ্রী এম পি শ্যামসুন্দরম : 'আক্কা সিমাইল' - তামিল; শ্রীবিশ্বনাথ স নারায়ণ : 'বিশ্বনাথ মধ্যকরালু তেলুগু (কাব্য গ্রন্থ); শ্রীআখতা ইমান : 'য়্যাদেন' - উর্দু (কবি সংগ্রহ)।

আগামী ৩১-এ মার্চ শ্রীনেহরু গ্র কারদের তাম্রপত্রে নাম খোদাই বাক্সের ভিতর পাঁচ হাজার টা জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেটসহ প স্কৃত করবেন।

আজকের দিনে শুধু নয়, শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এই টাকাটাই য নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা সাহিত্য পুরস্কৃত রচনাগুলি বহু মানুষের প যোগ্য রূপ দেওয়ার দায়িত্বও আকাদ রয়েছে। বিশেষ করে আকাদমী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত গুলির রচনায় হাত দিয়েছেন। প্র বছরে পুরস্কৃত গ্রন্থগুলি আকা অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশী ভ অনুবাদের ব্যবস্থা করতে পা এর দ্বারা সাহিত্যসাধক এক সর্বভারতের সাধারণজনের যেমন সুপরিচিত হবেন নিজের শিল্পী-সত্তার ওপর আস্থা বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন ভাষ মানুষের হাতে পুরস্কৃত শ্রেষ্ঠ গুলি তুলে দেওয়ার দায়িত্ব যদি আ দমী নেন তাহলে একটি মহৎ কর্তব্য পালন করা হবে।

তাছাড়া আমাদের সংকীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব দূর করার পক্ষে অনুবাদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা করতে পারে। পারস্পরিক চিন্তা-চে ভাবধারার মিলনের মধ্য দিয়া সাংস্কৃ জগতের যে যোগসাধন হবে তার দ্ ভবিষ্যৎ ভারতের ভিত্তিভূমি আরও হবে। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে বি ও পারস্পরিক হিংসার ভাব দূর হ সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য আকাদম একমাত্র এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্র করে ভারতীয় ঐক্যের পথকে বলিষ্ঠ ও বাস্তব রূপ দিতে পারেন।
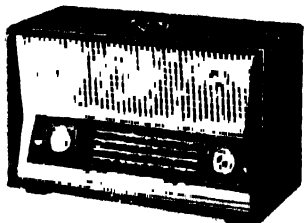
[উপন্যাস]

॥ ৪ ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গলির ওপাশে ঘোষেদের বাড়ির সাদা দেওয়ালটায় ভোরের আভাস লাগা-মাত্র উমা উঠে পড়লেন। এমনিই ওঠেন তিনি প্রত্যহ। কোন কোন দিন আরও আগে ওঠেন। বেশ খানিকটা রাত থাকতেই উঠতেন কিন্তু তাতে আলো জেবলে ঘরের কাজ সারতে হয়। শরৎ আসার পর সে-ব্যবস্থায় একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। দেশলাই জ্বালার আওয়াজে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়, চোখে আলোটাও লাগে। শরতের যেদিন হাঁপানির টান ওঠে, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকেন, ভোরের দিকেই যা একটু তন্দ্রা আসে। সেটুকু ভাঙাতে মায়া হয় উমার। আর সেই জন্যই—একটু অন্তত আবছা আলো আসার অপেক্ষা করতে হয়।

তা নইলে রাত থাকতে ওঠাই সুবিধা তাঁর। গঙ্গাস্নানের অভ্যাস করেছেন মার মতো। তাতে নাকি মাথা ঠাণ্ডা হয়, শরীরটাও ভাল থাকে। আসলে শরতের বিশ্বাস মার মতোই নিরিবিলিতে চোখের জল ফেলে মনটা হাল্‌কা করতে যান ওখানে—গঙ্গাজলে চোখের জলে একাকার হয়ে যায়, সে-কান্না কেউ টের পায় না।

গঙ্গাস্নানের জন্যই এত ভোরে উঠতে হয় তাঁকে। আরও ভোরে উঠলেই ভাল হয় ফরসা হলে ভিড় বেড়ে যায়, সে বড় অসুবিধা। পাঁচটা মেয়ে এক হলেই পাঁচটা বাজে প্রসঙ্গ—ও আর উমার ভাল লাগে না। অথচ এক ঘাটে যাঁরা প্রত্যহ স্নান করতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে একটু মুখচেনা গোছেরও পরিচয় হয়ে যায়—তাঁরা কথা কইলে মুখ ফিরিয়ে চলে আসা যায় না, দুটো কথা ওঁকেও বলতে হয়। এইটেই এড়াতে চান উমা। অথচ এখানেও কিছু কাজ থাকে—বিছানা ঠিক করা, দুটো ঘর বাইরের রকটুকু মোছা, নিজের প্রাতঃকৃত্য সারা—খুব কম করেও একঘণ্টার ধাক্কা। একটু রাত থাকতে না উঠলে সবদিক সামলাতে পারেন না।

ঘুম ভাঙলে বিছানাতেই উঠে বসে বালিশ ঠিক করতে করতে (রাসমণির শিক্ষা এটা, ওয়াড় টেনে চোস্ত করে বালিশ ফুলিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে রাত্রে মাথায় দেবার চিহ্ন না থাকে) একদফা ঠাকুরদের নাম করেন উমা। তাঁর মা-ও করতেন, শুনে শুনে শেখা। সাধারণত অনুচ্চকণ্ঠেই করেন—এ-ও মার শিক্ষা, তোমার ঘুম ভেঙেছে বলেই অপরের ঘুম ভাঙাতে হবে এমন কোন আইন নেই—ইদানীং আরও সাবধান হয়েছেন, পাছে শরতের বিশ্রামে ব্যাঘাত হয়। একরকম মনে মনেই বলেন।

আজও উঠে ঠাকুরদের নাম সেরে বিছানা থেকে নামতে যাবেন, হঠাৎ শরতের বিছানার দিকে চোখ পড়ে গেল। মনে হল শরৎ তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। শরৎ জানলার দিকটায় শোন, যেটুকু আলো ঐদিক থেকেই আসে। তাই আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না এ সময়টায়। নেমে কাছে এসে দেখলেন সত্যিই চেয়ে আছেন শরৎ, চোখে ঘুমের লেশ মাত্র নেই, সম্ভবত অনেক আগেই উঠেছেন।

'ওমা, তুমি জেগে আছ! আমি বলি ঘুমোচ্ছ। পাছে ঘুম ভেঙে যায় বলে—'

শরৎ তেমনি স্থির দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন 'আজ আর গঙ্গাচানে না-ই বা গেলে। সারা রাত তো ঘুমোও নি—এখন একটু ভোরাই হাওয়ায় ঘুমিয়ে নাও না!'

'সারারাত যার ঘুম হয়নি—এখন এই সকালের আলোয় শুলে তার ঘুম হবে? তোমার কি বুদ্ধি!...কিন্তু তুমি জানলে কি ক'রে আমার ঘুম হয়নি? তুমিও কি জেগে ছিলে? কৈ, আমি তো টের পাইনি!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চান উমা।

'তুমি ঘুমোও নি কেন? শরীর খারাপ করেছে?'

কাছে এসে কপালে হাত দেন।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওঁর হাতখানা ধরে ফেলেন শরৎ। খুব কোমলকণ্ঠে বলেন, 'আমার কিছু হয়নি, বেশ আছি। কিন্তু তোমার শরীর সত্যিই খারাপ হয়েছে। আজ আর বেরিও না, ঘুম না হয়, এমনি একটু বিশ্রাম কর।'

'হ্যাঁ, শুয়ে থাকলেই আমার চতুর্বর্গ হবে! ছাড় ছাড়, অসুময়

কাজ পড়ে—এমনিই বেলা হয়ে গেছে। গঙ্গায় গিয়ে সেই মাগীর দঙ্গলে পড়তে হবে।'

তবু হাতটা ছাড়েন না শরৎ। বলেন, 'একদিন গঙ্গায় না গেলে কি হয়?'

'তা কিছু হয় না। এই তো কতদিন যাই না। তবে সারারাত না ঘুমিয়ে আজ এখন মাথা আগুন হয়ে আছে, গঙ্গায় না গেলে ভীষণ মাথা ধরবে, কোন কাজ করতে পারব না।'

আর বাধা দিলেন না শরৎ। একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে হাতখানা ছেড়ে দিলেন।

বাধা দেবার কোন অধিকারই রাখেন নি তিনি। এ হাত ধরারও কোন যোগ্যতা নেই। এটুকু সময়ও যে সহ্য করেছে, কটু কথা বলেনি এই ঢের।

বালতি-ন্যাতা এনে ঘর মুছতে মুছতে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে হেসে উমাই আবার কথাটা তুললেন।

'আমি ভাবছি আজ পাড়িয়ে আসবার সময় খোকাটাকে নিয়ে আসব। কাল তো বড় বৌমার আসবার কথা গেছে—আর না এলেও, একটা দিন বড়দি বেশ চালিয়ে নিতে পারবে।'

খোকা এক মাসেরও ওপর কমলার বাড়ি আছে। গোবিন্দর বৌ বাপের বাড়ি, ছেলেমেয়েসুদ্ধ নিয়ে গেছে সে—কমলা টিকতে না পেরে খোকাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন। নাতি-নাৎনী হবার পর আজকাল আর একা থাকতে পারেন না তিনি। গোবিন্দ কোনদিনই রাত ন'টার আগে আসে না, এক-একদিন আরও দেরি করে—কমলার বড় কষ্ট হয় অত রাত অবধি একা বসে থাকতে।

'একটা দিন আমিও চালিয়ে নিতে পারব—তার জন্যে নয়। কিন্তু একদিনের অত চিন্তা কেন? তবুর ওখানে যেতে হবে বুঝি?'

সলজ্জ হেসে উমা বলেন, 'হ্যাঁ—ভাবছিলুম কাল রবিবার আছে, পড়ানো নেই, একটু ঘুরেই আসি।'

'তা খোকাকে আনবার কী দরকার—আমার জন্যে? না নিয়ে যাবে?'

'না, তোমারই জন্যে। আজকাল ও তো সব পারে, তোমার অনেক সুসার হবে।'

'আমার জন্যে অত কান্ড করবার দরকার নেই।' আমি বেশ থাকব। তুমিই বরং নিয়ে যাও—একলা গিয়ে পথঘাট খুঁজে পাবে না—আতান্তরে পড়বে।'

'না না। সে আমি একরকম ক'রে খুঁজে নেব এখন। তোমার কাছেই একজন থাকা দরকার। সারাদিনের ফের, কখন ফিরব—মানে ফিরতে পারব তারও তো ঠিক নেই। তুমি অসুস্থ মানুষ—কখন শরীর খারাপ হয়ে পড়বে কি হবে, হাঁপ শুরু হ'লে তো নড়তে পার না। খোকা থাকলে এদিকে তোমার ফাইফরমাশ খাটা কি বুকে একটু মালিশ করা—এগুলো তো পারবে, উনুন জেবলে চা-টা গুলোও ক'রে দিতে পারবে।'

'এখন ভালই আছি, সেসব কিছু হবে না। সে যেদিন শুরু হবে আগে থাকতেই টের পাই।...এই তো কদিন একা রয়েছি, তুমি তো রাত আটটার আগে ফের না। তা যদি পারি তো আরও না হয় দুটো ঘণ্টা পারবখন থাকতে। ...তা অত-শতরই বা দরকার কি, চল না আমিও যাই তোমার সঙ্গে—'

'তুমি যাবে? যেতে পারবে অতটা? ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা হাঁটতে হয় শুনেছি—'

মুখচোখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে উমার।

'তা পারব না কেন? এখন তো শুনেছি গাড়ি হয়েছে। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে।'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে, খোকা বলছিল। তা তাই চল তাহ'লে। সেই বেশ হবে। তাহ'লে আর কোন পিছটান থাকে না। তোমাকে রেখে গেলে ঐ একটা দুর্ভাবনা থাকবে—'

কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ গাঢ়স্বরে শরৎ বললেন, 'তুমি আমার জন্যে এত ভাব—? সত্যি? এইটে শুনলে মনে বড় বল পাই। আমার তো কোন জোরই নেই—এই কথা শুনলে তবু মনে হয়—আমি যত অপরাধই ক'রে থাকি না কেন তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখবে, তাড়িয়ে দেবে না।...আজকাল বড় ভাবনা হয় জান—যতদিন একা ছিলুম সে একরকম যায় গিয়েছিল, এখন মনে হয়, তুমি ছেড়ে দিলে আমার একদিনও চলবে না। আর অমন ক'রে থাকতে পারব না আমি একা একা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে হয়ে—'

'আজ আবার সকাল থেকে কী আদিখ্যেতা শুরু হ'ল তোমার!' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন উমা। কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রূঢ়তা আনবার চেষ্টা সত্ত্বেও—আশা ও আশ্বাসের সঙ্গে শরৎ লক্ষ্য করেন—মনের আবেগটা ধরা পড়ে যায়। তাতেই একটু বেশী রূঢ় শোনায় যেন। তারপর যখন কথা বলেন তখন আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় সেটা।—'তোমাকে ছেড়ে দিতে আর পারলুম কৈ? তাহ'লে আর যেচে ঘরে নিয়ে আসব কেন? এখন একবার যখন বোঝা ঘাড়ে নিয়েছি তখন আর নামাব কি ক'রে? কার ঘাড়ে চাপাব আর? এক—'

'হ্যাঁ' শরৎ তাড়াতাড়ি ওঁরই কথার সুর ধরে যেন বলেন, 'সেইদিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রো—দোহাই তোমার, একেবারে যমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিও, তাহ'লেই তোমার ছুটি। সেইটুকুই আমি চাইছি!'

'ও আবার কি কথা! বলে এত দুঃখ দিয়েও আশ মিটল না বুঝি? দেবার মধ্যে জীবনে দিয়েছ এই লোহা আর সিঁদুরটা—সেটাও সইছে না?......ও আশীর্বাদে আর কাজ নেই।'

'কিন্তু তুমি গেলে আমার কি গতি হবে?...এই তো—একবেলা কে দেখবে সেই ভাবনায় অস্থির হচ্ছ—তখন কে দেখবে?'

অনেকক্ষণ উমা কোন উত্তর দেন না, নীরবে বাকী ঘরটুকু মুছে নেন। তারপর মুখ টিপে হেসে বলেন, 'তা যম এলে তাকে কি বলব শিখিয়ে দিও।...কখনও তো আমার হয়ে কাউকে কিছু বললে না—পার তো তাকে বলে ব্যবস্থা ক'রো—যাতে দুজনেই এক সঙ্গে যেতে পারি।...না কি, সেখানে তো আবার তার একজন বসে আছে! আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়বে না তো?'

শরৎ প্রবলবেগে ঘাড় নেড়ে গাঢ় কণ্ঠে বলেন, 'না না, আর কেউ নেই। সে যা ঋণ ছিল তার এ জন্মেই শোধ হয়ে গেছে, পরকালে কোন দাবী তার নেই। আর যদিই বা বসে থাকে, দাবী করে—তোমার হক তুমি ছাড়বে কেন? তোমার তো জোরের জিনিস—এবার জোর ক'রেই তোমার পাওনা আদায় করবে, এমন ভাল মানুষের মতো ছেড়ে দিও না—'

'তবু ভাল!' বলে উমা আর একটু হেসে বালতি হাতে কলতলায় চলে যান।

খেয়ে দেয়ে পান মুখে দিয়ে বেরোবার সময় হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়ান উমা।

'দ্যাখো গো, গোটা-দুই টাকা হবে তোমার কাছে?''

'তা হবে। হঠাৎ টাকা চাইলে যে?'

'মাসের শেষ, হাতে যে কিছু নেই। ধারই চাইতুম, তা তুমি মেসো সঙ্গে যাচ্ছ—তোমারও তো কিছু কর্তব্য আছে। একটু লেবুটেবু কিনে নেবো আর কি।'...

'তা সে আজ কি—?' শরৎ টাকা দুটো বালিশের তলা থেকে বার ক'রে দিতে দিতে প্রশ্ন করেন, 'যাবে তো কাল?'

'আজই এনে রাখব মনে করছি। কাল ভাবছি রাত থাকতে উঠে যা হয় দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে না হয় দশটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। নইলে

ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আর না খেয়ে গেলে সে বড় পীড়ন করা হয়—তার যা অবস্থা শুনেছি—মেয়েটা তো জ্যান্তে মরা হয়ে রয়েছে—সেখানে না খেয়ে গিয়ে হাজির হওয়া—সে বড় লজ্জা করে!'

'না না—খেয়েই যাব। তা দু'-টাকাতেই হবে?'

'ঢের ঢের। বইবে কে অত?... তাছাড়া খরচাও তো হবে ঢের।...ট্রেন-ভাড়া আছে, গাড়ি-ভাড়া আছে—এক-গাছা খরচা। তোমার তো আর কুবেরের ভাণ্ডার নয়—ধর যদি আমি মরেই যাই—তখন তো মাইনে ক'রে লোক রাখতে হবে, এমন আপ-খোরাকী বিনে মাইনের ঝি আর মিলবে না তো!"

'আবার ঐ কথা? বললুম না যে তোমাকে আমি ছাড়ব না?'

'আচ্ছা আচ্ছা—ধরেই রেখো। যতদিন পারো খাটিয়ে নাও—আর কি! যমরাজের সঙ্গে ব্যবস্থাটা ক'রে নিও কিন্তু—'

টাকা দুটো আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে যান উমা।

খবরটা পেলেন পাড়ার দু তিনটি ছেলের মুখে। বাড়িওলাদের একটি ছেলেও ছিল তাদের মধ্যে। ছুটতে ছুটতে এসেছে তারা। বোধহয় ঊর্দ্ধ-শ্বাসেই ছুটে এসেছে।

উমার আসবার সময় হয়েছে আন্দাজ ক'রেই—তাঁকে একটু চমক লাগাবার জন্য শরৎ তখন গুলের উনুনটায় আঁচ দিয়ে সাগু চাপিয়ে দিয়েছেন। উমা বারোমাসই রাত্রে দুধসাগু খান। একা থাকার সময় ঐ অভ্যাস করেছেন—এখন আর কিছু সহ্য হয় না। আগে সকালেই ক'রে রেখে দিতেন, এখন ফিরে এসে এই উনুনটা জেবলে ক'রে নেন। শরৎ যেদিন ভাল থাকেন সেদিন রুটি কিংবা পরোটা খান দুখানা—সেও এই উনুনেই হয়। নইলে তিনিও সাগু খান। তার সঙ্গে হয় কোন সস্তা দামের মিষ্টি, কি দুটো নারকোল নাড়ু—কিংবা নিদেনপক্ষে বাতাসা। সকালের তরকারী একটা-আধটা রাখা থাকে, সেটাও গরম ক'রে নেওয়া হয় একবার। শরৎ রুটি না খেলে সাগুর সঙ্গেই খান দুজনে।

অন্যদিন উমা ফিরলে এই উনুনে আঁচ পড়ে। তিনিই এসে দেন। শরৎ শুধু একটা কেরোসিনের পলতে দেওয়া পুরনো আমলের স্টোভ আছে, সেইটে জেবলে একবার নিজের মতো চা ক'রে নেন বিকেলে। আজই হঠাৎ খেয়াল হয়েছে: কালকের ঐ সারারাত জাগার পর আজ তো অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটিই হয়নি, গঙ্গাস্নান, বাজার, রান্না—তারপর সারাদিন হাঁটা আর বকুনি—সবই তো চলছে। আসবে তো মরার মতো হয়ে। আবার এইসব করবে—তার চেয়ে তিনিই ক'রে রাখবেন। ও'রও সুসার হবে খানিকটা, এসে একটু স্থির হয়ে বসতে পারবেন—বিশ্রাম পাবেন, আর শরতেরও একটু বাহাদুরী নেওয়া হবে, দেখিয়ে দেবেন উমাকে যে তিনি যতটা অকর্মণ্য ভাবেন স্বামীকে ততটা অকর্মণ্য উনি নন।

ভেতরে উনুনের ধারেই বসেছিলেন —ছেলেরা এসে দোর ঠেলে এক সঙ্গে 'মেসোমশাই' বলে ডাকতেই চমকে উঠেছেন শরৎ। উমা সকলেরই মাসীমা, সেই সূত্রে তিনি মেসোমশাই ঠিকই—

"তোমারও তো কিছু কর্তব্য আছে"

কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো ওদের বিশেষ আলাপই নেই বলতে গেলে। কথা-বার্তা বলে ওরা কদাচিৎ। উনি অধিকাংশেরই নামটাও জানেন না। ওরা কেন অমন ভাবে ডাকবে ও'কে—এত ছেলে এক সঙ্গে—?

তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে আরও চমকে উঠলেন। আগে যেটা ছিল শুধুই বিস্ময় সেটা এবার আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল।

ওরা সবাই ও'কে দেখে অমন মাথা নামিয়ে দাঁড়াল কেন? কেউই যেন কিছু বলতে পারছে না—?

'কি—কী হয়েছে বিমু? ব্যাপার কী?' একমাত্র যে ছেলেটিকে চেনেন এদের মধ্যে, তাকেই জিজ্ঞাসা করেন। এক পা আরও এগিয়ে আসেন ওদের দিকে।

'তোমাদের মাসীমা—তাঁর কিছু হয়নি তো?'

এইবার ওরা মাথা তুলল। না বললেও নয় আর। কিন্তু বলাও কঠিন। বিমুর চোখ ছলছল করছে, রাস্তা থেকে আসা গ্যাসের আলোতেও তা লক্ষ্য করলেন শরৎ, চোখের কোণে কোণে চিক্ চিক্ করছে জলের আভাস।

'আপনি—আপনি একটু এই মোড়ে চলুন মেসোমশাই, এই বড় রাস্তার মোড়ে—। একটা—একটা য়্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে।'

'য়্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে? তা বেশ তো। তা আমি যাব কেন? কি য়্যাক্সিডেণ্ট?'

ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করেন শরৎ। আর করতে করতেই বুঝতে পারেন যে, ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে খুব। কী হয়েছে, কার হয়েছে—য়্যাক্সিডেণ্ট তাও বুঝতে পারেন—তবু সেই বুঝতে পারাটাকেই যেন যতক্ষণ

সম্ভব উপলব্ধি থেকে সরিয়ে রাখতে চান। যতক্ষণ না পরিষ্কার শুনছেন ততক্ষণই যেন বাঁচোয়া। যেটুকু সময় পান সেইটুকুই লাভ।

ওরা তাঁর আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে আবারও বলে, 'আপনি একটু চলুন মেসোমশাই। আপনার যাওয়া দরকার।'

'দরকার? অ। তা চল। দরজাটা দিয়ে যাব—না খোলাই থাকবে?'

একেবারে বুঝি ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছেন শরৎ। কী বলছেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারছেন না বোধ হয়।

ভাবছেন, প্রাণপণে ভাবছেন সকালের কথাগুলো। সে ছেড়ে যাবে না কোথাও, যেতে পারে না। তাহ'লে তাঁকে দেখাবে কে?

বাড়িওয়ালাদের ছেলে বিমু আর একজনকে ইশারা করলে। সে ও'র একটা হাত ধরে মৃদু টান দিয়ে বললে, 'আসুন মেসোমশাই, আমি নিয়ে যাচ্ছি—'

বিমু বললে, 'আপনি চলুন, আমি মাকে বলে যাচ্ছি দরজা বন্ধ ক'রে দেবে—

কেমন একরকম অসহায় ক্ষীণকণ্ঠে বললেন শরৎ, 'উনুনে সাবু চড়ানো ছিল, মানে তোমার মাসীমা খাবেন—তা—'

কথা শেষ করতে পারেন না; ছেলেটি টেনে নিয়ে যায়।

ও'দের গলি ছাড়িয়ে রামহরি ঘোষ লেন। তারপর বিডন স্ট্রীট। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা?

'কোথায়, কোথায় হ'ল য়্যাক্সিডেণ্টটা?'

'ঐ হে'দোর মোড়টায়—এই কাছেই। আর দূরে নেই।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যান শরৎ। এতক্ষণের অভিভূত ভাবটা যেন কেটে যায়। সবল সুস্থ মানুষ হয়ে যান যেন অকস্মাৎ। অনেকটা সহজ কণ্ঠে বলেন, 'এখনও বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ বাবারা—?'

'বোধহয় আছেন।' আস্তে আস্তে বলে বিমু। সে মাকে বলে ছুটে এসে ও'দের ধরে ফেলেছে।

আর কোন প্রশ্ন করেন না শরৎ। সহজভাবেই হে'টে যান। একটু জোরেই চলেন বরং।

দূরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। ভিড় জমে গিয়েছে। বহুলোক ঘিরে রয়েছে কিছু একটা। ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে একটা। তার পিছু পিছু আরও অনেক ট্রাম। পুলিশও এসেছে—

হে'দোর ওদিক থেকে আসছিলেন উমা, হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি এসে পড়ে উলটো দিক থেকে—সেইটে বাঁচাতে গিয়ে ট্রামে ধাক্কা খেয়েছেন। হাতপা কেটে বেরিয়ে যায়নি কোনটা, থে'তলে গেছে বেশী। মাথাতেও নাকি চোট লেগেছে। রাস্তাতেই পড়ে আছেন, এখনও।

শরতের ভালো ক'রে দেখা হ'ল না। তাঁরও দুর্বল দেহ—মাথা ঘুরে উঠল, সেইখানেই তিনি বসে পড়লেন।

কে একজন যেন বললে, 'ওরই স্বামী।'

'তাই নাকি!' ...ফিস ফিস ক'রে বললে আর একজন, 'আহা আহা—তাই মাথা ঘুরে উঠেছে অমন ক'রে—। বুড়োমানুষ, দ্যাখো দিকি, এই বয়সে এ শক্! বেচারী।'

এ সবই যেন দূর থেকে ভেসে আসছে—এই গলার আওয়াজগুলো। যেন দূরে কোথাও কারা বলাবলি করছে।

কারা সব ও'কে হাত ধরে তুলে এনে একটা বাড়ির সদরে বসিয়ে দিলে।

শুধু একটি প্রশ্নই করলেন শরৎ, এতক্ষণ চেষ্টা ক'রে করতে পারলেন, 'প্রাণটা—প্রাণটা আছে বলে কি মনে হ'ল? তাহ'লে একবার হাসপাতালে চেষ্টা—মানে যদি বাঁচত এখনও—?'

ভিড়ের মধ্যে থেকেই কে একজন বললে, 'বুকের কাছটা বোধহয় ধুকধুক করছে এখনও। প্রাণটা এখনও আছে বলেই মনে হচ্ছে। আপনি ভাববেন না কিছু—টেলিফোন করা হয়েছে—য়্যাম্বুলেন্স এতক্ষণে এসে যাবারই কথা। ঐ বোধহয় আসছেও—যা ভিড়—'

হঠাৎ শরতের মনে হ'ল—সাগুটা? নামিয়েছে তো ওরা? সবসুদ্ধ যদি পুড়ে যায় উমা এসে রাগারাগি করবে—

য়্যাম্বুলেন্সটা সত্যিই এগিয়ে এল। স্ট্রেচার নিয়ে কারা নামছে না?

একবার দেখে নিলে হ'ত। তখন তো ভাল ক'রে চাওয়াই হ'ল না—সব যেন ঝাপসা একাকার হয়ে গেল। শুধু নজরে পড়েছিল চওড়া লাল শাড়ির পাড়টা, আর হাতের সাদা শাঁখাটা। সেও চকিতে, তারপর আর কিছু দেখতে পাননি।

কে একজন এসে একটা পু'টুলি রেখে দিলে ও'র পাশে।

'ওনার হাতেই বোধহয় ছিল পু'টুলিটা। দেখুন তো...কী ছিল তা তো জানি না, খুলে ছড়িয়ে গিয়েছিল। ...যতটা পেরেছি কুড়িয়ে এনেছি—'

পু'টুলির গেরোটা খোলেনি—এদিকটা বোধহয় রাস্তায় ঘষড়ে ছি'ড়ে গেছে। কাদা মাথামাখি—তবু ঝাড়নটা ও'দের বলেই মনে হ'ল। নতুন ঝাড়নটা, মাত্র কদিন আগে উমা এনেছেন। কে এক ছাত্রীর মা দিয়েছে—ও'র ঝাড়নটা ছি'ড়ে গেছে দেখে। সেই ঝাড়নের এই অবস্থা দেখলে উমা হায়-হায় করবেন—

কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতোই পু'টুলিটা খুলে দেখলেন শরৎ, ছে'ড়ার দিকটাই খুলে দেখলেন। একটা গোল কাঠের বাক্স—আঙুর নিশ্চয়ই, গোটা দুই বেদানার মতোও মনে হচ্ছে, আরও সব কী রয়েছে। একটা খালি শালপাতার ঠোঙা—খালি কেন? ও—এই যে, ক্ষীরের বরফি ছিল, ভেঙে গু'ড়িয়ে গেছে—এক-পয়সানে চিনি কচকচে বরফি, যা পুজোর দেয় সাধারণতঃ, শরৎ ভালবাসেন এগুলো খেতে। দুধসাগু কি পরোটার সঙ্গে খাবেন মনে করেই নিয়েছিল বোধহয়—

চুপ ক'রে বসে রইলেন শরৎ। য়্যাম্বুলেন্সে তোলা হ'ল, একটু পরে তা চলেও গেল। পাহারাওলা ভিড় ঠেলে এসে ও'র নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। ভাগ্যে বিশু কাছে ছিল, সে-ই বলে দিলে। উনি হয়ত বলতে পারতেন না। নম্বরটা আজও জানেন না বাড়ির, কাউকে কোনদিন ঠিকানা দেবার তো দরকার হয়নি।

পাহারাওলা ঠিকানাটা নিয়ে বোধহয় য়্যাম্বুলেন্সকেই দিলে। কে জানে—য়্যাম্বুলেন্স চলে যেতেই ট্রাম ছেড়ে দিলে। পর পর ট্রামগুলো চলল সার বে'ধে। এইবার ভিড়ও হাল্‌কা হয়ে গেল, মজা দেখা মিটে গেছে, অনেকেরই এবার বোধহয় মনে পড়েছে বাড়ির কথা, কাজের কথা। যেটুকু ভিড় রইল এখন ও'কে ঘিরে।

কে একজন এসে ও'র হাত ধরল, 'উঠুন মেসোমশাই। বাড়ি চলুন।'

'বাড়ি?...হ্যাঁ, যাব বৈকি।...কোন হাসপাতালে নিয়ে গেল ওরা বাবা—জান কেউ? একটু খবর পাওয়া যাবে না?'

'বিমু গেছে মেসোমশাই। বিমু আর তারক। ওরা ফিরলেই সব খবর পাবেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি...... আপনি এখন বাড়িতেই যাবেন তো?'

'আমি?...তা বাড়িতেই তো—। মানে আর কোথায় যাবো?'

'আর কাউকে খবর টবর দিতে হবে?' বাড়িও'লাদেরই আর একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে। ওর মুখটা এতক্ষণে চিনতে পারেন শরৎ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—খবর দিতে হবে।...এই কাছেই মদন মিত্তিরের লেনে আমার বড় শালী থাকে। কিন্তু নম্বর জানি না।... আমার সঙ্গে যাবে কেউ বাবা? তাদেরই খবর দিতে হবে। তারাই ওর আপন—'

'চলুন চলুন, আমরা সবাই সঙ্গে যাচ্ছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে একবার পু'টুলিটার দিকে হাত বাড়ালেন।

'আমরা নিচ্ছি মেসোমশাই। আপনি চলুন।'

মাথাটা এখনও ঘুরছে। একজনের কাঁধে হাত রেখে সামলে নিলেন টালটা। তার কাঁধ ধরেই চললেন ধীরে ধীরে।... সাগুটা ওরা নামাবে তো? কড়াসুদ্ধ যদি ধরে যায়—উমা বড্ড বকাবকি করবে—

(ক্রমশঃ)

না। অবাক হবার কিছু নেই। আপনি বাঙালী কিনা সে বিষয়ে ঘোর-তর সন্দেহ আছে। এ-কথায় আপনার রাগ হতে পারে। কিন্তু এটা সত্যি কথা। বরফ-মাথায় ভেবে দেখলে বুঝবেন, বাংলাদেশে বাস করলে আর বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি তাকে বাঙালী বলা যায়? খাঁটি ঘি কিংবা খাঁটি দুধ যেমন বাংলাদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, শত বিজ্ঞাপন দিয়েও (কোম্পানী কর্তৃক) ফিরে আসে নি তেমনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত খাঁটি বাঙালীও বাংলাদেশ থেকে খাঁটি-ঘি-এর মতই লোপ পেয়েছে।

কিন্তু খাঁটির কথা থাক। কারণ ভেজালের যুগে খাঁটির স্থান নেই। সুতরাং খাঁটি ছেড়ে শুধু বাঙালী কাদের বলা যায় তাই স্থির হওয়া দরকার।

বাংলাদেশে যারা বাস করেন তাঁরা কি বাঙালী? তা তো নয়। কারণ অনেক অবাঙালীই বাংলাদেশে বাস করেন। সুতরাং বাংলাদেশে বাস করলেই বাঙালী হওয়া যায় না। তবে বাংলা ভাষায় কথা বলেন যাঁরা তাঁরাই কি বাঙালী? তাও নয়। সব চক্চকে জিনিসই যেমন সোনা নয় তেমনি সব বাংলাভাষীই বাঙালী নয়। অর্থাৎ বহু বাঙালী যেমন সুন্দর হিন্দী উর্দু প্রভৃতি বলতে পারেন তেমনি অনেক অবাঙালীও সুন্দরভাবে বাংলা বলেন। শুধু কি তাই? অভারতীয়দেরও অতি সুন্দর বাংলা বলতে শুনেছি। সকল ইংরিজী-ভাষীই যেমন ইংরেজ নয় ঠিক তেমনি সকল বাংলাভাষীই বাঙালী হবার দাবি করতে পারেন না। যদি কেউ বাংলা-দেশে সুযোগানুক্রমে বাস করার কথা বলে পাড়ি খেলতে আসেন তাও যুক্তির প্যাঁচে পড়ে ফরসা হয়ে যাবে। কারণ অনেক বাঙালীই আছেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা বাইরে থেকে এসে বাংলা-দেশে বসবাস আরম্ভ করেন। তাই তো আজও বহু বাঙালীর নামের সঙ্গে চৌবে, ত্রিবেদী, পাণ্ডা, পট্টনায়ক ইত্যাদি ঘুড়ির ল্যাজের মত লেগে আছে।

তাহলে প্রশ্ন বাঙালী কারা? আপনার কাছে এ প্রশ্ন কঠিন মনে হতে পারে। অবান্তরও মনে হতে পারে। আমার কাছে কিন্তু নয়।

বাঙালীর জাতিত্ব বা তার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কোন ব্যুৎপত্তি নেই। সুতরাং ঐ বিষয়ে কোন গুরুতর প্রবন্ধ ফাঁদছি মনে করলে উইকেটের বাইরের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হবার মতই ভুল করবেন। আপনি শুধু বাঙালী কিনা তাই একটু মিলিয়ে দেখুন।

বয়স হোক আর নাই হোক কলেজে ঢুকলেই বাঙালীর ছেলেরা সাবালক হয়ে যায়। রাত করে বাড়ী ফিরলে পুরনো অভ্যাস অনুযায়ী মা যদি বকাবকি করেন তবে তারা মাকে জানিয়ে দেয়—আর ইস্কুলে পড়া নাবালক ছেলে নয়। এখন রীতিমত সাবালক। সুতরাং তাঁর বকতে আসা অন্যায়। তবুও তিনি (মা) যদি পড়াশুনার কথা তোলেন তখন 'নিজের ভালোমন্দ বোঝার বয়েস হয়েছে' একথা বেশ জোরের সঙ্গেই তারা বলে দেয়। কিন্তু প্রকৃত সাবালক অবস্থায় বাঙালীর ছেলের কাছে যদি কোন কন্যাপক্ষ দাবি-দাওয়া একটু কমাতে অনুরোধ করেন, মাথাটা নীচু করে বেশ নরমসরম হয়েই পাত্র তখন জানিয়ে দেন—'দেখুন এ বিষয়ে আমি আর কি বলবো। মাথার ওপর যে গার্জেনরা রয়েছেন তাঁদের কথা তো শুনতে আমি বাধ্য। আপনি বরং তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন।' আপনি না জানলেও আমি জানি এই ছেলেরাই ছাত্র-

জীবনে পণপ্রথাকে কি ঘৃণার চোখেই না দেখে আর কি অগ্নিবর্ষী রচনাই না পরীক্ষার খাতায় লেখে। 'দেনাপাওনা' পড়ে বুকটা ওদের ভারী হয়ে ওঠে। এবং তখন তারা মনে মনে পণ করে কিছুতেই বিয়েতে কোন জিনিস দাবি করবে না। বড়দিদি বা বোনের বিয়ে দিতে বাবার হিমসিম খাওয়া দেখেও মনের গোপন পণটা আর একবার তারা দৃঢ় করে নেয়।

পরীক্ষার কথা যখন উঠলো তখন এই বিষয়েও বাঙালীর বিশেষত্বটা বলা দরকার। তিনশ' প'য়ষট্টি দিন ইস্কুল-কলেজে যাওয়া-আসার পথের ধারে কোন ঠাকুর-মন্দিরে গিয়ে প্রণাম না করলেও পরীক্ষার কদিন তারা কোন ভুলচুক করে না। তখন তারা বিশ্বাস করে ঐ প্রণামের জোরেই সব কোশ্চেন 'কমন' পাবে। বাঙালীর এই ধারা এন্ট্রান্স পরীক্ষা থেকে বর্তমানের একাদশী পরীক্ষার পরীক্ষার্থী পর্যন্ত বহন করে চলেছে। কোন ব্যতিক্রম নেই। যেন নিয়মের রাজত্ব।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সম্বন্ধে বাঙালীর ছেলে কোন সন্দেহই পোষণ করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তারা অত্যন্ত আশাবাদী। স্পুত্নিক-লুনিক এর খবরও তারা রাখে। গাগারিন-কার্পেণ্টারের নামও জানে। পাকাকলার মধ্যে ছারপোকা পুরে সেটা সকালে উঠে বাসিপেটে খেলে যে পালাজ্বর সারে না তাও এখন বিশ্বাস করে। দুরারোগ্য ক্যান্সার-রোগও যে একদিন বিজ্ঞানের কল্যাণে নিরাময় হবে এ ভরসাও তাদের আছে। কিন্তু আজও বাঙালীরা মাদুলী ও কবচ পরে! শুধু পরাই নয় আবার 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' করে মাদুলীর গুণ বোঝাবার চেষ্টা করে!

...গুণ বোঝাবার চেষ্টা করে
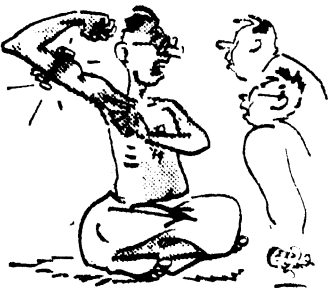
সত্যি কথা বলাও বাষ্প বলের মত বিপজ্জনক। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন সব ঠিক ঠিক মিলে যাবে। যেন মেসের হিসেব। যত টাকা যত নয়া পয়সা আয় ঠিক তত টাকা তত নয়া পয়সাই ব্যয়। এক নয়া পয়সাও গরমিল নেই।

প্রথম দিকের বাটসম্যানদের যেমন সকলেরই সেঞ্চুরী করার ইচ্ছে থাকে তেমনি সব বাঙালী ছেলেরই মনের ইচ্ছে সুন্দরী বৌ পাওয়ার। মেয়েরাও নাকি সিনেমার পছন্দ মত নায়কের সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্বামীর কল্পনাটাকে গুলিয়ে ফেলে। নিজের অবস্থা আর যোগ্যতার কথাটা তখন পাকা ফলের মত মনের বোঁটা থেকে খসে পড়ে যায়।

এ-সবগুলো বাঙালী কতদিন আঁকড়ে থাকবে জানি না। কিন্তু একথা আমি জানি কোন বাঙালীই উপহার না নিয়ে নেমতন্ন বাড়ী যেতে পারে না। ছেলে মেয়ে পড়ার সব বই কিনে দেবার সামর্থ না থাকলেও দুটাকা দামের বই কিনে নিয়ে গিয়ে 'বন্ধু-পত্নীর কর-কমলে......' দেওয়া চাই। কিংবা 'বনানীর বিয়েতে......' গিয়ে নেমতন্ন রক্ষা করে। প্রেস্টিজ বলে তো একটা কথা আছে' অবস্থাটা এমন পর্যায়ে গেছে যে, নেমতন্ন করেও বাঙালীরা আশা করে উপহার পেয়ে কতখানি উশুল হবে।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, বাঙালীর পেটে ভাত না থাকলেও প্রাণে কাব্য আছে। এ কথার সঙ্গে আমি একমত নই। পেটে ভাত না থাকলেও কাব্য করা যায় একথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিয়ে করার পর বাঙালীর ছেলেরা যে প্রত্যেকেই জীবনানন্দ দাস হয় একথা আমি বিশ্বাস করি। তখন তারা বেশ কাব্য করে 'ফরগেট মি নট' প্যাডের পাতায় বৌকে দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র লেখে। মিষ্টি উত্তরও তারা পায়। কিন্তু দুচার বছর পরেই পোস্টকার্ডে চিঠি যায়--'তোমার চিঠি পেলাম। তোমার হাতে যে টাকা নেই তা আমি বুঝতেই পারছিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই টাকা পাঠাচ্ছি। খোকার দুধের রোজটা বন্ধ করো না। আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহে গিয়েই টাকাটা দিয়ে দেব একথা শ্যাম ঘোষকে (দুধওয়ালা) বলো। অরুণকে দিয়ে (পাশের বাড়ীর ছেলে) খোকার কাশির ওষুধটা আনিয়ে নিও। ছেলে-মেয়েরা কেমন থাকে জানিও। ইত্যাদি ইত্যাদি।'

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বাঙালীর প্রথম পরিচয় বর্ণপরিচয়ের লাল মলাটের (আজকাল প্রচ্ছদপট বলতে হয়) চেয়ারে বসা ছবি দেখেই হত। আজকাল অবশ্য হয় ক্লাস ফোরে উঠে কিশলয়ের গল্পে। যাই হোক সেই বিদ্যাসাগরের উপর গবেষণা করে বাঙালীর ছেলেরা প্রয়োজনে ডকটরেট পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে' শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা স্মরণোৎসবের আয়োজনও করতে পারে। খুব বেকায়দায় পড়লে তাঁর জীবনী সম্পর্কে দুচার কথা বলতেও রাজী হবে। কিন্তু বিধবা বিয়েতে যে তারা কিছুতেই রাজী হবে না এ কথা জানলে বোধহয় ঈশ্বরচন্দ্র অত পরিশ্রম করে শরীর নষ্ট করতেন না। বিধবা বিয়ে না করলেও বাঙালীর ছেলেরা বিপত্নীক থাকে না। তারা জানে ভাগ্যবানের বৌ মরে আর অভাগার ঘোড়া মরে।

...বিপত্নীক থাকে না

আর একটা ব্যাপারে বাঙালীর সিংহ-ভাগ বসানো বড়ই দুষ্টিকটু। সেইজন্যে অনেকে মনে মনে বাঙালীর উপর চটা। ৪৬ কোটী ভারতবাসীর জন্যে মাত্র ৩৩ কোটী দেবদেবী বরাদ্দ। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম-বঙ্গকে আর কতই বা দেবেন? বড়জোর এক কোটী মিলতে পারে। কিন্তু বিপদে পড়লেই বাঙালী ৩৩ কোটী দেবদেবীকে ডাকতে আরম্ভ করে। সে ডাক শুনে তাঁরা আসুন আর নাই আসুন এবং তাঁদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ থাক আর নাই থাক তাতে বাঙালী কনভেনশনের কিছু এসে যায় না। কারণ বিশ্বকবির কথা তো আর ফেলনা নয়! যদি ডাক শুনে কেউ নাও আসে তবে একলা যেতে হবে। অর্থাৎ তাঁদের ডেকে যেতে হবে।

আর বেশী লিখে জায়গা নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কারণ ক্ষেপণাস্ত্র-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের যুগে কেউই আমার দীর্ঘ বক্তব্য পড়বেন না। আবার বর্তমানে নিউজপ্রিন্টেরও বড় অভাব। তবে একথা বলা দরকার যে বাঙালী-বিদ্বেষ আমার মোটেই নেই। আমার বহু বন্ধু বাঙালী। মোচারঘণ্ট আর সজনে-ফুলের চচ্চড়ি আমি বাঙালী বাড়ী ছাড়া পাব না জানি। শুক্তোর আস্বাদও কোন অবাঙালীকে বোঝান যাবে না।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম শেষ করবোও তাই দিয়ে। খাঁটি ঘি (অগ-মার্কা থাকলেও) বাজারে এখন মেলে না। খাঁটি বাঙালীও পাওয়া যায় না। কিন্তু বাজারে এখনও ঘি বিক্রী হয় এবং বাংলা-দেশে বাঙালীও পাওয়া যায়।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩

শৈলেশ্বরের অর্থগৃধ্নুতা ছাড়া এই আচরণের আর কোন অর্থ আমি খুঁজে পাইনি কোনোদিন। বাড়ি ফিরে ঝিমধরা মাথায় আমার একথাই মনে হলো, শ্বশুরবাড়ির কাছে নিজেকে যোগ্যতর রাখার জন্যই সে ঐ নিরপরাধ মেয়েটির এই সর্বনাশ করেছে। আমি বোধহয় বিনাসর্তে বিনা পণে তাদের মেয়েকে গ্রহণ করতে চেয়েই তার মনে প্রথম বিষ ছড়িয়েছিলাম। এক জামাই অমন মুচড়ে নিংড়ে নিলে, তার পাশে তারই সমান যোগ্য আর একজন যদি কিছুই না চায়, অবধারিতভাবে তার আসন অনেকটা উঁচুতে উঠে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তার উপরে শৈলেশ্বর জানে মানুষ হিসেবে আমি তার চেয়ে অনেক বড়ো, আমার মন তার মনের মতো স্বার্থান্বেষী নয়, আমার হৃদয়ে তার মতো প্রতিহিংসার কালিমা নেই, আমি পৃথিবীটাকে সরল চোখে দেখি, সহজ হৃদয়ে মানুষকে ভালোবাসতে পারি, কাছে টানতে পারি। আমাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে ঢুকোনো মানেই তার নিজের মর্যাদাকে, আর একাধিপত্যকে ক্ষুণ্ণ করা। কিন্তু আমাকে না হয় কাঁটার মতো সরিয়েই দিল, তার বদলে এই সর্বনাশ সে করতে গেল কেন? বড়োলোকের অপদার্থ পুত্রটির কাছ থেকে কি সে ঘুষ নিয়েছিলো, সুন্দরী মেয়েটিকে ভোগ করতে দিয়ে? না কি সেখানেও সেই অপদার্থের তুলনায় নিজেকে তুলে ধরাই তার আসল উদ্দেশ্য? কী? কোনটা?

হাত মুঠো ক'রে মিথ্যে আস্ফালনে ঘরময় ঘুরে বেড়ালাম আমি, আমার ইচ্ছে করছিলো শয়তানটাকে যেখান থেকে পারি টেনে এনে তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দি। আমার রাগ দমকে দমকে ফুটে উঠতে লাগলো। সব কিছুর শেষে বিছানায় মুখ লুকিয়ে আবার আমি আরেকবার বালকের তপ্ত চোখের জলে ভেসে গেলাম।

হাজার হোক শৈলেশ্বর বৌদির স্বামী, বৌদির লক্ষ্মীর মতো মুখে, কপালের ঐ লাল টিপটি শৈলেশ্বরেরই আয়ুর প্রতীক। আমি তার ক্ষতি করতে পারি না।

কিন্তু আসলে তা নয়, আসলে আমরা ভীরু, কাপুরুষ। শিক্ষাই আমাদের পঙ্গু ক'রে ফেলেছে। হাজার অপরাধ করলেও রেগে গিয়ে আমরা কারোকে হত্যা করতে পারি না, প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে নখে দাঁতে ছিঁড়ে ফেলতে পারি না। এরই নাম সভ্যতার সংকট।

নইলে যে আমাকে জীবন থেকে বঞ্চিত করলো, যৌবন থেকে উচ্ছেদ করলো, আমাকে মিথ্যার ফাঁদে জড়িয়ে মৃত্যুর দরজায় নিয়ে গিয়ে নরকে নিক্ষেপ করলো তাকেও কী ক'রে আমি ক্ষমা করলাম? শুধু ক্ষমাই নয়, বর্জনও করতে পারলাম না।

ছ' মাস পরে বিপন্ন হ'য়ে আবার বৌদি আমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন, আবার আমি ছুটে গিয়েছিলাম, তিনি হাত ধ'রে কেঁদে বলেছিলেন, 'আমি জানি আমার স্বামীর অপরাধের কোনো সীমা নেই, তবু আমি তাঁকে ভালোবাসি। প্রশান্তবাবু, আপনি আমার দিকে তাকিয়ে তাঁকে বাঁচান।'

টাইফয়েড হয়েছিলো শৈলেশ্বরের। তখনকার দিনে টাইফয়েড যমের দরজা খুলে এসে দাঁড়াতো। কোনো চিকিৎসাই ছিলো না। পুরো পঁয়তাল্লিশ দিন আমি নাওয়া খাওয়া উপার্জন সব ভুলে অক্লান্ত যত্নে অক্লান্ত পরিচর্যায় আর পর্যবেক্ষণে তাকে ভালো ক'রে তুলেছিলাম। আমি বৌদিকে বলতে পারিনি এই পাপীর মৃত্যুই শ্রেয়, এই বিশ্বাসঘাতক মিথ্যাবাদী বন্ধুকে অসুধের বদলে বিষ খাইয়ে মারতে পারলে তবেই আমার হৃদয়-জ্বালা জুড়োবে। হতভাগ্য আমি!

আর তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় বৌদির দরজায় হাত রেখে ক্লান্ত বিষণ্ণ বিধুর একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পাঁচ বছর আগে তেরোদিনের দেখা মেয়েটিকে চিনতে আমার একপলক দেরি হ'লো না। আমি যেমন গিয়েছিলাম, তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

বলাই বাহুল্য বৌদি আমাকে অনেকবার ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলেন, অনেকবার 'কথা আছে' বলে চিঠি লিখেছিলেন, নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আমি যাইনি। আমি যেতে পারিনি। দিদির কাছে বেড়াতে আসা দুঃখিনী সান্ত্বনার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে পারিনি আমি। আমি সান্ত্বনাকে কী রকম ভালোবেসেছিলাম তা আমি জানি না, সান্ত্বনা আমার জীবনের প্রতীক

ছিলো, আমার স্বপ্ন ছিলো, কল্পনা ছিলো। তাকে হারিয়ে আমি আমার যৌবনের বেগ হারিয়ে ফেলেছিলাম, ইচ্ছের জোর হারিয়ে ফেলেছিলাম, কোনো মেয়ের উপর দুর্বল হবার স্বাভাবিক ক্ষমতাও আমার নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিলো। তাই আর গরজ ক'রে বিয়ে করা হ'লো না জীবনে।

কিন্তু সান্ত্বনাই একদিন এলো। আমার মাসী বাড়ি ছিলেন না, আমি আমার ঘরে বসে কাজ করছিলাম, দরজায় টোকা দিল সে। দরজা খুলে আমি রুদ্ধশ্বাস হ'লাম।

একটু হেসে বললো, 'বোধহয় চিনতে পারেননি।'

'পারিনি।' ঢোক গিললাম আমি। একটা সাদা সবুজ পাড়ের শাড়ি পরেছিলো সে, লাল একটা ব্লাউজ, হাতে একজোড়া বালা। এই তার আভরণ। মুখের দিকে আমি অপলকে তাকিয়ে রইলাম। কী সুন্দর সান্ত্বনা।

'ধুলো-পায়েই তাড়িয়ে দেবেন বোধহয়, কিন্তু আমি যাবো না। আমার দরকার আছে আপনার সঙ্গে।'

অবাক হ'য়ে পর্দাটা তুলে ধ'রে আমি তাকে ঘরে নিয়ে এলাম। চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বোসো।'

সে বসলো। সহজ গলায় বললো, 'কাজ করছিলেন?'

বললাম, 'কাজই আমার বেঁচে থাকার উৎস।'

'হ্যাঁ শুনেছি, আসল উৎস এখনো গৃহে আলো করেন নি। আপনার মাসীমা এই মুহূর্তে আমাদের ওখানে। তিনি আপনার জন্য আমার দিদিকে ভালো পাত্রী খুঁজে দিতে বলছিলেন। আমাকেও বলেছেন, আমি বলেছি দেব।'

তার মানে মাসীমা নেই একথা জেনেই এসেছে সে। একা পাবার জন্যই চলে এসেছে। কেন? বুকটা লাফাতে লাগলো।

আমি তার চোখে তাকিয়ে দেখলাম, শাণিত ছুরির ধার, দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বললুম, 'ভালো আছ?'

'খুব।'

'বাড়ি চিনতে অসুবিধে হ'লো না?'

'বিখ্যাত মানুষের বাড়ি, অসুবিধে কী। আর অসুবিধে হ'লেও আমি আসতাম।'

'তা হ'লে একেবারে ভুলে যাওনি?'

অস্ফুট হাসলো সান্ত্বনা, শত্রুকে ভুলে যাব? না, ততো মেরুদণ্ডহীন নই।'

'সান্ত্বনা!'

'আপনি দিদির ওখানে যান না কেন? আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবার ভয়ে?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'লজ্জা?'

'লজ্জা কিসের?'

'তবে কেন যান না?'

কথা ঘুরিয়ে বললাম, 'শৈলেশ্বর উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে?'

'গিয়েই দেখতে পারেন।'

'একাই এলে?'

'দু'জন কোথায় পাবো?'

'রোদে কষ্ট হ'য়েছে হয়তো—'

'রোদের তাপ আমার সয়।'

'সান্ত্বনা—'

'আমি একজনের স্ত্রী, আমাকে কি নাম ধ'রে ডাকা উচিত?'

'যা উচিত নয়, এতোদিন ধ'রে তো তাই হ'য়ে এলো।'

'তা বলে কি সারাজীবনই তার জের টানতে হবে?'

'তা হ'লে তোমাকে তুমি বলাও তো আমার অন্যায়।'

'আমার তো যতোদূর মনে পড়ে দিদির বিয়ের সময় আপনি আমাকে আপনিই বলতেন।'

'আমারও মনে পড়ছে চিঠিতে তুমি আমাকে শেষের দিকে তুমি সম্বোধন করতে।'

'চিঠি!' সান্ত্বনা এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে তাকালো যেন ভারি অবাক হয়ে গেছে শব্দটা শুনে।

আমি বললাম, 'জানি সবই তুমি ভুলে গেছ।'

সান্ত্বনা চোখ নামিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। আস্তে বললো, 'হ্যাঁ ভুলের মাশুল আমি অনেক দিয়েছি,
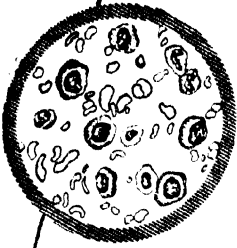
এবার সেই ভারটা নামিয়ে রাখতেই এসেছি।' হাত-ব্যাগ থেকে রঙিন ফিতে বাঁধা একতাড়া সযত্নরক্ষিত চিঠি বার ক'রে বিষণ্ণরেখায় হাসলো সে, 'এগুলো রেখে দিন, আমিও লাঘব হই, আপনারও একটু আত্মবিশ্লেষণ হোক।'

চিঠিগুলো সে আমার টেবিলের উপরে রাখলো।

তাকিয়ে দেখলাম আমি। আমার এক বছরের হৃদয়-নিংড়োনো ভালো-বাসার উত্তাপ। আমি অনুভব করলাম সে উত্তাপ এখনো থর থর ক'রে কাঁপছে আমার বুকের মধ্যে।

বললাম, 'ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

'বোঝা ব'য়ে লাভ কী?'

'এতোই যদি বোঝা পুড়িয়ে দিলে না কেন?'

'পারিনি যে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

'ফিরিয়ে দেয়ার চাইতে কি সেটা ভালো ছিলো না?'

'বেশ তো নিজেই পুড়িয়ে দিন না।'

'মৃত্যুর পরেই দাহ করবার নিয়ম। যা আমার কাছে একটা তাজা হৃৎপিন্ড, যা আমার জীবনে একমাত্র সত্য তা অন্যে নষ্ট করলে আমার হাত নেই, কিন্তু আমি নষ্ট করতে পারি না।'

'কী!'

'সান্ত্বনা, ঐ চিঠির যে আজ আর কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে তা আমি জানি, কিন্তু আমি তো সেই সত্যকে মুছে ফেলতে পারি না।'

কালো চোখে টলটলে দু'চামচে জল নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো সান্ত্বনা, কিছু বললো না।

চোখে চোখ রেখে আমি বললাম, 'তুমি বিয়ে করেছ, স্বামী পেয়েছ, সংসার পেয়েছে, হয়তো তোমার আগুন নিবে গেছে, কিন্তু আমি জ্বলছি, আজো জ্বলছি। সারা জীবন জ্বলতে হবে আমাকে।'

হঠাৎ সান্ত্বনার জলভরা চোখ বিদ্রূপে ঝলসে উঠলো, নড়েচড়ে নিজের দুর্বলতাকে সে কঠিন ক'রে নিয়ে বললো, 'সত্যি আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা।'

'অভিনয়!' দু'হাতে আমি কপাল চাপড়ালাম, 'যার অভিনয়ে আজ আমার সব কিছু ব্যর্থ হ'য়ে গেল তাকে তোমরা বলতে পার না কিছু?'

আমার অধীরতা লক্ষ্য ক'রে সান্ত্বনার ভঙ্গি বদলালো, তাকিয়ে থেকে কেমন অদ্ভুত গলায় প্রায় ষড়যন্ত্রীর মতো ফিস ফিস করলো সে, 'কার কথা বলছেন?'

'জানো না, বোঝো না?' আমি প্রায় হাঁপাচ্ছিলাম।

হাতের সঙ্গে হাত শক্ত করলো সান্ত্বনা, তার কঠোর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আসন্ন ঝড়ের সংকেত দেখতে পেলুম। গলার স্বরে সে একটুও উত্তেজনা প্রকাশ না ক'রে ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'সে কি শৈলেশ্বর মল্লিক?'

নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমি সতর্ক হ'য়ে গেলাম। আমার বৌদিকে মনে পড়ে গেল, স্বামীর জন্য তাঁর করুণাভরা বিশ্বস্ত দুই চোখের উদ্বেল ব্যাকুলতা আমি যেন প্রত্যক্ষ করলুম। নিজের বেদনা ভুলে বৌদির সংসারের আগুনকে চাপা দিতেই উৎসুক হ'য়ে উঠলুম বেশী। নিজেকে সংযত ক'রে বললুম, 'ওসব কথা থাক সান্ত্বনা, অন্য কথা বলো?'

'অন্য কথা বলতে আমি আসিনি, আমি যা অনুমান করেছিলুম তার সত্যাসত্য যাচাই করতেই আসা আমার। আমার সব কথা জানা দরকার।'

'জেনে তুমি কী করবে?'

'শৈলেশ্বর মল্লিককে বুঝিয়ে দেব সব পাপেরই শাস্তি আছে।'

'শোনো, তুমি শান্ত হও, আমার ভাগ্যই আমাকে ভিখিরি করেছে, এর-জন্য কেউ দায়ী নয়।'

'ভাগ্যের দোহাই এ দু'বছর অনেক শুনেছি। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন।'

'বলবার কিছু নেই।'

'কিছুই নেই?'

'না।'

'নিজেরও কোনো কৈফিয়ৎ নেই?'

'তা আছে।'

'আমি সেটাও শুনতে চাই।'

'আমার একটাই শুধু বলবার কথা, দু'বছর আগে যে একাগ্রতা নিয়ে যে সততা আর যে প্রেম নিয়ে আমি একজন মানুষকে প্রার্থনা করেছিলাম, জানি সেই প্রার্থনা আমার আর পূরণ হবার নয়, তবু সেই থেকে আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত তা ছাড়া ঈশ্বরের কাছে আর আমার কিছু চাইবার নেই। আমি যশ চাই না, অর্থ চাই না, মান সম্মান প্রতি-পত্তি একপলকে ছেড়ে দিতে রাজী আছি যদি আমার সেই প্রার্থনা কখনো পূরণ হয়।'

দু'হাতে মুখ ঢাকলো সান্ত্বনা। সে কাঁদতে লাগলো। কান্নার দমকে তার সুগঠিত পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। আমি কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়েই রইলাম। ভেবে পেলাম না কী করবো, কী বলবো। বর্ষায় ধোয়া সকালের টগরফুলের মতো মুখটা তুলে ধরলো সে, রুদ্ধস্বরে বললো, 'যদি তাই হবে তবে কেন ওরকম সব অপ-মানকর কথা বলে পাঠিয়েছিলেন, কেন তবে নিজে—নিজে নিজে—কেন এক-বার—' আবার মুখ ঢাকলো সে।

'অপমান!'

'আপনি বলেছিলেন আমার মতো গায়ে-পড়া মেয়েদের এভাবেই শিক্ষা দিতে হয়।'

'আমি এসব বলেছিলাম!'

'হ্যাঁ, আপনি, আপনি, আপনি। আপনি আমার ভগ্নীপতির কাছে কী না বলেছেন আমাকে নিয়ে। আর সেই থেকেই তো তাঁর সঙ্গে আপনার মনোমালিন্য।'

'শৈলেশ্বর এইসব ব'লেছে?' আমার গলার স্বর শক্ত হয়ে উঠলো।

'তবে কি সে মিথ্যা বলেছে?'
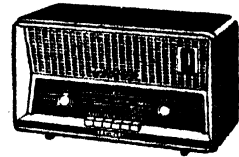
'শোনো সান্ত্বনা, কে মিথ্যাবাদী আর কে নয় তা নিয়ে আজ আর আমি তর্ক করবো না। শুধু জেনে রেখো তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম, এবং একজন মেয়েকে ভালোবাসলে তার যে পরিণতির জন্য মন উন্মুখ থাকে স্বাভাবিক নিয়মেই সেটা আমার ছিলো এবং তা আমি শৈলেশ্বরকে জানিয়েছিলাম। আমি জানতাম সে তোমাদের আপন লোক, আমারও বন্ধু, যা করবার, যা বলবার তাঁর দ্বারাই সেটা সহজ এবং শোভন ভাবে হ'তে পারবে। কিন্তু শৈলেশ্বর আমাকে জানিয়েছিলো আমি ডাক্তার, আমার চরিত্রের উপর তোমাদের বিশ্বাস নেই, তা ছাড়া—'

'কী! কী! তা ছাড়া কী!' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে প্রায় রক্ত বার করে ফেললো সান্ত্বনা।

'না তা নেই, কিন্তু তবু শৈলেশ্বরবাবুকে যা বলবার তা বলবো, আমার মা-বাবার ভুল ধারণা আমি সংশোধন করবো। উনি তো শুধু আমারই ক্ষতি করেন নি, আমাদের সমস্ত পরিবারের শান্তি অপহরণ করেছেন।'

'শোনো সান্ত্বনা—'

'তাতে যদি দিদির কোনো ক্ষতি হয় আমি কিছু করতে পারি না।'

'সান্ত্বনা' আমি তার হাত ধরলাম। এই প্রথম আমি আমার প্রেমিকাকে স্পর্শ ক'রে জ্বলে উঠলাম বাসনায়। ভুলে গেলাম সে অন্যলোকের স্ত্রী, ভুলে গেলাম তার এই হাত আর একজনের পাণিপীড়নে অভ্যস্ত, ভুলে গেলাম তার হাত আমার তৃষিত বুকে স্থাপনের

সারা জীবন জ্বলতে হবে আমাকে

জন্য নয়। আমি অসংগত আবেগে তাকে আমার দিকে আকর্ষণ করলাম, নিচু হয়ে চুম্বন ক'রে বললাম, 'এর চেয়ে বড়ো সত্য আর আমার জীবনে কিছু নেই।'

আমার লজ্জা করছিলো না, তাকে চুম্বন করার মধ্যে আমি কোনো অন্যায় দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমি জেনেছিলাম এ আমারই ন্যায্য অধিকার। আর তার স্বামী নামে যে মানুষটার অস্তিত্ব আমার আর তার মধ্যে বিশাল পর্বত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই এখানে অপহারক। লোকাচার দেশাচার এসবের কোনো অর্থ ছিলো না আমার কাছে। আমি কোনো সংস্কার মেনে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমি যাকে ভালোবাসি, যদি সে-ও আমাকে ভালোবাসে তা হ'লে মিলনের সেটাই সবচেয়ে বড়ো মন্ত্র, বড়ো অধিকার বলে মনে হচ্ছিলো আমার।

'না, কিছু না।' আমি আবার সংযত হ'লাম।

'আপনি সে সব বিশ্বাস করেছিলেন কেন? কেন নিজে যাননি। কেন একটা চিঠি লেখেননি?'

'চিঠি লেখার জন্যই নাকি তোমার বাবা সবচেয়ে বেশী রাগ করেছিলেন, তাই—'

'মিথ্যাবাদী!'

'সান্ত্বনা, আমি সেই সময়ে বেঁচে ছিলাম না, হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে ভেবেছিলাম যেন চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়তে পারি।'

শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সান্ত্বনা। আমি শান্ত হ'য়ে বললাম, 'কিন্তু একটা কথা, যা হবার হ'য়ে গেছে। তোমার দিদি যেন কষ্ট না পান, তার সংসারে তুমি ফাটল ধরিও না। তাঁর তো কোনো অপরাধ নেই?'

আমি সেদিন তাকে সেই কথাই বোঝালাম। একটা মিথ্যাকে সম্বল ক'রে কেন আমরা সারা জীবন বঞ্চিত থাকবো? আমি সমাজ মানি না, সংসার মানি না, যা আমার একমাত্র সম্পদ সে তুমি। আমি তোমাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো, পালিয়ে যাবো দেশ থেকে, সব, সব আমি ছাড়বো তোমার জন্য।

চুপ ক'রে সব শুনলো। তারপর এক সময় উঠে চলে গেল। শুনেছিলাম সেই রাত্রেই সে চলে গেছে তার মা-বাবার কাছে, পরে এ-ও শুনেছিলাম, স্বামীর ঘর আর করেনি সে। স্বামী ছ'মাস পরে আবার বিয়ে করেছিলো।

সান্ত্বনার সাহস ছিলো না তা আমার মনে হয় না। আমার সঙ্গে গৃহত্যাগ করার প্রধান অন্তরায় বোধহয় তার কাছে আমিই ছিলাম। আমাকে সে অনিশ্চিত জীবনে নিতে চায়নি, আমার প্রতিষ্ঠিত যশ এবং অর্থ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে তার মন ওঠেনি। আমার মঙ্গল চেয়েছিলো সে। ভেবেছিলো আমি তাকে কোনো একদিন ভুলে যাবো, কোনো একদিন আর একজন এসে তার শূন্যতা ভরিয়ে দেবে। তা কি হলো? হলো না, হলো না। অনেক পেয়েও ঐ এক ফোঁটার জন্য সমস্ত আমার বিস্বাদ হ'য়ে থাকলো সংসারে।

খুব ভুল করেছিলো সান্ত্বনা! আমিও কম ভুল করিনি। আমার উচিত ছিলো সেদিনই তাকে আটকানো। যা মূল্যবান তাকে এমনি দস্যু হ'য়েই অর্জন করতে হয়। কিন্তু সে বুদ্ধি আমার তখন ছিলো না। আমি হেরে গিয়েছিলাম। ভাগ্যের কাছেও হেরে গিয়েছিলাম, শৈলেশ্বরের কাছেও হেরে গিয়েছিলাম। আর সবচেয়ে বেশী হেরেছিলাম আমার পেশার কাছে।

কেননা আমাকে আরো বহুবার ডাক্তারী করতে শৈলেশ্বরের বাড়িতে যেতে হ'য়েছিলো, শেষে বৌদির মধ্যেই আমি আমার বেদনার শান্তি দেখতে পেয়েছিলাম। বৌদির মেয়ে মল্লিকা আমাকে সব ভুলিয়ে তাদের বাড়ির দৈনন্দিন অতিথিতে পরিণত করেছিলো। নতুন ক'রে ঐ ছোট মেয়েটা আমাকে মায়ার ডোরে বেঁধেছিলো।

বছর চারেক পরে দ্বিতীয় সন্তান হ'তে মারা গেলেন বৌদি, আমার সব বন্ধন ছিঁড়ে গেল। আমি ঐ মাতৃহীন ছোট মেয়েটাকে আর সইতে পারছিলাম না। শৈলেশ্বর এতো হৃদয়হীন, ছ'মাসের মধ্যেই তাঁর লক্ষ্মীর মতো স্ত্রীকে ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে ক'রে এলো, ভূপেন এসে নিয়ে গেলো তার ভাগ্নীকে। (ক্রমশঃ)

কলারসিক

শিল্পী জাহাঙ্গীর সাবাওয়ালার চিত্র-প্রদর্শনী

বোম্বের প্রখ্যাত শিল্পী জাহাঙ্গীর সাবাওয়ালা ইতিপূর্বে কলকাতার কোন কোন সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীতে যোগদান করলেও সম্ভবতঃ কলকাতায় এই সর্বপ্রথম তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। অশোকা গ্যালারীর কর্তৃপক্ষকে এজন্য আমরা অভিনন্দন জানাই।

শিল্পী সাবাওয়ালা ইংলন্ড, ফ্রান্স ও ইতালীতে দীর্ঘকাল ধরে আধুনিক শিল্পকলা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে এসেছেন। তাঁর চেতনায় ইউরোপীয় 'কিউবিজম' এবং 'ইম্প্রেশানিজমে'র প্রাধান্য তাই খুব স্বাভাবিক ঘটনা। অশোকা গ্যালারীতে প্রদর্শিত ১৮ খানি চিত্রের মধ্যেও তাঁর এই চেতনাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি।

তিনি তাঁর চিত্রের জ্যামিতিক পদ্ধতিকে সোসাসুজি প্রয়োগ না করে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় একটু বৈশ্লেষিক ভঙ্গিতে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে, চিত্রের সংস্থাপন যেমন দৃঢ়বদ্ধ চেতনাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছে তেমনি উজ্জ্বল রঙের বর্ণ-বিভঙ্গেও চিত্রে এক দ্যুতিময় জগতের প্রকাশ ঘটেছে। আর, মূলত কিউবিজমের অনুসারী হলেও শিল্পী সাবাওয়ালা এইভাবে তাঁর চিত্রে ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছেন।

জ্যামিতিক প্যাটার্ণে গাঢ় নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, মেটে ও ধূসর রঙের বৈপরীত্যে 'ম্যারাইন এনকাউণ্টার' (১) চিত্রে যে ঔজ্জ্বল্য ও ছন্দময়তা সৃষ্টি করতে শিল্পী সক্ষম হয়েছেন তা তাঁর দক্ষতার পরিচায়ক। অনুরূপ শিল্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষরে তাঁর 'দি বিচড্ বোটস' (১৫) ও 'দি টেম্পেস্ট' চিত্র-দুটিও স্মরণীয়।

শিল্পী : জাহাঙ্গীর সাবাওয়ালা

সম্পূর্ণ কিউবিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্র হল 'স্টিল লাইফ উইথ বোটলস' (৪)। কোন কোন চিত্রে স্থাপত্য-রীতিকেও গ্রহণ করেছেন শিল্পী। তাঁর 'পেরিনিয়াল ডন' (৫) কিংবা 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ' চিত্র দুটিতে স্থাপত্যরীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রদর্শনীর 'সাঁটী' (১২) চিত্রখানি ইম্প্রেসানিস্টিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত হলেও বাস্তবধর্মী চেতনার নিকটবর্তী। রঙে আর রেখায় অন্যান্য চিত্র থেকে এটি যে ব্যতিক্রম তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

আর্ট কাউন্সিলের সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনী

নবগঠিত 'আর্ট কাউন্সিল'-এর সম্মিলিত চিত্র-প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার মুষ্টিমেয় শিল্পী-সংস্থার সঙ্গে আর একটি শিল্পী-সংস্থার নাম যুক্ত হল।

বর্তমান বাংলার তরুণ শিল্পীরা বিমূর্ত শিল্প-চর্চার নামে অনেকে যে-ভাবে উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন 'আর্ট কাউন্সিল'-এর শিল্পী-সভ্যেরা তার মধ্যে শিল্পের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করতে না পেরে মূলতঃ বিমূর্ত শিল্প-চর্চার ভঙ্গী-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তাঁদের শিল্প-বক্তব্য নিবেদন করার জন্যই নাকি এই সংস্থা গঠন করেছেন। এই সংস্থার জনৈক মুখপাত্র স্পষ্টভাবেই বললেন : 'আমরা বক্তব্যহীন শিল্পে বিশ্বাসী নই। শিল্পের মাধ্যমে আধুনিক জীবন ও জগতকে প্রকাশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আমরা বিষয়বস্তু অনুযায়ী আঙ্গিক গ্রহণে ইচ্ছুক।'

আলোচ্য প্রদর্শনীতে উপরোক্ত বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে শিল্পীরা যে রক্ষা করতে পেরেছেন এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ শিল্পী সুকুমার দাসের ৮খানি চিত্রের মধ্যে ছয়খানিতে আঙ্গিক-প্রধান বিমূর্ত চেতনারই প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'কেদারনাথ' (৬০ ও ৬৩) চিত্র দুখানিতে যে চমৎকার বাস্তববোধ, নিপুণ ড্রয়িং ও কম্পোজিশন এবং অপূর্ব রঙ-প্রয়োগের

দক্ষতা বিদ্যমান তাতে তাঁর বিমূর্ত চেতনার অন্য চিত্রগুলি ম্লান হয়ে যায়।

এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য নয়জন শিল্পী মোটামুটি তাঁদের নীতিকে শিল্প-মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য শিল্পী অজয় মুখার্জি'রও প্রবণতা বিমূর্ততার দিকে। কিন্তু তাঁর বিমূর্ত-চেতনা 'কিউবিজম'-এর মধ্য দিয়ে প্রকাশমান। জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত তাঁর চিত্র উজ্জ্বল বর্ণ-সম্পাতে দৃষ্টিসুখকর এবং আমাদের বাস্তব-চেতনার কাছাকাছি।

শিল্পী : অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

শিল্পী অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর চিত্রকলার মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার মৌলগুণ এবং আধুনিক মনের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর 'অভিসারিকা' (৯) ও 'নববনায়িকা' (১৬) চিত্র দুখানি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অবশ্য তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'পরিবার' (১৮) জ্যামিতিক রেখায় বিধৃত বিমূর্ত চিত্রকলারই অন্য এক রূপ। জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'সভ্যতার অভিশাপ' (১৪) চিত্র রঙে, ছন্দময় রেখায় এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সুন্দর।
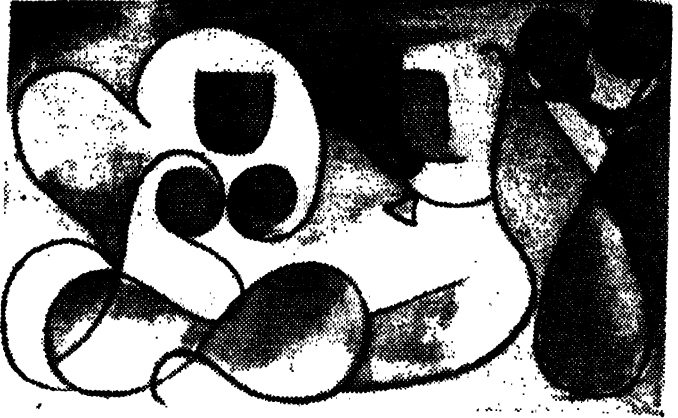
শিল্পী গণেশ হালই-এর মাত্র দুখানি চিত্র ছিল এই প্রদর্শনীতে। এই দুখানা চিত্রেই তিনি যে জলরঙের কাজে বিশেষ নিপুণ শিল্পী—এ-কথা প্রমাণ করেছেন।

শিল্পী রমেন কুণ্ডুর কাজ মন্দ নয়। বিশেষ করে কাগজ ভিজিয়ে তার উপর জলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'শান্ত সন্ধ্যা' (৩৭) ও 'উপত্যকায় মেঘ' (৩৮) চিত্র দুখানিতে নীল রঙের এমন একটি এফেক্ট সৃষ্টি করা হয়েছে যা মনোমুগ্ধকর। তাঁর তৈলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত ৪৩ ও ৪৪ নং চিত্র দুখানিও চিত্রসংস্থাপনের কৌশলে ও রঙ-প্রয়োগের দক্ষতায় সুন্দর।

শিল্পী : সুভাষ সিংহ রায়

শিল্পী সুভাষ সিংহরায় এই প্রদর্শনীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শিল্পী। এঁর কাজের মধ্যে স্বকীয়তা আছে। তাঁর তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত 'ভোরের বিচরণ' (৫৩) চিত্রখানি নিঃসন্দেহে এই প্রদর্শনীর সুন্দরতম চিত্র। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে 'অভাগার স্বর্গ' (৪৯) 'নষ্টচন্দ্র' (৫৪) ও 'রৌদ্রোজ্জ্বল তীর' (৫৮) চিত্র-বক্তব্যে এবং আঙ্গিক দক্ষতায় দর্শক-মন খুশি করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভাস্কর-শিল্পী হারান ঘোষের চৌদ্দটি ভাস্কর্যকলার নিদর্শন এই প্রদর্শনীর অন্যতম সম্পদ। দারু, প্রস্তর ও প্লাস্টারের ভাস্কর্যশিল্পগুলির মধ্যে 'লাজুক' (২৯) ও 'শান্তির প্রতীক' (৩০) নিঃসন্দেহে স্মরণীয় সৃষ্টি। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মনোরঞ্জন ঠাকুরের স্কেচ, শম্ভুনাথ শীলের 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' (৪৭) ও শিশুরঞ্জন দাশের অজান্তা গুহার একটি প্রতিলিপি প্রশংসনীয় কাজ।

আমরা এই নবগঠিত শিল্পী সংস্থাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

মায়া মুকুর

বিনতা রায়

পরিবার এবং ছেলে দেখে সে ইচ্ছা দমন ক'রে সাগ্রহেই ওই বয়সের মেয়ের বিয়েতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

প্রদীপনারায়ণ শুধু উচ্চশিক্ষিতই নয়, আজ বয়স চল্লিশের কোটা পেরিয়েছে বছর তিনেক হ'ল, এখনও কাজের বাইরে বই-ই তার সঙ্গী।

হ্যাঁ, কাজ করে প্রদীপ। প্রয়োজন না

চাবির গোছাটা কপালে লাগলে আঘাত কতটা হ'ত বলা যায় না, তবে তা না হ'য়ে পুরু পেবল্‌স্‌-এর চশমার ডানদিকের ডাঁটিটায় লেগে চশমাটা মার্বেল মেঝের ওপর পড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল কাঁচ দুখানা। আর অস্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ-নারায়ণ।

প্রদীপনারায়ণ চৌধুরী। বংশ-পরম্পরায় নীল রক্ত বইছে যার ধমনীতে। আরও কয়েক পুরুষ আলস্যে ধ্বংস করলেও সম্পত্তির অভাব হবে না যার। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, মার্জিত শিক্ষায় অসাধারণ পুরুষ আর ঠিক এই গুণ-গুলোই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তার বিবাহিত জীবনের শনি।

বিয়ে হয়েছিল অল্পবয়সে। এ পরি-বারে যেমন হ'য়ে থাকে। রায়বাহাদুর সোমেন রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা সুজাতার বয়স তখন বছর পনেরো হবে। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী সোমেন রায়। থাকলেও করে। পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হোক সংসারের প্রয়োজনে, ব্যয় হোক্‌ দুই পুত্র আর স্ত্রীর যথেচ্ছ প্রয়োজনে। নিজের যাবতীয় খরচ চলবে নিজস্ব পরিশ্রমের অর্থে। একে নিছক সখ বলে আত্মীয়-বন্ধু উপহাস করতে কসুর করে না। হাসে প্রদীপনারায়ণ, জবাব দেয় না। কথাগুলো কানে পৌঁছয় মাত্র। তার স্থির কর্তব্যকে নাড়াতে পারে এমন সাধ্য বোধকরি কারোই নেই।

পনেরো বছরের মেয়ে সুজাতার পড়ার

আগ্রহ দেখে, ততোধিক আগ্রহে নিজে তাকে পড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ধাপ সাফল্যের সংগে পার করিয়েছে। আজ সুজাতার জীবন সংসারের বাইরের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার আছে নানা জাতের সভা-সমিতি। নিজস্ব পত্রিকা 'চিত্রিতা'র সম্পাদিকা সে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পায় বাড়ীতে বসেই। পত্রিকা চলায় আর অসুবিধা কি? মুঠো-ভ'রে অর্থের বিনিময়ে বেঁধে রেখেছে লেখকগোষ্ঠী। সপ্তাহে একদিন বাড়ীতে ব'সে সাহিত্য-সভা। চা এবং প্রচুর খাদ্য-সম্ভারের সদ্ব্যবহারের সংগে সভা জমে ওঠে। এ ছাড়া এ্যামেচার নাটক-থিয়েটারের একজন মস্ত পৃষ্ঠপোষক সে।

একলা থাকার সময় পায় না সুজাতা। প্রাইভেট সেক্রেটারী মিলন বোসকে সংগে থাকতেই হয়, বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্যে। এ ছাড়া ভক্তবৃন্দেরও অভাব নেই। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়েই আছে তারা। সুজাতার একটু হাসি, দুটো কথায় ধন্য হ'য়ে থাকে তাদের মন। আশ্চর্য এই মিসেস চৌধুরী! সভায় দাঁড়িয়ে পাতলা ধনুকের মতো ঠোঁট দুটিতে সামান্য টান দিয়ে মিষ্টি হেসে যখন বক্তৃতা শুরু করেন, তখন অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে হয়। তারপর কি দরাজ হাত। টাকা থাকলেই মানুষ কখনও এমন দরাজ হয় না। ইনি অসাধারণ।

মানুষ নিয়ে কাজ করতে করতে মানুষের মনগুলো জলের মতো স্বচ্ছ সুজাতার কাছে। কোথায় কতটুকু কৃপা-বর্ষণ করলে কতটা কাজ আদায় হবে, আঙুলের টোকায় কোন্ সভাপতিকে সরিয়ে দিয়ে, সময়ের অভাব সত্ত্বেও আসনটি অলংকৃত ক'রে কৃতার্থ ক'রে দিতে হবে উদ্যোক্তাদের, সব তার নখ-দর্পণে।

কিন্তু এত ক্ষমতা নিয়েও একটি ক্ষেত্রে এসে বার বার চরমভাবে হতাশ হ'তে হয়েছে তাকে। বাইরে যার এত ক্ষমতা, এত প্রতিষ্ঠা, ঘরে এসে সে সমস্তই যেন কেমন তুচ্ছ হ'য়ে যায় একটি মানুষের মুখোমুখী দাঁড়ালে। চূড়ান্ত নৈকট্যের মধ্যেও সুজাতার মনে হয়, প্রদীপের সহজ, সরল, আনন্দময় ব্যবহারের পেছনে যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তার নাগাল সে পায় না। আর এই কারণেই প্রদীপ যত প্রশান্ত আর মনোরম হ'য়ে ওঠে, কি একটা আক্রোশের জ্বালায় ততই বেশী ক'রে জ্বলে উঠতে থাকে সুজাতা। বাইরের ডাকে সাড়া দিয়ে যত বেশী সার্থক হ'য়ে ফেরে, ততই সে যেন অনুভব করে, প্রদীপের মনে নিজস্ব একটা আনন্দ-লোক আছে, যেখানে হাত বাড়িয়ে কিছুতেই যেন তাকে ছুঁতে পারে না সে। আর এ থেকেই ক্রমে ক্রমে বাইরে আর ঘরে মেজাজের প্রচণ্ড একটা ফারাক হ'তে শুরু করে।

প্রদীপকে যেন আজকাল আর সহ্য করতে পারছে না সুজাতা। বিশেষ ক'রে শিক্ষা-সংস্কৃতির নেতা নিরঞ্জন পালের মতো হোমরা-চোমরা একটা লোক যখন আজ তার হাতের ইসারামাত্রে চলছে, প্রদীপ জানে সেটা, তখনও তার এত অহংকার কিসের? কেন সে শুধু হেসে হেসে মার্জিত, ত্রুটিহীন ব্যবহার ক'রে চলবে? একটিবারের জন্যেও তার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে বলবে না—তুমি আশ্চর্য! তোমার ক্ষমতা অসীম! যেমন বলে থাকে আর সবাই?

মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইক সরিয়ে দিয়ে হাজার লোকের সামনে জোরালো কণ্ঠে বক্তৃতা করে সুজাতা। কিন্তু কর্মীদের শত ত্রুটি—মৃদু কণ্ঠে, সহাস্য তিরস্কারে সংশোধন করে যে মেয়ে, তারই সুউচ্চ কণ্ঠে রূঢ় ভাষায় রাতের পর রাত প্রদীপকে জর্জরিত করার চেষ্টার কথা কে ই বা ভাবতে পারে?

এমনি পরিস্থিতিতে চশমাটা খুলে এক হাতে ধ'রে চোখ বুঁজে নিঃশব্দে বসে থাকে প্রদীপ। আর আঘাতগুলো বুমেরাং হ'য়ে ফিরে গিয়ে আরও ক্ষিপ্ত

করে তোলে সুজাতাকে। কখনও বা একটি মাত্র কথা বার হয় প্রদীপের মুখ থেকে—'চিৎকার করো না, আস্তে কথা বল।' চেঁচিয়ে কথা বড় অমার্জিত শোনায় প্রদীপের কানে।

এরই একটা চূড়ান্ত চেহারা নিল সেদিন দুপুরে। সমিতির চাঁদাগুলো দেওয়া হয় প্রদীপের চেক-এ। এ সব ক্ষেত্রে স্বামীর নাম, ঐতিহ্যগত আর্থিক স্ফীতির কথাটা লোকের সামনে বড় ক'রে রাখাটা বিবেচনার কাজ। এবং সুজাতাও এ সুযোগের অপব্যয় করেনি কখনও। বলেছে, 'অমুক জায়গায় মাসে এই অঙ্কের চাঁদা পাঠাতে হবে।'

'বেশ', ডায়রীতে টুকে রাখত প্রদীপ। ব্যস এইটুকুই। এর বেশী বলার দরকার হয় না। ঠিক তারিখে, ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেত টাকা।

কিন্তু সেদিনের ঘটনাটা একটু অন্য-রকম হ'য়ে গেল। বিধবা আশ্রমের চাঁদা পাঠানো হয় মাসের দশ তারিখে। বারোটা দিন পার ক'রে বাইশ তারিখে যখন এই টাকার তাগিদে ফোন এল সুজাতার কাছে, জ্বলে উঠলো সে। ছুটে এসে দাঁড়ালো প্রদীপের সামনে।

'বিধবা আশ্রমের চাঁদাটা পাঠানো হয়নি কেন?' কৈফিয়তের দাবীতে সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়াল সুজাতা।

গত কয়েকদিন যাবৎ স্বাস্থ্যটা ভাল যাচ্ছে না প্রদীপের। মাথার যন্ত্রণা আর জ্বরের একটা ভাব লেগেই আছে। কর্ম-ব্যস্ত সুজাতার সেটা জানার কথা নয়।

বই থেকে মুখ তুলে একটু ক্লান্ত-ভাবেই বলে প্রদীপ, 'ভুলে গিয়েছিলাম, চেকবইটা দাও।'

প্রদীপের ক্লান্তি চোখে পড়ে না সুজাতার। রাগ করতেই চায় সে। সে চায় প্রদীপের যে-কোনো ত্রুটি হাতে-হাতে ধরিয়ে দিতে। তাই দৃষ্টিও তার আচ্ছন্ন। 'এটা ভুল নয়, একে বলে অবহেলা। এই টাকায় কয়েকটি অসহায় মেয়ের দিন চলে, তা তুমি ভাল রকমই জানো। এ শুধু আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা। না হ'লে এতবড় ভুল হয় কি ক'রে?' ক্রমেই গলা চড়তে থাকে সুজাতার।

'চিৎকার করো না, আস্তে কথা বল', কপালটা হাত দিয়ে টিপে ধরে প্রদীপ।

'না, বলব না আস্তে কথা, এই অব-হেলার অপমান শুধু তাদের নয়, আমারও।'

'মান জিনিসটা কাঁচের মতো ঠুনকো নয়, এত সহজে তা যায় না।'

'থাক, আর বক্তৃতা দিতে হবে না তোমাকে। টাকা আমার এ্যাকাউন্ট থেকেই দেব।'

'তাই দিও, কিন্তু আর একটা কথাও নয়।'

'হ্যাঁ বলব, আমার যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ বলব কথা। অন্ততঃ তোমার হুকুমে থামব না।'

'থামবে।' কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রদীপ। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে।

তার ভঙ্গি দেখে আরও উদ্ধত হ'য়ে ওঠে সুজাতা। 'এর মানে কি? কি করতে পারো তুমি?'

'তুমি যতোটা পারো তার এক কণাও আমি পারি না। কিন্তু দরকার বুঝলে তোমার মুখটা চেপে ধরতে পারি।'

'কি, কি বললে তুমি! আমার গায়ে হাত দেবে? জোর ফলাবে আমার ওপর!' ক্ষিপ্তের মতো চাবির গোছাটা ছোঁড়ে সুজাতা, ফলাফল দেখার জন্যে মুহূর্তেও দাঁড়ায় না। যেমন এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কিছুক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, অভ্যস্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে দেওয়ালের গায় বসানো বেল-এর মাঝের সুইচটায় একটানা টিপ দেয় প্রদীপ। তারপর ফিরে এসে শুয়ে পড়ে বিছানায়। ক্লান্ত লাগছে। জীবনে পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে কখনই মাথা ঘামায়নি সে। কিন্তু দিন যতো এগোচ্ছে, একটা অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদ ধীরে ধীরে মনের ওপর যেন চেপে বসতে চাইছে।

বাড়ীর সরকার প্রৌঢ় যদুগোপাল-বাবু এসে দাঁড়ায় দরজায়। 'আমাকে ডাকছিলে বাবা?'

'হ্যাঁ, রঘুকে বলুন ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দেবে। আর চশমার ফ্রেমটা এখনই আমাদের পুরনো দোকানে পেঁছে দিন। সন্ধ্যের মধ্যেই চশমা আমার চাই, প্রেস-কৃপশন ওদের কাছে আছে।'

এরই বেশ কিছুকাল পরের ঘটনা। টকটকে লাল হ'য়ে উঠেছে প্রদীপের ফরসা মুখখানা।

একটিমাত্র ভাই, চরম অপদার্থ, জাগ-তিক সর্বরকম বদ-দোষে আসক্ত, পড়া-শোনার সঙ্গে জন্মগত বিরোধ যার, সেই সন্দীপকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে প্রদীপ। অল্পবয়সে মা মারা গেলে, বাবা যখন চারিদিক থেকে কড়া শাসনে রেখে

ছেলেদের মানুষ করতে চাইলেন, তখন থেকেই সন্দীপ বেপরোয়া। তার বহু রকম বদ-খেয়াল আড়াল ক'রে, তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলাটাই যেন ছিল প্রদীপের কাজ। বাবার মৃত্যুর পর, নিজে খুঁজে দেখে-শুনে অপরূপ সুন্দরী মেয়ে লাবণ্যর সঙ্গে বিয়ে দেয় ভাইয়ের। বহু চেষ্টা করেছে তাকে সুপথে চালানোর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিদারুণ যন্ত্রণার সঙ্গে ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয়েছে তাকে। আশ্চর্য! তবু তার স্নেহ এই ভাইয়ের দিক থেকে কিছুতেই মুখ ফেরাতে পারেনি। সেই ভাই গতকাল মারা গেছে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে।

এই দুঃসংবাদের বাহন টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে প্রদীপ এসে ঢোকে সুজাতার ঘরে। বিরাট ঘরের একপ্রান্তে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে কি লিখছে সুজাতা। এগিয়ে গিয়ে তার সামনে টেলিগ্রামটা রেখে আর দাঁড়াতে পারে না প্রদীপ, ব'সে পড়ে জানলার পাশের বড় কৌচটায়। টেলিগ্রাম চোখ বুলিয়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে থাকে সুজাতা। সে জানে এ আঘাত প্রদীপের কাছে কি প্রচন্ড। উঠে গিয়ে বসে তার পাশে।

'কি করবে এখন?'

'আজই যেতে হবে একবার।'

'কিন্তু—' একটু দ্বিধা করে সুজাতা —'নার্সিংহোম নিয়ে যে গন্ডগোলটা বেধেছে, আমার তো এখন কলকাতার বাইরে যাওয়া—'

'সে তো ঠিকই। তুমি আর কি ক'রে যাবে, আমি একাই যাই।'

উঠে পড়ে প্রদীপ। কোনো প্রতিবাদ নয়, কোনোরকম জোর করা নয়। স্ত্রীর কাজের গুরুত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে, নিজের করণীয় স্থির ক'রে নিয়ে ভারী পায় চলে যায় ঘর ছেড়ে। আর সেই একইভাবে আরও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে সুজাতা।

প্রদীপ শুধু যে গেল তাই নয়, কাঁধে নিয়ে ফিরল সন্দীপের বিধবা স্ত্রী লাবণ্য আর তাদের ছ' বছরের ছোট্ট মেয়ে ঝুমুরকে।

স্ত্রীর কাছে কৈফিয়তের মতো একবার যেন বললও, 'সংসারটা এমনই ছন্নছাড়া করে তুলেছিল হতভাগাটা। এদের ওখানে থাকা সম্ভব হতো না।' এতে সুজাতার আপত্তির কোনো কারণ ছিল না। দয়া-মায়া দেখাতে সেই কি কম যায়? শহরের প্রায় শ'খানেক পরিবার তারই অন্নে প্রতি-পালিত হচ্ছে। কথাটা সেখানে নয়।

আসল অসুবিধেটা হ'ল লাবণ্যকে নিয়ে। বড় শান্ত, বড় সুন্দর। নারী হ'য়ে সুজাতার নিজেরই মনে হয়, এ মেয়ের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন আশ মেটে না। এ মেয়ের শান্ত ভাব মনকে বড় তৃপ্তি দেয়।

নিজের ছেলেরা বড় হয়েছে। ছোট্ট ঝুমুরকে পেয়ে প্রদীপ যেন একটা নতুন স্বাদ পেল। তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া, এটা-সেটা কিনে আনা, বড় ভাল লাগে।

বাড়ী ফিরতে সুজাতার প্রায়ই দশটা পার হ'য়ে যায়। বাড়ী ফিরে সোজা উঠে যায় তেতলার ঘরটিতে। সন্ধ্যে থেকে এই ঘরেই থাকে প্রদীপ। তিন দিকের দেওয়াল-জোড়া কাঁচের আলমারিভর্তি বই। গদি-মোড়া ডিভান একটা, মাঝারি মাপের মুখোমুখী বসানো দুটো কৌচ, মেঝেয় পাতা কালো রঙের ওপর সোনালী কাজ-করা পার্সিয়ান কার্পেট। এক কোণে মার্বেল-টপ স্ট্যান্ডের ওপর ফুলদানিতে সাজানো দামী দুর্লভ ফুল।

মাঝের আলমারিতে নীচের তাকের শাটারটা ঠেললে দেখা যাবে, দামী বিলিতি পানীয়ের বোতল, ডিকান্টার। এটা প্রদীপের একটা সখের জিনিস। বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায়, পার্টিতে সে এসব খেতে ভালবাসে না। নিজের এই ঘরটিতে

সন্ধ্যের পর বই নিয়ে বসে। সামনে থাকে গ্লাসভর্তি পানীয়।

কর্মক্লান্ত স্ত্রীকে সে ঢেলে দেয় নিজের হাতে। অবশ্যি অধিকাংশ দিনই এর প্রভাবটা কাজে লাগায় সুজাতা মেজাজের বল্‌গা ছেড়ে দিয়ে কোনো না কোনো দিক থেকে প্রদীপকে আক্রমণ করতে। আবার কখনও যদি এর ব্যতিক্রম ঘটল, তো সেদিনের স্বাদটাই বড় বলে মনে করে প্রদীপ।

ইদানীং সন্ধ্যের পর আর একজনের উপস্থিতি ঘটছে এই ঘরে। সে হ'ল লাবণ্য। প্রথমতঃ সুদীপের বউ, তারপর এই অল্পবয়সে কত লাঞ্ছনাই সয়েছে কে জানে। ম্লানমুখে ঘোরাফেরা করে, এটা যেন বুকের ভেতর কোথায় গিয়ে বড্ড বেঁধে। তাই মাঝে মাঝে তাকে ডেকে পাঠায় প্রদীপ।

নিজে স্বল্পভাষী। কিন্তু লাবণ্যর সামনে বলতে হয় তাকে কথা। দুটি নারীপুরুষের নীরবে অনেকক্ষণ কাটানো বড় অস্বস্তিকর। তাই কথা বলতে হয় প্রদীপকে। প্রথম জোর করেই বলতে হতো। আজকাল সে বলে, বলতে ভাল লাগে বলে। কথা আজকাল ভাল লাগছে তার।

মাঝে মাঝে এক একটা মজার কথা শুনে খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছে লাবণ্য, আর কথা বন্ধ ক'রে তার দিকে চেয়ে থেকেছে প্রদীপ। আর তখনই মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে লাবণ্যর। ম্লান চোখদুটিতে ফুটে উঠেছে একটা অপরাধী ভাব। অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করেছে প্রদীপ, 'কী হ'ল, অমন ক'রে চুপ ক'রে গেলে যে?'

'না, মানে, আমি বুঝি, এমনভাবে হাসা আমার উচিত নয়। আমি হাসি চাপতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। আমি বেশী হাসলে উনি খুব রাগ করতেন।' একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে ফেলে একটু যেন হাঁপাতে থাকে লাবণ্য।

প্রদীপের মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়ে, সেটা সামলে নিয়ে বলে, 'আর তুমি না হাসলে আমি যদি খুব রাগ করি, তা হ'লে কি করবে? সুদীপের চেয়ে তুমি আমাকে একটু বেশী ভয় করবে, এটা তো আমি আশা করতে পারি?'

আবার হাসি পেয়ে যায় লাবণ্যর। বলে, 'ভয় পেলে কি হাসি আসে?'

প্রাণখোলা হাসি হেসে ওঠে প্রদীপ। যা তার নিজের কানেও বাজে। দীর্ঘকাল এমন ক'রে হাসেনি সে। 'ঠিক, ঠিক বলেছ তুমি। আচ্ছা, ভয় ক'রে নয়, আমি যা চাই—তা তুমি করবে আমাকে ভালবেসে। কেমন?'

অসাড় হ'য়ে যায় লাবণ্য। কিন্তু এতবড় কথাটার ওপর মুহূর্তের জন্যে চিন্তাকে থামতে না দিয়ে বলে চলে প্রদীপ, 'দেখো লাবণ্য, আঘাত, বেদনাকে এড়িয়ে চলতে মানুষ পারে না। অনিবার্যভাবে এগুলো এসে যখন পড়েই, তখন চোখে মুখে, সর্বাঙ্গে তাকে ফুটিয়ে রেখে চলাটা শুধু অসুন্দরই নয়, অনুচিত। তোমার দুঃখ তোমার ভেতরেই থাক। তার প্রকাশে তোমাকে যারা ভালবাসে, তাদের প্রতিনিয়ত ব্যথিত ক'রে কেন তুলবে তুমি? অবশ্যি সাধারণ মানুষের ধর্মই হ'ল, অপরকে সে আহত দেখতে, পরাজিত দেখতেই ভালবাসে। জীবনযুদ্ধে প্রচণ্ড লড়াই ক'রে, দুঃখকে জয় ক'রে, যে মানুষ সহজ স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তার প্রতি সাধারণ মানুষের একটা বিদ্বেষ জন্মায়। সেখানে উদার মনে জয়ীকে ধন্যবাদ দেবে, এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম।' একটু থেমে আবার বলে প্রদীপ, 'আমার সব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখার চেষ্টা করো। একদিন নিজের ভেতর থেকেই তোমার কাছে সব পরিচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে।'

কথা শেষ ক'রে বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসে রইল প্রদীপ। লাবণ্যও নিশ্চুপ। আর এমনি একটা থম্‌কানো আবহাওয়ার মধ্যে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো সুজাতা।

নারী মনের অনুভূতিতে পরিস্থিতির অস্বাভাবিকত্বটুকু অনায়াসেই ধরা পড়ে তার কাছে। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে লাবণ্যকে একবার দেখে নিয়ে বসে পড়ে সহজ ভাবেই কথা শুরু করল সে।

'কি রে ছোট, সন্ধ্যে থেকে এইরকম চুপচাপ বসে আছিস দুজনে? আমার তো কথা বলে বলে এমনই অভ্যেস হ'য়ে গেছে, যে চুপ ক'রে থাকতেই পারি না।'

'না, একেবারে চুপচাপ বলা যায় না। এইমাত্র একটা মস্ত বক্তৃতা দিয়ে থামলাম। তাই না লাবণ্য?' একটা গ্লাসে পানীয় ঢেলে সুজাতার দিকে এগিয়ে ধ'রে বলল প্রদীপ।

'এ্যাঁ! বক্তৃতা! তুমি!' চোখ বড় ক'রে হাসতে হাসতে গ্লাসে চুমুক দিল সুজাতা। 'তা এই ক'দিনে তোমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

চেষ্টা সত্ত্বেও কথায় ব্যঙ্গের ভাবটা চাপা পড়ে না।

'যথা—'

'যথা—এক নম্বর হ'ল, চেহারাখানা দিন দিন বেশ অতিরিক্ত সুন্দর হ'য়ে উঠছে—'

'থামো, থামো, কি বললে? আমার চেহারা! তোমার চোখে পড়ে?' আজ যেন প্রদীপ প্রগল্‌ভ হ'য়ে উঠেছে। চুপ ক'রে থাকতে পারছে না সে, সব কথার জবাব দেওয়া চাই।

নীচে ঘুমের ঘোরে মেয়ে কেঁদে উঠতে ছুটে চলে যায় লাবণ্য। আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সুজাতা।

'লাবণ্যর সামনে ও কথা কেন বললে?'

'যা সত্য, তাকে গোপন করার চেষ্টা ক'রে লাভ কি?'

'ঢাক পিটিয়ে জাহির করাটাও কোনো কাজের কথা নয়। তোমার পরিবর্তন ঝি চাকর থেকে শুরু ক'রে ছেলেদের পর্যন্ত নজরে পড়েছে। শুধু তুমিই টের পাও না। আমি নিজের কানে শুনেছি খেতে বসে টোকন খোকনকে বলছিল, ঝুমরীকে নিয়ে বাপী কি রকম ছেলেমানুষী করেন।'

'ঠিক বলেছে। ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষী করাটাই রীতি।'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো, অল্পবয়সী বিধবা মেয়েকে সঙ্গ দিয়ে তার দুঃখ ভোলাতে চাওয়াটাও বোধহয় তোমার ওই রীতির মধ্যেই পড়ে।'

'তাই হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গটা বিধবা মেয়েটি পায় কি আমি পাই, এ ক্ষেত্রে সেটা একটা ভাববার কথা।'

'বাস্‌ বাস্‌, আর বলতে হবে না।'

'হবে। আর তোমাকেও বসে শুনতে হবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে প্রদীপ।

স্তব্ধ বিস্ময়ে অনড় হ'য়ে বসে রইল সুজাতা। প্রদীপের এ চেহারার সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

'গত দশ বছর ধ'রে তুমি মেতে উঠেছ বাইরের কাজে। আমি আপত্তি করিনি। ঘর আর বাইরের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারার মতো শিক্ষা তোমার ছিল। কিন্তু তা তুমি করলে না। তোমার ছেলে একমাস ধ'রে ভুগেছে। ভোরে বেরিয়ে গেছ, ফিরেছ রাত দশটার পর। অভিমানে সে তোমাকে জানাতে চায়নি। দিনের পর দিন অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি কাজে গিয়েছি। শুধু মুখের দিকে চাইলে তুমি টের পেতে, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন তোমার ছিল না। মাসের পর মাস তোমার অপেক্ষায় কাটিয়েছি, তোমার সঙ্গ আমি পাইনি। তুমি গ্রাহ্যই করতে চাওনি আমার প্রতি তোমার স্ত্রীর কর্তব্য বলে কিছু আছে। প্রতিপত্তি, খোসামোদের পেছনে ছুটে চলেছ নেশার টানে। সংসারধর্মটা তোমার কাছে হাসির বস্তু। আমার বয়স হয়েছে, সঙ্গের প্রয়োজন বাড়ছে। কিন্তু তুমি সেদিক থেকে অনায়াসেই চোখ বুজে থাকতে পারো; কারণ তুমি সেখানে পরিতৃপ্ত।'

'কি বললে?'

'অস্বীকার করবে?'

'হ্যাঁ, তাই করব।'

'বেশ, অসত্য জেনেও, তোমার কথার মূল্য দিতে তোমার কথাই মানলাম।'

'আমি ডিভোর্স চাই, তোমার সঙ্গে ঘর করা আর সম্ভব নয়।'

'আমার সঙ্গে ঘর করা তোমার শেষ হ'য়ে গেছে বছর ছয়েক আগে। ডিভোর্স আমি দেবো না।'

'কেন? লোকলজ্জা, সমাজের ভয়?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সুজাতা কথাগুলো।

'হ্যাঁ, লোককে আমি সম্মান করি, তাদের সম্মান চাই। সমাজও মানি বইকি।'

'যে সম্পর্ক শেষ হ'য়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে টিঁকিয়ে রেখে লাভ কি?'

'সম্পর্ক যেদিন প্রথম শেষ হয়েছিল, আমার হাতের বাঁধন থেকে ছিট্‌কে স'রে গিয়েছিলে। চোখে বোধহয় একটু জলও দেখেছিলাম। বিবেকের বালাইটা তখনও ছিল। কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারোনি যে, তোমার সঙ্গে এই শেষ। কারণ তখনও স্বার্থের জন্যে আমাকে তোমার প্রচুর প্রয়োজন ছিল। তাই নয়?' উঠে দাঁড়াল প্রদীপ।

'তুমি যাকে নিয়ে সুখী হ'তে পারো। আমার কিছুমাত্র এসে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত জেনেছি প্রয়োজনের খাতিরেও অন্ততঃ আমাকে ছাড়া তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না, ততদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গ না পেলেও সুখী হ'তে চেষ্টা করেছিলাম। আজ জীবনের

সন্ধ্যার চরম অন্ধকার মুহূর্তে আমি আলো দেখেছি। বাঁচার স্বাদ পাচ্ছি। সব কিছু নতুন ক'রে ভাল লাগছে আমার। আর এ আনন্দ আমার একার। এর মধ্যে আর কারুর কোনো অংশই নেই।'

'হুঁ—' ঢক্ ঢক্ ক'রে শেষ ক'রে গ্লাসটা হাতে চেপে ধরে সুজাতা। তার রাগের শেষ প্রকাশ দেওয়ালের গায় গ্লাসটা ছুঁড়ে ভেঙে ফেলা।

প্রদীপ জানে সেটা। তাই ঠিক সময়ে ঝুঁকে পড়ে ধ'রে ফেলে হাতটা। অপর হাতে গ্লাসটা ছাড়িয়ে নিয়ে রেখে দেয় ঠিক যায়গায়।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নেয় সুজাতা। ডায়েল ক'রে অপর পক্ষে সাড়া পেয়ে বলে, 'পাল সাহেবকে খবর দাও।' মুহূর্ত কাটে। একটু পরে আবার বলে, 'নিরঞ্জন, এক্ষুনি এসো। হাঁ, একটুও দেরি করো না। বেরোবো তোমার সঙ্গে।' ঝপ্ ক'রে ফোন রেখে দেয়।

পেছনে হাতদুটো রেখে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে প্রদীপ। 'ভাগ্যবতী তুমি। ঠিক প্রয়োজনের সময় যাকে চাও, সেই কাজের মানুষটিকে পাশে পেতে পারো। তোমাকে আর আমার বলবার কিছু নেই, তবে এমনি সব নানা প্রয়োজনে একান্তভাবে কাউকে পাশে পাওয়ার দরকারটা প্রত্যেকের থাকতে পারে। এ কথাটা একবার ভেবে দেখো।'

বেরিয়ে যায় প্রদীপ ঘর ছেড়ে। আর এর প্রায় আধঘণ্টা পরে বিভ্রান্ত সুজাতা দ্রুত এসে ঘরে ঢোকে দরজা ঠেলে। ঘরের চারিদিকে একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়।

'লাবণ্য কোথায়?'

চমকে ওঠে প্রদীপ। থর্‌থর্‌ ক'রে একবার কেঁপে ওঠে তার শরীরটা। এক-মুহূর্ত। তারপরেই শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায় মেঝের ওপর।

'ঘরে নেই?'

'না, ঘরে নেই, কোথাও নেই।'

'তাই বুঝি আমার ঘরে খুঁজতে এসেছ?' আশ্চর্যরকম নিঃস্পৃহ কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে প্রদীপ।

'তুমি জেগে আছো, তুমি জানো সে কোথায় গেছে।'

'না, আমি কিছুই জানি না।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রদীপের নির্বিকার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে ছুটে বেরোতে যায় সুজাতা। বলিষ্ঠ হাতে তাকে টেনে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে প্রদীপ প্রশ্ন করে, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'বাঃ খোঁজ করতে হবে না? নিশ্চয় এর মধ্যে ওপরে উঠে গিয়েছিল, শুনেছে সে আমাদের সব কথা।'

'কেন খোঁজ করবে? গিয়েই যদি থাকে যাক্।'

'কোথায় যাবে ও? ও কি কিছু চেনে, না জানে?'

নিষ্ঠুর আমাকে হতেই হবে। লোকে জানে হৃদয়ের দিক থেকে আমি বড়ই দুর্বল। কিন্তু আর তা হবো না। আজ তাকে খুঁজে এনে একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের বদলে জীবনজোড়া লাঞ্ছনার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে কেন রাখবে তুমি? সে অধিকার তোমার আমার কারোই নেই।'

শেলের মতো কথাটা লাগলো গিয়ে সুজাতার বুকে। কিন্তু আজ আর সেটা সে গায়ে মাখলো না। গত কয়েকঘণ্টার মধ্যে জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে তাকে। প্রদীপ দেখিয়েছে জীবনে বাঁচার পথ। নিরঞ্জন পাল দেখাতে চেষ্টা করেছে স্খলনের রাস্তা। স্পষ্টই বলে দিয়েছে, সুজাতাকে সে ভালবাসে, তার সাহচর্য নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু তার জন্যে পদমর্যাদা, সমাজ, স্ত্রী, কিছুই ছাড়তে সে রাজী নয়। তবু সে যখন হাত বাড়িয়েছে, ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে বাড়ি ফিরেছে সুজাতা।

দুচোখ ভরা জল নিয়ে প্রদীপের হাত দুখানা চেপে ধরে, 'একটা কথা রাখো।'

'বলো।'

'ছোটর খোঁজ নাও। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমার সঙ্গে এক সম্মানে সে এ বাড়ীতে থাকবে। আমি দরকার হ'লে নিজে তাকে সব আঘাত থেকে বাঁচিয়ে চলব। আমি তোমাকে চিনেছি, তা ছাড়া লাবণ্যকে আমি কতটা ভাল-

—আর পারে না। প্রদীপের বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গেই নীচে বেজে ওঠে নিরঞ্জন পালের গাড়ীর হর্ন।

রাত প্রায় দুটো। আলো জ্বলছে দোতলায় প্রদীপের ঘরে। পেছনে দুহাত বদ্ধ ক'রে পায়চারি ক'রে চলেছে প্রদীপ।

নীচে গাড়ি থামা, ভারি দরজা বন্ধের শব্দ, সবই শোনা যায়।

'পথকে যে আশ্রয় করে, পথই তাকে রাস্তা দেখায়।'

'এখনও তুমি কি ক'রে পারছো এ ভাবে কথা বলতে? এত নিষ্ঠুর তুমি!' উত্তেজনায় কেঁদে ফেলে সুজাতা।

বুকের অনেকটা কাছে তাকে টেনে নেয় প্রদীপ। 'এই একটা দিনের জন্যে

'বাসি তুমি তো জানো। ঐ কাঁচা মেয়েটাকে নিয়ে এই রাত্তিরে—' আর পারে না। প্রদীপের বিছানায় উপুড় হ'য়ে পড়ে।

চেয়ে চেয়ে দেখছে প্রদীপ তার সুজাতাকে। সে দেখছে মাকে, দেখছে স্ত্রীকে, দেখছে মমতাময়ী এক নারীকে।

দেশে বিদেশে

সুনীলকান্তি ঘোষ

॥ বর্মায় রাষ্ট্রীয়করণের ঢেউ ॥

জেনারেল নে উইন পরিচালিত বর্মার সামরিক শাসন ইতিপূর্বে বর্মার অনেকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছিল। সম্প্রতি নেউইন সরকারের নির্দেশে আরও কয়েকটি শিল্প ও ব্যবসায় বর্মার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনীত হয়েছে।

ক্ষমতা দখলের পরেই জেনারেল নে উইন বিভিন্ন শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণকে তাঁর কর্মসূচীর বিশেষ অংশ বলে ঘোষণা করেন এবং সেই ঘোষণামত প্রথম দিকেই বর্মায় আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়। তারপর কয়েক মাসের নীরবতায় অনেকে হয়ত আশা করেছিলেন যে, বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রীয়করণে নে উইন সরকার আপাতত উদ্যোগী হবেন না। কিন্তু গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী শিল্পপতি ব্যবসায়ী ও চাউল কল-মালিকদের এক বৈঠকে জেনারেল নে উইন তাঁদের সে আশা নির্মূল করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে অনতিবিলম্বেই বর্মার ধানচালের ব্যবসায়কেও পরে চালকলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। এই ঘোষণার ঠিক এক সপ্তাহ পরে ২৩শে ফেব্রুয়ারী অতর্কিতে ব্যাংক ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা মুহূর্তকাল পূর্বেও কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। শনিবার হঠাৎ সরকারী কর্মচারীরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে উপস্থিত হন ও সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঐ সকল দেশী-বিদেশী ব্যাংকের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তাঁদের কাছ হতে যাবতীয় হিসাবপত্র বুঝে নেন। এর ফলে বর্মায় পরিচালিত ভারতীয় ব্যাংকগুলির শাখাসমূহও এখন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাতে ভারতীয় স্বার্থের কি অবস্থা দাঁড়াবে সেদেশে, তা এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে বর্মা সরকার জানিয়েছেন যে, বিষয়টি যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এই ঘোষণার মাত্র চারদিন পরেই বর্মার কাঠের ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে। এইভাবে নেউইন সরকার একে একে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, ছোটখাটো শিল্প, চাউল ব্যবসায়, ব্যাংক ও কাঠের ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করলেন। এই রাষ্ট্রীয়করণের ফলাফল নিরীক্ষা-সাপেক্ষ। তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, সৈনিকদের অনেক সময়ই নিজেদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না। তাই তাঁরা খেয়াল রাখেন না যে তরোয়াল দিয়ে দাড়ি কামানো যায় না, কাঠের ব্যবসা, চালের ব্যবসা, ইত্যাদির জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উদ্যোগ, সরকারী আমলা বা সৈনিক দিয়ে সে কাজ হয় না। এই গোঁয়ার্তুমির ফলে বর্মার সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ ব্যবসায়গুলি যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে তবে সেটা খুব বিস্ময়কর কিছু হবে না।

পরলোকে শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের সেক্রেটারী শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ গত ৩রা মার্চ ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ ছিলেন স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণের একমাত্র পুত্র এবং বর্তমান ঘোষ-পরিবারের প্রবীণতম ব্যক্তি। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের ম্যানেজার হিসাবে (তখন এখানে আনন্দবাজার ছাপা হত)। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের সেক্রেটারীরূপে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত সংবাদপত্রের প্রেস-ম্যানেজার রূপে কাজ করেন। খেলাধূলায় তাঁর উৎসাহ ছিল বহুজনের বিদিত এবং তিনি কলকাতার বড় বড় ক্লাবেরই আজীবন সভ্য ছিলেন। অমৃতবাজার স্পোর্টস ক্লাবের তিনি ছিলেন সভাপতি এবং উদ্যান পরিচর্যা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তিনি তাঁর পত্নী, একমাত্র পুত্র শ্রীসুচারুকান্তি ঘোষ, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী এবং বহু শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গ রেখে গেছেন।

॥ একটি বিশেষ সভা ॥

টি প্যাকেটার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভায় খোলা ও প্যাকেট চায়ের মধ্যে বিপুল কর-পার্থক্য দূরীকরণের জন্য আবেদন জানান হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে টি প্যাকেটার্স এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় মিঃ ই জে কব্ব, মিঃ জে পি এম ওয়াটসন, মিঃ কে ঘোষ (সহ-সভাপতি), মিঃ জে জি রবিনসন (সভাপতি), মিঃ বি, সি, বিয়াণী এবং মিঃ জি সারস্বত।

শ্রী জে জে রবিনসন বলেন যে, এই ব্যবস্থায় জাতির কল্যাণের কোন পথ যেমন নেই তেমনি এর মধ্যে ন্যায়সংগত বা অর্থনৈতিক কারণ নেই বলেই মনে হয়। সমান কর ধার্য করা হলে সকলের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। 'প্রবেশ কর' ব্যবস্থার তিনি বিরোধিতা করেন। তার ফলে ২২ মিলিয়ন কিলো চা চাবাগানেই বিক্রি হয়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক ক্রেতারা তা একেবারেই দেখতে পাননি। এর ফলে কলকাতার বাজার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সভাপতি বলেন যে এই ভাবে চায়ের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলেই তিনি মনে করেন। এই ব্যবস্থা চলতে থাকলে চায়ের রপ্তানি বাড়ান সম্ভব হবে না।

॥ পাক-চীন ষড়যন্ত্র ॥

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ও চীনের মিলিত ষড়যন্ত্র এখন প্রায় চরম সীমায় পৌঁচেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ইচ্ছানুসারে পাকিস্তান ভারতের সংগে কাশ্মীর ও অন্যান্য অমীমাংসিত বিষয়গুলি নিয়ে পুনরালোচনায় সম্মত হয়, কিন্তু সে আলোচনা সফল করার ব্যাপারে তার আগ্রহ যে এতটুকুও ছিল না তা ভারত, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ উপেক্ষা করে চীনের সংগে "সীমান্ত আলোচনায়" অগ্রণী হয়ে পাকিস্তান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে। পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টো পাক দখলাধীন কাশ্মীরের সংগে চীনের সীমান্ত নির্ধারণকল্পে পিকিং অভিমুখে যাত্রা করেছেন, এবং এই প্রসঙ্গ লেখা পর্যন্ত স্থির আছে যে, ২রা মার্চ উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

কাশ্মীরের একটি অংশ পাকিস্তান সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে এবং কাশ্মীরের উপর হামলাকারী অপর দেশ চীনের সংগে ঐ জবরদখল অঞ্চলই সে ভাগ করে নিতে উদ্যোগী হয়েছে—এ অবস্থায় পাকিস্তানের সংগে আর আলোচনা চালানোর কোন সার্থকতা আছে কিনা এ প্রশ্ন অনেকেই তোলেন। তার উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন, চতুর্থ দফা পাক-ভারত মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনা যা আগামী ১৪ই মার্চ হ'তে কলকাতায় শুরু হবার কথা আছে, তা ভারতের পক্ষ হতে বন্ধ করার কোন প্রস্তাব করা হবে না। যদিও বর্তমানে উৎসাহিত হওয়ার মত কিছুই নেই তবুও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সামান্যতম সুযোগ থাকলেও ভারত তা গ্রহণে দ্বিধাবোধ করবে না।

পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোও পিকিং যাওয়ার পথে দমদম বিমানবন্দরে ক্ষণকাল অবস্থানকালে সাংবাদিকদের বলেন যে, চতুর্থ মন্ত্রী-পর্যায়ের

বৈঠকে পাকিস্তান যথারীতি যোগদান করবে এবং ঐ বৈঠকেই যাহোক কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবে। মোটকথা, যা হবার তা এই পর্বের আলোচনাতেই হয়ে যাবে, আর পাকিস্তান আলোচনার জের টানবে না। পাক সরকারের বর্তমান কার্যকলাপ ও পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এই বেপরোয়া উক্তি হইতেই বোঝা যায় যে, চতুর্থ দফার আলোচনা কতখানি অর্থহীন ও নিষ্ফল হবে। পাকিস্তান আজ ভারত-বিরোধিতায় এমনই বেপরোয়া যে, এশিয়ার বৃহত্তম আতংক পররাজ্যলোলুপ চীনের সংগে হাত মেলাতেও তার কোন দ্বিধা নেই। পাকিস্তানের এই সর্বনাশা নির্বুদ্ধিতা পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পর্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছে এবং ইতিমধ্যেই সংসদে প্রচারিত হয়েছে যে চতুর্থ দফা পাক-ভারত আলোচনাকালে পূর্বসিদ্ধান্তমত মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথ কলকাতায় উপস্থিত থাকবেন না। ভারতের ক্ষতি করার নেশায় পাকিস্তান আজ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক ছেদে উদ্যত। 'সিয়াটো', 'সেন্টো' প্রভৃতি আঞ্চলিক সামরিক জোটগুলি হতেও পাকিস্তান নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেবে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান যাই করুক না কেন, এটা স্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তানকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বনের কোন আইনসংগত অধিকার তার নেই এবং চীনের সংগে যে ভাগ-বাঁটোয়ারাই হোক না কেন, ভারত তাকে বে-আইনী ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে মনে করবে।

॥ রুশ-চীন সংবাদ ॥

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মতদ্বৈধতার মীমাংসার যে সম্ভাবনা কয়েকদিন আগে বিশেষ প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল চীনের অনমনীয় মনোভাবের ফলে আবার তা মিলিয়ে যেতে বসেছে। চীনের সংবাদপত্রগুলিতে সম্প্রতি একটানা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করা হয়েছে এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যে চীনের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। ভারত-আক্রমণ সমর্থন করেও চীনের সংবাদপত্রগুলিতে প্রবন্ধ বার হতে আরম্ভ করেছে। কারণ সোভিয়েট-অনুগত কমিউনিষ্ট দেশ ও দলগুলি সম্প্রতি প্রকাশ্যেই চীনের ভারত-আক্রমণকে নিন্দা ও অননুমোদন করেছিল। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে আলবেনিয়ার কার্যকলাপের সমালোচনা করেছে এর বিরুদ্ধেও চীনের সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এসব হতে মনে হয় যে, আপোষ ও নিষ্পত্তির জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের আগ্রহ যতই প্রবল হোক না কেন, চীন তাতে সাড়া দিতে সম্মত নয়।

॥ ঘরে ॥

২১শে ফেব্রুয়ারী—৮ই ফাল্গুন : 'ভারতে বিদেশী বিমান বাহিনী মোতায়েন অথবা ঘাঁটি স্থাপনের প্রশ্নই উঠে না—নিজের শক্তি দ্বারাই ভারতকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা।

ত্রিপুরা রাজ্যের স্থানে স্থানে সশস্ত্র পাকিস্তানী দুর্বৃত্তদের দলবদ্ধ হানা ও অত্যাচার—গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগ ও গবাদি পশু চুরির সংবাদ। (সাম্প্রতিক ঘটনা)

শ্রীসি কে দপ্তরী (সলিসিটর-জেনারেল) ভারতের এটর্ণি-জেনারেল পদে নিযুক্ত।

স্বর্ণশিল্পীদের সমস্যা (স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধির ফলে উদ্ভূত) সমাধানের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত—বিধান-সভায় শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহারের ঘোষণা।

২২শে ফেব্রুয়ারী—৯ই ফাল্গুন : 'মালয়েশিয়া গঠন প্রচেষ্টাকে ভারত অভিনন্দন জানাইবে'— লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

বিরোধী পক্ষের সমালোচনা ও অভিযোগের উত্তরে বিধান পরিষদে (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি : চাউলের দর (চলতি বর্ষে) খুবই বাড়িয়াছে, তবে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১০ই ফাল্গুন : 'সরকারী সাহায্য পাওয়া না গেলে কলিকাতায় বস্তীবাসীদের পুনর্বসতি অসম্ভব'—কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের বাজেটে গভীর আশংকা প্রকাশ।

ত্রিপুরা রাজ্যে পুনরায় পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি।

'১৯৬৪ সালের শেষে আসামে সূক্ষ্ম তরঙ্গের (মাইক্রোওয়েভ) টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা (ভারতের মধ্যে প্রথম) প্রবর্তিত হইবে'—কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের ঘোষণা।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১১ই ফাল্গুন : বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের জন্য আটজন ভারতীয় লেখকের সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার (১৯৬২ সালের জন্য) লাভ—বাংলা সাহিত্যে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় পুরস্কৃত।

হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন—নিহত ব্যক্তির কঙ্কালের সাহায্যে সনাক্তকরণের ব্যবস্থা— বিশ্বের অভিনব এক আবিষ্কার—পশ্চিমবঙ্গের ফরেনসিক বিজ্ঞান গবেষণাগারের কৃতিত্ব।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—১২ই ফাল্গুন : 'প্রস্তাবিত পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অমিত্রোচিত কার্য হইবে'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) উক্তি : ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ভারতকেই লইতে হইবে—চীনের কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ভারত অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিবে না।

কলিকাতা পুলিশের নূতন পোশাক : লাল পাগড়ীর পরিবর্তে মাথায় নীল টুপি।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : 'দেশের বর্তমান সঙ্কটে চাই—কম কথা, বেশী কাজ'—কলিকাতার সভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের ভাষণ।

শ্রীনেহরু কর্তৃক আসামের অপরিশ্রুত তৈলের রয়্যালটির হার টন প্রতি সাড়ে সাত টাকা ধার্য—প্রধানমন্ত্রী রোয়েদাদ প্রকাশ।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৪ই ফাল্গুন : রপ্তানীযোগ্য বহু পণ্যের রেল-মাশুল হ্রাস—শতকরা ২৫ ভাগ হইতে ৫০ ভাগ পর্যন্ত রেহাই ('রিবেট')—পার্লামেন্টে রেলমন্ত্রী সর্দার শরণ সিংয়ের ঘোষণা—নূতন ব্যবস্থা ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ।

'বাংলায় দুর্ভিক্ষের আশংকা অমূলক' —বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের আশ্বাস বাণী—গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার আশাব্যঞ্জক চিত্র উপস্থাপন।

বাঙালী রেজিমেন্ট গঠনের প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী চ্যবনের উক্তি।

॥ বাইরে ॥

২১শে ফেব্রুয়ারী—৮ই ফাল্গুন : লিবিয়ার বার্স শহরে প্রচণ্ড ভূমিকম্প—পাঁচ শতাধিক নর-নারী নিহত : বারো সহস্রাধিক গৃহহীন—সমগ্র শহরাঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

কিউবাস্থ 'মিগ' বিমান হইতে মার্কিন জাহাজে রকেট নিক্ষেপের অভিযোগ 'কিউবা আক্রান্ত হইলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

২২শে ফেব্রুয়ারী—৯ই ফাল্গুন : 'কিউবা আক্রান্ত হইতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইবে'—আমেরিকার প্রতি সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনভাস্কির সতর্কবাণী—রাশিয়া যে-কোন আক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম বলিয়া মন্তব্য।

'আগামী সপ্তাহেই চীনের সহিত পাকিস্তানের সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর'—পিকিং যাত্রার পূর্বে পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর ঘোষণা।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১০ই ফাল্গুন : ব্রহ্মে সমস্ত দেশী ও বিদেশী ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত—বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেঃ নে উইন কর্তৃক আদেশ জারী।

পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণরের নূতন অর্ডিন্যান্স—সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ।

প্রস্তাবিত পাক-চীন সীমান্ত চুক্তিতে আমেরিকা ও বৃটেনের উদ্বেগ—করাচীতে মিঃ ভুট্টোর সহিত ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের সাক্ষাৎ।

আণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনায় (জেনেভা) পুনরায় অনিশ্চয়তা।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১১ই ফাল্গুন : চীনের সহিত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দলবল সহ পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (মিঃ ভুট্টো) পিকিং যাত্রা।

পূর্ব পাকিস্তানে অসামরিক কর্মচারী সমিতি বে-আইনী ঘোষিত—সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা গ্রেপ্তার।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—১২ই ফাল্গুন : কেরলে ভারতের রকেট ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব—মহাশূন্যের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রস্তাব রাষ্ট্রসংঘ কমিটি কর্তৃক সমর্থিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাশূন্যে পাড়ি দিবার উপযোগী মহাকাশযানের ('এম-২ ঊর্দ্ধাকাশে আরোহণ যন্ত্র) আবরণ উন্মোচন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—১৩ই ফাল্গুন : ব্রহ্মে কাঠের ব্যবসাও রাষ্ট্রায়ত্ত—সামরিক সরকারের ঘোষণা।

এডেনে অনুপ্রবেশকারী ইয়েমেনী সৈন্যদের উপর বৃটিশ বাহিনীর গোলাবর্ষণ— ইয়েমেনীদের পশ্চাদপসরণের সংবাদ।

'চীনের পররাষ্ট্র নীতি পাল্টাইবে না'—মিঃ চৌ এন-লাই'র (চীনা প্রধান-মন্ত্রী) উক্তি।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—১৪ই ফাল্গুন : কাম্বোডিয়া ও চীনের রাষ্ট্র-প্রধানদের মধ্যে পিকিং-এ চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্ন আলোচিত—উভয়পক্ষের বৈঠকে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রিন্স সিহানুকের আশা—সাম্প্রতিক আলোচনা শেষে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।

'বিশ্বের কম্যুনিষ্ট দেশগুলির আদর্শগত বিরোধ মিটিয়া যাইবে'—রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের আশা।

অভয়ংকর

একটি সোভিয়েট উপন্যাস ॥

র‍্যালফ্ পারকার একজন সোভিয়েট-
বিদ লেখক। তিনি মস্কো শহরে
বীর ভাগ থাকেন এবং রুশ ভাষায়
খত কিছু গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ
খ্যাতি অর্জন করেছেন। সম্প্রতি
ন একখানি রুশ উপন্যাসের অনুবাদ
করে তার ইংরাজী ও মার্কিন
করণের প্রকাশ-ব্যবস্থার জন্য লণ্ডন
য়াছিলেন। মস্কো শহরে ফিরে
খন হৈ হৈ ব্যাপার, রৈরৈ কাণ্ড।
মস্কো শহরে সকলের মুখে এক
আলেকজাণ্ডার সোলঝেনিৎসিনের
ন্যাস "One day in the life
Ivan Denisovich—" এক
প্রদ উপন্যাস। সাহিত্যিক এটি
। যে সাহিত্য [illegible]
ন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই
OVY MIR" (নভ্ মুনিয়া)—
০,০০০ কপি বিক্রি হয়েছে চক্ষের
মষে। সারা মস্কো শহরের বই-এর
কান ও স্টল লিখে রেখেছে—'সোলড্
ট'। ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই উপন্যাস-
ফটোস্টাট কপি করে অনেকে বিক্রি
ছেন। সোলঝেনিৎসিনের উপন্যাস
নকদিন পরে, সোভিয়েট রাশিয়ার
হত্য-জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি
ছে।

দু মাস আগেও সোলঝেনিৎসিনের
নো পরিচয় ছিল না। তিনি একজন
দশিক স্কুল-মাস্টার মাত্র। বর্তমানে
ন চুয়াল্লিশ বছর, কিন্তু তাঁর জীবন
চর্য বৈচিত্র্যপূর্ণ। রোষটভ-অন-ডনে
মর কিছুকাল পরেই সোলঝেনিৎ-
নের ডাক পড়ল সেনাদলে নাম
খানোর জন্য। পূর্ব-প্রাশিয়ায় প্রায়
ড় তিন বছর পরে গোলন্দাজ
নীর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সোল-
নিৎসিনকে দেশদ্রোহিতার অপরাধে
লিনের গুপ্তচরবাহিনী গ্রেপ্তার করে
বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত
।।

১৯৫৩-এ স্তালিনের মৃত্যুর ফলে
শাস্তির কাল আরো প্রলম্বিত
না, কিন্তু তাঁকে মুক্ত করাও হ'ল না।
ক আরো তিন বছর নির্বাসনে রাখা
।। বিংশতম পার্টি কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ
স্তালিন ও স্তালিনী আমলকে
নস্যাৎ করলেন তখন অকলংক চরিত্রের
সার্টিফিকেট নিয়ে সোলঝেনিৎসিন
আবার সোভিয়েট-সমাজে আশ্রয় পেলেন।
তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ তুলে
নেওয়া হল, এক হিসাবে তাঁর পুনর্বাসন
ঘটলো। সাইবেরিয়া, কাজাকিস্তান
প্রভৃতি অঞ্চলে এমনই যে সব অসংখ্য
নির্বাসিত বন্দী ছিলেন তাঁরাও মুক্তি
পেলেন।

সোলঝেনিৎসিন বিয়ে করলেন,
অঙ্কের মাস্টার হিসাবে একটি চাকরী
নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে অঙ্ক এবং পদার্থবিদ্যা শিক্ষার
সংগে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারফৎ
পত্রযোগে সাহিত্যকর্ম শিক্ষা করেন। প্রায়
দু বছর আগে সোলঝেনিৎসিনের বন্দী-
শিবিরের এক সহচর তাঁর প্রথমতম
সাহিত্যিক প্রচেষ্টা মস্কো শহরের কবি-
সম্পাদক আলেকজান্দার তভারদোভস্কীর
কাছে নিয়ে যান। এই কবি-সম্পাদক
তভারদোভস্কী "NOVY MIR"
পত্রিকায় ইতিপূর্বে স্তালিন আমলের
অত্যাচার কাহিনী কিছু কিছু উদ্ঘাটিত
করেছিলেন। ক্ষমতার অপব্যবহার
স্তালিন আমলে কিভাবে হয়েছে তা এই
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিশদভাবে।

তভারদোভস্কীর কাছে ৫০,০০০
শব্দবিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি জমা রইল,

সম্পাদক কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করেই বুঝলেন এ এক মহৎ সাহিত্য, এই উপন্যাস হয়ত মিখাইল সোলোকোভের "And Quiet Flows the Don"-এর সমতুল্য। কিন্তু কোনও সোভিয়েট সম্পাদকের ক্ষমতা নেই রাজনৈতিক মতামত না গ্রহণ করে এই উপন্যাস প্রকাশ করেন। তভারদোভস্কী নিজে "সি, পি, এস, ইউ"-র কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য। কিন্তু সোলঝেনিৎসিনের এই উপন্যাসে সোভিয়েট রাশিয়ার জীবনের এক অতি বাস্তব কাহিনী মুদ্রিত, যা কোনোদিন এমন সাহসভরে আর কেউ বলেন নি। এক হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়ার কয়েক বছরের ইতিহাস।

কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন অধিবেশনে এই উপন্যাস বার বার পঠিত হয়েছে। তার সিদ্ধান্ত অবশ্য অপ্রকাশিত। শোনা যায় যে এমনই এক অধিবেশনের পর লেখক একদিন শতছিন্ন পান্ডুলিপি পকেটে করে গভীর হতাশাভরে বাইরে চলে এসেছিলেন। কমিটি কিছুতেই স্থির করতে পারছেন না যে সাম্প্রতিক কালের এমন এক ডকুমেণ্টারি উপন্যাস প্রকাশ করা উচিত কি অনুচিত।

তভারদোভস্কী বললেন যে বর্তমান তখনও অতীতকে উপেক্ষা করতে পারে না; তিনি ক্রুশ্চেভের উক্তি ব্যবহার করলেন—পার্টির একটা নৈতিক দায়িত্ব হল অতীতের ত্রুটির কথা স্বীকার, আর সেই থেকে শিক্ষালাভ করা, যেন অতীতের ত্রুটির আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। স্বয়ং ক্রুশ্চেভ শেষ পর্যন্ত নাকি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং সোলঝেনিৎসিনের উপন্যাসের প্রশংসা করেন কমিটির এক সভায়। এই সভার কালেই "NOVY MIR" পত্রিকায় "One day in the life of Ivan Denisovich—" প্রকাশিত হল। আর প্রকাশের সঙ্গেই উপন্যাসটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে একটা নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল।

কিষান আইভান ডেনিসোভিচ সুখোভ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যুদ্ধের প্রারম্ভে লালফৌজে যোগদানের জন্য সে স্ত্রী এবং দুটি সন্তানকে বাড়িতে রেখে চলে যায়। কয়েকমাস পরে একটা জার্মান বাহিনী ওদের ঘেরাও করে এবং ধরে নিয়ে যায়। লালফৌজের দলটি ছিল অস্ত্রহীন, বস্ত্রহীন একটা সামান্য সেনাবাহিনী, সুতরাং তারা সহজেই ধরা পড়ে। আইভান পালিয়ে গিয়ে নিজেদের দলে ফিরে আসে।

১৯৪২-এর বিষাক্ত পরিস্থিতিতে সুখোভ সম্পর্কে কানাকানি শুরু হল যে সে একজন জার্মানদের গুপ্তচর, তাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে, ভেতরকার খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। এই যে 'উদ্দেশ্য' —সেটা যে ঠিক কি তা স্বয়ং সুখোভের কাছ থেকেও বেরোয় না, প্রশ্নকর্তা অফিসারও কিছু নামকরণ করতে না পেরে শুধু "মিশন" এই কথাটিই ব্যবহার করলেন। অবশেষে সুখোভকে স্বীকার করতে হয়, তার অপরাধের স্বীকৃতি গ্রহণ করে তাকে দশ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। বিভিন্ন অঞ্চলে বন্দী-জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট কাজাখস্তানের কারাগান্দা নামক একটি জায়গায় বন্দী নিবাসে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তাকে রাখা হ'ল।

১৯৫১-এ আট বছর বন্দীজীবন কাটিয়ে সুখোভ ছারপোকা-বেষ্টিত একটা শয্যায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, সেই বন্দীশালায় ৫০০ জন বন্দীকে রাখা হয়েছে। জানলায় সাত পুরু বরফের স্তূপ। টেম্পারেচার ২৭ সেন্টি-গ্রেড, কিন্তু আইভান সুখোভকে কাজে যেতে হবে সোস্যালিষ্ট ওয়ে অব লাইফ-উপনিবেশে বিদ্যুৎ-সরবরাহ কেন্দ্রে নইলে ২০০—৩০০ গ্রাম রুটি সংগ্রহ করতে পারবে না, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এ আর এক সংগ্রাম।

ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখক এই উপন্যাস রচনা করেছেন। স্তালিনের বন্দীশালার এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন একজন রাশিয়ান লেখক। সুখোভের জীবন-যন্ত্রণার মধ্যে স্তালিন-আমলের অত্যাচারের এক বিচিত্র চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে।

কয়েকটি অতি উত্তেজক ঘটনার উল্লেখ আছে, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার অতিরঞ্জন নেই, অতিনাটকীয়তা নেই। সুখোভ যে ক'দিন (৩৬৫৩) বন্দীশালায় কাটিয়েছেন তার দৈনন্দিন কাহিনী। র‍্যালফ পার্কার বলেছেন এই গ্রন্থ পাঠ করে চোখ শুখনো রাখা যাবে না।

বিদেশীদের কাছে রাশিয়ানরা বলে এমন কোনো রুশ-পরিবার নেই যাদের বাড়ির অন্ততঃ একজনও গত যুদ্ধে

মারা যাননি। একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের এই ক্ষুদ্র উপন্যাস পাঠে মনে হবে হয়ত রাশিয়ায় এমন কোনও পরিবার নেই, স্তালিনের রোষাগ্নির লেলিহান শিখা যাদের সংসার গ্রাস করেনি।

পার্কারের মতে সোলঝেনিৎসিন একালের সোভিয়েত রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করবেন। তাঁর সাহসিকতা এবং নিষ্ঠার প্রশংসা সব পাঠকই করবেন, আর বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা আরো বর্ধিত পাবে।

গল্প গুচ্ছ—(গল্প সংকলন)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা—৭। দাম পাঁচ টাকা।

স্বদেশী সমাজ— (প্রবন্ধ-সংকলন) —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দাম তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। একত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান চতুর্থ খণ্ডটি ঐ পর্যায়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই খণ্ডে মোট এগারটি গল্প আছে। তিনসঙ্গীর তিনটি গল্প ও নতুন গল্প 'ছোটোগল্প' ও শেষ কথার পাঠান্তর এবং 'বদনাম', 'প্রগতিসংহার', 'শেষ পুরস্কার', 'মুসলমানীর গল্প', 'ভিখারিণী', 'করুণা', 'মুকুট'—গল্পগুলি বর্তমান খণ্ডটির আকর্ষণ। পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে বহু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। এগুলির মূল্য অপরিসীম।

'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটি ১৩১১ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রথম পঠিত হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্বদেশ সম্পর্কে নানাবিধ বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। সমস্ত তথ্য সংকলিত করে বর্তমান গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থখানিকে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের পরিপূরকরূপে মনে করা যেতে পারে। পরিশেষে রয়েছে গ্রন্থ-পরিচয়।

বর্তমান দুটি গ্রন্থের সংকলন গ্রন্থপরিচয় রচনার সামগ্রিক কৃতিত্ব একনিষ্ঠ রবীন্দ্র-গবেষক পুলিনবিহারী সেনের। তাঁকে এবং বিশ্ব-ভারতী কর্তৃপক্ষকে বর্তমান গ্রন্থ দুটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সোনা রূপোর কাঠি—(উ প ন্যা স) —কবিতা সিংহ, প্রকাশক সুরুচি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম দু'টাকা।

সাম্প্রতিক রসসাহিত্যে কবিতা সিংহ অপরিচিত নয়। ইতোপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর একাধিক গল্প পাঠক-মহলের অনিন্দ্য প্রশংসা অর্জন করেছে। আলোচ্যমান গ্রন্থ ক্ষুদ্র উপন্যাস। এবং সম্ভবত লেখিকার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। প্রথম বলেই এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচকের সযত্ন মনোনিবেশের গুরুত্ব বহুল। আশার কথা লেখিকা দ্বিধাজড়িত চরণে সারস্বত-কুঞ্জে প্রবেশ করেন নি, কী-বক্তব্য কী-পরিবেশনে তাঁর বলিষ্ঠতা অনস্বীকার্য। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কতিপয় নিম্নমধ্যবিত্ত যুবতীদের আজ সেবাব্রত পেশা বরণ করে নিতে হচ্ছে। এই উপন্যাসে সেইসব সেবাব্রতী মেয়েদের জীবনধারণের কাহিনী গভীর সহানুভূতিতে আলোচিত হয়েছে। এবং আনন্দের কথা, বাস্তবানুগত হতে গিয়ে লেখিকা কোথাও সস্তা সেন্টিমেন্টাল রসে তাঁর চরিত্রগুলিকে তথা পাঠকদের ভেজাননি। তপতী মুখ্য চরিত্র, তাঁরি পর্যবেক্ষণে এবং অনুভবে অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণিত করা হয়েছে। ফলে ঘটনাপুঞ্জ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি, অন্তরঙ্গ মনোজীবনেরই সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটেছে চরিত্রায়নে। ডক্টর বিমান সেন, নাসা নীলিমা আরো দুটি উজ্জ্বল চরিত্র। তপতীর জীবনবোধের সঙ্গে চরিত্রগুলি একাত্ম হয়ে গেছে। এছাড়াও আরো কিছু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে।

উপন্যাসটি শেষ করে মনে ক্ষোভ জন্মে তার স্বল্পায়তনের জন্যে, কারণ পাঠকদের আরো কিছু দাবি থেকে যায়। লেখিকা ব্যঞ্জনাধর্মের আশ্রয় নেওয়ায় পাঠকদের উপলব্ধির উপর অত্যধিক আশা রাখতে হয়।

পরিশেষে একটি কথা বলার দরকার। লেখিকার ভাষা গঠনের অপূর্ব ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। গদ্যে কাব্যিক হিল্লোল ভাষাকে আবেগ দিয়েছে। কিন্তু এই কাব্যময়তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবতাকে পেলব করে তুলেছে। পরিণামে বিষয়-গুরুত্বের অপহ্নব ঘটেছে। ভাষার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, সে ভাবের পরিচ্ছদ মাত্র। যেখানে ভাব ও ভাষার পার্বতী-পরমেশ্বর সংমিশ্রণ ঘটেছে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্ম হয়েছে সেখানেই।

নান্দীকর

আজকের কথা

দেশের অবস্থা ও রঙ্গজগৎ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই লোকসভায় সেদিন যে বাজেট (আসছে বছরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ) পেশ করেছেন, তাকে বলা হচ্ছে আপৎকালীন কেন্দ্রীয় বাজেট। অর্থমন্ত্রী স্পষ্টই জাতির প্রতিরক্ষাশক্তি গড়ে তোলবার প্রয়োজনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিরক্ষা খাতে ৮৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন। বলাই বাহুল্য, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পনেরো বছরের মধ্যে কখনও এই রকম বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রতিরক্ষার জন্যে ব্যয়িত হওয়ার প্রস্তাব ওঠেনি। এই গুরু ব্যয় যাতে সম্ভব হয়, তার জন্যে দেশের আপামর জনসাধারণকে দুর্বহ করভার বহন করে এই অর্থের সঙ্কুলান করতে হবে, এ-কথাও অর্থমন্ত্রী জানাতে ত্রুটি করেন নি। এর থেকে সাধারণভাবে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বহিশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে ভারত দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে চীনের ব্যাপক আক্রমণের ফলে আমাদের দেশে যে আপৎকালীন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সে-অবস্থা এখনও চলছে এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছেন, এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

কিন্তু আমাদের রঙ্গজগতের দিকে আজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে কিছু অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার দান করেই যাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকেন নি, দেশপ্রেমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে যাঁরা মূল নাটকের আগে ছোট ছোট দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয় আয়োজন করে জাতীয় কর্তব্য পালনের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সহসা তাঁরা সে-পথ পরিত্যাগ করে নিত্য-নৈমিত্তিকের চেনা পথে চলতে শুরু করেছেন। চলচ্চিত্রজগৎও যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে দেশকে 'আমার দেশ' উপহার দিয়েছিল, সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়েছে বলেই মনে করতে বাধ্য হচ্ছি।

রঙ্গজগতের—নাট্য ও চিত্রজগৎ, উভয়েরই বর্তমান কার্যকলাপ দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন যেন ফুরিয়েছে। প্রশ্ন জাগে, তাঁরা কি মনে করছেন যে, দেশের ওপর হঠাৎ যে বিপদের ছায়া পড়েছিল, তা' চিরকালের জন্যে সরে গিয়ে দেশে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে? কিংবা, তাঁরা বলতে চান, আমাদের দেশের জনসাধারণ তাঁদের দ্বারা ইতিমধ্যেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমনই টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছেন যে, আর ইন্ধনের প্রয়োজন নেই? বলে দিতে হবে না, এর কোনোটাই কিন্তু সত্য ও যথার্থ অবস্থা নয়। চীনের আকস্মিক আক্রমণে দেশপ্রেমের যে-জোয়ার আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকে ক্রমে উত্তাল করে না তুলে স্তিমিত হতে দেওয়া কোনো ক্রমেই উচিত নয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে একটি জাতির এক পুরুষের (জেনারেশন-এর) রক্তপাত আদৌ গুরু মূল্যে নয়। আমরা সকলেই জানি, স্বাধীনতালাভের জন্যে আমাদের অতখানি দান দিতে হয়নি। বলতে কি, সামান্য ত্যাগস্বীকারের ফলেই জাতির স্বাধীনতালাভ ঘটেছে। এবং সেই কারণেই সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্যে যে সর্বাত্মক দেশপ্রেমের প্রয়োজন, তা' আজও আমাদের মধ্যে যে জাগরূক হয়নি, তা' দেশের গোষ্ঠীবিশেষের চিন্তাধারার মাধ্যমেই প্রতিফলিত হচ্ছে।

কাজেই গত যুগের "মেবারপতন", "সিরাজদ্দোলা", "মীরকাশিম", "প্রতাপাদিত্য", "ছত্রপতি শিবাজী", "গৈরিক পতাকা", "পথের দাবী" প্রভৃতি নাটকের মত রসসমৃদ্ধ দেশপ্রেমাত্মক নাটকের প্রয়োজনীয়তা আজ অত্যন্ত বেশী। গার্হস্থ্য প্রেম, ব্যথা-বেদনা এখন কিছুদিনের জন্যে ভুলে গেলেও চলবে। বীররসপ্রধান নাটক যাতে বেশ কিছু সংখ্যক রচিত হতে পারে, সেই অবস্থার সৃষ্টি করুন বর্তমান পেশাদারী নাট্যজগতের কর্তৃপক্ষ; স্বদেশ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতনতা যাতে জনসাধারণের মনে সঞ্চারিত হয়, এমন নাটক রচনাকে যথাসম্ভব করে তুলুন; তাঁরা তাদের কাজে ও কথায় জানিয়ে দিন যে, তাঁরা সাধারণ গার্হস্থ্য নাটকের অভিনয় বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ রাখতে চান এবং তার পরিবর্তে চান এমন সব নাটক, যা দর্শককে স্বদেশ, স্ব-সমাজ এবং জাতির প্রতি কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ করবে। চিত্রজগতের প্রযোজকরাও এই ধরণের কাহিনীর চিত্ররূপ দেয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হোন, জাতির প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করুন।

চিত্র সমালোচনা

গৃহস্থী : (হিন্দী) জেমিনার নিবেদন : ৪৩৯৭·৬৫ মিটার দীর্ঘ ও ১৭ রীলে সম্পূর্ণ, প্রযোজনা : এস এস ভাসান, পরিচালনা কিশোর সাহু, সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি, সংলাপ : পণ্ডিত মুখরাম শর্মা, গীত-রচনা : শাকিল, নৃত্য-পরিচালক : গোপীকৃষ্ণ,

রূপায়ণ : অশোককুমার, নিরুপা রায়, মনোজকুমার, মেহমুদ, শুভা খোটে, রাজশ্রী, ললিতা পাওয়ার, সোদেশকুমার, বিপিন গুপ্ত, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, বন্দনা, মাস্টার সাহিদ, বেবি পদ্মিনী, বেবি কামিনী, কনহাইয়ালাল, জাগির-দার, নিরঞ্জন শর্মা, অচলা সহদেব প্রভৃতি। জেমিনী পিকচার্স-এর পরি-বেশনায় গত ১লা মার্চ থেকে ওরিয়েণ্ট, বসুশ্রী, বীণা ও শহরতলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

'গৃহস্থী' গার্হস্থ জীবনের একটি বলিষ্ঠ আবেগ-মধুর নাটকীয় ছবি। জনসাধারণের মনোরঞ্জনে এ ছবি সার্থক। কাহিনী ও সংলাপ এ ছবির প্রধান সম্পদ। পরিচালক কিশোর সাহু প্রধান প্রয়োগ-কর্মের দায়িত্বটুকু সুচারুভাবে পালন করেন।

কাহিনী আরম্ভে দিল্লীর এক বড় মোটর কারখানার মালিক হরিশ্চন্দ্র খান্না সাহেবকে কর্মরত অবস্থায় দেখা গেল। মালিক হলেও তিনি অতি সাধারণ। কর্মী ও পরিবারের একজন প্রিয় ব্যক্তি। দিল্লী থেকে কিছু দূরে মেরঠ অঞ্চলে খান্না সাহেবের এক বড় সংসার। স্ত্রী মায়া, আটজন মেয়ে, বিধবা বোন যমুনা আর তার ছেলে জগ্গু এ সংসারের এক ধনী পরিবার। সপ্তাহে দুদিন শুক্র থেকে রবি হরিশ্চন্দ্র এখানে স্ত্রী-কন্যাসহ হাসিখুশিতে দিন কাটান। তারপর সোমবার তিনি যাত্রা করেন কারখানায় তার পুরনো মডেলের গাড়ীতে চেপে। খান্না সাহেবের বড় মেয়ে কমলার বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মেয়ে কামিনী স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক রবিকে আর তার সেজো মেয়ে কিরণ কলেজের অধ্যক্ষের ছেলেকে ভালবাসে। আর আদুরে ভাগ্নে জগ্গু ভালবাসে স্টেশন মাস্টারের মেয়ে রেখাকে। ত্রয়ী ভালবাসার প্রণয়-মধুর দৃশ্যগুলি নাচে-গানে ভরপুর। কলেজের বাৎসরিক নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানে কিরণের উপস্থিতি সর্বজনবন্দিত। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্রও মেয়ের নাচ দেখতে আসেন। ঘরে-বাইরে এক আদর্শ পরিবারের প্রাণবিন্দু ছিলেন হরিশ্চন্দ্র খান্না। পল্টু, মিঠ্ঠু, টুন্নি-মুন্নির দৌরাত্মে লাফিয়ে চলা দিনগুলো উপ-ভোগ করতেন এ বাড়ির পিসি যমুনা, খান্নাসাহেব ও তাঁর স্ত্রী মায়া। কুড়ি বছর বিয়ে হলেও সম্প্রতি হরিশ্চন্দ্রের আর একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এ বয়সে ছেলেমেয়ে হলেও তিনি খুব রসিক ছিলেন। মেয়েরা দুষ্টুমি করে ওষুধের নামে মিঠাই এনে বাবাকে ঠকিয়ে দেয়। বলে—'পিতাজী, তোমার পুরনো মোটর গাড়ীটা এবার বদলি করো।' পিতা তখন উত্তর দিতেন—'তাহলে তোমাদের পুরনো মাকে আগে

নতুন করতে হয়।' এমনিভাবেই আলো-হাসিতে উজ্জ্বল দিনগুলো নেচে-নেচে গড়িয়ে চলেছিল। এর মধ্যে কন্যাযুগল ও ভাগ্নের ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে আবিষ্কার করলেন খান্নাসাহেব। উপ-যুক্ত বয়সের স্বাভাবিক গতিটুকু তিনি প্রতিরোধ না করে অভিভাবকদের সঙ্গে শুভ পরিণয়ের কথা পাকা করলেন।

ছন্দপতন হল আশীর্বাদের শুভ-দিনে। সরল জীবনযাত্রায় এক অশুভ দূতের আবির্ভাব হল। খান্না সাহেবকে কারখানায় না পেয়ে একটি ছোট ছেলে এসে এ বাড়ীর জীবনে আর এক নতুন নাটকের মুহূর্তস্থার উন্মোচন করলো। আপন পরিচয়ে সে প্রমাণ করলো খান্না-সাহেব তার পিতা। দিল্লীর প্যাটেল নগরে তাদের সংসার। খান্না সাহেব সপ্তাহের বাকী চারদিন এখানেই থাকেন। এ সংসারের স্ত্রী রাধা। সন্তান-সন্ততির সংখ্যা চার। বড় ছেলে ও মেয়ের নাম সুন্দর এবং শান্তি। এ-সব তথ্য সত্য বলে স্বীকার করলেন হরিশ্চন্দ্র। গৃহস্থী মায়া মূর্চ্ছিতপ্রায়। স্বামীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় একদিন মায়া প্যাটেল নগরের সংসার দেখতে এসে মৃত গৃহিণীর ছবি দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মায়া জ্ঞান হারালো তারই মৃত বোন রাধার ছবি দেখে। মেরঠে ফিরিয়ে আনা হল অসুস্থ মায়াকে ডাক্তারের পরামর্শে। একটা গৃহস্থী সংসার আর ভবিষ্যতের সম্বন্ধী-সুজন প্রতিবাদ জানালো সাধুব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে। সভাগৃহ যখন উত্তেজিত তখন আপন গৃহস্থীকল্যাণে খান্না-সাহেব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আর একটি অজ্ঞাত জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করলেন। সে জীবন হরিশ্চন্দ্রের।

দীর্ঘ বাইশ বছর আগে ফেলে আসা যুবক হরিশ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-জীবন। এক সাধুজনের কাছেই তার

অজয় কর পরিচালিত 'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও সুচিত্রা সেন

জীবন গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত "দুই নারী" চিত্রের একটি দৃশ্যে অসিতবরণ ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

ভবিষ্যৎ জীবনের দানা বেঁধেছিল। পংগু বৃদ্ধের দুই মেয়ে। বড় মায়া, ছোট রাধা। হরিশ রাধাকে ভালবাসলেও তার দিদি মায়ার সংগে তার বিবাহপর্ব সমাপ্ত হয় এবং বিবাহান্তে রেংগুণে সে সস্ত্রীক ফেরে। সেই সময় জাপানীরা রেংগুণে বোমা বর্ষণ করায় এক ভুল সংবাদে হরিশচন্দ্র অবগত হল যে মায়া জীবিত নেই। যার ফলে বৃদ্ধ শেষ সময়ে তার ছোট মেয়ে রাধাকে হরিশের সংগে বিয়ে দেন। কিন্তু পরের সংবাদে জানা গেল মায়া জীবিত আছে। বৃদ্ধ তখন হরিশকে এক প্রতিজ্ঞাবন্ধে আবদ্ধ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সে প্রতিজ্ঞা—দুই বোনই যেন কোনদিন না জানে যে দুজনেই বেঁচে আছে। সেই থেকে যুদ্ধের এক বিবর্তে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বৃদ্ধ শ্বশুরের শেষ প্রতিজ্ঞা পালন করে এসেছিল হরিশচন্দ্র। কিন্তু হঠাৎ শুভ-মুহূর্তে এমন ঘটনা ঘটে যাবে তা হরিশ নিজেও বুঝতে পারেন নি। এই সত্য ঘটনায় জয়ী হলেন খান্নাসাহেব। গৃহস্থী মায়া তার মহৎ স্বামীর উদারতায় দুটি সংসারকে এক করলো। কন্যাভাগের ত্রয়ী ভালবাসার শোভাযাত্রা রাজপথে নামলো। কাহিনীর পরিণতি মিলনান্তে।

কাহিনীর মূলে নতুনো সমাজ-চেতনার একটি সমস্যা যুক্তিসম্মত পরিণতিতে সমাপ্ত হয়েছে। সংলাপ ও দৃশ্যবিন্যাসে কখনো আনন্দ কখনো অশ্রু দর্শকমনকে প্লাবিত করেছে। এক গার্হস্থ্য জীবনের সংঘাতময় জীবন নাট্যে নাচ, গান ও কৌতুকরসের সংগে, সে পরিবেশের সমতা বজায় রাখা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। হরিশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবনের নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত কৌতূহল-ঔৎসুক্য দর্শকের উদগ্র কৌতূহল সঞ্চার করে। এমন কি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দর্শক সম্মোহিত। কাহিনীর শেষ নাটকীয় এই সংক্ষিপ্ত ক্লাইমাক্স টুকু 'গৃহস্থী'র অনবদ্য সংযোজন।

প্রধান চরিত্রগুলিতে হরিশচন্দ্র খান্না সাহেবের ভূমিকায় অশোককুমার কোমল ও কঠোর অভিনয়ে আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মায়ার চরিত্রে নিরূপা রায় দুর্দান্ত। কিরণের ভূমিকায় রাজশ্রী এবং জগমোহনের চরিত্রে মেহমুদ দর্শকসাধারণের জনপ্রিয় হতে সক্ষম হয়েছেন। পিসির চরিত্রে ললিতা পাওয়ার ও অধ্যক্ষের ছেলের ভূমিকায় মনোজকুমার সার্থক। অন্যান্য চরিত্রে বিপিন গুপ্ত, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, শোভা খোটে, অচলা সচদেব, কনহাইয়া-লাল ও নিরঞ্জন শর্মা উল্লেখযোগ্য।

চারটি সংগীতবহুল এর সাতটি গান পরিবেশনযোগ্য সংগীত। সংগীত পরিচালনায় রবি ও নৃত্য-পরিচালক ও সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার কলা-কৌশল কর্ম নয়নাভিরাম।

জেমিনী চিত্র 'গৃহস্থী' প্রত্যেক গৃহস্থেরই ভাল লাগবে।

বিবিধ সংবাদ

দ্বিজেন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে বীচরা'র 'বিরহ' ও 'পুনর্জন্ম'

দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'বীচরা' নাট্যগোষ্ঠী ৮ই মার্চ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ মুক্তঅঙ্গনে দ্বিজেন্দ্র-লাল রচিত প্রখ্যাত দুটি প্রহসন 'বিরহ ও পুনর্জন্ম' পরিবেশন করবেন।

বর্তমানে নাট্যকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই প্রহসনটির সংগে তাঁরই রচিত আর একটি প্রহসন 'পুনর্জন্ম'কে পরিমার্জিত আকারে সময়োপযোগী করে উপস্থাপিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন 'বীচরা'র অন্যতম নট ও পরিচালক শ্রীতরুণ মিত্র।

এই প্রহসন দুটির বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণের দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ মিত্র, কৃষ্ণা রায়, বিমল দেব, রবী মিত্র, দেবব্রত নাগ, তুষার ভৌমিক, মানিক সরকার, চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়, কোমল সরকার ও রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

মুক্তি প্রতীক্ষায় অন্যধারার ছবি "হাইহিল"

রামচন্দ্র পিকচার্স প্রযোজিত রাজীব পিকচার্সের প্রথম ছবি "হাইহিল"

সম্প্রতি সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়েছে। অসাধারণ এই হাসির ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন ফণী গাঙ্গুলী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন মধু সংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেছেন নবীন পরিচালক দিলীপ মিত্র এবং সুরারোপ করেছেন স্বনামধন্য সুরকার হেমন্তকুমার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত ছয়খানি গানে নেপথ্যে কন্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জি, ইলা বসু, অমল মুখার্জি ও সুরকার হেমন্তকুমার স্বয়ং। এছাড়া সেতার বাজিয়েছেন বিখ্যাত সেতারবিদ নিখিল ব্যানার্জি এবং তাঁর সঙ্গে তবলা সংগত করেছেন শ্যামল বসু। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছেন—রঞ্জিত চ্যাটার্জি। চিত্রগ্রহণ, অমিয় মুখার্জি। সম্পাদনা। জে ডি ইরাণী, অতুল চ্যাটার্জি ও নৃপেন পাল—শব্দ গ্রহণ। গৌর পোদ্দার। শিল্প নির্দেশনা। প্রবীণ অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ছবিটির প্রধান সম্পাদক।

'হাইহিল' চিত্রে হরিধন

চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন—সন্ধ্যা রায়, অনিল চ্যাটার্জি, অনুপকুমার, কমল মিত্র, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জি, শীতল ব্যানার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, রেণুকা রায়, কুন্তলা চ্যাটার্জি, মিন্টু চক্রবর্তী, অনু দত্ত, দীপক অধিকারী, সৌরেন ব্যানার্জি, শৈলেন মুখার্জি, শিবু দত্ত, লিলি, মালবিকা, উমা, কুমকুম, সুতপা, জ্যোৎস্না, মীরা প্রমুখ। এছাড়া তিনটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন স্বর্গতঃ তিন শিল্পী—নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী এবং নবদ্বীপ হালদার। সর্বোপরি এই ছবিতেই নটসম্রাট ছবি বিশ্বাস সর্বশেষ অভিনয় করে গেছেন এবং তাঁর অনবদ্য অভিনয় ছবিটির আর একটি অমূল্য সম্পদ। দমফাটা-হাসি আর প্রাণমাতানো গানে ভরা "হাইহিল" শীঘ্রই সহরের তিনটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

"মহাতীর্থ কালীঘাট" ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত প্রায়

৫১ পীঠের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান 'মহাতীর্থ কালীঘাট' ছবির চিত্রগ্রহণ ভূপেন রায়ের পরিচালনায় রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে।

ভারতের বহু স্থানেই ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। আনন্দময়ী চিত্রপীঠের সশ্রদ্ধ নিবেদন 'মহাতীর্থ কালীঘাট' ছবির কাহিনী সংকলন করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সুরসৃষ্টি করেছেন কীর্তন-কলানিধি রথীন ঘোষ। প্রধান সম্পাদক হিসেবে আছেন প্রবীণ সম্পাদক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি, এছাড়া চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও শব্দগ্রহণে আছেন যথাক্রমে, ধীরেন দে, সত্যেন রায়চৌধুরী এবং সুনীল ঘোষ। ছবিটির কিয়দংশ গেভাকলারে রঞ্জিত হবে বলে জানা গেছে। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত ছবিটির বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন ঃ নবাগত শ্রীশঙ্করনারায়ণ, শম্পা চক্রবর্তী, অসিতবরণ, অমরেশ দাস, নীতিশ মুখার্জি, রবীন মজুমদার, মিহির ভট্টাচার্য, অমর মল্লিক, অজিত ব্যানার্জি, ঠাকুরদাস মিত্র, বুবু গাঙ্গুলী, বিশু ব্যানার্জি, শ্যামল ঘোষ, শিপ্রা মিত্র, বাণী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণা বসু, ভারতী দাস ও উত্তর ব্যানার্জি। মোট বারো খানি গান ছবিটিতে সন্নিবেশিত হবে। গানগুলি গেয়েছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখার্জি, রবীন মজুমদার, প্রতিমা ব্যানার্জি, নীলিমা ব্যানার্জি, বিনয় অধিকারী, মানস মুখার্জি, মাধুরী চ্যাটার্জি প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

খুব শীঘ্রই ছবিটির পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ ছবিটির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের জন্য বোম্বাই রওনা হচ্ছেন। তাছাড়া ভারতের বহু জায়গাতেই ছবিটির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

'মধু' ছবির পরিবেশক ন্যাশনাল মুভিজ প্রাঃ লিঃ উক্ত ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

।। শৌভনিকের নবম নাট্যোৎসব ।।

দক্ষিণ কলকাতার 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে শৌভনিকের নবম নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে গত ৫ই মার্চ থেকে। উৎসব চলবে আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত।

শৌভনিকের মঞ্চসফল নাটক রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ১৫০তম রজনী অতিক্রম করেছে। রূপক নাট্য 'রাজা', 'তাসের দেশ' ও 'বাঁশরী'-র অভিনয়ে শৌভনিকের কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। সংস্কৃত নাটক শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-এর (বাংলা রূপ) অভিনয়ও প্রশংসনীয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান', ইবসেনের 'গোস্ট'—নাট্য প্রযোজনায় শৌভনিকের উল্লেখযোগ্য অবদান। ইদানীং কালের মঞ্চসফল হাস্যরসাত্মক নাটক 'ললনা'-ও এঁদের অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত। শিশুবিভাগে শৌভনিকের নতুন প্রচেষ্টা

মুক্তিপ্রাপ্ত
নিশীথে
ছবির কয়েকটি দৃশ্য

জোয়ান অব আর্ক—শিশু নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে সাড়া জাগাবে।

।। লোকমঞ্চের প্রচেষ্টা ।।

আগামী ১৫ই মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ থিয়েটার সেন্টার হলে শ্রীমন্মথ রায়ের 'জওয়ান' ও শ্রীগিরিশংকরের 'বেঁড়ো ডাক্তারের চোখ' নাটিকা দুটি মঞ্চস্থ হবে। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করবেন আনন্দম্‌-এর শিল্পীবৃন্দ।

মঞ্চ ও শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শিল্পী শ্রীসুধীর ঘোষ। আলো এবং আবহসংগীতে রয়েছেন যথাক্রমে শ্রীআশুতোষ বড়ুয়া ও জে বি কনরাড।

দুটি নাটকেরই নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়।

"হারভার্ড কলেজ অব মিউজিক"-এর শুভ উদ্বোধন :

গেল রবিবার সন্ধ্যায় "হারভার্ড কলেজ অফ মিউজিকে"র উদ্বোধনী দিবসে কলিকাতার সংগীত পিপাসুগণ উক্ত কলেজের প্রেক্ষাগৃহে ওস্তাদ আলি আকবর খানের সরোদ বাদন উপভোগ করেন। ওস্তাদ খাঁ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মিউজিক কলেজটিতে যন্ত্র এবং কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাদানের আয়োজন করা হয়েছে। ওস্তাদ আলি আকবর খান সাহেব ছাড়াও শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেশ চক্রবর্তী এই কলেজে শিক্ষাদান করবেন। উক্ত কলেজের অবৈতনিক সম্পাদিকা এবং ওস্তাদ খান সাহেবের প্রিয় ছাত্রী শ্রীমতী শীলা মুখোপাধ্যায় কর্মবিবরণী উপস্থাপিত করে জানান যে, প্রকৃত সংগীত সেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই কলেজে শাস্ত্রীয় এবং ব্যবহারিকভাবে সংগীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, মাঝে মাঝে এই কলেজের উদ্যোগে খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞদের নিয়ে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও সর্বশ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দাস, ললিতা ঘোষ, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

হার্ভার্ড কলেজ অব মিউজিকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সরোদশিল্পী আলি আকবর খান সরোদ বাজাচ্ছেন।

বাঁকুড়া মিলনতীর্থের উদ্যোগে নতুন দেশাত্মবোধক নাটক

বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাঁকুড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় প্রতিরক্ষা সপ্তাহের চতুর্থ দিবসে স্থানীয় 'মিলনতীর্থ' নাট্য সংস্থার শিল্পীগোষ্ঠী নতুন দেশাত্মবোধক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রূপান্তর' মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির রচয়িতা আনন্দ বাগচী।

সমগ্র নাটকটিতে নাট্যকারের সৃজনীশক্তির পরিচয় রসজ্ঞ-দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রায় চার হাজার দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন মিলনতীর্থের শিল্পীগোষ্ঠী তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন—সর্বশ্রী দুর্গাপদ ঘোষ, মঙ্গল দুবে, চন্দ্রনাথ মুখার্জি, অশোক মুখার্জি, সুহাস মুখার্জি, রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মৃগাঙ্ক রায়, সৌরেন ব্যানার্জি, প্রদ্যোৎ মজুমদার, দুলাল চক্রবর্তী, অমিতাভ বিশ্বাস, হিমাংশু সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, মানস ব্যানার্জি, শিবকান্তি চ্যাটার্জি, পীযূষ দত্ত, দুঃখভঞ্জন দাশগুপ্ত, সুষমা রায় ও কল্পনা দাস। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীঅনাদি বসু।

* কলকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ

কলকাতা

সংগীত গ্রহণের পর দীপান্বিতা প্রোডাকশন্সের 'বিনিময়'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন দিলীপ নাগ। আর বিশ্বনাথের কাহিনী-চরিত্রে অভিনয় করছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নবাগতা সুচিতা

সিংহ, অসিতবরণ, কাজল গুপ্ত, তরুণ-কুমার, জহর রায়, রবি ঘোষ, গীতা দে, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র ও পরিতোষ রায়। সঙ্গীত পরিচালনা, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনায় নিযুক্ত আছেন যথাক্রমে কালীপদ সেন, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন রায়চৌধুরী। গত সপ্তাহে এ সংস্থার শিল্পী ও কলাকুশলীগণ বহি-দৃশ্য গ্রহণের জন্য রাঁচী যাত্রা করেছেন।

জে জে ফিল্ম কর্পোরেশন-এর সার্থক দুটি প্রচেষ্টা। সম্প্রতি এ সংস্থার তরফ থেকে পরিচালক ঋত্বিক ঘটক বাংলা ছবি 'সুবর্ণরেখা'-র কাজ শেষ করেছেন। ছবিটি মুক্তি প্রতীক্ষিত। এবছরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতি-যোগিতায় এ ছবিটি অংশগ্রহণ করেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, অভী ভট্টাচার্য ও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বাহাদুর খাঁ।

সংস্থার দ্বিতীয় প্রোডাকসন্সের হিন্দী ছবির কাজ শুরু হয়েছে। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরটারীর সঙ্গীতগ্রহণ স্টুডিওয় বম্বের সঙ্গীত পরিচালক বেদ পাল এ ছবির সঙ্গীতগ্রহণ করেছেন। গানে কন্ঠদান করেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও মহেন্দ্র কাপুর। ছবি দুটি প্রযোজনা করছেন রামেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা।

'ভগিনী নিবেদিতা' সাফল্যের পর অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন-এর নতুন ছবি 'রাধাকৃষ্ণ'-র কাজ শুরু হয়েছে অরোরা স্টুডিওয়। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রধান পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য লিখেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষের পরিচালনায় এ ছবির সঙ্গীত গৃহীত হয়েছে। কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, পান্নালাল ভট্টাচার্য, প্রতিমা মুখো-পাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

'ইঙ্গিত'-খ্যাত পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী ছবির নাম 'সৎ ভাই'। ছবির কাজ সমাপ্ত প্রায়। প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন অসিত-বরণ, তরুণকুমার, অনুপকুমার, সন্ধ্যা-রাণী, বিপিন গুপ্ত, শম্পা চক্রবর্তী ও মঞ্জুলা সরকার। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক আলী আকবর খাঁ।

অগ্রদূতগোষ্ঠীর মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্ত-রায়ণ'। এ চিত্রের শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে ও শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। পরশমল-দীপচাঁদ নিবেদিত এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব রয়েছে ডিলাক্স ফিল্ম ডিস্ট্রি-বিউটার্স লিমিটেডের।

বোম্বাই

পরিচালক সুরজ প্রকাশ তাঁর ছবি 'ফুল বানে আঙ্গারা'-র কাজ শুরু করেছেন। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন মালা সিনহা, বাঙলার আশীষকুমার, অশোককুমার ও জনি ওয়াকর। সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণজী-আনন্দজী।

সম্প্রতি কারদার স্টুডিওর কে প্রোডাকসন্সের 'দিল দিয়া দরদ লিয়া' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন এ. আর কারদার। এই রঙিন ছবির প্রধান অংশে অভিনয় করছেন দিলীপকুমার, ওয়াহিদা রেহমান, প্রাণ, জনি ওয়াকর, শ্যামা, রেহমান ও এস নাজির। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন নৌসাদ।

পরিচালক নরেন্দ্র সুরী নতুন ছবির কাজ শুরু করেছেন। নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রেহমান। এছাড়া রয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ, ললিতা পাওয়ার ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়। সুরারোপ করবেন কল্যাণজী-আনন্দজী। ছবির নাম ভাবা হয়েছে 'সিন্দুর'।

আলোকচিত্র-শিল্পী রাধু কর্মকার আর কে স্টুডিওর 'জিস দেশ মে গঙ্গা বহেতি হায়' ছবির পরিচালক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি প্রযোজক হয়েছেন। 'হার-ফান মৌলা' এ'র প্রযোজিত প্রথম ছবি। ছবিটি পরিচালনা করবেন শ্রীকর্মকার নিজে। চিত্রগ্রহণে থাকবেন সহকারী কানু রায়। রাজকাপুর ও নূতন এ ছবির নায়ক-নায়িকা।

নায়ক-প্রযোজক ভারতভূষণের ছবি 'দুজ কা চাঁদ'-এর দৃশ্য গ্রহণ সম্প্রতি শেষ হল রূপতারা স্টুডিওয়। ছবিটি পরিচালনা করলেন নিতীন বসু। সঙ্গীত পরিচালক রোশন। প্রধান অংশে অভিনয় করছেন ভারতভূষণ, সরোজা দেবী, অশোককুমার, চন্দ্রশেখর ও রত্না।

পরিচালক হিঙ্গোরাণী 'সহেলী' ছবিটি পরিচালনা করছেন। এই হাসির ছবিতে অভিনয় করছেন প্রদীপকুমার, কল্পনা, বিজয়া চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ ও জনি হুইস্কী। সঙ্গীত পরিচালক কল্যাণ-আনন্দজী।

আর. কে. স্টুডিওয় গীতিকার শৈলেন্দ্র প্রযোজিত 'তিসরী কসম' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্বিতীয় পর্যায়ে শেষ হল। এ ছবির চিত্রগ্রাহক সুব্রত মিত্র। পরিচালনা করছেন বাসু ভট্টাচার্য। সুরকার শঙ্কর-জয়কিষণ। প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন ওয়াহিদা রেহমান।

মাদ্রাজ

অভিনেত্রী টি আর রাধারাণী তাঁর দ্বিতীয় তামিল ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন ম্যাজেস্টিক স্টুডিওয়। প্রধান চরিত্রে রয়েছেন রাধারাণী, টি আর সরোজা, টি আর রামচন্দ্র ও প্রেম

মাদ্রাজ। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করছেন এস এ সুব্রহ্মান।

ভারত-চীন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ছবি 'রক্ত তিলকম' সমাপ্ত প্রায়। কাহিনী রচনা করেছেন দাদা মিরাসী। দাদা সাহেব এ ছবির পরিচালক। শিবাজী গণেশন ও সাবিত্রী দুই প্রধান শিল্পী।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার চতুর্থ ছবির নামকরণ হয়েছে 'বিপত্তি'। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর নিয়মিত কাজ করছেন পরিচালকদ্বয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। ছবিটি সমাপ্তপ্রায়। কলাকুশলীর বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রগ্রহণে দেওজিভাই, শিল্পনির্দেশনায় সুনীল সরকার, সম্পাদনা মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত পরিচালনায় ভি বালসারা, ব্যবস্থাপনায় শম্ভু মুখোপাধ্যায় ও নিরোদবরণ সেন।

'বিপত্তি'-র কাহিনীতে ঘটনা-বিন্যাসের চিত্রনাট্য সংক্ষেপে জানিয়ে
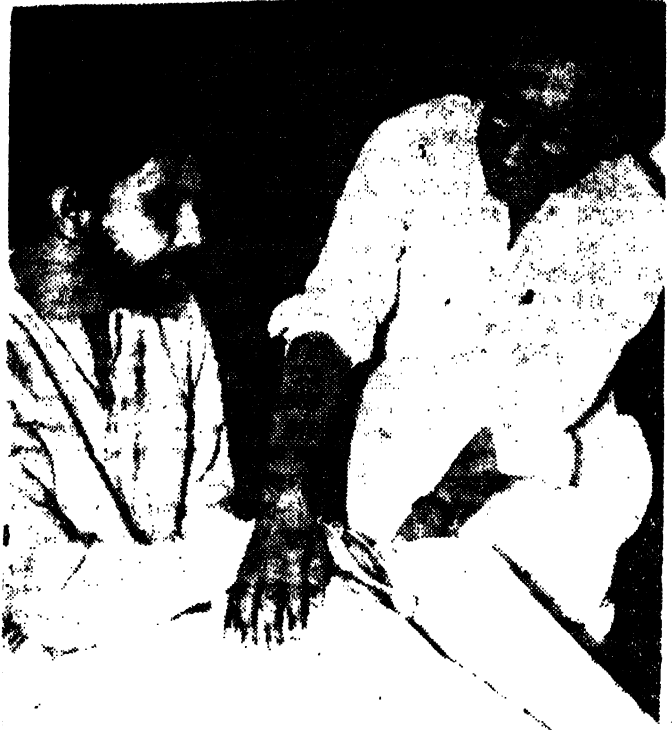
শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র পরিচালিত চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'বিপত্তি' ছবির একটি দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে পরিচালক অমিত মৈত্র ও নায়ক অরুণ মুখোপাধ্যায়

রাখছি। এক ধনী ব্যবসায়ী জ্যেঠার কাছে পূর্ণেন্দু ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছে। পড়ালেখায় অত্যন্ত মেধা ছেলের। কিন্তু জ্যেঠার ইচ্ছে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী পূর্ণেন্দু ব্যবসার প্রতি আকৃষ্ট হোক। পৈত্রিক আমলের ব্যবসা ছেড়ে পড়ালেখার তিনি ঘোর বিরোধী। তাই পূর্ণেন্দুকে তিনি ব্যবসা দেখতে বললেন। কিন্তু পূর্ণেন্দু পড়ালেখা ছাড়তে রাজী নয়। গ্রামের সামান্য ব্যবসায় সে নিজেকে সারাজীবন বিলিয়ে দিতে পারবে না। বিশুকাকা ও উমা এ বাড়ীতেই থাকতো। জ্যেঠার সহকারী বিশুকাকা। এমন মাটির মানুষ হয় না। বিশুকাকাকে সকলেই ভালবাসতো। বিপদ বাধলো অন্য জায়গায়। জ্যেঠার জুলুম সহ্য করতে না পারায় পূর্ণেন্দু সুদূর বার্মায় চাকরী নিয়ে চলে এলো। ব্যবসা তার ভাল লাগে না। পড়ালেখা করে সে মানুষ হবে। জ্যেঠাকেও সে জানিয়ে দিল এই কথা।

ঘটনাচক্রে কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেল। জ্যেঠা মারা গেলেন। মৃত্যুর আগে সমস্ত কিছু সম্পত্তি উমাকে লিখে দিয়ে গেলেন। তবে এক সর্তে। কোনদিন যদি পূর্ণেন্দু ফিরে এসে ব্যবসা দেখে এবং উমাকে বিয়ে করে তাহলে সেই হবে এ সম্পত্তির একমাত্র মালিক। বিশুকাকার চিঠিতে সমস্ত কিছু পূর্ণেন্দু জানতে পারলো। কিন্তু এমন সর্তে সে সম্পত্তির মালিক হতে রাজী নয়। যাকে সে ভালভাবে চেনে না জানে না, টাকার জন্য বিয়ে করা এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। পূর্ণেন্দুর বন্ধু সুদর্শন অনেক বুঝিয়ে রাজী করলো। যাত্রার জন্য সব ঠিক হয়েছে। এমনকি পূর্ণেন্দুর নামে প্লেনের টিকিট পর্যন্ত কাটা হয়ে গেছে। এমন সময় কোন একটা কারণে সুদর্শন আর পূর্ণেন্দুর সেই প্লেনে যাওয়া হল না। ওরা পরের দিন যাবে বলে ঠিক করলো। এদিকে সেই প্লেনের দুর্ঘটনায় যাত্রীরা কেউ কেউ মারা গেছে, তারমধ্যে পূর্ণেন্দুর নামটাও ছাপা হয়েছে। বিশুকাকা এ সংবাদ শুনে তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কোন রকমে শ্রাদ্ধের সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান শেষ হল। যদিও পূর্ণেন্দু মরেনি কিন্তু খবরে প্রকাশ সে মৃত। পূর্ণেন্দুকে এখানে এসেও নিজের পরিচয় গোপন রাখতে হল। সুদর্শন বন্ধুকে পরামর্শ দিয়ে আবার ফিরে গেল তার কর্মস্থলে। পূর্ণেন্দু শিক্ষিত। তাই এ ব্যবসার উমার সহকারী হিসেবে

চাকরী পেল। ব্যবসার সব কিছু তার এখন উমার ওপরে। বিশুকাকা শুধু নামে মাত্র আছেন। এক দূরসম্পর্কের মামা ও তার মেয়ে পূর্ণিমাকে নিয়ে এখানে উঠলেন কি করে এ সম্পত্তির কিছু অংশ ছিনিয়ে নেওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে। পূর্ণেন্দুকে কিন্তু মামা দেখতে পারতেন না। কারণ পূর্ণেন্দুকে বিশুকাকা খুব স্নেহ করতেন। তাছাড়া উমার সহকারী। পূর্ণেন্দু ফিরে আসার পর মামা কিন্তু সন্দেহ করতে আরম্ভ করলো। তাই তার আত্মীয় নিকুঞ্জর পরামর্শে আসল সাজিয়ে জাল পূর্ণেন্দুকে এ বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলো। এদিকে পূর্ণেন্দু সব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা উমা এবং বিশুকাকাকে বলতেও সে সাহস পাইনি। জাল পূর্ণেন্দুই প্রমাণ করলো সে সম্পত্তির মালিক। হঠাৎ সেই রাত্রে পূর্ণেন্দুকে তারা বন্দী করে লুকিয়ে রাখলো এবং চুরির অপবাদে মিথ্যে মিথ্যে থানায় নালিশ জানালো।

বন্ধুর অনেকদিন কোন খোঁজ না পেয়ে বার্মা থেকে সুদর্শন চলে এলো ঠিক এ সময়ে। সমস্ত কিছু জেনেও পূর্ণেন্দুর নিখোঁজের ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে পারলো না। শেষে সে পুলিশের সাহায্য নিলো। রোমাঞ্চকর মুহূর্তের পরের ঘটনাটা আর আগে থেকে বলছি না। আপনারাই ভেবে রাখুন এ কাহিনীর পরিণতিটুকু কি হতে পারে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন: পূর্ণেন্দু—অরুণ মুখোপাধ্যায়, বিশুকাকা—পাহাড়ী সান্যাল, উমা—কণিকা মজুমদার, পূর্ণিমা—সুমিতা সান্যাল, মামা—গঙ্গাপদ বসু, জাল পূর্ণেন্দু—অমর গাঙ্গুলী, সুদর্শন—অনুপকুমার, নিকুঞ্জ—কুমার রায় ও অন্যান্য চরিত্রে শান্তি দাস ও বঙ্কিম ঘোষ।

—চিত্রদূত

ভিন্ দেশী ছবি

বিদেশে বুলগেরীয় চলচ্চিত্র

গত বছর পৃথিবীর ৬৫টি দেশে ২৫ খানা বুলগেরীয় পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও ৬৫ খানা বুলগেরীয় সংক্ষিপ্ত ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এবং ১৮টি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বুলগেরীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়ে ৮টি পুরস্কার লাভ করেছে। গত বছর বুলগেরীয় ছবিগুলির মধ্যে "দি সান অ্যান্ড দি শ্যাডো" নামে ছবিখানা সবচেয়ে বেশী পুরস্কার লাভ করেছে। এই ছবিখানা সোভিয়েত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ফেডারেল জার্মানী, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে। "ক্যাপচারড ফ্লক" নামে যে বুলগেরীয় ছবিখানা ক্যানে চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছিলো সেই ছবিখানা এখন রুমানিয়া, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে। বুলগেরীয় ফিল্ম স্টুডিও থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি "দি গোল্ডেন যুথ" প্রথমে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও ফেডারেল জার্মানীতে প্রদর্শিত হবে।

ভেনেজুয়েলা ("ফার্স্ট লেসন"), ব্রহ্ম ("এ লিজেণ্ড অফ ল্যান্ড"), চিলি ("স্টারস"), ফিনল্যান্ড ("দি ল অফ দি সী") প্রভৃতি সুদূর দেশেও বুলগেরীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। বুলগেরিয়ার সংক্ষিপ্ত চলচ্চিত্রগুলিও বহু দেশে সমাদর লাভ করেছে।

বৃটিশ ছবির টুকরো খবর

রায়ানস্টোন সেভেন আর্টস-এর হয়ে মাইকেল ব্যালকন, 'স্যামি গোয়িং সাউথ' ছবিটির প্রযোজনা করছেন। ছবির কলাকুশলীবৃন্দ সকলে এখন আফ্রিকার নামাসাহালি বন্দরে নীলনদের ধারে। "দি লেডী কিলারস" এবং 'সুইট স্মেল অব সাকসেস' এর যশস্বী পরিচালক স্যাণ্ডি মেকেণ্ড্রিক এই ছবির পরিচালক। প্রধানাংশে অভিনয় করছেন এডওয়ার্ড জি রবিন্সন। দুমাসব্যাপী উগান্ডা, কেনিয়া এবং টাঙ্গানাইকায় বহির্দৃশ্যের কাজ করে অন্তর্দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের জন্যে এই চিত্রগোষ্ঠী ইংল্যান্ডে ফিরবেন।

—চিত্রকূট

খেলাধূলা

দর্শক

॥ রঞ্জি ট্রফি ॥

কোয়ার্টার ফাইনাল

বাংলা : ৩৮৬ রান (পঙ্কজ রায় ১১২, শ্যামসুন্দর মিত্র ৯৮, চুণী গোস্বামী ৪১ এবং পি পোদ্দার ৪১। রয় গিলক্রিস্ট ১২৪ রাণে ৫ উইকেট পান)

ও ২৮০ রাণ (পঙ্কজ রায় ১১৮ এবং অম্বর রায় ৪৪। গিলক্রিস্ট ১১১ রাণে ৪ উইকেট পান)

হায়দরাবাদ : ৩৬১ রাণ (মহেন্দ্রকুমার ৭০*, জয়সীমা ৬৫, আব্বাস আলী বেগ ৫৩। কিং ১৪৬ রাণে ৫ উইকেট পান)। * নটআউট।

ও ১২১ রাণ (মহেন্দ্রকুমার ৪১। দুর্গা মুখার্জি ২৩ রাণে ৪ উইকেট পান)

হায়দরাবাদ দলের অধিনায়ক এম এল জয়সীমা টসে জয়লাভ করে বাংলা দলকে ব্যাট করতে দান ছেড়ে দেন। বাংলা দলের ৪১ রাণের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। এর পর তৃতীয় উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক পঙ্কজ রায় এবং প্রকাশচন্দ্র পোদ্দার দলের ১৩০ রাণ যোগ করেন। পঙ্কজ রায় ১৯৫ মিনিট খেলে তাঁর শত রাণ পূর্ণ করেন। বাউণ্ডারী করেন ১৬টা। শেষ পর্যন্ত তিনি ১১২ রাণ ক'রে আউট হ'ন। প্রথম দিনের খেলায় বাংলা দলের ৩২০ রাণ দাঁড়ায়, ৭টা উইকেট পড়ে। শ্যামসুন্দর মিত্র ৭৩ রাণ ক'রে এই দিন নট-আউট থেকে যান। লাঞ্চের সময় বাংলা দলের রাণ ছিল ১০০, ২টো উইকেট পড়ে। চা-পানের বিরতির সময় রাণ দাঁড়ায় ২১৫, ৪ উইকেটে।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ২৩ মিনিট আগে বাংলা দলের প্রথম ইনিংস ৩৮৬ রাণে শেষ হয়। এই দিনে বাকি ৩টে উইকেটে পূর্ব দিনের ৩২০ রাণের (৭ উইকেটে) সঙ্গে ৬৬ রাণ যোগ হয়।

হায়দরাবাদ দল দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৯২ রাণ করে। কিং ৮৩ রাণে ৩টে উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে হায়দরাবাদ দলের প্রথম ইনিংস ৩৬১ রাণে শেষ হলে বাংলা মাত্র ২৫ রাণে অগ্রগামী হয়। হায়দরাবাদ তৃতীয় দিনের খেলায় বাকি ৬টা উইকেটে ১৬৯ রাণ যোগ করে। বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার গোড়াপত্তন খুবই খারাপ হয়েছিল। দলের ৮৩ রাণের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল বাংলার রাণ ১০৩, ৫টা উইকেট পড়ে। এই দি'নর মত উইকেটে নট-আউট থেকে যান পঙ্কজ রায় (৩০ রাণ) এবং অম্বর রায় (১১ রাণ)।

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনের খেলায় বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৮০ রাণে শেষ হয়। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে পঙ্কজ রায় এবং অম্বর রায় দলের অতি মূল্যবান ৯৯ রাণ যোগ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও পঙ্কজ রায় সেঞ্চুরী (১১৮ রাণ) করেন। ফলে একই সিরিজের উপর্যুপরি চারটি ইনিংসের খেলাতে তিনি সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার খেলাতে এ রেকর্ড এ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় করেন নি। মার্চেণ্ট দু'বার উপর্যুপরি চারটে ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন কিন্তু তা বিভিন্ন সিরিজের খেলা নিয়ে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বর্তমানে পঙ্কজ রায়ের সেঞ্চুরী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭টা।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক সংখ্যক সেঞ্চুরী করেছেন বিজয় হাজারে —২২টা সেঞ্চুরী। এ রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে। পঙ্কজ রায় এ পর্যন্ত ৪৩টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। টেস্ট খেলায় তাঁর সাফল্য এই রকম : খেলা ৪২, মোট রাণ ২৪৪১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১৭৫, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৫ এবং গড় ৩২·৫৪। ১৯৬১-২ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় তিনি দলভুক্ত হননি। ফলে প্রথম শ্রেণীর খেলাতে তাঁর আর কিছু দেওয়ার নেই, অনেকেই ভেবেছিলেন। আজ পঙ্কজ রায় যেন তাঁর পুরনো দিনগুলি ফিরে পেলেন রঞ্জি ট্রফির এ বছরের খেলায়।

হায়দরাবাদের বিপক্ষে বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ২৮০ রাণে শেষ হওয়ার পর খেলা ভাঙ্গতে আর ১৩৫ মিনিট বাকি ছিল। হায়দরাবাদ ৩০৫ রাণের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১২১ রাণে শেষ হ'লে বাংলা ১৮৪ রাণে জয়লাভ করে। রয় গিলক্রিস্ট এবং আব্বাস আলী বেগ দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন নি।

আলোচ্য খেলার প্রথম দিন থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড় রয় গিলক্রিস্ট খেলার মাঠে যে অভদ্র আচরণের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা একমাত্র তাঁরই দ্বারা সম্ভব। তাঁর অখেলোয়াড়ী মনোভাব এবং অভদ্র আচরণ কাক-পক্ষীরও অজানা নেই। এর জন্যে তিনি স্বদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে ধিকৃত এবং ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মাঠ থেকে শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হয়েছেন।

আমাদের দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা বহু অর্থব্যয়ে আজ এক অভূতপূর্ব তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

॥ জাতীয় লন টেনিস ॥

দিল্লী জিমখানা কোর্টে (দিল্লী) জাতীয় লন্ টেনিস এবং সেই সঙ্গে উত্তর ভারত লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় রতন থাডানি মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস ফাইনালে জয়লাভ ক'রে 'ত্রি-মুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে রমানাথন কৃষ্ণান স্ট্রেট সেটে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। ইতিপূর্বে মুখার্জি এ বছরের এশিয়ান লন্ টেনিস এবং মধ্যভারত লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ফাইনালে কৃষ্ণানের কাছে স্ট্রেট সেটে পরাজয় বরণ করেন। পুরুষদের সিঙ্গলস সেমি-ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জি ৬-১, ২-৬, ৬-১ ও ৬-৩ গেমে জাপানের ইশিগুরোকে পরাজিত করেন। অপরদিকে রমানাথন কৃষ্ণান ৬-২, ৬-০ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন নরেশকুমারকে। জাপানের ডাবলসের জুটি ইশিগুরো এবং ফুজি সেমি-ফাইনালে মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালের জুটির কাছে পরাজিত হ'ন।

পুরুষদের ডাবলস খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : রমানাথন কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-০ ও ৬-২ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশ কুমার বনাম জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎ লালের খেলা ৭-৫, ৬-৪, ৫-৭, ৬-৮, ৩-৪ গেমে অসমাপ্ত থাকে।

মহিলাদের সিঙ্গলস : রতন থাডানি ৬-২ ও ৬-২ গেমে চেরী চিত্তয়ানাকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : রতন থাডানি এবং লীলা পাঞ্জাবী ৬-২ ও ৬-৩ গেমে চেরি চিত্তয়ানা এবং শশীকলাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : রতন থাডানি এবং বিনয় দেওয়ান ৬-২, ৪-৬ ও ৬-২ গেমে এল উডরীজ এবং ইশিগুরোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

॥ প্রদর্শনী ক্রিকেট ॥

বোম্বাইয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে র্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজিত তিন নের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় কমনয়েলথ একাদশ দল ৬ উইকেটে সি সি ই (ক্রিকেট ক্লাব অব্ ইন্ডিয়া) একাদশ কে পরাজিত করে। কমনওয়েলথ দলের ধনায়ক ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক চ বেনো। আলোচ্য প্রদর্শনী ক্রিকেট লায় কমনওয়েলথ দলের পক্ষে খেলেলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর আটজন লায়াড়, ইংল্যান্ডের দু'জন এবং ওয়েস্ট ডজের একজন। সি সি আই একাদশ পরিচালনা ক'রেছিলেন পলি উম্রিগড়।

সি সি আই একাদশ দল প্রথম ব্যাট ়ে আরম্ভ খুব খারাপ হয়। দলের রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে শেষে ৭ম উইকেটের জুটিতে চান্দু এবং হনুমন্ত সিং ৯৪ রাণ যোগ র দলের পতন রোধ করেন। ২২৮ র মাথায় সি সি আই একাদশ দলের র ইনিংস শেষ হয়। এই দিনে কমনথ একাদশ দলের ৩টে উইকেট পড়ে ১১২ রাণ দাঁড়ায়। তাদেরও আরম্ভ হয়নি। দলের ৪৫ রাণের মাথায় ৩য় কট পড়েছিল। বেরী শেফার্ড (২৯) দলের অধিনায়ক রিচি বেনো (৩৯) দিন নট-আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের ইনিংস ২৮৬ রাণে শেষ হ'লে তারা রাণে অগ্রগামী হয়। এই দিনে সি সি একাদশ দলের ৬টা উইকেট পড়ে ২ রাণ ওঠে।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের আগেই সি সি একাদশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৫ র মাথায় শেষ হয়। ফলে কমনওয়েলথ র পক্ষে জয়লাভ করতে ১৫৯ রাণের জন হয়। হাতে সময় থাকে চার । কিন্তু ১০৫ মিনিটের খেলাতেই ওয়েলথ দল ৪টে উইকেট খুইয়ে জনীয় রাণ তুলে দেয়।

স আই একাদশ : ২২৮ রাণ (বোরদে ৭৯ এবং হনুমন্ত সিং ৭০। ওয়াটসন ২৮ রাণে ৪ এবং মার্টিন ৪৫ রাণে ৩ উইকেট পান)

১৫ রাণ (মঞ্জরেকার ৫৬, হনুমন্ত সিং ৪৩ এবং উমরীগড় ৪৫। ওয়াটসন ২৭ রাণে ৩ এবং মার্টিন ৫৫ রাণে ৩ উইকেট পান)

ওয়েলথ একাদশ : ২৮৬ রাণ (বেনো ১৩৫ এবং ম্যাকেঞ্জি ৪২। সূর্তি ১৭ রাণে ৩ এবং গুপ্তে ৮৮ রাণে ৫ উইকেট)

৫৯ রাণ (৪ উইকেটে। আর্থার মরিস ০। হনুমন্ত সিং ৪২ রাণে ২ কট)

॥ ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ড টেস্ট ॥

ইংল্যান্ড : ৫৬২ রাণ (৭ উইকেটে। পারফিট নট আউট ১৩১, কেন ব্যারিংটন ১২৬, বেরী নাইট ১২৫ এবং কাউড্রে ৮৬ রাণ। ক্যামেরন ১১৮ রাণে ৪ উইকেট) —ডিক্লেয়ার্ড

নিউজিল্যান্ড : ২৫৮ রাণ (বি ইয়ুল ৬৪, আর মজ ৬০ এবং জে আর রীড ৫৯। লার্টার ৫১ রাণে ৩, নাইট ২৩ রাণে ২ এবং টিটমাস ৪৪ রাণে ২ উইকেট)।

ও **৮৯ রাণ** (রীড নট আউট ২১। লার্টার ২৬ রাণে ৪ এবং ইলিংওয়ার্থ ৩৪ রাণে ৪ উইকেট)।

প্রথম দিন (২৩শে ফেব্রুয়ারী) : ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩২৮ রাণ করে। পিটার পারফিট (৩৩) এবং বেরী নাইট (৩৯) নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন (২৫শে ফেব্রুয়ারী) : ইংল্যান্ড ৫৬২ রাণের (৭ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। নিউজিল্যান্ড ৪ উইকেট খুইয়ে ৬৬ রাণ করে।

তৃতীয় দিন (২৬শে ফেব্রুয়ারী) : নিউজিল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংস ২৫৮ রাণে সমাপ্ত। নিউজিল্যান্ডের ৪টে উইকেট পড়ে ৪২ রাণ ওঠে।

চতুর্থ দিন (২৭শে ফেব্রুয়ারী) : নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৮৯ রাণে শেষ হ'লে ইংল্যান্ড এক ইনিংস এবং ২১৫ রাণে জয়লাভ করে।

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের একাদশ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস এবং ২১৫ রাণে জয়লাভ করে।

ইংল্যান্ড দলে শেষ পর্যন্ত ফ্রেডী ট্রুম্যান শারীরিক অক্ষমতার কারণে দলভুক্ত হননি। তাঁর শূন্যস্থানে খেলতে নামেন ডেভিড লার্টার। এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরকারী এম সি সি দলের মোট সতেরজন খেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র ডেভিড লার্টারের টেস্ট ম্যাচ খেলা বাকি ছিল। এই খেলায় নিউজিল্যান্ড দলের নির্বাচিত বারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯ জন খেলোয়াড় ১৯৬১-৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলে এসেছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে নিউজিল্যান্ড অপ্রত্যাশিত ভাবে বেসরকারী টেস্ট সিরিজ ড্র করেছিল।

ইংল্যান্ড টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট ধরে এবং প্রথম দিনের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে ৩২৮ রাণ ক'রে। কেন ব্যারিংটন সেঞ্চুরী (১২৬ রাণ) করেন। কেন ব্যারিংটন এবং কলিন কাউড্রে চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৬৬ রাণ যোগ করেন। পারফিট এবং নাইট যথাক্রমে ৩৩ ও ৩৯ রাণ ক'রে এই দিনে নট আউট থাকেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ড ৫৬২ রাণের মাথায় (৭ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ৫৬২ রাণই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের পক্ষে এক ইনিংসের খেলাতে সর্বাধিক রাণের রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

এক ইনিংসের খেলাতে ইংল্যান্ডের **সর্বাধিক রাণ করার পূর্ব রেকর্ড ৫৬০** রাণ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, ক্রায়েস্টচার্চ, ১৯৩২-৩৩)। তাছাড়া এই দিনের খেলাতে ইংল্যান্ড আরও একটা রেকর্ড সৃষ্টি করে। পারফিট (নট আউট ১৩১) এবং বেরী নাইট (১২৫ রাণ) ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ২৪০ রাণ যোগ করেন। ইতিপূর্বে কোন দেশেরই বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে এত বেশী রাণ তুলতে পারেনি। যে কোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে ৬ষ্ঠ উইকেট জুটির পূর্ব রেকর্ড ছিল ২১৫ রাণ। এই রেকর্ড রাণ ক'রেছিলেন লেন হাটান এবং জিওফ হার্ডস্টাফ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৩৮ সালে ইংল্যান্ডের ওভাল মাঠে।

প্রথম দিনের নট-আউট খেলোয়াড় পারফিট এবং নাইট ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ২৪০ রাণ তুলেছিলেন ২১৫ মিনিটের খেলাতে। দলের ৪১৮ রাণের মাথায় বেরী নাইট নিজস্ব ১২৫ রাণ ক'রে বোল্ড হ'ন। নাইটের এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। পারফিট এবং নাইট উভয়েই ১৪টা ক'রে বাউন্ডারী করেন। পারফিট ১৩১ রাণ ক'রে শেষ পর্যন্ত নট-আউট থেকে যান। এই নিয়ে পারফিট ৫টা টেস্ট সেঞ্চুরী করলেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যান্ড ৪টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬৬ রাণ তুলতে পারে।

তৃতীয় দিনে চা-পানের কিছু পরেই নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৫৮ রাণের মাথায় শেষ হয়। নিউজিল্যান্ডের শেষ দিকের খেলোয়াড়রা খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাদের রাণ দাঁড়িয়েছিল ৪ উইকেটে মাত্র ৬৬। তৃতীয় দিনে তাদের বাকি ৬টা উইকেট পড়ে ১৯২ রাণ উঠেছিল। দলের ১০৯ রাণের মাথায় যখন নিউজিল্যান্ড দলের অধিনায়ক জন রীড আউট হ'ন তখন *অনেকেরই ধারণা হয়েছিল প্রথম* **ইনিংসের আয়ু শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নেই। কিন্তু ডিক এবং ইয়ুল ৭ম উইকেটের জুটিতে ৬৫ মিনিটের খেলায় ৫২ রাণ এবং ইয়ুল এবং ডিক মোজ ৮ম উইকেটের জুটিতে ৯৫ রাণ তুলে দলের রাণ ভদ্রস্থ করেন। শেষের তিনটে উইকেট মাত্র ১৪ মিনিটের মধ্যে পড়ে** যায়, এ দিকে মাত্র ২ রাণ যোগ হয়।

নিউজিল্যান্ড ৩০৪ রাণের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করে। তখন খেলার সময় ছিল ৮০ মিনিট। দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের খেলার গোড়া-পত্তন খুব খারাপ হয়নি। খেলা শেষ হতে তখন মাত্র ১৫ মিনিট বাকি, স্কোর বোর্ডে দেখা গেল ৪২ রাণ উঠেছে একটা উইকেট পড়ে। খেলার এই শেষ সময়ে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টেড ডেক্সটার স্পিন বোলারদের বিশ্রাম দিয়ে অফ-স্পিনারদের ডেকে আনলেন। হাতে-নাতে ভাল ফল পাওয়া গেল। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে গেল ৪২ রাণের মাথায়। ইলিংওয়ার্থ পেলেন দুটো এবং টিটমাস একটা। ইলিংওয়ার্থের দিনের শেষ বলটাও বৃথা গেল না।

খেলার ৪র্থ অর্থাৎ শেষদিনে নিউজিল্যান্ড পূর্ব দিনের ৪২ রাণের সঙ্গে (৪ উইকেটে) আর মাত্র ৪৭ রাণ যোগ করে। তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ৮৯ রাণে শেষ হয়। এই দিনের ৬টা উইকেটের মধ্যে লার্টার ১৪ রাণে ৪টে এবং ইলিংওয়ার্থ ২৯ রাণে ২টো উইকেট পান। ইংল্যান্ডের আক্রমণের মুখে শেষ দিনে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক জন রীড (২১ নট আউট) এবং ভাঙ্গা হাটু নিয়ে আর মোজ (২০ রাণ)।

॥ নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ॥

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার উৎকর্ষতার মানদন্ডে নিউজিল্যান্ডের স্থান অন্য সকল দেশের নীচে। নিউজিল্যান্ড দ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশগুলি থেকে নিউজিল্যান্ডের অবস্থান অনেক মাইল দূরে। এই দূরত্ব এবং যাতায়াতের অসুবিধা নিউজিল্যান্ডকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। নিউজিল্যান্ড দ্বীপের আয়তন ১০৩,৭৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা মাত্র ২,৪০৩,৪৪৮। ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে স্থানীয় লোকের আগ্রহ খুবই কম। নিউজিল্যান্ডকে ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী ভাগ্যবান বলবো এই কারণে যে, তারা ভারতবর্ষের থেকে দু' বছর *আগে ইংল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকে[ট]* **ম্যাচ খেলার অধিকার লাভ করে। ১৯৩০ সালের ১০ই জানুয়ারী** ইংল্যান্[ড-]**নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট** খেলা শু[রু] **হয় নিউজিল্যান্ডের ক্রায়েস্ট** চার্চে। দু[ই] **দেশের এই প্রথম** টেস্ট খেলায় ইংল্যা[ন্ড] **অনায়াসেই ৮ উইকেটে** জয়লাভ করে। **ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট** খেলা[র] **জন্যে নিউজিল্যান্ডকে** অবিশ্যি দীর্ঘদি[ন] অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রথম ইংলি[শ] ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ড সফরে যা[য়] ১৮৬৩-৬৪ সালে। চারটে সফরের প[র] ১৯০২-৩ সালে লর্ড হকের নেতৃ[ত্বে] ইংলিশ ক্রিকেট দল নিউজিল্যান্ড সফ[রে] গিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথ[ম] শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় প্রথম যোগদা[ন] করে। ইংল্যান্ডের প্রতিভূ এম সি সি দল প্রথম নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েছি[ল] ই জি ওয়ানইয়ার্ডের নেতৃত্বে ১৯২৯-৩০ সালে। এই বছরেই ইংল্যান্ডে[র]

নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট

(১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)

বিপক্ষে	খেলা	জয়	হার	[illegible]
ইংল্যান্ড	২৯	০	১২	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	১	০	১	[illegible]
দঃ আফ্রিকা	৯	০	৭	[illegible]
ওঃ ইন্ডিজ	৬	১	৪	[illegible]
ভারতবর্ষ	৫	০	২	[illegible]
পাকিস্তান	৩	০	২	[illegible]
	৫৩	১	২৮	[illegible]

বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট সিরি[জ] খেলতে পায়। চারটে টেস্ট খেলার মা[ঝে] প্রথম টেস্ট খেলায় নিউজিল্যা[ন্ড ...] উইকেটে পরাজিত হয় এবং বাকি [তিনটে] খেলা ড্র যায়। নিউজিল্যান্ড এ পর্যন্ত সমস্ত ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশগুলি[র] বিপক্ষেই সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। এ পর্যন্ত (১৯৬৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত) বিভিন্ন দেশে[র] বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট খেলা[র] সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৩টি। খেলা[র] ফলাফল—নিউজিল্যান্ডের জয় মাত্র [১] (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে), পরাজ[য়] ২৮ এবং খেলা ড্র ২৪। নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ খেলেছে ১৮টা। কিন্তু কোন দেশের বিপক্ষেই টেস্ট সিরিজে 'রাবার' সম্মান লাভ করতে পারেনি 'রাবার' হারিয়েছে ১৫টা সিরিজে এব[ং] টেস্ট সিরিজ ড্র করেছে তিনটে—কেবল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় হাজার রাণ করেছেন নিউজিল্যান্ডের মাত্র দু'জন খেলোয়াড়—বার্ট সাটক্লিফ এবং জন রীড।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৫শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১লা চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday 15th March, 1963.
40 Naye Paise.

বাংলায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার অনেকেই পছন্দ করেন না এবং আমরাও পারতপক্ষে বিদেশী শব্দ বাংলা লেখায় ব্যবহার করি না। কিন্তু বিদেশী অনেক শব্দ আছে যাহা সমগোষ্ঠীর বা একই বর্গের হইলেও তাহাদের অর্থে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ বাংলায় বুঝাইতে হইলে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কেননা অর্থের প্রভেদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম হইলেও বৈলক্ষণ্যজ্ঞাপক অর্থাৎ একের স্থলে অন্যের ব্যবহার সম্ভব নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যবহারে বাক্যের সংজ্ঞায় প্রমাদ আসিয়া পড়ে। অথচ বিদেশী শব্দের দেশীয় পরিভাষা, যাহা আমাদের ভাষাবিদগণ সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্য দিয়াছেন বা বিদেশী হইতে দেশী ভাষার অভিধানে পাওয়া যায়, তাহাতে এই প্রভেদের কোনও নির্দেশ পাওয়া যায় না। যদিই বা শব্দের কিছু পার্থক্য কোনও ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, আবার সেই শব্দের অর্থ খুঁজিলে আবার সেই শব্দগুলিই পাওয়া যায় যাহা বিভিন্ন বিদেশী শব্দের পরিভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যায় তিনটি বিদেশী শব্দ—যথা রিপাব্লিক, ডিমক্রেসী ও সোসিয়ালিজম্। পরিভাষায় রিপাব্লিকের অর্থ পাইলাম গণ-রাজ্য কিন্তু অভিধানে ঐ শব্দ পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল গণতন্ত্র যাহার ব্যাখ্যার শেষে পাইলাম এক অভিধানে (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস) republic, democracy এবং অন্যটিতে (চলন্তিকা) পাইলাম ব্যাখ্যা হিসাবে "প্রজাতন্ত্র", democracy। আবার সোসিয়ালিজম শব্দের পরিভাষা পাইলাম সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের অর্থে (চলন্তিকা) পাইলাম ব্যক্তিগত প্রাধান্য লোপ ইত্যাদি এবং সবশেষে "Socialism"।

তবে দেখা গেল যে, অভিধানেও বিদেশী শব্দ ব্যবহার করিতে হয় এই সকল নূতন পরিভাষার পূর্ণ অর্থ বুঝাইতে, নহিলে উপায় নাই। আরও দেখা গেল যে, আমাদের বাংলা পরিভাষা ও ইংরাজী-বাংলা অভিধান যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে রিপাব্লিক ও ডিমক্রেসী এই দুই শব্দের একই অর্থ, অর্থাৎ একের বদলে অন্যের ব্যবহার চলে। কিন্তু ইংরাজী অভিধানে ঐ দুই শব্দের অর্থে প্রভেদ দেখা গেল, যে প্রভেদ সূক্ষ্ম হইলেও সুস্পষ্ট। এবং সেখানে সোসিয়ালিজম্ বলিতে যে ব্যাপক কয়েকটি সংজ্ঞা পাইলাম তাহাতে "ব্যক্তিগত প্রাধান্য লোপ" সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। বরঞ্চ সোসিয়ালিজম্ বলিতে যে কয়টি মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মার্ক্সবাদ রহিয়াছে। এবং আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি যে, যে সকল রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মার্ক্সবাদ অনুসারে গঠিত, সেখানে ব্যক্তিগত প্রাধান্যই মূলনীতি। আবার যদি হিট্‌লারের সমাজতন্ত্র (নাৎসিওন্যাল সোসিয়ালিজম্-নাৎসি)কে সমাজতন্ত্রের গোষ্ঠীর মধ্যে ধরা হয়, তবে ডিমক্রেসী ও সমাজতন্ত্র পরস্পরবিরোধী মতবাদে পরিণত হয়। তখন পরিভাষাকার সাধারণ গৌড়জনকে এই তিনের প্রভেদ বুঝাইবেন কোন্ পথে জানি না।

এই প্রসঙ্গের বিষয়বস্তু ভাষা বা পরিভাষার সমস্যা নয়। প্রসঙ্গের মূলে আছে পণ্ডিত নেহরুর ব্যাখ্যা আমাদের ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের আদর্শবাদ সম্পর্কে। তিনি ইহাকে "সোসিয়ালিষ্টিক প্যাটার্ন অফ ডিমক্রেসী" বলিয়াছেন। তিনি তো ইংরাজীতে বলিয়া খালাস, আমরা বাংলায় সঠিক অনুবাদ করি কি প্রকারে, কি ভাষায় এবং কি কি শব্দের বিন্যাসে? এই সমস্যা-পূরণের চেষ্টায় অনেক ডিক্সনারি, অভিধান ও পরিভাষা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া হতাশ হইয়া প্রসঙ্গের অবতারণায় এই পরিভাষা-সমস্যার আলোচনা করিতে হইল।

সমস্যাটি গভীর এবং জটিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাহা চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, শুধু যে আমরাই ডিমক্রেসী বা সোসিয়ালিজম্-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ তাহা নয়, অনেক ছোট-বড় রথী-মহারথীও এ-বিষয়ে ভুল ধারণা রাখেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, সেখানে দলগত মান-মর্যাদাই অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে, সমাজ বা সাধারণের প্রশ্ন সেখানে স্থানও পায় নাই। অথচ সেখানেও "ডেমক্রেসী"জনিত অধিকারের কথা খুবই চলিয়াছে।

নূতন ভালবাসা

বাণী রায়

আমাকে অবাধে ডাকে উন্মাদ আবেগ,
—উন্মাদ আবেগ তার দেহসিকতায়,
যৌবনের কাণ্ডে সে যে আফিম ফলায়,
ক্ষয়ে নেয় বার বার ভ্রমণের বেগ।

আজি আমি পলাতকা—ফিরে চলে আসি
ত্রিবর্ণ পতাকা ওড়ে আকাশে যেখানে,
জনতার কণ্ঠে এক শৌর্যের আখ্যানে
ভীরু মন বলে ওঠে—'ভয় ভালবাসি।'

কিছুক্ষণ আগে দুঃখ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কিছুক্ষণ আগে দুঃখ লগ্ন ছিল এই বক্ষপটে।
আপাতত বর্ণহীন কতিপয় রিক্ত অনুভূতি
প্রকাশ্যে শূন্যতা গড়ে। তারপর প্রসিদ্ধ নিকটে
সোহাগ স্বাক্ষর রাখে আস্বাদিত আনন্দের দ্যুতি।

বহুমুখী ভাবনাগুলি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘপথ ঘুরে
কেন্দ্র অভিসারী হয়। সমাপ্তির সব সম্ভাবনা
অতর্কিতে মুছে যায়। হৃদয়ের প্রকৃত অদূরে
সমুদ্র সশব্দে ডাকে যূথচারী বিরল কামনা।

ফুল আর ঝরিবে না অভিমানে। আংশিক আকাশে
ব্যথিত স্মৃতির শব্দ সৃষ্টি করে মুহূর্তের হাতে
অন্ধকার। তথাপিও পুষ্পবর্ষী বৃষ্টির প্রয়াসে
মৌলিক বিশ্বাস গুলি বেজে ওঠে আনন্দ আঘাতে।

ক্রমে লুপ্ত ব্যবধান তমসার প্রসিদ্ধ নিকটে
কিছুক্ষণ আগে দুঃখ লগ্ন ছিল এই বক্ষপটে।

স্রোতের মুখে

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর জলে নৌকা তোর কপালে টীপ্,
অন্ধকার ভয় করিনা কক্ষনো।
গা ছমছম প্রেতের শরীর—শালবনও
বিপদকালে হয়তো হবে প্রবাল দ্বীপ।

চিতার চোখ রাত্রিবেলা হীরক হয়,
আলোর চোখে নামতে থাকে গভীর ঘুম।
চেতনা তার প্রাঙ্গনের নীল কুসুম
ঝরিয়ে বলে, আমি তো তার সঙ্গী নয়।

নিকটতর তবুও তার অশ্বক্ষুর,
ক্ষমা, থাক্, বাঁচতে চায় তবুও কেউ।
আশ্বাসের ঝিলিকে কাঁপে জলের ঢেউ,
নৃত্য থামে, রাতের পায়ে চুপ ঘুঙুর।

বিশ্বাসের রৌদ্র—মুখে হাসির রঙ,
স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিই সব স্মৃতি।
বাঁচতে গিয়ে মরতে চাই, আজ বরং
মৃত্যু হোক ফুল ফোটানোর শেষ রীতি।
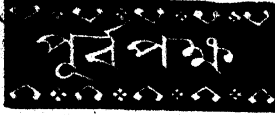
জৈর্মিন

কী খেয়াল হ'য়েছিল জানিনে, সেদিন চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে হাঁটছিলাম বিকেলবেলায়। হাতে কোনো কাজ ছিল না। ফাল্গুনের মনোরম হাওয়ায়, সুসজ্জিত পথচারীর সমারোহে মন্দ লাগছিল না পরিবেশটা। হঠাৎ মনে হল, এতদূরই যখন এসেছি, যাই একবার দেখে আসি।

দেখে আসি, শহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সেই লালবাড়িটা। প্রতিদিন কাগজের হেড লাইন আলো করে বসে যে বাড়ির কাহিনী, যার নাটক যাত্রার আসরের চেয়েও রসঘন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল সেখানে সার্কাসের তাঁবুর চেয়েও বেশি লোক-সমাগম দেখতে পাব। টিকিটের জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে না, অথচ উত্তেজনার প্রতিদান হিসাবে সাড়ে ষোল আনা লাভ, এমন সুযোগ মানুষ সহজে হাতছাড়া করে না। নিশ্চয়ই মানুষ জমে গেছে সেখানে দলে দলে, তালপাতার ভেঁপু বাজছে, পাঁপড় ভাজা বিক্রি হচ্ছে, বেশ একটা মেলার মতো আবহাওয়া তৈরি হ'য়েছে চারদিকে।

কিন্তু, হা হতাস্মি, গিয়ে দেখি রোজকার মতোই টিমটিমে ব্যাপার। বাড়তি লোকের ভিড় একতিলও নেই। বাঙালী সত্যিই পরিহার-রসিক জাত বটে। এতদিন ধরে আয়োজন করে লোক জমানোর চেষ্টা, অথচ সেদিকে একেবারে ভ্রূক্ষেপই নেই! উত্তেজনায় কি আমাদের অরুচি ধ'রে গেল?

বুঝতেই পারছেন, আমি কর্পোরেশনের কথা বলছি। গত কয়েক মাস ধ'রে যে নাটকের প্রস্তাবনা চলছিল সেখানে এবার সেটা ক্লাইম্যাক্সে উঠেছে—প্রায় ঘটোৎকচ বধের মতো উভয়সংকটের ব্যাপার। অথচ আশ্চর্য এই যে, সে ব্যাপারে আমরা যেন সম্পূর্ণই উদাসীন।

হে নাগরিকবৃন্দ, আপনারা কি অনুমান করতে পারছেন না, আপনাদের নাগরিক অধিকার বজায় রাখার জন্যে একশ্রেণীর পৌরপিতা কী বিষম আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত করেছেন নিজেদের?

হতে পারে, অধিকার বলতে আপনারা যা বোঝেন তাদের বুঝে ঠিক সে পথে চলে না। হতে পারে, নাগরিকজীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা নিরাপত্তা কোনোটিই তাঁরা দিতে পারেন নি। হতে পারে, তাঁদের সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার ভোজবাজিতে আপনাদের প্রাণধারণের অস্তিত্ব পর্যন্ত হ'য়ে উঠেছে বিপন্ন। কিন্তু ভুলে যাবেন না, তাঁরা আপনাদের অভিভাবক, তাঁরা পরিবারের কর্তা; তাঁদের সম্মানেই আপনাদের সম্মান, তাঁদের অপমানে আপনারাও অপমানিত! কেন আপনারা এমন উদাসীনের মতো দূরে সরে আছেন বন্ধুগণ? আপনাদের মান-সম্মান বজায় রাখার জন্যে তাঁরা যে পদত্যাগের মতো কঠোর অভিযানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছেন, আপনাদের হৃদয়ে কি সেজন্যে একবিন্দু সহানুভূতি জাগে না? তবে ভাই আসুন, কর্পোরেশনের পাশে এসে একবিন্দু চোখের জল নিবেদন করুন!

কী বলছেন? চোখের জল আপনাদের অতো সস্তা নয়? কেন নয় ভাই! বীরের এ আত্মদানে কি মহত্ত্বের বীজ নিহিত নেই! মহত্তের বেদনায় যার হৃদয় বিগলিত না হয় সে তো পাষাণ! আর যাই হোক, আপনাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবেন না আপনারা। যে রকমের অন্যায় বা অন্যায়ের ধারণা নিয়ে আপনারা আজকের এইসব পৌরপিতাদের বিষয়ে উদাসীন, ঠিক সেই ধরণের অন্যায়ের মাশুল কড়ায়গণ্ডায় শোধ ক'রেও আপনাদের পূর্বপুরুষগণ পূর্ববর্তী পৌর-পিতামহদের প্রতি তো কখনো বিরূপ মনোভাব পোষণ করেননি? আর তাই তো সৃষ্টি হ'য়েছে ঐ গালভরা প্রবচন, যাকে আপনারা বলেন 'অজিয়ান স্টেবল'। নেতাজী সুভাষচন্দ্রও উচ্চারণ করেছিলেন বোধহয় ঐ রূপেক-নামটি, এবং তারপর থেকে গত দুই যুগে বারেবারে উচ্চারিত হ'য়েছে ঐ একই অভিধা। কিন্তু তাতেও যখন বাস্তব অবস্থার হেরফের ঘটেনি, তখন এতদিন পর এ'দের-শুধু এ'দেরই উপর আপনারা এত বিরূপ কেন?......

নাগরিকগণ নিরুত্তর। বরং তাঁরা যেন বিপরীত ধরণের কিছু একটা ঘটে যাক, সেইদিকেই বেশী আগ্রহী। বহুদিন এক-টানা গ্রীষ্মের পর আকাশে একটু মেঘ দেখা দিলে চাতকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাঁদেরও মনোভাব যেন অনেকটা সেইরকমই। সামান্য একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ইশারা যা পাওয়া গেছে নতুন কমিশনারের তৎপরতায় তারই জন্যে তাঁরা কৃতজ্ঞ। এ সুযোগ তাঁরা যেন হেলায় হারাতে রাজি নন।

আমি ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাস করিনে। পৌর-কমিশনার অতিমানবিক কোনো
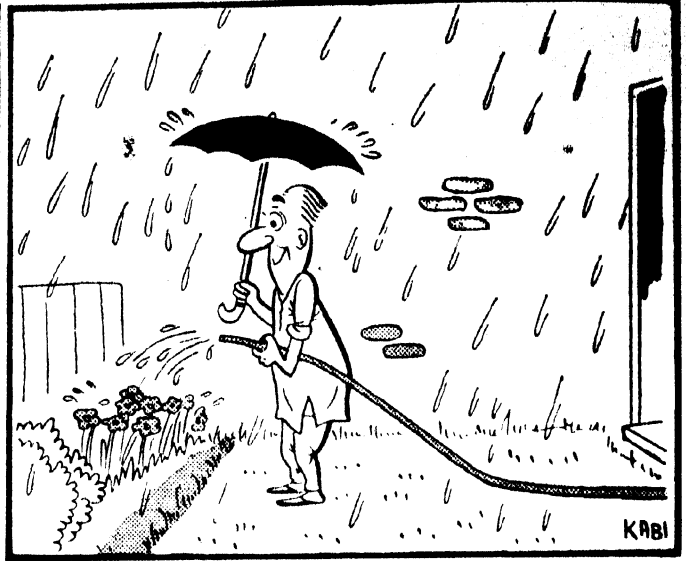
ডিউটি

কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন, তা বলে আমি তাঁর স্তাবকতা করব না। কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশে মানবিক দায়িত্বেরই এত অভাব যে সে তুলনায় তাঁকে সাহসী পুরুষ বলতেই হবে। আর সেই সঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তাঁর সদিচ্ছাকে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা করে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

হায়! পৌরপিতারা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার নামে কতো আস্ফালনই

'অমৃতে'র আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে
রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত জনপ্রিয় লেখক
শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী
রচিত মনোজ্ঞ রচনা
॥ দেবতার কথা ॥
ভারতাত্মাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করা যাবে এই বিচিত্রস্বাদের রমণীয় রচনাতে।

না করছেন আজ। কিন্তু তাঁদের আসল পরিচয় যে এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হ'য়ে গেছে! গণতন্ত্র কথাটা শুনতে বড় ভালো কিন্তু যে ব্যবস্থার মধ্যে 'গণ' নেই আছে শুধু 'তন্ত্র' সে ব্যবস্থার বিষয়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহ আজ বড়ই কম! রাস্তায় দিনের পর দিন আবর্জনা জ'মে মহামারীর দক্ষিণদ্বার খুলে দেয়, প্রাথমিক শিক্ষার নামে চলে মুষ্টিভিক্ষার প্রহসন, স্বল্পআয়ের মানুষ অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে জীবন ধারণ করে বস্তিতে, অথচ টাকা খরচ হয় জলের মতো, এবং তার ফলে অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটা দূরে থাক, অবনতি ঘটে দিনে-দিনে—এমন ব্যক্তিগত 'গণতন্ত্রে' আর যারই আস্থা থাক, উৎপীড়িত কল-কাতাবাসীর আজ কোনো আগ্রহই নেই!

কারণ তাঁরা জানেন, এ গণতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রের মোড়কে স্বার্থতন্ত্রের অকৃত্রিম নিদর্শন। এখানে বৃহত্তম জনসংখ্যার মহত্তম উপকার নয়, এ হল জটলা-ঘন সংখ্যালঘিষ্ঠের জটিলতম স্বার্থসাধনের উপায়। এই পাপের বাসা যতো তাড়াতাড়ি ভাঙে ততোই মঙ্গল।

কিন্তু মুশকিল এই যে, যে মেঘ বেশি গর্জায়, সে মেঘ ততো বর্ষায় না। 'আরেকবার সাধিলেই খাইব' বলে যে-ছেলে, তারই মতো অবস্থা হ'য়েছে এখন পৌর-পিতাদের। এ'দের এই আহত আত্মাভিমানে সামান্য একটু তোষামদের প্রলেপ পড়লেই গুটিগুটি ফিরে আসবেন এ'রা নিজেদের আসনে। আপত্তি নেই আমাদের সে ধরণের মৌখিক সহানুভূতিতে। কিন্তু, করজোড়ে অনু-রোধ, এবার থেকে তাঁরা ওজন বুঝে চলুন—নাগরিক-প্রেমের (!) যে জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কলকাতার বুকে, এ শহর তার নিচে সমাধিলাভ করতে অপারগ। অক্ষমকে তাঁরা একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন!

॥ শুচিবাই ॥

না মশাই, আমার অন্যকোন উদ্দেশ্য নেই, নিছকই মনে পড়া ব্যাপার। আপনারা সুযোগ দিয়েছেন তাই কলম ধরলাম। যদি মনে করেন আমরা কিসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করাই আমার উদ্দেশ্য তাহলে আমার উপর নেহাৎ অবিচার করা হবে। সে সব সাত-পাঁচ ভেবে লেখাটেখা আমার আসে না মশাই, সে জন্যই তো লেখক হতে পারলাম না, অবশ্য তার জন্য খুব একটা দুঃখও নেই। কারণ, আজকের দিনে কেবল আবর্জনা না ঘাঁটলে লেখক সমাজে কলকে পাওয়া যায় না।

অবান্তর কথা থাক! আমার মনে পড়া ঘটনাটা আপনাদের শোনাই, ডাক্তারবাবুকে দিয়েই শুরু করা যাক, কারণ উপসংহার ওঁরই হাতে।

মানব রায়

ডাক্তারবাবু একটু হেসেছিলেন।

আর, বছরখানেক আগে দেখা ছোট্ট সাধারণ একটা ঘটনা একটু অসাধারণ আকৃতি নিয়েই বিদ্যুৎ-চমকের মত আমার মানসপটে আছড়ে পড়েছিল। ঘটনাটা আমার মনে পড়েছিল, মনে পড়ার অভিনবত্বে আমিও হয়তো একটু হেসেছিলাম।

কোলকাতার একটা নামকরা হাসপাতালের এক্স্-রে টেক্‌নিশিয়ান আমি। শরীরের আভ্যন্তরীণ কলকব্জার ছবি তোলা আমার কাজ। হাসপাতালের বহির্বিভাগে সকাল আটটা থেকে একটা পর্যন্ত আমার ডিউটি। রাত্রে পড়াশুনা চালাই নৈশ কলেজে।

আজও যথারীতি ডিউটিতে এসেছিলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ একটা ভিজা এক্স্-রে প্লেট হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দ্রুত পায়ে চলেছিলাম সার্জিকাল আউট-ডোরে। বোন্-সেটিং হচ্ছিল। সেই কেসেরই ছবি। পেশেন্টকে টেবিলে শুইয়ে ডাক্তারবাবুরা সদ্যতোলা ওই ছবিটারই প্রতীক্ষা করছিলেন।

ই, এন, টি ডিপার্টমেন্টের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কে আমার হাতটা ধরে হঠাৎ আকর্ষণ করল, ফিরে দেখলাম জগন্নাথকে। জগন্নাথ চক্রবর্তী আমার ক্লাশ-ফ্রেন্ড। একই কলেজে বি, এস্-সি পড়ি আমরা। একই সেক্‌শনের ছাত্র। সাদাসিধে, গ্রাম্য, গোবেচারা ধরনের ছেলে। একটু ভীতু-ভীতু ভাব। বিশেষ সাতে-পাঁচে থাকে না।

কি ব্যাপার? এখানে যে?—ওকে দেখে আমি প্রশ্ন করি।

পিসিমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছি।—জগন্নাথ ওর স্বভাবসিদ্ধ ভীতু-ভীতু হাসিটা হাসে।

তোমার পিসিমার আবার কি হল? গলায় কি যেন হয়েছে।

টিকিট করেছ—আমি জিজ্ঞাসা করি।

ও ঘাড় নেড়ে টিকিটটা দেখায়। ওটা ওর হাত থেকে নিয়ে আমি ই, এন, টির ডাক্তারবাবুর কাছে যাই।

এই কেসটা একটু তাড়াতাড়ি দেখে দেবেন। আমার আত্মীয়।

ডাক্তারবাবু আমার হাত থেকে টিকিটটা নিয়ে বলেন, হাতের কটা সেরেই ডাকছি।

আমি জগন্নাথের কাছে আসি। ওর পিঠটা চাপড়ে বলি, ডাক্তারবাবুকে বলে দিয়েছি, তোমাদের এক্ষুনি ডাকবেন।

তারপর হাতের ভিজা ফিল্‌মটা

দেখিয়ে বলি, আমার একটু তাড়া আছে। চললুম, বুঝলে।

যাবার সময়ে এক্‌স্‌-রে ডিপার্টমেণ্টে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

জগন্নাথ কৃতজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়ে। আমি যেতে যেতে একবার আড়-চোখে ওর পিসিমার দিকে তাকাই। লম্বা একটা ঘোমটা দিয়ে বেঞ্চির এককোণে বসে আছেন ভদ্রমহিলা।

ভদ্রমহিলাকে আমি বছরখানেক আগে আর একবার দেখেছিলাম। অবশ্য কয়েক মুহূর্তের জন্য।

সেদিন ছিল রোববার, ছুটির দিন। ভবানীপুর অঞ্চলে একটা সিনেমা হলে গিয়েছিলাম ম্যাটিনি শো-এর টিকিট কাটতে। একটু আগেই পৌঁছেছিলাম। হলের দরজা তখনো খোলেনি। অগত্যা সামনের রাস্তায় পায়চারী করছি। এমন সময় দেখলাম জগন্নাথ আসছে। দু হাতে দুটো বাজার-ভর্তি থলে।

আমাকে দেখে একগাল হাসলো ও। কোথায় যাচ্ছ?

আমি আমার উদ্দেশ্যের কথা জানালাম।

জগন্নাথ বলল, দরজা তো এখনো খোলে নি, আমার সঙ্গে চল। বাজারটা বাড়িতে রেখে আমি আবার ফিরবো তোমার সঙ্গে।

সময়টা কাটাতে হবে, তাই ওর সঙ্গে চললাম ওর বাড়ির দিকে।

বাড়ি অবশ্য জগন্নাথের নয়। ওর গ্রাম-সম্পর্কে পিসিমার। জগন্নাথ গ্রামের ছেলে। বছর তিনেক হল কোলকাতায় কলেজে পড়তে এসেছে। উঠেছে এই পিসিমার বাড়ি।

ভদ্রমহিলা বিধবা। দুটি নাবালক ছেলে আছে। স্কুলে পড়ে। জগন্নাথ থাকতে খেতে পায় ছেলেদুটিকে পড়িয়ে। উপরন্তু বাজার-টাজার, ফাইফরমাশ এগুলোও আছে। পিসিমাকে খুব ভয় করে ও, ভক্তিও করে।

বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। জগন্নাথ দু হাতের থলে দুটোকে একহাতে নিয়ে দরজায় টোকা দিল। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বলল, একটু দাঁড়াও ভাই, আমি এক্ষুনি আসছি।

দরজা খুললেন ওর পিসিমা। জগন্নাথের দিকে তাকিয়েই ওঁর দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকেও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। তারপর ভিতরে চলে গেলেন। জগন্নাথও বাজার রাখতে ভিতরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম বাড়ির মধ্যে খুব জোর বকা-ঝকা শুরু হয়েছে। মনে হল উপলক্ষটা যেন জগন্নাথই।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে জগন্নাথ বিষন্নমুখে বেরোলো। হাতে আবার একটা থলে। যেতে যেতে বলল, আজ একটা জোর ভুল হয়ে গেছে ভাই, বাজারের থলে-দুটোয় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে।

মানে—

আমি একটু অবাক হলাম।

একটা থলে আমিষ বাজারের। অন্যটাতে নিরামিষ বাজার আসে। পিসিমার আবার ছোঁয়াছুঁয়ির ভীষণ বিচার। বিধবা মানুষ কিনা। শুচিবাইটা একটু বেশি রকমের। আমিষ বাজারের ছোঁয়া লেগেছে ওঁর নিরামিষ বাজারের থলেতে, ওগুলো উনি ছোঁবেনও না।

হাতের থলেটা দেখিয়ে বলল,—আবার বাজার আনতে হবে। এরকম ভুল আমার কখনো হয় না। আজ হঠাৎ হয়ে গেল। আবার পড়বি তো পড় একেবারে ওঁর নজরের সামনেই।—জগন্নাথের কণ্ঠে রীতিমত আপসোস।

সিনেমা হল পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় বকতে বকতে এল জগন্নাথ। আগাগোড়াই ওর পিসিমার কথা। তাঁর দাপট, নিষ্ঠা, শুচিবাই ইত্যাদি হাজারো রকম গুণের কথা। সিনেমা হলের দরজার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ইতিপূর্বের ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে পিসিমার গুণ-কীর্তনে একেবারে মুখর হয়ে উঠল জগন্নাথ। আমার কাছে বিদায় নিয়ে আবার বাজারের দিকে রওনা হবার আগে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে আমারই পিঠ চাপড়ে দিল সে।

সেদিনের কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আজকে জগন্নাথের পিসিমাকে দেখেও মনে হয় নি।

জগন্নাথ কখন ওর পিসিমাকে নিয়ে চলে গেছে জানি না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে নি। কিম্বা হয়তো খুঁজেছিল, আমাকে পায়নি। আজ খুবই ব্যস্ত ছিলাম আমি, সমস্ত কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরবার সময় ই, এন, টি, ডিপার্টমেণ্টের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার আবার মনে হল ওদের কথা।

ই, এন, টি-র ডাক্তারবাবু তখনো যান নি। চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছিলেন। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতে বললেন, কি খবর হে? কাজ শেষ হল?
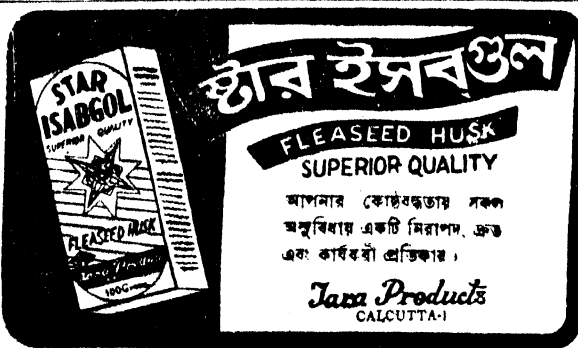
আমি বললাম, হ্যাঁ। সেই পেশেণ্টটিকে দেখেছিলেন?

কোন্‌টা? ও: তোমার সেই আত্মীয়া! গলায় কাঁটা ফুটেছিল, মাছের কাঁটা, সাঁড়াশী দিয়ে টেনে বার করে দিয়েছি।

ডাক্তারবাবু একটু হেসেছিলেন।

না মশাই, আগেই বলেছি কোন কিছু ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ও সব জটিলতা আমার মাথায় আসে না।

ঘটনাটা মনে পড়াতে আমিও হয়তো একটু হেসেছিলাম।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে চুল-দাড়ি **বানিয়ে মুখে** স্নো-পাউডার মেখে যখন **এয়ারপোর্টে** উপস্থিত হলাম, তখন **প্লেন ছাড়ার** মিনিট পাঁচেক বাকী। **কোনমতে** লাগেজ-ব্যাগেজ'এর পর্ব **শেষ করে** কাস্টমস-এর দরজা ডিঙিয়ে **প্রায়** চলন্ত প্লেনের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে **পড়লাম**। ভেবেছিলাম সেই **পরিচিত ন্যাস কলারের ব্যাঙ্গালোর** সিল্ক **জড়ানো** একজন ছুটে এসে অভ্যর্থনা **করবেন**। কিন্তু হা কপাল! যিনি **অভ্যর্থনা করলেন** তিনি কবিতা নন, এমনকি অমিত্রাক্ষর ছন্দও না। পান খাওয়া **ছত্রিশ পাটি** দাঁত **বের করে** পোড়া পোড়া রং-এর স্টুয়ার্ট আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মেজাজ তো খচে ব্যোম। **কয়েক মিনিট** বাদে যখন এ হেন **স্টুয়ার্ট প্লাস্টিকের থালায় করে** চকোলেট দিতে এলেন, তখন আর চুপ থাকতে **পারলাম** না।

—থ্যাঙ্কস্। আপনার হাতে চকোলেট **খেয়ে আর কি হবে** বলুন!

থিয়েটার-যাত্রায় পুরুষরা মেয়ের পার্ট করলে যেমন বিশ্রী কদাকার লাগে, এই স্টুয়ার্ট এক গাল হেসে পাশ দিয়ে **চলে যাবার সময়** আমার মনটাও **প্রায়** সে **রকমই হলো**। প্লেনে চড়ে এমন আঘাত **পাবার** পর মনে হলো, বুঝিবা নেপাল ভিজিটটাও এমনি হবে। নেপাল-অধিপতি বাবা **পশুপতিনাথ** আমার **মনঃকষ্ট** বুঝেছিলেন। তাইতো গোচর এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হবার সময় (শাস্ত্রীজিকে বিদায় জানাবার জন্য আগত) **চীফ অফ প্রটোকল** ঠাকুর-সাহেবকে **বললাম : ইফ্ আই** এ্যাম এ্যালাউড টু কোর্ট নেহরু তাহলে বলব আমি আমার অর্ধেক হৃদয় এই হিমালয় **রাজ্যে রেখে যাচ্ছি**।

নাগার্জুন পাহাড় ডিঙিয়ে **সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল** গোচর **এয়ার**-পোর্টের চারদিকে। তবে লালবাহাদুর **শাস্ত্রীর স্পেশ্যাল** প্লেন **যখন নামল**, তখন রাজনৈতিক আবহাওয়া কিন্তু এতটা **পরিষ্কার** ছিল না। নেপাল **কমিউনিস্ট হয়ে গেছে**, **পাকিস্তানের মো-সাহেবী করছে**, ভারতবর্ষের শত্রুতা **না করলেও বন্ধুত্ব করছে** না—এমনি **বহু** গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নেপাল সম্পর্কে **ভারত**-বর্ষের **নানাদিকে** শোনা গেছে। ওদিকে সন্দেহ **করছিল** ভারত বুঝিবা নেপালকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে চায় না।

হাসিমুখে শাস্ত্রীজি নেমে এলেন। হাত জড়িয়ে ধরলেন ডাঃ তুলসী গিরি—নেপালের 'ডি ফ্যাক্টো' প্রাইম মিনিস্টার। চীফ্ অফ্ **প্রটোকল ঠাকুর-সাহেব** শাস্ত্রীজিকে **আলাপ করিয়ে** দিলেন হোম - ন্যাশনাল গাইডেন্স-ল মিনিস্টার **থাপা** ও এয়ারপোর্টে আগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে। পিছন পিছন এলেন **'মাতাজী'** — **শাস্ত্রী-পত্নী**। **তাঁকেও অভ্যর্থনা জানালেন আগত সব নারী-পুরুষরা**। **আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা শেষে অতিথিরা চলে গেলেন 'শীতল** নিবাস-এ—'নেপালের **রাষ্ট্রীয়** অতিথিশালায়।

শীতল নিবাস-এর **একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। এই শতাব্দীর** গোড়ায় **দিকে এক প্রাক্তন রাণা প্রাইম মিনিস্টারের ছেলে এই বাড়ী তৈরী** করেন। **প্রাইম মিনিস্টার-নন্দন নিজেও** একজন **হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি ছিলেন; কম্যান্ডার-ইন্-চীফ্ হয়েই তাঁর সৈনিক**-জীবনের যবনিকা পাত **হয়। ইনি বর্ত**-মানে ব্যাঙ্গালোর বাসিন্দা। **শীতল নিবাসের ইতিহাস** এখানেই **শেষ হয়নি**। ইতিহাসের **এক** সন্ধিক্ষণে **শীতল** নিবাসে **ইন্ডিয়ান** এ্যাম্বাসেডর **বাস** করতেন। একদিন **শিকারে যাবার** অছিলায় **পরলোকগত** রাজা **ত্রিভুবন ও** তাঁর পুত্র রাজা মহেন্দ্র রাজপরিবারের অন্যান্য সবাইকে নিয়ে রাণাদের **হাত** থেকে বাঁচবার জন্য আশ্রয় **গ্রহণ করেন**। তখন নেপালের **সর্বত্র** রাণাদের **বিরুদ্ধে** গণ-আন্দোলন **চলছিল এবং স্বয়ং জওহরলালের** আশীর্বাদ-**পুষ্ট ছিল এই আন্দোলন**। এক **জার্মান মহিলা** ডাক্তার রাজা ত্রিভুবন ও নেহরুর মধ্যে যোগাযোগ **করেন**। **এ্যাম্বাসেডর** সি পি

এম সিং কোন এক বন্ধুর 'ফিউনারাল' এ্যাটেন্ড করার অছিলায় রওনা হলেন দিল্লী। পকেটে ছিল জার্মান মহিলা মারফত প্রেরিত নেহরুর প্রতি রাজা ত্রিভুবনের এক গোপন বার্তা।

......সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সেদিন নেহরুকে সাক্ষাৎ দেবতা-জ্ঞানে নেপালে লোকে পূজা করত। আর ভারতবর্ষ! সে তো নেপালের মানস সরোবর ছিল। শাস্ত্রীজি যখন নেপাল পেঁাছলেন, তখন ঈশান কোণে কালো কালো মেঘ জমেছে।

যে-কোনো কারণেই হোক রাজা মহেন্দ্র কৈরালা মন্ত্রিসভাকে গদীচ্যুতই শুধু করলেন না, অজানা গারদে পুরতেও দ্বিধা করলেন না। নেপালের ইনফ্যাণ্ট পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসীর অকাল-মৃত্যুতে নেহরু ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। আক্ষেপটাকে চেপে রাখতে পারলেন না নেহরু; খোলাখুলিভাবে রাজা মহেন্দ্রের সমালোচনা করলেন। নানা আলোচনা-সমালোচনায় নেপাল-ভারতের সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে কথা কাটাকাটি শুরু করল। নেপাল সন্দেহ করল, ভারত নেপালে তার তাঁবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কথাটি সত্য নয়। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে টুকরো টুকরো মেঘ জমে জমে নেপাল-ভারত সম্পর্কের বিরাট আকাশটাই অন্ধকারে ছেয়ে ফেলেছিল।

দেহের লম্বায়-চওড়ায় শাস্ত্রীজি দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও রাজনৈতিক স্বচ্ছতা আছে তাঁর দৃষ্টিতে।

নেপাল বলে কৈরালা মন্ত্রিসভাকে গদীচ্যুত করায় নেহরুর রাগ হয়, প্রতিবাদও জানান। কিন্তু পাশের দেশ বর্মাতে যখন আর্মি জেনারেলরা উ নু-কে জেলে পুরল তখন তিনি চুপ থাকেন। এটা কি যুক্তিযুক্ত। হাজার হলেও নেপাল একটি সার্বভৌম দেশ। নেপালের আরো অনেক কথা আছে। হোম মিনিস্টার থাপা আমাকে বলেছিলেন, 'তিব্বতে কমিউনিস্ট সরকার তো আমরা চাই নি। ভারতের আগ্রহের জন্য কমিউনিজম আমাদের দরজায় হাজির।' কফির কাপে চুমুক দিয়ে থাপা বললেন, চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে ছ'শো মাইল 'ওপেন ফ্রণ্টিয়ার' কিভাবে রক্ষা করা যায় বল তো! আর তা ছাড়া আমরা যদি চীনের বন্ধুই হতাম তবে গোর্খাদের ইণ্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দিয়ে চীনেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধা দিতাম। তাই নয় কি! আর পাকিস্তান! সেও তো নেপালের প্রতিবেশী।

নেপালের নেতারা কেন জানি না ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বাসেডর-এর সম্পর্কে খুব সন্তুষ্ট নয়। একজন মন্ত্রী তো আমাকে বলেই ফেললেন, হি ডিড নট নো হিন্দী বিফোর, আমরাই তো তাকে হিন্দী শিখিয়েছি। ভারত সম্পর্কে নেপালের সন্দেহ যে সত্য, তা নয়। শাস্ত্রীজি ঠিকই ধরেছিলেন যে, নেপাল-ভারতের মধ্যে একটা 'ইনফিরিয়র-সুপিরিয়র কমপ্লেক্স-সিটি' গড়ে উঠেছে। রাজা মহেন্দ্র ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে শাস্ত্রীজির। নেপাল যে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, সেকথা তিনি বার বার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

লম্বা-চওড়া স্টেটমেন্ট দিয়ে নিজের ঢাক বাজাবার প্রবৃত্তি শাস্ত্রীজির চরিত্রে একেবারেই নেই। তাই তিনি তাঁর সফরের ফলাফল সবার সামনে ফলাও করে তুলে ধরেন নি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শাস্ত্রীজির নেপাল-ভ্রমণের থেকে ভারত-নেপাল সম্পর্কে মোড় ঘুরবেই ঘুরবে।

পলিটিক্যাল দিক বাদ দিয়েও ব্যক্তিগত দিক থেকে নেপাল-ভ্রমণ শাস্ত্রীজির জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই তাঁর প্রথম 'বিদেশ' গমন।

শুধু তাই নয়। এই ভ্রমণ উপলক্ষে 'মাতাজী' জীবনের প্রথম দামী শাড়ী পরলেন। আজ না হয় তাঁর স্বামী ভারতের হোম মিনিষ্টার। কিন্তু যেদিন শাস্ত্রী মিনিষ্টার ছিলেন না, ছিলেন শুধুই একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী আর ভোগ করতেন জেলখানার আতিথ্য,

সেদিন মাতাজী অদ্ভুত সন্তানদের নিয়ে হাসিমুখেই সংসার চালাতেন। আট-দশ টাকার খদ্দরের শাড়ী আর কপালে একটা বিরাট সিঁদুরের টিপ পরেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। শীতল নিবাসের প্রাচুর্যের মধ্যে তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীজি চীফ্ অফ্ প্রটোকলকে বলেই ফেললেন, আমাদের একটা ছোট-খাট ঘর দেওয়া যায় না, পেলে বড় স্বস্তি পেতাম। শাস্ত্রীজির সে অনুরোধ রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে তিনি যে ছাপ ফেলে এসেছেন তা বোধকরি সহজে ভোলবার নয়।

মতামত

'অমৃত' পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়! আপনার সম্পাদিত ও ডাকযোগে প্রেরিত 'অমৃত' পত্রিকার ২রা ফাল্গুন (ইংরাজী ১৫ই ফেব্রুয়ারী) তারিখের সংখ্যাটি গতকল্য আমি পাইয়াছি। তাহাতে 'জানাতে পারেন' পৃষ্ঠায় আমার প্রেরিত "মাতাপিতাহীন" সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরটি প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এই সংখ্যায় আরও অনেক সুখপাঠ্য প্রবন্ধাদি আছে। তাহার মধ্যে "সমকালীন সাহিত্য" পর্যায়ে অভয়ংকর রচিত 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার' রচনাটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। সুনীতিবাবুর সহিত ত্রিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতার ফলে ঐ রচনার তথ্যগুলি সবই আমার পূর্ব হইতে জানা আছে। তথাপি সেগুলি ঐ প্রবন্ধে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে যে-সকল কৃতী ভারতবাসী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নূতন সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ কলিকাতার সুনীতিবাবু ও বোম্বাই-এর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর কাণে মহাশয় আমার বহু দিনব্যাপী বন্ধু ও আমার গবেষণা কার্যের উৎসাহদাতা। কাণে মহাশয়কে রাষ্ট্রপতি মহোদয় ভারতরত্ন উপাধি ও সুনীতিবাবুকে পদ্মবিভূষণ উপাধি দান করিয়াছেন। কাণে মহাশয় মারাঠী ও সুদূরে বোম্বাই-এর পন্ডিত বলিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে কিছু পরিমাণে অজ্ঞাত। তিনি চার বৎসর হইল কলিকাতার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয়ের সহিত এক সঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক পদে উন্নীত হইয়াছেন এবং তাঁহার গবেষণার বিষয় হইতেছে "ভারতীয় সংস্কৃতি" (Indology)। এখন 'ভারতরত্ন' উপাধি তাঁহাকে ভারতবাসী তথা সমগ্র পৃথিবীবাসীর কাছে অধিকতর পরিচিত করিয়া তুলিল। তাই আমি তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া পাঠাইলাম। * অমৃত পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে সাধারণ বাঙ্গালী তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিতে পারিবে।

ভাটপাড়া, ইতি ভবদীয়
২৪ পরগণা। শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য

* অন্যত্র প্রকাশিত।

অমৃত পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়, গত ২৫শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ, ১৩৬৯) শুক্রবার তারিখে প্রকাশিত অমৃত পত্রিকায় 'শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রচলিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে কয়েকটি স্থানে পাঠের ভুল আছে। আজ পর্যন্ত কেহ তাহা সংশোধন করেন নাই। আমি যথাস্থানে এই পাঠ-বিভ্রাট দেখাইয়া দিব।" প্রসঙ্গতঃ, গয়া ক্ষেত্রে পাদপদ্ম দর্শনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানসিক অবস্থা ও ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শেষে মন্তব্য করিয়াছেন—"সাধনা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য 'বাপ মোর' এবং 'প্রাণময়' একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং আমি যে পাঠ পাইয়াছি তাহাই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।" গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে প্রচলিত পাঠই গৃহীত হইয়াছে। তবে টীকায় ভাব-সমন্বয়ের চেষ্টা আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ যেরূপ প্রামাণিক ও সর্বজনমান্য তাহাতে আপাতদৃষ্টে ভুল আছে বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা নিতান্ত অনুচিত বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ-শিরোমণি 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ' বলিয়া তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-মঙ্গল (চৈতন্য-ভাগবতের আদিম নাম) গ্রন্থের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা—

চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।।
গ্রন্থ-বিস্তার ভয়ে তেঁহো ছাড়িলা
যে যে স্থান।
সেই সেই স্থান কিছু করিব ব্যাখ্যান।।
প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল
আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্বণ।।

(চরিতামৃত, আদি লীলা, একাদশ অধ্যায়।)

মহাপ্রভুর গয়া যাত্রা উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে সুমধুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর কোনরূপ টীকা টিপ্পনী না দিয়া কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় সূত্রমধ্যে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—

তবে ত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বর-পুরীর সঙ্গে তাহাই মিলন।।
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস।।

(চরিতামৃত, আদি লীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।)

যাহা হউক, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে পাঠ পাইয়া বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পত্রস্থ করিলে সাধারণে বিশেষ উপকৃত হইবে। ইতি—

বিনীত শ্রীগোলোকবিহারী রায়,
মুজাঃফরপুর, বিহার।

সম্পাদক,
'অমৃত'

সবিনয় নিবেদন,

গত পনেরোই ফেব্রুয়ারীর 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দিল্লী থেকে বলছি' শীর্ষক রচনায় শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য প্রজাতন্ত্র দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্পীদের নিদারুণ ব্যর্থতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, বাঙালী শ্রোতাদের কেউ সম্মিলিতভাবে গাওয়া নজরুল সংগীতের পরে হাততালি দেন নি। হেমন্ত-সতীনাথ প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত শিল্পী। এঁদের গান শ্রোতাদের ভালো না লাগার জন্য শ্রোতাদের বিকৃত রুচিই দায়ী। সেদিনকার অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী গায়ক-গায়িকাদের চটুল ছন্দে গাওয়া গানগুলো শ্রোতাদের মন হরণে সমর্থ হয়েছিল!

দিল্লীর বাঙ্গালী আজ তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। সেজন্যেই দেখা যায় যে, সার্বজনীন দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজোয় সারা রাত্রিব্যাপী বিনামূল্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও দেবী-প্রতিমার ভাসানে রাজধানী দিল্লীর রাজপথে বিচিত্র বেশভূষায় অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীসহকারে 'রক এণ্ড রোল' প্রভৃতি নৃত্য। যমুনার ঘাট যখন সম্মিলিত বিসর্জনের বাজনায় মুখরিত, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিদেশী দর্শকে ভর্তি, তখনই দেখা যায়, আরতির নাম করে তথাকথিত ভাকরা নৃত্য। দিল্লীর বাঙ্গালী যে তাঁর মহাপুরুষদের ভুলে যেতে বসেছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গত তেইশে জানুয়ারী নতুন দিল্লীর সর্বপ্রধান বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান 'নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব' আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখা গেল। অত্যন্ত লজ্জার ও গভীর দুঃখের বিষয় যে, সেদিনকার নেতাজী-জয়ন্তীতে ত্রিশ-চল্লিশজনের বেশী শ্রোতার উপস্থিতি ছিল না। দিল্লীতে অনেকগুলো বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু বঙ্কিম-শরৎ-মধুসূদন প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎদের জন্মদিনে স্মরণ করতে তাঁদের কুণ্ঠাবোধ আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

আমরা শ্রীভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত যে, দিল্লীর শ্রোতা ও দর্শক বাঙালী শিল্পীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল প্রভৃতির গান প্রত্যাশা করে। কিন্তু, সেই সঙ্গে গায়কেরাও নিশ্চয় শ্রোতাদের সংবেদনশীল মনের পরিচয় পেতে চাইবেন।

নমস্কার।
অশান্ত লাহিড়ী।
নতুন দিল্লী—৩।

শুপ্রন্ত

বনফুল

একাঙ্ক-নাটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যদু। সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার। এমন গেরুয়া রঙের মন্দির তো কখনও দেখি নি বাবা। মন্দিরের গা থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে।

শ্যাম। চল কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেখা যাক।

মাধব। থাম, থাম, ফট্ করে' ছুঁতে যেও না। আজকাল ইলেক্‌ট্রিসিটির যুগ, অ্যাটমিক এনার্জির যুগ, সেটা মনে রেখ। হয়তো আমেরিকা বা রাশিয়া কোন experiment করছে। কিছু বলা যায় না।

রাম। চীনও হ'তে পারে

মাধব। [চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষকদের] এই যে মাস্টারমশায়রাও এসেছেন দেখছি। কি ব্যাপার বলুন তো—! আপনারা হাতজোড় করে আছেন কেন!

চতুর্থ শিক্ষক। অপূর্ব এ আবির্ভাব! অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সত্য।

রাম। কিসের আবির্ভাব বলছেন?

চতুর্থ শিক্ষক। দেবতার। মন্ত্র শুনতে পাচ্ছেন না?

শ্যাম। মন্ত্র ওই মন্দির থেকে বেরুচ্ছে না কি?

চতুর্থ শিক্ষক। হ্যাঁ।

[সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। স্পষ্টতর হ'য়ে উঠল মন্ত্র। প্রথমে গুঞ্জনের মতো শোনাচ্ছিল।

শ্যাম। কিন্তু ওটা মন্দির না মায়া, সত্য না ছলনা, সেইটে আগে ঠিক করা দরকার।

মাধব। কিন্তু আমি বলছি ফট্ করে' ছুঁতে যেও না। শেষকালে কি হ'তে কি হবে।

যদু। [মাধবকে ধমকে] যাও, তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার তৃতীয় পক্ষের বউয়ের আঁচল ধরে, বসে, থাক গে যাও, [শ্যামকে] চল হে আমরা ছুঁয়ে দেখি। কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ মন্দির গজিয়ে উঠল ফাঁকা মাঠে! এস—

[শ্যাম প্রথমে উৎসাহ দেখিয়েছিল। কিন্তু কার্যকালে ইতস্তত করতে লাগল]

শ্যাম। [রামকে] চল না, অমন করে' দাঁড়িয়ে আছ কেন?

রাম। ভাবছি। ব্যাপারটা ভৌতিক নয় তো!

যদু। তুমি রাম, ভৌতিক যদি হয় তোমার নামেই তো ভূত পালাবে। ভূত দেখে তুমি ভয় পেলে আমরা কোথায় যাব?

হরি। কেন, তুমি তো যদুপতি, তুমিও কম কিসে হে।

যদু। ভূতের ব্যাপারে যদুপতির চেয়ে রঘুপতির দাপটই বেশী। (হাস্য) সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাই ভয় করছে।

রাম। আমারও।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কন্ঠের বজ্র-নির্ঘোষ শোনা গেল।

উদাত্ত কন্ঠ। বীর হ। সর্বদা বল 'অভীঃ'-'অভীঃ'। সকলকে শোনা মাভৈঃ, মাভৈঃ। ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক, ভয়ই অধর্ম, ভয়ই ব্যভিচার। 'আমি অমর চিন্ময় আত্মা' এই ভাব দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ কর।

[উদাত্ত কন্ঠ নীরব হল। মন্দিরের ভিতর থেকে মন্ত্রোচ্চারণ হ'তে লাগল, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ।

[পঞ্চম শিক্ষক এতক্ষণ নিমীলিত নয়নে হাত জোড় করে' দাঁড়িয়েছিলেন, এইবার তিনি কথা কইলেন]

পঞ্চম শিক্ষক। ভয় মৃত্যু, ভয় পাপ,
ভয় নরক, ভয় অধর্ম
এই কথা জপ কর
প্রাণপণে জপ কর, অহোরাত্র জপ কর।
ভয়েরই অন্ধকার নেমেছে চতুর্দিকে,
শাস্ত্র-ভয়, সমাজ-ভয়, রাজ-ভয়,
মনিব্যো-ভয়,
মৃত্যু-ভয়, দারিদ্র্যের ভয়, অপমানের
ভয়, সব অলীক সব মিথ্যা।

মাধব। আপনি যদি নির্ভয় হয়ে থাকেন তাহলে এগিয়ে গিয়ে ছুঁয়ে দেখুন ওটা সত্যিই মন্দির কি না

পঞ্চম শিক্ষক। হাত দিয়ে নয়
মন দিয়ে স্পর্শ করেছি।
তোমরাও তাই কর
তাহলেই নিঃসংশয় হবে।

চতুর্থ শিক্ষক। স্বামীজির আবির্ভাব হয়েছে সন্দেহ নেই। যেমন করেই হোক, যে কোনও কারণেই হোক, তিনি এসেছেন এখানে। আমি যাই কানু কীর্তনীয়াকে ডেকে আনি। সে এখানে এসে কীর্তন করুক। স্বামীজি গান ভালবাসতেন।

[চতুর্থ শিক্ষক চলে' গেলেন]

রাম। [শ্যামকে] চল হে আমরা গিয়ে ছুঁয়ে দেখি। যা থাকে কপালে,

মাধব। তোমরা যাও, আমি যাব না। আমি দূরে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি। তাতেও বিপদ আছে। তোমাদের যদি কিছু একটা হ'য়ে যায় সাক্ষী দিতে হবে আমাকে। সেটাও কম বিপদ নয়।

যদু। বেশ, বেশ, তুমি যেও না। চিরকালই, গা বাঁচিয়ে দূরে থেকে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছ তুমি। আমরাই যাব। শ্যাম এস। হরি, তুমিও যাবে না কি?

হরি। আপত্তি নেই

রাম। তুমি যেও না হরি। তোমার উপাধি যদিও মন্ডল, ফরসা কাপড় জামাও পর। রোজগারও ভাল করছ, কিন্তু ভুল যেও না জাতে তুমি মুচি। ওটা যদি মন্দিরই হয়, তোমার কি লাফিয়ে গিয়ে সেটা ছোঁয়া উচিত?

শ্যাম। তুমি যা বলছ তা ঠিক। কিন্তু আজকাল আইন জানো তো?

রাম। জানি। কিন্তু ওটা বাইরের আইন [হরিকে] তোমার বিবেকের আইন কি বলে?

পঞ্চম শিক্ষক। [অস্ফুট কণ্ঠে] অন্ধকার, অন্ধকার, চতুর্দিকেই অন্ধকার।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কন্ঠ-স্বর শোনা গেল]

উদাত্ত কন্ঠ। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না' ছোঁব না বলে আমরাই এদের হীন করে' ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা, কাপুরুষতায় ভরে' গেছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে। বহুকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেন্না করে' করে' তোরাই এখন জগতের ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছিস। ভুলো না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই। তুমিও কটি-মাত্র বস্ত্রাবৃত হ'য়ে সদর্পে ডেকে বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

[এই বাণী শুনে বিস্মিত হয়ে গেল সবাই। উদাত্ত কন্ঠের গম্ভীর নির্ঘোষ থেমে যাবার পরও ব্যায়ত আননে দাঁড়িয়ে রইল সকলে মন্দিরটার দিকে চেয়ে]

রাম। এর ভিতর একটা ষড়যন্ত্র আছে ভাই।

শ্যাম। বাই-ইলেক্শন হচ্ছে, কংগ্রেসের চাল বোধহয়।

মাধব। ভালো মনে হচ্ছে না! ব্যাপারটা কি হতে পারে!

যদু। যাই হোক, ভিতরে বুজরুকির গন্ধ পাচ্ছি। ওসব চালাকি আমাদের কাছে চলবে না। চলহে দেখি গিয়ে ওই আজগুবি মন্দিরের ভিতর কি আছে। কোনও লোক, না রেডিও!

[আবার উদাত্ত কন্ঠস্বর শোনা গেল]

উদাত্ত কন্ঠ। তোরা চালাকি নিয়েই সারা জীবন আছিস। নিজেরা চালাক হয়েছিস আর সকলের চালাকি ধরে' ধরে' বেড়াচ্ছিস। কিন্তু জেনে রাখ চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম হয় না। জেনে রাখ আমাদের দেশে মহৎ কর্মের মহা উদ্বোধন শুরু হয়ে গেছে, তোদের মতো ধূর্ত বাক্যবাগীশরা তাকে আর থামাতে পারবে না। হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতরা আর দাবাতে পারবে না ছোট জাতদের। তোদের এখন একমাত্র কল্যাণ হবে যদি দু'হাত বাড়িয়ে ওদের বুকে টেনে নিতে পারিস। আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়ে ওদের জ্ঞানোন্মেষ করে' দে। ওদের আপন করে' নে। তবেই তোরা বাঁচিবি।

[কন্ঠস্বর থেমে গেল। মন্দিরের ভিতর থেকে কেবল মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে লাগল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।]

রাম। ঠিক ভিতরে ট্রান্সমিটার আছে।

শ্যাম। ট্রান্সমিটার নয়, মানুষ। ঠিক আমাদের কথার পাল্টা জবাব দিচ্ছে শুনছ না?

মাধব। [মাথা নেড়ে] যাই হোক, ব্যাপারটা জটিল। আমার মনিবকে খবরটা দেওয়া দরকার।

[যদু যেন নিজেকে ব্যাপারটার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছিল না। নানাভাবে দেখছিল মন্দিরটাকে]

যদু। আমরা শিক্ষিত লোক, আমরা একটা ভাঁওতায় ভুলে যাব!

[সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল উদাত্ত কন্ঠস্বর]

উদাত্ত কন্ঠ। তোমরা শিক্ষিত নও। যাকে 'শিক্ষা বলে' তা তোমরা পাওনি। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা! যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এইসব স্কুল কলেজে পড়ে' তোরা এক ডিস্পেপ্টিক্ জাত তৈরি হয়েছিস। এই যে চাষা-ভুষো, মুচিমুদ্দফরাস এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে কাজ করে' যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাইরের হাল-চাল বদলেছে, অথচ নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এইসব সহিষ্ণু নীচ জাতের উপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে। আর তোরা 'হা চাকরি' 'যো চাকরি' করে লোপ পেয়ে যাবি। এরাই জাতের মেরুদন্ড। এরা কাজ বন্ধ করলে, তোরা অন্নবস্ত্র কোথা পাবি?

পঞ্চম শিক্ষক। শোন, শোন
কান পেতে শোন সবাই
এ অমৃতময় বাণী
এ বহুদূরাগত চিরন্তন সঙ্গীত।
বহুকাল আগে শুনেছিলাম
আবার শুনছি।
একা শুনে তৃপ্তি হচ্ছে না
ডেকে আনি সকলকে

[পঞ্চম শিক্ষক চ'লে গেলেন। হরি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। বিবেকানন্দের এই বাণী শুনে সে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠল]

হরি। ওই মন্দির সত্য কি মিথ্যা তা জানি না, কিন্তু ওর ভিতর থেকে যে বাণী নির্গত হচ্ছে তা সত্য, তা অপরূপ। আমি গিয়ে দেখব কে ওই মহাবাণীর প্রবক্তা। উনি আমার মনের কথা ব'লেছেন।

[যেতে উদ্যত হল]

রাম। একটা কথা কিন্তু মনে রেখ। ওই বাণীতে যে সব নীচ-জাতীয় শ্রমিকের কথা শোনা গেল, তুমি পুরোপুরি তা নও। তুমি নীচ-জাতীয় মুচি বটে কিন্তু তুমি লেখাপড়া শিখে তোমার কুল-কর্ম ছেড়েছ। আমাদেরই মতো কেরানী হয়েছ তুমি। চাকরি পেয়েছ বিদ্যা বা প্রতিভার জোরে নয়, হরিজন বলে।

হরি। আমরা বহুযুগ ধরে তোমাদের পায়ের তলায় কীটের মতো ছিলাম।

আজ কর্তৃপক্ষ যদি এই অন্যায়ের প্রতিকার-কল্পে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব করেই থাকেন তাতে দোষটা কি হয়েছে? মুচির ছেলে বলে আমাকে চিরকাল জুতোই সেলাই করতে হবে এমনই কি কথা আছে।

যদু। [শ্যামকে] এ আবিভর্াবটা সত্যিই কিন্তু অদ্ভুত!

[উদাত্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। অদ্ভুত বলে বিশেষ কিছু একটা নেই। অজ্ঞানতাই অন্ধকার। তাতেই সব ঢেকে রেখে অদ্ভুত দেখায়। জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হলে কিছুরই আর অদ্ভুতত্ব থাকে না। যাঁকে জানলে সব জানা যায়, তাঁকে জান, তাঁর কথা ভাব। সিংহগর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর। জীবকে অভয় দিয়ে বল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত। তোমরা

সচল হও, শক্তিমানই আত্মাকে লাভ করতে পারে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

[কণ্ঠস্বর নীরব হল। তারপর আবার ধীরে ধীরে ধ্বনিত হতে লাগল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত।

হরি। আমি যাব।

[দৌড়ে মন্দিরের দিকে চলে গিয়ে আকুলভাবে মন্দির স্পর্শ করতে লাগল।

রাম। কি দেখছ হে, সত্যি দেওয়াল ?

শ্যাম। ঢোকবার কোনো দুয়ার আছে ?

যদু। দেখ তো ভিতরে কোনও লোক আছে কি না।

[হরি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল, গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল।

রাম। হরি মূর্চ্ছা গেছে।

মাধব। (বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে) দেখ কি কান্ড হল। আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলাম। (রাম শ্যাম যদুকে) দেখ, দেখ, তোমরা। আমি যাই টংকনাথবাবুকে একটা খবর দিয়ে আসি। না দিলে অন্যায় হবে

[মাধব চলে গেল।

যদু। সরে পড়ল কেমন দেখলে ? ও টংকনাথবাবুর চাকরি করে তা ঠিক, কিন্তু সেখানে এখন যাওয়ার দরকারটা কি

রাম। ওটা একটা ছুতো।

শ্যাম। হরি, হরি, কি হল তোমার। উঠে পড়। ও হরি।

রাম। কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তো। চল, দেখি গিয়ে। এস না, সব দাঁড়িয়ে আছ সঙের মতো। এসো চল, একসঙ্গে যাওয়া যাক।

[যদু ও শ্যামের হাত ধরে টানতে লাগল।

যদু। হাত ছাড়, হাত ছাড়, যাচ্ছি—

শ্যাম। গিয়েই বা কি করব। আমরা কি ডাক্তার ? এই ফাঁকা মাঠে একফোঁটা জলও নেই যে মুখে ঝাপটা দেব। আমি বরং কোথাও থেকে একটু জল যোগাড় করে আনি। হাত ছাড় না—

রাম। আরে আগে দেখাই যাক না ব্যাপারটা কি। সব একসঙ্গে যাই চল—কাম অন—

[কিন্তু যাবার আর দরকার হল না। হরি এসে হাজির হল। তার চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চারিদিকে চাইতে লাগল।

রাম। কি দেখলে হে ?

[হরি নিরুত্তর।

শ্যাম। হাত দিয়ে দেখলে ? মন্দিরের দেওয়াল রয়েছে ?

[হরি নিরুত্তর।

যদু। আরে কথা বলছ না কেন !

[হরি তবুও নিরুত্তর। রাম তার কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকাতে লাগল।

রাম। তোমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল কেন হে। কিছু বল একটা। কি দেখলে—

হরি। যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয় !

[নির্ণিমেষে মন্দিরটার দিকে চেয়ে রইল।

শ্যাম। মন্দিরটা সত্যি মন্দির তো ? ছুঁয়ে দেখেছ ভালো করে ? সত্যি দেওয়াল ?

[হরি নিরুত্তর। দূরে খোলের শব্দ শোনা গেল। হরি আরও কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল।

রাম। পাগল হয়ে গেল না কি ছোকরা !

শ্যাম। ওহে ওই দলবল নিয়ে কানু কীর্তনীয়া আসছে। মহা হল্লা জুড়ে দেবে এখনই। ওসব হৈ-হল্লা শুনলে বুক ধড়ফড় করে আমার, ডাক্তারবাবু করোনারির সন্দেহ করছেন। তাছাড়া বাজার করা হয়নি এখনও। আলোকের কথা শুনে দৌড়ে চলে এলুম।

যদু। আলোক কোথা গেল বল তো ?

শ্যাম। সব্বাইকে খবর দিয়ে বেড়াচ্ছে। হুজুকে ছোঁড়া তো।

রাম। ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। আমার মনে হয় পুলিশে একটা খবর দিয়ে দেওয়া উচিত।

শ্যাম। ঠিক বলেছ। তারাই investigate করুক। আমি বাজারে চললুম। তোমরা থানায় চলে যাও, থানা তো পাশেই—

[রাম শ্যাম যদু চলে গেল। চতুর্থ শিক্ষকের সঙ্গে খোল কর-তাল বাজাতে বাজাতে প্রবেশ করল কানু কীর্তনীয়ার দল। তারা গান ধরেছে—ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী......। চতুর্থ শিক্ষক ভাবে গদগদ হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে গানের সঙ্গে করতালি দিতে লাগলেন। মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হয়ে উঠল।

উদাত্ত কণ্ঠ। স্তব্ধ হও। এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজান কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহ-নাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা। গীত-গোবিন্দ নয়, এখন গীতার বাণী শোনাতে হবে সবাইকে—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্
অনার্য জুষ্টম স্বর্গ্যম কীর্তিকর মর্জ্জুন।
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ
ত্বয্যুপ পদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ
পরন্তপ।

সবাইকে ডেকে বল, এই সংকটকালে এ মোহ তোমার কোথা থেকে এল ? এ যে আর্যগণের অযোগ্য, এ যে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, এ যে অকীর্তিকর। হে অর্জুন, তুমি ক্লীবতা ত্যাগ কর। কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রু-তাপন বীর, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তোরা সবাই ক্লীব হয়ে গেছিস, যে বাণী শুনিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ক্লীবত্ব ঘুচিয়েছিলেন সেই বাণী এখন জপ কর। এখন প্যান প্যান করে প্রেমের গান নাকি সুরে গাইলে আরও ক্লীব হয়ে যাবি। রাধার নয়, এখন চন্ডীর রূপ ধ্যান কর

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্য দলনী,
যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণ চণ্ডমুণ্ডে মথনী
যা রক্তবীজাশনী
শক্তিঃ শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য দলনী
যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটি মূর্তি সহিতা
মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।

যে চণ্ডী মধুকৈটভকে দলন করেছেন, মহিষাসুরকে বিনাশ করেছেন ধূম্র-লোচন চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করেছেন, যিনি রক্তবীজ ভক্ষণ করেছেন সেই শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যদলনী চণ্ডীকে ডাক এখন।

[উদাত্ত কণ্ঠস্বর নীরব হল। স্তব্ধ হয়ে গেল চতুর্দিক। কানু কীর্তনীয়ার দল ও চতুর্থ শিক্ষক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জমিদার টংকনাথের প্রবেশ, সঙ্গে মাধব। জমিদার টংকনাথের প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। চোখ দুটিও বড় বড় এবং রক্তাভ। হাতে একটি রুপোবাঁধানো মালাক্কা বেতের লাঠি। গায়ে দামী শাল, আঙুলে দামী আংটি, পায়ে দামী পাম্পশু। খানদানি জমিদারের চেহারা।

মাধব। [কানু কীর্তনীয়ার দলকে] ও হে তোমরা সরে যাও, সরে যাও। হাল্লা কোরো না এখানে। জমিদারবাবু এসেছেন।

চতুর্থ শিক্ষক। [শশবাস্ত] ও, টংকনাথ-বাবু এসেছেন!

মাধব। আমি গিয়ে ও'কে নিয়ে এলাম। এখানে ভয়ানক কান্ড হচ্ছে যে। এ জমির উনিই মালিক

চতুর্থ শিক্ষক। কোন জমির

মাধব। এই জমির, যে জমিতে মন্দির উঠেছে [কীর্তনীয়াদের] ওহে তোমরা যাও এখান থেকে

[কীর্তনীয়ার দল চলে গেল। টংকনাথ সবিস্ময়ে মন্দিরটা দেখছিলেন]

টংকনাথ। সত্যিই, আশ্চর্য ব্যাপার। আমার অনুমতি না নিয়ে কে মন্দির তুললে আমার জমিতে। মাধব যখন বললে আমি বিশ্বাসই করিনি। এখন দেখছি সত্যি। কে তুললে এ মন্দির [চোখ পাকিয়ে] তার নামে কেস করব আমি। কে তুললে

[জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চতুর্থ শিক্ষকের দিকে চাইলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। আমি জানি না কে তুলেছে

[আর একদল ছেলের সঙ্গে আলোকের প্রবেশ]

আলোক। [উদ্ভাসিত চক্ষে মন্দিরের দিকে চেয়ে] ওই দেখ, ওই দেখ আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে মন্দির উঠেছে। মন্দিরের ভিতর থেকে স্বামীজি কথা বলছেন। ওই যে—শোন, ভাল করে শোন

[মন্দিরের ভিতর থেকে মন্ত্র উচ্চারিত হ'তে লাগল—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় চ]

টংকনাথ। তুমি কে হে ছোকরা। এ মন্দির কে তুললে

আলোক। তা জানি না। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম মন্দির উঠেছে এখানে একটা। দেখছি, সত্যিই উঠেছে। আর কিছু জানি না।

টংকনাথ। স্বপ্ন দেখলে আর মন্দির উঠে গেল! আমাকে বোকা ঠাউরেছ না কি [ধমক দিয়ে] কে তুললে এই মন্দির সত্যি করে বল

আলোক। আমি জানি না, বোধহয় আপনি উঠেছে

টংকনাথ। আপনি উঠেছে! কে তুই? কার ছেলে?

আলোক। আমার বাবার নাম শ্রীশঙ্কর-সেবক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখান-কার শিবমন্দিরের পুরোহিত

টংকনাথ। ও, শংকর পান্ডার ছেলে তুমি! বুঝেছি। সেই তাহলে স্বপ্নের গুজবটা ছড়িয়ে রাতারাতি এই মন্দির তুলেছে। বুঝেছি, এতক্ষণে বুঝেছি। তোমার বাবাকে বলে দিও, আমি টংকনাথ, ভাঁওতায় ভোলবার লোক নই। মন্দিরের ভিতর মন্তর আওড়াচ্ছে কে? তোর বাবা, না আর কেউ

আলোক। [সভয়ে] আমি জানি না

টংকনাথ [আলোকের সঙ্গে যে কিশোর দল এসেছিল তাদের লক্ষ্য করে] তোমরা দেখে এস তো মন্দিরের ভিতর কে আছে—

[ছেলেরা চলে গেল। আলোকও গেল তাদের সঙ্গে]

টংকনাথ। [চতুর্থ শিক্ষকের দিকে চেয়ে] ও মাষ্টারমশাই না কি! আপনাকে প্রথমে চিনতে পারিনি। আপনিও এর মধ্যে আছেন দেখছি। এখন তো আপনার আমার ছেলেকে পড়াতে যাওয়ার কথা। আপনি এখানে কি করছেন? আমাদের বাড়িতে যান নি?

চতুর্থ শিক্ষক। গিয়েছিলাম। আপনার গৃহিণী বলে পাঠালেন ছেলে আজ সিনেমা দেখতে যাবে, পড়বে না। তাই চলে এলাম।

টংকনাথ। ও আচ্ছা। এখানে ব্যাপার কি বলুন তো। আমার জমিতে মন্দির ওঠালে কে

চতুর্থ শিক্ষক। কে ওঠালে তা জানি না, কিন্তু উঠেছে দেখছি। আমরা কয়েকজন শিক্ষক এই মাঠে বেড়াতে এসেছিলাম। হঠাৎ মন্দিরটা দেখতে পেলাম। ওই আলোকই ছুটে ছুটে এসে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে

টংকনাথ। আলোক? ও, ওই ফরসা ছোঁড়াটা? আগে থাকতে ও'কে চিনতেন না কি।

চতুর্থ শিক্ষক। হ্যাঁ। ও আমাদের স্কুলে ক্লাশ টেনে পড়ে যে। হীরের টুকরো ছেলে। প্রত্যেক বিষয়ে ফার্ষ্ট হয়। যেমন মেধাবী, তেমনি বিনয়ী

টংকনাথ। তাই না কি। কোন মাষ্টার পড়ায় ওকে বাড়িতে বলুন তো

চতুর্থ শিক্ষক। প্রাইভেট টিউটার রাখবার পয়সা নেই ওর বাবার। নিজেই পড়ে, খুব ভালো ছেলে

টংকনাথ। কিন্তু ওর বাবা শংকর পান্ডা তো একটা লোফার, মহা ধূর্ত। মনে হচ্ছে এ মন্দিরের ব্যাপারে ওরই হাত আছে। এখুনি এর একটা কিনারা করে যেতে চাই। কই, ছেলেগুলো এখনও ফিরল না তো। মাধব দেখ তো গিয়ে

[মাধবকে আর যেতে হল না। ছেলের দল সমস্বরে গান গাইতে গাইতে ফিরে এল। সকলেই শংকরাচার্যের শিবাষ্টক স্তোত্রটি গাইছে— প্রভু মীশমনীশমশেষ গুণং, গুণহীন মহীশ গরাভরণম্। রণ নির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম্, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ইত্যাদি—]

টংকনাথ। আরে, গান গাইছ কেন! কি দেখলে, কে আছে ওই মন্দিরে—

[ছেলেরা কোন উত্তর দিলে না, গান গাইতে গাইতে চলে গেল]

টংকনাথ। এ কি, আমার কথার জবাব দিলে না! ব্যাপার কি হে মাধব

মাধব। আজকালকার ডেঁপো ছোকরাদের ওই রকমই ব্যাপার হুজুর। মানীর মান রাখতে ওরা শেখে নি। দেখি, আমি ওদের কাছ থেকে যদি কোন খবর আদায় করতে পারি

টংকনাথ। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস না ব্যাপারটা কি

মাধব। আমি? হ্যাঁ, দরকার হলে নিশ্চয় যাব। আগে দেখি ও ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিছু বার করতে পারি কি না

[মাধব চলে গেল। তার ভাব-ভঙ্গী থেকে মনে হল সে নিজে ওই মন্দিরের ভিতর যেতে রাজী নয়। বাকী চারজন শিক্ষক প্রবেশ করলেন। টংকনাথকে দেখে পঞ্চম শিক্ষক ছাড়া আর সবাই হাত কচলাতে লাগলেন]

প্রথম শিক্ষক। আপনি এখানে। বিশেষ একটা দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। শুনে ছুটতে ছুটতে আসছি

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক। আমরাও গিয়েছিলাম

টংকনাথ। কি দরকার আপনাদের। আপনাদের ছেলেদের ব্যাপার না কি। ওরা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে খবর পেয়েছি

প্রথম শিক্ষক। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তাদের বাঁচান

দ্বিতীয় শিক্ষক। আপনি আমাদের মাতব্বর তাই আপনার কাছেই ছুটে গিয়েছিলাম

তৃতীয় শিক্ষক। আপনি দয়া করে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিন। আপনি এক লাইন লিখে দিলেই দারোগা ওদের ছেড়ে দেবে।

টংকনাথ। তা দেবে। কিন্তু—আচ্ছা সে আপনারা পরে বুঝবেন। আপনাদের কাছে কাগজ আছে? দিন লিখে দিচ্ছি এখুনি

তৃতীয় শিক্ষক। আমার এই ডায়েরির পাতাটা ছিঁড়ে দিচ্ছি। কলম আছে

টংকনাথ। দিন

[ডায়েরির পাতায় খস খস ক'রে লিখে দিলেন]

এই নিন। এখন আপনাদের ছেলেরা ছাড়া পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের নামে 'কেস' হবেই, সেটা ঠেকাতে পারা যাবে না। কেস লড়তে পারবেন তো?

দ্বিতীয় শিক্ষক। আমরা অসমর্থ অসহায় নিঃস্ব। যদি লড়তেই হয়, আপনিই আমাদের কৃপা করবেন

টংকনাথ। আমি কত লোককে কৃপা করব!

তৃতীয় শিক্ষক। কৃপা আপনাকে করতেই হবে

[হাঁটু গেড়ে টংকনাথের পায়ে হাত দিল]

টংকনাথ। কি মুশকিল, উঠুন উঠুন। টাকা আমি দেব, কিন্তু শোধ ক'রে দিতে হবে সেটা

প্রথম শিক্ষক। [করজোড়ে] একসঙ্গে পারব না, ক্রমে ক্রমে করব

টংকনাথ। বেশ তাই করবেন। আপনাদের কাছ থেকে six per cent-এর বেশী নেব না

দ্বিতীয় শিক্ষক। [সজল কণ্ঠে] আমরা আপনারই স্কুলের মাস্টার। আপনারই অন্নদাস। আপনারই চাকর, মারতে হয় মারুন, রাখতে হয় রাখুন। আমরা মরে যাচ্ছি মরে যাচ্ছি—

[মন্দিরের ভেতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠের নির্ঘোষ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। কি কচ্ছিস? এত লেখাপড়া শিখে ভিখারীর মতো হাহাকার কচ্ছিস? জুতো খেয়ে খেয়ে, দাসত্ব করে' করে' তোরা কি মানুষ আছিস? দেখছি ঘৃণিত কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে পড়েছিস। এমন সুজলা সুফলা দেশ, সেখানে তোদের পেটে অন্ন নেই, পিঠে কাপড় নেই। অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এ কি দুর্দশা। ছি, ছি, ছি, ছি। অথচ নিজেদের প্রশংসায় তো তোরা পঞ্চমুখ। যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না সে জাতের আবার বড়াই—

[কণ্ঠস্বর যেন ক্ষোভে দুঃখে রুদ্ধ হয়ে গেল]

টংকনাথ। [কটমট করে' মন্দিরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন] কে ব'সে আছে ওখানে। বেরিয়ে এস বলছি। বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস, কে তুমি—

[টংকনাথ ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক সুট সুট ক'রে সরে পড়লেন। চিঠিখানা নিয়ে থানায় গেলেন সম্ভবত। টংকনাথের চীৎকার সত্ত্বেও মন্দির থেকে কোনও লোক বেরিয়ে এল না। বেরিয়ে এল একটা অপূর্ব গান। কে যেন সুললিত কণ্ঠে শঙ্করাচার্যের নির্বাণষট্ক গাইতে লাগল]

গান

ওঁ মনো বুদ্ধ্যহংকার চিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্র জিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে
ন চ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ু
—শিচদানন্দ রূপঃ শিবোহম্
শিবোহম্।

ন চ প্রাণ সংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চবায়ু
র্ন'বা সপ্তধাতু র্ন'বা পঞ্চকোষাঃ
ন বাক পাণিপাদম্ ন চোপস্থ পায়ু
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহম্ শিবোহম্।
ইত্যাদি—

[গানের উদাত্ত সুমধুর সুরে সম্মোহিত হ'য়ে টংকনাথ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। কিন্তু একটু পরেই সম্বিত ফিরে পেলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষক হাতজোড় ক'রে মন্দিরের দিকে চেয়ে আছেন]

টংকনাথ। মাস্টারমশাইরা, একটু এগিয়ে দেখুন না, ব্যাপারটা কি হচ্ছে ওখানে

চতুর্থ শিক্ষক। আপনি বলছেন যখন, যাচ্ছি, কিন্তু গিয়ে কিছু বোঝা যাবে না

টংকনাথ। মন্দিরের একটা দরজা আছে কিনা, সেটা তো বোঝা যাবে

চতুর্থ শিক্ষক। আপনি যখন বলছেন—যাই [চলে গেলেন]

পঞ্চম শিক্ষক। দরজা আছে,
কিন্তু বাইরে নেই।
আছে আপনার হৃদয়ের মধ্যে।
সেই দরজা দিয়ে যদি ঢুকতে পারেন
তাহলেই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন।

টংকনাথ। এ কি, আপনি হেঁয়ালিতে কথা বলছেন দেখছি

পঞ্চম শিক্ষক। সত্য অনেক সময় হেঁয়ালির মতো শোনায়। ও মন্দিরে ঢোকবার একমাত্র দরজা আছে বুকের মধ্যে, বিশ্বাস করুন এ কথাটা

টংকনাথ। [স-শ্লেষে] বিশ্বাস করতাম কথাগুলো যদি আপনার মেয়ের রাঙা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু সে তো একদিন মাত্র এসে বেশ কিছু টাকা নিয়ে চলে গেল, আর তো এল না

পঞ্চম শিক্ষক। [শান্তভাবে] জানি না কেন আসেনি। বোধহয় আপনার চেয়ে বেশী ধনী ক্রেতা পেয়েছে কোথাও। মনে হচ্ছে, ঠিক জানি না।

টংকনাথ। আপনার মেয়ে কোথায় যায় তা আপনি জানেন না?

পঞ্চম শিক্ষক। না। একটি কথা জানি শুধু

টংকনাথ। কি সেটা

পঞ্চম শিক্ষক। আমি অক্ষম, আমি পাপী।

দেশজোড়া ব্যাভিচারের খর-স্রোতে
পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি
খড়ের টুকরোর মতো ভেসে গেছি।
আমি ব্রাহ্মণ,
আমি শিক্ষক,
তবু দুরাত্মা ধনীর পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি
অন্নবস্ত্রের জন্য
নগ্ন হ'য়ে অনাহারে মরতে ভয় পেয়েছি।
আমি অক্ষম, আমি পাপী, আমি ভীতু।
দেশজোড়া তামসিকতার তোড়ে ভেসে যাচ্ছি
এই শুধু জানি, আর কিছু জানি না

টংকনাথ। আপনি অক্ষম পাপী ভীতু হ'তে পারেন, কিন্তু দেশের সবাইকে আপনার দলে টানছেন কেন! আপনি তামসিক হ'তে পারেন, কিন্তু দেশের সবাই তামসিক এর কি কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে? ননসেন্স!

[মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠ সহসা ধ্বনিত হল]

উদাত্ত কণ্ঠ। দেখছ না, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণ-সমুদ্রে ডুবে গেল। যেথায় মহাজড়-বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করতে চায়, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করতে চায়, যেথায় ক্রুর কর্মী তপস্যাদির ভান ক'রে নিষ্ঠুরতা-কও ধর্ম করে' তোলে, যেথায় নিজের সামর্থ্য-হীনতার উপর দৃষ্টি কারো নেই, কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষ নিক্ষেপ; বিদ্যা যেথানে কেবল কতিপয় পুস্তক-কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিত-চর্বণে, এবং সর্বোপরি গৌরব

পিতৃপুরুষের নাম-কীর্তনে সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবছে তার কি প্রমাণান্তর চাই ?

[টংকনাথ খোশামোদে অভ্যস্ত। মুখের উপর এইসব কড়া কড়া কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন]

টংকনাথ। [পঞ্চম শিক্ষককে] মনে হচ্ছে আপনারই কোনও উকিল ওখানে ব'সে আছে ?

পঞ্চম শিক্ষক। আমার একার নন, উনি সক'লের উকিল।

[চতুর্থ শিক্ষক ফিরে এলেন]

চতুর্থ উকিল। না, কোনও দরজা দেখতে পেলাম না

টংকনাথ। কাছে গিয়েছিলেন ?

চতুর্থ শিক্ষক। না, যেতে সাহস হচ্ছে না। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হচ্ছে মন্দিরের গা থেকে

টংকনাথ। আপনি এত ভীরু ? আমি যাব

[টংকনাথ মন্দিরের দিকে চ'লে যাচ্ছিলেন। চতুর্থ শিক্ষক বাধা দিলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। আপনি যাবেন না, যাওয়া নিরাপদ নয়

টংকনাথ। আমাকে যেতেই হবে। দেখতে হবে এ কিসের ষড়যন্ত্র

[চ'লে গেলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। গেলেন বটে, কিন্তু কাছে ভিড়তে পারবেন না। আমি দেখলুম স্ফুলিঙ্গের মতো কি যেন ছিটকে ছিটকে বেরুচ্ছে। বিদ্যুৎ ছাড়া ও কি'সের আলো হ'তে পারে !

পঞ্চম শিক্ষক। বিদ্যুতের আলো যেখান থেকে আসে
সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র যাঁর কাছে আলোর জন্য ঋণী
আমাদের যে আলো আমরা নিবিয়ে ফেলেছি
এ সেই আলো, সেই আলো

চতুর্থ শিক্ষক। সত্যিই কি তাহলে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন ওই মন্দিরের মধ্যে ? সত্যিই কি ? যে সব বাণী শুনেছি এতো তাঁরই বাণী। সত্যিই কি তাহলে উনি ওই মন্দিরের মধ্যে এসেছেন। মন্দিরে কোন দ্বার নেই, কি ক'রে প্রবেশ করলেন তিনি ? কিছুই জানি না, আমরা শিক্ষক কিন্তু কোন জ্ঞানই নেই আমাদের। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছুই জানি না, কিছুই বুঝতে পারি না। নিজেদের বড়ই হীন মনে হচ্ছে। সাহস ক'রে ওই মন্দির স্পর্শ করতে পারলাম না। কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না। সত্যিই বড় ভয় করছে।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠের বাণী শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। ভয় কি ! বল আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান আমি ব্রহ্মবিৎ আমি প্রজ্ঞাবান আমি মায়ের সন্তান। সাহস ক'রে এগিয়ে যা দেখবি ভয় মিথ্যা। ভয় তামস প্রকৃতির লক্ষণ। আমি দুনিয়া ঘুরে দেখলুম এ দেশের মতো এতো অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। বাইরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ত্ব। ভয় কি ! ভয় মিথ্যা। নির্ভয়ে চলে আয়

[আলোককে টানতে টান'তে মাধব প্রবেশ করলেন। উদাত্ত কণ্ঠ থেমে গেল]

মাধব। বল ছোঁড়া, এ মন্দির কোথা থেকে এল। এ নিশ্চয় তোদের কারসাজি। বল মন্দি'রের ভিতর কে ব'সে আছে

আলোক। আমি জানি না। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, দেখছি আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। এর বেশী আমি আর কিছু জানি না। তখন মন্দিরের কাছে যেতেই কে যেন আমার কা'ন কানে বললেন—শংকরের প্রভু মীশমলীশ স্তোত্রটা সুর ক'রে গা' দেখি। তাই আমরা গাইছিলাম। উনিও যেন আমাদের সঙ্গে গাইছিলেন

মাধব। 'উনি'টা কে

আলোক। আমার মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ

মাধব। [ভেংচে] স্বামী বিবেকানন্দ। বল, সত্যি কথা বল এখনও

[তার কান ধরে টানতে লাগলেন]

আলোক। আমার কান ছেড়ে দিন। আমি মিথ্যা কথা কখনও বলি না। কান ছেড়ে দিন—

[আলোকের চোখমুখে উদ্দীপনার এমন একটা ছটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে মাধব পিছিয়ে গেলেন। টংকনাথ নিজের ডান হাতটা দেখতে দেখতে ফিরে এলেন। তাঁর কপা'লে কুঞ্চন মুখ গম্ভীর। তিনি এসে আবার মন্দিরটার দিকে চাইলেন]

টংকনাথ। [অস্ফুট স্বরে] আশ্চর্য।

চতুর্থ শিক্ষক। [সাগ্রহে] কি দেখলেন ?

টংকনাথ। ওখা'নে মন্দির নেই। দেওয়ালের মতো শক্ত কিছু হাতে ঠেকল না। হাত দিতেই হাতটা পুড়ে গেল। মনে হল যেন জ্বলন্ত অগ্নি-শিখায় হাত দিলুম। অথচ দেখছি হাতে কিছু হয়নি। মনে হয় জমি খুঁড়ে ওর মধ্যে কেউ পেট্রল বা স্পিরিট ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমি ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিচ্ছি

আলোক। [সানুনয়ে] না, না, ওসব কিছু করবেন না। আপনারা বুঝতে পারছেন না। আমার স্বপ্ন সফল হয়ে'ছে। আমি রোজ স্বামীজিকে প্রাণভরে ডাকতাম। তিনি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন

মাধব। (ধমক দিয়ে) চুপ কর, ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। ও'র স্বপ্ন সফল হয়েছে। [টংকনাথকে] আমার একটা পরামর্শ শুনবেন ?

টংকনাথ। কি বল,

মাধব। একটু আড়া'লে চলুন তাহলে

[টংকনাথকে নিয়ে আড়ালে গেলেন]

আলোক। [অসহায়ভাবে] এরা বুঝতে পারছে না, এরা বুঝতে পারছে না। আমি গিয়ে সবাইকে খবর দিই। সবাই এসে দেখুক অসম্ভব সম্ভব হয়েছে

[আলোক চ'লে গেল]

(ক্রমশঃ)

ভারতরত্ন মহামহোপাধ্যায় কাণে

ভবতোষ ভট্টাচার্য

শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত চিপলুনের সন্নিহিত পরশুরাম গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ জেলারই অন্তর্গত দাপোলি গ্রামের এক পুরোহিত বংশসম্ভূত। তাঁহার পিতা বামনরাও ১৮৭৪ ও ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে প্রবেশিকা ও জেলার উকীলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে মফঃস্বল আদালতে ওকালতি করিতে থাকেন। পুত্র পাণ্ডুরঙ্গ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাই শহরের উইলসন কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেখান হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাউদাজী পুরস্কার লাভ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় কয়েকবার বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বি-এ পাশের পর তিনি উইলসন কলেজে দুই বৎসরের জন্য 'দক্ষিণা সদস্য' নিযুক্ত হন এবং যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম আইন পরীক্ষায় এবং ইংরাজী ও সংস্কৃতের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য তিনি 'ঝালা বেদান্ত পুরস্কার' প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি রত্নগিরির সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে প্রবিষ্ট হন এবং দুই বৎসর পরে 'সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাস'-সংক্রান্ত ইংরাজী প্রবন্ধ রচনার জন্য মণ্ডলিক স্বর্ণপদক লাভ করেন। পর বৎসর তিনি বোম্বাইয়ের এলফিনস্টন হাইস্কুলে প্রধান সংস্কৃত শিক্ষকরূপে স্থানান্তরিত হন এবং 'রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে হিন্দু সমাজের অবস্থা'-বিষয়ক ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি ১৫০, টাকার মণ্ডলিক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর কয়েক মাসের জন্য এলফিনস্টোন কলেজে অস্থায়ীভাবে সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করেন। কিন্তু তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া অপেক্ষাকৃত কৃতিত্বহীন ব্যক্তি সরকারী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হওয়ায়, তিনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দেন ও বোম্বাই হাই-কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন এবং পর বৎসর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এল-এম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তৎসংশ্লিষ্ট ভাষা সম্বন্ধে 'উইলসন ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বক্তা' (Wilson Philological Lecturer) রূপে ছয়টি বক্তৃতা দেন এবং ১৯১৫—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ এই দুই বৎসরের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ভূগোল' সম্বন্ধে গবেষণার জন্য মাসিক একশত টাকা হারে 'স্প্রীঙ্গার গবেষণা বৃত্তি' (Springer Research Schorlarship) লাভ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অল্প কয়েক মাসের জন্য তিনি উইলসন কলেজে বিনা বেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। তাহার পর ১৯১৭ হইতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছয় বৎসরের জন্য মাসিক ৩৫০, টাকা বেতনে গবর্নমেন্টল কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁহার ইংরাজী ব্যাখ্যাদিসমেত বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণের' সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত পুস্তকের ইংরাজী ভূমিকাটি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাস-সম্পর্কীয় ও ১৭৭ পৃষ্ঠাব্যাপী। ইহার প্রকাশকাল তাঁহার ল' কলেজের অধ্যাপনা সমাপ্তির সমসাময়িক। সেই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাণে হাইকোর্টে ওকালতির সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট পুস্তক রচনার পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে লাগিলেন। ইহা হইল History of Dharmasastra বা 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস'। ইহার প্রথম হইতে চতুর্থ খণ্ড যথাক্রমে ১৯৩০, ১৯৪১, ১৯৪৬ ও ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথম ভাগ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় ভাগ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে পুণা ভাণ্ডারকর ইন্সটিটিউট নামক গবেষণা ভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডক্টর

রাধাকৃষ্ণন শেষ খণ্ডের শেষ ভাগের ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন ও উক্ত ১৭ই নভেম্বর তারিখে উক্ত ইন্‌স্টিটিউট ভবনে উপস্থিত হইয়া গ্রন্থকার কাণে মহাশয়ের সপ্রশংস গুণোল্লেখ করিয়া ইহার প্রকাশ ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ৬৫০০ ও মূল্য ১৯০ টাকা। উহার প্রথম খণ্ডে ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সম্ভাব্য রচনাকাল, দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণ, আশ্রম, সংস্কার, আহ্নিক, আচার, দান, প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ ও বৈদিক যজ্ঞ, তৃতীয় খণ্ডে রাজধর্ম, ব্যবহার ও সদাচার, চতুর্থ খণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ, অশৌচ ও তীর্থ এবং পঞ্চম খণ্ডে ব্রত, কাল ও মুহূর্ত, শান্তি, পুরাণ, তন্ত্র, বৌদ্ধধর্ম, মীমাংসাশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, সাংখ্য, যোগ, সৃষ্টিতত্ত্ব, কর্ম ও পুনর্জন্ম, ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ পরিণতি —এই বিষয়গুলি যথাক্রমে ও প্রচুর সংস্কৃত উদ্ধৃতিসহ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আবার, তাঁহার 'সাহিত্যদর্পণের' ভূমিকাস্বরূপ রচিত 'সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ইতিহাস' ৪৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ধিতকলেবর হইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে এবং আরও কিছু বর্ধিত আকারে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারত সরকার তাঁহাকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পরপর এলাহাবাদ ও পুণা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট্ উপাধির দ্বারা ও সম্প্রতি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এল-এল-ডি উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই-এর 'এশিয়াটিক সোসাইটি' সভা এবং লণ্ডনের 'প্রাচ্য ও আফ্রিকাসম্পর্কীয় গবেষণার' (School of Oriental and African Studies) তাঁহাকে 'সম্মানাত্মক সদস্য' (Honorary fellow) করিয়াছেন। ভারত সরকার ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা-দিবসে তাঁহাকে মাসিক ২৫০০ টাকা বৃত্তিতে পাঁচ বৎসরের জন্য জাতীয় অধ্যাপকপদে বৃত করিয়াছেন ও গত ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র-দিবসে রাষ্ট্রপতি মহোদয় তাঁহাকে 'ভারতরত্ন' উপাধি দান করিয়াছেন। বর্তমানে কাণে মহাশয়ের বয়স ৮৩ বৎসর হইলেও তিনি এখনও যুবকের ন্যায় কর্মঠ ও উদ্যমশীল। ৩৩ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড নিঃশেষিতপ্রায় বলিয়া তিনি ঐ খণ্ডের বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং বর্তমান লেখককে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আগামী মার্চ মাস হইতে সেই শ্রমসাধ্য কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিবেন।

পরিশিষ্ট

কাণে মহাশয়ের রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পুস্তকের তালিকা :

(১) নীলকণ্ঠ ভট্ট রচিত 'ব্যবহার-ময়ূখের' পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ইংরাজী ব্যাখ্যাসম্বলিত সংস্করণ।
(২) ঐ পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ।
(৩) কাত্যায়নস্মৃতিসারোদ্ধার : (ইংরাজী ভূমিকা, ও অনুবাদ নজীরসহ)।
(৪) ধর্মশাস্ত্রবিচার (মারাঠী পুস্তক)
(5) A Brief Sketch of the Purva-mimansa system
(6) Vedic Basis of Hindu Law

আবার প্রজাপতিটার গায়ে সিঁদুর মাখাল মা। প্রজাপতির গায়ে সিঁদুর মাখালে নাকি বিয়ের ফুল ফুটবে। দিদির বিয়ের ফুল। আমি প্রজাপতিটাকে দেখলাম। সুন্দর প্রজাপতিটার গায়ে যেন রঙের বাহার। সবুজ-হলুদ লাল কালো রঙের ছোপ। সিঁদুর-মাখা প্রজাপতিটার দিকে দিদি তাকাল। ওর চোখে চোখ পড়ল আমার। দিদি হেসে ফেলল। আমারও হাসি পেল।

বিয়ের আবার ফুল কিরে দিদি? প্রশ্নটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

যা দুষ্টু কোথাকার ঃ দিদি যেন কপট গম্ভীর হয়ে উঠল। তারপর বারান্দাটা পেরিয়ে দাদার বাগানটায় গিয়ে হাজির হল।

সাদা ডালিয়াগুলোর মাঝখানে যেন হারিয়ে গেল দিদি। দিদি অসম্ভব ফর্সা ছিল তো। লোকে বলে ফর্সা নয়। দিদির যেন কি রোগ হয়েছিল। ধবল। শ্বেতী। দাদা কিন্তু তা বলতো না। রোগ নয়। দাদা দিদিকে ডাকতো মহাশ্বেতা।

আমি কিন্তু ওসব বলতাম না। আমার দিদিকে কেমন যেন মেম মেম মনে হত। আমি ডাকতাম মেমদিদি।

অথচ এই মেমদিদির জন্যে মায়ের চিন্তার শেষ ছিল না। ও যেন মার বুকে একটা জগদ্দল পাথর। ওকে সরাতে না পারলে মা যেন নিশ্চিন্তে শ্বাস ফেলতে পারছে না। কেমন যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হত মার। কত প্রজাপতির গায়েই তো সিঁদুর মাখালে মা। কিন্তু আসল প্রজাপতি বুঝি এখনো আসে নি।

দাদা কিন্তু ওসব বিশ্বাস করতো না। তাই মা দাদাকে পাগল বলতো। সত্যি পাগলই বটে। দাদা মার মতো প্রজাপতির গায়ে সিঁদুর মাখাতো না! তবু প্রজাপতির প্রতি দাদারও কেমন যেন আকর্ষণ ছিল। দাদা প্রজাপতি ধরতো। জীবন্ত অবস্থায় পিচবোর্ডের গায়ে আটা দিয়ে লাগিয়ে রাখতো ওদের। কত রঙ-বেরঙের প্রজাপতি। দাদা তাঁর নিজস্ব 'কোডে' নাম রাখতো ওদের। বিশেষ বিশেষ নাম ধরে ওদের ডাকতো। আমি চেয়ে থাকতাম। দাদার যাদুঘরে প্রজাপতিদের মধ্যে হয়তো সিঁদুর-পরা কোন একটা প্রজাপতিও ধরা পড়েছে মনে হতো। মনে হতো মার হাতে সিঁদুর-দেয়া সেই বড় প্রজাপতিটা যেন আটায় বন্দী হয়ে কাঁদছে। ঠিক যেমন কখনো কখনো দিদি কাঁদতো ওর ভাগ্য নিয়ে।

দাদার বন্দীশালায় ওরা বন্দী। সেই বন্দীশালার অধ্যক্ষের মতো হেসে উঠে দাদা বলতো ঃ জানিস পীযুষ, ওরা মিছেই মাকে ভোগাচ্ছে। মার হাতের স্নেহ সিঁদুরের মূল্য ওরা দেবে না। তাইতো ওদের আমি বন্দী করেছি। দাদা আবার হেসে উঠতো। মৃত প্রজাপতির যাদুঘরটা যেন কেঁপে উঠতো। আর ভয়ে আমিও কাচের উপর কেঁপে উঠতাম।

এমনি আর একদিন কেঁপে উঠেছিলাম। যেদিন দাদা চলে এসেছিল রাঁচি থেকে। রাঁচির হাসপাতাল থেকে দাদাকে যেদিন ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিল। দাদা আর ভাল হবে না।

নিওরোটিক বুঝি ভাল হয় নারে দিদি ঃ প্রশ্ন করেছিলাম দিদিকে। দিদি সেদিন উত্তর দেয় নি। তবে বুঝি এর উত্তর হয় না। আমার কথাটা যেন আমাকে ব্যঙ্গ করছিল। না, আমার গলাটা যেন সারা ঘরটাকে ধ্বনিত করে তুলেছিল। রাঁচীর সেই পাহাড়টা যেন আমার সেই কথাটাকেই ছুঁড়েছিল ঃ নিওরোটিক ভাল হয় না।

দিদিও তো ভাল হয় নি। এমন একদিন ছিল যেদিন দিদিকে দেখলে ভয় হোতো। সাদায় কালোয় ডোরাকাটা মনে হতো। শঙ্খিনীর মতো। ভয় হতো। মনে হতো সেদিন দিদির যেন রোগ ছিল। কিন্তু আজ আর দিদিকে তেমন ডোরাকাটা মনে হয় না। কিংবা নানা রঙের এলোমেলো ছোপানো শাড়ি বলেও মনে হয় না দিদিকে। দিদি যেন এখন মেমের রং পেয়েছে অদ্ভুত সাদা। শ্বেতী তো বিলেসের কাকার। দেখলে গা রি রি করে। সাদা রংটা জ্বলে গিয়ে স্থানে স্থানে কেমন যেন দগদগে ঘায়ের মতো হয়েছে। দিদিকে কিন্তু তেমন মনে হয় না। রোগটা যেন দিদিকে অপূর্ব সুন্দরী করে তুলেছে। শুধু রূপা নয়—অপরূপা।

তাইতো অবাক হয়ে দিদিকে দেখছি। সকালে বিকালে। দেখেছে বাড়ির পাশের কেবিনটা থেকে দেবতোষদা। দাদার বন্ধু দেবতোষ সেন।

সেদিন দাদা তার বাগানে ডালিয়ার প্রদর্শনী করেছিল। প্রতি বছর এমনি দিনে একবার প্রদর্শনী করবে দাদা। সেবার দাদার প্রদর্শনীর কাজে সাহায্য করতে এসেছিল দেবতোষদা। এর আগে অবশ্য অজয় সোম, নীহারেন্দু বোস আসতো। তারপর দিদির পাশে দাঁড়িয়ে ফুল সাজাতো ওরা। আমিও ক্রাচে ভর করে বাগানে এসে বসতাম। ফুলের বাগানে বুঝি আমাকে বেমানান দেখাতো। কিংবা আমাদের-কে। দাদা-পাগল। দিদি শ্বেতী। আর আমি পঙ্গু।

অজয়দা আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টানছিল। আর দিদির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। মনে হল ধোঁয়াগুলো যেন হাওয়ায় বুদবুদ তুলে মার প্রজাপতির গায়ে সিঁদুর মাখানোর মতোই রঙসময় হয়ে উঠল। সেই ধোঁয়ায় দিদির মুখটাকে যেন অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

অজয়দার কাছেই দাদার গল্প শুনেছি। দাদার পাগল হওয়ার গল্প। দাদার যাদুঘর, ফুল আর প্রজাপতির গল্প। বাবার জন্যই নাকি দাদা এমন হয়েছে। পাগল হয়েছে।

দিদির বিয়ের ফুল ফোটেনি। কিন্তু দাদার বিয়ের ফুল ফুটেছিল। রায়বাহাদুর সুরজিৎ সিংহের মেয়ের সঙ্গে। কি যেন নাম ছিল রায়বাহাদুরের মেয়ের। নীহারেন্দুদা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল অজয়দাকে। সুব্রতা সিংহ।

সুব্রতা সিংহকে আমিও দেখেছি। সত্যি অমন সুন্দরী নারী আমি কম দেখেছি। মার চেয়েও সুন্দরী। সেদিন আমাদের বাড়িতে শানাই বেজে উঠেছিল। আর সেদিনই বাবা ধরা পড়ল। পুলিশের লোক ধরে নিয়ে গেল বাবাকে। জাল ওষুধের ব্যবসায় জড়িত হয়ে ধরা পড়ল বাবা।

রায়বাহাদুর মাকে অপমান করে চলে গেল। আর আমার দেখা পৃথিবীর সেই সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা রায়বাহাদুর-কন্যা সুব্রতা সিংহ সুন্দর ডালিয়াগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। বিয়ের রাতে। রায়বাহাদুরের সেই সুদৃশ্য শ্বেত পাথরের চত্বরে। অজয় সোম, নীহারেন্দু বোসের সম্মুখে। দাদা বোধহয় এই দৃশ্য ভুলতে পারে নি। ওর চোখের সামনে তখন বোধহয় মার সিঁদুর-দেয়া প্রজাপতিটা বসেছিল। আর দলিত ডালিয়াগুলো ব্যঙ্গ করছিল দাদাকে।

তারপর থেকেই আমাদের বাড়িতে ঐদিনটিতে প্রদর্শনী হয়। প্রজাপতি যাদুঘর আর ডালিয়া ফুলের। দাদার এই অদ্ভুত প্রদর্শনীটা আমার ভাল লাগতো। এইখানটায়ই বুঝি দাদার পাগলামী। তা না হলে কে দাদাকে পাগল বলবে। হিমালয়ের গাম্ভীর্য নিয়ে দাদা যখন দোতলায় বাবার ঘরটাতে বসতো তখনই যেন আমার ভয় করতো। মার্বেল পাথরে মোড়া সাদা বাড়িটাকে কেমন যেন বিলেসের কাকার মতো শ্বেতী শ্বেতী মনে হতো। সাদা শরীরে দগদগে ঘায়ের মতো।

লোকের মুখকে বন্ধ করতে পারে নি মা। শেষ পর্যন্ত পাঁযুষের বাবা ঐ কাণ্ড করে বসলো, চৌধুরীগিন্নি। মা আমাকে জড়িয়ে কেঁদেছিল সেদিন। আর আমি পাঁযুষে এই রক্তমাংসের শরীর নিয়েও পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলাম মার বুকে। নিথর নিশ্চল। দাদা বুঝেছিল। সমস্ত পরিচয়ের ভিতটা যেন কেঁপে উঠেছিল। দাদা হয়তো কেঁপে উঠেছিল। দাদা আমার মতো পাথর হতে পারে নি। তাইতো সমস্ত বাড়িটাতে দাদার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতো। আমারও বোধ হয় তাই। তাইতো কখনো জানলা বন্ধ দেখলে দাদা ক্ষেপে উঠতো। অন্ধকার বলে চেঁচিয়ে উঠতো। যেন অদৃশ্য কোন হাত ভূতের মতো গলা টিপে ধরতো দাদার। কৃষ্ণচূড়া গাছটা পেরিয়ে যে বাতাসটা আসতো একদিন বসন্তের ছোঁয়া নিয়ে আজ যেন সেই বাতাসটায় হাজার ভূতের কণ্ঠ ভেসে আসতো। সারা বছরটায় যেন বাড়িটাকে পাথরের অন্ধ গুহা বলে মনে হত আমার।

রায়বাহাদুর সুরজিৎ সিংহের কণ্ঠ যেন এখনো মার্বেল পাথরে মর্মরিত হয় ঃ এই পাপের বাড়িতে আমার মেয়েকে পাঠাতে পারবো না, মিসেস চৌধুরী।

এই পাপের বাড়িতে আমরা যেন সবাই পাপী। বাবার পাপকে আমরা যেন ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছি। দাদা পাগল, দিদির শ্বেতী। আর আমি পঙ্গু।

অথচ এই বাড়িতে যেদিন প্রদর্শনী হয়। দাদার ফুলের। প্রজাপতির। সেদিন যেন বাড়ির চারপাশে ভূতের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়। মানুষের কলকাকলিতে আবার ভরে ওঠে আমাদের বাড়ি। কৃষ্ণচূড়া গাছটা থেকে আগের মতো দক্ষিণের সেই শান্ত বাতাস ফিরে আসে। দাদার বাগানে ডালিয়া গোলাপগুচ্ছের গন্ধে গুমোট বাড়িটা আবার যেন ফিরে পায় তার যৌবন। হারানো দিন। সব।

এই দিনটিতে আমি যেন ভুলে যাই আমি পঙ্গু। ক্রাচ দুটোতে ভর করে আমিও যেন সেদিন ছুটতে পারি। সাধারণ মানুষের মতোই চলতে পারি। দিদি সেদিন সাজে। চোখে কাজল মাখে। দিদির আকাশী শাড়িটা পরে। কপালের কাচ টিপটা যেন দিদির তৃতীয় নয়ন। দিদি যেন ডালিয়া হয়ে যায় সেদিন। ডালিয়ার প্রদর্শনীতে ডালিয়ার রূপকে ডিঙিয়ে দিদি যেন প্রজাপতি হয়। প্রজাপতি মন। চেনা দিদিকে অচেনা লাগে। আশ্চর্য হই। আমার দেখা পৃথিবীর সেই সবচেয়ে সুন্দরী সুব্রতা সিংহকেও যেন দিদির কাছে আজ ম্লান বলে মনে হয়।

দিদি প্রদর্শনীতে এসে সত্যি যেন ফুল হয়। অজয় সোম, নীহারেন্দু বোস কিংবা দেবতোষ সেনরা যেন প্রজাপতি।

ইদানীং মার যেন কেমন পরিবর্তন হয়েছে। প্রজাপতির গায়ে সিঁদুর মাখানোর মন যেন তার নেই। আর সিঁদুর দিয়ে কি হবে। তবে কি প্রজাপতি ধরা পড়ল! মনের কোণে ঢেউ ওঠে আমার। ঢেউ ভাঙে। সময় চলে। তাইতো সিঁদুরকৌটোর দিন তো ফুরিয়েছে মার। সাদা থানে ঢাকা মার শরীরের দিকে তাকাতে পারি না এখন। বাবা নেই। বাবার সেই কুৎসিত ব্যাধিটাই শেষ পর্যন্ত বাবাকে খেয়েছে।

মার সিঁদুর-দেয়া কপালটা এখন শূন্য। চুলের সীমান্তে সিঁদুর দেয়া জায়গার রং কেমন যেন সাদাটে। ঠিক দিদির রং-এর মতন। তবে কি মারও দিদির রোগ হয়েছে? আমার ভয় হত। কিন্তু আজ যেন সেই ভয় কাটিয়ে উঠেছি। দাদা বলতো, ভয় কিরে! বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই তো করতে হবে। পুত্র কথাটার অর্থ কি জানিস পীযুষ? দাদা ব্যাখ্যা করতো। পুৎ নামক নরক থেকে যে ত্রাণ করে সেই পুত্র। দাদা হেসে উঠতো।

দাদার হাসির অর্থটা আমি জানি। আমাদের রক্তেও যেন সেই বিষ রয়েছে। আমরা যে বাবার উত্তরাধিকার। তাই তো দাদা পাগল, দিদির শ্বেতী আর আমি পঙ্গু।

অথচ মা স্বপ্ন দেখতো দিদির বিয়ের। সব মাই তো এই চায়। তাই মা অজয়দাকে খাতির করতো। নীহারেন্দুদাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতো। আর দেবতোষদার সঙ্গে দিদিকে বেড়াতে যেতে বলতো। মা বোধহয় বুঝে ফেলেছিল এরা জ্যান্ত-প্রজাপতি।

কিন্তু মা তুমি বোঝ না কেন প্রজাপতি হলেও এরা পতঙ্গের মতো বোকা নয়। আগুন দেখলে ওরা আসবে ঠিক। কিন্তু পতঙ্গের মতো পুড়বার মন এদের নেই। দিদি আগুন তা জানি। কিন্তু দিদির এই রোগতপ্ত শরীরে বুঝি আগুনের সেই দাহিকা নেই। যে দাহিকা ছিল সুব্রতা সিংহের।

সেই দাহিকা বোধহয় তোমারও ছিল না মা। যে দাহিকা দিয়ে পুরুষকে

বশ করা যায়। যে দাহিকা দিয়ে নারী হয় মোহিনী। তাইতো বাবার মতো উদ্দাম পুরুষকে তুমি ধরে রাখতে পারো নি। তোমার রূপ ছিল। কিন্তু জ্বালা ছিল না। স্নেহ শান্ত রূপে বাবা তোমার মধ্যে তার প্রেয়সীকে পান নি। তাই বাবা বোধহয় ঘরছাড়া হয়েছিল। তোমার ঠাকুরঘরের ধূপধুনোয় বাবা তার সবুজ যৌবনকে সন্ন্যাস দিতে পারেনি। তাইতো বাবার রক্তে বিষ ঢুকেছিল। বিষ।

বাঈজী সরমাতিয়ার রূপ ছিল না। কিন্তু সে বোধহয় মোহিনী ছিল। সে বাবাকে বশ করেছিল তার মতো একটা মোহিনীকে পুষতে গিয়ে বাবাকে অনেকটা নিচে নামতে হয়েছিল। তোমার ঠাকুরঘর বাবাকে রক্ষা করতে পারে নি। আর সেই মোহিনীর বিষ একটা কুৎসিত ব্যাধি হয়ে বাবার শরীরে লেপটে ছিল। রক্ত। সে দাহিকায় বাবা জ্বলেছিল। রূপের আগুনে পুড়তে পুড়তে বাবা শুধু রূপো হারায় নি। হারিয়ে ছিল মন। তার আত্মা। বিবেক। সব। তাইতো শয়তান জেগে উঠল বাবার মনে। মানুষের প্রাণের কারখানা হল শয়তানের অন্ধকার গুহা। ল্যাবরেটারী হল জাল ওষুধের কারখানা। পাপের নরক।

সেদিন তুমি যদি সাহস রাখতে মা। আগুন হতে। বাবার মতো পতঙ্গ তাহলে তোমাকে ঘিরে থাকতো। হলে তোমাকে আজ দুঃখ করতে হতো না। আমাদের জন্য। সেই বিষেরই ফসল তো আমরা মা। দাদা পাগল। দিদি বেশ্যা। আর আমি পঙ্গু। আজ দাদার বন্ধুদের সামনে দিদিকে তুমিই তো বের করে দাও। এই তো সেদিনও দিদিকে ধর্মাকরে তুমি দেবতোষদার সংগে বেড়াতে পাঠালে। আমি জানি তোমার প্রজাপতির গায়ে সিঁদুর মাখানো বৃথা মা। দিদিও তা জানে। তাইতো দেবতোষদার সংগে দিদি বেরুতে চায় না। দিদি জানে এই দাগী রূপের প্রদর্শনী করে হয়তো প্রজাপতি ধরা যায় না।

অথচ তুমি সেদিন বাবাকে ধরতে পারোনি মা। তোমার রূপে দাগ ছিল না। কলঙ্ক ছিল না। কিন্তু তুমি শুধু সংসারটাকেই দেখেছিলে। শৈশবের শিব পুজোটাকে বুঝেছিলে বাবাকে দেখোনি। আজ দিদিকে যতোটা নির্লজ্জ করতে চাও পরপুরুষের সামনে সেদিন তুমি যদি বাবার কাছে তার বিন্দুমাত্র হতে তবে হয়তো আজ দিদিকে নির্লজ্জ হতে হতো না। দিদিকে প্রদর্শনীর পুতুল হতে হতো না।

বাবার জন্য তুমি দুঃখ করো না মা। বাবার পরলোকের পথ তো তুমি তৈরী করে দিয়েছ। গঙ্গাতীরের সেই মন্দিরটার চত্বরে একটা পাষাণ ফলক

তৈরী করে দিয়েছ। ওতে নাকি পাপ স্খালন হয়। সাদা পাষাণের গায়ে বাবার নামটি চকচক করছে। চকচক করছে নামের অক্ষরগুলো। চকচক করছে বাবা। চকচক করছে কমলেশ চৌধুরী। যতদিন বাবা ছিলেন বাবা নিজেও বুঝি এতটা চকচক করেন নি। আরও তো অনেক পাষাণ ফলক রয়েছে। তবে কি ওরা সবাই পাপী। বাবার মতো পাপ এদের রক্তে, স্বভাবে। হয়তো সবাই নয়, কিংবা সবাই।

যেদিন বাবার ফলকটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলে তুমি সেদিন দাদা যে কথাগুলো বলেছিল আজো তা ভুলতে পারছি না : বাবাকে তুমি পাথর করে দিও না মা। ওখানে বাবার নামটা সাজিয়ে রেখো না। সবাই বাবার নামের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, বাবাকে মাড়াবে তা আমি সইতে পারবো না মা।

কয়েকটা পাণ্ডা বোধহয় দাদাকে পাগল বলেছিল। আর জোর করে দাদাকে সরিয়ে দিয়েছিল সেখান থেকে। ধস্তাধস্তিতে দাদা হয়তো ব্যথা পেয়েছিল। ওর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। দাঁতে বোধহয় ঠোঁট কেটে গিয়েছিল দাদার।

তা তুমি সইতে পারলে মা। তোমার ঠাকুর বোধহয় তোমাকে অন্ধ করে ফেলেছিল। তাইতো তুমি বাবাকে দেখো নি। আমাদেরকে দেখো নি। ঠাকুরের ওই পাথরের চোখ দিয়ে বোধহয় আমাদের দেখা যায় না মা। আমরা যে মর্ত্যের মানুষ। আমাদের যে লোভ কাম পাপ-পুণ্যের শরীর মা।

হ্যাঁ মা, আমাদের পাপপুণ্যের শরীর। দিদিটাকে দেখো না? দাদা ওর বন্ধুদের আভিজাত্যে বিশ্বাস করেছিল। ওরা যে শিক্ষিত। ভদ্র। আর তুমি ওদের কাছে দিদিকে গছাতে চেয়েছিলে। কিন্তু ওরা তোমাদের দুজনকেই প্রতারণা করেছে। কিন্তু দিদি! ওর যৌবন কি তোমার চোখে পড়েনি মা। যৌবনের তাগিদকে বোধহয় প্রতারণা করা যায় না। তাই দেবতোষ সেন দিদির এই দুর্বলতাকে বুঝেছিল। আর এই দুর্বলতার সুযোগে ধীরে ধীরে যে সর্বনাশ দিনে দিনে বড় হচ্ছিল দিদির রক্তে তা আমরা বুঝতে না পারলেও তোমার বুঝা উচিত ছিল মা। সেই সর্বনাশই একদিন দড়ি হয়ে দিদির গলাটাকে জড়িয়ে ধরেছিল আর টেনে তুলেছিল স্বর্গে। টেনে তুলেছিল আমাদের বৈঠকখানা ঘরের সিলিং-এর রডে। সেদিনের সেই নারকীয় দৃশ্যটা বোধহয় আমাদের বাড়িটাকে ভুতুড়ে করে তুলেছিল।

সেদিনও তুমি তোমার ঠাকুরঘরে গিয়ে কেঁদেছিলে। তোমার চোখের জলে সেদিনও বোধহয় পাথরের মন গলে নি।

দিদি মরে গেল। আমি জানি এবার ভিড় কমবে। দেবতোষদা হয়তো আর আসবে না। হয়তো মা আর প্রজাপতির গায়ে সিঁদুর মাখাবে না। দেবতোষদা জানতো দিদি মরবে। অথচ ও-ই দিদিকে বাঁচাতে পারতো। দেবতোষদা জানে আর যাই হোক একটা শ্বেতী মেয়েকে নিয়ে বউ করা যায় না। সারাজীবন একটা শ্বেতী মেয়ের দেহের পাশে ঘুমানো যায় না। জড়িয়ে ধরা যায় না। চুমু খাওয়া যায় না। অথচ অন্ধকারের বুঝি চোখ নেই। পছন্দ অপছন্দ নেই। এই অন্ধকারেই দিদির রক্তে দেবতোষদা আগুন ধরিয়েছিল। বয়েসের আগুনে হয়তো ওরা তখন জ্বলছিল। কামনার জ্বালা বোধহয় তখনো নেভেনি ওদের। দেহ পসরায় ফুল তখনও শুকায়নি দিদির। তাই দেবতোষদা আসতো। ডুবতো। ডুবাতো।

আমি জানি দিদি বোকামি করবে। ওযে মার মেয়ে। মা বাবাকে ধরে রাখতে পারেনি। দিদিও দেবতোষদাকে ধরে রাখতে পারবে না। দিদির বিয়ের ফুল

দেবতোষদা আসতো......

ফোটেনি। অথচ বিয়ের স্বাদ বোধহয় দিদি পেয়েছিল। আর সে বিয়ের কলি ফুটেছিল দিদির রক্তে। সে কলিকে দেবতোষদা স্বীকার করতে পারেনি। আমি জানি মার মতোই দিদি দেবতোষদার কাছে হেরে গিয়েছিল। আর পরাজিত ফুলের কাঁটাটিই দিদির বুকে বিঁধছিল কাঁটা হয়ে। দিদি জানতো এই পরাজিত জীবন নিয়ে অরণ্যে বাস করা সম্ভব হ'লেও অজয়, নীহারেন্দু কিংবা দেবতোষদের সমাজে বোধহয় বাস করা চলবে না।

দিদি দেবতোষদাকে একটা আলোক-স্তম্ভ ভেবেছিল। যে আলো দিতে পারে তেমনি একটা আলোক-স্তম্ভ। অথচ দেবতোষদা আলোক-স্তম্ভ ছিল না। সে ছিল আলেয়া। যার আলো মানুষকে টেনে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে পৌঁছে দেয়। তাই বোধহয় দিদি ডুবেছিল। অন্ধকারে। ক্লেদাক্ত অন্ধকারে।

দিদির মৃত্যু বুঝি দাদাকে নতুন করে তৈরি করছিল। দাদার সেই এলোমেলো হাসিটা থেমে গেছে। দাদার তৈরি প্রজাপতি-যাদুঘর থেকে দাদা বেরিয়ে এল। মৃত প্রজাপতির ফসিলগুলোকে বাইরে ছড়িয়ে দিল বাতাসে। জানালা খুলে দিল আগের মত। অফুরন্ত আলো, হাওয়ায় দাদা যেন নতুন করে দেখল নিজেকে। দীর্ঘ রোগভোগের পর মুক্তিস্নানের মতো বাগানে ডালিয়াগুলোর মধ্যে ডুবে গেল দাদা। পাপড়ি ছিঁড়ল না। সযত্নে সস্নেহে ওদের গায়ে হাত বুলোতে লাগল দাদা।

অথচ বাবার স্মৃতিফলকটিতে কেউ কখনো ফুল দেয়নি। হাজার পায়ের ধুলোতে বাবার নামটি যেন ঢাকা পড়তো। মনে হতো মা তুমি এ কী করলে? হয়তো মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে বাবার নামটিতে তুমিও পা রেখেছ কোনদিন। তার চেয়ে দাদার মতো তুমিও যদি ঠিক দিদির পাশের জায়গাটিতে বাবার একটা বেদী তৈরি করতে, তাহলে দিদির পাশে যেমন বসতে পারি তেমনি করে বাবার পাশে বসতে পারতাম। বাবাকে বলতে পারতাম দাদার মতো: তোমার পাপ আমরা ভাগ করে নিয়েছি বাবা। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিদি করেছে। আর সমাজের বলি হয়েছি আমরা তোমার দেওয়া রোগটাকে শরীরে মেখে।

আমরা তোমাকে আলো দেখাবো বাবা। আমি আর দাদা। তোমার ঐ বিষ আমরা চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করে মার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করবো। কালো কালো অক্ষরগুলো দিয়ে সাদা পাথরটাকে কালিমালিপ্ত করেছে মা। তার থেকে তোমাকে মুক্তি দেবো বাবা। পায়ে পায়ে ঘষে তোমার নামের অক্ষরগুলো হয়তো অস্পষ্ট হয়ে গেছে এতদিনে। এখন বোধহয় তোমার নামের অক্ষরগুলোকে আর চেনা যায় না। আর সেই সাদা স্মৃতিফলকটিকে এখন তুলে এনে দিদির বেদীটার পাশে বসালেও কেউ সহজে ধরতে পারবে না যে ওতে তোমার নাম লেখা ছিল কোনদিন। কালো অক্ষরের বন্ধনীতে তোমার জীবনের কালিমা ঘোষিত ছিল মুক্তির জন্য। সেই মন্দিরের চত্বরে। অসংখ্য নামের ভিড়ে।

আমি দাদাকে দেখে অবাক হলাম। তবে কি সেরে গেছে দাদা? কেমন একটা অবিশ্বাস্য চিন্তা যেন আমাকে তন্ময় করে তুলল। আনন্দে সেদিন বোধহয় আমার আত্মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। আর কৃষ্ণচূড়া গাছটার হিন্দোলিত পাতাগুলোর মতই আমি যেন শিহরিত হচ্ছিলাম।

বাগানের একটা সাদা ডালিয়াকে জড়িয়ে ধরে দাদা কেঁদে উঠেছিল। দাদাকে কাঁদতে দেখিনি। বাবার মৃত্যুতেও দাদা কাঁদেনি। আজ কেঁদেছিল: তুই আমাকে ক্ষমা কর মহাশ্বেতা। দেবতোষটা যে একটা কাপুরুষ তা আমার জানা ছিল না। আরো হয়তো কিছু বলেছিল দাদা। কিন্তু তার কথাগুলো যেন তার ঠোঁটের বেষ্টনী ভেদ করে বাইরে আসতে পারছিলো না। দাদার এই রূপ বহুদিন দেখিনি। আমার চোখেও বোধহয় জল এসেছিল সেদিন। দাদা যেন সেই বিরাট ডালিয়াটাতে দিদির ছায়া দেখছিল। আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছিল।

দাদা দিদির স্মৃতিতে তার বাগানে একটা বেদী তৈরি করল। সাদা পাথরের বেদী। কোন ঠাকুরের চত্বরে নয়। সেই সাদা বেদীতে দাদা কোন নাম লিখল না। কোন কথা নয়। কবিতা নয়। প্রত্যেকদিন দাদা সেই বেদীতে একটা সাদা ডালিয়া অর্পণ করতো। শরতে শিউলি গাছটা অজস্র শিউলিতে ভরে দিতো সেই বেদীটাকে। বেদীটা যেন কেমন দিদি হয়ে উঠতো।

মা বোধহয় পাথর হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরঘরে মা বসে বসে কি যেন বলতো। আর ভাবতো। শরীরের যত্ন নেওয়া আগে থেকেই বন্ধ হয়েছিল মার। এবারে যেন অবহেলা শুরু করল। মার রূপ যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাথার চুলে জট ধরেছে। জানি মাকে হারিয়েছিলাম অনেকদিন আগেই। এবার যেন মা পর হয়ে গেল। মার ঠাকুরঘরে হয়তো আলো জ্বলতো না অনেকদিন থেকেই কিন্তু প্রদীপ। এবার যেন প্রদীপও জ্বলল না। এক বেলার আহার তাও বুঝি সবদিন রুচতো না মার। এই আত্মপীড়ন করে মা যেন মুক্তি খুঁজতো। ওপারে যেতে চাইতো।

দাদা বলতো: এবার বুঝি মার পালা পাবুরে। মার মুক্তি। সাদা থানের বদলে গৈরিক ধরেছে মা। পাথরের মূর্তির মতই হয়তো মা সাংসারিক শোক-তাপ ভুলেছে। জানলা-বন্ধ ঘরে জীবনের সমস্ত রন্ধ্র-গুলোকে বন্ধ রেখে পাথরের স্তব করছে মা। গৈরিক স্বপ্নই মার সেই যৌবনের দিনগুলোতে বাবাকে সুখী করতে পারেনি। সংসারে থেকেও মা বুঝি যোগিনী। মার সেই নিঃসঙ্গ সংসারে আমরা বুঝি কেউ নই। কেউ নই। দাদার কথাগুলো যেন কখনও কখনও কেবল কান্নার মতো শোনাত।

তারপর অনেকদিন দাদা মার দরজা খুলে ঘরে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। মা যেন পর হয়ে গেছে। কিংবা পাথর।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারিনি: মা পাথর হয়েছে। আমি জানি আমরা সবাই মিলে মাকে যন্ত্রণার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছি। বাবা মাকে বুঝেনি। দাদা বুঝতে চেষ্টা করেনি। দিদি মায়ের কাছে জগদ্দল পাথর ছিল। তবু আমার মনে হয়েছে মা পাথর হয়নি। মা কি কখনো পাথর হয়? কখনো পর হয়?

সেদিন বোধহয় ঝড় উঠেছিল। বাতাসে বুঝি উন্মত্ততা। জলের ফোঁটায় বিষের তীর। জলের ধারা বইছিল আমাদের চত্বরে। দাদার বাগানে। অন্ধকারে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছিল। সেই আলো-আঁধারির মাঝখানে দাদার ডালিয়াগুলো যেন হেলে দুলে নাচছিল মহানন্দে। বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিদির বেদীটা আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি বৃষ্টির খেলা দেখছিলাম। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছিল আমার গায়ে। কাচের ঠক ঠক আওয়াজের মতোই সেই বৃষ্টির শব্দ যেন আমার কানে পৌঁছচ্ছিল। অচেনা কেউ থাকলে বুঝতো, হয়তো কেউ লাঠি ভর দিয়ে নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

সত্যিই যেন আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। রাত্রির নেশা যেন পেয়েছে আমাকে। বিদিশায় পাওয়ার মতোই আমি হেঁটে হেঁটে কখন যে মার ঠাকুরঘরের কাছে এসে গেছি তা বোধ হয় আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

দরজা খোলা সেই অন্ধকার ঘরে আমি যেন মার কণ্ঠ শুনেছিলাম। স্তবের মত কণ্ঠ। যেন দেবতার স্তোত্র পড়ছে

মা। কিন্তু আশ্চর্য হলাম। এ কী এতো সেতার নয়। মা বলছে : ওগো তুমি আমায় ভুল বুঝেছ। তুমি তো জানতে তোমার উদ্দামতার সঙ্গে আমি তাল দিতে পারবো না। তাই বুঝি তুমি অভিমান করে আমায় শাস্তি দিলে। আমার অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করতে পারলে না।

তারপর আবার নীরবতা। আমি আর চলতে পারছিলাম না। তবে সত্যি কি আমরা ভুল করেছি? মাকে পাথর ভেবেছি। আবার মার গলা স্পষ্ট শুনতে পেলাম : তোরা আমায় ক্ষমা করিস কল্যাণ, মহাশ্বেতা, পীযূষ। আমি যা করেছি। তোদের জন্য করেছি। ওঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছি আমি। তোদের মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসী হয়েছি। কঠোর ব্রত পালন করেছি। কিন্তু কী পেলাম। দেখলাম তোরা পর হয়ে গিয়েছিস। আমি পর হয়ে গিয়েছি। কী মঙ্গল হ'ল। তোরা আমায় পর করে দিস নে কল্যাণ, তোরা আমায় পর করে দিস নে পীযূষ।

দাদা মার কথা শুনতে পায়নি। আমি পেয়েছিলাম। ক্রাচের ওপর ভর দিয়ে বোধহয় ছোটা যায় না। কিন্তু সেদিন ছুটেছিলাম। সেই অন্ধকারে মাকে খুঁজলাম। অন্ধকারে মা বলে ডাকলাম। আমার শব্দটা যেন ঘরের মধ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'ল। হাত দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়ালাম। কিন্তু মা কোথায়? তবে কি আমায় বিদিশায় পেয়েছে। আমার ভয় হ'ল। গায়ের লোম কাঁটা দিল।

আমি কেঁদে উঠলাম। আমার কান্নাটা বোধহয় প্রথম জন্মের কান্নার মতো শোনালো। বলো মা বলো তুমি কি পাথর হয়ে গেছ? পাথর!

কিন্তু না! মা পাথর হ'ল না। আমার জন্মের পর মা যেমন করে কোলে নিয়েছিল তেমনি করে আমাকে কোলে নিল। বুকের উত্তাপে আমার বৃষ্টি-ভেজা জামাটাকে শুকিয়ে দিল। ততক্ষণে ঝড় থেমে গেছে। আমি যেন মার কোলে শিশু হয়ে বসেছিলাম। অন্ধকারে মা আমাকে চুমু খেল। আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল : তোরা আমায় ভুল বুঝিস না পীযূষ। ধ্যান-ধারণা জপতপ যা করেছি সে তোদের জন্য পীযূষ। হয়তো আর থাকবো না তোদের সঙ্গে। মার শ্বাস ঘন হ'ল। কথাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট শোনাল। কিছুক্ষণ পর আবার মা বলল : জানি তোরা করবি না। তোরা যে এ-যুগের মানুষ। তবু বলবো আমার কটা স্মৃতি-ফলক তৈরী করে ওঁর পাশে বসিয়ে দিস। ধর্মস্থানে থাকবো বলে নয়—শুধু ওঁর পাশে থাকবো। পারবি না খোকা? মা আবার আমাকে চুমু খেল।

তারপর সেই অন্ধকারে মার বুকের তাপ কমছিল। হাত শিথিল হচ্ছিল। বাইরে ভোরের আলো। মা সত্যি পাথর হয়ে গেল। সেই প্রতিমাটার মতোই পাষাণ। হয়তো আর কথা বলবে না। চুমু খাবে না। পীযূষ বলে ডাকবে না।

আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। দেখলাম মা পাথরের মূর্তিটার মতোই নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। জানালা খুলে দিলাম। আলো এল। অন্ধকার সেই ঘরটাতে আলো এল। যে ঘরটাতে আমি কখনো যাইনি। দিদি যায়নি। দাদাও না। সেই ঘরটাতে কোন ঠাকুর খুঁজে পেলাম না। কোন প্রতিমা নেই। ভোরের আলোকে দেখলাম একটা কাঠের আসনে বাবার ফটো বসানো। ফটোটার গায়ে কয়েকটা তুলসীর পাতা। সামনের একটা ছোট তামার গেলাসে সামান্য জল। সেই ফটোটাকেই অন্ধকারে প্রতিমা বলে ভেবেছিলাম। পাষাণ বলে ভেবেছিলাম। এদ্দিন আমরা সবাই বুঝি অন্ধকারে ছিলাম। আমি অবাক হ'লাম সেই ঠাকুরঘরে অনেক প্রজাপতি মরে আছে। ওদের গায়ে সিঁদুর। বিয়ের প্রজাপতি। গণক ঠাকুর।

দাদা ঠাকুরঘরে এলো না। মাকে দেখল না। শুধু হেসে উঠল। তবে কি দাদার রোগটা আবার চাড়া দিল। দাদার এলোমেলো হাসিতে আমার ভয় হ'ল। দাদা আবার হেসে উঠল। আগের মত সেই বিলম্বিত লয়ে হাসি।

ক্রাচের উপর ভর দিয়ে বাইরে এলাম। দেখলাম দিদির বেদীটার পাশে বসে ডালিয়ার পাপড়িগুলো ছিঁড়ছে দাদা। আর পাশে আঠায় বন্দী হয়ে পাখা ঝাপটাচ্ছে আবার কয়েকটা প্রজাপতি মুক্তির জন্য।

মুক্তি ওরা পাবে না। সময় দাদাকে মুক্তি দেয়নি। সময়ের যাদুঘরে দাদা তো শুধু একটি ফসিল। অতীতের ফসিল।

দাদা আবার আমাকে ডাকল : ওই পাষাণ ঘরটা থেকে চলে আয় পীযূষ। চলে আয়। কিন্তু আশ্চর্য দাদা যেন আমাকে চিনতে পারছে না আজ। এমনকি আমার ক্রাচের ঠক ঠক আওয়াজটাও যেন দাদার কানে পৌঁছচ্ছে না।

বন্দী লাল সবুজ হলদে কালো ছোপের প্রজাপতিটার মতো পাখা ঝাপটাচ্ছে মুক্তির জন্যে দাদা। আর ডালিয়ার পাপড়িগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে যেন অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। পিচবোর্ডের গায়ে বন্দী প্রজাপতিটার পাখা ঝাপটানোর শব্দটা যেন আমার ক্রাচের ঠক ঠক আওয়াজটার মতোই ভারী শুনোচ্ছিল। মৃত্যুর মতোই ভারী আর গম্ভীর।

মার ঠাকুরঘরের রহস্যটা তুমি জানলে না দাদা। তাই মার শেষ ইচ্ছেটা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমিই নিলাম। তুমি ভরসা দিও। সাহস দিও। যা তোমরা কেউ বুঝলে না। করলে না। আমার পঙ্গুত্ব যেন আমার যাত্রা পথের প্রতিবন্ধক না হয় দাদা।

অসংখ্য মৃত প্রজাপতির ফসিলের উপর দিয়ে হেঁটে আমি যেন মার মৃতদেহটার পাশে এসে দাঁড়ালাম।

বাবার ফলকটির পাশে মার স্মৃতিফলকটিকে বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এখনই হয়তো অনেকে এঁদের উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। না, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি ফিরে দাঁড়ালাম। তারপর দিদির বেদীটার পাশে এসে বসলাম। শিউলিতে কে যেন দিদির বেদীটা সাজিয়ে রেখেছে।

দাদা তখনও বোধহয় তার প্রজাপতি যাদুঘরে বসে আমাকে ডাকছে : চলে আয় পীযূষ—চলে আয়......। আর ডালিয়ার ছিন্ন পাপড়িগুলোর উপর দিয়ে সব-হারানো বন্দী শাহজাহানের মতো হেঁটে যাচ্ছে দাদা। হয়তো তখনও বন্দী প্রজাপতিগুলো মুক্তির জন্য পাখা ঝাপটাচ্ছে। পাখা ঝাপটানোর শব্দগুলোয় আমার পরিচিত ক্রাচের ঠক ঠক আওয়াজটা যেন হেমন্তের বিকেলের মতই শিশির ভেজা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই নিঃশব্দ হেমন্তের ঘুমন্ত বিকেলে দাদার সেই বিলম্বিত লয়ের কণ্ঠটা যেন তখনো আমাকে ডাকছে : চলে আয় পীযূষ, চলে আয়।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

দুটি সমস্যার কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সুষ্ঠু সমাধানের জন্যঃ—

ক।। আব্দুল আজীজ আলআমান তাঁর 'পদক্ষেপ' নামক গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব যুগ পর্যায়ে—

মূর্খে রচিল গীত
না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত
কানা হরি দত্ত।।

এই উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় বলতে চাইছেন যে—বিজয় গুপ্ত এখানে কানা হরি দত্তকে মূর্খ বলেছেন। এবং এই প্রসঙ্গে অনেক রূঢ় উক্তি করেছেন।

অথচ আমার মনে কবি বিজয় গুপ্ত এখানে ভণিতা করে নিজেকে মূর্খ এবং 'না জানে মাহাত্ম্য' বলে বিনয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কবি মূর্খ—বিজয় গুপ্ত না কানা হরি দত্ত?

বিধু চক্রবর্তী
২৯নং রাস্তা, ৩।এ,
পোঃ চিত্তরঞ্জন,
বর্ধমান।

সবিনয় নিবেদন,

আমার এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পাইলে খুশী হইব।

১। সুস্থ দেহে কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা নাক স্পর্শ করা কঠিন নহে। জ্বর হইলে ঐরূপ করা যায় না। কারণ কি?

২। মানব দেহের রক্তে কেমন করিয়া অ্যাগলুটিনোজেন ও অ্যাগলুটিনিন সৃষ্টি হয়? "ও" গ্রুপের রক্তে কেন অ্যাগলুটিনোজেন থাকে না?

রিপনকুমার সেনগুপ্ত
পোঃ বাকসাড়া
জিঃ হাওড়া।

(উত্তর)

বিগত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত শ্রীমঙ্গলকুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর ঃ—

প্রশ্নটি একটু জটিল এবং বাদানুবাদের সম্ভাবনাপূর্ণ। কাহারও প্রতি কোন প্রকার কটাক্ষপাত না করিয়াই সংক্ষেপে যথাসাধ্য উত্তরটি লিখিতেছি।

মনু ও অন্যান্য কয়েকটি সংহিতা ও পুরাণাদিতে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বা চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী "অম্বষ্ঠ" নামে পরিচিত এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিখ্যাত কোষগ্রন্থ অমরকোষে ও শূদ্রবর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে জাত এই অম্বষ্ঠ নামক বর্ণসংকর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। ভাষ্যকারগণ সকলেই ইহাদিগকে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী বৈদ্য সম্প্রদায় বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। এই অম্বষ্ঠ শব্দের ব্যুৎপত্তি
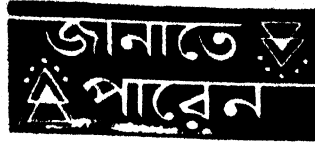
সম্বন্ধে দুটি মত দেখা যায়। ১। অধিকাংশের মতে অম্বা+স্থা+ড (অর্থাৎ জন্মিয়াই যে মাতার সঙ্গে থাকে) ২। (ক) অম্ব বা মৃতকল্প লোকের পার্শ্বে যে অবস্থান করে (চিকিৎসক), (খ) অম্ব বা পিতৃবৎ রোগশয্যার পার্শে যে অবস্থান করে (চিকিৎসক)—ব্রহ্মান্ড পুরাণ।

বৈদ্য সম্প্রদায়ের গোত্র পরিচয়াদি আলোচনা করিলে, তাঁহারা যে ঋষিবংশ হইতে জাত, এই অনস্বীকার্য তথ্যাদি জানা যায়। পুত্র স্বভাবতঃ পিতার জাতি ও গোত্রই পাইয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে মাতা বৈশ্য ছিলেন বলিয়া হয়ত পুত্রগণ পিতার যজ্ঞোপবীত উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিলেও সমাজে নৈকষ্য ব্রাহ্মণের স্থান লাভ করিতে পারেন নাই, ইহা স্বাভাবিক কারণেই অনুমান করা যায়। সম্ভবতঃ এজন্যই সম্রাট বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম অমর সিংহও তদীয় কোষগ্রন্থে শূদ্রবর্গের মধ্যে অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। কারণ নৈকষ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন সম্প্রদায়ের কোনটির পর্যায়েই তাঁহারা পড়েন না। পূর্বে হয়ত এই বৈদ্য বা চিকিৎসক-সম্প্রদায় ব্রাহ্মণগণের মতই দশাহ অশৌচ পালন করিতেন, এবং অন্যত্র না হইলেও বরেন্দ্রভূমিতে (উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে একত্রে পংক্তিভোজন করিতেন। কারণ, ১৪০১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হিন্দুরাজা গণেশের এক ঘোষণাপত্রে জানা যায় যে, সদাচার-ভ্রষ্ট অম্বষ্ঠগণ অতঃপর বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং মূলে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সঙ্গে আহার-বিহারাদি করিলে সমাজে পতিত হইবেন। সম্ভবতঃ এজন্যই প্রখ্যাত স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন বৈদ্য সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্রানুযায়ী পক্ষান্ত অশৌচের বিধান দিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও বৈদ্য সম্প্রদায়ের সকলেই হয়ত যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন নাই। যে যে স্থানে তাঁহারা সংখ্যাল্প ও প্রতিপত্তিহীন ছিলেন, কেবলমাত্র সে সে স্থানেই সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকেই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ বাংলাদেশ ছাড়া উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতিরই যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকার আছে। পশ্চিমবঙ্গে দশাহ অশৌচগ্রহণকারী এবং উপবীতধারী কিছু কিছু বৈদ্য পূর্বাপরই আছেন বলিয়া বৈদ্যগণ বলিয়া থাকেন।

আদিতে ঋগাদি চতুর্বেদ পাঠের অধিকার এই সম্প্রদায়ের ছিল কিনা, সঠিক জানা যায় না। পরবর্তী যুগসমূহে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে বেদপাঠ একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে এই নিষেধ অবশ্য আর কেহই মানে না। তবে আয়ুর্বেদের চর্চা পূর্বাপর এই বৈদ্য সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি ছিল। উপবেদ হইলেও ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ইত্যাদির ন্যায় আয়ুর্বেদও বেদই, অন্য কিছু নহে। আর আয়ুর্বেদ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও কিছুটা জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বৈদ্য জাতি সংখ্যাল্প হইলেও পূর্বাপরই সমাজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। কারণ চিকিৎসক হিসাবে তাঁহাদের প্রয়োজন রাজা-মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া আপামর সাধারণ সকলেরই হইত।

প্রাচীন যুগে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক হিসাবে শর্মা উপাধি ধারণ করিতেন কিনা, সঠিক জানা যায় না। কোষকার অমর সিংহের যুগের (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) খবরও জানিবার উপায় নাই। তবে রাজা আদিশূরের সময় হইতে (খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী) আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সময় পর্যন্ত এবং তৎপরেও বহু কালাবধি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত) যে বৈদ্য সম্প্রদায় স্ব স্ব নামের শেষে শর্মা লিখিতেন না, তাহার প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যকুলতিলক রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য সম্প্রদায়ের জন্য পক্ষান্তের বদলে দশাহ অশৌচের বিধান লইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হন, ইহা জানা যায়। তৎপর যতদূর মনে পড়িতেছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালে (১৯১৪-১৯১৯) সমগ্র বাংলাদেশে বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষৌরকার, গোয়ালা, যুগী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি হিন্দুজাতির প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এক আলোড়নের সূত্রপাত হয়, এবং তখনই এ সকল সম্প্রদায়ের কর্তাব্যক্তিগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্য সম্প্রদায়ের অনেকে সেই যুগে দাশশর্মা, গুপ্তশর্মা, সেনশর্মা ইত্যাদি উপাধি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞোপবীত ও দশাহ অশৌচের ব্যবস্থা করিয়া লন। সকলেই অবশ্য এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, এমন বলা যায় না। কারণ এখনও পৈতা-বিহীন ও পক্ষান্ত অশৌচধারী অনেক বৈদ্য আছেন বলিয়া জানি। এই শর্মা উপাধি ধারণের হিড়িকে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাটা পড়িতে থাকে। সম্ভবতঃ অনেকেই বুঝিতে পারেন যে ইহা একপ্রকার হীনমন্যতার নামান্তর মাত্র। কারণ পৈতা ধারণ করিলেই কেহ আর ব্রাহ্মণ হইয়া যায় না, বা পবিত্র হইয়া যায় না। স্ব স্ব শ্রেণীতে থাকিয়া স্বধর্মাচরণই আত্মোন্নতি ও সামাজিক উন্নতির একমাত্র উপায়।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী,
কলিকাতা-৯।

মহাপ্রস্থানের পথ ?
পদযাত্রী
নেপালে পশুপতিনাথ দর্শন
কর্পোরেশন সমস্যা
ঐ কমিশনার!
কা উ ন্সি লো র

অয়স্কান্ত

॥ চেয়ার-বন্দী ॥

দড়ি বা বেল্‌ট দিয়ে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন নেই। সাধারণ একটি চেয়ারেই আপনাকে এমনভাবে বসিয়ে রাখা চলে যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা আপনার থাকবে না। কথাটা আপনার হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে তো দরকার নেই—হাতে-কলমে পরীক্ষা করেই দেখা যেতে পারে।

সঙ্গের ছবির দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঠিক ছেলেটির মতো ভঙ্গিতে আপনাকেও চেয়ারে বসতে হবে। এই ভঙ্গির বিশেষত্ব এই যে শরীরটি থাকবে টান ও সিধে। পা-দুটিকেও খাড়া ও সিধে রাখতে হবে—পুরোপুরি খাড়া ও সিধে, একটু বেঁকিয়ে চেয়ারের ভেতরের দিকে রাখা চলবে না। শুধু এই দুটির শর্ত—শরীরটিকে টান রাখা ও পা-দুটিকে সিধে রাখা। এবারে শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বা পা-দুটোকে চেয়ারের ভেতরের দিকে না বেঁকিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন। আপনি যতো বড়ো ক্ষমতাবান ব্যক্তিই হোন—চেয়ারের সঙ্গে আপনাকে একেবারে এঁটে থাকতে হবে, চেয়ার ছেড়ে আপনি কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারবেন না। এই চেয়ার-বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে হয় আপনাকে সামনের দিকে একটুখানি ঝুঁকতে হবে, নয়তো পা-দুটো একটুখানি বেঁকিয়ে দিতে হবে চেয়ারের ভেতরের দিকে।

এ-ব্যাপারটি কেন ঘটছে তার ব্যাখ্যায় এবারে আসা যেতে পারে।

একটি পেনসিলকে যদি টেবিলের ওপরে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় তাহলে প্রথমত টেবিলটি হওয়া দরকার খুবই মসৃণ এবং দ্বিতীয়ত পেনসিলটিকে রাখা দরকার পুরোপুরি খাড়া অবস্থায়। পেনসিলটিকে একপাশে সামান্য একটু হেলিয়ে ধরলেই পেনসিলটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার বদলে মাটিতে পড়ে যাবে। কেন এমনটি হয়? প্রত্যেকটি পদার্থেরই একটি ভারকেন্দ্র আছে। এই ভারকেন্দ্র থেকে যদি একটি খাড়া লাইন টানা যায় আর সেই লাইনটি গিয়ে পড়ে পদার্থের ভূমির সীমানার মধ্যে তাহলে বুঝতে হবে

পদার্থটির ভারসাম্য বজায় আছে, অর্থাৎ পদার্থটি স্থির থাকবে। আর যদি খাড়া লাইনটি ভূমির সীমানার বাইরে গিয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে ভারসাম্য টলে গিয়েছে আর পদার্থটি এমনভাবে নড়তে থাকবে যাতে ভারসাম্য বজায় রাখার অবস্থায় পৌঁছানো চলে। সার্কাসের খেলায় যখন আমরা দেখি যে একজন লোকের পায়ের ওপরে রাখা মই বেয়ে বেয়ে আরেকজন লোক দিব্যি হাসিমুখে ওপরে উঠে যাচ্ছে—আশঙ্কায় আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। এও আসলে ভারসাম্যের খেলা। অনুশীলন ও চর্চা খেলোয়াড়দের এমন অভ্যস্ত করে তুলেছে যে দুটি মানুষ ও একটি মইয়ের বিন্যাস যতো জটিলই হোক ভারকেন্দ্রটি কখনো স্থানচ্যুত হয় না। অর্থাৎ ভারকেন্দ্র থেকে লম্ব টানলে সেটি সব সময়ে ভূমির ওপরে গিয়েই পড়ে। সাইকেলারোহী যখন বাঁক নেয় তখন তার শরীরটাও বাঁক নেবার দিকে হেলে পড়ে—এও সেই ভারকেন্দ্রকে ঠিক রাখারই কৌশল।

আমরা, মানুষেরা, দু-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তার মানে, বুঝতে হবে, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আমাদের শরীরের ভারকেন্দ্র থেকে লম্ব টানলে লম্বটি গিয়ে পড়ে ভূমির মধ্যে। এক্ষেত্রে ভূমি কতটুকু? দুটি পা-কে বেড় দিয়ে যদি একটি দাগ টানা যায় তাহলে এই দাগের মধ্যেকার অংশটুকুই ভূমি। এই কারণেই এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। ব্যালে-নর্তকীরা এক-পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপরে দাঁড়িয়ে সারা শরীরটাকে যেমনভাবে খুশি নাড়াতে-চাড়াতে পারে। অনেক চর্চা ও অনুশীলনের পরেই এই দুঃসাধ্য কৌশল আয়ত্ত সম্ভব। টানা দড়ি বা তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারাটাও কম দুঃসাধ্য নয়।

শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে হাঁটাচলার ভঙ্গিও বদলে যেতে পারে। জাহাজের বুড়ো খালাসীদের দেখা যায়, শহরের রাস্তা দিয়ে চলবার সময়েও পা-দুটোকে একটু ফাঁক করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটে। এই লোকটির সারাটি জীবন কেটেছে সমুদ্রের ওপরে দোলায়মান জাহাজের ওপরে চলাফেরা করে। সেই অবস্থায় পা-দুটোকে খানিকটা ফাঁক করে ভূমির পরিসরকে যদি বাড়িয়ে না নেওয়া যায় তাহলে প্রতি মুহূর্তেই ভারসাম্য টলে যাবার আশঙ্কা থাকে। এইভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত পা ফাঁক করে চলাটাই অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। অন্যদিকে স্টেশনে যারা কুলির কাজ করে তাদের বেলায় কিন্তু দেখা যাবে সিধে ও টান হয়ে চলাফেরা করতে তারা অভ্যস্ত। এমন কি মাথাটা পর্যন্ত একটুখানি নুয়ে পড়ে না। এই লোকগুলোর মাথায় থাকে ভারী ভারী বোঝা—কাজেই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যেই চলাফেরার এই বিশেষ ভঙ্গি এদের আয়ত্ত করতে হয়েছে। কিন্তু বাজারের যে-সব চাষী বাঁকে ঝুলিয়ে শাকসবজি নিয়ে আসে তাদের শরীর বা মাথা নুয়ে পড়তে কোনো বাধা নেই।

যাই হোক, এবারে আমরা মূল ব্যাখ্যায় আসতে পারি। যে বিশেষ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসার কথা বলা হয়েছে, সেই ভঙ্গিতে থাকার সময়ে শরীরের ভারকেন্দ্রটি থাকে শিরদাঁড়ার কাছে, নাভিদেশের প্রায় কুড়ি সেন্টিমিটার উঁচুতে। এই ভারকেন্দ্র থেকে যদি একটি লম্ব টানা যায় তাহলে এই লম্বটি গিয়ে

পড়বে পায়ের পেছন দিকে। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, দু-পায়ে উঠে দাঁড়াতে হলে ভারকেন্দ্রের লম্বরেখাটি এসে পড়া দরকার পায়ের পাতার সীমানার মধ্যে। এই কারণেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হলে হয় আমাদের পা-দুটিকে চেয়ারের ভেতরের দিকে বেঁকিয়ে দিতে হয় কিংবা শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে হয়। এ দুয়ের একটি না করা পর্যন্ত শরীরের ভারকেন্দ্রের লম্বরেখাটি কিছুতেই পায়ের পাতার সীমানার মধ্যে এসে পড়ে না। ফলে, এ দুয়ের একটি না করা পর্যন্ত চেয়ার-বন্দী অবস্থা থেকেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

॥ ঘুরন্ত চাকার ধাঁধা ॥

রাস্তায় বেরোলে আমরা অজস্র ঘুরন্ত চাকা দেখি। মোটর, বাস, সাইকেল—সবই ঘুরন্ত চাকায় ছোটে। ধরে নেওয়া যাক, এমনি একটি ঘুরন্ত চাকার টায়ারে এক জায়গায় কি করে যেন খানিকটা রঙ লেগে গিয়েছে। চাকাটি ঘুরছে আর আমরা তাকিয়ে আছি সেই রঙ-লাগা অংশটুকুর দিকে। দেখা যাবে, রঙ-লাগা অংশটুকু যখন নিচের দিকে থাকে তখন সেটি বেশ স্পষ্ট, আর রঙ-লাগা অংশটুকু যখন ওপরের দিকে থাকে তখন সেটি বেশ আবছা। এমন কি চাকার স্পোকগুলোও নিচের দিকে আলাদা আলাদা টের পাওয়া যায় আর ওপরের দিকে যেন একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে গিয়ে নিরেট পাতের মতো হয়ে ওঠে। এ থেকে মনে হতে পারে, চাকার ঘূর্ণাবেগ নিচের দিকে বেশি, ওপরের দিকে কম। কিন্তু তা তো আর হওয়া সম্ভব নয়; চাকা যখন ঘোরে, ওপরে-নিচে একই বেগে ঘোরে। তাহলে কি দেখার ভুল? তাও নয়। ব্যাপারটিকে ঘুরন্ত চাকার ধাঁধা বলে মনে হতে পারে কিন্তু একটু ভাবলে একটি ব্যাখ্যা অবশ্যই পাওয়া যাবে।

গাড়ির চাকা যখন ঘোরে তখন অ্যাক্সল সমেত পুরো চাকাটি সামনের দিকেও এগিয়ে যায়। অর্থাৎ, গাড়ির চাকার প্রত্যেকটি বিন্দুতে গতি রয়েছে দুটি—সম্মুখ-গতি ও আবর্তন-গতি। আমরা যখন চাকার দিকে তাকাই তখন এই দুটি পৃথক গতির মোট ফল আমাদের চোখে পড়ে।
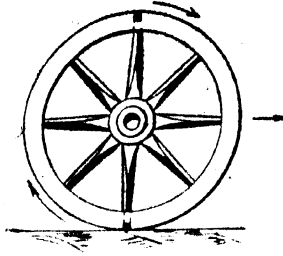
এবারে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, টায়ারের রঙ-লাগা অংশটুকু যখন ওপরের দিকে থাকে তখন সম্মুখ-গতি ও আবর্তন-গতি হয় একই দিকে। ফলে এই দুটি পৃথক গতি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দুয়ের যোগফলের সমান গতি সৃষ্টি করে। টায়ারের রঙ-লাগা অংশটুকু যখন নিচের দিকে থাকে তখন সম্মুখ-গতি ও আবর্তন-গতি পরস্পরের বিরুদ্ধে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় দুয়ের বিয়োগফলের সমান গতি। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম গতি। এই কারণেই ওপরের দিকে টায়ারের রঙ-লাগা অংশ আবছা, নিচের দিকে স্পষ্ট।

একই ধরনের ব্যাপার ঘটে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পাক খাওয়ার ব্যাপারে। আমরা জানি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে। একটি বার্ষিক গতি, অপরটি আহ্নিক গতি। বার্ষিক গতি সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার, আহ্নিক গতি (বিষুব রেখায়) সেকেণ্ডে প্রায় আধ কিলোমিটার। পৃথিবীর মানুষ হিসেবে আমরাও মহাশূন্যে ছুটে চলেছি এই দুটি পৃথক গতিতে। অর্থাৎ, পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছি আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির সমন্বয়ঘটিত গতিতে। এবারে যদি প্রশ্ন করি: আমাদের এই সূর্য-প্রদক্ষিণের বেগ কি দিনে-রাতে সমান? তাহলে আমরা অনেকেই হয়তো জবাব দিয়ে বসব, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সমান। কিন্তু জবাবটি ভুল হবে।

পৃথিবীর অর্ধাংশ থাকে সূর্যের দিকে—এই অর্ধাংশ আলোকিত দিক।

অন্য অর্ধাংশ অন্ধকার দিক। ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু যখন আলোকিত দিকে থাকে তখন সেখানে আহ্নিক গতি হয় বার্ষিক গতির বিপরীত দিকে। আবার এই বিন্দুটি যখন অন্ধকার দিকে থাকে তখন সেখানে আহ্নিক ও বার্ষিক গতি একই দিকে থাকে বলে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। তার মানে, আমাদের সূর্য-প্রদক্ষিণের বেগ মধ্যাহ্নের চেয়ে মধ্যরাত্রিতে অপেক্ষাকৃত বেশি। কথাটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগে কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটিই প্রতিদিন ঘটে চলেছে।

বাঁচার হয় তো ঠিক সারভাইভ করবে—নিত্য দেখছি তো!'

পরের দিন বড় ডাক্তার এলেন যখন তখন বেলা বারোটা বাজে। তখনও প্রাণ আছে কিন্তু আর তখন নাকি কিছু করবার নেই। তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে স্কাল্-এ খুব বড় একটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, ব্রেনে সুন্ধ চোট লেগেছে। তার মানে জটিল অপারেশন। সে সব যন্ত্রপাতিও নেই আমাদের, তাছাড়া যা অবস্থা পেসেন্টের —এখন এক্স-রে করিয়ে অপারেশনের তোড়জোর করতে করতেই ও মারা যাবে। বাইরে থেকে টের পাচ্ছেন না আপনারা, ভেতরে ভেতরে খুব হেমারেজ হয়েছে। শক্ত হার্ট বলেই এখনও টিকে আছে—'

সুতরাং কিছুই করা হল না, একটা চেষ্টা পর্যন্ত না। বেলা দুটো নাগাদ মারা গেলেন উমা।

কিন্তু তখনই শব বা হাসপাতালের ভাষায় 'লাশ' পাওয়া গেল না। এ নাকি পুলিশ কেস, পোস্টমার্টম করতে হবে। গোবিন্দ আর হেম—হেমকে হাওড়া স্টেশনে ধরে সকালেই খবর দিয়েছিল গোবিন্দ, সে অফিসে সই করেই চলে এসেছে—থানায় গিয়ে দারোগাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলে; ব্রাহ্মণের শব, সকলের সামনেই তো দুর্ঘটনা হয়েছে—মিছিমিছি কাটা-ছেঁড়া করবেন কেন, ডোমে ছোঁবে—যদি দয়া করে এমনিই ছেড়ে দেন উনি, ওরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, ইত্যাদি; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। পরে সকলে বললে যে কিছু প্রণামী দিলেই ছেড়ে দিত—সেটা এরা জানত না। অত মাথাতে যায়নি। সঙ্গে টাকাও ছিল না। তবে জানা থাকলে হয়তো শরতের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যেতে পারত, ধার করেও দিত হয়ত। ওরা কিছুই জানত না, আগে কেউ বলেও দেয়নি। তবে সেও তো অনুমান।

ফলে বাসিমড়া পড়ে রইল। পরের দিন শেষ পর্যন্ত যখন মর্গ থেকে লাশ ছাড়া হ'ল তখন বেলা একটা বাজে।

শরৎ সেই রাত থেকে কমলার ওখানেই আছেন। তাঁকে ও-বাড়ি মানে ওঁদের সে-বাড়ি যাবার কথা কেউ বলেনি, তিনিও তোলেন নি। এখানে যে আছেন—এদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা—তাও জিজ্ঞাসা করেন নি। কোথায় আছেন সেটাও অত মাথাতে যায়নি বোধহয়। সহজ ভাবেই থেকে গেছেন। সেই যে এসেই ধপ করে বসে পড়েছিলেন, সেই ভাবেই বসেছিলেন। ওঠেন নি, নড়েন নি, কারও সঙ্গে কথা বলেননি। অনেক রাত্রে—প্রায় শেষ রাত্রে কমলা এসে জোর করে শুইয়ে দিতেই শিশুর মতো শুয়ে পড়েছিলেন। কোন বাধা দেন নি—কোন প্রশ্ন করেন নি। শুধু কিছু খাবেন কিনা গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করাতে একটা অদ্ভুত অনুরোধ করেছিলেন। গোবিন্দকে কিছু না বলে কমলার দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বলেছিলেন, 'ঐ যে পুঁটুলির মধ্যে ক্ষীরের বরফিগুলো পড়ে আছে—তুলে রেখে দেবেন দিদি? ও এনেছিল আমার

আমাদের যে টুকু করবার করেছি আর কিছু...

জন্যে। আমি ভালবাসি বলে। আজ নয়—কাল সকালে আমি খাব।'......

পরের দিনও চুপ করে বসেইছিলেন এক জায়গায়। হাসপাতালে যাবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। কেমন আছে তাও জানতে চান নি। সকালে কমলাই কথাটা তুলেছিলেন, 'একবার দেখতে যাবে না ভাই?'

মৃদু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, না দিদি, কাজ নেই। কাল দেখার চেষ্টা করেছিলুম, দেখতে পাইনি। সব ঝাপসা দেখেছিলুম। ও অবস্থায় দেখতে পারবও না। ......না-ই বা দেখলুম আর। ......এক যদি - যদি - বাঁচে—'

আর কিছু বলতে পারেন নি। স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মৃত্যু সংবাদটা পাবার পরও চুপ করে বসেছিলেন। কান্নাকাটি করেন নি, কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। গোবিন্দ নিজে থেকেই বলেছিল পোস্ট-মার্টমের কথা, তাও কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। স্থির দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালে রঙীন ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

কমলা আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদছিলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হেম গোবিন্দ খোকা সকলেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল—কিন্তু শরৎ তখন কাঁদেন নি, কেঁদেছিলেন অনেক পরে, রাত্রিবেলা। অন্ধকারে বসে কেঁদেছিলেন। রাণী দেখেছে, রাণীই বলেছে হেমকে, গোবিন্দকে।

রাণীকে কেউ খবর দেয়নি, সে এমনিই এসে পড়েছিল বিকেলে। এদের ভাগ্যক্রমেই সে এসে পড়েছিল বলতে হবে। সে এসেই জোর করে নিজের ছেলেমেয়ে কোলে দিয়ে কতকটা শান্ত করল কমলাকে। সে না এলে সেদিন সন্ধ্যায় এদের ঘরে বোধহয় আলো জ্বলত না, কারও মুখে জল পড়ত না এক বিন্দু। হেম আর গোবিন্দ তো ঘুরছিল। খোকা গিয়েছিল মহাশ্বেতাদের বাড়ি খবর দিতে। কমলা কাঁদছেন—শরৎ চুপ করে বসে আছে, রাণী যখন এল।

রাণী বৌ-ই সন্ধ্যার পর চা করে শরৎকে দিতে গিয়ে দেখেছিল তাঁর দু-

চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে, কান্নার বেগ নেই—শুধু নিঃশব্দে জল পড়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই পড়ছে বোধহয়, সামনের গোঞ্জটা ভিজে গেছে।

রাণী ফিরেই আসছিল। কী ভেবে আবার কাছে গিয়ে কুণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, 'মেসোমশাই, চা এনেছি।'

শরৎ মুখ তুলে চেয়েছিলেন। তার-পর নিঃশব্দে চায়ের কাপটা ওর হাত থেকে নিয়ে পাশে নামিয়ে রেখেছিলেন। বোধহয় খেয়েছিলেনও, সেটা আর রাণী দেখেনি। দেখতে পারে নি। তার দুই চোখ জ্বালা করে জল ভরে এসেছিল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ালে হয়ত সে-ও কান্নায় ভেঙে পড়ত।

পরের দিন মর্গ থেকে কখন শব পাওয়া যাবে খোঁজ করে সেই মতো লোক-জন ঠিক করে হেমকে খাট এবং দুর্গা-পদকে ফুল কিনতে পাঠিয়ে গোবিন্দ শরৎকে ডাকতে এল।

'আপনাকে একটু উঠতে হবে মেসো-মশাই এবার। একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—'

উনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি—আমি যাব? আমি কেন বাবা?'

একথার জবাব গোবিন্দ দিতে পারত না। এ ধরণের কথার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে হকচকিয়ে গিয়েছিল। কমলা আবার হাহাকার করে কাঁদছেন। ওদের সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে রাণী বৌ। কাছে এসে পাশে বসে পড়ে বললে, 'শেষবারের মতো সিঁদুরটা যে আপনারই দেবার কথা মেসোমশাই, এটুকু না করলে তিনি পরলোকে গিয়েও শান্তি পাবেন না। আপনার কাছে এটা তাঁর পাওনা যে। আপনারও তো ঋণ কম নয় তাঁর কাছে—!'

হঠাৎ শরতের একটা কথা মনে পড়ে যায়। কে যেন কবে যেন বলেছিল, কোন্ দূরশ্রুত, প্রায় বিস্মৃত কথাটা—'এ জীবনে দেবার মধ্যে দিয়েছ তো এই লোহাটা আর সিঁদুরটা, তা সেটুকুও সহ্য হচ্ছে না বুঝি?'......

'আমারই সিঁদুরটা দেওয়ার কথা, না মা? তাহ'লে যাই। আর কি দিতে হয়? লোহা কি দেয় এ সময়ে? না শুধুই সিঁদুর?... ঠিকই বলেছ মা, অনেক ঋণ আমার, কিছুই শোধ করা হ'ল না!'

তারপরই—এই প্রায় দুদিন পরে হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল মা—ওর কাছে আসা। আমি না এলে হয়ত এমনভাবে মরত না, এত তাড়াতাড়ি। আমারই নিশ্চয় রাক্ষসগণে জন্ম—আমি যাকে ধরেছি সে-ই মরেছে। আমার কেউ বাঁচেনি, আমার আর কেউ রইল না। আমার জন্যেই সে গেল। কখনও কিছু দিতে পারিনি, অপঘাত মৃত্যুটা দিলুম শেষকালে—'

শ্মশান পর্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিলেন শরৎ, দাঁড়িয়েও ছিলেন শেষ পর্যন্ত—কিন্তু মুখাগ্নি করেননি। অনেক ক'রে বলেছিল হেম আর গোবিন্দ, অভয়পদ নিজে এসে অনুরোধ করেছিল কিন্তু তিনি রাজী হননি। বলেছিলেন, 'মুখ-অগ্নি করলেই শ্রাদ্ধ করতে হয়। আমি ওকে পিণ্ডি দেব না। আমার ভাত খেতে ওর বড় আপত্তি ছিল, দিনরাত ও ভগবানকে ডাকত আমার ভাত না খেতে হয়। আমি সে ভাত দেব না। জ্যান্তেই যখন একদিনও ভাত দিলুম না, মরার পর আর দিই কেন!... তাছাড়া ব্রাহ্মণের মেয়ের পিণ্ডি—ব্রাহ্মণের হাতে পাওয়াই উচিত। আমার আর ব্রাহ্মণত্ব কিছু নেই। আমি—আমি অতি নীচ অন্ন খেয়েছি। হেমই দিক—ওকেই সবচেয়ে ভালবাসত, ওই করুক শেষ কাজটা। খরচপত্র সব আমি করব—কিন্তু ওটি ব'লো না তোমরা!'

অগত্যা হেমকেই দিতে হয়েছিল মুখাগ্নি। সেইজন্যেই এতদিন আসতে পারেনি। অপঘাত মৃত্যু ত্রি-রাত্র অশৌচ। একেবারে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে নিয়মভঙ্গ সেরে এসেছে।

'কোথায় শ্রাদ্ধ হ'ল?' শ্যামা জিজ্ঞাসা করলেন।

'কালীঘাটে গিয়েই সেরে এলুম। আর কোথায় হ্যাঙ্গামা করব! অবশ্য জিনিসপত্র মেসোমশাই ভাল ভাল দিয়েছে দানে। বারোটি ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হয়েছে—সেও বেশ পরিতোষ ক'রে।'

'সেটা কোথায় হ'ল?' ঈষৎ যেন সজাগ হয়ে ওঠেন শ্যামা।

'সে ঐ যে-বাড়িতে মাসী থাকত সেইখানে। মেসোমশাই বললেন, এতকাল ওখানে ছিল, ওখানে কিছু করা দরকার। ব্রাহ্মণ খাওয়ানোই নাকি আসল,

ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর

নির্মল সাবানে কাচা কাপড়
দেখতে নির্মল, সুগন্ধে ভরপুর

মল দিয়ে কাচলে জামাকাপড় বাস্তবিকই পরিষ্কার হয়। দেখবেন, ধোকোবার
। কত ঝকঝকে-তকতকে দেখায়, আর কেমন একটি হালকা সুগন্ধ!

এত অল্প সাবানে ও অল্প আয়াসে জামা-কাপড় পরিষ্কার হবে যে
হয়ে যাবেন। নির্মল সাবান মাখবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ফেনা হয় ও
ঢুকে ময়লা সাফ করে দেয়। কাচা কাপড়খানি দেখতে হয় পরিচ্ছন্ন,
ও হালকা সুগন্ধময়।

নির্মল সাবানে চলেও অনেক দিন। বার বার ব্যবহারেও নরম হয় না,
শক্ত ও পরিষ্কার থাকে — স্বচ্ছন্দে বহুবার ব্যবহার করা যায়।

টুকরো করার সুবিধের জন্য নতুন
নির্মল হাফ-বার সাবানে দাগ
কাটা থাকে। আজকাল ছিমছাম
রঙীন-মোড়কে পাওয়া যায়।

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, ৯, ব্র্যাবর্ণ রোড, কলিকাতা-১

যে পুরুতও বললে। তাই ওখানেই করা হ'ল। বাড়িওলারা অনেক করেছে অবশ্য।...রান্না করলে বড় মাসী আর রাণী বৌদি—বামুন রাখতে চেয়েছিলেন মেসোমশাই, ওরা রাজী হ'ল না।'

'তা শরৎ জামাই এখন কোথায় রইলেন? ঐ বাড়িতেই?'

'না না। ওখানে কোথায় থাকবেন! বড়দা ওদের ওখানে এনে রেখেছে। বেশিদিন থাকবেন না তো—প্রেসের খদ্দের খুঁজছেন, দালালও লাগিয়েছেন, প্রেস বিক্রি ক'রে দিয়ে কাশী চলে যাবেন। সেখানে কে ওঁর দূর-সম্পর্কে বোন আছে, তার কাছেও থাকবেন না—তাকে লিখেছেন কম ভাড়ায় একটা ঘর খুঁজতে—'

'তা সব জিনিসপত্তর—?'

হেম একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসল। বললে, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মেসোমশাই, যে তোমরা কিছু নেবে—না সব বেচেকিনে দিয়ে তারই নামে টাকাটা কোথাও দিয়ে দেব—কোন সৎকাজে?'

'তা তুই কি বললি?' কথাটা শেষ করতে দেন না শ্যামা—তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে ওঠেন। উত্তরের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই আবার বলেন, 'যে মুখে আগুন দেবে, তারই তো সব পাওনা!'

'হ্যাঁ—সব ঐ হাড়পেকের বোঝা কে ঘাড়ে করবে!... আমি বললুম, একেবারে সব বেচে না দিয়ে কিছু কিছু আমাদের কাছে রাখা তো ভাল—তাঁর স্মৃতি তো। ...তা মেসোমশাই ঠিক করেছেন দিদিমার দরুণ বাসনের সিন্দুকটা আর মাসীর কাপড়চোপড় সুদ্ধ তোরঙ্গটা আমাদের দেবেন। বড়দাকে দেবেন ঘড়িটা। আর হাতের রুলি দুটো আর দিদিমার দরুণ কী সামান্য দু এক কুঁচি বুঝি আছে—সেগুলো রাণী বৌদিকে দিয়ে বাকি সব বেচে দেবেন।'

'তাহ'লে বড়বোয়েরই জিৎ হ'ল বল।'

'তা সে যা বোঝ।'

'কেন, বাসনকোশন কি আমরা কিছু পেতে পারি না?'

'সে কিছু কিছু বাড়িওলাদের দিয়ে দিয়েছে, মাসীর ভাতখাবার থালাটা আর জলখাবার ঘটিটা মেসোমশাই নিজে রাখবেন। বাকি সব কালই বিক্রি হয়ে গেছে। সব টাকা বড়মাসীর কাছে থাকবে—মেসোমশাই বলেছেন, তুমি তো রেলের পাস পাও, একসময় গিয়ে ঐ টাকাতে গয়াটা সেরে এসো। অপঘাতে মরেছে—গয়া না করলে মুক্তি নেই। ঐ নাকি আসল। পিণ্ডি দিয়ে ঐখানেই ব্রাহ্মণ খাইয়ে আসতে বলেছেন!'

শেষের দিকের কথাগুলো আর শ্যামার কানে যায়নি। তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা।

সুদূর অতীতে চলে গিয়েছিল তাঁর মন। অনেক, অনেকদিন আগেকার কথা ভাবছিলেন তিনি।

ও'দের মা রাসমণি তখন প্রায় মৃত্যু-শয্যায়। ওঁদের সকলকে ডেকে মার যা ছিল ক্ষুদকুঁড়ো—সামান্য একটু সোনা ও বাসন কখানা—ভাগ করে নিতে বলে-ছিলেন। তাঁর সামনে সব আনতে বলে-ছিলেন—অর্থাৎ তিনি যাকে যা দেবার বলে দেবেন, সেই মতো নেবেন ওঁরা।

সমান ভাগ করার কথা। রাসমণির সেই রকমই ইচ্ছা আন্দাজ করেছিলেন শ্যামা। কিন্তু উমাকে ওঁদের সমান ভাগ দিতে শ্যামার আপত্তি ছিল। ওর কেউ নেই, ওঁদের ছেলেপুলে আছে—ওঁর মেয়ে আছে, বিয়ে দিতে হবে, জামাই আসবে কুটুম সাক্ষাৎ আসবে—উমা কেন ওঁদের সঙ্গে চুল-চেরা ভাগ পাবে? ইঙ্গিতে সে কথাটা জানিয়েও ছিলেন মাকে। মা রাগ করেছিলেন তাতে। বলেছিলেন, ওঁদের ছেলেমেয়ে আছে সেইটেই তো বড় কথা, তারা এর-পর ওঁদের দেখবে। উমার তো কেউ নেই, ওর কোন একটা ব্যবস্থাও কিছু করে যেতে পারলেন না তিনি ভাল-মতো কিছু—ওরই তো বেশী দরকার এসবের। দরকার হলে এই বেচেই খেতে পারবে তবু দু-চার মাস।

দিয়েছিলেনও তাই। অন্তত শ্যামার যা বিশ্বাস। উমার দিকেই যেন পাল্লাটা একটু বেশি ঝুঁকল। ওঁর সেটা পছন্দ হয়নি। মনে মনে রাগ করেছিলেন, মার ভীমরতি হয়েছে মনে করে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য প্রকাশ্যে সে বিদ্রোহ জানাবার সাহস ছিল না। রাশ-ভারী লোক ছিলেন রাসমণি—তাঁর স্থির শান্ত দৃষ্টির দিকে চাইলেই মুখের কথা মুখে থেকে যেত। শ্যামা অন্য পথে গিয়েছিলেন, কিছু বাসন সরিয়ে রেখে-ছিলেন সকলের অজ্ঞাতে, বয়ে নিয়ে আসার অজুহাতে। কিন্তু মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এড়ায়নি সেটা। তখনও পর্যন্ত স্মরণশক্তি ছিল আশ্চর্য রকমের। ওঃ, সে নিয়ে কী অপমানই করেছিলেন সেদিন শ্যামাকে।

সেই সব বাসনই আজ তাঁর ঘরে আসছে। কোনটাই উমার ভোগে আসেনি। সবই বুকে করে রেখে দিয়ে-ছিল সে, একটিও খোয়ায় নি। অনেক দুঃখ কষ্ট করেছে তবু প্রাণ ধরে বেচতে পারে নি একটা।

সে-ই আসছে তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি কি খুব একটা আনন্দ বোধ করছেন? খুব একটা বিজয় গর্ব? মজ্জাগত অর্থলোলুপতার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এগুলো সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন বটে—কিন্তু এখন যেন কেমন ভার-ভার লাগছে। উমার কোন কাজে লাগেনি, তাঁরই কি লাগবে? এই তো সবাই ফেলে চলে যেতে হ'ল এক-নিমেষে। কাকে কি দেবার ইচ্ছে ছিল তাও বলে যেতে পারল না। কে জানে তাঁরই বা কখন কিভাবে ডাক আসবে। এই যে সব জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকছেন, তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিস, আরও চাইছেন, প্রাণপণ আকাঙ্খায় সর্বদা যেন দুই-হাত বাড়িয়ে রয়েছেন—এও কি একদিন এমনি বিনা নোটিশে ছেড়ে যেতে হবে। তাঁর এত কষ্টের এত দুঃখের জিনিস সব পাঁচভূতে নষ্ট করবে—তিনি বাধা পর্যন্ত দিতে পারবেন না, নিজের ইচ্ছাটা পর্যন্ত জানাতে পারবেন না। ...ভাবতে ভাবতে যেন শিউরে ওঠেন শ্যামা। ......এসব কি ভাবতে শুরু করলেন তিনি? দুর্বল শরীর বলেই বোধহয় এইসব ছাইভস্ম কথা মনে আসছে? ......

জোর করে মনকে প্রকৃতিস্থ করার চেণ্টা করেন।

এই তো দুনিয়ার নিয়ম—তাই বলে কি সকলে সব বিলিয়ে নাগা-ফকির হয়ে যাচ্ছে? তুমিও যেমন!

কান দেন হেমের দিকে। কী যেন বলছে হেম—?

'বরাত বটে ছোট মাসীর—মরেও কি শান্তি আছে? শেষ পর্যন্ত পোড়াটাও সুশৃঙ্খলে হ'ল না। পুরো দেহটা পোড়ানোই গেল না।'

'সে আবার কী রে? কি বলছিস?'

'আর কি বলছি! বায়ে তো চাপানো হ'ল, বেশ জ্বলছে, আমরা একটু এদিকে সরে আছি, কাছাকাছি আছেন বরং মেসোমশাই-ই, অকস্মাৎ একটা সোরগোল, মেসোমশাইও চিৎকার করে উঠলেন। কী ব্যাপার—না চেয়ে দেখি একটা সন্নিসী-মতো লোক উর্ধ্ব-শ্বাসে পালাচ্ছে আর তার পিছু পিছু কতকগুলো লোক দৌড়চ্ছে তাকে ধরবার জন্যে। কিছুই বুঝতে পারি না—কী হ'ল জিজ্ঞাসা করতে একজন বললে, আপনাদের চিতা থেকে ঠ্যাং নিয়ে গেল যে মশাই! সে কি কথা! মেসোমশাই কোথায়? চেয়ে দেখি তিনিও দৌড়ে-ছিলেন, শ্মশানের বাইরেটায় এসে বুক চেপে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছেন। একে ওঁর হাঁপানির ব্যয়রাম তায় বুড়ো মানুষ, পারবেন কেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম—ঐ লোকটা আস্তে আস্তে এসে একটা কাঠ দিয়ে মাসীর একটা ঝলসানো পা টেনে বার করে সেই আগ-জ্বলন্ত পা-টা নিয়েই দৌড় দিয়েছে—'

'সে কি রে? কে সে? করবেই বা কি ওটা দিয়ে?'

ভয়ে শিউরে ওঠেন তিনি। কনকও

পিছনে বসে শুনছিল, সে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কাঠ হয়ে যায় একেবারে।

'কী করবে জান? সে তোমরা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে না। ..... খাবে, খাবে। খাবার জন্যেই নিয়ে যাচ্ছিল।'

'ধ্যেৎ! খাবে কি? ওসব গল্প কথা রামায়ণে লেখা আছে। এখনকার দিনে বুঝি রাক্ষস আছে—'

'রাক্ষস কেন হবে—সন্ন্যাসী। আমাদের একজন গঙ্গাপুত্তুর বললে, ওদের বলে অঘোরপন্থী সান্ন্যাসী—কোন ঘোর থাকে না, আপন মনেই থাকে, যখন হুঁশ হয় খিদে পায়—তখন সামনে যা পায় তাই খায়। একবার অনেকদিন আগে নাকি এমনি এক অঘোরপন্থী জ্যান্ত গোখরো সাপ ধরে খেতে শুরু করেছিল—তাও ধরেছিল ল্যাজের দিক থেকে, সেও ছোবল দিয়েছে তিন-চারটে—পরের দিন দেখা গেল দুটোই মরে পড়ে আছে!'

'বলিস কি—পিশাচ বল!'

'তবে আর বলছি কি! এ লোকটা নাকি কদিন ধরেই এখানে আছে। শ্মশানের বাইরে একটা গাছতলায় বসে থাকে থুম হয়ে—তা সন্ন্যাসী তো অমন কতই থাকে শ্মশানের ধারে, বিশেষত নিমতলায় তো লেগেই আছে—কেউ তাই অত গ্রাহ্য করে নি। পরে শোনা গেল এ লোকটা দিনকতক মড়া না পেয়েছে কোথায় গঙ্গার ঘাটে বসেছিল অমনি। কেউই তত লক্ষ্য করেনি,—হঠাৎ একটা মার সঙ্গে একটা চার পাঁচ বছরের ছেলে যাচ্ছিল তাকে ধরে হাতটা কামড়ে এতখানি মাংস তুলে নিয়েছে একেবারে। তারা সব ধরে খুব পেটিয়েছেন মার দিয়েছে—তাইতেই পালিয়ে এখানে এসেছে!'

এতক্ষণে কনক কথা বলে। শাশুড়ী স্বামী একত্রে থাকলে আগে সে কথাই কইত না, এঁরা পছন্দ করেন না বলে—এখন দু-চারটে কথা বলে, যদিচ খুব জরুরী অবস্থায় না পড়লে সোজাসুজি স্বামীর সঙ্গে বলে না, শাশুড়ীকে উপলক্ষ করে বলে। আজও তাই বললে, 'তা যার হুঁশ নেই, খিদে পেলে যা সামনে পাবে তাই খাবে—সে তো গু-গোবরও খেতে পারে। বেছে-বেছে মাংসটি খাবে, তা আবার মানুষের মাংস—চুপিচুপি এসে চিতা থেকে ঝলসানো মাংস নিয়ে পালাবে—এ আবার কেমন অঘোর—হ্যাঁ মা?'

'তুমি রেখে ব'সো দিকি বৌমা! ও বজ্জাতী, বজ্জাতী। সান্ন্যাসী না হাতী—রে গরম সাঁড়াশি দিয়ে ঐ জিভ টেনে বার করলে তবে ও নোলা জব্দ হয়।'

তারপর মনে পড়ে গেল আসল কথাটা—'তা হ্যাঁরে, শেষ অবধি কি হ'ল তারপর? পাওয়া গেল?'

'পাওয়া গেল—কিন্তু পুরোটা তো নয়। তখন দু-তিন কামড় খেয়ে ফেলেছে। বেগতিক দেখে বেশ খানিকটা কামড়ে তুলে নিয়ে বাকিটা গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল। ..... আবার একজন গঙ্গাপুত্তুর গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে আসে—'

কনকের ছেলে কেঁদে উঠতে সে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল। তার নিজেরও যেন হঠাৎ নতুন করে চোখে জল এসে গেল আবার। খুব বেশী দেখে নি সে ছোট মাসীমাকে কিন্তু ওঁর সব কথাই শুনেছে সে। কী বরাত নিয়েই এসেছিল মানুষটা, এমন ভাগ্য যেন অতিবড় শত্রুরও না হয়। জীবনে একটা দিনও মানুষে অন্তত সুখী হয়—এঁর অদৃষ্টে ও জিনিসটা যেন দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন বিধাতা। .....সারা জীবনটাই তো দগ্ধে গেলেন, আবার মরেও শান্তি পেলেন না। মরণটা এল—তাও একটা ভয়ানক কাণ্ড করে, মরার পরে পুরো দেহটা পর্যন্ত দাহ করা গেল না। এমন কখনও শোনেনি কনক, আর কারও মুখে শুনলে বিশ্বাস করত না। .....লোকে বলে গতজন্মের পাপে নাকি এ জন্মে দুঃখ পায়। সারা গতজন্ম ধরেই কি পাপ করে এসেছিলেন উনি? —যাকে বলে নির্জনে বসে আপন মনে পাপ করেছিলেন, বাধা দেবার কেউ ছিল না; তাই মরার পরেও সে পাপ খাওয়া করল? ......

কে জানে এ-জন্মেই শেষ হ'ল কিনা। আর যেন সে পাপের ফল পরজন্ম পর্যন্ত না টেনে টানে। এ-জন্মে তো কোন পাপ করেন নি, সতীসাধ্বী—সাধ্য মতো পরের ভালই করে গেছেন। আসছে জন্মে যেন সুখী হন, স্বামীপুত্র নিয়ে যেন মনের শান্তিতে ঘর করতে পারেন—হে ভগবান!

মনে মনে উদ্দেশে প্রণাম করে সে ভগবানকে।

বাইরে প্রথম অপরাহ্নের সোনালী আলো গাছপালার পত্রপল্লবে ঝলমল করছে—জানলার বাইরে সজনে গাছের খেলা করছে সে আলোতে—একটা সিরসির শব্দ হচ্ছে তার। মৃদু বাতাসে পুকুরের কাকচক্ষু জলে অতি সামান্য লহর উঠেছে—অদ্ভুত দেখাচ্ছে জলটা। ঠিক লহর বললেও ভুল বলা হবে—যেন পুলক শিহরণ। সে শিহরণ শুধু পুকুরের জলেই সীমাবদ্ধ নেই, জলের ধারে শুষনি কলমীর দলেও তা বিচিত্র আলোড়ন জাগিয়েছে। শান্তি, শান্তি। চারিদিকেই অপূর্ব শান্তি একটা। কোলে তার আধোঘুমন্ত দেবশিশুর মতো ছেলে, স্তন্য পান করতে করতে চোখ দুটো বুজে আসছে ওর—এখনও যেটুকু খোলা আছে সেই অর্ধনিমীলিত—অক্ষিপল্লবের ভেতরকার ঢুলুঢুলু দৃষ্টিতে অপরিসীম তৃপ্তি ও মার প্রতি নির্ভরতা। এ সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে কোথাও কোন দুঃখ, কোন অশান্তি আছে। কনকেরও যেন নিজের মনেই একটা আশ্বাস জাগে।... সুখী হবে, নিশ্চয় সুখী হবে এ জন্মে মাসীমা। আর এমন ক'রে দুঃখ পাবে না।

ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে হঠাৎ মনে হ'ল, 'আচ্ছা যদি আমার কাছেই আসে আবার!... মা,গো, তা আসবে নাকি? অতবড় মানুষটা আবার এতটুকু হয়ে আমার কোলে শুয়ে দুধ খাবে?'

পরক্ষণেই বিষম লজ্জা করতে লাগল তার—কথাটা কল্পনা করার জন্য। আচ্ছা কাণ্ড বটে! যত কি বিদঘুটে কথা তার মাথাতে আসে!

(ক্রমশঃ)

প্যারিস থেকে বলছি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস, ফেব্রুয়ারী ঃ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপে একমাত্র আলোচনার বিষয় ছিল ঠাণ্ডা। শীত নয়। কারণ শীতকালে ঠাণ্ডা তো হবেই। এবার যা হয়েছিল তা শুধু ঠাণ্ডা নয়, বরফ-গলা ঠাণ্ডা নয়। জল জমে বরফ হওয়া ঠাণ্ডা। সবার মুখে এক কথা, এক শব্দ, উঃ হুঃ, হি হি, হা-হা। জমে যাচ্ছি, ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছি। এই শব্দ মাত্র। শীতকালে সব বছরে ঠাণ্ডা পড়ে না। ইদানিং কালে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েক দিনের জন্য ঠাণ্ডা পড়েছিল। কিন্তু এবার যা ঠাণ্ডা পড়েছে তাকে বলা চলে রেকর্ড সৃষ্টি। শুধু ঠাণ্ডা নয়, বাড়ীতে জলের পাইপ জমে বরফ। ফলে পুরনো পাইপ ফেটে একাকার। প্যারিসের আশে-পাশের লেকগুলো জমে বরফ। তার ওপর ছেলে মেয়ের দল স্কেটিং করছে। তাও একদিন দুই দিন নয়, এক মাস ধরে। এখানেই ওখানে। শুধুমাত্র খাল-বিল [illegible] ছিল না। প্যারিসের যেমন সেইন নদীর কয়েকটা শাখা জমে গিয়েছিল তেমনি লণ্ডনের সামনে টেমস নদী। এমন কি রাইন-দানিউবের কয়েকটি শাখা। মাস খানেক ধরে ওই সব নদীতে নৌকা চলা চল বন্ধ ছিল। ফলে বড় বড় শহরে মাল পত্র, খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল। সবচেয়ে বড় অভাব যা হল জ্বালানি দ্রব্য যেমন কেরোসিন, কয়লা ইত্যাদি। একদিকে ঠাণ্ডায় সব জমে যাবার যোগাড়। অন্যদিকে ঘর গরম করার জিনিসপত্র নেই। কি সাংঘাতিক ঝামেলা! ঘর গরম করতে চাই কয়লা বা কেরোসিন। ঠাণ্ডায় নদী-নালা জমে যাওয়ায় বহু নৌকো-জাহাজ নদীতে আটক। সেগুলো কয়লা বা কেরোসিন বহন করে। ট্রেনের অবস্থাও তাই। তুষারপাতে ট্রেনের লাইন বন্ধ। তার ওপর হল কয়লা-খনির কাজ বন্ধ। এই সব মিলে যা অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা না করাই ভাল। টাকা দিয়েও অতিরিক্ত কয়লা বা কেরোসিন কেনার উপায় নেই। লাইন লাগাও। এক মণ কয়লা চাইলে পনর সের, পাঁচ গ্যালন কেরোসিন চাইলে দুই গ্যালন পাওয়া গেছে। একটা বা দুটো কম্বলের কাজ নয়। তিন-চারটি কম্বল তার ওপর ঘর তো গরমই।

এ বছরে ইউরোপে ঠাণ্ডার কথা বলতে গিয়ে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশের মফঃস্বলের কোনো ছোট্ট শহরের একটি এ্যামেচার থিয়েটার সম্প্রদায়ের যিনি 'সীন' তৈরী করতেন তাঁকে সেই শহরের এক নতুন ক্লাবের কর্তা বলেছিলেন, "দেখ মাধব, আমরা শিগ্‌গির একটা থিয়েটার করব। সেই নাটকে সমুদ্রের 'সীন্' আছে। সুতরাং তোমাকে সমুদ্রের 'সীন্' তৈরী করতে হবে। মাধব তো শুনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। পরে সে বলে, দেখুন বাবু, নদী দেখাতেই পরান বেরিয়ে যায় তার ওপর সমুদ্র! পারবুনি বাবু।" ওই কথাতে আমার মনে পড়ল সমুদ্রের জল জমে যাওয়ার কথা। নদ-নদী, খাল-বিল জমে গিয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু উত্তর ইউরোপের সমুদ্রের ধারগুলো এবার জমে গিয়েছিল তার খবর না রাখাই ভাল। সমুদ্র জমে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। উত্তর ফ্রান্স, উত্তর জার্মানী ও বৃটেনের সমুদ্র-সৈকতে ঢেউগুলো এসে ঠাণ্ডায় জমে গেছে। সেই বরফের ওপর অনেকে স্কেটিং যেমন করেছে তেমনি স্কী। তার চেয়েও বেশী মারাত্মক হচ্ছিল সমুদ্রের ধারে বন্দরগুলোয় জল জমে বরফ। ফলে বহু সংখ্যক বন্দরের কাজ হয় বন্ধ। জাহাজগুলো অলস হয়ে বসে থাকে। একদিন বা দুদিনের জন্যে নয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পশুপক্ষীর কি দুর্দশা। নেকড়ে-হায়নার দল বন জঙ্গল ছেড়ে গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তেমনি হরিণ-শম্বর ইত্যাদি দল। বন্য পাখি এসে আশ্রয় নিয়েছে গৃহস্থের বাড়ীতে। এই ঠাণ্ডার বহু প্যারিসে

প্যারিসের একটি লেক জমে বরফ হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে স্কেটিং করছে ছেলেমেয়ের দল

বাঁচান কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের সাহায্যদান ছিল মহা সমস্যা। মানুষ যতখানি কষ্ট করেছে তার চেয়ে কয়েক গুণ কষ্ট করেছে পশু-পাখির দল। তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ঠাণ্ডার ঠ্যালায় মানুষ-পাখির অবস্থা একাকার।

* * *

চীরনিদ্রায় যারা আচ্ছন্ন তাদের কথা নয়, যারা অনিদ্রা রোগে নিয়মিত ভোগেন তাদের কথা বলছি। ঘুম বেশী পাওয়াটা যেমন রোগ তেমনি ঘুম না আসাটাও। অনিদ্রা বা যাদের ঘুম কম হয় বলে দুশ্চিন্তা তাদের জন্যে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক রকমের দাওয়াই বার করেছেন। ঘুম-পাড়ানর ওষুধ এখন আর কারুর অজানা নেই। কিন্তু ঘুমোবার ওষুধ বেশী সেবন করলে অনেককেই চিরনিদ্রায় মগ্ন থাকতে হয়। সেও এক বিপদ। আবার খুব বেশী অভ্যেস করলেও বিপদ। তখন ওষুধ না হলে ঘুম হবে না। তাই বছর দশ ধরে ইউরোপ-আমেরিকায় ঘুম পাড়াবার যন্ত্র বিভিন্ন হাসপাতালে চালু হয়েছে। এক এক দেশে এক এক রকমের ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে ঘুম-পাড়ান হয়। তার অধিকাংশ হল পরীক্ষামূলক। বাজারে চালু হয়নি। তবে কিছুদিন হল এক জাপানী প্রতিষ্ঠান ঘুম-পাড়াবার ইলেকট্রিক যন্ত্র বাজারে চালু করেছে। যন্ত্রটি মাথায় বালিশের কাছে রাখতে হয়। ঘরের আলো হবে আবছা নীল। যন্ত্রটি দিয়ে এক রকম সুর ভেসে আসবে যে শব্দ কানে লেগে মনে হবে যেন কেউ হিপ্‌নটাইজ করছে। মিনিট দশেক চলার পর ঘুম আসতে বাধ্য। তারপর আপনা আপনি সেই যন্ত্র বন্ধ হয়ে যাবে।

জাপানীদের যন্ত্র বাজারে চালু হবার আগে বছর ছয় পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের এক চিকিৎসক এইরূপ আরেকটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সেটিতে কিন্তু কুড়ি মিনিটে ঘুম আসে। রুশ বৈজ্ঞানিকরাও নাকি বছর পাঁচেক আগে একটি ছোট ইলেকট্রিক যন্ত্র আবিষ্কার করে যাতে নাকি সহজেই ঘুম-পাড়ান যায়। তবে সেই যন্ত্রটি রুশ দেশের বাইরে দেখা যায়নি। ফরাসীরাও এ-বিষয়ে অনেকখানি এগিয়েছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিজ্ঞানী মিলে একটা ছোট ব্যাটারিচালিত যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যেটির একটি অংশ মাথায় অপরটি পায়ে বেঁধে ঘুমোতে হয়। বিদ্যুৎ-সঞ্চারের ফলে ঘুম আসে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের নাম যথাক্রমে অধ্যাপক স্টেফান ল্যাডুক ও ডাঃ ল্যাবাণ্ডু। এঁদের যন্ত্রটি শুধু ঘুমপাড়ায় না, যারা রোগে কষ্ট পায় বা যন্ত্রণায় অস্থির হয় তাদের শান্ত করার জন্যও এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়।

ঘুম বেশী হওয়া বা ঘুম না হওয়া এই দুই রোগ সম্বন্ধে বহু শতাব্দী ধরে বহু বিজ্ঞানী গবেষণা করে আসছেন। নোবেল প্রাইজ-পাওয়া ফরাসী দার্শনিক বার্গশ বলেছেন যে, ঘুমের অর্থ হল বহির্জগৎ সম্পর্কে নির্লিপ্ত হওয়া।

বছর দুই-তিন যাবৎ বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এ্যাপ্‌লায়েড সাইকো-

হল্যান্ডের একটি খালের দৃশ্য

লজিক রিসার্চ ইউনিট'এর একদল গবেষক ঘুম সম্বন্ধে প্রচুর নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলছে যে, ঘুম রোগটা সবার সমান নয়। কারোর দিনে আট ঘণ্টা ঘুম দরকার, কারুর তিন-চার ঘণ্টা। অনেকে আবার এক সপ্তাহ না ঘুমিয়ে কাজ করে যেতে পারে, এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর দেখা গেছে। তবে যারা এক-নাগাড়ে না ঘুমিয়ে কাজ করে গেছে তিন চার দিন, তাদের কিন্তু পরে কোনো অবসাদ দেখা দেয়নি। তবে একটা প্রধান কথা হল এই যে, কোনো বিরক্তিকর কাজ করে না ঘুমিয়ে থাকলে পরে অসুখ করতে বাধ্য। কিন্তু কোনো মনোরঞ্জনদায়ক কাজ করে না ঘুমিয়ে থাকলে অবসাদ আসে না। তারা আরও বলেছেন যে, ঘুম না হওয়া বা অতিরিক্ত ঘুম হওয়ার মধ্যে অনেক সময় শারীরিক ব্যাধি ছাড়াও মানসিক চাঞ্চল্য বা মানসিক দুশ্চিন্তা কারণ হতে পারে।

• • •

জার্মানীর গ্যটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানাধ্যাপক ডঃ পল প্লা বহুকাল গবেষণার পর বলেছেন যে, একবিংশ শতাব্দীর মানুষেরা বিংশ শতাব্দীর মানুষের চেয়ে বেশী মেধাবী হবে। তার কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "প্রতিটি শিশুর মেধা বাড়াতে হলে শুধু লেখা-পড়া মুখস্থ করলেই চলবে না। তার হাত-পা, মাথা, নাক, চোখ ও কানগুলোকে সমানভাবে ব্যবহার করতে হবে। শুধুমাত্র মুখস্ত করে পরীক্ষা দিলে চলবে না। তাতে মস্তিষ্কটার ব্যবহার বা চর্চা হয় না। প্রতিটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা করতে পারলে তিন-চার বছর থেকে লেখাপড়া শেখান চলে। তারপর দশ থেকে বিশ বছরের মধ্যে তাকে পূর্ণ মানুষ করে গড়ে তোলা চলে। বিশ বছর পর্যন্ত সময় নষ্ট না করে তাকে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে যে সময় বাঁচবে সেই সময়ের মধ্যে তাকে চিন্তাশীল-বৈজ্ঞানিক করে তোলা যাবে।" আমরা সেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুখাপেক্ষি হয়ে বসে আছি। বোধ হয় তাদের একবিংশ শতাব্দীতে দেখা মিলবে। আমরা যে কত পিছনে পড়ে ছিলাম সেটা তারা প্রমাণ করবে গবেষণা করে।

• • •

শীতকালটায় প্যারিসে রাস্তায় রাস্তায় চিত্র-প্রদর্শনীর মেলা বসে। কয়েক শত আর্ট গ্যালারির সংবাদ দিতে গেলে 'অমৃত'র পৃষ্ঠা ভরে যাবে। তবে তাদের মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হল 'ম্যুজে গাইয়েরা' মিউজিয়মে আর্টিস্টদের পারিপার্শ্বিক ঘটনা নিয়ে প্রদর্শনী আর মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্টে তরুণ শিল্পিদের চিত্র-প্রদর্শনী। 'ম্যুজে দার মদার্ন'এ 'সালোঁ দ্য লা জন্ প্যানচুর'এ দেশি-বিদেশী অনেক তরুণ শিল্পীর আঁকা চিত্রপট স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে কলকাতার খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শক্তি বর্মণের একটি ছবি এখানে স্থান পেয়েছে। শক্তি বর্মণের ছবি সম্পর্কে এখানকার কয়েকটি সংবাদপত্র সুখ্যাতি করেছে। শক্তি বর্মণের অঙ্কন-পদ্ধতি ও রং-এর ব্যবহার প্রশংসনীয়। শক্তি বর্মণ প্রায় বছর সাতেক ধরে প্যারিসে বাস করছেন।

ভারতীয় রেডক্রশ সমিতির সাহায্যে প্যারিসের 'বার্নহাইম্ জন্' আর্ট গ্যালারি'তে এখন চলছে 'কালার দ্য ল্যান্দ' ভারতের রং নামে প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে দেখান হচ্ছে সুন্দর সুন্দর শাড়ী, রাজা-মহারাজাদের পোশাক, গহনা, কাঠ ও প্রস্তর মূর্তি। এখানকার প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র এই প্রদর্শনীর প্রশংসা করেছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে উৎকল

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

অপূর্ব দেশ এই উৎকল; আর অপূর্ব তার মহিমাময় শিল্পীদের কীর্তি। উৎকল বা উড়িষ্যার কথা মনে হইলেই ইহার অমূল্য সম্পদ ভারতীয় ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন—ইহার মন্দিরগুলি আমার চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে; আর অতীতযুগের যেসব শিল্পী এইসব স্বপ্নরূপকে বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে। উড়িষ্যার শিল্পীরা পাষাণশিল্পে যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবার দাবী রাখে।

মণ্ডনশিল্পের সাধনায় তাঁহারা যে নব নব রূপ ও রেখার সমন্বয়ে অপরূপ অলঙ্কার সৃজন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীন উৎকলশিল্পীরা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শিল্পসাধনা উড়িষ্যার শিল্পীদের জীবনধারার সহিত ওতপ্রোতভাবে এমনই মিশিয়া গিয়াছিল যে তাঁহাদের চিত্তের সমগ্র ভাবধারা নয়নাভিরাম অলঙ্কারধারারূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের কয়েকটি মন্দিরের এবং বিশেষ করিয়া উড়িষ্যার কোণারক ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নারী-মূর্তিগুলি সৌন্দর্যবিচারে সত্যই অপূর্ব। কবি কালিদাস তাঁর অনবদ্য কাব্য 'মেঘদূতে' নারীসৌন্দর্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, ভারতীয় ভাস্কর্যে যেন নিম্ন-

কোনারকের সূর্যমন্দিরের ভগ্ন প্রাচীরগাত্রে একটি নারী মূর্তি

উদ্ধৃত সেই বর্ণনাকেই রূপায়িত করা হইয়াছে:

"তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষমা চকিতহরিণী
প্রেক্ষণা নিম্ননাভী
শ্রোণীভারদলসগমনা স্তোকনম্রা
স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে
সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।"

দিদারগঞ্জের যক্ষীমূর্তি ঐতিহাসিক ভারতের প্রাচীনতম ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন এবং এই মূর্তিটি ভারতীয় নারীসৌন্দর্যের মান নির্ণয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনোমুগ্ধকর মূর্তি। উৎকলের অধিকাংশ মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন ভঙ্গিমার নারীমূর্তিগুলিও সৌন্দর্যের বিচারে প্রথম শ্রেণীতেই পড়ে।

প্রসাধনের দর্পণ বা নিরাভরণ হস্তে নায়িকামূর্তির বহু নিদর্শন ভারতীয় শিল্পে পাওয়া যায়। এই ধরণের মূর্তিগুলির মধ্যে অজন্তার প্রসাধনরতা রাজকুমারীর মূর্তিটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ। মথুরা ও অমরাবতীতেও এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় এবং উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কোণারকের মন্দিরেও এই প্রসাধনরতা যুবতীর অপরূপ জীবন্ত ও লাস্যময় মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আজ এদেশের ও বিদেশের অগণিত দর্শক ও শিল্পরসিক সমালোচকমাত্রই যে উড়িষ্যার মন্দিরগাত্রে খোদিত লতা-পাতা ও জীব-জন্তুর প্রাণবন্ত মূর্তিগুলি দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেছেন, তাহার মূলে যে কতখানি গভীরতা ও রসশক্তির অনুভূতি আছে তাহা চিন্তা করিবার

ভুবনেশ্বরের একটি মন্দিরগাত্রে খোদিত একটি অদ্ভুত পশু

ভুবনেশ্বরের একটি মন্দিরগাত্রে সুন্দরী নায়িকার মূর্তি

বিষয়। যে দৃষ্টি থাকিলে কোন বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরালের রসসৌন্দর্যের সন্ধান পায় এবং যে দৃষ্টি দ্বারা শিল্পী তুচ্ছ ও হেয় বস্তুর মধ্যে আপনার শিল্পকলার প্রেরণা পায়, তাহা যে উৎকলশিল্পীর ছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। প্রাণীজগত হইতে কত মনোহর আকৃতি, কত সুন্দর অঙ্গ-বিন্যাস, কত বিচিত্র গতি ও ভঙ্গির রেখা দ্বারা উড়িষ্যার শিল্পী যে স্ব-শিল্প-কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া ভাস্বর রূপচ্ছটায় মন্দিরগাত্রগুলিকে সুশোভিত করিয়াছে, তাহাও বিস্ময়ের বস্তু। মন্দিরগাত্রের এই মূর্তিগুলি প্রাণচাঞ্চল্যে সজীব বলিয়া মনে হয়। কোণারকের মন্দিরের অপূর্ব বেগবান অশ্বমূর্তি এবং মন্দিরগাত্রের নিম্নাংশের চলমান হস্তীমূর্তি প্রভৃতিতে প্রাণের বেগ ও গতি সুপরিস্ফুট। প্রস্তরশিল্পে এরূপ বস্তুতান্ত্রিকতা, এরূপ প্রাকৃতিক সাদৃশ্য ও গঠনবিন্যাসের সজীব অনুকরণ সাদৃশ্য ও গঠনবিন্যাসর সজীব অনুকরণ সত্যই বিরল। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উৎকল শিল্পীদের পাষাণশিল্পে জীব-জগতের প্রাণীদের দেহসৌন্দর্যের জীবন্ত ব্যঞ্জনার নিদর্শন—লিঙ্গরাজ মন্দিরের অপূর্ব সিংহমূর্তি, অনন্ত বাসুদেব ও কোণারকের বলদৃপ্তা গজগামিনী, মুক্তেশ্বরের সুন্দর সুঠাম মৃগযূথ এবং সূর্য-দেউলের তেজস্বী এবং প্রাণবান যুদ্ধাশ্বসমূহ, আজও শিল্পীদের অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভরূপে ভাস্কর্য-শিল্পের বিজয় ঘোষণা করিতেছে এবং অনাগত কালেও ঘোষণা করিতে থাকিবে।

অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে উড়িষ্যার শিল্পীদের অসাধারণ রসানুভূতি ও শিল্পসাধনার একটি গৌরবময় প্রচেষ্টার সূচনা, মৌলিক ও অপরূপ শিল্প সৃষ্টির বিপুল উদ্যম এবং তাহাদের জাতীয় প্রতিভার উন্মেষ ও তাহার পূর্ণ-প্রকাশ শিলাবক্ষে দেখা যায়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে ভুবনেশ্বরের ক্ষেত্রে, শত্রুঘ্নেশ্বরের মন্দিরে অপরিণত হাতের শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসের আভাস পাওয়া যায়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে গঠিত পরশুরামেশ্বর মন্দিরের রূপকারের শিল্পনৈপুণ্যের বিশিষ্ট উন্নতির পরিচায়ক। প্রায় সম-সাময়িক বৈতাল-দেউলের সুন্দর ও মনোহর পুষ্পলতার, বিশেষতঃ পদ্মপুষ্পের সুন্দর পরিকল্পনা ও মনোরম অলঙ্করণশিল্প প্রতিভার ক্রম-বিকাশের অপূর্ব নিদর্শন। দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন উড়িষ্যার শিল্পীরা পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইল, মুক্তেশ্বর মন্দির সেই নবোদ্ভাসিত শিল্পপদ্ধতির প্রতীকরূপে আজও সগৌরবে দণ্ডায়মান। এই মন্দিরটি শুধু উড়িষ্যার শিল্পেই নয়, ভারতের শিল্পেও যুগান্তর সৃষ্টি করে। বালুকাপ্রস্তরে নির্মিত মুক্তেশ্বর মন্দিরটি উচ্চতায় মাত্র ৩৫ ফুট হইলেও উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন এবং আনন্দের বিষয় এই যে ইহা প্রায় সহস্র বর্ষ অতিক্রম করিয়া আজও মহা-কালের ধ্বংসলীলাকে জয় করিয়া পুরাতন সৌন্দর্য লইয়াই দণ্ডায়মান হইয়া উড়িষ্যার গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। এই মন্দিরগাত্রের অলংকরণ নিখুঁত এবং অতি যত্ন ও সুরুচির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজা-রাণী মন্দিরটি উড়িষ্যা-শিল্পের একটি রত্নবিশেষ। খৃষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে ভুবনেশ্বরেই এই মন্দির নির্মিত হয়।

রসলোকের মধ্য দিয়া অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যে সম্পদলাভ করা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর উৎকলশিল্পী নির্মিত কোণারকের সূর্যমন্দিরে তাহার চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে। বিচিত্র চিত্তাকর্ষক কারুকার্যের প্রাচুর্যে এবং বিভিন্ন মূর্তির গঠনে ও নিখুঁত সমানুপাতে সূর্যমন্দির কেবল উড়িষ্যা বা ভারতবর্ষেই নয়, সারা জগতের স্থাপত্যশিল্পের একটি অতুলনীয় নিদর্শন। উচ্চতায় কোণারকের সূর্যমন্দির ২২৭ ফুট; আর পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বর্তমান উচ্চতা প্রায় ২১৫ ফুট। জগমোহনের মধ্যমাংশের পশ্চিমদিকে দুই হাত ভগ্ন দণ্ডায়মান ভঙ্গিতে সূর্যদেবতার বিরাট মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সবুজাভ কালো পাথরে নির্মিত সূর্যদেবতার গাত্রে নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য, মাথায় মুকুট, হাতে কেয়ূর এবং কটিতে নানা অলংকরণমণ্ডিত দেহবাস। কোণারকের মন্দিরগাত্রে কত গাছপালা, দেব-দেবী, পশু-পক্ষী, বাদ্যরত পুরুষ ও নারীমূর্তি, নৃত্যপরায়ণা নটীর দেহবিলাসের অপূর্ব ভঙ্গিমা।

উড়িষ্যার শিল্পীরা যে শিল্পসৃষ্টির ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, আগামী বহুকাল উৎকলবাসীরা তাহার জন্য গৌরব করিতে পারিবেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এই অপূর্ব নিদর্শনগুলি যুগে যুগে শিল্পীদের অনুপ্রেরণা দিয়াছে।

বিদায়, হে বিদেশী ফুল

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সরলা ঢুকলো ঘরে। তার হাতে একটি অরকিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগুনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপ্‌ছিপে লম্বা, শামলা রং, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ।...

......নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না, সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।......

নীরজার আজ কেবল মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা যুগান্তরের ইতিহাস। পশ্চিমধারে প্রাচীন মহানিম গাছ। তারই জুড়ি আরো একটি নিম-গাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানে ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ আলো-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তারপরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধু-বান্ধবেরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জ পরিক্রমা, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সব্জির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কার্নেশন।...

সেই ভোরবেলাকার ...... দার্জিলিং চায়ের বাষ্প-মেশা নানা ঋতুর গন্ধ-স্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে হায় হায় করে ওর মনে।

দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েও মালঞ্চের নীরজা তাই স্বামীকে বলেছিল —"আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অরকিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাওনি তো সে কথা। তারপরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ওই ঘরটাকে সাজিয়ে

তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না।"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে—"সে কেমন কথা! নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়!"

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে, "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।"

"বল কী। সরলা জানে না? যে মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জেঠামশায়। তাঁর তো জান-ওঁরি বাগানে আমার হাতেখড়ি।"

এ সেই কবেকার কথা। অনেক বছর আগে থেকে পুষ্প-প্রেমিকেরা পুষ্প-চর্চা করে আসছে। আজকাল ফুলের চাষ আরো ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। ইঁট-কাঠের চারদেয়ালে আবদ্ধ মানুষ এই অবরুদ্ধ জীবনে খেয়াল-খুশির একটা জানালা খুলে রাখতে চায়—যে গবাক্ষ দিয়ে হাওয়ার ঝাপটের সঙ্গে বয়ে আসবে প্রকৃতি অরণ্যের স্বাদ। যে সবুজের স্পর্শ আমাদের জীবনে ক্রমশঃ বিলীয়-

যান সেই মন্ত্রে প্রকৃতির প্রসাদ পাওয়ার জন্যে শহরের বাগানে অনেকেই আজকাল দেশী ও বিদেশী ফুলের চাষ করছেন।
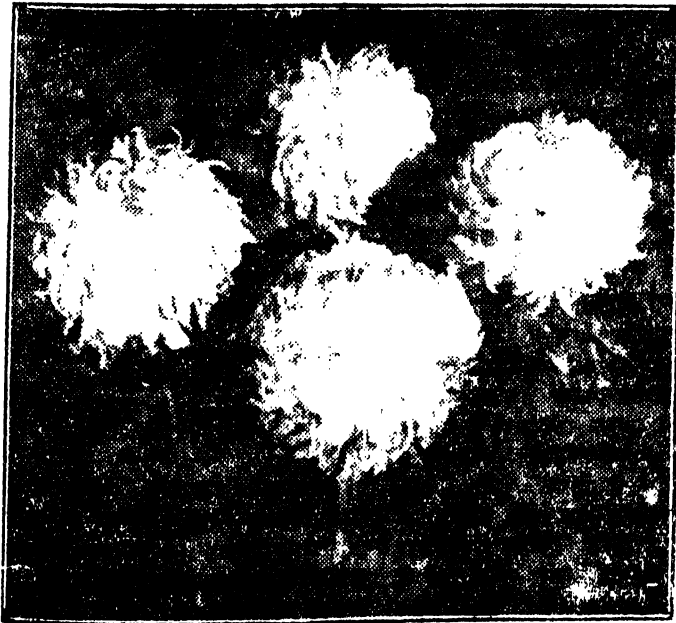
দেশী ও বিদেশী ফুলের নয়নানন্দকর প্রদর্শনীও এই কিছুদিন আগে কলকাতায় হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতায় উৎসাহবর্ধক অনেক পুরস্কার বিতরণ করাও হয়েছে। খবরের কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল কোনো এক মালঞ্চের মালাকার ৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের গাঁদা ফুল ফুটিয়েছেন। এত বড় গাঁদা ইতোপূর্বে আর দেখা যায়নি। গাঁদা ফুল বা মেরীগোল্ড দেশী কি বিদেশী তা নিয়ে তর্ক না তুলে আপাতত আমরা অত বড়ো আকৃতির ফুলের রূপেই মুগ্ধ হয়েছি। এরকম আরো অনেক বিদেশিনী ফুল আমাদের দেশের মাটিতে নিজগুণে ফুটে এদেশকেই আপন করে নিয়েছে। শীতের প্রারম্ভে ফোটা এইসব মরশুমি ফুলের বর্ণ-বাহার দেখে সুখ্যাতি না করে উপায় নেই।

এই বিদেশিনীদের যেমন রঙ নামও তেমনি নানান ঢঙের। এস্টার, এন্টারীনাম, কারনেশন, ডেজি, ক্যালেন্ডুলা, ক্লার্কিয়া, ফ্লক্স, প্যান্সি, ডালিয়া, ক্রিসান্থিমাম, কসমস্, সুইট সুলতান, কর্ণফ্লাওয়ার, হোলিহক—কত আর নাম করবো? তারা এখনো নিজ নিজ রূপ-লাবণ্যের সাম্রাজ্য বিস্তার করে অধিষ্ঠিত আছে। আসেম্‌ব্লির বাগান, হর্টিকালচার্ বাগান, আলিপুর চিড়িয়াখানার বাগান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানের মাঠে এবং আরো নানান বাগান আলো করে রানীর মহিমায় তারা বিরাজিত।

এই সব বিদেশী ফুলের নামকরণের পিছনে কিছু কিছু কিংবদন্তী আছে।

কখনো কখনো এই নামকরণের সঙ্গে মিশে আছে কবির কল্পনার রঙ।

'ডেজি' নামটির কথাই ধরা যাক। 'ডেজ্ আই' বা 'দিনের আয়ত আঁখি'র উপমা করা হয়েছে এই পূর্ণায়ত প্রস্ফুটিত ফুলটির সঙ্গে। তেমনি 'এস্টার' নামটিও 'এ্যাজ্ ষ্টার' বা আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করে দেওয়া হয়েছে। এস্টারকে তাই তারা-ফুলও বলা হয়।

ফুলের উপমা ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনো কবির পক্ষেই উত্তমা নায়িকার রূপ-লাবণ্য বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি।

প্রাচীনকাল থেকেই ফরাসী, ইংরাজী, সংস্কৃত বা বাংলা কাব্যে যেমন গোলাপ ও পদ্মের ছড়াছড়ি তেমনি প্রাচীন জাপানী ও চীনা কবিতাতেও চেরী ও পিয়নি ফুল কবিরা ব্রীড়াময়ী নায়িকার কপোলে সযত্নে ফুটিয়েছেন।

এক একটি ফুলের জন্মবৃত্তান্তের কাহিনীও চমৎকার। রমণীমোহন সুন্দর কিশোর নার্সিসাস তার প্রেম প্রত্যাশিনীকে প্রত্যাখ্যান করে স্বচ্ছ সরোবরে নিজের রূপ লাবণ্য দেখে নিজের প্রেমেই আত্মহারা হয়ে গেল। দিনের পর দিন নিজের প্রতিবিম্বের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে তার দেহ শীর্ণ হল, গালের রক্তাভা বিদায় নিল। বাঞ্ছিতকে না পেয়ে অকালমৃত্যু বরণ করতে হলো তাকে। বনপরী ও জলপরীরা তাদের প্রিয়তম বন্ধুর বিরহে শোকাকুল হলো। তার সংকারের জন্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বাললো। কিন্তু তারা নার্সিসাসের শবদেহকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে সৎকারের জন্যে নিয়ে যেতে যেতে দেখলো শবদেহ অদৃশ্য হয়েছে। তার বদলে মাঝখানে সোনালি এক শ্বেত বর্ণের পাপড়ির রেশম-কোমল ফুল ফুটে রয়েছে দীঘির স্বচ্ছ মুকুরে নিজের প্রতিবিম্ব বিকীর্ণ করে।

কিম্বা এ্যাপোলোর প্রিয়তম বন্ধু হায়াসিন্থাসের কাহিনীই ধরা যাক। এ্যাপোলো তার ছোট্ট বন্ধু হায়াসিন্থাসের সঙ্গে লোহার গোলক ছুঁড়ে খেলা করছিল। খেলতে খেলতে সেই গোলক লেগেই হায়াসিন্থাসের অকালমৃত্যু ঘটলো। বন্ধুশোকে অধীর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এ্যাপোলো তার বীণায় করুণ রাগিণী বাজাতে লাগলো। বনের পাখিরা স্তব্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ তরুশ্রেণীর উপরে শুধু শোনা যেতে লাগলো বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। অবশেষে শেষবারের মত সস্নেহে এ্যাপোলো হাত দিয়ে যেই হায়াসিন্থাসের কপাল স্পর্শ করেছে অমনি সেই দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার বদলে সেখানে ফুটে রইলো একগুচ্ছ নয়নাভিরাম ফুল। মৃত বন্ধুর কপাল-ঝরা রক্তের মতই প্রায় তার বর্ণ-বাহার। মানুষ রূপান্তরিত হলো ফুলে। বসন্তের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই এই ফুল আজও ফুটে ওঠে। এই ধরণের আরো কাহিনী প্রচলিত আছে।

বসন্তের রঙ শুরু হওয়ার অনেক আগে, শীতের শুরুতেই নীল দিগন্তে যারা ফুলের আগুন লাগিয়েছিল সেই বিদেশী ফুলেরা শহরের অনেক বাগান আলো করে আজো রয়েছে। শীতের কুয়াশাগুণ্ঠিত দিনেও তারাই বসন্তের পুলক এনেছে। শীগ্‌গিরই তাদের পালা সাঙ্গ হবে। তার পূর্বে অপেক্ষাকৃত অপরিচিতাদের একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

এন্টিরিনাম— ঋতুবাহারী ফুল। অনেকদিন এরা বাঁচে। খর্ব ও দীর্ঘ দুরকমের গাছই দেখতে পাওয়া যায়। বাগানে লাগানো ছাড়াও ঘরের সামনে, বারান্দায় বা জানালায় টবে ও কাঠের ফ্রেমে একে ঝুলিয়ে রাখাও যায়।

এস্টার—আগেই বলা হয়েছে এস্টারের আর একটি নাম তারা ফুল। ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই ফোটে। বাড়ীতে ফুলদানিতে সাজানোর পক্ষে এ ফুল অদ্বিতীয়।

এস্কেলটোজিয়া—এর আর একটি নাম 'ক্যালিফর্ণিয়ান পপি'। এই গাছে সহজেই অনেক ফুল ফোটে ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

কর্ণফ্লাওয়ার— সেন্টাউরিয়া কয়েনাস্‌কে কর্ণফ্লাওয়ার নামে পরিচিত করা হয়। এর ফুল বিভিন্ন রঙের হয়।

কসমিয়া—অনেক রঙের কসমিয়া বা কসমস্ দেখতে পাওয়া যায়। এক-দল ও দ্বি-দল পাপড়িবিশিষ্ট এই ফুল বেশি ফোটে।

কারনেশন্— প্রাচ্যদেশে গোলাপের পরেই কারনেশন ফুলের আদর। একটু যত্ন নিলে খুব বড়ো কারনেশন ফুল বারোমাসই ফোটানো যায়। এই ফুলের গন্ধ লবঙ্গের মত।

ক্যালেন্ডুলা— ক্যালেন্ডুলাকে অনেকে 'ইংলিশ' বা 'পট্ মেরীগোল্ড' বলে থাকেন। এক-দল ও দ্বি-দল পাপড়ি-বিশিষ্ট হলদে ও কমলা রঙের ফুল দেখা যায়।

ক্যাম্পানুলা—এই ফুলের আকৃতি ঘন্টার মত। এজন্যে ইংরেজীতে একে 'ক্যান্টারবেরী বেল্‌' বলা হয়।

ক্রিসেন্থিমাম— ক্রিসেন্থিমাম বা চন্দ্রমল্লিকার এলাচগন্ধী ফুলের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিছুদিন আগে 'ফ্লাওয়ার শো'-তে চন্দ্রমল্লিকাই আসর দখল করেছিল।

গম ফরেণা—দু'ফুট উঁচু গাছ। এই ফুলের আরেক নাম 'Globe Amaranth'। সাদা, গোলাপী ও বেগুনী অনেক রঙের ফুল সারা বছর ফোটে।

জিপ্‌সোফিলা— এই গাছে ছোটো ছোটো অজস্র ফুল ফোটে। মালায় কিম্বা তোড়া বাঁধতে এ ফুল খুব উপযোগী।

জিনিয়া— শীত-গ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই জিনিয়া জন্মায়। ডালিয়া ফুলের মত এক-দল ও দ্বি-দল পাপড়ি বিশিষ্ট বা কুঞ্চিত পাপড়ির বহু রঙের নানা আকৃতির জিনিয়া ফুল ফোটে।

টিথোনিয়া—কমলালেবু রঙের ফুল। দেখতে ছোটো ছোটো লাল্‌চে সান্‌ ফ্লাওয়ারের মত।

ডালিয়া— ডালিয়ার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। 'ফ্লাওয়ার শো'-তে অনেক সময় ডালিয়াই সেরা রূপসীর আসন পায়।

ডেজি—'ডেজ আই' বা দিনের পূর্ণায়ত চোখের সঙ্গে এই ফুলের সাদৃশ্য আছে।

ডেলফিনাম—নীল রঙের ডেলফিনাম দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। টবে ঝুলিয়ে রাখার পক্ষেও খুব উপযোগী।

ন্যাশটারসিয়াম— শীতকালে এবং বিশেষ শীতপ্রধান জায়গায় বারোমাসই এই ফুলের দেখা পাওয়া যায়। টবে ঝুলিয়ে রাখার পক্ষেও উপযোগী।

প্যান্সি—ঋতুবাহারী ফুলের মধ্যে প্যান্সির খ্যাতি সর্বজনবিদিত। প্যান্সি শীতপ্রধান দেশের চিরস্থায়ী বৃহৎ ও উজ্জ্বল বর্ণের ফুল। টবেও প্যান্সি ফুলের গাছ লাগানো যায়।

পিটুনিয়া—এই ফুলের গাছ অল্প লতানে। এক-দল ও দ্বি-দল পাপড়ির নানা রঙের এই ফুল দেখা যায়।

ব্র্যাচিকম—ছোট ছোট নক্ষত্রের মত এই ফুলের আকৃতি। নীল, সাদা ও গোলাপী রঙের ফুল পাওয়া যায়।

ভার্বেনা—এই গাছের ডালের মাথায় থোকা থোকা ফুল ফোটে। নানা রঙের ফুল দেখতে পাওয়া যায়।

ভায়োলা—এ ফুল দেখতে অনেকটা প্যান্সির মত। এজন্যে এর আর এক নাম 'টাফ্‌টেড্‌ প্যান্সি'। সাধারণতঃ সাদা ও বেগুনী এই দুই রঙের ফুল পাওয়া যায়।

ভিন্‌কা—ভিন্‌কা সন্ধ্যেবেলা ফোটে বলে বাংলাদেশে এর আর এক নাম 'শ্যাম সোহাগিনী'।

লার্কস্পার—বিভিন্ন বর্ণের ফুল ফোটে। দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এই ফুলগাছের খর্ব ও দীর্ঘ এই দুই শ্রেণী আছে।

সুইট্‌পি—লতাজাতীয় মরসুমী ফুল। সাদা, কালো, লাল, হলদে, বেগুনী, গোলাপী, নীল প্রভৃতি নানা রঙের মিষ্টি গন্ধের সুইট্‌পি পাওয়া যায়। সুইট্‌পি বর্তমানে খুবই আদৃত।

সুইট সুলতান—এর আরেক নাম সেণ্টাউরিয়া মসচাটা। ফুলের গন্ধ খুব মিষ্টি।

এছাড়া হেলিওট্রপ্‌ বা হোলিহক্‌ প্রভৃতির দেখা এখনো পাওয়া যায়।

অচিরেই বসন্তের রঙ্গ জমে উঠবে। স্বদেশিনী ফুল বসবে আসর জাঁকিয়ে। বিদেশিনী ফুল এবার পাততাড়ি গুটিয়ে পাড়ি দেবে সেই দেশে যেখানে ঠান্ডার আমেজ আছে। কুয়াশাগুণ্ঠিত অকাল মরশুমে রূপের সাহস নিয়ে যারা ফুটে উঠে গন্ধে-লাবণ্যে আমাদের মুগ্ধ করেছিল, আমাদের মনে বাসন্তী আমেজ এনেছিল, সেই ফুলের প্রতিমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এবার বলতে হবে—"বিদায়! হে বিদেশী ফুল!"

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবন ও যাত্রাভিনয়

পৃথ্বীশ নিয়োগী

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত যাত্রা উৎসবের অভূত-পূর্ব সাফল্য বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীল শিক্ষিত-সমাজের কাছে একটি নতুন জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছে। বাংলা দেশের অভিনয়-অনুষ্ঠানের মূল রসকেন্দ্র কোথায়, থিয়েটার এবং সিনেমার সর্বাত্মক প্রভাব কি রঙ্গজগতের অন্যবিধ শিল্প-কলাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যাত্রাভিনয় কি বিগত যুগেরই লুপ্ত শিল্প এবং এর সঙ্গে কি সত্যি নাগরিক জীবনের উন্নত ও শিষ্ট রসবোধের যোগ নেই, এ-সকল প্রশ্ন নতুন করে চিন্তা করবার সময় এসেছে। এক কথায় যাত্রা উৎসব সাংস্কৃতিক জগতে একটা স্পর্ধিত 'চ্যালেঞ্জ' রূপে দেখা দিয়েছে। সমস্ত জিনিসটাকে লঘু ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। যাত্রা উৎসবের এই বিরাট সাফল্যের অন্তরালে বাঙালীর যে মানস-প্রবণতা, যে রস-সংস্কার, কিংবা শিল্পবোধ কাজ করেছে তাকে গভীর ধৈর্য ও সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে অবশ্যই বিচার করতে হবে। কলকাতা কিংবা কলকাতার বাইরে যে বিরাট জন-মানস পড়ে রয়েছে তাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে এই নতুন জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তরের আলোকেই তা করা যেতে পারে।

যাত্রাগানের উদ্ভব এবং আবির্ভাব বর্তমানে সাহিত্যপন্ডিতদের গবেষণার বিষয়বস্তু হলেও, এ-কথা বলা হয়ত অসংগত হবে না যে, যাত্রাগান কথাটা এসেছে কৃষ্ণযাত্রা থেকে। ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শেষ হলো, অক্রূর এসে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে যান। শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা যাত্রার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণযাত্রার গোড়াপত্তন হয়; প্রথম দিকের এই ধরণের যাত্রাগানে, কোন গদ্য কথোপকথন বা সংলাপ ছিল না। শুধু গানের মাধ্যমেই কৃষ্ণ, রাধা, বড়াইবুড়ী, গোপী কিংবা অক্রূর উত্তর-প্রত্যুত্তর করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কৃষ্ণযাত্রার আর একটু অর্থবিস্তার ঘটলো। শুধু কৃষ্ণের মথুরা যাত্রাই নয়—কৃষ্ণবিষয়ক যে কোন লীলার পালাগান—, তা সে বৃন্দাবনলীলাই হোক কিংবা মথুরা অথবা দ্বারকালীলাই হোক, কৃষ্ণযাত্রারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। শ্রদ্ধেয় বসন্ত-রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন নামে যে পুঁথিখানি আবিষ্কার করেছেন, তা সম্ভবত এইরূপ কৃষ্ণ-লীলাত্মক যাত্রাগানেরই পুঁথি। এই পুঁথির কাহিনী রূপ, নাটকীয়তা ও বিভিন্ন ঘটনালগ্নের মধ্য দিয়ে চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস এবং সর্বোপরি এর নাট্যধর্মী সংলাপ এই মতেরই সমর্থন করে। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এই সকল গানের একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এই ধরণের সংগীতধর্মী কৃষ্ণযাত্রার মধ্য দিয়ে, শ্রোতার মনে কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণভক্তি উদ্রেক করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষ্ণের অতিমানুষী ও অলৌকিক দিব্যশক্তি দেখিয়েই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হোত। পরবর্তীকালে, কৃষ্ণযাত্রার পরিধি আরো সম্প্রসারিত হল। কৃষ্ণের লীলাত্মক বিষয়ক কাহিনীকে যাত্রার একমাত্র অবলম্বন না-করে, ভাগবত, পুরান, রামায়ণ ও মহাভারতের যে-কোন কাহিনী বা ঘটনাকে অবলম্বন করে যাত্রাগান রচিত ও গীত হতে শুরু হল। তখন এই সকল গানকে কৃষ্ণযাত্রা না বলে শুধু 'যাত্রা' আখ্যা দেওয়া হতে লাগলো। পরবর্তীকালে ঘটনাবস্তু ও কাহিনীবৃত্তের দিক থেকে যতটা অর্থবিস্তার ঘটুক না কেন, আমাদের দেশের 'যাত্রা' একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে একান্তভাবেই ধর্মকেন্দ্রিক; দর্শক ও শ্রোতার মনে ধর্মভাব জাগিয়ে তোলা এবং ভগবৎ ভক্তি ও ভগবৎ বিশ্বাস দৃঢ় করাই হচ্ছে যাত্রাগানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে কতগুলি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ প্রচার করাও যাত্রাগানের অন্যতম অভিপ্রায় ছিল। সেই সঙ্গে সতীত্ব ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা, ভ্রাতৃপ্রেম, মাতৃ-পিতৃ ভক্তি, অধর্মের পরাজয়, ধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আনুসাংগিক বক্তব্যগুলিও যাত্রাগানের প্রধান উদ্দেশ্যের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণযাত্রা সম্পূর্ণভাবে সংগীতের মাধ্যমে রচিত হলেও, পরবর্তীকালের যাত্রায় গদ্য ও পদ্য সংলাপের আবির্ভাব ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দৃশ্য ও অঙ্কের বিভাগও যাত্রাগানের মধ্যে সংযোজনা করা হয়। তবে মোটামুটিভাবে যাত্রায় সঙ্গীতের প্রাধান্য বিশেষভাবেই পরি-লক্ষিত হয়ে থাকে। ভগবৎ মহিমা ও ধর্মের মাহাত্ম্য দেখাতে গিয়ে, যাত্রা-গুলিকে অনেক পরিমাণে অলৌকিকতার উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এজন্য যাত্রার মধ্যে যে সকল situation বা ঘটনালগ্নের সৃষ্টি করা হয় তা সর্বত্র স্বাভাবিক না হয়ে অস্বাভাবিক ও কিছু পরিমাণে আকস্মিক হয়ে উঠে। যাত্রার ঘটনা বহু স্থলেই আরোপিত (imposed)—স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত (evolved) হয় না। না-হোক কিন্তু তাতে করে দর্শক কিংবা শ্রোতাদের বিশ্বাসপ্রবণতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না—বরং ভগবান বা কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিমহিমা উপলব্ধি করার ফলে তাদের আস্তিকাবুদ্ধি প্রবলতর হয়ে উঠে।

যাত্রাগানের উদ্ভব ও উহার আদর্শের এই পটভূমিকায় আমাদের দেশে যাত্রার বিরাট জনপ্রিয়তা ও তার অভিনয়-সাফল্য বিচার করা সম্ভব হবে। নাটক-জাতীয় দৃশ্যকাব্যে সাধারণত পাত্র-পাত্রী ও অভিনয়-বস্তুর সঙ্গে দর্শকের গভীর একাত্মতা ঘটে। অভিনয় দর্শনকালে দর্শক নিজের ব্যক্তিগত সত্তা, তার পরি-বেশ-পরিমণ্ডলকে ভুলে যান। এক গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনাবলে, তিনি রঙ্গমঞ্চের অভিনীত ঘটনার সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করেন। তখন অভিনয়ের জগৎ যেন নিজেরই জগৎ বলে মনে হয়। নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজের সুখ-দুঃখকে জড়িয়ে ফেলেন। তাদের সুখে নিজেকে সুখী এবং তাদের দুঃখে নিজেকে দুঃখী মনে করে থাকেন। একেই বলে "সাধারণীকৃত"। এই সাধারণীকৃত যত ব্যাপক ও গভীর হবে, অভিনয় ততই সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। দর্শকের জীবন-দৃষ্টি-ভঙ্গি ও মানস অনুভূতির প্র[illegible] অনুসারে, দেশে-দেশে ও কালে-[illegible] নাটকের এই সাধারণীকৃত তথা অভিনয়-সাফল্যের তারতম্য নির্ভর করে। আমাদের দেশ অপেক্ষা ইউরোপীয় জাতিসমূহ অনেক পরিমাণে বাস্তববাদী—সুতরাং জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন তাদের বাস্তবমুখী, তেমনি আবার অভিনয় দর্শনকালে তারা যে পরিমাণে জীবনের বাস্তব সমস্যা ও ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করে, সেই অনুপাতেই তাদের রসপিপাসু মন পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বাঙালীর তথা ভারতীয় জীবন-দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্ত্য জাতির অনুরূপ নয়। জীবনকে তারা প্রত্যক্ষ বাস্তবের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত নয়। যুগান্তকালের শিক্ষা ও সংস্কারের বলে তারা প্রত্যক্ষ বাস্তবের জীবনের অন্তরালবর্তী একটি ভাব-জীবনকে আঁকড়ে ধরে আছে। সংসারের এই প্রত্যক্ষ বাস্তব ত মায়া—দু' দিনের ঘটনা; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এর পরি-সমাপ্তি ঘটবে। এই সংসার-জীবন সেই বৃহত্তর অনন্ত জীবনেরই ভূমিকা মাত্র। সংসার-জীবনের সুখ, দুঃখ তাই ক্ষণিক

মায়া মাত্র। এখানকার প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তিতে কিছু এসে যায় না। একদিন জলবুদ্বুদের মতই সব কিছুই অনন্ত মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। সংসার-জীবনের অন্তরালে বসে, এক অনন্ত মহাশক্তি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিই আমাদের কাঁদাচ্ছেন, তিনিই হাসাচ্ছেন। জগৎ-সংসারের সব কিছুর মধ্যে তাঁকেই খুঁজে পেতে হবে—মৃত্যুর পর সেই অনন্তলোকে জগৎস্রষ্টা ও জগৎ নিয়ন্ত্রার হাতে আত্মসমর্পণ করে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে হবে, এটাই আমাদের জীবনের বড় কাম্য। তাই যে নাটক-অভিনয়ে, প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের অন্তরালবর্তী এই ভাবজীবনকে ও তার মায়ামধুর স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তা-ই আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে অভূতপূর্ব সাফল্য আনতে পেরেছে। আমাদের দেশের যাত্রাগানগুলি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই অলৌকিক ভাবলোকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের গভীর যোগসূত্র স্থাপনা করে দিয়েছিল। বাস্তবজীবনের সকল ঘটনাই, আধ্যাত্মিক ভাবদৃষ্টিতে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জীবনের সকল ঘটনাই জীবনের শিক্ষার জন্য সেই লীলাময় কৃষ্ণেরই নির্দেশে সংঘটিত হচ্ছে—যাত্রার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই ভাবসত্যটাকে ফুটিয়ে তোলা হত। তাই অভিনয় দর্শন করে বাস্তবজীবনের দুঃখ-বেদনার অতীত এক পরম আশ্বাসের সন্ধানে বাঙালী দর্শকের মন ভরে উঠেছে। এজন্য যাত্রার ঘটনাগুলো অবাস্তব ও অলৌকিক হলেও দর্শকমন তার মধ্যেই একটা বড়ো সত্যের সন্ধান পেয়ে—ওগুলোকেই অধিকতর বাস্তব সত্য মনে করে নিয়েছে। বাস্তবজীবন ও অলৌকিক অবাস্তবজীবনের মধ্যে কোন বিরোধই তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। বরং এই দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ-সেতু আবিষ্কার করে তাদের সংশয়-কাতর মন অনেক পরিমাণে সান্ত্বনা লাভ করেছে। যাত্রা-নাটকের সাফল্য এইখানেই। নটগুরু গিরিশচন্দ্র বাঙালী জাতির এই নিগূঢ় রস-প্রবৃত্তির রহস্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই যাত্রাভিনয়ের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে তিনি পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন এবং এককালে সেগুলোর অসাধারণ মঞ্চসাফল্য হয়েছিল। অথচ তৎকালে বাঙালী জীবনে কতগুলি বাস্তব সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল—যেমন মদ খাওয়া, বহুবিবাহ, সামাজিক অনাচার, বিধবা বিবাহ। এগুলো নিয়ে নাটক রচিত হলেও তার জনপ্রিয়তা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর জনজীবনে সেগুলোর আবেদন সামান্যই ছিল। কিন্তু পৌরাণিক নাটকগুলি জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

প্রথম দিকে যাত্রার বিষয়বস্তু, রূপ ও প্রকৃতি যাই থাক না কেন, পরবর্তীকালে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, একথা অনস্বীকার্য। পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু প্রথম যুগের যাত্রার উপজীব্য হলেও, পরবর্তীকালে আমরা ভিন্নতর উপাদানের যাত্রার অভিনয় দেখতে পেয়েছি। এই সকল অভিনয়ের মধ্যে দেশাত্মবোধক কিংবা হিন্দু মুসলমানের মিলনসূচক অথবা বাঙালী জাতির গৌরবাত্মক কাহিনীগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং লক্ষণীয় পরিবর্তন। এর মূলে একটি ভিন্নতর রসপ্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এই রসপ্রবৃত্তি হলো জীবনদৃষ্টিভঙ্গী জাতীয় জীবনেরই অনুকূল হওয়ায় এটাও পরবর্তীকালে সাদরে যাত্রাগানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এককালে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতসাধারণই তা' নিয়ে চর্চা করতেন। কিন্তু দেশপ্রেম, একদা কাব্য গল্প উপন্যাসের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর জাতীয়জীবনে স্বাধীনতা-আন্দোলনের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করল। প্রথম যুগের স্বাধীনতা-আন্দোলন মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে জনজীবনে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজীর অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র জাতির ভাবজীবনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। দেশপ্রেমের আবেগ গণজীবনকেও উদ্বুদ্ধ করে তুলল। ফলে দেশাত্মবোধের প্রেরণা প্রথমে নাটক পরে যাত্রার মধ্যে অনুপ্রবেশ করল এবং তা' জনমানসকেও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করল। মুকুন্দদাস ও তাঁর সম্প্রদায়েরাই সর্বপ্রথম এই ধরণের যাত্রার প্রবর্তন করেন। শুধু দেশপ্রেমই নয়, পণপ্রথার কুফল, সামাজিক দুর্নীতি, জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর শোষণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাহিনী-রচনা, যাত্রাগানের পালা বদলের আভাস সূচিত হল।

মুকুন্দ দাসের অভিনয় যাত্রা জগতে এক নবদিগন্তের সূচনা করল। তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালী-জাতির কাছে এক নতুন ভাবের জগৎ ও রসের জগতের সন্ধান এনে দিল। বাঙালী দর্শককে নতুন ভাবের বন্যায় স্নান করিয়ে তার নবজন্ম দান করল। মুকুন্দ দাসের যাত্রা শুনবার জন্য যে অভূতপূর্ব দর্শকসমাবেশ হত এবং অধীর আগ্রহ নিয়ে শ্রোতারা শেষ

পর্যন্ত অভিনয় দর্শন করত তার কারণ এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। সে যুগের স্মৃতি অনেক পাঠকের মনে জাগরূক রয়েছে। অথচ তাঁর অভিনয়ে না-ছিল সাজ-সজ্জার আড়ম্বর, না-ছিল costume-এর বাহুল্য। গৈরিক পোশাক পরিহিত লাঠিধারী অভিনেতাই আসর মাৎ করে দিতেন। যে ধর্মবোধ ও ধর্ম-চেতনা বাঙালীজাতিকে একদা একটা ভাবের জগতে আবিষ্ট করে রেখেছিল, তারই পাশাপাশি আর একটি নতুনতর ও ভিন্নতর আবেগ-চেতনা তার মানসলোকে এক অভিনব রসজগতের দ্বার খুলে দিয়েছিল। সে রসজগতের আকর্ষণ বাঙালী জাতির কাছে কম উপভোগ্য হল না। দেশপ্রেমই এ যুগের বাঙালীর কাছে নতুন ধর্মমন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছে। এই ব্যাপারে একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার আছে। দেশপ্রেমের নতুন ধর্মবোধ শুধু এক শ্রেণীর শিক্ষিত দর্শক কিংবা পাঠককে উদ্বুদ্ধ ক'রেই ক্ষান্ত হল না—সমগ্র জনচিত্তে—জাতির মানসচৈতন্যেও অভূতপূর্ব সাড়া এনে দিল। সময় অনুকূলে ছিল—মুকুন্দ দাস ও তাঁর সম্প্রদায় সেই অনুকূল জাতীয় লগ্নকে কাজে লাগিয়ে একটা বড় ঐতিহাসিক এবং জাতীয়দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন। বাংলা দেশের যাত্রা ও নাটকের ইতিহাসে মুকুন্দ দাসের দান অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অতঃপর যাত্রাগান কেবলমাত্র ধর্ম-কেন্দ্রিক না হয়ে ভিন্নতর রসের খাতে প্রবাহিত হতে লাগল। তবে যাত্রাগান বিভিন্ন রসাশ্রয়ী হলেও, একটা মূল সুর বিভিন্ন ধরণের যাত্রার পালাগুলোকে এক ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। এই মূল সুরটি হচ্ছে—একটা নৈতিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা। যে ধরণের পালাই রচিত হোক না কেন, পরিণতিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন অথবা ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয় কিংবা দুর্নীতিকে পরাভূত করে ন্যায় ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা করাই সমস্ত যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। যাত্রাগানের সম্ভবত এ হচ্ছে একমাত্র ফলশ্রুতি। বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত যাত্রা উৎসবে আমরা বিভিন্ন ধরণের যাত্রার অভিনয় দেখেছি। একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা, নদের নিমাই, পাদুকা, ধর্মের জয় প্রভৃতি যাত্রায় বিপুল জনসমাবেশ ঘটেছে, তেমনি আবার 'কবরের কান্না', 'বর্গী এল দেশে', 'বাঙালী', 'দ্বিতীয় পানিপথ', 'সোনাই দীঘি', 'নবাব সিরোজদ্দৌলা' প্রভৃতি যাত্রাভিনয়েও দর্শকসমাজ অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছে। এর কারণই হচ্ছে, যাত্রাগুলি ধর্মবোধকে আশ্রয় করেই হোক কিংবা দেশাত্মবোধকে আশ্রয় করেই হোক, যেভাবেই রচিত হোক না কেন, একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শের মহৎ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

আমরা এ পর্যন্ত যাত্রাগানের বিষয়-বস্তু নিয়েই আলোচনা করেছি। এর অভিনয়কলা, শিল্পরূপ কিংবা অভিনয়-ভঙ্গি সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। যাত্রাভিনয়ে এক বিশেষ ধরণের অভিনয়-ভঙ্গি আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত আছে। অতিনাটকীয় ভঙ্গিতে অভিনয় করা যাত্রার একটা বিশেষ রীতি। উচ্চগ্রামে স্বর তুলে, বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিসহকারে অভিনয় করা। শব্দ-বিশেষ কিংবা বাক্যাংশের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া, কিংবা কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে বাক্যাংশ উচ্চারণ করা অথবা অন্তরের সুগভীর ভাবাবেগকে হাত-পা বা মুখের নানা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অভিব্যক্ত করাই উচ্চাঙ্গের অভিনয়কলা বলে মনে করা হত। এর একটা বিশেষ কারণ ছিল। পল্লীগ্রামে সহস্র সহস্র দর্শক পরিবেষ্টিত মণ্ডপ বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনেতাদের অভিনয় করতে হত। অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে বিরাট আসরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হত। এজন্য উচ্চগ্রামে অভিনয় কিংবা কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এতগুলো দর্শককে পরিতৃপ্ত রাখতে হলে শুধু অভিনয় বা সংলাপই যথেষ্ট ছিল না। সঙ্গীতের প্রয়োজন হত বেশী। এই সঙ্গীত আবার বিভিন্ন ও বিচিত্র বাদ্য-যন্ত্রের সহযোগে দর্শকমণ্ডলীর সর্বত্র শ্রুতিগোচর করা হত। কিন্তু সংলাপ-অভিনয়ের যতই উৎকর্ষ সাধন হতে লাগল, সঙ্গীতগুলির প্রাধান্য ততই কমতে লাগল। এককালে জুড়িগান যাত্রার মধ্যে বিশেষ আদৃত হলেও, পরবর্তী-কালে এগুলো একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। পল্লীগ্রামে যাত্রার অভিনয়ের সময় অভিনেতারা আলোর স্বল্পতা লক্ষ্য করে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি (postures & gestures) সহকারে অভিনয় করে তাঁদের মানস-আবেগকে প্রকাশ করতেন। চোখ কিংবা মুখের সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রদর্শনের সুযোগ তাঁদের বড় একটা ছিল না। বর্তমানে আলোর প্রাচুর্য ঘটায় এবং দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কাছে সূক্ষ্ম অভিনয়-কারুকার্যের একটা সুযোগ এসে গিয়েছে। বহু প্রবীণ ও নবীন কৌশলী অভিনেতা এর পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন এবং এক শ্রেণীর দর্শকের কাছ থেকে তাঁরা সপ্রশংস শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। যাত্রা উৎসবে আমরা এই দুই ধরণের অভিনয় দেখেছি। নাটক এবং সিনেমা দেখে অভ্যস্ত শ্রোতাদের কাছে চোখ-মুখের সূক্ষ্ম কাজ বিশেষভাবে মুগ্ধ করলেও, চিরাচরিত বা Traditional অভিনয়-কলা ও বাচনভঙ্গি অগণ্য শ্রোতার করতালি এবং সপ্রশংস সম্বর্ধনা লাভ করেছে। যাত্রার বিষয়বস্তুর রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, অভিনয় কলার দিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে Traditional অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক থাকলেও, অদূরভবিষ্যতে সূক্ষ্ম অভিনয়-কলাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করবে বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যাত্রা উৎসবে অভিনয়কালে 'মাইক' ব্যবহার করতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন অভিনেতা কিংবা অভিনেত্রীর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়নি। এজন্য বহু শ্রোতার মৃদু গুঞ্জন এবং অনেক স্থলে দৃঢ় প্রতিবাদ শুনেছি। তাঁরা বলেন পল্লীগ্রামে এর চেয়ে বেশী শ্রোতা এবং দর্শকের সামনে বিনা মাইকে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে অভিনয় করে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা সম্ভবপর হয়েছে। সম্ভবত এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় নিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নট্ট কোম্পানী দল 'লোহার জাল' অভিনয় করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সে উদাম ও প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর কারণ সুস্পষ্ট। পল্লীগ্রামে সাধারণত অধিক রাত্রে নির্জন পরিবেশের মধ্যে যে ধরণের অভিনয় সম্ভব হয়ে থাকে এখানে নাগরিক জীবনের সহস্র কোলাহল ট্রাম-বাসের যান্ত্রিক গর্জনের মধ্যে তা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এরই স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে মাইক-অভিনয়। তা ছাড়া যাত্রাভিনয়ে অভিনেতারা যে ধরণের বাচন-ভঙ্গি প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন, তাতে অদূরভবিষ্যতে মাইক পল্লীগ্রামে অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আমি এ ভাল-মন্দের বিচার করছি না—আমি শুধু বলতে চাই যাত্রা উৎসবে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ মাইক প্রবর্তন করে, যাত্রা জগতে একটা নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন।

আরো একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যাত্রাভিনয়ে স্ত্রী-অভিনেতার স্থলে অভিনেত্রীর আবির্ভাব অভিনয় জগতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। আমরা দু' ধরণের অভিনয় দেখেছি। কণ্ঠস্বরের বলিষ্ঠ সাবলীলতা ও অভিনয়ের কলাকৌশলে পুরুষ অভিনেতারাই অভিনেত্রী অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। এবং এজন্য Traditional যাত্রা দল পুরুষ অভিনেতা দ্বারাই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয়ের পক্ষপাতী। কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয়েছে সাধারণভাবে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রীর অভিনয়ই ব্যাপকভাবে সম্বর্ধিত হয়েছে। এখানেও নতুনের কাছে পুরাতনের পরাভবই সূচিত হচ্ছে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১৪)

এরপরে আমি ঐ শহর ছেড়ে কলকাতা আসার চেষ্টা করলাম। আমার মন আর টিঁকছিলো না। মাসীমা আমার হৃদয়ের কোনো খবরই জানতেন না। তিনি তখনো তাঁর ছেলের জন্য পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, ছেলে কেন বিয়ে করতে চায় না তার জন্য পাড়ায় পাড়ায় খেদ করে বেড়াচ্ছিলেন। কলকাতা আসার কথায় তিনি অনেক বাদ সাধলেন, অনেক রাগ করলেন, কান্নাকাটিও বাদ গেলো না কিন্তু আমি তাঁর সব ইচ্ছে উপেক্ষা করে আমার পুরোনো বন্ধু-বান্ধব এবং মাষ্টারদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে যা হোক কিছু একটা আঁকড়ে এসে বসতে পারি, তারপর যা হয় হবে।

আমি যখন ঢাকা কলেজে গিয়ে আই-এস-সি-তে ভর্তি হয়েছিলুম, তোমার বাবা তখন বি-এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কলেজে ঢুকেই প্রথম দর্শনে আমরা বন্ধু হয়েছিলুম। আমাদের পরস্পরের রুচির মিল ছিলো, রাজনৈতিক মতামত এক ছিলো, আর যা ছিলো তা হচ্ছে সাহিত্য-প্রেম। হেসো না, পরবর্তী জীবনে যদিও আমরা একজন ডাক্তার আর একজন ইঞ্জিনিয়ার রূপে সংসারের রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলুম কিন্তু যৌবনের ক্ষুধা কবিতাতেই আসক্ত ছিলো। আমরা যুগ্ম-সম্পাদক হয়ে একটা হাতে-লেখা কাগজ বার করেছিলুম সেই সময়ে, সারা পত্রিকা আমাদের দুজনের পদ্যেই ভরা থাকতো। তোমার বাবার মনে তখন রং ধরেছে, এবং যদিও আমি বয়সে তাঁর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোট তবুও সেই রংয়ের নাম তিনি আমার কাছেই প্রথম উদ্ঘাটিত করেছিলেন। তোমার মা তখন ঢাকা ইডেন ইস্কুলে ক্লাশ টেনের ছাত্রী। কোনো সম্পর্কের সুবাদে দেখা হয়েছিলো কোথাও তারপর থেকে অবস্থা শোচনীয়। একটা কবিতা লিখেছিলো, আমার মনে আছে, কয়েকটা লাইন, আর কবিতাটা কিছু অপাঠ্যও ছিলো না। শুনবে না কি?'

'নিশ্চয়ই।' নীলিমা উৎসাহে ঝলমল করে উঠলো, 'বাবা কবিতা লিখেছিলেন এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আমি তো ভাবতে পারি নে।'

'পারো না?'

'না।'

'তা হলে শোনো,

'এই কিন্তু বেশ লাগে

যতোটুকু পার তুমি দিতে
চোখের মুখের হাসি
মুখের চোখের কথা দিয়া
ছোটো দিন ছোটো রাত
অনায়াসে দিব কাটাইয়া
তার চেয়ে বেশী কিছু
আমিও তো পারি না যে নিতে।'

'বাবা'র লেখা!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যৌবন একদিন সকলেরই ছিলো। ভাবো বুঝি বাবারা চিরদিনই বাবা, না?'

নীলিমা হাসলো।

ডাক্তার মৈত্রও হাসলেন, ভালো লাগলো তার এতোদিন পরেও বন্ধুর কবিতাটা ঠিকমতো মনে রাখতে পেরেছেন দেখে। দেয়ালে তাকিয়ে রইলেন কতোক্ষণ, যেন ধু ধু দেখতে পেলেন দিনগুলো।

নীলিমা বললো, 'তারপর?'

'তারপর সেই বন্ধুতা আমাদের অনেকদিন পর্যন্ত অটুট রইলো। কিন্তু সময় আমরা বেশী হাতে পাইনি। তোমার বাবার বাবা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ছেলেকে জর্মানিতে পাঠালেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। -ছাত্র তুখোড় ছিলো, টপাটপ সব সিঁড়ি ডিঙিয়ে ফিরে এলো। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছিলো অনেকদিন পর্যন্ত, তারপর যা হয়।

কিন্তু যেহেতু কলকাতা শহরে তার একটি পৈতৃক বাড়ি ছিলো, সেই কারণেই ঠিকানাটা হারালো না। সেই সময়ে তাকেও আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। তৎক্ষণাৎ জবাব পেয়ে গেলাম। প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত সে আমাকে ঐ একটা অজ পাড়াগাঁয়ে কেন পড়ে আছি তাই নিয়ে তীব্র তিরস্কার করেছে এবং পত্রপাঠ যেন কলকাতার জন্য পাড়ি দি তার হুকুমও পাঠিয়েছে সেই সংগে।

যদিও তোমার বিয়ের সময় একটু গোলমাল করে ফেলেছিলো কিন্তু মানুষটি একেবারে সাদা। তার উৎসাহ-ভরা চিঠি আমাকে নতুন প্রেম দিল। বাড়ি ঠিক করতে বলে মাসীমাকে নিয়ে নতুন জীবন গড়ে তোলার অনিশ্চিত আশায় আমি ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু এসে আমি অন্ধকার দেখলাম না। আমার মাস্টারমশাইরাও আমাকে সাহায্য করলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই হাসপাতালে একটি বাঁধা চাকরী জুটে

সুবিধে হয়ে গেল। এমনিতেও রোগী মন্দ জুটতে লাগলো না।

কিন্তু মাসীমা বেশীদিন বাঁচলেন না এসে। আর তাঁর মৃত্যুর পরে আমার জীবন একেবারে শূন্য হয়ে গেল। মামণি, তুমি তখন আর কতোটুকু? বারো-তেরো বছরের বেণী দুলোনো ফ্রকপরা এইটুকু একটা মানুষ। কাকা-বাবুর গজার কাঠি। আর তোমার মা বাবা আমার সব। তাঁদের কাছে আমি যে কতো কৃতজ্ঞ সে শুধু আমিই জানি। বিশেষত তোমার মা। তাঁকে আমার প্রথম থেকেই বৌদির মতো লাগছিলো, তেমনি শান্ত সহাস্য স্নেহপরায়ণ। আমার অসহায় অবস্থাটা তিনি যেন দু'হাতে মুছে দিলেন। তখন আমি বাবা তেমনি ব্যাকুল বন্ধুতার উত্তাপে আবার আমাকে গ্রহণ করেছেন।

বুঝতেই পারো, বন্ধুর উপর কতোটা জোর থাকলে বলতে পারি, মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবো, গোত্রান্তর করে পুষ্যি নিয়ে বাপ হয়ে বিয়ে দেব। আর তার উপরে কি একটা কথা বললো ওরা? ওরা জানে তোমার মঙ্গলের জন্য ওদের চেয়ে আমার ভাবনা একবিন্দু কম নয়। আর তখন আমি বিলেত থেকে সদ্য সদ্য ফিরেছি, কতোদিন ছিলাম না। তবু একটা কথা বললো মা আমার উপরে। এমন বন্ধু মানুষ পুণ্যবলে পায়।

অবিশ্যি তোমার মতো মেয়েও ভাগ্যবান বলেই পেয়েছি কী বলো? হাসলেন ডাক্তার মৈত্র। নীলিমা চোখ নামালো।

অবশ্যি তোমার মত মেয়েও...

মনে মনে বললুম ঈশ্বরের রাজত্বে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নয়, কোনো অন্ধকারই নিরন্ধ্র নয়, এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার বেদনার ক্ষতকে আর এক বন্ধুর স্নেহ কেমন অনায়াসে ভুলিয়ে দিল। ধীরে ধীরে আমার মন আবার কূল পেলো, আশ্রয় পেলো, আমি তোমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠলুম।

যুদ্ধ লাগলো তারপর, সাত বছরের জন্য চলে গিয়েছিলুম দূরে। অনেক ঘাটে ঘুরেছি, অনেক কিছু দেখেছি, আবার ফিরে এসেছি সেই কেন্দ্রে, কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে। তোমার মা-কাকাবাবুর জন্য নতুন করে ভালোবাসা অনুভব করলো হৃদয়ে।

ভাবতে গেলে জীবনটা এমন মন্দ কাটলো কী। ডাক্তারি-জীবনেও মান-সম্মান যশ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা কিছুই তো কম হ'লো না? অনেক মৃতকল্পকে বাঁচিয়ে, অনেক মানুষের বুকে আশা জাগিয়ে, অনেক মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজেকে তো বেশ সার্থকই মনে হয়েছে কখনো কখনো। তারপর বছর কয়েক আগে তোমার মার পরামর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর চেষ্টাতেই নাকতলাতে বাড়ি কিনেছি একটি, আম-জাম-নারকেল-সুপারির ঘেরা দু'বিঘা জমির উপর একতলা বাংলো-বাড়িটি সত্যিই মনোরম। নিস্তরঙ্গ মন নিয়ে একা একা বেশ কাটছিলো সেখানে, আমি শান্তিতে ছিলাম।

কিন্তু কী হলো জানো? একদিন বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছিলুম, সবে চা খাওয়া শেষ করেছি, হঠাৎ দেখলাম ছুটতে ছুটতে একটি মেয়ে এসে ফটকে ঢুকলো। আমার একপাল পোষা কুকুর আছে। তারা সব সর্বনিযুক্ত প্রহরী। আমাকে দেখলে ল্যাজ নাড়ে, গায়ে চড়ে, জ্বালিয়ে খায়, দ্বিতীয় প্রাণী দেখলেই কান খাড়া। তাদের প্রতিবাদের জোর এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে অনেক সময়ে আগন্তুকেরা আমাকে ধিক্কার দেয়।

আমি যতোক্ষণ বাড়ি তারাও নড়ে না, আমি বেরুলেই তারাও পাড়ায় ঘোরে। বলাই বাহুল্য সেই সময়ে সবকটা পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো, মেয়েটিকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো।

হাতের কাগজ সরিয়ে আমি ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম তাকে।

মেয়েটিকে উদভ্রান্ত মনে হলো, মনে হলো খুব বিপদে পড়ে এসেছে। এক দৌড়ে সে বাগান পার হয়ে এসে বারান্দায় উঠলো। ব্যস্ত-ব্যাকুল গলায় বললো, 'আপনিই কি ডাক্তার মৈত্র?'

'হ্যাঁ, কেন বল তো?'

'আমাদের বাড়িতে ভীষণ বিপদ, আপনি একটু আসুন না।'

'কী হয়েছে?' উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'আমার মাসীমার খুব অসুখ, উনি কেমন করছেন, এই কাছেই বাড়ি, একটু আসুন আপনি।' মেয়েটির গলায় প্রায় কান্না এলো।

আমি বললুম 'ব্যস্ত হয়ো না, একটু দাঁড়াও, এক মিনিট, এখুনি যাচ্ছি।'

ভিতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে এলুম। মেয়েটি বললো, গাড়ি লাগবে না, মাত্র দু'তিনখানা বাড়ি ছাড়িয়ে।'

মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি সব আমার চেনা চেনা লাগলো, আমি তার সঙ্গে মিলিয়ে আর কারো কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। অন্যমনস্ক হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম, ফটকে এলাম, ফটক পার হয়ে রাস্তায় এলাম।

সত্যিই খুব কাছে বাড়ি, একেবারে গঙ্গা ঘেঁষে, ছোট্ট একটি একতলার ফ্ল্যাট। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটি বললো, আমরা নতুন এসেছি এখানে, মাত্র দু'মাস! কাউকেই চিনি না, আমাদের চেনা ডাক্তার এতোদূরে থাকেন যে সব সময় ডাকতে যেতে পারি না,

ফোন নেই তো। কিন্তু আমার মামাও ডাক্তার ছিলেন, তিনি তিন মাস আগে মারা গেছেন, তারপরেই আমরা সে বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছি।'

আমাকে নিয়ে সে পা টিপে টিপে রোগীর ঘরে এলো। দেখলাম ঘরের মাঝখানে একটি ছোট্ট লোহার খাটের ধবধবে বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করছে, আর একজন মহিলা ব্যস্ত হয়ে ঝুঁকে আছেন তার মুখের কাছে। আমাকে দেখে তিনি সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। বুঝলাম তিনি কাঁদছেন।

কিন্তু আমার জন্য যে বিধাতার এতোবড়ো একটা ঠাট্টা অপেক্ষা করছিলো আমি তা জানতাম না। দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে রোগিণীর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম। বুঝতে পারলাম মেয়েটিকে
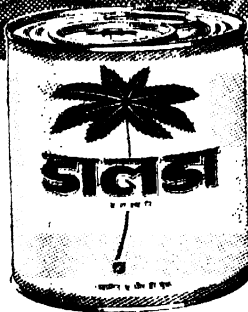
কেন আমার এতো চেনা চেনা লাগছিলো।

কিন্তু অপেক্ষা করার সময় ছিলো না, বিস্ময়ের ঘোর আমি তৎক্ষণাৎ কাটিয়ে উঠলুম। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম পুরোনো হার্টের অসুখ, এমনিতেই ইদানিং বেড়ে ছিলো, দাদার মৃত্যুতে তা চরমভাবে দেখা দিয়েছে। তবে আজের মতো এমন কখনো করেনি।

মেয়েটি আমাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। আমি বসলাম, রোগিণীর বুকে স্টেথেসকোপ লাগিয়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম তার হৃদয়ের শব্দ-তরঙ্গ। কিন্তু নিজেকে আমার বধির মনে হচ্ছিলো, আমি ঘামছিলাম। কম্পিত হাতে তার একটা হাত আমি নিজের হাতে তুলে নিলাম, নাড়ি দেখার চেষ্টা করলাম, কেমন যেন গুলিয়ে গেল।

সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে রোগিণী আমার দিকে তাকালো। তাকিয়েই রইলো।

সে যখন আমাকে শেষ দেখেছিলো, অথবা আমি যখন তাকে শেষ দেখে-ছিলাম, তার থেকে বয়েস আমাদের দুজনেরই আরো কুড়ি বছর এগিয়ে এসেছে কিন্তু চিনতে আমাদের ভুল হলো না।

গাঢ় গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

সে বললো, 'কী আশ্চর্য।' কথা বলবার মতো তার দম ছিলো না, অস্পষ্ট একটু হাসলো।

আমার মনে পড়লো একদিন সে আমাকে হাতুড়ে ডাক্তার বলেছিলো। সেই অমাবস্যা রাতের অন্ধকার ছাদ, সেই তারাভরা অনন্ত আকাশ আর আকাশের তলায় দুটি হৃদয়, সব যেন বর্তমান হয়ে ধরা দিল আমার মনে। একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, সান্ত্বনা চোখ বুজলো।

১৫

'কী আশ্চর্য! সত্যি কী আশ্চর্য! তা হলে কি ঐ মেয়েটি মল্লিকা?' বলে উঠলো নীলিমা। ডাক্তার মৈত্র মাথা নেড়ে বললেন, 'ঐ মেয়েটিই মল্লিকা। তোমার আমেরিকান ভ্রাতার মল্লিকা মল্লিক।'

'তারপর।'

'তারপর মাত্র সাতদিন বেঁচেছিলো সান্ত্বনা। আমার আহার-নিদ্রা ছিলো না। আমি আমার ডাক্তারী-জীবনের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি, সব নিঃশেষে খরচ করেছিলুম, নিজেকে আমার বিশ্বাস হয়নি, শহরের সমস্ত ডাক্তার এনে জড়ো করে ফেলেছিলুম, সান্ত্বনার প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের উত্থানপতনের সঙ্গে নিজের উত্থান-পতন নিয়োজিত করে-ছিলুম, তবু সে বাঁচলো না।

গভীর রাত্রে যখন আর সবাই ক্লান্ত ঘুমে নিশ্চেতন, শুধু আমি এক অতন্দ্র প্রহরী তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে সেই সময়ে সে আমার কোলের উপর মাথা রেখে আমার হাত বুকে নিয়ে নিঃশব্দে মারা গেল।

আমি কাঁদলাম না, আমার কান্না এলো না, সেই গভীর রাত্রির নির্জনে তার মৃত ঠোঁটে দ্বিতীয়বার চুম্বন করে আমি আমার স্বামীত্বের অধিকার স্থাপন করলুম, বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললুম, যেন পরজন্মে পাই।

তার শরীর তখনো গরম ছিলো, আমি নতুন বিবাহিতের মতো তাকে আদর করছিলুম। তারপর এক সময়ে দেখলুম আমি কাঁদছি, আবার সেই বাল্যকের বুকের কান্না ঘিরে ধরেছে আমাকে।

আমার স্বপ্ন এতোদিনে এই মরজগৎ থেকে বিদায় নিল।

শৈলেশ্বরের সঙ্গে সেই সূত্রেই আবার আমার দেখা। তেমনি রোগা আর চোখা নাক। সাবজজ হয়েছে। তার দ্বিতীয় স্ত্রীকেও দেখলুম, স্থুলাঙ্গী মহিলা, কথাবার্তায় পটু, শৈলেশ্বরকে বেশ নরমে গরমে রেখেছে।

সান্ত্বনার শ্রাদ্ধ হলো, মল্লিকাই সন্তানের কাজ করলো সব। খুব কান্না-কাটি করছিলো সে, তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিমর্ষতাও ছিলো। মাত্র কয়েকদিন আগে মামাকে হারিয়েছে, মাসীও গেল, এ বাড়িতে এই মেয়েটিই সকলের নয়নের মণি ছিলো, মল্লিকার সব আদর যেন এক ঝাপটায় কে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

শৈলেশ্বর আমার কাছে সান্ত্বনার জন্য খেদ করতে বসলো। বললো, 'বড়ো ভালো মেয়ে ছিলো হে, কিন্তু সুখ পেলে না একটা দিনের জন্য। স্বামীটা ছিলো পুরোদস্তুর অপদার্থ, মাত্র তো দু' বছর ঘর করেছে তারপরেই চলে গেল বাপের বাড়ি, ঐ মেয়ে কি ওটার সঙ্গে আসতে পারে? আর জানই তো অভাগার ঘোড়া মরে আর ভাগ্যবানের বৌ মরে, সান্ত্বনার স্বামীর হলো তাই। দিব্যি ড্যাং-ড্যাঙিয়ে আর এক বিয়ে করে বসলো।' কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করলো শৈলেশ্বর, "তোমার উপর কিন্তু শেষ অব্দি ইয়ে ছিলো।'

আমি বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। কিন্তু তাতে দমিত হলো না সে, বললো, 'একেবারে অল্পায়ু গুষ্ঠি সব। নইলে গোটা পরিবারটা মরে গেল? আমার স্ত্রীর কথা তো ছেড়েই দিলাম, মা-বাপের কথাই ধরো না কেন, বেঁচে থাকলে কি আসতে পারতেন না? তারপর ভুপেন, কী বয়েস ছিলো বলো?'

আমি চুপ।

'এই যে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী দেখছো, এ দেখবে আশি বছর টিঁকে থাকবে। আমার এই শ্বশুরের বয়েস কতো জানো?'

জানবার দরকার ছিলো না, তবুও জানতে হলো। আরো জানতে হলো, এই কন্যাই তার শ্বশুরের সর্বকনিষ্ঠা। মহিলাটি নাকি পয়মন্ত। তাকে বিয়ে করবার পর থেকেই শৈলেশ্বরের উন্নতি আরম্ভ হয়। তার দু'বছরের মধ্যেই সে ওকালতি ছেড়ে মুন্সেফিতে যোগ দেয়। এখন বর্তমানে সবজজ কিন্তু শীগ্গির জজ হবে।

ভাগ্য বইকি। বাঙালীর ছেলে ক'জন জজ হয়। সেদিক থেকে শৈলেশ্বর তার প্রতিজ্ঞামতো উঁচু ডালেই উঠেছে, কিন্তু সেখান থেকেও সে শকুনের মতো ভাগাড়ের দিকেই তাকিয়ে আছে। আকাশ দেখা তার হলো না।

এই পক্ষে চারটি ছেলে-মেয়ে। দুটি মেয়ে দুটি ছেলে। মেয়ে দুটি বড়ো, ছেলে দুটি ছোট। আক্ষেপ করলো সে, 'ভেবে দ্যাখো, ছেলে দুটো যদি বড়ো হতো তা হলে কতো ভালো হতো। পিছনে দাঁড়াতে পারতো না? তা না, এখন তিন তিনটে মেয়েকে পার করা কী ভয়ানক ব্যাপার। বড়ো মেয়ের জন্য তো এতোদিন তেমন ভাবিনি, মামা ছিলো মাসী ছিলো, তারাই ভেবেছে, এমন হলো যে তার ভাগ্যেও চলে গেল সব। আর ভুপেন কি কিছু রেখে গেছে বলে ভেবেছ তুমি? বলতে গেলে কিছুই না। নৈলে ডাক্তারি করে তো সোজা পয়সা পায়নি। এখন ছেলে নিয়ে বৌ যাচ্ছে জলপাইগুড়িতে, বাপ-মায়ের কাছে থাকতে।'

'আর মল্লিকা?' এতোক্ষণে আমি একটা কথা বলার অবকাশ পেলাম।

'মল্লি? আমার কাছে। আসল সময়েই আমার কাছে। আমার তো কেবল খরচের ভাগ! বিয়ে দিতে হবে না? কালো মেয়ে।'

'ওর বিয়ের জন্য ভাবনা কি, ভাবছোই বা কেন, লেখাপড়া করছে করুক না।'

'হ্যাঁঃ, তোমার যেমন কথা। লেখা-পড়া তো সেই কবে বি-এ পাস করে সাঙ্গ করেছে, মাঝে কী এক খুটুং খুটুং চাকরী করলো, এখন বলছে এম-এ পড়বে। তা মামা বেঁচে থাকতে পড়লি না কেন? খরচ চালায় কে? অন্য মেয়ে দুটো তো ফেলের উপরই আছে। এতো সব অপোগণ্ড নিয়ে বলতে গেলে একে-বারে পাথারে পড়ে আছি। কেবল খরচ খরচ আর খরচ। বেশ আছো বিয়ে না করে। হিংসে হয় তোমাকে দেখে।'

আমি আবার চুপ করলাম।

(ক্রমশঃ)

কলারসিক

শিল্পী মনীষী দে-র একক চিত্র-প্রদর্শনী

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য মনীষী দে'র চিত্র-প্রদর্শনী এই সর্বপ্রথম কলকাতা তথা বাঙলাদেশে অনুষ্ঠিত হল। এই প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আমরা রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করি। প্রদর্শনীটি দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের 'বিচিত্রা ভবনে' গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী শুরু হয়ে ৮ই মার্চ শেষ হয়েছে।

শিল্পী মনীষী দে কর্তৃক অঙ্কিত 'আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথ'।

শিল্পী মনীষী দে'র প্রদর্শিত চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। অবনীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক শিল্পী এখনও জীবিত আছেন শিল্পী মনীষী দে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিভাবান শিল্পী ১৯২৮ সাল থেকে ভারতের প্রায় সকল প্রধান শহরে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন, এমন কি ১৯৩০ সালে সুদূর সিংহলেও তাঁর চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর মত একজন প্রবীণ শিল্পীর কোন চিত্রপ্রদর্শনী বাঙলাদেশে কেন অনুষ্ঠিত হল না, এ-কথা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিল্পী অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যা বল্লেন সত্যি তা বেদনাদায়ক। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাঙলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান বা দরদী শিল্পরসিক ব্যক্তিই নাকি কোন প্রদর্শনী করার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান নি। ঘটনাটি সত্যিই আমাদের মাথা হেঁট করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এতকাল পরে এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটায় আমরা খুশি।

শিল্পী মনীষী দে'র এই প্রদর্শনীতে সর্বমোট ১৯৪ খানি চিত্র স্থান পেয়েছিল। আমি আজ পর্যন্ত কোন একক প্রদর্শনীতে একসঙ্গে এত চিত্রের সমাবেশ ঘটতে দেখিনি। সম্ভবতঃ এদিক থেকে এই প্রদর্শনী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড স্থাপন করল। আলোচ্য প্রদর্শনী দেখার পর আর একটি কথা অনায়াসে ঘোষণা করা যায়। সেটি হল : অবনীন্দ্রনাথ জলরঙের কাজে যে বিশেষ 'ওয়াশ পদ্ধতি'র প্রবর্তন করেছিলেন শিল্পী মনীষী দে সেই 'ওয়াশ পদ্ধতি'র সর্বশেষ সার্থক সাধক ও বাহক। তাঁর প্রতিটি ওয়াশের কাজ এত নিখুঁত এবং নিপুণ শিল্পসৌষমামণ্ডিত যে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওয়াশের মধ্য দিয়ে জমিনের উপর আশ্চর্য এক ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলে সমগ্র চিত্রপটে রঙের দ্যুতিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব অবশ্যই শিল্পী মনীষী দে'র প্রাপ্য। শুধু তাই নয়, ভারতীয় চিত্র যে রৈখিক চেতনা-ভিত্তিক এ-কথাও মনীষী দে প্রমাণ করেছেন। তিনি এত সূক্ষ্মভাবে রেখার কাজ করেছেন যে তা ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাসের সাহায্যে না দেখলে সব সময় ভাল করে উপলব্ধি করা যায় না। নারীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে এমনি সূক্ষ্ম রেখার কাজ সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর ড্রয়িং, চিত্র-সংস্থান এবং রঙের বৈপরীত্য-সৃষ্টির ক্ষমতাও অসাধারণ। বিশেষ করে প্রতিকৃতি এবং নিসর্গ চিত্রাঙ্কনেই তাঁর এই শিল্পনৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে সর্বাধিক। জলরঙের কাজের মধ্যে 'দরজায়' (৪৭), 'অরণ্যের অগ্নিশিখা, (৯৬), 'পূর্ণ প্রস্ফুটিত' (৯৭), 'হেমন্ত' (১১৫), নিসর্গচিত্র (১৯৩) এবং ২৫ খানি প্রতিকৃতি-চিত্র নিঃসন্দেহে শিল্পী মনীষী দে'র স্মরণীয় সৃষ্টি।

তেলরঙের মাধ্যমেও শিল্পী অনেক চিত্র অঙ্কন করেছেন। এগুলির অধিকাংশই মিনিয়েচার ধরণের কাজ। তবে একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেল। গুরু অবনীন্দ্রনাথ প্যাস্টেলে যে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন শিষ্য মনীষী দে তেলরঙের মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রে সেই প্যাস্টেলের (ড্রাই) এফেক্ট আনতে সক্ষম হয়েছেন। মোটা বোর্ডের উপর রঙপেষা ছুরির সাহায্যে তিনি তাঁর চিত্রে যে-সব রঙ প্রয়োগ করেছেন তা তেলরঙে হলেও ড্রাই প্যাস্টেলের এফেক্ট সৃষ্টি করেছে। প্রদর্শিত 'সবুজ মেয়ে' (৪), 'নৌকা' (১১), 'তালগাছ' (১৩), 'জেল' (৪২) প্রভৃতি চিত্র এরই উদাহরণ। তেলরঙের অনেকগুলি

মনীষী দে'র পেন্সিল স্কেচ 'মাধুরী'।

কাজের মধ্যে কিউবিজমেরও পরীক্ষা করা হয়েছে।

শিল্পী প্রদীপ বসুর চিত্র-প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে 'মহেঞ্জোদাড়ো' আয়োজিত প্রদীপ বসুর চিত্র-প্রদর্শনী দেখে এক প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন শিল্পীকে দর্শকেরা আবিষ্কার করতে পারবেন। প্রদীপবাবু এখনও আর্ট কলেজের ছাত্র। কিন্তু সুখের কথা, প্রদর্শিত চিত্রে জলরঙের কাজে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে ছাত্র-সুলভ দ্বিধা কিংবা জড়তা নেই। তাঁর চিত্র-সংস্থাপন, মৃদু রঙ প্রয়োগ এবং আলো-ছায়া সৃষ্টির নৈপুণ্য সত্যি সুন্দর! প্রাকৃতিক জগতের নানা দৃশ্যই মূলতঃ তাঁর চিত্রে বিধৃত হয়েছে। 'সংঘর্ষের পর' (১) চিত্রে দুটি মাছের সংস্থাপন এবং বর্ণ-প্রয়োগ, 'বৃষ্টিপাতের প্রাক্‌মুহূর্তে' (১০),

শিল্পী : প্রদীপ বসু

'ফণী মনসা' (১২), 'লাল মাটি' (১৫), 'দুর্গা' (২০), 'অনেক দূরে' (২১), 'নিভৃতে' (২৪), 'নোঙর' (২৯) প্রভৃতি চিত্রে শিল্পী তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পী বসুর ২১ খানি স্কেচের মধ্যে অন্ততঃ ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩ ও ১৪ নং স্কেচগুলি প্রশংসার যোগ্য। আমরা এই তরুণ শিল্পীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

সোভিয়েত দেশে গান্ধী-চর্চা

সোভিয়েত জনগণ মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আগ্রহশীল হয় অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে। গান্ধী তখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নেতৃত্বের বলগা হাতে তুলে নিতে চলেছেন।

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন কালে সোভিয়েত জনগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভারতের ঘটনাবলীর উপর। সেই ঘটনাপ্রবাহে গান্ধীর অসামান্য ভূমিকা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। ১৯২৪ সালে রোমাঁ রোলাঁর লেখা "মহাত্মা গান্ধী" গ্রন্থের দুই-দুটি রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত-বিশেষজ্ঞরা ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকার দিকে প্রভূত মনোযোগ দিয়ে এসেছেন।

ব্রিটিশ ।।সকদের কল্যাণে তখন বহির্ভারতে ভারত সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানবার উপায় ছিল না। যথোপযুক্ত তথ্যের অভাবে সোভিয়েত ইতিহাসবেত্তাদের ভারত-সম্পর্কিত প্রথম দিকের লেখায় খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না। তাঁরা গান্ধীজী সম্পর্কে এক স্ববিরোধী চিত্র তুলে ধরেছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৯২২ সালে পেট্রোগ্রাডে প্রকাশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের মুখবন্ধে ডি জি তান-বোগোরিজি গান্ধীজীকে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবীণ নেতা বলে লিখেছিলেন, অথচ 'ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে'র লেখকত্রয় এম পাভলোভিচ, ভি গুকোব্রিঝিন ও এস ভেলমা তাঁদের ঐ গ্রন্থে গান্ধীজীকে পাতি-বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের মুখপাত্র বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেন, "জাতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদ স্পষ্টতই এক প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ।"

তৃতীয় দশকের শেষে ও চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে গান্ধীবাদ ও গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে চারজন সোভিয়েত লেখকের রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে সোভিয়েত দেশে প্রথম প্রকাশিত হল মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনচরিত "মাই লাইফ"।

মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ণে এই সব ভুল ও একপেশে বিচার সত্ত্বেও উপরোক্ত রচনা-

গুলি ভারতের তৎকালীন ঘটনা-ঘটনের উপর আলোকপাত করেছে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা আরও ভাল করে জানবার, বুঝবার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতের গণআন্দোলনের নতুন উত্তাল তরঙ্গ ভারতের ঘটনাবলীর অনুশীলনে সোভিয়েত দেশে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় এ এম দিয়াকফের লেখা "ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জাতি অধিজাতি সম্পর্কিত প্রশ্ন"। এর পরই প্রকাশিত হয় ভি ভি বালাবুশেভিচের প্রবন্ধ 'ভারতের জনগণের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়'।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ এবং উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক বিনিময় ভারতের আধুনিক ইতিহাসের গবেষণার এবং গান্ধীর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের গভীরতর ও ব্যাপকতর বিচার-বিশ্লেষণের এক নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয় "নিউ টাইমস" পত্রিকায় বিখ্যাত সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ওয়াই ঝুকফের লেখা "মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে" শীর্ষক একখানি চিঠি এবং "ইন্টার-ন্যাশনাল লাইফ" পত্রিকায় অধ্যাপক এ এ স্তুবেরের খোলা চিঠি "এম কে গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও প্রাচ্যের নতুন ইতিহাস নামক গবেষণামূলক প্রবন্ধে উহার বিশ্লেষণ"। ঐ দুটি চিঠিতে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদ সম্পর্কে গভীর ও বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার আত্যন্তিক প্রয়োজনের কথা বলা হয়। ঐ একই বছরে "সোভিয়েত ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এ এম দিয়াকফ ও তাই এম রেসনারের প্রবন্ধ "ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা" শীর্ষক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক দুজন তাঁদের পূর্ব-প্রকাশিত লেখার কতকগুলি সিদ্ধান্তের ভুল স্বীকার করেন।

বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার আন্দোলনে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের ভূমিকার ওপর প্রভূত আলোকপাত করা হয়েছে। এই বইগুলির মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের এশীয় জাতিগুলির ইনস্টিটিউট কর্তৃক রচিত "ভারতের আধুনিক ইতিহাস"। এই ইতিহাসে ব্যাপক তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বৃহত্তর জনগণকে টেনে আনার কাজে গান্ধীজীর অপরিমেয় অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৫৯ সালে, মহাত্মা গান্ধীর ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রুশ ভাষায় প্রকাশিত গান্ধীজীর আত্মজীবনচরিতের মুখবন্ধ লিখেছিলেন এ ডি লিংম্যান। এই মুখবন্ধে ভারতের জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিকায় গান্ধীজীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের এক তদ্‌গত ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, গান্ধীজীর ভাববাদী ও ধর্মীয় চিন্তাধারার ওপর আলোকপাত করে বলা হয়েছে এই ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা জনপ্রিয় হওয়ার উপায় হিসাবে কাজ করেছে।

অবশ্য উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধ নিবন্ধগুলি গান্ধীজীর বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মজীবনের পর্যালোচনা ও [illegible]ষণার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আধু[illegible] ভারতের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে সোভিয়েত ভারতবিদ্যাবিদরা মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও কর্মজীবনের বিবিধ দিক নিয়ে অনুশীলন করছেন। গান্ধীর শিক্ষা ও কার্যকলাপ ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে অক্ষয় ছাপ রেখে দিয়েছে। সোভিয়েত পণ্ডিতদের বিশ্বাস, স্বদেশের মুক্তি-অর্জনে গান্ধীজীর ব্যাপক ও ফলপ্রসূ সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত দেশ ও ভারতের জনগণের মৈত্রী ও সহযোগিতা আরও নিবিড় হবে।

।। ভ্রম সংশোধন ।।

গত সংখ্যা 'সাহিত্য সমাচারে' তৃতীয় কলমে ষষ্ঠ লাইন এইভাবে পড়তে হবে "বিশেষ করে আকাদমী যখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির অনুবাদে হাত দিয়েছেন।"

॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপদ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর সমগ্র এশিয়া হতে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের দ্রুত অবসান ঘটে। ফ্রান্সের হাত হতে মুক্তি পায় ইন্দোচীনের তিনটি দেশ, হল্যাণ্ডের অধীনতা হতে নিষ্কৃতি পায় ইন্দোনেশিয়া ও ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটে ভারত উপমহাদেশে। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেকগুলি নূতন দেশের উদ্ভব হয়। আশা করা গিয়েছিল যে, এশিয়ার এই ছোটবড় সদ্যস্বাধীন দেশগুলি নিজেদের সম্মিলিত উদ্যোগে ও অগ্রসর দেশগুলির সহায়তায় অনতিবিলম্বেই এক শক্তিশালী এশিয়া গড়ে তুলবে। কিন্তু বিগত পনের বছরের ইতিহাস সে আশা-পূরণের অতি সামান্যই সাক্ষ্য বহন করে। আজ অধিকাংশ দেশ হতেই গণতান্ত্রিক শাসন লোপ পেয়েছে এবং দুর্নীতিপূর্ণ স্বৈরশাসন ঐসব দেশের জনগণের প্রায় সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ভারত, মালয় ও সিংহল ছাড়া আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন দেশে গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের কথাও চিন্তা করেন না ঐ সকল দেশের শাসকবর্গ। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারা যায়। ভারতে যেখানে পর পর দুটি পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজ শেষ হয়ে তৃতীয় যোজনার কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং সারা দেশ জুড়ে একের পর এক গড়ে উঠছে বৃহৎ শিল্প, পাকিস্তান সেখানে একটি জাতীয় যোজনাকেও কার্যকরী করতে পারেনি। চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, টাটা, ভিলাই, কোয়েম্বাটুর বা বিশাখাপত্তনের রেলইঞ্জিন, ইস্পাত, রেলকোচ, জাহাজ ইত্যাদির কারখানার মত কারখানা পাকিস্তানে কোনোদিন গড়ে উঠবে একথা পাকিস্তানের অতিবড় শুভাকাঙ্ক্ষীর পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব হয় না। ইন্দোনেশিয়া, বর্মা প্রভৃতি একনায়কশাসিত দেশগুলির অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। সর্বত্রই জনগণের অশান্তি আজ চরম সীমায় পৌঁচেছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে সত্তর কোটি নরনারী-অধ্যুষিত লালচীনের জঙ্গীনীতি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব কটি দেশকে সে তার হৃত রাজ্য বলে মনে করে এবং সকলের উপরেই আছে তার লোলুপ দৃষ্টি। সম্প্রসারণকারী বিরাট চীনের চারিপাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র দেশগুলির বৈষয়িক অনগ্রসরতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তাই শান্তিকামী বিশ্বের পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাশ্চাত্য শক্তিগুলির অনুপস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে লালচীন। প্রকৃতপক্ষে তার উগ্রনীতির সম্মুখে রুখে দাঁড়ানোর মত শক্তি সদ্যস্বাধীন দেশগুলির কারও নেই। আত্মকলহে ও প্রশাসনিক অদক্ষতায় তাদের অতিসামান্য প্রতিরোধক শক্তিটুকুও লোপ পেয়েছে। একারণে আজ প্রতিপদে চীনের সঙ্গে আপোষ করে চলা ছাড়া কোন উপায় নেই তাদের। ভারত ও মালয় এই অবস্থার ব্যতিক্রম বলে এই দুটি দেশের উপরে আজ লালচীনের শ্যেনদৃষ্টি। তাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে ও এশিয়ার রাজনীতিতে তাদের কোণঠাসা করতে লালচীনের আজ প্রয়াসের অন্ত নেই। কিন্তু ভারত বা মালয় কারও পক্ষেই আজ উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ রেখে সামরিক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় সামর্থ্য সম্পূর্ণ নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারসাম্য রক্ষাকল্পে আমাদের পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মৈত্রী ও সহায়তাকে অনিবার্য প্রয়োজন বলে ভাবতে হবে। এ বিষয়ে আজ কোন সন্দেহ নেই যে, চীন এখনও যেটুকু সংযত আছে তা শুধু মার্কিনী বিরোধিতার জন্যই। যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বিরোধিতার জন্যই চীনের পক্ষে দক্ষিণ কোরিয়া বা ফরমোসা দখল সম্ভব হয়নি। মালয়ের সঙ্গে উত্তর বোর্ণিও, সারওয়াক ও ব্রুনেই এবং সিঙ্গাপুরে সংযুক্ত করে যে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব হয়েছে তাও সফল হতে পারে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমর্থনে। এইভাবে আজ দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহায়তা অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সদ্যস্বাধীন দেশগুলি আত্মশক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা চীনের পররাজ্যলোলুপতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয়-নেতাদের আত্মকলহে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় আঞ্চলিক সৌহার্দ্য ও সংহতির প্রশ্নকে বড় করে না দেখে সামগ্রিক উন্নতি ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হবে। আর তারজন্য পৃথিবীর অগ্রসর ও শক্তিশালী দেশকে নির্দ্বিধায় মিত্র বলে গ্রহণ করতে হবে।

॥ লুঠের বখরা ॥

চীন ও পাকিস্থানের মধ্যে গত ২রা মার্চ যে তথাকথিত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল তা প্রকৃতপক্ষে ভারতের দুই দস্যু প্রতিবেশীর লুঠের মাল বখরা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাশ্মীরের উপর চীন ও পাকিস্থান উভয়েরই বিশেষ লোভ এবং উভয় রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে কাশ্মীরের বিস্তৃত অংশ বহুদিন ধরে দখল করে রেখেছে। সেই বেআইনী দখলদারী নিয়েই দুই দেশের মধ্যে একদফা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এ্যাক্ট-এর ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্থান নামক দুটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর এই দুই দেশের অভ্যন্তর ও সমীপবর্তী ছয় শতাধিক দেশীয় রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারত অথবা পাকিস্থানের অংশীভূত হয়। যেমন, চিত্রল, বাহওয়ালপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি যোগ দেয় পাকিস্থানে ঠিক তেমনি মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির মত কাশ্মীর যোগ দেয় ভারতে। কিন্তু কাশ্মীরের এই সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত পাকিস্থানের মনঃপূত হয় না এবং সেকারণে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে। ভারতও অতি দৃঢ়তার সঙ্গে সে আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং কাশ্মীরের বহু স্থান হতে পাক হানাদারদের উৎখাত করে। ভারতীয় বাহিনীর সেদিনের অগ্রাভিযান যদি হঠাৎ বন্ধ করা না হত তবে হয়ত দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্থানের কবল হতে সম্পূর্ণ কাশ্মীরকেই উদ্ধার করা যেত। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের আবেদনে ভারত অস্ত্র সংবরণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং অবশিষ্ট পাক কবলিত কাশ্মীর বরাবর যুদ্ধ-

বিরতি সীমারেখা নির্ধারিত হয়। তারপর হতে গত পনের বছর ধরে পাকিস্থানের দখলে রয়েছে কাশ্মীরের প্রায় ৩৩ হাজার বর্গমাইল স্থান। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐ বেদখল অংশ আবার যাতে কাশ্মীরের অঙ্গীভূত হয় তার জন্য ভারত গত পনের বছর ধরে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে কিন্তু তার সে প্রয়াস সফল হয়নি। সম্প্রতি ভারত ঐ যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা বরাবর কাশ্মীরকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে ও পাকিস্থানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটাতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতেও পাকিস্থান সাড়া দেয়নি।

সম্প্রতি তিন দফা পাক-ভারত মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা শেষ হয়েছে, আগামী ১২ই মার্চ কলকাতায় আবার তাদের বৈঠক বসার কথা। কিন্তু তার আগেই পাকিস্থান তার দখল করা কাশ্মীরাঞ্চলের প্রায় তেরো হাজার বর্গমাইল স্থান চীনকে উপঢৌকনস্বরূপ দিয়ে দিল, ঘটনা পরম্পরার চাপে পড়ে একদিন সম্পূর্ণ বেদখল কাশ্মীরাঞ্চলটুকুই ছেড়ে দিতে হতে পারে একথা ভেবেই হয়ত পাকিস্থান আজ এমন একটা নির্লজ্জ আচরণ করল। ভারতের শত্রুতা করাই আজ যেন পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির মূলকথা। তার জন্য নিজের ক্ষতি করতেও তার কোন দ্বিধা নেই। আর এই সর্বনাশা বৈরী মনোভাবের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল ভারত ও পাকিস্থান উভয়েরই প্রকৃত শত্রু লালচীন। ভারতের বিশ্বাস ও মিত্রতার সুযোগ নিয়ে ইতিপূর্বে কাশ্মীরের উত্তর সীমান্তে প্রায় সাড়ে বারো হাজার বর্গমাইল অরক্ষিত ভারতীয় অঞ্চল সে কুক্ষিগত করেছে, এবার পাকিস্থানের বন্ধু সেজে সে পাকিস্থানের কাছ হতেও তেরো হাজার বর্গমাইল স্থান ছিনিয়ে নিল। এইভাবে ৮৮ হাজার বর্গমাইল আয়তন-বিশিষ্ট কাশ্মীরের ২৫ হাজার বর্গমাইলেরও বেশী স্থান লালচীনের লোলুপ গ্রাসে চলে গেল।

পাকিস্থানের এই আচরণের পর আগামী ১২ই মার্চ কলকাতায় পাক-ভারত মন্ত্রীপর্যায়ের আলোচনার আর কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না।

॥ নেপাল ॥

ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী চারদিন নেপাল সফর করে এলেন। গত ২রা মার্চ তিনি নেপালে যান এবং চারদিনই রাজা মহেন্দ্র ও নেপালের মন্ত্রিপরিষদের সহ-সভাপতি ডঃ তুলসী গিরির সঙ্গে ঘন ঘন সাক্ষাৎকারে অতিবাহিত করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি, তবে উভয়পক্ষ হতেই বলা হয়েছে যে আলোচনা সম্পূর্ণ
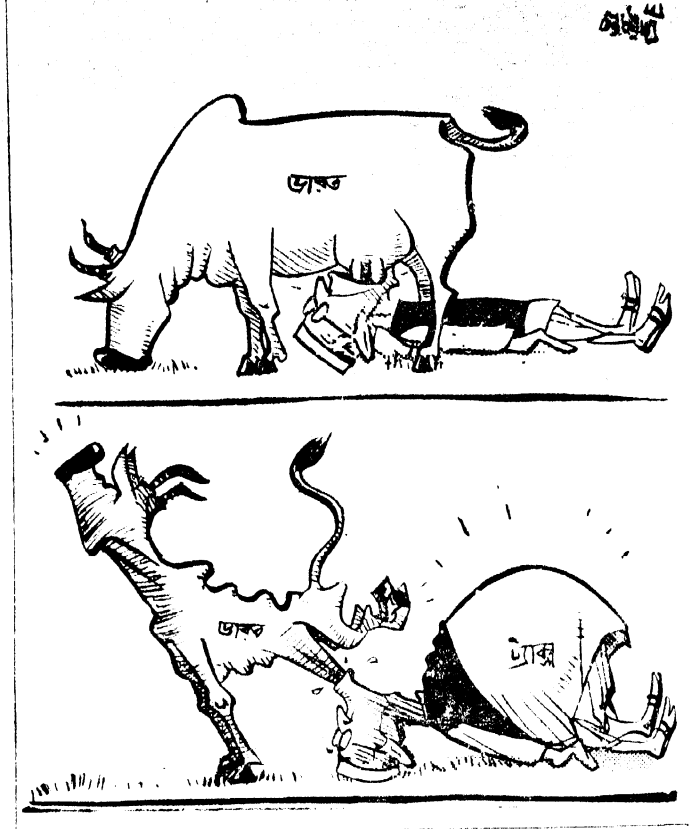
সফল হয়েছে এবং এর ফলে ভারত ও নেপালের সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি হবে। নেপালের সংবাদপত্রগুলিতেও ভারতের সঙ্গে নেপালের সৌহার্দ্যের কথা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে।

নেপালে পৌঁছানোর অব্যবহিত পরেই শ্রীশাস্ত্রী বলেন, শুধু ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই নেপালের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের মৈত্রীবন্ধন সাময়িকভাবে শিথিল হয়। এবং সামান্য প্রয়াসেই সে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। এরপর চারদিন ধরে তিনি নেপালের রাজা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যে আলোচনা করেন তাতে তাঁর নেপালের মৈত্রী কামনা বহুলাংশে পূরণ হয়েছে বলেই মনে হয়। কাঠমণ্ডু ত্যাগের প্রাক্কালে শ্রীশাস্ত্রী ও ডঃ তুলসী গিরি স্বাক্ষরিত যে যুক্তবিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে দুই নেতা দুই দেশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য (ভৌগলিক) সাংস্কৃতিক সংযোগের কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, দুই দেশের উন্নতিতেই দুই দেশের স্বার্থ নিহিত আছে।

॥ পদযাত্রা ॥

লোভগ্রস্ত লালচীনের [illegible] নেতাদের হৃদয় পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা মিশন দিল্লী হতে হাঁটাপথে পিকিং যাত্রা করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শান্তিবাদী নেতা রেঃ মাইকেল স্কট পদযাত্রী দলের নেতা। তাঁর অন্যতম সহযাত্রী ভারতের প্রখ্যাত প্রবীণ নেতা শ্রীশংকর রাও দেও। ঐ শান্তি মিশনে আরও আছেন বৃটেন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র হতে আগত কয়েকজন। শান্তির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা মিশনের এই আয়াসসাধ্য প্রয়াস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সামান্যতম সম্ভাবনাও আছে বলে মনে হয় না। কারণ ইতিমধ্যেই পিকিং কর্তৃপক্ষ ঐ আন্তর্জাতিক মিশনকে মার্কিন ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁরা চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেবেন কিনা সে সম্বন্ধে এখনও কিছু বলেন নি। তার কারণও সহজবোধ্য। চীনের সীমান্তে উপনীত হতে পদযাত্রীদের এখনও প্রায় দেড় বছর দেরী। সুতরাং এখনই কোন কথা বলার প্রয়োজনীয়তা পিকিং কর্তৃপক্ষ অনুভব করেন নি।

॥ ঘরে ॥

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৫ই ফাল্গুন : ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের (৭৯) পাটনার সদাকৎ আশ্রমে জীবনদীপ নির্বাণ — মহান নেতার তিরোধানে সারা দেশে শোকোচ্ছ্বাস।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৬৩-৬৪ সালের সাধারণ বাজেট পেশ—রাজস্ব খাতে ২৬৬·৬৭ কোটি টাকা ঘাটতি : সামগ্রিক ঘাটতি ৪৫৪ কোটি টাকা—দেশরক্ষা খাতে ৮৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ—২৭৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব। ব্যক্তিগত আয়ের একাংশের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের জন্য অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে নূতন বিল উত্থাপন।

ফরাক্কা বাঁধ (পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উপর) নির্মাণে ভারত সরকার দৃঢ়-সংকল্প—লোকসভায় সেচমন্ত্রী মিঃ হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমের বিবৃতি।

১লা মার্চ—১৬ই ফাল্গুন : পাটনার গঙ্গাতীরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন—জাতীয় মহানায়কের প্রতি দুই লক্ষাধিক নরনারীর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন—রাষ্ট্রপতি (ডাঃ রাধাকৃষ্ণন) প্রমুখ মহামান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতি।

স্বর্গত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সংসদের অধিবেশন এক দিনের জন্য মুলতুবী—দেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী অফিস এবং স্কুল-কলেজ বন্ধ। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ আইন-সভার বৈঠকও স্থগিত।

দিল্লীর রাজঘাট (গান্ধী সমাধি) হইতে পিকিং অভিমুখে মৈত্রী পদযাত্রা শুরু—১৮ জন আন্তর্জাতিক শান্তিবাদীর যোগদান।

২রা মার্চ—১৭ই ফাল্গুন : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে অর্থের অপচয়, পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যয়—সরকারী হিসাব কমিটির এবং অডিট রিপোর্টে অভিযোগ।

পাকিস্তানের সহিত অবৈধ সীমান্ত চুক্তির জন্য চীনের নিকট দিল্লীর প্রতিবাদ—**ভারত চুক্তির সারবত্তা স্বীকার করে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ।**

৩রা মার্চ—১৮ই ফাল্গুন : 'ভারত মীমাংসায় ইচ্ছুক হইলেও পাকিস্তানের যে-কোন দাবীই মানিয়া লওয়া অসম্ভব'—অমৃতসরে জনসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা : ভারত তাহার নীতি বিসর্জন দিতে পারে না।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়ার উত্তরাঞ্চলে সফর শুরু—প্রথম দফায় জলপাইগুড়ি উপস্থিতি।

৪ঠা মার্চ—১৯শে ফাল্গুন : পণ্য-দ্রব্যের অসঙ্গত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা বিবেচনা—অতিমুনাফার হিড়িকে কমিশনের গভীর উদ্বেগ—কংগ্রেস সংসদীয় দলের সাব-কমিটির বৈঠকে (দিল্লী) বাজেটোত্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনা।

প্রেসিডেন্ট কেনেডি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনকে (ভারত) আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন—আগামী গ্রীষ্মে সফরসূচী।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনারের (শ্রীএস বি রায়) সহিত কাউন্সিলারদের দ্বন্দ্ব ঘনীভূত।

৫ই মার্চ—২০শে ফাল্গুন : 'পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির অন্তরালে ১৩ হাজার বর্গমাইলেরও বেশী জমি চীনকে খয়রাত'—লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি—পাকিস্তানের খুশীমত কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না বলিয়া মন্তব্য।

'খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়করের আওতা-মুক্ত থাকিবে'—পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় বাজেট বিতর্কের উত্তরে অর্থ-মন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির ঘোষণা।

৬ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন : 'ভারত আক্রমণের মুখে নতি স্বীকার করিবে না'—পাটনায় দুই লক্ষাধিক লোকের সভায় ঘোষণা—চীনের বিচিত্র গতির সমালোচনা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় বিরোধী পক্ষ কর্তৃক সরকারী কৃষি-নীতির তীব্র সমালোচনা।

'আমরা কি অপরাধ করিয়াছি তাহা জানি না'—দমদম বিমানঘাঁটিতে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর খেদ—চীনের সঙ্গে মিতালির সাফাই।

॥ বাইরে ॥

২৮শে ফেব্রুয়ারী—১৫ই ফাল্গুন : 'নিগ্রো বিদ্বেষ আমেরিকার মুখে **কলঙ্ক লেপন করিয়াছে—বর্ণবৈষম্য বিরোধ বিল অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির মন্তব্য।**

১লা মার্চ—১৬ই ফাল্গুন : রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের সহিত ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রী আর কে নেহরুর সাক্ষাৎকার—দেড় ঘন্টাব্যাপী বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা।

সরেজমিনে তদন্ত (আণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত) বিষয়ে মতৈক্য না হইলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে (জেনেভা) আর আলোচনা চালাইতে রাশিয়ার অসম্মতি।

লাহোর জেলে খান আবদুল গফুর খানের অনশন ধর্মঘট।

করাচীতে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—পাঁচজন নিহত : ৮ জন আহত।

২রা মার্চ—**১৭ই ফাল্গুন :** পিকিং-এ ভারতের ভূমি **খয়রাতির ভিত্তিতে** পাক-চীন **চুক্তি স্বাক্ষরিত—বিশ্বের জনমত** অগ্রাহ্য করিয়া চীনের **সহিত** মিতালি—কম্যুনিষ্ট চীনকে **২,০৫০ বর্গমাইল** এলাকা যৌতুক। পাক-চীন চুক্তিতে **ইঙ্গ**-মার্কিন মহলে অসন্তোষ।

কাঠমান্ডুতে রাজা মহেন্দ্রের সহিত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রীলালবাহাদুর** শাস্ত্রীর (নেপাল সফররত) বৈঠক।

কঙ্গো হইতে অবিলম্বে **রাষ্ট্রসংঘ** বাহিনী অপসারণের **জন্য উ থান্টের** (রাষ্ট্রসংঘ সেক্রেটারী-জেনারেল) **নিকট** রাশিয়ার দাবী।

৩রা মার্চ—**১৮ই ফাল্গুন :** পেরুতে বিরাট ধ্বস নামায় **চার শত নরনারীর** প্রাণহানি।

পেরুর **সামরিক জুন্টার (শাসনচক্র)** প্রেসিডেন্ট **জেনারেল রিকার্ডো পেরেজ** গডয়কে অপসারিত।

৪ঠা মার্চ—১৯শে **ফাল্গুন :** পাকিস্তানের প্রতি চীন **সরকারের দরদ**—কাশ্মীর সম্পর্কে পাক মনোভাবের প্রশংসা—মিঃ ভুট্টোর (পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী) পিকিং **সফরের** পূর্বে **যুক্ত** ইস্তাহার প্রচার।

'নেপালের রাজা মহেন্দ্রর সহিত আলোচনা **ফলপ্রসূ হইয়াছে'**—কাঠ-মান্ডুতে **শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্তব্য :**

৫ই মার্চ—২০শে ফাল্গুন : ভারত-নেপাল সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ—শাস্ত্রী-মহেন্দ্র বৈঠক শেষে কাঠমান্ডু হইতে **যুক্ত ইস্তাহার প্রচার।**

৬ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন : রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা **ক্রুশ্চেভ সুপ্রীম** সোভিয়েটে পুনর্নির্বাচিত।

অভয়ঙ্কর

॥ ভারতে নাইপাল ॥

ত্রিনিদাদের প্রবাস-ভূমিতে যে ভারতীয় লেখকের জন্ম হয়েছে এবং যিনি সাম্প্রতিককালে পৃথিবীময় সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করেছেন সেই ভি এস নাইপালের বর্তমান বয়স ত্রিশের কোঠার গোড়ার দিকে। নাইপাল রচিত "এ হাউস ফর মিঃ বিশ্বাস" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই স্তম্ভে ইতিপূর্বে করেছি এবং 'অমৃতে'র পাঠকদের কাছে মিঃ নাইপাল অপরিচিত নন। এত অল্প বয়সে খ্যাতি অর্জন করলেও মিঃ নাইপাল ছোটখাটো আরো অনেক খ্যাতিমান লেখকের মতো এখনই দম্ভ এবং অহঙ্কারের মুখোস পরে নিজেকে অধিকতর আকর্ষণীয় করার জন্য সচেষ্ট ন'ন।

নাইপাল অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট, একদা তাঁর মনে ছিল আশা যে পূর্বপুরুষদের স্বদেশ এই ভারতবর্ষে এসে একটা [illegible] জব' গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দ্যে [illegible] করবেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নাইপাল হেসে বলেছেন— "আমার অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা আর হয়ে ওঠেনি। আমি আমার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি।"

নাইপালের যে পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে ত্রিনিদাদে গিয়ে সংসার গড়েছিলেন, তাঁর জীবনকথা খুব বেশী জানা নেই নাইপালের, তাই তিনি ভারতের কোন প্রান্তের মানুষ তা তিনি বলেন নি। তবে ভারতবর্ষে তিনি এসেছেন তীর্থযাত্রীর মত শুচিস্নিগ্ধ মন নিয়ে।

সর্বজনখ্যাত এবং প্রবীণতম জীবিত কথাসাহিত্যিক সমরসেট মম একটি পুরস্কার ব্যবস্থা করেছেন, এই পুরস্কারের প্রধানতম সর্ত হল যে সফল পুরস্কারভোগী লেখককে পর্যটন করতে হবে। 'Miguel Street' নামক উপন্যাসের জন্য ভি এস নাইপাল এই পুরস্কারে সম্মানিত হন।

নাইপাল বর্তমানে নয় মাসের জন্য ভারত-পর্যটন করছেন, এই তাঁর প্রথম ভারত-দর্শন। ভারতের বুকে বসে নাইপাল ইতিমধ্যে ইংলণ্ড সম্পর্কে একখানি নূতন উপন্যাস লিখছেন। নাইপাল বলেছেন যে, তাঁর এই ভারতভ্রমণকালে কোনো খ্যাতি ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি, যা দেখেছেন তা শুধু সব চমৎকার মানুষের দল।

নাইপালের প্রথম উপন্যাস "The Mystic Masseur" বিশেষ প্রশংসা লাভ করে এবং জন লেওয়েলিন রাইস স্মৃতিপুরস্কারে সম্মানিত হয়।

এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে এমন একটি মানুষকে ঘিরে যে অঙ্গ সংবাহক হিসাবে তেমন দক্ষ না হলেও একজন সফল রাজনৈতিক [illegible] মানুষ। এই অঙ্গ-সংবাহক ও পরে রাজনৈতিক শেষ পর্যন্ত একটা এম-বি-ই উপাধি লাভ করেন। নাইপাল বলেছেন যে, এই উপন্যাসটি তেমন সাফল্য লাভ না করলেও এখনও বিক্রী হচ্ছে।

প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার পর নাইপাল আর একটি উপন্যাস লিখলেন, তার নাম "The Suffrage of Elvira" —এর পর প্রকাশিত হল "মিগুয়েল স্ট্রীট" এবং "এ হাউস ফর মিঃ বিশ্বাস"। তাঁর আধুনিকতম গ্রন্থের নাম "মিড্‌ল প্যাসেজ"। এই গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মধ্য আমেরিকায় যে সব ঔপনিবেশিক সমাজ গড়ে উঠেছে তাদের সমস্যা এই গ্রন্থে আলোচিত।

মিঃ নাইপাল সাহিত্য-সমালোচনাও করে থাকেন, তাঁর ভালো লাগে এই কাজ, তাঁর মতে সাহিত্য
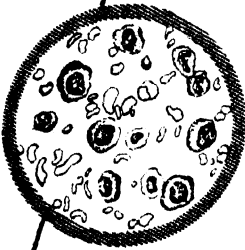
...ড ডিসিপ্লিন", অত্যন্ত উত্তেজক, ...ন, ক্লান্তিকর, কিন্তু আমার ...মানবর্তিতা ভালো লাগে, আমি ...ভোগ করি। মিঃ নাইপাল বলেন ...ত্যে-সমালোচনার মাধ্যমে তিনি ...ক কিছু শিক্ষা করেছেন।

...ত্রিনিদাদের এক সংবাদপত্রের ...টার হিসাবে কাজ করতেন নাই- ...র বাবা, নাইপালেরও তাই মনে ...ছিল একবার যে তিনিও সাংবাদিক ...ন পরে কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন ...মেজাজমাফিক কাজ সাংবাদিকতা ... এখনও সংবাদপত্রে বিশ্লেষণধর্মী ...যে কিছু লিখতে তাঁর অতিশয় ক্লেশ- ...হয়. তিনি বলেন, "তার চেয়ে বরং ...উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ এগিয়ে ...য়া ঢের বেশী আনন্দদায়ক এবং ...ক।"

"New Statesman" পত্রিকায় ...শে জানুয়ারী সংখ্যা থেকে মিঃ নাই- ..."Out of London" নামে একটি ...বাহিক বিবরণ লিখছেন। ন'মাসের ...ময় ভারতে প্রায় এগার মাস বেড়িয়ে ...অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি তা এই ...ক নিবন্ধে বিধৃত করেছেন। ...কাতের "বক্সওয়ালা"র দল সম্পর্কে ...ষ কষাঘাত করেছেন মিঃ নাইপাল। ...বক্সওয়ালার দল আনন্দকে এণ্ডি ...ন্ধ মানসীকে জিমি। নাইপালের ...আচরণবাদ সম্পর্কিত এই রচনা ...দের পাঠ করা কর্তব্য। 'বক্সওয়ালা' ...ভারত সম্পর্কিত বিবিধার্থ সংগ্রহ ...সন - জবসনের 'বাকসওয়ালা' ...ইংরাজী ও ভারতীয় শব্দের সংমিশ্রণে ...এর অর্থ "Native itinerant ...dlar", ভারতবর্ষের নিভৃততম অঞ্চলে ...নানা রকমের মনোহারি দ্রব্য ফেরী ...রে বেড়ায়। বোম্বাই শহরের 'বোরা' ...প্রদায়কে এককালে 'বক্সওয়ালা' বলা ...। পরে ব্রিটিশ সওদাগরী আমল- ...কে এবং তারও পরে ব্রিটিশ ব্যুরো- ...সীর ভারতীয় সংস্করণকে এই ...গাত্মক অভিধায় চিহ্নিত করা হয়ে ...ছে। নাইপালের 'New States- ...man'-এ লিখিত এই "বক্সওয়ালাদে"র ...পর্কিত উক্তি সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে।

কলিকাতাবাসীদের অবশ্য (কলি ...তার যারা আদিবাসী) একটা নিদারুণ ...দুর্নাম ইদানীং প্রধানমন্ত্রী থেকে ...বিদেশী ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টাররা করে ...কেন, দুঃস্বপ্নের শহর, মিছিল-নগরী ...ইত্যাদি। তার বহু অখ্যাতি। এই বহু- ...নিন্দিত শহরের নিতান্ত দুঃসময় এখন, ...কে অত্যধিক জনতার চাপ, তার ওপর ...ধনী থেকে অতি দীনতম ব্যক্তি এই ...হরে সহাবস্থান করে থাকে, জাইমোসিন ...থেকে রিকসা এবং ঠেলাওলার মিছিলের ...সঙ্গে মিশিয়ে আছে অসংখ্য পদযাত্রীর ...মিছিল। নাইপালকে এই বিচিত্র নগরী সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক নিবন্ধ রচনার জন্য 'New Statesman' চুক্তি-বদ্ধ করেছেন। নাইপালের যে ক'টি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে তা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। নাইপালের কাছে কল-কাতা ভালো লেগেছে, বোম্বাই শহর তাঁর মনোহরণ করতে পারেনি কারণ তার হৃদয় বলে বস্তু নেই। নাইপালের মতে বাণিজ্য-নগরী বোম্বাই যতই সুষ্ঠুভাবে তার পৌর-পিতৃবৃন্দ পরিচালনা করুন না কেন, তার মধ্যে "inner cleanliness and harmony"র অভাব। এদিকে কলকাতার প্রাণপ্রবাহ সংক্রামক। বাংলার রাজধানীর মধ্যে আছে একটা ছন্দোবদ্ধ সুষমামণ্ডিত রূপ।

কলিকাতার যাঁরা শুভানুধ্যায়ী তাঁরা অবশ্য নাইপালকে সতর্ক করে দিয়ে-ছিলেন কলকাতা সম্পর্কে, আগেভাগে সতর্ক করেছিলেন, বাসে আগুন লাগবে, বিছানার তলায় থাকবে বোমা, রক্ত দিয়ে লেখা জ্বালাময়ী পোস্টার মারা হবে দেয়ালের গায়ে গায়ে। ফুটপাথে পানের পীচ। বাস্তুহারা আর বিপ্লবীদের ভীড়, এদিকে দালাল আর দেহপসারিণী। নোংরা, পূতিগন্ধ, উদ্দাম পথজনতা, দারিদ্র, এবং অপরিচ্ছন্নতার ছড়াছড়ি, দেখে ভেগে পালাতে হবে। কিন্তু এই হুঁশিয়ারী কার্যকরী হয়নি। নাইপাল ভারতের এই বিদগ্ধ রাজধানীতে এসে তার প্রতিটি মিনিট উপভোগ করেছেন।

"While in Calcutta I was told to look for buses on fire, bombs on my bed, Screaming Poster on the walls written in blood, and Pan juice flooding the pavements. I was warned against the crush of refugees and revolutionaries, pimps and prostitutes. The filth, the stench, the erratic traffic, the appalling squalor and poverty -- I was expected to run away from these in sheer disgust. But I found myself enjoying every minute of my stay in this intellectual capital of India.

নাইপালকে ধন্যবাদ। তিনি বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, বিদেশে শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তবু ভারতের এই অবহেলিত এক প্রাচীন ও সমৃদ্ধি-শালী নগরীকে তাঁর ভালো লেগেছে। তাঁর মতে "Culturally Bengal is the most westernised State in India." --। অনেকদিন পরে বাংলাদেশ আর একবার একটা প্রশস্তি অর্জন করল। অনেক দুর্নামের ভীড়ে মৃদু সুনাম।

॥ সাহিত্যিকার বিবাহ ॥

প্রথম কলম ধরেই অতি অল্পবয়সে শ্রীমতী শ্রীলেখা ঘোষ 'অমৃতে'র পাঠক-

ডাঃ কল্যাণময় বসু ও শ্রীমতী শ্রীলেখা

বর্গের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১২ ফাল্গুন, ১৩৬৯) ডাঃ কল্যাণময় বসুর সঙ্গে তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন। বিবাহসভায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্তা পদ্মজা নাইডু এবং বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের এই মিলিত জীবনেও শ্রীমতী শ্রীলেখা বসু নিশ্চয়ই বঙ্গ-সরস্বতীর সেবা ক'রে অধিকতর সার্থকতার পথে অগ্রসর হবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা এই নবদম্পতির সুখসমৃদ্ধি কামনা করি।

নতুন বই

Book of General Knowledge—S. C Sarkar, M. C. Sarkar and Sons Private Ltd. 14 Bankim Chatterjee St. Calcutta-12. Rs. 4.00.

রাজনীতির রূপান্তর—(আলোচনা) —চেস্টার বোল্‌স্‌। এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এস, সি, সরকার সম্পাদিত গ্রন্থগুলি নানাবিধ গুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'বুক অব জেনারেল নলেজ' আলোচ্য গ্রন্থটি সেই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-গুলির অন্যতম। সাধারণ জ্ঞানের এই গ্রন্থখানি প্রতি বৎসরই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সংস্করণগুলি তথ্যের সম্পূর্ণ-তায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরি-চায়ক। সমগ্র পৃথিবীকে অল্প পরিসরে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে বর্তমান গ্রন্থ থেকেই তা উপলব্ধি করা যায়। একান্ত পরিচিত এবং অপরিচিত পৃথিবীর যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বস্তুসমূহ, মানুষ থেকে বিজ্ঞান, শিল্প, অর্থ-নীতি, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা, প্রাকৃতিক জগৎ, শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তানদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, পশু-জগৎ এবং হালআমলের সাংস্কৃতিক জগতের সংবাদ ও বিবিধ বিষয়ক তথ্য জানবার পক্ষে বর্তমান গ্রন্থ-খানির মূল্য অপরিসীম।

'রাজনীতির রূপান্তর' গ্রন্থের গ্রন্থ-কার ছিলেন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত। তাঁর রচিত এই গ্রন্থে সাম্প্রতিক কালের মার্কিনী রাজনীতির বহু খবরাখবর জানা যাবে। গ্রন্থকার অত্যন্ত সততার সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করায় যে-কোন মতাবলম্বী পাঠকের কাছে গ্রন্থখানি আদরণীয় হবে। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর।

বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—(আলোচনা)— মোহিতলাল মজুমদার। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। দাম পাঁচ টাকা।

যুগ-প্রবর্তক বিবেকানন্দ—(জীবনী)— স্বামী অপূর্বানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া। দাম তিন টাকা।

কবি ও সমালোচক মোহিতলাল ছিলেন এককালে বাঙলা সাহিত্যে খ্যাতিমান পুরুষ। 'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামীজীর প্রতি তাঁর হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। গ্রন্থখানিকে মোহিতলালের রচিত সম্পূর্ণ একখানি আলোচনামূলক গ্রন্থ বলা যায়। বিবিধ প্রসঙ্গে তিনি বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে সমস্ত আলো-চনা করেছিলেন, সংকলক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস তা যোগ্যতার সঙ্গে একত্রিত করে-ছেন। এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বও উল্লেখযোগ্য। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থে মোট পঁচিশটি আলোচনা আছে। প্রতিটি আলোচনাই মূল্যবান। বিবেকানন্দ সম্পর্কে যাঁরা গভীরভাবে কিছু জানতে চান তাঁরা বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

স্বামী অপূর্বানন্দ রচিত 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ' গ্রন্থখানি স্বামীজীর এক-খানি সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থ। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দের কর্মময় জীবনে প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। তত্ত্ব ও তথ্যবহুল এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি পাঠ করে অত্যন্ত অল্পসময়ে একজন মহাপুরুষের সমগ্র স্বরূপটি উপ-লব্ধি করা যায়। গ্রন্থকারের ভাষাভঙ্গি সুন্দর ও স্বচ্ছ।

সীমারেখা— অজিতকুমার। চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা। দাম—প[illegible] টাকা।

সম্প্রতি-প্রকাশিত এ [illegible] আধুনিক যুগ ও জ[illegible] এক চলচ্চিত্র। কাহিনীটি সু[illegible] চরি-গুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব আন্তরিক। কলকাতা-বাসী নরেশ চাকরি উপলক্ষে পাটনা-প্রবাসী। তার এই জীবনকে কে-করে একের পর এক ব্রজগোপালবাবু-কন্যা শিবানী এবং সহপাঠিনী অধ্যাপি[illegible] গায়ত্রী এক একটি আবর্ত সৃষ্টি করেছে। গায়ত্রী তার অতীত ভালবাসা নরেশ[illegible] সমর্পণ করল কিন্তু বিয়ে করল সমর[illegible] দেবব্রত-শান্তা এবং সবিতা-শান্তিরঞ্জ[illegible] কাহিনীটা উৎকেন্দ্রিক মনে হতে পারে কিন্তু শান্তার আত্মনিগ্রহ, সবিতা[illegible] জীবনপিপাসা শেষ পর্যন্ত কাহিনী ঘটনামুখীন করে তুলেছে। যার পরিণ[illegible] দেবব্রত ও শান্তার মিলনে। লেখকে[illegible] অনুভূতি ও মননের স্পর্শে চরিত্রগু[illegible] উজ্জ্বল ও আত্মনিষ্ঠ। শান্তার অন্তর্দ্ব[illegible] নরেশের জীবনান্বেষণের মনস্তত্ত্ব গ্র[illegible]টিকে একটি গভীর মর্যাদা দিয়েছে।

> **॥ রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার ॥**
>
> পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিচারকমণ্ডলীর সুপারিশে এই বছরের (১৯৬২-৬৩) 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করেছেন শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রণীত "রম্যানি বীক্ষ্য" এবং অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের "স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী" নামক গ্রন্থ দুটিকে। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চক্র-বর্তী 'অমৃতে'র লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম এবং একজন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে কর্মী. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলানা আজাদ কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমরা এই দুজন সাহিত্য-কারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। বিচারক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন ডঃ সুধীরঞ্জন দাশ।

নান্দীকর

আজকের কথা

ভারপীড়িত বাঙলা চলচ্চিত্র :

এমনিতেই বাঙলা চলচ্চিত্র নানা ...ায় জর্জরিত। ছবি তৈরী করবার ... উঠেছে বেড়ে, অথচ ছবি দেখিয়ে ... যাচ্ছে ক্রমেই ক'মে। বেশীর ভাগ ...ত্রেই দেখা যায়, একখানি ছবির প্রযোজনা যিনি ম'রে-বেঁচে করলেন, ছবির মুক্তির কিছু পরে তিনি আর বেঁচে নেই, অর্থাৎ ছবির রাজ্যে বেঁচে নেই; এ-রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। তাই বছর শেষে যখন চিত্রগৃহের খাতা নিয়ে হিসেব-নিকেশ করতে বসা যায়, তখন দেখতে পাওয়া যায়, বাঙলা ছবির প্রযোজকদের মধ্যে শতকরা আশীজনই 'একখানি ছবির প্রযোজক'। অর্থাৎ বাঙলা দেশে বাঙলা ছবির প্রযোজনা মোটের উপর লোকসানের কারবার। একজন বিখ্যাত প্রযোজক বড় দুঃখেই বলেছিলেন, চিত্র-প্রযোজকরা তো আসেন জবাই হবার জন্যে; কিন্তু ক্রমাগত জবাই হ'তে হ'তে ঐ বিশেষ জীবটির সংখ্যা বেশ ক'মে গেছে। তাই অনেকরকম ভালোমন্দ লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের এই কশাইখানায় হাজির করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তাছাড়া পূর্ব-ভারত চলচ্চিত্র সংস্থার সভাপতি, শ্রদ্ধেয় মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় এই সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় করের কাঠামো যদি বজায় থাকে, তাহ'লে ছবি

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের সদ্যমুক্ত 'নিশীথে' চিত্রে উত্তমকুমার (দক্ষিণাচরণ) ও সুপ্রিয়া চৌধুরী (নিরুপমা)।

তৈরী বাবদ মাত্র কাঁচা ফিল্ম কিনতেই এখন থেকে অন্ততঃ ৯,০০০্ টাকা বেশী খরচ পড়বে। এ ছাড়া ছবির মুক্তির সময়ে মুদ্রিত পজিটিভ ফিল্মের ওপর যে আবগারী কর দিতে হয়, তাও বেশ বেড়ে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত হারে ১৪টি প্রিণ্টবিশিষ্ট ১২ হাজার ফুট দীর্ঘ বাঙলা ছবির জন্যে আবগারী কর দিতে হবে অন্ততঃ ১১,৮৫০্ টাকা; অথচ বর্তমানে দিতে হয় ৬,২৭০্ টাকা অর্থাৎ প্রস্তাবিত খরচের প্রায় অর্ধেক। দেখা যাচ্ছে, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের করনীতি শাঁখের করাত; আসতে কাটে, যেতেও কাটে। ধান্দেনা ক'রে যাঁরা বাঙলা ছবির প্রযোজনা করতে আসেন, তাঁরা এখন থেকে সতর্ক হোন; কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের চাহিদা জোগাতে এখন থেকে প্রতি ছবিতে প্রায় ১৫,০০০্ টাকা বেশী খরচ পড়বে।

চিত্র সমালোচনা

নিশীথে (বাঙলা) ঃ অগ্রগামী প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,৬০৬ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী ঃ রবীন্দ্রনাথ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ অগ্রগামী-গোষ্ঠী; কাহিনী পরিবর্ধন ঃ সমরেশ বসু; চিত্রনাট্যে সহযোগিতা ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমল ভৌমিক; সঙ্গীত পরিচালনা ঃ সুধীন দাশগুপ্ত; চিত্রগ্রহণ ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত; শব্দানুলেখন ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ ঘোষ ও সুনীল ঘোষ; সম্পাদনা ঃ কালী রাহা; শিল্পনির্দেশনা ঃ সুধীর খান; রূপায়ণ ঃ সুপ্রিয়া চৌধুরী, নন্দিতা বসু, ছায়া দেবী, উত্তমকুমার, রাধামোহন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু,

শিশির বটব্যাল প্রভৃতি। চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ (প্রাইভেট) লিমিটেডের পরিবেশনায় গেল ৮ই মার্চ থেকে মিনার, ছবিঘর, বিজলী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

শেক্সপীয়রের নাটক "জুলিয়াস সীজার"-এর সীজার চরিত্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে, জীবন্ত সীজার থেকে মৃত সীজার ঢের বেশী শক্তিমান। কবিগুরুর "নিশীথে" গল্পের নিরুপমাও তাই। রোগশয্যায় শুয়ে হারাণ ডাক্তারের মেয়ে মনোরমাকে দেখে সেই যে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ও কে? ও কে? ও কেগো?', সেই আকুল জিজ্ঞাসাকে সে রেখে গেল আত্মহত্যা ক'রে স্বামী দক্ষিণাচরণের জীবন থেকে স'রে যাবার পরেও। দিনের বেলা কাজের ঝোঁকে যা-হোক ক'রে কাটে, কিন্তু 'নিশীথে'? তখন মদ্যপানও দক্ষিণাচরণকে বিবেকের বৃশ্চিক দংশন বিস্মৃত হ'তে দেয় না; মনোরমার সান্নিধ্যও নয়। ঘরে-বাইরে সর্বত্র ঐ এক প্রশ্ন 'ও কে? ও কে? ও কেগো?' তাকে কষাঘাত করে। মুমূর্ষু স্ত্রীর কাছে মিথ্যাচার তার ধরা পড়ে গিয়েছিল; এমন কি মনোরমার কাছেও। মনোরমা যেদিন থেকে জেনেছে তার রুগ্না স্ত্রীকে, সেদিন থেকে দক্ষিণাচরণের প্রতি তার ভালোবাসারও মৃত্যু হয়েছে। এবং স্বাধীন হ'লে সে হয়ত' দক্ষিণাচরণকে বিবাহও করত না। তাই বিবাহের পর কাব্যরসিক মনোরমা শুধুই বিষাদের প্রতিমূর্তি; কিছুটা কর্তব্যেরও বটে;

অনুশোচনাদগ্ধ স্বামীকে স্বেচ্ছাকৃত অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তাই সে ছুটে আসে; আশার আলো ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তাই সে হংসবলাকার দিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

১৩০৯ সালের মাঘ মাসে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই ছোট গল্পটি (গল্প-গুচ্ছের ১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) কিন্তু আবেদনে আদৌ ছোট নয়। তাঁর বহু বিখ্যাত গল্পের মধ্যে "নিশীথে" একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। এই ছোট গল্পকে যখন একটি পূর্ণদীর্ঘ কাহিনীচিত্রের উপাদান হিসেবে নির্বাচিত করা হ'ল, তখন স্বভাবতঃই ছোট গল্পটিকে দীর্ঘায়ত করবার প্রয়োজন দেখা দিল এবং অগ্রগামী-গোষ্ঠী অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত এই দুরূহ কাজের ভারটি সুসাহিত্যিক সমরেশ বসুর ওপর অর্পণ করলেন। এবং চিত্রনাট্যে সহ-যোগিতা করবার জন্যে নিলেন আরও দুজন সাহিত্যিককে; এক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দুই, বিমল ভৌমিক। এ'রা সকলেই এ'দের ওপর ন্যস্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন; কেউই ভুলে যাননি, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে কাজ করছেন। সমগ্র ছবিখানি দেখে যে-কোনো লোকই স্বীকার করতে বাধ্য, এ'রা কেউই কোনোখানেই রবীন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হননি। শেষ দৃশ্যে দক্ষিণাচরণের আত্মহত্যার অপচেষ্টাটি গল্পবহির্ভূত ঘটনা বটে, কিন্তু ওটি স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই এসেছে এবং ওই চরম কাজে প্রবৃত্ত না হ'লে দক্ষিণাচরণের জীবনে অন্ধকার কেটে যেতনা, সে মনোরমাকে আবার নিজের ক'রে ফিরে পেত না। নিরুপমা নামটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া না হ'লেও বেশ উপযোগী।

স্বাভাবিকভাবেই ছবির কাহিনীটি মন্দগতিতে এগিয়েছে—যে-গল্পের যে মেজাজ। টুকরো টুকরো দৃশ্যের ভিতর দিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠা নিরুপমার গৃহিনী-পণাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে; অবশ্য ছবিতে পিসিমা তাকে সাহায্য করেছেন। একদিকে রোগশয্যায় নিরুপমা, অপর-দিকে এলাহাবাদের হারাণ ডাক্তারের কালাপড়া মেয়ে মনোরমা; দুইয়ের মাঝে দক্ষিণাচরণকে প্রথমে দোল খেতে হয়েছে; কিন্তু পরে সে উষর মরু ছেড়ে ওয়েশিশের সন্ধানে গেছে এবং তখন ওষুধ খাওয়ানোয় ভুল হয়েছে ও মিথ্যা ওজুহাত পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠেছে। ছবির কোথাও দ্রুত লয়ের অবকাশ নেই, এমন কি জীবনের ঘূর্ণাবর্তে স্পাইরাল সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসার সময়েও। দক্ষিণাচরণের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ছবিতেও আলো-আঁধারির খেলা চলেছে। এমন কি পরিচালক গোষ্ঠী চিত্রশিল্পীর সহযোগিতায় সেই মরু

'পলাতক' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অনুপকুমার

বালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নারেখাকে মূর্ছিতভাবে পড়ে থাকতেও দেখিয়েছেন। দৃশ্যের মাধ্যমে লেখকের বর্ণনাকে এমন সার্থকভাবে চিত্রিত করার নিদর্শন কচিৎ দেখেছি। এবং সেই হৃদয়বিদারক প্রশ্ন—'ও কে? ও কে? ও কেগো?' এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হাহা-হাহা-হাহা হাসি; যা 'অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। ......যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশ-দেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে।' শব্দ

নতুন নাটক **তাপসী** কয়েকটি দৃশ্য

...দৃশ্যের মাধ্যমে এমন অপরূপ রূপায়ন কল্পনা করা যায় না।

অভিনয়ে উত্তমকুমার দক্ষিণাচরণকে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। তার কাব্য-রসিক প্রেমিক মন এবং শেষে বিবেক-দংশিত অপরাধী মন—দুইই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তিনি চিত্রিত করেছেন। প্রথমা স্ত্রী নিরুপমার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী স্মরণীয় অভিনয় করেছেন; সুস্থ এবং রুগ্ন নিরুপমা, স্বামীপ্রেম-গরবিনী এবং স্বামীপ্রেমহারা বঞ্চিতা নিরুপমা—সবই নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে। কুমারী মনোরমা ও শেষে দক্ষিণাচরণের দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমার ভূমিকায় নন্দিতা বসুর অভিনয় হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক; তাঁর মধ্যে এমন একটি আনকোরা ভাব আছে (যাকে ইংরাজীতে বলে ফ্রেশনেস), যা রুচিবান দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। এ ছাড়া আছেন হারাণ ডাক্তাররূপে কমলমোহন ভট্টাচার্য, 'নিশীথে'র ডাক্তার-রূপে গঙ্গাপদ বসু এবং পিসিমার ভূমিকায় ছায়া দেবী। এঁরা প্রত্যেকেই উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির গানগুলি সু-গীত। আবহ-সঙ্গীত অত্যন্ত ভাবপ্রকাশক। কিন্তু সঙ্গীতাংশ, বিশেষ ক'রে পরিচয়লিপির সঙ্গে টাইটেল মিউজিক একটু অযথা উচ্চগ্রামের হয়েছে সম্ভবতঃ শব্দগ্রহণের দোষে। অত লাউড না করলেও চলত। শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনা নিখুঁত।

"নিশীথে" রবীন্দ্রকাহিনীর একটি অনবদ্য চিত্রায়ন।

স্টারস্ (পূর্ব জার্মান চিত্র) ঃ পরি-চালনা ঃ কনরাড উলফ।

"...মামলক" চিত্রের পরিচালকের আর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি হচ্ছে "স্টারস্"। নাৎসী জার্মানীতে ইহুদী বিতাড়ন পর্বের পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটির কাহিনীটি রচিত। কেমন করে একটি ইহুদী মেয়ে একটি নাৎসী ছেলের মনে মনুষ্যত্ববোধ আনয়নে সমর্থ হ'ল, তারই বিচিত্র বেদনাময় চিত্র হচ্ছে ডেফা প্রযো-জিত "স্টারস্"। ছবিটি ফ্ল্যাশ-ব্যাক পদ্ধতিতে তোলা এবং এর পরিসমাপ্তি বিয়োগ বেদনায়-বিধুর। পরিচালক কনরাড উলফ্ যে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে ছবিটিকে মানবীয় আবেদনপূর্ণ করেছে সক্ষম হয়েছেন, দৃশ্যগ্রহণে যে চাতুর্য ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে ছবিটি যে আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। "সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা"-কে ধন্যবাদ যে, তাঁরা আমাদের এ-ধরণের শিল্পসৌন্দর্যময় চিত্র দেখবার সুযোগ দিয়ে আমাদের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করেন।

মঞ্চাভিনয়

তাপসী ঃ স্টার থিয়েটারের নিবেদন; কাহিনী ঃ ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত; নাট্য-রূপ ও পরিচালনা ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত; সঙ্গীত পরিচালনা ঃ অনাদিকুমার দস্তিদার; দৃশ্যসজ্জা ও আলোক-নিয়ন্ত্রণ ঃ অনিল বসু; রূপসজ্জা ঃ ফরহাদ হোসেন; রূপায়ণ ঃ কমল মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অজিত বন্দ্যো-পাধ্যায়, নবকুমার লাহিড়ী, ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, করুণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, সুখেন দাস, শ্যাম লাহা, চন্দ্র-শেখর, অপর্ণা দেবী, মঞ্জু দে, বাসবী নন্দী, গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী ইত্যাদি।

অধ্যাপক কন্যা তাপসীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব নিয়ে ভবেন চৌধুরী যেদিন তাঁর অধ্যাপকের সম্মুখীন হন, সেদিন পিতৃস্নেহে অন্ধ না হয়ে তিনি যদি ভবেনকে 'অপ্‌টিক নার্ভ অ্যাট্রোফি'তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাপসী অতি শীঘ্রই অন্ধ হয়ে যাবে, এই নিষ্ঠুর সত্যটি জানিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে 'তাপসী' নাটকের জন্ম হ'ত না। কিন্তু তিনি তা পারেননি। ফলে বিবাহের ছ'মাস যেতে না যেতেই তাপসী যখন ভবেনের সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করে চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে গেল, তখন ভবেনের সমস্ত আক্রোশ অভিমান গিয়ে পড়ল তার অধ্যাপকের ওপর—তিনি কেন সত্য গোপন করেছিলেন সমস্ত জেনে-শুনেও। তাই অধ্যাপকের কাছেই তাঁর অন্ধ কন্যা তাপসীকে ফিরিয়ে দিয়ে ভবেন নিজের আক্রোশবহ্নিকে নির্বা-পিত করতে চাইল। এই হচ্ছে পূর্ব-কথা।

নাটকের যেখানে শুরু, সেখানে দেখি কৃতী অধ্যাপক ভবেন্দ্র চৌধুরী আই সি এস মিঃ অধিকারীর আধুনিকা কন্যা সুষমাকে বিবাহ করার পরে দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক, তাঁর বন্ধু-কন্যা সুতপার আশ্রয়দাতা এবং দীপক নামে একটি তরুণ অধ্যাপকের বন্ধু-নির্দেশক এবং উপদেষ্টা-ফ্রেন্ড, গাইড অ্যান্ড ফিলজফার। প্রৌঢ় ভবেন্দ্রের প্রথম পুত্র গিয়েছে বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়তে, দ্বিতীয় পুত্র সুকুমার লেখা-পড়া না শিখতে পারার দরুণ নিজেকে বাড়ীর আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেও যেমন পারেনি, তেমনই নিজে একটা কাপড়ের কলে পাড়ের ডিজাইনার হিসেবে কাজ করে বলে তার আধুনিকা মা এবং বোন থেকে দূরে দূরেই থাকে। অবসর সময়ে সে গীটার বাজায় এবং লেখাপড়া শিখে মানুষ না হতে পারার দুঃখ ভুলতে মদ্য-পানও করে। বাড়ীতে তার একমাত্র সৌহার্দ ভবেন্দ্রের আশ্রিতা সুতপার সঙ্গে। আপন ভগ্নি রেখা যখন তার অত আধুনিকতার খেসারত দিতে গিয়ে বিপন্ন, তখন সুকুমার সুতপা সম্পর্কে তার মায়ের মিথ্যা সন্দেহের কারণ হওয়ার দরুণ বাড়ী-ছাড়া হয়ে বাস করছে তারই মিলের বন্ধু গোপেনের আশ্রয়ে। রেখাকে আসন্ন বিপদ থেকে একমাত্র সুকুমারই উদ্ধার করতে পারে, এই ভেবে সুতপা গোপেনের বাড়ীতে গিয়ে সুকুমারের সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু যখন সুকুমার ধনী অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উচ্ছৃংখল পুত্র হিরন্ময়কে তার অন্যায় সংশোধন করবার জন্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রার্থনা জানায় এবং অরবিন্দ হিরন্ময়কে সঙ্গে নিয়ে সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে ভবেন্দ্রের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন, তার পূর্বেই রেখা তার ধিক্কৃত জীবনকে শেষ করবার জন্যে বিষ পান করেছে এবং তাঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখেও পতিত হয়। শোকে ভবেন্দ্রের স্ত্রী সুষমা মূর্চ্ছিতা হন এবং তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ইতাবসরে ভবেন্দ্রের প্রিয় ছাত্র দীপক তার অন্ধ মা তাপসীর কাছ থেকে জানতে পারে, ভবেন্দ্রই তার পিতা। তাপসীকে পরিত্যাগ করার মত অমানুষিকতা ভবেন্দ্রের মত শিক্ষিত, কৃতবিদ্য, লোকের মধ্যে কি করে সম্ভব হ'ল, তা দীপক খুঁজে পেল না এবং নিজের প্রিয় অধ্যাপকের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে দীপক তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক-

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত আর ডি বি-র 'মহানগর' চিত্রে মাধবী মুখার্জি ও অনিল চ্যাটার্জি

যার জন্যে কাশীতে অধ্যাপনার কাজ নিল। ভবেন্দ্রের সংসার যখন বিপর্যয়ের চরম সীমায়, ঠিক তখনই তিনি জানলেন দীপক তাঁরই প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। তাপসীকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করার পর থেকেই তিনি অহর্নিশি যে মনোবেদনায় অস্থির হয়েছিলেন, এই ঘটনা তারই ওপর চরম আঘাত হানল। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন এবং অকস্মাৎ নিজের দৃষ্টি-শক্তিকে হারিয়ে ফেললেন। এরপর স্বামী-স্ত্রী এবং দীপক সুতপার মিলনে নাটকের পরিসমাপ্তি।

তিন অঙ্কে এবং সতেরোটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকখানিকে দেবনারায়ণ গুপ্ত এমন মানবিক আবেদনে ভরপুর করে ক্রমবর্ধমান গতিবেগের সংগে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, যা যে-কোনোও দর্শককে আপ্লুত না করে পারে না। একদিকে অধ্যাপক ভবেন্দ্রের বিবেকের দংশন, অতি-আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রায় নিরুচ্চার মর্মবেদনা, নিজের অন্ধত্বকে কৃতকর্মের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত-জ্ঞান, অপর দিকে সুতপার বেদনাবিক্ষুব্ধ জীবনে সেবা-ধর্ম, কৃতজ্ঞতা ও নীরব প্রেম এবং আর এক দিকে গোপেনের সংসারের হাস্য-পরিহাসময় পরিস্থিতি প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্র, ভাব ও রসকে এমন সুকৌশলে সমন্বয়সাধন ঘটিয়ে নাটকটিকে একটি সুষ্ঠু সম্পূর্ণতা দিয়েছেন, যা আজকের দিনে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

এবং এই নাটকটিকে তিনখানি রবীন্দ্র-গীতি ও আবহসংগীত রূপে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের সুর দ্বারা সমৃদ্ধ করে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত করার মধ্যে একটি অভিনবত্ব ও আভিজাত্যের চিহ্ন লক্ষিত হয়। বিশেষ বিশেষ নাটকীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী সুর নির্বাচনে সংগীত পরিচালক অনাদি দস্তিদার অসামান্য রসবোধ ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাসবী নন্দী দ্বারা গীত শেষের গানখানি ভাষা, ভাব ও সুরের দিক দিয়ে এমন উপযোগী হয়েছে যে, গানের সংগে বহু দর্শকের চোখে ধারা নামতে দেখেছি। এ দৃশ্য মঞ্চাভিনয়ে কচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

"তাপসী"র অভিনয় সামগ্রিকভাবে হয়েছে অনবদ্য। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁর ভূমিকায় নাটনৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। তবে ওরই মধ্যে প্রথমেই নামোল্লেখ করব সুতপার ভূমিকায় বাসবী নন্দীর। অভিনেয় চরিত্রটিকে আত্মস্থ করে নিয়ে তাকে সাজে, পোষাকে, চলনে, বলনে, ভংগীতে, দরদে এমন জীবন্ত ও মূর্ত করে তুলেছেন তিনি, যা আমাদের রীতিমত মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছে। অতি আধুনিকা মায়ের ভূমিকায় সম্ভবতঃ এই প্রথম মঞ্চাবতরণ করলেন সুপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী মঞ্জু দে। তাঁর মঞ্চাবতরণ সার্থক হয়েছে। এমন স্বচ্ছন্দে তিনি ভূমিকাটিকে রূপায়িত করেছেন যে, মনেই হয় না তিনি এই প্রথমবার পাদ-প্রদীপের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। উন্মাদরূপে তিনি যে আশ্চর্য নাট্য-নৈপুণ্য দেখান, তা প্রায় অবিস্মরণীয়ের পর্যায়ে পড়ে। জ্যোৎস্না বিশ্বাস নামে একটি শিল্পী রেখার ভূমিকায় সুন্দর-ভাবে অভিনয় করে তাঁর সম্ভাবনাময় অভিনেত্রীজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। তাপসীর নাম-ভূমিকায় অপর্ণাদেবীর করণীয় অতি সামান্যই; অবশ্য তাঁর স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে ব্যাকুল হবার দৃশ্যটি তাঁর নাটনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে।

পুরুষ-ভূমিকাগুলির মধ্যে তাপসীর পুত্র দীপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন চিত্রজগতের অন্যতম সার্থক নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি যথেষ্ট আবেগ সঞ্চার করেছেন তাঁর গৃহীত চরিত্রটিতে। কয়েকটি স্থানে তিনি সুন্দর নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রধান চরিত্র ভবেন্দ্রের ভূমিকায় কমল মিত্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন। সুকুমারের চরিত্রে অনুপকুমার একটি অভিনব ও সার্থক সৃষ্টি করেছেন। চরিত্রটি সত্যিই ভালো-বাসার মত। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়; দর্শকরা তাঁকে দেখতে চান এবং দেখে মেতে ওঠেন। রংগমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব মাত্রই প্রেক্ষাগৃহে হাসির ফোয়ারা ছোটে। কাজেই গোপেন রূপে তিনি যে আর একবার দর্শকদের খুসীর মাত্রাকে চরমে তুলেছেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য। এবং তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী সেবার ভূমিকায় গীতা দে তাঁর সংগে প্রায় পাল্লা দিয়েই কোঁদল করেছেন ও দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। আধুনিক উচ্ছৃংখল যুবক হিরন্ময়ের ভূমিকায় নবকুমার লাহিড়ী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে ত্রুটি করেননি। অপরাপর চরিত্রগুলিতে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, [illegible] লাহা, সুখেন দাস প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

স্টারের নবতম নিবেদন "তাপসী" নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ ও অভিভূত করবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বিবিধ সংবাদ

॥ সাত পাকে বাঁধা ॥

'সাত পাকে বাঁধা' ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র লাভ করেছে। আর ডি বনশালের এই বলিষ্ঠ চিত্রটি আগামী ২২-এ মার্চ শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য মফঃস্বল চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর চিত্রনাট্যরূপ দিয়েছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চ্যাটার্জি। অন্যান্য চরিত্রে আছেন—ছায়াদেবী,

মলিনাদেবী, সুব্রতা সেন, গীতা দে, তপতী ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণ-কুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, অজিত দে, শৈলেন মুখার্জি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরারোপিত এই চিত্রটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার "চার্লি চ্যাপলিন" চিত্রোৎসব ঃ

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আসছে এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে চার্লি চ্যাপ্-লিনের পুরোনো ছবিগুলোকে প্রদর্শনের মধ্যমে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত করবেন। চার্লির প্রথম যুগের "কীস্টোন" ছবিগুলি, কিড, সিটি লাইটস প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রগুলি এই উৎসব উপলক্ষ্যে দেখানো হবে।

জোফ্রি ব্যালে সম্প্রদায়ের সাংবাদিক সম্মেলন ঃ

জোফ্রি ব্যালের সংগঠক মিঃ জোফ্রি গেল ১লা মার্চ একটি সাংবাদিক সম্মে-লনে মিলিত হয়ে জানালেন, তাঁর সম্প্রদায় ২২ জন নৃত্য-শিল্পী, ১২ জন যন্ত্রী এবং নেপথ্যকর্মের জন্যে আরও ১২ জন সর্বসমেত ৪৬ জনের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁরা সঙ্গে এনেছেন ২২০০ পাউণ্ড ওজনের জিনিসপত্র এবং আলোকসজ্জা। ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালে থেকে শুরু আধুনিকতম ব্যালে—সমস্তরেই তাঁদের সমান দক্ষতা। ভারতে তাঁরা দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলি ও ভরতনাট্যম নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং আশা করছেন, তাঁদের নিজেদের নৃত্য এই ভারতীয় নৃত্য দ্বারা ভবিষ্যতে প্রভাবিত হবে।

।।'রূপান্তরে'র অভিনয় ।।

রূপান্তরের সভ্যবৃন্দ গত শুক্রবার ৮ই মার্চ বরাহনগরের নবপল্লীতে মন্মথ রায়ের "জওয়ান" ও কিরণ মৈত্রের "সংকেত" নাটক দু'টী মঞ্চস্থ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন নাট্যকার কিরণ মৈত্র।

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন যথাক্রমে মনোরঞ্জন দে সরকার (দয়াময়), অরুণ সেন (জ্ঞানেশ), দেবব্রত মুখার্জি (প্রাণেশ), অশোক ঘোষ (ডাঃ রায়), মানবেন্দ্র গুহ (শশি), রীনা মুখার্জি (রিণি), দীপক ভট্টাচার্য (পল্টন), শিবব্রত মিত্র (লন্ঠন), অচিন্ত্য মুখার্জি (মহানন্দ), কেশবলাল ঘোষ (আনন্দ), অশ্রু মুখোপাধ্যায় (ঈশ্বর), ও দীপালি চক্রবর্তী (ভারতী)। নাটক দু'টী সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালনা করেন মানবেন্দ্র গুহ।

জাদুকর বিজয়গোবিন্দ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে এক বিশেষ

রাজশ্রী পিকচার্সের 'হাইহিল' চিত্রে পরলোকগত শিল্পী ছবি বিশ্বাস ও রেণুকা রায়

জাদুবিদ্যা প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। কলকাতার প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের উপস্থিতিতে জাদুকর শ্রীবিজয় গোবিন্দ তাঁর জাদু প্রদর্শন করেন।

তাঁর খেলাগুলির মধ্যে দি ম্যাজিক গার্ডেন, রাডলেস মার্জারী., দি মিস্ট্রি অব ইয়াকোহামা, দি ফেস্টিভ্যাল টাইম ইন জাপান, দি জাপানীজ এরিয়াল ইলিউশান ও ব্ল্যাক আর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা এই তরুণ বাঙালী জাদুকরের শিল্পসৃষ্টির সাধু প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

*** কলকাতা ***
বোম্বাই * মাদ্রাজ

কলকাতা

আর ডি বনশাল প্রযোজিত ও পরি-বেশিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সাত পাকে বাঁধা' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজয় কর। চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কাহিনীর দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। পার্শ্ব-

চরিত্রে রয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা-দেবী, ছায়াদেবী, সুব্রতা সেন, তরুণ-কুমার, প্রশান্তকুমার ও অনিল দে।

রাজীব পিকচার্সের প্রথম ছবি 'হাই হিল' সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। ছবিটি মুক্তিপ্রতীক্ষিত। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনায় কাজ শেষ করেছেন যথাক্রমে ফণী গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মিত্র। কমেডি ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মিণ্টু চক্রবর্তী, অনু দত্ত, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ হালদার। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন রামচন্দ্র শর্মা।

গত সপ্তাহে পরিচালক দিলীপ নাগ রাঁচী ও টাটা নগরে 'বিনিময়' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন। রাঁচী হোটেল, ফার্মেসী, কলেজ ও ট্রেনের মধ্যে কাহিনীর বিশেষ দৃশ্যগুলি গৃহীত হয়। কাহিনী ও সংগীত রচনা করেছেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায় এবং কালীপদ সেন। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নবাগতা সুচিতা সিন্‌হা, গীতা দে, তরুণকুমার, সুব্রতা সেন, অসিতবরণ, জহর রায়, রবি ঘোষ, কাজল গুপ্ত, শিশির বটব্যাল, পরিতোষ রায় ও শিশির মিত্র। সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ করছেন অমিয় মুখোপাধ্যায় ও দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত আর ডি বি-র 'ছায়াসূর্য' চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল এবং শর্মিলা ঠাকুর।

সমরেশ বসু রচিত 'পুতুলের খেলা' অবলম্বনে দুইনারী' ছায়াচিত্রের চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবিটি মুক্তি-প্রতীক্ষিত। পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও সংগীত সৃষ্টি করেছেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে নির্মলকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, কাজল গুপ্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কালী সরকার ও পাহাড়ী সান্যাল।

বোম্বাই

ইন্দো - আমেরিকান কো-প্রোডাকসন্সের ছবি 'দি গাইড'-এর দৃশ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে রাজস্থানের উদয়পুর বহির্দৃশ্যে। প্রায় দুশো জন শিল্পী ও কলাকুশলীসহ একটি দল উদয়পুরে কাজ করছেন। ইংরেজী ও হিন্দী ছবির একসঙ্গে কাজ চলেছে। আর কে নারায়ণের কাহিনীটি চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক টি ডেনিলিউস্কি। চিত্রগ্রহণ, সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন ফলি মিস্ত্রি ও শচীনদেব বর্মন। প্রধান চরিত্রে করছেন প্রযোজক-নায়ক দেব আনন্দ, নায়িকা ওয়াহিদা রেহমান, কিশোর সাহু, আনোয়ার হোসেন, লীলা চিটনীস, ডেভিড, কে এন সিং, রসিদ খান ও হারিন চ্যাটার্জি। হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করছেন চেতন আনন্দ।

'আই মিলনকি বেলা' রঙিন ছবির দৃশ্য গ্রহণ করছেন পরিচালক মোহন-কুমার। নায়ক রাজেন্দ্রকুমার। নায়িকা সায়রা বানু। বিভিন্ন দৃশ্যে অভিনয় করেছেন শশীকলা, নাজির হোসেন, ধর্মেন্দর, সুলোচনা, মদনপুরী ও সুন্দর। কাশ্মীরে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। সুরসৃষ্টি করেছেন শঙ্কর জয়কিষণ।

প্রযোজক-নায়ক উত্তমকুমার যে হিন্দী ছবিটি করছেন তার নাম 'ছোটি সি মুলাকাৎ।' আলো সরকার ছবিটি পরিচালনা করছেন। বর্তমানে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে সিমলায়। এ মাসের শেষেই বম্বেতে ছবির ... কাজ শুরু হবে। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন উত্তমকুমার ও বৈজয়ন্তী মালা। সুরকার শঙ্কর জয়কিষণ। চিত্রগ্রহণ কানাই দে।

ইন্দরাজ আনন্দের নতুন ... কা সেজ।' অভিনয় করছেন বৈজয়ন্তী মালা, মনোজকুমার ও অশোককুমার।

মাদ্রাজ

আর আর পিকচার্সের তেলেগু ছবি 'মানছি ছেদু' প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন টি আর রামান্না। সরোজাদেবী, এন টি রামারাও ও রাজকুমারী প্রধান চরিত্রের শিল্পী। সংগীতপরিচালক বিশ্বনাথন। এ মাসের শেষেই অন্ধ্র প্রদেশে ছবিটি মুক্তি পাবে।

—চিত্রদূত

স্টুডিও পাড়ার ছবি-ছবি খবর ... এবারে ছবি তৈরীর একটা কারখানার কথা বলি। এর আগে স্টুডিও ... কিভাবে ছবির দৃশ্য গৃহীত হয় ... কথা বলেছি। আপনারা জানেন চি

নাট্যকার উপন্যাস বা কোন গল্পের চিত্রনাট্য প্রথম রচনা করেন। ছবির এই মূল চিত্রনাট্য থেকে পরিচালক বিভিন্ন কলাকুশলীর বিভাগীয় স্বাধীন দায়িত্বটুকু বুঝিয়ে দেন। কাগজে-কলমে ছবির প্রথম ধাপের কাজ শেষ হলে স্টুডিও ফ্লোরে দৃশ্য গ্রহণের জন্য প্রত্যেক কলাকুশলী প্রস্তুত হন। শিল্পনির্দেশক পরিবেশ অনুযায়ী দৃশ্যপট তৈরী করেন। আলোকচিত্রশিল্পী দিন অথবা রাত্রির বিশেষ আলোর পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ করেন। অভিনেতার চরিত্রানুযায়ী রূপকার রূপনে ব্যক্তিত্ব আনেন। কাহিনীর সংলাপ জেনে নিয়ে অভিনেতা অভিনয়ের জন্য ক্যামেরা-যন্ত্রে এগিয়ে আসেন। শিল্পী থেকে কলাকুশলী সব যখন প্রস্তুত পরিচালক তখন শব্দযন্ত্রীর কাছ থেকে পাকাপাকি খবরটুকু নিয়ে নির্দেশ দেন ছবি গ্রহণের জন্য। ছবি তো নেওয়া হল। কিন্তু কিভাবে সেই ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তার কতগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। আলোকচিত্রগ্রাহক ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তুললেন। শব্দধারক আলাদাভাবে অভিনেতার সংলাপ লিপিবদ্ধ করেন শব্দযন্ত্রে 'শব্দ চিত্র'-র সাহায্যে। দৃশ্য গ্রহণ শেষ হলে আলাদাভাবে দুটো ছবির ল্যাবরটারী বা শোধনাগারে একসঙ্গে মিলিত পরিস্ফুটনের কাজ চলে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এই কারখানা ছবি তৈরীর শেষ ধাপ। কথায় বলে, যার শেষ ভাল তার সব ভালো। শোধনাগারের ওপরই নির্ভর করে একটা সার্থক ছবির সবকিছুর দায়িত্ব। কাঁচা ফিল্ম-এর বিচিত্র কর্মধারার রূপান্তর নিয়ে এবারে আলোচনা করছি।

হাতী মার্কা নিউথিয়েটার্স স্টুডিওর এক অংশে সাউন্ড ও পিকচার নেগেটিভ পরিস্ফুটনের জন্য যে শোধনাগার তার নাম ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরটারী। নবনির্মিত এই ল্যাবরটারীর কাজ আরম্ভ হয়েছে গত ১৯৫৮ সাল থেকে। এখানকার কর্মাধ্যক্ষ আর বি মেহতা। সহকারীদের মধ্যে অন্যতম কর্মি তারাপদ চৌধুরী সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন এ কর্মধারার প্রয়োগটুকু। দোতলা বাড়ীর এ জীবন-যন্ত্র হঠাৎ দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। চিত্র গ্রহণের পর টুকরো টুকরো operation theatre chamber-এ punch যন্ত্রের সাহায্যে জুড়ে নিয়ে কাঁচা ফিল্ম পরিস্ফুটিত হয়। আলোকচিত্রশিল্পী প্রথমে পরীক্ষা করে নেন। তারপর ভুলত্রুটি বা আলোর পরিমাপ আরও উন্নত করতে কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। অন্ধকার ঘরের এ জীবন তখন আলোয় এসে মুক্তি পায়। কলাকুশলীরা তাদের কাজ পরীক্ষা করেন। আপন কর্মে খুসী হয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেদের কাজ শুরু করেন স্টুডিও ফ্লোরে। ছবির চাকা শুধুই ঘুরছে। অন্ধকার ঘরের কর্মিরা অনুভূতি আর অভ্যাসের নিয়মে কাজ চালিয়ে যান। খুব সাবধানে আর দক্ষতার সঙ্গে নজরটুকু ফেলে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা চলে। punch এর সময় অসাবধান হলে অনেক সময় ফিল্ম মেশিনে জড়িয়ে যায়। যার ফলে সারাদিনের পরিশ্রম এবং অর্থ দুই নষ্ট হয়। অর্থক্ষতি তখন প্রযোজকের। ল্যাবরটারীর কর্মিরা সেদিক থেকে খুব অভিজ্ঞ। অঘটন তেমন ঘটে না। এরপর ছবি পরিস্ফুটনের কাজ।

অন্ধকার ঘরের পাশে একটা বড় চৌবাচ্চা আছে। এর মধ্যে প্রায় ১৫০ গ্যালন তরল ক্যামিক্যাল থাকে ফিল্ম সোধনের জন্য। পাম্পের সাহায্যে এই রাসায়নিক তরল বস্তুটিকে সব সময় ছড়িয়ে রাখা হয়। এরপরেও 'কুলিং কয়েল' দিয়ে ক্যামিক্যালটি ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা চলে। গরমে যাতে ঘনত্ব না বাড়ে তার জন্য পরিমাপ-যন্ত্র রয়েছে। নির্দিষ্ট ঠান্ডায় ফিল্মের সমতা এই প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে। পরিস্ফুটনের সময় ফিল্মের গতি অনুযায়ী একটা মাপা সময় নির্দিষ্ট থাকে। সেই সময় উত্তীর্ণ হলে একটি প্রচ্ছন্ন ছবি সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সময় ফিল্মের গতির তারতম্য থাকলে সময় কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এ কাজের দায়িত্ব তখন অন্ধকার ঘরের প্রতিনিধির। Stop Bath ও Harding Bath-এর সাহায্যে ফিল্ম ঠান্ডা হয়। শেষ পর্যন্ত Cooling Current Water এবং Filter প্রক্রিয়ায় সোধিত হতে সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তারপর ছবিকে Drying Chamber এ শুকিয়ে নেওয়া

হয়। গৃহীত ছবি এবারে দর্শনযোগ্য হল। এরপরে সম্পাদক-টেবিল থেকে আবার ছবি দোতলা ঘরে আসে। এখানে ছবির শেষ কাজটুকু সম্পন্ন হয়। সে পদ্ধতির নাম Grading, Printing, Chemical mixing, density measuring, Chemical Testing room, Checking, Cleaning ইত্যাদি। বিস্তারিত এ সব কর্মপদ্ধতি পরের সংখ্যায় জানাবো। তাহলে বোঝা গেল চিত্র গ্রহণের পরেও মূল কাজটুকু এই ল্যাবরটারীতে শেষ হচ্ছে।

—চিত্রদূত

॥ লরেন্স অফ আরেবিয়া ॥

বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'লরেন্স অফ আরেবিয়া' সম্প্রতি লণ্ডনে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রটি নির্মাণ করেছেন 'দি ব্রীজ অন দি রিভার কোয়াই'-এর গোষ্ঠী। চিত্রটির প্রযোজক হলেন সাম স্পিগেল, পরিচালক ডেভিড লীন এবং চিত্রগ্রহণ করেছেন এফ. এ. ইয়াং। এঁরা সকলেই 'কোয়াই নদী'র লোক। তবে অনেকের মতে এঁদের পূর্বতন ছবির কীর্তিকে নবতম ছবিটি স্বচ্ছন্দেই ম্লান করে দিয়েছে। লরেন্সের দুঃসাহসিক চরিত্র, বিশাল পর্দায় তোলা মরু-যুদ্ধ, মরুভূমিতে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, মরুমায়ার চক্রান্ত প্রভৃতি চিত্রটিকে যথেষ্টই আকর্ষণীয় করেছে।

লরেন্স ছিলেন কায়রোতে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যাবাসের জনৈক সেনানী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তখন তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল ইংরেজদের, লরেন্সকে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ সংগঠন করার কাজে নিযুক্ত করা হয়। ভয়ংকর নেফাড মরুভূমি অতিক্রম করে অতর্কিতে লরেন্স তুর্কীদের আকাবা বন্দর অধিকার করেন। লরেন্সের বীরত্বে অভিভূত হয়ে আরবরা তাঁকে নেতার আসনে বরণ করে। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল এ্যালেনবির পৃষ্ঠপোষকতায় লরেন্স তুর্কীদের বিরুদ্ধে গরিলা সংগ্রাম চালাতে থাকেন। কিন্তু আরব বেদুইনরা স্থায়ীভাবে লরেন্সের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ চালাতে চায় নি। তুর্কীদের কাছ থেকে লুঠতরাজ করে যা পেয়েছিল তাই নিয়ে তারা একে একে বিশাল মরুভূমির মধ্যে সরে পড়তে আরম্ভ করল। লরেন্সের সৈন্যবাহিনী এসে ঠেকল মুষ্টিমেয় কিছু লোকে। ইতিমধ্যে তাঁকে তুর্কীরা বন্দী করে ফেলে। তুর্কীরা নিদারুণ অত্যাচার করে তাঁর ওপর। কিন্তু কোনোরকমে মুক্তি পান লরেন্স। ভগ্নমনোরথ লরেন্স ঠিক

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর শোধনাগারে ফিল্ম পরিস্ফুট হতে চলেছে। কর্মরত কলাকুশলী অনিলকুমার মহন্ত ও মহেন্দ্র জানা

করেছিলেন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে থাকবেন না কিন্তু এ্যালেনবির প্ররোচনায় লরেন্সকে আবার ডামাস্কাস অভিযানের নেতৃত্ব করতে হল। অনেক লোকক্ষয়ের পর দামাস্কাস অধিকার করলেন বটে তিনি, কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দিয়েছে। ফলে সংযুক্ত আরব কাউন্সিল ভেঙ্গে গেল এবং সেই সঙ্গে ভাঙ্গল লরেন্সের ঐক্যবদ্ধ এক স্বাধীন আরব গড়ার স্বপ্ন। হতাশ হৃদয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন লরেন্স। অবশ্য ইংরেজ সরকার কর্ণেল পদে উন্নীত করে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। ছবিটি এখানেই শেষ হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম সদস্য রবার্ট বোল্ট 'লরেন্স' চরিত্রটিতে এক নতুন আলোকে চিত্র-নাট্যে উপস্থিত করেছেন। লরেন্সের জীবনের মাত্র দুটো বছর চিত্রে দেখানো হয়েছে। লরেন্স ছাড়াও যুবরাজ ফৈজল, এ্যালেনবি, শেখ আউদা প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রকেও বর্তমান চিত্রে দেখা যাবে।

লরেন্সের ভূমিকাটি অতীব জটিল হলেও এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগত একজন অভিনেতা পিটার ওটুল। স্ট্রাডফোর্ড-অন-অ্যাভনএ সেক্সপীয়র নাটকের অভিনেতা ছিলেন পিটার ওটুল। কয়েকটি বৃটিশ ছবিতে ছোটো খাটো ভূমিকাতে অভিনয় করেছেন তিনি ইতিপূর্বে। লরেন্সের ভূমিকায় তাঁকে নেবার একটা কারণ তাঁর মুখের সঙ্গে ঐতিহাসিক চরিত্রটির সাদৃশ্য। অন্যান্য চরিত্রের অভিনেতারা কিন্তু সকলে বিখ্যাত। যুবরাজ ফৈজল-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্যার আলেক গিনেস, জেনারেল এ্যালেনবির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জ্যাক হকিন্স এবং এ্যান্থনি কুইনের ভূমিকাটি হল শেখ আউদার। এ ছাড়া ভারতবর্ষে এ ছবির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে আই. এস জোহারের অভিনয়। পাকিস্তানের এবং ইজিপ্টের অভিনেতারাও আছেন 'লরেন্স অফ আরেবিয়া' ছবিটিতে।

লরেন্সের নিজের লেখা 'দি সেভেন পিলারস অফ উইজডম' গ্রন্থটি থেকে এ চিত্রনির্মাণের জন্যে অনেক খুঁটিনাটি সাহায্য নেয়া হয়েছে।

—চিত্রব

দর্শক

॥ রঞ্জি ট্রফি ॥

সেমি-ফাইনাল

বাংলা : ৩২২ রাণ (পঙ্কজ রায় ৮১ রাণ। বালু গুপ্ত ১১৫ রাণে ৪, রমাকান্ত দেশাই ৩১ রাণে ৩ এবং নাদকার্ণী ৪২ রাণে ৩ উইকেট পান)।

ও ১৯৯ রাণ (চুণী গোস্বামী ৬৫ রাণ। বালু গুপ্তে ৩২ রাণে ৩, দেশাই ৩৩ রাণে ৩ এবং স্টেয়ার্স ২০ ২ উইকেট পান)।

বোম্বাই : ৫৫২ রাণ (ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ১৬২, সুধাকর অধিকারী ১৩৩, ভি এস রামচাঁদ ১০৭ এবং স্টেয়ার্স ৫৩ রাণ। অনিল ভট্টাচার্য ১২৫ রাণে ৩ এবং কল্যাণ মিত্র ১০০ রাণে ২ উইকেট পান)।

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় বোম্বাই এক ইনিংস ও ৩১ রাণে বাংলাকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে।

বোম্বাই দল ইতিপূর্বে ১৪ বার এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলে ১৩ বার রঞ্জি ট্রফি জয় করেছে। ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করেছে মাত্র একবার হোলকার দলের বিপক্ষে ১৯৪৭-৪৮ সালে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের (১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৫-৩৬) ফাইনালে বোম্বাই যথাক্রমে উত্তরাঞ্চল এবং মাদ্রাজকে পরাজিত ক'রে রঞ্জি ট্রফি জয় করে। বোম্বাই উপর্যুপরি ট্রফি জয় করেছে (১) ১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৫-৩৬; (২) ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭; (৩) ১৯৫৮-৫৯, ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২ (উপর্যুপরি চারবার)। কোন প্রদেশই বোম্বাইয়ের মত ১৩ বার এবং উপর্যুপরি চারবার রঞ্জি ট্রফি জয় করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে বাংলা ৬ বার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে খেলে মাত্র একবার (১৯৩৮-৩৯) ট্রফি পেয়েছে। ইতিপূর্বে ফাইনালে বোম্বাইয়ের কাছে বাংলা দল পরাজয় স্বীকার করেছে দু'বার (১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৮-৫৯)।

গত দু'বার (১৯৬০-৬১ ও ১৯৬১-৬২) রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে বোম্বাই রাজস্থানকে পরাজিত করেছে।

আলোচ্য সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দল ক্রিকেট খেলার সব বিষয়ে বাংলার তুলনায় উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলে নিঃসন্দেহে স্থান পাবেন এমন একাধিক খেলোয়াড় ছিলেন বোম্বাই দলে। সেই কারণে বোম্বাই দলের পক্ষে বাংলাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা সহজ হয়। অনেকে আশা করেছিলেন বাংলা দল লেস্টার কিংকে দলে পেয়ে শক্তিশালী হয়েছে এবং বোম্বাইকে বেশ বেগ দিতে পারবে। কিন্তু তাঁকে দলে পেয়ে বাংলার কোন লাভ হয়নি। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস খেলার প্রথম দিনে কিং ৪ ওভার বল দিয়ে ৩১ রাণ দেন; কিন্তু একটা উইকেটও পান নি। ঐ দিনই তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। পরের দিন তিনি চা-পানের পরে মাঠে নেমেছিলেন মাত্র, বল দেন নি। বাংলা দল যদি তাঁকে পুরো কাজে লাগাতে পারতো এবং একাধিক 'ক্যাচ' যদি মাটিতে ফেলে নষ্ট না করতো তাহলে বাংলা দলের খেলার চেহারা এরকম কাহিল হ'ত না। বোম্বাই দলও একাধিক ক্যাচ নষ্ট করে, কিন্তু তারা বাংলার দুর্বলতায় শেষ পর্যন্ত খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে। বোম্বাই দলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন খেলোয়াড়—চার্লি স্টেয়ার্স ছিলেন। কিন্তু বোম্বাই তাঁর দিকে মুখ চেয়ে মোটেই দল তৈরী করেনি। স্টেয়ার্স প্রথম ইনিংসের খেলায় ৭৪ রাণ দিয়ে একটা উইকেটও পান নি। দ্বিতীয় ইনিংসে পেয়েছিলেন মাত্র ২ টো উইকেট, ২০ রাণে। দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙেছিলেন দেশাই (৩৪ রাণে ৩ উইকেট) এবং বালু গুপ্তে (৩২ রাণে ৩ উইকেট)। বোম্বাইয়ের স্পিন বোলার বালু গুপ্তে, নাদকার্ণি এবং দেওয়াদকার যে পর্যায়ের বোলার, বাংলার অনিল ভট্টাচার্য কিম্বা প্রকাশ ভাণ্ডারীকে এক আসনে মোটেই স্থান দেওয়া যায় না। পেস বোলার রমাকান্ত দেশাই বাংলার দুর্গা মুখার্জির থেকে অনেক বেশী দক্ষ। ব্যাটিংয়ে বাংলা দলে 'সবে ধন নীলমণি' ছিলেন পঙ্কজ রায়। তিনি প্রথম ইনিংসে ৮১ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৭ রাণ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর আউট হওয়া সম্পর্কে অনেকেই আম্পায়ারের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। ঘটনাটি তাঁর এবং বাংলার পক্ষে খুবই মর্মান্তিক। কিন্তু আম্পায়ারের বিচার, তাঁর বিদায়ের পর বাংলাকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন মাত্র দু'জন খেলোয়াড়—চুণী গোস্বামী (৬৫ রাণ) এবং অম্বর রায় (৩৭ রাণ)।

বাংলা দলের অধিনায়ক পঙ্কজ রায় টসে জয়লাভ ক'রে প্রকাশ পোদ্দারের জুটিতে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দলের ৫১ রাণের মাথায় পোদ্দার নিজস্ব ৩৭ রাণ করে আউট হ'ন। লাঞ্চের সময় বাংলার রাণ ছিল ৭৯ (১ উইকেটে)। উইকেটে খেলছিলেন পঙ্কজ রায় (৩২ রাণ) এবং কল্যাণ মিত্র (৩ রাণ)। লাঞ্চের পরই খেলার দ্বিতীয় ওভারে বালু গুপ্তের প্রথম বলে দলের ৮০ রাণের মাথায় ২য় উইকেট (কল্যাণ মিত্র) পড়ে যায়। এর পর তৃতীয় উইকেটের জুটিতে পঙ্কজ রায় এবং অনিল ভট্টাচার্য দলের ৮০ রাণ যোগ করেন। দলের ১৬০ রাণের মাথায় অনিল ভট্টাচার্য ৩৭ রাণ ক'রে আউট হন। চা-পানের সময় বাংলার রাণ দাঁড়ায় ১৬৯ (৩ উইঃ)। এই সময়ে উইকেটে অপরাজেয় ছিলেন পঙ্কজ রায় (৭৬) এবং শ্যামসুন্দর মিত্র (৫)। দলের ১৭৫ রাণের মাথায় পঙ্কজ রায় নিজস্ব ৮১ রাণ ক'রে নাদকার্ণীর বলে এল-বি-ডব্লিউ হয়ে আউট হ'ন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ২৫৫ মিনিট খেলে ১৪টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল স্কোর বোর্ডে বাংলার রাণ দাঁড়িয়েছে ২৩৪, ৫টা উইকেট- পড়ে। উইকেটে এই দিনের মত অপরাজেয় রইলেন চুণী গোস্বামী (২৪ রাণ) এবং অম্বর রায় (২ রাণ)।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের সময় বাংলার ৩০১ রাণ দাঁড়ায়, ৮টা উইকেট পড়ে। দলের ২৬০ রাণের মাথায় চুণী গোস্বামী নিজস্ব ৩৮ রাণ ক'রে আউট হ'ন। এর পর খুব তাড়াতাড়ি ৭ম ও ৮ম উইকেট পড়ে যায় দলের ২৭৮ রাণের মাথায়। লাঞ্চের পর বাংলা দল আধ ঘণ্টা খেলেছিল। এই সময়ে দলের ২১ রাণ উঠেছিল বাকি ২টো উইকেট পড়ে। বাংলা দলের প্রথম ইনিংস ৩২২ রাণের মাথায় শেষ হয়। এই রাণ তুলতে তাদের ৪৮০ মিনিট সময় লেগেছিল।

বোম্বাই দল এই দিনে তাদের প্রথম ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ২০২ রাণ তুলে দেয়। ফলে বাংলা দলের প্রথম ইনিংসের ৩২২ রাণ করতে তাদের আর মাত্র ১২০ রাণের প্রয়োজন হয়। হাতে ১০টা উইকেটই জমা থাকে। এই দিনে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং সুধাকর অধিকারী যথাক্রমে ১১৪ ও ৭৪ রাণ ক'রে নট-আউট থাকেন।
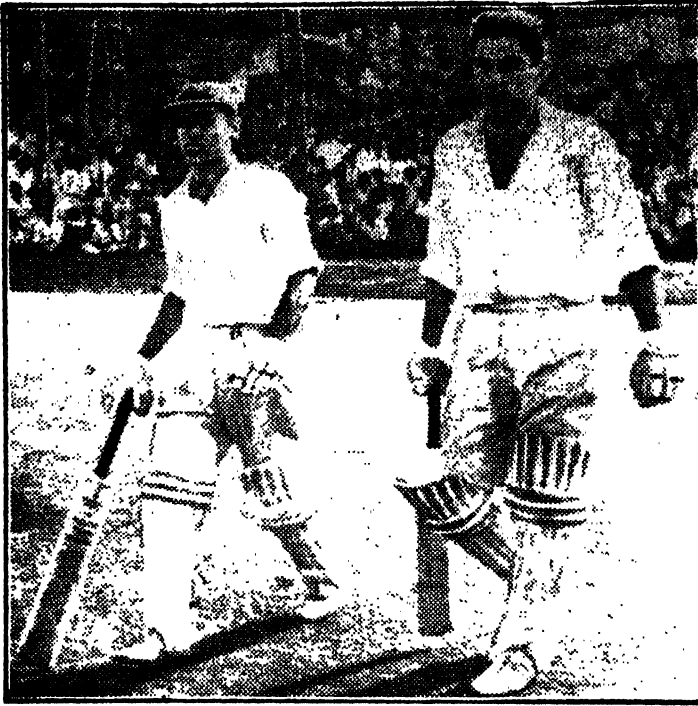
রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে বাংলাদলের বিপক্ষে বোম্বাইদলের প্রথম উইকেটের জুটি অধিকারী (বামে) এবং ইঞ্জিনীয়ার (ডানদিকে)। এই জুটিতে ২৬৯ রাণ ওঠে।

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা দলের প্রথম ইনিংসের ৩২২ রাণ এ বছরে বোম্বাই দলের বিপক্ষে এ পর্যন্ত সর্বাধিক রাণ হিসাবে গণ্য।

খেলার তৃতীয় দিনে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৫৫২ রাণের মাথায় শেষ হয়। দলের ২৬৯ রাণের মাথায় বোম্বাই দলের প্রথম উইকেট (ফারুক ইঞ্জিনীয়ার) পড়ে। ইঞ্জিনীয়ার ১৬২ রাণ করেন—বাউণ্ডারী ২১টা এবং ওভার-বাউণ্ডারী ১টা। প্রথম উইকেটের জুটিতে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার এবং সুধাকর অধিকারী অল্পের জন্যে রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রাণ (২৭৩ রাণ) ভাংগতে পারেননি। ১ম উইকেট জুটির রেকর্ড ২৭৩ রাণ করেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিপক্ষে উত্তর ভারত দলের নাজার মহম্মদ এবং জগদীশ লাল ১৯৪১ সালের খেলায়। লাঞ্চের সময় বোম্বাই দলের রাণ ছিল ৩২৩, ৩টে উইকেট পড়ে। বাংলা দলের প্রথম ইনিংসের রাণের থেকে তারা তখন এক রাণে অগ্রগামী হয়েছে। উইকেটে খেলছিলেন সুধাকর অধিকারী (১২৩ রাণ) এবং অজিত ওয়াদেকার (১ রাণ)। দলের ৩৩৩ রাণের মাথায় অধিকারী নিজস্ব ১৩৩ রাণ ক'রে অনিল ভট্টাচার্যের বলে বোল্ড আউট হ'ন। ২৯০ মিনিট খেলে তিনি ১৭টা বাউণ্ডারী করেছিলেন।

চা-পানের সময় বোম্বাই দলের রাণ দাঁড়ায় ৪৬৯, ৭টা উইকেট পড়ে। উইকেটে খেলছিলেন রামচাঁদ (৭৪ রাণ) এবং চার্লি স্টেয়ার্স (২৩ রাণ)। দলের ৫২০ রাণের মাথায় রামচাঁদ তাঁর নিজস্ব ১০৭ রাণ ক'রে রাণ আউট হ'ন। খেলা ভাংগার দশ মিনিট আগে বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংস ৫২২ রাণের মাথায় শেষ হয়। বোম্বাই দলের আরও দু'জন খেলোয়াড় রাণ আউট হ'ন—চার্লি স্টেয়ার্স (৫৩ রাণ) এবং বালু গুপ্তে (৭ রাণ)। এই দিনে বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে নি। বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যায় বাংলার থেকে ২৩০ রাণে অগ্রগামী হয়। বোম্বাই দলের তিনজন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন—ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (১৬২ রাণ), সুধাকর অধিকারী (১৩৩ রাণ) এবং জি এস রামচাঁদ (১০৭ রাণ)।

রামচাঁদ এবং স্টেয়ার্সের ৮ম উইকেটের জুটি উইকেটে যেন আগুন ছুটিয়ে দেন। তাঁদের জুটিতে দলের ১১৮ রাণ যোগ হয়। রামচাঁদের ১০৭ রাণ ওঠে ১৫৫ মিনিটের খেলায়। তাঁর রাণে ছিল ১২টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার-বাউণ্ডারী।

বাংলা দলের ফিল্ডিং খুবই খা[রাপ] হয়। একাধিক ক্যাচ লুফতে না পা[রায়] বোম্বাই সহজেই বিপুল রাণ তু[লতে] সক্ষম হয়।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ [দিনে] বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংস [...] রাণে শেষ হ'লে বোম্বাই এক ই[নিংস] ও ৩১ রাণে জয়লাভ করে। [বাংলা] দলের দ্বিতীয় ইনিংস চা-প[ানের] বিরতির সাত মিনিট আগে শেষ [হয়।] বাংলা দলের শেষ তিনজন খেলোয়[াড়কে] বালু গুপ্তে তাঁর এগার বলে [আউট] করেন মাত্র ২ রাণ দিয়ে।

দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা [দলের] পংকজ রায় (৩৭), চুণী গো[স্বামী] (৬৫) এবং অম্বর রায়ের (৩৭) [রাণ] উল্লেখযোগ্য। গোস্বামী ১২৯ [মিনিট] খেলে নিজস্ব ৬৫ রাণ [করেন;] বাউণ্ডারী করেন ৭টা। ৬ষ্ঠ [উই]কেটের জুটিতে চুণী গোস্বামী [এবং] অম্বর রায় দলের ৮০ রাণ তুলে[ন।] সকাল দিকের খেলায় দেশাই তিন [ওভারের] বলে ১৭টা রাণ দিয়ে ৩টে উইকেট [পান।] বাংলা দল এ আঘাত সহ্য [করতে] পারেনি।

সেমি ফাইনাল

দিল্লী : ২০৪ রাণ (ওয়াটসন ৫০[;] জি যোশী ৬৩ রাণে ৪ উইকে[ট])

ও ১৪৬ রাণ (জ্ঞানেশ্বর ৪২। [...] ৫১ রাণে ৫ এবং রাজ সিং ৫[...] ৪ উইকেট)

রাজস্থান : ২২০ র[াণ] (কিষণ ১০২, মঞ্জরেকার ৪৯। [...] ৭৫ রাণে ৪ এবং সীতারাম ৫[...] ৪ উইকেট)

ও ১৩৩ রাণ (৫ উইকেটে। (ম[ঞ্জরেকার] নট-আউট ৪১। সীতারাম ৩[...] ৪ উইকেট)

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযো[গিতার] সেমি-ফাইনালে রাজস্থান ৫ [উইকেটে] দিল্লীকে পরাজিত ক'রে [ফাইনালে] উঠেছে। চার দিনের খেলাটি শেষ [পর্যন্ত] দু' দিনের খেলাতে দাঁড়ায়। বৃষ্টি[র জন্য] দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে খেলা [আরম্ভ] করাই সম্ভব হয়নি। প্রথম দি[নে দিল্লী] দলের প্রথম ইনিংস ২০৪ রাণে [শেষ হয়।] এইদিনে রাজস্থান ৪টে উইকে[টে] ১৫৩ রাণ করে। উইকেটে অ[পরাজিত] থাকেন কিষণ রুংটা (৭৭ র[াণ] ও বিজয় মঞ্জরেকার (৩৯ রাণ)। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে রাজস্থা[ন দলের প্রথম] ইনিংস ২২০ রাণে শেষ হ'লে [১৬] রাণে অগ্রগামী হয়। রুংটা [ও] মঞ্জরেকারের ৫ম উইকেটের [জুটিতে] দলের ১২৫ রাণ ওঠে। রুংটা দি[...] দৃঢ়তার সঙ্গে পিটিয়ে খেলে[ন।]

)২ রাণ) করেন—১৩টা বাউন্ডারী একটা ওভার-বাউন্ডারী। দিল্লীর ীয় ইনিংস ১৪৬ রাণে শেষ হয় ঘণ্টার খেলায়। জয়লাভের জন্যে ১ রাণ তুলতে রাজস্থান ১১৫ মিনিট হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ম্ভ করে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট থেকে পাঁচ মিনিট আগে রাজস্থান ইকেট খুইয়ে ১৩৩ রাণ তুলে ৫ কটে জয়লাভ করে।

ংল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট

জিল্যাণ্ড ঃ ১৯৪ রাণ (বব্ ব্লেয়ার নট আউট ৬৪ রাণ। ট্রুম্যান ৪৬ রাণে ৪ এবং নাইট ৩২ রাণে ৩ উইকেট পান)।

১৮৭ রাণ (শেলেলি ৬৫ এবং ডিক নট আউট ৩৮ রাণ। টিটমাস ৫০ ৪ এবং ব্যারিংটন ৩২ রাণে ৩ উইকেট পান)।

ণ্ড ঃ ৪২৮ রাণ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড : কাউড্রে ১২৮ নট আউট ব্যারিংটন ৭৬ এবং এ্যালান স্মিথ ৬৯ নট আউট। ব্লেয়ার ৮২ রাণে ২, ক্যামেরন ৯৮ রাণে ২ এবং মরিসন ১২৯ রাণে ২ উইকেট পান)।

দিন (১লা মার্চ): নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৯৪ রাণে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় একটা উইকেট পড়ে ৭৪ রাণ। ইনিংওয়ার্থ (৪৩ রাণ) এবং ব্যারিংটন (২৯ রাণ) নট আউট থাকেন।

য় দিন (২রা মার্চ) ঃ ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৪১০ রাণ দাঁড়ায় ৮টা উইকেট পড়ে। কাউড্রে (১১৯ রাণ) এবং এ্যালান স্মিথ (৬৬ রাণ) নট আউট থাকেন।

দিন (৪ঠা মার্চ) ঃ ইংল্যাণ্ড ৪২৮ রাণের মাথায় (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৭ রাণে শেষ হয়।

ইংল্যাণ্ড - নিউজিল্যাণ্ডের একাদশ ক্রিকেট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ৪৭ জয়লাভ করে। চার দিনের টেস্ট তৃতীয় দিনেই শেষ হয়।

নিউজিল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দলের ৭৪ রাণের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। শেষের চারজন খেলোয়াড় ১২০ রাণ যোগ করে। ১০ম উইকেটের জুটিতে বব ব্লেয়ার (৬৪ নট আউট) এবং ক্যামেরন (১২ রাণ) ৫০ মিনিটের খেলায় দলের ৪৪ রাণ যোগ করেন। বব ব্লেয়ারের বর্তমান বয়স ত্রিশ। চার বছর পরে তাঁকে টেস্ট খেলায় দলে স্থান দেওয়া হ'ল। ব্লেয়ার নিজস্ব ৬৪ রাণ ক'রে শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান। ব্লেয়ার ১১০ মিনিট খেলে ৮টা বাউণ্ডারী করেন।

নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক জন রীড প্রথম টেস্টের উভয় ইনিংসেই দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে রাখতে পারেন নি—'গোল্লা' ক'রে বিদায় নিয়েছিলেন।

আহত থাকায় ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রেডী ট্রুম্যান প্রথম টেস্টে দলভুক্ত হননি। দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রথম ইনিংসে ট্রুম্যান ৪৬ রাণে ৪টে উইকেট পান। খেলার এক সময়ে তাঁর পরিসংখ্যান ছিল ২৪ রাণে ৪টে উইকেট। তাঁর বলে দুটো 'ক্যাচ' এই দিনে পড়ে যায়। তা না হলে এই দিনেই ট্রুম্যান ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-রেকর্ডের সমান উইকেট (২৪২টি উইকেট) পাওয়ার গৌরব লাভ করতেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনায় বিপর্যয় ঘটে যায়। দলের রাণ শূন্য, ব্লেয়ারের বলে রেভারেণ্ড ডেভিড শেফার্ড বোল্ড হ'ন। খেলা ভাঙ্গার সময় ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় ৭৪, ১টা উইকেট পড়ে।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয় দলের ১২৫ রাণের মাথায়। নিউজিল্যাণ্ডের প্রারম্ভিক বোলার ব্রুস মরিসন তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ইংল্যাণ্ডের ১২৫ রাণের মাথায় তাঁর তিনটে বলে ডেক্সটার এবং পারফিটকে আউট করেন। এই বিপর্যয়ের মুখে পঞ্চম উইকেটের জুটি ব্যারিংটন (৭৬) এবং বেরী নাইট দলের ৪৮ রাণ যোগ করেন। এর পর ৭ম উইকেটের জুটিতে কাউড্রে এবং টিটমাস ৬১ রাণ যোগ ক'রে দলের ২৫৮ রাণ দাঁড় করান। কাউড্রে এবং এ্যালান স্মিথ ৯ম উইকেটের জুটিতে ১৪৫ রাণ যোগ ক'রে এই দিনের মত নট আউট থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে ইংল্যাণ্ডের রাণ দাঁড়ায় ৪১০, ৮টা উইকেট পড়ে।

এই দিনে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে কলিন কাউড্রে সেঞ্চুরী রাণ ক'রে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নতুন নজির সৃষ্টি করেন—তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিটি টেস্ট ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশের বিপক্ষে (অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং নিউজিল্যাণ্ড) সেঞ্চুরী রাণ করার গৌরব লাভ করলেন।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড ৪২৮ রাণের মাথায় (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিনেও কাউড্রে আর একটা বিশ্ব-রেকর্ড করলেন তাঁর ৯ম উইকেটের জুটি এ্যালান স্মিথের সঙ্গে। কলিন কাউড্রে এবং এ্যালান স্মিথ নবম উইকেটের জুটিতে ১৬৩ রাণ (অসমাপ্ত) ক'রে ৯ম উইকেট জুটির পূর্ব বিশ্ব-রেকর্ড (১৫৪ রাণ) ভঙ্গ করেন। ১৮৯৪-৯৫ সালের মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার জে ব্ল্যাকহাম এবং এস গ্রেগরী ৯ম উইকেটের জুটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিডনী মাঠে ১৫৪ রাণ ক'রে বিশ্ব-রেকর্ড করেছিলেন।

আলোচ্য খেলায় ৯ম উইকেটের জুটিতে কাউড্রে এবং স্মিথ ১৫৪ মিনিটে ১৬৩ রাণ ক'রে অপরাজেয় থেকে যান। কাউড্রে চার ঘণ্টায় তাঁর ১২৮ রাণ (অসমাপ্ত) করেন—বাউণ্ডারী মারেন ১০টা। তাঁর জুটি স্মিথ ৬৯ রাণ ক'রে নট-আউট থাকেন।

ইংল্যাণ্ডের ৪২৮ রাণের মাথায় (৮ উইকেটে) প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর দেখা গেল ইনিংস পরাজয় থেকে রেহাই পেতে নিউজিল্যাণ্ডের ২৩৪ রাণের প্রয়োজন। খেলায় মাত্র এক সময়ে মনে হয়েছিল নিউজিল্যাণ্ড এ যাত্রা ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পাবে। দলের ৩য় উইকেট পড়ে যায় ৪১ রাণের মাথায়। দলের অবস্থা খুবই শোচনীয়। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে শেলেলী (৬৫ রাণ) এবং সিনক্লেয়ার (৩৬ রাণ) দলের পতন অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখেন। ৯৮ মিনিটের খেলায়

তাদের ৮১ রাণ যোগ করতে দেখে মনে হয়েছিল নিউজিল্যাণ্ড এযাত্রা ইনিংস পরাজয় থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু দলের ১২২ রাণের মাথায় চতুর্থ উইকেটের জুটি ভেঙ্গে যায়। নিউজিল্যাণ্ড আর কোমর সোজা ক'রে দাঁড়াতে পারেনি। মাত্র ৬৫ রাণে তাদের বাকি ৬টা উইকেট পড়ে যায়। পীচ থেকে স্পিন বোলাররা যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। টিটমাস ৫০ রাণে ৪ এবং ব্যারিংটন ৩২ রাণে ৩টে উইকেট পান।

একটি অবিস্মরণীয় টেস্ট ইনিংস :

নিউজিল্যাণ্ড বনাম ইংল্যাণ্ড, ১৯৫৪-৫৫

দ্বিতীয় টেস্ট—২৫, ২৬ ও ২৮শে মার্চ

নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

সার্টক্লিফ...... ব ওয়ার্ডলি	১১
লেগাট........ ক হাটন ব টাইসন	১
পোর........... ব টাইসন	০
রীড........... ব স্ট্যাথাম	১
রেবোন... এল-বি-ডব্লিউ ব স্ট্যাথাম	৭
ম্যাকগ্রেগর... ক মে ব এ্যাপলিয়ার্ড	১
কেভ...... ক গ্রেভনী ব এ্যাপলিয়ার্ড	৫
ম্যাকগিবন...... এল-বি-ডব্লিউ ব এ্যাপলিয়ার্ড	০
কোলাকিউহন...... ক গ্রেভনী ব এ্যাপলিয়ার্ড	০
মোয়ার...... নট-আউট	০
হেস........ ব স্ট্যাথাম	০
মোট	২৬

উইকেট পতন : ১।৬, ২।৮, ৩।৯, ৪।১৪, ৫।১৪, ৬।২২, ৭।২২, ৮।২২, ৯।২৬, ১০।২৬

বোলিং

	ওঃ	মেঃ	রাণ	উইঃ
টাইসন	৭	২	১০	২
স্ট্যাথাম	৯	২	৯	৩
এ্যাপলিয়ার্ড	৫	৩	৭	৪
ওয়ার্ডলি	৫	৫	০	১

১৯৫৪-৫৫ সালে ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ৮ম টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ট স জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট ধরে। দলের ৭৬ রাণের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়। রীড (৭৩ রাণ) এবং

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৩ সালের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় বিশ্বরেকর্ডস্রষ্টা কলিন কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড)।

রেবোন (২৯ রাণ) চতুর্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৭৮ রাণ যোগ ক'রে দলের রাণ অনেকটা ভদ্রস্থ করেন। প্রথম দিনে ৮টা উইকেট পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের ১৯৮ রাণ দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২০০ রাণের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলার গোড়াপত্তন মোটেই সুবিধার হয়নি। দলের ৫৬ রাণের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে। ৩য় উইকেটের জুটিতে মে এবং কাউড্রে খুব সতর্কতার সঙ্গে দু' ঘণ্টার খেলায় দলের ৫৬ রাণ যোগ করেন। তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পরের খেলায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৪৬ রাণে শেষ হয়। তৃতীয় দিনে বেলা ৩টের সময় ইংল্যাণ্ডের থেকে মাত্র ৪৬ রাণের পিছনে থেকে নিউজিলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করে। চা-পানের বিরতির সময় নিউজিল্যাণ্ডের রাণ ছিল মাত্র ১৩, ৩টে উইকেট পড়ে। এই ১৩ রাণ উঠেছিল ৪০ মিনিটের খেলায়। নিউজিল্যাণ্ডের ১৪ রাণের মাথায় বার্টার সার্টক্লিফ তাঁর ১১ রাণ করে ওয়ার্ডলির বলে বোল্ড হ'ন। তাঁর বিদায়ের পর ইংল্যাণ্ডের আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা আর কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। দলের ২২ রাণের মাথায় এ্যাপলিয়ার্ড তাঁর এক ওভারের চারটে বলে তিনটে উইকেট পান। প্রথম ইনিংসের খেলার মতই নিউজিল্যাণ্ডের ময়ার এবারও এ্যাপলিয়ার্ডকে 'হ্যাট-ট্রিক' করার সম্মান পেতে দিলেন না। নিউজিল্যাণ্ডে দ্বিতীয় ইনিংস ২৬ রাণের মাথায় শে হ'লে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহা পুরো এক ইনিংসের খেলায় দলগ সর্বনিম্ন রাণের বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি হয় পূর্ব রেকর্ড—দক্ষিণ আফ্রিকার ৩০ রা (১৮৯৫-৯৬ সালে পোর্ট এলিজা এবং ১৯২৪ সালে বার্মিংহামে ইংল্যাণ্ডে বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা দু'বার এ ৩০ রাণ করেছিল যথাক্রমে দ্বিতীয় এ প্রথম ইনিংসের খেলায়)।

আলোচ্য খেলাতে নিউজিল্যাণ্ডে তিনজন খেলোয়াড় উভয় ইনিংসে শূ রাণ করেছিলেন। এই দ্বিতীয় টে খেলায় ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ২০ রা নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ১– খেলায় 'রাবার' পেয়েছিল।

ইংল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট ক্রিকেট

(১৯৬৩ সালের ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত)

		ইংল্যাণ্ড	**নিউজি:**
স্থান	খেলা	জয়ী	জয়ী
ইংল্যাণ্ড	১৫	৬	০
নিউজিল্যাণ্ড	১৫	৭	০
মোট :	৩০	১৩	০

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রা

ইংল্যাণ্ড : ৫৬২ (৭ উই: ডি অকল্যাণ্ড, ১৯

নিউজিল্যাণ্ড : ৪৮৯ ১৯

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন র

ইংল্যাণ্ড : ১৮১ রাণ, ক্রাইস্ট ১৯২৯

নিউজিল্যাণ্ড : ২৬ রাণ, অক ১৯৫৫

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে : ৩৩৬* ড হ্যামণ্ড, অকল্যাণ্ড, ১৯৩৩।

নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে : ২০ পি ডোনেলি, লর্ডস, ১৯৪৯।

* নট আউট।

† বিশ্বরেকর্ড। কোন দেশের এক ইনিংসের খেলায় এ রাণ হয়নি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লে কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 22nd March, 1963.
40 Naye Paise.

আরও একদফা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হইয়া গেলো। মীমাংসা এখনও সুদূর-পরাহত মনে হয় যদিও আলোচনার পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো বলেন, "আমরা চলার পথ ফিরিয়া পাইয়াছি এবং একথা আদৌ ঠিক নয় যে, কলিকাতার আলোচনায় কাজ কিছু অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য অগ্রগতি খুব বেশী হয় নাই।"

সাধারণভাবে এই বৈঠকের ফলাফল হিসাবে যাহা দেখা যায় তাহাতে বোধহয় যে কথাবার্তা আরও চলিবে এইটুকুই স্থির এবং *পঞ্চম বৈঠকের স্থান করাচী, কাল* ২১শে এপ্রিল। অর্থাৎ এই আলোচনায় *এইখানেই* ছেদ পড়ে নাই। আবার অন্য দুই প্রকার বৈঠকের কথাও এইবারের আলোচনায় আসিয়াছে। উহা আসাম ও গুজরাট-সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে যে সকল এলাকা লইয়া দুইপক্ষের মধ্যে মতবিরোধ আছে এবং পাকিস্তানীদিগের অনুপ্রবেশ সফল করাইবার জন্য "ভারত হইতে মুসলমান উচ্ছেদ" বলিয়া যে জিগীর পাকিস্তান তুলিয়াছে, এই দুই ব্যাপার লইয়া পৃথক একটি মন্ত্রী-পর্যায়ের বৈঠকের প্রস্তাব। এই প্রস্তাব পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে আসে। ভারতীয় প্রতিনিধিগণ বিরোধ-মীমাংসার কাজ যদি উহাতে অগ্রসর হয় এই ইচ্ছায় ঐ দুই প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পাকিস্তান চাহিতেছে ভারতের উপর দাবীর পর দাবী চাপাইয়া নাজেহাল করিতে এবং জগতের সম্মুখে ভারতকে অন্যায় অধিকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে। ব্রিটিশ ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এতদিন এই আলোচনায় খুব আগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং এখনও দেখাইতেছেন। আমাদের জানা প্রয়োজন যে এই নূতন পাকিস্তানী প্যাঁচের মধ্যে ঐ দুই বিদেশী দপ্তরের কোন নেপথ্য ভূমিকা আছে কিনা।

এই নূতন বিষয়ের অবতারণা সম্পর্কে ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে এই জাতীয় আলোচনা সম্পর্কে অনুরোধ আমাদের তরফ হইতে করা হয় রাওয়ালপিন্ডির বৈঠকে ও তখন পাকিস্তান উহাতে কর্ণপাতও করে নাই। আজ কাশ্মীরের ১৩০০০ বর্গমাইল চীনকে নিবেদন করার ফলে এ্যাংলো-মার্কিন জগতে পাকিস্তানের মান কিছু "খেলো" হওয়ার ফলে এই প্যাঁচ খেলিয়া ভারতকে বিপাকে ফেলার বুদ্ধি কি পাকিস্তানের মাথায় নিজে নিজেই আসিয়াছে, না ইহার মধ্যে অন্য কাহারও ইশারা-ইঙ্গিত আছে আমাদের জানা প্রয়োজন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত প্রোফেসার গলব্রেথ এবিষয়ে সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা চাহেন *শুধু এই বিরোধের শেষ সোজাসুজি ও প্রত্যক্ষ আলোচনায় হইয়া যায়।* মীমাংসার ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু সহায়করূপে ধর্তব্য এবং উহা গৌণ মাত্র। এই আলোচনায় কোনও পক্ষের উপর প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টা বা ইচ্ছা যে মার্কিন সরকারের নাই তাহা প্রোফেসার গলব্রেথ প্রায় পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন।

ব্রিটেন আমাদের এই বিপদের সময় বন্ধুভাবে সাহায্য করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের উপর কোনও দোষারোপ করার আমাদের ইচ্ছা নাই। কিন্তু যাঁহারা ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের মতিগতি জানেন এবং ঐ দলের রাষ্ট্রনীতিবিদ-গণের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন যে, পররাষ্ট্রনীতির শতরঞ্জ খেলায় ঐ কূটনীতি-বিদগণের চাল যে কোনমুখে কি উদ্দেশ্যে চালিত হয় তাহা বুঝা সহজ নয়। সুতরাং এই দ্বিতীয় মন্ত্রী-পর্যায়ের বৈঠকে ভারত-পাক বিরোধ-মীমাংসার আলোচনায়, আমাদের বিপাকে ফেলার ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কূটনীতির কোনও প্রভাব বা পরোক্ষ সমর্থন আছে কিনা আমাদের জানা প্রয়োজন।

এখনও ঐ অন্য বৈঠকের সময় কাল পাত্র ইত্যাদির সবিশেষ বিবরণ কিছু প্রকাশিত হয় নাই। তবে উহা আমাদের বিপাকে ফেলার আর একটি ব্যবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঙ্কিল

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

নির্জন নক্ষত্র নেই যাকে ডেকে ভাবব তোমাকে।
হৃদয়ের রন্ধ্র পাকে-পাকে
কাজ, আবর্জনা।
সময় দেয় না তুলে একটি নির্মল স্বচ্ছ কণা
যেখানে তোমাকে পাওয়া যায়!
আমি এক পঙ্কিল হাওয়ায়
রোজ রুদ্ধশ্বাস।
একটু আকাশ নেই তোমার আভাস
ফুটবে যেখানে।
একটু সুরভি নেই ঘ্রাণে
যা দিয়ে তোমার দেহ করব নির্মাণ।
মন নষ্ট ছবি, ভ্রষ্ট গান॥

রণাঙ্গনে

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রি নামে। হিংস্র এক প্রাচীন স্তব্ধতা
ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে. অতর্কিতে শত্রু দেয় হানা
যোজনবিস্তৃত ম্লান অন্ধকারে রক্ষা করি আপন সীমানা
নিদ্রাহীন দুই চক্ষু জ্বলে ওঠে তীব্র খরশান ঃ
দস্যুর ধাতব অস্ত্রে লুপ্ত হবে রাষ্ট্রীয় সভ্যতা?

তাঁবুগুলি অন্ধকারে সমাধিস্থ। পার্বত্য বৃষ্টির সঙ্গী হিম
অশ্বগুলি নিদ্রাতুর, বার্চবনে পাতা ঝরে বিশ্রামবিহীন,
সাহসী সৈন্যের চক্ষে ভেসে ওঠে স্বদেশের ঘরখানি, স্বজন
সংসার
প্রবীণতা এনে দেয় সুমহান মৌল নীরবতা।

অক্লান্ত কর্তব্যে ভাবে আমার পবিত্রবন্ধু সেইসব তরুণ
সেনানী ঃ
হয়তো কাল ভোরবেলা আরো হিংস্র আক্রমণ হবে।

উজ্জ্বলতা ঝরে গেলে

রাম বসু

ঝরে গেল আভরণ উজ্জ্বলতা সব
তা হলে এই ত মুখ!
এ মুখ তোমার?
তার কোন সাজ-সজ্জা নেই
একদিন হীরা হবে তুমিও অঙ্গার
আমি কোন পরিণতি পাব?

কখন কখন ক্লান্ত পক্ষীরাজে রাজপুত্র হয়
ঝর্ণা খোলা তলোয়ার, রূপকথা মেঘের মুকুট
সেগুলি ভেঙে গেলে নির্জনতা মুকুলিত গাছ
দুটি চোখ অন্ধ হলে মুক্ত হয় দৃশ্যের তোরণ।

ঘৃণা অভিশাপে আঁকা আমাদের মানচিত্র এই
শুধু পাখি দুঃসাহসী গলা সাধে রোদ-পিঠ করে
পর্বত নদীর নিচে এক আদি আগুনের স্রোত
অবিরল বহমান সৃজনে বিনাশে
কালের অস্থির হাতে এ পৃথিবী খেলার কন্দুক।

আমি তাই চিরকাল বিজ্ঞতার পাশে
রাখি এক চিত্রিত মুখোস
পারিজাত মল্লিকার সজ্জিত বাগানে
নির্ভয়ে স্থাপন করি নির্বাক করোটি
বিবর্ণ ভিক্ষুক থাকে সম্রাটের বুকের কোটরে।

দহনের প্রাচীন ভাস্কর্য: আমি তার পাদমূলে বসে
চারিদিকে কৃষ্ণ-মণি অশ্রুরাজি, অনতি কথন
নষ্ট ফল, ভ্রষ্ট নদী, আতিশয্য কয়েকটি পালক
এই আদি উপাদান আমাকে দিয়েছ।
তাই দিয়ে আমি বুনি যাদু-যবনিকা
যার অন্তরালে সব দুঃখ দীপ্ত হয়ে যায়, আমি
তাইত ভোরের বেলা মৃত তারা দেখে
বিষণ্ণ হই না আর বিপন্ন হই না।

জৈর্মিন

কথায় বলে, 'গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল।' কিন্তু কেন-যে একথা বলা হয়, চিন্তা করে তার কোনো খেই পাইনি।

কারণ, ভেবে দেখুন, গাঁয়ে যদি না-ই মানে তো কোনো একজন লোক মোড়ল হবে কী করে? মোড়ল কথাটির সঙ্গেই অনুচ্চারিত রয়ে গেছে অন্য কতকগুলি মানুষের আনুগত্য। যে ব্যক্তিকে কেউই প্রধান বলে স্বীকার করে না মোড়লী তার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সংসারে কোনো জিনিসই চিরন্তন নয়। পরিবর্তমান এ বিশ্বের সবই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। কাজেই যাকে মোড়ল বলে মানা হয় এবং যাকে মানা হয় না, তারা দুজনেই পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে এই স্রোতের টানেই যদি একজনের নৌকা বানচাল হয়ে যায় আর অন্যজন পৌঁছে যায় বন্দরে, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

এর দ্বারা বোঝা যাবে, মোড়লী একটা সংগ্রামের ব্যাপার। অনেক হিসাব-নিকাশ করে, প্যাঁচ কষে, অনেক সাধ্য-সাধনার পর অর্জন করতে হয় সে পদাধিকার। প্রথম দিকে এই প্রতিযোগিতায় যে বিরুদ্ধতা দেখা দেবে, সে তো জানা কথাই।

অতএব, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' কথাটা যতো হাস্যকরই শোনাক, কোমর বেঁধে 'আপনি মোড়ল' সেজে না বসলে যে কোনোদিনই 'গাঁয়ে মানার' ভরসা থাকে না। এও অত্যন্ত খাঁটি কথা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোড়ল-পদ-লিপ্সুদের প্রথম গুণ যা দরকার তা হল নির্লজ্জতা। বিনয় বা কুণ্ঠা এসব হল মোড়লীর জন্মশত্রু। মুখের পেশীগুলোকে একটুও কুণ্ঠিত হতে না দিয়ে, বেশ মোলায়েমভাবে অন্যের ওপর খবরদারী চালাতে না পারলে মোড়লীর আশায় ঢ্যাঁরা দিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এক-একজন লোক যেন মোড়লীর জন্যেই অবতীর্ণ হয় সংসারে। তারা অন্যের ওপর হুকুম চালায়, যখন-তখন উপদেশ দেয়। সকলেই টের পেতে থাকে, লোকটা আছে—বেশ জবল-জ্যান্ত রকম আছে। রাস্তায় ষাঁড় দেখলে যে রকম পাশ কাটিয়ে যায় লোকে, এদেরও সেই রকম এড়িয়ে চলে।

কিন্তু ষাঁড় নেহাতই চতুষ্পদ জীব। তার যাতায়াতের চৌহদ্দি রাস্তার মধ্যেই

সীমাবন্ধ। মোড়ল স্বিপদ। অতএব স্বচ্ছন্দ-বিহারী। বাড়ী থেকে বাজার, শোভাযাত্রা থেকে শোকযাত্রা—সর্বত্রই একে দেখা যাবে পাশে-পাশে। এবং কালক্রমে নিতান্ত তিতিবিরক্ত হয়েই যদি লোকে এর আধিপত্য মেনে নেয়, তাহলেই এর শ্রম সার্থক।

মোড়লীর আরম্ভটা যতো নিরীহই হোক, পরিণতি এই পূর্ণগ্রাসে। প্রথমে অল্প-স্বল্প লেহন করে, শেষ পর্যন্ত শিকারকে ময়ালসাপের মতো পুরোপুরি উদরস্থ না-করা পর্যন্ত মোড়লী-ক্ষুধার শান্তি নেই কিছুতে।

শুরু হয় উপদেশ থেকে। যত্র-তত্র যে কোনো বিষয়ে উপদেশ। মাঝে-সাঝে তালভঙ্গও ঘটে। কিন্তু প্রকৃত মোড়লেরা তাতে দমে যায় না।

যেমন ধরুন, আমাদের হ-বাবু কথিত এই গল্পটা।

হ-বাবু পুরো-মোড়ল হতে পারেন নি। সে সাবালকত্ব অর্জনের দিকে তাঁর বোধহয় ইচ্ছেও নেই। উপদেশের বয়ঃসন্ধিতেই আটকে আছেন চিরকাল। একবার তিনি শুনলেন চ-বাবুর ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে। অমনি তিনি চ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নাদির পর উপদেশ দিতে শুরু করলেন তিনি ব্লাড-প্রেসার কমানোর বিষয়ে। শুরু হল খাদ্যাখাদ্য বিনিশ্চয় থেকে—অর্থাৎ এ অবস্থায় কোন জিনিস খাওয়া চলবে এবং কোনটা বর্জনীয়। তারপর এল তাঁর বিশ্রাম-তত্ত্ব। ঘুমটাকে বাড়িয়ে যেতে হবে ক্রমাগত। গোড়ায় ছ'সাত ঘণ্টায় শুরু করে এগারো-বারো ঘণ্টায় শেষ করতে পারলে নিশ্চিন্ত। একটানা এইভাবে উপদেশ দিয়ে চলছিলেন হ-বাবু। মাঝে-মাঝে চ-বাবু যে কী একটা কথা বলি-বলি করে বলার ফুরসুৎ পাচ্ছিলেন না সেদিকে তাঁর দৃক্‌পাতই ছিল না। অবশেষে ঘণ্টাখানেক একটানা বক্তৃতার পর যখন তিনি থামলেন, তখন চ-বাবু সবিনয়ে নিবেদন করলেন, তাঁর ব্লাড-প্রেসার এখন সেরে গেছে, বরং নেমে গেছে একটু নিচের দিকেই। শুনে হ-বাবু এমন একটা মুখভঙ্গি করলেন যা দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

আরেকবার একজন অপরিচিত যুবককে তিনি শীতকালের সন্ধ্যায় শুধু আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেড়াতে দেখে বলেছিলেন, 'ও মশাই, একটা গরম জামা গায়ে দিয়ে আসুন। ঠান্ডা লেগে যাবে!'

যুবকটি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে জবাব দিল, 'মশায়ের কি তেলের কারখানা আছে নাকি? নিজের চরকায় দিয়ে এত তেল আপনার বাড়তি থাকে কী করে?'

হ-বাবু একথার কোনো জবাব দিতে পারেন নি।

পারবেন কী করে? তিনি নেহাতই উপদেশ-দাতা, মোড়ল-পদপ্রার্থী নন। মোড়লদের চামড়া এর চেয়ে অনেক পুরু হয়। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় না তারা।

অর্থাৎ, ওপরের ঐ বিদ্রূপের হুল-বাক্যে কোনো উত্তর দিতে না পারলেও, প্রকৃত মোড়ল মুখ বুজে থাকত না। সে হয়তো বলত, 'আজ্ঞে কারখানা নেই, সঞ্চয় করি। আর তা আপনাদেরই সেবার জন্যে।' কিম্বা হয়তো বলত 'বেশী তেল আমারও নেই। কিন্তু আপনার অপচয় দেখে মনে হচ্ছে মশায় একটু অপ্রকৃতিস্থ!'

মোটকথা, অন্যকে ভড়কে দিতে হবে। তাহলেই কাজ হাসিল। আসলে এটা ব্যক্তিত্বের খেলা—বেশ জোর দিয়ে নিজেকে জাহির করলে অন্যকে তা কালক্রমে স্বীকার করে নিতেই হয়। কারণ সংসারের পনের আনা মানুষই নির্বিরোধী প্রকৃতির। দশ রকম কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তারা। মোড়লীর সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে আত্মসমর্পণ করাই তাদের পক্ষে আত্মরক্ষার সহজতম উপায়।

কিন্তু মোড়লদের তো অন্য কাজ গৌণ, মোড়লী করাই তাদের মুখ্য কাজ —অতএব উদ্যোগের লাগাম তাদের কখনো ঢিলে হয়ে পড়ে না।

সত্যি বলতে কি, বুনো ঘোড়া ধরে তাকে সওয়ারী দেওয়ার অনেক আগে থাকতেই মানুষ আবিষ্কার করেছে এই লাগাম প্রয়োগের গূঢ় রহস্য। যুগে যুগে এর চেহারা বদলেছে, কিন্তু সারবস্তু সেই একই। মধ্যযুগে এর শাসনদণ্ড ছিল ধর্ম—গোটা ইউরোপেই তার নিদর্শন মিলবে অজস্র। তারপরে এল নীতিবাদের চাবুক। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল বিতর্কে। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এই নিয়ে চর্চা করতে করতে জীবনটাই গলে বেরিয়ে গেল আঙুলের ফাঁক দিয়ে। সাহিত্যেও এসে লাগল এই বাদ-বিসম্বাদের ধুলো-ঝড়। কিন্তু আসল কথা হল, আধিপত্য। কে কার ওপর খবরদারী করবে তাই নিয়েই এত সোরগোল। নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন এখানে গৌণ।

ইদানীং সেইজন্যে আমি মোড়ল-ফোবিয়ায় ভুগছি। বৈঠকখানাতে হোক আর সাহিত্য-সভাতেই হোক, কেউ (বা কয়েকজন) যখন নিজের মতে সায় কুড়োনোর জন্যে তর্ক জুড়ে দেয়, আমি প্রমাদ গুনতে থাকি। কেননা, প্রাপ্ত-বয়স্কের গার্জেনী উভয়তই অস্বস্তিকর। এবং তা পণ্ডিত-সমাজেও যেমন, সাহিত্য-সমাজেও তেমনি।

বিশেষ করে সেই গার্জেনী যখন আসে আমাদের বহুবাঞ্ছিত স্বাধীনতার নামে, তখন 'স্বাধীনতা', 'সাহিত্য' আর 'সমাজ' এই তিনের সংজ্ঞা নিরূপণ হ'য়ে ওঠে আরো কঠিন। কারণ আমরা জানি যা প্রকৃত 'সাহিত্য' তা স্বভাবতই 'স্বাধীন' এবং 'সামাজিক'।

॥ মফস্বলের সাহিত্যিক ॥

হাল আমলের বাংলাদেশে সাহিত্যের কদর কতটুকু বেড়েছে, সেটা তর্ক-সাপেক্ষ। কিন্তু সাহিত্যিকের খাতির অনেক বেড়ে গেছে, সে বিষয়ে মতভেদ নেই। সে দিক দিয়ে কোলকাতার চেয়ে মফস্বলের লেখকেরা বেশী ভাগ্যবান। কারণটা আর্থনীতিক—ওখানে চাহিদার তুলনায় যোগান কম।

ইংরেজ আমলে জনসমাদরের শীর্ষ-স্থানে থাকতেন রাজপুরুষেরা, তারপর খেতাবধারীর দল। সভা, সম্মেলন, পুরস্কার বিতরণ, প্রদর্শনী বা দ্বারোদ্ঘাটন ইত্যাদি ব্যাপারে উচ্চাসনগুলোতে ওঁদেরই ছিল একচ্ছত্র অধিকার। স্বাধীনতার পর সরকারী উপরওয়ালাদের জলুস চলে গেছে, খেতাবের দাম নেই। তাঁরা যেখানে আসর জাঁকিয়ে বসতেন এখন সেখানে ডাক পড়ে সাহিত্যিকের। তার উপরে 'সংস্কৃতি' নামক একটি আজব বস্তুর আমদানি হয়েছে এবং দিন-দিন তার পরিধি যে-রকম বেড়ে চলেছে, কলকারখানা, হোটেল, আড়ত, মুদীর দোকান তো বটেই, গৃহস্থের হেঁসেল, গোশালাও তার আওতায় না ঢুকে ছাড়বে না। তারই নামে 'ঘাটে মাঠে বাটে' নতুন নতুন 'বার্ষিকী' এবং 'জয়ন্তীর' ভিড়। আর যেখানে সংস্কৃতি, সেইখানেই সাহিত্যিক।

'মনে পড়ল' লিখতে বসে পিছনে-ফেলে-আসা মফস্বল-জীবনের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা ভাবছি আর আপসোস হচ্ছে—নিত্য নিমন্ত্রণের স্বর্গরাজ্য ছেড়ে এই বড় শহরে মরতে এলাম কেন!

কত রকম জায়গা থেকেই না ডাক আসত!

একদিন বিকেলের দিকে আমার সরকারী বাংলোর অফিস-কামরায় ফাইল নিয়ে বসেছি। দুটি যুবক এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। ছিমছাম চেহারা; দেখেই বুঝলাম, 'সংস্কৃতি'। বসতে ইঙ্গিত করে বললাম, কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, গাঁজা-ফার্ম থেকে।

—গাঁজা ফার্ম!

আরেকজন বুঝিয়ে দিল, গাঁজা চাষের জন্যে যে সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে, শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে, সেখানকার 'অ্যানিভারসারি' অর্থাৎ বার্ষিক উৎসবে আমাকে সভাপতির আসন গ্রহণ

করতে হবে। বললাম, আপনারা বোধহয় বাড়ি ভুল করেছেন। আমি আবগারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট নই, জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তাঁর বাসাটা—

—আজ্ঞে স্যর, আমরা আপনার কাছেই এসেছি। আমাদের অনুষ্ঠানে আপনার মত একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের পদধূলি পড়লে ধন্য হবো।

বুঝলাম, ভুল আমারই। গাঁজা চাষের সঙ্গে সাহিত্য-কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।

আরেকদিন সাদর আহ্বান এল এক কুস্তির আখড়া থেকে। বাৎসরিক প্রতিযোগিতা উৎসবে পৌরোহিত্য এবং পুরস্কার বিতরণ। অনুষ্ঠানসূচীর প্রথমেই

জরাসন্ধ

কুস্তি প্রদর্শন, তারপর নাচগান আবৃত্তির ব্যবস্থাও আছে। রীতিমত 'কালচারাল ফাংশান'।

'বিশ্বশ্রী', 'ভারতশ্রী' মহাশয়েরা মাপ করবেন। ঐ ল্যাংগট-পরা জড়াজড়ি এবং উলঙ্গ পেশীনর্তনের মধ্যে শ্রী কোনখানে আমি কোনোদিন ধরতে পারিনি। ওগুলো আমার চোখকে বড় পীড়া দেয়। কিন্তু যারা সমাদর করে ডাকতে এসেছে তাদের সে-কথা বলা যায় না। কাজের অজুহাত দেখিয়ে সামান্য অনিচ্ছা প্রকাশ করতেই সামনের দিকে যে কুস্তিগিরটি ছিল, বেশ খানিকটা উদ্ধত সুরে বলে উঠল, ঠিক আছে। আপনার নাম শুনে এসেছিলাম। না যান, অন্য লোক আছে।

ঘাড়ে, গলায়, কানের পাশে একরাশ কাদা লেগে রয়েছে। অর্থাৎ আখড়া থেকে সোজা চলে এসেছে, এখনো ঠাণ্ডা হবার সময় পায়নি। দলটাকে চটাতে সাহস হল না। আপ্যায়নের সুরে বললাম, না, না; যাবো না কে বললে? আপনাদের অতবড় প্রতিষ্ঠান—এ তো আমার পক্ষে পরম গৌরবের কথা।

শহরের বাইরে গঙ্গার ধারে একটা পড়ো-মতন বাড়ির গায়ে একখানা রংচটা সাইনবোর্ড অনেক দিন চোখে পড়েছে—'সমাজ-কল্যাণ-সঙ্ঘ।' সন্ধ্যার দিকে বেড়াবার পথে কয়েকটি ট্রাউজার-পরা তরুণকে ওখানে স-চিৎকার আড্ডা দিতে দেখেছি। তর্কের বিষয়, যতটা কানে এসেছে, রাজনীতি, অর্থাৎ নেতাদের শ্রাদ্ধ। তাদেরও যে আমার উপর নজর পড়বে কে ভেবেছিল? সকালবেলা আফিসে বেরোবার মুখে সদলবলে এসে উপস্থিত। কী ব্যাপার? শ্মশানে যেতে হবে।' না; খাট নিয়ে আসেনি। শ্মশানের পাশে শববাহীদের বিশ্রামশালা তৈরী হচ্ছে। যোগাড়-যন্ত্র ওদেরই। মিউনিসিপ্যালিটিও কিছু টাকা দিয়েছে। আমাকে গিয়ে তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে।

ছেলেবেলা থেকে শ্মশানের নাম শুনলেই আমার গা ছমছম করে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের শবানুগমন এড়িয়ে গেছি। ভেবে রেখেছিলাম একবারই যাবো ওখানে। এরা দেখছি, তার আগেই টানতে চায়। বললাম, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানকে ডাক না কেন? এ সব কাজে তিনিই তো উপযুক্ত ব্যক্তি।

দলপতি উত্তর দিল, তাঁকে দিয়ে কী হবে! ভদ্দরলোক দু'লাইন বক্তৃতা করতে পারেন না। এই উপলক্ষে আপনার মত একজন সাহিত্যিকের ভাষণ শুনতে পাবো, এ কি কম লাভ?

আরেকজন বলল, তাছাড়া শুভ-কাজের সূচনাটা আপনার হাত দিয়ে হোক, এটাও আমাদের ইচ্ছা। আয়োজন একেবারে মন্দ হয়নি।

সংস্কৃতি যখন শ্মশান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, ওদের ইচ্ছা পূরণ না করবার কোনো কারণ ছিল না। তবু মনটা যেন বড় দমে গেল। চুপ করে আছি দেখে ওরা খুশী হয়ে জানতে চাইল, তাহলে কখন গাড়ি নিয়ে আসবো স্যর?

বললাম, গাড়ি লাগবে না। আর কটা বছর অপেক্ষা কর; তোমাদের কাঁধে চড়েই যাবো।

দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য
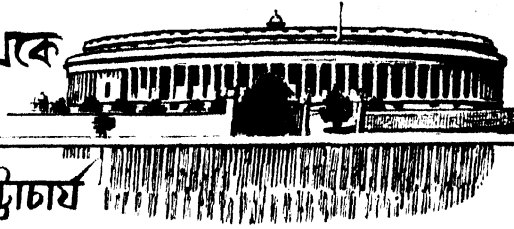
লজ্জা, ঘৃণা, ভয় থাকলে যেমন তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়, তেমনি আজকের দিনে সার্থক সাংবাদিক হওয়াও অসম্ভব। শাস্ত্র বলেছে, সত্যম্ ব্রুয়াত প্রিয়ং ব্রুয়াত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের মত সেদিনের শাস্ত্রকাররা একটা 'এ্যামেণ্ডমেণ্ট' জুড়ে বলেছেন, অপ্রিয় সত্য কখনও বলবে না। আমি কালাপাহাড় নই; তবে শাস্ত্রানুরাগীও নই। তাই শাস্ত্রের বিধান অমান্য করে কিঞ্চিৎ অপ্রিয় সত্য পরিবেশন করছি। মার্জনা করবেন।

'বন্দেমাতরম', 'জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ'—এমনি কতকগুলো বুলির সঙ্গে ভারতবাসীরা কয়েক পুরুষ ধরে পরিচিত। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিকে আগে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হতো। সমগ্র জাতির প্রেম-ভালবাসার প্রতিমূর্তি হতেন সেদিনের 'রাষ্ট্রপতি সুভাষ', 'রাষ্ট্রপতি জওহরলাল' রাষ্ট্রপতি..... । দেশ পালটেছে: কংগ্রেসও বদলেছে। কিন্তু 'প্যারা-ফার্নেলিয়া' বদলায়নি। আজও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে উট বা গরুর গাড়ীর উপর চাপিয়ে দু'চার মাইল লম্বা প্রসেশন করে নিয়ে যাওয়া হয়। আজও তিনি তাকিয়ার উপর বসে টোলের পণ্ডিতদের মত একটা ডেস্ক সামনে রেখে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন; তলব করেন জওহরলালকে বক্তৃতা দেবার জন্য এবং হুকুম করেন মোরারজীকে প্রস্তাব সমর্থনের জন্য। আবার মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজিয়ে বক্তৃতা থামিয়ে দেন অনেক নাম-করা নেতার। এইসব ঘটনা এমন 'সিরিয়াসলি' হয় যে সাধারণ লোকের তাক লেগে যায়। তাক লাগাই স্বাভাবিক এবং আমি তাদের দোষ দিই না। তবে হ্যাঁ, সত্যি কাহিনী বা প্রকৃত অবস্থা যদি জানতেন তবে আপনি না হেসে পারতেন না।

ট্যাণ্ডন-নেহরু লড়াই-এর পর জওহরলাল স্বয়ং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কথা বাদ দিন। সত্যি বলতে তারপর আর কেউ 'রিয়েল' কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হননি।...... অন্ধের রাজনীতিতে উজান বাইছিলেন চীফ মিনিস্টার সঞ্জীব রেড্ডী। হায়দ্রাবাদে আর মন টিকছিল না। দিল্লীতে এলেন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হয়ে। ভেবেছিলেন ভালই কাটবে; এ্যাফটার অল একটা অল ইণ্ডিয়া লীডার হওয়া যাবে। জওহরলাল পন্থ-শাস্ত্রী-মোরারজীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে পলিটিক্স করা যাবে—লোভটা নিতান্তই কম নয়। দিল্লীতে পৌঁছবার কদিনের মধ্যেই গিয়েছিলেন পন্থজী সন্দর্শনে। উদ্দেশ্য মহৎ, পলিসি ডিস্কাশন। 'রাষ্ট্রপতি' সঞ্জীব রেড্ডী বোধকরি আশা করেছিলেন পন্থজী স্বয়ং এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে তুলবেন। হায় অদৃষ্ট! জনতা এক্সপ্রেসের সঙ্গে ড্রইংরুমে বসতে হলো কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের। বেশীক্ষণ নয়, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই তলব পড়েছিল। মিনিট দশেকের মধ্যে পলিসি ডিস্কাশন শেষে বেরিয়ে এলেন সঞ্জীব রেড্ডী।

শুনেছি কদিনের মধ্যেই সঞ্জীব রেড্ডী তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, দিল্লীতে এসে মহা ভুল করেছি। ...আজ থেকে আবার হায়দ্রাবাদ ফিরে যাবার আশায় দিন গুনব। মন তাঁর টিকত না জন্তরমন্তরে; তাই ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াতেন সারা ভারতবর্ষ।

সঞ্জীব রেড্ডীর হায়দ্রাবাদের রিটার্ণ টিকিটের 'কনফারমেশন' জওহরলালজীর কাছ থেকে পাবার পর সে আর এক মহা সমস্যা। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আর খুঁজে পাওয়া যায় না। দু'একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টারের নাম শোনা গেল। কিন্তু তাঁরা কথাটা গায়েই লাগালেন না। পার্লামেণ্টের সেণ্ট্রাল হল আর লবীতে সে কি মুখর আলোচনা। দু'একজন এম-পি—মিনিস্টার প্রস্তাব করলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে : ওয়াণ্টেড কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। আর একটি সলুশনও সাজেস্টেড হয়েছিল : ডিফিটেড মিনিস্টার পাকড়াও করো।

এই প্রসঙ্গে কেশ-বিহীন কেশকারের নাম বহুবার শোনা গিয়েছিল।

ম্যাজিক দেখেছেন নিশ্চয়ই। মনে করে দেখুন, ম্যাজিসিয়ান দেখিয়ে দিলেন তার হাত খালি; অথচ একটা তুড়ি মারতেই হাতের মধ্যে টাকা-পয়সা এমন কি মুরগীর বাচ্চা দেখান ম্যাজিসিয়ান। জওহরলালও তেমনি; এক তুড়ি মেরে খালি হাতের মধ্যে দেখিয়ে দিলেন নতুন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। বিশ্বাস করুন প্রায় ম্যাজিসিয়ানের মতই এ কাজ করেছিলেন জওহরলাল। সপ্রু হাউসে এ-আই-সি-সি সেশন আরম্ভ হয়ে গেছে—তখনও পর্যন্ত কেউ জানেন না। পরের দিন একেবারে গলায় মালা চাপিয়ে পরিচয় করে দিলেন নতুন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে। মনে করে দেখুন অধুনাকালের বিখ্যাত ডেবর ভাই-এর বেলাতেও এমনি ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন জওহরলাল। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেওয়া হয় না; কিন্তু জওহরলালের দস্তখত-করা এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিলে অন্যায় হবে না, বরং সত্যতার স্বীকৃতি জানান হবে।

কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারীদের অবস্থা আজকাল আরও শোচনীয়। শাস্ত্রীজির বাড়ীর তাঁবুতে বসে আছি। টেলিফোন এলো : হা ভাই দিস্ ইজ কে. কে. শা; শাস্ত্রীজির সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে। পার্সোনাল এ্যাসিস্টেণ্ট নির্বিকারচিত্তে জানিয়ে দিলেন, মিনিস্টার অভি ঘর মে নেই হ্যায়; বাড়ী ফিরলে জিজ্ঞেস করে খবর দেব। শাস্ত্রীজি কিন্তু বাড়ীতেই আছেন এবং আগত লোকজনের সঙ্গে দেখাশুনাও করছেন।

দিল্লীর বাইরে এঁদের অন্য চেহারা। কখনও কেরালা ভাঙেন আর কখনও বা মিলিটারী স্ট্র্যাটেজি নিয়ে গৌহাটিতে জোর প্রেস কনফারেন্স করেন! জন্তর-মন্তরে বসে টেনসিল পেপারে লোহার কলম দিয়ে দস্তখত করা ছাড়া আপাততঃ এঁদের কোন কাজ নেই বোধহয়।

শ্রীমন নারায়ণই বোধহয় শেষ বুদ্ধিমান কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারী। আগরওয়াল উপাধি আর জেনারেল সেক্রেটারীশিপ ত্যাগ করে প্ল্যানিং কমিশনে হাজার তিনেকের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। লোকে বলে, সাদিক ভাই'এরও এমনি বাসনা ছিল; কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনে তো 'নো ভ্যাকান্সী'।

দ্বিজেন্দ্র চরিত :: আলোচনার সূত্র

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের যৌবনকাল পর্যন্ত তাঁর সমবয়সী কবি। আমাদের উজ্জ্বলতম কবি যখন বিদেশের লোভনীয় পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' ঘরে নিয়ে এলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন মৃত। তারপর থেকে তিনি বাঙালী পাঠকের স্মৃতিতে ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে আসছেন; যেমন আরো দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ধরে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছেন। এর অনেক কারণ আছে; তবে একথা নিশ্চিন্তমনে বলতে পারি, প্রতিভার কোনো অভাব থেকে এ বিস্মৃতি আসে নি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কবিতা, গান, নাটক রচনা করেছেন, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পার হয়েও একমাত্র তিনিই রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন। এখন পর্যন্ত হাসির গান রচনায় তিনি বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট। সাহিত্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মত প্রতিযোগিতা মাত্র আর একজন ব্যক্তি করতে পেরেছিলেন, তিনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের ভাব, ভাষা, এমন কি কাহিনীর নির্বাচনেও দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের অনুসারী ছিলেন, যদিও দুজনের দৃষ্টিকোণ ছিল পৃথক। দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির স্রষ্টা; কোথাও তাঁর রচনায় অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবার দৈন্য ছিল না। আরেক দিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই অগ্রসর ছিলেন, তা হলো, আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংগীতের সঙ্গে একাত্মবোধ। তাঁর নাটক, গান, কবিতায় বিদেশী সুরের সংমিশ্রণ থাকতো, এবং প্রথম থেকেই মাইকেলের মত তিনিও একজন বিদেশী কবি-কে গুরু বলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উইলিয়ম সেক্সপীয়র-এর প্রতি তাঁর আসক্তি ও শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যের বিশ্লেষণে নানারূপ বিরুদ্ধ মত শোনা যায়। জনৈক কবি-বন্ধু তাঁর জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তর্ক তুলেছিলেন এই বলে যে তিনি বড় বেশী জাতীয়তাবাদী, এবং তাঁর গানও এই অর্থে সংকীর্ণ। জন্মভূমিকে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সকল দেশের সেরা' বলেছেন; এখানেই এই শতাব্দীর তরুণ কবির আপত্তি। অথচ জাতীয়তা-বোধ দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনে পরিমিত-কাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকলেও, তাতে সংকীর্ণতা সত্যিই ছিল না। "যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চাইতে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে, জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক।"[১] — এ কথা তাঁরই লেখা। এবং এমন সময়ে লেখা যখন বাংলাদেশে জাতীয়তার বান ডাকছে, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঐ তরঙ্গে নিজেকে অনেকদূর ভাসিয়ে দিয়েছেন।

জাতীয় গানের প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও এ সময়ে মনে রাখা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলাল, সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরও আগে, স্বরচিত গানে ইউরোপীয় সুরের মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। সংকীর্ণ বলে নিন্দিত তাঁর 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' গানের যে সুর তার উৎস খুঁজতে হলে আমাদের বাংলা দেশ ছাড়িয়ে সুদূরে জার্মানীতে যেতে হয়। এটা ঠিক কট্টর জাতীয়তাবাদের লক্ষণ নয়।

জনৈক অধ্যাপক বন্ধুর বিশ্লেষণ আরেক রকম, এবং সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসঙ্গ উঠতেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন : দ্বিজেন্দ্রলাল কেষ্টনগর কালচারের মানুষ, তাঁর পেছনের যা ট্র্যাডিশন তা হলো গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র ও কবিয়ালদের। কথাটা দুদিক থেকে প্রতিবাদ করার মত। প্রথমত, কৃষ্ণনগরের কালচার তাচ্ছিল্যের নয়, অন্তত ভারতচন্দ্র থেকে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত এই কালচার-এর যতটুকু আমাদের চোখে পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভারতচন্দ্রের কালচার-এই লালিত, এ কথাটাও ঠিক নয়। ভারতচন্দ্রের সাহিত্য পুরোপুরিই ক্লাসিক; তাঁর পরিহাসও সকল রকম তিক্ততা, অস্থিরতা, অসহায়তা-র বোধ থেকে পৃথক ছিল। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যে গভীর অবতরণ করলে আমরা একই বিশুদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তা এবং তীক্ষ্ণ সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় পাই। দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যিক হিসেবে ছিলেন অস্থির, তাঁর পরিহাসে (অথবা উপহাসে) ছিল তিক্ততা; এবং সমকালীন অন্য সমস্ত কবি ও কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস-এর মতই তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন ও একক। এদিক থেকে বরং মাইকেলের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে, কেননা চরিত্রের দিক থেকে এই পূর্বসূরী কবিও অনুরূপ অস্থিরতা, তিক্ততা এবং একাকিত্বের বোধে সম্পূর্ণ অসহায় ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ নাটকগুলি মাইকেল-এরই অনুসরণ, এবং তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায়

১ মেবারপতন; নাটক; ১৯০৮।
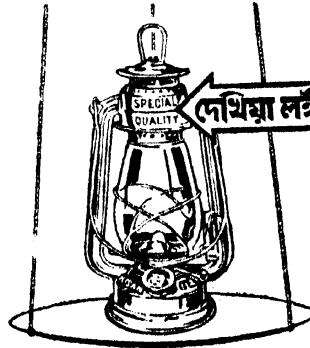
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের প্রভাব কদাপি দেখা যাবে না। নতুন কিছু করতে চাওয়াকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কবিতায় উপহাস করেছেন, অথচ সমস্ত জীবন ধরে মাইকেল ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত তিনিও নতুন কিছু করবার অস্থিরতা নিয়েই মৌলিক সাহিত্যের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁদের মত তিনিও পূর্বসূরী কোন স্বদেশীয় কবির প্রভাবই মানতে চান নি। বাংলা নাটকে সেক্সপীয়রীয় চৈতন্যের, বাংলা গানে বিদেশী সুর-তরঙ্গের, এমন কি বাঙ্গালীর জাতীয় আন্দোলনে হঠাৎ বেখাপ্পা একক বিরোধিতার ২ মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সকল সময়েই নতুন কিছু করার চেষ্টাই করে গেছেন। সমকালীন সমাজ ও সময়ের সঙ্গে আপসহীন বিরোধিতায় তিনি যেন মাইকেল-এর তুলনায়ও এক ধাপ অগ্রসর ছিলেন।

আরো তুলনা টানা যায়। মাইকেলের পৌরুষ দ্বিজেন্দ্রলালেরই উত্তরাধিকার। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করতে না জানা, নিজেকে আর দশজনের সঙ্গে মানাতে না পারা, উভয়েরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিলেত দেশ এবং বিদেশী সাহিত্যকে রক্তে নিয়েও সমকালীন ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজকে শ্লেষ ও উপহাসের দ্বারা বিদ্ধ করার স্বভাব দুজনেরই সমান ছিল। পুরাতন স্বদেশীয় সমাজের সঙ্গেও তাঁদের সমান বিরোধিতা। মাইকেল তথাপি এক জায়গায় থামতে জানতেন; বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রমুখের প্রতি সঙ্গত কারণেই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথকেও অন্যায়ভাবে আক্রমণ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হন নি। পৌরুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পেছনে অনেক-সময় যুক্তিরও কোনো বালাই থাকতো না। ভারতচন্দ্র বা পরবর্তী প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে এ ধরণের কোমর বেঁধে লড়াইয়ের কথা ভাবতেই পারা যায় না।

(২)

চারিত্রিক এই লক্ষণ অধিকাংশ সময়েই নায়কের জীবনে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে। এর যেমন ট্র্যাডিসন আছে তেমন বিয়োগান্তক পরিণতিও আছে। আমাদের সমকালেও অনুরূপ ট্র্যাডিসন কাজ করে যাচ্ছে। তার স্পন্দন আমরা দেখতে পেয়েছি মোহিতলাল এবং সজনীকান্ত দাস-এর চরিত্রে, এবং বেমানান শোনালেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র মধ্যে। একই অস্থিরতা, একই মানাতে না পারা, একই প্রচণ্ড পৌরুষ, একই পরিণাম। পরিবেশনে অনেক তারতম্য রয়েছে সন্দেহ নেই, অনেক সময় একের সাহিত্য রচনার সঙ্গে অপরের তুলনা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু যদি সৃষ্ট সাহিত্যের গভীর থেকে গভীরে অবতরণ করা যায়, এবং সেই সঙ্গে লেখকদের ব্যক্তিজীবনকেও আমরা মনে রাখি, দেখা যাবে অপরিমিত যুদ্ধোন্মাদনায়, প্রচণ্ড বাতাসের বিরুদ্ধে নিষ্ফল অসি-সঞ্চালনে এবং আত্মজীবনের পটভূমিকায় অনাবশ্যক ট্র্যাজেডীর সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্যে একটি ভিন্ন চারিত্রিক ট্র্যাডিসন এঁরাই গড়ে তুলেছেন। এই ট্র্যাডিসনের সুরু নিঃসন্দেহে মাইকেল মধুসূদন-এর এবং চরম পরিণতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর, জীবন ও সাহিত্য।

নতুন কিছু লেখার, নতুন কিছু বলার ভূত যখন একজন কবির মাথায় ভর করে, তখন আমরা অনেক কিছুই আশা করতে পারি, কিন্তু একটু ভীত হওয়াও দরকার। দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবে বাংলাদেশ প্রথমে ভীত হয় নি, চমকিত হয়েছিল। বিলেত থেকে ফিরে এসে তিনি সমাজে একঘরে হলেন, প্রতিবাদে লিখলেন 'এক ঘরে' নক্শা। বই পড়ে স্বর্ণকুমারী দেবী অভিনন্দন জানালেন, প্রাচীনপন্থীরা ক্ষেপে উঠলেও, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকেরা কবিকে সমর্থন দিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালকে নিয়ে ভীত হবার পালা এলো তাঁর পরবর্তী রচনাতেই। বইটিতে (কল্কি অবতার) তিনি বিলেতফেরতদের ব্যঙ্গ করলেন এমন ভাষায় যা সকল দিক থেকেই শিষ্টাচার বহির্ভূত। এই রচনাতেই তিনি আমেরিকায় বক্তৃতারত স্বামী বিবেকানন্দ-কে আক্রমণ করলেন। একই নতুনত্বের তাড়নায় কিনা জানি না, বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই তিনি নিজেকে পারিপার্শ্বিক বিদ্বজ্জনদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করে এবং অহেতুক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্যায়-যুদ্ধ ঘোষণা করে।

অথচ, তিনি যে খুব ভেবেচিন্তে এ-সব কাজ করতেন, তা-ও নয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে চরম বিরোধিতার মুহূর্তেই যখন আন্দোলন-মিছিল তাঁর বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছালো, তিনি তখনই অস্থির হয়ে উঠলেন। "একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং সে-গানে যোগদান করিলেন, এবং ঊর্ধ্ববাহু হইয়া, মেঘমন্দ্রবৎ, মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বরতলে ভাবরোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন।"৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ঘোষণার কারণটি একেবারেই তুচ্ছ। অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের অশ্লীলতা। সেক্সপীয়র-পড়া দ্বিজেন্দ্রলাল হঠাৎ চিত্তের সমস্ত স্থিরতা হারিয়ে ফেললেন। কার জন্য? —না, বাংলা সাহিত্যের শ্লীলতা রক্ষার জন্য!

(৩)

এ ধরণের অস্থিরতার দুটি দোষ। প্রথমত এতে করে কোনো কবি গভীর থেকে গভীরতর চৈতন্যালোকে পৌঁছাতে বাধা পান, এবং দ্বিতীয় দোষ, এই অস্থিরতার মাত্রাধিক্য হলে, তা কবি বা সাহিত্যিকের আত্মহত্যার সামিল হয়,—সমাজ এবং সময় কেউ তাকে আর সহৃদয় দৃষ্টিতে দেখে না। সাহিত্যের রচনায় সমস্ত সময় ধরে যদি দ্বিজেন্দ্রলাল অপরের কথায় ও কাজে আরেকটু কম সময় দিতেন, এবং যদি তিনি স্থিরচিত্তে নিজেকে ধ্যানমগ্ন করতে পারতেন, তাহলে জন্মের মাত্র একশ বছর পরে বাঙালী পাঠক তাঁকে অন্যভাবে স্মরণ করতো। রবীন্দ্রনাথের মত না হোক, রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি সাহিত্যিকের সম্মান তাঁর পাওনা ছিল।

কেননা, মাইকেল-এর তিরোভাবের পর এবং পরবর্তী প্রধান কবির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত, একমাত্র তিনিই রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী কবি, নাট্যকার, সঙ্গীত রচয়িতা। সমবয়সী এই কারণে নয় যে তাঁরা একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সমবয়সী এই কারণে যে তাঁরা প্রায় সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন, এবং যতদিন বেঁচেছিলেন, অপরিমিত যৌবন নিয়েই বেঁচেছিলেন। সমবয়সী ছিলেন পৌরুষ, মনুষ্যত্ববোধ ও কবিত্ব-শক্তির বিচারে।৪ মাত্র এক জায়গায়

২ বঙ্গদেশকে উপলক্ষ্য করে বাঙালীর স্বাদেশিকতা যে আন্দোলনের রূপ নিল, তার আদর্শগত দিকটার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন বিরোধ ছিল না; তবে বাঙালী সেদিন চরম বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল তাঁর বঙ্গভঙ্গের প্রতি আন্তরিক সমর্থন। একদিকে সমগ্র দেশ, আর একদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি মনে করতেন, বঙ্গ বিভাগের ফলে আসামী আর বিহারীদের সঙ্গে বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতিগত যে মিলন সাধিত হবে, তাতে বাংলার মঙ্গল, বাঙালীর শক্তি বৃদ্ধি।

—স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য (পৃ ২৭২) সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩ দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়-চৌধুরী, পৃ ৩৯৮।

৪ তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তার জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সবল হতে হবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর দেশপ্রীতির চরম বাণী এই যে 'আবার তোরা মানুষ হ'।

—প্রমথ চৌধুরী; সবুজ পত্র, আষাঢ়, ১৩২০।

দ্বিজেন্দ্রলাল হেরেছিলেন; সহ্যশক্তিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমান ছিলেন না। ভাগ্যের বিরুদ্ধতাও ছিল। বিলেত থেকে ফিরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-ও, কিন্তু তাঁকে একঘরে হতে হয় নি। তেমনি তাঁকে সহ্য করতে হয়নি চাকরি-জীবনের গ্লানি, হতাশা, নিষ্পেষণ! এই পার্থক্য একজনকে সহস্রবর্ষের, অপরজনকে তুলনায় অনেক কম সময়ের পরমায়ু দিয়েছে।

কিন্তু তবু, ঠিক এই সময়ের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলালকে ভুলতে চেষ্টা করা বাঙালী পাঠকের কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব-কাল পর্যন্তও যাঁর নাটক এবং সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং সঙ্গীতের তুলনায়ও দশজনের কাছে বেশী প্রিয় ছিল, হঠাৎ তাঁর প্রতি আমরা যেন আর কোনো আকর্ষণই অনুভব করছি না। হাসির গানের প্রসঙ্গ এমন দিনে তোলা বৃথা—কেননা, আমাদের চরিত্রে আর যত দোষ-গুণই থাকুক না, 'হো হো' করে হাসতে পারা আজ আমাদের কোনো চারিত্রিক লক্ষণ নয়। বরং ঐ ধরণের হাসিকে আজ আমরা ভয় করতে শিখেছি, পাগলামোর লক্ষণ বলে। এমন কি, সুকুমার রায়-এর 'আবোল তাবোল' পড়ে এ যুগে আমাদের হাসি আসে না, বরং চারদিকের বৈসাদৃশ্য জেনে আমরা আতঙ্কিত হই। কিন্তু তবু, দ্বিজেন্দ্র-লালের গান, তাঁর নাটক, তাঁর কবিতা এখনই আমরা ভুলে যেতে পারি না। বিশেষ করে একথা ভুলে যাওয়ার নয় যে, বাংলা কবিতায় একদিন তিনিই আশ্চর্য কথকতার সুর এনেছিলেন, যেমন বাংলা গদ্যে এনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যে ভাষায় গদ্য ও কবিতা লেখার জন্য একাদন প্রমথ চৌধুরীকে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের কাছে দরবার করতে হয়েছে; দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আর্যগাথা, মন্দ্র, আলেখ্য-র বিভিন্ন কবিতায় সে ভাষাকে নিয়ে যেন খেলা করেছেন :

আমি দেখেছি যেন দূরে, দূরত্বে
অস্পষ্ট একটা আলোকিত স্থান।
যেখানে সৌন্দর্য উৎস উঠছে ও
ঝঙ্কৃত হচ্ছে অবিশ্রান্ত গান।
পড়ছি মনে মনে একটা
উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যৎ...

অথবা

স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত
নক্ষত্রপুঞ্জে চেয়ে দেখি দূরে
ভাবি এত মহাজ্যোতি কী মহৎ উদ্দেশে
ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে ঘুরে?
কোথা সীমা পরিব্যাপ্তির? কী স্বচ্ছ,
কী স্তব্ধ আকাশ,
কী গাঢ়! কী কালো!
আচ্ছা—ঐ যে মহাশূন্যের
কতখানি অন্ধকার?—আর
কতখানি আলো।

(সত্যযুগ : আলেখ্য)

এ ধরণের কবিতা আজকের দিনেও যে কবি লিখবেন, তিনি পাঠকের হৃদয় জয় করবেন। তবু, আধুনিক কবি তার হৃদয় দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে অন্যত্র ফিরি-য়েছে। এর কারণ তাঁর রচনার অক্ষমতা নয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট। বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরোধ মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও বাঙালী কবিতার পাঠক মনে রেখেছে। তাঁকে এখনও অতীতের দেনা শুধতে হচ্ছে।

কিন্তু আমরা, কবিতার পাঠকের কাছে, আরেক রকম বিচারের আশা করবো। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যের পুনর্বিচার, অথবা তাঁকে আরো গভীরভাবে জেনে তবেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যের বিচার। দ্বিজেন্দ্রলালের চারিত্রিক লক্ষণগুলি যদি আমরা একবার অনুধাবন করতে পারি, এবং সেই সঙ্গে মাইকেল থেকে সুধীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একই ট্র্যাডি-সনের কবিদের যদি আমরা হৃদয়ে নিতে পারি, তা হলে তাঁকে ভালবাসবার, জ্যেষ্ঠ সহোদর ভেবে অপরিমিত শ্রদ্ধা করবার, আর কোনো বাধা থাকে না।

এবং একমাত্র অনুরূপ আব-হাওয়াতেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর নাটক, কবিতা, গান, জীবনী—সবকিছুই আমা-দের কাছে মূল্যবান মনে হতে পারে। তখনই আমরা বুঝতে পারবো, প্রচণ্ড পৌরুষ এবং সংগ্রামী মনুষ্যত্ববোধ-ই তাঁর সাহিত্যজীবনে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল। এবং একথা বুঝতে পেরে তাঁকে আমরা সেভাবে শ্রদ্ধা করবো, বাংলা-দেশের কাছে এবং বাঙালী পাঠকের কাছে যা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। দেনা যা ছিল তা এতদিন ধরে তিনি শোধ করেছেন।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগে উত্তর প্রত্যাশায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টি পাঠালাম—

১। প্রভাতফেরী কথাটি কোন্ ভাষার? উহার প্রকৃত অর্থ কি? কে উহা প্রথম প্রচলন করেন?

২। 'মার্কিন' বলিলে কি বুঝায়? দেশ, ভাষা, জাতি বা থানকাপড় বিশেষ? কথাটির উদ্ভব এবং প্রচলন কোথায়?

৩। ল্যাটিন আমেরিকা পৃথিবীর কোন্ অংশকে বলা হয়? উহার অন্তর্গত কি কি দেশ আছে? ইহার সহিত 'ল্যাটিন' ভাষার কোন সম্পর্ক আছে কিনা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ
দেবগ্রাম,
নদীয়া।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন—

অমৃতের দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় খণ্ডে 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীরণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'মাতাপিতাহীন' 'মাতাপিতৃহীন' ও 'পিতৃমাতৃহীন' বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিতেছি—

বাংলায় 'যাহার মাতা ও পিতা জীবিত নাই' এই অর্থে 'মাতাপিতাহীন' বলিলে কোনও দোষ হয় না, বিশেষতঃ যদি উহা চলতি বাংলা হয়। তবে যেহেতু বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারী প্রয়োগ অনেকেই করিয়া থাকেন, অতএব 'মাতাপিতৃহীন' শব্দও প্রযুক্ত হয়। মাতা এবং পিতা যাহার নাই, এই অর্থে সংস্কৃত ভাষায় 'মাতাপিতৃহীন' শব্দই হয়। মাতার গৌরবাধিক্য হেতু ঐ শব্দের 'পূর্ব-নিপাত' (শব্দের প্রথমেই প্রয়োগ) হয়। সংস্কৃতে প্রকৃত শব্দ 'মাতৃ' ও 'পিতৃ' (মাতা-পিতা বিভক্তান্ত পদ) এবং মাতৃ শব্দের ঋ স্থানে আকার হয়। সংস্কৃত ভাষাতেও কখন কখন পিতৃ শব্দের পূর্বনিপাত দৃষ্ট হয়। যিনি পিতার অভ্যর্হিতত্ব অধিক মনে করেন, তিনি পিতৃ শব্দের প্রয়োগ আদিতে করিবেন, এই বিষয়ে ব্যাকরণ অপেক্ষা লৌকিক-দৃষ্টিই প্রবলতর।

তবে সংস্কৃত ভাষাতেও 'মাতৃপিতৃহীন' শব্দ সিদ্ধ হয়—উহার অর্থ হইবে 'যাহার মাতার পিতা জীবিত নাই।' সেইরূপ 'পিতৃমাতৃহীন' শব্দের অর্থ হইবে—যাহার পিতার মাতা = (পিতামহী) জীবিত নাই। আমাদের মনে হয় যে 'পিতৃহীন' (যাহার পিতা নাই), 'মাতৃহীন' শব্দ দেখিয়া কেহ 'পিতৃমাতৃহীন' ও 'মাতৃপিতৃহীন' শব্দদ্বয়ের কল্পনা করিয়াছেন। এই কল্পনা সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। 'পিতা ও মাতা যাহার নাই' এই অর্থের পূর্বভাগে যে দ্বন্দ্ব
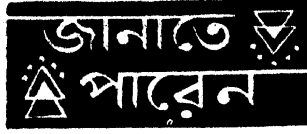
সমাস হইবে, উহাতে 'পিতামাতৃহীন'-ই হইবে: তদ্রূপ 'মাতাপিতৃহীন'ই সাধু হইবে। চলতি বাংলায় 'পিতামাতাহীন' এবং 'মাতাপিতাহীন' লেখাই অধিকতর উপাদেয়।।

শ্রীরামশংকর ভট্টাচার্য, ব্যাকরণাচার্য
৩।১৫১-এ, শিবালা, বারানসী

সবিনয় নিবেদন,—

১১ই জানুয়ারী ৩৬শ সংখ্যা অমৃতে শ্রীরণজিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর ঃ

আমরা যাহার মা ও বাবা জীবিত নাই তাহাকে 'মাতাপিতাহীন' বলি, কিন্তু ব্যাকরণ অনুসারে শব্দটি মাতাপিতৃহীন হওয়া উচিত।

পিতৃমাতৃহীন শব্দটির অর্থ পিতার মাতা অর্থাৎ পিতামহী যাহার নাই। কিন্তু এটিও যাহার মা ও বাবা নাই এই অর্থে বহুল প্রচলিত।

মাতৃপিতৃহীন মানে—যাহার মাতামহ জীবিত নাই। যাহার মা ও বাবা নাই এই অর্থে এই শব্দটির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীশান্তি ঠাকুর
পোঃ ঘাটশিলা, সিংভূম

সবিনয় নিবেদন,

২১শে ডিসেম্বর "অমৃত" সাপ্তাহিকে "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রকাশিত শ্রীকনক বাগচী মহাশয়ের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম।

(১) পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছাড়া পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশেই বাঙালী বসবাসকারীর সংখ্যা সর্বাধিক। বিহারে প্রায় ১৮ লক্ষ বাঙালীর বাস।

(২) আয়তন অনুসারে পৃথিবীর মধ্যে "মনাকো"র লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী। এর আয়তন মাত্র ৩৭০ একর, কিন্তু লোকসংখ্যা প্রায় ২২ হাজার অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৩৮ হাজার লোকের বাস।

(৩) আমার মনে হয় কলিকাতা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে ঃ
 (ক) কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর আধিক্যে,
 (খ) বিক্ষোভ মিছিলে এবং
 (গ) ট্রাম-বাস-ট্রেনে যাত্রীদের ভিড়ের দিক দিয়ে।

(৪) আমার মনে হয় জাতি হিসাবে "ইহুদী" জাতির মধ্যেই একতার পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। যদিও এ সম্বন্ধে আমার হাতে কোন সঠিক তথ্যপ্রমাণ নেই।

(৫) সিটি কলেজ—কলিকাতা।

(৬) "হিন্দু"—ইংরেজি দৈনিক, মাদ্রাজ হতে প্রকাশিত। এর বিক্রী-সংখ্যা দৈনিক গড়ে এক লক্ষ।

মৃণাল ঘোষ
পশ্চিম কংগ্রেসপাড়া,
জলপাইগুড়ি।

সবিনয় নিবেদন,

গত ১লা ফেব্রুয়ারীর 'অমৃতে' বিতান দত্ত যে প্রশ্ন করেছেন তার তিন নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, ভারতে—কলিকাতা, বর্ধমান, কল্যাণী, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, পাটনা, আসাম, দিল্লী, বোম্বাই ও হায়দরাবাদে এবং ভারতের বাইরে শিকাগো, মস্কো, ক্যালিফোর্ণিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বপন বসু
৪৫এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কোলকাতা—৯।

সবিনয় নিবেদন,

২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চ নং প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—বিধানসভায় যিনি দলের নেতৃত্ব করেন অর্থাৎ যাঁর দ্বারা নিজ নিজ রাজনৈতিক দল পরিচালিত হয় তাঁকে হুইপ বলে। হুইপ আর একটি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বিধানসভায় কোন জরুরী বিল উত্থাপনের সময় ভোট নেওয়া হয়। সেই ভোট গ্রহণের জন্য সভ্যদের কল্ করা হয়। এই কল্‌কেও হুইপ বলে। ঞ নং প্রশ্নের উত্তর—বাংলা মঙ্গলকাব্যের উপর লেখা আশুতোষ ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, কালিদাস রায় প্রভৃতির গ্রন্থ তথ্যমূলক ও গবেষণাভিত্তিক। এঁদের মধ্যে অনেকে সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যেও মঙ্গল-কাব্যের আলোচনা করেছেন। ঝ নং এর উত্তর—বাংলা ভাষার প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে উৎকর্ষের বিচারে নিম্নলিখিতগুলির নামকরা যেতে পারে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, বাণভট্টের কাদম্বরী অনুবাদ করেন তারাশংকর তর্করত্ন। কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌরাণিক অনুবাদের মধ্যে 'রঘুনাথ গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ডলি ভট্টাচার্য
ষ্টেশন রোড, জলপাইগুড়ি।

শ্বপ্রস্তু

বনফুল

একাঙ্ক-নাটক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ শিক্ষক। এখন আমাদের কর্তব্য কি?
অসম্ভব যদি সম্ভবই হয়ে থাকে,
সত্যিই যদি আবির্ভাব ঘটে থাকে দেবতার
আমরা কি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব?
অভ্যর্থনা করব না?
পূজা করব না?
আমি যাই ফুল নিয়ে আসি কিছু।
অর্ঘ্য নিয়ে আসি,
কাছে যেতে না পারি
দূর থেকে অঞ্জলি দেব।
তোমার জন্যেও আনব কিছু?

পঞ্চম শিক্ষক। এনো।
কিন্তু আমার অঞ্জলি আমি আগেই দিয়েছি।
প্রাণের অঞ্জলি
আকুলতার অঞ্জলি
পাপের অঞ্জলি,
এখন শুধু অপেক্ষা করছি।

চতুর্থ শিক্ষক। কিসের অপেক্ষা

পঞ্চম শিক্ষক। প্রায়শ্চিত্তের।

চতুর্থ শিক্ষক। মনে হচ্ছে খুব বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। চল পূজার ব্যবস্থা করি গিয়ে। অন্তত কিছু ফুল নিয়ে আসি চল। মেয়েরা এসে শাঁখ বাজাক। চল, তোমাকে এখানে একা রেখে যাব না। এস

[চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষক চলে গেলেন। মাধবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে টংকনাথ প্রবেশ করলেন]

টংকনাথ। তুমি কথাটা মন্দ বলনি। মন্দির কি ক'রে এল, মন্দিরের ভিতর কে আছে, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই

মাধব। কিচ্ছু লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আপনি জায়গাটা ভাল ক'রে ঘিরিয়ে ফেলুন। এখুনি খবরটা চাউর হ'য়ে যাবে। তখন দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করবে। সবাই যেতে চাইবে মন্দিরের কাছে। আপনি ওই রাস্তার দিকে অন্তত দুটো গেট করিয়ে দিন আর লোক বসিয়ে দিন তাতে। বেশী নয়, এক টাকা ক'রে মাথাপিছু টিকিট। দেখবেন, বেশ কিছু রোজকার হ'য়ে যাবে।

টংকনাথ। ঠিক বলেছ। মন্দির নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চল তাহলে আর দেরি করা ঠিক নয়। আমার নতুন বাড়িটা যেখানে হচ্ছে সেখানে আজ কাজ বন্ধ থাক। তারা এসে জায়গাটা ভাল ক'রে ঘিরুক

মাধব। আজ্ঞে হ্যাঁ চলুন। থানাতেও একটা খবর দিতে হবে। কারণ এসব ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য দরকার হবে। চলুন যাবার সময় ব'লে দিয়ে যাই, থানা তো মাঠের ওপারেই

টংকনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল, চল

[টংকনাথ ও মাধব চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল রাম, শ্যাম ও যদু]

রাম। মন্দির তো এখনও খাড়া রয়েছে দেখছি। এতো এক আচ্ছা আপদ হল। এই মাঠেই আমাদের ইলেকশন মীটিংটা করব ভেবেছিলাম। কি ক'রে হবে বল দেখি

শ্যাম। মন্দিরের ওপারে অনেক জায়গা আছে

যদু। তাতো আছে। কিন্তু এই মন্দিরের সামনে জগদীশবাবুর মীটিং কি জমবে। শুধু মন্দির থাকলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু ওর ভিতর থেকে বিবেকানন্দের বাণী বেরুলে তোমার রোগা বক্তা বিনু দাসের ক্ষীণ কন্ঠ যে চাপা পড়ে যাবে। তোমাদের মীটিং এখানে জমবে না। অন্য মাঠে যাও। তুমি জগদীশবাবুর দলে জুটলে কি ক'রে!

রাম। [হাসিয়া] শ্যামও জুটেছে। এখান থেকে ফিরেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কেন জুটেছি? (টাকা বাজাবার মুদ্রা দেখিয়ে) অনেক টাকা ঢালছে ওরা। ফাঁকতালে কিছু কামিয়ে নেওয়া যাক

যদু। শেষকালে জগদীশবাবুর দলে ভিড়লে! ও লোকটা যে কত বড় স্কাউনড্রেল তা জান?

রাম। তাতো জানবার দরকার নেই। আমাদের সমস্যা এই (পেট বাজিয়ে দেখাল)—এ সমস্যাটা উনি সমাধান করতে পারবেন কিনা সেইটেই জানবার ছিল। তা জেনেছি

শ্যাম। এই পোড়া পেটের জন্য কি না করছি বল। জুতো খাচ্ছি, লাথি খাচ্ছি, সেলাম করছি, পা চাটছি, মাতৃভাষা ত্যাগ ক'রে হিন্দী শিখছি। যেন তেন প্রকারেণ কিছু টাকা চাই

যদু। টাকা পেয়েছ?

রাম। পেয়েছি

শ্যাম। বহুত। ডেলি দশ টাকা ক'রে। বহুদিন পেট ভ'রে খেতে পাইনি ভাই। দু'দিন পেট ভ'রে ভালোমন্দ খেয়েনি

শ্যাম। সুতরাং আমরা এখন রাতকে দিন করব, কুৎসিতকে সুন্দর বলব, জগদীশবাবুকে বলব পরম পূজনীয় দেশপ্রাণ নিষ্কলঙ্ক মহাত্মা

শ্যাম। বহুদিন বেকার ব'সে আছি। তাঁর সুনজরে পড়লে, চাইকি একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে। আমাকে উনি promiseই করেছেন।

রাম। ওসব promise-এর কোন মূল্য নেই। নগদ যা পাওয়া যায় তাই লাভ

যদু। কি করতে হবে তোমাদের?

শ্যাম। মীটিং অর্গানাইজ করতে হবে। ভলান্টিয়ার জোগাড় করতে হবে। শুনেছি সিঙাড়াওলা মীটিং ভেঙে দেবার জন্যে গুন্ডা ভাড়া করেছে। পুলিশে খবর দিয়েছি আমরা

যদু। পুলিশ কিছু করবে না। তারা সিঙাড়াওলার কোন কাজে বাধা দেবে না

শ্যাম। তুমি কি ক'রে জানলে

যদু। আমি সিঙাড়াওলার দলে যে। শহরের সব ট্রাক আর রিকশা ভাড়া ক'রে ফেলেছি আমরা। ট্রাকে ট্রাকে আমাদের চলন্ত মীটিং হবে। আর রিকশাগুলোতে থাকবে লাউড-স্পীকার। ওই যে পুলিশ এসে গেল

[একজন পুলিশ অফিসার কয়েক-জন কনেস্টবল নিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনজনেই খুব ঝুঁকে সেলাম করল]

রাম। আমরা স্যর ভেবেছি এই মাঠটাতে মীটিং করব। কিন্তু হঠাৎ এই মন্দিরটা কোথা থেকে গজিয়ে গেল বুঝতে পারছি না। শুধু মন্দির নয়, ওর ভিতর একজন লোক ব'সে বিবেকানন্দের বাণী আওড়াচ্ছে।

পুলিশ অফিসার। এ মাঠে আপনারা মীটিং করতে পারবেন না। টংক-নাথবাবুর নায়েব মাধববাবু এখনি থানায় গিয়েছিলেন। এ মাঠ টংক-নাথবাবুর সম্পত্তি। মাধববাবু বললেন, এ মন্দির তিনিই তুলেছেন স্বামীজির শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে। স্বামীজির ভক্তরা এখানে এসে পূজো দেবেন। মীটিংয়ের হামলা এখানে চলবে না। আপনারা অন্য মাঠে যান।

শ্যাম। শহরে সব মাঠ যে অকুপায়েড স্যর, দুটি তো মোটে মাঠ। একটি দখল করেছেন নিরঞ্জনবাবু আর একটি রঘুবাবু। আমরা ভেবেছিলাম এখানেই।

পুলিশ অফিসার। এখানে হবে না। এ মাঠ টংকনাথবাবুর, তিনি এখানে মন্দির তুলে পুজোর ব্যবস্থা কর-ছেন. এখানে মীটিং হবে কি করে। আপনারা অন্য ব্যবস্থা করুন [কনেস্টবলদের দিকে চেয়ে] তোমরা এখানেই মোতায়েন থাক, দেখো কেউ যেন এখানে হামলা না করে। আমি চললাম। নমস্কার।

[কনেস্টবলদের নিয়ে চলে গেলেন]

যদু। [সহসা উল্লসিত] হুররে হুররে হুররে। তোমরা মীটিং করতে পারবে না। জয় সিঙাড়াওলার জয়, জয় সিঙাড়াওলার জয় [হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল] একটি সৎ পরামর্শ দিচ্ছি, শুনবে?

রাম। কি বল।

যদু। পিয়ারী টকিতে খুব ভাল একটা ফিল্‌ম এসেছে, সেইটি দেখ গিয়ে। হিরোইনের কি চেহারা মাইরি, কি অভিনয়, কি নাচ। বসন্তবালার ওইটেই 'হিট' বই। আর কি অদ্ভুত গান, এখনও কানে বাজছে।

[গানের এককলি গেয়ে শুনিয়ে দিলে]

অঙ্গে নীলাম্বর, বুকের উপর
রঙীন কাঁচুলি বাঁধা
ডাগর গাগরী কাঁখেতে লইয়া
ঘাটেতে চলেছে রাধা
জল উছলি পড়ে
গাগরীতে জল ধরে না ধরে না
উছলি পড়ে।

আর তার সঙ্গে কি খোল-করতাল বাজিয়েছে, সুপার্ব চমৎকার—

[মন্দিরের ভিতর উদাত্ত ধ্বনি আবার জেগে উঠল]

উদাত্ত ধ্বনি। খোল-করতাল বাজিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করেই দেশটা উৎসন্ন গেল। একে তো পেটরোগার দল, অত লাফালে ঝাঁপালে সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চসাধনার অনুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সারা দেশে কেবল খোল-করতালই বাজছে। ঢাক-ঢোল কি দেশে তৈরি হয় না? তুরী-ভেরী কি ভারতে মেলে না? ওই সব গুরুগম্ভীর আওয়াজ সবাইকে শোনা। ছেলেবেলা থেকে মেয়ে-মানুষি বাজনা শুনে শুনে দেশটা যে মেয়েদের দেশ হ'য়ে গেল। রাজনীতি ভাল, নাট্যচর্চাও ভাল। কিন্তু আগে মানুষ হ, তবে তো ও সব মানাবে। বলিষ্ঠ অঙ্গেই অলঙ্কার শোভা পায়। তোরা যে তলিয়ে যাচ্ছিস, ধাপে ধাপে নরকে নেবে যাচ্ছিস যে। এখন থেকে সাবধান না হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি। আগে সুস্থ হ, সবল হ, মানুষের মত মানুষ হ—তারপর ওসব করিস, তারপর ওসব সহ্য করতে পারবি।

[রাম, শ্যাম, যদু তিনজনেই চমকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল মন্দিরের দিকে]

যদু। বাপ্‌স্‌। কথাগুলো যেন ছররার মত গায়ে এসে লাগল। কে বসে আছে বল দেখি ওখানে। লোকটা বলে ভাল।

রাম। যে থাকে থাক আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। এইটুকু শুধু বলতে পারি it is something uncanny. হরিটা মন্দিরের কাছাকাছি গিয়েছিল, তারপর থেকে কেমন যেন ভম্ হয়ে গেছে।

শ্যাম। না, না আমরা ওর ভিতর যাচ্ছি না। আগে আমাদের মীটিংটা খাড়া করতে হবে। টাউনের ভিতর না পারি টাউনের বাইরে যাব। সেখানে প্রচুর ফাঁকা মাঠ আছে।

যদু। কিন্তু সেখানে লোক জুটবে না। নেহরু এলে জুটত। বিনু দাসের মিন্‌মিনে বক্তৃতা শুনতে কেউ যাবে না সেখানে। আমরা কিন্তু ট্রাক আর লাউডস্পীকার নিয়ে সর্বত্র যাব।

রাম। [দূরের দিকে চেয়ে] ওহে হরি আসছে। কাঁধে ঝোলা কেন। চল একটু আড়ালে দাঁড়াই। দেখা যাক কি করে। আমাদের দেখলে হয়তো অন্যদিকে চলে যাবে।

[তিনজনেই আড়ালে চলে গেল। শুধু গায়ে, শুধু পায়ে কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে হরি প্রবেশ করল। ঝোলা থেকে যে জিনিস বেরিয়েছিল তাতে মনে হ'ল ওটা মুচিদের ঝোলা। হরি কোন দিকে না চেয়ে মন্দিরের সামনে হাঁটুগেড়ে হাত জোড় করে বলল]

হরি। হে প্রভু, তোমার কথায় আজ আমার ভুল ভেঙেছে। আমি লেখা-পড়া শিখে কুলকর্ম ত্যাগ করে কেরানী হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বুঝি মস্ত কিছু হয়েছি। আজ তোমার বাণী শুনে আমার সে ভুল ভাঙল। ঠিক করলাম আর চাকরি করব না, মুচির কাজই করব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। সংসারের

দুঃখ-কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর—

হে চন্দ্রচূড়, মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরিশ, গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত-ভয়-সূদন মামনাথং
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ

[প্রণাম করে উঠে গেল। পরক্ষণেই হা-হা-হা- করে হাসতে হাসতে প্রবেশ করল রাম, শ্যাম, যদু। কিন্তু মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর বজ্রমন্দ্রে ধ্বনিত হয়ে থামিয়ে দিলে তাদের হাসি।]

উদাত্ত কণ্ঠ। তোমরা আর্যবাবুগণের যত জাঁকই কর না কেন, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা দশ হাজার বছরের মমি। তোমরা চলমান শ্মশান। তোমাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন দেখলে বোধহয় যেন ঠানদির মুখে গল্প শুনছি, তোমরা যেন চিত্রশালিকার ছবি! এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা — ভারতের উচ্চবর্ণেরা। তোমরা ভূত কাল, লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব একসঙ্গে। ভূত ভারত শরীরের রক্তমাংসহীন কঙ্কালকুল তোমরা। কেন তোমরা ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? পূর্বকালের অনেক মণিমাণিক্য রত্নপেটিকা এখনও তোমরা আঁকড়ে ধরে আছ, যত শীঘ্র পার তোমাদের জীবন্ত উত্তরাধিকারীদের সেগুলি দিয়ে দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির ভিতর থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। অনেক দিনের অত্যাচারের ফলে এরা পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা, লাভ করেছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না......

[উদাত্ত কণ্ঠ নীরব হল]

রাম। পালাই চল।

শ্যাম। বেশীক্ষণ শুনলে আমরাও পাগল হয়ে যাব।

যদু। হ্যাঁ, পালাই চল।

[তিনজনেই চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক তাঁদের তিন ছেলেকে নিয়ে প্রবেশ করছেন; ছেলে তিনটি সাহেবী পোষাকে সজ্জিত]

প্রথম শিক্ষক। টংকনাথবাবু নেই দেখছি।

দ্বিতীয় শিক্ষক। যাক্। ভালই হয়েছে। দুটো মনের কথা খুলে বলা যাবে।

তৃতীয় শিক্ষক [ছেলেদের দিকে চেয়ে]। নিজেদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অনেক কষ্টে তোমাদের ছাড়িয়ে এনেছি। আজ এখানে যে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে হয়তো তাঁরই কৃপায় টংকনথবাবুর পাষাণ-প্রাণও বিগলিত হয়েছে। তোমরা ওই দেবতার কাছে প্রণাম করে শপথ গ্রহণ কর—আর পাপ কাজ করবে না।

প্রথম পুত্র। দেবতা! কই?

দ্বিতীয় শিক্ষক। ওই মন্দিরের মধ্যে।

প্রথম পুত্র [স-শ্লেষে] ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, না যম? কোন দেবতা!

তৃতীয় শিক্ষক। মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হয়েছেন। তোমরা পাপ করেছ। তাঁর আশীর্বাদ পেলে তোমরা নির্মল হবে। প্রণাম কর।

দ্বিতীয় পুত্র। পাপ? আজকাল কোন কিছুই পাপ নয়। পাপের মৃত্যু হয়েছে। এখন যে যা করে তাই ঠিক। পাপের সম্বন্ধে সেকেলে আইনগুলো এখনও আছে বলেই মাঝে মাঝে কেউ কেউ ধরা পড়ে,—তাও সবাই নয়, যাদের সুপারিশ করবার লোক আছে তাদের কিছু হয় না। আমরা যা করি তা সবাই করছে। শিক্ষক ছাত্র, শাসক শাসিত, ধনী দরিদ্র, আপামর ভদ্র সবাই চোর। আজকাল চোর মিথ্যাবাদী না হলে সমাজে টেকা যায় না। চোরের সমাজে চোর হয়েই থাকতে হয়, মিথ্যাবাদীর সমাজে সত্যবাদীর স্থান নেই।

দ্বিতীয় শিক্ষক। তর্ক কোরো না। তোমাদের ওসব তর্ক অনেকবার শুনেছি। আর শুনতে চাই না। সুযোগ পেয়েছ, প্রণাম কর। এ সুযোগ জীবনে আর আসবে না।

তৃতীয় পুত্র। কই বিবেকানন্দ? তাঁকে দেখতে তো পাচ্ছি না। দেখছি শুধু অস্পষ্ট একটা মন্দির।

দ্বিতীয় পুত্র। যদি দেখতে পেতামও, তাহলেও প্রণাম করতাম না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বামী

বিবেকানন্দ ছিলেন কায়স্থ। তাঁকে প্রণাম করবার কোন মানে হয়?

প্রথম শিক্ষক। প্রণাম করবে তাঁর মহত্ত্বকে, তাঁর সাধনাকে, তাঁর শক্তিকে, তাঁর স্বাধীন চিত্তকে, তাঁর নির্ভীক আত্মাকে, তাঁর স্বদেশ-হিতৈষণাকে। প্রণাম কর। প্রণাম করে কৃতার্থ হও।

[মন্দিরের ভিতর থেকে আবার উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। যেখানে ভক্তি নেই, শ্রদ্ধা নেই, সেখানে প্রণাম অর্থহীন। তোরা নিজেদের প্রণাম করতে শেখ, নিজেরা প্রণম্য হ। সত্যিকারের প্রণম্য লোক দেশে বড়-একটা নেই। অনেকে নিজেদের পাকা আর্য মনে করেন। তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে, কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা। ওঁদের ধারণা ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, কেবল এদেশের রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে রংটা কালো হয়ে গেছে। ইংরেজরা কিন্তু আমাদের সব এক জাত করে দিয়েছিল। রাজা-মহারাজা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ধনী দরিদ্র তাদের চক্ষে সব একজাত—নেটিভ। ও কালো রঙের মধ্যে এক আধ পোঁচ কম-বেশী তাদের নজরে পড়ে না। সব নেটিভ। ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বল। সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে গেলে লাথি ঝাঁটার চোটটা বেশী বই কম পড়বে না। কথাটা মনে রাখিস। তোরা আজকাল সবাই সাহেবী পোষাক পরে বেড়াস, কিন্তু মনে রাখিস তাদের চোখে তোরা কালা আদমি—নেটিভ। আর শাস্ত্রের চোখে তোরা ব্রাত্য, পতিত ব্রাহ্মণ। যতদিন ছুঁচোর গোলাম চামচিকে হয়ে থাকবি ততদিন এ সব কথা মাথায় ঢুকবে না, কেবল কিচির-মিচির করবি। আগে নিজেদের শোধন কর।

প্রথম পুত্র। বাবাঃ এ যে ম্যাজিক দেখছি।

দ্বিতীয় পুত্র। ভেন্‌ট্রিকিউলিজ্‌ম্‌। কে করছে বল তো।

তৃতীয় পুত্র। ও সব বুর্জোয়া ননসেন্স অনেক শুনেছি, ও সবে আর আস্থা নেই [নিজের বাবাকে] আপনি বাজে ব্যাপারে আর সময় নষ্ট করবেন না। টাকার জোগাড় করুন। ওরা মকোর্দমা করবেই।

প্রথম শিক্ষক। সে ব্যবস্থা করেছি। টংকনাথবাবু ধার দেবেন। কিন্তু এত বড় একটা আবির্ভাব তোমাদের হৃদয়-স্পর্শ করছে না এ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।

দ্বিতীয় শিক্ষক। লজ্জিতও হয়েছি।

তৃতীয় শিক্ষক। [স-ক্ষোভে] হে ভগবান।

প্রথম পুত্র। যখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুদ্ধি কম ছিল, তখন এই সব ম্যাজিক দেখে আশ্চর্য হ'য়ে যেতুম। এখন আর হই না। মানব জাতির ইতিহাসে দেখা যায় ধর্মের আদি পর্বে ধর্ম ম্যাজিক ছিল। এখনও তাই আছে। বাইরের ঢংটা বদলেছে কেবল। আমাদের ম্যাজিকে বিশ্বাস নেই। আমরা জানি ধর্মের ম্যাজিক দেখিয়ে একদল চতুর লোক চিরকাল বোকা মূর্খ লোক-দের ঠকাচ্ছে। আমরা নাস্তিক, আমরা ও সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন ধর্ম বা ঈশ্বর নয়, সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন বাঁচতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচতে হবে।

দ্বিতীয় পুত্র। ওহে, আমরা যখন ছাড়া পেয়ে গেছি তখন চল না ক্লাবে যাই। আজ আমাদের প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হবে।

প্রথম পুত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ চল। টংকনাথ-বাবুর সঙ্গে দেখা হলে খুশী হতুম। তিনি আমাদের হিতৈষী।

তৃতীয় পুত্র। তাঁকে আমাদের হয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন [হাতঘড়ি দেখে] ওহে, যাবে যদি চল, আর সময় নেই।

প্রথম পুত্র। হ্যাঁ চল।

[তিনজনই চলে গেল]

প্রথম শিক্ষক। এই ছেলের বাপ আমি! মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

দ্বিতীয় শিক্ষক। সত্যি! এরাই দেশের ভবিষ্যৎ।

তৃতীয় শিক্ষক। [মন্দিরের দিকে ফিরে নতজানু হ'য়ে] ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো এই অভাগাদের।

[মন্দিরের ভিতর আবার উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হল]

উদাত্ত কণ্ঠ। সত্যের সন্ধানে আমিও একদিন নাস্তিক্যের মরুভূমিতে দিশাহারা হয়েছিলাম। তারপর ঠাকুর দয়া করলেন, সত্যকে সূর্যের মত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনের উপর যে মায়ার আবরণ ছিল তা সরে গেল দেখতে পেলাম সিংহকে। ওরাও পাবে। আত্মদর্শন করতেই হবে প্রত্যেককে। ওরা এখন দিশা-হারা হয়ে অরণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যথাসময়ে সিংহের দেখা পাবে। পাবেই। যাদের মন সবল সতেজ যুক্তিবাদী তারাই সত্যকে দেখতে পায়, তাদের উপরই আমার আশা বেশী, কিন্তু যারা সব কথাতেই সায় দিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কেবল জি হুজুর জি হুজুর করছে তারা অপদার্থ। তাদের পক্ষে সত্যের নাগাল পাওয়া শক্ত। ওরা তেজী ছেলে, ওরা পারবে।

[কণ্ঠ নীরব হল। মাধব এক দল কুলি সঙ্গে করে প্রবেশ করল। তাদের হাতে খন্তা কাটারি, দড়ি প্রভৃতি রয়েছে]

মাধব। দু' গাড়ি বাঁশ এখুনি এসে পড়বে। তোমরা এই মাঠটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেল। খুব মজবুত বেড়া হওয়া চাই। মন্দিরের ওপার থেকে আগে শুরু কর গিয়ে, তার-পর এধারে এস। দুধারে দুটো গেট হবে। তোমরা খুঁড়তে শুরু কর, আমি আসছি।

[কুলির দল চলে গেল]

মাধব। [শিক্ষকদের] আপনাদের ছেলেরা তো ছাড়া পেয়ে গেছে দেখলাম। টংকনাথবাবুর চিঠিতে কাজ হয়েছে তাহলে। হবে না? কত বড় লোক! বিনিময়ে কিন্তু আপনাদেরও একটা কাজ করতে হবে। আমরা তিনটে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছি, তাতে লাউডস্পীকার থাকবে। আপনারা প্রত্যেকে এক একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। চারিদিকে প্রচার করে দিন স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দিরে আবির্ভূত হয়েছেন। যাঁরা তাঁর বাণী শুনতে চান তাঁরা যেন এই মাঠে এসে কিউ দিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ান এবং একে একে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেন। মাথাপিছু মাত্র এক টাকা করে প্রণামী দিতে হবে। দুটো গেট থাকবে, একটা পুরুষদের, আর একটা মেয়েদের। যান, আপনারা চলে যান।

প্রথম শিক্ষক। সেটা কি শোভন হবে?

মাধব। যখন টংকনাথবাবুর পায়ে ধরে-ছিলেন তখন কি সেটা শোভন হয়েছিল?

দ্বিতীয় শিক্ষক। যেতে আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু বিবেকানন্দের বাণী শোনবার জন্যে টাকা দিতে হবে এইটে লাউডস্পীকারে চেঁচিয়ে বলাটা কি উচিত?

মাধব। সব মন্দিরেই প্রণামী দিতে হয়। এটা তো চিরকালের রেওয়াজ। এতে অনুচিতটা কোথায় দেখলেন।

তৃতীয় শিক্ষক। কিন্তু এ মন্দির সাধারণ মন্দির নয়, এই অদ্ভুতপূর্ব আবির্ভাবকে আপনারা ব্যবসার সামগ্রী করবেন?

মাধব। করলে ক্ষতি কি। মালিকের তাই ইচ্ছে। মালিকের এ-ও ইচ্ছে যে, আপনারা তিনজনই গাড়ি করে এইটে প্রচার করুন। আপনারা শিক্ষক, আপনাদের মুখ থেকে এ কথা শুনলে লোকে বেশী বিশ্বাস করবে, দলে দলে আসবে।

প্রথম শিক্ষক। কিন্তু—

দ্বিতীয় শিক্ষক। মানে—

তৃতীয় শিক্ষক। আমি—

[তিনজনেই ইতস্তত করতে লাগলেন]

মাধব। দেখুন, আপনাদের একটা সাফ কথা বলে দিতে চাই। টংকনাথ-বাবুর এ অনুরোধটি যদি না রাখেন তাহলে আপনাদের ছেলেদের আবার পুলিশে ধরবে, তাদের চাকরি তো থাকবেই না, জেলও হয়ে যাবে। তখন কিন্তু তাঁর কোন সাহায্য আর পাবেন না আপনারা।

প্রথম শিক্ষক। না, না, আমরা বলছিলাম—

মাধব। কিছু বলবেন না, সোজা চলে যান।

দ্বিতীয় শিক্ষক। যাচ্ছি, যাচ্ছি, গাড়িগুলো কোথায়।

মাধব। মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে। চলুন আপনাদের গাড়িতে বসিয়ে দি—

তৃতীয় শিক্ষক। চলুন। হায় ভগবান!

[মাধবের সঙ্গে শিক্ষকরা চলে গেলেন। দূরে গান শোনা গেল—'প্রভু মীশমনীশমশেষ-গুণং—' ইত্যাদি। গান গাইতে গাইতে আলোক ও তার সম-বয়স্ক কয়েকজন কিশোর এসে প্রবেশ করল]

আলোক। দেখ, আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। মন্দির উঠেছে, তার মধ্যে স্বামীজি এসেছেন।

প্রথম কিশোর। কই স্বামীজিকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

আলোক। তাঁর দেহ তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! তবে ইচ্ছে করলে, তিনি হয়ত দেখা দিতেও পারেন। কিন্তু তাঁর বাণী অমর, সেই বাণী শোনা যাচ্ছে এখানে।

দ্বিতীয় কিশোর। কিন্তু কই কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো।

আলোক। আমি শুনেছি তোরাও শুনতে পাবি। আয় সবাই প্রার্থনা করি। আয় সবাই চোখ বুজে স্বামীজির মূর্তিটা ধ্যান করি। আয়—

[সবাই চোখ বুজে বসল। একটু পরেই স্বামীজির উদাত্ত কণ্ঠ শোনা গেল]

উদাত্ত কণ্ঠ। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ। তোরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তোরা ওঠ, তোরা জাগ, সত্যের সন্ধানে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়। দেশকে গড়তে হবে, জগতকে জাগাতে হবে। তোদের দায়িত্ব অনেক। এ দায়িত্ব বহন করতেই হবে তোদের। ভয় পেলে চলবে না। কোন কারণেই ভয় পাবি না। ভয় নেই, ভয় মিথ্যা, ভয় অলীক। তোরা সবাই নচিকেতা, তোদের প্রত্যেকের মধ্যেই সত্য-জিজ্ঞাসার আগুন জ্বলছে। সত্যকে জানবার জন্য নচিকেতা যমের, মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল। ভয় পায় নি। তোরাও তেমনি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়। তোরাও পারবি।

[উদাত্ত কণ্ঠ নীরব হল। মাধবের প্রবেশ]

মাধব। এই ছোঁড়া দল পাকিয়ে আবার এসেছে দেখছি। ফের এখানে কি করছিস তুই?

আলোক। স্বামীজির পুজো করছি। আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে, আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি, আমি ধন্য হয়ে গেছি।

মাধব। থাম, ফক্কোড় ছোঁড়া। এই বয়সে লম্বা লম্বা বুলি কপচাতে শিখেছে। যা এখান থেকে। এখানে কি করছিস?

আলোক। পুজো করছি।

মাধব। খানিকক্ষণ পরে আসিস। মঠ ঘেরা হচ্ছে। উত্তর কোণের গেট দিয়ে ঢুকে যতক্ষণ ইচ্ছে পুজো করিস। এক টাকা টিকিট লাগবে।

আলোক। [বিস্মিত] তার মানে!

মাধব। তার মানে ওই। এ মঠ টংকনাথ-বাবুর। তিনি বিনা পয়সায় বাজে লোককে এখানে হল্লা করতে দেবেন না। পালা, পালা, শিগ্‌গির সরে পড়। ওই টংকনাথবাবু আসছেন, তোদের এখানে দেখলে ক্ষেপে যাবেন। যা না রে ছোঁড়া—

[তাড়া করে যেতেই আলোক আর তার বন্ধুরা চলে গেল।

[টংকনাথবাবু প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে দুজন স্থূলকায় মোহন্ত রয়েছেন। গেরুয়া পরা, কপালে নানা রঙের তিলক ফোঁটা]

টংকনাথ। ওহে, আমাদের বড় সৌভাগ্য এঁরাও আজ এসে গেছেন। আমি চাই গেটের সামনে এঁরা বসে থাকুন। এক গেটে ইনি, আর এক গেটে উনি। ওঁরা ওঁদের আশ্রমের জন্য আমার কাছে কিছু অর্থ সাহায্য চাইতে এসেছেন। আমি বলেছি—এই জায়গাটাই আপনাদের আশ্রম বানিয়ে ফেলুন না। এ খবরটা যদি একবার ভাল করে রটে যায় তাহলে টাকা নিয়ে শেষ করতে পারবেন না। কি অপূর্ব মন্দির উঠেছে দেখুন।

[মোহন্ত দুজন সবিস্ময়ে মন্দির দেখতে লাগলেন]

প্রথম মোহন্ত। কবে এ মন্দির আবির্ভূত হয়েছে।

মাধব। কবে তা জানি না, আজ আমরা দেখতে পেয়েছি।

দ্বিতীয় মোহন্ত। স্বামীজির বাণী আপনারা শুনেছেন?

টংকনাথ। হ্যাঁ, স্বকর্ণে। অপূর্ব।

প্রথম মোহন্ত। আপনি ধন্য। আমাদের কি করতে হবে?

টংকনাথ। কিছুই না। এখুনি মাঠটাকে ঘিরে ফেলছি। দুটো গেট থাকবে। আপনারা গেটের সামনে অভয়মুদ্রা করে বসে থাকবেন, আর মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াবেন। বাস্, আর কিছু করতে হবে না।

[মাধবকে] মাঠটা ঘিরতে কতক্ষণ লাগবে হে?

মাধব। ঘন্টা-দুয়ের মধ্যে হয়ে যাবে। অনেক লোক লাগিয়েছি।

[জন-মজুরের দল পুনঃ প্রবেশ করল]

প্রথম মজুর। হুজুর মাঠ ঘেরা যাবে না।

মাধব। যাবে না? যাবে না কেন?

দ্বিতীয় মজুর। বাঁশ পুঁতব কি ক'রে গর্ত খোঁড়া যাচ্ছে না।

তৃতীয় মজুর। পাথরের চেয়েও শক্ত।

চতুর্থ মজুর। আমি জোর করে খুঁড়তে গেলুম। আগুন ছিটকে বেরুল।

প্রথম মজুর। দেবতার ইচ্ছে নয় যে, এখানে বেড়া হয়। আমরা চললুম।

[মজুররা চলে গেল]

টংকনাথ। এ কি কান্ড! চল, চল, দেখি--

[সকলে চলে গেল। চতুর্থ ও পঞ্চম শিক্ষক প্রবেশ করলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। তুমি অধীর হ'য়ো না।

পঞ্চম শিক্ষক। না, অধীর হব না। অধীর হবার শক্তি আমাদের নেই। আমরা অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত ঠান্ডা, অত্যন্ত সমঝদার জাত। প্রতি পদে হিসেব করে চলি কি করলে আমাদের স্বার্থরক্ষা হবে। কিন্তু [হঠাৎ অসহায়ভাবে] চেহারাটা ভুলতে পারছি না ভাই। জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, ঘাড়টা কাৎ হয়ে গেছে এক দিকে। ঝুলছে, দুলছে... [ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত] যাবার আগেও আমার জন্যে টাকা রেখে গেছে। নগদ এক হাজার টাকা। এই যে— [পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে] করকরে নগদ এক হাজার টাকা। চিঠি-খানাও অদ্ভুত। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু অদ্ভুত [পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়লেন] বাবা, আর পারলুম না, যাচ্ছি। ক্ষমা কোরো। [হঠাৎ হা হা করে হেসে] আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছে! আমার কাছে, আমার কাছে! হা-হা-হা-হা। আমার কাছে! [হঠাৎ থেমে গেলেন। ভ্রূতে কুঞ্চন রেখা দেখা দিল] ওর মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী জান? তুমি! ও যখন নিষ্পাপ ছিল তখন ও তোমার ছেলে দুলালকে ভালবেসেছিল। আমাকে বলেছিল বাবা দুলালের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। কিন্তু হল না। রঘুনন্দন, মনু, চন্ডীমন্ডপে

পাণ্ডারা, তোমার পিসি, আমার শালারা, এই অভিশপ্ত প্রেতপুরীর লক্ষ লক্ষ প্রেত, ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। বিয়ে হল না। তুমি বলেছিলে কুষ্টি মিললে বিয়ে দেবে, কিন্তু সেটা ছিল তোমার ছলনা। তুমি চাইছিলে পণ, তুমি জানতে আমি গরীব পণ দিতে পারব না, তাই মিছে কথা বললে কুষ্টি মেলে নি। তারপর থেকেই আমার মেয়ে পা বাড়াল বিপথে, আর তোমার ছেলে ধরল মদ। আজ আমার মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তোমার ছেলে পড়ে আছে নর্দমায়। আমাদের গতি কি হবে? রৌরব, না, কুম্ভীপাক? না, আরও ভীষণ কিছু?

চতুর্থ শিক্ষক। যা হবার তা হয়ে গেছে ভাই। অধীর হ'য়ো না। অধীর হয়ে লাভ কি!

পঞ্চম শিক্ষক। না, অধীর তো হই নি। আমি অতি-স্থির-চিত্তে এই মহা-আবির্ভাবের কাছে নগ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছি শাস্তির জন্যে। এই মহাবিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে এসেছি, আমি মহাপাপী, আমাকে শাস্তি দাও, শাস্তি দাও, শাস্তি দাও—

[মন্দিরের ভিতর থেকে উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল]

উদাত্ত কণ্ঠ। শাস্তি দেবার বা ক্ষমা করবার অধিকার আমার নেই। কারো নেই। তোমার মনে সত্যিই যদি অনুতাপের আগুন জ্বলে থাকে তাহলে সেই আগুনেই তোমার সব পাপ পুড়ে যাবে। শুদ্ধ হবে তুমি। এ পাপ তোমার একার নয়, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত বহুজনের পাপ। অম্লান ফুলের মতো মেয়েদের তোমরা পাঁকে ডুবিয়ে হত্যা করে চলেছ যুগ যুগ ধরে। স্তূপীকৃত শবদেহের হিমালয় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে, অনুতাপের আগুনেই তা ভস্মীভূত হবে। অনুতাপ করো। পোড়ো, পোড়ো। পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হও। তারপর রুকে দাঁড়াও, বিদ্রোহ কর। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

[উদাত্ত কণ্ঠ থেমে গেল]

পঞ্চম শিক্ষক। ওঃ, ওঃ, ওঃ—

[মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। হন্তদন্ত একটি যুবক প্রবেশ করল]

যুবক। এ কি! আপনি এখানে কি করছেন। বাড়িতে পুলিশ এসে গেছে, চলুন, চলুন।

[পঞ্চম শিক্ষক দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন]

চতুর্থ শিক্ষক। ওঠ, ওঠ, চল বাড়ি চল।—

[দুজনে ধরাধরি করে পঞ্চম শিক্ষককে অতি কষ্টে নিয়ে গেলেন। দূর থেকে কলরব ভেসে আসতে লাগল। বোঝা গেল মন্দিরের ওপারের মাঠে জনসমাগম হয়েছে। 'জয় বিবেকানন্দের জয়' ধ্বনিও শোনা গেল কয়েকবার। শঙ্খ-ধ্বনিও। আলোক সদলবলে আবার 'প্রভু মীশমনীশ' গাইতে গাইতে প্রবেশ করল। তার গান শেষ হ'তে না হতেই উদভ্রান্ত টঙ্কনাথ প্রবেশ করলেন।]

আলোক। সত্যিই মাঠ ঘিরছেন না কি। অনেক লোক তো এসে গেছে।

টঙ্কনাথ। খুঁটি পোঁতা যাচ্ছে না। সব শাবল ভোঁতা হয়ে গেছে।

আলোক। মন্দিরের দিকে চেয়ে দেখুন। কি সুন্দর!

টঙ্কনাথ। [চেঁচিয়ে উঠলেন] ও মন্দির নয়, আগুন। জ্বলন্ত আগুন। এ আগুন আমি নিবিয়ে তবে ছাড়ব। আমার নাম টঙ্কনাথ। আমার কাছে চালাকি—

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব। আমি দমকলকে খবর দিয়েছি, এখুনি এসে পড়বে তারা—

আলোক। [ব্যাকুলভাবে] দেখুন, দেখুন মন্দির মিলিয়ে যাচ্ছে। এ কি হল—এ কি হল—

[সত্যিই মন্দির মিলিয়ে গেল। দেখা গেল এক মঞ্চের উপর স্বামীজি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেই গেরুয়া আল-খাল্লা, গেরুয়া পাগড়ি দেখেই চিনতে পারা যায়। শ্রোতারা তাঁর পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর সামনে বিপুল জনতা]

স্বামীজি। হে ভারবাহী পশুর দল, তোমরা জাগ, তোমরা ওঠ। দুর্ভেদ্য তমসাবরণ এখন তোমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখন চেষ্টায় তেজ নেই, উদ্যোগে সাহস নেই, মনে বল নেই, প্রাণে আশা নেই। আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতি-দ্বেষ, আছে দুর্বলের যেন-তেন-প্রকারেন সর্ব-নাশ-সাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বল-বানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থ-সাধনে, জ্ঞান অনিত্য বস্তু সংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মীতা কটু-ভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা বিকীরণে। তোমরা সব পশু হয়ে গেছ। তোমাদের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব মূর্চ্ছিত হয়ে আছে তাকে জাগাবার সময় এসেছে এইবার। ঘরে বাইরে চারি-দিকে শত্রু। বীর্যবলে তাদের বিদলিত করতে হবে। জাগো ওঠ। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হও। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় আত্মবলিদান দাও। শক্তি-পূজার মহা-নবমী সমুপস্থিত। রঘুনন্দন বলছেন, নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধির-কর্দ্দমং। তাই কর তোমরা। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে পুজো করতে হয়, তবে যদি তিনি প্রসন্না হন। মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে! নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে। তোমরা জাগো জাগো জাগো। নিজে জেগে সবাইকে জাগাও। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

[দূরে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল]

আলোক। [হঠাৎ টংকনাথের পা জড়িয়ে ধরে] ওদের যেতে বলুন, যেতে বলুন, আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবেন না, আমার স্বপ্ন ভেঙে দেবেন না।

[দমকলের ঘণ্টা আরও নিকট-বর্তী হ'ল]

যবনিকা
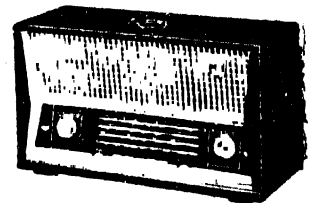
মালয়েশিয়া

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মালয় জাপ কবলমুক্ত হয়ে আবার বৃটিশ শাসনাধীনে আসে। কিন্তু সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখন যে প্রবল আকারে জাতীয় জাগরণ দেখা দেয় তাতে বৃটিশ সরকার এটা উপলব্ধি করেন যে, আবার আগের মত মালয়কে উপনিবেশ হিসাবে শাসন করা যাবে না। তাই অনতি-বিলম্বেই মালয়ের অন্তর্গত নয়টি দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সঙ্গে বৃটিশ সরকার মালয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং সেই আলোচনা অনুসারে ১৯৪৮ সালে মালয় যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৭ সালে মালয় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

নয়টি দেশীয় রাজ্য ও প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশ পেনাং ও মালাক্কাসের সমন্বয়ে গঠিত হয় ফেডারেশন অব মালয় বা মালয় যুক্তরাষ্ট্র। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে ক্রা উপদ্বীপের শেষপ্রান্তে অবস্থিত এই যুক্তরাষ্ট্রটির আয়তন ৫০,৬৯০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় সত্তর লক্ষ। তাদের মধ্যে মালয়ীদের সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ ও চীনাদের সংখ্যা পঁচিশ লক্ষ। তৃতীয় বৃহৎ জন-গোষ্ঠী হল ভারতীয় ও পাকিস্তানী, যাদের সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। এ ছাড়াও আছে লক্ষাধিক আদিবাসী ও অন্যান্য উপজাতীয়। এই হিসাব থেকেই বোঝা যাবে যে, মালয়ের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশ চীনা।

চীনারা মালয়ের খুব বেশীদিনের অধিবাসী নয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজ-শাসন সে দেশে কায়েম হওয়ার পর তাদের আগমন শুরু হয়। ইংরেজরা আসার আগে মালয় ছিল বনা-কীর্ণ অনগ্রসর অঞ্চল, সেকারণে বিদেশী-দের আকৃষ্ট করার মত সম্পদ সেদেশে অতি সামান্যই ছিল। তার খনিজ সম্পদ ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলই, এমনকি তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ রবারের তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৯০ সালে, অর্থাৎ মাত্র সত্তর বছর আগে ইংরেজরা সেদেশে প্রথম রবার গাছ রোপণ করে এবং তারপর একে একে শুরু হয় বিভিন্ন খনির কাজ। এর পরেই মালয়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে সেদেশে দলে দলে চীনা শ্রমিকদের আগমন শুরু হয়। বণিক-স্বার্থে ইংরেজ শাসকরা এইভাবে মালয়ের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করে।

ক্ষুদ্র হলেও মালয় সমৃদ্ধ দেশ। যদিও তার ৪/৫ অংশ এখনও বনাকীর্ণ, তার পশ্চিম দিকের জেলাগুলিকে জঙ্গল-মুক্ত করে সেখানে যে রবার, ধান ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপন্ন করা হচ্ছে, তাতেই মালয় ঐশ্বর্যশালী। আনারস, নারকেল, কোকো, কফি, ভুট্টা, চিনি, চা, তামাক, মসলা প্রভৃতিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয় মালয়ে এবং বিদেশেও এসব পণ্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। তবে রবারই তার প্রধান বাণিজ্য-পণ্য। রবার উৎ-পাদনে তার স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়, প্রথম স্থানাধিকারী ইন্দোনেশিয়া। মালয়ের অপর শ্রেষ্ঠ সম্পদ টিন। এই খনিজ পদার্থটির উৎপাদনে মালয়ের স্থান বিশ্বে প্রথম। ১৯৫৯ সালে বিশ্বের সমগ্র টিন উৎপাদনে মালয়ের ভাগ ছিল এক-তৃতীয়াংশ ও তার পরিমাণ ছিল ষাট হাজার টন। এ ছাড়াও মালয়ে পাওয়া যায় চুন, লোহা, সোনা। কিন্তু রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এহেন সোনার দেশের ভবিষ্যৎকেও আজ বিশেষভাবে বিপন্ন করে তুলেছে, আর এই অনিশ্চয়তার জন্য মূলত দায়ী চীনা অনুপ্রবেশ-কারীদের কমিউনিষ্ট চীন-প্ররোচিত অন্ত-র্ঘাতী কার্যকলাপ। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে মালয় সরকার কমিউনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনে যে, তার পূর্বের এক বছরে চীন সরকার মালয়ে প্রচার-পুস্তিকা বিলি করেছে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ।

সিঙ্গাপুর

মালয়ের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মালয়ের সমগ্র রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ যায় সিঙ্গাপুর বন্দর দিয়ে। কিন্তু প্রধানত চৈনিক সমস্যার জন্যই সিঙ্গাপুরকে প্রথম হতে মালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সর্বাধিক
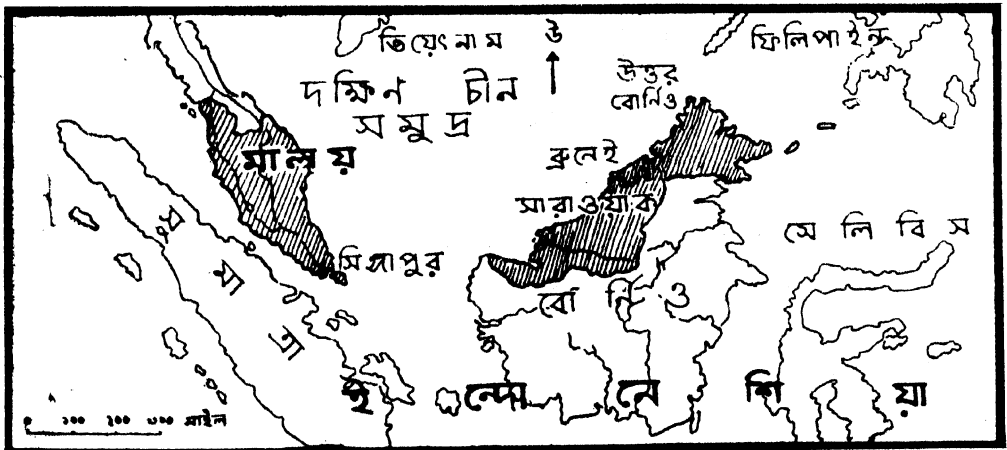
ছাব্বিশ মাইল লম্বা ও চোদ্দ মাইল চওড়া একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ সিঙ্গাপুর, কিন্তু তার বর্তমান লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ। আর এই ১৭ লক্ষ লোক শুধু খাদ্যের জন্যই নয়, পানীয়ের জন্যও সম্পূর্ণরূপে মালয়ের উপর নির্ভরশীল। মালয়ের অন্তর্গত জোহর পর্বত হ'তে পাইপ করে জল এনে সিঙ্গাপুরের মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ চীনা। তাই সিঙ্গাপুর যদি মালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তবে ঐ সংযুক্ত রাষ্ট্রে চীনাদের সংখ্যা মালয়ীদের অতিক্রম করে যাবে। সেখানে চীনাদের সংখ্যা হবে আটত্রিশ লক্ষ, আর মালয়ীদের সংখ্যা ছত্রিশ-সাতত্রিশ লক্ষ। এ অবস্থাটা মালয়ীদের পক্ষে মেনে নেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয় এবং এই কারণেই আজ পর্যন্ত শুধু মালয় ও সিঙ্গাপুরের

সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে মালয়ের শাসকবর্গ সম্মত হননি।

সিঙ্গাপুরে চীনাদের এই বিপুল সংখ্যার কারণও একই। ১৮১৯ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে স্যার টমাস র‍্যাফলস যখন সিঙ্গাপুরের নামকা-ওয়াস্তে সুলতান টেংকু হুসেনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, তখন সিঙ্গাপুরে নদীর মুখে মাত্র কুড়িটি মালয়ীদের কুটির ছিল। আর আজ সেই সিঙ্গাপুর দূর-প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ বন্দর-নগরী। এর প্রধান কারণ জল-পথে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ ও দূর-প্রাচ্যের মধ্যে সংযোগরক্ষায় তার সীমাহীন গুরুত্ব। ১৮৭০ সালে সুয়েজ খাল কাটা হওয়ার পরেই সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তার সমৃদ্ধিও শুরু হয় তার পর হ'তে। সিঙ্গাপুরের মাটি অনুর্বর তাই কৃষিজ উৎপাদন তার নগণ্য। কিন্তু তার বন্দরের কর্মতৎপরতা সীমাহীন। আর বিরামবিহীন তার সংখ্যাতীত শিল্প-উদ্যম। রবার প্রস্তুতের কারখানা, টিন গলানোর কারখানা, জাহাজ মেরামতের কারখানা হ'তে শুরু করে আসবাব, জুতো, সাবান, বিস্কুট প্রভৃতি অজস্র বিষয়ের সংখ্যাতীত কারখানা ছড়িয়ে আছে সারা সিঙ্গাপুরে। আর ঐ সব কারখানাতে কাজের উদ্দেশ্যেই চীনারা হাজারে হাজারে এসে হাজির হয়। পরিচ্ছন্ন এই সুন্দর শহরটি পরিব্রাজকদের কাছেও একটি বিশেষ আকর্ষণ।

অথচ এমন একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলকে মালয় চৈনিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে তার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারছে না। ১৯৫৯ সালের মে মাসে সিঙ্গাপুর স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করে। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে সিংগাপুর বর্তমানে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত।

মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব

মালয় ও সিঙ্গাপুর উভয়ের স্বার্থেই আজ এ দুটি স্থানের সংযুক্তি প্রয়োজন, কিন্তু জাতি হিসাবে মালয়ীদের বাঁচার প্রয়োজনে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এই রকম একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার প্রতিকারকল্পেই ১৯৬১ সালে মালয়ের প্রধানমন্ত্রী মালয় ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে বোর্ণিও দ্বীপের উত্তর ভাগে অবস্থিত তিনটি ক্ষুদ্র বৃটিশ উপনিবেশ সারওয়াক, ব্রুনেই ও উত্তর বোর্ণিওকে সংযুক্ত করে' মালয়েশিয়া নামে একটি বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন। টংকু আবদুল রহমানের এই প্রস্তাব ঐ বছরের শেষভাগে কমন-ওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত হয় ও উপস্থিত সকল প্রধানমন্ত্রীই তা সমর্থন করেন। তিনটি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করবে, প্রধানত এই কথা চিন্তা করেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও সে প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেন।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয় যে, ১৯৬৩ সালের ৩১শে আগস্ট মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐ যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন হবে ১,২৯,৫০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় এক কোটি। উত্তর বোর্ণিওর উপ-নিবেশগুলি ক্ষুদ্র, সুতরাং একক শক্তিতে তাদের স্বাধীন থাকার উপায় নেই। তাই এই প্রস্তাব গ্রহণে তাদেরও কোন আপত্তি থাকবে না। অবশ্য ঐ তিনটি উপনিবেশ সংযুক্ত হলেও চৈনিক সমস্যার খুব বেশী সমাধান হবে না। কারণ উত্তর বোর্ণিওর পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যেও ২৩ শতাংশ চীনা, সারওয়াকের সাড়ে সাত লক্ষ লোকের মধ্যে ৩১ শতাংশ চীনা ও ব্রুনেইর আশি হাজার লোকের মধ্যে ১১ শতাংশ চীনা। সুতরাং মালয়েশিয়া গঠিত হলেও তাতে চীনাদের সংখ্যা হবে একচল্লিশ লক্ষ, এবং মালয়ীরা তখনও থাকবে চীনাদের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। চীনাদের বিরুদ্ধে মালয়ী, ভারতীয় ও আদিবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হলে তবেই তাদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হবে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হল তিনটি উপনিবেশের স্বাধীনতা ও মালয়েশিয়ার সার্বিক উন্নতি। একারণে মালয়েশিয়া গঠন একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলে' ধরে নেয় সকলে। একমাত্র ফিলিপাইন এই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে এবং উত্তর বোর্ণিওর উপর উত্তরাধিকারের দাবী জানায়।

ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতা

কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ ব্রুনেইতে শেখ মহম্মদ আজাহারীর নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান ঘটায় মালয়েশিয়া গঠনের উদ্যোগ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বৃটিশ সৈনিকদের বাধায় আজাহারীর অভ্যুত্থান অল্পসময়ের মধ্যেই ব্যর্থ হয় এবং আজাহারী ব্রুনেই ত্যাগ করে' ম্যানিলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। ঠিক কার প্ররোচনায় এই বিদ্রোহ হয়েছিল তা না বোঝা গেলেও ইন্দোনেশিয়া হঠাৎ এ ব্যাপারে যেমন উৎসাহী হয়ে ওঠে ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের নায়ক বলে, শেখ আজাহারীকে অভি-নন্দন জানায়, তাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঐ প্ররোচনামূলক কার্যকলাপে ইন্দোনেশিয়ার ভূমিকা খুব সন্দেহমুক্ত ছিল না। তারপর থেকেই ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া গঠনের প্রয়াসকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত বলে অভিহিত করতে আরম্ভ করে এবং শেষপর্যন্ত এমন কথাও বলে যে, যদি ইন্দোনেশিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও মালয়েশিয়া গঠিত হয় তবে মালয়ের সঙ্গে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়বে। অপরপক্ষে মালয়ের প্রধানমন্ত্রীও গত ১১ই ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণায় বলেন, যাই ঘটুক না কেন আগামী ৩১শে আগস্ট মালয়েশিয়া অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে আর ইন্দোনেশিয়া অথবা যে-কোন শক্তি যদি তাতে বাধা দিতে আসে তবে সে বাধা প্রতিরোধ করা হবে। কি করে প্রতিরোধ করা হবে সেকথা জানাতেও টুংকু রহমান কোন দ্বিধা বোধ করেন নি। তিনি জানিয়েছেন, শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পৃথিবীর যে-কোন দেশের সঙ্গে যেটুকু সাহায্য পাবেন তা নিতে তিনি পশ্চাদপদ হবেন না। টুংকু গণতন্ত্রবাদী ও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির মিত্র, সুতরাং তাঁর সাহায্যে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই এগিয়ে আসবে। সুতরাং সত্যই যদি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া গঠনের পথে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হয় তবে তার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে একটা বিরাট অশান্তির সৃষ্টি হবে সে বিষয়ে

কোনই সন্দেহ নেই। ব্রুনেইর পাঁচ ভাগের চার ভাগ ও উত্তর বোর্নিও ও সারওয়াকের চার ভাগের তিন ভাগ এখনও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত। সুতরাং জঙ্গলযুদ্ধে পটু ইন্দোনেশিয়দের পক্ষে দীর্ঘকাল পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না।

এখন প্রশ্ন হল এই যে, ইন্দোনেশিয়ার এই হঠাৎ শত্রুতার কারণ কি? এর প্রথম উত্তর, ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ সংকট। রাজনৈতিক দলাদলি ও শাসকদের অক্ষমতায় ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের বৈষয়িক দৈন্য চরম সীমায় পৌঁচেছে। এ কারণে একটা আন্ত-আন্তর্জাতিক সংকটের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়াকে জড়িত রেখে তার জনগণকে সেই দিকে আকৃষ্ট রাখা ইন্দোনেশিয়ার শাসকবর্গের এখন একটা স্থায়ী নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিন ছিল পশ্চিম ইরিয়ানের সমস্যা। তার মীমাংসা ঘটে যাওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার সরকারকে সম্প্রতি বেশ খানিকটা বিরতই হতে হয়েছিল। তাই হঠাৎ ব্রুনেইতে অভ্যুত্থান ঘটে যাওয়ায় আবার তাঁরা এভাবে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছেন। মালয়েশিয়া গঠনের উদ্দেশ্য ইন্দোনেশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী চক্র দিয়ে ঘিরে রাখা, এর চেয়ে দুর্বল যুক্তি আর কিছুই হতে পারে না। দশ কোটি নরনারী-অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রীয় জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে ক্ষুদ্র মালয়ের সঙ্গে ক্ষুদ্রতর তিনটি বৃটিশ উপনিবেশ সংযুক্ত হলে—একথা কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই যুক্তি দেখিয়েই ইন্দোনেশিয়া আজ মালয়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।

ইন্দোনেশিয়ার বিরোধিতার দ্বিতীয় কারণ আরও ব্যাপক ও মারাত্মক। ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে কমিউনিস্ট চীনের বিশেষ মিত্র ও অনুগত। আর ঐ কমিউনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র মালয়ই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। তাছাড়া চীন জানে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় পশ্চিমী সাহায্য-পুষ্ট মালয়। এ অবস্থায় মালয়ের আরও বিস্তৃতি ও মালয়ী রাজনীতিতে চীনাদের কোণঠাসা করার প্রয়াস চীন কখনও মুখ বুজে মেনে নিতে পারে না। অথচ সদ্য সদ্য ভারত-আক্রমণের পর তার পক্ষে বিনা অজুহাতে মালয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাও সম্ভব নয়। তাই কমিউনিস্ট চীন মালয়েশিয়া গঠনের উদ্যোগ তার মিত্র ইন্দোনেশিয়াকে দিয়েই বানচাল করে দিতে চায়। সুতরাং মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্দোনেশিয়াকে একা মনে করলে খুবই ভুল করা হবে। উত্তর বোর্নিওর বৃটিশ উপনিবেশগুলির উপর, বিশেষ করে ব্রুনেই ও সারওয়াকের উপর চীনের লোলুপ দৃষ্টির আরও একটি কারণ হ'ল তার খনিজ তৈল-সম্পদ। ১৯৫৮ সালে ব্রুনেইর তৈল-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫১ লক্ষ টন, যে জায়গায় সমগ্র চীনের উৎপাদন ছিল মাত্র ৪০ লক্ষ টন। খনিজ তৈলের জন্য চীন আজ অতিমাত্রায় রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থায় ব্রুনেই, সারওয়াকের তৈলখনিগুলির উপর তার লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ খুবই স্বাভাবিক।

মালয়েশিয়া গঠনের পক্ষে যুক্তি

মালয়েশিয়া গঠনের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, যে-কটি দেশ ও অঞ্চলের সমন্বয়ে এই যুক্তরাষ্ট্রটি গঠনের প্রস্তাব হয়েছে, সেগুলি হয় অতি-সম্প্রতি বৃটিশ শাসনাধীন ছিল, নয়ত এখনও আছে। দীর্ঘকাল বৃটিশ শাসনাধীনে থাকার ফলে ঐ উপনিবেশ কটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনরূপে গড়ে উঠেছে। যেমন ব্রুনেইতে যে তৈল উত্তোলন করা হয় তা পরিশোধন হয় সারওয়াকে এবং তা বিদেশে রপ্তানি হয় সিঙ্গাপুর বন্দর দিয়ে। সিঙ্গাপুর বন্দর ঐ সব কটি অঞ্চলেরই প্রাণকেন্দ্র। মালয়ী ডলার ঐ সব কটি স্থানের একমাত্র প্রচলিত মুদ্রা।

এমনিভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার এক-একটি স্থান এক-একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত হয়ে এক-একটি স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন দেশ ও জাতিতে পরিণত হয়েছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া কেউ তার ব্যতিক্রম নয়। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের যে কটি দ্বীপ বা দ্বীপাংশ হল্যাণ্ডের শাসনাধীন ছিল তাদেরই সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে আজকের ইন্দোনেশিয়া। ইরিয়ান দ্বীপের পশ্চিমাংশ ওলন্দাজ-শাসিত ছিল, তাই ইন্দোনেশিয়া শুধু ঐ পশ্চিম ইরিয়ানটুকুকেই তার রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করেছে, সমগ্র ইরিয়ানকে নয়। ঠিক একই যুক্তিতে বোর্নিওর উত্তর ভাগে অবস্থিত বৃটিশ উপনিবেশগুলি আজ যে বৃটিশ উপনিবেশ মালয় ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যাচ্ছে, তাতে ইন্দোনেশিয়া বা কারও কোন যুক্তিসংগত আপত্তি থাকতে পারে না।

প্লাবন
তুরস্ক
ইস্রায়েল
ইরান
সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র
সাউদী আরব
ব্যাপার কী জুজোদাদা? লিকিং-এর পরে এই দুর্দশা যে?
নাবুর ভাই, থান ইঁট পড়ছে! একটু চুপ করে বসে থাক!

দেখ অধ্যাপক, খৃস্টধর্মে যে পাপ-স্বীকারের ব্যবস্থাটা আছে সেটাকে যদি একটু সংস্কার করে নেওয়া যেত, তাহলে বোধহয় বর্তমান যুগে আমরা যেসব জটিল মানসিক রোগে ভুগছি, তা থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠতে পারতাম। সুবিধে হচ্ছে 'পাপ' কথাটার সংজ্ঞা নিয়ে। তোমার কাছে যেটা পাপ আমার কাছে সেটা হয়তো পাপ নয়। এই জন্য পাপস্বীকারের ঝামেলায় না গিয়ে আত্ম-পরিচয় স্বীকার করো। দেখ, আজকে আমরা জীবনের সবক্ষেত্রেই যে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছি, যে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি, তার প্রধান কারণ আমরা নিজেদের কাছেও আমাদের আত্মপরিচয় স্বীকার করতে ভয় পাই বলে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক তোমার কথা। ছাত্রজীবনে তুমি খুব বিভূতিমান ছাত্র ছিলে। পরীক্ষায় ভালো ফলের অধিকারী। কৃতী অধ্যাপক। সহজ, সরল, সুন্দর বিবাহিত জীবন যাপন করেছ। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ। ছেলেকে যুগের হাওয়া থেকে বাঁচিয়ে উচ্চ-শিক্ষা দিতে পেরেছ। তোমার এই পরিচয়টুকু সবাই জানে। স্বাভাবিক কারণে এটুকুই প্রকাশ্য। অবশ্য আমি বলছি না, এছাড়া তোমার আরও কোন গোপন পরিচয় আছে। তবে যদি থাকে কিছু, তাহলে অন্তত নিজের কাছে তাকে স্বীকার করো। যেমন ধরো, আমার প্রৌঢ় জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন?

না, না, তোমায় বিরক্ত হতে হবে না। ওটা রাগের পূর্বাভাস। আমি তোমার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও কৌতূহলী নই।

দেখ অধ্যাপক, জীবনকে আমি খুব সোজা পথেই উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উনিশ শতকী সেন্টিমেন্টের কিছু কিছু বাষ্প দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এত গোলা-গুলি বারুদের ধোঁয়ায়ও মানুষের মন থেকে মিলিয়ে গেল না। তোমরা আমাকে সোজা পথে হাঁটতে দিলে না।

মনে করে দেখ, তেইশ বছর বয়সে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েই চাকরি পেলাম। তারপরই বাবা-মা বিয়ে দিলেন। আমার স্ত্রী আমাদেরই পালটি ঘরের মেয়ে, যথেষ্ট লেখাপড়া জানা। বিয়ের পর প্রথম ক'টা বছর যে কি ভাবে কেটেছিল, তোমারও নিশ্চয় মনে আছে। তোমরা তো ঠাট্টা করে আমাদের নাম দিয়েছিলে হানিমুন-কাপ্‌ল্।

পঁচিশ বছর বয়সে আমাদের প্রথম সন্তান ডলি এলো। দু'বছর পরে খোকা। পরিবার-পরিকল্পনার দিক থেকে আর আমাদের সন্তান-সন্ততি প্রয়োজন ছিল না।

তিরিশ বছর বয়সে দুই ছেলে-মেয়ের বাপ: হাতে প্রচুর পয়সা; দেহে অটুট স্বাস্থ্য; মনে অফুরন্ত যৌবন। আমার স্ত্রী বিদুষী, রূপসী, যুবতী; তবে তখনই কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া। স্বামী তাঁর ধ্যানজ্ঞান; ঠাকুরঘরেও যাতায়াত শুরু হয়েছে।

আমার তখনও ভালো লাগে, ছেলে-মেয়েদের আয়ার কাছে রেখে স্ত্রীকে নিয়ে

পৃথিবী ও আমার দর্শ…

পালিত
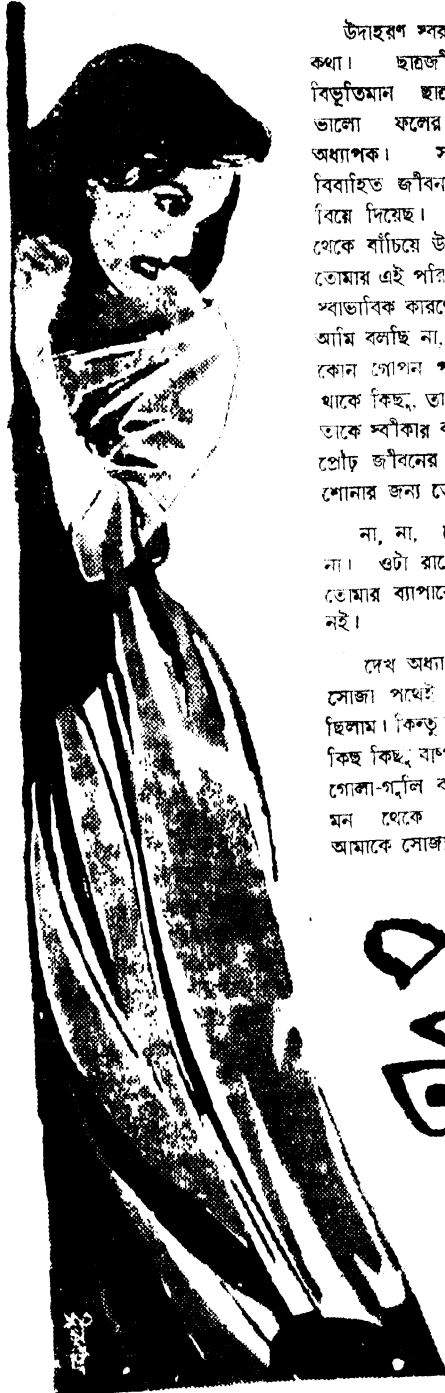
সন্ধ্যেবেলায় ড্রাইভ দিতে: ফাঁকা মাঠের ধারে মেটর রেখে, চুপচাপ ঘাসে-মোড়া জমিতে বসে চোখের ভাষায় কথা বলতে: ভালো লাগে প্রথম প্রেমের রোমান্টিকতাকে বারবার আস্বাদন করতে। উইক-এন্ড্-এ শহর ছাড়িয়ে দূরে কোন ডাক-বাংলোয় রাত কাটাতে যেখানে শাল-মহুয়ার জঙ্গল তার আদিম ডাল-পালা মেলে আমাদের চলার ছন্দকে ইসারা জানাচ্ছে।

কিন্তু আমার স্ত্রী যেন আমার সঙ্গে তাল দিয়ে উঠতে পারছিলেন না। উনি চাইছিলেন ছেলে-মেয়েদের জন্য একটু বেশী সময় দিতে, ঠাকুর-ঘরের ব্যাপারটা নিয়মিত করতে; ওনার বড়দির বাড়ীতে কোন স্বামীজী না মহারাজের পাঠের আসরে হাজিরা দিতে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার স্ত্রী খুব উদার ছিলেন। আমি যেমন আমার সঙ্গিনী হবার জন্য সব সময়েই ও'কে অনুরোধ-উপরোধ করতাম, উনি কিন্তু কখনই আমাকে ও'র সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ করতেন না। আমি মাঝে মাঝে যেচে ও'র সঙ্গী হতাম। উনি হেসে বলতেন, 'আমার জন্য জোর করে স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ কোরো না।'

সেবারে আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী পড়ল চৈত্রের এক পূর্ণিমা তিথিতে। ঠিক করলাম, সিমজুরির শালবনে আমার এক কাঠের ব্যবসায়ী বন্ধুর কুঠিবাড়ীতে রাত কাটাব, সেই আমাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীর মত। অধ্যাপক, তুমি কি কোন-দিন অনুভব করেছ, চৈত্রের পূর্ণিমা রাতে, যখন শাল-পিয়ালের ডালে ডালে রূপোলী ঝর্ণার প্লাবন চলে, যখন সমস্ত অরণ্যের মর্মরে যেন কি এক গোপন ভাষায় নিঃশব্দে আলাপ চলে, তখন দূরে থেকে ভেসে আসা সাঁওতালী পল্লীর ডিম-ডিম মাদলের শব্দে রক্তের মধ্যে যেন কিসের মাতন লাগে। তখন যেন সব কিছু ভালো লাগাতে চায়। মনের মধ্যে যেন ভালোবাসার জোয়ার আসে। মনে হয় ভালোবাসার এই অতুল ঐশ্বর্য কোথায় ফেলে ছড়িয়ে যাই! সমস্ত সত্তা যেন উন্মুখ হয়ে ওঠে আর একটি সত্তার সন্ধানে। অধ্যাপক, তুমি কি একে দেহ-কামনা বলবে? সৃষ্টির আদিতে, ধর পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, ঠিক এমনি করেই পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীর আকাশে দেখা দিত। মানব-হীন পৃথিবী সেই রূপোলী সুধায় মাতোয়ারা হয়ে কি আকুল হয়ে উঠত না, কি যেন এক অব্যক্ত অভাবের বেদনায়। নিয়ানডারথাল মানব তার মানবীকে বুকে চেপে ধরে কেবল কি দেহের তটে তটে আছড়ে পড়েছে। সৃষ্টির মধ্যে সে কি তৃপ্তির আস্বাদ পায় নি! সৃষ্টির মধ্যে সে কি রেখে যায় নি মানবের অমরতার বাণীকে।

সিমজুরির কথা বলতে গিয়ে আমি একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছি। আমার স্ত্রীও তাই হয়েছিলেন। প্রথমবার। হলদি-ঝর্ণা নামে একটা পাহাড়ী নদীর উৎস দেখে ফেরবার সময়ে একটা পাথরের টিলার ওপর আমরা বসেছিলাম। তির তির করে পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল ছোট্ট নদীটা চাঁদের আলোয় গলানো রূপোর স্রোতের মত। তাতে নাচছিল আমার ছায়া, বক্ষলগ্না আমার স্ত্রীর ছায়া; চাঁদেরও। আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে আমার স্ত্রী বলেছিলেন, আসব। প্রতিবছর এই দিনটিতে আমরা এখানেই ফিরে আসব।

সিমজুরির অন্ধকার প্রান্তরে আর বোধহয় সে প্রতিশ্রুতি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে না। আমরাও আর ফিরে যেতে পারিনি। পরপর কয়েকটা বছর আর সুযোগ হয়ে ওঠে নি।

তাই এবারে যখন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে স্ত্রীকে চমকে দেবার জন্য পরি-কল্পনাটা পেশ করলাম, দেখলাম উনি প্রত্যাশিত মাত্রায় উচ্ছ্বসিত হলেন না। একটু যেন লজ্জিত তথা সংকুচিত হলেন। বললেন, "বেশ তো, যাওয়া যাবে।"

আমি ও'র উত্তর শুনে একটু ক্ষুণ্ণ হলাম। বললাম, "তোমার কি অন্য কিছু প্ল্যান ছিল?"

উনি চট করে জবাব দিতে পারলেন না। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "না।
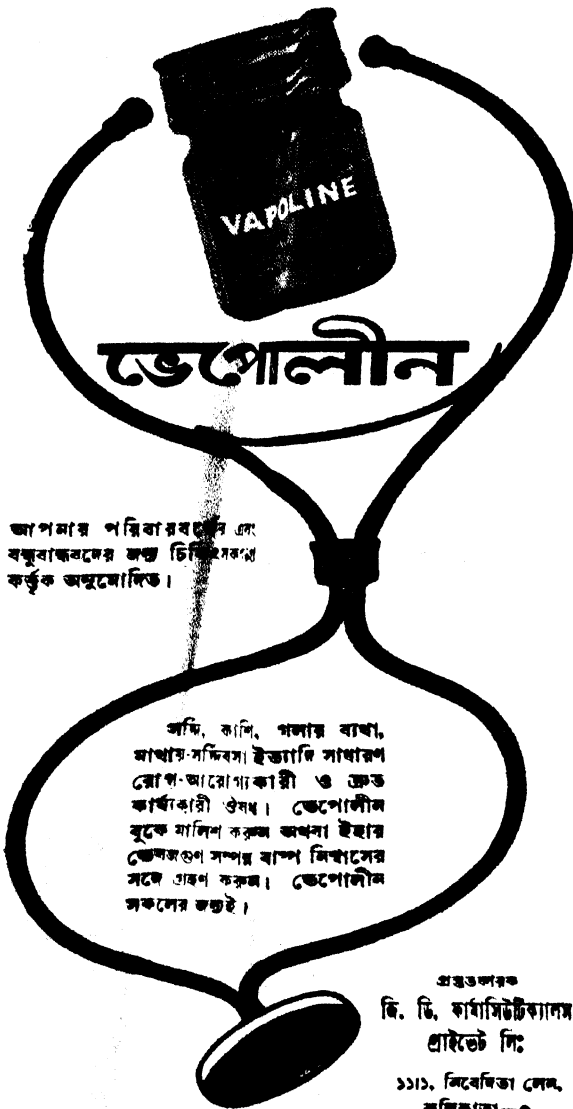
তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা এখন বড় হয়েছে। ওরা ছাড়বে না। সঙ্গে যেতে চাইবে। তা নইলে বড্ড কান্নাকাটি করবে।"

"তুমি কি ঐ জন্যেই যাবে না ঠিক করেছিলে?"

"ঠিক তা নয়। এই তিথিটা খুব ভালো ছিল। বড়দির বাড়ীতে স্বামীজী খুব বড় করে যজ্ঞ করবেন। তাই ঠিক করেছিলাম তোমাদের সবাইর মঙ্গল কামনায় পুজো দেব। তা ঠিক আছে। যাওয়ারই ব্যবস্থা করো। তবে ছেলে-মেয়েরা সঙ্গে যাবে। ওদের দেখাশোনা করার জন্য আয়াটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।"

স্ত্রী উদারতায় আমার মুগ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হইনি। একটু অসহায় ভাবে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বলে-ছিলাম, "বছরের এই দিনটা আমি শুধু তোমাকেই চাই, সুজাতা। সারা বছর তো তুমি ওদের জন্যই রইলে।"

স্ত্রী মৃদু হেসে কটাক্ষ করে বললেন, "সারা বছর তুমি কি আমাকে পাও না?"

"সে পাওয়া তো ভাগাভাগি করে পাওয়া।"

"কিন্তু আমি যে ওদের মা।"

"তুমি যে আমার প্রথম সঙ্গিনী। ওদের বাদ দিয়েও আমার জীবনে তোমার একটা ভূমিকা আছে সুজাতা। আমাদের দুজনের বয়স বাড়বে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা বড় হবে। আমরা বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা-কর্তব্য দিয়ে ওদের ঘিরে রাখব, একথা ঠিক। কিন্তু আমরা শুধুই বাপ-মা নই। আমরা স্বামী-স্ত্রী, মানব-মানবী। আমাদের সন্তান-সন্ততিদের বাদ দিয়েও আমাদের দুজনের কিছু না কিছু আবেগ-অনুভূতি থাকবে যা একান্তভাবে আমাদের দুজনের। সুজাতা, তোমার একান্ত জীবনে আমি কি অতিরিক্ত হয়ে পড়ছি।"

আমার স্ত্রী লজ্জিত হাসি হেসে বললেন, "বারে, যাবো তো বললাম।"

কিন্তু তিনি যে উদারতা দেখিয়ে যেতে রাজী হলেন, আমিই বা সে উদারতা দেখাতে পারব না কেন। আমি আর যাওয়া নিয়ে বিশেষ কিছু কথা তুললাম না। নির্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই মিলে আমার বড় শালীর বাড়ীতে পাঠ না পুজো কি যেন একটায় যোগদান করলাম।

অধ্যাপক, তুমি বোধহয় হতাশ হচ্ছ আমার আধুনিকতম অভিজ্ঞতার বদলে এইসব পুরোনো কাহিনী শুনে। বলছি সেটা। কিন্তু তার আগে এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হতে আমি আর্মিতে যোগদান করলাম। সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে কিংবা অভিমানবশতঃ নয় কিন্তু। ভেবেছিলাম ধরাবাঁধা জীবনের বাইরে আর একটা জীবনের স্বাদ পাব। স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করেছিলেন। আমারও ওঁকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু সত্যিই বহু বৈচিত্র্যে ভরা সামরিক জীবন আমার ভালো লেগেছিল। আকাশ-পাহাড়-জঙ্গলের মায়াপুরী মণিপুর-ইম্ফলের সামরিক তাঁবুতে, প্যালেল-টিড্ডিম-টামু-র ঢেউ-খেলানো পথে পথে জীপে চড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমি মানব-প্রকৃতির মহা-ভারতকে খুঁজে বেড়াতাম। টুকরো টুকরো ভারতীয় নারীচরিত্রের মধ্যে আমি যেন ভারতের এক আদিম ইতিহাসকে পান করতাম। কিন্তু সত্যি কথা জানো অধ্যাপক! যতই দিন যেতে লাগল ততই যেন জীবনবৈচিত্র্য একটু করে যৌনজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে লাগল। বিশ্ব-প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষকে না দেখে একটু একটু করে তাকে দেখতে লাগলাম প্রবৃত্তির পটভূমিতে। ফলে সভ্যতার পাপ-স্পর্শ-হীন সরলা পার্বত্যদুহিতা থেকে শুরু করে সিগারেটমুখী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কন্যা অবধি সর্বত্রই আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চরণ করতে লাগল, ঠিকাদারদের শ্বাপদ-চক্ষুর প্রলোভনের সাহায্যে।

যুদ্ধ শেষ হলে চাকরি ছেড়ে ঠিকা-দারীর ব্যবসা শুরু করলাম। আধুনিক সভ্যতার পীঠস্থান মার্কিন মুলুকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল ব্যবসা উপলক্ষে। গেলামও সেখানে একাধিকবার। আমার ভোগবাদের দীক্ষায় পূর্ণাহুতি পড়ল।

ইতিমধ্যে আমার ছেলে-মেয়েদুটি যুদ্ধোত্তর ভারতীয় সমাজে তরুণ-তরুণীতে পরিণত হয়েছে। আমি তাদের সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়েছি। ওদের মা তাঁর দিদির বাড়ীতেও পৃথক কোন শিক্ষা-ব্যবস্থার সন্ধান পাননি। এই মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন এ পদ্ধতিকে। সাদার্ণ এ্যাভিনিউর আমার এই নতুন বাড়ীর ঠাকুরঘরে বসে তিনি সব কিছুর সঙ্গেই যেন সামঞ্জস্য করে নিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে হলিউডের নায়ক-নায়িকার প্রেম, লরেন্স কিংবা ফাঁসোয়া সাগাঁর বই নিয়ে সাইকোলজি তথা সেক্সোলজি আলোচনা করতে আমার মোটেই বাধত না। ওরা আমার থেকেও দ্রুতলয়ে ইংরেজি বলতে শিখেছিল, আমার থেকেও নিখুঁতভাবে বিদেশী আদব-কায়দা রপ্ত করেছিল। কিন্তু আমার ছেলে, ওর মত বয়সে আমি যে মুগুর ভাঁজতাম কিংবা এ্যাভোগাড্রোর হাইপথীসিস মুখস্থ করে পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতাম, তার কোনটাই পারল না। মেয়েও এ্যাংরি ইয়ং মেন থেকে বীট-কবি সবায়ের খবর রাখলেও সেক্সপীয়ার পড়েনি এবং এক লাইনও শুদ্ধ ইংরিজি লিখতে শেখেনি। ফলে আমার দুটো কাজ বাকি আছে। একটি হল, ছেলেটির কোন মার্চেণ্ট-ফার্মে কোভেনটেড র‍্যাঙ্কে বসিয়ে দেওয়া। কেননা আমার ব্যবসা চালাবার ক্ষমতা ওর নেই। যতদিন তা না দিচ্ছি, ততদিন প্রায় সেই পরিমাণ টাকা হাতখরচ হিসেবে ওকে দিচ্ছি। আর একটা মোটর, কার-এ্যালাউন্স হিসেবে। দ্বিতীয় কাজ হল, মেয়েটির একটি বর যোগাড় করা যে ওর বর্তমান জীবন-যাপন পদ্ধতি কিছু-মাত্র ব্যাহত না করার বিনিময়ে আমার সম্পত্তির কিছুটা অংশ আশা করবে। মেয়ের বন্ধু যোগাড় করার ক্ষমতা আছে, বর যোগাড় করার নেই।

এগুলো সব করছি কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে। অস্বাভাবিক জীবন যাপন করার ফলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। পঞ্চাশ বছর বয়সেই আমাকে ষাটের কাছা-কাছি দেখাত। এদিকে স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে যেমন আহারে লোভ থাকে কিন্তু খিদে থাকে না, যৌনজীবনেও তাই, তার ওপর দুর্বল শরীরে মনকে সংযত করা যায় না। আমি তাই বাইরে বেরোনো ছেড়ে দিলাম। বাড়ীতেই যা কিছু করতাম। হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলেমেয়েদের জ্ঞাতসারেই। তাই ছেলেমেয়েকে একটু হাতে রাখতাম।

তোমায় আমি আগেই বলেছি জীবনকে আমি খুব সহজ সরল পথেই উপভোগ করতে চেয়ে-ছিলাম। কোন লুকোচুরি বা ঘোর-প্যাঁচ রাখিনি। অন্যান্য বারের মত এবারেও কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম সহকারিণী চেয়ে। ইংরিজি জানা চাই; স্টেনোগ্রাফী এবং টাইপ জানলে ভালো হয়। কাজের সময়ে সকালে দু-ঘন্টা। যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল, তাদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট ছিল, স্টেনো-টাইপীস্ট ছিল, পি-এ-র কাজে অভিজ্ঞতা আছে, এমন মেয়েও ছিল, একটি কাহিল-কাহিল চেহারার মেয়ে ভীতু ভীতু চোখদুটো তুলে বলল, "আমি পড়ি।"

মেয়েটিকে নিয়োগ করলাম। আমি ঠিক এদেরই খুঁজি। পড়ার খরচ চালানোর জন্য আংশিক সময়ে উপার্জন করতে চায়, এই বলে তো চাকরি করতে আসে। সত্যিই পড়ে কিনা জানি না। হাতে-লেখা একটা ইংরিজি চিঠি পড়তে বললে 'স্যার' অবধি এসে থমকে যায়। ইংরিজি খবরের কাগজ পড়তে বললে মিন-মিন করে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে কিযে পড়ে, কিছুই বোঝা যায় না। শেষ অবধি বাংলা কাগজটাই পড়তে বলি। তুমি বলবে, ওরা ছাত্রী হতেও পারে; কেননা এখন ইংরিজির মানটা খুব কম। যাইহোক ও ব্যাপারে আমার কৌতূহল নেই। তবে

দেখেছি, পড়াশোনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ওরা একটু এড়িয়ে যেত। বি-এ-র ইংরিজির কি সিলেবাস, টেস্ট পরীক্ষা কবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিত ভাসাভাসা। আমিও আর ওসব নিয়ে বেশী ঘাঁটাতাম না। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত বাংলা দেশে এই ধরণের চাকরিতে মেয়ের অভাব হয় না। চাকরির দাবী মেটাতে এরা যেন খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আসত। মোটামুটিভাবে ছমাস থেকে এক বছর এক একজন কাজ করত। তারপর চলে যেত।

ডিসেম্বরের এক সকালে মেয়েটি কাজে যোগ দিতে এলো। লেকের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ওর কাহিল চেহারাটা বেশ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ঠোঁটগুলো ফেটে গিয়েছিল। গায়ে গরম পোষাক কিছু ছিল না। আমি ওকে গরম কফি দিলাম, সঙ্গে টোস্ট আর ওমলেট। ও একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর খেয়ে নিল। ওকে বাংলা খবরের কাগজটা পড়তে বলে আমি চিঠিপত্রের ট্রে-টা টেনে নিলাম। এ সময়টা বড় বিরক্তিকর। রিডিং পড়াও যে শিখতে হয়, এটা যেন আজ-কাল ছাত্রছাত্রীরা ভুলে যাচ্ছে। মিনমিনে গলার একঘেঁয়ে মন্ত্রোচ্চারণ শোনবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। মেয়েটি চমৎকার-ভাবে পড়তে শুরু করে দিল। তারপর ওকে একটা কদর্য হস্তাক্ষরে লেখা ইংরাজি চিঠি পড়তে দিলাম। মেয়েটি কৃতকার্য হল।

প্রথম সপ্তাটা ওকে খুব কাজ দিতাম। ও বেশ খুশী মনেই করত। আমার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। চায়ের টেবিলে ওরা দুজনে আলোচনা করত। আমি শুনতাম। প্রথম প্রথম মেয়েটি চুপচাপ থাকত। কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই আমার মেয়ের অল্প পড়াশোনা, বেশী কথা বলা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে পরম বোদ্ধার মত অতিনাটকীয় মন্তব্য করার সুযোগে ও মুখ খুলল। আমাদের সময়ে অর্থাৎ সেই পুরোনো যুগে ছাত্র-ছাত্রী বলতে আমরা যা বুঝতাম, মেয়েটিকে আমার ঠিক তাই মনে হল। অবশ্য আগেই ও বলেছিল, ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষা দেবে। তখন ওর কথায় তত আমল দিই নি।

কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তায় ওর সেই খুশী-খুশী ভাবটা যেন আর থাকছিল না। আমার মেয়ের অনুপস্থিতিতে খবরের কাগজের সিনেমার পাতা থেকে আমরা সহজেই মানুষের জীবন, যৌবন, প্রেম, এইসব এ্যাকাডেমিক আলোচনায় চলে যেতে পারতাম। অন্যান্য মেয়েদের মত ও প্রথম প্রথম সংকুচিত হয়ে পড়ত না। বেশ সপ্রতিভভাবে আলোচনা চালিয়ে যেত। এ্যাকাডেমিক আলোচনা থেকে মাঝে মাঝে কৌতুককণ্ঠে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসতাম। ও চুপচাপ শুনত, জবাব দিত না। নিজের জীবনের দুচার কথা বলে ওকে আরও সহজ করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অন্যান্য মেয়েরা যেমন সহজ হয়ে আসত, এর ক্ষেত্রে তা হত না।

একদিন বাইরে বেড়াতে যাব বলে পোষাক পরে এসে দেখি, ও এসে গেছে। চুপচাপ বসে বসে কাগজটা পড়ছে। আমি আস্তে আস্তে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কৌতুককণ্ঠে বললাম, "শ্রীমতী, ওঠো।"

প্রথম অঙ্গস্পর্শে ও চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আমি ওর পিঠের ওপর দিয়ে হাত রেখে মৃদু আকর্ষণ করে বললাম, "চলো আজ একটু বেড়িয়ে আসি।"

"বেশ তো চলুন।"

ওর স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনে আশ্বস্ত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, ও দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে কি যেন একটা যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছে।

এমনি করে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মুহূর্তে-গুলিকে ও যেন আড়ষ্ট হয়ে কোনরকমে কাটিয়ে দিতে চাইত। এক একবার মনে হত ও যেন একাজের উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি। কিন্তু কই, কোন-দিন তো বাধাও দেয় না। এক হতে পারে যে ঠিক অভ্যস্ত নয়। এর আগে আমার কাছে যে সব মেয়েরা কাজ করে গিয়েছিল, তারা মোটামুটি তৈরী হয়েই এসেছিল। এমনকি আমার মত বয়স্ক লোকের সঙ্গে ন্যাকামি, অঙ্গভঙ্গি, ছলাকলা ইত্যাদিও বাদ দিত না। এ মেয়েটি কিন্তু সত্যিই বেশ লেখাপড়াজানা, সভ্য, সংযত, রুচি-পূর্ণ, আদব-কায়দা দুরস্ত, সুশ্রী, চমৎকার স্বাস্থ্য। পৈত্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স ছাড়া বোধহয় আর কোনঅংশেই আমার মেয়ের চেয়ে কম নয়। সব দিক থেকেই এই মেয়েটিকে আমার ভালো লেগে গিয়েছিল।

যেদিন মেয়েটিকে মাইনে দিলাম সেদিন ওকে যেন প্রথম দেখলাম ঈষৎ চাপল্যের ছোঁয়ায় চঞ্চল। ও টাকাগুলো হাতব্যাগে পুরে রাখছিল। আমি ওর ফাটা ফাটা গালদুটো টিপে দিয়ে একটু আদর করে বললাম, "শ্রীমতীর গালদুটো এত শুকনো কেন?

এই প্রথম এই ধরণের কথায় ও যেন একটু লজ্জিত হল। সেদিন বেড়াতে বেরিয়ে মোটরে ওর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে ততটা আড়ষ্ট লাগছিল না। শুধু আমার সরব আদরে ও মাঝে মাঝে সংকুচিত হয়ে ড্রাইভারেরর দিকে তাকাচ্ছিল। মনে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে মনের সব হিমবাহকেই আর্থিক উত্তাপে গলিয়ে আনা যায়।

আমরা যখন বেরোতাম, রাস্তার অপর ফুটপাথে রোগা রোগা চেহারার একটি ছেলেকে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম। প্রথম ক'দিন বিশেষ লক্ষ্য করিনি। একদিন লক্ষ্য করলাম ছেলেটা আমার পাশে মেয়েটির দিকে কেমন যেন একটা অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

সেদিন বেরোবার সময়ে মোটরে আমার দক্ষিণ বাহু ওর পিঠের ওপর দিয়ে বিস্তৃত করে, বাঁ হাত দিয়ে ওর আঙ্গুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ওকে বেশ একটা বৃত্ত-সান্নিধ্যে এনে ফেলেছিলাম। আমার শুষ্ক বিবর্ণ-প্রায় ওষ্ঠ দুটো রেশম-চুলের কানায় মোড়া তরুণ সরস যৌবনের আস্বাদন নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। গেটের কাছে মৃদু ঝাঁকানিতে চোখ তুলে দেখলাম, ছেলেটি তার অসহায় চেহারার কোন এক গহ্বর থেকে বিদ্যুৎ-গর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। আমার করুণা হল।

সেদিন ফিরে এসে বললাম, "শ্রীমতী আমাদের এই অভিসার-যাত্রার একটি সাক্ষী থেকে যাচ্ছে।"

মেয়েটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

"ফসা-ফর্সা, রোগা-রোগা, চশমা-চোখে একটি ছেলে।"

এক মুহূর্তে মেয়েটির কাহিল মুখও রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "কোথায়?"

"গেটের সামনে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে।"

আর্কিড-ঝোলানো জানালা দিয়ে ও বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। পাম গাছ-গুলোর পাশ দিয়ে, পাতাবাহারের গাছ-গুলো পার হয়ে ওর দৃষ্টি রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় শূন্য স্থানে কাকে যেন খুঁজে এলো।

পর পর দুদিন ও এলো না। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। একটু উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবলাম, অর্থবায়টা এবার ব্যর্থ হল কিনা।

তৃতীয় দিনে ঈষৎ শুষ্ক চেহারা নিয়ে ও উপস্থিত হল। যথারীতি প্রশ্নের উত্তরে ও জানালো, দুদিন একটু অসুস্থ ছিল। তাই আসতে পারেনি।

আমি আরোপিত সহানুভূতি দেখিয়ে বললাম, "আমি ভেবেছিলাম খবর নেব। কিন্তু কোথায় তোমার বাড়ী তা তো জানি না।"

ও বললে, "আমার বাড়ী কসবায়।"

'অতদূর থেকে আসা!! তুমি তো বাড়ীর কাছাকাছি একটা টিউশানি নিতে পারতে।"

"আমার একটু বেশী টাকার দরকার।"

"অত টাকা নিয়ে করবে কি!" আমি ঈষৎ হাল্কা গলায় বললাম।

"দুজনের পরীক্ষার ফী জমা দেবার জন্য অনেকগুলো টাকা লাগবে।"

"তুমি কি সত্যি সত্যি পড়ো নাকি।"

মেয়েটি অবাক-চোখে আমার দিকে তাকালো।

আমি একটু অপ্রস্তুতে পড়ে জিগেস করলাম, "মানে বলছিলাম কি, তাহলে কলেজে যাও কখন?"

"এখান থেকে সোজা কলেজে চলে যাই।

"সেকি! তাহলে খাওয়া-দাওয়া?

"দুটো-পয়তাল্লিশে ক্লাশ শেষ হয়। তারপর বাড়ী গিয়ে খাই।"

"টি-বিতে মরবে যে।"

মেয়েটি আমার কথা শুনে হেসে ফেলল; বলল, "না, মরব না।"

"কিন্তু দুজনের খরচ চালাতে হয় কেন? আর বাঝি অন্য ভাইবোন আছে?

"আছে, কিন্তু তাদের জন্য নয়।"

"তবে?"

আমার অনুসন্ধিৎসু মুখের দিকে ও সোজাভাবে তাকালো।

"একটি ছেলে আমায় পড়াশোনা চালানোয় বারবার সাহায্য করে আসে। হঠাৎ ওর টিউশানিগুলো চলে গেছে। অথচ এই সময়ে পরীক্ষার ফী জমা দেবার জন্য বেশ কিছু টাকার দরকার। তা না হলে ওর পরীক্ষা দেওয়াই হবে না।"

আমার মনে হয় ন্যাকামি, অসহ্য ন্যাকামি। ফুটপাথের ওপরে অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে-থাকা যে ছেলেটির জন্য সেদিন করুণাবোধ করছিলাম, আজ যেন প্রচণ্ড রাগ হল তার ওপর।

সেদিন বেড়াতে না গিয়ে ওকে দিয়ে টানা দেড়-ঘণ্টা কাজ করলাম। তারপর যখন ও ওঠার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়ছিল, তখন ওকে বসিয়ে রেখে আরও কাজ দিলাম।

আচ্ছা অধ্যাপক, বছরের ছটা ঋতুই নাকি পৌষ মাসে একবার দেখা দেয়? সেদিনটায় বোধহয় শ্রাবণের একটুকরো সকাল এসে পড়েছিল পৌষের ওপর। ভোরেই ঘুম ভেঙেছিল। কিন্তু লেপ ছেড়ে কিছুতেই বাইরে আসা যাচ্ছিল না। ঠাণ্ডায় গলা বসে গিয়েছিল, মুখ খুলতে পারছিলাম না, নাক দিয়ে কাঁচা জল গড়াচ্ছিল। বেড-টি খেয়ে অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম। কাচের সার্সি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, সব মেঘে ঢাকা রয়েছে। বাগানের গাছপালা-গুলো কুয়াশায় মাখামাখি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন সার্সি ভেদ করে আমার বুড়ো হাড়গুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ঝিপ ঝিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

শীতকালের সকালে এই মেঘলা স্যাঁত-সেঁতে আবহাওয়া যেন এক বিষণ্ণ মেজাজের সৃষ্টি করে। মৃদু মৃদু বৃষ্টির শব্দের ফাঁকে ফাঁকে যেন গির্জার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাই। এই বিষণ্ণতা অনুভবের কারণ কি জানো, অধ্যাপক, প্রকৃতির এই পরিবেশের সঙ্গে শরীরটাকে যখন আর পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারি না, তখন নিজের বয়সটা যেন বড্ড বেশী বলে মনে হতে থাকে।

গরম জল দিয়ে কুলকুচি করে করে গলাটা ঠিক করলাম। দাড়ি কামিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদ পরে আয়নার সামনে দাঁড়াতে গাল-তোবড়ানো এক বুড়োর মুখ ভেসে উঠল। মনে পড়ে গেল, দাঁতটা পরা হয়নি। সেটা পরলাম। অল্প-সল্প প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করলাম মন এবং দেহটাকে একটু ঝরঝরে করবার জন্য। আশা অনুরূপ ফল না পেয়ে সেই শীতের সকালে একটু ব্র্যাণ্ডি পান করলাম। মেয়েটি আজ আসবে কিনা ভাবলাম। কেন আসেনি এই কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেয়ে ও একটু কষ্ট করে আসাটাই পছন্দ করবে। আরও একটু ব্র্যাণ্ডি পান করে কিছুটা তাজা বোধ করলাম।

প্রাতরাশ টেবিলে ও এসে হাজির হল। একটা সসারে গরম দুধ আর কর্ণ-ফ্লেক্স্ ঢেলে তাড়াতাড়ি ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ওর ঠাণ্ডা নীল গালদুটো একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তামাক আর পাইপটা ওঘর থেকে এনে দেখি, খাওয়া শেষ করে ও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পেছনে এসে দাঁড়ালাম। কাঁধদুটোর ওপর হাত রেখে বললাম, "কি দেখছ?"

ও চমকে উঠল, তারপর বলল, "ঐ কাকটাকে।"

সার্সি ভেদ করে আমার ক্ষীণ দৃষ্টি বৈদ্যুতিক তারের ওপর একটা কাককে দেখতে পেল। কাকটা বসে বসে ভিজছে। মাঝে মাঝে মাথা ঝাড় দিয়ে গায়ের পালকগুলো ফুলিয়ে দেহের উষ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ওকে দেখে আমারও শরীরটা শীত শীত করে উঠল। আমি মেয়েটিকে দৃঢ়তর বাহুবন্ধনে পেতে চাইলাম। মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত পুতুলের

মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে মাহমুক্ত হয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলল, "আজ কোন কাজ নেই?"

আমিও এগিয়ে এসে মৃদু হেসে বললাম, "আছে।" তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

ও চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। উত্তেজনা প্রশমিত করতে চাইছে দেখে আমি ওর সামনে এগিয়ে এসে বললাম, "শ্রীমতী, চঞ্চল হয়ো না। ভেবে দেখ, আমরা দুজনেই জীবনে কিছু না কিছু পাইনি।"

ও ত্রস্তে আমার দিকে চেয়ে কম্পিত কন্ঠে বলল, "আমি পেয়েছি।"

আমি ওর মুখটা তুলে ধরে বললাম, "শ্রীমতী, আমার আন্তরিকতায় সন্দেহ করো না।"

ও শুষ্ক কন্ঠে জবাব দিল, "কি চান আপনি?"

আমি জবাব দিলাম না। আমার শুষ্ক বিবর্ণ প্রায় ওষ্ঠ দিয়ে সরস যৌবন পান করতে লাগলাম। হঠাৎ প্রগাঢ় সুখানুভূতির সমুদ্রে লোনা জলের স্বাদ লেগে চমক ভাঙলো। দেখি, চোখের জল! নেশা আমার পানশেষ হয়ে এলো। তীব্র বিরক্তিতে দেখলাম, মেয়েটি মুদিত নয়নে, ঠোঁট কামড়ে ধরে, থরথর করে কাঁপছে, কাঁধ দুটো ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "কি ভেবেছ তুমি?"

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে মেয়েটি জবাব দিল, "বিশ্বাস করুন আপনি, এ ধরণের চাকরির কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সুস্থ একটা জীবনবোধকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে যে টাকাটুকুর দরকার তারই লোভে আমি এখানে এসেছি। চেষ্টা করেছি, কিছুটা মানিয়ে নিয়ে আপোষ করে চলতে। কিন্তু কোনদিন এত সহজ করে টাকা পেতে চাইনি। চাইনি এত সহজ করে জীবনের বাধাগুলো ডিঙিয়ে যেতে।"

আমি কোন জবাব দিলাম না। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাকে বলি। আমার পদ্ধতিটা কি সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষণ নয়? আমার একটা মানসিক অতৃপ্তিকে আমি অত্যন্ত ভদ্র এবং রুচিসম্মত উপায়ে অপরপক্ষের সম্মতিতে তৃপ্ত করে থাকি। কেউ যদি ভুল বুঝে এসে পড়ে, সেটা আমার অপরাধ নয়। মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিশেষ করে সেই ছেলেটি তাকে সাবধান করে দিতে পারত।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "কি চাও এখন?"

"আমার বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে আমায় ওর কাছে ছোট করে দেবেন না। ও আমায় সাবধান করে দিয়েছিল, মানুষকে অবিশ্বাস করে তাকে ছোট করতে।"

"ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পার।"

ওর কান্না-ভেজা মুখে হাসির আভাস দেখা দিল। ও বললে, "আমি জানতাম।"

বলে এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে ফেলল।

"দাঁড়াও!"

ও ফিরে তাকাল। আমি ওর হাতে একটা খাম দিয়ে বললাম, "তোমার যৌবনকে ব্যবহার করবার জন্যই তোমায় রাখা হয়েছিল। এই নাও তোমার এ-মাসের মাইনে।"

ও খামটা নিয়ে হাসিমুখে বলল, "কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন আর এটার দরকার নেই।"

বলে ঘরের মেঝেয় খামটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িতে ওর পদশব্দ শুনতে মনে হল একসঙ্গে দুটি তরুণ-তরুণীর পরীক্ষা দেওয়ার ভবিষ্যৎ মাড়িয়ে মাড়িয়ে ও চলে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি খামটা কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখি সিঁড়ির তলায় মেয়েটি আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

আমার ছেলে বলল, "আমি সুমন্তকে বলেছিলাম, আপনাকে এখানে আসতে বারণ করতে।"

মেয়েটি যেন রাগে জ্বলছে। বললে, "কেন বারণ করেছিলেন?"

ও থতমত হয়ে গেল। জবাব দিতে পারল না।

"বলুন। চুপ করে রইলেন কেন? বলুন। ছেলের মুখে পিতৃ-পরিচয় শুনে মনের জ্বালাটা একটু জুড়োই।"

দেখলাম, আমার ছেলের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"সুমন্তকে তো বলে এসেছিলেন আমাকে এখানে আসতে বারণ করবার জন্য। কিন্তু সাহস করে তো বলে আসতে পারেন নি, লোকটা আপনার বাবা।"

আমার ছেলে চুপ।

"যাক, আপনার মানবতাবোধের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এ মানবতাবোধ পিতৃ-সম্পত্তির ছায়াতেই বর্ধমান। তাই নয় কি? এ পরগাছা-বৃত্তিটুকু ত্যাগ করতে পারলে আপনি বোধহয় এ শতাব্দীতে বেঁচে যেতে পারেন। ভেবে দেখবেন কথাটা, আচ্ছা নমস্কার।"

মেয়েটি চলে গেল।

সিঁড়ির নীচে আমার ছেলে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল; ওপরে আমি।

কাঁধ দুটোর ওপর হাত রেখে বললাম, "কি দেখছ?"

।। এক ।।

দেবতার দেশ এই ভারতবর্ষ। কিন্তু আজ এই দেশের দিকে তাকিয়ে বেদনায় বুক ভরে ওঠে। দুঃখ-দুর্দশার জন্য বেদনা নয়। যুদ্ধ করে দুঃখকে জয় করা যায়। আমার বেদনা হয় নিজেদের বিস্মৃতির কথা ভেবে। আমাদের ঐতিহ্য তো এক বছরের নয়, এক হাজার বছরেরও নয়। এদেশ জেগেছিল পৃথিবীর জন্মের দিনে। অন্য দেশের মানুষ যখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে, এদেশ তখন সভ্যতার শিখরে উঠেছে। এই সত্য কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। কেউ মনে করিয়ে দিলেও শুনতে চাইনে। বিদেশকে আমরা আজ অন্ধভাবে অনুকরণ করে আনন্দ পাই।

গুরুজী বলছিলেন, আর আমরা শুনছিলাম।

দেবতার দেশ এই ভারতবর্ষ। দেবতা যত, দেবতার মতো মানুষও তত। ঋষি-মনীষী সাধু মহাত্মা মহাপুরুষ, বীর কবি শিল্পী গায়ক। কত জ্ঞানী-গুণী পুরুষ ও নারী। কত ঐশ্বর্যে ভরা এই দেশ। মন্দিরময় তীর্থ জনপদ শৈলাবাস, কত দুর্গ, কত ইতিহাস, পুরাণ দর্শন সাহিত্য, সঙ্গীত নৃত্য শিল্প ও বিজ্ঞান। কজন এই দেবতার দেশকে জানে, জানে এই দেশের গৌরবের কথা।

সত্য কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছি। কিন্তু এসব কথা তো শিখিনি। আমার রোমাঞ্চ হল। দাদা আমার মুখের দিকে চেয়ে কিছু বোধহয় অনুমান করলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না। এম-এ পরীক্ষা দিয়ে আমি দাদার কাছে এসেছি দণ্ডকারণ্যে। এই অরণ্য সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। বন-জঙ্গল কেটে বাস্তুহারাদের কোথায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে, সে কথা জানবারও কোনদিন চেষ্টা করিনি। নূতন রেললাইন পাতবার কাজে স্থানে স্থানে যেমন ঘাঁটি হয়েছে, তারই এক ঘাঁটিতে দাদা বদলি হয়ে এসেছেন। আমি তাঁর কাছে বেড়াতে এসেছি।

পাকা ঘরবাড়ি নেই। তাঁবুর ভিতরে আমাদের বসবাস। ছোট-বড় সকল শ্রেণীর কর্মীদেরই প্রায় একই অবস্থা। যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণই সময় কাটে। তারপর অসীম অন্ধকার। নির্জন অরণ্য পরিবেশে প্রাণ-মন হাঁপিয়ে ওঠে। ভয় করে। দাদা একে নির্বাসন বলেন, কবে মুক্তি পাবেন সেই তাঁর একমাত্র চেষ্টা।

আজ কাজ থেকে ফিরে এসে বলেছিলাম : খবর পেয়েছি।

কিসের খবর ?

মানুষের।

বাঘের যে নয়, তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে মানুষ কোথায় ?

চল যাই আজই দেখে আসি।

দুই ভাই আমরা তখুনি বেরিয়ে পড়লাম। সত্যিই মানুষ আছে। একজন দুজন নয়, অনেক মানুষ। বনের এক প্রান্তে একটি ছায়াচ্ছন্ন আশ্রম। ছোট ছোট কুটীর আছে অনেকগুলি। এমনি একটি কুটীরের সামনে উপাসনার মন্দিরে গুরুজীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

সবাই তাঁকে গুরুজী বলে। বয়স তাঁর অনুমান করতে পারিনে। সৌম্য মুখে জরার চিহ্ন নেই। আছে ঋষিসুলভ প্রসন্নতা। শিষ্যরা তাঁর কাছে অধ্যয়ন করছিলেন। আমাদেরও অভ্যর্থনা করে বললেন : এস এস।

কেন জানি না, তাঁকে প্রণাম করতে ইচ্ছা হল। আমরা বসবার আগে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম। গুরুজী বললেন : বেঁচে থাক।

হিন্দীতে বললেন। শিষ্যরা একটু নড়ে-চড়ে আমাদের বসবার জায়গা দিলে।

শৈশবে টোলের গল্প পড়েছি। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতরা টোল খুলতেন। শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিতরা। দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। গরিব ছাত্র। পণ্ডিতমশাইও গরিব। অনেক অসচ্ছলতায় এই সব টোল চলত। নবদ্বীপের বুনো রামনাথের গল্প পড়েছি। তাঁর ব্রাহ্মণী দেশের রাজার অযাচিত দান গ্রহণ করেন নি। বলেছিলেন, 'আমার অভাব কিসের ? শোবার মাদুর আছে, ভাত খাবার পাথর আছে, রাঁধবার হাঁড়ি আছে, আর তেঁতুল গাছে আছে যথেষ্ট পাতা,—কর্তা তো তেঁতুল পাতার ঝোল খেতেই ভালবাসেন।' কিন্তু আজকের এই ছেলে-মেয়েদের দেখে টোলের ছাত্র বলে মনে হয় না। বয়সে সবাই নবীন নন, অনেকেই মনে হল লেখাপড়া সম্পূর্ণ করে এসেছেন। দু-একজন প্রবীণও আছেন। তাঁরাও মনোযোগ দিয়ে গুরুজীর কথা শুনছেন।—

আমি এই দেশকে দেবতার দেশ বলি। এদেশের মানুষ একদিন সত্যিই দেবতা ছিল। তেত্রিশ কোটি দেবতা। তাঁদের কথা একদিনে বলে শেষ হয় না। একজনে বলেও শেষ করতে পারে না। এ কথার শেষ নেই।

হঠাৎ আমার দাদার দিকে চেয়ে বললেন : তোমরা ?

দাদা বললেন : আপনার নাম শুনে দেখতে এসেছি।

আমার কী হল জানিনে, বলে ফেললাম : আমি আপনার কাছে থাকতে এসেছি।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন : সত্যি ?

দাদার দৃষ্টিতে আমি বিস্ময় দেখলাম। কিন্তু আমি সেই ভদ্রলোককে বললাম : সত্যি।

ফেরার পথে দাদা বললেন : এ কী করলি ?

দাদাকে সাহস দিয়ে বললাম : ভাবছ কেন! ভাল না লাগে, তোমার কাছেই আবার ফিরে আসব।

পরদিন সকালেই আমি গুরুজীর আশ্রমে এলাম ভর্তি হতে। দেবতার দেশের কথা আমি জানব, জেনে অপরকে বলব। এমনি একটি সংকল্প আমার মনে দানা বেঁধেছে।

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সবাই তাউজী বলেন। মানে জ্যাঠামশাই। তাঁরই হাতে আশ্রমের ভার। চোখে চশমা এঁটে একখানা খাতা খুললেন, বললেন : নাম?

আমার নাম?

তোমাকে আমি অন্যের নাম কেন জিজ্ঞাসা করব!

পিছনে হাসির শব্দ শুনে আমি ফিরে তাকালাম। অল্পবয়সের একটি সুশ্রী মেয়ে। হাসতে হাসতেই বলল : যেমন বোকা-বোকা চেহারা!

গম্ভীর গলায় তাউজী বললেন : সুপ্তি!

সুপ্তি পালিয়ে গেল।

আমি বললাম : ও কে তাউজী?

আমার মেয়ে।

তারপরেই তাঁর নিজের প্রশ্নে ফিরলেন : নাম?

নাম বলতে আমার লজ্জা হল। ঐ বেহায়া মেয়েটা নাম না শুনেই হেসেছে, শুনলে না জানি কী করবে। নামটা কি পালটে দেব?

তাউজী এক ধমক দিলেন : বোবা নাকি?

তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম : বিনায়ক।

বেশ নাম তো, সিদ্ধিদাতা গণপতি গণেশ। এবারে আমাদের সিদ্ধি হবে।

দূর থেকে আবার সেই হাসির শব্দ শুনলাম।

টাকা-পয়সা জমা করে যখন ছুটি পেলাম, তখন সুপ্তি আবার ফিরে এসেছে।

বলল : তোমার খুব অসুবিধা হবে।

কেন?

আমরা সবাই অনেক এগিয়ে গেছি।

তারপরেই বলল : তোমার বাড়ি কোথায়?

বাঙলাদেশে।

খবরদার।

আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই সুপ্তি হেসে ফেলল। বলল : বল দেবতার দেশে।

বললাম : দেবতার দেশে।

মনে থাকবে তো?

থাকবে।

আর ভুল হবে না?

না।

সুপ্তি হাসতে হাসতে সরে গেল।

।। দুই ।।

দুপুরবেলায় তাউজী আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন : আমি তোমাকে প্রথম পাঠ দেব।

বলে একখানা খাতা আর পেন্সিল দিলেন। আমি কোন উত্তর না দিয়ে সে দুটি সংগ্রহ করে নিলাম।

তাউজী বললেন : সকালবেলায় তোমরা যথেচ্ছ পড়াশুনো করবে, লিখবে।

কী লিখব?

যা কিছু টুকে রাখতে ইচ্ছে করবে, তাই লিখবে। ইচ্ছে না করলে কিছুই লিখবে না। দুপুরে আমাদের আলোচনা, আর বিকালে গুরুজীর কাছে পাঠ গ্রহণ। আমরা এখন দেবতার কথা শিখছি। বেদের তেত্রিশ দেবতা পুরাণে তেত্রিশ কোটি কী করে হল, সে কথা আমাদের শেখা হয়ে গেছে।

তাহলে?

ভয় নেই, আমি তোমাকে সংক্ষেপে সেই পাঠ দেব। পরে একদিন গুরুজীর কাছে সম্পূর্ণ জেনে নিও।

তাউজী আমাকে দেবতার কথার প্রথম পাঠ দিলেন।

দ্যোতনাদ্দেবঃ। যে দীপ্তিমান সেই দেব। কিন্তু আর্য ঋষিরা ঠিক এই অর্থে দেবতা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কিনা, আজ তাতে সন্দেহ জেগেছে। ঋক-সংহিতার অনুক্রমণিকায় কাতায়ণ ঋষি লিখেছিলেন :

যস্য বাক্যঃ স ঋষিঃ,
যা তেনোচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং
যদ্বস্তু সা দেবতা॥

যাঁর কথা, তিনি ঋষি। যাঁর বিষয় কথা, তিনি দেবতা। ঋষিবাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুই দেবতা। ঋগ্বেদে তাই সূর্য চন্দ্র গ্রহাদিই দেবতা নন, গিরি নদী বনস্পতিও দেবতার মত স্তুত হয়েছেন।

ধীরে ধীরে দেবতার সংজ্ঞা বদলাতে লাগল। নিরুক্তকার যাস্ক বললেন : দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা। দান ও দীপনের জন্য যিনি স্বর্গস্থানীয় হন, তিনিই দেব ও দেবতা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই ধারণাকে স্পষ্টতর করলেন :

দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাৎ
রোচতে দ্যোততে দিবি।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ
স্তূয়তে সর্বদৈবতৈঃ॥

স্বর্গে যাঁরা দীপ্তিমান, তাঁরাই দেবতা।

ভয়ে ভয়ে তাউজীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : এই সমস্ত শ্লোক আমাকে মুখস্ত করতে হবে?

তাউজী হাসলেন, বললেন : সংস্কৃতে ভয় আছে নাকি?

অধিকার নেই বলেই ভয়। ও ভাষায় দখল থাকলে হয়তো আনন্দ পেতাম।

তাউজী বললেন : যদি ভাল লাগে, একটু চর্চা ক'রো। দেবতার দেশের কথা জানতে হলে দেবভাষায় খানিকটা অধিকারের দরকার আছে।

বললাম : শিখে নেব।

তাউজী বললেন : সংস্কৃতের একজন অধ্যাপক শিষ্য হয়ে এসেছেন, সুপ্তিরা তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখছে।

তাহলে তো ভালই হল। আমিও তাঁর কাছে শিখতে পারব।

তাউজী বললেন : তোমাকে তাহলে সংস্কৃত শ্লোক বাদ দিয়েই বলি।

নিরুক্তকার যাস্ক লিখেছেন যে দেবতা তিনজন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশে সূর্য। তাঁরা ভাগ্যবান, কারণ তাঁদের অনেক নাম। এমনও হতে পারে যে, হোতা অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতার বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন নাম। দেবতাও স্বতন্ত্র হতে পারেন।

ঋক-সংহিতায় একাদশ দেবতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীতে একাদশ, অন্তরীক্ষেও একাদশ, আপন মহিমায় তাঁরা যজ্ঞ সেবা করেন।

একটু থেমে বললেন : এর পরে এল তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ। উপনিষদ তেত্রিশ দেবতা আমাদের ধন দান করুন। কিন্তু এই দেবতাদের পরিচয় নেই ঋক-সংহিতায়। শতপথব্রাহ্মণে পাই যে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য মিলে একত্রিশ, ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে নিয়ে তেত্রিশ।

এই নামের সঙ্গে ঋক-সংহিতায় প্রাপ্ত নামে কিছু অসঙ্গতি আছে। সেখানে আমরা আরও অনেক নাম পাই: অগ্নি মিত্র ও বরুণ বা মিত্রাবরুণ উষা অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য পূষা মরুৎ রুদ্র সোম ঋভুগণ সরস্বতী ব্রহ্ম।

ঠাকুরজী বললেন : এই সমস্ত দেবতার পরিচয় তোমাকে পরে দেব, আজ অন্য কথা বলি।

ঋক-সংহিতার এক জায়গায় আমরা একটি অদ্ভুত শ্লোক পেয়েছি। তিন হাজার তিনশো উনচল্লিশজন দেবতা অগ্নির পূজা করেছেন। সায়নাচার্য বোঝালেন যে, দেবতা মাত্র তেত্রিশজন, আর তিন হাজার তিনশো উনচল্লিশজন তাঁদের মহিমা প্রকাশক। এই সব অসঙ্গতি দেখে বৈদিক ঋষিরাই দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলেন :

প্র সু স্তোমং ভরত বা
জয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উঃ ত্ব আহ
ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম।।

আবার সংস্কৃত শ্লোক!

ভুল হয়েছে। আমি তোমাকে মানে বলে দিচ্ছি। ইন্দ্রের যদি অস্তিত্ব থাকে তবে, হে জয়াভিলাষী: তোমরা তাঁর উদ্দেশে সত্যভূত শ্লোক উচ্চারণ কর। নেম ঋষি বলেন, ইন্দ্র নামে কেহ নেই। কে তাঁকে দেখেছে? কার স্তুতি আমরা করব?

এ একটা সাময়িক সন্দেহের কথা। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আমরা তেত্রিশজন সোমপ এবং তেত্রিশজন অসোমপ দেবতার উল্লেখ দেখি। সোমপায়ীরা সোমপানে প্রীত হন, অন্যেরা তৃপ্ত হন পশুবলিতে। এই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণেই আমরা দেবাসুর সংগ্রামের প্রথম পরিচয় পাই। ঋক-সংহিতার অনেক মন্ত্রে দেব ও অসুর শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনও অবশ্য বৈর ভাব প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয়েছে যে, ঐ দুটি শব্দ দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির সংঘর্ষের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পুরাবিদেরা অন্য অর্থ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, দেবাসুরই পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি। প্রথমে তাঁরা মিত্র ছিলেন, পরে তাঁরা শত্রু হয়েছেন। কেহ বলেন, দেবাসুর দুই জাতি নয়, দেবোপাসক ও অসুরোপাসক দুই জাতি, তাদের সংগ্রামই দেবাসুরের সংগ্রাম নামে পরিচিত।

বেদের পর পুরাণের কথা। তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি দেবতায় পরিণত হল।

যদারা বিবুধাঃ সর্বে স্বানাং
স্বানাং গনৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ
কোটি সংখ্যাভয়াঃ ভবন।।

ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : গুরুজীও কি কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক বলেন?

ঠাকুরজী হেসে বললেন : কাল ওঁর মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনেছ?

না।

তবে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

আপনার ব্যাপার দেখে।

হাসতে হাসতেই ঠাকুরজী বললেন : ফাঁকা কলসীর আওয়াজ যে বেশি, তা বুঝি জান না!

হেসে বললাম : তারপরে বলুন।

এর পরে গুরুজী বলবেন। আজ পুরাণের দেবতার আলোচনা হবে।

সে তো সব আজগুবি গল্প।

আজগুবি ভাবলে কোন উপায় নেই। বিশ্বাস দিয়ে আমরা দেবতা গড়েছি। বিশ্বাস দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছি। এই বিশ্বাস হারালে হিন্দু দেবতত্ত্বই তার অস্তিত্ব হারাবে। সেই নেম ঋষির কথা, কে দেখেছে তাঁকে? কার স্তুতি আমরা করব?

ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম।
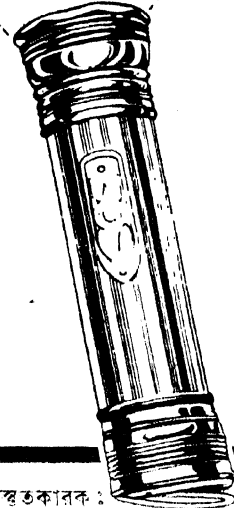
(ক্রমশঃ)

ভারতের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ

রঞ্জনকুমার সোম

অর্থনৈতিক উন্নতিপ্রয়াসী পরিকল্পনার জন্য জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার গণনার প্রয়োজন অপরিহার্য। ভারতের জনসংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সাস অবধি কোন বিশেষ নিয়ম মেনে বাড়েনি। কখনো বরং কমেছে। কিন্তু তারপর থেকে সর্বশেষ ১৯৬১ সালের সেন্সাস অবধি জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১নং ছকে ও ১নং রেখাচিত্রে ১৮৯১ থেকে ১৯৬১ অবধি ভারতের জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার দেওয়া আছে। ১৮৯১ সালের জনসংখ্যাকে যদি ১০০ ধরা যায়, তবে তা ১৯২১ সালে চল্লিশ বছর পরে হয়েছে মাত্র ১০৬; এ হচ্ছে প্রতি বৎসরে শতকরা ০·১৫ হারে বৃদ্ধি। অন্যদিকে ১৯২১ সালের জনসংখ্যাকে যদি ১০০ ধরা যায়, তাহলে ১৯৬১ সালে ত্রিশ বছর পরে তা হয়েছে ১৭৫; অর্থাৎ বৃদ্ধিহার প্রতি বৎসর শতকরা ২·৫, যেটা পূর্ববর্তী চল্লিশ বৎসরের বৃদ্ধিহারের ১৭ গুণ।

১নং ছক : ভারতের জনসংখ্যা
১৮৯১—১৯৬১

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)	পূর্ববর্তী দশকে শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস
(১)	(২)	(৩)
১৮৯১	২৩·৫৯	—
১৯০১	২৩·৫৫	−০·২
১৯১১	২৫·০৭	+৫·৭
১৯২১	২৪·৯৯	−০·৩
১৯৩১	২৭·৭৪	+১১·০
১৯৪১	৩১·৬৯	+১৪·২
১৯৫১	৩৫·৯২	+১৩·৩
১৯৬১	৪৩·৬৪	+২১·৫
১৯৬৬	৪৯·৭০*	—
১৯৭১	৫৬·১০*	—

*অনুমিত

১৯৪১—৫১, এই দশ বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ১·৩ হারে। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৫১—৬১) জনসংখ্যাবৃদ্ধি মাপার জন্য এই হারই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় থেকে অনুভূত হতে থাকে যে, জনসংখ্যা আরো বেশী হারে বাড়ছে। শতকরা ১·৩ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে ধরলে বৎসরে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ বাড়ছে বলে মানতে হত। কিন্তু অন্য মতানুযায়ী শতকরা ১·৯ বা ২ হার ধরলে ভারতের জনসংখ্যা বাড়ে প্রতি বৎসরে ৮০ বা ৯০ লাখ। এ দুই অঙ্কের তফাৎ, গত দুটি পরিকল্পনার দশ বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন কোটি দাঁড়ায়। সাড়ে তিন কোটি নেহাৎ ফেলনা নয়, কাজেই পরিকল্পনাতে নুতন ক'রে বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে ধরা যায়। অথচ সেই সময়ে অন্য কোন হিসেব ছিল না যা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের গণনা করা যায়। জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে আছে বটে, কিন্তু এও অজানা নেই যে, এই রেজিস্ট্রেশন সংখ্যাদি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, যে কারণে সরকারী মহলেও এর কোন ব্যবহার হয় না।
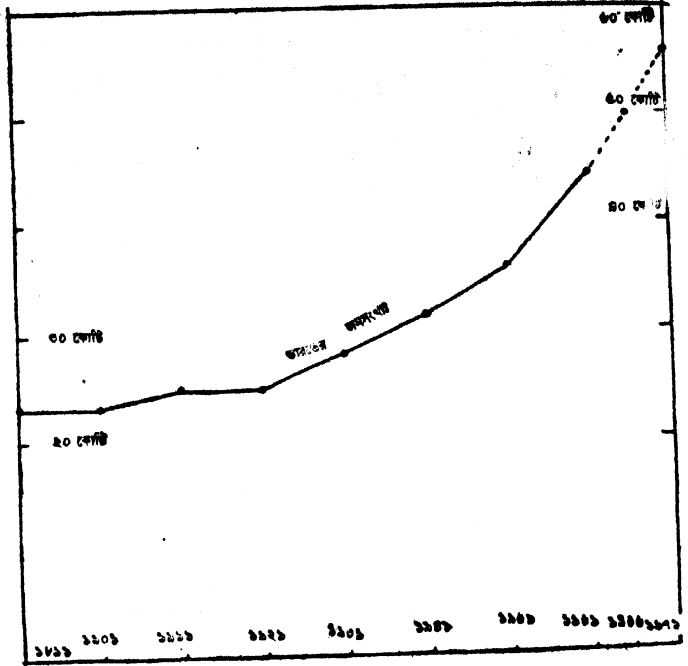
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংখ্যাতাত্ত্বিক উপদেষ্টা (এবং ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব পরিষদের ডিরেক্টর) অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরামর্শক্রমে জাতীয় নমুনা সংস্থার মাধ্যমে ১৯৫৮-৫৯ সালে এক নমুনা সংস্থা পরিচালিত হয়। এর ফলাফল এদের ৪৮নং রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। গণনায় জানা গেছে, গ্রামীণ ভারতে ১৯৫৭-৫৯ সালে লোকসংখ্যা ১·৯ হারে বেড়েছে। ১৯৫৯ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করেন, তাদের হিসেবে ভারতের অনুমিত জনসংখ্যার একটি প্রধান ভিত্তি ছিল এই নমুনা সংস্থার গণনা, পরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির অনুরূপ হারই দেখা গেছে।

কিন্তু শুধু এই বৃদ্ধিহার থেকে ভবিষ্যৎ ভারতের জনসংখ্যার সম্পূর্ণ রূপ অনুমান করা যায় না। বৃদ্ধিহারের একটি সমীকরণ হলো:—

বৃদ্ধিহার = জন্মহার — মৃত্যুহার + নীট দেশান্তরীণ হার। ভারতের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ও শহর-গ্রামের মধ্যে স্থায়ী দেশান্তরীণ সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু ভারত থেকে স্থায়ীভাবে অন্যত্র দেশান্তরী অথবা অন্য দেশ থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে বাসকারী লোকের সংখ্যা বর্তমানে নগণ্য। বর্তমান পৃথিবীর নানা বিধি-নিষেধের মধ্যে এই সংখ্যা আরো কমতে বাধ্য।

১ নং রেখাচিত্র

সমগ্র ভারতের মোট জনসংখ্যা-বৃদ্ধিহার তাহলে জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান থেকে পাওয়া যায়। ১৮৮১ থেকে ১৯৫৮ সাল অবধি গণিত জন্ম ও মৃত্যু হার (রেজিস্ট্রেশন সংখ্যা নয়) ২নং ছকে দেওয়া হলো। ১৯৪১-৫৯ এই সময়ে জন্মহার মোটামুটি হাজার-করা ৩৮ থেকে ৪০ ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার ক্রমশ কমে ১৯-এ দাঁড়িয়েছে। মৃত্যুহার যে আরো কমবে জাতীয় নমুনা সংস্থার ১৯৫৯-৬০ সালের হিসেবে

তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৬১ সালে ভবিষ্যৎ ভারতের অনুমিত জনসংখ্যার যে সংশোধিত হিসেব প্রকাশ করেন, তা এই সংখ্যাগুলির ও ১৯৬১ সালের লোকগণনার উপর ভিত্তি করে।

২নং ছক : গড় জন্ম ও মৃত্যু হার
১৮৮১—১৯৫৯

সাল	জন্মহার (প্রতি হাজার লোকপ্রতি)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজার লোকপ্রতি)
(১)	(২)	(৩)
১৮৮১—৯১	৪৮·৯	৪১·৩
১৮৯১—০১	৪৫·৮	৪৪·৪
১৯০১—১১	৪৯·২	৪২·৬
১৯১১—২১	৪৮·১	৪৭·২
১৯২১—৩১	৪৬·৪	৩৬·৩
১৯৩১—৪১	৪৫·২	৩১·২
১৯৪১—৫১	৩৯·৯	২৭·৪
১৯৫৭—৫৯	৩৮·৩	১৯·০

মৃত্যুহারের এই ক্রমক্ষীয়মান প্রবণতা অবশ্যই আনন্দের বিষয়। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ও সাধারণ জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির একই সংগে মৃত্যুহারও যে কমবে, এই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের প্রতিবেশী অন্য কয়েকটি দেশেও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সিংহলে ১৯৪১--৫০ সালে জন্ম ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ছিল হাজার-করা ৩৮ ও ১৭; ১৯৫১--৫৬ সালে জন্মহার মোটামুটি একই ছিল, কিন্তু মৃত্যুহার কমে দাঁড়িয়েছিল ১১।

মৃত্যুহারের এই হ্রাসের ফল ভারতে অন্যভাবেও দেখা যায়। ১৯৪১—৫১ সালের মধ্যে নবজাত কোন শিশুর ভবিষ্যতে গড়ে ৩২ বৎসর বাঁচবার কথা ছিল। এখনকার কোন নবজাতক ভবিষ্যতে প্রায় ৪৭ বৎসর বাঁচবার আশা রাখে। অর্থাৎ নবজাতকের আয়ু বেড়েছে প্রায় ১৪ বৎসর। এর আরো উন্নতি সম্ভব। সিংহলে নবজাতকের আয়ু ১৯৪৫-৪৬ সালে ৪৬ বৎসর থেকে ১৯৫৪ সালে ৬০ বৎসর হয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ বৃদ্ধি না হবার কোন কারণ নেই।

এই হ্রাসপ্রাপ্ত মৃত্যুহার ও ঊর্ধ্বস্থিত জন্মহারের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধিহারও দ্রুত বাড়ছে। বর্তমান হারে যদি জনসংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে আগামী ৩৩ বৎসরে তা দ্বিগুণ হবে, আর ২০০০ সালে দাঁড়াবে ১০০ কোটি। এই হিসেবগুলো কিন্তু খুবই মোটা রকমের।

বিশেষজ্ঞ কমিটির ১৯৬৬ ও ১৯৭১ সালের অনুমিত জনসংখ্যা ১নং ছকে ও ১নং রেখাচিত্রে দেওয়া আছে। বর্তমান সীমিত জ্ঞানের পরিধিতে এই সংখ্যাগুলোকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলা যায়।
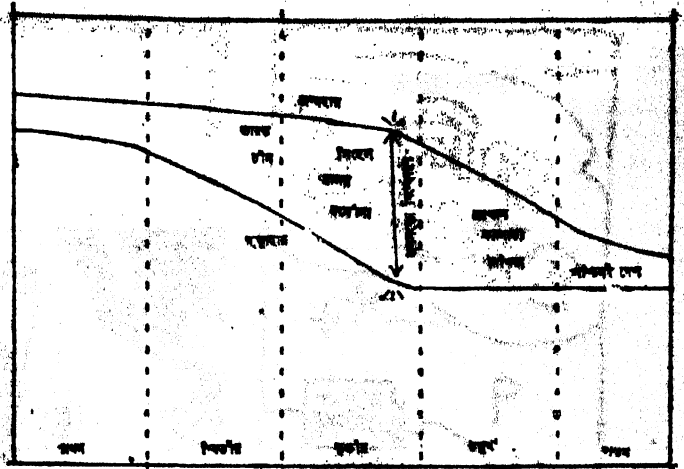
২ নং রেখাচিত্র। জনসংখ্যা বৃদ্ধির

বহু জনতত্ত্ববিদ মনে করেন যে, জন্ম ও মৃত্যুহার প্রত্যেক দেশে কয়েকটি বিশেষ ধাপের মধ্য দিয়ে যায়। এই ধাপগুলির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল (২নং রেখাচিত্রেও দেখানো আছে):—

(১) প্রথম ধাপে, জন্ম ও মৃত্যু হার দুই-ই খুবই বেশি ও প্রায় কাছাকাছি থাকে। ফলে জনসংখ্যা প্রায় স্থির থাকে বা খুবই স্বল্পহারে বাড়ে। আফ্রিকার কয়েকটি বিশেষ স্থান এখনো এই ধাপেই আছে।

(২) দ্বিতীয় ধাপে, জন্মহার প্রায় ঊর্ধ্বস্থিত থাকে, কিন্তু মৃত্যুহার ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে জনসংখ্যার দ্রুত-বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। এশিয়ার অধিকাংশ অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশ যথা ভারতবর্ষ বর্তমানে এই ধাপে আছে।

(৩) তৃতীয় ধাপে, জন্মহার ঊর্ধ্বস্থিতই থাকে, কিন্তু মৃত্যুহার আরো কমে যায়। ফলে বৃদ্ধিহারের বিশেষ স্ফীতি হয়। এই অবস্থাকেই বলা হয় "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" (population explosion)। এশিয়ার মধ্যে সিংহল মালয়, আর ফর্মোসায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় জনসংখ্যা ফেটে পড়ছে বলা যায়।

(৪) চতুর্থ ধাপে জন্মহারও কমতে শুরু করে। মৃত্যুহার আগের মত কম থাকে, ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়া, কানাডা, জাপান প্রভৃতি এই ধাপে।

(৫) পঞ্চম ও শেষ ধাপে, জন্মহার আরো কমে যায়। ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিও আরো হ্রাস পায় বা প্রায়স্থির থাকে। পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই ধাপে পৌঁছেছে বলা যায়।

প্রথম থেকে শেষ ধাপে পৌঁছতে শেষোক্ত দেশগুলোর একশ থেকে তিনশ বছর লেগেছিল। তবে অধুনা দ্রুত ত্বরান্বিত শিল্পীকরণ ও যৌগপদিক নগরপত্তনের ফলে আরো অনেক অল্প সময়ের মধ্যে এই ধাপগুলো পার হয়ে যাওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। যে অনুন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা ফেটে পড়ছে বা পড়বে বলা যায় (ভারত যার মধ্যে অন্যতম) তাদের সমস্যা এই জনতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে আরো পরিষ্কার হবে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধিহারের দুটি উপাদানের মধ্যে মৃত্যুহার সম্পর্কে একমাত্র নীতিই হচ্ছে একে আরো কমিয়ে আনা। এখানে বলে রাখা যায়, মৃত্যুহার কমানো মানে মৃত্যুকে বিলম্বিত করা।

দু-একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের মতে অবশ্য ভারত ও অনুরূপ দেশগুলিতে মৃত্যুহার কমতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে জনসংখ্যা সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু ভারতের মোট জনসংখ্যার বিপুলত্বই তার একমাত্র সমস্যা নয়। তাহলে কি বলা যায় যে, কোন উপায়ে যদি ভারতের জনসংখ্যা আজ অর্ধেক হয়ে যায়, তাহলেই জীবনযাত্রার মান দ্বিগুণ হয়ে যাবে? *

* লেখক ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব পরিষদের জনতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী এবং পরিকল্পনা কমিশনের জনসংখ্যা অনুমানের বিশেষ কমিটিতে উক্ত পরিষদের মনোনীত সদস্য। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্তিগত।

জনি হ্যাজার্ড
৭
ফ্র্যাঙ্ক রবিন্স

সুদূর প্রাচ্যের যে ক্ষুদ্র দেশটি রক্ষা করতে ওরা এল, সেখানে উপস্থিত হয়েই হেলিকপ্টার পাইলটরা একেবারে বিদ্রোহীদের প্লেনের কামানের মুখে পড়ল !
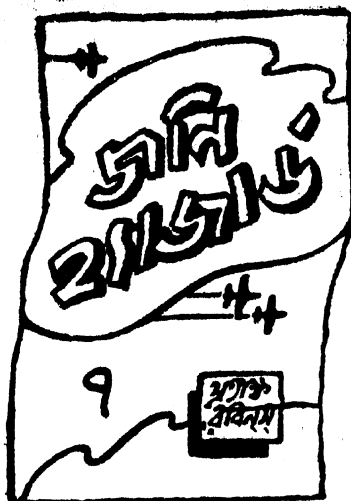
এখন ওরা অনেক কাছে এসে পড়েছে জুয়ান ... মাদাম সোম-ফন নিশ্চয় আত্ম-সমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে। লড়াই করবার আগেই বন্দী হলাম !
এত সহজে পেলে কি কেউ ছেড়ে দেয়, বেসো, কিন্তু ... দেখ দেখ! আরেকটু ওপরে ...

কিন্তু ছাড়তে হল যখন আমেরিকান জে
এসে পড়ে ...
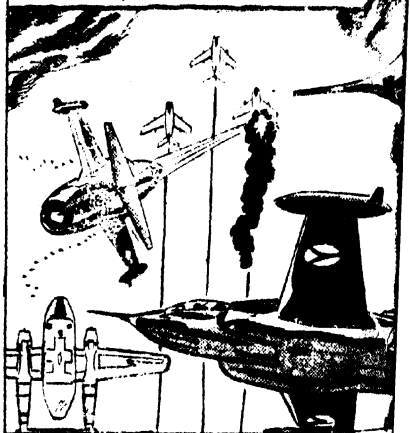
কিন্তু বোধ হয় ভুল জায়গায় বাঁচলুম বন্ধু হে! নইলে নামবার জন্যে শত্রু পক্ষের জমির দিকে এ যাচ্ছি কেন ?

ঠিক কথা বেসো! এর ! জবাব দিতে পারে একমাত্র ...

সন্ধ্যের এত কাছে বন্ধু হ্যাজার্ড... আর এর মধ্যেই আমাদের আর কাজ করবার কোন উপায়ই রইলনা!
বোধ হয় চিরকালের জন্যেই বেসো! যদিনা মাদাম সোম-ফন ইতিমধ্যে আমাদের গ্রেপ্তারকারীদের সঙ্গে রেডিও মারফৎ একটা রফা করে ফেলতে পারে!

তাতে আবার প্রাণটা বাঁচলেও বন্দী হতে হবে আর তার ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত!

।। শত্রুপক্ষের প্লেনগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে গেল ।।। !
ওয়াহ্‌!!! ওগুলো আমাদের! খুব বেঁচে গেছি !!!

প্রশ্ন অবশ্য তোমাদের মনে উঠতেই পারে, কিন্তু জেনে রাখ!!! বোকার মত বাহাদুরি দেখাতে গেলে হঠাৎ প্রাণটা দিতে হয়!
9-25
962. World rights reserved

খুবসুরত বিল্লীটা হঠাৎ দাঁত নখ বার করে বসল কেন হে!!! ব্যাপার খানা কি?
ওই শত্রু প্লেনগুলো বোধ হয় আক্রমণ করতে আসেনি, এসেছিল সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। তার মানে বেসো!!! আমাদের পাকড়াও করা হয়েছে!
এরপর দেখুন ২২.৬.৬২
ক্রমশঃ...
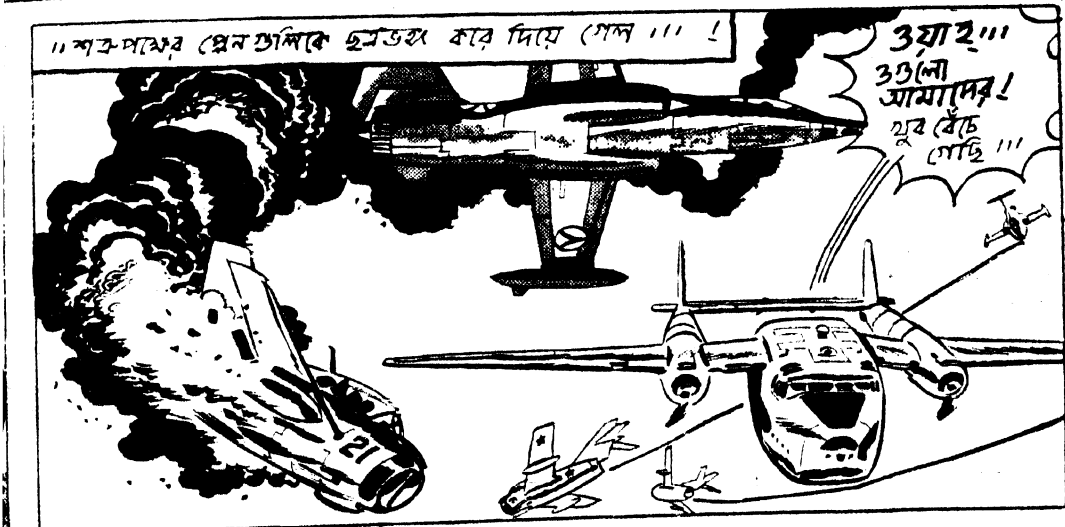
॥ একশ বছর পরমায়ু ॥

না, আমাদের একশ বছর পরমায়ু হবে এমনতর বাতুল চিন্তা আমরা কেউ আর করি না। কারণ, বাঁচতে চাইলেও থ্রমবসিস নামধেয় সাম্প্রতিক নতুন উৎপাতটির অত্যাচারে আজকের বাঁচার উপায় নেই। জানি দেনায় আমি আকণ্ঠ নিমজ্জমান, বিনা নোটিশে এই ত্বরিৎ-মৃত্যু আমাকে বহু যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারই করবে, কিন্তু আমার সম্পত্তির অধিকারী না হতে পারলেও, আমার ঋণের উত্তরাধিকার যাদের ঘাড় পেতে নিতে হবে, আমার সেই পিণ্ডদানের অধিকারী সন্তানদের পথে বসাতে চাই না বলেই এই অকালমৃত্যু পছন্দ করি না। এ ছাড়াও 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' কবির এই বাণীও নানা দুঃখক্লেশ সত্ত্বেও আমার দীর্ঘ পরমায়ুর প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে হ্রাস করতে চায় না।

মাঝে মাঝে ভাবি ভাগ্যিস রবিঠাকুর এই থ্রমবসিসের পাল্লায় পড়েন নি, *তা'হলে কবির সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যা কবির পরিণত বয়সেরই ফসল, তা থেকে বঞ্চিত হবার দুঃখ পোহাতে হত আমাদের।*

থ্রমবসিস নামক বস্তুটির ঘৃণ্য আক্রমণ সত্ত্বেও, 'শতং জীবেৎ' হবার কামনা আপনার আমার প্রত্যেকেরই আছে। বিশেষ ক'রে সেই সব শতের গণ্ডী পেরোন মানুষ, যারা দেহের জীর্ণতাকে আমল দিয়েও দেহ-মনের কর্মচাঞ্চল্য বজায় রাখতে পারেন, তাঁদের সৌভাগ্যের প্রতি আমাদের ঈর্ষা খুবই স্বাভাবিক। মহামনীষী কার্ভে এই সেদিন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যে কর্মচঞ্চলভাবে বাঁচার নমুনা দেখিয়ে গেছেন, তাতে করে এ'দের মত শতায়ু হতে পারলে নিজেদের সৌভাগ্যবানই আমরা ভাবতে পারতাম। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শেষ অবধি থ্রমবসিসের মোহিনী-মায়ায় আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু বয়সটা যে তাঁর শত পেরোলেও আশ্চর্যের কিছু হত না এ-রকম সন্দেহ করার কারণ তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের অমিত প্রাচুর্যের মধ্যে কোনদিন রাখেন নি। জানি শতায়ু হওয়া এ যুগে খুবই অসম্ভব। বিশেষ করে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে; তবু আর একটি মানুষের কর্মচঞ্চল জীবন শতের কোঠা পেরিয়ে যাক, অন্ততঃ ততদিনে আমাদের দেশ একটা সুস্থির নীতিতে সংহত হতে পেরে সমৃদ্ধির দিকে দৃঢ়পদক্ষেপের সুযোগ পাক এই কামনা আমাদের। সে মানুষটি হলেন আমাদের পণ্ডিতজী। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের আনাচে-কানাচেও যেন ক্লান্তি আর অবসাদ নেমে না আসে।

শতজীবী মানুষ নিয়ে আমরা আগ্রহশীল, যদিও শতজীবী মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে নিশ্চয় অল্প। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক মানুষগুলি কি করে' আধি-

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

ব্যাধি জয় করে এত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে, এটা যেমন বৈজ্ঞানিকদের কাছে অনুসন্ধিৎসার বিষয়, তেমনি আমাদের কাছেও কৌতূহলের। ছেলেবেলা থেকে যে বৃদ্ধা দিদিমাকে একই কাঠামোয় এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে দেখে এলাম, তার এই বয়স থমকে থাকার কারণটা কি?

সুস্থ হয়ে মানুষ কতদিন পর্যন্ত বাঁচতে পারে? এ সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা হল রাশিয়ায় গত যুদ্ধের সময় একটি দীর্ঘপরমায়ু মানুষের কথা। রাশিয়ান সেই মানুষটির তখনকার সেই যুদ্ধের সময় বয়স ছিল ১৪৫। যুদ্ধের পর অবশ্য সে লোকটা বেঁচে আছে কিনা তা জানা নেই। অবশ্য এই একশ *পঁয়তাল্লিশের বেশী কাউকে কাউকে বাঁচতেও শোনা গেছে। কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীতে আড়াইশ বছর বেঁচে আছে এমন মানুষও আছে, একশ থেকে দেড়শ* বছরের দীর্ঘজীবী মানুষের ত' ছড়াছড়ি।

অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলেন, এই বেশী বয়সের মধ্যে অনেকটাই হিসেবের গরমিল। তবে একশর ওপর খুব বেশী দিন বেঁচে আছে এমন মানুষের সংখ্যা যদিও নেই, একশ পেরিয়েছে এমন মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীর এ-কোণে ও-কোণে কিছু কিছু আছে।

১৯৪৩-এ আমেরিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা গিয়েছিল যে, তিনশ'রও বেশী শতায়ু লোক পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচে নেই, তাঁরা বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। দেহের চামড়া শ্লথ হয়েছে হয়ত, দাঁত পড়ে গেছে যদিও, তবু মনের সজীবতা তাঁদের একটুও কমে নি। এই তিনশ' জনের মধ্যে অনেকে তখনও কর্মজীবন পরিত্যাগ করেন নি। এবং একটু চাপল্য প্রকাশ পেলেও সেই রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই বলব, এ'রা মন থেকে রোমান্স বস্তুটকে বিদায় ত' দেনই পরন্তু কেউ কেউ একশ পাঁচ বছর বয়সে প্রথম বউ মারা যেতে দ্বিতীয়বার অন্য মেয়েকে মাল্যদানও করেছেন। এটা আশ্চর্য হলেও এও আমরা জানি, এই আধুনিক যুগে কিছু কিছু শতবর্ষের গণ্ডী অতিক্রমকারী ব্যক্তিও জীবিত আছেন।

আমরা যারা শতবর্ষের পরমায়ু পাব বলে আশাও করি না, তারা স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহলী হই এদের দীর্ঘায়ু হবার কারণ কি জানতে। বিজ্ঞা[illegible] মতে এই সব দীর্ঘায়ু মানুষদের [illegible] তালিকা এবং জীবন-যাপন [illegible] এমনই বিচিত্র যে মনে হয় বোধহয় [illegible] ব্যাপারটাই ওদের দীর্ঘায়ু হবার কা[illegible] একজন দীর্ঘায়ু মহিলা নাকি তার [illegible] ষাট বছরে শুধুমাত্র বিস্কুট, রুটী [illegible] আপেল ছাড়া কিছুই খেতেন না। [illegible] শতবর্ষজীবী গ্রীক দার্শনিক বলে [illegible] যে, তাঁর এই পরমায়ুবৃদ্ধির কারণ [illegible] বর্জন এবং মধুগ্রহণ। রাশিয়ান [illegible] জীব-বিজ্ঞানী— মেকনিকেভের [illegible] দীর্ঘায়ু হবার উপায় টক দুধ খাওয়া[illegible] কারণ সেই দুধই অন্ত্রের ক্ষতি[illegible] জীবাণুকে ধ্বংস করে। এবং এই [illegible] ধরে এর্কোলে মাংসাশী মানুষের [illegible] শাকান্নভোজী মানুষের পরমায়ুর বৃদ্ধি[illegible] কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই বাঁচবার ইচ্ছে[illegible] হল প্রধান শক্তি। জন্মেই যে মানুষ [illegible] চার পাশে মৃত্যুর অন্ধকার দেখে [illegible] কিসের জোরে বাঁচবে। এই বাঁচার লাইনে যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা বলেন বয়স য[illegible] বাড়ে, মানুষের বাঁচার ইচ্ছাটাও তত [illegible] *যায়। আর এই ইচ্ছাটাকে* সামনে [illegible] *করে রেখে সংযত জীবনযাত্রার মাধ্যমে পরমায়ুকে সহজেই শতের কোঠার দিকে ঠেলে দেওয়া যায়।* অবশ্য বিধাতা-বোলারের একটা অপ্রত্যাশিত বলে যদি আপনার বেল ছিটকে গিয়ে আপনি শত-বর্ষের রাণ হতে বঞ্চিত হন, সেটা নেহাতই দুর্ভাগ্য।

বিজ্ঞানীরা বলেন, অবিবাহিত পুরুষদের চাইতে বিবাহিত পুরুষরা বাঁচেন বেশী। বিশেষ করে বেশ পরিণত বয়সে বিয়ে করে অনেক মানুষ [illegible] হয়েছেন তারও নজীর [illegible]নীদের খাতায় আছে। বার্টাণ্ড রাসেল পরিণত বয়সেই টাইপিষ্ট একটি তরুণীকে বিয়ে করেছেন। দীর্ঘায়ু হবার জন্যেই কিনা এটা রাসেলই বলতে পারেন, কিন্তু পরিণত বয়সে পৃথিবীর ভবিষ্যতের জন্যে এই বৃদ্ধ দার্শনিকের যে কর্ম-চাঞ্চল্য আমাদের আনন্দিত করে তুলেছে, তা আরও বহু বছর অব্যাহত থাকুক এ সবাই কামনা করে। আসলে দীর্ঘায়ু হওয়াটার মধ্যে কৃতিত্ব থাকে তখনই, যখন দীর্ঘায়ু হয়েও নিজের অস্তিত্বটা মূল্যহীন হয়ে যায় না শুষ্ক বৃদ্ধ বনস্পতির মত।

অবশ্য এই দুর্লভ সৌভাগ্য মেলে খুব কমজনেরই। আপনার আমার জন্যে দীর্ঘায়ু এক ইংরেজ কবির স্মৃতি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ কথাটিই সত্য—

He lived an hundred and five
Sanguine and strong
An hundred to five
You live not so long.

অতএব একশ' পাঁচ বছর পরমায়ু হয়ত আমাদের হবে না, তবু যে কদিন বাঁচব যেন দেহমনে সজীব হয়েই বাঁচতে পারি।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

বাইরে তত প্রকাশ পাক না পাক—উমার মৃত্যুতে একটা বড় রকমেরই আঘাত পেয়েছিলেন শ্যামা। সংবাদটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তত বোঝা যায়নি; এতই আকস্মিক যে সংবাদের সম্পূর্ণ অভিঘাতটা তখন উপলব্ধি করতে পারেন নি। সেটা ক্রমে ক্রমে একটু একটু ক'রে করলেন। শূন্যতাটা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে অনেকখানি সময় লাগল তাঁর। দীর্ঘ জীবনের পৃষ্টপটে স্মৃতির রেখায় আঁকা যে ছবিটা অল্পে অল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর মনের পর্দায়—তার মধ্যে উমা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। সেই উমা তাঁর জীবন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সেই উমা আর নেই—আর কোনদিন তার দেখা পাবেন না, আর কোনদিন তার কাছে ছুটে যেতে পারবেন না দুঃখ জানাতে, তার কাছ থেকে কোন কিছু আর আশা করারও রইল না—দ্বেষ-রোষ-কলহ-ঈর্ষা—সমস্ত রকম মানবিক ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল সে—এই নির্মম সত্যটা অতি ধীরে ধীরে অনুভূত হ'তে লাগল তাঁর। আর যেমন সেটা একটু অনুভব করতে পারলেন, অমনি যে হাঁফিয়ে ছটফট ক'রে উঠলেন এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না কথাটা। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। বিস্ময়ও বোধ হয়। সেটা বোধহয় অন্য কারণে। উমা যে এতখানি জড়িয়ে ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গে—আজও, এটাও একটা নূতন উপলব্ধি। সেই-জন্যেই বিস্ময়।

কিন্তু এ আঘাত সামলাবার মতো সাতটা দিনও সময় পেলেন না শ্যামা। এ আঘাতে দুঃখ ছিল সেই সঙ্গে স্মৃতি রোমন্থনের একটা অভিনবতাও ছিল। এবার যে আঘাত এল তা শুধুই তিক্ততা এবং মর্মান্তিকতা নিয়ে এল—তার মধ্যে কোথাও কোন আশ্রয় কি অবকাশ রইল না।

ক'দিন এইসব হ্যাঙ্গামে হারানের খবর কেউ বিশেষ নিতে পারেনি। কান্তির ওখানে থাকার কথা ছিল কিন্তু সেও থাকতে পারেনি মার অসুখের জন্য। তবু মধ্যে মধ্যে গিয়ে সে-ই খবর নিয়ে আসত। ভালই ছিল হারান। কথাও দুটো একটা কইতে পারছিল ইদানীং জড়িয়ে জড়িয়ে—কেউ কিছু বললে বুঝতেও পারছিল। উমা তার এখানে আসার জন্য ফল কিনে ফিরছিলেন—গাড়ি চাপা পড়েছেন শুনে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। এইসব দেখে সবাই আশা করেছিল যে এ-যাত্রা বেঁচে উঠবে। হেম এর মধ্যে একদিন রাত্রে ডাক্তারের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছিল। তিনিও বলেছিলেন, 'বোধহয় এ ধাক্কাটা সামলে গেল। এখন কথাটা যদি ঠিকমতো ফিরিয়ে আনতে পারি তাহ'লে ধীরে ধীরে হাত-পাও ফিরে পাবে। তবে সময় লাগবে। আর খুব সাবধানে থাকতে হবে এখন দীর্ঘকাল। কোন রকম উত্তেজনা কি দৌড়ঝাঁপ চলবে না।'

অকস্মাৎ খবর এল একেবারে সব শেষ হয়ে গেছে।

সেদিন রবিবার, হেম খোকাকে সঙ্গে নিয়ে উমার দরুণ মালপত্র আনতে গিয়েছিল। শরতের ছাপাখানা বিক্রি হয়ে গেছে, এধারেও সব গুছিয়ে এনেছেন তিনি, কাশী চলে যাবেন দু'একদিনের মধ্যে—মাল সরানো দরকার। ঠেলাগাড়ির ওপর সিন্দুক আর তোরঙ্গ চাপিয়ে পাথরের ভারি বাসনগুলো পুঁটুলি বেঁধে হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকছে হেম, তরুদের পাড়ার একটি ছেলে এসে খবর দিলে।

শ্যামা আছড়ে পড়লেন কিনা সেদিকে আর তাকায়নি হেম। কনক আছে—যাহয় করবে। খোকাও থাক—এইমাত্র এই চার পাঁচক্রোশ রাস্তা হেঁটে এসেছে, ছেলেমানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নিশ্চয়—কান্তিকে মহাশ্বেতাদের বাড়ি পাঠিয়ে হেম একাই ছুটল সেখানে।

তখন অবশ্য কিছুই জানা যায়নি। এমন আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কি বা শেষ উপসর্গ কি হ'ল—সেটা জানা গেল অনেক পরে। তরুর মুখ থেকেও সব জানা যেত না—কারণ প্রথমত সে ঠিক সেই সময়টায় ছিল না—দ্বিতীয়ত তার তখন একটা স্তম্ভিত অবস্থা। বললেন, ওদের পাশের বাড়ির দত্তগিন্নী। তরুর কথাও তিনিই বললেন। সেই সময়টা—অর্থাৎ যখন ঠিক প্রাণটা বেরিয়ে গেল—নাকি একটা বুকফাটা চিৎকার ক'রে উঠেই ফিট হয়ে যায় ওর। তখন কে কাকে দেখে কী ব্যবস্থা করে, কোথায়

লোকজন, পাড়ার ডাক্তারের কাছে ছুটে যাওয়া—একটা আতান্তর অবস্থা, তবু তারই মধ্যে ও'রা মুখে মাথায় জল দিয়ে বাতাস ক'রে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছেন বটে কিন্তু তারপর থেকেই ঐ অবস্থা। চুপ ক'রে বসে আছে—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে। কথাও কইছে না কাঁদছেও না। অনেক প্রশ্ন করলে এক আধটা জবাব দিচ্ছে। এ অবস্থা হেম জানে, আগেও একবার হয়েছিল। ওকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা এ অবস্থায় বৃথা। সে চেষ্টাও সে করেনি।

হারানের খবরটাও দত্তগিন্নীর কাছে শোনা গেল। তিনি তরুকে ভালবাসেন তাই বড়বৌ পছন্দ করে না জেনেও না এসে থাকতে পারেন না। মধ্যে মধ্যেই আসেন, বিশেষত দুপুরের দিকটা। তিনি এসে বসলে তরু অনেক অনেকটা কাজ পায়।

সেদিনও খাওয়া দাওয়া সেরেই একটা পান মুখে দিয়ে এসে বসে-ছিলেন। তরু গিয়েছিল এক বালতি ক্ষারসিদ্ধ নিয়ে পুকুরে কাচতে। ইতাবসরে হারানের শ্বশুর এসে ঘরে ঢুকেছিলেন।

হারানকে ওর শ্বশুরের কীর্তি-কলাপ কেউ বলেনি। অসুস্থ অবস্থা, ডাক্তারে পই-পই ক'রে বলে দিয়েছে যে রাগ হয় কি উত্তেজনা হয় এমন কোন কথা না ওর কানে যায়। আজকাল বুঝতে পারছে যখন সব কথা তখন বুঝে সমঝে চলতে হবে। ও'রাও সাবধান ছিলেন সকলে। কিন্তু হারান বোধহয় এদের কথাবার্তার মধ্যে বা এদের আচারে আচরণে কিছু আঁচ ক'রে থাকবে। আরও কথা যে টাকাকড়ির ব্যাপারটা একেবারে গোপন করা যায়নি। দত্তগিন্নীর এক ছেলেই বাজার-হাট ক'রে দিত, সে এসে একদিন টাকা চাইতে তরুর মুখটা একটু বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই দেখে হারান উ'-উ' শব্দ ক'রে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলমারীটার দিকে বার-বার চায়। অর্থাৎ আলমারী খুলে টাকা বার ক'রে দিতে বলে। তরু কিছু বলেনি কিন্তু আলমারীও খুলতে পারেনি ওর সামনে। কী একটা বাজে কথা বলে দত্তগিন্নীর ছেলেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। সম্ভবত সে বাজে কথায় হারান ভোলেনি, সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিল খানিকটা। বোধহয় তরুর মুখের চেহারা দেখেই আঁচ করেছিল। কারণ ও বেরিয়ে চলে যাবার পরই অব্যক্ত কতকগুলো শব্দ ক'রে খুব অস্থির হয়ে ঘন ঘন মাথা চালতে শুরু করে। সেদিনও ঠিক সেই সময়টাতেই দত্তগিন্নী এসে পড়ে-ছিলেন, তিনিই বকে ধমকে ভুলিয়ে ওকে শান্ত করেছিলেন।

কিন্তু ঠিক অতটা যে বুঝেছিল তা কেউ ভাবেনি। তাছাড়া ওর শ্বশুর অনেকদিন আসেন নি, হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকবেন তাও কেউ জানত না। আগে দেখতে পেয়েছিল হারানই, দত্তগিন্নী দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিলেন, তিনি দেখলেও ফিরিয়ে দিতে পারতেন আগেই। শ্বশুরকে দেখেই হারান বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে, আর সেই উত্তেজনারই ফলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাক্‌শক্তি ফিরে পায়। চিৎকার ক'রে ওঠে, 'নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও হামারা বাড়িসে—শুয়ার কাঁহাকো! গেট আউট!'

দত্তগিন্নী ওকে থামাতে কি ওর শ্বশুরকে ঘর থেকে বার ক'রে দেবার কোন চেষ্টা করবার আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। কথা বলতে বলতে মাথাটা একটু উ'চু করেছিল, হঠাৎ দপ্‌ ক'রে পড়ে গেল। গলার কাছে কী একটা ঘড়ঘড় শব্দ হ'ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাক দিয়ে ও মুখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তারপরই সব স্থির হয়ে গেল। ডাক্তার অবশ্য ওর শ্বশুরই ছুটে ডাকতে গিয়েছিলেন, দত্তগিন্নীর চিৎকারে পাড়ার লোকজনও জড়ো হয়েছিল, তাদের কে একজন দৌড়ে গিয়ে পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারকেও ডেকে আনলে কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। ডাক্তার দেখে বললে, ঐসময়ই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।......

তরুকে এবার পাকাপাকি ভাবেই এ বাড়িতে এনে তুলতে হ'ল। ওখানে থাকার উপায় নেই। কার কাছে থাকবে এবং কিসের ওপর নির্ভর ক'রে থাকবে। জমিজমা যা আছে তা নিজেরা তদ্বির করলে কিছু আয় হয়—নইলে কিছুই না। লোকও নেই কেউ। ওর সতীনকে তার বাবা এসে পরের দিনই নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘাট করাবার জন্যও এখানে আনেন নি। শ্রাদ্ধ করল তরুই—ছেলে নিতান্তই ছোট, শ্রাদ্ধ করবার মতো নয়। তরু এখনও সেইরকম জড়ভরত হয়ে আছে—পাশে বসে জোর করে করাতে হ'ল হেমকে। বস্তুত হেমই করলে কাজটা। তরু বোধহয় ভাল ক'রে কিছু বুঝতেও পারল না—কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। তার কত বড় সর্বনাশটা হয়ে গেল তাও মাথায় পুরো ঢুকেছে বলে মনে হ'ল না।

শ্রাদ্ধের আগেই একদিন লোকজন এনে ওর সতীনের বাবা জিনিসপত্র অর্ধেক বার ক'রে নিয়ে গেছেন। অর্ধেক অবশ্য তাঁর মতে, পাড়ার লোকের মতে বেশির ভাগই নিয়ে চলে গেছেন তিনি। হঠাৎ এসেছেন, তরু তো অমনি চুপ, কান্তি ছিল বটে, সে একা কি করবে ভেবে না পেয়ে মহাদের বাড়ি ছুটেছিল খবর দিতে—কিন্তু যাওয়া আসায় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, মহার ছেলেরা আসতে আসতে সব কাজ সেরে চলে গেছেন তাঁরা। অভয়পদদের তখন বাড়ি থাকার সময় নয়, আর থাকলেও তাঁরা ছেলেদের আগে আসতে পারতেন না।

শোনা গেল দুই গোরুর গাড়ি বোঝাই মাল নিয়ে গেছেন ও'রা। আলমারী, বাক্স—বহু জিনিস। সবই নিয়ে যেতেন বোধহয়, দত্তগিন্নী আর আশপাশের বাড়ি থেকে আরও দু'চারজন মহিলা এসে খুব রাগারাগি চেঁচামেচি করায় বাসনকোশন কিছু কিছু রেখে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পাড়ার লোকেরা পরামর্শ দিলেন, 'কেস করো। আমরা সাক্ষী দেব। জেল হয়ে যাবে ও শালার। যেমনকে তেমনি। চশমখোর শয়তান!'

দত্তবাবু বললেন, 'আমার হাতে উকীল আছে, তুলোধুনে ছেড়ে দেবে বাছাধনকে। ওর মালে হাত দেবার অধিকার কি? তাছাড়া টাকা ছিল অনেক, আমরা জানি। সে টাকা কি করলে হিসেব দিক! টাকা ঐ ছেলের, নাবালকের টাকা—চালাকি নাকি?'

কিন্তু অভয়পদ বারণ করলে, ও কাজ ক'রো না। অগাধ জলে গিয়ে পড়বে। আলমারী সিন্দুকে যে টাকা ছিল তা প্রমাণ করতে পারবে না। ওসব সাক্ষীর কোন দাম নেই, ওরা উড়ো উড়ো জানত যে বুড়ির হাতে টাকা ছিল, সঠিক কেউ বলতে পারবে না। দু'তিনজন একরকম না বললে কিছুই টিকবে না। থাকলেও ওরাই যে নিয়েছে—সে কে দেখেছে? এক অফিসের ঐ টাকাটা নিয়ে এসেছে প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সে এমন কিছু নয় যে তার জন্যে কেস করা পোষাবে! একটা যাহয় খরচের হিসেব তো দেবেই, আর সত্যি কিছু খরচ

হয়েছেও, জমানো টাকার কথাটা প্রমাণ না হ'লে এ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করা যাবে না।. যেটুকু আদালত দেবে তাতে এত কাণ্ড করার মজুরী পোষাবে না। এক জিনিসপত্তর—তা তারই বা কত দাম, দাম ঠিক করবে কে?. তাছাড়া তারও মেয়ে আছে, কিছু তো পাওনা হয়ই। গেরস্তালির জিনিস আটকানো যায়ও না বোধহয়। অর্ধেকের বেশি নিয়েছে তাই বা প্রমাণ করা যাবে কি করে?... আমার তো মনে হয় জমি-জায়গাতেও বোধহয় টান দিতে পারে ওরা।... যাইহোক, সে পরের কথা, পরে দেখা যাবে, জমি কিছু উঠিয়ে নিয়ে পকেটে পোরা যায় না—এখন এসব নিয়ে কেস করতে গিয়ে লাভ নেই। ও আশা ছেড়ে দাও।'

হেম তা জানে। তাদের মতো লোকের কোন আশাই রাখতে নেই। তার প্রসন্ন করবেই বা কে, পুঁজি কৈ? উদিবন আর টাকার অভাবেই তো রতনের অতবড় সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে গেল, মামলার ঝুঁকি নিতে ভরসা হ'ল না। তার তো তবু কিছু সাক্ষীসাবুদ ছিল।......

অফিসেও গণ্ডগোল কম নয়। মাইনের টাকা ছাড়াও হারানের শ্বশুর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা খানিকটা বার করে এনেছে। সেটা বেআইনী। কিন্তু আইনের প্রশ্ন তুলতে গেলে ওর সেকশানের তিনজন বাবু বিপদে পড়েন। তাঁরা সরল বিশ্বাসে হারানের চিকিৎসা আটকে গেছে শুনে জামিন হয়ে টাকাটা বার ক'রে দিয়েছেন। শুধু শুধু তাঁদের বিপন্ন ক'রে লাভ নেই।

এই টাকাটা তোলার ফলেও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা খুব কমার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল কিছুদিন আগে হারান নিজেই বেশ খানিকটা টাকা ধার নিয়েছিল। তার সইসাবুদ সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে, সে নিজেই নিয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। কী করল এ টাকাটা নিয়ে তা কেউ বলতে পারল না। ওর সেকশানের একটি বাবু বললেন, 'একবার আমায় বলেছিল কোন্ বন্ধুর বোনের বিয়ে হচ্ছে না, কিছু টাকা ধার দেবে। তা আমি তো পই পই ক'রে বারণ করেছিলুম, তখন আমার সামনে বলেছিল—তা তুমি যখন বারণ করছ প্রকাশদা, তখন আর দেব না। কিন্তু তারপর বোধহয় মুখ এড়াতে পারেনি—লুকিয়ে দিয়েছে।... কিন্তু কে বন্ধু তা তো বলেনি। এর মধ্যে আমাদের আপিসে তিনজনের বোনের বিয়ে হয়েছে, হয়ত ওর পাড়া-ঘরেও কাউকে দিয়ে থাকতে পারে—ক্লাবের বন্ধুও তো বেস্তর, তিনটে ক্লাবে থিয়েটার করত ও—কাকে ধরব বলুন?"

এসব বাদ দিয়ে বাকি যা—তাও সবটা পেল না তরু।

সাহেবরা বললেন, 'তাহ'লে আদালত থেকে সাকশেশান্ সার্টিফিকেট নিতে

......নিকাল যাও, আভি নিকাল যাও......

হবে। নইলে যেখানে দুই স্ত্রী বর্তমান এবং প্রথম স্ত্রী ইতিমধ্যেই নোটিশ দিয়ে এর অর্ধেক দাবী করেছেন—সেখানে আমরা ওকে সব টাকাটা তো দিতে পারি না।'

ঐ টাকার জন্য সাকসেশান সার্টি-ফিকেটই বা নেয় কে! ওরা হয়ত সেখানেও আপত্তি করবে, সেও দীর্ঘকাল কোর্টঘর করতে হবে। হারানের প্রথম পক্ষের শ্বশুর নাকি বিখ্যাত মামলাবাজ, তার পয়সাও আছে সময়ও আছে—তার সঙ্গে হেম পেরে উঠবে কেন? অতএব বিনামামলায় যে অর্ধেক টাকা পাওয়া গেল তাই নিয়ে এল হেম।

টাকাটা নেবার সময় হেমের সঙ্গে তরুকে যেতে হয়েছিল। মূর্তিমতী বিষাদের মতো নির্বাক স্তম্ভিত তরুকে দেখে ওর অল্পবয়সের কথা চিন্তা ক'রে সাহেবরা খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন—নিজেরা পকেট থেকে যে যা পারলেন দিয়ে আরও শ আড়াই টাকা ক'রে দিলেন—কিন্তু তা মিলিয়েও দু হাজার টাকা পুরো হ'ল না।

ঐ সামান্য টাকা, কিছু বাসনকোসন, একটা সিন্দুক এবং কিছু কাপড়জামা ও গোটা দুই পুরনো তোরঙ্গ নিয়ে এক মেঘমেদুর অপরাহ্ণে তরু আবারও বাপের বাড়ি এসে উঠল—দীর্ঘকাল হয়ত বা চিরকালের জন্যই। ঐ একরত্তি গুড়োটুকু যদি মানুষ হয়ে উঠে কোন দিন আবার সংসার পাততে পারে, তবেই আবার স্বাধীন হবে তরু—নাহ'লে আর কোন আশা আর ওর জীবনে রইল না কোথাও।

ওকে দেখে শ্যামা ও কনক হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন কিন্তু তরু কাঁদল না, কাঁদতে পারল না—শান্তভাবে এসে রান্নাঘরের দাওয়াটায় বসে পড়ল। তার শূন্য উদাস দৃষ্টির দিকে চেয়ে কনকের যেন ভয় ভয় করতে লাগল। এইরকমই হয়ে থাকবে নাকি?

আবার মনে হ'ল—না, ছেলে যখন আছে তখন ওকে অবলম্বন ক'রেই আবার বুক বাঁধতে পারবে, শক্ত হয়ে দাঁড়াবে আবার।......

(ক্রমশঃ)

কে ধরিবে হাল

কনাদ চৌধুরী

কলিকাতা, ৯ই মার্চ—মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন-চিত্র কি?—আজ বিধানসভায় পরিষদে শ্রীযতীন চক্রবর্তী একটি নক্সা পেশ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

শ্রীচক্রবর্তী বলেন, মধ্যবিত্ত চাকুরীয়া-শ্রেণী প্রথম সপ্তাহে মাছ-মাংস খান এবং থিয়েটারে যান, দ্বিতীয় সপ্তাহে শুধু মাছের ব্যবস্থা করেন ও অল্প পয়সার সিনেমা দেখেন, তৃতীয় সপ্তাহে টাকা ধারের জন্যে বাহির হন এবং নিরামিষ আহার্যের ব্যবস্থা করেন। চতুর্থ সপ্তাহে সংসার চালান লইয়া কলহ এবং স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক শয্যা গ্রহণ।

—ষ্টাফ রিপোর্টার, যুগান্তর,
১০-৩-৬৩

ইদানীং যৌথ পরিবারের শিবিরগুলি ক্রমশঃই ছত্রাখান হয়ে পড়ছে। এখন সংসারে স্বামী এবং স্ত্রীই সার। সংসারের ভারী নৌকোটাকে মাইনের লগী দিয়ে, টিউশনীর গুণ টেনে অথবা ধারের স্রোতে নাজেহাল গা ছেড়ে তাঁরাই বান-প্রস্থের মোহনা পর্যন্ত নিয়ে যান। পাঁচ ভাই তাদের মাইনের প্রাই পয়সাটি পর্যন্ত বড় জ্যাঠামশাইর হাতে তুলে দিচ্ছে এবং দাড়ি কামাবার পয়সার জন্যেও তাঁর কাছে হাত পাতছে—এই দৃশ্যের ওপর কবেই কালের যবনিকা পড়ে গেছে, এখনকার জ্যাঠামশাইরা, কাকারা কেউ বহরমপুরে, কেউ টালায় অথবা এই সেদিন কেউ পাতিপুকুরে সদ্য বাড়ি করে চলে গেছেন। মা-বাবা অবশ্য আপাততঃ যাননি কোথাও তবে খোকা যদি তার জেদ বজায় রেখে অসবর্ণ বিয়েটা করে ফ্যালে, তাঁরা কোথাও না গেলেও খোকা আলাদা ফ্ল্যাট নেবে এতে সন্দেহ নেই।

এবং হাল নিয়ে নাজেহাল হওয়ার ব্যাপারটির আরম্ভ স্বামী-স্ত্রীর এই ফ্ল্যাট-বাড়িতেই। এই সংসারের হাল থাকবে কার হাতে? স্বামীর সাংসারিক জ্ঞান সম্বন্ধে যথারীতি কোনো স্ত্রীরই আস্থা নেই, আবার নব-বিবাহিতা স্ত্রীর সাংসারিক জ্ঞান কিঞ্চিৎ থাকলেও স্বামী সমীপে কৃপণ প্রমাণিত হবার আশংকায় পান্তা ফুরোবার আগে নুন আনার কৌশলটিকে তিনি সহজে কাজে লাগাতে চান না। তাছাড়া মানুষ ত অভ্যেসেরো দাস। অনেক স্বামী, স্ত্রীর হাতে উপার্জনের সব টাকা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে দৈনিক তিন প্যাকেট সিগেরেট ধরান, আবার অনেক স্ত্রী 'সস্তা' পেলেই সখের বাসন কেনেন, ফলে মাস শেষ না হতেই শেষ অঙ্কে সংলাপ শুরু হয়ঃ

—গোটা কুড়ি টাকা লাগবে কিন্তু এ মাসে!

—সে কি? এর মধ্যেই টাকা ফুরিয়ে গেল?

যাবে না, খরচ কি কম? রেডিওটা সারাবার কি কথা ছিল এ মাসে, মিনুর জন্মদিনে শাড়িও ত এ মাসেই কিনতে হল।

—বুঝেছি, বুঝেছি। তুমি আমাকে ফতুর না করে ছাড়বে না। একটা বাড়তি টিউশানী নিলাম, তাও তোমার চলে না!

—আমি তোমায় ফতুর করছি ত অন্য কাউকে নিয়ে এলেই পারতে! আমি কি তোমার টাকা আমার বাপ-ভাইয়ের কাছে পাঠাই, না নিজের জন্যে শাড়ি-গয়না কিনছি রোজ। আমাকে বিশ্বাস না হয় নিজের সংসার-খরচের ভার নিজে নিলেই পার!

কিন্তু সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বামীকে তখন খরচের ভার না নিয়ে স্ত্রীর ভারই নিতে হয় এবং ভারাক্রান্ত মনে টাকা জোগাড়ের কথা ভাবতে হয়।

এই সংলাপটি পর্যন্ত কোনোরকমে মেঘকে ধরে রাখা গেছে, কিন্তু এর পরেই অনুযোগের বিদ্যুৎ সহযোগে বারিপাত!

…সারের হাল ধরার [illegible] শুধু
…দের দেশেই সীমিত [illegible] আমেরিকার
…লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-
…রা এ ব্যাপারে পরিসংখ্যান সংগ্রহ
…দেখেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই
…রিবারে সংসারের খরচপত্র দেখেন
…মস্ত পরিবারের কথা বাদ দিলে
… ৫৩টি পরিবার স্বামীর হাতে
… ভার থাকে এবং বাকী ৪৭টি
…রে অর্থমন্ত্রী হলেন গৃহিণী।
…সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে প্রতি
…পরিবারের মধ্যে মাত্র একটি পরি-
…তাদের সংসারের খাজাঞ্চীর ওপর
…। তাহলে তত্ত্বাবধনার ভার কার
…থাকলে মাসের শেষের সে দিনগুলি
… হয়ে উঠবে না। স্বামী-স্ত্রী
…র মধ্যে স্বভাবতঃই যিনি কৃপণ
…তে ক্যাস-বাক্সের চাবি গছিয়ে
… কি সংসারের চাকায় শব্দ হবে না?
…ত্ত্বিকরা বলেছেন, ওতে বখেড়া
… বাড়ে। মা বা বাবা কৃপণ হলে
…ময়েরা স্বার্থপর হয়, মন্দির
…র খাতির পাওয়া যায় না, প্রতি
…াকর দেশে যাবার নাম করে আর
…া।

…শ-বাক্সের চাবিতে কার হক যথার্থ
… করতে গিয়ে জনৈক প্রখ্যাত
…ত্ত্ব একটা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত
…। সব প্রশ্নগুলিরই উত্তর হবে
…থবা 'না'। প্রশ্নগুলি পর পর নীচে
…া :

…াপনার ড্রয়ার, আলমারি, ট্রাংক
…তি কি প্রায়শঃই অগোছাল থাকে
… হঠাৎ একটি দিন আপনার
…াল চাপলে মাসে একবার কি দুবার
…াহুড়ো করে গুছিয়ে ফেলেন?

…নেমাতে কি আপনি প্রায়ই
…জ রীল আরম্ভ হবার পর
…ন?

…ধু-বান্ধবীর সঙ্গে টেলিফোনে
…আড্ডা দেয়ার অভ্যেস আছে
…নার?

…পরের জন্মদিন অথবা বিবাহ-
…কীর তারিখ ডায়েরীতে লিখে
… মুখস্থ রাখতে হয় আপনাকে
…ডায়েরীটা কোথায় রেখেছেন তাও
…থ রাখতে হয়? দৈবাৎ ডায়েরীটা
…য়ে গেলে রামের জন্মদিনে
…কে গ্রিটিং-কার্ড পাঠিয়ে ফেলেন?

৫। জামার অথবা কোর্টের একটা বোতাম যদি আলগা হয়ে গেছে লক্ষ্য করেন, আপনি কি বোতামটা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে পকেটে না রেখে দেখতে খারাপ লাগার ভয়ে যেমনকার বোতাম তেমনি রেখে দ্যান?

৬। আপনার কি ধনী-বন্ধুদের দামী উপহার এবং দরিদ্র বন্ধুদের কম দামী উপহার দেয়ার অভ্যেস আছে?

৭। পুরোনো, প্রায় অচল কাপড়-জামার ওপর কি আপনার অহেতুক মায়া আছে? পুরোনো পোষাক-পরিচ্ছদ কি
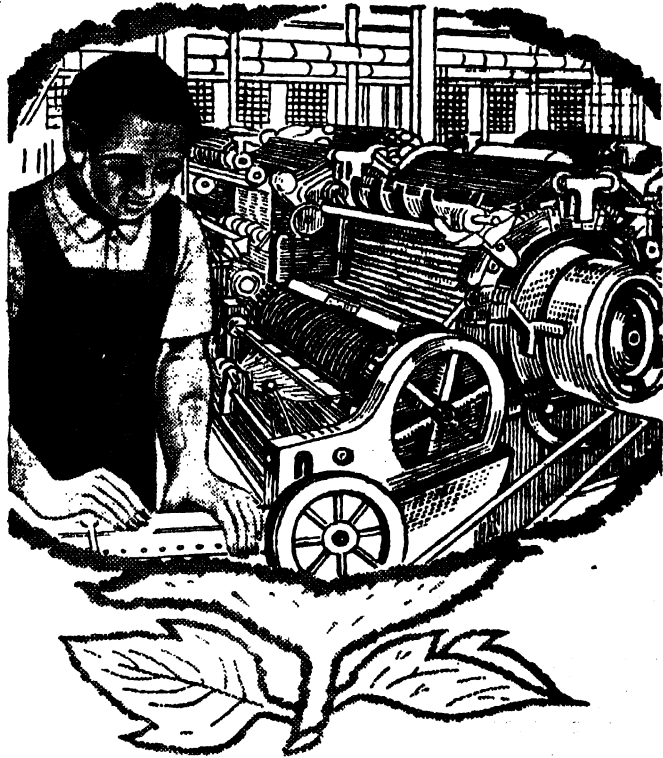
বাক্সে পুষে রাখতে ভালবাসেন আপনি?

৮। ডাক্তার যদি আপনাকে বিছানাবন্ধ থাকতে উপদেশ দ্যান, আপনি তাঁর নির্দেশমত বিছানায় থাকতে পারেন কি?

৯। আপনি কি পত্রালস ব্যক্তি? অর্থাৎ কেউ কোনো চিঠি লিখলে তার উত্তর দিতে আপনি কি অপরিসীম আলস্য বোধ করেন?

১০। গাড়ি নিয়ে পেট্রোল-পাম্পে গিয়ে আপনি কি 'অত লিটার তেল দাও' বলে পাম্পের লিটারের দিকে না তাকিয়ে পেট্রোল কেনেন?

১১। দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে দোকানদারের খানিকটা সময় ব্যয় করবার পর কি আপনার মনে হয় যে, যা হোক কিছু না কিনে বেরোনোটা অভদ্রতা?

১২। লাইসেন্স সঙ্গে না নিয়ে কি প্রায়শঃই গাড়ী চালান আপনি?

১৩। লোকে জিজ্ঞেস না করলেও কি আপনার ওপর-পড়া হয়ে কত দামে কোন্ জিনিসটা কিনেছেন বলার অভ্যাস আছে?

১৪। কোনো সভা, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত না হওয়াটা কি আপনি

খুব গর্বের ব্যাপার বলে মনে করেন? এবং এ-বিষয়ে কেউ জিজ্ঞেস করলে, "আমি বাপু ওসব সমিতি-ফমিতির মধ্যে নেই"—বলতে গর্ব অনুভব করেন?

১৫। পেছনে একটা গাড়ি এসে গেলে আপনি কি এক্সিলেটার চেপে স্পীড বাড়ান?

১৬। শাড়ি, জামা, কোট, জুতো ব্লাউজ-পিস পোষাক সংক্রান্ত এই প্রধান পাঁচটি জিনিস কিনে বাড়ি ফেরার পর, দুটোর বেশী ক্রীত দ্রব্য নিয়ে খুঁতখুঁত করতে থাকেন আপনি?

১৭। ঠিক এখন আপনার ব্যাগে কত টাকা আছে' হঠাৎ এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাগের টাকা না গুনে দিতে হলে আপনি কি তিন টাকার বেশী ভুল করবেন?

১৮। বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় আপনি কি বেছে বেছে বন্ধুদের সিগেরেট অফার করেন?

১৯। টাইগার হিলে সূর্যোদয়, তাজমহল, পুরীর সমুদ্র প্রভৃতি মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে কখনো কোনো কিছু, যেমন গলার মাফলার, হাতের লাঠি, ক্যামেরা অথবা ভ্যানিটি ব্যাগ ফেলে রেখে চলে এসেছেন?

২০। যে ধরনের [illegible] আপনার [illegible] হারায়, সেই ধরনের [illegible] কি [illegible] আবার কেনেন?

ওপরের এই প্রশ্ন[illegible] আটটি প্রশ্নের উত্তরে [illegible] বলেন তবে জেনে রাখুন অর্থ[illegible] প্রপাতে আপনি ভেসে যাবেন। [illegible] উচিত অর্থমন্ত্রীর পদে আজই [illegible] দিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনারা স্বামী[illegible] দুজনেই যদি অর্ধেকের বেশী প্র[illegible] বলতে পারেন তাহলে বাড়ি [illegible] লোনের জন্যে দরখাস্ত করে দিন। আপনাদের হবেই, চাই কি বড় [illegible] ডাক্তারী পাড়িয়ে চেম্বারও [illegible] পারেন। তবে এক্ষেত্রে দুজনের [illegible] খরচের ভার থাকা উচিত। আর [illegible] করুন, দুজনেই যদি আটটি তদোধিক প্রশ্নে 'হ্যাঁ' জানিয়ে [illegible] তাহলে জানবেন দুজনের [illegible] সংসারের হাল ধরে লাভ নেই— হালের ঘূর্ণির মধ্যে সংসারের [illegible] ঘুরতে থাকবে আজীবন। এ [illegible] দেশের বিধবা পিসীমাকে চট করে [illegible] তাঁর কাছে সিন্দুকের চাবি তুলে [illegible] একমাত্র কুবেরের করুণা পেতে পা[illegible]

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সান্ত্বনার মৃত্যুর পরে মল্লিকা আর ল্লিকার মামী মাস তিনেক ছিলো ঐ বাড়িতে। সেই সময়টুকুর মধ্যেই মল্লিকা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। শুধু ল্লিকাই নয়, তার মামাতো ভাইটি, তার মামী প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেলো। ভদ্রমহিলাটি চমৎকার মানুষ। আমার কাছে ভূপেনের স্মৃতিও কম মধুর ছিলো না। সবটা মিলিয়ে ওদের সঙ্গে আমার দিনগুলো ভালোই কাটছিলো। আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে ছিলো মল্লিকা আর তার ভাই, আমার নিঃসঙ্গ বাড়িটা যেন কথা বলে উঠেছিলো। শৈলেশ্বর ঘন ঘন আসতো, একদিন আমার বাড়িঘরও দখে গেল সে।

কিন্তু ঐ তিন মাসই। মল্লিকার মামীর দাদা এলেন, তিনি এসে বোনকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। মামীর বাপের বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো, মা বাপ জীবিত ছিলেন, এই একমাত্র দাদা এবং একমাত্র বোনে ভালোবাসা গভীর ছিলো, লে গেলেন তিনি। মল্লিকাকে নিয়ে গেলেন তার বাবা। মল্লিকা মামীর সঙ্গে যাবার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো কিন্তু শৈলেশ্বর দিল না। মামার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়ে পড়ে থাকবে তা তার সম্মানে লাগে। তার চেয়েও বড়ো কথা, সেখানে আর লাভ করবার লাভ করবার কী ছিলো? শৈলেশ্বর বুঝেছিলো, যে সামান্য কয়েক হাজার কা লাইফ ইনসিওর আছে ভূপেনের থেকে আর মল্লিকার বিয়ে দেবেন না মামী, তার ঐ বুড়ো বয়েসের ছেলেকে মানুষ করতেই চালাবেন সব।

এ সবই আমার অনুমান। একেবারে অনুমানও অবিশ্যি নয়, শৈলেশ্বরের ভঙ্গি থেকে বুঝতে পেরেছিলাম। মোট কথা এতোকাল পরে মল্লিকা তার বাবার সঙ্গে থাকতে গেল। শৈলেশ্বর দমদমের কাছাকাছি নিজে বাড়ি করেছিলো একটি, আমার নাকতলার বাড়ি থেকে তার দূরত্ব আর এক দেশ।

১৬

সান্ত্বনা আমার স্ত্রী ছিলো না, তার মৃত্যুতে আমার অসহায় বোধ করবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, তা ছাড়া এতো বছরের ব্যবধানে তাকে তেমন জ্বলজ্বলে হ'য়েও মনে থাকবার কথা নয়, যা ছিলো তা আমার কল্পনা মাত্র, আমার ইচ্ছে ক'রে ধ'রে রাখা স্মৃতির পরশ। সত্যি বলতে সান্ত্বনা আমার ভুলে যাওয়া গান, ভুলে থাকা সুর। মাত্র শেষের কাঁদনই সে সেই সুর আবার আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়ে গেল। তাতে খুব কিছু ইতর-বিশেষ হবার কথা নয় আমার জীবনে। সে হারিয়ে যাবার পরে যেমন জীবন তেমনিই চলতে লাগলো শুধু মাঝখানে একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো জোরে, তীরের অনেকটা মাটি ভিজিয়ে রেখে গেল।

আমার অবিবাহিত জীবনে এই আমি প্রথম খুব একটা অদ্ভুত ধরণের একা বোধ করলাম। আমার কেবলি মনে হ'তে লাগলো মল্লিকা আর ভূপেনের স্ত্রী এখানে থাকলে বড়ো ভালো হ'তো। তাদের জন্য আমার মন কেমন করতে লাগলো। আমার বাড়ির মস্ত মস্ত ঘর-গুলো চিরদিনই ফাঁকা কিন্তু তা আমি জানতাম না, ওরা যদিও আমার বাড়ির বাসিন্দা ছিলো না, তবুও ওরা যাবার পরেই আমি অনুভব করলাম ঘরগুলো যেন শূন্য হ'য়ে গেল। আমাদের পাড়াটা বনেদী, বেশীর ভাগ লোকই জমি-জায়গা নিয়ে বড়ো বড়ো বাড়িতে বাস করে, লোকজন বড়ো দেখাই যায় না, আর সেটাই ছিলো আমার এতোদিনের আকর্ষণ। তখন দেখলাম তাতে মনের মধ্যে যেন আরো অন্ধকার ঘনিয়ে আনছে।

আমার এক বিদেশী বণিক প্রতি-বেশী ছিলেন আমি মাঝে মাঝেই তাঁর বাড়ি যেতাম। রোগীর বাড়িতে ডাক্তার হিসেবে গিয়েই প্রথম আলাপ হ'য়েছিলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা বন্ধুতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিলো। আমার বাসভূমিটি কিনবার মূলেও তাঁর অংশ ছিলো কিছু। বাড়িটির খবর তিনিই প্রথম জানান আমাকে। তাঁর পাড়ায় বলে গরজ ছিলো যাতে আমি কিনি। বাড়িটি একজন জর্মান ভদ্রলোক সখ ক'রে করেছিলেন, স্ত্রী মারা যাবার পরে দেশে চলে গেলেন, তাই বিক্রি ক'রে দিলেন।

আমারও কেমন মনে হ'তে লাগলো আমিও এখন বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাই। সেই বিদেশী বন্ধুটির কাছে গিয়ে সেই মনোবাসনাই জ্ঞাপন করেছিলাম। বন্ধুটি আর তার

স্ত্রী আমাকে বসিয়ে চা খাওয়ালেন, খাবার খাওয়ালেন তারপর বোকামী করতে বারণ করলেন। আর সেইখানেই আমার একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'লো, যার নাম রাসেল স্মীথ।

'রাসেল স্মীথ!' চেঁচিয়ে উঠলো নীলিমা।

তেমনি ঠান্ডা গলায় ডক্টর মৈত্র বললেন, 'রাসেল স্মীথ। এবং আমি অনুমান করছি তোমার ভ্রাতা রাসেলের সঙ্গে এই রাসেল অভিন্ন।'

'কাকাবাবু—'

'আর সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা এই ছেলেটি আমার বাড়িতে থাকাকালীনই মল্লিকার বিয়ে হয়।'

'মল্লিকার বিয়ে হ'য়ে গেছে? কার সঙ্গে।'

'তা আমি জানি না। গল্পটা যদিও আমি তোমার গল্পের উপসংহার হিসেবে আরম্ভ করেছিলুম, শেষ পর্যন্ত নিজের গল্প বলেই সময়টা নষ্ট করলুম।'

'কাকাবাবু—'

'আমার সেই বিদেশী বন্ধুই এই ছেলেটিকে আমায় উপহার দিয়েছিলো, বলেছিলো, বড়ো অসহায়, বড়ো ভালো। পড়াশুনো আর কবিতা লেখা ছাড়া ছেলেটির আর কোনো বিদ্যে নেই, এদেশে কী একটা ফার্মে চাকরী নিয়ে এসেছে, এসেছে এদেশের লোকের সঙ্গে মিলতে, মিশতে। কোনো বাঙালী পরিবারে পেয়িং গেস্ট থাকতে চায়, তাদের ধরণধারণ ভাষা আচার বিচার সব শিখে বাঙালী বনে যেতে চায়। আমি লুফে নিয়েছিলুম প্রস্তাবটা। ছেলেটিকে দেখেই আমার মায়া পড়ে গিয়েছিলো। আর তারও দেখলুম আমাকে খুব ভালো লেগেছে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলুম সে যেন কী চায়, কী এক উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। আসলে সে তখনো তার প্রণয়িণীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। তার চাকরীতে খাটুনি ছিলো খুব, যেমন প্রচুর মাইনে দিত, তেমনি তা উশুলও ক'রে নিত। ছ' ঘণ্টা চাকরী ক'রে বাকী সময়টা ঘুরে বেড়াতো। পার্কে গিয়ে বসতো, বাজারে যেতো, ভিড় দেখলে ঢুকে পড়তো সেখানে, এর ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করতো, জিজ্ঞেস করতো, কিন্তু যাকে বললে তক্ষুনি তার হারানো মানিক সে ফিরে পায় তাকেই কোনোদিন সে জিজ্ঞেস করলো না। কোনো এক রাত্রে খাবার পরে গল্প করতে করতে আমি শুধু এইটুকুই জানলাম সে একটি মেয়েকে ভালোবাসে।

ব্যক্তিগত কথা। যতোটুকু বলেছে, ততোটুকুই শুনেছি। তার বাইরে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করা শোভন মনে হয়নি আমার। এই ক'রে ক'রে ছেলেটির স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো।

এর মধ্যেই আমি একদিন দমদমে মল্লিকাকে দেখতে গেলাম। দেখতে গেলাম মানে দেখা করতে গেলাম বলাই ভালো। বিদেশে আসার নিমন্ত্রণটা তখুনি পেয়েছিলুম। একেবারে ঠিক না থাকলেও বুঝেছিলুম শেষ পর্যন্ত যাবোই। আর যাবার মুখের ব্যস্ততায় নিশ্চয়ই এতোদূরে এসে মেয়েটাকে দেখে যাওয়া হবে না।

কিন্তু গিয়ে যেন একটা তোপের মুখে পড়ে গেলুম। শুনলুম বিয়ে ঠিক হ'য়েছে তার, কিন্তু সে রাজী হচ্ছে না। অসুখের ছলে বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছে।

শৈলেশ্বর বাড়ি ছিলো না, তার স্ত্রী রুষ্ট মুখে আমাকে হাতের কাছে পেয়ে আমাকেই অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, 'ঐ তো চেহারা, শুনেছি মা ছিলো কালো, বেঁচে থেকে মানুষ করতে পারেন নি বটে, কিন্তু চেহারার সম্পদটুকু দিব্যি ঢেলে দিয়ে গেছেন। রং কালো মেয়ে কি আজকাল কেউ বিয়ে করতে চায়? কতো হন্তদন্ত হ'য়ে বাপ ঠিকঠাক করলো এখন মেয়ে ঢং ধরেছে।'

চুপ ক'রে শুনতে শুনতে আমি বললাম, 'কেন, ওর আপত্তিটা কী? বর পছন্দ হয়নি?'

'পছন্দ অপছন্দের কথা উঠলো কোথায়? ও কি তাকে দেখেছে, না শুনেছে সে কে, আর কী করে। বলতে গেলেই উঠে যায়।'

'তার মানে ও এখন বিয়েই করতে চাইছে না এই তো?'

'হ্যাঁ, তিনি বিয়ে করবেন না, হয় পড়বেন নয় চাকরি করবেন। লেখাপড়ায় যে কতো মন তা তো আমার জানা আছে, আসলে বাইরে বেরুবার ছুঁতো। পাঁচটা ছেলের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি।'

'ও কোথায়?'

'কোথায় আবার। বিছানায়। বিছানায় পড়ে থাকাই তো এখন ওর একমাত্র কাজ। রোজ ঘুসঘুসে জ্বর আর মাথাধরা। কী জানি বাবা কী অসুখ বাঁধিয়ে বসেছে কে জানে। আমার তো সন্দেহই হয়।'

'কী সন্দেহ হয়!'

'ডাক্তার মানুষ বোঝেন না? এই ঘুসঘুসে জ্বর কি ভালো। আমি তো ঐ জন্যই আরো বিয়ে দিতে ব্যস্ত হ'য়ে গেছি। শেষে কি হিতে বিপরীত হ'য়ে গুষ্ঠিশুদ্ধু যাবো? ঘর ভর্তি ডবকা বয়সের ছেলেমেয়ে, একসঙ্গে খাওয়া মাখা, তারপর বীজ ঢুকুক আর কারো বুকে।'

'যদি তাই সন্দেহ করেন তবে তো কোনো রকমেই বিয়ে দেয়া উচিত না।'

'রেখে দিন উচিত অনুচিত। যদি কিছু হয়ই বাড়িতে রাখবো কোথায়? এই তো বাড়ি, গায়ে গা ঘেঁসাঘেঁসি। বিয়ে হ'লে স্বামীই তখন দায়ী হবে, সেই করবে।'

'ছিছী, এরকম ভাবা খুব অন্যায়।'

আমাকে গম্ভীর হ'তে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রমহিলা, হেসে বললেন, 'আপনিও যেমন, আমি কি সত্যি বলছি নাকি ওর সেই অসুখ। দিব্যি ভালো মেয়ে, সুস্থ সবল।'

'যদি ও বিয়ে করতে না-ই চায়, আপনারাই বা জোর করছেন কেন? পড়তে চায় পড়ুক না।'

'কেন মামা পড়াতে পারলেন না? বসিয়ে রাখলেন কেন? কেন চাকরি করতে অনুমতি দিলেন? ভাগ্নি যা বলবে তাই সই। বললো চাকরি তো চাকরি। পড়বো তো পড়ো। বসে থাকবো তো বসে থাকো। এতো আদর দিলে চলে না। মাথাটি একেবারে খেয়ে গেছেন ভদ্রলোক। আর ঐ যে মাসী মহিলা, বাবা, মেয়ে তো নয় যেন বাঘিনী। ভগ্নীপতিকে দেখলে যেন দুই চোখে আগুন জ্বলতো। নিজের মেয়ে নিজের কাছে আনতে চাইবে না যেন চোর। যখন চাকরি করতে আরম্ভ করলো, তখনো তো একটা বিয়ে ঠিক করেছিলেন ইনি। আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে সবে, চেহারাটাও একটু ইয়ে ছিলো। তখনো মেয়ে এমনিই বেঁকে বসলেন। তখন ছুতো দিলেন এতো ভালো চাকরি তিনি ছাড়বেন না বিয়ে

করবেন না। অমনি মামাও সেই তালে ...চলেন। তার উপরে ফাস্ট কতো, এই হলে না ঐ ছেলে—, গেল সেটা। তারপর তা নিজেই গেলেন। গেলেন তো দু'চার হাজার রেখে গেলেই পারতেন ভাগ্নীর না। অত তো আদরের ভাগ্নী। মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়েয়। টাকার বেলায় সকলেই সমান।'

'ও যদি বিয়ে করতে না চায়, আপনাদেরই তো সুবিধে. টাকা বে'চে যাবে। থাকতে দিন না ওকে ওর মনে। একদিন নিজেই দেখেশুনে ক'রে ফেলবে। বিশেষ ক'রে এখন যখন অসুস্থ।

'আপনি তো বললেন, কিন্তু সবাই কী বলবে জানেন?'

'কী বলবে?'

'বলবে সংমা বলেই মেয়েটাকে বিয়ে দিচ্ছে না। এদিকে সুমির বিয়ে ঠিক
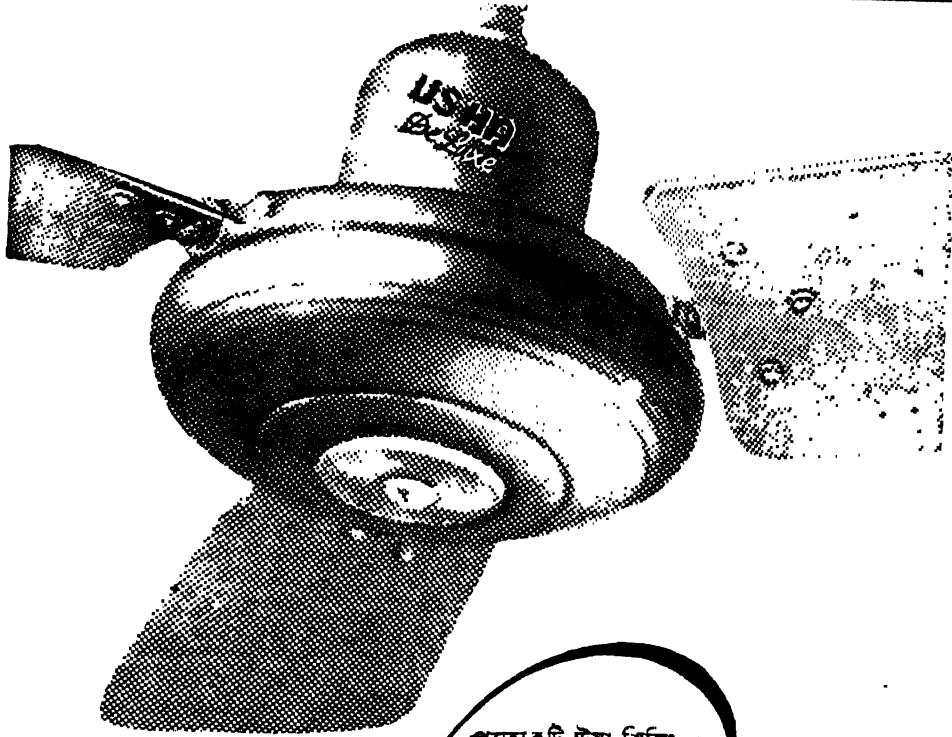
করে থেকে, ওর না হ'লে ওকে দিই কী করে?'

'তাতে কী?'

'সে হয় না। সৎমেয়েকে আগে পার ক'রে তবে নিজের মেয়ের কথা। কারো কথার তলে আমি থাকতে চাই না।'

'তাই তো। আচ্ছা চলুন তো দেখে আসি ওর আপত্তিটা কিসের।'

'যান, উপরে চলে যান, গেলেই ঢং দেখতে পাবেন।'

মল্লিকার এই মায়ের মাতৃমূর্তি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হ'লো না এ বাড়িতে ঐ আদরের মেয়ে কী ভাবে আছে। ওর মন্দভাগ্যের কথা ভেবে আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম উপরে। আমি জানতাম কোণের দিকে একটি ছোটো ঘরে মল্লিকার আস্তানা। গিয়ে দেখলুম সে তার সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিকে বসে বসে অঙ্ক কষাচ্ছে। অন্য ভাইটি ঢুলে ঢুলে বানান ক'রে ইংরিজি পড়ছে। শৈলেশ্বরের প্রাইভেট টিউটরের খরচটা যে বেঁচে গেছে মেয়েকে এনে সে বুঝতে পারলুম।

আমাকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো, 'ওমা, কাকাবাবু। আসুন। আসুন। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।'

আমি বললাম, 'অত ভাবাভাবির দরকার কী বাপু, সোজা চলে গেলেই হ'তো।'

'তাও বুঝি ভাবিনি। কিন্তু যা দূরে।'

'দূরে তো কী। লোকেরা দেশ থেকে দেশে গিয়ে দেখা করে আর তুমি একটা বাসে চড়ে বসতে পার না, না?'

'আমার শরীরটা বেশী ভালো নেই কাকাবাবু।'

'কেন? কী হ'য়েছে?'

বই টই ফেলে হাওয়া হ'য়ে গেল। মল্লিকা সেগুলো গুছিয়ে রেখে আমার মুখোমুখি খাটে বসে বিষণ্ণ গলায় বললো, 'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে নীচে?'

'সে তো দেখলুম বাড়ি নেই, তবে তার স্ত্রী অনেক কথা বললেন বটে।'

ডাক্তার মানুষ বোঝেন না?

'বেশ অনেকদিন হ'য়ে গেল কেবল ঘুরে ফিরে জ্বর হয়, দুর্বল লাগে।'

'তাই নাকি। একটা চিঠিও তো লিখে দিতে পারতে। কবে চলে আসতুম।'

'নম্বর যে জানি না।'

'সে কী।'

'বাড়ি চিনি, দেখা হয়, চিঠি লেখার কথা মনেই হয়নি। বাড়ির নম্বরের কথাও মনে হয়নি।'

'লিখে রাখো, লিখে রাখো। দরকার হ'তে পারে তো?'

'হবে, খুব শীগ্গিরই বোধহয় হবে।' ভাইয়েদের দিকে ফিরে তাকালো সে 'এই টুবলু, যা, তোদের ছুটি।'

টুবলু আর বাবলু দুই ভাই। একটি দশ একটি আট। পড়া ছাড়তে পেরে মহা ফুর্তি দু'জনের। তৎক্ষণাৎ

মল্লিকা তার কালো কালো চোখ তুলে ঠিক তার মায়ের মতো ক'রে তাকালো, চোখের তারায় হাসি মাখিয়ে বললো, 'কী কথা।'

'তোমার বিয়ের। কী ব্যাপার? আপত্তিটা কিসের?'

চুপ ক'রে থাকলো মল্লিকা।

আমি হাত বাড়িয়ে তার হাতের নাড়ি দেখতে দেখতে বললুম, 'মাস-খানেক ধ'রে যে এ রকম জ্বর হচ্ছে. চিকিৎসাটা কী রকম হচ্ছে শুনি?'

'তেমন জাঁক ক'রে চিকিৎসা করবার মতো কিছু নয়, তাই আর ডাক্তারের কথা ভাবিনি।'

'তুমি না ভেবেছ, তোমার বাপ তো ভাববে?'

'বাবা কাজে ব্যস্ত থাকেন, খেয়াল করেন না। এখন আপনি এসেছেন বলেই তো কী করি? এ রকম শরীর খারাপ

থাকলে তো কোনো কাজই করতে পারবো না।'

'এখন কী করছো তুমি?'

'এম-এ তে ভর্তি হ'য়েছিলাম, কিন্তু বাবা পড়াতে চান না। টিউশানি নিয়েছিলাম একটা, আপাতত সেটা গেছে, আর জুটছেও না। আসলে ঐ কাজটা ছেড়ে দেয়াই আমার বোকামী হ'য়েছে।'

'কী কাজ?'

'আমেরিকা থেকে ফেরার পরেই পেয়েছিলাম। কিন্তু এই শরীর খারাপই আমার কাল। মামা সবটাতেই অস্থির হ'য়ে পড়তেন, উনি বললেন এক বছর বিশ্রাম কর, নৈলে তোর ডিসপেপসিয়া হবে। বলেই ক্ষান্ত হ'লেন না, কাজ ছাড়িয়ে তবে আনলেন। মাঝখানে বাবা আবার ঠিক এই রকম বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপে উঠেছিলেন, সে সময়টায় অশান্তি গেছে অনেক, মামার সঙ্গে বাবার ঝগড়াঝাঁটি হ'য়েছে, আমি তখন বাবার কাছেই ছিলাম। শেষে মামা আবার নিয়ে গেলেন জোর ক'রে। এই ক'রে ক'রেই সময় কাটলো আমার। তারপর তো মামাই অসুখে পড়লেন, পুরো সাত মাস উদরিতে ভুগে তিনি মারা গেলেন। আর এখন তো দেখছেন।'

'এখনো তো একটা টিউসানি করছো দেখছি, তার মাইনেতে পড়ার খরচ চলে না?'

'টিউসানি? কই, না তো? এখন আমি বেরুতেই পারি না এতো শরীর খারাপ হ'য়েছে।'

'টুবলু বাবলুর জন্য এতোদিন নিশ্চয়ই অন্য মাস্টার ছিলো?'

আমার ইঙ্গিত বুঝলো মল্লিকা। চোখ নিচু ক'রে বললো, 'তা ছিলো। মা বললেন আমি আসতে আর তার দরকার কী।'

'মাসীর চিঠি পাও?'

'খুব কম। তিনিও অসুস্থ। আর বাবার কথা তো জানেন, আমার মামা মাসী কাউকেই তিনি পছন্দ করতেন না। বাবাকেও অবিশ্যি ও'রা পছন্দ করতেন না। মাঝখান থেকে আমাকে নিয়ে গোল বাধতো। কিন্তু যাক সে সব, আমি আপনাকেই মনে মনে খুঁজছিলাম কাকাবাবু।'

'কেন বলো তো?'

'যাকে ভালোবাসি, আর যিনি ভালোবাসেন তাঁকে দুঃখে পড়লেই মানুষ খোঁজে। খোঁজে না?' তার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

একটু থেমে বললো, 'বাবা আমার বিয়ে নিয়ে বড্ড জুলুম করছেন।'

'তুমি বড়ো হ'য়েছো, তোমাকে বিয়ে দে'য়া তোমার বাবার নিশ্চয়ই কর্তব্য।'

'কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই না।'

'কেন?'

'না।'

'কারণটা কী?'

'আমি এম-এ-টা পাশ করতে চাই, তারপর একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নেবো।'

'বেশ তো, বিয়ের পরে না হয় এম-এ পাশ কোরো।'

'না তা হবে না।'

'কেন, ওরা রাজী নয়?'

'কারা?'

'যাদের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে।'

'তারা কে, কেমন, রাজী কি গররাজী তা আমি কিছুই জানি না।'

'মোট কথা, তুমি এখন বিয়েই করতে চাও না, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'বাবাকে বলেছ?'

'বহুবার। উনি খেপে যান, আমাকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দিতে চান, যা তা বলেন। আমার মামা থাকতে এরকম কখনো বলেন নি।'

'মামাকে ভয় পেতেন বোধহয়।'

'মামার চেয়ে মাসীকে বেশী। মাসী একবার তাকালেই বাবা আর কথা বলতেন না।'

'শৈলেশ্বরের স্ত্রী কী বলছেন?'

'মা?'

'যদি তাঁকে তুমি মা বলো।'

'মা আমার খুব বিরোধী। তাঁর ধারণা আমার এই ঘরে ফিরে জ্বরটা ভালো নয়, তিনি আমাকে এখান থেকে সরাতে পারলেই সবচেয়ে বেশী খুশি হন। আমার পরের বোন সুমির খুব একটা ভালো বিয়ে ঠিক করেছেন তিনি, নগদেই তাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে, আমার বিয়ে না হ'লে তাতেও মার একটু খারাপ লাগছে।'

'তোমার বাবাটি একটি আস্তো গাড়োল। প্রথমে আমার জানা দরকার তোমার জন্য সে কেমন পাত্র ঠিক করেছে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না কাকাবাবু!'

'কেন এসে যাবে না।'

'যে-ই হোক, যেমনি হোক, আমি এখন বিয়ে করবো না, আর সেটাই আপনি বাবাকে বুঝিয়ে বলুন।'

'সে কি আমার কথা শুনবে?'

'কেন শুনবেন না, এ তো আমি এমন কিছু অন্যায় দাবী করিনি।'

'কিন্তু সে যদি কারুকে কথা দিয়ে থাকে?'

'আমি তাদের বাবাকে আমার মতামত জানিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে তুমি ভেবো না। কিন্তু একটু শুয়ে পড়ো তো, বুকটা দেখি একবার।'

মল্লিকা হাসলো, 'আপনারও কি মার মতো সন্দেহ হচ্ছে নাকি অসুখটা নিয়ে?'

'একবিন্দুও না। কিন্তু শরীরটা তো সারানো দরকার? বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যও তো তাগদ চাই কী বল?'

'ঠিক বলেছেন। এইসব কাণ্ড দেখে, বাবার এ রকম অদ্ভুত জেদ দেখে আমি আকুল হ'য়ে একটা চাকরির চেষ্টা করছি, যাতে চলে যেতে পারি এখান থেকে। মেয়ে হ'য়ে জন্মানো যে কী যন্ত্রণা, নানাভাবে যে কতো প্রতিবন্ধক, সে বোধহয় আমি ছাড়া এমনভাবে আর কেউ বুঝতে পারেনি।' আমার হাত জড়িয়ে ধরলো সে, 'কাকাবাবু, এটা আপনাকে ক'রে দিতেই হবে। আমি বাবার সঙ্গে পারবো না, বাবা বোঝেন না আমার যথেষ্ট বয়েস হ'য়েছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করাটা তাঁর উচিত নয়।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

'তা হ'লে সে কথাটাই আপনি বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন।'

'তুমি ভেবো না।'

'যদি আমি সুস্থ থাকতাম, আমি চলে যেতাম মাসীর কাছে। সবচেয়ে মুস্কিল হচ্ছে টাকাকড়িও তো নেই কাছে। যতোক্ষণ না একটা চাকরি পাই—'

'টাকার জন্য ভেবো না।'

'আপনি দেবেন, এই তো? আপনি না বললেও দরকার হ'লে আপনার কাছেই আমি চাইবো। ধরুন, বাবা যদি এমন অবস্থা ক'রে তোলেন যে আমার পক্ষে আর এখানে থাকা কোনো রকমেই সম্ভব না হয়, কোথায় যাবো? একটা মেয়েদের হস্টেল অন্তত ঠিক করতে হয়, তার জন্যও তো টাকা দরকার। যদি মাসীর কাছে যেতে হয়, ঐ একই প্রশ্ন। টাকা প্রত্যেক পায়ে। আপনি ছাড়া আর সে জোর আমার কার কাছে? সুতরাং টাকার কথা ভেবেও ভাবিনি। ভাবছি আমার শরীরের কথা। এতো দুর্বল হ'য়েছি—'

'একটা কাগজ দাও।'

'আমার কী হ'য়েছে কাকাবাবু?'

'শোনো, তুমি ভাজাপোড়া একেবারে খাবে না, ঘি তেল ছোঁবে না, পেঁপে সেদ্ধ আর ভাত। ঘোল খাবে, ছানা খাবে, ফল খাবে। চা নয়।'

'আমার জনডিস হ'য়েছে?'

'ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে। সাবধানে থাকবে, একতলা দোতলা কোরো না।'

'তবু নিশ্চিন্ত হ'লাম।'

'কেন, তুমিও কি টি-বি ভেবেছিলে নাকি?'

'একটু একটু খারাপ লাগছিলো বৈকি।'

আমি মাথায় টোকা দিলাম, 'বোকা মেয়ে।'

(ক্রমশঃ)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিনী সাহিত্যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে। নতুন ভাব বিষয় আঙ্গিকের উদ্ভাবনে কবিরা আকুল হয়ে উঠলেন। 'নতুন রীতি'র মোহে উন্মাদ হলেন তাঁরা। এঁদেরই একজন হিসাবে ই ই কামিংস উদ্ভাবন করলেন চটকদার মনোভাবের সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা। আজকের দিনের রক্ষণশীল সমালোচক তার মধ্যে চাপল্য ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছেন না। মনে হয় কবি কামিংসের জীবনদর্শন সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। এক যুগ-সংকটের মধ্য দিয়ে কামিংসের আবির্ভাব সাহিত্যে। ফকনার, হেমিংওয়ে, জন ডস্ প্যাসস-এর মত কামিংসও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দি এনরমাস রুম'-এ ব্যক্তি-মানবের প্রতি অসীম ভালবাসা এবং যাবতীয় কর্তৃত্বের প্রতি অসীম ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কামিংস। এই গ্রন্থেই বোঝা গিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোন জিনিসের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তা চেতনা প্রকাশ পাবে। ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত ভাষাভঙ্গিতে যে বক্তব্য ফুটে উঠেছে তার মধ্যে গভীর জোরালো ক্রিয়াপদ প্রয়োগ, অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত বিশেষণ ব্যবহার এবং ওলটপালট শব্দ সাজিয়ে অদ্ভুত আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'টিউলিপ্স্ অ্যান্ড চিম্নিজ' (১৯২৩) অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ। এখানে একদিকে প্রেম-ভালবাসা যাবতীয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক আনন্দানুভূতির উগ্র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত কবি; আবার দীনতা হীনতা, চিত্তক্লান্তি সাধারণ মানুষের এই সমস্ত নানা ভাবকে নিন্দা করা হয়েছে। অত্যন্ত অবজ্ঞা এবং ঘৃণার সঙ্গে কবি এই মনোবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বিদ্রূপ করেছেন। একজন খ্যাতনামা সমালোচক গ্রন্থটিকে 'রোম্যানটিক নৈরাজ্যবাদের সমুজ্জ্বল সতেজ ও শক্তিশালী অভিব্যক্তি'রূপে বিশেষিত করেছিলেন।

কামিংস-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আধুনিক মার্কিনী কাব্য-সাহিত্যের একটি দ্বন্দ্বের কথা এসে পড়ে। এই সংঘর্ষ চলেছে তরুণ কবিদের বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে পুরাতন আঙ্গিক ও বিষয়সর্বস্বদের লড়াই।

চমকে যেতে হয় এইজন্য যে কবিতার আদল বদলে গেল। ভাষা প্রয়োগ, আত্মবিশ্বাসে এল নতুন চিন্তার সুর।

কামিংস লিখছেন—

'গ্রামো
ফোনেরদম ফু
রিয়েযা চু, ছে গ্রামোফোন
থামল।'

আবার লিখেছেন—

'যে-কেউ বাস করেছে এমন ধারা
পরিপাটি কোন্ শহরে
(কত ওপরে-ভাসা নিচেয় নামা
ঘণ্টা-বাজা প্রহরে)
বসন্ত, গ্রীষ্ম, আর হেমন্ত আর শীতে সে
গান গেয়েছে, করি-নাই-এর, আর নেচেছে
করেছি-র।'

কোনরকম বন্ধনের মধ্যে না গিয়ে স্বাধীন শিল্পাভিব্যক্তির চমৎকার রূপ ফুটে ওঠে তাঁর রচনায়। কামিংস বিবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বারবার। নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্যে

কাব্যগ্রন্থে কামিংস প্রেমকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে চিত্রিত করেছেন। কাব্যে কৌতুকজনক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য যাঁরা কামিংসকে দোষারূপ করে থাকেন তাঁরা ভুলে যান—ঐ জিনিসটিও হাল্কা তুচ্ছ মূল্যহীন নয়। মার্কাস কানলিফ লিখেছেন, "শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কামিংস-এর দৃষ্টিভঙ্গি আবদ্ধ হয়ে আছে—একথা সত্য হলেও সে দশকের লঘু মেজাজেও যে দৃঢ়বিশ্বাস ও চিন্তাহীনতার সুর প্রতিধ্বনিত—সে সুর এ যুগে সার্থকভাবে বয়ে এনেছেন কামিংস। আধুনিক ভাস্কর্যের সঙ্গে আমেরিকান শিল্পী আলেকজান্ডার ক্যাল্ডারের যে সম্পর্ক কামিংস ও আধুনিক কাব্যের সম্বন্ধ তেমনই। গভীর ভারাক্রান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেননি। কিন্তু দুজনেই অভিযুক্ত হয়েছেন লঘুচিত্ততা ও অপরিণত বুদ্ধি-

ই, ই, কামিংস

তিনি প্রকৃত শিল্পীমানসকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শব্দবিন্যাস অভিনব পদযোজনায় কাব্যরস স্ফুটনে তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম দিয়েছিলেন '৫১ কবিতাবলী' (১৯২৫), 'ভি ভা' (১৯৩১), 'নো থ্যাংকস্' (১৯৩৫), '১×১' (১৯৪৪)। এই সমস্ত

চেতনার অভিযোগে। কামিংসের কাব্যে এবং ক্যালডারের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে শিল্পকলার এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ পরিদৃষ্ট। অবসর দিনের আতপ্ত সূর্যকিরণে তা যেন ঝক্‌ঝক্ করে ঘুরছে, উঠছে আর পড়ছে।"

স্বর্ণকালে

আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট ওই একটিই। সবেধন নীলমণি কেষ্টমাষ্টার। মাষ্টারের বাঁজ্জণু দশ বছর ধরে কেষ্ট মাষ্টারের রক্তে রক্তে মর্মে মর্মে উপ-নিবেশ গড়ে তুলেছে। প্রায় এক যুগের মাষ্টারীতে যে-হাত পেকেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেয় কে! এ তল্লাটে তো নেইই। এ সম্পর্কে জানে এপাড়া ওপাড়া। গাঁয়ের বয়স্ক অভিভাবকরা এবং সেয়ানা ছাত্রবৃন্দও। সব থেকে জানে কেষ্ট-মাষ্টারকে কেষ্টমাষ্টার। আর তাই নিয়ে ওর অহংকারও নিতান্ত নিঃশংক। তাতে কেষ্টমাষ্টারের মন্দ লাগে না। আত্ম-শক্তির ঢাক্‌ড়া পেটাবার ছন্দে কেষ্ট-মাষ্টার মশগুল হয়ে জমে যায়। গাঁয়ের মোক্তার, হেডপণ্ডিত মশাই, দাশু উকিল আর আয়ুর্বেদশাস্ত্রী যগু কোবরেজের আড্ডায় সব থেকে বেশি জমে। তিরিশ বছরের কেষ্টমাষ্টারের সঙ্গে আর সব বয়োজ্যেষ্ঠ আড্ডাদারদের বয়োপার্থক্যের অসুবিধেটা এ আড্ডায় সম্পূর্ণরূপেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বয়সের চড়াই-উতরাইকে সমতল করে দেয়া বোধহয় আড্ডার একটা বলিষ্ঠ ধর্ম।

আড্ডার প্রসঙ্গ বিবিধ এবং বিচিত্র হতেও পারে। কিন্তু যে-কোনো প্রসঙ্গ থেকেই কেষ্টমাষ্টার শেষ পর্যন্ত পাড়ি দেবে শিক্ষাপ্রণালীর সমস্যা-খাতে। শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক ধারার আলোচনা বেয়ে শেষতঃ স্ব-উদ্ভাবিত ও অনুসৃত শিক্ষাধারার মহাসাগরে এসে ভাসবে কেষ্টমাষ্টার।

দাশু উকিল বলবে—"আজকাল ভাল কাজে বড় একটা নিষ্ঠার নজির দেখা যায় না। সব তাতেই হুজুগ। বিবাদের ক্ষেত্রেই নিষ্ঠা বলবতী। গোটা আয়ুষ্কালের মধ্যে ক'টা লোক মশাই যত্ন করে রোব্ ঠাকুরের একখানা কবিতাও পড়েছে? দেখুন গে' যান, আমাদের কোর্ট-কাছারীতে— মামলাবাজীতে কত যত্ন, কত ছোটাছুটি, কত টাকা, কত বুদ্ধি-চর্চা—আর কালিঘাটে কত মানত মশাই!" হেড্ পণ্ডিত থাবা তুলল,—"নিষ্ঠা হবে কোত্থেকে মশাই? আরে ছাত্রজীবনেই তো নিষ্ঠার বীজ পাতা মেলে। কিন্তু গবেট—গবেট—ব্যাকরণের একটা সূত্র সারাদিন চিবিয়েও গিলবে না এই হতভাগা ছাত্রগুলো। বুঝে দেখুন নিষ্ঠার নমুনা।" যোগেন কোবরেজ এবার বলবে,—"আসলে মেধার অভাব মশাই, যাই বলুন। স্মৃতিশক্তি বলে আছে কিছু এদের? আমাদের সময়ে—" নায়কের মতো গম্ভীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেষ্ট-মাষ্টার যগু কোবরেজের কথায় ছেদ টেনে দিয়ে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে বলবে,—"কি বলছেন? —ও সব ভুঁয়ো, মশাই—ও সব ভুঁয়ো। গোড়ায় গলদ। শিক্ষার ধারাটাই অধিকাংশ সময় বেয়াড়া। মেধাকে কাজে লাগাবার সুনিপুণ প্রণালীরই বড় অভাব। পুরোনো শিক্ষাপ্রণালী এখন ভোঁতা হয়ে গেছে, তাতে ধার নেই মশাই, যে ছাত্রদের অজ্ঞতার মহীরুহ কাটবে। অল্পসময়ে একটি জিনিসকে আয়ত্ত করাবার কায়দা-কানুন চাই—টেকনিক্ জানা চাই মশাই। তার ব্যবস্থা না হোলে ছেলে ফেল করলে সব সময় গবেট বললে সংগত হয় না মশাই।" অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাসের উচ্চাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে কেষ্ট-মাষ্টার। চোখ দুটো বিজ্ঞের মত সাবধানী ওর। রঙচটা ময়লা হ্যাণ্ডলুমের শার্টের হাতটা একটু গুছিয়ে নিয়ে আবার শুরু করেছে কেষ্টমাষ্টার,—"অত কথার দরকার কি! আমাদের কোবরেজ মশাইর ছেলেকেই দেখুন না।" কোবরেজের দিকে একটু জিজ্ঞাসু ঢঙে তাকিয়ে নিয়ে বলবে,—"ক'বার যেন?...তিন তিন বার ম্যাট্রিক ফেল ক'রে ঝুলেছিল। সবাই তো বলেছে, ও পর্যন্তই, আর কাজ নেই বাবা। কিন্তু, মাত্র তিন মাস একটু দেখিয়েছিলুম। সে ছেলে এখন কোল-কাতায় ডাক্তারী পড়ছে দাশুবাবু।" —"না, না, ইয়ে, হ্যাঁ, তাতো বটেই, পরি-চালনার বাহাদুরী তো আছেই। আর তার জন্যে—হেঃ হেঃ আপনার কাছে কী যে—", কোবরেজ মশাই সাক্ষাৎ বিনয়-ভূষণ। এক মুহূর্তের জন্যে বিনয়ানত কেষ্টমাষ্টারের মুখ। হেড পণ্ডিত মশাই এবার তারিফ করলেন ছোকরা মাষ্টারের অধ্যাপনার। বললেন, "ভায়া, কি আর বলি। এ গাঁয়ের ভাগ্যে বৃহস্পতি তদ্দিনই আছে, যদ্দিন তুমি এ গাঁয়ে আছো।" আত্মপ্রসাদের স্মিত

হাসিতে কেষ্টমাষ্টারের মুখটা উজ্জ্বল হয়েছিল তখন।

তারপর আড্ডাটা ভেঙ্গে গেলে বাড়ী ফেরার মুখে হেড্ পন্ডিত মশাই কেষ্ট-মাষ্টারের কাঁধে হাত রেখে যতটা পারেন আন্তরিক করে বললেন, "ভায়া—তোমার যাদুবিদ্যেটা এবার একটু আমার জন্যে কাছে লাগাও। বুঝলে?" কেষ্ট-মাষ্টারের চোখে অবুঝ কৌতূহলের নিরুত্তরতা। "বুঝতে পারছো না তো! তবে শোনো, রোগের কথা বলি। প্রায় দুরারোগ্য ভেবেই এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি। তবু বলছি, যদি তোমার শাস্ত্রে কোনো চিকিচ্ছে থাকে। বছরের পর বছর ভুগছি ভায়া—। শেষে সাপে-কাটা মরার মতো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে মা মনসার দোহাই দিয়ে শুধু প্রতীক্ষা করেছি, যদি কোনো দেবী-কৃপায় বাসি মড়ার প্রাণ ফিরে আসে।...ভায়া, অন্ততঃপক্ষে অক্ষর জ্ঞান, এই একটু-আধটু নামটা লেখা, চিঠিটা লেখা, চিঠিটা পড়া—ব্যস্, আর কিস্‌সু না। বুঝলে? অথচ আমার ভাগ্যে তা' হোল না।" এতোক্ষণ প্রগাঢ় কৌতূহলে কথাগুলো আত্মসাৎ করছিল কেষ্টমাষ্টার। এবার বলল কেষ্টমাষ্টার রসিকের মতো, "পণ্ডিতপ্রবরের গৃহে নিরক্ষরতার ব্যাধি! কিন্তু রুগীটি কে বলুন তো!"

নতুন রুগী হাতে নিয়েছে কেষ্ট-মাষ্টার। আজকে একটুও দেরী করা চলবে না। তরল আগুনের মতো গরম এক কাপ চা কোনোমতে মুখে ঢেলে কেষ্টমাষ্টার পুরোনো ছেঁড়া চটি-জুতোর দুটো হাঁ-করা মুখে পা গলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ার আয়োজন করছে। কেষ্টমাষ্টারের বৃদ্ধ বিধবা মায়ের মুখে এবার কথা ফুটবে। —"আচ্ছা, একি বল দেখি তোর! সারা জীবনটা কি তুই এমনিই কাটাবি? হড়বড় হড়বড় করে ঠোঁট মুখ পুড়িয়ে চা খেতে না খেতেই ছুটবি ছেলে পড়াতে। তারপর রাতের বেলায়, বর্ষারে, বাদলারে, শীতরে—কোনো কিছু নেই, এইভাবে শরীর পাত করে বাড়ি ফিরবি। একটা সাধ বলতে নেই। অন্ততঃ তোকে দিয়ে আমারো তো আছেরে হতচ্ছাড়া!" মার কণ্ঠস্বরটা হতাশ্বাসে ভিজে হয়ে ওঠে।

মায়ের ওই আহত আশ্বাসকে কোনোদিন সুস্থ করার প্রয়াস নেয়নি কেষ্টমাষ্টার, বরং দিনের পর দিন প্রসঙ্গটিকে নিহত করার জন্যেই চেষ্টা করেছে। আজো তেমনি।—"ক্ষমা করো মা। বেরোবার মুখে অশুভ কথা বলতে নেই, জানলে?" একটা হোঁচট খেতে খেতেও বেরিয়ে গেল মাষ্টার। মায়ের এই সময়কার দীর্ঘশ্বাসটি অভ্যস্ত। যখনই সাধ করে মা এ প্রসঙ্গটি পেড়েছে তখনিই ছেলে বলেছে, "ওই বিয়ে-ফিয়ে ছাড়ো তো মা, যত সব—! কেন, এমনিই কি বেশ নেই তোমার কাছে? তবু যত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট।" ইতিহাসের একটি বই নিয়ে অধিকতর মনোযোগে ঝুঁকে পড়ল কেষ্টমাষ্টার। গোটা মুখটায় নিরাসক্তি, অথচ অনভিপ্রেত ঝামেলার বিকার। তিরিশ বছরের এই কেষ্টমাষ্টারের রূপ দেখে রূপোপাসুর কোনোকালেই মূর্চ্ছা যাবে না। ও এক চেহারা—কেমন যেন। তবু এক রকমের একটা রূপ রূপ। শ্যামল বর্ণের মুখে একটা উজ্জ্বলতা আছে। চোখ দুটো সদা সিরিয়েস ও মনোযোগী। চিবুকের বলিষ্ঠ গড়নে ব্যক্তিত্ব। জগতের এখানে-ওখানে যত আনন্দের আমন্ত্রণ রয়েছে, তার থেকে অনায়াসে নিজকে আড়াল করে, নির্লিপ্ত কেষ্টমাষ্টার ছাত্রছাত্রী পড়ানোর হিত-ব্রতে ব্রতী হয়েছে। ওই তার আনন্দ, ওখানেই ওর লিপ্ততা। অনেক রাতে পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারে, বাদলে বর্ষায় ফিরে কেষ্টমাষ্টার কোনো কোনো দিন কিচ্ছু না খেয়েই মাটির কলসীটার কাছে এসে দাঁড়াবে। এক গেলাস তৃষ্ণার চরিতার্থতা করে মাদুরটাতে লাস্ হয়ে পড়বে।

নতুন টিউশানীর একটা উল্লাস আছে। কেষ্টমাষ্টার তাই খানিকটা ব্যস্ত হয়েই পথ চলছে। রাজু মণ্ডল,—দু'তিন ছেলের বাপ, ঘোর সংসারী। বৌয়ের শাড়ী নিয়ে শহর থেকে ফিরছিল। —"আরে ভায়া, কেমন চলছে? তারপর? জীবন-ভর তো এই একটানা চর্কি ঘোরাই ঘুরছ। বলি এবার একটা—" রাজুর ভরা কলসীটা একটা ঢিল ছুঁড়ে ভেঙ্গে দিল কেষ্টমাষ্টার, "ভুল করছ, রাজু ভায়া। আমরা দর্শক মাত্র। তোমরা অভিনেতা। অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শক কবে কোথায় মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তোমরা চালিয়ে যাও—তারিফ করার জন্যে তো রইলাম। ...তারপর, তোমার হাতে?" ছেঁড়া তারের মত কথা বলল রাজু, "আর কি, তুমি তো ও রসে বঞ্চিত। এ তোমাদের
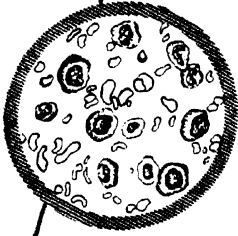
বোমার, একটা শান্তিপুরী, আরেকটা 'সুখে থাক'। উপসংহার ঘটায় কেষ্ট-মাষ্টার। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে যতটা তাড়াতাড়ি পারে ছোটে।

পরম সম্মানিত চিকিৎসা-বিশারদের মতো কেষ্টমাষ্টার বসেছে হেড্ পণ্ডিত মশাইর ঘরে। কাছাকাছিই বসেছে রুগী। রুগী নয় রোগিণী—হেড্ পণ্ডিত মশাইর একমাত্র মেয়ে। চতুর্দশী। ডুরি-কাটা একটা হলদে শাড়ী ঘরোয়া ঢঙে জড়ানো। লজ্জায় মাথা নীচু করে বসেছে শ্যামলী মেয়েটি। একটা নীলপদ্ম ওকে বললে আপত্তি কি! কনে দেখার লজ্জার মতো লজ্জা ওকে ঘিরে রয়েছে।

কেষ্টমাষ্টার নির্বিকার। প্রথমটা খানিক অপ্রস্তুতির চমক— অনভ্যাসের অসুবিধা। তারপর গম্ভীরতা।

—"তোমার নাম?"

মেয়েটি উত্তর দিতে পারেনি। দেহের ভাঁজগুলো একটু দুলেছে।

—"হ্যাঁ, বলো, কি নাম তোমার,—বলো—" আবার শান্ত স্বরে বলল কেষ্ট-মাষ্টার।

সীমা ছাড়ানো সময় নিলো মেয়েটি। কেষ্টমাষ্টারের ধৈর্যটা নিরুত্তরা মেয়েটির মুখোমুখি চুপ হয়ে রয়েছে। কেষ্ট-মাষ্টারের মুখটা এবার নেমে গেল। কে জানে, হেরে যাওয়া কিনা। মেয়েটি আরো একটু নামিয়ে নিল মুখ। তারপর বলল, "বিজলী"। অবিকল সত্য। বিজলীর দীপ্তি ওর মধ্যে। কেষ্ট-মাষ্টার গম্ভীর সাবধানী মুখে তাকাল। ফিরিয়ে নিলো তাকানোটা আবার। না, রোমান্টিক সেন্টিমেন্টের কোনো লিপি-লিপি কেষ্টমাষ্টারের পাষাণ মুখটিতে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোনো অক্ষর লিখতে জানো?" মেয়েটি লজ্জা পেলো নাকি! মনে হচ্ছে, নাকের ডগাটা কেমন আরক্ত হতে দেখে। কেষ্টমাষ্টার স্লেট-পেন্সিলটা টেনে নিয়ে লিখতে দিল 'অ', 'ক', 'ঃ' ইত্যাদি। হাতের আঙুলে খড়ি-মাটির একরাশ শ্বেত পরাগ মাখিয়েও বিজলী লিখতে পারল না 'অ', পারল না 'ক'। স্পষ্ট হয়েছে 'ঃ'। কেষ্টমাষ্টার বিস্মিত। বিজলীর লেখা বিসর্গ কেষ্ট মাষ্টারের একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে আনল। যা হোক, কেষ্টমাষ্টার অনুভব করল, চিকিৎসা বহু শ্রম-সাধ্য।

হেড্ পণ্ডিত মশাই এসে দাঁড়িয়েছেন। পরম উৎসাহে কেষ্ট-মাষ্টারকে ডেকে বললেন, "ভায়া, একটা কথা। আজকের নৈশ ভোজনটা এই গরীব বামুনের কুটীরে শেষ করতে কোনো আপত্তি নেই তো? তাছাড়া, তোমার নতুন ছাত্রীর রন্ধন-শিল্প একটু আস্বাদন করতে আপত্তি নিশ্চয়ই করবে না। রান্নায় বীজু আমার অন্নপূর্ণা। কিন্তু এমন কপাল ভাই, অন্নপূর্ণা-দুহিতা সরস্বতীর চরণ-পদ্মের একটি ছেঁড়া পাপড়িও বুঝি ও পেলো না। তাই—" হতাশা-মন্থর কণ্ঠস্বরে হেড্ পণ্ডিত আবার বলল,—"আর কিছু নয়, ভাই—অন্ততঃ নিজের নামটা, ধামটা; দু'কলম চিঠিটাও যেন লিখতে পারে মেয়েটা—।"

কিন্তু দু' এক মাসের মধ্যেই বিজলীর হাতে লিখনরেখায় পদ্ম ফুটল। এক এক সময় মাষ্টার মশাই অবাক হয়ে যায়—এ বিজলীর লেখা? বিজলী বলে, "কেমন হয়েছে মাষ্টার মশাই?—ভালো—?" উৎসাহে ঘাড় কাৎ করে ছবির মতো তাকিয়ে থাকে বিজলী। এই একটি জিজ্ঞাসায় যে ঢেউ ওঠে, তাতেই যেন কেষ্টমাষ্টার কেমন হয়ে যেতে চায়। একটুক্ষণ উত্তর দেবার সাধ্য থাকে না মাষ্টারের। ততক্ষণ আরো একটা ফেনিল ঢেউ তুলে দিয়ে বিজু বলে, "বলুন—সুন্দর, ভালো!" কেষ্টমাষ্টারের অনড় জিভ উচ্চারণ করল 'সুন্দর'! কেষ্ট-মাষ্টারের মুখোমুখি বসেছে বিজু। বই স্লেট ছড়ানো। সন্ধ্যাটা ঘন। একটা তেলের প্রদীপ খুব কাছাকাছি জ্বলছে। বিজুর মতোই প্রদীপের রূপসী শিখাটা কখনো লাজনম্রী, কখনো নুয়ে-পড়া ফুল কখনো মুখ তুলে হাসার মতো চঞ্চলময়ী, কখনো নির্বাক বিস্ময়ে স্থির। প্রদীপের আলোয় বিজুকে ভারী ভালো দেখাচ্ছে, কোমল দেখাচ্ছে। আঁটোসাঁটো করে চুল বাঁধা মুখটা মায়াবী হয়েছে ভারো। কিন্তু মাষ্টার মশাইর কপালটা ঘেমেছে। প্রদীপের আলোয়, না, তাপে। বিজু বলল, "সরিয়ে দেব প্রদীপটা?—আপনি ঘেমে গেছেন!" গম্ভীর হবার ব্যর্থ কৃত্রিম প্রয়াসে কেষ্টমাষ্টার উত্তর দেয়—"আগুনের কাছে থাকলে কার না ঘাম হয়!"

সে রাতে কি করে ঘরে ফিরেছে তা' মনে পড়ছে না কেষ্টমাষ্টারের। যথারীতি মাটির কলসীর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিলো। জল খেল। চুপচাপ শুয়েছে। জাফ্‌রী কাটা বাঁশের জানলাটা খোলা। বাইরে অন্ধকার। জোনাকীগুলোর কেমন যেন আলো জ্বালার ইচ্ছে। আজকে ইতিহাস ভালো লাগে না—গণিত নয়—ভূগোলের কোনো তথ্য ভালো লাগছে না কেষ্টমাষ্টারের। চুপ করে চেয়ে জোনাকীগুলোর সাধকে দেখছে। কেমন এক অভূতপূর্ব অনুভূতি ওর মনে। কেষ্টমাষ্টার ভাবে জোনাকীগুলোকে। ওরা মাষ্টার নয়। অনন্ত আনন্দে, অবাধ খেয়ালে ওরা ভরে আছে। ও রকম এক টুকরো আলো কেষ্টমাষ্টার হয়ে যেতে পারে না! অথবা ওরকম এক টুকরো আলো কেউ জেলে দিতে পারে না কেষ্টমাষ্টারের গ তা নু গ তি ক জীবনটায়! ভাবে কেষ্টমাষ্টার। যেন কোন একটা নতুন দেশে এসেছে কেষ্ট-মাষ্টার,—যেখানে আগে আর কোনোদিন আসেনি।

বিজলীর মতো মনে পড়ছে বিজলীকে এক একবার। কেষ্টমাষ্টার চমকায়। কিন্তু যে-পথে ভাবনায় পদক্ষেপ সে পথটাকে কোনো বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবার সাধ্য নেই কেষ্টমাষ্টারের। "মাষ্টার মশাই, আপনি শহরে যান?—শহরে কি পাওয়া যায়?—আমার জন্য একটা জিনিস আনবেন?" কেষ্টমাষ্টার অবাক হয়ে তাকায়। "বল না, কী চাই তোমার!" আদর উপচালো কেষ্ট-মাষ্টারের গলায়। আদুরে গলাতেই বিজু বলল, "এই, একটা ছুঁচ। আপনাকে একটা রুমাল দেব। আমার চিহ্ন—নেবেন তো?" এক আকাশ জিজ্ঞাসা বিজুর দুই চোখে। কেষ্টমাষ্টার একটু বিস্মিত হোল বৈকি। শাড়ী নয়, টিপ নয়, ভালো হিমানী আলতাও নয়, ছুঁচ! একটা ছুঁচ এনেও দিয়েছিল। হাত থেকে

সেদিন ছুঁচটি উৎসাহের জোয়ারে নিতে গিয়ে চঞ্চল হাত বাড়িয়ে কেষ্টমাষ্টারের হাত ধরেছে বিজু। অনভ্যস্তের চমকে চমকেছে সেদিন কেষ্টমাষ্টার। রক্তপ্রবাহ অবশ্যই দ্রুততর হয়েছে। আর হাতের মধ্যমা আঙুলের ভারী ডগাটায় ছুঁচটি বিঁধে গিয়ে একটু রক্তের কণা বেরিয়ে এসেছে। বিজু তৎক্ষণাৎ হলদে শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে চেপে ধরেছে আঙুলটা। একহাতে মাষ্টার মশাইয়ের বিক্ষত আঙুল, অন্যহাতে মাষ্টার মশাইর মণিবন্ধ। একটু পরে ছেড়ে দিয়ে লজ্জায় মন্থর হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছে বিজলী। —"ছিঃ ছিঃ, ক্ষত ক'রে দিলাম মাষ্টার মশাই।" অপ্রস্তুত বিজু বলেছিল। কেষ্টমাষ্টারের মনে এই ক্ষতটারই যেন কেমন একটা গরব বোধ হচ্ছিল। এক ঝলক পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে, এই অপরাহ্নকে কত ভালো লাগে যেন কেষ্টমাষ্টারের। যাবে না আজ পড়াতে। নিরালায় বসে একা একাকী মনের ভাঁজগুলো খুলে সারা দেহে মনে শিহরণ আনতে ভালো লাগছে আজ। বিদায়ী বিকেলের করুণ বাসরে তন্দ্রার মতো সন্ধ্যা নামছে। কেষ্টমাষ্টার নির্জন গ্রামান্তরে দীঘিটির তীরে এসে বসেছে। ঝিলমিল করছে কৃষ্ণকান্ত দীঘির জলতরঙ্গ। মনের তরঙ্গটা আরো রমণীয়। তাতে ছেঁড়া ছেঁড়া চূর্ণ চূর্ণ জ্যোৎস্নার মতো বিজু ছড়িয়ে পড়েছে। বিজু—কেষ্টমাষ্টারের পরম সাফল্যের ছাত্রী। যদি এই জীবনটার পাশাপাশি বিজুকে একান্ত করে পাওয়া যায়। অসম্ভব? মোটেই নয়। বিজুকে ওর চাইই। একথা কেষ্টমাষ্টার নিজেই কামাই করার অভ্যাস কেষ্টমাষ্টারের কোনোকালেই নেই। কিন্তু একমাস যেতে পারেনি কেষ্টমাষ্টার পড়াতে। একটা শক্ত অসুখের আক্রমণে শয্যাশায়ী হ'তে হয়েছিল কেষ্টমাষ্টারকে। শরীরটা অনেক রোগা হয়ে গেছে। দাঁড়াতে পাদুটো কাঁপে। কোমর অব্দি শরীরটা ঢেকে প্রায় সারাদিনই শুয়ে থাকে মাষ্টার। কখনো-সখনো বালিশে হেলান দিয়ে খানিকটা বসে। নিত্যদিন জাফরীকাটা বাঁশের জানলাটাই কেষ্টমাষ্টারের কাছে সংবাদ-পত্র। তাতে কখনো দূরের জামগাছের সবুজ পাতাগুলো, কখনো কাকের আকাশ-বিলাস, কখনো রাতের জোনাকী-ছিটানো অন্ধকার বিচিত্র কৌতূহল লিখে রেখে যায়। এমনি একটা অসুস্থ রাতের অন্ধকারে কেষ্টমাষ্টার বিজুকে ভাবতে ভাবতে প্রায় অধীর হয়ে পড়েছিল। ঘুম এসে ছুটি দিয়েছিল তারপর। পরদিন এসেছে একটি চিঠি। সত্যিই লিখেছে বিজু। খামের ওপরে মাষ্টার মশাই লেখার মধ্যে তা স্পষ্ট। কাঁচা কাঁচা হস্তাক্ষর-গুলোকে যথেষ্ট পরিপাটি করার সযত্ন চেষ্টাটাও স্পষ্ট। কিন্তু রোমাঞ্চের প্রবল অনুভব কেষ্টমাষ্টারকে তা বিশ্বাস করতে দিচ্ছে না। কেষ্টমাষ্টার পরখ করে দেখেছে নিজেকে, ওটা অসুস্থমনের বিকার কিনা। অবশেষে খাম ছিঁড়ে [illegible] চিঠিটা মেলে ধরেছে চোখের সামনে। কিন্তু পড়তে পারছে না। হাত দুটো বেশি কাঁপছে। তারপর চিঠির নীচে 'বিজু' নামটা বারবার পড়েছে। এমন রমণীয় মধুর অনুভূতিটি কেষ্টমাষ্টারের জীবনে অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব। বিছানায় শুয়ে থাকতে আর পারেনি কেষ্টমাষ্টার। খুশীর বেগ তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল।

"মাষ্টার মশাই, আমার প্রণাম জানবেন। যে অক্ষর অনেক কষ্ট করে আমাকে শিখিয়েছেন, সেই অক্ষরে জীবনে এই প্রথম চিঠি লিখছি। আপনার কাছে কত ঋণী। বলতে লজ্জা করছে তবু বলি, বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। এখন আর পড়ব না। বাবা আপনার কথা কত বলেন তা আর কি বলব। দুষ্টু মেয়ে তো আপনিই একদিন বলেছিলেন। তাই বলি বিয়ের দিন আসবেন কিন্তু। না এলে বাবা খুব দুঃখ করবেন কিন্তু। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি আপনার ছাত্রী বিজু।"

সূর্যওঠা সকালটা কেষ্টমাষ্টারের কাছে একমুহূর্তে অন্ধকার একটা করুণ রাত্রি হয়ে গেছে। এক ফুঁয়ে নিভে-যাওয়া একটা দীপশিখা যেন কেষ্টমাষ্টার। প্রদীপের সলতেটায় আলো নেই, কিন্তু ধূমায়িত একটা মূর্ছনা যেন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছে। শ্বাসপ্রশ্বাসও যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেছে কেষ্টমাষ্টারের। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন কেষ্টমাষ্টারের নিস্পন্দ শরীরে পোশাক পরিয়ে দিয়েছে।

"রান্নায় বীজু আমার অন্নপূর্ণা..."

চোখের আলো বিজুর সলজ্জ চোখে রেখে কেষ্টমাষ্টার বলল, "একটানা অক্ষত থাকে না মানুষ।" কেষ্টমাষ্টারের পায়ের নীচে যেন ভাবনার চোরাবালি। সেখানে গতি শুধু ডুবে যাবার দিকে—তন্ময় রমণীয় ভাবনায় ডুবে যাবার দিকে।

পরদিন বিকেলে যথারীতিই বেরিয়েছে কেষ্টমাষ্টার। মানুষের অসংখ্য কর্তব্যের স্তূপে যে একটা গোপন মধুর মন আছে, তাকে কেউ খুঁজে পাবার সুযোগ পায় না, কেউ কেউ পায়। সেই মনের গন্ধটা যদি কেষ্টমাষ্টারকে বার বার চমকে দেয়, উদ্ভ্রান্ত করে? নিজকে ভালো লাগে, বলবে। হ্যাঁ, স্পষ্ট করেই বলবে। বিজুকে, হেড্ পণ্ডিত মশাইকে। একটুও দ্বিধা নেই মাষ্টারের আজ। আর, আর, যদি বিজুই আগে বলে একথা কোনো এক অপ্রতিরোধ্য দুর্বল মুহূর্তে! কথার ধ্বনি দিয়ে যদি না-ই পারে, অন্ততঃ অক্ষরের ভীরু ভীরু রেখায়! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই যদি হয়! অনুপম রেখায় কাঁপা কাঁপা অক্ষরে কেষ্টমাষ্টারের কাছে শকুন্তলার মতো লিপি রচনা করবে বিজু।...কেষ্টমাষ্টার পরম তৃপ্তিতে একমনে বসে ভাবে। দীঘিতে তেমনি জলতরঙ্গ।

॥ পাক-ভারত আলোচনা ॥

কাশ্মীর ও অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে কলকাতায় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে চতুর্থ দফা মন্ত্রি-পর্যায়ের আলোচনা ১২ই মার্চ হতে আরম্ভ হয় সে সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করার মত আশাবাদী কেউই ছিলেন না। যে পরিস্থিতির মধ্যে পূর্বের তিন দফা আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, চতুর্থ দফা আলোচনা শুরুর করা আগে তার উন্নতি ত হয়ই নি, ঘটনাপরম্পরায় তা অবনত হয়েছিল। কাশ্মীরের অধিকার নিয়েই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা, অথচ এই কাশ্মীরেরই একটি বিরাট অংশ পাকিস্তান গত ২রা মার্চ চীনকে উপঢৌকন দিয়ে এসেছে। এর দ্বারা পাকিস্তান যেন এই কথাটাই ভারতের কাছে স্পষ্ট করে দিতে চায় যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের দাবী বা মনোভাবকে সে এতটুকুও স্বীকার করে না। সুতরাং তারপরেও তার সঙ্গে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার কোনই অর্থ থাকতে পারে না। পাক-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোও কলকাতায় পৌঁছিয়েই বলেন যে, এ পর্যায়ের আলোচনায় কোন নতুন প্রস্তাব নিয়ে তিনি আসেন নি। তবুও যে ভারত আলোচনা চালাতে অসম্মত হয়নি তার কারণ বোধহয় এই যে, আলোচনা ভেঙে দেওয়ার অপবাদ ভারত নিতে চায় না। কাশ্মীর বিভাগে ভারত সম্মত হয়েছে, মিত্ররাষ্ট্র ইংলন্ড ও আমেরিকার অনুরোধে কাশ্মীর উপত্যকার পুঞ্চ সমেত আরও অনেকখানি এলাকা সে পাকিস্তানকে দিয়ে দিতে চেয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান সে সব সর্তে সম্মত নয়। তার দাবী সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা। বলা বাহুল্য যে, এটা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার মনোভাব নয়; এটা চীনের মতই জুলুমবাজী, এবং কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতির পক্ষেই এ-ধরণের জুলুমবাজীর কাছে নতি-স্বীকার করা সম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকেও পাকিস্তান ভালভাবে নেয়নি; তার মতে এটা পাকিস্তানের উপর চাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। করাচীর আধা-সরকারী মুখপত্র 'ডন' প্রকাশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এসেছে। এসব থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারতের সঙ্গে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটানো বর্তমানে পাকিস্তানের নীতি নয়। যেটুকু সে অগ্রসর হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির চাপেই হয়েছে। সুতরাং পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতির একটা মৌলিক পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত শত বৈঠকেও পাক-ভারত বিরোধের মীমাংসা হবে না।

কিন্তু একনায়ক-শাসিত পাকিস্তানে এ পরিবর্তন সহজে ঘটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তাই গণতান্ত্রিক বিশ্বের চাপে পাকিস্তান যাতে তার বর্তমান নীতি ও মনোভাব পরিবর্তনে বাধ্য হয় তার জন্যই এখন ভারতকে চেষ্টা করতে হবে। যেসব দেশের সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তানের চলা সম্ভব নয় তাদেরই আজ এটা বোঝানোর দরকার যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের মৈত্রী অনেক বেশী মূল্যবান।

॥ পর্তুগীজ প্রতিহিংসা ॥

গোয়া হারানোর জ্বালায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বত্রই ভারতীয়দের চরম ক্ষতিসাধনে উদ্যত হয়েছে। মোজাম্বিকে যে কয়েক হাজার ভারতীয় দীর্ঘকাল ধরে বাস করে আসছিলেন তাঁদের সকলের যাবতীয় সম্পত্তি পর্তুগীজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় তাঁদের বিতাড়িত করে দিয়েছে। এসম্পর্কে ভারতের বহির্বিষয়ক দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, মোজাম্বিকে ভারতীয়দের প্রায় ষাট কোটি টাকার সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ গত বছর এপ্রিল মাসে ভারতের সঙ্গে পর্তুগালের এবিষয়ে বুঝাপড়া হয় যে, বিনা ক্ষতি-পূরণে কোন ভারতীয়ের সম্পত্তি দখল করা হবে না। কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা ন্যায়নীতির ধার পর্তুগীজরা ধারে না একথা আমরা ভালভাবেই জানি, সে কারণে তাদের বর্তমান আচরণ কোন ভারতবাসীর কাছেই বিস্ময়কর বলে মনে হবে না। কিন্তু এতগুলি লোকের উপর এই অন্যায় ও এত কোটি টাকার সম্পত্তিনাশ ভারতকে কি মুখবুজেই মেনে নিতে হবে? এ ব্যাপারেও কি আফ্রো-এশীয় দেশগুলির কাছে ভারত আন্তরিক সমর্থন পাবে না? আর যদি তা নাই পাওয়া যায় তবে ঐ জাতীয় আঞ্চলিক সংহতির উপর গুরুত্ব আরোপের কি মূল্য থাকতে পারে! এটা সত্যই ভারতের দুর্ভাগ্য যে, আজ পর্যন্ত তার প্রতি কোন অন্যায়ের প্রতিবাদে আফ্রো-এশীয় দেশগুলি সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসেনি, যদিও ভারত গত পনের বছর ধরে কোরিয়া হতে কঙ্গো পর্যন্ত সংখ্যাতীত আন্তর্জাতিক সংকটে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মাথা গলিয়েছে, এবং নিজের যথেষ্ট ক্ষতিস্বীকার করেও অন্যের ঘর সামলানোর চেষ্টা করেছে।

॥ সংস্কৃতি শাসন ॥

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ গত ৮ই মার্চ এক দীর্ঘ ভাষণে সোভিয়েট সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে আধুনিক পশ্চিমী ভাবধারা আনয়নের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পশ্চিমী চিন্তাধারাকে বিলাসপ্রধান ও বিভ্রান্তি-কর আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'ল কমিউনিষ্ট সমাজের বনিয়াদে ভাঙন ধরানো। তাই কমিউনিষ্টনায়ক নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে এই "পশ্চিমী বেয়াড়াপনার" অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নকে তার নিজস্ব কলা-কৃষ্টির ঐতিহ্য অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হবে। সোভিয়েট সংস্কৃতিতে আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তক ইলিয়া এরেনবুর্গকেও এই প্রসঙ্গে দু'এক কথা শুনিয়ে দিতে সোভিয়েট-নায়ক দ্বিধাবোধ করেননি।

কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের নিজস্ব কলাকৃষ্টি এতদিন যা ছিল তা আশা করি কারুরই অজানা নেই। রাষ্ট্রশাসকদের আজ্ঞাবহনই ছিল সোভিয়েট সাংস্কৃতির দীর্ঘদিনের একমাত্র কাজ, আর তার ফলে স্বাধীন চিন্তাভাবনালুপ্ত হয়ে তা এক আজব জড়পদার্থে পরিণত হয়েছিল। ক্রুশ্চেভই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটান এবং তাঁর শাসনকালেই সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে মুক্ত পরিবেশ-সৃষ্টির সূচনা হয়। আর সেই মুক্ত পরিবেশে সলোখব, এরেনবুর্গ প্রমুখের উদ্যোগে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে এক উদারনীতিক চিন্তাধারা। কিন্তু এর ফলে সোভিয়েট সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে ক্রমে সরকারী খবরদারীর নাগাল হতে দূরে সরে যাচ্ছে এটা বোধহয় ক্রুশ্চেভ হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন। আর একনায়কতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতার পরিণতি যে কি ভয়াবহ তাও বোধহয় তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি নির্দেশ জারী করেছেন, বুদ্ধি-বিভ্রান্তিকর পশ্চিমী ভাবধারাকে কমিউনিষ্ট দুনিয়া হতে বিসর্জন দিতে হবে। এই প্রসঙ্গেই হঠাৎ ক্রুশ্চেভের স্মরণপটে ষ্টালিনের উদয় হয়েছে, যে ভয়ংকর

নিষ্ঠুর মানুষটির নির্দেশেই একদিন বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগে চিন্তার স্বাধীনতাও সোভিয়েট ইউনিয়ন হতে নির্বাসিত হয়েছিল। কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে 'বিপথচালিত' ক্রুশ্চেভ বোধহয় বুঝতে পারছেন এখন, কেন ষ্টালিনের খড়্গ হ'তে সোভিয়েট দুনিয়ার সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাও অব্যাহতি পায়নি। কমিউনিষ্ট দুনিয়ায় হঠাৎ কোন কথা কেউই বলেন না। তাই আশঙ্কা হয় ক্রুশ্চেভের মুখে ষ্টালিনের নাম বোধহয় আর একবার পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত।

॥ সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান ॥

সিরিয়ায় আবার একবার ক্ষমতার হাতবদল হয়ে গেল। এবারও অভ্যুত্থানের নায়ক সমরনায়কদল ও তাদের ইচ্ছা-পূরণের হাতিয়ার সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী। ১৯৪৯ সালের মার্চ হতে ১৯৬৩ সালের মার্চ পর্যন্ত, অর্থাৎ ঠিক চোদ্দ বছরে একইভাবে সাতবার ক্ষমতার ওলট-পালট হ'ল সিরিয়ায়। সুতরাং এই অভ্যুত্থানই সিরিয়ার শেষ সামরিক অভ্যুত্থান; একথা অভ্যুত্থানের অতিবড় সমর্থকের পক্ষেও জোরগলায় বলা সম্ভব হবে না। পশ্চিম এশিয়ার অশান্ত আরব রাজ্যগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই আজ অহরহ এই ঘটনা ঘটে চলেছে। আজ যে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্মম হাতে শাসকদলের কয়েকজনকে হত্যা করে জনগণের পরি-ত্রাতা বলে নিজেকে ঘোষণা করছে কালই হয়ত দেখা যাচ্ছে যে তারও প্রাণহীন দেহ ধূলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে আর একদল ক্ষমতালোভীর হঠাৎ অভ্যুত্থানে। সুতরাং সিরিয়ার বর্তমান অভ্যুত্থানের শেষ পরি-ণতি সম্বন্ধে এখন হতেই কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এবার যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরা আরব-ঐক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং একদিন যারা সিরিয়াকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হতে বিচ্ছিন্ন করে এনেছিল তাদের বিরুদ্ধেও তাঁরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এইবারের অভ্যুত্থানের নেতারা মিশর-সিরিয়ার পুনঃসংযুক্তির সমর্থক ও আরব নেতা নাসেরের অনুগামী। নাসেরও এই নতুন নায়কদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিরিয়ার নতুন নেতারা মিশর অপেক্ষা ইরাকের প্রতিই বেশী সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং ইরাকের সংগে নিকট-সম্পর্ক গড়ে তোলার জনাই তাঁদের বেশী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য ইরাকে যাঁরা সম্প্রতি ক্ষমতা দখল করেছেন তাঁরাও নাসেরের বিশেষ সুহৃদ। সুতরাং ইরাকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অর্থ

মিশর ও নাসেরের প্রতি বিরূপতা একথা মনে করার মত কোন কারণ এখনও পর্যন্ত ঘটেনি।

॥ মালয়েশিয়ার ভবিষ্যৎ ॥

মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যত রকম বাধা সৃষ্টির চেষ্টাই হোক না কেন, আগামী ৩১শে আগষ্ট মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই প্রতি-ষ্ঠিত হবে। আর এই প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দিতে চাইবে যে সব রাষ্ট্র তাদের বাধার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। এর জন্যে কোন বৈদেশিক শক্তির সাহায্য নিতেই মালয় দ্বিধা বোধ করবে না।

অপরপক্ষে রবার, টিন, পেট্রোল ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই নয়া রাষ্ট্রটির পত্তন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট শক্তিগুলির এবং রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দো-নেশিয়ার কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পশ্চিমী শক্তিজোটের সমর্থক একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র যদি এইভাবে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায় তবে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অগ্র-গতির পথে তা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া সিঙ্গাপুরে বৃটিশ নৌঘাঁটি যদি স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ পায় তবে কমিউনিষ্ট চীনের সম্প্রসারণ তার ফলে অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রধানত এই কারণেই কমিউনিষ্ট চীনের মিত্র রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া আজ মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমনভাবে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ রাজ-নৈতিক দলাদলিতে ও রাষ্ট্রশাসকদের অক্ষমতায় ইন্দোনেশিয়ার বৈষয়িক অবস্থা আজ এমনই শোচনীয় যে একটি আন্তর্জাতিক বিরোধে ইন্দোনেশিয়াকে সব সময় জড়িত করে রাখা ছাড়া তার শাসকবর্গের গত্যন্তর নেই। এতদিন পশ্চিম ইরিয়ান এ ব্যাপারে বিশেষ সহা-য়ক ছিল, কিন্তু আজ আর সে সমস্যা নেই। এই কারণেই মালয়েশিয়া যুক্ত-রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব আজ ইন্দোনেশিয়ার শাসকদের কাছে এক অভাবিতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে। আপাতত এই "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তটির" দিকে ইন্দো-নেশিয়ার অধিবাসীদের কিছুদিন দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে বলে ইন্দো-নেশিয়ার রাষ্ট্রনেতারা মনে করেন। তাই আশঙ্কা হয় যে, মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠার দিন যত এগিয়ে আসবে, উত্তর বোর্ণিওর ইন্দোনেশীয়দের উপদ্রব ততই বৃদ্ধি পাবে। আর এর ফলে উত্তর বোর্ণিওর জঙ্গলে প্রান্তরে যদি নূতন করে এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তবে সেটা মোটেই বিস্ময়কর কোন ঘটনা হবে না।

॥ ঘরে ॥

৭ই মার্চ—২২শে ফাল্গুন ঃ কলিকাতা কর্পোরেশনকে বাতিল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান পরিষদে বিরোধী সদস্যদের দাবী। কর্পোরেশন কমিশনারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী কাউন্সিলারদের জেহাদ অব্যাহত।

'দ্রুত শিল্পায়নই' পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের একমাত্র পন্থা'—রাজ্য বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) শিল্প, বাণিজ্য ও সমবায় মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের ভাষণ।

পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির (পিকিং-এ স্বাক্ষরিত) বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদলিপি ঃ ভারতীয় অঞ্চল চীনকে প্রত্যর্পণের ক্ষমতা পাকিস্তানের নাই।

৮ই মার্চ—২৩শে ফাল্গুন ঃ কমিশনার (কলিকাতা কর্পোরেশন) অপসারণে ব্যর্থ হইয়া কংগ্রেসী কাউন্সিলরদের পদত্যাগের প্রস্তাব—কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার অর্পণ।

চীন কর্তৃক ভারতকে পুনরায় ভীতি প্রদর্শন ঃ হয় একতরফা পরিকল্পনা মানো, না সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। (চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ কর্তৃক শ্রীনেহরুকে প্রেরিত সাম্প্রতিক চিঠির বিবরণ)।

লোকসভায় রেলওয়ে বাজেট বিতর্কের সমাপ্তি—রেলওয়ের জন্য ১১৭৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরীর দাবী গৃহীত।

৯ই মার্চ—২৪শে ফাল্গুন ঃ 'কলিকাতা কর্পোরেশন বাতিল করার মত অবস্থা হয় নাই'—বিরোধী সদস্যদের দাবীর উত্তরে স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ঘোষণা—প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর বিরোধীপক্ষের গুরুত্ব আরোপ।

'শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ সত্য হইলেও অতিরঞ্জন আছে'—কংগ্রেস সংসদীয় দলের সভায় (দিল্লী) প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীনেহরু) মন্তব্য।

১০ই মার্চ—২৫শে ফাল্গুন ঃ মহানগরীতে (কলিকাতা) সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব পালন—দেশবন্ধু পার্কে ধর্মসভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা (সভাপতি) ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের শ্রদ্ধাঞ্জলি—স্থানীয় এলাকার দোলযাত্রা ও রঙ খেলা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন।

দালাইলামা (ভারতে অবস্থানকারী) কর্তৃক তিব্বতের নূতন সংবিধান ঘোষণা—তিব্বতের স্বাধীনতা (চীনা অধিকার হইতে) পুনরর্জিত হওয়ামাত্র সংবিধান বলবৎ হওয়ার নির্দেশ।

১১ই মার্চ—২৬শে ফাল্গুন ঃ কলিকাতা ও শহরতলীতে কয়েক পশলা শিলাবৃষ্টি—আকাশ-বাতাসে কালবৈশাখীর রূপ।

ডি-ভি-সি সম্পর্কে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী—রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীপক্ষ কর্তৃক অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ—সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি কর্তৃক অভিযোগ অস্বীকার।

১২ই মার্চ—২৭শে ফাল্গুন ঃ রাজভবনে (কলিকাতা) চতুর্থ পর্যায়ের ভারত-পাক কাশ্মীর আলোচনা শুরু—ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা রেলমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং ও পাকিস্তানী দলের নেতা মিঃ জেড এ ভুট্টো—বৈঠকের পর্যবেক্ষকরূপে মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথ ও ব্রিটিশ হাই-কমিশনার স্যার পল গোর বুথের কলিকাতা উপস্থিতি।

মিঃ চৌ এন-লাই'র (চীনা প্রধানমন্ত্রী) নিকট শ্রীনেহরুর পত্র (চৌ-এর ৩রা মার্চের লিপির উত্তরে ৫ই মার্চ তারিখে লিখিত) ঃ কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করিলে তবেই সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে আলোচনা। পার্লামেন্টে চৌ-নেহরু পত্রাবলীর বিবরণ পেশ।

পৌরসভায় (কলিকাতা) স্থিতাবস্থা বহাল রাখার বন্দোবস্ত—আপাতত কাউন্সিলার-কমিশনার দ্বন্দ্বের অবসান।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তীর (৮০) লোকান্তর।

১৩ই—২৮শে ফাল্গুন ঃ কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা-চেষ্টায় কলিকাতায় ভারত-পাক বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা ব্যর্থ আলোচনা।

'যে কোন মুহূর্তে চীন আবার ভারত আক্রমণ করিতে পারে'—ভূপালের সভায় শ্রীনেহরুর সতর্কবাণী—শত্রুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া জয়লাভে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা কমিটি গঠিত—মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উপস্থিতিতে নূতন ব্যবস্থা নির্ধারণ।

॥ বাইরে ॥

৭ই মার্চ—২২শে ফাল্গুন ঃ 'পাক-চীন সীমান্তে কড়া টহলদারি ঠিকই চলিবে—রাওয়ালপিণ্ডির (পাকিস্তানের রাজধানী) বিশ্বস্ত মহলের সংবাদ।

পাকিস্তানের সহিত সম্পর্কের উন্নতিবিধানে রাশিয়ার আগ্রহ প্রকাশ।

৮ই মার্চ—২৩শে ফাল্গুন ঃ সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান—নাসেরপন্থী (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেন্ট নাসেরের সমর্থক) অফিসারগণ কর্তৃক ক্ষমতা দখল।

কঠোর পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু।

৯ই মার্চ—২৪শে ফাল্গুন ঃ পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করিয়া 'ঐস্লামিক রিপাব্লিক অব পাকিস্তান' করার প্রস্তাব—জাতীয় পরিষদের বৈঠকে (ঢাকা) আবশ্যক বিল উত্থাপন।

ক্ষমতাদখলকারী বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক সালাহ্ উদ্দীন অল বিতার সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।

১০ই মার্চ—২৫শে ফাল্গুন ঃ ঢাকায় পাক্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর সহিত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দুইদিন অপ্রত্যাশিত বৈঠক—কাশ্মীর সম্পর্কে নেহরু-আয়ুব (ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাক প্রেসিডেন্ট) শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনা আছে বলিয়া কূটনৈতিক মহলের ধারণা।

সিরিয়া, আলজিরিয়া, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইয়েমেনের নিকট ইরাকের নূতন প্রস্তাব—পঞ্চজাতি সম্মিলিত আরব কমান্ড গঠনের প্রস্তাব।

১১ই মার্চ—২৬শে ফাল্গুন ঃ ইরাকী সৈন্যবাহিনীর ২৫ জন সদস্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৩) সামরিক অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করার অভিযোগ।

প্যারিসে গুপ্ত সামরিক সংস্থার নায়ক কর্ণেল থিরিকে গুলী করিয়া হত্যা—প্রেসিডেন্ট দ্য গলের (ফ্রান্স) প্রাণনাশের চেষ্টার জন্য মৃত্যুদণ্ড।

সোমালি-ব্রিটেন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ—সোমালি সরকারের সিদ্ধান্ত।

১২ই মার্চ—২১শে ফাল্গুন ঃ দলাই লামা কর্তৃক তিব্বতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ঘোষিত হওয়ায় চীনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া—ভারতের প্রধানমন্ত্রীর (শ্রী নেহরু) বিরুদ্ধে প্রসঙ্গতঃ বিষোদ্গার।

১৩ই মার্চ—২৮শে ফাল্গুন ঃ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডীন রাস্কের নয়াদিল্লী সফরের (২রা মে—৪ঠা মে, '৬৩) সিদ্ধান্ত।

অভয়ঙ্কর

॥ মনের গহনে লেখক ॥

সব কিছুই যেন অন্ধকার, সবই ভেঙে পড়ছে, এমনই এক ভঙ্গী আনা উলফের জীবনে. আশা নেই, ভরসা নেই, আর শেষে পৌঁছে দেখা যায় আনার তাসের মিনার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কি যেন ঘটেছে কোথায়, সব কেমন জড়িয়ে গেছে 'সরু মোটা দুই তারে'। একথা আমাদের বলতে হবে না, আনা স্বয়ং আমাদের বার বার শোনাবে। আনা উলফ, মিসেস ডোরিস লেসিং-এর নবতম উপন্যাস "The Golden Note Book"-এর নায়িকা। এর একটি উত্তর এই যে, আনা এক দেহে প্রায় ছ' জন, আমাদের ছ' জনায় মিলে পথ দেখায় বলে আমরা পদে-পদে বিপদে পড়ি, আনা একাই ছয়টি প্রাণী। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আনা তাই আপনাকে দ্বিখণ্ডিত করে। এক অংশ তার প্রেমিকের শয্যাসঙ্গিনী আর অপর অংশ হতাশা, বিরক্তি, উদ্বেগ ও আতঙ্কে আকুল হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে আছে। এক অংশ যখন প্রাচীন বিশ্বাসকে সন্তর্পণে রক্ষা করার জন্য উৎকণ্ঠ, অপর অংশ তখন ধ্বংসের অতলে। প্রেমের উষ্ণ আলিঙ্গনে সে উত্তপ্ত, আর অন্যদিকে তার অপরাংশ তুহিন শীতল। সে নিঃসঙ্গতার নিরালা আশ্রয় সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

আনার মন ঘূর্ণমান। মনে তার কালের মন্দিরার অবিরাম ধ্বনি। কেন আমি অসম্ভবের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব? আমার জীবন কেন এমন কাঁচা হয়েই রইল? মানসিকতার এক অনড়ত্বে কেন আমি জ্বলে মরি? কেন আমি শূন্যো, শূন্য এবং হিমমগ্ন? আমার আশপাশের দেওয়াল কেন এতই সূক্ষ্ম? প্রেম, বন্ধুত্ব, দায়িত্ব প্রভৃতি শব্দগুলি আমার কাছে অর্থহীন কেন? আমার মস্তিষ্কে উদ্বেগের ঘন কালো মেঘ কেন? কেন আমার মন হিমের ঘন-ঘোমটায় আচ্ছন্ন? কেন? কেন? কেন? আনার মনে হয় যে, বোধ হয় তার মনোবিকার ঘটবে। সে তাই একজন মনোবিজ্ঞানীর কাছে যায়, কিন্তু তাঁর উপদেশ আনা গ্রহণ করে না। আর সে লিখবে না, প্রথম উপন্যাসটি অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, কিন্তু তবু আনা আর লিখবে না। সে লিখতে *পারবে না। মন তার কুয়াশার বাষ্প-জালে ঢাকা। মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে আনা দেখা করেছিল তার বান্ধবী মলির সঙ্গে, তারপরই তার মনে প্রশ্ন জাগে—*

"We have the wrong attitude to the whole thing—and what is the security and balance that is supposed to be good". . . . Why do I always have to make other people see things as I do? It is childish, why should they? What it amounts to is that I'm scared of being alone in what I feel."

আনার উপন্যাসের নাম "দি ফ্রন-টিয়ার্স অব ওয়ার"—সেই উপন্যাস সাফল্যলাভ করেছে। সেই উপন্যাসই তাকে কিছু পরিমাণে অর্থস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছে। তবু আর নতুন উপন্যাস রচনা অসম্ভব কর্ম বলে মনে হয় আনার। মনে মনে এর জন্য সে একটা নৈতিক অজুহাত সৃষ্টি করে। তার মনে একটা বিরক্তি ও হতাশা জেগেছে, সেই অনুভূতিকে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার অধিকার তার নেই। মনকে সে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে, তার বান্ধবী মলিকে তাই বলে—

"After all it is not much of a loss, is it, a few people of a certain type saying they've had it, they are finished."

তথাপি এই ক্ষতি কম নয়, এ ক্ষতির পরিমাণ সে বোঝে তাই তার উদ্বেগ বাড়ে, নইলে সে এসব গ্রাহ্য করতো না। শুধু তার একার নয় আরো অনেকের কাছে এই অবস্থা পীড়া-দায়ক। মনোবিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, জীবনধারণের অক্ষমতার বশেই শিল্পী তাঁর সাহিত্য রচনা করেন, আনার কিন্তু এই মন্তব্যে গা ঘুলিয়ে ওঠে। আনার নানা রঙের নোটবই কালো, হলদে, লাল, নীল, বু প্রতিটি রঙের নোটবই-এ সে বিভিন্ন মনোভঙ্গীর অভিব্যক্তি টুকে রাখে। এই সব কথা পরিশেষে সোনালি নোটবই-এ সংযোজিত হয়ে অর্থ এবং পরিণতি লাভ করে।—কিন্তু নোটবই-গুলি শুধু নোটবই হয়েই পড়ে থাকে, আনা তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে না। এমন কি নোটবই-এর পাতায় লিখতেও আনার মনে বিরক্তি ও ক্লান্তি জাগে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির হয়ে সে কাজ করেছে, কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে সেখানে দেখা হয়। সে ক্লান্ত হয়ে প[...] তথাপি কিছুকাল পার্টিতে কাজ ক[...] যায়। আর্থার কোয়েলার একবার ব[...] ছিলেন যে কথা সে কথাটি তার [...] দীর্ঘকাল গাঁথা থাকে: সে কথাটি [...] এই যে, একটি বিশেষ তারিখের প[...] পশ্চিম জগতের যে সব কম্যুনি[...] পার্টি আঁকড়ে বসে আছেন সে [...] একটা "Private Myth"-এর ক[...] আনা ভাবে আমার "প্রাইভেট মিথ" কি [...] রাশিয়ার সমালোচনার অনেকখানি [...] কাছে সত্য বলে বিশ্বাস হয়. আবার একথাও মনে হয় নিশ্চয়ই নিষ্ঠাবান মানুষ কিছু আছেন যাঁরা আন[...] সমাজতন্ত্র গঠনের সুযোগের অপেক্ষা[য়] আছেন। *যদিও অন্য অনেক পার্টি সদস্যের এই ধরণের 'প্রাইভেট মিথ' থাকা সম্ভব তথাপি এসব কথা কিন্তু* সে অন্য কোনো পার্টি-মেম্বার ক[...] বলতে সাহস করে না। শুধু যে একটা রাজনৈতিক দলবিশেষ সম্পর্কে এই ধরণের 'প্রাইভেট মিথ' থাকা সম্ভব তা নয়, 'প্রাইভেট মিথ' আমাদের পরিবারে, বন্ধুত্বে, প্রেমে, ধর্মে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

এই উপন্যাসে শুধু আনা নয়, তার বান্ধবী মলিরও অসামান্য প্রতিভার কি অপচয়। আনার অসমাপ্ত উপন্যাসের নায়িকা এলার মনে হয় সে যেন একটা শামুক, যার খোলসটা পাথরে ঠুকরে নিয়ে গেছে। আনার মত তারও নিদারুণ যৌন-বুভুক্ষা। পুরুষকে যে তার প্রয়োজন সেই সত্য সে অপ্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে—"for having sex, for being serviced", আপনাকে সে এই [...] নানা দীন উক্তিতে নিপীড়ি[ত ক]রে। আনা নিজের জন্যই এ সব ব্যবহার করতে পারত, কারণ এলা তারই প্রতিবিম্ব মাত্র।

আনা পাঠকের কাছে কিছুই গোপন রাখে না। তার সেই কালো, লাল, নীল এবং পীত নোটবইগুলিতে আফ্রিকার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে তা প্রকাশ করে, এই তথ্যের ভিত্তিতেই তার প্রথম উপন্যাস রচিত। কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে তার স্বপ্নভঙ্গ এবং যৌন-অভিজ্ঞতার কাহিনী সে অকপটে প্রকাশ করে। তথাপি গ্রন্থশেষে আনাকে যেন স্পষ্ট জানা যায় না, ধর[া] যায় না। সে এড়িয়ে চলার ছলে হারিয়ে যায়। সে ভাষায় তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে অসমর্থ, [...] হয়ত তার দোষ নয়, এ ত্রুটি—"the thinning of language against the density of experience"—অভিজ্ঞতার নিবিড় ঘনসন্নিবেশে ভাষা হয়ে উঠেছে শীর্ণ। সে অতিশয় চতুরা, কিন্তু মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্যভাবে নির্বোধ। মেয়েটি একদিকে বেশ দৃঢ় অর্থ[...] সহজেই অপরিচিতের কাছেও ধর[া] দেয়। নিওরোটিক মেয়ে আনা, [...]

লে রক্তের গন্ধ দূরীকরণে জঘন-শে ঘটি ঘটি উষ্ণ জলের ধারা বর্ষণ তে না। মনোবিজ্ঞানীর চেয়ে সে ভাল ঝে তার ব্যাধি কোথায়। জীবন-ণের বেদনাকে প্রতিহত করতে সে। কিন্তু গখন কিভাবে তা করা যায় নল তখন সে বলে—

"I won't put the pain away ere it can't hurt, turn it into a ry or history."

নিশ্চিন্তভাবে বোঝা যায় না যে র মনের গহনে এক তামস দানব বাসা ধেছে আর সে তাকে পরাক্রান্ত তে পারছে না কিম্বা সে উন্মত্ততার ই বেছে নিয়েছে। মাঝে মাঝে সে শ্রয় অসহায়ের ভঙ্গীতে কথা ন, আবার মাঝে মাঝে পাঠককে ঝাতে চায় যে সে স্বেচ্ছায় ভেঙে ছে. সে মনোবিজ্ঞানীকে বলে—

"The essence of neurosis is con-t. But the essence of living w fully, not blocking off to at goes on, is also conflict. In I have reached a stage where look at people and say—he or they are whole at all, because y have chosen to block off at s stage or that. People stay e by blocking off, by limiting mselves."

মানুষ আপনাকে সীমিত রেখেই সিক সুস্থতা বজায় রেখেছে। পনাকে সীমিত রাখতে পারছে না নই কি সে ক্রমশঃ তার মানসিক রসাম্য হারিয়ে ফেলছে। কিম্বা থায় সীমানা তা সে বুঝতে পারছে নিজের পরিচয় সে হারিয়ে ফেলেছে ই আর নতুন উপন্যাস লিখতে রছে না। তার নোটবই-এর পাতায় না আপনাকে গেঁথে রাখে প্রতিটি য়। সবই বৃথা। এই আনাকেও সে তে পারে না. তাই সে নোটবই-এর তায় লেখা লাইনগুলি পাঠ করে ছুই বোঝে না। সেগুলি তার ভজ্ঞতার একটা আকৃতি নয়, কয়েকটি হীন শব্দ মাত্র। যেন ছায়াছবির উন্ড ট্রাক. ফিল্মের সঙ্গে সংযোগ রিয়ে ফেলেছে। মনে এমন বাক্-তমার উদ্ভব হয় যার সঙ্গে বাক্যের গ নেই। এইভাবে আনা আত্মবঞ্চনা র চলেছে। সংসারের মানসিক ভার-ম্য সে ফিরিয়ে আনতে পারে না, জেরও নয়। তার নিজের মন যখন ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার মুখে খন সে যেন মানসিকতা সংরক্ষণের পন রহস্যের সন্ধান পায়।

মিসেস লেসিং জীবনের বহু নিয়াদি সমস্যায় আমাদের দৃষ্টি কর্ষণ করেছেন, আমরা যা স্বীকার রে নিয়েছি, যাকে নিরাপদ নিশ্চিন্ততা ন করেছি, জীবনের সেই গভীরে সেস লেসিং পাঠককে নিয়ে গেছেন। যে জগতে আমরা বাস করছি সেখানে কি কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ধরে থাকা সম্ভব? কোন কিছু সম্পর্কিত বিশ্বাসকে কি ধরে রাখা যায়? আনার এই নোটবুকের মাধ্যমে বন্ধুত্ব, যৌন-সম্পর্ক, প্রেম, রাজনীতি, সাফল্য সম্পর্কে মিসেস লেসিং যেকথা বলতে চেয়েছেন সেকথা আগে বলা হলেও এমন জোরালো কণ্ঠে আর ধ্বনিত হয়নি। জীবন-সংগ্রামে আনার এই নিরাসক্ত নিস্পৃহ ভঙ্গী বর্তমান-কালের বিদগ্ধ-মানবের জীবনকাহিনী। মনো-ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ অসাধুতা না থাকলে জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা অসম্ভব. নয়ত কৃত্রিম জীবন যাপন করো। হয় নিজেকে ঠকাও নয় অপরকে, শুধু পাতায় পাতায় উড়ে বেড়াও, প্রশ্ন করো না। আনা আর উপন্যাস লিখতে চায় নি, কারণ সেই মনোভঙ্গী সে আয়ত্ত করতে পারে নি—

"People don't mind immoral messages. They don't mind art which says that murder is good, cruelty is good, sex for sex's sake is good. They like it, provided the message is wrapped up a little. And they like messages saying that murder is bad, cruelty is bad, and love is love. What they can't stand is to be told it all doe's not matter, they can't stand formlessness."

জীবনের এই দুঃসাহসিক সমীক্ষার কোন জবাব মিসেস লেসিং দেন নি। একালের মানুষ ও লেখকের সমস্যার, এবং লেখকসত্তার বিভ্রান্তিকর বিভীষিকার ইঙ্গিত করেছেন।

নতুন বই

বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা —১২। দাম—তিন টাকা।

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অচিন্ত্য-কুমার একটি অতিপরিচিত জনপ্রিয় নাম. বিশেষত ছোটগল্প-লেখক হিসেবে অচিন্ত্যকুমারের স্বাতন্ত্র্য আজকে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাই 'হাড়ি-মুচি-ডোম, কাঠ-খড়-কেরোসিন', 'সারেঙ'-এর লেখকের নবতম গল্প সঙ্কলনটি প্রকাশ করে প্রকাশক পক্ষ পাঠকজনের ধন্যবাদার্হ হলেন।

'বরবর্ণিনী' গ্রন্থে গল্পের সংখ্যা আট এবং ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকা-দিতে গল্পগুলি প্রকাশিত হবার ফলে গল্পগুলির সঙ্গে অনেক পাঠকেরই পূর্বপরিচিতি আছে। অচিন্ত্যকুমারের অসাধারণ আঙ্গিকের অঙ্গুলি হেলনে প্রতিটি গল্পই সুখপাঠ্য এবং আকর্ষণীয়। 'হাউস বোট', 'কুমারী' গল্প দুটি শাণিত ব্যঙ্গে উজ্জ্বল। প্রথমোক্ত গল্পটিতে ভৌগোলিক বর্ণনার আধিক্যে অবশ্য গল্পের মূলে গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে, তথাপি জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর রেলের ল্যাভেটারীতে রান্না চাপিয়ে খরচ বাঁচানোর চেষ্টায় যে কৌতুকরসের সৃষ্টি, গল্পের আগাগোড়াই তা বহমান। এই গ্রন্থের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প 'আর্দালি নেই'। জনৈক পেন্সনপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীর আর্দালি-প্রীতিকে সহৃদয় ভাষণে বলেছেন লেখক, ফলে ব্যঙ্গ-গল্পের সব উপাদান থাকা সত্ত্বেও মানবিক মাধুর্যে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে। 'দিন' গল্পটিতে অচিন্ত্যকুমার উকিল মুহুরির অর্থগৃধ্নু ষড়যন্ত্রের এক সার্থক ছবি এঁকেছেন। উকিলরা কত রকম উপায়ে আদালতে দিন ফেলে ফেলে মক্কেলকে পথে বসায় লঘু কণ্ঠে শুনিয়েছেন লেখক। বিচারালয় সম্বন্ধে

লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ এই গ্রন্থের অনেক গল্পেই বর্তমান।

অচিন্ত্যকুমারের সাম্প্রতিক রচনা-রীতি সম্বন্ধে বর্তমান সমালোচকের একটি মৃদু আপত্তি আছে। 'বরবর্ণিনী' গ্রন্থের গল্পগুলিতে লক্ষ্য করা গেল লেখকই সর্বভূতে মঞ্চ জুড়ে আছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা যেন মাঝেমাঝেই দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটতে পারছে না, উপমার, অনুপ্রাসের এবং উজ্জ্বল শব্দাবলীর উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অবশ্য ভাষার খাঁচায় গল্পের প্রাণীগুলিকে কুক্ষিগত করে রেখেও যে গল্প বলা যায় তার সকল প্রমাণ অসংখ্যবার দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তবু 'সারেঙ' গল্প পাঠক হিসেবে লেখকের নিকট বিনীত আশা তাঁর গল্পের সকল চরিত্র-গুলিই যেন স্বরাজ্যে স্বাধীন হয়।

রোল নম্বর ২০৫— পরিমল গোস্বামী। গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট। কলিকাতা-৬। দাম ২-৫০ নঃ পয়সা।

শ্রীপরিমল গোস্বামী কৌতুক রচনার সিদ্ধকলম। বয়স্ক পাঠক সমাজের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ছোটদের জন্যে লিখতে গিয়ে তিনি যে সহজেই তাঁর বয়সী ভূমিকা সহজে ছাড়তে পারেন তার প্রমাণ এই এগারো গল্পের সংকলনটি। বইটির প্রায় সব কটি গল্পই পুরোনো। একটি গল্প বাদ দিলে সব গল্পেরই রচনাকাল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত। একমাত্র 'কণিকার জয়' গল্পটি ১৯৬১ সালের। সমসাময়িক কালের ছাপ প্রায় সব গল্পেই পড়েছে এবং সব গল্পই লঘু-কথনে আরম্ভ হলেও, লেখক সব ক্ষেত্রেই কিছু একটা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই বলাটা কখনই গুরুমশাইর অনু-শাসন হয়ে পাঠকমনে বিরক্তির সঞ্চার করেনি। যেমন, 'বেগুনি সম্রাট' গল্পে প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্ত, 'ফলাফল' গল্পে আদর্শ রচনারীতি, 'অগ্নিপরীক্ষা' গল্পে জ্ঞানের বাস্তব দিক, ইত্যাদির দিকে কিশোর পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন লেখক এবং তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই। নীতি-কথার দিকটা বাদ দিলেও শুধুমাত্র গল্প হিসেবেও সব কটি গল্প সুখপাঠ্য এবং রেখাচিত্রিত হওয়ার ফলে সংকলন গ্রন্থটি নয়নসুখকরও বটে। ছোটদের পুরস্কার-গ্রন্থ হিসেবে সংকলনটি একটি আদর্শ বই।

চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন—শিবরাম চক্রবর্তী। শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ-৬৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দাম ১·৮০ নঃ পঃ।

দাদু-নাতির দৌড়— শিবরাম চক্রবর্তী। গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দাম ২·২৫ নঃ পঃ।

শিবরাম চক্রবর্তীর রচনার উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল, তিনি কখনো সোজা গল্প বলেন না, মকরধ্বজের যেমন মধু অনুপান, শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পেরও তেমনি অনুপান শব্দের খেলা। এই শব্দভেদী খেলায় শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী প্রায়শঃই জিতে এসেছেন অদ্যাবধি, আবার কখনো-সখনো তাঁকে হারতেও হয়েছে। যেমন 'চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন' উপন্যাসটিতে। হর্ষবর্ধন এবং গোবর্ধন বাংলা শিশু-সাহিত্যের দুটি স্মরণীয় চরিত্র। এই দুই ভাইয়ের অপ্রাকৃত কাণ্ড-কারখানায় কম হাসি তৈরী হয় নি। কিন্তু বর্তমান উপন্যাসটি পড়ে মনে হল হাসি হচ্ছে এমন একটি উৎপন্ন দ্রব্য যা কারখানার নিয়মে উৎপাদন করা যায় না। এই ছোট্ট উপন্যাসটি সম্বন্ধে আরেকটি শোক-সংবাদ হল উপন্যাসটি সম্পূর্ণ নয়। হর্ষবর্ধন এবং গোবর্ধনকে চোরেরা (কিংবা ডাকাতরা) চুরি করে নিয়ে বাগানবাড়িতে রাখল মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে। স্বভাবতঃই এই ধরণের গল্পের একটা পরিণতি থাকে, কিন্তু 'চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন'-এর কাহিনী যেন অর্ধপথেই শেষ হয়ে গিয়ে হা-হুতাশ করছে। কাহিনীর শেষে দেখি হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন দুই ভাই ডাকাতের হাতে বন্দীই আছেন এবং 'চৈত্র মাসের মতো হু-হু করে দুজনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে'। সন্দেহ নেই পাঠকদের দীর্ঘনিঃশ্বাসও ওই সঙ্গে যুক্ত হবে কারণ শেষ পাতার কোথাও "ক্রমশঃ" লেখা নেই। 'দাদু-নাতির দৌড়' উপন্যাসে কিন্তু শিবরাম তাঁর স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। ফানি সিচুয়েশনজনিত অনাবিল হাস্যরস এই উপন্যাসের প্রায় পাতাতেই ছড়ানো। বিশেষ করে টুসির রাত্রে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে রেলিং-এর ফাঁকে আটকে ঘুমিয়ে পড়া, দাদুর অনিদ্রা রোগের ইটযোগ চিকিৎসা, বটকৃষ্ট-ঘনশ্যামের পরীক্ষা পাশ বৃত্তান্ত পড়ে হাসি চাপা প্রায় অসম্ভবই। দাদু-নাতির স্নিগ্ধ সম্বন্ধের একটি মধুর স্বাদও পাঠকমনকে সহজেই আপ্লুত করে।

আলোচিত দুটি উপন্যাসেরই প্রচ্ছদ এবং ভেতরের রেখাচিত্রগুলির জন্যে শিল্পী রেবতীভূষণ ঘোষ এবং শৈল চক্রবর্তী অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী।

রবীন্দ্র সংগীত-প্রসঙ্গ— (দ্বিতীয় খণ্ড)—প্রফুল্লকুমার দাস। পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯। দাম—পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ এদেশে বিরাট ঝুরি-নামা অশ্বত্থগাছের মতো একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এটা যতখানি আশার কথা তারচেয়ে আশংকার কারণও কম নয়। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্র সমালোচনার নামে এদেশে যে জাতীয় অধ্যাপকসুলভ অতি-সরলীকরণের গড্ডলিকা প্রবাহিত তাতে বিচারশীল রবীন্দ্রমানস প্রায়শ-ই অনু-পস্থিত। ফলত রবীন্দ্রালোচনা কখনো অন্ধ স্তুতি কখনো অধ্যয়নশূন্য আস্ফালন।

বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে এই দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রসংগীত এদেশে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তার গগনস্পর্শ করেছে। জনপ্রিয়তার স্বধর্মে এমন একটি বিপদ লুকোনো থাকে যা যুক্তি বিবেচনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অথচ যে সম্বর্ধনা যুক্তির [illegible] প্রতিষ্ঠিত নয় তার নিশ্চিত [illegible] চিন্তাহীন ফ্যাশনের মড়কে। যে কোনো সংগীতকে বুঝতে হলে তার অন্তরে প্রবেশ করতে হয়, স্রষ্টার ধর্মকে জানতে হয়। রবীন্দ্রসংগীতকে বুঝতে হলে তার ব্যাকরণকে হৃদয়াঙ্গম করতে হয়। জানতে হয় তত্ত্বকে। অশিক্ষিত পটুত্বের প্রদর্শনীতে চোখ ভোলবার দিন আজ আর নেই।

সম্প্রতি কিছুকাল থেকে রবীন্দ্র-সংগীত-বিষয়ক হাতেগোনা কিছু গ্রন্থ বাজারস্থ হয়েছে। এবং ইতস্তত পত্র-পত্রিকায়ও কখনোসখনো রচনাও চোখে পড়েছে।

এই বিষয়ে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস মহাশয়ের আলোচ্য গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বকীয়তায় উজ্জ্বল মনোযোগ পাবার আশা রাখে। আলোচনার প্রথম সর্ত পরিশ্রম, এই গ্রন্থে স্বীকৃত। উপরন্তু লেখকের সমীক্ষা এবং প্রকাশভঙ্গি গবেষণার ঐতিহ্যের প্রতি অন্বিষ্ট।

ন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন ধারার দিকে ক যত্নশীল পাঠকের মনোযোগ র্ষণ করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ-্য সংগীতের তত্ত্বালোচনা, ধ্রুপদের ব, খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরির অঙ্গের গান, ় কি কীর্তন-বাউলের রবীন্দ্রনাথকেও ন উপস্থিত করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতের অনন্য বৈশিষ্ট্য র বৈপ্লবিক মতবাদে। সংগীতের ত প্রথামাফিক সুরকেই তিনি একেশ্বর করতে পারেননি, ভাষাকেও তিনি ম্পূর্ণ মর্যাদার আসন দিয়েছেন। । ও সুরের পার্বতী-পরমেশ্বর বয়ই রবীন্দ্রসংগীতের আত্মা। ফলে ঙ্গ সংগীতের সুরসর্বস্বতাকে তিনি র আশ্রয়ে বেঁধেছেন। এর জন্য সনা-ী গায়কমহল থেকে ধ্রুপদ বা রাগাশ্রয়ী র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে রীতিভঙ্গের যোগ শুনতে হয়েছে। এমনকি দেশে নষ্টের দায়ও তাঁকে বহন করতে ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বাসের ধে আপস করেননি। এর মূলে কবি-ষ্টির স্বাভাবিক স্পর্ধা। বস্তুতঃ ন্দ্রসংগীতে কথা না সুরকে বড় দ্বিধা জাগে না। তার কারণ র সংগীতসৃষ্টি-কৌশল। কখনো এক শয় সুরকে তিনি ভাষার পরিচ্ছদ য়েছেন, কখনো কথাকে গান করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের াব যেমন সানন্দ স্বীকৃত তেমনি ীতের প্রভাব, লোক-ঐতিহ্য, বাঙলা নর অবিকল সুর ও ছন্দকেও তিনি ন্দ করেছেন। ঋতুসংগীতগুলি রবীন্দ্-থর অনবদ্য সৃষ্টি। বাউল ও কীর্তন-ঙ্গের গানগুলি পল্লীকেন্দ্রিক জীবনেরই রচয়বাহী।

আনন্দের বিষয় গ্রন্থকার রবীন্দ্-গীতালোচনায় এই সকল বৈশিষ্ট্যের ক দৃকপাত করেছেন। এবং এমনভাবে থ প্রণয়ন করেছেন যাতে সাধারণ ঠকদেরও কৌতূহলের নিরসন হয়। খো পাণ্ডিত্যের ভারে সমস্ত আলোচনা শেষ কদাকার প্রাণীর মতো বেঢপ হয়ে ঠনি। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দোপভোগের তা জন্মে।

লেখকের সঙ্গে আমিও একমত য়বস্তুর প্রাচুর্যের ফলে কোনো কোনো ষয়-আলোচনা সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। শেষত নাট্য-নাটকের বেলায় এই ক্ষিপ্ত তালিকায় পর্যবসিত হয়েছে।

এমন একটি গ্রন্থের বহুলপ্রচার ম্য।।

ঢেউ ভাঙগা মুক্তা— আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য। অলকা-বিটা পাবলিকেশন। দাম—৬·৭৫।

এটি লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রথম উপন্যাস 'দৃষ্টিহারা' ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখকের অভিজ্ঞতা মার্জিতভাবে প্রকাশিত। কাহিনীর পটভূমিকা সুদূর বোম্বাইয়ে শুরু। জয়ন্ত কৃষ্ণাকে বিবাহ করে অথচ এই বিবাহে হৃদয়ের আবেগের চেয়ে পিতৃসত্য পালনের দায়িত্ব ছিল বেশী তাই এই বাইরের বন্ধন তৃষ্ণার প্রেমাবেগে ছিন্ন হয়ে গেল। জয়ন্ত-তৃষ্ণা-কৃষ্ণার প্রেমের পাশাপাশি, রত্না-সমীর এবং তৃপ্তি-অনুপের প্রেমকাহিনী যুক্ত হয়েছে। লেখকের মুন্সিয়ানায় পার্শ্ব-কাহিনীগুলি, মূলকাহিনীকে সংযুক্ত, প্রসারিত ও বৈচিত্র্য সম্পাদনে, জয়ন্ত-কৃষ্ণার মিলনান্তক আনন্দে পরিসমাপ্ত। কৃষ্ণার জীবনাদর্শ গ্রন্থটির সম্পদ। শত অবজ্ঞা, উপেক্ষা, সংঘাত ও আবর্তের মধ্য দিয়ে জয়ন্তকে ফিরে পাবার আকুল বাসনা পাঠকমনে বিস্ময় জাগায়।

কিতাগড়— পারাবত। ডি এম লাই-ব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৩। দাম চার টাকা

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তরুণ লেখক শ্রীপারাবত ইতিমধ্যেই স্বীয় প্রতিভার যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর অঙ্কিত করেছেন, আলোচ্য উপন্যাসটিতে তা' উজ্জ্বলতর হয়েছে। মানভূম-সিংভূম অঞ্চলের সাঁও-তাল, মুণ্ডা, আর ভূমিজদের ঐতিহাসিক 'জংগল মহলে'র অর্ধস্বাধীন 'সতেরখানি তরফে'র স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম প্রধানত উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। তার সঙ্গে কুশলী লেখনীর প্রভাবে মিশেছে উন্মুক্ত প্রকৃতির এই স্বাধীনচেতা দৃপ্ত বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টি-গত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ব্যর্থতার মানবিক ইতিহাস। বিরাট এই আলেখ্যের মধ্যে একদিকে যেমন আছে রণক্ষেত্রে দুর্জয়, স্বাধীনতা রক্ষায় জীবনতুচ্ছকারী সর্দার সারিমুর্মু, বুধৌকিস্কু, রাখরায় সোরেণ এবং রাজা ত্রিভন সিং-এর মত উজ্জ্বল, জীবন্ত চরিত্র, অন্যদিকে তেমনি আছে কঠিন ও কোমলতার সংমিশ্রণে করুণ, বীর রাণকো, প্রেমিকা ঝাঁপনী, বীর কবি ও ব্যর্থপ্রেমিক ভুইঃ টুডু আর ছুটকী। এদের ব্যক্তিজীবনের দুঃসহ ব্যর্থতা আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। লেখক প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে এদের দেখেছেন, আর গভীর নিষ্ঠায় সুনিপুণ-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। উপন্যাসের সার্থকতা এই-খানেই। এছাড়াও, বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারতের বর্তমান সঙ্কটক্ষণে, দেশ-প্রেম সমুজ্জ্বল এ ধরণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বাধিক। সেদিক দিয়েও লেখক তাঁর কর্তব্য সার্থক-ভাবে সম্পন্ন করেছেন। শ্রীপারাবতের পরবর্তী উপন্যাসের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ প্রত্যাশা রইল।

নান্দীকর

আজকের কথা

একখানি খোলা চিঠি

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র অনুসন্ধান সমিতি
সমীপেষু—

["অমৃত" ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আমাদের পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কাছে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে তার স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি বিধানের জন্যে একটি সুদৃঢ়, সুসমঞ্জ এবং সুযুক্তিপূর্ণ আর্থিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বহু প্রসঙ্গে বহুরকম আবেদন-নিবেদন মারফত ব'লে আসছে। তাই যেদিন বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের গুরুতর সঙ্কটের সংবাদে বিচলিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুইজন মন্ত্রী, মাননীয় জগন্নাথ কোলে এবং তরুণকান্তি ঘোষ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটাণ্ডায় সভা আহ্বান ক'রে ঘোষণা করলেন, চলচ্চিত্র শিল্পের এই বিপদের দিনে সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না এবং সেই কারণে অনতিবিলম্বে একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট অনুসন্ধান সমিতি গঠন ক'রে চিত্র-শিল্পের বিপদের কারণ ও তার স্থায়ী প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করতে কৃতসঙ্কল্প, তখন "অমৃত" এই দু'জন মন্ত্রীমহোদয় তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন না ক'রে পারেনি।

ইতিমধ্যে চারজন সদস্যসম্বলিত সেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়েছে এবং সমিতির তরফ থেকে একটি তিনপৃষ্ঠাব্যাপী মুদ্রিত প্রশ্নমালা বাঙলা চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং চলচ্চিত্রমোদী ও চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে যথাযথ উত্তরদানের জন্য পাঠানোও হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই সমিতি বিশিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে মৌখিক মতামতও সংগ্রহ করছেন এবং আশা করা যাচ্ছে, সমিতি এপ্রিল মাসের মধ্যেই তাঁদের অনুসন্ধানকার্য সম্পূর্ণ সমাপ্ত করতে পারবেন। তদন্তের ফলে লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সমিতি সর্ব-সম্মতিক্রমে যে-সুপারিশ করবেন, রাজ্য-সরকার সেই সুপারিশ অনুযায়ী চলচ্চিত্র শিল্পকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তৎপর হবেন, এ আশা করাও অন্যায় নয়।

অনুসন্ধান সমিতির সদস্যবৃন্দ নিশ্চয়ই তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাই আশা করি, তাঁরা তাঁদের অনুসন্ধানকার্যে কারুরই মতামতকে যোগ্য গুরুত্ব দিতে ইতস্ততঃ করবেন না। সেতুবন্ধকালে রামচন্দ্র কাঠবিড়ালের সাহায্যকেও উপেক্ষা করেন নি, এই জেনেই আমরা এই খোলা চিঠি মারফত আমাদের বক্তব্য প্রকাশে সাহসী হয়েছি।—]

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করব, বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বর্তমান দুর্গতিতে রক্ষা করা কেন প্রয়োজন, এ-প্রশ্ন কি আপনারা অনুধাবন ক'রে দেখেছেন? যে-শিল্প নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না, তার মৃত্যু তো অনিবার্য। কাজেই ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করার পর থেকে আজ অবধি প্রায় ৪৪ বছর কেটে যাবার পরেও যে-শিল্প ছিন্নমূল হবার উপক্রম হয়েছে, তার প্রতি সাহায্যহস্ত প্রসারিত করবেন কোন্ সঙ্গত কারণে? এক সময়ে বলা হয়েছিল, একটি সমুদ্র-তীরবর্তী প্রাকৃতিক শোভাবিশিষ্ট পার্বত্য অঞ্চলে ভারতের চলচ্চিত্র নগরী স্থাপন করা হবে এবং মাত্র সেই নগরীতেই চলচ্চিত্র নির্মাণশিল্পকে কেন্দ্রীভূত করা হবে। এতে শিল্পের মধ্যে সংহতি আনা এবং শিল্পের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সর্ব-ভারতীয় বা আঞ্চলিক— যে-কোনো ভাষাতেই ছবি তোলা ঐ এক জায়গা থেকেই সম্ভব হবে। কিন্তু চলচ্চিত্র তো মাত্র ব্যবসার নয়, তার প্রধান সংজ্ঞা হচ্ছে, সে আর্ট—সুকুমার শিল্প এবং শিল্পের মধ্যে যদি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বজায় রাখতে হয়, তা হ'লে তাকে কেন্দ্রীভূত করা আদর্শবিরোধী কার্য। কাজেই কেন্দ্রীয় অঞ্চল স্থাপনের প্রস্তাব কার্য-করী হয়নি। স্বীকার করা ভালো, বাঙলা ছবির বিশেষত্ব আছে এবং এই বিশেষত্ব তাকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদা দিয়েছে। বাঙলার চিত্রস্রষ্টাদের ধ্যানধারণা, প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে এমনই একটি শিল্পীসত্তা প্রকট হয়ে উঠে, যার অভিনব রসমূর্তি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সৃষ্ট চলচ্চিত্রে অনুপস্থিত। এবং বাঙলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম বাহক হিসেবেই বাঙলার চলচ্চিত্রকে পরমায়ু দান করা মাত্র রাজ্য সরকারেরই নয়, ভারত সর-কারেরও অন্যতম কর্তব্য।

কিন্তু বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্প সমস্যা-কন্টকিত; অগণ্য সমস্যার গহনে পথ হারিয়ে যায়। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, আর্ট বনাম ইণ্ডাস্ট্রির সমস্যা। চলচ্চিত্র মূলতঃ একটি চারুকলা; চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, সাহিত্যরচনারই মত চারুকলা—এর জন্ম চিত্রনাট্যকার-পরিচালকের মস্তিষ্কে। কিন্তু এর রূপায়ণে যে বিরাট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তাই এতে এনেছে ব্যবসায়িক স্বার্থ। কাজেই দ্বন্দ্ব বাধে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক এবং অর্থ বিনি-য়োগকারীর মধ্যে। প্রথমজন দেখতে চান, তাঁর সৃষ্টি যেন একটি নিখুঁত আর্টের নিদর্শন হয়, দ্বিতীয়জন চান, নির্মিত চিত্রটি যেন তাঁর নিয়োজিত অর্থ একটি সঙ্গত লভ্যাংশসমেত ফেরত দিতে পারে এবং এরজন্য আর্ট যদি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। এ ছাড়া প্রযোজনার ক্ষেত্রে আরও যেসব বিভিন্ন-মুখী স্বার্থের সম্মুখীন হ'তে হয়, তার মধ্যে আছে— অভিনেতা-অভিনেত্রীর আর্থিক চাহিদা, কলাকুশলীদের যান্ত্রিক নিখুঁতির চাহিদা, স্টুডিও-মালিকের
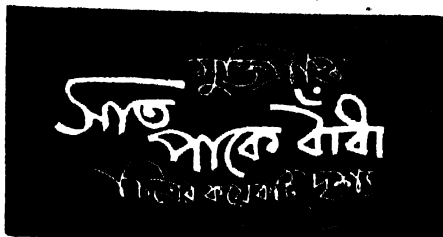
উপরের চিত্রে : সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মাঝের চিত্রে : (বাঁয়ে) সুব্রতা সেন ও সুচিত্রা সেন; (ডাইনে) সুচিত্রা সেন। নীচের চিত্রে : (বাঁয়ে) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুচিত্রা সেন এবং (ডাইনে) সুচিত্রা সেন ও মলিনা দেবী।

ভাড়া-আদায়ের স্বার্থ। কাহিনী বিশেষে একখানি ছবির প্রতি কতটুকু অর্থব্যয় করা সমীচীন, সে-বিষয়ে একমাত্র প্রযোজকেরই যা মাথাব্যথা। বাকী সকলেই তাঁকে ন্যায় এবং অন্যায়, যেকোনো উপায়েই দোহন করতে ব্যস্ত। নায়ক যখন পারিশ্রমিক হিসেবে এক লক্ষ টাকা দাবি করেন, তখন তিনি এক মুহূর্তও চিন্তা করেন না, একখানি বাঙলা ছবির পক্ষে কতখানি উপার্জন করা সম্ভব। পরিচালক যখন কোনো একটি বিশেষ দৃশ্যে এক হাজার সুসজ্জিতা সুন্দরীর উপস্থিতি দাবি করেন, তখন তিনিও ছবির উপার্জন-সম্ভাবনা সম্বন্ধে নির্বিকার। কিংবা স্টুডিও দ্বারা সরবরাহ-করা ক্যামেরার দোষের জন্যে পাঁচ-ছ'দিনের গৃহীত চিত্র যখন বরবাদ হয়ে যায়, তখনও প্রযোজকের ক্ষতির প্রতি স্টুডিও-মালিক সমানভাবেই নির্বিকার।

ঠিক আবার বিপরীত কথাও আপনাদের শোনাতে পারি। বাঙলা চলচ্চিত্রের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে হঠাৎ-প্রযোজকের সংখ্যাই বেশী। চিত্র-প্রযোজনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও এদেশে চিত্র-প্রযোজক হওয়া যায়, যদি পরিচালক হবার সখ-ওয়ালা কোনো বন্ধু এবং তার সঙ্গে তার 'চাঁদ ধ'রে দেবার' কথায় বিশ্বাস করবার মতো নির্বুদ্ধিতা কিংবা চিত্র-নায়িকা হবার বাসনাবিশিষ্টা কোনো বান্ধবী থাকে। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা সম্বল নিয়েই চিত্র-প্রযোজক সাজতে আসেন, এমন দুঃসাহসিকের এদেশে অভাব নেই। চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারে কাহিনী নির্বাচন থেকে শুরু ক'রে সেন্সার আফিস থেকে চিত্রপ্রদর্শনের ছাড়পত্র (সেন্সার সার্টিফিকেট) পাওয়া পর্যন্ত প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে কত যে স্বার্থের সংঘাত প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নাই বা দিলুম।

কিন্তু সেন্সার সার্টিফিকেট পাবার পরে ছবিকে আবার যে নতুন এক বিচিত্র স্বার্থ-সংঘাতের জগতে এসে দাঁড়াতে হয়, তার কথা আপনাদের শোনা দরকার। আমাদের বাঙলা ছবির মুক্তি হয়ে থাকে চেন-সিস্টেমে অর্থাৎ কলকাতা শহরে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ অঞ্চলের তিনটি চিত্রগৃহে একই সঙ্গে ছবিটির প্রদর্শনী শুরু হয়। হিসেব করলে দেখা যায়, বাঙলা ছবির মুক্তির জন্যে মোটামুটি পাঁচটি চেন আছে। এবং এই পাঁচটি মাত্র চেন কয়েকটি বিশেষ পরিবেশক-সংস্থার কুক্ষিগত বললেও অত্যুক্তি হবে না। কাজেই কোনো সাধারণ প্রযোজকের সাধারণ ছবির এই চেনে মুক্তি পাওয়া যে কি রকম কাঠখড় পোড়ানো ব্যাপার, তা আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। কথাতেই আছে, খালি মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে না। অতএব সাধারণ প্রযোজকের সাধারণ ছবি যদি কোনো বিশেষ পরিবেশকের মারফত পরিবেশিত হবার সৌভাগ্যলাভ না করে, তা হ'লে সে-ছবির মুক্তি-ব্যবস্থার জন্য বেশ কয়েকজন লোককে বেশ-কিছু টাকা কবুলে করারই রেওয়াজ আছে। এবং বিশেষ পরিবেশক মারফত পরিবেশিত হবার সৌভাগ্য লাভ করতে গেলে পরিবেশকের চাহিদা বা আদেশ মাফিক নায়ক-নায়িকা, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক প্রভৃতি নিয়োগ করতে হয় দ্বিরুক্তি না করে; এমন কি, কাহিনী এবং চিত্রনাট্যও তাঁর বা তাঁর আপনজনেদের মঞ্জুরির অপেক্ষা রাখে।

পরিবেশক-সংস্থা কোনো ছবি বাবদ কিছু টাকা প্রযোজককে অগ্রিম দিয়ে থাকেন পরিবেশন-চুক্তি অনুসারে। চুক্তির মধ্যে শর্ত থাকে, পরিবেশনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে পরিবেশক টিকিট-বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রমোদকর এবং প্রদর্শকের প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে প্রযোজকের যে-অংশ প্রাপ্য হয়, তার শতকরা ১০ ভাগ থেকে ক্রমে ৫০ ভাগ পর্যন্ত প্রথমেই নিয়ে নেবেন। এরপর যে-অর্থ প্রযোজকের প্রাপ্য হয়, তা' থেকে পরিবেশক প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ শোধ হবে। এই অর্থ পরিশোধ হ'তে প্রায়ই তিন মাস থেকে এক বছর দেড় বছর সময় লেগে যায়। এবং বহুক্ষেত্রেই কোনোদিনই শোধ হয় না। অর্থাৎ ঐ ছবির আয়ের একটি নয়া পয়সার মুখও প্রযোজক দেখতে পান না। বরং আজকাল চুক্তির মধ্যে এমন একটি শর্ত থাকে, যার বলে পরিবেশকের অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের কোনও অংশ যদি ছবি মুক্তি পাবার দু' বছরের পরেও অপরিশোধিত থাকে, তাহলে পরিবেশক প্রযোজকের কাছ থেকে সেই অংশ নগদ আদায় করে নিতে পারেন। কিন্তু যেখানে পরিবেশন করার জন্যে পরিবেশক বেশ মোটা টাকা কমিশন নিচ্ছেন, সেখানে চুক্তির মধ্যে এমন শর্ত থাকাই স্বাভাবিক নয় কি যে, পরিবেশক যদি ছবির মুক্তির দু' বছরের মধ্যে প্রযোজককে অন্ততঃ দু' লক্ষ টাকা তার অংশ বাবদে আয় না দেখাতে পারেন, তাহলে ঘাটতি টাকার জন্যে তিনি দায়ী থাকবেন? প্রযোজক একখানি ছবি প্রস্তুত করে পরিবেশককে দিলেন তা যথাযোগ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে। পরিবেশক যে তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন না, তার প্রমাণ কি? লক্ষ্য করলে দেখবেন, বহু ছবির প্রযোজক পথের ভিখারী হয়েছেন, কিন্তু সেই ছবিগুলির পরিবেশক তাঁর অফিসকেই খালি বড়ো করে তোলেননি, নিজেকেও বড়ো করেছেন শহরের মাঝে নতুন বাড়ী তৈরী করে এবং একের স্থানে তিনখানি মোটর হাঁকিয়ে।

এইবার আসুন, পূর্বে কথিত পাঁচটি চেনের মালিকদের কাছে। এঁদের সম্পর্ক ছবির পরিবেশকের সঙ্গে; প্রযোজক এঁদের কাছ থেকে কালেভদ্রে মৌখিক খাতির পেলেও আসলে তিনি এঁদের কাছে 'ফালতু আদমী'। ছবির মুক্তি সম্পর্কিত যে-চুক্তি হয়, তাতে পক্ষভুক্ত হন একদিকে পরিবেশক এবং অপরদিকে প্রদর্শক; কমিশন ইত্যাদির শর্ত পরিবেশকেরই সঙ্গে; টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের নিজেদের অংশ বাদে বাকীটা তাঁরা পরিবেশককেই পাঠিয়ে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই চুক্তিতে প্রযোজকের স্বাক্ষর থাকে অনুমোদক বা

কন্‌ফার্মিং পার্টি হিসেবে। প্রমোদকর বাদে যে-অর্থ থাকে, মোটামুটি তার অর্ধেক নিয়ে থাকেন প্রদর্শক। কিন্তু কয়েক হপ্তা চলবার পর ছবিটির প্রদর্শনী যখন বন্ধ হয়, তখন হিসেব করলে দেখা যাবে, প্রদর্শক শতকরা প্রায় ৬৫।৭০ ভাগ আদায় করে নিয়েছেন। কেমন ক'রে, তা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নেই। কিংবা খুলে বলাই ভালো! এ'রা পরিবেশকের সঙ্গে যে-চুক্তি সম্পাদন ক'রে থাকেন, তাতে 'গৃহ-সংরক্ষণ' বা 'হাউস-প্রোটেক্‌সন' নামে একটি শর্ত থাকে। আর একটি শর্ত থাকে, যাকে বলে 'হোল্ড-ওভার ফিগার' এবং যার বলে সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের কম বিক্রয় হ'লে ছবির প্রদর্শনীটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়ে থাকে। ধরুন, কোনো একটি চিত্রগৃহের 'হোল্ড-ওভার' ফিগার হ'চ্ছে ৬,০০০ টাকা এবং 'হাউস প্রোটেক্‌সন ফিগার' হচ্ছে ৪,৫০০ টাকা। তাহ'লে যে-সপ্তাহে ছবির বিক্রী ৯,০০০-এর কম হ'ল, সেই সপ্তাহ থেকেই প্রযোজকের অংশে মোট অর্থের অর্ধেক আমদানী হওয়া বন্ধ হ'য়ে গেল। কারণ প্রদর্শক প্রতি সপ্তাহে ৪,৫০০ টাকা কেটে নিয়ে বাকী টাকাটা পরিবেশককে পাঠাবেন। শেষ যে-সপ্তাহে ৬,০০০ বিক্রী হ'ল, সেই হপ্তায় পরিবেশকের প্রাপ্য হ'ল মাত্র ১,৫০০ টাকা। প্রদর্শকের বক্তব্য, প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ৪,৫০০ টাকা না পেলে তাঁর খরচের টাকাটাও উঠবে না। অর্থাৎ তিনি এমন ব্যবসায় ফে'দেছেন, যেখানে লোকসান হবার উপায় নেই। অথচ বিক্রীর অংশ নেবার বেলায় শতকরা ৫০ ভাগ!

আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, রেডিও সেট, গ্রামোফোন, মোটরকার থেকে শুরু ক'রে পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস আছে কি, যা বিক্রী ক'রে শতকরা ৩৩⅓ ভাগের বেশী কমিশন পাওয়া যায়? এবং এমন কোনো ব্যবসাও আছে কি, যাতে জীবনে কোনো দিন লোকসানের ভয় নেই? তা যদি না থাকে, তাহ'লে বাঙলা ছবির মুক্তিদাতা চিত্রগৃহগুলির মালিকরা পরিবেশকদের সহায়তায় আর কতদিন এমন ব্যবসা চালাবেন? একখানি চিত্রগৃহ নির্মাণে কি খরচ পড়েছে, চিত্রগৃহটি সুসংস্কৃত অবস্থায় রাখতে বাৎসরিক কত ব্যয় সম্ভব এবং একটি চিত্রগৃহের সাপ্তাহিক খরচ কি, এ হিসেব করতে বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কাজেই মূলধনী খাতে ব্যয়িত অর্থের ২০ বছরের মধ্যে সামগ্রিক অপচয় সম্ভব, এই সাধারণ হিসেব ধরে প্রতিটি চিত্রগৃহে সমস্ত খরচের ওপর ন্যায্য লাভ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ভাড়ার ব্যবস্থা কিম্বা লাভ-ক্ষতির কথা না তুলে কোনো ছবিকে শতকরা ৩৩⅓ ভাগ কমিশনে কয়েকটি নির্দিষ্ট সপ্তাহব্যাপী

প্রদর্শনী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ব্যবস্থা করা কি সম্ভবপর নয়?

আজকাল প্রতি বছর প্রায় ৩৫ খানি বাঙলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। এই ছবিগুলির নির্মাণব্যয় এবং প্রতি বছর বাঙলা ছবির প্রদর্শনী আয় কত, তা' জানতে অনুরোধ করি। গেল্প পাঁচ বছরের হিসেব নিয়ে দেখতে অনুরোধ করি, মোট ব্যয় থেকে মোট আয় কম না বেশী? এমন কি প্রতিটি ছবির নির্মাণব্যয় এবং তার দু'বছরব্যাপী প্রদর্শনী-আয়ও চেষ্টা করলে জানতে পারা কঠিন নয়। এবং ছবির আয় কিভাবে বিভক্ত হয়ে সরকার, প্রদর্শক, পরিবেশক ও প্রযোজকের অংশে কতটুকু ক'রে আসছে, তাও আপনারা নথিপত্র দেখে আবিষ্কার করতে পারবেন। তখন আপনারা নিশ্চয়ই দেখবেন, ছবির আয়ের অযৌক্তিক বণ্টন-ব্যবস্থা বাঙলা ছবির প্রযোজককে লোকসানের ব্যবসা ক'রে তুলতে কতখানি সাহায্য করছে।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন প্রযোজকের হয়ে যে স্মারকলিপি আপনাদের কাছে পেশ করা হয়েছে, তার প্রথমভাগে বাঙলা ছবির বাজারকে সম্প্রসারিত করবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা দেশেই বাংলা ছবির যে-বাজার ১০ বছর আগেও ছিল, আজ তা' সংকুচিত হয়ে অর্ধেকে দাঁড়িয়েছে কেন, এ-সম্পর্কে চিন্তা করা হয়নি। কলকাতা শহরের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলের চিত্রগৃহে অ-বাঙলা ছবি হপ্তার পর হপ্তা 'হাউস ফুল' বোর্ড টাঙিয়ে চলছে কেন, কিংবা বাঙলা দেশের বাঙালী-অধ্যুষিত মফস্বল শহরেই বা একখানি চিত্রগৃহ বাঙলা ছবির চেয়ে হিন্দী ছবি দেখাবার জন্যে আগ্রহশীল কেন, এ-সম্পর্কেও গবেষণা করা প্রয়োজন নয় কি? বাধ্যতামূলকভাবে বাঙলাদেশের সমগ্র প্রদর্শনী-সময়ের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বাঙলা ছবির জন্যে সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত। কিন্তু তার আগে ব্যবস্থা করা উচিত দেখবার উপযুক্ত বাঙলা ছবি তৈরী করার। বছরে শতকরা মাত্র ৫ খানি জনপ্রিয় ছবি করলে বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পকে কোনো বৈদ্যই প্রাণদান করতে পারবেন না, এ-সত্য স্বীকার করাই ভালো। অবশ্য আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের অনুরোধ করব, ভারতের অপরাপর রাজ্যে বাঙলা ছবির সুষ্ঠু প্রদর্শনী-ব্যবস্থার জন্যে সুপারিশ করতে। সঙ্গে সঙ্গে এও চাইব যে, বাঙলা ছবির মুক্তি-ব্যবস্থাকে প্রসারিত করবার জন্যে বর্তমানের পাঁচের পরিবর্তে অন্ততঃ আটটি 'রিলিজ চেন'কে সম্ভব ক'রে তোলবার মতো ব্যবস্থার সুপারিশ আপনারা করবেন। ভারতের বাইরে বাঙলা ছবির চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে যে সমবায় প্রথার কথা বলা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে।

মোটের ওপর বাঙলা চলচ্চিত্র-শিল্পের বিপদকে চিরকালের জন্যে দূর করতে হ'লে এই ব্যবস্থাগুলি করা উচিত ব'লে মনে করি:

(১) একটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিষদ গঠন। এই পরিষদে সরকারী প্রতিনিধি থাকবেন।

পরিষদের কাজ হবে: (ক) চলচ্চিত্র প্রযোজনায় ইচ্ছুক ব্যক্তির আর্থিক ও শিল্পগত যোগ্যতা নিরূপণ; (খ) প্রস্তাবিত কাহিনীর চিত্রোপযোগিতা নিরূপণ; (গ) চিত্রনাট্যের সম্ভাব্য সাফল্য নিরূপণ; (ঘ) চিত্রায়ণের সম্ভাব্য ব্যয় ও সময় নিরূপণ; (ঙ) চিত্রায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পী, কলাকুশলী প্রভৃতির সঙ্গে চুক্তি-সম্পাদনে সাহায্য দান; (চ) যতদিন পর্যন্ত না চিত্রটি সেন্সারের ছাড়পত্র লাভ করে, ততদিন তার অগ্রগতির প্রতি পর্যায়ে তত্ত্বাবধান।

(২) যে স্টুডিওতে চিত্রটি গৃহীত হবে এবং যে ল্যাবরেটরীতে প্রসেসিং হবে, তাদের ছবিটির অংশীদার হ'তে হবে; তবেই সেই ছবির সাফল্য সম্বন্ধে তারা যত্নবান হবে।

(৩) পরিচালক, চিত্রনাট্যকার থেকে শুরু ক'রে আলোকসম্পাতকরা পর্যন্ত যাতে নিজের নিজের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, তার জন্যে তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা একটি ফিল্ম টেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন ক'রে।

(৪) প্রতিটি স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরীকে আধুনিক করা।

(৫) ছবির আয়কে সুসমঞ্জভাবে বণ্টন করার ব্যবস্থা করা।

(৬) বাঙলা ছবির মুক্তি-ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা।

(৭) ভারতের অপরাপর রাজ্যে বাঙলা ছবির নিয়মিত প্রদর্শন-ব্যবস্থা করা।

(৮) বিদেশে বাঙলা ছবির চাহিদা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

(৯) বাঙলা ছবির উন্নতিকল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

এবং (১০) প্রযোজনা-পরিষদের সুপারিশ অনুসারে বিশেষ বিশেষ প্রযোজককে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা।

ইতি—

নান্দীকার

বিবিধ সংবাদ

রূপান্তরীর "সাড়ে ন'টা" এবং "প্রতিনিধি":

গেল রবিবার, ১৭ই মার্চ অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্ হলে রূপান্তরী নাট্য সংস্থার সভ্যবৃন্দ মঞ্চস্থ করলেন প্রথমে জগদীশ চক্রবর্তী রচিত একাঙ্কিকা "সাড়ে ন'টা" এবং পরে ঐ একই নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটক "প্রতিনিধি"। "সাড়ে ন'টা" হচ্ছে একখানি ব্যঙ্গাত্মক কিংবা তার চেয়েও বেশী,—বিদ্রূপাত্মক নাটিকা। স্মারক পুস্তিকায় বলা হয়েছে, "এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে একটি নীরব সমালোচনা।" একটু কম ক'রে বলা হয়েছে; বলা উচিত ছিল—"প্রকট হয়ে উঠেছে একটি সোচ্চার সমালোচনা।" অবশ্য অন্যায় হয়েছে বলব না। বর্তমান শহরের হাসপাতাল পরিচালনায় যে রোগমুক্তের ত্রুটির কথা হামেশাই জানা

মোটের ওপর হাস্যকৌতুকের
র তারই একটি নিখুঁত চিত্র
দের সামনে উপস্থাপিত করা
ত সমীচীন হয়েছে ব'লেই মনে
আমাদের রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্য
গের কর্তারা নাটিকাখানিকে প্রচুর
গাগ করবেন। অভিনয়ে রূপান্তরীর
া একটি সাধারণ মান বজায়
ছন এবং ওরই মধ্যে বিশেষ ক'রে
করতে হয় ডাঃ দস্তিদার,
ওসাজিস্ট ডাঃ পত্রনবীশ এবং
য়ার সার্জেন-এর ভূমিকায় যথাক্রমে
শ চক্রবর্তী, নীহার চক্রবর্তী ও
র চন্দ্র-এর নাম।

জগদীশ চক্রবর্তীর "প্রতিনিধি" সেই
সল্‌স্‌ম্যানের জীবনবেদনা নিয়ে
যারা ঘর থাকতেও ঘরছাড়া, যারা
ঘরের স্ত্রী পুত্র পরিজনদের
পালনের চেষ্টায় অনবরত মফঃস্বল
র হোটেলে দিন কাটাতে বাধ্য। যদি
ও তারা আত্মজনের কাছে ফিরে এসে
দিন তাদের মাঝে বাস করতে চায়,
তারা যেন তারই সংসারে একটা
ন লোক ব'লে গণ্য হয়, এই কথাই
বার বলতে চেয়েছেন। নাট্যকারের
র মধ্যে কতখানি সত্য নিহিত আছে, তা' যাচাই সাপেক্ষ। তবে দত্তবাবুর রয়্যাল হোটেলে তিনি যে-ক'জন সেলস্‌-ম্যানকে জড়ো করেছেন, চরিত্রের দিক দিয়ে তারা প্রায় প্রত্যেকেই একটি টাইপ। বিশেষ ক'রে আবার ওদেরই মধ্যে টাকুদা এবং অধীর-এর জীবনদর্শন দর্শককে চিন্তার খোরাক জোগায়। কিন্তু কিছু ঘটনাসৃষ্টি এবং কয়েকটি চরিত্রসৃষ্টিকে ছাপিয়ে "প্রতিনিধি" একটি সম্পূর্ণ নাটক হয়ে উঠতে পায়নি। বিকাশ এই সেলসম্যান জীবনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে আত্মহত্যা করল, আর অপর পক্ষে নতুন সেলসম্যান পি. এস. মুখার্জি কেমন অবলীলাক্রমে নিজেকে এই জীবনের জন্যে তৈরী করে ফেলল, —এই ভিন্নমুখী পরিস্থিতিকে উপজীব্য করা হয়েছে ব'লেই রচনাটি যে একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক হয়ে উঠেছে, এমন আত্ম-প্রসাদ লাভ করার কোনো কারণ নেই। কোন্‌খানে এদের মানসিকতার পার্থক্য, কি সংঘাতের মধ্যে এমন পৃথক মানসিকতা গ'ড়ে উঠতে পেল, তাদের ক্রমবিবর্তনকে যুক্তিগ্রাহ্য ক'রে উপস্থাপিত না করলে নাটকীয়তার সন্ধান মেলে না। অভিনয়ে জোছন দস্তিদার, জগদীশ চক্রবর্তী ও সুজিত ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা প্রদর্শিত "দি নাইফ"

নেদারল্যাণ্ডস্‌-এর তৈরী "দি নাইফ" ছবিটি একটি ছেলের বাল্য থেকে কৈশোরে উত্তরণের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতাময় চিত্র। সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে, পরিচালক কি আশ্চর্য উপায়ে ছেলেটির দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রবর্ণিত ঘটনাগুলি সংবলিত কাহিনীটিকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। গেল বৃহস্পতি ও শুক্রবার, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ ব্র্যাবোর্ণ রোডস্থ ম্যাক্সমুলার ভবনে সিনে ক্লাবের উদ্যোগে ছবিখানি দেখানো হয়।

রল্‌হান প্রোডাকসন্স-এর "গেহ্‌রা দাগ"

বিঠলভাই প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় নতুন চলচ্চিত্র সংস্থা রহ্‌লান প্রোডাকসন্স-এর বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ চিত্রনিবেদন "গেহ্‌রা দাগ" আসছে ২৯-এ মার্চ থেকে ৭০ মি-মিঃ প্রক্ষেপণযন্ত্র-সমন্বিত জ্যোতি সিনেমায় দেখানো হবে। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় রচিত

হিন্দী চিত্র 'গেহ্‌রা দাগ'-এ রাজেন্দ্রকুমার ও মালা সিনহা

কাহিনী অবলম্বনে নিজেই চিত্রনাট্য রচনা ক'রে ও. পি. রল্‌হান ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং এতে অবতীর্ণ হয়েছেন মালা সিংহ, রাজেন্দ্রকুমার, ঊষাকিরণ, ললিতা পাওয়ার, মনোমোহন কৃষ্ণ, মদনপুরী, সুন্দর এবং নর্তকীরাণী রাগিনী।

মুক্তিপথে "উত্তরায়ণ"

তারাশঙ্কর রচিত কাহিনী অবলম্বনে অগ্রদূত পরিচালিত এবং দীপচাঁদ কাংকারিয়া নিবেদিত চিত্র "উত্তরায়ণ" মুক্তিলাভের জন্যে প্রস্তুত। চিত্রটির রূপায়ণে আছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু, গীতা দে প্রভৃতি। শৈলেন রায় রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

"রঙ্গসভা"র নাট্যোৎসব

টালিগঞ্জ বংশদ্রোণীতে আসছে ২২এ, ২৩এ এবং ২৪এ মার্চ নাট্যোৎসবের আসর বসাচ্ছেন প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা "রঙ্গসভা"। এ'রা পর পর এই তিন দিন সন্ধ্যা ৭টায় অভিনয় করবেন এ'দের তিনটি সাফল্যমণ্ডিত নাটক বোবাকান্না, দালিয়া এবং বিপ্লবী ডিরোজিও। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন লিলি চক্রবর্তী, দীপা চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বতী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রশান্তকুমার, পীযূষ বসু, পরিতোষ রায়, ভোলা বসু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সুখ্যাত সভ্যবৃন্দ। তিনটি নাটকেরই পরিচালক হচ্ছেন পীযূষ বসু।

তথ্যচিত্র "স্বামীজীর ডাক"

গেল ৫ই মার্চ লাইটহাউস মিনিয়েচার থিয়েটারে চিত্রসাংবাদিকদের একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে ২৭৫ মিটার দীর্ঘ তথ্যচিত্র "স্বামীজীর ডাক" দেখানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যুব সম্প্রদায়কে লৌহ মাংসপেশী এবং ইস্পাতের স্নায়ু তৈরী করবার জন্যে যে উদাত্ত আহ্বান দিয়ে গিয়েছিলেন, এই ছবির মাধ্যমে তারই প্রতি বর্তমান যুগের অলসতাপ্রিয়, কর্মবিমুখ, উদ্দেশ্যহীন যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সমীর ঘোষের চিত্রনাট্য, নেপথ্যভাষণ এবং পরিচালনা, সৌম্যেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু ঘোষের চিত্রগ্রহণ, দুলাল দত্তের এবং বাহাদুর খাঁর সঙ্গীত পরিচালনা গুণে এই এককীতে সম্পূর্ণ তথ্যচিত্রটি নামের সার্থকতা বজায় রেখেছে। শোনা যাচ্ছে, ছবিটি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ মারফত সাধারণ্যে প্রদর্শিত হবে।

স্বরলিপি'র প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠান

স্বরলিপির ছাত্র-ছাত্রী ও সভ্যবৃন্দ গত রবিবার ১৭ই মার্চ মধ্য কলিকাতার ঝামাপুকুর রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে তাদের প্রথম বার্ষিকী প্রীতি অনুষ্ঠান এক ঘরোয়া পরিবেশে সুসম্পন্ন করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রধান এই শিক্ষায়তনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন অপর্ণা বসু, অশোকা দেব ও গীতা দেব। সহযোগিতায় কার্তিক বসু, পার্থসারথী বসু ও অমর মিত্র। সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বটুক নন্দী ও হিমাংশু পালের পরিচালনায় শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা নৃত্য ও গানে অংশ গ্রহণ করেন। শিশু বিভাগের আসরটি পরিচালনা করেন সলিল বসু। সম্ভ্রান্ত অতিথি ও অভিভাবক সমাগমে ছাত্র-ছাত্রীকৃত স্বরলিপির প্রথম প্রীতি উৎসব বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে স্মরণীয় হয়।

'সমুদ্র মন্থনের পরে'

ও. আর. এ. রিক্রিয়েশন ক্লাব সদস্যগণ গত ৮ই মার্চ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রী অ. চ. মু রচিত 'সমুদ্র মন্থনের পরে' নাটকটি অভিনয় করলেন। দেশবিভাগের পর বাঙ্গালীর সমাজের যে এক ভয়াবহ রূপ নাট্যকার প্রাঞ্জলভাবে এই নাটকে দর্শক সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল মৈত্র, নিখিল মিশ্র, সরোজ ঘোষ, রাজেন মুখার্জি, গায়ত্রী চক্রবর্তী, শুক্লা চ্যাটার্জি ইত্যাদি শিল্পীবৃন্দ। পরিচালনা করেছেন নাট্যকার স্বয়ং। আঙ্গিকে, অভিনয়ে ও পরিচালনার দক্ষতায় নাটকটি দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব মহোৎসব

গেল ১০ই, ১১ই এবং ১২ই মার্চ দেশবন্ধু পার্কের বর্ণোজ্জ্বল মণ্ডপ

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে দেশবন্ধু পার্কে অনুষ্ঠিত নিমাই সন্ন্যাস অভিনয়ের একটি দৃশ্যে ডানদিক থেকে নিমাইয়ের ভূমিকায় শ্রীমনোজ বসু, নিতাইয়ের ভূমিকায় গৌর মহারাজ এবং নাপিতের ভূমিকায় মিহির গাঙ্গুলী।

ভক্তিরসের প্রবাহে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। কীর্তন, ভজন, কথকতা, যাত্রা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে সেই নদীয়াবল্লভের মহিমা বারংবার কীর্তিত হয়েছিল উপস্থিত জনারণ্যকে রসসাগরে অবগাহনের অবসর দিয়ে।

শান্তারামের "সেহরা"

ভী. শান্তারামের নবতম চিত্রনিবেদন, ইস্টম্যান কালারে নির্মিত "সেহ্‌রা" একটি দুঃসাহসী সীমান্ত রমণীকে নায়িকারূপে উপস্থাপিত করেছে। শামস্ লখনভী রচিত এই চরিত্রে রূপদান করেছেন বিখ্যাতা সন্ধ্যা এবং তাঁর সঙ্গে আছেন প্রশান্ত নামে নবাগত নায়ক, ললিতা পাওয়ার, মনোমোহন কৃষ্ণ, উল্লাস, রাজন এবং মমতাজ। হসরৎ জয়পুরী রচিত গীতগুলিকে সুরসমৃদ্ধ করেছেন রামলাল নামে এক নবাবিষ্কৃত প্রতিভা।

✳ কলকাতা ✳ বোম্বাই ✳ মাদ্রাজ

কলকাতা :

সন্ধানী-গোষ্ঠীর পরিচালনায় সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে 'অয়নান্ত' ছবির কাজ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় আরম্ভ হয়েছে। সংগীত পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন সলিল চৌধুরী ও রামানন্দ সেনগুপ্ত। প্রধান ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড।

গত দোল পূর্ণিমায় রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় অনন্ত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শচীমার সংসার'-এর মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। চিত্রটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন পিনাকীভূষণ। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় দায়িত্ব নিয়েছেন ধীরেন দে ও অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়। নবাগত নায়ক অমরনাথ এবং ছায়াদেবীকে নিয়ে ছবির প্রথম দৃশ্য গৃহীত হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কিশোর এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী এই ছবির মূল বিষয়বস্তু। মহরতে ক্লাপস্টিক দেন প্রবীণ চিত্র-পরিচালক ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ডি. জি)।

আর. ডি. বনসালের প্রযোজনায় 'ছায়াসূর্য' পরিচালনা করছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয় ছবির প্রধান অংশের কাজগুলি শেষ হল। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর, মলিনা দেবী, অনুভা গুপ্তা, কল্যাণী ঘোষ, গীতা দে, নির্মলকুমার, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্র, শিল্পনির্দেশনা, সংগীত ও সম্পাদনা করছেন যথাক্রমে বিশু চক্রবর্তী, কার্তিক বসু, ভি. বালসারা ও অরুণ দত্ত।

সম্প্রতি রাজগীর অঞ্চলে উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম চিত্র
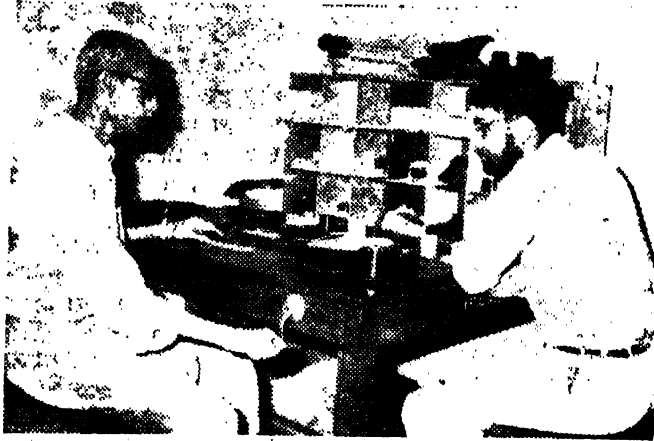
ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীর গ্রেডিং বিভাগে কর্ম-পরিচালক অবনী রায় ও তাঁর সহকারী অমলেন্দু মন্ডল

'ভ্রান্তিবিলাস'-র বহির্দৃশ্য গৃহীত হল। নালন্দায় এ ছবির কয়েকটি প্রধান দৃশ্য গ্রহণ করেন পরিচালক মানু সেন। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, ভানু বন্দোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সবিতা বসু, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র।

বোম্বাই :

সিমলায় পৃথিব পিকচার্সের 'উ কৌন থি'-র শুভ মহরৎ শেষ হল। ছবির বহির্দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা ছিলেন মনোজ-কুমার ও সাধনা। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন প্রভীন চৌধুরী, মোহন চটি ও ধুমল। চিত্রনাট্য ও সংগীত রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় ও মদনমোহন। পরিচালনায় রয়েছেন রাজ খোসলা।

জয় মুখার্জি, সায়না বানু অভিনীত 'দূরে কী আওয়াজ' অর্ধসমাপ্ত। প্রযোজক-পরিচালক দেবেন্দ্র গোয়েল এই রঙিন ছবির দৃশ্য গ্রহণ করছেন ফিল্মস্থান স্টুডিওয়। সংগীত পরি-চালক রবি। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন দুর্গা খোটে, প্রাণ, ওমপ্রকাশ ও জনিওয়াকর।

রূপতারা স্টুডিওয় রঙিন ছবি 'জাহান আরা'-র কাজ আরম্ভ করেছেন পরিচালক বিনোদকুমার। চরিত্র রূপায়ণে রয়েছেন ভারতভূষণ, পৃথিবরাজ কাপুর, শশিকলা, মিনু মমতাজ, টুনটুন, সুন্দর ও ওমপ্রকাশ। সংগীত পরিচালক মদনমোহন।

প্রকাশ স্টুডিওয় বিজয় ভট্টের নতুন ছবি 'হিমালয় কী গোঁদমে'-র মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। নায়ক চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন মনোজকুমার। সংগীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী। নায়িকা মালা সিন্‌হা।

মাদ্রাজ :

আলোকচিত্রশিল্পী ফারদো ইরাণী প্রযোজক ভেলু মানিসের একটি নতুন ছবিতে মনোনীত হয়েছেন চিত্রগ্রহণের জন্য। রঙিন ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন শাম্মি কাপুর, পৃথিবরাজ কাপুর, প্রাণ ও ওমপ্রকাশ। ছবিটির পরিচালক কে, শংকর। সংগীত পরি-চালনা করবেন শংকর-জয়কিষণ। নেপচুন স্টুডিওয় ছবির শুভ কাজ আরম্ভ হয়েছে। —চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

অনুশীলনাগার সম্পর্কে বলছিলাম। ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর পরিস্ফুটন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এর আগের সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবারে শেষ ধাপের কর্মপ্রণালীটুকু বলছি। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো থেকে সোজা যে রাস্তা চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে হাটলে আপনার মনে হবে যে, আপনি ছবি-ছা জগতে প্রবেশ করেছেন। পথে দুয়েকটা স্টুডিও পড়বে। পুরানো বাস-স্ট ছাড়িয়ে হাতি মার্কা গেট দিয়ে ঢুকলে এই ছবি তৈরীর অনুশীলনাগা আপনার চোখে পড়বে। দোতলা বাড়ী একতলার যন্ত্র-জীবনের কথা বলেছি এবারে সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ঘ এলে দেখা যাবে পরিস্ফুটনে প্রয়োগ-প্রণালী। প্রত্যেক ঘরগুলো শীততাপনিয়ন্ত্রিত। ধুলো-বালি যা প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বিশে ব্যবস্থা আছে। কর্ম-পরিচালক আর, মেহতাকে খুব ব্যস্ত দেখবেন। সহকর্মী মাথা নীচু করে অধ্যবসায়ের পরিচ দিচ্ছেন। জুতো খুলে ছবির আলোক চিত্রশিল্পীকে মেহতাজীর সঙ্গে ফিল্মে আলো-পরিমাপ সম্পর্কে আলোচ করতে দেখা যায়। কলাকুশলী তারাপ চৌধুরী চিত্রশোধনের এই রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচন করলেন। সেন্ উঠেই সামনে যে ঘরটা, সেখানে বিদ্যু ঘর। জেনারেটারের সাহায্যে আলো বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে বিদ্যুৎ-শক্তি যাতে সমানভাবে পরি বেশিত হতে পারে, তার জন্য প্রস্তুতি। এরপরের ঘরটা থেকে ফিল পরিষ্কার এবং শোধিত হয়। অনু সন্ধানের পর গ্রেডিং-ঘরে দৃশ্যানুযায় ফিল্মের লাইট নম্বর নির্দিষ্ট হয়। 'প্রিন্টিং অপারেটর' লাইট নম্বরে তালিকা অনুযায়ী ফিল্ম punch ক থাকেন। যেমন ৮·১২, ২২ ইত্যাদি। আলোকচিত্রশিল্পী সঙ্গে থাকেন। কোন দৃশ্যের আলো উজ্জ্বল এবং কোমল হবে, সেটি তিনি বুঝিয়ে দেন। চিত্রগ্রাহকের নির্দেশে আলোর পরিমাপ শেষ হলে ছবি পরিস্ফুটনের জন্য ফিল্ম 'প্রিন্টিং রুম'-এ আসে। এবার ছবিটি কিভাবে ছাপা হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করুন।

'প্রিন্টিং রুম' অন্ধকার এবং শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত। শুধু লাল আলোর সাহায্যে এখানে কাজ চলে। পজেটিভ বা স্লো-স্পিডের ফিল্মকে প্রিন্টিং যন্ত্রে চাপিয়ে ছবি মুদ্রিত হয়। ঘণ্টায় এক হাজার ফিট ছাপা হয়। একই ধরণের তিনটি যন্ত্র আছে। প্রয়োজনমত দিবা-রাত্র কাজ চলে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আপনাদের হয়তো মনে আছে, এর আগে দুটো ফিল্মের কথা বলেছি। একটি নেগেটিভ আর একটি সাউন্ড। কি মজার ব্যাপার দেখুন এই দুটো ফিল্ম একসঙ্গে পজেটিভ-এর ওপর প্রিন্ট হল। আপনারা জানেন সাউন্ড

'দি ফার্স্ট লেডি' চিত্রের একটি কৌতুকময় দৃশ্যে লেসলি ফিলিপস, জুলি ক্রিস্টি এবং জেমস রবার্টসন জাস্টিস

ফিল্মটি প্রিণ্ট হবার পর ছবির যন্ত্রে একসঙ্গে মিলিয়ে দুটো নেগেটিভ একটার ওপর দুবার প্রিণ্ট হয়। এই পদ্ধতির নাম 'ম্যারেড প্রিণ্ট'। আমরা যখন প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখি, তখন চোখে দেখি ছবি আর কানে শুনি কথা। এটা কিন্তু এখান থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়। অবশ্য প্রেক্ষাগৃহের মত এখানেও ছবিঘর আছে। ছবিতে ত্রুটি থাকলে এখানে সংশোধিত হয়। পরিচালক, আলোকচিত্রশিল্পী এবং সম্পাদক ছবিটি পর্দায় আগে থেকে দেখে নেন। বহু পরিশ্রমের পর এখানে যখন ছবি শেষ হল, তখন নিখুঁত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির জন্য প্রতীক্ষায় থাকে। আপনারা শেষ পর্যন্ত ছবি দেখেন। তখন অনুশীলনাগারের এত কথা আপনাদের মনেই পড়ে না। একটা ভাল ছবির কলাকুশলী-কাজ এই অনুশীলনাগারের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যেক কলাকুশলীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এই অনুশীলনাগারের প্রতিটি কর্মে। তাই এটা যে শুধু ব্যক্তিগত একটা চাকরী তা নয়, এর মধ্যে একটা মস্তবড় দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যন্ত্র হলেও এ আর এক শিল্পসৃষ্টির জগৎ।

—চিত্রদূত

।। দি ফার্স্ট লেডি ।।

ইলিয়ান উইন্টল-লেসলি পার্কিন-এর যুগ্ম প্রযোজনায় নির্মিত দি ফার্স্ট লেডি একটি অসাধারণ হাসির ছবি। চিত্রের নায়ক জনৈক স্কটল্যান্ডবাসী যুবক। ধনী এক মোটরগাড়ি ব্যবসায়ীর কন্যার পাণিপ্রার্থী সে। হবু শ্বশুরকে খুশী করবার জন্যে জনৈক ঘোড়েল সেলসম্যানের কাছ থেকে নায়কটি একটি পুরোনো বেন্টলি স্পোর্টস গাড়ি কিনে ফেলে। এই পুরোনো গাড়িটাই ছবির 'ফার্স্ট লেডি'! কিন্তু গাড়ি কিনলেও গাড়ি চালাতে তখনও শেখেনি নায়ক। কিন্তু গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে নায়কের ফ্যাসাদের অন্ত থাকে না। লাইসেন্স পাওয়ার আগে পুলিশের কাছে পরীক্ষা দিতে গিয়ে অকৃতকার্য হয় স্কচ নায়ক। আর ঠিক তখনই রাস্তা দিয়ে ব্যাঙ্ক লুঠ করে একদল ডাকাত গাড়ি করে পালাতে থাকে। নিরুপায় কনেস্টবলটি নায়ককেই বলে গাড়ি করে ডাকাত দলের পশ্চাদ্ধাবন করতে। ছবি শেষ হয় নিদারুণ হাস্যকর পরিস্থিতিতে।

স্টানলি বাক্সটার স্কচ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। লেসলি ফিলিপস এই চিত্রের 'অবলা-বান্ধব' প্রকৃতির গাড়ির সেলসম্যান। জেমস রবার্টসন জাস্টিস হলেন জাঁদরেল মোটর-ব্যবসায়ী। নবাগতা জুলি ক্রিস্টি চিত্রের নায়িকা।

দি ফার্স্ট লেডি পরিচালনা করছেন কেন অ্যানাকিন।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

॥ রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ॥

বোম্বাই : ৫৫১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড'। বাপ্‌নু নাদকাণী' ২১৯, রমাকান্ত দেশাই ১০৭, জি এস রামচাঁদ ১০২* এবং পলি উমরীগড় ৬৩ রান। জি আর সুন্দরম ৭৩ রানে ৩ উইকেট)। * নট-আউট

রাজস্থান : ১৯৬ রান (কিষণ রুংটা ৬৪ এবং হনুমন্ত সিং ৬২ রান। *চার্লি স্টেয়ার্স ৩৬ রানে ৬ উইকেট পান)।*

*ও ৩৩৬ **রান** (বিজয় মঞ্জরেকার ১০৮. কিষণ রুংটা ৮০. হনুমন্ত সিং ৫০ এবং জি আর সুন্দরম ৫২ রান। স্টেয়ার্স ৮৫ রানে ৩, রামচাঁদ ৩৫ রানে ২ এবং নাদকাণী ৬০ রানে ২ উইকেট পান)।*

জয়পুরে মহারাজা-কলেজ মাঠে ১৯৬২-৬৩ সালের রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই দল এক ইনিংস ও ১৯ রানে রাজস্থানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি পঞ্চমবার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের গৌরব লাভ করেছে। অপর দিকে রাজস্থান দল উপর্যুপরি তিনবার বোম্বাই দলের কাছে ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করলো।

এ পর্যন্ত ২৯ বার রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা হয়েছে। রঞ্জি ট্রফি জয় করেছে ৯টি প্রদেশ—বোম্বাই (১৪ বার), বরোদা (৪ বার), হোলকার (৪ বার), মহারাষ্ট্র (২ বার), নওনগর, হায়দরাবাদ, বাংলা, পশ্চিম ভারত এবং মাদ্রাজ। শেষের পাঁচটি প্রদেশ একবার ক'রে রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে। বোম্বাই ১৫ বার প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলে ১৪ বার ট্রফি জয় ক'রে যে রেকর্ড করেছে তা অতিক্রম করা সহজ নয়। তা ছাড়া উপর্যুপরি ট্রফি জয়ের রেকর্ডও বোম্বাই দলের। বোম্বাইয়ের উপর্যুপরি রঞ্জি ট্রফি জয় : ১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৫-৩৬; ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ (উপর্যুপরি দু'বার); ১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৬২-৬৩ (উপর্যুপরি ৫ বার)। বোম্বাইয়ের পর উপর্যুপরি দু'বার রঞ্জি ট্রফি পেয়েছে একমাত্র মহারাষ্ট্র (১৯৩৯-৪০ ও ১৯৪০-৪১)।

রাজস্থান টসে জয়লাভ করে বোম্বাই দলকে প্রথম ইনিংস খেলায় দান ছেড়ে দেয়। সুধাকর অধিকারী দলে অনুপস্থিত থাকায় দিলীপ সারদেশাই এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার প্রথম উইকেটের জুটিতে খেলতে নামেন। খেলার সূচনায় বিপর্যয় নেমে আসে—দলের ২, ১৫ ও ৪৯ রানের মাথায় যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় উইকেট পড়ে যায়। সুন্দরমের বলে ১ম উইকেট (ইঞ্জিনীয়ার) এবং ২য় উইকেট (সারদেশাই) পড়ে। দলের ৪৯ রানের মাথায় নাদকাণীর সঙ্গে বোম্বাই দলের অধিনায়ক পলি উমরীগড় যোগদান করেন। এই চতুর্থ উইকেটের জুটি দলের ১১৫ রান যোগ করেন। খেলা ভাঙ্গার পাঁচ মিনিট আগে দলের ১৬৪ রানের মাথায় ৪র্থ উইকেট (উমরীগড়) পড়ে। উমরীগড় ২২৫ মিনিটের খেলায় তাঁর ৬৩ রান করেন। বাউন্ডারী মারেন ৬টা। এইদিন ঝড় এবং আলোর অভাবের জন্যে মোট ৮০ মিনিট খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলায় বোম্বাই দলের ৪টে উইকেট পড়ে ১৬৪ রান ওঠে। বাপু নাদকাণী (৫৮) এবং রমাকান্ত দেশাই (০) উইকেটে অপরাজেয় থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাই দল খেলার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এই দিনে দেখা গেল ৩৩০ মিনিটের খেলাতে ৩৮৭ উঠেছে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় বোম্বাই মাত্র দুটো উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ১৬৪ রানের সঙ্গে (৪ উইকেটে) ৩৮৭ রান যোগ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল বোম্বাইয়ের ৫৫১ রান দাঁড়িয়েছে, ৬টা উইকেট পড়ে। উইকেটে নট আউট থাকলেন রামচাঁদ (১০২ রান) এবং অজিত ওয়াদেকার (৪)। এইদিন নাদকাণী এবং দেশাই ৫ম উইকেটের জুটিতে ১৭৮ রান যোগ করেন। দলের ৩৪২ রানের মাথায় ৫ম উইকেট (দেশাই) পড়ে যায়। দেশাই ১০৭ রান করেন ১৫০ মিনিটের খেলায়। বাউন্ডারী মারেন ৯টা এবং ওভার-বাউন্ডারী একটা। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে নাদকাণী এবং রামচাঁদ ২০৩ রান তুলেন। দলের ৫৪৫ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট (নাদকাণী) পড়ে। নাদকাণী খেলা ভাঙ্গার মুখে ২১৯ রান ক'রে আউট হন। এই রান তুলতে তাঁর ৬০০ মিনিট সময় লেগেছিল। বাউন্ডারী মেরেছিলেন ২৩টা। এবং মোট পাঁচবার আউট হওয়া থেকে খুব জোর রক্ষা পেয়েছিলেন। এই নিয়ে নাদকাণী তিনটে ডবল সেঞ্চুরী করলেন। রামচাঁদের নট আউট ১০২ রাণের মধ্যে ছিল ৯টা বাউন্ডারী এবং ১টা ওভার-বাউণ্ডারী। রামচাঁদ এই সেঞ্চুরী নিয়ে উপর্যুপরি দুটো সেঞ্চুরী করলেন এই মরশুমের খেলায়। তাঁর পূর্বের সেঞ্চুরী (১০৭ রান) বাংলার বিপক্ষে। ওয়াদেকার গত বছরের ফাইনালে এই রাজস্থানের বিপক্ষেই ডবল সেঞ্চুরী (২৩১ রান) করেছিলেন। এবার তিনি ৪ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসের খেলার জের আর টানেনি। পূর্ব দিনের ৫৫১ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

রাজস্থান দলের প্রথম ইনিংস এই দিনে ১৯৬ রানের মাথায় শেষ হয় চা-পানের ২৫ মিনিট পর। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বোলার স্টেয়ার্সের মারাত্মক বোলিংয়ে রাজস্থান দলের এই কাহিল অবস্থা দাঁড়ায়। স্টেয়ার্স ৩৬ রানে ৬টা উইকেট পান। রাজস্থান দলের উইকেট তাসের ঘরের মত নিয়মিত সময়ে ভাঙ্গতে থাকে। কেবল ১০২ মিনিটের মধ্যে কোন বিপর্যয় ঘটেনি। এই সময়ে পঞ্চম উইকেটের জুটি হনুমন্ত সিং (৬২ রান) এবং কিষণ রুংটা (৬৪ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে দলের ১১৮ রান যোগ করেন।

রাজস্থান দল ৩৫৫ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন করে। দ্বিতীয় ইনিংসে খেলার গোড়াপত্তনও তাদের সুবিধা হয়নি। দলের ৩, ১৩ এবং ২২ রানের মাথায় যথাক্রম ১ম, ২য় এবং ৩য় উইকেট পড়ে যায়। এই দ্বিতীয় ইনিংসেও স্টেয়ার্স ২টো উইকেট পান ৩৫ রানে। এই দিনের খেলায় তিনি মোট ৮টা উইকেট পান ৭১ রান দিয়ে।

তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল রাজস্থান দলের রান গড়িয়ে গড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০, ৩টে উইকেট পড়ে। মঞ্জরেকার তাঁর ৬ রানের মাথায় আহত হয়ে অবসর নিয়েছেন। উইকেটে নটআউট আছেন হনুমন্ত সিং (১২) এবং কিষণ রুংটা (১৬)।

চতুর্থ দিনে রাজস্থান প্রাণপণ করে বোম্বাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দেয়। এই দিনের খেলার অবস্থা দেখে অনেকেরই মনে হল রাজস্থান শেষ পর্যন্ত ইনিংস পরাজয় থেকে ছাড়ান পেয়ে যাবে। বোম্বাইয়ের ফিল্ডিংয়ের দোষে রাজস্থান এইদিন খুবই লাভবান হয়। অনেকগুলি ক্যাচ এইদিনে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খায়।

পূর্ব দিনের নটআউট খেলোয়াড় হনুমন্ত সিং এবং রুংটা ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৮৬ রান যোগ করেন। লাঞ্চের

ময় রাজস্থানের রান দাঁড়ায় ১৪২, ৪ ইকেট পড়ে। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ংটা এবং মঞ্জরেকার দলের ৯০ রান যাগ করেন। ৫ম উইকেট পড়ে দলের .৯৮ রাণের মাথায়। কিন্তু দলের ্জান এইখানেই শেষ হল না। চা-ানের বিরতির সময় দেখা গেল দলের ান ২০৯, ৭টা উইকেট পড়ে। ২০৯ ানের মাথায় ৬ষ্ঠ এবং ৭ম উইকেট ড়ে যায়। চা-পানের পরের খেলায় াজস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস বেশীক্ষণ থায়ী হবে না—দর্শকদের এ ধারণা দলে দিলেন মঞ্জরেকার, রাজসিং এবং ুন্দরম। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে ্কার বোর্ডে দেখা গেল রাজস্থানের ান ৩১৬, ৮টা উইকেট পড়ে। মঞ্জ-াকার (১০০ রান) এবং সুন্দরম (৪১ ান) নট আউট রইলেন। শক্তিশালী াম্বাই দলের পক্ষে রাজস্থানের বাকি টার মধ্যে ৫টার বেশী উইকেট পাওয়া ় এই দিনে সম্ভব হয়নি তার প্রধান ারণ মঞ্জরেকার (১০০ নট আউট), ংটো (৮০ রান), হনুমন্ত সিং (৫০) াবং সুন্দরমের (৪১ নট আউট) দৃঢ়তা-ূর্ণ খেলা।

ইনিংস পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে তখনও রাজস্থানের ৩৯ রানের য়োজন। খেলার এই অবস্থায় রাজ-থানের চতুর্থ দিনের নটআউট খেলো-াড় মঞ্জরেকার এবং সুন্দরম ৫ম র্থাৎ খেলার শেষ দিনে মাঠে খেলতে ামলেন। কিন্তু রাজস্থান তার বাকি টো উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ১৬ রানের (৮ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ২০ রান যোগ করে। রাজস্থানের দ্বতীয় ইনিংস ৩৩৬ রানে শেষ হলে াম্বাই এক ইনিংস ও ১৯ রানের াবধানে জয়লাভ করে। খেলা ভাংগার নির্দিষ্ট সময় থেকে ৩০০ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ভার-তীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক জি এস রামচাঁদ এইদিন মঞ্জ-রেকারের দামী উইকেট পান।

উপর্যুপরি পঞ্চমবার ট্রফি জয়

১৯৫৮-৫৯ : বোম্বাই ৪২০ রাণে বাংলাকে পরাজিত করে।

১৯৫৯-৬০ : বোম্বাই এক ইনিংস ও ২২ রাণে মহীশূরকে পরাজিত করে।

১৯৬০-৬১ : বোম্বাই ৭ উইকেটে রাজ-স্থানকে পরাজিত করে।

১৯৬১-৬২ : বোম্বাই এক ইনিংস ও ২৮৭ রাণে রাজস্থানকে পরাজিত করে।

১৯৬২-৬৩ : বোম্বাই এক ইনিংসে ও ১৯ রাণে রাজস্থানকে পরাজিত করে।

॥ টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ উইকেট ॥

১৯৬৩ সালের ১৫ই মার্চ টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন এবং সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বোলার ফ্রেডী ট্রুম্যানের জীবনেও এই দিনটি স্মরণীয় হয়ে রইলো। এইদিনে ইংল্যাণ্ড-নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে ট্রুম্যান নিউজিল্যাণ্ডের সিনক্লেয়ারের উইকেট নিলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড (২৪২ উইকেট) ভঙ্গ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ বছরের গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসের খেলায় স্ট্যাথাম যখন তাঁর ২৩৭তম টেস্ট উইকেট লাভ করেন, তখন ইংল্যাণ্ডের এ্যালেক বেডসার প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক উইকেট লাভের বিশ্ব রেকর্ড (২৩৬ উইকেট) ভেঙ্গে যায়। সুতরাং একই বছরে অল্প দিনের মধ্যে একই বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড দু'বার ভঙ্গ হ'ল। ইংল্যাণ্ডের এ্যালেক বেডসার এক সময়ে ২১৭টি উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্লারি গ্রিমেট প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড (২১৬ উইকেট) ভেঙ্গেছিলেন। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ডেরই তিনজন বোলার পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ট্রুম্যানের নতুন বিশ্ব রেকর্ডের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম। রিচি বেনো টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ না করলে তাঁকেও নিঃসন্দেহে ট্রুম্যানের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা যেত। রিচি বেনোর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা ২৩৬।

টেস্ট ক্রিকেট খেলা প্রথম সুরু হয়েছে ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ (ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ণ)। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ শতের বেশী টেস্ট খেলা হয়েছে; কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত মাত্র এই ৬ জন বোলার ২০০ শত উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন—ইংল্যাণ্ডের ফ্রেডী ট্রুম্যান (২৫০ উইকেট), ব্রায়ান স্ট্যাথাম (২৪২ উইকেট) এবং এ্যালেক বেডসার (২৩৬ উইকেট); এবং অস্ট্রেলিয়ারও তিনজন—রিচি বেনো (২৩৬ উইকেট), রে লিণ্ডওয়াল (২২৮ উইকেট) এবং ক্লারি গ্রিমেট (২১৬ উইকেট)। এই ৬ জন বোলারের মধ্যে একমাত্র ফ্রেডী ট্রুম্যান ছাড়া বাকি পাঁচজনকে তাঁদের প্রত্যেকের ২০০তম উইকেট পেতে দশ হাজারের বেশী বল খরচ করতে হয়েছে। ফ্রেডী ট্রুম্যান তাঁর ৯,৮৭৫ বলের মাথায় ২০০তম উইকেট পান। এই দিক থেকে ট্রুম্যান রেকর্ড করেছেন।

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড) : জন্ম ৬-২-১৯৩১। ফাস্ট বোলার; ডান হাতে ব্যাট ও বল করেন। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ ১৯৫২ সালে ভারতবর্ষের বিপক্ষে। ১৯৬২ সালের ২১শে জুন লর্ডস মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনে জাভেদ বার্কিকে ৫ রাণের মাথায় আউট ক'রে ট্রুম্যান তাঁর ৪৭তম টেস্ট খেলায় ২০০তম উইকেট লাভ করেন। টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ৫টা ক'রে উইকেট পেয়েছেন ১২ বার এবং একটা খেলায় মোট ১০টা উইকেট পেয়েছেন ১ বার (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮৮ রানে ১১ উইকেট, লিডস, তৃতীয় টেস্ট, ১৯৬১)।

ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ইংল্যাণ্ড) : জন্ম ১৭-৬-১৯৩০। ফাস্ট বোলার; ডান হাতে বল এবং বা হাতে ব্যাট করেন। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা নিউজি-ল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫০—৫১ সালে। স্ট্যাথাম তাঁর ৫৭তম টেস্ট খেলায় ১৯৬১ সালের ২২শে জুন অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকডোনাল্ডকে ৪ রানের মাথায় বোল্ড্ আউট ক'রে নিজস্ব ২০০তম উইকেট পূর্ণ করেন (লর্ডস, ২য় টেস্ট, অস্ট্রে-লিয়ার ১ম ইনিংস)। ১৯৬৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী এডিলেড মাঠের চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বেরী শেফার্ড নিজস্ব ১০ রানের মাথায় স্ট্যাথামের বলে ট্রুম্যানের হাতে ধরা দিলে স্ট্যাথাম ইংল্যাণ্ডের এ্যালেক বেডসার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক টেস্ট উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড (২৩৬ উইকেট) ভঙ্গ করেন। স্ট্যাথাম তাঁর ৬৬তম টেস্ট খেলায় বেডসারের পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড অতিক্রম করেন। ১৯৬২-৬৩ সালের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলার পর স্ট্যাথামের টেস্ট খেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭ এবং উইকেট পাওয়ার সংখ্যা ২৪২। ১৯৬৩ সালের নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে স্ট্যাথাম যোগদান না ক'রে স্বদেশে ফিরে যান। টেস্টের এক ইনিংসে পাঁচটা ক'রে উইকেট পেয়েছেন ৮ বার এবং একটা খেলায় ১০টা উই-কেট পেয়েছেন ১ বার (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ৯৭ রানে ১১ উইকেট, লর্ডস, ১৯৬০)।

এ্যালেক বেডসার (ইংল্যাণ্ড) : জন্ম ৪-৭-১৯১৮। মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ডান হাতে ব্যাট ও বল করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন ১৯৫৫ সালে। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৬ সালে। টেস্ট খেলায় ২০০ উইকেট পেতে তাঁকে ৪৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়ে-ছিল। টেস্টের এক ইনিংসে ৫টা ক'রে উইকেট পেয়েছেন ১৫ বার এবং একটা খেলায় ১০টা ক'রে উইকেট পেয়েছেন ৫ বার (অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের

সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ২০০ বা তার বেশী উইকেট যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের বোলিংয়ের পরিসংখ্যান নীচের এবং ৬৩৯ পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় কলমের তালিকায় দেওয়া হল। তালিকা ১৯।৩।৬৩ পর্যন্ত সংশোধিত।

ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)
(১৯৫২—৬৩)

বিপক্ষে	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
" অস্ট্রেলিয়া	১৫	৩৫৬০	৫৮	১৬০০	৬২	২৫·৮০
" দঃ আফ্রিকা	৬	১২৯৩	৩৫	৬২০	২৭	২২·৯৬
" ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	১৩	৩১৬৪	১২৩	১৪২৪	৫২	২৭·৩৮
" নিউজিল্যাণ্ড	৯	১৫৮৮	৯০	৫২৫	৩৪	১৫·৪৪
" ভারতবর্ষ	৯	১৭৮৪	৭৮	৭৮৭	৫৩	১৪·৮৪
" পাকিস্তান	৪	৯৮৯	৩৭	৪৩৯	২২	১৯·৯৫
মোট :	৫৬	১২৩৭৮	৪২১	৫৩৯৫	২৫০	২১·৫৮

ব্রায়ান ষ্ট্যাথাম (ইংল্যাণ্ড)
(১৯৫০—১৯৬৩)

বিপক্ষে	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
" অস্ট্রেলিয়া	২২	৫৪০৫	১৩০	২১৩৮	৬৯	৩০·৯৮
" দঃ আফ্রিকা	১৫	৩৬১১	১৪২	১২৮১	৬২	২০·৬৬
" ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	১০	২৬৫১	১০৩	১১৭৯	৩৯	৩০·২৩
" নিউজিল্যাণ্ড	৫	৮৭৪	৪৮	২৬৮	২০	১৩·৪০
" ভারতবর্ষ	৮	১৪২৪	৮০	৫১২	২৫	২০·৪৮
" পাকিস্তান	৭	১২৫৫	৬৬	৪৯১	২৭	১৮·১৮
মোট :	৬৭	১৫,২২০	৫৬৯	৫৮৬৯	২৪২	২৪·২৫

এ্যালেক বেডসার (ইংল্যাণ্ড)
(১৯৪৬—১৯৫৫)

বিপক্ষে	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
" অস্ট্রেলিয়া	২১	৭০৬৫	২০৮	২৮৫৯	১০৪	২৭·৪৯
" দঃ আফ্রিকা	১৩	৪২২৬	১৪৮	১৪৫৭	৫৪	২৬·৯৮
" ওয়েষ্ট ইন্ডিজ	৩	১০৮৬	৪১	৩৭৭	১১	৩৪·২৭
" নিউজিল্যাণ্ড	৫	১২৪৮	৪৯	৪৪৮	১৩	৩৪·৪৬
" ভারতবর্ষ	৭	১৮৬৭	৯০	৫৭৭	৪৪	১৩·১১
" পাকিস্তান	২	৪৪৯	২৮	১৫৮	১০	১[illegible]
মোট :	৫১	১৫,৯৪১	৫৭২	৫৮৭৬	২৩৬	২৪·৮৯

ট্রুম্যান

বিপক্ষে ২ বার ক'রে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১ বার)।

টেস্ট সিরিজে তিনি সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন—৩৯টা (গড় ১৭·৪৮। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৩ সালে)। টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর সর্বাধিক উইকেট—৯৯ রানে ১৪টা (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, নটিংহাম, ১৯৫৩)।

রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া) : জন্ম ৬-১০-১৯৩০। ডান হাতে লেগ-ব্রেক এবং গুগলী বল করেন। ব্যাটও করেন ডান হাতে। জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামেন ১৯৫১ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। বেনো তাঁর ৪৯তম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোহান কানহাইকে ১১৫ রানের মাথায় এল-বি-ডবলিউ ক'রে তাঁর ২০০ উইকেট পূর্ণ করেন (এডিলেড, ৪র্থ টেস্টের ২য় ইনিংস, জানুয়ারী ১৯৬১)। বেনো এক ইনিংসে পাঁচটা ক'রে উইকেট পেয়েছেন ১৫ বার এবং একটা খেলায় ১০টা উইকেট ১ বার (ভারতবর্ষের বিপক্ষে)। ১৯৬২-৬৩ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলার পর বেনোর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনে পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : টেস্ট খেলা ৫৯, মোট রান ১,৯৭০, এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান ১২২, সেঞ্চুরী সংখ্যা ৩ এবং ৬২৫৫ রানে ২৩৬টি উইকেট।

ক্রিকেট খেলায় রিচি বেনোর সাফল্যই তাঁর একমাত্র বড় পরিচয় নয়। বিগত ১৯৬২-৬৩ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের শেষ টেস্ট খেলায় তিনি যেভাবে ক্রিকেট খেলার দুর্লভ সম্মানকে দলের স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। ঘটনাটি এই রকম। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিডনির শেষ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস খেলার পর দেখা গেল টেস্ট ক্রিকেট খেলায় রিচি বেনোর রান-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯৭০ এবং উইকেট সংখ্যা ২৩৬। আর মাত্র ৩০ রান করলে টেস্ট খেলায় তাঁর মোট রান দাঁড়াবে ২০০০। এ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে কোন খেলোয়াড়ই ২০০০ রান এবং ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করতে পারেন নি।

ষ্ট্যাথাম

একমাত্র রিচি বেনোই সেই দুর্লভ সম্মানের অতি নিকটবর্তী হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে না নেমে মাত্র ৩০ রানের জন্যে তিনি সেই দুর্লভ সম্মান হাত ছাড়া করেন। তাঁর পূর্ব ঘোষণা অনুসারে এই খেলাটাই তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের শেষ টেস্ট খেলা ছিল। দলের স্বার্থে তিনি ব্যক্তিগত সাফল্যকে তুচ্ছ ক'রে নিঃসন্দেহে মহত্ত্বের উজ্জ্বল রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রিচি বেনো একজন চৌকস খেলোয়াড়ই নন, তিনি একজন দক্ষ অধিনায়কও। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ৬টি টেস্ট সিরিজ খেলে উপর্যুপরি ৫টি সিরিজে 'রাবার' লাভ করে এবং ৬ষ্ঠ সিরিজটি (১৯৬২-৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে) ড্র করে। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

বেনো (অস্ট্রেলিয়া)
১৯৫১-৫২—১৯৬৩)

ক	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
ইংল্যান্ড	২৭	৭২৮৪	২৮৯	২৬৪১	৮৩	৩১·৮১
দঃ আফ্রিকা	৯	২৭৮৩	৭৯	৯৬৪	৪০	২৪·১০
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১১	৩২৮০	১০৪	১২৭৯	৪২	৩০·৪৫
ভারতবর্ষ	৮	২৯৪৭	২০০	৯৫৬	৫২	১৮·৩৮
পাকিস্তান	৪	১৪৪৬	৯৬	৪১৫	১৯	২১·৮৩
মোট ঃ	৫৯	১৭,৭৪০	৭৬৮	৬২৫৫	২৩৬	২৬·৫০

লিন্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া)
(১৯৪৬—১৯৬০)

ক	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
ইংল্যান্ড	২৯	৬৭২০	২১৭	২৫৫৯	১১৪	২২·৪৪
দঃ আফ্রিকা	৮	১৮৩৫	৩১	৬৩১	৩১	২০·৩৫
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১০	২২৮৮	৪৪	১১[illegible]	৪১	২৭·৪৮
নিউজিল্যান্ড	১	১০২	৪	২৯	২	১৪·৫০
ভারতবর্ষ	১০	২১০৯	৯০	৭২৫	৩৬	২০·১৩
পাকিস্তান	৩	৬১২	৩২	১৮৬	৪	৪৬·৫০
মোট ঃ	৬১	১৩,৬৬৬	৪১৮	৫২৫৭	২২৮	২৩·০৫

গ্রিমেট (অস্ট্রেলিয়া)
১৯২৫—১৯৩৬)

ক	টেস্ট	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
ইংল্যান্ড	২২	৯২২৪	৪২৬	৩৪৩৯	১০৬	৩২·৪৪
দঃ আফ্রিকা	১০	৩৯১৩	২৪৮	১১৯৯	৭৭	১৫·৫৭
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৫	১৪৩৬	৬০	৫৯৩	৩৩	১৭·৯৬
মোট ঃ	৩৭	১৪,৫৭৩	৭৩৪	৫২৩১	২১৬	২৪·২১

।। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে বিভিন্ন দেশের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট ।।

	টেস্ট	বল	রাণ	উইকেট	গড়
রামাধীন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)	৪৩	১৪০৩৯	৪৫৭৭	১৫৮	২৮·৯৬
জে টেফিল্ড (দঃ আফ্রিকা)	৩৭	১৩৩৬৫	৪৪০৫	১৭০	২৫·৯১
মানক দ (ভারতবর্ষ)	৪৪	১৪৬৮০	৫২৩৫	১৬২	৩২·৩১
র ম্যাকগিবন (নিউজিল্যান্ড)	২৬	৫৬০৫	২১৬০	৭০	৩০·৮৩
মামুদ (পাকিস্তান)	৩২	৯১৯২	৩১০৫	১৩৪	২৩·১৭

মণ্ড লিন্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ঃ -১২-১৯২১। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বোলার। তাঁর আরও খ্যাতি ভদ্র রর জন্যে। জীবনের প্রথম টেস্ট ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৪৬ ইংল্যান্ড সফরে গেছেন তিনবার ৮ ১৯৫৩ ও ১৯৫৬)। ন্ডের বিপক্ষে ১৯৪৮ সালের টেস্ট ২৭ উইকেট (গড় ১৯·৬২) ১৯৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে ২৬ (গড় ১৮·৮৪) নিয়ে তিনি দলের পক্ষে টেস্ট সিরিজের য়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষ-লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ টেস্ট সিরিজে বিশেষ সুবিধা পারেন নি—মাত্র ৭টা উইকেট ৩৪·০০) পান। সময়ে সময়ে য়েও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় ন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৪৬-ালের টেস্ট সিরিজের মেলবোর্ণ খেলায় লিন্ডওয়াল ১১৫ মিনিটে রাণ করেন। শেষ দিকে তাঁর খেলায় বিশেষ ধার ছিল না। ৪৭টা টেস্ট খেলায় তিনি ১৯২ উইকেট পেয়েছিলেন (১৯৫৬ সালের ১১ই জানুয়ারী); কিন্তু ৮টা উইকেট নিয়ে তাঁর

বেডসার

বেনো

২০০তম টেস্ট উইকেট পূর্ণ করতে তাঁকে আরও ৬টা টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছিল। লিন্ডওয়াল এক ইনিংসের খেলায় ৫টা করে উইকেট পেয়েছেন ১২ বার। একটা খেলায় মোট ১০টা উইকেট একবারও পাননি।

ক্লারেন্স ভিক্টর গ্রিমেট (অস্ট্রেলিয়া) ঃ জন্ম ২৫-১২-১৮৯২। স্পিন বোলার। প্রথম টেস্ট খেলা—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯২৪-২৫ সালের টেস্ট সিরিজের ৫ম টেস্ট। তাঁর এই প্রথম টেস্ট খেলায় গ্রিমেট ৪৫ রানে ৫ এবং ৩৭ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৩৫-৩৬ সালের টেস্ট সিরিজে গ্রিমেট উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট খেলার প্রতিটিতে দশটি ক'রে উইকেট পান—(১) ১০ উইকেট ৮৮ রানে (কেপটাউন, ৩য় টেস্ট), (২) ১০ উইকেট ১১০ রানে (জোহানেসবার্গ, ৪র্থ টেস্ট) এবং (৩) ১৩ উইকেট ১৭৩ রানে (ডারবান, ৫ম টেস্ট)। এবং এই সিরিজে তাঁর মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪টি। এই সময়ে টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের সিডনি বার্ণেসের—৪৯টি উইকেট। বার্ণেসের পরই গ্রিমেট দ্বিতীয় স্থান পান। গ্রিমেট ১৯৩৬ সালে তাঁর ৩৬তম টেস্ট খেলায় ২০০ টেস্ট উইকেট পূর্ণ

লিণ্ডওয়াল

করেন (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গের ৪র্থ টেস্টের ২য় ইনিংস)।

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম ২০০ উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেন। শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৬ (৩৭টি টেস্ট খেলায়)।

॥ জি এস রামচাঁদ ॥

জয়পুরে বোম্বাই বনাম রাজস্থানের রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল খেলার শেষ দিনে (১৩ই মার্চ, ১৯৬৩) ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জি এস রামচাঁদ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। রামচাঁদ রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগ দান করেন ১৯৪৫ সালে। ১৯৬৩ সালে রাজস্থানের বিপক্ষে রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল খেলাই তাঁর শেষ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা। তাঁর এই শেষ খেলাতে রামচাঁদ ১০২ রাণ করে নট আউট থেকেছেন এবং খেলার শেষ দিনে একটা উইকেট

গ্রিমেট

নিয়েছেন। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় তাঁর সেঞ্চুরী সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১০টা এবং উল্লেখযোগ্য বোলিং সাফল্য—১২ রাণে ৮টা উইকেট (বোম্বাই বনাম সৌরাষ্ট্র, ১৯৫৯)।

১৯৫৯-৬০ সালে ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট খেলায় তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেন এবং তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতবর্ষ কানপুরের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে ১১৯ রাণে পরাজিত করেছিল। এই টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়েছিল ২—১ খেলাতে।

টেস্ট ক্রিকেটে রামচাঁদের খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে ঃ

ব্যাটিং ঃ খেলা ৩৩, মোট রাণ ১১৮০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ১০৯, সেঞ্চুরী ২, এবং গড় ২৪·৫৮।

ফিল্ডিং ঃ ক্যাচ ২০।

বোলিং ঃ বল ৪৯৭৬, ১৯৯০ রাণে ৪১ উইকেট এবং গড় ৪৬·৩৪।

॥ অর্জুন পুরস্কার ॥

ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এবং প্রশংসনীয় অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ৯ জন খেলোয়াড়কে ১৯৬২ সালের রাষ্ট্রীয় 'অর্জুন' পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এই নামের তালিকায় আছেন কলকাতার তিনজন—নরেশকুমার, বলরাম এবং লক্ষ্মীকান্ত দাস।

মনোনীত ক্রীড়াবিদদের নাম ঃ—তারলোক সিং (এ্যাথলেটিকস), উইলসন জোন্স (বিলিয়ার্ডস), মীনা শাহ (ব্যাডমিন্টন), পদম বাহাদুর মল (মুষ্টিযুদ্ধ), টি বলরাম (ফুটবল), নরেশকুমার (লন টেনিস), নৃপজিৎ সিং (ভলিবল), লক্ষ্মীকান্ত দাস (ভারোত্তোলন) এবং মালওয়া (কুস্তি)।

আগামী ২৮শে মার্চ রাষ্ট্রপতি ভবনে 'অর্জুন' পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করবেন।

॥ পরলোকে মহম্মদ নিসার ॥

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ নিসার গত ১১ই মার্চ তাঁর কর্মস্থল কোয়েটা যাত্রা প্রাক্কালে লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫২ বছর। মহম্মদ নিসার তাঁর ভ্রাতার বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে লাহোরে এসেছিলেন। দেশ বিভাগের পূর্বেই তিনি ভারতীয় রেলওয়ে বিভাগের চাকরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীকালে পাকিস্থান রেলওয়ে বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছিলেন। মহম্মদ নিসার এবং অমর সিং ছিলেন তাঁদের সময়ের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ফাস্ট বোলার।

মহম্মদ নিসার ভারতবর্ষের পক্ষে মোট ৬টি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন এবং প্রত্যেকটি ইংলণ্ডের বিপক্ষে।

টেস্ট খেলায় তাঁর সাফল্য ঃ মোট খেলা ৬, ওভার ২০৯·৫, মেডেন ৩৪ এবং ৭০৭ রাণে ২৫ উইকেট। লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড – ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি ৯৩ রাণে ৫টা উইকেট পান। লর্ডস মাঠে নিসারের বলে যে পাঁচজন আউট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বোল্ড আউট হন সাটক্লিফ, হোমস এবং এমস। প্রথম ইনিংসের খেলায় নিসার তাঁর দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলে সাটক্লিফকে বোল্ড করেন এবং ঐ ওভারের শেষ বলে হোমসকে। এরপর উলীকে রাণ আউট করেন লাল সিং। ইংল্যাণ্ডের তিনটে উইকেট পড়ে রাণ দাঁড়ায় মাত্র ১৯! এই টেস্ট খেলার মাত্র দশ দিন আগে এসেক্স দলের বিপক্ষে সাটক্লিফ এবং হোমস প্রথম উইকেটের জুটিতে ৫৫৫ রাণ করে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। এক ইনিংসের খেলায় নিসার আরও দু'বার ৫টা করে উইকেট পান—৯০ রাণে ৫ উইকেট (বোম্বাই, ১৯৩৩-৩৪) এবং ১২০ রাণে ৫ উইকেট (ওভাল, ১৯৩৬)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 29th March, 1963.
40 Naya Paise.

বিগত সপ্তাহে যে সকল সংবাদ সাময়িকপত্রের মারফৎ পাঠক ও পাঠিকাগণের সম্মুখে আসে তাহার মধ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতি, যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও জাতীয় জীবনে ও জাতীয় রাষ্ট্রনীতিতে যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থা-কালীন ব্যবস্থার প্রত্যেক সংঘাতকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঐ সকল সংবাদের মধ্যে নয়াদিল্লীর লোক-সভা ও রাজ্যসভার বিতর্কে ও পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্র প্রমুখাৎ অধিকাংশ তথ্য আসে এবং কিছু আসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিতর্কের বিবরণ হইতে। ইহা ভিন্ন যে সকল সংবাদ মোটা ও বড় অক্ষরের শিরোনামাযোগে প্রকাশিত হয় তাহাতে যুদ্ধের দরুণ জাতীয় জীবনের বিপর্যয় এবং সেই বিপর্যয়রোধে সরকারী দুশ্চিন্তাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে যে নূতন বিক্ষোভ ও উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে তাহা চীন ও পাকিস্তানের চুক্তির সর্তে নিহিত। ভারতের এই দুই ক্রুর শত্রু বহুপূর্বেই ভারতকে একযোগে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল মনে হয়, কেননা প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে নয়াদিল্লীস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত খোলাখুলি-ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বাধিলে ভারতকে দুই যুদ্ধপ্রান্তে দুই প্রবল শত্রুর—যথা চীন ও পাকিস্তান—সঙ্গে যুঝিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ভয় দেখাইয়া-ছিলেন যে, ঐ দুই শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে প্রতিহত করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব হইবে। বর্তমান চীন-পাক চুক্তি সেই গুপ্ত চক্রান্তেরই আংশিক আবরণ উন্মোচন বলিয়া আমাদের মনে হয় এবং আমাদের ধারণা এই যে, আরও অনেক ভারতীয় এলাকা সম্পর্কে এই দুই এক-নায়কত্ব অধ্যুষিত রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা মোটামুটি স্থির হইয়া আছে এবং যদি যুদ্ধ উঁহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে তবে সেই সকল ব্যবস্থা পাকাপাকি চুক্তিতে পরিণত হইবে। চীন এই ব্যবস্থা করিয়াছে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং পাকিস্তান করিয়াছে তাহার ছল-চাতুরির সাফল্যের উপর বাজী ধরিয়া। পাকিস্তানের পিছনে এখনও পশ্চিমী শক্তি-জোট আছে এবং পাকিস্তান মনে করে, মার্কিন ও ব্রিটেন তাহার এই ফেরেববাজী চক্ষু বুজিয়া সহিয়া যাইবে, সেই কারণে এই অপরূপ চুক্তির চাল ইহারা চালিয়াছে। আমাদের তরফ হইতে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'প্রতিবাদ' জানানো হইয়াছে।

আবার এই পররাষ্ট্রনীতিরই অপূর্ব ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া চীনের ভারতীয় পঞ্চমবাহিনীর মুখপাত্র-দিগের মধ্যে—কম্যুনিষ্ট-বিরোধী সদস্যদিগের মতে যাঁহারা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের রূপে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের একজন বিগত ২০শে মার্চ রাজ্যসভায় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা, মার্কিন দেশ হইতে যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণের বিরোধী এবং পরোক্ষভাবে চীনের নীতি সমর্থন করিতে চেষ্টিত হ'ন। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দোষ তিনি চীনকে শত্রু বলিয়াছেন এবং ঐ সদস্য মহাশয় বলেন যে, ভারতবর্ষ চীনের শত্রু নয় ও ভারতীয় জনসাধারণ চীনের জনসাধারণের শত্রু নহে। "আমাদের ঝগড়া হইল চীন সরকারের সহিত"।

তবে আর কি, "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" গান গাহিয়া শোভাযাত্রা চালাইবার আয়োজন করা হৌক—যদিও না চীনের জনসাধারণ না পাকিস্তানের জনসাধারণ কোনও-দিন আমাদের সহিত মিতালী করার কোনও কথা তুলিয়াছে।

যাহা আমাদের মনে যুগপৎ শিহরণ ও রোমাঞ্চ আনিয়াছে তাহা দিল্লী হইতে প্রেরিত, স্বর্ণ-বোর্ডের এক অভিনব আবিষ্কারের সংবাদ। তাহাতে দেখি যে, স্বর্ণ কণ্ট্রোল অর্ডারে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত স্বর্ণকারদিগের জীবনযাত্রা সুগম করিবার জন্য স্বর্ণ-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীজি, বি, কোটাক নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও অন্যান্য রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, স্বর্ণকারগণকে চাষ-আবাদ, মোটর-ড্রাইভিং ও অম্বর-চরখা চালনা করিতে শিখাইলেই তাহাদের সকল জ্বালা জুড়াইবে!

আমরা চাই এই কোটাক মহাশয়ের ইতিবৃত্ত ও বিদ্যা-বুদ্ধির সম্যক পরিচয়। সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় অর্জিত কারু-কৌশল নষ্ট করার এরূপ অপরূপ ফন্দি আমরা শুনি নাই। বাহবা কোটাক!

উত্তর বাতাস

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

উত্তর বাতাস আসে পৃথিবীতে টান ধরে যায়
হৃদয়ের টান ধরে? সেই টান কাকে যেন চায়
প্রাণে আর মনে আর অস্থি ও মজ্জায়।

উত্তর বাতাস আসে গাছেদের পাতা যায় ঝরে
মনের পাতা কি ঝরে? বোবা নিরুত্তরে
প্রশ্নগুলি মাথা নাড়ে—কী যেন হারায়।

উত্তর বাতাস আসে প্রজাপতি যায় উড়ে-উড়ে
স্মৃতি সব প্রজাপতি? রঙীন ফুরফুরে?
কথা বলে যেন এক গোধূলির গোপন ভাষায়।

রাত হয়ে আসে ভোর দিন যায় সন্ধ্যার দিকে
উত্তর বাতাসে যেন মনে হয় সবকিছু ফিকে
মনে এক নীল আলো আলেয়াও আলো কিছু দেয়।

তোমাকে

গণেশ বসু

কোনদিন ফিরিবে না। অজানা দ্বীপের অধিবাসী
আজ থেকে। তাই বুঝি নির্দ্বিধায় পুরনো মমতা
বিস্মৃতির জলস্রোতে ভাসালে সে। কিন্তু উপবাসী
প্রমত্ত হৃদয় হায় দেখিল না! এত নিষ্ঠুরতা
সমস্ত গোপন সূত্র খুলে দিয়ে, বাগানের ফুলে
অজস্র স্মৃতির স্পর্শ রেখে কেন যাই? হায়
চূড়ান্ত স্থিরতা আজ হৃদয়ের স্নেহ-প্রেম ভুলে,
পৃথিবীর কোমলতা সর্বনাশা পাতকী সন্ধ্যায়!

আমার শোকার্ত আত্মা, পিপাসার্ত জিহ্বা দ্বি-খণ্ডিত
এবং চতুর্দিকে স্তূপীকৃত বন্ধুদের শব
বিপুল গর্জনে ডাকে, বহুকাল ছিলেম জীবিত
সমুজ্জ্বল পৃথিবীতে। কিন্তু আজ সমস্ত নীরব
মৃত্তিকার অন্ধকারে। সেই মতো একান্ত ঘৃণিত
প্রেতিনীর পদাঘাতে অন্তরাত্মা—সূর্য অস্তমিত ।।

ঘূর্ণিতে

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কে জানে হয়তো ঠিক বলেছিল ভবঘুরে কবি—
'কোন্ কণ্ঠস্বরে মগ্ন যাও তুমি ধ্বংসের প্রবাহে?
কার দুঃখে ম্রিয়মাণ? বর্ষীয়ান্ স্নেহান্ধ অটবী
তোমাকে জাগায় না তো, ভাবায় না, ফেলে না কটাহে।'
কেঁপে উঠি; নীল চোখে কিসের আগুন গনগনে,
বুকের আয়না ভেঙে সামনে এনে কে রাখে আমাকে?
দৃশ্যে ঘুরি, ভ্রাম্যমাণ; চতুষ্পার্শ্বে জ্বলন্ত অয়নে
বিস্ফারে অক্ষির বৃত্ত, ভাঙাচোরা মুখ কেউ আঁকে।

কোন্ দৃশ্যে থেমে যাবো, ব'লে দাও, বিচক্ষণ কবি,
দাঁড়াব সুস্থির পায়ে দু-দণ্ডের ছায়ার আশ্রয়ে;
উজানে, অন্তিম টানে, ঘূর্ণিজালে একী কার ছবি
স্রোতে বাঁকে, দুর্বিপাকে, গোধূলির আসন্ন প্রলয়ে?
কি প্রসন্ন বরাভয়ে জেগে ওঠে নির্বেদে শবরী,
কোন্ চোখ খুলে দিলে, দিব্যদর্শী, ঘুরে ঘুরে মরি?

জৈমিনি

একজন হবু সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলছিল কিছুদিন ধরে। তাঁর শেষ চিঠিতে তিনি আমাকে মূর্খ, হামবাগ ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করায় আমি তাঁর চিঠিগুলো সর্বসাধারণে প্রকাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি সম্মতি জানিয়েছেন। কাজেই আমি নিরঙ্কুশ।

পত্রালাপের মধ্যে যেগুলো আমার উত্তর তা আমি প্রকাশ করছি নে। তাঁর চিঠি থেকে আমার উত্তরের বিষয়ে আন্দাজ করা যাবে যেটুকু, তাই যথেষ্ট। না হলে জায়গা বেড়ে যায়। ......

(১)

সবিনয় নিবেদন,

আমার উপন্যাসখানির পাণ্ডুলিপি পড়ে আপনি যা লিখেছেন তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। নতুন লেখকে আপনার আপত্তি নেই লিখেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপত্তি আপনার বিলক্ষণ।

আমি জানি এই দুর্মূল্যের বাজারে কোনো প্রকাশককে নতুন লেখকের বই ছাপাতে বলা সহজ নয়। কিন্তু আমি নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সচেতন বলেই আপনাকে প্রকাশক খুঁজে দিতে বলেছিলাম। এ বই ছাপলে প্রকাশক নিশ্চয়ই দেউলে হয়ে যেতেন না।

অবশ্য উপন্যাসটির ভাষা একটু নতুন তা আমি অস্বীকার করব না। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এ বইটাতে ভাষাই আমার প্রধান অধ্যবসায়। বাংলা ভাষার তারল্য ঘুচিয়ে একটা শক্ত আর জটিল কাঠামোয় বাঁধতে চেয়েছি তাকে। সিনট্যাক্স আর পাংচুয়েশান নিয়ে একটু নতুন রকম পরীক্ষা করতে চেয়েছি। আপনার দেখছি তা ধাতে সয়নি। সইবে কী করে? মুখে আপনি যাই বলুন আসলে তো আপনি সেকেলে। তাই বিদ্যাসাগর থেকে প্রমথ
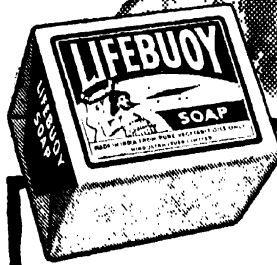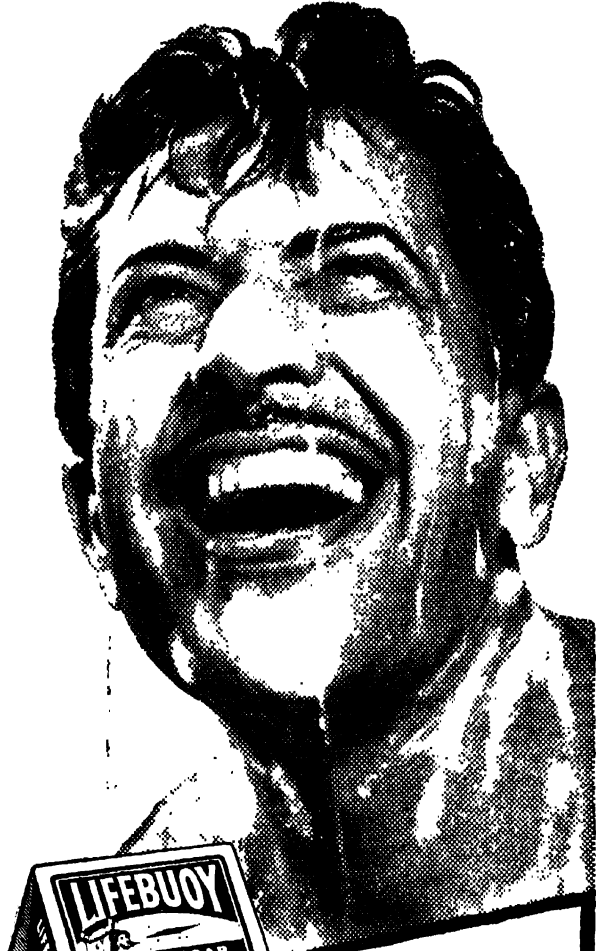
চৌধুরী পর্যন্ত এসেই আপনি থমকে দাঁড়ান, আর এগোতে সাহস পান না। কিন্তু সত্যি যদি আধুনিক হতেন তাহলে বুঝতেন, ভাষার কোনো নিজস্ব বাঁধুনী নেই। আমার মতো শক্তিমান লেখক বাঁধা-ভাষার মালাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেমন করে আবার গাঁথবেন, সেই মালাই সরস্বতী নিজের গলায় পরবেন। আপনার উদ্বেগ অযথা।

যাই হোক, আমি এক রকম লিখিনে। অনেক ধরণের লেখা আছে আমার। আপনার পছন্দ হবে, এ রকম একখানি উপন্যাসেরই সারমর্ম জানাচ্ছি এবার। যদি পছন্দ হয় তো জানাবেন, আসল জিনিসটাই পার্সেল করে পাঠাব।

উপন্যাসের কাঠামোটা এই রকম। ক-চন্দ্র খ-রেখা নাম্নী একজন মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু মাঝে গ-কুমার নামে একজন যুবক এসে ত্রিভুজ সৃষ্টি করে বসল। খ-রেখা একবার একে প্রশ্রয় দেয়, আরেকবার ওকে কাছে টানে—এই-ভাবে লেফট-রাইট করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঘ-নাথ বলে অন্য একজন যুবককে বিয়ে করে উপসংহার টেনে দিল। কিন্তু আসল উপন্যাস আরম্ভ হয়েছে তার পর থেকে। অর্থাৎ সবটাই ঘ-নাথের জবানীতে লেখা—ফ্ল্যাশব্যাক। তার পাওয়া এবং না-পাওয়ার যন্ত্রণাই উপন্যাসের মূল বিষয়। একেবারে জম-জমাট কাহিনী। স্ট্রীম অব কনসাসনেস টগবগ করছে আগাগোড়া। জ্ঞানের কথাও বলে দিয়েছি সেই ফাঁকে। অথচ ভালো ক'রে যাচাই করলে দেখবেন, শরৎচন্দ্রের

চেয়ে এগোইনি আমি একটুও। মানে, রজ্জুবদ্ধ জীব যেমন খোঁটার চারপাশে ঘুরপাক খায়, অনেকটা সেইরকম। এমন কি নায়িকাকে দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ খামখেয়ালী কাজ করিয়ে নিতেও পিছ্-পা হইনি। একবার তো কাঁদিয়েই দিয়েছি তাকে ঝরঝর ক'রে। পড়লে আপনারও মনটা উদাস উদাস হ'য়ে যাবে। দেব পাঠিয়ে বইটা? ভেবে দেখবেন। নমস্কার। ইতি কিণাঙ্কভূষণ কর্মকার।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

উপন্যাসের খসড়ার বিষয়ে আপনার মতামত শুনে স্তম্ভিত হলাম। চরিত্র-সৃষ্টিই উপন্যাসের প্রাণ, একথার দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? চরিত্র বলতে আপনি মহৎ কিছু বোঝাতে চাইছেন না নিশ্চয়ই! তাহলে, বাকী যা রইল সে তো অসম্ভব একঘেয়ে ব্যাপার। তা দিয়ে কখনো বই লেখা যায়? অ্যাবনর্মালিটি না থাকলে লোকে পড়বে কেন!

বেশ, আপনার বোধহয় দেশজ সংস্কৃতির দিকে টান। সেইভাবেই একটা উপন্যাস ফেঁদেছি। দেখুন যদি চলে। প্রকাশকদের কাছে হাঁটাহাঁটি করে পা দুটো তো ক্ষয়ে গেল আমার। এবার হাতের ওপর পী-কক খেয়ে হাঁটতে হবে।

উপন্যাসের নমুনা!—নায়ক চর্মকার, থাকে শহরতলীতে। নায়িকা তার প্রতিবেশিনী। প্রথম অধ্যায়ে একটা ঝড় দিয়ে আরম্ভ। ঝড়ের মধ্যে নায়িকা ছুটতে ছুটতে নায়কের চালার নিচে আশ্রয় নেয়। হঠাৎ একটা বাজ পড়ার শব্দে জাপটে ধরে নায়ককে। দুজনেরই নিশ্বাস হঠাৎ ঘন হ'য়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নায়কের বউ এসে হাজির হল ভেতর বাড়ি থেকে। রসভঙ্গ ঘটল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নায়কের দারিদ্র্যের বর্ণনা। স্ত্রীর সঙ্গে বচসা। বেশ রিয়্যালিস্টিক টাচ্ দিয়েছি সেখানে। তৃতীয় অধ্যায়ে নায়কের সঙ্গে নায়িকার পুনরায় সাক্ষাৎ। নায়িকার হৃদয়-বেদনা জ্ঞাপন। দু'খানা স্বরচিত গান দিয়েছি তার মুখে। বেশ গেঁয়ো-গেঁয়ো ভাষা। নদী, মাঝি, নৌকো, কদমফুল, মিলাজ পীরিতি এইসব কথা মিশিয়েছি তাতে। ফলে নায়কের বাহু প্রসারণ, কিন্তু উচ্চ হাসির সঙ্গে নায়িকার পশ্চাদপসরণ। চতুর্থ অধ্যায়ে আবার রিয়্যালিজম। মরা জন্তুর ছাল ছাড়াচ্ছে নায়ক। বর্ণনা পড়লে নাকে রুমাল চাপা দিতে হবে। কিন্তু পঞ্চম অধ্যায়ে চাঁদ ওঠে নায়কের ভাঙা চালার দাওয়ায়। তার বউ তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। নায়কের মন উদাস হ'য়ে যায়। অথচ ষষ্ঠ অধ্যায়েই আবার নায়িকার আবির্ভাব।...এইভাবে একুশটি অধ্যায়ের পর যেদিন নায়ক স্থির করল সে দেশত্যাগী হবে নায়িকার সঙ্গে, সেইদিনই তার বউ টাকাপয়সা যা ছিল সব চুরি করে কেটে পড়ল তার বাপের বাড়ি। অতঃপর প্রেমের স্থানে দেখা দিল পুলিশ। বইয়ের শেষ হল ট্রায়াল সীন্-এ।

এ বই বেরোলে পাঠকেরা লুফে নেবে। সিনেমাতেও চান্স পাবে বলে আমার বিশ্বাস। দয়া করে প্রকাশক জোগাড় করুন। নমস্কার। ইতি কি, ভূ, ক।

(৩)

মশাই, আপনি একটি মহামূর্খ দেখতে পাচ্ছি। আপনার হামবড়াই ভাব দেখলে হাসি পায়। উপন্যাসের কোনো ফর্মুলা হয় না বলে খুব একটা লেকচার ফেঁদেছেন, আপনি কি মনে করেন উপন্যাস একটা দৈববাণী? আমি জানি একখানা বই বেস্ট সেলার হলেই বছরে অন্তত ছ'খানা বই বাজারে ছাড়তে হবে আমাকে। ছক না করলে এত লেখা সম্ভব হবে কখনো? তাছাড়া বাংলাদেশের যা অবস্থা, ছ' মাস না লিখলেই পাঠকেরা মনে করবে আমি মরে গেছি। আর কি কেউ তখন বই ছাপতে চাইবে? আমি তাই আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছি। উচ্চাশাকে একেবারে গাছে তুলে দিয়ে শেষকালে মই টান দেওয়ার চাইতে আগেই একটা নিচু ডালে বসা ভাল। তাতে একই সঙ্গে পতন ও মূর্ছার হাত এড়ানো যায়। তারপর শেষকালে—নাথিং সাকসীডস লাইক সাকসেস—একবার নাম হ'য়ে গেলে কে কী বলে না বলে থোড়াই কেয়ার করি।

আমি নিশ্চিত জানি, সেদিন আমার আসবেই। তখন আপনার মতো হামবাগই সেধে খোশামোদ করতে আসবেন আমার সঙ্গে। এবং আমি, বলাই বাহুল্য, আপনার বন্ধুত্ব অস্বীকার করব। সেদিন না আসা পর্যন্ত নমস্কার। ইতি কি•।

॥ খোকাবাবু ॥

জলের নীচে পাঁক জ'মে বুদ্বুদ হয়ে থাকে। সেই পাঁকে খোঁচা দিলেই জলের উপর জেগে ওঠে অজস্র বুদ্বুদ্।

সারা দিন শত কর্মে রত থাকে যে মানুষ, তারও মনের গভীরে থাকে হয়তো অমনি পাঁক, এবং সেই পাঁকের গভীরে বুদ্বুদ্। হঠাৎ কখন কিসের খোঁচা লেগে মনটা খচ্ ক'রে ওঠে, আর অমনি জেগে ওঠে সেই সব জিনিস যা ছিল এতদিন চাপা।

খোকাবাবুর কথা বলছি। খোকাবাবু নামেই তিনি পরিচিত। আমরা তাঁকে বলতাম খোকাদা।

খোকাবাবু খুব খ্যাতিমান পুরুষ। আমাদের জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই

সুশীল রায়

তাঁর নাম শুনে আসছি। এবং কথা বলতে আরম্ভ করার পর থেকেই তাঁকে বলে আসছি খোকাদা।

খোকাবাবুর আর কোনো নাম আছে কি না, সে খবর আগে জানতামও না, জানার কৌতূহলও হয়নি। বড় হয়ে জেনেছি যে, তাঁর আর একটি নাম আছে। সে নাম হচ্ছে ইন্দ্রপ্রতাপ রায়চৌধুরী।

তাঁর প্রতাপ ছিল খুবই, কিন্তু ইন্দ্রপ্রতাপ বললে তাঁকে কেউ চিনত না। খোকাবাবু নামেই তিনি খ্যাত।

খোকাবাবু ছিলেন মস্ত জমিদার। উত্তর বাংলার এক বড় শহরে তাঁর বাড়ি, এবং সেই জেলার সর্বত্র তাঁর জমিদারি। আমরা সেখানকারই লোক, তাই তাঁকে শিশুকাল থেকে জানি।

খেলাধুলায় খোকাবাবুর টান বরাবর। তাঁর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের খেলাধুলাও রীতিমত বড় হয়ে উঠল। তিনি মন দিলেন শিকারে। ছোট-খাট শিকার না, যাকে বলে বিগ গেম তিনি সেই সব শিকার নিয়ে মেতে উঠলেন।

দেশ ছেড়েছি আমরা অনেকদিন। আছি কলকাতায়। বড় বড় শিকারের

জন্যে মাদ্রাজে বা সেকেন্দ্রাবাদে যাবার সময় তিনি এসে উঠতেন আমাদের কলকাতার বাসায়। সঙ্গে আনতেন শিকারের অজস্র সরঞ্জামের মধ্যে বড় বড় বন্দুক। বন্দুকের চোঙ পরিষ্কার করতে করতে বলতেন তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতার কাহিনী। মনোযোগ দিয়ে শুনতাম।

খোকাবাবু এইভাবে এলে আমরা ধন্য হয়ে যেতাম। আমাদের মধ্যবিত্ত সংসারটিকে তিনি যেন কৃতার্থ করে দিতেন। তাঁর মত একজন জমিদারের পদার্পণ ঘটলে তাঁর আদরআপ্যায়নের জন্যে যৎপরোনাস্তি ব্যবস্থা করা হত।

শিকারে চলেছেন খোকাবাবু। বন্দুকগুলো আমরা দেখতাম আশ্চর্য হয়ে।

বছর কয়েক হল খোকাবাবু মারা গিয়েছেন। তাঁর কথা ভুলেই ছিলাম। আজ দুপুরে চুপচাপ বসে আছি, আমার ছোট্ট ভাইপোটি তার খেলনা-বন্দুক আমার দিকে তাক করে বলল, "কাকামণি, গুড়ুম।"

চমকে উঠলাম। ভাইপোটি খুশিতে অস্থির হয়ে হাসতে লাগল।

হঠাৎ মনে পড়ল, মনে পড়ল খোকাবাবুর কথা।

শিকারে যাবার পথে তিনি আসতেন আমাদের বাসায়। তাঁকে আপ্যায়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত সংসারটি ফতুর হয়ে যেত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ধন্যও হত।

সেই খোকাবাবু মারা গিয়েছেন বছর কয়েক হল। শিকার করতে গিয়ে না। জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলতে গিয়ে।

ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যখন বাংলাদেশ দু-ভাগ হল, তখন খোকাবাবুর জমিদারি পড়ল পাকিস্তানে। অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতে পেরে তিনি বিক্রি করে দিলেন জমিদারি। কাঁচা টাকা নিয়ে চলে এলেন এপারে—পশ্চিমবাংলার শান্তিপুরে। পাঁচজন বন্ধুর পরামর্শে তিনি ঐ টাকা দিয়ে আসানসোলে কোলিয়ারি কিনতে গেলেন। যাদের তিনি বন্ধু ভেবেছিলেন আসলে তারা অন্য জীব। তারা টাকা মেরে দিল। খোকাবাবু ফতুর।

এসব জানতাম না। পরে জেনেছি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলতেই দেখি—সম্মুখে বিরাটকায় ঐ পুরুষটি। —খোকাবাবু।

বললাম, "আসুন।"

ভিতরে এসে বসেই তিনি প্রথম কথাই বললেন, "দিন কয়েক তোর এখানে থাকব। অসুবিধে হবে না তো?"

তাঁর কথা শুনে ভীষণ আশ্চর্য লাগল। এমন ভাষা তাঁর মুখে তো শোভা পায় না। যিনি এলে আমরা ধন্য হই, তাঁর মুখে এ কেমন কথা?

বিন্দুবিসর্গ অসুবিধে হবে না শুনে খোকাবাবু একটু হাসলেন, বললেন, "সবাই ভালো আছিস তো?"

দিন-কয়েক না। খোকাবাবু কয়েক মাস ছিলেন। তাঁর চেহারা ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে মন খারাপ হয়ে যেত। মনে হত তাঁর খাওয়া-দাওয়া বুঝি ঠিকমত হচ্ছে না। এর আগে তাঁর দু-চার দিন থাকার সময়ে যেমন করেই হোক, কিছু-একটা ব্যবস্থা করা গিয়েছে, কিন্তু মাসের পর মাস প্রত্যহ তো সেই স্ট্যান্ডার্ড রাখা যায় না। সংকোচ হত।

কিন্তু সব রকমের খাবারই পরম তৃপ্তির সঙ্গে তিনি খেতেন, আবার তারিফও করতেন। এসব জিনিস যে তিনি মুখে দিতে পারেন, এ ধারণাই ছিল না আগে।

খোকাবাবু খুব চাপা। কেন তিনি এখানে আছেন তা বলতেন না। জিজ্ঞাসাও করতে পারতাম না।

হঠাৎ একদিন তিনি বললেন, "শোন্, ক'টা টাকা হাওলাত দিতে পারিস?"

তাঁর মত মানুষের মুখে এমন কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ার কথা, কিন্তু শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে বসলাম।

তখন তিনি বললেন তাঁর ট্র্যাজিডির কথা। চোখ জলজল করে উঠল তাঁর, বললেন, "বড়লোক হতে গিয়েছিলাম রে। কোলিয়ারি কিনে লাখপতি হব ভেবেছিলাম। জুয়া খেলতে গিয়ে একেবারে হেরে গেলাম।"

তাঁর হারের কথা তখন ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম অন্য কথা। ক'টা টাকা কোথা থেকে জোগাড় করে তাঁকে দেওয়া যায়, সেই কথা।

টাকা তাঁকে দিয়েছিলাম। ফেরত পাওয়ার কোনো আশা না রেখেই। যা অবস্থা শোনা গেল, তাতে এ টাকা তিনি ফিরিয়েই-বা দেবেন কি করে।

সাত-আট মাস ছিলেন খোকাবাবু। তার পর একদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ায় সংসারের ভার হাল্কা হল বটে, কিন্তু মনটা ভারি হয়ে উঠল।

আরও মাস-দুই কেটে গেল। খোকাবাবুর কোনো খোঁজ করিনি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি এসে উপস্থিত হলেন। রিক্সা চেপে এসেছেন এবং গায়ের জামা বেশ পরিষ্কার দেখে একটু ভালোই লাগল।

রিক্সা থেকে নেমেই বললেন, "তুই আমার কাছে পঁচিশটা টাকা পাবি। এই নে।"

কয়েকটা নোট তিনি আমার হাতে দিলেন। বসতে বললাম, বসলেন না। অনেক কাজ আছে নাকি।

অনেক কাজের কথা শুনে আরও ভালো লাগল। মনে হল, বুঝি কোলিয়ারিটা তবে হয়েছে।

খোকাবাবুকে সেই শেষ দেখেছি। তার কয়েক দিন পরেই তিনি মারা যান।

দেনা তিনি করেছিলেন আরও কয়েক জনের কাছে। সেই একদিনেই তিনি সকলের সঙ্গে দেখা করে সকলের ঋণ শোধ করেন।

তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা থাকত শান্তিপুরের বাসায়। সেখানে দেয়াল-ঘড়ি ও আসবাবপত্র কিছু ছিল। সব বেচে দিয়ে নাকি এসেছিলেন কলকাতায়। সকলের পাওনা টাকা চুকিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে যেদিন ফিরে যান শান্তিপুরে তার তিনদিন বাদেই নাকি—

ছোট্ট ভাইপোটি আবার বলল, "গুড়ুম।"

তাকে ধমক দিয়ে উঠলাম, "ধেৎ!"

রেলগাড়িতে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস

পরিমল গোস্বামী

প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাত্রী বেশি নয়, মাত্র ছ' জন। পাঁচজন পুরুষ ও একজন মহিলা।

প্ল্যাটফর্মের দিকের ডাইনের আসনে একজন দারোগা। তার বিপরীত দিকে জানালার ধারে এক মহিলা বসেছে। মহিলার মাথার উপরে বাঙ্কে শোয়া এক ভদ্রলোক। কামরার আর এক প্রান্তে তিনজন ভদ্রলোক। কেউ কারো পরিচিত নয়, অন্তত দেখে তো তাই মনে হয়।

গাড়ি ছেড়ে দেবার পর চলতি গাড়িতে কোনো রকমে উঠে এলো আর এক ভদ্রলোক একটা ভারী ব্যাগ নিয়ে। ব্যাগটি অবশ্য কুলির মাথায় ছিল। তার হাতেও ছোট একটা অ্যাটাশে কেস। সে

এসে বসল দারোগার পাশের আসনে। একটু যেন গায়ে-পড়া ভাব। নইলে ইচ্ছে ক'রে কেউ দারোগার কাছে বসে না। অন্তত স্বগোত্র ভিন্ন সচরাচর এমন দেখা যায় না।

কুলি পয়সা নিয়ে চলতি গাড়ি থেকে নেমে গেল। পুলিসের লোক, কাজেই তাকে সবই লক্ষ করতে হয়। কোনো কারণ না থাকলেও ওটা একটা অভ্যাস। একটা বিদ্যাও বটে। কাজে ঢুকে প্রথম দিকে বেশ একটা আদর্শবাদ থাকে, চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে ইচ্ছা হয়। তারপর এ কাজটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। আরও পরে চোখের পাতা ভারী বোধ হতে থাকে।

কিন্তু গাড়ির মধ্যকার দারোগার চোখে যেন যৌবনের চঞ্চলতা, বয়স যাই হোক। তার চোখ দুটি কখনও দূরের তিনটি ভদ্রলোকের উপর নিবদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তার পরেই মহিলার উপর, তারপর বাঙ্কে শোয়া ভদ্রলোকের উপর, তারপর নবাগতের অ্যাটাশে কেসের উপর। তাতে তিনটি অক্ষর লেখা—বি-বি-এস।

আগন্তুক দারোগার এই কৌতূহল লক্ষ ক'রে মনে মনে হাসল। তারপর হাসিটা প্রকাশ্যে ফুটিয়ে বলল, "মশাই বড্ড ছোট জিনিসের উপর নজর দিচ্ছেন। পরিচয়টা কত সংক্ষেপ ক'রে রেখেছি মাত্র তিনটি অক্ষরের মধ্যে, তাও আপনার দৃষ্টি এড়াবে না?"

দারোগা হেসে বললেন, "আমি যে সর্বাঙ্গে নিজের পরিচয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছি, তাই আপনার ঐ তিনটি অক্ষরের কাছে নিজেকে বড় ছোট মনে হচ্ছে। তা মহাশয়ের নামটি জানতে পারি কি?"

"নিশ্চয় পারেন। পুলিসের কাছে আর লুকোবার কি আছে, আমি অতি-দীন এক সমাজ সেবক। আমার নাম ব্রজবিলাস সরকার।"

এ নামে দারোগা চমকে উঠে বলল "ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস"—

"আপনার কাছে আমার নামটি

অপরিচিত নয় দেখছি। ভালই হ'ল। কতদূরে যাবেন আপনি?"

"গয়া যাব। পিণ্ড দিতে হবে। আপনি?"

"আপাতত বর্ধমান। যে-কাজে নেমেছি, তাতে কখন কোথায় নামি ঠিক নেই। আপনার সাহায্য যদি দরকার হয় আশা করি নিশ্চয় পাব?"

ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকারের নামটি শোনামাত্র অন্যান্য যাত্রীদের মনের তারে তারে বিদ্যুতের চমক লাগল। বাঙ্কে শোয়া লোকটি তড়াক ক'রে উঠে বসল। দূরে বসা যাত্রী তিনজন ব্যাকুল আগ্রহে তার দিকে চেয়ে রইল। দারোগা সব লক্ষ ক'রে শেষে মহিলার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। গাড়ির মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। অথচ চঞ্চল। মহিলাটি দারোগার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই বোধ হয় উঠে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

দারোগা একটুখানি আশ্বস্ত হয়ে বলল, "পুলিসের কাছে ডিটেকটিভ—মানে কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ সহজে সাহায্য চায় না এই তো জানি। সব কাজ শেষ হ'লে অপরাধীকে গ্রেপ্তারের জন্য মাত্র পুলিস দরকার। বুদ্ধির জন্য কখনো নয়। কিন্তু"—

ব্রজবিলাস বলল, "পুলিসের বুদ্ধি কিছু কম ব'লে তো মনে করি না। আমরা কাজে স্বাধীনতা বেশি পাই, কারণ চাকরি তো আর করতে হয় না। তাই আমরা অপরাধী ধরতে যে সুযোগ পাই, পুলিসের লোকে তা পায় না। তাই ব'লে বুদ্ধি কম হবে কেন?"

দারোগার মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল এই সত্য কথাটি শুনে। কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ এমন কথা বলতে পারে তা তার জানা ছিল না।

আলাপ থেকে জানা গেল ব্রজবিলাস কতগুলো সোনা চালানি কেসে জড়িত হয়ে পড়েছে—অবশ্য সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। কারণ এতে দেশের স্বার্থ জড়িত। বর্তমানে দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। চীনাদের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশের এমন একটা সংকট উপস্থিত হয়েছে যাতে দেশরক্ষার জন্য এখন বহু সোনা চাই। অথচ এমন দিনেও দুর্বৃত্তেরা নানা স্থানে সোনা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের কয়েকজন এই গাড়িতে বর্ধমান যাচ্ছে, কয়েকজন আসানসোল যাচ্ছে। এ রকম কেস সে কখনো হাতে নেয় না, কিন্তু এ তো অন্যের কাজ নয়, নিজের কাজ, কাজেই নিজের গরজ। এর মধ্যে বুদ্ধির খেলা বিশেষ কিছু নেই।

দারোগা আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল "আপনি মহৎ। আপনার চোখের কালো চশমা এবং ব্যাগের আদ্যাক্ষরগুলি দেখে আমার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল যে, আপনি একজন ডিটেকটিভ। আপনি হ'লে নিশ্চয় করতেন।"

"শুধু কালো চশমাই আপাতত পরেছি। আমার বড় ব্যাগটার মধ্যে অন্তত দশ রকম ছদ্মবেশ আছে, অবশ্য চোরেরাও ছদ্মবেশ পরতে ওস্তাদ। কে যে কি ধরা শক্ত।"

"আপনি বহুদর্শী, আপনার কাছে থেকে অনেক শেখবার আছে। আমরা মশাই চাকরি করি, আমাদের কর্তব্য সবই বাঁধা। —কিন্তু আপনার বর্ধমান তো এসে গেল।"

"ও, ধন্যবাদ। আর হয় তো দেখা হবে না। এই গাড়িতেই চোরেরা যাচ্ছে। ছদ্মবেশে থাকে, ধরা শক্ত। শুনেছি পুলিসের ছদ্মবেশেও থাকে অনেকে।"

"মানে আমাকে" —

ব্রজবিলাস জোরে হেসে বলল, "না, না, আপনাকে সন্দেহ করছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বলতে বলতে গাড়ি বর্ধমান স্টেশনে প্রবেশ করতেই ব্রজবিলাস উঠে দাঁড়াল এবং বড় ব্যাগটি কুলির মাথায় চাপিয়ে ছোটটি নিজে হাতে নিয়ে নেমে গেল, ও ধারের আসনের দুজনও ঐ সঙ্গে নেমে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নেমে যাওয়া দুজনের একজন উঠে এলো দারোগার দিকে তাকাতে তাকাতে।

কিন্তু গাড়ি ছাড়বার পর প্ল্যাটফর্ম প্রায় শেষ হয়ে আসতে সেই চলতি গাড়িতে আর এক নতুন যাত্রী হাতে বড় একটা আর কাঁধে ছোট একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠল সেই কামরায়। তার মুখে দাড়ি, চোখে নীল চশমা এবং গায়ে লম্বা কোট। ব্যাগগুলো উপরে রেখে দারোগার সামনেই ব'সে পড়ল, এবং কোনো ভূমিকা না ক'রেই বলল, "আপনি দেখছি পুলিসের লোক, নিশ্চয় সব লক্ষ ক'রে থাকেন। আচ্ছা, বলতে পারেন, এ কামরায় এমন কোনো যাত্রী ছিলেন যিনি এই স্টেশনে নেমে গেছেন? আমি নির্দিষ্ট সময়ে স্টেশনে আসতে পারিনি, কিন্তু খবরটা বড় জরুরি।"

দারোগা আগন্তুককে ভাল ক'রে লক্ষ ক'রে বলল, "হ্যাঁ, ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকার নেমে গেছেন, তিনিই ছিলেন।"

আগন্তুক হতাশ হয়ে পড়ল। "কি সর্বনাশ!—নেমে গেল?"

দারোগা তার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ ক'রে বলল, "ছদ্মবেশটা বেশ ভাল হয়েছে দেখছি, তার মানে আপনিও ডিটেকটিভ, ব্রজবিলাসবাবুর সহকারী অথবা সহযোগী।"

বাঙ্কের উপরের লোকটি ক্রমে ধৈর্য হারা হচ্ছে।

মহিলার কৌতূহলও অদম্য হয়ে উঠেছে। দূরের দুজন যাত্রীর দৃষ্টি নবাগতের প্রতি নিবদ্ধ।

আগন্তুক উত্তেজিত স্বরে বলল, "আমি ব্রজবিলাসের সহকারী? আমি তার সহযোগী? কি বুদ্ধি আপনার। নইলে কি আর পুলিসের লোক।"

"কেন, কি হল আপনার খুলে বলুন না?"

"বলব কি বলুন? জোচ্চোরটা আমারই নামে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনার নাকের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল! কি সর্বনাশ! আমার শিকার হাত-ছাড়া হ'ল।"

দারোগা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলছেন আপনি?—এখানে তো ব্রজবিলাস সরকার ছিলেন। তাঁর ব্যাগে বি-বি-এস লেখা ছিল—তবে কি সব ধাপ্পা?"

"ছি ছি পুলিসের লোকের চোখে ধুলো দিয়ে একটি চোর পালিয়ে গেল! আর তাই বা বলি কেন, পুলিসের লোক বলেই ধুলো দিতে পারল। ব্রজবিলাস

সরকারকে কি আগে দেখেন কি কখনও?"

"না, এই প্রথম দেখলাম, এবং প্রথম শুনছি সে মিথ্যা। তারপর শুনছি আপনি ব্রজবিলাস সরকার। আমার আগের আনন্দটা মাটি ক'রে দিলেন, এতক্ষণ তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করছিলাম।"

"নিশ্চয় সোনা চুরির বিষয়?"

"দাঁড়ান, আগে ধাক্কাটা সামলে নিই। লোকটা তা হ'লে সত্যিই আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেছে।"

"তা দিয়েছে। কিন্তু তাতে আর আপনাকে দোষ দিয়ে কি হবে। আপনি ডিটেকটিভ হ'লে নিশ্চয় সন্দেহ করতেন, দারোগাদের তো অতটা তলিয়ে দেখার দরকার হয় না।"

"তা এক রকম ঠিকই বলেছেন। কেউ এসে এজাহার দিলে তবে তদন্ত আরম্ভ করি। ঐটেই অভ্যাস হ'য়ে গেছে। আর আপনি যে এ কথাটা বোঝেন এজন্য ধন্যবাদ। কিন্তু বিখ্যাত ডিটেকটিভের নাম ক'রে এক প্রতারক আমাকে ঠকিয়ে গেল এটি আমার কাছে বড়ই অপমান-জনক বোধ হচ্ছে। সোনা চুরির কথাই বলছিল এতক্ষণ। ঐ প্রতারক কি সোনা চালান দেয়?"

"কি ক'রে জানলেন? আর যদি জানলেন, ধরলেন না কেন?"

"আমাকে সোনা চোরদের বিরুদ্ধেই তো বলছিল। এতক্ষণে বুঝতে পারছি ধাপ্পা দেওয়ার জন্য বলছিল। ওঃ! দুনিয়াটা অদ্ভুত এক চিড়িয়াখানা" ব'লে দারোগা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

ইতিমধ্যে মহিলা যাত্রীটি হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন সে আরও কাছে এসে বসতে চায়। দূরের যাত্রীরাও যেন কৌতূহল দমন করতে পারছে না।

ব্রজবিলাস বলল, "সোনার চোরা-চালানের কথা শুনে এখন যে আপনার মনে হচ্ছে প্রতারকটা নিজেই এ কাজ করে, এতটা বুঝতে পারার দৃষ্টান্তও আমি দারোগাদের মধ্যে দেখিনি।"

"ধন্যবাদ। তবে, ডিটেকটিভ নভেলে দারোগাদের একেবারে নির্বোধ বানানো হয়। সেখানে সব বুদ্ধির মালিক একমাত্র প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তাই নিজে ডিটেক-টিভ হয়েও যে আপনি আমার বুদ্ধির একটু প্রশংসা করলেন এতে আমি কৃতজ্ঞ। আপনার উদারতা মনে থাকবে। আচ্ছা কতদূরে যাচ্ছেন আপনি? এখনই নেমে গেলে বড় দুঃখ পাব।"

"কিন্তু ইন্‌সপেক্টর সাহেব, আমি বড়ই দুঃখিত যে, আমাকে আসানসোলেই নেমে যেতে হবে। ঐখানে কিছু সন্ধানের কাজ আছে। খুবই জরুরি, নইলে আপনার সঙ্গে যাওয়ার আর কি বাধা ছিল?"

দারোগা বলল, "আসল চোর বর্ধমানে নেমে গেল, আর আপনি উঠলেন সেই বর্ধমান থেকেই?"

"একটিতেই শেষ নয় মশাই। আসান-সোলে বড় চোরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্ধমানে যে নামল, সে নিশ্চয় বর্ধমানে নামত না, এর জন্য আপনিই দায়ী। দারোগার পোষাকে না এসে শাদা পোষাকে এলেন না কেন? ইউনিফর্ম দেখে ভয় পেয়েই তো পালিয়েছে।"

"তাই হবে। কিন্তু আমি কি জানি যে আমাকে ডিটেকটিভের কাজ করতে হবে?"

দারোগা আলাপ করছে এবং অন্য যাত্রীদের দিকেও চেয়ে দেখছে ফাঁকে ফাঁকে। মহিলাটির দিকে দারোগার দৃষ্টি পড়তেই সে বিব্রত বোধ ক'রে আরও একবার বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। উপরের লোকটি দারোগার দিকে কটমট ক'রে চাইতে লাগল। তার ঈর্ষা চরমে উঠেছে। অপরিচিত মহিলার দিকে দারোগার চাইবার কি দরকার আছে?

মহিলাটি বাথরুমে যাওয়াতে লোকটি একটুখানি শান্ত হ'ল। কিন্তু তার ফিরে আসতে বেশি দেরি হল না।

দারোগা বলতে লাগল, "সোনা চুরিটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে অথচ এতে চোরদের বিশেষ লাভ নেই।"

ব্রজবিলাস বলল, "লাভ আছে বৈকি, তবে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।"

"লাভ আছে কি ক'রে? যতই লুকিয়ে রাখুক দাম তো আর বাড়বে না।"

"সে অনেক জটিল ব্যাপার, এখন সব বুঝিয়ে বলবার সময় হবে না। একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, সোনার দর

যে দেশে বেশি সে দেশে চালান দিতে পারলে লাভ আছে। কিন্তু ঝুঁকিও আছে সেই পরিমাণে, আগেই বলেছি।"

"সেখান থেকে টাকা আনা যাবে কি ক'রে?"

"আপনি দারোগা হ'য়ে এ সব জানেন না এখনও? তা হ'লে আর আপনাকে বোঝানো যাবে না। চোরদের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা আছে, দেশে দেশে যত বিবাদই থাক, তারা সব একাত্মা। এটা একটা বড় ধর্ম। আর কোনো ধর্ম ওরা মানে না।"

দারোগা যেন নতুন একটা আলো দেখতে পেল এই কথায়। খুবই খুশি হয়ে উঠল সে। বলল, "ব্রজবিলাসবাবু আপনার নামই শুনে আসছি এতদিন, আজ বুঝলাম আপনি কেন এত বড়। সব বিষয়েই আপনার জ্ঞান কত গভীর। আমরা মশাই থানায় প'ড়ে থাকি, ছিঁচকে চোর ধরি দু-চারটে। এতে কি আর অভিজ্ঞতা বাড়ে?"

"ঠিক কথাই বলেছেন। বোকাদের সঙ্গে মিশে মিশে দারোগারাও সেজন্য বোকা হয়ে পড়ে। সে দিক দিয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কত সুবিধা। সমস্ত দেশ প'ড়ে আছে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য।

"আপনার একটি অটোগ্রাফ আমার এই খাতায়"

চাকরির ভয় তো আর নেই যে কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

দারোগা এ কথায় দুঃখিত না হয়ে খুশিই হ'ল। বলল, "মশাই, আপনার প্রত্যেকটা কথা সত্য। আপনি ছদ্মবেশে থাকলেও আসল লোকটাকে চিনতে দেরি হয় না, দু-চার কথাতেই বোঝা যায়।"

ঠিক এই সময় ক্রমে মুগ্ধ এবং চঞ্চল হওয়া মহিলাটি আপন আসন থেকে উঠে দাঁড়াল এবং ব্যাগ থেকে একখানি ছোট্ট খাতা বা'র ক'রে এগিয়ে এলো তাদের কাছে, এবং এই অনধিকার প্রবেশের জন্য বার বার ক্ষমা চেয়ে বলল, "আমি এতক্ষণ ইতস্তত ক'রে শেষ পর্যন্ত চলে এলাম বিখ্যাত ডিটেকটিভকে দেখতে। আপনাদের আলাপে বাধা দিলাম নিশ্চয়?"

দারোগা বলল, "না না কিছুমাত্র না। একজন মহিলা কাছে থাকলে ব্রজবিলাসবাবুর মনে আরও হয়তো প্রেরণা জাগবে। আমরা ও'র কথা আরও শুনতে পাব।"

মহিলার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল কথাটি শুনে। তার গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, সামান্য ভাবান্তরে মুখের রং বদল স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু মুহূর্তে লজ্জার ভাবটি কাটিয়ে ফেলল সে। খুব মধুর কণ্ঠে বলল, "আমার একটি শখ ডিটেকটিভকে পূরণ করতে হবে।" ব্রজবিলাসবাবু, যদি দয়া ক'রে আপনার একটি অটোগ্রাফ আমার এই খাতায়"—কথাটি অপূর্ণ রেখে খাতাটি সে এগিয়ে দিল ডিটেকটিভের হাতে।

ব্রজবিলাস বলল, "অটোগ্রাফ কাউকে দিই না, তবে আপনার বেলায় আমার নীতির বদল করলাম"—ব'লে ইংরেজীতে নাম সই ক'রে দিল। মহিলা তাকে বার বার ধন্যবাদ দিয়ে আপন আসনে ফিরে গেল, এবং খুব সন্তর্পণে সেটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। যেন কত মূল্যবান একটি রত্ন।

বাঙ্কের উপরের লোকটি যেন আর সহ্য করতে পারছে না। অপরিচিত সুন্দর চেহারার মহিলাটির সঙ্গে দারোগা অকারণ আলাপ করতে পারল, অথচ সে কিছুতেই সংকোচ কাটাতে পারছে না ভেবে নিজেরই উপর তার রাগ হচ্ছে।

দূরে আসনের দুজন যাত্রী এদের চালচলনের উপর তাদের দুটি চোখ যেন বিঁধিয়ে ব'সে আছে।

গাড়ি আসানসোলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ব্রজবিলাস ঘড়ি দেখল, বলল, "আমার আর আধঘণ্টা পরমায়ু, তার পরেই বিদায় নিচ্ছি। ইনসপেক্টর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে বড়ই খুশি হয়েছি, নিশ্চয় ভবিষ্যতে আমাদের দেখা হবে।"

দারোগা বলল, "ভাল সন্ধানের কেস্ হাতে পেলে আপনাকে ডাকব এবারে। প্রাইভেট ডিটেকটিভকে কখনও ডাকিনি কোনো কাজে। বোধ হয় ভুল করেছি। অনেক শেখবার আছে তাঁদের কাছ থেকে।"

দূরে আসনের একজন যাত্রী নামবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। দারোগা তা দেখে জিজ্ঞাসা করল, "আপনারাও কি আসানসোলের যাত্রী? আমার এই বন্ধু ব্রজবিলাস সরকারও নামবেন এখানে।"

যাত্রীদের একজন বলল, "আমি নামব।" অন্যজন বলল, "আমি কাশী যাচ্ছি, তবে আসানসোল স্টেশনে দু মিনিটের একটি কাজ আছে সেটি সেরেই আবার ফিরে আসব। তারপর আলাপ-পরিচয় করা যাবে আপনার সঙ্গে।"

মহিলা বলে উঠল, "হাঁ একা চুপচাপ থাকা বড়ই কষ্টকর।"

উপরের যাত্রী বলল, "এতক্ষণে একটা মনের মতো কথা শোনা গেল।" —ব'লে হাঁটু নাচাতে লাগল বাঙ্কের উপরে ব'সে।

দারোগার চোখ কৌতুকে নাচছে। বাঙ্কের লোকটির মনস্তত্ত্ব তার কাছে বড়ই মজার মনে হচ্ছিল। মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করতে তার ষোলআনা ইচ্ছা, অথচ সংকোচ কাটাতে পারছে না, এ দৃশ্যটি দারোগার কাছে বড়ই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

গাড়ি আসানসোলে এসে পড়ল। ডিটেকটিভ নেমে গেল। দূরে আসনের দুজনও নেমে গেল। দারোগা প্ল্যাটফর্মের দিকে মাথা বা'র ক'রে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছে। মহিলাটিও এসে দরজায় মাথা বা'র ক'রে দাঁড়িয়েছে। বাঙ্কের লোকটিরও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আবার সংকোচ এসে তার ইচ্ছার গলা টিপে ধরল, হ'ল না ইচ্ছা মতো কাজ করা।

সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে একটা রহস্য ব'লে বোধ হচ্ছে, অথচ কথা বলবার উপায় নেই। সে এ গাড়িতে কেন এসেছে তাও সে জানে না, তাই সে মনে মনে অসহায়ের মতো গজরাচ্ছে।

এমন সময় সেই নেমে যাওয়া যাত্রী-দের একজন ফিরে এলো উত্তেজিত-ভাবে। মহিলা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে তাকে ভিতরে আসতে সাহায্য করল। সে এসেই দারোগাকে বলল, "সব ঠিক আছে।"

মহিলাকে সে আগেই ইসারা ক'রে জানিয়েছিল। দারোগা কথাটি শোনামাত্র লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণে তার অবরুদ্ধ মন মুক্তি পাওয়ায় হো হো করে হাসতে লাগল। গাড়ি ফেটে যায় বুঝি! আর তা দেখে মহিলাটিও হেসে আপন আনন্দে লুটোপুটি খেতে লাগল।

দারোগা অস্বাভাবিক চিৎকার ক'রে

উপরের লোকটিকে বলল, "শম্ভু আর কেন, এবারে নেমে এসো।"

উপরের লোকটি, মানে শম্ভু, রেগে গরগর করতে করতে নেমে এসে দারোগাকে বলল, "দেখ ব্রজবিলাস, তোমরা সবাই মিলে কি ষড়যন্ত্র করেছ জানি না, কিন্তু আমাকে জব্দ করা দেখছি তোমার একটি প্রধান প্ল্যান ছিল। কি সব হচ্ছে আমাকে জানাও নি কেন? কেন আমাকে কারো পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছ? কেন আমাকে চুপ ক'রে সমস্ত পথ শুধু সব লক্ষ করতে বলেছ? এ সব কেন, কি তোমাদের উদ্দেশ্য? কেন আমাকে ব্লাফ দিয়ে সঙ্গে এনেছ?"—ঝড়ের মতো বেগে ব'লে যেতে লাগল শম্ভু—শম্ভু দত্ত—ব্রজবিলাস সরকারের বন্ধু এবং সহকারী ডিটেকটিভ।

কিন্তু দারোগা—মানে—ব্রজবিলাস সরকার তখনও আনন্দে চেঁচাচ্ছে, শিস দিচ্ছে, এলোমেলো গান গাইছে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে শম্ভুকে বলল, "শম্ভু, তোমার অনুমান ঠিক। তোমাকে একটা ধাঁধায় ফেলে মজা দেখছিলাম। কিন্তু সব চেয়ে বড় মজা—সুন্দরী অপরিচিতা মহিলা দেখে তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেইটি লক্ষ করা। কিন্তু থাক, এ সব কি এবং কেন তা এখুনি জানতে পারবে। চুপ ক'রে ব'স আমার সামনে। এই যে এইখানে—যেখানে দুজন নকল ব্রজবিলাস সরকার ব'সে গেছে।"

"কুসুম দেবী, আপনিও কাছে আসুন।"

শম্ভু একবার ব্রজবিলাসের দিকে একবার মহিলার দিকে নির্বোধের মতো চাইতে লাগল।

দারোগা-বেশী ব্রজবিলাস কুসুম দেবীকে বলল, "আপনি কেন এসেছেন এবং এই নাটকে কোন্ ভূমিকা অভিনয় করেছেন তা শম্ভুকে বলুন—আর নলিনীবিহারীবাবু, আপনিও আসুন। আপনার কথাও বলুন।"

কুসুম বলল, "কিন্তু ব্রজবিলাসবাবু, আপনি দারোগা সেজে ব'সে থাকলে আমার অস্বস্তি বোধ হবে। সমস্ত দিন দারোগাদের মধ্যে কাটাতে হয়, এখানে আর সেটা চাই না।"

ঠিক বলেছেন কুসুম দেবী। ব'লে ব্রজবিলাস বাথরুমে গিয়ে সাধারণ পোষাকে বেরিয়ে এলো। ইতিমধ্যে শম্ভু নলিনীবিহারীর সামনে না পারছে কুসুমের দিকে তাকাতে, না পারছে তার সঙ্গে আলাপ করতে। কুসুম অতি ধূর্ত, সে মনে মনে হাসছে শম্ভুর ব্যবহারে।

ব্রজবিলাস এসে পড়াতে কমিক দৃশ্যটি আর বেশি দূর গড়াল না।

কুসুম বলতে লাগল, "এ নাটকে আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিক। আমি পুলিস বিভাগের লোক"—

শম্ভু এ কথায় ভীষণ চমকে উঠে দু হাত দূরে স'রে বসল এবং ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কুসুমের দিকে। "কুসুম পুলিস?" এই প্রশ্নটি তার মনের দেয়ালে বার বার মাথা ঠুকতে লাগল। "উঃ কুসুম পুলিস?"—

কুসুম মৃদু হেসে বলতে লাগল, "আমি আমাদের বিভাগ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলাম রেডিও প্রেরক যন্ত্রের কাজ করতে এবং ব্রজবিলাসবাবুর আদেশ পালন করতে। কথা ছিল সন্দেহযোগ্য কোনো যাত্রী কোন্ স্টেশনে নামবে এ কথা ব্রজবিলাসবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করবেন এবং আমার দিকে তাকাবেন। তখন আমি উঠে গিয়ে বাথরুমে লুকিয়ে রাখা প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে সে কথা কলকাতা অফিসে জানিয়ে দেব। তাঁরা রেল পুলিসকে বেতারে কর্তব্য নির্দেশ পাঠাবেন। বর্ধমানের যাত্রী এবং আসানসোলের যাত্রী দুজনের কথাই আমি জানিয়ে দিয়েছি। তবে গয়ায় পিণ্ডি দেবার কথা শুনে এমন হাসি পেয়েছিল যে, বাথরুমে গিয়ে কিছুক্ষণ না হেসে পারিনি।"

"এবারে আমি বলি"—সাব- ইনসপেক্টর নলিনবিহারী বলতে লাগল, "আমিও ব্রজবিলাসবাবুকে আমার দুজন সহকর্মীর সঙ্গে এসেছি সাহায্য করতে। পূর্ব ব্যবস্থা মতো আমার দুজন সঙ্গী পর পর দুজন সন্দেহজনক ব্যক্তির সঙ্গে নেমে গেছে দেখেছেন। তাঁদের উপর নির্দেশ ছিল রেল পুলিস যাদের গ্রেপ্তার করবে তাদের চিনিয়ে দেওয়া। আমিও নেমেছিলাম এবং ফিরে এসে সাফল্যের কথা জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি এ কথা আগে কখনই ভাবতে পারিনি যে, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভের বুদ্ধিতে এত বড় একটা কাজ হবে। ব্রজবিলাসবাবুকে আমরা কেউ আগে দেখিনি, পরিচয়ও ছিল না। আমি তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হয়েছি, আমার আর কিছুই বলবার নেই। শুধু একটি জিজ্ঞাসা—ঐ দুজন চোর যে এই কামরাতেই উঠবে তা জানলেন কি করে?"

"খুব সহজ। হাতীখেদায় যেমন বুনো হাতীকে এনে আটকানো হয় এদের বেলাতেও সেই বন্দোবস্ত ছিল। বহু সরকারী লোক এতে সাহায্য করেছেন।"

ব্রজবিলাস মৃদু মৃদু হাসছিল। এবারে শম্ভুর দিকে তাকিয়ে বলল, "শম্ভু, তোমার ভূমিকাটি বল এবারে।"

শম্ভু, এ কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "সবার সামনে আবার তুমি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে আমাকে অপদস্থ করছ। আমাকে তুমি আগাগোড়া অন্ধকারে রেখেছ। আমি শুধু মৃত সৈনিকের ভূমিকা অভিনয় করেছি এতক্ষণ।"

"সবচেয়ে কঠিন ভূমিকাই তো সেটি। বেঁচে থেকে মৃতের ভূমিকা অভিনয় করা। যেমন কঠিন মৃতের পক্ষে জীবিতের ভূমিকা করা।"

"কঠিন? তোমার তো খুব বুদ্ধি। এদেশের কত লক্ষ লক্ষ মরা মানুষ জীবিতের ভূমিকা অভিনয় ক'রে চলেছে দেখছ না দুটো চোখে?"

"দেশ আবার জেগে উঠছে, বহু কোটি মরা মানুষ আবার বেঁচে উঠছে সে খেয়াল রাখনি দেখছি। কিন্তু ও সব কথা থাক। কুসুম দেবী, আমি আপনার দিকে বার বার তাকাতে শম্ভুর কি রকম হিংসে হচ্ছিল লক্ষ করেছেন? তা আপনার চেহারা স্মরণ ক'রে ওকে ক্ষমা করা গেল।

কুসুমের মুখখানা আবার রাঙা হয়ে উঠল। শম্ভুর চোখ দুটিতে আগুন জ্বলল,—ব্রজবিলাসকে ভস্ম করে বুঝি।

ব্রজবিলাস কুসুমকে বিশেষভাবে প্রশংসা ক'রে বলল, "আপনি যে অটোগ্রাফের খাতাখানা এগিয়ে দিয়েছিলেন তাতে আমি মুগ্ধ। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপনার পরিকল্পনা।"

কুসুম বলল, "হঠাৎ কথাটা মনে এলো ওর নাম শুনে। খুব হাসিও পাচ্ছিল। আগের জনের নাম ঠিকমতো শুনতে পাইনি আমি। শুধু আপনার ইসারায় কাজ করেছি। কিন্তু এর নাম শুনেই বুঝলাম অটোগ্রাফ নিলে হয়। ওটা আমার একটা পুরনো শখ। এবারে শখের জিনিসটা হয় তো সমাজের কাজে লাগবে।"

ব্রজবিলাস জোরের সঙ্গে বলল, "নিশ্চয় লাগবে। খুব দামী দলিল হবে ওটা। ওরই সাহায্যে জোচ্চোরটাকে আইডেন্টিফাই করার সুবিধা হবে। প্রথমে যে লোকটি আমার নামে পরিচয় দিয়েছিল তার ব্যাগে তিনটি অক্ষর লেখা ছিল—বি-বি-এস। লোকটি খুব চালাক। ওর আসল নাম আমি জানি—বিধুভূষণ শর্মা। ওকে দেখেই চিনেছি।"

কুসুম বলল, "আপনি যে সুন্দরভাবে দারোগার ভূমিকা অভিনয় করেছেন সে কথাটা আলোচনা করা হ'ল না।"

"সে তো সবাই দেখেছেন ওটা শুধু আত্মগোপনের ভূমিকা। শুনুন, দ্বিতীয়জন ছদ্মবেশে থাকাতে লোকটি কে তা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আঙুলের ছাপে চেনা যাবে। অবশ্য ধরা পড়েছে যখন, তখন পুলিসের কাছে ওর রহস্য গোপন থাকবে না। এত বড় কাণ্ড, পিছনে এত রহস্য অথচ সবার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিইনি, কারণ হঠাৎ যদি চোরদের সামনে

তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তা হ'লে বুদ্ধি বাড়ার সুযোগ দেবে তারা পালিয়ে গিয়ে। শুধু নলিনবিহারীবাবুর সঙ্গে তাঁর দুজন সঙ্গীর পরিচয় ছিল, কিন্তু কুসুম দেবীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। দেখলেন, এত বড় কান্ড অথচ শম্ভুর এতে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই।" —ব্রজবিলাসের চোখে দুটি কৌতুকপূর্ণ, শম্ভুকে উত্তেজিত করাই তার উদ্দেশ্য।

শম্ভু উত্তেজিত হ'ল। "আমি এ বিদ্রূপ সহ্য করব না, আমি তোমার কোনো কাজে লাগিনি? আচ্ছা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি"—

"না না শম্ভু, শোন"—

"না আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা কেউ জান না। দ্বিতীয় লোকটি যখন তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল, তখন ছোট্ট একটি খাতা ঐখানে ফেলে গেছে—আমি সেটা দেখেছি, এতক্ষণ বলিনি। খাতাটা গাড়িতে ওঠবার সময় তার হাতে ছিল—ব্যাগে নয়, লক্ষ করেছিলাম।"

খাতাটি নামানো হ'ল। ব্রজবিলাস সেটিতে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল সেটি একটি মূল্যবান দলিল। এর সাহায্যে দু নম্বর ব্রজবিলাসের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা সহজ হবে। সবই প্রায় সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। ভেবেছিল গাড়িতে ব'সে ব'সে আরও কিছু লিখবে, কিন্তু পুলিসের লোক দেখে তা আর সম্ভব হয়নি। লোকটি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।"

ব্রজবিলাস শম্ভুর বিরুদ্ধে যা যা বলেছিল সব প্রত্যাহার করল—শুধু একটি ছাড়া। বলল, "সুন্দরী মেয়ে দেখলে শম্ভু সামান্য দিশাহারা হয়, অন্য বিষয়ে ওর মাথা পরিষ্কার।"

শম্ভুর চোখে আবার আগুন জ্বলতে লাগল।

কিন্তু ব্রজবিলাসের ক্ষমতায় নলিনবিহারী ক্রমে অভিভূত হতে লাগল। সে স্তম্ভিত হয়ে ব্রজবিলাসের দিকে এতক্ষণ চেয়ে ছিল। তার কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতায় সে আরও মুগ্ধ হ'ল। এইবার সে আস্তে আস্তে উঠে ব্রজবিলাসের একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল। তার চোখ দুটি উন্মাদের মতো স্থির। গম্ভীর সুরে বলল, "আপনার সঙ্গে একটি গোপন কথা আছে, আপনি দয়া ক'রে একবার অন্তরালে আসুন।"

ব্রজবিলাস বলল, "চলুন।"—তারপর দু পা এগিয়ে ফিরে দাঁড়াল, এবং ব্যাগ থেকে একটা শিশি বা'র ক'রে সেটি পকেটে নিয়ে নলিনবিহারীকে অনুসরণ করল। ওরা দুজনে বাথরুমে প্রবেশ করল।

দরজা বন্ধ হ'ল। নলিনবিহারী বলল, "মহিলা ছিলেন, তাই এখানে আসতে হ'ল।"

ব্রজবিলাস বলল, "ঠিক আছে। আমার কাজে মুগ্ধ হয়ে আমাকে চুমো খাবেন তো? চটপট খেয়ে নিন।"

নলিনবিহারী ব্রজবিলাসকে জড়িয়ে ধ'রে পর পর ডজনখানেক চুমো খেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আপনি জাদুকর।"

ব্রজবিলাস পকেট থেকে শিশি বা'র ক'রে তা থেকে কিছু তরল পদার্থ হাতে ঢেলে মুখে মাখতে মাখতে বলল, "আপনি সহজে ছেড়েছেন, আপনার সংযমকে প্রশংসা করি।—কোনো পুলিসের লোকই মিনিট দশেকের নিচে ছাড়ে না, কেউ কেউ আরও বেশি।"

এদিকে খালি ঘর পেয়ে শম্ভু কুসুম দেবীকে আবেগের সঙ্গে নিজের কৃতিত্বের কথা শোনাচ্ছিল, বাথরুমের দরজা খোলার শব্দে এক লাফে উঠে গিয়ে বাঙ্ক দখল করল।

গাড়ি রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলল হাজারিবাগ রোডের দিকে।

সাত দিন পরে খবর প্রকাশ হ'ল দুজন কুখ্যাত সোনাচালানকারী, কলকাতার ডিটেকটিভ বিভাগের তৎপরতায় ধরা পড়েছে। তাদের কাছে দু লক্ষ টাকা দামের সোনা পাওয়া গেছে।

দিল্লী থেকে বলছি

নিমাই ভট্টাচার্য

আগেই বলে নিচ্ছি 'ফর এ্যাডালটস্ ওনলি'।

ষোল-সতের হাজার ফিটের বাংলা ছবির একেবারে গোধূলি লগ্নে আবেগের তাড়নায় মুহূর্তের জন্য নায়ক নায়িকাকে আলিঙ্গন করলে সারা বাংলাদেশে ছিছি রব পড়ে যায়। কলকাতার স্কুল কলেজের ছেলে-মেয়েদের চোটে রাধা-পূর্ণতে প্রথম দু' সপ্তাহ সীট পাওয়াই দুষ্কর। মাস খানেক পরে দিদি-বৌদিরা এই ছবি দেখার চান্স পান; আর সেই চরম সিনটা এলেই বলতে শোনা যায় ঃ ছিঃ ছিঃ দিদি, একি ব্যাপার!

কিন্তু যান মেট্রো, লাইট হাউস অথবা আমাদের এখানকার রিভোলি-প্লাজাতে; মুহূর্তে মুহূর্তে দেখবেন লানা টার্ণার অথবা সোফিয়া লরেনের তান্ত্রিক সাধনার প্রকাশ। অন্ততঃপক্ষে হাজার খানেক আলিঙ্গনের দৃশ্য ও 'আনুসাঙ্গিক 'ডোজ' না থাকলে হলিউডের কোন ছবিই বোধকরি 'এ্যাকাডেমী এ্যাওয়ার্ড' পেতে পারে না। কিন্তু তবুও সে ছবি দেখতে আমাদের বাধে না; তেমনি বাধে না কলকাতা থেকে দিল্লী এসে এখানকার মেয়েদের দেখতে।

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের জন্য গান্ধীজি লণ্ডন গেলে বিলাতী সাংবাদিকরা তাঁকে ঠাট্টা করেছিলেন 'হাফ নেকেড' বলে। শুনেছি তার উত্তরে গান্ধীজি বলেছিলেন, পুরুষ হয়ে আমি যদি 'হাফ নেকেড' হই, তবে তোমাদের দেশের সব মেয়েরাই পুরোপুরি 'নেকেড'। গান্ধীজি স্বর্গে গেছেন। কারণ আজকের দিল্লীর ললিতা সখীদের পোষাক দেখলে তিনি বিলেতী মেয়েদের এত কড়া কথা বলতে সাহস বা উৎসাহ কোনটাই পেতেন না।

সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীতে এক বিখ্যাত ক্লথ মিলের সৌজন্যে 'ফ্যাশান প্যারেড' হয়ে গেল। পরের দিন প্রভাতী সংবাদপত্রে বেরুল তার ছবি। দিল্লীর সবচাইতে বিখ্যাত কাগজে যে ছবিটি বেরুল, সেটি লণ্ডনের 'ডেলী মিরর' ছাড়া অন্য কোন বিলেতী কাগজও নিশ্চয়ই ছাপত না। সাধারণতঃ প্রায় এ ধরণের ছবি নিয়েই কলকাতার চৌরঙ্গীর অলি-গলিতে ব্যবসা চলে; কিন্তু সে ছবিই ছাপা হলো কোনো একটি বিখ্যাত সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় একেবারে 'টপ সেণ্টার ডবল কলম'। দিল্লীর অন্যান্য সংবাদপত্রেরাও খুব বৈষ্ণব ভাব দেখাননি; ফ্যাশান প্যারেডের প্রতি তাঁরাও যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন। এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু রাজধানীর লক্ষ লক্ষ সংবাদপত্র পাঠক-দের মধ্যে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ দেখা গেল না। আক্ষেপ করার অবশ্য কোন কারণ নেই; এ দৃশ্য দেখতে তো অনভ্যস্ত কেউ নয়!

শুনেছি রূপ-যৌবনের খেলা দেখিয়ে রম্ভা, উর্বশী, মেনকারা মুনি-ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করতেন। তাঁরা আজ কোথায় জানি না; তবে দেখে-শুনে মনে হয় দিল্লীর মেয়েরাই রম্ভা-উর্বশী-মেনকার ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়ে বসে আছে। রূপ-যৌবনের খেলা দেখাবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিল্লী ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গার মেয়েদের নিশ্চয়ই জানা নেই; অন্ততঃ চোখে পড়েনি। সন্ধ্যাবেলায় জনপথের রিফিউজি মার্কেটের সামনে রূপ-যৌবনের যে জীবন্ত ও চলন্ত প্রদর্শনী দেখা যায়, প্যারিসের সাঁজে এলিজেতেও তেমনি দেখিনি। চলতে-ফিরতে এখানে এমন এক একটা ডিজাইন নজরে পড়ে যে তার সমতুল্য লণ্ডনের হ্যারডস্'এও দেখা দুষ্কর। দিল্লীর মেয়েদের পোষাকের আরো একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সকালে যাকে দেখে মনে হবে চল্লিশ, সন্ধ্যা সমাগমে তিনিই নেমে আসেন একেবারে চব্বিশে, তর্ক করলেও পঁচিশের উপর বলতে সত্যি বাধো বাধো লাগে। পোষাকের ক্ষেত্রে অবশ্য দিল্লীর ছাত্রীদের অবদান অনবদ্য। বিশ্বাস করুন, ক' বছর আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী এমন মারাত্মক পোষাক পরে ক্লাশে এসেছিলেন যে একটি ছাত্রের (স্বাভাবিকভাবেই) নিদারুণ চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ঘটনাটি এমনি গুরুতর আকার ধারণ করে যে ভাইস চ্যান্সেলার থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত মাথা ঘামাতে হয়।

আমার বক্তব্য যে অতিশয়োক্তি নয়, তার প্রমাণ ইদানীংকালে হিন্দী ও অন্যান্য ফিল্মে সালোয়ার-কামিজের অধিকতর চলনই প্রমাণ করে। বাংলার ডাইরেক্টর, মাদ্রাজের 'ডানসার' আর দিল্লী-পাঞ্জাবের সালোয়ার-কামিজই তো আজকের বোম্বে ফিল্মের বক্স-অফিস বাঁচিয়ে রাখছে। তাই নয় কি।

কলকাতা, বোম্বে বা মাদ্রাজের মত দিল্লীর কোন 'সোস্যাল বেস' নেই। পাঞ্জাবী-প্রাধান্য হলেও, চারিদিকের লোকজন নিয়েই দিল্লী। তাইতো এখানে সবাই কেমন যেন একটা নতুন সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করেন। মাদ্রাজবাসী মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের যে ছেলেটি ব্যাঙ্গালোরে বসে এক গেলাস 'বিয়ার' খেতে সাহস পাবে না, সেই-ই দিল্লীতে এসে প্রকাশ্যে হুইস্কীর বোতল নিয়ে ঘুরতে দ্বিধা করে না। তেমনি আমাদের যেসব বাঙ্গালী মেয়ের দল এক হাত ঘোমটা না দিয়ে বাংলাদেশে পাড়ায় বেরুতে পারেন না, তাঁদের অনেকেই দিল্লীর আবহাওয়ায় ঠোঁটে-মুখে রং লাগিয়ে হাতকাটা পেটকাটা ব্লাউজ পরে প্রকাশ্য দিবালোকে জনপথের ষ্টলে অন্তর্বাস কিনতে দ্বিধা করেন না।

ধর্মক্ষেত্র সম্পর্কে স্থান-মাহাত্ম্যের কথা শোনা যায়। কিন্তু ধর্মক্ষেত্র না হলেও দিল্লীর একটা স্থানমাহাত্ম্য আছে। তা না হলে (গত লোকসভায়) বাংলাদেশের পঞ্চাশ পেরুবার বয়স্কা মহিলা এম-পি'কে চোখে কাজল আর মাথায় ফুল গুঁজে আসতে দেখতাম না। বলা বাহুল্য বাংলাদেশে এঁকে গরদের শাড়ী পরে মিটিং'এ আসতে দেখা যায়। পার্লামেণ্টের সেন্ট্রাল হলের আড্ডা-খানায় এঁকে অনেকেই 'শকুন্তলা' আখ্যা দিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা বলতেন, 'বনলতা সেন'।

দিল্লীর ললিতা সখীদের নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোরের চাইতে মোটা বই লেখা যায়। কিন্তু মাত্র আর একটি 'পয়েণ্ট' বলেই আকাশবাণীর ভাষায় আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব। রাজধানীর ট্রাফিক এ্যাক্সিডেন্টের হিসেব-নিকেশ খুঁটিয়ে দেখা গিয়েছে যে, মেয়েদের অতিআধুনিক উগ্র পোষাক ও সেদিকে ড্রাইভারদের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত বহু এ্যাক্সিডেন্টের কারণ। দিল্লীর মেয়েদের পোষাকের জন্য মানসিক এ্যাক্সিডেন্টও বোধকরি কম হয় না।

সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই দেশ!

ভারত সংস্কৃতি ও ভরত নাট্যম্

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যের দেবতা নটরাজ। শিবের তাণ্ডব নৃত্য থেকে প্রকৃত নৃত্যের সূচনা। শিবতাণ্ডব থেকে নৃত্যের যে জয়যাত্রা শুরু হল তার মূল ভাবধারা ছিল ধর্মভিত্তিক। বিশেষ উল্লেখযোগ্য আমাদের দেব-দেবীরা সকলেই নৃত্যগীতে পারদর্শী। চিদাম্বরমের নটরাজ মন্দিরে খোদিত নর্তন মূর্তিগুলিতে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সার্থক প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবতাণ্ডব যেমন নৃত্যের প্রথম প্রকাশ তেমনই কালীতাণ্ডব পার্বতী প্রবর্তিত লাস্য নৃত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের পূর্ণাঙ্গরূপের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ভরতনাট্যম। এই নৃত্যকলা সম্পর্কে যাদের প্রকৃত ধারণা নেই তারা অনেকেই একে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক নৃত্যধারা বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতা সংকীর্ণতাবোধ থেকে প্রচারিত হয়েছে। আসলে ভরত-নাট্যম একটি নৃত্যধারা মাত্র নয় একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্য পদ্ধতি যা অপর প্রাকৃত নৃত্যধারাগুলিতেও অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও চিত্রকলা সংস্কৃতির এই চতুরঙ্গের সমন্বয়ে ভরতনাট্যম সারস্বত চেতনা সমৃদ্ধ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাগুলিতে এই সম্পূর্ণতা নেই, সেজন্য অন্যান্য নৃত্যধারা অপেক্ষা ভরতনাট্যম প্রাণময়তায় প্রবহমান ও গতিশীল। প্রকৃত শিল্প কোনও ক্রমেই স্থাবর নয়। গতিশীলতাই তার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়েই ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের প্রবহমান অভিযাত্রায় নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রেখে ভরতনাট্যম তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ভাব, রাগ ও তাল এই তিনের সমন্বয়ে নৃত্যের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন এই ভাব, রাগ ও তালের প্রথম তিনটি বর্ণকে কেন্দ্র করেই ভরতনাট্যম নামের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, ভরতমুনি প্রবর্তিত নৃত্য বলেই এর নাম ভরতনাট্যম। এ বিষয়ে এখনও কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।

ভরত-নাট্যশাস্ত্র রচিত হওয়ার আগেই আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রচলিত ছিল। বহুকাল পর্যন্ত বৈদিক সভ্যতাকেই শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীনতম মনে করা হত। কিন্তু মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে প্রাক বৈদিক যুগের নৃত্যকলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে ঊর্ধ্ব তাণ্ডব ভঙ্গিতে যে নটমূর্তি পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় পঞ্চম ও চতুর্থ খৃষ্ট পূর্বাব্দে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে নৃত্যকলার অনুশীলন করা হত। তাঞ্জোরের তিরুপত্তুর ও চিদাম্বরম মন্দিরে উৎকীর্ণ ঊর্ধ্বতাণ্ডব ভঙ্গিতে শিব ও নটরাজের ললিত মূর্তি, খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বারহুতে অপ্সরাদের লীলায়িত নৃত্যচ্ছন্দ, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে উড়িষ্যার উদয়গিরি গুহার রাণীগুম্ফায় নট-নটীদের নর্তন মূর্তি প্রাচীনকালের নৃত্য-গীতের অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। তামিল গ্রন্থ 'শিলাপাদ্দিকারম' থেকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের নৃত্যকলার উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে পানিনীর ভাষ্যকার পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর্তকীর কথা পাওয়া যায়। ভারতীয় নৃত্যকলা প্রাচীন আর্য, অনার্য, দ্রাবিড় প্রভৃতি আদিম জাতির সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে ও বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। বৈদিক যুগে নৃত্যকলাকে আত্মিক উন্নতির মার্গ হিসাবে গণ্য করা হত, শুধুমাত্র অবসরবিনোদন ও বিলাসের বস্তু মনে করা হত না।

যতিস্বরম

রামায়ণ, মহাভারতের যুগে সঙ্গীত ও নৃত্যকে সমাজে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। রাজা নির্বাচনে রাজকীয় গুণের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তিকে বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা হত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর যখন অমাত্য ও পারিষদরা ঋষি বশিষ্টকে একজন প্রজা-বৎসল ও গুণগ্রাহী নৃপতি নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ করেন সেই প্রসঙ্গে রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে এই কথার উল্লেখ আছে,

'নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টেনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে
রাষ্ট্রবর্ধনাঃ।।'

মহাভারতের যুগেও সঙ্গীত ও নৃত্যের অনুরূপ প্রসার ছিল। সভা-পর্বে উল্লেখ আছে,

'নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ
বিবিধৈরপি
রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং
শতক্রতুম।।'

মহাভারতের বীর অর্জুনও নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মৌর্য যুগ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সময়ে 'নৃত্য জাতক' গ্রন্থ থেকে তৎ-কালীন সময়ের নৃত্যের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায় হংসরাজ-কন্যা এক অপূর্ব প্রিয়দর্শন উজ্জ্বলগ্রীব রত্নপুচ্ছ ময়ূরকে পতি-রূপে মনোনীত করল। ময়ূর নৃত্য-কলায় পারদর্শী কিন্তু তার নৃত্য অসম ও ছন্দহীন হওয়ায় রাজকন্যা তাকে বরমাল্য দিতে অস্বীকৃত হল। নৃত্য জাতকের এই কাহিনীটি বারহুত স্তূপে খোদিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ৪৯৩ থেকে ৪৬২ সনে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে অন্তপুরিকাদের মধ্যেও নৃত্য-গীতের অবাধ অনুশীলনের কথা 'সিংহলী মহাবংশম' থেকে জানা যায়। সেই সময় রাজপ্রাসাদে নাট্য-মন্দির ও নৃত্যগৃহ ছিল এবং শাস্ত্রসম্মত নৃত্য-নিপুণা দেবদাসীরা কলা নৃত্য-গীত পরিবেশন করত।

গুপ্ত ও তৎপরবর্তীকালেও নৃত্য-কলার উৎকর্ষ ও প্রসারের পরিচয় আছে। মহারাজ সমুদ্র গুপ্ত ও তাঁহার মাতা মহারাণী কুমারদেবীর সঙ্গীত ও নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিতার বিবরণ পাওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্তের পুত্র মহারাজ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে নবরত্ন সভা, সঙ্গীত ভবন, নৃত্যগৃহ প্রভৃতি ইহার পরিচয় দেয়। গুপ্ত যুগকে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা যায়। মহাকবি কালি-দাসের 'মেঘদূত' কাব্যে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে নৃত্যনিপুণা দেব-দাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'পাদন্যাসৈঃ ক্বণিত-রসনা
স্তত্রলীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিত-বলিভি শ্চামরৈঃ
ক্লান্তহস্তাঃ।'
'পদক্ষেপে কাঞ্চী-রুত দেবদাসী
কুশলা নটনে
ক্লান্ত-হস্তা মণি-দ্যুতি লীলায়িত
চামর হেলনে।'
(অনুবাদঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার একটি বিশেষ স্থান আছে।

কথা ও কাহিনী সাহিত্যের অন্য-তম বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের সঙ্গীত ও নৃত্য-কলার সাংস্কৃতিক উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের এই ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি সেই প্রাচীন যুগেই শিল্পী ও ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

ভরতমুনি নাট্য ও নৃত্যের উপ-করণ তাঁর পূর্বকার আচার্যদের গ্রন্থ থেকে আহরণ করে নাট্যশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেন এই উক্তি তাঁর নাট্য-শাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। এ থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে ভরতনাট্যশাস্ত্র রচিত হওয়ার পূর্বেই ভারতবর্ষে শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রচলন ছিল। নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা মুনি ভরত আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা তা নিয়েও বহু মত-বিতর্ক আছে। অনেকে বলেন, নাট্য-শাস্ত্রে কুশলী নট মাত্রকেই 'ভরত' উপাধি দেওয়া হত। নন্দী ভরত, মতঙ্গ ভরত, কশ্যপ ভরত, কোহল ভরত ও তণ্ডু ভরত এই পাঁচজন নাট্যশাস্ত্রবেত্তার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যা হোক ইতিহাসের পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্য পদ্ধতি (ভরতনাট্যম) বহু সুপ্রাচীন কাল থেকেই কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতেই নয় সমগ্র দেশে প্রচলিত ছিল। অবশ্য এ কথা সত্য যে দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্যকলার প্রসার ও অনুশীলন হয়েছে। এর অন্যতম কারণ এই যে উত্তর ভারতে দীর্ঘকাল-ব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক কলহ, মুসলমান আক্রমণ ও পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসন। মুসলমান রাজত্ব-কালে উত্তর ভারতে এই ধর্মভিত্তিক শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রসার ব্যাহত হয় এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ হয়। স্বভাবতই দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের আনু-কূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে এই নৃত্যকলার বিকাশ অব্যাহত থাকে এবং কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্যধারা এই নৃত্য পদ্ধতির অন্ত-র্ভুক্ত হয়।

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্লারিপু, যতি-স্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, তিল্লানা এই-গুলিই প্রচলিত। কিন্তু এই নৃত্যগুলি বহু পরে ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতিতে সংযোজিত হয়েছে। সাদির নাটাম্, কুরুভাঞ্জি, ভাগবতমেলা নাটক এবং কুচিপুড়ী এই চারি পদ্ধতিতেই পূর্বে ভরতনাট্যম প্রচলিত ছিল। সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাদির নাট্যম্ বহু শতাব্দী ধরে তামিলনাদের মন্দিরে ও রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা পরিবেশিত হত বলেই তা দাসী-আট্যম নামেও পরিচিত ছিল।

কুরুভাঞ্জি ব্যালে ধরণের নৃত্য-পদ্ধতি। এতে ছয় থেকে আটজন স্ত্রীলোক অংশ গ্রহণ করত। নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগের কাহিনী পদ্য ছন্দে রচিত হত। সব থেকে প্রাচীন কুরুভাঞ্জি নাট্যের নাম কুত্রল কুরুভাঞ্জি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিরুকুড়রাজ আপ্পাকবির আয়ার সেটি রচনা করেন। সাম্প্রতিককালে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী কলাক্ষেত্রের শিল্পীদের দ্বারা কুরু-ভাঞ্জি নৃত্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের প্রয়াস করছেন।

ভাগবতমেলা নাটক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীন ধর্মভিত্তিক নৃত্যনাট্য। এই গোষ্ঠী নিজেদের ভরত-মুণির বংশধর বলে মনে করে এবং 'ভগবতা' নামে পরিচয় দেয়। সাধারণতঃ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্য রচিত হত। এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে কথাকলি নৃত্য-নাট্যের যথেষ্ট মিল আছে। এবং কথা-কলির মত সারারাত্রি ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যনাট্য তেলেগু ভাষায় রচিত।

কুচিপুড়ি নৃত্য অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণ নদীর তীরে কুচিপুড়ী গ্রামের ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর দ্বারা প্রবর্তিত। এই নৃত্য-ধারায় বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনু-শাসনগুলি কঠোরভাবে পালন করা হয়। এই নৃত্যে স্ত্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করে না, পুরুষেরাই স্ত্রী ভূমিকা গ্রহণ করে।

আল্লারিপ্পু ভরতনাট্যম অনু-ষ্ঠানের প্রথম নৃত্য। তেলেগু শব্দ আল্লারিপ্পু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। অল্লারিপ্পু শব্দের অর্থ প্রস্ফুট হওয়া। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশুদ্ধ নৃত্যের জন্য সুষম সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত

করা। শিল্পী মস্তকের উপর হাত দুইটি নমস্কারের ভঙ্গিতে রেখে বোলের সঙ্গে দৃষ্টি ও গ্রীবাকর্মের মাধ্যমে এই নৃত্য আরম্ভ করেন। একে বলা হয় পূর্বরঙ্গম বা বন্দনা। এই নৃত্যে শিল্পী দেবতা, দর্শক, কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পী সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই নৃত্য প্রদর্শনে সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট।

আল্লারিপুর পর যতিস্বরম অনুষ্ঠিত হয়। এ কতকগুলি জটিল যতির সমষ্টি। সাধারণভাবে পাঁচ থেকে সাতটি যতির সমন্বয়ে এই বিশুদ্ধ নৃত্য প্রদর্শিত হয়। এবং যতিগুলি রাগ ও তাল সমন্বয়ে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সাহায্যে পরিবেশিত হয়। এতে দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত ও পদকর্ম প্রধান এবং কোনও বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হয় না। দেহের সুষম ভঙ্গিমার মাধ্যমে সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এই নৃত্যের লক্ষ্য।

যতিস্বরমের পরে অনুষ্ঠিত হয় 'শব্দম'। তেলেগু ভাষায় রচিত ভক্তি-মূলক সঙ্গীতকে অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই এই নৃত্যের লক্ষ্য। এই সঙ্গীতের মাধ্যমে নায়কের শৌর্য ও মহত্ব বর্ণনা করা হয় এবং নায়ককে অভিবাদন করে নৃত্যের সমাপ্তি হয়। একে বলে যশোনীতি। এতে সঞ্চারী ভাবই প্রধান।

শব্দমের পরে বর্ণমের অনুষ্ঠান ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির সর্বা-পেক্ষা জটিল ও আকর্ষণীয় নৃত্য। এই নৃত্যের মধ্যে নাট্যম, নৃত্যম ও নৃত্তমের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। নৃত্যের সময় এক ঘণ্টারও অধিক এবং আবহসঙ্গীত প্রণয়ের অভি-ব্যক্তিতে রচিত হয়। যতিগুলি অত্যন্ত জটিল ও দ্রুত হয়ে থাকে; একে 'থিরমনম' বলে। এর চরণমগুলি অত্যন্ত সুন্দর এবং সঙ্গীতাংশে কল্যাণী, নবরত্নমালিকা প্রভৃতি অপ্রচলিত রাগ ব্যবহার হয়। এই সঙ্গীত ভাবোচ্ছল অথবা ভক্তিমূলক হয়ে থাকে। প্রতিটি যতির সমাপ্তিতে শিল্পী সঙ্গীত সমন্বয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

বর্ণমের পর 'পদম' পরিবেশিত হয়। প্রণয়ের অভিব্যক্তিতে রচিত এই মধুর সঙ্গীতগুলি সাধারণভাবে জন-প্রিয় কবি জয়দেব, পুরন্দর দাস, ক্ষেত্রকত, মথুতন্দভর ও ভারতী রচিত। এই নৃত্য অভিনয়প্রধান, ইহাতেও অল্প যতির ব্যবহার হয়।

সর্বশেষে পরিবেশিত হয় তিল্লানা। ভরতনাট্যম নৃত্যকলার ছন্দ, লাস্য, মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয়ে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই নৃত্যে।

শিল্পী এই নৃত্যে মাঝে মাঝে নিজের দেহসৌষ্ঠবকে স্থাপত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় রূপায়িত করে। এই নৃত্যে প্রত্যেকটি যতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ে পরিবেশিত হয়। শিরঃ কর্ম, দৃষ্টি, নাসাকর্ম, ভ্রূকর্ম, তারাপুটের কর্ম, গণ্ডভেদ, ওষ্ঠ লক্ষণ, চিবুক-কর্ম, গ্রীবাকর্ম, হস্তমুদ্রা, পাদকর্ম ও সুললিত আবহসঙ্গীতসমৃদ্ধ ভরত-নাট্যম নৃত্যকলা ভাবসৌষম্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

ভরতনাট্যমের আশ্রয়রূপে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য এই চার প্রকার অভিনয়। দুটি ধর্ম—লোক-ধর্মী ও নাট্যধর্মী। চারটি বৃত্তি—ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। দুই প্রকার সিদ্ধি—দৈবিকী ও মানুষী। পাঁচটি আসনম—পদ্মাসনম, সিংহাসনম, যোগাসনম, বীরাসনম ও সিদ্ধাসনম্। চারিটি মণ্ডলা—মণ্ডলা, অর্ধমণ্ডলা, সমমণ্ডলা ও নৃত্যমণ্ডলা। তিনটি পাদকর্ম—আঞ্চিতা, কুঞ্চিতা ও অর্ধাঞ্চিতা। তিনটি ভঙ্গি—সম, ললিতা ও বলিতা। তিন প্রকার অঙ্গভেদম—করণম, অঙ্গহারম ও মুদ্রা।

ভরতনাট্যমে নবরস বিদ্যমান কিন্তু এর মূলরস শৃঙ্গার। এই নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত তাণ্ডব ও লাস্য উভয়ই শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্ট। নাট্য-শাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই তাণ্ডব নৃত্যে অধিকার আছে যদিও পরবর্তীকালে রক্ষণশীল গুরুরা নৃত্য-ভেদে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্য নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয় কারণ শৃঙ্গার রস হতে উদ্ভব বলেই তাণ্ডবের প্রয়োগ সুকুমার ও লীলায়িত গতি বিশিষ্ট এবং এতে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার। নটনাদী-বাদ্যরঞ্জনম গ্রন্থ অনুযায়ী বার প্রকার তাণ্ডব আছে। আনন্দ তাণ্ডবম্ (সঙ্গম্ব যতিনাট্যম), সান্ধ্য তাণ্ডবম (গীত-নাট্যম), শৃঙ্গার তাণ্ডবম (ভরতনাট্যম), ত্রিপুড়া তাণ্ডবম (পোরানি নাট্যম), ঊর্ধ্ব তাণ্ডবম (চিত্রা নাট্যম), মুণি তাণ্ডবম (লাস্য বাল্য নাট্যম), সংহার তাণ্ডবম (সিমহালা নাট্যম), উগ্র তাণ্ডবম (রাজ নাট্যম), ভূত তাণ্ডবম (পট্টাসা নাট্যম), প্রলয় তাণ্ডবম (পাবই নাট্যম), ভুজঙ্গ তাণ্ডবম (পিত্তা নাট্যম), শুদ্ধ তাণ্ডবম (পদশ্রী নাট্যম)।

নাট্যশাস্ত্রের 'তাণ্ডবলক্ষণ' অধ্যায়ে একশত আটটি করণের উল্লেখ আছে। হস্ত ও পদের পারস্পরিক সহযোগ করণের রূপকেই বিকশিত করে। আবার কয়েকটি করণ মিলিত হয়ে অঙ্গহার সৃষ্টি করে। নাট্যশাস্ত্রে বত্রিশটি অঙ্গহারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই করণ ও অঙ্গহারগুলি নৃত্যের সৌন্দর্যের মূল উৎস। ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় সাধারণতঃ আটাশটি

অসংযুক্ত মুদ্রা ও চব্বিশটি সংযুক্ত মুদ্রার ব্যবহার হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে ভরতনাট্যম নৃত্যে এরুবম, মিট্রিয়াম, রূবকম, জাম্বাই, তিরুপুত্তাই, আডাতালম ও একতালম এই নয়টি তালের ব্যবহার হয়। এই নয়টি তাল আবার পচটি মাত্রা ও যতি সহযোগে প্রয়োগ হয়। এই পাঁচটি তালের মাত্রার নাম সাধুশ্রম, তিশ্রম, মিশ্রম, কান্ডম, সংগীর্ণম।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ আবহসঙ্গীত। সঙ্গীতাংশে একজন সুকন্ঠ সঙ্গীতশিল্পীর বিশেষ স্থান। যন্ত্রসঙ্গীতে বীণা, তম্বুরা, বাঁশী, নফরী, সারাঙ্গী, বুদবুদিকা, মৃদঙ্গম, করতাল, বেহালা, সুরশৃঙ্গার, পুঙ্গী, নাগেস্বরম ও মন্দিরা ব্যবহার হয়। মার্গ সঙ্গীতের প্রায় সকল সমৃদ্ধ রাগ-রাগিণী এর সঙ্গীতাংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অল্লারিপু

ভারতনাট্যম নৃত্যে কোনও প্রকার অস্বাভাবিক রূপসজ্জা করা হয় না। স্বল্প প্রসাধনে তনুশ্রী উজ্জ্বল ও মসৃণ করা হয়। এই নৃত্যে পোশাকেরও কোনও নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ নেই। তবে দাক্ষিণাত্যে একটি সুন্দর পোশাকের প্রচলন আছে। শিল্পী মস্তকে ও বেণীতে ফুলের গহনা ব্যবহার করেন এবং অন্যান্য অঙ্গে রত্ন-খচিত অলঙ্কার ব্যবহার করেন।

নটরাজ (শব্দম)

প্রাচীন গ্রন্থ শিল্লাপতিকারম থেকে আমরা 'নাট্টুয়াঙ্গম' শব্দটি পাই। 'নাট্টুয়াঙ্গম' শব্দের অর্থ নৃত্য সম্প্রদায়ের নেতা। সাধারণ নৃত্য-শিক্ষককে নাট্টুবান বলা হয়ে থাকে। নাট্টুবানগণ বংশপরম্পরায় নিজেদের পেশার অধিকারী হন এবং এই পেশা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নাট্টুবানগণ চুক্তিবদ্ধভাবে মন্দিরে দেবতার চরণে নিবেদিত দেব-দাসীদের বিনা পারিশ্রমিকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে দেবদাসীদের আজীবন তাদের উপার্জনের অর্ধাংশ নাট্টুবানদের দিতে হত এবং তাদের বিনা অনুমতিতে দেবদাসীরা কোনও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। এই দেবদাসী ও নাট্টুবানগণ ভরত-নাট্যম নৃত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ছিল। দেবদাসীগণ সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে মন্দিরের সেবায় আত্মনিবেদন করত। শিক্ষা শেষ হলে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার নিকট তাদের প্রথম নৃত্যানুষ্ঠান 'আরেংদে-আটাম' অনুষ্ঠিত হত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে দেব-দাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তীকালে দেব-দাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। রাজদাসীরা মন্দিরে ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য প্রদর্শন করত। স্বদাসীরা দাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে নিম্ন

স্তরের বলে গণ্য হত। এরা তাঞ্জোরের বিখ্যাত উৎসব কুম্ভাভিষেকের সময় ছাড়া দেবতার সামনে নৃত্য করতে পারত না। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনে এরা নিয়োজিত হত। সমাজপতিদের চক্রান্তে ও নাট্টুবানদের অর্থলালসায় দেবদাসীদের পবিত্র জীবন ক্রমশঃ ব্যাভিচার ও কলুষতায় পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে এই দাসী সম্প্রদায়ের প্রায় বিলুপ্তি ঘটেছে। এবং সকল শ্রেণীর শিল্পীরাই বর্তমানে এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে।

অনেকে মনে করেন ভরতনাট্যম অন্ধ্রদেশ থেকে মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত হয়েছে। অন্ধ্রদেশের বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতস্রষ্টা 'ঋষি ত্যাগরাজ'-এর তেলেগু ভাষায় রচিত অপূর্ব সংগীতের মাধ্যমে ভরতনাট্যমের নাট্যপ্রধান নৃত্যগুলি রূপায়িত হয়ে থাকে। তাঞ্জোরের মহারাজা [illegible] সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুবন্দনা সংগীত রচনা করেন।

নটনাদীবাদ্যরঞ্জনম ও শিল্লাপতিকাম এই দুটি গ্রন্থে মাদুরা ও তাঞ্জোর প্রদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঞ্জোর রাজদরবারের

তিল্লানা

চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম ও ওয়াড়িবেলু এই চারজন বিখ্যাত ভ্রাতা এবং মাদুরার শ্রীসুভারায়া আন্নাভি, শ্রীকল্যাণী সুন্দরম পিল্লাই, শ্রীপোরিয়া-তাম্বী আন্নাভি, শ্রীপুণ্যাম্বামী আন্নাভি প্রভৃতি নাট্টুবানদের ভূমিকা ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় চিরস্মরণীয়। নাট্টুবান ওয়াড়িবেলু দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের একজন প্রতিভাবান স্রষ্টা এবং তিনিই প্রথম দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে বেহালার প্রচলন করেন।

ভরতনাট্যম নৃত্যকে জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ করবার জন্য যাঁরা আত্মনিবেদন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী আরুণ্ডেল ও শ্রীমতী বালাসরস্বতীর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। রুক্মিণী দেবী কলাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে এই শিল্প কলার পুনরুজ্জীবন ও গবেষণার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীমতী বালাসরস্বতী ভরতনাট্যম নৃত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর অভিনয়বহুল পদম এই নৃত্যধারায় নবযুগের সূচনা করেছে। এই

শব্দম

প্রসঙ্গে শ্রীমতী শান্তারাও, শ্রীমতী রাগিণী দেবী, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান প্রভৃতির অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালের নৃত্য গুরুদের মধ্যে গুরু মীণাক্ষিসুন্দরম পিল্লাই, গুরু কান্ডাপ্পা পিল্লাই, গুরু টি কে মরুথাপ্পা পিল্লাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণরূপ ভরতনাট্যম। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও ধর্মসংস্কারকদের অনুদার মনোবৃত্তি এই নৃত্যকলার পূর্ণবিকাশের প্রতিবন্ধক। একদিকে প্রাচীন দর্শন ও আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রয়াস ও অন্যদিকে শুধুমাত্র মনোবিনোদনের প্রকরণ হিসাবে এই নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসাবিণী রূপকে প্রদর্শন বিলাসে পরিণত করা, দুই প্রচেষ্টাই নিঃসন্দেহে পথচ্যুত হওয়ার লক্ষণ। সমাজে কলাকেন্দ্রের প্রভাব গড়ে উঠলে তার মাধ্যমে এই নৃত্যশিল্পের দার্শনিক সম্পদ নিশ্চয়ই জাতিগঠন ও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করবে। হয়ত সে রূপ শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হবে না কিন্তু নিঃসন্দেহে ভারতের নিজস্ব যুগোপযোগী পরিবেশে ভারত সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও সংহতির উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে পরিচিত হবে।

পদম

গেলে, গেলে,
সব নাগালের
বাইরে
চলে গেলে!
যুদ্ধ
তামাক
প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের চাহিদা
বিলিতী
ইত্যাদি
স্টেট বাস ভাড়া
কেরোসিন
পোস্টকার্ড
বৈদেশিক মুদ্রা

সংক্ষেপিত প্রতিবেশী উপন্যাস

(তামিল)

স্বপ্ন আর কৃষ্ণমূর্তি

(কল্কি)

।। এক ।।

কাবেরী নদীর তীর। ভোরের সূর্যালোকের খেলা চলছে নদীর বুকে। নির্জন তীর। কয়েকটি ডুমুর গাছের মাঝে একটি কুঁড়েঘর। ঘরে রয়েছে যুবক-যুবতী। ওরা স্বামী-স্ত্রী।

দূর থেকে শোনা গেল অশ্বক্ষুর-ধ্বনি। ঘোড়ার আওয়াজ শুনে যুবক চমকে উঠে বাইরে গেল। ফিরে এসে স্ত্রীকে বলল, ওয়াল্লি, আজ দুপুরে চোলদেশের রাজধানী ওরাইয়ুর যাচ্ছি।

—কেন, সেখানে আজ কি আছে?

—আজ পল্লব রাজার রাজধানী কাঞ্চি থেকে কর আদায় করতে দূত আসলে আমাদের রাজা কর দিতে অস্বীকার করবেন। ঐ ব্যাপারে আমাকে যেতেই হবে। ওয়াল্লির স্বামী পোন্নন বলল।

—আমি এখানে একা থাকব কি করে? আমি বরং তোমার সঙ্গে গিয়ে ঠাকুর্দাকে দেখে আসি।

পোন্নন এবং ওয়াল্লি রাজধানীতে পৌঁছল গোধূলিবেলায়। অস্তমান সূর্যের সোনার আলোয় যেন ওরাইয়ুর স্নান করছে। পোন্নন তাড়াতাড়ি ওয়াল্লিকে ওর ঠাকুর্দার-বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল। যাওয়ার মুখে ওয়াল্লির বৃদ্ধ ঠাকুর্দা বলল, মহারাজের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ পেলে মারপ্প ভূপতির সঙ্গে সাবধানে চলাফেরা করতে বলো মহারাজকে।

মারপ্প ভূপতি রাজা পার্থিবের বৈমাত্রেয় ভাই। রাজা তাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন এবং নিজের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির পদও তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূপতি তৃপ্ত নয়। সে চায় না চোলরাজা পল্লবদের কবল থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করুক। স্বাধীনতা-পূজারী রাজা পার্থিব যখন ভূপতির মনের এই কথা টের পেলেন—তখন আর ভূপতিকে সেনাপতির পদে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তাকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে রাজা পার্থিব, রাণী আরুলমোল্লির সঙ্গে দেখা করলেন মন্দিরে ডেকে। এককোণ থেকে কাঠের একটি সযত্নে রক্ষিত বাক্স বের করে তার ভেতর থেকে একটি তলোয়ার এবং একটি পুঁথি দেখিয়ে বললেন, এই তলোয়ার চোলবংশের গর্বের ও কীর্তির স্মারক। অতীতে এই তলোয়ারের জোরেই রাজা করিকাল বলনে এবং নেডুমুডি কিলিনের মত মহান রাজারা রাজত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধি করেছেন। আর এই পুঁথি হল দেব-কবি তিরুবল্লুবরের পবিত্র তিরুক্কুরল। বহুকাল ধরে এ-দুটি জিনিস চোলপরিবারে রয়েছে। এ-দুটো চোখের মণির মত তুমি রক্ষা করবে এবং বিক্রমের বয়স হলে তার হাতে সঁপে দেবে। আরুলমোলি, এই পবিত্র তলোয়ার আমার বাবা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমি করতে পারিনি। অন্য কোন রাজাকে রাজস্ব দিয়ে রাজত্ব করার মাধ্যমে কোন মাহাত্ম্য নেই। আমাদের সন্তান বিক্রম যেদিন এক বিঘে জমিরও স্বাধীন রাজা হবে সেইদিন তার হাতে এই পবিত্র তলোয়ার ও গ্রন্থ তুলে দিও। আমি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছি। এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে আমাকে কথা দাও, তুমি আমার পরে বিক্রমকে সযত্নে মানুষ করবে, তাকে বীর করে তুলবে।

আরুলমোলি ছিলেন সেকালের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। চের-রাজকন্যা তিনি। যুবরাজ নরসিংহের সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার জন্য কাঞ্চির পল্লব-চক্রবর্তী মহেন্দ্র খুব চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আরুলমোলি স্বয়ম্বরা। একবার যাকে মন দিয়েছেন, চিরকালের জন্য তাকেই তিনি সব কিছু দিতে চেয়েছেন।

।। দুই ।।

ওরাইয়ুরের দক্ষিণে রাজবীথিস্থ চিত্রমন্দির সমগ্র দক্ষিণ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাঞ্চিপুরমে মহেন্দ্রচক্রবর্তী নির্মিত সুপ্রসিদ্ধ চিত্রমন্দির এর কাছে তুচ্ছ।

মহারাজ পার্থিব যুবরাজ বিক্রমকে নিয়ে চিত্রমন্দিরের সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন। পোন্ননও পৌঁছালেন সেখানে। তার হাতে ছিল একটি মশাল। তিনজনে চিত্রমন্দিরে ঢুকলেন। তিনটি বিরাট হলঘর পেরিয়ে রাজা পার্থিব এক বন্ধ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিক্রমকে বললেন, বাবা, বহুবার তুমি জিজ্ঞেস করেছো এই ঘরে কি আছে। ভেবেছিলাম আরও কয়েক বছর পরে এ-ঘরে যা আছে তা তোমাকে দেখাব, কিন্তু সময় আর নেই। আজ তোমাকে না দেখালেই নয়। বিক্রম, এ-ঘরে আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি।...... পোন্নন,

মশালটা আর একটু ওপরের দিকে তোলো।

পোম্নন তাই করল। রাজা ঐ ঘরে ঢুকে বললেন, বিক্রম, এই প্রথম চিত্রটি দেখে বল ত কি বুঝেছ?

—হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধ করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

—এ ছবি আমিই এ'কেছি। গত বার বছরে নিদ্রায়-জাগরণে যত ছবি আমার মানসপটে ভেসে উঠেছে সেগুলোকেই একটা রূপ দিয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। এ-ছবিটা আরও ভাল করে দেখে বল ত এত সৈন্য কার অধীনে?

—সামনের সারির সৈন্য ব্যাঘ্র-পতাকা উড়িয়ে যেভাবে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তাতে স্পষ্টই মনে হয় ওরা চোল-রাজার অধীনে। কিন্তু বাবা.........

বিক্রম থেমে গেলেন। রাজা বললেন, নিঃসঙ্কোচে বল বিক্রম, কি জানতে চাও?

—জানতে চাই, সামনের সারিতে রাজসিক জাঁক-জমকের সঙ্গে যে-হাতী এগিয়ে চলেছে তার পিঠে শুধু মাহুত ছাড়া আর কেউ নেই কেন?

—কঠিন প্রশ্ন করেছো। আমি সজ্ঞানেই এই জায়গায় কাউকে বসাইনি। আমাদের চোলবংশের যে সন্তান, এরকম বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিক্‌বিজয়ে বেরোবে একমাত্র তাঁরই ছবি ঐ শূন্যস্থানে আঁকা হোক এই আমি চাই। বিক্রম, এখন আমাদের চোলরাজ্য কত ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু আগে এত ছোট ছিল না। নিকট অতীতেই আমাদের চোলবংশের কীর্তি ছিল দিগন্তবিস্তৃত। আমি সবসময় স্বপ্ন দেখি, আবার আমাদের চোলরাজার ভূমি হবে দিগন্তবিস্তৃত। এইটাই আমার মনের একমাত্র জ্বলন্ত কামনা। রাজ্যবিস্তারের চিন্তাই আমাকে দিনরাত দগ্ধ করছে।

।। তিন ।।

পূর্ণিমার রাত। বেন্নারু-নদীর তীরে এক ভয়ংকর হৃৎকম্পকারী নারকীয় দৃশ্য। সারাদিনের তুমুল যুদ্ধের ফলে ঐ তটভূমি শবদেহে ভরে গেছে। এই রক্তাক্ত পটভূমিতে ধীরপদক্ষেপে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এগিয়ে চলেছেন। মাথায় তাঁর একরাশ বিভূতি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরনে গেরুয়া বস্ত্র, কাঁধে ব্যাঘ্রচর্ম। একটি একটি করে শবদেহ দেখছেন আর এগিয়ে চলেছেন। পার্থিবরাজার দেহ দেখে চমকে উঠে সেখানেই বসে পড়লেন। মুহূর্তে রাজার মাথা কোলে টেনে নিয়ে কমণ্ডলুর জল তাঁর দেহের ক্ষতবিক্ষত স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। রাজা পার্থিবের শরীর একটু নড়ল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আধবোজা চোখে বললেন, কে আপনি?

—সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর ইচ্ছায় চলছে সেই সচ্চিদানন্দ-ভগবানের দাসানুদাস আমি। পার্থিব, শুনেছি আজকের যুদ্ধে তুমি আশ্চর্যজনক শৌর্যবীর্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছো। তাই তোমাকে দেখার প্রবল ইচ্ছে জেগেছিল মনে, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।

রাজা পার্থিবের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—পার্থিব, তোমার মত বীরপুরুষের সেবা করা আমি নিজের কর্তব্য ব'লে মনে করি। তোমার কোন অপূর্ণ ইচ্ছা থাকলে বল। আমি তা পূর্ণ করার চেষ্টা করব।

ঐ শিবযোগীর কথা শুনে রাজা পার্থিব বললেন, প্রভু, আমি চাই আমার পুত্র বিক্রম বীর হোক, আর চোল-রাজ্যের উন্নতিবিধানই সে তার নিজের জীবনের চরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করুক। সে যেন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। চোলবংশের সম্মান রক্ষা ও পরাক্রম প্রদর্শনই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে। পরাধীন জীবন যেন সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। প্রভু, আমি আপনার কাছে শুধু এই ইচ্ছাই পূর্ণ করার সাহায্য চাই। আপনি কি সে সাহায্য করবেন?

শিবযোগী শান্তকণ্ঠে বললেন, রাজা পার্থিব, যতদিন আমার দেহে প্রাণ আছে ততদিন তোমার ইচ্ছাপূরণে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—প্রভু, আপনার এই কথা আমাকে যথেষ্ট শান্তি দিয়েছে। আপনার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পাওয়াই আমার সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথা। এখন আমার মনে কোন অপূর্ণতা নেই। এবার যদি দয়া করে আপনার নিজের পরিচয় দেন তবে আমি অত্যন্ত ধন্য হব। আপনার এই পবিত্র শরীর থেকে এমন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে যে.........

কথা শেষ হতে না হতেই শিবযোগী জটা সরিয়ে নিজের আসল রূপ প্রদর্শন করলেন। বিস্ময়ে রাজা পার্থিব হতবাক্। তাঁর বিস্ফারিত চোখে চরম বিস্ময়ের সমুজ্জ্বল ছাপ। তাঁর চোখ ঐভাবে খোলাই রয়ে গেল। রাজা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।.........

জটাজুটধারী শিবযোগী নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। যুবরাজ বিক্রমের মনে দেশপ্রেম, দেশাভিমান ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার যে মন্ত্র তিনি বপন করেছেন, তা বছর ছয়েকের মধ্যেই তার জীবনকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। সে বীজ তার মনে বটবৃক্ষের মত ব্যাপ্তিলাভ করেছে। বিক্রম একদিন শিবযোগীকে বলল, প্রভু, আমাকে আশীর্বাদ দিন। আগামী ভাদ্রমাসের পূর্ণিমার দিন ত্রিচিরাপল্লীর পাহাড়ের চূড়া থেকে পল্লবরাজদের ধ্বজা নামিয়ে আমি সেখানে আমাদের ব্যাঘ্র-ধ্বজা প্রোথিত করতে চাই।

—কিন্তু বিক্রম, শুধু পতাকা ওড়ানই তো যথেষ্ট নয়, সেটাকে রক্ষা করা এক

আমাদের রাজা কর দিতে অস্বীকার করবেন

বিরাট দায়িত্ব। তার কি কোন ব্যবস্থা করেছ?

—প্রভু, কাকা মারপ্প ভূপতি আজকাল মত বদলেছেন। চোলদেশের স্বাধীনতার জন্য উনি শেষ রক্তবিন্দুও পাত করতে প্রস্তুত।

বিক্রমের কথা শুনে শিবযোগী মনে মনে হাসলেন।

।। চার ।।

কাঞ্চনগরের রাজপথ ধরে রাজকুমারী কুন্দবী পালকি করে যাচ্ছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, অপূর্বসুন্দর এক রাজলক্ষণবিশিষ্ট উজ্জ্বল যুবককে লোহার শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘোড়ার জিনের সঙ্গে বেঁধে পল্লব-সৈনিকরা নিয়ে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে, যাকে নিয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টিও রাজকুমারীর উপর পড়ল। চার চোখ এক হল। ওদের এই সাক্ষাতের পিছনে কি ছিল বিধাতার মনে জানি না, রাজকুমারী আত্মবিহ্বলা হয়ে উঠল।

রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেই কুন্দবী বাবাকে বলল, বাবা, পথে দেখেছি আমাদের সৈন্য কোন এক যুবককে শিকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। চেহারা দেখে মনে হল সে রাজকুমার। সে কে বাবা?

—এ-সেই চোলরাজকুমার, মা। যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চক্রান্ত করেছে। কোন এক শিবযোগী মাঝে মাঝে তার এবং তার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসে। জানতে পারলাম সেই লোকটাই নাকি এই যুবককে মন্ত্রণা দিয়েছে। তারই জন্য নাকি যুবকটা এরকম উৎপাত শুরু করেছে।

—ওরাইয়ূরে কি যুদ্ধ হয়েছে, বাবা?

—না মা, যুদ্ধ হতে যাবে কেন? সে নিজেই বোকামি করে ধরা দিয়েছে। তার কাকা তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল, বলেছিল বহু সৈন্য দিয়ে যথাসময়ে তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু ঠিক সময় তাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা যুবকটি যে-গোপন পথ দিয়ে আসবে স্থির করেছিল সে-সম্পর্কে ওর কাকা নিজেই আমাদের সেনাপতির কাছে গোপনে খবর পাঠিয়েছে।

সারারাত কুন্দবী ঘুমোতে পারেনি। চোল-রাজকুমারের বিষাদক্লিষ্ট চোখমুখ তার মানসপটে জ্বলজ্বল করছিল। পরের দিন সকালে জানতে পারল যে, চক্রবর্তী নরসিংহ বর্মার সামনে দাঁড়িয়েই চোলরাজকুমার বিক্রম রাজস্ব দিতে গররাজী হয়েছে। এই ধৃষ্টতার জন্য মৃত্যুদণ্ড রাজা দিতে পারতেন। কিন্তু সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে তিনি দ্বীপান্তরের সাজা দিলেন।

কুন্দবী একটু সান্ত্বনা পেল। কিন্তু দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগে বিক্রমকে সে একবার দু-চোখ ভরে দেখতে চায়। তাই তৎক্ষণাৎ সে পালকি আনিয়ে মামল্লপুরমের বন্দরের দিকে রওনা হল। রাজকুমারীর ইচ্ছা পূর্ণ হল। মুহূর্তের জন্য হলেও চার চোখ আবার এক হল। দুজনের চোখেই ভাষা আছে। ঐ চোখগুলো যেন বলছে: হাজার বছর ধরে আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমাদের সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। আমরা পরস্পরের অভিন্নহৃদয় সাথী।

দীর্ঘ বার দিন পরে রাজার জাহাজ রাজকুমার বিক্রমকে চম্পক-দ্বীপে নামিয়ে দিল। এই দ্বীপ কোন একসময় চোলরাজাদেরই অধীনে নাকি ছিল। বিক্রমকে পেয়ে চম্পক দ্বীপের লোক আনন্দিত ও উৎসাহিত হল।

।। পাঁচ ।।

পল্লব সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কে কতখানি দায়ী—এই চক্রান্তের অন্তরালে কারা আছে এ সমস্তকিছু তদন্ত করার জন্য চক্রবর্তী নরসিংহ বর্মা তাঁর আদুরে মেয়ে কুন্দবীকে সঙ্গে করে ওরাইয়ূরে এসেছিলেন। পোন্নন এবং ওয়াল্লিকে রাজার সামনে হাজির করা হল। চক্রবর্তী বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, নাবিক, সত্যি কথা বল। আমার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিক্রমকে কে প্ররোচনা দিয়েছে? কার বুদ্ধিতে এসব হয়েছে?

পোন্নন নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে জোর দিয়ে বলল, মহারাজ, যার চক্রান্তে এসব হয়েছে, সে আপনারই সামনে দাঁড়িয়ে। মারপ্প ভূপতি এ সমস্তকিছুর জন্য দায়ী।

পোন্ননের কথা শুনে মারপ্প ভূপতি এমন ছটফট করতে লাগল যেন তার গায়ে হাজার হাজার কাঁকড়া-বিছা একসঙ্গে হুল ফুটিয়েছে।

চক্রবর্তী অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূপতি, এই অভিযোগের কোন সদুত্তর তোমার দেওয়ার থাকে তো দিতে পার।

—মহারাজ, বিক্রমকে এই দাসানুদাস নয়, এক জটাজুটধারী শিবযোগীই প্ররোচনা দিয়েছে। গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করে জটা পাকিয়ে লোকটা ঘুরে বেড়ায় বটে, কিন্তু আসলে সে একজন চক্রান্তকারী ছাড়া আর কেউ নয়। যুবরাজ বিক্রম এবং মহারাণী আরুলমোলির সঙ্গে তার প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হয়। এই নাবিকের ঘরেই তাদের সাক্ষাতের স্থান।

ওর কথা শুনে ওয়াল্লি আর চুপ করে থাকতে পারেনি, বলল—মহারাজ, এর কথা ডাহা মিথ্যা। শিবযোগী একজন সাত্যিকারের মহাত্মা। উনি হিংসাদ্বেষ, চক্রান্ত সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। আমাদের মহারাণী এখনও যে বেঁচে আছেন সেটা তাঁরই সান্ত্বনা দেওয়ার ফলে। আমি ঠিক জানি উনি আমাদের যুবরাজ বিক্রমকে যুদ্ধ না করার জন্যই বলেছেন, যুদ্ধ করার জন্য নয়। শিবযোগী শান্তিপ্রিয় লোক। উনি এসব কাজ করার জন্য কাউকে প্ররোচিত করতে পারেন না। যে ঐ ধরনের মহাত্মার উপর দোষ চাপায় সে নিজেই দোষী, পাপী।

চক্রবর্তী বললেন, ভূপতি, তুমি যা বলেছ সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তোমার কথার পরও তোমার উপর একটুও সন্দেহ কমেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবারের মত তোমাকে ক্ষমা করছি। সেনাপতি হতে চাও তো আগে নিজে যোগ্যতার পরিচয় দাও। তারপর পোন্ননের দিকে তাকিয়ে বললেন, নাবিক, তুমি এখন সস্ত্রীক ফিরে যাও। তবে যাওয়ার আগে তোমাকে একটি কথা বলে রাখি। তোমার
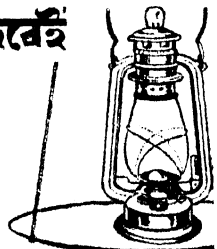
স্ত্রীকে বলবে, ওই শিবযোগীর উপর কড়া নজর রাখতে।

।। ছয় ।।

রাজার এই ব্যবহারের ফলে মারপ্প ভূপতি বিরূপ হ'য়ে উঠল। পল্লব-সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সে কিই না করেছে। সাত বছর আগে রাজা পার্থিব পল্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যে আয়োজন করেছিলেন তাতে সে পার্থিবের সহায়তা করেনি। শুধু তাই নয়, মাত্র এই সেদিন বিক্রমের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েও পল্লবসাম্রাজ্যকে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে সে বাঁচিয়েছে। এত কিছু করার পেছনে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। চোলরাজ্যের সিংহাসন পাওয়া। কিন্তু চক্রবর্তী উল্টো তারই উপর সমস্তকিছুর দোষ চাপিয়েছেন। তাও একান্তে নয়। এক তুচ্ছ নাবিক এবং নাবিক-পত্নীর সামনে। এটা কি কম অপমান।

এই সব দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে ভূপতি। হঠাৎ নজরে পড়ল সামনে দিয়ে রাজপরিবারের পালকি আসছে। তৎক্ষণাৎ সে নামল ঘোড়া থেকে।

পালকির ভেতর থেকে পল্লবরাজ-কুমারী কোমলকণ্ঠে বললেন, ভূপতি, বাবা আজ তোমার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করেছেন তাতে তুমি কিছু মনে কর না। তুমি যেন-তেন-প্রকারেণ এই চক্রান্তকারী শিবযোগীকে রাজার হাতে ধরিয়ে দাও, দেখবে বাবা খুব খুশী হবেন তোমার উপর।

রাজকুমারীর কথায় মারপ্প ভূপতির চোখের সামনে আবার নতুন আশার আলো ফুটে উঠল। সে ভয়ভক্তিমিশ্রিত স্বরে বলল, আপনি আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। ঐ ছদ্মবেশী সাধুকে না ধরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাব না।

কাবেরীর বুকে মাতালের মত দুলতে-দুলতে এগিয়ে চলেছে একটি নৌকো। নৌকায় রয়েছে পোন্নন এবং তার বউ ওয়াল্লি। ক্ষীণ একটা আশা নিয়ে মারপ্প ভূপতি ঐ নৌকা অনুসরণ করল।

কিছুদূর যাওয়ার পর নৌকাটা থামল। পোন্নন এবং তার বউ নামল তীরে। গেল কাছের একটি মহলের কাছে। পোন্নন একগোছা চাবি বের করে দরজা খুলল। ভেতরে ঢুকল দুজনে।

মারপ্প ভূপতি ভাবল, আর যাই হোক, নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যাপার আছে এখানে। তা নাহলে ওরা আসবে কেন। এক্ষুণি শিবযোগীও এখানে আসবেই। ঠিক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে এক ঢিলে তিনটি পাখী মারতে পারা যাবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে ঝট করে মহলের দরজার বাইরের দিক থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে লোক ডাকতে চলে গেল সে।
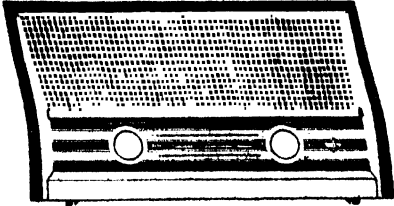
মারপ্প ভূপতি যা ভেবেছিল বাস্তবে ঠিক তা করতে পারল না। তার যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই শিবযোগী অন্যপথ ধরে এসে ছিটকিনি খুলে কাছের এক গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ পর পোন্নন এবং ওয়াল্লি মহল থেকে বেরিয়ে এল। পোন্ননের হাতে একটি বাক্স। এই সেই বাক্স যার ভিতর চোলবংশের অমূল্য সম্পদ একটি তলোয়ার এবং তিরুক্কুরল গ্রন্থ রক্ষিত ছিল।

পোন্নন এবং তার বউ ঐ বাক্স নিয়ে নৌকোয় পা রাখতে না রাখতেই দেখল একদল লোক মশাল নিয়ে তাদের এদিকে ছুটে আসছে। প্রাণের ভয়ের চেয়েও এই পবিত্র জিনিসগুলিকে হারানোর ভয় তাদের বেশি। ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শিবযোগী বললেন, পোন্নন, এখন আর চিন্তা করার সময় নেই। এই বাক্স আমার হাতে দাও। আমি খুব সাবধানে এটা রেখে আবার সুযোগ বুঝে তোমার হাতেই এটা দেব।

পোন্নন কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে শিবযোগীর হাতেই বাক্সটা তুলে দিল।

পরমুহূর্তেই মারপ্প ভূপতি সদলবলে পৌঁছে গেল নৌকোর কাছে। ভূপতি তন্নতন্ন করে নৌকোর ভিতর খুঁজল। কিছু না পেয়ে লজ্জায় তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

।। সাত ।।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে সুন্দরতম নগরী মামল্লপুরমে প্রত্যেক বছরের মত এবছরও কলা-প্রদর্শনী উৎসব জমে উঠেছে। জনতার আনন্দ-উৎসাহের সীমা নেই। এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে। এবারেও এসেছে। বিদেশীদের মধ্যে এক জহুরীও ছিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত কলা-

প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি জিনিস খ‍ুঁটিয়ে খ‍ুঁটিয়ে দেখছে। তার সংগে একটি ভৃত্য রয়েছে। লোকটা বামনাকৃতি। এবং সে শ‍ুধ‍ু কানেই খাটো নয়, বোবাও।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা কোলাহল শোনা গেল। জহ‍ুরী ঘ‍ুরে তাকাল। একটা পাল্কি আসছে। মনে হল সেই পাল্কির ভিতর থেকে দ‍ুটি কাজলকালো চোখ তার দিকে তাকাচ্ছে। তারও ইচ্ছে করল পাল্কির ভিতর দিকে তাকানোর। কিন্তু সে ইচ্ছে মনের গভীরে রয়ে গেল।

হঠাৎ কোত্থেকে মারম্প ভূপতি তার সামনে হাজির হয়ে বলল, আরে ও মশাই, রাস্তার উপর ওমন হাঁ-করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছেন কি?

জহ‍ুরী নিজেকে সামলে নিয়ে কিছ‍ু বলার আগেই ভূপতি আবার এক নিঃশ্বাসে অনেকগ‍ুলো প্রশ্ন করল, কে আপনি? কোন দেশ থেকে এসেছেন? কি নাম? কেন এসেছেন এখানে?

—নিতান্তই জানতে চান তো শ‍ুন‍ুন, আমার নাম দেবসেন। আমি জহ‍ুরী। মণি-মুক্তোর ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।

—তাই নাকি! কোত্থেকে এসেছেন আপনি? মানে, কোন দেশের লোক আপনি?

—চমৎকার! নিজের পরিচয় না দিয়ে আপনি দেখছি আমাকে অনেকগ‍ুলো প্রশ্ন করছেন!

ভূপতি হো-হো করে হেসে বলল, আমাকে চেনেন না? আমি হলাম স্বর্গত পার্থিব মহারাজের ভাই এবং চোল-রাজ্যের সেনাপতি।

জহ‍ুরী ভূপতিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, আপনিই তাহলে সেই পার্থিব মহারাজের ভাই? তাঁর স‍ুপ‍ুত্র তো আমাদের চম্পকদ্বীপে রাজত্ব করছেন?

মুহ‍ূর্তে ভূপতির চোখ বিস্ময়ে চমকে উঠল। নিজেকে সংযত রেখে বলল, আপনি বলছেন যে, বিক্রম আপনাদের দেশের রাজা? আপনার রাজা কি জানেন যে, তাঁর মা আর‍ুলমোলির কী চরম অবস্থা!

যে উদ্দেশ্যে মারম্প ভূপতি এই কথা বলেছিল তা সফল হল। যে জহ‍ুরীর চেহারায় এতক্ষণ কোন ভাবপরিবর্তন হয়নি, সে এই কথা শ‍ুনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কম্পিত গলায় ব্যগ্রভাবে বলল, মহারাণী আর‍ুলমোলির কি হয়েছে?

সংগে সংগে মারম্প ভূপতির চোখে-মুখে এক কুটিল ভাব ভেসে উঠল। ইতি-মধ্যে রাজসৈন্য কাছে এসে গেল। জহ‍ুরীকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে তার সংগে আর কোন কথা না বলে ভূপতি চলে গেল।

॥ আট ॥

ঐ জহ‍ুরী আর কেউ নয়, স্বয়ং নির্বাসিত যুবরাজ বিক্রম। নির্বাসিত হওয়ার পর বিনা অন‍ুমতিতে দেশে প্রবেশ নিষেধ। তাই জহ‍ুরীর ছদ্মবেশে এসেছিল বিক্রম।

চম্পক দ্বীপে তিন বছর কেটে গেছে। বিক্রম সেখানে এমন স‍ুন্দরভাবে রাজকাজ পরিচালনা করল যে চারদিকে তার স‍ুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বাইরের প্রশংসা যতই পাক না কেন, বিগত তিন বছরের মধ্যে একদিনও সে মা এবং মাতৃ-ভূমিকে ভুলতে পারেনি। নির্জনে বসে সে তার জন্য বহ‍ুদিন অশ্র‍ুপাত করেছে। মা এবং মাতৃভূমির কথা চিন্তা করার সময় পল্লব-রাজকুমারীর কথাও তার মনে জাগত। কুন্দবীর প্রতিচ্ছবি তার মানস-পটে চিরজাগর‍ুক।

মায়ের অবস্থা সম্পর্কে মারম্প ভূপতি যে সন্দেহজনক খবর পরিবেশন করল তাতে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে বিচলিত না হয়ে পারেনি বিক্রম। পাখা থাকলে সেই মুহ‍ূর্তেই হয়ত সে উড়ে যেত ওরাইয়‍ুরে।

ক্লান্তশ্রান্ত বিষণ্ণ মনে বীর পায়ে পায়ে বিশ্রামশালায় গিয়ে সেখান থেকে ঐ বামনকে নিয়ে সে ওরাইয়‍ুর রওনা হল। শৈশব-কৈশোর যার কেটেছে রাজপ্রাসাদে সে পায়ে-হাঁটা পথে যাবে কি করে! তাই বামনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে সংগে নিল। এ-পথ ও-পথ করে ঘ‍ুরে ঘ‍ুরে বামন বিক্রমকে নিয়ে এল গভীর অরণ্যে। স‍ুর্যাস্তের পর ঐ অরণ্যে অন্ধকার নামল তার গভীর কালো ডানা মেলে। দ‍ূরে থেকে শোনা গেল অশ্বক্ষ‍ুর-ধ্বনি। বামন চমকে উঠে কান খাড়া করে শ‍ুনতে লাগল সেই শব্দ। তার ভাবান্তর দেখে বিক্রম আশ্চর্য হল। লোকটা বোবা, কানে শোনে না, সে আবার কান পেতে কি শোনার চেষ্টা করছে? সন্দেহ হল তার উপর। হঠাৎ অস্ত্র বের করে তাকে ভয় প্রদর্শন ক'রে বলল, সত্যি কথা বল কেন এইভাবে লোকের কাছে বোবা-কালা বলে পরিচয় দিচ্ছ।

সে হো-হো করে হেসে মুখের ভিতর আঙ‍ুল প‍ুরে অদ্ভুত এক শব্দ করল। তৎক্ষণাৎ গাছের আড়াল থেকে চারজন লোক বেরিয়ে এসে বিক্রমকে ঘিরে ধরল। নিশ্চিত বিপদ জেনেও বিক্রম হত-ব‍ুদ্ধি হয়নি। উন্মত্ত হাতীর দলের মধ্যে পড়লেও কি আর সিংহশাবক ভীত হয়? অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ দলের দ‍ুজনকে ভূপাতিত করে পরক্ষণে এক আঘাতে বামনকেও মাটিতে শ‍ুইয়ে দিল বিক্রম। তারপর আবার শোনা গেল সেই অশ্ব-ক্ষ‍ুরের শব্দ। তাকিয়ে দেখল, ঘোড়া ছ‍ুটিয়ে কে যেন আসছে তার দিকে। বিক্রম বুঝল আজ আর তার উদ্ধার নেই। কিন্তু ভয়ের স্থান তার মনে নেই। তাই দ্বিগ‍ুণ উৎসাহে অস্ত্রচালনা করে তৃতীয়টিকেও মাটিতে ফেলে দিয়ে চতুর্থের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই দেখে এই লোকটার মাথা ঘাড় থেকে নেমে গেছে। মাথাটা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ঠোঁটদ‍ুটো কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

বিক্রম বিস্মিত হয়ে গেল। ঘোড়-সওয়ার বলল, কে আপনি? এই গভীর অন্ধকারে বনপথ ধরে কোথায় যাচ্ছেন?

—আমি এক ব্যবসায়ী, এই পথ ধরে ওরাইয়‍ুরে যাচ্ছি। হঠাৎ এই বিপদে পড়তে হল। আপনি ঠিক সময় এসে গেছেন, তা নাহলে.........

—না হলে কি হত? আপনি নিজেও তো একজন মস্তবড় যোদ্ধা, বীর: কোন্ দেশ থেকে আসছেন আপনি?

—চম্পক দ্বীপ থেকে।

—চম্পক দ্বীপ থেকে আসছেন! তা ওরাইয়‍ুরে কোন্ দরকার কাজে যাচ্ছেন?

—তাও আপনাকে জানাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আপনারও সামান্য একটু পরিচয় চাই।

—আমি চক্রবর্তী নরেশের এক সাধারণ সেবক। এখানকার গ‍ুপ্তচর বিভাগের নেতা। জানতে পারলাম আপনি এই পথ ধরে একা যাচ্ছেন। তাই আপনার যাতে কোন বিপদ না ঘটে সেজন্য ছ‍ুটে এলাম। আপনার উপর কোন কিছ‍ু ঘটলে চক্রবর্তী নরেশের আদর্শ-রাজ্য-পরিচালনা সম্পর্কে আপনার মনে সন্দেহ

জাগতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই আপনার পিছনে আছি।

—আশ্চর্য। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম যে এ-রাজত্বে রাজ্যপরিচালনার কাজ কত শিথিল। নির্ভয়ে একজন লোক পথ চলতে পারে না। ভালকথা, আপনার কাছে আর একটি সাহায্য কি আশা করতে পারি?

—আপনার ওরাইয়ুর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে এই তো? আপনি খুব চালাক ব্যবসায়ী দেখছি। ও-ব্যাপারে আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আমি ঘোড়া দিচ্ছি। কাল সকালে ওরাইয়ুর যাবেন। এখানে কাছে শিল্পপ্রদর্শনী রয়েছে —চলুন আজ সেখানে বিশ্রাম করবেন।

।। নয় ।।

মামল্লপুরমের কলা-প্রদর্শনী দেখে- কুন্দবী এবং যুবরাজ মহেন্দ্র কাঞ্চী- পুরমের রাজপ্রাসাদে ফিরে এল। অন্দর-

মহলে প্রবেশ করে কুন্দবী দেখল তার বাবার আসনে অচেনা একজন লোক বসে রয়েছে। তার এই ধৃষ্টতা দেখে কুন্দবী খুব আশ্চর্য ও ক্রুদ্ধ হল।

—কে তুমি? কার আদেশে অন্দর-মহলে ঢুকেছো?

—দেবী, আমি পল্লব-সাম্রাজ্যের প্রধান গুপ্তচর। আমার নাম বীর সেন। পরক্ষণে নকল গোঁফ-দাড়ি খুলে ফেলল চক্রবর্তী নরসিংহবর্ম্মা। কুন্দবী ছুটে গিয়ে অবাক হয়ে বলল, বাবা, তুমি।

—খুব অবাক হয়েছিস মা? ছদ্মবেশ ধারণ একটা শিল্পকলা। এই ছদ্মবেশেই কাল রাত্রে আমি এক জহুরীর প্রাণ রক্ষা করেছি। মধ্য-রাত্রে সে বনপথ ধরে ওরাইয়ুর যাচ্ছিল।

—বাবা সেই জহুরী কাঞ্চি না এসে ওরাইয়ুর গেল কেন? সেখানকার রাজ-প্রাসাদে তো কেউ নেই। কুন্দবী জহুরীর সম্পর্কে কিছু জানতে চায়।

—রাজপ্রাসাদে কেউ না থাকলে কি হয়েছে। ও তো যাচ্ছিল তার মার সঙ্গে দেখা করতে।

রাজকুমারীর [illegible] ঐ জহুরী আর কেউ নয়, নিশ্চয়ই যুবরাজ বিক্রম।

—বাবা, রাণী [illegible] কাছেই কোন রাজসভার উপর কেউ হাত তুললে অথবা [illegible] ধনদৌলত লুটপাট করলে তাতে কি লোকের মনে তোমার [illegible] সম্পর্কে অনাস্থা জাগবে [illegible] এই সব চোর ডাকাতদের একটা কড়া শাস্তি দিতে পার না?

—আমিও তো তোমার মত ওদের চোর-ডাকাতই ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে যা জেনেছি তাতে মনে হয় ওরা অনেক গভীর জলের মাছ। ব্যাপারটা অনেক জটিল।

—মানে?

—অমন সুন্দর রাজপুত্রের মত দেখতে এক যুবককে ওরা নরবলি দিতে চায়। মহারাজ কুন্দবীর দিকে না তাকিয়েই বললেন। কুন্দবী চমকে উঠে বলল, সে কি বাবা! আমাদের দেশে কি এখনও সেই ভয়ংকর পৈশাচিক প্রথা চালু আছে?

—আছে কুন্দবী। এই ভয়ংকর অন্ধ-সংস্কার সমূলে উৎপাটিত করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও সফল হতে পারিনি।

—তুমি ঠিক সময় ওখানে না পৌঁছলে বাবা, ভাবতেই পারছি না। কুন্দবীর চোখে-মুখে আশংকার ছাপ।

—সেই বেঁটে লোকটার উপর আগে থেকেই আমার একটা সন্দেহ ছিল। সে কোন এক কাপালিকের হাতের পুতুল। আজ আমার সেই সন্দেহ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যাক, ঐ জহুরীকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে ওরাইয়ুর পাঠিয়ে দিয়েছি।

এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুন্দবী কি একটা যেন ভেবে বলল, বাবা, ভাই আজও ওরাইয়ুর দেখেনি। আমরা অনেকদিন ধরে ভাবছি দুজনে ওরাইয়ুর যাব। বল না বাবা, যাব?

।। দশ ।।

বিপদ যখন আসে একা আসে না। প্রধান গুপ্তচরের ঘোড়ায় চড়ে বিক্রম সোজা ওরাইয়ুরের পথ ধরল। খাওয়া-দাওয়া ঘুম সব সে ভুলে গেছে। কতক্ষণে ওরাইয়ুরে গিয়ে মাকে দেখবে এই তার চিন্তা। কিন্তু সন্ধ্যা নামতে না নামতেই বৃষ্টি নামল মুষলধারায়। পথে একটা নদী পড়ে। সাধারণ অবস্থায় পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু সেদিন ঝড়-বৃষ্টির ফলে ঘোড়া নিয়ে জলে নামার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে বিক্রম পড়ে গেল। ঢেউগুলো ঘোড়াকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বিক্রম প্রাণপণ চেষ্টা করে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে পারছিল না। শেষে অচৈতন্য অবস্থায় জলে ভাসতে লাগল। জ্ঞান ফিরলে দেখে নদীর তীরে মহেন্দ্র-মণ্ডপে পড়ে রয়েছে। তার কাছে বসেছে পোন্নান মাঝি। তাকে দেখেই বিক্রম বলল, মা কেমন আছে?

মহারাণীর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে পোন্নান মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিক্রমের বুক ধক্ করে উঠল। অস্ফুট স্বরে বলল, মার কি হয়েছে? মা কি বেঁচে নেই?

—না যুবরাজ, তিনি জীবিতই আছেন। তবে তিনি যে কোথায় আছেন জানি না।

বসন্তমহলের এক কোণে বসে মহারাণী একক জীবনযাপন করছিলেন শোকে-দুঃখে হতাশায়। সেই সময় পার্থিব মহারাজের পরম সুহৃদ এবং পল্লব-সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব সেনাপতি পরঞ্জোতি সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে দেখা করতে আসেন মহারাণীর সঙ্গে। মহারাণীও তাঁদের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় রওনা হলেন। এই করে যদি মনের ব্যথা কিছুটা কমানো যায়। দুবছর ধরে বিভিন্ন তীর্থস্থানে ঘুরে পরঞ্জোতি ফিরে আসেন তিরুচ্ছেঙ্কাট্টে। সেদিন পৌষ মাসের অমাবস্যা। সূর্যগ্রহণেরও দিন। সেই উপলক্ষে কাবেরী মোহনায় স্নান করার জন্য বিভিন্ন প্রান্তের লোক জড়ো হয়। রাণী পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পূজো করছিলেন, হঠাৎ চিৎকার করে উঠে গভীর জলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। বাবা বিক্রম, তুমি এসেছো, এই যে আমি, আমি এখানে। পরমুহূর্তে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গগুলো রাণীমাকে নিয়ে গেল। আমি এবং পরঞ্জোতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি; কিন্তু পাইনি। আমরা খুঁজেছি, এমন সময় পরঞ্জোতির স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠল, দেখ দেখ রাণীকে একহাতওয়ালা একজন লোক কাঁধে করে নিয়ে পালাচ্ছে। আমরা দুজনে সেই হাজার মানুষের ভিড়ে অনেক খুঁজেছি লোকটাকে। পাইনি। এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে শিবযোগী আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, মহারাণী জীবিত আছেন। তিনি যে কোথায় আছেন, তা ঠিক জানা যাচ্ছে না। আমাদেরই খুঁজে বার করতে হবে। এদেশের কাপালিক, রুদ্রভৈরবের একটা হাত নেই। এদেশে যত কাপালিক আছে উনি হল তাদের সর্দার। তামিল দেশে নরবলির ঐতিহ্যকে শুধু রক্ষা করাই নয়, নরবলি যাতে আরও বেশি বেশি করে দেওয়া যায় তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। শিবযোগী আরও বলছিলেন, সেই কাপালিককে ধরতে পারলেই নাকি রাণীমার সন্ধান পাওয়া যাবে। আমি উঠে-পড়ে লেগেছিলাম তাঁকে খুঁজতে। মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে কোল্লিমলৈ অঞ্চলে নিজের চোখে সেই ভয়ংকর কাপালিককে দেখেছি। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত এক বেঁটে লোক—বামন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পোন্নানের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই একটা আওয়াজ শোনা গেল। পোন্নান কান খাড়া করে ঐ আওয়াজ শুনে বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেখতে পেল মারপ্প ভূপতি এবং সেই কাপালিক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দূরে থেকে সে ও বিক্রম কান পেতে শুনতে লাগল তাঁদের কথা।

—প্রভু, মায়ের কি আদেশ? মারপ্প ভূপতি অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলল।

কাপালিক অত্যন্ত কর্কশ এবং গম্ভীর গলায় বললেন, মা রণচণ্ডী তোমার উপর প্রসন্ন। তোমাকে মস্তবড় একটা পদে বসাতে চান। মা খুব তৃষ্ণার্ত, মা চান রক্ত। [illegible] রাজবংশের কোন যুবকের রক্ত।

—প্রভু, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি তাকে ধরতে। কিন্তু কি করব, সোনার পাখি হাতছাড়া হয়ে গেল। আমি যে জাল ফেলেছিলাম, তাতে ঠিক ধরা পড়ত কিন্তু একটুর জন্যে সমস্ত পণ্ড হল।

—এখনও সময় আছে, আপ্রাণ চেষ্টা কর বৎস, চেষ্টা কর। মা তোমাকে চোল-রাজ্যের সিংহাসনে আসীন দেখতে চান। কিন্তু তার আগে পার্থিবের পুত্রকে যদি মায়ের কাছে এনে বলি না দাও তাহলে কিছুতেই কিছু হবে না। অবশ্য মা শুধু বিক্রমকেই নয়, সেই ছদ্মবেশী শিব-যোগীকেও চান। তবে মনে রেখ, মা তোমার উপর একবার শুভভাবে প্রসন্ন হলে তুমিই হবে একদা পল্লব সাম্রাজ্যের অধিপতি। চোল আর পল্লব কোন রাজাই অন্যের হাতে থাকবে না।

—প্রভো! মা কি শুধু ঐ যুবরাজের রক্তে তুষ্ট হবেন না? তাহলে আবার সেই শিবযোগীর রক্ত কেন?

—ভূপতি, এসব বিষয়ে তর্ক কর না। মায়ের সংগে তর্ক চলে না। তাছাড়া তুমি জান না ঐ শিবযোগী কে!

ইতিমধ্যে মারপ্প ভূপতির হাতের লোক এসে গেল। সে বলল, প্রভু, আমার লোক এসে গেছে। আমি এখনই বেরোচ্ছি। আশীর্বাদ করুন, আমি যেন মায়ের কাজে সফল হতে পারি। আপনার আদেশমত যেন কাজ করতে পারি।

ওদের কথা শুনে বিক্রম এতটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যে তার হাত হঠাৎ কোমরের তলোয়ারের উপর চলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল যে তার তলোয়ার নদীর জলে হারিয়ে গেছে। অসহায় কণ্ঠে বলল, আমার দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। যে-ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসছিলাম সেটা ভেসে গেছে নদীর জলে। আমার সংগে যে অমূল্য রত্নের থলি ছিল তাও খুঁজে পাচ্ছি না। এখন দেখছি তলোয়ারও নেই।

—প্রভু, মহারাণী তীর্থযাত্রায় রওনা হওয়ার আগে একমাত্র আপনার হাতেই দেওয়ার জন্য একটা বাক্স দিয়ে গেছেন।

—সেই বাক্সে কি আছে পোন্নন?

—হাতলে অমূল্য রত্নখচিত একটি তলোয়ার। আপনার পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য।

—সত্যি তাই, সেই তলোয়ারেরই জোরে চোলরাজারা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। শুধু এদেশেই নয়, সাগরপারের অন্যান্য দেশেও। ভালকথা, ওটা সযত্নে রেখেছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ যুবরাজ।

—কিন্তু এখন সেটা কোথায়?

—বসন্তদ্বীপে।

—যত তাড়াতাড়ি পারি বসন্তদ্বীপে যেতে হবে। ঐ তলোয়ার আমার চাই।

কিন্তু পরের দিন কোথাও যাওয়া গেল না। বিক্রমের ভীষণ জ্বর হল। পোন্নন তার জানা সবরকম ওষুধ খাওয়াল। কিন্তু কোন কাজ হল না, জ্বর ছাড়ল না। শেষে পাশের গ্রাম থেকে বৈদ্য আনার জন্য চলে গেল। এদিকে জ্বর কমা ত দূরের কথা আরও বাড়ছে। বিক্রমের জ্ঞান ছিল না, অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে সে মা মা বলে চিৎকার করছে।

কুন্দবী এবং রাজকুমার মহেন্দ্র চক্রবর্তী মহারাজের অনুমতি পেয়ে ওরাইয়ুরের দিকে রওনা হয়েছে। মহেন্দ্র ঘোড়ার পিঠে আর কুন্দবী পালকিতে চলেছে। দুজনে ঐ মণ্ডপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেল বিক্রমের আর্তনাদ। কুন্দবী পালকি থামিয়ে ভাইকে বলল, ভাই, শুনতে পেয়েছ, কে যেন আর্তনাদ করছে?

—হ্যাঁ, কে যেন 'মা মা' বলে চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে ঐ মণ্ডপ থেকেই আওয়াজটা আসছে।

দুজনে ওখানে গিয়ে দেখতে পেল বিক্রম ছটফট করছে। কুন্দবী দেখেই চিনল, বলল, ভাই, এ সেই জহুরী। জ্বর হয়েছে, গা পুড়ে যাচ্ছে।...... এই, কেউ তাড়াতাড়ি আমাদের বৈদ্যকে ডেকে আনত।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিক্রমকে কুন্দবীর পালকিতে শোয়ানো হল। কুন্দবী নিজে চড়ে বসল একটি ঘোড়ার পিঠে।

এদিকে পোন্নন মণ্ডপে ফিরে এসে দেখল কেউ নেই। তার মাথায় যেন বাজ পড়ল। গোটা অঞ্চল তন্নতন্ন করে খুঁজল তার রাজকুমারকে। খুঁজতে-খুঁজতে পৌঁছে গেল পরান্তকপুরে। এক ফাঁকে দাঁড়িয়ে দুই বন্দিনীতে কী যেন গোপন কথা বলছে। তাদের ভাবগতিক দেখে পোন্ননের সন্দেহ হল। আড়ি পেতে শুনল ওদের কথা।

—যা বলছি শোন না। রাজকুমারী কুন্দবী নিজের পালকিতে শুইয়ে এক জহুরীকে নিয়ে এসেছে। কোন এক মণ্ডপে নাকি সে পড়ে ছিল। খুব জ্বর হয়েছে তার। দেখো না ওদিকে কত যত্ন করে লোকটাকে শোয়ানো হয়েছে।

পোন্নন তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাল। দেখল, বিক্রমকে ঘিরে রয়েছে অনেকে। পুরোদমে সেবাশুশ্রূষা চলছে।

।। এগার ।।

শিবযোগীর সঙ্গে দেখা করে পোন্নন বসন্তদ্বীপের দিকে রওনা হল। বিক্রমও রয়েছে বসন্তদ্বীপে। পোন্ননকে স্বাগত জানাল। পোন্নন তার বৈদ্য আনতে যাওয়ার পর শিবযোগীর সঙ্গে কখন তার দেখা হল, তারপর কখন কি সব বলল। শিল্প-মণ্ডপেই শিবযোগীর সংগে পোন্ননের দেখা হয়েছে বলে বিক্রম হল বিস্মিত। সেই মণ্ডপেই তো সেদিন সারারাত বিক্রম ঐ গুপ্তচর-প্রধানের সংগে কাটিয়েছে।

—পোন্নন, একটা সন্দেহ জাগছে আমার মনে।

—কি সন্দেহ যুবরাজ?

—গুপ্তচরপ্রধানই স্বয়ং শিবযোগী নয় তো?

—তা তো বটেই।

—সে কি, তাহলে তো উনি জানেন আমি কে? আমাকে যদি এক্ষুণি ধরিয়ে দেয়।

—উনি আপনাকে কোনদিন ধরিয়ে দিতে পারেন না, কিছুতেই না। রণক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী আপনার বাবাকে কথা দিয়েছিলেন আপনাকে সাহায্য করার। তবে বিপদ আসবে অন্য দিক থেকে।

—থেমে গেলে কেন, কোন দিক থেকে আসবে?

—মারপ্প ভূপতি ওৎ পেতে রয়েছে। আপনার উপর কোন বিপদ এলে আসবে ওর দিক থেকেই। এখানে বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়।

—বেশ চল। আমি প্রস্তুত।

—একটু দাঁড়ান, আমি রাণীমার দেওয়া বাক্সটা নিয়ে আসি।

তলোয়ার হাতে পেয়ে বিক্রম যেন নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহ পেল। তার চোখে-মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। সমগ্র চেহারায় অভূতপূর্ব তেজস্বিতা।

পোন্ননের চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত।

দুজনে ফিরে এসে দেখে নৌকো নেই। পোন্নন নৌকো খুঁজতে লাগল। বিক্রম শুনতে পেল পাতা নড়ার শব্দ। কে যেন আসছে তার দিকে। পিছন ফিরে দেখে কুন্দবী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরস্পরের দিকে তারা অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কুন্দবী প্রথম মুখ খুলল, এই-ই বুঝি চোলদেশবাসীদের ভদ্রতা। না জানিয়ে চলে এলেন যে!

তার কথার জবাব দেওয়ার আগেই ওদের চোখ পড়ল দূরের চারটি নৌকার উপর। তাদের দিকেই আসছে। পোন্নন ছুটতে-ছুটতে তাদের কাছে এল। বিক্রম বলল, পোন্নন, তলোয়ার দাও।

—না, যুবরাজ। এখন ওদের সংগে লড়াইয়ে মেতে গেলে সমস্ত কাজ পণ্ড

হবে। পূর্বপুরুষদের তলোয়ার দিয়ে কি আপনি নিজের প্রজাদের গর্দান নিতে চান?

নৌকোগুলো তীরে ভিড়ল। মারংপ ভূপতি নৌকো থেকে এক লাফে তীরে নেমে কুন্দবতীর কাছে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হাত কচলাতে-কচলাতে বলল, দেবি, আপনার বিনা অনুমতিতে এখানে এসেছি বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু আমি নিরুপায়। চক্রবর্তীর নির্দেশ পালন করবার জন্যই এখানে আমার আসা।

কুন্দবতী রাগে জ্বলে উঠে বলল, কার নির্দেশ?

—আপনার ভাই যুবরাজ নরেন্দ্রের। চম্পকদ্বীপ থেকে যে-ডাকাত এখানে এসেছে তাকে ধরে কাঞ্চি পাঠিয়ে দেবার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন।

—চম্পকদ্বীপের ডাকাত আবার কে!

—সে আপনারই সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—মিথ্যা কথা। ইনি ডাকাত নন। আপনি ফিরে যেতে পারেন।

—দেবী, এ যদি ডাকাত না হয় তো আর কে হবে।

—ভূপতি, মুখের ওপর কথা বলো না! মনে রেখো কার সঙ্গে কথা বলছ। নিজে কোন পদে আছ তা ভুলে যেয়ো না। কুন্দবতীর চোখে যেন আগুন জ্বলছে। ভূপতি আরও বিনয়ের সঙ্গে বলল, না দেবী, আমি নিজেকে কোনদিন ভুল ভাবিনি। আপনার সামনে দণ্ডায়মান লোকটির মুখ আমার খুব চেনা: অনেকবার দেখেছি। রাজাধিরাজ নরসিংহ-চক্রবর্তী এই লোকটিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন। একে যদি আপনি ডাকাত না বলতে চান, বলবেন না। কিন্তু এ অবশ্যই নির্বাসিত। একজন নির্বাসিত বিনা অনুমতিতে দেশে ফিরে এলে তাকে যে কি দণ্ড দিতে হয় তা নিশ্চয়ই রাজকুমারীকে বলে দিতে হবে না। দেবী, এবার আমাকে নিজের কর্তব্য পালন করতে দিন।

।। বার ।।

মধ্যরাত্রে পোন্নন দেখল গভীর বন-জঙ্গলে দুজন লোক শান্তার মন্দিরের দিকে যাচ্ছে। পোন্নন ওদের দুজনকেই চিনল। সেই বামন লোকটা আর মারংপ ভূপতি। সে গোপনে ওদের পিছু ধরল।

শান্তার মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে কাপালিক উদ্‌গ্রীব হয়ে ভূপতির পথের দিকে তাকিয়ে আছে। ভূপতিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, সেনাপতি, মায়ের আদেশ পালন করেছ?

—মহাপ্রভু, বলি সুরক্ষিত।

—সঙ্গে আনলে না কেন?

—আজ সন্ধ্যার সময়েই যুবরাজ বিক্রমকে ধরেছি। পথ বিপদমুক্ত কিনা, না জেনে কি করে আনব প্রভু।

কাপালিক পৈশাচিক হাসি হেসে বলল, সেনাপতি, আমার মা, কালী-করালীর আদেশ পালন করতে তুমি ভয় পাচ্ছ?

—না, প্রভু। আমার ভয় অন্য ব্যাপারে। মায়ের কাজে যাতে কোন ব্যাপারে বিঘ্ন না ঘটে সেইটেই আমি চাই। অমাবস্যার রাত্রে বলি এনে আপনার হাতে তুলে দেবো।

অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে কড়া পাহারার মধ্যে বিক্রমকে আনা হচ্ছিল। হঠাৎ, বোম-কালী-কাল্পী, কালী-করালী, প্রভৃতি নানান বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশজনের একটি সশস্ত্র দল বিক্রমের গাড়ি ঘিরে ফেলল। পোন্ননও ছিল সেই দলে। সে বিক্রমকে বন্ধনমুক্ত করল। পরক্ষণেই দেখা গেল পোন্নন এবং বিক্রম ঘোড়ার পিঠে চড়ে তীরবেগে চলেছে।

মহেন্দ্র-মণ্ডপের দ্বারে মশাল হাতে কিছু লোক দাঁড়িয়ে ছিল। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'ও পোন্নন, একটা শুভ খবর। ওরাইয়ুরের মহারাণীকে পাওয়া গেছে। আমাদের এই মণ্ডপেই আছেন।' একথা কানে যেতেই ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নিচে পড়ে বিক্রম 'মা' বলে ডাক দিয়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর পড়ল। মা ছেলের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন সমস্ত ঘটনা। শিবযোগীর চেষ্টাতে কি করে তিনি কাপালিকের হাত থেকে রক্ষা পেলেন ইত্যাদি। ঠিক সেই মুহূর্তে বামন লোকটা, মন্দিরের এককোণে যাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সে হো-হো করে হেসে বলল, আজ মাঝ-রাত্তিরেই সেই শিবযোগীকে হাড়িকাটে বলি দেওয়া হবে।

শুনে বিক্রমের গা যেন জ্বলে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ তলোয়ার বের করে মার আশীর্বাদ নিয়ে শিবযোগীকে উদ্ধার করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

।। তের ।।

সেই গভীর অরণ্যে হাড়িকাঠের কাছে শিবযোগীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার পাশেই রাক্ষসের মত চেহারাওয়ালা একটা লোক খাঁড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাপালিক মায়ের পুজো সেরে চোখ খুলে নির্দেশ দেওয়ার অপেক্ষায়। তারপরেই বলি।

বিক্রম একলাফে ঘোড়া থেকে নেমে শিবযোগীর কাছে দাঁড়াল। শুরু হয়ে গেল হৈ-চৈ সোরগোল। কাপালিক গম্ভীর গলায় ওখানে এসে বলল, তুমি রাজা পার্থিবের ছেলে বিক্রম না? তোমার খোঁজ আমি একবার মামল্লপুরমে গিয়ে-

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন কিনা, সম্প্রতি এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র মশায় গত ৩রা মার্চ যুগান্তর পত্রিকায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছেন। তাছাড়াও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় অনেকে আরও কয়েকটি তথ্য সংযোজন করেছেন মনে হয়।

বলা বাহুল্য, এ বিতর্ক ওঠার আগে আজ যেটা সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়, সেটা হচ্ছে, রবীন্দ্র ও বিবেকানন্দ পরস্পরের সম্পর্কে কখন কি মন্তব্য করেছেন তার বিস্তারিত তথ্য সংকলিত হওয়া দরকার। শ্রীভদ্র মশায় যুগান্তরের ঐ সংখ্যায় যে সব তথ্য দিয়েছেন তাতে এমন কিছু পাওয়া যায় না যার থেকে প্রমাণ হয় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ সরাসরি কবির কোন রচনার নজির দিতে পারেননি। বিবেকানন্দ সম্পর্কে কবি বিভিন্ন উপলক্ষে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন। কিন্তু যে উপলক্ষে কবি একেবার অত্যন্ত স্পষ্ট ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় বিবেকানন্দের অবদানের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন তা সম্পর্কে একটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। জানি না তা অন্য কোথাও কেউ উল্লেখ করেছেন কিনা। নীচে তা উদ্ধৃত করা গেল।

১৯২৮ সালে কবির সহিত সরসীলাল সরকারের আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে কয়েকবারই আলোচনা হয়। প্রসঙ্গতঃ গান্ধীজীর চরকা সম্পর্কেও তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। চিঠিপত্রের মাধ্যমেও পরে এ আলোচনা চলতে থাকে। ১৯২৮ সালের মে মাসে হিবার্ট বক্তৃতার জন্য কবির বিলাত যাবার কথা হয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে কবিকে এ যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়। এই যাত্রার স্বল্প কিছু কাল পূর্বে অমিয় চক্রবর্তী মশায় সরসীলাল সরকারকে চরকা সম্পর্কে কবির বক্তব্যের কথা জানিয়ে যে চিঠি লেখেন তা 'প্রবাসী' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের সংযোজন হিসাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে আরও কিছু মূল্যবান কথা জুড়ে দেন,—তাও ঐ সাথে প্রকাশিত হয়।

কবি লিখেছেন,

"সরসীবাবুকে অমিয় যে চিঠি লিখেছেন সেটি দেখলুম। সেই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলেছি সেগুলিকে বাদ দিলে চলবে না।

"চরকা কাটা একটা বাহ্যক্রিয়া— এটাকে একটা লৌকিক আচার করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু আচার প্রায়ই প্রবল হয়ে বিচারকে উপেক্ষা করে। কোনো একটা অভ্যস্ত দৈহিক কর্মকে যখনি উচ্চ সাধনার মূল্য দেওয়া হয় তখনি সে আন্তর সত্যের চেয়ে বাহ্য আচারকে বড়ো জায়গা দেয়, আমাদের সমাজে তার অনেক প্রমাণ আছে। আরো একটা নতুন আচার যোগ করে আমাদের মনোবৃত্তির জড়তা আরো বাড়ানো হবে বলে আশঙ্কা করি।

"একা একা বসে যাঁরা চরকা কাটেন তাঁরা মনে মনে ভাবতে পারেন যে চরকা কেটে সুতো উৎপাদন করে তাঁরা দেশের ধন বৃদ্ধি করছেন। কিন্তু একথা মনে রাখতে বেশি লোক বেশি দিন পারবে না —ক্রমেই এটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়ে বুদ্ধিকে ম্লান করেই দেবে।

"অথচ চরকা কাটা একথার মধ্যে কোনো মহৎ অনুশাসন নেই এই জন্যে একথায় পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায় না। আধুনিককালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলেরই মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি দরিদ্রদের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ কেবল এক-ঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণ মনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে আঙুলকে নয়। ভয় হয় পাছে আচারের সংকীর্ণ অনুশাসন সেই নবোদ্বোধিত তেজকে চাপা দিয়ে ম্লান করে দেয়, কঠিন তপস্যার পথ থেকে যান্ত্রিক আচারের পথে দেশের মনকে ভ্রষ্ট করে।"

[প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫॥ পৃঃ ২৮৫—৮৬।]

বিবেকানন্দ সম্পর্কে এতখানি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ অন্য কোথাও করেছেন বলে জানা নেই। বিস্ময়ের কথা শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ দুটি চিঠির কথা তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে উল্লেখ করতে বিস্মৃত হয়েছেন।

নেপাল মজুমদার,
শান্তিনিকেতন।

অয়স্কান্ত

উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণীবন্ধকরণ

ফাইকাস বেঙ্গালেন্‌সিস। উদ্ভিদ-বিদ্যা যাঁদের জানা নেই তাঁদের কাছে ল্যাটিন ভাষার এই দুটি শব্দ নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য ঠেকবে। কিন্তু যদি বলা হয় যে আমাদের অতি-পরিচিত বটগাছকেই এই নামটির সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে, অনেকেই হয়তো অবাক হয়ে মন্তব্য করে বসবেন, কেন, বট বলতে আপত্তিটা কী! অনেকে ধরেই নেবেন যে বিজ্ঞানীদের স্বভাবই এই—সরল ব্যাপারকে জটিল করে তোলা।

তেমনি অশ্বত্থ গাছের নাম হয়েছে ফাইকাস রিলিজিওসা। আমগাছের ম্যাংগিফেরা ইন্ডিকা। কনকচাঁপার

কনকচাঁপা

টেরোসপারমাম অ্যাসিরিফোলিয়াম। যে মহুয়া বা মাধবীলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এত কাব্য করেছেন, উদ্ভিদবিদেরা যখন ল্যাটিন ভাষায় তাদের নাম শোনেন মুহূর্তে সমস্ত কাব্যরস অন্তর্হিত হয়।

আর শুধু উদ্ভিদ নয়, প্রত্যেকটি প্রাণীকেও এমনি সব উদ্ভট ল্যাটিন নাম দেওয়া হয়েছে। এমন কি মানুষকেও। মানুষকে মানুষ না বলে হোমো স্যাপিয়েন্‌স্ বলার কী সার্থকতা থাকতে পারে তা অনেক সময়েই বোঝা যায় না। নিজের নিজের সম্পর্কে প্রত্যেকেরই গর্ব-মিশ্রিত মোহ আছে। এমন কি মুচিরাম গুড়ও শুধু গুড় পাল্টে রায় করেছিলেন, মুচিরাম ত্যাগ করেন নি। এবং সম্ভবত স্বয়ং ইংরেজ বাহাদুরের অনুরোধেও নিজের অকৃত্রিম নামের বদলে কোনো ল্যাটিন নাম গ্রহণ করতে একটু ইতস্তত করতেন।

তবে বিজ্ঞানীদের সপক্ষে একথা বলতেই হবে, গুরুতর কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে যেজন্যে নাম সম্পর্কে তাঁরা এতখানি নিষ্করুণ।

বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা

চোখ খোলা রেখে যে-কেউ চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পাবেন হাজার হাজার বিভিন্ন রকমের প্রাণী। খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে তিনি আরও দেখবেন, যতো তুচ্ছ প্রাণীই হোক প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকেই স্বকীয় স্বতন্ত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যেমন অজস্র মিল, তেমনি আবার অজস্র অমিল। প্রত্যেকের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে যদি ওয়াকিবহাল হতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত তথ্যের আতিশয্যে দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে। সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করতে হলে এমন কি চিত্রগুপ্তের খাতাতেও সম্ভবত কুলিয়ে ওঠা যাবে না।

এ-অবস্থায়, যে-জানার শেষ নেই তার শেষ জানার চেষ্টা বাধ্য হয়েই মুলতুবি রাখতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব এই যে তাঁরা এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে অসীমকেও যেন সীমার মধ্যে ধরা যাচ্ছে। অজস্র বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল যে জীব-জগতটি মানুষের আয়ত্তের বাইরে থেকে যাচ্ছিল তাকে যেন কতকগুলো সাধারণ ধারণা ও নীতির কাঠামোয় বন্দী করে খানিকটা বোধগম্য চেহারায় হাজির করা যাচ্ছে। ল্যাটিন ভাষায় নামকরণ বিজ্ঞানী-দের এই কৃতিত্বেরই ঘোষণা।

এক্ষেত্রে তিনটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার ভিত্তি বিবর্তনবাদ। জীবজগতে যদি বিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে রক্তের সম্পর্কে কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে কোনো কোনো প্রাণীর অবশ্যই মিল থাকতে হবে। কোনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে কোনো প্রাণীর অবশ্যই অমিল। তাই যদি হয় তাহলে এই মিল বা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কতকগুলো প্রাণীকে নিশ্চয়ই একটি দলে ফেলা চলে। এমনিভাবে পরস্পরের সঙ্গে প্রজাতিগুলোকে যদি এক-একটি দলে ফেলা যায় তাহলে সমগ্র জীবজগতটি অবশ্যই একটি শ্রেণীবন্ধ রূপ নিতে পারে।

এই হচ্ছে শ্রেণীবন্ধকরণের পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়ে প্রাণী-বিজ্ঞানীরা সমগ্র প্রাণীজগতকে প্রায় বারোটি প্রধান 'ফাইলা' বা পর্বে ভাগ করেছেন। যেমন, সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী নিয়ে একটি পর্ব, যার নাম 'কোর্ডাটা'। বলা বাহুল্য, প্রাণীজগতে এই পর্বটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটি পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যানথ্রোপোড্‌স' বা বহুগ্রন্থি বিশিষ্ট প্রত্যঙ্গ। এই পর্বে রয়েছে সমস্ত রকমের কীট। আরেকটি পর্বের নাম 'সীলেনটারেট্‌স' (জেলি মাছ), ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি পর্ব কতকগুলো শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি শ্রেণী কতকগুলো বর্গে ('অর্ডার')। প্রত্যেকটি বর্গ কতকগুলো গোত্রে ('ফ্যামিলি')। প্রত্যেকটি গোত্র কতকগুলো জাতিতে ('জিনাস')। প্রত্যেকটি জাতি কতক-গুলো প্রজাতিতে ('স্পিসিস')।

মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষের প্রজাতি—হোমো স্যাপিয়েন্স; জাতি—হোমো; গোত্র—হোমিনিডী; বর্গ—প্রাইমেট্‌স; শ্রেণী—স্তন্যপায়ী; পর্ব—কোর্ডাটা; সর্গ ('কিংডম')—অ্যানি-ম্যালিয়া।

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি জীবের দুটি নাম। প্রথমে জাতিগত, তারপরে প্রজাতিগত। অনেকটা আমাদের নাম ও উপাধির মতো।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম অনুসৃত। বট আর অশ্বত্থ দুয়েরই

জাতিগত নাম—ফাইকাস। বটের প্রজাতিগত নাম—বেঙ্গলেন্‌সিস। অশ্বত্থের প্রজাতিগত নাম—রিলিজিওসা।

জীবজগতকে শ্রেণীবিন্ধকরণের এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছিলেন সুইডেনের বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭—৭৮)। আজ থেকে দুশো বছর আগে তিনি প্রায় ৪৪০০ প্রজাতির জীবকে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীবন্ধ করেছিলেন। তাঁর সময়ের জানাশোনা কোনো জীবকেই তিনি তালিকা থেকে বাদ দেননি। জীবজগতে একটি নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা এই প্রথম। সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবজগতকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টায় লিনিয়াস পথিকৃৎ। এ-প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ডারউইনেরও একশো বছর আগে।

লিনিয়াস মাত্র ৪৪০০ প্রজাতির জীবকে তালিকাবন্ধ করেছিলেন। পরবর্তী দুশো বছরে এই তালিকা অবশ্যই বড়ো হয়েছে। এখন এই তালিকায় পাওয়া যাবে প্রায় দশ লক্ষ প্রজাতির জীবের নাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রজাতির সংখ্যা নিঃশেষ হবার কোনো লক্ষণ নেই। একমাত্র পোকামাকড়দের মধ্যেই প্রতি বছর ১০,০০০ নতুন প্রজাতির নামকরণ হচ্ছে। তার মানে, আমাদের পক্ষে এখনো সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয় আমাদের এই পৃথিবীতে মোট কত সংখ্যক প্রজাতির বাস। তবে অনুমান করা যেতে পারে প্রজাতির সংখ্যা কুড়ি লক্ষের কাছাকাছি। খুব সম্ভবত এই কুড়ি লক্ষের মধ্যে দশ লক্ষই হচ্ছে পোকামাকড়।

মানুষ নামক জন্তু

ওপরে মানুষের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাবে মানুষ 'অ্যানিম্যালিয়া' সর্গের অন্তর্ভুক্ত জীব। পৃথিবীর অন্য জন্তুজানোয়ারও এই একই সর্গের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, মানুষও এই জীবজগতেরই বিবর্তনের ফল। গত একশো বছরে জীবাশ্মবিদ্যার নানা আবিষ্কার নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর জীবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে গিয়েছে। পৃথিবীর এই জীবজগৎ মূলত একই জীবনের বিচিত্র প্রকাশ।

কথাটা আজ আর নতুন নয়। কিন্তু ষোল শতকের আগে জীবন সম্পর্কে মানুষের ভাবনাচিন্তা ছিল অন্য ধরনের। তখনো পর্যন্ত মনে করা হত পৃথিবী রয়েছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে আর পৃথিবী আছে বলেই সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের সার্থকতা। একই চিন্তাধারা অনুসরণ করে মানুষকে মনে করা হত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। মানুষ আছে বলেই পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এমন বিচিত্র আয়োজন। মানুষের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার মধ্যেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর সার্থকতা।

এমন কি এখনো পর্যন্ত কোনো উদ্ভট জীব চোখে পড়লে সেই সাড়ে-চারশো বছর আগেকার কালের ধারণার জের টেনে আমরা অনেক সময়ে প্রশ্ন করে বসি, এই জীবটির সার্থকতা কী? অর্থাৎ আমরা জানতে চাই, এই বিশেষ জীবটি মানুষের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করছে। ইতিমধ্যে এই সাড়ে-চারশো বছরে কোপারনিকাস প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়—পৃথিবী এই সৌরমণ্ডলের সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র। নিউটন এমন কতকগুলো সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন যার সাহায্যে আকাশের প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের গতি-বিধির মাপ নেওয়া চলে। হাটন আবিষ্কার করেছেন সময়ের বিপুলতা। আর ডারউইন তুলে ধরেছেন মানুষের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্কের সূত্রটি।

এই অবস্থায়—অসীম মহাবিশ্ব, নিরবধি কাল ও নিয়ত-পরিবর্তনশীল বিপুল এক জীবজগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো একটি বিশেষ জীবের সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা নিরর্থক হয়ে পড়ে। বরং প্রশ্ন করা যেতে পারে, মানুষেরই বা সার্থকতা কী?

বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে যে আমাদের এই পৃথিবী নিতান্তই একটি মাঝারি আকারের গ্রহ। আমাদের এই সূর্য নিতান্তই একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্র। সূর্যের মতো ও সূর্যের চেয়েও হাজার গুণ বড়ো আরো কোটি কোটি নক্ষত্র রয়েছে আমাদের এই বিশ্বে। এমনি কোটি কোটি বিশ্ব নিয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব। এই অনন্ত বিস্তৃতি সম্পর্কে আমরা শুধু খানিকটা অনুমান করতে পারি—কিংবা হয়তো তাও পারি না। আর এই অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে কতটুকু পরিসরে মানুষের অবস্থান! কত নগণ্য! কত তুচ্ছ!

মানুষ এই প্রাণীজগতের অবিশেষ একটি অংশ মাত্র—প্রোটোপ্লাজ্‌ম বা জৈবকোষ (বা বঙ্কিমচন্দ্র যার পরিভাষা করেছেন জৈবনিক)-এর বিশেষ একটি বিন্যাস ছাড়া কিছু নয়। মানুষকেও অবশ্যই জন্তু বলতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্য থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই।

"এখন দেখ, এই জৈবনিকে সর্বজীব নির্মিত। যে ধান ও ঘাস তুমি পাখিকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখিও সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রাণ মাত্র লইয়া, লোকমোহিনী সুন্দরী ফেলিয়া দিতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও তাই। কীটও যাহা, সম্রাটও তাই। যে হংসপুচ্ছলেখনীতে আমি লিখিতেছি, সেও যাহা, আমিও তাই। সকলই জৈবনিক।"

এই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'জৈবনিক' প্রবন্ধ থেকে। বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্যে এখন আর কেউ বিজ্ঞান-রহস্য পড়েন কিনা আমি জানি না। কিন্তু বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয় নিয়েও তত্ত্ব ও তথ্যের যাথার্থ্য বজায় রেখে এবং প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে সম্যকভাবে পরিবেশন করেও এমন সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে, বঙ্কিম-চন্দ্রই এখনো পর্যন্ত তার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর "সকলই জৈবনিক" বলাটাও তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। কাজেই আমি যদি এমন ভাবি যে বঙ্কিমচন্দ্রও যা আমিও তাই—তাহলে তা হবে নিতান্তই একটি হাস্যকর ধৃষ্টতা।

ধবধবে ফরসা
হালকা সুগন্ধে ভরপুর

নির্মল
বার সোপ
Nirmal
BAR SOAP
KUSUM PRODUCTS LIMITED

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের জানাতে পারেন বিভাগটির জন্য একটি প্রশ্ন পাঠাইতেছি। এর যথাযথ উত্তর পেলে বাধিত হইব।

"পরিবহন" শব্দটির অন্তে দন্ত্য'ন বা মূর্দ্ধন্য'ণ? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ ও রাজশেখর বসু প্রণীত অভিধানে দেখছি শব্দটি দন্ত্য'ন কারান্ত। সংসদ অভিধানে ইহা মূর্দ্ধন্য'ণ কারান্ত। শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধানে বা গিরিশ-চন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত শব্দসার অভিধানে ইহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃতমূলক অন্য বাংলা অভিধানেও আমি যতদূর জানি ইহার উল্লেখ নাই। ইহার প্রকৃত বানানটি কি?

শ্রীঅমলেন্দু রায়চৌধুরী,
৬৮নং রাজা বসন্ত রায় রোড,
কলিকাতা—২৯।

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতে'র 'জানাতে পারেন' বিভাগের জন্য নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠালাম। পাঠকদের কাছ থেকে উত্তর পেলে উপকৃত হব—

(১) আজকাল নুনের ওয়াগন রেল-স্টেশনে সময়মত এসে না পৌঁছুলে বাজারে নুনের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু বিগত যুগে বহু বছর আগেও লোকে নুন খেত......কিন্তু সেই 'গো-যান' যুগে নুন সারা দেশে কি করে সরবরাহ করা হ'ত? আর যান্ত্রিক যুগের পূর্বে এত বিপুল পরিমাণে নুনের উৎপাদনই বা কিভাবে সম্ভবপর হ'ত?

(২) আজও আমরা প্রায়শই বাঙ্গালী মেয়েদের নিজের মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে বলতে শুনি—"পরের হাঁড়ি ঠেলতে হবে"...ইত্যাদি। "পরের হাঁড়ি" ঠেলা এই বহু ব্যবহৃত উপমার অর্থ কি?

(৩) "নুন খেয়ে গুণ গাওয়া" প্রবাদ বাক্যটি কবে থেকে এবং কেন প্রচলিত হয়েছে? নুনের এরূপ সম্মান পাওয়ার কারণ কি?

(৪) শান্তি ও সাহিত্যের জন্য প্রথম নোবেল পুরস্কারবিজয়ী কারা?

সৌমেন্দ্রনাথ ঘোষ (শ্রীনাথ)
স্টেট ডিস্‌পেনসারী,
আমরাপাড়া
(সাঁওতাল পরগণা)
বিহার।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের 'জানাতে পারেন' বিভাগটি পড়ে খুবই ভাল লাগলো। তাই ছোট্ট একটি প্রশ্ন পাঠাচ্ছি—

প্রখ্যাত জনপ্রিয় ছদ্মনামী সাহিত্যিক 'জরাসন্ধে'র প্রকৃত নামটি জানতে ইচ্ছা করি।

সাধনা সেন,
সিউড়ী, বীরভূম।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ইং ১৯৬৩ সালের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে (শ্রীবাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের) প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতেছি। প্রশ্ন—১ : বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকার নাম—দিগ্‌দর্শন। ইহা একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রকাশকাল ছিল ইংরেজী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন হইতে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্সম্যান (John Clerk Marshman)।

প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম—'সমাচার দর্পণ'। ইহার প্রকাশকাল ইং ১৮১৮ সালের ২৩শে মে। ইহারও সম্পাদনা ও প্রকাশক একই।

(২) 'অমৃত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ—'যে পরম সুস্বাদু বস্তু পান করিলে অমরত্ব লাভ করা যায়'।

অমৃত পত্রিকার সহিত ইহার অর্থের সত্যকারের কি সম্বন্ধ তাহা আমি জানি না। আমার ক্ষুদ্র ধারণা যাহা তাহাই জানাইতেছি।

পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পূর্বপুরুষের বাসভূমি ছিল বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত 'অমৃত-বাজার' নামক গ্রামে। সেই গ্রামের নাম অনুসারেই বোধ হয় অমৃত পত্রিকা (সাপ্তাহিক) এবং অমৃতবাজার পত্রিকারও নামকরণ করা হইয়াছে। অবশ্য এভাবে সবসময়ে নামের ব্যাখ্যা চলে কিনা সন্দেহ।

পরিতোষ মজুমদার,
গোবরডাঙ্গা, ২৪-পরগণা।

মহাশয়,

আপনাদের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীবিমলকুমার মজুমদারের প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি—কাক শব্দের অর্থ পোকামাকড়, কাক উদরে যাহার সেই কাকোদর। সর্প পোকামাকড় ভক্ষণ করে বলে সর্পকে তাই কাকোদর বলা হয়।

২নং উত্তর—বিভীষণকে রামায়ণের যুগ থেকে পরমধার্মিক বলে মনে করা হোত। তাই ঘরের শত্রু হ'লেও লোকে তাকে সমর্থন করত। কিন্তু উনিশ শতকে নবজাগরণের ফলে মানুষের মধ্যে জীবনবোধ পরিবর্তিত হোতে থাকে। তখন লোকে বুঝতে পারে ন্যায়ের প্রতীক হলেও রামচন্দ্র বিভীষণের দেশের শত্রু। তাই তাঁর পক্ষে গিয়ে নিজের ঘরের সংবাদ তাঁকে দিয়ে বিভীষণ অন্যায়ই করেছে। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যও পরিবর্তনের মূলে অনেকটা কাজ করেছে। তাই আমার মনে হয়, "ঘরসন্ধানী বিভীষণ" প্রবাদটি খুব সম্ভবত তখন থেকেই প্রচলিত।

ডলি ভট্টাচার্য,
স্টেশন-রোড, জলপাইগুড়ি।

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী '৬৩ সালের অমৃতের 'জানাতে পারেন' বিভাগে শ্রীগৌরপদ দাশ 'Posthumous' শব্দের সঠিক উত্তর জানতে চেয়েছেন।

পত্রলেখক নিজেই এর উত্তর লিখে দিয়েছেন। তবে ছাপার ভুলে কিনা জানি না 'মরণোত্তর জাতক' না হয়ে 'জাত' হবে। কেননা শব্দটি বিশেষণ পদবাচক। সে যাই হোক এর শব্দটির অর্থ একটু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে এর তিনটি অর্থ করা যেতে পারে। যেমন, ১। পিতার মৃত্যুর পর জাত, ২। মৃত মাতার গর্ভ থেকে গৃহীত, ৩। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের এই অভিনব শিক্ষামূলক বিভাগটির জন্য। এতে প্রশ্নকর্তা তাঁর সঠিক উত্তর পেয়ে কেবল নিজেই উপকৃত হচ্ছেন তা' নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেকের কাছে যা' অজ্ঞাত এবং রহস্যাবৃত থাকে, অযাচিতভাবে তার দ্বার সহসা একদিন উন্মোচিত হয়ে যায়। আমাদের মনের সীমাহীন কৌতূহলের রাজত্বে এর দাম সামান্য নয়।

সতীশ চক্রবর্তী,
৪৮নং আনন্দচরণ ব্যানার্জি রোড,
পোঃ আড়িয়াদহ, ২৪-পরগণা।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যার জানাতে পারেন বিভাগে শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ সিংহদেও মহাশয়ের এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি :—

পৃথিবীতে সাংবাদিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক পদ হচ্ছে ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ। একজন মাত্র ভারতীয় সাংবাদিক এটি পেয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন বাংলা সংবাদপত্র "যুগান্তরের" নিরপেক্ষে"র ভূমিকায় অমিতাভ চৌধুরী ১৯৬১ সালে।

দয়াময় সেনগুপ্ত,
২৭৯, মহারাজ নন্দকুমার রোড,
কলিকাতা—৩৬।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ৩ ।।

এবারও ওর আসার কয়েকদিন পরেই কোথা থেকে ঐন্দ্রিলা এসে হাজির হল। কেন এল কদিনের জন্য এল, তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না তাকে, সেও বলল না। তবে সঙ্গে কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটা দেখে মনে হ'ল হয়ত যেখানে কাজ করছিল এতদিন সেখানকার কাজ ছেড়েই চলে এসেছে।

অর্থাৎ বেশ কিছুকাল স্থিতি এবার।

ওকে দেখেই যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন এঁরা কিন্তু এবার আর ও তরুর দুর্ভাগ্যে সে রকম উল্লাস প্রকাশ করল না, বরং দুফোঁটা চোখের জলই ফেলল। তবে এও বলল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, 'তাও তো তুই জিতে গেলি রে! হাজার হোক তোর তো ছেলে, কোনমতে যদি বেঁচে থাকে বড় হয়ে মোট বয়েও খাওয়াবে। একদিন স্বাধীনভাবে বেটার সংসারে বসে খেতে পারবি।...আমার মত মেয়ে নিয়ে তো জ্বলেপুড়ে মরতে হবে। এই পরের বাড়ি হাঁড়িহেঁসেলের সঙ্গে যুদ্ধ করে যা ঐ পাঠাচ্ছি তাই খেয়ে খেতে পাচ্ছে। খুব বিয়ে হ'ল মেয়ের! জামাইয়ের ছেলেরা তো দয়া করে দুটি চাল ফেলে দেয় ভিক্ষের মতো। তাও বলে, বাপকে খাওয়াতে পারি—তার মেয়েমানুষকে খাওয়াতে যাব কিসের জন্যে? ছোট মা কি ছোট মা বলে না—বলে বাপের মেয়েমানুষ!'

এ খবরটা এদের জানা ছিল না। তাই যদি হয় তো কাজ ছেড়ে দিয়ে এল কিসের ভরসায় তাও বুঝতে পারে না।

অবশেষে কনকই কথাটা বার করলে। অথবা ঐন্দ্রিলাই বলবার সুযোগ খুঁজছিল, বলতে পেয়ে বেঁচে গেল সে। কারণ, তারও না বললে নয়। ও পক্ষ থেকে কৌতূহল প্রকাশ পাওয়াতে তার সুবিধাই হ'ল।

আর সে জানে এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র কনকই যা সহানুভূতির সঙ্গে শুনবে সব কথা। মা কি দাদাকে বলতে গেলে হয়ত সূচনাতেই থামিয়ে দেবে। বরং কনকই তাদের শোনাতে পারবে। কনকের দ্বারা তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'তে পারে।

কাজ ঐন্দ্রিলা ছেড়ে আসে নি, তারাই ছাড়িয়ে দিয়েছে।

মেয়েকে টাকা পাঠাতে হয় নিয়মিত। কিন্তু কীই বা পাঠাতে পারে ও। ও পায়ই খাওয়া-পরা আর মোটে আটটি টাকা মাইনে। আট টাকাই পাঠাত সে, নিজের জন্যে এক পয়সাও না রেখে—কিন্তু তাতেও সীতার কুলোয় না। শুধু ধান ছাড়া সতাতো ছেলেরা কিছু দেবে না, ধান ভেনে চাল ক'রে নিতে হয় সীতাকে। ঐ চাল আর বাগানে যা আনাজ-পাতি হয়—এই ভরসা। তাও দেয় ভিক্ষের মতো, নিজে থেকে নিতে গেলে যাচ্ছেতাই অপমান করে। বলে, 'এ কী তোর বাপের সম্পত্তি পেয়েছিস?' বুড়ো কিছু বলতে সাহস পায় না—ছেলেরা গুণ্ডার মতো, রাগী, বদমেজাজী—তারা বাপের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, মামলা-মোকদ্দমা করতে গেলে প্রাণে বাঁচবে না। ওরা গুম-খুন ক'রে ফেলবে। বুড়োমানুষ প্রাণের ভয়ে যেন জন্তুর মতো হয়ে গেছে—সব অপমান নিঃশব্দে হজম করে।......এর ভেতর গত শীতের সময় সীতা চিঠি লিখল যে, গায়ে দেবার লেপ কুটি কুটি হয়ে গেছে, পরনে একটা গোটাকাপড় পর্যন্ত নেই; শীতে বিষম কষ্ট পাচ্ছে। ছেলেদের বলাতে দুখানা পুরনো কাঁথা বার ক'রে দিয়েছে, তাতে শীত ভাঙে না। আরও, সীতার মা টাকা পাঠায় একথা তারা টের পেয়েছে—সেই জন্যে এখন কিছুই দিতে চায় না। ওদের ধারণা মোটামুটি কিছু পাঠায়। দোষ এদেরই—সীতা পাড়ার একটি ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়েছিল, ঐন্দ্রিলা সেখানেই টাকা পাঠাত মনিঅর্ডার ক'রে, তিনি নিয়ে ওকে দিতেন। তাইতেই কত পাঠায় তা তারা জানতে পারেনি—পাঠায় এটা জেনেছে। না জানিয়ে উপায়ও নেই তো, এক বাড়িতে থাকা, খরচ করলেই ধরা পড়বে যে কোথাও থেকে টাকা আসছে। এখন বাড়িতেই পাঠায় অবশ্য, তাও তারা বিশ্বাস করে না—ভাবে যে ওখানে লুকিয়ে আরও কিছু আসে। এখন কিছু চাইতে গেলে বলে, 'বড়লোক মা মোট-মোট টাকা পাঠাচ্ছে, সেটা জমিয়ে আমাদের কাছে ভাগের ভাগ চাইতে এসেছ বুঝি? ও-সব হবে টবে না, ঐ টাকা ভাঙিয়ে খরচ করগে!'......

সীতার ঐ চিঠি পেয়ে ঐন্দ্রিলার মাথা খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবলে এখানে এসে এদের কাছ থেকে কিছু

চায়। কিন্তু মা কিছু দেবে না তা সে জানত। এক দিকে দিতে পারে দিদি—তা সে হয়ত বড়জোর দশটা টাকা দেবে—ওর যাওয়া-আসায় গাড়ি-ভাড়াই পড়ে যাবে ছ' টাকার ওপর—লাভ কী হবে?

অকূল-পাথার ভাবনা—কাউকে জানাবার কি পরামর্শ করবার লোক নেই। বাবুরা আগাম দিতে পারে—কিন্তু তাতে মাসের টাকা পাঠাতে পারবে না। কোন লোক না পেয়ে সে ওদের ঝি, স্থানীয় একটি মেয়ে একাদশীকে মনের কথা জানিয়েছিলে, পরামর্শ চেয়েছিল তার কাছে। একাদশী বোধ হয় এই সুযোগই খুঁজছিল বহুদিন থেকে—ঐন্দ্রিলার চাল-চলন দেখে কিছু বলতে সাহস করে নি। সে বললে, 'তেল-ঘি-চাল-ডাল সবই তো তোমার হাতে, কিছু কিছু সরাও, আমি লুকিয়ে বেচে দেব।' প্রথমটা খুব আপত্তি করেছিল ঐন্দ্রিলা। কিন্তু একাদশী বোঝালে যে, এতে কোন দোষ নেই, সবাই তাই করে। তাছাড়া ব্রাহ্মণের মেয়ে দু-বেলা আগুনে-তাতে মুখের রক্ত তুলে মরছে—তাকে ঐ আটটি টাকা দেওয়া এদের মানুষের মতো কাজ হচ্ছে? এদের কি টাকার অভাব আছে কিছু? যেমন-কে-তেমনি-জব্দ করা উচিত চুরি করেই।

ক্রমশ ঐন্দ্রিলাও বুঝলে, গরজ বড় বালাই। না বুঝে তখন আর উপায় ছিল না। অন্তত কোন উপায় সে দেখতে পায়নি।

ঐন্দ্রিলা কিছু কিছু সরাতে শুরু করতেই একাদশী আগাম দশটা টাকা এনে দিলে কোথা থেকে। সে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে। কিন্তু তারপরই ভুল বুঝতে পারল। একাদশীর চাপ বড় বেশী, তার খাঁই আর মেটে না। সে চায় ঐন্দ্রিলা পুকুর চুরি করুক। ঐন্দ্রিলার অত সাহস হত না। তা ছাড়া, সে বুঝেছিল যে এর বেশির ভাগই—টাকায় বারো আনা—উঠছে একাদশীর ঘরে। শেষে একাদশী ওকে ভয় দেখাতে শুরু করল। চুরি না করলে বাবুদের বলে দেবে এমন ভয়ও দেখাল। ঐন্দ্রিলা ভয়ে দিশেহারা হয়ে একাদশীকে খুশী করতে অর্থাৎ চুরির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

টাকাটা যেত মনিঅর্ডারে—ঠিকানাটা থাকত একাদশীর। স্থানীয় ডাকঘর—পোষ্ট-মাষ্টার বাবুদের সবাইকে চেনেন। তাঁর সন্দেহ হ'তে তিনি গোপনে এঁদের জানালেন। বাবুরা তক্কে তক্কে থেকে যে মুদীর দোকানে একাদশী মাল আধা-কাঁড়িতে বেচত—তাকে ও একাদশীকে হাতে-নাতে ধরে ফেললে। মারের চোটে সব কথাই বেরিয়ে পড়ল। ঐন্দ্রিলা সামনা-সামনি অস্বীকার করতে পারল না। করলেই বা তারা শুনবে কেন? ওর যোগসাজস ছাড়া এসব জিনিস বেরোনো সম্ভব নয়। ওকেই তারা বিশ্বাস করত সবচেয়ে বেশী, ঝি-চাকরের ভাঁড়ারে যাওয়ার নিয়ম ছিল না।

বামুনের মেয়ে ব'লে মার-ধোর করলে না—শুধু তখনই বিদায় করে দিলে—খাড়া খাড়া, সেই দিনই।

অথচ বিপদের ওপর বিপদ—মাসখানেক আগেই চিঠি পেয়েছে—সীতা অন্তঃস্বত্বা। কিছু বেশী টাকা তাকে না পাঠালেই নয়। এমনিই তো মাস-কাবারে টাকা না পাঠালে তারা শুকিয়ে মরবে। অথচ সে টাকাই বা কোথা থেকে পাবে। বাবুরা টিকিটটা কিনে দিয়েছে তবু দয়া করে—নইলে তো ভিক্ষে ক'রে আসতে হ'ত!

দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত ক'রে কনকের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চায়, 'তুমি ভাই দাও একটা ব্যবস্থা ক'রে—নইলে মেয়েটা শুকিয়ে মরবে। এই প্রথম পোয়াতী, কোথায় ভাল-মন্দ খাওয়াবার কথা, তায় একেবারেই উপোসের ব্যবস্থা। লক্ষ্মী ভাই বৌদি, আমি কাজকর্ম খুঁজে নেবই একটা, মাসে এক টাকা ক'রেও অন্তত শোধ করব। তোমার কোন ভয় নেই!'

কনক তো অবাক।

'তুমি কি ভাই ঠাকুরঝি তোমার দাদাকে চেন না? একটা টাকাও কি আমার হাতে দেয় কোন দিন? সেই মানুষ কি?...... আমি কোথায় পাব?'

'কিছু দেয় না তোমাকে? তুমি কিছু জমাও নি? ও মা, তবে আর বরকে কি হাত করলে? ছেলে হয়েছে—এখন তো তোমার জোর।......কিছু নেই তোমার হাতে এ আমি বিশ্বাস করি না। দেবে না তাই বল!'

অনেক দিব্যি-দিলেশার পর খানিকটা বিশ্বাস করে।

তখন অন্য অনুরোধ, 'তুমি একটু মাকে কি দাদাকে বুঝিয়ে বল। মা তো সুদে টাকা খাটায়—আমি সুদ দোব। কুড়িটা টাকা আমাকে ধারই দিক!'

এ অনুরোধের ফল কি হবে তা তো জানাই ঐন্দ্রিলারও জানা উচিত, কারণ সে মাকে কনকের চেয়ে অনেক বেশী দিন দেখেছে—তবু ওর অনুনয় ও মিনতি এড়াতে না পেরে বলবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

রাত্রে হেমের কাছে কথাটা পাড়বার উপক্রম করতেই সে বলে, 'ওসব প্যান-প্যানানীতে কান দেবার তোমার দরকার কী? ওর সঙ্গে অত আত্মীয়তা করতে যাও কেন? কী গুণের বোন আমার খাচ্ছে দাচ্ছে সে-ই ঢের, তার ওপর আবার দক্ষিণে দিতে পারব না। টাকা এত সস্তা নয় আমার!'

হেমের এ গলার আওয়াজ এতদিনে ভালই চিনেছে কনক। এর ওপর কথা কইতে যাওয়া বৃথা।

পরের দিন শাশুড়ীকে বলতে গিয়ে আরও কর্কশ কথা শুনতে হ'ল।

'কেন, তোমাকে উকীল পাকড়ে বলতে হ'ল কেন? তার মুখ কি হ'ল? সে পোড়ার-মুখ তো এখনও পোড়েনি, সে তো ঠিক আছে।......আসলে বুঝেছে যে এখন বৌদিই বাড়ির গিন্নী, গিন্নী বললে যা মাগী ভয়ে ভয়ে দিতে পথ পাবে না। দাসী-বাঁদী বৈ তো নয় মা।......তা এতই যখন গিন্নী হয়েছ বাছা, টাকার জন্যে সুপারিশ করতে এসেছ কেন—তুমিই ফেলে দাও না টাকা কটা! ভাতার তো মোট মোট টাকা এনে শ্রীপাদপদ্মে ঢালছে সে কি আর আমরা টের পাই না? —না, আমরা ধানের চালের ভাত খাই না। বেটা বিইয়ে দিয়ে ভাতারের সো হয়েছ—এখন তো হাতের মুঠোর মধ্যে ভাতার।......টাকাটা দিয়ে দিলেই পারতে

—ছলনা ক'রে আবার আমাকে বলতে এসেছ কেন? লোক-দেখানো কাষ্টনৌকতা না করলেই নয়?'

অবশ্য মেয়ের উদ্দেশ্যেও হ'ল তার-পর, 'সুদের কড়ারে টাকা ধার করতে এসেছেন উনি—দেবে কে ওঁকে, কিসের ভরসায় দেবে? ভারী তো ওঁর মুরোদ—বলে টিকে ধরাতে জামিন লাগে, সম্পত্তি বলতে আধ পয়সার জিনিস নেই কোথাও উনি আবার বড় গলায় সুদের লোভ দেখান। এত যখন দরের লোক হয়েছেন উনি—যান না, বাজারে লোকজনের অভাব আছে! কাকে কত সুদের লোভ দেখাতে পারেন দেখিয়ে আসুন না।'

এসব কথা বলা যায় না ঐন্দ্রিলাকে, বলতে পারেও না কখনও। শুধু টাকাটা চাওয়া, হবে না, ও টাকা দিতে পারবেন না —এই কথাটাই বলে। ফলে ঐন্দ্রিলা মনে মনে, তাকে বিশেষ কোন চেষ্টাই করেনি, হয়ত অন্য কোন চেষ্টা করে নি। সে ক্রমশঃ ওপর পর্যন্ত বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে।

দিন কতক ছট-ফট করে শেষে একদিন ছেলেকে গিয়ে ধরে, 'এই, তোর হাতে তো টাকা আছে—হাতে না থাক, তোরই তো টাকা—মাকে বল্ আমায় কুড়িটা টাকা ধার দিতে—আমি তোকে একুশ বাইশ টাকা ক'রে শোধ দোব। হয়ত এক মাসেই পারব না—তিন চার মাসে শোধ করব, তবে ঐ টাকাটা পুষিয়ে দেব।'

তবু হাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না, উদাসীন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আজকাল তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে বক্তার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে বটে, তবে তার মুখ দেখে বোঝা যায় না কথা-গুলো সে শুনতে পাচ্ছে কি না।

'কী লো দিবি—না দিবি না? সেইটে স্পষ্ট বলে দে না বাবু।'

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ঐন্দ্রিলা অল্প-ক্ষণেই।

তাতেও কোন জবাব না পেয়ে নিজ-মূর্তি ধরে সে, 'নেকী! কত কল্লাই জানিস্ মাইরি!......এই কল্লা ক'রে মা-ভাইকে তো ভুলিয়েও রাখিস! আমরা এসব কিছু শিখলুম না বলেই আমরা চিরকাল পাজী বদমাইশ হয়ে রইলুম সকলের কাছে। আমরাও একদিন হাত-শুধু ক'রে এসেছিলুম এ বাড়িতে—তোর চেয়ে ঢের কম বয়সে—তবু কেউ আহা-উহু করেনি। আমরা যে কল্লা শিখিনি—তার কী হবে!'

কিন্তু এসব কথারও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না—অব্যর্থ অস্ত্র পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে যেন। এবার ঐন্দ্রিলা ছিটকে উঠোনে নামে, গলা চড়িয়ে মাকে উদ্দেশ ক'রে বলে, 'এত টাকা আসছে—এক-এক জন গিয়ে শয্যে চড়ছে আর সিন্দুক-ভরা বাসন, বাক্স-ভরা টাকা তো এসে ঢুকছে ওঁর পেটে—তবু পয়সার মায়া এত! নিজের মেয়ে-নাতনীকে একটা পয়সা দেওয়া যায় না! আর কত লোকের সর্বনাশের পয়সা খাবেন উনি, কত খেলে ওঁর পেট ভরে—সেইটে জানতে পারলে যে হ'ত!...কাউকে রেখে যাবেন না উনি, সব কটিকে গব্বায় পুরবেন—তবে যাবেন। তখন ঐ বাসন আর পয়সা পাঁচভূতে খাবে, এই বলে দিলুম। আমাদের সঙ্গে বঞ্চে করা ঐ পয়সা!'

মর্মান্তিক আঘাত, শ্যামার বুকেও তা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে। কদিন আগে তরুর বাসনের সিন্দুক যখন নামছে তখন তিনি নিজেই সেই কথা ভেবেছেন। এত জিনিসের শখ তাঁর—কিন্তু এ কী জিনিস আসছে, এতো তিনি চান নি। ভগবান তার আকাঙ্ক্ষাকে এ কী পরিহাস করছেন। ......আজ মেয়ের এই কথায় সেই ক্ষতটাই আবার দগদগিয়ে উঠল যেন। তাঁর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠে আবার তা বিবর্ণ হয়ে গেল। চোখে জলও এসে পড়ল। তবু তিনি প্রাণপণে আত্মসম্বরণই করলেন। তরল ময়লায় ঢিল ছুঁড়লে সে ময়লা ছিটকে নিজের গায়েও এসে লাগে। দরকার নেই।

এর পর ঐন্দ্রিলার হিংসা ও হিংস্রতা নিরাবরণ হয়ে উঠল। একটু শান্ত থাকত

শুধু হেমের বাড়ি থাকার সময়টায়। সে অফিসে চলে গেলেই নিজমূর্তি ধারণ করত। অকারণ গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করত—সেটা ঠিক বাধত না বলেই আরও ক্ষেপে যেত যেন। গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে অভিসম্পাত ক'রে জীবন দুর্বহ করে তুলত সবাইকার। বোধ হয় এটুকু সে বুঝে নিয়েছিল যে, যাকে লাগানো-ভাঙানো বলে—কনক তা করবে না। অন্তত তার সব অত্যাচারের কথা পুরোপুরি হেমের কাছে বলবে না। মা-ও —বললে খানিকটা বলবে, সবটা বলতে পারবে না।

মতো অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসত তার মুখ দিয়ে—যথাযথ অঙ্গভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের সহযোগিতায় যে, তার ওপরে ওঠা কোন ভদ্রমহিলার পক্ষেই সম্ভব নয়। কনক অবাক হয়ে যেত এইসব শুনে। সে ভেবে পেত না যে ও এত শিখলে কোথায়, শিখলে কার কাছে! এ সবই কি অন্যত্র শুনে শেখা ওর—না স্বকপোল-কল্পনা?

'বেরিয়ে যাও', 'দূর হয়ে যাও' এসব বললেও কোন ফল হ'ত না। সদম্ভে জবাব দিত ঐন্দ্রিলা, 'কেন, কিসের জন্যে বেরোব আমি? আমি শুনেছি মায়ের সম্পত্তিতে

"...দিবি না দিবি না? সেইটে পষ্ট বলে দে...না বাপু"

অসহ্য হ'ত অবশ্য শ্যামারই। শুধু তাঁকে বললে অত গায়ে লাগত না তাঁর—কিন্তু সদ্যোবিধবা ঐ মেয়েটা—একে শোকে-দুঃখে নীরব নিথর হয়ে গেছে—ওকে যখন আক্রমণ করত, অসহ্য কটু কথা শোনাত—তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ রাখা অসম্ভব হ'য়ে উঠত এক একদিন। কিন্তু প্রতিবাদ বা তিরস্কারে কোনই ফল হ'ত না। এমন কাণ্ড করত ঐন্দ্রিলা, আরও অজস্র কুবাক্য এমন জলপ্রপাতের

মেয়ের অধিকার বেশী। বাড়ি তোমার নামে—আমি তো জোরের সাথে থাকব। চিরকাল বাঁচবে নাকি তুমি? আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে এসেছ?......মরতে হবে না একদিন ভেবেছ? তখন তো এ-সব আমাদের হবে।......তবে কিসের জোর তোমার? এক মেয়ে যখন বসে আছে আমিই বা থাকব না কেন? আমি তোমার মেয়ে নই? তাড়াতে হ'লে ওকেও তাড়াও।' ইত্যাদি।

পাগলকে যুক্তি দিতে যাওয়া বৃথা। বিশেষ সে এমনই চিৎকার করে যে তার ওপর গলা চড়িয়ে ওকে কোন কথা শোনাবেন—সে ক্ষমতা শ্যামার আর আজ-কাল নেই। অত চেঁচাতে গেলে তাঁর কষ্ট হয়।

এক উপায় হেমকে বলা। কিন্তু সে হয়ত মার-ধোর করবে শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে। সে এক কেলেঙ্কারী। এমনিই তো পাড়াঘরে মুখ দেখাতে লজ্জা করে তাঁর। তা-ছাড়া, বয়স হ'লেও ঐন্দ্রিলার সে অসামান্য রূপ এখনও এমন কিছু নষ্ট হয়নি—শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আর পথ নেই তার, মেয়ে তো বলতে গেলে ভিখিরী—তাড়িয়ে দিলেই বা কোথায় কার কাছে গিয়ে উঠবে। হয়ত গুণ্ডা-বদ-মাইশের পাল্লায় পড়বে—কে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক কি! আরও সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন। চাকরি-বাকরি কি আর একটা জুটবে না। সে তবু কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকা, কতকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। পাজী হোক—বজ্জাত হোক—নিজে থেকে স্বেচ্ছায় খারাপ পথে পা দেবে না। ও—সে বিষয়ে শ্যামা নিশ্চিন্ত।

মধ্যে মধ্যে আজকাল বেরিয়েও যায়—তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা, কোন কোন দিন বা আরও বেশীক্ষণ অনুপস্থিত থাকে। কাজের জন্য ঘুরছে কি টাকা ধার করতে —তা ঠিক বুঝতে পারেন না। সম্ভবত দুই উদ্দেশ্যেই।......যাই হোক— সেই সময়টা একটু শান্তিতে, একটু স্বস্তিতে থাকেন।......

এর মধ্যে একদিন একখানা মণি-অর্ডারের রসিদ ফিরে এল। সীতার নামে কুড়ি টাকা পাঠানো হয়েছিল, তারই রসিদ। কোথা থেকে টাকাটা পেলে ও? দুর্ভাবনায় মুখটা কালো হয়ে উঠল শ্যামার! অন্য কোথাও ধার করে করুক—কুটুমবাড়িতে মুখটা পোড়াচ্ছে না তো? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি খোকাকে পাঠালেন মহাশ্বেতার কাছে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করে আসবে।

খোকাকে এখানের ইস্কুলে ভর্তি করা হয়নি। ওখান থেকে ছাড়িয়ে সার্টিফিকেট আনিয়ে এখানে ভর্তি করতে গেলে নাকি এক গাদা টাকা খরচা। হেম বলেছে, এখন বাড়িতে পড়ুক, আসছে জানুয়ারীতে কোথাও পড়ে না বলে এখানকার ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দেবে—তাতে টাকা অনেক

কম লাগবে। শ্যামা আপত্তি করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে কমলার ওখানেই থাক, কমলাও রাজী ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দ রাজী হয়নি। অল্প যে কদিন ছিল ওখানে—গোবিন্দ ওকে লক্ষ্য করেছে—সে নাকি বলেছে যে, 'ও ছেলের হাবভাব ভাল না, বাইরে অমনি ঠান্ডা ভিজে বেড়ালের মতো থাকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ও বিগড়ে গেছে। ওকে রাখবে—তারপর যদি কিছু হয়, আরও বকে যায় তো আজীবন খোঁটা শুনতে হবে মাসীর কাছ থেকে। পয়সা কে পয়সাও যাবে—একটা ছেলেকে রেখে তার খরচা টানা কি সোজা—আমার গুনিও তো বড় হচ্ছে—মিছিমিছি তার ওপর দুর্নাম কিনি কেন!'

গোবিন্দর এ কথা হেম গোপন করে নি। শ্যামা খুবই চটে গেছেন তাতে। বলেছেন, 'আসলে খরচার কথাই বড় কথা। অতগুলো লোক খাচ্ছে, আমার ছেলে কি একেবারে য্যাত য্যাত খেত!... না হয় ইস্কুলের মাইনে, জামা-কাপড় আমিই দিতুম। শুধু খোরাকীটা—তাও দিতে পারলে না।...... সেই বলে না—ধান ভানাবি গা? না না ভানাবার গা!... তার পারবি না পারবি না—মিছি-মিছি একটা দুর্নাম দেবার দরকার কি? আমার এটুকু গুয়ের গোলা ছেলে—চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স হয়েছে—এর মধ্যে ও কি বিগড়ে গেল? কী বিগড়ে যেতে দেখলেন তিনি! একটা গেছে বলে কি সব কটাই যাবে? তাও সে গেছে কি আর ঐ বয়সে গেছে!' ইত্যাদি—

এ তো শুধু হেমের সামনে। হেমের আড়ালে গোবিন্দ সম্বন্ধে আরও যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা ভদ্রতার সীমায় আবদ্ধ থকে নি—বলাই বাহুল্য।

খোকা ফিরে আসতে বোঝা গেল, তাঁর আশঙ্কাই ঠিক। তাও মহাশ্বেতা নয়—চেয়েছে জামাইয়ের কাছেই, তাঁর মুখটা ভাল ক'রেই পুড়িয়ে এসেছে।

মহাশ্বেতা বলেছে, 'আমিই তো বললুম ছুঁড়িকে—যা না, তোর দাদাবাবুকে গিয়ে ধর না। আমিও হয়ত দিতে পারি—কিন্তু সে আর কত, পাঁচটা সাতটা না হয় বড় জোর দশটা। তা সে থাক না, তোর কি আর দরকার হবে না? এযাত্রা তোর দাদাবাবুকে গিয়ে বলগে যা সব দুঃখু জানিয়ে—দিয় দিতে পারে। তা মিনসেও তো তেমনি, নিজের কাছে কি এক পয়সা রাখে—সব তো এনে ঐ মহারাজার শ্রীপাদপদ্মে। সুদে খাটায় যে টাকা সেই টাকা শুধু থাকে, তা তা থেকে দেবে না আমি জানি—আর সে পড়েও থাকে না। সে খাটেও তো আমার টাকাই বেশী। তা বলবামাত্তরই ওর দাদাবাবু মেজকত্তাকে গিয়ে বললে—এক রকম দায়ে পড়েই, কী করবে এখন? কী ভাগ্যি মেজভাই সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে টাকাটা বার করে দিলে। এও বলে দিয়েছে যে—এ আর শোধ দিতে হবে না, এ তোমার মেয়েকে আমরা দিলুম। দিয়েছে তাই—না দিলে কি আমি অমনি ছাড়তুম নাকি, ওর শালীর ছেলেকে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে না?'

আবার বলেছে, 'তা মারই বা কী আক্কেল—হাজার হোক পেটের মেয়েই তো—পর তো আর নয়! মেয়ে আর নাতনী—একটা দুঃসময়ে পড়েছে—ঐ কটা টাকা দিতে পারলে না! এই যে সুদে খাটাচ্ছে টাকা—কিছু কি আর মারা পড়ে না? না হয় ভাবত যে তেমনি মারাই পড়েছে। বজ্জাত মাকে যে কথাটা শুনে দিদির খুব অসন্তোষ হয়েছে।'

খোকা আনুপূর্বক এসে বলে মাকে—যা যা দিদি বলেছে সব।

শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন শ্যামা, 'তবেই তো আমি তাঁর ভয়ে ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে বেরোব লুকোবার জন্যে। এত যদি তোর টান নিজে দিলিনে কেন—আমার মুখটা পোড়াতে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে গেলি কেন।......সারা কুটুম্ববাড়িময় জানাজানি হয়ে গেল—মুখটা পুড়তে কোথাও আর বাকী রইল না। বুদ্ধি না থাকে, হায়াপিত্তিও তো থাকে মানুষের—তুই কি বলে জামাইয়ের কাছে পাঠাতে গেলি! হাত্তোর ভাল হোল রে!'
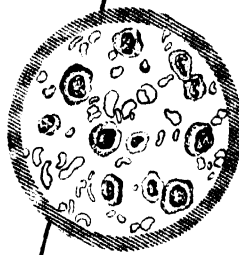
তিনি বহুকাল পর্যন্ত [illegible] থাকেন।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য, ভাগবত ও চরিতামৃত

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(পাঁচ)

মহাপ্রকাশ বা সাতপ্রহরিয়া ভাব। অন্যান্য দিন যেন ভাবাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শ্রীবাস মন্দিরে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিতেন। আজ আপন স্বভাবেই অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিষ্ণুখট্টায় আসিয়া বসিলেন।

আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া।।
সাতপ্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া।।

এই অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে প্রভুর অভিষেক সম্পন্ন হয়। ভক্তগণ পুরুষ সুক্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়া দেন। মুকুন্দাদি অভিষেক মঙ্গল গান করেন। নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভক্তগণ তাঁহার দিব্য অঙ্গে লেপিয়া দেন সুগন্ধি চন্দন। পরে বিষ্ণুখট্টা উপস্কারপূর্বক মহাপ্রভুকে তাহাতে বসাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করেন। সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিলে পূজা সম্পন্ন হয়। এইদিন শ্রীবাসের দাসী দুঃখী সুখী নাম প্রাপ্ত হন। এই শুভলগ্নে মহাপ্রভুর উদ্দেশে কত অলংকার, কত তৈজসপত্র, কত বস্ত্র, কত ফলমূল, কত মিষ্টান্নাদি যে অর্পিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা হয় না।

মহাপ্রভু এইদিন অপরে জানে না মাত্র তিনি জানেন আর সেই ভক্ত জানেন, এমন অনেক গোপন কথা বলিয়া ভক্তবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া দেন। সন্ধ্যায় বরদানে উন্মুখ হইয়া সর্বপ্রথম তিনি খোলাবেচা শ্রীধরকে আনিতে আদেশ করিলেন। শ্রীধর আসিলে বলিলেন—শ্রীধর আমার রূপ দর্শন কর। শ্রীধর দেখিলেন—সম্মুখে তমাল শ্যামল মূর্তি—

হাতে বংশী মোহন দক্ষিণে বলরাম।
মহা জ্যোতির্ময় সব দেখে বিদ্যমান।।
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে।
চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে।।

আশ্চর্যের বিষয় এই মহাপ্রকাশের দিনেও কোন ভক্ত শ্রীরাধার দর্শন প্রাপ্ত হন নাই, বা তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীধর বলিতেছেন—

পূর্বে তুমি মোর স্থানে আপনে বলিলা।
তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণ সলিলা।।
প্রভু মোর পাপ চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিলুঁ তুয়া দুই অমূল্য চরণ।।
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগরে।
এখনে হইলা নবদ্বীপ পুরন্দরে।।
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে।
হেনমতে নবদ্বীপে হইলা বাহিরে।।
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিলা তোমারে।
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে কান্ধে কৈলে গোপ সে শ্রীদামা।।

এই পর্যন্তই শ্রীবৃন্দাবন দাসের অনুভবের সীমা। মহাভক্ত হইয়াও তিনি ইহার অধিক অগ্রসর হন নাই। প্রচলিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে পাঠ আছে "ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপ-রামা।" পাঠটি ভুল। তিনি কোন গোপীকেই কান্ধে করেন নাই। শ্রীমদ্‌-ভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন যে প্রধানা গোপীকে সঙ্গে লইয়া তিনি অন্যান্য গোপীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কান্ধে করিবার প্রলোভন দিয়া অন্যান্য গোপীগণকে মদগর্বভঞ্জনের উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির চিরস্থায়ী সুদৃঢ় পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে অন্যান্য গোপীর প্রধানা গোপীর সঙ্গলাভ যাহাতে অনায়াসলভ্য হয়—তজ্জন্য তিনি প্রধানা প্রেয়সীকেও কিছুক্ষণের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি এই ভ্রমাত্মক পাঠ পরিহার করিয়াছি। ইহার পর প্রচলিত পাঠ—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী বহে যার মনে।
সে তুমি শ্রীদাম গোপ বহিলে আপনে।।

এই পাঠ প্রক্ষিপ্ত। শ্রীধর দাস্য-ভাবের ভক্ত। তাঁহার অনুভবে শ্রীমতী সত্যভামার কথা আসিয়াছে, কারণ তিনি ঐশ্বর্যসম্ভারে শ্রীকৃষ্ণের পরিমাপ করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু তাঁহাকে সখ্যরসের অনুভূতিও দান করিয়াছিলেন। অন্যথায় থোড় মোচা কিনিবার ছলে তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন না। এইজন্যই শ্রীমান শ্রীদামা গোপের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস যে কতবড় কবি ছিলেন একমাত্র শ্রীধরের স্তবেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রভু বোলে শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিব আজি তোমার গোচর।
শ্রীধর বোলেন প্রভু আরো ভাণ্ডাইবা।
নিশ্চিন্তে থাকহ তুমি আর না পারিবা।।
প্রভু বোলে দরসান মোর ব্যর্থ নহে।
অবশ্য পাইবা বর যেই চিত্তে লয়ে।।
মাগ মাগ পুনঃ পুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বোলয়ে প্রভু দেহ এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কারিলেন মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মণিরত্নের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিত্বের সহস্র নিদর্শন পাঠককে মুগ্ধ করে। কিন্তু এই খোলাবেচা দরিদ্র ব্রাহ্মণের উক্তি যেন অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কবি দরিদ্র শ্রীধরের হৃদয়কন্দরে প্রবেশ-পূর্বক তাহার মনের ভাব অবগত হইয়াছেন, এবং অপূর্বভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীধরের শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তি, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা কবি অতি চমৎকাররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুদীর্ঘ চারিশত বৎসরের অধিককাল পরেও কালপ্রবাহে ভাসিয়া শ্রীধরের কণ্ঠ আমাদিগকে সুধাধারায় পবিত্র করিতেছে—

যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
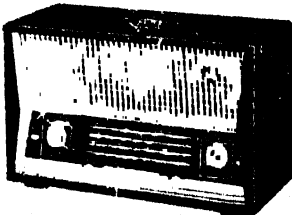
দেবতার কথা

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। তিন ।।

ভাউজীর কাছ থেকে ছাড়া পেতেই সুপ্তি আমাকে চেপে ধরল। প্রশ্ন করল : বাবার পড়া কেমন লাগল?

তোমার কেমন লাগে?

তোমার মন্তব্যটা আগে শুনি।

গম্ভীরভাবে বললাম, ভাল।

হুঁ।

হুঁ মানে?

তুমি মিথ্যেবাদী।

কেন?

বাবার পড়াকে সবাই ভয় পায়, আর তুমি বললে ভাল লাগল!

আমার ভাল লাগলেও আমি খারাপ বলব?

মাথা নেড়ে সুপ্তি বলল : বেশ, কটা শ্লোক শিখেছ বল।

একটাও না।

তবে কীরকম ভাল লাগল?

বলেই হেসে উঠল উদ্দামভাবে।

মুখ বাড়িয়ে একটি ছেলে বলল : কী হচ্ছে সুপ্তি?

সুপ্তি বলল : তা দিয়ে তোমার কী দরকার।

নতুন ছেলেটার পেছনে লেগেছ বুঝি?

বেশ করেছি।

আস্তে আস্তে আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ও কে।

চেনেলু।

চেনেলু তো তার নাম, পরিচয় বলবেন?

এখানে আবার পরিচয় কী! ও-ও তোমার মতো ছাত্র। বোকা বলেই মুখ বাড়িয়ে কথা বলতে আসে, আর বকুনি খায়।

আমি তো কথা না বলেও বকুনি খাচ্ছি।

তোমার কপাল।

বলে সুপ্তি সরে গেল।

আমি কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না। চেনেলু মুখ বাড়িয়ে বলল : এদিকে এস।

মনে হল যেন বেঁচে গেলাম। একটা ছেলের সঙ্গে ভাব হলেও সময় কাটবে। তা না হলে ঐ মেয়েটাই মাথা খারাপ করে দেবে। তাড়াতাড়ি আমি গিয়ে চেনেলুর ঘরে ঢুকলাম।

এ চেনেলুর ঘর নয়, আরও অনেক ছাত্র আছে এই ঘরে। কিন্তু আমাকে সে তার চারপায়ের উপর বসতে বলল। বলল : এইবেলা একটু গড়িয়ে নাও। পরে আর সময় পাবে না।

বললাম : দুপুরে গড়াবার অভ্যাস আমার নেই।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য মানে?

বাঙলা দেশের মানুষ শুনেছি দিবা-নিদ্রায় খুব দড়। দেশের মাটি নরম, রোদের তাপ কম। সকালে একবার লাঙল ঘুরিয়ে বিকেলে বীজ ছড়ালেই সোনা ফলে। পরিশ্রমের কোন দরকারই হয় না।

সরকার সেই জন্যেই তো বাঙালীদের, এই দণ্ডকারণ্যে পাঠাচ্ছে। খেটে খেতে শিখবে বলে।

চেনেলু হাসল, বলল : রাগ করলে বুঝি?

রাগ কিসের?

—তোমার দেশের লোককে অলস বললাম।

সত্যি কথায় রাগ করব কেন!

ছি ছি, তোমার প্রথম পাঠ দেখছি নেওয়া হয়নি। তোমার দেশ তো আমারও দেশ। আমাদের সকলের দেশ। সবাই আমরা দেবতার দেশের মানুষ।

সুপ্তির কথা আমার মনে পড়ল। বললাম : ভুলে গিয়েছিলাম।

চেনেলু চেপে ধরল। বলল : এ পাঠ তোমাকে কে দিয়েছে বল।

চেনেলুর দৃষ্টিতে প্রবল কৌতূহল।

বললাম : তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

দরকার তো কিছুরই নেই। এখানে পড়াশুনো করবারই বা কী দরকার! সরকারি চাকরি কেউ দেবে না ব্যবসার মূলধনও পাওয়া যাবে না। তবু তো আমরা দূর দূর দেশ থেকে এসেছি।

তোমরা কী করে খবর পেলে?

মুখে মুখে।

আশ্চর্য হয়ে বললাম : সত্যি?

চেনেলু বলল : এখানে আসার পরে ভাউজী তার কারণ বলেছেন। সামান্য আয়োজন নিয়ে ঢাক ঢোল পেটানো চলে না। আর পরিবেশ অন্যরকম হলে শিক্ষারও ব্যাঘাত হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন আমি ভুলিনি।

আমি ভুলে গেছি।

আমরা যে দেবতার দেশের মানুষ, একথা আমাদের গুরুজী বলেছেন। তুমি তখন ছিলে না। এ পাঠ তোমাকে কে দিল?

কেন জানি না, সুপ্তির নাম করতে আমার লজ্জাবোধ হল। বললাম : যদি বলি, এ আমার নিজের অনুমান!

বিশ্বাস করব না।

কেন?

জগতে এমন অনেক কথা আছে যা অনুমান করা যায় না। এও একটি তেমনি কথা।

তাহলে আমার কিছু বলার নেই।

আমার আছে।

বল।

সুপ্তি তোমাকে বলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম : কেন এ সন্দেহ করছ?

আগে ঠিক বলেছি কিনা বল।

সত্য কথা এবারে স্বীকার করলুম : ঠিক বলেছ।

খুশীতে চেনেলুর মুখ উজ্জ্বল হল না, ম্রিয়মানও না। বলল : এখানে যে অধ্যয়নের জন্য এসেছ, সে কথাটা স্মরণে রেখ।

আমি তাকে এই উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম।

।। চার ।।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকারে যখন চারিদিক আবৃত হল, আমরা এসে উপাসনার মন্দিরে সমবেত হলাম। গুরুজীকে কাল আমরা এইখানেই দেখেছিলাম। এই গৃহে। এর নাম যে উপাসনা-মন্দির, আজ তা জানতে পেরেছি।

চারকোণায় চারটি প্রদীপ জ্বলছে। ঘৃতের প্রদীপ নয়। এ দেশে ঘৃত এখন দুর্মূল্য হয়েছে। খাঁটি জিনিস পাওয়াও যায় না। খাঁটি জিনিস সংগ্রহের চেষ্টাও একটা শৌখিনতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের উপাসনা-মন্দিরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। গুরুজীর ঘরেও। আমাদের ঘরে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলে।

খড়ম পায়ে গুরুজী যখন মন্দিরে এলেন, আমরা উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি আমাদের বসতে বললেন। নিজে বসে বললেন : কাল আমি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিনি। দেবতার সম্বন্ধে গল্প বলবার আগে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিষয় কিছু বলা দরকার।

সবাই নীরবে রইলেন।

গুরুজী নিজেও অনেকক্ষণ নীরবে থেকে, ধীরে ধীরে বললেন : এ একটা কঠিন তত্ত্ব। দুরূহ বিষয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশ দীর্ঘদিন ধরে নানা কথা

ভেবেছে। কিন্তু কোন কূলকিনারা দেখতে পায়নি। জ্ঞান বিজ্ঞানে যার নাগাল পাওয়া যায়নি, বুদ্ধি দিয়ে যার সন্ধান মেলেনি, অক্লান্ত তপস্যায় তার অস্পষ্ট রূপ যেন স্পন্দিত হয়েছে। এই বিচিত্র সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিমান মানুষ একদা প্রশ্ন করেছিল, আমি কে? কোথা থেকে এসেছি, কোথায় এসেছি? আমার ও এই বিশ্বের পরিণতি কী?

এ প্রশ্নের নানা উত্তর পাওয়া গেছে, কিন্তু কোন্‌টা সত্য তা জানা যায়নি। ভারতের আর্য ঋষিরা এক পরব্রহ্মের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন। সৃষ্টির আদি নেই, অন্তও নেই। স্বয়ম্ভূ ভগবান সৃষ্টি কার্যে সারাক্ষণ নিযুক্ত আছেন। একোঽহং বহু স্যাং—এক আমি বহু হব, ভগবানের এই ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টির আরম্ভ। তিনিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

এই হল বেদান্ত মত। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির কল্পনা করা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হয়নি এমন দর্শন বা পুরাণ বুঝি এদেশে নেই। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, মনু ও হারিত সংহিতায়, তন্ত্রে, ভাগবতে, বিষ্ণু-শিব-অগ্নিপুরাণে আছে। আছে বৌদ্ধ ও জৈন মতে, বাইবেলেও আছে। ইহুদীরা ভেবেছে, মিশরের প্রাচীন মানুষেরা ভেবেছে, ভেবেছে ফিনিস ব্যাবিলন ও স্কাণ্ডিনেভিয়ার মানুষেরা।

দেবতার গল্প বলবার জন্যে এই সমস্ত মত আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু ব্রহ্মের অস্তিত্ব মেনে নিলেই আমাদের দেবতত্ত্ব আলোচনার কোন বাধা থাকবে না।

মনুতে আছে, আমাদের এই জগৎ যখন অন্ধকারে আবৃত ছিল, সয়ম্ভু ব্রহ্মার তখন প্রজা সৃষ্টির বাসনা হয়। প্রথমে তিনি জলের সৃষ্টি করে তাতে বীজ নিক্ষেপ করেন। ততক্ষণাৎ একটি অন্ডের উৎপত্তি হল। ঐ অন্ডে ব্রহ্মা নিজেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তারপরেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি শুরু হল।

পরমপুরুষই প্রকৃতির সত্ত্ব রজ তম গুণযুক্ত হয়ে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন! তারই নাম ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি বিষ্ণুরূপে পালন ও মহেশ্বররূপে তিনি প্রলয় সাধন করেন।

গুরুজী বললেন : আজ আমি ব্রহ্মার কথা বলব। ব্রহ্মার পূজা এখন খুব প্রচলিত নয়। গৃহদাহের পর সাধারণত ব্রহ্মার পূজা করা হয়ে থাকে। তাঁর গায়ত্রী : পদ্মাসনায় বিদ্মহে হংসারূঢ়ায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্মান্ প্রচোদয়াৎ।

কালিকা পুরাণে তাঁর ধ্যান আছে। সেটিও সুন্দর।—

ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্ত কমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুবঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রীবামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥

গুরুজী যখন এই ধ্যান পাঠ করছিলেন, আমি তাউজীর দিকে তাকাচ্ছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে গুরুজী সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেন না। তার পরেই মনে হল যে এটি শ্লোক নয়, ধ্যান। দেবতার বর্ণনা ধ্যানেই ভাল লাগে। একটু কষ্ট করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়লে অর্থবোধেও কষ্ট হয় না।

গুরুজীও ঠিক এই কথাই বললেন : দেবতার ধ্যানের অনুবাদ আমি করতে চাই না। ঋষিরা ধ্যানে দেবতাদের যে রূপ দেখেছেন, অনুবাদে তার মাধুর্য রক্ষা সম্ভব নয়। মন্ত্রের অনুবাদ হাস্যকর হবে।

খানিকক্ষণ থেমে গুরুজী বললেন : ব্রহ্মা সম্মান পেয়েছেন ব্রাহ্মণের হোমে। ব্রহ্মাকে স্থাপন না করে হোম হয় না। ব্রহ্মার অভাবে কুশপত্র দিয়ে ব্রহ্মা নির্মাণ করতে হয়।

আমার মনে একটা প্রশ্ন তখন ঘনিয়ে উঠেছে। বিষ্ণু ও শিবের পূজা ভারতের সর্বত্র সমান আদৃত। কোথাও বিষ্ণুর প্রাধান্য, কোথাও শিবের। কোথাও বা বিষ্ণু ও শিবের একই রকম প্রাধান্য। ব্রহ্মার পূজা কোনখানে দেখিনি। গুরুজী একটু আগে বললেন যে গৃহদাহের পরে ব্রহ্মার পূজা হয়। গৃহদাহের আগে নয় কেন?

ব্রহ্মা প্রজাপতি। কিন্তু সন্তান লাভের আশায় মানুষ ব্রহ্মার পূজা করে না, করে ষষ্ঠীর পূজা। ব্রহ্মার পূজা কি পৃথিবীতে রহিত হয়েছে! গুরুজীকে আমি কোন প্রশ্ন করতে সাহসী হলাম না। গুরুজী বলছিলেন : মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখি যে নয়জন ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁদের নাম—ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ। অন্যত্র দেখি, ব্রহ্মার মানসপুত্র দশ। দক্ষের বদলে প্রচেতা ও দশম পুত্র নারদ।

সুপ্তি তার বাবার পাশে বসেছিল। তারই সঙ্গে বোধহয় কোন কথা কইল। গুরুজী বললেন : কোন প্রশ্ন?

তাউজী কোন প্রশ্ন করলেন না।

ভয়ে ভয়ে সুপ্তি বলল : আজমীরে আমরা ব্রহ্মার মন্দির দেখেছিলাম।

গুরুজী বললেন : ঠিক দেখেছ।

আর কোথাও কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির দেখিনি।

তাও বোধহয় ঠিক।

সুপ্তির সাহস বাড়ছে। বলল : শুনেছিলাম, মিথ্যা কথা বলার জন্য ব্রহ্মার পূজা পৃথিবীতে বন্ধ হয়েছে।

গুরুজী হাসলেন। বললেন : সে শিব পুরাণের গল্প।

শিষ্যরা সবাই একসঙ্গে কৌতূহলী হল। গুরুজী বললেন : ব্রহ্মার সঙ্গে বিষ্ণুর তর্ক হচ্ছে, কে বড়। ব্রহ্মা বলছেন, আমি বড়। বিষ্ণু বলছেন, আমি। এখন বিচার কে করে! হঠাৎ দেখা গেল, দুজনের মাঝখান দিয়ে একটি স্তম্ভের মতো জিনিস মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। শেষে স্থির হল যে এই আশ্চর্য জিনিসটির আদি অন্ত বার করতে হবে। যে আগে পারবে, সেই বড়। বিষ্ণু অমনি বরাহ রূপে মাটির নিচে ঢুকলেন, আর ব্রহ্মা পক্ষী রূপে আকাশে উড়লেন। এই সময় উপর থেকে একটি ফুল পড়ছিল। ব্রহ্মা সেটি সংগ্রহ করে বিষ্ণুকে বললেন, এই নাও, আমি এর অন্ত খুঁজে পেয়েছি। আমার জয় হল। পরক্ষণেই সেই স্তম্ভ অন্তর্হিত হল। তার বদলে শিব উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী। এই মিথ্যা ভাষণের জন্যই পৃথিবীতে তোমার পূজা আজ থেকে রহিত হল। ব্রহ্মা অনেক কাকুতি মিনতি করলেন। তার উত্তরে শিব বললেন, বেশ, শুধু পুষ্করেই তোমার পূজা হবে।

আস্তে আস্তে সুপ্তি বলল : ব্রহ্মার বিবাহের গল্পও আমরা পুষ্করে শুনেছি। সে ভারি মজার গল্প।

গুরুজী বললেন : পুরাণে গল্পের শেষ নেই।

একধার থেকে চেনেলু বলল : ও গল্পও আমরা শুনব।

প্রদীপের মৃদু আলোতে আমি সুপ্তির মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। চেনেলুর দিকে তাকিয়ে সে হাসল।

কিন্তু গুরুজী এ গল্প বললেন না, বললেন অন্য কথা : পুরাণের গল্পে নানা বিপদও আছে।

চেনেলুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে কিছু হতাশ হয়েছে।

গুরুজী বললেন : এই যেমন সরস্বতীর কথা। আমরা সবাই জানি যে লক্ষ্মী, সরস্বতী শিবের কন্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে দুজনেই নারায়ণের স্ত্রী। কিন্তু দেবী ভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী, এবং দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। বেদে সরস্বতীর উল্লেখ আছে বাগদেবী রূপে। সরস্বতীর এই পরিচয়ই বোধহয় সত্য পরিচয়।

ব্রহ্মা কেন চতুর্মুখ হলেন, সে সম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে একটি কাহিনী আছে। একদিন তাঁর নিজের দেহ থেকে একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। কোথাও এই কন্যার নাম সন্ধ্যা, কোথাও দেখি

রূপবতী। তাকে দেখে ব্রহ্মা মুগ্ধ হলেন, বং 'কী আশ্চর্য রূপ' বলে বিস্ময় কাশ করলেন। কন্যাটি লজ্জায় আত্ম-গোপনের জন্য তাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মা সারাক্ষণ তাকে অব-লোকন করবার জন্য চতুর্মুখ হলেন। অন্যত্র ব্রহ্মার পঞ্চমুখ দেখি। শিবের তৃতীয় নয়নের রোষবহ্নিতে একটি মুখ দগ্ধ হয়। এখানে সে গল্প অশোভন। আমি তাউজীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হলাম। তিনি অনেক কিছু লিখে নিচ্ছিলেন। বাহিরে এখন সায়াহ্নের ছায়া নয়, অন্ধকার ঘন হয়েছে। ঝিঁঝি ডাকছে অবিশ্রাম। কিন্তু আমরা নিঃশব্দে বসে দেবতার কথা শুনছি।

এক সময় গুরুজী বললেন : আজ এই পর্যন্তই থাক। কাল বিষ্ণুর কথা বলব। তারপর মহেশ্বরের কথা।

গুরুজী উঠে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ মানুষটিকে আজ আরও বড় দেখাচ্ছে। কাঠের খড়ম পায়ে দিয়ে তিনি খটখট করে নেমে গেলেন। আমরাও উঠে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

কবি উইলিয়াম কারলোস উইলিয়মস্

কিছুদিন হল কবি উইলিয়াম কারলোস উইলিয়মস্ পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যবসার সংগে সংগে তিনি সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। উইলিয়মস্ যখনই চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নতির চরম শিখরে উঠছিলেন তখনই তাঁর লেখার হাত খুলে যায়। অথচ প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। তখন উইলিয়মস্ অস্ট্রিয়াতে গিয়েছেন উচ্চশিক্ষার জন্য। তাঁদের পরিবারে এক বন্ধু প্রকাশ করলেন উইলিয়মস্-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু মাত্র চার কপি বই বিক্রি হল। দশ বছর বাদে সহৃদয় প্রকাশক সমস্ত বই নষ্ট করে ফেললেন।

উইলিয়মস্-এর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাছাড়া উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ, একাংক নাটক, ছোট গল্প, আত্মজীবনী রচনা করেছেন। সংগে সংগে কয়েকটি স্প্যানিস ও ফরাসী গ্রন্থেরও অনুবাদ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে আছে "কোরা ইন হেল" (১৯২০), "সাওয়ার গ্রেপস" (১৯২১), "কমপ্লিট কলেকটেড পোয়েমস" (১৯৩৮), "দি ব্রোকেন স্প্যান" (১৯৪১)। অন্যান্য কয়েকটি জনপ্রিয় ও বহু প্রশংসিত গ্রন্থের তালিকায় আছে "লাইফ অ্যামং দি প্যাসেইক রিভার" নামক ছোট গল্পের সংকলন এবং "এ ভয়েজ টু প্যাগানি" নামক উপন্যাস।

উইলিয়মস-এর কবিতায় বহুক্ষেত্রে রাদারফোর্ড নগরী নানাভাবে উপস্থিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ গোচরীভূত বিষয় তাঁর কবি-দৃষ্টিতে অপূর্ব কাব্যরূপ লাভ করেছে। স্থূল ও নীরস বিষয়বস্তুর অতুলনীয় শিল্পাভিব্যক্তি কবিকে একালের শ্রেষ্ঠ মার্কিনী কবিদের মধ্যে বিশেষ আসনের অধিকারী করে। নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ অকাবিক বিষয়-বস্তুর প্রতি যে অকৃত্রিম মোহ ছিল উইলিয়মস-এর তা সমকালীন কাব্যান্দোলনের গতি ধারার সংগে তাঁর গভীর সম্পৃক্তিকে সুস্পষ্ট করে। কিন্তু তিনি মনে করতেন বাইরের ও ভিতরের অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল। একারণে উইলিয়মস-এর কাব্য-জগৎ ছিল সাম্প্রতিককালের কবিদের থেকে কোথাও কোথাও ভিন্ন।

"একটা লাল রঙের
হাত-গাড়ি—
তার ওপর বৃষ্টির জল পড়ে
চক্ চক্ করছে
আর তার পাশে সাদা সাদা
মুর্গীর বাচ্চাগুলো ঘুরে
বেড়াচ্ছে;

অথচ এরই ওপর
কত কি যে নির্ভর করে।"

হয়ত কোন গভীর তত্ত্ব বা দর্শন এখানে পাওয়া যাবে না। বড় কবির ও সাধারণ স্পর্শ হয়ত এখানে নেই। তবুও আমরা এত মুগ্ধ হই। একটি আপাতমধুর সরল ও উজ্জ্বল মুহূর্ত আমাদের আকৃষ্ট করে। এর অন্তরালে রয়েছে মহৎ কবির শিল্পীস্বভাব। যার জন্যে এই সাধারণ মুহূর্তটুকু এমন অসাধারণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু উইলিয়মস কাব্যসাধনার কালপরিক্রমায় ক্রম-উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বীয় অভিজ্ঞতা এবং চিরন্তন কাব্যানুভূতির

ডাঃ উইলিয়াম কার্লস উইলিয়মস
(১৮৮৩—১৯৬৩)

সুতীব্র আবেগ তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়েছিল এমনই আশ্চর্যজনকভাবে যা কবিতার পাঠক মাত্রকেই বিস্মিত করে। জীবন সম্পর্কে সুগভীর অভিজ্ঞতায় কখনো ভাবালুতার বা কষ্টকল্পিত আত্মদর্শন প্রচারের মোহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। স্যাণ্ডবার্গ বা ফ্রস্টের থেকে মানুষ ও জীবন সম্পর্কে তিনি গভীর শ্রদ্ধাশীল। তাঁর কোন কোন কবিতা অনুভূতির সুগভীর দ্যোতনায় ভাস্বর।

"জনতা—
হর্ষধ্বনি করছে, হাসছে জনতা—
কিন্তু প্রত্যেকের হাসি স্বতন্ত্র
অথচ এ হাসি চিরন্তন, গম্ভীর
হাসি হাসছে—
কিন্তু সে হাসি চিন্তাহীন।"

একজন বিদগ্ধ সমালোচক বলেছেন "কবি হিসাবে উইলিয়মস কখনও কখনও নৈর্ব্যক্তিহীন। আপাতদৃষ্ট ভাব-সৌন্দর্যে তিনি আকৃষ্ট হন। ফ্রি ভার্সের যে সমস্ত মুদ্রাদোষ ফ্রস্টকে প্রলুব্ধ করেনি—উইলিয়মস কখনও যেন তার মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর অসমান উচ্চাবচ পংক্তি এবং অস্পষ্ট ও অর্ধস্ফুট শব্দ অ-আমেরিকাবাসীর কাছে বড়ই দুর্বোধ্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু উইলিয়মস বিস্তীর্ণ কল্প-দৃষ্টি সম্পন্ন একজন সত্যকার ভাল কবি।"

উইলিয়মস-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য কাব্যগ্রন্থ "প্যাটারসন"। ১৯২৬ সালে ডয়াল পুরস্কার লাভ করেন এই কাব্যগ্রন্থের জন্য। 'নির্বাচিত কবিতা-সংকলন' ও 'প্যাটারসন' কাব্যের তৃতীয় খণ্ডের জন্য তিনি ১৯৫০ সালে জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার লাভ করেন। 'প্যাটারসন' কাব্যগ্রন্থের পাঁচ খণ্ড ইতি-মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু—মৃত্যুর পূর্বে কবি এই বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের শেষ কাজ করে গেছেন। নিউজার্সির প্যাসেইক নদীতীরবর্তী প্যাটারসন নগরীর ইতিহাস, কিংবদন্তী, লোকগাথা, সাধারণ অধিবাসীর কথায় মুখর সমস্ত কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতা ও হেঁয়ালির অভিযোগ সুবিদিত। উইলিয়মসও অভিযুক্ত হয়েছিলেন। যদিও 'প্যাটারসন' ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে হেঁয়ালি, অস্পষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতার পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু মনে হয় ঐ অভিযোগ করবার পেছনে আজ আর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। উইলিয়মস নিজেই বলেছেন : "আমরা অস্পষ্টতা রাখব কেন? শ্রোতা বা পাঠক যখন প্রকৃত নতুন কোন কিছুর সম্মুখীন হন, তখনই তার মনে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়। কারণ, তাদের মন তৈরী হয়ে রয়েছে পুরাতনের ভিত্তিতে। একবার যদি সে অস্পষ্টতা কাটিয়ে উঠতে পারে, তা হলে তার দৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক দূরে প্রসারিত হবে।"

উইলিয়মস-এর কাব্যালোচনার অপর একটি তথ্য সুবিবেচনার অপেক্ষা রাখে। তিনি বলেছেন যে, "বস্তুর মধ্যে ছাড়া ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই"। —কিন্তু তিনি কখনই কাব্যকে বস্তু সর্বস্ব করে তোলেন নি অর্থাৎ বস্তুকেই কাব্যের চরম ও পরম সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারেননি। ক্ষেত্র বিশেষ বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে উইলিয়মস-এর কাব্যালোচনায় এ সত্য সুপ্রমাণিত।

লণ্ডন, ১৮ই মার্চ ঃ প্রতি বছর ঈষ্টারের ছুটির প্রারম্ভে টেমস নদীতে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাচ প্রতিযোগিতা ব্রিটিশ জাতীয় জীবনের একটি বহু-প্রতীক্ষিত উৎসবের মত।

আগামী শনিবার দুটি বিশ্ব-বিদ্যালয় ১০৯ বারের মত পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে।

সেটা ১৮২৯ সাল। অক্সফোর্ডের খ্রাইষ্ট চার্চ কলেজের চার্লস ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ সর্বপ্রথম দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাচ প্রতিযোগিতার কথা উত্থাপন করেন। সেই বছরেরই ১২ই মার্চ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটক্লাব সেই প্রস্তাবের উত্তরে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়কে "আটজন দাঁড়ি নিয়ে ঈষ্টারের ছুটিতে লণ্ডনের কাছে-পিঠে কোথাও বাচ প্রতিযোগিতায়" আহ্বান জানালো।

অবশ্য তখন থেকেই ঐ প্রতি-যোগিতা প্রতি বছরেই অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা হয় ১৮৩৬ সালে। ১৮৩৭ ও '৩৮ সালে অক্সফোর্ড যথেষ্ট সংখ্যক দাঁড়ি যোগাড় করতে পারেনি। তাই ১৮৩৯ সালে অক্সফোর্ড তৎপর হয়ে একটি 'বোটক্লাব' প্রতিষ্ঠা করে। গত যুদ্ধের কটি বছর বাদ দিলে ১৮৫৬ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে যুদ্ধের ক' বছরও চারটি বেসরকারী প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতার রীতিনীতি

ইতিপূর্বে অল্প-স্বল্প পরিবর্তিত হলেও দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিযোগিতা শুরু হয় পূর্ব লণ্ডনের পাটনী ব্রিজের নীচে থেকে, শেষ হয় সর্টলেকে। দূরত্ব হচ্ছে ৪ মাইল ১ ফার্লং ১৫৪ গজ। এই নদীপথের একদিকে লণ্ডন আরেকদিকে সাৱে জেলা। সারের দিকটাই সুবিধেজনক। টসে ঠিক হয় কোন পক্ষ সে দিকটা পাবে।

সাধারণত জোয়ারের সময়েই বাচ হয়ে থাকে। কিন্তু ১৮৪৬, '৫৬ ও '৬৩ সালে উল্টো দিক থেকে, অর্থাৎ সর্টলেক থেকে পাটনী ব্রিজ পর্যন্ত ভাঁটার সময় প্রতিযোগিতা হয়।

প্রতিযোগিতায় হার-জিতের চরম সিদ্ধান্ত করেন একজন আম্পেয়ার। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটক্লাবের সভাপতিরা তাঁকে যৌথ সম্মতিক্রমে নির্বাচিত করেন।

১৮৩৬ সালের দ্বিতীয় প্রতি-যোগিতার সময় সিদ্ধান্ত হয় যে কেমব্রিজের দাঁড়িরা পরিধান করবেন হাল্কা নীল ও অক্সফোর্ডের দাঁড়িরা গাঢ় নীলের পোষাক। এই থেকেই 'ইউনিভার্সিটি ব্লু'র সৃষ্টি।

প্রতি বছর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোটক্লাব' প্রত্যেকে গড়পড়তা প্রায় ৬০০০ পাউণ্ড খরচ করে। তার মধ্যে নৌকা কিনতে যায় ৫০০ থেকে ৫৫০ পাউণ্ড। বাকিটা সপ্তাহে প্রায় ১২০ পাউণ্ড কোচিংয়ে।

প্রতিযোগিতায় স্মরণীয়

* ১৯৪৮ সালে কেমব্রিজ সমগ্র দূরত্বটি মাত্র ১৭ মিঃ ৫০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে রেকর্ড স্থাপন করে।
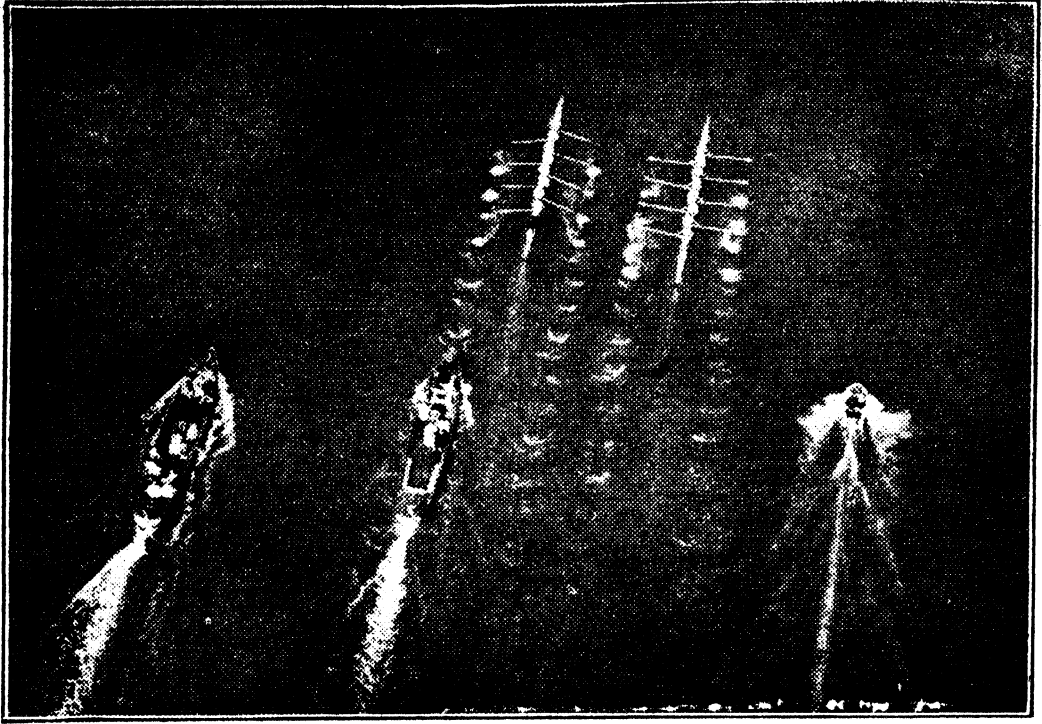
২৩শে মার্চ অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বাচ খেলা উপলক্ষ্যে হ্যামারস্মিথের নিকট টেমসের ওপর অক্সফোর্ড দলের প্রস্তুতির একটি দৃশ্য।

* যুদ্ধের পর থেকে কেমব্রিজ সর্বসমেত ১২ বার জিতেছে।

* ১৯১২ দুটি নৌকোই ডুবে যায়। অক্সফোর্ড তাদের নৌকোটি পুনরুদ্ধার করতে পারে। কিন্তু প্রতিযোগিতা নতুন করে হয়। অক্সফোর্ড জেতে।

* ১৯০০ সালে কেমব্রিজ বৃহত্তম ব্যবধানে (২০ লেংথ) ও ১৯৫২ সালে অক্সফোর্ড সংকীর্ণতম ব্যবধানে (মাত্র কয়েক ইঞ্চি) জেতে।

* কেমব্রিজ ১৯২৪-৩৬ পর্যন্ত একটানা প্রতি বছর জেতে।

* গত ১০৮টি প্রতিযোগিতার মধ্যে কেমব্রিজ ৬০ বার ('৬২ সাল সমেত) এবং অক্সফোর্ড ৪৭ বার জেতে। ১৮৭৭ সালে একেবারে সমান-সমান হওয়ায় জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়নি।

* গত বছর ও ১৯৫৮ সালে দু'দলের দাঁড়িদেরই গড় ওজন ছিল ১৩ স্টোন।

* প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে একবার মাত্র কেমব্রিজ আইন-ভঙ্গ বা 'ফাউল' করে। তারা সে বছর অক্সফোর্ডের নৌকোকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে।

সে বছর কেমব্রিজ কোচিংয়ের জন্যে একজন পেশাদার নিযুক্ত করে। ঐ আইনভঙ্গের জন্যে তাঁকেই দায়ী করা হয় এবং তারপর থেকে পেশাদারদের এড়িয়ে চলা হয়।

*গত বছর পর্যন্ত যে ১৯৪৪ জন দাঁড়ি উভয় দলে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৬০০ জন ছিলেন বিশ্ব-বিখ্যাত পাবলিক স্কুল ঈটনের প্রাক্তন ছাত্র।

* ১৮৯৫, '৯৬, '৯৭, '৯৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস বার্ণেল নামে এক ব্যক্তি প্রতিবার অক্সফোর্ডের দাঁড়ি ছিলেন এবং অক্সফোর্ড ঐ ক'বছরই উপর্যুপরি জেতে।

১৯৩৬ সালে তাঁর ছেলে ও গত বছর তাঁর নাতি অক্সফোর্ডের দাঁড়ি ছিলেন। কিন্তু অক্সফোর্ড দুবারই হারে।

আগে প্রতিযোগিতার অপরাহ্নে টেমসের দু'পারে লক্ষ লক্ষ লোক উভয় পক্ষের ব্যাজ বুকে এঁটে এসে মহোল্লাসে গগন বিদীর্ণ করতো। যে পক্ষের পরাজয় ঘটতো তারা প্রতিপক্ষের 'দুয়ো-দুয়ো' এড়ানোর জন্যে ত্বরিৎ হস্তে বুক থেকে ব্যাজ খুলে ফেলতো।

আজ টেলিভিশনের ব্যাপক প্রসারে বসন্ত সমাগমের সেই উদ্বেলিত অপরাহ্ন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ছে। বি-বি-সি'র মতে গত বছর অন্তত ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক ঘরে বসেই ঐ প্রতিযোগিতা দেখেছে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেসকৃপসন লিখে আমি তাকে দিলাম না, নিচে নেমে এসে শৈলেশ্বরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখুনি এলো সে। আমাকে দেখে হাঁকে ডাকে অস্থির ক'রে তুললো বাড়ি। বললো ডায়েবেটিস হয়েছে, শরীর দুর্বল। আবার স্ত্রীর ব্লাডপ্রেসার। ছেলে-মেয়েদেরও ডেকে ডেকে এনে দেখিয়ে নিল আমাকে দিয়ে। হাতের কাছে একটা ডাক্তার পেয়ে শৈলেশ্বর খুব খুশী। শেষে বললো, 'মিল্লির সঙ্গে দেখা হ'য়েছে?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ওর কী হ'য়েছে হে? এই ঘুসঘুসে জ্বর, শরীর দুর্বল, শুয়ে থাকা—'

'তোমার কী মনে হয়?'

'আমি তো ভালো বুঝিনে। দু'দিন বাদে বিয়ে আর তার মধ্যে এইসব।

'বিয়ে বাদ দাও তবে।'

'সে হয় না।'

'অসুখ থাকলেও হয় না?'

'অসম্ভব।'

'কেন?'

'আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

'অসুখের কথা বলো তাদের।'

'বললে কি আর এমুখো হবে তারা?'

'তাই বলে অসুখসুদ্ধু বিয়ে দেবে?'

'ও সেরে যাবে।'

'এদিকে বলছো, ঘুসঘুসে জ্বর, তোমার নানারকম সন্দেহ হয়, তারপরেও বলছো সেরে যাবে?'

'এসব রোগ বিয়ে হ'লেই সারে।'

'যদি না সারে?'

'তাহ'লে তাদের দায়িত্ব। আমি কী করবো।'

'তোমার তো মেয়ে, তোমার চেয়ে বড়ো দায়িত্ব নিশ্চয়ই আর কারো নয়।'

'উপদেশ দিও না তো।' রেগে গেল শৈলেশ্বর, 'বিপদের বেলাই আমার মেয়ে। মেয়ে নিয়ে তো মামা মাসী চিরটা দিন আমাকে জ্বালালো, আর মেয়েও নাকের জলে চোখের জলে ভেসে দৌড়ে দৌড়ে তাদের কাছেই চলে গেল, এখন সে সব আদরের মানুষেরা কই শুনি। আবার তুমি এসেছ সাউগিরি করতে। যাও, আমি পারবো না কিছু!'

চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আমার কাছে দেবে মেয়েকে আসতে?'

'তুমি কে? লোকে নিন্দে করলে মুখ চাপা দিতে পারবে?

'নিন্দের কী?'

'বিয়ে থাওয়া করোনি, সমাজের ধার ধার না। কী সুবাদে সে তোমার কাছে থাকবে শুনি?'

'বাবার বন্ধু।'

'বাবা থাকতে আবার কারো মেয়ে বাবার বন্ধুর কাছে থাকতে যায় নাকি? দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছি, ঘরে সৎমা, লোকেরা বলবে তাই মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'নিন্দার ভয় দেখছি তোমার ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা।'

'তোমাদের তো ঐ কর্ম। আর কিছু না পার নিন্দেটি ঠিক পারবে। অতবড়ো মেয়ে, বিয়ে হয়নি, তুমিও একজন অবিবাহিত পুরুষ, তোমার কি ধারণা এই মেয়ে নিয়ে থাকলে তুমিও সেই নিন্দার হাত থেকে রেহাই পাবে?'

'ওসব মিথ্যে নিন্দেতে কান পাতা আমার স্বভাব নয়।'

'তুমি মহাপুরুষ কিন্তু আমরা সাধারণ। আমরা পাঁচজন নিয়ে বাস করি।'

শৈলেশ্বরের স্ত্রী দু' কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

আপ্যায়িত ক'রে বললেন, 'আজ যখন সূর্য পূব থেকে পশ্চিমেই উঠেছে তখন এক কাপ চা খেয়ে ধন্য করুন।'

শৈলেশ্বর বললো, 'ঠিক। নাও চা খাও। ওগো, একটু বিস্কুট টিস্কুট—'

আমি বললাম, 'না, না, চা-ই ভালো।'

বলাই বাহুল্য, চায়েও রুচি ছিলো না তবু ভদ্রতা ক'রে মুখে তুলতে হ'লো।

শৈলেশ্বর বললো, 'কী এক শেয়াল-ডাকা গ্রামে থাকো, একদিন যে যাবো, তার যো'টি নেই। যেতে গেলে চাল চি'ড়ে বে'ধে যেতে হয়।'

'তা, আমিও তো সেই দূর থেকেই আসছি।'

'আরে, তুমি বড়ো মানুষ, গাড়ি আছে, তোমার সঙ্গে আমার তুলনা?'

'গাড়ি একটা কেন না কেন? বয়েস তো হ'লো। বাসে ট্রামে চড়ে জঞ্জিয়াতি করবার দরকার কী?'

'শোনো কথা। গাড়ি কিনবো আমি? এই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।'

'তবে টাকাগুলো কর কী?'

'বুঝলে হে, ঐ পরের পয়সা আর নিজের গুণ সকলেই খুব বেশী বেশী দেখে। তিনটে মেয়ে যে গলায় ঝুলছে তার হিসেব রাখো?'

'তিনটের মধ্যে একটি যখন বিয়ে করতে চাইছে না, বাদ দিয়ে দাও তাকে।'

'ঘুরে ফিরে দেখছি তুমি একই কথায় আসছো। তোমাকেই উকিল লাগিয়েছে বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, আমাকেই উকিল লাগিয়েছে। আমি বলছি তুমি জোর কোরো না।'

'আমিও বলছি আমার রাগ বাড়িয়ো না তোমরা।'

'তার মানে সে না চাইলেও তুমি জোর করবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'খুব অন্যায়।'

'আমি তাকে বুঝতে দেব তাকে আমিই জন্ম দিয়েছিলাম, তার মামা নয়। সে আমার ইচ্ছারই অধীন।'

'সে অধীনতা যদি ও না মানে?'

'ও মানবে না ওর ঘাড়ে মানবে। এটা তো ঠিক, আমার বাড়িতেই ও বাস করে, আর এ বাড়ির আমিই মালিক।'

'শৈলেশ্বর, এটা তুমি ঠিক বলছো না, কক্ষনো এ রকম জবরদস্তি করা তোমার উচিত হবে না।'

'কী উচিত আর কী নয়, আমার ব্যাপারে তা আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে চাই না।'

"তা বলে তুমি বাপ হয়ে ওকে শাস্তি দেবে?"

'তোমারই বা এতো জেদ কেন?'

'জেদ আবার কী? আমার কর্তব্য। এই তোমরাই শেষে পাঁচ কথা বলবে।'

'ধর, ও যদি একদিন রেগে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে?'

'আর যাবার জায়গা নেই, বুঝলে? কথায় কথায় রেগে বেরিয়ে যাবার দিন ফুরিয়ে গেছে।'

'তা বলে তুমি বাপ হ'য়ে ওকে শাস্তি দেবে?'

'মেয়ে হ'য়ে ও দেয়নি? কোনোদিন শুনেছে আমার কথা? যেবার বি-এ পাশ করলো বললাম, বাড়িতে আয়, থাক। সুমির তখন পরীক্ষা, অতবড়ো একটা বি-এ পাশ দিদি থাকতে কি আমি চল্লিশ টাকা দিয়ে একটা মাস্টার রাখবো? রইলো? নাচতে নাচতে মামার সঙ্গে চলে গেলেন আমেরিকা। এক বছর ধিঙ্গি হ'য়ে বসে থেকে ফিরে এসে বলেন পড়বো। আমি নিয়ে এলাম বাড়িতে। এ বাড়ি কিনিনি তখনো। শ্যামবাজারে ভাড়াবাড়িতে ছিলাম। তখনই আমি একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছিলাম। ঠিক এই কাণ্ড। কিছুতেই বিয়ে করবে না। কেন করবে না তা কি তখন জানি? পরে তো ধরা পড়লো সব। বুঝলে ঐ মাসীরই বোনঝি তো! কতো ভালো হবে? সেই প্রেম। আমেরিকা থেকে রোজ চিঠি আসছে। দিলাম সব বন্ধ ক'রে।'

শৈলেশ্বর বোধহয় ভুলে গিয়েছিলো প্রেমপত্রগুলো মাসী যাকে লিখতেন তিনি সামনেই উপস্থিত, এবং সেই পুরোনো আগুনকেই সে খুঁচিয়ে তুলছে। আমার চোখ লাল হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে, আমার কপালের শিরা ফুলে উঠলো। আমার দুর্দান্ত ইচ্ছা হ'লো ওর রোগা মুখটার মধ্যে প্রবল জোরে একটা ঘুষি মেরে চির-দিনের মতো ওর সমস্ত কথা থামিয়ে দি।

আমার মুখের দিকে তাকালে সে নিজে থেকেই থেমে যেতো, কিন্তু নিজের কৃতিত্বে এতো বিভোর হ'য়ে কথা বল-ছিলো বলে দেখতে পেলো না ওর সামনে ওর কৃতান্তের মূর্তি নিয়ে আমি বসে আছি। যেন ভারি একটা টেক্কা দিয়েছে সব কিছুর উপর, এমনিভাবে তুড়ি মেরে মাথা নেড়ে বললো, 'সায়েবের ব্যাটাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি, বুঝলে? কতো আর লিখবে, এক সময়ে থামলো। দু'পক্ষই থামলো।'

তার কথা শেষ হবার আগেই আমি বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামলাম। শৈলেশ্বর ব্যস্ত হ'য়ে পিছে ডাকলো, 'আরে, একি, চলে যাচ্ছো নাকি—'

চা দিয়েই শৈলেশ্বরের স্ত্রী চলে গিয়েছিলেন, ফিরে তাকিয়ে দেখলাম

তিনিও এসে দাঁড়িয়েছেন স্বামীর পিছনে। দুললাম আমি, প্রেসক্রিপসনটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'মেয়েটাকে বাঁচাতে চাও তো এই অসুধটা আনিয়ে দিও।' তারপর আর দাঁড়ালাম না।

বলাই বাহুল্য মল্লিকার জন্য খুব খারাপ লাগছিলো আমার, কিন্তু আমি কী করতে পারি বলো?'

।।১৭।।

দিন কয়েকের মধ্যেই রওয়ানা হ'য়ে পড়তে হ'য়েছিলো আমাকে। রাসেল স্মীথ রইলো বাড়িতে, আমার তিন মাসের অতিথি। ঐ তিন মাসেই সে আমার মনের অনেকটা জায়গা অধিকার ক'রে বসে-ছিলো। আমার খুব ভালো লাগলো ভাবতে, আমার বাড়িতে আমার একজন চিঠি লিখবার লোক রেখে যেতে পারলাম।

সাধারণত যখনই যেখানে যাই, ঘর-

গুলো তালাবন্ধ হ'য়ে পড়ে থাকে, লোকজনেরা থাকে বটে, কিন্তু তাদের কী মাথা ব্যথা ঘর-বাড়ি আগলাবার। খাওয়া খরচ রেখে আসি, মাইনে নিয়মিত পায়, বিশ্রাম ভোগ করে। দু'চারবার তাদের হাতে ঘরের চাবি রেখে দেখেছি, ফিরে গিয়ে নতুন ক'রে বহু জিনিস আবার আমাকে কিনতে হ'য়েছে। আসলে ঐ একটা নেপালি ছোকরা আছে, সেটা ছাড়া আর কোনোটাই বিশ্বস্ত নয়। কিন্তু সেটার আবার নেশার ধাত। তার উপরে অলস আর অন্যমনস্ক। সুতরাং তার হাতে চাবি রেখে আসতেও ভরসা হয় না।

অবিশ্যি যাই আর কোথায়। দু'চার বছর অন্তর অন্তর এই দু'-এক মাসের জন্য বা বিদেশে আসা। গরমে দু'চারবার পাহাড়ে। কিন্তু তাইতেই আমাকে ওরা পাগল ক'রে দেয়। এবার খুব গর্ব হ'লো মনে। আমারও তা'হলে বাড়ি আগলাবার কেউ রইলো বাড়িতে। বয়সের ঢলে-পড়া বেলায় এসে এমন একজনকে সঙ্গী পেলাম যে আমার বন্ধুও হ'তে পারে, ছেলেও হ'তে পারে। রাসেলকে আমি সব সময়েই মাই বয়, মাই সান বলে সম্বোধন করি। সে খুব খুশী হয়।

আসবার আগে কয়েকটা দিন একেবারে পাগলের মতো ব্যস্ত ছিলাম। গোটা কয়েক কঠিন রোগী ছিলো হাতে। তাদের বিধি-ব্যবস্থা ক'রে তবেই ছুটি। মাত্র তো ছয় সপ্তাহের ব্যাপার, মনে হ'লো যেন চিরকালের জন্য আসছি। দায়-দারিদ্র এতো বেশী চেপে বসেছে ঘাড়ে যে এখন আর তা চাইলেও ঝেড়ে ফেলার উপায় নেই। সত্যি বলতে রাসেলের মতো ও রকম এক-জন বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ ছেলেকে রেখে এসে আমি এবার খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। বলা যায় না, নৈলে হয়তো কনফারেন্সটি সেরেই পালাতে হ'তো।

আসবার আগে অবশ্য তোমার মা-বাবার সঙ্গে দিল্লীতেও দু'-এক দিন কাটিয়ে এলাম। ও'রা কলকাতা ছেড়েছেন পরেই আমি নির্বান্ধব হ'য়ে পড়েছি। তোমার মায়ের সেবাযত্ন না পেয়ে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া দশা। আবার মাঝখান থেকে ঐ মেয়েটা আর এক বন্ধনে জড়িয়ে গেল।

যেদিন রওনা হই সেদিন সকালে একটা প্রচন্ড ইচ্ছে হ'য়েছিলো ওকে একবার পাঁচ মিনিটের জন্য দেখে আসবার। ইচ্ছে ক'রেই গেলাম না। আমার হাতে যখন ওর জন্য কিছু করবারই শক্তি নেই তখন আর কী হবে ফাঁকা সহানুভূতি দেখিয়ে। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ভাগ্যের বিরুদ্ধে কার সাধ্য আছে লড়াই করবার? তা-ছাড়া মল্লিকা কিছু ছেলেমানুষ নয়, মায়ের মতো শান্ত হ'লেও স্তিমিত নয়। যদি কিছু করবার থাকে সে নিজেই করতে পারবে। অন্তত করা উচিত। একটা কথাই শুধু ভুলে গেলাম, সে বড়ো অসুস্থ ছিলো। তার হাতে একটি পয়সা ছিলো না। এই অবস্থায় বাপের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে পথে বেরিয়ে আসা প্রায় পর্বত লঙ্ঘনের মতোই কঠিন।

প্লেনে বসে উড়তে উড়তে মন খারাপ হ'য়ে গেল। সমস্তটা রাস্তা আমার দুর্ভাবনায় কাটলো, সমস্তটা রাস্তা আমি তার কথাই ভাবতে ভাবতে এলাম। বাংলা দেশে মেয়েরা যে এখনো কতো অসহায়, কতো পরাধীন, পুরুষেরা যে এখনো তাদের উপর অত্যাচারে কতো নির্বিচার, কতো নির্মম, সমাজ-ব্যবস্থা যে কতো নিষ্ঠুর ভেবে ভেবে নিজের পুরুষ-জীবনের প্রতিই আমার ধিক্কার এলো। তুমিই বলো, ঐ অসুস্থ নিঃসম্বল মেয়েটি এখন কোথায় যাবে? বাপ যদি জুলুম করে তা'হলে তার বিয়ে না ক'রে গতি কী? এক হ'তে পারে আত্মহত্যা। শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিলো আমি তো তা-ও জানি না।

মেয়েরা লক্ষ্মী, অথচ মেয়েদের কোনো সম্মান নেই আমাদের দেশে, আমি তো বলি সেই জন্যই আমরা আজ সব দিক থেকেই এতো কাঙাল আর এতো ছোটো। আর এদের দ্যাখো তো! কোথায় তারা পুরুষের চেয়ে কম? তাই বলে কি এরা ডেভোটেড নয়? সৎ নয়? সেবাময়ী নয়?

নিজেকে আমার অত্যন্ত স্বার্থপর মনে হচ্ছিলো। যা হয় হ'তো, তার বাপের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার ঝগড়া করা উচিত ছিলো, কিন্তু পালিয়ে এলাম। তখন এসেছিলাম রাগে, অসম্মানে, প্লেনে বসে মনে হ'লো নিজের শান্তি বজায় রাখতেই আমি পালিয়েছিলাম। তা নৈলে আমিই যে মল্লিকার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসা তা তো সে পরিষ্কারই জানিয়েছিলো আমাকে, আমার কি উচিত ছিলো না তার সেই অধিকারের দাবীকে মান্য করা?

এখানে এসে পোঁছবার পরে স্মীথ আমাকে যতো চিঠি ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলো তার মধ্যে মল্লিকার শুভ বিবাহের লাল চিঠিটাও ছিলো।

ডক্টর মৈত্র থামলেন। তার ভারি নিঃশ্বাস বদ্ধ ঘরে ভারি হ'য়ে ঝুলে রইলো। নীলিমা স্তব্ধ রইলো মাথা নিচু করে। মনে হ'লো ঘরের দরজা জানালা পর্দা সব যেন একযোগে স্তম্ভিত হ'য়ে আছে তাদের সঙ্গে।

ডক্টর মৈত্র আস্তে আস্তে উঠলেন, এবার, একটু হাসলেন, নিজের ঘরের দিকে চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সত্যিই এ-বিষয়ে আর মনে কোনো মোহ না রাখাই ভালো যে ভাগ্যকে কেউ এড়াতে পারে।' মল্লিকা যে শুধু তার মাসীর মতো চেহারাই পেয়েছিলো তা-ই নয়, তার ভাগ্যটাও ওর অদৃষ্টে বর্তেছিলো। নৈলে এমন হবে কেন? নৈলে এমনই বা হবে কেন, ওর বাপ হবে শৈলেশ্বর? ওর মা কি তার চেয়ে ভালো স্বামী পাবার যোগ্য ছিলেন না?

পকেট থেকে তিনি তাঁর প্রকান্ড সিল্কের রুমালটা বার ক'রে মুখ মুছলেন। তাঁর চশমা-খোলা ভেজা চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিল নীলিমা।

—ক্রমশঃ

প্রদর্শনী

চিত্ররসিক

গত ১৬ই মার্চ ,শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় পার্ক স্ট্রীটের আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস্ গ্যালারীতে তরুণ শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এটি পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী। শিল্পী ইতিমধ্যে কমার্শিয়াল কাজ, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা এবং মঞ্চসজ্জার কাজে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি এই সব কাজে বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে নানা পরীক্ষা করে থাকেন, এবং সে সবের ফল কোন কোন ক্ষেত্রে লোকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। এই প্রদর্শনী ছাব্বিশখানি জল-রং এবং কালিকলমের কাজ দিয়ে সাজান হয়েছে। গ্যালারীর আয়তনের জন্যে বেশী ছবি দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং ছবিগুলির আয়তনও ক্ষুদ্রই রাখতে হয়েছে। ছবিগুলি সবই মুখ্যত ডেকরেটিভধর্মী। হাল আমলের উৎকট বিমূর্ততা এতে নেই। কিছুটা রোমান্টিক এবং রহস্যময় ভাবের ইঙ্গিতই এখানে প্রধান। অল্পসল্প ভাবপ্রবণতার দোষও একেবারে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। "নিসর্গ চিত্র (২)" (৬নং) ছবিতে রং ও রেখার প্যাটার্ণ চোখকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এই একই গুণ ৭নং ছবি "গৃহ"তেও বর্তমান। "তাহার অবশিষ্ট" (৩নং), "অনুচ্চারিত শব্দগুলি" (১৬নং), "স্মৃতি" (২৩নং) প্রভৃতি ছবিতে বেশ সুন্দর কোমল রংয়ের কয়েকটি প্যাটার্ণ সৃষ্টি করা হয়েছে। নাতিউজ্জ্বল বেগুনি, হলুদ, কমলা ও ধূসর রংয়ের সম্মিলনে দর্শকের চোখ সহজেই আকৃষ্ট হয়। ১৪নং ছবি "একজন দ্বাররক্ষীর স্বপ্ন" ছবির সমতল প্যাটার্ণ এবং ডেক-রেটিভ ড্রইং-এ খানিকটা কমার্শিয়াল কাজের ছাপ পাওয়া যায়। দুয়েকটি ছবিতে কোন একটি গ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পরে বর্ণলেপ দিয়ে নতুন প্রকাশভঙ্গি আনার চেষ্টা করা হয়েছে। ফল সর্বদা সন্তোষজনক না হলেও নতুন পরীক্ষার উদাম অবশ্যই প্রশংসনীয়। অনেক ছবিতেই দর্শক একটা কাব্যধর্মী মেজাজ এবং প্রতীকধর্মী কাজের সাক্ষাৎ পাবেন; যেমন—১, ২, ৩, ১৮ প্রভৃতি ছবি। ২২নং ছবি "জীবনানন্দ অবলম্বনে" ছবিতে শিল্পী খোলাখুলিভাবেই মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে শিল্পীর আরো পরিণত ছবির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

শিল্পী বদ্রীনারায়ণ অঙ্কিত 'ফিগারস্ উইথ এ ইউনিকর্ণ'

॥ মহারাষ্ট্র শিল্পীবৃন্দের চিত্র প্রদর্শনী ॥

বোম্বে আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে গত ৭ই মার্চ ক্যাথিড্রাল রোডের অ্যাকা-ডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে মহারাষ্ট্র শিল্পীবৃন্দের একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। ছাপান্নটি ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনীতে মহারাষ্ট্রের প্রবীণ ও আধুনিক শিল্পীদের কাজ প্রদর্শিত হয়। এ'দের মধ্যে আছেন, ভানা, বদ্রীনারায়ণ, সাভোয়ালা, শিল্পী। বদ্রীনারায়ণের 'ফিগারস্' উইথ ইউনিকর্ণ" "বেগার" প্রভৃতি বনিয়াদী রেখাধর্মী কাজ। কুলকার্ণির "হাঙ্গরি এলিফ্যান্ট"এ তাঁর পূর্বতন শিল্পকর্মের উৎকর্ষ পাওয়া গেল না। ভানার ছবিগুলি মনকে বিশেষ নাড়া দিতে পারল না। প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে একমাত্র এদুয়ার্দো পাসকেলির "মাই ওয়াইফ" ছবিটি কম্পোজিশনের সরলতায় এবং বর্ণিকাভঙ্গের মাধুর্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

শিল্পী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র

॥ পুনরাক্রমণ আসন্ন ॥

ভারতকে অতি দুর্বল জেনেই চীন দ্রুত কাজ হাসিলের মতলবে শীতের প্রারম্ভে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ভারতের বীর জওয়ানদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে অচিরেই সে বুঝতে পারে যে, শুধু ধমক দেখিয়ে বা কয়েক সহস্র ভারতীয় সৈন্যকে হতাহত করে চুয়াল্লিশ কোটি নরনারী অধ্যুষিত বিশাল ভারতকে হার-মানানো যাবে না। তারপর আক্রান্ত হওয়া মাত্রই ভারত যে তার মিত্র দেশগুলির কাছ থেকে এমন বিপুল পরিমাণে সামরিক সাহায্য পাবে তাও বোধহয় চীন ভাবতে পারেনি। ওদিকে উত্তর সীমান্তে প্রবল শীতে তুষারপাতের ফলে সংকীর্ণ গিরিসংকটগুলিও অবরুদ্ধ হয়ে আসে, যার ফলে মিত্রশক্তিগুলির সাহায্যপুষ্ট বিশাল ভারতের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করার উপযোগী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ অব্যাহত রাখা চীনের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুখ্যত এই কারণেই চীন যেমন অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করেছিল তেমনি অতর্কিতেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ২১শে নভেম্বর চীন যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে এবং সেই একতরফা সিদ্ধান্ত অনুসারেই চীন তার নিজস্ব কল্পিত সীমান্ত-রেখার ওপারে ধীরে ধীরে চলে যায়।

কিন্তু চীনের খলবুদ্ধি রাষ্ট্রনায়কদের এই হঠাৎ সিদ্ধান্তকে কারও পক্ষেই সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। অতিবড় শান্তিবাদীর মনেও এ বিশ্বাস জাগেনি যে, চীন আবার ফিরে আসবে না, শীত শেষে আবার শুরু হবে না তার আক্রমণাত্মক অভিযান। গত ১৩ই মার্চ ভুপালে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর এক ভাষণে সারা ভারতের এই অশুভ আশঙ্কাই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শীত শেষে ও বর্ষা আরম্ভের বহু পূর্বে আবার চীন ভারতে আক্রমণ শুরু করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা যে অমূলক আশংকা নয় তার ইঙ্গিত মাত্র এক সপ্তাহ পরের সংবাদেই পাওয়া গেছে। ভারতের সীমান্ত বরাবর চীনের ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ, তিব্বতে বিপুল সৈন্য আমদানি ও ভারতের নিকট প্রেরিত চীনের সাম্প্রতিক 'নোট'গুলির তীক্ষ্ণ ভাষা হতে এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অনতিবিলম্বে চীন আরও একদফা আক্রমণের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, যে কোন অজুহাতে চীন কলম্বো প্রস্তাব সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে অচিরেই ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, চীনের এই আক্রমণাত্মক তৎপরতায় সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়েছে পাকিস্থানের সঙ্গে অতি-সম্প্রতি সম্পাদিত চীনের চুক্তি। কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবল শীত উপেক্ষা করে ভারতের বীর জওয়ানরা চীনকে যে সাংঘাতিক প্রতি-আক্রমণ হেনেছিল তাতে চীন এটা বুঝেছে যে, বর্তমান সামরিক ও ভৌগোলিক অবস্থানে ভারতীয় বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই নতুন পথের সন্ধান করছিল সে, আর সেই পথই তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি। পাকিস্থানের ইচ্ছাক্রমে কারাকোরাম পর্বতের গিরিবর্ত্মগুলি ব্যবহারের "আইনত" সুযোগ পেয়েছে চীন। আর সে পথ দিয়ে সত্যই যদি চীনা ফৌজ অগ্রগমনের সুযোগ পায় তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীকে অবশ্যই কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। ভারতের চরম ক্ষতি সাধনের দুষ্টবুদ্ধিতে বিভীষণের মতই পাকিস্থান আজ খিড়কির দরজা শত্রুর সম্মুখে খুলে দিচ্ছে।

এই প্রতিকূল পরিবেশে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে লৌহকঠিন দৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে সে বিষয়ে কোনই

সিকিমের মহারাজকুমার ও নবপরিণীতা স্ত্রী এবং রাজকুমারের প্রথম পক্ষের পুত্র

সন্দেহ নেই। তার জন্য আগামী বছরের বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা এই গরিব দেশের করভার বহন শক্তির বিচারে প্রায়-অসহনীয় হলেও আধুনিক সমরসজ্জার বিচারে নিতান্তই তুচ্ছ। তাই মিত্র-দেশগুলির কাছে যতভাবে সাহায্য পাওয়া যায় তা পাওয়ার জন্যও ভারতকে সচেষ্ট হতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, যে বিরাট ঐতিহাসিক দায়িত্ব আজ আমাদের উপর ন্যস্ত তার জন্য আমাদের প্রস্তুতির সময় অতি সামান্য। আজ মুহূর্তের দ্বিধা ও আলস্যেরও পরিণতি গুরুতর হতে পারে।

॥ প্রতিবাদ ॥

পাকিস্থান ও চীনের জবরদখল কাশ্মীর এলাকার বিলিবন্টন করে গত ২রা মার্চ পিকিং-এ যে পাক-চীন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে ভারত প্রতিবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদে সরকারীভাবে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এই প্রতিবাদ ও অভিযোগে আশু প্রতিকার সম্ভাবনা কিছুই নেই, তবুও ভারতের পক্ষ হতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতের আজ বিশেষ জোরের সংগে একথাটা বিশ্বের রাষ্ট্র সমাজে বলা দরকার যে পাকিস্থানের ভারত-বিরোধী আচরণ আজ এতদূরে এগিয়েছে যে, তার জন্য আন্তর্জাতিক আইন লংঘন বা রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতেও তার কোন দ্বিধা নেই। ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগষ্ট রাষ্ট্রসংঘের পাক-ভারত কমিশন (UNCIP) সুস্পষ্টভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত অঞ্চল হতে পাক সৈন্য অপসারণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যরূপে সে সিদ্ধান্ত পাকিস্থানের অবশ্যই মেনে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাকিস্থান তার জবরদখল এলাকা হতে সৈন্যবাহিনী অপসারণ ত করেইনি, পরন্তু চীনের সংগে সে এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ হল যার ফলে কাশ্মীরের একটি বৃহৎ এলাকা অনির্দিষ্টকালের জন্য চীনের কবলে চলে গেল।

১৯৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখেও স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান স্বস্তি পরিষদে বলেছিলেন, জম্মু ও কাশ্মীর হতে সৈন্য অপসারণ করতে পাকিস্থান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্থানের রাষ্ট্রসংঘস্থ প্রতিনিধি স্বস্তি পরিষদের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের কাছে এক পত্র লিখে বলেছিলেন, ভারত ও চীনের মধ্যে যদি কাশ্মীরের কোন অঞ্চল নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তবে পাকিস্থান তা মানবে না। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে আরও একটি পত্র লিখে পাক প্রতিনিধি তাঁর পূর্ব মতেরই পুনরুল্লেখ করেন। অথচ আজ সেই পাকিস্থানই চীনের

সংগে চুক্তি করে ২৭০০ বর্গ মাইল কাশ্মীর-এলাকা চীনকে স্থায়ীভাবে উপঢৌকন দিয়ে দিল। পাকিস্থানের এই অন্যায় ও বেআইনী আচরণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ তাই নিঃসন্দেহে সমুচিত ও সময়োপযোগী।

॥ রাশিয়ার আপত্তি ॥

গত ২০শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র আইনসভার সদস্যদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোভিয়েট রাশিয়া পাক-চীন চুক্তির বিরোধী। সোভিয়েট রাশিয়ার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ন্যায় ও যুক্তিসংগত। সোভিয়েট ইউনিয়ন বহু পূর্বেই কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং তারই একটি জবরদখল অঞ্চল দুটি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে তা কখনোই তার পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান ন্যায়-নীতি বা শান্তিনীতি সম্পর্কে জঙ্গী-চীনের কোনই দুর্বলতা নেই। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়নের এই অননুমোদনও তাকে কোনভাবে বিচলিত করবে না।

॥ নাম পরিবর্তন ॥

ঢাকায় পাক জাতীয়-পরিষদের অধিবেশনে স্থির হয়েছে অতঃপর পাকিস্থানকে শুধু পাকিস্থান প্রজাতন্ত্র না বলে পাকিস্থান-ইসলামিক প্রজাতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করা হবে। ইসলামের এই স্মরণ যে উদ্দেশ্যহীন নয় তা সহজেই অনুমেয়। স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র পাকিস্থানব্যাপী যে তীব্র অসন্তোষ বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে, পাক শাসকদের দৃঢ় ধারণা যে সেটা ভারত-প্ররোচিত। তাই 'হিন্দু' ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের 'মুশ্লিম' সত্তাটিকে আর একবার খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার বিশেষ তাগিদ বোধ করেন তাঁরা।

কিন্তু পাকিস্থানের বিক্ষুব্ধ জনমতকে যে এভাবে আর ইসলামের দোহাই দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। তা পাক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পাক জাতীয় পরিষদের বিরোধী সদস্যরা বলেছেন, সারা দেশের কোথাও যখন ইসলামি ন্যায়নীতির বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই তখন নামের মধ্যে ইসলাম কথাটা বড় করে জাহির করার কোনই মানে থাকতে পারে না।

॥ সিকিমের মহারাজকুমার ॥

সিকিমের মহারাজকুমার-এর সংগে ২২ বৎসর বয়স্কা মার্কিনী কন্যা হোপ কুকের শুভ পরিণয় ২০-এ মার্চ সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে সুদৃশ্য মনোরম রাজধানী গ্যাংটক নতুন রূপ লাভ করে। প্রধান প্রধান রাজপথগুলি বিচিত্র ও সুশোভিত তোরণে এক স্বপ্নময় রূপ লাভ করে। বিবাহ উপলক্ষ্যে আগত বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন শ্রী ও শ্রীমতী আর কে নেহরু; ওয়াই ডি গুন্দিভিয়া (কমনওয়েলথ সেক্রেটারি); এইচ দয়াল (নেপালে ভারতীয় দূত); টি এন কাউল (সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় দূত); শ্রীমতী বি কে নেহরু (যুক্তরাজ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পত্নী); জে এন চৌধুরী (চিফ অব দি আর্মি ষ্টাফ); জে কে গলব্রেথ, পল গোর বুথ; জাঁ পল গেরনিয়ের, ডঃ কোটা মাৎ সুদাইরা; সেফুল্লা এসিন; রাইভজ উভালিক; জর্জ এফ ডাকার্টিজ; আগা হিলালী, ইয়েন্দিন কানাল, পাতিয়ালার মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা ও মহারাণী, বর্ধমানের মহারাজা এবং আরো অনেকে।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

১৪ই মার্চ—২৯শে ফাল্গুন : কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসায় ভারত-পাক বৈঠক (কলিকাতা) কার্যতঃ ব্যর্থ—২১শে এপ্রিল (১৯৬৩) করাচীতে পঞ্চম পর্যায়ে আলোচনার ব্যবস্থা।

আসন্ন উপনির্বাচন-প্রার্থী আটক-বন্দীদের মুক্তির আশা—রাজ্যসভায় আইনমন্ত্রী শ্রীএ কে সেনের বিবৃতি।

রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়-নারায়ণ ব্যাসের (৬৪) দিল্লীতে জীবনাবসান।

১৫ই মার্চ—১লা চৈত্র : 'পশ্চিমবঙ্গে একটি লোককেও অনাহারে মরিতে দিব না'—রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের দৃঢ় ঘোষণা—ক্রমবর্ধমান খাদ্যাভাব ও বেকারী সম্পর্কে বিরোধী দলের হুঁসিয়ারী।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বৈঠকে প্রবল হট্টগোল—মেয়রের (শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার) অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ।

১৬ই মার্চ—২রা চৈত্র : কোটি কোটি মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্রতে জাতিকে আত্মোৎসর্গের আহ্বান—'ক্ষুধা হইতে মুক্তি সপ্তাহ' উপলক্ষে দিল্লী হইতে রাষ্ট্রপতির (ডঃ রাধাকৃষ্ণন) বেতার-ভাষণ—ক্ষুধার চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা।

'প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্ব হাসি-মুখে বহন করুন'—জনগণের প্রতি শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) আহ্বান—ব্যবসায়িক লেনদেনে সততারক্ষার দাবী।

দিল্লীতে ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রীর (৭৪) লোকান্তর।

১৭ই মার্চ—৩রা চৈত্র : বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের উন্নতির সুযোগ-সুবিধা দাবী—ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতি সঙ্ঘের (দিল্লী বৈঠক) প্রস্তাব।

নাইট্রিক এসিড পান করিয়া স্বর্ণ-শিল্পী শ্রীসুনীলকুমার কর্মকারের (২৭) জীবনের সমাপ্তি—নূতন স্বর্ণবিধির অভিশাপ—বেকার স্বর্ণশিল্পী মহলে ঘটনার প্রতিক্রিয়া।

'আসাম ও ত্রিপুরায় সাড়ে তিন লক্ষ পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ—পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় ৪৬ হাজার পাকিস্তানীর আগমন'—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট।

১৮ই মার্চ—৪ঠা চৈত্র : চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ স্বস্তি পরিষদে ভারতের প্রতিবাদ—স্বাক্ষরিত চুক্তি আন্তর্জাতিক আইনের ব্যভিচার বলিয়া মন্তব্য—দিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য প্রকাশ।

কলিকাতায় বাঙালী সম্মেলনে 'বেঙ্গলী রেজিমেন্ট' গঠনের দাবী।

সংসদে ১৯৬৩-৬৪ সালের রেলওয়ে বাজেট অনুমোদিত।

১৯শে মার্চ—৫ই চৈত্র : পুলিশ বাজেট আলোচনাকালে রাজ্য বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) তুমুল হট্টগোল—বিরোধী সদস্যগণ কর্তৃক অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে পুলিশের শোচনীয় ব্যর্থতার অভিযোগ—পশ্চিমবঙ্গের পুলিশবাহিনী সর্বোত্তম বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের দাবী।

লোকসভার তিনজন সোস্যালিষ্ট সদস্য তিরস্কৃত—সংসদের যুক্ত বৈঠকে রাষ্ট্রপতির ভাষণকালে বাধাদানের জন্য স্পীকারের কার্য-ব্যবস্থা।

বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজোর (লণ্ডনে অবস্থানকারী) ভারতে আসার ব্যাপারে শ্রীনেহরুর সর্ত : নাগাভূমিতে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ অবশ্য বন্ধ করিতে হইবে।

২০শে মার্চ—৬ই চৈত্র : 'পাক-চীন সীমান্ত চুক্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের আ প ত্তি'—মহারাষ্ট্র বিধানমণ্ডলীতে শ্রীনেহরুর ঘোষণা—চীনের অভিসন্ধি বুঝিতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান।

উত্তর সীমান্তে আবার বিপুল চীনা সৈন্য সমাবেশ। (নয়াদিল্লীর নির্ভরযোগ্য মহলের সংবাদ)

'সীমান্ত-চুক্তির পিছনে ভারতকে জব্দ করাই পাকিস্তান ও চীনের মতলব'—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত পুস্তিকায় মন্তব্য।

॥ বাইরে ॥

১৪ই মার্চ—২৯শে ফাল্গুন : পাক জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকালে (ঢাকা) বিরোধী সদস্যদের একযোগে সভাকক্ষ ত্যাগ—সরকারী আচরণের প্রতিবাদ।

'পারস্পরিক বোঝাপড়াই ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার একমাত্র পথ'—নিউ ইয়র্কে পোল প্রধান-মন্ত্রী মিঃ সিরান্‌কিউবিকপের মন্তব্য।

১৫ই মার্চ—১লা চৈত্র : সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব—সংশ্লিষ্ট খসড়া চুক্তি অনুমোদনকল্পে গণভোট গ্রহণের উদ্যোগ।

কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করিতে চীন এখনও নারাজ—মার্শাল চেন-ই (চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কর্তৃক প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় এতদিন পরে 'গুরুতর অসঙ্গতি' আবিষ্কার।

১৬ই মার্চ—২রা চৈত্র : দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক সরকার কর্তৃক কার্যতঃ সমগ্র দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

মধ্য জাপানে ধস নামিয়া ভয়াবহ অবস্থা—৬০টি গৃহ বিধ্বস্ত—প্রায় ১৫০ ব্যক্তি নিখোঁজ।

১৭ই মার্চ—৩রা চৈত্র : কেপ টাউনে ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তিগণ (প্রায় দশ সহস্র) আর্থিক ধ্বংসের সম্মুখীন—ভারতীয়দের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য আইনের প্রতিক্রিয়া।

বলিভীয় বিমান দুর্ঘটনায় ৪১ জন আরোহী নিহত। (বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ)

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণ-বিক্ষোভ।

১৮ই মার্চ—৪ঠা চৈত্র : ফ্রান্স 'সাহারায় আণবিক পরীক্ষা চালাইলে সহযোগিতার চুক্তি ছিন্ন করিব'—আলজিরিয়া সরকারের সতর্কবাণী।

পাক শাসনতন্ত্র সংশোধন বিল সম্পর্কে ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আলোচনা আরম্ভ।

ফ্রান্স কর্তৃক সাহারায় পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ।

১৯শে মার্চ—৫ই চৈত্র : ইরাণে সরকারী ফৌজের সহিত বিদ্রোহী উপজাতীয় লোকদের সংঘর্ষ—৪৪ জন নিহত : শতাধিক ব্যক্তি আহত।

বলীদ্বীপে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অন্ততঃ ১৩০ জনের প্রাণহানি—লাভা ও ভস্মরাশি দ্বারা সমগ্র দ্বীপ আচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা।

মরক্কো কর্তৃক সাহারায় ফ্রান্সের পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিবাদ।

২০শে মার্চ—৬ই চৈত্র : পূর্ব সপ্তাহে ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় (পূর্ব পাকিস্তান) বিধ্বংসী ঝঞ্ঝাবাত্যায় ১[illegible] জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত (বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ)

গ্যাংটকে সিকিমের মহারাজকুমারের সহিত সাড়ম্বরে নিউইয়র্ক তরুণী মিস হোপ কুকের বহু প্রচারিত বিবাহ সম্পন্ন।

ভারতের জন্য আরও সমরসম্ভার সংগ্রহের উদ্যোগ—আমেরিকায় শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের (উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী) সন্তোষজনক আলোচনা।

অভয়ংকর

পট পরিবর্তন

স্থান ক্রেমলিন, কাল ৮ই মার্চ, ১৯৬৩, পাত্র স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক ক্রুশ্চেভ। প্রায় পাঁচশতাধিক সাংস্কৃতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিদগ্ধমণ্ডলী আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত। চিত্রশিল্পী, লেখক, সঙ্গীত-কার এবং অন্যান্য বহুবিধ শিল্প ও সংস্কৃতি কর্মীর এই আসরে ক্রুশ্চেভ ভাষণ দিয়েছেন সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে। এ শুধু ভাষণ নয়, বুর্জোয়া মনোবিকারঘটিত বিমূর্তনবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ।

'অমৃত' পত্রিকার প্রথম বর্ষের ((১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) ত্রিশতম সংখ্যায় এই স্তম্ভে এলাইয়া এরেণবুর্গের আত্ম-জীবনী People And Life নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ড সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলাম :

"আরো বিস্ময়কর, লেনিনের মেন-শেভিক প্রতিদ্বন্দ্বী পাল মারটভের প্রসঙ্গ। এরেণবুর্গ প্যারীতে পলির সঙ্গে দেখা করতেন, আর সেই পলি ছিল— 'a gentle and attractive man of the utmost integrity"। মদিলিয়ানীর কথা হয়ত বলা যায়, এমন কি 'ফর্মালিস্ট' কিংবা 'ডিজেনারেট' গোষ্ঠীর কথাও না হয় বলা হল, কিন্তু লেনিনের শত্রুদের সম্পর্কে এই উক্তি প্রকাশে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যই কি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে? thaw শেষ হওয়ার পর spring-এর আগমন হয়েছে? এলাইয়া এরেণবুর্গ, শক্তিমান জনপ্রিয় এবং সফল উপন্যাস-রচয়িতা। তাঁর এই স্মৃতি-চারণ সম্পর্কে সোভিয়েটের আকাশ-বাতাস আজ কি ভাষায় মুখরিত, তা জানার বাসনা হওয়াই স্বাভাবিক।"

৮ই মার্চের ক্রেমলিনের মহাসভায় প্রদত্ত ভাষণের মাধ্যমে ক্রুশ্চেভ স্বয়ং সেই কৌতূহল নিবারণ করলেন। তিনি ১৯৫৮তে প্রকাশিত এরেণবুর্গের Thaw উপন্যাসের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"The Thawing season is a time, when it is hard to foresee snow and in what direction the weather will turn. But this certainly does not mean that now, after the denunciation of the personality cult, the time has come to let things drift, that the reins of Government have been relaxed, that the ship of Society is sailing where the waves carry it and that everyone is free to behave as he pleases."

সমাজের তরণী তরঙ্গের খেয়ালে চলবে না, যার যা খুশী তা করা চলবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আধিক্যের ফলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। সুতরাং যাঁরা অধিকমাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যদানের পক্ষে ওকালতী করছেন তাঁরা কম্যুনিজমের শত্রু।

শীর্ণদেহ, শুভ্রকেশ তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ লেখক এরেণবুর্গ বিনি ঝড় দেখেছেন। বসন্তের আভাসে তিনি পুল-কিত হয়েছিলেন, কিন্তু বসন্তের আগমনের আশায় খাঁচার পাখি যেমন শিস দিয়ে উঠেই আবার হঠাৎ থেমে যায়, এরেণবুর্গকেও আবার থামতে হল। এ যে রোদনভরা বসন্ত। পর্যায়ক্রমে সভা-সমিতিতে তিনি পশ্চিমের ভাবধারার সঙ্গে সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের আবেদন জানিয়েছেন, সরকার-সমর্থিত সমাজবাদী বাস্তবতার সঙ্গে পশ্চিমের শিল্প-রীতির সহাবস্থান কল্যাণকর মনে হয়েছে এরেণ-বুর্গের। কিন্তু যে এরেণবুর্গ সার্ব-ভৌমিক নীতি-বিরোধী আঁদ্রে ঝানভ কোপানল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন তাঁর আশ্চর্য পরিমিতিবোধের সাহায্যে, এই-বার তিনি পরাজিত, লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। দুদিনব্যাপী সম্মেলনের শুরুতেই লিওনিদ ইলিচেভ তাঁকে ভণ্ড বলায় তিনি আগে-ভাগেই সরে পড়ে-ছিলেন। তবে যাওয়ার সময় জনৈক তরুণ সহযোগীকে লক্ষ্য করে নাকি বলেছেন— "সোভিয়েট আর্টের পরিস্ফুটণ দেখার সেই ভাগ্য আমার নেই, তবে আগামী কুড়ি বছরের ভেতর তোমরা দেখতে পাবে।"

পশ্চিমাঞ্চলে 'এ্যাংরি ইয়ংম্যান' হিসাবে খ্যাত জনপ্রিয় তরুণ কবি ইয়েভজেনটি ইয়েভতুসেংকোও ক্রুশ্চেভের কাছে তীব্র ভর্ৎসনা লাভ করেছেন। তাঁর অপরাধ দ্বিবিধ, বর্তমান-শাসক গোষ্ঠীর বিমূর্ত-শিল্পকলার প্রতি যে বিরূপতা তার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন এরেণবুর্গ, আর সেই অভিযানে এরেণবুর্গের সমর্থক ইয়েভতুসেংকো। তাঁর দ্বিতীয় অপরাধ তিনি পশ্চিমাঞ্চলে রুষ্ট তরুণ হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ক্রুশ্চেভ বলেছেন যেটা তোমার পক্ষে সর্বোত্তম মনে হয় তা গ্রহণ করো। যদি শত্রুরা তোমাকে প্রশংসা করে, তাহলে স্বদেশবাসী তোমাকে নিন্দা করবে, এবং সেই নিন্দা অন্যায্য হবে না।

এই সব কথার সঙ্গে ক্রুশ্চেভ একথাও বলেন যে, স্তালিন আমলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা স্তালিনের অপ-রাধের কথা জেনেও বাস্তবের ওপর রঙ চড়িয়েছেন, (varnished reality)— এ কথাও সত্য নয়। ক্রুশ্চেভের ভাষণে সেই সব শিল্পী ও সাহিত্যিক-দের পক্ষ সমর্থন করা হয় এবং সেই সঙ্গে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। ক্রুশ্চেভ বলেছেন— They believed Stalin and did not even think that repressions could be directed against honest people who were devoted to our cause."

স্তালিন কম্যুনিজমের প্রতি উৎসর্গী-কৃত প্রাণ ছিলেন, তাঁর শেষকৃত্যের সময় ক্রুশ্চেভ অশ্রুবর্ষণ করেছেন এবং "These were sincere tears". স্তালিনের ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটি জানা থাকলেও ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ তাঁকে বিশ্বাস করতেন। তবে জীবনের শেষ কয়েক বৎসর স্তালিন অতিশয় অসুস্থ ছিলেন এবং নিপীড়নের মনো-বিকারে আচ্ছন্ন ছিলেন ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঘটনাবলী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান-পরিবেশিত সংবাদসূত্রে প্রাপ্ত। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক রাষ্ট্র-নিয়ন্তারা স্তালিন-আমলের কুখ্যাত ঝানভের মত একটা নতুন শিল্পরীতির প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন একথা বোঝা যায়। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রকাশকদের দপ্তরে নাকি স্তালিন-আমলের অত্যাচার বর্ণনায় মুখর অসংখ্য পাণ্ডুলিপি এসে পৌঁছেচে, সুতরাং পট-পরিবর্তন প্রয়ো-জন। পশ্চিমের জানালা আবার রুদ্ধ হোক, বিমূর্তন নয়, ফর্মালিজম নয়, বুর্জোয়া মনোবিকার থেকে কম্যুনিজমকে রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র ক্রুশ্চেভের এই আকস্মিক জেহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে একটা গবেষণা চলেছে হঠাৎ এতদিন পরে স্তালিনকে 'Good Marxist and good Communist' এই গুড কনডক্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার অর্থ কি!

সকলের ধারণা যে, স্তালিন-আমলের নিন্দাবাদ করার যন্ত্রটা আপাততঃ ধামা-চাপা দিয়ে রাখা হল। এই বক্তৃতার মূলে আছে সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ক্রম-বর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অবাধ্যতার সংবাদ। বিগত গ্রীষ্মকালে নিম্ন-ভলগাঞ্চলে যে বিশৃঙ্খলার কথা প্রকাশ পেয়েছিল, আসল ঘটনা নাকি তার চেয়ে অনেক বেশী। উৎপাদন আবার হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে একমাত্র নতুন মন্দী

নিয়োগ করতে হয়েছে। মন্ত্রণাদাতারা পরামর্শ দিয়েছেন স্তালিন-আমলের কঠোরতা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। স্তালিনের দুর্ধর্ষ কৃষি-ব্যবস্থার সমর্থক ওলসাকি এবং লাইসেংকোর পুনরাগমন ঘটেছে।

কালোবাজারী মুনাফাখোরদের চরম দণ্ডদানের যে ব্যবস্থা হয়েছে তা নব্য-স্তালিনবাদের ভূমিকা হিসাবেই সর্বত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রুশ্চেভের বক্তৃতার অর্থ এই যে, নব্য-ক্রুশ্চেভবাদের সমর্থনে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের 'সামিল' হতে হবে। স্তালিনের ক্ষমতার অপব্যয়ের সম্পর্কে বলা এক কথা আর পার্টির তাঁবেদারি থেকে বিচ্যুত হওয়া আর এক কথা। ক্রুশ্চেভের এই বক্তৃতার মূলে কিন্তু এরেণবুর্গের সেই স্মৃতি-চিত্রণ "People and Life" (অমৃত—১ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই গ্রন্থে এরেণবুর্গ বলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেকেই তাঁদের পরিচিত মহলের অপরাধহীনতা সম্পর্কে অবহিত থাকলেও ভয়ে মুখ খোলেন নি। এই গ্রন্থেই আছে পশ্চিমের শিল্পসত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আবেদন। এরেণবুর্গ স্পষ্টতঃ ক্রুশ্চেভকে অপাপবিদ্ধ নয়—একথা না বললেও প্রায় কাছাকাছি উক্তি করেছেন।

এই সঙ্গে একথা স্মরণ করা কর্তব্য ক্রুশ্চেভ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত বিখ্যাত বক্তৃতায় (যা আজ পর্যন্ত সোভিয়েট সংবাদপত্রে অপ্রকাশিত) বলেছিলেন ১৯৩৪-এর কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের শতকরা সত্তরজন ডেলিগেট আর ঘরে ফিরে যেতে পারেন নি। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে গুলি করে মারা হয়। ক্রুশ্চেভ ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বলেছিলেন—"Charges against those victims were absurd, wild and contrary to commonsense."

স্তালিনের দুঃস্বপ্নের কালের যা সত্য তা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে, এই প্রকাশের মুখে ক্রুশ্চেভের ভূমিকাও প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমান, এবং অনেকে মনে করেন শিল্পী ও সাহিত্যিকের স্বাধীনতা-নিয়ন্ত্রণের এই আকস্মিক প্রয়াস তারই এক অভিব্যক্তি। কারণ পরোক্ষভাবে ক্রুশ্চেভের ক্ষমতার বেদীমূলেও আঘাত এসে পৌঁছাচ্ছে। 'de-Stalinisation' নামক বিষবৃক্ষ তিনিই রোপণ করেছেন এবং স্বয়ং তা ছেদন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ শিল্পীর স্বাধীনতা যদি কয়েকজন মাত্র শিল্পী ও সাহিত্যিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এই বক্তৃতার প্রয়োজন হত না। এরেণবুর্গ এক জনপ্রিয় আন্দোলনের প্রবক্তা, সেই আন্দোলন আরো মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বিষধর সর্পের আবির্ভাব সম্ভাবনা, একথা ক্রুশ্চেভ বুঝেছেন। তাই স্তালিনকে "উত্তম মার্কসিস্ট" এই সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের ধারণা যে পিকিং-এর ছোট ভাইদের সঙ্গে এইবার একটা 'সমঝাওতা' বা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। কিউবা পরিস্থিতির সময় ক্রুশ্চেভের শ্লোগান ছিল—"Compromise and mutual concessions"—তা এখন অন্তর্হিত। পিকিং ক্রুশ্চেভকে 'cowardly as mice' বলেছে ২১শে ফেব্রুয়ারী। এখন সে-সব পকেটস্থ করেই হয়ত তিনি পিকিং যাবেন। মার্শাল ইয়েরেমেংকো স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েট বাহিনীর কৃতিত্বের জন্য ক্রুশ্চেভকে প্রশংসা করে এক 'থিসিস' লিখেছিলেন। মার্শাল মালিনোভস্কী তার নিন্দা করে মার্শাল ঝুকোভকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। ক্রুশ্চেভ নির্বোধ নন, তিনি বুঝেছেন হাওয়া কোন দিকে, তাই এই পট-পরিবর্তন। শিল্পী ও সাহিত্যিকের স্বাধীনতার তাই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, পশ্চিমের খোলা জানালার দূষিত বাষ্প যেন সোভিয়েট শিল্প ও সাহিত্যের শুচিতা না নষ্ট করে সংকম্যুনিস্ট লেখকের তা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নতুবা নিপাত যাও।

নতুন বই

সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা, রবীন্দ্রনাথ—(প্রবন্ধ গ্রন্থ) : বুদ্ধদেব বসু, এম সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিকতম প্রবন্ধ সংগ্রহ। সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ এই দুটি পর্যায়ে বইটি বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে নয়টি প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, পাস্টেরনাক, আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি, হেমন্ত, সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি রচনাসমষ্টি, দ্বিতীয় পর্যায়ের আটটি প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত। বুদ্ধদেবের মত এমনই বিরল প্রতিভা যাঁর—কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ—সব ক্ষেত্রেই সমান স্বচ্ছন্দ বিহার। বিশেষ করে প্রবন্ধ ভাষা-ব্যবহারে তিনি যে ঋজু অথচ কাব্যিক সুষমামণ্ডিত রীতির প্রবর্তন করেছেন তা অনন্য ও তাঁর একান্ত নিজস্ব। সংস্কারহীন বুদ্ধি-দীপ্ততায় প্রোজ্জ্বল হয়েও তাঁর রচনা নিছক উচ্চগ্রামে বাঁধা নয়। বিষয়নিষ্ঠতা ও বাক্যবিন্যাসের মাধুর্য—এ দুয়ের সমন্বয়েই তাঁর গদ্যরীতির উৎকর্ষ। আলোচ্য গ্রন্থে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিমনের প্রত্যয় ও ধারণা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি স্বীকার করছেন যে এখন যদি দুঘণ্টা ফাঁকা জোটে তাহলে হয় চুপচাপ বসে না হয় কয়েক পৃষ্ঠা ডস্টয়েভস্কি বা বোদলেয়ারের একটি-দুটি গদ্য কবিতা পড়ে কাটিয়ে দেন। 'সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতার ভাবটা বোধ হয় বোদলেয়ার থেকেই নেওয়া। কারণ বোদলেয়ার বলেছেন ও দুটো কথা একই—অন্তত কবির পক্ষে কেননা কবিরা তাঁদের নিঃসঙ্গতাকে মঙ্গলময় করে তুলতে পারেন, আবার মহানগরীর জনতার মধ্যে নির্জন হয়ে চলাফেরা করার কৌশলও তাঁদের জানা আছে। ডস্টয়েভস্কির মত বুদ্ধদেববাবুর সাহিত্য-প্রত্যয় হল মানুষের পক্ষে যা সত্য কাজ, সত্য ভাবনা, তা জগতের পুনর্গঠন নয় তা জীবনের রহস্য, মৃত্যুর রহস্য, তা প্রতিভার উদ্ভাস, ভালোবাসার মাধুরী। এই নিরীখেই তিনি পাস্টেরনাক, সুধীন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রতিভার বিশ্লেষণ করেছেন। বুদ্ধদেবের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত অনেকের আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এ প্রতীতি তিনি অর্জন করেছেন বই পড়ে নয় নিজস্ব সাহিত্যকর্মের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। সুতরাং এর প্রতি সম্ভ্রমবোধ প্রত্যেকেরই থাকা উচিত। বুদ্ধদেবকৃত সুধীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, শিশিরকুমারের ব্যক্তিক পরিচয়গুলি একদিক থেকে দুর্লভগুণসমন্বিত। কারণ এখানে তিনি কোন মতবাদ, তত্ত্ব বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিভার বর্ণনা করেন নি। তাঁর একান্ত ব্যক্তিক সূক্ষ্ম শিল্পচেতনায় অপরাপর মনীষা যে অনুরণন সৃষ্টি করেছেন তারই রূপরেখা তিনি এঁকেছেন। এই আলেখ্যগুলি আমাদের একান্ত উপভোগ্য মনে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ের সব রচনাগুলিই শতবার্ষিকীর প্রয়োজনে লিখিত। এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, গান, উপমা, মানসী কাব্যগ্রন্থ, সমাজচিন্তা, প্রতীচী সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা। বুদ্ধদেবের প্রতিভার বিকাশ প্রথম বোধ হয় কাব্যের মাধ্যমে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে দীর্ঘকাল 'কবিতা' পত্রিকার

সম্পাদনা করে তিনি বাংলা সাহিত্য-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্যের সমন্বয় আলোচনা করার বিশেষ অধিকার আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে যে রচনাটি সবচেয়ে বিতর্কমূলক সেটি হচ্ছে 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী'। বলা চলে যে শতবার্ষিকী বছরে যা হয়েছিল অর্থাৎ রবীন্দ্র আলোচনার নামে বেশিরভাগই পুরানো ব্যানারের চর্বিতচর্বণ গতানুগতিকতা, বুদ্ধদেবের রচনা সে দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি যাই বলুন জিনিসটিকে নতুন আলোকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তিনি প্রত্যেক বাঙালী সংস্কৃতি প্রেমিকেরই ধন্যবাদার্হ। আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি 'সঙ্গঃ নিসঙ্গতা, রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিশিষ্ট সংযোজন। গ্রন্থখানির অনুধাবন প্রত্যেক বাঙালী বুদ্ধিজীবীরই অবশ্য প্রয়োজন।

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার—(গ্রন্থ-বিজ্ঞান)— বিমলকুমার দত্ত। প্রকাশক—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ৩৩, হুজুরীমল লেন, কলিকাতা—১৪। দাম—দু টাকা। পৃঃ ৯০

দাম—দু টাকা। পৃঃ ৯০

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বা প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে-সব উক্তি করেছেন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী বিমলকুমার দত্ত সেইগুলি একত্রিত করে এক বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী এইভাবে উদ্ধার করার কৃতিত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, প্রাচীনকালের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার, পুস্তকপাঠের সুফল, অত্যধিক পুস্তকপাঠের কুফল। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, গ্রন্থদরদী রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি বিশেষ আকর্ষণমূলক। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীতিনকড়ি দত্ত লিখিত একটি পরিচিতি ও মুখবন্ধ এই গ্রন্থে সংযোজিত। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

সাহিত্যের খবর : বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাস্মরণ সংখ্যা : মাঘ, ১৩৬৯। সম্পাদক : মনোজ বসু, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : ·৭৫ নয়া পয়সা।

সাহিত্যের মাসিক ভোজে বিশেষ বিশেষ সাময়িক পত্রিকা নিজেদের স্বাদ নিয়ে আসে। 'সাহিত্যের খবর' দীর্ঘ দশ বছর ধরে সাহিত্য-সংসারের নানান ভাবনা-চিন্তার কথা সাহিত্যরসিকদের কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পৌঁছে দিয়ে আসছে।

আলোচ্য সংখ্যাটিতে শুরু থেকে শেষ অবধি এমনি নিষ্ঠার ছাপ। ভারত-প্রেমিক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত সংখ্যাটি শুধু সাহিত্যরসিক নয়—বাঙালী মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বিচিত্র জীবনের ওপর আলোকপাত করেছেন : স্বামী তেজসানন্দ, অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভবানীগোপাল সান্যাল, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল বসু, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, চারু দত্ত, সুধীরকুমার নন্দী, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, পরেশনাথ ভট্টাচার্য ও হরপ্রসাদ মিত্র।

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ওপর সম্প্রতি-প্রকাশিত বিবিধ পুস্তকের তালিকা এবং এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিটি রচনাই উল্লেখ করবার মতো।

নান্দীকর

আজকের কথা

বাঙলা ছবির রাষ্ট্রীয় সম্মান ঃ

এবারে ১৯৬২ সালের রাষ্ট্রীয় সম্মানের অধিকারী হয়েছে জালান প্রোডাকসন্স-এর জনপ্রিয়তম চিত্র "দাদা-ঠাকুর"। "দাদাঠাকুর"-এর এই সম্মানে আমরা যে কি পরিমাণ আনন্দলাভ করেছি, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মসমীক্ষা ক'রে দেখছি, এই আনন্দবোধের পিছনে অন্তত দু'টি বিশেষ কারণের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রথম আনন্দের কারণ, বাঙলা চলচ্চিত্র সৃষ্টির মূলে দর্শকদের নিছক আনন্দবিধান ছাড়াও যে শিক্ষণীয় আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস আছে, তাকে স্বীকৃতিদান। এবং দ্বিতীয় আনন্দের কারণ, প্রায় অপরিচিত, নিম্নমধ্যবিত্ত, বৈষয়িক দিক থেকে অতি-সাধারণ একজন জীবিত ব্যক্তির জীবন-কথার মধ্যে আত্মনির্ভর স্বাবলম্বিতা, স্বাধীনতাস্পৃহা, ত্যাগ এবং মানসিক আভিজাত্যের যে-মহিমাকে তুলে ধরা হয়েছে, তাকে সম্মান দান। "দাদা-ঠাকুর"-চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলুম, "একমাত্র রাণীভবানী প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করা ছাড়া যে নির্লোভ ব্যক্তি জীবনে কোনো কিছুর জন্যেই কারুর স্বারস্থ হননি, ইংরাজ গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে থেকে শুরু ক'রে লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি পদস্থ দেশ-বরেণ্য ব্যক্তির সানুগ্রহ সাহায্য, সুপারিশ এবং আর্থিক দানকে অকাতরে প্রত্যাখ্যান ক'রে স্বাবলম্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে-ছেন, জীবনে সুখ-দুঃখ কোনো কিছুকেই গায়ে না মেখে নিজের দৈনন্দিন কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন, ধনীর ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য ক'রে নিজের জিদকে বজায় রেখেছেন এবং দেশের মুক্তি-আন্দোলনকারীদের বহু রকমে সাহায্য ক'রে গৌরববোধ করেছেন, বৈষয়িক দিক থেকে সেই অতি-সাধারণ ব্যক্তির অসা-ধারণ জীবন-কথা আজকের খোলস-সর্বস্ব সভ্য বাঙালী সমাজের (আজ মনে হচ্ছে, শুধু বাঙালী কেন, সমগ্র জগৎ সমাজের) সামনে চলচ্চিত্রের মারফত তুলে ধরা যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তা' 'দাদাঠাকুর' ছবিটিকে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না করলে বুঝতে পারা যাবে না। বিশেষ ক'রে, দেশের বর্তমান সংকটজনক পরি-স্থিতিতে আমরা যেন এমনই একখানি ছবির প্রতীক্ষায় ছিলুম।" মনে হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় সম্মানের কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটি আমাদেরই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই 'দাদাঠাকুর'-এর মাথায় সম্মানের মুকুট স্থাপন করেছেন।

"দাদাঠাকুর"-এর এই সম্মানলাভ উপলক্ষ্যে আমরা মূল কাহিনীকার নলিনীকান্ত সরকার, চিত্র-নাট্যকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক শ্যামলাল জালান, নাম-ভূমিকার শিল্পী পরলোক-গত ছবি বিশ্বাস, ছবিখানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলী ও কর্মীকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এবং এই সঙ্গে প্রণাম জানাই মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের সেই 'সতেজ সরল সরস রসিকতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি' ব্রাহ্মণ-সন্তানকে, যাঁর জীবনকাহিনীকে

মুক্তিপ্রাপ্ত
সৎভাই
চিত্রের কয়েকটি দৃশ্যে

বাম দিকে ঃ
(ওপরে) মঞ্জুলা
(নিচে) সন্ধ্যারাণী
ডান দিকে ঃ
(ওপরে) অনুপকুমার ও শম্পা
(মাঝে) প্রবীরকুমার ও নার্সিমবানু
(নিচে) নার্সিমবানু

উত্তমকুমার ফিল্মস লিঃ-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'ভ্রান্তিবিলাস'এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সাবিতা বসু

আশ্রয় ক'রে এই সম্মানপ্রাপ্ত ছবিটি গ'ড়ে উঠেছে।

কোনও চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে প্রায়ই যে একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা আমাদের কানে এসে পৌঁছোয়, এখানে তার উল্লেখ না ক'রে পারছি না। বলা হয়, পুরস্কার অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা চলচ্চিত্রের কলাকুশলতা বা আঙ্গিককে উপেক্ষা ক'রে তার কাহিনীর ওপর বড্ড বেশী গুরুত্ব আরোপ ক'রে থাকেন। আমাদের প্রশ্ন, চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ বিচারে কাহিনী কি উপেক্ষার বস্তু? যদি দু'খানি চলচ্চিত্র কলা-কুশলতার দিক দিয়ে তুল্য-মূল্য হয়, তা'হলে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হবে কাকে অবলম্বন ক'রে? কাহিনী-চিত্রগুলিকে আসলে চিত্র-নাটক হিসেবে যদি গণ্য করা হয়, তা'লে সেগুলিতে মঞ্চ-নাটকের মতই নাটকীয় কাহিনী থাকাই স্বাভাবিক এবং যে-চিত্র যত সুষ্ঠুভাবে কোনো নাটকীয় কাহিনীকে ঘটনা ও চরিত্রের অভিনবত্ব ও স্বাভাবিক পরিণতির মাধ্যমে দর্শক-চিত্তজয়ী কৌতূহলোদ্দীপকভাবে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হবে, সেই চিত্রই তত সার্থক ব'লে গণ্য হবে। কলাকুশলতা বা আঙ্গিকের প্রয়োজনীয়তা নাট্যবস্তুকে যথাযথভাবে চলচ্চিত্রায়ণের জন্যেই; নাট্যোৎপাদনহীন আঙ্গিকসর্বস্ব চিত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু রসসৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অপারক। মঞ্চই বল, আর চিত্রই বল, পাকা রঃসর ভিয়ানী হ'তে হ'লে, হৃদয়-সংবেদনশীল অভিনব নাট্যবস্তুকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতেই হবে—সেখানে কোনো ফাঁক, বা ফাঁকি থাকলে চলবে না। রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্ত 'পথের পাঁচালী', 'কাবুলিওয়ালা', 'সাগর-সঙ্গমে', 'অপুর সংসার', 'ভগিনী নিবেদিতা' এবং 'দাদাঠাকুর'—এই তত্ত্ব যে অভ্রান্ত, তারই উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

*

এবারে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় গৌরবও যে বাঙলা ছবিই লাভ করেছে, এও আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা। সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান'-এর পশ্চাতে তৃতীয় স্থানাধিকারী হয়েছে হিন্দী ছবি 'সৌতেলা ভাই'; কিন্তু এখানেও আমাদের খুশী হবার একটি কারণ ঘটেছে। 'সৌতেলা ভাই' শরৎচন্দ্রের 'বৈকুন্ঠের উইল'-এরই হিন্দী সংস্করণ; কাজেই এখানেও বাঙালী প্রতিভার দানকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করেছে 'যাত্রিক' প্রযোজিত ভিন্নধর্মী ছবি 'কাচের স্বর্গ' এবং দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে অগ্রগামী পরিচালিত রবীন্দ্র-রচনা 'নিশীথে'। এই উপলক্ষ্যে আমরা প্রতিটি ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলী, শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চিত্র সমালোচনা

সাত পাকে বাঁধা (বাঙলা) **:** আর ডি বনশাল-এর চিত্র; ৩,৬৫৩ মিটার দীর্ঘ ও ১৪ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : আর ডি বনশাল; কাহিনী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা : অজয় কর; চিত্রনাট্য ও অতিরিক্ত সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; অধ্যক্ষতা : বিমল দে; সঙ্গীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্তী; শব্দধারণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়; আবহ সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু; সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়; রূপায়ণ : সুচিত্রা সেন, ছায়া দেবী, মলিনা, সুব্রতা সেন, গীতা দে, তপতী ঘোষ, সুষমা ঘোষাল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, প্রশান্তকুমার, অমিত দে, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, অমর মল্লিক, ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, দেবাশিস দাশগুপ্ত প্রভৃতি। আর ডি বি অ্যান্ড কোম্পানীর পরিবেশনায় গেল ২২-এ মার্চ থেকে শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অপরাপর ছবিঘরে দেখানো হচ্ছে।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে, যার বাঙলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ।' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত চিত্রকাহিনী 'সাত পাকে বাঁধা'কে যদি অনুরূপ নামে অভিহিত করা যায়, তাহ'লে নিতান্ত অন্যায়

হবে না। প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে অনুরূপা দেবী লিখিত 'মন্ত্রশক্তি'র মূলে বক্তব্যকেই 'সাত পাকে বাঁধা'তে আবার নতুন ক'রে প্রকাশিত করা হয়েছে। সেই অমোঘ মন্ত্রশক্তি 'যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব', যা বাণীকে অম্বরনাথের প্রতি দুর্লঙ্ঘ্যভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সেই মন্ত্রশক্তিই অর্চনাকে সুখেন্দুর জন্য আজীবন অপেক্ষা করতে উৎসাহিত করে। গরীব পূজারী-ব্রাহ্মণ অম্বরনাথ এখানে অল্প আয়বিশিষ্ট অধ্যাপক সুখেন্দুতে রূপান্তরিত, আর জমিদারনন্দিনী বাণী এখানে ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের অন্ধ অহমিকাপূর্ণ মিসেস বাসুর শিক্ষিতা কন্যা অর্চনারূপে উপস্থিত। পার্থক্য এই যে, মন্ত্রশক্তির বাণী বিশেষ অবস্থার গতিকে বাধ্য হয়ে অম্বরনাথকে স্বামীরূপে বরণ করেছিল, আর 'সাত পাকে বাঁধা'র অর্চনা নিজের জ্ঞাতসারে মনেপ্রাণে ভালোবেসে অনেকটা তার মায়ের অমতে অধ্যাপক সুখেন্দুর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় পার্থক্য, 'মন্ত্রশক্তি'তে বাণীর নিজের অহমিকা তার এবং অম্বরনাথের মধ্যে উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছিল, আর আলোচ্য কাহিনীতে অর্চনার মা মিসেস্ বাসুর অহমিকা অর্চনা ও সুখেন্দুর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের সৃষ্টি করে। অর্চনা যখন দুঃখের হাহাকারের মধ্যে বলে ওঠে : 'আমার দেখতে ইচ্ছে করে, তোমার মতো কত মা আমার মতো মেয়ের সংসারের সুখশান্তিকে ভেঙেচুরে তচনচ করে দিয়েছে,' তখন সাত পাকে বাঁধা'র মূল উৎসটিকে যেন নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তবু প্রশ্ন থাকে। সুখেন্দুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই যখন অর্চনা সাগ্রহে ও স্বেচ্ছায় তাকে স্বামিত্বে বরণ করেছে, তখন প্রতি পদে তার আর্থিক অসাচ্ছল্যের প্রতি তার নিজের মায়ের অশোভন ইঙ্গিতে স্বামীকে জর্জরিত হ'তে দেখবার পরেও সে কোন্ সঙ্গত কারণে স্বামীর ওপর অভিমান ক'রে পিতৃগৃহে বরাবরের জন্যে চ'লে এল, তা' সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় না। কৃষ্ণকান্তের উইল-এ ভ্রমর গোবিন্দলালের ওপর অভিমান করেছিল সঙ্গত কারণে: তবুও অভিমানগর্ভ সতীত্ব শুভদায়ক নয় বলে ভ্রমরকে দুঃখবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রায় বিনা কারণে নিজের প্রিয়তম স্বামীর ওপর অভিমান ক'রে অর্চনার মানসিক বেদনাবোধ ক'জন সমব্যথীকে আকৃষ্ট করতে পারে?

কিন্তু কাহিনীগত দুর্বলতা সত্ত্বেও 'সাত পাকে বাঁধা' একখানি অনবদ্য চিত্র হয়ে উঠেছে সামগ্রিক অভিনয় এবং পরিচালনাগুণে। সুচিত্রা সেনের অর্চনা

অনায়াসেই তাঁর অভিনেত্রী জীবনের একটি স্মরণীয় কীর্তি বলে চিহ্নিত হবে। একদিকে প্রবল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বামী, অন্য দিকে আভিজাত্যের দম্ভ ও অহমিকাসর্বস্ব মা—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে অর্চনার অসহায়তার ভাবকে তিনি চোখের চাউনিতে, ভ্রূভঙ্গে, ঠোঁটের সঙ্কুচনে, আকারে-ইঙ্গিতে, বেদনাহত স্বরে এমন সুন্দরভাবে মূর্ত করেছেন, যা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব। এম-এ পাশের পর নিজের বাবার সংগে অর্চনার সাক্ষাৎকারের নীরব দৃশ্য শ্রীমতী সেন এবং পাহাড়ী স্যান্যালের অভিনয়গুণে বিশেষ পরিমিতিতে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শেষের দৃশ্যে নিঃশব্দ নির্জনতায় অর্চনার নীরব প্রতীক্ষা আত্মগত ভাষায় সোচ্চার হয়ে দর্শকচিত্তকে ব্যথিত করে।

স্পষ্টবাদী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অধ্যাপক সুখেন্দুর চরিত্রকে সার্থকভাবে চিত্রিত করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মিঃ বাসুর ভূমিকাকে জীবন্ত করেছেন পাহাড়ী সান্যাল এবং তাঁর অহমিকাগ্রস্ত গৃহিণী

'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রে সুচিত্রা সেন

মিসেস বাসুর ভূমিকায় ছায়া দেবী অত্যন্ত বাস্তব অভিনয়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় তরুণকুমার (অর্চনার দাদা), মলিনা (সুখেন্দুর পিসিমা), গীতা দে (শিক্ষয়িত্রী), পঞ্চানন (দাসুদা), অমর মল্লিক (স্কুল-সেক্রেটারী) অমিত দে (নিখিলেশ), দেবাশিস (মিন্টু), তপতী ঘোষ (সুখেন্দুর ভ্রাতৃবধূ), শৈলেন মুখোপাধ্যায় (সুখেন্দুর ভ্রাতা) এবং ডাঃ হরেন (মিন্টুর বাবা) যথাযোগ্য অভিনয় ক'রে ছবিটির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

কলাকৌশলের সকল বিভাগেই ছবিটির মান অত্যন্ত উন্নত। বিশেষ ক'রে আলোকচিত্রে আলোছায়ার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ উচ্চ প্রশংসা দাবী করে। ছবিটিতে একখানিও গান নেই এবং তার জন্যে কোনো অভাবও অনুভূত হয় না। আবহসংগীত ছবিটির ভাববর্ধনে বিরাট সহায়তা করেছে।

'সাত পাকে বাঁধা' বিভিন্ন শিল্পীর অভিনয়গুণে একটি আকর্ষণীয় চিত্র।

বিবিধ সংবাদ

তারু মুখার্জি প্রোডাকসন্স-এর "সৎ ভাই" ঃ

আজ ২৯এ মার্চ, শুক্রবার থেকে রাধা, পূর্ণ এবং অপরাপর চিত্রগৃহে তারু মুখার্জি প্রোডাকসন্স-এর দ্বিতীয় চিত্র 'সৎ ভাই' প্রদর্শিত হবে। কাশ্মীর ফিল্মস পরিবেশিত এই ছবিটির কাহিনী ও চিত্র-নাট্য রচনা এবং পরিচালনা করেছেন তারু মুখার্জি। সংগীত পরিচালনা করেছেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। সম্পাদনার ভার নিয়েছেন অমিয় মুখোপাধ্যায়। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন—সন্ধ্যারাণী মঞ্জুলা সরকার, শম্পা চক্রবর্তী, গীতা দে, তপতী ঘোষ, নিভাননী, রেণুকা রায়, রাজলক্ষ্মী, শুক্লা দাস, অসিতবরণ, তরুণকুমার, অনুপকুমার, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যাম লাহা, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, সুখেন দাস, মাঃ তিলক প্রভৃতি নামকরা শিল্পী। এঁদের সংগে আছেন বোম্বে চিত্র-জগতের জনপ্রিয় শিল্পী নাসিমবানু।

রলহান প্রোডাকসন্স-এর 'গহেরা দাগ' ঃ

আজ ২৯এ মার্চ, শুক্রবার বোম্বাইয়ের নবগঠিত চিত্রসংস্থা রলহান প্রোডাকসন্স-এর প্রথম চিত্রার্ঘ 'গহেরা দাগ' শহরের জ্যোতি, কৃষ্ণা, প্রিয়া, কালিকা, খান্না এবং শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে। অতীতের গভীর চারিত্রিক ক্ষত একটি মানুষের জীবনের সুখ-শান্তিকে কি নির্মমভাবে কেড়ে নেয়, তারই বেদনাময় আলেখ্য এই ছবিখানিতে প্রযোজক-পরিচালক ও. পি. রালহান অত্যন্ত নিপুণতার সংগে চিত্রিত করেছেন। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্যটি তিনিই রচনা করেছেন। শকীল বাদোনী রচিত গানগুলিকে সুরসমৃদ্ধ করেছেন যশস্বী সংগীত-পরিচালক রবি। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে রাজেন্দ্রকুমার, মালা সিনহা, উষাকিরণ, ললিতা পাওয়ার, মদনপুরী, মনোমোহন কৃষ্ণ, সুন্দর এবং নৃত্যপটিয়সী রাগিণীকে। নরিম্যান এ, ইরানীর আলোক-চিত্র ছবিখানির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। বিঠলভাই প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে।

মুখার্জি মুভীজ প্রযোজিত 'মা-মণি' ঃ

মুখার্জি মুভীজ প্রযোজিত এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তী পরিচালিত 'মা-মণি' ছবির চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। মিহির সেনের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য যুগ্মভাবে রচনা করেছেন কাহিনীকার সেন ও পরিচালক চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ, শিল্প-নির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে জি. কে. মেহতা, জে. ডি. ইরাণী, রামচন্দ্র সিন্ধে ও দুলাল দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণ করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, তরুণকুমার, গীতালি রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায় এবং একটি নবাগতা বালিকা। ছবিখানির পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মুভীউইন নামে একটি নবগঠিত পরিবেশক সংস্থা।

স্বস্তিকা ফিল্মস্-এর 'পলাশের রঙ' ঃ

বি, এন, বাহেতী প্রযোজিত, বাণী বিশী রচিত, সুশীল ঘোষ পরিচালিত

অগ্রদূত পরিচালিত 'উত্তরায়ণ' চিত্রে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া ও সাবিত্রী

এবং কিনে কর্ণার প্রাইভেট লিমিটেড পরিবেশিত স্বস্তিকা ফিল্মস্-এর 'পলাশের রঙ' মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। এক গ্রাম্য কবিয়ালের সংসারের ভাঙাগড়া নিয়ে রচিত এই সঙ্গীতবহুল চিত্রে ভি, বালসারা সুরারোপিত গানগুলি গেয়েছেন চিন্ময় লাহিড়ী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, পিন্টু ও মাঃ দীপেন। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন বিকাশ রায়, অসীমকুমার, মঞ্জু দে, মঞ্জুলা সরকার, কমল মিত্র, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ ও নবাগতা সুতপা মজুমদার।

সুরসাগর চিত্রের 'দেবকন্যা' :

অনীতা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর পরিবেশনায় সুরসাগর চিত্র নিবেদিত এবং এস্ এন্ ত্রিপাঠী পরিচালিত 'দেবকন্যা' ছবিটি আসছে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতা শহরের বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। সতী মদালসা ও ঋতুধ্বজের কাহিনী নিয়ে রচিত এই চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় অনীতা গুহ, মহীপাল, কৃষ্ণাকুমারী, শীলা কাশ্মিরী, রত্নমালা, বি এম ব্যাস, মুকরী প্রভৃতি শিল্পীকে দেখতে পাওয়া যাবে।

বুন্দেলখণ্ড ফিল্মস্-এর 'মুলজিম' :

বুন্দেলখণ্ড ফিল্মস প্রযোজিত এবং এস. বি, ফিল্মস্ পরিবেশিত 'মুলজিম' ছবিটি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করবে।

সন্ধানী প্রোডাকসন্স-এর 'অয়নান্ত' :

'সন্ধানী' গোষ্ঠীর পরিচালনায় সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে সন্ধানী প্রোডাকসন্স-এর প্রথম প্রয়াস 'অয়নান্ত'-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে। ছবিটির প্রধান দু'টি ভূমিকায় আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এবং চিত্রগ্রহণ ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও সলিল চৌধুরী। ছবিটির পরিবেশন-স্বত্ব গ্রহণ করেছেন ছায়ালোক প্রাইভেট লিমিটেড।

'সাজঘর' নাট্য-সংস্থার 'সুখের পায়রা' :

গেল ১৫ই মার্চ থেকে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে "সাজঘর" নাট্যসংস্থা বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে শ্রীমতী আলো দাশগুপ্ত রচিত এবং সলিল সেন পরিচালিত "সুখের পায়রা" নামে রঙ্গনাটিকাটি মঞ্চস্থ করছেন।

"কথক" সম্প্রদায়ের "শেষ প্রহর" :

আসছে ৪ঠা এপ্রিল, বৃহস্পতিবার কালীঘাট অঞ্চলের 'কথক' সম্প্রদায় মহারাষ্ট্র নিবাস রঙ্গমঞ্চে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় লিখিত ও শক্তি মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রহস্যঘন নাটক "শেষ প্রহর" অভিনয় করবেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন রঞ্জন, কুমার, শক্তি, সুশীল, অরূপ, অনন্ত, দিলীপ, শৈলেন, রতীন, প্রকাশ, বিশু, সীমা কৃষ্ণা, মমতা, দেবিকা প্রভৃতি শিল্পী।

রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" :

রামচন্দ্র শর্মা প্রযোজিত রাজীব পিকচার্স-এর অসাধারণ হাসির ছবি 'হাইহিল' চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পরিবেশনায় মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ফণী গাঙ্গুলী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেছেন দিলীপ মিত্র এবং সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্তকুমার। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় এবং ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ হালদারকে। ছবির চিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখন, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়, অতুল চট্টোপাধ্যায়, ইরাণী ও নৃপেন পাল, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও গৌর পোদ্দার।

।। মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শনী ।।

গত শনিবার ২রা মার্চ একাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে প্রকৃত মণিপুরী নৃত্য দেখবার সুযোগ হয়। অনুষ্ঠানটি ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজনা করেছেন শ্রীআদিত্যসেনা রাজকুমার। আদিত্যসেনা রাজকুমার ভারতবিখ্যাত 'মণিপুরী নৃত্যগুরু' সেনারিক রাজকুমার ও

চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ১৯৬২

শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত 'দাদাঠাকুর'-এর নাম-ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

দাদাঠাকুরের পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়

দাদাঠাকুরের প্রযোজক শ্যামলাল জালান

পুরস্কারপ্রাপ্ত [illegible] চিত্র [illegible] ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

পুরস্কারপ্রাপ্ত 'অভিযান' চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ওয়াহিদা রহমান

অভিযান চিত্রের পরিচালক সত্যজিৎ রায়

পুরস্কারপ্রাপ্ত 'কাচের স্বর্গ' চিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়

পুরস্কারপ্রাপ্ত "সৌতেলা ভাই" চিত্রের নায়ক গুরু দত্ত

পদ্মশ্রী আতম্বা সিংহের সুযোগ্য শিষ্য। শ্রীরাজকুমার কলকাতায় নবাগত তিনি 'দক্ষিণীর' নৃত্য-শিক্ষক। অনুষ্ঠানের কতকগুলি কর্মসূচী বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল যেমন, প্রণাম ভঙ্গি, খাম্বা থইবী নৃত্য, করতালি ও নাগা নৃত্য। খাম্বা থইবী নৃত্য দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করে। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন রঞ্জনা চৌধুরী, দীপ্তি দত্ত, মিনতি দত্ত, সুদীপ্তা বসু, ছন্দা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুলা সরকার, মণিহার সিংহ, খেলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আদিত্য-সেনা রাজকুমার। অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেছেন শ্রীসুভাষ রায় ও শ্রীকমল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

।। রূপকারের আগামী নিবেদন ।।

চারণকবি মুকুন্দ দাসের জীবনী অবলম্বনে শীঘ্রই একটি নাটক মঞ্চস্থ করবেন 'রূপকার' সম্প্রদায়। দলগত ঐক্য, নিষ্ঠা আর মঞ্চপ্রীতিতে রূপকার-গোষ্ঠী সাম্প্রতিককালের বাঙলা নাট্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বর্তমান নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করবেন সবিতাব্রত দত্ত।

।। সুরঙ্গমা ।।

'সুরঙ্গমা' কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'নবীন' নৃত্য-গীতাভিনয় আগামী ৭ই এপ্রিল রবিবার সকাল ১০-৩০টায় রঙ্গি প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হবে। এই নাটকটি পরিচালনা করছেন বিশ্ব-ভারতী সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার।

ইউ-এস-আই-এস-এর উদ্যোগে প্রদর্শিত "কেনেডী" চিত্র

গেল শুক্রবার, ১৫ই মার্চ সাংবাদিক-দের একটি নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন স্থানীয় ইউ-এস-আই-এস। গেল ১৯৬২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনজন সাংবাদিক রাষ্ট্রপতি কেনেডীর সঙ্গে এক টেলি-

আকাদমি অব ফাইন আর্টস হলে অনুষ্ঠিত মণিপুরী নৃত্যানুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

ভিশন সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়ে বর্তমান জগতের বহু রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করে-ছিলেন। সেই চমৎকার আলোচনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ চিত্রটি সাংবাদিকদের একটি নতুন অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে।

।। কৃতবিদ্য সংঘের 'স্বর্ণবৃষ' অভিনয় ।।

শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ কৃতবিদ্য সম্মেলন গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ সংস্থার নিজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের শেষ অধিবেশনে কৃতবিদ্য সংঘের প্রযোজনায় নাট্যকার অজিত দে-র 'স্বর্ণবৃষ' একটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গনাট্য হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পায়। শ্রীবাস্তব গর্গরী কাহিনী-নাট্যের প্রাণবিন্দু। কৃপণ গর্গরীকে কেন্দ্র করে পাড়ার স্টেশনের চায়ের দোকানে প্রতিবেশী বাঁড়ুয্যে, ছোনে মিত্তির, কালাচাঁদ ও নিমাই প্রভৃতি চরিত্র মিছিলে কাহিনীর বিভিন্ন পরি-বেশে দর্শকদের প্রভূত আনন্দদানে সমর্থ হয়। শ্রীবাস্তবের একমাত্র পুত্র ভজহরি সদ্য বিবাহের পরেও যখন সুখী হতে পারলো না, তখন সে বাঁশি এঁটে বাবা বিশ্বনাথের চেলা সেজে বাড়ীতে বসে রোজগার শুরু করে দিল। কাহিনীশেষে ভজহরির কাছেই শ্রীবাস্তবকে জব্দ হতে দেখা গেল। নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সুঅভিনীত। পরিশেষে 'স্বর্ণবৃষ' রঙ্গ-নাট্যে রচয়িতা অজিত দে-কে এই সার্থক প্রচেষ্টার জন্য অভিনন্দন জানাই। নাটকটির পুনরাভিনয়ের জন্য সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানানো রইলো। নাটকটি পরিচালনা করেন দেবেন বোস।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলিকাতা

সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় দেবেশ ঘোষের প্রযোজনায় 'বর্ণালী' ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে ডি, আর, পিকচার্সের এ ছবিটি পরি-চালনা করছেন অজয় কর। চিত্রগ্রহণ

করবেন বিশ্ব চক্রবর্তী। সঙ্গীত-পরিচালক কালীপদ সেন। প্রধান দুটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর।

মিতালী পরিবেশিত চিত্রযুগের ছবি 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ'এর কাজ শেষ করেছেন পরিচালক গুরু বাগচী। রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। সম্প্রতি সম্পাদনার কাজ চলেছে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবে। কলাকুশলী বিভাগের প্রধান দায়িত্ব পালন করেছেন আলোকচিত্র, সম্পাদনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় অনিল গুপ্ত, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রবীন চট্টোপাধ্যায়। বহুল প্রচারিত এ উপন্যাসচিত্রের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, দিলীপ রায়, দীপা চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা সেন, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিত দে ও বনানী চৌধুরী।

অমর নানের প্রযোজনায় ছবিটি সমাপ্তপ্রায়।

সরকার প্রাডাকসন্সের ছবি 'নির্জন সৈকতে' মুক্তি প্রতীক্ষিত। তপন সিংহের পরিচালনায় পুরীর বহির্দৃশ্যের কাজ এ-ছবির প্রধান আকর্ষণ। কালকূট রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গঙ্গোপাধ্যায়, রেণুকাদেবী, ছায়াদেবী, ভারতীদেবী, অমর মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনায় দায়িত্ব নিয়েছেন কালীপদ সেন। শিল্প-নির্দেশনা, সম্পাদনা ও আলোকচিত্র পরিচালনায় রয়েছেন সুনীতি মিত্র, বিমল মুখোপাধ্যায় ও সুবোধ রায়। প্রযোজনার দায়িত্বভার শেষ করেছেন দিলীপ সরকার।

বোম্বাই

'নাগিন' কথাচিত্রের পর সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নতুন করে গানে-গানে ভরিয়ে তুলেছেন 'বীন বাদল বরসাৎ' চিত্রে। ছবির ন'খানা গানই জনপ্রিয় হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া এ-ছবির নায়িকা হলেন আশা পারেখ। নায়ক বিশ্বজিৎ। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মেহমুদ, পদ্মা, মণি চট্টোপাধ্যায়, দেবকিষণ, এস এন ব্যানার্জী ও নিসি। সম্প্রতি উত্তম চিত্রের এ-ছবির কাজ শেষ করেছেন পরিচালক জ্যোতি স্বরূপ।

স্টুডিও-ফ্লোরগুলিতে কেমন যেন রাতারাতি সব অবাককাণ্ড ঘটে যায়। সম্প্রতি রাজকমল কলামন্দির স্টুডিওয় শিল্পনির্দেশক সুধেন্দু রায় এক বিরাট কলোনি তৈরী করেছিলেন ফিল্মযুগের রঙিন চিত্র 'আয়ে মিলন কী বেলা'-র জন্য। দৃশ্যগ্রহণে ছবির কাজ এগিয়ে চলেছে। ছবির চরিত্রলিপির প্রধান আকর্ষণের প্রথম সারিতে রয়েছেন সায়রা বাণু, রাজেন্দ্রকুমার, ধর্মিন্দর, শশিকলা, নাজির হোসেন, মুন্দর ও মদনপুরী। এরমধ্যে সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর-জয়কিষণ সাতখানা গান ছবির জন্য গ্রহণ করেছেন। কিছুদিনের মধ্যে কাশ্মীর বহির্দৃশ্যে গানগুলি চিত্রে গৃহীত হবে। জে, ওমপ্রকাশের প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করছেন মোহন-কুমার।

মাদ্রাজ

প্রযোজক-পরিচালক এল ভি প্রসাদ জনপ্রিয় উপন্যাস 'পেনষানাম'-এর কাহিনী অবলম্বনে ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন রাহুনি স্টুডিওয়। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন শিবাজী গণেশন, বি সরোজাদেবী, এস ভি রাঙ্গ-রাও, এম আর রানা, টি আর রামচন্দ্র ও করুণানিধি। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন কে ভি মহাদেবন। —চিত্রদূত
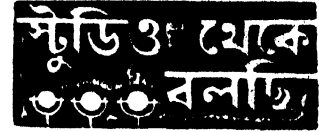
মেডিকেল রি প্রে জে ন্টে টি ভ শৌভিকের বিচিত্র জীবনের কাহিনী নিয়ে 'বিনিময়' ছবির চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ নাগ। সম্প্রতি রাঁচী, চক্রধরপুর ও টাটা শহরে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরেছেন এ সংস্থার কলাকুশলীদল।

কাহিনী-নায়ক শৌভিকের বিচিত্র

'গহেরা দাগ' চিত্রের একটি দৃশ্যে নায়ক রাজেন্দ্রকুমার ও নায়িকা মালা সিন্‌হা

জীবনের যে অভিজ্ঞতা সেখানে মানুষের জীবনদর্শনটুকু বৈচিত্রে ভরা। চরিত্র কত বিচিত্র। পথের দেখা মানুষ হঠাৎ কত আপন হয়। কলকাতায় দাদা কৌশিকের বাড়ীতেই একসঙ্গে থাকতো শৌভিক। অবশ্য বছরের সবটাই যাযাবরের মত পথে-পথে কেটে যায়। ডাক্তার আর ডাক্তারখানার সঙ্গে তার কর্মের মূল সম্পর্ক। হাতে হ্যান্ড-ব্যাগ, তাতে ওষুধের নমুনা। হয়তো বাঙলা কিংবা বিহারের সে প্রতিনিধি।

শৌভিক যাচ্ছে রাঁচীতে এবারের কর্মসূচীতে। হাওড়া থেকে ট্রেনের যাত্রী হয়েছে। এমনি কতবার তাকে যাওয়া-আসা করে ঘাঁটি পাকা করতে হয়। তা নাহলে অর্ডার দেবে কেন ডাক্তারবাবুরা। ট্রেনে যেতে যেতে কতলোকের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়। কিন্তু এবারের ঐ যে মেয়েটি একা বসে ডঃ জিভাগো বইটি পড়ছে একমনে, মীনাক্ষী যার নাম তার সঙ্গে আবার হঠাৎ তার বন্ধু রাঁচী কলেজের অধ্যাপক দেবুর বাড়ীতে দেখা হবে তা শৌভিক মোটেও ভাবতে পারেনি। তাই প্রথমটা অবাক হয়েছিল দুজনেই। দেবুই অবশ্য সেই দূরের বাঁধন ছিন্ন করে। পরিচয় হল তাদের। মীনাক্ষী কলকাতায় একা মহিলা নিবাসে থেকে চাকরী করে সওদাগরি অফিসে। সংসারে তার একমাত্র বিধবা মা থাকেন দেশে। এর বেশী শৌভিকের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তার কারণ অফিসের কাজে তার এক মুহূর্ত সময় হাতে থাকে না। স্টেশনে স্টেশনে দিন কাটে। এখানের কাজ শেষ করেই আবার চক্রধরপুর ছুটতে হবে। বাসে করে যেতে হয়। কি বিচিত্র যোগাযোগ। মুহূর্তের সেই মীনাক্ষী সেও চলেছে বাসে। দেখা হয় আবার দুজনের। শৌভিক জানতে পারলো মীনাক্ষী মাকে দেখতে চলেছে চাইবাসায়। পথের বন্ধুত্ব এবার শৌভিককে ভাবিয়ে তুললো। সে ভাবনা ভাললাগার। নির্দিষ্ট দিনে তার গন্তব্যস্থলে সে পৌঁছতে পারলো না। বিকল যন্ত্রে অচল বাস পথের মাঝে সন্ধ্যে নাগাদ থেমে পড়ে। শেষে দেশওয়ালী এক বৃদ্ধের বাড়ীতে তাদের এই রাতের জন্য এক ঘরে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হল। ভদ্রতার সবকিছু বজায় থাকে। শুধু অজান্তে দুটি মন ভালবাসায় রাঙা হল। ঠিকানা রেখে তারা আবার আলাদা হল।

কর্ম পরিক্রমার বয়স বাড়ে। পরিচয়ের নতুন-নতুন মুখ কখন আবার হারিয়েও যায়। আবার হঠাৎ প্রথম কামরার গাড়ীতে এমনি করেই পরিচয় হল ব্যবসায়ী সমীরণ ও তার প্রণয়ী সীমার সঙ্গে। এদের জীবনের গতিটুকু খুবই রোমাঞ্চকর। এরা পালিয়ে চলেছে দুটি জীবনকে এক করতে। কিন্তু সীমার বাবা মিঃ বসু রাজী নন এ বিয়েতে। তাই ধরা পড়ে একদিন বাবার কাছে বাড়ীতে ফিরতেও হল সীমাকে।

শৌভিক যখন কলকাতায় ফিরে আসে তখন মাঝে মাঝে মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা হয়। গড়িয়ে যায় অনেক বেলা ওদের মধ্যে ভালবাসার মুহূর্তটুকুকে

রাঁচীর বহিদৃর্শ্যে "বিনিময়" ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ চলেছে। চিত্রে নায়ক দিলীপ মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক দিলীপ নাগ

আশ্রয় করে। বাড়ীতে শৌভিকের বৌদি বুঝতে পেরে কৌশিককে জানায়। ওদিকে মীনাক্ষী তার মাকে সবকথা বলে। এমনি শুভ এক প্রতিষ্ঠার সূচনায় হঠাৎ ঝড় উঠলো। মিঃ বোসের অধীনে শৌভিকের দাদা চাকরী করতেন। মিঃ বসুর ইচ্ছে তাঁর মেয়ে সীমার সঙ্গে শৌভিকের বিয়ে হয়। কিন্তু এ যে মোটেই সম্ভব নয়! কারণ সীমা ভালবাসে সমীরণকে। শৌভিক ভালবাসে মীনাক্ষীকে। পরস্পরের এই সরল ভালবাসায় সে কি করে বিচ্ছেদ আনবে! কোন উপায় না দেখে চাকরী যাওয়ার ভয়ে বৌদি নিজেই মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা করে বর্তমান পরিস্থিতির সবকথা খুলে বলে। সব শুনে মুখে কথা দিলেও মীনাক্ষী ভেঙে পড়লো। চাকুরী ছেড়ে কাউকে না বলে সে কোথায় যেন নিজে আত্মগোপন করলো। ওদিকে দাদার ভয়ে শৌভিকও বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। তার চাকুরী গেছে।

ঘটনাচক্রে আবার সমীরণের সঙ্গে শৌভিকের দেখা হল। এর মধ্যে সীমার এক মিথ্যে আত্মঘাতী খবর জানিয়ে সমীরণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। মিঃ বসু তা জানতেন না। শুধু সীমার মৃত্যুখবরটুকু ছাড়া। দাদার চাকুরী তাই বজায় আছে। আবার সব জোড়া লেগেছে। কিন্তু মীনাক্ষীর কোন খবরই শৌভিক এখনও জানতে পারলো না। আবার এক নতুন চাকরী সে পেয়েছে আগের মত। তার বিশ্বাস সে মীনাক্ষীকে আবার পথের মাঝেই চিনে নেবে।

আর বিশ্বনাথনের কাহিনী অবলম্বনে প্রধান চরিত্রগুলির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শৌভিক—দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মীনাক্ষী—নবাগতা সুচিতা সিনহা, কৌশিক—অসিতবরণ, বৌদি—গীতা দে, সমীরণ—তরুণকুমার, সীমা—কাজল গুপ্ত ও দেবু—বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। কলাকুশলী বিভাগে দায়িত্ব নিয়েছেন আলোকচিত্রে—দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদনায়—অমিয় মুখোপাধ্যায়, শিল্পনির্দেশনায় সত্যেন রায়-চৌধুরী ও সঙ্গীত-পরিচালনায় কালীপদ সেন।

—চিত্রদূত

।। দ্বৈত ভূমিকায় নরম্যান উইজডম ।।

'নরম্যান উইজডম' মানেই হাসির ছবি। নরম্যান উইজডম কিন্তু আঙ্গিকের ব্যবহারে হাস্যরসের অবতারণা করেন না। তাঁর ছবিতে হাসির উৎস হল 'সিচুয়েশন'। কিন্তু 'অন দি বীট' ছবিতে উইজডম কাহিনীর সর্ত অনুসারে আঙ্গিকের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। একই রকম দেখতে দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উইজডম এই চিত্রে। একটি চরিত্রে তিনি পুলিশ বাহিনীতে নাম লেখাতে উৎসুক এক যুবক। কিন্তু অত্যাধিক বেঁটে হবার ফলে তিনি বারবার প্রত্যাখ্যাত হন পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক। দ্বিতীয় চরিত্রটি হল জনৈকা ইটালীয় মহিলার কেশপ্রসাধকের। পুলিশের খাতায় সে সন্দেহজনক অলংকার-অপহারক। পুলিশ কমিশনার উইজডমকে সত্যান্বেষণে নিযুক্ত করা স্থির করলেন। উইজডম সেই কেশপ্রসাধকের ছদ্মবেশে গোয়েন্দার ভূমিকায় নামলেন। অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে নানান জটিল ঘটনাবর্তে পড়ে গেলেন উইজডম। ছবির শেষে 'সত্যমেব জয়তে'।

ছবিতে পুলিশ কমিশনারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রেমণ্ড হান্টলে। ডেভিড লজ, অস্টিনর সামারফিল্ড এই ছবির অনন্য শিল্পী।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

॥ ইংল্যাণ্ড—নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট ॥

নিউজিল্যাণ্ড : ২৬৬ রান (জন রীড ৭৪ রান। ট্রুম্যান ৭৫ রাণে ৭ উইকেট পান)

ও ১৫৯ রান (জন রীড ১০০ রান। লার্টার ৩২ রানে ৩, ট্রুম্যান ১৬ রানে ২ এবং টিটমাস ৪৬ রানে ৪ উইকেট পান)

ইংল্যাণ্ড : ২৫৩ রান (ব্যারিংটন ৪৭, ডেক্সটার ৪৬ রান। মোজ ৬৮ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ১৭৩ রান (৩ উইকেটে। ব্যারিংটন ৪৫। কলিন কাউড্রে ৩৫ নট-আউট এবং বেরী নাইট ২০ নট-আউট। এ্যালবাস্টার ৫৭ রানে ২ উইকেট পান)

প্রথম দিন (১৫ই মার্চ) : নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮ উইকেট পড়ে ২৩৮ রান ওঠে।

দ্বিতীয় দিন (১৬ই মার্চ) : নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৬৬ রানে সমাপ্ত। ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮ উইকেট খুইয়ে ২৪৪ রান করে।

তৃতীয় দিন (১৮ই মার্চ) : ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানে সমাপ্ত। নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৯ রানের মাথায় খেলা শেষ করে। কোন উইকেট না হারিয়ে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৪১ রান করে।

চতুর্থ দিন (১৯শে মার্চ) : ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

১৯৬৩ সালের ইংল্যাণ্ড - নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ইংল্যাণ্ড ৩—০ টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয় করেছে। এই সিরিজ টেস্ট খেলার সংখ্যা ছিল মোট তিনটি। এই দুই দেশ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যোগদান করছে ১৯৩০ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে। এ পর্যন্ত টেস্ট খেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১—ইংল্যাণ্ডের জয় ১৪, নিউজিল্যাণ্ডের জয় ০ এবং খেলা ড্র ১৭। মোট ১১টা টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ড 'রাবার' পেয়েছে ৮টা এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৩টে (১৯৩২-৩৩, ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৯)।

আলোচ্য ইংল্যাণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় অর্থাৎ সিরিজের শেষ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

নিউজিল্যাণ্ড টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ নেয়। প্রথম দিনের খেলায় ২৩৮ রান ওঠে, ৮টা উইকেট পড়ে। খেলার সূচনায় দলের মাত্র ৩ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়। দ্বিতীয় উইকেট পড়ে দলের ৮৩ রানের মাথায়। ডাউলিং (৪০ রান) এবং সিনক্লেয়ার ১২৫ মিনিট খেলে দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ৮০ রান যোগ করেন।

নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম উইকেট জুটির খেলোয়াড় প্লেলি যখন তাঁর শূন্য রান এবং দলের ৩ রানের মাথায় ট্রুম্যানের বল মেরে ব্যারিংটনের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন তখন সারা মাঠে প্রচুর হাততালি পড়লো। দর্শকদের এ হাততালি ব্যারিংটনের ক্যাচ ধরাতে নয়, বোলার ট্রুম্যানের উদ্দেশ্যে তাঁদের এ হাততালি স্বযত্নে তোলা ছিল। প্লেলির এই উইকেট নিয়ে ট্রুম্যান টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড (২৪২ উইকেট) হাতের নাগালে পান। গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম তাঁর ২৩৭তম উইকেট পেলে তিনি ইংল্যাণ্ডেরই বোলার এ্যালেক বেডসার প্রতিষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড (২৩৬ উইকট) ভঙ্গ করেন। ১৯৬২-৬৩ সালের ইংল্যাণ্ড - অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ খেলার শেষে স্ট্যাথামের উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪২টি (বিশ্ব রেকর্ড) —৬৭টি টেস্ট খেলায়। স্ট্যাথামের এই বিশ্ব-রেকর্ড আলোচ্য তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসেই ট্রুম্যান ভাঙেন যখন তাঁর বল খেলতে গিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের সিনক্লেয়ার নিজেই নিজের উইকেট ভেঙে ফেলেন। ট্রুম্যান তাঁর এই ২৪৩তম উইকেট (নতুন বিশ্ব রেকর্ড) পান তাঁর ৫৬তম টেস্ট খেলার মাথায়। গত ২৬শে জানুয়ারী এ্যালেক বেডসার স্বশরীরে এডিলেড মাঠে উপস্থিত ছিলেন যখন স্ট্যাথাম তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে ছিলেন। কিন্তু ট্রুম্যানের এই বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার দিনে স্ট্যাথাম মাঠে উপস্থিত ছিলেন না। অস্ট্রেলিয়া সফরের খেলা শেষ করেই তিনি সটান স্বদেশে ফিরে যান। নিউজিল্যাণ্ড সফরে দলের সঙ্গ নেননি। অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষে স্ট্যাথামের টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ছিল ২৪২ আর ট্রুম্যানের ২৩৬ অর্থাৎ স্ট্যাথামের ৬টা উইকেট বেশী।

নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে আলোচ্য তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের খেলার শেষে ট্রুম্যানের টেস্ট উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৬টি—৫৬টা টেস্ট খেলে। ওদিকে নিউজিল্যাণ্ডের রান উঠেছিল ৮ উইকেট পড়ে ২৩৮। ট্রুম্যান একাই প্রথম ইনিংসে ৬১ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছিলেন। পঞ্চম উইকেটের জুটিতে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক জন রীড (৭৪ রান) এবং স্প্রিম্পটন (৩১) ৮৮ মিনিটের খেলায় ৬৮ রান তুলে দলকে পতনের হাত থেকে উদ্ধার করতে শেষ চেষ্টা করেছিলেন।

খেলার দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা ২৬৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন ফ্রেডী ট্রুম্যান নিউজিল্যাণ্ডের শেষ ২টো উইকেট পান। ফলে এই ইনিংসে তিনি ৭৫ রাণে পান ৭টা উইকেট এবং তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ২৪৮টা উইকেট। ইংল্যাণ্ড এই দিনে ৮টা উইকেট খুইয়ে প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৪৪ রান করে। সমান সংখ্যক ৮ উইকেট হারিয়ে নিউজিল্যাণ্ড তুলেছিল ২৩৮ রান। সুতরাং নিউজিল্যাণ্ডের ফিল্ডিং এবং বোলিংয়ের প্রশংসা করতেই হবে। তবু তারা এই দিনে একাধিক ক্যাচ নিতে পারেনি। ইংল্যাণ্ড খেলায় মাত্র একটা সময়ে নিউজিল্যাণ্ডের উপর মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল—ডেক্সটার এবং কাউড্রে যখন ৭০ মিনিটের খেলায় ৮৩ রান তুলেছিলেন, চতুর্থ উইকেটের জুটিতে। বেরী নাইট (৩১ রান) এবং এ্যালেন স্মিথ (০) এই দিন নট আউট থাকেন। এ্যালবাস্টারের বলে নাইট খেলার শেষের দিকে দুটো ওভার বাউণ্ডারী মার মেরেছিলেন।

খেলার তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানের মাথায় শেষ হলে নিউজিল্যাণ্ড ১৩ রানের ব্যবধানে ইংল্যাণ্ডকে পিছনে ফেলে রেখে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। খেলার এক সময়ে নিউজিল্যাণ্ডের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাদের দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রানের মাথায় শেষ হলে এবং ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে কোন উইকেট না হারিয়ে ৪১ তুলে দিলে নিউজিল্যাণ্ডের জয়লাভের আশা কর্পূরের মত উবে যায়। নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক জন

রীড দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে সেঞ্চুরী (১০০ রান) করেছিলেন। তিনি একজন ভাল জুড়ি পেলে ইংল্যান্ডের পক্ষে কিছুটা চিন্তার কারণ হ'ত। নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫৯ রানের মধ্যে রীডের রান ছিল ১০০ এবং বাকি খেলোয়াড়দের মধ্যে দশকের ঘরে রান তুলেছিলেন মাত্র দুজন ডাউলিং (২২ রান) এবং বার্টন (১২ রান)। প্রথম ইনিংসে ট্রুম্যান ৭টা উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর খেলায় মন ভাল করে বসেনি—টেস্ট খেলায় সর্বাধিক উইকেট পেয়ে তাঁর মেজাজই ছিল অন্য রকম—উইকেট শিকারে তিনি গা-ঘামিয়ে গোলা ছুড়েননি। সুতরাং নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় বলতে হবে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যান্ডের জয়লাভ করতে আর ১৩২ রানের দরকার—হাতে জমা ১০টা উইকেট।

খেলার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যান্ড ৩টে উইকেট খুইয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩২ রান যোগ করে পূর্ব দিনের ৪১ রানের সঙ্গে। মোট রান দাঁড়ায় ১৭৩ (৩ উইকেটে)।

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট
১৯৬৩ সালের ১৯শে মার্চ পর্যন্ত

স্থান	খেলা	ইংল্যান্ড জয়ী	নিউজিঃ জয়ী	ড্র
ইংল্যান্ড	১৫	৬	০	৯
নিউজিল্যান্ড	১৬	৮	০	৮
মোট ঃ	৩১	১৪	০	১৭

॥ ক্রিকেট মাঠে পাখি শিকার ॥

ক্রিকেট মাঠে খেলতে নেমে খেলোয়াড়ের প্রাণপাখি উড়ে গেছে এবং খেলাতে জখম খেলোয়াড়ের প্রাণ নিয়ে যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছে—এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বহু আছে। কিন্তু উইকেটের বদলে পাখি শিকার (?) দু'বারই হয়েছে। ব্যাপারটা আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল। বোলারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বলটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল উইকেট লক্ষ্য ক'রে—তার কোন রকম বদ মতলব ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের লিখনে একবার একটা উড়ন্ত চড়াই বলটায় আঘাত পেয়ে উইকেটের উপর লুটিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। পাখিটার দু'চোখে মানুষের বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ বা প্রতিহিংসা ছিল না। বরং ছিল একটা অব্যক্ত করুণ নিবেদন। পাখিটার প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি; কিন্তু তার মৃতদেহের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মহা তীর্থস্থান—ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠ। এই লর্ডস মাঠের যাদুঘরে ক্রিকেট খেলার বহু স্মরণীয় নিদর্শনের মধ্যে হতভাগ্য চড়াই পাখীটিও সসম্মানে স্থান পেয়েছে।
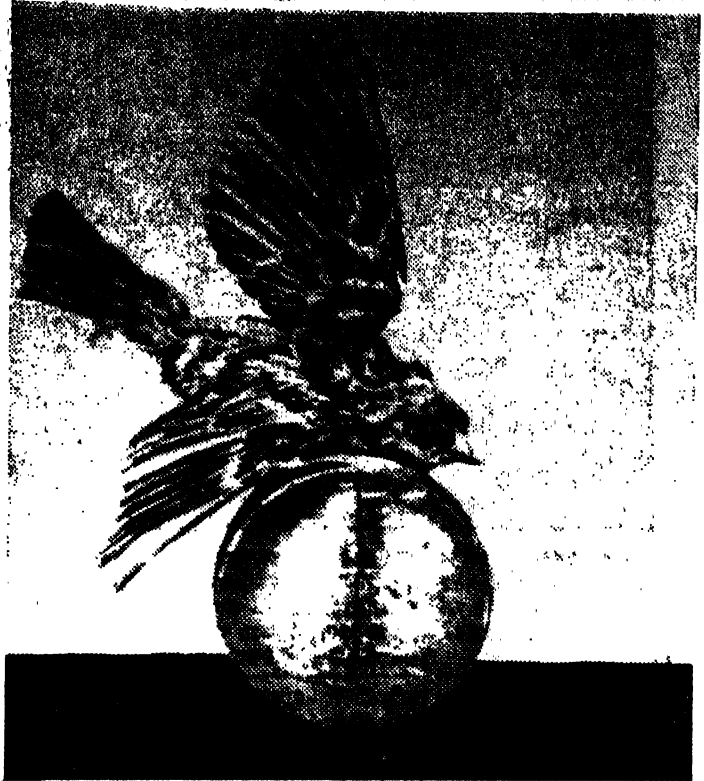
লর্ডস মাঠে (৩রা জুলাই ১৯৩৬) এম সি সি বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট খেলায় জাহাঙ্গীর খাঁর বলে নিহত হতভাগ্য চড়াই পাখি

যে বলটি মৃত্যুর কারণ—তারই উপর পাখিটি রাখা হয়েছে—এই দৃশ্যটি দর্শকের মন ভারাক্রান্ত করে তুলে। স্মৃতি-ফলকে দুর্ঘটনার দিন লেখা আছে—১৯৩৬ সালের ৩রা জুলাই। ঐ তারিখে লর্ডস মাঠে খেলা হচ্ছিল এম সি সি দলের সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলের। উইকেটে খেলছিলেন এম সি সি দলের টি এন পিয়ার্স এবং বল দিচ্ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাহাঙ্গীর খাঁ (ভারতবর্ষের টেস্ট খেলোয়াড়)। জাহাঙ্গীর খাঁর বলের মুখে পড়েই চড়াই পাখিটি প্রাণ হারায়। আশ্চর্যের কথা, উইকেটের উপর পাখিটার মৃতদেহ পড়েছিল কিন্তু বেল দুটির স্থানচ্যুতি ঘটেনি।

খেলার মাঠে এ ধরণের প্রথম দুর্ঘটনা ঘটেছিল কেম্ব্রিজে, ১৮৮৫ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে। বোলারের নিক্ষিপ্ত বলে সেবার প্রাণবলি দিয়েছিল এক হতভাগ্য সোয়ালো পাখি।

॥ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

মাদ্রাজের কর্পোরেশন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৬৩ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতীয় রেলওয়ে দল ২-১ গোলে সার্ভিসেস্ দলকে পরাজিত ক'রে 'রঙ্গস্বামী' কাপ জয় করেছে। এই নিয়ে রেল দল জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ৬ বার খেতাব লাভ করলো। রেল দল প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ১৯৩০ সালে এবং প্রথম যোগদানের বছরেই সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়ে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করে। এর পর ফাইনালে জয়লাভ করেছে ১৯৫৭-৫৯ (উপর্যুপরি ৩ বার), ১৯৬১ ও ১৯৬৩ সালে। প্রতিযোগিতায় রাণার্স-আপ এ পর্যন্ত একবারও হয়নি। অপর দিকে সার্ভিসেস দল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৮ বার খেলে ৪ বার জয়লাভ করেছে (১৯৫৩, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৬০)। রাণার্স-আপ হয়েছে ৪ বার—১৯৫১, ১৯৫৪, ১৯৫৯ ও ১৯৬৩ সালে। ১৯৫৫ সালে সার্ভিসেস ও মাদ্রাজ যুগ্মভাবে 'রঙ্গস্বামী' কাপ জয় করে।

১৯৬৩ সালের প্রতিযোগিতায় ২২টি দল নাম দেয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেরালা নাম প্রত্যাহার করায় হায়দরাবাদ তৃতীয় রাউন্ডে উঠে যায়।

বাংলা বনাম মাদ্রাজের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা দু' দিন ড্র যায়। তৃতীয় দিনে মাদ্রাজ ১-০ গোলে বাংলাকে পরাজিত করে। প্রথম দিন
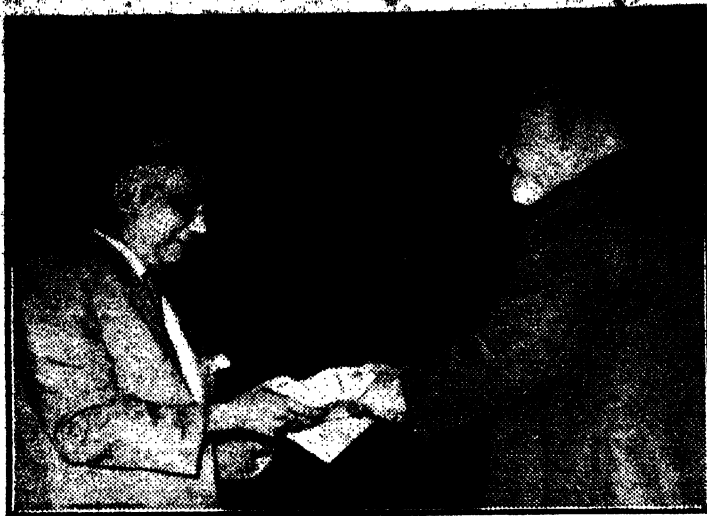
সমগ্র ভারতবর্ষে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে মুদ্রণ ও অংগ-সৌষ্ঠবে 'যুগান্তর' ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় দিল্লীতে যুগান্তরের পক্ষ থেকে শ্রীবিমল চ্যাটার্জি উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকীর হোসেনের নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন। এই নিয়ে পরপর তিনবার 'যুগান্তর' মুদ্রণ সৌকর্যের জন্য ভারত সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত হল

খেলাটি গোলশূন্যভাবে অমীমাংসিত থাকে। দ্বিতীয় দিনে উভয় পক্ষই একটা ক'রে গোল দেয়। বাংলা দলের এগারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই ছিলেন বাংলার বাইরের। চাকুরীর খাতিরে অথবা অন্য কোনরূপ ব্যক্তিগত কারণে তাঁরা ক'লকাতার বিভিন্ন হকি দলের খেলোয়াড় হিসাবে স্থানীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে থাকেন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে দলের পক্ষে তাঁদের যে আনুগত্য তা যে জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার পক্ষে সমানভাবে বজায় থাকবে এ রকম আশা দুরাশা মাত্র। তাঁরা মনে-প্রাণে বাঙ্গালী নন্; সুতরাং বাংলার মর্যাদা রক্ষায় তাঁদের মাথা ব্যথা করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। এবং এর জন্যে তাঁদের দোষারোপও করা যায় না। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে বাংলাদেশ মাত্র ৩ বার (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫২) খেতাব পেয়েছে। রাণার্স-আপ হয়েছে ২ বার (১৯৩২ ও ১৯৪৯)।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী পাঞ্জাব ২-১ গোলে দিল্লীকে, সার্ভিসেস ১-০ গোলে বোম্বাইকে, রেলওয়ে ৩-১ গোলে হায়দরাবাদকে এবং মাদ্রাজ ২-০ গোলে গত বছরের রাণার্স-আপ ভূপালকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে ওঠে। সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব বনাম সার্ভিসেস দলের খেলা তিন দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। প্রথম দিনে ২-২ গোলে খেলাটি ড্র যায়। অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়েছিল। কিন্তু খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময় থেকে দশ মিনিট আগে আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে কোন পক্ষই গোল দিতে পারে নি। তৃতীয় দিনেও খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি—উভয় দলেরই গোলের ঘর শূন্য ছিল। অতিরিক্ত সময়ের অষ্টম মিনিটের মাথায় সার্ভিসেস দলের ফরোয়ার্ড পিটারকে রুখতে গিয়ে পাঞ্জাব দলের লেফট-ব্যাক ধরম সিং 'ফাউল' করেন। ফলে সার্ভিসেস দল পেনাল্টি-কর্ণার পায়। এই পেনাল্টি কর্ণার সর্ট থেকে সার্ভিসেস দলের লেফট-ব্যাক পিয়ারা সিং দলের জয়সূচক গোলটি করেন (১-০)।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল খেলায় রেলওয়ে দল খেলা ভাঙ্গার শেষ সময়ের মাথায় ১-০ গোলে মাদ্রাজকে পরাজিত করে। রেলওয়ে দলের হরবিন্দর সিং নিজের চেষ্টায় মাদ্রাজ দলের একাধিক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোল দেন।

ফাইনাল খেলায় রেলওয়ে দল উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে ২-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের খেলার দ্বিতীয় মিনিটে রেলওয়ে দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড হরবিন্দর সিং দলের প্রথম গোল দেন। পাঁচ মিনিট পরে সার্ভিসেস দলের টোম্পো গোলটি শোধ দিয়ে খেলার ফলাফল সমান দাঁড় করান। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার ২০ মিনিটের মাথায় রেলওয়ে দলের রাইট-ইন গুরবক্স সিং জয়সূচক গোলটি করেন (২-১)।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম রাউণ্ড : মহীশূর ৭ : বিহার ০; উত্তর প্রদেশ ৫ : রাজস্থান ০; পাতিয়ালা ১, ১ : গুজরাট ১, ০; মাদ্রাজ ৯ : উড়িষ্যা ১।

দ্বিতীয় রাউণ্ড : দিল্লী ২ : মধ্য-ভারত ০; মহাকোশল ৬ : অন্ধ্র ১; উত্তর প্রদেশ ২, ২ : মহীশূর ২, ০; মহারাষ্ট্র ২ : বিদর্ভ ১; হায়দরাবাদ (ওয়াক-ওভার) : কেরালা; মাদ্রাজ ৪ : পাতিয়ালা ০।

তৃতীয় রাউণ্ড : দিল্লী ২ : মহাকোশল ১; বোম্বাই ১, ০, ৩ : উত্তর প্রদেশ ১, ০, ১; হায়দরাবাদ ১ : মহারাষ্ট্র ০; মাদ্রাজ ০, ১, ১ : বাংলা ০, ১, ০।

কোয়ার্টার-ফাইনাল : পাঞ্জাব ২ : দিল্লী ১; সার্ভিসেস ১ : বোম্বাই ০; রেলওয়ে ৩ : হায়দরাবাদ ১; মাদ্রাজ ২ : ভূপাল ০।

সেমি-ফাইনাল : সার্ভিসেস ২, ০, ১ : পাঞ্জাব ২, ০, ০; রেলওয়ে ১ : মাদ্রাজ ০।

ফাইনাল : রেলওয়ে ২ : সার্ভিসেস ১।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড.

অমৃত

৪৮শ সংখ্যা
মূল্য—
৪০ নঃ পঃ

শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
Friday, 5th April, 1963. 40 Naya Paise.

বহুদিন পূর্বে (৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বাধীনতার চতুর্মুখী রূপের বর্ণনা করেন, যথা বাক্য ও বাক্য প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, অভাবমুক্তির স্বাধীনতা ও ভয় হইতে ত্রাণের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এই চতুর্বর্গ সংজ্ঞার্থকে আরও সরল করিয়া বলা যায় যে তিন বিষয়ে স্বাতন্ত্র থাকিলে স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ হয়। সেই তিন বিষয় যথাক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক, চিত্তের ও চিন্তা প্রকাশের এবং অর্থনৈতিক। ইহার মধ্যে চিত্তের ও লেখনীর স্বাধীনতা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই। সে কাজ করিয়া গিয়াছেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়ক ও মানসজগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগণ, অমূল্য, অবিনশ্বর ও বিশাল সাহিত্যসম্পদ দান করিয়া। ইঁহাদের অবদান হয় ব্রিটিশ রাজত্বকালে, কিন্তু তাহারও পূর্বে, পাঠান ও মোগল আমলে, এদেশের কবিমানস বা গায়কের কন্ঠ পরাধীনতা মানিয়া লয় নাই। ভারত বিদেশী বিজেতার শাসন মানিয়া লইলেও চিত্তের উপর বা বাক্য ও লেখনীর উপর বিদেশীর অধিকারকে কখনও স্বীকৃতি দেয় নাই। এবং সেই কারণেই এদেশে স্বাধীনতার হোমশিখা নির্বাপিত হয় নাই।

ব্রিটিশ আমলে বাংলায় ও অন্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় যে বিরাট পরিমাণে দেশপ্রেমজনিত ও দেশাত্মবোধক সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহারই উত্তরাধিকার সূত্রে এদেশে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা আসে, একথা বলা যায়। কেননা যে দেশ ও জাতি চিত্তের ও চিন্তার স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে এবং সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বদ্ধপরিকর তাহাকে পরাধীন রাখা অসম্ভব। স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে প্রজাতন্ত্র অনুযায়ী সংবিধান রচিত হওয়ায় জাতির ও জনগণের সকল মৌলিক অধিকার নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হইয়াছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে পূর্ণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বর্তমানে জাতীয় সরকার যেভাবে জাতির ও দেশের সমগ্র শক্তি ও সম্পদ নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতেও দেশের রাষ্ট্রনৈতিক বা চিত্তমানসগত স্বাধীনতা যাহাতে বিন্দুমাত্রও খর্ব বা ব্যাহত না হয় সেদিকে খরদৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এবং যতদিন প্রজাতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকিবে ততদিন উহা লেশমাত্র খর্ব হওয়ার আশংকা খুবই কম।

এক হিসাবে চিত্তের স্বাতন্ত্রই স্বাধীন মানবের শ্রেষ্ঠতম অধিকার। কেননা চিন্তার পথ, চিন্তা প্রকাশের পথ এবং তথ্য ও সংবাদ আদি চিন্তার "খোরাক" সংগ্রহের পথ যদি উন্মুক্ত ও বাধাবিঘ্ন ও বন্ধনহীন না হয় তবে সেই পরিস্থিতির কারণে সে অবস্থার মানুষ ক্রমে ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তিহীন যন্ত্রচালিত মূর্তিমাত্রে পরিণত হয়। সেই কারণে চিত্তের স্বাতন্ত্র, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতারই মত, পরম সযত্নে ও সন্তর্পণে রক্ষণীয়। এবং সেই কারণে জাতীয় সাহিত্য ও সকল সাহিত্যিকের সকল প্রকার বাহ্যিক মতবাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সাহিত্যিক যদি কোন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে আবিষ্ট হইয়া উহাকে সত্য ও সুন্দরের আসন অপেক্ষা উচ্চে স্থাপন করেন তবে তাঁহার লেখনী রাষ্ট্রনৈতিক অপপ্রচারের আকরে পরিণত হইতে বাধ্য।

জাতীয় জীবনের ও জনমানসের সকল প্রেরণার প্রধান উৎস সেদেশের সাহিত্য ও শিল্প। সেইজন্য সাহিত্যিক ও শিল্পীর অবশ্য কর্তব্য তাঁহাদের চিত্ত ও মানসপটকে ঐরূপে বাহ্যিক প্রভাবের অনুপ্রবেশ ও বন্ধন হইতে রক্ষা করা। আজিকার দিনে, চীনা আক্রমণে ও আমাদের হিমালয় প্রান্তে স্থিত সীমান্তে চীন সেনার বিপুল সমাবেশের কারণে উদ্ভূত দেশের নিরাপত্তা ও জাতির স্বাধীনতার এই বিপত্তিজনক পরিস্থিতিতে, জাতিকে জাগ্রত করিবার এবং জাতিমানসে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা দিয়া ও দেশাত্মবোধের যজ্ঞশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া জনগণকে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করার দায়িত্ব আসিয়াছে দেশের সকল সাহিত্যিকের উপর। কি প্রবীন কি নবীন, কি প্রখ্যাত কি অজ্ঞাতনামা, সকল লেখকের উচিত এই দায়িত্ব পালন করা।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন মণ্ডপে অনুষ্ঠিত ও স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে আহূত, ভারতীয় লেখক সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অধিবেশনে এই সকল কথাই নানাদিক হইতে আলোচিত ও বিবৃত হইয়াছে সকল বক্তার কন্ঠে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত ভাষণে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ—

"সাহিত্যিকের ধর্ম সুন্দরের অন্বেষণ, উপলব্ধি ও প্রকাশ; কোন অর্থনৈতিক মতবাদ বা রাজনৈতিক আদর্শকে প্রচার করা নয়। যে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মানুষ হিসেবে কোনও মূল্যস্বীকৃতি নেই, যেখানে মানুষের শাসনযন্ত্রের চেতনাশূন্য জৈব অংশরূপে পরিগণিত হয়, সেখানে মানব-চরিত্রের মূল ভিত্তি—বিশ্বসত্তার সঙ্গে মানবসত্তার সংযোগ-সাধন, সহবোধসূত্রে ঐক্য সমন্বয় একান্ত অসম্ভব।"

উদ্বোধনে অন্য এক বক্তা বলেন, "সংস্কৃতি-রথের যাঁরা চালক সেই সাহিত্যিক ও শিল্পীসমাজের পক্ষে মতের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কোনো রাজনৈতিক মতবাদের বেড়াজালে বন্দী হয়ে সত্যকারের কোনো সুন্দর সৃষ্টিকে রূপ দেওয়া যায় না। তারই জন্যে কোনো মহৎ সাহিত্যিকই মনের বন্ধন-দশাকে কখনো মেনে নিতে পারেন নি।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্ভাষণদান প্রসঙ্গে অন্য এক বক্তা বলেন ঃ—

"সত্যকারের সাহিত্য স্বাধীন এবং শাশ্বত। অতীতে ইহার স্বাধীনতা খর্ব করার অপচেষ্টা হইয়াছে। তাহাতে উহা সাহিত্য হয় নাই, দেশের কল্যাণ সাধনে উহা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু অতীতের বিপদ অপেক্ষা আজ বিপদ আরও বেশী।"

নক্ষত্র

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আশার নক্ষত্রগুলি আকাশে ফুটাই
আদিগন্ত পূবে ও পশ্চিমে।
হেথা হোথা সরে যায় তারা;
হঠাৎ কখনো—
নিমেষে জ্বলিয়া উঠে নিমেষে মিলায়
অন্তহীন অন্ধকারে চোখের সম্মুখে।

উদাসীন অপ্রসন্ন প্রভাতের মহাশূন্যতায়
সারা দিন খুলে রাখি হৃদয়ের সমস্ত দুয়ার;
সাড়া নাই, কোনো শব্দ নাই,
শুধু প্রতীক্ষার
অস্থির মুহূর্তগুলি ভাঙে আর গড়ে
জীবনের কল্পনারে
কী নিষ্ঠুর খুশি ও খেয়ালে।
মনে হয়, প্রতীক্ষার কোনো মূল্য নাই
মূল্য নাই ফাল্গুনের হঠাৎ হাওয়ার।

তবুও আবার
সন্ধ্যার আকাশে ফোটে যেন সে নূতন
অসংখ্য নক্ষত্রগুলি;
স্মৃতির স্তিমিত দীপমালা
একে একে জ্বলে ওঠে অদৃশ্য আলোকে,
সে আলোক অনুজ্জ্বল
রহস্যে গভীর সে আঁধার,
তারি মাঝে অপমৃত্যু সকল আশার।
জীবনের ক্ষয় ক্ষতি বঞ্চনারে তবু
বেদনার সুখস্পর্শে নক্ষত্রে জ্বালাই,
স্মৃতিরে জাগাই মোহ-মুগ্ধ চেতনায়।

বোধন

গোপাল ভৌমিক

শুধু বোধনের মন্ত্র জানা আছে বলে
প্রতি পদে বার বার বোকা বনি, ঠকি :
বিসর্জন দেয় যারা বিস্মৃতির জলে
ফুটবল খেলে যেই শেষ হয় হকি।

মনটাকে বেঁধে নিয়ে সময়ের তালে
সুরের আলাপ তারা তোলে বেশ খাসা :
সবুজ হলুদ নীল আর গাঢ় লালে
অনীহা সমান তবু এক ভালবাসা।

এক আসে আর যায় ভাবনা কি তাতে?
আমি বসে থাকি এক ঘোর কাপালিক,
বোধনের মন্ত্র পড়ি শুধু দিন রাতে।
ওরা বলে, সব ডাল, মাথা নেই ঠিক।

স্বপ্ন ঘোরে তবু এক প্রতিমাকে ঘিরে,
বোধনের শেষ নেই বিস্মৃতির তীরে।

চতুর্দশপদী

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

বকুল, এসেছি আজ দুয়ারে তোমার।
ফিরাবে কেমন ক'রে? মেঘক্লিষ্ট দিনে
এনেছি অনেক বড় ব্যথার খবর
মানুষ জেনেছে যারে, জেনেছি দুজনে।
বজ্রে মরিনি আমি; রৌদ্রে, তিমিরে
আজো অবিচল আছি, অপমান ব্যাধি
কিছু নীল চিহ্ন শুধু রেখে গেছে ত্বকে.....
বক্ষদেশে বিদ্যুতের ত্রিশূল লেগেছে!

ভেবেছ, হয়ত কবে ভেসে গেছি বানে
বনে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের উদরে
চলে গেছি। মরব না যতদিন সেই
মালিনীর তীরে এক গোলাপের সাথে
বাতাসের যুদ্ধ হবে, যতদিন আকাশে অস্ত্রের
খোঁচা লেগে জল ঝরে, ক্লিষ্ট মেঘকণা।
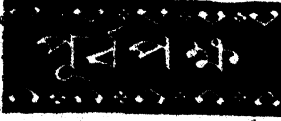
জৈমিনি

জনৈক বন্ধু একবার বলেছিলেন, কলকাতার মতো শহরে প্রতিবেশীর সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক শুধু উনুন-ধরানো ধোঁয়ায়। এ বাড়ির ধোঁয়া ও-বাড়ি যায় এবং ও-বাড়ির ধোঁয়া আসে এ-বাড়ি, কেবল এইটুকু সময়োচিত নিবেদন ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই নাকি প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘটতে চায় না আমাদের।

কথাটা সত্যি বলেই মেনে এসেছি এতদিন। কিন্তু সম্প্রতি এর কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছি বলাটা ভুল, বলা উচিত শুনতে পাচ্ছি। আমার এই বাড়িটাতে বসে (এবং শুয়েও) শুনতে পাচ্ছি এখন এমন একটা শব্দলহরী যাতে প্রতিবেশীর অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ বোধগম্য হচ্ছে।

সম্প্রতি একজন নতুন ভাড়াটের অভ্যুদয় ঘটেছে আমার পাশের ফ্ল্যাটে, যিনি সঙ্গীত-রসিক। গান, এবং বিশেষ করে তবলা বাদনের দিকে তাঁর এমন একটা অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যে, আমার প্রায় সংসার-বিরাগ দেখা দেওয়ার মতো অবস্থা। রাত দশটা নাগাদ আরম্ভ হয় তাঁর তবলা শিক্ষা। খেয়ে দেয়ে, গায়ে বেশ জোর করে নিয়ে শুরু করেন। বারোটার আগে আর নিবৃত্তি ঘটতে চায় না। তবলা জিনিসটি মহাশয় বস্তু বলেই হয়ত সয়ে যায় তাঁর করাঘাত, আমার অবস্থা দিনে দিনে (কিংবা বলা যায়, রাতে রাতে) হয়ে উঠছে অসহনীয় রকম শোচনীয়।

আমি শুনেছি, তাঁর বাদ্য সাধনার শ্রোতা হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রটি। আর, যতোদূর বুঝতে পারি, তাঁর কুকুরটি। এই তিন প্রাণীর সহ্য শক্তির আমি প্রশংসা করি।

কিন্তু যতো চেষ্টাই করুন, বাজনা যে তার একটুও এগোচ্ছে না তা হলফ করে বলতে পারি।

নাহলে দিনে দিনে (কিংবা রাতে-রাতে) তাঁর আক্রোশ এত দুর্দমনীয় হয়ে উঠত না। অজস্র বেতালা চাঁটিতে কিছুক্ষণ শব্দ উৎপন্ন করে চলেন তিনি, এবং মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলেন তালের নাম। কিন্তু নামগুলো আলাদা বললেও হাতে যে ওঠে তাঁর একই তাল সে বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

আমার একটি সাত-আট বছরের ভাগ্নে আছে। তারও দেখেছি একই অবস্থা। তবলা বাজায় না সে, তার আগ্রহ ছবি আঁকার দিকে। কিন্তু ঘোড়া আঁকতে বসে এ'কে ফেলে সে কুকুর, কুকুর আঁকতে সে আঁকে বেজী। মনের বাসনা এবং আঙুলের গতি তার এক-রেখায় চলে না কিছুতে। ফলে সে আঁকার পর নাম বসিয়ে দেয় ছবিতে। এবং বলা বাহুল্য ছবি দেখে আপনার যাই মনে হোক, তার নামকরণ পাঠ করে সে বিষয়ে কোনো রকম সংশয় প্রকাশ করা হয়ে ওঠে প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দর্শককে ধূলিশায়ী করে দেওয়া তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

আমার এই নতুন প্রতিবেশীরও বোধহয় সেই অবস্থা। অন্তত তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মুখে কখনো প্রতিবাদ শুনিনি। বরং শুনেছি যা, তা উৎসাহ। কিছুক্ষণ ধাতিন ধাতিন শব্দের পর বাদক যেই ঘোষণা করলেন 'কাহারবা', ছেলেও বলে উঠল 'কাহারবা' এমন ঘটনাই বেশি ঘটে। এবং ঐ ধাতিন ধাতিন বাজিয়েই পিতা যখন বলেন 'দাদরা', তখন পুত্রও হে'কে ওঠে 'দাদরা'।

বাদ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে রম্যরচনার কোনো রেওয়াজ আছে কিনা, আমি জানিনে। থাকলে ব্যাপারটা যে এই রকমই পরম রমণীয় হয়ে উঠত তাতে সন্দেহ নেই। লেখা-টেখা আমার নিজের বড় একটা আসে না। কিন্তু বিশেষ একটা বয়সে অন্যান্য বাঙালী যুবকের মতো আমারও মনে লেখক হওয়ার বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। তখন সেই আন্তরিক প্রেরণার খোঁচায় কত-যে দিন এবং রাত আমার রক্তাক্ত হয়ে গেছে সে-কথা ভাবতেও এখন আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমি তখনই আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমি জানতাম যে ছোটগল্পেই বাঙালী লেখকদের সব থেকে বেশি নাম। কিন্তু নিজে লিখতে বসে দেখলাম, গল্প লেখা সহজ কর্ম নয়। অন্তত আরম্ভ করা যতো সহজ, শেষ করা ততো নয়। যার বিষয়েই লিখতে বসি না কেন, সে যেন একাই একটি কথা-সরিৎ-সাগর হয়ে ওঠে। পাতার পর পাতা ভরিয়েও সে নিরুদ্দেশ-যাত্রার কূল পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু আমি বাঙালী, বাংলা আমার মাতৃভাষা এবং আমার হাতে কলম আছে, অতএব লিখতে আমাকে হবেই। তাই আমার অপটু গল্পগুলোর নাম দিতাম রম্যরচনা। এবং এইভাবে নিজের কাছে পাশ-নম্বর না পেলেও অন্যের বিবেচনায় উৎরে যাওয়ার একটা ফিকির খুঁজতাম।

আমাদের এই তবলা-বাদকেরও দেখছি সেই অবস্থা। একই ধরণের এক-ঘেয়ে বাজনাকে বিচিত্র নামের লেবেল এ'টে শ্রুতিগম্য করেন তিনি, সম্মুখে উপবিষ্ট স্ত্রী-পুত্রও তাতে সায় দিয়ে যায় অনায়াসে, কিন্তু তবু তাঁর বাদ্য-সাধনায় ছেদ পড়ে না কখনো।

পড়বে কী করে, নিজের কাছেই যে নিজে তিনি পাশ-নম্বর পাচ্ছেন না। 'উয়্যারার বেস্ট নোজ হয়ার দি শু পিঞ্জেজ'—জুতোয় যার পেরেক ওঠে সেই জানে তার আন্তরিক যন্ত্রণার কাহিনী।

আমাদের এই ভাড়াটে প্রতিবেশীর প্রতি অসীম সহানুভূতি নিয়ে তাই আমি রাত বারোটা পর্যন্ত রোজ দুর্গা-নাম জপ করি। দুর্গতিনাশিনী তাঁকে রস-সমুদ্রের পারে পৌঁছে দিন, এই এখন আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ শক্তি-পরীক্ষা ॥

"......ফুটহিলুসের দিকে শত্রু-সৈন্যের অগ্রগতি। চুশুলের ওপর শত্রুপক্ষের প্রবল গোলাবর্ষণ......

যদিও এর সংগে কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, তবু, কী জানি কেন, মনে পড়ে গেল, কয়েক বছর আগেকার একটি বিশেষ ঘটনার কথা। চীনা-রাষ্ট্রনায়ক কলকাতায় এসে যেবার "হিন্দী-চীনী ভাই-ভাই" করে গেলেন, তার পরের ঘটনা অবশ্যই, তবে ঠিক কতদিন পরে, এই মুহূর্তে তা' স্মরণ করতে পারছি না।

"তীব্বতেই ঘটনার শেষ হলো না মিস্টার ব্যানার্জি", —তীব্বত থেকে ফেরা তীব্বত-অভিজ্ঞ সাংবাদিক বন্ধুটি আমাকে সেদিন বলেছিলেন দিল্লীতে তাঁর বাড়ীতে বসে, —"অদূর ভবিষ্যতে ভারতেরও বিপদ উপস্থিত হবে।"

"বলছেন কী! পঞ্চশীলের অনুজ্ঞা ধূলিসাৎ হবে?"

"তা-ই ত মনে হয়", —বন্ধু বলেছিলেন,— "তা' না হলে, সেই চীনা ছেলেটিকে ওরা পাগল বলে আখ্যা দিয়ে তীব্বত থেকে অমনভাবে জোর করে সরিয়ে দিতো না।"

"চীনা ছেলেটি!"

বন্ধু বললেন,—"তীব্বতে এক সময় কিছু ছাত্র-স্থানীয় সৈন্যও আমদানী করা হয়েছিল। আমি তেমনি একটি চীনা সৈনিকের কথা বলছি, যার ওপর জনৈক লামাকে গুলী করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। লামাটিকে তীব্বতীরা 'গগ্যার' বলতো, যার অর্থ,—ভারতীয়। এই ভারতীয় লামা ছিলেন ভগবান তথাগতের একনিষ্ঠ সাধক। এ'র 'গোমুফা' বা 'মঠ' ছিল ন্যায়তঃ ভারত-সীমান্তে, কিন্তু, চীনা-কবলিত তীব্বত সে কথা মানে নি। লামাটিকে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে 'কার্যালয়ে',—দৈহিক পীড়ন থেকেও তিনি রেহাই পাননি, কিন্তু তবু তিনি তাঁর 'ধর্ম' ত্যাগ করেন নি, তবু ত্যাগ করেন নি ভগবান তথাগতের উপাসনা। এ'রকম একবার-দুবার নয়, অনেকবার আনা হয়েছে তাঁকে 'কার্যালয়'-এ, সেই সৈনিক ছাত্রটি তাঁকে প্রতিবারেই দেখেছে, ফলে লামার মুখখানা ভালোভাবেই চেনা হয়ে গিয়েছিল ছাত্রটির।

যেদিন 'লামা'টিকে "শেষ" করবার কথা, সেদিন চর এসে যথাসময়ে তাঁর খবর দিয়ে যাচ্ছে। রাত দশটা : তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাত একটা : তিনি উঠেছেন। রাত তিনটে : তিনি দেবতার ঘরে গিয়ে বসেছেন পুজো করতে। ঘরের দরজা আজ বন্ধ করতে ভুলে গেছেন, ভেজানো আছে।
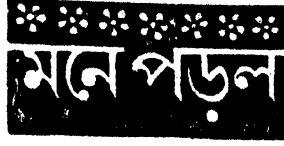
বলা বাহুল্য, বিশেষ নির্দেশে সেই রাত্রের বরফ-জমা হাড়কাঁপানো নিদারুণ শৈত্যের মধ্যেই রওনা হলো ছেলেটি। মন্দিরের দরজা প্রতিদিন লামা বন্ধ করে রাখেন পুজোর সময়, আর বেছে-বেছে ঠিক আজকের দিনেই কিনা ভুলে গেলেন? দরজাটা নিঃশব্দে খুলে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ছেলেটি চিন্তা করছিল কথাটা, আর অস্বস্তি বোধ করছিল।

অহিংস-সাধক বুদ্ধমূর্তির সামনে চোখ বুজে ধ্যানী তপস্বীর মতোই বসে আছেন লামা। সে যে ঘরে ঢুকেছে, তিনি তখনো তা' টের পান নি। ছেলেটি অতিকায় বুদ্ধমূর্তিটির পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো, বন্দুকটা ভগবান তথাগতের কাঁধের ওপর রেখে লামার দিকে নিশানা করলো। লামার মধ্যে কিন্তু বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। পাথরের বুদ্ধমূর্তি আর লামা যেন একই সুরে বাঁধা; লামা যেন ঐ বুদ্ধের মতোই নিষ্পন্দনিথর হয়ে গেছেন।

ছেলেটি প্রবল শীতে কাঁপছিল, লামা কিন্তু নির্বিকার। শীত একটু কমতেই ছেলেটির দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসছিল, অথচ, লামার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। কাজ শেষ করে ফিরে গেলেই হয়, কিন্তু ছেলেটি তা পারলো না, প্রদীপের স্বল্প আলোয় লামার প্রশান্ত মুখখানা এক অপূর্ব বিস্ময় হয়ে ধরা দিলো তার কাছে।

"দেখাই যাক না, চোখ ত এক সময় খুলবেই,"—ভেবে, বন্দুকটা অহিংস-সাধকের পৃষ্ঠে হেলান দিয়ে রেখে, কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেটি। লামাটি অদ্ভুত, দৈহিক পীড়নেও এর মুখে বিকারের চিহ্ন ফুটে ওঠে না, মুখ থেকে কাতরোক্তি বেরোয় না। আর, একটু পরে, গুলীটা যখন বুকের ভিতরটা ছিদ্র করে ফেলবে, তখনো লামার মুখখানা থাকবে অমনি নির্বিকার, অমনি প্রশান্ত?

* * *

কখন যে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে ধড়মড় করে জেগে উঠলো কী এক কোলাহল শুনে। তারই স্বজাতীয় জনা-চারেক সৈনিক এসে তাকে জাগিয়ে তুলেছে। বলছে,—"কী হে, কাজ করতে এসে ঘুমিয়ে পড়লে?"

লজ্জায়, সংকোচে, ছেলেটা যেন মরমে মরে গেল। ওরা বললে,—"লামাকে মারলে কী করে হে? গুলী খরচ না করে?"

—"লামা মারা গেছে!"

—"হ্যাঁ। ঐ দেখ না।"

লামা তেমনি নিষ্পন্দনিথর-ধ্যানী বুদ্ধের মতো বসে আছেন। ওরা গিয়ে ছুঁতেই হিমশীতল দেহটা গড়িয়ে পড়ে গেল। ছেলেটি আঁৎকে উঠলো ভয়ে। এক অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ভীতি তাকে যেন ঠান্ডা সাপের মতো এসে পাকে পাকে জড়াতে লাগল! লামার গ্রামবাসী যারা লামাকে জানে, তারা বললে—"লামা জানতে পেরেছিলেন তাঁকে নিয়ে কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে, লামা জানতে পেরেছিলেন —অর্থের বিনিময়ে তাঁরই এক গ্রামবাসী তাঁর ওপরে কী জঘন্য চরবৃত্তি করে যাচ্ছে,—তাই, লজ্জায়, ঘৃণায় লামা দেহ-ত্যাগ করলেন নিজের ইচ্ছামতো।

"নিজের ইচ্ছামতো দেহত্যাগ করতে পারে নাকি কেউ?" —ছাত্রটি সবিনয়ে প্রশ্ন করলো।

সহকর্মীদের একজন ছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সে বললে, —"ভারতীয় যোগীদের মনোবল যে কী অসাধারণ, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ওরা বলে, —আত্মশক্তি।"

ছেলেটি নাকি এরপর থেকে বলে বেড়াতো, "ওদের আমরা কিছু করতে পারবো না। ওদের জয় করতে যাওয়া —বাতুলতা!"

ছেলেটির কথা শুনে সহকর্মীদের বুক কেঁপে ওঠে। তারা ওকে তাই একদিন 'পাগল' সাব্যস্ত করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলো যেখান থেকে ও এসেছিল, সেইখানে।

সাংবাদিক-বন্ধুটি চুপ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সেদিন আর কোন বাক্য-বিনিময় হয়নি। আজ কিন্তু বার বার ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ছে।

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন কি-না?

গত সংখ্যা (শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) 'অমৃতের' আলোচনা বিভাগে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কিত একটি লেখায় শ্রীযুক্ত নেপাল মুজুমদার গত ৩রা মার্চের 'যুগান্তরে' প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ কি বিবেকানন্দ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন' অভিধাযুক্ত আমার প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন। লেখাটি পড়ে মনে হল, উক্ত বিষয়ক তথ্যাদি সম্বন্ধে লেখক রীতিমত ওয়াকিবহাল নন। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে স্বয়ং কবির রচনার যে নজির তিনি দিয়েছেন সেটি বৎসরাধিককাল পূর্বে 'অমৃত' পত্রিকাতেই প্রকাশিত, শ্রীনরেন্দ্রদেব মহাশয়ের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' (অমৃত ২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৮ : ৪৪ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধেই উৎকলিত হয়েছিল। দেব মহাশয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আদ্যন্ত বক্তব্য তাঁর প্রবন্ধের অঙ্গীভূত করেননি, কিন্তু যে অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা 'অত্যন্ত স্পষ্ট ও উচ্ছ্বসিত ভাষায়' অভিব্যক্ত হয়েছে তার সবটাই উদ্ধৃত করেছেন, হয়তো বা বাহুল্যবোধে বর্জন করেছেন। চরখা কাটা সম্বন্ধে মন্তব্যসম্বলিত গোড়াকার অংশটুকু। কবিগুরুর এই বিবেকানন্দ প্রশস্তি সম্পর্কিত যে 'মূল্যবান তথ্যটির কথা নেপালবাবু বলেছেন, সেটির উল্লেখ পাওয়া যাবে ১৬ চৈত্র, ১৩৬৮ সালের অমৃত পত্রিকার মতামত বিভাগে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আমার প্রবন্ধটিতে। "শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ দুটি চিঠির কথা, রবীন্দ্র-জীবনীতে উল্লেখ করতে বিস্মৃত" হওয়াতে লেখক বিস্মিত হয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রজীবনী পাঠ করা সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য ব্যাপার। সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদ্যন্ত পাঠ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হতে পারে। কাজেই লেখক যে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেই সাপ্তাহিক অমৃতেরই ১৩৬৮ সালের ১৬ই চৈত্রের সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কিত আমার প্রবন্ধটি (অমৃত পৃঃ ৬৭১) পড়ে দেখতেন তা হলে রবীন্দ্র-জীবনীকার সম্বন্ধে এই বিভ্রান্তিকর এবং অসতর্ক উক্তি করতেন না। নেপালবাবুর এই মূল্যবান তথ্যটির উল্লেখ যে পাওয়া যাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্রজীবনীর চতুর্থ খণ্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ আছে আমার প্রবন্ধে। বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনুরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রবীন্দ্রনাথ যে অন্যত্রও করেছেন তারও প্রমাণ মিলবে অমৃতে প্রকাশিত আমার উপরোক্ত প্রবন্ধে। স্বামী অশোকানন্দের কাছে বিবেকানন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন সেটি ঐ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পত্রটি ১৩৪৮, পৌষ সংখ্যা 'কিশোর বাংলা' থেকে আমি খুঁজে বের করি। পরে দেখতে পাই যে, সেটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে উদ্বোধন পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল।

সবশেষে একথা বলা প্রয়োজন মনে করছি যে, যুগান্তরে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে আমি 'স্বয়ং কবির কোনো রচনার নজীর' দিই নি সত্য, তবে খুঁজে পেতে যে সকল রচনাংশ আমি আহরণ করেছিলাম সেগুলো সন্নিবিষ্ট হয়েছিল অমৃতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে। রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি সম্প্রতি হয়েছে এটাও প্রকৃত তথ্য নয়। আমি যতদূর জানি বাংলা সাময়িকপত্রে এ আলোচনার প্রথম সূচনা হয় বৎসরাধিককাল পূর্বে অমৃত পত্রিকার মাধ্যমে আর এ আলোচনার পথিকৃৎ হচ্ছেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়। ২৩শে চৈত্র, ১৩৬৮ অমৃতেও মতামত বিভাগেও এ সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়। যাঁরা এ বিষয়ে আলোকপাত করবার প্রয়াস করেছেন তাঁদের মধ্যে সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ্য।

—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, কলিকাতা-৯।

মুখে। আইসক্রীম খেতে খেতে শান্তিপথের সবুজ ঘাসে মোড়া পেভমেণ্ট দিয়ে তিনজনে পাশাপাশি চলছিলাম। অস্তগামী সূর্যের শেষরশ্মি উঁকি দিচ্ছিল চাণক্যপুরীর এম্বাসী বিল্ডিংগুলোর চূড়ায় চূড়ায়। প্রশান্ত পরিবেশে দু'টি হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শে মনে মনে উত্তেজনাবোধ করছিলাম। পরের দিন সকালেই মেজর প্লেনে রওনা হবে শুনে মনটা হঠাৎ নাড়া খেলো। বিদায়ের পূর্ব-সন্ধ্যায় ওদের দু'জনের মাঝে নিজেকে রাখা সমীচীন বোধ করলাম না।

—'কিছু যদি মনে না করেন, একটা গান শুনতাম। শোনাবেন 'শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলেম।'

এক কথায় রাজী হলেন দিদি। গাইলেন চমৎকার। সেদিনের সন্ধ্যায়

'টি হাউস' থেকে বেরিয়ে সবে গাড়ীতে উঠতে গেছি, এমন সময় হঠাৎ পিঠে চাপড় খেয়ে পিছন ফিরে দেখি মেজর হাসছে। পাশে দেখি একজন সুদর্শনা; বুঝতে দেরী হলো না, তিনি আমার এক পাঞ্জাবিয়া দিদি।

'তারপর হাউ আর ইউ? নিশ্চয়ই খুব সারপ্রাইজড্!'

'তাতো বটেই। ভাবতেই পারিনি। মেজর সীমান্ত থেকে নেমে দিল্লী আসতে পারে।'

'অন টু পার্লামেণ্ট, না বাড়ী ফিরছ?'

'মেজর, আর্মির মত জার্নালিস্টরা প্ল্যান করে মুভমেণ্ট করে না। প্ল্যান নেই, তবে মুভমেণ্ট চলবে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।'

'আরে, তোমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়েই দিইনি। ইনি হচ্ছেন.........

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লাম: 'জানি।' বলে দিদির নাম-ধাম, বিদ্যে-বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত গুণপনার তালিকা আউড়ে গেলাম।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দিদি বল্লেন, কি আশ্চর্য! আপনি এত কথা জানলেন কিভাবে......আপনি কি......।

'না, ঠিক থট-রীডিং জানি নে।'

—'তাহলে কি তান্ত্রিক, না জ্যোতিষী?'

—'কোনটাই নই। তবে অনুমতি করলে আপনার বিষয়ে আরো কিছু বলতে পারি।'

এতক্ষণ মেজর যে মুখ টিপে টিপে হাসছিল, সেদিকে দিদির খেয়ালই হয়নি। চট করে সিরিয়াস হয়ে মেজর বললো: এ'দের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। জার্নালিস্টরা পারে না বা জানে না, এমন কিছু হতে পারে না। তর্ক করো না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যাবে।'

দু'জনের দৃষ্টি বিনিময় হলো। মেজরের হাসি দেখে দিদি বুঝল, সে-ই সব ফাঁস করে দিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে ইঙ্গিতে মেজরকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন তিনি।

তর্ক না করেই মেজর ও দিদি গাড়ীতে উঠল। ওদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠলাম আমিও, এবং নেমে পড়লাম সবাই চাণক্যপুরীতে।'

—'আপনি তো 'চকোলেট বার' খেতে খুব ভালবাসেন। কিনতে পারি কি?'

এতক্ষণে হাসি দেখলাম দিদির

আমার আর কিছু চাইবার ছিল না; বিদায় নিলাম পরের দিন স্টেশনে দেখা করার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে।

......স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের মাটি থেকে জোর করে দূর করে দেওয়া হলো পর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদের। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝে মান্দোভি নদীর পাড়ে পাঞ্জিমে উড়ল তেরাঙ্গা। ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা সবাই বসে আছি কাউন্সিল হলে মিলিটারী গভর্ণর মেজর জেনারেল ক্যান্ডেথের প্রেস কনফারেন্সের জন্য। আলবুকার্ক, ভাস্কো দা গামা প্রভৃতির বিরাট বিরাট অয়েল পেণ্টিং দেখতে দেখতে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চেয়ে দেখি কয়েকজন মিলিটারী অফিসার বেরিয়ে আসছেন। কথা বলছেন তাঁরা নিজেদের মধ্যে। একজনকে মনে হল বিশেষ রকম স্মার্ট আর কর্তব্য-পরায়ণ। তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল ব্যক্তিত্বের আভাষ।

তাঁর কথা মনে ছিল, কিন্তু তাঁর চেহারাটা ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েকমাস আগে একদিন সন্ধ্যায় অফিসার্স ক্লাবে বসে আছি। সোমরস পানের আসরে নরক গুলজার হচ্ছে; এমন সময় ক'জন অফিসার ঘরে ঢুকতেই ভীষণ হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার্সের একজন অফিসার আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলাম, তাঁদের মধ্যে আমার সেই পূর্ব-পরিচিত মেজরটিও আছেন।

মেজর আমার সঙ্গে খুব জোর একটা হ্যাণ্ডসেক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বল্লেন, 'ইফ্ মাই মেমারি ইজ কারেক্ট, দেন উই হ্যাভ্ মেট বিফোর।'

—দিল্লীতে?

—নো জার্ণালিস্ট, নট ইন ডেল্‌হি বাট আই সাপোজ ইন গোয়া।'

মুহূর্তের মধ্যে দু'জনেই ফিরে পেলাম অতীত স্মৃতি। দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম।

ক্লাব থেকে আমা'কে প্রায় 'কিডন্যাপ' করে নিয়ে গেল মেজর।

তারই সঙ্গে দেখা হল আজ আবার 'টি হাউসে'র সামনে। মাত্র তিনদিনের ছুটিতে দিল্লী এসেছিল মেজর। ফিরে যেতে হবে ফ্রন্টে। আমারও মনের একটা অংশ যেন তীর্থযাত্রা করল তারই সঙ্গে। ভারতের এই বীর সেনানীর মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষায় চোখ তুলে তাকালাম আমি আকাশে। দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে সেখানে সন্ধ্যাতারা। যেন ভারত-ভাগ্যবিধাতার বরাভয়।

মতামত

মহাশয়,

১১ই জানুয়ারী '৬৩র 'অমৃত'-এর 'সাহিত্য সমাচার' শীর্ষক 'কবিতা ও কবিতা-দিবস' সংক্রান্ত আলোচনায় উত্থাপিত 'আমাদের দেশের কবিরা এই ধরনের কবিতা দিবস উদ্‌যাপনের কথা ভেবে দেখতে পারেন'—প্রস্তাবটি প্রণি-ধানযোগ্য কারণ উক্তিটি একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

কাব্যরসাস্বাদনক্ষম জনসমষ্টির সংখ্যা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই কম—এ সত্য তর্কাতীত। কিন্তু এর কারণ কি? কবিতার প্রতি কাব্যের প্রতি বীত-স্পৃহার কোন রক্তগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। জগতের রূঢ় 'বাস্তবতা'র নিরঙ্কুশ উষরতার মধ্যে কাব্যের স্নিগ্ধ জ্যোতির যে একটা হৃদয়গত প্রয়োজন আছে—এ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। তাছাড়া, অন্যদিক থেকেও সর্বদেশের সাহিত্যই যে আদিতে কাব্যের জটার মধ্যে আবদ্ধ ছিল ইতিহাস তা প্রমাণ করে। সুতরাং নানা কারণেই সাহিত্যে 'কবিতা' সর্বাগ্রগণ্য।

তবে, এ-কাব্য-বিতৃষ্ণা বা কবিতা-পাঠে অনাসক্তির কারণ কি? আমার মনে হয় কবিতার ভেতরে প্রবেশ করা কিছুটা প্রচেষ্টানির্ভর তথা অনুশীলনসাপেক্ষ। বুদ্ধির বিদ্যুদ্দীপ্তি কবিতার মর্মলোক যথেষ্ট আলোকিত করতে পারে না বলেই বুদ্ধিজীবী মহলে 'কবিতা'র সমাদর কম এবং হৃদয়গত যে পরি-মার্জনা সূক্ষ্ম রসাস্বাদনতৎপর কাব্য-বোধ জাগাতে পারে—অনেক সাহিত্যা-নুরাগীর পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয় না বলে তারাও কবিতা-পাঠে অনু-রক্ত। ফলে, স্বাভাবিক কারণেই, কবিতার পাঠক-সংখ্যা অত্যল্প। কিন্তু এই জাতীয় সংখ্যালঘুতা চিরকালই ছিল। সাম্প্রতিকতম কবিতা-প্রচেষ্টা কবিতা-পাঠে অননুরক্তির আর একটি প্রত্যক্ষ কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এখনকার কবিতার জগৎ এমন রূপান্তরিত: বক্তব্য-ভঙ্গি (Technique), বক্তব্য বিষয়, পরিবেশিত জীবনরসের স্বরূপ এমন স্বতন্ত্র যে, কোন অভ্যস্ত কাব্য-সংস্কারগ্রস্ত (Accustomed poetic belief) ব্যক্তির কাব্যবোধ 'কবিতা'র মর্মোদ্ঘাটনে প্রায় অসক্ত। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলাও বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে, দৈনন্দিন জীবনের নিরতিশয় রূঢ়তা, অর্থনৈতিক অনটন ও তজ্জনিত তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রাণের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত রসানুভূতিকে অনেকাংশে খর্ব করে ফেলেছে যার ফলে—'কবিতা' আর তেমন আনন্দময় আবেদন (Appeal) সৃষ্টি করে না।

সেই কারণেই আজকের দিনে কাব্য-বোধকে জাগ্রত করতে, কবিতা-পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করতে এবং কাব্য-রসোপ-লব্ধিতে সাহিত্যানুরাগী জনসমষ্টিকে তৎপর করে তুলতে এই জাতীয় ঐকা-ন্তিক প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশে সম্প্রতি কবির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁরা যদি 'কবিতা-দিবসের মাধ্যমে সাহিত্যানুরাগীদের সঙ্গে একটি সরাসরি আত্মিক যোগাযোগ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হন, তাঁদের কাব্য-বৈশিষ্ট ও বক্তব্য-নিচয় স্বল্পায়াসবোধ্য করে তুলতে তৎপর হন—তাহ'লে কাব্য-পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টি-প্রচেষ্টাও যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হবে সন্দেহ নেই। কারণ, আমি দেখেছি—কাব্য-রস-চেতনা নানা কারণে ক্ষীণ এবং প্রায় দুর্লক্ষ্যপ্রায় হয়ে এলেও—আজও তা' স্ফূর্তির অপেক্ষায় সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের অন্তরালে ফল্গুধারার মত ব'য়ে চলেছে!

শঙ্কর চক্রবর্তী
কলিকাতা।

দড়ির ফাঁসের মতো পাহাড়টাকে প্রদক্ষিণ ক'রে রাস্তাটা নেমে গিয়েছে হাজার ফুট তলা পর্যন্ত। রাস্তার দু'-দিকে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খান কয়েক টিনের ঘর। সব মিলিয়ে জনসংখ্যা একষট্টি জনের বেশি নয়। ষাটজন তিব্বতী, ভুটিয়া আর নেপালী। একষট্টিতমের নাম দেবিদয়াল সুখানী। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। সবাই তাকে শেঠজী বলে ডাকে। এই হাজার ফুটের ঢালুটার নামই হচ্ছে কংকারং বস্তী।

চারদিকে পাহাড়। মাঝখানটায় কয়েক বিঘে সমতলভূমি। কালো নুনিয়া চাল জন্মায় কংকারং-এর মাটিতে। ধান কাটা শেষ হ'লে শুরু হয় ভুট্টার চাষ। হাজার দুই ফুট আরো নিচে নামলে দেখা যায় বড় এলাচের গাছ।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঢালুর মাথায় একটা টিনের ঘর তুলছিল দেবিদয়াল। মাঝখানে পার্টিশন তোলা। একদিকে গদি, অন্যদিকে শোবার ঘর। গদির অংশটাই বড়। যারা মাল বেচতে আসে তাদের বসতে দিতে হয় গদির ওপর। তা ছাড়া সিন্দুকের জন্যও জায়গা করতে হয়েছে এখানে। বেশ বড় সিন্দুক। ঘরের অর্ধেক জায়গা জুড়ে মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা। ত্রিশ বছর ধ'রে সিন্দুকের মাথায় সিঁদুর লাগাচ্ছে দেবিদয়াল। লন্ঠনের আলো নিবনিব হ'য়ে এলে হঠাৎ মনে হয়, মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দেয়াল ঘেঁষে।

ঠিক তার ওপর দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের বাক্স ঝুলছে। বাচ্চা ছেলেদের খেলনার মতো হাল্কা ওজনের একটি গণেশ সেখানে ব'সে ভারী ওজনের লোহার সিন্দুকটার ওপর দৃষ্টি রাখে সর্বক্ষণ। নিশ্চিন্ত বোধ করে দেবিদয়াল। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

পা গুটিয়ে জড়সড় হ'য়ে শুয়ে থাকতে হয়। উনোনের জন্য একটু

জায়গা ছেড়ে দিয়ে পুরো ঘর জুড়ে খাটিয়া পেতেছে সে। দৈর্ঘ্য মাত্র সাড়ে তিন ফুট। স্থানের অভাব বোধ করেনি কোনোদিনও। একা মানুষ। ঠাণ্ডার দেশ। কঙ্কাবং-এর উচ্চতা প্রায় ছ' হাজার ফুট। ঋতু বলতে দুটো—শীত আর বর্ষা। শীতকালে বরফ পড়ে, বর্ষায় জল। আরাম ব'লে কিছু নেই এখানে। পা ছড়িয়ে শুতে গেলে কষ্ট হয় বেশি। দেবিদয়াল তাই পা গুটিয়ে শুয়ে রইল সাড়ে তিন ফুট খাটিয়ার ওপর আর গদিতে ব'সে ব্যবসা করল সারাটা জীবন।

এক হাজার ফুট ঢালুটার ঠিক মাথার ওপর ঘর। গদিতে ব'সে দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ভুটান আর সিকিমের সীমান্তটা দেখা যায়। বয়স যখন কম ছিল তখন ঐদিকে চেয়ে থাকতে কষ্ট হ'তো না। সীমান্তের ওধার থেকে মেয়েরা আলুর বীজ নিয়ে আসে বেচতে। এই অঞ্চলের বড় ব্যবসা। সকালবেলা গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে তারা এসে পৌঁছে যায় দেবিদয়ালের গদিতে। মাল বেচে আবার ওরা গ্রামে ফিরে যায় সন্ধ্যের আগে। প্রথম কয়েকটা বছর নগদ দাম দিয়ে মাল কিনতে হয়নি। ছিট কাপড়, চুলের ফিতে, কাঁচের চুড়ি এইসব টুকিটাকি জিনিসের বিনিময়ে আলুর বীজ কিনত মেয়েদের কাছ থেকে। তারপর অবিশ্যি নিয়মটা পাল্টে গেল। নগদ টাকা না পেলে কেউ আর মাল বেচতে চায় না। দেবিদয়ালের তাতে অসুবিধে কিছু হয়নি। নতুন নিয়ম চালু হওয়ার আগে হাতে তার পুঁজি এসে গেল। সিন্দুকটা ভ'রে উঠল টাকায়।

খরচ করবার মতো ঘরে লোক নেই দেবিদয়ালের। সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তার। দাম্পত্য জীবনের রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার আগে বউটি মারা গিয়েছিল। অতএব প্রেম-প্রণয়ের কারবারে একটি পয়সা কিংবা একবিন্দু চোখের জল পর্যন্ত খরচ করতে হ'স না। শুধু গোটা কয়েক টাকা দিয়ে টিকিট কাটল একটা। প্রেম-প্রণয়ের সম্পর্কটা ঘাসের চাপড়ার মতো দেশের মাটি থেকে গেল আলগা হ'য়ে। জোড়া লাগাবার জন্য আর কখনো সেখানে ফিরে যায়নি দেবিদয়াল।

ছ' হাজার ফুট উঁচুতে বসে ব্যবসা করছে। শুধু ব্যবসা। রাত্রিবেলা জড়সড় হ'য়ে শুয়ে থাকে আর দিনেরবেলা চেয়ে থাকে সীমান্তের দিকে। আলুর বীজের ঝুড়িগুলো ঘাড়ের ওপর বেঁধে নিয়ে রঙ-বেরঙের প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে মেয়েরা চলে আসে দেবিদয়ালের কাছে। শ্রান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়ে গদির ওপর। পেমা ওয়াংদী ডান হাতটা সামনের দিকে এগিয়ে ধ'রে বলে, 'দেও না শেঠ, গিলাস ভরে রো রক্সি দেও—'

তৃষ্ণায় মেয়েদের ছাতি ফেটে যায়। গেলাসগুলো ওদের হাতে তুলে দেয় দেবিদয়াল। প্রকাণ্ড বড় কাঠের জালাটায় চোলাই মদ মজুত করা আছে। ছ' হাজার ফুট উঁচুতে আইনের শাসন কিছু নেই। কঙ্কাবং বস্তীর ঘরে ঘরে মদ চোলাই হয়। বস্তীর মোড়ল লিম্বু লামা এসে জালাটা ভর্তি ক'রে দিয়ে যায় প্রতিদিন। মেয়েদের রক্সি পরিবেশন করে দেবিদয়াল নিজের হাতে।

পেমা ওয়াংদীর বয়স কম। তাই তেষ্টা ওর সহজে মিটতে চায় না। দু'-তিন গেলাস খাওয়ার পর সোজা হ'য়ে উঠে বসে পেমা। শেঠের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে, 'আইলে ভাও গরো না দাজু—'

অতো তাড়াতাড়ি ভাও ঠিক করে না দেবিদয়াল। দামদস্তুরের মুহূর্তটাকে ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুলতে হয়। আরো দু' তিন গেলাস পরিবেশন করবার পর পেমার কথা যখন জড়িয়ে আসে, পা দুটো টলমল করতে থাকে তখন টান মেরে সিন্দুকের দরজাটা খুলে ফেলে সে। বাণ্ডিলে বাঁধা নোটগুলোর দিকে চেয়ে নেশা চ'ড়ে যায় পেমার। স্খলিত লতার মতো গদির ওপর লুটিয়ে প'ড়ে সে বলে, 'দেও না দাজু, টাকা দেও...... তোর সঙ্গে ভাও ক'রে লাভ নেই...... তুই তো মরদ ন'স......তুই শুধু শেঠ।'

বছর ষোল বয়স হবে মেয়েটার। একমণ বোঝা ঘাড়ের ওপর ফেলে সীমান্ত পার হ'য়ে চ'লে এসেছে কঙ্কাবং-এর বস্তীতে। পাহাড় ডিঙিয়েছে. পার হয়েছে নদীনালা। দলের হ'য়ে দামদস্তুর করে পেমা ওয়াংদী। আগে আসত ওর মা, নীমা ওয়াংদী। ত্রিশ বছর ধ'রে নীমাও দেবিদয়ালকে প্রশ্ন করেছে ' ,তুই কি কোনোদিনও মরদ হবি নে, শেঠ?' প্রশ্নের জবাব দেয়নি সে, শুধু হেসেছে। সিন্দুকটার সামনে ব'সে বুকের হাহাকার লুকিয়ে রেখেছে হাসির আড়ালে। নীমা অনুরোধ করেছে, 'একটু রক্সি, একটু মাংস তুই খা শেঠ। নইলে যে এই ঠাণ্ডার দেশে বরফ হ'য়ে যাবি!' জিজ্ঞাসা করেছে দেবিদয়াল, 'আমার জাত মারতে চাস নাকি?' 'হ্যাঁরে শেঠ, তোর জাত মারতে চাই। আগে তুই মরদ হবি, তারপর তোর জাতের কথা শুনব।' পেমার মুখে এসব কথা আগে কখনো শোনেনি। বয়স হ'য়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ত্রিশটা বছর মদ-মাংস খায়নি। শুধু বেঁচে থেকে ব্যবসা করেছে। সাড়ে তিন ফুট দৈর্ঘ্যের খাটিয়াটাকে কোনোদিনও ছোট মনে হয়নি।

টাকার বাণ্ডিল নিয়ে উঠে পড়ল পেমা। হাজার ফুটের ঢালুটার ওপর আজ মেঘ কিংবা কুয়াশা জমেনি। ওদের সঙ্গে সঙ্গে দেবিদয়ালও বাইরে বেরিয়ে এল। চুম্বী উপত্যকার দিকে হেলে পড়েছে দুপুরের সূর্য। কালো নুনিয়া ধানের পাকা শীষের ওপর সোনালী রশ্মি লুটোপুটি খাচ্ছে। ভূ-দৃশ্যটা আজ ভাল লাগছে দেবিদয়ালের চোখে। শীতলপাটির মতো সীমান্তটাও সমতল বলে মনে হচ্ছে। ঐ পথ দিয়েই নীমা আসত তার সওদা বেচতে। এখন আসছে পেমা। পরে অন্য কেউ হয়তো আসবে, দেবিদয়াল তখন বেঁচে থাকবে না। তা হোক, বেচা-কেনার পথটা বন্ধ হবে না কোনোদিন। নীমার পরে এল পেমা। পেমার পরে আসবে ডোমা ওয়াংদী। কিন্তু দেবিদয়াল সুখানীর পরে গদিতে বসবে কে? প্রশ্নটা পুরনো। দেখতে দেখতে ত্রিশটা বছর কেটে গেল। ত্রিশটা শীত আর বর্ষা পার হ'য়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। প্রশ্নের জবাবটা কখনো খোঁজবার চেষ্টা করেনি সে।

কয়েক পা নিচে নেমে গিয়ে পেমা বলল, 'সিন্দুক ভর্তি টাকা তোর। অতো টাকা দিয়ে করবি কি, শেঠ?'

হলদে রঙের পাগড়িটা মাথার ওপর চেপে ধ'রে দেবিদয়াল বলল, 'কারবার করব।'

'কার সঙ্গে কারবার করবি?'

'তোদের সঙ্গে।'

'আমরা আর আসব না।'

'কেন?'

'সীমান্তের পথ বন্ধ ক'রে দেবে ওরা।'

'ওরা?' প্যাকাটির মতো সরু দেহটাতে দোলা দিয়ে একটু ঝুঁকে

দাঁড়িয়ে দেবিদয়াল উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল,

'ওরা কারা?'

'দুশমন।' শতাব্দীর শান্ত জলে পেমা যেন ঢিল ছুঁড়ল একটা—টুপ্ ক'রে আওয়াজ হ'ল। কঙ্কাবং-এর পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। হতভম্বের মতো চুপ ক'রে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল দেবিদয়াল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কারা?'

চীনা দুশমন।' জবাব দিল দলের একটি মেয়ে।

'না রে শেঠ, তোর আসল দুশমন হ'ল ঘরের ঐ সিন্দুকটা। তোর যৌবনটাকে বন্দী ক'রে রেখেছে।' হাসতে হাসতে টলতে টলতে ঢালের পথ ধ'রে নেমে গেল পেমা ওয়াংদী।

বছর বার বয়সের একটি নেপালী

ছেলে কাজ করে দেবিদয়ালের কাছে। নাম সামশের গহতরাজ। মাসিক পাঁচ টাকা মাইনে। কঙ্কাবং-এর বস্তীতে ঠাকুমার কাছে থাকে। মা-বাপ নেই। পাঁচ বছর বয়সের পর লম্বায় আর বড় হয়নি। মেদমজ্জার পরিমাণও বাড়েনি। দেহের হাড় ক'খানা শুধু শক্ত হয়েছে। গায়ের রঙ এতো বেশি হলদে যে, দেবিদয়াল প্রায়ই ওকে ঠাট্টা ক'রে বলে, 'তোর দেহে বিলকুল সব চীনা খুন। সেই জন্য খুন তোর লাল নয়।'

উনোনের সামনে ব'সে রুটি সে'কছিল সামশের গহতরাজ। শেঠজীর জন্য রাত্রের খাবার তৈরি করছে। রক্তটা যে ওর লাল নয় তা সে জানে। এক সঙ্গে গোটা দশ রুটি বেলে উঠতে পারে না। হাত দুটো অবশ হ'য়ে আসে। শেঠজীর খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে থালাবাসন সব মেজে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে রেখে যেতে হয়। তারপর রাত্রি-বেলা যখন ঢালুর পথ ধ'রে বস্তীর দিকে নেমে যায় তখন দু'শ ফুট পর পর পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করে সামশের। ওর মতো বয়সের ছেলেরা এক দৌড়ে পার হ'য়ে যায় হাজার ফুটের ঢালু।

রুটি সে'কছে সামশের গহতরাজ। যতক্ষণ আগুন ততক্ষণ ফাগুন। এই অঞ্চলের চলতি প্রবাদ। আরামের স্পর্শ লাগে হাড়ে। গরম তাওয়াটাকে হাত দিয়ে চেপে ধ'রে নামিয়ে রাখে মেঝের ওপর। রুটি সে'কার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চায় না। প্রোটিনের অভাবটা তাপ দিয়ে পূরণ করতে চায়। এক হাত দূরে ব'সে রয়েছে দেবিদয়াল। অক্টোবর মাস শেষ হ'য়ে গেল। শীতের শুরু। সোনার দামের মতো এই অঞ্চলে কাঠের দামও হুহু ক'রে বাড়ছে। রুটি সে'কতে গিয়ে বার বার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে রুটি। দেবিদয়ালের চোখ দুটিকে ফাঁকি দিতে পারে না সামশের। দেবিদয়াল বলে, 'ঝুঠমুট কাঠ পোড়াচ্ছিস কেন, কাঞ্ছা? একটা রুটি সে'কতে আধ মিনিট লাগে। তোর লাগছে এক মিনিট।'

কথাটা মেনে নেয় সামশের। শুকনো ডালের মতো সরু সরু হাত দুখানা সহসা কর্মতৎপর হ'য়ে ওঠে. হাত থেকে ফসকে গিয়ে একটা রুটিও আর মেঝের ওপর প'ড়ে যায় না। আধ মিনিটের লোকসানটা বন্ধ করে দেবিদয়াল।

যতক্ষণ আগুন ততক্ষণ ফাগুন। রুটি সে'কা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। লোটা থেকে জল ঢেলে উনোনটাকে এবার নিবিয়ে দেবে শেঠজী। আধ-পোড়া কাঠ দু' একটা ঝুঠ-মুট নষ্ট করতে দেবে না। এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রয়েছে উনোনের দিকে। আগুনের আরামটুকু ধ'রে রাখবার জন্য সংগ্রাম করতে লাগল সামশের। বলল সে, 'শুনেছ শেঠজী—'

'কি?'

'দুশমন আসছে—'

'ঝুঠ্ বাত।' ধমকে উঠল দেবিদয়াল।

চীনা দুশমনের বর্ণনা দিতে লাগল সামশের। দু' একটা কথা যা শুনেছে সেগুলোকেই বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করতে লাগল। সেই ফাঁকে আধ-পোড়া কাঠ দুখানাকে ঠেলা মেরে ঢুকিয়ে দিল উনোনের মধ্যে। আরাম উপভোগের সময়টাকে বিলম্বিত করতে করতে বলল সে, 'আমাদের বস্তীটা ওরা দখল ক'রে নেবে।'

'ঝুঠ্ বাত—'হে'চকা টান মেরে গলায় স্বর দৃঢ়তর করল দেবিদয়াল।

'ঝুঠ্ বাত নয়, শেঠজী। থিম্বু লামা দেখেছে—'

'ঝুঠ নয়, সত্যি বাত। থিম্বু লামা দেখেছে—'

'কি দেখেছে?'

'দুশমন।'

'কোথায় দেখল? কেমন দেখতে?' ঝু'কে বসল দেবিদয়াল।

'কেয়া দেখা?'

'দুশমন আসছে।'

'তোরা লড়বি না?' দেবিদয়াল এগিয়ে বসল সামশেরের গা ঘে'ষে, 'লড়বি তো তোরা?'

'আলবৎ—' উঠে গিয়ে ঘরের কোণায়

থেকে নতুন একখানা কাঠ এনে উনোনের মধ্যে গ'্বজে দিয়ে সামশের বলল, 'থিম্বু এখানে নেই। শহরে গিয়েছে।'

'কেন?' খবর সংগ্রহ করছে দেবিদয়াল।

'বন্দ্বক ছোঁড়া শিখতে।'

'কবে ফিরবে?'

'আজ রাত্রেই ফিরবে।'

ফস ক'রে সামশেরের হাতটা চেপে ধরে দেবিদয়াল ধমকে উঠল, 'করছিস কি? ঝ্বঠম্বঠ কাঠ পোড়াচ্ছিস কেন?'

'ঝ্বঠ-ম্বট নয় শেঠজী। হাত সে'কছি। থিম্বু লামা আমাদের জন্য বন্দ্বক নিয়ে আসবে। হাতের চেটো গরম ক'রে রাখছি'। গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব নিচু ক'রে ফিসফিস ক'রে সামশেরই বলল, 'ওদের আসতে আর মাত্র দ্ব'দিন বাকী।'

'ঝ্বঠ বাত!' ভয়ের আভাস পাওয়া গেল দেবিদয়ালের গলায়। নতুন কাঠখানা সবেমাত্র ধ'রে উঠেছিল। সেটাকে নিজেই ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল সে, 'সতি কথা বলছিস?'

'সত্যি কথা শেঠজী! চুম্বী পাহাড়ের কাছে ঘ্বরে বেড়াচ্ছে দ্বশমন। সবাই দেখেছে—'

'তা হলে আজ এখানে থেকে যা, কাঞ্ছা। 'শোন্—' মিনতি করতে লাগল দেবিদয়াল, 'শোন্, এখন থেকে রাতেও এখানে থাকবি তুই। এক টাকা তলব বাড়িয়ে দেব। থাকবি তো?'

'বজ্বকে জিজ্ঞেস করব।'

'আজ আর বস্তীতে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে থাক। রোটি ডাল সব খেয়ে নে। আমার তবিয়ৎ খ্বব খারাপ।'

'না, শেঠজী। বস্তীতে আমায় যেতেই হবে। বজ্ব আজ মাংস রান্না করছে। চর্বিওয়ালা শ্বয়োরের মাংস'—

দ্ব' হাত দিয়ে কান দ্বটো বন্ধ ক'রে দেবিদয়াল ব'লে উঠল, 'তোরা ও-সব খাস নাকি? তোরা হিন্দ্ব না?'

জবাব দিল না সামশের। মাথা নিচু ক'রে মহা আনন্দে উনোনের সামনে বসে আগ্বন পোয়াতে লাগল। কঙ্কাবং বস্তীর লোকেরা যে কি খায় দেবিদয়াল তা গত ত্রিশ বছরের মধ্যেও জানতে পারে নি।

উনোনের আগ্বনে জোর ধরেছে খ্বব। সারস পাখির মতো ম্বখটাকে আগ্বনের দিকে এগিয়ে ধ'রে সামশের বলল, 'দ্বপ্বরবেলা বস্তীতে আজ মিটিং ব'সেছিল—'

'মিটিং?' হঠাৎ যেন ঘ্বম ভাঙল দেবিদয়ালের।

'হ্যাঁ, বড় মিটিঙ। সবাই বললে যে, দ্বশমনকে র্বখতে হবে।' হাই তুলল সামশের।

'হ্যাঁ, ঠিক বাত বলেছে। র্বখতে হবে। ভারতমাতা কী জয়—' ম্বদ্ব স্বরে ধ্বনি তুলল দেবিদয়াল, 'প্রাণ দিতে হবে।'

'থিম্বু লামা আজই বন্দ্বক নিয়ে আসবে। বজ্বর তো তিন কুড়ি বরস। বলেছে, সেও লড়বে।' জ্বলন্ত কাঠখানাকে নেড়ে-চেড়ে দিয়ে সামশের জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি লড়বে না, শেঠজী?'

'আলবৎ, আলবৎ লড়ব। একটা বন্দ্বক হামাকেও দিস।'

ঘরের কোণা থেকে আরও একটা জ্বালানি কাঠ নিয়ে এসে সামশের বলল, 'ওরা তোমায় বন্দ্বক দেবে না।'

'তবে হামি লড়ব কি ক'রে?'

'তোমার কাছে টাকা চাইতে আসবে।'

'টাকা! হামার টাকা দিয়ে লড়াই করবি তোরা?'

'হ্যাঁ শেঠজী। প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে হবে। থিম্বু লামার বউ-এর কাছে সবাই টাকা জমা দিচ্ছে। বলেছে তোমার পেটিতে নাকি লাখ লাখ টাকা।'

'এ মিটিঙ তাদের বে-আইনী। তাদের হুকুম আমি মানব না। ও কি করছিস? ঝুঠ-মুট কাঠ পোড়াচ্ছিস কেন? রেখে আয়—' সামশেরের হাত থেকে কাঠখানা ছিনিয়ে নিল দেবিদয়াল। গম্ভীরভবে মিনিট দুই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সামশের। তারপর বলল, 'কাল সকালে ওরা শোভাযাত্রা বার করবে। প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য টাকা তুলবে। তোমার কাছে আগে আসবে—সবাই দিচ্ছে।'

'তুই কতো টাকা দিলি?'

'আমার টাকা নেই। আমি খুন দেব।'

'খুন?' হেসে উঠল দেবিদয়াল, 'হামি দেব নগদ আর তুই দিবি খুন? তোরা কি ভাবছিস, আমি বুর্বক? এই কাঙ্গা, চললি কোথায়?'

'ঘরে। শুয়োরের মাংস ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। বজু রাগ করবে। কাল দেখো শেঠজী, রক্ত আমার কী রকম লাল হ'য়ে ওঠে!'

'থোরাসে ভি লাল হোবে না,' বুড়ো আঙুলটা ওপর দিকে তুলে ধরল দেবিদয়াল। হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল সে। হলদে রঙের পাগড়িটা খসে পড়ল মেঝের ওপর। হাত বাড়িয়ে জলের ঘটিটা টেনে তুলে নিয়ে ঢেলে দিল উনোনের আগুনে। ভড়কে গেল সামশের। শেঠজীর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে? উনোনে জল ঢালছে কেন? এক টুকরো কাঠও আর নেই, সব ছাই হয়ে গিয়েছে। দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চলি শেঠজী। কাল সকালে আমরা শোভাযাত্রা বার করব। তোমার কাছে আগে আসব। পাঁচ কুড়ি টাকা গুণে রেখে দিও।'

বেরিয়ে গেল সামশের গহতরাজ।

সারাটা রাত ঘুমুতে পারল না দেবিদয়াল সুখানী। মাঝে মাঝে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে চেয়ে থাকে সীমান্তের দিকে। এক হাত দূরের জিনিসও দেখতে পায় না সে। মেঘ আর কুয়াশায় চতুর্দিকের অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। কান পেতে রাখে ঢালুর দিকে, কোথায় যেন খস-খস আওয়াজ হচ্ছে। কালো নুনিয়া ধানের খেতে দুশমনের পদধ্বনি। পা টিপে টিপে ওপরে উঠে আসছে বোধ হয়। পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিচ্ছে কালো নুনিয়ার পাকা শীষ।

ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয় দেবিদয়াল। সিন্দুকের মাথার ওপরে হাত বুলতে থাকে। এক লাখ নগদ টাকা প'ড়ে আছে ওখানে। ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও চাবি লাগায় নি—লাগাবার দরকার বোধ করে নি। মাঝে মাঝে সামশেরকে একলা রেখে বাইরে বেরিয়ে যায় দেবিদয়াল। একটা পয়সা খোয়া যায় নি কখনো। কংকাবং পাহাড়টার মতো টাকার পাহাড়টাও ঘরের কোণায় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল চিরটা কাল। ধারে-কাছে থানা নেই, পুলিশ নেই। দেবিদয়াল তবু ভয় পায় নি কোনো-দিন। লোভের ধ্বস নামে নি পাহাড়ের গায়ে।

আজ তার ভয় করতে লাগল। দুশমনের পদধ্বনি ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। এ পদধ্বনি তার নিজের বুকে, না ধানের খেতে তা সে সঠিকভাবে বুঝতে পারল না। ভয়ে আড়ষ্ঠ হ'য়ে এল দেবিদয়াল। কাল সকালেই থিম্বু লামার দল এখানে এসে উপস্থিত হবে। সিন্দুকটা যদি লুঠ ক'রে নিয়ে যায়? চাবি খুঁজতে লাগল দেবিদয়াল।

চাবি খুঁজতে খুঁজতে বাকী রাত-টুকু শেষ হ'য়ে গেল। কংকাবং-এর কোথাও আজ আলো নেই। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া থেকে মেঘের খণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে নিচে। চোখে চশমা লাগিয়ে দেবিদয়াল দেখল, হাজার ফুটের ঢালুর বুকেও আজ ঘন অন্ধকার।

শোভাযাত্রা বার করেছে থিম্বু লামার দল। ওপরে উঠে আসছে ওরা। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কান খাড়া ক'রে রাখল দেবিদয়াল। হ্যাঁ, সামশের গহতরাজের কণ্ঠস্বরই বটে। অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসছে। মেটে রঙের কুয়াশা ভেদ ক'রে ভেসে আসছে সামশেরের গলা 'মেরো ঝাণ্ডা উঁচা রহে।'

দেবিদয়ালের চোখের সামনে কণা-তুষারের ঝড় বইতে লাগল। ঠাণ্ডায় হাতের আঙুলগুলো কুণ্ডলীর মতো কুঁকড়ে গিয়েছে। মরচে-ধরা সিন্দুকের চাবিটা হাতের মুঠোতে ধরে রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে, হাতের মাংস আলগা হ'য়ে চাবির সঙ্গে লেপ্টে গেল বুঝি।

কিন্তু সামশেরের হলদে রক্ত লাল হ'য়ে উঠেছে। কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। প্রত্যেকটা কথা ধনুর্ধরের তীরের মতো দেবিদয়ালের কানের পর্দায় এসে আঘাত করছে। পথ ঠেলে ওপরে উঠতে উঠতে সামশের চীৎকার ক'রে বলছে, 'মেরো ঝাণ্ডা উঁচা রহে।'

ঢালুর অন্ধকারে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দেবিদয়াল। ভেতরে এসে সিন্দুকের গায়ে হাত বুলতে লাগল। উত্তেজনা আর নেই। লোকসানের কথাও ভুলে গেল সে। দুশমনটাকে দেখতে পেয়েছে। মাত্র পাঁচ কুড়ি টাকার অস্ত্র দিয়ে তাকে রুখতে পারা যাবে না।

সিন্দুকটাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল দেবিদয়াল। পেমা ওয়াংদী ঠিক কথাই বলে গিয়েছে। পুরো যৌবনটা ওর ওখানেই বন্দী হ'য়ে আছে। প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে আজ সে নিজের যৌবনটাকেই দান করতে চায়। কোথা থেকে শক্তি আর সামর্থ এল তা সে জানে না। সিন্দুকটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল ঢালুর মুখে। বাণ্ডিলে বাঁধা নোটগুলো হাজার হাজার শবদেহের মতো প'ড়ে রইল ভেতরে। দম আটকে তিলে তিলে মারা গিয়েছে ওরা। হলদে রঙের পাগড়িটাকে মাথার ওপর ভাল ক'রে চেপে বসিয়ে দিল সে। হাতের আস্তিন গুটিয়ে তুলে ফেলল কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত। হাতের পাঞ্জা দুটো রগড়ে রগড়ে গরম ক'রে নিল একটু। যৌবনের তেজ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল যথাসাধ্য। বুকের ছাতিটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উঁচু করল আধ ইঞ্চি। ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সীমান্তের দিকে। তারপর ধাক্কা মেরে সিন্দুকটাকে ফেলে দিল ঢালুর পথে। ঠোক্কর খেতে খেতে গড়িয়ে গড়িয়ে পালাতে লাগল দুশমন।

আজ সে আর ওয়াংদীদের থেকে আলাদা নয়।

নেফার উপকথা

প্রভাতকুমার দত্ত

উপকথার প্রচলন সব সমাজেই আছে। উপকথার মধ্যেই আমরা একটি জাতির পুরানো ইতিহাস, জীবন, চিন্তাদর্শের কাব্যময় পরিচয় লাভ করি। উপকথাবিহীন জাতি মানেই কুল-পরিচয়হীন জাতি। দার্শনিকের বক্তব্যে যেমন প্রাচীন জ্ঞানের স্বাক্ষর থাকে, তেমনি থাকে উপকথায়, যদিও তার প্রকাশ হয় অন্যরূপে। উপকথা জিনিসটা এমন গুরুত্বপূর্ণ বলেই বর্তমানে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদেরা এর সংগ্রহে এত সচেষ্ট। অবশ্য সভ্যসমাজ আর অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সমাজের উপকথার রূপবৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রধানত মানুষ ও প্রকৃতির আদিম সম্পর্ক থেকে উপকথার উৎপত্তি। এই সম্পর্কটা অনগ্রসর সমাজে এখনও অনেকটা অকৃত্রিম অবস্থায় রয়েছে। সভ্যসমাজে ঠিক এই জিনিসটির অভাবের জন্য উপকথা তার সজীবতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। নেফার আদিবাসী সমাজের উপকথার এই আলোচনা থেকে আমরা উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যাসত্য বুঝতে পারবো।

নেফার আদিবাসী সমাজের কোন লিখিত সাহিত্য নেই। কিন্তু অলিখিত সাহিত্য অর্থাৎ মুখে মুখে প্রচলিত উপকথায় এই অঞ্চল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এখানে নানাসময়ে নানাভাবে উপকথা বলা হয়ে থাকে। কতকগুলি উপকথা নাচের সঙ্গে সঙ্গে সুর করে আবৃত্তি করা হয়, যেমন নাগাদের আভঙ কিংবা শেরদুকপেন জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যথা শিশুর জীবন বাঁচানো, শস্যকাটার উৎসব, মৃতের সংকার ইত্যাদিতে উপকথার ব্যবহার হয়। শীতের রাতে অনেক আদিবাসী একত্র গোল হয়ে বসে যখন আগুনের উত্তাপ উপভোগ করে তখনও তাদের মুখ থেকে শোনা যায় নানা উপকথা। নেফায় আবার এমন কতকগুলি উপকথা আছে যেগুলি সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় না, কেবল পরম্পরাগত জ্ঞান বা ইতিহাস হিসাবে শামান (পুরোহিত) থেকে শামানের মধ্যে বংশানুক্রমে সীমাবদ্ধ থাকে।

এপর্যন্ত নেফায় যে সমস্ত উপকথা সংগৃহীত হয়েছে সেগুলিকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন আকাশ ও মাটি, মানুষ ও তার ইতিহাস, মানুষের দৈনন্দিন জীবন এবং জীবজন্তু সংক্রান্ত। নেফার উপকথায় ভারতীয় রূপকথা-উপকথার তেমন কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। মাঝে মাঝে হয়ত একটু-আধটু রামায়ণ বা জাতকের গল্প কিংবা মিশনারি বিষয়ের প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু মোটামুটি উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপকথা স্বকীয় প্রতিভার সৃষ্টি। নেফার উপকথায় যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশী করে চোখে পড়ে তা হচ্ছে অপূর্ব কল্পনাশক্তি যা একমাত্র সত্যকার কবিতারই উপজীব্য। সভ্যমানুষই একমাত্র সূক্ষ্ম কল্পনার অধিকারী এ ভুল আমাদের ভেঙে যায় এই উপকথা-গুলির সঙ্গে পরিচিত হলে। একজন বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ বলেছেন যে উপকথা হচ্ছে: Primitive history and ethnology expressed in poetic form এই মন্তব্য যে কত সত্য তা আমরা নেফার উপকথা থেকেই বুঝতে পারি।

এখন আলোচ্য উপকথার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হচ্ছে। জগৎ, আকাশ ও উপগ্রহ সম্পর্কে উপকথাগুলো অপূর্ব কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। আকাশ ও মাটি পরস্পর প্রেমাসক্ত। যখন আকাশ মাটিকে তার প্রেম জানায় তখনই গাছপালা, তৃণ ও সমস্ত রকমের জীবনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আকাশ আর মাটিকে আলাদা করা দরকার কারণ তারা পরস্পর আলিঙ্গনা-বদ্ধ থাকলে তাদের সন্তানাদির থাকার কোন স্থান থাকে না। মিনিয়ং জাতির একটি উপকথায় আছে যে তাদের পরস্পর আলাদা হওয়ার পর মাটির পৃথিবীর সবসময় কামনা বা ইচ্ছা করে স্বামীর সঙ্গে একত্র হওয়ার। এই ইচ্ছা নিয়ে যখন সে আকাশে উঠতে যায় তখন হঠাৎ চন্দ্র ও সূর্য দেখা দেওয়ায় লজ্জায় পড়ে আর অগ্রসর হতে পারে না। পর্বত-গুলি তার দেহের সেই অংশ যেগুলি প্রভুর সঙ্গে মিলন কামনায় মাথা ঊর্ধ্বে তুলেছিল। নেফার আর একটি আদিবাসী জাতি সিংপোদের উপকথায় রামধনু সম্পর্কে বলা হচ্ছে এটি একটি মই যার সাহায্যে মাটির পৃথিবীর এক দেবতা চাঁদের দেশে তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলিত হন। রামধনুকে কনের স্বামী-গৃহের যাবার পথের সেতু হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। শেরদুকপেন জাতির মধ্যে রামধনুর আরো একটি অভিনব বর্ণনা পাই। পাহাড়ী ঝরনার জলে সাদা, কালো, হলদে ও লাল চারটি অদৃশ্য শক্তি বাস করে; এরা মাঝে মাঝে সুন্দরী স্ত্রীর সন্ধানে স্বর্গরাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের যে পথ দিয়ে এরা যায় সেখানে নানারঙের রামধনু দেখতে পাওয়া যায়। মিনিয়াং উপকথা অনুসারে আকাশের বিদ্যুৎ চমক হচ্ছে স্বর্গীয় মাতার চোখের তারার কম্পন; মিশমীদের মতে এটি

তারারূপী কন্যার দ্রুত চলে যাওয়ার সৌন্দর্যময় রূপ; বুনুন উপজাতির লোকেরা বলে এটি লম্বা মাথার কাঁটা (hair pin) যা দিয়ে এক মেয়ে অবাঞ্ছিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে ভয় দেখায়। অন্য এক উপকথায় আবার আকাশ ও মাটিকে দুইভাইরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বড় ভাই থাকে মাটিতে ও ছোটটি আকাশে। কখনও কখনও ছোটটি নাচতে শুরু করে এবং মাটির দিকে রাশি রাশি জলকণা ছুঁড়ে দেয়। এরপর সে মর্ত্যের যত সুন্দরী মেয়েদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে তাদের গলায় কি এই জলকণার মত এমন মনোরম মালা আছে? মাঝে মাঝে সে বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করে তার হাতে যে অদ্ভুত এক ম্যাজিক ক্ষমতা রয়েছে সেকথা প্রকাশ করে। বিরাট ঢাকগুলি (drum) বাজানোর ফলে আকাশের গায়ে যখন বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয় তখন তার প্রশ্ন—মর্ত্যের মানুষ কি এমন সঙ্গীতের অধিকারী? নেফার আদিবাসীরা আকাশ ও মাটিকে নিয়ে এমনই সব উজ্জ্বল কল্পনাময় উপকথা সৃষ্টি করেছে।

এবার আমরা মানুষ ও তার দৈনন্দিন জীবন নিয়ে যে উপকথাসমষ্টি তারই একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছি। এটি অপূর্ব কল্পনারসে সিঞ্চিত। কাপড় বোনা নেফার আদিবাসী সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কাপড় বোনা প্রত্যেক আদিবাসী রমণীর অবশ্যকরণীয় কাজ। উপকথাটি এই কাপড় বোনার ব্যাপার নিয়েই। আদিবাসীরা কি করে বুনতে শিখল? অনেকদিন আগে খামলাঙ নদীতে হামরু নামে এক মাছ বাস করত; তার গায়ে ছিল ফুলের রঙ; সঙ্গে থাকতো লাল, সাদা ও সবুজ মিশ্রিত তিনরঙা একটি সাপ। কাওনসা নামে এক পিতৃমাতৃহীন বালকের মাছ ধরার খুব শখ ছিল কিন্তু সারাদিন মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হোত বলে সে সুযোগ বড়-একটা পেত না। যাইহোক একদিন সে রাত্রে নদীতে জাল ফেলে রেখে মনে মনে কামনা জানালো: "আমার ভাগ্যে যদি মাছ পাওয়া থাকে তবে তা আপনি এসে ধরা দেবে।" পরদিন সকালে বিস্ময়ান্বিত হয়ে সে দেখল যে দুটি হামরু মাছ—একটি বড় ও একটি ছোট তার জালে ধরা পড়েছে। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

কাওনসা বড় মাছটিকে পাত্রে জিইয়ে রেখে ছোট মাছটিকে আগুনে ঝলসে খেয়ে ফেলে। পরের দিন ভোরে সে যথারীতি মাঠের কাজে বেরিয়ে যায়; সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখে তার ঘর অদ্ভুত সুন্দর সব নক্সাকরা কাপড়ে পূর্ণ। এরকম কদিনই চলতে থাকলো; মাছকে খাবার দিয়ে সে রোজই ক্ষেতের কাজে চলে যায়; ফিরে এসে দেখে নতুন বোনা সুন্দর সুন্দর সব কাপড়ের রাশি। মনে তার সন্দেহ জাগে। একদিন সে কাজে না গিয়ে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকে। কিছু পরেই দেখতে পায় মাছটি পাত্র থেকে বার হয়ে সুন্দরী মেয়ের রূপ নিয়ে তার নিজের তাঁত দিয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় বুনে ফেলছে। আলুলায়িত কেশদাম এই সুন্দরী মেয়েটিকে কাওনসা তার স্ত্রীরূপে বরণ করে। কাওনসার স্ত্রীর কাছ থেকে গ্রামের অপর সব মেয়েরা বোনার পদ্ধতি শিখে নেয়। নক্সার অপূর্ব জ্ঞান সম্পর্কে মেয়েরা প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয় যখন সে মাছ ছিল তখন তিনরঙা সাপের গা ও মেঘের গায়ে প্রতিফলিত রঙ থেকে নক্সা শিক্ষা করে। কাওনসা একদিন তার স্ত্রী হামরুই মাইয়ের বোনা কিছু কাপড় বাইরে রোদে শুকোতে দিয়েছিল, জোরে বাতাস আসায় সেগুলি উড়ে অন্য গ্রামে চলে যায় এবং সেই সমস্ত গ্রামের মেয়েরাও বুনতে শেখে। রনমাই ও মোলো নামে দুই দেবতা হামরুই মাইয়ের কাছ থেকে নক্সাগুলি ভেঙে নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে বোনার জ্ঞান ছড়িয়ে দেন। নেফার আদিবাসী মানুষেরা মনে করে এইভাবে বোনার বিদ্যা প্রচারিত হয়েছিল।

মানুষের উৎপত্তি ও ইতিহাস ব্যাপারে নেফার উপকথাগুলি খুবই বৈচিত্র্যময়। এখানকার বিভিন্ন জাতি বিভিন্নভাবে জিনিসটাকে দেখেছে। কেউ বলছে আকাশ ও মাটির মিলন থেকে মানুষের জন্ম; অপর একটি মত এই যে সরাসরি স্বর্গ থেকে মানুষ মর্ত্যে নেমে এসেছে; তৃতীয় ধরনের উপকথা অনুসারে শিল্পী যেমন কাদা নিয়ে মূর্তি গড়ে তেমনি এক স্বর্গীয় শক্তি নারী ও পুরুষকে গড়েছে; গজদন্ত বা পাত্র থেকে মানুষের উদ্ভবের কথাও কোন কোন উপকথায় আছে। মানুষের উৎপত্তির সবশেষের কারণটি সেই নোয়ার নৌকার গল্পের মত। কিছু কিছু আদিবাসী জাতি বিশ্বাস করে যে আদি মানুষ আগুন আর বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছল, শুধু একটি দম্পতি রক্ষা পাওয়ার তাদের থেকে মানুষ আবার বৃদ্ধি পায়। নেফার পাহাড়ী আদিবাসীরা কেন সমতলবাসীদের তুলনায় অশিক্ষিত সে সম্পর্কে চমৎকার এক উপকথা প্রচলিত আছে। অনেক প্রাচীনকালে সমস্ত জ্ঞানের কথা চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে পার্বত্য ও সমতলবাসী উভয় মানুষকেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত আদিবাসীরা চামড়াটিকে রান্না করে খেয়ে নেয়, সেজন্য তারা বহুকাল থেকে অজ্ঞ অবস্থায় রয়েছে।

নেফার আদিবাসী সমাজে প্রাণীদের নিয়ে যে সমস্ত উপকথা রচিত হয়েছে তার মধ্যে ব্যাঙ, জোঁক এবং মাছের প্রাধান্য চোখে পড়ে। মাছ নিয়ে উপকথা শুধু আদিবাসী সমাজ কেন সব দেশের সভ্যসমাজেই আছে। বাঙালী আমরা—আমাদের উপকথা-রূপকথায় মাছের বিশেষ স্থান সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমরা সচেতন। নেফার উপকথায় জোঁক নামক প্রাণীকে নিয়েই খুব বেশী কাহিনী গড়ে উঠেছে। এর দুটি প্রধান কারণ আছে। আদিবাসী সমাজচিন্তায় জোঁক প্রথমত যৌনতা (Sexual) এবং দ্বিতীয়ত প্রতিশোধ-ইচ্ছার প্রতীক। একটি কাহিনীতে বলা হয়েছে দুটি নারীর মিলন থেকে জোঁকের জন্ম, এই ধরনের জীবের শরীরে হাড় থাকতে পারে না; এমনকি তার হাত-পা মুখও নেই। মা একে স্তন দেবার চেষ্টা করলে সে তার হাতের রক্ত চুষতে আরম্ভ করে। আনাতানি, দফলা, মিরি প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে যে কাহিনী প্রচলিত তাতে বলা হয়েছে, প্রাচীন একবার এক শুকনো পাতা বা হোগলাকে বিবাহ করে; তার শিশু মায়ের স্তন না পাওয়ায় বাপের হাত ও হাঁটুতে রক্ত শুষে নিতে আরম্ভ করে। ফলে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। পরজন্মে সে প্রতিশোধ নেবার জন্য জোঁক হিসাবে জন্মগ্রহণ করে।

উপরে নেফার উপকথার বিভিন্ন রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হোল। এক হিসাবে এই উপকথাগুলি নেফার অতীত ইতিহাসের পরিচয় বহন করছে। নেফার উপজাতির পূর্ণ ইতিবৃত্ত রচনা করতে গেলে এগুলি অন্যতম মালমশলা হবে। নিজেদের কোন লিখিত সাহিত্য না থাকলেও সাহিত্যের মূলে একটি উপাদান অর্থাৎ কল্পনার ঐশ্বর্যে নেফার আদিবাসীরা অদ্ভুত ঐশ্বর্যবান। এ ব্যাপারে এখানকার মানুষের প্রতি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত। ✱

ধনঞ্জয় বৈরাগী

[উপন্যাস]

॥ ১ ॥

আজ বুঝতে পারছি সেদিন আমার জীবনে যে ঝড় উঠেছিলো তার মধ্যে ছিল না কালবৈশাখীর রুক্ষতা, ছিল না আকস্মিক হাওয়ার ঘূর্ণি, ছিল না ভয়ংকর-এর প্রলয় নিনাদ।

তবু ঝড় উঠেছিল।

এই ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেল চৈত্র মাসের ঝরাপাতার মত আমার শুক্‌নো দিনগুলো। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিলো আমি নিঃস্ব, অনুভব করছিলাম রিক্ততার করুণ ব্যাকুলতা কিন্তু পরক্ষণেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো কচি পাতায় ভরা বর্ষার জলে ভেজা স্নিগ্ধ শ্যামল গাছের ছবি। যে গাছের পূর্ণতায় মন ভরে ওঠে, যার শ্যামলিমায় চোখ জুড়িয়ে যায়।

সেই প্রথম বুঝতে পারলাম আমারও বাঁচবার লোভ আছে। জীবনের অর্থ খুঁজে পেলাম। শুধু কান্না, কান্না আর কান্না। যদি কাঁদবার জন্যেই এ পৃথিবীতে এসেছিলাম তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? কতজনকে প্রশ্ন করেছি কেউ তার সদুত্তর দিতে পারেনি। মেজদি বল্‌ত এ নাকি আমাদের অদৃষ্ট। সে তো বলবেই, আট বছর বয়েস থেকে যে হার্টের অসুখে ভুগ্‌ছে, এ ছাড়া তার আর কি সান্ত্বনা। অদৃষ্ট, যা দেখিনি, যার কথা জানি না, তারই নিষ্ঠুর নির্দেশনায় আমাদের জীবন বয়ে চলেছে। দুঃখ, সুখ, আনন্দ, যে যা পেল তাই তার লাভ। কেন জানি না অদৃষ্টের দোহাই পেড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ঘরের কোনে পড়ে থাকতে আমি পারিনি। হয়তো বা অদৃষ্টের বিরুদ্ধেই ছিল আমার বিদ্রোহ।

বউদি যেদিন কিছুতেই তর্ক করে আমার সঙ্গে পারতো না, ধম্‌কে গালাগাল দিয়েও হার মানতে বাধ্য হত, তখন বিষ মেশানো তেতো গলায় বল্‌তো, আমি বলে রাখছি শেষ পর্যন্ত তুমি জেলে যাবে। এ বংশের কলঙ্ক হবে।

আমি তার উত্তরে বলতাম, তোমার সংসারে ঝিয়ের মত পড়ে থাকার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক ভাল।

বৌদি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত, বাপ, মা-খাওয়া মেয়ে কত আর ভাল হবে। আমি জায়গা না দিলে তো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতিস।

বৌদির সঙ্গে কথা বলতেই আমার বিরক্ত লাগতো। আমি ওকে মনেপ্রাণে ঘেন্না করি। ওর গোলগাল চেহারা, শ্যাম্‌লা রঙ্‌, পান খাওয়া দাঁত। কথা বলার সময় নাক দিয়ে একটা খন-খনে আওয়াজ বেরয়, বিশেষ করে রেগে গেলে। ওই আওয়াজটা শুনলে গা কি রকম শিউরে ওঠে, মনে হয় ইচ্ছে করে আমাকে বিরক্ত করার জন্যে কারা যেন বড় বড় নোখ দিয়ে দেওয়ালে আঁচড় কাটছে। মাথার মধ্যে আমি রক্তের চাপ অনুভব করি। মনে হয় ঝম ঝম্‌ করে জোড়া পায়ের ঘুঙুর বাজছে।

চেঁচিয়ে উত্তর দিই, ছোটবেলা থেকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে শিখ্‌লে অনেক ভাল হত, ভদ্রলোকের মেয়ে সেজে, ঠোঁটে রঙ্‌ মেখে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ত না।

বৌদিকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিই। আমি জানি দু'ঘন্টা ধরে ও চেঁচিয়ে যাবে যতক্ষণ দমে কুলোবে, এমন কোন বিশেষণ নেই যা ওর মুখে আটকায়।

আড়াইখানা ঘরের ছোট্ট ফ্ল্যাট। দেড়খানা ঘরে সেজ্‌দা বৌদি আর তার দুই ছেলে-মেয়ে। আর একখানা ঘর বারমেসে হাসপাতাল, মেজদি হার্টের রুগী, কখন কি হয় বলা যায় না। সেই ঘরে আমার আস্তানা। মেজদির যন্ত্রণা-কাতর মুখ দেখলে আমি ভেতরে শুকিয়ে যাই, বেঁচে থাকবার ওর কি প্রবল বাসনা, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেবার কি মারাত্মক চেষ্টা অথচ ওর বেঁচে থেকে কি লাভ? সারা জীবন তাকে গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে, হয় বৌদির না হয় আর কারুর। তবু মেজদি যখন আমাকে কাছে ডাকে, আমার হাতটা নিয়ে তার কপালে রাখে, তার জীর্ণ চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে

দিতে দিতে মমতায় আমার মন ভরে যায়। চোখে জল ভরে আসে, এই মেজদির জন্যেই বোধহয় আজও আমি মুখ বুজে বৌদির অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছি। যদি ওকে কোথাও নিয়ে যেতে পারতাম, কয়েকটা দিন অন্ততঃ নিশ্চিন্ত আরামে রাখতে পারতাম, সেই একঘেয়ে ঝোল-ভাতের হাত থেকে রেহাই দিয়ে একটু ভাল মন্দ খাওয়াতে পারতাম। অথচ জানি কিছুই তা পারব না। কে আমাকে টাকা দেবে। কোথায় আমি রোজগার করব, বাঙালীর ঘরের অতি সাধারণ মেয়ে আমি। কলেজে উঠলেও পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। চেহারায় এমন কোন জৌলুষ নেই যার জোরে রূপোলী পর্দায় নামতে পারি, মঞ্চের কথা ছেড়ে দিলাম কারণ অভিনয় আমার আসে না। যদি অভিনয় করতেই পারতাম অন্ততঃ এতখানি অপাংক্তেয় হয়ে আমাকে বাড়ীতে থাকতে হ'ত না। চেষ্টা করলে বৌদির মন যুগিয়ে চলা সম্ভব হত। শুধু তাই কেন, শুনেছি আমার বড় দিদি আমাকে ভালবাসতেন, ওরা বড়লোক, গাড়ী বাড়ী, সবই আছে, দু'একবার চেষ্টাও করেছিলেন আমায় নিয়ে যেতে কিন্তু আমি যাই নি। কারণ আমি যে জানি বৌদির চেয়ে অনেক বেশী স্বার্থপর আমার বড়দি। এ দুনিয়ায় নিজেব ছাড়া সে কিছুই বোঝে না। তাকে ভালবাসার অভিনয় করব কি করে।

আমার এতগুলি ভাইবোনের মধ্যে যার কাছে পেয়েছি অকৃপণ স্নেহ, যে চেষ্টা করেছিল বাবা মার অভাব বুঝতে না দিয়ে আমাকে কাছে কাছে রেখে মানুষ করবার সেই তো আমার মেজদি। কত বড় বোকা মেয়েটা। এই স্বার্থপর দুনিয়ার কোন মারপ্যাঁচই সে বুঝলো না, আমাকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে পুড়ে মরল। আজ সে কৃপার পাত্রী, ভালবাসার পুরস্কার হিসেবে মানুষের কাছে সে পেল শুধু গঞ্জনা। আমি যে এসব জানি, যদি আমি অভিনেত্রী হতে পারতাম তাহলে আমিও তো অন্যদের মত চলে যেতাম নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার লোভে।

একেই কি বলে অদৃষ্ট।

জানি মেজদি আমাকে ভুল বোঝে, বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করলে ও আমাকে বকে, কিন্তু বোঝে না কেন আমার মনের এ অস্থিরতা, কেন আমি শান্ত হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতে পারি না, কেন আমি ছুটে বেরিয়ে যেতে চাই।

টাকা, টাকা, টাকা।

টাকা আমায় রোজগার করতে হবে। কতদিন আমি স্বপ্ন দেখি সেই আলিবাবার মত যদি আমি ডাকাতদের গুহার সন্ধানটা একবার পেতাম, গাধার পিঠে বোঝাই করে নিয়ে আসতাম মোহর। কাশেমের মত হিংসের জ্বালায় ছটফট করত বৌদি। মোহর, মোহর, মোহর। মুঠো মুঠো মোহর। তাহলে বোধহয় মেজদিকে সারিয়ে ফেলতাম; বড় বড় ডাক্তার আসত, ওষুধ দিত। সেরে না উঠলেও অন্ততঃ মনে সান্ত্বনা পেত ওই ভেবে যে তার জীবনটারও দাম আছে। ময়লা কাগজের মত সে মূল্যহীন নয়।

এ স্বপ্ন দেখেই বা কি লাভ। টাকা বড় আশ্চর্য জিনিস, শুনেছি যার টাকা আছে সে আরও টাকা পায়। যার নেই সে কিছুই পায় না।

কলেজ ছেড়ে দিয়ে আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকিনি একদিনও। টিউশানি করেছি, হয়ত ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়েছি, সে যে ভাবেই হোক মাসের গোড়ায় অন্ততঃ কিছু টাকা এনে তুলে দিয়েছি সেজদার হাতে, বৌদির হাতে নয়।

অন্ততঃ এইটুকু সান্ত্বনা সেজদা আমাকে খানিকটা বোঝে, বলে, টাকাটা তোর কাছেই রাখ না, সংসার তো এক রকম করে চলে যাচ্ছে।

বলেছি, কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারি, সেই জন্যেই তো বৌদি—।

—ও প্রসঙ্গ থাক, অনু, তোর বৌদিকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না।

আমি নীরস গলায় বলেছি, যে বোঝবার নয় তাকে কি করে বোঝাবে।

—মনে হয় তোর বিয়ে দিতে পারলে হয়তো।

—ও সব বিলাসিতার কথা নাই-বা ভাবলে।

সেজদা মুখ তুলে তাকায়, হয়তো বা আমার কথার ধরনে ব্যথা পায়। আমি বুঝিয়ে বলি, আমাদের জন্যে তোমার জীবনটা নষ্ট কোর না সেজদা। আর সব দাদারাই যখন সরে পড়তে পারল, তুমি কেন এ বোঝা ঘাড়ে বইবে।

সেজদা ম্লান হাসে, তুইও যে তোর বৌদির মত কথা বলছিস।

অজান্তে দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বল্লাম, কথাগুলো শুনে শুনে নিজের ওপরই যে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে।

বৌদি এসে পড়ায় কথা থেমে গেল, জিভে শান দিয়ে সেজদাকে বলল, তোমার বিদ্যেধরী বোনকে বলে দাও অত রাত করে যেন বাড়ীতে না ফেরে। গেরস্তর বাড়ী, পাঁচজনে পাঁচকথা বলে সেটা শুনতে তো ভাল লাগে না। সেজদা কথা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলে, কই অনু তো আজকাল দেরী করে না। বৌদি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তা করবে কেন, কোনদিন ঘুমবার আগে বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—সে আমি সকাল সকাল শুয়ে পড়ি।

—রাত এগারটা যদি সকাল সকাল হয় তবে রাত বলব কাকে শুনি? আমার বাপের বাড়ীতে রাত ন'টার মধ্যে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তার মধ্যে বাড়ী না ফিরলে বাইরে রাত কাটাতে হবে।

—আঃ, তুমি বড় চেঁচামেচি কর। বলেই সেজদা নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

আমি বৌদির সামনাসামনি পড়ে গেলাম। বাঘিনীর মত সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলে, কথাটা বিদ্যেধরীর কানে ঢুকেছে।

আমি ইচ্ছে করে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলাম, এক কান দিয়ে ঢুকেছিল, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

—তার মানে তুমি আমার কথা শুনবে না।

—কথা আমি শুনি, কিন্তু কারুর হুকুম শুনি না।

—আজও তুমি দেরী করে ফিরবে।

—ইচ্ছে ছিল না, তবে যখন চোখ রাঙাচ্ছ তাহলে দেরীই করব।

রাগে বৌদির ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, এ রকম সৃষ্টিছাড়া মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।

মুখে মুখে জবাব দিলাম, ওটা এক-তরফা নয়।

বৌদি চলে যাচ্ছিল ফিরে তাকাল, চোখে তার উপচে পড়া ঘৃণা। বল্লাম, তুমি যে আমার চেয়েও সৃষ্টিছাড়া।

এ ধরনের কথা কাটাকাটি প্রতি-দিনের ঘটনা। ঘরে ফিরে এলেই দেখি
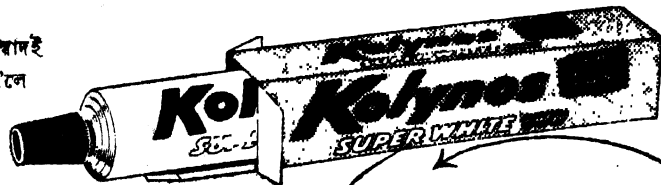
মেজদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আজকাল আর আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে না শুধু নিজে দুঃখ পায়। আমি কোণের চেয়ারে বসে বই পড়ার চেষ্টা করি, পারি না. প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যাই। এই সময় মেজদির নীরব অভিমান আমাকে ব্যথা দেয়, এক একবার আড়চোখে তার দিকে তাকাই, দেখি পাশ বালিশটা আঁকড়ে ধরে ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে। বুঝি ওর চোখে জল, কিন্তু কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। এই নিষ্ফল অভিমানের দাম কতটুকু। বইটা সরিয়ে রেখে বসলাম ছুঁচের কাজ করতে, প্রায় মাসখানেক থেকে চেষ্টা করছি একটা একগজি চৌকো টেবিল ঢাকার উপর গোলাপ ফুলের নক্‌সা তুলতে, কিন্তু পারছি না। সেই এক প্রশ্ন, কি হবে করে। কার জন্যে করব।

আমাদের ঘরের একটা জানালা খুললে এক-টুকরো আকাশ দেখা যায়। পাশের বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে, কাপড় শুকোনর তার টপকে নজর পড়ে ঐ এক ফালি আকাশের উপর। তাও রোজ দেখা যায় না। প্রায়ই ও বাড়ীর অবাঙালী বাসিন্দার রঙ্গীন শাড়ী ঝোলে, আর কখনও বা উনুনের ধোঁয়া, ওরা বুঝি তিন তলায় রান্না করে। ধোঁয়ার চোটে যেদিন জানালা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে। বৌদির গঞ্জনাভরা এই ঘিনঘিনে সংসারের মধ্যে আর কিছুদিন থাকলে আমিও বোধহয় মেজদির মত চিররুগ্ন হয়ে যাব। মুক্তি আমাকে পেতেই হবে, সেই জন্যেই সংসারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ।

হাতের কাজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে খানিকটা লাল রুজ মাখলাম, বোধহয় মাত্রাটা বেশী হয়ে গেছে, বড় উগ্র মনে হল। তাক থেকে পাউডারটা পাড়তে গিয়ে পড়ে গেল, শব্দ শুনে মেজদি বোধহয় বুঝতে পারল আমি সাজগোজ করছি। জিজ্ঞেস করল, অপু, তুই বেরুচ্ছিস?

বল্লাম, হ্যাঁ।

—খাবি না?

—না।

—শরীর ভেঙ্গে যাবে যে।

মুখে তখন আমার পাউডার মাখা হয়ে গেছে, সামান্য জল দিয়ে রঙটা বসিয়ে নেবার চেষ্টা করছি. আয়নার সামনে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, ভুরুতে পেন্সিল ঘষার দরকার নেই। চোখের কোল দুটো টেনে দিলাম।

মেজদি আবর বল্‌ল, শরীর ভেঙ্গে যাবে যে?

বল্লাম, তাতে কার কি এসে যায়?

জানি মেজদি মনে কষ্ট পেল, কিন্তু কি করব? আমি তো ও-কে কষ্ট দিতে চাই নি, তবু এক এক সময় কেমন যেন হয়ে যাই। তাড়াতাড়ি মাথার চুলটা জড়িয়ে নিলাম, সাধারণ এলো খোপা। ভগবান ঐ একটা ঐশ্বর্য আমাকে দিয়েছেন। একরাশ কালো চুল, এত অযত্নেও আজও উঠে যায়নি! শাড়ী বদলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে হল ছাতা আনতে ভুলে গেছি, আকাশের অবস্থা খুব ভাল নয়, জলভরা মেঘ থম থম করছে, তবু বাড়ী ফিরে যেতে আর ইচ্ছে করল না, ট্রামে উঠে বসলাম।

কন্ডাক্‌টার এসে যখন টিকিট চাইল তখন খেয়াল হল কোথায় যাব। কিছু ভেবে না পেয়ে টিকিট কাটলাম ড্যালহৌসি স্কোয়ারের। ঐ পর্যন্ত গিয়ে ট্রাম আবার ফিরে আসবে এই কালীঘাটের লাইনে। এও এক সমস্যা। একলা বেরিয়ে কোথায়ই বা যাওয়া যায়, হয় কারুর বাড়ী না হয় সিনেমা। আর যেখানেই যাই না কেন পেছনে ফেউ লাগবে, মানুষ ফেউ।

ছেলেবেলায় যা কিছু পড়েছিলাম আজ বুঝতে পারি সত্যিকারের জীবনে তার কোন দাম নেই। পড়েছিলাম নারী মায়ের জাত, আমাদের সনাতন ভারতবর্ষে এই নারীজাতির সম্মান অনেক উঁচুতে, অথচ এতবড় মিথ্যে আর কিছুই নেই। নারী হয়ে না জন্মালে এই নির্মম সত্য বোধহয় উপলব্ধি করতে পারতাম না যে এদেশে মেয়ে হয়ে জন্মানো পাপ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যার দাসখৎ লেখা হয়ে যায়, দাসত্ব করতেই যাদের জন্ম, প্রথমে পিতা, পরে স্বামী, শেষে পুত্রের, তাদের জীবনে স্বাধীনতা কোথায়। ঘরের লাঞ্ছনার জ্বালায় যে বাইরে বেরিয়ে আসব তার বা উপায় কই। ট্রামে বাসে চলতে গিয়ে মনে হয় আমি যেন একটা দেখবার জিনিস। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কি দেখে ওরা, কখনও কি মেয়ে দেখেনি। বাড়ীতে কি মা নেই, বোন নেই। এরা কি নারী-বর্জিত দ্বীপের কোন অসভ্য বাসিন্দা।

প্রথম প্রথম বিরক্ত হতাম, কিন্তু এখন আর হই না। সহজভাবেই তাকাই। কারুর চোখের উপর চোখ পড়ে গেলে সরিয়ে নিই না। দেখেছি এতে ফল ভাল হয়। ওরা নিজেরাই লজ্জিত হয়ে পড়ে।

ট্রাম লিণ্ডসে স্ট্রীটে থামতে নেমে পড়লাম। কোথাও যাবার না থাকলে আমি অনেক সময় মার্কেটে ঢুকে পড়ি। নানা রকম দোকান, অনেক আলো, ঘুরে বেড়ালে সময় কেটে যায়। কত রকমের চরিত্র চোখে পড়ে। কতগুলো মেয়ে আছে রোজই মার্কেটে ঘোরে, এরা পয়সাওয়ালা ঘরের বউ। স্বামী আপিস যাবার সময় ঘ্যান ঘ্যানে বউকে মার্কেটে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়, দোকানের সঙ্গে এদের বন্দোবস্ত আছে, জিনিস কিনে সই করে দিলে চলে, টাকা দেবার দরকার হয় না, নগদ টাকা তাদেরই দিতে হয় যাদের টাকা নাই। বড় আশ্চর্য দুনিয়া।

মার্কেটে ছেলেবেলায় এসেছি বলে মনে পড়ে না। আর আসবই বা কেমন করে, আট ভাই-বোনের সংসার। কি রকম করে যে দিনগুলো কেটে গেছে, তবু সে দিনগুলোর মধ্যেও আনন্দ ছিল। দিদির বিয়ে বাবা নিজে দিয়ে গিয়েছিলেন। পয়সাওয়ালা বনেদী ঘরে। তারপরই বাবা মারা গেলেন। বাবার যে এত দেনা ছিল, দাদারা কেউ জানত না। পাওনাদাররা ছেঁকে ধরল, আমরা ছিলাম মধ্যবিত্ত, হয়ে গেলাম গরীব।

মা মারা গিয়েছিলেন আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তাঁর অভাব কেউই ততটা অনুভব করেনি যতটা করেছিল বাবার মৃত্যুতে। এসব আমার শোনা কথা। যখন থেকে জ্ঞান হল বুঝলাম আমরা ক'জন ভাই-বোন, দারিদ্রের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করেছি। মেজদি বেচারী তারই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ল, সেজদি বিয়ে করল প্রেম করে, বাড়ীর অমতে। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল ছিল, তা না হলে সেজদি সুখী হল না কেন?

একটা খেলনার দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। কত রকম নতুন নতুন খেলনা বেরিয়েছে আজকাল। দম দিয়ে ছেড়ে দিলে চর্কির মত একটা চাকা ঘুরছে, তার উপর বসানো কয়েকটা ছোট ছোট পুতুল। আশ্চর্য, ওগুলো কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না।

অথচ আমাদের সংসারে সবাই ছিটকে পড়ল। কোথায় সেই আগের দিনগুলো। দাদা এখন বম্বেতে, বৌদিকে দু-একবার দেখেছিলাম, কিন্তু পরিচয় হয় নি। মেয়েটি বম্বের প্রবাসী

বাঙালী। চিঠিপত্রে যতটুকু জানা যায় মনে হয় ওরা সুখী হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে, কিন্তু ওরা কি আর ছোট পিসীকে চিনবে? তবু বড়দা অন্ততঃ চিঠিটা লেখে, পুজোর সময় বোনেদের নামে দশটা করে টাকা পাঠায়। মেজদা যেন কি রকম বদলে গেল। ওরা তো কলকাতাতেই থাকে, তবু কত যেন দূরের মানুষ। লোকে বলে মেজদা বিয়ে করেছে, কিন্তু কই আমরা তো জানি না। এমন কি ঠিকানাটাও রেখে যায়নি, শ্যামবাজারে কোথায় থাকে কে বলতে পারে।

মার্কেটে দু'চক্কোর দিয়ে যখন রাস্তায় বেরলাম দেখলাম আকাশের অবস্থা আরও খারাপ। বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির আভাস। শাড়ীর আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নিলাম, চুলটা আরও আঁট করে বাঁধলে ঠিক হ'ত, বড্ড উড়ছে। তবু হাঁটতে ভাল লাগল। অনেকদিন পরে ক'লকাতার একঘেঁয়ে আবহাওয়ায় পরিবর্তন এল।

অনুভব করলাম ক্ষিদে পেয়েছে। এ আর এক সমস্যা। ক'লকাতায় রেস্তরাঁর ছড়াছড়ি, কিন্তু একলা বসে খাবার জায়গা কম। মনে পড়ল একটা মাদ্রাজী কাফে আছে, শহরের আর এক প্রান্তে। গড়িয়াহাটের কাছ বরাবর, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, লোকের ভিড় থাকলেও গোলমাল নেই। ছোট্ট কেবিনে বসে নির্ঝঞ্ঝাটে খাওয়া যায়।

চৌরঙ্গী পাড়া থেকে উজোন বয়ে মাদ্রাজী কাফেতে এসে ঢুকলাম। সাদা দোসা, খান দুই ইডলী আর এক গেলাস গরম কফি। পেট বেশ ভরে গেল। মনে পড়ল এই রেস্তরাঁটা আমাকে দেখিয়েছিল আমার কলেজের এক বন্ধু রেখা। রেখা এই পাড়াতেই কোথায় থাকে। বছর দুই আগে একদিন তার বাড়ী গিয়েছিলাম। বালীগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে।

রেস্তরাঁ থেকে বেরুলাম রেখার বাড়ী খুঁজতে। কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু হঠাৎ খেয়াল হল ওর সঙ্গে দেখা হলে মন্দ হয় না। কি করছে আজকাল মেয়েটা। বিয়ে হয়েছে ওর অল্প বয়েসে, স্বামীর সাধ বৌ লেখা-পড়া শিখুক, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেচারীকে কলেজে আসতে হয়। বেশ মিষ্টি মেয়েটা। কত কথাই বলত।

কতক্ষণ রেখার বাড়ী খুঁজেছি মনে নেই। যখন খেয়াল হল দেখি আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। প্রচণ্ড ঝড় উঠল। একটা দোকানের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলাম প্রায় আধ ঘণ্টা। ঝড়টা একটু কমতেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম ট্রাম লাইনের দিকে। এই বেলা ট্রামে উঠতে না পারলে অলকাদের বাড়ী সময় মত পোঁছতে পারব না। কিন্তু ট্রাম লাইন পর্যন্ত পোঁছতে পারলুম না, হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামল। হঠাৎ যে এত জোরে নামবে সত্যি ভাবতে পারিনি। চারদিকের লোকগুলো ছুটে পালাচ্ছে, সকলের মুখে কলরব। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম একটা খোলা বারান্দার নীচে। আগে থাকতেই সেখানে অনেকে জড় হয়েছে। চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব দেয়ালের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে, তিনদিক থেকে ছাট আসছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, এই ছাতাটা নিন। তবু খানিকটা জলের হাত থেকে রেহই পাবেন।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। ফিরে তাকালাম। গগন সেন।

পরা নেই, পাছে অন্ধকারে কিছু দেখতে না পায় এই ভয়ে বোধহয়। মাথার টাকের পাশে যে বড় বড় চুলগুলো কাঁধ পর্যন্ত অবিনাস্ত ভাবে ঝোলে, অন্য-দিনের মত তা ফাঁপানো নেই, জলে ভিজে চুপসে গেছে। সেই সঙ্গে দাড়ীর চুলগুলোও।

গগন সেন আবার বলল, ছাতাটা নিন।

বললাম, না, না, আপনি কি করবেন।

—আমার ভেজা অভ্যেস আছে।

—তা হয় না।

জলের ধারার দিকে তাকিয়ে গগন সেন বলে, বৃষ্টি এখন থামবে না। মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে চলবে। আর
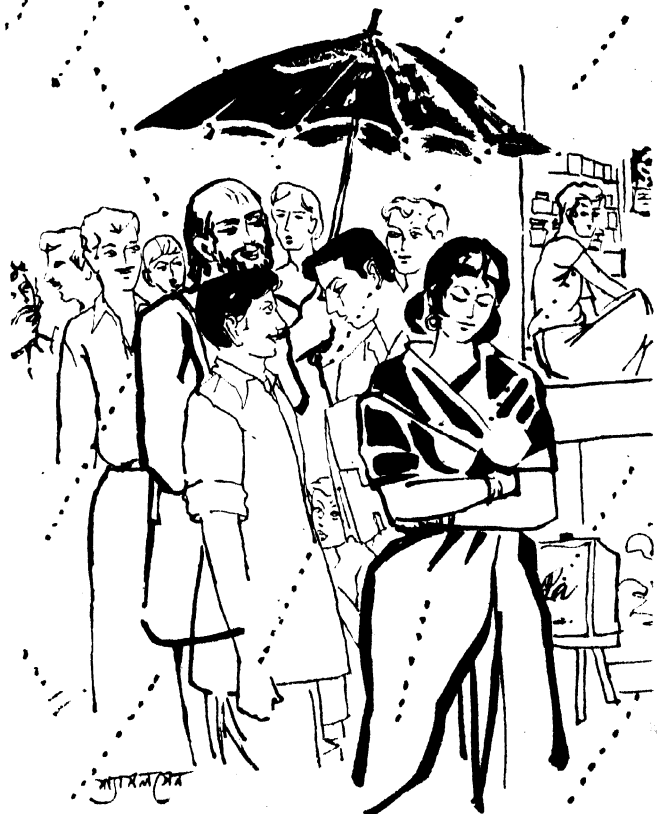
"এই ছাতাটা নিন্..."

কথার খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি?

গগন সেন উত্তর দিল, আপনারই মত জলে আটকে পড়েছি।

তাকিয়ে দেখলাম গগন সেনের পরনে সেই চির পরিচিত খয়েরী রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি, ধুতি, কাঁধে বইএর ঝোলা। শুধু চোখে কালো চশমাটা

বর্ষণের বেগ যদি এই রকমই থাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জল জমে যাবে।

কথা শুনে শঙ্কিত হলাম, সে কি, তাহলে বাড়ী ফিরব কি করে।

গগন সেন ছোট্ট উত্তর দিল, ভয় নেই, আমি আপনাকে পোঁছে দেব।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই জল জমছে। (ক্রমশঃ)

কমনওয়েল্থের
নূতন মন্ত্র ?
২৭।৩।৫৩ ইং
বৃটেন লালচীনকে
এরোপ্লেন বিক্রয়
করিয়াছে
" রাজবন্দীদের বিচারে আনা চলেনা "
- পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী

ডক্টর বাকের সঙ্গে

রথী ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয়েছিল। যে-সব ইউরোপীয় এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, ইউরোপে তাঁদের সংখ্যা বিলুপ্তপ্রায়। রবীন্দ্রনাথের এই সব সাক্ষাৎ-শিষ্য ও অনুরাগীদের মধ্যে যাঁরা এখনও আছেন, ডক্টর বাকে তাঁদের অন্যতম।

লণ্ডনে কিছুকাল আছেন, এমন বাঙালীর কাছে ডক্টর বাকে সুপরিচিত। ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রেরণা বহন করছে এরকম যে-কোন সঙ্গীতের আসরে বা চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁকে দেখা যাবে। তবে তাঁর সাধনা ও একজন বিদেশী হিসাবে নিরলস ভারত-চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ লণ্ডনবাসী বাঙালী কতটুকু জানেন সন্দেহ।

ডক্টর বাকের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। ইণ্ডিয়া হাউসের উৎসবে, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীতে, টেগোর ইণ্ডিয়া সেণ্টারের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র-প্রদর্শনীতে এবং এই সেদিন ওয়ালডরফ হোটেলে একটি ঘরোয়া মজলিশে।

প্রথম পরিচয়ে জেনেছিলাম তিনি ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ। সেই আমার প্রথম ঔৎসুক্যের সঞ্চার। বিদেশী ভারতীয় কয়েক জনকেই চিনি যাঁরা ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে খোঁজ রাখেন। কিন্তু তথ্যগত জ্ঞান থাকলেও ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছেন এমন মরমী সাধক ইউরোপে কম।

তাই পরিচয় হতেই প্রগলভ প্রশ্নে হয়তো অর্বাচীনতার পরিচয় দিয়েছিলাম। ডক্টর বাকে শান্তভাবেই উত্তর দিচ্ছিলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন আমার আমন্ত্রণ-কারী। সুতরাং কৌতূহল দমন করতে হল। কিন্তু ঔৎসুক্য থেকে গেল ভারত সম্পর্কে এঁর অনুশীলনকে জানবার।

সুযোগ এল। শ্রীমতী ঠাকুর ইংল্যাণ্ডে এসে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি সঙ্গে ছিলাম। ডক্টর বাকের হল্যাণ্ড-পার্কের বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী দুজনের সাথেই অন্তরঙ্গ আলাপ হল।

সারা বাড়ীতে ছড়ানো রয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় শিল্প-নিদর্শন। ভারতীয় সঙ্গীত-শিল্পের ইতিহাসে বোঝাই তাঁর পাঠগৃহ। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি ঘুরে ঘুরে আমাদের সব দেখালেন। পুরনো বন্ধুদের খোঁজ-খবর নিলেন। শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ ও শ্রীসৌম্যেন ঠাকুর দুজনেই তাঁর অতি-পরিচিত। সৌম্যেন বাবুর ইউরোপীয় ভাষাজ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তা-ছাড়াও রথীবাবুর মৃত্যু, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি

ইউনেস্কোর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ কনস্টানটাইন ব্রাইলোউ এবং ডক্টর বাকে

অনেক প্রসঙ্গ উঠলো। নেহাৎ পারি-বারিক ও ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্যেই বুঝলাম, ভারতের প্রতি তাঁর অন্তরের টান কতখানি।

১৮৯৯ সালে ডক্টর বাকের জন্ম হয়। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই প্রাচ্যের প্রতি তাঁর নিবিড় আকর্ষণ। এই সময় থেকেই তিনি প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে চর্চা করতে আরম্ভ করেন।

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়। এই বয়ঃ-সন্ধিক্ষণেই তিনি প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের আস্বাদ পেলেন। সেতারের ঝংকারে মুগ্ধ হলেন উনিশ বছরের ডাচ্ তরুণ। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নয়, ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কেও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলেন ডক্টর বাকে। এখানে বলা দরকার ডক্টর বাকে ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েণ্টাল ও স্লাভনিক স্টাডিজে সংস্কৃত বিভাগের রীডার এবং তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্র হলেও সংস্কৃততেই তিনি ডক্টরেট উপাধি-ধারী।

সংস্কৃত ছাড়াও তিনি জাভানীজ এবং ইন্দোনেশিয়ার আরও দু'-একটি ভাষা শিখেছিলেন। জাভানীজ ভাষায় ব্যুৎপত্তি কাজে লেগেছিল ১৯২৭ সালে,—যখন রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে তাঁর জাভা ও বালি যাবার সুযোগ ঘটে।

হল্যাণ্ডে লাইডেন ইউনিভার্সিটিতে ঐ সময় ভারতানুরাগীদের একটি ছোট দল ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ভোজেল। তিনি প্রায় ১৪ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে-ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের বেশীর ভাগই অতিবাহিত হয়েছিল মথুরার খননকার্যে।

লাইডেন ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় এনায়েৎ খাঁর দু'জন ছাত্র হল্যাণ্ডে আসেন এবং ডক্টর বাকে তাঁদের জন্য একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এদের কাছেই তিনি সুফী ধর্ম-সঙ্গীত শোনেন এবং মুগ্ধ হন। এই এনায়েৎ খাঁ স্বনাম-ধন্য শিল্পী বিলায়েতের পিতা নন। এঁকে ইউরোপে সশিষ্য পাঠিয়েছিলেন বরোদার মহারাজা এবং ইনি সুফী ধর্ম-সাধক হিসাবেই তদানীন্তন ইউরোপের একটি গোষ্ঠীর কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

যাই হোক ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীত ও সহজ সুফী সঙ্গীতের মাধুর্য তাঁর সামনে ভারতীয় সঙ্গীত জগতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এ বিষয়ে তাঁর নিজের অভিমত এই যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-সঙ্গীত দিয়ে আরম্ভ করলে এত সহজে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মর্মে পৌঁছতে পারতেন না। অবশ্য যে কোন বিদেশী

সঙ্গীত মাত্রেরই যন্ত্র-বিভাগ কণ্ঠ-বিভাগের চাইতে অনেক বেশী অনুভূতি-গম্য। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ লাইডেন ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি ভারত ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক বিনিময়ের কথা বলেন। বাকে তখনও ছাত্র। তাই কবির আহ্বানে তখন সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় নি তাঁর পক্ষে।

এর পর ১৯২৫ সালে তিনি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে যান। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত অধ্যয়ন। পণ্ডিত বিমল শাস্ত্রীর সহায়তায় তিনি গবেষণা শেষ করলেন। বিষয়বস্তু হল "কনট্রিবিউশন টু দি নলেজ অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক"। এই গবেষণার জন্য তাঁকে সংগীত রত্নাকর ও সঙ্গীত-দর্পণের সাহায্য বিশেষভাবে নিতে হয়েছিল।

শান্তিনিকেতনে তিনি ছাত্রদের ফ্রেঞ্চ ও জার্মান শেখাতেন। তাঁর স্ত্রীও জার্মান ভাবায় অধ্যাপনা করতেন। শ্রদ্ধেয় মনোমোহন ঘোষ জাভার সংস্কৃতির ওপর ডাচ্ প্রভাব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ডক্টর বাকের কাছে ডাচ্ শিক্ষা করেন।

রবীন্দ্রনাথের দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে স্মৃতির ভারে বিষণ্ণ মনে হল। "কি সুন্দর ছেলেই ছিল নীতু! যেমন চেহারা, তেমনি শেখার আগ্রহ, তেমনি প্রতিভা। জার্মানী যাবার আগে তাকে কিছুদিন জার্মান পড়িয়েছিলাম। কিন্তু যাবার কয়েকমাস পরেই তো মারা গেল। রবীন্দ্রনাথের বংশধরদের মধ্যে নন্দিতা ছাড়া কেউই বেঁচে নেই।"

কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম "আর কি কি ভাষা জানেন আপনি?" "বিশেষ কিছুই না। আরবী আর হিব্রুটা জানি।"

এ সময় শান্তিনিকেতনে বিদেশী মনীষীদের মেলা। ডক্টর বাকে যাঁদের দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইটালীয়ান প্রফেসর তুচি ও ফর্মিক, ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া, রুশ অধ্যাপক বগদানফ। তা'ছাড়াও প্রাগ থেকে এসেছিলেন প্রফেসর লেসনী, বুদাপেস্ট থেকে অধ্যাপক গামানোস।

"সুন্দর সৌহার্দময় আবহাওয়া ছিল আশ্রমে। ক্ষিতিবাবুর কাছে আমার বাংলা শেখায় হাতে খড়ি, আর দীনুবাবুর কাছে গানের। রথীবাবু, মীরা দেবী সকলের সাথেই ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল। বুড়ীকে (নন্দিতা কৃপালনী) কত ছোট দেখেছি! নন্দবাবু, ইন্দিরা দেবী সবার কথাই মনে পড়ে।"

কিন্তু ১৯৩০ সালে যখন আবার ৪ বছরের জন্য ভারতবর্ষে যান তখন প্রাচ্য-দেশীয় ও প্রতীচ্যবাসীদের মধ্যেকার সেই প্রাণখোলা ভাবটায় ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। তা—সে রাজনৈতিক কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক। এবারের যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল লাইডেন ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ভারতীয় লোক-সঙ্গীতের সমীক্ষা।

আবার ১৯৩৭ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে ভারতে এলেন ডক্টর বাকে। ভারতীয় সঙ্গীত ও ধর্মীয় নৃত্য সম্বন্ধে গবেষণা করার এই প্রচেষ্টাকে যাঁরা আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাই সবার আগে গুরুদেবের আশীর্বাদ নিতে এলেন ডক্টর বাকে। এই তাঁর কবির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

"এর পর দীর্ঘকাল কেটেছে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমায়। সেখান থেকে গুজরাট, বম্বে, সিন্ধু, রাজপুতানা ও পাঞ্জাব ঘুরেছি। এই দীর্ঘ পথ অতিবাহিত হয়েছে ট্রাকে। কলকাতার দিকে আর আসা হয় নি। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনলাম দেরাদুনে।"

যুদ্ধের সময় পেট্রোলের কড়াকড়ি হল। বিদেশী গবেষণাকারী ও অধ্যাপক হিসাবে তাঁর ওপর এ ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি না হলেও আরও পাঁচটা অসুবিধায় কাজের ব্যাঘাত হতে লাগল।

১৯৪১ সালে দিল্লী রেডিওতে ভারতীয় সঙ্গীতের উপদেষ্টা হিসাবে যোগ দিলেন। তারপরই কলকাতা রেডিওতে এলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিভাগের পরিচালক হয়ে। ১৯৪৩ সাল অবধি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরের তিন বছর ডক্টর বাকে কীর্তন শেখায় মনোনিবেশ করেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁকে কীর্তন শেখান। নবদ্বীপ ব্রজবাসীও যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁর সাথে ডক্টর বাকে বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে কয়েকটি ঠাকুর-বাড়ীতে কীর্তন পরিবেশন করেন।

আমি বললাম, "ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে একজন বিদেশী হিসাবে কিছু বলুন।"

বললেন "আমাকে দিয়ে বিদেশী শ্রোতাকে বিচার কোর না। ভাগ্যক্রমে প্রথম থেকেই আমি ভারতীয় সঙ্গীতে রস পেয়েছি। তবে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-সঙ্গীতের রস পেতে আমার বহু দিন লেগেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমার কাছে মর্মস্পর্শী মনে হয়েছে। ধর "জীবনে যত পূজা হল না সারা" ঐ গানের কথা ও সুর কত সহজ অথচ কত গভীর!

"আমি ভারতীয় সঙ্গীতের ধর্মীয় দিকটা নিয়েই গবেষণা করেছি। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হই পাখোয়াজ বাজানো শুনে। ১৯২৬ সালে কবির সাথে লক্ষ্মৌয়ের সঙ্গীত-সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীত যথেষ্ট উপভোগ করেছিলাম। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের বাজনা সেই বোধহয় প্রথম শুনি। রবিশংকর যখন বার বছরের ছেলে তখন তার বাজনা শুনি মিহিরবরণের বাড়ীতে। তিমিরবরণ, আলি আকবর, বিলায়েৎ সবাইকেই চিনি এবং এদের সবার বাজনাই শুনেছি। খুব ভাল কথাকলি দেখবার সুযোগ হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। কথাকলি নিঃসন্দেহে বিরাট শিল্প। মণিপুরী প্রথম দেখি শান্তি-নিকেতনের মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষকের কাছে। খুব নামকরা শিল্পীর ভারত-নাট্যম দেখার সুযোগ হয় নি। কথক দেখেছি বহু পরে।

"উদয়শংকরকে প্রথম চিনি শান্তি-নিকেতনে, তারপর বম্বেতে। দেরাদুনে থাকবার সময় আলমোড়ায় তাঁর শিক্ষা-লয়েও গেছি। উদয়শংকরই বোধহয় প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতে জাভার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন। হল্যাণ্ডেও তাঁর নাচ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

"ভারতীয় নৃত্যে মূলতঃ ধর্মীয়। অনুষ্ঠানগুলি এবং কাহিনীগুলি মোটা-মুটি সেই দিকেই ইঙ্গিত করে।"

"কীর্তন কেমন লেগেছিল?"

"খুব—খুব ভাল।"

"আপনি শেষ কবে ভারতে গেছেন?"

"১৯৫৫ সালে। সেবার মোটামুটি নেপালেই ছিলাম। এবারও উদ্দেশ্য ছিল লোক-সঙ্গীত ও নৃত্য দেখা।"

"আবার কবে আসছেন বলুন?"

"ইচ্ছে আছে এদিককার ব্যবস্থা করতে পারলে অন্ততঃ বেশ কিছু দিনের জন্য ভারতে থাকার। অল্পদিন থেকে কোন কাজ হয় না।"

বললাম "আগে থাকতেই স্বাগতঃ জানিয়ে রাখলাম।" ডক্টর বাকে মোটামুটি বাংলা জানেন। বললেন, "ধন্যবাদ।"

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প

(মেক্সিকো)

প্রেমের আলেখ্য

এর্নেস্টো র‍্যামন লার্বিহো

।। শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প ।।

দেশ-বিদেশের প্রধান পুলিশ-অধিকর্তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত এই রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

লড়াই তখন সবে জমে উঠেছে। একটা মসৃণ কালো ষাঁড় শিংয়ের প্রচণ্ড গুঁতোয় প্রায় রক্তাক্ত করে ফেলেছে একজন মাটাডোরকে। তীক্ষ্ন নৈঃশব্দ্য চারদিকে, কালো ভারি নৈঃশব্দ্য থমথম করছে। চতুর্দিকের গোলাকৃতি মঞ্চে অসংখ্য দর্শক এক তীব্র মুহূর্তের চূড়ায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে সেই দৃশ্যের ক্রমবিকাশ আর যেন কাঁপছে উত্তেজনায়, যেন কেউ টান টান করে বেঁধে দিয়েছে তাদের স্নায়ু, শিরা-উপশিরা।

সেই টান-করে-বাঁধা স্নায়ু, প্রবল নৈঃশব্দ্য আবার মাঝে মাঝে শিথিল হয়ে আসছে—ও ভাই যখন এক পর্যায় থেকে পৌঁচচ্ছে অন্য পর্যায়ে। দর্শকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে অজস্র করতালিতে। তার সমবেত ধ্বনি এবং চিৎকার কখনও ষাঁড় কখনও তার সঙ্গে চতুর খেলায় মত্ত মাটাডোর এবং তার দলবলের প্রতি সহস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে।

আমি বসেছিলাম গোল মঞ্চের বিকেলের এই আনন্দটুকুর ওপর যবনিকা টেনে এক্ষুনি উঠতে হবে আমাকে। খুব বিরক্তি লাগল। কারণ, আমার অতি-ব্যস্ত জীবনে আনন্দের ফালিটি অতি সঙ্কীর্ণ। তারও মধ্যে এই উৎপাত কি ভালো লাগবার কথা! এখন, এই তীব্র মুহূর্তে পৃথিবীর কোন দুঃখরই কিছুমাত্র অর্থ নেই আমার কাছে, কোন দুর্ঘটনার খবর শুনতেও চাই না আমি। কেই বা চায় হঠাৎ কোন দুঃসংবাদ এসে এই অনৈসর্গিক আনন্দকে মাটি করে দিক, মনকে ছিঁড়ে নিয়ে যাক এখান থেকে।

যেখানটায় একটু ছায়া পড়েছে। হঠাৎ দেখলাম, আমার সেক্রেটারি মার্টিনেজ হন্তদন্ত হয়ে মঞ্চের ধাপে ধাপে হুড়-হুড় করে নামছে এবং আসছে আমারই দিকে। ওর ওভাবে ছুটতে ছুটতে আসা মানেই একটা কিছু ঘটেছে কোথাও এবং

আমাদের এমন কি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে পারে যার জন্য এক্ষুনি ছুটতে হবে আমাকে? যাই ঘটুক আমি উঠছি না—অন্তত যতক্ষণ না মাটাডোর মেঘের মত কালো ষাঁড়টাকে খতম করে দিচ্ছে—আর তারপর লাশটা টেনে এনে ফেলে দিচ্ছে মাঠের বাইরে।

মার্টিনেজ ইতিমধ্যে আমার পাশে এসে হাজির হয়েছে। আমাকে এভাবে বিরক্ত করতে আসার জন্য সে নাকি খুবই দুঃখিত। অথচ উপায়ও ছিল না, কেননা একটা খুন হয়েছে এবং তার সঙ্গে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত। আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে সেখানে।

অত্যন্ত শান্ত গলায় মার্টিনেজ তার বক্তব্য পেশ করল। কেননা সে জানত, ভালো করেই জানত কি জবাব আসবে আমার কাছ থেকে, কি মনে করব আমি। পুলিশের বড়কর্তা হলেও আমি মেক্সিকোর লোক ত বটে। আমি কেন, এ অবস্থায় এ দেশের যে-কোন লোকের মনোভাব ঠিক আমারই মত হতো।

'হবে, হবে, সব কাজ ঠিক সময়মতই হবে', তাকে বললাম আমি, 'আপাততঃ খুন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বসে পড়ো আমার পাশে। লড়াইটা দেখি, ঐ ষাঁড়টাকে খুন করুক মাটাডোর, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়। তাছাড়া দেখো, যে একবার মরেছে সে ত আর বাঁচবে না। আমার ত মনে হয় না আমাদের একটু দেরী হলেও মৃত লোকটি কিছু মনে করবে। এই অপরিসীম কালের মধ্যে এক আধ মিনিট সময়ের দামই বা কি বলো?'

মৃদু হাসল মার্টিনেজ এবং বাক্যব্যয় না করে বসে পড়ল আমার পাশে।

ষাঁড়টা মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে, প্রচণ্ড রাগে মাটি খুঁড়ছে খুর দিয়ে। তারপর তার সমস্ত শরীরে জোর ঝাঁকুনি দিল একটা। পিঠে বেঁধা ছোট ছোট বর্শাগুলো বড়ো বিরক্তিকর। হঠাৎ মনে হল, মাটাডোর ভিলাসকোয়েজকে যেন ঠিক দেখতে পেয়েছে সে: না—তার হাতের লাল কাপড়টা নয়, তাকেই। তৎক্ষণাৎ শিং নামিয়ে তীরের মত ছুটল ষাঁড়টা। ভেলাসকোয়েজ তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল দু'পা জোড় ক'রে লাল কাপড়টা এক পাশে ধরে। তার উজ্জ্বল পোষাকে অজস্র নক্ষত্রের দ্যুতি। ষাঁড়টা তেড়ে আসতেই তাকে ঘুরিয়ে দিল তার চারপাশে, তার গা ঘেঁষে। এতো কাছ দিয়ে যে তার পিঠের ক্ষতমুখ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ছিটকে এসে ভেলাসকোয়েজের জামায় প্যান্টে লাল দাগ ধরিয়ে দিল।

হাততালি আর চিৎকারের ঝড় উঠল চারদিক থেকে। ভেলাসকোয়েজ ষাঁড়টাকে ঘোরাতে লাগল তার চারপাশে। প্রায় গোটা বারো পাক খাইয়ে হাতের লাল কাপড়টা ফেলে দিল সে এবং আর এক টুকরো লাল কাপড়ের আড়ালে তলোয়ার তুলে নিল একটা।

খেলা তখন চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে। এবার ষাঁড়টাকে মারবে ভেলাসকোয়েজ। মারবার আগে বিচারকদের অনুমতি নিল সে, একটি সুন্দরী মেয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল ষাঁড়টাকে, তারপর মাঠের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে শিং নিচু করে ছুটে এল ষাঁড়টা। শুধু একটি মুহূর্ত। সময়ের এই একটি বিন্দুর মধ্যে যেন অপরিসীম নৈঃশব্দ্য, মৃত্যুর মুখোমুখী এক চরম সত্য বিস্ফারিত। বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল ভেলাসকোয়েজের তলোয়ার এবং চক্ষের নিমেষে দুই শিং-এর ভেতর দিয়ে কাঁধ চিরে ঢুকে গেল। পনেরো শ' পাউণ্ডের সেই বিশাল শরীর তার প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে টলে উঠল একবার, ভেঙে পড়ল হাঁটুর ওপর এবং তারপর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

আমরা যখন উঠে এলাম ভেলাসকোয়েজ তখন ষাঁড়টার লেজ এবং কান নিয়ে মাঠের চারদিকে ঘুরছে। চারদিকে চিৎকার এবং অভিনন্দনের ঝড় বইছে। দর্শকরা ফুল, টাকা, মাথার স্কার্ফ, টুপি—যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছে ছুঁড়ে মারছে।

মাঠ থেকে বেরিয়ে সোজা খুনের জায়গায় হাজির হলাম। বাড়িটা হাল্কা লাল রংয়ের এবং অভিজাত। ঠিকানা—১৭নং বাড়ি আভিয়েন্দা ইনসার্জেন্টস। 'ক্রিমিন্যাল আইডেন্টিফিকেসন ল্যাবরেটরি'-র বড়কর্তা আন্তোনিও বি, কুইজানো, তাঁর সহকারী এবং পুলিশ অফিসার ম্যানুয়েল কারভানো আমাদের আগেই এসে পৌঁচেছেন সেখানে। খুনটা আবিষ্কার করেছে ম্যানুয়েলই। ও এলাকার চৌকিদার সে। বাড়ির পেছনের দরজার চাবি ছিল তার কাছে, বাড়ির মালিকই দিয়েছিল তাকে।

'ভদ্রমহিলার বাড়ি এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনো করতাম আমি, কিছু টাকাকড়িও পেতাম', বলল ম্যানুয়েল, 'একা থাকতেন ভদ্রমহিলা। আমি খুশী হয়েই ও'র কাজ করতাম। রোজ আসতাম একবার করে। আজ এসে দেখি এই কাণ্ড। দেখে আমার মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল বুঝতেই পারছেন।'

জিনিসপত্র সব ওল্টানো-পাল্টানো, ভাঙা-চোরা যেন কোন উন্মাদ এসে তচনচ করে রেখে গেছে সুন্দর করে সাজান বাড়িটাকে। একটা জিনিস আস্ত নেই। বিছানা, কৌচ কমফর্টার কেটে ছিঁড়ে রেখেছে, দামী কম্বলগুলো টুকরো টুকরো করেছে, ফরাসী চিনেমাটির ফুলদানি, টেবল-ল্যাম্প ভেঙে চুরমার করেছে, মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছড়িয়ে রেখেছে মেঝের ওপর, ড্রয়ার খালি করে স্তূপাকার করেছে জিনিসপত্র এবং তার ওপর উপুড় করে ফেলেছে পাউডার।

ভেতরের থাকবার ঘরের অবস্থাও তেমনি। প্রাচীন স্প্যানিশ ছবি, সূক্ষ্ম কারুকাজকরা আসবাবপত্র, চেয়ার—সব উল্টেপাল্টে ভেঙে-চুরে রেখে গেছে। তাছাড়া শ' কয়েক চিঠি ছড়ানো রয়েছে মেঝের ওপর।

আর চারদিকের এই বীভৎস ধ্বংসের মধ্যে পড়ে আছে একটি সুন্দরী মধ্যবয়সী নারীর শরীর, মাথাটা থেঁতলে ভেতরে ঢুকে গেছে।

'এই ভদ্রমহিলাই জাসিন্তা অবনাজ', বলল ম্যানুয়েল।

'ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে কি জান তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

চিন্তার ছাপ পড়ল ম্যানুয়েলের মুখে; 'খুব রহস্যজনক ছিলেন মহিলা।'

ম্যানুয়েলের সরল স্বভাব হাসাল আমাকে, 'মেক্সিকোতে এরকম রহস্যজনক মহিলার কি অভাব আছে, ম্যানুয়েল? ভদ্রমহিলার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তুমি কি জান বলো।'

'ভদ্রমহিলা বাড়ি থেকে প্রায় বেরুতেনই না, কোন বিশেষ উপলক্ষ্য থাকলে অবিশ্যি বেরুতেন। তাছাড়া বাড়িতেই থাকতেন, একা। চাকর খাবার দিয়ে যেত। মহিলার বন্ধু-বান্ধব কে ছিল, কারা ছিল আমি জানি না।'

ম্যানুয়েল যাই বলুক, শরীরে যার অতো সৌন্দর্য সে এভাবে একা প'ড়ে থাকত একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না আমার। তাছাড়া এতো প্রেমপত্রই বা এলো কোথা থেকে?

ইতিমধ্যে পুলিশ ফোটোগ্রাফার মিগুয়েল আলভারেজ এলো এবং খুনের দৃশ্যাবলী আর তার চারদিকের স্তূপাকার ধ্বংসের ছবি তুলতে লাগল।

'অনেক চমৎকার চমৎকার ছবি রয়েছে বাড়িটাতে', বললাম মিগুয়েলকে, 'বেশ কয়েকটা দেয়াল জুড়ে লাইন করে টাঙান মেক্সিকোয় তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে দেখছি।'

মিগুয়েল হাসল, বলল, 'আমি এর চেয়ে অনেক ভালো ছবি তুলি।'

'তোমার চরিত্রে বিনয় নামক গুণটির অভাব আছে, মিগুয়েল,' বললাম তাকে। কিন্তু মনে মনে আমি ভাল করেই জানতাম, এ শহরে ওর মত ফোটোগ্রাফার আর দ্বিতীয় নেই এবং নিজের সম্বন্ধে সে বিশ্বাস রাখবার অধিকারও ওর আছে।

ছবিগুলো দেখে খুব অবাক হলাম। মেক্সিকোর নামজাদা লোকদের ছবি সব—

কেউ ডাক্তার, কেউ শিল্পপতি, কেউ উকিল। ছবিগুলো উৎসর্গ করা হয়েছে জাসিন্তাকে; ছবির পেছনে উৎসর্গের সব বিচিত্র ধরনে লেখা। তার কোনটা আবেগে ভরপুর, কোনটায় প্রবল উচ্ছ্বাস; যেমন ঃ

'সেই একটি মাত্র নারীকে, যে আমার চেতনা থেকে বাইরের পৃথিবীকে লুপ্ত করেছিল।'

'জাসিন্তা, মেক্সিকোর ফুল তুমি, আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো। তোমারই...........'

'জাসিন্তা, তামাম দুনিয়ায় তোমার তুলনা নেই, তুমি আমার গভীর প্রেমের উপহার গ্রহণ করো।'

'তোমার আলিঙ্গনে স্বর্গ; আমার জীবনে নতুন অর্থ যোজনা করেছ তুমি, তোমাকে ধন্যবাদ।'

কিছু ছবির উৎসর্গে আবার জাসিন্তার স্তুতি নেই, তার নানারকম গুণের বর্ণন রয়েছে ঃ

'মেক্সিকোর সবসেরা জ্যোতিষীকে—অসীম কৃতজ্ঞতাসহ।'

'হস্তাক্ষরবিদ জাসিন্তাকে—যার গণনা নির্ভুল, অভ্রান্ত।'

'এ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মোহনবিদ্যা-বিশারদ জাসিন্তাকে।'

একে একে সব ছবিগুলি পরীক্ষা করলেন আন্তনিও বি, কুইজানো, কিন্তু কোন ছবিতেই আঙুলের কোন ছাপ নেই।

'আচ্ছা, আন্তনিও, যারা এতো আবেগ দিয়ে উৎসর্গ রচনা করেছে তারা আঙুলের ছাপ এড়াবার জন্যে এতো পরিশ্রম করবে কেন? কি মনে হয় তোমার?'

মাথা নাড়ল আন্তনিও। ব্যাপারটা তারও বোধগম্য হচ্ছে না।

'ছবিগুলো ল্যাবরেটরিতে নিয়ে চল, আবার পরীক্ষা করবো।'

আমরা তখনও বাড়িময় হাতড়ে বেড়াচ্ছি, যদি কিছু খুঁজে পাই। হঠাৎ একজন খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা এক টুকরো কাগজ এনে দিল। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১—তারিখের খবর ঃ

'জাসিন্তা অবনাজ কয়েক মাসের জন্য স্পেনে যাচ্ছেন। ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর বাড়ি তালাবন্ধ থাকবে। তিনি ফিরে আসার আগেই তাঁর অনুরাগীদের সে খবর জানিয়ে দেওয়া হবে।'

অনুরাগী? কে তারা? ছবির ঐ লোকগুলো নয়তো? ঐ উৎসর্গগুলো কি তা হলে জাসিন্তার এতোগুলো প্রেমের নিদর্শন নাকি? কেমন অবিশ্বাস্য মনে হল আমার। তাছাড়া হস্তাক্ষর-বিচার, সম্মোহনবিদ্যা ইত্যাদির সঙ্গে এর সম্পর্কই বা কি?

বুঝতে পারছিলাম না। মনে হল এর চেয়ে ষাঁড়ের লড়াই দেখাই ভাল ছিল, সময়টা আনন্দে কাটান যেত। এই দুর্বোধ্য রহস্যের মধ্যে পড়ে মাথার চুল ছিঁড়তে হত না।

বাড়িটা পাহারা দেবার জন্য একজন লোক রেখে আমি চলে এলাম। চিঠিগুলো আমার অফিসে পেঁছে দিতে বললাম তাকে। আগামীকাল দেখব। জাসিন্তার মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল তখন। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকেও খুন সম্বন্ধে কিছু তথ্য হয়ত পাওয়া যাবে। মার্টিনেজকে বললাম মাদ্রিদের পুলিশদপ্তরে তার পাঠাতে। ওরা যদি কিছু খোঁজ-খবর দিতে পারে।

সেখান থেকে বেরিয়ে ফের ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গেলাম। শেষ লড়াইটা তখন সবে শুরু হয়েছে। যাক্, রোববারটা তবু পুরোপুরি মাঠে মারা গেল না।

সোমবার দুপুরবেলা আন্তনিওর রিপোর্ট পেলাম। কোন ছবির ওপরই আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি। মাদ্রিদ পুলিশদপ্তর থেকেও তার এলো ঃ

জাসিন্তা অবনাজ স্পেনে এসেছিলেন সম্রাট আলফানসোর অতিথি হয়ে—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ। তিনি রাজপ্রাসাদেই থাকতেন। বিস্তৃত খবর পরে জানাচ্ছি।'

'স্পেন-সম্রাটের সঙ্গে জাসিন্তার কি সম্পর্ক ছিল—উপ-পত্নীর না বন্ধুর? না সম্রাটের জ্যোতিষী ছিল জাসিন্তা? কিছুই জানি না। এ তো সুরেনেদের ব্যাপার এবং আমার অজ্ঞাত। এখানকার এই শহরের যে-সব খবর জানা গেছে তাও কম জটিল নয়। সুতরাং শহরের এ-সব বিখ্যাত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে সাবধানী হতে হবে আমাকে। নচেৎ কিছু অবাঞ্ছিত খোস-গল্পের সৃষ্টি হতে পারে এবং কিছু নির্দোষ লোকও জড়িয়ে যেতে পারে তার জালে।

ছবিগুলোর মধ্যে একজন ডাক্তার এবং একজন সেনাবাহিনীর অফিসার আমার বিশেষ বন্ধু। তারা বহুবল্লভা এক মহিলাকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছিল এটা আমি ভাবতে পারছিলাম না। অবশ্য আমি নিশ্চিত জানতাম, জিজ্ঞেস করলে তারা সব কথা খুলে বলবে আমাকে, গোপন করবে না কিছু।

মাদ্রিদে আমি আবার তার করলাম। খবর এলো, 'জাসিন্তা এর আগে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও একবার স্পেনে গিয়েছিলেন এবং সেবারও স্পেন-সম্রাটের অতিথি হয়ে ছিলেন। সেবার ওখানকার একজন রাজতন্ত্র-বিরোধী সাংবাদিকের সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল তাঁর।'

অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে খুনের কোন

সম্পর্ক আছে একথা আমি কখনই ভাবি নি। আমার কেমন মনে হয়েছিল খুনের হদিশ এই শহরেই পাওয়া যাবে, অন্য কোথাও নয়।

আমাকে সাহায্য করার লোকের অভাব ছিল না। বেশ কয়েকজন ডিটেক-টিভ তদন্তের কাজ করছিল। ছবির পেছনের লেখাগুলো বিশ্লেষণ করে জন কুড়িকে জাসিন্তার প্রেমিক বলে মনে হল আমাদের। বাকি কতজন জাসিন্তার কাছ থেকে নানারকম সাহায্য নিয়েছে মাত্র, প্রেমে পড়ে নি।

জাসিন্তার অতীত জীবন সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিলাম। জাসিন্তার জন্ম হয়েছিল য়ুকাটান-এর পাহাড়ী অঞ্চলে, প্রাচীন পিরামিডের দেশ সেটা, অধি-বাসীরা সূর্য-সাধক। পিতা ধনী ছিলেন। জাসিন্তার বয়স যখন তেইশ তখন তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরেই জাসিন্তা চলে আসে মেক্সিকোতে।

মেক্সিকোর কাউকেই চিনত না জাসিন্তা। যিনি তার প্রথম পড়শী হয়ে-ছিলেন তাঁর কাছে শুনলাম, জাসিন্তা খুব লাজুক ভীরু প্রকৃতির মেয়ে ছিল। কোন পুরুষের সঙ্গে কখনও কেউ তাকে বেরুতে দেখে নি। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া টাকা সে পড়াশুনোয় ব্যয় করত। মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করত। সেখানেও মিশত না কারো সঙ্গে, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকত।

ভাষা শিখবার আগ্রহ জাসিন্তার চরিত্রগত। তার লাইব্রেরীই তার প্রমাণ। ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান এবং তার নিজের ভাষায় লেখা অজস্র বই দিয়ে ভর্তি তার লাইব্রেরী। ফ্রয়েড, ম্যাডলার-এর বই ত শেলফ্-এ রয়েছেই, তাছাড়া হস্তাক্ষরবিশ্লেষণবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যার বইও কিছু কম নয়।

অফিসে বসে খুন সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট পড়ছি আর অপেক্ষা করছি এক-জন বন্ধুর জন্য। জাসিন্তার ঘরে বন্ধুটির ছবি পাওয়া গেছে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব তাকে। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল, একটু ফাঁক হল দরজাটা এবং একজন ডিটেকটিভের মুখ দেখা দিল :

'জানেন, একটা গোপন ড্রয়ার খুঁজে পেয়েছি আমরা—ছবি আর প্রেমপত্রে বোঝাই। বাপ্‌রে বাপ্, কী প্রেম-পাগলাই ছিল মেয়েটা!'

একটু উল্টে-পাল্টে দেখলাম চিঠি-গুলো। শুধু প্রেম এবং উচ্ছ্বাস।

বন্ধুবর এলেন। ধরুন তাঁর নাম ডাঃ আলবের্তো মোরিনস্।

'কি হে, ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছ কেন হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করলে আলবের্তো।

'খুব একটা সাংঘাতিক কারণ কিছু নেই', বললাম তাকে, 'তবে একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য আমার দরকার। কিন্তু সে কথা পরে হবে, গতকালকার ষাঁড়ের লড়াইয়ের খবরটা বল আগে।'

আলবের্তোও গতকাল ষাঁড়ের লড়াই দেখতে গিয়েছিল। আমি লড়াইয়ের যেটুকু দেখতে পারিনি তার খবরটা জেনে নিয়ে কাজের কথা পাড়লাম :

'জাসিন্তাকে চিন ত তুমি? জাসিন্তা অবনাজ?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'জাসিন্তা অবনাজ? না!'

'কেন লুকোচ্ছ, বলেই ফেল না সত্যি কথাটা। ভয় নেই, আমি তোমার গিন্নিকে লাগাতে যাব না।'

মেক্সিকোর বিখ্যাত ডাক্তার আল-বের্তোর মুখে স্পষ্টই বিরক্তির ছায়া পড়ল। বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনের। আমি যাদের কাছে যাই তাদের সবাইকেই তো তুমি চেনো। সত্যি বলছি, জাসিন্তা বলে কাউকে চিনি না আমি। অবশ্য হতে পারে মহিলা আমার পরিচিত, কিন্তু ও নামে নয়।'

আলবের্তোকে তার ছবি এবং ছবির পেছনের লেখা দেখালাম :

—'প্রিয়দর্শিনী জাসিন্তাকে প্রেমের কোন অনুভূতিই যার অজানা নয়।—ইতি তোমারই আলবের্তো।'

ডাক্তারের মাথায় যেন বাজ পড়ল; বলল, 'হ্যাঁ, এ ছবি আমারই, রোটারি ইণ্টারন্যাশনালের সভার জন্যে তোলা হয়েছিল। হাতের লেখাটা আমারই মত, কিন্তু আমি লিখি নি। জালিয়াতি, স্রেফ জালিয়াতি এটা। বিশ্বাস করো, আমার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'তোমার সঙ্গে জাসিন্তার প্রেম থাকলেও আমার কিছু মনে করার নেই,' বললাম আলবের্তোকে, 'আমার উদ্দেশ্য খালি সত্য কথাটা খুঁজে বের করা। জাসিন্তার হত্যাকারীকে ধরতেই হবে আমাদের।'

আলবের্তোকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবার ছিল না। কেননা, এ ব্যাপারের সঙ্গে আলবের্তো যে জড়িত নয় সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। সুতরাং তার সময় নষ্ট করেছি বলে ক্ষমা চাইলাম এবং ঠিক আগের মত হাসি-মুখে বিদায় দিলাম তাকে।

আলবের্তো চলে যেতেই ছোঁ মেরে টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। স্যানবোর্ন রেস্তোরাঁয় এক ক্যাপ্টেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার কথা। রেস্তোরাঁটির খ্যাতি জগৎ-জোড়া। বড় বড় ব্যক্তিরা যাতায়াত করেন এখানে। প্রচুর ট্যুরিস্টও আসে। তাদের কাণ্ড-কারখানা দেখবার জন্যে আমি মাঝে মাঝে যাই ওখানে।

ঢুকতেই দেখলাম সব বসে আছে—সেই ছোটখাটো বৃদ্ধা মহিলা টাকার হিসেব কষছে। পরিবারের লোকজনদের জন্যে টুকিটাকি সব জিনিস কিনবে। টেক্সাসের সেই লোকটিও আছে; কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ঘোড়ায় চড়বার পা-দানি দুটো আনে নি আজ। একদল স্কুল-মাস্টার গোল হয়ে বসে স্প্যানিশ উচ্চারণ দুরস্ত করছে, অথচ ওয়েট্রেস মহিলা তাদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছে না।

ক্যাপ্টেন এলো। অন্য দু'একটা কথা বলে আসল কথা পাড়লাম।

ডাক্তারের মত ক্যাপ্টেনও সব অস্বী-কার করলেন। বলল, ছবিটা তারই, হাতের লেখাও তার মতই, কিন্তু সে লেখে নি। তাছাড়া জাসিন্তাকেও সে চেনে না।

যাঁদেরই ছবি বা চিঠি পাওয়া গেছে তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই দেখা করলাম। কিন্তু একই কথা বললেন সবাই, 'এই ছবি আমার, হাতের লেখাও আমারই মত, কিন্তু আমি লিখি নি।'

জন কুড়ি অবশ্য স্বীকার করলেন যে তাঁরা জাসিন্তার বাড়ি গেছেন—কেউ সম্মোহনবিদ্যা শিখতে, কেউ মনঃ-সমীক্ষণের পার্টিতে। কেউ আবার হস্তাক্ষর-বিচারে জাসিন্তার প্রতিভাকে নিজের কাজেও লাগিয়েছেন। হাতের লেখা দেখে লেখকের চরিত্র নাকি নির্ভুল-ভাবে বলতে পারত জাসিন্তা।

ভাবছিলাম এঁদের মধ্যেই কেউ খুন করেছে কিনা জাসিন্তাকে। এই দেখা-সাক্ষাৎ থেকে সেটা বোঝা গেল না ঠিকই, কিন্তু দুটো ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রথমতঃ, এঁরা কেউ-ই জাসিন্তাকে ছবি দেন নি; দ্বিতীয়তঃ, এঁরা সবাই একজন ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন এবং সে শহরের সেরা ফোটোগ্রাফার—মিগুয়েল আলভারেজ।

যাঁদের ছবি পাওয়া গেছে তাঁরা সকলেই নামী লোক। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারটা তাঁদের অনেকেরই পছন্দসই হল না। কেননা, এই নিয়ে তাঁদের পরিবারের মধ্যে গণ্ডগোল বাধতে পারে। তাছাড়া খুনের সঙ্গে নিজেকে কেই বা জড়াতে চায়। নামী বলেই বদনাম রটলে এঁদের যেমন প্রচুর ক্ষতি হতে পারে, তেমনি তার বিরুদ্ধে লড়বার শক্তিও আছে তাঁদের।

একজন ত পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'ভাববেন না আপনাদের এই অপমান আমি মুখ বুজে সহ্য করব। রাষ্ট্রপতির ভাই আমার আত্মীয়। আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের লোকজনদের মধ্যে যাতে সুবুদ্ধি ফিরে আসে আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

এই বিপদের মধ্যে আর এক বিপদে পড়লাম মিগুয়েলকে নিয়ে। ছবিগুলো

সবই তার তোলা যদিও সে পুলিশের ফোটোগ্রাফার। আমার চিন্তা তাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে লাগল।

চিঠি এবং ছবিগুলোর হাতের লেখা বিচার করতে পাঠালাম। রিপোর্ট এলে দেখলাম, আমাদের ধারণাই ঠিক। সব একই ব্যক্তির লেখা এবং ব্যক্তিটি জাসিন্তা।

এর ব্যাখ্যা একাধিক হতে পারে। জাসিন্তা হয়ত বদনামের ভয় দেখিয়ে সুবিধে আদায়ের জন্য এ কাজ করে থাকতে পারে; অথবা তার অনুরাগীদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার করা তার উদ্দেশ্য ছিল, কিংবা এমনও হতে পারে যে এই সব নামী লোক তাকে ভালবাসে—এ কথা কল্পনা করে আনন্দ পেত সে।

ফোটোগ্রাফার মিগুয়েলকে ডাকালাম। মিগুয়েলই বলতে পারবে তার তোলা ছবি জাসিন্তার হাতে গেল কি করে। রবিবার বিকেলে মিগুয়েল জাসিন্তার মৃতদেহ এবং তার বাড়ির ধ্বংসস্তূপের ছবি তুলেছে। অথচ তখন ও একবারও বলল না যে, জাসিন্তাকে সে চেনে। ছবিগুলোতে আঙুলের দাগ নেই কেন তারও হয়ত কিছু হদিশ দিতে পারবে মিগুয়েল।

মিগুয়েল এলো। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কত দিন কাজ করছ, মিগুয়েল?

'দশ বছর।'

'আচ্ছা মিগুয়েল, এবার সেই কাহিনীটা বল তো আমাকে যেটা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল তোমার।'

মিগুয়েল যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করল। যেন কোথা থেকে শুরু করবে, কি বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

'আমি জানি আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়,' শুরু করল মিগুয়েল, ভেবেছিলাম কেউ জানবে না, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম আপনার কাছে। জাসিন্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেলেছেন আপনি। সুতরাং সব কিছুই খুলে বলব আপনাকে।'

আমি কিন্তু কিছুই জানতাম না, তবু ভাব করলুম যেন সবই জানি। বললাম, 'তুমি ত জান মিগুয়েল কোন গোপন ব্যাপারই আমাদের কাছে গোপন থাকে না। তাছাড়া কোন কিছুই চিরকাল লুকিয়ে রাখা যায় না।'

মিগুয়েল বুড়ো আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ—, তারপর বলল, 'আপনি জানেন আমার বাড়িতে একটা স্টুডিও আছে এবং ছবি তুলে আমি কিছু উপরি রোজগার করে থাকি। ভাল তুলতে পারি বলে আমার খদ্দেরও প্রচুর। গত কয়েক বছর ধরে আমার ছবির চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আমি ছবির কাজ করি রাত্রে অথবা ছুটির দিনে।

'প্রায় বছরখানেক আগে একদিন জাসিন্তার কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম। জাসিন্তার বাড়ি গিয়ে তার ছবি তুলতে হবে। আমি লম্বা ফি হাঁকলাম। রাজী হল জাসিন্তা। সুতরাং সেদিন রাত্রে গিয়ে তার ছবি তুললাম। আশ্চর্য ভাল হল ছবিটা। জাসিন্তা খুব খুশী। এতো খুশী যে দেহদান করে বসল আমাকে। আমি যে খুব গররাজী ছিলুম তা নয়। কেননা, সে-ই জলের মত সহজ করে দিয়েছিল কাজটাকে; তাছাড়া এমন সুন্দর বাড়ি এবং এতো অজস্র টাকার মালিক সে।

'এক বছরেরও বেশি হল আমি তার প্রেমিক। কিন্তু ভাল তাকে আমি কোনদিনই বাসিনি, আসলে আমার নজর ছিল তার স্তূপীকৃত টাকার ওপর।'

'কত টাকা পেয়েছিলে?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় দশ পনেরো হাজার হবে।'

'তোমাকে টাকা দিত কেন? ওকে ভালবাসার জন্য?'

'না, তা নয়। প্রেমের জন্য টাকা দেবার পাত্রী সে ছিল না। আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কি বলুন ত?'

উত্তর না দিয়ে শুধু হাসলাম একটু।

'এই মেয়েটা পাগলের মত বিখ্যাত লোকদের ছবি জোগাড় করত।' বলল মিগুয়েল, 'ছবিগুলো নাকি সোনার খনি। জাসিন্তার বাড়িতে যারা আসত তারা মনে করত এই সব বড় বড় লোকেরা সেখানে যাওয়া-আসা করে।'

মিগুয়েলকে একগোছা চিঠি এবং একখানা ছবি দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'দ্যাখো ত ছবিটি তুমি তুলেছিলে কিনা আর চিঠিগুলো আগে কখনও দেখেছ কিনা।'

'ছবিটা আমারই তোলা, কিন্তু চিঠিগুলো বা ছবির পেছনের লেখাগুলো আগে কখনও দেখিনি আমি। ছবির পেছনে এসব কেন লিখেছিল জানেন? প্রেম আর উত্তেজনার জন্যে পাগল ছিল মেয়েটা। এসব তীব্র আবেগের কথা লিখবার সময় তার মুখে যে খুশির হাসিটি ফুটে উঠেছিল তাও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'আচ্ছা, অনুরাগীদের নিয়ে কি করত জাসিন্তা?'

সম্মোহনবিদ্যা শেখাত, সম্মোহন করে দেখাত। একবার আমাকে বলেছিল, সম্মোহিত করে তাদের দিয়ে নিজের সঙ্গে প্রেম করাত সে। আমাকে বলত — লোক জোগাড় করে নিয়ে আসতে। হাতের লেখা দেখে লেখকের চরিত্র চমৎকার বর্ণনা করতে পারত জাসিন্তা। ভুল বড়একটা হতই না এবং এই করে টাকাও রোজগার করত প্রচুর।'

মিগুয়েলের কাহিনী জাসিন্তা সম্বন্ধে আমার ধারণাকে পরিপূর্ণ করে তুলছিল। কিন্তু দুটো প্রশ্নের জবাব তখনও পাইনি। প্রথমতঃ ছবিগুলোর ওপর আঙুলের ছাপ নেই কেন; দ্বিতীয়তঃ জাসিন্তার হত্যাকারী কে?

মিগুয়েল যেন আমার মনের কথা টের পেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই খুনে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছেন?'

চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম আমি, 'নিশ্চয়ই!'

'শনিবার সারারাত আমি জাসিন্তার সঙ্গে ছিলাম। ফিরেছি রবিবার সকালে। সেদিনই বিকেলে ফের তার বাড়ি যেতে হয়েছিল বলে একটু অবাকই হয়েছিলাম আমি। যাক সে কথা। রবিবার সকালেও খুব ফুর্তিতেই ছিল জাসিন্তা, কোনরকম অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করিনি। প্রাতঃরাশের পর ওর একজন অনুরাগী এলো এবং ভেতরের ঘরে চলে গেল ওরা দুজন। আমি বাইরের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা ঝগড়া করছে। লোকটাকে চিনি না আমি। সকালে ডিউটি ছিল বলে তক্ষুনি চলে আসতে হল আমাকে, অপেক্ষা করতে পারলাম না। অপেক্ষা করা প্রয়োজন বলেও মনে হয়নি, কেননা, আমি নিশ্চিত ছিলাম কোন বিপদ ঘটলেও জাসিন্তা নিজেকে ঠিক রক্ষা করতে পারবে।'

লোকটাকে ভাল করে দেখতে পায়নি মিগুয়েল, তবে যেটুকু দেখেছে তারই ভিত্তিতে তার চেহারার একটা বর্ণনা দিল।

'দরকার হলে আমি আবার তোমাকে ডেকে পাঠাব,' বললাম মিগুয়েলকে।

মিগুয়েলের গল্পটা খুব সুবিধের ঠেকল না আমার কাছে। পুলিশের চাকরিতে এসব লোকের স্থান নেই। এই কাহিনী, জাসিন্তার সঙ্গে ওর সম্পর্ক ইত্যাদি সব কিছু আরও এক সপ্তাহ আগে বলা উচিত ছিল আমাকে।

মিগুয়েলের সঙ্গে আলোচনায় আঙুলের ছাপ নিয়ে কোন কথা আমি বলিনি। এখন মনে হল ভালই করেছি না বলে। যে চিঠিগুলো মিগুয়েলকে দেখতে দিয়েছিলাম সেগুলো পাঠিয়ে দিলাম তার আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করবার জন্যে। রিপোর্ট পড়ে মনটা একটু খারাপ হল। মিগুয়েল ওর ছদ্মনাম, আসল নাম পেড্রো গ্যালেগোস। ইতিপূর্বে ধর্ষণ এবং ডাকাতির জন্য ভেরা ক্রুজে একবার সে জেল খেটেছে।

জলের মত পরিকার হয়ে গেল সব কিছু। তৎক্ষণাৎ জনকয়েক লোককে মিগুয়েলের বাড়িতে পাঠালাম। বাড়ি তল্লাস করে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে রক্ত-মাখা শার্ট, প্যান্ট আর ছোট ভারি ডাণ্ডা পাওয়া গেল একটা।

আর পালাবার পথ ছিল না মিগুয়েলের। বাধ্য হয়ে সব স্বীকার করতে হল তাকে। বলল,

'হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি জাসিন্তাকে। ফোটোগ্রাফার হিসেবে আমি সাফল্য অর্জন করেছিলাম, আগের জীবনে আর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না আমার। জেল থেকে বেরিয়ে আমার স্ত্রী এবং মেয়ে ছাড়া সব মেয়েদের ঘৃণা করতে শুরু করলাম। মেয়ে-সম্পর্কিত সব কিছুই ঘৃণ্য হতে থাকল আমার কাছে।

'টাকার ওপর আমার লোভ অসীম এবং জাসিন্তা অজস্র টাকার মালিক। কিন্তু জাসিন্তার শরীরের অসীম ক্ষুধা, মিনিটে-মিনিটে তর্ক, ঈর্ষা, আবেগের চড়াই-উৎরাই আর সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। একটা বছর এইভাবে গেছে। তবু আমি ছাড়তে পারিনি জাসিন্তাকে কারণ আমার প্রচুর ছবি কিনত সে এবং অবিশ্বাস্য রকম বেশি দাম দিত। তাছাড়া, দরকার হলেই টাকা পেতাম তার কাছ থেকে।

'একদিন সম্মোহন শিক্ষার বৈঠক করল জাসিন্তা। আমাকে বলল বৈঠকের পর থাকতে। বৈঠক ভাঙল, লোকজন চলে গেল একে একে। জাসিন্তা আমাকে হুকুম করল তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসতে, মধুর প্রেমের কথা বলে জয় করতে তার মনকে। করলাম। পরে দেখলাম জাসিন্তা আমাদের সব কথাই টেপ রেকর্ড করে নিয়েছে।

'রেকর্ডখানা তোমার পরিবারের লোকজন নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করবে, বলল সে, 'তাছাড়া এখানে আমার বাড়িতেও প্রচুর হাসির খোরাক জোগাবে।'

'আমি তখন রাগে কাঁপছি। ইচ্ছে হল খুন করে ফেলি তাকে। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্ষমা চেয়ে এবং আরও ছবির অর্ডার দিয়ে শান্ত করে ফেলল আমাকে। তারপর কয়েক সপ্তাহ আর কোন অভদ্র ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে।

'আপনার বোধহয় মনে আছে কিছু-দিন আগে একদিন ডিউটিতে আসিনি আমি।'

আমি মাথা নাড়লুম। মিগুয়েল আবার শুরু করল :

'সেদিন জাসিন্তা আর আমি মেক্সিকোর বাইরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে ওকে বিয়ে করতে বলল জাসিন্তা। সব কথা ঠিক মনে নেই আমার, তবে মেক্সিকো শহরে ফিরে জাসিন্তা বিবাহ-বিচ্ছেদের একখানা দলিল দেখিয়েছিল আমাকে মনে আছে। সেই সঙ্গে বিয়ের দলিলও দেখিয়েছিল একখানা।

'রবিবার সকালে কোন অনুরোগী ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া হয় নি জাসিন্তার। ওটা বানিয়ে বলেছিলাম আপনাকে। জাসিন্তা সারাক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল আর লম্বা-চওড়া কথা বলছিল। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না, কাঁপছিলাম রাগে এবং অবশেষে খুন করে ফেললাম তাকে, ধ্বংস করে দিতে চাইলাম তার সবকিছু। সব —তার সব সম্পত্তি, যা কিছু এ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে সে। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম সে সময়। উঃ! কী ভয়ানক, বীভৎস সে দৃশ্য!'

'তুমি কি হাতে দস্তানা পরে গিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ, খুন করে, বাড়ির সব কিছু ধ্বংস করে ফেলে মনটা শান্ত হল ভীষণ বিপদের মধ্যে পা দিয়েছি।'

'আমার ধারণা, ছবিগুলোতে তোমার আঙুলের ছাপ ছিল এবং তুমি সযত্নে মুছে ফেলেছ সেগুলো।'

'নিশ্চয়ই! অবশ্য ওটা নেহাতই বোকামি করেছিলাম। আমার বোঝা উচিত ছিল, ছবিগুলো যে আমি তুলেছি তা কোনমতেই চাপা থাকবে না।'

মিগুয়েলের প্রতি করুণা হল আমার। বসে আছে আমার সামনে, নিঃশেষিত, ভগ্নজানু। আমি নিশ্চিত জানি সে আমাকে যা বলেছে তার সব-টুকুই সত্যি। একটা শয়তান আসঙ্গ-লিপ্সু মেয়ের জালে জড়িয়ে পড়ে এই পরিণতিতে পৌঁছেছে আজ। কিন্তু তবু খুন কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

......পরিবারের লোকজন নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করবে......

বিচারে তিরিশ বছর জেল হল মিগুয়েলের।

জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে-ছিল একবার, কিন্তু পারেনি। গুলী খেয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছিল।

আর প্রেমপাগল জাসিন্তা? সে তার সব সম্পত্তি য়ুকাটানের এক এতিমখানাতে দান করে গিয়েছিল।

অনুবাদ : কালিকা চৌধুরী

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। পাঁচ ।।

প্রভাতে আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা। অধ্যাপক বয়সে নবীন, নাম পাধ্যে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই শিক্ষা-দানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রথমে ছাত্রী ছিল সুপ্তি, পরে চেনেলু এসেছে, এবারে আমি এলাম।

পাধ্যে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, সংস্কৃত কতদূর পড়েছি, বাঙলা বা ইংরেজীর মতো স্বচ্ছন্দে পড়তে পারি কিনা, ইত্যাদি।

বললাম ঃ স্কুলে আমার অতিরিক্ত বিষয় ছিল, কিন্তু অক্ষর পরিচয় ভাল হয়নি। স্বচ্ছন্দে পড়া দূরের কথা, ঠেকে ঠেকেও সব কথা পড়তে পারিনে।

পাধ্যে আশ্চর্য হলেন।

বললাম ঃ আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অল্পদিন আগেও বাঙলা দেশের স্কুলে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। কিন্তু ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর বাঙলা হরফে লেখা চলত। সংস্কৃত হরফ মোটামুটি চিনেই পরীক্ষা পাশ করা কঠিন ছিল না।

পাধ্যে বললেন ঃ তোমাকে তাহলে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। ইংরেজী বাঙলার মতো গড় গড় করে পড়তে হবে। তারপরে অর্থবোধের চেষ্টা।

হাতের কাছে একখানা হিন্দী সাম-য়িক পত্র ছিল। সেইখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ পড়।

এ তো হিন্দী বই।

অক্ষর দেবনাগরী। কিছু অর্থবোধ হবে বলে পড়তে বিরক্তি আসবে না।

সুপ্তি মিট মিট করে হাসছিল। সেই হাসি দেখে আমার রাগ হল। বললাম ঃ তুমি হাসছ কেন?

সুপ্তি বলল ঃ চেনেলুর সঙ্গে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসো।

কেন?

দুজনকেই তো এখন হিন্দী পড়তে হবে।

চেনেলু বলে উঠল ঃ আর তুমি বুঝি একা সংস্কৃত পড়বে?

পড়ব বৈকি।

চেনেলু আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি চেনেলুর দিকে।

পাধ্যে বললেন ঃ হিন্দী তোমাদের বেশিদিন পড়তে হবে না। পড়াটা সড়গড় হলেই সংস্কৃত ধরে দেব।

চেনেলু বলল ঃ সুপ্তি বুঝি পড়তে পারে?

হিন্দী যে ওর মাতৃভাষা।

চেনেলু তার বই হাতে উঠে দাঁড়াল। বলল ঃ সংস্কৃত শিখে কাজ নেই। চল নিজেদের ঘরে।

কিন্তু আমি উঠলাম না। পাধ্যেকে বললাম ঃ এখানে বসে পড়তে তো কোন দোষ হবে না?

সুপ্তি বলল ঃ হবে বৈকি।

কী দোষ?

তোমরা মানুষের ভাষা পড়তে পার না, আর তোমরা ব্যাঘাত করবে দেবতার ভাষা পড়ায়?

আমি আশা করেছিলাম, অধ্যাপক পাধ্যে আমাদের থাকতে বলবেন। কিন্তু তার আগেই চেনেলু আমার হাত ধরে টানল, বলল ঃ চলে এস।

বেরিয়ে যেতে যেতেও আমি সুপ্তির মুখখানা দেখতে পেয়েছিলাম। কৌতুকে সে হাসছে।

বাহিরে এসে চেনেলু বলল ঃ সব ছল।

মানে?

মানে বুঝতে তোমার কিছু সময় লাগবে। নতুন এসেছ, চোখ কান একটু খুলে রেখ।

তোমরাও তো সম্প্রতি এসেছ শুনলাম।

চেনেলু এ কথার প্রতিবাদ করল না। বলল ঃ চল, আমরা নিজেদের ঘরে গিয়ে বসি। ঘরে এসে আমি পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগলাম, কিন্তু চেনেলু গুম হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ তাকে লক্ষ্য

করবার পরে বললাম : এখনও রাগ পড়ল না?

চেনেলু গম্ভীরভাবে বলল : না।

তার উত্তর শুনে আমি হেসে ফেললাম।

এ হাসবার কথা নয় বিনায়ক। সহ্যের একটা সীমা আছে। ঐ বর্গিটা এসে অবধি ঐ রকম করছে।

বর্গি!

কেন, বর্গি জান না? তোমাদের বাঙলা দেশেই তো বেশি হামলা করত!

সেই ছেলেভুলানো ছড়াটি আমার মনে পড়ল।—

খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো
বর্গি এল দেশে।

বললাম : মনে পড়েছে বৈকি। তুমি শিবাজীর সৈন্যের কথা বলছ।

শিবাজীর সৈন্য বৈকি। অশিক্ষিত চাষা সব। ঘোড়া আর তরোয়াল পেলেই যেন সৈন্য হওয়া যায়!

আমি হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলাম : পাণ্ডেকে কেন বর্গি বলছ?

কাণ্ডটা দেখ না, দু'পাতা সংস্কৃত পড়েই নিজেকে পণ্ডিত ভাবছে।

ভাবতে দাও।

কিন্তু চেনেলু শান্ত হতে পারল না। বলল : ব্যাপারটা তুমি এখনও বুঝতে পারনি।

তোমার মতো বুদ্ধি থাকলে কে পারবে।

চমকে আমরা পিছন ফিরে তাকালাম। পরম কৌতুকে সুদীপ্ত হাসছে। চেনেলু চট করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

সুদীপ্ত চেনেলুর পাশে এসে বলল : ব্রহ্মার বিয়ের গল্প তোমাকে শোনাতে এলাম।

চেনেলু কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না।

সুদীপ্ত আমাকে বলল : দেখছ তো, কাল গুরুজীর কাছে শুনতে চাইল। আর আজ আমি বলতে এসেছি কিনা।

বললাম : তোমার সংস্কৃত শেখা কী হল?

একদিনেই কি সব শেখা যায়!

তবে গল্প বল।

সুদীপ্ত আড় চোখে একবার চেনেলুকে দেখে নিয়ে বলল : বলিহারি দিই নারদকে। বাপের সঙ্গেও কম রসিকতা করেননি।

বললাম : নারদ তো ঝগড়া বাধাতেই ওস্তাদ বলে জানি।

সুদীপ্ত বলল : বাপ মায়ে যে ঝগড়া বাধায়, সেই হল ছেলে।

বললাম : গোড়া থেকেই বল।

সুদীপ্ত বলল : পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করছেন পুষ্করে। পূর্ণাহুতি দেবার সময় হয়েছে, অথচ ব্রহ্মাণী সাবিত্রী তখনও এসে পৌঁছননি। মহা বিপদ। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে হবে সস্ত্রীক। শেষে নারদকে ডেকে বললেন, শিগগির তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়। বাপের হুকুম পেয়েই তো নারদ মায়ের কাছে ছুটলেন, বললেন, শিগগির করে চল মা, বাবা যজ্ঞ শেষ করতে পারছেন না। ব্রহ্মাণী তখন হেঁসেল হাঁড়ি ঠেলছিলেন। কপালের ঘাম মুছেই বললেন, ওমা, তাই নাকি! চল্ তবে। ময়লা কাপড়, আঁচলে হলুদের দাগ। চোখ কপালে তুলে নারদ বললেন, সেকি, তুমি এমনই বেশে যাবে! দেবতাদের বউরা সব সেজেগুজে রুজ লিপস্টিক মেখে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে এসেছেন। ব্রহ্মাণী বললেন, সে তাই তো, তুই এগিয়ে যা, আমি এখনই আসছি।

এদিকে নারদ ফিরে এসে বাপকে বললেন, সর্বনাশ! মা তো সাজতে বসেছে, বিলক্ষণ দেরি হবে। তবে উপায়?—ব্রহ্মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। নারদ তখনই ব্যবস্থা দিলেন, বললেন, ঐ দেখ, একটা মেয়ে আসছে। ওকেই বিয়ে করে যজ্ঞ শেষ কর। সে গোয়ালার মেয়ে। নারদ বললেন, তাতে কী হয়েছে! গরুকে দিয়ে খাইয়ে দাও, পেট থেকে বেরিয়ে এলেই শুদ্ধ। ব্রহ্মা বললেন, সাবাস বেটা। সেই গোয়ালার মেয়ে গরুর পেট থেকে বেরিয়ে হল গায়ত্রী। তাকেই বিয়ে করে ব্রহ্মা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিলেন।

সাবিত্রীর কী হল?

সেজেগুজে সাবিত্রী আসছিলেন পুষ্করে। তাঁকে আসতে দেখেই নারদ ছুটলেন তাঁর কাছে। বললেন, বাবার কাণ্ড দেখলে মা! এই বুড়ো বয়সে আর একটা বিয়ে করে যজ্ঞ শেষ করে ফেলেছে। অ্যাঁ!—ব্রহ্মাণী সেইখানেই বসে পড়লেন, ঐ সাবিত্রী-পাহাড়ের চূড়োতেই।

তারপর?

তারপর আবার কী। নারদের মতো সুপুত্রের জন্যেই পিতামহের আজ এই দুরবস্থা। দেশের কোথাও তাঁর পুজো হয় না।

সে গল্প তো আমরা গুরুজীর কাছে শুনেছি।

সুদীপ্ত বলল, পুষ্করে আমরা অন্য কারণ শুনেছি। গায়ত্রীকে বিয়ে করার জন্যেই নাকি সাবিত্রী শাপ দিয়েছিলেন, বুড়ো ব্রহ্মার পুজো পুষ্কর ছাড়া আর কোথাও হবে না।

গল্প শুনতে শুনতে চেনেলু তার রাগের কথা ভুলে গেল, বলল : বস এইখানে। সুদীপ্ত হেসে উঠল খিলখিল করে, তারপরেই পালিয়ে গেল।

।। ছয় ।।

দ্বিপ্রহরে তাউজী আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন : কেমন লাগছে?

ভাল মন্দ লাগার কথা আমি ভেবে দেখিনি। দু একদিনে কোন মতামতও গড়ে ওঠে না। শুধু সৌজন্য প্রকাশের প্রয়োজনে বললাম : ভাল।

আজ কিছু পড়েছ?

না।

নিজে পড়তে হবে। এ তো স্কুল নয় কলেজও না। এখানে পড়তে কেউ বলবে না। কিন্তু সময়ের অপব্যবহারও কেউ পছন্দ করবে না।

আমারও এই কথা মনে হয়েছে।

কেন?

কয়েকজনকে দেখে। তাঁরা সারাক্ষণ পড়াশুনো করছেন। আমরা তাঁদের কাছে যেতেও সাহস পাচ্ছি না।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন : তাঁরা কী পড়ছেন দেখেছ?

না।

তাঁরা অষ্টাদশ পুরাণ পড়ছেন। বেদের দেবতার উপর ভাল বই আছে, কিন্তু পুরাণের দেবতার উপর নেই। সমস্ত পুরাণ পড়ে দেবতাদের পরিচয় পেতে হবে। কোন পুরাণ পড়েছ?

পড়িনি।

শখ নেই, না বই পাওনি?

বললাম : একজনের বাড়িতে একখানা পদ্মপুরাণ দেখেছিলাম। মহাভারতের চেয়েও মোটা।

তাউজী বললেন ঃ বুঝেছি। আকার দেখেই পুরাণ সম্বন্ধে একটা ভয় জন্মেছে।

ঠিক ধরেছেন।

কাল পুরাণের গল্পটি তোমার কেমন লাগল?

ভাল।

তার মানে, গল্পগুলি শুনতে তোমার আপত্তি নেই, আপত্তি পড়ার ব্যাপারে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না দেখে বললেন ঃ তোমার দোষ দিই না। এটা যুগেরই হাওয়া। পরিশ্রম করে কেউ কিছু শিখতে চায় না, অনুশীলন করে উন্নতির চেষ্টা কেউ করে না। তুমিই বা করবে কেন? তবে—

তবে কী?

তাউজী একটু ইতস্তত করে বললেন ঃ স্বেচ্ছায় শিখতে এসেছ, শেখবার বাসনা দমন করে না যায়। অন্যদিকে মন না দিলে এখানকার আবহাওয়া তোমার প্রতিকূলে মনে হবে না।

তা দেখতে পেয়েছি।

তাউজী বললেন ঃ বেদের দেবতার কথা তোমাকে বলব বলেছিলাম। বেদ বা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার উল্লেখ নেই। সৃষ্টিকর্তাকে সেখানে হিরণ্য-গর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার আছে অন্য অর্থে। মন্ত্র বা প্রার্থনা। পবিত্র বাক্য জ্ঞান সত্তা পরমাত্মা ও পুরোহিত—এ সব অর্থেও ব্যবহার আছে। বৈদিক ঋষিদের কাছে সৃষ্টিকর্তার ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। তাঁরা যা কিছু সুন্দর দেখতেন, উপকারী মহৎ ও শক্তিমান, তাদেরই স্তব করতেন। ধীরে ধীরে এক সর্বশক্তিমানের ধারণা তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একং বৈ ইদং বি বভূব সর্বং। একই সর্ব-প্রকারে হয়েছেন। কিন্তু এই পরম একের কী নাম দেওয়া যায়? স এতদ্ ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম বড় কবিত্বময় নাম। বুদ্ধি যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, কল্পনা দিয়ে যার নাগাল মেলে না, সেই অনির্বচনীয় শক্তির নাম ব্রহ্ম। ঋষিরা কত বেদগান করেছেন, মনীষীরা করেছেন দর্শন রচনা। সাধারণ মানুষ সম্পদে স্মরণ করেছে, বিপদে প্রার্থনা। এ যুগের বৈজ্ঞানিক তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইছে।

বেদের এই ব্রহ্ম ব্রহ্মা নন। ব্রহ্মা পুরাণের দেবতা। ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির প্রথম মূর্তি, সৃষ্টিকর্তা।

একটু থেমে বললেন ঃ দ্বিতীয় মূর্তির নাম বিষ্ণু। পুরাণে পালনকর্তা তিনি। আজ গুরুজী এই বিষ্ণুর আলোচনা করবেন।

সে তো পৌরাণিক আলোচনা!

বৈদিক আলোচনা আমাদের হয়ে গেছে।

আমার তা শোনা হয়নি।

শুনবে?

বলবেন আপনি!

তাউজী বললেন ঃ তোমার আগ্রহ থাকলে কেন বলব না!

তবে বলুন না।

কিন্তু বিষ্ণুর সম্বন্ধে বৈদিক ধারণা শুনে নিরাশ হবে। বেদে বিষ্ণু একজন গৌণ দেবতা। তিনি ইন্দ্রের বন্ধু, যজ্ঞে তাঁরা একসঙ্গে অবতীর্ণ হন। একবার ইন্দ্রের প্রীত্যর্থে শত মহিষ বলি দিয়েছিলেন।

একটু ভেবে বললেন ঃ যতদূর মনে পড়ে, মাত্র পাঁচ ছটি সূক্তে বিষ্ণুর স্তুতি আছে।—

বিষ্ণোর্নু কং বীর্যাণি প্র বোচম্ যঃ
পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রে-
ধোরুগায়ঃ।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাউজী বললেন ঃ কিছুই বুঝতে পারলে না না?

মাথা নেড়ে তা স্বীকার করলুম।

তাউজী বললেন ঃ এর মানে খুব কঠিন নয়। ঋষি বলছেন, আমি বিষ্ণুর বীর্যের কথা বলছি। এই বিষ্ণু পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক প্রভৃতি স্থান নির্মাণ করেছেন। ইনি দ্যুলোককে পতন থেকে রক্ষা করে স্তম্ভিতভাবে রেখেছেন। ইনি তিনবার বিচক্রমাণ করেছেন।

বাধা দিয়ে আমি বললাম ঃ এই শ্লোকে তো বিষ্ণুকেই সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। এতো কোন গৌণ দেবতার স্তুতি নয়?

তা নয় বলেই আমি এই সূক্তটি শোনালাম। এই রকমের কয়েকটি সূক্তের জন্য পরবর্তীকালে ভাষ্যকাররা বিপদে পড়েছেন। অনেকে মনে করেন যে ইন্দ্রকেই বিষ্ণু বলা হয়েছে। অনেকে বলেন, সূর্যকেই বিষ্ণু বলা হয়েছে। এই মতও মেনে নেবার উপায় নেই। কেননা এই সূক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব তর্কে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বললাম ঃ আমার প্রশ্নটা আপনি এড়িয়ে গেলেন!

তাউজী আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিতে খানিকটা বিস্ময়। বললেন ঃ এ নিয়ে কি তোমার সঙ্গে কারও আলোচনা হয়েছে?

না তো।

তোমাকে যা বললাম, এতদিন আমার এই ধারণাই ছিল। বিলাতি বই পড়ে আমার এই ধারণা জন্মেছিল। গুরুজী আমার এই ভুল ভেঙে দিয়েছেন। সূক্তের পর সূক্ত উদ্ধৃত করে তিনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পুরাণের বিষ্ণুর সঙ্গে বেদের বিষ্ণুর বিশেষ প্রভেদ নেই। বিষ্ণু কোন গৌণ বা নগণ্য দেবতা নন। কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশের জন্য আমাদের একটা ভ্রান্তি জন্মেছে। মূল বেদ পাঠে এই ভ্রান্তি দূর হবে।

তাউজী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি বেদ পড়েছ?

না।

কেন পড়নি?

বেদ আমাদের পাঠ্য ছিল না।

পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছু তোমরা পড় না?

হেসে বললাম ঃ অপাঠ্য সব কিছুই পড়ি।

পিছন থেকে সুস্মিত হেসে উঠল খিলখিল করে। দুজনেই আমরা পিছন ফিরে তাকালাম।

সুস্মিত বলল ঃ বিনায়ক বেদ পড়বে! সংস্কৃত অক্ষরই যে ও চিনে না।

কেন জানি না, লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেল। বোধহয় তা লক্ষ্য করেই তাউজী বললেন ঃ ভাবনা কী, দুদিনেই ও শিখে নেবে।

(ক্রমশঃ)

জনি হ্যাজার্ড
৮
প্রত্যেক রবিবার

সরকারী জোট শত্রুপক্ষের প্লেন ছারখার করে দেবার সাথে সাথে এই স্বেচ্ছাসেবী পাইলটদের নিয়ে মালবাহী বিমানটি শত্রুপক্ষের জমির দিকেই নামবার জন্যে এগোতে থাকে...!
মাদাম সোম-ফন্ হয়ত এর জবাব দিতে পারেন ?

কি জ্বালা! জীবনে কোনোদিন বেসো মেয়েদের কাছে এমন বোকা বনেনি, কিন্তু এই মাদাম সোম্-ফন্... ...এ্যা!
মনে রেখো আমাদের প্রত্যেকের ওপর ওর নজর রয়েছে বেসো!

গণ সরকারের তরফ থেকে আপনার নিরাপদে পৌঁছনোর জন্যে অভিনন্দন জানাই কমরেড হান-সিন্!

ভদ্রমহিলাকে আটকানো হয় এবং... তার বদলে আমিই যাই তাঁর "কাগজ পত্র" নিয়ে, বাকিটুকু সোজা!
তা, ত বটেই! তবু একটা কথা মাথায় ঢুকছেনা... আমাদের বন্দী করার জন্যে এত চেষ্টা কেন ?

আমাদের বন্দীরা যে খাওয়াপরার জন্যে কাজ করে! আর আমাদেরও যে শিক্ষিত হেলিকপ্টার পাইলটদের একান্ত প্রয়োজন!
21

বন্দুকের মুখে কেড়ে জব্বর চায়না জুয়ান যজার্দ। আমি বলি বরং সবাই নিজের সীটে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকুক!

ভারী সাফ জবাবটি! বেসো, আমার মনে হচ্ছে আমাদের পাকড়াও করাই হয়েছে!

খানিকটা সত্যি জুয়ান যজার্দ! পরের হাতের পুতুল যে সরকারের সঙ্গে আমাদের লড়াই হচ্ছে তারা সত্যিই বিদেশী হেলিকপ্টার পাইলট যোগাড় করার ব্যবস্থা করেছিল…

তাদের মাদাম সোম-সন্‌কে "কাগজ পত্র" দিয়ে এ কাজে পাঠান হয়… আমরা সেটা টের পাই…

9-30

আমাদের মিত্র-শক্তি যন্ত্রপাতি দেয়… কিন্তু ওইটুকু! অতএব শুধু দল পরিবর্তন ছাড়া… তোমাদের কাজ, সেই একই রইল!
ঠিক এই রকম না?
এরপর : "বন্দী স্কোয়াড্রন!"

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সাহিত্য পত্রিকা 'অমৃতে'র আমি একজন নিয়মিত আগ্রহী পাঠক। বিশেষ করে "জানাতে পারেন" বিভাগটি নিয়মিতভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনারা আমার মতো অনেকেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। "জানাতে পারেন" বিভাগের মারফৎ আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার ব্যবস্থা করলে বাধিত হবো।

(ক) সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধি ও মানের ক্রমানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য-গুলিকে পর পর সাজালে আমাদের বাংলা সাহিত্যের স্থান কোথায় পড়বে?

(খ) বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের রচনা বিদেশী (অভারতীয়) কোন্ কোন্ ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

বিশ্বনাথ দাস,
ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরী,
পোঃ গোপীনগর,
হুগলী।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার "জানাতে পারেন" বিভাগে প্রকাশের জন্য প্রশ্ন পাঠালাম। উত্তর পেলে উপকৃত হব।

"নোবেল প্রাইজ" সর্বপ্রথম কে পেয়েছেন?

শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল,
৭৪নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার "অমৃত" পত্রিকার আমি একজন অনুরাগী. অল্প কয়েক দিনের মধ্যে "অমৃত" আমাদের মন জয় করে নিয়েছে। অন্ততঃ আপনার মত মানুষ যেখানে আছে সে পত্রিকার খুবই উজ্জ্বল, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার পত্রিকার "জানাতে পারেন" বিভাগে আমার কতকগুলি গুলি প্রশ্ন পাঠাচ্ছি।

(১) দক্ষিণ কলিকাতার সুপরিচিত রাসবিহারী এভিনিউ কার নামানুসারে?

(২) আনন্দমোহন বসুর পরে আর কতজন ভারতীয় Cambridge এর র‍্যাংলার হতে পেরেছেন, তাঁদের নাম কি কি?

(৩) বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিদ শ্রীহরিনাথ দে কি এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ? ক'টি ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ,
৩সি, গঙ্গাধর ব্যানার্জি লেন,
কলিকাতা ঃ ২৩

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীরথীনকুমার বিশ্বাস-এর প্রশ্ন দুটি আলোচনা করা যেতে পারে।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন—মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন, আজকের দিনেও একটি জটিল প্রশ্ন। এর সদুত্তর পাওয়া এখনও সম্ভব হয়নি, কখনও হবে কিনা জানি না।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়া একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। এর থেকে ধারণা করা যেতে পারে দেব-দেবীর প্রত্যাদেশ আমরা পেয়ে থাকি স্বপ্নের মধ্যে। এ ধরণের প্রত্যাদেশ পাওয়ার ঘটনা এখনও একেবারে বিরল নয়।

কিন্তু দৈব-বিশ্বাস সর্বসাধারণের নয়। নাস্তিকবাদীদেরও একটা ব্যাখ্যা থাকা চাই। তার ওপর এমন উদ্ভট স্বপ্নও দেখা যায় যার সঙ্গে দেব-দেবী কেন, তাঁদের বাহনদেরও কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। তাই এর দু'-একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও গড়ে উঠেছে। *এর মধ্যে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাই বহুল প্রচারিত।*

ফ্রয়েড বলেন, মনের অবচেতন বাসনা বা depressed desires*-গুলি* যখন আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে তারই বিকৃত রূপ হয়ে দেখা দেয় স্বপ্নে। এ সঙ্গেও বলা দরকার যে আমাদের মনে অবচেতন ও সচেতন দুটি কক্ষ আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ থাকলে অবচেতন মনের ওপর পরিষ্কার একটি পর্দা থাকে, কিন্তু ঘুমোবার সময় ইন্দ্রিয়-গুলির সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে অবচেতন মনের অবদমিত কামনা আত্মপ্রকাশ করতে চায়।

আগেই বলেছি এই আত্মপ্রকাশ কিছু বিকৃত রূপে হয়। কাজেই এর জন্য 'স্বপ্নতত্ত্ব' ঘাঁটা খুব সমীচীন নয়। যেমন, হয়ত স্বপ্ন দেখলেন অফিসের বড়বাবু মারা গেছেন এবং আপনি তার জন্য খুব বিমর্ষ ও দুঃখভারাক্রান্ত। বলতে পারেন, অফিসের বড়বাবুর মৃত্যু তো আপনি চাননি! এখানে ফ্রয়েড-পন্থীরা ব্যাখ্যা দেবেন যে বাইরে না চাইলেও একথা আপনার মনে ছিল। কারণ, বড়বাবু মারা গেলে তাঁর পদটি আপনার লাভ করবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাতে সুখী না হয়ে আপনি দুঃখিত হলেন কেন—নিজের কাছেও ঢাকাঢা হ্যাঁ, এইটেই স্বপ্নের বিকৃতির মূলে

অবচেতন মনের এই যে স্বপ্ন— অনেক ভবিষ্যদ্বাণীও হতে দেখা এর পেছনে রয়েছে ইচ্ছাশক্তি বা W force। আর একটি প্রসঙ্গের উ করা দরকার। 'ভোরের স্বপ্ন সত্যি' যে একটা প্রবাদ আছে তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সারা ঘুমের মধ্যে ভোরে এসে ইন্দ্রিয় একেবারে পরিপূর্ণ বিশ্রাম পায়— অবচেতন মনটি একেবারে সম্পূর্ণ যায়। মনের একেবারে ভেতরের খ (যাকে বলে হাঁড়ির খবর) এসে স্বপ্নের মধ্যে। সেগুলি ফলে খুবই স্বাভাবিক।

এত কথা বলার পরও আবার একে সম্পূর্ণভাবে কখনই জানা যা এখনও এমন বহু স্বপ্ন দেখা যায় যুক্তিতেই যাকে ধরা যায় না। থেকে স্বপ্ন দেখলেন প্যারিসে আত্মীয় মারা গেছে। সে স্বপ্ন এ সঠিক হয়েছে এ দৃষ্টান্ত এ বিরল নয়। তবু মোটামুটিভাবে স্বপ্ন-দর্শনে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ পারি।

রথীনবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন নামের সার্থকতা কি! এর ঠিক নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া শক্ত। ইতিপূ বোধ হয় অপর একজন এ প্রশ্ন ছিলেন। এর সন্তোষজনক উত্তর দ হতে পারে—

এক।। অর্থ যদি সুধা সাহিত্যের সার অংশ বা সুধা পরিবে করা এবং পাঠকসাধারণের অনন্ত তৃ সাধন করা। এ নামটির যৌক্তিকতা আ

দুই।। অর্থ যদি মৃত্যুহীন বা অ হয়। এর উদ্দেশ্য এই হতে পারে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে—সংস্কার পরিবেশনের যে পবিত্র উদ্দেশ্য পত্রিকাটির আবির্ভাব, শত বাধাতেও সে উদ্দেশ্য পথ-ভ্রান্ত হবে যে কাজ করতে পত্রিকাটির আবির্ভা অনন্তকাল সে কাজ করে যাওয়াই সংকল্প।

এ জাতীয় ব্যাখ্যাও দেওয়া চল পারে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ
২৩, আনন্দপুরী, ব্যারাকপ

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৪ ॥

অশান্তি কমে না—বেড়েই যায় দিন দিন। ঐন্দ্রিলা খুবই ঘুরছে চাকরির জন্যে কিন্তু চাকরি কোথাও পাচ্ছে না মনোমতো। একজনরা রাজী হয়েছিলেন, মাইনেও পুরো দশটা টাকাই দিতে চেয়েছিলেন—তাছাড়া একাদশীতে একাদশীতে দু'আনা করে পয়সা—কিন্তু ঐন্দ্রিলাই পিছিয়ে এল শেষ পর্যন্ত। শোনা গেল লোকপরম্পরায় সে বাড়িতে নাকি কোন ঝি-রাঁধুনী দশদিনের বেশী টেকে না—কর্তার দোষ আছে। কর্তাই দেখেশুনে পছন্দ করে নেন—অল্পবয়সী না হলে পছন্দ হয় না তাঁর, ইত্যাদি। এসব শুনে আর সাহস হয় না সেবাড়িতে কাজে যেতে।

এধারে যত দেরি হয়—ততই মেজাজ আরও খারাপ হতে থাকে তার। মাস শেষ হতে চলল—মেয়েকে আবার টাকা পাঠাবার সময় হয়ে এল। আর কোথায়ই বা পাবে টাকা। এখন কাজে ধরলেও এক মাস পরে টাকা—অথচ এখনও কাজই ধরতে পারল না। ফলে মনের সব দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা বিষ হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। সারা দিনই চেঁচামেচি করে সে—যতক্ষণ বাড়িতে থাকে। কাকচিল বসতে দেয় না বাড়িতে—এমন চিৎকার করে।

কনকের আর যেন সহ্য হয় না। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। সারাদিনে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পারে না ও, ননদের চেঁচানির চোটে।

আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে ইদানীং—শাশুড়ির অহেতুক বিদ্বেষ তার প্রতি।

এটার কোন মানেই বুঝতে পারে না সে। সে কি দোষ করল? সে প্রাণপণে খাটছে সংসারে, সকলের সেবা করছে—শাশুড়িও তার বিশেষ খুঁৎ ধরতে প্যারেন না আজকাল। সেও তো তাঁর মন যুগিয়ে চলবারই চেষ্টা করছে অহরহ।...মেয়ের প্রতি যে রোষ রুদ্ধ আবেগে জমতে থাকে মনের মধ্যে, প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না—সেটাই যেন তির্যক গতিতে এসে ওর ওপর আছড়ে পড়ে। বৌয়ের ওপর আক্রোশ চেপে থাকার প্রয়োজন হয় না—কারণ সে প্রতিবাদ করতে পারবে না, করতে সাহস করবে না—সেই ভরসাতে নিশ্চিন্ত হয়েই সব বিষটা এখানে উদ্গার করেন। দিনে দিনে সে আক্রোশটা যেন বড় বেশী উগ্র বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠছে। কনক অনেক সয়েছে এ-বাড়িতে এসে, অনেক কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকে সে আজকাল কিন্তু তারও সহ্যের সীমা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আগে সে ভাবত যে সব রকম লাঞ্ছনাই তার গা-সওয়া হয়ে গেছে—এখন চোখের জলে বুঝেছে যে তার অভিজ্ঞতা খুবই সীমাবদ্ধ। এমনই কথা বলেন শ্যামা, এমন চোখা চোখা আঘাত করেন কথার দ্বারা যে কনকের মনে হয় এর চেয়ে হাত দিয়ে মারা ঢের ভাল ছিল। 'বাক্যবাণ' শব্দটা বহু লোকেই ব্যবহার করেন বটে কিন্তু সে বস্তুটি কি তা কেউ জানে না। এখানে না এলে জানা সম্ভব নয়।

সবচেয়ে দুঃখ এই আঘাতগুলো আসে সম্পূর্ণ অকারণেই—তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপলক্ষ ধরে। এ কেউ বিশ্বাসও করবে না বললে। সেই জন্যেই সে বলেও না হেমকে। তাছাড়াও, কেমন যেন বাধে তার —মার নামে নালিশ করবে ছেলের কাছে? ছেলে যদি ভুল বোঝে? হাজার হোক তার মা। এখনও সে স্বামীর মনোরাজ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পেরেছে বলেও মনে হয় না তার। হয়ত সে কনকের ওপরই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠবে।

বলে না—তবে হেম তার মুখ দেখে কিছু কিছু বুঝতে পারে বৈকি। প্রদীপের সামান্য আলোতেও ঢাকা পড়ে না এক একদিন। বোঝে যে তা মুখে না বললেও তার ব্যবহারে প্রকাশ পায়। হয়ত মুখে বলে না বলেই হেমের সহানুভূতি বেশী। সে যে সহ্য করছে—নালিশ করছে না, লাগাচ্ছে না তার কাছে—এতে শ্রদ্ধাই বাড়ছে হেমের। রানী বৌদি ঠিকই বলেছিল—এ রত্ন হেমই চিনতে পারেনি।

হেম একদিন নিজের কানেও শুনল। শনিবার বিকেলে কলকাতা যাবে বলে বেরিয়েও ফিরে এসেছিল সে—শরীরটা খারাপ লাগাতে। জ্বর জ্বর ভাব বলে এসে অন্ধকারেই শুয়ে পড়েছিল। শ্যামা টের পাননি। ছেলের সামনে একটু সতর্কই থাকেন তিনি। কত তুচ্ছ কারণে কী বিষ তিনি ঢালছেন শুনতে শুনতে অসহ্য হয়ে ওঠাতে হেম তেড়ে বেরিয়ে এল, 'ও কি হচ্ছে কি! ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো বুঝি?...শক্ত মাটিতে দাঁত

শাসাতে পার না—মেয়ের কাছে ধ্যাতানি খেয়ে সেই ঝালটা ওর ওপর ঝেড়ে গায়ের জবালা মেটাও—না?'

এর ফল যে ভাল হ'ল না—তা সহজই অনুমেয়। ছেলেকে মনে মনে একটু সমীহ করলেও সামনাসামনি সেটা স্বীকার করবার লোক নন শ্যামা। তিনি জানেন যে একবার মেনে নিলে আর কোন দিন নিজের অধিকার মানাতে পারবেন না।

তিনি সমান তেজের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তা মেটাই তো। তার জন্যে কী করবি কি? মারবি নাকি? সেইটে হ'লেই মাগপুজোর ষোড়শোপচার পূর্ণ হয়।...তুই তোর মেগের পা ধুয়ে পাদোক জল খেতে পারিস—আমি কেন খেতে যাব? আমার বাড়ি আমার ঘর।...বেশ করব বলব—না পোষায়, ভাল না লাগে মাগ ঘাড়ে করে বেরিয়ে যা। ভাবিসনি যে ঐ কুড়ি টেক্‌লো করে মাসে ঠেকিয়ে আমার মাথা কিনে রেখেছিস—না দিলে আমার দিন চলবে না। বলে তোর জন্মদাতাই আমাকে উপোস করিয়ে মারতে পারলে না—তা তুই!'

বৌয়ের ওপর ঝালটাও আর গোপন করবার দরকার হয় না।

'ভেড়ুয়া ভাতার পেয়েছিস, ভাবছিস দুনিয়ার সবাই তোকে ভয় ক'রে চলবে, না? বলা হয়েছে ওৎ পেতে শোন তোমার মা মাগী কি রকম বলে, দ্যাখো ব্যাভারটা।...তা শোনানো তো হ'ল—এইবার কি হবে কি? আমার কাঁচা মাথাটা উলিয়ে নেবে তোর ভাতার? নাকি হেঁটে-কাঁটা ওপরে-কাঁটা দিয়ে উঠোনে পুঁতবে আমায়? যা পারে করতে বল—আর সাধ্যি থাকে তুইও আয় হারামজাদার বংশ—হারামজাদী আমার সংসার জবালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ ক'রে দিলে গা! যেদিন থেকে ভিটেয় পা দিয়েছে সেদিন থেকে অশান্তি। কী আয়পয় দেখেই বৌ এনেছি, আহা! এসে পর্যন্ত মড়াই মরছে শুধু। সবাইকে খেয়ে উনি একা এখানে রাজত্ব করবেন! করাচ্ছি রাজত্ব তোমাকে। তেমন তেমন দেখব—খ্যাংরা মারতে মারতে বাড়ি থেকে দূর করে দেব। দেখি তোর কোন বাবা রাখে।'......

ঘরের মধ্যে রুদ্ধ-স্বরে কনক হেমকে বলে, 'কেন তুমি কথা কইতে গেলে। এই সওয়া আমি নিত্যি চার প্রহর সইছি—তুমি একদিন সইতে পারলে না? আরও বিষ বাড়লই শুধু।....তোমার কি, তুমি তো দিনে বারো ঘণ্টার ওপর বাইরে থাক—আমার তো দিনরাত থাকতে হয়। এর পর আরও কি কাণ্ড হবে তা বুঝতে পারছ!'

হেম গুম হয়ে বসে থাকে তখন, কথা কয় না।

রাত্রে স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'পীড়ন হচ্ছে বুঝতে পারি কিন্তু এতটা বুঝি নি। তুমিও তো বলনি কখনও?'

এ কথার কি উত্তর দেবে কনক! এই-টুকুই হেমের পক্ষে যথেষ্ট সপ্রেম ব্যবহার, বলা সম্ভব নয়। ওর মনে হয় বিষ নয়—রীষ এটা।......ও'র মেয়েরা একে একে এ জন্মের মতো সব সৌভাগ্য ঘুচিয়ে এসে ঢুকেছে তাঁর কাছে—বৌ পরের মেয়ে স্বামীপুত্র নিয়ে মনের সুখে ঘর করবে কেন—যেন এই ধরনেরই ঈর্ষা একটা ও'র

কথাটা ভাববে না বলেই মনে করে কনক, বড় নোংরা কথা, বড় খারাপ কথা—তবু ঘুরে-ফিরে বারবারই মাথায় আসে কথাটা। আজও, হেমের এই প্রশ্নে কথাটা মনে হ'তেই, শিউরে উঠে কথাটাকে মন থেকে তাড়াতে চাইল সে।

হেম ওর মনের কথাটা বুঝল না কিন্তু শিহরণটা টের পেল। সে আরও সস্নেহে

"তুমি একদিন সইতে পারলে না?"

এই সামান্য স্নেহের সুরেই তার চোখে জল এসে গেছে। কথা কওয়ার শক্তিও নেই তখন।

হেম একটু চুপ করে থেকে আবারও বলে, 'কেন এমন করছে মা—যেন কী এক বিষের জবালায় ছিটফিটিয়ে বেড়াচ্ছে। কী করলে কি তুমি?'

এ কথারও উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ওর যা মাঝে মাঝে মনে হয় তা কাউকেই

ওকে একটু কাছে টেনে বলল, 'আর কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো। আমি চেষ্টা করছি কিছুদিন থেকেই—বদলীর অর্ডারও হয়ে গেছে—সেখানে কোয়ার্টার এখনও তৈরি হয়নি সব, কোয়ার্টার পেলেই চলে যাব। যা শুনছি, বড়জোর আর দুটো মাস।'

সংবাদটা এতই অপ্রত্যাশিত, এত আনন্দের যে, কনকের মনে হ'ল একটা

চিৎকার করে সে এ উল্লাস প্রকাশ করে। পারে সে—একদিন মুক্তি পাবে! তোমরা সবাই শোন—সে চলে যেতে পারবে এই জীবন্ত সমাধি থেকে!

কিন্তু এসব আনন্দ ও অধীরতা মুখে প্রকাশ করতে নেই এই অসহ সুখের মধ্যেও সে জ্ঞান তার ছিল। অতিকষ্টে আত্মসম্বরণই করল সে, মুখে শুধু প্রশ্ন করল, 'তারপর, এখানে?'

'এখানে মা রইল, তরু রইল—কান্তি রইল। যা হয় হবে—আমি আর ওদের কথা ভাবতে পারব না। ঢের ভেবেছি। কান্তিটা বলছে সামনের বার এগজামিন দেবে, দিতে পারে দিক। মেসোমশাই বলেছেন যে, ও যদি এগজামিন দিতে চায় তো তাঁকে জানালেই তিনি ফীয়ের টাকা পাঠিয়ে দেবেন। পারে পাস করতে, একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। বড়দাকে বলেছি কোন বাঙ্গালী বাড়ির কাজ খুঁজতে—যা দু-চার পয়সা দেয়। সায়েবের চাকরি তো আর হবে না ওর দ্বারা। সরকারী কাজও পাবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'খোকাটাকে মনে করছি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমারও হাত-নুড়কুৎ হবে একটু—ওখানের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। তবু চোখে চোখে রাখা যাবে। কে জানে বড়দা কী বোঝে, সে তো বলে, ওর পিপুল পেকেছে, ওর আর কিছু হবে না।'

কিন্তু গোবিন্দ যা-ই বলুক তার কথাটা যে এত শীগ্‌গির ফলে যাবে তা বোধহয় সেও ভাবে নি।

ঘটনাটা ত্বরান্বিত করলেন অবশ্য শ্যামাই।

অনেকদিন পরে এক কাঁদি ভাল কালীবো কলা পড়েছিল বাগানে। কদিন আগে কান্তিই সেটা কেটে নামিয়ে রেখেছে। সেদিন সকালে উঠে ছালা সরিয়ে শ্যামা দেখলেন, যে সবগুলোই পেকে উঠেছে, সেদিনই বিক্রীর ব্যবস্থা না করলে কালো হয়ে যাবে সব।

তিনি কান্তিকে বললেন, ওপর-দিককার মাথার ছড়াগুলো কেটে সাবধানে একটা ধামাতে সাজাতে, আর খোকাকে বললেন ধামাটা নিয়ে বাজারে গিয়ে ফল-ওয়ালাদের কাছে বেচে আসতে।

কথাটা তাঁর কাছে এতই স্বাভাবিক যে, কোন প্রতিবাদ আশাও করেন নি।

কিন্তু খোকা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল : সে আমি পারব না।'

'পারবি না!' আশ্চর্য হয়ে যান শ্যামা, 'পারবি না কেন?......ও কালা-মানুষ কি শুনতে কি শোনে, ওকে ঠকিয়ে দেয়—তুই রয়েছিস তুই যাবি এই তো সোজা কথা। বেশ ভাল ফল হয়েছে, ভাল দাম পাওয়া যাবে দরদস্তুর করতে পারলে। তা তোমার কি হ'ল কি?'

সে তেমনি মুখ ফিরিয়েই উত্তর দিলে, 'বাজারে মোট ঘাড়ে করে বেচা বেচতে যাব—আমি কি ছোটলোক!'

'ও আবার কি কথা! নিজের বাগানের জিনিস নিজে বেচবি—তাও তো আমি নিজে বসে খুচরো বেচতে বলছি না, তাতে তো দু'পয়সা বেশীই পাওয়া যায়—পাইকিরি বেচবি একজনকে, তা আবার ছোটলোক ভদ্দরলোক কি! যা বলছি! কান্তি এই তো কতদিন ধরে করছে, ও পারে তুমি পার না? ও ছোটলোক হয়ে গেছে না?'

'যে পারে পারে—আমি পারব না। এমনিই আমাদের দেখলে পাড়ার ছেলেরা হাসে। তার ওপর ধামা মাথায় ক'রে কলা বেচতে গেলে আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

শ্যামা এই কথাতে আরও ক্ষেপে যান। পাড়ার লোকে তাঁকে একটু বিদ্রূপের চোখে, অবহেলার চোখে দেখে তা তিনি জানেন। কিন্তু সেই কথাটারই কেউ ইঙ্গিত দিলে সহ্য করতে পারেন না।

'পারবি না কি, পারতেই হবে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।......আমার মুখের ওপর পারব না বলা!......গোবিন্দ দেখছি ঠিকই বলেছে, পিপুল পেকেছে তোমার।......দুদিন কলকাতার জল গায়ে পড়ে ধরাকে সরা দেখছ, না? চাল বেড়েছে! চাল বার করছি। দুদিন ধানের চাল পেটে না পড়লেই সব চাল চলে যাবে। ভিরকুট-বাঁচি ও, ওর বড় দাম : পাড়ার ছেলেরা কি বলবে এই ভয়ে আমার দুটো পয়সা আয় বন্ধ করে দেব না? এত বড় সংসারটা চলবে কিসে? পাড়ার ছেলেরা খেতে দেবে তোকে—না আমাকে দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করবে! যাদের ছেলেরা হাসে তারাই দেখিস না মাথা হেঁট করে টাকা ধার করতে আসে আমার কাছে।...... নে ওঠ বলছি, ভাল চাস তো! মাথায় করতে হবে কেন, হাতে ক'রেই নিয়ে যাও না।'

কিন্তু শ্যামা যতই যা বলুন, খোকা নড়ে না। বজ্জাত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে। কথা যে সে শুনবে না সেটা স্পষ্ট সবাইকার কাছেই—

এত বেয়াদপি শ্যামার সহ্য হয় না। তিনি এক চড় বসিয়ে দেন ওর গালে। পাতা-কুড়নো আর পাতা-চাঁচা, মাটি কুপনো হাত—পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসে যায় ওর গালে।

কিন্তু তাতেও এক ইঞ্চি নড়ে না ও।

তখন পাগলের মতো মারতে থাকেন শ্যামা। কনক ধরতে এসে পিছিয়ে যায়—শ্যামার সে সময় রণ-রঙ্গিনী মূর্তি! পাখার বাঁটের এক ঘা সজোরে তার হাতেও পড়ে ঝনঝনিয়ে ওঠে হাত। ছুটে আসে ঐন্দ্রিলাও। কান্তি এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

'আমি যাচ্ছি মা। আমিই তো যাই।... ওকে ছেড়ে দাও।'

ঐন্দ্রিলার বাঙ্গেই বেশী কাজ হয়, 'কেন গো, তোমার ছেলেমেয়ে সবাই তো লক্ষ্মী, সব ভালো। যত বদ তো আমি।... তবে আবার এ মূর্তি কেন?.........কেউ

তোমার কথা শুনবে না, কেউ না—এটি মনে রেখো। মারের চোটে আর কদিন শোনাবে? এর পর ওরাই ধরে মারবে যখন?'

শ্যামার হাতের মুঠো থেকে এইবার পাখাটা টেনে নেয় কনক।

'আচ্ছা, আমিও দেখে নোব তোমার এ ভিরকুটি কদিন থাকে। ও ভিরকুটি ভাঙ্গতে আমি জানি। বালাম চাল পেটে পড়ে কদিনেই বড় বাড় হয়েছে তোমার।... ঐ চাল বন্ধ করলেই ঢিট্ হয়ে যাবে তুমি! আজ থেকে ভাত বন্ধ তোমার এ বাড়িতে। মাথায় করে আনাজ নিয়ে বাজারে গিয়ে বেচে আসবে তবে ভাত পাবে আবার। যে কথা সেই কাজ আমার —আমাকে তুমি চেন না!'

সত্যিই সেদিন ভাত দেন না শ্যামা। দালানের জানলায় সেই যে কাঠ হয়ে বসে থাকে খোকা—বসেই থাকে তেমনি। ঘামে গা ভিজে যায়—কিন্তু চোখে এক ফোঁটা জল বেরোয় না। সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ হয়ে গেছে, দেখে কনকের মন-কেমন করে। আহা, ঐটুকু ছেলে—কী চোরের মারই খেল। ইচ্ছে হয় কাছে টেনে নিয়ে গা মুছিয়ে দেয়—সান্ত্বনা দেয় একটু—কিন্তু শ্যামার ভয়ে পারে না। তবু শ্যামা যে সত্যিই ওকে খেতে দেবেন না তা তখনও ভাবে নি ওরা। সবাই লুকিয়ে বসে আছে শুধু তরুকে ডেকে খাইয়ে দিয়েছে কনক। বেলা দেড়টা নাগাদ শ্যামা গম্ভীরভাবে নিজের ভাত বেড়ে নিয়ে যখন খেতে বসলেন, ঐন্দ্রিলাকে ডেকে বললেন, ডাল-তরকারী কি কি হয়েছে দিয়ে যেতে—তখন সে সুদ্ধ অবাক হয়ে গেল।

'তা ও—?' কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে ইঙ্গিতে দালানের দিক দেখিয়ে প্রশ্ন করে সে।

'ওর কথা তো একবার বলে দিয়েছি বাছা। আমার কথা না শুনলে এ বাড়িতে ওর অন্ন নেই—সাফ্ কথা। কেউ যেন কোন রকম দয়াধম্ম না করতে যায়—শুনলে আমি কিন্তু তাকে সুদ্দ সেই দণ্ডে বাড়ির বার ক'রে দেব!'

এর পর ওকে ডেকে ভাত দেবে সে সাহস কারও নেই।

অনেক ইতস্তত করে ঐন্দ্রিলা ভাত নিয়ে নিজেও খেতে বসল। কিন্তু কনক পারল না। তারও সেদিন দুপুরে খাওয়া হ'ল না।

শ্যামা খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়েই যথারীতি প্রশান্ত বদনে বাইরের রকে গিয়ে পাতা নিয়ে বসলেন।

ঐন্দ্রিলা খেয়ে এসে ছোট ভাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যাশ ফ্যাশ ক'রে বললে, 'এই—যা না, গিয়ে একবার মাপ চাইগে যা না। উপোস করে থাকবি নাকি? এখনই তো তোকে বাজারে পাঠাচ্ছে না। আর কী আছে ঘরে যে পাঠাবে? সে কলা তো কান্তিই বেচে এল।...যা ওঠ—।

......আ মর, তেজ দ্যাখো, কথা শোনে না। মরুক গে, মরতে তুই-ই মরবি—আমার কি। পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে!'

হেসে অঙ্গভঙ্গি করে ঘরে চলে গেল ঐন্দ্রিলা।......

কনক দাওয়াতেই বসে ছিল চুপ করে। সে-ই দেখল খানিক পরে খোকা উঠে খিড়কীর দোর দিয়ে বাগানের দিকে গেল। সে ভাবল পাইখানায় যাচ্ছে বোধহয়, এসে স্নান করবে। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল, যখন—এদিকে ফিরল না, পুকুরেও কারুর স্নান করার সাড়া পাওয়া গেল না—তখন সে উদ্বিগ্ন বোধ করল। বাগানে বেরিয়ে দেখল পাইখানার দিকে কেউ যায় নি—পিছনটা সব দেখে এল—যদি কোন গাছ-তলা-টুলায় বসে থাকে, সেখানেও নেই। তখন বাইরে এসে সাহসে ভর করে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, মা—খোকা ঠাকুরপো কোথায় গেল বলুন তো?'

'গেল?' একটু চমকেই উঠলেন শ্যামা, 'কোথায় যাবে? কই—এদিকে তো আসে নি। ওখানে নেই?'

তখন কনক বলল উঠে বাগানের দিকে যাবার কথাটা।

'তাহলে বোধহয় ওদিক দিয়ে বাইরে চলে গেছে—আমার সামনে দিয়ে যাবে না বলে। যাক না—বন্ধুবান্ধব ঢের হয়েছে পাড়ায়, কে কত খাওয়াতে পারে খাওয়াক না! যাবে কোথায় বাছা, ঠিক ফিরে আসবে। তুমি খেয়ে নাও গে—একজন সোহাগ করে বসে আছে দেখলে জব্দ হবে না।'

কনক যে খায়নি তা শ্যামা লক্ষ্য করেছেন। গলার কোমল সুরে বোধ হ'ল মনে মনে খুশীই হয়েছেন তাতে।

কিন্তু বিকেলেও ফিরল না খোকা। সন্ধ্যার পরও না। এবার শ্যামা সুদ্দ উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। তিনি নিজেই বেরোলেন পাড়ায় খোঁজ করতে। ঐন্দ্রিলাও কতকগুলো বাড়িতে গেল। খালি গায়ে এক কাপড়ে বেরিয়েছে, কোথায়ই বা যাবে?... কিন্তু পাড়াঘরে কোথাও খবর পাওয়া গেল না। কেউ দেখে নি তাকে।

হেম এসে সব শুনে খুব বকাবকি করল মাকে। শ্যামা চুপ করে রইলেন। তাঁর ভয় হয়েছে—অনুশোচনাও হয়েছে। ইতিমধ্যে কান্তিকে পাঠানো হয়েছিল মহাদের বাড়ি, সে ফিরে এল। সেখানেও যায় নি। ওর সঙ্গে বুড়ো ন্যাড়ারা এসেছিল খবর পেয়ে—তারা আলো নিয়ে স্টেশন লাইনের ধার খুঁজে এল। হেম তখনই গেল কলকাতায় বড়মাসীর বাড়ি। সেখানেও নেই।

জানাশুনো কোন জায়গাতেই খবর পাওয়া গেল না তার। পরের দিনও সবাই যতটা পারলে ঘোরাঘুরি করলে। হেম আপিস কামাই করে থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে বেড়াল—কিন্তু কেউই কোন খোঁজ দিতে পারল না। অত বড় ছেলেটা যেন উবে গেল একেবারে।

শ্যামা পরের দিন থেকে অন্নজল ত্যাগ করলেন; কান্নাকাটিও ঢের করলেন। গালাগাল দিলেন সদ্য-মৃতা বোনকে। বিশ্বাস করে তার কাছে রেখেছিলেন, সে এত ছেলেমেয়ে চরাত সে লক্ষ্য করেনি যে ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে? গোবিন্দ তো এক-দিনেই চিনল!......বিশ্বাস করতে নেই কাউকে, খুব শিক্ষা হ'ল তাঁর। তার নিজের ছেলে হয়নি তো কী বুঝবে পেটের একটা নষ্ট হ'লে কী দুঃখ হয়।

কদিন পরে আবার ঠেলে উঠলেন নিজেই। আবার শুরু হ'ল নিয়মিত প্রাত্যহিত জীবন-যাত্রা। যেমন চলছিল সব তেমনই চলতে লাগল। সবাইকে শুনিয়ে বোধ করি নিজেকেই সান্ত্বনা দিলেন, 'যাবে আর কোথায়? মরে নি এটা তো ঠিক, মলে হয় এখানেই রেলে গলা দিত, নয়ত কোন পুকুর ডুবত।... সে খবর পাওয়াই যেত এতদিনে। কলকাতার হাসপাতালেও তো খবর নেওয়া হ'ল।...... না মরে নি। আমার মন বলছে ফিরে আসবে সে। তবে কী মূর্তিতে আসবে সে-ই হ'ল কথা। কি গুণ্ডাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ল, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালী শিখে আসবে—চোর ডাকাত খুনে হবে—সেই এক ভাবনা।...... তা আমি আর কি করব। মায়ের পেটের বোনকে দিলুম বিশ্বাস ক'রে, সে-ই যখন—' ইত্যাদি—

কিন্তু শ্যামার আশা বা আশঙ্কা কোনটারই আশু কোন চেহারা দেখা যায় না। দিন-সপ্তাহ-মাস কেটে যায়—গাছ-পালায় প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্তনের ইতিহাস রচিত হ'তে থাকে—তবু খোকা ফেরে না। শ্যামার মন ভার হয় আবার, সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে বসে চোখের জল ফেলেন —কিন্তু ছেলেকে ফিরিয়ে আনার কোনও উপায় খুঁজে পান না। কোথায় আছে যদি জানতে পারতেন।

মন খারাপ হয় সকলকারই। কনকের তো আরও বেশী, নূতন সংসারে তার সঙ্গে থাকবার কথা। কোথায় গেল কে জানে, দুটো দিন যদি ধৈর্য ধরে থাকত! অতবড় ছেলেটা বরবাদে চলে গেল!

তার কথা ভাবলেই সেই মার-খাওয়া ম্লানমুখ চেহারাটা মনে পড়ে যায়। চোখ ফেটে জল আসে যেন। আহা, যেখানেই থাক, সুখে থাক, মানুষ হোক!

(ক্রমশঃ)

সময়ের দর্পণে নাট্যকার এলমার রাইস

রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী

আমেরিকান নাট্যকার এলমার রাইস বিশেষ সফরে কলকাতায় এসেছেন ২৮শে মার্চ। কলকাতার পর শ্রীযুক্ত রাইস বেনারস, দিল্লী, জয়পুর এবং আগ্রা পরিভ্রমণ করবেন। ভারত-সফরান্তে রাইসের গন্তব্য তেহেরাণ। নাট্যকার হিসেবে রাইস মনে করেন নাট্যকার সমসাময়িককালের দর্পণ মাত্র। সমসাময়িককালের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথ প্রতিফলিত করতে পারলেই আধুনিক নাট্যকারের প্রাথমিক কর্তব্য সমাপ্ত বলে তিনি মনে করেন। সত্তর বছর বয়স্ক পুলিটজার পুরস্কারপ্রাপ্ত রাইস ভারতে এসেছেন এখানকার সমসাময়িক নাট্যকারদের সংগে মতামত বিনিময় করতে। ভারতের এবং ইরাণের আধুনিক নাটক এবং তার প্রযোজনার বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যেই এই মার্কিনী নাট্যকার এসেছেন এশিয়ায়।

এলমার রাইস প্রায় তিরিশটিরও বেশী নাটক লিখেছেন। প্রায় পাঁচ যুগ ধরে আমেরিকান সমাজের নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সব কয়টি নাটক রচিত। নিউইয়র্কে রাইসের জন্ম। নাট্যকার হিসেবে তাঁর প্রথম সফল পদক্ষেপ 'অন ট্রায়াল' নাটকটি প্রযোজনা করে। 'অন ট্রায়াল' নাটকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট। এই নাটকটি রচনাকালে রাইস একটি প্রতিষ্ঠানে আইন বিভাগের কেরানী ছিলেন। 'অন ট্রায়াল' নাটকটিকে বিচারালয়-কেন্দ্রিক নাটক বলা যেতে পারে। এই নাটকেই সর্বপ্রথম আমেরিকান রঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্রের ফ্ল্যাশ-ব্যাক' প্রচার প্রচলন শুরু হয়। 'অন ট্রায়াল' নাটকটি ছাড়াও রাইস 'দি এ্যাডিং মেসিন', 'স্ট্রীট সিন', 'কাউন্সিলার এ্যাট ল' এবং 'ড্রিম গার্ল' প্রভৃতি মঞ্চ-সফল নাটক রচনা করেছেন। 'স্ট্রীট সিন' নাটকটির জন্যে তাঁকে পুলিটজার পুরস্কার দেয়া হয়। রাইস-এর সাম্প্রতিক নাটক হল 'কিউ ফর প্যাশন'।

শুধু নাটক লিখেই না, রাইস উপন্যাসকার হিসেবেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর 'এ ভয়েজ টু পিউরিলিয়া' উপন্যাসটি নিউইয়র্ক টাইমস সার্থক ব্যঙ্গ রচনা হিসেবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। রাইসের 'ইম্পিরিয়াল সিটি' সম্বন্ধে টাইমস পত্রিকা বলেছেন, 'নিউইয়র্ক শহরের জীবন সম্বন্ধে একটি সৎ এবং নিখুঁত চিত্র'। স্যাটার্ডে রিভিয়্যুতে 'আমেরিকান থিয়েটার এ্যান্ড দি হিউম্যান স্পিরিট' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রাইস বলেছেন:

The artist, and particularly the dramatist, does not exist in a vacuum. He is a product of his times, and is most effective and significant when he expresses and reflects the currents of thought and feeling that prevail in the society in which he lives. I say particularly the dramatist for the drama is primarily a mass art. It addresses itself to the crowd rather than to individual. And we all know that the responses of the crowd are more conservative, more emotional, less differentiated, than are those of the individuals who compose it.

রাইস অবশ্য আরো বলতে পারতেন যে নাট্যকার হচ্ছেন সময়ের বিবেক-দূত। সমসাময়িক বিবেক-বার্তাকেই রাইস মার্কিনী রঙ্গমঞ্চে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন তাঁর রচিত নাটকগুলিতে।

জীবিকার অনেক অলি-গলিতে ঘুরে রাইস আমেরিকায় আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। নিউইয়র্ক এবং মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন কিছুকাল। আমেরিকার 'অথরস লিগ'-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন ১৯৪৫-৪৬ সালে। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক সেন্সরশিপ-এর চেয়ারম্যানও ছিলেন রাইস। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক পি-ই-এন ক্লাবের সহ-সভাপতি।

সাম্প্রতিক নাট্যকলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাইস বলেছেন যে, সাম্প্রতিক নাটক যদি বুদ্ধিবাদের চর্চা থেকে সরে গিয়ে থাকে এবং তাতে যদি আত্মিকবৃত্তিগুলির অবনতি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সূচিত হয়ে থাকে তার কারণ এই যে আমরা খণ্ডিত জীবনদর্শনকালের নাগরিক।

।। জোনাকির আলোর উৎস কোথায় ।।

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পল্লী অঞ্চলে জোনাকির ঝাঁক বেরিয়ে আসে, তাদের দেহে যে আলো জ্বলে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে ভেবেছেন। এই আলো কোথা থেকে আসে, কেন আসে, এতে এদের কি কাজই বা হয়—ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা একশ বছরেরও বেশী হলো গবেষণা করে আসছেন।

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে এই আলোর উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কয়েক দশক পূর্বে এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন তাঁদের গবেষণাকে ভিত্তি করেই সাম্প্রতিককালে পথসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে।

এই জৈব আলো বা "বায়োলিউ-মিনেসেন্স" বিষয়ে পর্যালোচনা ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী বিজ্ঞানী শারীর-বৃত্তবিৎ রাফায়েল দুবোআ। এক ধরণের দীপ্তিমান শক্তি নিয়ে তিনি গবেষণা করে দেখলেন যে এই জৈব আলোর পিছনে দুটি জিনিষ রয়েছে। এই দুইটি জিনিষের মধ্যে একটির নাম দিলেন "লুসিফেরিন" আর একটির লুসিফারেস। এই শব্দ দুটি এসেছে লুসিফার শব্দ থেকে। লুসিফারের অর্থ আলোর বাহক।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বিজ্ঞানী ই নিউটন হার্ভে দুবোআর গবেষণাকে ভিত্তি করে এ বিষয়ে আরও তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করেন। তাঁর এই চেষ্টার ফলে জানা যায় যে, এই

আলো বিকীরণের পিছনে আছে এনজাইম গোষ্ঠীর কোন বস্তু, যেমন পেপসিন প্রভৃতির ক্রিয়া। এই পেপসিন জাতীয় বস্তুটি জোনাকির আলো বিকিরণের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। আলো বিকিরণ-কারী নানা ধরণের জীব নিয়েই তিনি লুসিফেরিন লুসিফারেসের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং এই প্রতিক্রিয়া যে নানা রকমের হয়ে থাকে তা প্রমাণ করেন।

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানী সম্প্রতি "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" নামে একটি সাময়িক পত্রে এ পর্যন্ত জৈব আলো সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এতে তাঁরা জীবের বিবর্তনের পথে এই জৈব আলো বিষয়টির কিভাবে উদ্ভব হলো তারও বর্ণনা দিয়েছেন।

এই দুজন বিজ্ঞানীর একজন হলেন ডাঃ উইলিয়ম তি ম্যাককেলরয়। ইনি জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-বিদ্যা বা বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান। আর একজন হচ্ছেন ডাঃ হাওয়ার্ড এইচ সেলিগার। ইনিও ঐ বিভাগেরই অধ্যা-পক এবং এ বিষয়ে গবেষণার সাহায্য করছেন। তাঁদের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জৈব আলো বিকিরণের পিছনে কি আছে, অর্থাৎ মূল বস্তুটি কি, তা জানা গিয়েছে।

জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ডাঃ ম্যাককেলরয় এবং তাঁর সহকারীগণ জোনাকির দেহ থেকে লুসিফেরিন নামে পদার্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কিন্তু কি কি পদার্থের সম-বায়ে এই বস্তুটি গঠিত অর্থাৎ এর

[illegible] ডাঃ ম্যাককেল[illegible] [illegible] সহযোগিত[illegible] [illegible] পেরেছেন এবং [illegible] পৌঁছেছে[illegible] [illegible] নির্ভুল কি না প্রম[illegible] [illegible] বিশ্লেষিত পদা[illegible] [illegible] সংশ্লেষিত করেন। যৌগিক পদার্থটি উপযুক্ত পরিবেশে প[illegible] [illegible] আলো বিকিরণ করায় এই সিদ্ধান্তে[illegible] সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এই আ[illegible] অন্যতম প্রধান উপকরণ লুসিফারেসকে[illegible] তাঁরা পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। [illegible] থেকে এই আলো বিকিরণের ক্ষম[illegible] কেবলমাত্র জোনাকিরই নয়, নানা রক[illegible] জীবাণু, কীট পতঙ্গ, ছত্রাক, নানা রক[illegible] মাছ, শামুক, শুক্তি প্রভৃতিরও আছে।

ডাঃ ম্যাককেলরয় এবং ডাঃ সেলি[illegible] এই সকল জীবের দেহ থেকে আ[illegible] বিকিরণের ব্যবহারিক বা কার্য[illegible] দিকটিরও উল্লেখ করেছেন। বি[illegible] জীবের ক্ষেত্রে এই আলো বিভিন্ন ক[illegible] করে থাকে। জোনাকির ক্ষেত্রে এই [illegible] নিঃসৃত আলো হলো প্রণয়িনীর স[illegible] মিলনের সংকেত। গভীর সমু[illegible] অ্যাংলার জাতীয় মাছের দেহনিঃস[illegible] আলোর কাজ হচ্ছে অন্য প্রাণীকে প্রল[illegible] করা এবং কোনও কোনও [illegible] বিকিরণকারী সামুদ্রিক জীবের [illegible] এটি হলো আত্মরক্ষার উপায়।

তবে অতিক্ষুদ্র জীবদেহে [illegible] দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাক[illegible] এত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। আ[illegible] বিকিরণকারী জীবাণু ও ছত্রাক কৃ[illegible] উপায়ে জন্মানো যেতে পারে।

পৃথিবীর আদিমতম জীবের বিক[illegible] ঘটেছিল অক্সিজেন শূন্য আবহাওয়া[illegible] তাদের কাছে অক্সিজেন ছিল বিষতুল[illegible] এই ধারণার ভিত্তিতেই হপকিনস বি[illegible] বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এ[illegible] পৌঁছেছেন, জীবদেহে যে রাসায়নি[illegible] প্রতিক্রিয়া হেতু জীবদেহ অক্সিজে[illegible] গ্রহণ করতো না তার সঙ্গে এই জৈ[illegible] আলোর সম্পর্ক রয়েছে।

তার পরের যুগে যখন ঐ সব [illegible] জীব অক্সিজেন গ্রহণ করতে লাগ[illegible] তখনও অক্সিজেন অপসারণকা[illegible] আলোর প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটালো [illegible] যদিও ঐ আলো ছিল তখন অপ্রয়োজনী[illegible] এজন্যই কোন কোন জীবদেহ থেকে [illegible] আলো নিঃসৃত হয়ে থাকে বর্তমান পরি[illegible] বেশে তার ব্যবহারিক প্রয়োজন আর নেই।

তবে এটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান যা[illegible] এ বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে আর[illegible] বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপসংহার

গল্পটি শেষ করে অশ্রুসিক্ত চোখে ডাক্তার মৈত্র যখন গভীর রাতে শুতে গেলেন, নিউইয়র্ক শহর যখন কয়েক ঘণ্টার জন্য একটু শান্ত হলো, কলকাতায় তখন দুপুর নামলো। ধু-ধু রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে একটি চিঠির প্যাড খুলে বসলো মল্লিকা। লিখলো :

কাকাবাবু,

এই চিঠিটা লিখতে আমার এক সপ্তাহ লেগে গেল, আর ততোদিনে আপনার ফেরার সময় হ'য়ে গেল। জানি না ঠিকমতো হাতে পৌঁছবে কিনা। এ ক'দিন ধরে দু'টো-তিনটে চিঠি আপনাকে লিখেছি, কিন্তু তখুনি ছিঁড়ে ফেলেছি। যে খবরগুলো দিতে চাই, কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারি না, এলোমেলো হ'য়ে যায়। ভালো চিঠি লেখার শক্তি আমার নেই। আজ প্রতিজ্ঞা করেছি, এ-চিঠি আমি পাঠাবোই, যেমনি হোক।

কাকাবাবু, এই মুহূর্তে আমি আপনার ভাগ্যের কথাই ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে একটু ভুল করেছিলেন আপনি। ভাগ্যকে আপনি ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে রেখেছিলেন, পুরুষকারের হাতে নয়। যে বন্ধু একাধিকবার তার প্রবঞ্চনায় বাধিত করেছে, তাকে অবিশ্বাস করেন নি, তাঁর কথাই ধ্রুব নয়—এই সন্দেহ নিয়ে কখনো আমার মাসীর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ান নি। আমার দাদামশায়ের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যাকে প্রার্থনা করেন নি। সেইখানেই আপনার পতন ঘটেছিলো। যা বাঞ্ছনীয় ছিলো, যা হ'লে সবচেয়ে সুন্দর হ'তো, তা হ'লো না। সব শুনে সেই সময়ে আমার কান্না পেয়েছিলো, কিন্তু চাকাটা ততোদিনে ঘুরে গেছে।

ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় আশৈশব আমিও কম কষ্ট পাইনি। আমার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার সকল শান্তি অপহৃত হ'য়েছিলো। যদিও আমার মামা আমার পিতার অধিক ছিলেন, আমার মামীকে আমি মা ছাড়া ভাবিনি, আর মাসী ছিলেন আমার আদর্শের প্রতীক, তবুও আমি কখনো পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে বড়ো হ'য়ে উঠিনি। আমার জীবনে একটা টানাপোড়েন ছিলো। সেই টানাপোড়েন আমার বাবা। আমি বাবাকে ভালোবাসতুম। আমার মামা-বাড়িতে যে আমার বাবার কোনো আসন ছিলো না, এটা আমার কাছে বেদনার ছিলো। এজন্য সর্বদাই তাঁদের উপর একটা অবুঝ অভিমানে আমি ক্ষত-বিক্ষত হতুম। বাবাকে যখন ও'রা নিন্দে করতেন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতুম, ভালো ক'রে খেতুম না, জেদ করতুম।

কিন্তু বড়ো হ'তে হ'তে বুঝেছিলুম মানুষ হিসেবে সত্যি তিনি শ্রদ্ধেয় নন। তাছাড়া আমাকে নিয়ে প্রায়ই গোল করতেন। যখন-তখন পিতার অধিকার ফলিয়ে টেনে নিয়ে যেতেন নিজের বাড়িতে, আবার মামা গিয়ে সেধে ভজে নিয়ে আসতেন। মামা যে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না, এটা তাঁকে কষ্ট দেবার পক্ষে বাবার একটা মস্ত হাতল ছিলো। সব জেনেও আমি বাবার উপর টানটা ছিঁড়তে পারতুম না। মাসীর জীবনটা যে তিনিই নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন, তা জানবার পরেও আমি আমার মন থেকে সেই দুর্বলতা দূর করতে পারিনি।

আমেরিকা থেকে যখন ফিরে এলুম, কিছুদিনের মধ্যেই আমার মামা মাস-কয়েকের জন্য দিল্লীতে গেলেন। বাবা আমাকে যেতে দিলেন না, তাঁর পিতৃত্ব খাটালেন। আর আমিও তাঁর সেই আদেশ অমান্য না ক'রে রয়ে গেলুম। এবং সেই ক' মাসে তিনি আমার একটি মস্ত ক্ষতি করলেন। আমার কাছে যেসব চিঠি আসতো, সেগুলো খুলে খুলে পড়তেন তিনি, আমি যেসব চিঠি লিখে ডাকে দিতুম, সেগুলোও নষ্ট করতেন, আর তার ফলে আমি আমার একটি প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়ে ফেললুম। হারিয়ে ফেলে যে কষ্ট পেলুম, সে-কষ্ট তুলনা-হীন। কিন্তু তবুও শেষপর্যন্ত তাঁর প্রতি আমার সমস্ত হৃদয়মন এমন বিমুখ হ'য়ে ওঠার সুযোগ হয়তো পেতো না যদি না আমার মামার অকাল মৃত্যু ঘটতো।

জীবন ভ'রে অনেক পাপ করেছেন তিনি, অনেক অন্যায় করেছেন। মামলায়

হারিয়ে অনেক বিধবাকে পথে বসিয়েছেন, অনেক শিশুকে নিরবলম্বন করেছেন। তাঁর ওকালতি পেশায় সমস্ত অন্ধকার অলিগলিতে তিনি স্বেচ্ছায় হেঁটেছেন। ভালোবেসে ঘুরেছেন। আমার মনে হয়, সর্বোপরি তাঁর অর্থলোভই তাঁকে এতোখানি নীচে নামিয়ে এনেছিলো, সেই দুর্জয় লোভই তাঁর রাহু। তাঁর সেই লোভের প্রথম আহুতি আমার মাসী, শেষ খেলা খেললেন আমার সঙ্গে। আশা করি আমিই তাঁর শেষ বলি।

আপনি যে বিদেশে গিয়েছেন আমি জানতুম না। আপনি সেদিন এ-কথাটা আমাকে বলেন নি। ঠিকানাটাও নিতে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু আপনি যে আমার বাবাকে কী মন্ত্র দিয়ে এসেছিলেন জানি না, হঠাৎ দেখলুম, তারপর থেকে আমার খুব যত্ন বেড়ে গেল। আমার ওষুধ এলো, পথ্য হ'লো, এমন কি বিশ্রামের জন্য নীচে নামা পর্যন্ত বারণ হ'য়ে গেল।

আমি ভাবলুম যতোই হোক, বাবা তো, কতো আর নিষ্ঠুর হ'তে পারেন। আপনি নিশ্চয়ই যতো না অসুখ, ভয় দেখাবার জন্য বাড়িয়ে বলেছেন দ্বিগুণ। পিতৃহৃদয় ব্যাকুল হ'য়েছে। আর ঐ ভদ্রমহিলা তো একজন মেয়েই, আমার না হোন, কারো তো মা, তিনিই বা আর কতো হৃদয়হীন হবেন। তবু আমি ভেবে রাখলুম, একটু বেরুবার মতো শরীরের অবস্থা হ'লেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো। এ-জায়গা আমার নিরাপদ মনে হচ্ছিলো না, আমি মামীর কাছে যাবার জন্য মনে মনে ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলাম। আমার বিয়ের প্রসঙ্গটা চাপা পড়েছিলো সেই সময়ে।

কিন্তু বাড়িতে একটা আয়োজন চলেছিলো। সমারোহের বিয়ে নিশ্চয়ই নয়, তবু তো বিয়ে। দু'-চার জন লোকের আনাগোনা, কেনাকাটা। মা বললেন, সুমির বিয়ের বন্দোবস্ত। আমি খুশী হ'লাম, নিশ্চিন্ত হ'লাম। নিজেকে মুক্ত মনে করলাম। কিন্তু বিয়ের আগের দিন সকালে জানতে পারলাম, এ-আয়োজন আমার বিয়ের জন্যই। বোঝা উচিত ছিলো। এমন নিরাভরণ আয়োজনে যে আমার মায়ের প্রথম মেয়ের বিয়ে হ'তে পারে না এটা ধরাধার্য। তবু বুঝিনি। বুদ্ধি ততদূর পৌঁছোয়নি।

আসলে এসব আমাকে আটকে দেবার ফন্দি। যেন কোনো রকমেই তাঁদের হাত গলে পালাতে না পারি। ওষুধ, পথ্য আর যত্নের ছলনায় আমাকে ও'রা বন্দী ক'রে ফেলেছিলেন।

বিয়ের আগের দিন সকালে বাবা বললেন, 'প্রস্তুত হ'য়ে নাও, ও'রা এসেছেন।'

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'কারা?'

তিনি বললেন, 'যাঁরা তোমাকে পাকা দেখবেন, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক।'

'মানে?'

'মানে কাল তোমার বিয়ে।'

দৃঢ় হ'য়ে বললুম, 'সে হয় না।'

ততোধিক শক্ত গলায় বাবা বললেন, 'হয়।'

আমি বললুম, 'তাঁদের ফিরিয়ে দাও। এ বিয়ে হবে না।'

'সে কি তোমার ইচ্ছেমতো?'

'আমার অসম্মতি আমি তোমাকে অনেক আগেই জানিয়েছি।'

'তোমার সম্মতি-অসম্মতিতে আমি উঠবো-বসবো এটাই কি তুমি আশা করেছিলে? যা বলছি তা শোনো।'

'হয় না। হয় না।'

'হয়, আলবাৎ হয়।' হাত ধ'রে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন তিনি, মা একটা শাড়ি নিয়ে এগিয়ে এলেন। আমি তেমনি শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলাম, মা একটা ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না আগেই জানি।'

ধাক্কাটা জোরে দিয়েছিলেন, পড়ে গিয়ে ব্যথা পেলুম। কোথা থেকে আমার সবচেয়ে ছোট ভাই, মায়ের সবচেয়ে ছোট ছেলে টুবলু, ও-বাড়িতে একমাত্র মানুষ, যে আমাকে ভালোবাসতো, সেই আট বছরের ছেলে ছুটে এসে কেঁদে উঠলো, 'দিদিকে তুমি মারছো?'

মা তার গালে ঠাস ঠাস ক'রে পাঁচ আঙুল ফুটিয়ে চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মারছি, মেরে ফেলবো, কী করবি তুই?'

'আমিও তোমাকে মারবো। তোমরা খারাপ, তোমরা দিদিকে ঐ কালো চশমাপরা অন্ধ লোকটার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ, আমি সব জানি। ঐ লোকটা গাড়ি ক'রে বাবার কাছে আসে।' এ-কথায় পরে মা অসহ্য রাগে তার চুলের মুঠি উপড়ে ধরলেন। আমি ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি প্রস্তুত হ'য়ে নিচ্ছি, কিন্তু ওর গায়ে হাত দিয়ো না।'

আর কোনো গোলমাল হ'লো না এর পরে, কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, দামী শাড়ি পরে বাধ্য মেয়ের মতো নীচে গেলাম বাবার সঙ্গে। পাকাদেখা সেরে চলে গেলেন ও'রা, আমি উপরে এলাম। আমাদের ঝি বললো, 'বড় লোকেরাই এসব পারে। আমরা গরীব তবু এমন টাকার লোভে অন্ধ ছেলের কাছে মেয়ে দিতে পারতুম না। ছিঃ।'

বিয়ে দেবার গরজের আসল কারণটা বোঝা গেল। এটা সকালবেলাকার ঘটনা। এর পরে সারাদিন আমি কেমন ক'রে কাটিয়েছিলাম, তা লিখে লাভ নেই। অনবরত এই একটাই চেষ্টা করছিলাম কিভাবে এখান থেকে বেরুতে পারি। কোনরকমে পালাতে পারি কিনা। তোর জবরদস্তি যে কোনো কাজে লাগবে না সে বুঝে নিয়েছিলুম, সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছিলুম, যা করবার আজই করতে হবে, কাল উপায় নেই। কাল বিয়ে। আর একজন বাঙালী হিন্দু মেয়েকে কোনোরকমে একটি পুরুষের সঙ্গে সাত পাকে ঘুরিয়ে দিতে পারলেই তো হ'য়ে গেল, সমাজের হাতে বন্দী তখন। সেই সমাজ কি আর তাকে সেই অন্ধকূপ থেকে বেরুতে দেবে জীবনে।

এ-দেশে মেয়ে হ'য়ে জন্মাবার কী বিড়ম্বনা কাকাবাবু। বয়সই বাড়ুক আর বিদ্যেই বাড়ুক, কিছুই কিছু না।

চারিদিকে প্রহরী, বেরুবো কোথা দিয়ে? কিছুতেই পারলুম না। এই করতে করতে শেষ হ'য়ে গেল বেলা, সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, রাত হ'লো। আমার মন রাত্রির মতোই ভ'রে গেল অন্ধকারে। হতাশায় ভ'রে গেল, কান্নায় ভ'রে গেল। আমি দেখলুম, আমার মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এক মুহূর্ত আমাকে ছেড়ে নেই।

তবু আমার আশা ছিলো। এক সময়ে তো ঘুমুবে এরা? সারা রাত তো আর পাহারা দিতে পারবে না। যেমন ক'রে আমি পারবোই। সে যে ক'রেই হোক।

খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে সবাই যখন শুলো, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর ঘরে ঘরে যখন ঘুমের

নিঃশ্বাস গম্ভীর হ'লো, সেই সময়ে উঠে বসলাম। বসেই নামলাম না, দেখলাম, বুঝলাম, তারপর নামলাম। ঘরের দরজায় ঝি শুয়েছিলে, তাকে ডিঙিয়ে দরজা খুললাম আস্তে আস্তে, পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে এলাম। সোজা সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম একটু। বুকটা ঢিপ-ঢিপ করছিলো, কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দরজায় হাত দিয়েই তা থেমে গেল। মস্ত লোহার তালা সজোরে আঁকড়ে ধরলো আমার হৃৎপিন্ডকে। আমি 'মাগো' বলে বসে পড়লাম মেঝেতে। আমার যে আর কোনো উপায় নেই এটা ভেবে নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হ'য়ে এলো।

কিন্তু সে ক্ষণিক, আমি আবার উঠলাম। একটা উপায় দেখতে পেয়ে-ছিলুম, আমি তাই করতে বদ্ধপরিকর হ'লুম। আমি উঠে এলুম সিঁড়ি বেয়ে, দোতলায় নয়, তেতলায়। তেতলায় মস্ত আকাশের তলায় মস্ত ছাদ, লাফিয়ে পড়লে কে আমাকে আটকাবে? বাবাকে জয়ী হ'তে দেবো না আমি, তাঁকে ব্যর্থ করবো, তাঁর লোভের আশায় ছাই দেব। বেগে দরজা খুলতে গিয়ে কিন্তু সেখানেও আমার হাত থেমে গেল। আমার হাতের চেয়ে অনেক বেশী শক্ত হাত যে ঘিরে আছে চারদিকে, সেটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে দেয়ালে কপাল কুটে রক্ত বার ক'রে ফেললুম। কিন্তু শক্ত তালাটির মুখ তাতে একটোটুকুও ফাঁক হ'লো না।

আবার নামলাম দোতলায়, আবার একতলায়, আবার দোতলায়, আবার তেতলায়। নিঃশ্বাস ঘন ঘন হলো, দাঁতের কামড়ে ঠোঁট কেটে গেল, হাতের মুঠো শক্ত হ'লো, শেষে নিস্তেজ হ'য়ে নিজেকে দ্রৌপদীর মতো গোবিন্দের হাতে সমর্পণ ক'রে বললুম, বাঁচাও।

হাওয়ায় রান্নাঘরের জানালাটা শব্দ করলো. সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেলুম সেখানে, উনুন ধরাবার কেরোসিনের বোতল আর দেশলাইটা পাওয়া গেল হাতের কাছে, কুড়িয়ে নিতে দেরী করলুম না। এলুম বাবার বৈঠকখানা ঘরে, সেখানে তাঁর আলমারি ভর্তি ভর্তি আইনের বই, তাঁর কূটবুদ্ধির সহায়ক। দ্রুত হাতে সেগুলো পাঁজা ধ'রে নামিয়ে কেরোসিন ঢাললুম তার উপর, তারপর দেশলাইয়ের কাঠিটি ধরিয়ে দিয়ে দৌড়ে এলুম উপরে। নিজের ঘরে নয়, বাথ-রুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম, যাতে ও'রা এ-কথাটাই ভেবে নেন, বাথরুমে এসেছিলাম বলেই দেখেছিলাম।

প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠলুম, 'আগুন, আগুন, আগুন লেগেছে।'

মুহূর্তে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। ফটাফট দরজা খুলে গেল সব ঘরের, ঘুম ছুটলো সকলের, নীচের দাউ দাউ আগুন সারা বাড়ি আলোকিত ক'রে ফেলেছিলো। দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি, চেঁচামেচি, মা, বাবা, ভাই, বোন, দাসী, চাকর, ভালা খোলা, দমকলকে খবর দিতে যাওয়া—

আমি দাঁড়ালাম না, ফিরে তাকালাম না, ভিড়ের মধ্যে খোলা দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে এলাম রাস্তায়, আগুন আমার পিছনে রইলো, অনেক দূরে এসে আমি থামলাম। মধ্যরাত্রির বিশাল গম্ভীর আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, 'ঈশ্বর, তুমি তো আছ।' নইলে আমাকে কে এ বুদ্ধি দিল।

কিন্তু কোথায় যাই? কী করি? আর সেই মুহূর্তেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনি ছাড়া আর আমার কেউ নেই; আর কারো কাছে গিয়েই আমি এ অবস্থায় দাঁড়াতে পারি না। কিন্তু আপনি আর আমি দু'জন দুই প্রান্তে বাস করি। কেমন ক'রে এই সমুদ্র পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবো?

কটা বেজেছে কিছু বুঝতে পার-ছিলাম না, নির্জন রাস্তা ধ'রে শূন্য হৃদয়ে, শূন্য হাতে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। আমার ভয় করছিলো। ভীষণ ভয় করছিলো। কেবলি মনে হচ্ছিলো, কে যেন পিছে পিছে আসছে। শাড়ির আঁচলটা মাথা-মুখ ঢেকে জড়িয়ে নিলাম।

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিলো, হাত বাড়িয়ে আদর করতেই আসলো, ল্যাজ নেড়ে নেড়ে পিছন নিল। কেন তাতেও ভরসা পেলাম খানিকটা। দূর থেকে দেখতে পেলাম, আলো জ্বালিয়ে একটা বেবী ট্যাক্সী ছুটে আসছে, নিশ্চয়ই কারোকে এয়ার পোর্টে পৌঁছে দিয়ে ফিরছে, নয়তো এই সময় ট্যাক্সী যাবে কার আশায়? সাহসে ভর ক'রে থামালাম হাত দেখিয়ে, উঠে বসলাম, ভিতরে ভিতরে যতোই কেঁপে থাকি, বাইরে একফোঁটা ভয়ের রেখা ফুটতে দিলাম না। ভাবলাম, ট্যাক্সীওলা যদি সর্বনাশ না ক'রে তাহ'লে যার কাছে গিয়ে পৌঁছুবো, সেখানে আমার সব

দুঃখ জড়িয়ে যাবে। কে জানতো যে, আপনি সেখানে নেই।

যে-কোনো বিপদের জন্যই আমি প্রস্তুত রাখলুম নিজেকে, দরজার হাতলটা শক্ত ক'রে ধ'রে থাকলাম মুঠোতে। মনে মনে ভাবলাম, দরকার হ'লে লাফিয়ে পড়বো।

নির্বিকার ড্রাইভার, সোজা ক'রে স্টিয়ারিং ধ'রে নিরালা রাস্তায় দ্রুততম গতিতে গাড়ি চালিয়ে যেতে লাগলো। আমার কাছে সময় দীর্ঘ লাগাই স্বাভাবিক কিন্তু ঘড়ির সময় অনুসারে সারা শহরের বুক মাড়িয়ে খুব তাড়াতাড়িই বোধ হয় সে আমাকে দক্ষিণ প্রান্তে এনে পেঁছে দিয়েছিলো।

আমি আমার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে লাফিয়ে নামলুম। হাতের বালাটা খুলে গুঁজে দিলুম ড্রাইভারের হাতে, সে আলো জ্বাললো, অবাক হ'য়ে তাকালো আমার দিকে, লক্ষ্য করলুম, বয়সে সে যুবক। আমি ভেজা গলায় বললুম, 'আপনি আমার যে উপকার করেছেন, সে ঋণ কখনো শোধ হবার নয়। এটা কিছু না।'

আপনার বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে ছিলো। বড়ো বড়ো গাছের ঘন অন্ধকার। আমি উত্তেজিত পায়ে কম্পাউন্ড পার হ'য়ে বারান্দায় উঠলুম, প্রাণপণে কলিং বেলটাকে টিপে ধরলুম জোরে। আপনার দক্ষিণ কোণের বড়ো ঘর থেকে একটি নীল আলো জ্বলে উঠলো সেই প্রচণ্ড শব্দে। আমি আপনাকে দরজা খুলে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বুকে। আমার সব শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে গিয়েছিলো, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিলুম না। নিস্তব্ধ বাড়ির অন্ধকার বাতাসে নিজের কান্নার অস্ফুট শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠলাম।

অন্ধকারে আপনার ছায়াও চমকে উঠলো। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই ছায়া আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে। আমি বললুম, 'কাকাবাবু, আমি—আমি পালিয়ে এসেছি, বাবা আমাকে আটকে রেখেছিলেন—আমি—আমি—'

ছায়া নড়লো, গভীর গম্ভীর শান্ত গলায় উচ্চারণ করলো, 'ব্লেস মাই সোল।'

'ক্কে!' আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে তার হাতের বন্ধন থেকে সরে দাঁড়ালাম।

সে বললো, 'তুমি কি ডক্টর সানিয়ালকে খুঁজছো?'

'কিন্তু তুমি—'

'আমি রাসেল। রাসেল স্মিথ।'

'রাসেল! রাসেল স্মিথ!'

লেখা যায় নাকি এসব? গাঢ় ক'রে শেষের দিকের লাইন ক'টা কেটে দিল তাড়াতাড়ি। লিখলো, 'রাসেল স্মিথ নামক যে আমেরিকানটিকে আমি আপনি ভেবে অন্ধকারে ভুল করেছিলাম, সে আমার চেনা। আপনার অবর্তমানে আপনার কন্যাকে সে যত্নেই রেখেছে, আমাকে আমার কাকাবাবুর কোন অভাব বুঝতে না দিতে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু একটা খুব বদ দোষ, সারাদিন বিশ্রী উচ্চারণে বাংলা বলে এবং এমন ভাব ক'রে যেন এ-বাড়িটা আমার কাকাবাবুর নয়, আমার কোনো অধিকার নেই, সে-ই

"আমাদের প্রণাম নেবেন"

'তুমি কি ভুলেছো আমাকে।'

'ভুলেছি!'

'তুমি কি জান, কোটো কোণ্টো পেয়েছে হামি—'

'আমি পাইনি!'

'মল্লিকা, হামার মল্লিকা—'।

এই পর্যন্ত লিখে জিব কেটে থেমে গেল মল্লিকা। ছি-ছি, এই সব কাকাবাবুকে কী লিখছে সে? গুরুজনকে

সর্বময় কর্তা। পুরো বাঙালীবাবু হবার জন্য বাজারে যাওয়া ধরেছে এবং আমার কোনো কথা শোনে না। আপনি এলে আমরা দু'জনে মিলে তাকে খুব শাসন করবো।

আজ এই পর্যন্ত। অন্য খবর সব এলে বলবো। আমাদের প্রণাম নেবেন। কবে আসবেন? তাড়াতাড়ি আসুন।'

মল্লিকা

সমাপ্ত

ভরত রচিত 'গীতালংকার'

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুদিন পূর্বে (১৯৫৯) পণ্ডীচেরী শহরের ভারতীবিদ্যার ফরাসী পরিষদ একখানি অপ্রকাশিত সংগীতগ্রন্থ সম্পাদন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থটির নাম 'গীতালংকার'। মূলে সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন—পণ্ডিত ভট্ট মহাশয়। ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন—ভারতের সংগীত বিদ্যার বিশেষজ্ঞ মসিয়ে' অ্যালেন্ দানিয়েলু। ইনি একটি গ্রন্থের প্রস্তাবনা সংযুক্ত করিয়া এই গ্রন্থের বিষয়ে নানা আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ১৫টি অধ্যায়ে সংগীতবিদ্যার নানা তত্ত্বের আলোচনা আছে—তাহাতে ভারতের সংগীতের অনেক নূতন উপাদান পাওয়া যাইতেছে। সংগীতের ইতিহাসের এই নূতন উপাদান সংগীতপ্রেমী ও সংগীত-ঐতিহাসিকের বিশেষ কৌতুক ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই। কিছু তর্ক উঠিতেছে এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম ও রচনাকাল আলোচনায়। ফরাসী অনুবাদক মহাশয় গ্রন্থখানি ভরতমুনির রচনা বলিয়া দাবী করিতেছেন। তিনি আরও দাবী করিতেছেন যে, গ্রন্থখানি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বহু পূর্বকালের রচনা।

Le Naty-satra, ueconpilation du debut notre ere, generalement attriabutei a Bharata, est un ouvrage posterieur du Gitalamkara.

এই গ্রন্থে বর্ণাধ্যায়ে (১৪) রাগ-রাগিণীর যে নাম ও শ্রেণী বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রমাণে গ্রন্থখানির রচনাকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে নির্দিষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে। এই রচনাকাল যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে গ্রন্থখানি নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরতমুনির রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

প্রথম শ্লোকেই গ্রন্থকার ভরতকে এবং শিবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন সুতরাং এই গ্রন্থের রচয়িতা ভরতমুনি হইতে পারে না। "প্রণম্য ভরতো (ভরতং ?) ভক্ত্যা সর্বদং শিবদং শিবম্। গীতস্য লক্ষণং প্রাহ বাদিমত্ত-গজাঙ্কুশং।। 'ভরতং' পাঠ না ধরিলে শ্লোকটির অর্থ হয়—সর্বদ শিবদ শিবকে প্রণাম করিয়া ভরত সংগীত শাস্ত্রের বাদীমত্ত হস্তীদের অংকুশ স্বরূপ গীতের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন।

গ্রন্থের শেষে পুষ্পিকায় আছে—
'ইতি ভরত কৃতো গীতালংকারো
বাদিমত্ত গজাংকুশঃ সমাপ্তঃ।'

এই গ্রন্থের রচয়িতা ভরত, নাট্যশাস্ত্রের ভরত কিনা তাহা প্রমাণ করা যায় না। হয়ত অন্য কোনও ভরতের রচনা। কারণ চতুর্দশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার ছয়টি পুরুষ-রাগ ও ৩৬টি স্ত্রী-রাগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুঃ রাগ ও স্ত্রী রাগের ভেদ এবং ছয় রাগ ৩৬ রাগিণীর নাম ৫ শতকের পূর্বে সংগীতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পঞ্চম শতকে রচিত 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে এই বিভাগ প্রথম দেখা যায়। 'নাট্যশাস্ত্রের' রচনাকালে (১—৩ শতকে রচিত) রাগ-রাগিণীর বিশিষ্ট নাম পাওয়া যায় না, কেবল গ্রামের নামে নির্দিষ্ট গ্রাম-রাগের উল্লেখ আছে। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর বিভেদ ও নাম কল্পনা—ভরতমুনির রচনার অনেক পরবর্তীকালের রচনা। কিন্তু 'গীতালংকারের' রচয়িতা যিনিই হউন—এই গ্রন্থে প্রদত্ত নানা নূতন ও কৌতুকপ্রদ তত্ত্ব সংগীত-প্রেমীদের প্রচুর আনন্দ দেবে, একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

প্রাচীন পূর্বগামী সংগীত রচনাকারদের ১৪ জন পূর্বসূরীদের নাম পাওয়া যাইতেছে; ব্রহ্ম—রুদ্র, নারদ, পর্বত, মেধা, কশ্যপ, অশ্বতর, ভীমসেন, বৃহস্পতি, তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, হাহা ও হূহূ—(গন্ধর্ব), রাবণ এবং রাজা জনক।

প্রথম অধ্যায়ে (৭—১০) সংগীত-সাধনার মোক্ষদায়িনী শক্তির উল্লেখ ও উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। যৎ-গীতং রমণীকর্ণে মধুবং যাতি কুৎস্নশঃ। তেন কাম বাপ্নোতি যদ্যপি স্যাং বিরূপকঃ।।৭।। নিষ্কলং বর্তমানোঽপি গীয়তে যৎ স্ব-শক্তিতঃ। তন্মোক্ষায় ভবেদ্ পুংসোং নিষ্কামানামসংশয়ম্।। ।।৮।। কৃত্বা পাপ-সহস্রানি বেণুর্নাম মহীপতিঃ। ধর্ম-গীতাং বিপাপ্মাসৌ সংপ্রাপ্তস্ ত্রিদশালয়ম্।। ।।৯।। রাবণো-ভর্গমারাধ্য গীতে নৈশ্চর্যতাং গতঃ। কম্বলাশ্বতরৌ নাগো বিভূতিং পরমাং-গতৌ।।১০।। কিন্তু গীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া বর্ধমান শহরে একজন শূদ্র (তাহার নাম বুক) তাহার নিজ স্ত্রীকে হত্যা করিয়া অন্য স্ত্রী বরণ করিয়াছিল—তাহার করুণ কাহিনীর উল্লেখ পাই। সুতরাং গীতের আকর্ষণ সকল সময়ে মোক্ষলাভ দান করে না। গীতের আকর্ষণে অনেকে দুর্নীতির জীবন যাপন করিতেছেন—তাহার উদাহরণ আমরা বর্তমান সমাজে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই। সংগীত-সাধনা মাত্রই উচ্চতর সংস্কৃতির সহায়ক নহে। উপরের শ্লোকে উল্লিখিত 'বর্ধমানপুর' যদি আমাদের বাংলাদেশের বর্ধমান শহর হয়, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা ভরত সম্ভবতঃ বাঙ্গালী ছিলেন।

এই গ্রন্থে এক এক রাগের প্রয়োগে ও শ্রবণে কিরূপ শ্রুতিফল হয়—তাহার চমৎকার কাব্যময় লক্ষণ ধৃত হইয়াছে:—গান্ধার রাগ প্রথমে গন্ধর্বগণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন—মনুষ্যগণ সমাকরূপে এই রাগ গান করিলে ব্যসন-মুক্ত হয়:—

গন্ধর্বৈঃ প্রথমং গীতং গান্ধারস্
তেন গীয়তে।
সম্যগ্গীতঃ করোত্যাশু নরাণাং
ব্যসন-ক্ষয়ম্।। (১৪)

যদি মহিলাগণ (কোনও কারণে) বিরক্ত হইয়া থাকেন—তাহাদের রক্ত-গান্ধারে গান শুনাইলে, তাঁহারা রক্ত-গোলাপের মত প্রফুল্ল হইয়া উঠিবেন:—

রক্তানারান্তি সদ্যো বৈ বিরক্তা
অপি যোষিতঃ
যতঃ শ্রবণ-মাত্রেন রক্ত-গান্ধারকস্ ততঃ।
(১৪)

সেকালের ভিখারী

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন রকম কায়িক পরিশ্রম না করে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা-অর্জনকারী ভিখারীদের সংখ্যা কলকাতা শহরে নেহাৎ কম নয়। অনেকে বলেন বর্তমানে কলকাতা শহরে ভিখারীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার। কিন্তু এই সংখ্যায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মোট কথা, প্রকৃত সংখ্যা কত তা' আন্দাজে বলা যায় না। কলকাতার বিভিন্ন পথে নানা ভাষায় গান গেয়ে কিম্বা আর্ত-নাদ করে ভিখারীদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়। সমস্যাবহুল কলকাতা শহরের আর একটি সমস্যা হলো ভিখারীর প্রাচুর্য। দু-মুঠি অন্নের জন্য কোন রকমে বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রায় সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে ভিখারীরা এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতা মহানগরীর রাজ-পথে এবং শহরের আনাচে-কানাচে। কলকাতা শহরে নানা রকম ভিখারী দেখা যায়। অন্ধ, পঙ্গু, বোবা, পক্ষাঘাতে কাতর, কুষ্ঠব্যাধি ও অগ্নিদগ্ধ বীভৎস মূর্তি ও অনাথ প্রভৃতি ভিখারী শহরের রাজপথে স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলেছে। তা' ছাড়া আছে সাধু, বৈরাগী, ফকির প্রভৃতি রূপধারী ভিখারী। তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। কোন কোন ভিখারী শ্রমের বিনিময়ে ভিক্ষা করে থাকে যেমন গান গেয়ে পয়সা চায় কিম্বা নানা রকম ভোজবাজী বা জাদু দেখিয়ে তাহার বিনিময়ে ভিক্ষা করে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে কলকাতা শহরে একজনকে শারীরিক পীড়ন দিয়ে ভিক্ষা করতে দেখা যেত। তাকে লোকে বলতো "হাপু"। আজও আমার মনে পড়ে সেই লোক-টাকে। সে নগ্নগাত্রে ঘুরতো। পরনে থাকতো আধ-ময়লা জীর্ণ বস্ত্র। সেই লোকটিকে দেখা যেত উত্তর এবং মধ্য-কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়। হাতে থাকতো একটি কঞ্চি ভাঙা লাঠি। তাই

বৈরাগী, ভিখারী ও ফকিরের ছবি : বিদেশী চিত্রকর Belnos-এর আঁকা।

দিয়ে সে নিজের পিঠে মারতো নিষ্ঠুর-ভাবে। তার শরীরের গঠন ছিল বেশ বলিষ্ঠ। থপ থপ করে হাঁটতো। লাঠির আঘাতে সারা পিঠে রক্ত জমে পিঠের রঙ হয়েছিল কালোবরণ। এক হাতে লাঠি পিঠে মেরে যেত আর এক হাত বাড়িয়ে রাখতো পয়সার জন্য। সে মাঝে মাঝে বিকট শব্দে চিৎকার করতো "পাগলা হাপু", "পাগলা হাপু" বলে।

ভিক্ষা করে জীবিকা অর্জন করার প্রথা প্রাচীন ভারতেও ছিল। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক গ্রন্থ 'কৌটিলীয় . অর্থশাস্ত্র' তাতে উল্লেখ আছে—"ভিক্ষুক ও কুহক (ঐন্দ্র-জালিক) ও এই প্রকার অন্যান্য কার্য-কারীদিগকে (রাজা) দেশের (লোকের) পীড়া উৎপাদন করা থেকে বারণ করবেন।'

ভিক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

"সর্ব-গণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীর ভিক্ষা-ধর্ম করয়েন
শিক্ষা॥"
আ।২।৫৫॥

সেকালে গৃহস্থ-বাড়ীতে ভিখারী পদার্পণ করলে গৃহস্থ সাধ্যমত ভোজ্য দিয়ে ভিখারী তুষ্ট করতেন। ভিখারীর বেশ যদি সাধু-সন্ন্যাসীর মত হতো তা' হলে এইধরনের দানকে ভিক্ষা প্রায় বলা হতো না। এ.ক বলা হতো সাধুসেবা। ভিখারী খাওয়ানোকে অনেকে বলতেন দরিদ্র-নারায়ণ সেবা।

ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় ব্যবস্থা তাতে কোন রকম সন্দেহ নেই কিন্তু ধর্মীয় লোকাচারের ফলে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা বেশ কিছু লোক কায়িক শ্রম না করে এই অসম্মানজনক কাজকে পেশারূপে গ্রহণ করেছে।

সেকালে অর্থাৎ প্রায় দু-শো বছর আগে কলকাতা শহরে লোকসংখ্যা ছিল অনেক কম। শহর তখন সবে গড়ে উঠছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েলস এষ্টিমেট থেকে জানা যায় যে, সে সময় লোকসংখ্যা ছিল ৪০৯,০০০ এবং ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মেকিনটসের এষ্টিমেট থেকে জানা যায়, লোকসংখ্যা ৫০০,০০০ ছিল। কলকাতায় ভিখারীদের সংখ্যাও সেকালে বেশী ছিল না। সেকালে ভিখারী, ফকির ও বৈরাগীরা দোকান-দারের কাছ থেকে প্রতিদিন ভিক্ষা পেত। কলকাতা শহরের শাসনভার তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। কোম্পানীর সরকার সে ভিক্ষারও পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এবং ভিক্ষার জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা ছিল।

২০শে আগষ্ট ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ তারিখের কলকাতার ভিখারীদের একটি প্রার্থনা-পত্র থেকে জানা যায় যে, সে-সময়কার ভিখারীরা ফোর্ট উইলিয়ামের কাউন্সিল ও প্রেসিডেণ্ট মহোদয় সমীপে আবেদন পাঠিয়েছিল। যারা আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল তাদের কয়েকজনের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন—জীবন দাস বৈরাগী, বাসুদেব ব্রহ্মচারী। তা' ছাড়া আরও অন্যান্য ভিখারীরাও আবেদন করেছিল। ভিখারীরা প্রার্থনাপত্রে, জ নিয়েছিল—

"সবিনয় নিবেদন, এই আবেদনকারীগণ কলকাতা শহরের বাসিন্দা ব্রাহ্মণাদি হুজুরের নিকটে প্রার্থনা জানাইতেছে যে, তাহারা সংখ্যায় দুইশত। এবং প্রেসিডেণ্ট ও কাউন্সিলের প্রদত্ত সনন্দের বলে তাহাদের নিত্য প্রতি দোকান হতে পাঁচটি করে কড়ি ভিক্ষা নেবার অনুমতি ছিল। উক্ত ভিক্ষা তাহাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হতো। এবং তাহারা এতাবৎ কাল পর্যন্ত উক্ত প্রকারে ভিক্ষা পাইয়া আসিত-ছিল। কিন্তু যখন হতে কোম্পানী বাহা-দুরের ঘাটগুলি নির্মিত হয়েছে, দোকানীরা ঐ ভিক্ষা দিতে অস্বীকার করিতেছে। সুতরাং হুজুরের আবেদন-কারীগণ নিরতিশয় নম্রতার সহিত অনু-নয় করিতেছে যে, হুজুর (কোম্পানী বাহাদুর) এই বিষয়টি বিবেচনা করে এক আদেশ জারি করেন যে হাতে তাহারা পূর্ববৎ ভিক্ষা পাইতে পারে।"

৩১শে জুলাই, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে একটি লাইসেন্স নিমাইচরণ দাস ব্রজবাসী ফকিরকে দেওয়া হয়েছিল। উক্ত সনন্দের প্রতিলিপিতে উল্লেখ আছে—

"নিমাইচরণ দাস ব্রজবাসী ফকিরকে আদেশ করা যাইতেছে যে সে কলকাতা শহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের প্রত্যেক দোকান হতে দৈনিক এক কড়া করে কড়ি ভিক্ষা চাহিতে পারিবে।"

বোধ হয় সেকালে কলকাতা শহরের প্রত্যেক ভিক্ষুককে এইভাবে লাইসেন্স নিতে হতো। ভিখারীরা যে জোর-জবরদস্তি করে দোকানির নিকট বেশী আদায় করতো এরূপ ব্যবস্থাই তার প্রমাণ।

শোভন আচার্য

॥ সাহিত্যিক-বাতিক ॥

ইংলণ্ডের দুজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী সম্পর্কে গল্প আছে—একজন বক্তৃতা দেবার সময় হাতে একটি গোলাপফুল নিয়ে উঠতেন এবং বক্তৃতা শেষ হলে দেখা যেত তিনি ফুলটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছেন। আর একজন বক্তৃতাকালে কোটের ফলস্ বোতামটা ক্রমাগত ঘোরাতেন। একবার হল কী! বক্তৃতা দিতে দিতে বোতাম গেল ছিঁড়ে, আর অমনি দম-ফুরানো রেকর্ডের মতো থতমত খেয়ে মাঝপথে থেমে গেলেন বক্তা। মানুষ কিছু কিছু অভ্যেস জীবনে অর্জন করেন এটা ঠিক, কিন্তু অভ্যাসের দাস হওয়া নিহাত-ই বিচ্ছিরি ব্যাপার। অন্ততঃ অসংখ্য জীবন সৃষ্টি-কারী সাহিত্যিকদের পক্ষে তো আরোই। সাহিত্যিক বিভিন্ন চরিত্রের মানব সৃষ্টি করেন—কখনো অসুস্থ, বিকৃত, ম্যানিয়া-গ্রস্ত। আর ভাবতে গেলে আশ্চর্য হতে হয় সাহিত্যিক নিজেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ম্যানিয়াক। এমনকি নায়ক চরিত্রের ওপরও তাঁদের প্রিয় বাতিক-গুলি তাঁরা নির্দিধায় আরোপ করেন।

চলাফেরায় কথায়-বার্তায় মুখ-ভঙ্গিতে পর্যন্ত লেখকেরা অসাধারণ। একজন বিখ্যাত অধ্যাপক-সমালোচককে দেখেছি নাচতে-নাচতে হাঁটতে। আর একজন প্রধান সাহিত্যিক খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলেন। অথচ এ'দের দুজনেরই পায়ের কোনো ব্যারাম নেই বলে জানি। আবার গুণগুণ গান করতে করতেও জনৈক সাহিত্যিককে আমি হামেশা কলেজ স্ট্রীট যাতায়াত করতে দেখি। অধিকন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ভিতর-বুঁদে কয়েকজন লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে যাঁদের আমি হাসতে দেখিনি। তাঁদের চিন্তাকুটিল আনন দেখলে মনে হবে সারা বিশ্বের সমস্যা যেন ও'দের মাথায় ভারি মেঘের মতো জমাট বেঁধেছে।

এই বাহ্য। এ'দের আত্যন্তিক বদভ্যাস সবচেয়ে বেশি প্রকট হয় যখন লেখার টেবিলে বসেন। আমার একজন পরিচিত গ্রন্থের সাহিত্যিক লেখেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ভাবেন পায়চারি করতে করতে, আর মিনিটে মিনিটে জলে গলা ভেজানো চাই। আর একজন লেখার ডেস্কে ঝুঁকে ডান হাতে কলম ধরে বাঁ হাতে ব্রহ্মতালুর চুল ছিঁড়তে থাকেন। কী আশ্চর্য, তাঁর উত্তর চল্লিশেও টাক পড়েনি এ পর্যন্ত। সেদিন বেজায় সংকটে পড়েছিলাম। গিয়েছিলাম একজন প্রবীণ সাহিত্যিককে এক সভার জন্য নিমন্ত্রণ করতে। ঘরে পা দিতেই ভীত হলাম, দেখি আমার দিকে চেয়ে তিনি দাঁত খিঁচোচ্ছেন। পরে বৌদির কাছে শুনলাম লিখতে লিখতে দাঁত খিঁচোনো দাদার মস্ত রোগ! মধ্যকলকাতার নামজাদা একজন সাহিত্যিক লেখাকালে রবীন্দ্র-নাথ আবৃত্তি করেন। এ ছাড়া বাথরুমে বসে ভাবা, গায়ে জল ঢালতে ঢালতে ভাবার অভ্যেস তো প্রায় সাহিত্যিকেরই আছে। এ ছাড়া লিখতে বসার টাইম-বেটাইম সম্পর্কেও লেখকরা ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কেউ লেখেন রাত জেগে মধ্যরাত্রিতে, দিনের বেলায় তিনি নাকি কিছুতেই লিখতে পারেন না। তাঁদের যুক্তিঃ গভীর রাত্রির নিঃশব্দতায় যখন স্নায়ুকেন্দ্র অবসিত থাকে তখন ভাবাবেগের সমুদ্র হঠাৎ জোয়ারে থৈ থৈ করে ওঠে এবং রচনাশৈলী তখন আবেগ-সমুদ্র মন্থন করে রসস্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। আবার খটখটে দুপুরে যাঁরা লিখতে অভ্যস্ত তাঁদের যুক্তিঃ গদ্য জাতীয় রচনা পুরুষ জাতীয় সৃষ্টি, রমণী-সুলভ অলংকারের বাহুল্যে তার দরকার হয় না। কাজেই পরিষ্কার খরধার দ্বিপ্রহরেই গদ্য রচনার পক্ষে প্রশস্ত সময়। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে সুলেখক-দের লেখার উপযুক্ত সময় নির্দেশ করা হয়েছে ব্রাহ্মমুহূর্তে। কারণ সাহিত্য-কর্মী সংস্কৃত সমালোচকদেব কাছে কবিক্রতু ক্রান্তদর্শী! ভূত-ভবিষ্যত-বর্তমানদর্শী সুকবি তাঁদের চোখে ঋষিকল্প ব্যক্তি।
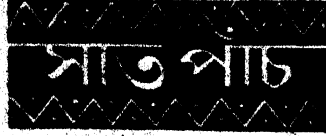
কিন্তু, আমার আলোচনায় ফিরে আসি।

এছাড়াও লেখকরা কতগুলো বাড়তি অভ্যাস আহরণ করেছেন। লেখার টেবিলে চা কফি ওভালটিন পান সিগারেট নস্যি, এমনকি পশ্চিমা অভ্যাস খৈনী পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। সব চেয়ে মজার ব্যাপার, লেখকরা তাঁদের এইসব বদভ্যাসের জন্যে বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ নন্। নেশার সমর্থনে তাঁরা সাফাই গেয়েছেন, বলেছেন, এগুলি কনভেনশনাল নেসেসিটি! অবশ্য নেশাতে আমার আপত্তি নেই। কারণ নেশাবিহীন পুরুষ নুনছাড়া রুটির মতো বিস্বাদ পদার্থ। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে নেশার ক্রীতদাস বনে-যাওয়া।

এ সম্পর্কে একটি শোচনীয় কাহিনীর অবতারণা করা যাক। কাহিনী নয়, ঘটনা যা ঘটেছিল।

তখন মালদায় থাকতাম। শ্বশুর-বাড়ির দেশে বেড়াতে এসেছেন এমন এক উদীয়মান শক্তিশালী সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক ভীষণ সিগারেট-খোর। এক রাত্রে উপন্যাস লিখতে লিখতে নায়ক-নায়িকারা এমন এক ক্রিটিকাল চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে, আবেগে থরথর করে কাঁপছেন—হঠাৎ কলম থেমে গেল, হাঁপাচ্ছেন, চোখে মুখে অন্ধকার দেখছেন : প্যাকেটে একটি সিগারেটও অবশিষ্ট নেই। এ্যাসট্রে উল্টেপাল্টে খাওয়া চলতে পারে এমন আধপোড়া সিগারেটও মিলল না।

চেয়ার ছেড়ে উত্তেজিত পদচারণা শুরু হল। নায়ক-নায়িকাকে অমন উদ্বেগজনক অবস্থায় থামিয়ে রেখে ছটফট করেছেন স্রষ্টা। কিন্তু, উপায় কী। মস্তিষ্কে ধোঁয়া না দিলে হাত খুলবে না। অতএব বাড়ি থেকে বেরুলেন। কাছেপিঠে কোনো দোকান খোলা থাকার কথা নয়। তখন ঘড়িতে একটা। নিশুতি রাত্রিতে প্রায় মাইল দুয়েক শহর প্রদক্ষিণ করে এলেন সাহিত্যিক। অবশেষে এক খোট্টার দোকানে মিলল—সিগারেট নয়, বেঙ্গল পুলিশ, মানে বিড়ি।

পরদিন সকালে হাসতে হাসতে ভদ্র-লোকই জানালেন তাঁর এই কীর্তির কথা।

হঠাৎ লেখায় বাধা পড়ল।

ব্রাহ্মণীর কণ্ঠস্বর : কী ছাইভস্ম লিখছ শুনি? এ্যাশট্রে দুটোই যে সিগারেটে আর ছাইয়ে উপচে পড়ছে।

মাফ করবেন, এটা নেহাতই দাম্পত্য সংলাপ।

কিন্তু এর পর আর কি লেখা যায়, আপনারাই বলুন।

॥ চৈনিক মিথ্যাচার ॥

চীন সরকারের মিথ্যা প্রচার আবার আশংকাজনকভাবে মাত্রা অতিক্রম করেছে। গত বছর ২০শে অক্টোবর তারিখে ব্যাপকভাবে ভারত আক্রমণের প্রাক-মুহূর্তে এমনিভাবেই চীন ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করেছিল। তাই এবারের এই মিথ্যাপ্রচারের হঠাৎ মাত্রাধিক্যকে নিছক স্বভাবসুলভ বা উদ্দেশ্যহীন মনে করলে খুবই ভুল করা হবে।

চীনা কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বলতে আরম্ভ করেছেন, হাজার হাজার চীনাকে ভারত সরকার নাকি বন্দী করে রেখে তাদের উপর চরম নির্যাতন আরম্ভ করেছেন। তার উত্তরে ভারত সরকার জানিয়েছেন যে, হাজার হাজার নয়, মাত্র দু' হাজার চীনাকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে আটক রাখা হয়েছে এবং তাদের এ-কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, চীনে ফিরে যেতে চাইলেই তাদের সে অনুমতি দেওয়া হবে। আর তাদের যে কি অবস্থায় রাখা হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কর্তৃপক্ষ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে গেছেন। অপরপক্ষে চীন সরকার যে আজও তিন হাজার ভারতীয় সৈন্যকে বন্দী করে রেখেছেন, তাদের সম্বন্ধে কোন কথাই এপর্যন্ত ভারত সরকারকে জানতে দেওয়া হয়নি। এমন কি আন্তর্জাতিক রেডক্রসের পক্ষ হতে ঐ বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চীন সরকারের কাছে যে আবেদন জানানো হয়েছিল, তাও চীন সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। চীন যদি সত্যই শান্তিকামী হত, তবে ঐসব বন্দী সৈন্যদের বহুদিন পূর্বেই তারা মুক্তি দিয়ে দিত।

চীনের দ্বিতীয় মিথ্যাপ্রচারটির উদ্ভাবক হলেন ঐ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মার্শাল চেন ঈ। তিনি হঠাৎ বলে বসেন যে, কলম্বো প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা দিল্লীতে করা হয়েছিল, সে ব্যাখ্যা পিকিঙে করা হয়নি। এইভাবে কলম্বো প্রস্তাবের উদ্ভাবকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তিনি চীনের কলম্বো প্রস্তাব না মানার পক্ষে একটা অজুহাত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে-প্রয়াস সামান্যই সফল হয়েছে। কারণ, কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোগী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিশর ও সিংহল ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে যে, চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তি ঠিক নয়। আর ঠিক যে নয়, সেটা অতি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর পক্ষেও বোঝা সম্ভব। ব্যাখ্যা-বৈষম্য যদি সত্যই ঘটত, তবে সে-কথাটা জানাতে চীনের তিন মাস দেরী হত না। কিন্তু কোন মিথ্যা কতখানি প্রকাশ হয়ে পড়ল, তা নিয়ে চীনের বর্তমান কমিউনিস্ট শাসকরা মাথা ঘামান না। মিথ্যা কথাটা যে উদ্দেশ্যে তাঁরা বলেন, সেই উদ্দেশ্যটা কতখানি সিদ্ধ হল, সেইটাই তাঁদের প্রধান বিচার্য বিষয়।

কিন্তু চীনের দুশ্চিন্তাকর মিথ্যা প্রচারটি শুরু হয়েছে ২৩শে মার্চ থেকে। চীন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে চীন-সিকিম সীমান্ত অতিক্রমণের অভিযোগ আনতে আরম্ভ করেছেন। চীনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর পক্ষ হতে প্রচার করা হয়েছে যে, ভারতের চীন-সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনা এখন এত ঘন ঘন ঘটতে আরম্ভ করেছে যে, তা নাকি আর কোন মিথ্যা দিয়েই ভারতের পক্ষে ঢাকা সম্ভব নয়। তারপর চীনের সীমান্ত বরাবর ভারতের সৈন্য মোতায়েনের সংবাদও বিশেষ জোরের সঙ্গে চীন সরকার প্রচার করতে আরম্ভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সিকিম সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলা হচ্ছে যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সিকিমের সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক চীন স্বীকার করে না। চীন ও সিকিমের দীর্ঘ দিনের মৈত্রীর সম্পর্ক ভারত ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত হয়েছে একথা বলার অর্থ হল সিকিমকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে প্রচার করা। কারণ প্রকৃত অবস্থায় ভারতকে বাদ দিয়ে সিকিমের সঙ্গে চীনের কোন স্বতন্ত্র সম্পর্ক থাকতেই পারে না। বলা বাহুল্য, চীনের এইসব উক্তি এক অশুভ ভবিষ্যতেরই ইঙ্গিতবহ। সুতরাং আমাদের তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে।

॥ ভুট্টোর উষ্মা ॥

ভারত যে পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমীপে প্রতিবাদ জানিয়েছে সেটা পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর মনঃপূত হয়নি। এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, এটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের একটানা প্রচার-অভিযানেরই একটি অংশ। তিনি আরও বলেছেন, ভারতের প্রতিবাদে যে "তীক্ষ্ণ ও প্ররোচনামূলক ভাষা" ব্যবহার করা হয়েছে তা তাঁর ও সর্দার শরণ সিং-এর প্রথম পর্যায়ের আলোচনার শেষে প্রচারিত যুক্ত বিবৃতির ভাষা ও চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। এবং এর ফলে কাশ্মীর সম্পর্কে ভবিষ্যৎ পাক-ভারত আলোচনা যে কতখানি সফল হবে সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েছেন।

বর্তমানে যে গতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করে পাক-ভারত আলোচনা চলেছে তার পরিণতি সম্পর্কে জনাব ভুট্টোর মনে সত্যই কোন সন্দেহ আছে কিনা আমরা জানি না। কিন্তু যদি তিনি বলেন যে, ভারতের পাক-চীন চুক্তি-বিরোধী মনোভাবের জন্যই তা ব্যর্থ হয়ে যাবে তবে তার চেয়ে অসত্য উক্তি আর কিছুই হবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের সঙ্গে আর আলোচনা না চালানোর জন্য অভিযোগসৃষ্টির উদ্দেশ্যে পাক সরকার বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ভারতের প্রতিবাদ্য বিষয় শুধু এইটুকু যে, কাশ্মীরের কোন অংশ চীন বা অন্যকোন রাষ্ট্রকে ছেড়ে দেওয়ার অধিকার পাকিস্তানের নেই। একথার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের কিছু বক্তব্য থাকলে সেইটাই তাঁদের জানানো উচিত ছিল। কিন্তু জনাব ভুট্টোর ঢোল পাতার বিবৃতিতে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখার তাগিদে ভারতকে তার প্রত্যেকটি অন্যায় কাজ সমর্থন করে যেতে হবে এই যদি পাকিস্তানের মনোভাব হয়ে থাকে তবে পাকিস্তানের কল্যাণেই অনতিবিলম্বে তার পরিবর্তন ঘটা প্রয়োজন।

॥ অসাবধান উক্তি ॥

ভারতের এখন যা সঙ্কটময় অবস্থা তাতে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ হতে শুরু করে অতি সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলেরই বিশেষ সতর্কভাবে চলা বা ভেবেচিন্তে কথা বলা দরকার। কিন্তু সুপ্রতি উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়েক যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে যেভাবে কথাবার্তা বলে এসেছেন সেটা সকলের পক্ষেই বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের সামরিক প্রয়োজনের বিবরণগুলি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ভারতের সামরিক গোপন তথ্য কয়েকটি এমনভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন যা আজ পর্যন্ত ভারতের সংসদেও কোনদিন আলোচিত হয়নি। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এই ধরণের আচরণ অবিশ্বাস্য। শ্রীপট্টনায়েকের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেই আমরা বলছি যে, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ও

কর্তব্য এতবেশী যে তা ঠিকমত পালন করতে হলে অন্যকোন কাজের ভারই আর নেওয়া সম্ভব হয় না।

॥ বৃটেনের বাণিজ্য সঙ্কোচ ॥

রাষ্ট্রসংঘ হতে সম্প্রতি প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান তথ্যে জানা যায় যে, গত চোদ্দ বছরে এশিয়ায় বৃটেনের বাণিজ্য বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে আর সে জায়গায় বৃটেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখা দিয়েছে ইউরোপের কমন-মার্কেট। ১৯৪৮ সালের পর হতে গত চোদ্দ বছরে এশিয়ার বাজারে বৃটেনের রপ্তানি কমেছে ২০·১% হতে ১৩·৮% ভাগে। সে জায়গায় কমন-মার্কেটযুক্ত ছয়টি রাষ্ট্রের রপ্তানি ৩% হতে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫·৭%। এই হিসাব হতেই বৃটেনের কমনমার্কেটে প্রবেশের এতখানি আগ্রহের কিছুটা কারণ খুঁজে পাওয় যায়।

মৃত্যুভয়

আরব-ঐক্যের প্রয়াস যত সফল হচ্ছে, এবং একের পর এক আরব রাজ্য হতে যতই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটছে ততই ভয়ংকর হয়ে উঠছে সৌদী আরবের রাজা ইবন সৌদের অবস্থা। মৃত্যুভয়ে আজ তাঁর জীবন প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বর্তমানে তিনি অবস্থান করছেন ফ্রান্সের নীস নামক স্থানে, হোটেল নেগ্রেস্কো নামে একটি অভিজাত হোটেল সম্পূর্ণ ভাড়া করে। সেই হোটেলের পাঁচতলায় থাকেন তিনি তিন স্ত্রী, চারটি রক্ষিতা ও পাঁচটি অল্পবয়স্ক পুত্র নিয়ে। তিনজন ডাক্তার তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন। সেই পাঁচতলা থেকে একবারও নীচে নামেন না রাজা সৌদ। পাঁচ তলায় ওঠার লিফ্‌ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কেবল সিঁড়ির মুখে একটু পথ খুলে রাখা হয়েছে। সেখানে সব সময় মোতায়েন আছে একজন ফরাসী ও একজন সৌদী আরবীয় সশস্ত্র পুলিশ। সিঁড়ির মুখ ছাড়িয়ে তাদের ভেতরে আসার অনুমতি নেই। সেইখানেই সব সময় উপস্থিত থাকেন এক দোভাষী ও একটি নারী পরিচারিকা। ঐ কজনের মধ্যে রাজার অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি আছে শুধু ঐ নারী পরিচারিকাটির। যা কিছু সংবাদ তাঁর মাধ্যমেই রাজার কাছে পৌঁছায়।

হোটেলের তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আছেন রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং দোতলায় আছেন রাজার সেক্রেটারী ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারিগণ। এক-তলায় আছে ফ্রান্স ও সৌদী আরব সরকারের পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী। রাজার অন্যান্য সঙ্গীরা নিকটবর্তী হোটেলগুলিতে বাস করছেন। রাজা সৌদ তাঁর নিজের ঘরে ফরাসী সরকারের অনুমতি নিয়ে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার সেট বসিয়েছেন। রাজ্যের সংবাদ প্রতি মুহূর্তে পাওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা।

সম্প্রতি রাজার একটি বিমান সৌদী আরব হতে নীসে আসার পথে আল্পস্‌ পর্বতের মাঝে ধ্বংস হয়েছে। রাজা বলেছেন, বোমা মেরে ঐ বিমানটি ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু কি করে তিনি ঐ সংবাদ পেলেন তা এখনও জানা যায়নি। তবে রাজকর্মচারিগণ জানিয়েছেন যে, ঐ বিমানে আসছিল রাজার লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের হীরা, জহরৎ ও কয়েক ব্যাগ বোঝাই ডলার। রাজার অতি মূল্যবান কয়েকটি পুরাতন অস্ত্রও নাকি ঐ বিমানের মধ্যে ছিল। ফরাসী সরকারের পক্ষ হতে এখনও বিমানটি সন্ধানের চেষ্টা চলছে, কিন্তু আল্পস্‌ পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সেটা সম্ভব হয়নি।

॥ আরব ঐক্যের প্রয়াস ॥

আরব জগতের দুটি বিশিষ্ট রাষ্ট্র ইরাক ও সিরিয়ায় অতিদ্রুত দুটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার পরেই তা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের নায়ক নাসেরের সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করে। ঐ দুটি দেশের অভ্যুত্থানের নায়করাও নাসেরকে পাল্টা অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঐক্যবদ্ধ বিশাল আরব গঠনই তাঁদের লক্ষ্য। স্বভাবতই মনে হয় যে, সিরিয়া ও ইরাকের অভ্যুত্থান নাসের-অনুপ্রাণিত এবং অনতিবিলম্বেই ঐ দুই দেশ ও মিশরের সম্মিলনে গড়ে উঠবে আরব সংযুক্ত রাষ্ট্র ও তারই ভিত্তিতে গড়ে উঠবে বিশাল আরবের ঐক্যের বলিষ্ঠ বনিয়াদ।

অনতিবিলম্বেই কায়রোয় তিন রাষ্ট্রের বৈঠক শুরু হয়ে যায় এবং সেই বৈঠকেও ঘোষণা করা হয়, তিন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব ফেডারেশন গঠনের কথা। কিন্তু এই ঘোষণার কয়েক দিন মাত্র পরেই একটি অতি সংক্ষিপ্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ঐক্য আলোচনা সফল হয়নি এবং ইরাক ও সিরিয়ার রাষ্ট্রনেতারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল সে আলোচনা কেন এমন অতর্কিতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল সে সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ কিছু না বললেও কারণটা হয়ত কিছুটা অনুমান করা যায়। মনে হয় যে, সংযুক্ত আরব গঠনের পূর্ব প্রয়াস ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আরব নেতা নাসের তা থেকে খুব বেশী শিক্ষালাভ করেননি। সিরিয়া যে একদিন মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তার জন্য হয়ত তিনি শুধু সেদিনের বিদ্রোহী সিরিয় সামরিক

নেতাদের 'বিশ্বাসঘাতকতা'কেই দায়ী বলে মনে করেন। তাই বাথ সোস্যালিস্টরা আবার সিরিয়ার শাসনক্ষমতা দখল করাতে নাসের হয়ত ভেবেছিলেন যে পূর্বের অনুকরণেই আবার ঐক্য সম্ভব হবে। কিন্তু সিরিয়ার যে বাথ সোস্যালিস্টরা একদিন স্বেচ্ছায় সিরিয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন ও নাসেরের সর্বাধিনায়কতা মেনে নিয়েছিলেন তাঁরাই আজ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এটা বুঝেছেন যে, অবলুপ্তি ঐক্য নয়। ঐক্যের ভিত্তি হতে পারে শুধু স্বাধিকার, গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি। তাই সিরিয়া, ইরাক এবং হয়ত আরও অনেক আরব রাষ্ট্রই আজ চান স্বরাষ্ট্রের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে আরব ঐক্য। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই এই ঐক্য সম্ভব হতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে আরও প্রয়োজন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও সহনশীল নেতৃত্ব। এক সর্বাধিনায়কের হাতে কোটি কোটি নর-নারী কিছুতেই আর স্বেচ্ছায় নিজেদের ভাগ্য গচ্ছিত রাখতে সম্মত হবেন না. এ-সত্য নাসের যত শীঘ্র উপলব্ধি করবেন, আরব ঐক্যও ততই ত্বরান্বিত হবে।

॥ বৈরী নাগাদের তৎপরতা ॥

কয়েক মাস আগে যে দুই শত নাগা ভারত হতে পলায়ন করে পাকিস্থানে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা পাকিস্থানে সামরিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করে আবার ভারতে ফিরে আসছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। আর এই প্রত্যাগমনের ফলে নাগাভূমিতে বৈরী-নাগাদের তৎপরতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, অতিসম্প্রতি বৈরী-নাগারা প্রায় পাঁচশত সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এবং অবিলম্বে তারা উপজাতীয় পরিষদের সদস্য ও আরও অনেক সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপভাবে ধরে নিয়ে যাবে বলে শাসিয়েছে। বৈরী-নাগাদের এইসব কার্যকলাপে সমগ্র নাগাঅঞ্চল আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ভারত সরকার অবশ্য বৈরী-নাগাদের এইসব কার্যকলাপ কঠোর হাতে দমনের জন্য সচেষ্ট এবং এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই মণিপুরের পাঁচটি মহকুমাকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারত আজ যখন চীনা আক্রমণের সম্মুখীন ঠিক সেই সময় নাগাদের বিদ্রোহী হওয়ার জন্য পাকিস্থানের এই প্ররোচনা ও সক্রিয় সহায়তা ভারতের প্রতি তার অমিত্রসুলভ আচরণের আর একটি পরিচয়। পাকিস্থান যে ভারতের বন্ধুত্বের প্রত্যাশী নয়, এমনকি যতদূর সম্ভব ভারতকে বিব্রত রাখাই যে তার বর্তমান রাষ্ট্রনীতির একমাত্র লক্ষ্য তা সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে পাকিস্থানের পক্ষ হতে অন্তত চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।
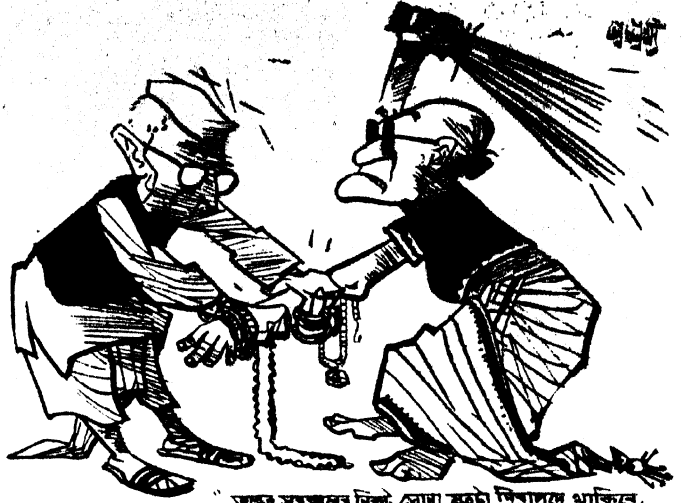
"ভারত সরকারের নিকট সোনা যতটা নিরাপদে থাকিবে, ভারতীয় জনসাধারণের নিকট সোনা তদপেক্ষা অনেক বেশী নিরাপদে থাকিবে।" — রাজাগোপালাচারী

॥ লাল চীনের বিষোদ্গার ॥

সোভিয়েট ইউনিয়নের আপোষকামী মনোভাবের ফলে কমিউনিষ্ট দুনিয়ায় বিরোধ মীমাংসার যে সম্ভাবনা সম্প্রতি দেখা দিয়েছিল, লালচীনের একটানা বিষোদ্গারের ফলে আবার তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। লালচীনের কমিউনিষ্ট দলের মুখপত্র 'রেড ফ্ল্যাগ'? 'রেড-ষ্টার' পত্রিকায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও তার নেতা ক্রুশ্চেভকে পরোক্ষে ও তাঁর অনুগামী ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলির কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের নেতৃবৃন্দকে সোজাসুজি আক্রমণ করে চীনের কমিউনিষ্ট নেতারা বলছেন, তাঁরা আপোষকামী, শোধনবাদী, বুর্জোয়াদের মৈত্রীপ্রত্যাশী। সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যে বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, চীনের কমিউনিষ্ট নেতাদের মতে তা নাকি শুধু ঐ শোধনবাদীদের দুর্বলতার জন্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কিউবা সম্পর্কে সোভিয়েট নীতিকে চীন প্রথমে হঠকারিতা (এডভেঞ্চারিজম) ও পরে কাপুরুষতা বলে বর্ণনা করেছে। পূর্ব জার্মানীর কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিরা চীনা প্রতিনিধিকে যেভাবে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেছেন তার বিরুদ্ধেও চীন তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এখনই যুদ্ধ শুরু করার যে প্রস্তাব কমিউনিষ্ট চীনের আছে সেই প্রস্তাব আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন না গ্রহণ করা পর্যন্ত লাল চীন সংযত হবে বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় ক্রুশ্চেভ আরও কতদিন সংযত থেকে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার ভাঙন প্রতিরোধ করতে পারবেন—সেইটাই এখন বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

॥ সোমালিয়ার ফ্যাসাদ ॥

পূর্ব আফ্রিকার 'শৃঙ্গ'-রাষ্ট্র সোমালিয়ায় এখন তীব্র বৃটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক বিক্ষোভ চলেছে। তার কারণ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র কেনিয়ার যে অঞ্চলটিকে সোমালিয়া তার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করে সেই অঞ্চলটিকে কেনিয়ারই অন্তর্ভুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত বৃটিশ সরকার ঘোষণা করেছেন। কেনিয়ার প্রতি বৃটিশ সরকারের এই পক্ষপাতিত্বে ও সোমালিয়ার প্রতি অবিচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে সোমালিয়া সরকার তাই স্থির করেছেন, বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তাঁরা ছিন্ন করবেন। কিন্তু একটি অভাবিতপূর্ব অসুবিধার জন্য সোমালিয়া সরকারের পক্ষে এখনই এই কাজটি সমাধা করা সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক কিভাবে যে একটি দেশের সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় তা সোমালিয়ার বর্তমান শাসকদের জানা নেই। আর সাটৌর যে বইটিতে এইসব কূটনৈতিক রীতিনীতি লিখিত আছে সেই বইটিও তাঁরা হাতের কাছে পাচ্ছেন না।

ঘটনা প্রবাহ

॥ ঘরে ॥

২১শে মার্চ—৭ই চৈত্র : বিভিন্ন প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তুমুল হট্টগোল—বিরোধী সদস্যদের কয়েক দফা সভাকক্ষ ত্যাগ—আমলাতন্ত্রের উপরতলার চরম দুর্নীতির অভিযোগ।

প্রেসিডেন্সী জেলে (কলিকাতা) ২৮ জন বন্দীর প্রতীক অনশন—বিধানসভায় রাজ্যসরকারের (পশ্চিমবঙ্গ) কারানীতির সমালোচনা।

বিনা বিরোধিতায় কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট (১৯,৯২,৮৩,০০০ টাকার বরাদ্দ) গৃহীত—কমিশনারকে (শ্রী এস বি রায়) কেন্দ্র করিয়া সভায় যথারীতি হৈ-চৈ।

২২শে মার্চ—৮ই চৈত্র : ভারতীয় স্থল বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য ছয় ডিভিসন নূতন সৈন্য সংগ্রহের আয়োজন—এন সি সি'র সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও সরকারী পরিকল্পনা—চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে পাহাড়ে-জঙ্গলে যুদ্ধকৌশল শিক্ষাদানের উদ্যোগ।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভায় চরম বিশৃঙ্খলা—২২ জন সোস্যালিস্ট সদস্য সসপেন্ড ও সভা হইতে বহিষ্কৃত।

সংবাদপত্রে একচেটিয়া মালিকানা রোধের চেষ্টা—লোকসভায় প্রচার ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ গোপাল রেড্ডীর আশ্বাস দান—পরবর্তী বৈঠকে প্রেস কাউন্সিল গঠনের বিল পেশ।

২৩শে মার্চ—৯ই চৈত্র : পুনঃ আক্রমণের জন্য চীনের ব্যাপক তোড়-জোড়—তিব্বতে চীনাদের সৈন্য সমাবেশ ও সীমান্তে সড়ক নির্মাণ—লোকসভায় শ্রীনেহরু কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ সমর্থন—প্রস্তুতির জন্য দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী।

পাকিস্তান কর্তৃক ফেণী নদীতে বাঁধ নির্মাণের কাজ পুনরারম্ভ—পাক সরকারের নিকট ত্রিপুরা কর্তৃপক্ষের প্রতিবাদ।

কৃষ্ণা-গোদাবরীর অববাহিকার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন—কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গুলহাটি কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক কংসাবতী সেতুর (পাঁশকুড়া) উদ্বোধন।

২৪শে মার্চ—১০ই চৈত্র : কলিকাতা ও বরানগরে তিনটি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড—১ জন নিহত ও ৮ জন গুরুতর আহত—লালবাজার অঞ্চলে রাসায়নিক পদার্থের গুদাম ভস্মীভূত—৪ জন দমকল কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ভূটান সীমান্তে ব্যাপক চীনা সৈন্য সমাবেশের সংবাদ।

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনের ইথিওপিয়া, সুদান ও মিশরে শুভেচ্ছা-সফরে যাত্রা।

'আসন্ন উপনির্বাচনসমূহে প্রার্থীদের প্রচারকার্যের জন্য সমস্ত সুযোগ দেওয়া হইবে'—মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে (দিল্লী) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নির্দেশ।

২৫শে মার্চ—১১ই চৈত্র : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা (১৯৬৩) আরম্ভ—এক লক্ষ ৩৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ।

'আণবিক অস্ত্র ভারত কখনই প্রস্তুত করিবে না'—লোকসভায় শ্রীনেহরুর ঘোষণা—সাহারায় ফ্রান্সের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে দুঃখপ্রকাশ।

২৬শে মার্চ—১২ই চৈত্র : বিদ্যুৎ সংকট মোচনে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রচেষ্টায় কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্যোগ—লোকসভায় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ও ভি আলাগেসানের বিবৃতি।

'চাউলের নিম্নতম মূল্য বর্তমানে বাঁধিয়া দেওয়া অনাবশ্যক'—লোকসভায় খাদ্য ও কৃষি উপমন্ত্রী শ্রী এ এম টমাসের ঘোষণা—কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে পশ্চিমবঙ্গে চাউল সরবরাহের আশ্বাস।

২৭শে মার্চ—১৩ই চৈত্র : জবর-দখল কলোনীর উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব—কয়েক শত পরিবার উচ্ছেদের মুখে—চক্রবৃদ্ধি হারে ক্ষতিপূরণের মাত্রা বৃদ্ধির জের।

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে লাওসের রাজা শ্রীসাভং ভাত্তানার দিল্লী আগমন—লাওস-এ শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের ভূমিকার প্রশংসা।

॥ বাইরে ॥

২১শে মার্চ—৭ই চৈত্র : সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পুনরায় মহাকাশে স্পুৎনিক (কৃত্রিম উপগ্রহ 'কসমস-১৩') উৎক্ষেপণ।

বার্লিন সম্পর্কে দ্বিপক্ষীয় (রুশ-মার্কিন) আলোচনা পুনরারম্ভে রাশিয়ার সম্মতি।

মিশর, সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া নূতন আরব যুক্তরাষ্ট্র—সমান দায়িত্বের ভিত্তিতে গঠনের পরিকল্পনা।

বলীদ্বীপে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্‌গীরণে চারদিনে প্রায় ১১ শত নর-নারী নিহত। (সরকারী হিসাব)।

২২শে মার্চ—৮ই চৈত্র : তুরস্কের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সেলাল বেয়ারের (যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত) ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তিলাভ।

২৩শে মার্চ—৯ই চৈত্র : 'ভারতে মার্কিন সাহায্য অবশ্যই চালাইয়া যাইতে হইবে'—প্রেসিডেন্ট কেনেডির নিকট বিশেষ কমিটির রিপোর্ট।

আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতে বলীদ্বীপে আরও পাঁচটি গ্রাম বিপন্ন—১২শত লোকের প্রাণহানির আশঙ্কা।

গুয়াতেমালায় বিদ্রোহীদের সহিত সৈন্য দলের সংঘর্ষ।

২৪শে মার্চ—১০ই চৈত্র : বিহারে চম্বলপুরা প্রকল্পের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ১৬০ লক্ষ ডলার মার্কিন ঋণ মঞ্জুর।

পাকিস্তান গঠনের জন্য গৃহীত লাহোর প্রস্তাবের স্মরণে ঢাকায় পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপন।

নিউইয়র্কের সংবাদপত্রের (৮টি) মুদ্রকদের ১০৭ দিনব্যাপী ধর্মঘটের অবসান।

২৫শে মার্চ—১১ই চৈত্র : পশ্চিম ইরাণে ভূকম্প—১১৯ জন আহত : পাঁচ হাজার মাটির ঘর ক্ষতিগ্রস্ত।

রুশ মহাকাশ যান 'মারস—১'-এর পৃথিবী হইতে ৬৬,৫৪০,০০০ মাইল দূরে অবস্থান—পৃথিবীর সহিত সংকেত বিনিময়ের দাবী।

'কলম্বো প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় কোন অসঙ্গতি নাই'—পিকিং-এর নিকট শ্রীমতী বন্দরনায়কের লিপি।

২৬শে মার্চ—১২ই চৈত্র : বলীদ্বীপে আগ্নেয়গিরির উৎপাতে ৪ লক্ষ লোকের সর্বনাশ—দশ বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বলীতে শস্য উৎপন্ন না হওয়ার অবস্থা।

ছদ্মনামে ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী পলাতক নেতা জর্জ বিদোর মিউনিক হইতে লিসবন উপস্থিতি।

অবৈধ পাক-চীন চুক্তির বিরুদ্ধে স্বস্তি পরিষদে (রাষ্ট্রসংঘ) ভারতের প্রতিবাদে পাকিস্তানের উষ্মা।

২৭শে মার্চ—১৩ই চৈত্র : পাক-চীন সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিবাদ পিকিং সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য।

জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় দুই শতাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার—নাওগাঁ-এ (উত্তরবঙ্গ) পুলিশের গুলীচালনার প্রতিবাদে ছাত্র-ধর্মঘট আহ্বান।

অভয়ংকর

॥ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ॥

গত ২৮শে মার্চ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে মার্কাস স্কোয়ারে তিন দিনব্যাপী সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন আরম্ভ হয়। বিশিষ্ট সর্ব-ভারতীয় লেখকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে উদ্বোধন প্রসঙ্গে 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন :

"ভারতের নানা প্রান্ত থেকে বাণীর বরপুত্রেরা এসেছেন সাহিত্যের সত্য, সাহিত্যের দায়িত্ব এবং সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। সাহিত্য-পাঠক ও সাহিত্য-রসপিপাসু হিসাবে যে কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয় তা হলো এই যে, সাহিত্যেই একটা জাতির সংস্কৃতির যথার্থ প্রকাশ ঘটে থাকে। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থে আমরা ভারত-সংস্কৃতির শাশ্বত পরিচয় পেয়ে আসছি। সেইদিক থেকে বিচার করলে একটা দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। সংস্কৃতি যে দেশে বন্ধনমুক্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পের বিকাশ সে দেশেই সম্ভব। সংস্কৃতি-রথের যাঁরা চালক সেই সাহিত্যিক ও শিল্পী সমাজের পক্ষে মতের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কোনো রাজনৈতিক মতবাদের বেড়াজালে বন্দী হয়ে সত্যকারের কোনো সুন্দর সৃষ্টিকে রূপ দেওয়া যায় না। তারই জন্যে কোনো মহৎ সাহিত্যিকই মনের বন্ধন-দশাকে কখনো মেনে নিতে পারেন নি। তাহলে সংস্কৃতির জয়যাত্রাই ব্যাহত হবে, সংস্কৃতির রথ মধ্যপথে অচল হয়ে পড়বে।

"তবুও আমার মনে হয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বিষয়ে নূতন করে আমাদের ভাববার সময় এসেছে এবং চিন্তার পবিত্র স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যে ভারতবর্ষের সাহিত্যিকদের সতর্ক ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিমানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সাহিত্যিকের কাছে তাঁর মনের স্বাধীনতা অমূল্য। সেই অমূল্য স্বাধীনতা যদি একবার অপহৃত হয়, তাহলে সাহিত্যিকের মূল সত্তাই বিনষ্ট হতে বাধ্য। সেইজন্যেই সতর্কতার প্রয়োজন। জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ মুক্ত মনের প্রেরণায় সৃষ্ট সরস সাহিত্যই সত্যকারের সাহিত্য-পাঠকদের কাম্য। স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণে সেই পথের সমস্ত বাধাকে আপনারা অপসারণ করবেন, সমস্ত অন্তরায়কে অস্বীকার করবেন, এইটুকুই আমার বক্তব্য।"

তারাশঙ্করের ভাষণ

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর প্রেরিত ভাষণ পাঠ করেন দক্ষিণারঞ্জন বসু :

"ঐকান্তিক ইচ্ছে সত্ত্বেও এই গুণী-সমাবেশে উপস্থিত থাকতে না পারায় আমি আন্তরিক দুঃখিত। যদিচ মন স্বাধীন, যখন-তখন যত্রতত্র অবাধ বিচরণে সক্ষম, এবং সে হেতু আমি এখানে অনুপস্থিত থেকেও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে উপস্থিত; তত্রাচ পঞ্চ-বস্তু-নির্মিত এই রক্তমাংসের দেহটা মনের সমান্তরাল রেখা নয়। এবং বার্ধক্যের এটা অন্যতম পরম ট্রাজেডি।

"গত পঁয়ত্রিশ বছরে—সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে এবং দৈনন্দিন জৈব প্রাণ-ধারণের আঘাত ও সংঘাতের ভেতরেও জীবনের বৃহত্তম সত্তা ও গভীরতম উপলব্ধিকে আক্ষরিক ভাষা-শিল্পের মাধ্যমে পাঠক-সাধারণের ভাব-লোকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছি। এই প্রচেষ্টাকেই সত্য বলে স্বীকার করেছি; তার সফলতা কোথায় এবং সার্থকতা কি, তার বিচার করবে ইতিহাস।

"আজ এই জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়িয়ে এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি আমরা, এই মহান ভারতের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা, যাঁদের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে সুখের চাইতে শান্তি বড়, ভোগের চেয়ে ত্যাগ মহত্তর এবং ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন অপেক্ষা আত্মার আনন্দ মূল্যবান। স্বাধীনতার অর্থ আরণ্য পাশবিকতা নয়, স্বাধীনতা মানে সামগ্রিক মানব-কল্যাণের আদর্শ মেনে চলা, ঐকিক সত্তাকে সার্বিক সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করা। এদে[শে] কিম্বা অন্যদেশে চিরকাল আগেও চি[ত্র]কর, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি প্রভৃ[তি] মন্দির, মসজিদ, প্রাসাদ, সঙ্গীত, কা[ব্য] নাটক সৃষ্টি করেছে, নবাব, রাজা, বাদ[শা] আর বিত্তশালী ব্যক্তির ফরমা[য়েশ] অনুযায়ী এবং সে সবের অধিকাং[শই] বিশ্ব-চিত্তলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদরূ[পে] পরিগণিত। শিল্পীর স্বাধীন[তা] সেখানে বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি, যে[হেতু] শিল্পীর সৌন্দর্যচেতনার অনুভূ[তি]মূলক উপাদানের ওপর কোনো বি[...] রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের প্র[...] ছিল না। ছিল না ব্যক্তিচেতনার স[ঙ্গে] সমষ্টি-চেতনার বিরোধ। কিন্তু বর্ত[মানে] বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক য[...] মানুষের জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃ[ত্তির] অনিবার্য সংঘাতের ফলে জীবনের [...] কল্যাণকর আত্মোপলব্ধির [...] কণ্টকাকীর্ণ। সাহিত্যিকের [...] সুন্দরের অন্বেষণ, উপলব্ধি ও প্রক[াশ] কোন অর্থনৈতিক মতবাদ বা [রাজ]নৈতিক আদর্শকে প্রচার করা নয়। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের মা[...] হিসেবে কোনও মূল্যস্বীকৃতি [...] যেখানে মানুষ শাসনযন্ত্রের চে[...] শূন্য জৈব অংশরূপে পরিগণিত [...] সেখানে মানব-চরিত্রের মূল ভি[ত্তি] বিশ্বসত্তার সঙ্গে মানব-সত্তার সং[যোগ] সাধন, সহবোধসূত্রে ঐক্য সম[...] একান্ত অসম্ভব।

"আমরা যেন ভুলে না যাই যে [...] মাত্র আর্থিক অসচ্ছলতাই দুঃ[খের] কারণ নয়। মানবচরিত্র বিচিত্র। ম[ানুষ] এক আশ্চর্য জীব। অন্য কোন জ[ীবের] সঙ্গেই তার তুলনা হয় না।

"বিশ্ব-মানবসত্তার মধ্যে আম[...] মানুষের মত বেঁচে থাকার [...] আকাঙ্ক্ষাকে বিনষ্ট করার সর্বপ্র[কার] বিজাতীয় অপপ্রচেষ্টাকে বাধা [...] তাই আমরা আজ এখানে সমবেত [...] কৃতসংকল্প।"

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সভা[পতি] শ্রীঅশোককুমার সরকার তাঁর ভ[াষণে] বলেন, "সত্যকারের সাহিত্য স্বা[ধীন] এবং শাশ্বত। অতীতে ইহার স্ব[াধী]নতা খর্ব করার অপচেষ্টা হইয়[াছে] তাহাতে উহা সাহিত্য হয় নাই, দে[শের] কল্যাণ সাধনে উহা ব্যর্থ হইয়[াছে]। কিন্তু অতীতের বিপদ অ[পেক্ষা] আজ বিপদ আরও বেশী। [...] আক্রমণের পটভূমিকায় এ স[ম্পর্কে] আমাদের বিশেষ করিয়া সাবধান হ[ওয়া] দরকার।" (যুগান্তর, ২৯-৩-[...])

সম্মেলনে প্রখ্যাত তামিল সাহি[ত্যিক] শ্রীকা না সুব্রাহ্মনীয়ম্, শ্রীপ্রেমেন্দ্র [মিত্র], শ্রীসুবোধ ঘোষ এবং আরো অ[নেকে] ভাষণ দেন।

২৯-৩-

নতুন বই

কাল তুমি আলেয়া— (উপন্যাস) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা—১২। দাম ১২-৫০ নঃ পঃ।

ছয়শত পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি একাধিক কারণে সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্যরূপে বিবেচিত হবে। প্রতি মাসে আমরা নতুন উপন্যাস অনেক পাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি বড় গল্প,—উপন্যাসের গুণ তাদের মধ্যে পরিস্ফুট হবার সুযোগ কম। অবশ্য আকারে বড় হলেই যে সত্যকার উপন্যাস হয় না সে কথা বলাই বাহুল্য।

চারুদি অল্প বয়সে বিধবা হবার পর স্বামীর বন্ধু হিমাংশু মিত্রকে ওষুধ তৈরীর ব্যবসা করতে টাকা দিলেন। সেই ব্যবসা এখন বড় হয়েছে। চারুদি ব্যবসার একজন প্রভাবশালী অংশীদার। গ্রামের বাড়ীতে ধীরাপদ চক্রবর্তীর সঙ্গে চারুদির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বহুদিন পরে কলকাতার পথে চল্লিশোত্তীর্ণা চারুদির সঙ্গে ধীরাপদর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ধীরাপদ পড়াশুনা শেষ করে বিজ্ঞাপনের কপি লিখে অতি কষ্টে উপ-বাসকে ঠেকিয়ে রেখেছে। চারুদি এতদিন পরে ধীরাপদকে পেয়ে খুবই খুশী। চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠালেন হিমাংশু মিত্রের কাছে। কল্পনাতীত সৌভাগ্য। একেবারে প্রথমেই ছয়শত টাকা বেতন। পরে বুঝতে পারল ধীরাপদ, সে শুধু চাকরি করবে না, কোম্পানীতে চারুদির প্রতিনিধি হিসাবেই তাকে আনা হয়েছে। এই কোম্পানীকে কেন্দ্র করে ধীরাপদ পরিচিত হল বড় সাহেব হিমাংশু মিত্র, তাঁর ছেলে ছোট সাহেব সিতাংশু মিত্র, চীফ কেমিস্ট অমিতাভ ঘোষ এবং তরুণী ডাক্তার লাবণ্য সরকার প্রভৃতির সঙ্গে। আপিসের বাইরে আছেন চারুদি ও তাঁর পালিত কন্যা পার্বতী। এ ছাড়া আছে ধীরাপদর নিজস্ব জগৎ। সোনাবৌদি, গণুদা, রমণী পণ্ডিত, একাদশী শিকদারকে নিয়ে সুলতান-কুঠির জগৎ। আপিস আর সুলতান-কুঠির জগতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে ধীরাপদ।

লাবণ্য সরকার, পার্বতী ও অমিতাভ ঘোষের আকর্ষণ-বিকর্ষণ; লাবণ্য সরকারকে জয় করবার জন্য সিতাংশু মিত্রের বাসনা; কারখানার শ্রমিকদের অসন্তোষ, ইত্যাদি নানা ঘটনা ও অনুভূতির আবর্তনে কাহিনী এগিয়ে চলেছে। আর এদিকে আছে রহস্যময়ী নারী সোনাবৌদি এবং রমণী পণ্ডিত ও একাদশী শিকদার প্রভৃতির সুখ-দুঃখের সংঘাত। সৌভাগ্য ধীরাপদর হৃদয়কে কঠোর করতে পারেনি। তাই একদিন যা অনায়াসে পেয়েছিল তা ত্যাগ করে সরে আসতে পারল অবলীলা-ক্রমে। লাবণ্য সরকারও এল সঙ্গিনী হয়ে। নতুন সংসার রচনার স্বপ্ন তার চোখে।

লেখক বহু চরিত্রের ভিড়ের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাহিনী-উন্মোচন করেছেন। পাঠকের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। তাঁর সংযমও বিশেষ প্রশংসনীয়। কাঞ্চনের দেহ বিক্রয়ের ব্যবসা, লাবণ্যের আত্মসমর্পণের বর্ণনা কিংবা ফ্যাক্টরির শ্রমিক বিক্ষোভ কাহিনীর গতি ব্যাহত করতে পারত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা হয়নি। লেখকের চরিত্র-চিত্রণের নিপুণতাও লক্ষণীয়। এতগুলি নর-নারী তিনি কাহিনীর মধ্যে এনেছেন, তথাপি কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। প্রত্যেকটি চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সোনাবৌদি এই উপন্যাসের একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। তানিস সর্দার ও তার বৌ, মানকে, রমণী পণ্ডিত,

একাদশী শিকদার, গণ্দা, কাঞ্চন, রমেন প্রভৃতি ছোট ছোট পার্শ্বচরিত্রগুলি মনের উপর ছাপ রেখে যায়।

এই উপন্যাস পড়ে পাঠকের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে লেখকের গভীর সহানুভূতির স্পর্শে। কোনো চরিত্রকেই তিনি উপেক্ষা করেননি। নর-নারীর হৃদয়-সমুদ্র থেকে মণিমুক্তা উদ্ধার করে তিনি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে যারা ক্ষমার অযোগ্য তাদের জন্যও পাঠকের মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই আন্তরিক দরদের স্পর্শ কাহিনীকে স্নিগ্ধ করেছে।

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে 'কাল, তুমি আলেয়া' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও সূর্যের কাছে— (কাব্যগ্রন্থ)
দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রকাশক এন মুখার্জি, প্রদীপিকা, ৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

হৃদয়হীনতা যখন এ যুগের সাহিত্য-শিল্পের প্রধান উপজীব্য, মানুষের জন্য যদি কেউ দরদ প্রকাশ করে ফেলেন তখন সেটা স্বভাবতই মরুভূমিতে বৃষ্টিপাতের মতো মনে হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর 'আরও সূর্যের কাছে' কাব্যগ্রন্থটি বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মাত্র ষাটটি কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং কবিতাগুলির রচনাকাল মোটামুটি গত তিরিশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত। এই প্রায় ত্রিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের সামাজিক এবং মানসিক অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। রাজনৈতিক পর্বে দেখি পরাধীনতা, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মনুষ্যত্বের অধঃপতন এবং নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা। দক্ষিণারঞ্জন বসু সমাজ এবং রাজনীতি সচেতন কবি। তাই এদের ছাপ তাঁর কবিতায় পড়া স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত : 'বন্দীর মন', 'জিজ্ঞাসা', 'প্রতিরোধ', 'সমস্যা', 'যুদ্ধের জের' প্রভৃতি একাধিক কবিতায় কবির অন্তরের বেদনা-ক্ষোভ-জ্বালা-আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি প্রতিরোধ-স্পৃহা মুক্তকণ্ঠে একাধিকবার ঘোষিত হয়েছে। বিশেষ করে "প্রতিরোধ" কবিতার শেষ ছ'টি লাইনে তিনি দ্বিধা-সংশয় অতিক্রান্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনের চেহারা আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অতুপীকৃত সর্বনাশ গৃহদ্বারে—মন পলাতক!
শব্দশিখা মর্মভেদী সমুদ্যত সুতীক্ষ্ণ আহ্বান;
পূর্বপ্রান্তে ঘূর্ণমান মৃত্যুবাহী উদ্ধত বিমান।
সহসা বিকল চিত্ত। স্তব্ধ দৃষ্টি। ভেঙেছে চমক—
প্রেয়সীর বাহুমুক্ত জাগরূক আত্মশক্তি বোধ :
নিতান্ত বাঁচিতে হবে সুসংহত চাই প্রতিরোধ!'

দক্ষিণারঞ্জন বসু একান্তভাবেই বাঙালী কবি। কিন্তু সমন্বয়ে বিশ্বাসী। আধুনিক বাংলা কবিতার পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা তিনি সুন্দরভাবে তাঁর কবিতায় কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর অনীহা এবং বিবিক্তি আজকের কবিতার অন্তরে তাদের প্রভাব ফেলেছে। তাঁর কবিতায় এর ছায়া যে পাইনি তা' নয়। বিভিন্ন চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষায় এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রায়ই বাদুড়, সাপ, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীজগতের প্রতীকারোপিত চিত্রকল্পে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল উত্তীর্ণতায়, আবদ্ধতায় নয়। জীবনের এই নরক-দর্শনই শেষকথা নয়, কবির স্থির বিশ্বাস অগ্রগতির দিকে।

তিনি বলেছেন—

'আরো সত্য, জীবনের গতিপথে মৃত্যুর
সাক্ষাৎ বারবার অমৃতেরই প্রতি পদক্ষেপ।'
(এই জীবন)

জীবন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি কবিকে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধির পথে এগোতে সাহায্য করেছে। প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ সুরুচিসম্মত।

ঘরে-বাইরের সাহিত্য চিন্তা—
ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—সাহিত্য জগৎ, ২০৩।৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

সাহিত্যিক এবং সাহিত্য গবেষক হিসাবে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সর্বত্র পরিচিত। ডঃ দাশগুপ্ত অতিশয় শান্ত এবং শিষ্ট সমালোচক হিসাবে সর্বজনশ্রদ্ধেয়। সমালোচনা কঠোর হওয়া সম্ভব কিন্তু সেই কারণে যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন—এই সত্য ডঃ দাশগুপ্তের জানা থাকায় সমালোচনা-সাহিত্যে তিনি এক বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছেন। "ঘরে বাইরের সাহিত্য চিন্তায়" লেখকের আটটি প্রবন্ধ সংযোজিত। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে লিখিত। এই গ্রন্থে টলস্টয় সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ আছে—টলস্টয়ের ছোটগল্প, টলস্টয়ের সাহিত্যাদর্শ, শিল্পবোধে টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 'টলস্টয়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, শেষোক্ত প্রবন্ধটি সেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। শুধুই নিছক নীরস গবেষণা নয়, এই প্রবন্ধ তিনটি সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ এবং মূল্যবান তথ্য এবং যুক্তিতে উজ্জ্বল। সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস চেতনা প্রবন্ধে —প্রাচীন সাহিত্যে রাষ্ট্র-চেতনার বা সমসাময়িক কালের প্রতি ফলনের অভাব এবং তার হেতু বিশ্লেষণ করে ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন—"রামায়ন, মহাভারত বা কৃষ্ণকাহিনী বাঙলা দেশের জল-মাটির ফসল নয়—বাহির হইতে প্রাপ্ত বীজ বা চারাগাছকে দেশী জল-মাটিতে নূতন করিয়া বপন করিয়া তাহাদিগকে স্বীকরণের চেষ্টা।" তাই সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায় মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে। এই উক্তি গ্রহণযোগ্য। ডঃ দাশগুপ্তের "বাঙলা কমিউনিষ্ট সাহিত্য সম্বন্ধে দু'-চার কথা" প্রবন্ধটিতে সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া। এ-যুগের সমালোচকদের মধ্যে একটা একদেশদর্শিতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা ডঃ দাশগুপ্তকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলে সহজ সাফল্য লাভ করবেন। 'আধুনিক কবিতা' প্রবন্ধটি 'অমৃত' পত্রিকার পাঠকদের কাছে পরিচিত। এই প্রবন্ধটি ব[illegible] আলোচিত। ডঃ দাশগুপ্ত কিছু 'হোম ট্রুথ' পরিবেশন করেছেন এই প্রবন্ধে স্নিগ্ধ ঝরঝরে ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধাবলী অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করেছেন।

গ্রন্থটির মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী —(গবেষণা গ্রন্থ) : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। পৃঃ ৩০৮

মধ্যযুগীয় বাঙালী সংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ নব্য স্মৃতির বিষয়ে বিশদ বিস্তৃত আলোচনাই বর্তমান গ্রন্থখানির বিশেষত্ব। ঐতিহাসিক পটভূমিতে বঙ্গে স্মৃতিস্তম্ভের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে বিবর্তন ধারার সূচনা করে তার সু

…আলোচনা করেছেন বর্তমান গ্রন্থকার। …বঙ্গীয় নব্যস্মৃতিতে পুরাণ ও তন্ত্রের …প্রভাবও আলোচিত হয়েছে। ডঃ সুশীল…কুমার দে গ্রন্থ 'পরিচয়'-এ বলেছেন : '…যোগ্যতা, অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সহিত …বঙ্গীয় স্মৃতি নিবন্ধের আলোচনায় গ্রন্থকার বহুকাল ব্যাপৃত আছেন। এরূপ …ব্যাপক ও গভীরভাবে আর কেহ আলো…চনা বা তৎসম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। সংস্কৃতে লিখিত মূল গ্রন্থগুলির অধিকাংশ দুরূহ ও সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত: অনেকগুলি মুদ্রিত হয় নাই, তাঁহাদের পুঁথি বাংলা দেশেও দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থকার তাঁহার একাগ্র অনুশীলন ও অনুসন্ধানের ফল এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সহজবোধ্য গ্রন্থে যেরূপ আধুনিক পদ্ধতিতে বিবৃত করিয়াছেন, আশা করি তাহার যথাযোগ্য আদর হইবে। নব্য ন্যায় সম্বন্ধে চর্চা হইয়াছে ও পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু নব্যস্মৃতির এরূপ বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই।' চতুর্থ অধ্যায়ে বিবাহ, সংস্কার, শ্রাদ্ধ, ব্রত, দুর্গাপূজা, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার প্রভৃতি কৌতূহলজনক এবং আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় 'স্মৃতিনিবন্ধে সামাজিক চিত্র', 'পরিশিষ্ট' এবং 'সংযোজন'—সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আলোচনা।

বর্তমান গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধের মূল বিষয়গুলি বাঙলা ভাবাভাষীর কাছে এরূপ বিস্তারিতভাবে কেউ তুলে ধরেন নি। গ্রন্থকার সেই মূল্যবান কাজ করেছেন বর্তমান সুলিখিত গ্রন্থের মাধ্যমে। তাঁর পরিশ্রম যে সার্থক এবং সম্পূর্ণ সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। উপযুক্ত পরিশ্রমের মূল্য কোনকালেই অস্বীকৃত থাকে না। কারণ বর্তমান গ্রন্থের জন্য গ্রন্থকার 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন। এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাই।

মনন— (প্রবন্ধ)—বনফুল। প্রকাশক । সেকাল একাল, ৮-বি, টেমার লেন। কলিকাতা—৯ ।। দাম—চার টাকা ।। পৃ. ১৮৮ ।।

বাংলা সাহিত্যের প্রিয় লেখক 'বনফুল'। তাঁর গল্প, কবিতা ও নাটক বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। কিন্তু 'বনফুলে'র সাহিত্য-চিন্তার মধ্যে যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান তার পরিচয় সাহিত্য-পাঠকরা খুব বেশী পান নি। 'মনন' বনফুলের সেই চিন্তনের পরিচয়। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বা কোনো বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে 'বনফুল' যে সব বক্তৃতা দান করেছেন, বা আলোচনা করেছেন এই প্রবন্ধ-সঞ্চয়নে তা সংকলিত। বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও সমস্যা, সংস্কৃতি কোন্ পথে, বাংলা সাহিত্যের বর্তমান গতি, বাংলার অতীত ও ভবিষ্যৎ, বাংলা সাহিত্য, আমরা বাঙালী, বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর শিক্ষা-সমস্যা প্রভৃতি নিবন্ধাবলীতে যথেষ্ট 'অপ্রিয় সত্য' উচ্চারণ করেছেন সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী 'বনফুল'। বাংলার বাহিরে বাস করার জন্যই বোধকরি তাঁর বাঙালীপ্রীতিতে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। দূর থেকে তিনি বাঙালী জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করেছেন, সতর্কবাণী দান করেছেন এবং সমাধান নির্দেশ করেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তাঁর রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ তোষণ-নীতির অভাব, স্পষ্ট ভাষণে ও কঠোর সত্য উচ্চারণে তিনি যে কুণ্ঠিত নন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'মননে'র প্রতিটি পৃষ্ঠায়।

প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ মনোরম।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন—ইরজেন প্রায়র এর্বার্লি রচিত ইংরাজী গ্রন্থের জয়ন্ত চৌধুরীকৃত বঙ্গানুবাদ। প্র কা শ ক—এশিয়া পা ব্লি শি ং কোম্পানি। কলিকাতা—১২। দাম—দু টাকা।

বিখ্যাত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কিন্তু গ্রন্থের নামপত্রের কোথাও মূল লেখকের নাম উল্লিখিত নেই। অনুবাদকের নামটি মূল লেখকের ভঙ্গীতে মুদ্রিত। এই ত্রুটি অমার্জনীয়। বিজ্ঞানসাধক ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী বিশেষ আকর্ষণীয়। অনুবাদকের দায়িত্ব উত্তমরূপেই প্রতিপালিত। ভাষা সুন্দর, স্বচ্ছ এবং সাবলীল।

নান্দীকর

চিত্র সমালোচনা

(১) গহেরা দাগ (হিন্দী) : রালহান প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৪,৩৮৯ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : ও, পি, রালহান; কাহিনী : ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবি; গীত-রচনা : শকীল বদাউনী; সংলাপ : আহশান রিজভী; চিত্রগ্রহণ : নরিম্যান, এ, ইরানী; সঙ্গীত-গ্রহণ : বি, এন শর্মা; নৃত্য-পরিচালনা : বি, হীরালাল; শিল্পনির্দেশনা : সন্ত সিং; সম্পাদনা : বসন্ত বোরকার; রূপায়ণ : রাজেন্দ্রকুমার, মনোমোহন কৃষ্ণ, মদন পুরী, সুন্দর, মালা সিংহ, ঊষাকিরণ, ললিতা পাওয়ার, রত্নমালা, নৃত্যশিল্পী রাগিণী প্রভৃতি। বিঠলভাই প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১৯-এ মার্চ থেকে জ্যোতি, কৃষ্ণা, প্রিয়া, কালিকা, খান্না এবং শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

চলচ্চিত্রকে যাঁরা মাত্র সাধারণ দর্শকের সস্তা আনন্দের উপকরণ ব'লে

'ছায়াসূর্যে' শর্মিলা

মনে করেন না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে লোকশিক্ষার অন্যতম বাহনরূপেও গণ্য করেন, প্রযোজক-পরিচালক ও, পি রালহান সেই মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর অন্যতম। 'গহেরা দাগ' ছবি আমি কেন নির্মাণ করেছি?' তার কারণের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আদালতের শাস্তিকে মাথা পেতে নিয়ে একজন অপরাধী কারাগারে শাস্তিভোগ করলেই সমাজের কাছে তার ঋণ শোধ হয়; এরপর তার আবার নিজ সমাজের মধ্যে নিজের যোগ্য স্থানটিতে ফিরে আসবার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজের অপরাধবোধ ভিন্ন ধরনের। কোন বিশেষ পরিবেশে, কোন্ বিশেষ মানসিক অবস্থায় অপরাধটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে সমাজ মনে করে, যে একবার অপরাধ করতে পেরেছে, সে নিশ্চয়ই মূলতঃ মন্দ এবং সারা জীবন ধরেই সে অপরাধী থাকবে।' এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন করবার জন্যেই তিনি 'গহেরা দাগ' ছবিখানি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

'গহেরা দাগ'-এর নায়ক শঙ্কর নিজের ভগ্নী সম্বন্ধে অত্যন্ত অসম্মানজনক উক্তি শুনে রাজেন্দ্রের সহপাঠীকে উন্মত্ত ভাবে আক্রমণ করে এবং দু'জনেরই হিংসাত্মক আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের মধ্যে উত্তেজনার বশে তাকে এমন আঘাত করে, যার ফলে তার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে। এই আকস্মিক ব্যাপারে শঙ্কর হতচকিত হয়ে যায়। কিন্তু সে হত্যাকারী, এই অপরাধে তার চোদ্দ বছরের জন্যে কারাদণ্ড হয়। কারাগারে তার সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে জেলার সাহেব তার জন্যে সুপারিশ করেন এবং দশ বছর কারাজীবন ভোগের পর যখন সে মুক্তি পায়, তখন তিনি তাকে বলেন, 'মনে রেখো, সত্য এবং প্রেম জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে সাহায্য করে।' ফিরে এল সে নিজের ভগ্নীর বাড়ীতে। তার দুটি ছোট ছোট ছেলেকে নিয়ে সুখেই তার দিন কাটছিল। কিন্তু ছোট বোনের বিবাহবাসরে হঠাৎ সেই পুরোনো কথা প্রকাশ পেল; সে খুনী। অতএব বোনের বিবাহ হ'ল না। সে দুঃখে-ক্ষোভে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করলে; কিন্তু শোভা নামে একটি মেয়ে তাকে তার সঙ্কল্পচ্যুত করলে। জলপথে স্টীমার ক'রে আসবার সময়ে তার মাকে শঙ্কর জলে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছিল। শঙ্করের সঙ্গে শোভার বিবাহ দেবার জন্যে শোভার মা যখন প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছেন, তখন অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হ'ল, শঙ্কর যাকে মুহূর্তের উত্তেজনায় হত্যা করেছিল, সে শোভারই দাদা। বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস! এর পরের উত্তেজনাময় ঘটনার ভিতর দিয়ে শঙ্কর আবার কি ক'রে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল, ... নিয়েই ছবির সমাপ্তি।

উদ্দেশ্যমূলক চিত্রোপহার দিতে গিয়েও প্রযোজক-পরিচালক রালহান সাধারণ দর্শককে বিস্মৃত হননি। তাই ছবির মধ্যে অন্ততঃ ছ'খানি মনোহর সুরসমৃদ্ধ গান এবং নৃত্যের সমাবেশ আছে। আবহসঙ্গীত রচনাতেও সঙ্গীত-পরিচালক রবি বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক ঘটনাকে সুপরিস্ফুট হ'তে সাহায্য করেছেন। চিত্রগ্রহণে 'মুড ফোটোগ্রাফী' রচনায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নরীম্যান ইরাণী। মনে হয়, 'গহেরা দাগ' যদি রঙীন চিত্র হ'ত, তাহ'লে এর আবেদন আরো বেশী ক'রে অনুভূত হ'ত। শিল্পনির্দেশ এবং সম্পাদনার কাজ উচ্চাঙ্গের।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় রাজেন্দ্রকুমারের। আকস্মিক হত্যাপরাধে দশ বছরের কারাবাসের ফলে শঙ্করের চরিত্রে যে গভীর ক্ষত হয়েছিল, সেই ক্ষত বারংবার তার জীবনে এনেছে বিভীষিকা। যতবারই সে সমাজের সঙ্গে সহজ হ'তে গেছে, ততবারই সে

(ওপরে) ইরা চক্রবর্তী, মমতাজ আহমেদ, জয়শ্রী সেন।
(মাঝখানে) তৃপ্তি মিত্র ও অসীমকুমার, আরতি দাস।
(নীচে) বিধায়ক ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, সুব্রতা সেন।

অতীতের বিষজ্বালার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাকে প্রায় সারা জীবন ধরেই করতে হয়েছে—শঙ্করের এই চরিত্র রাজেন্দ্র-কুমারের অসামান্য অভিনয়প্রতিভারূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি অবিসংবাদী-ভাবে হিন্দী চলচ্চিত্র-জগতে নায়করূপে শ্রেষ্ঠদের অন্যতম বলে পরিগণিত হবেন। শঙ্করের জীবনে শুভ-তারকা-রূপে আবির্ভূত হয়েছে শোভা। তারই সহানুভূতিশীল প্রেমের স্পর্শে শঙ্করের জীবন হয়েছিল ধন্য। এই শোভা শোভাময়ী হয়েছে মালা সিংহের দরদী অভিনয়গুণে। শোভা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ভূমিকা। এ-ছাড়া মনোমোহন কৃষ্ণ (জেলার), ঊষাকিরণ (শঙ্করের দিদি), ললিতা পাওয়ার (শোভার মা), মোহনপুরী (শঙ্করের ভগ্নিপতি) প্রভৃতি ভূমিকাও সুঅভিনীত।

'গহরা দাগ' সর্বশ্রেণীর দর্শকের পক্ষেই একখানি পরম উপভোগ্য চিত্র।

(২) সং ভাই (বাঙলা) : তারু মুখার্জি প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন; ৩,২২২ মিটার দীর্ঘ এবং ১২ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা, রচনা ও পরিচালনা : তারু মুখোপাধ্যায়; সংগীত-পরিচালনা : ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ; গীত-রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রগ্রহণ : ননী দাস; শব্দানুলেখন : জে ডি ইরানী, নৃপেন পাল ও বাণী দত্ত; শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র; সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়; রূপায়ণ : সন্ধ্যারাণী, রেণুকা রায়, নিভাননী, তপতী ঘোষ, মঞ্জুলা, শম্পা, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী, নাসিম বাণু, অসিতবরণ, তরুণকুমার, অনুপকুমার, প্রবীরকুমার, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি, মিহির ভট্টাচার্য, শ্যাম লাহা, সুখেন, তিলক প্রভৃতি। কাশ্মীর ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গেল শুক্রবার, ২৯-এ মার্চ থেকে রাধা, পূর্ণ, অরুণা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

অনেক রকম মানত, পুজো, তুকতাক করেও সরমা যখন ছেলের মুখ দেখল না, তখন গ্রামের জ্ঞাতি পিসীর পরামর্শে সরমা তার স্বামী চরণের আর একবার বিবাহ দিয়ে ঘরে সতীন নিয়ে এল প্রতিমাকে। সরমার মনস্কামনা পূর্ণ করে প্রতিমার একটি পুত্র সন্তান জন্মাল; কিন্তু সন্তান জন্মের পরেই প্রতিমার হ'ল মৃত্যু। সরমাই সতীন-পুত্রকে মানুষ করবার ভার নিল দৈবের খেলা! তাই শিগগিরই সরমার নিজের কোলেও ছেলে এল। সতীন-পো মহিম এবং নিজের পেটের সন্তান রমেশ—দু'জনেই বড়ো হতে লাগল সরমার স্নেহচ্ছায়ায়। কিন্তু রমেশ হ'ল যাত্রাপাগল; আর মহিম হ'ল লেখাপড়া করা ভালো ছেলে। মহিম সং-ভাই রমেশের দোষ ঢেকে বেড়ায়; কিন্তু মাঝে মাঝে ধরাও পড়ে। ক্রমে ওরা বড়ো হ'ল; ওদের বৌও এল। গ্রামে এলেন বিলেত-ফেরত ধনী মিঃ সেন সঙ্গে বিলিতী মেম স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা ইভা। ইভা সাইকেল চড়ে, সাঁতার কাটে, সুপুরুষ এক যুবকের সঙ্গে প্রেমও করে। মিঃ সেন গ্রামের জমি কিনছেন—কারখানা বসাবেন, ট্রাকটর দিয়ে চাষ করবেন। মহিম বলে ধানজমিতে কারখানা বসাতে দিলে চাষীদের সর্বনাশ হবে। রমেশ বলে—বসুক কারখানা; একবার জমি বেচে টাকা আসবে, আবার কারখানায় কাজ করে টাকা আসবে। দুই ভাইয়ে মতান্তর বিরোধ বেধে উঠল; দু'জনেই লাঠি হাতে সদলবলে পরস্পরের সম্মুখীন। এমন সময় মিঃ সেন এসে করলেন মুস্কিলআসান। আবার দু'ভাইয়ে মিল হ'ল।—এই হ'ল সংক্ষেপে 'সংভাই'এর গল্প।

সোজাসুজিভাবে গল্পটি ছবির পর্দায় বলে যাওয়া হয়েছে—কোনো রকম মারপ্যাঁচ নেই। একটি জায়গায় নাটকীয় মুহূর্ত চমৎকারভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ছোট ভাই রমেশ যাত্রা সেরে রাত্রিবেলা বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছ থেকে শুনল, বড় ভাই মহিম তাকে পৃথক করে দিয়েছে। তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। ছোট বৌ (তার স্ত্রী) বললে, 'কেন তুমিই ত' সকালবেলা খেতে খেতে বললে আমি বিষয় ভাগ ক'রে নেব!' 'ও হরি, সে কি আমি সত্যি-সত্যি বলেছিলুম?' ছুটে এসে দাঁড়াল উঠোনে। তারপর যাত্রার ঢংয়ে গৈরিশ ছন্দে তার কি বিলাপ! যতক্ষণ না দাদা এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, ততক্ষণ সে তার প্রাণ ফাটা আর্তনাদ চালাল।—এই দৃশ্যটি সত্যিই অপূর্ব। আর বহু হাসির দৃশ্যের মধ্যে সেই বিশেষ দৃশ্যটি—যেখানে অর্জুনবেশী অনুপকুমারের সঙ্গে 'সুভদ্রাবেশিনী' জহর রায় নারীকণ্ঠে 'বৎস অভিমন্যু'র জন্যে বিলাপ করছে—সারা প্রেক্ষাগৃহ হেসে চৌচির! আর আছে ছাগল চুরি ক'রে মাংস রান্না

দৃশ্যে ছেলেদের গান—'বিদেশী কি পিশি, আছে যত পিসি'।

অভিনয়ে যথারীতি মাত করেছেন অনুপকুমার রমেশের ভূমিকায় সুন্দর, সাবলীল, বাস্তব অভিনয় করে। ছবির প্রথম দিক ব্যেপে আছেন সুদখোর চরণের ভূমিকায় অসিতবরণ বিচিত্র রূপসজ্জায় ভূষিত হয়ে। তিলোত্তমা ঘটক-কন্যারা প্রতিমাকে দেখে বিয়ে-পাগল চরণের স্বার্থবোধক অভিব্যক্তি সুন্দর। সাধ্বী স্ত্রী এবং কর্তব্যপরায়ণা স্নেহময়ী মায়ের ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেন নি। ছোট মহিম ও রমেশ বেশে যথাক্রমে সুখেন ও তিলক, কান্ত পিসি-রূপে রেণুকা রায়, বড় মহিমের ভূমিকায় তরুণকুমার এবং তিলোত্তমা ঘটকের বেশে নৃপতি চট্টোপাধ্যায় যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া আছেন বিপিন গুপ্ত (মিঃ সেন), তপতী ঘোষ (প্রতিমা), মঞ্জুলা (মহিমের স্ত্রী), শম্পা (রমেশের
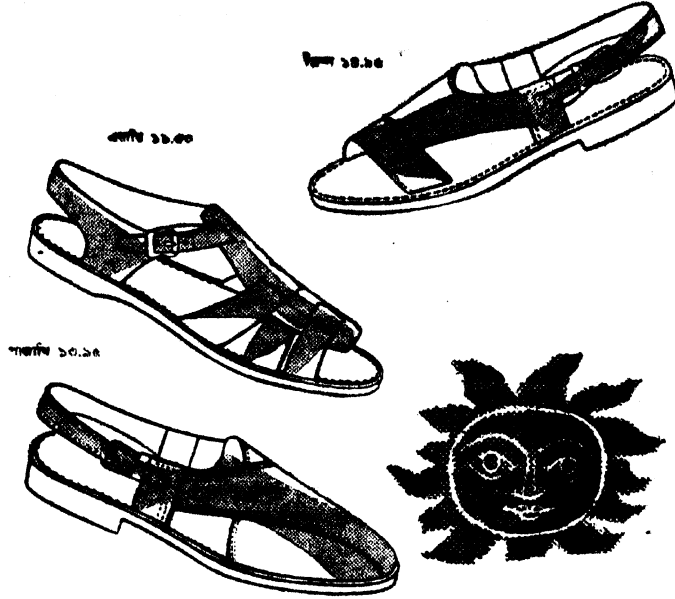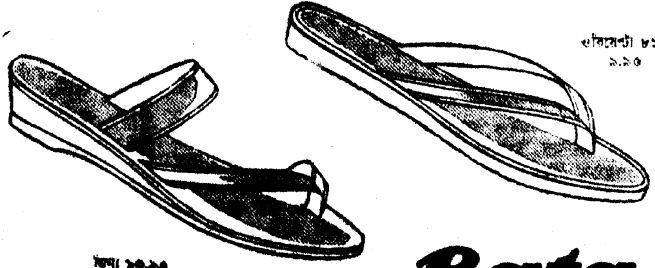
'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' চিত্রের একটি দৃশ্য

স্ত্রী), প্রবীরকুমার (মিঃ সেনের জামাতা) এবং জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, রাজলক্ষ্মী, প্রেমাংশু বসু, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পী অত্যন্ত নগণ্য ভূমিকায়। এবং সবশেষে আছেন মিঃ সেনের কন্যা ইভার ভূমিকায় নাসিম বানু (বোম্বে)। শ্রীমতী বানু সর্টস্ প'রে সাইকেল চালিয়েছেন, গ্রামের নরনারীর কৌতুকের বস্তু হয়ে সুইমিং কস্টিউম প'রে সাঁতার কেটেছেন এবং গীটার হাতে ক'রে প্রবীরকুমারের সঙ্গে প্রেমের গান গেয়েছেন "অন অ্যান আইল্যান্ড অব মুন"। সাধারণ দর্শক আহ্লাদে আটখানা হয়ে সিটি দিয়েছেন এবং আরও নানা রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আমাদের কাছে বাঙলা ছবিতে চরিত্রটি অত্যন্ত বিসদৃশ লেগেছে; মনে হয়েছে—এই কমার্শিয়াল প্যাঁচ না করলেই কি নয়?

ছবির কলাকৌশলের কাজ অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের। ক্যামেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থাণু। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁয়ের আবহ-সঙ্গীত প্রশংসনীয়।

ত্রুটি স্বীকার

কথায় আছে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। গেল হপ্তায় "সাত পাকে বাঁধা"র সমালোচনা প্রসঙ্গে একান্ত অসতর্কতা এবং অনবধানতার জন্যে আমরা তাই ক'রে ফেলেছি। আমরা লিখেছি, "আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত চিত্রকাহিনী 'সাত পাকে বাঁধা'কে ......"। কিন্তু না, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত মূল কাহিনীর সঙ্গে চিত্র-কাহিনীটির ঘটনা-সংস্থাপনে ও চরিত্র-চিত্রণে এতই পার্থক্য যে, চিত্র-কাহিনীটিকে তাঁরই রচনা বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। বিশেষ ক'রে 'যদেতদ হৃদয়ং তব' ইত্যাদি যে মন্ত্র-শক্তির ওপর চিত্রকাহিনীটি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মূল রচনায় তার উল্লেখমাত্রও নেই।

আমরা আমাদের এই অজ্ঞতার জন্যে শ্রীমুখোপাধ্যায় এবং পাঠকদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

বিবিধ সংবাদ

কলকাতায় বিখ্যাত নাট্যকার ও পরিচালক এলমার রাইস :

আমেরিকার প্রখ্যাত নাট্যকার ও মঞ্চ-পরিচালক ৭০ বৎসর বয়স্ক এলমার রাইস গেল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬৷৷টায় বিমানযোগে এসেছিলেন কলকাতা বেড়াতে। শুক্রবার দিন এই শহরের বিভিন্ন জায়গা দেখে সন্ধ্যায় তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন বিশ্বরূপাতে বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনীত 'বিসর্জন' দেখবার জন্যে। শনিবার সকালে তিনি কলকাতা

এলমার রাইস

ত্যাগ ক'রে বারানসীর দিকে রওনা হন। তাঁর বহু নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে পুলিটজার পুরস্কারপ্রাপ্ত 'স্ট্রীট সিন' (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অভিনীত)। এর পরেই নাম করতে হয় 'দি অ্যাডিং মেসিন' (১৯২৩), 'ড্রিম গার্ল' (১৯৪৫) এবং 'কাউন্সেলার-অ্যাট-ল' (১৯৩১) নাটক ক'খানির। মঞ্চ-পরিচালনা সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত বই 'দি লিভিং থিয়েটার' আধুনিক নাট্য-প্রযোজকদের অবশ্য পাঠ্য।

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের 'একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা' :

গেল শনিবার, ৩০-এ মার্চ থেকে বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরি-

বদ আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক 'একাঙ্ক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা' আরম্ভ হয়েছে।

৫ম বার্ষিক বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন :

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ৫ম বার্ষিক বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১২ই থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত। বরাবরের মত সম্মেলনের আসর বসবে বিশ্বরূপা থিয়েটার প্রাঙ্গণে।

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলন :

সুরসাগর হিমাংশু সংগীত সম্মেলন আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্যে ২১-ই, দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলিকাতা—২৬এ রথীন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

নজরুলের ৬৪তম জন্মজয়ন্তী

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে এ বছর ২৫, ২৬ এবং ২৭-এ মে (১১, ১২ এবং ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০)—এই তিনদিনব্যাপী জয়ন্তী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতায় দু'দিন এবং নজরুলের জন্মগ্রাম চুরুলিয়ায় একদিন এই উৎসব অনুষ্ঠান করা হবে। বাঙলা দেশের শিল্পিসমাজ ও সুধীজনকে এই সম্পর্কে ৬, আন্টনিবাগান লেন, কলিকাতা—৯-এ কমিটির প্রধান কর্মকেন্দ্রে যোগাযোগ স্থাপনের অনুরোধ জানান হয়েছে।

নিখিল ভারত বাঙালী চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শক সম্মেলন

বেঙ্গল মোশান পিকচার অ্যাওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে আসছে ১২ই থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী নিখিল ভারত বাঙালী চলচ্চিত্র ও নাট্যদর্শক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বাঙলা চলচ্চিত্র উৎকর্ষের বিচারে শ্রেষ্ঠ হয়েও কেন আর্থিক দিক দিয়ে সাফল্যলাভ করছে না, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নিরূপণ এবং নাট্য ও মঞ্চ সম্পর্কে দর্শকদের তরফ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাদি পেশ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই সম্মেলনের পরিকল্পনা। এই সম্মেলন সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধানের জন্যে উদ্যোক্তা কমিটির প্রধান কার্যালয় ৫৫, কলেজ স্ট্রীট (ত্রিতল), কলিকাতা—১২তে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

অহীন্দ্র বন্দনা

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে গেল মঙ্গলবার, ২৬-এ মার্চ রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে গুরুবন্দনার আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানসূচী শুরু হয় নটরাজ বন্দনা করে।

কবিগুরুর নৃত্যনাট্য অবলম্বনে বৈজয়ন্তীমালা ও সম্প্রদায় পরিবেশিত 'চণ্ডালিকা'র একটি দৃশ্য। আগামী ৩রা থেকে ৭ই এপ্রিল রণজী স্টেডিয়ামে নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হবে

মানপত্র ও উপহার প্রদানের পর সভাপতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যকার মন্মথ রায়ের ভাষণের পর নটসূর্য শ্রীচৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার হবে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীর দীর্ঘ মিছিল। অভিনেতারূপে তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভ করেছেন; এখন নাট্যশিক্ষকরূপে তাঁর কাম্য হবে সফল ছাত্রছাত্রী। এরপর সুচিত্রা মিত্রের গান ও কলামণ্ডলম্ গোবিন্দন্ কুট্টির অপরূপ নৃত্যানুষ্ঠানের পর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয় তুলসী লাহিড়ী প্রণীত "দেবী" নাটিকা। অভিনয়ে সবচেয়ে পারদর্শিতা দেখান শকুনীর ভূমিকায় আরতি রায়। সর্বশ্রী বিভাস ঘোষ (নিতাই), বিশ্বনাথ কুণ্ডু (পুলিশ অফিসার মিঃ ঘোষ) এবং সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোবর্ধন)-এর অভিনয়ও চরিত্রোপযোগী হয়েছিল। বাংলা দৃশ্যের মঞ্চস্থাপনা সবিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক।

"শিশু রংমহল"-এর নতুন অধ্যায়

গেল ২৫-এ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট "শিশু রংমহল"কে তাদের ক্রীত জমির দখল দিয়েছেন। জমির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা। এই জমির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে অবন মহল। এই সৌধটি গড়তে আনুমানিক খরচ পড়বে আট লক্ষ টাকা। দেশবিদেশের বহু গণ্যমান্য অতিথি শিশু রংমহলের কাজ দেখে অবাক হয়ে গেছেন। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গেছেন কালোরাডো ইউনিভার্সিটির শিশুনাট্য বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ কেম্পটন বেল এবং চেকোস্লোভেকিয়ার পাপেট থিয়েটারের ডিরেক্টার মিসেস ইভা ডেভিকোভা। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করছেন শিশু রংমহল। তাই যাঁরা শিশু-অনুরাগী, তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ববিধ প্রচেষ্টাতে যে অকাতরে সাহায্য করবেন, এ-আশা আমরা অনায়াসেই করতে পারি।

বিঠলভাই মানসাটার সান্ধ্যভোজ

"গহেরা দাগ"-এর প্রযোজক-পরিচালক ও পি রালহান এবং নায়কের ভূমিকাভিনেতা রাজেন্দ্রকুমার ও সহ-অভিনেতা মদনপুরীকে কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করবার জন্যে পরিবেশক বিঠলভাই মানসাটা গেল শুক্রবার, ২৯-এ মার্চ সন্ধ্যায় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে একটি সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছিলেন। ভোজসভায় সর্বশ্রী রালহান্ রাজেন্দ্রকুমার ও মদনপুরী স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে

গুজরাটী চিত্র 'সত্যবান-সাবিত্রী'তে মহেশ দেশাই এবং শশিকলা

অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা কন এবং চলচ্চিত্রের রাজ্যে বাঙলার প্রতিভার অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্বের কথা বারংবার উল্লেখ করেন।

"কথক"-এর "শেষপ্রহর"

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা এপ্রিল মহারাষ্ট্র নিবাস হল-এ "কথক"-সম্প্রদায় সৌমেন চট্টোপাধ্যায় রচিত "শেষপ্রহর" অভিনয় করেন।

"সুরঙ্গমা"র "নবীন"

আসছে রবিবার, ৭ই এপ্রিল "সুরঙ্গমা"-সম্প্রদায় রঙ্গি সিনেমাগৃহে রবীন্দ্রনাথের "নবীন" নাটকটিকে মঞ্চস্থ করবেন।

"দীপশিখা" শিল্পিগোষ্ঠীর "কালো মানুষ নীল আকাশ"

আজ শুক্রবার, ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৭টায় মহারাষ্ট্র নিবাস হলে "দীপশিখা" শিল্পিগোষ্ঠী শচীন ভট্টাচার্য রচিত নতুন নাটক "কালো মানুষ নীল আকাশ" মঞ্চস্থ করবেন।

।। একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান ।।

আগামী ১৬ই এপ্রিল থিয়েটার হলে "গীতিছন্দে"র উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠান সুরু হবে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায়। সঙ্গীত ও নৃত্য পরিচালনা করবেন যথাক্রমে অরবিন্দ সরকার ও কল্পনা কর।

রঙ্গসভার নাট্যোৎসব :

গত ২২শে থেকে ২৪শে মার্চ তিন দিন ধরে বাঁশদ্রোণীতে রঙ্গসভার উদ্যোগে নাট্যোৎসব হয়ে গেল। যে সব সৌখীন নাট্যদল নতুন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসার কারণ হয়েছেন, 'রঙ্গসভা' তাদের মধ্যে অন্যতম। মাত্র চার বছর পূর্বে এই সৌখীন নাটকের দলটি স্থাপিত হলেও নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে এ'রা বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বাঁশদ্রোণীর উদ্যান-মণ্ডপে ২২শে মার্চ রঙ্গসভা 'বোবাকান্না' মঞ্চস্থ করেন। দ্বিতীয় দিন অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'দালিয়া'। অভিনয়গুণে, জমকালো প্রচ্ছদ সজ্জায় নাটকটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল। শেষ দিনে ডিরোজিওর জীবন-কাহিনী নিয়ে 'বিপ্লবী ডিরোজিও' নাটক অভিনীত হয়। ডিরোজিওর ভূমিকায় শ্রীপীযূষ বসুর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনটি নাটকের অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে দিলীপ রায়, প্রশান্তকুমার, ভোলা বসু, পরিতোষ রায়, পান্না মিত্র, নিমাই মিত্র, শাশ্বতী মুখার্জি, লিলি চক্রবর্তী এবং দীপা চ্যাটার্জি অন্যতম।

"অগ্নিকুসুম"

গত ১৩ই চৈত্র মাটবাঁওড় জনমঙ্গল সমিতির সদস্যবৃন্দ, তাঁহাদের নিজস্ব সমিতির প্রাঙ্গণে অন্নপূর্ণা সান্যালের নতুন [illegible] নাটক 'অগ্নিকুসুম' প্রথম মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক শ্রীননী দাশগুপ্ত।

অভিনয়ে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রী কমলা সাহা, নৃপেন পাল, উমারাণী হালদার, গোপাল বৈরাগী, রাধারমণ হালদার ও কৃষ্ণপদ দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। নাটকটির আবেদন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। কীর্তন-সুধাকর শ্রীরাধেশ্যাম ঘোষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন ও নাটকটি পরিচালনা করেন—'দৈনন্দিন' সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র।

✻ কলকাতা ✻ বোম্বাই ✻ মাদ্রাজ

কলকাতা

ভি শান্তরাম প্রযোজিত প্রথম বাংলা ছবি 'পলাতক'-এর কাজ শেষ করেছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। বর্তমানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর এডিটিং রুমে ছবিটির সম্পাদনা করছেন সম্পাদক দুলাল দত্ত। মনোজ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, ভারতীদেবী, জহর রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গাপদ বসু। কলা-কুশলী বিভাগে চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন সৌমেন্দু রায় ও বংশীচন্দ্র গুপ্ত। সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ত্রিধারা' সমাপ্তপ্রায়। কাহিনী ও চিত্র-নাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রে অভিনয়াংশে রয়েছেন জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, কালী ব্যানার্জি, রেণুকা রায়, ভারতী-দেবী, অনুভা গুপ্তা, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, তরুণকুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও জীবেন বসু।

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের 'সূর্যশিখা' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। প্রযোজনা, কাহিনী ও পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তম-কুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তরুণকুমার ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত-পরিচালনায় রবীন চ্যাটার্জি। চণ্ডীমাতা ফিল্ম পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কালিকা চিত্রম্-এর 'মরুতৃষা' সমাপ্তপ্রায়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন সুরেশ রায়। প্রধান

চরিত্রলিপিতে রয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, সবিতা বসু, তপতী ঘোষ, বিপিন গুপ্ত, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, জয়শ্রী সেন, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, মণি শ্রীমণি ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। মহাজাতি ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক কালোবরণ।

বি, এন্ড, বি প্রোডাকসন্সের ছবি 'মৌনমুখর' ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। কাহিনী লিখেছেন শেখর রায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন মৈত্রী গোষ্ঠী। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে নির্মলকুমার, ভারতী রায়, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, জহর রায়, তপতী ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী ও মিতা চট্টোপাধ্যায়।

বোম্বাই

এস এস আই ফিল্মসের রঙিন ছবি 'সাজ আউর আওয়াজ'-এর সম্প্রতি সঙ্গীতগ্রহণ শেষ হয়েছে। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন নৌসাদ। সুবোধ মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালক। প্রধান ভূমিকায় জয় মুখোপাধ্যায়, সায়রা বাণু, কানাইয়ালাল, নিরঞ্জন শর্মা ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র ও শিল্প-নির্দেশনায় রয়েছেন ভি এন শ্রীনিবাস ও শান্তি দাস।

মডার্ণ স্টুডিওয় রুহি ফিল্মসের রঙিন ছবি 'জানোয়ার'-এর কাজ চলেছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন ভাপ্পি শোনি। প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন শাম্মি কাপুর, রাজশ্রী, পৃথিবরাজ ও রেহমান। তারু দত্ত এ ছবির আলোকচিত্রশিল্পী। শৈলেন্দ্র ও হসরৎ জয়পুরী রচিত গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

সম্প্রতি এস জে ফিল্মসের 'সাজ আউর সবেরা' চিত্রের বহির্দৃশ্য গৃহীত হল বেনারসে। বর্তমানে মোহন স্টুডিওয় পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করছেন। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত, মীনাকুমারী, মেহমুদ, মনমোহন কৃষ্ণ ও প্রীতিবালা।

প্রযোজক ও পরিচালক এইচ এস রাওয়াল যে রঙিন ছবিটি করছেন তার নাম 'মেরে মেহেবুব'। ফেমাস স্টুডিওয় চিত্রগ্রহণের কাজ চলেছে। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে রয়েছেন রাজেন্দ্রকুমার ও সাধনা। বিভিন্ন অংশে অভিনয় করছেন অশোককুমার, নিম্মি, অমিতা, প্রাণ, মালিকা, সুন্দর ও জনি ওয়াকার। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন নৌসাদ।

ফিল্মালয়-এর 'আও পেয়ার করে' ছবির কয়েকটি গান নায়ক-নায়িকা জয় মুখোপাধ্যায় ও সায়রা বাণুর কণ্ঠে গৃহীত হল। এ ছবির নৃত্যানি গানের সুর করেছেন সঙ্গীত-পরিচালক উষা খান্না। ছবির কয়েকটি মুখ্য দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ ইউরোপে গৃহীত হবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আর কে নায়ার।

আলোকচিত্রশিল্পী মদন সিনহা সম্প্রতি পরিচালক হয়েছেন। তিনি যে ছবিটি পরিচালনা করেছেন তার নাম 'এক ছায়া দো রূপ'। শ্রীসাউন্ড স্টুডিওয় দৃশ্যগ্রহণের কাজ চলেছে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শশি কাপুর, তনুজা, পরিভন চৌধুরী, অভি ভট্টাচার্য, আনওয়ার হোসেন, তিওয়ারী, তরুণ বসু ও নবাগত কুলজিৎ। এ-ছবির সঙ্গীত-পরিচালক চিত্রগুপ্ত।

ফিল্ম ভারতীর ছবি 'নর্তকী'-র শেষ গান রেকর্ড করলেন ফেমাস সিনে ল্যাবে সঙ্গীত-পরিচালক রবি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নিতীন বসু। নৃত্য ও সঙ্গীত এ-ছবির প্রধান আকর্ষণ হবে। মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন সুনীল দত্ত, নন্দা, ওমপ্রকাশ, নানা পালশীকর ও আগা। ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এ-ছবির প্রযোজনাভার গ্রহণ করেছেন মুকুন্দ ত্রিবেদী।

মাদ্রাজ

বাসুদেবা মেনন প্রযোজিত 'ভরসা' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। এ মাসেই ছবিটি মুক্তি পাবে। কে শংকরের পরিচালনায় বিভিন্ন অংশে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত, আশা পারেখ, সুদেশকুমার, শুভা খোটে, মেহমুদ, ললিতা পাওয়ার, ওমপ্রকাশ, নানা পালসিকর, কানহাইয়ালাল, সুলোচনা চ্যাটার্জী ও নীনা। সঙ্গীত-পরিচালক রবি।

—চিত্রদূত

স্টুডিও থেকে বলছি

চৈত্রের দুপুরে ছায়া নেই। স্টুডিও পাড়ার পৃথিবী সূর্য-শাসনে তেতে উঠেছে। পাঁচঢালা পথ পেরিয়ে আসতে পায়ে বেশ তাত লাগে। সূর্যের ছায়া নেই। শুধু নিজের ছায়াকে সামনে রেখে পায়েপায়ে এগিয়ে চলি সিনেমা-জগতের খবর নিতে।

বাংলা ছবির জয় হয়েছে। এবারের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ছবিগুলিই সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছে। গত বছর 'ভগিনী নিবেদিতা', এবছর 'দাদাঠাকুর' পুরস্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া 'অভিযান', 'কাঁচের স্বর্গ' ও 'নিশীথে' শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে গণ্য হয়েছে।

স্টুডিও ফ্লোরে বিজয়ী ছবির অভিনন্দন চলেছে। দাদাঠাকুরের পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় 'ত্রিধারা' ছবির কাজ সম্প্রতি শেষ করেছেন। নায়ক-নায়িকা বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। আগামী বাংলা নতুন বছরের শুরুতে শ্রীমুখোপাধ্যায় একসঙ্গে দুটি ছবি পরিচালনা করবেন। একটির নাম 'গড়ে ওঠা শহর'।

টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর'-এর কাজ এগিয়ে চলেছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য লিখেছেন
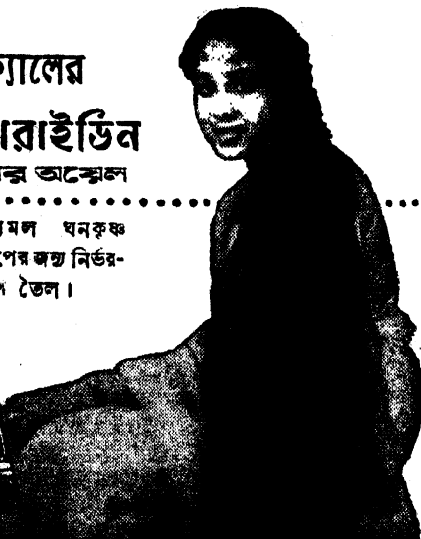
অগ্রদূত পরিচালিত 'বিভাস' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি লাহা ও সহকারী পরিচালক চন্দন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরায়। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, শেফালিকা পুতুল, প্রসেনজিৎ, জয়া ভাদুড়ী ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করছেন সুব্রত মিত্র।

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে 'বিভাস' এই স্টুডিওর দু'নম্বর ফ্লোরে চিত্রগ্রহণ চলেছে। বিনু বর্ধন এ ছবির পরিচালক। নামভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। নায়িকা নবাগতা ললিতা চট্টোপাধ্যায়।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর দুটি ফ্লোরে পরপর দু'তিনদিন যাওয়া-আসা করলে আপনার চোখে একজনকে দুজন বলে মনে হবে। একটিতে দামাল, অশান্ত কালো ছোট্ট মেয়ে - ঘেঁটু। আর অন্যটিতে শান্ত বড় সুন্দরী মেয়ে প্রীতি। দুটি ভিন্নমুখী চরিত্রে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর। প্রথমটি পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়াসূর্য'। দ্বিতীয়টি প্রান্তিক গোষ্ঠীর 'শেষপ্রহর'।

আগামী বৈশাখ থেকে নতুন কয়েকটি বাংলা ছবির কাজ শুরু হবে। অল্প দৈর্ঘ্যের প্রচার ছবির পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত এবারে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী নিয়ে ছবি করবেন বলে ঠিক করেছেন। ছবিটির নাম অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'একই অঙ্গে এত রূপ'। প্রধান দুটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত আর একটি নতুন ছবির নাম 'বর্ণালী'। দেবেশ ঘোষ-প্রযোজিত ও সুবোধ ঘোষ-রচিত এ কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অজয় কর।

গত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান স্টুডিওর সঙ্গীতগ্রহণ বিভাগে অগ্রদূত পরিচালিত 'বাদশা'র সঙ্গীতগ্রহণ করলেন সঙ্গীত-পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দুদিন ধরে শব্দধারক সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ছবির গানগুলি গৃহীত হল। এই প্রথম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছবিতে গান করলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। হেমন্ত-কন্যা রাণু এ ছবিতে গান করেছে।

সম্প্রতি রাধা ফিল্মস স্টুডিওয় নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বাদশা'-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম বিভূতি লাহা এ ছবির পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব পালন করছেন।

এক অসাধু জীবনের মানুষ হল বাদশা। অপরাধের নজির ছড়িয়ে তার জীবন ভেসে চলেছিল। পালখানা পুলিশ স্টেশন থেকে আরম্ভ করে গ্রামের ছোট ছোট থানা পর্যন্ত সকলেই বাদশাকে ধরবার জন্য চোখে চোখে রাখতো। কিন্তু তার ধরা অত সহজে মিলতো না। রাতের আঁধারে কালো পোষাক আর টুপির ছদ্মবেশে তার জীবনযাত্রা ঠিকই চলতো। এমনিভাবেই বাদশা হয়তো একদিন বৃদ্ধ হ'ত। কিন্তু হঠাৎ এই জীবন-পরিক্রমায় একটি শিশু বাচ্চুর সান্নিধ্যে বাদশার জীবনে পরিবর্তন এলো। এক মেলায় এই ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ তার করুণা হল। হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট ছেলে বাচ্চুকে নিজের কাছে নিয়ে এসে বাদশা মানুষ করতে আরম্ভ করে। বাচ্চুর মা, মমতা, ও বাবা অবনমোহন তাঁদের একমাত্র ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

বাদশা তার অসাধু পেশা বর্জন করেছে। এখন সে রাস্তায় রাস্তায় কুকুর, ছাগল আর বানরের খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে।

বাদশার এই অসাধু জীবনে একটি শিশুর সংস্পর্শ কি ভাবে সাহায্য করেছিল, তারই আবেগময় মুহূর্তের ওপর ভিত্তি করে 'বাদশা' কাহিনী গড়ে উঠেছে। বাদশার কঠিন ও কোমল চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। বাচ্চুর চরিত্রে অভিনয় করছে শিবশঙ্কর।

মমতা ও অবনীমোহনের চরিত্রে রয়েছেন সন্ধ্যারাণী ও অসিতবরণ। ডাঃ অচিন্ত্য গুপ্তের চরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়। পাশ্বচরিত্রে রয়েছেন তরুণ মিত্র, প্রেমাংশু বসু, রথীন ঘোষ ও সন্তু মজুমদার। কলাকুশলী বিভাগে কাজ করছেন শিল্পনির্দেশনা, সম্পাদনা ও রূপসজ্জায় যথাক্রমে সত্যেন রায়চৌধুরী, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বসির আমেদ।

—চিত্রদূত

জার্মান চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ

স্থির হয়েছে যে, প্রতি বছর পশ্চিম জার্মানীতে একশ কাহিনী-চিত্র ও সাড়াইশ প্রামাণিক-চিত্র তৈরী হবে। এর জন্যে আট হাজার কর্মী ছাড়াও গ্রন্থকার, পরিচালক, কাটার, ক্যামেরা-ম্যান, সাউন্ড ইঞ্জিনীয়ার, ইলেকট্রি-সিয়ান, মেক-আপ ইত্যাদিতে আরও ছ' হাজার লোকের দরকার হবে। গত দশ বছর যাবৎ এই এতগুলি লোক চিত্র-শিল্পে কাজ করলেও এই অভিযোগ শোনা যায় যে, চিত্রশিল্পে কাজের লোকের যথেষ্ট অভাব এবং বেশী নতুন লোকের এই পেশায় বিশেষ আগ্রহ নেই। এর কারণ সুদক্ষ কর্মীরা আজ টেলি-ভিশনের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছে। আজ পর্যন্ত চিত্রজগৎ থেকে প্রায় বার হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী বিদায় নিয়ে টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চ বেতনে ভাল চাকরীতে বহাল হয়েছে।

গত কয়েক বছরে বহু অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পের কর্মী টেলিভিশনে যোগদান করায় এই শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তো বটেই তাছাড়া জনসাধারণও টেলি-ভিশনের প্রতি বেশী আগ্রহান্বিত। এই অবস্থা চিত্রশিল্পের ধারক ও বাহকদের অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি জার্মান ফিল্ম আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করবেন বলে স্থির করেছেন যেখানে চিত্রশিল্পে আগ্রহী তরুণদের শিক্ষা দেওয়া হবে। পশ্চিম জার্মান সরকার এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং ফিল্ম ও টেলিভিশন আকাদেমি প্রতিষ্ঠার জন্যে দশ লক্ষ জার্মান মার্ক বরাদ্দ করেছেন।

"ইনসপেক্টর হল" চিত্রের নায়িকা জার্মান অভিনেত্রী ব্রিট ফর্নটিজেনহাউজেন। ব্রিট জার্মান টেলিভিশন নাটকেও অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

১৯৬৪ সালে এই আকাদেমির কাজ শুরু হবে স্থির হলেও, আকাদেমির শিক্ষাধারা ও স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা এখনও একমত হতে পারেন নি। তবে মিউনিখ, বার্লিন বা হিস্‌বাদেনে এই আকাদেমি স্থাপিত হবে। শিক্ষা দেবেন চিত্র ও টেলিভিশন জগতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা। চার বছর আটটি টার্মে ভাগ করে কারিগরি ও অভিনয়কুশল তরুণদের ক্যামেরাম্যান, কাটার, স্থপতি, লেখক, পরিচালক, আলোকশিল্পী ও শব্দযন্ত্রী হিসাবে পারদর্শী করে তোলা হবে। প্রতি কোর্সে আড়াইশর বেশী ছাত্র গ্রহণ করা হবে না।

সুতরাং ১৯৬৮ সালে এই আকাদেমি থেকে প্রথম যে কজন স্নাতক বেরুবে চিত্র ও টেলিভিশন শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় তারা খুবই অল্প। ১৯৭০ সালের আগে যথেষ্ট শিক্ষিত পাওয়া যাবে না এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে ততদিন জার্মান চিত্রশিল্প টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। তবে একটি শিল্পকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে নানাভাবে চেষ্টা করা দরকার এবং জার্মান চিত্রশিল্পও তাই করছে।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে ব্যাডমিন্টন খেলায় কুলমর্যাদা রক্ষার ধারক এবং বাহক এই অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা (ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান) এবং দলগত অনুষ্ঠানে টমাস কাপ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার নামকরণ থেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা একটি আঞ্চলিক অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু যে-সব দেশ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংস্থার সভ্য সে সব দেশের খেলোয়াড়দের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে কোন বাধা-নিষেধ নেই। দলগত বিভাগে টমাস কাপ প্রতিযোগিতার যে গুরুত্ব, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের এই অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সেই গুরুত্ব সমানভাবে আরোপ করা হয়। এই প্রতিযোগিতার যে-কোন একটি অনুষ্ঠানে জয়লাভের সম্মান—বিশ্ব-খেতাব লাভের সমান গৌরবময়।

ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়া-অনুরাগীদের আন্তরিক চেষ্টাতেই ব্যাডমিণ্টন খেলা আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-জগতে পাকা-পোক্ত আসন লাভ করেছে। আসলে কিন্তু এই খেলাটি ইংল্যাণ্ডের নিজস্ব খেলা নয়। ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রতিপালক এবং সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এক সময়ে ভারতবর্ষে পুণা খেলার খুব জনপ্রিয়তা ছিল। এই পুণা খেলা দেখে জনৈক ইংরেজ মিলিটারী অফিসার বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলেই এই খেলার খুব ভক্ত ছিলেন। দীর্ঘ দিনের ছুটিতে যখন তিনি স্বপরিবারে ভারতবর্ষ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যান সেই সময় তাঁদের অতিপ্রিয় পুণা খেলার সাজ-সরঞ্জামও সঙ্গে নিয়ে যান। একদিন সান্ধ্য মজলিসে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রদর্শনী পুণা খেলার আয়োজন করেন। এই প্রদর্শনী খেলায় তাঁর পরিবারের অনেকেই অংশ গ্রহণ ক'রে উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের মুগ্ধ করেন। সেই দিনেই উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের প্রস্তাবমত পুণা খেলাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং গৃহকর্তার বাড়ীর নামে পুণা খেলার নতুন নাম দেওয়া হয় 'ব্যাডমিণ্টন'। এই ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রধান আকর্ষণ অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে প্রতিযোগিতার ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখেছেন। যুদ্ধোত্তর কালে এই প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভ করেছেন মালয়, আমেরিকা এবং ডেনমার্কের খেলোয়াড়রা। অন্যদিকে দলগত বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় (টমাস কাপ) এ পর্যন্ত দুটি দেশ খেতাব লাভ করেছে—মালয় (৩ বার) এবং ইন্দোনেশিয়া (২ বার)।

১৯৬৩ সালের অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় দু'জন খেলোয়াড়—আরল্যান্ড কপ্‌স (ডেনমার্ক) এবং শ্রীমতী জুডি হাসম্যান (আমেরিকা) ব্যক্তিগত সাফল্যে জয়যুক্ত হয়েছেন। এই নিয়ে গত ছ' বছরের প্রতিযোগিতায় কপস পাঁচবার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব
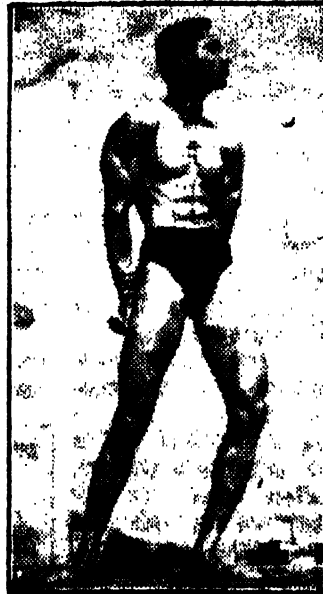
রমেন্দ্রনাথ রায় : কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ১৯৬৩ সালের আন্তঃকলেজ শ্রেষ্ঠদেহী প্রতিযোগিতায় 'সর্বাধিক পেশীবহুল প্রতিযোগী' আখ্যা লাভ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন। শ্রীরায় কলিকাতার গুরুদাস কলেজ এবং ঘোষের শরীর শিক্ষণ কলেজের ছাত্র।

শ্রীমতী জুডি হাসম্যান

পেলেন। তিনি প্রথম খেতাব পান ১৯৫৮ সালে। ১৯৫৯ সালের প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করেন নি। তারপর ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত (উপর্যুপরি ৪ বার) পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। এ বছরের কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যাণ্ডের সাঙ্গাদ রত্তানুসোর্নকে পরাজিত করতে কপ্‌সকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় জাপানের যোশিও কোমিয়োর খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রতিযোগিতায় জাপানের যোগদান এই প্রথম। কোমিয়ো প্রতিযোগিতায় একাধিক খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে পরাজিত ক'রে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি পরাজিত হ'ন ১৯৫৯ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান তান জো হকের (ইন্দোনেশিয়া) কাছে।

মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পান গত ছ' বছরের বিজয়িনী শ্রীমতী জুডি হাসম্যান (আমেরিকা)। কুমারী অবস্থায় তিনি ছিলেন জুডি ডেভলিন। শ্রীমতী হাসম্যান এই নিয়ে সাতবার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। তাঁর পিতা ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন একজন বিশ্বখ্যাত ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়। ফ্র্যাঙ্ক ডেভলিন অল্ ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ৬ বার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন। শ্রীমতী জুডি হাসম্যান পেলেন ৭ বার অর্থাৎ পিতার থেকে একবার বেশী। তা-ছাড়া শ্রীমতী হ্যাসম্যান ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে মহিলাদের ডাবলস খেতাবও পেয়েছেন।

এবারের পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে আরল্যান্ড কপ্‌স (ডেনমার্ক) ১৫—৭ ও ১৫—৭ পয়েণ্টে চানারং রত্ন—
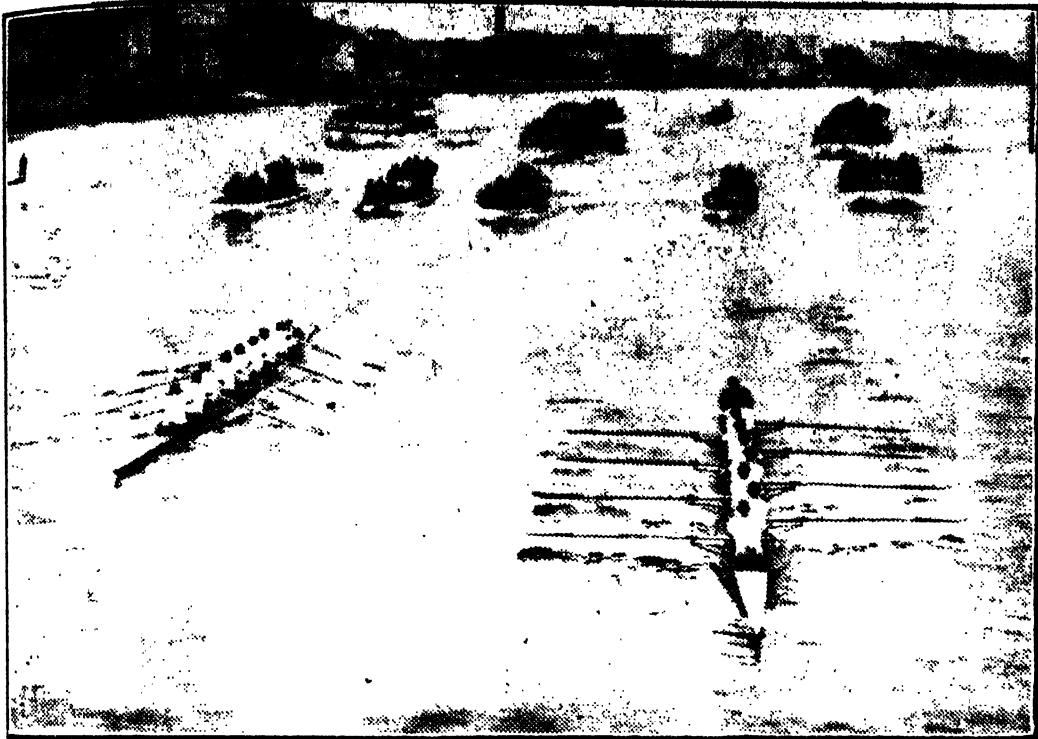
অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯তম বাচ প্রতিযোগিতার দৃশ্য। অক্সফোর্ড (ডানদিকে) ৫ লেংথে জয়লাভ করে। বর্তমানে অক্সফোর্ডের জয় দাঁড়াল ৪৮ এবং কেম্ব্রিজের ৬০ বার।

[...]সেপ্প সুয়াংগকে (তাইল্যান্ড) পরাজিত [ক]রেন। অপর দিকে মহিলাদের সিঙ্গলস [ফা]ইনালে শ্রীমতী জুডি হাসম্যান (আমে[রি]কা) ১১—৫ ও ১১—৯ পয়েন্ট [অ]্যাঞ্জেলা বেয়ারস্টোকে (ইংল্যান্ড) পরা[জি]ত ক'রে সাতবার সিঙ্গলস খেতাব [জ]য়ের গৌরব লাভ করেন।

[জা]তীয় বাস্কেট বল প্রতিযোগিতা

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার [ত্র]য়োদশ অনুষ্ঠান আগামী ৭ই মে থেকে [বা]ঙ্গালোরের ওয়াই এম সি এ কোর্টে [আ]রম্ভ হবে। ইতিপূর্বে বাঙ্গালোরে এই [প্র]তিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনবার—[১]৯৪৬, ১৯৫২ ও ১৯৫৯ সালে। [আ]গামী ত্রয়োদশ প্রতিযোগিতায় আনু[মা]নিক ৩৫০ জন খেলোয়াড় বিভিন্ন রাজ্য [দ]লের পক্ষে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রতি[যো]গিতায় তিনটি বিভাগ আছে—পুরুষ, [ম]হিলা এবং বালক। গত বছরের প্রতি[যো]গিতার ফাইনালে পুরুষ বিভাগে [সা]র্ভিসেস, মহিলা বিভাগে পশ্চিম বাংলা [এ]বং বালক বিভাগে মহারাষ্ট্র জয়লাভ [ক]রেছিল। পুরুষ বিভাগের বিজয়ী দলকে [']টড মেমোরিয়াল ট্রফি' দিয়ে পুরস্কৃত [ক]রা হয়। এই ট্রফি দান করেছেন হিন্দু[স্থা]ন এয়ার ক্র্যাফ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মি[বৃ]ন্দ। হায়দরাবাদের প্রিন্স বাসলাত ঝা [ম]হিলা বিভাগের বিজয়ী দলের জন্যে তাঁরই নামে একটি ট্রফি দান করেছেন। বালক বিভাগের বিজয়ী দলের পুরস্কারের নাম—সি সি আব্রাহাম ট্রফি। ভারতীয় বাস্কেটবল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির নামে এই ট্রফিটি দান করেছেন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত সদস্য-রাজ্যগুলি। পুরুষ বিভাগে বিজয়ী দলের তালিকায় দেখা যায় মহীশূর ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ফাইনালে জয়লাভ করেছে। তারপর ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগে একটানা জয়লাভ করেছে সার্ভিসেস দল। উভয় দলই উপর্যুপরি পাঁচবার ক'রে টড্ মেমোরিয়াল ট্রফি পেয়েছে।

॥ অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বোট রেস ॥

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে অক্সফোর্ড বনাম কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ স্থান আছে। শতাধিক বৎসরের এই পুরাতন ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীরা দলগত অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোন রকম পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা করেন না। এমন কি এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রশংসাপত্র দেওয়ারও ব্যবস্থা নেই। এই দিক থেকে পৃথিবীর আর কোন আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠান—শৃঙ্খলায় এবং ঐতিহ্যে এই প্রতিযোগিতার সমকক্ষ নয়। আরও বিশেষ

মোহনবাগান ক্লাবের টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস বিজয়ী সুমন্ত মিশ্র এবং এ সাবারওয়াল অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা এই বাচ খেলা উপলক্ষে টিকিট বিক্রী করেন না। টেমস নদীর দু' পাড়ে কাতারে কাতারে লোক জমায়েত হয় এই **বাচ খেলা** দেখতে। সুদীর্ঘ ৪ মাইল **৩৭৪ গজ পথ** বেয়ে দুটি বাচ কোটি **কোটি নয়ন সার্থক** ক'রে তীরবেগে **ছুটে চলে যায়।** অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের **এই বাচ খেলা** ইংরেজ জাতির জাতীয় **উৎসব।** টেমস নদীতে সাধারণতঃ মার্চ **মাসের শেষ** সপ্তাহে অথবা এপ্রিল মাসের **প্রথম** সপ্তাহে এই বাৎসরিক বাচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার সীমানা পাটনি থেকে মর্টলেক, **এই দুই স্থানের** দূরত্ব ৪ মাইল ৩৭৪ **গজ।**

গত ২৮শে মার্চ তারিখে ১০৯তম **বাৎসরিক** বাচ প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ড **বিশ্ববিদ্যালয়** দল ৫ লেংথ দূরত্বে গত **দু' বছরের** বিজয়ী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় **দলকে পরাজিত** ক'রে তাদের হ্যাট-ট্রিক **করার** গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। ঠিক **এইভাবে অক্সফোর্ড** বিশ্ববিদ্যালয় দলের **হ্যাট-ট্রিক** হাত-ছাড়া হয়েছিল ১৯৬১ **সালে,** কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়লাভে। **প্রতিযোগিতার** সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে **বর্তমান ফলাফল দাঁড়াল—কেম্ব্রিজের জয় ৬০ বার,** অক্সফোর্ডের ৪৮ বার এবং **একবার** ডেড্ হিট (১৮৭৭ সাল)। **সুতরাং** কেম্ব্রিজের নাগাল পেতে **অক্সফোর্ডের** বেশ অনেক দিন অপেক্ষা **করতে হবে।** ১৯২৪ সাল থেকে এই বাচ **প্রতিযোগিতার** ফলাফলের তালিকা **পরীক্ষা** করলে দেখা যায়, যেখানে **কেম্ব্রিজের উপর্যুপরি জয় ১৩ বার (১৯২৪-৩৬), ৫ বার (১৯৪৭-৫১) এবং ৪ বার (১৯৫৫-৫৮),** সেখানে অক্সফোর্ড **কখনও উপর্যুপরি** ৩ বার জয়লাভ করতে পারেনি। যুদ্ধোত্তর কালের প্রতিযোগিতায় (১৯৪৫-৬৩) কেম্ব্রিজের জয় ১৩ বার এবং অক্সফোর্ডের ৬। একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে, ১লা এপ্রিল তারিখটা অক্সফোর্ডের পক্ষে মোটেই শুভ নয়। এ পর্যন্ত চার বার ১লা এপ্রিল তারিখে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চারবারই অক্সফোর্ডের পরাজয় ঘটেছে।

সর্বাপেক্ষা কম সময়ে প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট পথ (৪ মাইল ৩৭৪ গজ) অতিক্রম করার রেকর্ড করেছে কেম্ব্রিজ—সময় ১৭ মিনিট ৫০ সেকেন্ড (২৭শে মার্চ, ১৯৪৮)। সর্বাপেক্ষা কম দূরত্বে জয়লাভ করার রেকর্ড অক্সফোর্ডের—দূরত্ব ক্যানভাস (২৯শে মার্চ, ১৯৫২)। সর্বাপেক্ষা বেশী দূরত্বে জয়লাভ করার রেকর্ড কেম্ব্রিজের। দূরত্ব—২০ লেংথ (১৯০০)।

।জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা॥

দিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় একাধিক জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রতিযোগিতায় কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটায় খেলার আনন্দ এবং উৎসাহ একেবারে নষ্ট হয়। প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে প্রকাশ্য রাজপথে (কিচনার রোড) যখন ১৮০ কিলোমিটার রোড রেস অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সাইকেল চালকেরা প্রতিযোগিতার নির্দিষ্ট দূরত্বের শেষ অধ্যায় অতিক্রম করছিলেন সেই সময় বিপরীত দিক থেকে একটি মিলিটারী ট্রাক আকস্মিকভাবে প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে রেলওয়ে দলের প্রকাশ সিং (বয়স ৩৫) ঘটনাস্থলেই মারা যান। এই দুর্ঘটনায় আহত অপর চারজনকে (রেলদলের কানিয়াপ্পান, কিষণ চাঁদ ও হরবন সিং এবং অন্ধ্রের জগন্নাথ) মিলিটারী হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এই চারজনের মধ্যে কানিয়াপ্পান গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। ২৫শে মার্চ কানিয়াপ্পান (বয়স ৩০) হাসপাতালে দেহরক্ষা করেন। অপর তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নতুন জাতীয় রেকর্ড

৪০০ **মিটার পারস্যুট (দলগত)** : সময় ৫ মিঃ ১৭·৪ সেঃ—পাঞ্জাব
পূর্ব রেকর্ড : ৫ মিঃ ২০ সেঃ—বোম্বাই, ১৯৫৫

৪০০০ **মিটার পারস্যুট (ব্যক্তিগত) :** দলবীর সিং (পাঞ্জাব)। সময়—৫ মিঃ ২৮·৩ সেঃ
পূর্ব রেকর্ড : ৫ মিঃ ৩২·৪ সেঃ—অমর সিং সোখি (দিল্লী), ১৯৫৮

১০০০ **মিটার স্প্রিণ্ট :** সুচা সিং (সার্ভিসেস), সময় : ১২·৭ সেঃ
পূর্ব রেকর্ড : ১৩ সেঃ—সুচা সিং (সার্ভিসেস), ১৩শ প্রতিযোগিতার হিটে, ১৯৬৩

॥ ক্যালকাটা হকি লীগ ॥

ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগের খেলায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এ পর্যন্ত সব খেলাতেই জয়লাভ করেছে। মোহনবাগান ১৫টা খেলায় ৩০ পয়েন্ট তুলেছে। তারা ৮০টা গোল দিয়ে মাত্র একটা গোল খেয়েছে। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পয়েন্ট ২৬, ১৩টা খেলায়; গোল দিয়েছে ৪৬টা এবং গোল খেয়েছে মাত্র দুটো। এই দুই দলের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী বি এন আর ক্লাব ১৪টা খেলায় ২৫ পয়েন্ট করেছে। বি এন আর ১৫—০ গোলে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত ক'রে পরবর্তী খেলায় রাজস্থানের সঙ্গে

আলগা দিয়ে খেলতে গিয়ে ০—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। লীগের খেলায় তাদের এই প্রথম পরাজয়। কাস্টমস ক্লাবও লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াইয়ে অন্যতম প্রতিদ্বন্দী। বর্তমানে তাদের পয়েন্ট ১৬, দশটা খেলায়। মাত্র একটা খেলায় হার স্বীকার করেছে, মোহনবাগানের কাছে ০—১ গোলে।

॥ মুষ্টিযুদ্ধে জীবনদান ॥

সম্প্রতি মুষ্টিযুদ্ধ জগতে এমন একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল যাতে সব দেশের ক্রীড়া-মহলে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

গত ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রে লস্ এ্যাঞ্জেলস শহরে ফেদারওয়েট বিভাগের বিশ্ব-মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান ডেভী মুরে (আমেরিকা) তাঁর বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখতে কিউবার সুগার রামোসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দশম রাউণ্ডের লড়াইয়ে রামোসের কাছ থেকে একাধিক প্রচণ্ড ঘুঁষির আঘাত পেয়ে ডেভী মুরে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের দড়ির উপর ছিটকে পড়েন। রেফারী ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে তাঁকে লড়াইয়ে আর নামাতে পারেন নি। ঘণ্টাধ্বনির সময় মুরে দড়ির সঙ্গে অসহায় অবস্থায় জড়িয়ে ছিলেন। ফলে রেফারীর সিদ্ধান্তে সুগার রামোস ফেদারওয়েট বিভাগে বিশ্ব-খেতাব লাভ করেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! এই শহরের ক্রীড়ামঞ্চে ১৯৫৯ সালে নাইজেরিয়ার হোগান (কিড) ব্যাসেকে ১৩ রাউণ্ডের লড়াইয়ে পরাজিত ক'রে ডেভি মুরে ফেদারওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব পেয়েছিলেন। এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সেই বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রেখে আজ কিনা সেই শহরেই তাঁকে বিশ্ব-খেতাব হাত-ছাড়া করতে হ'ল। এইখানেই নাটক শেষ হল না। এই খেলাটিই হ'ল তাঁর জীবনের শেষ খেলা। এই খেলায় তিনি মান-সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনও বিসর্জন দিলেন। লড়াইয়ের শেষে ডেভি মুরের গুরুতর আঘাত সম্বন্ধে কোন পূর্বাভাষ পাওয়া যায়নি। লড়াইয়ের পর তিনি ড্রেসিং রুমে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কিছুক্ষণ আলাপ করেছিলেন এবং তিনি এক সময়ে ম্যানেজারকে তাঁর মাথার দারুণ যন্ত্রণার কথা জানিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হাসপাতালে এই অচেতন অবস্থায় ডেভি মুরে ২৫শে মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। ডেভি মুরে ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে অপেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এর পর তিনি পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে মুরে এই নিয়ে মাত্র দু'বার নক্-আউটে পরাজিত হ'ন। অপরদিকে তাঁরই হাতে ২৯ জন মুষ্টিযোদ্ধা নক্-আউটে পরাজিত হয়েছিলেন। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব-খেতাব রক্ষায় লড়াইয়ে ডেভি মুরেকে নিয়ে দু'জন মুষ্টিযোদ্ধা আত্মবলি দিলেন। প্রথম ব্যক্তি হ'লেন কিউবার বেনী (কিড) প্যারেট। ১৯৬২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে প্যারেট তাঁর ওয়েল্টার-ওয়েট বিভাগের বিশ্ব-খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে আমেরিকার এমিলি গ্রিফিথের হাতে পরাজিত হন। গ্রিফিথের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তাঁকে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ থেকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়। দশ দিন পর এই অবস্থাতেই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমেরিকার 'রিং ম্যাগাজিন' এই শোচনীয় দুর্ঘটনার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন, ১৯০০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে মোট ৪৫০ জন মুষ্টিযোদ্ধাকে আঘাত পেয়ে প্রাণ হারাতে হয়েছে। বে-সরকারী হিসাবে দেখা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত ২০০ জন মুষ্টিযোদ্ধা মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে প্রাণ দিয়েছেন। যে আঘাতের দরুণ ডেভী মুরের মৃত্যু হয়, ডাক্তারদের মতে, সেই আঘাতের জন্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দী দায়ী নন্। ফিল্মে এই যুদ্ধের যে ছবি তোলা হয় তাতে দেখা যায়, দশম রাউণ্ডের লড়াইয়ে মুরে রিংয়ের দড়ির উপর প্রচণ্ড বেগে হুমড়ী খেয়ে পড়ে যান। ডাক্তারদের মতে এই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ। অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেছেন, চলতি খেলার মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দীর কাছ থেকেও মুরে যে কয়েকটি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন তা সমগ্রভাবে তাঁকে কাবু করে ফেলেছিল।

এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপ জন মন্তব্য করেছেন, এই খেলা বর্বরতাপ্রসূত এবং স্বাভাবিক রীতি-নীতির বহির্ভূত। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে উত্তেজিত করা বর্বরতার সামিল। খৃষ্ট কখনও খেলাধুলো অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করেন নি।

প্রাক্তন বিশ্ব ফেদারওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান ডেভি মুরের শোচনীয় মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মুষ্টিযুদ্ধ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বিল আনয়নের চেষ্টা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কালিফোর্ণিয়া স্টেটে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ বিলোপের উদ্দেশ্যে গণভোট সংগ্রহের সুপারিশ ক'রে উক্ত স্টেটের আইনসভায় একটা খসড়া বিল পেশ করা হয়েছে। এদিকে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ এসোসিয়েশনের এশিয়া শাখার সহ-সভাপতি জাণ্টিনিয়ানো মণ্টানো (ছোট) মুষ্টিযোদ্ধা ডেভি মুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং সেই সঙ্গে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ বে-আইনী করার বিরোধিতা করেছেন।

তিনি এই মন্তব্য করেছেন যে, পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ বে-আইনী ঘোষণা করলে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত 'কালোবাজারী' ব্যবসায়ে পরিণত হবে। তাঁর মতে, মুষ্টিযুদ্ধের পদ্ধতি সম্পর্কে কঠোর আইন প্রণয়ন করা উচিত। তিনি এখানে উদাহরণ হিসাবে ফিলিপাইনের মুষ্টিযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, বিপদজনক খেলা হিসাবে যদি মুষ্টিযুদ্ধ বে-আইনী করা হয় তাহলে আরও কয়েকটি খেলা যেমন মোটর রেসিং এবং মার্কিন ফুটবল খেলাও বে-আইনী করা প্রয়োজন। তাঁর মতে বিপদজনক খেলার তালিকায় মুষ্টিযুদ্ধের স্থান সপ্তম।

মোটের উপর ডেভি মুরের এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে মুষ্টিযুদ্ধের বিপক্ষে সারা জগতে একটা তীব্র অসন্তোষ এবং ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, এই বর্বর পাশব খেলা একেবারে আইনের সাহায্যে বন্ধ করা উচিত। এই বর্বরোচিত খেলা অনেক শোচনীয় মৃত্যুর কারণ তো বটেই, তা-ছাড়া যে খেলা দেখতে গিয়ে মানুষ আরো বর্বর এবং পশু হয়ে পড়ে বা নির্দয় ঘুষাঘুষিতে পাশবিক আনন্দ পায় তা - একেবারে সভ্য জগৎ থেকে নির্বাসিত করা একান্ত প্রয়োজন।

খেলাধুলোয় কখনও প্রতিপক্ষকে এমন আঘাত করা উচিত নয়, যার ফলে সে গুরুতরভাবে আহত হ'তে পারে অথবা যার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে। খেলাধুলোয় যদি এ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করা হয়, তাহলে তা খেলাধুলো নয়—খেলাধুলোর নামের আড়ালে বর্বর যুগের যুদ্ধ করা। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে একমাত্র জয়লাভের উদ্দেশ্যেই প্রতিপক্ষকে প্রচণ্ড আঘাতে কাবু করার নীতি গ্রহণ করা হয়। আঘাত যত বেশী প্রচণ্ড হবে, সে আঘাতে যত বেশী রক্তক্ষয় হবে এবং প্রতিপক্ষ যত বেশী বীভৎস রূপ ধারণ করবে দর্শকদের পক্ষে পৈশাচিক আনন্দ তত বেশী হবে। এই কাজের জন্যে দর্শকদের চোখে আহত এবং পরাজিত মুষ্টিযোদ্ধাই হবেন পরম অপরাধী এবং অপর দিকে তাঁর প্রতিপক্ষ হবেন বীরশ্রেষ্ঠ। দর্শকদের আসনে অনেকেই এই বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চেতনা হারান অথবা সাময়িকভাবে অভিভূত

১৯৬৩ সালের গত ২১শে মার্চ তারিখে লস্ এঞ্জেলসের ক্রীড়া-মঞ্চে কিউবার স্যুগার রামোসের প্রচন্ড ঘ্যুষি খেয়ে প্রাক্তন বিশ্ব ফেদারওয়েট চ্যাম্পিয়ান ডেভি ম্যুরকে (আমেরিকা) রিংয়ের দড়ির উপর অসহায় অবস্থায় ঝ্যুলতে দেখা যাচ্ছে। ২৫শে মার্চ তারিখে ডেভি ম্যুর অচেতন অবস্থায় দেহ ত্যাগ করেন।

১৯৬২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে এমিল গ্রিফিথের (আমেরিকা) ঘ্যুষিতে প্রাক্তন বিশ্ব ওয়েল্টারওয়েট চ্যাম্পিয়ান বেনি প্যারেট (কিউবা) জ্ঞান হারিয়ে দড়ির উপর পড়ে যাচ্ছেন। দশদিন পর প্যারেট এই অবস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

হ্যন; কিন্তু ম্যুষ্টিযুদ্ধ দেখা বর্জন করেন না।

মানুষের এই পাশবিক হৃদয়-বৃত্তির স্যুযোগ নিয়েই পেশাদারী ম্যুষ্টিযুদ্ধ বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে স্ফীত হয়ে উঠেছে। অর্থের জন্য আজও মানুষের এই ঘৃণ্য পেশা এবং পৈশাচিক আনন্দ-লাভের জন্যে মানুষের এই পৃষ্ঠপোষকতা সভ্য জগতের পক্ষে শুধু কলঙ্কই নয়—মানব সভ্যতার পক্ষে এক বিপদজনক খেলা।

যুদ্ধোত্তরকালে ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের এম সি সি দল ১৯৬২-৬৩ সালের অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফর শেষ ক'রে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেছে। ঘরের ছেলে ফিরে পেরে ইংল্যান্ড খুশী হয়েছে; কিন্তু মনের দুঃখ তার কম নয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড 'এ্যাসেজ' সম্মান পুনরুদ্ধার ক'রে ঘরে তুলতে পারেনি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আলোচ্য সফরে 'রাবার' জয় করেছে। কিন্তু এ জয়লাভ তাদের কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ নয় যত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সি[...] কেবল এই দুই দেশের কাছেই নয়, [...] র্জাতিক ক্রীড়া-জগতে ইংল[...] অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজ একটি [...] গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যুদ্ধোত্তর [...] (১৯৪৬-১৯৬৩) ইংল্যান্ড-অস্ট্রে[...] মধ্যে ৯টি টেস্ট সিরিজ খেলা হ[...] এই সময়ে (১৯৪৬-১৯৬৩) 'এ্য[...] সম্মান পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া ৫ [...] ইংল্যান্ড ৩ বার এবং সিরিজ অম[...] সিত থেকেছে একবার (১৯৬২-[...] যুদ্ধোত্তর কালের টেস্ট সিরিজে [...] লিয়া উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৪৬ [...] ১৯৪৮ ও ১৯৬০-৬১) 'এ্যাসেজ' [...] এর পর ইংল্যান্ডও পায় উপর্য[...] ৩ বার (১৯৫৩, ১৯৫৪-৫৫ [...] ১৯৫৬)। রিচি বেনোর নেতৃত্বে ১৯[...] ৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রে[...] সেই যে ইংল্যান্ডের হাত থেকে 'এ্যা[...] সম্মান উদ্ধার করে, ইংল্যান্ড পর[...] দুটি টেস্ট সিরিজে (১৯৬১ ও ১৯[...] ৬৩) তা হস্তগত করতে পারেনি।

যুদ্ধোত্তর কালে ইংল্যান্ড বি[...] দেশের বিপক্ষে এ পর্যন্ত মোট [...] টেস্ট সিরিজ খেলেছে। ফল [...] দাঁড়িয়েছে : ইংল্যান্ডের রাবার [...] ২০, হার ৮ এবং সিরিজ ড্র ৭।

যুদ্ধোত্তর কালে
ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট
(১৯৪৬ থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯[...]

বিপক্ষে	খেলা	জয়	হা[...]
" অস্ট্রেলিয়া	৪৫	৯	২০
" দঃ আফ্রিকা	৩০	১৬	৫
" ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৩	৭	৭
" ভারতবর্ষ	২২	১০	৩
" নিউজিল্যান্ড	১৯	১১	০
" পাকিস্তান	১২	৬	১
মোট :	১৫১	৫৯	৩৬

টেস্ট সিরিজের ফলাফল
(১৯৪৬—১৯৬৩)

বিপক্ষে	খেলা	জয়	হার
" অস্ট্রেলিয়া	৯	৩	৫
" দঃ আফ্রিকা	৬	৫	০
" ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৫	২	২
" ভারতবর্ষ	৫	৩	১
" নিউজিল্যান্ড	৭	৫	০
" পাকিস্তান	৩	২	০
মোট :	৩৫	২০	৮

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪৯শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

Friday, 12th April, 1963.
40 Naya Paise.

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পূর্বে এই কমিটির কার্যক্রমে এদেশ ও জাতির কল্যাণ ও প্রগতির জন্য যে চিন্তা, বিচার ও প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইত, আজ তাহার অভাবই দেখা যায়। এবারের বৈঠকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—যথা উচ্চ অধিকারি পর্যায়ে দুর্নীতি, উৎকোচগ্রহণ ইত্যাদি—সম্পর্কে "রুদ্ধদ্বার" আলোচনা হইবে শোনা গিয়াছে তবে সেটা কিভাবে করা হইবে এবং প্রকৃত বিচার ও বিতর্কের অবকাশ তাহাতে আদৌ থাকিবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের নিকট কোনও সংবাদ পৌঁছে নাই। যাহা পৌঁছিয়াছে তাহা কংগ্রেসী সরকারের উচ্চ অধিকারিবর্গের ভাষণ ও বচনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র মনে হয়।

এখন বলা প্রয়োজন যে, এই কংগ্রেস কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রবীণ, বিচক্ষণ ও উচ্চ-অধিকার বা অর্থাগমের সুযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, সদস্যযুক্ত করা উচিত। নহিলে উহার কর্মক্ষমতা নষ্ট হইবে।

ঐ সংস্থার যে কোনও প্রয়োজন বা উহার অস্তিত্বের কোনও কারণ এখন নাই—একথা ঠিক নয়। বরঞ্চ দেশের ও জাতির এই আপৎকালিন সময়ে জনগণ ও শাসন ও চালনতন্ত্রের অধিকারি ও চালকবর্গের মধ্যে সংযোগ ও নির্লিপ্তভাবে বিচার করিবার জন্য এইরূপ বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান এখন খুবই প্রয়োজন। বর্তমানে এই সংস্থার সভ্যগণ যেভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহাতে নিষ্পক্ষপাত ও নিরাসক্তির স্থান কতদূর আছে তাহা ভাবিবার বিষয়। অন্যের কর্তব্য নির্দেশে ইঁহাদের অনেকেই পঞ্চমুখ হইয়াছেন কিন্তু ইঁহারা, অতীতে ও বর্তমানে, কে কিভাবে কর্তব্যপালন বা উহাতে অবহেলা করিয়াছেন সে কথা বলিবার অধিকার যেন কাহারও নাই। অবশ্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানমণ্ডল বা সংসদগুলিতে বিরোধীদলের মন্তব্য বা অভিযোগ করার ক্ষমতা অটুট রহিয়াছে। কিন্তু সে ক্ষমতার প্রয়োগে শাসন ও চালনের উচ্চ অধিকারিবর্গের চেতনাদান প্রায় অসম্ভব, কেননা অধিকাংশ সময়েই ঐ সকল মন্তব্য ও সমালোচনা অত্যুক্তি বা ভাষার অপপ্রয়োগ দোষে দূষিত হওয়ায় তাহাকে নস্যাৎ বা ধূলিসাৎ করা মন্ত্রীমণ্ডল বা তাঁহাদের স্বপক্ষীয়দের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় না। কিন্তু যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সেই সকল বিষয় সম্পর্কে পক্ষপাতশূন্য ও নির্ভীক বিচার-বিবেচনা করিয়া—এমন কি প্রয়োজন বুঝিলে তদন্ত করিয়া—মত-প্রকাশ করেন তবে সেই মত বা মন্তব্য জনগণ বা অধিকারিবর্গ কেহই হেলায় ঠেলিতে পারিবে না।

দেশ ও জাতির প্রতি আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনের আহ্বান যাঁহারা দিয়াছেন ও দিতেছেন, সেই অধিকারিবর্গ নিজেরা সেই কর্তব্য কিভাবে পালন করিতেছেন সেদিকে খরদৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ঐ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জাতীয় সংস্থার। যদি ঐ সংস্থার কোনও ক্ষমতার বা প্রতিষ্ঠার লেশমাত্র আজ থাকিত তবে অসংখ্য স্বর্ণশিল্পী এই অসহায় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইত না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয়বরাদ্দের দাবী লোক-সভায় আলোচিত হইবার সময় কংগ্রেসী সদস্যা শ্রীমতী শারদা মুখার্জি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত চিন্তাপদ্ধতির অভিযোগ আনেন এবং জানান যে কিভাবে সৈন্যবিভাগে, ঐরূপ বিভ্রান্তি-অনুযায়ী কার্যকলাপের ফলে, নিয়মশৃঙ্খলার অধোগতি হইয়াছে। তাঁহার এই অভিযোগের তদন্ত অত্যাবশ্যক।

দুর্দিন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

প্রথমত গলাগলি, খালি ভাই-ভাই
বিনোদিয়া রঙ্গঢঙ্গ ফুর্তি আশনাই
শুধু মধুরাই।
তারপরে লেখালেখি চিঠি—
সোহাগ আদর ঝুড়িঝুড়ি
প্রেমিকেরা করে খুনসুড়ি।

ক্রমে ক্রমে বাধায় বাড়ায় খিটিমিটি।
এটা নাই ওটা চাই
সুরু করে ধানাই-পানাই।
তারপরে স্পষ্ট রূঢ় পেশ করে দাবি,
কন্ঠ বিষস্রাবী
করে দৃপ্ত আটোপটঙ্কার,
'এই সব ভূখন্ড আমার।'
তুমি যত যুক্তি ধরো তত সে যে খ্যাপে
স্বচ্ছকে আচ্ছন্ন করে দলিলে ও ম্যাপে।
তারপরে অতর্কিতে মর্মে হানে শেল
অরক্ষিত ঘরে ঢোকে সশস্ত্র সিঁদেল।
ইচ্ছেমত লুটে পুটে ছিঁড়ে ছিনে অকস্মাৎ রুদ্ধ করে গতি
'এইখানে আমাদের যুদ্ধের বিরতি।'
বিশ্বেরে দেখায় ডেকে কত তার শান্তিতে সম্মতি।
'ফিরে যাই নিজের এলেকা
যার নাম "বাস্তবিক নিয়ন্ত্রণ-রেখা"।
কোথা যে তা কে বা জানে
শূন্যের সে কোন ময়দানে।
'ভেবে ভেবে খাও হিমসিম
আপাতত বন্ধ করো যুদ্ধের ডিন্ডিম।
রেখার নিহিত অর্থ দুরূহ কে বলে?
যেটুকু এসেছে গ্রাসে রেখে দেব সেটুকু কবলে।'
তারপর পেতে থাকে ওৎ
লগ্ন বুঝে ঢেলে দেবে দানবের স্রোত।

এরই নাম চীন
পৃথিবীর মলিন দুর্দিন॥

আর্তনাদ

শিবশম্ভু পাল

আর্তনাদে কেঁপে ওঠে মালভূমি, নাকি, মনোভূমি
পথিপার্শ্বে উপ্ত যত ছায়াঘন বৃক্ষলতা পাতা
কালজয়ী অদৃষ্টের লিপি নিয়ে যত শিল্প নন্দনের মাটি
ফেটে যায়, তৃষাতুর, কার কাছে হাত পাতব আমি?
উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে সমান জলবায়ু
সর্বত্র বিদীর্ণ মাটি আমারই বিম্বিত দৃশ্য, কে কার সহায়?
টেবিলের চারপাশে সকলেই সমান খদ্যোত
মনে হয় এ টেবিল দিগন্ত উধাও কালো রাত্রির আকাশ।

বরং উপমা রেখে ফিরে আসি আগের কথায়—
কার কাছে হাত পাতব, জল দাও, অভিশপ্ত নির্বান্ধব পুরী,
সকাল দুপুর গেছে। সমস্ত রোদ্দুর ছায়া দেহে
প্রবীণতা এনে দেয়, সন্ধ্যা হলে অবশেষে তোমার বাড়িতে।
তেমন দীঘির জল, মেঘপুঞ্জ তোমাতে কোথাও
হয়তো গোপন আছে ; আমি যে তোমারে ভালোবাসি!

তুমি বলো

অশোক পালিত

তুমি বলেছো তাই অশ্বমেধ ঘোড়াকে বেঁধেছি।
পৃথিবী তোলপাড় করতে চেয়েছিল।
নিরাপদ আস্তাবলে রেখেছি।
তার গায়ের ওপর এখন গৃহবলিভুক্ পায়রারা খেলা করে।
মাঝে মাঝে ক্ষুরের শব্দ ওঠে; মনে হয়
রাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

তুমি বলেছো তাই আকাশ দেখি না
পাছে, তোমাকে দেখার চোখে রামধনুর রঙ লাগে
তোমার মুখে নক্ষত্রের আলো এনে ফেলি
এখন চোখের পাতা তুলি না।
মাঝে মাঝে চোখ অভিমান করে; মনে হয়
আর কোনো কথাই সে শুনবে না।

তুমি বলো ঘোড়াটাকে খুলে দিই
দিগন্ত ভেঙে চলে যাক্ অথৈ পৃথিবীতে
তুমি বলো আমি আবার আকাশে তাকাই
তোমাকে দেখি।

জৈমিনি

সাহিত্য, বিশেষ করে সংসাহিত্যের আদর্শ কী, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু একটি বিষয়ে অনেকেই হয়তো একমত হবেন যে, সিনেমা-সাহিত্য ঠিক সংসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না।

আজকাল সিনেমা-পত্রিকার জয়-জয়কার। চলতি ছবির সমালোচনা, অনাগত ছবির টুকিটাকি সংবাদ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা পোজের ফটো সাজিয়ে এইসব পত্রিকা জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে অতি সহজেই। সিনেমা এখন বৃহত্তম শিল্প-মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে, যেখানে জনসাধারণের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই লেখাপড়া জানার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, সেখানে সিনেমার উপযোগিতা কেবল আনন্দ লাভের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান-সঞ্চয়নের ক্ষেত্রেও অপরিসীম। সিনেমা-পত্রিকা হ'ল এরই পরিপূরক ব্যবস্থা। অর্থাৎ সিনেমার বিষয়ে কৌতূহলী মানুষদের মধ্যে যাঁরা অক্ষর-পরিচয়ের গন্ডি পেরিয়েছেন তাঁদের কাছে সিনেমার খবর পৌঁছে দেওয়াই এ ধরণের কাগজের প্রধান উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য এ পর্যন্ত কারো আপত্তি ওঠার কথা নয়। সাহিত্য এক বিশাল সমুদ্রের মতো। লোক-সাহিত্য, ধর্মসাহিত্য, দার্শনিক সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ইত্যাদি কত রকমের নদ-নদী যে তাতে এসে পরমাগতি লাভ করেছে তার শেষ নেই। আবার বিজ্ঞাপন-সাহিত্য বা ডাক্তারী সাহিত্য ধরণের কতকগুলি উপনদী-শাখানদীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে আজকাল। সেই রকমই একটি নতুন জলধারা হল সিনেমা-সাহিত্য। নদীর মতো স্বাভাবিক নয়, হাতে-কাটা খাল। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোনো ইতর বিশেষ ঘটে নি।

বিপত্তি দেখা দিচ্ছে এর পরের পর্যায়ে। সিনেমা-পত্রিকা কেবল সিনেমা নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে হাত

বাড়িয়েছে গল্প-উপন্যাসের দিকেও। ফলে সিনেমা-সাহিত্য আজ আর শুধু সিনেমা-বিষয়ক সাহিত্য নয়, সিনেমা এবং সাহিত্যের এক বিমিশ্র জগা-খিচুড়ি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

আর এর ঢেউ এসে লেগেছে তথা-কথিত এক শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকাতেও। সিনেমার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থার্ড ক্লাশ জীবনী ফোর্থ ক্লাস ভাষায় প্রকাশ করে এ'রা বঙ্গ-সাহিত্যের সোল এজেন্ট হ'য়ে উঠছেন।

এতে সিনেমার কি ক্ষতি হয়েছে সে বিচার করবেন যোগ্যতর ব্যক্তিরা, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষতি যে বিলক্ষণই হচ্ছে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সিনেমা পত্রিকার ঝোঁক হল বৃহত্তম জনসংখ্যার ব্যাপক-তম মনোরঞ্জনের দিকে, এবং এ'দের মধ্যে 'শিক্ষিতের' সংখ্যা যতো না হোক, 'সাক্ষর' লোকের সংখ্যাই বেশি। এই সমস্ত পাঠক, যাঁরা কোনো রকমে লিখতে এবং পড়তে শিখেছেন তাঁদের দাবী মেটাতে হয় বলে সিনেমা-পত্রিকার সুর স্বভাবতই উঁচু গলায় বাঁধা। সিনেমা পত্রিকার জন্যে প্রার্থিত গল্প-উপন্যাসেরও অলিখিত অনুরোধ সেইদিকে।

অবিশ্যি আমি জানি, সিনেমার কাগজেও ভাল লেখা প্রকাশিত হয়। যাঁরা বিবেকবান সাহিত্যিক তাঁরা সিনেমার কাগজে লেখার সময়েও নিজের দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হন না। কিন্তু নতুন লেখক এবং সাধারণ লেখকের বেলায় এ যুক্তি খাটে না। জনপ্রিয়তার করতালিতে কান বাঁধা রেখে তাঁদের কলম যেন নৃত্যপরা উর্বশীর চেয়েও যৌবনক্ষরা হয়ে ওঠে। সং-সাহিত্য তখন লজ্জায় অধোবদন।

এ যেন ইনকমিকসের সেই গ্রেশামস্ ল-এর সাহিত্যিক প্রয়োগ। খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার থেকে উৎখাত করে দেওয়ার মতো সৎসাহিত্যও বদ্-সাহিত্যের চাপে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

সৎ সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ভাবিত, ব্যাপারটা তাঁদের ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। এটা ঠিকই যে, উচ্চ-মার্গের সাহিত্যের পাঠক চিরদিনই কম। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি অন্তত এমন থাকা দরকার যে ভালোর প্রতি সাধারণ মানুষের মনেও একটা শ্রদ্ধা জেগে থাকে। না হলে, অবস্থা যেমন দাঁড়াচ্ছে তাতে আশঙ্কা হয়, অচিরাৎ পঞ্জিকাগুলোতেও গল্প উপন্যাস সংযোজিত হয়ে সেগুলো সাহিত্যের সার্টিফিকেট জোগাড় করে ফেলবে। এবং সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে হয়তো রেলের টাইম টেব্‌ল বা টেলি-ফোন গাইডেও দেখা যাবে রম্যরচনার শুভাগমন।

এমন সম্ভাবনা যে একেবারে অলস-কল্পনা তা বলা কঠিন। সবরকম সভার কাজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখার মতো সব রকম ছাপা পুঁথিতেই হয়তো একদিন গল্প-উপন্যাস দেওয়ার রেওয়াজ দেখা দেবে। আর কালক্রমে এই উৎসাহ যদি রেস-এর বই পর্যন্ত এসে পেঁছায়, সাহিত্য যে তাহলে রাতা-রাতি চতুর্বর্গ লাভ করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।......

অচিরাৎ সিনেমা-সাহিত্যের বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

মতামত

মহাশয়,

অমৃতের (২য় বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা ২২শে চৈত্র ১৩৬৯) বর্তমান সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা পড়িলাম। যাঁরা এ বিষয়ে আলোকপাত করবার প্রয়াস করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার নাম উল্লেখ করেছেন তিনি তজ্জন্য ধন্যবাদ। বর্তমান আলোচনা পর্বের পূর্বেও আমি এবিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা অন্যত্র করেছি। রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী বৎসরে (১৩৬৭) গল্পভারতীতে আমি একটি প্রবন্ধ দিই। গত বৎসর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে "Impact of Ramakrishna-Viveka-nanda movement of Rabindra-natha's thought if any প্রসঙ্গটি উত্থাপন করি এবং সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতা বক্তা হিসাবে—Nivedita as a link between Vive-kananda and Rabindranath — সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করিবার সৌভাগ্য হয়।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মত ক্রান্তদর্শী মহাপুরুষদের সাধারণভাবে কে কার কথা কতোটা বলেছেন বা বলেননি এ নিয়ে যুগ-চেতনাকে কি রকমভাবে রূপায়িত করেছেন এবং সে মহৎদানের সার্থকতা জাতীয় জীবনের কোন কোন পর্ব ছুঁয়ে গেছে এবং তার মধ্যে ভারত-সাধনার কোন বিশিষ্ট রূপটি মূর্ত হয়েছে এই সব বিষয়েই সম্যক আলোচনা হওয়া দরকার। লীলাপন্থী কবি আর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক কেমন করে মহামানবের সাগর থেকে শক্তি মুক্তো তুলেছেন সেই সমন্বয়ের কথাই বলি না কেন? এখানে সম্প্রদায়গত কোন বিরোধ, আদর্শগত কোন বিচ্ছেদ, রুচিগত কোন বিসম্বাদ বা ব্যক্তিগত কোন তর্ক না তুলেও বলা যেতে পারে ভারতচেতনার দুটি সমান্তরাল রেখা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হবে না। অঃ সাঃ]

সে এক বীভৎস রাত !

কয়েক বছর আগেকার কথা।

এক শনিবারের সন্ধ্যায় আউটরাম ঘাটের পণ্টুনে দোতলার খোলা রেস্তোরায় বসে কফি আর স্যাণ্ডুইচ খাচ্ছিলুম বান্ধবীকে নিয়ে। সামনে গঙ্গায় জোয়ারের জল থই-থই করছে, আকাশে তারা ফুটেছে। ছোট-বড় মাল-বওয়া নৌকো-বোট আর স্টীমারগুলো লঙ্গর করে রয়েছে ধারে-কাছে, আবার ভেসেও চলেছে দু'একটা। দৃশ্য মনোরম।

কিন্তু এখানে এলেই আমার মন কেমন যেন উদাস হয়ে যায়, হু-হু করে। মনে পড়ে যায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের এক ভয়াবহ ঘটনার কথা। সত্যিই আমার জীবনে সে এক ভয়াবহ বীভৎস রাত। এমন রাত কারু জীবনে এসেছে কিনা জানি না, তবু এইটুকুই বলতে পারি—এ-রাত কারু জীবনে যেন না আসে।

বিশু মুখোপাধ্যায়

সেদিন এখানেই নীচের পণ্টুনে এসে বসেছিলুম অনেক রাত পর্যন্ত। সব লোক চলে যাবার পরও বসেছিলুম একেবারে একা। অপেক্ষা করছিলুম আরও রাত বাড়ার জন্য। বাড়িতে একটা চিঠিতে আমার শেষ কথা লিখে রেখে এসেছিলুম। আর ফিরবো না বলেই ছিল আমার সংকল্প। পতিতোদ্ধারিণী তাঁর অঙ্কে যদি স্থান দেন তবেই শান্তি। মনের সে-অবস্থায় শান্তির আর কোন পথ ছিল না আমার কাছে। সুযোগের অপেক্ষায় ঘণ্টা-ক্ষণ-পল যখন গুণছি, মন যখন আবেগে অভিভূত, ঠিক এমনি সময় আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে নাম ধরে ডাকলো মাধুরী। মিষ্টি করেই অবশ্য ডেকেছিল, তবু খুব কাছে-পিঠে বজ্রপাত হলে যেমন হয়, তেমনি হতচকিত হয়ে গিয়েছিলুম আমি।

'এ কি, তুমি!—তুমি এখানে কি করে এত রাত্রে?' প্রশ্ন করেছিলুম আমি।

আমার সে-প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই অপেক্ষাকৃত রূঢ়কণ্ঠে মাধুরী বলেছিল, 'ছিঃ, এই বীরপুরুষ তুমি, একটা সামান্য মেয়ের জন্যে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ! জানো, আত্মহত্যা করা মহাপাপ! তার চেয়ে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেও আমি সান্ত্বনা পাব!—চলো আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা চলবে না—চলো, বাড়ি চলো!'

'তুমি কি করে জানলে আমি এখানে এসেছি?'

আমার সে প্রশ্নও এড়িয়ে গিয়েছিল মাধুরী। বলেছিল, 'বিয়ে না হয় নাই বা হ'ল আমাদের, তা' বলে তোমার জীবনকে আমি এ-ভাবে কিছুতেই নষ্ট হতে দেব না—তোমার বাবা-মা রয়েছেন, ছোট-ছোট ভায়েরা রয়েছে!—এরপর দেখবে কত ভাল-ভাল মেয়ে আসবে তোমার জীবনে, তখন আমার কথা তোমার মনেই পড়বে না!'......

'আবার তুমি এ-ধরনের কথা বলছ মাধুরী? তুমি জানো, তোমাকে একান্ত-ভাবে পাবার জন্যে কি অসাধ্যসাধনই না করেছি আমি।'

'আমিও যে কিছু কম করিনি তা তোমার অজানা নেই। তাছাড়া পরে তুমি আরো জানতে পারবে। কিন্তু এখন থাক সে কথা। চলো, আগে বাড়িতে পেঁ'ছে
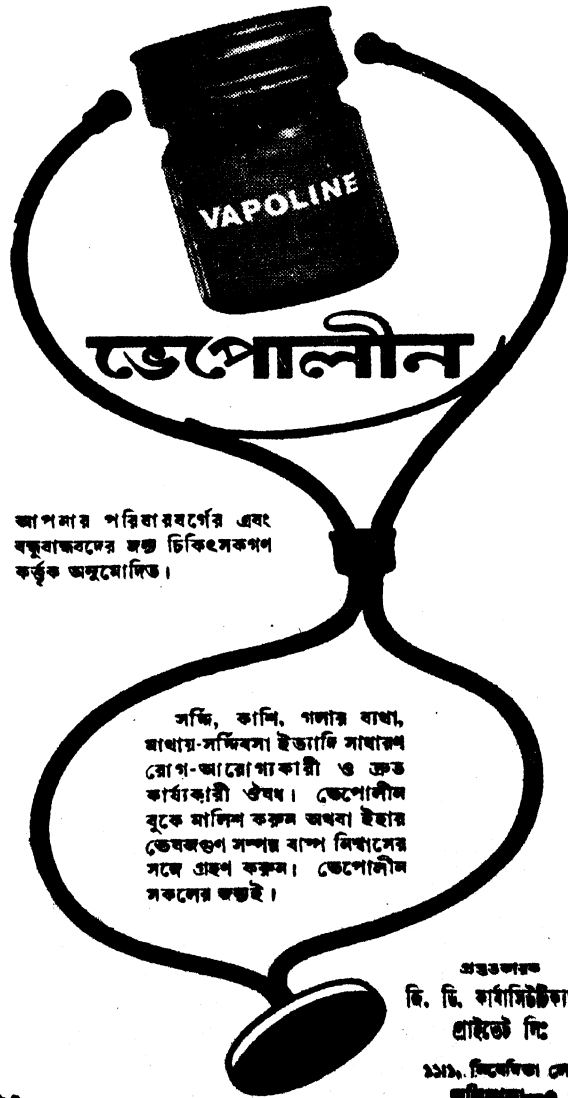
দিয়ে আসি তোমায়—তা না হলে বিশ্বাস নেই!'

'এত কাণ্ডর পরও বিশ্বাস নেই বলছ?'

'বাব্বা, পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস আছে নাকি!—এই এখান থেকে ফিরে গিয়েই তুমি কি করবে তা কেউ জানে না!'

'আমার সম্বন্ধে তুমি অন্ততঃ তা জানো।'

'কই গঙ্গার উপর দাঁড়িয়ে শপথ করো দেখি, জীবনে এমন কাজ আর কখনো করবে না যা আমাকে স্বর্গ থেকেও নরক টেনে আনবে—এমনভাবে জীবনকে কখনো নষ্ট করবে না তুমি? আর'......

'আর বিয়ের কথা বলছ তো?—বিয়ে তোমাকে ছাড়া জীবনে আর কারুকেই কখনো করব না—এটা তুমি নিশ্চিন্ত জেনো!'

'না না, সে কথা বলছি না—আমি বলতে চাইছি, আমার সঙ্গে যখন বিয়ে হচ্ছেই না, তখন তুমি বরং অন্য কোথাও একটা'......

'আর বলতে হবে না তোমায়—তাই যদি হবে তাহলে আমি এখানে আসব কেন?'

'যে উত্তেজনার মাথায় এখন তুমি এখানে এসেছ, সে উত্তেজনা কমে যাবার পর এ-কথা তোমায় ভাবতে বলছি।'

'এ ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।' একটা ট্যাক্সি ডাকলুম আমি।

পণ্টুন থেকে রেল-লাইন পেরিয়ে আমরা তখন বড় রাস্তার উপর এসে পড়েছি। ট্যাক্সিটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, 'মাধুরী, চলো তোমায় আগে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি—রাত অনেক হয়েছে। এতক্ষণ নিশ্চয় বাড়িতে হই-চই পড়ে গেছে!'

মাধুরী হা-হা করে হেসে বল'ল, 'বাপের বাড়িতে কেউই জানে না, আমি সোজা শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি!'

'কি যে বলো!'

'ঠিকই বলছি। মানে, আমি আমাদের ওখান থেকে সোজা তোমাদের ওখানে গিয়েছি, তারপর তোমার ঘরে বালিশের তলায় রাখা চিঠিখানা পড়েই কারুকে কিছু না-বলে সোজা চলে এসেছি এখানে। আমি না এলে তুমি কি ফিরতে?'

ট্যাক্সি ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হু-হু ক'র ছুটে চলেছিল। অদ্ভুত লাগছিল সেদিনের সেই মাধুরীকে। তাকে নিয়ে অনেক ট্যাক্সি চড়েছি, তবু সেদিনের সেই রাত ছিল যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মাদকতায় মোড়া। ছাপ্‌কা-ছাপ্‌কা গ্যাসের আলো এসে পড়ছিল তার মুখখানাতে। অলৌকিক এক মায়া, মোহ ও মাধুরীতে ভরা ঐ মুখ। কয়েক মুহূর্ত অপলকে চেয়েছিলুম তার দিকে। হঠাৎ মাধুরী বলে উঠেছিল, 'বা রে, তুমিই শুধু আমাকে দেখবে—আমাকে একটু দেখতে দেবে না?'

এর উত্তর নেই। তাছাড়া অন্য কথা কওয়ারও আর অবকাশ ছিল না তখন।

ট্যাক্সি বাড়ির কাছ বরাবর এসে পৌঁছে গিয়েছিল।

'তাহলে বাড়ি এসে গেলুম আমরা।' মাধুরী বিমর্ষভাবে বললে।

'তুমিই ফিরিয়ে নিয়ে এলে।' আমি বললুম।

'তা'হলে আমায় এবার ফিরে যেতে দাও।'

'এতো রাত্রে আবার যায় নাকি—কি যে বলো!' উত্তেজনার মুখে কথাটা এভাবে বলে ফেললেও মনে মনে ভয়ও কম হয়নি। সত্যিই মাধুরী যদি ওদের বাড়ি না-ফিরে এখানেই থেকে যেতে চায়!

মাধুরী বললে, 'বলবো আর কি—বাড়িতে এতক্ষণে হয়ত কান্নাকাটি পড়ে গেছে, মা-বাবা হা-হুতাশ করছেন আর পাড়া-পড়শীরা ছ্যা-ছ্যা আরম্ভ করে দিয়েছে—এ অবস্থায়'......

এ অবস্থায় কি কর্তব্য আমিও তখন স্থির করতে না-পেরে চুপ করে ছিলুম।

মাধুরী বললে, মেনিং সম্মতি লক্ষ্মণম্—আমি তাহলে এখন আসি, সম্মতি দাও। তুমি যে আমার পরম গুরু—তোমার সম্মতি না-পেলে আমি কি যেতে পারি! নাবো গাড়ি থেকে। টাকা আমার কাছে আছে, ট্যাক্সির ভাড়া আমিই দিয়ে দেব।

ট্যাক্সি থেকে নেবে পড়েছিলুম আমি। নেবেই জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তা'হলে 'ক'বে কবে আবার দেখা হবে?'

'হবে হবে হবে!' বলতে বলতে ট্যাক্সিটা চলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল—মাধুরীর গলা মিলিয়ে গিয়েছিল!

সে দেখা আর হয়নি। পরের দিনই খবর পেয়েছিলুম, গত রাত্রে সবাই খেয়ে-দেয়ে শোবার পর এগারোটার সময় মাধুরী তার ঘরে আত্মহত্যা করেছে।

ভাবতে-ভাবতে কিছুক্ষণ একেবারে অন্য জগতে চলে গিয়েছিলুম। চমক ভেঙে দিয়ে বান্ধবী বললেন, 'ওপারের দিকে চেয়ে কি এমন উদাসভাবে ভাবছিলে বল তো?'

যা ভাবছিলুম তা আপনাদের কাছে বললেও, তাকে আর কি করে বলি বলুন?
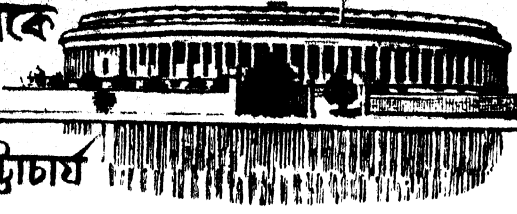
প্রফেসর প্রশান্ত মহালনবীশের চেলা আমি নই, তাই সংখ্যাতত্ত্বের ধার দিয়েও মাড়াই না। জানি, প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ জন্ম নিচ্ছে, প্রেমে পড়ছে এবং মরণকে বরণ করে নিচ্ছে। এদের সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই এবং জানার প্রয়োজনও নেই। কেউ প্রেমে পড়লে তার চোখে সারা পৃথিবীর রং বদলাবে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার পূর্ণাহুতি হিসেবে প্রথম পুত্রের জন্ম তাদের নতুন উন্মাদনা এনে দেবে এবং একজনের মৃত্যু হয়ত সারা পরিবারকে শোকাচ্ছন্ন করে দেবে। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ভাবে এর প্রত্যেকটির মূল্য অসীম; কিন্তু এই বিরাট সমাজ-সংসারের তাতে কিছু আসে যায় না।

কথায় আছে, ভাগ্যবানের (বা ভাগ্যবতীর) বোঝা ভগবান বয়। পরম-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বা ভগবান শ্রীচৈতন্যের 'কনটেমপোরারি' আমি নই; তাই এই প্রবাদবাক্যের সত্যতার পক্ষে কোন ঘটনার নজীর দেওয়া আমার সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, এমন নজীর জানা আছে যখন একজনের নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আর পাঁচজনের চিন্তার (বা আলোচনার) শেষ থাকে না। পলাশী গ্রামের শ্যামাপদ পণ্ডিতের কাছে শুনেছি শাস্ত্রে লেখা আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। সুতরাং বিবাহিতা মহিলার সন্তান হওয়াটা শাস্ত্রাজ্ঞা পালন বই আর কিছু নয় এবং এ নিয়ে অন্যের চিন্তা (বা দুশ্চিন্তা) হওয়ার কোন যুক্তি নেই। 'লজিক' বা ন্যায়শাস্ত্র কনসাল্ট করে জীবনে সব কাজ করা সম্ভব তো দূরের কথা, কল্পনারও অগোচর। তাই মানুষ বহু যুক্তিহীন কাজ করে এবং সে কারণেই জীবন হয়ে ওঠে জীবন্ত নাটক।

এত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা করে যে কথা বলতে চাই, সেটি বিশেষ কিছুই নয়; অন্ততঃ তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তবে নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসেবে অপর পাঁচজনের আগ্রহ উপেক্ষা করতে পারি না বলেই লিখছি। পৃথিবীর কোটি কোটি মহিলার মত আমাদের এক কেন্দ্রীয় ডেপুটি মিনিষ্টার সম্প্রতি একটি সন্তানের জননী হয়েছেন। ব্যাপারটি এমন কিছু গুরুতর নয়; কিন্তু একে ভি-আই-পি তার উপর পার্লামেন্টের গ্লামার কুইন! সুতরাং সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানায় 'টেমপেষ্ট ইন্ এ টি পট' উঠে গেল এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে।

যাকেই জিজ্ঞেস করি 'কিয়া খবর', সেই বলে খবর আর কই। তারপরই কানে কানে ফিস ফিস করে বলেন, খবর তো ঐ একটাই। কিছুদিন ধরে পার্লামেণ্টে যেখানেই তাকাই না কেন, সেখানেই দেখি ক'জন মিলে কি যেন ফিসফিস করে আলোচনা করছেন। আমাদের মত ছেলে-ছোকরাদের যোগ-দানে কোন আপত্তি নেই; বরং কিছু কন্ট্রিবিউট করলে সবাই খুশীতে গদগদ হয়ে পড়েন। এসব আলো-চনায় বয়ঃবৃদ্ধ অথচ রসিক এমন বহু এম-পি'ও যোগদান করেন। পার্লামেণ্টের এবারের বাজেট সেসন বড়ই 'ডাল' চলছে। কৃষ্ণমেনন যতদিন মন্ত্রী ছিলেন, ততদিন তাঁর নিন্দা করেই বহু এম-পি দেশসেবা করছিলেন এবং তাঁকে নিয়েই সেন্ট্রাল হল গুলজার হতো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে কৃষ্ণ মেননের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু পলিটিসিয়ান ও করস্পনডেণ্টও বেকার হয়ে পড়েছেন। হাতের কাছে আর ছিল কে. ডি. মালব্য। কিন্তু যেই বোঝা গেল তিনি ইলেক্শন ফাণ্ডের জন্য কলকাতার ব্যবসাদারটির কাছ থেকে টাকা উঠিয়েছিলেন, অমনি বিপ্লবী কংগ্রেসী এম-পি'দের সব উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেল। মনে হয় ব্যবসাদারের কাছ থেকে ইলেকশন ফাণ্ডের জন্য চাঁদা জোগাড় করেননি, এমন এম-পি'র সংখ্যা বিরল। তাই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' করে মালব্য-অধ্যায় শেষ হলো। সুতরাং আলোচনার একমাত্র বিষয় রইল 'গ্লামার-কুইন'এর সন্তান হওয়া।

ফিল্ম-ষ্টারদের মত পলিটিসিয়ান-দেরও 'বক্স-অফিস' এবং 'ফ্যান' থাকে। যেমন ধরুন নেহরু। রাজনীতির ক্ষেত্রে এঁর সমতুল্য 'ষ্টার' আর কেউ নেই এবং এঁর 'ফ্যান'এর সংখ্যা কোটি কোটি। পার্লামেণ্টেও এর পরিচয় পাওয়া যায়; যেদিন নেহরু নেই, সেদিন হাউস ফাঁকা, গ্যালারী ফাঁকা। বক্স-অফিস ও ফ্যান-এর দিক থেকে আমাদের আলোচ্য ডেপুটি মিনিষ্টার-সাহেবা খুব টপ পজিশনের ষ্টার। পার্লামেণ্টে 'সিক্রেট পোল' নিলে হয়ত দেখা যাবে এঁর জনপ্রিয়তা নেহরু ও শাস্ত্রীজির পরেই।

বয়স চল্লিশের ঘরে হলে কি হবে, দেখলে মনে হবে যেন চঞ্চল। তারপর ঠোঁটে হাসি, চোখে কাজল। প্রৌঢ় ও বুড়ো এম-পি'দের মনে দোলা দেবার জন্য আর কি চাই বলুন! রং'এর উপর রসান চড়াবার জন্য আছে আধা-কাঁচা আধা-পাকা কিছু করসপনডেণ্ট।

—'ইউ লুক ওয়াণ্ডারফুল টুডে।' মন খুলে কথা বলার সুখ্যাতি আছে ভদ্রমহিলার। তাই উত্তর শুনি, 'কেন অন্য দিন কি ভাল লাগে না?'

মাঝখান থেকে ফোড়ন কেটে বল্লাম: 'কট্কি ব্লাউজ আর কাঞ্জিভরম শাড়ীর চমৎকার কম্বিনেশন করেছেন কিন্তু আজ।'

'কেন, ইজ টেলারিং ভেরি ব্যাড?'
ইঙ্গিত বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই মজায় আর আনন্দে হেসে ফেলি আমরা সবাই।

একদিন সেণ্ট্রাল হলের এক কোণে দেখি বেশ ক'জন ঘিরে রেখেছেন গ্লামার-কুইনকে। ভিড় ঠেলে যখন কাছে এলাম, তখন চিট্-চ্যাট্ প্রায় শেষ।

—'আর দেরী করব না, এখনও লাঞ্চ হয়নি।' পাশের একজন বয়স্কা মহিলাকে দেখিয়ে বল্লেন, 'আজ আর নয়; আপনাদের সঙ্গে বক্ বক্ করার জন্য তো আর ছোট বোনকে না খাইয়ে রাখতে পারি না।

হা কপাল! উনি ও'র ছোট বোন; দেখে তো মনে হয় ঠিক উল্টো।
ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলেই ফেল্লেন, 'দেখে তো মনে হয় আপনিই ও'র ছোট বোন।'

—'দেহের মাধুর্য বজায় রাখার ক্ষমতা সবার থাকে না; আমার আছে, ও'র নেই।'

চটপট উত্তর দিয়ে চলে গেলেন ডেপুটি মিনিষ্টার-সাহেবা।

প্রেস গ্যালারী থেকে নজরে পড়ে হাউসের মধ্যেও কম মজা হয় না। সব কথা লেখা সম্ভব নয় আর 'স্পেস'ও নেই। তবে জেনে রাখুন, দুষ্টুমি শুধু স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাই জানে না; আমাদের 'জুনিয়র' মিনিষ্টার ও এম-পি'রাও কম নয়।

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃতে'র 'জানাতে পারেন' বিভাগের মাধ্যমে নিম্নের প্রশ্ন কয়টির উত্তর আশা করি।

গত এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাষ্ট্রে (১) নারী প্রধানমন্ত্রী, (২) নারী মুখ্যমন্ত্রী, (৩) নারী রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট, (৪) নারী রাষ্ট্রদূত, (৫) নারী গভর্ণর, (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ভাইস্‌চ্যান্সেলার, (৭) নারী সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন এবং হয়েছেন?

গজেন্দ্রনাথ পাল,
চক্রতীর্থ, পুরী।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। পত্রিকার 'জানাতে পারেন' বিভাগটি অতি চমৎকার। ঐ বিভাগটি আমি খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। আমি ঐ বিভাগটি মারফৎ কয়েকটি প্রশ্ন পাঠকবৃন্দের সামনে উপস্থিত করিলাম।

১। পৃথিবীতে প্রথম মেরুদন্ডী প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে কখন এবং তাহা কোন প্রাণী?

২। একটি ইতিহাসে পড়িলাম "এখনও পৃথিবীতে দুইটা স্তন্যপায়ী জীব আছে যাহাদের প্রকৃত স্তন নাই, যদিও তারা তাদের চামড়ার তলা হইতে নিঃসৃত এক ধরণের পুষ্টিকর রস দিয়া তাদের বাচ্চার পুষ্টিসাধন করে ইহারা হইতেছে হাঁস-ঠোঁট প্লাটিপাস (duck-billed platypus) আর একিডনা (echidna)।"

যদি এই ধরনের জীব থাকে তাহা হইলে ইহাদিগকে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়?

৩। ধূমকেতু আকাশে নির্দিষ্ট সময়ে দৃষ্ট হয় না কেন?

আব্দুর রসিদ
গ্রাম, পোঃ আউসগ্রাম
জেলা—বর্ধমান

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত' পত্রিকার ২২শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় "জানাতে পারেন" বিভাগে শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাসের প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

'মসলিন' কাপড়, কলকাতায় যাদুঘরে বা ভারতে অন্য কোন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে কিনা আমার জানা নাই। তবে ঢাকা শহরের ওয়ারি অঞ্চল বলদা গার্ডেনের যাদুঘরে আছে। আমি নিজে ১৯৫৯ সালে ওই যাদুঘরে ২০০ বছরের পুরাতন একখণ্ড 'মসলিন' দেখে এসেছি।
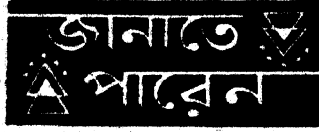
আর ইতিহাস থেকে জানতে পারেন; W. W. Hunter—A Statistical Account of Bengal. ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়— বাঙালীর ইতিহাস, Dacca University — History of Bengal. যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস। সম্ভবতঃ আরও বহু ঐতিহাসিকের নানান গ্রন্থ আছে।

সুফী আবদুল আল্লাম
ই।কে।১।৩৭ দয়ানন্দ রোড,
দুর্গাপুর—৪,
জেলা—বর্ধমান।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৯শে মার্চ প্রকাশিত সাধনা সেন লিখিত প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, ছদ্মনামী সাহিত্যিক জরাসন্ধের আসল নাম শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী।

শান্তিগোপাল চক্রবর্তী
৬১, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

গত ২রা নভেম্বর তারিখেই প্রকাশিত শ্রীমদনচন্দ্র খান্না মহাশয়ের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর :—

১। আমাদের দেশে ব্যবহৃত প্রাচীন ঘড়িসমূহের ডায়্যালে ((Dial) I, II, III, IV প্রভৃতি রোমান সংখ্যার ব্যবহারে ইহা বুঝায় না যে রোমানগণই এদেশে সর্বপ্রথম ঘড়ি আমদানি করিয়াছিল। বস্তুতঃ যে যুগে মধ্য ইউরোপে যান্ত্রিক ঘড়ির আবিষ্কার হয়, সে যুগে লাটিন ভাষার (রোমান ভাষা) দাপট সারা ইউরোপে বিদ্যমান ছিল। শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় লাটিন ভাষায় কথাবার্তা বলিতে গৌরব বোধ করিতেন। প্রথম আবিষ্কারের যুগে এবং তৎপরেও বহুকালাবধি ঘড়ি মহার্ঘ, এবং সৌখীন ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই ব্যবহারযোগ্য জিনিস ছিল। এজন্যই ঘড়ির ডায়্যালে রোমান সংখ্যা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এদেশে বাণিজ্যরত ইংরেজ, পর্তুগীজ, জার্মান, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইতালীয়গণের মধ্যে কোন জাতি সর্বপ্রথম ঘড়ি আমদানি করিয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব এদেশে কায়েম হওয়ার পরই ঘড়ির ব্যবহার এবং ব্যবসায়ের প্রসার ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

৩। কোন কিছুর উপর বেশী জোর দিতে হইতে একার্থ বা সমার্থবোধক শব্দ পরপর ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এজন্য, কেবলমাত্র রাজা-মহারাজাদের বেলায়ই নহে পূজনীয় বা অতিপূজনীয় ও সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের নামের পূর্বেও "শ্রীল শ্রীযুক্ত" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যে অতিশয় মানী এবং সম্মানার্হ লোক, এ কথাই বুঝায়। আমরা স্কুলে পড়িবার সময় হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের নিকট লিখিত দরখাস্তসমূহের শিরোনামায় শ্রীল শ্রীযুক্ত পাঠই লিখিতাম। সাধু-মহাত্মাগণের কাহারও কাহারও নামের আগে "১০৮ শ্রী" শব্দটিও দেখা দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজারা স্ব স্ব নামের পূর্বে "৫ শ্রী" ব্যবহার করিতেন। ইহাতে কোন ভুল হয় না।

৪। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো বিশ্বধর্ম সভায় "The brothers and sisters of America" এরূপ সম্ভাষণ করেন নাই, করিয়াছিলেন, "Sisters and Brothers of America" বলিয়া। পাশ্চাত্য সমাজে মহিলার সম্মান পুরুষ অপেক্ষা অধিক বলিয়াই স্বামীজি প্রথমে "Sister" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ স্বামীজি এই সম্ভাষণ "প্রচার" করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা ভুল হইবে। পাশ্চাত্য দেশে "Ladies and Gentlemen" এরূপ আর একটি সম্ভাষণ-রীতি প্রচলিত আছে। তবে স্বামীজির সম্ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণ নূতন এবং চমকপ্রদ ধরণের। সভাপতি শব্দটি সংস্কৃত, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এতদ্দেশে আগমনের বহুপূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় চলিত ছিল। মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গ্রামপতি, কুলপতি প্রভৃতি পতি-সমন্বিত বহু শব্দ দেখা যায়। সুতরাং বাংলা ভাষায় "মাননীয় সভাপতি মহাশয়" ইত্যাদি সম্ভাষণ বাক্য ইংরেজ আমলের Mr. President-এর অনুকরণে চলিত হইয়াছে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই।

৬। ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তান (পশ্চিম পাকিস্তান নহে) ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া জানি না। তবে বিদেশীভাষা শিক্ষা-দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোথাও কোথাও বাংলা ভাষার চর্চা হয় বলিয়া জানা যায়, অবশ্য তাহাও প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের কল্যাণেই। লন্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে বলিয়া শুনিয়াছি। বার্লিনে ও ক্যাম্ব্রিজে বর্তমানে আছে কিনা, সঠিক জানি না।

অমিয়কুমার চক্রবর্তী
১৬, গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন,
কলিকাতা—৯।

মন্দ মধুর হেসে

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

।। লণ্ডন ।।

বলে দেখার দরকার হয় না। দেখলেই চেনা যায়। একেবারে টিপটপ। কালো রঙের স্যুট। টাইট ফিটিং। ভেতরে ওয়েস্ট কোট। সাদা স্টিফ কলারের সার্ট। গাঢ় রঙের টাই। কালো জুতোয় পালিশের জৌলুষ। মাথায় বোলার হ্যাট। হাতে ছাতা। সংযত পদক্ষেপ। মুখে আভিজাত্যের ছাপ। এ নিশ্চয় টাইমসের পাঠক। অভাবে গ্রাহক।

ছাতার কথা শুনে অনেকে হয়ত অস্বস্তি বোধ করছেন। ভাবছেন ওটা আবার কেন। তবে আমায় জানাতে হয়, ও নাহলে অচল। বিলেতে ছাতা বিনা ছত্রপতি হয় না—ছাতা আভিজাত্যের মানদণ্ড। কেউ কেউ বলে ছাতার পেছনে ইটন বা হ্যারো প্রভৃতি পাবলিক স্কুলে পড়ার ছাপ। বিলেতের পাবলিক স্কুলে কিন্তু পাবলিকের প্রবেশাধিকার নেই—অধিকার মানে অর্থনৈতিক সামর্থ্য। এসব স্কুলের প্রধান পাঠ ক্যাপিটালিসম বা কমিউনিসম নয়—ম্যানারিসম। যার বিষয়-বস্তু কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রের পরিপূরক নয় বরং বলা যায় তার বিপরীত প্রতিজ্ঞা। মুই কোন ছার পরিচয়ে বৈষ্ণবের আত্ম-তৃপ্তি অন্যজনের আত্মম্মন্যতায় আসক্তি। এরা 'E' টাইপ নামেও পরিচিত। একজন মধ্যবিত্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'E' বলতে কি এজুকেটেড বোঝায়। তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। যেন সালফিউরিক অ্যাসিডে জল পড়ল। ভাবলাম বুঝি বলবে ইডিয়ট।

জাতে ইংরেজ। ফস করে বেফাঁস কথা বলে না। উত্তর দেয় 'E' হল Established। একটু থেমে আবার শুরু করে, ঠেলার জোর থাকলে এঁদে-পেঁদিও পীরপয়গম্বর হতে পারে। আমাদের মত সংগ্রাম করে যদি মানুষ হতে হত বাছাধনরা বুঝত কত ধানে কত চাল।

এই প্রতিষ্ঠিত সমাজের আদবই আলাদা। পথে পরিচিতর সঙ্গে দেখা হলে একটু নীচু হয়ে অভিবাদন জানায়, হাউ-ডু-ইউ-ডু। আবার চলে নিজের কাজে। এরা আঁটসাট পোষাক পরে। চলনে বলনে আঁটসাট, এদের জীবনটাই যেন আষ্টেপৃষ্ঠে এটিকেট দিয়ে বাঁধা। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। কথা প্রসঙ্গে এ'রাও হাসেন কিন্তু অতি পরিমিত। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এ হাসি তো! না হাসির আধারে অবজ্ঞা। আর যাই হোক এই সূত্র ধরে কোন অর্থ উদ্ধার করা যায় না। ধীমানদের জন্যে টাইমস কাগজ। সেখানে অট্টহাস্যের হট্টগোল খুঁজতে গেলে হাস্যাস্পদ হতে হবে। টাইমস শুধু সংযত নয়, সদা সন্ত্রস্ত এই বুঝি অভাজনকে বেশী মর্যাদা দিয়ে ফেলল। তাই জন্মমৃত্যু বিবাহের বিজ্ঞাপন এর প্রস্তাবনা। এমন কি ভেতরেও পাতাভর্তি ব্যানার লাইন এ কাগজে অচল। যে কথা বলছিলাম—তাহলে সারা কাগজটা কি বাংলা পাঁচের মত মুখ করে পড়তে হবে। ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেণ্ট কোথাও একটু ফাঁকা নেই হাসি বেরোবার। শ্রীশ্রীদুর্গাসহায় থেকে ইতি বশংবদ পর্যন্ত গাম্ভীর্যের পালিশ চড়ান।

না, টাইমসের পাঠকরা অতটা দুর্ভাগা নয়। ভারী ভারী সংবাদ আর সম্পাদকীয় পড়ে ক্লান্ত হলে গা মেলে বসার জন্যে আছে কনিষ্ঠ সম্পাদকীয়। তাতে হাস্য-রস আছে, কিন্তু হৈ-হুল্লোড় নেই। আরও বড় কথা রাজনীতির তর্জা নেই, শ্লেষ নেই, নীতিবাক্য নেই, এমনকি একজনকে হুল ফুটিয়ে অন্যকে হাসাবার চেষ্টা নেই। তবে কি ভাঁড়িয়ে এর তরলতা। কিছু কথার কারচুপি, কিছু মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা, কিছু বা সাময়িক ছোট্ট ঘটনা। সামান্য বিষয় নিয়ে সরস বর্ণনা। পড়তে পড়তে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে। মনে হয় বাঃ বেশ লিখেছে তো!

সংবাদ-সাহিত্যের একটা নীতি, কোন ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ থাকলে তার একটু পরিচয় জুড়ে দেওয়া। লেখাটা যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। পাঠককে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে দেওয়া সাংবাদিকদের মনঃপুত নয়। টাইমসের কনিষ্ঠ সম্পাদকীয়তে পেলাম তার ব্যতিক্রম। বিভিন্ন নামের ছড়াছড়ি কিন্তু গোত্রের সন্ধান নেই। সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, দার্শনিক, চিত্রতারকা এমনকি সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের প্রতিনিয়ত দেখা যায়। হানস্ খ্রিশ্চিয়ান এণ্ডারসনের 'রাজ-কুমার'রাও এই লেখকদের প্রিয়পাত্র। স্বজাতি নিয়ে ইংরেজদের খুব অভিমান। ডেনমার্কের রূপকথায় লেখককে কি করে এত আপন করে নিল তাই ভাবি। লেখার কোন চরিত্রই অজ্ঞাত-কুলশীল নয়। তবে পাঠক সব সময় কুলকিনারা করতে পারেন কি? দেশের সাহিত্যেই আমার দখল নেই। বিদেশের সাহিত্য অসীম সমুদ্র। তাই পড়তে পড়তে অনেক সময় বৈচিত্র্যময় নামা-বলিতে ধাক্কা খাই। মানি এ আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতা তবু মনে হয়, টাইমসের সব পাঠক কি সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম না এ আভিজাত্য প্রকাশের এক টেকনিক। লেখক জুড়ে দিল দুটো স্বল্প-পরিচিত নাম পাঠক না-বুঝে বোঝার ভান করল। টাইমস পত্রিকার পক্ষ থেকে জানায়—তাদের পাঠকগোষ্ঠী 'বিদ্বান এবং বিচক্ষণ' সটীকা সংবাদের প্রয়োজন হয় না। বিনা বিশ্লেষণে উপভোগ করতে পারে। তথাস্তু! হয়ত বা তাই হবে! বাল্মীকি আর বেদব্যাসকে আমরা এড়িয়ে চলি। কাশীরামদাস বহু পরিশ্রম করে সহজ সরল করে বলে গেছেন, কিন্তু তা শুনে পুণ্যবান হবার আগ্রহও আমাদের সীমাবদ্ধ! তাই বলে সাহিত্য স্থবির নয়। রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনার সেখানে ঘনঘটা। এবং তা উপভোগ করার জন্যে টীকা-টিপ্পনী লাগে না। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী কি সুয়োরাণী দুয়োরাণীর পরিচয় দেওয়া আমাদের কাছে অবান্তর। এইসব চরিত্র শাশ্বত সত্য হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে গাঁথা।

টাইমস-এর রস সম্পাদকীয়র বিষয়-বস্তু বিচিত্র এবং বিভিন্ন। লেখক একজন নয় অনেক। তবে কতজন জিজ্ঞাসা করবেন না—এ টাইমস-এর ট্রেড সিক্রেট। ব্যক্তি-গতভাবে সংখ্যাতত্ত্বে আগ্রহ আমার কম। সুতরাং সার বস্তুতে আসা যাক।

টাইমস-এর ব্যক্তিগত কলমে এক ভর-ভাড়ায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। তাই নিয়ে

রূপ রচনা। ভদ্রলোক তাঁর বাংলোর কেমন মহিলাকে ভাড়া দিতে চান তার ওপর টীকা-টিপ্পনী। সুন্দরী, রুচিমার্জিত কিন্তু একজন নামকরা চিত্রতারকার মত হলে চলবে না। আমেরিকার কোন ভদ্রমহিলা বিশ্রামবিহীন কথাবলার বিশ্ব-রেকর্ড করেন। এই সংবাদের ওপর ভিত্তি ক'র 'ম্যারাথন' শিরোনামায় এক লেখা বেরোয়। নিউজিল্যান্ড থেকে প্রতিবাদ এসেছে, অবিরাম ধারায় কথাস্রোতে কোন নিউজিল্যান্ডবাসীর কৃতিত্ব বেশী। আয়ার্ল্যান্ড জানিয়েছে তার প্রতি অবিচারের এ আর একটা নমুনা।

কয়েক বছর আগে এক আইরিশ মহিলা ১৩৩ ঘণ্টা অনর্গল কথা ব'ল গেছেন। বেচারা স্বামী! কথার পাহাড় ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক। সিসিলির কোন লবঙ্গলতিকা লিকলিকে আঙুল দিয়ে টাইপ রাইটিং-এ ম্যারাথন রেকর্ড করেছেন। ফ্রান্সে এক রেস্টুরেন্টের বয় ২ মিনিট ২১ সেকেন্ডে একশটা শামুক ছাড়িয়ে বিশ্ববিজয়ী হয়েছেন। কানাডার পুরুষোত্তম ২৩ দিন ৫ ঘণ্টা বাঁশের চুড়োয় বসে বিশ্ব'ক চমক লাগিয়েছেন। বোস্টনের এক ইলেকট্রিশিয়ান ১৩২ ঘণ্টা পিয়ানো বাজিয়েছেন। হাতে জুতো পরে পা আকাশে তুলে কয়েকদিন হেঁটে চলা তাজ্জব ব্যাপার। সে পথে পথিকৃত অস্ট্রেলিয়ার লোক। প্রচারসর্বস্ব যুগেও বসুন্ধরা বীরপ্রসূ!

এবার শুনুন "ভদ্রলোকের মত কাজে"র কথা। এক যুবতী হবু-স্বামীর পরিচয় করিয়ে দেন—'মিস্টার স্মিথ। উনি কাজ ক'রেন না। মানে...মানে

—'মানে কি বেকার?'

—'বেকার কেন হবেন? লেখক।' সুর গর্ব আর শ্রদ্ধায় ভরা।

মনে পড়ে কিপস-এর কথা। তার সাহিত্যের কোন পোষাকবিক্রেতা বলেছিলেন—'লেখকদের কি মজা। দু'-একঘণ্টা লেখো, ব্যাস সারা দিনের কাজ সারা। এর উত্তরে বলতে হয়, সে জানে না, কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের খেদ একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন—ভ্রাতৃবর সারা সকালটা নষ্ট করল Cuckoo কথাটার epitheh খোঁজার জন্যে। কঘণ্টা কলম চলল, সেইটেই লোকে হিসেবের খাতায় তুলল, কিন্তু পরের পৃষ্ঠা লেখার জন্যে কতঘণ্টা মাথা ঘামাতে হল সে হিসেবটা কে রাখবে।

মেজর পেনডেনিস ভাগনের নভেল ছাপা হলে হিসেব করতে বসেন। বইখানা এত পৃষ্ঠার লিখতে কত সময় লাগ'ত পারে? এক মাস। তাহলে বছরে বারোটা। একটা বইতে যদি উপায় হয় এত টাকা...। তরুণীটি ভাবী স্বামীর লেখা নিয়ে ব্যবসায়ীর মত টাকার হিসেব করেছে কিনা বলা মুস্কিল তবে দুদিন বাদে স্বামীদেবতার ওপর ম'তের পরিবর্তন হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লেখক হয়ত পড়ার ঘরে বসে ডুবে আছেন সাময়িক সাহিত্যে কিম্বা ভাবছেন কোন্ শব্দটা জুতসই হবে রাজনৈতিক প্রবন্ধের মতামতে। স্ত্রী হাজির। সাংসারিক সমস্যা ত বসে থাকবে না। লেখকের চোখে মুখে ফুটে উঠবে অস্বস্তি। বলবে—আমি একটু ব্যস্ত।

উত্তর শুনে শ্রীমতী শ্রীহারা হন। সাদা মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। কান দুটো গরম। এ অপমানের প্রতিকার অজানা নয়।

ভাবছি লেখকের রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে নিশ্চয় জুড়ে দিতেন,

'কহিল কবির স্ত্রী,
রাশি রাশি মিল করিয়াছ জ'ড়ো
রচিতেছ বসি পুঁথি বড় বড়
মাথার উপ'রে বাড়ি পড় পড়
তার খোঁজ রাখো কি।"

একটা কথা বলে নেই। যদিও বলেছি কনিষ্ঠ সম্পাদকীয় আসলে এর পরিচয় 'চতুর্থ সম্পাদকীয়'। কখন তৃতীয়, কখন পঞ্চম বা ষষ্ঠস্থানে ওর আবির্ভাব তবু নামটা চতুর্থ কেন। ব্যাখ্যা করতে হয়। ধরুন পঞ্চম কন্যার নাম রাখা হল 'ইতি'। পরে আবার মেয়ে হল তার নাম পুনশ্চ রাখা যেতে পারে। তবে শেষকন্যা না হলেও শ্রীপঞ্চমীর নাম 'ইতিই' থাকল। এ অনেকটা তাই। এই হাল্কা সম্পাদকীয় প্রথম ছাপা হয় ১৯১৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী। তখন তিনটে গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় লেখা হত। তারপর থাকত এই তরলিকা। স্থান পরিবর্তন হয়েছে তবে নাম পাল্টান হয়নি।

প্রথম দিনের বিষয়বস্তু ছিল ভবিষ্যতের রঙীন ছবি এ'কেই আমাদের

পরম আনন্দ। তাহলে জীবনটা কি আশার মরীচিকা। রঙীন কল্পনা ভাবী কালের হলেও অতীতের স্মৃতি দিয়ে গড়া। আমরা স্বর্গের ছবি এ'কেছি পরম আনন্দময় মুহূর্তের অভিজ্ঞতা দিয়ে। স্মৃতিই আনন্দ। বর্তমানের ছোটখাট দুঃখ ভুলিয়ে দেয় তৃপ্তির সন্ধান। স্মৃতি এবং স্বপ্ন যদিও অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়া তার উপভোগ কিন্তু বর্তমানে। যদি কেউ বলে দুটোই প্রকৃতির মায়া তাহলে বলব তারা জানে না ওই আনন্দের সদ্ব্যবহার করতে। লেখাটা অনেকটা হাল্কা রসের দার্শনিক আলোচনা।

এদেশের অনেক আধুনিক অফিস-বাড়ীর পুরো দেওয়াল কাচের। বাড়ীতে বড় বড় কাচের জানালা—আলো আসবে অথচ ঠাণ্ডা হাওয়া আসবে না। কেবল পরিষ্কার রাখা দায়। লেখার বিষয়বস্তু তাই।

"কাচঘর"

কাউকে এগিয়ে আসতে হয় একটা কমিশন বসাবার দাবী নিয়ে। অনুসন্ধান করতে হবে জানলা পরিষ্কারের খুঁটি-নাটি সমস্যা। সাধারণ মানুষের কাছে ও ব্যবসায়ের রীতিনীতি যেন একটা হেঁয়ালি। অর্থনৈতিক জড়াপটাকির যুগে খুব কম ব্যবসা আছে যাতে কুটকচালী নেই। এ ব্যবসা সে বিষয়ে একেবারে জলবৎ তরলং। স্বাধীন ব্যবসা ইচ্ছে হলে যে কেউ খুলে বসতে পারে। মূলধনের ধান্ধায় ঘুরতে হবে না। রেজিস্ট্রেশনের রেওয়াজ নেই। খাতাপত্র খামকা জঞ্জাল। লাভের অঙ্ক হয়ত খুব বড় নয় তবে নগণ্য বলা যায় না। ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না। বড় কথা ধমকাবার মনিব নেই। কয়েদীর মত চারদিকে দেওয়াল ঘেরা ঘরে বসে কাজ করতে হয় না। শিস দিতে দিতে মনের আনন্দে কাজ করে যাও। একাধারে উপার্জন উপরন্তু সমাজসেবা। তবু একাজে লোকের উদ্দীপনা আছে বলে মনে হয় না। যারা কোনরকমে বাঁচিয়ে রেখেছে তারাও যেন সুযোগ খুঁজছে ছাড়বার। এক সুপ্রভাতে হাসি-খুশি মুখে হাজির হয়। সাইকেলে বাঁধা মই, হাতে বালতি। বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করে, সে কি সেবায় লাগতে পারে। তার সেদিনকার মেজাজ অনুযায়ী হয় ধীরে না হয় বিদ্যুৎগতিতে কাজ করে। শেষ হলে দক্ষিণা নেয়। পক্ষকাল পরে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়—বলা বাহুল্য পুনরাগমন আর হয় না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে যায়। কাচ স্বচ্ছ থেকে ঘোলাটে হয়। ঘর তমসাচ্ছন্ন হতে থাকে। বাড়ীর কাউকে তোয়াজ করে রাজি করাতে হয়। মই খাটিয়ে বালতি হাতে ওষুধ গেলার মত অনিচ্ছায় কাজ সারে। কিন্তু
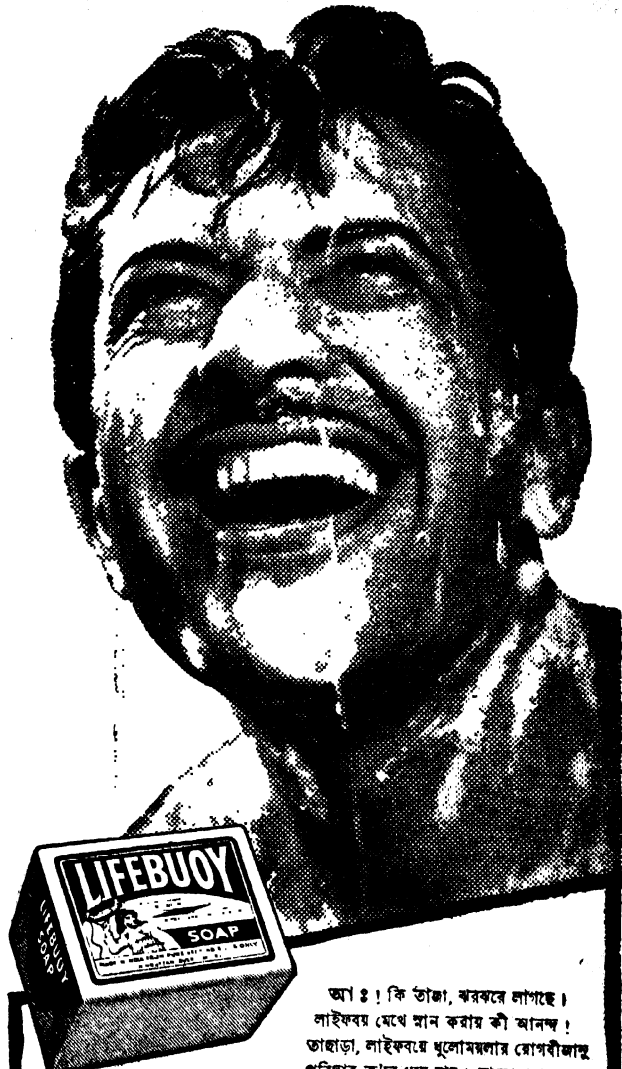
দিন বাদে অন্য একজন হাজির হয়। জানলা পরিষ্কার করতে চায়। বেশ ভালো কথা। তারপর পুনরাবৃত্তি-প্রতিশ্রুতি এবং শ্রীমুখের অদর্শন।

সুতরাং প্রয়োজন কমিশনের। বাতায়ন-প্রক্ষালন অনুসন্ধান সংঘ। যাঁরা খোঁজ নেবেন বড় বড় অফিসে। সেখানে দেওয়াল বলতে কাচের পার্টিশন। কোন হিসেবী বধূরাণী এই বড় বড় কাচঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়ত ভাবে। এরা কি করে জানলা এমন পরিষ্কার রাখে। কদিন অন্তর পরিষ্কার করে—কত পয়সা না জানি খরচ করে? কোন মহাকার প্রতিষ্ঠান কি দয়া করে পুরবালাকে জানিয়ে দেবেন খরচের অঙ্কটা। তুলনা করে দেখতে পারে নিজের খরচের সংগে। পরমুহূর্তে ভদ্রমহিলার মনে হয় ঝানু ব্যবসাদারই তাদের দুর্ভোগের জন্যে দায়ী। একদল বিরাট বিরাট কাচের ঘরে অফিস ফেঁদেছে আর এক দল এই ঘর পরিষ্কার রাখার চুক্তি করেছে—এই দুই মহাপ্রভু মিলে জানলা পরিষ্কার করার লোকদের ভাগিয়ে আনছে শহরতলী থেকে। লোভ দেখাচ্ছে —নিয়মিত মাইনে, অসুখ হলে ছুটি, বেড়াবার ছুটিতে পয়সা, ক্যানটিনে সস্তা খাবার আরও কত কি?

অনুসন্ধান সংঘের আরও ভাবা উচিত যদি কখনও কর্মচারীরা দীর্ঘ দিন ধরে ধর্মঘট করে, যদি ভাবে এই এক-ঘেঁয়েমি বিরক্তিকর কাজ আর করবে না। একে একে সবাই কাজ ছেড়ে দিতে থাকে। কি অবস্থা হবে। চোখের সামনে ভাসছে, শহরের ঝকঝকে জানলাগুলো নোংরা হচ্ছে, তারপর ঘোলাটে শেষে তমসাবৃত। অফিসের কর্তার মুখভার। টাইপিস্ট আর কেরানীকুল সূর্যের মুখ না দেখে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। তখন অফিসের চলতি হাসির কথা হবে নেই কাজ ত খই বাছ অর্থাৎ জানলা পরিষ্কার কর। প্রসংগটা আপতদৃষ্টিতে তুচ্ছ বা অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু কাচের ঘরে বাস করলে সাবধানে থাকা উচিত।

আমাকে ধরাশায়ী করেছে অন্যজনে। 'দি টাইমস' পত্রিকায় চিঠি ছাপা হল উইন্ডো-ক্লিনারের। ভাবছিলাম কাগজের আভিজাত্য ধুলোর ধরণীতে মিশে যায়নি ত? Top People যার পাঠক, সেখানে লেখকের কল্কে পেল কিনা নগণ্য ঝাড়ুদার। এখানকার সমাজের আর একটা দিক আছে। ইংলন্ড বিশেষজ্ঞের দেশ। বিদ্যের দৌড় বা সাধারণ জ্ঞান ত সেরা কথা নয়, নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কি অভিজ্ঞতা তাই বিবেচ্য। ক বলতে কপাল ফাটুক, নিখুঁত করাত চালাতে পারে ত? সে বিশেষজ্ঞ, গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের চেয়ে তার মাইনে বেশী। সুতরাং পদমর্যাদা যাই-হোক, বিশেষজ্ঞের দাবী মানতে হবে বৈকি।

আসল কথায় আসি। উইন্ডো-ক্লিনার যোটরাইট লেখে, আমি নিজে একজন স্বাবলম্বী ব্যবসায়ী। জানলা পরিষ্কার করি। তাই এ বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই। যাতে লোকের ভুল ধারণা না থাকে। এ লাইনে আমার পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা। এ ব্যবসায়ের দুটো প্রধান অবলম্বন, ভালো আবহাওয়া এবং গৃহস্থের সদিচ্ছা। এদেশে দুটোই অনিশ্চিত তাই আমাদের আবির্ভাবও দৈবাৎ এবং অনিয়মিত। কয়েকদিন শরীর খারাপ হলেও কথাই নেই। লেখক ঠিক বলেছেন খটখটে রোদ্দুর উঠলে এরা হাজির হয়। আমি এটুকু বলতে পারি, স্যাঁতসেতে পচা দিনে আমাদের কেউ অনুগৃহীত করে না। অনেকে বলে ভালো দিনের মুখ দেখলেই চলে এসো।

আমি আনন্দিত হব যদি শীতের সকালে লেখক আমার সংগে হাজির থাকেন। পূব দিক থেকে কনকনে হাওয়া আসছে। তুষারঝঞ্ঝা বইছে, জলে ভেজান কাপড় জমে শক্ত হয়ে গেছে। ঠান্ডায় হাতে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে। তখন দু তলার বরফে ঢাকা জানলায় দাঁড়িয়ে কাচ পরিষ্কার করা আর জীবনটা হাতের মুঠোয় পুরে ঘুরে বেড়ান এক কথা। এ কাজ অত্যন্ত পরিশ্রমের, লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং আরও বড় কথা শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলেই এ কাজ করা সম্ভব। ট্যাক্স সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য মানতে অক্ষম। আমি যথাবিহিত আয়কর দেই। সাংবাদিক আইন বাঁচিয়ে কলমের খোঁচায় অনেককে ঠোকরাতে পারেন। তা আমি করতে চাই না। কেবল জানাই, লেখাটা আকর্ষণীয় হয়নি কারণ, বিষয়টা তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে।

স্বাধীন উইন্ডো-ক্লিনারের জীবিকা বিচিত্র। ট্যাক্স দেয় কিন্তু কাজ না থাকলে বেকার ভাতা পায় না। দুর্ঘটনা ঘটলেও বীমার টাকা পায় না যদি না ব্যক্তিগত কোন বীমা থাকে। কোন অনুসন্ধান সংঘে চাকুরে লোকের সুখ-দুঃখ খতিয়ান করতে পারে। আমাদের ভাগ্যে চিরাচরিত অনিশ্চয়তা। সম্মান কিছু আছে বলে মনে হয় না স্বীকার করি আছে কাজের স্বাধীনতা—আধুনিক যুগে ওকথাটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

আর একটা চতুর্থ সম্পাদকীয় দিয়ে লেখাটা শেষ করি।

"সর্বাংগসুন্দর"

ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। একথা কে না জানে পুরুষের চোখে সদ্য-জাত শিশু কদাকার। তবু বন্ধুর নব-জাতকে দেখতে যেতে হয়। মনে মনে ভাবে কি পরিহাস। বন্ধুকে দেখতে কার্তিকের মত, তার স্ত্রীও দেখতে মন্দ নয়। অথচ ছেলেটা এমন কুৎসিত হল কি করে। কি মর্মদায়ক চিত্র! ঠিক একটা মাংসের পিন্ড। নাকটা থ্যাবড়া, চোখ দুটো পিট পিট করছে, হাত পা লিকলিকে। আশ্চর্য, অাই একরত্তি ছেলে অথচ বাজখাঁই গলা, চীৎকার করে বাড়ী ফাটিয়ে দিচ্ছে। এবার দুর্ভাবনায় পড়ে, একটা কিছু বলতে হয়। কি বলা উচিত হবে। মামুলি অনেক কথাই ত প্রচলিত, কই একটা কথাও ত মনে পড়ছে না। জিজ্ঞাসা করবে কি ছেলে না মেয়ে? অতটা অজ্ঞতা প্রকাশ না করাই ভালো। অস্বস্তিকর আবহাওয়া কাটিয়ে ওঠে—বলার কিছু পেয়েছে। বলে ঠিক বাবার মত দেখতে হয়েছে কেবল চোখ দুটো ওর মায়ের মত। শেষ পর্যন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কাঁথামুড়ে মাংসপিন্ডটা সরিয়ে নিয়ে যায়। যাক ছেলে দেখা চুকল। আপাতত কিছুদিনের মধ্যে আর এ সমস্যায় পড়তে হবে না।

এবার খোদকর্তার কাহিনী শোনা যাক। কিছু দিনের মধ্যে বাড়ীতে পেরাম্বুলেটর হাজির। ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। ঘরে ঢুকতে গেলে গায়ে ধাক্কা লাগে বেরোতে গেলেও ধাক্কা। অফিস সেরে ঘরে পা দিতেই সবাই হা হা করে ওঠে। ছেলে উঠে পড়বে। পা টিপে টিপে চলতে শেখো, গলা নামিয়ে কথা বলো। শুধু কলঘর নয় সারা বাড়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে—যেদিকে ফেরাও আঁখি—ছেলের অর্ধসিক্ত কাঁথা। সময় অসময় ছ পাউন্ডের দলাটাকে কোলে নিতে হয়। তখন কেবলই ভয়, কি জানি এই বুঝি পড়ে যাবে হাড়গোড় গেল ভেঙে। শেষে একদিন সাহস সঞ্চয় করে ভালো করে দেখে—মন দোদুল্যমান! কি আশ্চর্য, থ্যাবড়া নাক কোথায় গেল, এ যে প্রায় বাঁশির মত দেখতে। চোখটা টানা টানা। ওর দিকে বড় বড় চোখ করে চেয়ে আছে। হাসছে মিটি মিটি। কি মিষ্টি। ছোট ছোট হাত। কি চমৎকার ধরতে শিখেছে। আবার এক গাল হেসে দিল। বোধ হয় চিনতে পেরেছে। বাবাকে।...... আর থাকতে চাইছে না। হয়ত বা খিদে পেয়েছে। কান্না জুড়ে দিল। কাঁদুক তবু কি মিষ্টি গলা। সেদিন থেকে ছেলে ছেলে করে সে পাগল। প্রতি বিষয়ে ছেলের ওপর পক্ষপাতিত্ব। ছেলে তার গৌরব। ছেলের কথা ছাড়া কথা নেই। অফিসে, বন্ধুমহলে কেবল ছেলের গল্প। তার বুদ্ধি আর বীরত্বের কথা। শেষে পরম আগ্রহে ব্যাগ থেকে ছেলের ঝাপসা ছবি বের করে। লক্ষ্য করে না বন্ধুর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ওই ছবিটায়। ঘুণাক্ষরে বোঝে না বন্ধু নিতান্ত অসহায় ও অস্বস্তিবোধ করছে।

কাপড়ের আবরণে মাথা-মুখ ঢাকা লোক-হলেও যারা তাই মনে করে নিজেদের—এদের গুলোকে আমি দেখেছিলাম। সাদা পোষাক পরে ছিল সবাই। ঘোড়ায় চেপে স্রোতের মত এসেছিল তারা। প্রদোষের ম্লান আলোয় ঘোড়সওয়ার মূর্তি-গুলোকে সাক্ষাৎ শয়তানের মত দেখাচ্ছিল। আমার তখন বয়স খুব অল্প। নেহাতই ছেলেমানুষ। ফ্লোরিডার মেরিয়ানার কাছাকাছি একটা গ্রামে আমি থাকতাম। অনেক রাত আমার জীবনে এসেছে, কিন্তু সে রাতটাকে আমি আজও ভুলতে পারি নি। ভুলতে পারি নি কিভাবে মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকগুলো একটা জ্বলন্ত ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল ক্যাথলিক গির্জের বাইরে; তারপর, ভেতরকার উপাসনারত সবাইকে হুকুম করেছিল বাইরে বেরিয়ে আসতে। বয়স তখন খুব অল্প হলেও এ সবের অর্থ যে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ভয়াবহ সূচনা, তা বোঝার মত বুদ্ধি আমার ছিল।

ক্যাথলিক, নিগ্রো, ইহুদি—এদের প্রত্যেককে ঘৃণা করতো মাথা-মুখ ঢাকা এই লোকগুলো।

গায়ের রঙ যাদের সাদা নয়, দক্ষিণ-দেশের মানুষ না হলেও যারা তাই মনে করে নিজেদের — এদের প্রত্যেককে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতো এরা, এই মাথা-মুখ আচ্ছাদিত লোকেরা। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের গ্রামের সবার এবং খেত-খামারের চাষী মানুষদের অন্তরে বিভীষিকা রচনা করে এসেছে এই কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়েরা।

ছেলেবেলার প্রথমদিকের স্মৃতি, বিশেষ করে এই সবের স্মৃতি কোন-দিনই মুছে যায় না মনের পট থেকে। পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা হলেও আজও আমি যখন জীবনে প্রথম দেখা মাথা-মুখ ঢাকা সেই লোকগুলোর কথা মনে করি, স্নায়ুতে স্নায়ুতে উপলব্ধি করি সেদিনকার রক্তজমানো আতঙ্ক।

পরে এদের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি জেনেছিলাম। জেনেছিলাম কিভাবে গৃহযুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রথম শুরু হয় কু ক্লুক্স ক্ল্যান-য়ের তৎপরতা। তারপর দাসত্ব প্রথা লোপ পাওয়ার পর আরও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এরা। সে সময়ে অজ্ঞতা, আতঙ্ক আর কুসংস্কার—এই সব কটিকেই কাজে লাগাতো ওরা। অনেক নিগ্রোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ক্ল্যানসমেনরা সত্যি সত্যিই সাদা ভূত এবং তাদের অলৌকিক ক্ষমতাও তাই সীমাহীন।

কলেজে পড়ার সময়ে ক্ল্যানদের তৎপরতা সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আমি পড়েছিলাম। এদের বিচিত্র অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যা শুনলে উপকথা বলে মনে হয়, এদের মৃত্যুর শপথ এবং কোন সভ্যের নাম ফাঁস করে দেওয়ার দুঃসাহস যে দেখায় তার প্রতি পাশবিক দন্ডদানের বিধান—সবই আমি জানতে পারলাম। কশাঘাত এবং লাঞ্ছনার সে এক গা-শিউরোনো কাহিনী। 'গ্র্যান্ড ইম্পিরিয়েল উইজার্ড অ্যান্ড মোগল' ইত্যাদি গাল-ভরা নামগুলো শুনলে হাসি পেলেও কিন্তু বাস্তবিকই এদের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মগত এবং জাতিগত বিদ্বেষকে জিইয়ে রাখার জন্যে যারা জীবন পণ করেছে, এ নাম ছিল তাদেরই।

তারপর বহুবছর পরের কথা। বড় হয়েছি আমি। দেহ-মনে পরি-পূর্ণতা লাভ করেছি এবং অপরাধী সন্ধানী হিসেবে কিছু সুনামও হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে আমাকে পাঠানো হলো একটা কু ক্লুক্স ক্ল্যান হত্যার তদন্তে। সমাজের দুষ্ট ব্রণ-স্বরূপ আমেরিকার রীতি-নীতির পরিপন্থী এই গুপ্ত সমিতির কফিনে আরও একটা পেরেক পোঁতার জন্যে আমার সর্বশক্তি বিনিয়োগ করার সংকল্প নিয়ে রওনা হলাম আমি।

১৯৩০ সালের ৭ই অগাষ্ট ইন্ডিআনার ম্যারিঅনে পৌঁছোলাম আমি। বিধির কি বিড়ম্বনা! এক সময়ে এই ম্যারিঅনের নামডাক ছিল অন্য কারণে। অবরুদ্ধ দক্ষিণ অঞ্চল থেকে বহু নিগ্রো ক্রীতদাস 'মাটির তলার রেলপথ' দিয়ে সটকান দিয়ে-ছিল এইখান দিয়েই।

ম্যারিঅনের ঘটনাটা আসলে দু পরিচ্ছেদে ভাগ করা একটিমাত্র কাহিনী—যার শুরু এবং শেষ মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। ফেয়ারমন্ট জায়গাটা খুব কাছেই। ফেয়ারমন্টের একটি খামার থেকে একটি ছেলে তার আঠারো বছরের বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্যে এসেছিল ম্যারিঅনে। ঘটনার শুরু এইখান থেকেই। সিনেমা দেখতে গিয়েছিল দুজনে। তারপর একটা ড্রাগ ষ্টোরে দাঁড়ায় সোডা খাওয়ার জন্যে। সেখান থেকে দুজনে গাড়ী হাঁকিয়ে যায় মিস্-সিসিনউয়া নদীর দিকে। গাড়ী দাঁড় করানোর পর নদীর ধারে দুজনেই একটু ফূর্তি-উচ্ছল হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীরা এ ধরণের পরি-বেশে এসে পড়লে যে রকম আনন্দে মেতে ওঠে, এও তাই। কিন্তু এ-হেন কবিতার ছন্দপতন ঘটলো আচম্বিতে আতঙ্ক আর বিভীষিকার এক ঘন কালো মেঘের আবির্ভাবে। আচমকা এক ঝটকায় খুলে গেল গাড়ীর দরজা এবং একটা ছায়ামূর্তি, নিগ্রো বলেই মনে হয়েছিল তাকে, একটা রিভলবার তুলে ধরলে দুজনের পানে।

গুরু গম্ভীর গলা শোনা যায়, —"ওহে খোকাখুকুরা, বেয়াড়াপনা করলেই বিপদে পড়বে। ভাল চাওতো গুটি গুটি নেমে এস দিকি গাড়ীর ভেতর থেকে।"

বিনা দ্বিধায় হুকুম তামিল করে ছেলেটি। মেয়েটি গাড়ীর মধ্যেই বসে থাকে। এবার পিস্তলধারীর সংকেত পেয়ে অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে আরও দুজন ছায়ামূর্তি। ছেলেটির পকেট হাতড়ে তাকে কপর্দকহীন করে ওরা—খুচরো-গুলোও নিতে ভোলে না। তারপর দলের পান্ডার হুকুম হয় 'মেয়েটিকে দেখাশুনা করার'। ওদের মধ্যে এক-জন সুট্ করে ঢুকে পড়ে গাড়ীর ভেতর এবং পর মুহূর্তে মেয়েটির ভয়ার্ত চীৎকার ভেসে আসে ছেলেটির কানে। মরিয়া হয়ে ওঠে সে। নিজের বিপদ তুচ্ছ করে আচমকা এক মোক্ষম ঘুসি বসিয়ে দেয় পিস্তলধারীর মুখের ওপর।

এ কাজে রীতিমত সাহসের দরকার—বিশেষ করে একজন অল্প বয়েসী ছেলের পক্ষে এতখানি সাহস দেখানো বড় সোজা কথা নয়।

একটু টলে ওঠে পিস্তলধারী। তারপরেই সামলে নিয়ে পর পর তিনবার গুলিবর্ষণ করে। হাতে এবং পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে আছড়ে পড়ে ছেলেটি। ক্ষতমুখ থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটে আসা রক্তের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে জ্ঞান হারায় সে।

হানাদার তিনজন তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ে নিজেদের গাড়ীতে। পুরোনো মডেলের একটা টি ফোর্ড গাড়ী। এবং সাংঘাতিক-ভাবে আহত ছেলেটির পানে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই ঝড়ের

মত বেগে গাড়ী চালিয়ে উধাও হয় সবাই।

প্রিয়তম ছেলেটির পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ে মেয়েটি। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিল বেচারী যে প্রথমেই আর্ত-স্বরে চীৎকার করে ওঠে সে। কিন্তু তার চীৎকার শুনে ছুটে আসার মত লোক ধারে কাছে কেউই ছিল না। শেষকালে নিরালা জায়গাটা ছেড়ে সে

ক্যাম্পবেল লোকটি ছিলেন ঝানু পুলিশ অফিসার। সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল না। এবং অভাব যে বাস্তবিকই নেই, তা প্রমাণিত হয় তাঁর খুঁড়িয়ে চলার ধরণ থেকেই। পিস্তল-যুদ্ধে গুরুতরভাবে পায়ে চোট পেয়েছিলেন ক্যাম্পবেল। এ কেস যখন তিনি হাতে নিলেন, তখন ডাক্তারেরা উঠে পড়ে লেগেছেন ছেলেটির জীবন বাঁচানোর জন্যে।

"...পর পর তিনবার গুলীবর্ষণ করে

দৌড়োতে থাকে একটা খামারবাড়ী লক্ষ্য করে সাহায্যের আশায়। রাত তখন দশটা কুড়ি মিনিট।

গুলিবর্ষণের এই দৃশ্যটি যেখানে ঘটে, সে জায়গাটি ম্যারিঅনের বাইরে। কাজেই শহরের পুলিশরা সাফ বলে দিলে তদন্তটা পড়ছে কাউন্টি কর্তৃ-পক্ষের এখতিয়ারে। ডাক পড়ল স্টেট হাইওয়ে পেট্রোলের। শেষে ঠিক হলো গ্র্যান্ট কাউন্টির শেরিফ জেক ক্যাম্পবেল হাতে নেবেন এই কেস।

মেয়েটির জবানবন্দি থেকে ঘটনার নিখুঁত বিবরণও পাওয়া গিয়েছিল।

গুলিবর্ষণের পরেই সেই রাত্রেই ম্যারিঅনে হাজির ছিলেন ক্যাম্পবেল। একটা সেকেলে মডেলের টি ফোর্ড গাড়ীর মধ্যে তিনজন নিগ্রোকেও দেখেছিলেন। ওয়াশিংটন স্ট্রীট বরা-বর বিকট স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে গাড়ী চালাচ্ছিল ওরা। ওদের এই হুল্লোর আর আচরণ দেখে তখন

কিন্তু উনি বিশেষ কিছু ভাবেন নি। উনি জানতেন, মেজাজ খিঁচড়ে গেলে, খুব মুষড়ে পড়লে মানুষমাত্রই, তা সে কালোই হোক আর সাদাই হোক, একটু বেসামাল হয়ে ওঠে। হাবভাবে আচার ব্যবহারে তখন অনায়াসেই একটা বেখাপ্পা বেয়াড়া ভাব লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, টি মডেল গাড়ীটার লাইসেন্সটা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যে গাড়ীটাকে দাঁড় করালেন উনি। দেখলেন, রেজিস্ট্রেশন হয়েছে টম শিপ্-এর নামে। এই কান্ডর একটু পরেই ক্যাম্পবেল এবং তাঁর ডেপুটিরা রওনা হলেন টম শিপ-এর ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্যে শহরের যে অঞ্চলে কালো চামড়ার লোকেরা থাকে সেই দিকে।

কেঠো বাড়ীটায় রঙের কোন বালাই ছিল না। আধা-অন্ধকারের মধ্যে বাড়ীটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন বয়সের ভারে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী—নিজেকে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখার মত শক্তিও তার নেই। গ্যারেজের ভেতরে হানা দিতেই ফোর্ড গাড়ীটা চোখে পড়ল পুলিশ অফিসারদের। অ্যাক্সেলের চার পাশে ঘাস এবং গুল্ম লেগেছিল। মিস্‌সি-সিনউয়া নদীর তীরে গেলে যে ধরণের ঘাস-গুল্ম পাওয়া যায়—ঠিক সেই রকমের।

পর্দা দেওয়া দরজাটা লাথি মেরে দুহাট করে খুলে ফেললেন ক্যাম্পবেল। এলোমেলো বিছানার ওপর জামাকাপড় পরেই চীৎপাৎ হয়ে শুয়ে ছিল টম শিপ। ঘুম ভাঙানোর পর ও স্বীকার করলে, হ্যাঁ, এক স্মিথ আর হার্ব ক্যামেরন নামে দুই বন্ধুর সঙ্গে সে একটু ফূর্তি করতে বেরিয়েছিল বটে। শিপ্‌কে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্যাম্পবেল। ডেপুটিরা পাকড়াও করে আনলেন স্মিথ আর ক্যামেরনকে।

আব্রাহাম স্মিথের বয়স উনিশ বছর। আর, হার্ব ক্যামেরনের বয়স মাত্র ষোল। উপবাসশীর্ণ ফিনফিনে চেহারা তার। হাতকড়া লাগিয়ে দুজনকে নিয়ে যাওয়া হলো ম্যারিঅনের পুরোনো আদালত ভবনে। লাল ইঁট আর গ্র্যানাইট দিয়ে তৈরী সে বাড়ী।

নদীতীরে গুলিবর্ষণের অকুস্থলে এবং তার পরের ভয়াবহ উপসংহার

নিয়ে তদন্তে ব্যস্ত থাকার সময়ে ক্যাম্পবেল অনেক কথা আমায় বলেছেন সে রাতের ঘটনা প্রসঙ্গে। কিন্তু গ্রেপ্তার করবার পর সেই রাতেই ডেপুটিরা এই তিনটি কালো-চামড়া ছেলেদের নিয়ে আসলে কি যে করেছিলেন, তার কোন বৃত্তান্তই আমি বার করতে পারলাম না কারও কাছ থেকে। শুনেছিলাম, খুব মার-ধোর করা হয়েছিল ওদের এবং 'থার্ড' ডিগ্রী' নামক পদ্ধতিটিও বাদ যায় নি। কেউ কেউ বললে, ছেলেগুলোর পেট থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার পর নাকি বেদম হাঁপিয়ে পড়েছিলেন ডেপুটিরা।

নদীতীরে প্রেমিক-প্রেমিকার ওপর চড়াও হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল টম শিপ্। বাকী দুজনেও স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ তারাও ছিল টম শিপ্-এর সাথে।

ম্যারিঅনের সীমানার বাইরে কু ক্লক্স ক্ল্যান্-এর সভার নির্ধারিত সময় ছিল ৭ই অগাস্টের রাত দুটো। সবাই মিলিত হবার পর নিষিদ্ধ জিন-এর স্রোত বয়ে গেল নির্বাধে। সেই সঙ্গে চললো নিগ্রোদের প্রতি অবাধে বিষোদ্গার। আলোচনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত মতলব স্থির হয়ে গেল : ঠিক হলো, দল বেঁধে সবাই হামলা দেবে জেলের মধ্যে। সভা যখন ভঙ্গ হলো, তখন বেশীর ভাগ ক্ল্যানস্‌মেন-ই মদে চুর-চুর এবং নষ্টামির জন্যে উদগ্রীব। জেলার প্রত্যেককে ডেকে তুলে বিরাট দল গড়ার পরিকল্পনাও হয়েছিল। স্লোগান তৈরী হলো, 'কুত্তা নিগার-গুলোকে যে ভাবেই হোক পাঠাতে হবে যমালয়ে!'

সকাল দশটা নাগাদ আদালত ভবনের দিকে যে কটা রাস্তা এসেছে, সব কটায় জড়ো হলো কাতারে কাতারে লোক। পিল পিল করে আরও লোক আসছিল ম্যারিঅনের বাইরে থেকে। রাগে গন গনে প্রত্যেকরই মেজাজ। সত্যি কথা বলতে কি আসন্ন হাঙ্গামার—সম্ভাবনায় দেখতে দেখতে থমথমে হয়ে উঠল চারপাশের আবহাওয়া। জেলের বাইরের জনতা যে একটা কিছু গোলমাল শুরু করার জন্যেই ওৎ পেতে রয়েছে, এ সম্পর্কেও হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো শেরিফ ক্যাম্পবেলকে। কয়েদীদের চুপিসারে ম্যারিঅনের বাইরে পাচার করে দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হলো তাঁকে।

কিন্তু নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখতেন শেরিফ। তাই জবাব দিলেন—"অর্থাৎ সবাই ভাবুক যে ভয়ের চোটে ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়ছি আমি। ওসব কিস্‌সু হবে না। এ অঞ্চলের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য জেল হলো এইটা। কারও ক্ষমতা নেই দরজা ভেঙে এর ভেতরে উৎপাত করবে।"

দারুণ ভুল করেছিলেন ক্যাম্পবেল। কেননা, খুব জোর ঘণ্টা তিনেক, কি তারও একটু পরেই জয়জয়কার পড়ে গেল সেই আইনের যে আইন কোন আইনের পরোয়া না করে নিজ হাতেই তুলে নেয় অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার গুরুভার। কড়া রোদ্দুরের মধ্যে ঝুলতে লাগল দু'দুটো নিষ্প্রাণ দেহ। আনুষ্ঠানিক বিচার প্রহসন বেমালুম কেটে ছেঁটে সংক্ষিপ্ত করে আনলে জনতা। রক্তের তৃষ্ণা মিটোনোর এই বীভৎস দৃশ্যে কিন্তু একটি জাতীয় রক্ষীও উপস্থিত ছিল না এ কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্যে।

জেলের ওপর সর্বপ্রথম হামলা শুরু হয় চারজন মাথা-মুখ ঢাকা ক্ল্যানস্‌মেন-এর প্রচেষ্টায়। রাস্তার কোণ থেকে লোহার ট্র্যাফিক সিগন্যালটা মাটি খুঁড়ে তুলে আনে ওরা। তারপর, শুরু হয় আদালত ভবনের লোহার কীলমারা ওককাঠের ভারী দরজাটার ওপর আঘাতের পর আঘাত। কিন্তু এক চুলও নড়ে না পাথরের মত শক্ত দরজাটা। বাধ্য হয়ে লোহার খেঁটে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয় ওরা। রীতিমত ঘামতে ঘামতে বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণের পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু হয় তাদের প্রচেষ্টা।

ইতিমধ্যে একটা কাঁদুনে গ্যাসের বোমা এসে পড়ে জনতার মাঝে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্যে। কিন্তু একজন অতি-তৎপর ক্ল্যান হাঙ্গামাকারী চট্ করে বোমাটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলে যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকেই। দরজা-ভাঙার খেঁটে এবার আর ব্যর্থ হয় না। দরজার পাশে পাশে গাঁথুনিতে ফাটল দেখা যেতেই মুহুর্মুহু বিজয়ের উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে এদিকে-সেদিকে। হুড-পরা একজন চীৎকার করে ওঠে—"ওহে, হাত লাগাও সবাই, বাস্টার্ডদের এবার আমরা হাতের মুঠোয় পাব।" হাতে হাতে চালান হয়ে গেল জিন-জলের একটা বোতল। উইজার্ড অর্থাৎ জাদুকরের পোশাকের নীচ থেকে বেরিয়ে এল একটা দড়ি। এবং আরও রাশিরাশি লোক ছুটে এল হাত লাগানোর জন্যে।

জেলের বাইরের পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হাঙ্গামাকারীদের নিরোধ করা যাবে না—এমন ধারণা কিন্তু তখনও জেলের ভেতরে শেরিফ ক্যাম্পবেলের মাথায় আসেনি। আগের চাইতেও জনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাণ্ড দেখার জন্যে গাড়ীর ছাদের ওপরেও উঠে পড়েছিল বিস্তর মানুষ। কেউ কেউ আবার আদালত-ভবনের দরজা ভাঙার দৃশ্যটা ছেলেমেয়েদের দেখানোর জন্যে তাদেরকে তুলে নিয়েছিল নিজের নিজের কাঁধের ওপর। এ হেন হামলা স্বচক্ষে দেখে বিকৃত তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে এসেছিল অনেকে। এ কাজে অংশ নেওয়ার মত সাহস তাদের ছিল না। বাধা দেওয়ার মত সাহস বা সদিচ্ছাও কারও ছিল না।

জানলা থেকে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন ক্যাম্পবেল—"থামো! দরজার দিকে আমি মেসিন গানের মুখ ঘুরিয়ে রেখেছি। প্রথমেই যে ঢুকবে, তার আর নিস্তার নেই।"

বিকট চীৎকার আর উল্লাসধ্বনির মধ্যে অব্যাহত থাকে হামানদিস্তা পেটার মত দমাদম শব্দ। শেষকালে খসে পড়ে পাথর আর ইঁটের বাঁধুনি এবং বিজয়মালা এসে পড়ে কু ক্লক্স ক্ল্যানদের গলে। ধুলো আর চুন-বালি-শুরকির কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে জনতা ঢুকে পড়ে ভেতরে। তারপর যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তা উন্মাদদের প্রলয়-নাচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেপরোয়া জনতার ওপর গুলি চালানোর ভয় দেখালেও শেষ পর্যন্ত তা আর করলেন না ক্যাম্পবেল। এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা বাস্তবিকই বড় সহজ কাজ নয়। উনি জানতেন ভিড়ের মধ্যে তাঁর বন্ধু আছে, প্রতিবেশী আছে, হয়তো দু' একজন আত্মীয়ও আছে। কয়েদীদের প্রতিরক্ষার জন্যে জন বারো কি তারও বেশী মানুষকে সাবাড় করাটা ন্যায়সঙ্গত কিনা, তা তাঁকে ভাবতে হয়েছে ঐটুকু সময়ের মধ্যেই। এবং তার চাইতেও দরকারী হলো এই যে জনতার ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েও কি কয়েদীদের বাঁচাতে পারতেন উনি?

মাথা-মুখ ঢাকা ভেল্কিবাজরা শেরিফের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়

চাবীর খোকা। খুলে যায় গারদের দরজা। দুজন চেপে ধরে টম শিপ্‌কে। অজ্ঞান হতে তখন তার বেশী দেরী নেই। একজন তাকে শক্ত হাতে ধরে রাখে, আর একজন ঘুসির পর ঘুসি বসিয়ে যেতে থাকে তার মুখের ওপর। টানতে টানতে ওকে আনা হয় বাইরে। আদালত-ভবনের সিঁড়ির ওপর থেকে লাথি মেরে গড়িয়ে দেওয়া হয় নীচের লনে। তারপর যখন দড়ির ফাঁস পরানো হয় ওর গলায়, তখন পুরোপুরি অচেতন হয়ে পড়েছে সে। গাড়ির ছাদের ওপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চীৎকার করতে থাকে—"খুন করো ওকে! খুন করো ওকে!"

একমুহূর্তের মধ্যেই গাছ থেকে ঝুলতে থাকে টম শিপ্‌। তারপর টেনে আনা হয় এব স্মিথকে। দুহাত তার পেছনে বাঁধা একজন মাতাল জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—"কিহে কালো শয়তান, কিরকম লাগছে তোমার?" দড়ির অন্য প্রান্তের ফাঁসটি এক গাছের একটা শাখার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হয়। এবং নিষ্করুণভাবে ফাঁসবন্ধ এই নিগ্রো ছোকরাও খুব দ্রুত ত্যাগ করে তার শেষ নিঃশ্বাস।

ষোল বছরের হার্ব ক্যামেরন একজন স্ত্রীলোকের সেলে লুকিয়ে পড়ে রেহাই পেয়ে যায় সে-যাত্রা। চুরির জন্যে স্রেফ দশদিনের হাজতবাসের গল্প ওরা বিশ্বাস করেছিল কিনা, অথবা ওরকম হাড়িসার ছোকরার জন্যে দড়ির অপচয় করাটা ওরা অনুচিত মনে করেছিল কিনা—তা কেউ বলতে পারবে না। এমনও হতে পারে যে, দু'দুটো খুনের পর জনতার হত্যালালসা এবং হাঙ্গামা-তৃষ্ণা অনেকাংশে মিটে গিয়েছিল।

এই ভয়াবহ গল্প বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ার পর দুনিয়ার পুলিশেরা এসে হাজির হলো ম্যারিঅনে। জাতীয় রক্ষীবাহিনীও এল। কিন্তু তখন ক্ল্যানস্‌ম্যেনদের কেউই আর ছিল না সেখানে—অন্তত হুড-পরা অবস্থায় নয়। অপরাধীদের খুঁজে বার করার চেষ্টায় আমি যখন কাজ শুরু করলাম, তখনও কিন্তু বেশ গরম ম্যারিঅনের আবহাওয়া। রুচিশীল নাগরিকেরা যে এই বীভৎস হাঙ্গামার জন্যে খুব মুষড়ে পড়েন নি, এমন কল্পনাও যেন কেউ না করেন। এমন কি একজন পুরুতও হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে যারা পারে তাদের প্রতি আবেদন করার সময়ে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, বহুজনের মতের সঙ্গে তাঁরও মতের মিল আছে এবিষয়ে। উনি বলেছিলেন, "খৃষ্টের নামে বলছি, জনতার ভয়াবহ জয়লাভের ফলে যারা অত্যাচারিত, তাদের সম্পর্কে সত্য কথা শুনতে চাই আমরা।"

সামরিক আইনের আওতায় এসে পড়ে ম্যারিঅন। জনতা আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করার মত সাহস যাদের আছে, তাদেরকে নিয়ে চার হপ্তা ধরে এক-নাগাড়ে আমি চেষ্টা করলাম ন্যায়চক্রকে ঘূর্ণমান রাখতে। কিন্তু এত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও, সেই ভয়ংকর দৃশ্য যারা দেখেছে, তাদের অত জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি এমন দুজন সাক্ষী পেলাম না যারা দলের পাণ্ডাদের নাম বলতে রাজী আছে। দুজন তো দূরের কথা, এরকম লোক আমি একজনও পেলাম না। কেউই বললো না—"আমি দেখেছি—নিগ্রোদের গলায় ফাঁস পরাতে। আমি ওকে চিনি। ভালভাবেই চিনি। আমার ভুল হতে পারে না এবিষয়ে। বহুবার তার গলাও আমি শুনেছি।"

গুজব শোনা গেল, ক্ল্যান পাণ্ডারা জর্জিয়া পালিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর করণীয় কিছুই ছিল না। পরবর্তী কর্মপন্থাকে কার্যকরী করতে গেলেই আমাকে প্রমাণ করতে হবে ব্যাপারটা দুই দেশের মধ্যে সন্ধি সম্বন্ধে আবদ্ধ অপরাধ। অর্থাৎ আন্তঃ প্রদেশ কিডন্যাপিং, অথবা আন্তঃ প্রদেশ যোগাযোগ। কিন্তু তা অসম্ভব ছিল। গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও করণীয় কিছু ছিল না। কাজে কাজেই কেসটা ছেড়ে দেওয়া হলো প্রদেশ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের হাতে।

জেম্‌স্‌ এম ওগ্‌ডেন নামে এক সাহসী অ্যাটর্ণী-জেনারেল শেষ পর্যন্ত ম্যারিঅনের ক্ল্যানদের দলপতি হিসেবে দুজন পুরুষকে দোষী সাব্যস্ত করে-ছিলেন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে কোর্ট এ অভিযোগ নাকচ করে দেয়।

হার স্বীকার করার পর ম্যারিঅন ছেড়ে এসেছিলাম আজ হতে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণ অঞ্চলে, সুদিন এসেছে, উন্নতি ঘটেছে। যদিও হেথায়-সেথায় এখনও জাতিবিদ্বেষ ফুটে রয়েছে দুষ্ট কীটঘ্ন ফুলের মত, তবুও বেশীর ভাগ আমেরিকান তাকিয়ে আছেন সেই সুদিনের দিকে যেদিন এই বিষ চিরতরে মুছে যাবে সমাজের বুক থেকে।

অনুবাদ : আদ্রীশ বর্ধন।

দণ্ডকারণ্যে একটী উদ্বাস্তু বৃদ্ধি!

যাত্রা সমীক্ষা ও যাত্রার ভবিষ্যৎ

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সেকালের অনেক কিছুই লুপ্ত হতে বসেছে। যাত্রাও প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল, সুখের বিষয় লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাত্রাকে জনপ্রিয় করার জন্য একদল নাট্যরসিক এগিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে দু'একটা বারোয়ারী পুজামন্ডপে বা সংস্কৃতি সম্মেলনের আসরে যাত্রা হয় বটে তবে তা বৃহত্তর জনসমাজকে ও নাট্যরসিকদের আকৃষ্ট করতে পারে না। বৈচিত্র্যের পশরা সাজিয়ে মঞ্চ-নাটক ও ছায়াচিত্র আজ আসর জমিয়ে বসেছে, ভাবে-ভঙ্গীতে ও বৈশিষ্ট্যে এক অনাস্বাদিতপূর্ব-রসের সন্ধান দিয়েছে, হাজার বাতির আলোর বিচ্ছুরিত দ্যুতি চোখ ধাঁধিয়েছে মন ভুলিয়েছে, এখন আর হ্যাজাক লন্ঠনের সীমিত আলোকচ্ছটা আমাদের প্রাণ ভরাতে পারে না। নিয়ন-শোভিত কলরবমুখরিত এই বৈচিত্র্যময়ী শহরের দিকে দিকে রস ও আনন্দের সম্ভার থরে থরে সাজানো। এর মধ্যে যাত্রার দেখা বড়-একটা মেলে না। পল্লীবাংলার নির্জন বনবীথির মাঝে একদিন যে আলোকবর্তিকা বঙ্গ সংস্কৃতির দিশারী হয়ে গণমানসে ভাবের তরঙ্গ তুলেছিল, যার সুরে সুর মিলিয়ে বাউল ও চারণেরা বাঙালীকে বিশ্বমানব-সাগর-সঙ্গমে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল তা আজ অবস্থাবৈগুণ্যে এবং মহাকালের চঞ্চল চরণাঘাতে ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

যুগের পরিবর্তন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও অতএব এর জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না বা অনুযোগ করলে ভুল হবে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে অনেক পিছিয়ে পড়তে হয় যাত্রার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল, আগের দিনের যাত্রার সঙ্গে এখনকার যাত্রার তুলনা করলেই বিষয়টা ও কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একদিকে মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার ঘন ঘন পট-পরিবর্তন, দেশের স্বাধীনতালাভ, দেশভাগ ও লক্ষ লক্ষ লোকের ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে আসা, অন্যদিকে নানা সমস্যার চাপে পড়ে সাধারণ মানুষ যখন হাঁফিয়ে উঠেছিল ও এই হঠাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যখন দেশের শিল্প ও কলাক্ষেত্রে নব নব পরীক্ষানিরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল তখন যাত্রাকে সংস্কৃত ও যুগমানসের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকট করার বিষয়ে তৎপর হতে দেখা যায়নি, সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় সময়ে যাত্রানাটকের মধ্য দিয়ে জীবনের কোন সমস্যা ফুটে ওঠেনি অর্থাৎ গণচিত্তের নব-উদ্বোধনে যাত্রা কোন প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়নি।

সে যুগে যাত্রায় যে সব কাহিনীর অবতারণা করা হতো তার মধ্যে ভাবের চেয়ে আবেগ ও আতিশয্যই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। রাজকীয় পরিচ্ছদ ও অসির ঝনঝনা যাত্রাওয়ালাদের এত বেশী প্রলুব্ধ করেছিল যে তাঁরা তখন গতানুগতিক কাহিনী মানুষের মনে যে নূতন দিনের আশা ও আশ্বাসের বাণী পৌঁছে দিতে পারছে না তা একবারও বিচার করে দেখেননি। কৃষ্ণ-রাধার প্রেম বা রাজকন্যার সঙ্গে ভিন-দেশী যুবকের প্রেম, দেবতা ও দানবের বিবাদ রাজান্তঃপুরের বিলাস ও আড়ম্বর কি করে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই চিন্তায় বেশী মশগুল ছিলেন। মাঝে মাঝে ভাঁড়ের মুখে কতকগুলি নিম্নরুচির কথাবার্তা বসিয়ে একদল লোককে রসিয়ে তোলার চেষ্টাও কম করেননি। কারণে-অকারণে গান ও যুদ্ধ বাধিয়ে বাজীমাৎ করার কেরদানী করতে করতে তাঁরা নিজেরাই যে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছেন সে খেয়াল মাথায় আসেনি। যদি কিছুটা আত্মসমীক্ষা সেদিন হতো তবে যাত্রার আবেদন আরও গভীর আরও ব্যাপক হয়ে বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আনন্দ ও রসের স্রোত বইয়ে দিতে সমর্থ হতো এবং জাতীয় ভাবধারা নবরূপায়ণে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতো।

যাত্রার পরিবেশ ও অভিনয় আমাদের তৃপ্ত করতে পারেনি। গতানুগতিকতা যুগবিমুখীনতা ও নাটকের একঘেয়েমি এত বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল যে অনেকে যাত্রার কথা শুনলে নাক সিঁটকে উঠতেন। ছায়াচিত্র ও মঞ্চ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নাটক প্রয়োগ-কৌশল ও আলোকসম্পাত নিয়ে যে গবেষণা চলছে তার কিছু কিছু এদেশে নিয়ে এসে নাট্য রসপিপাসু জনসাধারণকে এমন এক রসের সন্ধান দিয়েছে যা যাত্রা দিতে পারেনি। যদিও মঞ্চে যে সব প্রয়োগকর্ম দেখা যায় তা মঞ্চের কতকগুলি সুবিধা আছে বলেই সম্ভব হয়। যাত্রায় তা সম্ভব নয় তবুও যাত্রার আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে কেউ বড়-একটা মাথা ঘামাননি।

রূপ বদলাতে হবে রঙ ধরাতে হবে মানুষের মনে, যুগ ও জীবনকে তুলে

বলতে হবে সকলের সামনে, বলতে হবে নতুন কথা তবেই হবে যাত্রার জয়যাত্রা শুরু, একথা সেদিনকার যাত্রাওয়ালারা অনুধাবন করতে পারেননি। যাত্রার ইতিহাসের গতিপথে বহু পরিবর্তন ইতিপূর্বে হয়েছে, কথকতা, পাঁচালী, ছড়া, তরজা, কীর্তন ও লোকসংগীতের নানা ধাপ বেয়ে যাত্রা এগিয়ে চলেছিল, রাধাকৃষ্ণের লীলাভিসারের পথে যেতে যেতে যেদিন দেশের মধ্যে অত্যাচার, পীড়ন ও নির্যাতন শুরু হল, সহস্র সহস্র লোক দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্য অম্লানবদনে ফাঁসিকাঠে ঝুললো, বিদেশী রাজশক্তির প্রচন্ড পীড়নে বাংলার শহর থেকে গ্রামে নির্যাতীত মানবাত্মা রুদ্ররোষে জ্বলে উঠলো, গর্জে উঠলো সেদিন যাত্রা সেই রক্তরাঙা রাজপথে জনসাধারণকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার মহানমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিল। লোকের মনে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য নূতন নূতন পালা রচনা করে ভূষণ দাস, মুকুন্দ দাস, মথুর সা প্রমুখ বিখ্যাত যাত্রাওয়ালারা বাঙালীর মনে যে অগ্নিমন্ত্রের বীজ বপন করে দিয়েছিলেন তা ভোলবার নয়। সংস্কৃতির ইতিহাসে যাত্রার এই অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। সাধনায়, চিন্তায়, মননে ও অনুধ্যানে এই সব যাত্রাওয়ালাদের স্বকীয়তা ও নূতনত্ব ছিল তাই যাত্রা মনের মণি-কোঠায় অনেকখানি আসন জুড়ে রয়েছে।

এই সব যাত্রা-নাটক দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম, এর সুরে প্রাণমন অনুরণিত ও উদ্দীপিত হয়ে উঠতো, কালক্রমে সেই যাত্রার গতিহীনতা আমাদের হতাশ করেছিল। আজকের যুগের যে সমস্যা যে জীবন-জিজ্ঞাসা তা পরবর্তী সময়ে মূর্ত হয়ে উঠেনি তাই অলকাপুরীর যক্ষের মত যাত্রা অনেকদূরে সরে গিয়েছিল।

দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় যাত্রার আসর বন্ধ হয়ে গিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তেই যাত্রা সীমাবদ্ধ থাকতো কারণ শহরবাসী যাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখে প্রায় বর্জনই করেছিল, শহরের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারায় যাত্রার এই অবস্থা ঘটেছিল। ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ার ফলে প্রবল অর্থনৈতিক সংকটে যাত্রার দলগুলিকে পড়তে হয়েছিল এবং অনেক ছোট ছোট দল উঠেও গিয়েছিল। সেই সংকটজনক মুহূর্তে যাত্রাকে পুনরায় উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য কোন সুচিন্তিত কার্যক্রম নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি, বা নাট্যরসিক সমাজের পক্ষ থেকে যাত্রার এ অবস্থা কেন হচ্ছে তার সম্যক বিচার ও বিশ্লেষণ হয়নি।
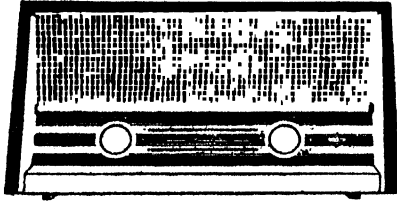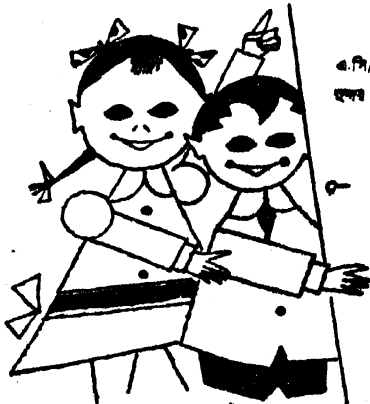
পনেরো বিশ বছর আগে যে সব যাত্রা হয়েছে তার মধ্যে অভিনয়নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করেছি, শিল্পীদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখেছি আর লক্ষ্য করেছি জনসাধারণের যাত্রা সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা। আজ তার রূপান্তর ঘটেছে দেখা যাচ্ছে।

এর একটা কারণও আছে। যে সব শিল্পী অভিনয় করে মানুষকে সম্মোহিত করে রাখতেন যাঁদের অভিনয় দেখার জন্য জনসাধারণ উন্মুখ হয়ে থাকতেন তাঁদের কথা সেদিন গভীর-ভাবে ভাবা হয়নি। দিনের পর দিন অপরকে আনন্দ দিয়ে যাঁরা কষ্টে দুঃখে সামান্য বেতনে ধূপের মত নিজেকে শিল্পচর্চায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন, কলালক্ষ্মীর আঙিনা প্রদীপালোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন তাঁরা মরলেন কি বাঁচলেন একথা চিন্তা করার অবকাশ কারো হয়নি, যাঁরা দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁরা যদি মানুষের মত বাঁচার সুযোগ ও সুবিধা না পান তাহলে সংস্কৃতির অপমৃত্যুই ঘটবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অন্যদিকে আমরা দেখেছি রঙ্গ-মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নূতন করে গড়ে তোলার জন্য ও যুগোপযোগী করার চেষ্টায় বহুসংখ্যক নাট্যরসিক তৎপর হয়েছিলেন, প্রয়োজনে অর্থ দিয়ে সামর্থ দিয়ে সাহায্যও করেছেন তাই রঙ্গমঞ্চ সমৃদ্ধ হয়েছে। অথচ যাত্রাকে বাঁচাবার জন্য কে কি করেছেন তার কোন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা শক্ত। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির সাংস্কৃতিক ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায়

তবে দেখা যাবে যে তাঁরা নিজেদের দেশের লোকসংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আধুনিক যুগের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে সেখানকার সংস্কৃতির মূলে সূত্র উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন ও শিল্পীদের সার্থকভাবে বাঁচার দাবিকে স্বীকার করেছেন ও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। তাই তদ্দেশীয় সংস্কৃতি পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে উঠে জন-জীবনের সংগে একাত্ম হয়ে গেছে। দেশের মর্মবাণী রূপ পেয়েছে ভাষা পেয়েছে। আর আমাদের দেশে তার বিপরীত চিত্রই প্রকট হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে পড়ে দেশীয় সংস্কৃতির মান উন্নয়ন তো করিইনি বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা এক পাশে সরিয়ে রেখেছি অতলান্তিকের উত্তাল তরঙ্গ-মালায় বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বাংলার শান্তশ্রী

সৌন্দর্যমণ্ডিতা কুলকুল প্রবাহিনী স্রোতস্বতীর শ্যামল সৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলেছি। অবহেলিত ও অনাদৃত হয়ে লোকসংস্কৃতি যখন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে তখন সর্বনাশের হাসি হেসেছি। একবার আমরা ভাবিওনি যে এই মোহান্ধতা ভবিষ্যতে কি পরিমাণ ক্ষতিকর হতে পারে। দেশের মাটির সঙ্গে যার গভীর সংযোগ মানুষের অকথিত ভাষার যা বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম আনন্দের অমৃত পাত্র যা কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে পারে তা যে ক্রমশঃ লোকলোচনের অন্তরালে চলে যাচ্ছে, সে অধঃপতনের গভীরতা সেদিন আমরা বুঝিনি আর বুঝিনি বলেই পরবর্তী সময়ে যাত্রার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

যুগ আবার পালটেছে। মানুষের মন রঙ্গমঞ্চের ও ছায়াচিত্রের কৃত্রিম আবহাওয়ায় ও পরিবেশের মধ্যে ঠিক যেন যাত্রার মত ঘরোয়াভাব খুঁজে পাচ্ছে না তাই আবার যাত্রাকে উন্নত করার চেষ্টা চলেছে। নূতন নূতন নাটক নবীন পরিচালক ও যুগসমস্যাকে উপজীব্য করে কাহিনী রচনা করে যাত্রাওয়ালারা এগিয়ে এসেছেন বাঙালী মানসের সিংহদ্বারে তাঁদের লুপ্ত আসন পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, দেখাতে চেষ্টা করছেন যে স্বকীয়তায় ও বৈশিষ্ট্যে যে যাত্রা নাটক একদা বাঙালীর মর্মস্থলে ধ্বনিত ও প্রতি-ধ্বনিত হয়ে বাঙালীকে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনে সহায়তা করেছিল তা পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা রাখে।

যাত্রাওয়ালাদের অনেক সমস্যা আছে নানা অভাব অভিযোগ আছে একথা বোধকরি আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে। জাতীয় জীবনকে সুন্দর ও বিকশিত করে তুলতে হলে চাই জাতীয় শিল্পকলার সামগ্রিক উন্নতিসাধনে সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যে সব লোকসঙ্গীত কথকতা যাত্রা ও পাঁচালীর আসর বসতো পুনরায় তাদের জাগিয়ে তুলতে হলে যে শিল্পীরা ঐসব বিষয়ে সাধনায় ব্যাপৃত আছেন ও যাঁদের প্রচেষ্টায় বাঙালী নিজ ঐতিহ্যে গরীয়ান ও মহীয়ান তাঁদের সামাজিক মর্যাদা পুরোপুরিভাবে দিতে হবে। জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করতে করতে তাঁদের প্রাণান্ত যাতে না হয় মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি যাতে না শুকিয়ে যায়, তাঁরা যাতে সকলের মত মাথা উঁচু করে নিরলসভাবে শঙ্কামুক্ত-চিত্তে সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা সরকারী তরফ থেকে অবিলম্বে করা উচিত।

দেশের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশকে সর্বদিক দিয়ে উন্নত করার যে চেষ্টা চলছে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে বিশেষতঃ কলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাতে যাত্রাকে অন্যতম অংশীদার হিসাবে নেবার কথা এখনও অনেকেরই মাথায় আসেনি। আধুনিক যুগের প্রবহমান ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে আমরা অতীতের অনেক কিছুই বর্জন করেছি কিছু কিছু গ্রহণও করেছি। অথচ লোক-সংস্কৃতি যা জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত থেকে মানুষের মজ্জায় মজ্জায় যুগযুগান্তর থেকে ভাবের সঞ্চার করছে তাকে অনেক ক্ষেত্রেই অস্বীকার করেছি। আর করেছি বলেই আমরা এখনও সম্পূর্ণ নয় বিশিষ্ট নয়।

দেশের সাধারণ মানুষ কৃত্রিমতার মুখোশ পরে যেদিন শহরের দিকে ঝুঁকে পড়লো সেদিন থেকেই আমরা নিজেদের চিনতে বার বার ভুল করেছি বা করছি, যদিও একথা ঠিক সেদিনের মত শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পল্লীজীবন আর নেই। গোয়ালভরা গরু ও গোলাভরা ধানের ভাণ্ডার উজাড় হয়ে গেছে, সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার দেখা আর মেলে না। নানা কৃত্রিমতার মধ্যে যেখানে বাস করতে হয় সেখানে অবস্থার কিছুটা ইতরবিশেষ ঘটে বটে তবে এখন যেভাবে ঘটছে তা কাম্য নয় বাঞ্ছনীয় তো নয়ই।

যাত্রাকে দূরে ঠেলে দিলেও মন থেকে তার আবেদন মুছে যায়নি। দূরে থাকা মানেই ভুলে থাকা নয় একথা আজ প্রমাণ করার দিন এসেছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে যাত্রাজগতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অতীত ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হননি বলেই যাত্রার ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে সেজন্য অনেকে চেষ্টা করছেন।

শহরের আশেপাশে আজ আবার যাত্রার আসর বসছে তবু যে কার্যক্রম গ্রহণ করলে বাংলার ঐতিহ্যবাহী যাত্রার গৌরব আরও বৃদ্ধি পায় সেরকম সর্বাত্মক চেষ্টার অভাব পরি-লক্ষিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে যাত্রার আসর বসিয়ে যাত্রাকে জনমানসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা প্রশংসার্হ তবে এই সঙ্গে যাত্রাশিল্পীদের এবং যাত্রাওয়ালাদের উন্নতশ্রেণীর নাটক সম্বন্ধে গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয়ে উৎসাহ-প্রদানের জন্য সরকারের পক্ষ হতে নানা পুরস্কার প্রতি বৎসর দেওয়া হয় কিন্তু যাত্রার নাট্যকার ও শিল্পীদের পুরস্কার দেবার কথা মোটেই চিন্তা করা হয় না। বিদগ্ধজন, সুধীমণ্ডলী ও নাট্যরসিকেরা এ বিষয়ে নীরব কেন তা বোঝা শক্ত।

অতএব অবিলম্বে যাত্রাকে কেন্দ্র করে যাত্রা-আন্দোলন চালাতে হবে, নবনাট্য আন্দোলনের ফলে বাংলার মঞ্চনাটক সমৃদ্ধ হয়েছে ও নব নব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জনমনকে যেমন প্রভাবিত করছে যাত্রাকে সেইভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

বাংলাদেশের গ্রামগুলির দিকে যদি তাকানো যায় দেখা যাবে যে এখানে একদিন যে রকম যাত্রা হতো এখন আর তা হয় না। প্রথমতঃ খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছে, দ্বিতীয়তঃ যাত্রার আসর বসিয়ে আগে গ্রামস্থ জমিদার ও সম্পন্ন গৃহস্থেরা জনসাধারণকে আনন্দ দিতেন তাঁরা আজ অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছেন। এই শহরমুখীনতার ফলে সকলের মনে পরিবর্তন এসেছে তাই চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় হ্যাজাক লণ্ঠন আর জ্বলে না বা এক অপূর্ব আনন্দরসে মানুষের মন আপ্লুত হয়ে উঠে না।

বাংলা দেশের মানুষকে যাত্রা ঐক্যবদ্ধ করেছে, আকাশে বাতাসে ঘরোয়া সুর বইয়ে দিয়েছে বঙ্গ-সংস্কৃতির মানস সরোবর থেকে শ্বেত-পদ্ম আহরণ করে কলালক্ষ্মীর রাঙ্গা চরণে নিবেদন করেছে, সর্বোপরি তাণ্ডবের অন্তস্থলে লীলাকমল হাতে নিয়ে অভিসারে যাত্রা করেছে। এককথায় বাংলার সাধারণ মানুষকে এমন এক আনন্দরসের সন্ধান দিয়েছে যাতে বাঙালী জীবনের সঙ্গে যাত্রার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এ যোগসূত্র আজকের নয় বহুদিন থেকে চলে আসছে। কীর্তনে গানে কথকতায় পরিশেষে যাত্রায় লোকসংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছে তা যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাতে হবে তবেই হবে যাত্রার নব উদ্বোধন গণমানসের সঠিক স্ফুরণ এবং যাত্রার যাত্রাপথের নবদিগন্তের আবরণ উন্মোচন। কালের গতিতে মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন অবশ্য-ম্ভাবী হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন করে যাত্রাকে এগিয়ে যেতে হবে নব নব উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। দেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে যাত্রা আবার নবভাবে আত্মপ্রকাশ করে ব্যঞ্জনায় মূর্ছনায় দ্যোতনায় যেদিন নবজীবনের বাণী বহন করে আনবে সেদিন বাঙালীর হৃদয়-সমুদ্রে জোয়ার আসবে সেই জোয়ার সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রাণচাঞ্চল্যে ও রসাস্বাদনে দেশ ও জাতিকে মহিমান্বিত করে তুলবে।

| উপন্যাস |

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

।। ২ ।।

দেখতে দেখতে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেল।

বর্ষাকালে কলকাতার রাস্তায় জল জমার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই। কতদিনই তো দেখেছি কোমরভর জল জমে নদীর রূপ নিয়েছে। কিন্তু সে দেখার সঙ্গে আজকের দেখার অনেক তফাৎ। বাড়ীর বারান্দা থেকে জলভরা রাস্তা দেখতে ভালই লাগে। অন্যদের দুর্ভোগ দেখলে নিজের অজান্তে মানুষে খুশী হয়ে ওঠে। আমিও তার ব্যাতিক্রম নই। কিন্তু আজ এভাবে জলের মধ্যে আটকে পড়ে কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম।

প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জল উঠেছে। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। যাও বা দু'চারটে মটরগাড়ী চলছিল, এখন আর চলছে না। তাদের মধ্যে অনেকগুলোই রাস্তায় আটকে গেছে। জলের মধ্যে নেমে ঠেলাঠেলি করছে, গাড়ীতে স্টার্ট দেবার জন্যে। কতগুলো ছেলে আটকে যাওয়া গাড়ী ঠেলে দিয়ে মোটা বকশিশ নিচ্ছে। এই ওদের মরশুম। অনেকে বলে এরাই নাকি নর্দমাগুলো বন্ধ করে রাখে যাতে রাস্তায় জল জমে, ওদের রোজগার হয়।

কখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি নামতে শুরু করেছে। কেউই বুঝতে পারেনি। বিকেল থেকেই আজ আকাশে আলো ছিল না। বর্ষার ধারার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন জমাট হয়ে নেমে এসেছে এই শহরের বুকে। রাস্তার আলো জ্বললে তবু বোঝা যেত কখন সন্ধ্যে হল। এই বৃষ্টির জন্যেই বোধহয় এদিককার আলো-গুলো জ্বলেনি। অবশ্য বাড়ীর আলো জ্বলছে, সামনের বাড়ীর আলোর লম্বা ছায়া পড়েছে জলের মধ্যে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে নিজেরই যেন ভুল হয়, মনে হয় সত্যিই একটা ছোট নদী। যদি আমার সর্বাঙ্গ এভাবে ভিজে না যেত, যদি বাড়ীফেরার দুর্ভাবনা না থাকত মনে, এই জল, এই অন্ধকার, এই অদ্ভুত পরিবেশ নিশ্চয়ই আমার মনে মোহ বিস্তার করত।

আমি অনমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। গগন সেনের কথায় চমক ভাঙ্গল।

—বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।

বল্লাম, হলে হবে কি, রাস্তার জল এখুনি নামবে বলে তো মনে হয় না।

—বলেন তো একটা রিক্সা ডেকে আনি।

—পাবেন কোথায়।

—একটু এগিয়ে দেখি।

বাধা দিয়ে বল্লাম, জলের মধ্যে দিয়ে যাবেন কি করে।

গগন সেনের সেই সংক্ষিপ্ত ছোট্ট উত্তর, আমার অভ্যেস আছে।

আমাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বইএর ব্যাগটা আমার হাতে ধরিয়ে জুতো খুলে রেখে, ধুতিটা উঁচু করে তুলে গগন সেন জলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল মোড়ের দিকে।

অনেকক্ষণ আমি সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম, ভাগ্যিস লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, তা না হলে আজ মহাবিপদে পড়তাম। লোকটা বড় অদ্ভুত ধরণের। গত দু' মাসের মধ্যে অলকাদের বাড়ীতে বার আষ্টেক ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোন কথা হয়নি। চুপচাপ এসে কোণের চেয়ারে বসে, কারুর সঙ্গে বিশেষ আলাপ করে না। দু'একদিন আমি ওকে দাবা খেলতে দেখেছিলাম অলকার পিসেমশাই মিঃ দত্তর সঙ্গে, দুজনেরই বুঝি দাবার নেশা, ঐখানেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

মনে পড়ে অলকাকে আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, ঐ দাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকটি কেরে?

অলকা হেসে উত্তর দিয়েছিল, একটি অদ্ভুত জীব।

—কি রকম।

—আজ পর্যন্ত চোখ তুলে তাকাল না। নিজেই ঝুলি করে বই নিয়ে এসে পড়ে। এখানে আসার ওর কি দরকার আমি বুঝতে পারি না।

কৌতূহল হল, প্রশ্ন করলাম, ভদ্র-লোক কি করেন?

—জানি না।

—নাম!

—গগন সেন।

নামটা আমার কানে লেগেছিল, কারণ ঠিক ঐ ধরণের নাম আমি আগে কখনও শুনিনি। এই দু'মাসের মধ্যে গগন সেনের সঙ্গে বিশেষ কোন কথা-বার্তা আমার হয়নি। অবশ্য প্রয়োজনও কোনও ছিল না। অলকাদের বাড়ী সন্ধ্যেবেলাটা এমনই হৈচৈ-এর মধ্যে কেটে যায় যে কে কোথায় চুপচাপ বসে আছে তা দেখবার সময় হয় না। আজ হঠাৎ এভাবে গগন সেনের সঙ্গে দেখা

হয়ে যাবে, এভাবে সে আমায় সাহায্য করবে সত্যিই ভাবতে পারিনি।

আমার আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে সকলেই রওনা হবার চেষ্টা করছে। যাদের বাড়ী কাছাকাছি বৃষ্টি থামতেই তারা গুটি গুটি বেরিয়ে পড়ল। জুতোগুলো হাতে নিয়ে বকের মত অতি সাবধানে পা ফেলছে, নিজেদের মধ্যেই হাসাহাসি করছে। ভিড় ক্রমশঃ পাতলা হয়ে এল, রাতও বাড়ছে। কিন্তু রাস্তার জল কমার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। কেন জানি না আশঙ্কা হল গগন সেন যদি না ফেরে, কতক্ষণ আমি একলা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব। চার পাশটা ঘুরে দেখলাম, সোনালী চুলওয়াল ফর্সা রঙের ছেলেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এসে থেকেই কড় কড় করে কথা বলছিল, জলে-ভেজা জামাখানা খুলে টাঙিয়ে দিয়েছে দরজার কড়ায়। চোখে-মুখে কেমন যেন একটা নোংরামির ছাপ আমি ইচ্ছে করেই ওর দিকে তাকাতে চাইছিলাম না, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম সে সর্বক্ষণ আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। এখন ভিড় কমে যাওয়ায় ছেলেটার সাহস বেড়েছে মনে হল, পায়চারি করতে করতে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। এদের চোখের ভাষা আমার অজানা নয়। যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

বেশীক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হোল না, রিক্সা চেপে গগন সেন সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, উঠে পড়ুন।

আমাকে রিক্সায় তুলে গগন সেন তার জুতো আর বইএর ঝোলা নিয়ে এসে বসল আমার পাশে। বলল, আপনার বাড়ীটা কোন্ দিকে আমি ঠিক জানি না।

বললাম, কালীঘাট।

—অনেকটা পথ, পৌঁছতে সময় লাগবে। চলুন, যাওয়া তো যাক।

রিক্সাওয়ালার সঙ্গে গগন সেন ভাড়ার কথা কি বলে এনেছিল জানি না, কালীঘাট যেতে হবে শুনেও সে একটুকু বিরক্তি প্রকাশ করল না, বরং সানন্দে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

রিক্সাও যখন সবে ছেড়েছে কানে ভেসে এল, সেই ছেলেটা আমাদের ইঙ্গিত করে কি একটা মন্তব্য করল। কথাটা অশ্লীল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দু' একজন হাসল, বুঝলাম ওর দলে লোকও ছিল। মনে মনে গগন সেনকে ধন্যবাদ জানালাম, সত্যিই সে আমাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

রিক্সা চলতে শুরু করল।

আমি আর গগন সেন পাশাপাশি বসে। আশ্চর্য লাগছে একথা ভাবতে সম্পূর্ণ অপরিচিত না হলেও নামমাত্র পরিচিত এই মানুষটির সঙ্গে কত অনায়াসে আমি এ রিক্সায় চাপতে রাজী হলাম। আমাদের দুজনেরই জামা-কাপড় ভিজে গেছে, হাওয়ায় মাঝে মাঝে গা শিরশির করছে। হঠাৎ এক একটা ঝাঁকুনিতে দুজনেই দুজনের অত্যন্ত কাছে এসে পড়ছি। ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করছি আর একটি মানুষের উষ্ণতা।

গগন সেন এক সময় জিজ্ঞেস করল, আপনি অলকার বন্ধু?

—হ্যাঁ।

—কতদিনের পরিচয়?

বললাম, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম।

—অলকা তো এখনও পড়ে।

—হ্যাঁ, ও এম-এ দিচ্ছে, আমি থার্ড ইয়ারে উঠে কলেজ ছেড়ে দিয়েছি।

গগন সেন বাইরের দিকে তাকিয়েই বলল, আগে কিন্তু আপনাকে অলকাদের বাড়ী দেখেছি বলে মনে হয় না।

বললাম, না, মাস দুয়েক হল যাতায়াত করছি।

গগন সেন এইবার আমার দিকে ফিরে তাকাল, গম্ভীর খাদের গলায় জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ?

মনে হল গগন সেন তার দৃষ্টি দিয়ে আমাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে বাধ্য হলাম, আমি ওখানে চাকরি করি।

—ও, তাই বলুন। গগন সেনের কণ্ঠে নিশ্চিন্ত স্বর।

রিক্সা দেশপ্রিয় পার্ক ছাড়িয়ে এসেছে, রাস্তার সব জায়গায় সমান জল নয়, যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম অতটা লাগেনি। এভাবে চললে আর কুড়ি মিনিটে বাড়ী পৌঁছে যাব।

বোধহয় কোন কথা বলা উচিত ভেবেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বাড়ী কদ্দুর?

গগন সেন হাসল, রিক্সা চড়ে সেখানে পৌঁছন যাবে না।

—কেন?

—অনেক দূরে।

বুঝলাম ইচ্ছে করে কথার উত্তরটা সে এড়িয়ে গেল।

হঠাৎ আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। খুব জোরে না হলেও বেশ ঝির ঝিরে বৃষ্টি। রিক্সাওয়ালা চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলে সামনের পর্দাটা ফেলে দেবে কিনা।

উত্তর দিল গগন সেন, না থাক। দরকার হলে ছাতাটা খোলা যাবে, কি বলুন?

বললাম, ভিজে গেছি, আর একটু ভিজলে কি ক্ষতি।

এতক্ষণ পর্যন্ত বেশ নিশ্চিত মনেই আমি চলছিলাম, হঠাৎ ঐ পর্দার উল্লেখে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ে গেল আমি মেয়ে। সহজ স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে থাকলেও সে স্বাধীনতা আমার নেই। আজ এভাবে আমাকে আর গগন সেনকে রিক্সায় পাশাপাশি দেখলে নিশ্চয়ই সকলে জিভে শান দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে টিটকিরি কাটবে। যা সত্যি নয়, যে কথার কোন ভিত্তি নেই তাকেই তারা মিথ্যের বেলুনে পুরে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করবে। এমনিভাবেই লোকলজ্জার ভয় আমাদের মনকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে দেয়। ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে যাই নিজের কাছে।

এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তখনি পারি মন যতক্ষণ সজাগ থাকে। চারদিকে প্রহরী বসিয়ে ধমক দিই। যাতে না মন ভয় পায়। কিন্তু সংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাবো কেমন করে। তা নাহলে হঠাৎ পর্দার কথায় বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো কেন?

জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের বোঝা সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ে চাপা বুড়োর মত আমার অবচেতন মনটাকে চেপে ধরে বসে আছে। এক একবার সে নাড়া দেয়, অমনি তার অস্তিত্ব বুঝতে পারি।

না আমি মানবো না। চক্ষুলজ্জার পর্দা সরিয়ে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম আমি গগন সেনের দিকে। বয়স ওর বেশী নয়, পঁয়ত্রিশের মধ্যে। অকালে টাক পড়েছে বলে ভারিক্কি মনে হয়। দাড়ির চুলগুলো সযত্ন ছাঁটা, খাড়া নাক। চোখে মুখে রুক্ষ পৌরুষ। অন্যমনস্ক-

ভাবে আমার ডান হাতটা এগিয়ে দিলাম, ছোঁয়া লাগল ওর বাঁ হাতের সঙ্গে। গাটা শিউরে উঠল। বুঝলাম এও সংস্কারের কারসাজি। কি হয়েছে এতে। ইচ্ছে করেই আমি হাত সরালাম না।

বেশ ভালো লাগছিল। এ যেন এক এ্যাডভেঞ্চার। বর্ষার অন্ধকার কলকাতায় অপরিচিত কোন পুরুষের সঙ্গে পাশা-পাশি বসে চলার এক রোমান্স। কি জানি গগন সেন কি ভাবছে।

হঠাৎ হাসি পেল নিজের। সত্যি কি ছেলেমানুষ আমি, মনে পড়ে গেল সেই গানটা একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। রঙে রসে মিথ্যে জাল বোনার এই কি সময়? ছি ছি একি দুর্বলতা।

— কালিঘাট এসে গেছে। কোন পথে যাবো এখন?

গগন সেনের কথায় চমক ভাঙলো। রাস্তা দেখিয়ে দিলাম, তাহলেও বাড়ী

পর্যন্ত যাওয়া গেল না, আমাদের গলির মোড়ে একটা ট্রাক খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। পাশ দিয়ে রিক্সা চলা শক্ত।

—ঠিক আছে আমি এখানে নেমে পড়ছি। রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়লাম।

গগন সেন বলল, খুব বেশী হাঁটতে হবে না তো।

বললাম, না। এই গলির শেষে আমাদের বাড়ী।

—ছাতাটা নিয়ে যান।

আপত্তি করলাম, না না তার কোন দরকার নেই।

গগন সেন শুনলো না, কেন মিছি-মিছি ভিজবেন। অলকাদের বাড়ী ছাতাটা রেখে দেবেন, আমি নিয়ে নেব।

ভদ্রলোকের কথা বলার ধরনটি বড় মজার। নিজে যা বলবে তা অপরকে না শুনিয়ে যেন ছাড়বে না। শুধু শুনিয়ে নয় মানিয়েও। আমার হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে রিক্সায় বসে চলে গেল। আমি ভাড়া দেবার জন্যে টাকা বার করে-ছিলাম। গগন সেন কিন্তু তা দিতে দেয় নি। বলল মাঝরাস্তায় ভাড়া দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত যে চড়ে তারই দেওয়া নিয়ম।

সঅভিমানে প্রতিবাদ করলাম, বাঃ আপনি তো আচ্ছা লোক আমার কোন কথাটাই শুনছেন না।

গগন সেন সশব্দে হেসে উঠলে, শুনবো কেন, আমি যে আপনার চেয়ে অনেক বড়। আই মীন বয়সে।

—কালকে আসছেন অলকাদের বাড়ী।

—চেষ্টা করবো তবে বলতে পারছি না।

গগন সেন নমস্কার করে চলে গেল।

আমি ফিরলাম বাড়ীর পথে।

রাত খুব বেশী না হলেও পাড়াটা যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেশীর ভাগ বাড়ীই অন্ধকার। এমনকি দত্তদের তিনতলার আলোটাও জ্বলছে না। আমি কিন্তু প্রতি রাতে বাড়ী ফেরার সময় দত্তদের ঐ আলোটা দেখতে পাই। লোকে বলে দত্তবাড়ীর বৌ আলো জ্বালিয়ে না-খেয়ে চুপচাপ বসে থাকে স্বামীর অপেক্ষায়। স্বামী বাড়ী ফেরে অনেক রাত্রে একেবারে নাকি বেহুঁস হয়ে। দত্তবাড়ীর সে বোলবোলা না থাকলেও নাটু দত্ত এই কাপ্তেনী লাইনে পিতৃ-পুরুষের নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

প্রতিটি রাত্রে ওদের ঐ তিনতলায় আলোটি দেখি আর আমার মন খারাপ হয়ে যায়। দত্তদের বৌটিকে আমি দেখেছি বড় মিষ্টি দেখতে চোখদুটো মমতায় ভরা। অথচ বনেদী বাড়ীতে বিয়ে দেবার ফলে দাম্পত্য জীবনের একি করুণ প্রহসন।

দত্তদের দুটো বাড়ী পরে যে ইঁট বার-করা ভাঙ্গা বাড়ীখানা সেখানে একজন পাগল আছে। প্রায়ই রাত্রিবেলা সে চেঁচামেচি করে। বাড়ী ফেরার পথে ওর চীৎকার আমি শুনতে পাই। লোকটির বয়স কত জানি না হয়তো বা আমাদেরই বয়সী। হয়তো নানারকম স্বপ্ন দেখতো, বেঁচে থাকার স্বপ্ন। হয়তো বা তার সেই স্বপ্নের ছোট ছোট নৌকগুলো বাস্তবের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জলের তলায় ডুবে গেছে। তাই আর মাথার ঠিক রাখতে পারে নি।

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত সময় ঐ পাগলটার কথা ভেবেছি। মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি ভাগ্যিস আমি ওর মত স্বপ্ন দেখি না। আমি মিথ্যে স্বপ্ন দেখে পাগল হতে চাই না, আমি ঐ দত্তবাড়ীর নির্বোধ বৌএর মত দুশ্চরিত্র স্বামীর সেবা করতেও পারবো না। এর চেয়ে বরং একলা থাকবো।

আমাদের ফ্লাটের দরজায় কিন্তু অন্য-দিনের মত বেশীক্ষণ কড়া নাড়তে হল না। মেজদি এসে দরজা খুলে দিল। ওর চেহারা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। শিরাগুলো যেন সবুজ আলপনা কেটেছে মুখের উপর। ক্লান্ত দেহ থরথর করে কাঁপছে।

ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলাম, তোমার শরীর খারাপ লাগছে, মেজদি।

মেজদি আস্তে আস্তে বলল। তুই ঘরে চল বলছি।

দেখলাম মেজদি অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সেজদার ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিলাম।

—কি হয়েছে বল।

মেজদি ফিস ফিস করে বলল, আজ সারাদিন বাড়ীতে খুব গোলমাল হয়েছে।

—কি নিয়ে? কেন?

—বৌদি তোর নামে অনেক কিছু বলেছে।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল দপ্ করে। কি বলেছে?

মেজদি আমার চেহারা দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল। দেখিস তুই যেন আবার চেঁচামেচি করিস না।

—কি বলেছে, বৌদি।

মেজদি আরও গলা নামিয়ে দেয়, তুই যেখানে টিউশানি করতে যাস, বৌদি সেখানে খবর নিয়ে জেনেছে তুই নাকি সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছিস তিন মাস আগে।

—তাতে কি হোল?

বৌদি আমাদের জিজ্ঞেস করছিল, তুই টাকা পাস কোথায়।

—যেখানেই পাই, ওর তাতে কি। ওদের টাকার দরকার, প্রত্যেক মাসে আমি টাকা দিই, ব্যস ফুরিয়ে গেল সম্পর্ক, কি করে পাই, কোথা থেকে পাই অত কৈফিয়ৎ দিতে যাব কেন?

রাগের মাথায় আরও কি বলতাম জানি না, মেজদি থেমে যেতে আমিও চুপ করে গেলাম, দেখলাম ওর চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ছে। কাছে নিয়ে বল্লাম, তুমি কাঁদছ কেন?

—আমার বড় ভয় করে।

—কিসের ভয়?

—তুই যদি এখান থেকে চলে যাস।

সহজ হবার চেষ্টা করে জবাব দিলাম, যদি যেতেই হয় একলা যে যাব না সে তো তুমি ভাল করেই জান।

—তা জানি।

মেজদি শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে দ্বিধাজড়িত গলায় বলে, তবু তুই বল, বৌদি যা বলছে সব মিথ্যে।

—কি মিথ্যে।

—এসব টাকা তুই, মেজদি থেমে যায়।

আর আমার বুঝতে বাকী থাকে না, বৌদি ওকে কি বুঝিয়েছে, নিমেষের মধ্যে আমার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। একসঙ্গে শরীর মন কঠিন হয়ে উঠল, তীক্ষ্ণ

কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তুমিও কি তাই বিশ্বাস কর মেজদি?

মেজদি ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না আমি করি নে।

—তবে আর আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছিলে কেন? এই বাঁদরীর গালে একটা সজোরে চড় বসিয়ে দিতে পারলে না?

মেজদি ভয়ে ভয়ে উঠে এসে, আমাকে থামাতে চায়, আর বলিস না চুপ করে অনু। তখনও আমি থামি না, নিজেদের ঘরে গোলমাল না থাকলে কারুর এরকম জঘন্য সন্দেহবাতিক হয়।

এতক্ষণে মেজদির নজরে পড়ল আমার ভিজে জামা-কাপড়ের দিকে,

ছাতাটা নিয়ে যান

—চুপ, চুপ, ওরা শুনতে পাবে।

আমি গলা না নামিয়েই বল্লাম, শুনতে পেলেও আমার সামনে ও প্রসংগ তুলবে না। ওদের বাড়ীর হাঁড়ির খবর সবই আমি জানি। ওর নিজের পিসি পালায় নি বাড়ী-ঘর ফেলে নিজেদেরই কোন্ এক আত্মীয়ের সংগে।

বলল, একি সর্বনাশ যা, যা, শিগ্‌গীর ছেড়ে ফেল, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হবে যে।

সারাদিন ঘুরে আর বৃষ্টিতে ভিজে শরীর মন দুই-ই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, তার উপর বাড়ীতে ঢুকে থেকে এই চেঁচামিচির মধ্যে পড়ে আমার মন এক বিরক্তিকর অবসাদে ভরে গেল। কোনরকমে জামা-কাপড় বদলে ভিজে চুল খুলে বিছানায় বসে পড়লাম। মনে হল এই মুহূর্তে যদি বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারতাম। ঘরের দেয়ালগুলো যেন আমায় গিলতে আসছে। এই সংকীর্ণতার মধ্যে আমি বেঁচে থাকব কি করে?

মেজদি বুঝি জিজ্ঞেস করল, খাবি না?

বল্লাম, না। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। উঃ, বিছানাটা যেন আমার গায়ে ফুটছে। মাথার নীচে বালিশ নয়, থান ইঁট। আমাকে কি ওরা সেই স্বপ্ন-দেখা ছেলেটার মত পাগল করে দিতে চায়। না জোর করে দত্তবাড়ীর বউ সাজিয়ে তামাসা দেখার মতলব। না, আমি লড়ব, শেষদিন পর্যন্ত একলা যুদ্ধ করে যাব, যদি না পারি—

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, অনুভব করলাম, মেজদি আমার কপালের উপর তার শীর্ণ হাতখানা রেখেছে। অকারণে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বাধা না মানা চোখের জল।

মনে হল মেজদির গলা যেন দূরে থেকে ভেসে আসছে, একে একে আমার জীবনের সব আলোগুলোই যে নিভে গেল রে অনু, তুই ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। তাই এই সব গোলমালে কেমন যেন ভয় পেয়ে যাই, বিশ্বাস কর, এ শুধু তোকে হারাবার ভয়।

মেজদির হাতখানা আমি বুকের উপর টেনে নিলাম, মুখে দিয়ে কোন কথা বলতে পারলাম না, কিন্তু হৃদয়ের স্পন্দন দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমি তো তোমারই মেজদি।

জানি না মেজদি সে কথা বুঝতে পারল কিনা, কিন্তু আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে চুলের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে আগের মতই ধীর স্বরে বলল, বাবা আমায় বলতেন এমন সব কাজ করবি মেজো যাতে আমার বুক গর্বে ফুলে ওঠে, আমি তো কিছুই পারলাম না অনু, কিন্তু আমি জানি তুই পারবি। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি তুই সুখী হবি, ভগবান তোর মঙ্গল করবেন।

সে রাত্রে কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুই বোনে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম জানি না, শুধু এইটুকু উপলব্ধি করেছিলাম সংসার যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন অন্ততঃ একজনের কাছ থেকেও সত্যিকারের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা পেলে মানুষ তার সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। (ক্রমশঃ)

।। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী বিমান ।।

বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুভূত হচ্ছে। বিমান-চলাচলের ক্ষেত্রেও প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে যন্ত্রবিজ্ঞানের। আজ তোড়জোড় চলছে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে যাত্রীবাহী বিমান চালাবার। সে বিমানের নকসা পরিকল্পনাও তৈরী হয়েছে এবং হিসাবমত কাজ চললে আগামী দশকেই মানুষ শব্দের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে পৃথিবীর এক-প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করবে। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, মানুষ এই গতির ধকল সইতে পারবে কিনা? এর জবাব দিয়েছেন বোয়িং এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট কোম্পানীর এভিয়েশন মেডিসিন বা ভেষজ বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ ডোনাল্ড এইচ স্টারিং

তিনি বলেছেন, অসামরিক বিমান-চলাচলের যে ধকল তার চেয়ে বেশী কিছু সইতে হবে না শব্দের চেয়ে দ্রুত-গামী বিমানে। ডাঃ স্টারিং-এর মতে প্রথমদিকে যে সমস্ত শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান চলাচল করবে তাদের গতি হবে ঘণ্টায় ৩,৫০০ মাইল অর্থাৎ শব্দের গতির তিন গুণ। প্রায় ৭৫ হাজার ফুট উচ্চতায় চলাচল করবে এইসব জেটবিমান।

চিকিৎসকদের এক সভায় ডাঃ স্টারিং জানান যে, শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতেই বিমান চলাচলে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে এই শব্দাতীত গতিবেগ সৃষ্ট প্রচণ্ড আওয়াজ। একসঙ্গে দুটি বজ্র-পাত হলে যে প্রচণ্ড আওয়াজের সৃষ্টি হয়, এই শব্দাতীত দ্রুতগামী বিমান-নিঃসৃত শব্দতরঙ্গের আওয়াজ হবে প্রায় সে রকমের। অতএব এই দ্রুতগামী বিমান-চলাচল-ব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করছে মানুষের এই সম্পূর্ণ নতুন পরিবহন-ব্যবস্থা মেনে নেবে কিনা এবং এই বিকট আওয়াজ সহ্য করবে কিনা তার উপর। এই আওয়াজই হল এই বিমান-চলাচলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

ডাঃ স্টারিং আরও জানান যে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের যে তারতম্য তা নিয়েও খানিকটা মুস্কিল হবে যাত্রীসাধারণের, জীবনযাত্রা-প্রণালীতে সামঞ্জস্য করে নিতে হবে তাদের। এই-সব বিমানের শব্দাতীত দ্রুত গতিবেগের ফলে বর্তমানের অর্ধেকেরও কম সময়ে যাত্রীরা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহা-দেশে উপনীত হবে। ব্যাপারটা হবে প্রায় এইরকম, একটি জেটবিমান সকাল আটটায় আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকে যাত্রা করে মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় ইটালীর রোমে পৌঁছুবে অর্থাৎ হিসাবমত দুপুর ১টা নাগাদ পৌঁছবার কথা। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যাবে রোমে বিমানটি পৌঁছুচ্ছে রাত দশটা নাগাদ। এটাও মুস্কিলের কথা। এজন্যে যাত্রীদের আগে থেকে ভেবেচিন্তে হিসেব করে যাত্রার সময় স্থির করতে হবে।

বিমান-চালাবার লোকজনদেরও নানারূপ অসুবিধা হবার সম্ভাবনা। প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যে ঠিকমত বিমান-চালাবার জন্য নানারকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম বসাতে হবে, রদবদলও করে নিতে হবে অনেক কিছুর। এই ধরনের বিমান-চলাচলের ক্ষেত্রে সব-কিছুর পরিকল্পনা আগেভাগে করে নিতে হবে, এমন কি বিমানযাত্রা করবার পূর্বেই হয়ত গন্তব্যস্থলে অবতরণের ব্যবস্থাদি করে নিতে হবে।

শব্দাতীত দ্রুতগামী জেটবিমান-গুলি উড়বে অনেক উঁচুতে। এ কারণেই বিমানের কেবিনে চাপের সমতারক্ষার ব্যবস্থায় কোনরূপ গোলযোগ ঘটলে অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এ রকম ব্যবস্থাও বিমানে রাখা প্রয়োজন। খুব উঁচুতে সামান্য-ক্ষণের জন্য যাতে কেবিনের চাপ-ব্যবস্থা নষ্ট না হয় সে রকম ব্যবস্থা রাখা দরকার।

।। বিশ্বপঞ্জিকার কল্পনা ।।

ব্রেসেনের এক ঘড়ির দোকানের কাঁচের জানালায় পথচারীরা ভিড় করে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। উদ্দেশ্য একটি ঘড়ি। এমনিতে দেখতে সাধারণ হলেও ঘড়ির মুখটা খুবই আকর্ষণীয় কারণ তার রুপোলী রঙকরা দুটো ডায়াল, একটা রঙীন ভাগ যেটা রাতের আকাশের প্রতীক হিসাবে চাঁদের বিভিন্ন কলা দেখায় এবং আর একটি ঘুরন্ত সোনালী চাকা ঠিক রাশিচক্রের নীচে। ঘড়িটি কি সাধারণ লোক কি বিশেষজ্ঞ সকলেরই ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছে। ঘড়িটাতে এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও নির্ভুল সময় দেখা যায়। এটিই প্রথম এবং এক-মাত্র ঘড়ি যেটিতে জাতিপুঞ্জের পরি-কল্পনা অনুসারে নতুন পঞ্জিকাধারা দেখানো হয়েছে। এই নতুন পঞ্জিকাধারা জাতিপুঞ্জ ১৯৬৭ সালে বিশ্বের সমস্ত দেশে প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করেছে।

"এই ঘড়িটি হচ্ছে আমার জীবনের কর্ম এবং আমার ভাগ্য, এটি ছাড়া আমার জীবন অন্য দিকে মোড় নিত", বলেছেন আটত্রিশ বছর বয়সের হ্যান্স লাঙ্গ যিনি ঘড়ির কাজ শুরু করেছিলেন পূর্ব জার্মানীর ড্রেসডেনে ও সমাপ্ত করেছেন পশ্চিম জার্মানীতে এসে। মোট ৩,৫০০ ঘণ্টার বেশী অতি মনো-যোগের সঙ্গে খেটে তি[illegible] ঘড়িতে ১২৮টি ক্ষুদ্র চাকা, [illegible] দাঁত-ওয়ালা চাকা, নটি [illegible] ফের বন্ধ করার জ[illegible] সুইচ এবং গতি এক[illegible] দুটি সিমক্রোমোটর লাগিয়েছে[illegible]।

হ্যান্স লাঙ্গ ড্রেসডে[illegible] কারি-গরদের কলেজে প[illegible]। এ[illegible] আশ্চর্য ঘড়ি তৈরীর জন্যে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। জ্যোতিষে তিনি খুব আগ্রহী। ১৯৫৫ সালে তাঁর অসমাপ্ত ঘড়ির বিভিন্ন অংশ পকেটে ও কয়েকটি থলিতে পুরে তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম জার্মানীতে চম্পট দেন। এখানে পৌঁছে তিনি আবার তাঁর ঘড়িটি নিয়ে পড়েন ও ১৯৫৯ সালে সম্পূর্ণ করেন।

পৃথিবীর বহু জায়গায় অনেক অদ্ভুত ঘড়ি আছে বটে, কিন্তু হ্যান্স লাঙ্গের তৈরী ঘড়ির পিছনে শুধু অসাধারণ ও আশ্চর্য ইতিহাস ছাড়া এটিতে জ্যোতিষের ও পঞ্জিকা সম্বন্ধে বহু খবর পাওয়া যায়। দিনের সময় সপ্তাহের দিন, মাস ও ঋতু ছাড়াও চন্দ্রের বিভিন্ন কলা, সূর্যের ক্রান্তি, চন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের নাক্ষত্রিক অবস্থান, চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ ইত্যাদি এই ঘড়ি থেকে জানা যায়। এইসব এই ঘড়িটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এই কীর্তির সমস্ত সম্মান হ্যান্স লাঙ্গের প্রাপ্য।
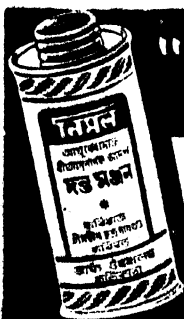
বাঙালী ঘরকুনো জাত। ঘর ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতেই তার আপত্তি। তাই মঘা, ত্রয়োস্পর্শ, দিকশূলের বাধা এড়িয়েও হাঁচি টিকটিকির হুকুম মেনে চলতে হয় তাকে। এ ছাড়াও,

শূন্য কলসী শুক্না না'
গাছের ডালে ডাকে কা
যদি দেখ মাকুন্দে চোপা,
এক পা না যেও বাপা।

শূন্য কলস আর কাকের ডাকের চেয়েও শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন সাবালক পুরুষ বিপজ্জনক লাল সংকেত।

কিন্তু কুসংস্কারের ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশও বড় কম যায় না। সংখ্যার মধ্যে ত্রয়োদশের দুর্ভাগ্য সুবিদিত। একই দেশলাই কাটি থেকে তৃতীয় জনের সিগারেট ধরানোর পরিণাম মারাত্মক। শ্রীষ্টমাস পর্বের আগের সন্ধ্যায় সেঁকা রুটি কখনই নাকি খারাপ হয় না। কালো বেড়াল সৌভাগ্যের প্রতীক। অ্যালবাট্রস্ পাখি সমুদ্রের হাওয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরণের সব সংস্কার ওদেশের মাটিতে গজিয়ে দিব্যি ডালপালা ছড়িয়ে বেঁচে আছে। সারা পৃথিবীময় যে কত কুসংস্কার প্রচলিত তার ইয়ত্তা নেই। মানুষ যে মানুষের ভাই তা অন্তত কুসংস্কারের বহর দেখে বোঝা যায়।

প্রথমে মেয়ে জন্মালে যাদের মন খারাপ হয়ে যায় তাদের জন্য ইংরেজদের সান্ত্বনার বাণী আছে। প্রথমে মেয়ে এল মানেই জীবনটা ভালভাবে শুরু হল। নয়তো ফার্স্ট এ সন্ দেন এ ডটার, ট্রাব্‌ল ফলোজ আফটার্।

বিয়ের কনের সখি হতে কার না আপত্তি। কিন্তু দোহাই, পর পর তিন-বার ব্রাইড্‌স্ মেড্ হয়ো না। জীবনে তাহলে আর বিয়ের পিঁড়েয় বসতে হবে না।

একই শহরে বিবাহিত য়িহুদী তিন ভাইকে বাস করতে নেই। সেই জন্যেই হয়তো য়িহুদীরা যাযাবরে জাত।

বেড়াল আমাদের দেশে মা ষষ্ঠীর বাহন। বেড়াল মারলে সমান ওজন নুনের সঙ্গে তাকে মাটি চাপা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ম্যাসিডোনিয়ার লোকদেরও বিশ্বাস বেড়ালকে মেরে ফেললে সে-লোকের এখনও সুদিন আসে না। জার্মানরা দুর্ধর্ষ বীর, কিন্তু যাত্রাকালে একটা বেড়ালকে সামনে দিয়ে রাস্তা পার হতে দেখলে অনেক বীরশ্রেষ্ঠেরও মন খারাপ হয়ে যায়। এর মানেই হচ্ছে পথে নানা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট তার পেছু নেবে।

ঘুম থেকে উঠেই সম্মার্জনী দেখতে চায় না কেউ। কেউ দেখলে আমরা ধরে নিই তার দিনটা ভাল যাবে না। জিনিসটা সোজা দাঁড় করিয়ে রাখাও সমীচীন নয়। এর মানেই গৃহবিবাদ ডেকে আনা। সম্মার্জনী প্রয়োগে ভূত তাড়ানোর ব্যবস্থা তো রয়েছেই। এ জিনিসটা আবার ওদেশে পেত্নীদের বাহন। ডাইনীরা নাকি সম্মার্জনীর প্লেনে চড়ে শূন্যে হাওয়া খেয়ে বেড়ান। চন্দ্রলোকেও যান কিনা জানা নেই তবে এই বাহনে চড়ে এর, ওর, তার মন্দ করে বেড়ানো ওদের স্বভাব। তাই ওদের দেশে সদর দরজায় দুখানি ঝাঁটা আড়া-আড়িভাবে রেখে গৃহস্থ এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয় যে অপদেবতা আর ও-বাড়ীমুখো হবে না। হাম্বুর্গের লোকদের বিশ্বাস, সমুদ্রে অনুকূল হাওয়া পেতে হলে জাহাজের সামনের দিকে একটি সম্মার্জনী ছুঁড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ওদের আরও একটা প্রচলিত বিশ্বাস খাবারটেবিলের ধুলো কখনই ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়তে নেই তাহলে পরি-বারের কেউ নির্ঘাৎ মারা যাবে। এ কুসংস্কারটি অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়।

আলো অন্ধকারের শত্রু। আলো দেখলে চোর ছ্যাঁচোড়ই নয়, অপদেবতাও পালায়। আর সর্বদেশে, সর্বকালে ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে নয়তো আবছা আলো-আঁধারি রাতে ভূত প্রেতের আনা-গোনা। ব্রহ্মদৈত্য থেকে হ্যাট্‌কোট পরা সাহেব ভূতেরাও দিনদুপুরের কট্‌কটে রোদ পছন্দ করে না। আলোর চেয়ে অন্ধকারেই বেশী আরাম বোধ করে। হ্যামলেটের বাবা ছেলেকে সব কথা জানাতে রাত বারোটার পরের সময়ই বেছে নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও আলো আর আগুন নিয়ে সব দেশেই নানা কুসংস্কার রয়েছে। শ্মশান থেকে ফিরে আগুন-ছুঁতে হয় এদেশে। ওদেশে খুব ধার্মিক লোকের কবরে নাকি আলো দেখতে পাওয়া যায়। এক ঘরে তিনটে আলো জ্বালতে নেই এই রকম আরো কত কী। শুভ ব্যাপারেও আলোর সংকেত। কুমারী মেয়ের সম্মুখে একই সারিতে যদি তিনটে বাতি জ্বলে তাহলে

সম্মার্জনীর প্লেনে চড়ে…

কিন্তু অপ্রিয় সত্যবাদী এই বন্ধুটি সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার।

ধীরস্থিরেরও মন খারাপ হয়ে যায়

বুঝতে হবে তার বিবাহ আসন্ন। রাত এগারটার অন্ধকারে গীর্জার কবর খুঁড়ে মৃতদেহের পোষাক পরতে পারলে নাকি অদৃশ্য হওয়া যায়। তবে রাত বারোটার মধ্যেই ঝটিতি সব কাজ সারতে হবে। অবশ্য অদৃশ্য হতে চাইলে আরও অনেক তুকতাকের ব্যবস্থাপত্র আছে। আলেকটোরিয়া পাথর খুঁজে পেলে অদৃশ্য হওয়া যায়। দৈবাৎ বাদুড়ের ডান চোখ পেয়ে গেলে তখনই ওয়েস্টকোটের পকেটে পুরে নেবে। তাহলে আর ভাবনা নেই। শহরের সব সিনেমা হাউসেই ফ্রি পাশ পেয়ে গেলে। ম্যাটিনি, ইভনিং, নাইট সোর যেটাতে যখন খুশি ঢুকে পড়, গেটম্যানদের নাকের ডগা দিয়েই। না, কেউ দেখতে পাবে না।

এবারে দর্পণ প্রসঙ্গে আসা যাক। আরশি বড় মারাত্মক জিনিস। যৌবনের সুদিন যে আর নেই একথা আরশিতে ফুটে ওটা রূপোলী চুলই প্রথম জানিয়ে দেয়। সত্যকথা জানানো বন্ধুর কাজ।

একখানি আরশি ভেঙে ফেললে পর পর সাত বছর দারিদ্র্যের ঘানি টানতে হবে। তখন সাত বছর ধরে প্রতিদিনই মাসের শেষ দিন। আরশি যদি আপনা থেকেই দেওয়াল থেকে খসে পড়ে ভাঙে তাতেও রক্ষা নেই। বুঝতে হবে সামনেই সমূহ বিপদ। অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর হাত থেকে ভাঙলো তো তাদের অদৃষ্টে বিবাহ নেই। বিবাহ হলেও বিচ্ছেদ ঘটবে। তবে একখানি ভাল দামী আরশি ভেঙে ফেললে বিবাহিত দম্পতির মধ্যেও যে বিচ্ছেদের সূচনা দেখা যায় এ একেবারে বিজ্ঞানসম্মত সত্য। সে যাই হক আরশি দিয়ে সংকাজও পাওয়া যায়। বাইরে দারুণ শিলাবৃষ্টি কি ঝড় শুরু হয়েছে, যমন্ত লোকের নাকের ডগায় আরশি ঝুলিয়ে দাও অমনি ঝড় তুফান সব ঠাণ্ডা হয়ে থিতিয়ে যাবে।

আমাদের ভাগ্যের ফাইল নিয়ে টিকটিকিরাও নাড়াচাড়া করে। জানি না সেই জন্যই গুপ্তচরদের টিকটিকি বলা হয় কি না! যাত্রাকালে এই টিকটিকিরা যেমন বাগড়া দিতে ওস্তাদ, তেমনি আমাদের মুখের ন্যায্য কথা শুনলে ওরা জিভ দিয়ে বাহবার হাততালি বাজায়। জনশ্রুতি, কোন কোন দেশে লোকের ধারণা, যে মেয়ের হাতের ওপর দিয়ে টিকটিকি চলে যাবে লেডি রেবোর্ণ ট্রেণিংয়ের পয়লা সার্টিফিকেট নির্ঘাৎ তার ভাগ্যে। তবে মাথায় পড়ে তিনবার ডাকলে তখন কোনো কিছুরই পরোয়া নেই। একেবারে রাজা।

তবে ডেমোক্র্যাসীর যুগে টিকটিকিরাও সেয়ানা হয়ে গেছে। মাথায় যদি বা পড়ে, ডাকবার নামটি নেই। পড়েই সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়।

সব শেষে একটা কথা মনে করিয়ে দিই। বন্ধুকে যত খুশি দেদার উপহার দেওয়া চলে। বই, ফাউন্টেনপেন, ঘড়ি, ফুলদানী থেকে চাই কি আস্ত একখানা মোটরকার দিলেও আপত্তি নেই। কিন্তু খবরদার, ক্ষুর কাঁচি

ডাকবার নামটি নেই

ছুরি জাতীয় জিনিস কখনই দিতে নেই। এই সব শানানো অস্ত্র উপহার দেওয়া মানে সেই মুহূর্তেই ভালবাসার মায়ার বাঁধনটি কেটে ফেলা। কোন কারণেই এ রকম জিনিস দেওয়া চলবে না।

তবে ক্ষুর কাঁচির চেয়েও টাকা ধার দেওয়া নাকি বেশী ধারালো।

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। সাত ।।

পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত গেল। আমরা যারা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, একে একে সবাই ফিরে এলাম। উপাসনা-মন্দিরে আমাদের একত্র হতে হবে। গুরুজী আজ বিষ্ণুর পরিচয় দেবেন।

চেনেলু আজ আমার পাশে এসে বসল। গুরুজী এলেন সকলের পরে। বললেন :

উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং
গদাং পঙ্কজং
চক্রং বিভ্রতমিন্দিরা-বসুমতী
সংশোভি পার্শ্বদ্বয়ং।
কোটিরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং
কৌস্তুভো-
দ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি
লসচ্ছ্রীবৎসচিহ্নং ভজে।

এই হল বিষ্ণুর ধ্যান। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর এক হাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খ, আর এক হাতে সুদর্শন চক্র। তৃতীয় হাতে কৌমোদকী গদা, পদ্ম চতুর্থ হাতে। মণিবন্ধে স্যমন্তক মণি, ভুজমধ্যে কৌস্তুভ, ও বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন। অসির নাম নন্দক, শার্ঙ্গ ধনু, বিনতানন্দন গরুড় তাঁর বাহন। তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠ, শয্যা অনন্ত। লক্ষ্মী স্ত্রী, কামদেব পুত্র। মতান্তরে তাঁর দুই স্ত্রী—লক্ষ্মী ও সরস্বতী। বিষ্ণুর সঙ্গে এই কয়েকটি নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

বিষ্ণুর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা মত ব্যক্ত হয়েছে। মৎস্য পুরাণে এক কথা, বরাহ পুরাণে অন্য কথা, কূর্ম ও অগ্নি পুরাণে আবার অন্য রকমের কথা। আপাতদৃষ্টিতে এইসব মতে প্রভেদ আছে, কিন্তু আসলে নেই। আসলে সেই স্বয়ম্ভুকেই স্বীকার করতে হয়েছে। কোন অদৃশ্য শক্তির সৃষ্টির বাসনা থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ব্রহ্ম, না নারায়ণ, না অন্য কিছু, সে কথা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। তিনি অত্যন্ত তৎপরভাবে কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। গুরুজীর কথাই নিশ্চয় টুকছিলেন।

আমি চেনেলুর দিকেও তাকিয়ে দেখলুম। তার চোখ ছিল অন্যদিকে। আমার দৃষ্টি তার উপর পড়তেই সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গুরুজী বললেন : সেদিন বিষ্ণুর কথা কিছু বলেছি। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর পরিচয়ের কথা। বিষ্ণুর নামে একখানি মহাপুরাণ আছে। নানা গল্প আছে নানা পুরাণে। সে কথা আজ বলব না। পুরাণগুলি সকলেরই একবার পড়ে নেওয়া উচিত। ভয় নেই। সমস্ত ভাষাতেই পুরাণের অনুবাদ আছে।

আমার মনে পড়ল, আমিও একখানি পুরাণের বাঙলা অনুবাদ দেখেছি। মূলে সংস্কৃত ও বাঙলা অনুবাদ দুইই এক গ্রন্থে আছে। যাঁরা সংস্কৃত জানেন না, তাঁরা শুধু বাঙলাই পড়তে পারেন।

গুরুজী বললেন : আজ দশাবতারের গল্প বলি। অবতার কথাটা এসেছে অবতরণ থেকে। পৃথিবীর সংকটকালে বিষ্ণু বারে বারে নানা রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এইসব রূপের নাম অবতার। এ যাবৎ নয়টি অবতার হয়েছে, দশম অবতার এখনও বাকি। সে কল্কি অবতার। কলির শেষ পাদে কল্কি আবির্ভূত হবেন। সে কাহিনীতে লেখা হয়ে আছে কল্কি পুরাণে। প্রথম গল্প মৎস অবতারের।

কল্প দিয়ে পৌরাণিক কালের গণনা। বর্তমান কল্পের নাম শ্বেত বরাহ কল্প। শাসন বৈবস্বত মনুর। ইনি সপ্তম মনু। প্রলয়ের পূর্বে ইনি দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন। এই রাজা অযুত বৎসর কঠিন তপস্যা করেছিলেন। প্রথমে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে, পরে অধোমস্তকে অনিমেষ নয়নে। একদিন যখন তিনি কৃতমালা বা তমসা নদীতে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিতে একটি সফরী উঠল। রাজা এই পুঁটি মাছটি জলে ফেলে দিতেই সেই মাছ মানুষের মতো বলে উঠল, রাজা, প্রাণের ভয়ে আমি আপনার অঞ্জলিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে ফেলে দিলেন? এখানে যে হাঙরে মকরে কুমীরে আমাকে খেয়ে ফেলবে।

দয়ালু রাজা বললেন, সত্যিই তো। তারপরেই আবার অঞ্জলিতে তুলে নিজের কলসীর ভিতর মাছটি রাখলেন। নিয়ে এলেন নিজের আশ্রমে।

এক রাত্রে সেই মাছ এমন বড় হল যে কলসীতে আর ধরে না। রাজা তাকে কূপে বা মণিকচ্ছ জলে নিক্ষেপ করলেন। সেই জলে পড়েই মাছের আকার হল তিন হাত। রাজা তাকে সরোবরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সে আরও বিরাট হল, এবং রাজার কাছে আরও বড় জায়গা প্রার্থনা করল।

বিস্ময়াপন্ন রাজা তাকে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু সেই পুঁটি মাছ এমন বাড়ছে যে কোথাও তার স্থান কুলোচ্ছে না।

সুপ্তির দিকে চেয়ে আমি দেখলাম যে কৌতুকে তার দু চোখ নাচছে। চেনেলুও কৌতুক বোধ করেছে। গুরুজী না হয়ে আর কেউ একথা বললে তারা সরবে হেসে উঠতো। কিন্তু গুরুজীর সামনে হাসতে সাহস পেল না।

গুরুজী বললেন : রাজা যখন তাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন মাছ বলল : রাজা, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আপনি আমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে গেলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। সমুদ্রের জন্তু আমাকে খেয়ে ফেলবে।

রাজার মনে তখন সংশয় জেগেছে। এতো মাছ নয়, এ নিশ্চয়ই নারায়ণ এসেছেন তাঁকে ছলনার জন্যে। রাজা বললেন, প্রভু, আমি তো তোমার দাস,

আমার কাছে তোমার এ মায়া কেন? তোমার আদেশ আমাকে বল।

মৎস্য স্বীকার করলেন যে তিনি নারায়ণ, মহাপ্রলয়ের সময় সৃষ্টিরক্ষার জন্য উপদেশ দিতে তিনি এসেছেন। বললেন : সাতদিন পরে প্রলয়পয়োধি জলে পৃথিবী হবে নিমগ্ন। তার আগে, হে রাজা, তুমি সমস্ত বীজ ওষধি, প্রাণী মিথুন ও ঋষিদের নিয়ে একত্র হবে। প্রলয়ের জলে আমি একটি বিরাট নৌকা পাঠাব। তোমরা সেই নৌকায় আরোহণ করে আমার অপেক্ষা ক'রো।

তাই হল। রাজা সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে সমুদ্রের তীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঘন মেঘে আকাশ হল অন্ধকার। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। সমুদ্রের জল পাহাড়ের মতো ফেঁপে উঠল। আর তরঙ্গে ভেসে এল সেই বিশাল তরণী। সকলের সঙ্গে রাজা সেই নৌকায় উঠে বসলেন।

তারপর পৃথিবী ডুবে গেল, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। এক সময় শৃঙ্গযুক্ত সুবর্ণময় মহা-মৎস্যের আবির্ভাব হল। রাজা মহা-সর্পের রজ্জু দিয়ে মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধলেন। মৎস্য হিমালয়ের দিকে উজিয়ে চলল।

এই সময়ে মৎস্য পুরাণের জন্ম। মৎস্যের মুখে রাজা সাংখ্যযোগ ও আত্মতত্ত্ব শুনলেন।

হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ তখনও জলের উপরে জেগে আছে। সেই শৃঙ্গে রাজা নৌকা বাঁধলেন। প্রলয়ের অবসানে দেখা গেল, তাঁরই নৌকায় সৃষ্টি রক্ষা পেয়েছে।

চেনেলু আস্তে আস্তে বলল : এ যে নোয়াজ আর্কের গল্প!

আমি মাথা নাড়লাম।

চেনেলু বলল : হ্যাঁ, না, না বলছ?

বললাম : হ্যাঁ।

চেনেলু বলল : আমাদের পুরাণ খুবই প্রাচীন রচনা। কাজেই আমাদের পুরাণ থেকেই তারা নোয়ার নৌকোর কল্পনা পেয়েছে।

আমি মাথা নাড়ালাম।

চেনেলু বলল, হ্যাঁ, না, না বলছ?

বললাম : না।

না মানে?

আমাদের পুরাণ তারা পড়েনি।

তবে?

একই গল্প কি দুজনের মাথায় আসে না?

চেনেলু তর্ক না করে আমার কথাই মেনে নিল। গুরুজী তখন দ্বিতীয় অবতারের কাহিনী শুরু করছেন।

।। আট ।।

গুরুজী বললেন : দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। মৎস্য অবতারের মতো এ কোন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় নয়, এ দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনের গল্প। কেন এই প্রয়োজন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

গল্প শুনতে আমাদের ভাল লাগে। সমুদ্রমন্থনের গল্পও আমাদের জানা আছে। কিন্তু সে জানা সম্পূর্ণ নয়। আমি চেনেলুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে সেও কৌতূহলী হয়েছে।

গুরুজী বললেন : একদিন দুর্বাসা মুনি সন্তানক বনে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে বিদ্যাধর-বধূরা পারিজাতের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা করেন। তারপর ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা। দুর্বাসা সেই মালা ইন্দ্রকে উপহার দিলেন। কিন্তু ইন্দ্র নিজের গলায় পরলেন না, ঐরাবতের কুম্ভের উপর রাখলেন। পারিজাতের গন্ধ পেয়ে ঐরাবত শুঁড় দিয়ে মালাটি নামাবার চেষ্টা করল। মালা মাটিতে পড়ল। তাঁর মালার এই দুর্দশা দেখে ক্রোধে দুর্বাসা অন্ধ হলেন। বললেন : তোমার কিসের অহংকার বাসব? আজ থেকে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, তোমার স্বর্গ হবে শ্রীহীন।

চেনেলু আমাকে আস্তে আস্তে বলল : পারিজাত তো শুনেছি সমুদ্র-মন্থনে উঠেছিল?

বললাম : পারিজাতের কথা জানিনে, ঐরাবত উঠেছিল।

তবে?

সমুদ্রমন্থনের আগে এসব কোথা থেকে এল। এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

গুরুজী বললেন : দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীদেবী স্বর্গ ও ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করে পাতালে বরুণালয়ে নেমে গেলেন।

চেনেলু বলল : বিপদের কথা।

কথা না বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

চেনেলু বলল : লক্ষ্মীদেবী তো বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণুর বউ। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ?

কঠিন প্রশ্ন।

আমরা যে কথা বলছিলাম, গুরুজী বোধহয় দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন : কোন প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন করবার সাহস আমার হল না। আমি চেনেলুর মুখের দিকে তাকালাম।

চেনেলু বলল : লক্ষ্মী তো বিষ্ণুর স্ত্রী। তিনি পাতালে প্রবেশ করলে ইন্দ্রের কী শাস্তি হল?

গুরুজী হেসে বললেন : ভাল প্রশ্ন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর স্ত্রী, কিন্তু জগতে তিনি সকল শ্রীসম্পদ সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি ত্যাগ করলে শুধু সম্পদ নয় সৌভাগ্যও গেল। আর একটি কথা মনে রাখবার মতো। এই লক্ষ্মী ত্রিমদুর্গার কন্যা নন। মহর্ষি

ভৃগু এই লক্ষ্মীর পিতা, এবং দক্ষ-কন্যা খ্যাতি তাঁর মাতা।

আমার আবার সব এলোমেলো হয়ে গেল। আমি জানতাম, লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোনেরই বিষ্ণুর সংগে বিবাহ হয়েছিল। পুরাণে তাহলে কজন লক্ষ্মী! গুরুজীকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস আমার ছিল না। তাই আমি নীরব হয়ে রইলাম।

গুরুজী বললেন : এই লক্ষ্মীকে উদ্ধারের জন্যই সমুদ্রমন্থনের প্রয়োজন হল। দেবতারা শ্রীহীন হয়েছেন, যাগযজ্ঞ লোপ পেয়েছে। অসুরেরা পরাক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করল। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক দেবতারও প্রাণ গেল। অনেক ভেবেচিন্তে ইন্দ্র পবন বরুণ চন্দ্র প্রভৃতি প্রধান দেবতাদের নিয়ে সুমেরুশিখরে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হলেন।

পুরাণে ব্রহ্মার একটি মাত্র কাজ। এই রকম বিপদে তিনি দেবতাদের নিয়ে বিষ্ণুর নিকটে যান এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু সাহায্য করেন অবতাররূপে। এবারেও বিষ্ণু বললেন : ভাল কথা। আমি তোমাদের সাহায্য করব, কিন্তু তোমরা অসুরদের সংগে সন্ধি কর। তাদের সাহায্যের দরকার আছে।

শত্রুর কাছে আবার সাহায্য কিসের!

বিষ্ণু বললেন, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে অমৃতের দরকার। সমুদ্র-মন্থন করে অমৃত পাওয়া যাবে। প্রথমে সমস্ত ওষধি ও লতাপাতা ক্ষিরোদ সাগরে নিক্ষেপ কর। মন্দর পর্বতকে কর মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু। তোমরা একদিকে ধর, আর একদিকে অসুরেরা ধরুক। পৃথিবী যাতে এই মন্থনের বেগে রসাতলে না যায়, তার জন্যে কূর্মরূপে আমি মন্দরকে ধারণ করব।

দেবতারা বললেন, তথাস্তু।

বিষ্ণু বললেন, আর একটা কথা। মন্থনের সময় যে সমস্ত জিনিস উঠবে, তার প্রতি লোভ ক'রো না, অসুরদের সংগে বিবাদও ক'রো না। শুধু অমৃত নয়, কালকূটও উঠবে। তাতেও ভয় পাবার কিছু নেই।

তথাস্তু বলে দেবতারা বিদায় নিলেন।

তারপর ইন্দ্র গেলেন দৈত্যরাজ বলির কাছে। সমুদ্রমন্থনের প্রয়োজনীয়তা তাঁকে ভাল করে বোঝালেন। দুজনে সন্ধি হল। দেবাসুর মিলিত হয়ে সমুদ্রমন্থন করবে।

প্রথমে তাঁরা মন্দর পর্বত আনতে গেলেন। খুব ভারি পর্বত। মাঝরাস্তায় তা মাটিতে পড়ে গেল। পর্বতে চাপা পড়ে অনেক দেবাসুর মারা গেল। তখন বিষ্ণু এসে তাদের রক্ষা করলেন, আর মন্দরকে গরুড়ের পিঠে তুলে ক্ষীরোদ তীরে এনে নামিয়ে দিলেন। এবারে সমুদ্রের অনুমতি দরকার। অমৃতের ভাগ পাবেন, এই শর্তে সমুদ্র মন্থনের অনুমতি দিলেন।

বাসুকিকে রজ্জুর মতো মন্দরের গায়ে জড়ানো হল। বিষ্ণু বললেন, দেবতারা মুখের দিকে ধর, আর অসুরেরা লেজের দিকে। অসুররা ভাবল, তাদের প্রতি অবিচার হল। বলল, আমাদের জন্মকর্ম অপ্রশস্ত নয়, অস্ত্র-বিদ্যা শিখেছি, বেদাধ্যয়ন করেছি, তবে আমরা লেজের দিকে কেন ধরব! সাপের লেজ ধরলে যে অমঙ্গল হয়, সে কথা তো শাস্ত্রেই আছে।

বিষ্ণু হাসলেন। বললেন, তবে তোমরা মুখের দিকেই ধর। দেবতারা লেজের দিকে ধরলেন। মন্থন শুরু হল।

চেনেলু আমার দিকে চেয়ে বলল : কূর্ম ?

বললাম : সময়মতো নিশ্চয়ই আসবে।

গুরুজী বললেন : কিন্তু মন্দর পর্বত সমুদ্রের গর্ভে ডুবে যেতে লাগল। তাকে ধারণ করে এমন কোন আধার নেই। দেবতারা অসুরদের দিকে তাকালেন, অসুররা দেবতাদের দিকে। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণু কূর্মের আকার ধারণ করে মন্দরকে ধারণ করলেন। এবারে নির্বিঘ্নে মন্থন চলল।

প্রথমে উঠল সুরভী গাভী, মহর্ষিরা তার সেবার ভার পেলেন। সুরভীর ঘৃতে যজ্ঞ উদ্ধার হবে।

গুরুজী হঠাৎ থামলেন। খানিকক্ষণ পরে বললেন : পুরাণান্তরে সুরভীর উৎপত্তি বিষয়ে অন্য কথা আছে। প্রজাপতি দক্ষ অমৃত পানের পর যে উদ্গার তুলেছিলেন, তারই থেকে এই কামধেনুর জন্ম। সে যাক, তারপরে উচ্চৈঃশ্রবা উঠল। শাদা ঘোড়া। এই নিয়ে ইন্দ্র ও বলির মধ্যে বচসা দেখে বিষ্ণু বলিকেই দিলেন। পরে ইন্দ্র এই উচ্চৈঃশ্রবাকে পেয়েছিলেন। তারপরে উঠল চার দাঁতের ঐরাবত হাতী। ইন্দ্রের ভাগে পড়ল। একে একে অষ্ট দিগগজ অষ্টকরিণী পদ্মরাগ ও কৌস্তুভ মণি উঠল। কৌস্তুভ মণি বিষ্ণু নিজের বুকে ধারণ করলেন। তারপর উঠলেন লক্ষ্মী দেবী, ও উদ্ধতযৌবনা বরুণকন্যা বারুণী, মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বারুণীকে অসুররা গ্রহণ করলেন। তারপর অমৃত-কুম্ভ হাতে উঠলেন ধন্বন্তরি, দেবতায় ও অসুরে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত অসুরেরাই তা পেল। বিষ্ণু তখন মোহিনী নারীর মূর্তিতে অসুরদের ভুলিয়ে সেই অমৃত হরণ করলেন। অমৃত হারিয়ে দেবতাদের সংগে অসুরদের খানিকক্ষণ যুদ্ধ হল, বিষজর্জরিত অসুররা হল পরাজিত। তখন দেবতারা বিষ্ণুলোকে গিয়ে অমৃত পান করলেন।

ভেবেছিলাম, সমুদ্রমন্থনের গল্প এইখানে শেষ হল। কিন্তু তা নয়। গুরুজী একটু থেমেই বললেন : রাহু নামে এক দৈত্য দেবতার রূপ নিয়ে দেবতাদের সংগে অমৃত পান করতে বসেন। অমৃত যখন এঁর কণ্ঠ পর্যন্ত প্রবেশ করেছে তখন সূর্য ও চন্দ্র রাহুকে চিনতে পারেন ও সকলকে জানিয়ে দেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ রাহুর মাথা কেটে ফেলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত পানের ফলে রাহুর মৃত্যু হল না। তার মাথার ভাগ রাহু ও দেহের অংশ কেতু নামে পরিচিত হল। আর চন্দ্র-সূর্য হলেন রাহুর চিরশত্রু। আজও রাহু চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করেন গ্রহণের সময়।

চেনেলু উসখুস করছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, কোন প্রশ্ন করবার বাসনা তার হয়েছে। কিন্তু তার আগেই গুরুজী বললেন : এ গল্পের আর একটু বাকি আছে। বিষ্ণু যে মোহিনী রূপে অমৃত হরণ করেন, সেই রূপে মহেশ্বর মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিষ্ণু তাঁর সেই মোহ ভংগ করে বললেন, এস আমরা মিলিত হই। বলে উভয়ে দেহার্ধ মিলিয়ে হরিহর মূর্তিতে দেখা দিলেন।

চেনেলু আর থাকতে পারল না, বলল : সমুদ্রমন্থনে শুনেছি বিষও উঠেছিল।

গুরুজী বললেন : উঠেছিল। কেউ বলেন, প্রথমেই উঠেছিল। কেউ বলেন, সকলের শেষে। সে যাই, হোক কাল-কূট উঠেছিল। আর সেই বিষের সংগেই দেবতা ও অসুররা অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা শিবের শরণ নিলেন। আর জগতের কল্যাণের জন্য শিব সেই বিষ অবলীলায় পান করে নীলকণ্ঠ হলেন।

চেনেলু একবার সুপ্তির মুখের দিকে, আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি তার দৃষ্টিতে খানিকটা আত্মপ্রসাদের ভাব দেখলাম। গুরুজীকে সে একটা সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে, তারই জন্যে তার আত্মপ্রসাদ।

রাত বোধহয় অনেক হয়েছিল। সেই দিকে লক্ষ্য করে তাউজী বললেন : আজ এই পর্যন্ত থাক। বাকী গল্প-গুলি কাল শোনা যাবে।

সভা ভঙ্গ হল।

(ক্রমশঃ)

© King Features Syndicate, Inc., 1962 World rights reserved

কিন্তু মালবাহী বিমানটি এসে নামল শত্রুপক্ষের জমিতে!
?
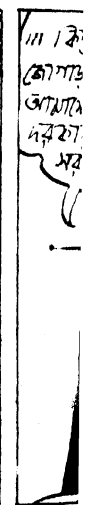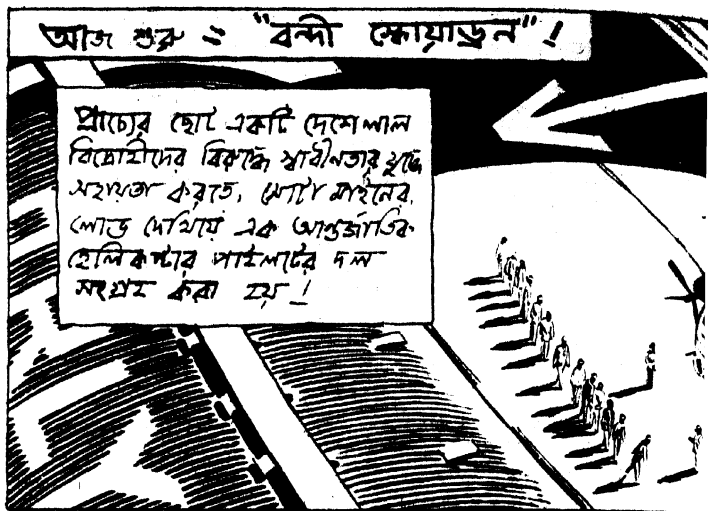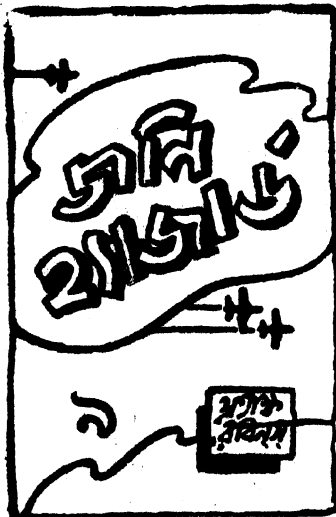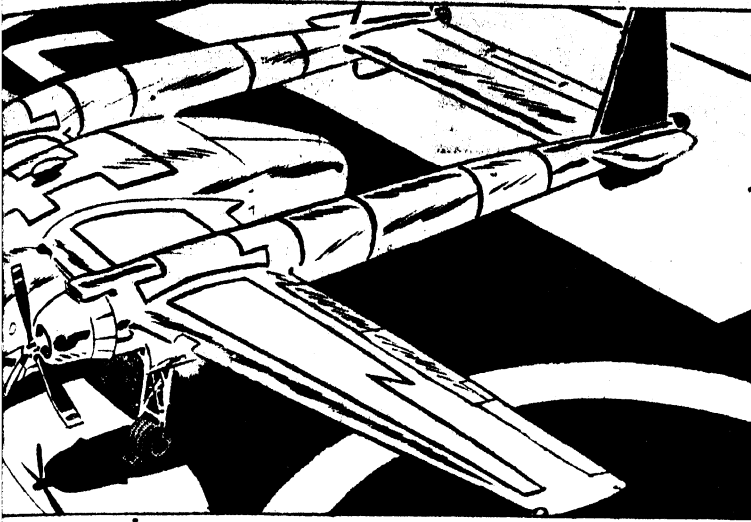
সেই আনন্দেই খাবুন কমরেড!
"দীর্ঘকাল অনাহার আর ফায়ারিং স্কোয়াড্রের কাজ কর্ম দেখে একটু আধটু খিদে পেলে, হয়ত এটা তোমাদের পক্ষেই দুঃখের ব্যাপার হবে!

দোস্ত... এখন বোধ হয় চুপ করে থাকাই ভাল!
ব্যারাকের দিকে এসো, এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রায়াল শুরু হবে!

ঠিক সেকেণ্ড বাদেই...!
বারণ করলাম... শুনলে না... রাস্তার দু'ধারের জঙ্গলেই প্রচুর মাইন পোঁতা আছে!
ক্রমশঃ...

অয়স্কান্ত

॥ মেরিনারের চোখে শুক্রগ্রহ ॥

মানুষের তৈরী প্রথম যে-ব্যোমযান অতি নিকট থেকে শুক্রগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করেছে তার নাম মেরিনার। এই ব্যোমযানটির কৃতিত্বপূর্ণ অভিযান সম্পর্কে আগেও আমরা বিজ্ঞানের কথায় আলোচনা করেছি। সম্প্রতি মেরিনারের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

স্মরণ থাকতে পারে, মেরিনার ব্যোমযানটি শুক্রগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৬২ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে। ব্যোমযানটির ওজন ছিল ৪৪৭ পাউন্ড বা ২০৩ কিলোগ্রাম। ১০৯ দিনে আঠারো কোটি মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে মেরিনার শুক্রগ্রহের ২১,৫৯৪ মাইলের (৩৪,৫৫০ কিলোমিটার) মধ্যে পৌঁছতে পেরেছিল। মেরিনার ব্যোমযানের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট ছিল দুটি ইলেকট্রনিক পর্যবেক্ষণ-যন্ত্র। এই দুটি যন্ত্রের সাহায্যে যে-সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের তাপমাত্রা সম্পর্কে এবং শুক্রগ্রহে জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

শুক্রগ্রহের উপরিতলের তাপমাত্রা ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শুক্রগ্রহে বিন্দুমাত্র জলের অস্তিত্বও টের পাওয়া যায়নি।

৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের তাপমাত্রায় অনেক পদার্থই কাঠিন্য হারাতে শুরু করে। অর্থাৎ শুক্রগ্রহকে বলা যেতে পারে, অনেকাংশে গলিত উত্তপ্ত পদার্থের একটি পিণ্ড বিশেষ। তার ওপরে যদি ছিটে-ফোঁটা জলও না থাকে তাহলে আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি, পৃথিবীতে যে-ধরনের জীবন দেখতে আমরা অভ্যস্ত তার কোনো সম্ভাবনাই শুক্রগ্রহে নেই।

এই সঙ্গে পৃথিবী থেকেও রেডিও-টেলিস্কোপ ও রাডারের সাহায্যে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য একসঙ্গে মিলিয়ে নিলে শুক্রগ্রহের যে-ছবিটি পাওয়া যায় তা মোটেই মনোরম নয়। অসহ্য রকমের উত্তপ্ত উপরিতল, বালুকাময় মরুভূমি, গলিত পদার্থ, ঘন মেঘের আবরণ—এই হচ্ছে শুক্রগ্রহ। মেঘের আবরণটি এতই ঘন যে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না। তাছাড়া, পৃথিবীর মতো এই গ্রহটির চুম্বকত্ব নেই। আর এই গ্রহটির অক্ষ-আবর্তন পৃথিবীর মতো চব্বিশ ঘণ্টায় একবার নয়—অতি ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই এই গ্রহটির বড় রকমের অমিল।

এই সমস্ত বিশ্লেষণ করে আমেরিকার জাতীয় বিমান ও নভোচারণ প্রশাসনের অধ্যক্ষ ডঃ হোমার নিউয়েল মন্তব্য করেছেন, 'আমরা যে-ধরনের জীবনকে জানি সেই ধরনের জীবন এই অতি-উচ্চ তাপমাত্রায় সম্ভব নয়। তবে জীববিজ্ঞানীরা বলতে পারেন, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলে উচ্চস্তরে হয়তো কোনো ধরনের জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে।'

মেরিনারের পর্যবেক্ষণ-যন্ত্রে শুক্রগ্রহের মেঘমণ্ডলের বাইরের দিকের তাপমাত্রাও ধরা পড়েছে। এই এলাকাটি অতিমাত্রায় শীতল—তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ষাট ডিগ্রি ফারেনহাইট বা একান্ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিচে।

শুক্রগ্রহের মেঘমণ্ডল ঘন ও পুরু। মোটামুটি ৪৫ মাইল বা ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে এই মেঘমণ্ডল শুরু। মেরিনারের সাহায্যে জানা গিয়েছে যে, এই মেঘমণ্ডলের উপাদান হচ্ছে হাইড্রোকার্বন। ইতিপূর্বে শুক্রগ্রহের মেঘমণ্ডলকে পৃথিবীর যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল যে, শুক্রগ্রহের মেঘমণ্ডলের উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন। মেরিনার কিন্তু বিজ্ঞানীদের ধারণাকে সমর্থন করেনি।

মেরিনারের যন্ত্রে দুই গ্রহের মধ্যবর্তী মহাকাশ সম্পর্কেও কয়েকটি তথ্য জানা গিয়েছে।

সবচেয়ে বড়ো খবর সূর্যকিরণ সম্পর্কে। সূর্যকিরণকে বলা যেতে পারে 'সৌরবায়ু'। এই সৌরবায়ু ফুটন্ত সূর্য থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রতি মুহূর্তে মহাকাশে ধাবিত হচ্ছে। মেরিনারের যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়েছে, এই সৌরবায়ুর উপাদান পারমাণবিক কণা, উত্তাপ দশ লক্ষ ডিগ্রি ফারেনহাইট, গতিবেগ সেকেণ্ডে ২০০ থেকে ৫০০ মাইল (৩২০ থেকে ৮০০ কিলোমিটার)। আরো জানা গিয়েছে মহাকাশের প্রতি ঘন ইঞ্চিতে সৌরবায়ুর পারমাণবিক কণা রয়েছে দশ থেকে কুড়িটি।

মেরিনার ব্যোমযানটি শুক্রগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করার সময় পেয়েছিল ৪২ মিনিট। যদিও খুব অল্প সময়ের পর্যবেক্ষণ, কিন্তু সংগৃহীত তথ্য সে-তুলনায় কিছু কম নয়।

পৃথিবীকে ঘিরে যেমন একটি চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে, শুক্রগ্রহকে ঘিরে তা নেই। পৃথিবীর এই চৌম্বক-ক্ষেত্র থাকার জন্যে পৃথিবীকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক তেজস্ক্রিয় বলয় (ভ্যান অ্যালেন বেল্ট)। শুক্রগ্রহ বেষ্টনকারী কোনো তেজস্ক্রিয় বলয়ের অস্তিত্ব মেরিনারের যন্ত্রে ধরা পড়েনি। গ্রহের যদি চৌম্বকত্ব না থাকে তাহলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

মেরিনারের কক্ষ শুক্রগ্রহের মাধ্যাকর্ষণে কিছুটা বেঁকে গিয়েছিল। এ থেকে শুক্রগ্রহের ভর হিসেব করা হয়েছে। শুক্রগ্রহের ভর পৃথিবীর ০·৮১৪৮৫ গুণ। অর্থাৎ, এগারোর পরে চব্বিশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো পাউন্ড, বা পাঁচের পরে চব্বিশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ততো কিলোগ্রাম।

মেরিনারের অন্য আরেকটি পর্যবেক্ষণ শুক্রগ্রহের অক্ষ-আবর্তন সম্পর্কে। পৃথিবীর একটি পাক যেখানে চব্বিশ ঘণ্টায়, শুক্রগ্রহের সেখানে সম্ভবত ২৫০ দিনে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শুক্রগ্রহের সময় লাগে পৃথিবীর হিসেবে ২২৫ দিন। তার মানে, শুক্রগ্রহের কক্ষ-আবর্তন ও অক্ষ-আবর্তন মোটামুটি একই সময়ে। তার মানে সূর্যের দিকে শুক্রগ্রহের একই দিক সব সময় থাকে।

ম্যারিনারের সাহায্যে সূর্যকিরণ সম্পর্কে, মহাকাশের ধূলিকণা সম্পর্কে ও কসমিক রশ্মি সম্পর্কে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গিয়েছে।

৪ঠা জানুয়ারির পর থেকে মেরিনার ব্যোমযানের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো যোগাযোগ নেই। এই ব্যোমযানটিকে এখন বলা চলে সৌরমণ্ডলের একটি কৃত্রিম গ্রহ। অন্যান্য গ্রহের মতো এই কৃত্রিম গ্রহটিও বিশেষ একটি কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলবে।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁরা দ্বিতীয় আরেকটি ব্যোমযান শুক্রগ্রহের খোঁজ-খবর নেবার জন্যে পাঠাবেন। এই ব্যোমযানটির ওজন হবে ১২০০ পাউন্ড বা ৫৪০ কিলোগ্রাম। বলা বাহুল্য, এই ব্যোমযানটিতে যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম থাকবে প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি এবং সম্ভবত একটি টেলিভেশন ক্যামেরাও থাকবে। তাছাড়া, ব্যোমযানটিতে এমন আয়োজনও থাকতে পারে, যার ফলে

শুক্রগ্রহের উপরিতলকে বিশ্লেষণ করবার জন্যে ব্যোমযান থেকে একটি পেটিকা শুক্রগ্রহের মাটিতে খসে পড়বে।

মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে মার্কিনী ব্যোমযানের যাত্রার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাস। এই ব্যোমযানটিতে এমন আয়োজন থাকবে যাতে মঙ্গলগ্রহের ছবি এবং মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া যেতে পারে।

পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, ১৯৬২ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে একটি সোভিয়েট ব্যোমযান মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল। এই অভিযানের বিস্তারিত ফলাফল এখনো জানা যায়নি। তবে আশা করা চলে, সোভিয়েত ব্যোমযান 'মার্স—১' মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করবে। যতোদূর বোঝা যাচ্ছে, আমাদের এই সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর বাইরে একমাত্র মঙ্গলগ্রহই মনুষ্যবাসের একেবারে অনুপযুক্ত নয়। সম্ভবত চন্দ্রের পরে মঙ্গলগ্রহই হবে মহাকাশ-অভিযানের গন্তব্যস্থল। এদিক থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহের গুরুত্ব খুবই বেশি।

মহাকাশের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে মঙ্গলগ্রহ পর্যবেক্ষণ

ইতিমধ্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বেলুনের সাহায্যে মস্ত একটি দূরবীক্ষণ-যন্ত্রকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে পাঠিয়ে মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করার আয়োজন করেছিলেন। বেলুনটি আকাশে ওঠানো হয়েছিল টেক্সাস থেকে আর বেলুনের সঙ্গে ছিল একটি তিন টন ওজনের ৩৬ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রসমেত বেলুন ৭৭,০০০ ফুট বা ২৩,১০০ মিটার উঁচুতে উঠে গিয়েছিল এবং দূর-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল মঙ্গলগ্রহের দিকে। এতোদিন পর্যন্ত মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর থেকে। এই প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ অংশের বাইরে থেকে মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হল।

দূরবীক্ষণের পর্যবেক্ষণ-কার্য শেষ হবার পরে যন্ত্রটিকে পুরোপুরি অক্ষয় অবস্থায় মাটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু প্রাথমিক ফলাফল যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, মঙ্গলগ্রহে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্ব আছে। মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এ তথ্য অজানা ছিল না।

ভবিষ্যতের ব্যোমযান। এমনি একটি ব্যোমযান ১৯৭০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চন্দ্রে যাতায়াত করবে।

আরো বলা হয়েছে, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব যদি থাকেও তো তা খুব প্রাথমিক ধরনের।

তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি কৌতূহল মঙ্গলগ্রহের উপরিতল সম্পর্কে। আশা করা চলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে তোলা মঙ্গলগ্রহের আলোকচিত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারবে।

॥ চন্দ্রে যাবার তোড়জোড় ॥

বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একটি মার্কিনদেশে, অপরটি সোভিয়েত ইউনিয়নে। দুটি ঘটনাকেই বলা হয়েছে চন্দ্রে যাত্রার প্রস্তুতি-পর্ব। ঘটনার গতি দেখে মনে হয়, চন্দ্রের উদ্দেশে মানুষের যাত্রার দিনটি আর খুব বেশি দূরে নেই। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, ১৯৬৭ সালের মধ্যেই তাঁরা এই চমকপ্রদ কীর্তিটি অর্জন করবেন। মার্কিন বিজ্ঞানীরা আরো তিন বছর বেশি সময় নিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ধরে নিতে পারি, এই ষাটের দশকটি শেষ হবার আগেই পৃথিবীর মানুষ চন্দ্র জয় করবে।

গত ২৮শে মার্চ তারিখে মার্কিন মহাকাশ-সংস্থার বিজ্ঞানীরা অতি-বৃহৎ একটি মহাকাশ-রকেট আকাশে তুলেছেন। এই রকেটটি 'স্যাটার্ন' পর্যায়ের, ওজন ৪৭০ টন। স্যাটার্ন পর্যায়ের রকেটের এটি ছিল চতুর্থ পরীক্ষাকার্য। এই পরীক্ষাকার্যে বহুধাপ-বিশিষ্ট রকেটটির মাত্র প্রথম ধাপটির কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, রকেট উৎক্ষেপণের ১০০ সেকেণ্ড পরে রকেটের আটটি ইঞ্জিনের একটিকে ইচ্ছে করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রকেটটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করেছে এবং থেমে-যাওয়া ইঞ্জিনের জন্যে মজুদ জ্বালানী অন্য ইঞ্জিনগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, দুটি ইঞ্জিন থামিয়ে দিলেও রকেটটি বেচাল হত না। রকেটের যাত্রী হয়ে সত্যিকারের একজন মানুষ যখন চন্দ্রে যাত্রা করবে তখন যদি রকেটের একটি বা দুটি ইঞ্জিন থেমেও যায় তাহলেও যাতে রকেটটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে তারই জন্যে এই ব্যবস্থা।

গত ২রা এপ্রিল তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চতুর্থ চন্দ্র-রকেট উৎক্ষেপ করেছেন। এটির নাম দেওয়া হয়েছে লুনিক—৪। ওজন ৩১৩০ পাউণ্ড। লুনিকের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে একটি আন্তর্গ্রহ গবেষণাগার।

চিত্ররসিক

॥ শিল্পী রবীন মণ্ডলের একক প্রদর্শনী ॥

পার্ক স্ট্রীটের আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে গত ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীরবীন মণ্ডলের একটি একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। শ্রীমণ্ডল অল্পদিন হল ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছে এবং একক প্রদর্শনী তিনি এর আগেও আরেকটি করেছেন। শ্রীমণ্ডল আধুনিক চিত্রকলার অনুরাগী এবং বলা যেতে পারে যে কিউবিসম-এর ভক্ত। ফর্মকে ভেঙে কোণাকুণি জ্যামিতিক প্যাটার্ণে ফেলার দিকেই এঁর ঝোঁক বেশী দেখা গেল। ষোলখানি তৈলচিত্রের প্রায় অধিকাংশ ছবিতেই নীল রংয়ের (এবং প্রায় একই টোনের) প্রাধান্য অত্যাধিক পরিমাণে দেখা যায়। ফলে গোটা প্রদর্শনীতেই কেমন একটা পুনরাবৃত্তি দোষ একটু চক্ষু-পীড়াদায়করূপেই দেখা দেয়। এর ব্যতি-ক্রম দেখা গেল 'রেসপন্স টু এ কল (১)' "স্লেট ডাবল (৩)" "জেলাসি (১৫)" ইত্যাদি কয়েকটি ছবিতে। এ ছবিগুলি এদের ডিজাইনের গুণেই কিছুটা লোচন-গ্রাহী হয়েছে। এছাড়া অতি আধুনিক উগ্র বিমূর্ত শিল্পের বদলে কিছুটা মূর্তাভাস থাকার জন্যেও বটে। তবে, এই ধরণের প্রদর্শনীর মধ্যে একটা জিনিষ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে আধুনিক শিল্পিবৃন্দের অধিকাংশের মধ্যেই কয়েকটি ফর্মকে ক্রমান্বয়ে পুন-রাবৃত্তি করে যাওয়ার ঝোঁক, এবং কোনো পরিচিত গঠনের কয়েকটি ফর্মুলামাফিক বিকৃতি সাধন। রিপ্রেজেন্টেশনাল ছবি আঁকা এঁরা এড়িয়ে চলেন। কিন্তু যেসব বিদেশী শিল্পাচার্যদের অনুকরণে এঁরা আঁকেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তথাকথিত 'অ্যাকাডেমিক' এবং 'রিপ্রেজেন্টেশনাল' ছবি আঁকতেও সমান পারদর্শী। তাই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, আমাদের দেশের এই আধুনিক শিল্পীরা যাঁরা এইসব শিল্পগুরুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন তাঁরা তাঁদের মানস-চিত্রের ঠিক হুবহু রূপটি আমাদের সামনে ধরছেন তো? কারণ একটা কথা খুবই সত্যি যে, যে-কোন শিল্পকর্ম তা যদি আন্তরিক অনু-ভূতির সঙ্গে কোন কুশলী কারুকৃৎ আঁকতে পারেন ত তা দর্শকের মনে ধরণের আবেগ অনুভূতি আনতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের কাংশের আঁকা ছবিই সে ভাব আ সক্ষম হয় না। এবং এসব ছবি এত ফর্মুলায় ফেলা নকশা, যে অনেক একের কাজের সঙ্গে অন্যের ক তফাৎ পর্যন্ত করা যায় না। আর বা করা যায় ত তার মধ্যে গ পার্থক্যও অতি সামান্য—কিম্বা নেই। শ্রীমণ্ডলের ছবিগুলিও এর ক্রম নয়। যেকোন শিল্পীর কুশ চূড়ান্ত নিদর্শন, বোধ হয় দেহ অংকনে। আজকালকার প্রদর্শনীতে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। সেইজন শিল্পের মূল উৎস যে জীবনের তার থেকে চিত্রশিল্পও যেন মনে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। হয়ত স মধ্যে ব্যক্তির বদলে যূথের প্রাধান্য মানুষের বদলে যন্ত্রের প্রাধান্যের ফ রকম যূথবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি থাকবে। অ্যাকাডেমিক শিল্পের অচল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ফর্মকে ভা যে স্বাধীনতা একদিন শি চেয়েছিলেন, আজকে যেন স্বাধীনতার দাসত্ব করতেই শিল্প নতুন শৃঙ্খল পরতে হয়েছে।

শিল্পী রবীন মণ্ডল অংকিত দুটি চিত্র

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

।। ১ ।।

খবরটা যখন পৌঁছল তখন অরুণকে দেখা গেল না। সে যে কোথায় লুকিয়ে বসে আছে তা কেউ জানে না। খবর সেদিন বেরোবে তা অরুণও জানত—কিন্তু কলকাতায় গিয়ে দেখে আসার সাহস হয়নি। এমনিই গত কদিনে যেন শুকিয়ে উঠেছে সে, মুখ-চোখের এমন ম্লান অবস্থা যে তাকানো যায় না। তিন-চারদিন ধরে বলতে গেলে ভাতের সামনে বসছে শুধু, তাও সাধ্য-সাধনা করে বসানো, বুঁচি গিয়ে খুঁজে-পেতে নিয়ে আসে তাই—বাগানের কোন্ কোণে লুকিয়ে বসে থাকে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধই করে দিয়েছে এক রকম।

বুঁচি খুঁজতেও আসে—আবার সে জন্য ফেজাতও করে কম নয়।

মুখের সামনে তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে বলে, 'বলি, তুমি পেয়েছ কী আমায়? কত মাইনে দাও যে পেত্যহ এমনি করে খুঁজে পেতে সাধ্যিসাধনা করে নিয়ে যেতে হবে! ভাত খেয়ে কি আমার মাথাটা কিনবে?'

ওর সেই তিরস্কারের ভঙ্গীতে রাগ হয় না অরুণের বরং তার সেই অপরিসীম শুষ্ক মুখেও প্রসন্ন হাসি ফোটে।

'তুমি খোঁজো কেন—আমি কি বলি খুঁজতে? কৈ, আর তো কেউ খোঁজে না।'

'তুমি বলবে কেন, তুমি যদি দুটো কথা বলতে কি একটা দুটো ফরমাস করতে কাউকে তাহলেও তো বুঝতুম যে খানিকটা মানুষের মতো কাজ হচ্ছে। ......আমার যে হয়েছে যত জঞ্জাল। আর তো কারুর মাথাব্যথা নেই। একটা মনিষ্যি খাচ্ছে না চান করছে না, মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়াচ্ছে তা কি কারও হুঁশপব্ব আছে? ......আচ্ছা, তাও বলি, এত ভাবনার কি আছে, ফেল তো তুমি করবে না।'

'তা কি বলা যায়—যদি ফেল করি! এঁদের এতগুলো পয়সা খরচ করালুম, ফেল করলে আর মুখ দেখাতে পারব না। একে তো এই বুড়ো বয়সে এগজামিন দেওয়া বলতে গেলে—'

'নাও, তুমি আর হাসিও নি বাপু। আঠারো-উনিশ বছরে একটা পাস করে যাবে—সেটা কি কম কথা হ'ল! ঐ-তো মজুমদারদের গ্যাঁড়া—ওর তো বয়সের গাছপাথর নেই, ফী বছর এগজামিন দিচ্ছে ফেল করছে আর বিড়ি ফুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ......নাও, ওঠো, দয়া করে নেয়ে খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করবে চল। ......তুমি যেদিন ফেল করবে সেদিন পুবের সুয্যু পশ্চিমে উঠবে।'

'কেন আমি কি একেবারে বিদ্যের জাহাজ—ফেল করতে পারি না। ...আমার তো মনে হচ্ছে কিছুতেই পাস করতে পারব না।'

'রেখে বোস দিকি বাপু! এমন পাগলামী ছেমো কে তোমার মাথায় ঢোকালে! তুমি যদি ফেল কর তাহলে বুঝব সাক্ষেৎ মা সরস্বতীর সাধ্যি নেই এ এগ্‌জামিনে পাস করার। বিদ্যের জাহাজ কি বলছ—বাব্‌বা যে পড়াটা তুমি পড়লে আমি তো মনে করি এক জাহাজ বিদ্যে তোমার পেটে ঢুকে গেছে। ......নাও নাও ওঠো—খেয়ে আমার মাথা কিনবে চলো, তোমার সঙ্গে এত বাজে বকবার সময় নেই আমার।'

অগত্যা অরুণকে উঠতে হয়, স্নানাহারও করতে হয়। অন্তত ভাতের সামনে বসতে হয় একবার। এই ভাবেই চলছে কদিন। স্বর্ণলতা ধরে না আনলে বোধহয় এর মধ্যে তার একবারও খাওয়া হ'ত না—খাওয়ার কথা মনেই পড়ত না। রকম সকম দেখে প্রমীলা হেসে বলত, 'মালক্ষ্মীর আমার চাকরীটি হয়েছে ভাল! ও বুঝি তোমার খাস তালুকের প্রজা—হ্যাঁ-গা গিন্নীমা, তাই তুমি না বললে উঠবে না খাবে না?'

মহাশ্বেতা আড়ালে গজরাত, 'মুয়ে আগুন মেয়ের। ঘরজ্বালানী পর-ভালানী। নিজের ভেয়েরা খেলে কিনা—তা একবারও খোঁজ নিস? পরের জন্যে তো মাথাব্যথার সীমে-পরিসীমে নেই একেবারে।'

'নিজের ভেয়েদের খবর নোব কি, নিত্যি তো চোখে দেখছি—চারবার সদরে চারবার চুরি করে—এই আটবার খাওয়া তো বাঁধা। খবর নিতে গেলে তো চুরি-বিদ্যের খবরও রাখতে হয় গো—বাপ-কাকাকে জানাতেও হয়। সেটা কি ভাল হবে—বুঝে দ্যাখো।'

ঝঙ্কার দিয়ে চলে যেত স্বর্ণলতা। মহাশ্বেতার শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করা ছাড়া উপায় থাকত না। চারবার না হোক, চুরি করে এটা-ওটা খাওয়া যে ওদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে তা সেও জানে। বরং বলা যায়, সে-ই শিখিয়েছে। ......

সেদিন খবর বেরোবে, ইউনি-ভার্সিটির দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবে—এ খবরটা রটে গিয়েছিল আগের দিনই। দুর্গাপদ অরুণকে ডেকে বলেছিল, 'তাহলে আমি বলি কি অরুণচন্দর আমার মান্থলী টিকিটটা নিয়ে ভোরের গাড়িতে চলে যাও তুমি—দেখে সাতটার মধ্যে ফিরতে পারবে না?

আটটার গাড়িতেই এসো, আমি ইষ্টিশানে টিকিটটা নিয়ে নেব'খন্ তোমার কাছে।'

কথাটা শুনে অরুণের মুখ বিবর্ণতর হয়ে উঠল। স্বর্ণলতা লক্ষ্য করল, তার পা দুটো ঠক-ঠক্ করে কাঁপছে।

সে বললে, 'খুব লোককে গিয়ে খবর নিতে বলছ ছোটকা, দেখছো না ওর অবস্থা। ......হাওড়া ইষ্টিশানে পেণছে কোথায় ভিরমি লেগে দাঁত ছরকুটে পড়ে থাকবে—তখন তোমার আপিস যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। ও বাপু তুমিই একটু কষ্ট করে জেনে দাও—'

স্বর্ণলতা কর্তাদের সকলেরই প্রিয়। একটু ভুরু কুঁচকে উঠেছিল আগে দুর্গাপদর প্রস্তাবটা শুনে—কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল শেষ পর্যন্ত, 'আমাকেই খবরটা জেনে দিতে হবে?......তা দোব। তবে বাছা ভোরে গিয়ে ফিরে এসে আবার সাত-তাড়াতাড়ি বেরোনো, সে আমার দ্বারা হবে না, বরং একটা ট্রেণ আগে কি মেজদার সঙ্গেই খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে যাব—খবরটা জেনে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব! কেমন?'

স্বর্ণলতা খুশী হয়ে বলে, 'সেই ভাল।'

তখন থেকেই অরুণের অবস্থা দাঁড়িয়েছে শোচনীয়। রাত্রে নাকি ঘুমোয়নি এক বিন্দুও, যারা ওর ঘরে শোয় তারা সবাই বলেছে সে কথা; যে যখন উঠেছে রাত্রে ওকে দেখেছে বসে থাকতে। তার ওপর ভোর-না হতেই এমন উধাও হয়েছে যে বহু খুঁজেও কেউ পাত্তা পাচ্ছে না। বাগান, পুকুর-পাড়, ওধারের বাগান সব নাকি দেখা হয়ে গেছে।

পাত্তা কে পাবে তা অবশ্য গিন্নীরা সকলেই জানে। প্রমীলা মুখটিপে হেসে বলে, 'তোদের ব্যস্ত হতে হবে না—তোরা নিজের ধান্দায় যা। আমার গিন্নীমায়ের দুধ জ্বাল দেওয়াটা শেষ হোক—খবর সে-ই পৌঁছে দেবে এখন।'

লজ্জা পায় স্বর্ণলতা, 'বেশ বলছ তো বাপু, কেউ খুঁজে পেলে না যেকালে সেকালে আমিই বা পাব কি করে? আমি কি তাকে ট্যাঁকে পুরে রেখেছি না সিন্দুকে চাবি দে রেখেছি?'

'কোথায় রেখেছ—কোথায় রাখ তা তুমিই জান মা—তুমিই তো খুঁজে পাও দেখি ঠিক!'

স্বর্ণলতার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে তরলা তাড়াতাড়ি কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, বলে, আসলে ওর স্বভাবটা লক্ষ্য করেছে আর কি, কোথায় বসে থাকতে পারে, সেটা ওর জানা হয়ে গেছে। ......তা তুই যা না বাপু, আমি দুধ দেখছি।'

'সে বাপু আজ বলা শক্ত।' নরম হয়ে আসে স্বর্ণ, 'আজ সে মোক্ষম লুকনো লুকিয়েছে—বেশ বুঝতে পারছি। ... তা এসো তাহলে তুমি দুধ দেখসে। ......জ্বালা জ্বালা হয়েছে বাবু, দেখি আবার, কোন সাপের গর্তে কি ব্যাঙের গর্তে লুকলো!'......

সে কিন্তু সোজাই খুঁজে বার করলে ওকে—একবারেই। সবাই সব জায়গা দেখেছে যখন—তখন আবার নতুন করে দেখতে গিয়ে লাভ নেই সেই সব জায়গাই। সে এমন কিছু দূরবীন চোখে এঁটে যাচ্ছে না যে অপরের চোখে যা পড়েনি তা তার চোখে পড়বে। সে জানত যে পাইখানার দিকটা কেউ যাবে না, অথচ ঐখানে পগারের ধারে নোনা-গাছে আর জামরুল গাছে জড়াজড়ি করা বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ একটি নিরাপদ জায়গা আছে—লোকচক্ষুর আড়ালে।

আর সেইখানে সত্যিই পাওয়া গেল অরুণকে।

'বলি তোমার ব্যাপ্যরটা কী বল দিকি! তুমি মনিষ্যি না ভূত! বলি কাউকে খুন করে ফেরার হয়েছ নাকি যে এমন জায়গায় এই গায়ের বনে এসে লুকোতে হবে। ধন্যি বাবা, ধন্যি!'

ওকে দেখে অরুণ উঠে এল অবশ্য। কিন্তু ভয়ে বোধ করি তার পা অবশ হয়ে গেছে তখন—আসতে আসতে দু-তিনবার টাল খেল সে।

'ওগো ভয় নেই—পাস করেছ! ছোট-কা নিজের চোখ দেখে খবর পাঠেছে। খুব ভাল পাস করেছ নাকি, কী একদাঁড়ি না কি বলে—তাই পেয়েছ। একদাঁড়ি কাকে বলে গা?'

'ফা-ফার্স্ট ডিভিসন। প্রথম বিভাগ। খ-খবরটা কে দিলে বঁচি?'

'যে দিয়েছে ভাল লোক। ছেলে-ছোকরা কেউ নয়। মতি ভট্চাযের ছেলেও তো দিয়েছিল, ছেলের সঙ্গে সেও গিয়েছিল দেখতে, তাকে দিয়েই বলে দিয়েছে। মতিবাবুর ছেলে নাকি তিন দাঁড়ি পেয়েছে। দুঃখ করছিল খুব। আমি তো জানি বেশী পেলেই ভাল—তা এ বাপু দেখছি তোমার এই পাসের পড়ায় সবই বিপরীত!'

ছোট-কা—ছোট-কা ঠিক দেখেছেন তো—ভুল হয়নি?'

'তোমার বাপু ধরণধারণ দেখলে আমার গা জ্বালা করে। এ কী ভুল দেখবার জিনিস? তার এ জ্ঞান নেই? তোমার যা কাণ্ড তা তো নিজে চোক্ষে দেখেছে সে, ভুল খবর দিলে যে তোমার হাত ছেড়ে যাবে তা জানে না? মতি-বাবুও দেখেছে—ছোটকা দেখিয়েছে তাকে। ওরা আপিসে কাজ করে—কত সায়েবের কাজ ওদের হাতে, ওদের ভুল করলে চলে না—জানো! তাহলে ম্যাদ্দিন চাকরী করে খেতে হ'ত না।'

এবার অরুণের মুখ পরিষ্কার হয়। মুখে হাসি ফোটে তার। হঠাৎ কি মনে করে—সম্ভবত ধারে-কাছে জনপ্রাণী ছিল না বলেই ভরসা হয় কতকটা—স্বর্ণলতার একটা হাত ধরে বলে, 'তোমার খু[illegible] আনন্দ হচ্ছে—না বঁচি?'

'তা বাপু হচ্ছে একটু, মিছে কথ[illegible] বলব না।......তা এ কথাটা জিগ্যেস করছ[illegible] কেন হঠাৎ? তুমি এগজামিন দিয়ে পা[illegible] করেছ, আমার আনন্দ হবে কেন?'

ওর মুঠির মধ্যে থেকে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে না, শুধু এক[illegible] বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টিতে চায় [illegible] মুখের দিকে।

কিন্তু অরুণের ভরসার পুঁজি [illegible] ক্ষণে ফুরিয়ে এসেছে। সে অপ্রতিভ ভা[illegible] নিজই হাতটা ছেড়ে দেয়, অন্যদি[illegible] চেয়ে বলে, 'না—তুমিই তো এর মূলে, তুমি চাড় না করলে আমার পড়াই হ[illegible] না হয়ত। তোমার দয়াতেই আমার প[illegible] করা হল—সে কথা আমি ভুলব না কে[illegible] দিন।'

স্বর্ণলতা তার অভ্যস্ত ভঙ্গী[illegible] ধমক দিয়ে ওঠে, 'তুমি আর ঐ সব [illegible] চার ঝাড়তে বসো নি বাপু!......ঐ দয়া-ধম্ম হ্যানো ত্যানো—কথাগু[illegible] শুনলে আমার রাগ ধরে যায়। চল [illegible] এখন বাড়িতে চল। মুখ-চোখের ছিরিই হয়েছে। আহা! দয়া ক'রে এ[illegible] গিয়ে মুখে একটু কিছু দেবে [illegible] ব্যাগত্তা করি। আমার এখন তোমার নেকচার শোনবার সময় নেই—এখ[illegible] খাড়া-খাড়া হরিমুট পাঠাতে হবে ঠাক[illegible] ঘরে—মানসিক রয়েছে!'

'কে মানসিক করেছিল—তুমি? আ[illegible] পাসের জন্যে?' যেতে গিয়েও থম[illegible] দাঁড়িয়ে যায় অরুণ। তার গলার কাছে [illegible] যেন একটা ঠেল উঠছে, কথা বেরো[illegible] চাইছে না ঠিকমতো।

'হ্যাঁ গো-হ্যাঁ। নইলে আর কার ম[illegible] সিকের জন্যে মাথাবাথা পড়ে যাবে শু[illegible] বলি কাউকে তো করতে হয় এক[illegible] পাসটা কি অমনি হয় নাকি? দেব[illegible] ঠাকুরকে না জানালে চলে? মেজকাক[illegible] হয়ত করতে পারে—তা জানি [illegible] মা-মাসীরই তো করবার কথা। তবে অ[illegible] বাবার কাছ থেকে চেয়ে নে স' পাঁচ [illegible] পয়সা আলাদা করিয়ে রেখেছি। মুতা[illegible] ভালি ভাল খবর এলে সেই [illegible] হরিমুট দেব—এই মানসিক!......[illegible] নাও—চল, আবার দাঁড়ালে কেন!'

'যাচ্ছি। চল।' অস্পষ্ট ধরা গ[illegible] উত্তর দেয় অরুণ। তার চোখ দুটো [illegible] জানে কেন, ঝাপসা হয়ে গেছে। এ[illegible] মুছে নিতে পারলে হ'ত। কিন্তু [illegible] মুছতে গেলে জল বেরিয়ে যায়—জ[illegible] চিহ্ন ধরা পড়ে, সেইজন্যে সাহস হয়ে[illegible] তার।

কয়েক পা গিয়ে স্বর্ণলতাই দাঁড়িয়ে পড়ে।

'তা এবার তাহলে তুমি কি করবে?'

তেমনি ধরা-গলায়ই অরুণ উত্তর দেয়, 'দেখি মেসোমশাই কি বলেন। একটা চাকরি-বাকরিরই চেষ্টা দেখতে হয়।'

'কেন—আর পড়বে না? বি-এ পাস করার অত শখ তোমার—!'

'কত দিন আর পরের ঘাড়ে চেপে এমন বসে খাব বল? কলেজে পড়ার যে অনেক খরচা?'

'জলপানি পাবে না? ছোট-কা বলছিল সেদিন, ও জলপানি পেতে পারে।'

'কী জানি, আমার কি আর অত ভাগ্য হবে?'

তারপর একটু থেমে বলে, 'স্কলারশিপ পেলেও, হয়ত একটা দশ টাকার ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাব। তাতে তো কলেজের খরচাই চলে যাবে। যদি ফ্রী হ'তে পারি তা'হলেও না হয় কথা। তাতেও—ভর্তির টাকা তো আর ফ্রী হয় না, সেও এক-গাদা টাকা লাগবে। আর এ'দের ঘাড়ে এমনভাবে বসে খাওয়া কি ঠিক?'

'দ্যাখো, এ তো নারদের গুষ্টি দেখতেই পাচ্ছ—রান্নাঘরে রাবণের চিতে জ্বলছেই—তা যেখানে এতগুলো লোক বসে খাচ্ছে সেখানে আর একটা লোককে খাওয়াতে কি আমার বাপ-কাকারা দেউলে হয়ে যাবে?... আমার ভায়াদেরও তো দেখছ—না পড়াশুনো না রোজগার, কোন চেষ্টাই নেই, হল্লো হল্লো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু। তারাও তো খাচ্ছে চারবেলা! তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন? তুমি এ সংসারে দুটো ভাত খেলে তবু তো বুঝব ভাল কাজে গেল।... তোমার দিন তুমি কিনে নাও। জলপানি পাও তো উত্তম কথা, না হ'লেও তুমি মেজ-কাকে কিছু জিগ্যেস করতে যেওনি। মেজকাকে আগে বললেই বলবে চাকরিতে ঢুকে পড়, আর একবার বলে ফেললে মুশকিল।... কথা যা পাড়বার আমিই পাড়ব। এখন—কলেজে ভর্তির কত টাকা লাগে চুপি চুপি আমাকে বলো—'

আবার চলতে শুরু করল ওরা। চলতে চলতেই অরুণ বলল, 'দেখি—।'

'না না, দেখি টেখি নয়। ও ঠিক করেই ফ্যালো। তুমি কালই খোঁজ ক'রে আমাকে বলবে। তোমার ভর্তির টাকা—বই-খাতা—কী কী লাগবে সব বলে দিও। মেজ-কাকে বলে আমি সব আদায় ক'রে দিয়ে যাব যাবার আগে। আমার তো আবার দিনের সংক্ষিপ্ত—গোনা-গাথা দিন আর থাকা এখানে!'

'তার মানে? তুমি কোথাও যাবে নাকি?' কথাগুলো উচ্চারণ করতে তার যেন রীতিমতো কষ্ট হয়। উত্তরটা যেন সে আগেই আশঙ্কা করে, 'কোথায় যাবে—কত দিনের জন্যে?'

'কতদিন কি গো? তুমি কিছু জান না? একেবারেই তো যাচ্ছি। কোথায় আর যাব বল, মেয়েরা কোথায় যায় বড় হ'লে? আমায় যে এরা বিদেয় ক'রে দিচ্ছে এ বাড়ি থেকে।'

এতক্ষণে জিনিসটা কি মনে পড়ে তার লজ্জা হয় একটু, সে মাথা নামায়।

'তোমার—তোমার বিয়ে হচ্ছে? আশ্চর্য। আমি কিছু শুনি নি তো!'

'শুনবে কি ক'রে বল, তুমি কি আর মনিষ্যির সংসারে বাস করো? তুমি তো শ্যালের মতো গত্তে ঢুকে বসে থাক চোপর দিন!......ও কি, আবার দাঁড়ালে কেন, চল চল—'

এবার স্বর্ণই অসহিষ্ণু হয়ে ওর একটা হাত ধরে টানে।

আবার চলতে শুরু করে অরুণ—কিন্তু মনে হয় যেন পৃথিবীতে আর কোথায় কোন জিনিস সম্বন্ধে তার আগ্রহ নেই। পাস হ'ল কিনা এখন যেন তাও তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। এই বাড়িতে, এই পৃথিবীতে একমাত্র যে অবলম্বন ছিল, একমাত্র যে আশ্রয় ছিল—সে চলে যাচ্ছে, অবলম্বন বলতে আর কিছু রইল না, পায়ের নিচের মাটিটাই যেন সরে যাচ্ছে তার।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শুধু জিগ্যেস করে, 'সে—সে কবে হবে?'

'কী হবে, বে?......এই তো সামনের মাসের আটুই। এদের এত তাড়াতাড়ি করবার ইচ্ছে ছিল না। তারাই জোর করছে। মেয়ে আগুন! তাদের যেন ঘর চলছে না একেবারে। ঐ তারিখের পরই বুঝি কি অকাল পড়ছে, তার আগে সারতে চায় তারা।'

আপন মনেই বলে যাচ্ছিল, হঠাৎ অরুণের মুখের দিকে চোখ পড়ে যেন চমকে উঠল সে।

হয়ত কারণটাও অনুমান করল, সে—সঙ্গে সঙ্গেই।

'ও মা, কী হ'ল গো তোমার? তোমার মুখ অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন আমার বে'র কথা শুনে? তুমি কি ভাবছ আমি চিরকাল এখানে থেকে তোমাকে আগলে আগলে রাখব? কোন কালে আমার বে-থা, ঘর-কন্না হবে না?'

তারপর গলা নামিয়ে—ছেলেমানুষকে যেমনভাবে সান্ত্বনা দেয়—তেমনি ভাবে বলে, 'ওগো বাবু, এখন থেকেই তোমাকে অত ভাবতে হবে না তা বলে! যাব বলে কি আমি সেই দিন থেকেই একেবারে চলে যাব? আটদিন বাদে ফিরে এসে তো এখন তিন-চার মাস থাকবই, সে বাবা বাচিয়েই নিয়েছে তাদের সঙ্গে—তারপরও আসব যাব। এই কাছেই তো—শিবপুরে সে হচ্ছে। তবে তুমি এবার থেকে একটু সেয়না-শঠ হও বাপু। চিরদিনই কি এমনি গো-বেচারা ভাল-মানুষ থাকবে?'

"আমার এখন তোমার ঐ নেকচার শোনবার সময় নেই।"

বাড়ির মধ্যে থেকে প্রমীলা হাঁক পাড়ে, 'কৈ লো বুচী, পেলি সে ছোঁড়াকে?'

'পেয়েছি মেজকাকী—যাচ্ছি।... চল চল, ওরা ভাবছে।'

সে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে যায় অরুণকে। (ক্রমশঃ)

চুলোচুলি

কনাদ চৌধুরী

অজয়তোষ সান্যাল আমার ঈর্ষিত ব্যক্তি। কারণ আজ পর্যন্ত কখনো সেলুনে যেতে দেখিনি তাঁকে। নিজের চুল ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি নিজেই কাটেন। ফলে যে কোনো রবিবারে অথবা ছুটির দিনে মাথা উঁচু করেই থাকতে পারেন তিনি, মাথাটিকে পরকরতলে সমর্পণ করতে হয় না। আর শুধুই কি মাথা? কান টানলে যেমনি মাথা আসে, মাথা টানলেও তেমনি দুটো কানকেই পাশাপাশি যেতে হয়, এবং সেলুনে কান যাওয়া মানেই কানের অবস্থা যায় যায় হয়ে যাওয়া। রবিবারের অথবা কোন ছুটির দিনের সেলুন মানেই হচ্ছে মিউজিকাল চেয়ারের জলসাঘর। অন্ততঃ চুপচাপ ঘরের বেঞ্চে আধ ঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘরের চুলঝুরির মধ্যে এক চুলও না নড়ে অপেক্ষা করেই যদি আয়নার সামনের আসনটায় আপনি আসীন হতে পারেন। কিন্তু ততক্ষণে পাড়ার দোকানে নির্মিত রেডিও সেটটি থেকে নির্গলিত সিলোন-সঙ্গীতের দাপট, জনৈক অপেক্ষমান ভদ্রলোক কর্তৃক উচ্চৈস্বরে পত্রিকার সম্পাদকীয় পাঠ, কারিগরের সঙ্গে কেশ-বিয়োগ-ব্যথার বিধুর যুবকটির চুল নিয়ে চুলোচুলি তর্ক শুনতে শুনতে আপনি প্রায় পাগল হয়ে যাবেন। এবং স্বভাবতঃই তখন আপনার মনে হতে পারে যে, কানের বদলে মানুষের যদি কানকো থাকতো, তাহলে খুলে, বন্ধ করে, যেমন ইচ্ছে খুশী শব্দটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন আপনি।

কলকাতার সেলুনে চোখের শাস্তি ত কম না। সেলুনে প্রায়শঃই সামনা-সামনি দুটো করে আয়না থাকার ফলে মাথার পেছন, ঘাড় পিঠ প্রভৃতি অপরিচিত অংশগুলি চোখে পড়তে থাকে। এবং সেই সময়ে নিজেকে যেন প্রতিমার মতন পুতুল মনে হয়। দুর্গা প্রতিমার পেছনের খড়-মাটি দেখে যেমন সামনের মুখকে আন্দাজ করা অসম্ভব সেলুনে সামনের আয়নার অনবরত অপরিচিত পশ্চাৎপট দেখতে দেখতে তেমনি ভীষণ মুখচেনা লোকটাকেও ভিনদেশী মনে হতে থাকে। আমার এক গাড়িয়ালা বন্ধু ত সেলুনে আয়নার সামনে বসেই চোখ বন্ধ করে ফেলেন।

—আরে ভাই নিজের পেছনের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হয় যেন চুল কাটছি না, গাড়ি ব্যাক করছি!

...বিষয়ক ঘটনা এই ... না। দাড়ি ক... পরামানিকের ... সেই বিচিত্র ... ছেড়ে তার কা... ...ছেন এবং সেই হাতটি অ... মুখের আশপাশ দিয়েই অ... সঞ্চালিত হচ্ছে এই দৃশ্যটিকে চোখ বুজে বাতিলও করেন, ... ঝোলানো নানাবিধ যুবক-ক্যালেণ্ডার এবং ছবিগুলির ... আপনার চোখ পড়বেই। এবং ... ছবির দিকে তাকাতে গিয়ে ... ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে আপনার চোখি হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র না...

এই সব বিচিত্র (এবং ... কারণেই সেলুন সম্পর্কে আমার ... প্রবল। বছরে বড়জোর চার... পাঁচবার সেলুনে ঢুকি। কিন্তু ... চার্চিল বা ক্রুশ্চভের মত মসৃ... না হওয়ার ফলে দীর্ঘদিন ... কাটলে মৃদু বিপত্তিতে পড়... মাঝে মাঝে। কবি না হওয়া ... কবি-সম্মেলনে স্বরচিত কবিত... আহ্বান আসে। এবং চুল কাটতে ... *বেশী দেরী হয়ে গেলে, আমার ... এবং উপাধির মধ্যবর্তী শ... কৌমার্য হরণ করে 'শংকর' যুক্ত ... পরিচিতরা তৎপর হয়ে ওঠেন। য... না সেলুনে ঢুকি ততদিন নাচতে ... জেনেও নাচার হয়ে নাম-সংক...* সংকট নিয়ে কালাতিপাত করতে ... আমার বন্ধু শংকরনাথ কিন্তু ... দিয়ে নিরঙ্কুশ। সে অকুতোভয়ে ... বড় চুল রাখে, বুড়ো আঙুলে প... চিরুনির দাঁড়া বাজিয়ে পানের দো... আয়নায় চুলের মাৎসন্যায় সামল... নামকে অনাথ করে পুনরোপ... করার উপায় নেই কারণ 'শংকর শ... কারো নাম হতে পারে না। এবং ... সম্মেলন থেকে আহ্বান এলেও ... নেই—শংকরনাথ কবিতা লেখে। ... চুলের জন্যে শংকরনাথ কেবল ... অনুপ্রাসপ্রিয় জ্যাঠামশাইকেই ভয় ... কিন্তু রিটায়ার্ড করে বহরমপুরে ... যাওয়ার পর আর সেই ভয় নেই। ... শুধু বাবার কাছেই চিঠিতে আ... করেন তিনি :

শংকু নিয়মিত কেশকর্তন ... কিনা জানাইবা। আমি কলিক... থাকিতে তাহাকে বুঝাইয়া পারি ... আমি বলিতেছি তাহাকে কেশ ... শাসন করিও নতুবা ঐ ছেলে ব... বাশ হইবে। সে যেরূপ কেশ ... তাহাতে কেশর বলিলেই হয়।

বলা বাহুল্য জ্যাঠামশাই ... মারফৎ শঙ্করনাথের কেশাগ্রও ... করতে পারেন নি।

কিন্তু আমার সমস্যা অন্য। ... চুল কাটাতে ভয় পাই না, আমার অ... পরহস্তে কেশকর্তন। তবে ...

কমাত্র সান্ত্বনা যে, আমার মত সেলুন-ীরু লোকের সংখ্যা ইংল্যাণ্ডেও জারে হাজারে আছে। ইংল্যাণ্ডে ভদ্র-াক মাত্রেই সেলুনকে এড়িয়ে চলবার ষ্টা করেন। চুলটা নেহাৎ যাতে সপুটিনের মত লম্বা না হয়, তাই ানরকমে সেলুনে ঢুকে ঘাড় এবং ার দু পাশ ছেঁটে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা। ফলে ইংল্যাণ্ডে পুরুষদের সেলুনের অবস্থা আমাদের দেশের সেলুন-এর মতই। মলিনমূর্তি আসবাব, অতিব্যবহারে জীর্ণ লিনোলিয়াম, ভাঙ্গা বলিরেখা-গ্রস্থ দর্পণ এবং নোংরা বেসিন এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে জেন্টস সেলুনের স্বাভাবিক আয়োজন। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নাগরিকবৃন্দ কেশ বিষয়ে অধিক সচেতন। ইংল্যাণ্ডে তিন-চার শিলিং-এর বেশী পারতপক্ষে কেউই কেশকর্তনে বিনিয়োগ করতে চান না। কিন্তু প্যারিস-ন্যুইয়র্ক-এর বাবুরা মাসে দুবার দশ থেকে পনেরো শিলিং অনায়াসেই খরচ করেন। সেখানকার সেলুনও তাই ইংল্যাণ্ডের তুলনায়

ইন্দ্রপুরী। আসবাবপত্র সব ঝকঝকে-তকতকে; বড় দোকানে চুল-কাটার যন্ত্রপাতি স্টেরিলাইজ পর্যন্ত করা হয়। এই ধরনের দোকানে ঢুকে বৃটেনের বাবু প্রায়ই স্বগতোক্তি করেন :

—দে ডোল্ট কাট হেয়ার ইন এ সেলুন, দে জাস্ট অপারেট ইট ইন দি অপারেশন থিয়েটার!

অবশ্য সেলুনকে যারা ভয় পায়, সেলুনকে অপারেশন থিয়েটার ভাবাটা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু না, তবু একথা ঠিক ইয়োরোপ বা আমেরিকার সেলুনের মর্যাদা অপারেশন থিয়েটারের চেয়ে কোন অংশে কম না। কিন্তু ইংরেজ মহিলারা সেদিক দিয়ে অকুতোভয়। ইংল্যান্ডের সেলুনের বাজারে "লেডিজ ফার্স্ট" প্রবচনটি শব্দে শব্দে সত্যি। চুলে তরঙ্গ তুলতে, রং করতে এবং শাম্পু করতে যে কোন ইংরেজ তরুণী এক সপ্তাহ অন্তর তিন থেকে চার গিনির মায়া অমলিন মুখে ত্যাগ করেন। সেলুনে যাওয়ার সঙ্গে ইংরেজ মেয়েদের যেন একটা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত। ইংল্যান্ডের পরামানিক সম্প্রদায় তাই মহিলা কেশশিল্পী (স্বর্ণশিল্পী যদি স্বর্ণকার হয়, তাহলে কেশশিল্পীদের কেশকার বলা যায় না?) হবার দিকেই বেশী ঝোঁকেন। মেয়েদের সেলুনে কাজ করে সপ্তাহে চল্লিশ পাউন্ড পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে কারিগররা, পুরুষদের সেলুনে ষোল পাউন্ডের বেশী আয় হলে ধরে নিতে হবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুরুষদের মাথায় ব্যামো অথবা খুস্কি হয়েছে। তবে সম্প্রতি অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। পুরুষদের কেশকর্তনে 'আভা-গার্দ' আন্দোলন আরম্ভ করেছেন জনৈক সাতাশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটির নাম আলবার্ট সেফিয়ার। সেফিয়ার কিন্তু যেমন-তেমন কেশ-শিল্পী নন। আগে তিনি স্কুলশিক্ষক ছিলেন, ভায়োলিন চমৎকার বাজাতে শিখেছেন চার বছর বয়স থেকেই। বর্তমানে অবসর সময়ে রাজনীতির চর্চা করেন। ছোটগল্পের একটা সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর, এমন কি একদা তিনি একটা খবরের কাগজের সম্পাদকও ছিলেন (আমাদের দেশের সঙ্গে কত তফাত!) কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ, তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর মনে "ফ্যাশান হচ্ছে স্বাতন্ত্র্যের জহ্লাদ! হালফ্যাশানে চুল ছাঁটলেই উত্তম-ছাঁট (!) হয় না।" কিন্তু যেহেতু এদেশের মত ওদেশেরও উত্তম-ছাঁট-অভিলাষীরা মনে করেন "উত্তম" কথাটি ফ্যাশানের প্রতিশব্দ, সুতরাং ফ্যাশানের খুরে মাথা মুড়োনোর লোকের অভাব কখনই হয় না ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ডে চুল-কাটার কায়দা ভূগোল অনুযায়ী বদলায়। উত্তর ইংল্যান্ডের লোকেরা প্রবল শীতেও ঘাড় এবং ধার 'সাদা' করে ছাঁটে না। এমন কি উত্তরাঞ্চলের কোন লোক যদি অন্যরকম চুল ছেঁটে চাকরির ইন্টারভিয়ু দিতে যায়, নির্ঘাত পরদিনই তার বাড়িতে 'রিগ্রেট লেটার' চলে আসবে। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের লোকরা কেশকর্তনে বরং কিছুটা উদার। পিকাডেলীর চৌরঙ্গীতে দাঁড়ালে মনে হবে প্যারিসের মাথা গুনছেন আপনি। প্রায় সকলেরই চুল ওপর দিকে কদম-ছাঁটা। ওপর-ছোট কদম-ছাঁট চুলের আবেদন মেয়েদের কাছে অত্যন্ত বেশী কারণ তাতে নাকি পুরুষকে অধিকতর পুরুষ মনে হয়। (আমাদের দেশে সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'কদম'-এর প্রতি মেয়েদের দুর্বলতার খবর রাখতেন, তাই এত গাছ থাকতে কদম গাছকেই আশ্রয় করেছিলেন!) এবং আমার এক বন্ধুর গবেষণায় এই মাথার কদম্ব-কারণেই অভিনেতা বার্ট ল্যাংকাস্টার এত রমণীমোহন!

কিন্তু চুলকর্তনের কোন ধ্রুব আদর্শ আছে বলে কেশনবীশ আলবার্ট সেফিয়ার মনে করেন না। তাঁর বক্তব্য :

আমি দেখেছি নিখুঁত করে কাটা চুলও কি ভয়ানক লাগে দেখতে অনেক সময়। কারিগর তাঁর দক্ষতার প্রমাণ দিতে গিয়ে অনেক সময় চুলের চালাকি দেখাবার চেষ্টা করেন, ফলে খদ্দেরের মাথাটাও আক্ষরিক অর্থেই খারাপ দেখায়। এই টনি-কার্টিস ছাঁটের কথাই ধরুন না কেন। সব মুখে টনি-কার্টিস মানায় না। লম্বা মুখ কার্টিস-কাটে আরো লম্বা হয়ে একেবারে ঝুলে পড়ে। তবুও লম্বামুখ লোকরা ফ্যাশানের দায়ে মাথার চুল বিকিয়ে কার্টিস-ছাঁট দিয়ে নিজেদের মুখ নষ্ট করে। সেলুনের সুনামও সেই সঙ্গে নষ্ট হয়।

কিন্তু নরসুন্দরের সৌন্দর্যজ্ঞানে পুরুষদের আস্থা সব দেশেই কম। সেলুনের শিল্পীরা নিবেদিত ... যন্ত্রী। যথা নিযুক্তোস্মি তথা করো[মি] মন্ত্র দিয়ে হৃষিকেশ গ্রাহকদের ... লাঘব করলে তবেই তাঁরা হৃষ্ট হ[ন]... দেখা গেছে পুরুষরা খুব কমই ... কাটার ধরন পাল্টাতে রাজী ... মাথায় টাক-না মাকান মরুভূমির ... না হলে শতকরা প্রায় নব্বুইজন প... সারাজীবন এক ধরনে চুল কেটে যা...

আলবার্ট সেফিয়ারের কিন্তু ... কাটার প্রক্রিয়া একেবারে আ... খদ্দের দোকানে ঢুকলেই তিনি ... ধরনে চুল কাটতে হবে স্যার' ... করেন না। প্রথমে খদ্দেরকে ... বসিয়ে খানিকক্ষণ তার মুখাব[য়বের] দিকে, মাথার দিকে তাকিয়ে চু[ল] বিচার করতে থাকেন তিনি। চু[ল] বিচারকের কর্তব্য শেষ হলে খদ্দে[রকে] সিগারেট অফার করেন সেফি[য়ার]। সিগারেট খেতে খেতে খোলা[খুলি] আলোচনা আরম্ভ হয় খদ্দেরের স[ঙ্গে]।

ক্ষমা করবেন চুল-কাটার আগে আ[পনার] সঙ্গে একটু শারীরিক আলো[চনা] করতে হবে। কি রকমভাবে আপ[নার] চুল কাটলে ভাল দেখাতে পারে ... সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আপন[াকে] জানাবো। আপনার যদি তাতে অ[মত] থাকে পরে আমায় জানাতে পারে[ন]। আপনি যেভাবে সাধারণতঃ চুল ক[াটেন] থাকেন দেখতে পাচ্ছি, সেটা অব[শ্য] খারাপ না। তবে ওইভাবে চুল ক[াটলে] আপনাকে বড্ড স্পর্শকাতর মনে হ[য়]। তাছাড়া কানদুটোও আপনার একটু ব... চুল কাটতে গিয়ে আমি আপনার চিন্[তা]শীল কপালের ওপরেই গুরুত্ব আরো[প] করতে চাই। আপনার মুখ এবং চো[খের] স্পর্শকাতর দৃষ্টির ওপর লোকে[র] দৃষ্টি যত কম পড়ে ততই ভা[ল]। আপনার মাথার ওপরে এখন এব[ং] বেশী পরিমাণেই চুল আছে, ওপ[রের] ওই সমস্ত চুল সরিয়ে মাথার স্বাভাবি[ক] কেশরেখাটিকে ফুটিয়ে তুললে লোকে[র] দৃষ্টিরেখা আগে আপনার চু[লের] ওপরেই গিয়ে পড়বে। কিছু ... আপনার কানের ওপরেও ফেলা উচি[ত], তার ফলে আপনার বড় কান অত ... দেখাবে না। তাছাড়া আমি চাই আপন[ার] কেশবিন্যাসে একটু অবিন্যস্ত ভ[াব] ফোটাতে। যাদের মুখে বুদ্ধির ছা[প] স্পষ্ট, তাদের মুখ ফিটফাট দেখা[লে] সর্বপ্রথমে মুখটাই একেবারে হতবু[দ্ধি] হয়ে পড়ে।

কিন্তু কলকাতার কোন সেলুনে ঢু[কে]...

যদি এই ধরনের কথা শুনতে হয় নির্ঘাৎ মনে হবে পরামানিকমশাই আগামী নির্বাচনে দাঁড়ানোর বাসনায় এখন থেকেই বক্তৃতা অভ্যেস করছেন, এবং সেক্ষেত্রে নিজেদের একমাত্র কর্তব্য হল অন্য কোন সেলুনে নির্বাচন করা। চুল ছাঁটায় আমরা খুব ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হলেও সেলুন-নির্বাচনে নিরতিশয় ব্যক্তিত্বের পক্ষপাতী। যে সেলুনে খদ্দেরের বেমানান মর্জিকে না মেনে মনোনসই চুল-কাটার চেষ্টা হয় সে সেলুন আমাদের কাছে ন্যাড়ার বেল-তলা—ভুলেও দ্বিতীয়বার যাই না। কাজেই কলকাতার সব সেলুনের সাইন-বোর্ডে একই বিজ্ঞপ্তি টাঙানো থাকে : "এখানে উত্তমরূপে চুল কাটা হয়।" গ্রাহক অনুযায়ী চুল কোথাও কাটা হয় না, এবং গ্রাহক অনুযায়ী চুল-কাটার কথা লিখে ব্যবসাও কেউ নষ্ট করতে চান না। অথচ গ্রাহক অনুযায়ী চুল কেটে আলবার্ট সেফি-য়ারের লণ্ডনের ওয়াশিংটন হোটেলের সেলুনটি বারো বছরের মধ্যেই আজকে প্রায় কেশতীর্থ! সেফিয়ার আজও গ্রাহকমণ্ডলীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে উপদেশ-বর্ষণ করে চলেছেন :

—মাথাটা সরু হলে বুঝলেন, ধারের দিকে বাড়তি চুল দরকার, আর ওপরের দিকে যদি মাথাটা বড় হয় আর সেই সঙ্গে চিবুক ছোট, তাহলে বলবো ধারের দিকে যত চুল কম থাকবে ততই ভাল। আপনি যদি বেঁটে হন তাহলে আপনার হেয়ার-লাইন উঁচুতে থাকা দরকার এবং উঁচু হেয়ার-লাইন বজায় রাখতে গেলে চুলটা সামনের দিকে মাচড়াতে হবে। ছোট মুখকে বড় করার উপযুক্ত করতে হলে চুল ফাঁপাতে হবেই আপনাকে। আপনার ঠোঁটটা যদি অতিরিক্ত রকমের ঝোলা হয় তাহলে মাথার চুলে এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকের দৃষ্টি ঝোলা ঠোঁট থেকে সরে যায়। আসলে কি জানেন, ভাল চুল কাটা হচ্ছে ভালভাবে কাটা স্যুটের মতন, গায়ে স্বাভাবিকভাবে আপনা-আপনিই লেগে থাকবে, কারিগরের চাতুরীর কোন স্বাক্ষরই তাতে থাকবে না।

এহেন সেফিয়ারকেও আমাদের মনোতোষদা পাত্তা দেন নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল মনোতোষদা ওয়াশিংটন হোটেলে উঠলেও সেফি-য়ারের সেলুনে একবারও ঢোকেন নি।

—সে কি মনোতোষদা? সেফিয়ারের দোকানে একবারও চুল কাটলেন না?

আমার দিকে খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে বললেন মনোতোষদা,

—দ্যাখ আমি রবীন্দ্রনাথের তরুসিং নেই বটে, কিন্তু তরু সিং-এর চেয়ে কিছু কমও নই। বেণীর সঙ্গে মাথা তরু সিং দিতে চেয়ে-ছিল, কিন্তু আমি শুধু মাথাটাই দিতে পারি, বেণী নৈব নৈব চ! চুল আমি কাউকেই ছিঁড়তে দিতে পারি না, তা নিজের চুল কাউকে ছিঁড়তে দেয়া সেফ না, তোমার সেফিয়ারই বল আর যাই বল। আমার মাথার চুল আমি নিজেই কাটবো ছিঁড়বো!

মনোতোষদা অবশ্য নিজেই নিজের চুল 'ছেঁড়েন,' কিন্তু আমার সে ভাগ্য নয়, খুব আপসোস হলেও কোনদিন নিজের মাথার চুল নিজে ছিঁড়তে পারি নি। অগত্যাই মনোতোষদাকে বলেছিলাম সেদিন :

—আচ্ছা, আমাকে শিখিয়ে দেবেন কি করে নিজের চুল নিজে কাটতে হয়?

—পারি, কিন্তু বেশ কিছু টাকা খরচ করতে হবে তোকে!

—টাকা? কেন কোন নাপিতকে প্রাইভেট টিউটার রাখতে হবে?

—না, তা নয়। তবে নিজের চুল কেটে ত আর চুলকাটা শেখানো যায় না, পরের চুল কেটে শিখতে হয়। তোকে প্রথমে—

মনোতোষদার কথা শেষ না হতেই লাফিয়ে উঠি,

—বুঝেছি, বুঝেছি। প্রথমে আমাকে এমন লোক ঠিক করতে হবে যে টাকার বিনিময়ে আমাকে তার চুল কাটতে দিতে রাজী হবে।

—দূর বোকা! টাকা দিলেও কেউ রাজী হয় নাকি এ ব্যাপারে? আনাড়ী হাতে চুল কাটলেই ত তোকে ন্যাড়া হতে হবে। আর একবার সে ন্যাড়া হওয়া মানেই তোমাকে প্রায় ছ মাস বসে থাকতে হবে তার চুল গজানোর জন্যে। আবার এই ছ মাস চুল না কাটার ফলে দেখবি যেটুকু শিখেছিলি সেটুকুও ভুলে গেছিস!

তাহলে পরের চুল পাবো কি করে?

—পরের চুল পাওয়া শক্ত কি, পর-চুলো কিনলেই হয়। আমি এই পরচুলো মাথায় পরেই ত প্রথমে নিজের চুল নিজে কাটতে শিখেছি। অন্যের মাথার চুলকে আপন করে নিলেই নিজের চুল নিজে কাটতে শেখা যায় সহজে। পাঁচটা পর-চুলো কাটলেই দেখবি নির্ঘাৎ শিখে গেছিস চুল কাটতে।

পরচুলো মাথায় পরেই প্রথমে নিজের চুল নিজে কাটতে শিখেছি

খানিকক্ষণ মনোতোষদার দিকে আমাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় বিস্ময়ে। তারপর আস্তে আস্তে বলতে হয়,

—কিন্তু পাঁচবার পরচুলোয় হাত পাকাবার পরও যদি প্রথমবার নিজের আসল চুল কাটতে গিয়ে চুল-কাটা খারাপ হয়ে যায়? তখন ত আর বাইরে বেরুনো যাবে না!

—প্রথম প্রথম ত হবেই, এমন কি পরেও দু-চার বার হতে পারে। আরে তাই ত পরচুলোয় সুবিধে! এই যেমন ধর না, এই, এইবারই ত চুল কাটতে গিয়ে ঘাড়ের এক দিকটা অনেকখানি উঠে গেল আমার। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কি? যাচ্ছে না। পরের চুলকে আপন করে নেয়ার ওই ত সুবিধে। এই দ্যাখ না—

আমাকে প্রায় পাথর করে দিয়ে, হ্যাঁ, সাধুভাষায় বলতে গেলে ঠিক আপন করেই একটা পরচুলো টান মেরে নিজের মাথা থেকে খুলে আমার চোখের সামনে নাড়তে লাগলেন মনোতোষদা।

টলস্টয় : স্মৃতি চারণা প্রসঙ্গে

অজিত দে

"বৃষ্টি-ঝরা আষাঢ় শ্রাবণের দুপুরে বুড়ী ঠাকুরমা দিদিমার কোল ঘেঁষে বসে তোমরা নিশ্চয়ই ছেলেবেলায় অনেক ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, রূপ-কথার দেশের রাজকন্যার কাহিনী, বা ঠাকুরমার ঝুলির রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনেছ'—, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই: কিন্তু সেই বুড়ী ঠাকুরমার মুখে কি কখনো তাঁর বাবা-মার গল্প শুনেছ? একেতো কোমর-ভাঙ্গা দাঁত-ফোগলা বুড়ী ঠাকুমা—তাঁরও আবার বাবা-মা? তা কি কখনো হয়? না হতে পারে? তাই না? তোমরা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছ' আমি যত সব মিথ্যে আষাঢ়ে গল্প বলছি তোমাদের, তাই না? কিন্তু সত্যিই বিশ্বাস করো', মিথ্যে আমি বলিনি, ঠিক তোমাদেরই মত আমারও বাবা-মা ছিলেন একদিন।"

একেতো ঠাকুরমার বাবা—তায় আবার যে-সে বাবা নন, তিনি হলেন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যস্রষ্টা, মহান শিল্পী, নির্যাতিত মানবাত্মার একনিষ্ঠ প্রেমিক কাউন্ট লিও টলস্টয়। কাউন্টের সর্বকনিষ্ঠা কন্যা কাউন্টেস্ আলেকজান্দ্রা —তাঁর দেবতুল্য পিতার বিষয় বলতে গিয়ে ও'পরের কথাগুলি বলেছেন। আলেকজান্দ্রা আজ সাতাত্তর পেরিয়ে আটাত্তরে পা' দিয়েছেন; দীর্ঘ পুষ্ট রুশ রমণীর সে শারীরিক ঐশ্বর্য এখন আর এই বয়সে নেই বটে কিন্তু অতীতের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের শেষ স্বাক্ষর আজও তিনি বহন করছেন। নিউ ইয়র্কের প্রান্তসীমায় এক নিভৃত গ্রাম্য পরিবেশে ঋষি পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজে মগ্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছেন টলস্টয়-দীক্ষিত নিষ্ঠাবতী কাউন্টেস্ আলেকজান্দ্রা।

কিছুদিন আগে এক মার্কিন সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এই মহীয়সী মহিলা বলেছেন—"সহোদর ভাই-বোনে মিলে আমরা ছিলুম সবসমেত তেরো-জন—তার মধ্যে সবার ছোট আমিই। আজ আর কেউ বেঁচেও নেই। বাবা জন্মেছিলেন আমাদের পৈত্রিক গাঁয়ের বাড়ীতে—'য়শনায়া পলিয়ানা' গ্রামে ১৮২৮ সালে। সেটা ছিল জার-তন্ত্রের যুগ—দাসপ্রথার শেষ নির্যাতনের কাল। কাউণ্ট উপাধিটা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের পরিবারটি ছিল বৃহৎ এক জমিদার বংশোদ্ভূত। জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়ে বাবা যখন তখ্তে-তাউসে বসলেন তখন তাঁর হাতে এলো কয়েক হাজার বিঘে আবাদী জমি, কয়েকশত গবাদি পশুর একটি বিরাট দল আর তারও চেয়ে বৃহত্তর ক্রীতদাস-দের এক গোষ্ঠী। পৈত্রিক ভদ্রাসনটিও ছিল বড় কম নয়, তাতার সুলতানদের প্রাসাদেরই মত ছিল কিংবদন্তীতে রহস্যময়, ভয়ঙ্কর ও দুর্গম। সে বাড়ীতে ঘর ছিল অসংখ্য—যার অর্ধেকেরও অর্ধেক ঝাড়পোঁছ তদারকি করতে আমরা দেখেছি চোদ্দজন ক্রীতদাস হিমসিম খেয়ে যেত।

"আমার বাবার জীবনের প্রথম পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে শুনেছি অকল্পনীয় বিলাস-ব্যসনে, ফুর্তি-আমোদে, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যে বেশ রাজকীয় ভাবেই। তারপরই এলো তাঁর চরম বিবর্তনের দিন—জীবন-দর্শনের আমূল পরিবর্তনের মাহেন্দ্রক্ষণ। মহত্তর মানবতাবোধের যে অগ্নিময় চেতনা তাঁর সমগ্র যৌবন আর প্রৌঢ় কালটিকে অহরহ পুড়িয়ে মারছিল তা থেকে যেন তিনি কিছুতেই নিস্কৃতি পাচ্ছিলেন না মায়া-মমতাহীন সেই উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে।

"আমার মা কাউন্টেস্ সোনিয়া ছিলেন দুর্দান্ত রকমের ঐশ্বর্য-বিলাসিনী। মা তাঁর ছেলেমেয়েদেরও তৈরী করেছিলেন ঠিক সেই ছাঁচে। যাকে তোমরা বল 'প্রাইমাডোনা' (Prima Dona) আমার বড় বোন মার্শা ছিল সে যুগের তাই। সে ছিল শিল্পী, কাব্যরসিকা, নৃত্য-গীতে বিশেষ পটিয়সী, আর পরমাসুন্দরী। তার ঘরে প্রত্যহ আসর জমিয়ে বসতো সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি, অভিনেতা, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকরা আর মধুলোভী সম্ভ্রান্ত অভিজাত যুবকের দল। তারা সবাই মত্ত থাকতো তাতিয়ানা অর্থাৎ মার্শার চিত্তবিনোদনে আর মার্শা তাদের মধ্যে ছড়াত চতুর কটাক্ষমদিরা লোভনীয় যৌবন-হিল্লোল। বাড়ীর ভিতরকার এই হৈহুল্লোড়ে ভরা উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে বাবা হাঁপিয়ে উঠতেন, ধিক্কারে আর ঘৃণায় বিরাগ প্রকাশ করতেন আর মা-ও ততোধিক ক্রোধে রূঢ় ভাষায় বাবাকে করতেন শাসন। পরিবারের সর্বগ্রাসী এ বিরোধ অগ্রাহ্য করে, মার সঙ্গে গৃহ বিবাদ আর আমার বড় ভাইদের উচ্ছৃঙ্খল আচার-ব্যবহারের কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে বাবা ধীরে ধীরে ত্যাগ ও সেবাধর্মে দীক্ষিত মহান ঋষি জীবনদর্শনের পথে এগিয়ে যেতে শুরু করলেন।

"তাঁর নিজের প্রজা ক্রীতদাসদের তিনি সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত করলেন, তাদের সন্তানাদির জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন আর যৌথ-কৃষি-ব্যবস্থার রীতি প্রচলন করে নিজেদের পরিশ্রমে অর্জিত সম্পদে তাদের অংশীদার করে নিলেন। বিলাস-ব্যসনের পথ সম্পূর্ণ পরিহার করে গ্রহণ করলেন সহজ সরল সন্ন্যাসী জীবন। খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করে নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে শুরু করলেন। পোশাক পরিচ্ছদের ধারাও বদলে ফেললেন, যেটুকু মাত্র আচ্ছাদন নইলে নয় তা ছেঁটেকেটে একেবারে ন্যূনতমে এনে ফেললেন। খুব ছোটবেলা জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি দেখেছি নিজের চোখে বাবার আশ্চর্য সহনশীলতা। প্রতিকূল পরিবেশের নিরন্তর বিরোধ তার বিরুদ্ধে তাঁর অনমনীয় ধৈর্যশীল দৃঢ়তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যেতুম।

"আমি যখন জন্মেছি বাবা তখন তাঁর আত্মিক সংগ্রামের মধ্যপথে। আমি তাঁর সকলের ছোট সন্তান—বুঝতুম না কিছুই—তবু কি জানি কেন বাবা আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর নতুন জীবন-দর্শনের, প্রেমধর্মের পথে ক্ষুদ্রতম শিষ্যা হিসেবে। আমাকে তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে শেখাতেন আত্মীয়স্বজনের প্রতি, পরিবারের অধস্তন ক্রীতদাসদাসীদের প্রতি, বন্ধু

বান্ধবের প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হবে, কি ধরণের কথা বলতে হবে, কাকে কেমন ভাবে নিতে হবে।"

সাতাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা মহিলা জগদ্বিখ্যাত পিতার স্মৃতি-চারণা করতে করতে বার বার চোখের জল মোছেন আর হেসে ফেলেন—বোধহয় অল্পবয়স্ক শ্রোতাদের সামনে অশ্রুবিসর্জনে লজ্জিত হয়ে পড়েন, অথবা পিতৃ-প্রসঙ্গে শ্লাঘা বোধ করেন। আবার শুরু করে বলতে লাগলেন—"বাবা বলতেন—'নিজের হাতে কাজ করো, প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সহজ সরল জীবনের পথে এগিয়ে চল', আর নির্যাতিত মানুষের সেবায় ও প্রেমে উৎসর্গীকৃত হও।"

আলেকজান্দ্রা টলস্টয় যখন ষোলো বছরে পড়লেন তখন তাঁর বড় বোন মার্শা—বিয়ে থা' করে সংসার পাততে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলো। মার্শাই এতদিন টলস্টয়ের সেক্রেটারীর কাজ করত। এবারে ভার পড়লো আলেক-জান্দ্রার ওপর। এই ভার পিতৃভক্তি-পরায়ণা সৌভাগ্যবতী মহিলা বাবার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বহন করে এসেছেন। তিনি বলেন—"খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকাল আটটা নাগাদ বাবা বাগানে চলে যেতেন; কোনদিন হয়ত কোন গাছের গুঁড়ি অথবা মাটির ঢিবির ওপর অথবা কখনও তাঁর প্রিয় বেঞ্চিটিতে বসে চিন্তা করে নিতেন তিনি সারাদিনটি কেমনভাবে কাটাবেন। ঘণ্টাখানেক বাগানে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে প্রাতরাশ খেতেন লালরুটি আর কফি। তারপর ঢুকতেন তিনি লেখাপড়ার ঘরে। বেলা একটা পর্যন্ত লিখতেন। এরপরে খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ করে বাবা সিধে চলে যেতেন মাঠে—যেখানে তাঁর যৌথ কৃষি পরিকল্পনার চলছিল প্রথম প্রয়োগ। মাঠে চাষাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাবা নিজেও কাজ করতেন ওদেরই মত একাগ্রতায় ও কঠোর পরিশ্রমে। সন্ধে পর্যন্ত কাজ করে ফিরে আসতেন বাড়ীতে আর সিধে গিয়ে ঢুকতেন আবার লেখাপড়ার ঘরে।"

বারবার কাটাকুটি করে লেখাকে যতক্ষণ না ঠিক মনের মত করতে পারতেন ততক্ষণ টলস্টয় শান্তি পেতেন না। এই কাটাকুটি আর সংশোধনের কাজে কোন কোন লেখা সম্পূর্ণ দোষ-ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠতে শুধু মাসই নয়, বছরও গড়িয়ে যেত। শোনা যায় রেসারেকসন্ উপন্যাসখানি নাকি দশ বছর ধরে কাটাকুটি করে তবে টলস্টয় ছাপতে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত জড়ানো এবং অস্পষ্ট। সেই লেখা কপি করার জন্যে নতুন সেক্রেটারী অর্থাৎ আলেকজান্দ্রার কাজে বহালের গোড়ার দিকে চোখের জল পড়ত অঝোরে। বৃদ্ধা হাসতে হাসতে বললেন—"বাবার লেখা কপি করতে গিয়ে অস্পষ্ট জড়ানো হাতের লেখা পড়তে না পারার জন্যে রাগে আর দুঃখে আমি কেঁদে ফেলতুম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কঠিন পরিশ্রম করে সে লেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলুম—এবং তারও পরে আমি Short-hand ও typewriting শিখে ফেলেছিলুম।"

টলস্টয় তাঁর কন্যাকে যে শুধু লেখা কপি করতে দিতেন তা নয়—নিজের পরিকল্পিত সমাজসেবামূলক কিছু কিছু কাজের ভারও দিতেন। তার মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর জমিদারীর কৃষক এবং দিনমজুরের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল পরিচালনা করা।

"বাবা বলতেন—'চাষামজুরের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজটাকে তুমি যা-তা মনে করো না, শাশা;' বাবা আমায় ঐ নামেই ডাকতেন। বলতেন—'কোন কাজই তুচ্ছতাচ্ছিল্যে অবহেলা করে করলে তার অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় না—কারণ কাজের সার্থকতা এবং সিদ্ধি থাকে তার কঠোরতা এবং

একাগ্রতার মধ্যে লুকনো। কঠিন কার্য-সিদ্ধির আস্বাদনই আলাদা, সেটা উপভোগ করার চেষ্টা করো আনন্দ পাবে'।"

সে যুগের উচ্চশ্রেণীর আভিজাত্য আর মর্যাদায় উজ্জ্বল ছিলেন আলেকজান্দ্রার মা অর্থাৎ টলস্টয়ের স্ত্রী কাউন্টেস সোনিয়া। তিনি সন্তানদের শেখাতেন অভিজাত সমাজের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, চারিত্রিক নীতির শিথিল ও উচ্ছল অপব্যবহার। বাবা টলস্টয় কিন্তু শেখাতেন ঠিক উল্টো আদর্শ—সমাজের নীচ, নির্যাতিত দরিদ্রের প্রতি মায়া-মমতাপূর্ণ অন্তরঙ্গতা, ব্যক্তিগত জীবনের দৃঢ়নীতি-পূর্ণ সংযমী আচার। "তখন আমার বয়স কত আর হবে—বছর এগারো-বারোর বেশী নয়—" বৃদ্ধা বলতে লাগলেন,—"একদিন সকালে প্রাতরাশের আগে আমার বিছানার পাশের জানালাটিতে কি যেন স্বপ্নের ঘোরে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলুন অনেকক্ষণ। আর ঘরের ভিতরে তখন আমাদের একজন বৃদ্ধা ক্রীতদাসী আমার বিছানা ঝাড়পোঁছ করে দিচ্ছিল। বাবা এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে ঘরে এসে আদর করে আমায় কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর স্বভাবজ মিষ্টিমধুর কথায় বললেন—"শাশা, মা, এখন তুমি বড় হয়েছ, গায়ে তোমার কত জোর হোয়েছে, তবে ঐ বুড়ী মানুষকে দিয়ে কেন তোমার বিছানা করিয়ে নিচ্ছ? ওর কত কষ্ট হচ্ছে দেখোতো।" বলা মাত্রই হঠাৎ কেমন যেন আমি হয়ে গেলুম। সেদিন থেকে আর কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি আমার জীবনে; নিজের প্রয়োজনের যা কিছু সব নিজেই করে নিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে আজও এ বৃদ্ধ বয়সে আমার নিজের প্রয়োজনের সব কিছু আমি নিজের হাতেই করে নিই—কোন কষ্ট আমার হয় না।"

আর একবার জাপানের এক লেখক এসেছিলেন টলস্টয়ের সঙ্গে দেখা করতে। কয়েকদিন তিনি অতিথি হয়ে ছিলেন ওঁদের বাড়ীতে। একদিন বিকালে সেই লেখকের সঙ্গে বাড়ীর লনে টেনিস খেলছিলেন আলেকজান্দ্রা। টলস্টয় বাগানে গিয়েছিলেন কাঠ কাটতে। হঠাৎ কুড়ুল হাতে বাগান থেকে খেলার ছলে এসে আলেকজান্দ্রাকে ডেকে সেই চিরকালের মাধুর্যেভরা স্বরে বললেন—, "শাশা, আমাদের মাঠে একজন অন্তঃসত্ত্বা চাষী অতি কষ্টে ঘাস বোঝাই করছে গাড়ীতে দেখে এলুম—; যৌবনশক্তিতেভরা আমার এমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে টেনিস খেলবে আর ঐ চাষীটি কষ্ট পাবে এ আমি কল্পনাও করতে পারি না, যাও মা তাকে একটু সাহায্য করো গে।" সেদিন সেই জাপানী লেখক আর মেয়ে আলেকজান্দ্রা দুজনেই ছুটে গিয়েছিলেন মাঠে আর সেই চাষীর কাজ নিজেরা শেষ করে তবে বাড়ী ফিরেছিলেন সন্ধ্যার অনেক পরে। এই ঘটনার কথা বলে সবশেষে সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধা কাউন্টেস্ আলেকজান্দ্রা বললেন—"অবসর বিনোদনের আনন্দ এইভাবে উপভোগ করতেই আমি শিখেছিলুম আমার বাবার কাছে সেই ছেলেবেলা থেকে—এবং আজও আমি সেই আনন্দই পাই।"

মানবতাধর্মের আদর্শে পূর্ণ-বিশ্বাসী, ত্যাগ ও সেবাব্রতে উৎসর্গীত-জীবন, এবং নিজের পারিবারিক জীবনের যথেচ্ছাচারিতায় ও উচ্ছৃংখলতায় তিক্ত বিরক্ত সেই মহাজীবনের বুকে আলোড়িত হচ্ছিল তখন সাগরের উত্তাল অশান্তি। কিছুতেই যেন তিনি পেরে উঠছিলেন না শান্ত হতে, শান্তি পেতে। তাই একদিন রাত্রে—১৯১০ সালের ২৮শে অক্টোবরের তুষারক্লিষ্ট এক নিশ্রুতিগভীর রাতে জগদ্বরেণ্য সেই মহান স্রষ্টা ঋষি টলস্টয় তাঁর একমাত্র পারিবারিক বন্ধু, শিষ্যা ও সহচরী কনিষ্ঠা কন্যা আলেকজান্দ্রাকে নিয়ে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন 'যশনায়া পলিয়ানা' ছেড়ে। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর'— বোধহয় সেই উদ্দেশ্যে টলস্টয় বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁর অনির্দেশ যাত্রায়। দীর্ঘকান্তি সেই সৌম্য ঋষি কন্যার কাঁধে ভর করে ঘুরে বেড়ালেন কত গ্রাম কত জনপদ—হৃদয়ের গভীরতম নদীতে ঝরে পড়ল কত না নীরব অশ্রুধারা—নির্যাতিত মানবাত্মার অব্যক্ত বেদনায়। শেষে 'এ্যাসটোপভ্' নামে এক গ্রামে ট্রেনের মধ্যে তিনি নিউমোনিয়া রোগে বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন; সেই গ্রামেই তাঁকে নামিয়ে স্টেশনমাস্টারের ঘরে শুইয়ে দেওয়া হোল। এবং এখানেই ১৯১০ সালের ৭ই নভেম্বরে এ জগতের সমস্ত পার্থিব ঋণ পরিশোধ করে চিরশান্তির কোলে বিশ্রাম নিলেন জগতের সবচেয়ে বড় দুঃখী মহান শিল্পী ঋষি টলস্টয়।

সৌভাগ্যবতী মহীয়সী আলেকজান্দ্রা জলভরা দুটি চোখে রুমাল বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"তোমরা কিছু মনে করো না যেন, বাবার কথা বলতে গেলেই চোখে আমার এমনি জল এসে যায়, কি যে ভালো লাগে! মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি আমায় শেষ আদেশ দিয়ে গেছেন জীবনে যেন কখনো ঐশ্বর্যপূর্ণ বিলাসীর জীবনযাপন না করি; শুধু তাই নয়, দরিদ্র দুঃখী অত্যন্ত সাধারণ মানুষকে যেন আমার নিজের কোন সুখের জন্য, কোন খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য, কোন আর্থিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্যাতন না করি।"

কাউন্টেস আলেকজান্দ্রা বললেন—"বাবা বলতেন, 'নিজের হাতে কাজ করো, প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সহজ সরল জীবনের পথে এগিয়ে চলো আর নির্যাতিত মানুষের সেবায় ও প্রেমে উৎসর্গীত হও।' —তাঁর সে কথা যেন না আমি কখনো ভুলি এই ছিল আমার আজীবনের সাধনা। জানিনা কতদূর পেরেছি, তবে বাবার স্বর্গীয় আশীর্বাদ যে প্রতিমুহূর্তে আমায় রক্ষা করছে সে বিশ্বাস আমি হারাইনি কখনো।"
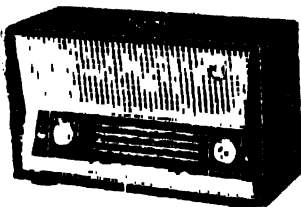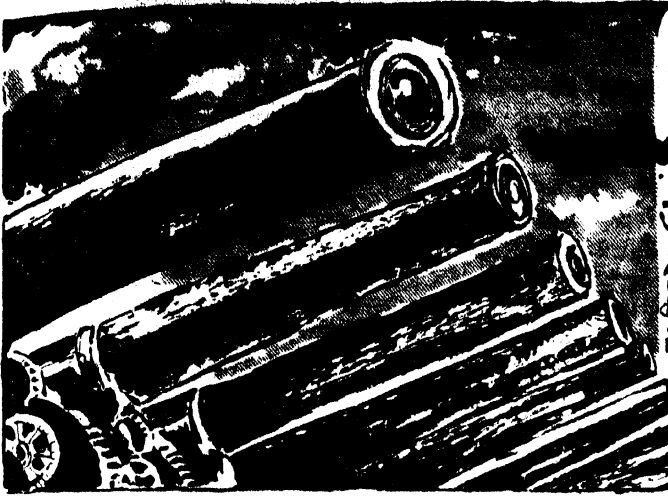
এই যুদ্ধ এবং তিনি

অশোককুমার সেনগুপ্ত
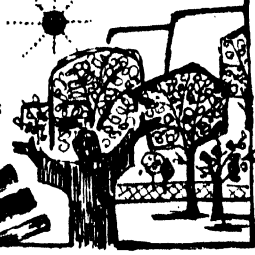
তবুও স্বপ্নের অদৃশ্য সুতোর কোমলতায় কর্কশ নৃশংস ক্রুর হাতের চাপ পড়ল।

অথচ এখনও সোনাগোলা রোদ ধানের শিষে! দূরে আমবাগানে পাখির শব্দ! শীতের সূর্য পূবের আকাশে। তিনি দেখলেন। বাতাস এল। গন্ধ বইল। হাতের লাঠির মাটি-ঘষা আওয়াজ এবার শ্রুতিগোচর হল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। গায়ের চাদর বাঁ হাতে কান পর্যন্ত তুললেন। যেন এতক্ষণে গ্রাম থেকে এতটা পথ আসার পর প্রথম শীত লাগল। শরীরে লোমকূপে যেন হিম ঢুকল। অথচ এখন ত বুকভরা আগুন। হায়, এ সামান্য শীতে এ ভীতি! অথচ এ হিম শরীরে জল হবে। তিনি চোখে হাত দিলেন। আঙ্গুলের ডগায় উঠে এল পিচুটি। চোখ কড়কড় করল কিসের যেন জ্বালায়। তাঁর মনে হল চোখ যেন ভিজে গেল কিসের প্লাবনে। পরক্ষণে মনে পড়ল এখনও তিনি মুখে জল দেন নি। সঙ্গে সঙ্গে মুখের গন্ধ, দাঁতগুলোয় ময়লার আস্বাদন, ঠোঁট চোখ জুড়ে মেশা পুরাতন একটি দিনের ক্লেদ তাঁকে কষ্ট দিল। তিনি নিজেকে বড় বেশী অসুখী মনে করলেন। কোট, কতদিনের পুরাতন তা তাঁর মনে নেই; চাদর সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় কেনা, জামা, কাপড়ের মধ্যেকার শরীর যেন ঘিনঘিন করে উঠল। জিভ চেটে একটা টক্ টক্ স্বাদ তিনি নিলেন। সামনে বড় পুকুর। দু'পাশে উঁচু পাড়। পাহাড়ের সামিল। তার উপর দীর্ঘ তালগাছ। তাদের পাতার কর্কশ শব্দ এল। মধ্যিখানে গুহার মত ফাঁক হয়ে আছে ঘাটে নামার পথ। অশত্থগাছটার উঠে থাকা শিকড়ে লাঠির খোঁচা দিয়ে তিনি ভাবলেন। 'এবার কি একবার ঘাটে যাব? গিয়ে মুখটা ধুয়ে এলে কেমন হয়।' উত্তর দিকে কোন পাড় নেই ধানক্ষেত আর পশ্চিমে শাল মহুয়ার বন। তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না এই পাহাড়ের আড়ালে। তবু তাঁর যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওই বনের বুকে। 'আঃ ওই বন আমার কতদিনের পরিচিত। আমি ওদের প্রত্যেককে চিনি। কোন গাছ আমার অপরিচিত নয়। কত নির্জন সন্ধ্যা, আর প্রত্যুষের গাঢ় কোমল মুহূর্তগুলি কাটিয়েছি ওদের তলায়। সে—সে কবেকার! আমি এ গ্রামে এসেছি সেই কবে?' তার এ সময় ভাবতে ভীষণ ভাল লাগছিল। কেন, তিনি বুঝতে পারছিলেন না। স্কুলমাষ্টারি নিয়ে তিনি এসেছেন হাওড়া থেকে এতদূরে। এই বীরভূমের শেষ প্রান্তরে। সাঁওতাল পরগণার শেষ সীমায়। শহর থেকে পনের মাইল দূরের এ গ্রামে। নতুন স্কুলকে তারপর তিনি ক্রমশঃ ভাল বেসেছেন। আর ইচ্ছে করে নি। ইচ্ছে করে নি অন্য কোথাও গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু কাটান। তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন এ গ্রামের বহু পরিচিত। শুধু এ জন্ম নয় জন্ম জন্মান্তরের। ভাবতে ভাবতে তিনি কখন যেন পা পা করে এগিয়ে গিয়েছেন। ঘাটের দিকে নয় ঘাসের মধ্যে সিঁথির মত সাদা একফালি রাস্তার দিকে। দু'পাশে সবুজ ঘাসের বিছানা। মধ্যিখানে ঘাস উঠে যাওয়া সরু সাদা, বিধবার মত করুণ পথ। তিনি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। দূরের নতুন হাসপাতালের হলদে বাড়ীর বুকে সূর্যের আলো দেখলেন।

তিনি চকিতে মুখ ঘোরালেন। কে যেন তাকে ডাকল। যেন একেবারে কানের কাছে। মাষ্টারমশাই। তিনি আবার শুনলেন। তারপর সমস্ত শরীর ঘুরিয়ে নিলেন। ঘাড় নাড়লেন কঠিন এক দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। মাথায় হাত তুললেন। সামনের মানুষটাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'হঠাৎ এদিকে?' এমনভাবে ঘাড় দোলালেন, চোখের পাতা নামালেন যেন তিনি অপরিচিত। মুখ কুঁচকে গেল। কি যেন ভাবলেন। তিনি কি যে কথা বললেন তা ভেবে পেলেন না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হঠাৎ সব ছাপিয়ে বললেন, পাঁচকড়ি, পুকুরে যাবে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মাষ্টারমশায়। আপুনি কুথা যাচ্ছেন? পাঁচকড়ি বিগলিত হয়ে হাসল। একটু থামল। তারপর মাষ্টারমশায়কে নীরব দেখে বলল, ছেলের পত্তরটো এয়েছে? ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ দেখল।

এবার তাঁর যেন অনুভব হল। তিনি সরে যেতে চাইলেন এবার। এই মানুষটার সামনে থেকে বিদ্যুতের মধ্যে ছিটকে যেতে চাইলেন। এ কথা শুনে তাঁর কি কষ্ট হল? তিনি বুঝতে পারলেন না। এই কথা শুনে তাঁর কি হৃদয় অপার তৃপ্তিতে ভরে উঠল? তিনি বুঝতে পারলেন না। শুধু তাঁর ভাল লাগছিল না। এই মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেন কিছু সহ্য করতে পারছিলেন না। অশেষ দুঃখ অথবা সুতীব্র সুখ। কিছু না। 'আমি একটু বনের ওদিকে যাব।'

তিনি হাসলেন। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন কিছুটা। বাতাস রোদ মেখেও শীতলতা দিল। তাঁর যেন হাড় কাঁপল। 'আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি।' তাঁর সমস্ত শরীর রি রি করে উঠল। "অথচ...অথচ আমি এখন যুদ্ধে যেতে চাই।" তাঁর বুকজুড়ে হাড় কাঁপিয়ে শীতের চেয়েও রূঢ় বেদনা পাক খাচ্ছিল। তিনি বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। চারপাশে ভয়ঙ্কর বাতাসহীনতা! যেন দমবন্ধ হয়ে আসে। যেন শরীর পোড়ায়। রক্তে আগুন ধরায়। আঃ কি নির্মম, কি অসহ্য এ বাতাসহীনতা!

কিছুটা হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক গাছের কাছে এলেন। বিরাট অশ্বত্থ। তার পাশে একেবারে গা ঘেঁষে একটা শাল। তার দীর্ঘ দেহ অনেক উঁচুতে। তিনি এ গাছের গোড়ায় বসেন। প্রতিটি দিন। আজও উঠে থাকা মোটা অশ্বত্থের একটা শিকড়ে বসলেন। ভাবলেন এ সময় তার ছেলের কথা। বা এখানে এসে তাকিয়েছেন। ফ্যাকাশে বোকা বোকা চোখে চেয়েছেন ছেলের মুখের দিকে।

—বাবা। আমি কাল যাব। বলিষ্ঠতায় তার সমস্ত শরীর গমগম করে উঠছিল। বলেছিল, বাবা অসহ্যতা যে কাকে বলে তা আমি এই প্রথম বুঝলাম। আমি কোনদিন জানিনি এর আগে। তারপর একটু থেমে মুখে একগাল হাসি নিয়ে বলেছে, বাবা, তোমার মনে আছে সেই পড়ানর কথা। তুমি ক্লাসে ইতিহাস পড়ানর সময় বলতে পুরুর কথা। সেই বীরত্বের কাহিনী। তাঁর নির্ভীকতা তাঁর দেশাত্মবোধের কথা বলতে বলতে তোমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসত। মনে নেই বাবা! জান বাবা, আজ সুযোগ এসেছে। পুরু হবার স্বপ্ন যদি কোনদিন দেখে থাকি তবে তা আজ পূর্ণ হবে। বাবা, এ সুযোগ আমি কিছুতেই নষ্ট করতে পারব না। লক্ষ্মীটি তুমি এ সময় মায়া-মমতার কথা ভুলে যাও।

তাঁর মনে হল এ গাছ যেন পুড়বে

তাঁর তখন মনে পড়ল ছেলেকে। বলিষ্ঠ সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য। একথা মনে পড়তেই গত তিনদিন যাবত তাঁর এভাব কেন ক্রমশঃ তা স্পষ্ট হয়ে এল। তবে কি তিনি ব্যথা পেয়েছেন? ছেলের যুদ্ধে যাওয়াটাকে তিনি মানিয়ে নিতে পারেন নি? ভাবলেন। হয়ত বা তাই। একমুহূর্ত দোলা দিল। নিজেকে বড় বেশী নীচ কঠিন ক্রুর এবং শঠ বলে মনে হচ্ছিল। স্বার্থপরতার অন্ধ গলিতে গন্ধ তার সমস্ত শরীর ছাপিয়ে উঠছিল। অথচ ছেলে হাসিমুখে ঘাড় নেড়েছে। অথচ ছেলে বাবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছে, বাবা, তুমি কথা বল।

—কি কথা বলব। তিনি বিষণ্ণ হয়েছেন। বিমর্ষতা তাঁর শরীরে ঢেউ তুলেছে। তিনি যেন কথাটা শুনতে পাননি এমন মুখ চোখ তুলে

তিনি আর কোন কথা বলেন নি। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন তিনি খুঁজেছেন। কিন্তু কিছু পাননি সেই শান্ত সৌম মুখের পাতায়। তাঁর বুক কিসের যেন এক অদৃশ্য শক্তিতে ভরে উঠেছে। চোখ বুঁজেছেন। গাঢ় শ্বাস ফেলেছেন। হাত মেলে আবার হাত গুটিয়েছেন। পুরাতন সেই চাদরটা আবার শরীরে চাপা দিয়েছেন।

তিনি এখানে বসে ভাবলেন। ভাবলেন পরক্ষণ থেকে এল দুর্বলতা। কিন্তু কিসের এই দৌর্বল্য? এ কি স্নেহ-মায়া আপন থেকে জন্ম? না কি শরীরের দুর্বলতা? এই বদ্ধ, অশক্ত শরীরকে বহন করতে পারছে না আর? হৃদয় কি এরই মধ্যে অবসন্ন হয়ে এল?

রোদ ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছে। সূর্যের উত্তাপ তাঁর সারা শরীর ভরে জমছে। এক খসখসে তীব্র অনুভূতি তাঁর চামড়া-পথে বিস্তৃত করল। তিনি যেন এখানে আর বসে থাকতে চাইলেন না। সব কিছু কেমন যেন তিক্ত আর বিস্বাদ মনে হতে থাকল তাঁর। গতকাল তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর মনে পড়ল। এবার ভয় এল। ঘটনা, বড় বড় হেডিংগুলো যেন তাঁর সামনে উদ্দাম নৃত্য শুরু করল। তিনি চোখ বুঁজলেন। তাঁর চারপাশে অজস্র গাছ। ও পাশে শাল শিমুল মহুয়া। কোণ বরাবর একরাশ ডালপালা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে দুটি আমগাছ। তার পাশে একটা উঁচু ঢিবি। নীচে গর্ত। এখানে সেখানে শীতে সর্বাঙ্গ ঢাকা-দেওয়া বৃদ্ধার মত ঝোপ, কাঁটা ঝোপ, বনকুলের ঝোপ। তিনি চোখ খুলে সব দেখলেন। তিনি ভালবাসেন এই সব গাছ, এখানকার এ নির্জনতা। ভালবাসেন পাতার মৃদু আলোড়ন, পাখির শ্বণন, সবুজের হিল্লোল। এরা যেন সব ভুলিয়ে দেয়। এ আমার প্রিয়। এ আমার আপন। এ আমার ভালবাসা। হঠাৎ যেন সংবাদ-পত্রের হেডিং দুলল তাঁর সামনে, অনেক লেখা। "তেজপুর অঞ্চল থেকে অধিবাসীদের অন্যত্র সরান হইল"; 'ওয়ালং-এর পরিস্থিতি ভয়াবহ"; "মনপা শিশু আর আগুন জ্বেলে উত্তাপ নিতে পারে না"; "বিশ্বাসঘাতক চীনের সমুচিত জবাব দিব"; "আরও একটি ভারতীয় ঘাঁটির পতন।" তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। সংবাদপত্রের খবরগুলো পোকার মত কিলবিল করে তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে বইতে থাকল। তিনি অশক্ত হাতে গাছের গুঁড়ি ধরলেন। আকাশ দেখলেন। যেন চাতকের মত কয়েক বিন্দু জলের প্রার্থনা জানালেন ঈশ্বরের কাছে। তাঁর মনে হল এ গাছ যেন পুড়বে। এক মুঠো আগুন নিয়ে এ নৃশংস দানব যেন এগিয়ে আসছে। সব লুপ্ত হবে। আমার এ ভালবাসা জ্বলে যাবে। পারি না—পারি না। দুহাতে কান চাপা দিয়ে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আপ্রাণ শক্তিতে সে আগুন নেভাতে চাইলেন। পারলেন না। হঠাৎ বিদ্যুতের মত চকিতে তাঁর কি যেন মনে হল। মনে হল যেন তাঁর চারপাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শক্তি বাতাসে ভাসছে। প্রতিরোধের কঠিন দৃঢ় ঘাঁটিগুলো সব দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটা কথা, শুধু একটা আশ্বাস, শুধু একটা সহানুভূতি পেলে যেন সব এগিয়ে আসবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে সব দানবের বুকে।

আগুনে জল দেবে। তিনি মাথা নীচু করলেন। যেন কিছু দেখতে চান না। অথচ শব্দ উঠছে। অথচ শব্দ হল। কি যেন ভাঙছে। কি যেন ভেঙে গেল।

তিনি আর পারলেন না। চিৎকার করে উঠলেন, ওগো, তোমরা সব এগিয়ে এসো। ওগো তোমরা সব এগিয়ে এসো!

বিকাল বেলায় তিনি ছেলের পৌঁছা সংবাদ পেলেন। চিঠিটার উপর আদর করে হাত বুলালেন। পরম তৃপ্তিতে অসীম সুখে হাসলেন। ছোট ছেলে তার বাপের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাপি, আমি যুদ্ধে যাব।" তিনি ছেলেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, যাবি। নিশ্চয়ই যাবি।

তাঁর এ জীবনে এই প্রথম নিজেকে সুখী বলে মনে হল।

॥ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি ॥

গত বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চীনাদের অতর্কিত আক্রমণ-প্রতিরোধকালে যে তিন সহস্রাধিক ভারতীয় সৈন্য বন্দী হন তাঁদের সম্বন্ধে এতদিন প্রায় কোন কথাই জানা সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের কর্তৃপক্ষও তাঁদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য চীন সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন। সংবাদ-পরম্পরায় এইটুকু শুধু জানা যায় যে, ভারতীয় সৈনিকদের তিব্বত ও সিনকিয়াঙের অত্যন্ত ঠান্ডা কয়েকটি স্থানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁদের মুক্তিদান সম্পর্কে কোন কথাই চীন সরকার এতদিন বলেননি। কিন্তু ২রা এপ্রিল চীন সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে হঠাৎ এক ঘোষণায় বলা হয় যে, ১০ই এপ্রিল হতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। ঐ ঘোষণাতেই জানা যায় যে, চীনের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ৩,২১৩। তাঁদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার আছেন একজন ও ফিল্ড অফিসার ছাব্বিশজন। গত ডিসেম্বরে চীন সরকার রুগ্ন ও আহত সাতশ'জন ভারতীয় সৈন্যকে মুক্তি দেন, তারপরেও বিভিন্ন সময়ে মুক্তি দেন আরও পনেরজনকে। বন্দীদের মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করে চীন সরকার এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এর ফলে চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আরও সহজ হবে।

তিন হাজারেরও বেশী বন্দীর মুক্তি-পর্ব কতদিনে শেষ হবে তা বলা কঠিন। তবে চীন সরকার যদি মনে করে থাকেন যে, বন্দীদের মুক্তি দিলেই সীমান্ত-বিরোধের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে তবে তাঁরা খুবই ভুল করবেন। যাঁদের প্রায় ছ'মাস আগে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল তাঁদের এতদিন আটক রেখে চীন সরকার যে অন্যায় করেছিলেন এই মুক্তিদানের ফলে শুধু সেই অন্যায়েরই প্রতিকার হল। সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি সামান্য। সীমান্ত-বিরোধের নিষ্পত্তি যদি সত্যই তাঁদের কাম্য হয় তবে অনেক অন্যায় জেদ পরিত্যাগের জন্য চীন সরকারকে প্রস্তুত হতে হবে। আর তাঁদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে কলম্বো প্রস্তাবকে, যা আলোচনা শুরুর ন্যূনতম সর্তরূপে ভারত অনেকদিন আগেই গ্রহণ করেছে।

॥ প্রতিরক্ষা তহবিলে দান ॥

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জমা পড়েছে ৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বিভিন্ন সূত্রে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে অনুমান করা হয়, জনগণের স্বেচ্ছাদানে গড়ে-ওঠা এই জাতীয় অর্থভান্ডারটির সংগ্রহ অর্ধশত কোটি টাকা অতিক্রম করে যাবে। এছাড়া বারো বছর মেয়াদের জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেটও বিক্রয় হয়েছে ৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের দানের পরিমাণ ২২শে মার্চ পর্যন্ত ছিল ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। এর ওপর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকারের দানের পরিমাণ আড়াই কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারদানের পরিমাণ ১,৫৩,১৪২·৩৭ গ্রাম।

জনগণের স্বেচ্ছাদানে অর্ধ শত কোটি টাকা সংগ্রহ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের মানুষ দেশকে যে কত গভীর ভালবাসে তার জাজ্বল্য-প্রমাণ এই অর্থসংগ্রহ। কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেছেন, সংগৃহীত অর্থের পঁচিশ কোটি টাকা শীঘ্রই অস্ত্রক্রয়ে ব্যয় করা হবে।

॥ মার্কিনী সাহায্য ॥

রাষ্ট্রদূত গলব্রেথ গত ২রা এপ্রিল নয়াদিল্লীতে প্রকাশ করেন যে, দশ দিনের মধ্যেই চার জাহাজ মার্কিনী অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পৌঁছাবে। অস্ত্রগুলি কি ধরনের বা তার পরিমাণ কি, সামরিক গোপনতারক্ষার প্রয়োজনে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক গলব্রেথ কিছু বলেন নি। ঐ চারটি জাহাজ ছাড়াও আরও অনেকগুলি অস্ত্রবোঝাই মার্কিন জাহাজ পর পর ভারত অভিমুখে আসবে বলে জানা গেছে। এই প্রসঙ্গে গলব্রেথ বলেন যে, চীনা-আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়াই বর্তমানে মার্কিন সরকারের নীতি।

ঐদিনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ৪৫২·৫ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানিয়ে যে বাণী প্রেরণ করেন, তাতেও ভারতকে উদার হস্তে প্রচুর সাহায্য দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলেন, চীনের পুনরায় ভারতের আক্রমণের আ থাকায় এই সাহায্য ভারতের পক্ষে প্রয়োজন।

॥ নেপালে নূতন শাসন

নেপালে ২৮ মাস স্থায়ী বর্তীকালীন শাসনের অবসান। রাজা মহেন্দ্র এক নূতন মন্ গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। তুলসী গিরীর নেতৃত্বে সাতজন নিয়ে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে রাজঘোষণায় বলা হয় যে, ন শাসনব্যবস্থা নেপালে আগামী দি পঞ্চায়েতী শাসনের প্রথম পদক্ষেপ

ডঃ তুলসী গিরীর মন্ত্রিসভায় জন মন্ত্রী ছাড়াও থাকবেন সা সহকারী মন্ত্রী। এই চোদ্দজন মন্ত্র সহকারী মন্ত্রী নেপালের ১২৫ স বিশিষ্ট জাতীয় পঞ্চায়েতের সদস্য। গঠিত জাতীয় পঞ্চায়েৎ নেপ সর্বোচ্চ প্রতিনিধিসভা। আগামী এপ্রিল রাজা মহেন্দ্র জাতীয় পঞ্চায়ে উদ্বোধন করবেন। হিন্দু উৎসব নবমীর দিনে রাজা মহেন্দ্র এই ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন।

ঐ একই দিনের ঘোষণায় মহেন্দ্র রাজসভা বা স্টেট কাউন্ ৬৯ জন সদস্যের নাম ঘোষণা ক রাজসভায় কাজ হবে রাজাকে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। রাজার পস্থিতিকালে রাজ-প্রতিনিধি মনে এই সভার অন্যতম বিশেষ অধিকার

১৯৬০ সালের ১৫ই ডিসে রাজা মহেন্দ্র নেপালে সংসদীয় শা অবসান ঘটান। তার দুই বছর ১৯৬২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হয় পঞ্চায়েৎ-ভিত্তিক নেপালে সংবিধান। সেই সংবিধানের বা নুসারেই নেপালের এই নূতন মন্ গঠিত হয়। নূতন শাসনব নেপালের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ভা কাম্য।

॥ লাওসে অশান্তি ॥

লাওসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকু ফলসেনা ১লা এপ্রিল তাঁর এক রক্ষীর আক্রমণে নিহত হয়েছেন। দেহে আঠারোটি গুলীর আঘাত যায়। লাওসের রাজা বাথানার প্রত্যাবর্তনের পর রাজপ্রাসাদে সম্বর্ধনার আয়োজন হয় সেখান রাত্রে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর প্রবেশমুখে তিনি নিহত হন।

শ্রীফলসেনা লাওসের মধ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভানা ফুমার গামীরূপে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন, পরে তিনি কমিউনিস্ট-পন্থী প্রধানমন্ত্রী পাথেট লাও দলের প্রিন্স সুভানাভঙের সমর্থকে হন।

উপ-প্রধানমন্ত্রী সুভানা ভ

হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এর পিছনে বিদেশীদের হাত ছিল, কোন বিদেশী তা তিনি বলেন নি। শুধু বলেছেন যে, যারা চায় না যে লাওস আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোট-নিরপেক্ষ থাকুক তারাই শ্রীফলসেনাকে হত্যার প্ররোচনা যুগিয়েছে।

॥ লাতিন আমেরিকায় গণ্ডগোল ॥

লাতিন আমেরিকার দুটি দেশ ভেনেজুয়েলা ও আর্জেণ্টিনায় রাজনৈতিক অশান্তি শুরু হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই অশান্তির স্রষ্টা সামরিক বাহিনী। ভেনেজুয়েলার সামরিক অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পটভূমিকা এখনও সুস্পষ্ট হয়নি। তবে আর্জেণ্টিনার ক্ষমতা-দখলকারীদের লক্ষ্য হ'ল পেরনবাদের অবসান। আর্জেণ্টিনায় প্রেসিডেণ্ট পেরনের শাসনের অবসান ঘটে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, কিন্তু তাঁর প্রভাব এখনও সে রাজ্যে যথেষ্ট থেকে গেছে। আর্জেণ্টিনার যিনি বর্তমান প্রেসিডেণ্ট (এখনও তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন কিনা তা এই প্রসঙ্গ লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি) সেই জোস মারিয়া গিদোও ছিলেন পেরন-বিরোধী। সৈন্যদলের সহায়তায় তিনি ক্ষমতা দখল করেন, কিন্তু পরে শাসনকার্য চালাতে গিয়ে বোঝেন যে, পেরনের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই গত কয়েক বছরে তিনি বহু বিষয়ে পেরনপন্থীদের সঙ্গে আপোষ করেন। কিন্তু গোঁড়া পেরন-বিরোধীদের সেটা মনঃপূত না হওয়ায় আবার তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হতে আরম্ভ করে। গত ২রা এপ্রিল প্রধানতঃ নৌবাহিনীর সহযোগিতায় জেনারেল বেঞ্জামিন মেনেন্দেজ নামক যে ব্যক্তিটির নেতৃত্বে গিদো-বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, বারো বছর আগে পেরনের বিরুদ্ধে আর-একবার অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টার অভিযোগে তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

স্থলবাহিনীর আনুগত্য এখনও প্রেসিডেণ্ট গিদোর পক্ষে এবং স্থলবাহিনীর কমান্ডার এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নৌ-বাহিনী বিদ্রোহী হলে তাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হবে। এই পরিস্থিতিতে আর্জেণ্টিনার বিদ্রোহের নিষ্পত্তি খুব সহজে হবে বলে মনে হয় না।

॥ রুশ-চীন সংবাদ ॥

বিতর্কিত বিষয়গুলির মীমাংসার উদ্দেশ্যে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ক্রুশ্চেভকে পিকিঙে আসার জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ক্রুশ্চেভ তার উত্তরে জানিয়েছেন যে, আপাতত তাঁর পক্ষে পিকিঙে যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে আলোচনার উদ্দেশ্যে চীনা কমিউনিষ্ট নেতা মাও
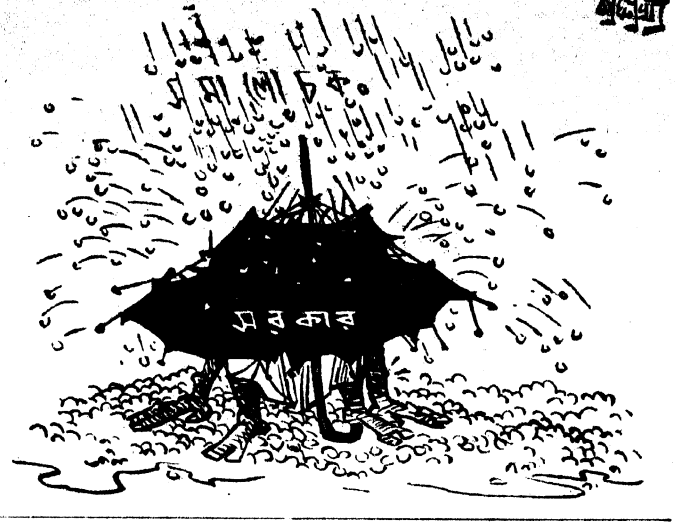
যদি মস্কোয় আসেন ত সোভিয়েট কমিউনিষ্ট-নায়ক খুবই খুশী হবেন। আর মাও যদি একান্তই না আসতে পারেন, তবে সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট ব্রেঝনেভ পিকিঙে যাবেন। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট-নেতা একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, কমিউনিষ্ট চীনের বহু সমালোচিত দেশ যুগোশ্লাভিয়াকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট দেশ বলেই মনে করে, যদিও যুগোশ্লাভিয়ার বহু বিষয়ের সঙ্গে তার মতপার্থক্য আছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের এই মনোভাব ও বক্তব্য সম্পর্কে পিকিঙের দৃষ্টিভঙ্গী এখনও জানা যায়নি।

॥ সিরিয়ায় আবার অশান্তি ॥

গত ৩০শে মার্চ এক বেতার-ভাষণে সিরিয়ার প্রধান সেনাপতি জেনারেল লুয়ে আতাসি বলেন, আরব ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসাবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাক একটি ফেডারেশন গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হতে সিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচারের জন্য অবিলম্বে বিপ্লবী আদালত গঠন করা হবে। —জেনারেল আতাসির এই কথাগুলিতে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, সিরিয়ার বর্তমান শাসকবর্গ নাসেরের অনুগামী।

কিন্তু এই ঘোষণার মাত্র তিনদিন পরে দামাস্কাস হতে প্রচারিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে বলা হয় যে, তার পূর্বদিনে প্রায় এক লক্ষ নাসেরপন্থী সিরিয়া-দামাস্কাসের প্রধান সামরিক দপ্তর পরিবেষ্টন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ঐ বিক্ষোভ দমনের জন্য সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে গুলীবর্ষণ করতে হয়। বিক্ষোভে কতজন হতাহত হয়েছে তা উক্ত সংবাদে বলা হয়নি বা বিক্ষোভের কারণ কি ছিল তাও জানা যায়নি। যে সরকার ক'দিন আগে মাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে নাসেরের অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সেই সরকারের বিরুদ্ধেই আবার লক্ষাধিক নাসেরপন্থী জনতা কেন সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, সিরিয়ার বর্তমান সরকার এখনও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নয়।

॥ আরব কমন মার্কেট ॥

ব্রিটেনের উদ্যোগে তেরটি ক্ষুদ্র ব্রিটিশ রক্ষণাধীন শেখশাহী ও এডেনের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ আরব ফেডারেশনে ১লা এপ্রিল হতে 'কমন মার্কেট' চালু হয়েছে। এর ফলে ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে যাবতীয় শুল্কের ব্যবধান অন্তর্হিত হল। এতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির যে ক্ষতি হবে তা পূরণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ফেডারেশনকে চলতি বছরে দুই লক্ষ পাউন্ড দেবেন। এই ব্যবস্থায় প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে ইয়েমেন। এতদিন এডেন বন্দর হতে কোন পণ্য ইয়েমেনে পৌঁছতে ছ'টি শুল্কের প্রাচীর অতিক্রম করত। বর্তমান ব্যবস্থায় তা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হল। এর ফলে ইয়েমেন এখন যে কোন পণ্য এডেন থেকে পূর্বমূল্যে অপেক্ষা ২৫ শতাংশ কমে কিনতে পারবে। ক্ষুদ্র শেখশাহী লাহেজে এতদিন অন্য পণ্যের মত মানুষ ওজন করা হত, কর আদায়ের উদ্দেশ্যে। নূতন ব্যবস্থায় তা বন্ধ হল।

॥ ঘরে ॥

২৮শে মার্চ—১৪ই চৈত্র : লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের চারটি আসন বৃদ্ধি—আসামেরও দুইটি বেশী আসন লাভ—ভারতের রাজ্যসমূহের (জম্মু ও কাশ্মীর বাদে) আসনসংখ্যা ৪৮১ হইতে ৪৯০ পর্যন্ত বর্ধিত—নির্বাচন কেন্দ্র সীমা নির্ধারক কমিশনের ঘোষণা।

অগ্নি নির্বাপনকালে আহত দমকল অফিসার শ্রীএ্যান্টনী জেমসের (৪৩) হাসপাতালে (কলিকাতা) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ; লোকহিতে আত্মদান ও কর্তব্যসম্পাদনের নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের পুনরায় ঘোষণা : বাংলায় দুর্ভিক্ষ হইতে দিব না।

২৯শে মার্চ—১৫ই চৈত্র : 'জরুরী অবস্থায় কম্যুনিষ্ট বন্দীদের মুক্তিদান অসম্ভব'—বিধানসভায় (পশ্চিমবঙ্গ) মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের স্পষ্টোক্তি।

'আক্রমণের মুখে শাসনযন্ত্র আর অচল হইবে না'—তেজপুরের অভিজ্ঞতার (চীনা আক্রমণকালীন) ভিত্তিতে ভারত সরকারের নূতন নীতি—আসাম বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার ঘোষণা।

৩০শে মার্চ—১৬ই চৈত্র : বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় সনাতনী ধারণা ও অভ্যাস পরিহারের আহ্বান—নিখিল ভারত উৎপাদক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে (দিল্লী) প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ—ন্যায়বিচার ও সাম্যের আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ।

ভারত সরকার কর্তৃক নেফার কামেং বিভাগ এবং চীনা-পরিত্যক্ত অন্যান্য অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা—আসাম রাইফেলের একটি বিরাট অংশকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ (অনুমোদিত) ছাত্রদের জন্য জুলাই (১৯৬৩) হইতেই এন-সি-সি ট্রেনিং চালু—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত।

৩১শে মার্চ—১৭ই চৈত্র : 'যুদ্ধ হউক বা না হউক প্রতিরক্ষা উদাম শিথিল করিলে চলিবে না'—রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের সতর্কবাণী—কোয়েম্বাটোরে সম্বর্ধনা-সভায় ভাষণ।

'প্রাক্তন অপরাধপ্রবণ উপজাতীয়রা জাতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ'—বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য দিল্লীর আলোচনাচক্রে ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর আহ্বান।

প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া যাইবার দাবী—বিমানবাহিনী দিবস উপলক্ষে বিমান অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ারের বাণী—জাতীয় সংকটে সশস্ত্র বাহিনী ও নাগরিকদের দায়িত্বের উল্লেখ।

১লা এপ্রিল—১৮ই চৈত্র : 'জরুরী ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় নাই'—বিরোধীদের সমালোচনার উত্তরে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ঘোষণা।

বাংলাকে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষারূপে চালু করার দাবী—বিধান পরিষদে কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যদের ভাষণ—প্রয়াস ত্বরান্বিত করা হইবে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের প্রতিশ্রুতি।

২রা এপ্রিল—১৯শে চৈত্র : 'ভারত রক্ষা বিধানে ধৃত বন্দীরা রাজনৈতিক বন্দী নহেন'—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রীর (শ্রীসেন) ঘোষণা।

দরিদ্র ও প্রতিভাবান ছাত্রদের (প্রায় ৬৭ হাজার) উচ্চশিক্ষার্থে ঋণাভিত্তিক বৃত্তি দান—কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নূতন পরিকল্পনা—পরিকল্পনাটির জন্য নয় কোটি টাকার সংস্থান।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দেশলাই-এর উপর বিক্রয়করকে কেন্দ্র করিয়া তুমুল উত্তেজনা—বিরোধী সদস্যদের একযোগে সভাকক্ষ ত্যাগ।

৩রা এপ্রিল—২০শে চৈত্র : 'বিদ্রোহী নাগাদের হিংসাত্মক কার্যে চীনের উস্কানী রহিয়াছে'—কলিকাতায় নাগাভূমি শাসন পরিষদের প্রধান শ্রীপি শিলু আওয়ের বিবৃতি।

'কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ না করিলে চীনের সঙ্গে আলোচনা অসম্ভব'—ভারত সরকারের মনোভাব অটুট।

॥ বাইরে ॥

২৮শে মার্চ—১৪ই চৈত্র : পূর্ব-পাকিস্তানে সন্ত্রাসের রাজত্ব—১০ই এপ্রিল ধর্মঘটের আশঙ্কা—এ যাবৎ তিন শত ব্যক্তি গ্রেপ্তার—পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে সর্বত্র ছাত্রবিক্ষোভ—ঢাকায় শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশের লাঠি চালনার সংবাদ।

চীনা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তিব্বতে ক্ষেপণাস্ত্র আনয়ন—ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি বলিয়া আশঙ্কা।

২৯শে মার্চ—১৫ই চৈত্র : দক্ষিণ চীনে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি—খাদ্যের গুদাম লুট করিবার অপরাধে ২০জনের প্রাণদণ্ড।

ভারতের শক্তিবৃদ্ধিতে পাকিস্তানের গাত্রদাহ—আয়ুব খাঁ (পাক প্রেসিডেন্ট) কর্তৃক পুনরায় বিষোদ্গার।

৩০শে মার্চ—১৬ই চৈত্র : পশ্চি[illegible] তিব্বতে সীমান্ত বরাবর চীনাদের ঘাঁ[illegible] স্থাপন—ভারতের সীমান্তের শিপ[illegible] গিরিবর্ত্মের সন্নিহিত অঞ্চলে বিমানক্ষে[illegible] নির্মাণ।

কিউবার বন্দরে সোভিয়েট মালবাহ[illegible] জাহাজের ('বাকু') উপর আক্রমণ—মার্কিন সরকারের নিকট রাশিয়ার প্রতি[illegible]বাদ।

৩১শে মার্চ—১৭ই চৈত্র : জাপা[illegible] প্রায় দুই লক্ষ রেলকর্মীর ২৪ ঘন্টাব্যাপ[illegible] ধর্মঘটের সূচনা।

গুয়াটেমালায় সৈন্যবাহিনীর অভ্[illegible]খান ও সামরিক শাসন বলবৎ।

ইরাণে পুনরায় প্রবল ভূমিকম্প[illegible] অনেকের প্রাণহানি ঃ বহু গৃহ ভূমিস্মা[illegible]

১লা এপ্রিল—১৮ই চৈত্র : চা[illegible] শহরে (পূর্ব পাক রাজধানী) বস[illegible] রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব—গড়ে দৈনি[illegible] ত্রিশজনের মৃত্যু।

বিক্ষুব্ধ সিরিয়ায় শাসনক্ষমতা[illegible] অধিষ্ঠিত বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক [illegible] ঘন্টাব্যাপী কারফিউ বলবৎ।

দেহরক্ষীর গুলীতে লাওসের [illegible]পেক্ষতাবাদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ কুইনি[illegible] ফোলসেনা নিহত—আততায়ী গ্রেপ্তার[illegible]

২রা এপ্রিল—১৯শে চৈত্র : ভারত[illegible] যুদ্ধবন্দীদের ৩,২১৩জনকে মুক্তিদা[illegible] চীনের সিদ্ধান্ত—১০ই এপ্রিল (১৯৬[illegible] হইতে বন্দী অর্পণের কার্য শুরু—[illegible] সরকার কর্তৃক ভারতীয় দূতাবা[illegible] সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।

রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক নেপালে নূত[illegible] মন্ত্রিসভা নিয়োগ—মন্ত্রি পরিষদে[illegible] চেয়ারম্যান ডাঃ তুলসী গিরি।

চন্দ্র অভিমুখে রাশিয়ায় আর একটি রকেট (মনুষ্যবিহীন) প্রেরণ—পৃথি[illegible] প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ হইতে র[illegible] উৎক্ষেপ।

আর্জেণ্টিনায় ক্ষমতাদখলের জ[illegible] সৈন্যদলের ব্যর্থ বিদ্রোহ।

৩রা এপ্রিল—২০শে চৈত্র : দক্ষি[illegible] পূর্ব এশিয়ার দিকে চীনের লুব্ধ দৃ[illegible] —সমগ্র সীমান্ত বরাবর সামরিক ঘাঁ[illegible] স্থাপন।

ব্রিটেন কর্তৃক ভারতকে আরও ৩[illegible] লক্ষ পাউন্ড ঋণদানের ব্যবস্থা।

চন্দ্রাভিমুখে সোভিয়েট মহাশূ[illegible] রকেটের (৩,১৩০ পাউন্ড ওজনে[illegible] লুনিক ৪) অব্যাহত গতি।

উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের জন্য মস্কো[illegible] মাও-সে তুং (চীনা কম্যুনিষ্ট পা[illegible] প্রধান) আমন্ত্রিত—ক্রুশ্চেভের (র[illegible] প্রধানমন্ত্রী) পিকিং গমনে অসম্মতি।

অভয়ঙ্কর

॥ বিবেকানন্দের ধর্ম ॥

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দের মতে স্বামী বিবেকানন্দ এ যুগের এক বিস্ময়। মানসিক ইতিহাসের বিস্ময়কর প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দ। যুগ-প্রবর্তক সমাজ-সেবী।

বিবেকানন্দের মধ্যে বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সমন্বয় ঘটেছিল। শঙ্করাচার্যের মনীষা, বুদ্ধের হৃদয়, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, গুরু নানকের আধ্যাত্মিক বহ্নি, যীশুখ্রীষ্টের কোমলতা আর সেণ্ট পলের ওজস্বিতা যেন একদেহে লীন। এই বহুবিধ গুণসমন্বিত বিবেকানন্দকে একজন মহাপণ্ডিত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-সমৃদ্ধ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ বলা চলে।

স্বামিজী ছিলেন শক্তির পূজারী। দেশের যুবকসম্প্রদায় সব দিক থেকে শক্তিমান হোক এই ছিল তাঁর অভিলাষ। ছেলেদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তারা শারীরিক শক্তিতে প্রবল হোক, বুদ্ধিতে দীপ্ত হোক, নৈতিক দিক থেকে মহৎ হোক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অপরাজেয় হোক এই ছিল স্বামিজীর নির্দেশ। কঠোপনিষদের নায়ক নচিকেতার মতো সমগ্র যুবশক্তি গড়ে উঠুক এই কথাই তিনি বলতেন। নচিকেতার শিক্ষা সার্থক হয়েছিল। নচিকেতা ছিল তেজে দীপ্ত, মৃত্যুর দেবতা যমের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সে বিচলিত হয়নি। নচিকেতার অন্তরে ছিল আত্মত্যাগের বহ্নি, তাই মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতালাভের জন্য যে-কোনও রকমের ত্যাগস্বীকার তার পক্ষে কঠিন নয়। তিনি বলতেন যে, নচিকেতার মত একশটা ছেলে পেলে এই জড় জগতের একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত।

স্বামিজীর জীবন ও বাণী প্রেরণার অনন্ত উৎস। প্রাচ্য-খণ্ডকে যুগ যুগ সঞ্চিত মোহ থেকে ও পাশ্চাত্য-খণ্ডকে তার আত্ম-তুষ্টির মিথ্যা অভিমান থেকে মুক্ত করার জন্য স্বামিজী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এ ছাড়া প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গীকে সংযুক্ত করাও তাঁর জীবনের ব্রত ছিল।

পাশ্চাত্য জগতে বিশ্ব-সংসার ও মানবিক জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে অংশতঃ ডারুইনবাদের ভিত্তিতে গঠিত জড়বাদী দর্শন, শিল্পের দ্রুত উন্নয়নে এবং ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ফলে। নির্মম প্রতিযোগিতামূলক জগতে প্রাচীন অধ্যাত্ম ধারণার স্থান নেই, আর ধর্মহীন জীবনের না আছে পবিত্রতা, সৌন্দর্য বা বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে প্রাচ্যদেশে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা প্রভৃতির আধিক্যের ফলে তারা ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কুসংস্কারের জটিলতায় আচ্ছন্ন। আধ্যাত্মিক শক্তির যে প্রেরণা প্রাচ্যদেশকে প্রাচীনকালে সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ করেছিল সেই শক্তি এই কালে অন্তর্হিত, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক ঘন-তমসাবৃত। বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল পারস্পরিক মূল্য-বিনিময়ে। স্বদেশে বহু গোঁড়া এবং ধর্মান্ধ মানুষকে স্বামিজী সামাজিক সংস্কারের পথ-নির্দেশ করে শত্রুভাবাপন্ন করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছেন—

"সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"
(বর্তমান ভারত—পৃ—৫২)

দেশপ্রেম, স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম, ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দশার জ্বালা এই মহামানবকে আকুল করলেও ভারতে যে কি নূতন বিপ্লব ঘটবে এবং তার ফলে ভারতে কি পরিবর্তন প্রসারিত হবে তা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে অনুমান করা সম্ভব নয়, তা তিনি বুঝেছিলেন—
"The embodiment of freedom, the master of nature, is what we call God."

স্বামী বিবেকানন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃত-মানস তাঁকে কোনো-রকম গোঁড়ামিতে আবদ্ধ রাখতে পারেনি বলেই তিনি বলতে পেরেছেন :

"I accept all religions that were in the past, and worship with them all; I worship God with everyone of them in whatever form they worship him."
(—Realisation of a Universal Religion)

এই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে—
"A man may believe in all the churches of the world, he may carry in his head all the sacred books ever written, he may baptize himself in all the rivers of the

earth; still if he has no perception of God, I will class him with the rankest atheist."

তাই বাহ্যিক কোনো শক্তি বা আচার যে মোক্ষলাভের সহায়ক এ কথা বার বার তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর সমসাময়িকদের কর্ণে তাঁর এই দুঃসাহসিক উক্তি নিঃসন্দেহে কলঙ্কজনক মনে হয়েছে। নির্ভীক বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন—

"It is good to be born in a church, but it is bad to die there. It is good to be born a child, but it is bad to remain a child".

স্বদেশবাসীর কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন নব-জাগরণের এবং নব-জন্মের উদ্গাতা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে জনৈক আমেরিক্যান বন্ধুকে লিখিত পত্রে স্বামিজী বলেছিলেন—

"আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রী, এই ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।" (বিবেকানন্দ চরিত)

ভারতীয় মনকে সংস্কারমুক্ত করে সংগঠনমূলক আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেলুড়ে যে তরুণ দল সদ্য য়ুরোপ-প্রত্যাবৃত্ত স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, তাদের তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন—"ভারতে এখন বোমার প্রয়োজন।" 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে স্বামিজী বলেছেন—"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া তোমরা কেবল স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমির আরাধনা কর; অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয় বর্ষ ভুলিলেও কোন ক্ষতি নাই।" (পৃ ৩৩৯)

পশ্চিমের মানুষকে স্বামিজী যে বাণী দিয়েছিলেন তার মর্মার্থ এই যে, মানুষ ধূলির পরমাণু মাত্র নয়। ধর্মই তার সত্তার প্রকৃত অভিব্যক্তি, পৃথিবীতে আবির্ভূত প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে দীপ্ত আলোক-শিখা প্রজ্বলিত তা অনির্বাণ। তিনি বলেছিলেন—

"It is my belief that religious thought is in man's very constitution, so much so that it is impossible for him to give up religion until he can give up his mind and body, until he can give up his thought and life." তাঁর ধারণায় প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি হল ধর্ম। সেই উপলব্ধিই মানুষের জীব নর প্রতিটি ধারাকে সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত করে। সমগ্র মানসিকতা যখন পুরোভাগে ধাবিত হয় তখনই অনুভব করা যায় যে বিশ্বজগতের এই শক্তির উৎস হচ্ছে এক কেন্দ্রীভূত আত্মিক সমন্বয়। ধর্ম অর্থে তাই বিবেকের বিস্তার বোঝায়, মানসিক সম্প্রসারণের নামই ধর্ম। ধর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রগতির পরিপন্থী নয়।

বিবেকানন্দের এই চূড়ান্ত মহ বিজ্ঞানের বিস্ময় উন্নত পৃথিবীতে ও সুস্থ মানসিকতার শিক্ষা দি অনেকেই যেকালে ঈশ্বর এবং স্বদেশবাসীতে বিশ্বাস হারিয়ে কালে তিনি ঘোষণা করেছেন :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্ব
জীবে প্রেম করে যেই জন—
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারা বিবেকানন্দ জানতেন, মানুষের শক্তির অন্তর্নিহিত উৎস থেকেই করবে জ্ঞান, আপনাকে সংস্কৃ বুদ্ধ এবং মহৎ করতে হবে। নন্দের বাণী তাই আত্মবিশ্বাস ও বাণী।

'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' এই মুক্ত চিন্তানায়ক বলেছিলেন—

"ওরে ধর্ম-কর্ম করতে গে কূর্মাবতারের পূজা চাই: পেট সেই কূর্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না তোর ধর্ম-কর্মের কথা কেউ নেবে ধর্মকথা শুনতে হলে আগে এ লোকের পেটের চিন্তা দূর করে নতুবা লেকচার-টেকচারে বিশেষ ফল হবে না।"

মানুষের দারিদ্র্য, নিদারুণ এই শতকের প্রথম দিকেই তাঁর উৎপীড়িত করেছে যে, তিনি বির বলেছেন—"অন্নাভাবে চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার কচ্ছিস? ফেলে দে তোর গঙ্গাজলে।" (স্বামী-শিষ্য সংবাদ সাবধান-বাণীর মর্ম আজ ১৯৬ কি আমরা ঠিকমত উপলব্ধি কর

স্বামিজীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর দৃ শৌর্য এবং অসংখ্য জ্ঞান ও মা পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর রচনা সমকালীনদের সংগৃহীত বাণীতে। বিবেকনন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী উপ লণ্ডনের ফিনিকস্ হাউস স্বা বাণী ও উপদেশ ও তাঁর প্রখ্যাত বলীর সংক্ষেপিত অংশ সঞ্চয়ন ক গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জন কবি ক্রীস্টোফার ঈশারউডকৃত সংকলিত ভূমিকাংশটুকুও মূ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও স যাঁরা আগ্রহশীল এবং তাঁর স্বদেশ কাছে এই গ্রন্থ মূল্যবান বি হবে। *

* WHAT RELIGION IS: S VIVEKANANDA; Edited JOHN YALE (PHOENIX H LED., LONDON) — PRICE Shillings.

নতুন বই

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ—(জীবনী-গ্রন্থ) —মণি বাগচি প্রণীত। প্রকাশক জিজ্ঞাসা—৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা —৯। দাম—পাঁচ টাকা। পৃঃ ১৯৪।।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ও পশ্চিমের সাধনাকে দক্ষিণে ও বামদিকে রাখিয়া তাহার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া তাহাকে চিরদিন সংকীর্ণতার মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। তিনি ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মিলনের সেতু রচনার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার ও সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।" যে বিরাট কর্মকাণ্ডের মধ্যে সিংহ-প্রতিম স্বামী বিবেকানন্দ আপনার লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয়দান করেছেন তার তুলনা নেই। ভারতীয় সংস্কৃতিকে সংস্কারমুক্ত করে, আত্মবিস্মৃত জাতিকে নবীন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বামীজী। ১৮৮৬ খৃীষ্টাব্দে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হওয়ার পর স্বামী বিবেকানন্দ মঠস্থাপনায় প্রয়াসী হন এবং শংকরাচার্য-প্রবর্তিত সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে কঠোর সাধনা শুরু করেন। প্রতীচ্য-খণ্ডে বেদান্তের বীজ বপনের কৃতিত্ব যেমন স্বামী বিবেকানন্দের, তেমনই ভারতকে নবীন মন্ত্রে, দেশজননীর সেবায় অনুপ্রাণিত করার কৃতিত্বও তাঁর। প্রায় চল্লিশ খানি জীবনী-গ্রন্থের জনপ্রিয় লেখক মণি বাগচি অতিশয় নিপুণতার সংগে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী রচনা করেছেন। স্বামীজীর বিরাট জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর সঙ্গে নানাবিধ নতুন তথ্য ও সমসাময়িক মত সংযোজন করে কৃতী লেখক গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষা মনোরম, তাই অতিশয় দুরূহ তত্ত্বকেও তিনি অতি সহজ এবং স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। মাত্র ঊনচল্লিশ বছরকাল যিনি মর্ত্যলোকে বিচরণ করেছেন, তাঁর বিরাট জীবনের কর্ম ও চিন্তাধারাকে জাতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁর দেখা পাইনে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য।" সুলেখক বাগচি মহাশয় এই মহাপুরুষের মহাজীবন-কথা রচনা করে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দান করেছেন। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত এবং শোভন প্রচ্ছদমণ্ডিত।

দিনান্তের রঙ—(উপন্যাস)—আশাপূর্ণা দেবী। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম সাড়ে ছয় টাকা।

বিধবা সুচিন্তা তিন পুত্রকে নিয়ে সুখেই ছিল। সামাজিকতা, বন্ধুত্ব, সকল কিছুই তাদের কাছে ছিল উপেক্ষিত। এমন সময় তাদের সেই নীরব স্বচ্ছন্দ জীবনে এল নীতা এবং তার বৃদ্ধ উন্মাদ পিতা সুশোভন। সুশোভন সুচিন্তার বালাবন্ধু। সুশোভনের মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনবার জন্য এমন একজন মানুষের সাহচর্য প্রয়োজন— 'যার মধ্যে রোগীর মনের সমস্ত শূন্যতার পরিপূর্ণতা'— তাই নীতা বাবাকে নিয়ে এসে উঠল দিল্লী থেকে কলকাতায় এই প্রায় ভুলে-যাওয়া বাড়ীটাতে। যদিও তাদের আত্মীয়ের অভাব ছিল না কলকাতায়। সুচিন্তা সুশোভনকে সরিয়ে দিতে পারেনি। নীতাও সুচিন্তার ছেলেদের সংগে মিশেছে এবং তার ফলে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। সুশোভনের ভাইদের পরিবারের কথা এসেছে। নীতা চলে গেল বিদেশে তার বাগদত্তের বিপদের খবর পেয়ে। ইন্দ্রনীল বিয়ে করল। মেজছেলে নিরঞ্জন বাড়ী ছেড়ে গেল। বড় ছেলের উদাসী উপেক্ষিত দৃষ্টির সামনে অসহায় সুচিন্তা সুশোভনকে নিয়ে আরও নীরবতার গভীরে তলিয়ে গেল। অবশেষে দিল্লীতে ফিরে যাবে সুশোভন। নীতাও এসেছে। কিন্তু সকলের সামনে সুশোভন যখন ফিরে না যাওয়ার জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানাল, সুচিন্তা তখন

সুশোভনকে হাত ধরে নিয়ে নিজের বাড়ীতেই তুলল। সুশোভনের ফিরে যাওয়া আর হল না।

সুচিন্তার শান্তজীবনে ঝড় এসেছে নানাদিক দিয়ে। একজন আধপাগলা লোককে সুস্থ করাই যখন তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল তখন ছেলেদের ব্যবহার তাকে আঘাত করলেও নীরবে সহ্য করে নিয়েছে। নীতার উচ্ছৃংলতা, পড়শীদের অন্তরঙ্গতার সুযোগ, পুত্রদের বহির্মুখীনতা অবশেষে সুশোভনের বৌদি ও ইন্দ্রনীলের শ্বশুরবাড়ীর ব্যবহার তাকে আঘাত করেছে। তবু একটি দুষ্টু ছেলেকে কেন্দ্র করে যে চরিত্রগুলি সেই সোনার শৈশবে আবর্তিত হয়েছিল সেই ঠাকুমা, ফুল, আর ছাদকে সুচিন্তা ভুলতে পারে না। জীবনের সেই না-বোঝা দিনগুলো এমন প্রভাব রেখে যায় যা কোনদিন ভোলা সম্ভব নয়। সুচিন্তাও ভুলতে পারেনি। বাল্যবন্ধু সুশোভনকে সে যখন দেখেছে বিবাহ-পরবর্তী জীবনে এক অপরিসীম লজ্জায় সে আবৃত হয়েছে। অন্তরের অন্তস্থলে সুশোভন যে জায়গা দখল করে রেখেছিল তা সুচিন্তা দীর্ঘকালেও ভুলে যেতে পারেনি। পারেনি বলেই শতবার ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে অবশেষে সুশোভনকে নিজের কাছে রেখেছে একজন দরদী মানুষ হিসাবে। একজন পাগলকে নিয়ে সারাজীবন জ্বলতে চেয়েছে সুচিন্তা। সুচিন্তার যে কাহিনী উপন্যাসে উপ-স্থিত সেখানে তাকে অসামান্য মাতৃস্নেহ-সম্পন্ন কোন অসামান্য রমণী হিসাবে না দেখেও একথা সহজভাবে উপলব্ধি করা যায় সুশোভন সুচিন্তার স্মৃতি থেকে কোনকালে মুছে যায়নি। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে নীরব শান্ততা বিরাজ করেছে সেখানে সুশোভনের আসন ছিল অক্ষয়। সুচিন্তা যখন বার বার বিচলিত হয়ে পড়েছে তখন তার সেই সমস্ত দিন-গুলির কথা মনে পড়েছে। কিন্তু আজকের প্রৌঢ়ত্বের দ্বারসীমায় পৌঁছিয়ে আত্মীয়স্বজন পুত্র-পুত্রবধূর সামনে এছাড়া তার পক্ষে অপর কোন মানবিক গুণের পরিচয় দেওয়া সম্ভব ছিল না বলেই মনে হয়।

বর্তমান উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবীর সাহসিক ভূমিকা স্বীকার্য। তিনি কাহিনী নির্বাচনে যে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন তা বহু ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি-বহির্ভূত। বিশেষ করে বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি এই কারণেই স্বতন্ত্র এবং অনন্য। তিনি যদি কেবল মাত্র সুচিন্তা-নীতার জীবনকথা অর্থাৎ মেয়েদের জীবনের দিকে তাকিয়ে কাহিনী বর্ণনায় অগ্রসর হতেন তবে এতখানি সার্থকতা লাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। তাঁর প্রদর্শিত পথে বাঙলা দেশের মহিলা কথাশিল্পীরা নতুনতর জীবনোপলব্ধিতে অগ্রসর হবেন বলে আশা করি। গ্রন্থের একটি মনোরম প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী সুব্রত ত্রিপাঠী।

[illegible] —— (
[illegible] নন্দী।
[illegible]। ৪২, কর্
স্ট্রীট, কলকাতা—৬।
টাকা।

'আসল কথা কি জান', আবার চোখ তুললো, 'প্রেম ব
জিনিস—মানুষকে কর্মঠ করে
তার আশা-উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়
সম্পর্কে...' এই অর্থগূঢ়
সুদাস বলেছিল নৃপতিকে লক্ষ
প্রেম সম্পর্কে সুদাসের উপলব্ধি
যথার্থ কিন্তু জীবন সম্পর্কে ত
ছিল নাবালকোচিত। যে নৃপতি
বেলা থেকে তাকে আগলে
বেড়িয়েছে। এমন কি পুরীতে
যখন শাঁখের কারবারি বুড়ো
ছেলের বৌয়ের সঙ্গে গোপনে
করছে তখনো নৃপতি তাকে
দিতে চেয়েছিল পরিণামের কথা
হয়তো পরিণামের দ্বন্দ্ব সুদাস
চেতন মনেও ছিল। বন্ধু নৃপতি
আসলে তারই বিবেক। কিন্তু
ফলের দুর্জয় লোভে য
পালিয়ে গিয়ে সে অতীত
চয় মুছে ফেলতে চেয়ে
সে টুঁটি টিপে মার
কাটারি দিয়ে খুন করেও সে
দংশন থেকে নিস্তার পেল
শুনতে মৃতদেহের সামনে
সুদাস ও তার প্রণয়িনীর ম
এই উপন্যাসের উজ্জ্বলতম অং
ও পাপের শাস্তির এই
জায়গায় জায়গায় রচয়িত
লেখনীর স্পর্শ রয়েছে বলে

ভিত্তি দৃঢ় না হলে প্রে
না। রক্ত আর কান্নার মধ্যে
প্রণয়িনীও তাই সুদাসকে ছে
গেল। বিপদের ঝুঁকি নিতে
ভাবে ঘরের নিশ্চিতি ছেড়ে
বেরোয়নি! কাঁদতে কাঁদতে
অতল কালো সমুদ্রের ডাক
মধ্যে শুনতে পেলে। এখন স
একমাত্র বন্ধু।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর এই
ধর্মী উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। চ
সুদাস যতটা সমুজ্জ্বল
তার তুলনায় কাঠের পুতুল
আসলে সেও তো রক্ত-মাংসে
তার সরলতা সময় সময়
ঠেকেছে। তবে তিনি বর্ণনা
ব্যবহারে এই গ্রন্থে শিল্পী
সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশোধ— (উপন্যাস)—বি
মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক :
জগৎ, ২০৩।৪, কর্ণওয়ালি
দাম ছয় টাকা। পৃষ্ঠাঃ ২৪

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম
লেখক বিভূতিভূষণের নবতম

[ঋণপ]রিশোধ'। বিভূতিভূষণের ...
[প]রিবেশনে পারদর্শী ... তিনি ...
[প্র]সারিত ভঙ্গীতে ...
[আ]লোচ্য উপন্যাসের নায়ক প্রশান্ত ...
[মু]তে এক দরিদ্র পরিবারে আশ্রয় নিতে
[বা]ধ্য হয়। বৃদ্ধ ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতা আর
[তা]র তরুণী কন্যা স্বাতী সেই ঘরের
[বা]সিন্দা। তারা দরিদ্র হলেও ...
[ছি]ল একদা জমিদার ছিলেন ল্যাহিড়ী পরি-

॥ সাহিত্য পুরস্কার ॥

অন্যান্য বছরের মত এবারও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে পুরস্কৃত করেছেন অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, মৌচাক, আনন্দবাজার, দেশ ও উল্টোরথ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। 'অমৃতবাজার' ও 'যুগান্তর' কর্তৃক প্রদত্ত শিশিরকুমার ও মতিলাল স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু। 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীরমাপদ চৌধুরী। 'মৌচাক' পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। 'উল্টোরথ' পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীউমা রায়।

[বা]র। শেষপর্যন্ত জানা যায় প্রশান্ত [ল]াহিড়ী মহাশয়ের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী [দ্]বারকেশেরই ছেলে, যে দ্বারকেশের জন্যই [আ]জ তাঁদের এই দুর্দশা। প্রশান্ত ও [স্ব]াতীর মিলনে ঋণপরিশোধ এবং [কা]হিনীর পরিসমাপ্তি। কুশলী লেখকের [স্ব]চ্ছ সাবলীল বর্ণনাভঙ্গীতে গ্রন্থটি [আ]দ্যোপান্ত সুখপাঠ্য হয়েছে। ছাপা এবং [প্র]চ্ছদ আকর্ষণীয়।

[ঋ]তু রঙ বদলায়— (উ প ন্যা স)— বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : সবিতা প্রকাশ-ভবন। ৩২, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা (৯)— দাম তিন টাকা। পৃঃ ১১৯

এই নূতন লেখকের উপন্যাসে বর্ত[মা]ন সমাজ-জীবনের গুরুতর এক [স]মস্যার প্রতি ইঙ্গিত আছে। অঞ্জলি [ম]ধ্যবিত্ত সমাজের পিতৃহীনা মেয়ে, দাদা-[বৌ]দির গলগ্রহ। বৌদি অঞ্জলিকে বাড়ি[ও]লা কালাচাঁদবাবুর হাতে সঁপে দিতে [চা]য়। তার দাদা জুতার দোকানের সেলস[ম]্যান, কালাচাঁদ বাড়িওলাকে যদি হাত [ক]রা যায় তাহলে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য [লা]ভ করা যায়। বৌদি তার জন্য চাপ [দে]য়। অঞ্জলির নিদারুণ ঘৃণা লোকটার [প্র]তি। কিন্তু ...

...আলোচকের অপ্রকাশিতের ... আত্মবলিদানে সম্পূর্ণ হয়। এই কাহিনী সংযম ও নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে লেখক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

আগন্তুক (ফাল্গুন : ১৩৬৯)—সম্পাদক : মৃণাল বসুচৌধুরী। মজিলপুর দত্তবাড়ী। পোঃ জয়নগর মজিলপুর। ২৪-পরগণা। দাম পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'আগন্তুকে'র এই নবপর্যায় প্রথম সংকলনে লিখেছেন—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, আলোক সরকার, মানস রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, অনন্ত দাস, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী, ...কুমার আচার্য-চৌধুরী, সুব্রত সিরোলী এবং আরো অনেকে।

লেখনী (পৌষ-মাঘ : ১৩৬৯)—সম্পাদক : অজিত চক্রবর্তী। বেঙ্গলী ক্লাব, নিউদিল্লী, কালীবাড়ী। দাম উল্লেখ নেই।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'লেখনী' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটির আবির্ভাবকে আমরা অভিনন্দন জানাই। বাঙলার বাইরে এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাঙলা-ভাষাভাষীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—বারীন্দ্রমোহন বর্ধন, ফণী বসু, অজিত চক্রবর্তী, সুশান্ত ঘোষ, গৌরাঙ্গ রায়, শিশিরকুমার ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ ঘোষ, নীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কে ডি গুপ্ত।
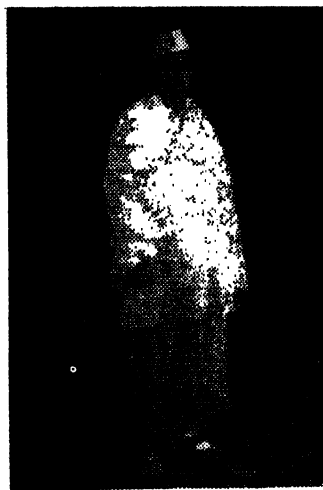
পঃ বঙ্গ নাট্যাভিনয় বিল '৬২

রাসবিহারী সরকার

ব্রিটিশ আমলে পরাধীন ভারতে স্বাভাবিক কারণেই গণকলা-শিল্প-বিকাশের পূর্ণ স্বাধিকার আমাদের ছিল না। বিদেশী শাসকবৃন্দ এতদ্দেশীয় যে কোন লোকশিক্ষামূলক হিতকর কার্যকেই সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। জাতীয়তার উন্মেষ ঘটতে পারে, এমন কোন-কিছুর কণ্ঠরোধই ছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি হয় ১৮৭৬ সালের নাট্যাভিনয় সম্পর্কিত আইন। সে আইন যে নাট্যাভিনয়ের পূর্ণতর বিকাশের পক্ষে সহায়ক ছিল না, তা' বলাই বাহুল্য। কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্বের স্থিতিকাল পর্যন্ত এবং তার পরও কিছুকাল দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত আইন দ্বারাই আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতীয় সংবিধানে লোক-হিতকর সকল প্রকার কাজের সুযোগ ও সুবিধাকে নাগরিক জীবনের পবিত্র অধিকার ব'লে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে ১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পারফরম্যান্স এক্ট এলাহাবাদ হাই কোর্ট কর্তৃক সংবিধান-বিরোধী ব'লে ঘোষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও উক্ত আইনকে তাই বাতিল বলে গণ্য করার ব্যবস্থা করেন। এবং "দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরম্যান্সেস বিল, ১৯৬২" (পশ্চিমবঙ্গ নাট্যাভিনয় বিল, ১৯৬২) নামে একটি নতুন বিলের খসড়া রচনা ক'রে সাধারণ্যে প্রচারার্থ গত ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় তা প্রকাশও করেছেন।

সঙ্গত কারণেই আশা করা গিয়েছিল যে, স্বাধীনোত্তর যুগে আনন্দের মাধ্যমে লোকশিক্ষামূলক এই বিশেষ বিভাগটির সম্প্রসারণে জাতীয় সরকারের আনুকূল্য-লাভে দেশবাসী বঞ্চিত হবে না। ভারত গভর্ণমেন্টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তর সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। রাজ্যসরকার ভারত সরকারের নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু "পশ্চিমবঙ্গ নাট্যাভিনয় বিল" (১৯৬২)-এ এমন একটি নীতি অনুসরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী বিশেষ কয়েকটি ধারার সংযোজন ঘটেছে যে, যদি প্রস্তাবিত বিলটি এবং বর্তমান ধারাগুলি আইনে পরিণত হয়, তা হ'লে সামগ্রিকভাবে নাট্যাভিনয় এবং বিশেষভাবে সৌখীন নাট্যাভিনয় সম্প্রসারিত হবার পরিবর্তে সংকুচিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আমরা তাই উক্ত বিশেষ ধারাগুলির দিকে নাট্যামোদী জনসাধারণ ও পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, রাজ্য-সরকার নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়েই বিলটি রচনা করেছেন। বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন প্রচারধর্মী শিল্পরীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিশ্চয়ই আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু জরুরী অবস্থার অবসানে প্রস্তাবিত আইন বাতিল বলে গণ্য হবে, এমন কোন ইঙ্গিতও সরকার কোথাও দেননি। সাধারণভাবে যেখানে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের বাক্-স্বাধীনতা প্রজাতন্ত্রী সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, সেখানে নাটক লেখা ও অভিনয়ের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণবিধি নিশ্চয়ই নীতিগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাক্-স্বাধীনতা বলতে যেমন কোন অসৎ কাজের প্ররোচনা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতায় ইন্ধন জোগান বোঝায় না, তেমনি কলা-শিল্পে স্বাধীনতা বলতেও এমন কিছু নিশ্চয়ই বোঝায় না, যাতে আমাদের সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র বা ব্যক্তিজীবন বিপন্ন হতে পারে।

তাই প্রস্তাবিত বিলে objectionable performance বা আপত্তিকর উপ-স্থাপনা বলতে ২নং ধারার (এ), (বি), (সি) উপধারায় যা বলা হয়েছে, তা সর্বথা সমর্থনীয়। ব্যাখ্যা হিসাবে বিলে সরকারী নীতির আইনানুগ সমালোচনা ও আন্দোলনের ইঙ্গিত উপস্থাপনার সুযোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার যে গণতান্ত্রিক উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্যে আমরা রাজ্যসরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রস্তাবিত আইনের ৫নং ধারা অনুসারে প্রতিটি প্রদর্শন-ব্যবস্থাপক বা ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নিয়মিত প্রদর্শন-ব্যবস্থাপনার জন্য পাঁচ বৎসর অনধিক ২০০ (দুই শত টাকা) জমা দিয়ে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। বৎ
আর্থিক সংকটের দিনে এখন পশ্চিম
সামান্য কয়েকটি নিয়মিত রঙ্গাল
মধ্যেও কেউ কেউ আর্থিক অনিশ্চ
দরুণ নিয়মিত অভিনয় পরিচালন f
দ্বিধাগ্রস্থ, সে সময়ে রঙ্গালয়গ
উপর নতুন লাইসেন্স কি বোঝার
শাকের আঁটি হিসাবেই গণ্য হ
নীতিগতভাবে লাইসেন্স গ্রহণে অ
নিশ্চয়ই নেই। রঙ্গালয়গুলিকে ক
কাতা করপোরেশন থেকে উপ
বিষয়ে লাইসেন্স গ্রহণ করতেও
প্রস্তাবিত বিলের ৫ ধারার ২নং
ধারার (ক) বিভাগে যা বলা হ
করপোরেশন কর্তৃক লাইসেন্স প্রদ
ঐ একই নীতি অনুসরণ করা
থাকে। তা সত্ত্বেও নূতন একটি লাই
গ্রহণের কি যুক্তি থাকতে পারে,
সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য
সরকার করপোরেশনের পরি
নিজেরাই একমাত্র লাইসেন্স প্রদ
অধিকারী হন এবং সরকারের
লাইসেন্স-গ্রহণকারী অন্য কোন স্ব
শাসিত সংস্থার দ্বারস্থ হতে
হয়, তাহ'লে স্বতন্ত্র কথা এবং সে
আপত্তিরও কিছু থাকবে না। কিন্
ধরণের কোন ইঙ্গিত প্রস্তাবিত
নেই। শেষপর্যন্ত হয়ত দেখা
একদিকে রাজ্যসরকার, অন্যদিকে ক
কাতা করপোরেশন—দুদিক
দু'খানি একই প্রকার লাইসেন্সের
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফি দাবী করছে।
রঙ্গালয়গুলিকে এরূপ দ্বৈত নি
সংস্থার চাপও সহ্য করতে হচ্ছে।
মিত রঙ্গালয়গুলির পক্ষে এ ধ
অস্বাভাবিক অবস্থা প্রীতিপদ

প্রস্তাবিত বিলের ৪নং
লাইসেন্স-প্রদানের ক্ষমতাধিক
হিসাবে কলিকাতার জন্য একক
পুলিশ কমিশনার এবং মফ
এলাকার জন্য এককভাবে জেলা ম
স্ট্রেটদের চিহ্নিত করা হয়েছে।
কোন আবেদনও নাকচ করে দে
অধিকারী স্বাভাবিকভাবেই স্ব স্ব
উপরোক্ত অফিসারবৃন্দ। ব্যক্তিবি
গুণাগুণের ওপর কোনরকম কটাক্ষ
ইঙ্গিত না করেই একথা নিশ্চয়ই
যায় যে, এককভাবে নির্দেশপ্রদ
নীতির মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়
অসম্ভব নয়।

বর্তমান সমাজজীবনে সার্ব
কার্যসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ পঞ্চা

থা স্বীকৃতরীতি। চলচ্চিত্রের ব্যাপারেও সার বোর্ড সরকারী-বেসরকারী র্তিনিধি দ্বারা গঠিত। তবে নাট্যানয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাই বা কেন একক র্তৃত্বাধীন থাকবে? আমাদের মনে হয় লোচ্য ক্ষেত্রেও যদি সরকারী ও সরকারী একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে চিত্রের অনুরূপ কোন বোর্ড গঠন রে. সেই বোর্ডের ওপর লাইসেন্স দান বা অনুমতি প্রত্যাহার প্রভৃতির য়িত্ব অর্পণ করা যায়, তবে গণতান্ত্রিক তিও রক্ষিত হয়, এবং জনসাধারণও য়বিচার সম্বন্ধে নিশ্চিন্তবোধ করতে রে। সর্বসমেত কমপক্ষে সাতজন প্রতিধি নিয়ে কলিকাতা ও বিভিন্ন অঞ্চলে র্থাৎ জেলাভিত্তিক এ ধরণের এক কটি বোর্ড গঠনের সম্ভাব্যতার কথা রকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। কমিটি প্রতি মাসে একবার মাত্র লিত হয়ে অপেক্ষমান আবেদনপত্র কল বিবেচনা করবেন। প্রস্তাবিত নাটক বন্ধেও বিচারবিবেচনার ভার কমিটির তেই থাকবে। নাটকটি সম্বন্ধে থমিক পাঠ অবশ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চারীরাই সমাধা করবেন। সংশ্লিষ্ট ভাগীয় নোটে নাটকটি আপত্তিকর বেচিত হলেও মাত্র প্রস্তাবিত কমিটি ই বিশেষ ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে পুনর্বেচনা করবেন। বিভাগীয় প্রাথমিক পোর্টে যদি আপত্তিকর কিছু না কে. তবে উক্ত নোটের ভিত্তিতেই টকটি প্রদর্শনযোগ্য ব'লে ঘোষিত হতে রে। প্রসঙ্গতঃ এ নিয়মও নিশ্চয়ই ঘাষণা করতে হবে যে, যদি কোন নাটক কোন একটি আঞ্চলিক বোর্ড দ্বারা ভিনয়োপযোগী বলে ঘোষিত হয়, বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যে কোন ঞ্চলেই তা অভিনীত হবার অবাধ াধীনতা থাকবে। অঞ্চলান্তরে দর্শনের জন্য রাখা একাধিকবার ভিন্ন গাষ্ঠীদ্বারা প্রদর্শনের জন্য দ্বিতীয়বার কান বোর্ডের অনুমতিলাভের প্রয়োজন বে না। এরূপ করা হ'লে প্রদর্শন ংস্থাগুলি অহেতুক হয়রানি, অর্থব্যয় বং সময়ের অপচয় থেকে অব্যাহতি াবে এবং সার্থক নাটকের বহুল অভিনয়ের সুযোগ থাকার ফলে জনশিক্ষার াজও দ্রুততর হবার আশা থাকবে। ন্যথায় সমগ্র বিষয়টির জটিলতার ফলে বং সরকারী বিধিব্যবস্থার শম্বুকতির অপরিহার্য পরিনামে নাট্যাভিনয়ের তিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হবে।

প্রস্তাবিত বিলের ৬ (১) নং ধারায় খানে নাট্যাভিনয় আয়োজনে উৎসুক যে কোন ব্যক্তিকে অনূর্ধ ৫০৲ টাকা লাইসেন্স ফিসহ অনুমতিগ্রহণের আবেদন করতে বলা হয়েছে, আমাদের মতে সেখানে ব্যক্তিগত লাইসেন্স-প্রদানের ব্যবস্থা রহিত করে সংস্থাগতভাবে উক্ত ধারার প্রয়োগ করা উচিত। অর্থাৎ যে কোন সৌখীন নাট্যসংস্থার পক্ষেই প্রস্তাবিত আইনের ৫ ধারায় মূলনীতি অনুসারে ৬ (১) ধারায় বর্ণিত লাইসেন্স ফি আদায় দিলে পূর্ণ এক বৎসরের জন্য প্রদর্শন-লাইসেন্স পাওয়া যেন সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রেও ৬ (১) ধারায় বর্ণিত ফিকে হ্রাস করে নামমাত্র ৫৲ টাকা ফি গ্রহণের ব্যবস্থা রেখে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্থ আমাদের সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়গুলির প্রদর্শন-প্রচেষ্টাকে সহজতর করতে হবে। 'সোসাইটি অ্যাক্ট'-এ রেজেস্ট্রীকৃত সংস্থাগুলিকে লাইসেন্সগ্রহণের দায় হতে অব্যাহতি দিতে হবে। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (যার সঙ্গে নৃত্য-নাট্য সঙ্গীত একাডেমি একাত্মভূত হয়েছে) কর্তৃক স্বীকৃত সংস্থাসমূহকেও লাইসেন্স-গ্রহণের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

অনুরূপভাবে স্বীকৃত কোন সংস্থাকে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন নাটক-প্রদর্শনের জন্য প্রতিবার লাইসেন্স-গ্রহণের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র অনুরূপ ধারার সংযোজন দ্বারই সরকারের মূলনীতি অর্থাৎ নাট্যাভিনয়-প্রদর্শনের উপর সুনিয়ন্ত্রণের নীতি অভিনয়-সম্প্রসারণের পথে অন্তরায় না হয়ে সহায়ক হতে পারে। অন্যথায় প্রতিটি নূতন নাটক প্রদর্শনের সময় আবেদনের ঝামেলা, অর্থব্যয় প্রভৃতির ঝক্কি সামলাবার দায় যদি আর্থিক অনটনগ্রস্ত এবং সাংগঠনিক দিক থেকে অবিন্যস্ত ও অপুষ্ট আমাদের সৌখীন নাট্যসংস্থাগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে আশঙ্কা হয় যে, অধিকাংশ সৌখীন নাট্যসংস্থার পক্ষেই বেশীদিন সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে।

বিশেষভাবে ৭নং ধারায় Private performance-এর জন্য লাইসেন্স গ্রহণ সম্বন্ধে নিষ্কৃতিদানের যে ব্যবস্থা রাজ্যসরকার নিজ হাতে রেখেছেন, ঐ বিশেষ Private performance-গুলিকে সাধারণভাবে আবেদনের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। সাধারণভাবে অনুমোদিত নাটক হলেই ঐ ধরনের অভিনয়-ব্যবস্থা করা যাবে এবং তারজন্য অনুমতি-গ্রহণের কোন দায়ই সংগঠকদের থাকবে না।

আমাদের দেশে নাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়গুলির অবদান স্বীকৃতিধন্য। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার দায় বা দায়িত্ব তাঁরাই গ্রহণ করে থাকেন।

রাজ্যসরকারের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই সৌখীন সম্প্রদায়গুলির আত্মবিকাশের পক্ষে হানিকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামগ্রিক নাট্যচর্চার স্বাভাবিক অগ্রগমনে ব্যাঘাত যেন সৃষ্টি না করা হয়। আশা করবো, জনদরদী রাজ্যসরকার জনস্বার্থের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন ধারাগুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করবেন। এবং আমাদের সরকারের সুবিবেচনা হ'তে নাট্যজগৎ বঞ্চিত হবে না।

নান্দীকর

আজকের কথা

পশ্চিমবঙ্গ অভিনয়নিয়ন্ত্রণ বিল :

বাঙলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার তারিখটি নাট্যরসিক পাঠকবৃন্দের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। সেই স্মরণীয় ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ সালের ৯০ বছর ৩ দিন পরে গেল ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার "পশ্চিমবঙ্গে নাট্যাভিনয়কে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে" পশ্চিমবঙ্গ অভিনয়নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৬২—নামে একটি খসড়া-আইন সাধারণ্যের অবগতির জন্যে ক্যালকাটা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত করেছেন। এই বিল প্রবর্তনের উদ্দেশ্য এবং কারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "১৮৭৬ সালের নাট্যাভিনয় আইনের কয়েকটি ধারা বর্তমানে সংবিধান-বিরোধী ও অকার্যকর ব'লে বিবেচিত হয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের একটি রায়ে সম্পূর্ণ আইনটিকেই সংবিধানের ক্ষমতা-বহির্ভূত বলা হয়েছে। এই কারণে ঐ আইনটিকে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বাতিল করবার এবং বিচার বিভাগীয় মীমাংসা অনুসারে নূতন আইন প্রবর্তিত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানের খসড়া-আইনটি এই উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে।"

১৮৭৬ সালের নাট্যাভিনয় আইনটি প'ড়ে দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। এবং যে বিশেষ নাট্যাভিনয়টিকে উপলক্ষ ক'রে ইংরেজ সরকার ত্বরিত-গতিতে এই আইনটি প্রণয়ন করেন, তাও আমাদের অজানা নেই। হাই-কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সম্রাট সপ্তম এডয়ার্ডের প্রিন্স অব ওয়েলস-রূপে পদার্পণকে উপলক্ষ ক'রে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ সালের ১৯-এ ফেব্রুয়ারি 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নাম দিয়ে প্রহসনখানির অভিনয় যদি না করতেন, তা' হ'লে তখনই এই আইনটির জন্ম হ'ত কিনা, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই 'গজদানন্দ' প্রহসন তদানীন্তন সরকারকে এমনই বিচলিত করেছিল যে, বড়লাট নর্থব্রুক নাট্যাভিনয়ের ১০ দিনের মধ্যে ২৯-এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাঙলা সরকারকে নাট্যাভিনয় বন্ধ করবার বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং কলকাতার বহু গণ্যমান্য লোকের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে "ড্রামাটিক পারফরম্যান্স কন্ট্রোল বিল" নামে যে প্রস্তাবটি আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হয়, তা ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই অর্থাৎ বাঙলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হবার ৪ বছরের মধ্যেই আইনে পরিণত হয়ে স্বাধীনভাবে নাট্যাভিনয়ের পথে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করে। ঐ বছরের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (তখন বাঙলা কাগজ) লিখে-ছিলেনঃ—"এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গবর্ণ-মেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শা[স]ন স্থাপন করিলেন। আমরা শাস[নে]র প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমে[ন্ট] যদি আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমু[দায়] কার্যের উপর পর পর এইরূপে শা[সন] স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হই[লে] বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজ[ের] আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভার[ত]বর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করি[বে] যেখানে আর ইংরাজ-শাসনের ভ্রূকুটি তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। ইংরেজ-শাসনের চাপ ক্রমেই ভারতবাসী[র] অসহ্য হয়ে উঠেছিল; কিন্তু শেষ পর্য[ন্ত] তার জন্যে ভারতবাসীকে অন্য কো[নো] জায়গায় যেতে হয়নি, ইংরেজকেই [এ] দেশ ছাড়তে হয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট "দি ড্রামাটি[ক] পারফরম্যান্স অ্যাক্ট, ১৮৭৬"কে স্বাধ[ীন] ভারতের সংবিধান-বিরোধী ব'লে র[দ] দিয়েছেন। যে-নাটক বা প্রহসন[কে] প্রাদেশিক সরকার (ক) কোনো ব্য[ক্তি] বা প্রতিষ্ঠানের কলঙ্কপ্রচারকারী মানহানিকর বা, (খ) ভারতে আই[ন] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকার সম্বন্ধে বিরু[দ্ধ] ভাব উদ্রেককারী কিংবা (গ) দর্শকে[র] নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করতে সক্ষ[ম] বলে বিবেচনা করেন, তার অভিনয়[ে] বন্ধ করবার অধিকার সরকারকে দেও[য়া] হয়েছিল এই আইন মারফৎ। এ-ছা[ড়া] আইনঅমান্যকারীদের গ্রেপ্তার করা এ[বং] অনধিক তিনমাস কারাদণ্ড দেওয়া বা/ও জরিমানা করার এবং নিষি[দ্ধ] নাটক সম্পর্কিত সমস্ত আসবাবপ[ত্র] পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বাজেয়া[প্ত] করার অধিকারও এই আইনে সরকারের করায়ত্ত ছিল।

কিন্তু স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতে[র] সংবিধানের ১৯ ধারা অনুসারে সক[ল] নাগরিককেই বাক্য এবং মনোভা[ব] প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দি[য়ে] এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই বিশে[ষ] আইনের আবশ্যকতাকে স্বীকার করেনি এবং সংবিধানবিরোধী ব'লে [ঘোষণা] করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকা[র] ১৮৭৬ সালের আইনকে বাতিল ক[রে] যে-খসড়া আইন রচনা করেছেন, তা[তে] সরকারকে "আপত্তিকর অভিনয়" [বন্ধ] করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এব[ং] কোনো নাটক আপত্তিকর কিনা, তা বিচার করবার ভার কলকাতা শহ[রে] পুলিশ কমিশনার এবং মফস্বলে জেল[া] ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর অর্পণ করা হয়েছে এবং যদি কোনো লোক বা সংস্থা "আপত্তিকর" ব'লে বিবেচিত নাটকে[র] অভিনয় করেন, তাহ'লে ঐ অভিনয়ের জন্যে দায়ী ব'লে সাব্যস্ত ব্যক্তির ছ'মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এব[ং] ১০০০৲ এক হাজার টাকা পর্য[ন্ত]

জরিমানা হ'তে পারে ব'লে ঘোষিত হয়েছে।

মনে হচ্ছে, সংবিধানের ৩য় ভাগের ১৯ ধারার ২য় উপধারার সাহায্যে ১ (ক) উপধারা বর্ণিত বাক্‌স্বাধীনতা ও মনোভাব প্রকাশ বা ব্যক্ত করবার স্বাধীনতা ক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খর্ব করবার প্রয়োজনীয়তা আমাদের রাজ্য-সরকার অনুভব করেছেন। কিন্তু "ভারত প্রতিরক্ষা আইন"-এর সাহায্যই কি এ-বিষয়ে যথেষ্ট নয়? কোনো নাটকের অভিনয় দেশদ্রোহিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রচার করছে মনে হ'লে সাধারণ দেশ-রক্ষা আইনের সাহায্যেই তা বন্ধ করা যায় ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি যাঁরা ক'রে থাকেন, এমন কোনো আইন প্রণয়ন করা উচিত নয়, যাতে তাঁদের সৃষ্টির স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। এবং অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলছি, কোনো নাটকের মধ্যে দেশের বিধিবন্ধ আইন লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা, তা যদি বিচার করেই দেখতে হয়, তাহ'লে সে-বিচারের ভার পুলিশ-কমিশনার বা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর না দিয়ে সাহিত্যরসিক কোনো আইনজ্ঞের ওপর দেওয়াই অধিকতর যুক্তিসংগত হবে না কি?

প্রস্তাবিত আইনে দু'ধরনের লাইসেন্স প্রবর্তনের কথা আছে। এক, যে-সব জায়গায় নিয়মিতভাবে অভিনয় হয়ে থাকে, সেই সব স্থানের মালিক বা কর্তৃপক্ষকে প্রতি বছর লাইসেন্স নিতে হবে অনধিক ২০০ টাকা ফি দিয়ে; দুই, যে-সংস্থা কোনো 'অনুমোদিত' নাটক অভিনয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, তাকে অনধিক ৫০ টাকা আদায় দিয়ে একটি লাইসেন্স নিতে হবে এবং সেই সংস্থার অধিকার থাকবে, ১লা এপ্রিল থেকে ৩১এ মার্চ-এর মধ্যে সেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত নাটকটি যতবার খুশী অভিনয় করবার।

দেখা যাচ্ছে, পেশাদারী নাট্যশালাগুলি ছাড়াও আশুতোষ হল, মহারাষ্ট্র-নিবাস, রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম-গৃহ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, সুবর্ণবণিক সমাজ প্রভৃতি কলকাতার যেখানে যেখানে অভিনয়, গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্যের আসর বসে, সেই সব স্থানেরই কর্তৃপক্ষকে অনধিক ২০০ টাকা আদায় দিয়ে লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে এই আইনের আদেশবলে। এবং যে-সব সংস্থা—সে অফিসক্লাবই হোক, আর কলেজের ছাত্রপরিষদই হোক কিংবা কোনো সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানই হোক—যাঁরাই কোনো রকম অভিনয় অনুষ্ঠান করতে চাইবেন, তাঁদেরই অনুষ্ঠেয় বিষয়বস্তুটি পুলিস-কমিশনার বা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা অনুমোদিত হবার পর অনধিক ৫০ টাকা আদায় দিয়ে অভিনয় করবার অনুমতি সংবলিত লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।

ভরসার কথা এই যে, কিম্বদন্তী থিয়েটারের রাসবিহারী সরকার মহাশয়ের মুখে শুনতে পাওয়া গেল, ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ক্যালকাটা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রস্তাবিত খসড়া আইনটি ছাপবার পরে সরকারের ধারণা হয়েছে যে, খসড়া আইনটিতে গলদ আছে এবং তা দূর করা প্রয়োজন। আমাদের প্রশ্ন, ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অভিনয় সংক্রান্ত আইনই কি যথেষ্ট নয়? কি প্রয়োজন আবার নতুন আইনের বেড়াজাল সৃষ্টি করবার?

মঞ্চাভিনয়

তিতাস একটি নদীর নাম: মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের নিবেদন; কাহিনী (মূল উপন্যাস): পরলোকগত অদ্বৈত মল্লবর্মণ; নাট্যরূপ ও পরিচালনা: উৎপল দত্ত, সঙ্গীত-পরিচালনা: নির্মল চৌধুরী, দৃশ্য-সজ্জা: নির্মল গুহরায়, আলোক-সম্পাত: তাপস সেন; রূপায়ণ: বিজন ভট্টাচার্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ রায়, উৎপল দত্ত, নির্মল চৌধুরী, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ সেন, সলিল ভট্টাচার্য, জিতেন ভট্টাচার্য, তিনু ঘোষ, সমর নাগ, অশোক মিত্র, শান্তনু ঘোষ, মৃণাল ঘোষ, অরবিন্দ চক্রবর্তী, শোভা সেন, নীলিমা দাস, সুলেখা ভট্টাচার্য, দীপিকা ভট্টাচার্য, সুস্মিতা দে, স্বাতী বসু, মনীষা সরকার প্রভৃতি।

মালোপরিবারের সন্তান, জন্ম-শিল্পী ও সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' তিতাসের তীরবর্তী গোকনঘাটের মালো পরিবারের একটি সামগ্রিক জীবনালেখ্য। কোথাও মিথ্যা রোমান্টিকতা নেই, আবার সত্যের ছলনাও নেই। তিতাস-নির্ভর গ্রাম এবং তার মানুষদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, প্রেমপ্রতিহিংসা, মিলন-বিরহ ওখানকার প্রকৃতির সঙ্গে মিলে একটি পরম নিগূঢ় অনুভূতিসম্পন্ন জীবনধারার সরস অভিব্যক্তি।

চারখণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসটির প্রধানতঃ প্রথম দু'খণ্ডের উপর এবং কিছুটা তৃতীয় খণ্ডের উপর নির্ভর ক'রে নাট্যরূপদাতা উৎপল দত্ত মূলের কিছুটা ইঙ্গিত এবং কিছুটা ঘটনার সঙ্গে নিজের কল্পনা ও নাট্যবোধকে অপূর্বভাবে মিশ্রিত ক'রে যে-বহুরসাশ্রয়ী নাটকটি পরিবেশন করেছেন,

কয়েকটি দৃশ্যে দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, সন্ধ্যা রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দীপা চট্টোপাধ্যায় ও শিপ্রা।

'তিতাস একটি নদীর নাম' নাটকের একটি দৃশ্য

...গা তাঁর রচনাকুশলতার গৌরবময় ...নদর্শন।

...বৃদ্ধ রামকেশবের জীবনে আঁধার ...নমে এল, যখন তার ছেলে কিশোর ...র বিয়েকরা বৌকে হারিয়ে দেশে ...ফরল উন্মাদ অবস্থায়। গ্রামের মেয়ে ...াসন্তী একদিন চেয়েছিল ঐ ...কশোরেরই জীবনসঙ্গিনী হ'তে; কিন্তু ...কশোরই উদ্যোগী হয়ে দিয়েছিল তার ...ঙ্গে তার বন্ধু সুবলের বিয়ে। তাই ...ন্মাদ কিশোরকে দেখে বাসন্তীও মাঝে ...াঝে উদাস হয়ে যায়; ভাবে তার সঙ্গে ...ববাহ হ'লে কিশোরের এমন দশা ...ত না। রামকেশব যখন সর্বস্ব ...ণ ক'রে কিশোরকে সুস্থ ...রবার দুশ্চর সাধনায় মত্ত, তখন ...কদিন তাদের সামনে এসে উপস্থিত ...ল একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে এক ...বতী। তার নাকি মনের মানুষ ...ারিয়ে গেছে; কিংবা সেই ছিল কারুর ...নের মানুষ। কুসীদজীবি কালোবরণের অর্থগৃধ্নুতার জালে প'ড়ে যখন রাম-...কেশব সমেত সমগ্র মালো-সমাজ যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ঠিক তখনই পাগল-...কিশোর ধরল অনন্তের মার হাতটি ...চেপে। সকলের মাথায় চাপল খুন; ...বিচার করল না যে, কিশোর পাগল। পাগলেরই মত তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। আহত কিশোর অন্তিম শ্বাসত্যাগ করবার পর সবাই ...জানল অনন্তের মা-ই কিশোরের সেই ডাকাতে-লুটে-নিয়ে-যাওয়া বৌ। তখন ...তাদের বাঁধভাঙ্গা চোখের জল গিয়ে ...মিশল তিতাসের জলের সঙ্গে।

এই প্রধান নাট্যকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মালোদের সোমবচ্ছরের ...জীবনযাত্রার কাহিনী; এতে আছে ...কুমারী উৎসব মাঘমন্ডলের ব্রত; যাতে ...ব্রতনীরা চৌয়ারি মাথায় নিয়ে ভাসায় ...তিতাসের জলে, আর মালো ছেলে সেই ...চৌয়ারি ধ'রে ব্রতনীর মনের মানুষ ...হ'তে চায়। আর আছে, দোলের ...আমোদ ফাগ দিয়ে যে-যার আপন ...জনকে রাঙিয়ে দেয়। আবার আছে, ...কালীপুজোর সং এবং সামাজিক বৈঠক। ...মালোদের অন্ধমাতব্বর কৃষ্ণচন্দ্র, দয়ালও ...যেমন আছে, তেমনই আছে সংস্কারমুক্ত ...প্রসাদ, যে বিধবা-বিবাহের মধ্যে কোনো ...অধর্ম দেখতে পায় না। পুরোহিত, ...ত্রিপুরারাজের তহসিলদার, কোন ...কোম্পানীর কর্মচারী, মাতাল আনন্দ-...প্রয়াসী প্রভৃতি বহুলোকের সমাগম ...ঘটেছে এই গোকনঘাটের মালোদের ...জীবননাট্যে।

"তিতাস একটি নদীর নাম"-এর ...নাট্যপ্রযোজনায় মঞ্চস্থাপত্যের যে ...বৈপ্লবিক নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছে ...তা' বাঙলা রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ অভিনব কীর্তি ব'লেই চিহ্নিত হবে। প্রেক্ষা-গৃহের মাঝের পথের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে অন্ততঃ দু'ফুট চওড়া বেদী মঞ্চের সামিল হয়ে নির্মিত হয়েছে, তার অপর প্রান্তের সিঁড়ি বেয়ে বহুবার চরিত্রের আনাগোনা ঘটেছে এবং মঞ্চে নির্মিত মূল দৃশ্য তিতাসতীরের মালো রামকেশবের বাড়ী বা সামাজিক উৎসব স্থানকে ঢেকে-রাখা পর্দার সামনে বহু দৃশ্য অভিনীত হয়েছে এবং দৃশ্য শেষে বহু শিল্পী মঞ্চগর্ভে নেমে গেছেন। অমাবস্যার রাতে তিতাসের বুকে চলন্ত নৌকার দৃশ্য নূতনত্বের দিক দিয়ে চমৎকার হ'লেও কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ব'লেই বোধ হয়। নদীগর্ভে খোলের অভ্যন্তরের লোকজনসহ দৃশ্য কোন্ বিশেষ স্থানে ব'সে দর্শকদের পক্ষে দেখা সম্ভব? এবং কার্টেনের সামনেই যখন নাটকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অভিনয়, তখন প্রেক্ষাগৃহের মাঝখান থেকে শিল্পীদের আবির্ভাব না ঘটিয়ে সম্মুখ মঞ্চের দু'পাশের সিঁড়ি দিয়ে তাঁদের আনালে প্রযোজনার কি খুব বেশী অসুবিধে হ'ত? বরং প্রেক্ষাগৃহের সামনের দিকের দর্শকেরা বারংবার ঘাড় বেঁকানোর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেন।

নাটকে তিতাস-তীরের আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে বাস্তবতার দিক দিয়ে স্থানীয় আব-হাওয়া বা লোক্যাল কালার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাটির সঙ্গে যাদের আদৌ পরিচয় নেই, তাদের কাছে বিষয়বস্তুর আবেদন বা সংলাপের শিল্পমাধুর্যের পরিচয় কম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই কি?

বরাবরের মত এই "তিতাস একটি নদীর নাম" নাটকেও লিটল থিয়েটার গ্রুপের সামগ্রিক অভিনয়ে নাট্যরসিক-মাত্রকেই রসের সাগরে নিমজ্জিত করবে। বিশেষ করে একটি বেদনাদায়ক উপা-খ্যানকে এমন মোহনীয় সুরের জালে জড়িয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, দর্শকমাত্রই নৃত্য, গীত, অভিনয়ের সংমিশ্রণজাত একটি অসামান্য নাট্যবৈভব দ্বারা সম্মোহিত হয়ে পড়েন।

হাসিকান্নার চুণীপান্না দিয়ে গাঁথা এই অভিনয় লিটল থিয়েটার শিল্পিগোষ্ঠীর নাট্যনৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হয়ে থাকবে। একসঙ্গে প্রায় অর্ধশতাধিক শিল্পীর বিভিন্নমুখী অভিনয় ও নৃত্য-গীতের সাহায্যে তিতাস-তীরবর্তী মালোজীবনের সুখদুঃখের এমন একখানি নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারা নাট্য-পরিচালকের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় বহন করছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে সমগ্র অভিনয়কে চরমোৎকর্ষে পেশছে দিয়েছেন। তবে ওরই মধ্যে বিশেষ করে নাম করব রাম-কেশবের ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের। বহুকাল এমন স্বাভাবিক জীবন্ত দরদী অভিনয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় গায়ক মোহনের ভূমিকায় নির্মল চৌধুরীর। তাঁর সুললিত উচ্চকণ্ঠ তিতাসের জলে উজান বইয়েছে; তাঁর অভিনয়াংশও হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বেগবান। স্বার্থান্ধ কুসীদজীবি বেপারী কালো-বরণের ক্রুর ধূর্ততা অতি সহজেই রূপায়িত হয়েছে পরিচালক উৎপল দত্তের দ্বারা। অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইন্দ্রজিত সেন। এবং সত্যাশ্রয়ী উদার হৃদয় প্রসাদ সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটনিপুণতায় সার্থক হয়েছে। কিশোর, সুবল, অনন্তর মা, বাসন্তী এবং ওঝার চরিত্রে যথাক্রমে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায়, নীলিমা দাস, শোভা সেন এবং তিনু ঘোষ তাঁদের নাটনৈপুণ্যের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর রেখেছেন।

'হাইহিল' চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও কুন্তলা চ্যাটার্জি

লিটল থিয়েটার গ্রুপের "তিতাস একটি নদীর নাম" সামগ্রিক অভিনয়-গুণে, সঙ্গীতের চমৎকারিত্বে, মঞ্চ-স্থাপনের অভিনবত্বে এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে নাট্যরসিক দর্শকবৃন্দকে অভি-ভূত করবার ক্ষমতা রাখে।

বিবিধ সংবাদ

।। অমৃতলালের 'খাস দখল' ।।

গত বুধবার ২০শে মার্চ সন্ধ্যায় রঙমহলে সানডে রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক রসরাজ অমৃতলালের 'খাস দখল' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। অপেশাদার নাট্য সংস্থার এই প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। অভিনয়াংশে প্রথমেই মোক্ষদার ভূমিকায় শেফালী দে'র নাম করতে হয়। তারপর মোহিতের ভূমিকায় বাচ্ছা সেন, ঠাকুরদা—পণ্টু দে, নিতাই—মন্তো ঘোষ এবং অন্যান্য অংশে সুনীল মারিক, শৈলেন ঘোষ, দীপা হালদার, প্রতিমা দে ইত্যাদি সকলেই সু-অভিনয় করে-ছেন। নিতাই এবং মোহিতের ভূমিকায় কিছু আতিশয্যদোষ থাকলেও সকলেই নিজ নিজ চরিত্র সাধ্যমত সুঅভিনয় করবার চেষ্টা করায় সমস্ত নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। পুরোনো গান-গুলি বাদ না দেওয়ার জন্যে এই সংস্থাকে ধন্যবাদ।

চিত্রযুগ-এর "দ্বীপের নাম টিয়া রঙ" :

আজ শুক্রবার, ১২ই এপ্রিল থেকে রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী চিত্রগৃহে চিত্রযুগ প্রযোজিত, মিত্রালী ফিল্মস পরিবেশিত এবং গুরু বাকচী পরি-চালিত "দ্বীপের নাম টিয়া রঙ" মু[ক্তি] লাভ করছে।

দীনেন্দ্র সংগীতায়তনের 'বসন্তোৎস[ব]'

গত ১৭ মার্চ ১৯৬৩ রবিব[ার] সন্ধ্যা সাতটায় ৩৫।২, বিডন স্ট্রীট[স্থ] ভারতী বিদ্যালয়ের অঙ্গনে দীনে[ন্দ্র] সংগীতায়তনের সংস্কৃতি বিভাগ 'র[ঙ্গ]-চক্রে'র প্রথম অধিবেশনের কার্য[সূচি] 'বসন্তোৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। অনু-ষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঙ্গীতায়তনে[র] সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। ক[...]

'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রে নবাগত পুষ্করনারায়ণ

সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন কলশ্রী শ্রীরূপা ঠাকুর, শ্রীলেখা ঠাকুর, আলো বসু, দীপালি চক্রবর্তী, প্রজ্ঞা রায়, তৃপ্তি দত্ত, অঞ্জলি পাল, স্বপন মুখোপাধ্যায়, সাধনচন্দ্র সরকার, শৈলেন দত্ত, অজিত চৌধুরী, সমীর চন্দ্র ও অমূল্যকুমার দাস। রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' কবিতাটি আবৃত্তি করেন শ্রীরূপা ঠাকুর। একক সংগীত পরিবেশনে সংগীতায়তনের ছাত্রী শ্রীলেখা ঠাকুর ও আলো বসু রবীন্দ্রসংগীতের যথাযথ মান ও মর্যাদা রেখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁদের দুজনকে প্রশংসা ও সাধুবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ। বিশিষ্ট অভ্যাগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা শ্রীমতী উমা দেবী, গীতবিতানের অধিকর্তা শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজনে আড়ম্বর ও বাহুল্য বর্জন করে সুষ্ঠু রবীন্দ্রসংগীতসুলভ প্রাণময়তা ফুটিয়ে তোলার যে প্রয়াস ছিল তা সত্য সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। সর্বোপরি সংগীতানুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যোৎসব :

গেল ১০ই মার্চ, রবিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ড্রামা ক্লাব কর্তৃক একটি নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। থিয়েটার সেণ্টার নাট্য-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অশোক সেন এই উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। অভিনীত চারটি নাটকের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিতে বিপরীত' এবং বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। যে পঁচাত্তর জন ছাত্রছাত্রী এই নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে 'হিতে বিপরীত' নাটকের পরিচালক এবং 'ভজহরি'র ভূমিকাভিনেতা মুকুর ভট্টাচার্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। মোট দশজন শিল্পী বিশেষ প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহে "স্যাটান নেভার স্লিপস" :

লাল চীন সম্পর্কিত পার্ল বাক-এর বিখ্যাত গল্প "স্যাটান নেভার স্লিপস"-অবলম্বনে রচিত, লিও ম্যাককেরী পরিচালিত টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স নিবেদিত চিত্রখানি আজ শুক্রবার থেকে এলিট সিনেমায় দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করেছে। উইলিয়ম হোল্ডেন অভিনীত ধর্মযাজক ও'বানিয়ন-এর সঙ্গে ফ্রান্স নিউয়েন অভিনীত সিউ-ল্যান-এর গভীর প্রেম এই ছবিখানির প্রধান উপজীব্য। সাম্যবাদী চীনাদের
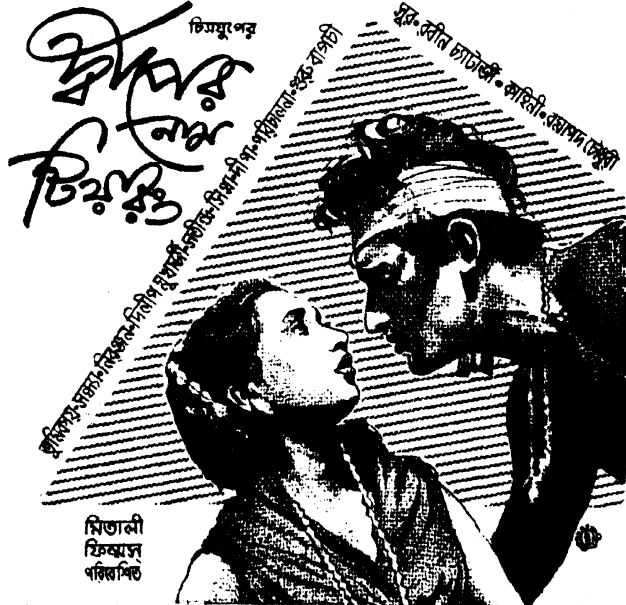
'খিভাস' এবং 'কালস্রোত' চিত্রে নবাগতা ললিতা চট্টোপাধ্যায়

হবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ বিশী মহাশয়।

৪র্থ বার্ষিক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ :

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল গেল ৩০এ মার্চ ঘোষিত হয়েছে। এবারে এই পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় নিম্নমানের জন্যে ১৮টি পারিতোষিকের মধ্যে মাত্র ৪টি বিতরিত হতে পেরেছে। কোনো নাট্য সংস্থাই "গিরিশ চ্যালেঞ্জ শীল্ড" পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হননি। "নাটুকে দল" ২য় পুরস্কার লাভ করেছেন। "বড় পিসিমা"র লেখক বাদল সরকার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং ইউরেকার বিনয় মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১২ জন শিল্পী প্রশংসাপত্র লাভ করেছেন।

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ২রা এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার ভবনে বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব ভাব গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ স্বামী শান্তিনাথানন্দজী পৌরোহিত্য করেন এবং ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীমৎ স্বামী চেতনানন্দজী যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকের আসন গ্রহণ করেন। স্বামীজীর অলোক সামান্য প্রতিভা এবং জাতীয় জীবনে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিবেকানন্দ যে আজীবন বিপ্লবী ছিলেন এবং অন্যায় ও অবিচারকে কখনও ক্ষমার চক্ষে দেখেন নি তা শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনীর সভাগণ কর্তৃক অভিনীত শ্রীঅমল সরকার রচিত বিপ্লবী বিবেকানন্দ নাটকে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই নাটকে দলগত ও অভিনয় নৈপুণ্যের সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীঅনিল চ্যাটার্জি'র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরবীন গুপ্তের বিবেকানন্দ, শ্রীগোপাল মুখার্জি'র কেবলরাম প্রশংসার দাবী রাখে। সামগ্রিকভাবে শিল্পীদের নিষ্ঠায় এবং অভিনয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ

কলকাতা

জালান প্রোডাকসন্স পরিবেশিত শিবানী চিত্রমের 'আকাশ প্রদীপ'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কনক মুখোপাধ্যায়। কাহিনী, সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। রবীন চট্টো-

পাধ্যায় সুরারোপিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নবকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী ও সুমিতা সান্যাল। কলাকুশলী বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় যথাক্রমে দেওজী ভাই, অমিয় মুখোপাধ্যায় ও সুনীল সরকার।

রাজীব পিকচার্সের নতুন ছবি 'প্রথম প্রেম' স্বাধীনভাবে প্রথম পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক অজয় বিশ্বাস। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়েছেন প্রদীপকুমার, সুমিত্রা দেবী, সন্ধ্যারাণী, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, লিলি চক্রবর্তী ও নমিতা সিনহা। সংগীত পরিচালনা করবেন অমল মুখোপাধ্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষে সেবক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' প্রবীণ পরিচালক মধু বসুর পরিচালনায় দ্রুতগতিতে চিত্রগ্রহণের কাজ এগিয়ে চলেছে। শ্রীমতী ইভা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সুরকার অনিল বাগচীর পরিচালনায় কণ্ঠদান করেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শিল্প-নির্দেশনা ও শব্দগ্রহণে আছেন যথাক্রমে অজয় মিত্র, অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বটু সেন ও বাণী দত্ত। কাহিনীর নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন 'ভগিনী নিবেদিতা' খ্যাত অমরেশ দাস। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, প্রেমাংশু বসু, চিত্র ঘোষাল, জীবন ঘোষ ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য।

টেকনিয়ান্স স্টুডিওয় সম্প্রতি 'মহাতীর্থ কালীঘাট' ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। রঙীন দৃশ্যগুলি বর্তমানে গৃহীত হচ্ছে। চিত্রগ্রহণ করছেন ধীরেন দে। আনন্দময়ী চিত্রপিঠের এ কাহিনী সংকলন করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ভূপেন রায়ের পরিচালনায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন শঙ্করনারায়ণ, শম্পা চক্রবর্তী, অসিতবরণ, অমরেশ দাস, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, মিহির ভট্টাচার্য, মণি শ্রীমানী, অমর মল্লিক, শিপ্রা মিত্র, বাণী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণা বসু ও ভারতী দাস। ভারতের বহু স্থানে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। বিপুল অর্থ-ব্যয়ে নির্মিত এ চিত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন ঘোষ। প্রায় বারোখানা গান এ ছবির বিশেষ আকর্ষণ। ন্যাশনাল মুভিজ পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বোম্বাই

প্রযোজক-পরিচালক এস ডি নারাং সম্প্রতি কাশ্মীর যাত্রা করেছেন। 'সাহনাই' চিত্রের বহির্দৃশ্যের জন্য। ফেমাস স্টুডিওয় এই রঙীন চিত্রের কয়েকটি প্রণয়মধুর দৃশ্য গৃহীত হল। অভিনয় করলেন বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী। রাজেন্দ্রকৃষ্ণের গীতরচনায় এ ছবির সংগীতে সুরসৃষ্টি করেছেন সংগীত পরিচালক রবি। প্রধান দৃশ্যে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, রাজশ্রী, জনি ওয়াকার, পরভিন চৌধুরী, মধুমতী, পদ্মচরন, নিরূপা রায়, লীলা চীটনিস ও চাঁদ-ওসমানি। এ ছবির আলোকচিত্রশিল্পী সুধীন মজুমদার।

রঞ্জিৎ স্টুডিওয় সম্প্রতি 'বীন বাদল বরসাত' চিত্রের চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন পরিচালক জ্যোতিস্বরূপ। কাহিনীর রোমাঞ্চকর দৃশ্যগুলি রূপায়িত করেন বিশ্বজিৎ ও আশা পারেখ। পার্শ্বচরিত্রে রূপ দিয়েছেন মেহমুদ, পদ্মা, মণি চ্যাটার্জি, দেবকিষণ, এস এন ব্যানার্জী এবং নিশি। সংগীত-পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

এশিয়াটিক আর্ট প্রোডাকসন্সের 'ফুল বনে অঙ্গারে' ছবিটি পরিচালনা করলেন সুরজপ্রকাশ। ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের পটভূমিকার ওপর এ কাহিনী রচিত হয়েছে। নেফা ও বমডিলা অঞ্চলে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। বাংলাদেশের নায়ক আশীষকুমার এ ছবিতে অভিনয় করছেন নায়িকা মালা সিনহার বিপরীত চরিত্রে। অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন অশোককুমার ও জনি ওয়াকার। কল্যাণজী-আনন্দজী এ ছবির সুরকার।

মাদ্রাজ

প্রযোজক-পরিচালক ফণী মজুমদার 'আকাশ দীপ' আরম্ভ করেছেন। সাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষ এটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন অশোককুমার, নন্দা, নিম্মি, মেহমুদ, ধর্মেন্দ্র ও শুভা খোটে। সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন চিত্রগুপ্ত।

ভিজয়া স্টুডিওয় পরিচালক প্রকাশ রাও তাঁর ছবি 'স্বয়ংসিদ্ধা' আরম্ভ করেছেন। আজাম প্রযোজিত এ চিত্রের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন মালা সিনহা, গুরু দত্ত, ফিরোজ খান, ললিতা পাওয়ার ও নাজির হুসেন। এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালনা করছেন সি রামচন্দ্র।

সঙ্গীত পরিচালক আদিনারায়ণ রাও 'ফুল কি সেজ' ছবিটি প্রযোজনা করছেন। [illegible] এ ছবির কয়েকটি গান [illegible]। ইন্দররাজ আনন্দ [illegible] এ চিত্রের প্রধান কয়েকটি [illegible] অভিনয় করছেন বৈজয়ন্তীমালা, [illegible] ও অশোককুমার।

—চিত্রদূত
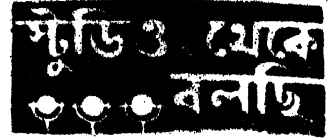
দুপুরের আকাশে রৌদ্ররেখা স্পষ্ট হয়। টালিগঞ্জের ভাণ্ডোর হাসপাতাল যেখানে তারই পাশে গা এলিয়ে গল্প করে রাধা ফিল্মস স্টুডিও। দুপুরের সংলাপে অনেক খবর পাড়ায়-পাড়ায় ছড়িয়ে পরে। গত সপ্তাহে এই স্টুডিওর পরিচালক রাজেন তরফদার তাঁর নতুন ছবি 'রৌদ্ররেখা'র মহরৎ-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করলেন। সাংবাদিক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে মহরৎ-উৎসবের আড়ম্বর ঘটা করে পালিত হল। লাল ফুলের মালা আর পূজার প্রসাদ সেই সঙ্গে লাল ফোঁটা, দেখলে আপনার মনে হবে কোন পূজা-পার্বনে দেবীদর্শন করতে এসেছেন। এমন একটি ভক্তি-বিশ্বাসের অনুষ্ঠান।

মহরৎ-শিল্পী ছিলেন সন্ধ্যা রায়। পরিচালক শ্রীতরফদারের নির্দেশে কাহিনীর প্রথম দৃশ্য গৃহীত হল। চিত্রগ্রহণ করলেন আলোকচিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত। শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবি চট্টোপাধ্যায় তরুণ দত্ত। একজন জীবন-বীমার দালালকে নিয়ে এ চিত্র-কাহিনী রচিত হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন রাজেন তরফদার। প্রধান নায়ক-চরিত্রে অভিনয় করবেন অনুপকুমার। এ ছাড়া দুটি মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায় ও তরুণকুমার। সঙ্গীতপরিচালনা করবেন প্রবীর মজুমদার। আগামী সপ্তাহ থেকে রৌদ্ররেখার নিয়মিত দৃশ্যগ্রহণ শুরু হচ্ছে রাধা ফিল্মস স্টুডিওয়। কাহিনী ও বিস্তারিত এ ছবির খবর পরে জানতে পারবেন।

বড়'র নাম মল্লিকা, ছোট'র ঘেঁটু। ফুলের নামে নাম। ছবির নাম 'ছায়া-সূর্য'। আর ডি বনশালের প্রযোজনায় ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে ঘেঁটুর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর। গত সপ্তাহে এ সংস্থার কলাকুশলী দল রাঁচীর নেদারহাট অঞ্চলে বহির্দৃশ্যের জন্য রওয়ানা হয়েছেন। শর্মিলা ঠাকুর, নির্মলকুমার প্রভৃতি শিল্পীদের নিয়ে এ ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে।

কাহিনীর অপর পক্ষে বড় বোন মল্লিকার চরিত্রে অভিনয় করছেন কল্যাণী

রাজেন তরফদার পরিচালিত 'রৌদ্ররেখা'-র মহরৎ অনুষ্ঠানে মহরৎ-শিল্পী সন্ধ্যা রায়।

গেম। বড়দার অফিসসর্বস্ব শান্তিপ্রিয় চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, মেজদার সাহেবী মেজাজের চরিত্রে বিকাশ রায়, ছোটকাকা সাহিত্যানুরাগী নির্মলকুমার, বড়বৌদির কোমল চরিত্রে মলিনা দেবী, মেজবৌদির চকরণে কথাবলা এবং উন্নাসিক ব্যক্তিত্বে অনুভা গুপ্তা। এ ছাড়া বাড়ীর চাকর বংশী—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রবি ঘোষ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায় ও বেবি মিতা রয়েছেন। এ ছবিতে দুটি রবীন্দ্রসংগীতের সংযোজন চিত্রামোদীদের বিস্মিত করবে। গান-দুটি হল—এসো এসো আমার ঘরে এসো, শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। 'তবে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে', শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন। সংগীত-পরিচালনা করেছেন ভি বালসারা।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় সত্যজিৎ রায় 'মহানগর' শেষ করছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা করছেন শ্রীরায়। মহানগর কলকাতার এক মধ্যবিত্ত সংসারে স্বামী সুব্রত যখন বেকার তখন তার স্ত্রী আরতি 'মুখার্জি এন্ড মুখার্জি' কোম্পানীতে চাকরী নিল। বর্তমান সমাজে মহিলাদের যে সমস্যা, মধ্যবিত্ত সংসারের যে দৈন্যতা এবং স্বামী-স্ত্রীর যে দ্বন্দ্ব সেই ঘটনা-বিন্যাসের ওপর কেন্দ্র করে এ কাহিনী চিত্রে রূপ নিচ্ছে। সুব্রত ও আরতির চরিত্রে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। সুব্রতর বাবা এবং মায়ের ভূমিকায় রূপদান করছেন হরেন চট্টোপাধ্যায় ও শেফালিকা পুতুল। সুব্রতর ছোট ছেলে ও বোনের চরিত্রে প্রসেনজিৎ ও জয়া ভাদুড়ী অভিনয় করছে। কলাকুশলী বিভাগে রয়েছেন আলোকচিত্রে সুব্রত মিত্র, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত ও শিল্পনির্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত। আর ডি বনশাল এ ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় দুটি ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। 'অচিনপুরের কথকতা' অবলম্বনে 'বিভ্রাস' ছবিটি পরিচালনা করছেন বিনু বর্ধন। নাম-ভূমিকায় রয়েছেন উত্তমকুমার। এ ছাড়া ললিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা ও তরুণকুমার। সঙ্গীতপরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টি সন্ধানীগোষ্ঠীর পরিচালনায় 'অয়নান্ত'। দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। সঙ্গীত ও আলোকচিত্র পরিচালনা করছেন সলিল চৌধুরী ও রামানন্দ সেনগুপ্ত।

স্টুডিও-পাড়ার চিত্রসংবাদ শেষ হল।

—চিত্রদূত
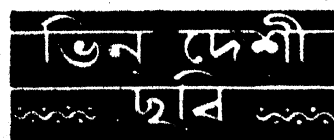
।। ডক্টর নো ।।

ইংল্যান্ডে ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দশটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের মধ্যে 'ডক্টর নো' ছবিটি অন্যতম। আয়ান ফ্লেমিং-এর রোমাঞ্চকর রহস্যকাহিনী অবলম্বনে ডক্টর নো তোলা হয়েছে। ছবির পটভূমি হল জামাইকা। চিত্রের নায়ক জেমস বন্ডকে পাঠানো হয় জামাইকাতে দুটি হত্যার কিনারা করতে। তদন্ত করতে গিয়ে বন্ড আধাচৈনিক ডক্টর নোর সংস্পর্শে আসেন। ডক্টর নো একজন ক্ষমতালিপ্সু বৈজ্ঞানিক। পরিচালক টেরেন্স ইয়ং এমনভাবে ছবিটি তুলেছেন যে চিত্রের অন্তিম-উত্তেজনায় ছোট বড় সব বয়সের দর্শকই রোমাঞ্চ-মুগ্ধ হবেন। ডক্টর নোর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জোসেফ ওয়াইজম্যান। সীন কনোরি নামে এক নবাগতকে নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে। অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন উর্সেলা আন্দ্রেস, জেনা মার্শাল, ইউনিস গেসন।

।। মার্ডার এ্যাট দি গ্যালপ ।।

আগাথা ক্রিস্টির কাহিনীর আকর্ষণ কম না। চলচ্চিত্রেও ইতিপূর্বে একাধিক বক্সঅফিসধন্য চিত্র ক্রিস্টির কাহিনী অবলম্বনে তোলা হয়েছে। সম্প্রতি এম জি এম-এর ব্রিটেনস্থিত স্টুডিওতে আগাথা ক্রিস্টির আরেকটি ছবি উঠেছে। 'মার্ডার সি সেইড' চিত্রগোষ্ঠীর কলাকুশলীরা বর্তমান ছবিটি তুলছেন। "আফটার দি ফিউনারেল" উপন্যাসটির কাহিনী অবলম্বনে 'মার্ডার এ্যাট দি গ্যালপ' তোলা হচ্ছে। এই চিত্রে "মিস মার্পল"-এর বিখ্যাত ভূমিকায় অভিনয় করছেন মার্গারেট রাদার ফোর্ড। চার্লস টিংওয়েল ইন্সপেক্টর ক্রাডক-এর ভূমিকায় নামছেন। এই রহস্যচিত্রের পরিচালক হলেন জর্জ পোলক।

—চিত্রকূট

খেলাধুলা

দর্শক

এম মেডনিয়ানস্‌জকি (হাঙ্গেরী) : টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় স শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড়
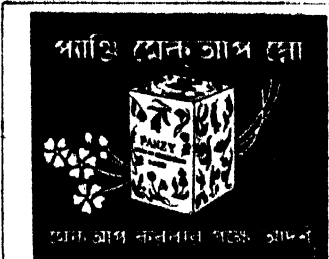
বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

প্রাগে গত ৫ই এপ্রিল থেকে ২৭তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষ হবে ১৪ই এপ্রিল। প্রতিযোগিতায় আছে এই সাতটি অনুষ্ঠান : পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (সোয়েথলিং কাপ), মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (কোর্বিলোন কাপ) এবং ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপের পাঁচটি অনুষ্ঠান—পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস, পুরুষদের ডাবলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস খেলা। আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশন এই বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তা। ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিযোগিতা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৯২৭ সালে। প্রথম বছরে অনুষ্ঠানের সংখ্যা কম ছিল।

ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গেরী) : বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিঙ্গলসে পাঁচবার খেতাব পেয়ে পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় সর্বাধিক জয়লাভের রেকর্ড করেন।

মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়া খেলা তালিকাভুক্ত হয়েছে ১৯৩৪ ব্যক্তিগত বিভাগের অনুষ্ঠানগুলি সময় থেকে আরম্ভ হয়েছে যোগিতার আরম্ভ থেকে ইউরোপে গুলিই একটানা (১৯২৭ ১৯৫১) জয়লাভ করেছে। সালে ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত ১৯ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপ প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমে ইউ সুদীর্ঘ কালের একটানা প্রাধ করে। মোট সাতটি অনুষ্ঠানে জাপান চারটি অনুষ্ঠানে জয়লাভ পুরুষদের সিঙ্গলসে জয়ী হন সাটো, পুরুষদের ডাবলসে ফু হায়াসী, মহিলাদের ডাবল এবং নারাহারা। তাছাড়া ম দলগত অনুষ্ঠানে জাপান কো কাপ পায়। প্রতিযোগিতায় যো প্রথম বছরেই এই রকম সাফল্য ছাড়া আর কোন দেশ দেখাতে প জাপানের এ সাফল্য যে 'বেড়ালের শিকে ছেঁড়া' নয় জাপান তা প প্রতিযোগিতায় প্রমাণ করেছে। মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি জাপানই বিশ্ব টেবল টেনিস যোগিতায় খেতাব লাভের প্রথম অর্জন করে।

১৯৫২ সাল থেকে সালের মধ্যে ৮ বার বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত। ১৯৫৭ সালের পর প্রতিযোগিত বছরে না হয়ে এক বছর অন্তর সেই কারণে ১৯৫৮, ১৯৬ ১৯৬২ সাল বাদ পড়েছে। বারের মধ্যে জাপান ৭ বার যোগিতায় যোগদান করেছে, সালে (অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় যোগদানের পরের বছর) রাজ কারণে যোগদান করেনি। বারের মধ্যে জাপান পুরুষদের

বিভাগে সোয়েথলিং কাপ পেয়েছে উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৫৪—১৯৫৭, ১৯৫৯) এবং মহিলাদের দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ পেয়েছে উপর্যুপরি ৩ বার নিয়ে মোট ৫ বার (১৯৫২, ১৯৫৪—৫৫, ১৯৫৭, ১৯৫৯ ও ১৯৬১)। একই বছরে সোয়েথলিং কাপ এবং কোর্বিলোন কাপ পেয়েছে তিনবার (১৯৫৪, ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯)। এই সম্মান মাত্র একবার পেয়েছে আমেরিকা, ১৯৩৭ সালে। ১৯৫৪ সালে জাপান সোয়েথলিং কাপের খেলায় অপরাজেয় থেকে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে জাপানের সাফল্য কম নয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ৭ বার প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জাপান পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছে ৫ বার (১৯৫২, ১৯৫৪—৫৭)। ব্যক্তিগত বিভাগের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও জাপান উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। জাপানের এই সাফল্যের মধ্যে হাঙ্গেরীর সিডো এবং রুমানিয়ার এঞ্জেলিকার সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩ সালে সিডো এবং এঞ্জেলিকা তিনটি করে অনুষ্ঠানে জয়লাভ করে 'ত্রিমুকুট' সম্মান লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের প্রতিযোগিতায় এঞ্জেলিকা মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেলে তিনি উপর্যুপরি ৬ বার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পাওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি করেন। বর্তমানে জাপানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রজাতন্ত্রী চীন। ১৯৫৯ সালের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল ছাড়া বাকি চারটি বিভাগের ফাইনালে জাপান খেলেছিল এবং এই চারটি বিভাগের মধ্যে তিনটিতে—মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে কেবল জাপানের খেলোয়াড়রাই খেলেছিলেন। ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি খেতাবের মধ্যে শেষ পর্যন্ত জাপান চারটি খেতাব পায় এবং সেই সঙ্গে পায় সোয়েথলিং এবং কোর্বিলোন কাপ; অর্থাৎ প্রতিযোগিতার মোট সাতটি খেতাবের মধ্যে জাপানের হাতে যায় ৬টি খেতাব। পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব পায় প্রজাতন্ত্রী চীন।

পরবর্তী ১৯৬১ সালের প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন সোয়েথলিং কাপ, পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পায়। তাছাড়া রানার্স-আপ হয় পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে। অন্যদিকে জাপান পুরুষদের ডাবলস, মিক্সড ডাবলস খেতাব এবং কোর্বিলোন কাপ পায়। রুমানিয়া মহিলাদের ডাবলস খেতাবটি নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইউরোপের মুখরক্ষা করে। যদি কিছু অঘটন না ঘটে তাহলে প্রাগের ২৭তম বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় খেতাব নিয়ে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে।

বিবিধ রেকর্ড

সর্বাধিক জয়ের রেকর্ড

পুরুষদের সিঙ্গলস : ৫বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গেরী) —১৯৩০, ১৯৩২-৩৫ সাল।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ৬বার—এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া) —১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সাল।

পুরুষদের ডাবলস : ৮বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গেরী)। বার্ণা তিনজন জুটির সহযোগিতায় এই রেকর্ড করেন (১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৯)।

মহিলাদের ডাবলস : ৭বার—এম মেডনিয়ানস্‌জকি (হাঙ্গেরী)। তিনজন জুটির সহযোগিতায় এই রেকর্ড হয় (১৯২৮, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫)।

মিক্সড ডাবলস

পুরুষদের পক্ষে : ৪বার—এফ সিডো (হাঙ্গেরী) —১৯৪৯-৫০, ১৯৫২-৫৩ সাল।

মহিলাদের পক্ষে : ৬বার—এম মেডনিয়ানস্‌জকি (হাঙ্গেরী) — ১৯২৭-২৮, ১৯৩০-৩১, ১৯৩৩-৩৪ সাল।

সর্বাধিক ব্যক্তিগত জয়

মহিলাদের পক্ষে : ১৮বার—এম মেডনিয়ানসজকি (হাঙ্গেরী)।

পুরুষদের পক্ষে : ১৫ বার—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গেরী)।

উপর্যুপরি ব্যক্তিগত জয়

মহিলাদের সিংগলসে : ৬বার (১৯৫০-৫৫) —এঞ্জেলিকা রোজিনু (রুমানিয়া)।

পুরুষদের সিংগলসে : ৪বার (১৯৩২-৩৫)—ভিক্টর বার্ণা (হাঙ্গেরী)।

সর্বাধিক দলগত জয়

সোয়েথলিং কাপ : ১১বার—হাঙ্গেরী। হাঙ্গারীর শেষ কাপ জয় ১৯৫২ সালে।

কোর্বিলোন কাপ : রুমানিয়া এবং জাপান ৫বার করে এই কাপ পেয়েছে। রুমানিয়ার শেষ কাপ জয় ১৯৫৬ এবং জাপানের ১৯৬১ সালে।

উপর্যুপরি সর্বাধিক জয় :

হাঙ্গেরী (১৯২৭-৩১) এবং জাপান (১৯৫৪-৫৯) উপর্যুপরি ৫বার করে পুরুষদের দলগত বিভাগের পুরস্কার সোয়েথলিং কাপ জয় করেছে।

উপর্যুপরি সর্বাধিক বার কোর্বিলোন কাপ (মহিলাদের দলগত বিভাগের পুরস্কার) **জয়ের রেকর্ড :** ৩বার —জাপান (১৯৫৭-৬১)।

বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কার

দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ :

পুরুষ বিভাগ—সোয়েথলিং কাপ
মহিলা বিভাগ—কোর্বিলোন কাপ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ :

পুরুষদের সিঙ্গলস—সেন্ট ব্রাইড ভাস
মহিলাদের সিঙ্গলস—জি গিস্ট প্রাইজ
পুরুষদের ডাবলস—ইরাণ কাপ
মহিলাদের ডাবলস—ডব্লিউ জে পোপ ট্রফি
মিক্সড ডাবলস—হেডুসেক প্রাইজ

সোয়েথলিং কাপ বিজয়ী দল

১৯২৭-৩১ হাঙ্গেরী; ১৯৩২ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৩-৩৫ হাঙ্গেরী; ১৯৩৬ অস্ট্রিয়া; ১৯৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৮ হাঙ্গেরী; ১৯৩৯ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪০-৪৬ খেলা বন্ধ; ১৯৪৭-৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৯ হাঙ্গেরী; ১৯৫০-৫১ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫২ হাঙ্গেরী; ১৯৫৩ ইংল্যান্ড; ১৯৫৪-১৯৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ প্রজাতন্ত্রী চীন।

কোর্বিলোন কাপ বিজয়ী দল

১৯৩৪ জার্মানী; ১৯৩৫-৩৬ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৯ জার্মানী; ১৯৪০-৪৬ খেলা বন্ধ; ১৯৪৭-৪৮ ইংল্যান্ড; ১৯৪৯ আমেরিকা; ১৯৫০-৫১ রুমানিয়া; ১৯৫২ জাপান; ১৯৫৩ রুমানিয়া; ১৯৫৪ জাপান; ১৯৫৫-৫৬ রুমানিয়া; ১৯৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ জাপান।

॥ ক্যালকাটা হকি লীগ ॥

প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব ১৭টা খেলায় ৩৪ পয়েন্ট করে বর্তমানে লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে গত বছরের রানার্স-আপ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৭টা খেলায় ৩২ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দুটো পয়েন্ট নষ্ট করেছে—কাস্টমসের সঙ্গে ০—০ গোলে এবং গ্রীয়ারের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র করে। বর্তমানে একমাত্র মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কোন খেলায় হার স্বীকার করেনি।

॥ উবের কাপ ॥

মহিলাদের আন্তর্জাতিক "উবের কাপ" ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার জোন-ফাইনালে ইংল্যান্ড ৫-২ খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করায় গত দু'বারের (১৯৫৭ ও ১৯৬০) উবের কাপ বিজয়ী আমেরিকার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। এই প্রতিযোগিতাটি আরম্ভ হয়েছে ১৯৫৭ সালে। প্রতি তৃতীয় বৎসরে এই খেলা হয়। আমেরিকা ১৯৫৭ এবং ১৯৬০ সালে উবের কাপ জয় করেছে।

আলোচ্য জোন-ফাইনালে ইংল্যান্ড উপর্যুপরি চারটি খেলায় (৩টি সিংগলস এবং ১টি ডাবলস) ইন্দোনেশিয়াকে পরাজিত করে চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে খেলবার অধিকার লাভ করে। বাকি তিনটি ডাবলস খেলার মধ্যে ইংল্যান্ড একটি এবং ইন্দোনেশিয়া দুটি খেলায় জয়ী হয়। মোট সাতটি খেলার মধ্যে সিংগলস খেলার সংখ্যা তিন এবং ডাবলস খেলার সংখ্যা চার।

ইংল্যান্ড প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ৭-০ খেলায় কানাডাকে পরাজিত করেছিল। অপর দিকের ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে ইন্দোনেশিয়াও ৭-০ খেলায় পরাজিত করেছিল নিউজিল্যান্ডকে।

চ্যালেঞ্জ রাউন্ড

গত দু'বারের উবের কাপ বিজয়ী আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে ৪—৩ খেলায় ইংল্যান্ডকে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতার সূচনা থেকে উপর্যুপরি তিনবার এই কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

আলোচ্য চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় এক সময়ে আমেরিকা ৩—১ খেলায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ড দৃঢ়তার

উবের কাপ

সঙ্গে খেলে খেলা সমান (৩—৩) দাঁড় করায়। শেষ ডবলস খেলাতে আমেরিকার শ্রীমতী জুডী হাসম্যান এবং কার্লিন স্টার্কি ইংল্যান্ডের বোগাস' এবং প্রিচার্ডকে পরাজিত করলে আমেরিকার হাতেই উবের কাপ থেকে যায়। চ্যালেঞ্জ রাউন্ডের খেলায় আমেরিকার শ্রীমতী জুডী হাসম্যানের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি তিনটে খেলায় যোগদান করে দলকে জয়লাভের পথে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় এবং নেতৃত্বে আমেরিকা উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৭, ১৯৬০ ও ১৯৬৩) উবের কাপ পেল। মহিলা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রীমতী হাসম্যান নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। কুমারী জীবনে তাঁর নাম ছিল জুডী ডেভলিন।

॥ ডেভিস কাপ ॥

১৯৬৩ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমিফাইনালে ভারতবর্ষ ৪—১ খেলায় পাকিস্থানকে পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে।

পুণার নবনির্মিত ডেকান জিমখানা কোর্টে অনুষ্ঠিত এই খেলার উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শাহ। উদ্বোধনী ... খেলায় জয়দীপ মুখার্জি (ভা... ৬-৩, ৬-৪ ও ৬-২ গেমে ... পিরজাদাকে (পাকিস্থান) ... করেন। দ্বিতীয় সিংগলস ... রমানাথন কৃষ্ণান (ভারতবর্ষ) ৬-... ও ৬-০ গেমে সৈয়দ কুতুব... (পাকিস্থান) পরাজিত করলে ভ... এইদিন ২-০ খেলায় অগ্রগামী ...

দ্বিতীয় দিনের ডাবলস ... ভারতবর্ষের জয়দীপ মুখার্জি ... আখতার আলী তাঁর প্রতি... মধ্যে পাকিস্থানের ইফতিকার ... এবং মুনীর পিরজাদাকে ... করলে ভারতবর্ষ পূর্বাঞ্চলের ... মালয়ের সঙ্গে খেলবার যোগ্য... করে। এই দিনের খেলায় ... জুটি ৩-৬, ৫-৭, ৬-৩, ৬-৪ ... গেমে জয়লাভ করেছিল।

তৃতীয় দিনের বাকি দুটি ... খেলায় ভারতবর্ষ এবং প... ভাগাভাগি করে জয়লাভ করে। এই দিনের খেলায় কোন গুরু... না, নিয়ম রক্ষার খেলা ছিল ... বলবো দুর্বল পাকিস্থান দল শ... ভারতবর্ষের হাত থেকে একটা ... জয়লাভের গৌরব ছিনিয়ে ... শেষ দিনে জয়দীপ মুখার্জি ... বর্ষ) ৬৮ মিনিটের খেলায় ... কুতুবুদ্দিনকে (পাকিস্থান) ... করেন। অপরদিকে পাকিস্থানের ... বছর বয়সের তরুণ ... জুলফিকার রহিম পাঁচ ... ৬-৮, ৬-২, ১-৬, ৭-৫ ৬-... ভারতবর্ষের ৪নং খেলোয়াড় ... আলীকে পরাজিত করেন।

॥ এ্যাথলেটিক্সে বিশ্ব রেক...

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অ... এ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন এ্যাথ... অনুষ্ঠানে ৪২টি বিশ্ব রেকর্ড অ... ক'রে এক-তালিকা প্রকাশ করে...

এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য ... পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের পিটার ... স্নেলের এই তিনটি বিশ্ব রেকর্ড ... মোদন লাভ করেছে : ১ মাইল ... সময় ৩ মিঃ ৫৪·৪ সেঃ। ৮০... দৌড়—সময় ১ মিঃ ৪৪·৩ ... ৮৮০ গজ দৌড়-সময় ১ মি... সেকেন্ড।

রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত ... ভালেরি ব্রুমেলের হাই জা... তিনটি বিশ্ব রেকর্ডও অনুমো... করেছে : ৭ ফিট ৪½ ইঞ্চি ... ১৯৬১), ৭ ফিট ৫ ইঞ্চি ... ১৯৬২) এবং ৭ ফিট ৫¾ ইঞ্চি ... সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দে এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এস-সিতে শারীরবিদ্যা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। শ্রীমতী দে শতকরা ৭৫ নম্বর পাইয়া এই বিষয়ে একটি নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। বি এস-সি পরীক্ষায় উক্ত বিষয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছিলেন।

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চীফ-মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার (প্ল্যানিং) শ্রী এস সি দে-র একমাত্র কন্যা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

অমৃত

২য় বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫০শ সংখ্যা—মূল্য ৪০ নয়া পয়সা
শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

Friday, 19th April, 1963.
40 Naya Paise.

ইংরাজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে যাহার অর্থ "সে ঝড় অতি খারাপ ঝড় যাহাতে কাহারও উপকার হয় না।" সম্প্রতি চীনাদের আক্রমণে যে ঝড় এদেশের ও জাতির উপর বহিয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ প্রবাদবাক্য ফলিয়া গিয়াছে বহুদিকে ও বহু রকমে। এবং উহার সুফল ফলিয়াছে বিশেষে নয়াদিল্লির প্রধান মহাশয়গণের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে যিনি আসিয়াছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলে তাঁহার কথার ধরণে এবং বিবৃতির তথ্যে মনে হয় ঐ ঝড়ে শুধু একজন অকর্মণ্য ও বাক্‌সর্বস্ব লোককে উড়াইয়া দিয়াছে নয়, ঐ দপ্তরের অনেক আবর্জনাও দূর করিয়াছে সেই সঙ্গে যাহাতে এই নূতন মন্ত্রীর কার্যক্রমের পথ সরল হয়। আশা করা যায় সেই সঙ্গে গিয়াছে সেই বিপরীত মনোবৃত্তি যাহার বিষয়ে লোকসভায় শ্রীমতী শারদা মুখার্জি বলিয়াছিলেন।

প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্টা এতদিনে সোজা পথে চলিতেছে মনে হয়। সব কাজের সব কিছুই এখন আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে না। সময়ের যে মূল্য আছে সে কথা বোধহয় এতদিনে প্রতিরক্ষা-দপ্তরের উচ্চতম অধিকারি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছেন ও বলিয়াছেন। সেইজন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবন লোকসভায় প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে ঐ সকল সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থার বিষয়ে বলিবার কালে প্রত্যেকটি কাজের পূরণের সময় নির্দেশ করিয়াছিলেন। এবং সেনাবাহিনী দ্বিগুণ করার ও বিমানবাহিনীর সম্প্রসারণ সম্পর্কেও তিনি কাজ দ্রুত অগ্রসর করিবার জন্য কি করা হইতেছে তাহারও আভাস দিয়াছেন। সবকিছুই ভবিষ্যতের উপর এ নিও রহিয়াছে কিন্তু অনেক অত্যন্ত জরুরী কাজ—যথা হিমালয়ের উচ্চস্কন্ধে লড়িবার মত সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঐ উচ্চস্থলে পরিশ্রমের অভ্যাসযুক্ত পাঁচ ছয়টি পূর্ণ ডিভিশন, পথঘাট যানবাহন ও বিমানকেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি—এই বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে তিনি বলিয়াছেন। অন্য কাজগুলিও তিনি দূর ভবিষ্যতের দিকে ফেলিয়া রাখিতেছেন না একথাও তাঁহার ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং সদস্যগণ তাহাতে "হর্ষধ্বনি" করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

'অমৃতে'র পাঠকবর্গ এবং শুভানুধ্যায়ীদের আমরা
নববর্ষের
সাদর সম্ভাষণ জানাই

এই ঝড়ে আর একটি দপ্তরকে সময়ের মূল্য বুঝাইয়াছে। এবং তাহার দরুণ পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালীর অনেক উপকার পাইবার সম্ভাবনা আছে, যদিও তাহাতে সময় লাগিবে—প্রায় চার বৎসরের মত।

পশ্চিমবাংলার—বিশেষে বৃহত্তর কলিকাতার শিল্পাঞ্চল ও কলিকাতা বন্দরের—জীবনরুধির-স্রোত বহিতেছে গঙ্গানদীর প্রবাহে। কিছুদিন যাবং মূল প্রবাহ সরিয়া যাওয়ায় ভাগীরথী, জলাঙ্গী ইত্যাদিতে জলস্রোতের ধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ইহার ফলে এই অঞ্চলের সমূহ ক্ষতি এবং এখানের সকল কাজে বাধা পড়িয়াছে এবং ক্রমেই সেই বাধাগুলি মারাত্মক দাঁড়াইতেছে। ইহার প্রতিকার কিভাবে করা যায় তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয় প্রায় দশ বৎসর পূর্বে। সেই নির্দেশে বলা হয় যে ফরাক্কায় বাঁধ দিয়া মূল প্রবাহের একটা অংশকে ফিরাইয়া এই দিকের জলস্রোতকে বর্ধিত ও স্ফীত করিতে হইবে।

অন্যদিকে কলিকাতা বন্দরের মুখে জলস্রোত ক্ষীণ হওয়ার দরুণ বিরাট ও বিশাল চড়া পড়িতে আরম্ভ হয়। সমুদ্র ও মহাসাগরগামী বড় জাহাজগুলির কলিকাতা পর্যন্ত যাতায়াত ক্রমেই দুরূহ হইতেছে। চড়ার বালিমাটি ড্রেজার দ্বারা কাটিয়া তুলিয়াও তাহার প্রতিকার কিছু বিশেষ হইতেছে না। উপায় কি, সে বিষয়ে চিন্তারও প্রয়োজন আছে; কেননা কলিকাতা বন্দরে সারা ভারতের আমদানি-রপ্তানির শতকরা ৪৫ ভাগ চলে। এবং শুধু রপ্তানির—যাহা ভারতের অর্থসঙ্গতির মূল ভরসা—বোধহয় শতকরা ৭৫ ভাগ এখান দিয়াই চলে। সুতরাং স্থির করা হইল হলদিয়ায় একটি সহযোগী বন্দর প্রতিষ্ঠা করা হইবে যাহাতে রপ্তানির বৃহৎ অংশ ও আমদানির অনেক কিছু বড় জাহাজ মারফৎ বিনা বাধায় করা চলে।

কিন্তু বাঙ্গালীর এতবড় উপকার এত সহজেই হইবে তাহা আশা করা কঠিন। সুতরাং জল্পনা-কল্পনায় সাত-আট বৎসর কাটাইয়া এখন কাজের বেলা অতি ধীর মন্থর গতিতেই সব চলিতেছে। কিন্তু আসিল এই ঝড় এবং সেই সঙ্গে "আক্কেল"। শোনা যায় জরুরী নির্দেশ আসিয়াছে দুই কাজই ১৯৬৭'তে শেষ করার।

জলদ কণ্ঠের স্বর

কৃষ্ণ ধর

জলদ কণ্ঠের স্বর ভেঙে পড়ে
ভেঙে ভেঙে পড়ে
হিমালয়, স্রোতস্বিনী, জল
বনরাজি তার কৌতূহলী, সেই কণ্ঠ শোনে
আসমুদ্র ভারতবর্ষ, দেবতাত্মা কথা জানে তার
পবিত্র তুষারমালা, কিরীটিনী কাঞ্চনজঙ্ঘার
শব্দ হয়, প্রতিধ্বনি প্রতিহত হয়, শব্দ হয়
সেই শব্দে ইতিহাস
আবর্তিত হয়।

জলদ কণ্ঠের স্বর ভেঙে পড়ে
ভেঙে ভেঙে পড়ে
চীনের প্রাচীরে
আবার হননের গান সহস্র হিংসার
কী রক্তাক্ত স্রোত
বর্বর বন্যার বেগে
দেবতাত্মা বিচলিত হয়।
এই সব যেন পঙ্গপাল, হননে কি বিস্তর উল্লাস
বন্য ক্ষুধা চোখে ফেরে
বধির পশুর বেগে নেমে আসে
রক্তমাখা ঢল
সমতলে, সমতলে আরও সমতলে
যেখানে মানুষ সব
অফুরন্ত ভারতবর্ষের
গাঢ়তম ভালবাসা, অফুরন্ত
বিশাল প্রাচীরে
অতঃপর প্রতিরোধ অফুরন্ত সমতলে
তরঙ্গিত সমুদ্রসমান।

চিন্ময়ী মায়ের ডাকে

করুণাসিন্ধু দে

চিৎকারে জাগে না চিত্ত দ্রিমিদ্রিমি দাম্ভিক ঢোলকে
আস্ফালনে শূন্যগর্ভ ঘোষণায় প্রাণে প্রতিধ্বনি
আসে কী কখনো? শব্দ প্রতিহত শ্রুতির গোলোকে
গোলোক-ধাঁধায় ঘোরে ফিরে আসে অমল লাবনি
হারিয়ে ফতুর হাটে; ক্ষুব্ধ পিপাসায় অথবা ক্ষুধায়
শুধু হাহাকারে শান্তি ক্লান্তি কোথা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে
ফসল ফলানো ঘরে? কিংবা ক্রূর রাত্রির দ্বিধায়
কোথায় প্রহরী তুমি?......

পরস্পর দোষারোপ দিতে
দিন গেলো রাত্রি গেলো অবিশ্বাসে আত্মবঞ্চনার
সংশয়ে সন্দেহে পোড়ে; মাটিতে নাড়িতে নির্বিশেষ
প্রণয় প্রথম সত্য, ঐকতানে ফোটালে কুসুম
চতুর্দিক মেতে ওঠে, জনপদে উন্মুক্ত দুয়ার
মুখের আলোয় ভাসে জাগরণে নিশ্চেতন ঘুম
চিন্ময়ী মায়ের ডাকে। চারণ সংগীতে জাগে দেশ।

পরতন্ত্রী

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

সঠিক নিয়মে চলি আমি তার কঠিন ইঙ্গিতে।
সরে যায় পদতলে রক্তসমাকীর্ণ সরোবর,
তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে কাটে স্বাধীন আঙুল। এই শীতে
আমাদের মৃতদেহে ভ'রে যাবে বিশাল প্রান্তর।

দিগন্তে নক্ষত্রপুঞ্জ কিংবা ঐ চাঁদের মশাল
জ্বালিয়ে কী লাভ। ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ সৃষ্টির
পদাঘাতে জাগে না কি ক্লান্ত, পরতন্ত্রী পঙ্গপাল!
শিশিরে, বৃষ্টির শব্দে তারই নম্র বিরল দৃষ্টির

সন্নিপাত। আমি জেগে উঠি দ্বারপ্রান্তে। বাতায়নে
বিলুপ্ত সার্কাবদল। অন্ধকার নিদ্রিত শয়নে।

জৈমিনি

আপনারা আমার নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ ও শুভকামনা গ্রহণ করুন। আমি জানি, অন্যান্য বছরের মতো গত বছরও আপনাদের খুব সুখে কাটেনি। পিছনের দিকে তাকিয়ে যে অশান্তিটা সবচেয়ে বড় ক'রে চোখে পড়ছে আজ, সে হল চীনা আক্রমণ। অবর্ণনীয় এই বিশ্বাস-ঘাতকতার ধাক্কায় আমাদের অনেক দিনের সাজানো মূল্যবোধগুলি ভেঙে পড়েছে, নতুন ক'রে ঘর সাজিয়ে শত্রুর মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়েছি আমরা। স্বভাবতই এর ফলে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকারের জন্যে প্রস্তুত হ'তে হয়েছে আমাদের। এই প্রস্তুতি যতোই গুরুভার হোক, আমরা তা সানন্দে বহন করব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি।

এ দিক থেকে চীনা আক্রমণ যে ভয়ানক রকম ব্যর্থ হ'য়েছে তা দিবা-লোকের মতোই স্পষ্ট। গত বছরের বড় রকম দুর্যোগের এই মহত্তম অবদান হল আমাদের জাতীয় সংহতি এবং আত্মবিশ্বাস। ভারতবর্ষ আজ নিজের অধিকার এবং দায়িত্বের বিষয়ে যেভাবে সচেতন, তা যেকোনো জাতির পক্ষেই গৌরবের বিষয়।

কিন্তু সেই জনাই কতকগুলি ছোটো ছোটো দুর্গতির বিষয়ে আজ নতুন ক'রে ভাবতে হ'চ্ছে। অতীতে আমরা যখন সাজে-তামামী করতাম তখন সমা-লোচনার মধ্যে থাকত একটা প্রশ্রয়ের ভাব। অর্থাৎ ধরণটা হত এই রকম যে—বলছি বটে, কিন্তু দয়া করে এ-সব সীরিয়াসভাবে নেবেন না, নেহাৎই একটু বঙ্গ রসিকতার খাতিরে বলা এবং এ-সব না থাকলে যে বঙ্গ-রসিকতাও বন্ধ হ'য়ে যাবে সেটুকুও ভেবে দেখবেন।

এখন আমাদের আরো একটু নির্মম হওয়া দরকার। হিসাব-নিকাশের খাতিয়ানে গরমিলের ফাঁকগুলি কৈফিয়ৎ দিয়ে ভরাট না ক'রে জবাবদিহির জন্যে তৈরী হওয়া আবশ্যক। নাহলে ফুটো পাত্রে জল ঢেলে তৃষ্ণা মিটবে কী ক'রে?

সংহতির কথা আগে বলেছি। কিন্তু ভেবে দেখুন, এই কদিন আগে হিন্দীর প্রবক্তারা লোকসভায় যে কাণ্ড করলেন, সেটা কি জাতীয়-সংহতির অনুকূল। হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জুলুম যে নেহাৎ ভাষাপ্রেমের খাতিরেই জন্মলাভ করেনি, অহিন্দী-

ভাষীদের এ সন্দেহ যেন আরো ভালো ক'রে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারল এই ঘটনায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কথাটা নীতি হিসাবে আমরা সকলেই মেনে নিই বটে, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় সে ঐক্যবোধ বড়ই ঠুনকো। সামান্য একটু স্বার্থহানির আশংকা দেখা দিলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের চেয়েও অসংযত হয়ে পড়ে আমাদের ব্যবহার। এ রোগের প্রতিকার কী, তা আমি জানিনে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে এই বালখিল্য চিৎকারে কর্ণপাত করেননি, সে একটা শুভ লক্ষণ বটে।

এর পরে ধরুন ভেজালের কথা। আমি জানি, এ প্রসংগ উঠলেই এখন আমাদের হাই ওঠে। প্রকৃত প্রস্তাবে, মাছ যেমন জলের মধ্যেই জন্মলাভ করে, আমরাও তেমনি আজন্ম বাস করছি ভেজালের আবহাওয়াতেই। অথচ এতদিনেও সেটা গা-সওয়া হ'য়ে উঠল না। কয়েকদিন আগে ভেজালের বিষয়ে একটা বিবরণ বেরিয়েছে কর্তৃমহল থেকে। তাতে আক্ষেপ করা হয়েছে, আমাদের সমস্ত রকম আহার্য এবং ব্যবহার্য বস্তুতেই ভেজালের রাজত্ব চলছে দোর্দণ্ড প্রতাপে। এ বিবৃতি যে ঠিক কার উদ্দেশ্যে প্রচারিত বোঝা মুশকিল। যদি বলা যায় যে, জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন হোক, সেই জন্যেই প্রচারিত হয়েছে এই ভেজাল-মহিমা, তাহলে প্রশ্ন করা চলে যে সাধারণ মানুষ এ-সব তথ্য জানলে লাভ কী! অবিশ্যি সব সময়েই চক্ষুষ্মান-ভাবে থাকা ভালো একথা আমরা নীতিগতভাবে স্বীকার করি। কিন্তু মরতে যেখানে হবেই সেখানে চোখ বুজে মরা আর চোখ খুলে মরায় কি খুব একটা কিছু পার্থক্য থাকে?

যাঃ ভীষণ লজ্জা করছে........

কিম্বা এমনও হতে পারে যে, ভেজাল-তালিকা যাঁরা প্রকাশিত করেন তাঁরা হয়তো বলতে চান, ভেজালের কৌশল তাঁরা সবই হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন, অতএব ভেজাল-ব্যবসায়ীরা হুশিয়ার হোক। কিন্তু তার উত্তরে বলা যায় যে, ভেজাল দেওয়ার শাস্তি যেখানে নগণ্য, সেখানে ভেজালদাতারা যে অধিকতর সাবধানতার সংগে সে কারবারে আত্মনিয়োগ করে ভেজাল ধরার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে না তার নিশ্চয়তা কী?

আসলে ভেজালের উদ্দেশ্য কেবল বেআইনী অর্থোপার্জন হলেও ভেজালের পরিণতিতে যখন মানুষের প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটতে পারে, তখন অপরাধটাকে নরহত্যার পর্যায়ে ফেললেই শুধু এ অন্যায়ের কিছুটা নিরাকরণ করা সম্ভব। ঠিক যেমন ঘটে রাস্তায় ছোরা মেরে টাকা লুঠের সময়। এ ক্ষেত্রে কেবল টাকা লুঠের জন্যেই শাস্তি হয় না অপরাধীর, নরহত্যার দায়েও তাকে জবাবদিহি করতে হয়। ভেজালদানেরও সেই ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কারণ, মূলত ঘটনা দুটি একই জাতের। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রাহাজানির সময় আগে খুন করে পরে টাকা লুঠ করা হয়, ভেজাল খাদ্য আর ওষুধের বেলায় আগে টাকা লুঠ ক'রে পরে খুন করা হয়।

তৃতীয় আলোচ্য বিষয় মনে করা যাক, আমাদের পর্যায়ক্রমিক মোহনিদ্রা। আমরা যারা কলকাতা শহরে বাস করি তারা জানি যে কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি মহামারী প্রতি বছরই কী রকম আতংক সৃষ্টি করে এখানে। অথচ ভারতেরই অন্য কয়েকটি শহরে ব্যাপকভাবে ব্যবস্থার ফলে এ ধরণের সংক্রামক ব্যাধিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছে। কলকাতা বৃহত্তম নগরী হলেও এ ব্যাপারে তার স্থান পিছনের সারিতে। কেন? কৈফিয়ৎ অনেক আছে তা আমরা জানি—কৈফিয়তই তো শুনে আসছি বছর বছর—কাজেই মুখস্থ হয়ে গেছে সে সব। কিন্তু কথা হল, কারণগুলো যখন আগে থেকেই সব জানা, তখন তার প্রতিকার হয় না কেন?

হয় না তার কারণ, জোর একটা ধাক্কা খেলে আমরা যেমন জেগে উঠি, তেমনি সেই ধাক্কাটা মৃদু হয়ে এলে তার দোলায় কচি বাচ্চার মতোই ঘুমিয়ে পড়ি আবার। তাই টীকা, পানীয় জল, ইনজেকশান, পরিচ্ছন্ন শহর, ময়লাটানা লরী ইত্যাদি নিয়ে ক্ষণিক হৈ-চৈ এবং দীর্ঘস্থায়ী নিস্তব্ধতা—এইভাবেই চলে আসছে বছরের পর বছর, এ গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ কোনোটাই ঠিক ভগবান-নির্দিষ্ট ব্যাপার নয়। সবই মানুষের দ্বারা তৈরী এবং মনুষ্যানিয়ন্ত্রিত বিশৃংখলা। নাকি মানুষ আজ এতই শক্তিমান হয়ে উঠেছে যে, নিজেকেই সে নিজে আর ঠিক কনট্রোল করতে পারছে না? তা যদি হয় তবে সে বড় ভয়াবহ অবস্থা।

নববর্ষের শুরুতে তাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা, সীমান্তে চীনা শত্রুর সওয়াল নেওয়ার সংগে সংগে আমরা যেন নিজেদের মনের ভেতরও মনুষ্যত্ব-বিরোধী শত্রুতাগুলিকে নির্মূল করতে পারি।

বছর পাঁচেক আগের একটি দিনের কথা

আমার বাড়ীর পশ্চিমের ছোট্ট ছাদের ওপর পড়ন্ত সূর্যের মুখোমুখি আমি বসি রোজ বিকেল বেলায়। আমার সামনে অনেকগুলি টবে নানারঙের ফুল। আমি চেয়ে দেখি আকাশের রঙ ও ফুলের রঙ।

আমার সামনে অনেকগুলি নানা রঙের বুগানভিলিয়ার লতানে ফুলের গাছ। তারই পাশে ছোট্ট একটু ঝারির মত ঝুলিয়ে রাখা একটি টব থেকে নীচের দিকে যেন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দুতিনটি সরু ডাল আর আজ এই মধ্যচৈত্রের বসন্তদিনে ঐ ডালগুলির দুদিকে ফুটেছে বড় সুন্দর নতুন গড়নের ছোট্ট ছোট সাদা ফুল। অপরূপ সৌন্দর্য ঐ ছোট্ট সাদা ফুলগুলির। এগুলি এক জাতের অর্কিড। শুধু

অবনীনাথ মিত্র

বছরের এই সময়ে দশ বারো দিনের জন্য এই ফুল ফোটানর মেলা—তারপর সারা বছর আর নেই। ঐ ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে বসে আছি, আকাশে সূর্যাস্তের নানা রঙের ছড়াছড়ি। মনে পড়ে যাচ্ছে আজ থেকে প্রায় বছর পাঁচেক আগের একটি দিনের কথা।

একটু কাজে আমি ও আমার স্ত্রী গড়িয়ার দিকে গিয়েছিলাম। ফিরবার পথে বাঁশদ্রোণীতে একটি বিশেষ বাড়ীর দরজায় গিয়ে গাড়ী থামালাম। বাড়ীতে বোধ হয় কোন উৎসব, পরিপাটি উৎসব সজ্জা দেখে তাই মনে হল। গাড়ী থেকে নামব কিনা তাই ইতস্ততঃ করছিলাম। কিন্তু কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বসালেন একটি অপরূপ লতাকুঞ্জের মধ্যে। জানলাম গৃহস্বামীর ছেলের বিবাহ হয়েছে এবং সেদিনই বৌভাত।

কি মুস্কিল? খুব দিনেই এসে পড়েছি যা হোক। আর একবার চেষ্টা করলাম কোনমতে পালিয়ে আসা যায়

কিনা। কিন্তু গৃহস্বামী খবর পেয়ে এসে উপস্থিত। সেই পরিচিত দীর্ঘদেহ, সেই বহুদৃষ্ট হাসি মুখ, সেই পূর্বশ্রুত মার্জিত মিষ্ট কণ্ঠ।

কিন্তু এর আগে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি কখনও। আমি নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম—"আজ এই উৎসবের মাঝে এসে পড়ায় বিব্রত বোধ করছি। কিন্তু এদিকেই এসেছিলাম, মনে হল আমি যে আপনার অভিনয়ে কত মুগ্ধ তা স্বয়ং আপনাকে জানিয়ে যাই এবং অভিনন্দন করে দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

তিনি আমার কথা শুনে খুবই খুশী হয়ে উঠলেন। মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং হেসে তাঁর সেই অপূর্ব সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন—"আমার অভিনয় আপনাদের যে ভাল লাগে সেটাই আমার একমাত্র পুরস্কার ও সম্পদ।"

ছাড়া পাওয়া গেল না, মিষ্টিমুখ করতেও হল। এদিকে আমার স্ত্রী মুগ্ধ অন্য কারণে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সখ বাগানের। বিভিন্ন ফুলের রঙ রূপ গন্ধ ছাড়াও অন্য আরও অনেক খবর তাঁর নখদর্পণে থাকে। ফুল গাছের যত্ন তাঁর প্যাশন। তিনি মুগ্ধ গৃহস্বামীর বাগান দেখে। অচিরেই ফুল গাছের খবর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে নবপরিচয়ের দূরত্ব সম্পূর্ণ বিদূরিত হ'ল। ওঁরা দুজনে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল গাছ দেখে বেড়ালেন।

বিদায় নেবার আগে হঠাৎ চোখে পড়ল আমি যে লতাবিতানে বসেছিলাম সেখানে অন্য লতার ফাঁকে কয়েকটি সরু ডালে ছোট ছোট সুন্দর ছোট ফুল ফুটে নীচের দিকে ঝুলে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথা থেকে পেলেন এমন সুন্দর অর্কিড?"

তিনি বললেন—"ওটা পাওয়ার এক গল্প শুনুন। একবার ঘাটশিলা থেকে ফিরছিলাম। পথে হঠাৎ চোখে পড়ল একটি বাগানের মধ্যে আম গাছের গা থেকে ঝুলছে পরগাছার ডাল আর তাতে ঐ সুন্দর সাদা ফুল। গাড়ী থামাতে বলে ড্রাইভারকে খোঁজ নিতে বললাম বাগানে কেউ আছে কিনা। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও কাউকে পাওয়া গেল না। তখন বিনা অনুমতিতে ড্রাইভারকে গাছে চড়িয়ে ঐ অর্কিডের কয়েকটি ফুলসুদ্ধ ডাল সংগ্রহ করলাম। যদিও সংগ্রহ কাজটা প্রায় চোরাবৃত্তির পর্যায়ে পড়বে বলেই আমার ধারণা তথাপি এত সুন্দর ফুল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে তা আমার সহ্য হল না। তাই অনেক যত্ন করে আমি ওদের এখানে বাঁচিয়েছি, ওতে বছরে একবার করে ফুল ফোটে।"

আমার স্ত্রীকে সেই সুন্দর ফুলগুলির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—"আপনি যদি চান আপনাকে একটা অর্কিড আমি দিতে পারি।" আমার স্ত্রী ত তাই মনে মনে চাচ্ছিলেন। অর্কিডটি পেয়ে আমরা খুবই খুশী হলাম।

সেই অর্কিডের ডাল দুটি আমার ছাদের বাগানের টবে একটি Dwarf ত্রিশ বৎসরের নিম গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর প্রতি বৎসর এই সময়ে ওতে ফুল ফুটছে। যখনই ফুল ফুটেছে আমি টেলিফোন করে তাঁকে জানিয়েছি "মশাই, আপনার অর্কিডে ফুল ফুটেছে।" শুনে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।

এ বছরও ওতে ফুল ফুটেছে। টেলিফোন আছে। কিন্তু টেলিফোনে খবর নেবার লোকটি—"ছবি বিশ্বাস" আজ আর নেই।
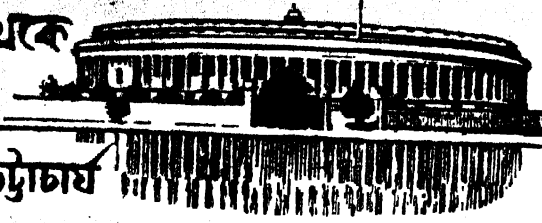
রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। কোন একটা জরুরী খবরের কনফারমেশনের জন্য শাস্ত্রীজির বাড়ীতে অপেক্ষা করছি। ঘরের ভিতরে মধ্যপ্রদেশের চীফ মিনিস্টার মান্দোলি আর বাইরে প্রতাপ সিং কায়রণ এবং আরো দু'একজন হোম মিনিস্টারের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁবুতে বসে নির্বিবাদে পান-সিগরেট উড়িয়ে চলেছি। শাস্ত্রীজির পার্সোনাল স্টাফের কেউ দৌড়াদৌড়ি করছেন, কেউ টাইপ করছেন আর কেউবা দু'কানে তিনটে টেলিফোনে কথা বলছেন। কিন্তু তারই মাঝে আমরা এক-ছটাক আধ-ছটাক আড্ডাও মারছি।

হঠাৎ ললাটে লাল আলো জ্বালিয়ে একটা বিরাট গাড়ী এলো। সিকিউরিটি-ম্যান ও চাপরাশীরা বুঝল রাষ্ট্রপতি ভবনের গাড়ী চড়ে কোন ভি-আই-পি এলেন। তারা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। হাসি মুখে ছড়ি হাতে বেরিয়ে এলেন একজন বয়স্ক লোক। পরনে বেশ দামী প্যান্ট ও বাটনড্-আপ কোট। বলা-বাহুল্য মাথায় ছিল গান্ধী ক্যাপ্। কর্মব্যস্ত পি-এ'র দল হাতের কাজ ফেলে উঠে যেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার আগেই ভদ্রলোক তাঁবুতে এসে গেলেন। কিছু না বলে একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে বসে পড়লেন।

—আরে মহারাজ সাহাব, কিয়া হাল হ্যায়? সিমলায় সব খবর ভাল?

শাস্ত্রীজির পার্সোনাল এ্যাসিস্-টেন্টের প্রশ্নোত্তরে মহারাজ সাহাব জানালেন, খবর ভালই। সৌজন্য প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের খবর ভাল তো?

মহারাজ সাহেবকে ভিতরে যেয়ে সোফায় বসতে অনুরোধ জানান হলো। কিন্তু কেন জানি না তিনি পি-এ'দের মধ্যে ছেঁড়া তাঁবুতে আমার পাশেই বসে রইলেন। বল্লেন, ওখানে যেয়ে কি করব, এখানেই বেশ আছি।

কিছুক্ষণ বাদে মান্দোলিকে বিদায় ও কায়রণকে ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য বেরিয়ে এলেন শাস্ত্রীজি। মহারাজ সাহাব ছড়ি ভর্ দিয়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই শাস্ত্রীজির নজর পড়ল। দুজনেই দুজনের দিকে এগিয়ে এলেন। 'কার্টেসি এক্সচেঞ্জে'র পর দুজনের মধ্যে কথা হলো মিনিট কয়েক। কায়রণকে নিয়ে শাস্ত্রীজি ভিতরে গেলেন; মহারাজ সাহাবও লাল আলো (বাতি নয়) জ্বালিয়ে নাম্বার প্লেটবিহীন 'সত্যমেব জয়তে' মার্কা গাড়ীতে বিদায় নিলেন।

মহারাজ সাহেবের মুখখানা চেনা চেনা মনে হলেও, পরিচয়টা ঠিক মনে পড়ছিল না। পাশ ফিরে শাস্ত্রীজির এক পি-এ'কে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁ ভাই, ভদ্রলোককে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

—আরে মহারাজ সাহাব আমাদের হিমাচল প্রদেশের লেফ্‌ন্যান্ট গভর্ণর।

......গভর্ণরদের তিনটে পাইলট হাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করতেই আমরা দেখি। আমার মত বিত্তহীন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের দল শুধু হাঁ করে চেয়ে থাকি। হেড্ এ্যাসিস্টেন্টের চরণে তৈল-মর্দন আর হুজুর-বারোশ'র আণ্ডার সেক্রেটারীদের দেবতাজ্ঞান করে যাঁদের জীবন কাটে, তাঁরা শুনে সুখী হবেন যে, লাটসাহেবদেরও অন্ততঃ দু'একটা জায়গায় হেঁ হেঁ করতে হয়।

আর একটি ঘটনা বলছি। তখন পন্থজী বেঁচে। কেরলায় সেন্ট্রাল ইন্টারভেনশনের পর মিড-টার্ম ইলেকশন হবে। ইলেকশনের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় পন্থজীর বাড়ীতে তাঁর পার্সো-নাল সেক্রেটারী জানকীর ঘরে বসে আছি। হঠাৎ ট্রাংকল। স্পীক্ অন টু ত্রিভ্যানড্রাম্।

—হ্যাঁ সাব, কিয়া হাল হ্যায়? জানকী চীৎকার করলো। আবার বল্লো, হোল্ড অন, জিজ্ঞাসা করে বলছি।

টেলিফোন রেখে জানকী পন্থজীর কাছ থেকে ঘুরে এলো। টেলিফোন তুলে নিয়ে বল্লো, ভীষণ কাজে ব্যস্ত, টেলিফোনে কথা বলার সময় নেই। কি বলতে চান বলুন, আমি বলে আসছি।

আবার কি যেন শুনে জানকী ভিতরে গেল। ফিরে এসে বল্লো, উনি বল্লেন আপনার দিল্লী আসার দরকার নেই। ইলেকশনের রেজাল্ট তো সংগে সংগেই এখানে জানা যাবে। যদি আপনাকে দরকার হয়, তবে পরে জানান হবে।

ট্রাংকল শেষ হলো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, কেরালা গভর্ণর হিজ একসেলেন্সী ডক্টর বি রামকৃষ্ণ রাও টেলিফোন করছিলেন।

হা ভগবান! হোম মিনিস্টারের সংগে একটু সরাসরি কথাও বলতে পারলেন না!
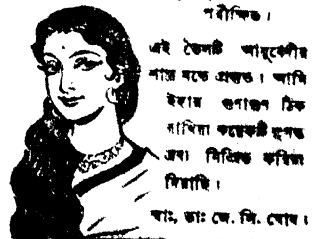
সাহিত্য আকাদমী ও ভারতীয় সাহিত্য

জওহরলাল নেহরু

সাহিত্য আকাদমী প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে গত সাত আট বছরে, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায় স্বাধীনতা-লাভের পর থেকে ভারতীয় ভাষাসমূহের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটেছে। পরিমাণ ও উৎকর্ষ উভয় দিক থেকেই তা উল্লেখযোগ্য। এ লক্ষণ শুভ।

ভারতের সকল ভাষার সঙ্গেই সাহিত্য আকাদমী সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক ভাষার উন্নতিসাধনই তার কাম্য। সকল ভাষার একীকরণ করে নয়, এক ভাষার সাহিত্যসম্ভার অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে পরস্পরের মধ্যে একটা হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার জন্য আকাদমী অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছে।

আমাদের দেশের অনেকগুলি ভাষাই সুপ্রাচীন। অনেক ভাষায় এমন কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ আছে সেগুলি কয়েক শতাব্দী পূর্বে লিখিত। আমাদের জনমানসের উপর তাদের প্রভাবও অপরিসীম।

প্রথম যুগে সংস্কৃতের অসাধারণ প্রতিপত্তি থাকায় এবং পরবর্তী যুগে পারসিকের বহুল প্রচলন থাকায় অনেকগুলি ভাষারই সমৃদ্ধি ঘটেনি বা ঘটতে দেওয়া হয়নি। সেকালের পণ্ডিতেরা মনে করতেন সংস্কৃত বা (পরবর্তীকালে) পারসিকে কৃতিত্ব প্রকাশ করাই বিজ্ঞের কাজ। তাই আমাদের ভাষাগুলি প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্ত্বেও তার উন্নতি ঘটেনি।

যথার্থ বিচার করলে দেখা যাবে, ১০০ কি ১২০ বৎসর পূর্বে ভারতীয় ভাষাগুলির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। তখন ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে যে সব নতুন নতুন আদর্শের ঢেউ এসে পৌঁছায় স্বভাবতই আমাদের সাহিত্য তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবশ্য অন্যান্য ভাষার মাধ্যমেও সে-ঢেউ এসেছিল। এইসব ভাষার আধুনিক সাহিত্য আধুনিক সমাজ ও আধুনিক সমস্যার দ্বারা প্রভাবিত। এবং সেটাই হওয়া উচিত।

এই সমস্যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে: ব্রিটিশ আমলে ইংরিজি ছিল মোটামুটিভাবে সরকারী ভাষা। আমাদের দেশের বহুলোক ইংরিজি ভাষার সংশ্রবে আসে। ইংরিজি ভাষার প্রচলন তখন এক দিক দিয়ে ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। সে যুগে নতুন বিশ্বের নতুন চিন্তাধারার বাহন ছিল ইংরিজি। এই ভাষার মাধ্যমে যে নতুন চিন্তাধারার ঢেউ এসে পৌঁছায় তাতে ভারতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধিই ঘটে।

ভারতীয় ভাষাগুলি এখন বেশ শক্তিশালী এবং কার্যোপযোগী। বিভিন্ন ভাষায় বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। তার অনেকগুলিই মূল্যবান। এদের ক্রমোন্নতি যে অব্যাহত থাকবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক ভাষা অপর ভাষাকে খর্ব করতে উদ্যত হয়েছে এমন মনে করা ভুল। পারস্পরিক আদানপ্রদানে ভাষার সমৃদ্ধিই ঘটে। এক ভাষা অপর ভাষার যত ঘনিষ্ট সংশ্রবে আসবে সাহিত্য ততই সম্পদশালী হবে। সাহিত্য আকাদমীর কাজ হল এই ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে বিদেশী ভাষার চিরায়ত সাহিত্যের অনুবাদ করে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাঁরা চালিয়ে যাবেন।

সমগ্র বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে ব্যক্তি যেমন বাঁচে না, ভাষাও তেমনি টিকে থাকতে পারে না। ভাষা যতই সুন্দর হোক ক্রমান্বয়ে তার বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য নিঃশেষ হয়ে আসে। পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে। তাই আমাদের দেশের লেখকদেরও আমাদের নিজস্ব ভাষা বা অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করে চলতে হবে। সাহিত্য আকাদমী বিদেশী সাহিত্য অনুবাদের কাজেও হাত দিয়েছেন।

বিদেশে ভাষা-রূপান্তরের এক নতুন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞান ক্রমেই অধিকতর প্রতীকের সাহায্যে লেখা হচ্ছে। যে কোনও উচ্চাঙ্গ গণিতের গ্রন্থে দেখবেন তার শতকরা ৭৫ ভাগই প্রতীক-চিহ্ন, মাঝে মাঝে কয়েকটি করে বাক্য। কাজেই এখন যে নতুন ভাষা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে প্রতীকী ভাষা বলা যায়। এই সব প্রতীক যে কোনও ভাষায় ব্যবহার করা সম্ভব। নতুন ভাষা-রীতি কিভাবে সমগ্র রচনা-শৈলীর বৈচিত্র্য সাধন করে, কিভাবে সাহিত্যসৃষ্টির সহায়তা করে তা আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করব। কিন্তু এই বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যার যুগে প্রতীকী ভাষাকে স্থান ছেড়ে দিতেই হবে, আর এই প্রতীকী-ভাষা হবে সকল ভাষায় সমান গ্রাহ্য। উল্লেখযোগ্য যে এইভাবেই শুরু হবে সাহিত্যে বর্তমান যুগ-ধারার স্বীকৃতি।

আমার নিজের ধারণা, সাহিত্য আকাদমী সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহদানে এবং বিভিন্ন ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের একত্র আনয়নে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছেন। এতে শুধু যে ভারতের বৈচিত্র্য আরও বাড়বে তা নয় ভারতের ঐতিহ্যগত মৌলিক ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে। যাঁরা মনে করেন, একমাত্র বৈচিত্র্যের অবসান ঘটিয়েই ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব, আমার ধারণা, তাঁরা ভুল করেন। অপরদিকে যাঁরা মনে করেন বৈচিত্র্যের অর্থ স্বাতন্ত্র, ঐক্যের বিখণ্ডীকরণ তাঁরাও ভুল করেন। কারণ দেশের পক্ষে সর্বদিক থেকেই এটা মারাত্মক।

(গত ৩১-এ মার্চ নয়াদিল্লীতে সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কারবিতরণ-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।)

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প
(রিও-ডি-জেনিরিও : ব্রেজিল)

এক বোতল কাশাকা

আলফোনসো মার্তিনেল্লি

সারা বিকেল তুমুল বৃষ্টি পড়েছিল রিও-ডি-জেনেরিও-তে। থমটা হয়েছিল সেই রাতেই এবং তখনও জলের দাগ বুকে নিয়ে চিক্‌চিক্‌ করছিল গোটা শহরটা। বেলাভূমি বরাবর অন্তহীন আলোর মালাটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নিস্তরঙ্গ শান্ত জলরাশির কালো কুচকুচে পটভূমিকায়। বন্দর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছিল আরও একটা আলোর রেখা। আঁকাবাঁকা পথে না গিয়ে রেখাটা সিধে চলে গিয়েছিল শহরের বুক পর্যন্ত। আলোর ধারায় ঝকমক করছিল রাস্তাগুলো। কাদাজল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছুটে চলেছিল বড় বড় সব গাড়ী।

সুন্দর সুন্দর হোটেল, কারুকাজকরা বড় বড় বাড়ী আর কাঁচের দেওয়ালওলা প্রকোষ্ঠগুলোর খোলা জানলায় পাওয়া যাচ্ছিল আনন্দের উষ্ণতা; হালকা হাসির ঠুন্‌কো আওয়াজ, ম্যারিমবা আর ম্যারাকাস-এর শব্দ, বেহালার তারে উত্থিত সংগীত আর কক্‌টেল গেলাসের রিনিঝিনি আওয়াজ—সবই ভেসে আসছিল বাতায়নপথে। এ সময়ে এই রকমটি শোনাই তো স্বাভাবিক। স্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ সুপ্তিভঙ্গ হওয়ায় জেগে উঠছিল সারা শহরটা। নর এবং নারী, চটপটে তাদের প্রকৃতি, বিপুল তাদের অর্থ—প্রত্যেকেই এই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যেন আর একবার উপলব্ধি করছিল আনন্দের প্রতি, ফুর্তির প্রতি তাদের আতীব্র আকর্ষণ। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মতই তীব্র সে অনুভূতি।

শ্যাম্পেনের বুদ্‌বুদ্‌ আর মহার্ঘ সুগন্ধির বায়ুবহ সৌরভের আবেশে আবিষ্ট কেউই সে রাতে ক্ষণেকের জন্যেও ভাবেনি অপরূপ সুন্দর কোপাকাবানা বালুকাবেলার কাছাকাছি পাহাড়ের সানু-দেশের নিরানন্দ কুঁড়েঘরের শহরটির কথা। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে আসছিল না; মাঝে মাঝে এই নিরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে জেগেছিল কয়েকটা শুধু

আলোয় কম্পমান বিন্দু—মোমবাতির শিখা। আর ছিল নিস্তব্ধতা। শুধু শোনা যাচ্ছিল টুপ টুপ জল পড়ার আওয়াজ—মর্চেধরা টিনের চাল থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরে পড়ছিল ধরিত্রীর বুকে। এছাড়া সবকিছুই হারিয়ে গিয়েছিল নৈঃশব্দের অতলে।

আচম্বিতে একটা কুঁড়েঘর থেকে ভেসে এল রুদ্ধ চাপা কণ্ঠস্বর এবং পরক্ষণেই একটা আর্ত চীৎকার। আর তারপরেই সব চুপ। অসহ্য থমথমে নীরবতা। কুঁড়েঘরের ভেতরকার মোম-বাতিগুলো নিভে গেল একে একে। এক মুহূর্ত পরেই সুট করে একটা মূর্তি বেরিয়ে এল ভেতর থেকে—চটপট পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। নিম্নমানের জীবনধারা প্রবাহিত সমাজের এই দরিদ্র অংশটিতে কেউই কারও খবর রাখতো না এবং এখানে খুন-জখম ছিল নেহাতই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেকাজেই পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল রোগা একহারা মেয়েটির লাশ। এবং তারপরেই খবর চলে গেল পুলিশের দপ্তরে।

যে কুঁড়ের নীচে খুনটি হয়েছে, বিস্তর লোক তার চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সবার আগে আমার চোখে পড়ল কয়েকটা ছেঁড়া পোশাক-পরা ছেলেমেয়ে। বাচ্চাগুলো এদিক-সেদিক দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। জনতার এই জমাট প্রাচীর নড়ায় কার সাধ্য। শেষকালে যখন চীৎকার করে উঠলাম : "পুলিশকে এগোতে দাও," তখনই চটপট পথ করে দিলে ওরা এবং কয়েকজনকে টুক করে সরে পড়তেও দেখলাম। কারণটা আমার অজানা নয়। সম্প্রতি এ অঞ্চলে পর পর কয়েকটা চুরি হয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে পুলিশকে যতখানি মাথা ঘামাতে হয়েছে, তার চেয়েও যে বেশীমাত্রায় তৎপর হতে হবে এ কেস নিয়ে—তা ওদের কারোরই জানতে বাকী নেই।

সিগারেটের প্রান্তভাগ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো মহাবাগ্‌বিতণ্ডা জুড়েছে......

ঠেলেঠুলে এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। টানের চোটে খুলে গেল কোটের সামনের বোতাম। পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে অতখানি ওঠার ফলে রীতিমত ঘেমেও গিয়েছিলাম। তাই মুছে নিলাম কপালের ঘাম। এতখানি হেঁটে আসার ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নোংরা পরি-বেশের মধ্যে এসে পড়ে একটু মুষড়েও পড়েছিলাম। কিন্তু খুন যখন হয়েছে, তখন খুনীকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

আধপোড়া সিগারেটটার দিকে একবার তাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। তারপরেই মাথা নীচু করতে হলো একটা নীচু বরগার আক্রমণ থেকে মাথা সামলানোর জন্যে। নোংরা, নীচু কুঁড়েঘরটার অন্ধকারের মধ্যে থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বরগাটা।

শুনতে পেলাম, বাইরে সিগারেটটার প্রান্তভাগ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলো মহা-বাগ্‌বিতণ্ডা জুড়েছে এবং হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে। রিও ফোর্সে আঠারো বছর রয়েছি আমি পুলিশ চীফ-এর পদে। কাজেকাজেই রুগীকে পরীক্ষা করার সময়ে ডাক্তারের মনে যে ধরণের আগ্রহের সঞ্চার হয়, ঠিক সেই ধরণের পুলিশ চীফ সুলভ আগ্রহ দুই চোখে নিয়ে তাকালাম ঘরটার চারপাশে। এর আগেও এ রকম ধরণের কয়েক শো চালাঘরে হানা দিতে হয়েছিল আমাকে। সে সবের থেকে কোনও প্রভেদ দেখতে পেলাম না এ ঘরটায়। একই রকমের নড়বড়ে আসবাবপত্র, হাড়জিরজিরে টেবিল, গোটা দুই ঝপ-করে-ভেঙে-পড়া চেয়ার, এবং এক কোণে রাশীকৃত নোংরা কম্বল। সূর্যকিরণের প্রসাদবঞ্চিত হওয়ায় একই রকমের উৎকট গন্ধ আর মেঝের ওপর ধুলোর পুরু স্তর। কুঁড়ে-ঘরের এই শহরে সবকটা চালাঘরেই যেমনটি দেখতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ টিনের চাদর আর ধাতুর প্যানেল দিয়ে তৈরী বাঁধা-ছক দেওয়াল আর ছাদ—এ ঘরের বৈশিষ্ট্যও দেখলাম তাই। হরেক রকমের এই জিনিসগুলো অবশ্য সবই চোরাই মাল—এক সময়ে যা ব্যবহৃত হতো বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড হিসেবে।

সেদিন সকালে অন্যান্য সবকটা চালাঘর থেকে এই ঘরটিকে একেবারে আলাদা করে ফেলেছিল যে জিনিসটি, তা হলো একটা দেহ। মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়েছিল দেহটা। স্ত্রীলোকের লাশ। মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল সে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

ঝুঁকে পড়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলাম ওর দেহ। এক সময়ে সুন্দরী ছিল সে। কিন্তু এখন যার মুখের দিকে তাকালাম, তাকে মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বহু বছর ধরে জীবনকে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার নিদর্শন ফুটে-ছিল তার নিষ্প্রাণ মুখের পরতে পরতে।

আপনার
বাড়িতে
প্রয়োজন সবার সেরা
উৎকর্ষ এবং নিখুঁত কারিগরীর জন্য পৃথিবীর চল্লিশটি দেশের লক্ষ লক্ষ লোক উষা পাখাই পছন্দ করেন।
বিশ্বের বৃহত্তম পাখা তৈরীর কারখানায় দক্ষ কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত উষা পাখাই ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়।
পাখা কেনার সময় আপনি নিশ্চিন্ত মনে উষা কিনতে পারেন—উষাই আজকালকার সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা।
দীর্ঘদিন স্বচ্ছন্দে চলবার জন্য সমস্ত সিলিং ফ্যানই ডবল বল-বিয়ারিং যুক্ত।
উষা পাখা
জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১
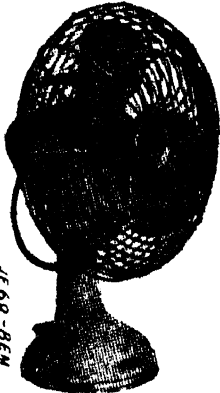
বলিরেখা গভীর হয়ে বসে গিয়েছিল তার চামড়ায়। বিস্রস্ত কাঁচাপাকা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো বিস্ফারিত চোখের ওপর। জবরদস্তির কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না কোথাও। অথচ সমস্ত চালাঘরটা আর্তস্বরে বলতে চাইছিল—"খুন! খুন!"

নতজানু হয়ে বসেছিলাম এতক্ষণ। এবার উঠে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল যারা, তাকালাম তাদের দিকে। ভিড়ের মধ্যে যে সব মুখ আমি দেখতে পেলাম, বহুদিন ধরে তাদের খোঁজ করছিল আমাদের দপ্তর। কিন্তু এখন সে সময় নয়। পরে এদের নিয়ে পড়া যাবে'খন।

প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। বেশী প্রশ্ন নয়। কেননা আমি জানতাম এদের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য আমি পাবো না। আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা—এই দুইয়ের তাড়নায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে ওরা; কেউই চায় না অপরকে ফাঁসিয়ে দিতে। তাছাড়া, পাশের চালাঘরের লোক কতটা খবর রাখে, তা তো কেউই জানে না। ওরা নাকি কাউকেই দেখেনি এবং অস্বাভাবিক কিছু শোনেও নি। কিছু দেখলে বা শুনতে পেলে তখুনি পুলিশকে না জানিয়ে কি তারা বসে থাকে হাত-পা গুটিয়ে?

মনে মনেই বলি—"তাই বটে! আইনকে অক্ষরে অক্ষরে তোমরা মেনে চলো কিনা! পুলিশকে সাহায্য করতেও কসুর করো না। কিন্তু তবুও যদিও বা কোনদিন পাকড়াও করতে পারি খুনীকে—জানি তোমাদের এককণা সাহায্যও থাকবে না তার মধ্যে।"

ভিড়ের সামনে এগিয়ে গিয়ে এমনই একটা প্রশ্ন করলাম যার উত্তরে সত্য না বললেই নয়।

জিজ্ঞেস করলাম— "নিহত স্ত্রীলোকটি কে?"

একজন উত্তর দিলে—"এলসা।"

"পুরো নাম কি?"

"পুরো নাম কোনদিনই আমাদের বলেনি ও।"

"পেট চলতো কি করে?"

"ভিক্ষে করে।"

"আর কোন পথে টাকা রোজগার করতো কি?"

"আমরা অন্তত জানি না।"

"বিয়ে করেছে?"

"যদিও বা করে থাকে, কোনদিন দেখিনি ওর স্বামীকে।"

"ওর সঙ্গে আর কেউ থাকত এখানে?"

"দেখিনি কোনদিন।"

"তোমাদের মধ্যে আর কেউ কিছু জানে কি?"

'সিনর মার্টিনেলি, আপনি তো জানেনই এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানলে কতখানি খুশী হতাম আমরা।'

সেই একঘেয়ে পুরোনো গপ্প। পেছন ফিরে আবার গেলাম চালাঘরটার ভেতরে। ওদের কাছ থেকে আর কোন খবর জানার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত, বেশী কিছু জানেও না ওরা। খুন-খারাপী করাটা চালাঘরবাসীদের আওতার মধ্যে পড়লেও জিনিসটা ওরা ফ্যামিলির চৌহদ্দির বাইরে সরিয়ে রাখাই পছন্দ করে।

পুলিশের ডাক্তার জানত নিছক পয়েন্ট নিয়ে লেখা খুব সংক্ষিপ্ত রিপোর্টই পছন্দ করি আমি! ফিরে এসে দেখি লাশ পরীক্ষাপর্ব সাঙ্গ করে ফেলেছে সে। আমাকে দেখেই বললে—"মাথায় চোট লেগেছিল। খুলি চুরমার হয়ে গেছে। মারা গেছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স মেয়েটার। পুষ্টিকর খাবার না খেতে পাওয়ার চেহারা হয়েছে অস্থিসার। ঘণ্টা দশেক হলো মারা গেছে।"

তার মানে দাঁড়াচ্ছে—এই যে গত রাতে দশটা নাগাদ খুন হয়েছে এলসা। ঠিক এই সময়টায় স্ত্রীকে নিয়ে আমি বাড়ীর কাছাকাছি একটা সিনেমা হাউসে মিকিমাউজ-এর ছবি দেখতে দেখতে মনের আনন্দে হাসছিলাম। আবার ঠিক এই সময়টাতেই কোপাকাবানায় শুরু হয়েছিল প্রথম ফ্লোর-শো এবং ঝলমলে আলোয়, আনন্দে, ফূর্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রিও-র একটা অংশ।

ডাক্তারকে শুধোলাম—"এই কি সব? আর কিছু নেই?"

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে যায় ডাক্তার দরজার কাছে। বলে—"আর একটা খবর। আকণ্ঠ মদ গিলেছিল মেয়েটা।"

"মদ গিলেছিল!" চিন্তার আনাগোনা শুরু হয় মস্তিষ্কের কোষগুলোয়। "ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। পয়সার লোভে নিশ্চয় এ কাজ কেউ করেনি। কেননা, পকেট হাতড়ে কয়েকটা ক্রুজেরোজও পাওয়া গেল না। তাছাড়া, নিজের পয়সায় সাধারণত কেউ মদ্য পান করে না। আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক কি পাওয়া যায় আশপাশে।"

আর একবার তল্লাসি চালিয়ে নতুন তথ্য বলতে বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না শুধু একটা খালি বোতল ছাড়া। মেঝের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছিল বোতলটা। তর্জনীটা বোতলের মুখে আঁকশির মত আটকে দিয়ে তুলে ধরলাম নাকের কাছে। তখনও কাশাকার বিশ্রী অস্বস্তিকর গন্ধ পাচ্ছিলাম বোতলের মধ্যে। কাশাকা এক রকমের সস্তা মদ। আখ থেকে এখানকার লোকেরা চোলাই করে নেয় কাশাকা। বিশেষ করে এই কাশাকাটি যে সবচেয়ে সস্তা আর সবচেয়ে মারাত্মক, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। সামান্য কয়েকটা ক্রুজিরোজ-এর বিনিময়ে ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিতে পারে তা যত কিছু যন্ত্রণা, চিন্তা-উদ্বেগ-ক্লেশ।

সন্তর্পণে বোতলটাকে কাগজ দিয়ে মুড়ে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিলাম চারধারে। তারপর অ্যাসিস্ট্যান্টদের ডেকে হুকুম দিলাম লাশটাকে স্ট্রেচারে করে অ্যামবুলেন্সে তুলে দিতে। পাহাড়ের পাশেই দাঁড়িয়েছিল অ্যামবুলেন্স।

ভিড় ঠেলে এগুচ্ছি, আস্তে আস্তে পা ফেলে নেমে আসছি ঢালু পথ বেয়ে, এমন সময়ে শ্লেষতীক্ষ্ণ সুরে কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল—"গুড মর্নিং, সিনর মার্টিনেলি।"

কণ্ঠস্বরের অধিকারী যদি জানত যে আমার দুজন সহকারী ঐদিনই আবার ফিরে আসবে শহরে—হোল্ড-আপ চার্জের বলে তাকে গ্রেপ্তার করতে—তাহলে এতখানি চ্যাংড়ামি করতে সে যেত না।

• • •

এ ধরণের খুনের তদন্তের একটা বিরাট অংশই হচ্ছে নিরানন্দ কর্মসূচীর একঘেয়েমি। পুলিশ হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসার পরেই শুরু হলো এই চক্রবৎ কর্মসূচীর পুনরাবর্তন।

লাশটা আনার পর আঙুলের ছাপ নিয়ে শনাক্ত করা হয়েছিল। এলসা কোরেলহোর বয়স সাতচল্লিশ। রেসিফ

শহরের উত্তরাঞ্চলে তার আদি নিবাস। বহু বছর ধরে ভিক্ষুক-বৃত্তি আর যাযাবর-বৃত্তির অভিযোগের রেকর্ড পাওয়া গেল এলসার। তার সর্বশেষ জেলখাটার মেয়াদ ছিল দশ দিনের এবং সে মেয়াদ শেষ হয়েছে তার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে।

কাপাকা বোতলের ল্যাবোরেটরী রিপোর্ট তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আঙুলের ছাপ মৃত মেয়েটারই। নীল কাঁচের সরু হয়ে ওঠা ঘাড়ের কাছে একটা ধ্যাবড়া তালুর ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যস, আর কিছু না।

বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম তালুর ছাপটার দিকে। হৃদয়-রেখা আর আয়ু-রেখাদুটো নিবিড় হয়ে নেমে এসেছিল বোতলের তলার দিকে। একটু আবেগের সঞ্চার হয় আমার মনে। ভাবি, হাতের এই রেখা দেখে কোনও হস্ত-রেখাবিদ্ কি বলতে পারত আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল এলসার জলাটলিপি? কিন্তু দিবাস্বপ্নের অথবা অনুধ্যান করার সময় এটা নয়।

ভাবলাম, "কি করা যায় এবার? আচ্ছা, এলসার তো পেশা ছিল ভিক্ষে করা। পৃথিবীর যে কোন বড় শহরে আছে এই বিপুল অথচ একান্ত ঘনিষ্ঠ সমাজটার উৎপাত। আমার সুযোগ খুবই ক্ষীণ : সম পেশার কাউকে পাকড়াও করে আলাপ করা ছাড়া আপাতত আর কোন উপায় আমি দেখি না।"

• • •

নগরবাসী ভিখিরীরা সাধারণত নামজাদা শ্রেণীর বদমাস হয়। খুনোখুনি করা এদের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, নিজের পেশার কেউ যে খুন হয়, এটাও কেউ চায় না।

ল্যাটিন ভিখিরী জানে খুনেরা অনায়াসেই খুন করতে পারে তাকে। কেননা, দু-একটা ভিখিরীকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় সাধারণত সমাজের নেই। কাজেকাজেই এলসার সহকর্মীরা যখন দেখলে যে ওর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করার সমস্যা নিয়ে বেজায় দুশ্চিন্তায় পড়েছি আমি এবং এমনভাবে সেই খুনেটার সন্ধান করছি যেন একটা নামকরা লোককে খুন করে বসেছে সে, তখন ওরা আমায় সাহায্য করতে শুরু করল। ওদের কথার মধ্যে থেকেই এল আমার অভীপ্সিত সাহায্য। এলসা সম্বন্ধে যা কিছু জানত, সব বলল ওরা। এক সময়ে একটা রাঞ্চের পরিচারিকা ছিল সে। তখন তার যৌবন ছিল, রূপ ছিল। তারপর তাকে ব্যভিচারের পথে নামিয়ে আনে রাঞ্চের মালিকের ছেলে এবং বাসনা পরিতৃপ্তির পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় ভাঙাচোরা লোহার টুকরোর একটা স্তূপের ওপর।

বন্ধুবান্ধব? প্রত্যেকেই ভালবাসত ওকে। বিশেষ কোন বন্ধু? আর্নেস্টো নামে একটা ভিখিরীর সঙ্গে কিছুদিন একসাথে ছিল এলসা। কিন্তু পরে ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ভিখিরীদের মধ্যে ভালবাসা, ধ্যাবড়া চালাঘরের ভেতরে মদের ঝোঁকে কোঁদল, মাথার ওপর আচম্বিতে চোট.....হুঁ, এই ভাবেই হয়তো ঘটেছে ব্যাপারটা।

কিন্তু আর্নেস্টো কোথায়? ভিখিরীরা তা জানে না। গত দিনদুয়েক ওকে দেখা যায়নি। কিন্তু সে নাকি রিও-র "ব্রডওয়ে" সিনেলান্ডিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এর থিয়েটারের ভিড়ে "কাজ" করতো।

একজন ভিখিরী আমার সঙ্গে ফিরে এল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। জুয়াচোর বদমাসদের গ্যালারীতে আর্নেস্টোর ফোটোগ্রাফ দেখেই চিনতে পারল সে। সঙ্গে সঙ্গে হুলিয়া বেরিয়ে গেল তাকে গ্রেপ্তার করে আনার। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার তাকে। আর, তারপরেই শুরু হলো আমাদের ডিপার্টমেন্টের সেই কাজটি, যে কাজ সব গোয়েন্দাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে এবং তা হচ্ছে প্রতীক্ষা—নিছক প্রতীক্ষা।

• • •

তিনদিন পরে নিয়ে আসা হলো আর্নেস্টোকে।

ওর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখের কোণাগুলো লাল, আর নোংরা চেহারার সঙ্গে পুলিশের ফটোগ্রাফের সাদৃশ্য বার করাই মহামুশ্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। জেলখানার মধ্যে দাড়ি-গোঁফ কামানোর পর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার পর তোলা হয়েছিল ফোটোগ্রাফটি। শনাক্তকরণে একটু প্রাথমিক অসুবিধা দেখা গেলেও লোকটা আর্নেস্টোই বটে।

মানুষটি ছোটখাটো, কৃশকায়। নার্ভাস চোখে মিট মিট করে ও বার বার তাকাতে লাগল আমার পালিশকরা টেবিল আর অফিসের পুরোনো দেওয়ালের দিকে।

"মেয়েটাকে চেনো?" টেবিলের

ওপর এলসার একটা ছবি ঠেলে দিয়ে শুধোলাম আমি।

এক পলক ছবিটার দিকে তাকালে আর্নেস্টো।

তারপর জবাব দিলে মদে-ভাঙা গলায়—"নিশ্চয়। আমরা—আমরা খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" হলদে-হলদে দাঁত বার করে নার্ভাসভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করল ও।

"এলসা যে মারা গেছে, এ খবর তুমি পেয়েছো কি?" প্রশ্নটা তীরের মত ছুঁড়ে দিলাম ওকে লক্ষ্য করে।

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে আর্নেস্টোর চোখ।

"মরবার আগে তোমার সঙ্গে তার একচোট হাতাহাতি হয়েছিল—খুন হওয়ার একটু আগেই, তাই নয় কি?"

চুপ করে রইল আর্নেস্টো। অথবা, মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলল সে।

"কি জন্যে এ কাজ তুমি করলে আর্নেস্টো?"

"আমি? দিব্যিগেলে বলছি, আমি ওকে খুন করিনি....." কাশির ধমকে মাঝপথেই আটকে গেল বাকী কথাটা। এবং তখনই দেখা গেল সে যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত।

সামলে না নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর আবার শুরু করলাম—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার আমি শুনতে চাই সব কিছু, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এলসাকে তুমি কতদিন থেকে চিনতে? ঝগড়াই বা করলে কেন? সমস্ত বল! বুঝেছো?"

সাগ্রহে মাথা নেড়ে সায় দিলে আর্নেস্টো। কাহিনীটা চটপট বলে ফেলার খুব ইচ্ছে দেখা গেল ওর মধ্যে। চার কি পাঁচ বছর হলো এলসার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তার। গত দু'বছর ওরা একসঙ্গে বাস করে এসেছে। কিন্তু ইদানীং ওর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল আর্নেস্টোর মনে। হপ্তা তিনেক আগে পুলিশের জালে ধরা পড়ে আর্নেস্টো। তারপর জেলের মধ্যেই কাটাতে হয়েছে কয়েকটা দিন।

জেল থেকে বেরিয়েই এলসার খোঁজ করতে লাগল ও। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না ওকে। ও ভেবেছিল, নিশ্চয় অন্য কোন ভিখিরীর সঙ্গে সটকান দিয়েছে এলসা। তারপর কিন্তু এলসাকে আবার দেখতে পায় আর্নেস্টো। কিন্তু ওর অভিযোগ অস্বীকার করে এলসা। দারুণ ঝগড়া হয় দুজনের মধ্যে। তার বেশী কিছু নয়। এলসাকে খুন করেনি আর্নেস্টো।

শুধোলাম—"সোমবার রাতে কোথায় ছিলে তুমি? ঐ রাতেই খুন হয়েছে এলসা।"

ঠোঁট চেটে নিলে আর্নেস্টো। বলল—"বন্দর অঞ্চলে ছিলাম। সারারাত সেইখানেই ঘুমিয়েছি আমি।"

"কেউ দেখেছিল তোমাকে? প্রমাণ করতে পারো তোমার কথা?"

"না, পারব বলে মনে হয় না আমার।"

"সে রাতে তাহলে এলসার ধারে কাছে যাওনি তুমি?"

"দিব্যিগেলে বলছি, যাইনি।"

"ঠিক তো?"

"বেঠিক কিছুই বলিনি, সিনর মার্টিনেলি। ঐ রাতে ওকে আমি দেখিই নি। একাজও আমি করিনি।"

আর্নেস্টোকে সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া ছাড়া করণীয় আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, এই সেই লোক যাকে আমি খুঁজছি। ভিখিরীরা সবসময়ে জটলা পাকিয়ে বাস করে। সে রাতে যদি বন্দর অঞ্চলেই থাকতো আর্নেস্টো, তাহলে সমশ্রেণীর কেউ না কেউ ওকে ঠিকই দেখতে পেত। এবং সেক্ষেত্রে নিজে থেকেই ওর অ্যালিবি আমাকে জানিয়ে দিত আর্নেস্টো।

আর্নেস্টোই হত্যাকারী। কিন্তু কি করে তা প্রমাণ করা যায়? সন্দেহের অভিযোগে কাউকে যে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না, এ তথ্য আর্নেস্টো জানে। আদালতে হাজির করলে এই মস্ত সুবিধেটাই পেয়ে যাবে সে।

* * *

এর পর কিছুদিন ধরে অনেকভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম আর্নেস্টোকে। যতই ওকে চাপ দিতে থাকি, ততই মনে হতে লাগল ও যেন বুঝতে পারছে যে অকাট্য কোন প্রমাণ হাতে না নিয়ে স্রেফ সন্দেহের বশে জেরা করে চলেছি ওকে। এক এক দফা সওয়াল-জবাব হয়ে যাবার পরে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল আর্নেস্টো। এবং দফায় দফায় আমিও ভেঙে পড়তে লাগলাম, রেণু রেণু হয়ে যেতে থাকে আমার মনোবল।

খুনের প্রায় দিন-দশেক পরে এক রাতে আর একবার শুরু করলাম আমার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। শেষকালে যখন বুঝলাম আমার সমস্ত উদ্যমই নিরর্থক এবং কোন মতেই পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতিসাধন সম্ভব নয়, তখন কোটটাকে খামচে তুলে নিয়ে সিধে রওনা হলাম বাড়ীমুখো। রীতিমত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম আমি। শরীর-মন ভরে উঠেছিল অপরিসীম অবসাদে।

আমার ছোট্ট ফ্ল্যাটের দরজার চৌকাঠ পেরোনোর আগেই লক্ষ্য করলাম পাল্টে গেছে সমস্ত আবহাওয়া—রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছিল ভাল ভাল খাবার রান্নার সুগন্ধ। দরজা খুলতেই ময়দা মাখা দু'হাত বাড়িয়ে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে আমার স্ত্রী। হাতের তালুতে [illegible] অধরোষ্ঠের চুম্বন তুলে নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে খুশী-উচ্ছল স্বরে বলে উঠল—"দু'এক মিনিটের মধ্যেই সব তৈরী হয়ে যাবে।"

"আমার খুব খিদে পায়নি।" আর্নেস্টোর ইস্পাত-কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের কথা ভাবতে ভাবতে জবাব দিলাম আমি।

হেসে উঠল আমার স্ত্রী, বলল—"টেবিলে খাবার এসে পৌঁছোনোর আগে পর্যন্ত চিরটাকালই ঐ কথাটি বলেছো তুমি।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। দেখলাম, এক বোতল মদ তুলে নিয়ে একটা কেকের মিশ্রণের ওপর খানিকটা মদ ও ঢালছে। ঢালা শেষ হলে বোতলটা নামিয়ে রাখল ও। দেখলাম, ওর ময়দা-মাখা তালুর পরিষ্কার ছাপ উঠে এসেছে বোতলটার ঘাড়ের কাছে। ......হৃদয়-রেখা আর আয়ু-রেখা দুটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এসেছে ওপরে বোতলের মুখের দিকে।

আর একবার তাকালাম ছাপটার দিকে এবং তারপরেই বিদ্যুৎচমকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সবকিছু।

কোটটাকে ঝপকরে তুলে নিয়ে এমনভাবে বিকট চীৎকার করে উঠে-

ছিলাম যা শুনলে মনে হতো যেন একটা উন্মাদ তারস্বরে সম্বোধন করছে তার বউকে।"

"এখুনি ফিরে আসছি," বলেই বোঁ করে উধাও হয়ে গেলাম রান্নাঘর থেকে।

পিছু পিছু এল না আমার স্ত্রী। এমন কি ডিনার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার অনুযোগ নিয়ে উষ্মাও প্রকাশ করল না। বহুদিন ধরে ঘর করতে হয়েছে তাকে গোয়েন্দার সঙ্গে—তাই এ সব তার গা-সওয়া।

আমি তীরবেগে ফিরে চললাম অফিসে। কেসটার প্রমাণ রয়েছে সেইখানেই।

ঠোঁটের কোণে উপহাসের হাসি ঝুলিয়ে এল আর্নেস্টো। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি দেখেই এ হাসি মিলোতে বিশেষ দেরী লাগল না।

শান্তস্বরে বললাম—"খুনের চার্জ আনছি আমি তোমার বিরুদ্ধে।" বলে, টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করলাম আশাকের বোতলটা—যে বোতলটা দিয়ে পরপারে পাঠানো হয়েছে এলসাকে।

বোতলটা দেখামাত্র আর্নেস্টো বুঝলে তার বরাত মন্দ। আমতা-আমতা করতে থাকে ও। "না, না, আমি ইচ্ছে করে করিনি ও কাজ। ভুল হয়ে গিয়েছিল।"

আর একটা শব্দও সহ্য করার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললাম —"হ্যাঁ, ভুলই বটে, তোমারই ভুল। বোতলটাকে ওখানে ফেলে যাওয়াটাই হয়েছে মহাভুল। বোতলের ওপর তালুর ছাপটা দেখে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ও ছাপ এলসার।

"জিনিসটা আরও আগে লক্ষ্য করা উচিত ছিল আমার। তালুর লম্বা লম্বা রেখাগুলো নীচের দিকে নামতে নামতে কাছাকাছি চলে এসেছে। তার মানে এই যে, বোতলটা যার হাতে ছিল, সে মদ ঢালবার জন্যে বোতল ধরেনি, ধরেছিল উল্টোভাবে, হাতিয়ার হিসেবে, ঠিক এই ভাবে।"

মুগুর ভাঁজার মত বোতলটাকে এক পাক ঘোরাতেই সে রাতের স্মৃতি হু-হু করে ভাসিয়ে দিলে আর্নেস্টোর মনের দুকূল। শুরু হলো দয়াভিক্ষার পালা। এলসার সঙ্গে মদ্যপান করার সময়ে নাকি কথা কাটাকাটি শুরু হয় ওর সঙ্গে আর্নেস্টোর। ঝগড়ার বিষয় সেই একই—এলসার ওপর সন্দেহ। তখনই, "বোতল দিয়ে ওর মাথায় দড়াম করে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাই আমি" —স্বীকার করলে আর্নেস্টো।

আর্নেস্টোর তালুর ছাপের সঙ্গে বোতলের ছাপ মিলিয়ে দেখলাম। না দেখলেও চলতো। কিন্তু নিয়মের খাতিরে এটুকু করতে হলো। দেখলাম, অবিকল মিলে গেল দুটি ছাপ।

কেসের পরিসমাপ্তি শুনে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল আর্নেস্টো। বিচারপতির মুখে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা শুনেও কিন্তু যতখানি বিচলিত হওয়া উচিত ছিল, তার অর্ধেকও হয়নি আর্নেস্টো। কারণ কি জানেন? ওকে আমি বলেছিলাম, এলসা কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি তার সাথে। আর্নেস্টো জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর এলসাকে খুঁজতে গিয়ে তাকে পায়নি। কেননা, এলসাও তো তখন ভিক্ষুকবৃত্তির অপরাধে শ্রী-ঘরে চালান হয়েছে। আর্নেস্টো ভেবেছিল এলসা বুঝি অন্য কোন প্রেমিকের সঙ্গে ফূর্তি লুটতে গেছে—আসলে সে তখন ছিল পুলিশেরই হেফাজতে।

* * *

চার বছর পরে আজ আমার শুধু বয়সই বাড়েনি, রিও-ডি-জেনেরিওর সি আই ডি'র চীফ হিসেবে নতুন খেতাবও পেয়েছি। কিন্তু আজও আমি মনে করতে পারি সেই রাতটির কথা যখন বাড়ী ফিরে আসার পর দেখেছিলাম ডিনার সাজিয়ে বসে রয়েছে আমার স্ত্রী। খাবার যে এত সুস্বাদু হতে পারে, তা আগে জানতাম না। স্ত্রীর পাকা হাতের কেক-তৈরীর সূত্র-কাহিনী যখন বললাম, তখন তো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল ও। হাসি-মুখে গিন্নী সেদিন বলেছিল—"অফিসে যে সময়টা কাটাও, তার চাইতে বেশী সময় যদি আমার রান্নাঘরে খরচ করো, তাহলে হয়তো দেখা যাবে আরও অনেক কেস সমাধান করতে পারছো তুমি।"

অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

এবার বাঁশী ছেড়ে অসি ধরো !
শঙ্করদাস ব্যানার্জী
অস্ত্র নির্মান কারখানা
১২-৪-৬৩

গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

রবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'শিল্প জিনিসটা কী তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল, সেই পারে শিল্প করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে গাইতে, নাটক লিখতে—একালে শখ নেই, শখ বলে কোনো পদার্থ নেই। একালে সবকিছুকেই বলে শিক্ষা.... আমাদের কালে সকলেই ছিল শৌখিন।'

(ঘরোয়া, পৃঃ ৩)

কলাশিল্প প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ যেকথা বলতে চেয়েছেন, তা শিল্পতত্ত্বের মূলকথা এবং আমাদের মনে হয়, শিল্পকলার যেকোনো দিকের প্রসঙ্গেই কথাটা প্রযোজ্য। আসলে ছবিই হোক, আর কবিতাই হোক, কোনো কিছুরই সৃষ্টি সম্ভব নয়, যদি সেখানে অন্তরের তাগিদ না থাকে। বাইরের দিক থেকে 'একাডেমিক' অর্থে যে-শিক্ষা আমরা গ্রহণ করি তা আমাদের মানসলোকে আলোড়নে অসমর্থ একথা না বললেও, একথা নিশ্চয় করে বলা যায়, সেই শিক্ষা আর যাই করুক আমাদের অভ্যন্তরের স্রষ্টাকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম নয়। শিল্প-সাহিত্যের যেকোনো দিকের প্রসঙ্গেই কথাটা প্রযোজ্য। অবনীন্দ্রনাথ যে শৌখিনতার কথা বলেছেন, সে শৌখিনতা মনের, তা মোটেই বাইরের নয়। আর বলাই বাহুল্য, আজ আমরা শৌখিন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব না করলেও, অন্তর থেকে কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা না পেলেও, ঠাকুর পরিবারের তৎকালীন মনীষীরা এ-প্রেরণা অনুভব করতেন; যথার্থ শিল্পীর কাছে এই শৌখিনতার, এই সৃষ্টিকার্যের মূল্য অপ্রধান নয়। আর অবনীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ওই একই কথা। শিল্পী তিনি, বলা উচিত, মহত্তম শিল্পী তিনি, যেখানে তিনি জগৎ ও জীবনের সেই অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি ফুটিয়ে তুলেছেন যা নিয়ে আর্টিস্টের কারবার। সৃষ্টির আনন্দে, বলা ভালো, রসের আনন্দে শিল্পীর মানসমূর্তিতে ঘটনার ছাঁচ যায় বদলে, 'হাড়-মাসের ছাঁচ পায় না শিল্পীর মানস, কিন্তু মানসের ছাঁচ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়-হদ্দ, ভিতর-বাহির।' অবনীন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছি আমরা শিল্পতত্ত্বের এই মৌলিক কথাটি, দীর্ঘদিনের শিল্প-সাধনার পর স্বাভাবিকভাবেই শিল্পকলা সম্পর্কিত তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলোকে গ্রথিত করে গেছেন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, ঠাকুর বাড়ির জীবনের আনু-পূর্বিক ঘটনারাজি আমাদের শুনিয়েছেন, আর তখনই আমরা দেখতে পেলাম অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সীমা কেবল শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই নিঃশেষিত নয়, আরো কিছু পরিচয় আছে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের।

মহৎ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। আন্ত-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমালোচকরা তাঁর শিল্পের আলোচনা করেছেন ঃ 'the first Indian painter who painted in Indian style' বলে বিশ্বের সামনে সম্মানিত করেছেন আর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সেই অসামান্য ক্ষমতার সামনে তাঁর ওই দ্বিতীয় পরিচয়টি আমাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে। অথচ তাঁর শিল্পচর্চার মতই তাঁর গদ্যরচনাগুলিও যুগপৎ আমাদের আনন্দের ও বিস্ময়ের সামগ্রী। তাছাড়া লেখনীনিঃসৃত অনবদ্য গদ্যরচনাগুলি তার পরিপূরক সামগ্রী। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাগুলিও তাঁর শৌখিনতার ফল-শ্রুতি, তাঁর নিয়ত সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত অন্তরের-প্রেরণায়। কিন্তু তাঁর লেখাগুলি নজর দিয়ে পড়লে আমরা বুঝতে পারব, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাগুলি আকস্মিক নয়, এর প্রস্তুতি চলেছিল শিল্পী-মানসে। একদিন রবীন্দ্রনাথের অনু-প্রেরণায় কীভাবে সেই শক্তি মুক্তিলাভের আনন্দে প্রকাশিত হবার সুযোগ পেলে, সেকথা অবনীন্দ্রনাথ নিজে মুখেই বলেছেন এইভাবে ঃ

'একদিন উনি [রবীন্দ্রনাথ] আমায় বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম, বাপ্‌রে! লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই না, ভাষায় কিছু দোষ হয়, আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম একঝোঁকে শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটি-মাত্র কথা লিখেছিলুম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্‌' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাক্‌। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম।

মনে বড় স্ফূর্তি হল, নিজের ওপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট লিখে যেতে লাগলুম ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি।' (জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃঃ ১২২-২৩)।

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় সাহিত্যচর্চার হাতে-খড়ি শুরু এবং তারপর থেকে অবনীন্দ্রনাথের লেখনী অকৃপণ। শকুন্তলা গ্রন্থটি লিখে তিনি যে অন্তর্লীন শক্তিকে আবিষ্কার করলেন, সে পরিচয় পূর্ণতা পেলে যখন আমরা একে-একে 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী,' 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি', 'মাসি', 'একে তিন তিনে এক', 'মারুতির পুঁথি', 'চাঁই বুড়োর পুঁথি' প্রভৃতি অপরাপর গ্রন্থগুলি পেলাম। অজস্র গদ্যরচনা তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন এবং ঠিক তখনই আমরা একজন অসামান্য স্রষ্টাকে পেয়েছি, শিল্পীকে পেয়েছি। অবনীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণতম রূপটি আমাদের সামনে উন্মোচিত হ'ল : বাংলা গদ্যসাহিত্যে এতদিনে আমরা একজন সত্যকার শিল্পীকে পেলাম, যাঁর আপাতঃনিরাভরণ ভাষায় সেই অন্তরের বাণী সঞ্চারিত হয়েছে, যা সাহিত্যের ইতিহাসে এক দুর্লভ বস্তু বললেও অত্যুক্তি হবে না। যদিও লক্ষ্য রাখা দরকার, সাহিত্যিক গদ্যের রূপটি কেমন হবে, সে বিতর্কে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখিনি। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব, বিদ্যাসাগরের গদ্যে আমরা প্রথম art form পেলাম, তৎপূর্বে রামমোহনের রচনা ধর্মীয় খণ্ডযুদ্ধ-বিশেষ : সাহিত্যিক গদ্যের রূপটি সেখানে নেই বললেই চলে। বিদ্যাসাগরই প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য-বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসম্পাদন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়া দিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।' (চারিত্রপূজা, পৃ ১৩)।

কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যদি আমরা বিদ্যাসাগরের গদ্যের আলোচনা করি, তাহলে দেখব, সেই গদ্য 'সুন্দর' ঠিকই, মোটামুটিভাবে 'সুশৃঙ্খল'ও কিন্তু সর্বত্র 'সরল' নয়। পণ্ডিতী-ঘেঁষা গদ্যের রূপ, এবং সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবে একথা ঠিক, সাহিত্যে গদ্যের রূপ যখন খাড়া হয়নি তখন বিদ্যাসাগরের রচনাগুলি আমাদের সামনে ইতিহাসের এক মূল্যবান সামগ্রী। রামমোহন যদি হন গদ্যস্রষ্টা (maker of prose), তিনি তাহলে প্রথম সত্যিকার গদ্যশিল্পী (artist)।

বাংলা গদ্যে ভাষার রূপটি কেমন হবে তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই : এঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আলোচনা চলতে পারে, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাগুলির মূল্যমান-নির্ণয় প্রসঙ্গে। বাংলাভাষা সম্বন্ধে উইলিয়ম কেরি বলেছেন : 'It may be esteemed one of the most expressive and elegant languages of the East'। দেড়শো বছরেরও বেশি আগে বাংলাভাষার আন্তর-স্বরূপ সম্বন্ধে কেরি অবহিত ছিলেন, তিনি যেন বাংলাসাহিত্যের অন্ধকার সময়ে ভাষার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আলোকবর্তিকা, যার অমেয় স্পর্শে আমাদের সাহিত্যের দৈন্য কালক্রমে ঘুচে গেল, আমরা কিছু শক্তিমান স্রষ্টাকে লাভ করলাম। অন্যান্য শাখার মত গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না : এবং এইসমস্ত গদ্যস্রষ্টাগণ সাহিত্যের ভাষার রূপ কেমন হবে, সে সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর ছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী এঁরাই স্পষ্টত সেই ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, যার সর্বশেষ প্রবক্তা অবনীন্দ্রনাথ।

আমি আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক গদ্যভাষার রূপ কেমন হবে, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। কেবল, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থের উদ্ধৃতি-অংশটুকুতে যে ইঙ্গিত আছে, তাইই আমরা তাঁর মুখে শুনেছি। ভাষা-আন্দোলনে মুখ্যতঃ যোগদান না করলেও, কেবলমাত্র তাঁর লেখা গদ্যরচনা তাঁর মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারিবে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।' বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অতি সুপরিচিত হলেও এখন বাংলাদেশের অনেক গদ্যরচয়িতাই হয়তো এটা স্বীকার করেন না। কারণ, ভাষার প্যাঁচে বক্তব্যকে আড়ষ্ট করা প্রবন্ধ বর্তমান প্রায়ই চোখে পড়ে। প্রমথ চৌধুরী পরবর্তীকালে এই বঙ্কিম-নির্দেশিত গদ্যে সাহিত্য-চর্চায় প্রয়াসী হয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, 'সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা' প্রবন্ধ), কিন্তু তিনিও সর্বত্র এইপ্রকার গদ্যচর্চায় সক্ষম হননি : তাঁর চলতি বাংলা আসলে সাধুভাষারই প্রকারভেদ; ক্রিয়াপদের রূপের বদল হয়েছে এইমাত্র। সাধুভাষার ক্রিয়াপদের রূপটা পাল্টে দিলেই তা চলিতভাষায় রূপান্তরিত হয় না, এই সত্য আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যে সেই ত্রুটি লক্ষ্য করবার মত। তাঁর আগে প্যারীচাঁদ মিত্র অবশ্য ভাষার রূপ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, যার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি 'আলালের ঘরের দুলাল'। শেষোক্ত গ্রন্থের ভাষা ত্রুটি-সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য; কারণ, 'যে-ভাষা সকল বাঙালীর বোধগম্য, এবং সকল বাঙালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তাতে সংশয় প্রকাশের অবকাশ কম; যদিও, 'আলালী' গদ্যের ভিত্তি 'সাধুভাষা' এবং 'বোধগম্য' হলেও বাঙালী কর্তৃক 'ব্যবহৃত' ভাষা নয় সর্বত্র। সে যাই হোক, প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রাপ্য কৃতিত্ব অনেকখানি, প্রমথ চৌধুরী যে কৃতিত্বের জন্য স্মরণীয়। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, 'আলালী' গদ্যকে প্রমথ চৌধুরী পুনঃপ্রবর্তন করলেন, তার মানে এই যে, বাংলাগদ্যে পরবর্তীকালে শেষোক্ত ব্যক্তি 'বোধগম্য' ভাষার প্রবর্তক। প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে বলা চলে, তাঁর প্রবন্ধের গদ্যরীতির থেকে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যের গদ্যরীতির পার্থক্য রয়েছে। উপন্যাসের ভাষা সর্বত্র 'সরল' নয়, সমাসাড়ম্বর, আরোপিত অলঙ্করণ, বিশেষণ প্রয়োগের বাহুল্য, সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সরলতার অন্তরায়। কিন্তু পরবর্তীকালে গদ্যসাহিত্যের ভাষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে, রবীন্দ্রনাথকে বাদ

দিলে. কৃতিত্বটুকু যদি কারো প্রাপ্য থাকে, তবে তিনি অবনীন্দ্রনাথ। কেন, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

গত দেড়শো বছরে বাংলা গদ্যের ভাষাগত যে-পরিবর্তন হয়েছে, তা ভাববার মত। জীবন্তভাষামাত্রেই নিয়ত পরিবর্তনশীল কিংবা বলা যায়, এই পরিবর্তনশীলতাই জী ব ন্ত ভা ষা র বৈশিষ্ট্য। বহু বছরের ব্যবধানে মুখের ভাষার রূপ যায় বদলে, সেই সঙ্গে সাহিত্যের ভাষারও।

As new words or expressions come into use in the spoken language, they are gradually promoted to a place in the language of literature and they often remain use hereafter they have ceased to be employed in the ordinary colloqual speech of everyday life. Thus the written form of a living language does

not become fixed, but is forever undergoing regeneration and re-juvenation. (H. C. Wyld: The Historical Study of the Mother Tongue, P. 12) অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর রেখে বলতে চাই, বাংলায় সাহিত্যিক গদ্যভাষায় মৌখিক রূপটি যখন গৃহীত হল, তখন সে ভাষা সহজেই হৃদয়গ্রাহী হল এবং আমাদের মনকে আকর্ষণ করল। যে-ভাষায় আমরা প্রতিদিন কথা বলছি, সেই মৌখিক ভাষার বাগভঙ্গী কালক্রমে সাহিত্যে স্বচ্ছন্দে এসে যায়, এবং ভাষার সেই রূপটিই খাঁটি এবং আর্টের অনুকূল। সেই অকৃত্রিম ভাষায় রচিত সাহিত্যের শিল্পগত মূল্য ক্ষুণ্ন হয় না, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে মনের ছবিটি বেশ স্পষ্টতরভাবে ফুটে ওঠে। এবং অবনীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে, বাংলা গদ্যের রূপটি অকৃত্রিম এবং বাণীবহ হয়েছে, যা কচিত সাহিত্যে চোখে পড়ে। তাঁর পরবর্তীদের থেকে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, 'আলোর ফুলকি'র লেখকের ভাষাগত রূপটি পরিপূর্ণভাবে নিজস্ব; সে গদ্যে শব্দের মারপ্যাচ নেই; নেই কোনো জটিল বাক্যবিন্যাসপদ্ধতি;—তা স্পষ্ট এবং প্রতিদিনের ব্যবহৃত গদ্যের চেহারা। অথচ কাহিনীবুননে শৈথিল্য আসে নি এতটুকুও; আপাতঃদৃষ্টিতে অলংকৃত মনে হলেও এক বিরল বৈশিষ্ট্যে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত। অর্থাৎ এককথায় তাঁর গদ্যভাষায় দেখি ঃ

ক। সে গদ্য 'সরল' 'স্পষ্ট' 'অকৃত্রিম'।

খ। আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁর ভাষা নিরাভরণ, কৌশলবিহীন; সেটাই তাঁর কৌশল ঃ দুএকটি আঁচড়ে ভাষার রূপে ভাবের বাণীটি চমৎকার গ্রথিত হয়েছে।

গ। চিত্রধর্মিতা ঃ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যরচনায় ছবির পর ছবি এঁকেছেন।

বক্তব্যের স্বপক্ষে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের নিদর্শন নমুনা হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে; দেখানো যেতে পারে, গদ্য-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যা বলতে চান, তা বলেন সহজেই, তার জন্যে তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে বক্তৃতা করতে হয় না, পরিমিত কথাতেই তিনি উপস্থাপ্য বিষয়ের আত্মার চেহারাটিকে তুলে ধরেন ঃ

'দূরে একটা মহাবন, সেখানে বসন্ত বাউরি 'বউ-কথা-কও' বলে থেকে থেকে ডাক দেয়; কাছে পাহাড়তলীর আবাদের পশ্চিমে, চালু মাঠের ধারে, পুরোনো গোলাবাড়ির গায়ে মাচার উপর কুমড়োলতার ঘেরা-দেওয়া কোঠাঘর; সেখানে একটা ঘড়ি বাজবার আগে পাপিয়ার মত 'পিউ পিউ' শব্দ করে। যার বাড়ি তার পাখির বাতিক; পোষা পাখি, বুনো পাখি, এই গোলাবাড়ির আর কোঠাবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কত যে আছে ঠিক নেই, কেউ দরজা-ভাঙা খাঁচায়, কেউ ছেঁড়া ঝুড়িতে, চালের খড়ে, দেয়ালের ফাটলে, বাসা বেঁধে সুখে আছে। ও পাড়ার ভালকুত্তো ভম্মা মাঝে মাঝে মুরগির ছানা চুরি করতে এদিকে আসে, কিন্তু পাখিদের বন্ধু পাহাড়ি কুত্তানি জিম্মার সামনে এগোয় তার এমন সাহস নেই। বাড়ি যার, সে যখন বাইরে গেল, পাহারা দিতে রইল জিম্মা আর রইল মোরগ-ফুলে মাথার-গোঁজা কুঁকড়ো—সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে।' (আলোর ফুলকি, পৃ. ১)

অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের যে চেহারা তুলে ধরা গেল, তার থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে, অবনীন্দ্রনাথ জানেন মূর্তি গড়তে। কারণ তিনি শিল্পী ঃ শিল্পী রেখার এবং লেখারও। তাঁর সামনে খড়-মাটি-কাঠ থাকে, তিনি তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন; মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র তাঁর জানা ছিল। আসলে যথার্থ শিল্পী যিনি, তিনি দেখতে জানেন, দেখাতে জানেন। উপকরণ সামনে থাকলে শিল্পী আর নীরব থাকতে পারেন না, আপন অন্তরের প্রেরণায় তিনি কেবল রচনা করে চলেন। বর্তমান প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এখন গল্প কেউ বলে না, বলতেই জানে না।' কথাটা অত্যন্ত ক্ষোভের সন্দেহ নেই, এবং যে গল্পের প্রসঙ্গেই বলে থাকুন না কেন, সত্য। বর্তমান কালের শিল্পী-সাহিত্যিকেরা অবনীন্দ্রনাথের কাছে গদ্যচর্চার পাঠ গ্রহণ করতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলি স্পষ্ট অকৃত্রিম এবং সরল কিন্তু কুত্রাপি 'তরল' নয়। ছেলেদের জন্যে লেখা fantasy-মূলক রচনাগুলি যে বলিষ্ঠ শিল্পীর হাতের, কিংবা 'রাজকাহিনী'র গল্পগুলিতে যে 'সিরিয়াস' মুড্ কাজ করেছে, একথা প্রমাণের জন্যে উদ্ধৃতি অনাবশ্যক।

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৩ ॥

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে অন্য দিনের চেয়ে আমার অনেক দেরী হল। পাশ ফিরে দেখলাম মেজদির বিছানা খালি, নিশ্চয় তরকারি কুটতে গেছে, পাশের ঘর থেকে সেজদার ছেলে-মেয়ে দুটোর গলার স্বর ভেসে আসছে, ওরা স্কুলের পড়া তৈরী করছে। সেজদা বোধ হয় বাজারে, বৌদি রান্নায় বসেছে।

চুপচাপ শুয়ে রইলাম উঠতে ইচ্ছে করল না, শরীরের ক্লান্তি হয়তো বা দূরে হয়েছে, কিন্তু মনের অবসাদ এতটুকুও যায়নি। তারই মধ্যে মনে পড়ল আজকে অলকাদের বাড়ী যেতেই হবে, গগন সেনের ছাতাটা ফেরৎ দেওয়া প্রয়োজন। ভদ্রলোক কি আজ ওখানে আসবেন? কিছুই বলা যায় না। মানুষটা অদ্ভুত ধরনের, কয়েকদিন পর পর অলকাদের ফ্ল্যাটে ওকে দেখেছি, আবার, দীর্ঘ দিনের জন্যে কোথায় যে উধাও হয়ে যেতেন। অবশ্য আমার সঙ্গে পরিচয়ই বা কতটুকু? ওর কথা যে বলতে পারবে সে অলকা।

দেয়ালের ঘড়িটা টিক টিক করে বাজছে, বাবার আমলের পুরোন ঘড়ি, নিচের পেন্ডুলামটা দেখা যায় না। ঐখানকার কাচটা কেউ ভেঙ্গে ফেলেছিল, পাতলা কাঠ দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। না দেখা গেলেও পেন্ডুলামটা নিশ্চয় দুলছে, ঠিক আমার মনের মত। আমার মনের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

খুব ব্যস্তভাবে বৌদি এসে ঘরে ঢুকল। আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে হন্-হন্ করে চলে গেল কোণের জাল আলমারিটার দিকে। ইচ্ছে করে আমি চোখ বুঁজে রইলাম। শুনতে পেলাম জিনিসপত্র খোলার টুং-টাং শব্দ, তার পর এক সময় বৌদি চলে গেল। আড় চোখে দেখে নিলাম মুখখানা তোলা হাঁড়ীর মত। আমার কিন্তু হাসি পেলো, আহা বেচারী, দুখানা ঘরকেই পৃথিবী ভাবছে, যেখানে সে রাজিয়া সুলতানা। যে তাকে অমান্য করবে, বঁটি দিয়ে তার গলা কাটার ইচ্ছে। এই সব নিয়ে সারা-দিনটা কাটিয়ে দেয় তো বেশ। এই কটা দেওয়ালের বাইরেও যে একটা বিরাট পৃথিবী আছে সেকথা চিন্তা করার কোন দরকারই মনে করে না। মনকে বোঝালাম ওর কথা ভেবে কি হবে, মিছিমিছি মাথা গরম করে কি লাভ।

আবার ঘড়িটার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, টিক্ টিক্ টিক্। এতক্ষণ কানে আসছিল না। এ বাড়ীর আওতা পেরিয়ে মন চলে গেল, অলকাদের ফ্ল্যাটে। গগন সেনের জন্যে নয়, ভাবছি অলকার কথা।

প্রথম দিন কলেজে গিয়ে আমার চোখ পড়েছিল অলকার উপর। অতগুলো মেয়ের মধ্যে ওর চেহারার স্বাতন্ত্র্য আমার মত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল! শুধু ফরসা বললে ওর গায়ের রং বোঝানো যায় না, সাদার মধ্যে অনেক সময় একটা ফ্যাকাশে ভাব থাকে। অলকার গালে আছে রক্তিম আভা। চলতি ভাষায় যে রঙটাকে আমরা দুধে-আলতা বলি, অলকাকে দেখলে বোঝা যায় নারী-দেহে ঐ রঙের রূপ কি হওয়া উচিত। রঙ ছাড়াও আর যে জিনিসটা চোখে পড়ে-ছিল তা ওর স্বাস্থ্য। যেমনি আকর্ষণীয় দেহের গড়ন, তেমনি সুঠাম শরীর। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের মধ্যে যে দেহের প্রকৃত লাবণ্য লুকিয়ে থাকে তা আজকাল সচরাচর চোখে পড়ে না বলেই বোধহয় অলকা বোস প্রথম দর্শনেই আমাকে এত-খানি আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য ঈর্ষাও জাগিয়েছিল অনেকের চোখে। আমাদের স্কুল থেকে আটজন মেয়ে ঐ কলেজে ঢুকেছিলাম, আমার মনে পড়ে ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত অলকার বিষয়ে।

—ঢং দেখে আর বাঁচি না, কে বলবে মেয়ে কলেজে এসেছে। স্টুডিওর ফ্লোরে গেলেই হয়।

অন্যরা খন-খন করে হাসে, রোজ একটা করে নতুন শাড়ী পরে।

—আর ব্লাউজের ডিজাইনগুলো দেখেছিস?

কে যেন গলাটা তুলে ইচ্ছে করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, তার উপর এলো-চুলের বাহারখানা দেখ্, রোজ বোধহয় দোকান থেকে ড্রেস করিয়ে আনে।

আমি বুঝতে পারতাম ওরা হিংসের জ্বালায় জ্বলছে। আমার কিন্তু অলকার চেহারা খুবই ভাল লাগত, প্রসাধনের বাহুল্য হয়ত ছিল কিন্তু মোটেই বেমানান লাগত না। ওর চুল ছোট, তাই ইচ্ছে করেই কাঁধের খানিকটা নীচে থেকে রোজ করে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। এতে করে চাল-চিত্রের মত চুলগুলো ওর মুখের চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। ওর

সুন্দর মুখখানা আরও সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে।

এ নিয়ে অবশ্য বন্ধুরা আমাকে ঠাট্টা করত, বলত, যা না, সেধে সেধে রূপ-কুমারির সঙ্গে ভাব করে আয়।

আমি বলতাম, এক ক্লাশে যখন পড়ছি আলাপ ঠিকই হবে।

—কি গাড়ী চড়ে আসে দেখেছিস?

বল্লাম, না।

—সাদা প্যাকার্ড। রাজহাঁসের মত রাস্তা দিয়ে গা ভাসিয়ে চলে।

—গাড়ীটা আমিও দেখেছি। প্রায় প্রত্যেক দিনই অলকা বোস ঐ বিরাট গাড়ীখানায় চড়ে আসে। তবে মাঝে মাঝে ঘন নীল রং-এর একখানা ছোট গাড়ী কলেজ ভাঙ্গার পর ওকে নিতে আসে দেখেছি। কে যেন বলেছিল গাড়ীটা অষ্টিন। দূরে থেকে গাড়ী দেখে কোনটার কি নাম আমি আজও বুঝতে পারি না। কলেজে তো আরও বুঝতাম না। অথচ কত মেয়েকে দেখেছি, যারা গাড়ী দেখলে শুধু নাম নয় তার মডেল পর্যন্ত বলে দিতে পারে। গাড়ী সম্বন্ধে আমার কোন রকম কৌতূহল ছিল না বলেই বোধ হয় কোন্ মেয়ে কি গাড়ী চড়ে আসে জানবার আগ্রহ আমার ছিল না। গাড়ীর দুটো বিশেষণ আমি ব্যবহার করতাম, এক বড়, অপরটি ছোট।

অলকা বোসের সঙ্গে আমার আলাপ হল একরকম হঠাৎ-ই বলতে হবে। কেন মনে নেই, সেদিন শেষের পিরিয়ডে ক্লাশ হল না। তিনটের সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, রাস্তার ধারে একটাও গাছ নেই যার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াব।

গরমের দিনে কলকাতায় শহরে দুপুরবেলা রাস্তায় বেরুন যে কি যন্ত্রণা তা যারা না বেরিয়েছেন কোনদিন বুঝতে পারবেন না। রাস্তার পীচ গরম হয়ে ওঠে, চটি পায়ে হাঁটতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়ে, ইঁট আর পাথরের তৈরী বাড়ীগুলো তেতে উঠে আরও যেন তাপ ছড়িয়ে দেয় রাস্তার উপর। রাস্তায় লোক দেখা যায় না, মাঝে মাঝে হুস্ হুস্ করে দু'-একখানা গাড়ী চলে যায়। বাসের কণ্ডাক্টার চেঁচাতে পারে না, তবু লোক ভর্তি। সেঁকা রুটির মত তাদের চেহারাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। কপালের শির ফুলে উঠেছে, ঘামে ভেজা চুলগুলো কপালে নেতিয়ে পড়েছে। জামা-কাপড়গুলো চুপসে গেছে, বাসে উঠলেই মারকেল তেলের ভ্যাপসানো গন্ধ, যেন ধাক্কা মারে।

বাস আসতে দেরী করছিল। আমি একলা দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় কানে এল কে আমার নাম ধরে ডাকছে, অর্পিতা, অর্পিতা।

পেছন ফিরে দেখি কলেজের গেটের কাছে অলকাদের সাদা গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে, তার ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ও আমাকে ডাকছে। যদিও আমরা এক ক্লাশে পড়ি, কিন্তু এর আগে কোনদিন ওর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। তাই আমার নাম ধরে ডাকতে শুনে, কিছুটা অবাক হয়েছিলাম বৈকি, কাছে যেতে অলকা সহাস্যে কথা বলল, বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছো তাই ডাকলাম। যা গরম, চল না, তোমার বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে আসি।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোথায় থাক?

—বালীগঞ্জ।

অলকা ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, গাড়ী সোজা তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে।

এতক্ষণে নিজের পোশাকের কথা মনে হল। অলকার পাশে আমাকে সম্পূর্ণ বেমানান লাগছে। আসমানী রঙের যে তাঁতের শাড়ীটা আমার পরনে, প্রায় মাস তিনেক আগে কিনেছিলাম, বেশী ব্যবহারের ফলেই বোধহয় কয়েক জায়গায় রঙটা জ্বলে গেছে। এর সঙ্গে হলুদে রঙের ব্লাউজটা একেবারেই বেমানান। কেন যে আজ তাড়াতাড়ির সময় মেজদির জামাটা পরে চলে এলাম। চটিটা বদলাবার সময় হয়েছে অনেকদিন, ওপরের চামড়াতেও দু'জায়গায় তালি পড়েছে, ভগবান জানেন মুখের চেহারা কি হয়েছে। আজ আবার একটা বিনুনি করে বেরিয়েছি।

……কলেজের গেটের কাছে অলকাদের সাদা গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে,……

বল্লাম, অসুবিধে হবে না? আমি যে থাকি—

অলকা পদপূরণ করে দিল, কালীঘাটের কাছে, তা আমি জানি।

—কে বলল।

—যেই বলুক উঠে পড়।

অলকা দরজা খুলে দিল, আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম, আঃ কি নরম গদী। সিটের মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে আরাম লাগল। বিশেষ করে এতক্ষণ গরমে দাঁড়িয়ে থাকার পর।

অলকা বলল, আজ তো তাড়াতাড়ি কলেজ ছুটি হয়েছে, আমাদের বাড়ীতে চল না, চা খেয়ে যেবে। বিকেলে পৌঁছে দেব।

আপত্তি তুলে বললাম, না, না, থাক অলকা। আমি অন্য কোনদিন তোমাদের বাড়ী যাব।

—কেন কি হয়েছে।

অলকা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল কেন আমি কিন্তু কিন্তু করছি। বলল, আমাদের বাড়ীতে এখন কেউ নেই,

মেশমশাই ফিরবেন ছ'টার পর। তার আগেই না হয় তোমাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো।

আর আপত্তি করার কিছু পেলাম না। স্টোর রোড ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল, বালীগঞ্জের দিকে।

এক সময় অলকা জিজ্ঞেস করল, কলেজ কি রকম লাগছে?

বললাম, ভালই তো। তবে এখনও সব সাবজেক্টগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না। বিশেষ করে লজিক।

—আমারও সেই অবস্থা, তবে বাড়ীতে একজন প্রফেসর আছেন বলে বোঝবার কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু আমার যেটা খারাপ লাগছে, তা হোল এখানকার কলেজ লাইফ। ঠিক [illegible] ইস্কুল। কলেজে আসো, লেখাপড়া [illegible] বাড়ী যাও। মেয়েগুলোর মধ্যে একটুও প্রাণ নেই।

ঠিক এ ধরনের [illegible] আমার কখনও হয়নি। বাড়ীর অনেক ঝামেলা সহ্য করে একরকম জেদের বশে যে কলেজে এসে ঢুকেছে, টিউশানী করে যাকে খরচা চালাতে হয়, সে আর পড়াশুনোর বাইরে কলেজ-জীবনের কথা কি ভাববে? শুধু জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বুঝি খেলাধুলো করতে ভালোবাসো? অলকা হাসতে হাসতে বললে, খুব যে ভালো খেলতে পারি তা নয়, কিন্তু টেবিল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন খেলে, দেখে সময় কাটাতে ভাল লাগে। নাচ-গান, হৈ-হৈ-এর মধ্যে দিয়েই যদি কলেজ জীবনটা কাটাতে না পারি তাহলে আর কি লাভ। একটু থেমে বললে, মেয়েগুলোর দিকে যখন তাকাই, আমার কি মনে হয় জানো? সব যেন পিসীমা আর ঠাকুমার দলে। একেবারে ম্রিয়মান, নিষ্প্রাণ।

কথাগুলো শুনতে আমার অদ্ভুত লাগলো, বলতে গেলে আমিও তো ঐ পিসীমা আর ঠাকুমার দলে। খেলাধুলোর কথা শুনলে আমারও তো গায়ে জ্বর আসে। অলকা যে রকম প্রাণ খুলে হাসতে পারে, আমি তো তাই পারি না। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অর্ধেকটা শক্তি আমি খুইয়ে ফেলেছি। তাই অলকার কথাগুলো এ রকম বিচিত্র শোনাল।

গাড়ী এসে দাঁড়াল অলকা'দের বাড়ী। দরোয়ান দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিলে। আমরা দু'জনে নামলাম, সাদা পাথরের তিনটে ধাপ ভেতরে ঢুকেই চওড়া কাঠের ঘোড়ান সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। মাঝখান দিয়ে কার্পেট পাতা।

অলকারা যে বড়লোক তা ওর চাল-চলনেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু সেদিন ওদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বুঝলাম শুধু বড়লোক বললে ওদের বৈভবের ব্যাখ্যা করা চলে না। ওরা ধনী।

কিন্তু আশ্চর্য অলকার ব্যবহারে ওর মধ্যে এতটুকু টাকার ঝাঁঝ নেই। এত সহজ ভাবে আমাকে কাছে টেনে নিল, যে আমি সব পার্থক্য ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেয়ে, ভুলে গেলাম আমার মলিন সাজ-পোশাকের কথা, যা পরে এ ধরনের বাড়ীতে [illegible] স্বাভাবিক।

দোতলায় উঠে খুব সাজানো একটা মাঝারি আকৃতির ড্রইং রুমে বসে আমরা গল্প করছিলাম। আগেও বলেছি, অলকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ওর প্রাণ-খোলা হাসির মধ্যে, হাসলে ওর চোখ-দুটো কথা বলে, শরীরের মধ্যেও তার স্পন্দন অনুভব করা যায়।

অলকা যে এখানে মেশমশাই-এর বাড়ীতে থাকে তা গাড়ীতে আসতে আসতেই সে আমায় বলেছিল, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি, ওর বাবা-মা নেই। যখন জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের বাড়ী কোথায়, সে বললে—হুগলীতে।

—তোমার বাবা নেই?

—আমি যখন পাঁচ বছরের মেয়ে, বাবা মারা গেছেন।

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, ওর মা কোথায় থাকেন?

অলকা থামিয়ে দিয়ে বল্‌ল, আমার মা-ও নেই, বছর তিনেক আগে 'টাইফয়েড'এ ভুগে মারা গেলেন।

অলকার গলায় একটা বিষাদের সুর ছিল যা অতি সহজেই আমার অন্তরকে স্পর্শ করল। বল্লাম, আমরা দু'জনেই এক নৌকোর যাত্রী মনে হচ্ছে, আমারও অবস্থা তোমার মত, তার উপর আবার আমাকে লড়াই করতে হয় বেঁচে থাকার জন্যে। অলকা সহজ গলায় বল্‌ল, সেটা ভাই আমার বরাত। আমিও কোথায় তলিয়ে যেতাম কে বলতে পারে, ভাগ্যিস মেশমশাই আশ্রয় দিয়েছিলেন।

এর পর অলকা যে কথা বলেছিল তা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। হঠাৎ ওর চোখের চাউনি বদলে গেল, হাসির ছটা আর সেখানে দেখতে পেলাম না, সেখানে নেমে এল করুণ সন্ধ্যা, বল্‌ল, এক এক সময় আমার কি মনে হয় জানো অর্পিতা, যদিও আমাদের দুজনের একদিক থেকে মিল আছে, দুজনেই অন্যের আশ্রয়ে মানুষ হচ্ছি, যদিও এটা সত্যি তোমাকে প্রাণপাত করে থাকতে হচ্ছে, আমি অনেক নিশ্চিন্ত আরামে রয়েছি তবু আমি বলব তুমি সুখী।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, একথা কেন বল্‌ছ?

অলকা আনমনা দৃষ্টিতে অন্য দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তোমার পায়ের নীচে একটা মাটি আছে, শক্ত মাটি, তুমি যা তুমি তাই। অথচ আমি এ কোন্ বালির প্রাসাদের মধ্যে রয়েছি, কার বাড়ী, কার ঘর, কার এ বিষয়-সম্পত্তি। তার মধ্যে আমি বাস করছি। কলেজের মেয়েরা যখন ঈর্ষাভরে আমার নামে টিপ্পনী কাটে, আমার বড় হাসি পায়। ওরা তো জানে না, আমি একজন এ বাড়ীর আশ্রিতা মেয়ে।

সেদিন অলকা প্রত্যেকটি কথা এমনই এক অনুভূতির সঙ্গে বলেছিল যে, অতি সহজে আমিও তাকে আপনার করে নিয়েছিলাম। এর পর থেকে অলকাকে যেখানেই দেখেছি, সে যতই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তে হোক না কেন, আমার কানে ভেসে এসেছে ওর ঐ ব্যথাভরা কথাগুলো, চোখের সামনে ফুটে উঠেছে একটি অসহায়া কুমারীর মুখচ্ছবি।

বেয়ারা এসে একটু পরে চা-কেক, আর স্যান্ডউইচ্ দিয়ে গিয়েছিল। আমরা দুজনেই খেলাম। খেতে বসে বুঝলাম বেশ খিদে পেয়েছিল, তারিফ করে বল্লাম, স্যান্ড্‌উইচ্‌গুলো চমৎকার।

—অলকা বল্‌ল, বাড়ীতে করা।

—তাই নাকি, এ যে দোকানকেও হার মানিয়েছে।

—এ বাড়ীর খানসামা খাবার বানায় চমৎকার। কোন এক ছুটির দিন দুপুরবেলা তোমায় খাওয়াব। লোকটা পুরোন, একরকম বাড়ীর গিন্নী, সবকিছু দেখাশুনো করে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন মাসীমা এসব দেখেন না।

মাসীমার উল্লেখে অলকার মুখটা আবার শুকিয়ে গেল, বল্‌ল, তোমাকে মাসীমার কথা বলিনি বুঝি, আমাদের জীবনে আর এক ট্র্যাজেডী সেটা।

—তার মানে?

—মাসীমাকে রাখা হয়েছে কসৌলী স্যানিটোরিয়ামে। উনি টি, বিতে ভুগছেন।

—কতদিন?

—তিন বছর হয়ে গেল, অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বোধহয় আর ফিরবেন না। ক'দিন আগেও মেশমশাই গিয়েছিলেন দেখা করতে। ডাক্তাররা বলছে অবস্থা ভাল নয়।

কথাটা শুনে বড় দুঃখ হল, প্রশ্ন করলাম, ওদের কোন ছেলে-মেয়ে নেই?

—না, হয় নি। এখন যা বোঝা যাচ্ছে, মাসীমার অসুখটা পুরোন।

প্রথম দিনের আলাপেই অলকা তার জীবনের অনেক কথাই অকপটে জানিয়ে দিল আমাকে। কেন সে অতগুলো কথা আমায় বলেছিল জানি না, কেনই বা সে আমাকে বিশ্বাস করল, কিন্তু তার ফল দাঁড়াল এই, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি অলকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে পড়লাম। প্রায় প্রত্যেকদিন আমি কলেজের পর অলকাদের বাড়ী যেতাম, সেখান থেকে ফিরতাম বাসায়, কত সময় ও আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেত, গঙ্গার ধারে, ভিক্টোরিয়ায়, লেকে। যেদিন কলেজ আগে ছুটি হয়ে যেত, অলকা আর আমি সিনেমায় যেতাম ম্যাটিনি শো। বলা বাহুল্য, টিকিট কাটত অলকা। দু'একদিন আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, তাতে ও হেসে বল্‌ত, তুই ভারি বোকা অপু, কথায় বলে লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। টাকাটা যখন মেশমশাই-এর, তোর আর আমার ভাববার দরকার কি।

আমি বরাবর দেখেছি, অলকার একটা বোঝবার ক্ষমতা আছে, জোর করে ও আমাকে শাড়ী কিনে দিয়েছে, বাধা দিলেও শোনেনি, দোকানে গেলে পড়ার বই দু'কপি করে কিনত, ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দিত আমার কাছে। টাকা অনেকের থাকে কিন্তু সকলে দিতে পারে না, অলকা দিতে পারত। শুধু তাই নয় তার দেওয়ার মধ্যে কোনরকম অহংকারের বড়াই লুকিয়ে থাকত না। সেইজন্যেই বোধ হয় অলকার কাছ থেকে এত সহজে আমি নিতে পেরেছি। শুধু আমার জন্যেই নয়, মেজদির অসুখের কথা শুনে থেকে অবধি প্রায়ই অলকা ঝুড়ি করে ফল পাঠাত। প্রথম যেদিন ওর পাঠান ফলের ঝুড়ি ড্রাইভার নিয়ে এল আমি চেষ্টা করেও চোখের জল সামলাতে পারিনি। চিররুগ্ন মেজদিকে ফল খাওয়াবার ইচ্ছে থাকলেও আমার সামর্থ্য ছিল না। তা বুঝতে পেরেই অলকা ফল পাঠাত। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গিয়েছিল।

মেজদি বলত, অলকা মেয়েটা বড় ভাল, নারে?

আমি সোচ্ছ্বাসে বলতাম, কত যে ভাল তোমায় বোঝাতে পারব না মেজদি।

—ওকে একদিন নিয়ে আসিস্।

কেন?

বলতাম, ওরা মস্ত বড়লোক, এখানে এলে কি আর ভাল লাগবে। মেজদি কিন্তু খুব সহজভাবে বলত, কেন আসবে না, আমার নাম করে একবার বলিস।

প্রথম দিকে বাধ বাধ ঠেকলেও পরে আমি মেজদির কথা অলকাকে বলেছিলাম। আশ্চর্য, শুনেই অলকার চোখমুখ খুশীতে ঝল-মল করে উঠল। নিশ্চয় যাব, এতদিন তুই বলিসনি বলেই তো আমি অবাক হচ্ছিলাম।

বল্লাম, আমাদের ঐ পায়রার খোপের মত বাসা, পাছে তোর অসুবিধে হয় তাই বলিনি। বিশেষ করে আমার বৌদির কথা তো তোকে বলেছি। ওর সঙ্গে কারুর আলাপ করিয়ে দিতে আমার ভয় করে।

অলকা হেসে বলেছিল, আমার জন্যে ভয় পাস না। ইচ্ছে করলে আমি বোধহয় সাপকেও পোষ মানাতে পারি।

অলকার কথা শুনে আমি হেসেছিলাম, মনে হয়েছিল, ও ঠাট্টা করছে। পরে বুঝলাম ওটা ঠাট্টা নয়। আমাকে না বলে-কয়ে অলকা হঠাৎ একদিন আমাদের বাসায় এসেছিল, সেই ওর প্রথম আসা। আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম না, ফিরতে একটু দেরীই হয়েছিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অলকার হাসির শব্দ পেলাম। ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। মেজদির কাছে বসে আসর জমিয়ে নিয়েছে অলকা, দাদার ছেলেদুটো ওর গা ঘেঁসে বসে, এমন কি বৌদি পর্যন্ত হেসে হেসে গল্প করছে। আমাকে দেখে অলকা চেঁচিয়ে উঠল, এত দেরী করলি কেন, আমি কখন থেকে বসে আছি।

কাঁধের থেকে ঝুলিটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম, তুই আমাকে বলিসনি তো আসবি।

—তোকে সারপ্রাইজ দেবো বলে।

মেজদি বলল, তোর বন্ধু ভারি দুষ্টু, অপু দেখ না একগাদা জিনিস নিয়ে এসেছে। চেয়ে দেখলাম বাচ্চাগুলোর হাতে চকোলেট আর লজেন্সের ঠোঙা, মেজদির খাটের উপর একটা শাড়ী, বুঝলাম, অলকা বৌদির জন্যেও নিশ্চয় আরও দামী শাড়ী নিয়ে এসেছে, তা না হলে ওর মত মেয়ে এ রকম খোসগল্প করত না কখনই। সেটা আরও প্রমাণ হল একটু পরেই আমি যখন অলকাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি খাবি বল।

অলকা হেসে উত্তর দিল, তোর আতিথ্যের জন্যে আমি বসে আছি কিনা। বৌদি এতক্ষণ আমায় গরম গরম লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছিলেন।

বৌদি সোহাগ-উথলোনো গলায় সহাস্যে বলে ওঠে, আহা কতই বা খেলে, সবই তো বসে বসে খোকাদের খাওয়ালে।

তারপর ওরা কি বলছিল আমি মন দিয়ে শুনিনি। শুধু ভাববার চেষ্টা করলাম গত কয়েক বছরের মধ্যে বৌদিকে এরকম খুশী হয়ে কথা বলতে শুনেছি কিনা। শাড়ীটা নির্ঘাত দামী। তা না হলে অলকা এত সহজে বুনো সাপ বশ করতে পারত না।

চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, মেজদি এসে ঘরে ঢুকল। কিরে অপু উঠবি না।

বললাম, এই যে উঠছি মেজদি।

—কাল যা জলে ভিজেছিলি, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—না।

মনে হয় মেজদি যেন কিছু আমায় বলতে চায়, জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবে?

মেজদি ভয়ে ভয়ে বলল, একবারটি বৌদির সংগে কথা বল্ না। গজর-গজর করে আমার মাথা গরম করে দিচ্ছে।

বৌদির নাম শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, বললাম, আমার সময় নেই। এখুনি বেরতে হবে।

—সেকি, কোথায়?

—অলকাদের বাড়ী। একটা জিনিস ফেরৎ দিতে হবে।

ঘরের কোণের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ছাতাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গগন সেনের ছাতা।

(ক্রমশঃ)

মহাশয়,

আমার এই পত্রটি পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হবো।

'পঃ বঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল' এই শিরোনামা নিয়ে শ্রীরাসবিহারী সরকার মহাশয়ের যে সুচিন্তিত প্রবন্ধটি ১২।৪।৬৩ তারিখের অমৃতে প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্যে আপনাকে ও প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাই। এমন একটি বিলের কথা যা জনসাধারণের অগোচরে ছিল, তাকে প্রকাশ্যে প্রথম তুলে ধরবার জন্যে রাসবিহারীবাবু অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হলেন।

কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, আজকের 'নব-নাট্য প্রবাহ'-এর সঙ্গে যে রাসবিহারী-বাবুর সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, একটু রদবদল সাপেক্ষে তিনি পরোক্ষে এই বিলটিকে সমর্থনই করে গিয়েছেন। প্রবন্ধটি পড়ে মনে হয়েছে, তাঁর দৃষ্টি কোলকাতার নাট্য প্রচেষ্টার ওপরই নিবদ্ধ। কোলকাতার বাইরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে নি। তা যদি হতো, প্রস্তাবিত বিলে সরকারী লাইসেন্স

নেবার আইনটিকে বর্তমানে চালু কর্পোরেশন লাইসেন্স-এর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করবার কথা তিনি বলতে পারতেন না।

বর্তমান কর্পোরেশন লাইসেন্স মুষ্টিমেয় মণ্ডমালিকদের (কিছু সংস্থারও) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু প্রস্তাবিত সরকারী লাইসেন্স 'ফাঁকা জমি'র মালিককেও গ্রহণ করতে হবে যদি সেখানে কোন নাট্যানুষ্ঠান হয়। তাহলে? সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই যে 'মাচা' বেঁধে অভিনয়ের পালা চলেছে তার কি অন্তিম দশা উপস্থিত হবে না? আর যাদের কল্যাণে আধুনিক নাট্যকারদের দু-চারখানা নাটক বিক্রী হচ্ছে, তাদেরও?

পরবর্তী অংশে রাসবিহারীবাবু প্রস্তাবিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার পরিবর্তে সিনেমার মত নাটকের ক্ষেত্রেও 'সেন্সার বোর্ড' গঠন করার প্রস্তাব করেছেন। একটু তলিয়ে দেখলে এর অসারতা অনায়াসেই প্রমাণ হয়ে যাবে।

চলচ্চিত্র কটা ওঠে বছরে? সেগুলো জন্ম নিচ্ছে কোথায়? বলা বাহুল্য সংখ্যায় নগণ্য। প্রাণকেন্দ্র কোলকাতা। এ ক্ষেত্রে সেগুলো অনুমোদন করা বা করানো অনুমোদন সংস্থা বা চলচ্চিত্র-কারদের পক্ষে অতি সহজসাধ্য। কিন্তু নাটক লেখা হচ্ছে, প্রযোজিত হচ্ছে শুধু কোলকাতায় নয়। বরং তার বহুগুণ কোলকাতার বাইরে। একটি অতি ক্ষুদ্র পল্লী সংস্থা বা একজন সাধারণ নাট্য-কারের পক্ষে কি তাঁদের নাটক পূর্বাহ্নে সেন্সার বোর্ড থেকে পাশ করানো সম্ভব? না সেন্সার বোর্ডের পক্ষেও সে কাজটা করে ওঠা সম্ভব?

তা ছাড়া, সরকারের হাতে যথেষ্ট আইন আছে। ইচ্ছে করলে যে কোন আপত্তিকর নাটকের প্রদর্শন বন্ধ করে দিতে পারেন। সেখানে আবার 'সেন্সর বোর্ড' কেন? বা সরকারী অনুমতিরই বা প্রয়োজন কি? প্রশ্ন তোলা যেতে পারে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও তা সম্ভব তাহলে সেখানে সেন্সার বোর্ড কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে চালু অবস্থায় একটি চলচ্চিত্র বন্ধ করলে তা বহুজনের (কারণ চলচ্চিত্র একসঙ্গে অনেক জায়গায় চলতে পারে) লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা কম।

প্রস্তাবিত বিলে ৫০ টাকা লাই-সেন্সের বদলে রাসবিহারীবাবু ৫ টাকার লাইসেন্স প্রবর্তনের কথা বলেছেন। ৫ টাকা ফি আদায় করার জন্যে সরকারকে যে সমারোহ করতে হবে তাতে 'ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রী'র সামিল হবে। তাছাড়া অধিকাংশ সম্প্রদায় যেখানে বছরে একবার-দুবার নাটক করেন, তাঁদের সারা বছরের জন্যে 'লাইসেন্স' নিতে বলার যুক্তি কোথায়?

তাই আমার প্রস্তাব এই বিল সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত হোক। পরবর্তী এক প্রবন্ধে শ্রীনান্দীকর মহাশয় যথা-যোগ্যই বলেছেন যে, ক্যালকাটা কর্পো-রেশনের অভিনয় সংক্রান্ত আইনই যখন যথেষ্ট তখন আবার নতুন করে আইনের বেড়াজাল কেন?

বিশেষ করে আজ জরুরী অবস্থা চলছে। দেশেরই প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থা দেশাত্মবোধক নাট্য প্রযোজনায় নেমেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-ক্রমে কোলকাতার বিভিন্ন নামী সংস্থা খুব শীগ্‌গিরই বহু দেশাত্মবোধক নাটক প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশে দেশাত্মবোধক নাটকের বান ডাকবে। ঠিক এই সময়েই এমন বিল কি কিছুটা বাধা সৃষ্টি করবে না? তাই আমি আশা করি সরকার এই বিল আনতে প্রতিনিবৃত্ত হবেন।

—ইতি
কিরণ মৈত্র
কলিকাতা : ৩৫।

(একাঙ্কিকা)

[ছোটবড় আবিষ্কার পেটেন্ট করার অফিসের বাইরের ঘর (Reception Room)। একপাশে চেয়ার টেবিল নিয়ে একজন অত্যন্ত বিশ্রী দেখতে ভদ্রলোক বসে আছেন। অন্যদিকে অপেক্ষা করার জন্য বসার জায়গা। সেখানে একজন মধ্যবয়সী সুন্দর দেখতে ভদ্রলোক সম্ভবতঃ কারু জন্যে অপেক্ষা করছেন। দুটি লোকের চেহারাগত তফাৎ চোখে পড়বেই। চাকরীপ্রার্থিনী একটি ২২।২৩ বছরের যুবতী এলেন। সুন্দরী।]

মনসিজ—এটি একটি আধিভৌতিক নাটক কারণ আমি মদন অথবা মনসিজ স্বর্গের লোক। মনসিজকে চেনেন না! জীবনে প্রেমে পড়েন নি বুঝি? হ্যাঁ আমি সেই মনসিজ। আপাততঃ একটা বাজি ধরেছি। শালা বরুণ বলেছে আমি নাকি বুড়ো হয়েছি। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবকে বলেছি—ঠিক আছে—বরুণকে দেখাব কিরকম ভেল্কি এখনও দেখাতে পারি। শালা মেঘ হয়ে দেখছে। দেখ দেখ—আমার নাম মনসিজ হুঁ হুঁ বাবা।

সুন্দর ভদ্রলোক—আরে আসুন আসুন। (মেয়েটি তাকেই অফিসের লোক মনে করে সটান তার কাছে গিয়ে বলে।)

যুবতী—আমি পরিচালকদের কারু সংগে দেখা করতে চাই।

কুৎসিত ভদ্রলোক—কোথাকার বেয়াদপ্। এখানে আসুন।

সুন্দর ভদ্রলোক—হ্যাঁ উনিই হলেন আফিসের লোক। আমি একজন বেকার অর্থাৎ আপাততঃ কোন কাজ নেই।

যুবতী (কুৎসিত ভদ্রলোকের কাছে)—আমি পরিচালকদের কারু সংগে দেখা করতে চাই।

কুৎসিত ভদ্রলোক—আপনার আবিষ্কার বড় না ছোট।

যুবতী—অ্যা?

কুৎসিত ভদ্রলোক—জানেন নিশ্চয় এটি বড় ও ছোট আবিষ্কার পেটেন্ট করার অফিস, তাই জিজ্ঞাসা করছি আপনার আবিষ্কার—বড় না ছোট। মাঝারি বলবেন না যেন তার জন্যে অন্য অফিস আছে।

যুবতী—আমি এসেছিলাম যদি কোন-রকমের চাকরি—

কুঃ ভদ্রলোক—চাকরি! অগত্য কারণিকের সংগে দেখা করবেন আগামী বৃহস্পতিবার ১২টা থেকে তিনটা। ওটাই হোল চাকরিপ্রার্থীদের দেখা করার দিন। নমস্কার। (কাজে মন দেয়।)

যুবতী—দেখুন আমার ভয়ানক দরকার না হলে—

কুঃ ভদ্রলোক (খেঁকিয়ে নেয়)—দেখছেন না কাজ করছি। আসুন—

(কাজে মন দেয়।)

(যুবতী খুব দুঃখিত মনে ভাবে—তারপর চলে যেতে আরম্ভ করে। সুন্দর ভদ্রলোক ডাকেন)

সুঃ ভদ্রলোক—ও মশাই শুনুন।

যুবতী—আমাকে বলছেন?

সুঃ ভদ্রলোক—হ্যাঁ, শুনুন। বসুন। আপনি ভৃগুবাবুর মেয়ে রঞ্জনা না?

রঞ্জনা—হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন।

সুঃ ভদ্রলোক—সে অনেক কথা। আর একদিন বলবো। আজকে শুধু এইটুকু জেনে নিন যে আপনি আমার সম্মান বাঁচাবেন, সেই আশাতে বসে আছি।

রঞ্জনা—আমি আপনার সম্মান কি করে বাঁচাবো। আমি যে বেকার। দুটি ছোট ভাই বোন, রুগ্না মা, বাবা একা আর কতদিন চালাবেন—তার শরীরও ভেংগে পড়ছে।

সুঃ ভদ্রলোক—আজই সব দুঃখের শেষ হবে। তা যদি না করতে পারি একেবারে বানপ্রস্থ গ্রহণ করবো।

রঞ্জনা—না না ওকি কথা। আমার জন্য আপনি কেন কষ্ট পাবেন।

সুঃ ভদ্রলোক—আপনার জন্য মোটেই নয় আমার নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য। অচ্যুতবাবু হেসে বললেন, মনসিজের চুল পেকে গেলো হে। মনসিজ মানে আমি। পুরন্দরবাবু ঠাট্টা করলেন, বললেন ওর রীতি-নীতি এত পুরোনো হয়ে গ্যাছে যে আজকাল কোন কাজই হয় না। বরুণটার ভারী মজা হোলো ওমনি পেছনে লাগলো। আমি বললাম—হয় আমি আজকের মধ্যে আমার কাজ দেখাবো নইলে কাল সকালেই বানপ্রস্থ নেবো।

রঞ্জনা—তা আমি কি করবো।

মনসিজ—সেটাই হোলো আসল কথা। আমি যা বলবো তাই আপনাকে করতে হবে। দূর হোকগে যাক—আপনিটা প্রথমেই বাদ দেওয়া যাক কি বলো।

(বাইরে হাসির আওয়াজ)

রঞ্জনা—হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

মনসিজ (জানলার দিকে রেগে তাকায়)—ফাজলামো করার একটা সময়-অসময় আছে!

সুঃ ভদ্রলোক (চীৎকার করে ওঠে)—আস্তে!

মনসিজ—দেখ, আমি যা বলবো তাই করবে, যেমন বলে দেবো বুঝেছ?

রঞ্জনা—কিন্তু আপনি—

মনসিজ—ওইটি বাদ। মনে কোন প্রশ্ন আনা চলবে না। কোন রকমের—'কিন্তু আমি' বা 'কিন্তু আপনি' নয়। একেবারে অখণ্ড বিশ্বাস চাই বুঝলে রঞ্জনা। (কাঁধে হাত রাখলো। ওমনি কে কোথায় কেশে উঠলো। মনসিজ কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে একদিকে রেগে তাকালো।)—ভাল হচ্ছে না বলে দিলাম।

রঞ্জনা (একটু ভয় পায়)—বলুন কি করতে হবে।

(ইতিমধ্যে কুৎসিত ভদ্রলোক কাজ করতে করতে নিজেকে চওড়া লাল ফিতেতে জড়িয়ে ফেলেছে।)

মনসিজ—ওই দেখ, জগৎবাবু লাল ফিতের জালে নিজেকে জড়িয়েছেন। তুমি গিয়ে ওর ফিতের জট খুলে দাও। ওকি চললে কোথায়? দাঁড়াও শোন। এখনি চেষ্টা করলে তুমি কেন, তোমার মত দশ জনাতেও খুলতে পারবে না। শোন, ওর পিঠের পেছনে একটা গিঁট পড়ে গেছে—ঘুরে মরছে অথচ দেখতে পাচ্ছে না। তুমি গিয়ে ওর পিঠের গিঁটটা খুলে দাও।

(রঞ্জনা জগৎবাবুর কাছে গেল)

জগৎবাবু—উঃ জ্বালাতনে পড়লাম। রোজ এটা একবার জড়িয়ে যাবে আর খুলতে প্রাণান্ত।

রঞ্জনা—গিঁটটা পেছন দিকে আছে খুলে দেব?

জগৎবাবু—না মানে হ্যাঁ।

(রঞ্জনা গিঁট খুলে জগৎবাবুকে উদ্ধার করল। জগৎবাবু খুশী হলেন)

—আপনি টাইপ করতে জানেন? কিংবা হিসাব করতে?

রঞ্জনা—না।

জগৎ—সম্পাদনা করতে পারবেন? ভাষা-জ্ঞান আছে? বাংলা হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী, জাপানী?

রঞ্জনা—না।

জগৎ—তাহলেই তো মুস্কিলে ফেললেন। আচ্ছা আপনি কিছু জানেন যা সাংঘাতিক একটা আইডিয়া কিংবা যন্ত্র, কিংবা মানুষ মারা যন্ত্র। রসায়ন, প্রশাসন, ফলিত, গণিত বা ফ্যাসান কিছু চলিত?

রঞ্জনা—না তো।

জগৎ—তবেই তো।

(আবার কাজে ডুবে যায়)

মনসিজ—এদিকে এস বোকা মেয়ে। কিছু হ্যাঁ বলতে পারলে না?

রঞ্জনা—আমি যে কিছু জানি না।

মনসিজ—লজ্জা জান? লোভ জান? বিশ্বাস আর ক্লেশ জান?

রঞ্জনা—তা জানি।

মনসিজ—তবে তো হয়ে গেল।

রঞ্জনা—কি হোল।

মনসিজ—কাজ। শোন এবার একটা কঠিন কাজ তোমাকে করতে হবে। ওই লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে তোমায় বলতে হবে—ইস আপনি কি সুন্দর।

রঞ্জনা—তার মানে?

মনসিজ—মানে অত্যন্ত সোজা। এক এক-জনার জীবনের এক একটা চাবি আছে। সেটা খুঁজে পেলেই সে তাই দিয়ে সব দরজা খুলতে পারে। এই চাবিটা খুঁজে পাওয়াই কঠিন। খুঁজতেই জীবন চলে যায়। তোমার জীবনের চাবি হল ওই একটা কথা।

রঞ্জনা—ইস্ আপনি কি সুন্দর?

মনসিজ—হ্যাঁ। কিন্তু অমন করে বললে তো হবে না। এমনভাবে বলতে হবে যেন ওই কথাটা তোমার প্রাণের ভেতর থেকে আসছে? তুমি যাকে উদ্দেশ্য করে বলছ তার মনে হবে তুমি সত্যি সত্যি বলছ।

রঞ্জনা—তবে কি সত্য সত্য বলব না?

মনসিজ—নিশ্চয় সত্যি করে বলার মতো বলবে। তবে সব সময়ে যে সত্যি সত্যি বলবে, তা বলতে পারি না। খুব ভাল অভিনয় করতে হবে।

রঞ্জনা—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

মনসিজ—কেন এতো সহজ কথা। প্রত্যেক পুরুষ হলো ময়ূরের জাত। তারা নিজেদের সব থেকে বেশী ভালবাসে। অনেক লোক আছে যারা নিজেকে কুৎসিত বলে আনন্দ পায়—তাদেরকে তাদের অস্ত্রেই ঘায়েল করতে হবে।

রঞ্জনা—কি রকম?

মনসিজ—যেমন ধর ঐ যে জগৎবাবু—ওকে যদি বল 'আপনি কি সুন্দর' উনি নিশ্চয় চটে যাবেন।

রঞ্জনা—আপনি তো আমাকে তাই বলতে বলছেন।

মনসিজ—হ্যাঁ বলছি—কিন্তু ঐ সুন্দর কথাটার মানে বুঝতে হবে। সেই লোকটির ভেতর কোন সৌন্দর্য আছে সেটা জেনে তার প্রশংসা করতে হবে।

রঞ্জনা—ওরে বাবা, আমি পারব না। অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতেই কি রকম সংকোচ হয়!

মনসিজ—কই আমার সঙ্গে কথা বলতে তো খুব সঙ্কোচ হয়নি।

রঞ্জনা—সেই কথাটাই তো ভাবছি।

মনসিজ—কারণ সহজ। আমাকে তোমার অপরিচিত মনে হয় নাই, আমাকে তুমি চেন বলে।

রঞ্জনা—চিনি? আমার তো মনে পড়ছে না। কবে?

মনসিজ—ব্যস, ব্যস ওসব বাজে কথা এখন নয়। শোন, তুমি যে কোন পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল না তাকেই মনে করবে তুমি চেন। তবে হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখ দুম্ করে যেখানে সেখানে প্রেমে পড় না—তাহলে সেখানেই পড়ে থাকবে।

রঞ্জনা (লজ্জিত)—কি যে বলেন!

মনসিজ—'কি যে বলেন' না—সারা জীবন এই দেখছি।

(কোথায় কে আবার হেসে উঠল)

(রেগে) থামলে না কি!

রঞ্জনা—তাহলে আমাকে কি করতে হবে?

মনসিজ—প্রথমে জগৎবাবুকে বলতে হবে—আপনি কি সুন্দর। উনি জগৎবাবু বলবে ইয়ারকি করছেন কেন! আমার কাজ আছে। তার উত্তরে তুমি বলবে না সত্যি বলছি, হঠাৎ দেখলে আপনাকে বিচ্ছিরি লাগে অস্বীকার করব না কিন্তু অনেকক্ষণ দেখলে—বুঝতে পেরেছ যাও। কি দাঁড়াও। দুবার ঢোঁক গিলে নাও। নাও আমাকে বল—বল—

রঞ্জনা (যেন সত্যি এমনভাবে বলে—সত্যি আপনি কি সুন্দর! (এমন চমৎকার হয় বলা যে মনসিজ কথাটা সত্যি ভাবে। লজ্জারাঙা মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে—)

মনসিজ—কি যে বল। চুল পেকেছে, বয়স হয়েছে। তবে যৌবনে—

(কে কোথায় হেসে ওঠে। মনসিজ চমকে ওঠে। চেয়ে দেখে রঞ্জনা জগৎবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে চটে তারপর নিজের শিক্ষার চমৎকারিত্বে আনন্দিত হয়। শেষে রঞ্জনার শিখে নেবার কৌশলে ভয় হয়। রঞ্জনাকে লক্ষ্য করে।)

রঞ্জনা (জগৎবাবুকে)—কিছু মনে করবেন না। আপনাকে বিরক্ত করছি। কিন্তু একথা না বলেও পারছি না—আপনি ভারী সুন্দর।

জগৎ—ইয়ারকি করছেন কেন? আমার কাজ আছে।

রঞ্জনা—আপনি বিশ্বাস করবেন না জানি। কারণ আপনাকে অনেক কুৎসিত বলেছেন। আপনি নিশ্চয় বিখ্যাত

শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর 'শীত' মূর্তিটা দেখেছেন। সেই লোকটি মোটেই আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সুন্দর নন্। কিন্তু বলুন দেখি সেটা যে সুন্দর একথা কি বলে দিতে হয়।

জগৎ—আপনি বলছেন আমার মধ্যে সেই রকম—

রঞ্জনা—কি রকম শুকনো, রুক্ষ সৌন্দর্য। পাতা ঝরা বসন্তের গাছ যেন, কালো অনড় যেন খানিকটা পাথরের তাল।

জগৎ—আমার রঙটা কিন্তু জানেন এত খারাপ ছিল না। লিভার-এর গণ্ডগোলে—

রঞ্জনা—মুখে হতাশা, শান্ত বসে আছে, আর যেন কেউ নাই। কাজেও নাই, মাথা গুঁজবার জায়গা নাই। ক্লান্তি তার সর্বাঙ্গে।

জগৎ—আমার চেহারা কি জানেন, অফিসে চিরদিনই। যার ফলে ঐ [illegible] নাই। নিজে রান্না করি—আর বাড়ী ফিরে স্টোভে দেখতে হবে ভাত ডাল। এগারোটার আগে বাড়ী ফিরি না। [illegible] মিলছে—আমার সঙ্গে যাওয়ার জায়গা নাই, মনের কথা বলার ঠাঁই নাই।

রঞ্জনা—সমস্ত পৃথিবীতে সে যেন একা।

জগৎ—এটা খাঁটি সত্যি কথা। দেখুন বারোটা বাজতে চল্ল কারু দেখা নাই। বলুন না এতবড় অফিস আমার পক্ষে চালানো সম্ভব?

(মনসিজ ঘোড়দৌড়ে রঞ্জনা ভীষণ ক্লান্ত হয়েছে আর পারল না। মাথা ধরে চেয়ারে বসে পড়ল।)

—কি হল, কি হল? অমন করে বসে পড়লেন কেন?

রঞ্জনা—মাথাটা বড্ড ধরেছে।

জগৎ—মাথা ধরেছে। ওরে কে আছিস্, জল নিয়ে আয়

(কেউ নাই। জগৎ ভাবে কাজ ছেড়ে যাবে কিনা।)

—আপনি একটু বসুন, আমি এখুনি জল নিয়ে আসছি। বেয়ারা-গুলো যে কোথায় থাকে!

(বেগে প্রস্থান)

মনসিজ—বাঃ, বেশ হচ্ছে, এমনি করে চালিয়ে দাও। মনে রেখ এটা সিঁড়ির প্রথম ধাপ।

রঞ্জনা—আমি আর পারছি না। আমার মাথা ঘুরছে বড় ক্লান্ত লাগছে। আমি বাড়ী যাই—

মনসিজ—বাড়ী যাই মানে, এই সুযোগ কেউ ছেড়ে দেয় নাকি?

রঞ্জনা—আমি পারব না। আমার ভাল লাগছে না। বিচ্ছিরি।

মনসিজ—তোমাকে একদিনে আমি তোমার জীবনে পূর্ণ সফলতা দেব প্রতিজ্ঞা করেছি। আর তুমি তাকে ফেলে দিতে চাচ্ছ?

রঞ্জনা—কিন্তু এমনি করে?

মনসিজ—নয় কেন? এর থেকেও বড় সহস্রগুণ খারাপ কাজ লোকে করে জীবনকে সফল করবার জন্যে।

রঞ্জনা—আমি পারব না।

মনসিজ—তাহলে তোমার বাবা না খেয়ে থাকবেন, রুগ্ন মার চিকিৎসা হবে না। ভাইবোনেদের পড়াশোনা হবে না। মনে রেখ রঞ্জনা তুমি কিছু জান না। আজকের সুযোগ হারালে সারা জীবন পস্তাতে হবে।......

(সরে যায়)

জগৎ—এই যে জল। আমি বলি একটু মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে দিন।

(রঞ্জনা জল খায়। জলের ঝাপটা দিয়ে একটু সুস্থ বোধ করে।)

রঞ্জনা—আপনাকে ধন্যবাদ।

জগৎ—না না ধন্যবাদের কিছু নাই। আমি শুধু কর্তব্য করেছি।.. ও ঘরে আয়নায় নিজের মুখটা দেখছিলাম—কিছুতেই সুন্দর মনে হল না। বলুন এই নাকটা—

রঞ্জনা—আমি তো আপনাকে আলাদা আলাদা করে দেখিনি। এক সঙ্গে আপনাকে দেখেছি আমার সুন্দর লেগেছে।

জগৎ—একটা সত্যি কথা বলি আপনাকে। যখন অফিস আসি আর আমার পায়ের কাছে আমার ছায়াটা পড়ে মনে হয় সত্যি বোধহয় আমি কুৎসিত নই। ওই ছায়াটাকে—দয়া করে হাসবেন না, আমার সুন্দরই লাগে।

রঞ্জনা—ঠিক বলেছেন। এখানে আপনার ছায়া, আপনার সমস্ত রূপটার সাংকেতিক ছবি আপনার চোখের সামনে ধরছে। কাজেই দেখুন আপনি বুঝতে পারছেন আমি ঠাট্টা করছি না।

জগৎ—ওই যে সেক্রেটারী সাহেব এলেন। আমি দেখি। (দ্রুত প্রস্থান)

মনসিজ—কি রকম বুঝছ।

রঞ্জনা—মন্দ নয়। অন্ততঃ লোকটি কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ পেল ও কথায়, সে জন্যও আনন্দ হচ্ছে।

মনসিজ—এবার প্রস্তুত হও। এবারের পরীক্ষা আর একটু কঠিন। তালিম নাও—তালিম দাও।

রঞ্জনা—(টেলিফোন ধরে)—ভাই টেলিফোন তুমি কি সুন্দর।

মনসিজ—উঁহু ছুঁয়ো না, ছুঁলে চলবে না। গায়ে হাত দেওয়া বারণ। তুমি বরং ঐ পাখাটাকে বল।

রঞ্জনা—পাখা তুমি কি সুন্দর। (হঠাৎ মনসিজকে) আপনি কি সুন্দর।

মনসিজ—(খুশী)—ছোটবেলা থেকেই আমাকে দেখতে ভাল—মানে তুমি আমার সঙ্গে ফাজলামো করছ নাকি?

—আর এই বরুণ ছোঁড়াটাকে আমি যদি না—(বারান্দার দিকে প্রস্থান)

(দরজা দিয়ে পেট মোটা, গোল একটি লোক ঢুকল। তিনি সেক্রেটারী নাম রবি ভোস।)

রবি—এই যে নমস্কার। আপনার কথা নীচে জগৎ আমাকে বলছিল। আপনি নাকি নানা গুণে অলংকৃতা। কিন্তু মুস্কিল আমাদের হাতে এখন কোন খালি চাকরি নাই। অত্যন্ত দুঃখিত, নমস্কার।—ও কি অমন করে কি দেখছেন?

রঞ্জনা—কিছু না।

রবি—তবে অমন করে কি দেখছিলেন। আপনার সঙ্গে আগে কোথাও দেখা হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

রঞ্জনা—না আপনাকে আজই প্রথম দেখছি তাই অবাক হয়ে গেছি।

রবি—কেন কেন?

রঞ্জনা—আমার ধারণা ছিল সেক্রেটারী মাত্রই পেট মোটা (প্রায় ৬ ফুট আবেষ্টনী দেখাল) গোল আর

বেঁটে হয়। (প্রায় দু ফুট উচ্চতা দেয়াল)। আপনাকে দেখে আমার ভুল ভাঙ্গল।

রবি—আমি গোল পেট মোটা নই?

রঞ্জনা—আপনি খুব সুন্দর দেখতে।

রবি—কি বললেন!

রঞ্জনা—জোরেই তো বলেছি—শুনতে অসুবিধা হয়েছে নাকি?

রবি—তাই মনে হচ্ছে। আপনি বলেছেন আমি খুব সুন্দর।

রঞ্জনা—হ্যাঁ তাই কি।

রবি—আমি সুন্দর হলে, আমার এতবড় জীবনে কেউ না কেউ, কোন না কোনদিন একথা বলত।

রঞ্জনা—যাদের চোখ নাই আর যারা বোকা তারাই শুধু বলেনি।

রবি—না না একথা স্বীকার করতে পারি না। আমার মা, বোন, ভগ্নীরা সবাই বোকা কিছুতেই হতে পারে না।

রঞ্জনা—যদি কোন চাকরি খালি না থাকে তাহলে আমি চলি।

রবি—দাঁড়ান একটু। আমার মৌলিকত্বটি কথা বলছিলেন। আমার মা আমার ছাতকে সুন্দর বলে। বলে বেশ মোটা মোটা সুন্দর পুরুষের হাত।

রঞ্জনা—আপনার মায়ের কথার ওপর কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে। তবে তিনি ঘরের মানুষ—বাইরের পৃথিবীকে কেমন করে জানবেন। আর আপনার বোন—

রবি—সে আমার চরিত্রের দৃঢ়তার খুব প্রশংসা করে। আমি অজও বিয়ে করিনি কিনা। ভগ্নীরা ছেলেমানুষ—তাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। Gregory Peck এর সিরিজ না হলে তাদের পছন্দ হয় না।

রঞ্জনা—আপনি কি জানেন, আপনাকে ঠিক মদনদেবের মত দেখতে।

রবি—তিনি কে চিনতে পারলাম না।

রঞ্জনা—মদন যিনি প্রেমের দেবতা।

রবি—You mean Cupid? না না।

রঞ্জনা—ওখানেই তো আপনারা ভুল করেন। একটা বিদেশী Comparison আপনাদের চাই। আমাদের দেশের মদনদেব ওই রকম ছেলেমানুষ নন। তিনি বেশ গোলগাল হাসিখুশী লোক যাদের দেখলেই মনে হয় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পাশা খেলতে খেলতে পৃথিবীর সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দেবেন। যেমন কাজের লোক—তেমনি চেহারা। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

রবি—আমাকে এই রকম দেখতে? না না।

রঞ্জনা—[illegible]

রবি—না থাক।

রঞ্জনা—তবে আপনাকে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি—কিছু মনে করবেন না। আপনার পোশাকটাকে দেখলে মনে হয় হাঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

রবি—[illegible] আমাকে নাকি মদনদেবের মত দেখতে! আমি যেন পাগল হয়েছি [illegible] বললাম [illegible] বলছেন একটি অল্পবয়সী মেয়ে—আমার [illegible] ভগ্নীদের থেকে [illegible] পাঁচ বছরের বড়।

—আপনি বাকি লোক দেখলেই ও রকম সুন্দর সুন্দর বলে থাকেন।

রঞ্জনা—আমি জীবনে মাত্র দুজন লোককে ও কথা বলেছি। [illegible] হলেন আপনি।

(জগৎবন্ধু দৌড়ে ঢুকলেন।)

জগৎবন্ধু—স্যার পরীক্ষকেরা [illegible] এসে গেছেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কটার সময় এসেছেন। বলেছি ৯টার সময়। আপনি স্যার এবার ঘরে গিয়ে বসুন। (দ্রুত প্রস্থান।)

রবি—আপনাকে [illegible] কাল যদি আসেন আমরা এ বিষয়টা আর একটু আলোচনা করতে পারি।

রঞ্জনা—কাল?

রবি—কাল বুঝি অসুবিধা আছে। তাহলে এ কাজ করুন কাল থেকে আপনি আমার টাইপিস্ট হোন। একজন অবশ্য আছে—তাকে ছাড়িয়ে দেব, বেচারা ভুল করে অজস্র।

রঞ্জনা—কিন্তু আমি যে টাইপ করতে জানি না।

রবি—ও কিছু না শিখে নিতে দুদিন লাগবে। তাহলে কাল আসছেন তো?

রঞ্জনা—আমি কিন্তু Short hand জানি না। কোন রকমে dictation নিতে পারি, কিন্তু তারপর নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারি না।

রবি—তাতে কি শিখিয়ে নেবখন। সে তো বেশ ভালই হবে। আপনাকে শেখাতে আমার বেশ ভালই লাগবে। জানেন এই চাকুরে Steno-গুলো এত ভুল করতে আরম্ভ করেছে যে প্রাণ যায়। আপনার সঙ্গে বেশ ঘরোয়া হওয়া যাবে। [illegible] কি বলেন?

রঞ্জনা—কেবল একটি সর্তে—

রবি—আমি আপনাকে চাকরি দিচ্ছি আর আপনি সর্ত শোনাচ্ছেন। বলুন—[illegible] শিরশ্ছেদের হুকুম শুনতেও প্রস্তুত।

রঞ্জনা—ওই রকম সাজে পরে [illegible]

রবি—[illegible] আছে, কাল [illegible] পরে [illegible] এইটুকু করতে পারেন না।

রঞ্জনা—[illegible] ভাল লাগে।

রবি—[illegible] একটা [illegible] করতে [illegible] আজ সন্ধ্যা থেকেই [illegible] লাগবে। মাকেও লাগিয়ে [illegible] একদিন না ঘুমালে আর কি হয়। কি বলেন? (দ্রুত ভেতরে প্রস্থান।)

মনসিজ—কি রকম হচ্ছে?

রঞ্জনা—আমার ভয় লাগছে। ওই লোকটা ওর বাড়ীর সব লোককে সারারাত জাগিয়ে রাখবে শুধু জামা ইস্ত্রি করার জন্যে।

মনসিজ—ওরা তো পারে। ভয় পেয়ো না। যেভাবে চলেছ এই ভাবে চললে সন্ধ্যার আগেই সব নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

রঞ্জনা—ওই লোকটা ওর বুড়ো মাকে খাটাবে না তো। তাহলে আমি প্রাণপণে যাকে তাকে সুন্দর বলে যাবো। .....আচ্ছা নিষ্পত্তি কিসে হবে?

মনসিজ—তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। নিজেই সময় মত বুঝতে পারবে এইবার

কাজ শেষ হোল। না না আমাকে আর সুন্দর বলা চলবে না। প্রস্তুত হও এবার তিনজনা একসঙ্গে।

রঞ্জনা—কি করে বলব? এক একজনকে একবার। যেমন যেমন ঢুকবে?

মনসিজ—উহুঁ সবাইকে একসঙ্গে বলবে।

রঞ্জনা—একসঙ্গে?

মনসিজ—হ্যাঁ আমি বারান্দায় চললাম।

(প্রস্থান)

(দুজন পরিচালক কথা বলতে বলতে ঢুকলেন)

ভরত—এত বছরে জগৎবাবুর মুখে এমন প্রশংসা কারু শুনি নাই।

শম্ভু—ভদ্রমহিলার নিশ্চয় অসাধারণ [illegible] আছে। জগৎবাবু ওকে [illegible] করেছে।

ভরত—একেবারে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ভাবলাম লোকটা পাগল হল নাকি।

শম্ভু—তার উপর হাসি দেখেছিলে। বোধহয় গত কুড়ি বছরে ওকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম।

ভরত—বলে কি উনি [illegible] কালেই কোম্পানীর বাড়বাড়ন্ত হবে। এই যে নমস্কার।

শম্ভু—এই যে নমস্কার। [illegible] আপনার দেখছে।

রঞ্জনা—নমস্কার, আপনারা কি সুন্দর।

ভরত—আঁ! কি বললেন।

শম্ভু—কি করে জানলেন আমরা সুন্দর।

রঞ্জনা—কেন সবাই যেমন করে জানে—চোখ দিয়ে দেখে।

শম্ভু—যাই বল ভরত, মহিলার Power of observation remarkable.

ভরত—মনে আছে কলেজে পড়ার সময় তোমার সঙ্গে তর্ক করতাম কে বেশী সুন্দর আমাদের মাঝে। আজ সমাধান হোল।

শম্ভু—কি রকম spontaneous.

ভরত—Prucer is always Spontaneous.

উভয়ে—আচ্ছা চলি, নমস্কার, পরে দেখা হবে।

(কি রকম spontaneous ইত্যাদি বলতে বলতে উভয়ের প্রস্থান।)

(প্রধান পরিচালক এলেন। বরঞ্চ বলা চলে প্রধান পরিচালকের ছেলে। বয়স ৩৫-৩৭। কিন্তু চেহারায় বিশেষত্ব আছে। গাম্ভীর্য আর হাসি খুবই সহজ এর কাছে। ব্যবহার খুব সরল।)

পরিচালক—নমস্কার। আপনাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আপনি করেছেন কি বলুন দেখি। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অফিসটা দিয়ে শুধু দুর্বোধ্য কাজের ধোঁয়া গন্ধ বেরিয়েছে আর একরাতে সব পাল্টে গেল। সমস্ত জিনিস ঝকঝকে তকতকে যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। আমাদের জগৎবাবুর মুখে খালি বিরক্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না, কেউ তাকে কখনও হাসতে দেখেনি। ওই চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখেনি। সে আজ সবার কাজের তদারক করছে, হাসিমুখে সকলকে নমস্কার জানাচ্ছে একবার যেন—হ্যাঁ একবার মনে হোল নিজের ছায়াকেই নমস্কার করছে। আপনি সত্যি ভেলকি দেখিয়ে দিয়েছেন।

রঞ্জনা—আমি কিছুই করিনি। ও সব আপনি হয়েছে।

পরিচালক—দেখুন না আমাদের ফেরে তৈরী ১২টার আগে কোনদিন আসেন না, আজ ৯টা থেকে এসে কাজ করছেন। কিভাবে করলেন বলুন তো অসম্ভবকে সম্ভব। আমি বরঞ্চ আপনার কাছে শিখবো—তার জন্যে যা দাম লাগে আমি দিতে রাজী। কি চাবি দিয়ে এদের মনের দরজাগুলো খুলে দিলেন?

রঞ্জনা—'আপনি কি সুন্দর'।

পরিচালক (থতমত খায়)—তার মানে? বুঝতে পারলাম না।

রঞ্জনা—এই কথা ওদের সকলকে বলেছি—সকলকে। 'আপনি কি সুন্দর'।

পরিচালক—মানে আপনি ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন—আর মনে মনে ওই কথা ভেবেছিলেন।

রঞ্জনা—না, আমি জোরে স্পষ্ট করে সকলকে বলেছি 'আপনি কি সুন্দর'।

পরিচালক—তাতেই এই রকম হয়ে গেল!

(ভরত আর শম্ভুর জোর হাসি ভেসে এল।)

হ্যাঁ এবার আমার বিশ্বাস হয়েছে। ওই দুজন ঝগড়া না করে এক ঘণ্টাও থাকতে পারে না। আর শম্ভু আজ হাসছে।

(আবার হাসি)

ওদের মধ্যে কাকে আগে সুন্দর বললেন?

রঞ্জনা—কাউকে না। দুজনকে একসঙ্গে বললাম।

পরিচালক—দুজনকে একসঙ্গে! বাঃ বাঃ। ভাবছি কি আপনাকে আমাদের পরিচালক সমিতিতে নেব। কি বলব আপনাকে ওই দুজনের দিবারাত্রি ঝগড়ায় আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

(পরিচালক দরজা পর্যন্ত গিয়ে দেখে এল)

—কি আশ্চর্য ওরা সেক্রেটারীর পিঠ চাপড়ে হাসছে। অথচ ওকে তাড়াতে ওরা কাল পর্যন্ত বদ্ধপরিকর। কে তাড়াবে এ নিয়ে ঝগড়া বাধল বলে সেক্রেটারীটা টিকে গিয়েছে।

—সত্যি আপনাকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রঞ্জনা—না না আমি তো কিছুই করিনি।

পরিচালক—চলুন আজই আপনাকে পরিচালক সমিতিতে নেব। ...... বাবাঃ আপনার সাহস আছে এতগুলো পুরুষকে আপনি নাচিয়ে বেড়িয়েছেন।

রঞ্জনা—নাচাই নি তো। আমি যে তাদের সত্যি সুন্দর ভাবি।

পরিচালক—তার মানে?

রঞ্জনা—সৌন্দর্য বোধটা আপেক্ষিক। অর্থাৎ আপনার যাকে সুন্দর লাগে, অন্যের তাকে লাগে না, তিনি হয়তো সুন্দর ভাবেন যাকে আপনি কুৎসিত ভাবেন।

পরিচালক—তার মানে আপনি বলছেন, সৌন্দর্য বোধের কোন মানে নাই?

রঞ্জনা—মানে নিশ্চয়ই আছে। মন আর দৃষ্টি থাকলে সবাইকেই সুন্দর লাগবে। অর্থাৎ কিছু না কিছু সৌন্দর্য সবার মধ্যেই আছে—এমন কি ঘোর কদর্যের মধ্যেও। দেখতে জানলেই হোল।

পরিচালক—জগৎবাবু, সেক্রেটারী তাহলে সত্যি সুন্দর?

রঞ্জনা—নিশ্চয়ই। সেক্রেটারীকে দেখলেই মনে হয় তিনি সেক্রেটারী ছাড়া আর কিছু নন। সেই নির্ভরতা ওঁর সৌন্দর্য। আর জগৎবাবু সদা ব্যস্ত, সদা ঝঞ্ঝাটগ্রস্ত, স্ত্রীর জ্বালায় অস্থির—কাজের লোক হিসেবে সুন্দর। ওকে দেখলে মনে হয় মাটিতে ওঁর শিকড় গাজিয়ে আছে—উনি অন্তত।—ওই অবস্থায় অল্পবয়সী, ফর্সা কাউকে কি ভাল লাগবে।

পরিচালক—আমাকে বোধহয় এই সব কোন দলের মধ্যে ফেলা যায় না।

রঞ্জনা—কেন বলুন দেখি?

পরিচালক—কারণ আপনি আমাকে ছাড়া আর সবাইকে সুন্দর বলেছেন।

রঞ্জনা—আপনাকে বলার প্রয়োজন আছে মনে করিনি।

পরিচালক—কেন, কেন?

রঞ্জনা—কারণ আপনি সত্যি সুন্দর।

পরিচালক—আমাকে ঠাট্টা করলে কিন্তু ভারী চটে যাই।

রঞ্জনা—ঠাট্টা যে করছি না এটা আপনি মনে মনে জানেন বলেই চটবেন না।

পরিচালক — উঃ আমি কি করি বলুন তো?

রঞ্জনা— কেন বলুন দেখি?

পরিচালক — আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করতে পারছি না আবার বিশ্বাস করতেও ভরসা হচ্ছে না। আচ্ছা আজ সকাল থেকে যাদের বলেছেন তার মধ্যে—না না আপনাকে উত্তর দিতে হবে না।

রঞ্জনা—আয়নার সামনে একা হয়ে দাঁড়ালে নিজেই বুঝতে পারবেন। কাউকেই আর বলে দিতে হবে না।

(জগৎবাবু দৌড়ে ঢোকেন)

জগৎবাবু—স্যার Miss Molly এসেছেন স্যার। আপনাকে ডাকছেন একবার।

পরিচালক—কেন Miss Molly?

জগৎবাবু—(আশ্চর্য)—কেন স্যার উনি আপনাকে বৈশাখ মাসে বিয়ে করবেন বলে খবর বেরিয়েছে।

পরিচালক—আপনি গিয়ে বলুন, এখন কাজে ব্যস্ত আমি যেতে পারব না।

জগৎবাবু—আচ্ছা স্যার। (দ্রুত প্রস্থান)

পরিচালক—হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম। আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি সুন্দর। এমন কিছু বলুন যাতে আমার বিশ্বাস হয়।

রঞ্জনা—আপনি মদনদেবের মূর্তি দেখেছেন?

পরিচালক—মদনমোহন?

রঞ্জনা—না মদনমোহন নয়। মোহনমদন বলতে পারেন।

পরিচালক—যিনি শিবের গায়ে তীর মেরে হরগৌরী মিলন করেছিলেন?

রঞ্জনা—ঠিক ধরেছেন।

পরিচালক—হ্যাঁ কালিদাসের কুমারসম্ভব পড়েছি। বোধ হয় ছবিও দেখেছি দু একটা রামায়ণে না মহাভারতে।

রঞ্জনা—আরে না সে তো লোক দেখানো ছবি। আমি বলছি আপনাকে দেখতে আসল মদনদেবের মত।

(মর্নাসঞ্জ মুখ বাড়ায়। খুশীতে তাকে বাঁদরের মতো দেখতে হয়েছে, হাতে হাত ঘষছে)

পরিচালক—মদনদেবের মূর্তি বুঝি পাওয়া গেছে?

রঞ্জনা—অনেক দিন।

পরিচালক—[illegible] ওই দোষ আর কোন খবরই রাখা হয় না। তা উনি যে historical figure তা তো জানতাম না।

রঞ্জনা—Historical আর practical

পরিচালক—[illegible], আজকে [illegible] থেকে ভাল লাগছে, আমাকে কেউ একটা সুন্দর লোকের মত দেখতে। মূর্তিটা বুঝি খুব সুন্দর।

রঞ্জনা—খুব।

পরিচালক—কোন ফটো না ছবি আছে দেখবার মতো।

রঞ্জনা—একটা ছবি আছে

পরিচালক—কোথায়?

রঞ্জনা—আমার মনে।

(দুজনের প্রতি দুজনের আকর্ষণ এত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে, দুজনাই চুপ করে যায়।)

(মিস Molly এসে ঢোকেন।)

মলি—এই নাকি তুমি কাজে ব্যস্ত!

পরিচালক — মলি তোমাকে আমি অফিসে আসতে বারণ করেছি।

মলি—কেন বারণ করেছ আজ সেটা বুঝতে পারছি।

পরিচালক—এই মহিলাটি বলেছেন আমি নাকি সুন্দর।

মলি—ওদের মতো মেয়েদের ভাল করেই জানা আছে। কি বললে তোমরা খুশী হবে।

পরিচালক—অসভ্যের মতো কথা বোল না মলি।

মলি—নিজে এতক্ষণ খুব সভ্যতা করছিলে।

পরিচালক—আমি কোন অন্যায় করিনি।

মলি—কেবল একটি মেয়ের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করছিলে। আমি ডেকে পাঠালাম, বলা হোল কাজ করছি।

পরিচালক—আমি তোমার হুকুম মানতে বাধ্য নই।

মলি—তবে তোমার হুকুম মানতে আমিও বাধ্য নই।

পরিচালক—এই অফিসে আমার হুকুম মানতে হবে! শোন মলি আমি তোমায় দুঃখ দিতে চাই না। আচ্ছা ; আপনি এইমাত্র বললেন না, আমি খুব সুন্দর।

রঞ্জনা— হ্যাঁ বলেছি।

মলি—কে সুন্দর—ও (হাসে) এমন মিথ্যাবাদী আমি দুটো দেখিনি।

পরিচালক—মুখ সামলে কথা বলবে মলি।

মলি—তোমার গায়ে যে জ্বালা লাগল।

রঞ্জনা—আমি কিন্তু সত্যি ওকে সুন্দর মনে করি।

মলি—ওই রকম লোক! ভেতরে ঢোকা চোখ। হাতে পায়ে ভালুকের মত লোম। চুল পাকতে শুরু করেছে।

রঞ্জনা—সব মিলে মনে হয় না ওঁর ওপর নির্ভর করা যায় উনি সত্যিকারের পুরুষ—কি সুন্দর।

মলি—দেখতে এক রকম বলা চলে—সুন্দর কিছুতেই বলা চলে না। ও সুন্দর হলে রাস্তার যত লোক সব সুন্দর!

পরিচালক—আচ্ছা মলি সত্যি করে বল দেখি তুমি আমায় সত্যি সুন্দর মনে কর না।

মলি—মিথ্যা বলা আমার স্বভাব নয়। তোমাকে ভালবাসি অন্য গুণের জন্যে।

পরিচালক—সে গুণের একটা কি আমার টাকা?

মলি—তা বলতে পার। ওটা না হলে একেবারেই চলে না।

পরিচালক—এবার আমি একটা সত্যি কথা বলব শুনবে মলি। তুমি অন্ধ—না কানা, তোমার চোখ নাই। সুন্দর কিছু তুমি দেখতে পাও না কারণ তোমার চোখদুটো কুৎসিত, তাই সব কিছু তোমার কাছে বিশ্রী, বিকট।

মলি—তুমি আমাকে এই সব বলতে পার।

পরিচালক—না পারব কেন? তুমি না আমাকে অসুন্দর বললে।

মলি—এখনও তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার গালা-গাল সহ্য করতে হবে।

পরিচালক—গালাগাল নয় সত্যি কথা। তুমি যেমন বললে।

মলি—মনে করছ আমার বলার কিছু নাই।

পরিচালক—থাকবে না কেন, তুমি যে ওইটাই শিখেছ! তোমার সব ময়লা।

মলি—ইতরের মত কথা বলবে না।

পরিচালক—বোকার মত চেঁচাবে না।

মলি—ছোটলোক!

পরিচালক—চুপ কর!

রঞ্জনা—রেগে গেলে আপনাদের দুজনকে এত সুন্দর দেখায়।

(দুজনের ওপর দু'রকম ফল হোল। দুজনাই চুপ করে গেল। মলি রাগে কেঁদে ফেলল। পরিচালকের রাগটা কমে গেল)

মলি—আমি যদি জীবনে কখনও তোমার মুখ দেখি।

পরিচালক—তোমার আমার পৃথিবী আলাদা মলি। বিয়ে করার আগে ভেবে দেখ আমার এই সুন্দর জীবনে তুমি আছ কিনা।

মলি—তোমাকে বিয়ে করে সারা জন্ম কেঁদে মরব না কি!

রঞ্জনা—ওঁকে কাঁদলেও বেশ সুন্দর দেখায়।

মলি—উঃ!

পরিচালক—সেই ইরের মতো দেখায়।

মলি—উঃ!

(বেগে প্রস্থান)
(পরিচালক ভাবে)

রঞ্জনা—কি ভাবছেন?

পরিচালক—ভাবছি। আমি যদি কোন দেবতা হতাম বেশ হোত। নিজের ইচ্ছামত চেহারাটা সুন্দর করে নিতে পারতাম। বেশ লম্বা হতাম, চুল একটাও পাকা থাকত না, বড় বড় চোখ, বড় নাক, একেবারে যেমন হলে নিখুঁত হয়।

রঞ্জনা—কি দরকার। আজ আমার কাছে সব সুন্দর হয়ে উঠেছে।

পরিচালক—সত্যি আমি যদি তোমার আশার মত সুন্দর হতাম।

রঞ্জনা—আজ সকালেও জানতাম না যে সৌন্দর্য নির্ভর করে মনের ওপর, সুন্দর দেখতে জানা চোখের ওপর। দেখ না আজ আমার কাছে ওই টেবিল, চেয়ার, গাছ, রাস্তা, পাখী, সব সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখ তো কি সুন্দর কালো মেঘ উঠেছে, কি চমৎকার ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছে।

পরিচালক—তুমি আমার জীবনের সাথী হবে? আজ সন্ধ্যাতেই আমি তোমার বাবার অনুমতি চাইতে যাব।

(সেক্রেটারী ঢুকলো। পেছনে ভরত - শত্রুঘ্ন)

বিবি—স্যার, এইমাত্র আমরা একটা বোর্ড মিটিং সেরে দুটি Resolution সর্বসম্মতিক্রমে জানাচ্ছি।

(জগৎবাবু এসে দাঁড়াল)

পরিচালক—কি?

বিবি—দুটোই অবশ্য আপনার ব্যক্তি সম্পর্কে।

পরিচালক—আমার সম্পর্কে?

ভরত—তুমি যদি না রাখ আমি আজই resign করব।

শত্রুঘ্ন—আমিও পদত্যাগ করব তবে আজ নয় কাল।

পরিচালক—কি ব্যাপার?

ভরত—বলছে।

বিবি—এক, এই মহিলাকে পরিচালক সমিতিতে নিতে হবে। আর দুই ওঁকে আপনাকে বিবাহ করতে হবে।

পরিচালক—মানে—

ভরত-শত্রুঘ্ন—আমরা একমত।

(মনসিজ মহাস্ফূর্তিতে বেরিয়ে এল।)

মনসিজ—বাঃ বাঃ এই তো চাই। ধর্ম - অর্থ - কাম - মোক্ষঃ বাঃ।

শালা বরুণ বলেছিল আমি বুড়ো হয়ে গেছি।

(খুব জোরে মেঘ ডাকল)

এই বরুণ একটু অপেক্ষা কর ভাই। আমি আসছি। পুরন্দরের কাছ থেকে মোটা বর্কশিস্ আদায় করতে হবে।

(জোরে বাজ পড়ল)

অভিনন্দন — অভিনন্দন — (প্রস্থান)

(জোর বাতাস আর বৃষ্টি সুরু হোল। জগৎবাবু দরজা বন্ধ করতে গিয়ে)

জগৎ—কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে।

(দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলেন)

যবনিকা

জনি হ্যাজার্ড
১০
ফ্র্যাঙ্ক রবিন্স

মাদাম হান মিন এর ধাপ্পায় পড়ে হেলিকপ্টার পাইলটরা দেখল যে সরকার পক্ষের বদলে তাদের আসলে লাল বিদ্রোহীদের হয়েই কাজ করতে হবে। আর তাদের মধ্যে দুজন পালাবার চেষ্টা করতেই ...

খাওয়া শেষ হলে লীডার হান মিন ব্রিফিং দেবেন। আর... দুজন নির্বোধ কমরেডের মৃত্যু দেখে আর কারো চালাকি করতে না যাওয়াই ভাল।

দুর ছাই! এই সব আরশোলাগুলোর জন্যে কাজ করতে পারবনা জুয়ান। রাস্তা একটা বার করতেই হবে ...

আমাদের একজন করে লোক প্রতিটি হেলিকপ্টারে থাকবে পালাবার চেষ্টা করলেই ভয়ানক শাস্তি!

গোল দাগ দেওয়া জায়গায় মাল ফেলতে হবে। অন্যখানে সর্বত্রই গভীর জঙ্গল ...
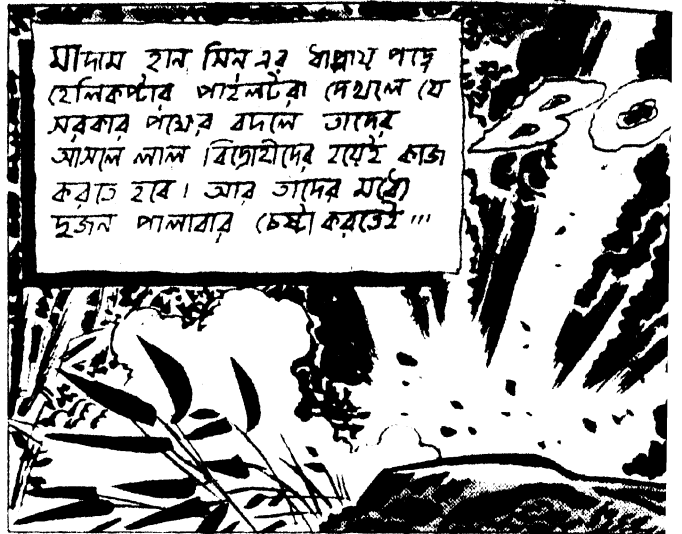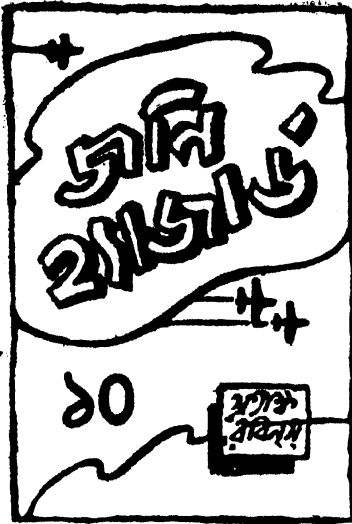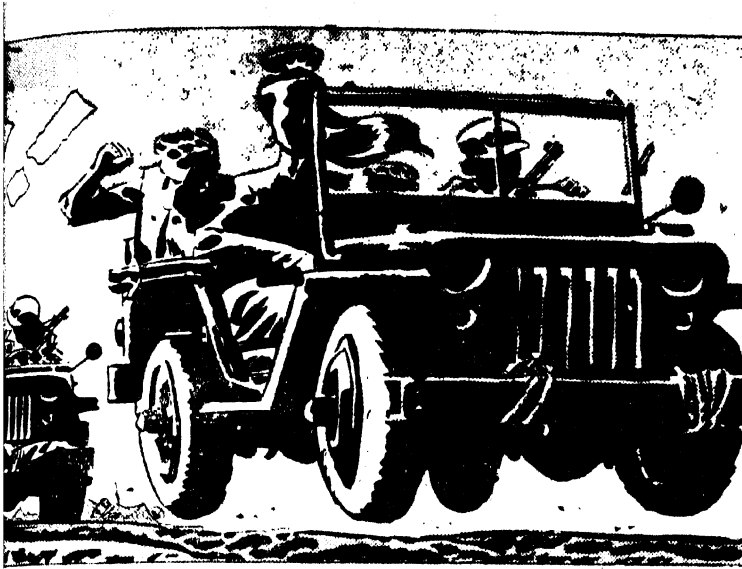
রাস্তার ধারে ধারে মাইন পাতা.... বেচারীরা এতটুকু সুযোগও পেলনা....

পারে....
কাল ভোরে রওনা হতে হবে। নির্দিষ্ট জায়গায় মাল ফেলে ঘাঁটিতে ফিরে আসবে। তোমাদের নিরাপত্তার জন্যে ....

বিষাক্ত জল... হিংস্র জন্তু... জংলী ব্যাধি.... এসব, যারা পায়ে হেঁটে এই ঘাঁটি থেকে বেরোতে চায় তাদের জন্য ওৎপেতে রয়েছে ....
এখন আর কারো মনে কোন সন্দেহ বা ভ্রান্ত ধারনা থাকার কথা নয়... সুতরাং নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়াই ভাল...
বা; এর কথাগুলি ভারী মিষ্টি... শুনলে শরীর জুড়িয়ে যায়!

(প্রশ্ন)

সবিনয় নিবেদন,

'অমৃত'-এর অন্যতম আকর্ষণ জানাতে পারেন বিভাগে প্রশ্নগুলো প্রকাশ করলে সুখী হব এবং উত্তরের আশায় থাকবো।

১। আমরা নামের পূর্বে 'শ্রী' ব্যবহার করি কেন? নিজের নামের পূর্বে শ্রী লেখার কারণ কি? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে 'শ্রী' লিখে রচনা পাঠালে নির্বিবাদে লেখককে শ্রীহীন করে রচনা প্রকাশ করা হয় কেন? রবীন্দ্রনাথ এক সময় নিজে থেকেই শ্রীহীন হয়েছিলেন, এর কোনো বিশেষ অর্থ বা কারণ ছিল কি?

২। বেড়ালকে বাঘের মাসী বলে কেন?

৩। প্রসঙ্গত আমরা বাপ-বাবা চৌদ্দপুরুষের উল্লেখ করি কেন? এক পুরুষ, দুই পুরুষ নয়, একেবারে চৌদ্দতে কেন?

৪। আমরা মন্দির নির্মাণ করেই তাতে কালী বা শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করি কেন? দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী কত দেবদেবীই তো আছেন? তবে কেন কালী শিব-এর প্রতি এত আকর্ষণ? দক্ষিণ ভারতে এত মন্দিরের বাহুল্য কেন? এর কোন বিশেষ ঐতিহাসিক কারণ আছে কি?

বিভূতিভূষণ রায়,
কল্যাণী স্পিনিং মিলস্,
পোঃ কল্যাণী, নদীয়া।

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

৩৫ সংখ্যা অমৃতে শ্রীসুনীলকুমার মণ্ডলের দুটি প্রশ্নের উত্তর নীচে দিচ্ছি।

মেয়েদের গোঁফ গজায় না কেন?

প্রাণী মাত্রেরই শরীরের যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কার্য নিয়ন্ত্রিত হয় হরমোনস নামক একপ্রকার রাসায়নিক রস দ্বারা। এরা প্রস্তুত হয় Endocrine-glands বা অন্তঃক্ষরিক গ্রন্থিগুলিতে। পুরুষ ও স্ত্রীর শারীরিক গঠন, আকৃতি, ও যৌন বিভিন্নতার মূলেও এই হরমোনস-গুলি। জন্ম থেকে শৈশবকাল পর্যন্ত সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের শারীরিক গঠনে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। Puberty বা বয়সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত ছেলে বা মেয়ে উভয়ের যৌন গ্রন্থিগুলো সুপ্ত থাকে। কিন্তু puberty-র পর থেকে (১২ থেকে ১৫ বৎসর) এই গ্রন্থিগুলি কার্যকরী হয়ে উঠে, আকারে বৃদ্ধি পায় এবং এদের অন্তঃক্ষরণ শুরু হয়। এই অন্তঃক্ষরণের প্রভাবেই ছেলেমেয়েদের শারীরিক গঠনে ও

মানসিক চিন্তাধারায় ভিন্ন পরিবর্তন আসে।

ছেলেদের যৌনগ্রন্থি হল testis এবং এর নিঃসৃত হরমোনগুলির নাম এ ন্ ড্রো জে ন্ স (androgens)। এন্‌ড্রোজেন্‌স্‌এর প্রভাবেই ছেলেদের মধ্যে পৌরুষিক পরিবর্তনসমূহ আসে। যেমন গলার মিহি স্বর ভেঙে অনেকটা কর্কশ হয়, শরীর আকারে বৃদ্ধি পায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ পেশীবহুল হয়, মুখে দাড়ি-গোঁফ গজায় ও অন্যান্য যৌন পরিবর্তন ঘটে।

মেয়েদের যৌনগ্রন্থি হল 'ওভারি' (ovary)। Puberty-এর সময় ovary আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং অন্তঃক্ষরণ শুরু হয়। ovary-নিঃসৃত হরমোনগুলির নাম ইস্ট্রাডায়ল (Estradiol) এবং প্রোজেস্টেরন (progesterone)। যৌবনারম্ভে এদের প্রভাবে জরায়ুর বৃদ্ধি ঘটে এবং নারীদেহের অন্যান্য লক্ষণগুলি বিকশিত হয়। যদিও স্তন গঠনে অধোমস্তিষ্ক গ্রন্থি (Pituitory gland)-নিঃসৃত প্রোল্যাক্‌টিনের (Prolactin) প্রভাবই প্রধান। কিন্তু এই হরমোন-গুলির প্রভাবে গোঁফ-দাড়ি গজায় না। একমাত্র পুরুষদের androgens-এর প্রভাবেই তা হয়ে থাকে।

বহিঃকটি-গ্রন্থি বা adrenal cortex-এ উপরিউক্ত যৌন হরমোন-গুলি পাওয়া যায়—যদিও খুব অল্প পরিমাণে। কোন কারণে যদি কটি-গ্রন্থি থেকে androgens বেশী নির্গত হয়—যেমন adernal virilism-এ—তখন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের শরীরে ক্রমশঃ পুরুষের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে। গোঁফ-দাড়ি গজায়, মুখের আকৃতি, পেশীসমূহ পুরুষের মত হয়—অর্থাৎ কিনা পুরুষালি মেয়েতে পরিণত হয়।

অনুরূপভাবে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে কটিগ্রন্থি থেকে কোন কারণে স্ত্রী-হরমোনগুলি বেশী নির্গত হলে—তার শারীরিক গঠন মেয়েদের মত হতে আরম্ভ করে। পেশীসমূহ কোমল হয় এবং আরো অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে।

শ্রীমণ্ডলের দ্বিতীয় প্রশ্ন—তিনি লাল-সবুজ এক করে ফেলেন। কেন? সত্যিই কি কালার ব্লাইণ্ড হয়?

কালার ব্লাইণ্ডনেস—চোখের এই ত্রুটি—সত্যিই অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ছেলেদের মধ্যে (শতকরা ৮ জন) বেশী হয় ও মেয়েদের মধ্যে কম হয় (মাত্র শত‹ ০·৪ জনের)। তবে ছেলেরা এ ‹ পেয়ে থাকে মায়েদের কাছ থেকে।

বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন পরী‹ দ্বারা কালার ব্লাইণ্ডদের কয়েকটি ভ‹ বিভক্ত করেছেন। যদিও বিভিন্ন জাত‹ কালার ব্লাইণ্ডনেসের লক্ষণগুলি অত‹ জটিল, দুয়েক কথায় তাদের উ‹ করছি।

(ক) মনোক্রোমেট (mon‹ chromate) বা এক-রঙদর্শী। ‹ কোন রঙকেই সঠিকভাবে চিনতে প‹ না এবং বর্ণালীর সব রঙকেই ধূ‹ বর্ণ দেখে।

(খ) ডাইক্রোমেট (Dichroma‹ বা দুই রঙদর্শী। এরা বর্ণালীর রঙকে যে কোন দুটি মৌলিক র‹ সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। যে‹ প্রোটনোপস্‌রা (Protonopes) ডিউটারানোপস্‌রা (Deutaranop‹ লাল ও সবুজকে এক করে ফে‹ প্রোটনোপস্‌রা বর্ণালীর অন্য র‹ সঠিক বুঝতে পারে না বি‹ ডিউটারানোপসরা পারে। তা ছাড়া অ‹ ট্রাইটানোপস্‌ ‹ টেটারটানোপস্‌‹ প্রথমোক্তরা সমগ্র বর্ণালীতে কেবল নী‹ সবুজ ও লাল-কমলা রঙ দেখে ‹ শেষোক্তরা নীল-হলুদে গুলিয়ে ফে‹

উষারঞ্জন রায়,
৭১, সদর বক্সী লেন, হাও‹

(উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

গত ১১ই জানুয়ারীর চণ্ডী‹ মজুমদারের প্রথম প্রশ্নের ‹ জানাই,—

রাষ্ট্রপুঞ্জে সমস্ত কাজ‹ ইংরাজীতে বাধ্যতামূলক নয়। রা‹ পুঞ্জের official language ‹ ইংরাজী, ফরাসী, চাইনিজ, রাশি‹ আরবী এবং স্পেনিস্‌। ‹ working language হল ইংরা‹ এবং ফরাসী। রাষ্ট্রপুঞ্জের বি‹ দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের স্ব‹ রাষ্ট্রভাষাতেও ভাষণ দিতে পারেন।

রমাপতি ভট্টা‹
পলো ইন্‌‹
শিলং (আসা‹

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ২৫শে নভেম্বরের অ‹ সংখ্যায় প্রকাশিত বাদলচন্দ্র মুখোপা‹ মহাশয়ের ২নং প্রশ্নের উত্তরে জানা‹ যে, বাংলাভাষায় প্রথম সাহিত্য পত্রি‹ মার্শম্যান সাহেবের সম্পাদনায় 'দি‹ দর্শন' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ‹

শ্রীরঞ্জনকুমার গু‹
১৬।১, বনমালী চ্যাটার্জি স্ট্রী‹
কলিকাতা—২

প্যারিস থেকে বলছি

দিলীপ মালাকার

প্যারিস, এপ্রিল ঃ আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই (ইনি যতখানি নীতিবান তাই ওঁকে নীতিমন্ত্রী বলে ডাকা উচিত) ঠিকই বলেছেন, স্বর্ণালংকার হচ্ছে মেয়েদের বশে রাখার হাতিয়ার। কথাটা এতই খাঁটি যে, পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট সরকারগুলো বহুকাল আগেই সেই পন্থানুযায়ী সোনার গহনা মায় সোনা বাজার হতে নিশ্চিহ্ন করেছে। এই মাসখানেক আগে পূর্ব জার্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া পরিদর্শনে গিয়ে দেখলাম মোরারজী দেশাই-এর জয়জয়কার। ওই সব দেশে সোনার গহনা বাজারে বিক্রি হয় না। বিয়ের সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন ভাবী বর-কনের দুটো সোনার আংটি। কিন্তু সোনার আংটি তৈরী করতে হলে স্যাকরাকে দিতে হবে খাঁটি সোনা। বাজারে কিন্তু সোনা বিক্রি হয় না। সব বেআইনী। তাই যেসব পরিবারে সামান্য জমান সোনা আছে তাই ভাঙিয়ে বিয়ের আংটি গড়াতে হয়। নইলে তামা, পেতল বা গিল্টি-করা গহনা বাজারে পাওয়া যাবে। কম্যুনিস্ট-শাসিত প্রতিটি দেশের গহনার দোকানে দেখেছি খালি তামা-পেতল আর গিল্টি-করা গহনা (কখনো রুপোর)। গত পঞ্চাশ বছর ধরে জগতের প্রতিটি মহিলা সমিতি আন্দোলন চালিয়ে এসেছে তাদের স্বাধীনতা আরোপ করতে। এখন প্রায় সব রাষ্ট্রে মহিলারা ভোট দিতে পারেন। তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও পুরুষ-দের মতন। কম্যুনিজমের মূল উদ্দেশ্য হল সাম্যবাদ। অর্থাৎ সবাই সমান। মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার। শ্রমিক-ধনিকেরও। যুগ যুগ ধরে মেয়েরা স্বর্ণালংকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে পুরুষের অধীনে বাস করছিলেন। কম্যুনিস্ট সরকারগুলো স্বর্ণালংকার বাতিল করে সোনার প্রচলন উঠিয়ে দিয়ে কম্যুনিস্ট দেশে নারী-স্বাধীনতা দিয়েছেন। কম্যুনিস্ট কী কথা। খাস গণতন্ত্রী পশ্চিম ইউরোপে, মায় বিলেতে আসুন না। দেখবেন এখানে বহুকাল যাবৎ খাঁটি সোনার গহনা বেআইনী। বছর বিশ ধরে এখানে চলে আসছে ১৪ ও

'সারোশ'-এর নতুন পোষাক

চুলের বাহার

'ডিয়র'-এর সান্ধ্যপোষাক

১৮ ক্যারাট সোনার গহনা। বছর কয়েক আগে এক বাঙালী সাহিত্যিকের স্ত্রীর সাথে গিয়েছিলাম প্যারিসের এক গহনার দোকানে। তিনি যেই শুনলেন যে, ১৮ ক্যারাটের বা মরা সোনার গহনা তক্ষুনি আমাকে ট্যাক্সি ডাকতে অনুরোধ করলেন। ১৪ বা ১৮ ক্যারেট সোনা সোনাই নয়। এহেন অবস্থায় আমাদের দেশের মহিলাদের শোচনীয় অবস্থা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসে অনুধাবন করতে পারছি। শুধুমাত্র আমাদের দেশেই সোনার গহনার বেহাল হয় নি ইউরোপ জুড়ে তার দুরবস্থা চলেছে বছর পঁচিশ ধরে। তবে তামা-পেতলের গহনা কম মনোরম নয়। লণ্ডন-প্যারিসে এলে সেটা মালুম হতে পারে।

আমাদের দেশের মেয়েদের বাক-স্বাধীনতা ও স্বর্ণ-শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিতে চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই। তিনি তাদের হয়ে ওকালতিও করেছেন। এত আন্দোলন, কম্যুনিজম, প্রগতিবাদী মহিলাদের উঁচু কণ্ঠে ঘোষণা সত্ত্বেও আমি দেখেছি মেয়েদের সোনার প্রতি কতখানি লোভ। অর্থমন্ত্রী মেয়েদের স্বর্ণ-শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিতে চাইলে হবে কি তারা নিজেরাই স্বর্ণ-গহনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়। পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে তারা স্বর্ণালঙ্কারই চায়। মুক্তি নয়। সপ্তাহ কয়েক আগে কম্যুনিষ্ট-শাসিত পূর্ব জার্মানীর রাজধানী পূর্ব বার্লিনের এক রেস্তোরাঁয় জার্মান সাংবাদিক দম্পতির সাথে খানা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বন্ধুপত্নীকে যে, তার হাতের ও গলার গহনাগুলো কি সোনার? ওরা দুজনেই ঘোর কম্যুনিষ্ট। অহরাত্র কম্যুনিজম জপ করে। ধর্ম-কর্ম মানে না। বন্ধুপত্নী কোন এক কম্যুনিষ্ট পত্রিকার পরিচালিকাও। কম্যুনিষ্ট এবং কমরেডানি হলে হবে কি তিনি যে সেই আদিম 'আদম-ঈভের' নারী। হাজার বছর ধরে গহনা পরার সখ। সে সখ কি কম্যুনিজমের বুলিতে ঘোচে। কম্যুনিষ্ট-শাসিত দেশে সোনার গহনা বিক্রি হয় না। আমার প্রশ্নে বন্ধুপত্নীর অবচেতন মনে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তিনি বলেই ফেললেন, "আরে না, না, এগুলো পেতলের। শুনেছি তোমাদের দেশে রাজা-রাণীদের সোনার গহনা রাস্তায় গড়াগড়ি যায়। আমার ইচ্ছে তোমাদের দেশে গিয়ে কিছু সোনার গহনা গড়িয়ে আনব।" আমি তাকে জানালাম যে, সে পথ আমাদের সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। নারী-স্বাধীনতা যেন আরও প্রগতির পথে এগোয় একমাত্র ওই কারণেই। **আমার কথায় মহিলা কেঁদে ফেলার** জোগাড়। কাঁদ কাঁদ স্বরে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হল এই যে, আমরা মেয়েরা স্বাধীনতা চাই বইকি। কিন্তু তার আগে চাই খাঁটি সোনার গহনা (আপনারা যাকে বলেন স্বর্ণ-শৃঙ্খল)। অর্থমন্ত্রীর দরদে কাজ নেই। তিনি নিজের শুভকামনায় মগ্ন থাকুন। আমাদের শুভকামনা করে তাঁর নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়া উচিত নয়। খাঁটি সোনার দাম কত। তাছাড়া পরেও আরাম, দেখিয়েও আরাম। পেতলের গহনা কে দেখে। না খোলে তার রূপ। মুখপোড়াদের......। বন্ধুপত্নী ভারত-ভ্রমণ আশা ত্যাগ করেছেন। হয়ত পাকিস্তান বা বর্মায় যাবেন তিনি সোনার গহনা সংগ্রহার্থে। চীনে গিয়ে লাভ নেই। কারণ কম্যুনিষ্ট চীনে সোনার বাজার ও সোনার গহনা বেচা বন্ধ হয়েছে ১৯৫০ সালে। আজ নয়।

পুরুষ জাতটা যেন কি রকম সাংঘাতিক। আমি বলব তারা ভয়ঙ্কর জীব। মেয়েদের বশ করতে কি শুধু স্বর্ণালঙ্কারের প্রয়োজন। তারা তাই ফাঁদ পেতেছে পোষাক ও প্রসাধনের। ইউরোপ কেন আমাদের দেশেও তো আজকাল পোষাক ও প্রসাধনের বাজার বেশ জমে উঠেছে। তবে ইউরোপে পোষাকের ফ্যাশন অনেক খরচের ব্যাপার। তার ওপর প্যারিসের ফ্যাশন তো কথাই নেই। ইউরোপীয় পোষাকের ফ্যাশন বিধান-দাতা হল প্যারিসের উচ্চসারিনা নেয়ে (ওত্‌কুচুর) গুলো। এদের এক একটা পোষাকের দাম হাজার থেকে দশ হাজার টাকা। তার সাথে প্রসাধনের দাম লাগসই।

ইউরোপে খাঁটি সোনার গহনা পাওয়া যায় না বটে, তবে রূপোর গহনায় মণি-মুক্তো বসান থাকে। ফলে গহনার দাম বাড়ে। কিন্তু তাতেও মেয়েদের মন ওঠে না। তাই ভয়ঙ্কর জাতের পুরুষরা পোষাকের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে নারী-স্বাধীনতাকে। বছরে দুবার করে মেয়েদের পোষাকের ফ্যাশন পরিবর্তন হয়। প্যারিসের দশ-বারটি ফ্যাশন হাউসের স্রষ্টারা কিন্তু সবাই প্রায় পুরুষ। পুরুষরা মেয়েদের পোষাক তৈরী করে, করে ফ্যাশন সৃষ্টি। মহিলারা নয়। কোনো বছরে হয়ত হাঁটুর ওপরে তিন ইঞ্চি ঝুলে উঠল। কোনো বছরে গাউনের ঝুল দশ ইঞ্চি বাড়ল। এই না তফাৎ। কখনো বা ওপরের দিকটা অর্ধ-নগ্ন কখনো ঢাকা। গ্রীষ্মকালীন ফ্যাশনের প্রদর্শনী হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারী-মার্চ ধরে। এবারকার গ্রীষ্মকালীন ফ্যাশনে তেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখছি না। **শোনা যাচ্ছে মেয়েদের পোষাক মডার্ণ থেকে ক্লাসিকে উঠতে যাচ্ছে। তবে** মেয়েদের ফ্যাশনে পুরুষ স্রষ্টারা মাঝে মাঝে মজাদার পোষাক তৈরী করে মেয়েদের বেশ ঠকায়। কুরূপা মহিলাকে আরও কুশ্রী করে তোলার পোষাকও এরা কম তৈরী করে না। কিন্তু অনেক মহিলা এই সব পোষাক পরিধান করে সং সেজে মনে করে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে তাকে। বলার কিছু নেই। কারণ ও যে ফ্যাশন হাউসের পোষাক। আর ভয়ঙ্কর জাতের পুরুষরা তাদের ফ্যাশন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মুচকি হেসে থাকে। চড়া দামের ফ্যাশন হাউসের পোষাক কিনতে পারে কারা? একমাত্র বিত্তবানরা। আর তারা অধিকাংশ বৃদ্ধের দল। তাদের স্ত্রীরাও বৃদ্ধা। তারাই হলেন উচ্চ ফ্যাশন হাউসের খদ্দের। বয়স্কাদের যৌবন ফিরিয়ে আনতে ফ্যাশন স্রষ্টারা তারুণ্যের পোষাক সৃষ্টি করে। যেমন তরুণীদের জন্যে টুইষ্ট নাচের বা রক এণ্ড রোলের পোষাক। ওগুলো যখন বয়স্কাদের গায়ে ওঠে তখন যা মানায় তা আর বলতে নেই।

ফ্যাশন হাউসের পোষাকের সাথে তাল রেখে চলতে হয় প্রসাধন ও চুলের ফ্যাশন হাউসগুলোর। কোন পোষাকের সাথে কোন ধরণের চুল বাঁধা মুখ-চোখের আকৃতি ইত্যাদি গবেষণার ব্যাপার। তার ওপর রয়েছে [illegible] পাউডার এবং আরও কত কি। সে এক বড়দরের ব্যবসা। মেয়েরা পোষাক, প্রসাধন ও কেশগুচ্ছের যত্নে যত সময় দেয় তার একাংশ যদি তাদের স্বাধীনতা ও উন্নতির জন্যে ব্যয় করত তাহলে জগতের চেহারা বদলে যেত। কিন্তু তারা নিজেরাই ইচ্ছে করে পুরুষদের তৈরী জালে আবদ্ধ ও বশে থাকতে ভালবাসে। মোরারজী দেশাই-এর [illegible] শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শীতের ঠাণ্ডা এখনও শেষ হয় নি। তাই চলছে বসন্তকালীন পোষাকের বাছ-বিচার। মাস দুই পরে গ্রীষ্মকালীন পোষাকের লেন-দেন তখন আরও বিস্তৃত খবর পাঠাব।

* * *

প্যারিস পৌরসভার কয়েকজন সদস্য প্রস্তাব করেছে যে, আগামী দুই-এক বছরের মধ্যে প্যারিসের সব মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী ও থিয়েটারে তরুণ ও ২৫ বছর পর্যন্ত যুবক-যুবতীদের একটি করে প্রবেশপত্র দেওয়া হবে। ওই প্রবেশপত্র বলে তারা বিনামূল্যে থিয়েটার, অপেরা, মিউজিয়ম, আর্ট গ্যালারী দেখতে সক্ষম হবে। ফলে তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীরা হবে সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। নয় ।।

সকালবেলায় আমার সংস্কৃত পড়ার কথা মনে পড়ল। কিন্তু পাখানে দেওয়া সেই হিন্দী বইখানা খুঁজে পেলাম না। টেবিলের কাগজপত্র উলটেপালটে দেখতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান নেই।

বাইরে হঠাৎ হাসির শব্দ পেলাম। হাসতে হাসতে সুদীপ্ত সরে গেল।

রাগে গা জ্বলে যায়। এই মেয়েটা যেন হাসবার জন্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে বললাম : হাসছ যে?

এমনি।

এমনি কেউ হাসে নাকি?

কেন হাসবে না!

পাগলে হাসে।

হাসতে হাসতে সুদীপ্ত বলল : পাগল দেখেও হাসে।

তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। উত্তর না দিয়ে আমি সরে যাচ্ছিলাম। সুদীপ্ত বলল : তোমার বই-এর কথা চেনেলকে জিজ্ঞেস করো।

বলেই সুদীপ্ত পালিয়ে গেল।

চেনেল আমার বই কেন নেবে, বুঝতে পারলাম না। তবু তার কাছে গেলাম। বললাম : তুমি আমার বই নিয়েছ?

না।

নাওনি মানে?

মানে আবার কী, তোমার কোন বই আমি নিইনি তাই বলছি।

তবে কে নিয়েছে বল।

তোমার টেবিলে একখানা অন্য লোকের বই ছিল, সেখানা তাকে ফেরৎ দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে এ খবর কে দিল, ঐ মেয়েটা বুঝি?

যেই দিক, কেন ফেরৎ দিলে তাই বল।

ও লোকটা আমাদের অপমান করবে, আর আমরা তা মুখ বুজে সহ্য করব?

অপমান আমার কী করল?

অপমান করেনি! অপমানের আর বাকি কী রেখেছে?

আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন জানালাম।

চেনেল বলল : কাল বার করে দেয়নি তার ঘর থেকে? থাকতে দিয়েছিল তোমাকে?

তা দেয়নি, তবে অপমানের কথাও কিছু বলেনি।

চেনেল রেগে উঠল, বলল : তবে আর কি, আবার যাও তার খোশামোদ করতে।

তুমি যাবে না?

চেনেল ঘৃণায় নাক সিঁটকে বলল : থুঃ।

আমার মনে হল, এই ক্রোধের অন্য কারণ আছে। কিছু যে সন্দেহ করিনি তা নয়। তাই তার পাশে বসে বললাম : অত রাগ কেন?

চেনেল বলল : নানা ফড়নবিশের জাত।

মানে?

অত মানে আমি বলতে পারিনে।

আমি তার উত্তর শুনে হাসলাম। ইতিহাসে নানা ফড়নবিশ কোন **ধিক্কৃত** ব্যক্তি নন। আমি যতদূর জানি, তিনি নাবালক পেশোয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। নানা ফড়নবিশ মীরজাফরের মতো কোন লোক নয়, বরং চাণক্যের মতো কূটনৈতিকের পরিচয় হতে পারে, কিংবা রাজস্থানের চন্ডের মতো অভিভাবক। বললাম : তোমার রাগের কারণ আমি জানি।

জান?

জানি বৈকি।

বলতো কী জান?

বলব না।

চেনেল আমার হাত চেপে ধরল, বলল : বলতেই হবে।

হেসে বললাম : গায়ের জোরে কি সব কাজ হয়?

আচ্ছা, না হয় খোশামোদই করছি।

বললাম : অধ্যাপকের দোষ নয়, দোষ ঐ মেয়েটার।

কেন?

ঐ মেয়েটা অধ্যাপককে নাচাচ্ছে।

চেনেল আমাকে চেপে ধরল : তুমি সত্যি বলছ?

বললাম : অধ্যাপক লোক ভাল, কিন্তু বোকা। সুদীপ্ত তার নাকে দড়ি লাগিয়েছে।
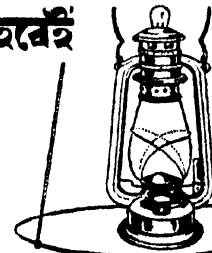
চেনেলুর একথা পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। বলল : আমার কী মনে হয় জান! মেয়েটাকে সরল পেয়ে ঐ লোকটা তার পেছনে লেগেছে।

আমি বলতে পারতাম, তাতে আমাদের কী! কিন্তু একথা চেনেলু নিজেই বলল : মরুকগে, আমাদের তাতে কী এসে যায়।

সাঁত্যই তো, আমরা লেখাপড়া করতে এসেছি, আমাদের এ নিয়ে মাথাব্যথা কেন?

আমার কথা বলার ধরনে কী ছিল জানি না, চেনেলু বলল : তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা করছ?

তামাসা!

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণার কথা তুমি ঐ অধ্যাপকের ওপর চাপাচ্ছ।

একথার উত্তর না দিয়ে বললাম : ওঠ এইবারে।

নির্লিপ্তভাবে চেনেলু বলল : আর টানাটানি ক'রো না।

বাইরে সুদীপ্তর গলা শোনা গেল, চেঁচিয়ে বলল : চলে এস, মাস্টারমশাই তোমাদের ডাকছে।

চকিতে চেনেলু উঠে দাঁড়াল, বলল : চল চল।

আমি হাসলাম তার কাণ্ড দেখে।

পাধ্যে বলল : তোমাদের পড়া কত দূর এগোল?

আমি বললাম : একটুও না।

কেন?

কাল আমাদের ঘর থেকে বার করে দিলে, আমরা অপমানিত বোধ করেছি।

আমি তো বার করে দিইনি।

সুদীপ্ত হাসছিল। চেনেলু তার দিকে তাকিয়ে বলল : তোমার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল।

এবারে আমিও হাসলাম।

পাধ্যে বলল : অতীতের কথা থাক, আমরা এবারে বর্তমানের কথা বলি। হিন্দী বই কাল কতখানি পড়লে বল।

বইপত্রের মাঝখান থেকে সুদীপ্ত আমাদের বই দুখানা বার করে দিল।

পাধ্যে আশ্চর্য হল, এখানে!

সুদীপ্ত বলল : চেনেলু কালই ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

পাধ্যে হেসে বলল : এস আজ তোমাকেই পড়াব।

সুদীপ্ত আমার দিকে চেয়ে বলল : আমাদের তাহলে ছুটি।

উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করল না। চল চল বলে আমাকেও সে টেনে বাহিরে আনল।

চেনেলুর মুখ দেখে তাকে কেমন অসহায় মনে হল।

॥ দশ ॥

সন্ধ্যাবেলা উপাসনার মন্দিরে গুরুজী বললেন : বরাহ তৃতীয় অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ বধ করেছিলেন, কিন্তু তাকে বধ করবার জন্য তিনি অবতার হননি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী উদ্ধার। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব জন্মগ্রহণের পর পিতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কী সেবা করব বলুন। ব্রহ্মা বললেন, তুমি সংসারী হয়ে পৃথিবী শাসন কর। কিন্তু পৃথিবী কোথায়! সমস্ত সৃষ্টি তো এখনও জলময়।

ব্রহ্মা ভাবলেন, তাইতো! এই জলময় অবস্থা থেকে পৃথিবীকে কে উদ্ধার করবে! বিষ্ণু ভিন্ন আর কে এ কাজে সমর্থ হবেন! ঠিক এই সময় তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহ বহির্গত হল। আকাশে তার আকার হল বিরাট, পর্বত-প্রমাণ, বজ্রের মতো গর্জন করে উঠল। পিতাপুত্রে নিঃসংশয় হলেন যে স্বয়ং বিষ্ণুই আবির্ভূত হয়েছেন। বেদ আবৃত্তি করে ব্রহ্মা বরাহের স্তব করলেন। বরাহ আর একবার গর্জন করলেন, যেন আশ্বাস দিলেন তাঁদের, তারপরেই সমুদ্রে প্রবেশ করলেন।

প্রলয়কালে যে পৃথিবী তাঁর কোলে ছিল, এখন তা রসাতলে। বরাহ সমুদ্রের একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত চিরে ফেলে দন্তাগ্রে পৃথিবীকে বাহির করলেন। হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে তাঁর দেখা হল এই সময়।

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর জন্মের একটা ইতিহাস আছে। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর জয়-বিজয় নামে দুই দ্বারপাল ছিলেন। একদিন সনক সনন্দাদি ঋষিরা বেড়াতে বেড়াতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বিবস্ত্র ও বালকের মতো দেখে জয়-বিজয় উপহাস ক'রে পথরোধ করে। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে স্বয়ং ভগবানের দ্বারে থেকেও যখন তাদের জ্ঞান হয়নি, তখন তারা অসুর হয়ে জন্মাবে। তারপর দয়াপরবশ হয়ে বললেন, যে অনন্তকাল নয়, তাদের মাত্র তিন জন্ম হবে, এবং বিষ্ণুই তাদের বধ করবেন। প্রথম জন্মে তারা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, এবং তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র হ য় জন্মেছিলেন।

দিতি তাঁর স্বামী কশ্যপের কাছে মহাবলশালী পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন। সে এক সায়াহ্নের গল্প। অশ্লীলতা-দুষ্ট বলে তাকে বাদ দেওয়া যাক।

চেনেলু আমার দিকে তাকিয়েছিল। আর সুদীপ্ত তাকিয়েছিল আমাদের দুজনের দিকেই। অশ্লীলতার প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। আমার মনে হল যে গুরুজী এই অশ্লীল গল্পটি গোপন করে আমাদের বেশি কৌতূহলী করলেন। দুএকজনে যে মূল পুরাণ পড়তে বসবেন, তাতে আমার সন্দেহ রইল না।

গুরুজী বললেন : এই দুই অসুরের জন্মের পর পৃথিবীর যে অবস্থা হয়েছিল, পুরাণে তার বর্ণনা আছে। তাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নানা অমঙ্গলের সূচনা হল। আকাশ থেকে উল্কাপাত হল, ঘনমেঘে আচ্ছন্ন হল চারিদিক। বজ্র বিদ্যুতে পৃথিবী উঠল কেঁপে। সমুদ্র উঠল ফেঁপে। শুভ ও অশুভ গ্রহে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শৃগাল ও পেঁচক যেন চিৎকারে অস্থির হল, কেউ তার কারণ জানল না।

যদিও যমজ সন্তান, তবু হিরণ্যকশিপু বড় ও হিরণ্যাক্ষ ছোট। [illegible] দিনে উভয়ের দেহ পাহাড়ের মতো কঠিন ও পাহাড়ের মতো বিপুল হল। ছোট ভাই বড় দাদার বড় প্রিয় হল বড় ভাই-এর। তারপর একদিন হল যুদ্ধের বাসনা। গদা হাতে হিরণ্যাক্ষ বার হলেন প্রতিদ্বন্দ্বীর খোঁজে। পায়ে তাঁর সোনার নূপুর, গলায় বৈজয়ন্তীমালা, [illegible] অঙ্গুরো ভয়। হিরণ্যাক্ষ প্রথমেই স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভয়ে দেবতারা সব পালালেন। শূন্য স্বর্গে খানিকক্ষণ বিচরণ করে হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রে এলেন স্নানের জন্য। তারপর গিয়ে বরুণের বিভাবরী পুরীতে প্রবেশ করলেন। কিছুদিন বরুণ লুকিয়ে ছিলেন, তারপরেই ধরা পড়ে গেলেন। হিরণ্যাক্ষ বললেন, যুদ্ধং দেহি। ভয়ে ভয়ে বরুণ বললেন, আমার সঙ্গে! ছিঃ ছিঃ, আপনার মতো বীরের সামনে আমি দাঁড়াতে পারি! আপনি ধরুন বিষ্ণুকে, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তবু কিছু আরাম পাবেন।

কোথায় বিষ্ণু? নারদ হিরণ্যাক্ষকে সংবাদ দিলেন যে বিষ্ণু এখন পৃথিবীর উদ্ধারে রসাতলে আছেন। শোনামাত্র হিরণ্যাক্ষও রসাতলে প্রবেশ করলেন।

এইবারে যুদ্ধ বাধবে। বরাহের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষের। আমরা সেই যুদ্ধের গল্প শোনবার জন্য ব্যগ্র হলাম।

গুরুজী বললেন : বরাহকে দেখে হিরণ্যাক্ষ ভাবলেন, নারদ তাঁর সঙ্গে তামাসা করেছেন। একটা বরাহের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছে! বরাহের দাঁতের উপর তখন পৃথিবী, অসুরকে দেখে ক্রোধে তাঁর নেত্র রক্তবর্ণ হল।

তারপর ঘোর যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে বরাহ হিরণ্যাক্ষকে দাঁত দিয়ে চিরে সুদর্শন চক্রের আঘাতে বধ করল।

আমরা নিরাশ হলাম। এতবড় একজন অসুর এত সহজে নিহত হবে ভাবতে পারিনি।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : পুরাণান্তরে আছে, বরাহ পৃথিবীকে জলের বাহিরে স্থাপন করে হিরণ্যাক্ষের সংগে অর্ধ-বরাহ ও অর্ধ-বিষ্ণু-মূর্তিতে যুদ্ধ করেন। বরাহের দাঁতের সংগে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রেরও প্রয়োজন হয়েছিল।

সকল পুরাণের মতে এইখানেই বরাহ অবতারের শেষ। কিন্তু কালিকা পুরাণে আরও একটু কাহিনী আছে। হিরণ্যাক্ষ বধের পর বরাহ পৃথিবীর সংগে সংসার শুরু করল। তাদের অসংখ্য সন্তানসন্ততি হল। সেইসব শূকরের অত্যাচারে জগৎ জর্জরিত হল। দেবতারা এসে বিষ্ণুর কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বিষ্ণু বললেন, নিজের শক্তিকে তিনি নিজে বিনাশ করতে পারলেন না। তার চেয়েও বড় শক্তির প্রয়োজন। তখন দেবতাদের অনুরোধে শিব অষ্টপদ শরভ মূর্তিতে বরাহ ও তার বংশকে বিনাশ করলেন।

বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষের বড় ভাই হিরণ্যকশিপু বধ হল না। সে অসুর ব্রহ্মার কাছে অদ্ভুত বর লাভ করেছিল। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার বিনাশ হবে না। দেবতা বা মানুষ তাকে বধ করতে পারবে না। এইজন্য নৃসিংহ অবতারের প্রয়োজন হয়েছিল।

ছোট ভাই-এর মৃত্যুতে শোকার্ত অসুর মন্দর পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হল। একমনে নিরম্বু তপস্যা। উঁই আর পিঁপড়েয় খেল সমস্ত শরীর, কিন্তু কংকালের তপোভঙ্গ হল না। ব্রহ্মা এসে বললেন, বর নাও। হিরণ্যকশিপু বললেন, তবে আমায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর, আর—

আর কী?

আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে আমার মৃত্যু হবে না, দিবসে রাত্রিতে না, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে না।

ব্রহ্মা তাঁকে সেই বরই দিলেন।

তারপর জগতে দুর্দিন এল। অসুরের আদেশে যাগযজ্ঞ নষ্ট হল, স্বর্গরাজ্য হল হিরণ্যকশিপুর করতলগত। দেবতারা তাঁরই সেবা শুরু করলেন, যজ্ঞের ভাগ সে নিজে নিল। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে না পেরে দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। সেখানে দৈববাণী হল, ধৈর্য ধর। অসুর যেদিন তার পুত্র প্রহ্লাদের বিদ্রোহাচরণ করবে, সেদিন তিনি তাকে বধ করবেন। হৃষ্টচিত্তে দেবতারা ফিরে এলেন।

প্রহ্লাদের কথা আগে বলা হয়নি। সে তার চতুর্থ পুত্র। মাতার নাম কয়াধু। বিষ্ণুভক্ত ছেলে। বাপ তাকে ধর্মপথ থেকে নিবৃত্ত করবার অনেক চেষ্টা করেছিল। অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল, হাত পা বেঁধে জলে নিক্ষেপ করেছিল, হাতীর পায়ের নিচেও ফেলেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদের মৃত্যু হয়নি। ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করল, কে তোমাকে বারে বারে রক্ষা করে।

প্রহ্লাদ সংক্ষেপে বলে, বিষ্ণু।

কোথায় সে?

তিনি সর্বত্র আছেন।

এই স্তম্ভের ভিতর আছেন?

আছেন।

তবে দেখি তোর হরিকে।

বলে মুষ্ট্যাঘাতে সেই স্তম্ভটি ভাঙল।

কী আশ্চর্য! ভক্তের ভগবান সেই স্তম্ভ থেকেই বার হলেন। ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী নয়। মানুষ নয়, দেবতাও নয়। অভূতপূর্ব নরসিংহ মূর্তি। নরদেহ সিংহের মুখ। বিজৃম্ভিত জটা ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ। দুচোখ তপ্ত কাঞ্চনের মতো পিঙ্গল, করাল দন্ত করবালের মতো চঞ্চল, জিহ্বা ক্ষুরধার। বিকট হুংকারে পৃথিবী কাঁপিয়ে তিনি হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করলেন।

তখন দিবস নয়, রাত্রি নয়। সায়াহ্নের অন্ধকারে সংগ্রাম শুরু হল। নৃসিংহদেব অসুরকে নিজের উরুর উপর ফেলে নখ দিয়ে তার কুক্ষি বিদীর্ণ করলেন। হিরণ্যকশিপু বধ হল। পৃথিবী রক্ষা পেল। ইন্দ্র তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

ইতি নৃসিংহ অবতার কথা।

(ক্রমশঃ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছরই সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েকটি বে-সরকারী পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে পুরস্কারগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে এটি গৌরবের বিষয়।

'অমৃতবাজার' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার দুটির নাম 'শিশিরকুমার' ও 'মতিলাল' পুরস্কার। দুটি পুরস্কারের সম্মান-মূল্য প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা। 'শিশিরকুমার পুরস্কার' বাঙলা কাব্য-সংস্কৃতি ও সমালোচনামূলক কাজের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। এ বছর এই পুরস্কার লাভ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীবুদ্ধদেব বসু। 'মতিলাল পুরস্কার' দেওয়া হয়ে থাকে প্রধানত গল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদির স্বীকৃতি-স্বরূপ। এ বছর বর্তমান পুরস্কারটি লাভ করেছেন প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিশেখর কালিদাস রায়
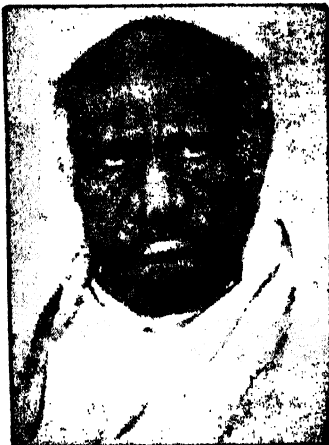
সাহিত্য সমাচার

বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী এম সি. সরকার অ্যান্ড সন্স-প্রকাশিত এবং সুধীরচন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'মৌচাক' পত্রিকার নামে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে শিশু সাহিত্যের উল্লেখ-যোগ্য স্বীকৃতিস্বরূপ। নগদ পাঁচশত

বুদ্ধদেব বসু

টাকার এই পুরস্কারটি লাভ করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত 'সুরেশচন্দ্র' ও 'প্রফুল্লচন্দ্র' পুরস্কার দুটির সম্মান-মূল্য প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা। বর্তমান বৎসরে এই পুরস্কার দুটি লাভ করেছেন শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীরমাপদ চৌধুরী।

কবিতা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ নগদ পাঁচশত টাকা সম্মান-

উমা রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মূল্যের 'উল্টোরথ' পুরস্কারটি লাভ করেছেন শ্রীমতী উমা রায়।

* * *

২৩শে ও ২৪শে চৈত্র, ১৩৬[illegible] শনিবার ও রবিবার শিশু সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলকাতা ইনফরমেশন সেণ্টারে নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলনের ৮ম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন শাখায় শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরাধারাণী দেবী, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন। সম্মেলনে শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে শিশু সাহিত্যে তাঁদের অবদানের জন্য ১৩৬৮ ও ১৩৬৯ সালের ভুবনেশ্বরী পদক প্রদান করা হয়।

রমাপদ চৌধুরী

[উপন্যাস]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ২ ।।

...বিয়ের চেষ্টা চলছে ... অরুণই শুধু খবর ... নইলে সবাই জানে। ইদানীং ... ছুটির দিনেও আফিসের ... সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন ... চেনা জানা যত ব্রাহ্মণ ... সকলের বাড়িতে গিয়ে ... সামনে গিয়ে না পড়লে ... না। খিদিরপুর, বেহালা, ... ঠাকুরে, মায় বারুইপুর, ... এদিকে এই, ওদিকে শ্রীরাম- ... ঘোষপাড়া, বরানগর, নৈহাটী— ... ফেলেছেন। একটি মেয়ে তাঁদের ... দেবেন, তাতে কিছু খরচা হয় ... এই জন্যেই এত খোঁজাখুঁজি ... তাঁদের পছন্দমতো পাত্রপক্ষ মেয়ে ... না। কটা চোখ, মানানসই যা ... বেটে—এই সব আপত্তি হয় ...

...কাণ্ডর পর এই পাত্র ঠিক ... পাত্র খুব সুন্দর দেখতে, শিব- ... নিজেদের বাড়ি, দুটো পাস, কোন্ ... ফার্মে চাকরী করে। এর চেয়ে ... পাত্র গৃহস্থ সংসারে আশা করা ... না। খরচ কিছু বেশীই পড়বে, সব ... গহনা, খাট, আলমারী ছাড়াও ... হাজার টাকা নগদ দিতে হবে। ... কিছুতেই কমাতে চাইলেন না ... মা। মেজকর্তা দাদাকে বললেন, ... শুনেছি ওর মার কিছু দেনা আছে, সেই জন্যেই জোর করছে টাকাটার জন্যে। ... একটু মেয়ে-কাপ্তেন গোছের আর কি!...... নগদ টাকাটা পাবার আশাতেই এক কথায় ওরা পছন্দও করেছে, নইলে অমন সুন্দর ছেলে, আমাদের মেয়ে ওর পাশে মানায় না, সে তো আমরাই বুঝছি। ওটার জন্যে এ পাত্র হাতছাড়া করো না।'

'টাকার কথা তুমি জান', অভয়পদ চিন্তিত মুখে উত্তর দিলে, 'কিন্তু শাশুড়ির যে রকম হাত—এর পরে? আবারও যদি দেনা করে? এখানে দেবে মেয়ে?'

'এর পর দেনা করে সে বুঝবে! আমি খুব ভাল ক'রে খোঁজ নিয়েছি—বাড়ি ছিল হরেনের বাবার নামে চার ভাই ওরা, ছোট এখনও নাবালক, বাড়ি তো আর বাঁধা দিতে পারবে না। তাছাড়া, বুচিই তো হবে বড় বৌ, ছেলে-পুলে হ'লে ওই বাড়ির গিন্নী হবে—তখন আর শাশুড়ির কী জোরই বা থাকবে। ছেলে ভাল চাকরী করে—আপনার গণ্ডা আপনি বুঝে নিতে পারলেই হ'ল!'

'দ্যাখো যা ভাল বোঝ।' অভয় নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় ভাইয়ের ওপর ছেড়ে দেয় সব।

সেইখানেই বিয়ে ঠিক হয়েছে, সামনের আটই বিয়ে।

ঘটা ক'রেই বিয়ে দেবে কর্তারা। এ গ্রামের সব বাড়ি থেকেই একটি ক'রে বলা হবে, পাড়ায় বাড়িসুদ্ধ সবাই। এ ছাড়া আত্মীয়-কুটুম্ব তো আছেই। পৈতে-টৈতে যা এর আগে হয়ে গেছে, এই বলতে গেলে প্রথম কাজ—সকলকে আনা চাই-ই, ক্ষীরোদা বার বার ক'রে বলে দিয়েছেন। তিনি এখন আর খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। কিন্তু চোখ কান দুই-ই ভাল আছে। বসে বসে তিনিই সব ফর্দ করলেন কোথায় কোথায় বলতে হবে। সবসুদ্ধ পাঁচশ' লোক দাঁড়াল।

মহাশ্বেতা এরই মধ্যে একদিন স্বামীকে ধরে বললে, 'হ্যাঁগা, তা তোমরা অত বোকা কেন?'

স্ত্রীর মুখে অপরের সম্বন্ধে বুদ্ধি-হীনতার অভিযোগ এতই অভিনব যে, এই প্রথম না হ'লেও, অভয় বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর স্বামীর এই বিস্ময় তার নিজের বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি ভেবে মহাশ্বেতা যৎপরোনাস্তি পুলকিত হয়ে ওঠে।

'বলি সেই যে কাজে একটি খরচ হচ্ছে—ও পাঁচশ' লোক ধরছ, শেষ পজ্জন্ত ছশ' সাতশ'য় দাঁড়াবে—তখন এক কাজে দুই কাজ সেরে নিলে না কেন?'

'তার মানে?'

তবুও বুঝতে পারে না অভয়পদ।

'একেবারে এই সঙ্গে আমাদের বুড়োর বিয়েটা দিয়ে কাজ চুকিয়ে দিলে না কেন?'

'বুড়োর বিয়ে? বুড়োর বিয়ে দোব?' অভয়পদ প্রায় বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ গো। ছেলের বিয়ে দিতে হবে না?'

'তা সে এরই মধ্যে কি?'

'ওমা, তা ওর কি বিয়ের বয়স হয়নি? তুমি তো পেরায় ঐ বয়সেই বিয়ে করেছিলে!'

'আমি রোজগার করতুম, তাছাড়া তখন সংসারে করবার কেউ ছিল না।'

'হ্যাঁ, তাই সাত বছরের মেয়ে এনেছিলে! আর আমিই কি আর বুড়ো ধাড়ী মেয়ে আনতে বলছি, ছোটখাটো দেখেই একটি আনতে চাই আমি। আমার এক মেয়ে যাচ্ছে আর এক মেয়ে আসবে। এই তো সোজা কথা।'

'তা তোমার ছেলে বিয়ে করবে—বৌকে খাওয়াবে কি? না লেখাপড়া শিখল, না কোন কাজকম্ম। কিছু তো একটা ক'রে খেতে হবে।'

'নাও! তোমার ছেলের বৌকে তুমি দু-মুঠো ভাত দিতে পারবে না বুঝি? এ বাড়িতে যে ভাত রোজ গোরুর ডাবায় যায় সে ভাতে একটা ছোট-খাট সংসার প্রতিপালন হয়। সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না, তুমি মেয়ে দ্যাখো!'

'আমরা না হয় এখন খেতে দিলুম। এর পর? সংসার বাড়বে না ওর?'

'সে যখন বাড়বে তখন নিজেরই জ্ঞান-চৈতন্য হবে। মাথার ওপর চাপ পড়লেই বাপও বলবে।......লেখাপড়া তো আমার কোন ছেলেই শেখে নি—তাই বলে ওদের বিয়ে হবে না? বেটার বিয়ে আবার লেখা-পড়ার জন্যে আটকায়?'

যেন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বিজয়গর্বে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় মহাশ্বেতা।

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করা চলে না, আপাততঃ প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য অভয়পদ বলে, 'আচ্ছা, সে হবে এখন!'

স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় করুণা হয় মহাশ্বেতার, 'ওমা, অবাক করেছে। সে হবে কি গো! এই তো আটুই বুঁচীর বে, দিলে তো ছ তারিখেই বুড়োরটা দিতে হয়—তবে তো বে-বৌভাত এক যজ্ঞিতে হবে!'

'তা সে তো আর মাঝে দশটি দিন বাকী—মেয়ে কোথায়? মেয়ে কিছু ঠিক ক'রেছ?'

'আমি ঠিক করব কি? আমি কি ঠিক করবার কত্তা? এ বাড়িতে আমার ঠিকে কিছু হয়? যাঁরা করবার কত্তা সেই আসল কত্তাগিন্নীকে বল!'

'তাঁদের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই আট-দশ দিন সময় আছে হাতে,—এখন কোথায় মেয়ে কোথায় মেয়ে খুঁজে বেড়াক!'

'কী তুমি বল—আমার ছেলের বে দেব শুনলে পঞ্চাশ গণ্ডা মেয়ে এসে পায়ে গড়াবে—'

'তা গড়াক, মেয়ে ঠিক কর—তারপর দেখা যাবে। আর ছেলের বিয়ে দিয়ে যদি চিরকাল তার সংসার টানতে পারি তো বৌ-ভাতে দু'-একশ' লোকও খাওয়াতে পারব। তার জন্যে তোমায় এত মাথা ঘামাতে হবে না।'

ঐখানেই ও প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে যায় অভয়পদ।

মহাশ্বেতা গজ-গজ করতে থাকে আপনমনেই, 'দেবে না তাই বল! মহা-রাণীদের মত নেই তাই বল। নইলে মেয়ের আবার ভাবনা! দশ দিন কেন, তিন দিনে মেয়ে ঠিক হয়। খবরটা একবার চাউর হ'লে হয়—বলে কত মেয়ের বাপ হাত ধুয়ে বসে আছে এ বাড়িতে মেয়ে দেবে বলে—!'

অরুণকে সবাই মুখ-চোরা, লাজুক, ঘরকুনো বলেই জানত—কিন্তু স্বর্ণলতার বিয়েতে যেন নবকলেবর ধারণ করল সে। এ যেন সে অরুণই নয়। হঠাৎ যেন তার উৎসাহই শুধু নয়—সপ্রতিভতাও বেড়ে গেল। সেই খাটল সবচেয়ে বেশী, দৌড়-ঝাঁপ ছুটোছুটিতেও সে কারুর চেয়ে কম গেল না। ওর এই কর্মক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

অরুণের এই সক্রিয় সহযোগিতায় কর্তাদেরই উপকার হ'ল সবচেয়ে বেশী। আর কোন ছেলেই মানুষের মত নয়, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার মতো তো নয়ই। সবচেয়ে যেটা বিপদের কথা—পয়সা-কড়ির ব্যাপার তাদের দিয়ে আদৌ বিশ্বাস নেই। ওদের যা বয়স তাতে হাত-খরচা দরকার হবার কথা, অথচ এ বাড়িতে সে কথা কেউ চিন্তাও করে না। এই বিবাহে তাদের অনেকখানি আশা-ভরসা ছিল। যে ভাগাড়ে মড়া পড়ে কদাচিৎ, সেই ভাগাড়ের শকুনিদের মতোই ক্ষুধার্ত অবস্থা তাদের। সে সম্বন্ধে কর্তারাও সচেতন, তাই হাতে ক'রে পয়সা খরচ করার যা কাজ তার বেশির ভাগই এসে পড়ল অরুণের ঘাড়ে। এতে ক'রে ছেলের দল আর একদফা বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল তার ওপর। কিন্তু কর্তারা উপকৃত হলেন।

অরুণের সেই অমানুষিক পরিশ্রম সকলেরই চোখে পড়ল। বলাবলিও করতে লাগল সকলে, 'দ্যাখো, কার ভেতর কি গুণ থাকে কেউ বলতে পারে না! ক তো বাপু, সময়ে খাওয়া নেই ঘুম নে ভূতের মতো খাটছে সব সময়ে!'

স্বর্ণলতার বিয়ে—এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকারই কথা, তার ছোট ক তাকে সে কথা বলেও দিয়েছে, 'খবর তুই কোন কথায় কথা কইতে যাস্ যেন—তা'হলে ভারী নিন্দে হবে। ব মেয়ে বড় বেহায়া. পাঁচটা কুটুম-সা আসছে তো।......তোমার তো আবার তাইতে ফোড়ন দেওয়া স্বভাব, আগে থাকতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি!

তা এ কদিন মুখে 'গো' দিয়ে ছি সে। কিন্তু একটা মানুষ মুখে রক্ত মরে যাচ্ছে, তার দিকে কেউ তাক লোক নেই—দেখেই বা সে চুপ ক'রে কী করে? সে ওকে আড়ালে ডেকে 'বলি, ও কী আদিখ্যেতা হচ্ছে বি একটা ভারী অসুখ না বাধালে চলছে না? এ সব আমাকে জব্দ মতলব আঁটা—নয়?'

আগের মত কাঁচু-মাচু মুখে ঘাড় করল না অরুণ, বেশ সপ্রতিভ মুখেই বলল, 'কেন—কী করলুম?'

'কী করলুম। সময়ে না দিনান্তে দুটো ভাতও তো মুখে হয়, খাওয়া-দাওয়া যে ছেড়েই একেবারে......আর তার ওপর এই খাটুনি। দুটো খেয়ে অন্তত কেথাত্ত কর!'

'খাওয়া তো আছেই—রইলও; বিয়ে তো আর হবে না, এই একবার

'আমার বে-তে তোমার কি বেরোচ্ছে শুনি যে তোমার উপোস হবে? আর দুটো ভাতে বসলেই দুপোর সময় নষ্ট হয়? না না, চালাকী ছাড় বলছি, নইলে আমাকেই ধরে নে গিয়ে রান্নাঘরে জোর ক'রে খাওয়াতে হবে। তা সে লোকে অ বেহায়া বলুক আর যাই বলুক!'

'ও, বেহায়া বলবার ভয়ে এই কট চুপ ক'রে আছ বুঝি?'

'আছিই তো, নইলে দেখিয়ে মজা। আদিখ্যেতা ক'রে না খেয়ে বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিতুম একেবা তা কথা তো কেবল এইড়ে যাচ্ছ—না কি?'

'খাব খাব।......কিন্তু বুঁচী,

যখন থাকবে না—তখন কে আমার খাওয়ার খবরদারী করবে?'

'সে তো আমি দেখতে আসব না—কী করছ না করছ! আর সেদিন তো আমাকে কথা দিয়েছ—ঠিক ঠিক খাওয়া-দাওয়া করবে, শরীরের দিকে নজর রাখবে!'

'কথা দিয়েছি নাকি?'

'বা-রে ছেলে! এরই মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছ! তা'হলে তুমি যা করবে এর পরে—তা বুঝতেই পারছি! কিন্তু আমি আসব মধ্যে মধ্যে সেটি মনে রেখো—এসে যদি দেখি অমনি শুকনো চেহারা, তা'হলে কিন্তু পুঁথি-পত্তর সব টান মেরে পুকুরের জলে ফেলে দেব!'

'দিও দিও, তাই দিও। সে রকম চেহারা দেখলে তো দেবে।' হাসতে থাকে সে।......

অরুণ জলপানি পেয়েছে পনেরো

টাকা ক'রে। সে খবরটা পাওয়া গেছে কদিন আগেই। স্বর্ণলতাকে আর কিছু বলতে হয়নি, অম্বিকাপদ নিজেই ডেকে বলেছে অরুণকে, 'কোন্ কলেজে পড়বে এবার—কিছু ঠিক করলে?......বিয়েটা চুকে যাক, আর দেরি করে দরকার নেই, কোন্ কলেজে পড়বে, আই-এ না আই-এস-সি ঠিক ক'রে ভর্তি হয়ে যাও, টাকা-পয়সা কি লাগবে জানিও, আমি দিয়ে দোব। আমি কাজে থাকি—তোমার মাসীর কাছ থেকে চেয়ে নিও, কোন লজ্জা করো না।'

পুঁথি-পত্রের কথাতেই বোধহয় কথাটা মনে পড়ে যায় স্বর্ণর, হঠাৎ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার জলপানির টাকা থেকে আমাকে কি দেবে অরুণদা?'

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অরুণ, সে কোন উত্তর দেয় না। স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে শুধু।

'কৈ বললে না?' অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে স্বর্ণ, 'বাব্বা এরই মধ্যে পয়সায় এত টান! খরচার কথা উঠতেই মুখে কুলুপ পড়ে গেল!'

'তোমাকে?' অরুণের যেন হঠাৎ চমক ভাঙে, 'তোমাকে তো পুরো টাকাটাই দিতে পারি। কিন্তু তুমি কোথায় থাকবে আর আমি কোথায় থাকব—!'

'ওমা, এই তো এ-পাড়া ও-পাড়া বলতে গেলে। কত দশ পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে যাচ্ছি গা?......তা কি দেবে সেইটেই বল না বাপু!'

'আর যদি জলপানি না পাই?' কেমন একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে চায় অরুণ।

'সে আবার কি কথা! সরকারী কাগজে নাম উঠে গেল, মেজ-কা ছোট-কা—দু-দুজনে স্বচক্ষে দেখেছে—পাবে না কেন?......তোমার যত সব উদ্ঘুট্টি কথা বাপু!......চল চল—তুমি যা জিনিস দেবে তা খুব বুঝেছি, সেই থেকে হেজো-ভিজে মুখের কথা তাই বেরোল না, তা পয়সা বেরোবে! এখন দয়া ক'রে দুটো খাবে চল দিকি!'

'তুমি বেড়ে দেবে ভাত?......বেহায়া বলবে না লোকে?'

'ওমা ভাত বেড়ে দিলে বেহায়া বলবে কেন? কথা কইতেই দোষ। যার বে তার সেই বে-র কথায় থাকতে নেই—বুঝলে?'

বিয়ের রাত্রেও একা যেন দশ হাতে কাজ করল অরুণ। কোন মানুষ যে এত খাটতে পারে, বিশেষ তার মতো ঘরকুনো গ্রন্থকীট মানুষ—তা কেউ ধারণাই করতে পারে নি এর আগে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করত না কেউ। শুধু বিয়ের সময় পিঁড়ি ঘোরাতে বলেছিল—সে রাজী হয়নি। বলেছিল, 'আমার যে এদিকে অনেক কাজ, তোমরা আর কাউকে দ্যাখো বরং—'। অবশ্য তারপরই কে কথা তুলেছিল, 'যাদের বিয়ে হয়েছে—গুষ্টির জামাইরাই পিঁড়ি ধরবে। এতগুলো জামাই থাকতে আইবুড়োরা ধরবে কিসের জন্যে! তবে দেখো বাপু, যাদের বৌ মরেছে তারা যেন ধরো নি।'

সন্ধ্যার আগে থেকে, কনে-সাজানোর শুরু থেকেই—আর তার দেখা পায়নি স্বর্ণ। উৎসুক চোখে দরজার দিকে তাকিয়েছে বারবার, বারবারই প্রত্যাশা করেছে তাকে। বিশেষত সাজানোর সময় অনেকেই এসে দেখে গেল, ভাইয়েরা সবাই এল—অরুণদা আসতে পারল না। 'কেমন দেখাচ্ছে' অনুচ্চারিত এই প্রশ্ন সব মেয়ের মনেই থাকে এ সময়টা, এবং সকলের মুখ থেকেই শুনতে চায় সে। অরুণ আসবে এবং প্রশংসা করবে—এটা খুবই আশা ছিল স্বর্ণের কিন্তু সে যেন এদিক দিয়েই হাঁটল না।

আর থাকতে না পেরে ছোটভাই গুপোকে ডেকে একসময় প্রশ্ন করল সে, 'হ্যাঁরে অরুণদাকে একবারও দেখতে পাচ্ছি না কেন রে? কোথায় কী করছে সে?'

'ও বাবা, তার কি কাজের অন্ত আছে আজ—সে-ই তো ম্যানেজার গো। মেজ-কাকা তাকেই সব বুঝো দিয়েছে যে!'

'তবেই তো মাথা কিনেছে! এই শোন্ না, তোকে কাল যাবার সময় একটা পয়সা দোব, একবার ছুট্টে গে ডেকে আনবি অরুণদাকে?'

একটা গোটা পয়সার লোভেও গুপো উৎসাহিত হয়ে উঠল না তেমন। সন্দিগ্ধ সুরে বললে, 'আসবে কি—দেখি। তার আজ পাত্তা পাওয়াই দায়!'

সে গেল কিন্তু আর ফিরল না। বর আসতে যখন তাকে বরের চাদ'রর ওপর বসিয়ে রেখে যে যার চলে গেল তখন একা একা বসে ভাবতে লাগল—দুপুর-বেলা ছোট কাকী ওকে ডেকে খাইয়েছিল কিনা। পই-পই ক'রে তা বলে দিয়েছিল। ও যা ছেলে, ওকে জোর ক'রে না খাওয়ালে

খাবেই না কখনও, তা সে তুমি কেন ক[illegible] দিন শুকিয়ে রাখো না। তবু ভাগ্[illegible] দুপুরবেলা দুধ-সন্দেশ খাবার সময় [illegible] ক'রে সে একটা সন্দেশ খাইয়ে দিয়েছি[illegible] তাই কি খেতে চায়, কত বকা-ধমকা [illegible] খাইয়েছে সে।......হয়ত ঐ পর্যন্[illegible] আর কিছুই পেটে পড়েনি।......বা[illegible] সব ফোড়ন কাটতেই আছেন—একটু ম[illegible] রাখতে পারেন না কেউ। সেই স[illegible] খাওয়ানোর সময় ছোটকাকার কী কথ[illegible] বলে, 'হ্যাঁরে তা ওর গার্জেন তো প[illegible] বাড়ি চলল, এখন ওকে কে দেখবে? তুই বরং এক কাজ কর—[illegible] তোরঙ্গের মধ্যে ক'রে শ্বশুরের নিয়ে যা!'

শোন কথা একবার! সে নিয়ে য[illegible] হ'লে ও ঠিকই নিয়ে যেত—নি[illegible] ভাইয়ের মতো—দোষই বা কি? বি[illegible] কিছুদিন পুরনো না হ'লে, তাদের [illegible] না নিতে পারলে কি আর সাহস [illegible] যায়? তা সেও খুব শুনিয়ে দিয়েছে [illegible] কাকাকে, 'কেন তোমরা একটু দে[illegible] পার না? দেখা তো উচিত। এ[illegible] বামুনের ছেলে উপোস ক'রে থা[illegible] পাপটা মান্যিটা কার লাগবে শ[illegible] আমি তো পরের ঘরে চললুম! গোত্তর হয়ে যাব আজ থেকে!'

বিয়ের সময় কোন দিকে চা[illegible] পারে নি স্বর্ণ, তবে অরুণ ছিল [illegible] সেখানে। থাকলে অন্তত গলা পেত[illegible] রাত্রে বাসর ঘরে সবাই এসে এক[illegible] ক'রে উঁকি মেরে মেয়েদের কাছে [illegible] খেয়ে চলে গেল—অরুণ ছাড়া। [illegible] খবরও পেলে না, বর-মিন্সে প[illegible] বসে, লজ্জায় সে কথাই কইতে পা[illegible] না কারুর সঙ্গে।

একেবারে সকালে একবার খুঁজে [illegible] করেছিল সে। কী চেহারাই হ[illegible] বাবুর—অসুখের মতো খেটে আর [illegible] খেয়ে। চোখ মুখ বসে গেছে একে[illegible] দৃষ্টি রক্তবর্ণ, চোখের কোলে [illegible] বুরুস কালি।

'বা, চেহারার তো বেশ খোলা[illegible] হয়েছে! বলি এবার এ দেহত্যাগ ক[illegible] বসে মতলব এঁটেছ নাকি! কী পে[illegible] কি!'

সে কথার উত্তর দেয়নি অরুণ, [illegible] হেসেছিল একটু। অবসন্ন, ক্লান্ত হা[illegible]

'বলি কাল থেকে তো কিছুই পে[illegible] নেই, তা সকালে একটু চা-টাও কি খে[illegible]

নেই! হাঁড়ি হাঁড়ি চা ফুটছে তো দেখতে পাই. যেমন মেজকা চা দুচোক্ষে দেখতে পারত না— তেমনি চায়ের রেলা হয়েছে আজকাল।...তা একটু চা দুটো মিষ্টিও তো খেতে পার?'

'খাবই এখন। খেতে তো হবেই। কিন্তু তোমারই বা চেহারার কী ছিরি হয়েছে। আয়নায় দেখেছ?'

'দেখেছি! রুক্ষু চুল, রাতজাগা—ও অমন হয়। কাল ছিলে কোথায়—কাল যখন সাজলুম গুজলুম তখন দেখতে পারলে না?'

সে কথার উত্তর দিল না অরুণ। বলল 'তা তুমি কি খাবে এখন?'

'ওমা, আমি খাব কি? এখন বর্গপিঁড়েতোয় বসতে হবে না? খাওয়া আজ যার নাম ধরো গে সেই তিন টয়—। এক কাজ করো দিকি, চট্ করে দুটো পান্তুয়া নিয়ে এসো দিকি'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায় অরুণ।

'কেন বল তো? কার জন্যে?'

'নিয়েই এসো না বাপু। আমি কি দোষের দুটো পান্তুয়াও খরচ করতে পারি না—তার জন্যে এত কৈফিয়ৎ দিতে হবে!'

অগত্যা নিয়ে আসে অরুণ। একটা মাটির গেলাসে করে।

'নাও, খাও।' মুখের সামনে ধরে স্বর্ণ।

'পাগল নাকি! আমার এখনও মুখ পর্যন্ত ধোওয়া হয়নি।'

'খাও বলছি, নইলে অনর্থ কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড করব। আমাকে চেন না!'

অগত্যা খেতে হয়। কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে খায় সে—স্বর্ণর মুখের দিকে চাইতে পারে না। স্বর্ণর মনে হয় ওষুধ-গেলা পাঁচনগেলা করে খাচ্ছে—তাই এদিকে চায় না।

নরম গলায় বলে, 'মিষ্টি খেতে ভাল লাগছে না—না? দুখানা মাছ খাবে। আমিই নিয়ে আসছি নয়?'

কিন্তু অরুণ আর উত্তর দেয় না, স্বর্ণ কিছু বোঝবার কি বাধা দেবার আগেই উঠে পালিয়ে যায় সেখান থেকে।

সেই যা ওর সঙ্গে দেখা। আর সারা দিনে ধারে কাছেও আসেনি স্বর্ণর।

যাত্রাকালে মেয়ে-জামাই আশীর্বাদের সময় অন্তত সে এসে দাঁড়াবে আশীর্বাদ করবে—সবাই আশা করেছিল—তাও এল না। স্বর্ণর সে সময় অবশ্য কোন জ্ঞান নেই—সে কেঁদে ভাসাচ্ছে কিন্তু খেয়াল

'নাও, খাও।'

করেছিল মহাশ্বেতাই. কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, 'অরুণটা কোথায় গেল, সে আশীর্বাদ করবে না? ওরে তোরা কেউ দ্যাখ না!'

প্রমীলা বলেছিল, 'হ্যাঁ, সে যা ছেলে—এই কান্নাকাটির ভেতরে সে আসবে। সে যা ভালবাসে ওকে, দ্যাখো গে যাও বাগানের কোন্ কোণে সেঁদিয়ে বসে আছে—মাটি ভাসা চ্ছ সেখানকার। এমনিই তো চোখ দুটো জবাফুলের মতো হয়ে রয়েছে সকাল থেকে—'

তবু, গাড়িতে ওঠার সময় অন্তত তাকে কাছাকাছি কোথাও দেখা যাবে ভেবেছিল সবাই, তাও এল না। তারপর অবশ্য অত কারও খেয়ালও ছিল না। বড়রা কান্নাকাটি করছে তখনও, কুটুম্বিনীরা এলিয়ে পড়েছে—কর্তারা বসে গিয়েছিল পরের দিন ফুলশয্যায় তত্ত্ব সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। কী কী আছে—কী কী কিনতে হবে, ক্ষীরের ছাঁচগুলো

মেয়েরা তুলতে পারবে কি না—এই নিয়েই তাদের চিন্তা। আজ রাতটুকু পোয়ালে কালই তো তত্ত্ব গুছোনো—সময়ই বা আর কই ?

খেয়াল পড়ল অনেক রাত্রে, খেতে দেবার সময়। তরলাই সকলকে ভাত দিচ্ছিল, সে-ই বললে, 'অরুণ? অরুণ কোথায় গেল রে?'

বুড়ো মুখ বাঁকিয়ে বললে, 'কে জানে বাবা তোমাদের ভালছেলের খবর আমরা রাখব কেমন করে? দ্যাখো গে যাও, হয়ত বাগানে গিয়ে বসে আছে কোথাও!'

'তা যা, কেউ খুঁজে গিয়ে নিয়ে আয় তোরা—'

'কে যায় এই এতরাত্তিরে বাগানে খুঁজতে। সে বুঁচীরই পোষায়, আমরা কোথায় খুঁজব!'

ন্যাড়া বললে, 'থাক না—দুপুর রাত্তিরে যখন শ্যালে এসে ঠ্যাং ধরে টানবে তখন হুঁশ হবে বাছাধনের, বাগানে গিয়ে বসে থাকার মজা টের পাবেন।'

'ও কি কথা রে!' মহাশ্বেতা ধমক দিয়ে ওঠে। এই কদিন তার মেয়ের বিয়েতে অরুণ যা অমানুষিক পরিশ্রম করেছে তা সে চোখেই দেখেছে। তারপর তার সম্বন্ধে স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। মহাশ্বেতার তো বিশেষ করে, রাগ বা দ্বেষ সে কারুর সম্বন্ধেই বেশী-ক্ষণ মনে রাখতে পারে না, দুটি লোক ছাড়া। সে বলে, 'দ্যাখ্ খুঁজে ভাল ক'রে, যা গাধার খাটুনি খাটল কদিন, খাওয়া নেই ঘুম নেই—হয়ত কোথাও ঘুমিয়েই পড়েছে বাছা। ছাদটা দেখে আয় দিকি, চিলেকোঠার ঘরটা আগে দ্যাখ—'

ছাদ, চিলেকোঠার ঘর, ওপর নিচে, বাগান সব খোঁজা হ'ল—অরুণ নেই। আলো নিয়ে হৈ হৈ করে একপাল ছেলে বেরিয়ে পড়ল বাগানে—শেষের দিকে অভয়পদ অম্বিকাপদও বেরোল—যেখানে যত সম্ভাব্যস্থান ছিল বসে থাকবার মতো সব দেখা হ'ল, অভয়পদ পাইখানা, তার পিছনের বাঁশঝাড় সব দেখে এল নিজে—কোথাও কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

এবার সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল! গেল কোথায় ছোকরা?

এখন অনেকেরই মনে হ'ল যে ওর ভাবভঙ্গীটা কদিন ধরেই খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। কিন্তু তাই বলে—এমন নিঃশব্দে কোথায় যাবে, করবেই বা কি?

কে একজন বললে, 'বুঁচীর শ্বশুর-বাড়িতে চলে গেল না তো? খুব ভাল-বাসত তো বুঁচী—দ্যাখো, হয়ত কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই চলে গেছে!'

'দূর, পাগল নাকি—সে যা লাজুক!' কথাটা উড়িয়ে দিল প্রমীলা।

হঠাৎ মনে পড়ল অম্বিকাপদর—বিকেলের দিকে, ঠিক আশীর্বাদের আগে কী একটা কাগজে-মোড়া প্যাকেট মতো দিয়ে বলেছিল, 'এটা একটু বাক্সয় তুলে রাখবেন মেসোমশাই?'—কী জিনিস সেটা সেও বলে নি, অম্বিকাপদও জিজ্ঞাসা করেনি। তখন জিজ্ঞাসা করার সময়ও ছিল না তার। প্রয়োজন আছে বলেও মনে করেনি অবশ্য। এই কদিনেই যেন সাবালক হয়ে উঠেছিল অরুণ, ওর ওপর একটা আশ্চর্য নির্ভরতা এসেছিল সকলের। অকারণে সে কিছু বলছে না বা করছে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল অম্বিকাপদ।

এখন গিয়ে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে দেখল, বিভিন্ন দফার বিভিন্ন কাজ বাবদ ওকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তারই জমা খরচ—নির্ভুল হিসাব। যেখানে রসিদ, ক্যাশমেমো বা ফর্দ পাওয়া গেছে তাও আছে সেইসঙ্গে একটা পিনে গ —আর বাকী টাকা পয়সা। এগারো পয়সা মেলে নি, তাও লেখা আছে গর্‌ড়া বলে।

এমনভাবে এত কাজ এত ব্যস্ত মধ্যে হিসাব দিতে গেল কেন?

এই প্রথম একটা সন্দেহ দেখা দি সকলকার মনে।

তবে কি আগে থাকতেই ছোক কোথাও সরে পড়বার মতলব ছিল : মনে?

কিন্তু এভাবে কোথায় যা কিছুইতো নিয়ে যায় নি। খোঁজ দেখা গেল—যা জামা কাপড় তার প ছিল তাছাড়া বাড়তি জামা-কাপ নেয়নি।......

সে রাত্রে আর কিছু করা সম্ভব সকলেই একটা থমথমে অবস্থায় চুপ গিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন কি ছে দলও কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে —তারাও নির্বাক হয়ে গেল। এ কী হল, এরকম একটা-কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা!

পরের দিনও একটু আধটু করা হল পাড়াঘরে। কেউই কোন দিতে পারলে না। কেউই দে. খানে বিশেষ কেউ চিনত না, কারণ বা বাইরে যেত সে কদাচিত।

পরের দিন ডাকে একটা চিঠি অম্বিকাপদর নামে। হাওড়া স্টেশনে ফেলা হয়েছে, হাওড়া আর এম এর ছাপ রয়েছে।

চিঠিতে লেখা :

"শ্রীচরণেষু, মেসোমশাই, আমার কোন চিন্তা করিবেন না, আমি ভা আছি। আপনারা আমার জন্য করিয়াছেন তাহার ঋণ শোধ হওয়ার যদি পারি তো মানুষ হইয়া সে শোধের চেষ্টা করিব। বলিয়া আসি পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবে আপনি প্রণাম লইবেন, প্রণাম প্রণম্যদের প্রণাম দিবেন। ইতি—সে অরুণ।"

এ চিঠিতে কৌতূহল বেড়েই গেল শুধু, কিছুই জানা গেল না।

কেন গেল সে—এ প্রশ্ন নিরুত্তরিতই থেকে গেল। কেন এবং কোথায় গেল।

কেন? কেন? কী দুঃখে? কী ভাবল সে, কী মনে ক'রে এমনভাবে সরে পড়ল?

সে কি কারও ওপর অভিমানে? স্বর্ণদের ওপর রাগ করে?

কোথাও চাকরি পেলে সে? কেউ তাকে জামাই করে নিলে?

সমস্ত প্রসঙ্গের বহু জল্পনা-কল্পনা ও বহু উত্তরেও সমস্যাটা যেমন অমীমাংসিত ছিল তেমনই রয়ে গেল।

শেষ অবধি দুর্গাপদ এককথায় জল্পনার উপসংহার টেনে দিলে, 'গ্রহ! গ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। ওর জন্মলগ্নে গোড়া থেকে সবকটা গ্রহই বিরূপ ছিল—নৈলে বাপ-মাই বা এমন বাদে-ছরাদে মরে কেন? এখানে এমন ভাল ব্যবস্থা—ওকে কলেজে পড়াতে চাইলে, জলপানি পেয়েছিল হয়ত ফ্রীও পড়তে পারত কলেজে কোথায় লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি করবে ভাল দেখে—জীবনে উন্নতি করবে, তা নয় ভ্যাগাবন্ডের খাতায় নাম লেখাতে গেল। গ্রহ ছাড়া আর কী বলব! দেখো, যদি দিনকতক বাদে ফিরে আসে, সুমতি হয় আবার!'......

স্বর্ণলতাকে ওখানে কেউ কিছু বলেনি, এখানে এসে শুনল। শ্বশুরবাড়ির হাজারো গল্প করবে বলে পেট ফুলছিল তার, কলকল করতে করতে নেমেছিল পালকি থেকে, খবরটা শুনে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার সমস্ত আনন্দ, মনের মতো সুন্দর বর পাওয়ার সমস্ত সৌভাগ্য-বোধ যেন নিমেষে ম্লান হয়ে গেল।

অরুণদা এমন করলে! কলেজে পড়া না। কত শখ তার বি-এ পাশ করবে! সেইজন্যে অমনভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'যদি জলপানি না পাই!' এই মতলব ছিল তাহলে!

কিন্তু কেন এমন করলে সে? কেন? কেন?

তার দুই চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রুর ধারা নামল। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল সে।

আহা, কোথায় আছে, কী খাচ্ছে সে। কেউ কি তাকে ডেকে খাওয়াচ্ছে? যা লাজুক, হয়ত না খেয়েই মরে যাবে। সে যে কারুর কাছ থেকে চেয়ে কিছু খাবে তা তো মনে হয় না।......

তবে একেবারে নিঃসম্বল যায়নি সে। দুতিন-দিন পরে মনে পড়ল স্বর্ণলতার।

এক পয়সা এক পয়সা করে জমানো সাতটা টাকা ছিল ওর। ভায়েদের ভয়ে অনেক কষ্টে লুকিয়ে রাখত। বিয়ের দুদিন আগে সেই টাকা সাতটা সে অরুণের জিম্মা করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি তো কদিন থাকব না, এরা সব উটকে পাটকে বার ক'রে নেবে। এ কটা টাকা একটু ঠিকানা করে রেখে দাও অরুণদা—'

অরুণ বলেছিল, 'বেশ লোককে জিম্মে করছ! কেন, তোমার তো নতুন পোর্টম্যান্ট কেনা হয়েছে—তুমি নিয়ে যাও না।'

'না না—তুমি বোঝ না। ওরা যদি বাক্সপ্যাটরা খুলে দেখে? শুনেছি অনেক শ্বশুরবাড়িতে বৌয়ের বাক্সে মুখদেখানি আশীর্বাদী টাকা যা থাকে বার করে নেয়। এটাও যদি সেই সঙ্গে বার করে নেয়?'

'আমাকে দিচ্ছ, আমি যদি মেরে দিই, খরচ করে ফেলি?'

'সে তো খুব ভাল। তুমি এক্ষুনি খরচ করো না—আমার কোন দুঃখ নেই!' বলেছিল স্বর্ণ। অবশ্য তখন স্বপ্নেও ভাবেনি অরুণ প্রাণধরে তার টাকা খরচ করতে পারবে!

সেই টাকা সাতটাই সঙ্গে আছে নিশ্চয়। সব পাই-পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে—সেটা তো দেয়নি! হয়ত ঐটুকু সুমতি হয়েছে তার, হয়ত ওর টাকাতে তার জোর আছে, নিয়ে গেলেও কিছু মনে করবে না—এ বিশ্বাস হয়েছে শেষ পর্যন্ত। হে ভগবান, তাই যেন হয়, হে মা কালী-ঘাটের কালী, টাকা কটা যেন নিয়ে থাকে সঙ্গে, এখানে যেন না কোথাও ফেলে গিয়ে থাকে। হে বাবা তারকনাথ—তাকে দেখো।

কথাটা কিন্তু কাউকে বলে না স্বর্ণ। কী দরকার, হয়ত ভুল বুঝবে সবাই, ভায়েরা রটাবে বুচীর টাকা ভেঙে পালিয়েছে।

স্বর্ণ তো জানে—সে তেমন ছেলেই নয়।

যদি এমন হবে জানত তো তার আশীর্বাদী টাকা থেকেও আর কটা টাকা দিয়ে যেত ওকে। (ক্রমশঃ)

।। একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র ।।

গত সপ্তাহে কলকাতা থেকে একটি দুষ্প্রাপ্য এবং ঐতিহাসিক ছবি ওয়াশিংটনে চলে গেল। ছবিটি আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটনের—চিত্র-শিল্পী গিলবার্ট স্টুয়ার্ট (১৭৫৫-১৮২৮)। স্টুয়ার্ট প্রতিকৃতি-শিল্পী হিসেবে তখন আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডেও সুনাম অর্জন করেন। ছবিটি ওয়াশিংটনকে দেখেই আঁকা। ওয়াশিংটনের যতগুলি প্রতিকৃতি আছে তার মধ্যে স্টুয়ার্টের আঁকা ছবিগুলিই সবচেয়ে ভাল এবং জনপ্রিয়ও বটে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে আমেরিকার যে বাণিজ্য ১৭৮৭ থেকে ১৮৪৫ পর্যন্ত প্রচুরভাবে চলত, ছবিটি তারই স্মারক।

—যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বস্টন ও নিউইয়র্কের কয়েকটি বৃহৎ বাণিজ্য সংস্থার এজেন্টের কাজ করেছেন এবং বহু মার্কিনী জাহাজী ক্যাপ্টেনকে বাণিজ্য ব্যাপারে সৎ উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এই আটান্ন বছরের মধ্যে শত শত বাণিজ্য জাহাজ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে পণ্যের আদান প্রদান করেছে। এই ব্যবসা প্রধানত চলত সালেম, মাসাচুসেট্‌স্‌ এবং বস্টনের সঙ্গে। চা, চিনি, আদা, নীল, চট, রেশম, বস্ত্র, মশলা প্রভৃতি ছিল প্রধান রপ্তানিদ্রব্য। সালেম থেকে যে জাহাজখানি বহুবার কলকাতায় যাতায়াত করত সেটির নামই হয়ে গিয়েছিল "সালেম জাহাজ"। ভারতফেরত জাহাজের ক্যাপ্টেনরা স্বদেশে বিশেষ সম্মান পেতেন।

এই ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তখনকার বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী রামদুলাল দে। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের বুদ্ধি ও সততার বলে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮০১ সালে কলকাতার এই বিখ্যাত ব্যবসায়ী রামদুলাল দে-কে তাঁর গুণমুগ্ধ আমেরিকান ব্যবসায়ী-বন্ধুরা এটি উপহার দিয়েছিলেন। সেকালের বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়বুদ্ধি এবং সততার জন্যে রামদুলাল দের খ্যাতি বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেকালের একজন আমেরিকান জাহাজের মালিক তাঁর নামে নিজের একখানি জাহাজেরও নামকরণ করেন। এই ছবিখানি বস্টন, নিউ ইয়র্ক, [illegible], বার্মিংহেম ও ফিলাডেলফিয়ার ... জন পঁয়ত্রিশ বণিক চাঁদা তুলে কিনে তাঁকে উপহার দেন।

রামদুলালের বংশধরেরা এই ছবিটি পরে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মল্লিক-পরিবারে বিক্রী করে দেন। তাঁদের কাছ থেকে কিছুদিন যাবৎ এই ছবিটি আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্যে কথাবার্তা চালানো হচ্ছিল। অবশেষে ছবিটি ৯৫০০০ টাকায় ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারী অব আর্টস-এর এরিক কাউডার কিনে নিয়েছেন। ছবিটি ন' ফুট দীর্ঘ ছ' ফুট প্রস্থ। প্রতিকৃতিটি পূর্ণাবয়ব। এক হাতে তরবারি ধারণ করে অন্য হাত নেড়ে ওয়াশিংটন যেন কোন বক্তৃতা দিচ্ছেন এই ভঙ্গিমায় আঁকা। জীবন্ত মানুষটির মুখমণ্ডল দেখেই প্রতিকৃতির মুখমণ্ডলটি আঁকা। স্টুয়ার্টের আঁকা ওয়াশিংটনের অন্যান্য চিত্রে যে শান্তভাব দেখা যায় বর্তমা[n] চিত্রটি তা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনে[র]। অযত্নের ফলে কিছুটা ময়লা প[ড়ে] যাওয়া ছাড়া ছবিটির আর কো[ন] ক্ষতি হয়নি। এমনকি পুরো[নো] ফ্রেমটিও অটুট আছে।

এই ছবিটি দেখতে দেখতে অতীতে[র] বহু স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেই সম[য়ের] দিনে বিদেশী মানুষেরা ভারতের ব[...] এই বিস্ময় ও আশ্চর্যের সন্ধান পে[য়ে] ছুটে এসেছিলেন। অদ্ভুত আর অন[...] দ্রব্যসম্ভার নিয়ে ফিরে গেছেন নিজে[দের] দেশে। আমেরিকা অত্যন্ত বৃহৎ বৃ[টিশ] সাম্রাজ্য থেকে ছিন্ন হয়ে নতুন স্বাধ[ীন] দেশে পরিণত হয়েছে। আর রামদুলাল[ের] মত সৎ মানুষেরা অসীম আগ্রহ নিয়ে দেশের মাটি ও মানুষকে অকৃত্রিম ভা[লো]বাসা জানিয়েছে।

গিলবার্ট স্টুয়ার্ট অঙ্কিত ওয়াশিংটনের প্রতিকৃতি

যে ফুল ভাগ্য-রাতের তারা

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

শনিবারে রেসের ময়দানে যাঁরা ছুটন্ত ঘোড়ার পুচ্ছ ধরে সংসারে বাজিমাত করে দেবার আশা রাখেন তাঁদের কেউ কেউ ময়দানে যাবার আগে নিউ মার্কেটের ফুলের স্টলে কিম্বা ইতস্ততঃ একটি বিশেষ ধরণের ফুলের খোঁজ করে থাকেন। কোনো শুভকার্যের শুরুতে যেমন সিদ্ধিদাতা গণেশ, এইসব রেসের পাণ্টারের কাছে এই বিশেষ ধরণের ফুলটির তেমনি সম্মান। এই বিশেষ ধরণের ফুলটির নাম অর্কিড। কাকের বাসায় জন্ম ও প্রতিপালিত হয়েও কোকিলকে যেমন লোকে ইজ্জত দেয় তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের জন্যে। তেমনি এই পরভৃতিকা লতাটিও যে ফুল ফোটায় তার রঙের জেল্লা দেখে সকলেই দিওয়ানা। সায়েবদের আমলে এক একটি অর্কিড সময় বিশেষে প্রায় কোহিনুরের মর্যাদা পেয়েছে। বড়দিনের জম-জমাট মরশুমে হয়তো খেলা হবে কিংস কাপ কি ভাইসরয়েস কাপ। লে আও অর্কিড। সায়েব বাটনহোলে সেই ফুল গুঁজে বিবিজানকে বাঁয়ে নিয়ে যাবেন রেসের ময়দানে। দাম যাই হোক না কেন—পাঁচ থেকে পাঁচশো! সব রকমেরই অর্কিড আছে। ফুলের রঙ আর বাহার দেখে বিশেষজ্ঞেরা ঠিক করবে কোন্টা কতখানি 'লাকি'। পোখরাজ-হীরা বা মুক্তোর মত এরও জাতিভেদ আছে, আছে শ্রেণীবিভাগ। যে অদৃশ্য জন্ম-লগ্নের নক্ষত্র ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে হীরে-মুক্তোর মত এই ফুলে বাটনহোলে গুঁজলেও নাকি সে প্রসন্ন হবে। লাগাম-ছেঁড়া বেগে 'ফেভারিট' ঘোড়া দৌড়ে বাজি জিতে শূন্যপকেট ভরিয়ে দেবে দিস্তা দিস্তা নোটে। বিধি যাদের প্রতি আপাতত বাম অর্কিড সেই সব ভাগ্য-হতের ভাগ্যরাতের তারা।

আগে অর্কিডকে পরভৃতিকা লতা এই কারণে বলা হয়েছে কেননা কোনো গাছ কিম্বা পাহাড়কে আশ্রয় করে এই পরগাছা হাওয়া থেকেই নিজের খাবার সংগ্রহ করে। এ রকম অধিকাংশ অর্কিডই প্রায় হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকে। তাদের শেকড়ও তাই খুব মোটা মোটা ও লম্বা দেখতে। আর এক জাতের অর্কিডও দেখতে পাওয়া যায় যা মাটিতেই সাধারণ উদ্ভিদের মত জন্মায়। তবে সাধারণত গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কোনো উপায়ে ভর করে বাতাসের জলীয় অংশ গ্রহণ করে এবং নিজের মূলে সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে এরা জীবনধারণ করে।

এ ফুলের নানান রঙ আর নানান ঢঙ। রঙের ও আকৃতির কত যে বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায় তার শেষ নেই। এই রঙ ও বৈচিত্র্যানুসারেই তার দর-দামও ঠিক হয়। এই ফুল সংগ্রহ করতে অনেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে এবং বহু জীবনও বিপন্ন হয়েছে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল থেকে উদ্ধার করে এই ফুল নিয়ে আসতে।

ভারতবর্ষের আর্দ্র ও গরম আব-হাওয়ায় অর্কিড সহজে জন্মাতে পারে। হিমালয়ে, আসামের গারো ও খাসিয়া পাহাড়ে, নেপাল, সিকিম ও ভুটানে অর্কিড প্রচুর জন্মায়। তেমনি বর্মা, সিংহল, মালয়, চীন, জাভা বোর্ণিও, মালাক্কাতেও অর্কিড প্রচুর পাওয়া যায়। পশ্চিমে কানাডা, ব্রেজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউগিনি, মেক্সিকো, পেরু এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নানান ধরণের অর্কিডের সাক্ষাৎ মেলে।

অর্কিড নানান জাতের আছে। তাই তার চাষ করবার আগে প্রত্যেক জাতের অর্কিডের বিশেষত্ব জেনে নিলে তাদের

জাভার অর্কিড

'ভাণ্ডা' অর্কিড

চীনের অর্কিড

দক্ষিণ আমেরিকার রাণী অর্কিড

বাঁচিয়ে তোলা ও বাড়িয়ে তোলার সাহায্য হয়। যে আবহাওয়ায় যে ধরণের অর্কিড বাঁচে, চাষ করতে হলে সেই ধরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারলে সেই অর্কিডের বাঁচার পক্ষে অনুকূলে পরিবেশ হয়।

অর্কিডকে বারান্দায় ঝুলিয়ে ইচ্ছা-মতো সাজিয়ে রাখা যায়। এক একটি অর্কিড ফুল ফুটে উঠে অনেকদিন পর্যন্ত টাটকা ও তাজা থাকে। সুগন্ধে মন মাতিয়ে দেয়। অর্কিডের জন্ম-রহস্য অনুসন্ধান করে জানা গেছে এরা গাছের শাখায়, পাহাড়ের গায়ের ফাটলে কিম্বা শ্যাওলা ঢাকা পাহাড়ী জায়গায় সহজেই জন্মায়। তাই থেকে বোঝা যায়, প্রখর রোদ্দুরের তাপ এরা সইতে পারে না। ছায়াময় স্যাঁতসেঁতে স্থানই এর বাঁচবার অনুকূলে পরিবেশ।

অর্কিড আবার হাওয়া না খেয়ে বাঁচতে পারে না। তাই অর্কিডের পরি-চর্যার জন্যে ঘর বানাতে হয়। সেই অর্কিডঘরে আলো-হাওয়া চাই প্রচুর। আবার ঘরের আবহাওয়া যাতে ছায়াময় ও স্যাঁৎসেঁতে হয় তারও দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। তাই অর্কিডঘরের দেওয়াল ও মেঝে অর্কিড গাছ বাড়ন্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে ভিজিয়ে ঠান্ডা করে রাখতে হয়।

শ্রেণী হিসেবে কোনো অর্কিড শীতকালে, কেউ গ্রীষ্মকালে আর কেউবা বসন্তে ফুল ফোটানো শুরু করে। এবং শ্রেণী হিসেবেই কেউবা অপেক্ষাকৃত উত্তাপ এবং কেউ ছায়া পছন্দ করে।

যেমন ইরাইডিস ওডোরেটাম, ইরাই-ডাস রোজিয়াম, ইরাইডাস অ্যাফাইনি, ডেনড্রোবিয়াম নোবিলি, ডেনড্রোবিয়াম কেয়াব্যুলেসেনস, স্যাকোলাবিয়াম গাটেটম, ভান্ডা টেরেশ প্রভৃতি অর্কিড শোওয়ার ঘরে বা বারান্দায় ঠান্ডা বা শুকনো জায়গায় ঝুলিয়ে রাখলে ফুল ফুটবার সময় তাদের ফুল মাসখানেক টাটকা ও সজীব থাকে।

আবার কয়েক ধরণের অর্কিড গরম আবহাওয়া একেবারেই পছন্দ করে না। ডেনড্রোবিয়াম সুপার্বাম, ডেনড্রোবিয়াম জিনাউইয়েনাম, ডেনড্রোবিয়াম পুলচেলাম প্রভৃতি শ্রেণীর অর্কিড ফুল উষ্ণ জায়গায় না রেখে ঠান্ডায় রাখলে অনেকদিন সতেজ ও সজীব থাকে।

ক্যাটেলিয়া, লাইক্যাস্ট, সিরটোচি ফ্রিচোপিলিয়া, স্টোসিয়া, অর্নাসি ইপিডেনড্রাম, ওডোন্টোগ্লোসাম প্র অর্কিড ফুল রৌদ্রালোকহীন ছা ঠান্ডা জায়গায় অনেকদিন পর্যন্ত অবস্থায় থাকে। গাছে জল দে সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে যাতে ফুলে জলের ছিটা না ল কেননা জলের ছিটা লাগলে ফুলে ধরে ও ফুল তার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য হা ডেনড্রোবিয়াম এগ্রিগেটাম, কোরমে ডালহাউসিয়ানাম, ভ্যান্ডা রে রক্সবারঘি ইত্যাদি সমতলভূমিতে অ দিন ফুল দেয়।

অর্কিড তৈরী করা যাদের শখ তাঁরা অনেক উপায়ে অর্কিড গাছ ল পারেন। গাছের ডালে, কাঠের টুকরো কিম্বা তারের বাস্কে চালুনির মত ছিদ্রযুক্ত টবে ল লাগানো যেতে পারে। কয়েক অর্কিড আছে যেমন—ভান্ডা, স লারিয়াম, ইরাইডিস, আনগ্রেইকাম নোপসিস্ শ্রেণীর অর্কিডকে বাক্স বা কাঠের গায়ে বসালে শিকড় তাড়াতাড়ি গজায় এব সাহায্যে বাতাস থেকে রস সংগ্র এরা দ্রুত বেড়ে ওঠে। কাঠের ব যে কোনো পাত্রে অর্কিড হলে তা বহুছিদ্রবিশিষ্ট হওয়া

গাছের ডালে বা কাঠের টুকরোর গায়ে অর্কিড লাগা সেখানে কিছু শ্যাওলা দিয়ে অর্কিড স্থাপন করতে হয়। গজানোর পর গাছটি শ্যাওলা দিয়ে ডাল বা কাঠের সঙ্গে ভালো করে বেঁধে এইভাবে অর্কিড প্রস্তুত করতে ভালভাবে যাতে জলসেচন হয় তার সজাগ লক্ষ্য না রাখলে গাছটি যেতে পারে। শীতকাল সাধ অনেকশ্রেণীর অর্কিডেরই বিশ্রা শীতের পরেই অর্কিডকে নতুন অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত কাঠের বাক্স স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। মাঘ মাসের শেষ থেকে চৈত্রমাসের ভাগের মধ্যে অর্কিডগুলির নতুন পত্র গজায়।

হাজার হাজার বছর ধরে অ রহস্য মানুষের মনে মায়াজাল করেছে। একসময় লোকে বলত হচ্ছে 'দেবতার ফুল'। বন-জ ছায়াচ্ছন্ন চিরগোধূলিতে অর্কিডে বহুবর্ণ প্রজাপতির মত ঝিলিক ওঠে। এক একটা অর্কিডকে দে হয় যেন মোমের তৈরী জানোয়ারের কখনো মনে হয় জরা-কুঞ্চিত ম মুখ। অর্কিডের সঙ্গে জন্ম ও

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—এই ধর্মবিশ্বাস বহু উপজাতির মধ্যে প্রচলিত।

যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে দূরদূরান্তে অর্কিড এরোপ্লেনে করে আমদানী হওয়ার ফলে জনসমাজে সহজ-লভ্য হয়েছে। 'ফুলের রাজা' অর্কিড এখন মন দেয়া-নেয়ার খেলার সাথী। প্রেমের প্রতীক রূপে জনসমাজে এখন অর্কিড পরিচিত। যাতে তাড়াতাড়ি শুকনো না হয়ে যায়, তাই জলভর্তি টিউবে অর্কিডকে সাবধানে স্থাপন করে প্রেয়সী রমণীকে দিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করেন আধুনিক-কালের প্রেমিক। সান্ধ্য-পোষাকে জল-ভর্তি টিউব-সমেত অর্কিডটি প্রেমিকা সযত্নে ও সগর্বে লাগিয়ে পার্টিতে যোগ দেন। কিন্তু সাবধান, মন জানাজানি হলে একমাত্র প্রেমিকই তার প্রেয়সীকে এই ফুল উপহার দিতে পারবেন। একটি ফুলই প্রেমিকযুগলের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে।

কলারসিক

মার্চের শেষ সপ্তাহে থিয়েটার রোডের অশোকা গ্যালারীতে দিল্লীর তরুণ শিল্পী ওম প্রকাশের একক প্রদর্শনী এবং অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর স্কেচ ক্লাবের সম্মিলিত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

।। শিল্পী ওম প্রকাশের প্রদর্শনী ।।

শিল্পী ওম প্রকাশের প্রদর্শনীটি কলকাতার শিল্প-রসিক মানুষদের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই তরুণ শিল্পীর আঙ্গিক দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে তেলরঙের মাধ্যমটি সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন এ-কথা প্রায় প্রতিটি চিত্রেই পরিস্ফুট। কিন্তু শিল্পীর মানসিক আবেগ বিমূর্ততার প্রতি নিবদ্ধ বলে চিত্রের বক্তব্য নিয়ে তিনি বেশি ভাবিত না। ফলে, তাঁর চিত্র-বক্তব্য অনেক সময় কোন অর্থই বহন করে না বলে মনে হতে পারে। বোম্বে, দিল্লী এবং কলকাতার বিমূর্তবাদী যে-সব তরুণ শিল্পী বিমূর্ততার নামে উন্মার্গগামিতার দিকে ছুটে চলেছেন শিল্পী ওম প্রকাশ মূলতঃ তাঁদেরই দলে। অথচ এই শিল্পী ড্রয়িং সম্বন্ধেও যে সচেতন তা তাঁর ব্যঞ্জনাময় রেখা ও চিত্র-সংস্থাপন-পদ্ধতি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। অন্ততঃ তাঁর 'কাশ্মীর ট্রিস' (১৮) চিত্রখানি আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করতে পারি।

প্রদর্শিত ১৮ খানি চিত্রের মধ্যে ১৮নং চিত্রখানি হয়ত ব্যতিক্রম। অন্যান্য চিত্রে তিনি কোথাও কিউবিজম, কোথাও বা স্থাপত্যরীতির জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাঁর চিত্র-বক্তব্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এর মধ্যে আবার 'পেন্টিং ইন রুদ্' (৭), 'ক্যাপচার্ড' (১০) কিংবা 'আফটার দি ক্লাইমেক্স' (১২) চিত্রগুলি এতই বিমূর্ত যে কোন দর্শকের পক্ষে চিত্র-বক্তব্য অনুধাবন করা সত্যিই কঠিন। অথচ তাঁর নানা রঙের সংমিশ্রণে গঠিত জমিনের দ্যুতিময় অভিব্যক্তি মনকেও কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে। এই রঙ-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যই শিল্পী ওম প্রকাশের সবচেয়ে বড় গুণ।

স্থাপত্যরীতির যে-সব চিত্র রঙে ও সংস্থাপনায় আমাদের ভাল লেগেছে তার মধ্যে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত 'মারনাউল' (১) ও 'দি টাউন' (৫), এবং জ্যামিতিক পদ্ধতির চিত্র 'কম্পোজিশান' (৯) ও 'ল্যান্ডস্কেপ' (১৩) উল্লেখযোগ্য। 'ট্রু ফিগারস' চিত্রখানির অপূর্ব জমিন সৃষ্টি এবং সামান্য রেখার ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক।

শ্রীসুধীর সেন অঙ্কিত 'একটি স্টাডি' (১)

শিল্পী ওম প্রকাশের এই একক প্রদর্শনী আমাদের মনে একই সঙ্গে আশা ও আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। তাঁর মানস-প্রবণতা অতঃপর কোনদিকে ধাবিত হয় আমরা কৌতূহলের সঙ্গে তা লক্ষ্য করব। আমাদের বিশ্বাস শিল্পীর নিষ্ঠা ও সততা তাঁকে অচিরেই এক সুস্থির ভিত্তিভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দেবে। প্রদর্শনীটি সপ্তাহকাল চলার পর গত ২৯শে মার্চ শেষ হয়েছে।

।। স্কেচ ক্লাবের প্রদর্শনী ।।

জীব-জগৎ ও প্রাকৃতিক জগতকে পর্যবেক্ষণ করা এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও দৃশ্যাদি সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জন যে-কোন শিল্পীর প্রাথমিক কর্তব্য। শিল্পী তাঁর এই অর্জিত জ্ঞানকে এবং নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তিকে কতখানি সার্থকভাবে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারলেন তার উপর নির্ভর করে তাঁর শিল্পী-জীবনের ভবিষ্যৎ। আমাদের দেশে শিল্পকলার স্কুলে ছাত্রেরাই এই জ্ঞানার্জনে প্রধানতঃ চেষ্টা করেন। বাঙলা দেশে এর বাইরে এমন কোন স্টুডিও বোধহয় নেই যেখানে শিল্পীরা জীবন্ত মডেল বিশেষ করে নারী-দেহ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এই অভাব পূরণের জন্য অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছেন। অ্যাকাডেমীর স্কেচ ক্লাবের সভ্যেরা জীবন্ত মডেলের সাহায্যে শারীরিক অবস্থান তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পর্যবেক্ষণান্তে তার রেখা-চিত্র অঙ্কন করে তাঁদের শৈল্পিক দক্ষতাকে শাণিত করে তোলার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

১৯৫৭ সাল থেকে স্কেচ ক্লাবের সভ্যেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ রেখা-চিত্র নিয়ে একটি করে বার্ষিক প্রদর্শনী করে আসছেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য চিত্র, প্রদর্শনীতে যে স্থান পায় না তা নয়। এবার এই ষষ্ঠ বার্ষিক প্রদর্শনীতে রেখাচিত্র সহ তেইশজন শিল্পী তাঁদের অন্যান্য চিত্রও প্রদর্শনীতে উপস্থিত করেছিলেন। এর মধ্যে ন্যুড স্টাডিই প্রধান। কিন্তু ন্যুড স্টাডির মান খুব উন্নত নয় বলেই মনে হল।

অবশ্য অন্যান্য স্কেচের মধ্যে তরুণ শিল্পী কুমকুম মুন্সী, যোগেন চৌধুরী, সেলিম মুন্সী, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুচন্দ্রা রায়, শ্রীদাম সাহা, সুবল সাহা, সজল রায়, মিলু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কাজ এবং কয়েকটি প্রতিকৃতি ও নিসর্গ চিত্র আমাদের ভাল লেগেছে। আমরা স্কেচ ক্লাবের কাছ থেকে আরও উন্নততর শিল্পকলার প্রত্যাশী। প্রদর্শনীটি ১লা এপ্রিল পর্যন্ত খোলা ছিল এবং এটি উদ্বোধন করেন শ্রীমতী রানু মুখোপাধ্যায়।

॥ চীনাদের উদ্দেশ্য কি? ॥

চীনাদের পুনরায় ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে যখন বিভিন্ন মহলে আশংকা প্রকাশ করা হয়, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ তিন সহস্রাধিক ভারতীয় যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিদানের দিনক্ষণ ঘোষণা করে চীন সকলকে আর একবার বিভ্রান্ত করে। ১লা এপ্রিল চীন সরকারের পক্ষ হতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, পূর্ব-সিদ্ধান্ত মত ১৫ই ও ১৭ই এপ্রিল চীন সীমান্তে প্রথম দফায় ছয়শত বন্দী জওয়ানকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে প্রত্যর্পণ করবে। নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়েক বলেন যে, অনতি-বিলম্বেই চীনের সঙ্গে ভারতের আলো-চনা শুরু হবে। চীন আর ভারত আক্রমণ করবে না এবং মুখে না বললেও কাজে চীন ইতিমধ্যেই কলম্বো প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। অবশ্য তিনি সেসঙ্গে একথাও বলেন যে, চীনাদের ভারত আক্রমণ, দ্রুত অগ্রগতি ও অকস্মাৎ প্রত্যাহার এতই পরস্পর-বিরোধী যে তার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পাননি। শ্রীপট্টনায়েকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন।

শ্রীপট্টনায়েকের এই সকল উক্তি যে আশার সঞ্চার করে পরের দিনই তা প্রায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় এক পাকিস্তানী সাংবাদিকের কাছে চীনা প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্তব্যে। প্রায় দুই বছর পরে এক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মিঃ চৌ বলেছেন, সীমান্ত এলাকা-গুলিতে ভারত সৈন্য প্রেরণ করলেই চীন পুনরায় আক্রমণ শুরু করবে। অর্থাৎ গত অক্টোবর মাসে ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করে চীনের সৈন্যবাহিনী ভারতের যে কয়েক সহস্র বর্গমাইল স্থান দখল করে এবং তারপর আবার একতরফা যুদ্ধবিরতির ঘোষণা করে সেইসব এলাকায় ভারতীয় সৈন্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে তারা যে পিছু হটে আসে, সেই এলাকাগুলিতে আজও তারা ভারতীয় সৈন্য প্রবেশ করতে দিতে রাজী নয়। যার মানে হল যে, সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলেও ঐসব এলাকায় ভারতের অধিকার চীন আজও স্বীকার করেনি এবং সেকারণে সেখানে ভারতীয় সৈন্যের প্রবেশাধিকার সে এখনও মেনে নেয়নি। চীনের যা মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে চৌ-এর সাম্প্রতিক উক্তিগুলিতে তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতের উত্তরসীমান্তবর্তী এলাকাগুলি সম্বন্ধে চীনের মনোভাব এতটুকুও পরিবর্তিত হয়নি। সুতরাং চীন মুখে না মানলেও কাজে কলম্বো প্রস্তাব মেনে নিয়েছে একথা ভাবলে বোধহয় আত্মপ্রবঞ্চনাই করা হবে। চীনা সৈন্য-মুক্ত এলাকাগুলিতে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর চেষ্টা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

॥ বৈরী নাগাদের তৎপরতা ॥

নাগাভূমির মুখ্য প্রশাসনিক কাউ-ন্সিলর শ্রীশিলু আও সম্প্রতি সদলবলে নয়াদিল্লী যান কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের সঙ্গে নাগাভূমির প্রশাসনিক সমস্যাবলী আলোচনার উদ্দেশ্যে। সেই সময় দিল্লীতে এক সম্বর্ধনাসভায় তিনি বলেন যে, নাগাভূমি ভারতের অন্যতম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করায় মুষ্টিমেয় বৈরী নাগা বাদে নাগাভূমির সকল অধিবাসীই বিশেষ খুশী। নাগারা নাগাভূমিকে ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করে এবং ভারতের উপর আবার যদি কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ আসে তবে নাগারা সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করবে।

নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রী-প্রতিম শ্রীশিলু আওর এই উক্তির মাত্র দুই একদিন পরেই বৈরী নাগাদের তৎপরতা আবার বিশেষ-ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের কার্যকলাপে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সংখ্যাশক্তিতে এখনও তারা খুব দুর্বল নয় বা তাদের ধ্বংসাত্মক শক্তির পূর্বের থেকে খুব বেশী হ্রাস পায়নি। গত ৯ই এপ্রিল বৈরী নাগারা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের মরিয়ানি-ল্যামডিং সেক্‌শনে রাঙ্গা পাহাড় ও ধানশিরি স্টেশনের মাঝে একটি চলন্ত প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উপর গুলীবর্ষণ করে, যার ফলে ঘটনাস্থলেই ছয়জন নিহত ও সাতাশজন আহত হয়। তার-পূর্বে বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে নাগারা অনেকখানি রেলপথ ধ্বংস করে। বলা বাহুল্য বৈরী নাগাদের এই ধ্বংসাত্মক শক্তি উপেক্ষণীয় নয় এবং নাগাভূমি বর্তমানে মোটামুটিভাবে শান্ত একথা ভাবলে প্রকৃত সমস্যার গুরুত্বকে লঘু করা হবে। আজ এটা স্পষ্ট যে, নাগারা একা নয় এবং কোন ভারত-বৈরী রাষ্ট্র তাদের শুধু প্ররোচিতই করছে না, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে তাদের ধ্বংসাত্মক শক্তিও অটুট রাখছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীও এ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, নাগারা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট। সুতরাং বৈরী নাগাদের সম্বন্ধে বা তাদের নেতা ফিজো সম্বন্ধে সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশের ফলও গুরুতর হতে পারে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বর্তমানে যে সংকটজনক অবস্থা তা যাতে আরও সংকটাকীর্ণ না হতে পারে তারজন্যে বৈরী নাগাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

॥ লাওস পরিস্থিতি ॥

লাওসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অকস্মাৎ আততায়ীহস্তে নিহত হওয়ার পর লাওসের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দ্রুত অবনত হওয়ার আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে। কমিউনিস্ট-পন্থী প্যাথেট লাও বাহিনীর কর্মতৎপরতা উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনীর সহ-যোগিতায় বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। প্যাথেট লাও বাহিনী লাওসের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভানা ফুমার অনুগত নিরপেক্ষ বাহিনীর দখল হতে গত ৭ই এপ্রিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক রাজধানী জিয়েঙ খোয়াঙ বলপূর্বক ছিনিয়ে নেওয়ায় অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। নিরুপায় হয়ে প্রিন্স সুভানা ফুমা লাওসের শান্তি ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাওস সংযুক্ত মন্ত্রিসভার উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্যাথেট লাও দলের নেতা প্রিন্স সুভানা ভঙ তার প্রতিবাদ করে বলেন যে, লাওসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কারও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। অবশ্য সে প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্ণপাত করেননি এবং প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা এগিয়ে আসেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বাহিনীর

কমাণ্ডার জেনারেল কঙলের হস্তচ্যুত জিয়েঙ খোয়াঙ পুনরুদ্ধারের কোন সংবাদ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নিরপেক্ষ বাহিনীর একটি অংশ কমিউনিস্টপক্ষীয়দের সঙ্গে যোগ দেওয়াতেই ঐ এলাকাটি অত সহজে পাথেট লাও বাহিনীর পক্ষে দখল করা সম্ভব হয়। সংবাদে প্রকাশ, নিরপেক্ষ বাহিনীর কর্মকর্তারাই এই অব্যবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা বহুকাল বেতন না পাওয়ায় ও তাদের খাদ্য-সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় অনেকদিন পূর্বেই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্ট পক্ষ সেই বিক্ষোভকেই নিজেদের কাজে লাগিয়েছে মাত্র। এই অনিশ্চিত অবস্থার যদি এখনও কোন প্রতিকার না হয় তবে লাওসের আরও বহু অংশ কমিউনিস্টদের দখলে চলে যাওয়া অসম্ভব হবে না। স্থানীয় বিক্ষোভ ও জনগণের দুঃখ দুর্দশার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে শুধু যদি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে সংকটত্রাণের উপায় চিন্তা করা যায় তবে তা যে শেষপর্যন্ত শোচনীয় পরিণতিই ডেকে আনে লাওসের এই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ।

॥ যুগোশ্লাভিয়া সম্পর্কে চীন ॥

সম্প্রতি চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে মত-বিনিময় হয় তার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েট নায়ক ক্রুশ্চেভ সুস্পষ্টভাবে চীনের কমিউনিস্ট কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে চীনের ইচ্ছামত তিনি পিকিঙে যেতে পারবেন না। তবে চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও যদি মস্কোয় আসেন তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাতে খুশী হবে। ঐ প্রসঙ্গেই সোভিয়েট-নায়ক ক্রুশ্চেভ আরও জানিয়ে দেন যে যুগোশ্লাভিয়াকে তিনি কমিউনিস্ট দেশ বলেই মনে করেন, যদিও যুগোশ্লাভিয়ার বহু বিষয়ের সঙ্গে তাঁর মতভেদ আছে। ক্রুশ্চেভের পিকিঙ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে চীনের কমিউনিস্ট নেতাদের মনোভাব এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে চীনের মনোভাব চৌ-এন লাই এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যুগোশ্লাভিয়া সমাজতন্ত্রী দেশ নয়। নিরপেক্ষতার মুখোস পরে ঐ দেশ ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং এই-ভাবে এশিয়ার অভ্যন্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে।—চৌ-এন লাইর এই স্পষ্ট কথায় এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যুগোশ্লাভিয়ার প্রশ্নে চীন-সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে কোন আপোষ করতে প্রস্তুত নয়।
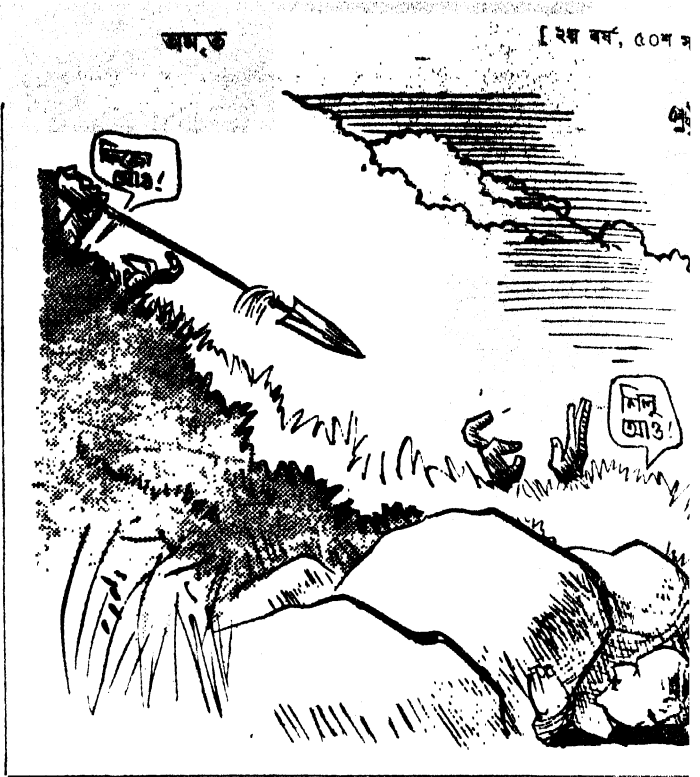
॥ কানাডার নির্বাচন ॥

মিঃ লেস্টার পিয়ার্সনের নেতৃত্বে কানাডার লিবারেল দল গত ৮ই এপ্রিলের সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক আসন লাভ করেছেন। অবশ্য ২৬৫ আসনবিশিষ্ট কানাডার প্রতিনিধি-সভার অন্যূন ১৩৩টি আসন অধিকার করতে না পারায় লিবারেল দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেননি এবং একারণে লেস্টার পিয়ার্সনকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ১৬ সদস্যবিশিষ্ট নিউ ডিমক্রাটস দল বা ২২ সদস্যবিশিষ্ট সোশ্যাল ক্রেডিট দলের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। বিগত রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী জন ডিফেনবেকার পুনর্নির্বাচিত হলেও তাঁর মন্ত্রিসভার ছয়জন সদস্য নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন। কমনওয়েলথ রাজনীতির এই হাওয়া-পরিবর্তন লক্ষণীয়। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলকেও আগামী নির্বাচনে এইরকম বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে বলে বিভিন্ন তথ্যাভিজ্ঞ নৈতিক মহল অনুমান করছেন।

॥ আরব যুক্তরাষ্ট্রের অগ্র

কায়রো হতে ৯ই এপ্রি পুনরায় ঐক্য আলোচনার সা প্রচার করা হয়েছে। মিশর, সি ইরাক একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনে হয়েছে। তিনটি দেশের স্বতন্ত্র থাকবে বা তাদের নিজস্ব পার্লা থাকবে কিন্তু তাদের উপরে থাকবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও সংসদ। যুক্ত সরকারের হাতে থাকবে প্রধানত প নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরক্ষার যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যে সৈন্য থাকবে সেই সৈন্যবাহিনী যে কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন পারবে। একই কূটনৈতিক প্র তিন রাজ্যের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রে ও রাষ্ট্রসংঘে উপস্থিত থা কায়রো হবে নতুন যুক্তরাষ্ট্রের রা যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট থাক তাঁর অধীনে থাকবে একটি প্রেসি য়াল কাউন্সিল ও যুক্তরাষ্ট্র স কাউন্সিলে মিশরের প্রতিনিধি থ চারজন ও সিরিয়া ও ইরাকের করে। ইরাকের খনিজ তৈল, সি কৃষিব্যবস্থা ও মিশরের শিল্প ও —এই কটি মহামূল্য সম্পদের স প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের যে অমেয় সামর্থ্য গড়ে উঠবে তা শুধু আর গুলিতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের রাজ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পার

॥ ঘরে ॥

৪ঠা এপ্রিল—২১শে চৈত্র : উদ্বাস্তু পুনর্বাসন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ হ্রাস—দণ্ডকারণ্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা বিপর্যয়ের সম্মুখীন—কলিকাতায় দণ্ডকারণ্য-কর্তৃপক্ষের বৈঠকে অবস্থা পর্যালোচনা—সমগ্র কর্মসূচী ঢালিয়া সাজার সিদ্ধান্ত।

'সমাজতন্ত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইলে কংগ্রেস দুর্বল হইবে'— দিল্লীতে কংগ্রেসকর্মীদের সভায় শ্রীনেহরুর (প্রধানমন্ত্রী) সতর্কবাণী—বিভিন্ন পরিকল্পনায় ধনী অধিকতর ধনী হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য।

৫ই এপ্রিল—২২শে চৈত্র : বাংলা নববর্ষ (১৩৭০ বাং) হইতে পৌর এলাকা বহির্ভূত এক বিঘা পর্যন্ত বসতভূমির খাজনা রেহাই—বিধানসভায় সরকার ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা।

তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে গ্রামাঞ্চলের ২৫ লক্ষ নর-নারীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা—পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ৪৫০টি কর্মসূচী গ্রহণ।

'সমস্যাসংকুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মন্ত্রীসংখ্যা হ্রাসের প্রশ্নই উঠে না'—বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের উক্তি—সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে কর্মচ্যুত স্বর্ণশিল্পীদের সাহায্যব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির ঘোষণা।

৬ই এপ্রিল (২৩শে চৈত্র) : চীন-অধিকৃত প্রতি ইঞ্চি জমি উদ্ধারের সঙ্কল্প—গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ নীতি ও সমাজতন্ত্রে কংগ্রেসের অবিচল আস্থা প্রকাশ—দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মত প্রস্তাব।

ত্রিপুরার চতুর্দিকে পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতা। বিরোধমূলক অঞ্চলগুলিতে অনধিকার প্রবেশ ও টহল।

৭ই এপ্রিল—২৪শে চৈত্র : উত্তেজনার মধ্যে চৌরঙ্গী কেন্দ্রের (কলিকাতা) উপ-নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন—রাজ্যের অপর চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত।

'কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে বিভেদই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে বাধা'—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের মন্তব্য।

৮ই এপ্রিল—২৫শে চৈত্র : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পাঁচটি শূন্য আসনেই কংগ্রেসের জয়লাভ—উপনির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা।

কলিকাতা পৌরসভার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থীর জয়—মেয়র : শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি ও ডেপুটি মেয়র : শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত।

দুই বৎসরের মধ্যে ভারতের সৈন্যসংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত—লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচাবনের ঘোষণা।

৯ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র : বিভিয়ান বোস কমিশনের রিপোর্ট-অনুযায়ী শীঘ্রই কোম্পানী আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে—লোকসভায় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীরেড্ডীর ঘোষণা।

আবার নাগা বিদ্রোহীদের দৌরাত্ম্য—মরিয়ানি-লামডিং সেকশনে ডিনামাইট ও আধুনিক সমরাস্ত্র লইয়া যাত্রীবাহী ট্রেন আক্রমণ—বেপরোয়া গুলীবর্ষণে ৬ জন নিহত ও ২৭ জন আহত— বিস্ফোরণে রেললাইন উৎপাটিত।

১০ই এপ্রিল—২৭শে চৈত্র : জাহাজী ব্যবসায়ে (ভারতীয়) বৈদেশিক লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত—লোকসভায় জাহাজী মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের ঘোষণা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ৬৫তম জন্মদিবস পালন।

কলিকাতায় সারা বাংলা স্বর্ণশিল্পী সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা কর্তৃক স্বর্ণ আইনের ব্যর্থতার উল্লেখ—প্রবর্তিত ব্যবস্থা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শিল্পীর বেকারত্বের কারণ বলিয়া বর্ণনা।

॥ বাইরে ॥

৪ঠা এপ্রিল—২১শে চৈত্র : মধ্য লাওসে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ—কম্যুনিষ্টপন্থী প্যাথেট লাও বাহিনী ও নিরপেক্ষতাবাদী সৈন্যদলের মধ্যে সংগ্রাম—পররাষ্ট্রমন্ত্রী কুইনিম ফোলসোনার হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী ঘটনা।

৫ই এপ্রিল—২২শে চৈত্র : আকস্মিক যুদ্ধবন্ধের উদ্দেশ্যে রাশিয়া কর্তৃক ওয়াশিংটন-মস্কো টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের প্রস্তাব।

'ভারত এবং চীনকে প্রদত্ত ভাষ্যে কোন পার্থক্য নাই'—মার্শাল চেন ই'র বিবৃতি সম্পর্কে সিংহল সরকারের মন্তব্য।

কায়রো-এ প্রেসিডেন্ট নাসেরের সহিত সফররত ডাঃ জাকির হোসেনের (ভারতের উপরাষ্ট্রপতি) গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

৬ই এপ্রিল—২৩শে চৈত্র : 'কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা হউক আর না-ই হউক ভারতকে আমেরিকা অস্ত্রসাহায্য দিবেই'—করাচীতে মার্কিন নীতিপ্রণয়ন বিভাগের প্রধান মিঃ রস্টোর সাফ কথা।

সোভিয়েট রকেট লুনিক-৪'এর চন্দ্রের আকাশপথ অতিক্রম।

৭ই এপ্রিল—২৪শে চৈত্র : 'পাক্ মনোভাবই কাশ্মীর-সমস্যা মীমাংসার অন্তরায়'—শিকাগো-এ টেলিভিশন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য।

৮ই এপ্রিল—২৫শে চৈত্র : প্যাথেট লাও ফৌজ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ শহর জিয়েং খুয়াং দখল—মধ্য লাওসের জার্স সমতলভূমিতে সংগ্রাম অব্যাহত—নিরপেক্ষ সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণ।

লাওসে শান্তি বিঘ্নিত না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট আবেদন—জেনেভা সম্মেলনের (লাওস সম্পর্কিত) কো-চেয়ারম্যানদের (ব্রিটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন) বার্তা।

৯ই এপ্রিল—২৬শে চৈত্র : কানাডার নির্বাচনে মিঃ লেস্টার পিয়ারসনের উদারনৈতিক দলের জয়লাভ—প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডিফেন-বেকারের রক্ষণশীল দলের পরাজয় বরণ।

১০ই এপ্রিল—২৭শে চৈত্র : 'সীমান্তে সৈন্য পাঠানো হইলে পাল্টা আঘাত হানা হইবে'—ভারতের প্রতি চীনের হুমকী।

ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের নিকট শ্রীনেহরুর পত্র—সীমান্ত-বিরোধ মীমাংসায় চীনকে রাজী করানোর অনুরোধ জ্ঞাপন।

পাক্ জাতীয় পরিষদে (ঢাকা) পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ভুট্টোর উক্তি : আমেরিকা কাশ্মীর-বিভাগের কোন প্রস্তাব করে নাই।

লাওসে গৃহযুদ্ধের অবসানের সংবাদ।

চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে লণ্ডনে ইঙ্গ-মার্কিন আলোচনা।

চট্টগ্রামের পাহাড়তলী এলাকায় ধর্মঘটী রেলকর্মী ও বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পাক্ পুলিশের গুলীবর্ষণ—৪ জন নিহত : বহু লোক আহত।

অভয়ংকর

॥ দেশবিভাগের বিপর্যয় ॥

১৯৪৬-এ অমৃতসর মিউনিসিপালিটির একজন একসিকিউটিভ অফিসার মিউনিসিপ্যাল হোস-পাইপ মেরামত করছেন দেখা গেল। অনেকে প্রশ্ন করল ব্যাপারটা কি? হঠাৎ এমন এক অকাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণ কি? উত্তরে অফিসারটি বললেন "শহরে অতি শীঘ্রই আগুন লাগতে পারে, দাউ-দাউ করে বাড়িঘর পুড়বে, তাই দেখছি কতদূর কি করতে পারি! তৈরী হয়ে থাকছি আগেভাগে।"

ভদ্রলোকের দূরদৃষ্টি অভ্রান্ত সন্দেহ নেই, তবে হোস-পাইপ অগ্নি-নিবারণের পক্ষে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪৭-এর প্রাক্-স্বাধীনতা কালে পাঞ্জাবে যে ধরণের হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যে ভাবে লোক-বিনিময় ঘটেছে, তার গুরুত্ব "unparalleled in world history in time of peace". — যে পরিমাণ মানুষ নিহত হয়েছিল তার আনুমানিক সংখ্যা দুই লক্ষেরও ওপর আর যারা বাস্তুহারা হয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় দশ মিলিয়ান।

এই প্রলয়ঙ্করী সর্বনাশের কারণ কি? এই অবস্থা কি নিবারণ করা সম্ভব ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তরদানে যাঁরা অধিকারী ব্যক্তি মিঃ পেন্ডেরেল মুন তাঁদের অন্যতম। তিনি সিভিল সার্ভিসের স্টীল ফ্রেমের মানুষ, পাঞ্জাবের বহু নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক নেতার তিনি অন্তরঙ্গ। সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ তাঁকে বিশ্বাস করতেন। দেশবিভাগের কালে তিনি বহাওয়ালপুরের সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন, একেবারে গুরুমানির দক্ষিণ হস্ত বিশেন। ১৯৪৮ থেকে তিনি ভারত সরকারের অধস্তন কর্মী। ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মিঃ পেন্ডেরেল মুন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত "Divide and Quit"-এ (Chatto and Windus) রেখেছেন। লেখকের মতে প্রলয়ংকর ঘটনাবলী ভারতবিভাগের সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রত্যক্ষ এবং অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া। পাঞ্জাব-বিভাগ এবং দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের বিভাগ এই ঘটনার জন্য দায়ী, বিশেষতঃ শিখ সম্প্রদায়। মিঃ মুন বলেছেন যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূল কারণ এই যে বিবদমান দলগুলি চেষ্টা করেছিলেন— "to ensure survival as a compact, coherent, undivided community"

কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে লেখক খানিকটা অদৃষ্টবাদীর মত বলেছেন যে, এই বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব ছিল না, কোনো উপায় ছিল না নিবারণ করার।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্থির করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। সবকটি প্রধান রাজনৈতিক দল দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নেন ১৯৪৭-এর জুন মাসে, আর তার দু মাসের মধ্যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট পুঁটলি-পোঁটলা নিয়ে দেশত্যাগ করে চলে গেলেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিন্দা করা হয়েছে অশোভন ব্যস্ততার জন্য—"in rushing through the partition in two and a half months while the Punjab was seething with passion" এবং পাকিস্তান ও পূর্ব পাঞ্জাবের নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে গেল।

মিঃ মুন বলেছেন এই সমালোচনাকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন— "It all rests on the false premise that the means and the time were available when in fact they were not". যে সামরিক শক্তির প্রয়োজন ছিল সেই শক্তিমান এবং বিশ্বাসযোগ্য সৈন্যবাহিনীর দ্বারা এটা হয়ত প্রতিরোধ করা সম্ভব হ নেতারা এই অবশ্যম্ভাবী প সম্পর্কে সচেতন থাকতেন। ভি পি মেননের মত ব "the authorities were ta surprise".

মার্চের গোড়ার দিকে অ মাস আগে পাঞ্জাবে যা ঘ সত্ত্বেও কেউই যে এই অব করতে পারলেন না এটা কর। পেন্ডেরেল মুন ব "It should have been pos deduce fairly accuratel would happen in the Pu a few weeks. I cannot did so".

নেতারা যদি এই অবস্থা এতটুকু চিন্তা করতেন তা হয়ত এই কান্ড ঘটত না। লোভে নেতারা একটু অশোভন সত্বরই দেশবিভাগে রাজী হ ফলে পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পা দুর্দশা। যদি আত্মিক আত্মাভিমান ত্যাগ করে দলকে আরো কয়েকদিন অনুরোধ করতেন তাহলে দুর্বিপাক ঘটতো না।

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি অমৃতসরের এই সরকারী কম মত অনেকেই জানতেন যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা আসন্ন কিছুই প্রতিকার চেষ্টা ক বোধ করেন নি। মাউন্টব্যাটে ব্যবস্থা কার্যকরী হয়নি তার ফলেই এমন আশ্চর্য ঘটেছে।

মিঃ মুন অবশ্য তা স্বীক না, তিনি বলেন শুধুমাত্র শিখ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত যে সংহ রাখা হবে তাহলে হয়ত সেই এক এই বিপর্যয় প্রতিরোধ করা হত। মিঃ মুন স্বীকার ক "Perhaps a sneaking sy for the Sikhs" তাঁর মনে ফলে তিনি একটা শিখ-মুসলি প্যাক্টের চেষ্টায় ছিলেন। দিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার পরিচয় কৌতূহলজনক।

লীগের পক্ষ থেকে গুরুন শিখদের তরফে সর্দার বলদেব প্রথম দিকটায় বলদেব সিং তত ছিলেন না, পরে কিন্তু প্রস্তাবে স্বীকৃত হন।

এই প্রচেষ্টা ফলবতী হল না, বলদেব সিং নেহরু মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। রাজনীতির এই বিচিত্র গোলকধাঁধায় যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের অপরিণামদর্শিতাই এই নিদারুণ দুর্দশার কারণ। মিঃ মুনের মতে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ায় যা অনিবার্য ছিল না তা অপরিহার্য হয়ে উঠল।

মিঃ মুন অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে অনেক অজ্ঞাত তথ্য সহকারে এক সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিবিশেষ তাঁর এই বিশ্লেষণে [illegible] করেন নি। তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট এবং সংহত। এই ধরণের আরো গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। [illegible] অবহেলিত পর্ব এবং পশ্চিম বাংলার দুঃখকর দুঃস্বপ্নের দিন সম্পর্কে

নতুন বই
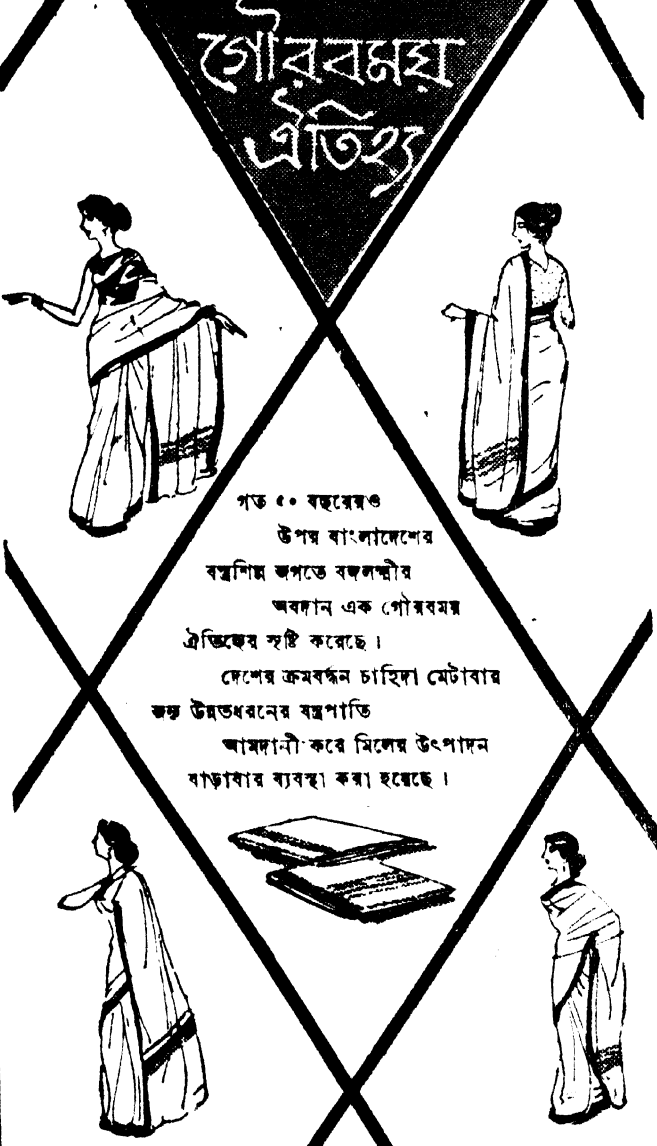
India's Struggle for Freedom—Hirendranath Mukherjee. Publishers : Messrs National Book Agency Private Ltd., Bankim Chatterjee Street : Calcutta—Price : Rs. 8 only.

স্বাধীনতাসংগ্রামে ভারতের যে ভূমিকা তার যথাযথ ইতিহাস রচিত হয়নি আজো। ডঃ তারাচাঁদের ইতিহাস-সরকারি বাংলানুবাদ আজো অনেকের [illegible] আছে। ১৯৪৫-এ দেশ-বিভাগের পূর্বে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থটি প্রথম রচনা করেন। নভেম্বর ১৯৬২-তে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, এই সংস্করণে লেখক ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করেছেন। কয়েকটি পরিচ্ছেদ নতুনভাবে সাজিয়েছেন, আর গ্রন্থশেষে স্বাধীনতা-উত্তরকালীন ঘটনাবলীর একটি নির্ঘণ্ট দান করেছেন। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের সমগ্র কাহিনী বিধৃত করার প্রয়াস করেছেন। প্রায় একশত পঞ্চাশ বছর কাল ধরে আমাদের স্বদেশবাসীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, ব্রিটিশ শোষণ-নীতি জনজাগরণে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রায় আটাত্তর বছর আগে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার কাল থেকেই ভারতের জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত। লেখক এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, গান্ধীজীর জীবন ও কর্ম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের আত্মজীবনী বা জীবনকথা প্রভৃতি থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের মালমশলা লেখক সংগ্রহ করেছেন। স্বাধীনতাসংগ্রামে বঙ্গদেশ বা মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-আয়োজন সম্পর্কে ইংরাজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নেই, বাংলায় এবং মারাঠী ভাষায় আছে, সুতরাং সেই বিষয়ে একটি পরিচ্ছেদ থাকলে ভাল হত। ডঃ তারাচাঁদের সরকার-প্রযোজিত ইতিহাসে যেমন অনেক ফাঁক আছে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও

সকল দিক থেকেই এই গ্রন্থকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা হয়েছে। জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য-নির্ভর আলোচনা আছে। গ্রন্থের শেষাংশে 'Suggested Reading' অংশটি বিশেষ মূল্যবান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসসন্ধানী পাঠকের পক্ষে এই নির্ঘণ্ট অতিশয় প্রয়োজনীয়। তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই ইতিহাস-গ্রন্থটি শুধুমাত্র তত্ত্বান্বেষীর কাছেই যে আদৃত হবে তা নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁদের কাছেও মূল্যবান। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

Morning Blossoms—(collection)—P. Chakraburty: Publishers General Printers & Publishers Private Ltd. Calcutta: Price: Rs. 4 only.

হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও জগন্নাথ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক হিসাবে শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চক্রবর্তী পরিচিত। বিদগ্ধমহলে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্যরুচির খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে যে পাঁচটি প্রবন্ধ আছে তা শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কলেজ ম্যাগাজিনের প্রয়োজনে লিখিত অল্পবয়সের রচনা, সেই কারণেই এর হয়ত প্রভাত কুসুম নামকরণ করা হয়েছে। কলেজের প্রবীণ বেয়ারার সঙ্গে কলেজের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ, লেখকের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর পাঠরত অবস্থায় এই রচনাটি লিখিত। রম্যরচনার নিদর্শন হিসাবে চমৎকার। কলেজ স্কোয়ারের সমর্থনে লিখিত প্রবন্ধটিও রম্যরচনা, ১৯১৯-এ প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রবন্ধটিও প্রেসিডেন্সী ম্যাগাজিনে ১৯২২-এ প্রকাশিত, নবাগতের দৃষ্টিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে the Power House of Bengal's intellectual supply মনে হয়েছে। ভারতীয়ের লিখিত ইংরাজী এবং মনমোহন ঘোষ অবশ্য অন্য জাতের রচনা। বিশ্লেষণী শক্তি ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী উত্তরকালে গভীর সাহিত্য-প্রীতি সত্ত্বেও কেন যে আর সাহিত্য-সৃষ্টিতে আগ্রহশীল হন একথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের এই রচনা অনেক পরিণত লেখকের পক্ষেও শ্লাঘনীয়।

ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

মালঞ্চের রঙ— (গল্প-সংকলন)। বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক— সম্বোধি পাবলিকেশন প্রাইভেট লিঃ ।। ২২, স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা—১। দাম—ছ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ।। পৃষ্ঠা : ২৭১

এই সংকলন-গ্রন্থের নামপত্রে লিখিত হয়েছে— "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্পের সংকলন" এবং সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন— "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ-পর্যন্ত ইতিহাসের অস্থির তরঙ্গ পেরিয়ে আর এক যুগ-সন্ধির ভাঙা-গড়ায় আধুনিক গল্প-সাহিত্য কী পরিমাণ শিল্প-সমৃদ্ধি লাভ করেছে তার পরিচয় সন্ধানেই এই সংকলনের পরিকল্পনা।" এই পরিকল্পনার রূপায়ণে সম্পাদক যে বাইশজন লেখকের গল্প সংকলন করেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত লেখকদের কোনও গল্প সংকলিত হয়নি—যথা : মনীশ ঘটক, সৈয়দ মুজতবা আলী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, বাণী রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সুশীল জানা, নরেন্দ্র ঘোষ, ননী ভৌমিক, রঞ্জন, দীপক চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুতরাং এই সংকলনগ্রন্থকে প্রতিনিধিস্থানীয় বলা চলে না। হয়ত সম্পাদকও সে বিষয়ে সচেতন এবং সেই কারণেই তিনি ভূমিকায় লিখেছেন— "সবিনয়ে স্বীকার করি,এমন আরও কৃতী গল্পলেখক আছেন যাঁদের রচনা অন্তর্ভুক্ত হলে এই সংকলন পূর্ণাঙ্গ হতে পারতো, কিন্তু সংক্ষিপ্ত কলেবরের জন্য তা সম্ভব হয়নি।" নামপত্রে ঘোষিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ছোটোগল্পের সংকলন কথাটি এই কারণে অর্থহীন মনে করি। পূর্ণাঙ্গ সংকলন-গ্রন্থ হিসাবে তাই "মালঞ্চের রঙ" গ্রন্থটির অঙ্গহানি ঘটেছে। যে কয়জন লেখকের গল্প এই সংকলনে সংগৃহীত তার মধ্যে তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, প্রতিভা বসু ও সমরেশ বসুর গল্প কটি বাংলা-সাহিত্যের ছোটগল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন, এবং সম্পাদকের নির্বাচন-কৃতিত্বের পরিচায়ক। গ্রন্থশেষে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'লেখক পরিচিতি' অংশটিও প্রশংসার দাবী রাখে। এই উপহারযোগ্য গ্রন্থটির মুদ্রণ-বৈশিষ্ট্য ও শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী-অঙ্কিত সুন্দর প্রচ্ছদ সুরুচির পরিচায়ক।

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা (প্রবন্ধ)— সুনীল বন্দ্যোপাধ্যা[য়] এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, ৫ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা পৃঃ ১০৫।

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েক[জন] আলোড়নসৃষ্টিকারী কবি বাংলা কা[ব্য] ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের জোয়ার এ[নে]ছিলেন বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের কা[ব্য] বৈশিষ্ট্য ও কাব্যসাধনার আলোচনা ক[রা] হয়েছে। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গু[প্ত,] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দ[ত্ত,] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীল[াল] চক্রবর্তী এবং নবীনচন্দ্র সেন সম্প[র্কে] আলোচনায় গ্রন্থকার পুরনো কথা নতুনভাবে বলবার চেষ্টা না করে নতুন তথ্যকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠার চে[ষ্টা] করেছেন। এখানেই বর্তমান গ্রন্থখানি একমাত্র বৈশিষ্ট্য।

রাগ নেই— (গল্প-সংকলন)—চাণক্য সেন। প্রকাশক—করুণা প্রকাশনী ১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা ১০২ ।।

চাণক্য সেন এক নতুন ধরনের সাহিত্য রচনার পরিচয় দান করেছেন তাঁর 'রা[জ]পথ ও জনপথ' এবং 'সে নহি সে নহি' নামক দুখানি জনপ্রিয় গ্রন্থের মাধ্যমে 'রাগ নেই' তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন গল্পগুলিকে "সমসাময়িক ভার[তীয়] জীবনের সাহিত্যের সমীক্ষা" ব[লে]ছে[ন] লেখক, সেই দিক থেকে বিষয়-বৈচিত্র্যে গল্পগুলি অভিনন্দনের দাবী রাখে আধুনিককালে ভারতরাষ্ট্রের রাজধানীতে কি বিচিত্র এক জগৎ গড়ে উঠেছে তার ছবি এঁকেছেন লেখক ব[লি]ষ্ঠ তুলিতে ও কড়া রঙে, তাঁর সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদে তেমন যত্ন নেওয়া হয়নি।

শহরতলির শয়তান—(অনুবাদ-গ্রন্থ) বারট্রান্ড রাসেল। অনুবাদ : অজিত কৃষ্ণ বসু, প্রকাশক রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা—১২। চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

রাসেলের "স্যাটান ইন সার্বস" এর অনুবাদ। বইয়ের পাঁচখানি গল্পই রহস্য এবং বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী। রাসেলের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মনের ছাপ সুস্পষ্ট। শেষ তিনটি গল্পে রাজনীতি ও সমাজের প্রতি তীক্ষ্ম কটাক্ষপাত হয়েছে। প্রতিটি গল্প পড়েই তৃপ্তি পাওয়া যায়। কারণ অনুবাদক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং যথাসাধ্য আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছেন। তবে এই

নিষ্ঠার জন্যেই দু-এক জায়গায় অনুবাদ সামান্য আড়ষ্ট হয়েছে। ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদপট সুরুচিসম্পন্ন।

নীলকণ্ঠের বিষ-(নাটক)মনোজ মিত্র। গন্ধর্ব প্রকাশনী। ১৮, নূর্ব লেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আড়াই টাকা।

সাম্প্রতিক নাট্য প্রচেষ্টা—যাকে নব-নাট্য আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয় তার সঙ্গে নট ও নাট্যকার শ্রীমনোজ মিত্র ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। স্বভাবতই তাই তাঁর নাটকে গতানুগতিকতার চিহ্ন নেই। বরং তাঁর নাটক হয়ে ওঠে জীবনের প্রকাশ ও নূতন সন্ধানের তীব্রতায় উজ্জ্বল। পূর্ব-কথনে তিনি বলেছেন "খুঁজি সেই ঈশ্বরের রাজ্য—যেখানে আমি একা—আমি শক্তিমান—আমার সকল অসহায়তা দৌর্বল্য জয় করে আমি।" তর্কসাপেক্ষ এই উক্তির সার্থকতা বিচার্য নয়। অথবা এই উক্তিটি ঠিক এইভাবে নাটকে কতদূর উপলব্ধ সত্য হয়ে উঠেছে সে প্রশ্নও অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু নাটকে যে 'লংম্যান'কে পাই সে জীবন্ত; হয়ত নাট্যকারের জীবন সম্পর্কিত পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই চরিত্রের স্বাভাবিক আলোকে সে উদ্ভাসিত এবং একটি উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত।

লংম্যান একজন যাজিকার প্রতি আসক্ত হওয়ার অপরাধে নির্বাসিত হল একা নির্জন ও পরিত্যক্ত গীর্জায়। লংম্যানের অপরাধ—সে চার্চের ফাদার হয়ে খৃষ্টধর্মকে অবমাননা করেছে। ভীষণ নির্জনতা সহ্য করতে পারে না লংম্যান। নিঃসঙ্গ হয়ে অভিসম্পাত করছে। রাতের অন্ধকারে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে দুঃখীরাম, নিরাপদ প্রমুখ পথের পাশে পড়ে থাকা মুমূর্ষুদের। পৃথিবী থেকে তাদের রেখে দিয়েছে দূরে। সঙ্গ পাবার আশায় বন্দী করেছে, অসহায় হয়ে করেছে নির্যাতনও। এমন সময় এল ডাক্তার। সে এক ঝড়ের রাত। সমস্ত গির্জায় একটা বিপর্যয় ঘটছে। খুবই নাটকীয় সম্ভাবনাপূর্ণ এই দৃশ্য এবং প্রয়োগনৈপুণ্যে আরও গভীরতার আশা করা যায়। ডাক্তার বলে লংম্যান-কে, "ওদের ওপর অত্যাচার করছেন আপনি... নিজের মনের ক্ষিদে ওদের দেহের ওপরে মেটাচ্ছেন।" ডাক্তার বলে ওদের জন্যে চাই হাসপাতাল। ডাক্তার চলে যায়। কথাটা মনে ধরে লংম্যানের। দ্বিতীয় অঙ্কে লংম্যানকে দেখা যায় ডাক্তারি বই পড়তে, হাসপাতালের আয়োজন করতে। এমন সময় আসে জনৈক এ্যাংলো বৃদ্ধ, সঙ্গে খানসামার মাখনলাল। দেশে ফিরে যাবার ভাড়া দিতে সে রাজী। বৃদ্ধ উৎসাহিত। দেশে ফেরার কথায় উৎসাহ পায় না লংম্যান। এমনকি যাজিকার কাছে ফিরে যাওয়ার কথাও তার কাছে 'সিলি সেন্টিমেন্ট'। কোন সর্তেই লংম্যান ছেড়ে দিতে পারে না তার রোগীদের। শাসায় বৃদ্ধ। কিন্তু লংম্যান অটল। তাই পৃথিবীর মানুষেরা আহত করে লংম্যানকে। তৃতীয় অঙ্কে ফিরে আসে ডাক্তার। হাসপাতাল তৈরি। আর্ত-দের জন্যে হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়। ফাদার লংম্যান হয়েছে তার অধিকর্তা। যারা লংম্যানের ক্র্যাচ কেড়ে নিয়েছিল, যে পৃথিবীর মানুষেরা আহত করেছিল তাকে, সে-ই পৃথিবীর মানুষেরাই দিল তাকে ভালবাসার এই পুরস্কার। এমন-ই একটা হাসপাতাল চেয়েছিল লংম্যান যেখানে সে ওই নিরাপদ দুঃখীরামদের সঙ্গে একসঙ্গে বাঁচতে পারবে; তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে না। রাজী হল লংম্যান। এমন সময় আবিষ্কৃত হল যে লংম্যানের কুষ্ঠ হয়েছে। কিন্তু দূষিত শরীর নিয়ে আর সকলের জীবনকে বিষাক্ত করে তুলতে অসম্মত হল লংম্যান। সে থাকল তার সেই নির্জন গীর্জায় একা একা। যে নির্জনতা প্রথম দৃশ্যে লংম্যানের কাছে ছিল অসহনীয়, যে যীশুর মূর্তি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি সেই নির্জনতা ও যীশুর মূর্তি হল তার শেষ আশ্রয়। লংম্যান এবার নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াতে পারল নির্জনতার মুখোমুখি। কারণ বোধহয় সে আর নিঃসঙ্গ নয়; সে সত্যিই নিরাপদ দুঃখীরামদের ভালবাসতে পেরেছিল বলেই অবিচ্ছিন্ন ও দৃঢ়। আশা করা যায় মনোজ মিত্রের এই নাটক যে আত্মিক সমস্যাকে বিধৃত করা হয়েছে তা পাঠক-দের দ্বারা অভিনন্দিত হবে এবং মঞ্চেও হবে সাফল্যমণ্ডিত। এই চিন্তাদীপ্ত নাটকটির প্রতি আমি উৎসাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

॥ সংকলন ও পত্র-পত্রিকা ॥

মোহনা (৩য় বর্ষ ।। ১ম ও ২য় সংখ্যা)—সম্পাদক : তরুণ বসাক। রহড়া; পি এস-খড়দহ, ২৪-পরগণা। দাম কুড়ি নয়া পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন হরিহর গোঁসাই, দেবী রায়, গণেশ দাস, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ মুখার্জি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, বিমল-কান্তি ভট্টাচার্য, শিবেন্দ্র গোস্বামী, নির্মলকুমার চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

সাহিত্য পত্র (দ্বাদশ বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা : ১৩৬৯)—সম্পাদক : অসীম রায়। ৩এ, দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন—বিষ্ণু দে, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, অসীম রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ-প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ভট্টাচার্য। দান্তে, বের্টোল্ট ব্রেখ্ট এবং গোটের রচনার অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু দে, জিষ্ণু দে এবং দেবব্রত রেজ।

নান্দীকর

আজকের কথা

ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্য ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেক্সিকোর আদিবাসীদের নেতা বেনিটো পাবলো ওয়ারেজকে যখন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর প্রতিভূ ম্যাক্সিমিলিয়ান বোঝাতে চেয়েছিলেন, অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিম জাতিকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, ব্যবহারে সুসভ্য ক'রে তোলবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ ক'রে ফরাসী জাতি মেক্সিকোবাসীর অযাচিত উপকারই করছেন, তখন ওয়ারেজ অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, ফরাসী জাতির এই পরোপকার প্রবৃত্তিকে ধন্যবাদ! মিঃ ম্যাক্সমিলিয়ান, আপনি আপনার মনিব নেপোলিয়নকে জানাবেন, মেক্সিকোবাসী চিরদিন অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে, তবু বাহিরাগত ফরাসীদের প্রজ্বলিত আলোকের সাহায্যে আলোকিত হ'তে চায় না।

ওয়ারেজ জানতেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—এই তিন রকমের পরাধীনতার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরাধীনতা। ইংরেজ ভারতবর্ষে এসে আমাদের দেশকে শুধু যে বাহুবলে শাসন করেছিল, তা' নয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিকেও কুক্ষিগত করেছিল এবং তার চেয়েও বেশী যা করেছিল, সে হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর দুরন্ত আধিপত্য বিস্তার। তারা আমাদের তন্তুবায়দের অঙ্গুলিচ্ছেদন ক'রেই শান্ত থাকেনি, আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যকে নির্মূল করবার জন্যে বহুরকম পন্থা অবলম্বন করেছিল। তার মধ্যে যেটি প্রধান, সেটি হচ্ছে শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। একদিকে তারা শহরে সভ্যতা বিস্তার করে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের জন্যে স্কুল-কলেজ খুলেছিল, অন্যদিকে সারা ভারতের অগণিত টোল-চতুষ্পাঠীগুলিকে বন্ধ ক'রে সংস্কৃত শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এই যে সাংস্কৃতিক পরাজয়, তার গ্লানি আমাদের আজও বহন করতে হচ্ছে। ইংরাজী শিক্ষার বিষ ভারতবাসীকে এমনই আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে যে, অতি বড় শিক্ষিত ব্যক্তিও ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যকে বর্জন করে জীবন ধারণের কথা ভাবতেই পারেন না। ইয়োরোপের ফরাসী, ইতালী, জার্মান, রুশ প্রভৃতি জাতির কথা না হয় নাই তুললাম, এশিয়াতে জাপানীদের আমরা নিশ্চয়ই একটি সুসংস্কৃত এবং অগ্রসর জাতি ব'লে স্বীকার করি। বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, এমন দিন ছিল, যেদিন ইংরেজকে জাপানে পদার্পণ পর্যন্ত করতে দেওয়া হ'ত না এবং আজও মার্কিন প্রভাব সত্ত্বেও জাপানে ইংরেজী শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ জাতি হিসেবে ইংরাজী ভাষা না জেনেও এবং ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকেও জাপানের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

এত কথা লিখতে হ'ত না, যদি না সেদিন একটি বিদগ্ধ সম্মেলনে জনৈক উচ্চশিক্ষিত সুধীজনের মুখ থেকে শুনতাম যে, ইংরেজী ভাষা না জানলে এবং বিশেষ করে ইংরেজী নাটকের সঙ্গে আমাদের সম্যক পরিচয় না হ'লে আমরা বাঙলা নাটক লিখতে পারতুম না। বহু গুণিজনের অপ্রীতিভাজন হব এটা জেনেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাঙলা নাটক আজ পর্যন্ত যদি একখানিও রচিত না হ'ত, তাতেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে যে সকল নাটক আমরা রচনা করেছি, তার অধিকাংশরই সঙ্গে আমাদের মাটির সংস্রব নেই। এবং আমাদের অভিনয়ধারাও যে পাশ্চাত্য প্রভাবিত, সে-কথা না বললেও চলে। অথচ ভরতের নাট্যসূত্র, নন্দীকেশ্বরের অভিনয়দর্পণ প্রভৃতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, প্রাচীন ভারতে নাট্যকলার চূড়ান্ত সমৃদ্ধি ঘটেছিল। রামগড়ে আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসাবশেষ মঞ্চস্থাপত্যের একটি সুন্দর পূর্ণ নিদর্শন। মুসলমান রাজত্বকালে উত্তরভারতে নাটকাভিনয় চর্চায় একটি ছেদ পড়ে বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে উদ্ভব হয় যাত্রাগান, কথকতা, পাঁচালী নৌটঙ্কি প্রভৃতির। এবং দক্ষিণভারতে কথাকলি, ভরতনাট্যম প্রভৃতির চর্চা চলতে থাকে পুরোদমে। কিন্তু ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য-প্রভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটেছে, সে ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন! আমরা যে অসভ্য জন্তু ছিলাম, আমাদের সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই ছিল না, ইংরাজের শিক্ষায় আমাদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ এবং সেই বৃহৎ অংশটি 'তথাকথিত' উচ্চশিক্ষিত অংশই সে-কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। প্রাচীন ভারতের বিদগ্ধজনের লেখ্যভাষা সংস্কৃতর সম্যক চর্চা যে সকল ভারতীয়কে একসূত্রে আবদ্ধ করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন ঐশ্বর্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত করতে পারে, এ ধারণা করবার মত মনোবৃত্তি আমাদের শিক্ষিতজনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় দুশো বছর ধরে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরজী পড়েও শতকরা দশজন ভারতবাসী যদি ইংরেজী শিখে থাকে, তাহ'লে মাত্র পঁচিশ কি পঞ্চাশ বছর ঠিক ঐ রকমভাবেই সংস্কৃত শেখবার চেষ্টা করলে শতকরা অন্ততঃ নব্বইজন ভারতীয় সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে, এ-কথা তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেন না।

ইংরাজীকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে কায়েম না করে যদি জাপান, জার্মান, রুশ প্রভৃতি দেশের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহ'লে ভারতের পক্ষেই তা সম্ভব হবে না কেন, তা অনুধাবন করা নিশ্চয়ই দুষ্কর। মনে রাখা উচিত, যে সকল জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব'লে স্বীকৃত, তারা নিজেদের ঐতিহ্য, ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই অগ্রসর হয়েছে এবং এও মনে রাখা উচিত যে, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে আজকের পৃথিবীর যেখানেই কোনো নতুন চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়, অগ্রসর দেশসমূহ তাকে তৎক্ষণাৎ নিজ ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে আত্মস্থ করতে একটুকু বিলম্ব করে না। এর জন্যে পূর্বোক্ত অগ্রসর জাতির মধ্যেই বৈদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু ব্যক্তিই নিয়োজিত আছেন।

কাজেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও আমরা নিজেদের ভাষার সাহায্যেই—সে সংস্কৃতই হোক, আর বাঙলাই হোক—হোমার, দান্তে, সেক্সপীয়র, টলস্টয় প্রভৃতির অমূল্য রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারতুম বা আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটি, নিউটনের মধ্যাকর্ষণ বিষয়ক প্রস্তাব ও অপরাপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত হ'তে পারতুম। ইংরেজ আসবার আগে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থা থেকে কোনো পাশ্চাত্য শক্তি এদেশে না এলে আজ আমরা কি অবস্থায় উপনীত হতুম, এ সম্পর্কে কথা কাটাকাটির কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে সম্পর্কে আজ সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষমুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারতের নাগরিকরূপে আমরা আমাদের ভারতীয়ত্বকে কি উপায়ে গড়ে তুলতে পারি।

চিত্র সমালোচনা

দ্বীপের নাম টিয়া রঙ (বাঙলা) : চিত্রযুগের নিবেদন : ৪,১০৫ মিটার দীর্ঘ ও ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; কাহিনী : রমাপদ চৌধুরী; পরিচালনা : গুরু বাগচী; চিত্রনাট্য : ঋত্বিক ঘটক; সঙ্গীত-পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়; গীত-রচনা : প্রণব রায়; আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত; চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা; শব্দধারণ : নৃপেন পাল (অন্তর্দৃশ্য) ও শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য); সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ-পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ; সম্পাদনা : অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় মুখোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশনা : কার্তিক বসু; রূপায়ণে : সন্ধ্যা রায়, বনানী চৌধুরী, শিপ্রা সেন, দীপা চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, দিলীপ রায়-চৌধুরী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, অমিত দে, শিশির মিত্র, কালিপদ চক্রবর্তী, মিঃ ব্যাকেনফোর্ড প্রভৃতি। মিতালী ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিবেশনায় গেল ১২ই এপ্রিল থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অপরাপর চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছে।

স্বাগত জানাই "দ্বীপের নাম টিয়া রঙ" ছবিটিকে এবং অভিনন্দিত করি এই ছবির প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, শিল্পী ও অপরাপর কলা-কুশলী ও কর্মীবৃন্দকে। সমুদ্রবিধৌত বেলাভূমি, ঝটিকাক্ষুব্ধ বায়ুমণ্ডল, বর্ষণ-মুখর প্রকৃতি এবং বনভূমিসংশ্লিষ্ট নিসর্গশোভার যে নিদর্শন এই ছবির মাধ্যমে দেখতে পাওয়া গেছে, তাকে অভূতপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার ওপর ছবিটির সঙ্গীতসমৃদ্ধ রূপটি আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। সমবেত এবং একক সঙ্গীত ও গীটারের প্রাধান্য সমেত যন্ত্রসঙ্গীত সমস্ত ছবিখানিকে রসের নির্ঝর ক'রে তুলেছে। "পীরিতি বসত কুরে হি-দেশে, মিৎা পিয়া ভিড়াই সাম্পান" এবং "ঐ ভরা রাইতে ইতো হাসি আলো" গান দুখানি এমনই আবেগমূর্ছনার সৃষ্টি করে যে, বারংবার শুনেও আশ মেটে না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সুরের সুর-ধুনীপ্লাবিত "দ্বীপের নাম টিয়া রঙ" অকুণ্ঠ জনপ্রিয়তা লাভ করার সঙ্গের সঙ্গে বাঙলার চিত্রজগতে একটি অবিস্মরণীয় অবদান বলে স্বীকৃত হবে।

ছোট্ট টিয়া রঙ দ্বীপ, আর তার চারপাশে বন্ধনহীন সমুদ্র। দ্বীপের বন্য অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ ঐ দ্বীপের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। কবে, কোথা থেকে তারা সেখানে এল, তা তারা জানেই না। যমুনী, মদন, মাধো, ফিরুজা, আকাশী এদের মেয়ে-পুরুষের নাম। এদের বিয়ে হয়; আবার মেয়েদের যৌবন থাকতে থাকতে বর মরে গেলে বা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে মেয়েরা অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সাঙা করে। যেমন করেছিল টিয়া রঙের সবচেয়ে প্রাণচঞ্চলা মেয়ে ফিরুজা তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্যে বহুদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষা করবার পর বলিষ্ঠদেহ মদনকে। কিন্তু বিধির কি নির্বন্ধ! সাঙা করার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরুজার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী যমুনী ফিরে এসেছিল ঐ দ্বীপে। কিন্তু সে যমুনী যেন সেই আগেকার যমুনী নয়, অন্য কেউ। এ যমুনী বাহারে কামিজ গায়ে দেয়, হিন্দীতে কথা বলে আর 'বাবু'-ভোলানো নাচ দেখিয়ে পয়সা রোজগারের ফিকির করে। ফিরুজা মদনের সঙ্গে সাঙা করেছে, তাতে যমুনীর কুছ পরোয়া নেই; সে আকাশীকে তার নাচের জুড়ী ক'রে পয়সা রোজগারের ধান্দায় ফিরতে লাগল। কিন্তু আকাশী! পাগল

'দ্বীপের নাম টিয়া রং' চিত্রে সতীন্দ্র ও শিপ্রা।

আলভা—কোন্ এক পর্তুগীজের বংশধর আলভা যে আকাশীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল ঃ তাকে পেয়েই রাবা বাজিয়ে গেয়ে উঠেছিল ঃ "পীরিতি বসত কুরে যি-দেশে"। কিন্তু অর্থোপার্জনের আকর্ষণ আকাশীকে পেয়ে বসেছিল; তাই সে অনায়াসেই হয়ে উঠেছিল যমুনীর নাচের সাথী। কিন্তু যেদিন মত্ত আকাশী আলভার নিজ হাতে বোনা ঘাঘরা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে হাসতে হাসতে যমুনীর হাত ধরে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন আলভার স্বপ্ন গেল ভেঙে; সে তার পূর্বপুরুষের গুপ্তধন খুঁজে পাবার নক্সাটিকে ফিরুজার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'ই নক্সাটা আকাশীকেই দিও টিয়ারাণী। মাটিতে অনেক মোহর আছে আমার, অনেক সোনা। অরেই সব দিয়া গেলাম।' এই বলে সে জেলেডিঙি নিয়ে নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছিল।

স্টিফেন্স সাহেব কাঠচালানী কারবার খুলেছিলেন এই টিয়া রঙে। ম্যানেজার চ্যাটার্জি যেদিন টিয়ারঙীদের 'আগুনিয়া' পরবের অঙ্গস্বরূপ বনে আগুন লাগানোতে আপত্তি জানিয়ে মাধো সর্দারকে গুলির আঘাতে নিহত করলেন, সেইদিন মাধোর মেয়ে আকাশীর মনে প্রতিজ্ঞা জেগেছিল, এই অন্যায়ের বদলো নেবার জন্যে। আলভা যেদিন দ্বীপ ছেড়ে চলে গেল, সেদিনই আকাশীর ডাক এল চ্যাটার্জিবাবুর শ্যালী তামসীর বিয়েতে নাচতে যাবার। বাবুদের উৎসবে সবাইকে যেতে মানা করে দিয়ে আকাশী নিজে গেল যমুনীর সঙ্গে নাচতে। নাচের মাঝে সে যমুনীকে করল ছুরিকাহত, পরে বনে আগুন লেগেছে দেখতে পেয়ে মিঃ চ্যাটার্জি যখন বন্দুক হাতে ছুটে গেলেন, তখন সে তাকে বেকায়দায় ফেলে নিজের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে গেল; কিন্তু প্রাণ হারাবার আগে চ্যাটার্জি তার প্রাণটিও নিলেন বন্দুকের গুলির সাহায্যে। এই সময় কোম্পানীর হুকুম এল যুদ্ধের কারণে দ্বীপ ছেড়ে চলে আসবার জন্যে। তাড়াহুড়ো পড়ে গেল জাহাজে চাপবার জন্যে। যমুনীর ঔরসজাত ছেলে বুদ্ধুর খোঁজ পেল ফিরুজা জাহাজের মধ্যে; কিন্তু নতুন ছেলেকে দোলা থেকে নামিয়ে আনবার জন্যে যখন সে পা বাড়াল, তখন সে আবিষ্কার করল যে, জাহাজ ইতিমধ্যেই চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। নিরুপায় ফিরুজা তখন জাহাজ থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে এবং বহু শ্রমে সাঁতরে দ্বীপে গিয়ে উঠল। কিন্তু ঘরে পৌঁছে দেখে, চিতাবাঘের বাচ্চা পরমানন্দে তার শিশুসন্তানকে গলাধঃকরণ করেছে। তারপর?—তারপর সেই দ্বীপে এল ফিরুজা—সদ্য সন্তানহারা ফিরুজা কি বিচিত্ররূপে বিচরণ করেছিল এবং যুদ্ধশেষে বুদ্ধুসহ মদন সেখানে ফিরে এসে ফিরুজাকে কি অবস্থায় আবিষ্কার করেছিল, তাই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত হয়েছে। এখানে ব'লে রাখা ভালো,

'সুবর্ণরেখা' চিত্রে অভি ভট্টাচার্য ও মাধবী মুখার্জী

আমরা রমাপদ চৌধুরীর মূল কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত নই। আমাদের আলোচনা ছবিতে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ছবির বিভিন্ন শিল্পীর মধ্যে যে দুজন আমাদের চোখকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন ফিরুজার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় এবং আল্‌ভার ভূমিকায় সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। টিয়া রঙ দ্বীপের টিয়ারাণী ফিরুজাকে তিনি মূর্ত ক'রে তুলেছেন তাঁর সাজে, চলনে, বলনে, চাউনিতে। অপরূপ রূপসজ্জায় প্রেমিক আল্‌ভাররূপী সতীন্দ্র ভট্টাচার্যকে মনে হয়েছে স্বর্গীয় সুষমাসম্পন্ন কোনো ঋষিতুল্য ব্যক্তি। তাঁর কণ্ঠের গান এবং তাঁর অভিনয় ভূমিকাটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে। যমুনী এবং আকাশীর ভূমিকায় যথাক্রমে দিলীপ রায় ও শিপ্রা সেন নাচে ও অভিনয়ে ভূমিকা দুটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। এ ছাড়া দিলীপ রায়চৌধুরী (চ্যাটার্জি), দিলীপ মুখোপাধ্যায় (সমীরণ), নিরঞ্জন রায় (মদন), শিশির মিত্র (মাধো সর্দার), মিঃ ব্যালেশেয়ার্ড (স্টিফেন্স), কালিপদ চক্রবর্তী (কুলীর দোরককারী) প্রভৃতি যথাযোগ্য সুঅভিনয় ক'রে ভূমিকাগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন।

'আগুনিয়া' উৎসবে নাচের দৃশ্যগুলিকে কিছুটা কৃত্রিম বলে বোধ হল। বর্মিজ দ্বীপের পুরুষ-রমণীদের নৃত্যোৎসব দেখেছি। বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবাসিন্দাদের নাচ কি রকম হওয়া উচিত, তা ঐ নাচ থেকেই বোঝা যায়।

"দ্বীপের নাম টিয়া রঙ" বিষয়বস্তুতে, বর্ণনা-বৈচিত্র্যে, দৃশ্য-সংস্থাপনে, সুরযোজনায়, পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জায় এবং সর্বোপরি রসপরিবেশনে এক [illegible] অভিনব সৃষ্টি।

বিবিধ সংবাদ

৫ম বার্ষিকী বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন :

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ৫ম বার্ষিকী বঙ্গ নাট্য-সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে (১২ই এপ্রিল, শুক্রবার) মূল-সভাপতিরূপে প্রথিতযশা সাহিত্যিক-অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী যে সুচিন্তিত অভিভাষণ দেন, তাতে তিনি নাটক লিখতে লোকে উৎসাহিত হয় না কেন, বাঙলা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর নাটক লেখা হয় না কেন, বাঙলা নাটকে ট্র্যাজিডির ভাষা তৈরী হয়নি কেন, থিয়েটারী নাটকে ঠিক জাতীয় সাহিত্য হয়ে ওঠেনি কেন, ভালো নাটক লেখায় উৎসাহ দেবার জন্যে কি করা উচিত প্রভৃতি বহু বিষয়ের উত্থাপন করেন। আমরা বারান্তরে তাঁর ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার আশা রাখি। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক পি কে গুহ এবং এই অধিবেশনে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার জলধর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ, সাহিত্যিক মনোজ বসু এবং নাট্যকার মন্মথ রায়।

এলিটে "ম্যারেজ গো রাউন্ড"

আজ শুক্রবার, ১৯এ এপ্রিল থেকে এলিট সিনেমায় টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-এর নবতম কমেডি-চিত্র 'ম্যারেজ গো রাউন্ড' মুক্তিলাভ করবে। সুসান হেওয়ার্ড, জেমস ম্যাসন এবং সুন্দরী মাদকতাময়ী অভিনেত্রী জুলি নিউমার-অভিনীত এবং লেসলী স্টিভেন্স-লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ওয়াল্টার ল্যাং পরিচালিত এই চিত্রটিতে অধ্যাপনা কার্যে রত দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন বিচিত্র মনোভাবসম্পন্ন সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাবে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তাই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে দেখানো হয়েছে। সিনেমাস্কোপ ডি ল্যুক্স কালারে তোলা ছবিখানি মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে।

অগ্রদূত প্রযোজিত 'উত্তরায়ণ' :

আসছে শুক্রবার, ২৬এ এপ্রিল থেকে উত্তরা, পূরবী ও উজ্জ্বলাতে মুক্তি পাচ্ছে অগ্রদূত প্রযোজিত ও পরিচালিত নবতম চিত্রার্ঘ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গঠিত 'উত্তরায়ণ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত তারাশঙ্করের অনবদ্য কাহিনীটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু প্রভৃতি শিল্পী। ছবিটিতে সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ডিল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার ছবিখানির পরিবেশক।

দক্ষিণ কলিকাতায় 'রূপকার' সম্প্রদায় :

দক্ষিণ কলিকাতার দর্শকদের আগ্রহাতিশয্যে 'রূপকার' সম্প্রদায় আসছে ২৯এ এপ্রিল সোমবার থেকে পর পর কয়েকটি সোমবার রাজা বসন্ত রায় রোডস্থ 'রসিক-রঞ্জন-সভা'র নবনির্মিত নাট্যমঞ্চে তাঁদের বহুপ্রশংসিত 'চলচিত্ত-চঞ্চরী' ও 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটক দুখানি অভিনয় করবেন।

স্টার অব ইন্ডিয়া পিকচার্স-এর "চৌধুরী কর্ণেল সিং"

গেল ১২ই এপ্রিল থেকে জনতা সিনেমা চিত্রগৃহে স্টার অব ইন্ডিয়া পিকচার্স-এর নবতম চিত্রনিবেদন, রাষ্ট্রীয় সম্মানভূষিত প্রথম পাঞ্জাবী চিত্র 'চৌধুরী কর্ণেল সিং' ছবিখানি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হচ্ছে। চমৎকার সংলাপ, নাচ ও গানে ভরপুর ছবিখানি পাঞ্জাবভাষীদের প্রীতি সম্পাদনে যে সক্ষম হয়েছে, তা প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ থেকেই বোঝা যায়।

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান আগামী ১৭ থেকে ১৯শে এপ্রিল মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হবে।

এই অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসরে দীর্ঘদিন পর ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ যোগ দেবেন; তাছাড়া ভীমসেন যোশী, আমীর খাঁ, সুনন্দা পটনায়েক কণ্ঠসঙ্গীতে যোগ দেবেন; যন্ত্রসঙ্গীতে যোগ দেবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ভি জি যোগ, শাশ্বত গাঙ্গুলী প্রভৃতি কৃতী শিল্পীরা। রবীন্দ্রসঙ্গীতের
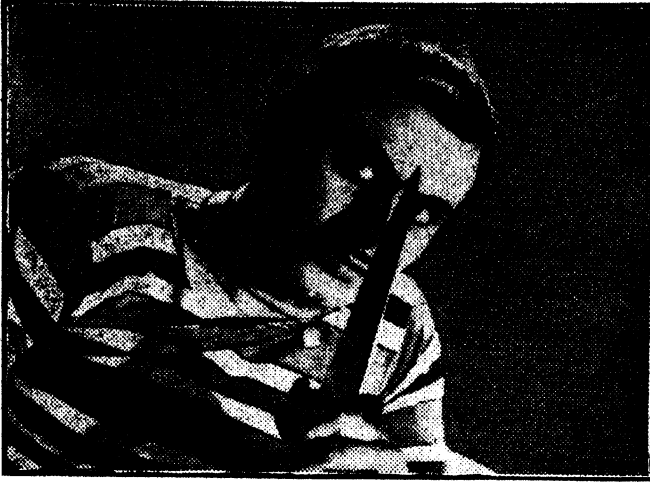
অগ্রদূতে পরিচালিত 'বাদশা' চিত্রে একটি বিশেষ ভূমিকায় কালী ব্যানার্জী

'তেরে ঘরকে সামনে' চিত্রের নায়ক-নায়িকারূপে দেব আনন্দ ও নূতন।
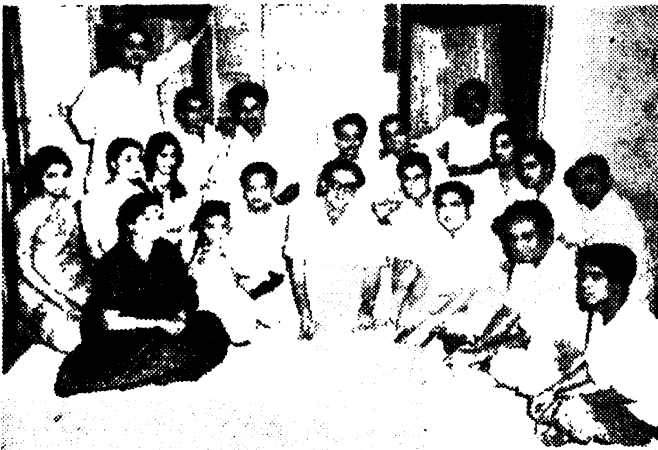
মাস থিয়েটার্সের সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি সংস্থার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সদস্যদের সঙ্গে এক চা-চক্রে মিলিত হন। অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সংস্থার সংগঠনী সম্পাদক শ্রীনিরঞ্জন রায় এবং পরিচালক শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে

আসরে দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্রের সংগীতও অন্যতম আকর্ষণ।

।। 'দীপশিখা'র অভিনয় ।।

গত ৫ই এপ্রিল '৬৩ শুক্রবার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে দীপশিখা শিল্পী-গোষ্ঠীর শিল্পীরা মঞ্চস্থ করলেন শচীন ভট্টাচার্যের নতুন নাটক 'কালো মানুষ নীল আকাশ'। বাস্তব চরিত্রসৃষ্টি সুষ্ঠু সংলাপ ও সার্থক নাটকের পরিণতির জন্য 'কালো মানুষ নীল আকাশ' সাম্প্রতিককালের একটি বলিষ্ঠ নাট্যযোজনা।

অভিনয়ে গোবিন্দ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, চঞ্চল গুহ, রথীন চক্রবর্তী, সুতপা ভট্টাচার্য, সত্যেন ব্যানার্জি, নটরাজ সাহা ও শচীন ভট্টাচার্য দর্শক-মনে গভীর রেখাপাত করেন। এ'রা ছাড়াও নাটকে সুঅভিনয় করেন সুকুমার দাস, রবীন সিন্‌হা, প্রণব বসু-রায়চৌধুরী, অর্চনা অধিকারী, অর্ণব গুহ, যাদব চক্রবর্তী ও দীপক সেন।

নাটকটি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং।

মঞ্চসজ্জা সাধারণ। আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

।। 'অন্বেষা'র নতুন দু'টি নাটক ।।

উত্তর ক'লকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা অন্বেষা গত ১৮ই ও ২৫শে মার্চ তাঁদের সাম্প্রতিকতম দু'টি নাটক মঞ্চস্থ করেন। প্রথমটি শ্রীঅগ্নি মিত্রের 'নাগপাশ' অন্যটি শ্রীগঙ্গাপদ বসুর 'মহাগুরু নিপাত'। প্রথমটিতে সমাজের একদল কুচক্রী স্বার্থান্বেষী মানুষদের কুটিল ষড়যন্ত্রের নাগপাশে আবদ্ধ একটি নারী কি ক'রে তার জীবনের সব কাঙ্খিত বস্তুকে হারালো, সেই করুণ বাস্তবালেখ্যটিই প্রতিফলিত হ'য়েছে; আর দ্বিতীয় নাটকে একটি সুডৌল কাহিনীকে আশ্রয় করে সুন্দর হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি শিক্ষিত সুদর্শন যুবক এক গুরুবাদ-কণ্টকিত বৃদ্ধের বাড়ীতে গৃহভৃত্যের চাকরী নিয়ে কি করে তাঁর কাঁধ থেকে গুরুবাদের ভূত নামালো এবং তার বাঞ্ছিত প্রেমিকাকে লাভ করলো সেই কাহিনীটিই বলা হয়েছে। 'অন্বেষা' গোষ্ঠীর সাবলীল দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকটির 'সাসপেন্স' ও 'হিউমার' পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হয়েছে।

অভিনয়াংশে দু'টি নাটকেই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুই নায়ক চরিত্রে অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন স্বদেশ বসু। বিশেষতঃ দ্বিতীয় নাটকের শ্রীবসুর কয়েকটি নির্বাক অভিব্যক্তি ও অর্ধস্ফুট সংলাপ অনেকদিন মনে থাকবে। দু'টি নাটকেই দু'টি 'টাইপ'

ভিন দেশী •• তারকা

ওপরে : সোনজা জীমান ও হেইডি ব্রুল। নীচে : মার্গিট সাদ ও জনৈক শিল্পী এবং হেলগ শ্ল্যাক

চরিত্রে অবিস্মরণীয় অভিনয় ক'রে প্রশান্ত সেন দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রাণী' ও 'শিবানী' তাঁর বলিষ্ঠ শিল্পীজীবনের পরিচায়ক।

নাটক দুটির নির্দেশনার কৃতিত্ব স্বদেশ বসুর এবং মঞ্চপরিকল্পনা, যন্ত্রসঙ্গীত ও শব্দপ্রয়োগের কৃতিত্ব যথাক্রমে মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু ঘোষ ও শ্যামল দত্তের।

।। 'অহীন্দ্রমে'র নতুন প্রচেষ্টা ।।

বেহালায় "অহীন্দ্র-মঞ্চ" গত ২৫শে ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়ে আজ পর্যন্ত প্রতি রবিবার ত্রি-মাত্রিক প্রথায় "অমিয়পন্থা" নাটকের অভিনয় চলছে।

নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠান

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবসন কলেজ অফ্ ড্রামাটিকস-এর মঞ্চে একটি মনোরম ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সরকার (চাকী)। ইনি গত দেড় বৎসর যাবৎ এখানে নিয়মিত ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা দিয়ে আসছেন। গত বৎসর জুন মাসে বিদেশী ছাত্রীদের নিয়ে প্রথম অনুষ্ঠান হয়। এ বৎসর বিভিন্ন মহাদেশের সতেরো জন ছাত্রী নিয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ ও লোকনৃত্যের আসর জমে ওঠে। ভারতীয় নৃত্যের বেশভূষা, বিশেষ অঙ্গসজ্জা ও পুষ্পাভরণ—সর্বোপরি বিভিন্ন অঞ্চলের নৃত্যের বিশেষ বৈচিত্র্য ও লাবণ্য আন্তর্জাতিক দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের সঙ্গীত ও বাদ্যে অংশ গ্রহণ করেন দেশী ও বিদেশী শিল্পীবৃন্দ। পিয়ানোতে ভারতীয় সুরজাল সৃষ্টি করেন আমেরিকান শিল্পী কুমারী জুডিথ মোকে। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নেন যথাক্রমে আমেরিকা ও হল্যান্ড দেশীয় শ্রীমতী সার্লট বেইন ও শ্রীমতী নন্দা নিয়ের মানস। বাদ্যযন্ত্র পরিচালনা করেন নাইজিরিয়ার ইউরোবা-বাদক শ্রী ও ওলাওয়ে। বাঁশী বাজান ডাঃ ইন্দ্রদয়াল শেঠ। পুষ্পাভরণের পরিকল্পনা শ্রীমতী গ্রেস মার্টিন।

নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রীদের ভারতীয় নৃত্যানুষ্ঠানের একটি দৃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভারতীয় নৃত্যের প্রতি ক্রমশ আগ্র হয়ে উঠছেন। বিদেশী রসিক আন্তরিক সহানুভূতি ও স যোগিতা শ্রীমতী সরকারকে সাহায্য ও প্রেরণা দিয়ে সম্প্রদায়টি নাইজিরিয়াস্থিত টেল অনুষ্ঠানে আগামী ২৫শে মে একা ঘণ্টাকালীন নৃত্য প্রদর্শনের আমন্ত্রিত হয়েছেন এদেশী পত্রপত্রিকাতেও অনুষ্ঠানের সা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

জে, জে, ফিল্মস্ কর্পোরেশনের ৩নং চিত্র ঃ

"সুবর্ণরেখা" চিত্রখানি সমাপ্ত বার পর রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়া প্রযোজনা ও পরিচালনায় ভারতের বর্বর চীনের আক্রমণের পরিপ্রে রচিত জে, জে, ফিল্মস্ কর্পোরে দোভাষী (হিন্দী ও বাংলা) ছবির ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। স পরিচালক ভেদপাল ছবিখানির কয়েকখানি গান রেকর্ড করেছেন ই ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে। ঋত্বিক ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন।

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিক পরিষদ ঃ

আসছে জুলাই মাস থেকে বি রূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক গিরিশ না সব শুরু হবে। এবারের উৎসবের বি বস্তু হবে এই যে, ১৯৪০ সালের

রচিত বা অভিনীত বিভিন্ন ধরনের ও আঙ্গিকের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক মঞ্চ ও যাত্রা-নাটকের মধ্যে এই উৎসবকে সীমিত করা হবে। পরিষদ পুরানো নাট্যাভিনয়ের এই উৎসবে যোগদান করবার জন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত পেশাদার ও সৌখীন নাট্য-সংস্থাগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং যুগ্ম-সম্পাদকের সঙ্গে বিশ্বরূপা থিয়েটারে যোগাযোগ করবার জন্যে অনুরোধ করছে।

* কলকাতা * বোম্বাই * মাদ্রাজ

কলকাতা

সরকার প্রোডাকসন্স-প্রযোজিত তপন সিংহের 'নির্জন সৈকতে' মুক্তি-প্রতীক্ষিত। কালকূট-রচিত এ কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রুমা গুহঠাকুরতা, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, অমর মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রথীন ঘোষ ও উপমন্যু চট্টোপাধ্যায়। বহির্দৃশ্যে গৃহীত ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন বিমল মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন। গোল্ডউইন পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

সুবোধ ঘোষের মঞ্চসফল নাটক 'শ্রেয়সী' চলচ্চিত্রায়ণে রূপ নিচ্ছে। পরিচালনা করছেন শ্যাম চক্রবর্তী। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয় বর্তমানে চিত্রগ্রহণের কাজ চলেছে। বম্বে থেকে সবিতা চট্টোপাধ্যায় এসেছেন এ ছবিতে অভিনয় করতে। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন বসন্ত চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, দীপিকা দাস, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মাদেবী, এন. বিশ্বনাথন, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিনতা রায়, তনুশ্রী গাঙ্গুলী ও রাজলক্ষ্মী দেবী। প্রধান কারিগরী শিল্পী বিজয় ঘোষ।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার চতুর্থ ছবি 'বিশপ্তি'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। রোমাঞ্চ-মধুর কাহিনীর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, পাহাড়ী সান্যাল, সুস্মিতা সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, অমর গাঙ্গুলী, শান্তি দাস ও কুমার রায়। ছবির পরিচালকদ্বয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র।

ইন্দ্রাণী প্রোডাকসন্সের ছবি 'হাসি শুধু হাসি নয়' মুক্তিপ্রতীক্ষিত। চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনা করেছেন সন্তোষ গুহরায়। চিত্রনাট্য ও সংলাপ-রচয়িতা বিনয় চট্টোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় রূপদান করেছেন বিশ্বজিৎ, কল্যাণী ঘোষ, জহর রায়, নিতীশ মুখোপাধ্যায়, পদ্মাদেবী, বনানী চৌধুরী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু ও মাঃ শ্রীমান। সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন শ্যামলকুমার মিত্র।

বোম্বাই

মুক্তিস্তানের ছবি 'প্রীত না জানে রীত'এর দৃশ্যগ্রহণ প্রায় শেষ হতে চলেছে মডার্ণ স্টুডিওয়। এস. ব্যানার্জি-পরিচালিত এ ছবির কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করছেন শাম্মি কাপুর, বি. সরোজাদেবী, শশিকলা, নাজির হুসেন, ধুমল, শাম্মি ও জনি ওয়াকর। এইচ. কে. রবি-প্রযোজিত এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক কল্যাণজী-আনন্দজী।

সঙ্গীত-পরিচালক ও. পি. নায়ার সম্প্রতি পাঁচটি গান গ্রহণ করলেন শক্তি সামন্তের রঙিন ছবি 'কাশ্মীর কী কলি'র জন্য। গানগুলি ছবিতে গৃহীত কাশ্মীর বহির্দৃশ্যে। কণ্ঠদান করেছেন মহম্মদ রফি ও আশা ভোঁসলে। রঞ্জন বসুর কাহিনী অবলম্বনে সংলাপ লিখেছেন রমেশ পন্থ। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন শাম্মি কাপুর, শর্মিলা ঠাকুর, প্রাণ, নাজির হুসেন, মদনপুরী, পদ্মাদেবী ও মৃদুলা।

পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় বেনারস-বহির্দৃশ্য শেষ করে ফিরেছেন। এস. জে. ফিল্মসের 'সাঁঝ আর সবেরা' চিত্রের প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন মীনাকুমারী, সুনীল দত্ত, মেহমুদ ও মনমোহন কৃষ্ণ। এ ছবির চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর-জয়কিষণ।

ডিলাক্স ফিল্মসের নতুন ছবিটি (নামকরণ হয়নি) পরিচালনা করছেন নরেন্দ্র সুরী। মোহন সেগলের প্রযোজনায় ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে মোহন স্টুডিওয়। সুধেন্দু রায়ের শিল্পনির্দেশনায় আলোকচিত্র গ্রহণ করছেন এম. এন. মলহোত্রা। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন বিশ্বজিৎ ও ওয়াহিদা রহমান। সঙ্গীত সুরসৃষ্টি করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

মাদ্রাজ

ভেনাস চিত্রের কৃষ্ণমূর্তি একটি রঙিন ছবির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রধান চরিত্রে রূপ দেবেন বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার। শঙ্কর-জয়কিষণ এ ছবির সঙ্গীত-পরিচালক। ছবিটি পরিচালনা করবেন টি প্রকাশ রাও।

—চিত্রদূত
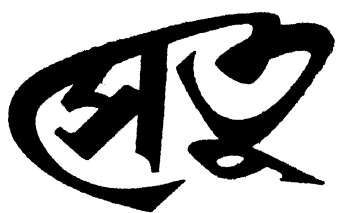
মৃণাল সেনের নতুন ছবি 'প্রতিনিধি'র প্রথম দিনের দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে পরিচালক শ্রীসেন অনুপকুমারকে নির্দেশ দিচ্ছেন

শ্বশুর প্রিয়লালবাবু সে বছর সাবজজি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি ফেঁদেছেন কলকাতায়। প্রিয়বাবুর কাছেই টুটুল বড় হতে লাগলো। বাসন্তীর নাকি কোন অধিকার নেই। প্রিয়বাবু সে কথা বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাধ্য হয়ে বাসন্তী বাপের বাড়ি ফিরে এলো। লম্বা-লম্বা পা ফেলে কয়েকটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে ডিগ্রী পেল।

প্রিয়বাবুর সংসার থেকে একদিন বাসন্তী সত্যিই গেলো হারিয়ে। এমন কি তার স্মৃতির ঘটলো অপমান। নিজের পায়ে দাঁড়াতে টাকা-রোজগারের জন্য পথে নেমে পড়লো বাসন্তী। মাস্টারি নিয়ে চলে গেলো সে অন্যত্র। হারানো স্মৃতির মৃত্যু ঘটলো। বাসন্তী আবার নতুন করে জীবন শুরু করে।

টুটুল তখন ছ'বছর পেরিয়ে গেছে। আজকাল সে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ডিল-নোঙর খেলে। মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বাসন্তী আসতো দেখতে। টুটুল বাসন্তীকে ভাসা ভাসা চিনে ফেলেছিল। যদিও তাকে মা না বলে 'ছোট-বউ' ডাকতো। মাস্টারি নেবার পর প্রিয়বাবুকে বাসন্তী একটা চিঠি লিখেছিলো, টুটুলকে চেয়ে। প্রিয়বাবু স্পষ্ট লিখে ছিলেন, 'যে-মেয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর বিপথগামিনী হয়, তার সঙ্গে স্বামীর পরিবারের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। টুটুল তাঁদের ছেলে, তাঁদের বংশধর, তাঁদের কুলপ্রদীপ। তার ওপর বাসন্তীর কোন অধিকার নেই। মাইনে-করা সামান্য শিক্ষয়িত্রী হিসেবেও নয়। সে মা নামের অযোগ্য। টুটুল জানে, তার মা কবে মারা গেছে।' চিঠিটা মুড়ে রাখতে-রাখতে বাসন্তী মনে-মনে হাসলো। এতোতেই এত. তবু সে নীরেনকে বিয়ে করেনি।

নীরেনের সঙ্গে বাসন্তীর আলাপ হয়েছিল গিরিডিতে। কলকাতায় তার বিরাট ব্যবসা। সংসারে সে একা। তার বাবার বিস্তীর্ণ ব্যবসার সে একক উত্তরাধিকারী। নীরেনকে ভাল লেগেছিল বাসন্তীর। মাঝে মাঝে চিঠির মধ্যে তাদের উপস্থিতি থাকতো। হঠাৎ কে শ্বশুরের চিঠিতে বাসন্তীর মনে হল যেন বহু ঢেউ ঠেলে প্রথম পেল মৃত্তিকার আশ্রয়। বাঁচতে তাকে হবেই রোদের মত, বৃষ্টির মত, বসন্তের মত বাসন্তী যেন নতুন। তৎক্ষণাৎ নীরেনকে চিঠি দিল : 'তাড়াতাড়ি চলে এসো, আমি রাজি।'

বাসন্তী নিরঞ্জনকে কথা দিল তাদের বিয়ে হল। তবে সাধারণ ভাবে তেমন উৎসব করে নয়। আইনের সঙ্গে মেনে তারা এক হল। কলকাতায় ফি নীরেনের বিরাট বাড়ীতে একা হাঁফিয়ে উঠলো বাসন্তী। নীরেন শুধু কাজ নিয়েই ডুবে থাকে। অর্থ তাকে পাগল করে তুলেছে। বাসন্তী বুঝিয়ে পেরে ওঠে না! বাধ্য হয়ে হারানো স্মৃতি থেকে টুটুলকে সে কোলে তুলে নিল। টুটুলের জন্মদিনে বাসন্তী শ্বশুর... গেল কয়েক যুগ পর। টুটুল এখন বড় হয়েছে, স্কুলে পড়ে। বাসন্তীকে চিনতে পেরেছে। মায়ের মুখ কি সহজে ভোলা যায়! প্রিয়বাবু বাসন্তীকে অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত টুটুলকে বাসন্তী জয় করলো। টুটুল এখন তার মায়ের কাছে থাকে। হঠাৎ বাসন্তীর ... পরিবর্তনে নীরেন ক্ষেপে উঠলো। পরের ছেলেকে নিয়ে মাতামাতি তার সহ্য হয় না। টুটুলকে পেয়ে নীরেনের কাছ থেকে অনেক দূরে যেন সরে গেছে বাসন্তী। আগের মত আর সে সহ্য করতে পারে না নীরেনকে। বর্তমানে তার ব্যব... বাসন্তীকে দুঃখ দিত। সংসারে মা... মালিন্য আরম্ভ হল। বাসন্তী-নীরেন ভালবাসা হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল টুটুলকে নিয়েই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। সমাজের চোখে এর বিচার কি জানি না তবে একটা নিষ্পাপ শিশুর ভবিষ্যৎ কতটুকু সুখের হবে তা এই সমস্যার কাহিনী-নাট্যে আভাস আছে। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের 'প্রচ্ছদপট' অবলম্বনে 'প্রতিনিধি'র চিত্রকাহিনী-নাট্য

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স-এর নবতম কমেডি 'দি ম্যারেজ গো রাউন্ড'-এ সুসান হেওয়ার্ড, জেমস্ ম্যাসন ও জুলি নিউমার

করেছেন মৃণাল সেন। শ্রীসেনের পরিচালনায় টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় এ ছবির দৃশ্যগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। বাসন্তী ও নীরেনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন মাধবী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কলাকুশলী বিভাগে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন চিত্রগ্রহণে শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনায় গঙ্গাধর নস্কর, সুরে শৈলেন গাঙ্গুলী ও শিল্প-নির্দেশনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত। প্রিয়বাবুর চরিত্রে রয়েছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্য দুটি মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন অনুপকুমার ও জহর রায়।

—চিদানন্দ

ফিলিপ অ্যালফোর্ড-এর অভিনয়ও এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ। আর শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশনার জন্যও আরো দুটি পুরস্কার এই ছবিকে দেওয়া হয়েছে।

।। স্যামি গোয়িং সাউথ ।।

গত ১৮ই মার্চ লণ্ডনের ওডিয়ন থিয়েটারে 'স্যামি গোয়িং সাউথ' ছবিটি সাড়ম্বরে মুক্তিলাভ করেছে। মুক্তির দিন রাণী এলিজাবেথ এবং রাজমাতা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন। ইলিং স্টুডিওর কর্ণধার এবং বর্তমান চিত্রটির প্রযোজক স্যার মাইকেল ব্যালকন ছবিটিকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা বলে ঘোষণা করেছেন। একটি পিতৃমাতৃহীন বালকের পোর্ট সৈয়দ থেকে ডারবান প্রায় পাঁচ হাজার মাইল অভিযান-কাহিনীর মূল উপাদান। উগাণ্ডা, কেনিয়া এবং টাঙ্গানাইকার বহির্দৃশ্য এই ছবির একটি আকর্ষণীয় সম্পদ। বারো বছরের 'স্যামি'র ভূমিকায় অভিনয় করেছে ফেরগুস ম্যাকলেল্যান্ড। এডওয়ার্ড জে রবিন্সনকেও একটি ভূমিকায় দেখা যাবে।

'স্যামি গোয়িং সাউথ'এর পরিচালক হলেন স্যান্ডি ম্যাকেন্ড্রিক।

॥ যোসেফ কনরাডের উপন্যাস চিত্রায়িত ॥

কনরাডের বিখ্যাত উপন্যাস 'লর্ড জিম' অবলম্বনে একটি ছবি পরিচালনা করছেন রিচার্ড ব্রুকস। লর্ড জিম-এর ভূমিকায় অভিনয় করবেন পিটার ওটুল। পিটার আসলে রঙ্গমঞ্চেরই অভিনেতা। এ বছরও ওল্ড ভিক রঙ্গমঞ্চে লরেন্স অলিভিয়ারের 'ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানীর' অভিনেতা হিসেবে 'হ্যামলেট'-এর ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

—চিত্রকূট

।। অস্কার পুরস্কার ।।

১৯৬৩'র শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে অস্কার পেলেন এবার জনপ্রিয় অভিনেতা গ্রেগরী পেক ইউনিভার্সাল ইণ্টারন্যাশনালের ছবি 'টু কিল এ মকিং বার্ড' ছবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের জন্যে। হার্পার লী'র—নিগ্রো সমস্যা নিয়ে লেখা এই নভেলটিও ইতিপূর্বে আমেরিকার বিখ্যাত পুলিৎসার পুরস্কার লাভ করেছে। এই ছবিতে গ্রেগরী পেককে ছোট শহরের এক আইনজীবী 'অ্যাটিকাস ফিঞ্চ'এর ভূমিকায় দেখা যাবে। ইতিপূর্বে যে সব চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন তার থেকে এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এছাড়া দুটি নতুন শিশু অভিনেতা অভিনেত্রী মেরি ব্যাধাম এবং

খেলাধুলা

দর্শক

বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে অনুষ্ঠিত ২৭তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীন গতবারের মত (১৯৬১) এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল রেখেছে। ১৯৬১ সালের ২৬তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রজাতন্ত্রী চীন পুরুষদের দলগত বিভাগে সোয়েথলিং কাপ এবং জাপান মহিলাদের দলগত বিভাগে কোর্বিলোন কাপ জয় করেছিল। ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি অনুষ্ঠানে প্রজাতন্ত্রী চীন এবং জাপান দুটি করে অনুষ্ঠানে জয়ী হয়েছিল; পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিল প্রজাতন্ত্রী চীন এবং জাপান পেয়েছিল পুরুষদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস। বাকি মহিলাদের ডাবলস ফাইনালে চীনকে পরাজিত ক'রে রুমানিয়া ইউরোপের মান-সম্ভ্রম কোন রকমে রক্ষা করেছিল।

আলোচ্য ২৭তম প্রতিযোগিতায় মহিলাদের দলগত বিভাগের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী জাপান ৩—০ খেলায় রুমানিয়াকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি চতুর্থবার কোর্বিলোন কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে। এই নিয়ে জাপান ৮ বার প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রে কোর্বিলোন কাপ পেল ৬ বার (১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬১ ও ১৯৬৩)। জাপান বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ১৯৫২ সালে।

পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে গতবারের (১৯৬১ সাল) বিজয়ী প্রজাতন্ত্রী চীন এবং রাণার্স আপ জাপান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং চীন ৫—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার সোয়েথ[লিং কাপ] জয়ের গৌরব লাভ করে। উল্লেখযোগ্য যে, জাপান ... প্রতিযোগিতায় ৮ বার যোগ[দান করে] সোয়েথলিং কাপ পেয়েছে ... মোট ৫বার (১৯৫৪—৫৭) এ[বং] (১৯৬১ ও ১৯৬৩) রা[ণার্স আপ] হয়েছে। একই বছরে সোয়েথ[লিং] এবং কোর্বিলোন কাপ জয়ে[র] সম্মান লাভ করেছে ৩ বার ... ১৯৫৭ ও ১৯৫৯)। প্রতি[যোগিতার] ইতিহাসে মাত্র একবার ... পেয়েছে আমেরিকা, ১৯৩৭ ...

ব্যক্তিগত বিভাগের মোট ... খেতাবের মধ্যে জাপান পেয়ে[ছে] ... এবং প্রজাতন্ত্রী চীন দুটি।

প্রতিযোগিতায় মোট সা[তটি অনু]ষ্ঠানে জাপানের জয় চার এবং চীনের জয় তিন। জাপান মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ন ব্যক্তিগত বিভাগের মহিলাদের ... ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবল[স] ... অপরদিকে প্রজাতন্ত্রী চী[ন] পুরুষদের দলগত চ্যাম্পি[য়ন] ... ব্যক্তিগত বিভাগের পুরু[ষদের] ... এবং ডাবলস খেতাব। ... মহিলাদের খেলায় এ[বং] ... পুরুষদের খেলায় এ ... করেছে।

ভারতবর্ষের খেলা

ভারতবর্ষ পুরুষদের দল[গত] এবং ব্যক্তিগত বিভাগের কয়ে[কটি অনু]ষ্ঠানে যোগদান করে। পুরুষ[দের দলগত] বিভাগের ডি গ্রুপে খেলে ... চতুর্থ স্থান পায়। এই গ্রু[পে] শীর্ষস্থান পেয়েছিল জাপান ... খেলায় ভারতবর্ষের জয় ৩ এ[বং পরাজয় ৩]। খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

জয় (৩) : ভারতবর্ষ ৫— ... দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে, ৫ ... হল্যান্ডকে এবং ৫— ... পোল্যান্ডকে পরাজিত ক[রে]।

পরাজয় (৩) : আমেরিকা ৫ ... জাপান ৫—০ খেলায় এ[বং] ... ৫—০ খেলায় ভারতবর্ষ[কে পরাজিত] করে।

কোর্বিলোন কাপ

১৯৬৩ সালের ২৭ ... যোগিতায় যোগদানকারী ... চারটি গ্রুপে ভাগ ক'রে ... প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা ... একদিকের সেমিফাইনালে ... চ্যাম্পিয়ান জাপান ৩—০ ... গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী[কে পরাজিত] করে: অপর দিকের ... এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান রুমা[নিয়া অপ্রত্যা]শিতভাবে ৩—২ খেলায় ... রাণার্স-আপ এবং এবা[রের] ... চ্যাম্পিয়ান প্রজাতন্ত্রী চীন[কে] ...

জাপানের প্রখ্যাত মহিলা টেবল টেনিস খেলোয়াড় এস নারাহারা কলম ধরার ভঙ্গিতে ব্যাট ধরে খেলছেন। ১৯৫২ সালে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় নিশিমুরার সহযোগিতায় মহিলাদের ডাবলস খেতাব পান

করে। রুমানিয়ার বিপক্ষে এই সেমি-ফাইনাল খেলায় গতবারের মহিলাদের বিশ্ব সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান চুরি চাং-হুই (প্রজাতন্ত্রী চীন) দুবার পরাজিত হন। রুমানিয়ার মারিয়া আলেকজান্ড্রু ২১—৯, ২১—৭ পয়েন্টে এবং ইলা কনস্টান্টিনেস্কু ২১—১৬, ৯—২১, ২১—১৯ পয়েন্টে তাঁকে পরাজিত করেন। ইলা কনস্টান্টিনেস্কু (রুমানিয়া) কুমারী অবস্থায় (ইলা জেলার) পাঁচবার বিশ্ব খেতাব পেয়েছিলেন। আলোচ্য সেমিফাইনাল খেলায় রুমানিয়া ২—০ খেলায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু পরবর্তী দুটি খেলায় (ডাবলস এবং সিঙ্গলস) প্রজাতন্ত্রী চীন জয়লাভ করে খেলার ফলাফল সমান ২—২ দাঁড় করায়। শেষ সিঙ্গলস খেলায় প্রজাতন্ত্রী চীনের চাং-হুই (১৯৬১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান) পরাজিত হলে রুমানিয়া ৩—২ খেলায় জয়লাভ করে ফাইনালে ওঠে।

ফাইনালে জাপান ৩—০ খেলায় রুমানিয়াকে পরাজিত করে। ১৯৫৭ সালের ফাইনালেও জাপানের হাতে রুমানিয়া পরাজয় স্বীকার করেছিল। এছাড়া ১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালের ফাইনালে জাপান কোর্বিলোন কাপ পেয়েছিল প্রজাতন্ত্রী চীনকে পরাজিত করে।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জাপান এবার অপরাজেয়র অবস্থায় কোর্বিলোন কাপ পেল।

সোয়েথলিং কাপ

১৯৬৩ সালের ২৭তম প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা বেশী হওয়াতে খেলায় যোগ্যতা অনুযায়ী পুরুষদের দলগত বিভাগের খেলা ভাগ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলিকে। প্রাথমিক পর্যায়ের লীগের খেলায় প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ মূল প্রতিযোগিতার লীগের খেলায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। এই পর্যায়ের লীগের খেলায় ৪টি গ্রুপ ছিল। প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশকে নিয়ে সেমি-ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়। ফাইনালে প্রজাতন্ত্রী চীন ৫—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি দুবার সোয়েথলিং কাপ পেল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য প্রতিযোগিতায় জাপান সেমিফাইনাল পর্যন্ত অপরাজেয় ছিল।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

লীগের খেলা

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : প্রজাতন্ত্রী চীন
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : পশ্চিম জার্মাণী
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : সুইডেন
গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান : জাপান

গিজি ফার্কাস (হাঙ্গেরী): বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সিঙ্গলসে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৭—৪৯) খেতাব পান। রাণার্স-আপ হ'ন ১৯৫০-৫১ সালে। ১৯৪৭ ও ১৯৪৯ সালে মহিলাদের ডাবলস এবং ১৯৪৭, ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে মিক্সড ডাবলস খেতাব পান

সেমিফাইনাল

জাপান ৫ : সুইডেন ০
প্রজাতন্ত্রী চীন ৫ : পঃ জার্মাণী ১

ফাইনাল

প্রজাতন্ত্রী চীন ৫ : জাপান ১

ব্যক্তিগত বিভাগ

ব্যক্তিগত বিভাগের খেলায় পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে জাপান তিনটি এবং প্রজাতন্ত্রী চীন দুটি অনুষ্ঠানে খেতাব লাভ করে। ফাইনালে ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত দেশ ছিল মাত্র দুটি—মহিলাদের সিঙ্গলসে রুমানিয়া এবং মহিলাদের ডাবলসে ইংল্যান্ড। পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস ফাইনালে চীন ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলোয়াড় ছিল না। তেমনি মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে ছিল কেবল জাপানের খেলোয়াড়রা। মহিলাদের সিঙ্গলস এবং ডাবলসের বিজয়ী জাপানের বিপক্ষে খেলেছিল যথাক্রমে রুমানিয়া (সিঙ্গলস ফাইনালে) এবং ইংল্যান্ড (ডাবলস ফাইনালে)। কোন অনুষ্ঠানের ফাইনালে জাপান এবং প্রজাতন্ত্রী চীনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। মিক্সড ডাবলসে এইবার নিয়ে জাপান উপর্যুপরি চারবার খেতাব পেল।

গতবারের (১৯৬১) চ্যাম্পিয়ন জাপানের ইচিরো ওগিমুরা এবং কিমিও মাৎসুজাকী চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় প্রজাতন্ত্রী চীনের খেলোয়াড়দের কাছে পরাজিত হন। ইচিরো ওগিমুরা এবং ফুজি এগুচি (জাপান) উপর্যুপরি দুবার (১৯৫৭ এবং ১৯৫৯) মিক্সড ডাবলস খেতাব পান। ১৯৬১ সালে ইচিরো ওগিমুরা মিক্সড ডাবলস খেতাব পেয়েছিলেন মাৎসুজাকীর সহযোগিতায়। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে গত বারের (১৯৬১) দুজন খেলোয়াড়ই খেলেছিলেন এবং গত বারের বিজয়ী এবারও জয়লাভ করেছেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিঙ্গলস : চুয়াং সে-তুং (প্রজাতন্ত্রী চীন) ২১-১৬, ২১-১৫, ১০-২১, ২১-১৮ পয়েন্টে লি ফু জাংকে (প্রজাতন্ত্রী চীন) পরাজিত করে উপর্যুপরি দুবার খেতাব পান। গত বারের ফাইনালেও লি ফু জাং রাণার্স-আপ হয়েছিলেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১৯৫৯ সালের বিজয়িনী কিমিয়ো মাৎসুজাকি